॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৪ বর্ষ ১৩৭৩

(১ সংখ্যা থেকে ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত)

— অ —

— আ —

— ই —

— এ —

— ও —

— ক —

— খ —

— গ —

— ঘ —

— চ —

— ছ —

— জ —

— ট —

— ড —

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

খাবার বাঁচে

সময় বাঁচে

জ্বালানী খরচ বাঁচে

সমস্ত ভিটামিন বজায় থাকে

খাবার সুস্বাদু হয়

খাবারের চেহারা হয় লোভনীয়

অপ্রত্যাশিত অতিথি কোন সমস্যাই নয়

পূর্ব ভারতের জন্য আঞ্চলিক ডিস্ট্রিবিউটর
আর চম্পকলাল অ্যান্ড কোং.
২৩ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমাদের নববর্ষ

দেশ পত্রিকা চৌত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করল। বাংলা দেশে সাময়িক পত্রিকা সাধারণত পরিমিত আয়ু নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে। সাহিত্যের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে প্রয়োজনের তাগিদেই এক-একটি পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। যখন সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তার আয়ুও শেষ হয়। শুধু প্রাণধারণের জন্য বেঁচে থাকা কোনো পত্রিকার পক্ষেই গৌরবের নয়। দেশ পত্রিকার ভাগ্য সে-দিক থেকে ভালো।

মানুষের জীবনের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তাহলে চৌত্রিশ বৎসরের যৌবনকাল দেশ পত্রিকার জীবনেও একটি গৌরবময় অধ্যায়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার সম্মান একমাত্র দেশ পত্রিকাই লাভ করেছে, অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন ও প্রেস রেজিস্ট্রারের ঘোষণায় এই মর্যাদা স্বীকৃত। কিন্তু আমরা জানি আমাদের এই সাফল্যের পশ্চাতে আছে এই পত্রিকার পাঠকদের সম্প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা। দেশকে তাঁরা প্রীতি ও মমতা দিয়ে সর্বদা লালন করে এসেছেন, এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁরাও একাত্ম হতে পেরেছেন বলেই নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও একে তাঁরা বর্জন তো করেনই নি, উপরন্তু একে বেড়ে ওঠায় ও বড় হয়ে ওঠায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা কর্তব্যে যখনই বিচ্যুতি ঘটেছে তাঁরা সস্নেহে সচেতন করে দিয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা ও বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতামত সম্পর্কে সমালোচনাপূর্ণ বহু চিঠি পাঠকদের কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তিরস্কারও যে পাই না তা নয়। কিন্তু পাঠকদের সেইসব চিঠির মধ্যে যে আন্তরিকতা ও পত্রিকার প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয় পাই তার মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম।

কোনো দলগত রাজনীতি বা কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রভাব থেকে দেশ পত্রিকা সর্বদাই নিজেকে মুক্ত রেখেছে। মানুষের স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত চিন্তার সবগুলি অর্গল যাতে উন্মুক্ত রাখা যায় আমাদের পত্রিকার নানা বিভাগ ও বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে সেই চেষ্টাই আমরা করে এসেছি। কিন্তু দেশ যখন শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন হয়েছে তখন পত্রিকা সেই শত্রু প্রতিরোধে সংগ্রামীর ভূমিকা নিতে কুণ্ঠিত হয় নি—সে-শত্রু বাইরের হোক অথবা ভিতরের।

লেখকদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। দেশ পত্রিকার প্রতি তাঁদের মমত্ব আপন রচনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের পাঠক খুঁজে পেয়েছেন, পাঠক সৃষ্টিও করেছেন। এ-কথা আজ আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, এই পত্রিকার পাঠকভাগ্যের সঙ্গে লেখকভাগ্য সমভাবেই যুক্ত হতে পেরেছে বলে পত্রিকা আজ এই সম্মানের অধিকারী হবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছে।

দেশ পত্রিকার চৌত্রিশ বৎসরের সাফল্যমণ্ডিত যাত্রাপথে আরেক পক্ষের সক্রিয় সহযোগিতার কথা আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁরা হলেন এই পত্রিকার অগণিত বিজ্ঞাপনদাতা। মাঝে মাঝে পত্রিকায় অত্যধিক বিজ্ঞাপন দেখে কোনো কোনো পাঠক অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগ জানান। একটি কথা তাঁদের বিবেচনা করবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিজ্ঞাপনই হচ্ছে যে-কোনো স্বাধীন মতাবলম্বী পত্রিকার মেরুদণ্ড। পত্রিকার মহৎ আদর্শকে আমরা প্রদীপের আলোর সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকি। কিন্তু বিজ্ঞাপনের সলতে না জ্বললে আদর্শও বাঁচে না, প্রদীপের আলোও নিভে যায়।

নববর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এতক্ষণ নিজেদের সাফল্য আর গৌরবের কথা বলতে গিয়ে ভবিষ্যতের কথা আমরা বিস্মৃত হই নি। আত্মশ্লাঘা যেন আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে, আপাত সাফল্যের নিশ্চিন্ততায় আলস্য যেন আমাদের নিষ্ক্রিয় করে না রাখে। ভারতের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার প্রচার সংখ্যার তুলনায় আজও আমরা পিছনে পড়ে আছি। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবার পর আমাদের পাঠকদের একটি বৃহদংশ আমাদের হারাতে হয়েছে। তবু আমাদের সংকল্প—হচ্ছে পত্রিকার মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা ভারতের যে-কোনো ভাষার সাময়িক পত্রিকার প্রচারসংখ্যার সমতুল্য হতে পারব। আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের সহায়তাই আমাদের এই সংকল্পকে কাজে পরিণত করবে।

কোনো মৌলিক প্রশ্নের জবাব নাসের-টিটো-ইন্দিরা বৈঠকের কাছ থেকে পেশাদার প্রচারকরা ছাড়া আর কেউ আশা করে নি। সুতরাং সেদিক দিয়ে আশাভংগের কোনো কারণ নেই। তবে বলা যায় যে, ছোটোখাটো লাভ যদি কারো কিছু হয়ে থাকে তাও ভারতবর্ষের হয় নি। যুক্ত বিবৃতিতে প্যালেস্টাইনের. আরবদের অধিকার সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তাতে যদি কোনো লাভ হয়ে থাকে তবে সেটা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের. যদিও ইজরেলকে একটু চটানো ছাড়া এর আর কোনো বাস্তব মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। তবে প্রেসিডেন্ট নাসের এটাকে একটা ব্যক্তিগত সাফল্য বলে ধরতে পারেন। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রকে খুশী করার জন্যে ইজরেলকে একটা খোঁচা মারার প্রতিদান হিসাবে যদি ভারত সরকার আশা করে থাকেন যে, ভারতের মন যাদের কার্যকলাপে বিশেষভাবে বিরক্ত তাদের কারো সম্বন্ধে সম্মেলন একটু বিরাগের ভাব দেখাবে তা হলে তাতে সে আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হয় নি। বরঞ্চ উল্টাই হয়েছে। কারণ যুক্ত বিবৃতিতে চীনের অপ্রসংশার কোনো কথা তো নেইই, উপরন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চীন সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট নাসের যা যা বলেছেন তা সবই চীনের পক্ষ টেনে।

এর ফলও সংগে সংগে দেখা গেছে। নয়া-দিল্লি বৈঠকের কয়দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট টিটো ও শ্রীমতী ইন্দিরাকে পিকিং নাম করে, গালাগাল দিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে কিছু বলে নি।

নূতন দিল্লিতে নাসের-টিটো-ইন্দিরা বৈঠক এবং জনসন-এর ম্যানিলা বৈঠক প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু অনেকটা বিপরীতধর্মী হলেও একটা অপরটার চ্যালেঞ্জ হিসাবে হয় নি। চীনের নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষার এই উভয় কনফারেন্সের সমসাময়িক হওয়াটা কিন্তু আকস্মিক বলে মনে হয় না। সে আলোচনা আগামী সপ্তাহের জন্যে থাকল।

৩০।১০।৬৬
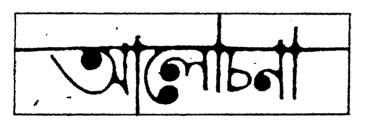
লর্ড কার্জনের পাৎলুন

২১শে আশ্বিন তারিখের 'দেশে' শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র'-এ লর্ড কার্জনের পাৎলুন অন্তর্ধান রহস্য পড়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। পাদটীকায় ডঃ আলী জানিয়েছেন যে, এ কাহিনী যাঁর কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন তাঁর মতে লীটন স্ট্রাচী এই কাহিনী প্রথম লিপিবদ্ধ করেন।

আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি স্ট্রাচীর সব লেখাই পড়েছি, কিন্তু এ লেখাটি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। তবে হ্যারল্ড নিকলসনের লেখা এই কাহিনী অনেকদিন আগে পড়েছি। ভ্যালেটির নাম ছিল Aerenthal (বানান ভুল হতে পারে); সে ছিল অতিমাত্রায় পানাসক্ত এবং তার অন্তর্ধানের পরে লর্ড কার্জনের পাৎলুনগুলোও পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেগুলো পাওয়া যায় অবিন্যস্ত অবস্থায় কার্জনের খাটের তলা থেকে।

নিকলসন সাহেব তখন পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করতেন এবং ঘটনার সময়ে কার্জনের সংগে ছিলেন। তাঁর লেখা কাহিনীর সংগে আলী সাহেব বর্ণিত ঘটনাবলীর detail-এ কিছু কিছু ফারাক আছে। সত্যান্বেষীরা হয়তো নিকলসনের লেখাকে প্রাধান্য দেবেন, কিন্তু এ রকম লেখাতে সত্যের চেয়ে রসের প্রাধান্য অনেক বেশী, এবং আলী সাহেব এই লেখায় রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

সত্যব্রত ঘোষ
কলিকাতা-২৬।

ছাত্র উচ্ছৃংখলতা

চলতি সপ্তাহে (৪৯ সংখ্যায়) সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'ছাত্র উচ্ছৃংখলতা' প্রবন্ধ পাঠ করে তৃপ্ত হলাম। বড়ই সময়োপযোগী এবং যুক্তিসংগত হয়েছে। সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ।

ছাত্র ইউনিয়ন ভাল কিন্তু তখনই সেটা দূষিত যখন তৃতীয় পক্ষ আবির্ভূত হয়ে রাজনীতির রংগে ছোপান অ্যাপ্রোনটি ইউনিয়নের গায়ে চাপিয়ে দেয়। ছাত্র সমাজ শিক্ষাভবন ত্যাগ করে যখন বিধান ভবন অভিমুখে দৃষ্টিপাত করে—তখন দেশের ও সমাজের সমূহ ক্ষতি। আজ যে ছাত্র ভবিষ্যতে সে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শিক্ষার বাতি নিবিয়ে রাজনীতির রঙিন আলো দেখার ফলে ভবিষ্যত সমাজ অন্ধকারে যাচ্ছে। ছাত্রদের সুপরিচালিত করার দায়িত্ব যৌথ। অভিভাবকেরা একাজে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না নিশ্চয়ই।

অমৃত মল্লিক
চিত্তরঞ্জন।

॥ অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন ॥

সাহিত্যের সংসারে লেখকের স্থৈর্যের প্রয়োজন পাঠকের চেয়ে অনেক বেশী। শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ-গুলিতে শুধুমাত্র ভুল তথ্য পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হন নি, তার লেখা প্রতিবাদ পত্রগুলির মধ্যে তাঁর মনের তমোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। বহুবারই তাঁর প্রবন্ধের ভুল সুধী পাঠকবর্গ ধরেছেন। কিন্তু তিনি তাতে লজ্জিত না হয়ে কালো মুখ তুলেই আস্ফালন শুরু করেছেন। এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র তাঁর নিজের কলংক ডেকে আনে না, সমস্ত বিজ্ঞানী সমাজের কলংকসূচক। তাঁর এই তমসায় পেছনে কারণ আছে। শ্রী মুখোপাধ্যায় একজন মনীষী নন, যে সব শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি জীব বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক মাত্র। তিনি যদি ভাবতে চান যে তাঁর সীমিত জ্ঞান নিয়ে সব ব্যাপারেই মাস্টারী করবেন তবে তো ভুল করবেনই। তাঁর সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় তিনি তাঁর নিজের Subject-এর বাইরে লেখা বন্ধ করুন, না হলে তাঁর প্রবন্ধের ভুল ত্রুটির জন্য দোষ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকুন।

অশিক্ষিত লোকের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করা যায় —কিন্তু শিক্ষিত লোকের ওসব জিনিসের কড়া শাসন দরকার।

শিশির নিয়োগী
বিই এমই (পি এইচ)
কলকাতা

ত্রিলোচন কলমচি

> ত্রিলোচন কলমচি বেনামীতে এক শক্তিমান লেখক। বাঙলার বিভিন্ন শহর ও উপনগরের উপেক্ষিত মানুষদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার কথা প্রতি সপ্তাহে আমাদের জানাবেন।

প্রস্তাবনা

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠলাম! আমার চোখের সামনের এই মানুষটি কে? আমার দিকে যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখখানা চেনাচেনা। জুলপির কাছে গেটিকতক চুলে পাক ধরেছে, চিবুকের কাছে ফুটিয়ে-আসা পিনকুশনের মত ঝকঝকে আলপিনের কয়েকটি ফুটকি। কপালে পেন্সিলের কয়েকটি গভীর রেখা। আমার দিকে ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে কে এই লোকটা? হোমের তিলকের মত, "ঝরে যাওয়া মৌসুমী ভুরুর শেষ ভস্মরেখা, চোখের ওপরে আঁকা। হাইপাওয়ারের আইগ্লাসের ওপিঠে দুটি মজঃফরপুরী ছাড়ানো লিচু।

লোকটির চরিত্র সম্বন্ধে ভাবতে চেষ্টা করলুম, মুখ দেখে অনেক রকম সন্দেহও হল। হঠাৎ মনে হল এ তো আমি! আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনী উঠল রাঙা হয়ে। কিন্তু আমার চেহারা তো বদলালো না। ভেতরে ভেতরে আমি যে মানুষটি, যে প্রবৃত্তির পাণ্ডুলিপিতায় জ্বলছি, যে বয়সে, যে স্মৃতির সংসারে, যে অভিজ্ঞতায় এবং মনে মনে যে চেহারায় আছি—এই অর্ধপ্রৌঢ় উন্মাদতুল্য মূর্তিটির মুখে তো তার কোনোই আগমার্ক নেই! আমার নাম মনে পড়লো, পদবী—সংগে সংগে শিউরে উঠলাম। অনিচ্ছায় বয়ে বেড়ানো নিজের ছায়ার মত নিজের এই পরিচিতি এই কি আমি চেয়েছিলাম? আমার সুদূর পূর্বপুরুষ কোন্ রাজসভায় বসে উচ্চাংগ সংগীতে ঠেকা দিয়েছেন জানি না, কিন্তু শতাব্দীকাল পরেও সেই মসীকলংকচিহ্ন নিজের পদবীতে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। মানুষ হিসেবেও আমি যে তেচোখো কিংবা পদাধিক্যে বাধক্য এমন নয়, তবু আমি ত্রিলোচন। অবিশ্যি এই বদনামে আমার আখেরে কিছু এসে যায় না। এই বহু চোখোমিতে আমার কিছু মূল্যবৃদ্ধি কিংবা ডিভ্যালুয়েশন ঘটবে না।

তবু মনের ভেতরের অস্বস্তি যাবার নয়। এত নিকটের এত অন্তরংগ মুখও বিমুখ হল! ভয় পেলাম। নিকট যখন দূর হয়ে যায় এমনিই ভয় লাগে। তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ফিরে এলাম। সেই মাতালের ঘটনা মনে পড়লো। মানুষ কেউ কাউকে চেনে না, এমনকি নিজেকেও না! চিৎপুরের ভিড়-ভাট্টা বাসে বিপজ্জনকভাবে ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে মাতালটি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শুধিয়েছিল, 'কনডাকটর, ভাই, আমি কি উঠেছি?'

কয়েক প্রস্থ প্রশ্নের পর জনৈক সহযাত্রী বিরক্ত হয়ে উত্তর করেছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি উঠেছেন—এবার আর একটু উঠে দয়া করে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ান।'

মাতালটি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি আমাকে চেনেন?'

লোকটি বিরক্তির গলায় বলল, 'কোনো জন্মেও না!'

মাতালের বিস্মিত কণ্ঠ এইবার সকলকে চমকে দিল, 'তা হলে কি করে বুঝলেন যে আমিই উঠেছি?' এই দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের বলাই বাহুল্য আর কোনো উত্তর হয়নি।

আমি যে আমিই, এই তত্ত্বের মীমাংসায় উপনীত হতে না পেরে শয্যাশায়ী হতে গিয়ে চমকে উঠলাম। ডবলডেকার তুল্য একটি ট্র্যাশ উপন্যাস বুকের ওপর তুলে একটি স্ত্রীলোক আমারই বিছানায় নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে আছে। কাছে গিয়ে ডাকলাম কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না। কোনো 'গুপ্ত' লেখকের সেই অমানুষিক উপন্যাসে সম্মোহিতা রুদ্ধবাক আমার স্ত্রীকে এমন অপরিচিত আর কখনো বোধ হয়নি।

কি আর করি, পেনিসিলিন ট্যাবলেটের মত এককলি রবীন্দ্রসংগীত ঠোঁটে চড়ালাম, কাছে থেকে দূর রচিলে কেন গো আঁধারে। সংগে সংগে দিব্য নেত্র (তৃতীয় লোচন কিনা জানি না) খুলে গেল। দেখলাম, অনেক নিকট আছে যা কখনোই কাছে নয়, আমরা তাকে স্পষ্ট দেখি না, অনুভব করি না; অনেক দূরবর্তী দূরের মত তা আমাদের কাছে বোধগম্য হয় না। আমাদের ঘাড়ে গা লাগিয়ে অনেক মানুষ চলছে ফিরছে শুচ্ছে, আমাদের পা মাড়িয়ে দিয়ে অনেক মানুষ ট্রামবাস থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্যাঁচ খেলার ঘুড়ির মত একবার

আইগ্লাসের ওপিঠে দুটি মজঃফরপুরী ছাড়ানো লিচু

আমারই বিছানায় নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে আছে

মাত্র পরস্পরের কাছে আসছি, সংলগ্ন হচ্ছি, হিংসায়-বিবংসায়; পরস্পরের কাছ থেকে চিরন্তরে দূরে সরে যাব বলে. অনেক আনাগোনায়, বেনোপাওনায়, দেখাশোনায় মানুষ নিয়ত মানুষের নিকটবর্তী হচ্ছে, ভূগোলের দূরত্ব কমছে, ইতিহাসের দৈর্ঘ্য বাড়ছে কিন্তু ব্যবধান ক্রমশই প্রকটতর হচ্ছে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই পরস্পরের দিকে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে আছি; টিপ-ছাপের মতই অদ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্যে। জীবনের কোনো একক নির্জনে প্রত্যেকের স্বাক্ষর আছেন।

যে যুবকটি ভেন্টিলেটারের ফোকরে এক কলতের আক্রমণীর সেজেছিল, কিংবা যে চতুর্দশী মেয়েটি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের শেষ পর্যন্ত কি হল বলতে পারেন? তারা কি একজন ট্যাক্সি চালাচ্ছে আর অন্যজন নার্সিং শিখে মাথায় হাসপাতালের ফেট্টি বেঁধেছে? ব্যর্থ প্রেমে দুনিয়া অন্ধকার দেখে যে মেয়েটি ট্রেনে কাটা পড়তে গিয়েছিল সেই কি তার সম্পূর্ণ অজানা একটি মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে না? এই তাজ্জব তামাশায় তামাম দুনিয়ার মানুষ নিরন্তর ডিগবাজি খাচ্ছে। মানুষ কোথাও স্থির নেই। দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, বার্ধক্যের দিকে, নিয়তি নাম্নী নারীর দিকে, নিরর্থকতার দিকে।

তাই কোনো মানুষ হুবহু এক নয়, দুটি নিশ্বাস কখনো এক নয়। দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বুকের ভিতরে দিক বদলাচ্ছে; দূরে কাছে মানুষ ভাঙছে—শোকে দুঃখে হতাশায় আনন্দে ভালোবাসায়—নিরন্তর মানব পতনের শব্দ হচ্ছে।

কিন্তু তবু ওরা কেউ কিছু হয়নি, অথচ সম্ভাবনা ছিল। লেজার ফাইলের নিউক্লিয়াসে মানীর মত লোয়ার কিংবা আপার ডিভিশন ক্লার্ক, টপস্পীডের স্টেনোগ্রাফার, টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের তলায় ওদের জীবনের ব্লু-প্রিন্ট নেই, কার্বন চিত্র ফোটে নি। অগণিত স্কুলঘরের মধ্যে যারা ব্ল্যাকবোর্ডে তাজা চকখড়ির মত ক্ষয়ে যাচ্ছে, খবরের কাগজের পরজন্ম ইংকে যাদের ফুসফুস কোলাপ্স করে আসছে, প্রুফ দেখতে দেখতে চোখের আলো ফুরিয়ে এল তাদের কথাই ভাবছি। কৈশোরের রূপকথা উপজীবিকার তেপান্তরে হারিয়ে গেছে কবে। সেই রাজপুত্র-কোটালপুত্রের দল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে প্রাণভিক্ষা পেয়েছে হয়ত, কিন্তু রাজকন্যার হদিস খুঁজে পায় নি নিশ্চয়।

কিংবা আর এক ধাপ ওঠা যাক। যাদবপুর-শিবপুর দৌড়োদৌড়ি করে যারা টাট্‌কা ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরিয়েছিল কিংবা হাসপাতালগুলোর ভেতর থেকে স্টেথোর মালা গলায় ঝুলিয়ে সুপারম্যানের মত যারা বেরিয়ে এল, তাদেরই বা কি হল? দূরারূঢ় পিতার অনুবর্তী হয়ে জেনারেল প্র্যাক্‌টিসে নামল, শ্বশুরের পয়সায় ডিসপেন্সারি সাজালো কিংবা সচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন করল, বাকি সবাই তো বরাদ্দ বাঁধা সরকারী বৃত্তে দোদুল্যমান অফিসার হয়ে ঝুলে বেড়াতে লাগলো। কেউ ডেপুটি, হাফ ডেপুটি, কোয়ার্টার ডেপুটি, কেউ মুন্সেফ কিংবা বি ডি ও। সদরে-মহকুমায় আমলানি-রপ্তানির জপমালায় বাঁধা।

কিন্তু তবু কেউ কিছু হয়নি। ঘোরতর সংসারী হওয়া ছাড়া। কোর্টকাছারির বটতলায় যারা শামলা পরে ব্রীফ-বগলে ঘুরে বেড়ায়, মোক্তার-মুহুরি-টাউট থেকে শুরু করে জজম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত, কেউ কিছু হয়নি। যে যা হতে চেয়েছিল হয়নি। যার স্বপ্ন দেখেছিল তার দেখা মেলে নি। কাফে রেস্তোরাঁয় অনেক রাজা উজীর বধ করেও মানুষ শেষ পর্যন্ত অসহায়। রাতভর দেওয়ালে জনতার পোস্টার এঁটেও মানুষ শেষ পর্যন্ত একলা। তার ছায়া অবশেষে ঘরের বিছানায়, তার প্রতিধ্বনি তার শ্লোগানে অতঃপর পুত্রকলত্রে বহুগুণিত সংসারের মধ্যে। ছোট চাকর থেকে বড় চাকর—পরোক্ষ চাকর থেকে ঘরোয়া চাকর—সকলেরই এক দশা। সকলেরই ফলতা বন্দনে, এবং বিফলতা ক্রন্দনে।

নাটকে-উপন্যাসে-ইতিহাসে এরা কেউ নায়ক-নায়িকা হবে না। এদের নামে রাস্তা ঘাট পার্ক রাতারাতি নাম বদলাবে না। এরা যুগে যুগে এসেছে, চলে গেছে, চিহ্ন রেখে যায় নি। এই অগণিত সাধারণ মানুষ, কাল-সমুদ্রের মাঝখানে যারা গায়ে গায়ে লেগে দ্বীপপুঞ্জ গড়ে তুলছে, তারা কিন্তু কেউ হুবহু এক নয়। এই অতি নিকটবর্তী, ঝাপ্‌সা, অবুঝ্কিয়োর মানুষের কথাই আমার কথা।

একটি মৃত্যু

ভেবেছিলো অটুট থাকবে প্রতিজ্ঞা, কিন্তু হঠাৎ
লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলো হাত দুটো,
পায়ে জাগলো দাঙ্গার উৎসাহ, উৎকট স্লোগান তার কণ্ঠে;
তার নৌকোর মাল্লারা হ'লো বিদ্রোহী, মধ্য-সমুদ্রে।

মাছেরা ভয় পেয়ে স'রে গেলো। সে টের পেলো শীত।
টের পেলো, সে এখনো কাপ্তান, জয় অনিবার্য।
অনেক উঁচুতে ঐ আকাশ, আর নক্ষত্র, এই হৃদয়েশ্বরী রাত্রি,
সব—সব বাঁধা পড়লো তার আলিঙ্গনে।

কিন্তু তার দখলে দেখে হার মানলো বিদ্রোহীরা।
ভেঙে-ভেঙে খ'সে গেলো সে, চুঁইয়ে পড়লো ছিদ্রময় ভাণ্ড থেকে;
নেমে এলো পাতালে, অন্ধকারে, ভিনদেশী অদ্ভুত আগন্তুক,
জলে আর নিঃসঙ্গতায় আরো ভারি হ'য়ে।

'সমুদ্র নয়, সুন্দরী নদীও নয়,
নেই সোনার মতো বালি, যা সোনায় ভরা সিন্দুক,
শাঁখ নেই, মুক্তো নেই, নেই কোনো স্মরণস্তম্ভ ইতিহাস:
শুধু, পাঁক, আর শামুক, আর আমোদের কঙ্কাল: রবীন্দ্র-সরোবর।

'করুণ শেলি, করুণ ওফেলিয়া,
কোনো গর্ভিণী কুমারী, কোনো কামার্ত যুবক—
কিছু নয়! এক দাঁত-পড়া লোলচর্ম বৃদ্ধ
আরো কুৎসিত হ'য়ে উঠে আসবে ডাঙায়।

'"কী আশ্চর্য! আর ক'টা দিন সবুর সইলো না?"
"কোনো অসুখ ছিলো?" "না কি ভুগছিলো অসরূপ?"
—শোনো: তোমরা যা জানো না, আমি জেনেছিলাম,
স্বাধীনতার নির্বেদ, আবশ্যিকের অত্যাচার,

'সে চেয়েছিলো ঈশ্বর হ'তে তার বাধ্যতায়
দুটো ছিলো উদ্দেশ্য সমান্তরাল:
অনন্ত কাল অনন্ত দারোগা, অনিঃশেষ, অর্থহীন পুনরাবৃত্তি,
আর মুক্তি: যখন অন্ধকার গর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ঠ করি
আমার মৃত্যুকে।

'এক সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল ভ'রে, কোনো কবির অমরতার মতো,
তিলে-তিলে, সংগোপনে যা গ'ড়ে উঠেছিলো—
সেই মৃত্যু, আমাদের শেষ সন্তান—বৈধ, কর্তব্যপরায়ণ।'

হয়তো এই ভেবেছিলো সে, তার অহমিকার কল্পনার সীমান্তে।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি
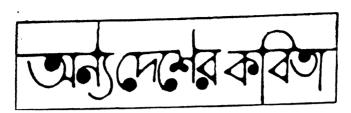
স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন লেগেছে!
সেই হলঘরগুলি
সেই সব রেখাচিত্র, সব
জায়গায় আগুন, মার্জনার চিঠির
মতন, আগুন! আগুন!

লাল-নিতম্ব গোরিলার মতন
ঐ উঁচুতে ঘুমন্ত কার্নিসে—
জানলা ভেঙে যায়, গর্জন করছে ঝাঁপিয়ে
পড়ার জন্য, আগুনে!

আমরা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য
পড়াশুনো করছিলুম, হ্যাঁ, আমাদের
উচিত, আমাদের খাতাপত্র, থিসিস
বাঁচানো! আমার গবেষণাগুলো
এর মধ্যেই ফাটতে শুরু করেছে তালাবন্ধ
সিন্দুকে—
বিরাট একটা কেরোসিনের বোতলের মতন
পাঁচটা গ্রীষ্ম, পাঁচটা শীত
হুস্ করে জ্বলে উঠলো শিখায়
হে আমার মধুর যৌবন
আর, আমরা এখন আগুনে পুড়ছি!

পরীক্ষায় টুকলি করার জন্য ছোট ছোট
কাগজে নোট, উৎসব, দল, সব গেলো
যাচ্ছে, এই যে গেলো, উঁচুতে উঁচুতে
লকলকে শিখায়—
তুমি ঐখানে রইলে, ট্যাঁপারির ঝোপে
এক ছিটে গোলাপি
বিদায়। বিদায়।

বিদায় স্থাপত্য
বিদায় আগুনের শিখায়
শিশু কন্দর্পদের ছোট ছোট গোয়ালঘর
প্রাচীন জমকালো সেভিংস ব্যাংক, তোমাদের বিদায়
হে যৌবন, হে ফিনিক্স
হে মূর্খ, তোমার সার্টিফিকেটগুলো যে
সব আগুনে পুড়ে গেল!
হে যৌবন, লাল স্কার্টের মধ্যে তোমরা
তোমাদের পেছন দোলাচ্ছো, হে যৌবন
তোমরা বকবক্ করে জিভ দোলাচ্ছো

বিদায়, সীমানার কাল,
নাপাক্লোক, জীবন এই রকম
এক জ্বলন্ত উৎসব থেকে অন্য প্রজ্বলনে
যাচ্ছো, আমরা সবাই ছাদ্দের মধ্যে—
তুমি বেঁচে আছো—তুমি আগুনে জ্বলছো!

কোনো খোলানো বল, কোনো সবুজ [illegible] উঠবে
এই আগুনে থেকে
টোসিং পেপারের একটা নিয়ে প্রথম সই করবে
দাগের মতন ছাই [illegible]

কিন্তু কাল, অশান্ত পাখির মতন কিচির মিচির করে,
তোমরার চেয়েও বেশী রাগী,
এক মুঠো ছাইয়ের মধ্যে দেখা যাবে কম্পাসটাকে
হুল ফোটাবে......

সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
বাঃ
সবাই এবার বুকে ভরে নিশ্বাস নাও।
সব কিছু শেষ?
সব কিছুর শুরু হলো
এবার চলো, আমরা
সিনেমা দেখতে যাই!

[রাশিয়ার যে তরুণ কবিকুল সাম্প্রতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাদের মধ্যে ভজনেসেনস্কি কনিষ্ঠতম, এবং এখন সমালোচকদের বিচারে, তিনিই ঐ তরুণ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। ইয়েভতুশেংকো নেতা হিসেবে প্রচুর সম্মান ও প্রচার পেয়েছেন কিন্তু শব্দজ্ঞানে ও কবিত্বে ভজনেসেনস্কিই পাঠকদের কাছে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। তাঁর বয়েস এখনো ত্রিরিশ পেরোয়নি। ১৯৬০ সালে লেখা এই কবিতাটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় করেছে, বহুদিন পর রাশিয়ার কবিতায় আবার দেখা গেলো যে অগ্নিকাণ্ডের জয়গান করা হয়েছে, ভাঙন নিয়ে উল্লাস ও ইয়ার্কি করা হয়েছে। শুধু সৃষ্টি, সংগঠন, সংঘবদ্ধতার নামে জয়ধ্বনি তোলা—যা ছিল সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সরকারী নীতি, তার বাইরে বেরিয়ে এলেন এই যুবা কবিবৃন্দ। যৌবন বয়েসের সাহিত্যে ভাঙার দিকে যাওয়াই স্বাভাবিকধর্ম—যে-কোনো দেশে।]

অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
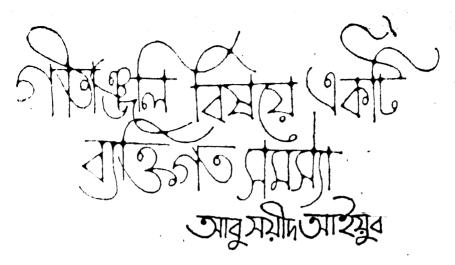
গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি (একই বইয়ের তিন খণ্ডের তিনটে নাম আলোচনার পক্ষে অসুবিধাজনক, অতঃপর বর্তমান লেখাতে সাধারণভাবে গীতাঞ্জলি বলতে গীতাঞ্জলি তিনখানা বই-ই বোঝাবে) সম্পর্কিত ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা বা গান। এর অধিকাংশ গান শুনে আমি মুগ্ধ হই, এমন কি সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতা রূপে পাঠ করলেও আমার মন গভীরভাবে সাড়া দেয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার নেই এমন কথা বলব না। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক যে-কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত। শব্দ (authority) প্রমাণ হিসেবে আমার কাছে একেবারে অগ্রাহ্য, শুধু অগ্রাহ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। এবং দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথে-বিপথে যত এগিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ততই ক্ষীণ হয়েছে: অবশেষে আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে কালাকালের পরম নিশ্চিত, পরম কল্যাণময়, আনন্দ শংকর, সকল দুঃখতাপহর কোনো বিশ্ববিধানকর্তাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ যে-ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে আমার মনের প্রতিটি কক্ষ প্রবল প্রতিরোধ, সেই ঈশ্বর-প্রেমে আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কাব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে একটুও বাধে না।

কেন বাধে না, এ প্রশ্ন আমাকে তরুণ-বয়স থেকে ভাবিয়েছে। একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস বলি এখানে। গীতাঞ্জলি আমি প্রথম পাঠ করি উর্দু ভাষায়— তখনো বাংলা পড়তে বা বলতে শিখিনি। ইংরেজি গীতাঞ্জলির চমৎকার অনুবাদ করেছিলেন নেয়াজ ফতেহ্‌পুরী; যতদূর জানি ঐ অনুবাদ থেকেই উর্দু গদ্য-কবিতার (নসর-শায়েরীর) সূত্রপাত। কহ্‌কুশান নামক পত্রিকার পাদ-পূরণ-রূপে ব্যবহৃত এই গদ্য-কবিতাগুলি পড়তে পড়তে চোখে জল আসত যে অতিশয় আনাড়ি কিন্তু নিঃসন্দেহে আন্তরিক পাঠকের তার বয়স তেরো, সে তখন মনে প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, পরকালের ভয়ে পুণ্যকর্মে যত্নশীল, পাপবোধে ঈষৎ পীড়িত। বছর তিনেক পর অপেক্ষাকৃত পরিণত রুচি ও বুদ্ধি নিয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়লাম। পড়ে আরও মুগ্ধ হলাম, কতবার যে আবেগকম্প্র কণ্ঠে আবৃত্তি করলাম তার ইয়ত্তা নেই। স্মরণশক্তি নিতান্ত ভোঁতা না হলে আজও তার অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ থাকত। কিন্তু ততদিনে আমি বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতির পাঁচ-সাতখানা গণ-পাঠ্য দার্শনিক পুস্তক হস্তগত করে হয়ে উঠেছি ঘোরতর নাস্তিক, এমনকি নাস্তিক্য-প্রচারের মিশনারি উৎসাহ নিয়ে বড়দের সঙ্গে তর্ক করতে সর্বদা উদ্যত। সহিষ্ণুরা সকৌতুকে ক্ষমা করেছিলেন; অসহিষ্ণুদের কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলাম যতবার, ধর্ম-বিশ্বাসের অসারতা বিষয়ে আমার প্রত্যয় ততবার নতুন করে বল পেয়েছিল।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠ করে একটি সংকল্প এবং একটি প্রশ্ন মনে দানা বাঁধল। সংকল্পটি মূল বাংলা ভাষায় গীতাঞ্জলি পড়বার। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আর মিলন্ সাহেবের ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণ যোগাড় করে লেগে গেলাম সেই ভাষার চর্চায় যে-ভাষা আজ আমার মাতৃভাষার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়। প্রশ্নটি হল—যে ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে অলীক বলে জানি, সেই ঈশ্বরভাবে ভরপুর কাব্যে কেন সমস্ত মন সাড়া দেয়? আমি পেশাদারী নিস্তাপ সাহিত্যিক বিচার বা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা বলছি না যার দৌলতে আমরা দুর্লঙ্ঘ্যতম মানসিক ও আন্তরিক ব্যবধান অনায়াসে পার হয়ে দূর-যুগ, সংস্কৃতি ও মেজাজের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য রায়দান করে থাকি। আমি বলছি কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা যাতে সমস্ত মন-প্রাণ মুচড়ে ওঠে। প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি সেদিন; আজো তার উত্তর খুঁজছি। কিছুক্ষণের জন্য পাঠককেও সেই খোঁজার শরিক করতে চাই।

একটি উত্তর সহজেই মনে আসে। গীতাঞ্জলিতে তো ঈশ্বর-বিষয়ক কোনো মত, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে না, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির একটি বা একাধিক অনুভূতি মাত্র ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই কবি এবং পাঠকের মধ্যে মত-বিশ্বাসের পার্থক্য যত গভীর ও মৌলিক হোক না কেন, অনুভূতির প্রকাশ যদি সুন্দর হয়ে থাকে তবে যে-কোনো সহৃদয় পাঠকের মন তাতে সাড়া দিতে পারবে না কেন? অনুভূতির প্রকাশ অবশ্য সার্থক হওয়া চাই। মা যখন পুত্রশোকে কাঁদে তখন সে-ও তার তীব্র বেদনা প্রকাশ করে। তবু তা কবিতা নয়, কারণ মায়ের হৃদয়াবেগ নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্যক্ত হয় বটে কিন্তু সুস্পষ্টরূপে হয় না; মা নিজেই নিজের অনুভূতির রূপরেখা, বর্ণালি ও গভীরতা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে না। কবি পারেন। দ্বিতীয়ত, কবি কলাকৌশল দ্বারা তাঁর অনুভূতির সত্যরূপ পাঠকের চিত্তে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। শোকার্ত মায়ের কান্না শ্রোতার মনে যে-অনুভূতি জাগায় তা শোক-জাতীয় কিছু নয়, একেবারে ভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতি—করুণা বা দরদ। মোট কথা সুস্পষ্ট অনুভূতির সুদক্ষ প্রকাশই কবিতা। অন্য সব প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

কিন্তু অনুভূতি-বহির্ভূত আর সব প্রশ্নই কি অবান্তর? আমরা ভুলে যাই যে আমাদের অনুভূতিগুলি একান্ত নিরালম্ব স্বাশ্রয়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনোব্যাপার নয়। এরা বাস্তব

জগতের কোনো অবস্থার বা ঘটনার (অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, নিকটস্থ বা দূরবর্তী) উপলব্ধি নামক একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যঙ্গ বিশেষ; প্রত্যঙ্গ না বলে বলা উচিত তারই অনুরঞ্জন কিম্বা অনুরণন। কাজেই কবিকে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করার জন্যে অনুভূতির বাহ্য উৎস বিষয়েও পাঠককে প্রয়োজন মতো অবহিত করতে হয়। কবি তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করেন উতলা মায়ের মতো হাত পা ছুঁড়ে বা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করে নয়, বাস্তব বা বাস্তব-প্রতিম কোনো কিছুর যথোপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমেই। অবজেক্টিভ কোরেলেটিভের * কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, আমি তারই কথা বলছি এখানে।

কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতি নিরালম্ব নয়, বিষয়-নির্ভর—এটা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু সে বিষয় বাস্তবিক না হয়ে কাল্পনিক হলেও কবিকর্ম বেশ সুষ্ঠুভাবেই এগুতে পারে। আর কাব্যানুভূতির অধিষ্ঠান যদি কল্পলোকেই হয় তবে তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সে বিশ্বাসের সঙ্গে পাঠকের বিশ্বাসের ভেদাভেদ নিয়ে তো কোনো সমস্যা উঠতে পারে না। তা কিন্তু নয়। এখানে অনুভূতি-প্রকাশের বাহ্য প্রতীক এবং অনুভূতির বাহ্য বিষয়—এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রথমটি কাল্পনিক হতে কোনো বাধা নেই। প্রেমভাব-প্রকাশের অবজেকটিভ কোরেলেটিভ হতে পারে কোনো কাল্পনিক গভীর বন বা সুরম্য অট্টালিকা। কিন্তু প্রেমাস্পদ রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া আর কী হতে পারে? যে-কবি কখনো সত্যিকার প্রেমে পড়েন নি, শুধু প্রেমের কবিতা বা উপন্যাস পড়েই প্রেমের কথা জেনেছেন এবং সে বিষয়ে একটি কাল্পনিক ভাবাবেগ গড়ে তুলেছেন, প্রেমরস কি তাঁর কাব্যে সত্য হয়ে উঠতে পারে? এবং যে-পাঠক প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত, তার পক্ষে কি প্রেমের কবিতার সম্যক্ রসোপলব্ধি সম্ভব? অর্থাৎ রোমান্টিক প্রেম যার কল্পনাতেই আছে হৃদয়ে অনুপস্থিত এবং প্রতিরুদ্ধ, সে কি কীট্স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, য়েটস কিম্বা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাপাঠে অধিকারী? তেমনি এ প্রশ্নও কি ওঠে না যে, ভক্তিভাব যার মনে স্থান পায়নি, উপরন্তু সে-জাতীয় কোনো ভাবাবেগ জাগবার অনুকূল মনই যার তৈরি নেই, সে কি গীতাঞ্জলির মতো ভক্তিকাব্যপাঠে অধিকারী?

কোনো কলাকৈবল্যবাদী তবু তর্ক করতে পারেন, প্রেমই হোক্ আর ভক্তিই হোক্, সানাড়ি এবং সহৃদয় পাঠক কাব্যের সেই ভাবকে সম্যক আত্মসাৎ করে তাতে বিহ্বল হতে যাবেন কেন? এমন কি কবি নিজেও তো সেই ভাবের ঘোরে কাব্য লেখেন না। আমাদের আলংকারিকদের ভাষায় কবিকর্মে ভাব পরিণত হয় রসে, অর্থাৎ যা ছিল মনকে আন্দোলিত করে, আপ্লুত করে, তা এক বিশুদ্ধ, শান্ত, নৈর্ব্যক্তিক, অলৌকিক রূপ ধারণ করে কবিতায়—এমন যে তাকে আমারও বলা যায় না পরেরও বলা যায় না (পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ)। সেই রসও আবার সহৃদয় পাঠক অন্তরে ঠিক গ্রহণ বা ধারণ করেন না, তার আস্বাদ-মাত্র সম্ভোগ করেন, অর্থাৎ তাকে যেন জিভের উপর রেখে একটু চেখে দেখেন মাত্র। অতএব কাব্যে প্রকাশিত হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে যদি বা কোনো বাস্তব বিষয়ের উপলব্ধি এবং কোনো জাগতিক কিম্বা সামাজিক সত্যে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, সেই অনুভূতি যখন রূপান্তরিত হয় রসে এবং ঐ রস যখন কোনো বিদগ্ধ পাঠকের নিরাসক্ত সম্ভোগ-মাত্রের বস্তু হয়, তখন কবির মনে যে-গভীরতর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের পরিমণ্ডল তাকে বেষ্টন করেছিল তা অগ্রাহ্য ঠেকলেও তাঁর বিশুদ্ধ রসানুভূতি ক্ষুণ্ণ হতে যাবে কেন?

এ মতে আমার মন অনেকটা সায় দেয়, বেশ কিছু কাল সম্পূর্ণ সায় দিত। সম্প্রতি একটু খটকা লাগে। আলংকারিকদের মত-বাদ নাট্যকাব্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল, তারি পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার করা যাক। ওথেলোর ঈর্ষা, ইয়াগোর অসূয়া, লেডি ম্যাকবেথের দুর্ধর্ষ অভীপ্সা—এই ভাবগুলিকে নাটকে আমরা বস্তুত পক্ষে অনুভব করি না, আস্বাদন করি মাত্র; নাটক দেখার সময়ে যদি সত্যি সত্যি ঐসব ভাবে বিলোড়িত হয়ে পড়ি তবে রসসম্ভোগে বিঘ্ন ঘটে এবং আমরা উপযুক্ত দর্শক নই একথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু আলংকারিকরা নাটকে অভিব্যক্ত এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টি এবং তাদের রসরূপের প্রতি যতটা মনোযোগী ছিলেন, সে পরিমাণে দৃষ্টি দেননি নাটকের সামগ্রিক ঐক্যরূপের দিকে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, ভয়ানকাদি নবরস নাটকে ব্যবহৃত উপকরণ, এর কয়েকটি বা সবকটির যথাযথ সন্নিবেশে নাটক রচিত হয়, কিন্তু কোনো একটিকে সমগ্র নাটকের মূল রস বলা যায় না (সবকটিকে বা কয়েকটির সমষ্টিকে তো নয়ই)।

অনেকে শান্তরসের পক্ষ থেকে এই দাবী তুলেছেন। এক হিসেবে এ দাবী যথার্থই। জীবনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের তুলনায় আর্টের অভিজ্ঞতা প্রশান্ত বই কি। যত ভয়ানক বা মর্মন্তুদ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হোক রঙ্গমঞ্চে, আমরা তা প্রত্যক্ষ করি (বলা উচিত সম্ভোগ করি) প্রশান্ত চিত্তে। প্রেক্ষাগৃহে যেসব মহিলারা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করেন বা কণ্ঠস্বর তারায় চড়িয়ে চিৎকার শব্দে ছাদ ফাটাবার উপক্রম করেন, তাঁরা নাট্যরস-সম্ভোগের উপযুক্ত মানসিক পরিণতি লাভ করেন নি। শোনা যায় নীলদর্পণ দেখতে দেখতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি দৃশ্য-বিশেষে এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে অত্যাচারী রোগসাহেবের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন তাঁকে চটি জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ঘটনাটা যদি সত্য হয় তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রগুণ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে, কিন্তু তিনি সুরসিক দ্রষ্টা ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। যাই হোক্, যে-শান্তরস নবরসের একটি রস এবং অন্য আটটির সমপর্যায়ভুক্ত, আর যে শান্তরস সমগ্র নাটকের মূলরস—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

তবু শান্তরসকে (মনে হয় অ্যারিস্টট্‌ল-এর ক্যাথার্সিস তত্ত্বের ইঙ্গিতও এর দিকেই) আমি নাটকের মূলরস বলব না, মূল রসের সর্বপ্রধান গুণ বলেই গণ্য করব। নাট্যকার এবং মহৎ শিল্পী মাত্রেই মানুষকে, সমাজকে, পৃথিবীকে এবং সমগ্র বিশ্বজগৎকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করেন, সে নিরীক্ষণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় হৃদয়াবেগ জড়িত থাকে। আবেগপূর্ণ নিরীক্ষাকে উপলব্ধি বলা যেতে পারে। নাট্যকারের এই উপলব্ধিটি নাট্যরচনায় যে-রূপান্তর গ্রহণ করে তাকেই ঐ নাটকের মূলরস বলা সঙ্গত। তা অবশ্যই শান্ত হবে, কিন্তু শান্ত বললেই তার যথোপযুক্ত পরিচয় দেওয়া হয় না। নাটকের অন্তর্ভুক্ত এবং উপকরণরূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন গৌণ 'রস'গুলিকে যে-ভাবে আমরা আস্বাদন করি, সমগ্র নাটকের মূল উপলব্ধি এবং তার রসরূপ সেইভাবে শুধু চেখে দেখবার জিনিস নয়, তার আবেদন নিবিড়তর, অন্তরের গভীরে সে পৌঁছয় এবং বাসা বাঁধে।

কলাকৈবল্যবাদীদের আমি প্রশ্ন করব : নাটকের মূল উপলব্ধির আলয় যে-জাগতিক নিরীক্ষা, তার থেকে আমাদের স্বকীয় জাগতিক নিরীক্ষার বিরোধ যদি মৌলিক হয় তবে কি ঐ নাটকের সম্যক রসসম্ভোগ অব্যাহত থাকবে?" সাহিত্য-বিশেষজ্ঞের সুশীতল সাধুবাদের পক্ষে অবশ্য কবি ও তাঁর পাঠকের মধ্যে হার্দ্যবিচ্ছেদ, মস্ত বাধা নয় জানি, কিন্তু আমি বলছি সেই রস-

* "The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative', in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts are given, the emotion is immediately evoked."
—(T. S. Eliot : Essay on Hamlet.)

গ্রহণের কথা যাতে অন্তঃকরণের প্রতিটি তার ঝংকার দিয়ে ওঠে। তেমন করে সাড়া দেওয়ার কথা ভাবলে কি টি এস এলিয়ট-এর মতো আমরাও মানতে বাধ্য নই যে তত্ত্বের এবং তর্কের খাতিরে যাই বলি, "I can only conclude that I cannot, in practice, wholly separate my poetic appreciation from my personal beliefs."*

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয় যদি প্রশ্নটাকে বিশ্বানিরীক্ষা বা ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক বিরোধ থেকে মূল্যবোধের, বিশেষত নীতিবোধের, সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে আসা হয়। ফ্যাশিস্ট মার্কা উচ্চণ্ড স্বাজাত্য-দম্ভ ও পরজাতিবিদ্বেষের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চাঙ্গের নাটক, কবিতা বা উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা জানি না। আদৌ সম্ভব কিনা এমন সন্দেহ যদি কেউ প্রকাশ করেন তবে বলব যে তিনি গোড়াতেই মেনে নিচ্ছেন সাহিত্যে মতবিশ্বাসের কথাটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে সত্যাসত্য শুভাশুভ যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঁচু দরের সাহিত্য রচনা সম্ভব—অর্থাৎ সেই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যা উঁচু দরের বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু আমাদের মতো মনে-প্রাণে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যারা—যাদের কাছে ঐ বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও হৃদয়ভাব শুধু অনধিগম্য নয়, রীতিমতো অবজ্ঞেয়—তাদের পক্ষে ফ্যাশিস্ট সাহিত্যের রসসম্ভোগের চেষ্টা কি পদে পদে ব্যাহত হবে না? অবশ্য আমরা কোনো ফ্যাশিস্ট নাটকের প্লটের ঘনসন্নিবদ্ধতা, চরিত্রাঙ্কণের সূক্ষ্মরেখতা, ভাষার অনবদ্যতা, ছন্দের অপূর্বতা, চিত্রকল্পের উজ্জ্বলতা, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শীতল প্রশংসোক্তি বর্ষণ করতে পারি; কিন্তু তাকেই কি বলে রসগ্রহণ? পেশাদারী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা বিমুখ থাকবে। কারণ ফ্যাশিস্ট লেখক এবং ফ্যাশিস্ট-বিরোধী পাঠকের মধ্যে ব্যবধান অসেতুবন্ধ্য।

এতো গেল নাট্যকাব্যের কথা। গীতি-কবিতার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কবির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটা দিক কিম্বা জগৎ ও জীবন বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্ণ উপলব্ধি পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা কম। তেমন প্রকাশ ঘটে অনেকগুলি কবিতার মাধ্যমেই। সে সমস্ত কবিতা একই কাব্য-গ্রন্থে সংগৃহীত থাকতে পারে, বা একাধিক

* T. S. Eliot—Essay on Dante, Note to Section II.

কাব্যগ্রন্থে ছড়ানো। অনেক সময়ে সমগ্র কাব্যসংকলন না পড়লে আমরা কবির মনের নাগাল পাই না। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মেজাজ ও উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে গীতাখ্য তিনখানি কাব্যগ্রন্থে, উৎসর্গে এবং তৎপূর্ববর্তী নৈবেদ্যের ও অব্যবহিত পরবর্তী বলাকার কয়েকটি কবিতায়। এই পর্বকে ভক্তিপর্ব বলা যেতে পারে, এর আগে বা পরে আমরা ঠিক ভক্তিরসের স্বাদ পাই না*—খুব অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যতিক্রম ধর্তব্য নয়।

গীতিকবিতা প্রায় সব সময়েই উত্তম পুরুষে লেখা হয়, কিন্তু এই উত্তম পুরুষটি যে সর্বদা কবি নিজেই হবেন এমন কোনো কথা নেই। "The Love Song of Alfred J. Prufrock" বা "Portrait of a Lady"র উত্তম পুরুষ স্পষ্টত এলিয়ট নন, মানসীর "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি", "বধূ" এবং শিশু কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই উত্তম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ নন। প্রথম দুটি তো ক্ষুদ্র নাটিকাই, প্রুফরক এবং অন্য কবিতাটির তরুণ প্রণয়ী (যাদের মুখ দিয়ে কবিতা দুটি বলানো হয়েছে স্বগতোক্তির আকারে) দুই নাটিকার দুজন নায়ক। "নারীর উক্তি", "বধূ" এবং শিশুর কবিতাগুলি ঠিক নাটিকা না হলেও নাট্যধর্মী। এসব ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর অনুভূতি কবির অনুভূতি নয়, কবি পাঠকের সামনে এই অনুভূতিগুলির চিত্র এঁকেছেন মাত্র। এই চিত্রের অন্তরালে কবির নিজের যে উপলব্ধিটি উহ্য রয়েছে তা যদি পাঠকের মর্মে না পৌঁছে থাকে তবে বলতেই হবে হয় কবির লেখা, নয় পাঠকের পড়া ব্যর্থ হয়েছে। যে-কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই সেটা এই যে এ জাতীয় নাট্যধর্মী লিরিকে পাত্রপাত্রীর অনুভূতি আর কবির অনুভূতি বা উপলব্ধি বেশ একটু পৃথক, এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপজীব্য। পাঠকও কবিতার দুই স্তরের অনুভূতিকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। প্রুফরক এবং বধূর অনুভূতির আমরা দ্রষ্টা বা আস্বাদকমাত্র, কিন্তু তদন্তরালবর্তী কবির নিজস্ব অনুভূতি আমাদের অন্তরের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে: তার সঙ্গে যদি অনেক পরিমাণে তাদাত্ম্য (আইডেন্টিটি) স্থাপিত না হয় তা হলে কবিতার সম্যক রসগ্রহণ সম্ভব হয় না।

কিন্তু বেশির ভাগ গীতিকবিতার উত্তম পুরুষ কবি স্বয়ং, তাঁর কল্পিত কোনো ভিন্ন-হৃদয় চরিত্র নয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই স্তরের অনুভূতি সেখানে এক হয়ে গেছে, কবিতায় অভিব্যক্ত অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং কবির অনুভূতি। অবশ্য কাব্যের অনুভূতিমাত্রই জীবনের অনুভূতি থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের—অপেক্ষাকৃত সাধারণীকৃত এবং নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিটি কবিরই, কাজেই পাঠক যদি তাকে নিজ অন্তরের গভীরতম কক্ষে জায়গা না দিয়ে তাকে প্রেক্ষাগৃহের আসন থেকে দেখেন, তবে তিনি একটি গীতিকবিতাকে অবলম্বন করে স্বতন্ত্র নাটক রচনা করতেও পারেন, কিন্তু ঐ গীতিকবিতার মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাবে। অনেক নাস্তিক (শুধু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অর্থেই নয়, জীবনবিমুখ এবং বিশ্ববিরক্ত অর্থে নাস্তিক) এবং রবীন্দ্র-মানসে বীতশ্রদ্ধ সমালোচক যখন গীতাঞ্জলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তখন সে প্রশংসায় অন্তরের সাড়া যতটা থাকে, তার চেয়ে হয় তো অনেক বেশি থাকে কৃতবিদ্য সূক্ষ্মদর্শী মূল্যবিচার, বিশেষত কলা-কৌশলগত গুণগ্রাহিতা। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে এঁরা গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকেও নাট্যকাব্য রূপে গ্রহণ করেন, কবিতার ভক্তিভাব যেন কবির নিজস্ব অনুভূতি নয়, কবিবর্ণিত একটি ভক্ত হৃদয়ের চিত্রণ মাত্র। সুতরাং পাঠকও নাটকোচিত দূরত্ব রক্ষা করেই তার রসসম্ভোগ করবেন, যেমন করে তিনি দূর থেকে সম্ভোগ করেন ওথেলোর ঈর্ষা বা ইয়াগোর অসূয়া। কিন্তু তাই যদি হত, তবে এই ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যঞ্জনায় গীতিনাট্যকারের স্বকীয় একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠত—ব্যঙ্গের, করুণার বা ট্র্যাজিক চেতনার। সহজেই অনুমান করা যায় যে, কোনো আধুনিক কবি যদি কখনো গীতাঞ্জলির ভাব নিয়ে কাব্যরচনা করেন, তবে তার পেছনে এমনতর ব্যঙ্গের, করুণার, সকৌতুক বিস্ময়ের বা ট্র্যাজেডির সুর প্রচ্ছন্ন থাকবে—প্রচ্ছন্ন থাকবে এমন কোনো ইঙ্গিত যে এ "মৌল নাস্তি"র অনন্ত অমার মাঝখানে বসে যে মানুষের হৃদয়ে অনাবিল প্রশান্ত প্রেম জেগে ওঠে স্রষ্টা বা তাঁর সৃষ্টির প্রতি, কত অসম্ভব করুণ, অর্বাচীন বা মধ্য-ভিকটোরীয় তার অন্ধ প্রত্যয়।

কিন্তু গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ কাব্যবর্ণিত ভক্ত হৃদয়কে দূর থেকে সকৌতুকে বা সকরুণায় অবলোকন করছেন না, সে ভক্ত হৃদয় রবীন্দ্রনাথেরই। পাঠক যদি গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে এই নাটকীয় দূরত্ব রক্ষা করে চলেন তবে আমি বলব গীতাঞ্জলির সুর তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছয় নি। শিশু কাব্যগ্রন্থে শিশুমনের প্রকাশের প্রতি পাঠকের যে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, গীতাঞ্জলিতে ভক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তির প্রতি সেই একই নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া অসংগত। "ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে / মিলিয়ে এল আলো" এবং "মেঘের পরে মেঘ জমেছে / আঁধার করে আসে", কিম্বা "আমার যেতে ইচ্ছে করে / নদীটির ঐ পারে" এবং "আমি চঞ্চল হে / আমি সুদূরের পিয়াসী"—কবিতাদ্বয় পাশাপাশি পড়লে আমার বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। প্রথমত, শিশু থেকে উদ্ধৃত কবিতা দুটিতে যে ভাবৈশ্বর্য আছে, গীতাঞ্জলি ও উৎসর্গের কবিতায় তা অবর্তমান। দ্বিতীয়ত, শিশুর কবিতা পড়বার সময়ে আমরা কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিশুমনের সকৌতুক পরিচয় লাভ করি, কিন্তু গীতাঞ্জলি পাঠকালে আমরা কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই মনের বেদনা ও ব্যাকুলতা অনুভব করি। শিশুর সুখদুঃখ আমাদের পক্ষে ঠিক অনুভব করা সম্ভব নয়, আমরা তার সহৃদয় দর্শকমাত্র। অপর পক্ষে, গীতাঞ্জলির বেদনা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নয়, অনুভূত। এই সমানুভবতার প্রয়োজন আছে গীতাঞ্জলির মতো কাব্যের পূর্ণ রসসম্ভোগের জন্য।

কাজেই প্রশ্ন থেকে যায় কেমন করে অভক্ত পাঠক, শুধু অভক্ত নয় ভক্তিরসের প্রতি বিরূপ পাঠক, গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে সেই তাদাত্ম্য অনুভব করবেন যার অবর্তমানে এ ধরনের গীতিকবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। প্রথিতযশাদের মধ্যে নাম করতে পারি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, গেল দশ বছরের বুদ্ধদেব বসু এবং শিব-নারায়ণ রায়ের। এঁদের মনে কখনো এ সমস্যা জেগেছিল কি না, এবং জেগে থাকলে তাঁরা কীভাবে তার নিরাকরণ করেছিলেন, ঠিক বলতে পারি না। আমার নিজের চোখে সমস্যাটি যে রূপ ধারণ করেছে তার কিছু পরিচয় দিলাম। কোন পথে আমি সমাধান খুঁজেছি এবার সে বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

তার আগে দুটো কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। প্রথমত, পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সাহিত্যকর্মীদের মন গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ থেকে যতটা দূরে অবস্থিত বলে আমার বিশ্বাস, আমার নিজের মন ততটা দূরে নয়, কাজেই যে গিরিদরী আমাকে লঙ্ঘন করতে হল তা ততটা দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। ব্যক্তিগত ঈশ্বরে স্রষ্টা, বিধাতা এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদিচ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই। মানুষের সমগ্র সত্তা শারীর বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের খাতে কোনো দিন ধরা দেবে, একথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি না। এমন কি, আমা

* ব্রহ্মসংগীত বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে ভাষা ও সুরদান করিয়া তিনি ব্রহ্মসংগীত লেখেন। উহাদিগকে আমরা রচিত গান বলিব, ভক্ত হৃদয়ের বেদনাসঞ্জাত ভাবসংগীত বলিতে পারিব না।"

বিশ্বাস সে জড়জগতের একটা চিত্রমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে অনুরেখনীয় ও অনুধাবনীয়। অর্থাৎ যদিচ বিজ্ঞান আমার চোখে অতীব শ্রদ্ধেয় ও প্রণিধানযোগ্য, তবু আমার মতে অনেকান্ত বিশ্বজগতের একটা অন্ত বা দিক মাত্র বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাকিটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অপার গভীর রহস্যে ঢাকা। উপরন্তু মানবেতিহাসে আমি একটি মন্থর যদিচ উত্থান-পতন-বন্ধুর অগ্রগতির আভাস দেখতে পাই। এবং লক্ষ কোটি বৎসর পর নাক্ষত্র-জগতের অবধারিত তাপমৃত্যুর ফলে মনুষ্যজাতির নিষ্করুণ বিনাশ ঘটবেই এ দুশ্চিন্তা আমার ঈষৎ ক্ষীণ আশাবাদকে সমাচ্ছন্ন করে না, কারণ আমি ওয়াইৎসেকরকে অনুসরণ করে পদার্থবিজ্ঞানের এমনতর বহুদূর-পাল্লার ভবিষ্যৎ ও অতীত-বাণীকে সন্দেহের চোখে দেখি।

এতৎসত্ত্বেও—এবং এটাই আমার দ্বিতীয় স্বীকৃতি—গীতাঞ্জলির সব কবিতা আমার মনে সাড়া জাগায় না। যেগুলিকে বলা যেতে পারে শুদ্ধ ভক্তির কবিতা (যথা, "আমার মাথা নত করে দাও হে", "একটি নমস্কারে প্রভু", "তোমায় আমার প্রভু করে রাখি", "আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না" ইত্যাদি) যদিও সুরের জন্য কয়েকটি তার ভাল লাগে, ভাবের দিক থেকে আমাকে নাড়া দিতে পারে না। উচ্চাঙ্গের কাব্যকৌশল এমন কি সুরের কৌশলও কোনো ব্যক্তি-স্বরূপিত বা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার প্রতি আমার মনে কোনো প্রকারের দাসভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম নয়। এই বিশেষ মানসমুকুলটি ফুটিয়ে তুলবার মতো সার আমার মনের মাটিতে নেই। তবে সুখের কথা এই যে এ ধরনের প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক-নির্ভর ভক্তি-গীতির সংখ্যা সমগ্র গীতাঞ্জলির গানের সংখ্যার অনুপাতে অত্যল্পই।

গীতাঞ্জলিতে বহু সংখ্যক রোম্যান্টিক প্রেমের এবং প্রকৃতি-অনুরাগের গান আছে যাতে ভক্তির ছোঁয়া লেগেছে, অনেক সময়ে খুব আলগোছেই লেগেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি : "শুধু তোমার বাণী নয়, হে বন্ধু, হে প্রিয়," "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি" "আরো আঘাত সইবে আমার", "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না", "ঝড়ে যায়, উড়ে যায় গো" "আমারে দিই তোমার হাতে"—এগুলিকে নিছক প্রেমের গান মনে করলেও খুব ভুল করা হয় না। অন্য দিককার উদাহরণ : "আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে" "আজি বারি ঝরে ঝর ঝর" "আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে", "এসো হে এসো, সজল ঘন বাদল বরিষণে"—এগুলিকে তেমনি নিছক প্রকৃতির গান মনে করলে ভুল করা হয় না। ভুল করা হবে না বটে, তবে এই উভয় শ্রেণীর গানের মধ্যে ভক্তিভাবের আমেজ না দেখতে পেলে তার সম্পূর্ণ মূল্য অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

গীতাঞ্জলির মূল সম্পদ হচ্ছে সেই সব গান যাতে ভক্তি এবং প্রেমের কিংবা ভক্তি এবং প্রকৃতি-অনুরাগের কিংবা তিনটেরই সংগম ঘটেছে। উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই—"মেঘের পরে মেঘ জমেছে"; "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার", "পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে", "ও আমার মন যখন জাগলি না রে", "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা" প্রভৃতি বহু সংখ্যক গান আমাদের খুবই পরিচিত; গীতাঞ্জলি বলতে এই সব গানের কথাই সর্বপ্রথমে মনে পড়ে।

দুটি কথা লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমত, প্রেমের অথবা প্রকৃতি অনুরাগের মধ্যেই ভক্তিভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এসব গানে। দ্বিতীয়ত, ভক্তি শব্দের প্রয়োগ এখানে তার সুনির্দিষ্ট সুপরিচিত অর্থে নয়, তার চেয়ে একটু ব্যাপকতর বা ঢিলেঢালা অর্থে। কারণ এসব গানে প্রিয়া বা প্রকৃতির সীমিত সত্তায় যে-অধরা, পলাতক ছায়ার মতো মুহূর্তে সচকিত করে দূরে পালিয়ে যাওয়া, সত্তার আভাস বা ইঙ্গিত রয়েছে তাকে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসসম্মত, শাস্ত্রনির্দিষ্ট অর্থে ভগবান বলা একটু শক্ত। সেই আভাসিত সত্তার জন্য আকুতি আছে, আনন্দ ও বেদনা আছে, ভরসা ও নৈরাশ্য আছে, বিস্ময় ও রহস্যবোধ আছে, এবং এই সব ভাবাবেগ ঐহিক প্রিয়া ও প্রকৃতির জন্য যতটা স্বাভাবিক তাকে মাত্রায় ও গুণে ছাড়িয়ে গেছে, তবু এগুলিকে যা এদের সম্ভারকে আভিধানিক অর্থে ভক্তি বলতে বাধে।

বাধাটা আরও পরিষ্কার হবে যদি এগুলির সঙ্গে আমরা তুলনা করি গীতাঞ্জলির সেই সব গানের যেগুলিকে শুদ্ধা ভক্তির গান বলা যায়। সেখানে ভক্তি নির্দিষ্ট অর্থে ভক্তিই, আর পাত্র চলিত অর্থে ভগবানই। আগেই বলেছি এই শেষোক্ত গানের সম্যক রসগ্রহণে আমি

অনধিকারী। বাকী দুজনের ক্ষেত্রে এই অনধিকারের বাধা নেই, কারণ সেক্ষেত্রে প্রেমের ও প্রকৃতি-অনুরাগের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা জমি তৈরি করে রেখেছে। প্রেমের বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের মনে খুব নিবিড় এবং প্রবলভাবে জাগে তখন আমরা বোধ করি প্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা ঐ সীমাটুকুর মধ্যে ধরা দেয় নি যে সীমা শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস টেনে রেখেছে অপ্রেমের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় চেনা মানুষের চারদিকে; সে যেন এক অসীম রহস্যময় লোকোত্তর সত্তায় মিশে যায় যা তার রক্ত-মাংসের প্রতীক হয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রবল অনুভূতিও (বিশেষত ঐ সৌন্দর্য যদি সেই পর্যায়ভুক্ত হয় ইংরেজীতে যাকে সাব্লাইম বলা হয়) আমাদের এক রহস্যঘন অনন্তলোকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানগুলিতে আমি একেবারে অপরিচিত অনভিজ্ঞাত অনধিগম্য কিছু পাই না; প্রিয়া ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে যা আগেই পেয়েছি তারই উন্নীততর, সূক্ষ্মতর, পূর্ণতর এবং সর্বোপরি স্পষ্টতর (নান্দনিক অর্থে স্পষ্টতর) রূপ দেখে অভিভূত হই। গীতাঞ্জলি পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধরে হাঁটছি, একটু এদিকে সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিকে সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত ইংরেজী গীতাঞ্জলির কল্যাণে পশ্চিমের এবং এদেশের অবাঙালী পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথকে মোটের উপর ভক্তিরসের কবি বলেই জানেন, অর্থাৎ অত্যন্ত আংশিকরূপেই জানেন। ভক্তিরস তাঁর একটি বিশেষ পর্বের, (কালের দিক থেকে দশ বারো বৎসরের) মধ্যে সীমাবদ্ধ। বারো বৎসর অবশ্য খুব অল্পকাল নয়, তবে যিনি ষাট বৎসরের অধিককাল কাব্যসাধনা করেছেন তাঁর কবি-পরমায়ুর ক্ষুদ্র অংশ তো বটেই। কিন্তু ঐ সময়ের কবিতাও যে বিশুদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়ীভাবে ভক্তি রসের কবিতা নয় সেটা আরো একটু বিশদ করে একটু অন্য দিক থেকে বলা হয়তো বাহুল্য হবে না।

ভক্তের মন একান্তভাবে ঈশ্বরে তন্ময়, নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার কথা নয় তার। ভক্তিরস বাৎসল্যরসের মতই একতরফা; মা যেমন শিশুর কাছে, ভক্ত তেমনি ভগবানের কাছে নিজেকে নিঃশেষে কেবল ঢেলে দিতেই চায়, প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা রাখে না, দাবি তো নয়ই। কিন্তু গীতাঞ্জলির কবি-আত্মনিবেদনে [illegible]

তাতে দান যেমন অকৃপণ, প্রতিদানের দাবিও তেমনি অকুণ্ঠ, আত্মবিসর্জন এবং আত্ম-স্মরণ দুটো বিপরীত ভাবের ব্যঞ্জনা একাধারে বিধৃত। এক দিকে যেমন শুনি—

আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।

অন্যদিকে তেমনি জানতে পারি—

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার এ প্রাণ নইলে সে কি কোথাও ধরবে?

একদিকে যেমন—

আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে

অন্যদিকে তেমনি—

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক না তুফান।

এক দিকে—

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে

অন্য দিকে—

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।

এই দ্বিতীয় সুরটি কবীরের দোঁহার মত বিশুদ্ধ ভক্তিকাব্যে স্বভাবতই শোনা যায় না, কারণ এ সুরটি প্রেমের, ভক্তির নয়। প্রেমিক সর্বদাই প্রতিদান চায়, না পেলে তার প্রেম ব্যর্থ, আত্মনিবেদন বৃথা। প্রেমাস্পদের জন্য যত উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, উদ্বেলতা থাক, আত্মবিস্মৃত নয় প্রেমিক। কবীরের কাব্য ভক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল কিন্তু প্রেমের লক্ষণে দীন একথা মানতেই হবে। কবীরের সঙ্গে তুলনার বিশেষ গুরুত্ব আছে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবীরকে তাঁর পূর্বসূরীরূপে পাশ্চাত্ত্য এবং সেই সূত্রে এ দেশীয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। "ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্ত্য একদল ধর্মব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এই সব কথা খৃষ্টধর্মেরই প্রভাবে লেখা, এবং আমাদের দেশের বহু লোক সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন......তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হল এই জাতীয় ভাব ইংরেজ আমলের পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যে ছিল।"

অথচ এমনি কপাল যে ঐ অনুবাদ পড়ে য়েট্‌স্ প্রভৃতি কয়েকজন বিদগ্ধ পশ্চিমী পাঠকের মনে হয়েছিল এ অনুবাদ না ছাপলেই ভাল করতেন রবীন্দ্রনাথ, কেন না তাঁর কাব্যিক অর্থাৎ ঈষৎ জোলো ভক্তিরস কবীরের খাঁটি গাঢ় ভক্তিরসের তুলনায় একটু পানসে ঠেকে। এঁরা [illegible] না যে, কবীর শুদ্ধ খাঁটি ভক্ত নন, মূলত ভক্তই, কবিতা তাঁর পক্ষে গৌণ কর্ম, কবি না হলেও তাঁর ভক্তিরস বিন্দুমাত্র খণ্ডিত হত না। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি এবং মূলত কবিই, ভক্তি তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপাদান এবং একমাত্র উপাদান নয়, ভক্ত না হলেও তিনি উঁচু দরের কবি হতেন, কিন্তু কবিতার প্রকাশের সার্থকতা না পেলে তাঁর ভক্তিরস অচিরে শুকিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, কবীরের দোঁহা বিশুদ্ধ ভক্তিরই প্রকাশ, তাতে প্রেমিক প্রেমিকার সেই ভাবগত আদান-প্রদান নেই যা গীতাঞ্জলির ভক্তি কাব্যকে অন্য এক স্তরে নিয়ে গেছে। কবীরের ভক্তিরসের সঙ্গে যা মিশেছে তা প্রেম নয়, বিশুদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যান এবং ধর্মদেশনা: The creature is in Brahma and the Brahma is in the creature, they are ever distinct yet ever united. (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ) —এই ধরনের পংক্তির অপ্রতুলতা নেই তাঁর কাব্যে। দু' এক জায়গায় স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিকপ্রেমাস্পদার প্রতীক থাকা সত্ত্বেও (এ প্রতীকের ব্যঞ্জনাশক্তি খুবই দুর্বল সেখানে) সর্বত্র যা প্রকাশ পেয়েছে তা কেবল এক পক্ষের আকূতি এবং আত্মনিবেদন—সেটাই ভক্তির ধর্ম। অপর পক্ষ যে পরমেশ্বর, তিনি কেমন করে ব্যাকুল হবেন কারও জন্য? গীতাঞ্জলির ভগবান কিন্তু আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ নন ("আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর/ এ প্রেম হত যে মিছে"), তিনি বিরহী ("আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে" "তুমি পার হয়ে এসেছ মরু/নাই যে সেথায় ছায়াতরু"); তিনি চোখের জলও ফেলেন:

সন্ধ্যা হল, একলা আছি ব'লে
এই যে চোখের অশ্রু পড়ে গ'লে,
ওগো বন্ধু, বলো দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি?
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

এমনতর বিরহ-ব্যাকুল মিলন-তৃষ্ণার্ত ত্রিভুবনেশ্বরের চিত্ররূপ কবীরের রচনায় আশা করা যায় না, ভাবাই যায় না।

এ সবই পাওয়া যাবে অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় "প্রেমভক্তি-আত্মনিবেদন-মিশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভঙ্গির আমেজ লাগিয়াছে।"১ প্রেমের ধারা যে বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির তুল্য সংরক্ত, প্রাণ-স্পন্দিত ও প্রকাশোজ্জ্বল প্রেমের কবিতা যে কোনো সাহিত্যে দুর্লভ, এবং রবীন্দ্র-নাথ বাল্যকাল থেকে তার নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। সন্দেহ উপস্থিত হয় অন্য দিক দিয়ে। বৈষ্ণব কাব্যের যে পদগুলির সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত এবং যার কাব্যিক উৎকর্ষ সর্বসম্মত, তাতে প্রায়ই প্রেমের লক্ষণ কি ভক্তির লক্ষণকে ছাড়িয়ে যায় নি? অনেক সময়ে মনে হয় যেন ভক্তির ছদ্মবেশে নিরতিশয় মানবিক প্রেমই অভিব্যক্ত; ছদ্মবেশটাও যে সর্বত্র ধারণ করা হয়েছে তা নয়। বিদ্যাপতি সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন —"বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ ব্রজের রাধা বা বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বলিয়া একেবারেই ঠাহর হয় না। সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপটিই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পাই"২—তা কি চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদাবলী সম্বন্ধেও বলা যায় না? এটাও ভাববার কথা যে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যের সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের একাত্মতা বোধ করেন নি, নইলে "পাশ্চাত্ত্য ধর্মব্যবসায়ীদের" ভুল শোধরাবার জন্য কেবল কবীরের দোঁহার ইংরেজী তর্জমা করেই ক্ষান্ত হতেন না, অন্তত কয়েকটি বৈষ্ণব পদের অনুবাদও সংযোজিত করে নিজের এ দেশীয় পূর্বসূরীদের পরিচয় পূর্ণতর করতেন। অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে কবীরও খেয়া-গীতাঞ্জলি-রচয়িতার পূর্বসূরী ছিলেন না। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রকাশে ভারতীয় ভাবধারার ও সৃষ্টিকর্মের পারম্পর্য যতখানি লক্ষণীয়, অপূর্বতা তার চেয়ে ঢের বেশী। তবে অপূর্বতা তাঁর ভুঁইফোড় ছিল না, দেশের মাটির মধ্যে বহুদূরবিস্তৃত এবং শক্ত তার শিকড়।

(১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত— উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯৭

(২) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, ও অন্যান্য মহাজন পদকর্তা, কবিপরিচয়

[প্রথম নয়ন—টগরের]

এ আমার ভাল লাগে না, এ আমার ভাল লাগে না, লতুদির অদ্ভুত সব হাবভাব, কান্ডকারখানা। এক-একবার মনে হয়, লতুদি কী ধরনের মেয়ে আমি জানি। আবার মনে হয়, এখনও সেটা ভাল বুঝতে পারিনি।

প্রথম তো অস্বাভাবিক লতাদির চেহারা, চেহারার চেয়েও চাউনি। চেহারাটা কাঠ-কাঠ, একটা পুরুষের যেটুকু ঢেউ ওঠে লতুদির দেহের ডৌলে তা-ও নেই। মাথায় এই ঘরের চৌকাট-প্রমাণ, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন সমান-সমান, মেয়েমানুষের এত বাড় ভাল নয়।

লতুদি তা অবশ্য মানেন না। বলেন, করব লেডি ডাক্তারি আর চেহারা দশাসই হবে না?

এই শহরেই লতুদি আছেন প্রায় দশ বছর। এর আগেও নাকি কাজ করেছেন অন্যত্র—বেরিলি না মীরাট না মোরাদাবাদ, সেও পাক্কা পাঁচ বছর।

সন্ধ্যা বেলা বাঁধা রিকশায় লতুদি বাড়ি ফেরেন, ধপাস করে ব্যাগটা ফেলে দেন চেয়ারে, নিজেও সোফায় গা এলিয়ে স্প্রিং-এর তালে তালে একটু দুলে নেন। ক্লীনেক্স ব্যাগেরই মধ্যে থাকে, কপালের ঘাম মোছেন। ঘাড়ের আর গলার তলারও, একটু আড়াল করে। যদিও আমি জানি, আড়াল করার মত বস্তু লতুদির বিশেষ নেই।

গলা এমনিতেও ও'র ভারী, তখন আরও যেন ধরা-ধরা শোনায়, যখন লতুদি বলেন, "টগর এক গ্লাস জল, এক কাপ চা। বড় হাঁপিয়ে উঠেছি রে, বয়স তো কম হল না?"

"কতই বা হল লতুদি, বত্রিশ কি বড় জোর পঁয়ত্রিশ?"

ঠোঁট থেকে জলের গ্লাস না নামিয়েই লতুদি বলেন—"তুই কী করে টের পেলি?"

"গলার ভাঁজ দেখে। গুনেছি, সাড়ে তিনটে।"

"গলার ভাঁজ দেখে মেয়েদের বয়স জানা যায়?"

"ছেলেদেরও যায়।"

ঠকাস করে গ্লাস নামিয়ে লতুদি বলেন, "তুই বুঝি ছেলেদেরও জানিস?"

জড়োসড়ো হয়ে যাই, কথা বলি না। লতুদি ডাকেন, "টগর কাছে আয়।"

যাই। উনি কাঁধে হাত রাখেন, ক্রমে পিঠে, পরে কোমরে আলগোছে জড়িয়ে নেন। খুব নরম করে বলেন, "তোর বুঝি খুব ছেলেদের জানতে সাধ? তাই ঘন ঘন জানালার কাছে দাঁড়াস, দরজায় কেউ বেল টিপলেই তাড়াতাড়ি ছুটে যাস?"

বলি, "দরজা খুলে দেওয়াই তো আমার কাজ লতুদি।"

লতুদির বাদামী রঙের উপরের ঠোঁটে চিকণ রেশমী রোম, এমনিতে চোখে চট করে পড়ে না, কিন্তু জল খেলে চিকচিক করে। ঘামলেও। দেখলে আমার হাসি পায়, আড়চোখে চেয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিই।

লতুদি বলেন, "আমি খুব বুড়ি হয়ে গেছি, না রে? তোর প্রায় ডবল তো হব। মেঘে মেঘে কত বেলা কেটে গেল।"

আবহাওয়া একটু হালকা করে দিতে বলি, "গেল তো বয়েই গেল। তোমার কী। তুমি তো আর বিয়ে করবে না।"

দুষ্টুমি করে চোখ পাকিয়ে লতুদি বলেন, "আমি করব না, না আমাকে কেউ করবে না? সেই কথাটাই ঘুরিয়ে বলছিস?"

বলেই লতুদি কাঁধে তোয়ালে ফেলে বাথরুমে যান। থপথপে কাচাকাচি, ঘসঘস ঘষাঘষি, ঝপঝপ জল ঢালার শব্দ পাই। লতুদি কখনও ঝরণা খোলেন না। বলেন, দম আটকায়।

বেরিয়ে আসেন চিনেঢালা, চুল ওঁর ছোট করে ছাঁটা, সুতরাং সর্বদাই খোলা, শ্যাম্পু করেছেন বলে হাওয়ায় খানিক পরে তা ফোলা-ফাঁপাও হয়ে ওঠে। ঘাড়ের কাছে কয়েক গুচ্ছ বেঁকেও থাকে। সিংহীর তো কেশর নেই, ওগুলো তবে কি কুকুরের লেজ?

তখন লতুদি—ওঁর চামড়া চকচকে বা মোলায়েম করার জন্য করবারও কিছুই বিশেষ নেই, ঘাড়ে বা হাতের খাঁজে একটু-আধটু পাউডার বোলান—হেলানো চেয়ারে বসে, পা দুটো টান-টান করে দিয়ে ওঁ জেনে করে একটা সিগারেট ধরান। অল্প অল্প ধোঁয়া হয়, ওঁর খুব কাছাকাছি থাকলে আমি কাশি। মেঘের মত পরদায় আস্তে আস্তে লতুদি, তাঁর চোখ, নাক, মুখের ভঙ্গি সব ঢেকে যায়। লতুদি বলেন, "এই একটুখানি সময় ধোঁয়ার আড়ালে উবে যেতে আমি ভালবাসি।"

আমি বাসি না। ভয়ে ভয়ে প্রথম দিকে বলেছি, "মেয়েদের সিগারেট খাওয়া, লতুদি, ভারী বিশ্রী।"

লতুদি ভ্রূকুটি করে বলেছেন, "বিশ্রী কেন? তোর বুঝি ধারণা সব মজার একা ব্যাটাছেলেদেরই অধিকার?"

"অতশত জানি না। দেখতে ভাল লাগে না।"

"লাগে না দেখার অভ্যাস নেই বলে। পুরুষদের শেখানো বুলি গড়গড় করে উগড়ে দিচ্ছিস। আমি দেড় বছর এডিনবরার এক হাসপাতালে ট্রেনিং-এ ছিলাম, জানিস। ওদেশে হেন কাজ নেই যা পুরুষদের সংগে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও করে না। এ আর কী দেখছিস, শুধু তো চুল ছেঁটেছি, সিগারেট খাচ্ছি। ওসব দেশে মেয়েরা ছেলেদের মত শার্ট-স্ল্যাকস্‌ও পরে সর্বত্র ঘোরে।"

সিগারেটটা টিপে মেরে লতুদি বলেছেন, "তুই টগর, তলে তলে আসলে ছেলেদের পুজো করিস। ছেলেরা তোকে কি রানী বানাবে? বিনে মাইনের ঝি-গিরি, তার ওপর পালে পালে বাচ্চা, এত ডেলিভারি কেস করি, সব দেখি তো, ঘেন্নায় মরি।"

"তার চেয়ে", পায়ের উপর পা রেখে লতুদি যোগ করেন, "তার চেয়ে, তুই এই বেশ আছিস। নার্সিং শিখছিস, কমপাউন-ডারিও জানিস—তোকেও পুরোপুরি ডাক্তার করে, তবে আমি মরব টগর, রাজী?"

শেষের কথাটা লতুদি যখন বলেন, তখন কেমন অদ্ভুত শোনায়, চাপা-চাপা, যেন খানিকটা ধসা। রাজী? যেন আমাকেও একটা জুয়োয় বসাচ্ছেন বাজী রাখতে। ঘরের দেয়াল তখন ধূসর অস্পষ্ট লাগে, ঢাকা-দেওয়া আলোটা কাঁপে, জানালার পরদা হাওয়ায় পাখা ঝাপটায়।

লতুদির বাসায় আমার থাকতে আসার গোড়ার দিকের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়।

সহজে আমাকে কাজে বহাল করেননি লতুদি রীতিমত বাজিয়ে নিয়েছিলেন। মেসোমশাই যেতেন এক আড্ডায়, সেইখানে কথায় কথায় কার কাছে যেন জেনে এসেছেন লেডি ডাক্তার মিস্ দাশগুপ্তা মাসের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। মাসিমা বললেন, "ওর তো ... নার্সিং শিখেছিল, কেন এই চাকরি?"

"ওকে দেবে কেন?"

"লতুদির কথার জোর আছে।" মেসোমশাই নাকি মাথা নাড়ছিলেন, তাড়াতাড়ি বরদাস্ত হেনা ফেলে বলে উঠলেন। লেখাপড়া বেশি শিখিনি, বোকা হয়ে আছি, বুঝলাম খাওয়ানো-পরানো থেকে বিয়ে দেওয়ার দায় থেকেও রেহাই পেতে চাইছেন।

বাজার থেকে ফিরে এসে মেসোমশাই বেজার মুখে বললেন, "যা ভেবেছিলাম, তা না। ওই লেডি ডাক্তারের কাছে সর্বদা থাকতে হবে, ওর বাড়িতেই রাখবে, এখানে থাকতে দেবে না।"

গলগ্রহ মেয়ে, দেখে-শিখে আঠারো বছরেই সেয়ানা, চট করে বুঝে নিলাম বিঁধছে কোথায়। এ-বাড়িতে থেকে চাকরি করতে পেলে মাইনের টাকার ভাগ প্রায় সবটাই ওঁদের হত, উপরন্তু, সংসারের পার্ট-টাইম খাটাখাটুনিও উশুল করা যেত।

মাসিমা বললেন, "মাইনে দেবে না?"

"দেবে, একশো টাকা।"

"থাকা-খাওয়া জামাকাপড়ের খরচের ওপর আরও একশো? সে তো প্রায় দুশো টাকার সমান হল না? মাস গেলে তুমিই তো সব ছেঁটে কেটে বাড়িতে আনো মোটে দুশো আটাত্তর। ভালই হল, টগর বরং মাইনে পুরোটা বাঁচিয়ে আমাদেরও কিছু-কিছু দিতে পারবে। কী টগর, পারবি না?"

হাসি ফুটিয়ে বললাম, "পারব মাসিমা। আগে কাজটা তো পাই।"

"পাবি, পাবি। দিদির আশীর্বাদ তোর ওপরে আছে"—এতদিন পরে আমার মার কথা মনে পড়ে মাসিমা শোকে কেঁদে ফেললেন।

লতুদি (তখন তাঁকে অবশ্য তাঁর মিস দাস বলেই জানতাম) প্রথমে মেছুড়েদের মত একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে (তখনই লক্ষ্য করেছিলাম, ও'র চোখের মণিও শাদায় ধূসরের ছিট-লাগা) আমাকে অনেকক্ষণ দেখলেন, এত দেখার কী ছিল, আমি কি মাছভাজা? তাতেও হল না, চশমা পরে নিলেন। কিন্তু প্রশ্ন যখন করতে থাকলেন তখন চাহনি, স্বর সব সহৃদয় হয়ে গেল, এমন কী অতটা ভারী না হলে ও'র গলাকে তখন মিষ্টিই বলা যেত।

প্রথমে দু'একটা কথার জবাব মেসো-মশাইই দিয়ে দিচ্ছিলেন আমার হয়ে। এক ধমকে লতুদি ওকে থামিয়ে দিলেন।—"আপনি বলছেন কেন। আপনাদের মেয়ে কেমন বলিয়ে-কইয়ে, টেস্‌ট করতে দিন?"

তাতেও হল না—লতুদি একটু পরে বললেন, "টগরকে একবার ভেতরে নিয়ে যাব, আর একটু কাজ বাকী আছে?"

মেসোমশাইয়ের বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হয়েছিল।—"তা-তা-তা নেবেন বইকি, নিন্‌ না, মানে..." সাঁতার না-জানা লোক যে-ভাবে ডুবে যাওয়া ঠেকাতে হাত-পা ছুঁড়ে জল ছেটায়, তিনিও তেমনই আধখানা সিকিখানা করে বলা কথা ছিটোচ্ছিলেন।

ভিতরে নিয়েই লতুদি প্রথমে পরদা পুরো টেনে দিলেন, কী ভেবে দরজাও দিলেন ভেজিয়ে। মুখের রেখাগুলো ও'র যখন মোলায়েম হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল, আমার সাহস বাড়ছিল তত। বুক ঢিপ ঢিপ থেমেই গিয়েছিল।

অবাক হয়ে এক সময় দেখি, লতুদি মিটমিট করে হাসছেন। —"তোকে এত জবরজং করে সাজিয়ে এনেছে কেন রে, তুই কি বিয়ের কনে?"

প্রথমেই তুই। আশ্চর্য কী, আমিও একেবারে বেপরোয়া হয়ে যাব, তা-ছাড়া আধা পাড়াগাঁ থেকে কিছুদিন আগে এই শহরে এসেছি, মুখরা বলে বাড়িতে একটু খ্যাতি তো আমার ছিলই। বলে বসলাম, "আপনিই বা এত খুঁটিয়ে কী দেখছেন লতুদি (ও'র যেমন 'তুই' আমারও তেমনই মুখ ফসকে হঠাৎ 'লতুদি'), আমি কি বিয়ের কনে?

লতুদি থতমত খেলেন, তারপর অবাক ভাবটা কাটাতে হাসতে থাকলেন। —"খুব স্ট্রেট-ফরোয়ারড্‌ তো তুই। এই রকমই তো চাই।"

বলেই লতুদি যে-হুকুম করলেন তা-তে দম বন্ধ হয়ে আমার হাত-পা হিম হবার উপক্রম হল। শুনলাম স্বর হঠাৎ গম্ভীর করে লতুদি বলছেন, "জামা-কাপড় সব ছাড়। তোকে আমি পরীক্ষা করব।"

বললাম, "পরীক্ষা, সে কী!" ইঁদুরের মুখে যদি মানুষের ভাষা থাকত, তবে তার গলায় কথাগুলো এইরকমই শোনাত।

"আমি ডাক্তার, জানিস না? তোকে চাকরিতে বহাল করব আর মেডিক্যাল এক্‌জামিনেশন করব না?"

তারপর, কতক্ষণ যে মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বললে বাড়াবাড়ি শোনাবে, তবে চোখ বুজে ছিলাম। সম্বিৎ ফিরল যখন চোখ মেলে দেখি, লতুদি নানা ধরনের চড়া আলো ফেলে, আমাকে নানান ভাবে দেখছেন। এক্‌স্‌-রে বলে কী একটা আছে জানতাম। এই কি সেই এক্‌স্‌-রের আলো? ডাক্তার-দিদি নিজের চোখও কি এক্‌স্‌-রে? লতুদি আবার তাঁর দাস হয়ে গিয়েছিলেন।

অত আলো, এত কাছে, এত নীচে, গরম লাগার কথা, আমার ভয়ে শীত করছিল। রগে-রগে রক্ত নয় তো, যেন

বরফ বইছে, চামড়া শিটিয়ে যাচ্ছে কুঁকড়ে আমি কাঁপছি, গ্রামের বাড়িতে মাঘ মাসে, শেষ রাতে, ঘুমের ঘোরে গা থেকে লেপ কি-কাঁথা সরে গেলে যেমন কাঁপতাম। তখন তবুও আন্দাজে আঁচলে জড়িয়ে গুটি-সুটি হয়ে শুয়েছি, এখন এই টেবিলে আমি টানটান, গায়ে কী দিই?

পিটপিট করে চেয়ে দেখলাম, ডাঃ দাসের চাহনিও নরম ছায়ার মত, আরও ঠান্ডা ধরিয়ে দিচ্ছে।

বাঁচলাম, যখন আবার ধরাচুড়ো পরার অনুমতি পেলাম। এক গ্লাস জল খেতে সাহস ফিরে এল। একটু রাগের সঙ্গে কৌতূহল মিশেছিল, ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম, "কী দেখলেন অত? আমার কোনও অসুখ নেই তো?"

লতুদি চটলেন না। বললেন, "শুধু অসুখ কেন, পুরনো কোনও ভুলের ছাপও তো থাকতে পারত? না, রে টগর, কিছু নেই। তা-ছাড়া, তা-ছাড়া"—লতুদি একটু থেমে জোর দিয়ে বললেন, "দেখলাম যে তুই মেয়েই—পুরোপুরি।"

মেসোমশাই ছটফট করছিলেন। বেরিয়ে যখন এলাম, তখন খুব সম্ভব আলমারির সব ক'টা শিশির লেবেলের নাম ও'র মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আমরা ঢুকতে আশা আর ভয় সমান সমান মিশিয়ে দৃষ্টিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

লতুদি ও'কে আর বেশিক্ষণ কষ্ট দিলেন না। বললেন, "টগরই জ ও কে। তা সিকদার মশাই, ওকে কিন্তু ও-বেলাই দিয়ে যাবেন। একটা ক্লিনিক করব এই বাড়িতেই, একা সব করে উঠতে পারছি না, হাতে হাতে কাজ গুছিয়ে দেবার লোক আমার এক্ষুনি চাই।"

মেসোমশাইয়ের ঠোঁট নড়ে উঠল, বোধহয় বলতে গেলেন "আজ বিকালেই?" এবং সম্ভবত এত দিনের স্নেহ-টেহ সব উথলে উঠছিল, কিন্তু লতুদি মায়া-মমতা এইসব নিয়ে ও'কে বেশি মাখামাখি করতে দিলেন না, "এ-মাসের ভাঙা ক'দিনের মাইনে অ্যাডভান্স" বলে আমার হাতে গোটা পাঁচেক দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন।

মেসোমশাইয়ের অদৃশ্য নখ তখন থেকে নোটগুলোকেই আঁচড়াচ্ছিল, বোধহয় ক'ত পারসেনট ও'র হিসেব করছিলেন।

রিকশায় উঠে সব ক'টা নোট ও'কে দিয়ে দিলাম।

একটা টিনের বাক্স আর আমাকে মেসোমশাই তখন নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তখন ঝির ঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ঠান্ডা হাওয়াকেও বাড়িয়ে দিচ্ছিল লতুদির বাড়ির গেটের বাইরের ডাকাতের মত দেখতে গাছটা।

লতুদি "ক্লাব" থেকে ফিরেছিলেন, বললেন "আজ আর বেরুবে না।" জানালা বন্ধ করে দিলেন। "একটু চা খাওয়াবি? বলতে ভুলে গেছি টগর, কিছু কিছু ঘরের কাজও তোকে দিয়ে করিয়ে নেব কিন্তু। ঘরের মেয়েই তো তুই, করবি না?"

ও'র প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এই সুযোগটাই না ক[illegible] পায়, বলে উঠলাম, "লতুদি, ঘরের কাজ কী বলছেন, আমি আপনার পা-ও টিপে দিতে পারি।"

লতুদি আরও খুশি হলেন। —"আগে একটা সাঁওতালি মেয়ে ছিল, কাজটাজ করে দিত। সেটা মাসখানেক হয় সটকেছে। আমার দিন কাটে কল-এ কল-এ, কেস সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাই, রোজ একার জন্যে রাঁধতেও ইচ্ছে করে না। মাসের অর্ধেক দিন দুধ-রুটি খেয়ে থাকি—নিরামিষ, বিধবাদের মত।"

বললাম, "আপনার আর দুধ-রুটি খেয়ে রাত কাটাতে হবে না লতুদি। আমিই পারব।"

"বেশি মেহনত নেই। বেশি ভোল্টেজের ইলেকট্রিক স্টোভ রেখেছি, দরকার হয় গ্যাসও আনিয়ে নেব। ক্লিনিক যখন খোলা হবে, তখন সবই তো লাগবে।" সঙ্গে সঙ্গে যেন খানিকটা আশ্বস্ত করতে লতুদি বললেন, "তুই চালাক মেয়ে, সব পারবি। ক্লিনিকের কাজও ওই সঙ্গে শিখবি। নারসিং জানিস, [illegible]ও না কিছুদিন পড়েছিলি, তোর আবার ভাবনা কী?"

সেই রাতেই রান্না হল খিচুড়ি। লতুদি খুব তারিফ করলেন। —"তুই আমাকে লজ্জা দিলি। আমি আবার ওই চিত্রাঙ্গদা-টাইপের, মেয়েলি কাজ বিশেষ শিখিনি। চিত্রাঙ্গদার গল্প জানিস?"

বোকার মত চেয়ে বললাম, "গানগুলো জানি।"

শখের মত লতুদি বলে উঠলেন, "শোনাবি?"

বৃষ্টি থেমে গিয়ে তখন একটু জ্যোৎস্না ফুটি-ফুটি করছিল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গান হল। লতুদির ফরমাস ফুরোচ্ছিল না। ভাল লাগছিল আমারও। নতুন বাড়ি, নতুন গন্ধ, তবু তো এই প্রথম দিন, নিজের বাড়ি না হোক, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। মাসিমাদের বাড়ি ঢুকে আসার পরে কোন দিন গলা এতখানি খুলে দিইনি।

শোবার ঘরে ঢুকলাম যখন, তখন প্রায় বারোটা, সাড়ে বারোটা তো হবে? চৌকাঠ ডিঙিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে লতুদি বললেন, "সাঁওতালী ছুঁড়িটা মেঝে এইখানটা শুতো। আমি আবার একা-একা শুতে পারিনে। তুই-ও এই ঘরে ওই খাটটায় শুবি।"

আলাদা ক্যাম্প খাটটায়, চাদর বালিশ সবই জড়ো করা ছিল।

নতুন জায়গা, আমার ঘুম আসবে না, সে তো জানা কথাই। মার কথা, আমার বয়সের কথা, আজ সকাল থেকে সারা দিনের সব ঘটনা, রাত নটা থেকে বারোটা অবধি গাওয়া যত গান, গানের কথা, সুর রসপ্রাণ, সব মাথার মধ্যে মৌচাক হয়ে গেল।

অনেক দিন পরে টের পেলাম লতুদিও ঘুমোননি। ও'র বিছানাতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, উনি কখনও কখনও, দেখতে পেলাম, ছটফট করছেন, কখনও-বা কনুই দিয়ে ঢাকছেন চোখ।

উঠে একবার জল খেলেন। শুতে গিয়ে শুলেন না। জানলা এ'টে চাঁদের আলো-টুকুকে কাক-তাড়ানোর মত হ'স করে বের করে দিলেন। টের পেলাম, লতুদি আসছেন। আসছেন, আসছেন এই বিছানার দিকে। না, এলেন না, আরে না, এই তো। নাকের কাছে একটা হাত বেশ বুঝতে পারছি। জেগে আছি কিনা পরখ করছেন। আমি কখন নিশ্বাস সত্যি-অফ করে দিয়েছি, পরখ করতেন কী করে।

কিন্তু চোখের পাতাটা বেইমানী করল, কেঁপে উঠল একবার। লতুদি, ও'র চোখ সত্যিই কি বেড়ালের, দেখতে পেলেন, অন্ধকারেও।

"টগর, ঘুমোসনি?"

ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে বুঝিয়ে দিলাম—না।

"আমারও ঘুম আসছে না, কেমন যেন গুমোট গরম, মাথা ধরেছে। তুই তো বলেছিলি, পা টিপতেও পারিস, তা মাথা টিপে দিবি?"

বিছানার ধারে বসেছিলেন লতুদি, আস্তে আস্তে শরীরটা ওখনেই এলিয়ে দিলেন। কপালে আমার হাতটা চেপে বললেন, "আঃ, কী ঠাণ্ডা।"

ও'র পায়ের গোড়ালি খাট ছাড়িয়ে বাইরে পড়েছিল, লতুদি নিজেই বললেন, "দেখেছিস, আমি কত লম্বা? এইটুকু খাটে ধরে না।"

যদিও, তবু—ও'র সংগে কথা বলার ধরন সহজ হয়ে এসেছিল, বললাম, "তোমার বিয়ে হলে লতুদি, স্পেশাল মাপের খাটের অর্ডার দিতে হত।"

লতুদি চটলেন না, "তুমি"টাকেও স্বাভাবিকভাবেই নিলেন। ক্লান্ত সুরে শুধু বললেন, "বিয়ে কেন বলছিস। মরলেও তো খাট লাগে। তখনও একই ব্যাপার।"

আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। ডুবে যাব, ডুবে যাব, টুপ করে ডুবে যাব—ঠিক তার আগের মুহূর্তে শুনলাম, "তোর অবিশ্যি ও-সব ভাবনা নেই, ঠিক মানানসই আছিস।"

জড়ানো গলায় বললাম, "মেয়ে হয়ে আর বেশি ঢ্যাঙা হলে, লতুদি লজ্জা পেতাম যে।"

গালে জোরে একটা চিমটি কেটে লতুদি ঘুম ছুটিয়ে দিলেন। —"কেন, আমার চেয়ে বাকী সব যে তোর বেশি-বেশি ঢগর, তাতে বুঝি লজ্জা করে না?"

আর মনে নেই। পরদিন ঘুম থেকে উঠলাম যখন, লতুদির তখনও হুঁশ নেই। অত বড় কাঠখোট্টা শরীরটা অগোছাল। পায়ের গোছের কাছে ছোট্ট রবারের বলের মত যেন একটু মাংস-ও আছে লতুদির। আর সকালের আবছা আলোয় দেখতে পেলাম ও'র পা দুটি শক্ত, ভারী-ভারী —পুরুষের মত। পুরুষদের মতই রোঁয়া-ওঠা।

শব্দ না করে ছিটকিনি খুলেছিলাম। ভোরের রোদও শব্দ না করেই ভিতরে পড়ল। পাপোষটা যেখানে, তার পাশেই অনেকটা জায়গা জুড়ে চৌকোনো সাদা দাগ, মোটামুটি একটা কাঁথা বা মানুষের মাপের।

সাঁওতালী মেয়েটা কি ওইখানেই শুত?

পর পর কয়েকদিন কেটে গেল, বিশেষ কিছু ঘটল না। ঘরের সব কাজ আমিই করতাম, লতুদি কিছু নোটস্ আর বই দিয়েছিলেন, উনি বেরিয়ে গেলে মুখস্থ

করতাম, অবশ্য কাজে ফাঁক আর ফুরসুত পেলে। লতুদি একদিন শুধু সকালে চা খেতে খেতে বললেন, "পড়া এগোচ্ছে তো? একদিন কিন্তু ধরব। যদি না পারিস দেব তাড়িয়ে, আর পারিস যদি তোকেও নিজের সঙ্গে নিয়ে কলে বেরুব। হাতে-কাজ শেখার মত ট্রেনিং আর নেই।"

"ক্লিনিক, লতুদি?"

অর্ডার দিয়েছি সব আস্তে আস্তে এসে পড়বে। তার আগে বাইরের ঘর দুটোকে একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে না?"

একদিন নিজেই আমার জন্য কড়া-ভাঁজ সাদা কতকগুলো পোশাক নিয়ে এলেন লতুদি। —"আন্দাজে তোর মাপ ধরে নিয়ে কিনেছি। দ্যাখ্ ফিট করেছে কিনা।"

"এ-সব কী, এ-সব কেন লতুদি?"

"তোর ড্রেস। আমার অ্যাসিস্টান্ট হবি, ও-সব গেঁয়ো জামা-কাপড়ে চলবে কী করে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-সবও আস্তে আস্তে শিখে নে। অভ্যেস হয়ে যাক।"

প্যাকেট ছিল বাড়তি একটা। খুলতেই দেখলাম, ফিকেগোলাপী নাইলনের জামা একটা, কিন্তু ফ্রক নয়, শেমিজের চেয়ে ঢের বেশি আবার আলখাল্লাও বলা যায় না।

এটা কী? লতুদি বললেন, নাইটি—রাত্তিরের পোশাক।

"রাত্তিরের আবার পোশাক কী?"

আমার নাকটা টিপে দিয়ে লতুদি বললেন, "বাঃ, তৈরি মেয়ে। এখন থেকেই বুঝি ধরে বসে আছিস, রাত্তির হল বিনা পোশাকের? জবু-থবু হয়ে কী কতকগুলো পরে শুয়ে থাকিস—ওতে স্বাস্থ্যহানি হয়। এতে দেখবি, আরাম কত, চমৎকার ঘুম হবে।"

"নিজের জন্য আনলে না?"

"আমার যা মাপ তাতে কি আর রেডিমেড হয় রে, পুরোনোগুলো ধুতে দিয়েছি, আজকালের মধ্যে এসে পড়বে।"

সেদিন শনিবার। লতুদি আরও কুড়ি টাকা হাতে দিয়েছিলেন, আমার কাজের ড্রেস, রাত্তিরের পোশাক সব পুঁটলি করে আর নোট দু'খানা নিয়ে মাসিকে দেখাতে গেলাম।

ফিরে এসে দেখি, লতুদি নেই। টেবিলে চিঠি চাপা—"আরজেনট কেস, বেরিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। খেয়ে নিস, আমার খাবার চাপা দিস।"

খাইনি, দু'জনের খাবারই চাপা দিয়ে আমি চেয়ারে বসে ঢুলছিলাম। মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলাম, একবার মনে হল, কে যেন দরজা ঠেলছে, ভাবলাম লতুদি, ঘুমের ঘোরেই ছিটকিনি খুললাম, একটা বেড়াল টুপ করে ঘরে চলে এল। আবার মনে হল, বারান্দার কার নিশ্বোসের শব্দ, একবার খুলে না দিয়ে ভয়ে ভয়ে জানালাটা খুললাম, সারা শরীর কঠিন করে ঠকঠক শব্দ করলাম পাল্লায়, বিরক্ত একটা রাস্তার কুকুর রাগতভেই নেমে গেল। একটু একটু করে টের পেলাম, আমার ঘুমকে পিছনে ঠেলে ঠেলে ভয় এগিয়ে আসছে। সব ক'টা আলো জ্বালিয়ে রেখেছি, তবু ভয়। এমন তো আজকাল প্রায়ই হয়—ইলেকট্রিকের গোলমালে হঠাৎ যদি সব আলো নিভে যায়? খুঁজে হাতড়ে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে বসে রইলাম। আয়নায় আমারই ছায়া পড়েছিল, সেটাকে নিজের মন কল্পনা করে নিয়ে বললাম—তবে না সাহসী বলে বড়াই তোমার?

ওই আয়নার ছায়াই মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি দিল। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকলে, এমন কী চলাফেরা করে সময় কাটালেও ভয় কাটবে।

প্যাকেটটা বাইরেই ছিল, তখন চোখে পড়ল। রাত্তিরের পোশাকটা খুলে গলার কাছে ধরতেই পায়ের পাতা অবধি ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে পরে নিলাম। দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। রোদ্দুরে পাতা বাহারের মত কাচ ঝলমল করে উঠল। কাচ, না আমি? মুগ্ধ আমি ছায়াটাকে বললাম, বাঃ খাসা তো?

তখনই কড়া খটখট করে উঠল, একই সঙ্গে বেলটাও বাজল। জোরে বলে উঠলাম, "কে?"

পুরুষের গলা শোনা গেল, "আমি বিশ্বাস, নিরঞ্জন বিশ্বাস। ডাঃ মিস্ দাস আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি কি টগর, মিস টগর?"

"কী দরকার আছে বলুন, বুঝতেই পারছেন, দরজা খোলা সম্ভব নয়।" আমার গলা কাঁপছিল, কব্জি, কনুই, কোমর বা হাঁটুতে কোন স্নায়ু বা পেশি ছিল না।

"আপনি বুঝতে পারছেন না কী আরজেন্ট ব্যাপার। ডাঃ দাসের এই ওষুধটা চাই, চিরকুটে লেখা আছে, ও'র হাতের লেখা দেখলে তো চিনতে পারবেন? বলেছেন, ওষুধটা আছে মেডিসিন চেসটে। দরজা না খোলেন তো জানলা দিয়ে স্লিপটা নিন।" লোকের গলার স্বরেও ঘাম ফোটে, সেই প্রথম টের পেলাম।

দরজা খুলিনি, জানলা দিয়েই চিরকুট আর ওষুধ চালাচালি হল। শিকের বাইরে দাঁড়ানো নিরঞ্জন বিশ্বাসের চেহারাটা ওরই মধ্যে এক ঝলক দেখা গেল। শার্ট বুক খোলা। ট্রাউজারস, বেলট বাঁধা। পায়ে স্যানডাল, চুল এলোমেলো। মাঝবয়সী লোকটা, কিন্তু গড়নে মজবুত, ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত, ভয়ার্ত দৃষ্টি।

লতুদি সেদিন এলেন আরও ঘণ্টা দুই পর। আমি ঘুমোইনি, ঘুমোতে পারিনি, মাঝে মাঝেই উঠে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছি: ল্যাম্প পোস্টটার পায়ের কাছে এখন থেকে ছায়াটা পড়ে আছে, হয়ত কাকুতি-মিনতি করছে তুলে নাও, তুলে নাও, কিন্তু কী নিষ্ঠুর ওই পোস্টটা, একবারও নুয়ে পড়ে ছায়াটাকে বুকে তুলে নিচ্ছে না।

লতুদি এলেন, থমথমে মুখ, একটাও কথা বললেন না। খাবার ঢাকা ছিল, ছুঁলেন না—একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না আমি খেয়েছি কিনা। বুঝতে পারছিলাম, লতুদি খুব পরিশ্রান্ত, চোখ তো এমনিতেই লাল, আরও লাল হয়ে গিয়েছে।

চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়তে যাচ্ছেন—আমি তখন আস্তে আস্তে বললাম "খাবে না?"

কথার উত্তর না দিয়ে লতুদি প্যাড বের করে খস খস করে কী লিখলেন। টেবিলে চাপা দিয়ে বললেন, "ডেথ সার্টিফিকেট। লিখে রাখলাম। ওই লোকটা আবার হয়ত

আমাকে, শুধু তোমারই। দিয়ে দিস। আমি আর উঠতে পারব না।"

"পেশেনট আর বাঁচবে না লতুদি?"—না বলে পারলাম না।

"শ্মশানে কোনও গল্পের সাধু বা সন্ন্যাসী যদি কমণ্ডুলু থেকে মন্ত্র পড়ে জলের ছিটে দিয়ে বাঁচায় তবে বাঁচতে পারে। তা নইলে না।"—লতুদি ডাকিনী-যোগিনীদের মত গলার খলখল করে হেসে উঠলেন।—"বছর-বছর বিয়োবে, ছাগল-গরু কুকুর-শুয়োরের সঙ্গে ওদের তফাত কী? বিশ্বাসের বউটা খুব সুন্দর ছিল রে। প্রতিমার মত।"

আবার বললাম, "লতুদি খাবে না?"

"এই যে খাই" বলে লতুদি ব্যাগ খুলে একটা আরকের শিশি খুলে গলায় ঢকঢক ঢাললেন। ওই আরকের লেবেল আমি চিনি। ঘরে মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ঘোলাটে চাউনি ধোঁয়ায় ঢাকতে লতুদি একটা সিগারেটও ধরালেন।

পাঁশীদি খুলে যাকে বাঁচাতে এর খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়েছিলাম, সে এখন মরছে। বাকীটা আমি শেষ করি? মরা আর জ্যান্ত দুই মেয়েমানুষে মিলে একটা বোতল ফাঁক।"

কাশির দমকের সঙ্গে মিশে গেল বলে লতুদির হাসিটা এবার খ্যাক খ্যাক শোনাল।

পোড়া তামাক আর কড়া মদের গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘোলাটে চোখ দিয়ে আমাকে চেটে নিয়ে লতুদি বললেন, তখন থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? আমার রাতের পোশাকটাও এতক্ষণে যেন ও'র চোখে পড়ল।—"ব্যাটাছেলে ভোলাবি বলে আশায় আশায় ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস?"

পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন, "লোকটা কতক্ষণ ছিল রে, ঠিক করে বল, কী বলছিল, কী করছিল। তোকে জড়িয়ে ধরেছিল?"

"ছি, লতুদি"—আমি ঠকঠক করছি, তবু বললাম, "ভদ্রলোকের স্ত্রী মরণাপন্ন, তাঁকে নিয়ে—"

"ওরা সব পারে", লতুদি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

আবার কী বলতে যাব, লতুদি তখন অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত একটা কাজ করে বসলেন, টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাকে ঠাস ঠাস করে মেরে বসলেন দুটো চড়।

"পাজী মেয়ে, নষ্ট মেয়ে, বজ্জাত—তবু তর্ক?"

গাল জ্বলছিল আমার, তার চেয়ে জ্বলছিল চোখ, কী করব, কোথায় যাব, শোধ তুলব কি হুকুম করব ঠিক করার আগেই দেখি ছলছল করছে লতুদির চোখ। হঠাৎ করলেন কী, গাল যেখানে আঙুলের দাগে পাঁচআঙুলের লাল হয়ে উঠেছে, সেখানে ভীষণ জোরে চেপে ধরলেন ঠোঁট। আমাকে জড়িয়ে ধরে লতুদি চুমু খেলেন।

একটা ভালুক জড়িয়ে ধরেছে আমায়—ভালুকের নিশ্বাসে মদ, ভালুকের নিশ্বাসে তামাক, আমার বমি পাচ্ছে, আমি নির্ঘাত এক্ষুণি—।

কিন্তু আমার পেটটা বমি করল না, বমি করল আমার চোখ। আমি কেঁদে ফেললাম।

চট করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে লতুদি একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন। ও'রও দপদপ করছে চোখের পাতা, নিশ্বাস ঘনঘন পড়ছে। দৃষ্টি আবার কঠিন হচ্ছে।

খি-খি করে হেসে বললেন, কাঁদছিস? মেসা হচ্ছে? কোনও ব্যাটাছেলে হলে খুব ভাল লাগত বুঝি, ধরা যাক ওই নিরঞ্জন বিশ্বাস? লোকটা তোকে কী করেছিল বল না, রাতের পোশাক পরে আছিস, ভেতরে কিছু নেই, ঠিক করে বল, ও তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল কিনা।"

দম নিলেন লতুদি, যেন এক ঢোক জল খেলেন।—"কেন, পুরুষের গন্ধে এমন কী মধু যাদুমণি? আমি ওদের চেয়ে কিসে কম? কটা পুরুষ আমার চেয়ে মাথায় উঁচু, কজনের কব্জিতে আমার চেয়ে বেশি জোর?"

সব রাতই পোহায়, এই রাত্রিও পুইয়ে-ছিল। সকালের রোদ এসে পড়েছিল পাপোষের পাশে, মেঝের। সাঁওতালি মেয়েটা সেখানে শুত।

সাঁওতালি মেয়েটা সত্যিই তো ওখানে শুত?

ঠিক করে ফেলেছিলাম, এখানে আর থাকব না। এই সিদ্ধান্তও অথচ এলোমেলো হয়ে গেল। কারণ, সকালে দরজা খুলে আস্তে আস্তে বাইরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, হেঁটে—কিন্তু মনে হয়েছিল যেন ঘোড়ায় চেপে—ছুটে আসছে, নিরঞ্জন বিশ্বাস।

[দ্বিতীয় নয়ন নিরঞ্জনের—
আগামী সংখ্যায়]

গান্ধীজীর দূত

সুধীর ঘোষ

গান্ধীজী ও নিঃসঙ্গ ভালবাসা

১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ সনের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত গান্ধীজী কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। ফলে সেই ছোট্ট আশ্রমটিই তখন ভারতীয় রাজনীতির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোদপুর আশ্রম থেকেই তিনি বাংলা আর আসামের গ্রামাঞ্চল সফর করতে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমই ছিল তাঁর সফর-সূচীর কেন্দ্রবিন্দু। যাই হোক, গান্ধীজীর উপস্থিতির জনাই ভারতবর্ষের তাবৎ অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক নেতারা কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ তাঁরা সোদপুরে গিয়ে হানা দিতেন। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান হত; হাজার হাজার মানুষ তাতে যোগ দিতেন। জনতার সে এক বিরাট উৎসব।

বাংলা দেশে বিস্তর কাজ থাকা সত্ত্বেও তারই মধ্যে সময় করে নিয়ে গান্ধীজী কয়েকদিনের জন্য আসামে গিয়েছিলেন। আসামের সফর-সূচীকে সংক্ষিপ্ত না-করে উপায় ছিল না। গোহাটিতে গান্ধীজী শ্রীমতী অমলপ্রভা দাসের স্মরণীয় আশ্রমের আতিথ্য নিয়েছিলেন। আমরাও অর্থাৎ যারা গান্ধীজীর সংগে আসামে গিয়েছিলাম, সেই আশ্রমে উঠি। শ্রীমতী অমলপ্রভা দাস সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রাক্তন বাসিন্দা। গোহাটিতে শহরের ঠিক বাইরেই তাঁর আশ্রম। গান্ধীজীর পুত্র মণিলাল গান্ধীও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মণিলাল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন; সেইখানে থেকে তাঁর পিতার আরব্ধ কাজই তিনি করে যাচ্ছিলেন। স্বদেশ থেকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকবার পরে সদ্য তখন তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। মানুষ হিসাবে মণিলাল খুবই সহজ-সরল। বাবার কাছে প্রায়ই তিনি অনুযোগ করতেন যে, নিজের সংসারকে তিনি অবহেলা করেছেন। মুশকিল এই যে, 'সংসার' বলতে আর-পাঁচজন যা বোঝে, গান্ধীজী তা বুঝতেন না। তাঁর সংসার তো নিজের পুত্রকন্যাকে নিয়ে গড়া নয়; যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং তাঁর সুখ-দুঃখের অংশ নিতেন, তাঁদের নিয়েই গান্ধীজীর সংসার গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ে তাঁর পুত্রদের কিছু ক্ষোভ ছিল। গান্ধীজীর সঙ্গী-দলে একটি মেয়ে সেই সময়ে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামান্য জ্বর, গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু তাতে কী, কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ তাকে পরীক্ষা করতে এবং তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে ছুটে এলেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আমরা তো গান্ধীজীর 'সংসার'-এর লোক; তাই আমাদের কারও কিছু হলেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন; সকলেই চেষ্টা করতেন যথাসাধ্য আমাদের যত্ন করতে। গান্ধীজীর 'সংসার'-এর প্রত্যেকের সুখ-সুবিধের দিকে বিখ্যাত সব ব্যক্তিদেরও এত প্রখর নজর দেখে মণিলাল আর থাকতে পারলেন না; বাবাকে তিনি একদিন একটা লম্বা লেকচার শুনিয়ে দিলেন। লেকচারের বিষয়বস্তু এই যে, গান্ধীজী তাঁর নিজের সত্যিকারের সংসারের দিকে কখনও ফিরেও তাকান নি। বেশ তিক্তকণ্ঠেই মণিলাল সেদিন মন্তব্য করেছিলেন যে, বাপুর কাছে থাকাটা বেশ আরামদায়ক ব্যাপার, এতটুকু ঝঞ্ঝাট কাউকে পোহাতে হয় না। শান্তভাবে গান্ধীজী সব শুনে গেলেন। তারপর নম্র গলায় বললেন, "মণিলাল, আমার কাছে থাকাটা যদি সত্যিই খুব আরামের ব্যাপার হত, তাহলে আমার ছেলেরা আমাকে ছেড়ে যেত না।"

মণিলাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর গান্ধীজী আমাকে বললেন, "বেচারা মণিলাল! ও কিছু বুঝতে পারে না। কাল তুমি বরং ওকে নিয়ে শিলং বেড়াতে যাও। শিলং তো চমৎকার জায়গা। যাও, মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে একদিনের জন্য শিলং থেকে বেড়িয়ে এসো। একটা দিন একটু ফুর্তিতে কাটালে ভালই লাগবে। এখানে এই যে আমার মতন বুড়োমানুষের কাছে তোমাদের সময় কাটছে, এ তো তোমাদের ভাল লাগবার কথা নয়। তোমাদের তো হাঁফিয়ে উঠবার কথা।"

মণিলালকে একটু আনন্দ দেবার জন্যই অতএব গৌহাটীর এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা গাড়ি যোগাড় করলুম; তারপর গাড়ি চালিয়ে, পার্বত্য পথে ষাট মাইল পাড়ি দিয়ে, পৌঁছলুম শৈল-শহর শিলঙে। তখন দুপুর, বেশ খিদেও পেয়েছিল। গাড়ি হাঁকিয়ে আমরা পাইনউড হোটেলে গিয়ে

হাজির হলুম। শিলংয়ের এটি বিখ্যাত হোটেল। ডাইনিং-রুমে ঢুকে একজন ওয়েটারকে ডাকলুম মধ্যাহ্নভোজের ফরমাশ দিতে কিন্তু ওয়েটাররা দেখলুম নিজেদের মধ্যেই মুখ-চাওয়া-চাউরি করছে, মধ্যাহ্নভোজের ফরমাশটা আর কেউ নিচ্ছে না। অগত্যা কী আর করা যায়, চুপচাপ খানিক সময় বসে থেকে আমরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালুম। ম্যানেজারটি ভারতীয়। তিনি আমাদের কাছে এসে নম্রভাবেই জানালেন যে, পাইনউড হোটেলে একমাত্র ইউরোপীয়দের ছাড়া আর-কাউকে খাবার পরিবেশন করা হয় না। এ যে ১৯৪৬ সনের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় গোহাটিতে ফিরে মণিলাল বেশ রাগতভাবেই তাঁর বাবাকে জানালেন যে বর্ণ-বৈষম্যের ব্যাপারে, এমন কী দক্ষিণ আফ্রিকাও সম্ভবত আসামের চাইতে আর-একটু উদার জায়গা। ঘটনার বিবরণ শুনে গান্ধীজী কিন্তু এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। ক্ষোভ নেই, তিক্ততা নেই—শুধু মুখের উপরে করুণ একটি বেদনার ছায়া পড়ল। একটা দিন একটু আনন্দে কাটাবার জন্য তিনি আমাদের শিলংয়ে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু এক হোটেলের ম্যানেজার সেই আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। তার জন্যও তিনি কিছুটা দুঃখ পেয়ে থাকবেন।

গান্ধীজী যখন কলকাতায় আসেন, কলকাতায় এবং তার কাছাকাছি কয়েকটি জেলে রাজবন্দীদের সংখ্যা তখনও কয়েক শ'। কলকাতা থেকে আসাম রওনা হবার আগে গান্ধীজী তাঁদের বিষয়ে গভরনর কেসিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল:

খাদি প্রতিষ্ঠান,
সোদপুর,
৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৬

প্রিয় বন্ধু

আমার মেদিনীপুর-যাত্রা এবং সেখানে থাকার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা যে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে, শ্রী এস বক্সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অতএব আমি বাধ্য। তবে আসাম থেকে ফিরে এসে তবেই আমি দেখা করতে পারব। সেখানকার অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গেও সেই একই সময়ে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক। তার কি কোন ব্যবস্থা হতে পারে?

শ্রীসুধীর ঘোষ আমাকে জানাচ্ছেন যে, আগামী মঙ্গলবার আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আনন্দ পেতে চাই।

ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য যে সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী।

হিজ একসেলেনসি দি গভরনর অব বেংগল,
ক্যালকাটা।

গান্ধীজী যখন দমদম সেন্ট্রাল জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল আর প্রেসিডেন্সী জেলে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। প্রতিটি জেলেই তিনি রাজবন্দীদের সঙ্গে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। বন্দীদের অনেকেই গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেকথা তাঁরা স্পষ্ট জানাতেন। কিন্তু মতের যতই পার্থক্য থাক, গান্ধীজী তাঁদের চোখে ছিলেন স্নেহশীল পিতার মত। অহিংস নীতিতে তাঁদের বিশ্বাস থাক আর না-ই থাক, গান্ধীজী যে তাঁদের সকলের কথাই ভাবেন, তা তাঁরা জানতেন।

নিরাপত্তা-বন্দীদের সকলেই যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মুক্তির জন্য গভরনর কেসিকে ক্রমাগত জ্বালাতন করাই ছিল আমার কাজ। মিঃ কেসি তখন বাংলা দেশে তাঁর পাট তুলে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তা লোকজনকে এ-সব ক্ষেত্রে ক্রমাগত জ্বালাতন করতে আমি খুবই দক্ষ; গভরনরকেও আমি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলাম। কলকাতা থেকে গান্ধীজী মাদ্রাজে যাওয়ার দিন পনের বাদে আমার চেষ্টা ফলবতী হল। ১ ফেবরুয়ারি তারিখে গান্ধীজীকে মিঃ কেসি এই চিঠি লিখলেন:

গভনরমেন্ট হাউস,
কলকাতা,
১লা ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

উপর্যুপরি আপনাকে পত্রাঘাত করছি,

তার জন্য আমি দুঃখিত। যে-সব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থার আভাস দেবার জন্যই, এখানকার কাজের পাট চুকিয়ে দিতে-দিতে, আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

জানুয়ারি মাসে মোট ৪১জন নিরাপত্তা-বন্দীকে মুক্তি দেবার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। ফেবরুয়ারি মাসে তাঁদের আরও ৫০ জন মুক্তি পাবেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে আর যাঁদের-যাঁদের মুক্তি দেওয়া নিরাপদ, তাঁদের মুক্তিদানের কাজ চলতেই থাকবে।

দিন কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৫ পাউনড পশম এসে পেঁছেছে। চমৎকার পরিষ্কার পশম। তাকে আমি আরও ভাল করে প্যাক করে সরাসরি সিমলায় রাজকুমারী অমৃত কাউরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

ভারতীয় রেডক্রসের বাংলা শাখার জন্য অস্ট্রেলিয়া আমাকে ২০০ বেল পশম দিয়েছে (এর দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা)। এই পশম এখন অস্ট্রেলিয়া থেকে সমুদ্র-পথে এখানে আসছে। যে-দাম নিলে খরচটা উঠে যায়, নিতান্ত সেই দামে এই পশম বিক্রি করা হবে, এবং যথাসম্ভব এই প্রদেশের কাটুনী ও তাঁতীদের মধ্যেই এটা বণ্টন করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকাটা যাবে ভারতীয় রেডক্রসে। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় সর্বাংশে (এবং ১৯৪৬ সনের জুন মাসের পরে সর্বাংশে) শুধু বাংলা দেশের অসামরিক অধিবাসীদের ত্রাণকর্মের বিরাট দায়িত্ব পালনেই ব্যস্ত থাকবে।

এই সূত্রে গতকাল রাত্রে আমি বেতারে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছি। তার একটি নকল এই সঙ্গে পাঠালুম।

শুভেচ্ছাসহ
আন্তরিকভাবে আপনার
আর জি কেসি

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার,
হিন্দুস্থানী নগর,
মাদ্রাজ।

বাংলাদেশ থেকে গান্ধীজী যেভাবে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, সে এক বিচিত্র কাহিনী। স্বাভাবিক ভাবে যদি তিনি সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যেতেন, তো তাঁকে একটি গাড়িতে উঠে, মাইল পনর পাড়ি দিয়ে, নদী পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে হত, এবং স্টেশনে পৌঁছে মাদ্রাজের ট্রেনে উঠে বসতে হত। গভরনর কেসি বলেছিলেন, হাওড়া থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত তিনি একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সৌজন্যবশতই গান্ধীজির কাছে তাঁর এই প্রস্তাব। কিন্তু, ঠিক শিশুর মতই, গান্ধীজীর মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব ইচ্ছে হত। দিন কয়েক বাদেই কলকাতা ছাড়তে হবে, আমরা তাই তখন গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত। সেই সময়ে গান্ধীজী একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন যে, আশ্রমের ঠিক বাইরেই তো সোদপুরের ছোট্ট রেল-স্টেশন। তা ঘর থেকে এক পা বেরিয়েই যদি ওই স্টেশনে গিয়ে রেল-গাড়িতে চাপা যায়, আর সেই রেলগাড়িতেই যদি মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাহলে সেটা দিব্যি ব্যাপার হয়, গাড়ি পালটাবার ঝঞ্ঝাট আর পোহাতে হয় না। গান্ধীজীর কথা শুনে তো আমি চমকে গেলুম। তা কী করে হয়? সোদপুর হচ্ছে গঙ্গার পূর্বতীরে কলকাতার উপকণ্ঠে বেঙ্গল-আসাম রেল-পথের উপরে শহরতলির একটা ছোট্ট স্টেশন। সেক্ষেত্রে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রেল-পথের বিন্যাস একেবারেই আলাদা। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মাদ্রাজ-কলকাতা লাইন হচ্ছে নদীর পশ্চিমকূলে। গঙ্গার পূর্ব-কূলে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের ট্রেনে উঠে, সেই ট্রেনে করেই ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে ঢুকে, অতঃপর সেই ট্রেনেই আবার গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেঙ্গল-নাগপুর রেল-ওয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কেউ ইতিপূর্বে মাদ্রাজ গিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। কিন্তু গান্ধীজীকে সে-কথা তখন কে বোঝাবে। আশ্রম থেকেই তিনি রেল-লাইনের উপরে শহরতলির ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখতে পেতেন। দেখতে দেখতেই তাঁর চিত্তে হয়ত এই বাসনা জেগে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, সোদপুর স্টেশনেই যদি তিনি তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ওঠেন, আর সেই কামরাতে বসেই যদি সরাসরি মাদ্রাজ যেতে পারেন, তাহলে সে বেশ মজার ব্যাপার হয়।

শুনে আশ্রমের সবাই একবাক্যে বললেন যে, তা সম্ভব নয়। এমন ব্যবস্থা হতেই পারে না। গান্ধীজীকে আমি বললুম যে, ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের কাছে আমি নিশ্চয়ই একবার যাব, এবং জেনে নেব, এমন ব্যবস্থা সত্যিই করা যায় কিনা। ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার তখন মিঃ এন সি ঘোষ। আমি তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলুম, এবং জিজ্ঞেস করলুম, এমন ব্যবস্থা কি তাঁরা করতে পারবেন? ধরা যাক, গান্ধীজীর

ছোট্ট তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল ট্রেনটি যদি সেওড়াফুলির ছোট্ট রেল-স্টেশন থেকে রওনা হয়ে, বালি ব্রিজের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে পশ্চিমকূলে ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, তাহলে সেখান থেকে কোনও একটা জায়গাতেই কি তাঁরা ট্রেনটিকে বেংগল-নাগপুর রেলওয়ের মধ্যে চালান করে দিয়ে সরাসরি তার মাদ্রাজ যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? রেলওয়ের এই বড়কর্তা সম্ভবত ইতিপূর্বে আর কখনও এমন অভিনব প্রস্তাবের সম্মুখীন হন নি। এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে কেউ কখনও করেছেন বলেও স্মরণ করা গেল না। বেংগল-নাগপুর রেলওয়ে আসছে দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারত থেকে; ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ে আসছে উত্তর ভারত থেকে। তারা হাওড়া স্টেশনের সংগমে এসে মিলেছে। এই পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু সেই সংগমের কাছাকাছি কোথাও ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ে থেকে একটি ট্রেনকে বেঙ্গল-নাগপুরে রেল-ওয়ের উপরে চালান করবার মত কোনও যোগসূত্র আছে কিনা, তা কেউ চট করে বলতে পারলেন না। মিঃ ঘোষ তখন বেঙ্গল-আসাম, ইস্ট-ইনডিয়ান আর বেঙ্গল-নাগ-

পরে—এই তিন রেলওয়ের তিন চীফ ইনজিনীয়ারের এক বৈঠক ডাকলেন। রেলপথের যাবতীয় নকশা ড্রইং ইত্যাদি সেখানে তলব করা হল। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, হাওড়া টার্মিনাসের কাছে শালিমারের বিরাট গুডস ইয়ারডে তেমন একটা যোগসূত্র সত্যিই আছে বটে। তবে ইতিপূর্বে আর কখনও সেটা কেউ ব্যবহার করেনি। যাই হোক, যোগসূত্র যখন মিলেছে, তখন মাইল পনর-কুড়ির সেই অস্বাভাবিক লাইনটিকে এবারে কাজে লাগানো হবে বলে ঠিক করা হল। আসল কথা, গান্ধীর এই ছেলেমানুষী বায়না মেটাবার জন্যেও রেলকর্মীরা যে-কোনও রকম পরিশ্রম বরণে প্রস্তুত ছিলেন। শালিমার গুডস ইয়ার্ডের অব্যবহৃত সেই লাইনটিকে অতএব পরিষ্কার করা হল, এবং পরীক্ষা করে দেখা হল, সেটা ব্যবহারের যোগ্য আছে কিনা। এবং গান্ধীজীর ইচ্ছাপূরণের পথেও অতঃপর আর কোনও বিঘ্ন ঘটল না। তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল ট্রেনটি সত্যিই সোদপুর স্টেশন থেকে রওনা হয়ে, গঙ্গা পার হয়ে, ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে ঢুকে, শালিমার ইয়ারডের মধ্য দিয়ে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সরাসরি মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছল।

মাদ্রাজ থেকে ফেবরুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি সেবাগ্রামে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ পারলামেনটারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মাদ্রাজেই গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অতঃপর সেই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাকেও নানা স্থানে ঘুরতে হয়। ৯ই ফেবরুয়ারি তারিখে তাঁরা নয়াদিল্লি থেকে ইংল্যানড যাত্রা করেন। প্লেন ছাড়ল বিকেলে। প্রতিনিধিদলকে প্লেনে তুলে দেবার জন্য আমি উইলিংডন বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যায় ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেল আমাকে টেলিফোন করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই অনুযায়ী আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি এমন একটা অনুরোধ করে বসেন, যা ঠিক প্রত্যাশা করা যায়নি। তিনি জানালেন যে, দক্ষিণ ভারতের যে-সব জায়গায় অনাবৃষ্টির ফলে এক নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সফর সেরে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সেই-দিনই বিকেলে রাজধানীতে ফিরেছেন, এবং খাদ্য পরিস্থিতির জন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। গান্ধীজীর সঙ্গে ভাইসরয় দেখা করতে চান এবং খাদ্য-সংকট সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। অ্যাবেল বললেন, লর্ড ওয়াভেলের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে পরদিন সকালেই আমাকে গান্ধীজীর কাছে যেতে হবে, এবং দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়, তা নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য গান্ধীজী যাতে নয়াদিল্লি আসতে রাজী হন, তার জন্য আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। অ্যাবেল জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি এতে সম্মত আছি?

১০ই ফেবরুয়ারির সাত-সকালে সামরিক বিভাগের একখানি বীচক্র্যাফ্‌ট একা আমাকে নিয়ে নাগপুর যাত্রা করল। আমার হাতে তখন ভাইসরয়ের চিঠি। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি:

ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি.
৯ই ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

খাদ্যাবস্থা নিয়ে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি ইতিমধ্যে মিঃ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছেন। মিঃ ঘোষ এ-বিষয়ে আপনাকে সব বলবেন। দক্ষিণ ভারতে সফর শেষ করে সদ্য আমি এখানে ফিরেছি। খাদ্যশস্য বাঁচাবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি-এলাকার মানুষরা যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পায় তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের পক্ষে যে-সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবার দরকার হতে পারে, সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলি কী মনোভাব অবলম্বন করবেন, তারই উপরে অসংখ্য মানুষের জীবন নির্ভর করছে বলে আমার মনে হয়।

আপনার পক্ষে যদি দিল্লি আসা সম্ভব হয়, তাহলে এই সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। তার জন্য আমি খুবই উৎসুক।

এ-ব্যাপারে সময়ের প্রশ্নটা অতিশয় জরুরী। আপনি যদি অবিলম্বে যাত্রা করতে পারেন, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল।

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার।

নাগপুরে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখলাম, মধ্যপ্রদেশের গভরনর আমার জন্যে একটি বিরাট মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং আমার জন্যে সেটি অপেক্ষা করছে। ধুলোয় ভর্তি পথের উপর দিয়ে ৪৬ মাইল পাড়ি দিয়ে আমি ওয়ার্ধায় পৌঁছলাম, এবং জেলার ডেপুটি কমিশনারকে জিজ্ঞেস করলাম, ওয়ার্ধা থেকে আমাকে সেবাগ্রামে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি আর একটু আটপৌরে একটা গাড়ি দিতে পারেন কিনা। গভরনরের মস্ত ঝকঝকে গাড়ি, তকমা-আঁটা শোফার—আশ্রমের পরিবেশে যে এ-সব খুবই বেখাপ্পা ঠেকবে, তা আমি জানতুম বলেই ডেপুটি কমিশনারের কাছে একটা ছোট গাড়ি চাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অতীতে যতই তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধ ঘটে থাক না কেন, সাহায্যের জন্যে ভাইসরয় এই যে আবেদন জানিয়েছেন,

গান্ধীজী এতে সাড়া দেবেন। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম।.. গান্ধীজী দিল্লি যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি আমাকে দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, ভাইসরয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লি যাবার জন্যে আমি যেন তাঁকে পীড়াপীড়ি না করি। আমি যে আদৌ লর্ড ওয়াভেলের অনুরোধ রক্ষা করে গান্ধীজীর কাছে তাঁর চিঠি নিয়ে এসেছি, তার জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তক্ষুনি ভাইসরয়কে এই কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলেন যে, "শারীরিক ও নৈতিক কারণে" ভাইসরয়ের অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারছেন না। তবে সেই সঙ্গে তিনি এও জানালেন যে, ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে কথা বলবার অধিকার দিয়ে একজন প্রতিনিধিকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে তাঁর সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল

সেবাগ্রাম
১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

শ্রীসুধীর ঘোষ আপনার ন-তারিখে লেখা চিঠিখানি আমাকে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, সম্ভব হলে আপনার আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতাম। কিন্তু, যিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু, তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলেছি যে, শারীরিক ও নৈতিক কারণে কেন আমার পক্ষে আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সেই কারণগুলির কথা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলবেন, এবং আমার প্রস্তাবটি আপনার কাছে পেশ করবেন। আপনি যদি কোনও প্রতিনিধি পাঠান তবে আমি সানন্দে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী।"

হিজ একসেলেন্সি দি ভাইসরয়

টেলিফোনের সুবিধে সেবাগ্রামেও ছিল। ভাইসরয়ের প্রস্তাব শুনে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে, জর্জ অ্যাবেলকে তা আমি টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম। ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখেই বিমানযোগে অ্যাবেল নাগপুরে চলে এলেন। সেখান থেকে এলেন সেবাগ্রামে। তাঁর সঙ্গে ছিল ভাইসরয়ের লেখা আর-একটি লিপি।

ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি
১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী

মাদ্রাজ সফরের পরে যে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ-কথা জেনে দুঃখিত হলাম। একটু বিশ্রাম নিলেই আশা করি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আপনার পক্ষে যেহেতু দিল্লি আসা সম্ভব হল না, তাই আপনি প্রস্তাব করেছেন যে, খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য আপনার কাছে আমি কাউকে পাঠাতে পারি। এই প্রস্তাবে আমি খুশী হয়েছি, এবং অ্যাবেলকে পাঠাচ্ছি। অ্যাবেল আমার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলে আমি আপনাকে যা-যা বলতুম, তা অ্যাবেলই আপনাকে বলবে।

এই একই বিষয়ে আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নাকে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

যত রকমের বাক্‌নৈপুণ্য জর্জ অ্যাবেলের জানা ছিল, গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসে তার সবগুলিই তিনি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। বন্ধ অটল। মূলেই আসলে গলদ ছিল। ভাইসরয়ের চিঠিতে লেখা ছিল, "এই একই বিষয়ে আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নাকে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলছি।" এদিকে অ্যাবেলও একটি যৌথ আবেদনের খসড়া তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আবেদনটি ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উদ্দেশ করে রচিত; তাতে বলা হয়েছিল যে, সংকটের মোকাবিলা করতে হলে খাদ্যশস্য বাঁচাতে হবে এবং আরও ফসল ফলাতে হবে। পরিকল্পনাটা ছিল এই যে, গান্ধীজী, মিঃ জিন্না আর ভাইসরয় এতে সই করবেন। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই দাঁড়াত যে, একটি তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ ভাইসরয়ের উদ্যোগে ভারতবর্ষের হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজী এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ জিন্না তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন যে, ভয়াবহ খাদ্য-

সংকটের সমাধান করবার ব্যাপারে তারা যেন সরকারের সংগে সহযোগিতা করে। ভাইসরয় এ-কথা খুব ভালই জানতেন যে, ভারতবর্ষে তাঁর প্রতাপ সীমাহীন বটে, কিন্তু দেশের মানুষের চিত্তে তাঁর কথা এতটুকু রেখাপাত করবে না। তাঁর চারপাশের ধূর্ত আমলারাও জানতেন, গান্ধীজীকে এর মধ্যে জড়িয়ে দেওয়া চাই, একমাত্র তাতেই কাজ হবে। কিন্তু দেশে যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে, তখনও এ-ব্যাপারে সেই পুরনো অভিসন্ধিটাই—অর্থাৎ গান্ধীজীকে হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি আর মিঃ জিন্নাকে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়ে প্যারিটি রক্ষা করবার অভিসন্ধিটাই—ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যৌথ আবেদনে যদি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে মিঃ জিন্নার স্বাক্ষর নেবার দরকার হয়ে থাকে, তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করবার জন্য কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদকে অনুরোধ করলেই সেটা সংগত কাজ হত। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল যাঁদের পরামর্শে পরিচালিত হতেন, সেই ব্রিটিশ আমলাদের বিচারে গান্ধীজী ছিলেন ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রতিনিধি; এবং জিন্না ছিলেন ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের প্রধান প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটাকে তাঁরা এইভাবেই বিচার করতেন। এই ধরনের বিচারে গান্ধীজীর "নৈতিক" আপত্তি ছিল। লর্ড ওয়াভেলকে লেখা চিঠিতে সে-কথা তিনি জানিয়েও দিয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও অবশ্য ভাল যাচ্ছিল না; দেখলেই সে-কথা বোঝা যেত। তবে "নৈতিক" আপত্তি না থাকলে স্বাস্থ্য তাঁর পক্ষে তার অন্তরায় হত না। অন্তর থেকে যদি সায় পেতেন, তাহলে স্বাস্থ্য যতই খারাপ থাক, খাদ্য-সংকটের সমাধানে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরতে রাজী হতেন।

ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন গান্ধীজী। কেন প্রত্যাখ্যান করলেন, তা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গি যে এত কঠোর হবে, তা আমি ভাবিনি। ব্যাপার দেখে আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সূত্রে আমাকেও গান্ধীজী বেশ কঠোর কিছু কথা শোনালেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন সেবাগ্রাম আশ্রমে ছিলেন। তিনিও যোগ দিলেন সেই আলোচনায়। এ হল ১০ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। পরদিনই মিঃ অ্যাবেলের দিল্লি থেকে আসবার কথা। ঘণ্টাখানেক ধরে গান্ধীজী আর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলেন। আমাকে তাঁরা যা-তা- বললেন, তা আমি শান্ত হয়ে শুনলাম। গান্ধীজী বারবার বলছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাদের কথায় তাঁর আস্থা নেই; আমারও থাকা উচিত নয়। কথাটা তাঁকে বারবার বলতে শুনে আমি ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঈশ্বর আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন, এবং তিনি নিশ্চয়ই চান যে, সেটাকে আমরা কাজে লাগাই। গান্ধীজী আমাকে এও বললেন যে, ভাইসরয় ও অন্যান্য সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা আমাকে ডাকাডাকি করছেন বটে, কিন্তু তাতে যেন আমি 'উল্লসিত' না হই। কথাটা শুনে আমি ব্যথা পেয়েছিলাম ঠিকই; তবে এও বুঝতে পারছিলাম যে, তাঁর কথাগুলিতে পিতৃসুলভ স্নেহও অনেকখানি রয়েছে। যাকে তিনি গভীরভাবে স্নেহ করেন, ভর্ৎসনার ছলে তাকে তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন মাত্র। তাঁর চিন্তার গতিপ্রকৃতি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করতুম। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ মনের মানুষ; সেই মনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার তরঙ্গ কীভাবে উঠছে-নামছে, তার সবটাই যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। কিছুই তিনি লুকিয়ে রাখতেন না। বেশির ভাগ মানুষই দেখেছি কথা দিয়ে যেমন নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি আবার কথা দিয়েই তাকে অনেক সময় ঢেকেও রাখে। গান্ধীজী সেক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে নিজের চিন্তাকে শুধু প্রকাশই করতেন; কথার আড়ালে তাকে গোপন করতেন না। এও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য।

কথা এই যে, আমার মনের মধ্যে একটি শিশুও তো রয়েছে। গান্ধীজী সেদিন স্নেহশীল পিতার মতই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভর্ৎসনার তীব্রতায় সেই শিশুটি সেদিন আহত হয়েছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অ্যাবেলের সংগে বিমানযোগে আমি দিল্লিতে ফিরলাম; তার পরদিনই রওনা হলাম কলকাতায়। গান্ধীজী বলেছিলেন, ব্রিটিশ আমলাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। সেবাগ্রাম থেকে রওনা হবার পর সারাটা পথ শুধু এই একটি কথাই আমি চিন্তা করেছি। আমার মনে হচ্ছিল, অদ্ভুত এক নিঃসংগতা যেন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে। কলকাতায় ফিরে আমার স্ত্রীকে আমি সমস্ত কথা জানালাম। দিন কাটছিল, কিন্তু আমার অশান্তি কিছুতেই যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত, নিজেকে কিছুটা ভারমুক্ত করবার জন্য, ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীকে আমি একটি চিঠি লিখলাম। চিঠিখানি এই :

১১ লাভলক প্লেস,
বালিগঞ্জ পোঃ,
কলকাতা,
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।

"প্রিয় বাপু,

১১ই তারিখে সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে আমি খবর পাই যে, কলকাতায় গুরুতর দাঙ্গা বেধেছে। কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে, গোঁয়ার্তুমি না করে যে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়, এই কথাটা তাঁদের বোঝাতে পারব, এই আশায় পরদিন সকালেই আমি কলকাতা রওনা হই। গভর্নরের সংগে আমি দেখা করেছি, এবং যেটুকু আমার সাধ্য তা করেছি।

দিল্লিতে আমি অ্যাবেলের কাছে জানতে পাই, ইতিমধ্যেই তাঁরা এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন যে, স্বাস্থ্যগত কারণে আপনার পক্ষে এসে ভাইসরয়ের সংগে দেখা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আপনি তাঁকে এও জানাতে বলেছিলেন যে, আপনার এখন আরও নানা কাজের খুব চাপ যাচ্ছে। অ্যাবেল বললেন, তিনি সেবাগ্রামে ফোন

ক্ষমবেন, এবং যে ভুল হয়ে গিয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইবেন।

সেবাগ্রামে যখন আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, তখন আপনি বন্ধুবান্ধবদের 'অবিশ্বাস' করবার কথা বলেছিলেন। সেবাগ্রাম থেকে চলে আসবার পরে এ নিয়ে আমি ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে, আমি কী করতে চেষ্টা করছি এবং কেন তা করতে চেষ্টা করছি, সে-বিষয় আমার কিছু বলা উচিত। কিন্তু এ-নিয়ে কিছু বলাও বড় শক্ত। এই সঙ্গে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। আমি যখন কেমব্রিজ থেকে চলে আসি, তখন এক ইংরেজ তরুণী এই চিঠি আমাকে লিখেছিলেন। আশা করছি, কোনও এক অবকাশের মুহূর্তে এই চিঠিখানি আপনি পড়ে দেখবেন। পত্রলেখিকা একজন কোয়েকার; ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর আমরা পড়েছি; তখন ফ্রেনড্স মিটিং হাউসে আমরা একযোগে উপাসনা করতাম। তরুণ-বয়সীরা কীভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং পরস্পরের অনুরাগী হয়ে ওঠে, তা আপনি জানেন। আমাদেরও পরস্পরকে খুবই ভাল লাগত; তবে বন্ধুত্বের এই

সম্পর্ককে আমরা ভাবালুতার বন্ধন থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলাম। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "যে-কাজ সহজে সম্ভব, তা তুমি করতে চাও না, তুমি অন্য পথ বেছে নিয়েছ। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রায়ই তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করবে। তবে শক্তির এমন একটা উৎস তোমার আছে, চূড়ান্ত রকমের পরীক্ষা আর নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেও যা তোমাকে শক্তি যোগাতে ব্যর্থ হবে না। আমার বন্ধুত্বে যদি তোমার উপকার হয়, তাহলে আমি খুশী হব; এবং এখন যেমন তোমাকে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি, তেমনি তখনও জানাব।" ইংল্যানডের যা ভাল, তার মর্ম বুঝতে এই তরুণী আমাকে সাহায্য করেছিলেন; ব্রিটিশ জাতি আর ভারতবাসীদের মধ্যে যাতে শান্তিময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার জন্য কাজ করবার প্রেরণা আমি কেমব্রিজেই পেয়েছি। ১৯৪০ সনের গ্রীষ্মকালে আমি কেমব্রিজ থেকে বিদায় নিই; এই তরুণী তখন আমাকে এই চিঠি, এবং চিঠির সঙ্গে একখন্ড 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্সেস' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি যে "নিঃসঙ্গতা"র কথা বলেছেন, এবারে সেবাগ্রাম থেকে চলে আসবার সময় সেই নিঃসঙ্গতারই অভিজ্ঞতা আমার হল। আমি জানি, কী আমি বলতে চাইছি, তা আপনি বুঝবেন।

আমি বাড়ি ফিরে আসায় শান্তি খুশী হয়েছে। সে আপনাকে তার ভালবাসা জানাচ্ছে।

দিল্লি এবং কলকাতার বিষয়ে আরও অনেক কথা লিখবার ছিল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে চিঠি না-লিখে সাক্ষাৎ-আলোচনাই শ্রেয়। মিঃ কেসি আমাকে আগামীকাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। যেসব বিষয়ে আপনি তাঁকে লিখেছিলেন, তার কিছুটা তাঁকে দিয়ে করানো যায় কিনা, তা নিশ্চয়ই দেখব।

মাদ্রাজে আপনার স্বাস্থ্য যেমন দেখেছিলাম, এবং সেবাগ্রামে যেমন দেখলাম, তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আমি লক্ষ করেছি। আশা করছি, পুনায় অবস্থানের ফলে স্বাস্থ্য আবার ভাল হবে।

ভালবাসা জানাই।

সুধীর"

আমার এই চিঠি পড়ে গান্ধীজীর মনে যে-সব চিন্তার উদয় হয়েছিল, ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'হরিজন' পত্রিকার জন্য লেখা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি তা ব্যক্ত করেন। নিবন্ধটির শিরোনামা "নিঃসঙ্গ নয়।" ১৯৪৬ সনের ৩রা মার্চ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়।

নিঃসঙ্গ নয়

(মো. ক. গান্ধী)

সম্প্রতি এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন যে, সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন। ইতিপূর্বে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমলা মহলের কথা আমি অবিশ্বাস করি। তারই ফলে তাঁর এই মন্তব্য। তিনি অবিশ্বাস করেন না। এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, আমিও তাঁর বিশ্বাসের অংশীদার হব। যখন তিনি দেখলেন যে, তা আমি হব না, তখন তিনি নিরতিশয় হতাশ হলেন। অবশ্য চিঠিখানি তিনি স্পষ্ট করে লেখেন নি, এবং এমনও হতে পারে যে, ঠিক এই কথা তিনি বোঝাতে চান নি। তবে আমি তার এই ব্যাখ্যাই করেছি, এবং উত্তরে তাঁকে জানিয়েছি যে, ঈশ্বরের ভক্ত হিসাবে তাঁর কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করা উচিত নয়। কেননা, ঈশ্বর তো সারাক্ষণই তাঁর সঙ্গে আছেন। সমগ্র বিশ্ব-সংসার যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে, তাতেই বা তিনি বিচলিত হবেন কেন? মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় থেকে যদি তিনি বিশ্বাসের প্রেরণা পান, তবে আমি যা-ই বলে থাকি না কেন তাঁর বিশ্বাসকে তিনি বজায় রাখবেন।

আমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পারস্পরিক বিশ্বাসকে আমি বিশ্বাস বলি না; পারস্পরিক ভালবাসাকেও আমি ভালবাসা বলি না। যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদেরও যদি তুমি ভালবাসতে পারো, তো সেই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। তোমার প্রতিবেশীকে বিশ্বাস না-করা সত্ত্বেও যদি তাকে তুমি ভালবাসতে পার তো সেই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। ইংরেজ আমলা মহলকে যে আমি বিশ্বাস করি না, তার জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে আমার ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তো ইংরেজকে অবিশ্বাস করেও তাকে আমি ভালবাসব। বন্ধুকে যতক্ষণ বিশ্বাস করছি, শুধু ততক্ষণই তাকে ভালবাসব—এমন ভালবাসায় লাভ কী? তেমনভাবে তো চোররাও ভালবাসে। পারস্পরিক বিশ্বাসটা যেই ভেঙে যায়, অমনি তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"

গান্ধীজী এ-বিষয়ে একটি চিঠিও আমাকে লিখেছিলেন। (চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি।) তাতে তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় মহম্মদ ও তাঁর শিষ্য আলীর গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁরা দুজনে একবার এক অন্ধকার গুহার মধ্যে আশ্রয় নেন। আলী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরকে তিনি বলেছিলেন, "আমরা নিঃসঙ্গ।" উত্তরে পয়গম্বর তাঁকে বলেন, "নিঃসঙ্গ হওয়া তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরই আমাদের সঙ্গে আছেন।"

(ক্রমশ)

আঠারো

অবনী বলল, "আসুন; আমার মনে হচ্ছিল আজ আপনি আসবেন।"

অবনীর সহাস্য মুখ সরল দৃষ্টি লক্ষ করতে করতে হৈমন্তী সিঁড়ির শেষ ধাপ উঠে বারান্দায় পা দিল। "কি করে মনে হল আমি আসব?"

"ইনট্যুশান!" অবনী হেসে-হেসেই বলল।

বারান্দায় বসা যেত, কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকা যেত না। এখন বিকেল শেষ হয়ে আসেছে, এখুনি দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে যাবে, শীত আর বাতাস গায়ে ফুটবে। হৈমন্তী বারান্দায় দাঁড়াল। বলল, "আমি বাজারে নেমে ছিলাম, ব্যাটারি-ট্যাটারি কেনার ছিল।" বলে হৈমন্তী মুহূর্তের জন্যে থামল, অবনীর চোখ দেখল, তারপর হেসে বলল, "সেখানে আপনার মহিন্দরকে দেখলুম, সাইকেল চেপে আসছে।"

অবনী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। "আরে, না, মহিন্দর আমায় কিছু বলে নি; আমি জানিই না সে বাজার গিয়েছিল।"

হৈমন্তী এবার চোখের একটু ভঙ্গি করল। "তাহলে তো আপনার ইনট্যুশানে বিশ্বাস করতেই হয়।"

হাসির মুখ করল দু' জনেই।

অবনী বলল, "আজ আমি একবার ওদিকে যাব ভেবেছিলাম। তারপর কেমন মনে হল আপনি আসতে পারেন।"

"ভেবেছিলেন যখন তখন যাবেন—" হৈমন্তী সুমিষ্ট করে হাসল। "আমার বই ফুরিয়ে গেছে—" হৈমন্তী এমন ভাবে বলল যাতে মনে হবে বই ফুরিয়ে গেলে তার না এসে উপায় কি। অবশ্য এই বলাটা তেমন কৈফিয়তের মতন শোনাল না।

অবনী বলল, "এত তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললেন কেন?

"কেন?"

"এ-ভাবে পড়লে আমি আর বেশিদিন বই জোগাতে পারব না।"

"সে পরের কথা—"

"আপনি আর-একটু রয়ে-সয়ে পড়বেন", অবনী হেসে বলল, কিন্তু এমন ভাবে বলল যাতে বোঝা যায় তার কথার মধ্যে একটা সকৌতুক ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ অবনী যেন পরিহাস করে বোঝাতে চাইল, অত তাড়াতাড়ি সব বই শেষ হয়ে গেলে হৈমন্তী আর কি এ-বাড়ি আসবে!

হৈমন্তী কথাটায় কান দিল কি দিল না বোঝা গেল না।

বসার ঘরে এসে বসল হৈমন্তী। বাতিটা জ্বালিয়ে দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে অবনী জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "সুরেশ্বরবাবুর খবর কি?"

হৈমন্তী প্রথমে কোনো জবাব দিল না, পরে উদাসীন গলায় বলল, "ভাল।"

অবনী হৈমন্তীর দিকে তাকিয়েছিল। বলার ভঙ্গিটা তার কানে গেল। বাইরে তাকাল; শীতের অপরাহ্ণ গত, কোথাও রোদ নেই, আলোর সামান্য আভাস এখনও আছে, গাছপাতা প্রায় কালচে হয়ে এল, ছায়া গাঢ় হয়ে ময়লা রঙ ধরে যাচ্ছে। এই সময়টা অবনীর চোখে সব সময়ই বিষণ্ণ লাগে, বিশেষ করে যখন একা একা থাকে একা একা দেখে। হৈমন্তীর কথা থেকে অবনীর মনে হল, জবাবটা খুব নিস্পৃহ; আগে এভাবে জবাব বড় দিত না হৈমন্তী, এখন দেয়; এখন সে আশ্রম সম্পর্কে বিরক্তি বা উদাসীনতা অবনীর কাছে জানাতেও দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু সুরেশ্বর সম্পর্কে বেশীর ভাগ সময়েই হৈমন্তী নীরব থাকে, যা বা বলে তার মধ্যে উৎসাহ বা অনুৎসাহ কিছু থাকে না। এই মুহূর্তের 'ভাল' বলাটা ঠিক নৈর্ব্যক্তিক নয়, উদাসীন নয়; কোথায় যেন একটা বিরক্তি ছিল বলার স্বরে ও ভঙ্গিতে।

অবনী বলল, "বিজলীবাবু পরশুদিন গিয়েছিলেন না!" কথাটা আগের কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইচ্ছে করেই অবনী অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করল।

"হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রীকে দেখাতে?"

"চোখে কি হয়েছে বলছিলেন—"

"একটু গণ্ডগোল আছে, সেরে যাবেন।" হৈমন্তী হাতের ব্যাগ খুলে অবনীর বইগুলো বের করে রাখল। তারপর হঠাৎ বলল, "বিজলীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ, বার দুই দেখলাম। বেশ ভাল লাগল।"

"ব্যাপার কি?" অবনী ইচ্ছাকৃত বিস্ময় জানাল, পরিহাস করেই।

"কিসের ব্যাপার, কেন?"

"একে অন্যের এত প্রশংসা করছেন?"

"উনি বুঝি আমার প্রশংসা করেছেন?"

"বিজলীবাবু তো তাই বললেন। ভীষণ প্রশংসা..."

"ও! পরের মুখে ঝাল খেয়ে বলছেন—" হৈমন্তী এবার হাসল। তার হাসি থেকে বোঝা গেল সে আগের মানসিক বিরক্তি-টুকু ভুলে গেছে।

"নিজের মুখে ঝাল খেতে হলে চোখের একটা উপসর্গ দরকার—" হাসতে হাসতে বলল অবনী। কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে বসল। বসার আগে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এল।

হৈমন্তী আচমকা বলল, "বিজলীবাবুর স্ত্রীকে দেখলে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে; অবিকল একই ছাঁচের মুখ। হাসি-টাসিগুলোও যেন এক রকম। আমার সেই বন্ধু এখন শিলিগুড়িতে থাকে।"

"ডাক্তার?" অবনী ভয়-ভয় গলা করে বলল।

"হ্যাঁ, তবে এমনি ডাক্তারী করে না; সরকারী হেলথ্ ডিপার্টমেন্টে কিসের একটা চাকরি নিয়েছে। তার স্বামীও ডাক্তার।"

অবনী হৈমন্তীর চোখে চোখে চাইল। হয়ত অবনী বোঝবার চেষ্টা করল হৈমন্তীর মনে কোনো রকম নৈরাশ্য আছে কি না। কিছু বোঝা গেল না। অবনী অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে যেন বিজলীবাবুর স্ত্রীর প্রসঙ্গ আরও একটু বিস্তৃত করল, "বিজলীবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁর প্রথম স্ত্রীর সহোদর বোন।"

"শুনেছি।...বড়কেও দেখেছি, সেই যে বিজয়ার পর গিয়েছিলাম। খুব ভারিক্কী, গিন্নী গিন্নী..."

"ধর্মকর্ম জপতপ নিয়েই থাকেন।
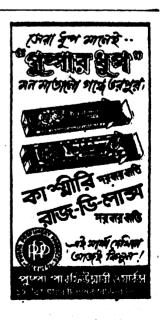
রেশ-মহারাজের খুব ভক্ত।" অবনী শেষ থাটা যেন কেমন ভেতরের কোনো লোভের শ বলে ফেলল।

হৈমন্তী কথাটা শুনল কিছু বলল না।

অবনী বসে থেকে থেকে একটা সিগারেট াবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে প্যাকেট বা শলাই পেল না। শোবার ঘরে পড়ে াছে। উঠে দাঁড়াল. সিগারেট আনতে হবে, য়ের কথা বলতে হবে মহিন্দরকে; নলার বাইরে যেন হু হু করে একরাশ ধকার এসে গেছে. বাগানের গাছে পাখিরা ক বেঁধে ফিরে কলরব শুরু করেছে।

"একটু বসুন, আসছি।" অবনী চলে লে।

হৈমন্তী বসে থাকল। অবনীর এই বসার র আজকাল তাকে মাঝে মাঝে এসে বসতে া. ঘরটা তাই পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে সছে। সাদামাটা বেতের সোফাসেট, লার গদি পাতা. কাঠের ছোট সেন্টার বল, একপাশে একটা বুক র‍্যাক, ছোট নে এক কাঠের সেলফ. তার তলায় কয়েকটা মা পেতলের মূর্তিটুর্তি, ওপরে এক লদানি, টেবল ল্যাম্প; দেওয়ালে একটি ালেন্ডার. অবনীর যুবক বয়সের একটা ব। এই সজ্জার মধ্যে বাহুল্য নেই, কেবারে শূন্যতাও নয়, যেন কাজ চালিয়ে বার মতন করে সাজানো ঘর। ঘরটি বেশ রচ্ছন্ন. কোথাও বিশৃঙ্খল হয়ে কিছু ই। একলা মানুষ, ঘরদোর এলোমেলো ার কারণ নেই। চাকর বাকররা যেটুকু ব তাই যেন যথেষ্ট।

হৈমন্তী অবনীর বসার ঘর ছাড়া ভেতরের া দুটি ঘরও একদিন দেখেছে। অবনী ড় দেখাবার সময় একদিন দেখিয়েছিল। ানো ঘরেই সে বাহুল্য বা বিশেষ ীখিনতা দেখে নি। শৌখিনতা যেন অবনীর ই; তার সবই সাদামাটা, যেটুকু প্রয়োজন র অতিরিক্ত বড় কিছু রাখে না। এই নের মানুষ যা হয়—অফিস নিয়ে পড়ে াছে, কাজকর্ম শেষ হলে যেটুকু সময় টুকু শুয়ে বসে বিশ্রাম নিয়ে কাটানো, লস্যে বসে বসে গোয়েন্দা কাহিনী পড়া, াস্ট্রেটেড উইকলি দেখা, কী বড়জোর ডয়ো খুলে দিয়ে পায়চারি করা।

অবনী ফিরে এল। জামাকাপড় বদলে সছে. পরনে গরম ট্রাউজারস, গায়ে রো হাতা সোয়েটার, মুখচোখ পরিষ্কার, ার চুল আঁচড়ানো। হাতে কিছু বই। ন্তীর কাছে এসে হাতের বইগুলো ময়ে দিয়ে বলল, "দেখে বেছে নিন, এর একটা আগেও আপনাকে দিয়ে থাকতে র।"

াইরে এতক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরের লো এবার ফুটে উঠেছে। ন্তী বই দেখতে লাগল, অবনী মুখো- থ বসে ট্রাউজারসের পকেট থেকে মোজা বের করে পিট নুইয়ে পরে নিতে লাগল। তার আচরণের মধ্যে কোনো রকম সংকোচ ছিল না।

বই দেখতে দেখতে হৈমন্তী বলল, "কোথাও বেরোবেন ?"

"আপনার সঙ্গে..."

এ যেন হৈমন্তীর জানা ছিল। সাধারণত সে এলে অবনী তাকে গুরুডিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসে। আজ প্রথম থেকেই হৈমন্তীর কোনো তাড়া ছিল না। অন্যদিন সে এসে পনেরো কুড়ি মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখে, বাসের কথা বলে, আজ একবারও ঘড়ি দেখে নি, বাসের কথা বলে নি। তার ইচ্ছে আজ সে দেরী করে ফিরবে, যতটা সম্ভব সে দেরী করতে চায়।

"আজ বেশ ঠান্ডা—" হৈমন্তী বলল যেন এতটা ঠান্ডায় অবনীকে গুরুডিয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে মনে মনে প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিল।

"এ ঠান্ডা আমাদের গা-সওয়া", অবনী সোজা হয়ে বসল। "আর কদিন পরেই কুসমাস, তখন কয়েকদিন, জানুয়ারির আধাআধি পর্যন্ত ভীষণ ঠান্ডা পড়বে। আমার নিজের খুব ভাল লাগে সময়টা।"

"কুসমাসে গগন আসছে।" হৈমন্তী তিনটে বই বেছে অন্য একটা বইয়ে হাত দিল।

চা নিয়ে এল মহিন্দর। চা আর ওমলেট। হৈমন্তী মহিন্দরের সঙ্গে দুটো কথা বলল। এ বাড়িতে তার পরিচয় এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বলে চাকর বাকরের মধ্যেও কোনো কৌতূহল আর দেখা যায় না। মহিন্দরের বাবার চোখের ছানি মহিন্দর হৈমন্তীকে দিয়ে দেখিয়ে এনেছে। ছানি কাটাতে হবে। এখনও একটু দেরী আছে। হৈমন্তী নিজে ছানি কাটবে না, বলেছে ব্যবস্থা করে দেবে।

মহিন্দর চলে গেলে হৈমন্তী চা ঢেলে অবনীর দিকে এগিয়ে দিল।

অবনী বলল, "আসছে হপ্তায় আমাকে হয়ত একবার পাটনা যেতে হবে।"

"পাটনা! কেন ?"

"ওপরঅলার ডাক।"

"সেই ব্যাপারটা নাকি ?"

"বুঝতে পারছি না। হতেও পারে।" অবনী একটুকরো ওমলেট মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগল। তারপর বলল, "নতুন যে কনস্ট্রাকসানের তোড়জোড় হচ্ছে সে ব্যাপারেও হতে পারে।"

হৈমন্তী চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে চামচ করে ওমলেট কাটতে কাটতে বলল, "জীবনে উন্নতি হয় না বলে লোকে আফসোস করে, আর আপনার ঠিক উলটো; উন্নতি পায়ে ধরে সাধছে আপনিই মুখ ফেরাচ্ছেন।"

অবনী হাসির মুখ করল। "বিজলী বাবুও তাই বলেন।"

"সকলেই বলবে; বিজলীবাবু আপনার বন্ধু..."

সামান্য চুপ করে থাকল অবনী, চা খেল। শেষে বলল, "এই তো বেশ আছি এখানে। উঁচু চেয়ারে বসার অনেক ঝামেলা।"

"ঝামেলা এড়াবার জন্যে প্রমোসান নেবেন না ?"

অবনী হৈমন্তীর চোখে চোখে তাকাল, পরে চোখ সরিয়ে নিল। "এ-সব চাকরি—বিশেষ করে এখানে বাঙালী হয়ে বেশি-দিন টিকিয়ে রাখা মুশকিল। অনেক রকম ক্লিক থাকে। আমার কোনো ইন্টারেস্টও নেই।"

হৈমন্তী ওমলেট মুখে তোলার আগে অবনীকে দেখতে দেখতে বলল, "আপনার যেন কোনো বড় অ্যাম্বিসানও নেই।"

"না, নেই।" অবনী হাসিমুখে জবাব দিল।

"কেন ?"

"কি হবে বড় অ্যাম্বিসনে।"

"বেশী মাইনে, প্রতিপত্তি, খ্যাতি..." হৈমন্তী হাসি হাসি মুখে বলছিল, "এ-সব তো শুনেছি হয়।"

"এই মাইনেতে আমার কুলিয়ে যায়, খুব একটা অভাব বোধ করি না।"

"একলা আছেন বলে। পরে..." হৈমন্তী

অসতর্কভাবে বলে ফেলল।

অবনী আবার ..চোখ তুলে স্পষ্ট করে হৈমন্তীর চোখ মুখ দেখল। পরিহাস হয়ত, তবু মেয়েলী কৌতূহলে হৈমন্তীর এ-কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় বা সে-কৌতূহল প্রকাশ করাও অন্যায় নয়। অবনী বলল, "ভবিষ্যতের কথা আমি বড় একটা ভাবতে পারি না। ওটা আমার ডিফেক্ট..."

"প্রতিপত্তি চান না—এটাও বোধ হয় তাই." হৈমন্তী যেন আগের অসতর্ক কথাটা মোছবার জন্যে বলল, বেশ জোরে জোরে হেসে।

"অল্পস্বল্প প্রতিপত্তি আমার এখানেও আছে—" অবনীও পরিহাসের গলায় জবাব দিল।

"পুরুষমানুষ প্রতিপত্তির খুব ভক্ত। অহংকার, প্রতিপত্তি, মর্যাদা—এসব তার ভূষণ..." হৈমন্তী যদিও পরিহাসের মতন করে বলেছিল তবু কথাগুলো ঠিক পরিহাসের মতন শোনাল না।

অবনী অনুভব করতে পারল হৈমন্তীর বলার ভংগীতে পরিহাস থাকলেও কেমন এক তিক্ততা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যেন চাপা উপহাস করল হৈমন্তী। অবনী স্পষ্ট কিছু

অনুমান করতে পারল না, তবে তার মনে হল, হৈমন্তীর আজকের আচরণ কিছুটা বিসদৃশ।

"এত ভূষণ গায়ে চাপালে হাঁটা যায়?" লঘু স্বরে অবনী বলল।

"যাবে না কেন, যায়।" হৈমন্তীর ঠোঁটের কিনারায় বঙ্কিম হল।

"তবে তিনি পুরুষ নয়, মহাপুরুষ।" অবনী ঠাট্টা করে বলল। চা শেষ করেছে অবনী, ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল।

আরও একটা বই বেছে নিয়ে হৈমন্তী অন্যাগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে মুখ নীচু করে বলল, "আপনার উদ্যোগ নেই, উদ্যোগ থাকলে মহাপুরুষ হওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, আমি স্বভাব খানিকটা ইন-অ্যাকটিভ—" অবনী হাসল।

বই থেকে চোখ তুলে হৈমন্তী বাকি চাটুকু শেষ করে অবনীর দিকে তাকাল। দু মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "উঠবেন?"

"আমার তাড়া নেই; আরও কিছুক্ষণ বসতে পারেন।"

"আমার বই বাছা শেষ হয়ে গেছে—আর মাত্র একটা নেব..." বলে হৈমন্তী সামান্য দ্রুত হাতে অন্য একটা বই বাছতে লাগল।

অবনীর একটা বইয়ের ওপর চোখ পড়েছিল। বলল, "ওই—ওই বইটা নিতে পারেন, ঠিক ক্রাইম বা মিস্ট্রি নয়, তবু পড়তে মন্দ লাগবে না।"

"এইটে...?" হৈমন্তী একটা বই তুলে দেখাল।

"না, নীচেরটা, আপনার কোলের ওপর—"

হৈমন্তী কোল থেকে বইটা তুলে নিল : 'এ রুম ফর টু'। নামটা দেখল হৈমন্তী, মুখে কিছু বলল না, বেছে রাখা বইয়ের মধ্যে রাখল।

সন্ধ্যে গাঢ় হয়েছে। অবনী ঘড়ি দেখল। পৌনে সাত। হৈমন্তী সময় জিজ্ঞেস করল, সময় বলল অবনী। তারপর চুপচাপ, যেন এখানের কাজ হঠাৎ সব ফুরিয়ে গেছে। নীরবে বসে হৈমন্তী তার ব্যাগের মধ্যে বইগুলো ভরতে লাগল। অবনী চুপচাপ। ঘরের বাতিটা সামান্য মৃদু হয়ে আবার জোর হয়ে উঠল। বাইরে বাতাসের শব্দ প্রখর হলে শোনা যাচ্ছিল।

"চলুন উঠি," হৈমন্তী বলল।

"চলুন। একটু দাঁড়ান, জুতোটা পায়ে গলিয়ে আসি।" অবনী উঠল, উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

হৈমন্তী ব্যাগের মুখ বন্ধ করল, মুখ মুছল রুমালে, দু হাতে কপালের চুলগুলো সামান্য ঠিক করল। বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল সামান্য, দেওয়ালে টাঙানো অবনীর তরুণ বয়সের ছবিটা দেখল। খুব নিরীহ আর ভীতু-ভীতু দেখায়, এখনকার চেহারার সঙ্গে বেশ তফাত। অবনী কখনও নিজের পারিবারিক কথা বলে না কেন? হৈমন্তী প্রায় সবই বলেছে, মা মামা দাদা বউদি গগনের কথা। , অবনীর যেন এসব পারিবারিক কথায় আগ্রহ নেই। হৈমন্তী জানলার দিকে সরে গেল। বাইরে অন্ধকারে হিমের সঙ্গে ধোঁয়া জমেছে সামান্য, কাছে স্টেশন, এঞ্জিনের ধোঁয়া এ-সময় একটু জমে থাকে এখানে, উত্তরের বাতাস শনশন করে বইল, এই ঠাণ্ডায় এবং বাতাসে অবনী গুরুডিয়ায় যাবে আবার আসবে ভেবে যেন হৈমন্তী কিছুটা সঙ্কোচ অনুভব করল।

আজ তার কি রকম যেন লাগছে। অবনীর বাড়িতে সে একটু দেরী করেই এল। কেন এল? একবার এমন কথাও মনে হয়েছিল আসবে না। আজ অকারণে তার কোথাও যেন কিছুটা দ্বিধা এবং সঙ্কোচ লাগছিল। সেই তখন থেকে—লাটঠায় আসবার সময় থেকে—বাসে ওঠা, এবং বাসে আসতে আসতে, বাজারে নেমে (বাজারে সে ইচ্ছে করেই আগে ভাগে নেমে সময় কাটাচ্ছিল এবং মন স্থির করে নিচ্ছিল) বাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসার সময় প্রায়ই তার ওই বিশ্রী চিন্তাটা কাঁটার মতন ফুটছিল : সুরেশ্বরের ঈর্ষা ও সন্দেহ, এবং অবনীর মুখ মনে ভাসছিল। এ বড় অদ্ভুত চিন্তা। যেন একের সঙ্গে অন্যটা জড়ানো। যদিও এই ঈর্ষা ও সন্দেহ অসম্ভব। হৈমন্তী বিশ্বাস করে না। তবু...তবু। অবনী সম্পর্কে তার এ-ধরনের কোনো ভাবনা সজ্ঞানে হয় নি এ-যাবৎ, এখন হচ্ছে, যদিও সেটা প্রায় কিছুই নয়, তবু ভাবনাটাই কেমন অকারণে তাকে সংকুচিত করছিল। শেষ পর্যন্ত হৈমন্তী চলে এল, কিন্তু অবনীর সামনে মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করেছে যে তাতে সন্দেহ নেই। এ রকম কেন হবে সে বুঝতে পারছিল না। আজ সে অবনীর সামনে হয়ত কিছু এলোমেলো কথা বলেছে, হয়ত অন্য দিনের মতন সপ্রতিভ হতে পারে নি, যদিও তার চেষ্টা করেছিল। এমন কি হৈমন্তী যেন গোপনে সুরেশ্বরের প্রতি তার মনের বিরূপতাও আজ কিছু প্রকাশ করে ফেলেছে। অবনী বোধ হয় কিছু বুঝতে পারে নি। কিংবা পেরেছে হয়ত। কে জানে!

অবনী এল। "চলুন, আমার হয়ে গেছে।"

হৈমন্তী পিছু ফিরে তাকাল। গলায় পাক দিয়ে মোটা একটা মাফলার ঝুলেছে অবনীর, হাতে টর্চ। দু পলক তাকিয়ে থাকল হৈমন্তী।

"গরম আর কিছু গায়ে দেবেন না?"

"না, আর দরকার হবে না।"

"ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"লাগবে না।"

হৈমন্তী এগিয়ে এসে সোফার ওপর থেকে

তার লম্বা গরম কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল।

গাড়িতে এসে ওঠার সময় হৈমন্তী বলল, "গাড়ি যদি ধীরে চালান তবে সামনে বসি।"

"বসুন।"

হৈমন্তী গাড়িতে উঠল। হালে জিপ গাড়িটার কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছে। আগে মাথায় ছিল ক্যানভাস, এখন অ্যালুমিনিয়াম শিট দিয়ে মাথা ঢাকা হয়েছে, পিছনটা ঢেকে দিয়ে গায়ে নতুন ক্যানভাস জড়ানোও হয়েছে সদ্য। এ-সবই অবনীর সুবিধে মতন সে করিয়ে নিয়েছে, নয়ত এই সর্বদিক খোলা গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করতে তার অসুবিধে হচ্ছিল ; দরকারী জিনিস, কাগজপত্র নষ্ট হচ্ছিল পথে।

হৈমন্তী আজ পিছনে বসল না; পিছনে বসলে কথাবার্তা বলতে, গল্প করতে বড় অসুবিধে হয় ; একজনের ঘাড়ের দিক মুখ করে সারাক্ষণ বসে থাকা বা কথা বলা বড় বিশ্রী, মুখ দেখা যায় না, জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। তা ছাড়া, বাইরের এই বাতাসের ঝাপটা পেছনে বেশী লাগে, সামনে বসলে কাচের আড়াল পাওয়া যায়, গায়ের পাশ দিয়ে বাতাস কাটিয়ে নেওয়া চলে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় আসতে চোখে পড়ল, আকাশে বাঁকা চাঁদ উঠে আছে।

বাজার পর্যন্ত বড় একটা কথা হল না, সাধারণ কিছু বাক্য-বিনিময়। বাজার পেরিয়ে থানার দিকে পিচের রাস্তাটা ধরতেই আশেপাশে বাড়িঘর আলো কমে এল, তারপর থানা পেরুতেই সব যেন দপ করে নিবে গেল এবং লোকালয় অদৃশ্য হল। অবনী বেশ ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল।

ঘরে বসে হৈমন্তীর যদি কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় থাকে বাইরে পথে এসে এবং অন্ধকারে তা হচ্ছিল না। বরং তার ভাল লাগছিল। শীত অনুভব করলেও কয়েক প্রস্থ পোশাকের দরুণ সে কাঁপছিল না বা বাতাসের ঝাপটা গায়ে লাগতে দিচ্ছিল না। অথচ হাতের আঙুল, নাক কান ঠান্ডা হয়ে এসেছিল।

অবনী যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, হৈমন্তী তার আগেই বলল, "গগন এলে একটু বেড়াবার ইচ্ছে আছে। চারদিকেই শুনি বেড়াবার নানা জায়গা। একদিন টাউনে যাব।"

"যান নি এখনও?"

"একদিন দুপুরে গিয়েছিলাম, বিকেলেই ফিরতে হল..."

"চলুন একদিন..."

"গগন আসুক।"

"এলে আর-একবার হবে, তবে পরশু যদি যেতে চান আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। পরশু দিন আমায় যেতে হবে একবার, কাজ আছে।"

"কখন যাবেন?"

"বেলা দশটা নাগাদ—"

"না, আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

হৈমন্তী কি একটু ভাবল, বলল, "ওপরঅলার হুকুম নেই।" বলে হাসবার চেষ্টা করল।

অবনী মুখ ঘুরিয়ে দেখল। তার যে ভাবে যে-স্বরে 'ওপরঅলা' শব্দটা বলে

হৈমন্তী ঠিক সেই ভাবে বলল। অনুকরণে ভুল হয় নি। কিন্তু এ-ধরনের অনুকরণে যা থাকার কথা নয় হৈমন্তীর বলার মধ্যে তা ছিল।

অবনী হেসে বলল, "আপনার আবার ওপরঅলা কোথায়? সুরেশ্বর..."

হৈমন্তী হাসল না। "বেলা একটা পর্যন্ত আমার হাসপাতাল; তার এদিক ওদিক করা যাবে না।"

"ভীষণ কড়া নিয়ম তো।"

"এই নিয়মটা অবশ্য আমার। ওরা আরও বেশী সময় থাকতে বলে। দিন দুপুর সন্ধ্যে। আমি রাজী না। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে।"

"গোলমাল?" অবনী মুখে হাসছিল, কিন্তু মনে মনে সে বুঝতে পারছিল কোথাও একটা মনান্তর চলছে বোধ হয়।

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, বলল "সেই রকম।"

গাড়ি দেখতে দেখতে অনেকটা চলে এসেছে। স্টেশনে আসার শেষ বাসটা পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। দু পাশে উঁচু নীচু মাঠ, আর গাছপালা; অন্ধকারে খুব ফিকে চাঁদের আলো ছড়ানো, মাঠময় বাতাস ছুটছিল, শীত যেন আরও ঘন হয়ে এসেছে এখানে।

অবনী গাড়ি চালাতে চালাতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, "আপনার ওপরঅলা কিন্তু সব সময় আপনার সুখ্যাতি করেন।"

"করেন..."

"সেদিনও আমার কাছে প্রচণ্ড সুখ্যাতি করছিলেন।"

"কি হিসেবে? ডাক্তার হিসেবে তো?"

"হ্যাঁ; আর কিসের করবেন?"

"ডাক্তার হিসেবেই আমার যেটুকু দাম..." হৈমন্তী হঠাৎ বলে ফেলল। বলে চুপ করে গেল।

অবনী এবার আর মুখ ফেরাল না। সে অনুভব করতে পারল হৈমন্তীর কোথাও যেন একটা ক্ষোভ ক্রমশ জমে জমে ভারী হয়ে গেছে। আগে বোঝা যেত না, পরে অল্প অল্প বোঝা যাচ্ছিল, এখন যেন তা আরও স্পষ্ট, প্রকাশ্য। সুরেশ্বরের সঙ্গে হৈমন্তীর ঠিক কোথায় যে মনোমালিন্য ঘটতে পারে অবনী তা অনুমান করে আজকাল। কিন্তু সে বুঝতে পারে না— স্বেচ্ছায় যে কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়ে এই বন-জঙ্গলের দেশে চলে এসেছে তার মধ্যে হঠকারিতা বেশী, না কি অনুরাগ, অথবা আদর্শ? আদর্শ নয়। কেন না এই ক'মাসের পরিচয়ে অবনী নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছে অন্ধ আশ্রমের আদর্শ বা আকর্ষণ হৈমন্তীর নেই। আদর্শ যখন নেই তখন অনুরাগ ভিন্ন আর কিছু থাকে না; সুরেশ্বরের প্রতি অনুরাগবশেই হৈমন্তী সব ছেড়ে এসেছে। এই অনুরাগ কি এখানে এসে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কেন? হৈমন্তী কী আশা নিয়ে এসেছিল, কোথায় সে ব্যর্থ হল, তার আশাভঙ্গের যথার্থ কারণ কি? হৈমন্তী কি তার দিল্লির বান্ধবীর মতন হতে পারলে সুখী হত?

অবনী লাটঠার মোড় সামনে দেখতে পেল; বলল, "গুরুডিয়ায় যাবেন, না বেড়াবেন একটু?"

"বেড়াই..."

"শীত করছে না?"

"না, তেমন নয়।"

"আর একটু সরে বসুন, বাতাস লাগবে না।"

হৈমন্তী আরও একটু অবনীর দিকে সরে বসল। অবনী সামনে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল, যেন এই পথে, নির্জনে, প্রান্তর আর অতিম্লান ঈষৎ নক্ষত্রের আলোর মধ্যে তারা দুজনে ঘনিষ্ঠ ও অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

(ক্রমশ)

(১৬)

অবনীন্দ্রনাথকে আমি একবারই দেখেছি। তাঁর ছবি তুলেছি ঐ একবারই। তাও সে-ছবি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেগুলো শুধু ব্যক্তিগত খাতে রেখে দেওয়া চলে। আর চলে এই হিমালয়তুল্য শিল্পীমহানের সন্দর্শনে একটি দিনের কাহিনী স্মরণ করতে।

হিমালয় তার মহান রূপ-ঐশ্বর্য দেখাতে কোথাও যায় না, তার রূপদর্শন মানসে সারা বিশ্বের গুণগ্রাহীরা ছুটে আসে। দেখে নয়ন-মন সার্থক করে ফিরে যায়। তেমনি মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত হয়েও নিজে কোথাও যাননি। অতি সতর্কতায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন শিল্প-চর্চায়। সারাদিন, সারাক্ষণ, বছরের পর বছর। কিন্তু প্রতিভা লুকিয়ে রাখা যায় না বলেই রস-সন্ধানী চিত্রশিল্পীরা ছুটে এসেছেন দেশ-বিদেশ থেকে তাঁরই রঙ-তুলির খেলা দেখতে। স্বচক্ষে দেখে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন—প্রাচ্যের চিত্রকলায় এই নতুনত্বের ধারা নিঃসন্দেহে অবনীন্দ্র-নাথের প্রতিভায় সমৃদ্ধ। যাঁর কল্যাণে ভারতবর্ষ এতখানি স্বীকৃতি পেল, এতখানি সমাদর পেল—তিনি কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সর্বদাই ব্যস্ত। বেশির ভাগ সময়ই তিনি ছবি নিয়ে মগ্ন থাকেন বরাহনগরের এক প্রান্তে 'গুপ্ত-নিবাসে'। জানি না, ওটা তাঁর লুকিয়ে থাকার স্থান ছিল বলেই নাম গুপ্ত-নিবাস হয়েছিল কিনা। তবে এটুকু জানতাম যে, নেহাত তেমন প্রয়োজন না হলে শান্তিনিকেতনে পর্যন্ত বেশী দিন থাকতে চাইতেন না।

আমরা চার বন্ধুতে ১৩৫২ সালে শেষ-পৌষের একটি দিনে হাজির হয়েছি অবনীন্দ্রনাথ-দর্শন মানসে। বরাহনগর যাবার পথে সেদিন আমার অনেকখানি মনে হয়েছিল দেব-দর্শনের কথা। জানি না, মানুষকে দেবতার সামিল গণ্য করলে দেবতারা রুষ্ট হন কিনা। হয়ত সে-জনাই সেখানে পৌঁছে শুনলাম—অবনীন্দ্রনাথ অসুস্থ, লোকের সঙ্গে দেখা করা ডাক্তারের বারণ, এখন ঘুমিয়ে আছেন—ইত্যাদি। পিতার এই অসুস্থতার কথা জানিয়ে অলক ঠাকুর আমাদের অবস্থাটাও একটু ভেবে দেখলেন যেন। বললেন—একটু বসুন তো, দেখি! আমার বন্ধুদের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হয়েছিল জানি না। তবে আমার তখন মনে পড়ছিল—তারকেশ্বরে একবার দেব-দর্শন করতে গিয়ে মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার থেকে ব্যর্থ চিত্তে ফিরে এসেছিলাম। তারপর ট্রেনে করে ব্যান্ডেল এসে সেখানকার বিখ্যাত গির্জা দেখেছিলাম ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে। সেদিন দেব-দর্শনের ব্যর্থতা মনে কোন আফসোস টেনে আনেনি। কিন্তু এদিন অবনীন্দ্রনাথের গৃহে বসে তাঁকে বিনা দর্শনে চলে যেতে হবে ভাবতেই মনটা যেন মুষড়ে গেল। বিষণ্ণ মনে বসে রইলাম নীরবে। হাতের ক্যামেরাটার দিকে একবার তাকিয়ে আমার বিষণ্ণতা যেন আরো গাঢ় হল।

তখনি হঠাৎ দেখি ঘরের পর্দা সরিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবনীন্দ্র-নাথ। নিমেষেই মন থেকে মুছে গেল পুঞ্জীভূত নিরাশা। সন্তুষ্টচিত্তে সবাই প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু নলেন-গুড়ের সন্দেশ আর একটি রজনীগন্ধার তোড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেগুলো টেবিলের উপর রাখতেই ভৃত্যকে তিনি ফুলটা ভিতরে নিয়ে যেতে বললেন। একটু ইতস্তত করে আবার বললেন—সন্দেশটা ওদিকে রেখে যাও। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডাক্তারের বারণ আছে এ-সব খাওয়া, বউমা হয়ত দেবে না—তাই লুকিয়ে এখানেই দু-একটা খেয়ে নেব। শিশুর মত কথাগুলো বলে শিশুর মত হাসতে লাগলেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি যেন তখন ভুলে গেছেন তাঁর শরীর অসুস্থ।

তারপর আমরা বেশ কিছু সময় ছিলাম

তাঁর সান্নিধ্যে। নানা কথায় তিনি মেতে উঠেছেন, তারই ভিতর এক ফাঁকে নিয়ে এলেন একটা 'কুটুম-কাটাম'। একটা কাঠ-বেড়াল। এত সব মজার ব্যাপার দেখছি, কিন্তু আমি বন্ধুদের মত তেমন উপভোগ করতে পারছি না। কারণ, আমার মনের ভিতর তখন জেগেছে একটি নিরাশার ব্যথা। স্পষ্ট বুঝলাম, আমার ক্যামেরার বরাত মন্দ।

তবুও জানলাম অবনীন্দ্রনাথকে ছবি তোলার কথাটা।

—কিন্তু আমার যে অসুস্থ শরীর, আর দেখছ না একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি?

উত্তরে আমি বলি—অসুস্থ শরীরের চেহারাই না-হয় আমি তুললাম।

তিনি বুঝলেন ছোড়া নাছোড়বান্দা। মুখের দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে অগত্যা রাজী হলেন—আচ্ছা, তা হলে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেল। অস্ত্র যখন এনেছ, তখন বধ করেই ফেল। বল কোথায় বসব?

ছবি তোলার অনুমতি পেয়ে সেদিন নানাভাবে ছবি তুলতে কসুর করিনি। এমনকি, তাঁর ভৃত্য যখন চা-খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল, তখনো ছবি তুলেছি।

সেদিন পৌষের অপরাহ্ণ বেলায় বরাহনগরের গুপ্ত-নিবাস ছেড়ে আসবার সময় আমার মনে যে আশা-নিরাশার একটা মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছিল, তা আজো মন থেকে মুছে যায়নি। সেদিন নিরাশার মুখে শিল্পী-গুরুর দর্শনলাভে সমর্থ হয়ে বিশেষ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে, ছবি তুলেও যা চেয়েছিলাম, তা তো পেলাম না। তাঁর অসুস্থতা ছবিগুলোকেও যেন অসুস্থ করে দিয়েছে।

—নীরোদ রায়

পিয়ের বোনার্দ

পাঠক নিশ্চয় ভাবছেন এখনও কেন সেজান্ বা ভান গ বিষয়ে আলোচনা করলুম না। সেজান্ যদিও জন্ম-তারিখ অনুসারে বহু আগেই আলোচ্য, তবু তাঁর প্রথম যৌবনের ইম্প্রেশনিজম-পর্ব কেটে যাবার পর যেসব ছবি তিনি এঁকেছিলেন তা উনিশ শতকের ছবির সুরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এক বিরাট ভবিষ্যৎবর্ণী বিশ শতকের, এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন। বিশ শতকের কিনারে এসে তাই সেজানকে স্মরণ করা যাবে ভেবেছি, এবং ভান গ যেহেতু আমার মতে পুরোপুরি এক্সপ্রেশনিস্ট তাই তাঁকেও একটু পরে আনব।

এই সপ্তাহের শিল্পী পিয়ের বোনার্দ, ফন্তেনে-অরহোজ-এ ১৮৬৭ সালে জন্ম, ফরাসী সন্তান। ১৮৯১ সালের আগে এই ছেলেটি আত্মপ্রকাশ করেনি, ওই বছরই তার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী হয় আরো কয়েক-জন চিত্রকরের সঙ্গে—সাঁল-দ্য-আঁদেপঁদাতে এবং এই নবপ্রতিভার স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ছবি আঁকার কায়দা দেখে চিত্র সমালোচক-দের মধ্যে হইহই পড়ে যায়। সিম্বলিস্টদের শিল্পাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বোনার্দ এবং তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ, মরিস ডেনিস, রুসে (রসো নয়) প্রভৃতিরা একটি দল গড়েন, এবং নিজেদের "নবি" (Nabis) বলে পরিচিত করেন শিল্পী মহলে ("নবি" কথাটা আসছে হিব্রু থেকে, অর্থ "প্রফেট্")।

রোগা, লম্বা, হাড়সর্বস্ব এই ছোকরা বড় লাজুক ছিল, নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখত অন্যদের কাছ থেকে, সর্বদাই যেন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। তরুণ বয়সে তাঁর বড় বড় চিত্রকরদের ছবির চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় লাগত "অ্যাপ্লায়েড আর্টের" দিকটা: পুরনো ফার্নিচারের দোকানে কিংবা এ্যান্টিক-শপএ পিয়েরের প্রায় দুপুরই কেটে যেত অসাধারণ কোন ফর্মের সন্ধানে। ছেলেটিকে সবাই জানত লাজুক, বোকা বোকা, ঠাণ্ডা প্রকৃতির বলে, চিন্তাই করতে পারত না শিল্পকলার দিকে ও আছে তাই ১৮৯১তে তাঁর "ফ্রাঁস-শাম্পান" নামক রঙিন পোস্টারটা যখন সর্বসম্মুখে প্রকাশিত হল, চমকে উঠল সবাই। অসম্ভব গতি আর তেজ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে ছবিটা থেকে বর্শার ফলার মত। যদিও ব্যক্তিগতভাবে নিরস প্রকৃতির মনে হত তাকে লোকের, কিন্তু তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণই ছিল রস, বা অনুভূতির তিব্রতা। বোনার্দের ছবি বিষয়ে যদি একটি বিশেষণ বাছতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সবার "মধুর" কথাটি মনে পড়বে।

দাগার পরে এই আরেকজন শিল্পী যিনি পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন থেকে দর্শক হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বোনার্দের কাছে ছবি আঁকাটা একটা তোড়জোড়ের ব্যাপার একেবারেই ছিল না, দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তা তিনি নিয়েছিলেন একমাত্র আত্মপ্রকাশের রাস্তা হিসেবে। এই ধরনের লোকেরা, আমার মনে হয়, হয়তো কখনো শিল্প-সাহিত্যের দিকে আসবার কথাই ভাববেন না যদি চতুর হতেন কথাবার্তায়, সাবলীল সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হতেন মানুষের সঙ্গে। বোনার্দের কথা ভাবলেই আমার মনে হয় একটি লোক হেঁটে বেড়াচ্ছে উদাসভাবে প্যারিসের রাস্তায়, কোটের তলায় একটা গরম হৃদয় লুকোনো, পকেটে পয়সা নেই, চোখদুটি উজ্জ্বল—যা দৃষ্ট হচ্ছে, হৃদয়টা যেন টাইপরাইটারের মত টুকে নিচ্ছে তা, যা টুকছে তার সঙ্গে তথ্যের দূরত্ব অনেক, কিন্তু সত্য সেখানেই লুকোনো। আমাদের ভালো লাগলে আনন্দে জড়িয়ে ধরি বন্ধুকে, কিন্তু যে লোক লাজুক, ওরকমভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না, তার তো ছবি বা কবিতার আশ্রয় নিতেই হবে। বোনার্দের বোধ হয় ছবি না এঁকে কোন উপায়ই ছিল না।

'ওয়োম্যান উইথ আম্ব্রেলা'

প্রৌঢ় বয়সে বোনার্দ চলে গিয়েছিলেন লো-কানে নামক সমুদ্রতীরবর্তী এক শহরে এবং সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি কিনে

বোনার্দ-অঙ্কিত 'বীচ অ্যাট লো টাইড'

স্থায়ী বসবাস করবেন ঠিক করলেন। বাড়িটিতে কোনো সরঞ্জামই নেই কয়েকটি সাদা রঙের কাঠের চেয়ার আর একটা খাট ছাড়া, এবং বোনার্দেরও কখনো মনে হয়নি সরঞ্জাম সংখ্যা বাড়াবার কথা। এখানে বসে তিনি বহু ছবি এঁকেছেন এবং সুতো দিয়ে ঝুলিয়েছেন সেগুলো দেয়ালে, ফ্রেম-ট্রেম করার কোনো ব্যাপারই নেই। আমি বলছিলাম না যে এই চিত্রকরের ছবি আঁকা জীবনযাত্রার, বেঁচে থাকার সঙ্গে এমন স্বাভাবিক ভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে তার জন্য কোনো তোড়জোড়ের ব্যাপারই ছিল না। যেহেতু, "শিল্পী হয়ে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকব" এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছবি আঁকার কারণ নয়, সত্যি বলবার জন্যই যেহেতু তিনি তুলি ধরেছেন, সেহেতু থিওরি, লোকে কি বলে, টাকা দিচ্ছে কত, ভালো বলল কে কে, কি করলে আকাদমিতে স্থান পাওয়া যাবে এসব চিন্তা তাঁর মাথায়ই ছিল না। এবং এসব ব্যাপার ছিল না বলেই তিনি এমন স্বাধীনভাবে, এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কারুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ছবি এঁকে যেতে পেরেছেন। তাঁর ছবি আঁকা যেহেতু কোনো "থিওরী"র ওপর নির্ভরশীল নয় সেহেতু বাস্তবতা রক্ষা করার জন্য ছবির দিগন্ত সীমিত করতে হয়নি—ছবির প্রয়োজন, সত্যপ্রকাশের প্রয়োজনে বোনার্দের ক্যানভাসে বাস্তবতা প্রায়সই তাঁর ছবিতে ভেঙেছে। কোনো এক ইণ্টারভিউতে এই প্রসঙ্গে বোনার্দের কথা কয়েকটি তুলে দিচ্ছি: "আমার মনে হয় ছবি আঁকার সময়ে "বিষয়ের" উপস্থিতি, সে দৃশ্যই হক, স্টিল লাইফই হক, নারীই হক, চিত্রকরের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর। "বিষয়"কে দেখে আমাদের তার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয় মনের ভিতরে এবং এই ধারণা মনের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করার মুহূর্তেই শিল্পের প্রথম ধাপ। এখন চিত্ররচনার সময় যদি "বিষয়" সামনে থাকে তাহলে শিল্পী বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাৎক্ষণিক খুঁটিনাটিতে, অবহেলা করতে শুরু করেন ধারণার "বিষয়টির" যে চিত্রটি তৈরি হয়েছে। এর ফলে হয় কি শিল্পী "বিয়য়"টির বিস্ময়তা হারিয়ে ফেলেন, চিত্রটি হয়ে ওঠে অর্থহীন অগভীর একটি প্রতিচিত্র মাত্র; কিন্তু শিল্প নয়।"

বোনার্দের ছবি আমার মনে হয় অসম্ভব ব্যাখ্যা করা যদি না তার রঙিন প্রিন্ট দেখেন কারণ রঙ অনেক জায়গাতেই তাঁর ছবির অর্থের সংকেত বহন করে। আমি বোনার্দের দুটি ছবি—"বীচ এ্যাট লো টাইড" এবং "উওমেন উইথ আম্ব্রেলা" উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করছি, লক্ষ করবেন ছবির ছন্দময় মাধুর্য আর সাবলীল প্রকাশভঙ্গী। বোনার্দ খুব বড় শিল্পী নন, তাঁর বিষয়ে না জানলে এমন কিছু বিরাট ক্ষতিও নেই, স্বীকার করি; কিন্তু তাঁর ছবির মধ্যে যে স্বাধীন আত্ম উপলব্ধি প্রকাশ, তা নিঃসন্দেহে বিশেষ।

শুদ্ধশীল বসু

এ আবার কী? মেয়েটার দেখছি মৃগী রোগ আছে। সেদিনও এই মৃগী রোগই প্রকট হয়ে উঠেছিলো। কতো ভয় পেয়েছিলো সে তাই দেখে, ভেবেছিলো বুঝি মরেই গেছে। আবার কষ্টও হয়েছিলো একটু। কষ্ট! এইসব বদমায়েশ মেয়ের জন্য আবার কষ্ট। এরা হ'লো শিকলি কাটা পাখি। দাঁড়ের ময়না। যখন যার তখন তার। নইলে কেউ এসেই এমন জাঁকিয়ে বসে? আর মনিবকে তো মুঠোয় ভরেছে রূপ দেখিয়ে। ভদ্দরলোক সব! ভদ্দর-লোকে ঘেন্না ধ'রে গেল। দাঁত মুখ ছরকুটে প'ড়ে আছে কেমন দ্যাখো না। থাক পড়ে। মর। ইচ্ছে করে তোর বাপকে ডেকে এনে দেখাই। বলি, মেয়ের সতীগিরি রক্ষার জন্য তো কতো মাথা ব্যথা ছিলো, কতো সতী দ্যাখো এসে। ভালো করে বলতেই দিল না কথাটা।

গগনকে কথা দিয়েছিলাম দু সপ্তাহ পরে ফেরত দেব তার মেয়ে, মেয়ে আর তোমার গেছে। তিনমাস তো তোফা কাটিয়ে দিল। কী? না অসুখ। ডাক্তারবদ্যির ঘটা কতো। যেন রাজসূয় যজ্ঞ। কী ঘর। কী বিছানা। পরনের কাপড়টা দ্যাখো না। জন্মে চোখে দেখেছে এমন? ডাইনে বাঁয়ে দাসদাসী। আরে বাপু, এক রাত্রির ব্যবধানে তুই কী থেকে কী হলি জানিস? ঘুটে কুড়ুনি, রাজরানীর গদিতে বসলি। কিন্তু বসালোটা কে? এই আমি। এই হয়কে নয় করার ওস্তাদ গুণী মহিম সরকার। এখন হারামজাদা মেয়ে, সেই মহিম সরকারকেই তোমার ভয়। কেন ভয় হবে না? জানে তো, যেমন এনেছি, ঠিক তেমনি ক'রেই একদিন আবার ঐ ছেঁড়া কাঁথার তলায় নিয়ে ঠুসে দিতে পারি। সেই জন্যই ভয়। সেদিন কতো ভালোবেসে দেখতে এলাম, নির্লজ্জ মেয়েটা আমার সামনেই জড়িয়ে ধরলো মনিবকে। ছি ছি ছি। তুই না হালদার বাড়ির মেয়ে? কোথায় শিখলি এইসব ছেনালিপনা। রাখাল ঠিক বলে, 'ঐ এক ছোপের বাঁশ, কাটতে কাটতে ছ' মাস।' মেয়েছেলে মেয়েছেলেই। দুটো চাঁদির টাকা দেখলেই ঠান্ডা।

কতো কান্ড করে আজ এলুম। উপরে কি উঠতে পারি নাকি? তাদের লীলাখেলা হচ্ছে যে। দিনেরেতের লীলাখেলা। প্রভুজী যে বসেই আছেন ছিমতী রাধাসনে। আহাহা, কী যুগল মিলন। এ দেখছি তিনমাসেও লীলা ফুরোলো না। কী? না অসুখ। কী? না কেউ বিনা অনুমতিতে দোতোলায় উঠবে না। কী? না, কর্তার মেয়েমানুষ আছে সেখানে।

এতোদিনে বাবু বেরুলেন একটু। তাও ছোঁড়াগুলো একেবারে নাছোড় হলো বলে। জানি, সব জানি। শায়লার কাছে সব খবর নিয়েই এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ বাপের নামটা যাতে না বলে তুষিয়ে বুষিয়ে তার বন্দোবস্ত ক'রে যাবো, তা ঢংটা দ্যাখো না। মর। মর। তুই মরে যা। তোর মতো অসৎচরিত্র মেয়ের মরণই ভাল। গগনের মত মানুষের এই মেয়ে? হালদার বংশে এর জন্ম?

দেরি ক'রে কাজ নেই বাবা। কোনদিক থেকে কে দেখবে। ঝিটা পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে পান খেতে খেতে চাকরগুলোর সঙ্গে মস্করা করছিলো, ফষ্টি নষ্টি করছিলো, শায়লাও ধারে কাছে নেই, টপ ক'রে উঠে এলুম। বেশ, পেয়েওছিলুম একা, তা চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

মেয়েটা অপয়া। মেয়েটা অলক্ষ্মী। মেয়েটাকে এনেছি ইস্তক আমার শান্তি নেই। এই এক জাতের লোক থাকে যাদের ধরলে ছুঁলেই সর্বনাশ হয়। এরা ডাইনি। এদের মাথা মুড়িয়ে গাধায় চড়িয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে দেশ থেকে দূর ক'রে দিতে হয়। নইলে আগে তো আমার সাদা মনে কোনো কাদা ছিলো না। দিব্যি টাকা কামিয়ে আরামেই ছিলুম। হঠাৎ সেই যে সেই রাত থেকে মনটা কেমন বিকল হ'য়ে গেল, আর যেন ঠিক হচ্ছে না। অসুখটাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। এসব তো বলা যায় না কাউকে? রাখালটাই যা একটু বন্ধু। শুনে বলে, 'লেস্‌সালা বাঙাল, এইবারই মরনের ফাঁদ পেতেছিস তুই, যা, যা, ডাক্তারের কাছে যা।'

আরে তুই তো বললি যা, যাওয়া যেন সোজা কথা। শেষে জানাজানি হ'য়ে যাক আর কি। জানিস না তো ঘরে আমি কী প্রিকিতির স্ত্রী নিয়ে বাস করি। আমি হলাম তোর স্বামী, পতি, পরমগুরু, আমার উপর কথা বলিস তুই? এতো তোর আস্পর্ধা? আমি কী করি না করি তা দিয়ে তোর কিসের মাথা ব্যথা শুনি? মেয়ে-মানুষ তুই মেয়েমানুষের মতো থাক। খেতে দিচ্ছি, পরতে দিচ্ছি, আবার তোর আজ

ফষ্টি নষ্টি কিসের? বাজা মাগী, এ পর্যন্ত একটা ছেলে বিয়োতে পারলি না, ত্যাগ যে করিনি এই না তোর ঢের? তার আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আগেকার দিনে কুষ্ঠরোগী স্বামীকে তাদের বউরা কাঁধে ক'রে বেশ্যাবাড়ি পেণছে দিতো। এখন কাঁধে করে তো দূরের কথা, কুষ্ঠ হ'য়েছে শুনলে ত্রিসীমানা মাড়াবে? এমনিতেই কী সন্দেহ হ'য়েছে কে জানে, কদিন থেকে কেমন আড়ে আড়ে ঠ'রে ঠারে চলছে। বারে বারে বলছে পাপ করলে তার সাজা আছেই আছে। টের পেয়েছে নাকি কে জানে। পাক। মনে রাখিস আমি তোর স্বামী। আমার যা আছে, তোর রক্তেও আছে সেই বীজ। এই যে মাসে মাসে তুই নানান থানায় ভুগিস, সে সব কী? মুশকিল হয়েছে এই ঠোঁটের দু' পাশের ঘা গুলো নিয়ে। পানের কষে যতোই রাঙাই ব্যাটাচ্ছেলে তেমনি সাদা হ'য়ে ওঠে? এরপরেও যদি আরো কিছু হয়, তখন কিন্তু মুশকিলই হবে একটু। কিন্তু তা বলে তুই রক্ষা পাবি না। তুই আমার বউ, তোরও সেই একই সাজা হবে। তুইও ভুগবি। তুইও পচবি। তবে? তবে যে
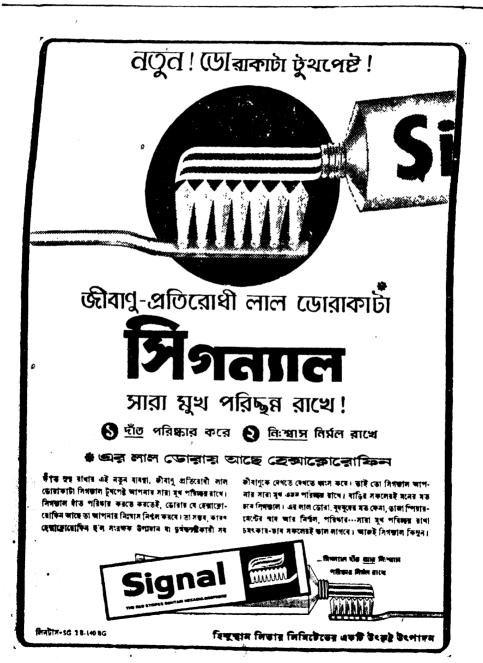
বড়ো স্বাধীন জেনানা ভাব দিয়ে ঘুরে বেড়াস এদিক ওদিক? নিস্তার পাবি বলে ভেবেছিস, না?

কিন্তু—কিন্তু—মনটা যেন আজকাল প্রায়ই কেমন খারাপ হ'য়ে থাকে। এই নচ্ছার মেয়েটাকে আনার পর থেকেই এই ভাব। ঈশ্শ্। কী কান্ড করেছিলো আসবার সময়ে। কী দাপানিটাই দাপিয়ে-ছিলো। যেন একটা গরম তেলে জ্যান্ত কই। হাজার হোক, গগনের মেয়ে তো, একটু নরম না হ'য়ে পারা যায় কি? এই যে ঢং দিয়ে পড়ে আছে, দুই লাথি মেরে সিধে করা উচিত। তা তো কই করছি না। এখন কেউ নেই এখানে, কিন্তু এসে পড়তে কতোক্ষণ? আমি পালাবো। কেউ দেখে ফেলার আগেই পালাবো। বাবা রে বাবা, শেষে মনিব জেনে ফেলুক আর কি। দুই টুকরো ক'রে কেটে ফেলবে, এই না? পালাবার আগে মুখটার মধ্যে লাথি না হোক, দুই দলা থুতুও তো ছিটিয়ে যেতে পারি। আর আমার থুতু? আহাহা। একেবারে পরিশ্রুত জল। কিন্তু তা পারবো না। কেন পারবো না তাও জানি না। যে মেয়েমানুষ, একজনের মেয়ে-মানুষ, সে মেয়েমানুষ সকলের। তবু আমি ওকে থুতুও ছিটোতে পারবো না, মনিব যখন ভোগ ক'রে তাড়িয়ে দেবে, তখন ব্যবহারও করতে পারবো না। কেবল কাঁটা হ'য়ে ফুটে আছে বুকে, ও যে গগনের মেয়ে। থাকলে, আমারও তো এরকম একটা মেয়ে থাকতে পারতো। এমনি সুন্দর। আমি যদি কারো বাপ হতাম, কে বলতে পারে, অন্যের সন্তানকে এমন নির্মমের মতো ছিনিয়ে এনে—

সামনের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ না? ওরেব্ বাবা, শালা এলেই তো হ'য়েছে আর কি! আর যদি মনিব হয়? না কি রাত্তিরের নার্সটা? ক'টা বাজলো?

মহিম সরকার কাছা কোঁচা সামলে, দৌড়লো উল্টোদিকে, একেবারে পিছনের সিঁড়িতে। অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে নিরাপদে নামলো এসে পেয়ারা বাগানে, তারপর মিলিয়ে গেল।

আমি কোথায়? কোথায়? বাবা তুমি কই? তুমি এ রাস্তায় কেন এলে? এ রাস্তা তো শুধু অন্ধকার দিয়ে ভরা। এখানে ডাক্তার কোথায়? তবে কি আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি? তবে কি আমরা দূরে গিয়ে বাস ধরবো? বাসে ক'রে শহরে যাবো? শহর গিয়ে ডাক্তার আনবো? শহর কোথায়? কতোদূরে? আমি শহর চিনি না। শহরের ডাক্তার চিনি না। শহরের ডাক্তার দরকার নেই। দেরি হবে। এতো দেরি সইবে না। তার চেয়ে চলো, পাড়ার শীতল ডাক্তারের কাছে যাই। আমাদের তাড়াতাড়ি দরকার। খুব তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি অষুধ না দিলে ওরা চলে যাবে। মা আর পার্থ। ওদের ফেলে আর বেশী দূরে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। আমি আর তুমি, মাথার কাছে আর পায়ের কাছে, বসে থাকি গিয়ে চলো। চলো, আমরা গিয়ে দণ্ডি কাটি, যেমন দণ্ডি রাম কেটেছিলেন সীতার জন্য। আমরা গিয়ে তেমনি ক'রে বসে থাকি ওদের কাছে। তেমনি ক'রে চলো, বুক দিয়ে মরণকে ঠেকিয়ে রাখি। ওরে আমার পার্থরে, আমার সোনার পার্থরে। ওগো আমার মাগো। মাগো। আমি আর পারছি না। বাবা, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বাবা, আজ আমি সারাদিন খাইনি।

এটা কার বাড়ি? এমন সুন্দর বাড়ি? এমন সুন্দর সাজানো ঘর, সাজানো বিছানা, মখমলের বসবার আসন, পাথরের ঠাণ্ডা মেঝে। আঃ কী ভালো লাগছে এই মেঝে। কী শান্তি এই মেঝেতে! এই তো আমি। এই তো আমার শরীর। কী সুন্দর সবুজ শাড়ি। শাড়িতে হলুদ বুটি। সবুজ আর হলুদ। হলুদ আর সবুজ। কুকুর আর বেড়াল, বেড়াল আর ইঁদুর। আমি কুকুর ভালোবাসি। আমি সবুজ ভালোবাসি। আমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি তোমাকে। সে তুমি কোথায়? যে তুমি আমার সকল দুঃখ ধুয়ে দিয়েছ? যে তুমি আমার সকল ভয় দূর ক'রে দিয়েছ? যে তোমাকে দেখলে আমার বুক ভরে আনন্দ উথলে ওঠে? যে তোমার নাম নীলেন্দু। না, তুমি ডাক্তার নও, তুমি নীলেন্দু। নীলেন্দু।

নীলেন্দু, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি আমার আলোর ফোয়ারা। আলো, আমার আলো। তুমি কোথায়? কোথায়? মনে নেই সেই ভয়ংকর রাত্রি? বাবা আমাকে কতোদূরে ফেলে এগিয়ে গেলেন, জন্তুগুলো দাঁত দেখিয়ে ছুটে আমাকে কামড়াতে এলো, আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি কোথা থেকে এসে বাঁচালে আমাকে। মেরে ফেললে ওদের। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সব ভয় ভুলে গেলাম। তুমি ঈশ্বর। তুমি পৃথিবী। তোমার মুখের দিকে তাকালে সুখে আমার বুক ফেটে যায়। সেই তুমি আমার কোথায়?

আমার মা কই? আমার বাবা কই? আমার দাদু? আমার ঠাকুমা? আমার ভাইবোনেরা? ও, আমরা আবার ঢাকা চলে এসেছি? কবে? কখন? আমি কি ঘুমিয়েছিলাম? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টিকাটুলির বাড়িতে চলে এলাম? আমি জানতাম। সব জানতাম। এমনি করে যে একদিন আবার আমরা ফিরে আসবো সে কথা জানতাম আমি। ফিরতেই হয়। সকলকেই ফিরতে হয়। যদি যাও, তবে তো তুমি ফিরবেই। যদি আস তবে তো তুমি যাবেই। যদি দিন তবে তো রাত্রি। আর যদি রাত্রি তবে তো ভোর। হ'লো না? দেখছো না? মা তুমি কেঁদো না। আমার

লক্ষ্মী মা। সবুজ পাতা, হলুদ পাতা। পাতা সবুজ। পাতা—হলুদ। সুখ দুঃখ। দুঃখ সুখ। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক, তবে তাই হোক। তবে তাই হোক।

কী? কী বললে? অনেক দূরের থেকে কী বললে তুমি আমাকে? তুমি তো সেই একটা অক্টোপাস? সেই যে ওদের সঙ্গে আমাকে জাপটে ধরেছিলে? একি? তুমি কেন এলে? কোথা থেকে এলে? সেই ভয়ংকর ভয় নিয়ে আবার তুমি এলে কেন? এখন আমি কোথায় যাই? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জলের তলায়? ডুবিয়ে দিচ্ছ? ছাড়ো, ছাড়ো, আমাকে ছেড়ে দাও। এই দ্যাখো আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। এই দ্যাখো একটা লতার জাল আমাকে জড়িয়ে ধরলো। শ্যাওলা। শামুক। ওরা কুমীর। তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? তুমি আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

আপনি কে? এসব আপনি কী বলছেন? আমি ঘুমিয়ে বসেছি? হ্যাঁ..
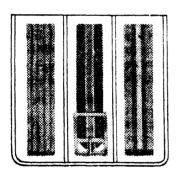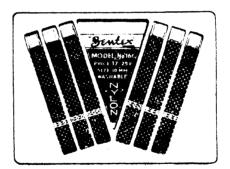
আমার বাবার নামই গগন হালদার। আমি তাঁর বড়ো মেয়ে, অতসী। আপনি আমার সংগে সাবধানে কথা বলবেন। কী! এই সেদিনও আমি ভদ্রলোকের মেয়ে ছিলাম, আর আজ—আজ কী? কী? ছি ছি ছি, এসব কী বলছেন? আমার কিসের কলংক। কেন আমি আমার বাবার নাম মুখে আনবো না। আমি কী করেছি? ন্যাকামি? যে আমার সর্বনাশ করেছে সে তবে কে? ঘরের মেয়ে বউ ধ'রে এনে কে তাদের—আঁ! কী! কী! কী!

ভগবান এ তুমি আমার কী করলে? এ ঘৃণা আমি রাখবো কোথায়? তা হ'লে তা হ'লে তোমারই কীর্তি সব? রক্ষকের ছদ্মবেশে তা হ'লে তুমিই আমার ভক্ষক? সেই তোমাকেই আমি না বুঝে, না জেনে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি। আমি তবে এখন কী করবো? কোথায় যাবো? কোথায় পালাবো? কে আমাকে রক্ষা করবে? এই পাপের পঙ্ক থেকে, এই নরকের কুণ্ড থেকে হে ঈশ্বর। হে ঈশ্বর! আর কে আমাকে উদ্ধার করবে? আর তো আমার কেউ নেই। আমার কেউ নেই। আমার কেউ নেই।

'এ কী? কী হ'য়েছে আপনার? মেঝেতে শুয়ে কাঁদছেন কেন? উঠুন। বিছানায় আসুন। পড়ে যাননি তো? ব্যথা পাননি তো?'

চোখ খুলে তাকালো অতসী। চোখের ঘোর কাটাতে সময় লাগলো। নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'না।' নার্স তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। সেই বিকেলে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন মিত্র সাহেব। অনেক জট পড়ে গেছে অনেক কাজে। অনেক জায়গায় অনেক কথা দেয়া আছে যা তিনি রক্ষা করেননি। যা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তার উপরে একদল ছোকরার পাল্লায় পড়ে তাঁকে যেতেই হলো এক লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে। সেখানে দেরি হ'য়ে গেল। রাত আটটায় একটা ডিনার ছিলো বাইরে, সোজা চলে গেলেন সেখানে। ফিরতে ফিরতে সাড়ে বারোটা।

শেষ সিঁড়িটায় পা দিয়ে বারান্দার ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন তিনি। নিথর নিঃঝুম। একলা একলা আলোগুলো শুধু চুপচাপ জেগে আছে। আর কেউ কি জেগে আছে? কে থাকবে? সব ঘর ফাঁকা, শুধু ঐ প্রান্তে বেঁকে গিয়ে অতসীর ঘর। অতসী কি জেগে আছে? থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু নার্স আছে পাহারায়। না, এতো রাত ক'রে রোগীর ঘরে যাওয়া ভদ্রতা নয়। জেগে থাকলেও নয়, আর ঘুমিয়ে থাকলে তো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি নিজের ঘরের দিকেই মোড় নিলেন। শায়লা শোবার পোশাক এগিয়ে দিল, ছাড়া পোশাক হ্যাঙারে লটকে ঝুলিয়ে দিলো ওয়ার্ডরোবে। তারপর সেলাম ক'রে বিদায় নিল রাত্রির মতো।

একটা বই হাতে নিয়ে শুলেন তিনি। কিন্তু বইটা পড়লেন না। বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে নিজের অজান্তেই অতসীর কথা ভাবলেন। বিকেল থেকে অনেকক্ষণ তাকে দেখেননি। খুব ইচ্ছে করছিলো। সে ইচ্ছে তীব্র, গোপন, তীব্র কিন্তু উগ্র নয়। যে ইচ্ছে স্নেহে সিক্ত, মমতায় গভীর। মনে হ'লো, একদিনের জন্যে হ'লেও এভাবে এ বাড়িতে এ রকম একা রেখে কলকাতার বাইরে যাওয়া তাঁর উচিত হবে কিনা। এ বাড়িতেও কারো আত্মীয় নয়, বান্ধব নয়, পরিচিত নয়। ও যে কে, কোথা থেকে এসে জুড়ে বসেছে তাও কেউ জানে না। অন্য মহলে এ নিয়ে যথেষ্ট কানাঘুষো শুরু হ'য়ে গেছে। মহিম কাউকে কিছু বলেছে কিনা, তা তিনি জানেন না, কিন্তু কর্মচারীরাও এ নিয়ে কম কৌতূহলী নয়। তার উপরে ও নিজে যদি স্বাভাবিক থাকতো তা হ'লেও কথা ছিলো। নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে পারতো, ও তো তাও নয়। যেসব মাইনে করা লোকের হাতে ওকে তিনি রেখে যাবেন, তাঁরা যে বিশ্বস্ততার সংগে দেখাশুনো করবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ধরা যাক, নার্স কামাই করলো, ঝি ইচ্ছেমতো বেড়াতে গেল, সময় মতো কেউ খাবার দিল না, তখন কী করবে ও? কাকে বলবে? ওর কে আছে এখানে? যারা ওর সেবক তারা সবাই জানে ও স্বাভাবিক নয়, তারা অন্যায় করলে নালিশ করবার শক্তি নেই ওর। একটা ধমক দিলেই ভয়ে চোর হ'য়ে যাবে। কেউ যদি ধ'রে মারেও তবুও ওকে রক্ষা করবার কেউ নেই এখানে।

বিশেষভাবে আত্মীয়রা তো খড়্গহস্ত। তারা জানে কে একটা অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন। জলের মতো অর্থব্যয় করছেন তার চিকিৎসার জন্য, সারাক্ষণ নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন তার পরিচর্যায়। এই মাসে তাদের হাত খরচ বন্ধ আছে, হরিশবাবু খাওয়া খরচে টান দিয়েছেন, আশ্রয়ের সুযোগে যারা আশ্রয়দাতার সর্বনাশে উৎসুক তাদের তিনি সমুচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সুতরাং সেই ক্ষিপ্ত শত্রুরা কোনদিক থেকে কীভাবে আক্রমণ চালাবেন তাও ঠিক বলা যাচ্ছে না।

দিল্লী গেছেন খবর পেলে দল বেঁধে দেখতে আসতেই বা বাধা কী? চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে যাবে। দেখবার জন্য তো মরে যাচ্ছে এক একজন। চিড়িয়াখানার কোন চীজ এনে আটকে রেখেছেন তিনি, অথব নিজে শিকল পরেছেন গলায়, এতো দেখবারই ব্যাপার। সারা বাড়ি তিনি তালাবন্ধ ক'রে রেখে যেতে পারেন না। সুযোগ বুঝে মহিমটাই হয়তো উঠে আসবে। তার তো কোনো অসুবিধেই নেই। সে এই মহলেরই কর্মচারী, যখন তখন এসে হাজির হচ্ছে তার ডাকে। সবাই তাকে পথ ছেড়ে দেবে। সেটাও নিরাপদ নয়। মহিম সব পারে, খুন করতে পারে, বিষ খাওয়াতে পারে, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিন তিনটা মাস একদম বেকার বসে আছে সে, কে জানে তার জন্য ওকেই হয়তো দায়ী ভাববে। ভাববে ওকে শেষ করতে পারলেই আবার ফুসলাবে মনিবকে, বাঘের মুখে আবার রক্তের স্বাদ তুলে দেবে।

চিন্তা করতে করতে আরো অনেক ভয়ানক ভয়ানক কথা ভাবলেন তিনি। অনেক দূরে নিয়ে গেলেন বিপদের সম্ভাবনাকে। চিন্তা জিনিসটাই তাই একবার আরম্ভ হ'লে আর শেষ হ'তে চায় না। বল্গাবিহীন ঘোড়ার মতো কোথায় দৌড়ে দৌড়ে চলে যায়।

উঠে বসে জল খেলেন, সিগেরেট খেলেন, তারপর স্থির করলেন যতো জরুরীই হোক আপাতত দিল্লী যাওয়াটা তার স্থগিত রাখতেই হবে।

(ক্রমশ)

হিন্দুস্তানী সঙ্গীত ও উত্তর ভারতের যুব সমাজ

দিল্লী অনেক দূর; কেবলমাত্র তরুণ বয়স্কদের গানের নমুনা শোনবার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা, ভাবছিলুম। অবশেষে স্থির করলাম যাওয়াই যাক, দেখাই যাক, উত্তর ভারতের সংগীত শিক্ষার্থীদের মান কিরকম। বছর বছর কনফারেন্সে গান শুনি—সেই সব গানের সঙ্গে উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের গানের তুলনা করে দেখার বাসনা হল—অর্থাৎ সংগীত জগতের ভবিষ্যৎ অবধারণ করবার কৌতূহলকে দমন করা গেল না। ভারত সরকার যে-সব শিল্পীর সম্ভাবনা আছে, তাদের দুই বৎসরব্যাপী একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। বৃত্তি দেবার পূর্বে তাঁরা যথারীতি সেই সম্ভাবনাকে যাচাই করে নেন। এই গুরুত্বর ভারটি মহামান্য সরকার সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে না রেখে একটি ছোটখাটো কমিটির ওপর অর্পণ করেছেন। তাঁদের বিচারের পর আরও একটি সূক্ষ্মতর বিচার হয় বলে শুনলুম, তবে গুরুত্ব প্রথমটিরই সর্বাধিক।

দিল্লীতে কতিপয় গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল, এটি পরম সৌভাগ্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক চন্দ্রশেখর পান্থ পণ্ডিত ব্যক্তি, অতি বিনীত এবং সদালাপী। বাংলা ইনি বেশ ভাল বলেন, পড়তেও পারেন। বাংলায় সংগীত সম্বন্ধে কী কাজ হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও খোঁজ রাখেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর নিজের গবেষণা আছে। লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থটির প্রকাশ-কাল সম্বন্ধে ইনি পরিশ্রম সহকারে গবেষণা করেছেন। ইনি এ পর্যন্ত কলকাতায় আসেননি, অথচ বাংলায় সংগীত-সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট খবর রাখেন—এটা জেনে প্রচুর আনন্দ হল। আমার সঙ্গে বাংলাতেই আলাপ করলেন। অথচ হিন্দীতে আমার অধিকার নেই—এ কথা স্মরণ করে লজ্জিত হলুম। আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হল—ইনি অধ্যাপক ধ্রুবতারা যোশী। বেশ কয়েক বছর ধরে বর্ধমানে আছেন। সংগীত সম্বন্ধে এঁর সুপ্রচুর অভিজ্ঞতার কথা অনেকের কাছে শুনেছি। যোশীজী চমৎকার বাংলা বলেন, এ-খবর অনেকেই জানেন। তিনি যখন বাংলারই অধিবাসী, তখন অবশ্যই পরিচয় নিবিড়তর করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

দু' দিনের অধিবেশনে শতাধিক শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীর গান-বাজনা শোনা গেল। এঁদের অনুষ্ঠান শুনেই যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা করেছি তা নয়, কিন্তু একটা সুস্পষ্ট ধারণা করেছি, এটা বলতে পারি। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী আছেন, যাঁরা স্কলারশিপের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হন না; আবার অনেকে আবেদন করেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেন না। এঁদের মধ্যে নিশ্চিত অনেকে আছেন, যাঁদের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু যা শুনলুম, তাতেও শিক্ষার ধারাটা সাধারণত কোন্ পথে চলেছে, সেটা বোঝা গেল। উড়িষ্যা থেকে কোনও ছাত্রছাত্রী আসেননি। শুনলুম, বিহার থেকেও আবেদনের সংখ্যা খুবই কম। উত্তর প্রদেশ বা রাজস্থান থেকেও আশানুরূপ আবেদন হয়েছে বলে মনে হল না। আসাম থেকে একজন ছাত্রী এসেছিলেন, তিনি বাঙালী। মারাঠী, গুজরাটী, এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে জনকয়েক ছিলেন। বাঙালী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা পরিমাণে খুব ভাল। বাংলার বাইরে স্থায়িভাবে বাস করেন, এমন বাঙালী ছাত্রছাত্রীও অনেকে আবেদন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিমত এই যে, প্রত্যেক প্রদেশ থেকে সেইখানকার অধিবাসীরা বৃত্তির জন্য সচেষ্ট হবেন, যাতে এটা বোঝা যায় যে, সর্বত্রই সংগীত শিক্ষা সমভাবে অগ্রসর হচ্ছে। বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা যে সংগীত শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী এবং উৎসাহী, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

এখনকার সর্বাধিক জনপ্রিয় রাগ বোধ হয় আহীর ভৈরোঁ। গান-বাজনায় এই রাগটিই অধিকাংশ ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে দেখা গেল। প্রচলিত মূল রাগগুলির প্রতি শিক্ষার্থী সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে উদাসীন দেখা গেল। দুটি অধিবেশনে এতজনের মধ্যে ভৈরবী বোধ হয় কেউই নির্বাচন করেননি। এইটি আমার কাছে শ্রেয় বলে মনে হয় না। আসলে বড় বড় সুপরিচিত রাগগুলির ব্যবহার এবং প্রয়োগ দক্ষতা দেখেই শিল্পীকে ভালভাবে বিচার করা যায়।

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন পরীক্ষার্থীদের এই নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন সঙ্কীর্ণ রাগকে

পরিহার করেন। গান এবং বাজনায় গতানুগতিক পন্থাকে অনুসরণ করবার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা গেল। দশ মিনিট সময়ের মধ্যে মাত্র একঘেয়ে স্থায়ীর বিস্তার ছাড়া বেশ একটা সুপরিকল্পিত রাগ-বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া গেল না। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। শ্রীমান রণধীর রায়ের এসরাজ শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি নয়, আমার সহযোগীরা সকলেই একবাক্যে এই তরুণ বাদকের প্রশংসা করেছেন। এসরাজে এমন নিখুঁত তানের কাজ, এমন আবেগ সঞ্চার এবং সুর-মাধুর্য খুব কমই শোনা যায়। যে-কোনো কনফারেন্সে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হবার যোগ্যতা ইনি রাখেন—এ'র সাবলীল বাদন প্রণালী দেখে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। বোধ করি, ইনি বিশ্বভারতীর ছাত্র। সেতার, সরোদ বা বেহালায় তেমন সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল না। তবলায় দু একজন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি মাত্র বাঙালী গায়িকাকে ঠুংরী গাইতে শুনলুম। তাঁর অনুষ্ঠান আমার ভালই লেগেছে কিন্তু আমার সহযোগীরা আমার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তার

কারণ উক্ত গায়িকা কোনো একটি বাঈজীর অনুকরণ করছিলেন। এতে আমি দোষের কিছু দেখি না কারণ বাঈজী হলেও ঠুংরীতে তিনি যথার্থ পারদর্শিনী এবং বর্তমানে যথেষ্ট প্রবীণা। ঠুংরীর একটি বিশেষ ঘরানার একজন প্রতীক হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া হয়েছে। পাখোয়াজ শুনে আশান্বিত হইনি। পাখোয়াজের সঙ্গে হারমোনিয়মে যে সুর বাজছিল তা প্রাচীন বাংলা থিয়েটারের কনসার্টের মত। এইরকম বাজনার সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গত হতে পারে, এরকম ধারণাই আমার ছিল না। সংগত বা বাদ্যসহযোগিতা সম্পর্কে ভারত সরকারের বোধ হয় কোনো দায়িত্ব ছিল না কারণ তাঁরা পরীক্ষার্থীদের নিজের নিজের বাজনা আনতে বলেছিলেন। কিন্তু, দূর থেকে আজকালকার পরিস্থিতিতে এটা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তা ছাড়া সরকার যখন ব্যবস্থাই করেছিলেন তখন সেটা আর একটু সহৃদয়তা এবং মনোযোগের সঙ্গে করলেই ভাল হত। এঁদের নিয়োজিত বাদকগণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল না।

সমগ্রভাবে বিচার করে মনে হল ছাত্রছাত্রীরা এমন শিক্ষা পাচ্ছেন না যাতে তাঁরা একটি স্বকীয়তায় উদ্বুদ্ধ হন। কৃতবিদ্য শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুর অন্ধ অনুসরণ কাম্য নয়। তাঁদের নিজস্ব একটা ভঙ্গী এবং বৈচিত্র্যের পরিচয় পাব—এইটাই আশা করেছিলুম। সে আশা সফল হয়নি কিন্তু অনেকের মধ্যে সাধনার ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে এ বিশ্বাস হয়েছে যে সংগীত সাধনার গুরুত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ শিল্পীগণ বিশেষভাবে সচেতন। এই শ্রদ্ধার মূল্য বড় কম নয়।

পরিশেষে দিল্লিপ্রবাসী শ্রীশচীন ঘোষের সহৃদয়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। মাত্র দু-একদিনের মধ্যে তিনি আমাদের একেবারে আপনার করে নিয়েছেন।

কল্যাণীতে অতুলপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী

সম্প্রতি কল্যাণী টাউন ক্লাব অতুলপ্রসাদ সেনের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের "আমাদের কথা" নামক ত্রৈমাসিক মুখপত্রে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন। অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁর কয়েকজন নিকট আত্মীয়া যেসব তথ্য আমাদের গোচর করেছেন তার অনেক কিছু আমাদের অনেকের জানা ছিল না। যাঁরা অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে ঔৎসুক্য পোষণ করেন তাঁরা এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করলে উপকৃত হবেন। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ গুপ্তকে এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ প্রদান করি।

অতুলপ্রসাদের গান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ গায়িকা শ্রীমতী রেণুকা দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:—

"আজকাল অতুলপ্রসাদের গান শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। অতুলপ্রসাদের গান হামেশা রবীন্দ্র ঢং-এ গাওয়া হচ্ছে। রেকর্ড করেও রাখা হচ্ছে। নিজস্ব সুর এবং ঢঙেই বেশীর ভাগ গান গাওয়া হয়, অবশ্য দু একজন ছাড়া। অনেকে বলেন শুনি এই ঢং গলা দিয়ে নাকি আসে না। অদ্ভুত শোনায় কথাটা। কান ভরে গান শুনতে হয়, বারে বারে গাইতে গাইতে গানকে এমন করতে হয় যখন সুর কানকে আর ফাঁকি দিতে পারে না। আমার এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে, আমার মনে হয় তাঁর স্মৃতির প্রতি সেইদিনই সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হবে, যেদিন তাঁর গানগুলি তাঁরই সুরে ঢঙে গাইয়েরা ঠিকমত গাইতে পারবেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গান বর্তমানে যে দু-চারজন রেডিও বা গ্রামোফোনে গাইছেন তাঁদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। আসল কথা গানটা মুখস্থ করার ব্যাপার নয় রচয়িতাকে বোঝবার মত "ইনটেলেকট্" থাকা চাই। শ্রীমতী দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি এই সাবধানবাণী স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। এই ভোঁতা আবৃত্তির যুগে এইরকম স্পষ্ট অভিমতের বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রামীণ গীতি সংস্থার অনুষ্ঠান-কাজলরেখা

সম্প্রতি গ্রামীণ গীতি সংস্থা বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে মহাজাতি সদনে তাঁদের "কাজলরেখা" নাট্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। "কাজলরেখা" ময়মনসিংহের সুপরিচিত লোকগাথা। অধ্যাপক ভাস্কর বসু বিশেষ অভিনিবেশসহকারে মূল পালাকে অবলম্বন করে তার নাট্যরূপ প্রদান করেছেন এবং এবিষয়ে তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন। এই অভিনয়ের গীতগুলিতে ময়মনসিংহে প্রচলিত লোক-সংগীতের সুর প্রদান করা হয়েছে এবং মনোগ্রাহিতার প্রলোভন সত্ত্বেও কোন কারণেই উদ্যোক্তারা অন্য ধরণের সুর আরোপ করে আঞ্চলিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেননি। গ্রামীণ গীতি সংস্থার এই আদর্শকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করি। নৃত্য পরিচালনায় শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায় পরিকল্পনার বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন। সর্বত্র গ্রাম্য সাধারণতাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করে রস এবং রূপের যে ব্যঞ্জনা তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগীত পরিচালনায় শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহের গ্রামীণ গীতিশিল্পকে অতি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের গোচরে এনেছেন। বর্তমান লোকসংগীতে "কাজলরেখা" একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

—শার্ঙ্গদেব

"মা আমারই জন্য সিনথল টয়লেট পাউডার কিনে এনেছেন...অথচ

... তিনি নিজেই বেশীর ভাগ এটি মাখেন।"

এর স্নিগ্ধ সুরভি তাঁর ভাল লাগে। বাবাও তো মাখেন! উনি বলেন, সিনথল টয়লেট পাউডারে অতুলনীয় উপাদান জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন) আছে বলে এই পাউডার মেখে তাঁর গায়ে কোন দুর্গন্ধ হয় না। অথচ ঘামাচির হাত থেকে রক্ষাপাবার জন্যে আমারই জন্য নাকি এটা কেনা হয়েছে! আমারই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী!

NEW CINTHOL DEODORANT LUXURY TOILET POWDER WITH G-11 By Godrej

সিনথল টয়লেট পাউডার

নিশ্চিন্তভাবে রক্ষা পাবার জন্য জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন) মেশানো সিনথল সাবান মেখে স্নানের পর সিনথল টয়লেট পাউডার মাখুন।

সিনথল টয়লেট পাউডার এখন ৩টি সুদৃশ্য কৌটায় পাওয়া যায়।

জি-১১ এল. জিভাউদাঁ এট সী এস.এ.-র ট্রেডমার্ক.

INTERPUB/GCP/4 BN

বঙ্কিম সরণী

প্রমথনাথ বিশী

"হায় রজনী! পাথরে এত আগুন!"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্যতিক্রম। অবশ্য শ্রেণী বিচারে রজনী সামাজিক উপন্যাস; অনেকের মতে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা; কাহিনী বিন্যাস পদ্ধতিতে অভিনব, পাত্র-পাত্রীগণই বিন্যাসকার। এ সমস্তই সত্য, তবে আমার মতে ব্যতিক্রমের কারণ এসব নয়। রজনীর শিল্প স্থাপত্যে একটি জটিলতা আছে যার অনুরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে দেখা যায় না। এখন এই জটিলতা স্বেচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত; এ জটিলতা কি বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প স্থাপত্যের বিবর্তন সঞ্জাত; কিম্বা এক নূতন পরীক্ষা: কিম্বা যে উপাদান নিয়ে সৌধ নির্মাণে তিনি উদ্যত সেইসব উপাদানেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া: এসব প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। আমি যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এমন মনে করি না; তাই কোন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত না করে আমার চিন্তার ধারা মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করবো।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্প স্থাপত্যের একটি প্রধান লক্ষণ ও গুণ সরলতা, এ সরলতা সাধনার বিষয় হ'লেও কেবল সাধনলভ্য নয়; সহজাত হওয়া আবশ্যক; সহজাত হ'লে সাধনায় পরিণতি লাভ করে। প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ও শেষ উপন্যাস রাজসিংহের গঠনবিন্যাসে এই সরলতা বিদ্যমান; তবে দুর্গেশনন্দিনীর সহজাত সরলতা দীর্ঘকালের সাধনায় রাজসিংহে সুপরিণত। কালানুক্রমের ধাপে ধাপে এই সরলতা-গুণ উপন্যাসসমূহে বৃদ্ধি পেয়েছে; মাঝখানে ব্যতিক্রম রজনী।

রজনীর শিল্প-স্থাপত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্যের একটি প্রধান লক্ষণ প্রসন্ন সরলতা; স্থপতির কারু-কৌশল, উপাদানের বৈশিষ্ট্য ও গ্রীক সমাজের অভিপ্রায় সবসুদ্ধ মিলিত হয়ে সৌধের মধ্যে যে পরিণামকে গড়ে তুলেছে তাকে একটি প্রসন্ন সরলতা ছাড়া আর কি বলবো জানি নে। রজনী ছাড়া আর সব উপন্যাসে গ্রীক স্থাপত্যোচিত এই সরলতা প্রকট।

তুলনায় রজনীর স্থাপত্য-রীতিকে Gothic বলা যেতে পারে। এ রীতির প্রধান লক্ষণ ও গুণ জটিলতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহুলতা, কারুকার্যের অতিরেক, ছায়াতপের আতিশয্য, আতপের চেয়ে ছায়া অংশের আধিক্য; সবসুদ্ধ মিলে দর্শকের মনে একটি রহস্যময় জটিলতা এনে দেয়; মনে করিয়ে দেয় দৃশ্যমান অংশের অন্তরালে অজ্ঞেয় একটা কিছু যেন থমথম করছে। একেই বলি জটিলতা। গ্রীক স্থাপত্যের তুলনাস্থল যদি হয় উদার ও প্রসন্ন আকাশ, Gothic স্থাপত্যের তুলনাস্থল গহন অন্ধকার অরণ্যানী। সহস্রবার ব্যবহৃত শব্দ যদি একোত্তর সহস্রবার ব্যবহার অনুচিত না হয়, তবে একটি ক্লাসিক্যাল রীতি, অপরটি রোমাণ্টিক। গ্রীক স্থাপত্যের অসামান্যতা সত্ত্বেও তার প্রধান ত্রুটি রহস্যময়তার অভাব; ইন্দ্রিয়াতীত ছায়াময় আর-কিছু তার পিছনে উঁকি-ঝুঁকি মারে না। Gothic স্থাপত্যের সৌন্দর্যে অন্তর্গূঢ় রহস্যময় ভাবটা খুব প্রবল; যেন আরও কিছু আছে, অনুমান করছি, অথচ প্রমাণের আলোয় এনে ফেলতে পারা যাচ্ছে না; মনটা কেবলই আন্দোলিত হ'তে থাকে। রজনী উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি এই-রকম একটা প্রমাণাতীত অনুমান-জাত ভাবের ব্যগ্র আনমনা অবস্থা।

উপন্যাসের নায়িকা অন্ধ; একে পরিচ্ছন্ন অন্ধকার, তার আবার সে অন্ধ এবং যুবতী এবং সুন্দরী। অন্যতর নায়িকা সত্যই অদ্ভুত। বঙ্কিম-পরিকল্পিত আর কোন নারী কি অভিতত্ত্বের ইহকাল ও পরকালকে পৃথক ক'রে নিয়ে দু'জন পুরুষকে সমর্পণ করেছে; রজনীর বাহজীবন ও অন্তর্জীবনের স্বিত্ব, লবঙ্গলতার ইহকাল ও পরকালের দ্বিত্ব উপন্যাসে উপাদানের জটিলতা জুগিয়েছে, কিন্তু জটিলতার এখানেই শেষ নয়। নায়কদের একজন সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অন্যজন অপ্রাকৃতের অধীন, অন্তত বারো আনা রকম। বস্তুত উপন্যাস-খানাই যেন অপ্রাকৃতের অধীন। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনেক উপন্যাসে সাধু-সন্ন্যাসী আছে, কিন্তু তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সহজবুদ্ধির অতীত নয়, এখানে সহজ-বুদ্ধি অচলপ্রায়। তারপরে আছে Gothic শিল্পের কারুকার্যের বাহুল্যের মতো এখানে আইন ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত মামলার তথ্য-প্রমাণাদির গুরুভার। আরো আছে, পাত্রপাত্রিগণ বক্তা হওয়ার অনেক সময়ে গল্পের একটা সূত্রের উপরে পুরানো সূত্র এসে পড়েছে, জটিলতা-বৃদ্ধিতে এরও প্রতিক্রিয়া কম নয়। সর্বোপরি লেখকের কবুল জবাবে

স্বভাবতই পাঠকের মন উপন্যাসের রহস্যময়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। "যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।" "যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য"—সেগুলি কি লেখক বিশদভাবে বলা আবশ্যক মনে করেন নি। অন্ধ যুবতীর মনের অন্ধকারের সঙ্গে মিশেছে লেখকের মনের অন্ধকার, অবশ্য শেষোক্ত অন্ধকার স্বেচ্ছাকৃত। মোটের উপরে বুঝতে পারা যায় যে, বিশেষ একটা তত্ত্ব-প্রতিপাদন গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্বন্ধে এমন উদ্দেশ্য নূতন নয়, তবে সে-সব লিখিত হয়েছে রজনীর অনেক পরে। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম ও রাজসিংহ উপন্যাসগুলি তত্ত্বের শিরদাঁড়া সমন্বিত। কমলাকান্তের দপ্তর, অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পাঠ করলে সে শিরদাঁড়ার পরিচয় পাওয়া যায়; গ্রন্থের মধ্যে, গ্রন্থের ভূমিকায় (যেমন রাজসিংহে)

এবং গ্রন্থের বাইরে লেখকের অনেক উক্তি শিরদাঁড়ার স্বরূপ আসে সাহায্য করে। পরবর্তী আলোচকগণের মন্তব্যে সহায়ক। সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম (ধর্মতত্ত্বে কথিত) প্রভৃতি মিলিয়ে এই তত্ত্বের শিরদাঁড়াটি গঠিত। তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে এমন একটা তত্ত্বকে অবলম্বন ক'রে যে উপন্যাসগুলি গঠিত, সে বিষয়ে বোধ করি মতভেদের স্থান নাই। কিন্তু রজনীর তত্ত্ব-রহস্য সম্বন্ধে লেখক ও আলোচকগণ নীরব। এক-আধটি বাক্যের সাহায্য পেলে পাঠক হর্ম্যের অন্ধকার কিছু হয়তো হালকা হ'ত।

গ্রন্থের নায়িকা রজনী (যদিচ আমার মতে লবঙ্গলতা। রজনী ও পূর্ণশশীর মধ্যে যথার্থ নায়িকার স্থান কার সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকা অসম্ভব নয়। রজনী, রজনী, লবঙ্গলতা, পূর্ণশশী) অন্ধ। গ্রন্থের শেষে সে দৃষ্টিবতী। গ্রন্থকার বলেন, সন্ন্যাসীর চিকিৎসার গুণে, অবশ্য চিকিৎসার নীতি অপরের অপরিজ্ঞাত, কাজেই তারা অলৌকিক বলবে। এখন এই অলৌকিক শক্তির উৎস সন্ন্যাসীর শিক্ষা না আর কিছু? শচীন্দ্রের ভালোবাসা নয়তো? শচীন্দ্রের নিকষিত প্রেমকে যদি রজনীর দৃষ্টিলাভের কারণ বলে গ্রহণ করা যায়, তবে এক রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে উপন্যাসখানা রূপকে পরিণত হ'য়ে পড়ে। সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি যদি দৃষ্টি দিতে পারে, প্রেমের অলৌকিকতর শক্তি দৃষ্টি দিতে না পারবে কেন? দুয়েরই স্বরূপ সমান অজ্ঞেয়, তবে একটির বদলে আর-একটিকে কারণ বলতে গ্রহণে বাধা কি? কিন্তু তার ফলে যে উপন্যাসখানা রূপকোপন্যাসে পরিণত হয়। ক্ষতি কি? বঙ্কিমচন্দ্র অনেক জাতের উপন্যাস লিখেছেন, একখানা না-হয় রূপক জাতেরই হ'ল। অবশ্য এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেননি, পরবর্তী আলোচকগণও বলেননি, এ নিছক আমার অনুমান মাত্র। তাই এ উক্তিতে কিছু পরিমাণে নুন মিশিয়ে নিতে অনুরোধ করবো পাঠককে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীনদের মধ্যে হেমচন্দ্রের ছায়াময়ী ও দশমহাবিদ্যা রূপকাশ্রিত কাব্য। পরবর্তীকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে-সব নাটক তত্ত্ব-নাট্য বলে পরিচিত, তাদের অনেকগুলি রূপকাশ্রিত (অন্তত আংশিক)। রাজা নাটকে রানী সুদর্শনার চোখ আছে, কিন্তু দৃষ্টি নাই, যে দৃষ্টি থাকলে রাজার স্বরূপ বোঝা যায়। আবার ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউল দৃষ্টিহীন, কিন্তু তার সেই দৃষ্টি আছে, যাতে জীবনের (জীবন-সর্দার=জীবন) স্বরূপ বোঝা সম্ভব। একজন চক্ষুষ্মান হ'য়েও অন্ধ, অপরে অন্ধ হ'য়েও চক্ষুষ্মান। রানী অশেষ দুঃখভোগের পর যথার্থ দৃষ্টিলাভ করেছে, বাউলের গোড়া থেকেই তা ছিল। বস্তুত অন্ধের দৃষ্টিলাভ কখনো বহির্মুখী, কখনো অন্তর্মুখী, এ পৃথিবীর সাহিত্যের একটা সাধারণ বিষয়। রজনী উপন্যাসকে রূপক বলে স্বীকার করি বা না করি, তার দৃষ্টিলাভ সেই সাধারণ বিষয়-রীতির অন্তর্গত।

রজনী উপন্যাস সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার কাব্য; বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার কবি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জগতে সমস্তই সুন্দর, অসুন্দরের স্থান নাই সেখানে। তাঁর উপন্যাসের নারীগণ সকলেরই অতুল সৌন্দর্য; সকলেই রূপে এ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলা, মোতি বিবি, কপালকুণ্ডলা, কার নাম করি আর না করি। এমনকি গৌণ পাত্রীগণেরও রূপে কম নয়: আলপানি, হীরা, নির্মলকুমারী, দরিয়া আরও নাম করা যায়। আবার তাঁর পাত্রগণও পৌরুষ ও রূপে অসামান্য, জগৎসিংহ, নবকুমার, হেমচন্দ্র থেকে যে সৌন্দর্যের প্রস্রবণ নির্গত, তার ধারা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত। অন্যপক্ষে তাঁর পাত্রপাত্রীদের নামগুলিও কম সুন্দর নয়, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, ভ্রমর, সূর্যমুখী, কপালকুণ্ডলা ইন্দিরা প্রত্যেকটি নাম কানে মধুবিন্দু ক্ষরণ করে। ওদিকে স্থানের নামগুলিতেও কী মোহ। বারুণী ও ভীমা; হরিদ্রা গ্রাম ও প্রসাদপুর; চিত্রা ও ত্রিস্রোতা। বন্দে মাতরম সংগীতে সৌন্দর্যের যে ঘনীভূত রূপ, তারই বিশ্লেষণ উপন্যাসসমূহে; এ যেন সৌন্দর্যের সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গিয়ে একান্ন পীঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর-এক রকম গূঢ়তর সৌন্দর্য আছে, আয়েষা প্রতাপের আত্মত্যাগ, চন্দ্রশেখরের নিষ্ঠা ও সংযমে, অমরনাথের উদাসীন আত্মনিগ্রহে, প্রফুল্লর সংসারে প্রত্যাবর্তন এবং রাজসিংহের ধর্মাত্মক বীর্যে; মহৎ কর্ম, মহৎ চেষ্টা, মহৎ ব্রতও সুন্দর। অন্তরে বাহিরে, মানবে নিসর্গে যত সৌন্দর্য আছে, সব একত্র হ'য়ে সঞ্চিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের মধুচক্রে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের মধুকর। এ বিষয়ে সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনাস্থল কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অসুন্দর, কুৎসিত, বীভৎসের স্থান নাই, এমনকি, মানুষ ও প্রকৃতির যে ভীমকান্ত রূপ দেখা যায়, ভবভূতির কাব্যে, তারও অভাব কালিদাসে ও রবীন্দ্রনাথে: বঙ্কিমচন্দ্রেও বটে। কপালকুণ্ডলা ও সমুদ্র উপকূলের সৌন্দর্যের ছায়ায় কাপালিকের বীভৎসতাও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে। এঁদের তিনজনের চোখেই জগৎ সুন্দর মানুষ সুন্দর, মানুষের সমাজ, আচার ও ভাবা সুন্দর; অবশ্য এহেন সৌন্দর্যের সুন্দর বনে মাঝে মাঝে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতা শ্বাপদের মতো প্রবেশ করে সত্য, কিন্তু তাতেই যে সুন্দরের পরীক্ষা, পরিণামে যে সুন্দরের জয়। সুন্দরের জয়-ঘোষণাতেই এঁদের কাব্যের সমাপ্তি।

এ পর্যন্ত না-হয় এক রকম বোঝা গেল, এবারে প্রশ্ন, তিনজনেরই সৌন্দর্যের স্বরূপ কি এক? সাদা কথায়, কী এঁদের সৌন্দর্যতত্ত্ব?

কালিদাস সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর নিজেরও সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। উমা বাহ্য সৌন্দর্য দিয়ে মহাদেবের চোখ ভোলাতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। শকুন্তলা বাহ্য সৌন্দর্য দিয়ে দুষ্মন্তের সঙ্গে যে মিলন ঘটিয়েছিল, তার ফল উভয়ের পক্ষেই বিষময় হয়েছিল। যক্ষ স্বকর্তব্যচ্যুতির অপরাধে বর্ষভোগ্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল; যক্ষপত্নীর সৌন্দর্য মোহ যে স্বকর্তব্যচ্যুতির কারণ, কালিদাস খুলে না বললেও অনুমান করা অসঙ্গত নয়। উমাকে তপস্যা করতে হয়েছিল, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দুঃখভোগ, আর যক্ষ ও যক্ষপত্নীকে বর্ষকালের বিচ্ছেদ। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, বহিঃসৌন্দর্যের সঙ্গে যেখানে অন্তঃসৌন্দর্যের বিরোধ ঘটে, সেখানে পরিণাম শুভ নয়। এই অন্তঃসৌন্দর্যকে কি নাম দেওয়া যাবে, সেটা রুচিভেদের ব্যাপার। প্রেম বলা যেতে পারে, কল্যাণ-বুদ্ধি বলা যেতে পারে, কেননা, "সুন্দরের পাদপীঠতলে কল্যাণ দীপ জ্বলে" সংক্ষেপে শ্রেয়ের বোধ বলা অন্যায় নয়। রবীন্দ্রকাব্যেও এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত অবিরল। চিত্রাঙ্গদা, সুদর্শনা, শাপমোচনের যক্ষ ও যক্ষপত্নী, বিক্রমদেব প্রভৃতি শ্রেয়োবোধের অভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। এখন এর প্রতিকার কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন, দুঃখভোগ, প্রাচীনেরা বলতেন তপস্যা। যতদূর বুঝি এই হচ্ছে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব। বাইরে থেকে দেখলে যা সৌন্দর্য ভিতর থেকে দেখলে তাই কল্যাণ ও শ্রেয়। কীটসের "Beauty is Truth, Truth Beauty" উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়।

এখন বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যতত্ত্বটা কিরকম? কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের থেকে যে খুব ভিন্ন তা মনে হয় না। তবে স্বভাবতই স্পষ্টতর, কারণ তিনি উপন্যাস লিখছেন; কাব্যে গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আলো-আঁধারির যে মায়া সৃষ্টি করবার অবকাশ আছে, উপন্যাসে তার অভাব। তা ছাড়া, নব্যবঙ্গীয় লেখকদিগের প্রতি নিবেদন শীর্ষক অনুশাসনে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছেন যে, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও মানবের হিতসাধন আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা মহাপাপ। পরবর্তীকালে গাঢ়তর আকারে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন, বলেছেন ধর্ম ও সাহিত্য অভিন্ন, কারণ দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। এইরূপ আভাসে ইঙ্গিতে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করলেও কোথাও বিশদভাবে বলবার সুযোগ তাঁর হয়নি—রজনী উপন্যাস ছাড়া। তাই রজনী উপন্যাসকে সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার গাথা বলেছি।

রজনী পরমাসুন্দরী, কিন্তু জন্মান্ধ। সংসার পথে সে বিচরণ করছে, এ পর্যন্ত কারো হৃদয় আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। জন্মান্ধকে ভালবাসবে কে? রজনী ভাবে জন্মান্ধ বলেই প্রেমে বঞ্চিত, সে ভাবে দৃষ্টি লাভ করলে প্রেমের অভাব তার হবে না। তাই সে মনে মনে বলে, "বহুমূর্তিময়ী বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন?...তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন?... বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা। আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি।"

রজনীর জিজ্ঞাসা ও খেদের অন্ত নাই। "আমাকে দেখিলে কখনও কি কাহারো আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না, আমার নয়ন নাই, কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্তি গড়ে কেন, আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী মাত্র?" তার সমস্ত অস্তিত্ব মন্দ্রিত করে একটি জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়—"কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?"

পাপে নয় রজনী, তুমি এখনও বিধাতার অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, তোমাকে মোমেটে করে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু এখন চক্ষুদান করবার অবকাশ পাননি তাই তুমি নিজেকে দেখতে সক্ষম হচ্ছ না, অপরে তোমাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না। তোমার মধ্যে প্রেম এখনও জাগ্রত হয়নি, তাই তুমি অন্ধ; অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তুমি জন্মান্ধ। প্রেম সৌন্দর্যের চক্ষু। সেই চক্ষু যেদিন লাভ করবে, রজনী, সেদিন দেখবে জগৎ সুন্দর, জগৎ দেখবে তুমি সুন্দরী। প্রেমহীন সৌন্দর্য পাষাণখণ্ড মাত্র, মাংসপিণ্ড মাত্র। রোহিণী অপূর্ব সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমহীন, তাই তৃপ্ত করতে পারেনি পুরুষের হৃদয়কে, ভ্রমর ভ্রমরবর্ণা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের হৃদয়ের সেই তো শেষ সান্ত্বনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রেমহীন সৌন্দর্য সুন্দর নয়। কিম্বা সৌন্দর্যের অর্ধাংশ, বহিরাংশ মাত্র। তাঁর কাছে সৌন্দর্যের অন্তরাংশ প্রেম। অর্থাৎ বাহির থেকে দেখলে যাকে বলি সৌন্দর্য, ভিতরে থেকে দেখলে তা-ই প্রেম। প্রকৃতির মধ্যে অন্তরের উপলব্ধিতে সৌন্দর্য, মানুষের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধিতে প্রেম—মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্পর্ক অনুরূপ।

কিন্তু এ সম্পর্কটা মানুষে বোঝে না, অন্তর থেকে [illegible] মনে করে। [illegible] হিসাবে [illegible] সুপ্রাপ্ত। [illegible] তপস্যার ফলে [illegible], দেখা যায় যে ভিতরে বাইরে কোথাও গরমিল নেই, চোখে যা সৌন্দর্য মনে তা-ই প্রেম।

সৌন্দর্যের সঙ্গে [illegible] কাম মিশে আছে; এমন সৌন্দর্য বড় দেখা যায় না, যার মধ্যে কামের মিশাল নাই; জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক; নামে হোক নামান্তরে হোক কামের মিশাল অনিবার্য। তবে কখনো কখনো অদৃষ্টগুণে এমন সৌন্দর্য দেখা যায় যার মধ্যে কামের মিশাল ঘটেনি। অমরনাথের ভাগ্যে এমন সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ একবার ঘটেছিল। তখন লবঙ্গলতা "অতীত শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত যৌবন।" অমরনাথ তাকে দেখে বুঝেছিল "যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।" তবে এখন আবার সে প্রাপ্ত যৌবন রজনীকে দেখে মুগ্ধ হল কেন? অন্ধ যুবতীর সৌন্দর্যের সহিত "ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই" বলে কি? শচীন্দ্রের চোখেও রজনীর রূপের ঠিক এই ভাবটি প্রকট। তার সৌন্দর্যে আকর্ষণ আছে, "কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।"

শচীন্দ্র ও অমরনাথ দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে রজনীর রূপ, যে রূপে "ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই।"

ওদিকে রজনীর অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। লবঙ্গ ঠাকুরানিকে সে বলেছে "ঠাকুরানি, তোমাদের চক্ষু আছে, চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"

অমরনাথ ও শচীন্দ্র দুজনেই রজনীর মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে, অমর ভাস্কররচিত মূর্তিকে দেখেছে, রক্তমাংসের মানুষটিকে দেখে নাই, দেখলে এমন কথা বলতে পারতো না। পরম সুন্দরীও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্বরূপা হয়ে থাকতে চায় না, একটুখানি খুঁত স্বীকার করে মানবহৃদয়ের স্পর্শ চায়। তবে দুজনের উক্তির মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতার প্রভেদ আছে। অমরনাথের উক্তি সেই সময়ে যখনই তার মনে রজনী সম্বন্ধে এতটুকু বিকার মাত্র ঘটেনি। আর শচীন্দ্রের উক্তিতে, "যাহাকে পঞ্চবাণ বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?" শেষের এই ছোট্ট খোঁচাটি "নাই কি?" স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রজনী সম্বন্ধে শচীন্দ্রের মনে বিকার শুরু হয়ে গিয়েছে, যদিচ এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত।

আর যে রজনী একদিন এক মুহূর্তের

জন্য চোখের দৃষ্টি প্রার্থনা করেছিল, সে আজ অন্ধের ভাগ্যে সন্তুষ্ট হ'তে গেল কেন? কেন বলল, "চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?" কেন? তবে কি বসুন্ধরা, তার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে তার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে? আসল কথা, রজনী ভাল বেসেছে, তাই তার আর খেদ নাই, চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নাই; ফাল্গুনীর অন্ধ বাউলের মতো এখন সে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে দেখে; এই রকম দেখাতেই যথার্থ পূর্ণতা। তুলনায় শচীন্দ্র ও অমরনাথের দৃষ্টি অপূর্ণ। অবশ্য ক্রমে তাদের হৃদয়েও প্রেম জাগ্রত হ'ল, তখন রজনীর বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে মানবীয় হৃদয় সম্পর্কিত গুণের মিশ্রণ ঘটলো। রজনী আর ভাস্করের প্রতিমা নয়, মানবের কন্যা।

শচীন্দ্রের সংস্পর্শে রজনীর হৃদয়ে প্রেম অবতীর্ণ হয়েছে, এতদিন পরে সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের মিলন ঘটলো। অমরনাথ শিখা উস্কে দেওয়ার কাঠিখানি, নিজেকে ঈষৎ দগ্ধ ক'রে প্রেমের দেয়ালীর আলো উজ্জ্বলতর করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। আর লাবণ্যলতা না থাকলে সমস্ত দীপটাকেই নিরর্থক বোধ হ'তো; সেই নিভৃত কোণটিকে সে রচনা করেছে, যেখানে প্রেমময়ী রজনীর রূপের দীপশিখা অনির্বাণ জ্যোতিতে জাগরূক হয়ে বিরাজ করবে। এইসব কথা চিন্তা করেই রজনী উপন্যাসক সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার কথা বলেছি, রজনীকে রূপক বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎ সৌন্দর্যময়, অসুন্দরের স্থান নাই সেখানে। এসব কথা আগেই বলেছি। তবে সৌন্দর্যে প্রেমের সঞ্চার না হওয়া অবধি চিত্রকরের চিত্র বা ভাস্করের প্রতিমা। তারপরে প্রেম জাগ্রত হলে পরস্পরের সংস্পর্শে প্রেম ও সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করে। তবে এই প্রেমের জাগরণ ব্যাপারটা সাধনলভ্য ও দুঃখসাধ্য। রজনী ও শচীন্দ্র দুজনকেই দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। তাদের হৃদয়ের অনেক আঘাত প্রত্যাঘাতের পরে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রেমের দীপটি। রজনী শচীন্দ্রকে না পাওয়ার দুঃখে ডুবে মরতে গিয়েছিল, আবার তাকে পাওয়ার আশাতেই মরতে পারেনি। আর রজনীর অন্ধত্বের অনুরোধে শচীন্দ্র অন্ধ হ'তে ইচ্ছা করেছে। কিংবা "রজনী, এ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত করো।" এই তো প্রেমের চরম লক্ষণ, দুজনের একীরূপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। শচীন্দ্রের জগৎ এখন রজনীময়। কিন্তু এ কী, কেন রজনী। এত জ্বালা কেন, দাহ কেন? "হায় রজনী, পাথরে এত আগুন।"

না, শচীন্দ্র, আগে পাথরে আগুন ছিল না, পাথর তুষারবৎ শীতল ছিল। তারপরে একদা তোমার স্পর্শে আগুন জ্বলল, প্রেমের স্পর্শে আগুন জ্বলল, তাই এখন পাথরে এত আগুন। ক্রমে এই আগুনে, এই তাপে তুমি ও রজনী গলে গিয়ে একীভূত হবে। তাই এত তাপ, এত দাহ। এই আগুনেরই নামান্তর প্রেম।

জগৎ তো মনুষ্য জন্মাবার আগে থেকেই এমন সুসজ্জিত ও সুসংস্কৃত ছিল। কিন্তু সুন্দর ছিল কি? সৌন্দর্য বস্তুতে নাই, দ্রষ্টার চোখে আছে, সৌন্দর্য দৃষ্টি-বিশেষের গুণে। মানুষ সেই দৃষ্টি নিয়ে এলো, জগৎকে দেখলো সুন্দর।

"আমি এলেম, কাঁপলো তোমার বুক"
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুন ভরা
আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম
কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।"

রজনী সুসজ্জিতা ও সুসংস্কৃতা ছিল, কিন্তু সুন্দর হয়ে উঠলো শচীন্দ্রের চোখের গুণে, সেই গুণটি প্রেমের উপাদান। প্রেমের উপাদান এইজন্যে যে, প্রেমেও দুই পক্ষের আবশ্যক, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তু। দ্রষ্টা যখন দৃষ্টবস্তুতে সৌন্দর্য দেখে, তখন বুঝতে হবে যে, প্রেমের আগুন জ্বলেছে। এক্ষেত্রে আগুন জ্বলেছে। সেই তাপেই বিস্মিত শচীন্দ্রের উক্তি, "হায়, রজনী! পাথরে এত আগুন।"

কপালকুণ্ডলার মতোই রজনী উপন্যাস-খানিও অনন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর কোন ধারার সঙ্গে এর মিল নাই। কপাল-কুণ্ডলাও হৃদয়ে প্রেম জাগরণের কাব্য, কপাল-কুণ্ডলার হৃদয়ে জাগ্রতপ্রায়; মোতি বিবির হৃদয়ে পূর্ণ জাগ্রত। কিন্তু বিপুল বিশ্বের ইটের উপরে স্থাপিত বলে মানুষের সুখদুঃখ এখানে অনেকটা নিস্তেজ। রজনীর ক্ষুদ্র পরিসরে দুঃখের প্রচণ্ডতা এবং প্রেমের দ্যুতি দুই-ই সুপ্রকট। নিসর্গ প্রভৃতি অন্য সূত্র না থাকায় প্রেমের বিকাশ দেখবার অবাধ সুযোগ পেয়েছেন লেখক। সর্বোপরি মনে রাখবার কথা এই যে, রজনী উপন্যাসখানা রূপক। ঘটনা স্রোতের তলায় আর যে একটা গূঢ়তর অর্থ আছে, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক। শিল্পগত অভিনবত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তবে তত্ত্বগত রূপটি এমন কিছু নূতন নয়। সৌন্দর্য প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র যা খণ্ডকারে বলেছেন, এখানে তার একটি অখণ্ড রূপকাশ্রিত প্রকাশ। (ক্রমশ)

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি...কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন।

রিসার্চ : আমি 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনা করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাসপ্রো' ফর্মুলাতেই পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস্ গভর্নমেন্টের উদ্যোগে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে তাতে পরিষ্কার দেখা গেছে যে 'অ্যাসপ্রো'র সক্রিয় উপাদান গতি ও কার্যকারিতার বিচারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যথা-নিবারক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তাররা 'অ্যাসপ্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহযন্ত্রে মেটাবলিক বর্জ্য জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে: 'অ্যাসপ্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাসপ্রো' গ্রহণ করবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা ব্যথা • দাঁত ব্যথা • গাঁটে ব্যথা • গা-জর জর • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বরে 'অ্যাসপ্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রা :
বয়স্ক : দুইটি বড়ি।
আবশ্যক হলে আবার
গ্রহণ করা উচিত।
শিশু : একটি বড়ি অথবা
ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

A.G.I.H.

শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে অশোক হলে প্রবেশ করছেন টিটো, ইন্দিরা ও নাসের

তাঁরা দুজনেই দীর্ঘকায়। পদক্ষেপ দৃঢ়, এখনো অনেকটা সৈনিকদের মতো। ঋজু মেরুদণ্ড। একজনের বয়েস ৭৪, প্রবীণ অভিজ্ঞ রাজনীতিক। অন্যজন মাত্র ৪৮, কিন্তু মুখে-চোখে তাঁর মধ্য-বয়স্কতার চাইতে যৌবনের ছাপ অধিক। একজন যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটো, অন্যজন সংযুক্ত আরব জনতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নাসের।

অক্টোবরের ২১ থেকে ২৪ ক'টা দিন নিরপেক্ষ শক্তিদের রাজনীতি নিয়ে মশগুল ছিল রাজধানী। সংবাদপত্রে, রেডিয়োতে আর টিভিতে শুধু তিন দেশের নাম: যুগোশ্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব জনতন্ত্র (মিশর) আর ভারত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনটি নাম—টিটো, নাসের, ইন্দিরা। পিতৃদেব জহরলাল যা করে যেতে পারেননি, ইন্দিরাজী করলেন—দিল্লিতে ত্রয়ীশক্তির সম্মেলন। কিন্তু রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ঢাক-পেটানোর আওয়াজে টিটো আর নাসেরের ব্যক্তিগত জীবন-কথাগুলো যেন চাপা পড়ে গেল। সাধারণ ঘরের সন্তান তাঁরা দুজনেই; দুজনই অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং দুজনেই এনেছেন নিজেদের দেশে সমাজতন্ত্র। যুগোশ্লাভিয়া আর মিশরের কোটি কোটি মানুষ এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

"টিটো" হল ছদ্মনাম। বহু বছর তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল কিনা, তাই। আসল নাম হল জোসিফ (উচ্চারণ ইয়োসিফ) ব্রজ। পিতা ফানিয়ো, মাতা মারিয়া। দরিদ্র কিষাণের ঘর, জাগ্রেবের অনতিদূরে কুমরোভেচ গ্রামে। জন্মদিন ২৫শে মে ১৮৯২।

সরকারীভাবে আজ তাঁকে বর্ণনা করা হয়: "শ্রমিক, বিপ্লবী, সামরিক নেতা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক।" কোনোটাতেই অত্যুক্তি নেই। কিন্তু অবাক হতে হয় তাঁর জীবনের কথা শুনে। খেটে খাওয়া মজুর বিপ্লবের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন সমগ্র দেশের নেতা হিসাবে। বি-এ এম-এ কিছু পাশ নেই। লেখাপড়া গোড়ায় মামুলি। তারপর হাতের কাজ শিখলেন ধাতু ইত্যাদি নিয়ে কারিগরি শিক্ষায় এবং সেই কাজ উনি করেছেন নানা দেশে: যুগোশ্লাভিয়ায়, অস্ট্রিয়ায়, জার্মেনীতে। উনি প্রথম নামলেন রাস্তায় একটি বিক্ষোভ মিছিলে জাগ্রেব সহরে। তখন বয়েস মাত্র ১৮। শ্লোভেনিয়াতে কারখানায় কাজ করতে করতে জোসিফ ডনগিচ (জিমন্যাস্ট) হিসাবে খুব নাম করেন। এখনো চেহারায় ডন-পেটা ছাপ। জার্মেনীতে রূঢ় প্রদেশে কারখানায় মজুরি করেছেন, এবং সেখানেই ২০।২১ বয়সে শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে আরম্ভ করেন। জার্মান ভাষাও তখন শিখলেন।

অনেক পরে, অর্থাৎ ১৯১৭-১৮তে রুশ বিপ্লবের সময়ে, উনি লাল সেনার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন এবং রাশিয়ায় থাকতে থাকতে ভাল করে শেখেন রুশ ভাষা। পড়েন মার্কস্ আর রুশ সাহিত্য। আসলে অস্ট্রো-হাংগেরির সামরিক বাহিনীতে

শীর্ষ সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাসের

প্রেসিডেন্ট গামেল আবদুল নাসের দিল্লির রাজঘাটে 'ভিজিটার্স' বুক'-এ স্বাক্ষর করছেন

থাকতে প্রথম মহাযুদ্ধে জোসিফ আহত হন এবং রুশদের হাতে বন্দী হন। অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে নানাস্থানে কাজ করতে পাঠান হয়েছে, কিন্তু ১৯১৭-তে নেমে গেলেন জুলাই মাসের বিক্ষোভ মিছিলে, তদানিন্তন পেট্রোগ্রাড শহরে।

বলা যেতে পারে, তখন থেকেই জোসিফের জীবন কমিউনিস্ট পথ বেছে নিল। তা থেকে বিচ্যুত হননি কোনো-কালে। জাগ্রেবে ফিরে আসেন ১৯২০-তে আর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট দলে যোগ দিলেন। পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করায় গোপন জীবন আরম্ভ হয় ১৯২১ থেকে। যুগোশ্লাভিয়ার নানাস্থানে কারখানার কাজ নিয়ে আর দলের সংগঠন কাজ নিয়ে। এবং অনেকবার জেলে যেতে হয়েছে, স্বভাবতই। জেলের কয়েদি নম্বর ছিল ৪৮৩।

দলের নেতৃত্ব অনেক বৎসর দেশের বাইরে থেকে চালাতে হচ্ছিল, কিন্তু ১৯৩৭ সনে সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর জোসিফ কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের ভিতরে এসে সংগঠন আরম্ভ করেন। হিটলার ও মুসোলিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাঁর জীবনে আনল বিরাট পরিবর্তন। "টিটো" নাম নিয়ে গরিলা যুদ্ধে নেমে গেলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এ টিটোর সৈন্যসংখ্যা হল ৮ লক্ষ।

টিটোর যুদ্ধ জয় আজ কিংবদন্তী এবং কী দাম দিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ অর্জন করেন স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র? সব মিলিয়ে নিহত ১৭ লক্ষ; আহত তিন লক্ষ। চার বছরের যুদ্ধে শত্রুসৈন্য তারা ধ্বংস করেছে সাড়ে চার লক্ষ; বন্দী করেছে দুই লক্ষ দশ হাজার। সাড়ে চার হাজার কামান, ১৩,৪০০ মেশিনগান, প্রায় ছ' লক্ষ রাইফেল ইত্যাদি শত্রুপক্ষ থেকে ধরা পড়ে।

এগুলোর কিছু কিছু বছর ছয়েক আগে দেখেছি বেলগ্রেডের সামরিক মিউজিয়মে। দেখেছি রিভলবার, রাইফেল যা নিয়ে টিটো নিজে যুদ্ধ করেছেন। অসামান্য দেশের স্রষ্টা টিটো।

*

গামাল আবদেল নাসের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। গ্রামের নাম বেন মুর, জন্মদিন ১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮। জন্মেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে,—ক্লেয়োপেট্রার শহর আলেকজান্দ্রিয়া। রাস-এল-টাইন নামক মাধ্যমিক ইস্কুলের ছাত্র হিসাবে নাসের প্রথম অংশ নেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে পনেরো বছর বয়সে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদ এই দুটিই কালক্রমে হল নাসের ও নতুন মিশরের শত্রু। যার বিরুদ্ধে নাসেরের অক্লান্ত লড়াই। ১৯৩৩-এর ঐ ছাত্র বিক্ষোভ (মানশিয়া স্কোয়ারে) থেকে নাসের অন্যান্যদের সঙ্গে গেলেন জেলে। ফিরে এলেন "অন্তরে ক্রোধ-বহ্নি নিয়ে" (তাঁর নিজের কথায়)।

বছর দুয়েকের মধ্যে নাসের ছাত্র নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। তখন তাঁর কর্মকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া নয়, কায়রো। এখনো তাঁর কপালে পুলিশের লাঠির দাগ আছে, অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। ইস্কুল থেকে পাশ করে নাসের ভর্তি হন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে, পাশ করে বেরুলেন ১৯৩৮-এ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে। সেদিন তাঁর দুজন সহপাঠী: জাকারিয়া (অধুনা উপ-সভাপতি) আর আনওয়ার (জাতীয় পরিষদের সভাপতি)।

এই তিনজন, আর পরে আবদেল হাকিম আমের (প্রথম উপরাষ্ট্রপতি), সেনাবিভাগে স্বদেশিকতার মন্ত্র নিয়ে কাজে নামলেন। কর্মস্থল আবার সেই আলেকজান্দ্রিয়া। "আমার চিন্তা, কী করে মিশরের সৈন্য-বিভাগ থেকে উৎপাটিত করা যায় ভ্রষ্টাচারী-দের", নাসের লিখেছেন।

টিটোর মতো নাসেরের জীবনেও অমল সুযোগ এল মহাযুদ্ধে। যেমনি এসেছিল ভারতের ১৯৪২, তেমনি এল ১৯৪২ মিশরে, যখন (ফেব্রুয়ারি ৫) ইংরেজরা আবদিন প্রাসাদ ট্যাঙ্ক দিয়ে ঘেরাও করে নিজেদের পছন্দ প্রধানমন্ত্রী করল মুস্তাফা নাহাস পাশাকে। জন্ম নিল সেই নিগূঢ় "ফ্রি অফিসারস মুভমেন্ট" যার নেতৃত্বে এল মিশরী বিপ্লব এবং যার মধ্যমণি ছিলেন নাসের।

নাসেরের নিজের কথায়: "একবার যদি সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পারে যে, মিশরীরা আত্মত্যাগে পেছ-পা নয়, সে তখন তাঁদের সঙ্গে লেনদেনে রাজী হবে।" গোপন সংগঠন চলে ধীরে ধীরে, কারণ সংগঠন প্রধানত হল সামরিক কর্মচারীদের ভিতর, যাদের ভিতর ছিল মুক্তি কামনা আর অসন্তুষ্টি। ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এ এল পেলেস্টাইন যুদ্ধ। শিক্ষার ও সংগঠনের আরো সুযোগ। কিন্তু ১৩৪৮-এ যখন আরবদেশীয় স্বেচ্ছা-সেবক সৈন্যরা ইহুদি ইংরাজদের সঙ্গে সংগ্রামে নামল, তখন থেকে নাসের বিপ্লবের দিন গুনতে আরম্ভ করেন। একটা চিঠিতে বলেছেন: "আমাদের তখন ছোট্ট গোপন চক্র মাত্র কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর। আমি তখন ক্রমাগত পড়ছি লাসকি, নেহরু আর অ্যানিউরিন বিভান। তারপর ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা আমার মনে বাড়তে লাগল"।

দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত ত্রিশক্তি বৈঠকে মার্শাল টিটো

ঐ যুদ্ধে নাসের নিজেও নামলেন, কয়েকবার আহত হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, একবার খুব গুরুতরভাবে। কিন্তু তার ভেতর দিয়েই দেখতে পেলেন কী কদর্য দুর্নীতি এসেছে মিশরের সৈন্যবাহিনীতে। গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র অনেক সময় অকেজো। ঘুষ খেয়ে মোটা হয়েছে কোনো কর্মচারী কোটি কোটি টাকার বাজে মাল কিনে। যেমন, কামান থেকে গোলা দাগান হল, কিন্তু গোলা আর ফাটে না। ভরা যুদ্ধের সময় সামরিক ইনজিনিয়ারদের উপর হুকুম হল বাদশা ফারুকের জন্যে গাজা মরুভূমিতে স্নানাগার তৈরি করার!! শত্রুকে আক্রমণ করার অনেক আগেভাগে প্রকাশিত হয়ে যেত আক্রমণ করার পরিকল্পনা কায়রোর খবরের কাগজে।

নাসের বলেছেন, "আমরা যখন যুদ্ধে আহত, কায়রোতে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরা টাকার কুমীর সেজে বসেছে। সস্তা মাল বেশি দামে বেচেছে সৈন্যবিভাগের কাছে। আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল : রাজা ফারুককে সরাতে হবে। রাজবংশের শেষ করতে হবে।" গোপনে গরিলা যুদ্ধ শিক্ষা চললো সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে। "আমাদের প্ল্যান ছিল ১৯৫৫-তে কর্তৃত্ব দখল করার। কিন্তু ঘটনার স্রোতে তা আগেই করতে হয়েছিল"।

কায়রো শহরের বিরাট অগ্নিকাণ্ড ১৯৫২ জানুয়ারি; অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও জনসাধারণের অশেষ ক্লেশ, রাজা ফারুকের বিলাসব্যসন ও নতুন সামরিক কর্মচারীদের

১৯৫২-তে, তারিখ ২৩শে জুলাই। যদিও সেদিন প্রথমে রাষ্ট্রপতি ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের আসল নেতা ছিলেন নাসের। দুবার (১৯৫৪ আর ১৯৫৬) মিশরী সৈন্য ইংরাজদের বিতাড়িত করেছে মিশর থেকে। এবং ১৯৫৬-র বৃটিশ-ফ্রান্স-ইসরায়েলের আক্রমণ থেকেই নাসের বেরিয়ে আসেন মিশর ও আরব স্বাধীনতাকামীদের নায়ক হিসেবে, এমন কি আফ্রিকার কয়েকটি দেশের।

কাছাকাছি দেখে ও তাঁর কথাবার্তা ও চালচলন দেখে এ ধারণা আরো দৃঢ় হল যে এশিয়া ও আফ্রিকার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একজন অন্যতম নায়ক হবেন গামাল আবদেল নাসের।

—খগেন দে সরকার

ORWO

কলকাতার ডায়েরী

না, এ পাড়ায় পুজো হয় না। ঢাকের বাদ্যি, মাইকের আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছায় না। এ পাড়া সাহেব পাড়া।

উত্তরে পার্ক স্ট্রীট, পশ্চিমে চৌরঙ্গী এবং পূবে-দক্ষিণে সারকুলার রোড—ছিমছাম এই অভিজাত পল্লী শহরের মাঝখানে থেকেও এ সময় শহর থেকে বাইরে। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া—প্রতি বছর এই পাঁচদিন সারা কলকাতায় ধুন্ধুমার ব্যাপার, লোকের ছোটাছুটিতে অন্যরকম চেহারা; কিন্তু এ পাড়া যে-কে-সেই, গাড়ির হর্ন আর পিয়ানোর টুংটাং ছাড়া ঘরে বাইরে বিশেষ কিছু শোনা যায় না।

গিয়েছিলাম উত্তরে, ঠাকুর দেখতে। প্রতিবারই যাই—বাগবাজার, কুমারটুলি, বিডন স্কোয়ার। অনন্যসুন্দর সব কটি দেখে এবার বাড়তি দেখলাম আর একটি—জগৎ মখার্জি পারকের ঠাকুর। অ-সাধারণ মূর্তি, কল্যাণ আর অকল্যাণের দ্বন্দ্বে ক্ষমা-সুন্দরদৃষ্টি দেবী দুর্গার পৌরাণিক বিজয়-কাহিনী আধুনিক আঙ্গিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী শ্রীঅশোক গুপ্ত। ভাস্কর্য আর চিত্রকলায় মিশ্রণে এবং রঙের বিন্যাসে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেছে বটে, কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত নয়, বরং সামগ্রিক পরিকল্পনায় অতিরিক্ত রসের স্বাদ দিয়েছে।

ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে মনে পড়ল এক বন্ধুর কথা। সে ওই সাহেব পাড়াতেই থাকে, বড় চাকুরে বিদেশী কোম্পানির। ট্যাকসিতে পাড়া ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম সেই পান-বিড়ি-কাম-গ্রসারি শপে ওড়িয়া মালীদের নিত্যকার আড্ডা, সেই ধোবিখানা-কাম-কয়লার দোকানের খাটিয়া-গুলিতে খানসামা-বেয়ারার আফটার লাঞ্চ গুলতানি, একটি দুটি গাড়ির যাতায়াত, ফটক খোলা, বন্ধ হওয়া, দামী কুকুরের শালীন পদচারণা, রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছের ঝিরঝিরানি—সব অন্যদিনের মত [illegible]বারণেই [illegible]

লাসব্যসন [illegible]তলায় উঠে বেল টিপলাম। সন্তুষ্টি এ[illegible] অভ্যর্থনা জানালেন বন্ধুপত্নী, হাতে চটুল বিলিতী ম্যাগাজিন।

—"আরে আরে, এসো এসো—"

—"মিসটার কোথায়?"

বন্ধুকে চেনেন না, এমন দিনে কি ও বাড়িতে থাকে, লাঞ্চ থেকেই ক্লাবে।

ফিরবে কখন?

বলা মুশকিল, অনেক রাত হবে। 'পুজো-মুডে' আছে কিনা।

আপনি সঙ্গে গেলেন না?

আমাকে আবার বিকেলে নানুডির সঙ্গে বেরোতে হবে। বাসুদের বাড়ি ডিনারের নেমন্তন্ন।

পুজো দেখতে যাবেন না?

মাথা খারাপ, ওই ভিড়ে কেউ যায়, হরিবল।

—আচ্ছা চলি, ওকে বলবেন—

সে কী, বসুন এসে, একটা কিছু খোরা—

না, না, আর একদিন আসব। ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' আচ্ছা নমস্কার।

ফের ট্যাকসিতে। কয়েক চক্কর মেরে আর এক বন্ধুর বাড়িতে। লর্ড সিনহা রোডে। সেখানে অন্য ব্যাপার। চেনা অনেকেই রয়েছে। সোফা সরিয়ে কারপেটের উপরেই তাসের আড্ডা। মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে হল্লা। ওদিকে বাড়ির বেয়ারা বড় রাস্তা থেকে সোডার বোতল আনতে আনতে হয়রান। বুঝলাম ক্লাবে বা গলফ খেলতে যায়নি বটে, তবে এরাও বাড়িতে পুজো-মুডেই আছে।

ঘরে ঢুকতেই টানাটানি। কোরাসে চিৎকার—'বসে পড় বসে পড়।'—অর্থাৎ 'রামি' খেলতে হবে।

বন্ধুপত্নী জানালেন আগের রাত থেকে তাস শুরু হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়া। তাঁর সন্দেহ, এই আড্ডা বিজয়া দশমী তক চলবে।

তাসে মন নেই; পাশের ঘরে তাই ঢুকে দেখি সেখানে আর একদল। সেখানকার আলোচনার বিষয় চেনা মহলের সাম্প্রতিক স্ক্যানডাল এবং আসছে হপ্তায় কে কোথায় ছুটি কাটাতে বাইরে যাবে, তাই নিয়ে আলোচনা।

সেখানেও খানিক বসে জুত হল না। চলে এলাম। বললাম জরুরী কাজ আছে, বাড়ি ফিরতে হবে এখনই।

আবার ট্যাকসিতে। দক্ষিণের পথ ধরতেই দেখলাম রাস্তার কোণটায় একটা দারোয়ানের ঘরের পাশে ছোট্ট একটা শেফালি গাছ অকারণে ফুল ঝরিয়ে চলেছে। এই গাছ এ পাড়ায় বড় বেমানান।

*

বেশ কিছুদিন আগে এই ডায়েরির পাতাতেই কলকাতার পথুয়া কুকুর নিয়ে লিখেছিলাম। সেদিন একটি কাগজ হাতে পড়ল, তাতে দেখছি সি-এস-পি-সি-এ মহলেও এই নিয়ে সাড়া পড়েছে। ওরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পথুয়া কুকুরের সংখ্যা হ্রাস নিয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

পরিকল্পনাটির রচয়িতা শ্রীমতী করবী সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী, এখন বর্ধমানে অধ্যাপিকা। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর মেধা এবং অনুরাগের কথা এত-দিন জানতাম, সেদিন জানলাম শহরের সারমেয়-অনুরাগীদের তিনি একজন। তবে তাঁর অনুরাগ দেশী পথুয়া কুকুরদের উপরই বেশী।

যত্রতত্র কুকুর দেখলেই নির্বিবাদে তাদের মেরে ফেলার তিনি বিরোধী। তাঁর মতে দুরারোগ্য ব্যাধি যাদের, তাদেরই শুধু মেরে ফেলা যেতে পারে, ম্যাগসালফ ইনজেকশনে, অন্যদের বেলায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সারমেয়ীদের পরাতে হবে 'লুপ', সারমেয়দের করতে হবে নির্বীজ।

শ্রীমতী সেনের প্রস্তাব, তার জন্যে শহরে খোলা হোক ভেটেরিনারি ক্লিনিক, সেখানে রোজ নির্বীজ করা হবে কুড়িটি কুকুরকে। ওই ক্লিনিকে ধরে আনা কুকুরদের দুদিন পরীক্ষায় রেখে তৃতীয় দিনে হবে অপারেশন। ওরা ওখানে থাকবে মোট দশদিন। তারপর

ছেড়ে দেওয়া হবে আবার পথে। এল কা-ওয়ারি থাকবে কয়েকটি ভারপ্রাপ্ত এজেনসি, তারাই নিয়ে আসবে তাদের এলাকার কুকুরকে এবং অপারেশনের পর এজেনসিই ফেরত পাঠাবে নিজেদের পাড়ায়। শহরে পথুয়া কুকুরের সংখ্যা প্রায় পনের হাজার যদি ধরা যায়, তাহলে প্রায় সাত হাজারকে অপারেশন করতে লাগবে মোটামুটি এক বছর। এবং তারপর ভবিষ্যতের জন্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত। আপনাতেই পথুয়া কুকুরের সংখ্যা কমে যাবে, পাড়ার লোকেরা উত্যক্ত হবে না, আর ওদেরও খাঁচায় পুরে নিয়ে গিয়ে মারতে হবে না।

শ্রীমতী সেনকে বললাম, "কিন্তু অনেক সময় তো শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে ওদের মারতেই হয়।

উত্তরে তাঁর বক্তব্য : মেরে ফেলা অপরিহার্য কিনা সেটা আগে দেখা দরকার। না মেরেও যদি জনস্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় তাতে আপত্তি কী।

"তা ছাড়া"—শ্রীমতী সেন বললেন—"সব পথুয়া কুকুরই কিন্তু বেওয়ারিশ নয়, হিসেব নিয়ে আমরা দেখেছি, শহরের শতকরা সাত ভাগ কুকুরই ব্যাধিগ্রস্ত, বাকিরা বেশ আরামেই আছে বস্তিতে, খাবার দোকানের কোণে। আসলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে পথুয়া কুকুরের [illegible] ব্যাপারে কোন্ পন্থা ভালো? [illegible] ফেলা, না জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা? আমি তো মনে করি নিতান্ত অপরিহার্য না হলে কোন সভ্য দেশেই এই ভাবে নিরীহ প্রাণীকে [illegible] করে দেওয়া অন্যায়।"

শ্রীমতী সেনের সঙ্গে আমিও একমত। এখন দেখা যাক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভার-প্রাপ্ত দপ্তর প্রস্তাবটিতে সায় দিতে আদৌ রাজী হন কিনা এবং হলেও ক্লিনিক খুলতে কত বছর লাগান।

চাণক্য

বিশ্ব বিজ্ঞান
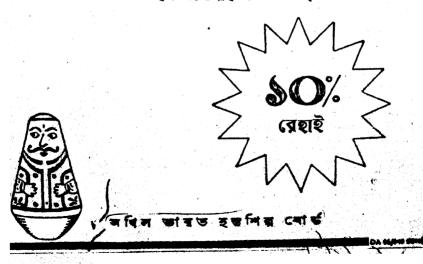
কৃষি ও বিকিরণ

পারমাণবিক বিকিরণের নাম শুনলে আমরা আতঙ্কে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভেসে ওঠে হিরোশিমা ও নাগাসাকির কথা। কিন্তু পরমাণুর বিকিরণ-ধর্মকে মানুষ সমাজকল্যাণে ব্যবহার করতে পারে এবং করছে। পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস ও নিষিদ্ধ করতে পারলেই আর ভয়ের কিছু থাকে না।

কৃষির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, খাদ্য সংরক্ষণ, শস্যরোগ ও শস্যকীট ধ্বংস ইত্যাদি বহু কাজে-কর্মে আজ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার হচ্ছে শুধু আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ইত্যাদি বিজ্ঞানে অগ্রগামী দেশে নয়, আমাদের ভারতের মত উন্নতিকামী দেশেও। ট্রম্বের পারমাণবিক সংস্থা খাদ্যসংরক্ষণে পরমাণুশক্তির ব্যবহারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। সেখানকার বিজ্ঞানীরা ঘরের মধ্যে সাধারণ তাপমাত্রায় কিছু কলা ১০০ দিন রেখে দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলি পচেনি। তেমনি কিছু হাতে গড়া রুটি বিকিরণের সাহায্যে তাঁরা ৫০ দিন তাজা রাখতে পেরেছেন—সেগুলির রং গন্ধ ও পুষ্টিমূল্য এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। এই রকম আরো বহু খাবার, শাকসব্জি, ফলমূল ও তরিতরকারির সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টা সার্থক হয়েছে। আমাদের দেশে উৎপন্ন খাদ্যের বেশ কিছুটা অংশ উপযুক্ত সংরক্ষণের বন্দোবস্তের অভাবের দরুন পচে, নষ্ট হয়ে যায়। সেই দিক থেকে এই বিজ্ঞানীদের সাফল্য বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

ট্রম্বে সংস্থার আর একদল বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিকিরণের সাহায্যে তাঁরা এমন নতুন জাতের ধান ও চিনাবাদাম সৃষ্টি করেছেন যেগুলি ফলবে বেশি, আয়তনে বড় এবং ওজনে ভারি। সেই ধান মামুলী জাতের ধানের চেয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে পাকে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা হাতে-কলমে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কতকগুলি পদার্থের পারমাণবিক বিকিরণকে নিয়ন্ত্রিত কৌশলে ব্যবহার করতে পারলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এই কাজে তাঁরা ব্যবহার করেছেন কোবল্ট-৬০-এর গামা রশ্মি, এক্স-রশ্মি এবং অন্য কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ যেগুলি 'মিউটেশনে' সাহায্য করে।

ঐ সব রশ্মি উদ্ভিদ কোষের বংশগতিবাহী জীনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ভাল গুণগুলি জাগিয়ে তোলে। অবশ্য নতুন জাতের সবগুলিই যে কাজে আসে তা নয়। কতকগুলি অকেজো হলেও দুটি থেকে বেশি ফসল পাওয়া যাচ্ছে গত তিন বছর যাবৎ। একটির নাম পিটিবি-১০, অন্যটির জিইবি-২৪। তবে এখানে মাটির চরিত্রের প্রশ্নও আছে। প্রথম জাতের ধানটির কেরালার মাটিতে শতকরা ৪৫ থেকে ৬০ ভাগ বেশি ফলন হলেও বোম্বাই-এর মাটিতে সেই সুফল পাওয়া যায় না। অবশ্য এটির চাল একটু মোটা। কিন্তু নিউট্রনের দ্বারা প্রভাবিত জিইবি-২৪ খুব ভাল জাতের মিহি চাল দেয়, ফলেও শতকরা ১৯ ভাগ বেশি। ট্রম্বে, মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে এটির পরীক্ষামূলক চাষ হয়েছে বেশ ব্যাপক ভাবে। হালে বোম্বাই রাজ্যের ৪০০ একর জমিতেও ধানটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর পর ট্রম্বেতে বীজ ধান ফলানোর পরিকল্পনা আছে।

চীনাবাদাম আর একটি পুষ্টিকর কৃষি-জাত খাদ্যশস্য। সেটির ক্ষেত্রেও বিকিরণ কৌশল ব্যবহার করে সুফল লাভ হয়েছে। গত ৪ বছর ধরে একটি নতুন জাতের বাদামের চাষ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যার শুটি খুব বড়। সাধারণ বাদামের শুটির আয়তন যে ক্ষেত্রে ২·৮০×১·২৬ সেন্টি-মিটার, সেক্ষেত্রে মিউট্যান্ট বাদামের আয়তন ৪×১·৮০ সেন্টিমিটার।

ট্রম্বের পরীক্ষা কেন্দ্রে বিকিরণ কৌশল প্রয়োগ করে ভাল জাতের গম, জোয়ার, অন্যান্য তরকারি ও ফল সৃষ্টি করার জন্য গবেষণা চলেছে।

আমেরিকা প্রভৃতি অগ্রগামী দেশের কাছে কৃষির উন্নতির স্বার্থে তেজস্ক্রিয় পরমাণু (আইসোটোপ) ব্যবহার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য ওকরীজ শহরে এক কৃষি গবেষণাগার আছে। মার্কিন পারমাণবিক
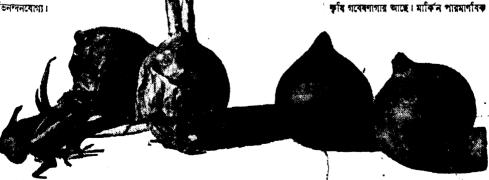
...পূর্বে ১২ সপ্তাহে পেঁয়াজের কলি বের হয়—বিকিরণ প্রয়োগের ডানদিকে পেঁয়াজ ২৪ সপ্তাহ পরও তাজা।

বিকিরণ প্রয়োগের ফলে বাঁদিকের আলুর কল বেরনো বন্ধ হয় এবং ২৮ সপ্তাহ গুদামে তাজা রাখা সম্ভব হয়

শক্তি কমিশনের দ্বারা সেটি পরিচালিত। ওক্‌রীজের গবেষণাগারে শুধু উদ্ভিদ নিয়ে কাজ হয় না, গৃহপালিত পশুর উন্নতি-সাধনের জন্যও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে থাকে।

কোন গাছ বা পশুর শরীরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ইঞ্জেকশন করে দিলে, শরীরের মতে সেটির গতি বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ঐ ক্ষেত্রে আইসোটোপটিকে বলা হয় 'ট্রেসার অ্যাটম।' খাবারের সঙ্গে ট্রেসার মিশিয়ে দিয়ে শরীরের মধ্যে কতটা বেগে এবং কোন্ পথ দিয়ে খাদ্য শোষিত হচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যাবে। এই ব্যাপার থেকে আমেরিকার ঐ গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা কোনো বাছুর ভবিষ্যতে বড় হয়ে বেশি দুধ দেবে কিনা তা জানতে পারেন। তাঁরা বাছুরের খাবারের সঙ্গে সামান্য একটু তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-১৩১ মিশিয়ে দিয়ে দেখেন যে সেই আয়োডিনের আইসোটোপ থাইরয়েড গ্রন্থিতে জমা হচ্ছে কিনা। যদি জমা হয় তাহলে বুঝতে হবে বাছুরটির থাইরয়েড ভাল কাজ করছে অর্থাৎ বাছুরটি বড় হয়ে ভাল দুধ দেবে। তেমনি ধরুন ভুট্টা বা গমের গাছে ঐ রকম ট্রেসার ব্যবহার করে জানা যায় রাসায়নিক সার কতক্ষণে ভুট্টা ও গমের শীষে পৌঁছচ্ছে।

ভাল জাতের ফসল, ফল, তরি-তরকারি ও তুলা সৃষ্টি করা নিয়ে আমেরিকায় ব্যাপকভাবে কাজ হচ্ছে। আমাদের যেমন ট্রম্বে, আমেরিকার তেমনি ওক্‌রীজ। সেখানকার গবেষণাগারে বিকিরণের দ্বারা এমন শস্য গাছ তৈরি হয়েছে যাতে কাটা নেই, বেশি ফল হয়। গাছগুলি টোমাটো গাছের মত খাড়া।

ওক্‌রীজ গবেষণাগারে মার্কিন ও মিশরীয় তুলোর সংকরীকরণের চেষ্টা হচ্ছে। ভাল জাতের মার্কিন তুলোর আঁশের দৈর্ঘ্য ২·৫৪ সেণ্টিমিটার এবং মিশরীয় তুলোর আঁশের দৈর্ঘ্য ৩·৮১ সেণ্টিমিটার। এই দুই জাতের তুলোর সুনাম সবচেয়ে বেশি। দুটিতে গাঁটছড়া বেঁধে দিতে পারলে সংকরজাতীয় তুলো রূপে গুণে আরো সরেশ হবে।

শস্যের বিভিন্ন রোগের বীজ ও কীট পতঙ্গ নষ্ট করার জন্যও আমেরিকার ঐ গবেষণাগারে বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এক্স ও গামা রশ্মি বিকিরণের সাহায্যে কীটপতঙ্গের জননশক্তি নষ্ট করে দেওয়া যায়। ফলে যেসব ডিম হয় সেগুলি থেকে আর বাচ্চা হয় না। এই কৌশলে ফ্লোরিডা, জর্জিয়া ও আলাবামার ফসলের এক মারাত্মক শত্রু পোকা সমূলে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে গুদামে জমা থাকার সময় যেসব পোকা মাকড় শস্য, তামাক, পশম ইত্যাদির অনিষ্ট করে সেগুলিকে পারমাণবিক আক্রমণের দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। এই সব জ্ঞান ভারতের পক্ষেও অমূল্য। বিকিরণের দ্বারা পোকামাকড় ইত্যাদি নষ্ট করার ব্যাপারেও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা কিছু পিছিয়ে নেই।

খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পারমাণবিক বিকিরণের সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় গবেষকরা বেশ কিছুটা কৃতিত্ব এর মধ্যেই দেখিয়েছেন। আমেরিকাতে আজকাল খাদ্য নিজীবাণুকরণে (পাস্তুরাইজেশন) বিকিরণ কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। স্টেরিলাইজেশনের চেয়ে এতে বিকিরণ অনেক কম লাগে অথচ রোগবীজাণু মরে, খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধ নষ্ট হয় না। ভারতীয় গবেষকরাও পরীক্ষামূলকভাবে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির উপর বিকিরণ প্রয়োগ করে চমৎকার ফল দেখতে পেয়েছেন। ঐ পদ্ধতি প্রয়োগের পর তরি-তরকারিগুলিকে মজুত রাখবার জন্য আর হিমঘরের প্রয়োজন হয় না। সেইসব আলু বা পেঁয়াজের গায়ে ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত কল বেরোয় না। বিকিরণের সাহায্যে প্রয়োজনমত ফল পাকা বিলম্বিত করা যায়। আম পেড়ে বিকিরণ প্রয়োগের পর এক মাস রেখে দিলেও পাকবে না। টিন ভর্তি ফলমূল ইত্যাদি খাবার গামা রশ্মির সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়ামুক্ত হয় অথচ সেগুলির স্বাদ, গন্ধ সবই অবিকৃত থাকে এমন কি খাদ্য প্রাণের উপাদানেও কোন হেরফের হয় না। তেমনি গামা রশ্মিপ্রযুক্ত চিংড়ি মাছ ১০।১২ ডিগ্রী উত্তাপে ৬৫ দিন পর্যন্ত একটুও পচে না এবং [illegible] ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপে ১০ দিন পর্যন্ত থাকে। এই সব সাফল্যের জন্য ট্রম্বের বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবার যোগ্য।
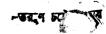
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার : ১৯৬৬

নকুল চট্টোপাধ্যায়

সুইডিশ একাডেমী ঘোষণা করেছেন যে এ বছর সাহিত্যের জন্য যুক্তভাবে দুজন সাহিত্যিককে নোবেল-পুরস্কারে ভূষিত করা হল। লেখক দু'জনই জাতিতে ইহুদী। প্রথমজন হলেন স্যামুয়েল যোসেফ আগনন (আগস্ট ১৮৮৮—) আর দ্বিতীয় জন হলেন একজন মহিলা কবি শ্রীমতী নেলি শাখ্‌স্‌ (১০ই ডিসেম্বর ১৮৯১—)। তবে আগনন হচ্ছেন হিব্রুভাষার সাহিত্যিক আর শাখ্‌স্‌ জার্মান ভাষার (গীতিধর্মী) কবি। আগননকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তাঁর "profoundly characteristic art" -এর জন্য আর নেলি শাখ্‌স্‌-কে তাঁর "... outstanding lyrical and dramatic writing, which interprets Israels' destiny with touching strength" -এর জন্য। যুক্তভাবে এ-বছরের পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, যদিও দুজন সাহিত্যিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তবুও এই দুই সাহিত্যিকের সাহিত্যকীর্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদী জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জয়গান—এ'দের সাহিত্যের মূল উৎস এক ও অভিন্ন।

স্যামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন্‌

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হবার কয়েক সপ্তাহ পরে জনৈক সাংবাদিক আসেন আগনন্‌কে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। আগনন্‌ সেই সাংবাদিকের সামনে যে মন্তব্য করেন তা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেছিলেন "আমার সম্পর্কে আজও লোকের কৌতূহল আছে দেখে অবাক হচ্ছি।" কথাটা বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তিনি সেদিন বলেছিলেন। আধুনিক ইস্রাইলের পাঠকদের চোখে তিনি নাকি সেকেলে! তিনি নিজেই বলেছেন "আজ যুব সম্প্রদায়ের সামনে আকর্ষণের অনেক সামগ্রী আছে। আমি আধুনিক লেখক নই। আমার একজন পাঠক-ও আছে এ কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।"

একদিন আগননের রচনা হিব্রু-সাহিত্যের পাঠকদের আনন্দ দিয়েছিল কিন্তু নাৎসী অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা [illegible] তাঁর চোখে জল আসে। তাঁর দুঃখ এই যে, একদিন যাঁদের তিনি আনন্দ দিয়েছিলেন আজ আর তাঁরা নেই।

হিব্রু সাহিত্যের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে স্যামুয়েল যোসেফ আগননের আবির্ভাব

স্যামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন্‌ : ১৮৮৮

ঘটেছিল। অ্যাগনন্‌ যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন হিব্রু-সাহিত্য ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত। সেদিন হিব্রু সাহিত্য-সেবীরা এক যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নূতন দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ ফুটে উঠেছিল তাঁদের রচনায়। তখন প্রত্যেকের সামনেই এক চিন্তা—কোন পথ?—"Jewishness" না "Universalism"! তরুণ কবিরা তখন তাঁদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য ভুলে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে "প্রকৃতি"-র কোন স্থানই ছিল না হিব্রু-সাহিত্যে তাই ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে সাহিত্যের আসরে জেঁকে বসল। এক কথায় তখন হিব্রু-সাহিত্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে আর সে যাত্রার পথ প্রশস্ত করছেন ক্রিস্‌ম্যান এবং তাঁর বন্ধু ও অনুগামীরা।

অ্যাগনন্‌ এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করলেন। তিনি বহির্মুখী হিব্রু-সাহিত্যের গতিকে অন্তর্মুখী করার প্রচেষ্টার ব্রতী হলেন। কোন রকম যুক্তি বা তর্কের অবতারণা না করে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে নিজের জাতি, স্বকীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ইতিহাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মত তিনিও যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হননি এমন নয়, তবে তিনি অন্যান্যদের মত সেদিন বাইরের প্রভাবে নিজের সত্তা বিস্মৃত হননি, তাই হিব্রু-সাহিত্যে আগননের আবির্ভাব একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। সমালোচকের মতে—"With Agnon the Hebrew short story reaches artistic heights. He has the secret of the perfect blend of Content and form, style and rhythm, inner beauty and outer grace. He has tapped new sources of Jewish ethical and esthetic values, revealing the spiritual grandeur in Jewish life. He has done what others have sought in vain to do: to Convert simplicity and folk-naivete into a thing of consummate art and beauty. To the jangled nerves of this troubled generation Agnon's stories bring balm and comfort."

আগননের রচনায় ইহুদী লোক-সাহিত্য, ধর্ম ও ইতিহাসে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আর এই বিশ্বাসের বলেই তারা জীবনের শত দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে পরিণতিতে ভগবানের করুণা পেতে

গেলে অতি স্বাভাবিক কারণেই দারিদ্র্য উপেক্ষা ও অবমাননা সহ্য করতে হবে। আগননের গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "story within a story"। গল্প বলতে বলতে তিনি অনেক সময়ে মূল গল্পকে থামিয়ে রেখে চলে যান গল্পান্তরে—সেই গল্পের নায়কের জীবনের সমস্যার কথা বলেন। তাঁর নায়ক যে-পথে চলেন সেই পথের অন্যান্য পথচারীরাও তাঁর উপন্যাসে মুখর ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বক্তব্য থাকে। গল্প বলার এই বিশেষ আঙ্গিকের বিরুদ্ধে সমালোচকদের হয়ত অনেক কিছুই বলবার থাকতে পারে কিন্তু লেখকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি নির্বিকার। লেখকের উদ্দেশ্য ইহুদী জীবনের সমস্যার কথা বলা। মূল গল্পের নায়ক ক্ষণিকের জন্য পাঠকের কাছ থেকে সরে গেলেও গল্প বলা থামেনা, গল্প এগিয়ে চলে। তাই তাঁর গল্প নায়ক-নায়িকার গল্প হলেও প্রকারান্তরে বহু মানুষের গল্প।

কারও কারও মতে আগনন্ হচ্ছেন মেণ্ডেলে মুখার সেফারিমের উত্তরসূরী। সেফারিম যেমনভাবে রাশিয়ায় ইহুদী জীবনের সমস্যা সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আগনন-ও তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন গালিসিয়ার ইহুদী জীবনযাত্রার রূপ। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেফারিম্ ছিলেন সমালোচক আর আগনন্ হচ্ছেন সহানুভূতিশীল আশাবাদী ঔপন্যাসিক।

সাম্প্রতিক আগননকে [illegible] সাহিত্যিক হিসেবে [illegible] তাঁর রচনার [illegible] ও উপন্যাস। আগননের রচনাবলীর মধ্যে সামান্যই এযাবৎ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগও অনূদিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। তবে হিব্রু-সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। সমালোচকের ভাষায় বলতে হয়,

"He portrayed Jewish folk-life in all its color and revealed its hidden beauty. Out of the bits of an already vanished civilization he has reconstructed a complete pageantry of life among Jews a century ago and has illuminated it with his art"

আগনন্ নিজেকে সেকেলে বলে আখ্যাত করলেও

"Agnon has abandoned the epic style of his earlier work, and his more idiomatic short stories have made him the idol of modern Israeli writers..."

[illegible] অল্পকয়েকের মধ্যে তিনি [illegible] পেয়েছেন। [illegible] তিনি দেখাতে পেরেছেন যে তাঁর রচনা [illegible] সম্মান পেয়েছে।

স্যামুয়েল যোসেফ আগনন—এটি লেখকের ছদ্মনাম। আসল নাম স্যামুয়েল যোসেফ চাচেস্কী। [illegible] ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে [illegible] ১৯০৮—১৯১৩ [illegible] করেন। [illegible] এবং সেখানে ১৯২৪ [illegible] [illegible] ১৯৩৬ [illegible] [illegible] পুরস্কার ও [illegible] পুরস্কার [illegible] তিনি ইংরেজী [illegible] না— [illegible]

"... this has the advantage of [illegible] who might interfere with his work."

নেলি শাখস্

এ বছরের নোবেল-পুরস্কার বিজয়িনীর [illegible] ১০ ডিসেম্বর। [illegible] পুরস্কার।

[illegible] নেলি শাখসের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন জার্মান সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তাঁর পক্ষে বেশীদিন [illegible] সম্ভব হয়নি। [illegible] জার্মানীর ইহুদী-বিদ্বেষের প্রকোপে যেমন

জার্মানীর বহু শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক একদিন অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি নেলি শাখ্স্কেও ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক প্রথম পর্বে পালিয়ে আসতে হয়েছিল স্টকহলমে। সেই দুর্দিনে যাঁরা তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন, সুইডেনের প্রিন্স ইউজিন এবং বিশ্ববিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক সেল্মা লেগারলফ্। সেল্মা লেগারলফ্ হচ্ছেন বিশ্বের প্রথম মহিলা সাহিত্যিক, যিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নোবেল-পুরস্কার পান এবং তিনিই প্রথম মহিলা যিনি নোবেল কমিটির সভ্যপদে নিযুক্ত হয়ে সম্মানিত হন। তিনি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন, কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি নিরাশ্রয় নেলি শাখ্স্কে আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেন। সেল্মা লেগারলফ্ শাখ্সের মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন, আজ নোবেল কমিটির স্বীকৃতির দ্বারা তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নেলি শাখ্স্ স্টকহলমে কিছু সুইডিস কবিতার জার্মান অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পড়ে জার্মান পাঠকেরা তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিল আর সুইডিস লেখকরা করেছিল তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯৪৭ সালে তাঁর কবিতার বই "In den wohnungen des Todes" [In the house of deads] প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "Sternverdunkelung" [Eclipse of Stars], এই গ্রন্থটি সুইডিশ গীতি কবিতার জার্মান অনুবাদ, এবং ১৯৫৭ সালে Sternverdunkelung" [Eclipse of stars] এই গ্রন্থটি সুইডিস গীতি কবিতার জার্মান অনুবাদ, এবং ১৯৫৭ সালে "und niemand weis weiter" [And no body knew farther] নেলি শাখ্স্ নিজে ইহুদী জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনার প্রজ্জ্বলন্ত সাক্ষী। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ইহুদীদের দুর্দশা, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ (বন্দী-শিবির) অমানুষিক উৎপীড়ন এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারী নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য জ্ঞানী-গুণীদের দেশত্যাগ। অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী-শক্তি যে ষাট লক্ষ ইহুদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, সে ঘটনা নেলি শাখ্সের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল বলেই সেই দুঃখময় জীবনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর গীতি-কবিতাগুলিতে। এক দিকে যেমন তাঁর রচনায় এই দুর্দশার চিত্র আছে, তেমনি অন্য দিকে তিনি বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) শাশ্বত বাণী গীতি-কবিতার মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। লেখিকার "Flucht und verwandlung" 1959" [Flight and transformation] ____ গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর পূর্ণতা লাভ করেছে।

নেলি শাখস্ : ১৮৯১

ইহুদী জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনা যে সমগ্র বিশ্বমানবের ভাগ্যের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত, তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে নেলি শাখ্সের রচনায়। ১৯৫০ সালে "Eli" নামক একটি অতিন্দ্রীয়বাদী নাটকও তিনি রচনা করেছেন।

১৯৬৫ সালে "জুইস কোয়ার্টারলী"-র একটি বিশেষ সংখ্যায় ডাঃ হারী জন নেলি শাখ্স্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"She writes with a careful raftsmanship of a Holderlin, Novalis, or Rilke. There is some-hing age-old and timeless about her language, an exquisite German replete with images drawn from Jewish mysticism, particu-larly Chassidism. From volume after volume published since the end of the war, Nelly Sachs emerges as the poetess par excellence of the holocaust, and writing long after the end of the German-Jewish symbiosis she seems to disprove the dictum that after Auschwitz it is no longer possible to write a poem."

গত বৎসর জার্মানীর পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা নেলি শাখ্স্কে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে "শান্তি পুরস্কারে" সম্মানিত করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, বন্দীশিবিরে তাঁর পরিবারের অনেকেই একদিন মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি বর্তমান জার্মান নাগরিকদের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভই মনে পোষণ করেন না। বর্তমান জার্মানীর ভাবী বংশধরদের ওপর তিনি সম্পূর্ণ আস্থাশীল।

রচনাবলী

১। স্যামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন্। [হিব্রু-ভাষায়]

Agunot, '1909; Vehaya Heakov Lemishor, 1912; Mahmat Hamatzik, 1919; Giv'at Hahol, 1919; Besod yesharim; At kapot Haman'ul; Poiln; Hanidah, 1926; Hakhnasat kalah, 1937; Orsah Nata Lalun, 1937; Elu Vaelu; Meaz umeata; Beshuva uvenahat; Sippur pashut; Tmol Shilshom, 1950; Samukh Venir'eh; Ad Hena, 1953; Sippurei Ahavim.

অনুবাদ—ইংরেজী

The Bridal Canopy, 1937; The Heart of the Seas, 1948; Days of Awe, 1948, Hemda, 1952; Two Tales, 1966.

২। নেলি শাখ্স্ :—(জার্মান ভাষায়)

In den wohnungen des Todes, '947; Sternverdunkelung, 1949; Und niemand weis weiter, 1957; Zu Ehun, 1961; Fahst ins staublose, 1961.

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—সমাজবাদের পথেই ভারতের অগ্রগতি সম্ভব।

—"তাতো বটেই। কিন্তু সেই পথে **রেড লাইট আর** নো-এনট্রিরও যে অন্ত নেই, **সেইতো ভয়**"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বিজয়ার পর আত্মীয়-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীদের (সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে **অনুগ্রাহক** এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের) শুভেচ্ছা **জ্ঞাপন একটি** চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু **আমরা** আমাদের অ-শুভানুধ্যায়ীদের **সকলের** আগে বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা **জ্ঞাপন করিতেছি**। ব্যক্তিগত কলহ **আমাদের কাহারও** সঙ্গেই নাই, এক ট্রাম-**বাসের প্রবেশপথ** বা সীট দখলের ব্যাপার **ছাড়া**—তবু রঙ্গপরিহাসচ্ছলে কাহারও **সম্পর্কে** বিরূপ সমালোচনা করিয়া আমরা **হয়ত তাঁহাদিগকে** আমাদের অশুভানুধ্যায়ী **হইবার** সুযোগ দিয়াছি। আজ সেই কথা **মনে করিয়া** তাঁহাদিগকেই আন্তরিক প্রীতি-**সম্ভাষণ জানাইতেছি**। সারা বছরের গালা-**গালি আজ** গলাগলিতে রূপান্তরিত হউক।

পঞ্জিকাকার বলিতেছেন, দেবীর গজে গমন, **ফলং** শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। **শ্যামলাল বলিল** (তার সিদ্ধির ধকল তখনো **কাটে** নাই)?—"বসুন্ধরা কতটা শস্যপূর্ণা **হবেন** তার খতিয়ান এখনো নেওয়া হয়নি, **কিন্তু** গজে গমনের ফলে ট্রাম শূন্য **কলিকাতার লক্ষণ** ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে !!"

যোজনা কমিশনের সমীক্ষায় প্রকাশ কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ শোচনীয়ভাবে **অক্ষমতার পরিচয়** দিয়াছে—"নূতন কথা নয়, রামপ্রসাদ বহু আগেই গেয়ে গেছেন—মন তুমি কৃষি কাজ জান না; **অবশ্য** সেটা মনের জমিনের কথা, কিন্তু মাঠের জমিতেও আরো খাটে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শিক্ষাকালে ছাত্ররা যাহাতে কিছু উপার্জন করিতে পারে সেই ব্যবস্থা চালু করার জন্য নাকি চিন্তা করা হইতেছে। বিশু **খুড়ো** বলিলেন—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু ভাবছি, উপার্জনের ক্ষেত্রে মাগ্গি ভাতার দাবি কিংবা শিক্ষা-শেষে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে মিছিল হবে না তো!!"

রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেলদের কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন : উপাচার্যদের ম্যাজিস্ট্রেটের **ক্ষমতা** দিতে হইবে। সহযাত্রী বলিলেন "সে তো বুঝলাম, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটদের ঘেরাও থেকে বাঁচবার **ক্ষমতা** কার হাতে থাকবে সেইটেই তো প্রশ্ন!!"

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন তাঁর এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বাঙালীকে **শক্ত** হইতে হইবে। আমাদের অন্য এক **সহযাত্রী** বলিলেন—"সেইজন্যেই

তো কাঁচকলা ভক্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের এত নালিশ!!"

কলিকাতায় খুব বেশি ধূমের উৎপাতে নাকি নানা রোগ দেখা দিয়াছে, তার মধ্যে প্রধান হলো দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ। —"শুধু ধূম নয়, ধূমধামের উৎপাতও কিন্তু এই শহরে বড় **কম** হয় না"—বলেন সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, আগামী সাধারণ নির্বাচনে **উত্তর** বোম্বাই নির্বাচন কেন্দ্র **হইতে** যাহাতে **শ্রীকৃষ্ণ** মেননকে কংগ্রেস **প্রার্থীরূপে নির্বাচন** করা হয় তাহার জন্য **চিত্রতারকারা** নাকি সহায় করিবেন। **সহযাত্রী** বলিলেন—"ওঁরা সহায় করলেন, তাঁদের মধ্যে চিত্রাভিনেত্রী দু' একজনের নাম দেখলাম, চিত্রাভিনেত্রীদের

নয়। সেটা হলে **ব্যাপারের কৃষ্ণ-প্রীতির** ঐতিহ্য রক্ষিতেও **বজায় থাকত**!!"

এক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের কোন এক সরকারী মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন যে, দিল্লী মাথা পাতেনা না দিলে পশ্চিমবঙ্গকে পাকাটা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সেটা কবে কীভাবে হইবে এই প্রশ্ন সহযাত্রীরা করিলে জনৈক সহযাত্রী একটি গল্প শুনাইলেন : কোন একটি বারে বসে ভদ্রলোক বন্দের খুব চেঁচামেচি শুরু করে দেন এবং তাতে উপস্থিত অন্যান্যদের খুবই অসুবিধে হয়। বারের ম্যানেজার এসে উক্ত ব্যক্তিকে বললেন : আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এই সময়ের মধ্যে আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোকের চেহারা ছিল দৈত্যের মতো, যেমন লম্বা তেমনি মোটা। সে রাগে ফেটে পড়ে ম্যানেজারকে বললে, আমি যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে না যাই, তুমি কী করতে পার। ম্যানেজার তার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল, বললে, সেক্ষেত্রে আমি সময়-সীমা আরো বাড়িয়ে দেবো।" গল্পের মোরালটি পাঠককেই উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

মাদাম টিটো দিল্লীতে পুতুল-মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, নানা দেশের পুতুলের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া মাদাম খুব আনন্দিত হন এবং বলেন—এমন সুন্দর পুতুলের সমাবেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। শ্যামলাল বলিল—"আছে, রাষ্ট্রপুঞ্জে !!"

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন : আমরা **প্রমাণ** করিয়া দিয়াছি যে, বিপদের মুখে আমরা **এক** হইতে পারি। **জনৈক** সহযাত্রী বলিলেন—"নির্বাচনের মুখে যে অন্য অনেকে এক হতে পারেন **সেই প্রমাণ** পাওয়া গিয়েছে !!"

বিদেশী প্রতিনিধিদের সংগে হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মী। মধ্যে উপবিষ্ট শ্রীমতী দেবদাস
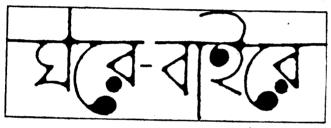
সেই আলিপুর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবনিযুক্ত নায়েব নাজিম মীরজাফর আলি খান-এর নামে তার নাকি নামকরণ হয়েছিল। আলিপুরের হেস্টিংস হাউস। ওয়ারেন হেস্টিংস যে বাড়ি তুলেছিলেন প্রেয়সীর জন্য। তাঁর "Beloved Marian"-এর রম্য হর্ম্য সে যুগের ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেছে জাকজমক আর চমৎকারিত্বের। তারই বিশাল উদ্যানের এক অংশে আজ স্থাপিত হয়েছে বিহারীলাল কলেজ অফ হোম অ্যাণ্ড সোস্যাল সায়েন্স। বেলভেডিয়রে লাইব্রেরী হওয়া নিয়ে নাকি কোন কাগজে টিপ্পনী হয়েছিল যে, প্রেমের দেবতা কিউপিড জ্ঞানের দেবী মিনার্ভাকে পথ ছেড়ে দিয়েছেন। এ-বাড়ি সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশী প্রযোজ্য!

বিহারীলাল কলেজে এবার হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার অষ্টম অধিবেশন হ'য়ে গেল ৪ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। সভাপতিত্ব করলেন ডাঃ রাজাম্মল দেবদাস। হোম সায়েন্স বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে শ্রীমতী দেবদাস ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্মীদের একজন। বর্তমানে তিনি কোয়েম্বাটোরে শ্রীঅবিনাশীলিঙ্গাম হোম সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষা। রাজাম্মল দেবদাস আন্তর্জাতিক গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট।

অ্যাসোসিয়েশনের মূল অফিস নূতন দিল্লির লেডী আরউইন কলেজে। ১৯৫২ সালে অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন হয় এবং উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—এই চারটি আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত হয়ে কাজকর্ম চলছে। পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান শ্রীমতী মমতা অধিকারী। মমতা অধিকারী বিহারীলাল কলেজের অধ্যক্ষা।

পশ্চিম বাংলায় সমিতির অধিবেশন এই প্রথমবার হ'ল। এবারের সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "The role of Home Science in National Integration and Development" জাতীয় সংহতি ও উন্নতিতে গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা। সেমিনারে আলাপ-আলোচনার জন্য গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দিক-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। বিদেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন। আটটি বিষয় বিশদভাবে বিচার করা হয়: (১) পল্লী উন্নয়নে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে হোম সায়েন্স, (৩) শিশুর ক্রমবিকাশ, (৪) জাতীয় অগ্রগতিতে পুষ্টির স্থান, (৫) বাসগৃহ, (৬) উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া দেশে ক্রেতা বা ভোক্তার (Consumer) ভূমিকা, (৭) বস্ত্রশিল্প, (৮) পারিবারিক জীবন।

হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিবর্জিত প্রতিষ্ঠান। মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, আশ্রয়, পরিচ্ছদ এবং শিক্ষা। সাধারণ নাগরিকের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবকিছুর ভিত্তি এই মৌলিক প্রয়োজনগুলিকে ঘিরে। কাজেই গৃহবিজ্ঞান যে-কোন পর্যায়ে কার্যকর এবং উপযোগী শিক্ষা। চিরকাল মানুষ পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই তার সুখের নীড় রচনা করতে চেয়েছে, তবে সভ্যতার অগ্রগতি আমরা যাকে বলি, তার সংগে সংগে নানা জটিলতাময় ও সমস্যাবহুল হ'য়ে উঠেছে স্বাভাবিক জীবন। তাই আজকের ঘরণীকে পথ খুঁজে নিতে হবে, জানতে হবে কেমন করে ঘর-সংসার ও সমাজকে সে সুন্দর করে তুলতে পারে। যে-কোন মহিলা সার্থক সংসার গড়তে চান, তিনিই এই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিতে পারেন। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার, পুষ্টির নানা তথ্য, ঘরকন্না, গৃহস্থালির আধুনিক উপকরণ ও উন্নত মান সবকিছুই যাতে দেশের মেয়েদের দরজায় পৌঁছোতে পারে, তার চেষ্টাই সমিতি করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দ্বিতীয় বছরে সর্বভারতীয় সভা আহ্বান করা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরাও আসেন দিতে আর নিতে। বিশেষজ্ঞরা এসে তাঁদের প্রায়োগিক বিদ্যা বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য পেশ করে যান।

এবারকার কনফারেন্সে বিশেষ বক্তা হিসাবে এসেছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিখ্যাত অর্থনৈতিক ডঃ ভি কে আর ভি রাও। তিনি সেমিনার বা বিতর্ক সভার উদ্বোধন করেন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহবিজ্ঞানীর দায়িত্ব কি, সে সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন ডঃ রাও। তাঁর ভাষণে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন যে, বিরাট অর্থবিনিয়োগ মেয়েদের কলেজী শিক্ষায়

হচ্ছে তার কতটা ফল আমাদের সামাজিক উন্নতিতে দেখা যাচ্ছে, ভাববার বিষয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েরা আজও ছেলেদের তুলনায় অতি অল্প-সংখ্যক আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে গত ১০।১২ বছরে এক অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। কলেজ শিক্ষায় প্রতি ছাত্রীর বছরে অন্তত ৪০০ টাকা খরচ হয়। চার বছর যদি শিক্ষা-সময় ধরা হয়, তবে গড়ে অন্তত ১৬০০ টাকা দাঁড়ায়। দেশে যদি পাঁচ বা ছয় লাখ মেয়ে কলেজী শিক্ষায় এই টাকা খরচ করে, তবে কত দাঁড়ায়, ভেবে দেখুন। অথচ বৃত্তিমূলক বা Professional শিক্ষা সমাপনান্তেও বহু মেয়ে কার্যকরী ব্যবহার তাঁদের অধীত বিদ্যার করেন না। জাতীয় অপচয় হিসাবে নেহাত উপেক্ষা করার মত ব্যাপার মোটেই নয়।

শিক্ষিত মেয়ের দায়িত্ব অনেক। যে শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ না হ'লে তার সার্থকতা থাকে না। এখানেই গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের গুরুত্ব। উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে যদি উন্নততর ঘরকরনা, সমাজ কল্যাণ, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির কিছু জ্ঞান তাঁদের হয়, তবে বিবাহিত জীবনে যাঁদের উপার্জনের জন্য অনেক সময় দেবার সুযোগ নেই বা প্রয়োজন নেই, তাঁরা অবৈতনিক সমাজ কল্যাণের বহু কাজ করতে পারেন। এই স্বেচ্ছাসেবা ব্যক্তিগত-ভাবে পারিবারিক অর্থনিয়োগ এবং সামাজিক ও সরকারী ব্যয়ের সার্থকতা আনবে নানাভাবে। দেশকে বড় করতে হ'লে সুস্থ শরীর ও মনের মানুষ গড়ার কাজ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সে-দায়িত্বের কিছুটা সহজেই মেয়েরা, বিশেষত শিক্ষিত মেয়েরা নিতে পারেন।

তিনি একটি উদাহরণে বলেন যে, এডুকেশন কমিশন ছয় বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তার আগে শিশুরা কি করবে? যে-সব শিশুদের পিতামাতা বা অভিভাবক তাদের কোনও সুযোগ দিতে পারবে না, তাদের এই গঠনমূলক বছর কটা কি হবে? শিক্ষিত মহিলা, যাঁদের উপার্জনের প্রয়োজন বড় নয়, বা অর্থকরী উপার্জনে সময় দেন না, তাঁরা দরিদ্র সংসারের শিশুদের তত্ত্বাবধান করলে দেশের কত উপকার হয়, তার সীমা নেই। সম্পূর্ণ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মত দেশে শত শত কোটি টাকার প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর জন্য আছে মাত্র দু-তিন কোটি টাকা। একা একটি মেয়ে না হ'য়ে পাড়ায় পাড়ায়, দু-চারজন একত্র হয়েও তো কাজ করতে পারেন।

ডঃ ভি কে আর ভি রাও ভাষণ দিচ্ছেন

একইভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে, অল্প খরচায় চা-জলখাবারের আয়োজন ব্যবস্থা সাধারণের জন্য সংগঠন করে সমাজের মস্ত অভাবের অনেকটা পূরণ করতে পারেন। দেশে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হয়েছে এবং কত মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, হিসেব না করেও বলা যায় যে, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-পড়া মেয়ে অনেক নয়। কাজেই হোম সায়েন্স-এর উন্নত মানের শিক্ষা বাদেও অল্প সময়ের মোটামুটি শিক্ষার প্রচলন দরকার। এই সংক্ষিপ্ত শিক্ষার জন্য পদার্থ বা রসায়নবিদ্যার অনেকটা দরকার নেই। সামান্য অর্থনীতি, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ধারণা দিয়েই কাজ চলবে। অপচয় বন্ধ করা, পুষ্টিমান নির্ধারণ করা ইত্যাদি জানা দরকার। অল্প আয়ের সংসারে কি করে দৈনন্দিন জীবনে হেরফের আনা যায় তাই হওয়া উচিত প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত রাও মনে করেন যে, স্কুলেও শিশু এবং বালক-বালিকার খাদ্য-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক পুষ্টির প্রয়োগের জন্য প্রত্যেক হোম সায়েণ্টিস্টের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। প্রয়োজন হ'লে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবেন, "আমরা হোম সায়েণ্টিস্ট। পরিকল্পনায় সাহায্য করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রীরা এবং উচ্চপদস্থ অধিকারীরা আমাদের সুযোগ করে দিন।"

শ্রীরাও-এর ভাষণটি এত ভাল লেগেছিল যে, অনেকটাই তাঁর ভাষণ আলোচনা করে ফেললাম। বিহারীলাল কলেজের কথা বারান্তরে বিশেষভাবে বলবার ইচ্ছা রইল। বাগবাজারের বিত্তবান বিহারীলালের প্রচুর [illegible] কলেজ। এমনকি, ৫ নম্বর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের বাড়িখানা (যেখানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ) তিনি কলেজকে দান করেছেন। তার আয় থেকে কলেজের বিশেষ সাহায্য হয়। মাত্র ছ'টি মেয়ে নিয়ে শ্রীমতী মমতা অধিকারী বছর কয়েক আগে হোম সায়েন্স কলেজ আরম্ভ করেন। আজ প্রবেশ-প্রার্থীকে বিমুখ করতে হয় দলে দলে। জিজ্ঞাসা করলাম হোম অ্যাণ্ড সোস্যাল সায়েন্স নাম কেন হয়েছে। শ্রীমতী অধিকারী বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজের সূত্রপাতের সময় হয়তো পরি-কল্পনা একটা ছিল, আলাদা করে সোস্যাল সায়েন্সকে অধীতব্য বিষয় করবার। তা আর হয়নি, কিন্তু নামটা হয়েছে। মমতা অধিকারী নিজে সোস্যাল সায়েন্সের ছাত্রী ছিলেন। শিশু অপরাধ-তত্ত্ব তাঁর বিশেষ বিষয়। শিশু অপরাধীদের বিচারের ম্যাজিস্ট্রেট তিনি।

বিহারীলাল কলেজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে একটি উৎপাদন কেন্দ্র বা প্রোডাকশন সেণ্টারও হয়েছে। ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজে হোম সায়েন্স-এর অনার্স পড়বার আয়োজন হয়েছে। শ্রীমতী অধিকারী বলছিলেন, গৃহিণীদের জন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করবার একটা পরিকল্পনা আছে।

কলেজের শিক্ষা যে কেবল কেতাবী নয়, তার প্রমাণও শ্রীমতী অধিকারীর কর্মীদল দিয়েছেন। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি দলকেও সয়াবিনের রসগোল্লা আর বাগানের কাঁচকলার পান্তুয়া দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন! কলেজ সংলগ্ন সমবায় ক্যাণ্টিনে অল্প খরচে পুষ্টি পরিবেশনের নিত্য নূতন আয়োজন চলছে। খাদ্য মূল্য ভিটামিন, ক্যালরির ব্যবহারিক প্রয়োগের হাতেখড়িও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী অধিকারীকে একটি প্রশ্ন না কর[illegible] পারলাম না। এত বুদ্ধিদীপ্ত ঝলমলে মেয়ের দল যে আসছে, তাদের উদ্দেশ্য কি সংসারে শ্রীবৃদ্ধি করা না জীবিকার সন্ধান করা? উত্তরে তিনি বললেন, মেয়েরা কেউ বা আসে জীবিকার বৃত্তি হিসাবে হো[illegible] সায়েন্স শিক্ষার জন্য, কেউ বা আসে সার্থ[illegible] গৃহিণী হতে। তবে বিলাসিতা দুটি[illegible] একটিও নয়। হোম সায়েন্স কোর্স রীতি[illegible] মত শক্ত পাঠ। এ-পাঠের জন্য ধন[illegible] সংসারের শখের খেয়াল মেটানোর উদ্দেশে আসা সম্ভব নয়। অথচ অল্প দিন আগে এ সম্বন্ধে সমাজে ভ্রান্ত ধারণা ছিল[illegible] কাপড়ে ছাপা থেকে নিয়ে নার্সারি স্কু[illegible] কেমন করে চালাতে হয়, শিখতে হ[illegible] স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে। অবহেল[illegible] অবসর আশা করে তাই কেউ আসে না।

—শ্রীমন্ত

জীবনী

বিপ্লবী পুলিন দাস—ভবতোষ রায়। গীতা পাবলিশার্স—৪৭ কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৫·২৫ পয়সা।

পুলিনবাবুর আত্মকথা অবলম্বন করে শ্রীভবতোষ রায়ের সম্পাদনায় আলোচ্য পুস্তকখানি রচিত হয়েছে। পুলিন দাস পূর্ব বাংলার লোনসিং গ্রামে এক নিম্নবিত্ত ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কলকাতার ব্যারিস্টার পি মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, বরীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সংস্পর্শ লাভ করেন এবং পি মিত্রের কাছেই অনুশীলন ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুলিন দাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে অচিরেই পূর্ব বাংলায় অনুশীলন সমিতি খ্যাতি লাভ করে। কালক্রমে এই অনুশীলন সমিতি বৈপ্লবিক দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। রাউলাট কমিটির একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"A few handful of East Bengal students made the British Government almost impossible in India."

সমিতির সভ্যগণকে পুলিন দাস লাঠি খেলা, যুযুৎসু, বিদ্যা এবং অস্ত্রচালনা বিদ্যায় হাতে ধরে শিখিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। এ সময়ে তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে সংগঠনের জন্য পুলিন দাসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হতে থাকে। এ সময় কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কিছুদিন মন্টগোমারীর জেলে অন্তরীণাবদ্ধ থাকতে হয়। ফিরে এসে তিনি আবার সমিতির কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে সব বরেণ্য দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, সুরেন ব্যানার্জি, তিলক, মুঞ্জে, খাপার্ড়ে, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মতিলাল নেহরু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। চারদিক থেকে এই উদ্দীপনা এবং সাহচর্য লাভ করে পুলিন দাসের নেতৃত্বে যখন সমিতির কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তখন উদ্বিগ্ন বৃটিশ সরকার পুলিন দাস প্রমুখ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে, ডাকাতি, ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করে দেন। দায়রা আদালতের বিচারে পুলিন দাস যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টের আপীলে দণ্ডের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে সাত বছরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডে পর্যবসিত হয়। আন্দামানের কারাবাস থেকে তিনি যখন ফিরে আসেন, ভারত তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠেছে। বাংলায় সি আর দাস এবং অনুশীলন সমিতি ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক সংস্থা মহাত্মার অসহযোগ নীতি সমর্থন করে। অসহযোগ আন্দোলনে সি আর দাশ ও পুলিন দাসের সমর্থনলাভের আশা করে মহাত্মা মতিলাল নেহরুকে সঙ্গে করে সি আর দাশের বাড়িতে এসে, পুলিন দাস ও সি আর দাশের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সি আর দাশের আংশিক সম্মতি লাভ করেন। মতিলাল নেহরু তখন মহাত্মা গান্ধীকে বলেন, সি আর দাশের যখন সম্মতি পাওয়া গিয়েছে তখন পুলিন দাসকে সহজেই—মহাত্মা গান্ধী বাধা দিয়ে বলেন: "No, no I shall have to crack a harder nut" শেষ পর্যন্ত পুলিন দাস সম্পর্কে নিরাশ হয়ে মহাত্মা ফিরে গেলেন।

শেষ জীবনে পুলিন দাস লাঠি খেলা শিক্ষা দেবার কাজেই ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজে ব্যাপৃত থাকাকালেই তাঁর অনাড়ম্বর জীবনের অবসান ঘটে। গ্রন্থখানি পড়লে একজন লোকের মধ্যে কেমন অদম্য চরিত্রবল, অনমনীয় মনোভাব, অসীম উৎসাহ, অসাধারণ সাহসিকতা, অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের সমাবেশ হতে পারে, তার সম্যক পরিচয় মিলবে।

৪৩৭।৬৫

শারদ সাহিত্য

কম্পাস। সম্পাদক: পান্নালাল দাশগুপ্ত। ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·৫০ পয়সা।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্প এবং কবিতার অভাব এই সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য। যাঁরা এতে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়, কাজি আবদুল ওদুদ, শৈবাল গুপ্ত, অমিতাভ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, পরেশ দে সরকার, সঞ্জয় এবং কমল দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রফুল্ল গুপ্তের 'ভারত কি দুর্ভিক্ষের দেশ' সময়োপযোগী প্রবন্ধ।

সপ্তাহিক। সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র বিশ্বাস। সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বর্ষের এই শারদীয়া সংখ্যাখানি কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতার সমন্বয়ে বেশ উপাদেয় হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, ধনঞ্জয় বৈরাগী, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীকিরণশংকর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রভৃতি। পত্রিকাখানি প্রকাশে শহরতলির সাহিত্যসেবীগণের উদ্যম প্রশংসার্হ।

সপ্তপর্ণ। সম্পাদিকা শ্রীমতী সুনীতি সেন। গৌহাটি। মূল্য ১·০০।

গৌহাটি রবীন্দ্র-পরিষদের দ্বি-ভাষিক ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাখানির প্রবন্ধগুলি শিক্ষাপ্রদ। তা ছাড়া এতে আছে কবিতার ছড়াছড়ি। কয়েকটি গল্প পাঠোপযোগী। লেখকগণের সাহিত্যপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যায়াম চর্চা। পরিচালক শ্রীমতিলাল মণ্ডল। ৮বি ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬।

ব্যায়াম শিক্ষা সম্পর্কে বহু চিত্র সম্বলিত আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানি ব্যায়াম-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশে শরীরচর্চা সম্বন্ধে এরূপ মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকার বহুল প্রচার এবং প্রসার অত্যাবশ্যক।

ছন্দিতা। সম্পাদক শ্রীগৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা ১৮। ৫০ পয়সা।

বহু কবিতা, কয়েকটি প্রবন্ধ, একটি বড় গল্প ও কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি নিয়ে এই শারদীয়া সংখ্যাখানি প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, রত্নতী দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, নচিকেতা ভরদ্বাজ, দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি। পত্রিকাখানি পাঠোপযোগী।

মায়ামঞ্চ। সম্পাদিকা গীতা মুখার্জি। ২১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ১·০০।

ম্যাজিক সংক্রান্ত আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি বাংলা ভাষার পূজা সংখ্যায় একখানি অভিনব সংযোজন। সাধারণ ম্যাজিক সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি ফরমূলা এতে স্থানলাভ করেছে। ম্যাজিক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মনের কিছু খোরাক এতে মিলবে। সংখ্যাখানি তথ্যবহুল।

হোম শিখা। সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসাদ বসু। হোম শিখা কার্যালয়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এই পূজো সংখ্যাখানিতে আছে কয়েকটি মনোরম কবিতা, কিছু তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, ছোট-বড় কয়েকটি গল্প এবং অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি। লেখকগণের মধ্যে আছেন—কুমারেশ ঘোষ, অজিতকৃষ্ণ বসু, বন্দে আলি মিয়া, গোপাল ভৌমিক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, বোম্মানা বিশ্বনাথম, মণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। বহু নবাগত লেখকের রচনাও প্রশংসার দাবি রাখে।

শিক্ষক। সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী। শিক্ষক কার্যালয়, ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। মূল্য ১·০০।

সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা-সম্ভারে পূর্ণ এই শারদীয়া সংখ্যাখানির লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, শ্রীমণি বাগচী, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীরণজিৎকুমার সেন, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি। অন্যান্য লেখকগণের রচনাও প্রণিধানযোগ্য।

জনমত। সম্পাদক : শ্রীরাধারঞ্জন গুপ্ত। পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য শারদ সংকলনখানি প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা এবং কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে সুদূর মফস্বল শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণের সব রচনাই বেশ সুখপাঠ্য। মফস্বলবাসী এইসব সাহিত্যসেবীদের আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

পুনশ্চ। সম্পাদক মৃণাল দত্ত। ৪বি গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলকাতা-২৫। ১·০০।

কবিতার খুব তীক্ষ্ণ একটি শারদ সংকলন। খুব তীক্ষ্ণ এই অর্থে যে কিছু ধারালো কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বাংলা কবিতা এখন যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের সকলেরই রচনা এই সংখ্যায় আছে। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের ওপর আলোচনা সংখ্যাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। কবিদের মধ্যে আছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। সম্পাদক মৃণাল দত্ত সংখ্যাটির জন্য প্রশংসা দাবী করতে পারেন। কিন্তু কোন বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য খুবই খোঁচাটে লাগল।

তন্দ্রা। সম্পাদক : মধুসূদন চৌধুরী ও সুধাংশু ঘোষ।

কবিতা ঘেঁষা পত্রিকা এবং পত্রিকার বয়সও বেশী নয়। শারদ সংখ্যাটি শুধু অনর্গল কবিতায় পরিপূর্ণ। 'বাংলা দেশের হাল আমলের কাব্যপ্রচেষ্টার অনুসন্ধানীদের কাছেই পত্রিকাটির মূল্য।' কবিদের মধ্যে আছেন অশিস সান্যাল, কেতকী কুশারী ডাইসন, নবনীতা সেন, মৃণাল দত্ত, অসিত দত্ত, গণেশ বসু এবং আরও অনেকে।

একক। সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৯৯৬।১ কালীঘাট রোড থেকে প্রকাশিত।

'একক' বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত একটি কবিতা পত্রিকা। তারই শারদ সংকলন এটি। বাংলাদেশের সমস্ত খ্যাতনামা কবি কখনো না কখনো একক-এ লিখেছেন। এখন কবিতার কাগজ অনেক। কবির সংখ্যাও অগণন। কিন্তু কুড়ি বছর কি তারও বেশী আগে সামান্য কয়েকটি কবিতার কাগজের মধ্যে একক-ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান সংকলনে বেশ কিছু নতুন কবি এবং চির-পরিচিত পুরনো কবির একত্র সমাবেশ ঘটেছে। সংখ্যাখানি কবিতাসন্ধানীদের আনন্দিত করবে।

পঞ্চায়েত। সম্পাদক : অজিতকুমার বসু। তারকেশ্বর। মূল্য ১·২৫।

একটি উপন্যাস, পাঁচটি গল্প ছাড়া কবিতা ও প্রবন্ধের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাখানি। লেখক তালিকায় বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর রায়, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল ওদুদ, সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, ডঃ রমা-মনোহর লোহিয়া, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সাহানা। সম্পাদক : শ্রীগোপেন লাহিড়ী। ২৫।১ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫। মূল্য ২·০০।

খ্যাতনামা ও স্বল্প পরিচিত লেখকদের রচনা নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকাখানির শারদীয়া সংখ্যাটির কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কয়েকটি সুখপাঠ্য গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এতে পাওয়া যায়। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, কুমারেশ ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, অগ্নি মিত্র, ডঃ অমিয়-কুমার হাটি, ডঃ নরেশ জানা, ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী প্রভৃতি।

ঢেউ। সম্পাদক : অজিত রায় ও গৌরাঙ্গ ভৌমিক। ৫-বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ১·০০।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক পত্রিকার শারদ সংকলনটি সুখ্যাত স্বল্প পরিচিত লেখকদের রচনা নিয়ে প্রকাশিত। সংখ্যাখানি সাহিত্য-রুচির পরিচয় দেয়। প্রকৃত সাহিত্য রসিক-দের কাছে সমাদর লাভ করবে।

হংস বলাকা। সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ সেন। ১৬।২ এইচ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা ১৯। মূল্য ২·৫০।

পরিচয়-বিজ্ঞপ্তিতে শতাব্দীপ্রাচীন বাংলা মাসিক বলে উল্লেখিত। লেখক তালিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মন্মথ রায়, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, দীনেশ দাস, শৈলেশ দে, আশা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র সূত্রে খ্যাত জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, সরোজ সেনগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা দ্বারা সংখ্যাখানি আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হয়েছে। তবে 'অভিনবত্ব' বলতে কিছু লক্ষ করা গেল না।

ছুটির সানাই। সম্পাদনা : সুজিতকুমার নাগ। পম্পা পাবলিসিটি—৪৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

শারদীয়া উপলক্ষে ছোটদের জন্য যা প্রকাশিত হয়েছে তারমধ্যে আলোচ্য বইখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছুটিকে আনন্দে ভরিয়ে তোলার মতই ছোট গল্পের সম্ভার। বাইশটি গল্প লিখেছেন বাইশজন কথাশিল্পী যাঁদের প্রায় সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুখ্যাত।

বিচিত্রা। সম্পাদক : নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা, জীবন ভৌমিক। ৭এ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০।

'শিল্প সাহিত্য ও সমালোচনা পত্র' বলে ঘোষিত আলোচ্য ত্রৈমাসিকখানি নামের দিক থেকে সার্থক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনাতে একটা বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। এ সংখ্যার একটি সম্পদ হল বিভূতীভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের দিনলিপি। সাহিত্য ও শিল্প রসিকদের কাছে পত্রিকাখানি সমাদৃত হবে।

এমকোজ'র 'উত্তরপুরুষ' (পরিচালনা : চিত্রকর) ছবিতে সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার ও বসন্ত চৌধুরী—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে
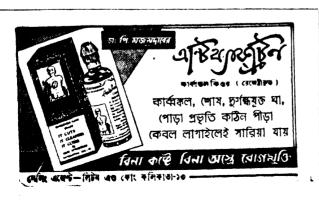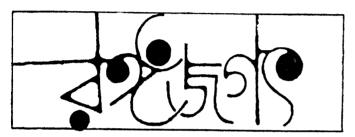
আর্টিস্টস ট্রাস্ট

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক প্রস্তাবিত 'আর্টিস্টস ট্রাস্ট' এবং 'প্রোডাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' কীভাবে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে একটি বিশদ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নিকট পেশ করেছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এ সম্পর্কে স্থানীয় আর্টিস্টস গিল্ড-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সরকারী মহল মনে করেন, আর্টিস্টস ট্রাস্ট এবং প্রোডাকশন ফান্ড গঠিত হলে চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণই হবে। ট্রাস্ট ফান্ড-এর প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ইনকাম ট্যাক্স আইনের কিছু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় হতে পারে। কারণ, শিল্পী ও কলাকুশলীরা ট্রাস্টে তাঁদের যে উদ্বৃত্ত আয় জমা দেবেন তা আয়কর আইনের আওতায় না পড়বারই কথা। তাঁরা দশ কিংবা পনেরো বছর পর মাসিক অথবা বার্ষিক কিস্তিতে টাকা তুলতে পারবেন। সে টাকা তাঁরা তুলবেন তার উপর অবশ্য আয়কর ধার্য করা হবে। শিল্পী ও কলা-কুশলীরা সাধারণত ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার কথা ভেবেই মোটা পারিশ্রমিক দাবি করেন। ট্রাস্ট গঠিত হলে তাঁরা এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। এবং প্রকৃত আয় গোপন রাখার প্রচেষ্টাও হ্রাস পাবে বলে সরকার মনে করেন।

প্রোডাকশন ও ডেভেলপমেন্ট ফান্ড [illegible] দুটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন। একটি ব্রিটিশ অপরটি সুইডিশ পরিকল্পনা। অর্থাৎ ওই দুই দেশে এই জাতীয় তহবিল যেভাবে গঠন করা হয়েছে তার কার্যকারিতা সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। এই পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য : কাহিনী অথবা শিশুচিত্র নির্মাতাদের অর্থ সাহায্য কিংবা ঋণদান, শিল্পী ও কলাকুশলীদের শিক্ষাদান, সিনেমা তৈরি, ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের প্রসার ইত্যাদি।

চিত্র-সমালোচনা

ফুল অওর পত্থর

একটির পর একটি হিন্দী চিত্র যদি সম্প্রতি আপনার মন বিষিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আপনি ও পি রলহনের "ফুল অওর পত্থর" দেখুন। যতটুকু বঞ্চিত হয়েছেন তার চেয়ে বেশি উসুল করে নিতে পারবেন। অসামান্য কোন বিষয়বস্তু আপনি ছবিতে পাবেন না। ফুলের মত নরম, পবিত্র মন নিয়ে যারা জন্মায়, তারাই আবার সমাজের অবিচার ও অবহেলায় একদিন পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠে। পাপের পথ বেছে নেয়। আবার প্রেমের স্পর্শে তারও রূপান্তর ঘটে। এই ছবির ক্রিমিন্যাল-এর জীবনে এসেছে এক বিধবা নারী। এখানেই হয়ত, তথাকথিত হিন্দীচিত্রের বিচারে, কাহিনীর নতুনত্ব। নতুবা ছবির আর সব ঘটনায় চিরাচরিত

[illegible]

ছবির পর ছবি

পরিচালক পীযূষ বসুর নতুন ছবির নাম "অসামাজিক"। কেডি পিকচার্স-এর এই প্রথম ছবির চিত্রনাট্য অসামাজিক পরিচালক শ্রীবসু নিজেই রচনা করেছেন। সম্প্রতি অসামাজিক-এর নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হয়েছে। অরুণ মুখোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। ওস্তাদ বাহাদুর খান সংগীত পরিচালক।

রূপছায়া চিত্রের "খেয়া"র ইনডোর শুটিং শেষ হয়েছে। নীতা সেনের গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রথম পর্যায়ের খেয়া শুটিং-এ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অনুপকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হারাধন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি। নভেম্বর মাসের প্রথমে ছবির আউটডোর শুটিং আরম্ভ হবে। প্রযোজক-সুরকার শ্যামল মিত্র ইতিপূর্বে ছবির গান রেকর্ড করেছেন।

'ফুল অওর পথ্থর'-এর নায়ক-নায়িকা ধর্মেন্দ্র ও মীনাকুমারী গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন—ছবির মুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিসম্মেলনে ফ্যানদের (কোন্ ছিদ্রপথে তাঁরা প্রবেশাধিকার পেলেন কে জানে) ভিড় ও অপ্রীতিকর আচরণের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথে ধর্মেন্দ্রকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন মীনাকুমারী

ফটো—দেশ

পাদপ্রদীপের আলোয়

অভ্যুদয়ের "নাম নেই"

অধুনা শৌখিন মঞ্চে কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমাদের অবাক করেছে। অভ্যুদয়-গোষ্ঠীর "নাম নেই" দেখে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

সত্যি বলতে কী, "নাম নেই" দেখে এত পাব আশা করিনি। হয়ত অভ্যুদয়-গোষ্ঠী এবং নাট্যকার ও প্রয়োগকর্তা কিরণ মৈত্র দ্বিধান্বিত মনেই নাটকটি উপহার দিয়েছিলেন। তাই "নাম নেই"-এর উপর দৃষ্টি পড়েনি। নাটকটি দেখলাম, অভিভূত হলাম। শৌখিন নাট্যাভিনয়ে যাঁরা আজ অগ্রগণ্য, অভ্যুদয়-দল সগৌরবে গিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারেন। নাটকের নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যাঁরা অভিনন্দিত, কিরণ মৈত্রের আসন তাঁদের মাঝখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

নতুন ধরনের, আঙ্গিকে "নাম নেই" উপস্থাপিত। এক পেশাদারী মঞ্চের নাট্যপরিচালক ও শিল্পীদের নিয়ে এই নাটক। পরিচালকের স্বপ্নদর্শনই নাট্যবস্তু—যাতে তার সহকর্মীরা এক একটি চরিত্রে রূপান্তরিত। তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রই যেন (অভিনীত জীবনের সঙ্গে যার মিল নেই) পরিচালকের স্বপ্নে ধরা দিয়েছে। তার নিজের জীবনের ঘটনাও প্রকাশ পেয়েছে। সেটাই নাটক, বাস্তব নাটক। ঘটনার পরিণাম যখন দেখা দিয়েছে, তখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। কৃতকর্মের জন্য আইনের চোখে সে অপরাধী। বাস্তব ও কল্পনা, রিয়ালিটি ও ফ্যান্টাসির মেলবন্ধন ঘটেছে এই নাটকে। নাট্যকার এ-যুগের প্রেমহীনতাই দেখাতে চেয়েছেন তাঁর নাটকে। [illegible]

"বালিকা বধূ"-র প্রযোজক-পরিচালক তরুণ মজুমদার (বাঁ-দিক থেকে দ্বিতীয়) মানা-[illegible] এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানান, "বালিকা বধূ" যেখান—ছবিতে সন্ধ্যা [illegible]

[illegible]

প্রেমের স্বীকৃতি তাঁর নাটকে সামান্য। আদর্শহীনতাই শুধু বিশদভাবে দেখাবার অর্থ কি?—এই প্রশ্ন দর্শকের মনে জাগতে পারে। এবং নাট্যকার-পরিচালক তাঁর বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতাও (চরিত্রদের সংলাপে) স্বচ্ছন্দে বর্জন করতে পারেন। নাটকের বিষয়বস্তু এমনিতে গভীর নয়, পাত্রপাত্রীদের উপর জীবনের জটিল ছায়া এসে পড়েনি। তাদের অভিলাষ ও বিড়ম্বনা, এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় নাটকীয় স্বাদ নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু এর অনিবার্য উপভোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। এবং যা মুগ্ধ করে, তা হল কিরণ মৈত্রর প্রয়োগ-কল্পনা। জোনাল লাইট-এর সাহায্য তিনি নিয়েছেন। একই শিল্পীকে দিয়ে আলো-আঁধারের অবকাশে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিয়েছেন। 'ফ্রিজ' বা চিত্রার্পিত নাট্যমুহূর্ত এবং ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মত বিন্যাস তো আছেই। তার চেয়ে সুন্দর, মঞ্চেই আবহ-সংগীতের ব্যবহার। এক কথায় "নাম নেই" আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। অথচ নাটকের রস বিন্দুমাত্র ক্ষয় পায়নি, গতি ব্যাহত হয়নি।

শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় দর্শককে যেন আরও বেশী মুগ্ধ করে। এঁদের মধ্যে কে কার চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন বলা কঠিন। এঁরা হলেন শঙ্কর পাল, মনোরঞ্জন সোম, পরিমল দত্ত, আশীষ মুখোপাধ্যায়, জীবন গুপ্ত, বিজন চক্রবর্তী, শান্ত সান্যাল ও মানবেন্দ্র গুহ। অভিনেত্রী একজনই। তিনি অলকা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। সৌখিন মঞ্চে এত ভাল অভিনয় বেশী দেখিনি।

চতুর্মুখের "সন্দেশ"

চতুর্মুখ-গোষ্ঠীর "সন্দেশ", বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, দর্শককে আনন্দ দেবে। দু'টি ঘণ্টা যাঁরা প্রাণ খুলে হেসে কাটিয়ে দিতে চান তাদের জন্য এই নাটক (সাধন ঘোষ রচিত)। প্রথম দৃশ্য থেকেই নাটক হাস্যরসের বেগে হুহু করে এগিয়ে চলে,

[illegible]গবনের ঝাপটায় দর্শককে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে।

এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এই নাটকের প্রধান পুরুষ। সদ্য-বিধবাকে বিয়ে করার বেশ কিছুকাল পর যখন তিনি জানলেন তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামী বর্তমান তখনই প্রকৃতপক্ষে নাটকের কৌতুকপর্ব জমাট বেঁধেছে। পর পর একাধিক সন্দেশ, মানে সংবাদ তার কাছে এসেছে। শেষের সন্দেশে প্রকাশ, তার স্ত্রীর প্রথম স্বামী বেঁচে নেই। কর্নেলের ভাইঝির প্রেমের ঘটনা নিয়েও নাটকে রঙ্গের বিস্তার। সব মিলিয়ে আবার বলি, নাটকটি প্রতি মুহূর্তে সুখভোগ্য।

নাট্যপরিচালনা (অসীম চক্রবর্তী-কৃত) সুনিপুণ। দর্শক মনোরঞ্জনের চাবিকাঠি শ্রীচক্রবর্তীর হাতে ছিল সন্দেহ নেই। এবং কর্নেল ষষ্ঠীচরণের চরিত্রে চমৎকার কৌতুকাভিনয় করে দর্শকদের খুব হাসিয়েছেন। তবে তাঁর অভিনয়ে কোন কোন মুহূর্তে যেন আতিশয্য এসে গেছে, ইংরেজী সংলাপও অস্পষ্ট হয়েছে। এদিকে তাঁর সচেতন হওয়া দরকার।

অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় নন্দিতা দে, কল্পনা দাস, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, বারীন মুখোপাধ্যায় ও পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় সুঅভিনয় করেছেন।

পরলোকে সুধীশ ঘটক

চলচ্চিত্রকার সুধীশ ঘটক অষ্টমী পূজার দিন (২১ অক্টোবর) পরলোক গমন করেন। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১। লণ্ডনে সিনেমাটোগ্রাফিতে দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করে তিনি ওই দেশেই ১৯৩৪—৩৬ সনে কিছু অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তোলেন। পরে দেশে ফিরে এসে নিউ থিয়েটার্স-এ যোগ দেন। ক্যামেরাম্যান হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। 'স্ট্রিট সিংগার' (হিন্দী), 'সাথী', 'শকুন্তলাই' (তামিল) প্রভৃতি ছবির আলোকচিত্রশিল্পী রূপে তাঁর নাম চলচ্চিত্র মহলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তিনি ভারত-সরকারের "ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড"-এর প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করেন। কিছুকালের জন্য তিনি ফিল্মস ডিভিশনেরও ক্যামেরাম্যান ছিলেন। তিনি "রাধারানী" ও "পঞ্চায়েত" দুখানি চিত্র-

সুধীশ ঘটক

পরিচালনা করেন। সৈনিক, মন্ত্রমুগ্ধ, বৈরথ, প্রভৃতি ছবির আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন। ফটোগ্রাফি বিষয়ে শ্রীঘটকের গবেষণার কথা সুবিদিত। তিনি কয়েক বছর প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসুস্থ হবার আগে তিনি বোম্বাইয়ে বিমল রায় প্রোডাকশন্স-এর তত্ত্বাবধান করতেন। সৎ ও অমায়িক ব্যক্তি হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। চিত্রপরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটক তাঁর অনুজ। শনিবার (নবমী) কেওড়াতলা শ্মশানে শ্রীঘটকের মরদেহের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্রশিল্পলোকের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।

ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব

সম্প্রতি কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতার উদ্যোগে নেদারল্যাণ্ড দূতাবাসের সহযোগিতায় আয়োজিত ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার গুরুত্ব অনুধাবনের আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে ডাচ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মিঃ বি এ নোপার্স ডাচ চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি প্রবীণ চলচ্চিত্রকার শ্রীমধু বসু।

এই উৎসবে নয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার-বিজয়ী চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বার্ট হান্সট্রা কৃত 'এলেমান' বা 'দি হিউম্যান ডাচ'। ১৯৬৪ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি পুরস্কার বিজয়ী এই ছবিটি একটি প্রামাণিক চিত্র।

[illegible] বি সী [illegible]

"[illegible]" (পরিচালনা : দিলীপ নাগ) [illegible]

"আকাশ ছোঁয়া" চিত্রে (পরিচালনা: রাজেন তরফদার) সুপ্রিয়া চৌধুরী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

হারম্যান ভ্যান ডার হর্স্ট নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে হল্যান্ডের ছবি তুলে ধরেছেন। 'এ সানডে অন দি আইল্যান্ড অফ দি গ্রাণ্ডে জ্যাটে' ছবিতে পরিচালক ফ্রান্স ওয়েজ লেখক ও পাঠকের কল্পিত অবস্থাকে রূপ-কথার আশ্চর্য ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। উৎসবের বাকী তিনটি ছবি—হাট্টাম হোডিং কৃত 'সেইলিং', লুই এ ভ্যান গাস্টেরেন কৃত 'দি হাউস' এবং চার্লস নুগেণ্ট ভ্যান ডার শিণ্ডেন পরিচালিত 'দি বিল্ডিং গেম' নেদারল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র অনুশীলনের পরিচায়ক।

সংগীতচক্রের "চিত্রাঙ্গদা"

আগামী ১১ই নভেম্বর সকালে সংগীত-চক্রের উদ্যোগে বসুশ্রীতে কবিগুরুর "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যটি অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একক সংগীত পরিবেশন করবেন এবং চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মুখ্যচরিত্রগুলির জন্য কণ্ঠদান করবেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, সুমিত্রা সেন ও ধীরেন বসু। নৃত্যে থাকবেন রূপশ্রী লাহিড়ী (চিত্রাঙ্গদা) ও অনাদিপ্রসাদ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ধীরেন বসুর। গ্রন্থনায় কাজী সব্যসাচী।

বোম্বাইয়ে বাংলা লোকসংগীত

বেংগলী ক্লাবের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রনাট্য মন্দিরে সম্প্রতি নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং তাঁর লোকভারতীর শিল্পীরা "মলুয়া" গীতিনাট্য এবং লোকসংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বোম্বাইয়ের রসিকজন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচকরা বাংলার লোকসংগীতের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ। "লোক-ভারতী"র "মলুয়া"ও তাঁদের ভাল লেগেছে। বোম্বাইয়ের কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজী কাগজের সমালোচক বলেছেন,

"It is freely acknowledged that just as Bismillah gave concert status to shehnai, so did Nirmalendu to folk songs.

✻

ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে একটি সিনেমা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মস কাউন্সিল-এর রিপোর্টে তা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। গত বারো মাসে ব্রিটেনের সিনেমা হাউসের সংখ্যা ২,০৫৬ থেকে ১,৯৭৫-এ নেমে এসেছে। ১৯৫১ সনে ব্রিটেনের সিনেমার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ছিল। মোট ৪,৫৯৭টি। আর একটি দুশ্চিন্তার কারণ, দর্শকদের সিনেমা দেখার আগ্রহ নাকি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে।
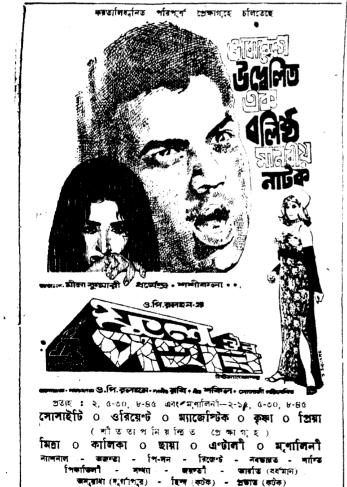
অরণ্যদেব ✲ লী ফক
দীর ধারে -- পাদরি দম্পতির বাড়িতে ---
উঁয়া উঁয়া
!
ঠিক সেই সময়েই বাঘ-শিকারে বেরিয়ে অরণ্যদেব সেইখানে এসে পৌঁছেছেন-
?
!
5/22
পাদরি জেরোমিয়া -- মারা গেছেন ---
চলো, ভিতরে যাওয়া যাক ---
ই আছে এখানে?
— সাড়া দাও।
দুজনেই জ্বরে মারা গেছেন। স্বামী-স্ত্রীকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে যাই।
উঁয়া... উঁয়া...
?

সাপ্তাহিক সংবাদ

যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট টিটো, সংযুক্ত আরব প্রেসিডেন্ট নাসের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে নয়াদিল্লিতে চার দিনব্যাপী আলোচনার পর ২৮ অক্টোবর এই ঐতিহাসিক "ত্রিশীর্ষ সম্মেলন" সমাপ্ত হয় এবং একখানি যুক্ত ইস্তাহার স্বাক্ষরিত হয়। এই ইস্তাহারে বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। যুক্ত ইস্তাহারে নেতৃত্রয় বলেছেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলি সকল রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও কার্যত প্রযুক্ত হওয়া দরকার। তা হলেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা পাবে। এই সম্মেলনে নেতৃবর্গ অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন প্রয়াসে প্রাচ্য দেশগুলির অংশ গ্রহণের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আর উন্নত দেশগুলি বৈষয়িক সাহায্যের শর্তরূপে যে-সব রাজনৈতিক চাপ দেয়, তার বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র অভিমত প্রকাশ করেন। সম্মেলনের তিন প্রধান একথাও বলেন যে, "ভিয়েতনামের যুদ্ধ যাতে সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা এবং উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। জোট নিরপেক্ষ এই ত্রিশীর্ষ সম্মেলন একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্বের দুটি সম্মেলন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

নাসের

টিটো

দেশী সংবাদ

২৪ অক্টোবর—গতকাল রাত্রে মুঙ্গের থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে পূর্বোত্তর রেলপথের লক্ষ্মীসরাই রেল স্টেশনে শোচনীয় দুর্ঘটনার ফলে ৩২ জন যাত্রী নিহত, ৯ জনের বেশী যাত্রী আহত হয়েছেন। প্রকাশ: যাত্রীরা যখন রেলপথে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ২২ ডাউন উত্তর বিহার এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিদ্যুৎগতিতে তাঁদের উপর দিয়ে চলে যায়।

পাটনার এক খবরে প্রকাশ: কোশি নদীতে নিমাসী ঘাটের কাছে গত রবিবার একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা ডুবে যাওয়ায় একশত জন নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নৌকাটিতে ১২৫ জন যাত্রী ছিল। এর মধ্যে ১৫ জনকে তীরবর্তী লোকজন উদ্ধার করেছে।

২৫ অক্টোবর—আজ সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের কাছে সাত বছরের একটি বালক ট্রামে কাটা পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও চারখানি ট্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। একখানি ট্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য পুলিস লাঠি চালায়। গোলমালের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন সরকার সমীপে যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে নাকি মন্ত্রী ও সচিবদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগাদি সম্পর্কে তদন্তের জন্য দুই প্রস্থ কর্তৃপক্ষ নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

২৬ অক্টোবর—যে সব সরকারী অফিসারের মধ্যে "সততার অভাব" দেখা যাবে তাঁদের যাতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো যায়, সে সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এক পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় এই পরিকল্পনার [illegible]।

২৭ অক্টোবর—ছাত্রদের দাবি যতদিন পর্যন্ত পূরণ না হবে, ততদিন অবধি রাজ্যে ছাত্রদের আন্দোলন চলবে—আজ এলাহাবাদে উত্তর প্রদেশের ছাত্র নেতাদের দুদিনব্যাপী সম্মেলনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিকদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বেড়াজাল আছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেন আজ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে তার বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেন। ... বলেন যে, ... উপাচার্য রাজ্য আইন সভার সদস্য। তাঁর মতে এই নীতি ঠিক নয়।

২৮ অক্টোবর—[illegible] মধ্যে যাতায়াতকারী সরকারী পরিবহণের একটি বাস থেকে [illegible] টাকা ডাকাতদের দিনে-দুপুরে চুরির এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে [illegible] থেকে।

আর্থিক সমস্যার দরুন চতুর্থ যোজনায় অর্থবরাদ্দের পরিমাণ অন্তত দু' হাজার কোটি টাকা ছাঁটাই করতে হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের মহল থেকে জানানো হয়েছে যে, আর্থিক সঙ্গতি এতই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে যে, রাজ্যসমূহের অর্থ-বরাদ্দের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা এবং কেন্দ্রে ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে প্রত্যেকের ৫০০ কোটি টাকা করে হ্রাস করতে হচ্ছে।

২৯ অক্টোবর—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও আত্মগোপনকারী নাগা নেতা শ্রীকুগাতো সুখাইয়ের মধ্যে আর এক দফা আলোচনার পর নাগাভূমি সম্পর্কিত বর্তমান পর্যায়ের আলোচনা শেষ হয়। নাগাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের এক্তিয়ারে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অতিরিক্ত কিছু দিতে সম্মত হন না।

ইদানীং সংসদে ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে বারবার বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টির ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে লোকসভার অধ্যক্ষ হুকুম সিং তার স্থায়ী সমাধানের আহ্বান জানিয়ে বলেন—"দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

৩০ অক্টোবর—দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে আজ হাওড়া থেকে মাদ্রাজগামী দু'খানা ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে। ওয়ালটেয়ারের কাছে গোপালপত্তনমে প্রধানত ছাত্রেরা লাইনের উপর বিক্ষোভ প্রদর্শন করার ফলে শনিবার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিশাখাপত্তনমে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবিতে শ্রীঅমৃত রাও অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট করেছেন। ছাত্রেরাও এই দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালাচ্ছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯ অক্টোবর—হোটেল ম্যানিলার সামনে আজ রাত্রে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে পুলিস গুলি চালালে অন্ততপক্ষে ২ জন আহত হয়। ভিয়েতনাম সম্পর্কে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগত প্রেসিডেন্ট জনসন ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এই হোটেলে অবস্থান করছেন।

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ই আজ বলেন, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লড়াইয়ের সংগ্রামে চীন পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়াবে। পিকিং বেতারে প্রচারিত খবরে একথা বলা হয়।

২৫ অক্টোবর—জাকার্তায় বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল আজ গত বছরের ব্যর্থ কম্যুনিস্ট সমর্থিত অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংস্রব থাকার জন্য প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিওকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রাণদণ্ড কার্যকর করার তারিখ স্থির হয়নি।

২৬ অক্টোবর—সায়গনের উচ্চ সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্যদের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জনসন ম্যানিলা থেকে বিমানযোগে আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসেছেন।

২৭ অক্টোবর—পিকিং-এ সোভিয়েট দূতাবাসের বাইরে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ জানিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ চীনের কাছে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এই সব শোভাযাত্রা রুশ-সোভিয়েট-চীনা রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছাকৃতভাবে সংগঠিত করা হচ্ছে।

২৮ অক্টোবর—গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বহু তর্কবিতর্কের পর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে শাসনের জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকাকে প্রদত্ত অধিকার (ম্যানডেট) বাতিল করে ওই দেশটি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাধীনে আনার প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

২৯ অক্টোবর—পূর্ব বাংলার এবারের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত লোকদের জন্য রাওয়ালপিণ্ডির কৃপণ সাহায্য ও ঔদাসীন্যের কঠোর সমালোচনার মুখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব গতকাল থেকে চারদিনের জন্য পূর্ব বাংলা সফর আরম্ভ করেছেন।

৩০ অক্টোবর—১৯ জন সদস্য বিশিষ্ট গিনির একটি প্রতিনিধি দলকে ঘানা সরকার আটক করেন এবং বলেন যে, তাঁর দেশের একশর মত লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিনি আটক করে রেখেছে। তাদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিলে গিনির প্রতিনিধি দলকে ঘানা মুক্তি দিবে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	...	১৮৭
সাহিত্য-সংবাদ—নীললোহিত	...	১৯৩
পুস্তক-পরিচয়—	...	১৯৫
খেলার মাঠে—একলব্য	...	১৯৭
ক্রীড়াকীর্তি—মুকুল	...	২০০
রংগজগৎ—	...	২০১
অরণ্যদেব—	...	২০৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	২০৮

প্রচ্ছদ : শ্রীঅতুল এলেকদান

০ উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থ ০

অদ্বিতীয়া ॥ সুশীল রায় ॥ ৪·০০

দু'হারা ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৭·০০

অমাবস্যার গান ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

ফেরাই ॥ সমরেশ বসু ॥ ৩·০০

বনপলাশির পদাবলী ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ ৮·৫০

গল্প-সংগ্রহ ॥ সরলাবালা সরকার ॥ ৫·০০

মনের মানুষ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

অনাগত ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ২·০০

নট আউট ॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥ ৬·০০

ফুটবলের আইনকানুন ॥ মুকুল দত্ত ॥ ৫·০০

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ৪·০০

চিন্ময় বঙ্গ ॥ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ॥ ৪·০০

বিবেকানন্দ চরিত ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ ৬·০০

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ ২·৫০

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ॥ ৮·০০
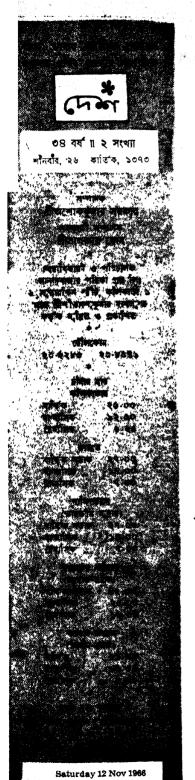
চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর, জে, মিনি ॥ ৫·০০

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ॥ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯

দাবি আদায়

অন্ধ্রটা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে দিল্লির টনক একমাত্র গুঁতোর চোটেই নড়ে। গুঁতোর চোটে বাবা বলা সাধারণের রেওয়াজ, কিন্তু সরকারী বাবাও যে গুঁতোর ভয়ে এতটা দিশেহারা হয় এ হয় তো অনেকের জানা ছিল না। অন্ধ্রে ইস্পাত কারখানার দাবি নিয়ে যে ঘটনা ঘটল তার পরে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, ভারতের যে-কোনো প্রান্তে এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র তো স্পষ্টই বলেছেন, পঞ্চম ইস্পাত কারখানার জন্যে অন্ধ্র যেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তেমনি বস্তারে একটি ইস্পাত কারখানার জন্যে মধ্যপ্রদেশের মানুষও বিক্ষোভ জানাতে পারে। যদি তাই জানায় তবে কি হবে? তিনি অবশ্য মনে করেন না যে, হুমকির কাছে নতি স্বীকার করা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত।

শ্রী মিশ্র যদি মনে করেন করুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি দিল্লির মাথা জায়গামতন নত হয়। মুরুব্বির জোর থাকলে খাতিরে, কখনও রণং দেহি মনোভাবের কাছে, কখনও-বা কুমন্ত্রে সিদ্ধান্ত পালটাতেও আপত্তি থাকে না। তৈল-শোধনাগারের পরিকল্পনাটি কলকাতা এলাকা থেকে আসামে নিয়ে যাবার পিছনে যে মনোভাব কিংবা বিহারের বারাউনিতে দিল্লির কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের ঘটনাকে আমরা ভুলে যেতে পারি না। অন্ধ্রের ঘটনাটা তারই দ্বিতীয় অঙ্ক, যদিও এই অঙ্কে প্রাণহানি, জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি ইত্যাদি যা ঘটেছে তার তুলনা নেই।

প্রশ্ন হল, দেশের বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারে দিল্লি কোন্ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবেন—বিশেষজ্ঞ মহল যা পরামর্শ দেবেন সেই পরামর্শ, অথবা উচ্ছৃঙ্খল জনতা যা দাবি করবে সেই গণ আব্দার? পরিকল্পনা জিনিসটা যে আদপেই হরির লুঠ দেওয়া নয় এ-কথা ভুলে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে তবে কেন এই পরিকল্পনা প্রহসন? মোটামুটিভাবে এ-কথা কে না বোঝে যে, কোথাও কোনো কারখানাই হোক আর তৈল শোধনাগারই হোক, বা বন্দরই হোক তা স্থাপন করার কথা হলে সেটা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতই হয়েছে। আর বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শের পিছনে যা আছে সেটা বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক বিচার বিবেচনা, খেয়াল খুশি নয়। এই বিচার বিবেচনা যে সব সময় ত্রুটিমুক্ত হয় না এমন কথা বলব না, তবে সাধারণত তা হওয়া উচিত নয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যদি হয়, কারখানাটা অমুক জায়গায় করো আর আমাদের যদি তা মনঃপূত না হয় তবে ট্রেন পুড়িয়ে, হাঙ্গামা করে, গুলি খেয়ে মরে, অনশন করে সেই পূর্বের জায়গাটি বদল করিয়ে নিজেদের এলাকায় কারখানা টেনে আনার পিছনে যতটা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা আছে, ঠিক ততটাই মূর্খতা।

আমরা মুখে যতই স্বদেশ-চেতনার কথা বলি না কেন, কাজের বেলায় প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা থেকে বিন্দুমাত্র মুক্ত নয়। সমগ্র দেশ এবং জাতি কিসে লাভবান হবে তার চেয়ে আমাদের লক্ষ আমার প্রদেশ কতটা পেল। অর্থাৎ কোন রাজ্য কতটা আদায় করতে পারছে তার হিসেবেই আমার তুষ্টি। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিটি রাজ্যেরই কিছু দাবি থাকবে, সেটা তার সঙ্গত দাবি। অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও সাধারণ মানুষের জীবিকার জন্যে রাজ্যকে কলকারখানা গড়ে তুলতেই হবে, কিন্তু এই দাবি জানানোর পিছনে যদি অসঙ্গত আব্দার আর জোর জবরদস্তি ভিন্ন অন্য কিছু না থাকে তবে শত কলকারখানা গড়েও দেশের শ্রীবৃদ্ধি কিছু ঘটবে না। লুণ্ঠন ও বণ্টন এক জিনিস নয়।

অন্যান্য রাজ্যে দাবি আদায় নিয়ে যে ধরনের তাণ্ডব দেখি তেমন তাণ্ডব আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক কি করতে পারি? এই যে কলকাতা শহর যেখানে সারা ভারতের লোক এসে তার মধু লুঠে নিয়ে যাচ্ছে সেই শহরের যতগুলি সঙ্গত পরিকল্পনা তার কোন্‌টিতে অন্য রাজ্যের মানুষের সহযোগিতা বা সহানুভূতি রয়েছে? কোন যুক্তিতে দিল্লির কর্তারা কলকাতার প্রতি বছরের পর বছর বিরূপ হয়ে আছেন? কেন এই কলকাতা শহরে মামুলি একটা চক্রবেড় রেলও তৈরি হয় না? কেন শহর কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে দিল্লির হাত ওঠে না? ফরাক্কা, হলদিয়ার ব্যাপারটাও কি কারণে টালবাহানার মধ্যে পড়ে থাকে?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অবশ্য আমরা অন্ধ্রের জনতার মতন হাঙ্গামা করে দিল্লির টনক নড়াতে বলছি না। বিশৃঙ্খলায় আমাদের ভক্তি নেই। তবে দেশের যেমন অবস্থা হয়ে উঠছে তাতে যদি গুঁতোর চোট ভিন্ন কাজ আদায় না হওয়ার অভ্যাস পাকাপাকি ভাবে ধাতস্থ হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যৎ যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাস-এ আগুন লাগানোর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।
'বাংলাদেশ কাল যা ভেবেছিল, সারা ভারত আজ তা-ই ভাবছে।
শুভ সংবাদ!!
বিরোধীদের নির্বাচনী আসন-রক্ষায় ভাঙন।
সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস

সুনন্দর জার্নাল

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে বাংলা দেশে কিছু তৎপরতাও লক্ষ করা গেল। লক্ষণ শুভ, সন্দেহ নেই।

শিশু-মনোরাজ্যে একদা যিনি একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন এবং আজকে যাঁর অধিকাংশ বই-ই দুষ্প্রাপ্য, তাঁর শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমরা বহির্বিশ্বে কর্তব্য পালন করেছি, এ আত্মপ্রসাদটুকুই আজ নিশ্চয় উপভোগ করতে পারি। কিন্তু প্রসঙ্গে সিটি স্কুলের আর একজন শিক্ষক প্রমদাচরণ সেনকে আমাদের মনে পড়বে? —তিনি ভিত্তি রচনা না করলে যোগীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটত কিনা সন্দেহ; মনে পড়বে না 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে—যোগীন্দ্রনাথকে বিকশিত করে তোলবার কাজে যাঁর অনেকখানি ভূমিকা ছিল; মনে পড়বে না সমকালীন ব্রাহ্ম-সমাজকে—যে প্রতিষ্ঠান সেদিন জাতির কল্যাণের সর্বাঙ্গীণ সাধনায় সৎ এবং সাধু শিশু-সাহিত্য রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই এবং সেই বিস্মরণ ঘটে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে।

আসলে বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের সাধনা তো নিষ্কাম কর্মযোগ। এখনো বাঙালী শিশু-সাহিত্যিক একশো-দেড় শো টাকায় কপিরাইট বিক্রি করতে পারলে চরিতার্থ হয়ে যান, ফাইভ পার্সেন্ট রয়্যালটি যিনি পান তিনি পরম ভাগ্যবান, নিতান্ত ইন্দ্র-চন্দ্র হতে পারলে দশ পার্সেন্টের সুখস্বর্গে জায়গা পাওয়া যায় (যদিও পঞ্চম মুদ্রণের পরেও প্রথম মুদ্রণের পুরো টাকাটা হাতে আসে না) এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বই ছেপে এবং চা খাইয়েই প্রকাশক লেখককে চরিতার্থ করেন। মারা গিয়ে ক্লাসিক হতে পারলে তবেই কিঞ্চিৎ কৌলীন্য আসে— যেমন কুলীন হয়েছেন উপেন্দ্র-কিশোর- সুকুমার-দক্ষিণারঞ্জন এবং যোগীন্দ্র-নাথ—নইলে শিশু-সাহিত্যিককে কেউ সাহিত্যিক বলেই মনে করেন না। বিশ্ব সাহিত্য যে-সব মনীষীর নখ-দর্পণে, তাঁদের ক'জন পড়েছেন রুশ লেখক সামুয়েল মারশাকের আশ্চর্য বই 'বারো মাস', আধুনিকতম ফরাসী সাহিত্য নিয়ে যাঁরা মশগুল, তাঁদের ক'জন খবর রাখেন স্যাঁৎ একজুপেরীর অসাধারণ বইগুলির?

অতএব হাতে কলম থাকলে এবং কলমে কিছু জোর থাকলে বড়োদের লাইনে পৌঁছে ওভার করাই ভালো; তাতে খ্যাতি এবং অর্থ দুই-ই আসে। বড়োদের জন্যে জাঁদরেল রূপকথা লিখতে পারলে চলচ্চিত্রের স্বর্ণ-দ্বারও সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায়। তা সত্ত্বেও যাঁরা শিশু-সাহিত্যকে আঁকড়ে বসে থাকেন —তাঁরা নিতান্তই শহীদত্ব কামনা করেন।

আর শহীদ তো চিরকাল মৃত্যুর পরেই রেমাল্যটি লাভ করে থাকেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, যোগীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জন-উপেন্দ্র-কিশোর এ যুগের বাংলা দেশে জন্ম নিলে শিশু-সাহিত্যসৃষ্টির পণ্ডশ্রম না করে মোটা মোটা ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস-রচনাকারী উপন্যাস লিখতেন—তাতে তাঁদের অর্থ আর পরমার্থ দুই-ই অর্জিত হত।

তাঁদের সৌভাগ্য, কিংবা দুর্ভাগ্য বলব কিনা জানি না, তাঁরা বাংলা দেশের একটা অসাধারণ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সামনে দুটি সুনিশ্চিত লক্ষ্য ছিল। একটি আত্ম-সংগঠন আর একটি জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। বাইরে যখন দেশ জুড়ে বিভিন্নমুখী আন্দোলন চলেছে, তখন নেতারা নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলেন যে এই সব আন্দোলন এবং আত্মবোধনকে যদি স্থায়িত্ব দিতে হয়—তা হলে একেবারে মূলে শক্তি-সঞ্চার করতে হবে। এই মূল হচ্ছে দেশের শিশুর দল—সৎ এবং সুন্দর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যদি তাদের মনোগঠন করতে পারা যায়, তা হলেই এই মুহূর্তের সমস্ত সূচনা ভবিষ্যতে তার পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছুতে পারবে। তা যদি না হত, তা হলে আদর্শ শিশু-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কি দুঃখ আর অকাল মৃত্যুকে [illegible]ণ করতেন প্রমদাচরণ সেন? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি তা না হলে অমন সুন্দর একটি শিশু-পত্রিকা প্রচার করতেন? তা যদি না হত, তা হলে কি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুকুলে'র সম্পাদনার ভার নিতেন, লেখা দিতেন উপেন্দ্রকিশোর-যোগীন্দ্রনাথ সরকার- যোগীন্দ্রনাথ বসু? সখারাম গণেশ দেউস্কর-বিপিনচন্দ্র পাল কি ছোটদের জন্যে প্রবন্ধ-কবিতা লিখতেন? আর 'বালকে'র জন্যে কি এমন করে প্রাণমন ঢেলে দিতেন রবীন্দ্রনাথ—লিখতেন পাঞ্জাব - মারাঠা ইতিহাসের কাহিনী, হৃদয়-ভরানো শিশু-কবিতা, 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস?

দক্ষিণারঞ্জন এসেছিলেন আরো কিছু পরে। কিন্তু সে-ও শুধু রূপকথার ডালি সাজাবার জন্যেই নয়। সেদিন বাঙালীর সামনে স্বদেশ তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে : "আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে যখন আপনি—"। দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি-ঠাকুরদাদার ঝুলি বাঙালীর ঐতিহ্য-সাধনার আর একদিক, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের আত্মদীপনে কটি কল্যাণ-প্রদীপ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপেই স্মরণ করেছি; আমরা ভুলে গেছি, তাঁর সাহিত্য-সাধনা মাত্র একটি একক মননেরই সম্ভার নয়—তার অন্তরালে একটি বিশাল যুগের বিপুল প্রাণ প্রেরণা সক্রিয় হয়ে আছে। আনন্দময় নির্মল শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বতোমুখী সুশিক্ষা সঞ্চারকে কতখানি সার্থক করে তোলা যায়—যোগীন্দ্র-নাথের বইগুলি তার উদাহরণ; কিন্তু তাঁর এই সফলতার পশ্চাৎপটে যে যুগচেতনা, যে কর্মোদ্যম, বিভিন্ন অনন্য ব্যক্তিত্বের যে-সব প্রভাব নিহিত হয়ে আছে—সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁর শতবার্ষিকী স্মরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আর এই ট্র্যাডিশনের কথা ভুলে গিয়ে আজকের বাংলা শিশু-সাহিত্যও অর্থহীন হতে চলেছে। অভাবে, উপেক্ষায়, প্রকাশকের শোষণে —বাঙালী শিশু-সাহিত্যিকেরা ক্রমশই প্রেরণা হারিয়ে ফেলছেন—নিষ্কাম কর্মযোগে আর কতক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহ থাকে! তার চাইতে বয়স্কদের জন্যে 'সিউডো-রিয়্যালিস্টিক' রূপকথা লেখাই ভালো—তার সম্ভাবনা বিবিধ এবং সমুজ্জ্বল। আজ বাংলা দেশে ছোটদের জন্যে রূপকথা আর কেউ লিখতে চান না—তার প্রয়োজনও আর নেই, কারণ বড়োরাই যে আজ চুষিকাঠি মুখে পুরে হামা দিতে শুরু করেছেন—এ সত্যটি বুদ্ধিমান লেখক-দের অধিগত।

না—সন্দেহ নেই, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ যুগে জন্ম নিলে ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখতেন

আরোহণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চিদ্রূপে বিদ্রূপ নেই।
বাঙ্ময়ী বুদ্ধিমতী সাহিত্য সুন্দরী,
অলক্ষ্য কটাক্ষপাতে স্পর্শ গরীয়সী
জানি জানি একদিন মুছে দেবে সমস্ত বক্রতা।
বহিরঙ্গ ছেড়ে যেই অন্তরঙ্গ তুমি
অস্তিত্বের সার-অংশ, প্রাণের পাথেয়,
সে মুহূর্তে সে গভীর পরিচয়ে
নেই আর তুচ্ছ পরিহাস
নেই আর বাক্যের চাতুরী, আবর্ত কুটিল,
তখন সমানস্রোতে অভিন্ন মননে
তুমি-আমি এক ধারা এক যাত্রা একই প্রবেশ।
এক নাভি এক নেমি এক চক্রাকার॥

সেই তো আমার ধ্যান
সম্মুখে প্রসারিত করো,
করো তুমি সর্বাংশে অসীম, অপরিমিত।
ছিন্ন করে নিয়ে যাও
পরিচিত বসনের মতো
পরিচিত জীবনের কুণ্ডলের থেকে
অলৌকিক-প্রকাশের অমরাবতীতে।
তুষারে বন্দিনী নির্ঝরিণী
তুমি কেলিবিলাসিনী, হবে না তো আয়ান-ঘরণী,
হও তাই নিরর্গল নিরবধি
গোষ্পদের ভূমিকারে দাও এনে সাগরসমতা,
তোমার অনন্ত দানে প্রসাদে প্রাচুর্যে গানে
দিঘি করো চূর্ণ করো নাবিকের প্রত্যয়ের ভার,
স্বাতী নক্ষত্রের জলে জন্ম দাও প্রসুপ্ত মুক্তার॥

যতই শাণিত হোক
বুদ্ধি অল্পস্থায়ী।
বারে বারে ফিরে আসে গুহা প্রান্ত থেকে,
কিন্তু প্রেম স্বতঃসিদ্ধ
অন্তঃপুরে নিয়ে যায় যক্ষকুঠুরিতে,
নিয়ে যায় কোন পথে কে বা জানে
সহজ বিজ্ঞানে।
নিজেরা সহজ নই, সাধন সহজ।
নিষেধের নাগপাশ ছিঁড়ে নিয়ে যায়
অনায়াসে, স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের দেশে
সেথা দেখি তৃপ্তির অমৃত জ্যোৎস্না
গলে পড়ে অবাধ প্রাপ্তির সরোবরে।
সে অতল সরসীতে
স্নান করে পুণ্য হই শুচি হই স্নিগ্ধ করি জীবন-মরণ॥

ভালো লাগে, শুধু, ভালো লাগে—
দয়া করো এত অল্পে রেখো না নিষ্প্রভ করে
স্তিমিতে নির্জীবে উদাসীন।
তার চেয়ে সুনিপুণ কথা প্রাণা
প্রাণের প্রবল নিমন্ত্রণে, প্রস্ফুট প্রণবে,
বলো ভালোবাসো, বন্ধহীন ছন্দহীন অপরাধহীন
পরিপূর্ণ প্রতপ্ত বিহ্বল
আবরণ নিবারণ-করা
বৈরাগ্যের শুভ্রতায় প্রণাম নির্মল।
সুখে দুঃখে ভালো-মন্দে সুরে বা বেসুরে
উত্থানে পতনে
স্বেদে ক্লেদে শোণিতে অশ্রুতে
সর্বময় সত্তার সৌরভে
মন্থনে মোচনে, ভদ্রে ও ভীষণে
সর্বক্ষণ ভালোবাসো
সর্বক্ষণ হৃদয় দুর্বার,
উন্মীলিত আনন্দের চেতনার ক্রম-আরোহণ॥

এদুয়ার ভুইয়ার

তুলনস্ লোত্রেক সভ্য না হলেও একজন পৃষ্ঠপোষক যে ছিলেন "নবি" চিত্রাদর্শের শিল্পীদের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই চিত্রাদর্শ ইম্প্রেশনিস্টদের পরিপন্থী— তাঁরা আলোর চমক ধরবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন না, চেয়েছিলেন অভিজ্ঞতাকে শিল্পী বলব না, এমনকি এদের চিত্রাদর্শও খুব শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, কারণ মুখে যদিও এ'রা ইম্প্রেশনিজমের বিরোধী, কিন্তু কাজে এলে দেখা যায় এ'রা অচেতনভাবে প্রভাবিত উনিশ শতকের সেই সব অমর শিল্পীদের দ্বারা যাঁরা আলোর রূপ ধরার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের প্যালেট-গুলি নিয়ে দেশ-দেশান্তরে।—আজ ভুইয়ার বিষয়ে আলোচনা; যিনি নিজেকে একজন নবি বলে পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু ছবিতে যিনি একেবারেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি অবিলম্ব পূর্ব সূরিদের প্রভাব। থিওরির সঙ্গে কাজের গরমিল থাকলেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। তাই ভুইয়ার বিষয়ে আধুনিক চিত্রকলা পর্যায়ে আলোচনা আবশ্যক।

ফ্রান্সের কুইসো গ্রামে এদুয়ার ভুইয়ার ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বালকটির বয়স যখন পনেরো তখন পিতার মৃত্যু হয় এবং রেখে যান তিরিশ বছরের ছোটো তাঁর স্ত্রীকে—এবং এই মা তাঁর সেবা যত্ন করেন ভুইয়ারের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ভুইয়ারের জীবনধারণ একেবারে পাতি-বুর্জোয়ার—মায়ের একটি দর্জির দোকান ছিল মমার্তে, সেই দোকানের পিছনেই একটি ঘরে মা-ছেলের আস্তানা, পোশাক তৈরি করে যে পয়সা পেত তাই দিয়ে চলত দিন। বাল্যাবস্থাতেও ভুইয়ার ছিলেন শান্ত, ঘরে থাকা সুবোধ বালক, বখাটে ছোকরাদের মত কাজের দিকে ঝোঁকটা একেবারেই নেই।

ভুইয়ারের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁকটা পড়ে ইস্কুলের দুই বন্ধুর প্রভাবে—মরিস ডেনিস এবং রুসে। এ'দের সঙ্গে তিনিও ভর্তি হন ১৮৮৬ সালে একোল দা বোসার্তে (স্কুল অফ্ ফাইন আর্টস্) এবং আকাদামির আদর্শ ভালো না লাগায় একসঙ্গেই একোল ছেড়ে আকাদমি জুলিয়ানের বিদ্রোহী শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দেন। বছর খানেকের মধ্যেই "নবি" চিত্রাদর্শের জন্ম হয় এবং নবিকৃষ্ট বলে পরিচয় দেন নিজেদের।

ভুইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে গলা মেলালে হবে কি, তাঁর ছবিতে নবিজম্ কোথাও নেই। তাঁর গুরু তখন দেগা, অসম্ভব ভালো লাগে গোগ্যাঁর ছবি এবং রঙের ব্যাপারে স্বাধীনতা নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই কেননা, পল গোগ্যাঁর বিখ্যাত উক্তির দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ: "গাছটা দেখতে কেমন? সবুজ? তা হলে সবুজ ব্যবহার কর, তোমার প্যালেটের সবচেয়ে যে সবুজটা আছে তুলে নাও তুলিতে। ছায়ার কথা বলছ? নীলচে মনে হচ্ছে? ভয় পেও না। এটাকে যত নীল তোমার করতে ইচ্ছে করে কর না।"—যদিও ভুইয়ার তাঁর তরুণ বয়সে গোগ্যাঁর "স্টাইলাইজেসন্ অফ্ কালার থ্রু এক্সাজারেশন" এই আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ব-সূরিদের অন্ধ প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বাতন্ত্র্য এনেছিলেন নিজের চিত্রে—তবে মনে রাখবেন পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি ক্রমশ

• সুবিন্যস্তভাবে, ফর্ম ও রঙের মধ্যে সাম্য এনে ক্যানভাসে সাজাতে, যাতে এক অ-স্থির (অস্থির নয়) মুহূর্তও পটে আঁকা ছবির মত চিরন্তন স্তব্ধতায় অমর হয়। "নবি"দের আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

বক্তমের দিকে ঝ‍ুঁকেছিলেন তা নয়: ণও অবিরাম নিজেকে নবিস্ট বলতেন। লেট-ভিক্টোরিয়ান টেক্সটাইল ডিসাইনে মন দেখা যায়, ভুইয়ার চেয়েছিলেন তাঁর নভাসের বিষয়কেও তিনি সেই রকম খ‍ুঁতভাবে নক্‌শার মত উপস্থিত বেন। যদিও তাঁর চিত্রে যে বিন্যাসের ক নজর আমরা লক্ষ করি তা ইম্প্রেশনিস্টদের মধ্যে বিরল তথাপি তাঁর টুকরো টুকরো তুলির আঁচড়ের জন্য অনেক ময় তাঁর ছবি স্থূলে চোখে ইম্প্রেশনিস্টিক নে হয়। কিন্তু দর্শক খ‍ুঁটিয়ে দেখলে এ ভুল করবেন না কারণ ইম্প্রেশনিস্টরা বস্তুর ওপর আলোর প্রভাব, কিংবা শুধুমাত্র আলোর ঝলমলানি প্রকাশ করতে গিয়ে এই টুকরো টুকরো তুলির আঁচড়ের সাহায্য নিয়েছেন, যেখানে ভুইয়ারের উদ্দেশ্য ছিল কাপড়ের ওপর নক্‌শায় বস্তুর যে খ‍ুঁটিনাটি প্রকাশিত হয় সেই রকম তাঁর বিষয়কেও তুলির সাহায্যে ক্যানভাসে প্রকাশ করা। সরলভাবে বলতে গেলে, ইম্প্রেশনিস্টরা যেখানে আলোর অ্যাবস্ট্রাক্ট দিকটা ফুট্‌কি ফুট্‌কি রঙের সাহায্যে প্রকাশ করছেন—একই পদ্ধতিতে ভুইয়ার প্রকাশ করছেন একটি বস্তুর প্রতিটি কোষের বস্তুময়তা। ফুল, পাতা, ইঁটের টুকরো সবের মধ্যেই ভুইয়ার এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাজানো নক্‌শা দেখতে পেয়েছেন—তাঁর ছবির এইটিই হয়তো সবচেয়ে স্বতন্ত্র লক্ষণ। এই চিত্রকর ছবি আঁকেন নি, ছবি বুনেছেন ক্যানভাসে।

এতক্ষণ যেসব বললাম তার উদাহরণ হিসেবে আমি চিত্রকরের একটি ছবি উপস্থিত করছি—"শয়নে"। ছবিটি ১৮৯১-এ আঁকা হয়েছে। "শয়নে" ছবিটি যে পর্যায়ে আঁকা সে সময়ে চিত্রকর ক্যানভাসে সামগ্রিক চিত্রবিন্যাসের সুষ্ঠুতার দিকে মনযোগী বেশী। ছবিটির মধ্যে মার্কিন শিল্পী হুইস্‌লারের ধাঁচ আসছে—ক্যানভাসে গভীরতা না এনে চিত্রকর ছবিটিকে করে তুলছেন রঙের এবং ফর্মের এক সরল কম্পোজিশন। লক্ষ করুন ছবিটি সাজানো হচ্ছে কীভাবে। ক্যানভাসের উপরের দিকে একটি হাল্কা সবুজ ব্যান্ড এবং ক্যানভাসের নিচে সমপরিসর জুড়ে একটি হাল্কা ব্রাউন ব্যান্ড, এবং মাঝে যে ছাইছাই নীল রঙের পরিসর তার মধ্যে চিত্রের বিষয়—একটি নারী বিছানায় সর্বাঙ্গ চাদরে মুড়ে শুধু মাথাটুকু বের করে শায়িত। এ ছবিতে বালিস এবং চাদরের ভূমিকাই বেশী শায়িত ব্যক্তির চেয়ে, কারণ চাদরের নানা ভাঁজ এবং বালিসের বিন্যাসে যে অসাধারণ ফর্ম সৃষ্টি হচ্ছে তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, যেন একটি কম্পোজিশন, এইভাবে শিল্পী প্রকাশ করছেন। বর্ণবিন্যাসে কোথাও বাস্তবতা নেই কেননা তাও এ ছবিতে কম্পোজিশনের অন্তর্ভুক্ত।

বোনার্দ গত সপ্তাহে, এবং এ সপ্তাহে ভুইয়ার বিষয়ে দু'-চার কথা বললুম কারণ এই দুই "নাবি" শিল্পী যদিও যুগান্তরকারী কিছু সৃষ্টি করেন নি কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্থান এঁদের, কারণ উনিশ শতকের শেষভাগ কেমনভাবে ইম্প্রেশনিস্ট এবং রিয়ালিস্টদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে ফর্মের দিকে মনযোগী হল সে বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার না হলে বিশ শতকের ছবি দেখবার সময় অনেক কিছুই ভুল ভাবে মনে হতে পারে এটা বুঝি হঠাৎ হল।

শুদ্ধশীল বসু

[দ্বিতীয় নয়ন—নিরঞ্জনের]

টগরকে বলেছি, "যিনি ডাঃ মিস দাস তিনি এত তাড়াতাড়ি আমার কাছে লতু হয়ে যাবেন, জানতাম না।"

টগর, মিষ্টি টগর, নরম টগর, কৌতো টগর যেন চোখের চাউনিতে আরও ফুটে উঠে বলেছে, "আপনারা সব পারেন। কিছু আটকায় না। নিরুদি—আপনার স্ত্রীর নাম নিরুপমাই ছিল তো?—মারা যেতে না যেতে, শ্মশান থেকে একেবারে ছাঁদনাতলায়? বাব্বাঃ, আপনারা পুরুষেরা সব পারেন।"

টগর ছেলেমানুষ, টগর হাসিখুশি। ওর কথা ধরতে নেই। টগর শুধু লতুকে যা ভয় পায়। তা-ও সব সময়ে নয়।

ওকে বলি, "বোকা, বাজে বোকো না। আমাদের আচরণের এটাও কি প্রমাণ হয় না, মেয়েরা কত অবশ্যক? একজন যেতে না যেতেই তবে একজনকে ধরি, বুক খালি হতে না হতে ভরে ফেলি। পুরুষেদের বুক কলকাতার ভাড়াবাড়ির মত—'টু লেট' আর ঝুলোতে পায় না।"

টগর হাসে।—"আপনি খুব কথা বলতে জানেন তো।"

বলি, "ওইটেই তো শিখেছি। যে-কোন বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকের সংগে মিলিয়ে দেখতে পার—ওরা হয়ত ডবল এম-এ, কিংবা ডাক্তারি-ছাপ পাওয়া স্কলার। ওদের সংগে আমার তফাৎ শুধু ডিগ্রীর—নট্ অব্ কাইনড।"

টগর বলে, "সেই, শুধু কথা!"

বলি, "কথা বেচে বেচেই তো ইহকালের প্রায় পঞ্চাশটা বছর ঝরঝরে করে দিলাম।"

টগর—"আপনার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, সত্যি? পুরুষদের বয়স কিছু বোঝা যায় না। পঁয়ত্রিশ, আর পঞ্চাশ সব সমান।"

আমি—"তোমার লতুদির অনারে ওইটুকু মারজিন রেখেছি, কারণ আমার সন্দেহ উনি কম করেও চল্লিশ।"

টগর বলে, "লতুদি কক্ষনো বয়স বানিয়ে বলবেন না।"

"আমিই কি বলি? আমার মত পেটে মুখে এক লোক তুমি ক'জন দেখেছ? দ্যাখ না, সরল বলেই তো অকপটে কবুল করে ফেললাম, বুক কখনও খালি রাখি না। যেমন খালি রাখতে নেই পাকস্থলীও। পাকস্থলী বা তলপেট খালি রাখলে হয় গ্যাসট্রিক আলসার, বুক খালি রাখলে প্লুরিসি, নিউমোনিয়া বা যক্ষ্মা।"

টগর তখন বলে, "অসভ্য। দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি।"

টগর একটু হেসে চলে যায়, ওর আঁচলের হাওয়া আমার চুলে লাগে, বেশ লাগে। আরাম করে একটা সিগারেট ধরাই, দু'চার টান দিতেই সেটা কেমন তেতো হয়ে ওঠে, টান মেরে ফেলে দিই।

ক্রমশ বুঝি, আসলে তেতো হয়ে উঠছে আমার মুখ, সকালে উঠেই সটান এখানে চলে এসেছি, আমি, কনট্রাকটর বিশ্বাস, যার পিতৃদত্ত, নিরঞ্জন বলেও একটা নাম ছিল। ওই দ্যাখ, বাংলা ইডিয়মের ঝোঁকে পিতৃদত্ত শব্দটা অনায়াসে ব্যবহার করে ফেলেছি, চেকে যেমন ফুটকি দেওয়া লাইনে সই করি, নইলে এই নামটা কে দিয়েছিল সেটা আমার অজানা।

যেমন আমার বাপ কে ছিল, সেটাও। তবে কেউ একজন ছিল নিশ্চয়, এদেশে জন্ম যখন, তাও আবার পয়লা আর দুসরা দুনিয়া-জোড়া লড়াইয়ের মাঝামাঝি কোনও একটা সালে, তখন টেস্ট টিউবে পয়দা বাচ্চা আমি খুব সম্ভব নই। যৌন বিজ্ঞানের বইয়ে যেমন লেখে, আমার জন্মও আলবত সেই-ভাবে হয়েছে, অর্থাৎ কোন বেচারী মা বেটির বহনের লজ্জায়, প্রসবের ব্যথায়। তারপর আমি মাটিতে পড়েই ডুকরে উঠে আমার প্রাণের ফোয়ারা কচ্ছপের মত করে কামড়ে ধরেছিলাম কিনা, কালিদাসের কেচ্ছা আর কী, যে-ডালের আগায় বসেছি সেই ডালেরই গোড়ায় কোপ, অভাগিনী মা আমার দুয়োরাণী ভয়ে ব্যথায় অথবা রেগে গিয়ে ডাসটবিনে আমাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল কিনা—এ-সব অনুমান আমার দুইয়ে দুইয়ে চার করে রচনা, নইলে হলপ কোনটার বিষয়েই করতে পারব না।

হতে পারে, আস্তাকুঁড়ই অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে হয়েছিল আমার দাইমা, খড়ের গাদা মানবপুত্র যিশুর যেমন, পরে কে আমাকে কুড়িয়ে পায়, কোন্ ঝাড়ুদার, কে আমাকে জমা করে দেয়, কোন্ দফাদার, অরফ্যানেজে আমাকে জিম্মা করে নেন ক্যোজুট সমন্বিত, থুড়ি লম্বা দাড়িতে ঋষিপ্রতিম কোন দয়ার অবতার সমাজদার—এ-সব দরকারী তথ্যের বিন্দুবিসর্গ জানি না। প্রডিজি কিংবা শিশু-জিনীয়াস হলে হয়ত বা জানতাম। কোন্ মহামুনি নাকি মাতৃগর্ভেই শুনে শুনে বেদ অধ্যয়ন করেছিল।

জন্মাবধি দেখছি আমি মিশনে, ঠেলে-ঠুলে ক্লাসগুলো তরে গেছি, জারসি, প্যানট, রবারের বল এইসব দেদার মনে আছে বখশিস পেতাম বড়দিনে। কারণ অকৃতদার যে ফাদার হতেন বড়দিনের বাবা, তাঁর নেকনজরে পড়েছিলাম কিনা। ডিসেম্বর মাসে ঠাণ্ডা পড়লে ফাদার তাঁর জোব্বার তলায় জড়িয়ে নিতেন, একটুও শীত লাগতে

দিতেন না। আরও যা যা ব্যবহার করতেন, আহা, তৃষিত ঋষি চিরকুমার, পরে বাপ হয়ে বুঝেছি তার কোনটাকে ঠিক পিতৃজনোচিত বলা চলে না।

অন্য ছেলেদের চোখ টাটাত, তারা আমাকে খ্যাপাত, আমি তাদের মুখ ভেংচাতাম, মওকা পেলে দূরে থেকে ঢিলও ছুড়তাম, তারপর এক দৌড়ে ফাদারের সস্নেহ দুর্গে, নিদেন তাঁর বসবার ঘরে অরগানের আড়াল তো ছিলই। তা-ছাড়া, ভাগ দিলে অন্য ছেলেরাও চুপ করে যেত, কিংবা রাগ ভুলত, চট করে আর ঘাটাত না।

হিন্দু গালগল্প, পৌরাণিক কথা-গাথা ইত্যাদি আমি পড়ি অনেক পরে, কলেজে উঠে, কর্ণের দৈবায়ত্ত কাহিনী তখনই মনে গেঁথে যায়। তার ঢের আগেই অবশ্য আমার নামের লেজ গজিয়েছিল, অর্থাৎ বিশ্বাস পদবীটা, জানি না, কবে থেকে যেন বিশ্বাস্য-ভাবে জুড়ে গেল।

নাম নিয়ে কোনও ক্ষোভ অতঃপর আমার আর ছিল না। চেহারা নিয়েও না। কারণ চেহারা আমার খুবসুরৎ না হোক, প্রস্থে ও দীঘে প্রমাণাকার হয়েছিল, তা-ছাড়া আমার চোখ দুটো ছিল, পাটকিলে হলেও, বেশ বড় বড়, চাউনির চালেই আমাকে বেশ ভারিক্কী দেখাত। আর ওই বয়সেই আমি আবিষ্কার করি, আমি দু'রকম করে চুল আঁচড়াতে পারি, একরকম করে সিঁথি কাটলে আমাকে বেশ বয়স্ক, রাশভারী দেখায় সমবয়সীরা সমীহ করে, আবার চুল পিছনের দিকে উলটে দিলে আমি যা তাই ফচকে ছেলেছোকরা পারা হয়ে যাই। অনেক কসরত করে এই দু'মুখো চেহারা আজও বজায় রেখেছি, যেমন আমর বয়স পঁয়ত্রিশ না পঞ্চাশ টগব ধরতে পারে ন।

মুখটা তেতো লাগছে, এইবার মনে পড়েছে আমি মুখটুখ না ধুয়েই, সকালে উঠে যা-যা কর্তব্য তার একটাও না সেরে হঠাৎ চলে এসেছি। টগর চা করতে গেছে, চা গরম এখন খাব না। খেলে ফেঁসে যেতে পারি, এ-বাড়িতে আবার দুইটি মোটে মহিলার বাস, তাদের কাকে ছেড়ে কাকে বলি, 'তোমাদের ইয়ে, টয়লেটটা কোথায় একবার দেখিয়ে দাও না।' কাউকেই বলা যায় কি?

ডাক্তারনি অবিশ্যি, যতদূর বুঝতে পারছি এখনও ওঠেনি, উঠলে টগর সাহস করে এতক্ষণ আমার কাছে ঘেঁষত না। গা ঘেঁষা টগরেরই স্বভাব নাকি? কোন-কোন গরু যেমন গাছ দেখলেই গুঁড়িতে বাকলে একবার গা ঘষে নেয়। কোন-কোন পুরুষেরও যেমন আলুর দোষ মেয়ে-ন্যাকড়া স্বভাব, এই আমারই যেমন, নিরু—আমার স্বর্গীয়া গৃহিণী—জানত, নিরু টের পেয়েছিল, বলত তুমি কুকুর নাকি, তুলসী গাছ দেখলেই—

ক্রমশ নিরুপমা আমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ছিল। শ্রদ্ধাহীনতার ফলে ও ধীরে ধীরে খিন্ডি- রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ওর মুখে কিছু আটকাত না।

টগর এসেছে, হাতে চায়ের কাপ, পাশে রাখতে ওকেও হাত ধরে পাশে বসাই, "বোসো খুকী"। টগর খুকী বললে রেগে যায়। যাবেই তো, আঠারো-উনিশ বছরের যুবতী স্বাস্থ্যবতী, খুকী বললে রাগবে না তো কী! ষোল বছর বয়সে আমাকে কেউ বিশেষত কোনও নারী খোকা বললে আমি রাগতাম না?

টগর বলে, "আমি খুকী না।"

আমি—"বেশ তো, না। কিন্তু টগরও তো কারও ভাল নাম হতে পারে না, তোমার ভাল নাম কিছু নেই?"

টগর হেসে ফেলে।—"দাঁড়ান আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।"

ও উঠে গিয়ে নিয়ে এল, রুলটানা একটা একসেসাইজ বই। ইংরাজীতে যেখানে লেখা আছে 'নেম'—তার পাশে টগর গোটা গোটা হরফে লিখেছে অঞ্জলি হালদার। তার নীচে আর-একটা লাইন—ফাদারস নেম, সেখানে টগর কিছু লেখেনি।

পদবী যখন আছে, আর টগরের এই পদবী নিশ্চয় বানানো নয়, তখন বাবাও একজন আছে বা ছিল নিশ্চয়। ইচ্ছে হল জানতে চাই, টগর, তোমার বাবার নাম কই?

ওটা আমার একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেল নাকি—অবচেতন না কী যেন বলে, সেখানে একটা অভাববোধ, খামোখা মনে মনে সকলের বাবার নাম জানতে চাই।

হায়, সময় থাকতে খবরের কাগজ একটা বিজ্ঞাপন দিইনি কেন, যথা "বাবা! একবার দেখা দাও।" কিংবা "তুমি কে জানাও।" বিজ্ঞাপনের মুসাবিদার ভাষায় নিজেরই হাসি পেল, সঙ্গে সঙ্গে টগর বলে উঠল, "হাসছেন যে?"

বললাম, "কিছু না।" প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালাম। নতুন প্যাকেট মোড়ক, রাংতা ছিঁড়তে ছাড়াতে একটু সময় লাগল। চল্লিশ পার হবার পর যেই প্রথম দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা, ডেনটিস্টের কাছে গেছি, সেদিন থেকেই প্যাকেট থেকে এক-একটা সিগারেট বের করাতেই মনে হয় যেন সিগারেট নয়, এক-একটা দাঁত তুলছি—অথচ সিগারেট তো সেই কবে থেকেই খাই।

টগর বলল, "চা খাবেন না?"

"এই যে।" পেয়ালা ঠোঁট ছোঁয়ালাম।—"লতু, মানে মিস্ দাস ওঠেননি?"

টগর মুখ টিপে বলল, "লতুই বলুন না। আপনাদের যে বিয়ে হবে, এ-তো আমার জানা।"

"তোমারও জানা?"

"আন্দাজে। নইলে লতুদি নতুন করে এত সাজগোজ করতেন না। কত পোশাক, যদি দেখতেন?"

লোভ হল, বলি, "তোমার সেই রাতের পোশাকটা পর না?" যে পোশাকে টগরকে প্রথম অস্পষ্ট দেখি, মনে পড়ে যায়, নিরুপমার মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেকার সেই রাত্রির ঘটনা।

আমি, নিরঞ্জন বিশ্বাস, কনট্রাকটার, কিন্তু আমি যে একটা 'ফেক্', সেটা নিরুপমা একেবারে প্রথমেই টের পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু। ওর গোটা ভাল-বাসার ক্ষীর টকে গিয়ে একেবারে খাট্টা দই হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, আমি তুখোড় মিথ্যুক, ভাল একটা চাকরির দরখাস্ত করার সময়ে ছাপানো ফরমে 'ফাদারস নেম' লাইনটায় এসে থতমত খেলাম কেন? শেষ পর্যন্ত লিখতেই তো হত, কলমটা কামড়ে, আগেও সে নামটা বাজিয়ে কতবার লিখেছি—নিরঞ্জন বিশ্বাস?

নিরু ধরে ফেলেছিল। নিরু তখন থেকেই শ্রদ্ধা হারায়। জেরা করে করে সব বের করে নেয়। তার আগেই ভাগ্যিস ম্যারেজ রেজিসটারকে পুরুত মেনে সই-করা নিয়ে হয়ে গেছে, ভাগ্যিস খবরের কাগজের ভাষায় যাকে ইনফিলট্রেসন বলি, তাতে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছি, আমার গুপ্তচর লালিত হচ্ছে নিরুর জঠরে, নইলে ওকে বেঁধে রাখা যেত না।

তবু নিরু শ্রদ্ধা হারাল। হারাল কেন। আমার উপযুক্ত মর্যাদা নেই, তাই? কিন্তু কুলে জন্ম তো মদায়ত্ত নয়, আধুনিক নিরু নিশ্চয়ই ছিল সংস্কারমুক্ত, তবে? ওই যে মিথ্যে কথা বললাম, থতমত খেলাম, আর মিথ্যে একটা নাম লিখলাম, তাই থেকেই কি নিরুর মনে খটকা ধরে গেল যে, কুলে জন্ম চুলোয় যাক, যথার্থ পৌরুষও আমার আয়ত্ত নয়?

আর বেরিয়ে আসতে পারল না বলে, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব মেনে নিতে হল বলে, নিরুপমা আস্তে আস্তে নিজের উপরেও শ্রদ্ধা হারাল।

নিরুপমাও খারাপ হয়েছিল, কাউকে বলিনি। আমি টের পেয়েছিলাম। আমি জানতাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে টগর নিজেও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাইরের দিকে, তাই বুঝতে পারছে না আমি ওর দেহের কোন্ অসতর্ক অংশে নিবদ্ধ হয়ে আছি। মেয়েদের শরীর যদি টোপ, আমাদের চোখ কি বঁড়শিতে গেঁথে ছটফট করে—আমাদের চোখ কি মাছ?

টগর রাতের পোশাক পরেনি, কিন্তু কী-কী পরেছে ঠিক ধরত পারছি না।

আমাদের লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা ও সমব্যবসায়ীদের বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

চাণক্য সেনের নতুন উপন্যাস

তিন তরঙ্গ

ভারতবর্ষের সঙ্গে যে দেশের সম্পর্ক আজ ঘনিষ্ঠতম, আপনি চান, কি না চান, সে দেশ হ'ল আমেরিকা। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা যদি বা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা হয়েছে, সাহিত্যিক আঙ্গিকে তার প্রতিচ্ছবি এই প্রথম। বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ইংলণ্ডকে ছায়াপট করে উপন্যাস কম রচিত হয়নি। কিন্তু ভারত-মার্কিন মানস-সংযোগকে উপন্যাসে রসিয়ে তোলা এই প্রথম।

তিন তরঙ্গ তিনটি মার্কিন কুমারী কন্যা—আইলীন, জোয়ানা, মেরী। স্বল্প-কালের জন্য ভারতবাসী। তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রতর অনুভূতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আইলীন কেন চন্দ্রভাগ ঠাকুরকে 'সিডিউস' করল? জোয়ানা অমৃত সোহানীর সন্ধান পেয়ে পূর্ণতর হ'ল, না শূন্যতর? মেরী যখন ভারত ছাড়ল, তার কানে বাজল শুধু তিনটি বাক্য; আজ মনে রেখো আমি আছি। কিছুদিন বাদে মনে রেখো, আমি ছিলাম। তারপর বহুদিন মনে রেখো, আমি ছিলাম না।

চাণক্য সেনের উপন্যাস কেবল ব্যক্তি-সংঘাতের আকর্ষণীয় কাহিনী নয়; বর্তমান কালের, জীবনের ও মানসের অনুভূতিপ্রবণ গভীর বিশ্লেষণ। দাম : ৬·৫০

বিমল মিত্রের জনপ্রিয় উপন্যাস

এর নাম সংসার ৩য় সং ৮·৫০ — **স্ত্রী** ৫ম সং ৪·৫০

শিবশঙ্কর মিত্রের **বনবিবি** ৬·০০

শংকর-এর

চৌরঙ্গী ১৭শ সং ১০·০০ — **মানচিত্র** ১১শ সং ৬·০০ — **পাত্রপাত্রী** ৮ম সং ২·৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস **একটি আদর্শ প্রেম** ৩·৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **দেনাপাওনা** ৫·৫০

বিমল মিত্রের **একক দশক শতক** ৩·০০ নাট্যরূপঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত

রতনকুমার ঘোষের **সম্রাট** নাটক ২·২৫

দেবনারায়ণ গুপ্তের **দাবী** নাটক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** ৭ম সং ৪·০০

বনফুলের **দূরবীন** ৩য় সং ৩·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **জলভ্রমি** ২য় সং ৩·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **পৌষ ফাগুনের পালা** ৩য় সং ১৫·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **দ্বিতীয় অন্তর** ২য় সং ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **কুয়াশা** ৩·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের **পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট** ৫·০০

জরাসন্ধ-র

পাড়ি ৯ম সং ৫·৫০ — **মসিরেখা** ৪র্থ সং ৯·০০ — **আশ্রয়** ৬ষ্ঠ সং ৩·৫০

বিমল মিত্রের **চার চোখের খেলা** দাম : ৫·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর **তারার আলোর প্রদীপখানি** ৬·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **দিগ্‌ভ্রান্ত** ৯·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **বলাকার মন** ৩য় সং ৬·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের **অগ্নিসাক্ষী** ৩য় সং ৪·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **প্রথম কদম ফুল** ১৫·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর **দম্পতি** ৫·০০

নমিতা চক্রবর্তীর **শাশ্বতী** ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কালের মন্দিরা** ৪·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **জীবনস্বপ্ন** ৪·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আরোগ্য নিকেতন** ৭ম সং ৭·৫০

নরেন্দ্র ঘোষের **আগুনের উক্তি** ৩·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জনপদবধূ** ৪র্থ সং ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **সন্ধ্যার সুর** ৩·০০

বাক্‌-সাহিত্য ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ | **প্রকাশ ভবন** ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পশ্চাত দেখতে পাচ্ছি, শাড়ি, এক ব্লাউজের কাপড়টা মোটা বলে বোঝা যায় না অন্তর্বাস আছে কিনা।

ভয়ংকর রকমের লোভ আর সাহস সুড়সুড়ি দিচ্ছে, টগরের শরীরের কোন একটা অংশ ছুঁই, একটা প্লেটোনিক অঙুল, করতলে নিকষিত হেম চুমো—কিন্তু তা হলে তো আবার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি চাই, হাঁটু ভেঙে বসা-টসা, সে অনেক সারকাসী কসরত, আখড়ার মেহনত। রিপু বলে, আর কিছু ছোঁও, যথা ঠোঁট, ঘাড় (শুদ্ধ ভাষায় নির্দোষ করে বলা যায় গ্রীবা) গলা, গলার তলা, যেখানে চড়াই। ভূগোলের বইয়ে এ-সব জায়গার ভাল ভাল নাম আছে—অধিত্যকা, না তরাই?

ভাবলাম, টগরের মাথাটা আলগোছে টেনে নামাই, কানের উপর মুখ রেখে, তার আগে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেব, ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করি, "ব্রা পরে আছ? অথবা এত সকালে ও সব তোমরা পর না, বা পরোনি?"

সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। টগর লজ্জায় পাকা টমাটো হয়ে যাবে, আহা টমাটোর মত টসটসে ফল আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। টগর কি চটবে, উঠেও যাবে, কী জানি, পরখ করতে পারব না। অত সাহস অমার হবে না।

সুতরাং খুব মিটমিটে বদমাসের মত বলি, "টগর, তোমার লতুদি এখনও ওঠেননি?"

টগর কিসে যেন তন্ময় হয়ে ছিল, শালিখে অথবা সামনের বাগানে সরষের মত অজস্র ফোটা কোন খুদে খুদে ফুলে, আমার কথায় নিজেকে ফিরে পেল, বাড়ির ভিতর দিকে তাকিয়ে বলল, "উঠেছেন। বাথরুমে শব্দ পাচ্ছি। আপনি এসেছেন টের পেয়েছেন, একেবারে তৈরী না হয়ে তো বেরুবেন না।"

টগর থামল। তারপর পাতা উলটে পরের পৃষ্ঠা পড়ার মত করে বলে গেল, "লতুদি বদলে গেছেন, বদলে যাচ্ছেন, এই ক'দিনে লতুদিকে অনেক বদলে দিয়েছেন আপনি।"

"আমি?"

"আপনি। ভালই তো হল, ভালই হচ্ছে।" টগর গলা নামিয়ে যেন নিজেকেই বলল, "আমি বেঁচে গেছি।"

ওর এই শেষের কথাটা বুঝলাম না।

আমি কনট্রাকটার নিরঞ্জন বিশ্বাস, ভাগ্যবান, নইলে ব্যবসা যখন ফোঁপরা হয়ে এসেছে, তখন আমার বউ মরত না, হাতে-হাতে পেয়ে গেলাম এক আধবুড়ি লেডি ডাক্তার, চিরকুমারী। খুব সেয়ানার মত ওকে বুঝতে না দিয়ে একটা যোগাযোগ রেখে গেলাম।

এক ঢিলে দুই পাখি। বাজপাখি একটা, আর-একটা, আর-একটা কী। কী একটা পাখি যেন ছোট্ট, তুলতুলে, যার মাংস নরম? মনে পড়েছে তিত্তির।

বউটা লোকসান হয়ে গেছে আমার, সে ছিল, মোটাসোটা মুরগীর মত, নিয়মিত ডিম পাড়ত আর শেষবার ডিম পাড়তে গিয়েই গেল। মুরগী গেছে অতএব মাংস চাই তিত্তিরের।

অবরে সবসরে লোকসান পুষিয়ে নিতে চাই ঠিক। বাজপাখি বুড়িটাকে পরার জন্য তাই শিকলি নিয়ে ঘুরঘুর করছি।

আমি এ-রকম পারি, নিজেকে ভেড়া বা ছাগলের মত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে কসাইয়ের দোকানে ঝুলিয়ে দিতে। ছাগল বা ভেড়ার আত্মা হয়ে বাইরে থেকে নিজেরই ছাল-ছাড়ানো সত্তা দেখতে। মাছি বসছে, ...

আমার স্বভাবে কতগুলো আদিমতা আছে আমি জানি, আছে যৌনতার প্রতি ... আকর্ষণ। আমি সেই রেলগাড়ি না, যা ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদ্দুরে খোলা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে উদাস প্রান্তরের দিকে বাউলের মত একতারা বাজাতে বাজাতে বিবাগী হয়ে যায়। আমি সেই গাড়ি, যা পাহাড়ের রাস্তায় চাকায় চাকায় যন্ত্রণার শিকল টেনে, হিঁচড়ে হিঁচড়ে নেংচে নেংচে ঢোকে গিয়ে পিছল স্যাঁতসেঁতে টানেলে। ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গ যেন আদিমতায় ঘেরা, জন্মলগ্নের ফেরা—

ওই টানেল যেন যোনিপথ।

আমার এই ভয়ংকর একটা সত্তার কথা আমি জানি।

কথায় কথায় যেই টের পেলাম ... মাগি একটা ক্লিনিক খুলেছে, অমনি ... করে ফেললাম, এই কনট্রাকটা আমার চাই। গোড়ার দিকে অবশ্য সে সবের ধারে কাছে যাইনি। আগে মাগির ধাত বুঝে নিই।

"বা-রে, ক্লিনিক খুলবে তুমি, আরও বড় ঘর চাই না? আমি প্ল্যান দেখালাম, তোমার সঙ্গে বসে এস্টিমেট হল, তুমি টাকা স্যাংসন করলে—"

"তোমারই তো টাকা, অঞ্জন। মানে, তোমারই হবে।" লতু মাথা নামাল। ডাক্তার মাগিও লাজুক হতে জানে।

"আজ দশটার পর আমার লোকজন আসবে লতু। জিনিসপত্তর সব আগে সরিয়ে নিও। টগরকে বুঝিয়ে দিলে সে-ও হাতে হাতে হেলপ করতে পারবে।"

টগরের প্রসঙ্গ টেনে আনার দরকার ছিল—সে উদ্দেশ্য হাসিল হল।

"টগর তোমাকে চা দেয়নি?"

"দিয়েছে। তোমার সঙ্গে বসে আরও এক কাপ খাব। পরে বাড়ি যাব। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে—"

"ওদের বোরডিং-এ দেবে বলেছিলে, কত দূর হল।"

"হচ্ছে। এই সপ্তাহেই ঠিক করে ফেলব। ছোট নাগপুরে একটা মিশনারি স্কুলে লিখেছি, আজকালের মধ্যেই জবাব এসে পড়ল বলে।"

সিরিঞ্জ দিয়ে হুল ফোটানোর আগে ডাক্তার যেমন রোগীকে খানিক পর্যবেক্ষণ করেন, আমিও তেমনই লতিকাকে একটু দেখি। দাগ ধরল কিনা।

"এই মাসেই লতু, আমরা কিন্তু নোটিস দিয়ে দেব ভাবছি।"

"ভাল করে ভেবে দেখেছ তো, অঞ্জন। তোমাকে বারবার বলেছি, আবার বলছি।"

"ভেবে দেখেছি লতু। লোকে কী বলবে, এই তো ভয় তোমার? তা নিরু যাবার পর বেশ কয়েক মাস তো কেটে গেল। আমি বাঁচব না নতুন করে? তুমিও কি নতুন হবে না?"

নতুন একটা শাড়ি পরে ছিল লতিকা—তাঁতের যদিও। নতুন মাড়ের গন্ধ আসছিল। খসখসে আঁচলটায় নকশার বাহার আছে।

"যাই, চা আনি।" লতিকা উঠে গেল।

কই, একবারও তো আমার কৌতূহল হল না যে, লতিকাও "ব্রা" পরে আছে কিনা। কৌতূহল হবার ফুরসতেই বা ও দিল কই। যতক্ষণ বসে ছিল, ততক্ষণ ওর বুকে বোবা চিৎকারে চোখ বিঁধছিল। ব্রা চোখা, ব্রা তো ব্রা, এমনও হতে পারে, লতিকা একটা আস্ত পিরামিড, টুটেনখামেন কিংবা ওই রকমই কোন ফ্যারাওয়ের কবর, বুকে বেঁধে আছে।

মিষ্টি কোন ফুলের সুবাস আসছে, তার মানে লতিকা, লতু আমার লতু, ফিরে আসছে। কিছুদিন ধরে টের পাচ্ছি, লতু ফুলে সুরভিত কোনও তেল মাখছে, আগে মাখত না। নখও রাখছে লতু, তা রাখুক, নখে রঙও মাখুক, কিন্তু ওর ওপরের ঠোঁটের পাতলা সেই গোঁফের রেখা কোথায় গেল? কোনও লোশন মখছে নাকি লতু—কিংবা ছোট্ট এক এক রকম যে ব্লেড পাওয়া যায়, গোপনে তাই ব্যবহার করছে?

লতুদি বদলে যাচ্ছে, টগর বলেছিল। টগর হয়ত জানে। আড়ালে টগরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে লতিকা বলল, "বিয়ের পরে কিন্তু আমরা অঞ্জন, দিনকতক বাইরে বেড়াতে যাব।"

বললাম, "হনিমুন, হান্?" (সাহেবরা শুনেছি প্রিয়াকে ডাকে হ্যান; হ্যানকে আবার আরও ছোট্ট করে বলে "হান্", আমিও তাই বললাম) কিন্তু আমার হাতে, মানে, ব্যাংকে এখন তো, মানে জানো তো নিরুর অসুখে, ইয়ে ছেলেমেয়েদের বোরডিংএ পাঠাতে—"

আটকে দিয়ে লতু বলল, "অঞ্জন, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রশ্ন এল "পাহাড়, না সমুদ্র—কোন্‌টা তোমার বেশি পছন্দ, লতু?" জুতসই সংলাপ, আমি নাট্যকার হলে সব ব্যাটা পালা লিখিয়ের অন্ন ঘুচে যেত।

"কোন্‌টা?" লতিকা একটু ভাবল।—"সমুদ্র—সমুদ্রই তো ভাল।"

হনিমুন স্থির হল, লাগে টাকা, দেবে কোন্ গৌরী সেন—সেই ফয়সালাও। বাকী রইল টগর। টগরও যাবে কিনা সেটা অবশ্য সোজাসুজি জানতে চাওয়া ঠিক হবে না, কায়দা করে বের করে নিতে হবে।

যেন খুব ঠাট্টা, যেন কতই রসিকতা, এইভাবে বললাম, "ভালই হল, আমার সুইমিং কস্টিউমটা কাজে লাগছিল না—এবার একটা গতি হবে। তোমারও আছে তো?"

লতু ডাঃ মিস দাস হয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল—"ঠাট্টা হচ্ছে? এ-বয়সে আর ওসব ন্যাকামো করতে পারব না বাপু। ও-সব কস্টিউম-ফস্টুম পরতে হয় তো টগর পরবে।"

বাস, বোঝা গেল, টগরও যাবে। লতু আমার লতু আজ যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তৎক্ষণাৎ চোখ বুঁজে ধ্যানে বসে গেলাম। রাতের পোশাকে টগরকে দেখেছি, ঢিলেঢালা অস্পষ্ট প্রতিমা। আঁটোসাটো সাঁতারের সাজে ওকে কেমন দেখাবে? সেই কোন্ কবিতায় যেমন পড়েছিলাম—যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা? হাতির দাঁতের মত সুঠাম গঠন ঢের দেখেছি বিদেশী সিনেমা আর ছবির ম্যাগাজিনের কল্যাণে—হায়, যত বিদেশিনীর উন্মুক্ত পা দেখেছি, স্বদেশিনীদের তত দেখিনি, দেখব না—আপাতত ভরসা পেয়ে আমি কচি শ্যামান্ত দু'টি কদলীকাণ্ড দেখতে থাকলাম।

শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রয় করেছি আমি, ঠিকেদার শ্রীনিরঞ্জন বিশ্বাস। বিনিময়ে সে প্রত্যহ আমাকে বরাদ্দের একটি পারমিট 'ইসু' করে, আমি সেটা মাথায় ঠেকাই। আজও মনে মনে মাথায় হাত ঠেকিয়ে আমার সেই ইষ্টদেব শয়তানকেই স্মরণ করছি, "হে গুরু, হে মহাজন! তুমি এবার মাস-দুয়েকের পারমিট এক সঙ্গে ইসু করে দাও, আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নিই।

[তৃতীয় নয়ন—লতিকার আগামী সংখ্যায়]

কলকাতার ডায়েরি

চণ্ডীগড়ের কল্যাণে আমরা সবাই করবুশিয়েরের নাম শুনেছি, তাঁর স্মিক মৃত্যু সংবাদও ভারতবর্ষের বাদপত্রপাঠকের দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু য়েত্রার নাম এদেশে কজন জানেন?—জানে না। এইতো গত হপ্তায় বিশ্ববিখ্যাত ই মার্কিন স্থপতি কলকাতায় দিন কয় টিয়ে গেলেন, তবু তাঁকে নিয়ে তেমন ই চৈ হল না।

রিচার্ড নয়েত্রাকে অবশ্য দেখলে স্থপতি নে হয় না, পক্ক কেশ, ঝাঁকড়া ভুরু, আর ঋষির মত সরল হাসিতে তাঁকে দার্শনিক ভেবেই ভুল হয়। দার্শনিকই বটে, অনেকে তাঁর নাম দিয়েছেন 'স্থাপত্যের আইনস্টাইন।' নয়েত্রার নাম প্রথম শুনি বোম্বাইয়ের লিল ঘোষের কাছে। নয়েত্রা বছর কয় আগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তার সঙ্গে স্থাপত্য-কলা নিয়ে খ্যাতনামা কলাসমালোচক পৃথ্বীশ নিয়োগীর সঙ্গে যে আলোচনা য়, তারই ভিত্তিতে সলিল ঘোষ অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ঋতুপত্র' নামক অধুনালুপ্ত এক কাগজে।

নয়েত্রার জন্ম ভিয়েনায়, শিক্ষাদীক্ষাও ইয়োরোপে। স্থায়ীভাবে বাস করতে আমেরিকায় চলে আসেন ১৯২৩ সালে। এই শতাব্দীতে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা বিপ্লব ঘটিয়েছেন, নয়েত্রা তাঁদের একজন। প্লাইউড, ইসপাত বা এলুমিনিয়াম দিয়ে বাড়ি তৈরির ব্যাপারে নানা পরীক্ষা তিনিই শুরু করেছিলেন। তবে সেটাই বড় কথা নয়, নয়েত্রার অভিমত—প্রকৃতি আবহাওয়া আর মানুষের দিকে নজর রেখেই বাড়ি বানাতে হবে।

নয়েত্রার মতামত এ যুগের অন্য দুজন বিখ্যাত স্থপতি, ফ্র্যাংক লয়েড রাইট এবং লা করবুশিয়েরের মতের বিপরীত। রাইটের মতে স্থাপত্যে প্রকাশ পাবে স্থপতির নিজস্ব স্টাইল, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া বাড়ির ডিজাইনের সঙ্গে সংগতি রেখেই হবে যাবতীয় আসবাব। তেকোণা বাড়ির তেকোণা ঘর, তেকোণা টেবিল। আবার করবুশিয়েরের মত জ্যামিতিক কাঠামোয় গড়া —যাকে তিনি বলেন 'দি মডিউলর— মাপজোকের একটা বিশেষ রীতি যা' মানুষের শরীর এবং গণিতের উপর ভিত্তি করে।

নয়েত্রা তার উলটো। তিনি বলেন, বাড়িতে স্থপতির ব্যক্তিত্ব থাকবে না, থাকবে না জ্যামিতিক মাপজোক। কেননা মানুষ ছাঁচে ঢালা জড়পদার্থ নয়। বাড়ির ডিজাইন মত আসবাবই বা কেন হবে? কেউ যদি পা গুটিয়ে বসতে ভালবাসে তাহলে হাতলওয়ালা চেয়ারের কী দরকার? বরং ফরাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

নয়েত্রা বিশ্বাস করেন স্থান কাল পাত্রে। স্থাপত্য শুধু আর্ট অব স্পেস নয়, এর সঙ্গে যুক্ত আছে কাল। তাছাড়া ব্যবহারকারী মানুষের প্রয়োজন ও মনোভাব মত বাড়ি বানাতে হয়। বাসস্থানের পরিবেশ হবে 'মুড' অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। সকালবেলার বিশেষ মনের অবস্থায় আমরা গৃহটিকে পেতে চাই একভাবে, আর সন্ধ্যাবেলার ক্লান্তির পর বিশ্রাম যখন প্রয়োজন, তখন তাকে চাই অন্য ভাবে। বাড়ি সেই মত হবে। নয়েত্রা দাবি করেন, এমন বাড়ি তিনি তৈরি করে দিতে পারেন, যেখানে অল্পদিনের মধ্যেই নবদম্পতি ডাইভোর্সের মামলা আনতে বাধ্য। আবার এমন বাড়িও তিনি তৈরি করেছেন, যার

সমন্বয় পরিবেশে কিছুদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর হয়ে গিয়েছে।

নয়েত্রা তাঁর মতবাদ নিয়ে বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন প্রচুর। তার মধ্যে বিখ্যাত বই হল 'স্ট্রাকচারাল গ্রু ডিজাইন।' তিনি ঘুরেছেনও বিস্তর, অসংখ্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেই নয়েত্রা কলকাতায় আসেন এক বক্তৃতা দিতেই। মার্কিন সরকারের বার্তা বিভাগ থেকে আমেরিকার শহর পুনর্গঠন সম্পর্কে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় তথ্য কেন্দ্রে, সেখানেই তিনি শহরবাসের সমস্যা এবং শিল্প-শহরের স্থাপত্য নিয়ে ভাষণ দেন।

কিন্তু নয়েত্রার কলকাতা কেমন লাগল? মন্দ নয়। দমদম থেকে ভি-আই-পি রোড দিয়ে আসার সময় তাঁর ভালই লেগেছে, বলেছেন, ইচ্ছে করলে রাস্তার দুদিকের চেহারা বদলে দেওয়া যায়। আর কলকাতা শহরের স্থাপত্য? কথাটা ঘুরিয়ে তাঁর জবাব, দেখুন, প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য রীতি, বর্তমান পশ্চিমী স্থাপত্য থেকে ঢের ঢের ভাল।

❋

ভূমিকালিপি পড়ে মনে হয় যেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বসে কোন সংস্কৃত নাটক দেখছি। রামের ভূমিকায় সুলক্ষণ, সীতার ভূমিকায় রত্না দেবযানী। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন রত্না রুক্মিনী, সুশীলস্মৃতি, সুজোত্র, ত্রিসংত, সুবন্ধু, হরিদর্শন প্রভৃতি। না, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা নয়, রবীন্দ্র সদনে বসে ইনদোনেশিয়ার রামায়ণ পালা দেখছিলাম এই সেদিন।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। 'আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে; দেখিনু চুপে চুপে, আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে—।" দূর ইনদোনেশিয়ায় প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য এখনও কত প্রাণবান, কত রূপবান, তার পরিচয় পেলাম পালাগানের পরদা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। ঢোল, রবাব, গং গেনডার, বোনাং নিয়ে বেজে চলেছে ইনদোনেশীয় অরকেসট্রা 'গামেলান', যেন কোন দেবমন্দিরের সামনে বাজছে পুজোর বাজনা। খানিকটা চীনা, খানিকটা দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙ শুরু হল সংস্কৃতঘেঁষা শব্দের গান। বাজনার তালে তালে মঞ্চে একে একে এলেন রাবণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, কুম্ভকর্ণ, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ। রাবণের পরাজয়, রাম-সীতার পুনর্মিলন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা—চিরকালের চেনা এইসব চরিত্র আর ঘটনা নতুন হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। ধীর-মন্থর পদক্ষেপ, ললিত অঙ্গভঙ্গী, হয়ত বা অনেক সময় একঘেঁয়ে, তবু কী সুনিপুণ দক্ষতা আর নিষ্ঠায় এঁরা, এই বিদেশীরা অভিনয় করে গেলেন আমাদেরই মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনীকে।

দলের নেতা যোগাকর্তার গবর্নর পাকু আলম। তাঁরই তিন কন্যা তিন প্রধান নারী চরিত্রের ভূমিকায়। সকলেই ধর্মে মুসলমান, কিন্তু নামে বা অভিনয়ে বোঝার উপায় নেই, ওঁরা হিন্দু নন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বারবার মনে পড়ে। ইনদোনেশিয়ার লোকেরা যদি ধর্মে মুসলমান হয়েও তাঁদের দেশের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও নাম নিতে পারেন, তাহলে ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না কেন? সব্যসাচী বা অনিরুদ্ধ—এই রকম দু একটি নামের দৃষ্টান্ত আছে বটে; কিন্তু সে ব্যতিক্রম। পোশাক কিংবা আহারে কিংবা সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য বিচার পরের কথা, গোড়ায় ওই নামের জোরেই দু তরফ আলাদা হয়ে আছে। এবং শেক্সপীয়র যাই বলুন না কেন, ওই নামেরই দেখছি এদেশে অনেক কিছু ঘটে যায়।

অথচ ভারতীয় খৃস্টানদের ক্ষেত্রে যা হয়নি, তা মুসলমানদের বেলায়। সুকুমার হিন্দু না মুসলমান যেমন নামে বোঝা যায় না, তেমনই অজিত সোম বা অখিল বিশ্বাস হিন্দু না খৃস্টান নামে ধরা যাবে না। মানিক বা মদন, এই ধরনের দু একটি নাম আমরা হিন্দু মুসলমানেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখনও দু তরফেই এই ব্যাপারে উদারতা দেখা গেল না। যদি দেখা যেত, তাহলে হয়ত আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে যেত। ইনদোনেশিয়া যদি প্রাচীন ভারতের আদর্শে এখনও এতটা অনুপ্রাণিত হতে পারে, তাহলে আমরাই বা কেন বর্তমান ইনদোনেশিয়ার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারব না?

❋

এবার 'রবীন্দ্র সদনে' ঢুকে একটি জিনিস নজরে পড়ল, যার উল্লেখ না করে পারছি না। চমৎকার বাড়ি, চারদিক ঝক-ঝকে তকতকে, সুবেশ-সুবেশাদের আনা-গোনা, কিন্তু কাগজের কুচি কিংবা সিগারেটের টুকরো ফেলার জন্যে থামের গায়ে গায়ে নোংরা, রদ্দি মার্কা সার সার টিন—ভাঙা, তোবড়ানো।

আশ্চর্য, প্রায় অর্ধ কোটি টাকা খরচ হল বাড়ি বানাতে, আর শেষ শেষ টান পড়ল কিনা আবর্জনা ফেলার সুদৃশ্য কোন পাত্র কেনার টাকার বেলায়!

চাণক্য

ত্রিলোচন কলমচি

দুরারোগ্য নিকেতন

গোটা দুনিয়াটাই যখন হুলুস্থুলে ভর্তি হতে চলেছে তখন পৃথিবীর সদর অন্দর সবই তো হাসপাতাল! খবরের কাগজের পাতা খুললে যত বড় অ্যাটলাস চোখে পড়ে সবটা জুড়ে শুধু অগ্নিকাণ্ড আর রক্তপাত, সংজ্ঞাহীনতা আর মৃত্যু। ইতিহাস মানেই পোস্ট মর্টেম আর ডেথ-সার্টিফিকেট। অপারেশন থিয়েটার আর জলসাটা ঘর ছাড়া তফাত বর্তমানে আর কিছু নেই। নিরবচ্ছিন্ন অসুখের মধ্যে অকাল নিমজ্জিত রয়েছে সবাই।

তবু পৃথক করে হাসপাতাল গড়েছে মানুষ। পাগলাগারদ কিংবা চিড়িয়াখানা। সব বাড়িতেই কুকুর আছে তবু যেমন কোনো কোনো গৃহস্বামীর আত্মঘোষণা 'কুকুর হইতে সাবধান' দেখতে পাওয়া যায়। কোনো একটি কলেজের সোস্যালে গান শুনেছিলাম:

শত কলেজ জন্মদাতা আজব শহর কলিকাতা
তাহার মাঝে আছে কলেজ
সব কলেজের সেরা
অসুখ দিয়ে তৈরি সে যে
ওষুধ দিয়ে মোড়া।

এ হেন কলেজ-হাসপাতাল দিয়েই আমার লেখার পর্ব শুরু হল। হাসপাতাল থেকে তিন জাতীয় চিজ (আমার বর্তমান লেখাটি বাদেই) বেরোয়—ডেড বডি, ডক্টর অ্যান্ড ডাম-ফুল। উক্তিটা অবশ্য জনৈক অভিজ্ঞতা রসিকের। আমি অবশ্য অতটা রসিক নই, তাই অমনধারা ব্যাজস্তুতি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু জানি, who suffers from good health তাকেই ডাক্তার বলে। তিনি নিরস্ত্র নাড়িটেপা ফিজিশিয়ান হতে পারেন কিংবা ছুরি কাঁচি শানিয়ে সার্জন। শুনেছি, উভয়ের মধ্যে আবার মিলমিশ খুব নাকি মধুর নয়। আমার পরিচিত এক সার্জন ভদ্রলোককে ডায়োজেনেসের পথে আসার কারণ শুধিয়েছিলাম। তিনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন,

...who suffers from good health..

yes. I often stab people but never in the back. as they invariably do in the clinics.

স্পাইনাল অপারেশনের সময় কোথায় ছুরি চালান সে প্রশ্ন করে আর চটালাম না। মেডিক্যাল কলেজের কবির লড়াই মনে পড়লো, ফিজিশিয়ান-কবি গাইছিল:

ওই যে হোথায় বসে আছেন
পরামাণিক দাদা,
ছুরি কাঁচি শানিয়ে নিয়ে
গোঁফ করেছেন সাদা।

সুতরাং স্বভাবতই যারা মিকশ্চার-মলম-ট্যাবলেট বেচে বড়লোক হয়েছে, থার্মোমিটার পড়ে, প্রেসার মেপে, প্রেসক্রিপশন-লিটারেচার লিখে কিংবা স্টেথোস্কোপে সাউন্ডমিউজিক শুনে যারা ফেমাস হয়েছে তাদের ওপর এনারা নিশ্চয়ই প্রসন্ন থাকবেন না। সার্জারির কথাটা নাকি এসেছে গ্রীক শব্দ cheiraurgia থেকে, একে দু টুকরো করলে cheir (=হাত) এবং ergon (=কাজ) এই দুই মশলা পাওয়া যায়, অর্থাৎ কিনা কথাটার মতলব, হাতের কাজ। তা সাঁটা, সেলাই, ফোঁড়াই, জোড়াই—এই তিন নিয়েই তো সার্জারি। যে ছেলে যত সূচী-কর্মে-রিপুকর্মে নিপুণ আর জোড়তে-ফোঁড়তে দক্ষ হয় সে হয় তত বড় সার্জন। ছুরি কাঁচি ছুঁচ—এই ত্রয়স্পর্শেই তার বাহাদুরি।

লাইফ অ্যান্ড ডেথের মধ্যে সবচেয়ে শর্টকাট ওয়ে হচ্ছে সার্জারি। হয় বাঁচা নয় মরা, হয় এস্পার নয় ওস্পার, কোনো বিকল্প নেই। অপারেশন থিয়েটারে আসন পেতে হলে তাই আগে টিকেট কাটো, আগে বন্ডে সই করো পরে টেবিলে শোও। চেস্ট কার্ডিয়াক কিংবা অ্যাবডোমেন—যাতেই ছিদ্র দাও না কেন, অপারেশন হচ্ছে ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক। ফার্স্ট ইনসিসনের পর থেকে যত দূর এগোবে, স্কিন-ফ্যাট-টিসু-মাসল-ভেন-আর্টারি ভেদ করে, অপহৃতা সীতার ফেলে যাওয়া পথনির্দেশের মত ক্লিপ, ক্ল্যাম্প, টাওয়েল, রিট্র্যাক্টর, স্ক্যালপেল, ফরসেপ, সিজর ছড়াতে ছড়াতে—ফেরার সময় আবার মোগলাই রীতিতে সব সোনাদানা কুড়িয়ে আনতে হবে সেই একই পথে। সেলাইয়ের সেলাম রাখতে রাখতে। কারণ ভালো সার্জন তাঁর পেশেন্টের অভ্যন্তরে বরং ভিজিটিং কার্ড রেখে আসতে রাজী তবু কোনো যন্ত্রকে সুভেনির নয়। তবুও পরবর্তী এক্সপ্লোরেশনে পূর্ববর্তী যন্ত্রের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এমন খবর খবরের কাগজে প্রায়ই বেরিয়ে থাকে।

কিন্তু প্রফেশনাল জেলাসিও কাজ করে হায় প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গ এলে। মেডিক্যাল কলেজ আর আর জি কর-এর মধ্যে তো আন-ডিক্লেয়ার্ড যুদ্ধই চলেছে। ছাত্র থেকে শিক্ষক, ডাক্তার থেকে নার্স সকলের মধ্যেই রোগটা সংক্রামিত। বাগে পেলে মেডিকোকে (মেডিক্যাল কলেজ) খালু (খাল পারে আর জি কর) এক হাত নিয়ে নেয়, আবার মেডিকোও বদলা নিতে ভোলে না। দেখা-দেখি কম্বেল (ক্যাম্পবেল) আর ন্যাশিট (ন্যাশনাল) আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাতের লেখাকে দুর্গম করে তোলা ডাক্তারদের সাধনা। নইলে যাবতীয় দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরওয়ালা ছেলেমেয়েরা কি করে এক লাইনে এসে জড়ো হয়! ডাক্তার যা লেখেন তা তাঁরা দ্বিতীয়বার পড়েন না, এ শুধু কেমিস্ট ড্রাগিস্টের দোকানগুলোতেই যে সব

সময় ওই অবাস্কিয়োর প্রেস্‌ক্রিপশন পড়ে থাকে তাতেও সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলেন, Shake the prescription before use লেখা থাকলে ভালো হয়, অক্ষরের জট তাতে ছাড়তে পারে। আসলে ওটি হচ্ছে ডাক্তারদের গুহ্যসাধনতত্ত্ব, অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্ত। তাই বেশী আলো লাগলে যেমন ওষুধ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি বেশী নজর লাগলে দাওয়াইপত্র। সন্ধ্যা ভাষায় লেখা ওই প্রেমপত্র আসলে দুজনের জন্যে লেখা, যে লিখবে এবং যার উদ্দেশ্যে লিখবে। 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' আর কি! তা ছাড়া, আর একটি মস্ত বড় লাভ, হাতের কাছে মেডিক্যাল ডিকশনারী না থাকলেও স্পেলিংপ্রুফ হওয়া যায়। 'ভাওয়েল-ডিফিসিয়েন্স' আর 'কনসোন্যান্ট-ইনফ্লেমেশনে' ওষুধের আধুনিক বদনাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

বাংলা দেশের যে কোনো মফস্বল শহরের রাস্তায় এখন এভ্‌রি ফিপথ ম্যান—বেকার নয়, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওয়েল-সুটেড, ওয়েল-বুটেড এবং ওয়েল-রুটেড অমানুষিক সশ্রী চেহারার কাউকে যার পেটেন্ট লেদারের রাশভারি ব্যাগ হাতে

চলতে-ফিরতে দেখেন তাহলেই বুঝবেন তাঁরা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। এনসাইক্লোপিডিয়ার এক একখানা জীবন্ত মুখপত্রের মত তাঁরা এসেছেন ডাক্তার অন্বেষণে। এই টুরিস্ট লোক্‌চারারের দল খানিকটা খোসগল্প করে উঠে যাবার সময় রেখে যান রঙ-বেরঙের কি-হোল্ডার, রুটার, পেপার ওয়েট, ডট্‌পেন, ডায়েরী ইত্যাদি উপহার এবং তৎসহ নমুনা-মার্কা-দেওয়া ওষুধপত্র।

খবরের কাগজের পাত্রপাত্রী কলমের বিজ্ঞাপনের ভাষায় আজ পর্যন্ত পয়লা সারিতে আছে ডাক্তার এবং এঞ্জিনিয়ার। আমাদের সমাজে এই দুই পুরুষের চাহিদা দেখে মনে হয় সব মেয়েই মনে মনে মালা গাঁথছে এদের জন্যেই। যদিও মেয়েদের মধ্যে অনেকেই, আমার ধারণা, ডাক্তারকে পছন্দ করলেও ডাক্তার স্বামী পছন্দ করে না। পাবলিসিটি ভালোবাসলেও পাবলিক ম্যানকে (ফিল্ম স্টার ছাড়া) ভালোবাসা, মানে স্বামী হিসেবে কামনা করা অনেকের পক্ষেই শক্ত। যে স্বামীর ওপরে বাইরের মানুষের হোলটাইম দাবি, যে স্বামী নার্সদের মত পরিপক্ক রমণীলোকে বিচরণ করে এবং যার জামাকাপড়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে হাসপাতালের গন্ধ লেগে থাকে তাকে স্ট্যান্ড করা একটু শক্ত নার্ভের দরকার। তবু প্রতি বছর দলে দলে ছাত্র দৌড়য় মেডিক্যাল কলেজে নামের লিস্টি বেরোলো কিনা দেখতে। হাসপাতাল তাদের কাছে আরব্য উপন্যাসের মত। ডাক্তার তাদের কাছে হিন্দী ফিল্মের হিরো। কবে তারা মড়ার ওপর চকাচক চাকু চালিয়েই জ্যান্ত মানুষের দিকে ধাবিত হবে, কবে স্টেথোরমালা গলায় দিয়ে ছ' মাসের কিন্ডিং খেটে বেরিয়ে আসবে এ স্বপ্ন কে না দেখে!

কিন্তু ছেলেকে ডাক্তারী পড়তে পাঠানো আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারা একই কথা, আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে। ছেলেকে এই লাইনে লায়েক করতে যে পরিমাণ রসদ যোগাতে হয় তার চেয়ে এক-একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঝক্কি পোহানো অনেক সহজ।

মাস মাস হাত-খরচা আছে। থান ইটের মত এক-একটা বই কেনা আছে। ছেলে কিন্তু ফুর্তিতে আছে। আপনাকে বিনীত নিবেদন জানিয়ে পত্রপাঠ পাঁচশোটি টাকা পাঠাতে লিখলো। কিনা জরুরী প্রয়োজন, দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব কিনতে হবে। আপনি ধার-দেনা করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাঠালেন। আপনি কি আর জানেন, ও টিউব পৃথিবীর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, ঈশ্বর রমণীলোকে দয়াপরবশ বিতরণ করে থাকেন!

সারা বছর ইধার-উধার করে, অ্যানাটমি পরীক্ষার আগের দিন সেই সিওর-সাক্‌সেস টিপসের জন্য, নানা জায়গায় ধরনা। কোনো এক হাসপাতালে, নাম বলবো না, এই সিজিনে King-ডোম দু-পয়সা লোটে। পরীক্ষার আগের রাতে তার কোচিং ক্লাস, পার হেড দু' টাকা। পরদিন প্রভাতে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষায় আসবে তিরিশ বছরের ধুরন্ধর ডোমের তা নখদর্পণে রয়েছে।

ওয়েল-বুটেড এবং ওয়েল স্যুটেড

রোগের জন্য যদি আছেন ডাক্তারবাবু, রুগীর জন্য আছেন নার্স। ডাক্তারী বিধান অনেকটাই পথ্যে এবং কিছুটা ওষুধে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তাঁরাই। ব্যাণ্ডেজ বদলাতে, ইঞ্জেকশন দিতে, বেডহেড টিকেট আপটুডেট রাখতে এই নার্স, গ্লুকোজ-স্যালাইন-ব্লাড দেহে অবিরাম ইম্পোর্ট করা কি ক্যাথেটার চালিয়ে দেহের অন্তস্তল থেকে অবাঞ্ছিত ফ্লুইড এক্সপোর্ট করা হচ্ছে, প্রহরী কে আছে? এই নার্স। কন্ডিশন সিরিয়াস, অক্সিজেন তুলে ধরো রুগীর নাকে-মুখে, কাবার হয়ে গিয়েছে তো এক্স-পায়ারী রিপোর্ট পাঠাতে হবে হাউস-সার্জনের কাছে; আর যদি আর একটু সময় থাকে, সিচুয়েশন গ্রেভ তবে কল-বুক পৌঁছে যাক যথা জায়গায়।

অপারেশন থিয়েটারে একেবারে স্টেজে মারবেন ডাক্তারবাবু কিন্তু সেট সাজানোর দায় নার্সের অ্যাপারেটাস সাজানো, অপারেটিং ফিল্ড পেণ্ট করা, স্টেরিলাইজার থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছুরি-কাঁচি-ছুঁচ বের করে রাখা ট্রলির ওপরে। সার্জনদের গ্লাভস এগিয়ে দেওয়া, গাউন পরতে সাহায্য করা, মুণ্ডু ঘুরিয়ে মাস্কের ফিতে বেঁধে দেওয়া সবই তাঁদের পটিয়সী আঙুলের কর্ম। অপারেশন সাক্‌সেসফুল করতে হলে যেমন একজন অভিজ্ঞ অজ্ঞানবাবু (Anes-thetist) চাই তেমনি চাই একজন ভালো প্রম্পটার, যিনি প্রতিমুহূর্তের আগাম কথার মতই নির্ভুল যন্ত্রপাতি যুগিয়ে যাবেন সার্জনের প্রসারিত করতলে। প্রায় ঘুষের মতই নিঃশব্দ মসৃণ অবধারিত-ভাবে। এই কারণেই কিনা জানিনা, ডাক্তাররা অনেক সময়েই সহচরী নার্সের পাণিপ্রার্থী হয়ে থাকেন।

সমস্ত স্থলে কাজগুলিই অত্যন্ত হালকা ছন্দে, স্মিতহাস্যে, কথা বলে কিংবা না বলে হাসিল করে যাচ্ছেন নার্স। ছিমছাম চেহারা, শুভ্র সুন্দর পোশাক, কাপড়ের কুঁচি এবং মাথার আবরণ আশ্চর্য বয়ন রীতিমত তাকিয়ে দেখার জিনিস। তবু তাঁদের নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই। ডাক্তার এবং নার্স মিললেই একটি কাহিনী। পেশেন্ট-নার্স মিললে উপন্যাসের প্লট। নার্স হচ্ছেন রোমান্সের মুক্তাঙ্গনের নায়িকা। মুখরোচক পরচর্চায় যাঁরা অত্যুৎসাহী, অন্তত তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই। কারণ, পেয়িং হোক আর নন-পেয়িং হোক, দিবসরজনী-উদয়াস্তের শয্যাপ্রসঙ্গিনী এই নার্স।

তবু অভাবের জন্যই নার্স এসেছেন চাকরি করতে। সবাই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নয়। হাসপাতালে যতক্ষণ ডিউটি, ততক্ষণ তাঁদের নিজেদের স্বামী-সংসার ছেলেপুলে আছে মনেই হয়না। তাঁদের নিজেদের অভাব-অসুখ-সমস্যা আছে অন্যে কে ভাবে সে কথা। জনতার অভাব-অভিযোগ আর মনোযোগ কুড়োতে কুড়োতে সিজিন্ড সেগুন হয়ে গিয়েছে নার্সের মন। সেখানে সাদা ছাড়া সত্যিই আর কোনো রঙ অবশিষ্ট নেই।

[illegible] আগের রাম ও সীতা

দিল্লির ডায়েরি

সূর্পনখার নাক কাটা গেল, যুদ্ধ হল রাম রাবণের। আর আমরা পেলাম মহাকাব্য রামায়ণ। নাক না কাটা গেলেও হয়তো রাম-রাবণের যুদ্ধ, কারণ সূর্পনখা তো নিমিত্ত মাত্র, বিধাতার নির্দিষ্ট একটি ঘুঁটি [illegible]। ঐ তো বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ। সূর্পনখা ছিল না, ছিল আধুনিক যুগোস্লাভিয়ার সারাজিভো শহরে এক যুবক [illegible]। সে গুলি করে হত্যা করল একটি দম্পতি, আর লেগে গেল পৃথিবী-জোড়া মারামারি কাটাকাটি। জার্মানীর হিটলার [illegible] পোলাণ্ডকে ১৯৩৯ সনে: "বাপু, [illegible] একটা বন্দর চাই, নাম ডানজিগ। [illegible] হবে তো—"। লেগে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যার জন্যে চালের দাম পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা মণ আজ।

অর্থাৎ সূর্পনখার অভাব হয় না যদি [illegible] থাকে আর থাকে রাবণ। ন্যায় আর অন্যায়ের যুদ্ধ হবেই হবে। সেদিন ফিরোজশা কোটলার মাঠে মাথায় হিম লাগাতে লাগাতে চক্ষু স্থির করে দেখছিলাম সূর্পনখার নৃত্য: রূপসী সূর্পনখার। সে [illegible] ভোলাতে চাইছে একবার রামচন্দ্রের আরেকবার লক্ষ্মণের, আর বেরসিক, আত্ম-পীড়নপ্রিয় রামানুজ রেগেমেগে (ফ্রয়েড কী বলবেন?) কেটে ছিল রূপসী সূর্পনখার নাক! তখন কপালমন্দ নৃত্যময়ী সূর্পনখা হলেন একটি পূর্ববঙ্গের মেয়ে রেখাশংকর, তিনি নাচেন ভাল, অভিনয় করেন ভাল আর [illegible] গান। "অপূর্ব" সূর্পনখা (তার [illegible] লোকেরা তাকে অনেক সময় "অপূর্ব" [illegible] ডাকে) যখন ভ্রাতা রাবণের কাছে [illegible], তখন কিন্তু আর মায়াবী রূপসী নয়, [illegible] রাক্ষসী তখন। হয়তো সে জানতো যে রূপসী নাক-কাটা হয় না; নাক কাটলেই সে রাক্ষসী!

আপনাদের ভিতরে যারা রামায়ণ ব্যালে দেখেছেন রাজধানীর ফিরোজশা কোটলা মাঠে, তাদের অনেকেই হয়তো চেনেন না আমাদের সূর্পনখাকে, রাম সীতা আর রাবণকে, আর তাদের যারা রূপ দিয়েছেন ঋষি বাল্মীকির মহাকাব্যকে আবার আপনার আর আমাদের সন্তানদের উপযোগী করে। তাদের সংগে আলাপ পরিচয় করে ভাবলাম, এবার আপনারাও তাদের চিনুন। কারণ এই ৪০।৫০ জন নারী-পুরুষ আজ দশ বৎসর যাবত শিল্পানন্দ আর শিক্ষা দিয়ে আসছে হাজার হাজার দেশবাসীকে।

নৃত্যনাট্যটির নাম—হরী নৃত্যনাট্য নটকি, —তার নাম রামায়ণ। বৃদ্ধা পিসিমার কাছে আমরা সুর করে পড়েছি। বিহার আর উত্তর প্রদেশে এখনো তারা সুর করে পড়েন তুলসীদাসের রামায়ণ।

সেই রামায়ণকে চমৎকার সুর দিয়ে বেঁধেছেন কয়েকজন শিল্পী, যাঁদের ভিতর প্রধান হলেন সুরশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর শ্রীনরেন্দ্র শর্মার অনেক গুণের অধিকারী নরেন্দ্র শর্মা। সংস্থার নাম হল "ভারতীয় কলাকেন্দ্র"। প্রতি বৎসর [illegible] সময় এদের শিল্পী-শিল্পীকারা ধর্ম-ভক্তির রামায়ণকে মূর্ত করেন নৃত্য-গীত-বাদ্য ও কথার মাধ্যমে। আজ অবধি এর জুড়ি ভারতে নেই—একটা সামগ্রিক নৃত্য-নাট্য রূপ, একটা মহাকাব্যের এমন রূপ-পরি-বেশন যে ছোট বড় ভারতের সকল সন্তানই তা বুঝতে পারে।

এই নৃত্যনাট্যটি প্রথমবার মঞ্চস্থ হল ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সন। প্রেরণা পেল দেবেন্দ্রশংকর আর গুরু গোপীনাথের কাছ থেকে। তারপর এলেন নরেন্দ্র শর্মা। এ বছর থেকে ডাইরেক্টার হলেন কলকাতার [illegible], ইনডিয়ান রিভাইভেল সেন্টারের নেতারূপে তিনি একদা সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে-দুটি ব্যক্তি এই সার্থক শিল্প-প্রয়াসের পেছনে আছেন তাঁরা হলেন সংগীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর নৃত্যবিদ নরেন্দ্র শর্মা। নরেন্দ্র হলেন উদয়শংকরের শিষ্য, আলমোড়া কেন্দ্রের ছাত্র। এবং আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রাজধানীর এই বিরাট শিল্প প্রয়াসের

রাম ও সীতা চলেছেন বনবাসে দর্শকদের মধ্য দিয়ে—যাদের মধ্যে আসীন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ

পিছনে বাঙালীর অবদান সব চাইতে বেশি। এ বছরের ৪০।৫০ জন শিল্পীর ভিতর প্রায় অর্ধেক হলেন বাঙালী, গানে নাচে আর বাজনায়।

প্রায় তিন ঘণ্টার প্রোগ্রাম। কিন্তু ছোট বাচ্চারাও চোখ বোজে না। কী গান, কী সে বাদ্য, আর নৃত্য-সমারোহ! খুবই অপূর্ব হল একটা কথা যে, গোটা নৃত্য-নাট্যটির ভিত্তি হল তুলসীদাসের রামায়ণ, তাঁর দোঁহা আর চোপাই, মার্গ সংগীত আর লোক সংগীতের রূপে ঢালা। বললেন আমাদের মৈত্র মশায়, যিনি অনেকের কাছে হলেন "বটুকদা": আমি বলেছিলাম, তুলসীদাসের দোঁহাকে দেব সুর। দেব নাট্য-কথারূপ। কেন হবে না, হল, শেষটায় হল, বুঝলে, সমস্ত সন্দেহ আর দ্বিধা জিতে হল তাই। শুনেছ তো: পরশুরাম বলল—"বহুরি বিলোকি বিদেহীসন,

কাহাহু, কাহে অতিভিড়?

কহু জড় জনক ধনুষ কাঁহি তোড়া?"

কে ভেঙেছে হরধনু? কেন এতো গোল? কী ব্যাপার?

সুর দিয়ে সার্থক করলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর নৃত্যে রূপ দিলেন নরেন্দ্র শর্মা। "রামায়ণ" ভরা অনেক রাগ-রাগিণী: ভায়রো, গুণকেলি টোড়ি, দরবারি কানাড়া, মালকোশ, চন্দ্রকোশ, কাফি, ভৈরবী। অনেকক্ষেত্রে মিশ্রাকারে। সঙ্গে অনেক যন্ত্র: সেতার, এসরাজ, তার সানাই, সরোদ কাষ্ঠতরঙ্গ, গাবুগুবা, একতারা, বেহালা,

বাঁশী, ঢাক, ঢোলক, খোল, পাসা, কাড়া, নাকাড়া, ঘণ্টা, ঝাঁঝ (একেবারে জাভা দ্বীপের নিনাদময়ী ঝাঁঝ)।

আর ঐ সংগে কণ্ঠসংগীত মেলান, তুলসীদাসের দোঁহা-চোপাই নিয়ে, মার্গ সংগীত আর লোক সংগীত (কীর্তন, আলহা, কাজ্‌রি, পূর্বাইয়া, পাহাড়ি ধুন) মাধ্যমে প্রায় দশজন, যাদের ভিতর আছেন ঋত্বিক দা, ঘসির আমেদ, শেলি দত্ত, আশা ভেলেনটাইন, করুণা ভাদুড়ি। বাজনায় আছেন : সুশীল দাশগুপ্ত, ঐকতান পরিচালক; বরুণ গুপ্ত, দিনেশ দেবনাথ, মহম্মদ আলি, শের আলি, শংকর যাদব ইত্যাদি।

সকলের মিলিত প্রয়াস রূপ নেয় রামায়ণ নৃত্য-নাট্যে। সুপুরুষ রামচন্দ্র সাজেন পূর্ববঙ্গের হীরেন্দ্রলাল কুণ্ডু। আজ আট বছর আছেন এই কলাকেন্দ্রে। ছোট্ট তাঁর বাসা আরউইন হাসপাতালের কাছে, থাকেন সস্ত্রীক। অনেক কাল ছাত্র ছিলেন উদয়-শংকরের গুরু গোপীনাথের আর প্রথম দিকে প্রলয় গুহ মশায়ের। নিজের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে, হাসারা গ্রামে। বললেন আমাকে : "বাবা কিছুতেই চাননি আমি এই গান-বাজনা-নাচের লাইনে যাই। কিন্তু গেলাম তো।" ইনি উদয়শংকরের সংগে অনেক জায়গা দেখেছেন। শেষে রবীন্দ্র-ভারতী থেকে তিন বৎসরের শিক্ষাও নিয়েছিলেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন : "গোটা নৃত্য-নাট্যের প্রাণ হল কথাকলি নৃত্যরূপ। তার সংগে মেলান আছে মণিপুরি, ওড়িষি, ভারতনাট্যম, সময় সময় কথক ইত্যাদি। একটা সামগ্রিক রূপ, যেমনি রূপ দিতেন উদয়শংকর নিজে।"

ওদিকে গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া এদিকে এস।" উনি এলেন, উনি হলেন এখনকার সীতা। ইনিও বাঙালী, বিয়ে করেছেন একজন মহারাষ্ট্র সন্তানকে। আগেরবার সীতা ছিলেন যিনি এবারকার সূর্পনখা—বুঝুন কোথায় সীতা কোথায় রাবণ-ভগিনী। কিন্তু শিল্পীর কাছে রূপ দেওয়াই আসল কাজ। সবই হয়তো সমান।

কেশবন নাম্বুদ্রি সাজেন রাবণ। খুব ভাল তাঁর নৃত্য-কুশলতা। চমৎকার কথাকলি নাচের বিকাশ। লক্ষ্মণ সাজেন রাঘবন নায়ার; দশরথ আর বিভীষণ সাজেন জয়দেব চ্যাটার্জি; কৈকেয়ী সাজেন অনুরাধা দাশগুপ্তা, কৌশল্যা হলেন সরোজ বল, সুমিত্রা হলেন প্রীতি মুক্তি, আর সোনার হরিণ সাজলেন অলোকা পাণিকর, ইনিও বাঙালী মেয়ে।

হাঁ, বলতে গেলে এর জুড়ি ভারতে আর নেই, এই "রামায়ণ" নৃত্যনাট্য, ভারতীয় কলা কেন্দ্রের, যার মধ্যমণি হলেন আমাদের ঋতুকদা, নরেন্দ্র শর্মা, আর জোগসুন্দর।

এবছরের রাম ও সীতা

সকলের সংগে জড়িত বাঙলার কৃষ্টি, শান্তিনিকেতনের প্রভাব। প্রতিদিন শত শত লোক ভিড় করে আসেন ঐ খোলা মাঠে। আমাদের নিজেদের দেশের লোক আর বিদেশীরা। সেদিন আমার বাঁদিকে বসে একজন বৃদ্ধ শিখ। দেখলাম আমার চাইতেও ভাল জানেন রামায়ণ। মনে পড়ল অনেক বছর আগে জাভা দ্বীপে বোরুবদুরে একটি মুসলমান যুবকের কথা। কী-ভাবে সেদিন উনি আমাকে বোঝালেন রামায়ণের কথা, কতো সুন্দর আর সহজভাবে!

রাম-সীতা-রাবণ আর মহাকাব্যের কথা যেন দেখলাম ফিরোজশা কোটলা মাঠে। ভাবলাম, আমরা রামসীতাকে ভালবাসি, ভক্তিও করি। কিন্তু উত্তর ভারতের লোক-দের মতো আজও পুজো করি না। হয়তো আমরা পুজো না-করেই তাঁদের করি আপনার; আর অন্যরা পুজো করে করে তাঁদের আপনার।

নাচ আর গান রামায়ণ অতি সহজে মনে গেঁথে যায়। জন্ম, স্বয়ম্বর, মন্থরা-কৈকেয়ী, রামের বনবাস, গুহক চণ্ডাল, পঞ্চবটি, সোনার হরিণ, সূর্পনখা, রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, জটায়ু, বালি-সুগ্রীব, হনুমানের লঙ্কাদহন, সেতুবন্ধন, সংগ্রাম, মেঘনাদ-লক্ষ্মণ যুদ্ধ, গন্ধমাদন আনয়ন, কুম্ভকর্ণ-রাবণ বধ, আর শেষটায় রামসীতা-লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন।

সাধারণের জন্যে তৈরি বলে, নৃত্যনাট্যটি একটু মোটা ধরনের, পোশাক-আশাক মুখোশ ইত্যাদিতে একটা দেহাতি ভাব। কিন্তু জনসাধারণের কাছে বেশ প্রিয়, তার কারণ রামলীলার জনপ্রিয়তা। বাঙলা দেশে ওটা বুঝা মুশকিল। আমরা শুধু "রাম" বলি; এরা বলেন "শ্রীরামচন্দ্র", "রামজী"। বহুলোকের কাছে "সিয়ারাম" "রামরাম" অভিবাদনের রূপ।

রাজধানীতে রাজনীতির প্রভাব স্বভাবতই

বেশি। এবং অনেক সংস্থা রাজনীতিকদের সামনে রাখলে সুযোগ সুবিধাও অনেক পায়। ভারতীয় কলা কেন্দ্রটির গভর্নিং কাউনসিলের সভাপতি হলেন মন্ত্রী সদোবা পাতিল। কিন্তু আসল পরিচালনা হল লেডি চরত রামের হাতে। সতেরোটি মেম্বারের মধ্যে একজনও বাঙালী নন, যদিও শিল্পের দিকে বাঙালীদের সংখ্যা সব চাইতে বেশি। কলা কেন্দ্র শিল্পীদের দিকে যতোটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত, দিচ্ছে না। নরেন্দ্র শর্মার সংস্থা ত্যাগ কী সূচিত করে বলা কঠিন। কলা কেন্দ্রের অ-শিল্পীরা শিল্পে যদি মাথা না-গলান তাহলেই ভাল।

এই গেল রামায়ণ কথা; আর এই হল সাধারণের "রামলীলা"। ঐ নামেই আজ বিখ্যাত রাজধানীর এই নৃত্যনাট্য। সাংস্কৃতিক পরিবেশে নতুন জিনিস। এখানকার রামলীলা মাঠে তারা শোলার তৈরি রাবণকে আগুন দিয়ে পোড়ায়, আর হাজার জনতা বলে, "জয় সিয়ারাম"। নৃত্য-নাট্যে তাঁদের রূপ আরো অনেক উপভোগ্য। তাঁরা যেন সত্যিকার রাম-সীতা; চিরকালের ন্যায়-মহিমা।

—খগেন দে সরকার

সদ্য স্বরাজ পেলে দেশমর্যাদার চিহ্ন-স্বরূপ সর্বপ্রথমে শুরু করা হয় বিশেষ কয়েকটি প্রকল্প : রাজধানীতে আকাশছোঁয়া একটি প্রাসাদ, শহরের কেন্দ্রস্থলে স্বাধীনতার শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ, স্টেডিয়াম, এয়ার ওয়েজ আর সম্ভব হলে একটা ইস্পাতের কারখানা। অনেক বলবেন, এর সাথে আরও একটি জিনিস যোগ করা উচিত, সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। আফ্রিকার অনেক দেশের পক্ষে কথাটা খাটে। স্বাধীনোত্তর আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আজ পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়ায় ১টি, সিয়েরা লিওনে ২টি, ঘানায় ৩টি ও নাইজেরিয়ায় ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ব-বিদ্যালয় কলেজ রয়েছে। মধ্য আফ্রিকার জাম্বিয়া (পূর্বতন উত্তর রোডেশিয়া) ও মালাবি (পূর্বতন নায়াসাল্যান্ড) একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে। আর পূর্ব আফ্রিকায় কেনিয়া, উগান্ডা ও টানজানিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সোপান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসী ভাষী আফ্রিকায় অবশ্য স্বাতন্ত্র্যের জয়পতাকা উড়িয়ে প্রতি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়নি। এ মহা-দেশে ফ্রান্সের পূর্বতন উপনিবেশগুলিতে ফরাসী প্রভাব এখনও যথেষ্ট : বড় বড় কোম্পানীর মালিক ফরাসীরা, পুলিস ও সেনাদলে ফরাসী উপদেষ্টা, স্কুল কলেজের পরিচালনায় ফরাসী মিশনারী, এমন কি একটু বড় দোকানগুলিতে মালিক-কর্মচারী ফরাসী; এবং ক্রেতা-সাধারণের সঙ্গে তারা ফরাসী ভাষাতেই 'পার্লে-ভু' করে থাকে। একদা ফরাসী সাম্রাজ্যের যখন জয়জয়কার তখন মুষ্টিমেয় আফ্রিকানদের ফরাসী বানাবার প্রচেষ্টা চলেছিল। আজও যথা-পূর্বম্ এসব দেশের বহু তরুণ-তরুণী ফ্রান্সে শিক্ষা পাচ্ছে। স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ গড়তে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয় চেতনার লালন-কেন্দ্র হিসেবে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব এসব দেশে এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত। তাছাড়া এমন অনেক ফরাসীভাষী দেশ স্বাধীন হয়েছে যাদের তহবিল প্রায় শূন্য, যারা ছিটেফোঁটা জমির মালিক কিংবা জনসংখ্যা যাদের বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীদের চেয়ে কম। এসব দেশের পক্ষে শ্বেতহস্তীপোষার মত বিশ্ববিদ্যালয় চালানোও দুরূহ। তবু গত এক দশকের মধ্যে দাকার (সেনেগাল), আবিজান (হস্তিদন্ত উপকূল), ব্রাজাভিল (কঙ্গো-ব্রাজাভিল) ও তানান রিভ (মালাগাসী) শহরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হয়েছে। গিনি, মরিতানিয়া আর দাহোমে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে নয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পত্তন করবে। ফিরিস্তি এখানেই ফুরোয় না। পূর্বতন বেলজিয়ান উপনিবেশ কঙ্গোতে যত বিদ্রোহ হোক তিন তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে চলছে। তার মধ্যে একটা হল বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় লুভ্যাঁ-র শাখা। তারপর সাহারা পেরিয়ে আছে উত্তর আফ্রিকার রাবাত, ফেজ, টিউনিস, কায়রো ও আলেক্জান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এক কায়রোতেই তো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি ইসলামীয় শাস্ত্র ও আইন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য-চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠকেন্দ্র হাজার বছরের পুরোনো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি হল আমলের কায়রো বিশ্ব-বিদ্যালয় আর অন্যটি হল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় (বেইরুটের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয়)। আর একটু দক্ষিণে রয়েছে সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারই পূব ঘেঁষে সমুদ্র থেকে ৮,০০০ ফিট ওপরে ইউক্যালিপটাস বনঘেরা আদ্দিস আবাবায় হাইলে সেলাসি বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় রোডেশিয়ায় একটি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের অর্ধ-ডজন বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য এদের আলোচনা বাদ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের কলরবমুখরিত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে আফ্রিকার কোন একটি নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়লে চমকে যেতে হয়। প্রথমে প্রবেশপথে দোতলা বাড়ির মত উঁচু সিংহদ্বার। পয়সা ও প্রতিভার মিলনে তার স্থাপত্য নানান ধরনের হতে পারে। ঘানার কুমাসি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার তো প্রাচীন আশান্তি-রাজের সিংহাসনের মত করে তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশান্তে আপনি দেখবেন ক্যাম্পাসের ডানা-মেলে-দেওয়া উদার বিস্তৃতির বুক চিরে চলে গেছে সুপ্রশস্ত রাজপথ, যার মাঝখানে ঘাসের কেয়ারি আর দুপাশে গাছের সারি কোথাও শাল, কোথাও নারকেল, কোথাওবা কৃষ্ণচূড়া। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, ছাত্র-ছাত্রীদের 'হল', খেলার মাঠ, অধ্যাপকদের বাংলো, রেজিস্ট্রার ও উপাচার্যের অফিস, পাঠাগার, ডাকঘর, সস্তায় জিনিসপত্র কেনার সমবায় বিপণি বই-এর দোকান (অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরের সবচেয়ে ভাল বই-এর দোকান), হাসপাতাল ও (ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ওষুধ), অধ্যাপক-দের ক্লাব। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ওপর থাকে অন্যান্য আকর্ষণ : গির্জা ও মসজিদ, সুইমিংপুল, মুক্ত অঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ, টেনিস কোর্ট, রেস্তোরাঁ ও বার। নাইজেরিয়ার ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড সরকারী মহাফেজখানা বা আর্কাইভস; ঘানার কুমাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কৃষিক্ষেত্র ও পোলট্রি ফার্ম যেখান থেকে ছাত্র-অধ্যাপকরা সস্তায় তাজা তরি-তরকারি, ডিম ও মাংস পেয়ে থাকেন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভিড় এখানে নেই। অধিকাংশ দেশের লোকসংখ্যা কম। বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার বনিয়াদ এখনও সঙ্কীর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষা ধনীর প্রাসাদে বন্দী। অর্থাৎ ছাত্র কম, শিক্ষক বেশী। শিক্ষক-ছাত্রের উচ্চ সংখ্যানুপাতে অধ্যাপকরা ছাত্র-ছাত্রীদের রোল-নম্বরের অতিরিক্ত ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পান। ঘানার লেগন বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী কোন না কোন অধ্যাপকের অভিভাবকত্বের অংশীদার। অধ্যয়ন, বিষয়-নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ, বাসস্থান ও এই ধরনের সমস্যার কথা সে তার অধ্যাপক-অভিভাবকের কাছে তোলে ও পরামর্শ চায়। কর্তৃপক্ষ ছাত্রটি সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট চাইলে, অধ্যাপক তা পেশ করেন। সাধারণত সব ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে থাকার জন্য তাদের মধ্যকার পরিচয় গভীরতর হতে পারে। 'হল' কেবল দু' রকমেরই হয়, ছাত্রদের ও ছাত্রীদের। লেগনের মেনসা-সার্বা হলে আবার পরীক্ষামূলকভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের একই বাড়িতে রাখা হচ্ছে।

ছাত্রদের মত অধ্যাপকরাও ক্যাম্পাসের বাসিন্দা। এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের বাংলো সুষ্ঠু পারিপাট্যের প্রতীক। ইংরাজী যেখানে শিক্ষার বাহন, সেখানে ইংরেজ অধ্যাপকদের বাহুল্য। ফরাসী-ভাষী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফরাসী অধ্যাপক-দের ওপর নির্ভরশীলতা বোধ করি আরো বেশী। তবু আফ্রিকার এইসব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী যেন এক একটি ক্ষুদে রাষ্ট্রসংঘ। কেপকোস্টের কথা বলি। এখানকার অধ্যাপকরা এসেছেন এইসব দেশ

থেকে : বৃটেন, আয়ার প্রজাতন্ত্র, হল্যান্ড ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ক্যানাডা, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ঘানা, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরায়েল, পাকিস্তান, সিংহল ও ভারতবর্ষ। এদের মধ্যে আছে ইংল্যান্ড, ক্যানাডা ও আমেরিকা থেকে ১ বছর কি ২১ মাসের জন্য আগত স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক। আছে ইউনেস্কো প্রেরিত এক্সপার্ট এবং অন্যরা। ভাইস-চ্যান্সেলারের পার্টিতে গাউন ও শাড়ি মার্কিনী কাট আর ঘানার 'কেণ্ট'র কোলাকুলি।

গত এক দশকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান থেকে বহু অধ্যাপক এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। পাকিস্তানীরা প্রায় সকলে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশীয় ও মালয়ালীরা প্রধান। এ'দের প্রায় সকলের বিদেশী ডিগ্রী রয়েছে। কেউ কেউ দেশে নামকরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। এত সত্ত্বেও ইওরোপীয় বিশেষ করে বৃটিশ, সহকর্মীদের উন্নাসিকতা তাঁদের কিছুটা সহ্য করতে হয়। এতদিন এইসব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইওরোপীয়দের একচেটিয়া বিচরণ ক্ষেত্র। এখন এশীয়রা রবাহূত হয়ে ভিড় করছে। অনেকে প্রধান অধ্যাপক এমন কি বিভাগীয় অধ্যক্ষ পর্যন্ত হচ্ছে। একজন ইংরেজকে কি করে একজন ভারতীয়দের অধীনে কাজ করতে বলা হয়।

ওদের চোখে ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকার কারণ আছে। আফ্রিকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে ইওরোপীয় ধাঁচে গড়া। ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসূরী গোল্ডকোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে ফেলে সাজা হয়েছিল। কর্মকর্তাদের নামকরণ এখনও অনুরূপ আছে : হল-মাস্টার, সিনিয়র টিউটর, চ্যাপলেন, ভোজনকক্ষে অধ্যাপকদের জন্য উঁচু টেবিলের স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি। কেম্ব্রিজের মত হলগুলিতে ছাত্রদের ফী নেওয়া হত। খেতে বসার আগে লাতিন বাইবেল থেকে উপাসনা করা হত। এমন কি যে দেশে এত অখৃষ্টান সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্মগুলির নামকরণ হয় মিকেলমাস, লেন্ট ও ট্রিনিটি। অনুরূপ ইওরোপীয় অনুকরণ আফ্রিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়েছে। শুরুতে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শাসক দেশের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে "বিশেষ সম্পর্কে" সম্বন্ধিত হয়ে তার ইনটেলেকচুয়াল আওতায় বেড়ে উঠেছে। নাইজেরিয়ার ইবাদান ও ঘানার লেগন বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অকাদেমীয় তত্ত্বাবধানে। সিয়েরা লিওনের ফুরা বে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে "বিশেষ সম্পর্কে" যুক্ত আছে। এমন সম্পর্ক রয়েছে দাকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারী ও বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, কঙ্গোর কিনসাসা (পূর্বতন লেওপোল্ডভিল) শহরের কাছে লুভেনিয়ুম বিশ্ববিদ্যালয় ও বেলজিয়ামের লুভাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে।

পরবর্তীকালে অবশ্য এরকম অকাদেমীয় অছিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে। ফলে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কোন ইওরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাকরেদী না করে সোজাসুজি নিজেরা ডিগ্রী দিতে শুরু করেছে। মালাবি ও জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এদের মধ্যে অন্যতম। অন্য কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আবার ইওরোপ ও আমেরিকার বিশেষ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ। এমন সহযোগিতার মাধ্যমে তারা অধ্যাপক ও গবেষক বিনিময় করে এবং কখনও কখনও লাইব্রেরীর বই ও ল্যাবরেটরীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও পেয়ে থাকে। পূর্ব নাইজেরিয়ার নসুক্কা বিশ্ববিদ্যালয় মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ স্থাপন করেছে।

বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতেও ইওরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রায় সর্বত্র ইংরজী এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য, লাতিন ভাষা ও সাহিত্য এবং তৎসহ রোমান ইতিহাস এমন কি কখনও কখনও গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য এবং গ্রীকদর্শনের পঠন-পাঠন হয়। ইবাদনের মত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। এবং অন্তত কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মূলত খৃষ্টধর্মের চর্চাই এখানে হত। অথচ শুরুতে অনেক ক্ষেত্রে পাব্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জিওলজি বা ভূবিদ্যা, অর্থ বিজ্ঞান এবং নৃ ও সমাজ বিজ্ঞান উপেক্ষিত হয়েছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা এখনও কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকান ভাষা (এমন কি আরবী, হাউসা ও সোয়াহিলি পর্যন্ত) ও সংস্কৃতি পঠন-পাঠনের আয়োজন অপ্রতুল।

গত কয়েক বছরে অবশ্য রাজনীতির "পরিবর্তনের ঝড়" বিশ্ববিদ্যালয়ের গজদন্তমিনারে এসে ধাক্কা দিয়েছে। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এখন আফ্রিকান। এবং প্রতি বছর বুদ্ধিদীপ্ত আফ্রিকান তরুণ তরুণীরা সোৎসাহে অধ্যাপনায় যোগ দিচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রে আফ্রিকার ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি আজকাল ডিগ্রীকোর্সের প্রথম বছরের পাঠক্রমের বাধ্যতামূলক অঙ্গ। ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার ওপরও ক্লাস নেওয়া হয়। আর আশার কথা, উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকান গবেষকরা নিজ নিজ দেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে মননশীল আলোচনায় নামছেন।

এমনি করে অধ্যাপনা পরিচালনা, পাঠক্রম ও গবেষণা প্রভৃতি সব দিক থেকেই এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে পূর্ণ "আফ্রিকায়নের" দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩০।৯।৬৬

অংশু দত্ত

গান্ধীজীর দূত

সুধীর ঘোষ

শান্তির সন্ধানে

গান্ধীজীর দুই কোয়েকার বন্ধু ছিলেন, আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস অ্যালেকজানডার। তাঁদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিয়ে, একত্রে আমাদের এই তিন জনকে তিনি একটা ডাক-নাম দিয়েছিলেন। রাঁডিং রোডের ভাঙ্গী কলোনিতে যখনই আমরা এক সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতুম, কাজ থেকে তিনি মাথা তুলে তাকাতেন, হাসতেন, তারপর বলতেন, "এই যে, এবারে ত্রিমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা বসতে পারো, কিন্তু খবরদার টুঁ-শব্দটি করবে না। সত্যিকারের কোয়েকারের মতন চুপটি করে বস। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ব্যস্ত।" বলে চুপচাপ তিনি আবার কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন। তারপর হাতের কাজ শেষ করে আবার আমাদের দিকে তাকাতেন। চোখের মধ্যে একটু দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠত। বলতেন, "এবারে বলো, ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের কতটা ঘায়েল করতে পেরেছ।"

স্বর্গত সি এফ এনড্রুজ ছিলেন গান্ধীজীর খুবই প্রিয়পাত্র। কোনও ভারতীয়ও সম্ভবত গান্ধীজীর চিত্তের এতটা সান্নিধ্যে আসতে পারেননি। আগাথা হ্যারিসন সেই এনড্রুজেরই বান্ধবী। গোল-টেবিল বৈঠক উপলক্ষে ১৯৩২ সনে গান্ধীজী যখন লনডনে যান, এনড্রুজের মাধ্যমে আগাথা হ্যারিসন তখন গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ নামে কোয়েকারদের একটা ছোট সমিতি ছিল; আগাথা ছিলেন তার সেক্রেটারি। বিখ্যাত কোয়েকার কার্ল হীথ এই সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে হোরেস আলেকজানডার আর জ্যাক হয়ল্যানডের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা কোয়েকার কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাছাড়া ক্যাডবেরি পরিবারের কয়েকজনও ছিলেন এই সমিতির সদস্য। সমিতির কার্যকলাপের মূল কেন্দ্র ছিল লনডনে; ইউসটন রোডের ফ্রেনডস হাউসে। সদস্যরা আদর্শনিষ্ঠ নরনারী; এঁদের কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংস্রব ছিল না। ইংরেজদের এই ছোট্ট গোষ্ঠীটিতে খুবই উঁচুদরের বুদ্ধি ও প্রতিভার সান্নিধ্য মিলত; ধর্ম সম্পর্কেও এঁদের উপলব্ধি ছিল স্বতন্ত্র। কোয়েকাররা শান্তিবাদী মানুষ, সেই কারণেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের একটা বিশেষ যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। গান্ধীজীর অহিংসা আর কোয়েকারদের শান্তিবাদ মূলত একই বস্তু। গান্ধীজীর বিশ্বাসের মূল ছিল হিন্দু ধর্মে নিহিত তার বাস্তবরূপ ছিল রামধুন। রামই তাঁর ঈশ্বর; গানের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী তার মহিমাকীর্তন করতেন। পক্ষান্তরে যিশুর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তারই ভিত্তিতে কোয়েকাররা তাঁদের শান্তি-বাদী আদর্শকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে কোয়েকারদের যেখানে মিল, আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, আত্মিক ব্যাপারটাই সেখানে বড় কথা।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি ছিলুম কেমব্রিজের এক আনডারগ্র্যাজুয়েট। সেই সময়ে আমি কোয়েকারদের প্রতি আকৃষ্ট হই। প্রতি রবিবার সকালে জেসাস লেনের মীটিং হাউসে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে উপাসনা করতুম। সেই উপাসনা-অনুষ্ঠানের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমি শান্তি আর সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলাম। ধর্মে আমি হিন্দু; তবু কোয়েকাররা আমাকে কোয়েকার বলেই ভাবতেন। আমার অবস্থাটা ছিল 'অনারারি কোয়েকার'-এর মতন। কেমব্রিজের বাসিন্দা-কোয়েকারদের তালিকায় যখন আমার নামও ফী-বছর ছেপে বেরুত, তখন সেই কোয়েকারী ভুলটা আমার ভালই লাগত। ছাত্রাবস্থার সেই দিনগুলিতেই আমি লনডনের ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপের প্রতি আকৃষ্ট হই। বস্তুত কেমব্রিজের আনডারগ্রাজুয়েটদের মধ্যেও আমি কোয়েকার-পদ্ধতিতে একটি ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ গড়ে তুলে-ছিলুম। তার সদস্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কয়েকজন তরুণ কোয়েকার, এবং মোটামুটি কোয়েকারদের মতই আদর্শে বিশ্বাসী আরও জনাকয় ব্রিটিশ আনডার-গ্র্যাজুয়েট। (তাঁদের মধ্যে একজনের নাম এরিক পাইল; তিনি এখন কেমব্রিজের বেসহানট কলেজের প্রেসিডেনট।) গ্রুপের মধ্যে ভারতীয় বলতে ছিলাম একমাত্র আমি।

প্রতি রবিবার আমরা এক সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করতুম। শরতে আর শীতকালে ছাত্রনিবাসেই—পালাক্রমে এক-একজনের ঘরে—মধ্যাহ্ন ভোজের আসর বসত। বসন্তে আর গ্রীষ্মে আসর বসত ফাঁকা মাঠে, নদীর তীরে। কেমব্রিজ আর রুপার্ট ব্রুকের গ্রাম

গ্র্যানটচেসটার—তারই মধ্যে যে-কোনও জায়গায় নদীর ধারে আমরা বসে পড়তুম। মধ্যাহ্ন ভোজের পদ বলা বাহুল্য, বেশী হত না। সুপ, রুটি, মাখন আর মার্মালেড। তার আয়োজন কী করে করব। আমরা তখন ছাত্র; পকেট তো প্রায় সর্বদাই শূন্য থাকত।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আরথার এডিংটন ছিলেন এই গ্রুপের চেয়ারম্যান। তিনিও ছিলেন কোয়েকার। ইংল্যান্ডে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ-যাবৎ অসংখ্য কোয়েকার আমি দেখেছি, কিন্তু তাঁর মত নিঃশব্দ কোয়েকার আর কাউকে দেখিনি। জেসাস লেনে প্রতি রবিবার সকালে উপাসনা-অনুষ্ঠান হত; সেখানে প্রতি রবিবারই তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, সমাবেশের এক কোণে শান্ত হয়ে তিনি বসে আছেন। পুরো তিন বছর সেখানে উপাসনা করেছি আমি; কিন্তু সেই তিন বছরের মধ্যে একদিনও তাঁকে মুখ খুলতে দেখিনি। আমাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা (তাঁদের মধ্যে অনেক তরুণীও ছিলেন) কিন্তু মোটেই মুখ বুঁজে থাকতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন প্রবীণ সকলেই যাতে গান্ধীজীকে আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন, তার জন্য গ্রুপ থেকে আমরা নানা রকমের সভা আর আলোচনা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতুম। সার আরথার এডিংটন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডনদের মধ্যে আমাদের আরও কয়েকজন সমর্থক ছিলেন। আমি যেখানে পড়তুম, সেই ইমানুয়েল কলেজের টিউটর ডঃ অ্যালেকস উড, ক্রাইস্ট কলেজের অধ্যাপক চার্লস র‍্যাভেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সার আরনেসট বারকারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোসাইটি অব ফ্রেনডস-এর বাইরে থেকেও এঁদের প্রথম দুজন ছিলেন বিশিষ্ট ব্রিটিশ শান্তিবাদী। মাঝে-মাঝেই আমরা বেশ বড় রকমের বিতর্ক-সভার আয়োজন করতুম। তারই একটিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে একবার আমরা লনডনের ইনডিয়া লীগ থেকে কৃষ্ণ মেননকে কেমব্রিজে নিয়ে এলুম। বিতর্ক সভায় সেবারে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন সার হিউ ও'নীল আর সার অ্যালফ্রেড ওয়াটসন। প্রথমজন তখন সহকারী ভারত-সচিব; সেই সময়ে ভারত-সচিব ছিলেন মিঃ এল এস আমেরি। আর দ্বিতীয়জন কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী-দের হাত থেকে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। তা সে যাই হোক, ব্রিটিশ টোরি দলের এই দুই ধুরন্ধরকে সেদিন কৃষ্ণ মেনন একেবারে ধরাশায়ী করে ছেড়েছিলেন। ব্রিটেনের অল্পবয়সী আনডার-গ্র্যাজুয়েটরা তাঁদের সেই দুর্দশা দেখে ভারী খুশী। দুজনে মিলেও তাঁরা কিছু করতে পারলেন না; কৃষ্ণমেনন একাই তাঁদের ঠান্ডা করে দিলেন। তার দুই দশক বাদে চীনা কমিউনিসটরা যেদিন থাগলা রিজে আক্রমণ চালাল, সেদিন অবশ্য কৃষ্ণ মেননের সেই রণনৈপুণ্য আমরা দেখতে পাই নি।

লনডনে ইনডিয়ান কনসিলিয়েশন গ্রুপের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য ছিল। তারই সূত্রে আমি আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডারের সান্নিধ্যে আসি। আগাথা আমাকে মায়ের মতন স্নেহ করতেন। চেলসির অন্য পাড়ে, টেমসের তীরে, আলবার্ট ব্রিজ রোডে ২নং ক্র্যানবোর্ন কোর্টের একটি ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। বিদেশে সেই ফ্ল্যাটই আমার আপন বাড়ি হয়ে উঠল। শুধু আমি কেন, প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকের কাছেই সেই ফ্ল্যাট নিজের বাড়ির তুল্য ছিল। ইন্দিরা নেহরু তখন অকসফোর্ডের সমারভিল কলেজের ছাত্রী। তিনিও সেখানে মাঝে-মাঝেই যেতেন। কোয়েকারদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক দিনের। পরে, ১৯৪২-৪৩ সনে, ফ্রেনডস অ্যামবুলেনস ইউনিটের একদল শান্তিবাদী তরুণ ইংরেজ সাইক্লোন আর দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যে সাহায্য করবার জন্য হোরেস আলেকজানডারের সঙ্গে বাংলা দেশে আসেন। পুরনো সেই যোগাযোগের জন্যই তখন আমি সে-কাজে হোরেস আলেক-জানডার আর সেই তরুণদের সঙ্গে হাত মেলাই। আরও পর, ১৯৪৬ সনের এপ্রিল-মে-জুনে, ক্যাবিনেট মিশনের ভারত-সফরের সময়ে, আমরা তিনজন আবার এক-যোগে কাজ করেছি। আমি, আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডার—গান্ধীজী তখন আমাদের নাম দিয়েছিলেন 'ত্রিমূর্তি'।

চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তখন আলোচনা চলেছে। আর সেই আলোচনার ব্যাপারে আমরা ছিলাম উভয় পক্ষেরই আস্থাভাজন। আমাদের পক্ষে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে আমার পক্ষে তো বটেই। আমি ভারতীয়। তবু নম্র স্বভাবের মানুষ লর্ড পেথিক-লরেনস আর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস—এঁরা দুজনেই আমাকে বিশ্বাস করতেন। অথচ আমার সম্পর্কে তাঁরা কত-টুকুই বা জানতেন তখন? গভরনর কেসি যা বলেছিলেন, তার বেশী তো কিছুই তাঁরা জানতেন না। যাই হোক, দুই পক্ষের আস্থাভাজন হয়ে একদিকে আমি যেমন উৎফুল্ল বোধ করেছি; অন্য দিকে তেমনি তখন দেখে দুঃখ পেয়েছি যে, ব্রিটেন আর ভারতবর্ষের উচ্চচেতা দুই দল মানুষ প্রাণপণে পরস্পরকে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

৩১শে মার্চ তারিখে গান্ধীজী নয়া-দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের জন্য ভাইসরয় ইতিপূর্বে যে তারিখ ধার্য করে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ রাজনীতিক দুজন তার আগেই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হন; এবং ঘরোয়াভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার অভিপ্রায়ে তার আগেই তাঁকে দিল্লী আসবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী ৩১শে মার্চ তারিখেই গান্ধীজী নয়াদিল্লি এলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া কথাবার্তা হল, অতঃপর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের পর্বও চুকল। তাঁর কাছে আর কী তাঁদের প্রত্যাশা, গান্ধীজীর সে সম্পর্কে তখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁর তাই মনে হল যে, ভারতবর্ষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার যে জটিল দায়িত্ব নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছেন, ঠিক মতো সেটা পালনের ব্যাপারে মিশনকে তাঁর যা পরামর্শ দেবার তা তো তিনি দিয়েছেন, এবারে তাঁর পুনঃ কিংবা সেবাগ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেওয়া ভাল। কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশনের যে আলোচনা হবার কথা, সে-আলোচনা কংগ্রেসের প্রেসিডেনট মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে চলবে। ইতিপূর্বে ভারত-সচিবের সঙ্গে ঘরোয়া-ভাবে গান্ধীজীর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। গান্ধীজী সেই আলোচনার শেষে ভারত-সচিবকে জানিয়েছিলেন যে, ক্যাবিনেট মিশন যদি মনে করেন, এতে কিছু কাজ হবে, তো ব্যক্তিগতভাবে তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন। ১৯৪৬ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লর্ড পেথিক লরেনস এই প্রস্তাবের উত্তরে গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয় ভবন,
নয়াদিল্লি,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় গান্ধীজী,

গত সোমবার যখন আমার বাংলোয় আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন, এবং তারপরে গত বুধবারও আমার দফতরে আপনি বলে-ছিলেন যে, মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপনি কথা বললে তাতে কাজ হবে বলে যদি আমরা মনে করি, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আপনি রাজী আছেন।

আমার এখনও মনে হয় যে, এমন সময় আসতে পারে যখন আপনাদের সাক্ষাৎকারে সত্যই উপকার হবে, এবং আমি জানি, মিঃ জিন্নাও খুবই সানন্দে আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন। তবে আমার সহ-কর্মীরা ও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অবস্থা এখনও এতটা পরিষ্কার হয় নি, যাতে এই মুহূর্তে আপনাদের সাক্ষাৎকারের পরিণামে বেশ-কিছুটা মতৈক্য ঘটা সম্ভব।

আমার মনে হয় যে, আমাদের এই ধারণার কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কেননা, এর সঙ্গে আপনার কার্যসূচী জড়িত, এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য আপনাকে আমি দিল্লিতে থাকতে বলতে পারি না।

আবার যে আপনার সঙ্গে দেখা হল, ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমি আনন্দিত। বন্ধুভাবে আপনি আমাদের কাজে অনেক সাহায্য ইতিমধ্যেই করেছেন; তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাই

আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেনস।"

ভারত-সচিবের চিঠিখানি আমি দেখলাম। দেখে মনে হল, বিবেচনা ও সৌজন্যবশতই এ চিঠি লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু গান্ধীজীকে যে দিল্লিতে রাখা দরকার, ভারত-সচিব তা বুঝতে পারেন নি। সুতরাং তক্ষুনি আমি সার স্ট্যাফোর্ডের কাছে গেলাম, এবং গান্ধীজীকে দিল্লি থেকে চলে যেতে দিলে যে কত বড় ভুল হবে, সেটা বুঝিয়ে বললাম। সেই সঙ্গে এও বললাম যে, গান্ধীজীকে দিল্লিতে রাখবার জন্যে তাঁকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমি জানতুম, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা যদি তাঁকে দিল্লিতে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন, গান্ধীজীর তাহলে আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে আপত্তি হবে না। সার স্ট্যাফোর্ড আমার কথাটার তাৎপর্য চট করে বুঝে নিলেন, এবং একই দিনে ভারত-সচিব অন্য কথা বলা সত্ত্বেও, গান্ধীজীকে দিল্লিতে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে এই চিঠিখানি লিখে দিলেন :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয় ভবন,
নয়াদিল্লি.
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

শুনতে পাচ্ছি, আপনি হয়ত দিল্লী-অবস্থানের মেয়াদ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারেন। বাড়াবার জন্যেই আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

সংশ্লিষ্ট মূল পক্ষগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা শুরু করবার আগে বিভিন্ন স্বার্থ ও শ্রেণীর সঙ্গে আরও কয়েকটি বৈঠক আমাদের সেরে নিতে হবে। অর্থাৎ নানান রকমের সম্ভাবনা এখন গড়ে উঠবার সময়। যাঁরা আপনার উপদেশ চান, তাঁদের উপরে আপনার প্রভাবের মূল্য যে কতখানি, তাও আমি জানি। আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা শুরু হবামাত্র আমরাও আপনার উপদেশ চাইতে ইচ্ছুক হব। সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখন চলে যান, তাহলে তো আপনার সাহায্য আমরা পাব না; সেটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। আমার জন্যে নয়, ভারতবর্ষের জন্যই আপনার এখন নয়াদিল্লিতে থাকা দরকার। দয়া করে থাকুন।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।"

গান্ধীজী এ-চিঠির উত্তরে লিখলেন :

হরিজন মন্দির,
৫ই এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় সার স্ট্যাফোর্ড,

আপনার সস্নেহ পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মৌখিক বার্তাও সুধীর আমাকে জানিয়েছে। মৌলানা সাহেবের

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

নির্দেশে অন্তত ১৬ তারিখ পর্যন্ত আমি এখানে আছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,
এম কে গান্ধী।"

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

চিঠিখানিতে আন্তরিক বন্ধুভাবের পরিচয় ছিল। আমি এটি ক্রিপসের কাছে পৌঁছে দিলাম। শুধু তাই নয়, এর উত্তরে আবার ক্রিপসের কাছ থেকে ছোট্ট সহৃদয় আর-একটি চিঠি এনে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিলাম আমি। ক্রিপস লিখলেন :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয় ভবন,
নয়াদিল্লি

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনি যে আরও কিছুদিন থাকছেন, তা জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি। রোজ যাঁরা গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করছেন, তাঁদের নামের লম্বা তালিকাটিই প্রমাণ করছে, আপনাকে আমরা সকলেই কতটা ভালবাসি।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।"

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যখন আলোচনা চলেছে, তখন দিনের পর দিন এইভাবেই আমি দুই পক্ষের মধ্যে সেতু বাঁধবার চেষ্টা করেছি। একটু-একটু করে তাঁরা পরস্পরের দিকে এগোচ্ছেন, এটা দেখে আমার খুবই আনন্দ হত। আবার, পরস্পরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাঁরা এগোতে পারতেন না, অবস্থাটা তখন খুবই দুঃখ-দায়ক হয়ে দাঁড়াত।

বন্ধ্যা আগাথা ছিলেন প্রত্যেকের মাতৃ-স্বরূপা। নয়াদিল্লিতে তিনি প্রতি রবিবার সকালে কোয়েকার উপাসনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন, উপাসনা কখনও হত বড়াখামবা রোডে, মডার্ন স্কুলের একটি ছোট্ট হল-এ। আবার কখনও হত জয়সিং রোডে, ওয়াই-ডবলু-সি-এর বাড়িতে, একতলার একটি ঘরে। আগাথা তখন জয়সিং রোডে থাকতেন। গান্ধীজীর মুখ্য সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাসট ফেজ' ('শেষ অধ্যায়') গ্রন্থে এই উপাসনা-অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে লিখেছেন :

"সমাবেশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর 'চিন্তা'র অংশ অন্যদের দিতে চান, 'বন্ধু'দের নীরব যোগ-সম্পর্কে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য ছেদ পড়ে। যেদিনকার কথা বলছি, সমাবেশে উপস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে একজন সেদিন নীরবতা ভঙ্গ করে-ছিলেন। চার্লি এনড্রুজের কথা চিন্তা করছিলেন তিনি। 'ইংল্যানডের যা ভাল আর ভারতবর্ষের যা ভাল' চার্লি এনড্রুজ ছিলেন 'তারই মধ্যে আত্মিকতার এক রেশমী যোগসূত্র'।"

আমিই সেই ভারতীয়; আমিই সেদিন এ-কথা বলেছিলাম। আমার কথায় গান্ধীজী আলোড়িত হয়েছিলেন। উপাসনা-অনুষ্ঠানে তিনিও এ-বিষয়ে কিছু বললেন, এবং উপসংহারে এই আশা প্রকাশ করলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চার্লি এনড্রুজ তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে যা-ই করে থাক না কেন, এতেই তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে।"

দুই কোয়েকার আর আমি তখন আমাদের সাধ্যমত একদিকে গান্ধীজীর কাজে যথাসাধ্য খেটেছি; অন্যদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের কাজে। আমাদের চতুর্দিকে তখন জোর আলাপ আলোচনা চলছে। ১৯৪৬ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের তিনজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রী আর ভাইসরয় মিলে, ১৮২টি বৈঠকে, যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মোট ৪৭২জন ভারতীয় নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন। কী রকম ব্যাপকভাবে যে আলোচনা চলছিল, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

আলোচনার পিছনে প্রধানত যাঁর মাথা খাটছিল, তিনি ক্রিপস। ব্রিটিশ উদ্যোগের তিনিই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষের দক্ষতম কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি তখন আলাদাভাবে কিছু কথাবার্তা বলেন। স্বর্গত সার এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের (পরে

তিনি নেহর, সরকারে মন্ত্রী হয়েছিলেন) সংগে ১০ই এপ্রিল তারিখে তাঁর যে বৈঠক হয়, এই প্রসংগে তার উল্লেখ করতে পারি। আয়েংগার ছিলেন দক্ষ একজন সিভিল সারভ্যানট। ভারতবর্ষের দক্ষতম সিভিল সারভ্যানটদের তিনি অন্যতম। জম্মু আর কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রিপসের সংগে তাঁর যে কথাবার্তা হয়, এখানে তা তুলে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে এই আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। ক্যাবিনেট মিশনের চিন্তা তখন কোন্ পথে এগোচ্ছিল, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

ক্রিপস : আপনি আসায় আমি খুশী হয়েছি। আসুন, খোলাখুলিভাবে কথা বলা যাক। অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

আয়েংগার : এখনই সেটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। আপনিও জানেন, আমিও জানি, অবস্থার গতি এখন নিত্য পালটাচ্ছে। আমার মনে হয়, আপনি এবং মিশনের অন্যান্য সদস্য এখন দুটি লক্ষ্যের উপরে নজর রাখছেন। নূতন সংবিধান রচনার জন্য

একটা পরিষদ গড়ে তোলা; এবং কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা। আপনার কি মনে হয় যে, এ-যাত্রায় এই দুটি সমস্যারই আপনারা সমাধান করতে পারবেন?

ক্রিপস : সে-আশা আমার খুবই আছে। আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে পারি যে, সমস্যা দুটির সমাধান না-করে আমরা এ-দেশ থেকে বিদায় নিতে রাজী নই।

আয়েঙ্গার : সমস্যা দুটির সমাধানের পথে রয়েছে পাকিস্তানের প্রশ্ন। সমস্যা দুটির সমাধান আপনারা করতে পারবেন, আপনার যদি এমন আশা থাকে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তান-দাবি সম্পর্কে প্রথমেই আপনাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক্রিপস : হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এর সঙ্গে শুধু এইটুকু আমি যোগ করব যে, এ-ব্যাপারে একটা মতৈক্য ঘটিয়ে তবেই এই প্রাথমিক প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

আয়েঙ্গার : মতৈক্যের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। মিঃ জিন্না সম্প্রতি যে-সব বিবৃতি দিয়েছেন এবং নানাজনের কাছে যে-সব উক্তি করেছেন তা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। আইনসভার মুসলিম সদস্যদের সম্মেলনে যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হল, তাও নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে।

ক্রিপস : নিশ্চয়ই পড়েছে। কথাগুলি যে অনলস্রাবী, তাও লক্ষ করেছি। তবে জেনে রাখুন, এ-সব কথায় আমরা বিশেষ বিচলিত হই না। স্বদেশেও এই ধরনের কথা আমরা শুনে থাকি। এতে আমরা অভ্যস্ত।

আয়েঙ্গার : তা হয়ত হবে। তবে আপনাদের দেশে তো রাজনীতির ভিত অনেক পাকা। সেখানে এই ধরনের কথায় যে প্রতিক্রিয়া হয়, এখানে তা না-ও হতে পারে।

ক্রিপস : আমি যখন দেখতে পাই, প্রতি-পক্ষকে নিন্দা করতে গিয়ে কেউ অস্বাভাবিকভাবে গলা চড়াচ্ছে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, তখন আমার মনে হয়, লোকটা বুঝতে পেরেছে যে, যে চরম দাবির সে সমর্থক, তার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছে।

আয়েঙ্গার : মিশনের আগমনবার্তা ঘোষিত হওয়ায় এবং সেই অনুযায়ী মিশন এ-দেশে আসার ফলেই এই সব গাল-গালাজের ঝোঁকটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এইটেই এর প্রত্যক্ষ কারণ। মিশন যে এ-সব কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, এটা জেনে আমি খুশী হলাম। তবে এইমাত্র আপনি বলছিলেন যে, মতৈক্যের ভিত্তিতে আপনারা পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সলা করবেন বলে আশা রাখেন। কিন্তু প্রধান দুটি দলের, বিশেষত মুসলিম লীগের, এখন যে মেজাজ, তাতে কী করে যে মতৈক্য ঘটবে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্রিপস : সমস্যাটাকে কি ইতিমধ্যেই অনেকটা গুটিয়ে আনা হয় নি? প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ইত্যাদি কয়েকটি যৌথ বিষয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য একটা ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা হবে, সেইটেই এখন প্রশ্ন। জিন্না বলছেন, পাকিস্তান আর অবশিষ্ট-ভারতের মধ্যে একটা চুক্তির ভিত্তিতে এই বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে। আর কংগ্রেস বলছেন, এই সব বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রে একটি ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থা চাই। এই যে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ, এর মধ্যে সেতুবন্ধ তো আদৌ অসম্ভব নয়।

আয়েঙ্গার : কিন্তু এই দুই দৃষ্টিকোণ কি মূলত পরস্পরের বিপরীত নয়? এক পক্ষ ভাবছে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা; এবং বলছে যে, তাদের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক থাকবে। আর অন্য পক্ষ ভাবছে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের কথা; যাতে এই দুটি বিষয়ের দায়িত্বভার কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ক্রিপস : ঠিক কথা। কিন্তু এই ধরনের মতের পার্থক্য যেখানে দেখা দেয়, সেখানে পক্ষ দুটি তার একটা মীমাংসাও করে নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, তার জন্য তাঁদের মিলিত হওয়া চাই, আলোচনা করা চাই, এবং দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করা চাই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি, যা নিয়ে বিরোধ এবং যে-ব্যাপারে মীমাংসা করতে হবে তা এমন কিছু দুরূহ নয় যে, একটা আপোস-মীমাংসা সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকার ইতিপূর্বে এর চাইতেও অনেক বৃহৎ সমস্যাকে এই পথেই মিটিয়ে নিয়েছেন, এবং এখনও নিচ্ছেন। কংগ্রেস আর লীগ, দুই পক্ষকেই কিছুটা নরম হতে হবে এবং আলোচনায় বসতে হবে।

আয়েঙ্গার : অর্থাৎ যার যার দাবির থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে মাঝপথে তারা মিলিত হবে। সেই মাঝ-বরাবর জায়গাটার একটা আন্দাজ দিতে পারেন?

ক্রিপস : কনফেডারেশন আর কনফেডারেল কেন্দ্রের ব্যাপারটা তো নতুন নয়।

আয়েঙ্গার : কিন্তু কনফেডারেল কেন্দ্র বলতে কি নেহাতই বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মিলন বোঝায় না?

ক্রিপস : তাই বোঝায় বটে।

আয়েঙ্গার : সাধারণত কেন্দ্রে আমরা একটি আইনসভা এবং এই রকমের আরও কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা দেখতে পাই। কিন্তু কনফেডারেল কেন্দ্রে তো সে-সব কিছুই থাকবে না।

ক্রিপস : না, তা থাকবে না।

আয়েঙ্গার : কনফেডারেট শাসন-ব্যবস্থা কোন্ অধিকারে সিদ্ধান্ত নেবে?

ক্রিপস : এটা যে একটা ঢিলেঢালা সম্মিলন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আপনাকে তো স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার করে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রথমে ছিল একটি কনফেডারেশন; পরে তারই থেকে একটি ফেডারেশন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষেও তো তেমনটা না-হবার কোনও কারণ নেই।

আয়েঙ্গার : কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখতে পাব যে, তার অঙ্গরাজ্যগুলি প্রথমে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা ঢিলেঢালা একটি সম্মিলনে যোগ দিয়েছিল। পরে তারা দেখল যে, সেই ঢিলেঢালা সম্মিলনে তাদের প্রয়োজন মিটছে না। তখন আরও ঘনিষ্ঠ
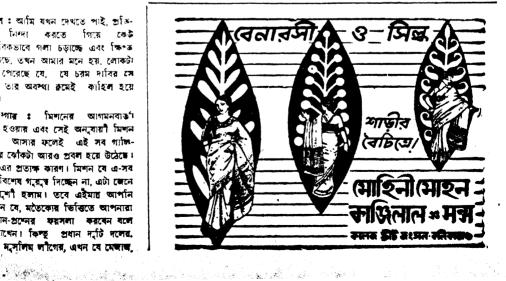
হয়ে তারা একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ে তুলল। সেই ফেডারেল রাষ্ট্রটিকেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবারে ভারতবর্ষের কথা ভাবা যাক। একই কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ভারতবর্ষ তো এখনই একটি ঐক্যবন্ধ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের অংশ-গুলিকে আপনি আবার টুকরো-টুকরো করে দিচ্ছেন।

ক্রিপস : না না, তা আমি করছি না।

আয়েঙ্গার : আমি বলেছি, অংশগুলিকে আপনি টুকরো-টুকরো করে দিচ্ছেন। তার অর্থ এই নয় যে টুকরো-টুকরো করাই আপনার উদ্দেশ্য। যে-প্রস্তাব আপনার বিবেচনাধীন, সে সম্পর্কে আমার ধারণা কী, তাই আপনাকে জানালাম মাত্র। প্রস্তাবিত পাকিস্তান, এবং অবশিষ্ট-ভারতকে নিয়ে আপনারা একটি কনফেডারেল ইউনিয়ন গড়বার কথা ভাবছেন। সেই সম্পর্কে আমার মতামত আপনাকে জানালাম। যা বলছিলাম, পাকিস্তান-দাবি যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমানের এই ঐক্যবন্ধ ভারত-রাষ্ট্রের অংশগুলিকে টুকরো-টুকরো করে দেওয়া হবে, এবং তাদের বলা হবে যে, নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী তারা দুটি কি তার বেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবে, এবং এই আশায় তাদের একটি ঢিলেঢালা কনফেডারেশন গড়ে তোলা হবে যে, পরে এই কনফেডারেল ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিই তাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ে তুলতে বাধ্য করবে। অর্থাৎ শেষ পরিণতি হিসেবে এই কথাই ভাবা হচ্ছে যে, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক যোগ-সম্পর্ক এবং যৌথ-বিষয়গুলির পরিচালন-ব্যাপারে যে-অবস্থায় তাদের এনে দাঁড় করানো হবে, মোটামুটিভাবে তা আজকের এই অবস্থারই অনুরূপ। আজ তারা যে-অবস্থায় আছে, তখনও সেই অবস্থাতেই থাকবে। অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না।

ক্রিপস : আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। তবে মীমাংসায় যদি পৌঁছতে হয় তাহলে তো শুধুই যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে একটা গ্রহণযোগ্য কিংবা গৃহীত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যাওয়া চলে না। মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হল, তার থেকে আবার এই ধারণা করে বসবেন না যে, কনফেডারেশনের পক্ষেই আমি মীমাংসা খুঁজব বলে মনঃস্থির করে ফেলেছি।

আয়েঙ্গার : বুঝতে পারছি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

ক্রিপস : মুসলিমদের মধ্যে এই ভয়টা এখন খুবই ব্যাপক যে, হিন্দুরা তাদের উপরে আধিপত্য করবে। ভয়টা হয়ত ভিত্তিহীন। তবু, ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে যদি শান্তিতে থাকতে হয়, তাহলে মুসলিমদের মনে এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে, যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়বার চেষ্টা চলছে, তাতে তাদের ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না।

আয়েঙ্গার : ভয়টাকে দূর করবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে যা-কিছু করা সম্ভব, তা তো করতেই হবে। কিন্তু এ দেশের বাস্তব অবস্থা যদি বিচার করি, এবং মুসলিমদের সংখ্যা আর সেই সংখ্যার বিন্যাসের কথা যদি ভেবে দেখি, তাহলে এ-কথা মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের জন্য আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে দিলেই এই ভয়ের অবসান হবে। তার কারণ, সেই রাষ্ট্রে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে বটে, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক অমুসলমানও সেখানে
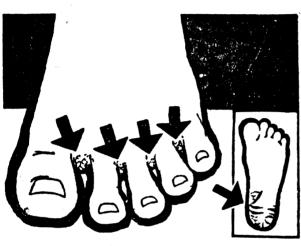
থাকবে। যাই হোক, দুই পক্ষের মধ্যে মতৈক্য সম্ভব হবে, আপনার এমন আশার কারণ কী? মতৈক্যের জন্য চেষ্টাই বা করা হবে কীভাবে?

ক্রিপস: কথাটা আর কাউকে বলবেন না; শুধু এইটুকু আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন যে, মুসলিম সম্মেলনে গত দু-দিনে যতই অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা দেওয়া হয়ে থাক, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান-প্রধান নেতারা এখন জোর মাথা ঘামাচ্ছেন, কী করে তাঁদের ঘোষিত দাবিগুলিকে কিছুটা কাটছাঁট করে তাঁরা এখন অন্য পক্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে পারেন।

আয়েঙ্গার: মুসলিম নেতারা তো দাবির মগডালে বসে আছেন। সেখান থেকে তাঁদের নামিয়ে আনবার কার্যকর উপায় মাত্র একটি। আপনি নিজে কিংবা মিশনের অন্য-কোনও সদস্য যদি যথাসম্ভব শীঘ্র মিঃ জিন্নাকে এমন আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে এ-কথা বুঝিয়ে দেন যে, মিশন কিংবা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাঁর পাকিস্তান-দাবি মেনে নেবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, মগডাল থেকে তাহলেই তাঁরা সুড়সুড় করে নেমে আসবেন।

ক্রিপস: তাতে যে কাজ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে, ঘরোয়াভাবেও তা তো আমরা এখন কাউকে জানাতে পারছি না। এখনও তার সময় হয় নি।

আয়েঙ্গার: এ-ব্যাপারে দ্বিধার কোনও অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না। এ-দেশে আপনাদের যে ইতিহাস, তার পটভূমিকায় এ-কথা চিন্তা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব যে, আপনাদের যদি একটা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বলা হয়, তাহলে দেশটাকে ভেঙে আপনারা দু-তিনটে স্বাধীন রাষ্ট্র করবার সপক্ষে রায় দেবেন।

ক্রিপস: আপনার দৃষ্টিভঙ্গির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু মীমাংসায় যদি পৌঁছতে হয়, তাহলে কেসটা যার পাকা, সেও তো অনেক সময়—সিদ্ধান্ত পাছে তার বিপক্ষে যায়, এই আশঙ্কায়—নিজের ন্যায্য দাবিরও কিছুটা ছেড়ে দিয়ে থাকে। ছেড়ে দেবার প্রয়োজন যে ঘটে না, এমন তো নয়। বারে-এ প্র্যাকটিস করবার সময় প্রায়ই আমি এমনটা ঘটতে দেখেছি। দেখেছি, যার হয়ে আমি আদালতে লড়ব, কেসটা ষোল-আনা পাকা হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছে এসে বলেছে, "আমাদের কেস পাকা ঠিকই, কিন্তু জজ যে কী রায় দেবেন, তা তো আমরা জানি না। ইতিমধ্যে অন্যপক্ষ আমাদের কাছে মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। ন্যায্যত যা আমাদের প্রাপ্য, এরা তার থেকে কিছু কম দিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে চাইছে বটে, কিন্তু, রায়টা যেক্ষেত্রে অনিশ্চিত, এটা সেক্ষেত্রে নিশ্চিত। জজের রায় যে আমাদের বিপক্ষে যাবে না এমন তো কোনও কথা নেই। সুতরাং আপনি কী বলেন? দাবির কিছুটা ছেড়ে দিয়ে মিটিয়ে নেব?"

আয়েঙ্গার: প্রধান দুটি পক্ষ যদি আপোস-মীমাংসায় পৌঁছতে পারে, তবে তার চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আপোসের একটা বিপদও আছে। বিশেষ করে তৃতীয় পক্ষের চাপে যদি তার শর্তগুলি নির্ধারিত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখা যাবে যে, দুই পক্ষের এক পক্ষ তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছে না, কিংবা তার স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বস্তুত, দুই পক্ষই শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হতে পারে, এবং কোনও পক্ষেরই স্বার্থ হয়ত এতে অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

ক্রিপস: এমন সম্ভাবনার কথা আমি অস্বীকার করি না। তবে যে-সিদ্ধান্তে কোনও পক্ষই খুশী নয়, তাও তো অনেক-সময় দিব্যি চলে যায়, দেশ তাকে শেষ পর্যন্ত মেনেও নেয়। ভারতীয় ইতিহাসে এমন ব্যাপার তো ইতিমধ্যেই ঘটেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথাই ধরুন না কেন।

আয়েঙ্গার: সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সকলেই এর নিন্দায় মুখর। নিন্দা মুসলিমরাও করছে। তবু যে এটাকে সাফল্যের সঙ্গে চালু করা গিয়েছিল, তার প্রধান কারণ, ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে, এবং দরকার বুঝলে একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্তকেও তাঁরা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রশ্নে যদি আপনারা অনুরূপ একটা সিদ্ধান্ত করে বসেন, তাহলে কিন্তু অবস্থা একেবারে অন্য রকম দাঁড়াবে। ভারতবর্ষ তো তখন স্বাধীন। সুতরাং পাকিস্তান-প্রশ্নে আপনাদের সিদ্ধান্তের ফলে যে-সব ঝুঁকি দেখা দেওয়া অনিবার্য, সেগুলি সামলাবার জন্যে আপনারা তখন এখানে থাকবেন না। যে-সিদ্ধান্তের পরিণামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরও প্রবল হয়ে দাঁড়াবে এবং হয়ত গৃহযুদ্ধও দেখা দেবে—এবং যা সামলাবার দায়িত্বও আপনাদের থাকবে না—তেমন সিদ্ধান্ত যদি আপনারা নেন, তো তাতে দেশের অপকারই আপনারা করবেন। সিদ্ধান্তটা যদি ন্যায্য হয়, তবে আপনারা এ-দেশ থেকে বিদায় নেবার পরেও তাকে কার্যকর করা সহজ হবে। পক্ষান্তরে কার দাবি ন্যায্য আর কার অন্যায্য, সেটা বিচার না করে দুই পক্ষের দাবিকেই যদি কিছুটা ছেঁটে দিয়ে তাদের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন আপনারা, এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন, তবে তার পরিণামে হাঙ্গামা বাধবে।

ক্রিপস: ঝুঁকি আছে, সে-কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু মীমাংসার ব্যবস্থা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি আপোসে একটা মীমাংসায় উপনীত না হয়, তবে আমরা নিজেরাই একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

আয়েঙ্গার: এ-দেশের দলগুলি যদি একটা মীমাংসায় আসতে না-পারে তবে ক্ষমতা যাঁদের হাতে, সেই ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই একটা সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সালিশের কথাও তো উঠেছে।

ক্রিপস: জানি। তা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি ঠিক করে যে, একজন রুশ, একজন তুর্কী আর একজন চীনাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে, এবং পাকিস্তান-প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ভার সেই কমিটির হাতে অর্পণ করা হবে, তাহলে আমরা সে-ব্যবস্থায় বাধ সাধব কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। বলা বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা যোগ-সম্পর্ক রয়েছে এবং এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকের চাইতেই বেশী; সেই বিচারে আপনার এই অভিমত অবশ্যই যুক্তিযুক্ত যে, ব্রিটেনেরই এ-ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিই যদি মনে করে যে, বাইরের একটা কমিটির—যে-ধরনের কমিটির কথা আমি বলেছি—সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবে, এবং সেইটেই শ্রেয়, তবে আমাদের তো তাতে আপত্তি

Bensons/1-501 S-105 Ben
৫০১
স্পেশাল সাবান
কাগজে মোড়ানো একমাত্র কাপড় কাচবার
সাবান যা সত্যিই স্পেশাল নামের যোগ্য…
এর স্পেশাল ফরমুলার প্রচুর ফেনা…ওতে কাপড় সহজেই পরিষ্কার ধবধবে হয়ে ওঠে।
501
SPECIAL
MAKES EVERY WASH A SPECIAL WASH
501
টাটার তৈরী

করবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। দুই দলের কাছেই যা গ্রহণযোগ্য, এমন একটা মীমাংসায় পৌঁছনোটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

আয়েঙ্গার : স্যার স্ট্যাফোর্ড, সংবিধান-রচনার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি আশা কার এ-কথা মেনে নেবেন যে, দু-দুটি সংস্থার হাতে আপনারা সংবিধান রচনার ভার দিতে পারেন না। শুনতে পাচ্ছি, পাকিস্তান-দাবির সপক্ষে যদি না প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সংবিধান-রচনার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাকে সেক্ষেত্রে দুটি অংশে ভাগ করবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে প্রদেশগুলিকে তো আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কে কোন্ সংবিধান-সংস্থায় কিংবা তার কোন্ অংশে থাকবে।

ক্রিপস : হ্যাঁ।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলিকেও ঠিক একইভাবে নিজের পথ ঠিক করতে হবে।

ক্রিপস : হ্যাঁ। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি যে সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জন্য পৃথক একটা সংবিধান-সংস্থা চাইতে পারে, এমন সম্ভাবনাকেও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আয়েঙ্গার : এই সব জটিল সম্ভাবনার কথা কি আপনারা চিন্তা করে দেখছেন?

ক্রিপস : জটিলতা তো আছেই। কিন্তু পাকিস্তান-প্রশ্নের কী মীমাংসা হয়, সব-কিছু আসলে তারই উপরে নির্ভর করবে। সর্বাগ্রে অতএব সেই বিঘ্নটি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

আয়েঙ্গার : সংবিধান-সংস্থাটিকে আপনারা কীভাবে গড়ে তুলবেন? কোন অধিকারবলে? পার্লামেনটের আইনের বলে?

ক্রিপস : (কিছুটা দ্বিধার পরে) তা আমরা এখনও ভেবে দেখিনি। এর জন্যে পারলামেনট থেকে আইন পাশ করাবার দরকার হবে বলে তো আমার মনে হয় না।

আয়েঙ্গার : পারলামেনট থেকে আইন যদি না পাশ করানো হয়, তবে অন্তত একটি রাজকীয় ঘোষণার দরকার হবে। এটা একটা বৃহৎ ব্যাপার। বর্তমান ভারত সরকার নেহাতই সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়ে কিংবা ভাইসরয় একটি ঘোষণা জারী করে এ-কাজ করতে পারেন না।

ক্রিপস : এ-সব কথা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব। সর্বাগ্রে এখন পাকিস্তান-প্রশ্নের একটা মীমাংসায় পৌঁছতে হবে; সেইটেই আসল কথা। মীমাংসায় তো পৌঁছাই; তারপর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে যে-ভাবে এই ব্যবস্থাটাকে কার্যকর করলে ঠিক হয়, ঠিক সেইভাবেই করা হবে।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলির কী হবে? যা মেনে নেওয়া শক্ত, এমন সব বায়না ধরে তারাও এই ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসতে চাইবে তো?

ক্রিপস : ও-দিক থেকে কোনও বিরাট-রকমের অসুবিধে দেখা দেবে বলে আমার মনে হয় না।

আয়েঙ্গার : প্যারামাউনট-ক্ষমতার কী হবে? আপনারা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, প্যারামাউনট-ক্ষমতা তখন কার হাতে ন্যস্ত হবে?

ক্রিপস : আমরা বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে প্যারামাউনট-ক্ষমতারও অবসান হবে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করবে, তখন শুধুই ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ নয়, প্রতিটি দেশীয় রাজ্যও স্বাধীন হবে।

আয়েঙ্গার : ৫৬২টি না ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকেই স্বাধীন হবে?

ক্রিপস : হ্যাঁ। স্বাধীন হবার পরে তাদের প্রত্যেকে আবার নতুন করে নতুন ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করে নেবে।

আয়েঙ্গার : ভারতবর্ষে যেভাবে আপনারা ক্ষমতা পরিহার করতে চলেছেন, তার ফলে এই আবার একটি বাড়তি ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকে পৃথকভাবে আবার নতুন করে ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করবার জন্য আলোচনা শুরু করবে—কীভাবে যে আপনি এই আশা করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এখনকার কথাই ধরা যাক। আপনাদের সঙ্গে এখন চুক্তি আছে তো মাত্র দুটি-চারটি দেশীয় রাজ্যের। যেমন তাদের, তেমনি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকেও ভারত সরকার প্যারা-মাউনট ক্ষমতা প্রয়োগ করেই একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন।

ক্রিপস : হায়দরাবাদের কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশ ক্রাউনের সঙ্গে এই রাজ্যটির স্থায়ী চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এখন হায়দরাবাদের মতামত না নিয়েই যদি তার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা হয়, তবে হায়দরাবাদ যে তা মেনে নেবে, এমন কথা ভাবা শক্ত। সে বলে বসতে পারে : আপনারা আর নতুন সরকার মিলে যে-ব্যবস্থাই করুন, আমরা তা মেনে নিচ্ছিনে।

আয়েঙ্গার : প্যারামাউনট ক্ষমতাবলে যে-ব্যবস্থা করা হবে, একটা দেশীয় রাজ্য—তা সে হায়দরাবাদই হোক আর অন্য যে-কোনও রাজ্যই হোক—তা মেনে নেবে না, এমনটাই বরং বিশ্বাস করা শক্ত।

ক্রিপস : হয়ত আপনার কথাই ঠিক; হয়ত হায়দরাবাদের মত রাজ্যের পক্ষেও দীর্ঘদিন সেই ব্যবস্থাকে অমান্য করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের দায়-দায়িত্বকে তো তাই বলে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে। এ-ব্যাপারে আপনি কী করতে বলেন?

আয়েঙ্গার : যে-ব্যবস্থা স্বাভাবিক, সেইটেই করতে বলি। দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে ব্রিটিশ সরকারের যে আধিপত্য, প্যারামাউনট ক্ষমতার মাধ্যমেই তা কার্যকর হয়ে থাকে। ভারতবাসীদের কাছে আপনারা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চলেছেন। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ থেকে আপনারা চলে যাবার পরে যে-সরকার এখানে শাসন-কর্তৃত্ব পাবেন, প্যারামাউনট ক্ষমতার প্রয়োগও তাঁরাই করবেন।

ক্রিপস : সেটা তো বে-আইনী ব্যাপার হবে।

আয়েঙ্গার : ১৮৫৮ সনে আর ১৯৩৫ সনে কি সেটা বে-আইনী ব্যাপার বলে গণ্য হয়েছিল?

ক্রিপস : অতীতে যদি একটা অন্যায় আইন জারী হয়ে থাকে, তাহলে এখনও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে, এমনটা নিশ্চয়ই আপনারা আশা করেন না।

আয়েঙ্গার : আপনার ঠিকমতো সমস্যার মোকাবিলা করছেন না। যাকে আপনি অন্যায় আইন বলছেন, তা এখনও চলু, এবং প্রায় শতাব্দীকাল ধরে দেশীয় রাজ্য-গুলি তাকে মান্য করে চলছে। তাতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

ক্রিপস : প্যারামাউনট ক্ষমতার বিধান অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যথা, আমরা তাদের রক্ষা করতে বাধ্য। রাজকীয় নৌ-বহর আর বিমান-বহর ছিল বলেই এতকাল সেই দায়িত্ব আমরা পালন করতে পেরেছি। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে রাজকীয় নৌ-বহর আর বিমান-বহর এখানে থাকবে না। সুতরাং নূতন ভারত সরকারের পক্ষে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব

**পালনও সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে আমাদের বলা উচিত হবে না যে, এ-দেশ থেকে বিদায় নেবার সময়ে সেই দায়িত্ব আমরা নূতন ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। দেশীয় রাজ্যগুলি অতঃপর কী করবে, সেটা স্থির করবার ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। নূতন ভারত সরকারের সঙ্গে কী ব্যবস্থায় তারা আসবে, সেটা তারাই ঠিক করুক।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পালন নূতন ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না, আপনার এই কথার অর্থ কী?

ক্রিপ্‌স : নিজেকে রক্ষা করবার মতও নৌ-বহর আর বিমান-বহর যে নূতন সরকারের থাকবে না, এ তো খুবই স্পষ্ট ব্যাপার।

আয়েঙ্গার : অবস্থাটাকে আপনি বাড়িয়ে বলছেন। এটা ঠিক কথা যে, নৌ-বাহিনী আর বিমান-বাহিনীকে যদি স্বাধীন ভারতবর্ষের সশস্ত্র-বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ করে তুলতে হয়, তাহলে ভারতীয় নৌ-বাহিনী আর ভারতীয় বিমান-বাহিনীর

প্রভূত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কিন্তু সেই উন্নয়নের কাজ চলবার সময়েই দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্য নূতন ভারতবর্ষ অবশ্যই অন্য ব্যবস্থারও আশ্রয় নিতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি, ব্রিটেনের সঙ্গেই সে এখন চুক্তি করতে পারে যে, ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী আর বিমান-বাহিনীর গুটিকয় ইউনিট ভারতে মোতায়েন থাকবে। এ-সবই করা হবে দেশরক্ষার জন্য,

এবং দেশরক্ষা বলতে তখন দেশীয় রাজ্য-গুলির রক্ষা-ব্যবস্থাও বোঝাবে। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নূতন ভারত সরকার যে প্যারামাউন্ট ক্ষমতা পাবেন, তার দায়িত্ব পালন করা তাই আদৌ অসম্ভব হবে না। কিন্তু, সে কথা থাক; দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ শক্তিকে যে তাঁদের নৌ-বহর আর বিমান-বহরের উপরে বিশেষ নির্ভর করতে হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না। প্রধানত ভারতীয় স্থল-বাহিনীর উপরেই সেই দায়িত্ব ছিল। এবং নূতন শাসন-ব্যবস্থার সূচনা-পর্বেই এমন একটি ভারতীয় স্থল-বাহিনী আমরা পাচ্ছি, যা কিনা দেশের আভ্যন্তর প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষই সে কথা বলেছেন।

ক্রিপ্‌স : অন্য দিকটাও ভাবুন। এই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ক্রাউনের চুক্তি হয়েছিল। সুতরাং তাদের সম্মতি না নিয়ে ক্রাউনের পক্ষে তো সেই চুক্তির দায়িত্ব অন্য কারও কাছে হস্তান্তরিত করা সম্ভব নয়।

আয়েঙ্গার : ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, অন্তত দু'বার আপনারা এইভাবেই দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। প্রথমবারে তো এ-ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করা হয়নি। আমি ১৮৫৮ সনের কথা বলছি। দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের দায়িত্ব সেই বছরে ইস্ট ইনডিয়া কোম-পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ ক্রাউনের কাছে চলে যায়। ক্রাউন অতঃপর সপারিষদ গভরনর জেনারেলের মাধ্যমে অর্থাৎ ভারত সরকারের মাধ্যমে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৩৫ সনে তার জায়গায় আবার এক নতুন ব্যবস্থা হল। সেই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী সপারিষদ গভরনর জেনারেলের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করে ক্রাউন তাকে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি-নিধির হাতে অর্পণ করলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সপারিষদ গভরনর জেনারেল কিংবা রাজ-প্রতিনিধি—কোনও পদই সম্ভবত থাকবে না; দু'টিই লুপ্ত হবে। এখন যাকে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ বলা হয় তার নূতন সরকারই তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। যে-সব শর্তের উপরে প্যারামাউনট ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, তার চাইতে সুবিধাজনক শর্ত যদি দেশীয় রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়, এবং নূতন ভারত সরকারের কাছে এই ক্ষমতা হস্তা-ন্তরের ব্যাপারে যদি দেশীয় রাজ্যগুলি অতঃপর সম্মতি দেয়, তবে তো সব দিক দিয়েই ভাল। পক্ষান্তরে, প্রতিটি দেশীয় রাজ্য কিংবা তাদের একাংশ যদি এই হস্তান্তরে আপত্তি তোলে, তাহলে তাদের দ্বিধা সত্ত্বেও প্যারামাউনট ক্ষমতা নূতন সরকারের হাতে তুলে দিতেই হবে। কেননা, তা যদি করা না হয়, তাহলে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই যে শুধু অসুবিধে ঘটবে তা নয়, সর্ব-ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য সাধারণ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুপরিচালনাও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেশীয় রাজ্যের বিষয়ে ক্রিপ্‌সের আর কিছু বলবার ছিল না।

আয়েঙ্গার : একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ-দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে, পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থাই তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। দেশের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে; সেই নির্বাচকমণ্ডলীকে যদি জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভিত্তিতে গড়া হয়, কোনও দেশেরই রাজ-নৈতিক জীবন তাহলে সুস্থ থাকতে পারে না। আপনারা এখন যে আলোচনা চালাচ্ছেন, তার মাধ্যমে তো আপনারা বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা আপোস-মীমাংসায় পৌঁছতে চান; সেই মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসেবে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার স্থানে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থাকে মেনে নেবার জন্য আপনারা যদি তাদের উপর চাপ দেন, এবং তাদের দিয়ে এটা মেনে নেওয়াতে পারেন, তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যতের উপরে তার প্রভাব খুবই সুফল-প্রসূ হবে।

ক্রিপ্‌স : আমি যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার সমর্থক। কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে মাথা না-গলিয়ে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অন্তর্বর্তী সরকার আর সংবিধান-সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়াই কি আমাদের পক্ষে ভাল নয়?

আয়েঙ্গার : পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সলা করা, অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সংবিধান-সংস্থা আহ্বান করাই যে এখন আশু কর্তব্য, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার ধারণা, পাকিস্তান-প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে যখন দুই পক্ষের উপরেই চাপ দেওয়া হচ্ছে, তখন নির্বাচন-ব্যবস্থার এই গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যাটিরও যদি মোকাবিলা করা হয়, তবে তাতে অন্তর্বর্তী সরকার ও সংবিধান-সংস্থার উপকার হবে। নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনই যদি একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব না হয়, তবে না-ই হোক, তাতেও ক্ষতি নেই; যথাসময়ে যাতে এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয়, এখনই তার জন্য ক্ষেত্র রচনা করে রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলি, পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা যে শুধু অখণ্ড ভারত-বর্ষের সরকারের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে তা নয়; বস্তুত পাকিস্তান সম্পর্কে মিঃ জিন্নার ইচ্ছাই যদি পূর্ণ হয়, তবে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের চাইতে পাকিস্তানের পক্ষে আরও বড়-রকমের শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়াবে। মিঃ জিন্না বিভক্ত ভারতের যে ছবি আঁকছেন, তাতে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ কোটি; আর সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা হবে ৭ কোটি আর সংখ্যালঘু অমুসলমান-দের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৪০ লক্ষের মত।

ক্রিপ্‌স : হা অদৃষ্ট, এই হচ্ছে মিঃ জিন্নার পাকিস্তান! এ এক অবাস্তব কল্পনা। এমন এক রাষ্ট্র গড়ার কথা তিনি ভাবছেন, নামে সংখ্যালঘু হলেও, হিন্দুদের সংখ্যা যেখানে বিপুল হয়ে দাঁড়াবে; আর এই ৪ কোটি ৪০ লক্ষ হিন্দু সেখানে পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করবে! এমন কথা ভাবাও যায় না। যাই হোক, নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার ভার যে সংবিধান-সংস্থার হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল, আশা করি তা আপনি স্বীকার করবেন।

(ক্রমশ)

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর পুনরুজ্জীবন

বছর কয়েক আগে এশিয়ার চিরতুষার-বৃত উত্তরাঞ্চলে কিছু লোক টেলিফোন লাইন বসাচ্ছিল। খুঁটি গাড়বার জন্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এক জায়গায় দেড় গজের মত গভীরে তারা দেখে যে গিরগিটির মত একটি জীব পড়ে আছে। জীবটি যেখানটায় সমাহিত ছিল সেখানে তার বেশ একটা ছাঁচ তৈরি হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, লোকগুলি জীবটিকে উপরে তুলে আনবার কিছুক্ষণ পরে সেটি আস্তে আস্তে নড়চড়া শুরু করে। সেদিন রোদের তাপে সেই যে তুষারগর্ভে সমাহিত জীবটি বেঁচে উঠেছিল, সেটির নাম ট্রাইটন। শুনেছি জীবটি নাকি দিব্যি পোকামাকড় খেয়ে আজও বেঁচে আছে।

এই ব্যাপার ঘটবার পর একদল ভূতত্ত্ববিদ্ সেই জায়গায় গিয়ে আরো গভীর করে খননকার্য শুরু করেন। ৮ গজের মত নিচে পৌঁছে তাঁরা সেখান থেকে ওই উভচর জীবের আর একটি নমুনা উদ্ধার করেন। সেটিও বেঁচে ওঠে। অথচ সেখানে মাটিতে তাঁরা এমন কোন ফাটল বা সুড়ঙ্গ পেলেন না, যা দিয়ে প্রাণীটি অত নিচে নামতে পারে। তাই থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়ালেন যে, জীবটি যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেইখানেই তার বসবাস ছিল। ভূগর্ভের সেই যে স্তর, সেটি ১০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই বাসিন্দা আজ আলো ও তাপের ছোঁয়া পেয়ে নতুন করে বেঁচে উঠেছে।

ব্যাপারটা বিশ্বাস করা শক্ত নয় কি? কিন্তু শক্ত হলেও সত্য। তাছাড়া এটি এক বিচ্ছিন্ন বা একক ঘটনা নয়। আজ পর্যন্ত দেশ-দেশান্তরে ওই ধরনের গোটা-ত্রিশেক জীব পাওয়া গিয়েছে। তারও অনেক আগে ১৯১১ সালে সাইবেরিয়ার তুষারগর্ভে একটি ম্যামথের জীবাশ্ম পাওয়া যায় যার শুঁড়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে কিছু জীবাণু পাওয়া যায় যেগুলি বেঁচে ছিল। হাজার হাজার বছর বরফ-চাপা থেকেও তারা মরেনি।

কিছুদিন আগে দক্ষিণ-মেরু অভিযানে গিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানী মিঃ মায়ার্স বরফের নিচে একটি গর্তের ৩০ মিটার গভীরে জীবন্মৃত অবস্থায় এক জীবাণুপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। পুষ্টি দেবার পর সেগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানকার তুষারাবরণের বয়েস ৩০০০ বছর।

দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে আসছেন অনেকদিন ধরে। প্রতিকূল পরিবেশে, বিশেষ করে অত্যধিক ঠান্ডায় জীবদেহ ও জীবকোষের অবস্থা ও কার্যকলাপ পরীক্ষা করছেন তাঁরা। অত্যধিক ঠান্ডায় রেখে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপগুলি মন্দায়িত করার পর আবার তাদের অনুকূল পরিবেশে রেখে জৈবক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, এই হচ্ছে তাঁদের কাজ।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, কয়েক জাতীয় জীব যখন শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটায় তখন তাদের ধমনী-স্পন্দন এত আস্তে হয়ে যায় যে অনুভবই করা যায় না। সেই সময় তাদের দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সমান হয়ে যায়। সেই অবস্থাটা হচ্ছে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান-রেখা। তার এক

এই প্রাগৈতিহাসিক উভচর জীবটির নাম ট্রাইটন। এটি ম্যামথের সমসাময়িক। ৬০০০ বছর আগে জীবটি সাইবীরিয়ায় বরফের তলায় ঢাপা পড়ে। ১৯৬৪ সালে এক খননকার্যের সময় এটিকে পাওয়া যায়। বাইরে এসে জীবটি আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠে সারা গ্রীষ্মকাল খুব মজে খেয়ে বেঁচে ছিল

পাশে জীবন, অন্য পাশে মৃত্যু। জাগ্রত অবস্থার চেয়ে ঝিমিয়ে থাকা অবস্থায় জীবগুলির দেহ প্রতিকূল অবস্থাজনিত ক্ষয়ক্ষতি বেশি সইতে পারে। আচার্য সাজিনস্কি নামে লেনিনগ্রাদের এক বৈজ্ঞানিক কতকগুলি শূককে ক্রমে ক্রমে কম ঠাণ্ডা থেকে বেশি ঠাণ্ডা অবস্থায় নিয়ে গিয়ে শেষে ৪ দিন ধরে সেগুলিকে তরলীকৃত নাইট্রোজেনের মধ্যে রাখেন, যার তাপমাত্রা শূন্যের ১৯৬ ডিগ্রী নিচে। তারপর স্বাভাবিক উত্তাপে ফিরিয়ে আনার পর সেগুলি আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি আরো দেখেছেন যে, ওই জীবের পুরুষ বীজ বরফে ৮ বছর জমিয়ে রেখেও সেগুলির গর্ভাধান করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়নি। শূন্যের ২৬৯ ডিগ্রী কম তাপমাত্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা রেখে আচার্য সাজিনস্কি ২০টির মধ্যে ১৩টি পোকা বাঁচিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু শূক আর মেরুদণ্ডী জীব এক কথা নয়। এ পর্যন্ত লেবরেটরিতে তাদের উপর ওই ধরনের পরীক্ষা একবারও সফল হয়নি। অবশ্য প্রকৃতির রাজ্যে ওই ধরনের ব্যাপার যে না ঘটে তা নয়। আলাস্কার নদীতে এক রকমের কালো রঙের মাছ আছে, যারা নদীর জল বরফ হলে মৃতপ্রায় হয়ে যায়; আবার জল গলতে শুরু করলে তারা প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

মৃতপ্রায় বা জীবন্মৃত জীবকে পুনরুজ্জীবিত করার পরীক্ষা মানুষের জীবনে বহু উপকারে আসবে। সেই পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে ঠাণ্ডা পরিবেশে হয়ত মৃতপ্রায় মানুষ বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন। তখন দেহকে ঠাণ্ডা করে অস্ত্রোপচার করাও সহজতর হবে। শস্যের পক্ষে অনিষ্টকর পোকাগুলির কোন্‌টি প্রচণ্ড শীতে মরবে, কোন্‌টি মরবে না সেটা জেনে বিজ্ঞানীরা শস্যকীট নিবারণে সেই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

তাপমাত্রার প্রচণ্ড হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিভিন্ন জীবের পক্ষে যখন বেঁচে থাকা সম্ভব তখন মঙ্গলগ্রহের প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সেখানে যে কোন জীব থাকা সম্ভব নয়, এ কথা বলা কি সমীচীন।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

১২

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও এই সংকল্পে তিনি অটুট রইলেন। আর তার জন্য যা করণীয় সবই করলেন একে একে। ফোন করতে হলো। কয়েকটা, রিজার্ভেশন নাকচ করতে হ'লো, দুটো ট্রাঙ্ক কল করলেন, একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। কিছুটা অর্থদণ্ড হ'লো, ঝামেলা হ'লো অনেক। হোক। শেষ পর্যন্ত যে নিরাপদে করে উঠতে পারলেন সব তাই ঢের। খুব নিশ্চিন্ত লাগলো। খুব নিরুদ্বেগ হলেন। এতো শান্ত লাগলো মনটা! এতো ভালো লাগলো! এমন একটা আনন্দ অনুভব করলেন হৃদয়ে যে সব গ্লানি ভুলে গেলেন।

দিনের নার্স বাদ দিয়েছেন কাল থেকে। মিছি মিছি জুড়ে থাকতো ঘরটা। ভালো ভদ্র একজন আয়ার খোঁজ পেয়েছেন, সারাদিন থাকবে সঙ্গে সঙ্গে, অথচ অদরকারে লেগে থাকবে না। না ডাকলে আসবে না। রাত্তিরের নার্সটি বরং থাক আরো কয়েকদিন, ভারি ভালো, ভারি যত্নশীল। এখনো ওর যথেষ্ট যত্নে থাকা দরকার।

হাতের ঘড়ি দেখলেন। দশটা বেজে পাঁচ। বাঃ। মাত্র দশটা বেজেছে? এইটুকু সময়ের মধ্যে এতো কাজ করে উঠলেন? তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে বাইরে এলেন, বারান্দা পার হয়ে, বেঁকে সোজা এ-ঘরে।

একটা সদ্য যুবকের মতো টগবগ করছিলেন তিনি। অতসী ওদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলো জানালায়। এই জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের বড়ো বড়ো গাছপালা ছাড়িয়ে সরু লেনটার কিছু অংশ চোখে পড়ে। তাঁর মনে হ'লো অতসীর একাগ্রদৃষ্টি সেই লেনটার উপরেই নিবদ্ধ। সে নিশ্চয়ই তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকেই খুঁজছে ওখানে। কাল দুপুর থেকে তিনি অনুপস্থিত। বেচারা, এতোক্ষণ না দেখে হয়তো কতো অস্থির হয়েছে, ভয় পেয়েছে, রাগ করেছে—

নিঃশব্দে এসে গা ঘেঁষে পাশে দাঁড়ালেন। কিছু বলতে গিয়েছিলেন, অতসী চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো, তারপরেই যেন সাপ দেখেছে এমনিভাবে ছিটকে সরে গেল ওদিকে।

'কী হলো?' অভ্যাস মতো আদরের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়েছিলেন কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকেও চমকাতে হলো। যে অতসীকে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত দেখে গেছেন, এই অতসীর সঙ্গে কোনো মিল ছিলো না তার। এই অতসীর স্বাভাবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আগুন প্রতিহিংসা সব একসঙ্গে লেলিহান হয়ে উঠছে।

তাঁর তপ্ত বুকটা মুহূর্তে হিম হ'য়ে গেল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরেই সব বুঝলেন। না বোঝার কারণ নেই কোনো। এই দৃষ্টির সঙ্গেই তো তাঁর গাটছড়া বাঁধা। এর সঙ্গেই তো এতোকাল ঘর করেছেন। বেদে যেমন সাপের ভঙ্গি বোঝে, তিনিও তেমনি মেয়েদের চোখের ভাষা বিশারদ। এই সব অপ্রুত অব্যক্ত ভঙ্গি নিয়েই তাঁর কারবার।

তাহলে এতোদিনের এতো যত্নের ফল সত্যি ফললো? ওর চেতনার আয়নায় ধরা দিল সব? ফিরে এলো স্মৃতি? বর্তমানের বিভীষিকা বোধগম্য হ'লো? আসল পাপীকে চিনতে এক লহমাও দেরি হ'লো না?

ভালো। ভালো। এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? এই তো তিনি চেয়েছিলেন। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে এই সুস্থ, সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়ানোই তো ছিলো তাঁর একান্ত কামনা। এই তো তাঁর সেই কামনার ধন। আর এই কাম্য কন্যারা তাঁকে যা দিতে পারে অর্থাৎ এদের কাছ থেকে যা তাঁর প্রাপ্য, তা তো এই। এই ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আগুন আর প্রতিহিংসার অতসীর চোখ মুখ হাত পা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে অবিরলভাবে যা উদ্গীরন হচ্ছে।

এখানে যে সব মেয়েরা আসে, অতসীর মতো এতো সরল এবং নিষ্পাপ না হলেও তারাও কেউ দেহপোজীবিনী নয়। টাকার জন্যই আসে বটে অথবা অভিভাবকের প্ররোচনায় কিন্তু সকলেই তারা চোখের জলে গাল ভাসিয়ে আসে। তারাও ভয় পায়, ঘৃণা করে। সারা চেহারায় আতঙ্কের ছাপ মুখোসের মতো এঁটে থাকে। প্রত্যেককে জোর করতে হয়, এবং এই কথাটা তিনি নিজের কাছে একাধিক বার স্বীকার করেছেন যে, সেই জোর করাটাই তাঁর আসল খেলা। এই লীলার সেটাই আসল অংশ। একদিকে একটা অসহায় অরক্ষিত, অনিচ্ছুক দেহ, অন্যদিকে একটা হৃদয়হীন জন্তু। মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার্থে হরিণের ত্রস্ততার সঙ্গে বাঘিনীর হিংস্রতা নিয়েও কেউ কেউ যখন বন্য হয়ে ওঠে, মিঃ মিত্রের মনে হয় চমৎকার! এই দুটো রূপই তো ওদের আসল রূপ। এই সময়েই তো সবচেয়ে রমনীয় হ'য়ে ওঠে ওরা। নাটকের তো এই ক্লাইমেকস্? তখন ঘুড়ির লাটাইয়ের মতো নরমে গরমে সুতো ছাড়েন। নাস্তানাবুদ হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত মেয়েগুলো নেতিয়ে যায়, কলের মতো। সমর্পিত হয়, চাইলেই পান। আর তখনি তাঁর সমস্ত ঔৎসুক্য নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। আবার ডাক পড়ে মহিমের, আবার নতুন নেশার খোরাক জুটোতে সে হন্তদন্ত হয়।

কিন্তু আজ একটু গোলমাল হয়ে গেল। নিজেকে ঠিক সুস্থ মনে হলো না। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক দাপট, দম্ভ, জেদ হার না মানার উদ্ধত ভঙ্গি, অভ্যাস-কিছুই কার্যকরী হ'লো না। চুপ ক'রে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, একটি প্রলম্বিত রোদের রেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানালায় নুয়ে পড়া লেবুগাছটা বাতাসে নড়ছিলো সেটা দেখতে দেখতে এক সময়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

১৩

অতসী উন্মাদ ছিলো না, অর্ধচৈতন্য ছিলো। তার অতীত ছিলো না বর্তমান ছিলো। স্মৃতি না থাক স্মরণ-শক্তি ছিলো। শুধু কতোগুলো ভুল ধারণা যুক্ত হয়েছিলো সেই অর্ধচেতনার সঙ্গে। ভুল ধারণাগুলো হেমন্তের শুকনো পাতার মতো ঝরে গেল

করে, শুধু যা সত্য তাই প্রকট হ'য়ে রইলো সামনে পিছনে। সেই সত্যের আলোয় অতীতও যেমন স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বর্তমানও ঠিক তাই। দুই-ই অসহ্য যন্ত্রণাবহ। তবু অতীতের অসংখ্য দুঃখ বেদনার মধ্যেও তার কোনো অসম্মান ছিলো না এবং বেঁচে থাকার পক্ষে সেটাই ছিলো তার সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। তা-ছাড়া মানুষটা সে বিশ্বাসপ্রবণ। মনকে সে এই কথা বলেই সর্বদা শান্ত রাখতো, যতো কষ্টই পাই না কেন, এ কষ্টের অবসান আমাদের হবেই হবে। হ'তে বাধ্য। কেননা জগতে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। এমন কি তার মা আর ভাই পার্থর শিয়রে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর পদক্ষেপ শুনতে শুনতেও এই বিশ্বাস তার শিথিল হ'তো না। তার মনে হ'তো মৃত্যুর ততো শক্তি নেই যার আঘাতে তার মন থেকে এই বিশ্বাস সে উৎপাটিত করতে পারে।

আসলে বিশ্বাসকে আঁকড়ে না থেকে কোনো উপায়ও ছিলো না। বিশ্বাসের জোরেই সে চলতো, ফিরতো, খাটতো, ধারণ করে রাখতো এতো বড়ো সংসার সমুদ্রকে। সেই সম্বলটুকু নিয়েই সে ঐ সংসারের অতোগুলো ফুটো নৌকোর

জল সেচন করতো এক হাতে। কষ্টকে কষ্ট বলে মানতো না, দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করতো, হতাশাকে দাবিয়ে রাখতো ভ্রুকুটির শাসনে।

কিন্তু এখন? এখন আর তার কোনো সম্বল রইলো না। তার বিশ্বাস ভেঙে খান খান হ'য়ে গেল। অসংখ্য কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনবরত বিদ্ধ করতে লাগলো তাকে, অনবরত রক্তক্ষরণ হ'তে লাগলো। এই অসম্ভ্রান্ত অপমানিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা তো শুধু মরতে না পারার শাস্তি। আগে সে মায়ের জন্য বেঁচেছে, বাবার জন্য বেঁচেছে, ভাইবোনদের জন্য বেঁচেছে। হাজার বেদনার মধ্যেও সে বেঁচে থাকার গৌরব ছিলো কতো। কতো অর্থ ছিলো। কতো প্রয়োজন ছিলো এখন তো শুধু জ্বালা, শুধু আগুনের বেড়াজালে বিরামহীনভাবে দগ্ধ হওয়া। হে ঈশ্বর। এ জীবন আমার নিজের সৃষ্টি নয়, তোমারই ইচ্ছার দান, তবে কেন এই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ? এই ভয়ঙ্কর নরকে নিক্ষেপ?

আর ওরা? ওরা কী করছে? কী খাচ্ছে? কী ভাবছে? মা কেমন আছে? পার্থ কেমন আছে? মালতী কেমন আছে। আমার আর সব ভাইবোনেরা? আমার শিবাজী কৃষ্ণ অর্জুন চম্পা চামেলি—যারা আমরা একই মায়ের পেটের অন্ধকার থেকে একই রক্তে মাংসে তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের অমন সুন্দর সদাশিব বাবা—

বাবার কথায় এসেই অতসীর চিন্তা একটু টোল খায়। কেমন এক নাম না জানা যন্ত্রণায় ধড়ফড় ক'রে ওঠে বুকটা। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না বাবা তাকে ডাক্তার ডাকার জন্য ঐ রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

কদিন যাবতই বাবা কেমন যেন অন্য রকম হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহারে সামঞ্জস্য ছিলো না। তিনি কথা বলতেন না, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বারান্দায় পড়াতে বসতেন না, মার কাছে পর্যন্ত দাঁড়াতেন না একবার। কেবল কী ভাবতেন আর ভাবতেন। বাবা কি তখন আস্তে আস্তে পাগল হ'য়ে যাচ্ছিলেন। ওসব কি মানুষের মাথা খারাপের লক্ষণ? দুঃখে দুঃখে বস্তুতই কি মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়? বাবারও কি তাই হয়েছিলো? আর সেজন্যই কি সেদিন সকালে স্নান করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরলেন না? পথ ভুলে যাননি তো? আমাদের কথা ভুলে যাননি তো? সেদিন বাবার কী হয়েছিলো? কোথায় গিয়েছিলেন? কোথা থেকে সন্ধ্যাবেলা অমন উদভ্রান্ত মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন?

আর ফিরে এসেও যে ব্যবহার করলেন, সেভাবে তাকে ডাক্তার ডাকার কথা বললেন, যে পথে নিয়ে এলেন, তখন মনে হয়নি, সেই বিপদের গুরুত্বে আর কিছু মনে হবার মতো অবস্থা ছিলো না কিন্তু এখন সভাবে ভেবে মিলিয়ে দেখতে গেলে সবটাই কেমন যেন এলোমেলো অস্বাভাবিক বলে বোধহয়।

বাবা, আমার বাবা, তুমি কি তবে সত্যি পাগল হ'য়ে গেছ? আর তাই কি লোকগুলো সুযোগ বুঝে পালালো আমাকে নিয়ে? তুমি কিছু করতে পারলে না! যে তুমি একটা পাথরের মতো শক্ত মানুষ যে তোমার শক্তিতে সাহসে সততায় আমাদের ঢাকার সারা পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত থাকতো, যে তুমি লাঠি-হাতে নিলে তেমন তেমন যোয়ানের দলও মুখ চাওয়া চাওয়ি করতো। পালাতে পথ পেতো না অপরাধীরা। সেই তোমার চোখের সামনে থেকে তোমার মেয়েকেই ধরে নিয়ে গেল পাষণ্ডগুলো। তারপর? তারপর তুমি কী করলে? বাড়ি ফিরে গেলে? পথে পথে ঘুরলে? কপাল ঠুকলে ফুটপাতে? তাহলে ওদের কে দেখছে? তোমাকে কে দেখছে? এখনো কি বেঁচে আছে ওরা? মা আর পার্থ? আর মালতী? আমার পঙ্গু দুঃখী বোনটা। সে কী করছে?

অতসী কাঁদতে চায়, কাঁদিতে পারে না। জল আসে না চোখে। এখানে এই বাড়িতে, একজন মেয়ের পক্ষে চূড়ান্ত অপমানের জীবনে কোথাও জল না থাকাই স্বাভাবিক। চোখের জল হ'লেও জলই তো? তাতেও তো অনেক দুঃখ ধুয়ে যায়? ধোবে কেন? এ তো শুধু পোড়ার। পুড়ে পুড়ে ছাই হবার। এ শুধু আগুন। আগুন। জ্বলন্ত আগুন।

কিন্তু কবে আমি এসেছি এখানে? কদিন আগে? কী বার ছিলো সেদিন? কী মাস ছিলো। মাসটা মনে আছে, তারিখটাও; শুধু বারটা মনে নেই। চৈত্র মাসের তেরো তারিখ। শিবাজীর জন্মের তারিখ ছিলো সেদিন। সে কথা আর কারো মনে ছিলো না, শুধু তার ছিলো, আর ছিলো শিবাজীর নিজের। আর সেইদিনই এই ঘটনা ঘটলো। এই দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো জীবনে।

কোথায় বসন্তের চৈত্র আর কোথায় বর্ষার আষাঢ়। চৈত্র থেকে আষাঢ়। তিন মাস? তি-ন-মা-স? বুকটা ফেটে যায় তার। টেবিলের উপর দাঁড় করানো শৌখীন ক্যালেণ্ডারটা টেনে এনে তারিখ মিলোয় সে। তার পরেই হাতে যেন ফোস্কা পড়ে। মনে পড়ে যায় এই ক্যালেণ্ডারটা কে এনে রেখেছে এখানে, কেন রেখেছে, কেন একটা নির্দিষ্ট তারিখের উপর লাল পেন্সিলের দাগ।

বলাই বাহুল্য, এর পর সমস্ত জিনিসটার চেহারাই সম্পূর্ণ বদলে গেল। সমস্ত আবহাওয়াটাই অন্য রকম হয়ে গেল। লজ্জায় দুঃখে অপমানে ক্রোধে অতসীও যেমন একেবারে নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে রইলো মিঃ মিত্রও তেমনি যথা সম্ভব দূরে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু হাজার হোক অতসী তাঁর অতিথি, অসুস্থ, তাকে তিনিই একদা তাঁর জোর খাটিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের দায় তাঁর আছে বইকি! একটু আধটু খোঁজখবর না নিয়ে কি থাকা যায়? দিনান্তে অন্তত একবারও না দেখে কি ভালো লাগে? তাই, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব পেরিয়ে মাঝে মাঝেই এসে টোকা দেন দরজায়। এইটুকুর জন্যই তাঁর অনেক বল সঞ্চয় করতে হয়। নিজের এই দীন চেহারা দেখে নিজেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, আর সেজন্যই বাইরের বারান্দা দিয়ে যখন আসেন জুতোর শব্দটা একটু বেশী হয়। যা তাঁর স্বভাববিরোধী। সেই শব্দ দিয়েই তিনি জানিয়ে দিতে চান, এখানকার তিনিই

একচ্ছত্র সম্রাট। এ বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী, তাঁরই হুকুমের দাস। কিন্তু দরজার কাছে এসেই সেই শব্দ যে কখন স্তিমিত হয়ে ওঠে বুঝতেও পারেন না। কোনো জানান না দিয়ে সদম্ভে ঘরে ঢুকতে গিয়েও ভীরু গলায় বলেন, 'আসতে পারি?' বলেই অবশ্য ঢুকে পড়েন। জানেন যে এই প্রশ্নের জবাব দেবে না কেউ।

আয়া যদি ঘরে থাকে সে অবশ্য তাড়াতাড়ি ছুটে আসে দরজার কাছে, এক পাশে পর্দা সরিয়ে ধরে সাহেবকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানায়। সাহেব ঘরে ঢুকে এলে তার গা-ভরা গয়নায় ঝুমুর তুলে সে বেরিয়ে যায় বাইরে।

আয়াটি নেপালীনি; সুন্দরী, তার নিজস্ব বসনভূষণে সদা সজ্জিত। গোলাপী মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন মিত্র সাহেব, হাসির অভাব নেই সেখানে। ঐ মুখে তার আরো সুখের চিহ্ন এ'কে দিতে ইচ্ছে করে, মনে মনে ভাবেন এর সংগে বেশ ঘটা পটা করে শায়লার বিয়ে দিলে কেমন হয়? শায়লা যথেষ্ট উপযুক্ত পাত্র, কেমন খটখটিয়ে ইংরিজি বলে, স্যুটে বুটে সেজে থাকে, দেখতে এর চেয়ে বেশী ছাড়া কম সুন্দর নয়, আর মাইনে তো বেশ। কোয়ার্টার আছে।

ভাবতে ভাবতে ঘরের চারদিকে তাকান, তার পরেই বেরিয়ে যাবার একটা নিঃশব্দ নির্ঘোষ শুনতে পান। মনে হয় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারের মতো 'প্রবেশ নিষেধের' একটা অলিখিত নির্দেশ উজ্জ্বল অক্ষরে সে'টে দিয়েছে কেউ।

নিজেরই বাড়ি, নিজেরই ঘর তবু কেমন চোর চোর মনে হয়।

'কেমন আছো?' ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করে ফেলেন। পরপার থেকে জবাব আসে 'ভালো'।

নার্স বলছিলো, 'ঘুম হচ্ছে না রাত্রে—'

'হয়।'

'কিছু খেতে চাও না—'

'খাই।'

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

'আয়া ঠিক মতো কাজ করছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এ ঘরটা বোধ হয় তোমার পক্ষে একটু ছোটো—'

'না।'

'বরং পাশের বড়ো ঘরটাতে গেলে—'

'কিছু দরকার নেই।'

'অর্থাৎ আমি বলছিলাম যে, ঘরগুলো তো সব অমনিই পড়ে আছে, সব ঘরের সংগে দরজাও আছে সব ঘরের, ইচ্ছে মতো সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পার।'

এর কোনো জবাব আসে না উল্টো পক্ষ থেকে।

'সারা দিন এইটুকু জায়গার মধ্যে—একটু হাঁটা চলাও তো দরকার?'

জবাব নেই।

'আজকাল আর একেবারেই বারান্দায় আসো না—'

'আর যা ভাপসা গরম পড়েছে। কে বলবে বর্ষাকাল।' চুপ।

'বিকেলে যদি গাড়ি করে একটু বেড়াতে যেতে চাও—'

'না।'

'আমি যাবো না সংগে, ড্রাইভারই নিয়ে যেতে পারে। আয়া থাকবে—'

'না।'

'তা হ'লে, মানে তা হ'লে—' তা হলে যে কী সেটা আর ভেবে পান না। সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে ধরান না, সার্টের বুকের বোতামটা খোলেন আর লাগান; তবু দাঁড়িয়ে থাকেন। এ ঘরের মানুষ তাঁকে বসতে বলেনি, তবু হঠাৎ বসে পড়েন মখমলের সোফাটার উপর। উঠে পড়েন তখুনি, টেবিলের কাছে এসে ওষুধগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কী সব মন্তব্য করেন সে বিষয়ে। হঠাৎ মনে হয় সমস্তটাই একটা লম্বা দুঃস্বপ্ন, এক্ষুনি অতসী ঠিক আগের মতো করে তাকাবে তাঁর দিকে, আবার উদ্বেল হয়ে বলে উঠবে 'এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

কিন্তু অতসী তা বলে না, সে একটা লোহার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ প্রান্তে, তার দৃষ্টি তখন থেকে একই ভাবে মাটিতে নিবদ্ধ, যেন সে দৃষ্টি সেখানেই পুতে গেছে। তার নিচু করা শক্ত মুখ দেখে তিনি অনায়াসেই অনুভব করতে পারেন সে দৃষ্টির জ্বলন্ত আগুনে সে পুড়িয়ে দিচ্ছে মেঝেটা। মহাভারতের গান্ধারীর দৃষ্টি। চোখে সাতপাল্লা কাপড় বাঁধা থাকা সত্ত্বেও যে দৃষ্টির আগুনে উছলে পড়েছিলো যুধিষ্ঠিরের নখের উপর। জ্বলে গিয়েছিলো তৎক্ষণাৎ। হ্যাঁ, তিনি জানেন, অতসীর দৃষ্টিতেও এখন সেই আগুন উন্মত্ত হয়ে জ্বলছে।

(ক্রমশ)

পুষ্পমাল্য গলায় অভিনন্দিত শাহনওয়াজের ছবিটিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই। আছে এই ছবি তোলার কাহিনীতে। আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, তালেগোলে সেদিন সব যোগাযোগ যেন আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল একটির পর একটি। আর ফাঁকতালে আমি কাজ হাসিল করে বেরিয়ে এলাম। বোধ করি রাশিফল তুংগী ছিল।

অবশ্য সেদিনটি নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয়। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জানুআরি দিল্লির গগন সোনালী আলোতে ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রভাত হতে না হতেই। আলোর কিরণচ্ছটায় প্রচন্ড শীতের প্রকোপ পর্যন্ত সরে গেল আড়ালে, পথে-ঘাটে, আকাশে-বাতাসে সোনালী আলোয় ধ্বনিত হল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ—আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর যোদ্ধারা মুক্তিলাভ করেছে। অচিরেই উল্লসিত জনতায় পথঘাট ছেয়ে গেল, চতুর্দিক থেকে সবাই ছুটল মুক্ত বন্দীদের দর্শন করতে। অভিনন্দন জানাতে। স্বতস্ফূর্ত আনন্দে সবাই উন্মাদপ্রায়। ততক্ষণে সারা দেশ জেনে গেছে—লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারের অবসান ঘটেছে, শাহনওয়াজ-শেগল-ধীলন সবাই বীর সম্মানে মুক্তিলাভ করেছে।

দিল্লির যখন ওই হাল, তখন আমারো ইচ্ছে হল এই বীর সন্তানদের একবার দেখতে। কিন্তু আমার ইচ্ছার কে ধার ধারে? তবুও ক্যামেরাটা কাঁধে ফেলে এসে দাঁড়ালাম গোল-মার্কেটের কাছে পথের ধারে। দাঁড়িয়ে দেখছি পথে বয়ে-যাওয়া উল্লসিত জনস্রোত আর ভাবছি—কোথায় কীভাবে গেলে এই বীরদের দেখতে পাব, ছবি তুলতে পারব! কিছুই তো আমার জানা নেই, কে আমাকে এ সব হদিস দেবে? দিল্লিতে আমি বেড়াতে এসেছি।

আনন্দে মুখরিত জনতা-বোঝাই টাঙার দল ছুটে চলেছে হরদম। হঠাৎ দেখি একটি টাঙা রোখকে-রোখকে বলে থেমে গেল আমার কাছেই। একজন আমাকে ডেকে বলল—জলদি আইয়ে, আপ বাইরে গা না? কথার থেকে কাজ এখানে দ্রুততর হল। কাউকে জানিনা-শুনিনা অথচ দিব্যি চেপে বসলাম ওদের সংগে। টাঙা আবার ছুটে চলল দরিয়াগঞ্জের দিকে। আমি বেশী কথা বলছি না, সেই ভদ্রলোকই একবার বললেন—আমরা আপনাকে আই-এন-এ অফিসে নামিয়ে দেব, সেখানে গেলেই সব পাত্তা পাবেন।

আই-এন-এ অফিসের দরজায় টাঙা থেকে নেমেই দারুণ একটা স্পীডের মাথায় অফিস-ঘরে প্রবেশ করে দেখি ঘরময় লোক ভরতি। অতি ব্যস্ত এক ভদ্রলোক টেবিলে বসে শুধু নেহি-নেহি বলে আপত্তি জানাচ্ছেন। চতুর্দিকের কথায় জর্জরিত। এ অবস্থায় আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম—আই অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা...। কথা শেষ না হতেই—আচ্ছা তো ঠিক হ্যায়—বলেই অফিসের কাগজে খচ্‌খচ্‌ করে লিখে দিলেন "ক্যালকাটা প্রেস"। আমাকে আর কোন প্রশ্ন বা কথা বলার অবকাশ না দিয়ে একটা বাড়ির ঠিকানা বললেন। সেখানেই ও'দের সবাই-এর দেখা মিলবে। পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন—চলিয়ে, হাম ভি বা-রাহা হ্যায়। আর কথা নেই, ভদ্রলোকের সংগে বাইরে এসে তার গাড়িতে বসলাম। তিনিই

ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে চললেন সেই বাড়িতে।

যে বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল, সেখানে শত শত লোক বাইরে অপেক্ষা করছে মালা হাতে। বোধ হয় ভুল করেই আমাদের গাড়িকে ঘিরে ধরল সবাই। ইতি-মধ্যে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। বাড়ির বারান্দায় অতি-ব্যস্ত কয়েকজনকে আমার কথা কি বললেন বুঝলাম না, দেখি একজন এগিয়ে এসে আমাকে অতি সমাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন—এখন শাহনওয়াজ শুধু আছেন, সেগল আর ধীলন বাইরে গেছেন, আসবেন এক্ষুনি। আপনি একটু চা খান। সংগে সংগেই চা আর খাবার দিয়ে গেল একজন। মনে হল এ যেন উৎসব-বাড়ি, আর আমি এক বিশিষ্ট অতিথি! আমার কোন ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ঘটেনি সেই সকাল থেকে। এখনও ভাবতে পারছি না, তারপর কি হবে! একবার শুধু ভদ্রলোককে বললাম—শাহনওয়াজের ছবিটা এখন তুলে ফেললেই তো হয়! এক মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে এলেই চলবে। ভদ্রলোক তখুনি শাহনওয়াজকে নিয়ে এসে বললেন—চলিয়ে মিস্টার দত্ত।

জানিনা আমি কেন 'দত্ত' হলাম। তখন তাই মেনে নিয়ে শাহনওয়াজের সংগে বাইরে এলাম। আর সংগে সংগেই আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি শুরু হল—জয় হিন্দ! নেতাজী জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! শাহনওয়াজ—

শাহনওয়াজের গলায় তখন মালার বোঝা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে আমি ছবি তুলে নিয়েছি, কিন্তু উন্মত্তপ্রায় জনতার আক্রমণে এমন এক পরিস্থিতি ধারণ করল যে, শাহনওয়াজকে তখুনি বাড়ির ভিতর নিয়ে না গেলে সেই ভদ্রলোকের বাড়িটি শেষ পর্যন্ত আস্ত রাখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ভিতরে এসে ভদ্রলোক আমাকে বললেন—যা অবস্থা দেখছেন তো মিস্টার দত্ত? আপনি এখন এ-ঘরে বিশ্রাম করুন, ওরা সবাই এলে আমরা একসংগে লাঞ্চ খাবো। আপনিও থাকবেন। তারপর আমরা বিকেলে গান্ধী-ময়দানে যাবো, সেখানে এঁদের সম্বর্ধনায় আসফ আলী সাহেব বক্তৃতা করবেন।

এবার প্রমাদ গুণলাম। ভাবলাম তালে-গোলে আমার কাজ হাসিল হয়ে গেছে, আর থাকাটা নিরাপদ নয়, শেষকালে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তখুনি বুদ্ধি করে বিকেলের মিটিং এবং জরুরী টেলিগ্রামের গল্প দেখিয়ে চলে এলাম ও-বাড়ি থেকে। পথে এসেই এক টাঙা নিয়ে সোজা গোল-মার্কেট।

*

ফেরার পথে গোটা ব্যাপারটা স্মরণ করে মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কেন লোকটা টাঙায় তুলে আমাকে নিয়ে গেলেন আই-এন-এ অফিসে? অফিসের সেই ভদ্রলোক আমাকে কী-ই বা ঠাউরে-ছিলেন, আর গাড়ি করে কেন-ই বা আমাকে নিয়ে গেলেন অচেনা সেই ভদ্রলোক? তার-পর আমাকে 'দত্ত' বানিয়ে বিশেষ সমাদরে সেই ভদ্রলোকের আতিথেয়তা—এ সবের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। গোল-মার্কেট এল। টাঙা থেকে নেমেই চলে যাচ্ছিলাম। থমকে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিলাম। সেদিন পকেট থেকে এই প্রথম পয়সা দিতে হল।

—নীরোদ রায়

"এ জীবন লইয়া কি করিব ?"

বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হল না। অবশ্য জীবনী নামে অনেক গ্রন্থ আছে, তাদের মূল্য অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, কোনখানিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবনের যোগ্য নয়। এ সব গ্রন্থের অধিকাংশই হয় তথ্য ও ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ, নয় অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য গাল্পগল্প ও কিম্বদন্তীর সংগ্রহ। কোন লেখকের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত না করেও নিরপেক্ষ পাঠক বলতে বাধ্য হবে যে, প্রচুর তুষের মধ্যে কখনো কখনো সত্যের দানা আছে সত্য, কিন্তু সে সব এতই অল্প যে, সমস্ত সংগ্রহ করলেও মুষ্টিমেয় হবে কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়ার পক্ষে সে মুষ্টিমেয় দানা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তবে এই নিয়মের কতকগুলি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালীনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সবগুলিই আকারে প্রবন্ধ অর্থাৎ ক্ষুদ্র। এই সব রচনার নখদর্পণে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিভাত বটে। কিন্তু নখদর্পণে বিম্বিত মূর্তি জীবন্ত হলেও মনুষ্য প্রমাণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিয়াত্তর বৎসর গত হতে চলল, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনীর অভাবে মানুষের কল্পনা তাঁর একটি মানস মূর্তি গড়ে তুলেছে। ফলে সাধারণ বাঙালী পাঠকের মনে যে বঙ্কিমচন্দ্র বিরাজিত তিনি পাঠকের কল্পনায় সৃষ্ট ব্যক্তি, আসল মানুষটি নন।

প্রত্যেক দেশ নিজের বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মূর্তি এইভাবে গড়ে তোলে; কখনো সেসব বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কখনো মেলে না, অনেক সময়েই মেলে না। এই বিকল্পগুলিই তাদের চোখে মৌলিক মানুষটি। এই গঠন ক্রিয়ায় মৌলিক মানুষটির প্রকৃত পরিচয় থাক বা না থাক গঠনকারীর পরিচয় অবশ্যই থাকে। সাধারণ বাঙালীর চোখে বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাঙালীর কোমল মন দয়া গুণটাকে যেমন বোঝে অজেয় পৌরুষকে তেমন নয়। তাই বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ অনেকটা আড়ালে পড়ে গিয়েছে। মধুসূদন দত্তকে বাঙালী পাঠক নিজের রুচি অনুসারে ঢেলে গড়বার চেষ্টা করেছে, নতুবা দীনবন্ধু মিত্রকে উত্তর দিতে হত না যে, মধু কি কখনো নিম হয়। দুর্জয় শক্তির আধার মধুসূদন, যার একমাত্র তুলনাস্থল গ্রীক পুরাণের দুর্ভাগ্যের বীরবর Laokoon, বিস্মৃতপ্রায়। আর বাঙালীর যৌথ কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে দেবত্বে অভিষিক্ত করেছে; তাঁকে এমন উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে যেন তিনি সাধারণ মানবীয় সুখদুঃখ অভাব অভিযোগের অনেক ঊর্ধ্বে। বাঙালীর শক্তিপুজোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শক্তিপুজোর পরিকল্পনা বিশেষ এক আমলের বাঙালীর অসহায় অবস্থার পরিচায়ক। বাস্তবে যে বলভরসার অভাব ছিল, কল্পনায় তাই পুরিয়ে নিয়েছিল বাঙালী। "পঁচিশে বৈশাখের" রবীন্দ্রনাথও সেই রকম একটা পরিকল্পনা কি না একবার সন্দেহ হয়। যে সব সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগে নিরন্তর আমরা পীড়িত তার অনেক উচ্চে অবস্থিত এক দিব্য পুরুষ সৃষ্টি করে বাঙালী যেন বিকল্পে সান্ত্বনা লাভ করতে চায়। কিন্তু এই মূর্তিই কি আসল মানুষটির! সাধারণ মানবীয় সুখদুঃখ বিরহ মিলনে পীড়িত অগ্নিগর্ভ গিরিচূড়ার মত তিনি নন কি? পাহাড়ের চূড়ায় শ্যামল বনরাজি, মাঝে মাঝে লোকালয়, এখানে ওখানে নির্ঝর; কিন্তু তেমনভাবে কান পেতে থাকলে শুনতে পাওয়া যাবে অতি গভীর অভ্যন্তরে 'অকৃতার্থ অতীতের" বিকারের গর্জন। প্রান্তিক কাব্যখানি পাঠ করে দেখতে অনুরোধ করি।

বাঙালীর কল্পনাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গতিটাই বুঝি সবচেয়ে বেশী হয়েছে। এ জন্য অংশত দায়ী তাঁর শালের পাগড়ি ও হাকিমী বেতনের আটশ' টাকার অঙ্ক। শেষের তথ্যটা আমার কল্পনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর মতামতের সমালোচনা উপলক্ষে বাঙালী পরিচালিত কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকা একাধিকবার এমনভাবে ঐ অঙ্কটার উল্লেখ করেছে যাতে কেবল অর্থনীতি নয়, মনের অনেক ক্ষোভ উদ্গীরিত হয়ে উঠেছে। একালের পাঠক যখন আবার আট বা দশ দিয়ে গুণ করে ঐ আটশ টাকাকে একালের মুদ্রামানে পরিণত করে তখন বঙ্কিমচন্দ্র মূর্তিমান "প্রতিক্রিয়াশীল" হয়ে দেখা দেয়। বঙ্কিম বিদূষণের এখানেই শেষ নয়। প্রতাপ কেন আর একটা দেবদাস হল না; প্রায়শ্চিত্তের নামে কেন হেনস্তা করা হল শৈবলিনীর; রোহিণীর হত্যা; কুন্দনন্দিনীর বিষপান; আনন্দমঠের "অবাস্তবতা", এমন কত কী। ইংরেজীনবিশগণ রুষ্ট কৃষ্ণকে কেন অবতার স্বীকার করা হল, আবার গোঁড়ার দল রুষ্ট, কৃষ্ণ নাকি ঐতিহাসিক মানুষ। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খুশী নন; ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানগণ অসন্তুষ্ট; প্রগতিশীলগণের রাগের কারণ কেন সাম্য বইখানা আর ছাপা হল না; রক্ষণশীলগণের রাগ আদৌ ঐ বইখানা কেন লিখিত হয়েছিল!

অন্য পক্ষে সাহিত্য সমালোচকগণও কম অবিচার করেন নি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি। তিনি কতখানি হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন; তাঁর দেশাত্মবোধের তাপমাত্রা কত তীব্র ছিল; প্রথম আমলে এই দুটি ছিল বঙ্কিম-সমালোচনার প্রধান সূত্র। হালে আর একটা নূতন সূত্র দেখা দিয়েছে, তিনি কি পরিমাণে "বাঙালী" অর্থাৎ তান্ত্রিক ছিলেন। এ সব সূত্র সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে, আংশিক সত্য হওয়াই সম্ভব, তবে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। ফলে এই সব অবান্তরের চাপে আসল কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছে এবং বাঙালীর মনে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। সাধারণের ধারণা হয়েছে কৃষ্ণ-চরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ও গীতার ভাষ্য-রচয়িতা এবং কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহ রচয়িতা দুই পৃথক ব্যক্তি। ওই শালের পাগড়িটাই সব দুর্গতির মূলে। তাঁর শেষ জীবনের ওই ছবিখানা অবলম্বন করেই বাঙালী বঙ্কিম-চরিত্র গঠন করে তুলেছে। সে বঙ্কিম বাংলাদেশ-ব্যাপী প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় অধিষ্ঠিত সমাজপতি দুর্ধর্ষ বৃদ্ধ! তাঁর অনুশাসন পছন্দ না হলেও প্রতিবাদ করবার উপায় নেই, লোকটা ধনী, মানী এবং মুখর। তবে মেজাজ ভালো থাকলে রসিয়ে গল্প করতে জানে বটে। বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, সাহিত্যে, সমাজে ও রাজনীতিতে নূতন দিগ্‌দর্শন-দাতা এবং উনবিংশ শতকের (শুধু তা-ই বা কেন?) তীক্ষ্ণতম মেধার সঙ্গে বাঙালীর মানস-মূর্তির মিল কোথায়? তাঁর একখানি উপযুক্ত জীবনী থাকলে কিছু পরিমাণে হয়তো এর প্রতিকার হতে পারতো। শোনা যায় যে, নিজের জীবনী লিখতে তিনি নিষেধ করে গিয়েছেন এবং জীবনী রচনার উপাদান যা তাঁর হাতে ছিল সব নষ্ট করে

ফেলেছেন। সেই সুযোগে কিংবদন্তী ও দুষ্ট কল্পনা আধিকার বিস্তার করেছে। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ছাপার অক্ষরে পড়তে হয়েছে তরুণ হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, পেশোয়াজ পরে ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে নাচ দেখিয়ে আসামী গ্রেপ্তার করেছেন। দুষ্ট কল্পনার চরম। আর কোন বাঙালী পুরুষের স্মৃতি নিয়ে এমন নয়-ছয় কান্ড হয়েছে বলে জানিনে। "কবিরে পাবে না কবির জীবন চরিতে"—অত্যন্ত ভয়াবহভাবে সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর জীবনী লিখতে নিষেধ করে গিয়ে থাকেন, যদি জীবনীর উপকরণ নষ্ট করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি নিজেই বিস্তারিত আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী থেকে (আগের রচনাগুলোকেও ধরা যেতে পারে) আরম্ভ করে পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ অবধি এই আত্মজীবনীর বিস্তার। তথ্য ও ঘটনাগত জীবনী এ নিশ্চয় নয়, তবে প্রকৃতার্থে জীবনী নিঃসন্দেহ। কবি, ভাবুক ও মনীষীগণের জীবনী যেমন হওয়া উচিত।

কর্মীরা সংসারের পথে ভারি পায়ের

ছাপ ফেলে যায়; যোদ্ধাদের ফৌজি জুতোর ছাপ ভগ্ন পদচিহ্নের চেয়ে গভীর; এ সব মুছলে ওঠে না। এই সব ছাপের লৌকিক নাম ইতিহাস। কবি ও ভাবুকদের পায়ের ছাপ আলগোছে পড়ে, সব সময়ে চোখে পড়তে চায় না, সযত্নে রক্ষা করতে গেলে স্থূলে হস্তমেদের বিড়ম্বনায় অনেক সময়ে মুছে যায়। এই আলতো পায়ের ছাপগুলি তাঁদের রচনা ও চিন্তা। প্রত্যেক সাহিত্যিক সংসারের পথে পদাবলী গেঁথে চলে যান: সেগুলি অনুসরণ করলে লেখকদের গতি-প্রকৃতি ও লক্ষ্য বুঝতে পারা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পদাবলী জানায়ই নাম বঙ্কিম-সরণী। কবিরে মিলিবে কবির জীবন-চরিতে, যদি সে জীবন-চরিত কবির জীবনী হয়, বিশেষ স্বয়ং কবি-কর্তৃক রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী এমনি একখানা জীবন-চরিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মূলত extrovert, বহির্মুখী। তাঁর ভাষা পেশীবহুল, উপন্যাসগুলির প্যাটার্ন নাটক ও এপিক মিলিয়ে গঠিত। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মূলত introvert, অন্তর্মুখী। তাঁর ভাষায় প্রধান লক্ষণ নমনীয়তা, কবিতা তো বটেই, এমন কি নাটক, উপন্যাস, গল্পগুলিও লিরিক ধর্মাক্রান্ত।

বহির্মুখী প্রতিভাকে নিরন্তর বহির্জগতের সঙ্গে, অর্থাৎ বিচিত্র তথ্য, ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, যার ফলে ভাষা দৃঢ় ও পেশীবহুল হয়ে ওঠে। উপন্যাসও ঠিক এই কারণেই নাটক ও এপিকের ছাঁদ অবলম্বন করে, কারণ যাবতীয় শিল্পকলার মধ্যে ওই দুটোই সবচেয়ে বেশি বাস্তবের মুখাপেক্ষী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাদির পক্ষে এ কথা সর্বাংশে সত্য না হলেও মূলত সত্য। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সমাজ, বিজ্ঞান, সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র সমস্তই মূলত বহির্মুখী, কেননা, তথ্য, উদাহরণ ও প্রমাণ সহযোগে তারা গঠিত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যেমন, ধর্মতত্ত্ব (কমলাকান্তের কোন কোন নিবন্ধও বটে) পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলি অন্তর্মুখী। মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়, বহির্মুখী প্রতিভা হঠাৎ অন্তর্মুখী হতে গেল কেন? আর কিছুই নয়, সমাজ ও কালের দাবিতে এখানে প্রতিভা-ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সমাজ ও কালের দাবিতেই তাঁর উপন্যাসের গতিতেও বারে বারে মোড় ঘুরেছে; সমাজ ও কালের দাবিতেই তাঁকে এক সময়ে বঙ্গদর্শন এবং পরে প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়েছে। প্রত্যেক শক্তিশালী লেখক সমাজ ও কালের দাবি স্বীকার ও আত্মসাৎ করে নিয়ে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। কেবল ক্ষুদ্র লেখকরাই সমাজ ও কালের দাবিকে চরম সত্য মনে করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সাধারণ অর্থে সমাজ ও কালের দাবি বোঝা অসম্ভব নয়, কিন্তু এখানে বিশেষ অর্থটা কি? বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের যে অবস্থায় ও যে-কালে জন্মেছিলেন তার বিশেষ দাবিটা কি ছিল?

হেয়ার ডিরোজিও রিচার্ডসনের যুগের পরবর্তী কালের মানুষ তিনি। বিশেষ, তাঁর সম্মুখে ছিল ধার্মিক ও আদর্শ-চরিত্র পিতা; আর চারদিকে ছিল সজীব আনুষ্ঠানিক ধর্মের পরিবেশ। কাজেই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের যুবকগণ যেমন বিচলিত হয়েছিল তেমন হতে হয়নি তাঁকে। কৈশোরে মন যখন তাঁর প্রথম গ্রাহক হয়ে উঠছে তখন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রভাবের কেন্দ্রে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়স্ক কেশবচন্দ্র (এক বছরেই দুজনের জন্ম) দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে পড়লেন, বঙ্কিমচন্দ্র এড়িয়ে গেলেন। কারণ, তিনি কলকাতা সমাজের লোক ছিলেন না; কাঁঠালপাড়া, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে, অনেক সময়েই পিতার চোখের সম্মুখে তাঁকে জীবনযাপন করতে হয়েছে।

প্রথম যৌবনে চাকুরি পেয়ে যখন তিনি অনেকটা স্বাধীন এবং পিতার কাছ থেকে দূরে বাস করছেন, তখন তিনি আরও অনেক ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের মতো ফরাসী দার্শনিক কোঁতের প্রভাবাধীন হলেন। তখন কোঁৎ গুরু, মিল পুরোহিত। মনের এই অবস্থাতেই সাম্য বইখানা রচিত। তখন তাঁর কাছে জগতে তিনজন সাম্যাবতার; বুদ্ধ, যীশু ও রুসো। মন কতটা ভারসাম্যচ্যুত হলে এই তিনজনের নাম একত্র উচ্চারিত হয় সহজেই অনুমেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্থিতধী ও অপ্রমত্তবুদ্ধি ব্যক্তিরও যদি এ দশা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে কারণটা প্রবল ছিল। খুব সম্ভব ব্রাহ্মসমাজের একাগ্র ভক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পজিটিভিজমের প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল। কিংবা এমনও অসম্ভব নয় যে, শংকরের মায়াবাদেরও এটা প্রতিক্রিয়া। শংকর যেমন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করেন না, পজিটিভিস্টরা জগৎ ছাড়া (এক্ষেত্রে মানুষ) তেমনি আর কিছু স্বীকার করে না। (এখানে বাঙালী পজিটিভিস্টদের কথাই হচ্ছে।) আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়াই পজিটিভিজমকে প্রবল করে তুলেছিল। যোগেশ ঘোষ ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পজিটিভিস্ট রয়ে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও-পথ পরিত্যাগ করলেন। এখন বুঝতে পারা যাবে কেন তিনি সাম্য বইটা আর মুদ্রিত করেন নি। কোন সুস্থবুদ্ধি লোকের পক্ষে এক-নিশ্বাসে বুদ্ধ ও যীশুর সঙ্গে রুসোর নাম

করা সহজ নয়; আরও সহজ নয় স্বীকার করা যে, রুসোর সাম্যতত্ত্ব এবং বুদ্ধ ও যীশুর সাম্যতত্ত্বের ভিত্তি এক। সাম্য তিনি আর মুদ্রিত করেন নি সত্য, তবে বঙ্গদেশের কৃষক, মূলে যা সাম্যের অন্তর্গত ছিল না, পৃথকভাবে তা প্রকাশিত করেছেন। সাম্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনাস্থা জন্মেনি, অনাস্থা জন্মেছিল রুসো প্রচারিত ঠুনকো সাম্যে। অনেকে ভুল বোঝেন, তাই বিস্তারিত বলতে হল।

মানস-ভ্রমণের পথে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা দশ-কুশি ধাপ ফেলে এগিয়েছে; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পজিটিভিজম ও Social Contract-এর বদলে আবিষ্কার করলেন, মহাভারত ও গীতা; রুসো ও মিল নিরর্থক হয়ে পড়লো তাঁর কাছে। বুদ্ধ ও যীশুর প্রতি তাঁর ভক্তি হ্রাস না পেলেও তাঁদের দিয়ে আর প্রয়োজন ছিল না তাঁর; তিনি তাঁদের প্রতিকল্প পেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণে, যে কৃষ্ণ একাধারে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও অবতার। কৃষ্ণে স্বতোবিরুদ্ধ দুই গুণের আরোপে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হয়নি, না ভক্তগণ, না ঐতিহাসিকগণ। বিশেষ এ কৃষ্ণ বিরাট কর্মীপুরুষ, আদর্শচরিত্র, কিন্তু

তেমনভাবে ভক্তির উদ্রেক করেন না—এ অভিযোগ অত্যন্ত সাধারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য কৃষ্ণ তিনি আদৌ নন, ভারতীয় কোন উপাসক সম্প্রদায়ের আরাধ্য কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, তা না হতে পারে, তবে এই মহাভারতের কৃষ্ণই মূল কৃষ্ণ, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং আদর্শ মানব। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ধর্মতত্ত্বে অনুশীলন রহস্য কথিত হয়েছে; এই অনুশীলনই মনুষ্যত্ব লাভের পথ; অনুশীলনপুষ্ট মানুষই আদর্শ মানুষ, কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ। তিনি বলেন, অনুশীলন-গ্রন্থে যা তত্ত্বমাত্র, দেবীচৌধুরানীতে তার কাল্পনিক দৃষ্টান্ত; কৃষ্ণ-চরিত্রে তারই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আনন্দমঠ, সীতারাম ও রাজসিংহকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলা যায় বলে আমার বিশ্বাস, সে চেষ্টা যথাস্থানে করেছি।

ভিক্‌টোরীয় যুগের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের উনবিংশ শতকের সাহিত্যের সমতার কথা অনেকের মনে হয়েছে, কিছু সমতা থাকা অসম্ভব নয়, তবে অসমতাই অধিক। ১৮৫৯ সালে ডারবিনের ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব প্রচারিত হলে হঠাৎ বহুকাল-পোষিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লেগেছিল ইংলণ্ডের সাহিত্যে ও ভাবুকতায়। সকলের পায়ের তলায় স্থিরাপৃথ্বী বিচলিত হল। ভিক্‌টোরীয় যুগের সাহিত্যে তার বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এ রকম কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ঘটেনি আমাদের সাহিত্যে। এ-দেশ রক্ষণশীল হলেও চিন্তার ক্ষেত্রে অসীম স্বাধীনতা ভোগ করতো। বরঞ্চ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলি ও বায়রন প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের সংঘাতে যে চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে পড়েছিল তার তুলনা-স্থল আছে আমাদের দেশে, ডিরোজিও রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে। প্রথম ইংরাজী শিক্ষার মদিরায় তারা চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে পড়েছিল, কিন্তু সেকালে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে সাহিত্যে তার একমাত্র চিহ্ন মধুসূদনের কাব্য। আর কোন চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না।

এ-দেশে ফরাসী বিপ্লবের বা ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের অনুরূপ সংঘাত দেখা দেয়নি সত্য, কিন্তু আর একটা প্রভাব ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে সচেতন করে তুলছিল। সেটা পরাধীনতা-বোধের গ্লানি। প্রথমে সেটা দেখা দিল চেতনারূপে; তারপর গ্লানিরূপে; নির্দিষ্ট প্রতিকার-পন্থা রূপ গ্রহণ করেছে অনেক পরে, উনবিংশ শতকের একেবারে শেষে, "স্বদেশী আন্দোলনের" সময়ে মূর্তিটা নির্দিষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরাধীনতার গ্লানি এবং ইংরেজ-শাসকের সুফল দুয়ে মিলে একটা আলো-আঁধারি ভাব সৃষ্টি করেছে সে-কালের বাঙালী লেখকদের মনে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র সকলের রচনাতেই এই দ্বিধাভাব বর্তমান। এই কারণেই সিপাহী বিদ্রোহকে সকলে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা মনে করেছিলেন। পরাধীনতার অবসান একদিন হবে, হওয়া উচিত তাঁরা বিশ্বাস করতেন, আবার সেই সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন যে, সময় এখনো হয়নি, কোন এক সময়ে অবশ্য হবে। ধীর-গতিতে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন। তার আগে বা তার জন্য একজন কর্ণধারের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। উনবিংশ শতকের সাহিত্যের একটি মূল আকাঙ্ক্ষা এই কর্ণধারের বা মহানায়কের ধ্যান ও সন্ধান। কারো কাছে তিনি দধীচি, যাঁর আত্মত্যাগে দৈত্যের কবল থেকে স্বর্গের উদ্ধার হবে। কারো কাছে তাঁরা মার্কণ্ডেয় ও ব্যাস, গুরু ও শিষ্য, যাঁরা ভারতের ভৌগোলিক-দেহে অধ্যাত্মরূপ প্রত্যক্ষ করছেন। নবীন সেনের কাছে তিনি কৃষ্ণ, যিনি আর্যে-অনার্যে মিলিয়ে নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করবেন। রমেশ দত্তর কাছে তিনি প্রতাপ সিংহ ও শিবাজী, যাঁরা 'পতন-অভ্যুদয়ের' পথে জাতির নেতৃত্ব করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি কে ও কি? এ অনুসন্ধানে তাঁকে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে।

কমলাকান্তে পরাধীনতার চেতনা ও গ্লানিবোধ। আনন্দমঠের নায়ক মহাপুরুষ ও সত্যানন্দ যোগাব্যক্তি, কিন্তু যে আধারে স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে, সেই আধার অর্থাৎ সমাজ তখনো যোগ্যপাত্র হয়ে ওঠেনি; তাই কাজের অর্ধাংশ মাত্র সম্পন্ন করে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করে তপস্যা করবার উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান করেছেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ তপস্যার বিবরণ দেবী চৌধুরানীতে। এই তপস্যার বঙ্কিম-প্রদত্ত নাম অনুশীলন। প্রফুল্ল নিজে অনুশীলিত হয়, তবে তার অনুশীলন কাজে লাগলো না, দেশ তখনো অপ্রস্তুত। সীতারাম যোগ্য নায়ক বটে, তবে তাকে সফলতায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অলংঘ্য বাধা; ইতিহাসের স্পষ্ট সাক্ষ্য ও তার পতন। বাধ্য হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করে চারিত্রিক রন্ধ্রগত পাপে যোগ্য নায়কের পতন বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজসিংহ যোগ্য ঐতিহাসিক নায়ক: স্বদেশরক্ষা ও মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংসরূপ, দুটি কার্যই তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে; আনন্দমঠের অসম্পূর্ণ অর্ধাংশ, দেবী চৌধুরানীতে অচেষ্টিত, সীতারামে চেষ্টিত কিন্তু ব্যর্থ, সমস্ত এসে যেন পূর্ণতা ও সমাপ্তি লাভ করেছে রাজসিংহে। তবে রাজসিংহের পিছনেও একটি বৃহৎ ছায়া, সেটি কৃষ্ণ-চরিত্রের

কৃষ্ণের। সেই জনাই রাজসিংহের সঙ্গে বার বার তিনি যদুপতির তুলনা দিয়েছেন। তিনি মহানায়ক, কারণ তিনি পূর্ণ অনুশীলিত, মনুষ্যত্বের আধারস্বরূপ। এ কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

বলা বাহুল্য মহানায়ক-সন্ধানের এখানেই শেষ নয়। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এ সন্ধানের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা বোধ হয় ধনঞ্জয় বৈরাগী। তার পরে আর সন্ধানের প্রয়োজন হয়নি, কারণ তখন মহানায়ক রক্তমাংসের দেহে দেখা দিয়েছেন।

কাব্যের ও সমাজের দাবিতে দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার নিছক শিল্পীকে সমাজচিন্তা ও দেশচিন্তার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। কপালকুণ্ডলার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে স্তম্ভিত নিষ্কলঙ্ক কল্পনা বিগলিত ধারায় কমলাকান্তের ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে; বহু তরণীর যাতায়াতে আবিল, বহু প্রয়োজনের চিহ্নে মলিন, কিন্তু এই তো নদীর সার্থকতা। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুধা ভাবকে কমলাকান্তের মধ্যে আত্ম প্রক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে, "আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?" জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নদী বিস্তৃততর, জিজ্ঞাসা গভীরতর হয়েছে এবং অবশেষে গুরু-শিষ্য সংবাদের গুরুর প্রমুখাৎ সেই জিজ্ঞাসা আর্তনাদরূপে প্রকাশিত হয়েছে—"এ জীবন লইয়া কি করিব?" সারা জীবন এই উত্তরের মীমাংসা তিনি সন্ধান করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশের পরে লিখিত যাবতীয় উপন্যাস তার আগে ও পরে লিখিত যাবতীয় প্রবন্ধাদি এই প্রশ্নের সন্ধান। একটু অনুধাবন করে পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাকে এই প্রশ্নের সূত্রে একটি অখণ্ড মাল্যরূপে গ্রন্থন করে তোলা সম্ভব। এমন একধ্যান, একাগ্রমুখী লেখক সত্যই বিরল।

মধুসূদনের জীবন সাহিত্যের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁর যা কিছু জিজ্ঞাসা ও শিল্প ও সাহিত্য-সংক্রান্ত, তার বাইরে তিনি পদক্ষেপ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন দীর্ঘ; তাঁর রচনার বিস্তার বহুদূরপ্রসারী; অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে পর্বে পর্বে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। কিন্তু এ রকম মৌলিক জিজ্ঞাসা দেখি না তাঁর রচনায়। তাঁর গতিপথ যেন পূর্বাহ্নেই সুচিহ্নিত ছিল, পিতার ও রামমোহনের সাধনা পথপ্রদর্শক ছিল, সেই পথ ধরে তিনি অশ্লথগতিতে অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পথ এমন সুনির্দিষ্ট নয়, গতি এমন অশ্লথ ও অব্যাহত নয়: প্রত্যেক পদক্ষেপে নতুন নতুন প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছে তাঁকে —সব প্রশ্নের মূল প্রশ্ন "এ জীবন লইয়া কি করিব?"

এই মূল জিজ্ঞাসাটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে অনেকগুলি অণু-জিজ্ঞাসা। ধর্ম কি? মনুষ্যত্ব কি? মনুষ্যত্ব লাভের উপায় কি? দেশের এ দুরবস্থা কেন? পরাধীনতা কেন? স্বাধীনতা লাভের উপায় কি? পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে রোধ করা কিংবা আত্মসাৎ করা, কোনটা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর? "দেশীয় লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হয়েছে?" ইত্যাকারে অনেক জিজ্ঞাসার সংহত রূপ "এ জীবন লইয়া কি করিব?" বঙ্কিমচন্দ্রকে যথাসাধ্য এ সব অণু-জিজ্ঞাসার সমাধান করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছে মূল জিজ্ঞাসাটির দিকে।

মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক বা ধর্মীয় সমস্যা সমাধান সাহিত্যিকের আশু কর্তব্যের মধ্যে নয়। তার জন্য অন্য লোক আছে, যাদের বলা হয় সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। তবে পরাধীন দেশের পক্ষে সব সময়ে এ নিয়ম খাটে না। কেননা, পরাধীন দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বর্তমান যুগে ও দুই ভিন্ন নয়) পরহস্তগত। সে ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব নাই বলেই সাহিত্যিকগণের উপরে এমন কতকগুলি দায়িত্ব বর্তায় যার সমাধান সাহিত্যিকের কর্তব্যের মধ্যে নয়। শেক্সপীয়রকে এ সব সাময়িক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়নি, মানুষ সম্বন্ধে কতকগুলি চিরকালীন কথা বলে তিনি কর্তব্য সমাধান করেছেন। দেশের স্বাভাবিক নেতাগণ এ সব প্রশ্নের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। রানী এলিজাবেথ ও তাঁর সেক্রেটারি লর্ড বার্লি; এসেক্স ও স্যার ফিলিপ সিডনি; ড্রেক ও হাওয়ার্ড প্রভৃতি ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা; তাঁরা সাময়িক প্রশ্নের সমাধান যথাসাধ্য করেছেন। বেকন অবশ্য ব্যতিক্রম: তিনি চিরকালীন বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে সাময়িক জিজ্ঞাসা জড়িত করেছিলেন, ফল শুভ হয়নি। পরাধীন ভারতে এ নিয়ম চলেনি, কাজেই বাঙালী সাহিত্যিকগণকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে সাময়িক জিজ্ঞাসার উত্তরদান করতেও চেষ্টা করতে হয়েছে। বিশেষ রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ Polemics বা সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে বিচার। ইয়েট্স খেদ করেছেন যে, জীবনের অনেকটা অংশ ব্যয় হয় Polemics রচনায়। তিনিও পরাধীন দেশের কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের দৈর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের তুলনায় অনেক হ্রস্ব। সেই স্বল্প পরিসরে দুর্লভ অবকাশেরও অনেকটা গিয়েছে পূর্বঘটিত সমস্যাগুলির আলোচনায়। এমন কি তাঁর রস-সাহিত্যও অনেক পরিমাণে এ নিয়মের অন্তর্গত। কোন স্বাধীন দেশের লেখককে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী লিখতে হয় না। পরাধীন দেশের সাহিত্য কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারে না, তাকে অনেক অবান্তর ভার গ্রহণ করে চলতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকেও চলতে হয়েছে। যুগের দাবি তিনি অস্বীকার করেন নি। যুগের দাবি, চিরকালের দাবি ও লেখকের বিশেষ শক্তি এই তিনের টানাটানির পরিণাম সাহিত্য।

আমার এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণ স্বীকার করে নিলে অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ জাতীয় রচনার সঙ্গে তার রস-সাহিত্যের সম্বন্ধটি। হিমালয়ের চিরহিমানী-স্তূপের সঙ্গে উত্তর-ভারতের নদনদীর যে সম্বন্ধ তারই অনুরূপ তাঁর প্রবন্ধে ও উপন্যাসে। ও দুই এক বস্তু এ নয়: একটি স্তম্ভিত অপরটি চঞ্চল, একটি কঠিন অপরটি তরল, একটি অকলঙ্ক অপরটি আবিল, একটি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, অপরটি নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী। প্রবন্ধগুলি ভাব, উপন্যাস মূর্তি। কিন্তু এখনো শেষ হল না। প্রবন্ধ পেলাম, উপন্যাস পেলাম, লেখককে তো পেলাম না; বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কাব্যকে জানা উত্তম, কবিকে জানা অধিকতর উত্তম। এখন কবিকে জানবার উপায় কি? যে কবির যে মানস থেকে প্রবন্ধ ও উপন্যাসের সৃষ্টি সে মানস পেলাম কই? ওই মানস শব্দটিতেই পেয়েছি। উত্তর-ভারতের নদনদীর উৎস মানস সরোবর। সেই আদিম উৎস থেকে নির্গত হয়ে এবং চিরহিমানী-স্তূপ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে সিন্ধু, শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি ভারতের সমতলে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঘাটে ঘাটে অমৃত বিতরণ করছে। ওই মানস আছে বলে, চিরহিমানী আছে বলেই নদীগুলি আছে। ও দুয়ের কোন একটা না থাকলে নদীগুলির সৃষ্টি হত না, ও দুয়ের কোন একটার অভাব হলে নদীগুলি শুকিয়ে যাবে। তিনে অক্ষয় যোগাযোগ। বঙ্কিমচন্দ্রের মন বা কল্পনা, প্রবন্ধাদি ও উপন্যাস তিনে এক; তিন একসূত্রে স্থাপিত করে দেখতে পারলে তবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ করে দেখার পরিচয়। এই সূত্রটিরই নাম বঙ্কিম-সরণী।

(ক্রমশ)

শিল্পের বিনিয়ন্ত্রণ

দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে যে-সব বাধানিষেধ আছে, সেগুলি ক্রমশ সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন সম্প্রতি অনুভব করা হচ্ছে। নতুন সামগ্রী তৈরি করে বর্তমান শিল্পগুলি যাতে তাদের উৎপাদনের বৈচিত্র্য সাধন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে শিল্পক্ষেত্রে সরকারী লাইসেন্স-দান নীতি উদার করা হবে। অবশ্য সেরকম বৈচিত্র্যকরণে যদি অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা না লাগে এবং ছোট বহরের শিল্প উৎপাদন ব্যাহত না হয়, তবেই সেটা সম্ভবপর হবে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর আগে তেরোটি শিল্পকে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আমদানি নিয়ন্ত্রণ

আমদানিজাত আবশ্যক কাঁচামাল ও কলকব্জার অনটন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে: আমদানির কঠোর নিয়ন্ত্রণ তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের পর সরকার উদার আমদানী নীতি অবলম্বন করেছে। এতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বেড়ে যাবে, আশা করা যায়। কাঁচামাল, কলকব্জা প্রভৃতি পাওয়া গেলে দেশ কয়েকটি শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

অগ্রাধিকার শিল্প

আবার, যে ৫৯টি শিল্পকে আমদানির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি রপ্তানী শিল্প আছে। উদার আমদানী নীতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিরও সহায়ক হবে। কেননা, অগ্রাধিকার শিল্পগুলির মধ্যে ট্রাক্টর, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, পাম্প, সার ও বীজাণুনাশক তৈরি থাকায় ঐসব সামগ্রীর অধিক আমদানি কৃষি উন্নয়নের অনুকূল হবে। সেই রকম, আমদানিজাত তুলো ও পাট ব্যবহারিক শিল্পসমূহের কাজে লাগবে। কলকব্জা ও সরঞ্জাম বেশি পরিমাণে পাওয়া গেলে চা, কফি ও চিনি শিল্পের সুবিধা হবে।

বলাই বাহুল্য, আমদানির পরিবর্তকরণে সাফল্য আমাদের অর্জিত কারিগরী বিদ্যার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল; কয়েকটি ক্ষেত্রে লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতু, বিশেষ ইস্পাত, সংকর ধাতুর অনটন পরিবর্ত উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

সন্দেহ নেই, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঢালাই, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও অনেকগুলি মৌল রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন-ক্ষমতার সম্যক সম্প্রসারণ ঘটেছে। সরকারী অংশের জলসেচ, শক্তি, পরিবহণ ও চলাচল, যা অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করে তোলে, সেই সব ক্ষেত্রের জন্য চতুর্থ যোজনায় নির্ধারিত টাকা কমিয়ে দিলে স্বভাবত বেসরকারী অংশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সরকারী অংশে মূলধন নিয়োগ হ্রাস করলে বেসরকারী শিল্পের প্রধান কয়েকটি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য চাহিদা কমে যাবে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প অংশ দুটি পরস্পর সম্পূরক: আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

সিমেন্টের বিনিয়ন্ত্রণের ফল মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে বলা যায়। বণ্টন ব্যাপারে শিল্পগুলি সহযোগিতা করলে, সিমেন্টের মতো অন্যান্য শিল্পসমূহের বিনিয়ন্ত্রণের কথা সরকার বিবেচনা করতে পারে।

ব্যয়, মূল্য ও আয় নিয়ন্ত্রণ

ব্যয়, মূল্য ও আর্থিক আয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া যাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র, খাবার তেলের মতো অতি-প্রয়োজনীয় ভোগ্য-দ্রব্যের মূল্য ন্যায্য স্তরে রাখতে হলে পাইকারী ও খুচরো ব্যবসায় সরকার কর্তৃক অংশ গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। আর্থিক ব্যবস্থায় বায়বৃদ্ধির সঙ্গে যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যবৃদ্ধি না ঘটে অথবা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যেন আপনা আপনি মজুরী বৃদ্ধি না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্যক ভোগ সামগ্রীর ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পের কাঁচামালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমান প্রয়োজন আছে। তার কারণ, শিল্পের কাঁচামালের দাম আর্থিক ব্যবস্থার সাধারণ বায়মানের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ক্রেতা সমবায়, সরকারী ভাণ্ডার ও ন্যায্য-মূল্যের দোকানের মাধ্যমে যাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের যোগান বাড়ে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে, শিল্পের কাঁচামালের মূল্য নীতির প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। তার জন্য, নির্বাচন-মূলকভাবে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং অন্তর্বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ দুইয়েরই দরকার আছে।

একাধিক দ্রব্যের মূল্য যেখানে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেখানে কি উৎপাদন, কি বণ্টন ব্যবস্থা, কোনোটাই স্বাভাবিক অবস্থার বাজারের মতো সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের আগের মত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ যদি মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বণ্টনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কিছুটা সাহায্য করে, তাহলে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে যত অসুবিধাই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণ যাতে শিল্পক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের আকর্ষণ কমিয়ে না দেয় অথবা শিল্পে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহের অভাব না ঘটায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যোগানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুসারে ক্রমশ শিথিল করে দেওয়া যেতে পারে। তাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

যেসব নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য নয় অথবা যেগুলিকে কার্যকর করা যায়নি সেগুলি তুলে নেবার সময় এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে এখন যা দরকার তা হচ্ছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু বা স্থানে নির্বাচনমূলক চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই দিক থেকে দেখলে, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়া অন্য ক্ষেত্রের শিল্প-গুলিকে নতুন দ্রব্য উৎপাদনের যে স্বাধীনতা সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য। শিল্পগুলি এখন অতিরিক্ত লাইসেন্স ছাড়াই যে তাদের উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াতে পারবে সেটা দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হবে, আশা করা যায়।

শান্তিকুমার ঘোষ

Macleans
TOOTH PASTE

হীরেন মিত্র ও অবি সরকারের চিত্র প্রদর্শনী : একাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন

কোন কোন কাজের ব্যাপারে, যদি আমরা চিত্রগত বাস্তবতার মূল, নির্মাণ কৌশলের দিক, ভেবে দেখি তাহলে বড় ভাল হয়, এতে করে এক একজনের কাজ যে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, কত ন্যায় সঙ্গত, তা আমরা আন্দাজ করতে পারব।

এই জন্য এ কথা যে, হীরেন মিত্র, ড্রইংএ যাঁর হাত সংযত, যাঁর কারসাজ বোধ আছে, রঙকে যিনি জ্ঞানের চোখে দেখবার জন্যে উৎসুক তিনি একদিকে বিমূর্ত ধর্মী; এখানে বলা প্রয়োজন যে, তাঁর ছবির নামগুলি একটি সিরিজের নম্বর, সিরিজের নাম 'একস্প্রেশনইজম'। আমরা তাঁর বিমূর্ত নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করব।

এক্সপ্রেশ শব্দ আছে বলেই যে, জর্মান ধারার সঙ্গে যোগ আছে এমন হয় না। সেই একসপ্রেশনইজম ভাবনা বহুদিন থেকে গড়ে উঠছিল, এবং তা বিশেষজ্ঞের ধারণায় "ট্রাজিডির জন্ম" গ্রন্থ থেকে; এটা কিন্তু আদতে থিয়েটারে অর্থাৎ নাটকে হয়; সেটা আর একরূপ নিল ছবিতে, অবশ্য 'ব্লু রাইডার' গোষ্ঠী বলে এটা তাদের পরিকল্পনা—কেন না তাদের লেখায় অন্যদের উল্লেখ নেই।

হীরেন মিত্র একস্প্রেশন নামেতে তাঁর চিত্তগত উপলব্ধি, একটির পর একটিতে মুদ্রিত করেছেন।। রঙ আর রেখা এ দুয়ের একেবারে স্বকীয় রূপ নিয়ে যার শুরু (আবার অন্যত্র মাধ্যমের বলে রূপায়ণ আর এক ভাবে দেখা দিয়েছে)।

এখন নির্মাণ কৌশলের দিকটা দেখে নেওয়া যাক্। বিখ্যাত চিত্র তাত্ত্বিক মোঁসিয়ে প্লেইঝ বলেছেন "...চিত্র হচ্ছে কোন সমতল বা প্লেন সারফিস্-কে, উদ্দীপিত প্রাণবন্ত করা। সমতল হচ্ছে শুধুমাত্র দুটি ডাইমেনশনের জগৎ। নিছক দুটি ডাইমেনশনের দিক দিয়েই তা সত্য। এখন তাকে, মানে, সেখানে তৃতীয় ডাইমেনশন আরোপ-প্রক্ষেপ করা, তৃতীয় ডাইমেনশন দ্বারা উজ্জীবিত করা যদি হয়, তাহলে এই হিসাবে তাঁর ছবির নিজস্ব মূলগত, আদত সত্তাকে পরিবর্তন করা হল (প্রেত্যাঁর ল' রাহেবসাঁতির দ'ইউন ত্রোয়া সিয়োঁসিয়, সে ভুলওয়ার লা দেনাতিউরে দা সোঁ রেসাঁস মেম।)।

ঠিক এইখান থেকেই একটা বিশেষ চিন্তাসূত্র প্রসূত হতেও পারে, যে, চিরাচরিত সার্বেকিয়ানা (কনভেনশানালইজম) ছাড়িয়ে যেতে পারি কিনা—ক্রমেই কোন নামরূপ নেই, যেখানে বস্তুত্ব নেই, যেখানে আলো অর্থাৎ ছায়া আতপ নেই নিয়মমাফিক, সেখানে কোন ডাইমেনশন নেই। মন চলে গেছে আলতামিরায় কিম্বা আদিবাসীদের বাড়ির দরজার সামনে, ঐখানে ফ্রেম নেই, এইখানে নক্শা।

কোন ডাইমেনশন নেই, এমন হয় না; তবে এই জন্য 'নেই' স্বীকার করা, যেহেতু দ্বিতীয়টি আছে বলেই প্রথমটির উপলব্ধি চিত্রগতভাবে, এবং প্রথম আছে বলেই দ্বিতীয়র বিদ্যমানতা।

এখানে হীরেন মিত্রর ছবিতে রেখা বড় একা, রঙ নির্জনতা। যে রেখা রেনেসাঁসের মহৎ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে; রঙ যা ইদানীংকার ধারার প্রাণ; এবং এই রঙই রেখাকৃত পরিপ্রেক্ষিতের স্থান নিল। রঙের পরিপ্রেক্ষিত তার ধর্ম আবিষ্কৃত হল; যা কিছু দীপ্ত ওতপ্রোত হয়, উজিয়ে আসে (স'রাভাঁস), যা নিরেট নিপট, কৌণিক কঠোর অনমনীয় (দুর্জিসতাঁ), যা আলোকাতর তা সবই কমলারঙে জরে আছে।

অন্যদিকে, যা কিছু শ্যাম, তমসাময়, ছায়া, পশ্চাদগামী, গঠনক্ষম এবং আবর্তিত হয় তা সবই জরে থাকে ক্যাম্পেমাগুতেয়র নীল রঙে। এবং ঐ দুয়ের বিভিন্নমুখী চরমসীমায় ইতোমধ্যে লাল বাদামী রঙ আতপের ভাগে আর নীলাভ বর্ণ ও হরিৎ ছায়ার দিকে যায়। এতে করে একটা অভাবনীয় ছন্দ নির্মিত হয়।

হীরেন মিত্র অতএব ঐ তত্ত্বের সাহায্য নেননি। তাঁর সামনে কোন নামরূপ জগৎ নেই অর্থাৎ সেই সব যা এতাবৎ চিত্রের বিষয়ভূত হয়েছে। তাঁর ছবিতে একটি কমলারঙ কি বিস্ময়করভাবে প্রতীয়মান, আবার অনন্ত শুধু সবুজে-হলুদ রঙ খুব ন্যায়সঙ্গতভাবে এসেছে। রেখা এখানে শুধু সমতলকে জাগ্রত করেছে, রঙ তাকে বর্ণনা করেছে। অবশ্য 'বর্ণনা' বললেই তখনই একটি বস্তুত্বের ভাব এসে পড়ে, আবার যদি বলা হয় না তা ঠিক নয় রঙ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছে, তাতে করে রঙের মধ্যে বৈপরীত্যগুণের আবির্ভাব হয়—তাতে ছায়াআতপের সংকেত দেয়। হয়ত এই বললে আপাতদৃষ্টিতে, খানিকটা পরিষ্কার হবে যে বিশেষণ গোছের।

শেষোক্ত পদেও কিন্তু কিছুর একটা কথা আপনা হতেই আসে; আশ্চর্য যে কোন বিমূর্ত কিছুকে আমরা মূর্ত কল্পনা দিয়ে তাকে সামনে রেখে বুঝি। যাই হোক তাঁর ছবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্বেই স্বীকার করেছি যে তাঁর হাতের দিক থেকে দ্বিমত হবার সুযোগ নেই। প্রতিটি জায়গায় কিয়ারসকুয়ার মাফিক ভাগ, কালো সাদার স্থান, সুচিন্তিত চাতুর্য তাঁকে কৌশলী বলে প্রমাণ করে, তিনি যে ছবি নিয়ে ভাবেন এটা বুঝা যায়।

অবি সরকারের ছবির সিরিজের নাম রিয়ালইটি। সর্বসমেত তাঁর তেরোখানি ছবি এখানে ছিল। অবি সরকার, অ্যানাটমী, পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় রঙ সামনে রেখেই ছবিগুলি নির্মাণ করেছেন। তাঁর ঐ তিন নিয়ম সম্পর্কে বেশ ভাল জ্ঞান আছে বলেই তিনি তা প্রয়োজন হিসাবে নিয়ে এক নিজস্ব বাস্তবতার সৃষ্টি করেছেন।

তাঁর জগৎ অতীব রহস্যময়, এখানে মাটি নেই; তৃষ্ণা স্কুল পাঠ্য পুস্তকের একটা নৈতিকতা; অদ্ভুত ম্যাকাওয়াবার ভৌতিক। সমস্ত কারসাজ সমস্ত রঙের উপর একটি যথাযথ অবিকলবাদী (ন্যাচারলইস্টিক) উত্তমাঙ্গ! যার চোখ আত্মস্থ কপালে দুশ্চিন্তার রেখা।

এটা সেই গল্প যে, মানুষ আজও আশায় হাত প্রসারিত করে, তার একদিকের বুকে মাংস নেই পাঁজর, উত্তোলিত বাহু বিশেষ ডিসটরটেড। এই আজব ঘটনার স্থানের কোথাও কোথাও আলোকিত। রূপকটি (ফ্যানটাসি) দর্শক সাধারণকে বিমোহিত করে।

এই দুর্যোগ বলতে অবি সরকার, এটা খুবই অবাক ব্যাপার যে; অপ্রত্যাশিত রঙের বাছাই করেছেন, কোথাও লাল সবুজ এবং এর আরোপে যথেষ্ট বেলোয়ারি করা! তবু এই রঙ সূত্রে একটা চেনা ভাল লাগার মধ্যেও সমগ্র কারসাজ দর্শককে ধাক্কা দেবেই। কোথাও তার কারণ কাঠামো হাল্কা হয়নি।

যেহেতু তিনি বর্ণকাডণ্ডের থেকেও রেখা যোগে সমস্ত রঙকে বশে আনতে চেষ্টা করেছেন, তাতে করে রঙে রঙে একটা মিশ খেয়েছে। এবং প্লাসটিসিটি কোথাও ব্যাহত হয়নি এমন ধারণা হয়, অবশ্য মুখমণ্ডলও সেদিক থেকে সাহায্য করেছে বলা যেতে পারে।

এঁরা দুজনেই শিল্পের জগতে অত্যন্ত অল্পবয়সী, তবু এঁদের কাজ থেকে সকলেই ভরসা পাবে।

উনিশ

বড়দিনের ছুটির সময় সময় গগন এল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই শীত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল; সেই শীতের আঁচড় প্রত্যহ যেন আরও ধারালো ও তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। গুরুডিয়ায় পা দিয়েই গগন বলল, 'অরে বাপস্, বরফটরফ পড়বে নাকি রে এখানে?' হৈমন্তী হেসে জবাব দিল, 'থাকছিস তো, পড়লে দেখতে পাবি।'

গগনকে দেখলেই হৈমন্তীর সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্কটা অনুমান করা যায়। দুজনের মুখের আদল প্রায় এক, চোখ মুখ কপালের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। তবু, পুরুষ বলে গগনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সব যেন ছিমছাম কাটাকাটা। তার নাক হৈমন্তীর তুলনায় শক্ত এবং উঁচু, ঠোঁট কিছুটা পুরু, ও বড়। চিবুকেরও সামান্য পার্থক্য আছে। গগনের গায়ের রঙ ফরসা, তবে মেয়ে বলে হৈমন্তীর গায়ের রঙে যে মসৃণতা এবং কোমলতা আছে গগনের তা নেই। সুশ্রী, সপ্রতিভ, হাসিখুশী মেজাজের ছেলে গগন, বয়সে হৈমন্তীর চেয়ে বছর চারেকের ছোট। দিদির সঙ্গে তার সম্পর্কটা বরাবরই সঙ্গী এবং বন্ধুর মতন। বড় ভাই, হৈমন্তীরও বড়, সেই দাদার সঙ্গে এই দুই ভাই-বোনের সম্পর্ক না থাকার মতন। চা বাগানের সেই সাহেবদাদা আর তার সিকি-মেমসাহেব বউ তাদের আত্মীয় এই মৌখিক পরিচয়টুকু ছাড়া আর কিছুই নেই যা বলা যায়। যোগাযোগ দেখাসাক্ষাতও নেই, এমন কি মার সঙ্গে চিঠিপত্রেও দাদা যেটুকু সম্পর্ক বজায় রাখত একসময়, আজকাল তাও রাখে না। দাদার সঙ্গে তাদের দুজনের বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল; বাবা বেঁচে থাকতেই দাদা দূরে দূরে সরে যায়, তার পর বিয়ে করে, বিয়েটা সে নিজের খেয়াল-খুশিতে করেছিল, সংসারের বা মার মতামত নেয় নি, গ্রাহ্যও করে নি। তখন থেকে দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কে বড় রকমের ফাটল ধরে যায়। হৈমন্তীর অসুখের সময় দাদার ব্যবহার দেখে এরা বুঝে নিয়েছিল ওপক্ষ কোনোভাবেই আর এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নয়; দায় দায়িত্বও অস্বীকার করতে ওদের বাধছে না। তখন থেকেই যোগাযোগ ভেঙে গেছে; মা ও মামা বছরে একটি দুটি সাধারণ চিঠি লেখে মাত্র, দাদাও সেই রকম জবাব দেয়। কাজেই পারিবারিক ও সাংসারিক সম্পর্ক যা তা এই দুই ভাই-বোনেই গড়ে উঠেছে বরাবর, দাদার কথা ওরা ভাবে না, ভাবতেও পারে না।

গগন এসে গুরুডিয়ার অন্ধ আশ্রমেই উঠল। সুরেশ্বরের ইচ্ছে ছিল গগন তার কাছেই থাকবে, তার বাড়িতে। হৈমন্তীর তাতে তেমন আগ্রহ ছিল না; তার ইচ্ছে ছিল গগন তার ঘরের পাশাপাশি থাকে। হৈমন্তী আর মালিনীর ঘরের গায়ে গায়ে ছোট মতন একটা ঘর ছিল, নানা রকম অকাজের জিনিসপত্র জড় করা ছিল। গগন আসার আগে আগে সেই ঘর পরিষ্কার করাল হৈমন্তী। একটা তক্তপোশের ব্যবস্থাও হল, নিজের ঘর থেকে ক্যাম্বিসের হেলান-দেওয়া নতুন চেয়ারটা গগনের জন্যে তার ঘরে এনে রাখল, ছোট একটা লেখার টেবিল যোগাড় করে আনল মালিনী। মোটামুটি বেশ মানিয়ে গেল ঘরটা।

সুরেশ্বর ঘরের ব্যবস্থা দেখতে এসেছিল সকালে; দেখে শুনে বলল, 'বাঃ, বেশ হয়েছে।'

বিকেলে সুরেশ্বর আর হৈমন্তী দুজনেই স্টেশনে গেল গগনকে আনতে। শীতের সন্ধ্যে দেখতে দেখতে ঘুটঘুটে হয়ে এসেছিল, সেই অন্ধকারে আর শীতে বসে বসে করে ওরা গুরুডিয়া এল, গগনকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে সুরেশ্বর সামান্য বসে চলে গেল। ততক্ষণে রাত হয়ে আসছে, শীতও পড়ছে।

শীতের প্রকোপ দেখে গগন বলল, "আরে বাপস্, বরফটরফ পড়ে নাকি রে এখানে?"

ভাইয়ের বিছানাপত্র পেতে দিতে দিতে হৈমন্তী হেসে জবাব দিল, "থাকছিস তো, পড়লে দেখতে পাবি।"

দু চারটে সাধারণ ঘরোয়া কথার পর গগন বলল, "সুরেশদা তখন কি যেন বলছিল রে?"

"কিছু না। ওর বাড়িতে থাকার কথা বলেছিল প্রথমে, আমি না করে দিয়েছিলাম।"

"ওর বাড়িটা কি রকম?"

"এই রকমই প্রায়, মাটির গাঁথনি; খান দুয়েক ঘর আছে। কাল দেখিস।"

"কিছু মনে করল না তো?"

"মনে করার কি আছে, আমার বাড়ির লোক এসে আমার কাছে উঠবে না তার কাছে!"

গগন বিছানার পাশে ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারটায় বসে ছিল। গাড়িতে উঠেছে বেলা দশটা নাগাদ। একটু ভিড় ছিল আজ। ট্রেনের ধকলে সামান্য ক্লান্ত হয়ত, কিংবা কলকাতা শহরের হইহট্টগোল কলরব আলো থেকে হঠাৎ এই নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছে বলে অনভ্যস্ত অজানা অচেনা পরিবেশে নিজেকে এখনও তেমন সইয়ে নিতে না পারার জন্যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ও ম্লান হয়ে পড়ছিল।

বিছানার ওপর একটা র‍্যাগ পেতে বিছানা ঢাকা দিয়ে দিল হৈমন্তী; অন্য র‍্যাগটা পাট করে পায়ের কাছে রাখল। বলল, "তোর বিছানায় র‍্যাগ ঢাকা দিয়ে রাখলাম, বিছানা গরম থাকবে। পায়ের কাছে আর-একটা থাকল।"

গগন তাকিয়ে তাকিয়ে বিছানা দেখল, অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারপাশ তাকাল, হাই তুলল।

হৈমন্তী বিছানার পাশে বসে। ঘরের জানলা বন্ধ, দরজা প্রায় ভেজানো।

গগন হঠাৎ বলল, "এই ঠাণ্ডায় তোর কষ্ট হয় না?"

"এ কদিন একটু হচ্ছে, রাতের দিকে, দিনের বেলায় হয় না। দিনের বেলাটা খুব চমৎকার।"

"তোর শরীর খারাপ হবে না তো?" গগনের গলায় চাপা উদ্বেগ ছিল।

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, "না। আমি তো সাবধানেই থাকি।"

গগন এবার সিগারেট বের করে ধরাল। ধোঁয়া টানল খানিক, তারপর বলল, "মা আমায় অনেক কিছু বলে দিয়েছে, বুঝলি। মামাও।"

"কি বলেছে?"

"সে অনেক কথা। আমায় আবার পুরোট

ওয়ান টু করে সাজিয়ে মনে করে নিতে হবে—" গগন হাসল, "পরে বলব।"

হেমন্তী ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মোটামুটি জানে মা কি বলেছে, কি বলতে পারে, কেনই বা গগন এখানে এসেছে। শুধু যে বেড়াবার উদ্দেশ্যেই গগন এসেছে তা তো নয়।

হেমন্তী বলল, "তুই আমার সঙ্গে কথা না বলে কিছু বলবি না কাউকে।"

গগন কথার ধরন থেকে বুঝতে পারল দিদি কি বলতে চাইছে। তবু যেন বোঝে নি এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য চুপচাপ, গগন আলোর দিকে ধোঁয়ার একটা রিঙ ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করল, পারল না। পরে বলল, "সুরেশদাকে অনেক দিন পরে দেখলাম। সেই সেবারে কলকাতা গিয়েছিল আর এই—বছর দু আড়াই হবে প্রায়।......শরীর স্বাস্থ্য কিন্তু বেশ ভালই আছে। মাছ মাংস খায়, না ছেড়ে দিয়েছে?"

"মাংস এখানে হয় না।"

"বলিস কি?"

"পয়সায় কুলোয় না।...মাছটাছ পাবি

মাঝে মাঝে, নদীটদী থেকে ধরে আনা ছুনো মাছ। স্বাদ আছে।"

"বলিস কি! আগে তো বলিস নি।"

"বলেছিলাম, ভুলে গিয়েছিস—" হৈমন্তী হাসল। কথাটা হৈমন্তী বাস্তবিকই বলেছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়ত বলে নি। সে নিজেও মাংস খায় না, খেতে ভাল লাগে না। কলকাতায় থাকতেই ছেড়ে দিয়েছে।

ভাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন হেসে হেসে হৈমন্তী বলল, "তোর খাবড়াবার কোনো কারণ নেই গগন, মাংস খেতে চাস ব্যবস্থা করে দেব। ডিম খাবি, নদীর মাছ খাবি, শাকসবজি টাটকা সব—এখানকার বাগানের। সাত দিনে ফুলে যাবি।..."

"তুই কিন্তু ফুলিস নি", গগন হাসল।

"বলিস না; কলকাতার জামা এখন আমার গায়ে আঁট-আঁট লাগে।"

"মনে তো হয় না। তবে তোর শরীর খারাপও হয় নি। রঙটা কেমন পুড়ে গেছে।"

"শীতে এখানে ভীষণ টান ধরে, আর রোদ: সকাল হোক দেখবি—কী তেজ রোদের।"

গগন হৈমন্তীর চোখ মুখ এতক্ষণ লক্ষ করে করে একটা কিছু সন্দেহ করছিল। এবার বলল, "এত ভাল জায়গা, ক'মাস ধরে রয়েছিস কিন্তু যতটা ভাল দেখানো দরকার ততটা ভাল তোকে দেখাচ্ছে না...কলকাতায় পাড়ার লোকেরা যা দেখেছি তার চেয়ে ভাল না, বরং তোর মুখে..." কথা শেষ করল না গগন।

হৈমন্তী ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, তার মুখের ভাব হঠাৎ কেমন মলিন হয়ে এল, যেন সে এখন আর কিছু গোপন রাখতে চাইছে না—বা পারছে না। চোখের দৃষ্টিতে এই ভাবটা ফুটে ওঠার পর হৈমন্তী হয়ত সচেতন হয়েছিল, ফলে সে যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করতে চাইল। এমন সময় বাইরে মালিনীর গলা শোনা গেল।

হৈমন্তী সাড়া দিল।

মালিনী ঘরে এল। হাতে একটা কাঠের বড় পিঁড়ি, তার ওপর মাটির ছোট উনুন: ছোটদের খেলাঘরের উনুনের মতন। কাঠ কয়লার আগুন করে এনেছে। উনুনটা নামিয়ে রেখে মালিনী হৈমন্তীর দিকে তাকাল, "গরম জল দেব কলঘরে?"

হৈমন্তী একটু অবাক হয়েছিল। ঘরে এই আগুন দেবার জন্যে বা গরম জল করার জন্যে সে মালিনীকে বলে নি। নিজে বুদ্ধি খাটিয়েই মালিনী করেছে। খুশী হয়ে হৈমন্তী বলল, "গরম জলও করেছ! বাঃ!... মালিনী বড় গুণের মেয়ে—" বলে ভাইয়ের মুখের দিকে হেসে তাকাল।

মালিনী অপ্রস্তুত বোধ করল সামান্য, নীচু গলায় বলল, "দাদা যাবার সময় আমায় বলে গিয়েছিলেন।"

এই আতিথ্য পালনের ব্যবস্থাগুলো তবে সুরেশ্বরের নির্দেশে হচ্ছে! হৈমন্তী কিছু বলল না। মালিনী সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

গগন বলল, "তাহলে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলি, কি বল!"

"হ্যাঁ; জামাকাপড় ছেড়ে তুই আয়, কলঘরে গরম জল দিতে বলছি।" হৈমন্তী কেমন অন্যমনস্ক গলায় বলল, বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাইবোনে গল্প হচ্ছিল। গগন বিছানার ওপর একটা র‍্যাগ গায়ে চাপিয়ে বসে, হৈমন্তী শাল মুড়ি দিয়ে ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসে। পায়ে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মোজা পরেছে। দু জনের সামনে কাঠের তক্তার ওপর সেই কাঠকয়লার উনুন, তার আঁচ নিবে এসেছে প্রায়।

কলকাতার বাড়ির কথা, মা আর মামার কথা, চেনাজানা কারও কারও কথার পর প্রসঙ্গটা শেষাবধি ফুরিয়ে গেলে দু জনেই থেমে গেল। অল্প সময় চুপচাপ। তারপর গগন বলল, "তোদের সেই এনজিনিয়ার ভদ্রলোকের খবর কি?"

"কে, অবনীবাবু?"

"হ্যাঁ—"

"আছেন। পাটনায় যাবার কথা ছিল, অফিসের কাজে। গিয়েছিলেন জানি। ফিরে আসার কথা। এ ক'দিন আর স্টেশনে যেতে পারি নি।"

"তুই কি স্টেশনে যাস নাকি?"

"যাই; মাঝে মাঝেই যাই।.. এখানে মুখ বুজে থাকা, কথা বলার মতন মানুষ নেই একটা। কথা বলতে হলে ওই মালিনী। কত আর পারা যায়!"

"সুরেশদা.."

"ও-সব বড় বড় মানুষ, ওদের কথা আলাদা। গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করার অবসর নেই।" হৈমন্তী প্রসঙ্গটা অন্যভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও তার কথার স্বরে নৈরাশ্য ও চাপা বিরক্তি ছিল।

গগন নির্বোধ নয়, তার কানে হৈমন্তীর মনের বিরূপতা ধরা পড়ল। হৈমন্তীর চোখ লক্ষ করল গগন, পরে বলল, "তোকে তো তেমন খুশী মনে হচ্ছে না।"

হৈমন্তী ভাইয়ের দিকে তাকাল না। নীচু মুখে শালের পাড় খুঁটতে লাগল। বলল, "অখুশীর কি বুঝলি!"

গগন সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। হাত দুটো উনুনের আঁচে দেবার জন্যে ঝুঁকে বসল, তাত নেবার চেষ্টা করল,

আগনে নিবে গেছে, সামান্য একটু ভাত, ঠিক মতন অনুভব করাও যায় না।

"আমি তো এই ব্যাপারটা সেটেল করতে এসেছি—" গগন ধীরে ধীরে বলল, "মার পক্ষে এ-রকম ভাবে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। অনেক বয়েস হয়ে গেছে, শরীর খারাপ, আজকাল সবসময় দুশ্চিন্তা করে। মামা বুড়ো মানুষ, সারাটা জীবন আমাদের নিয়ে থাকল, মামাও এখন আর শুনতে চায় না। কে কবে চোখ বুজবে সেই ভাবনায় পড়েছে আজকাল, দায়দায়িত্বটুকু সেরে ফেলতে চায়।"

হৈমন্তী কোনো কথা বলল না। হেঁট মুখেই বসে থাকল।

গগন অপেক্ষা করল সামান্য, তারপর আবার বলল, "দাদার ব্যাপারের পর মার নানা রকম ভয়, মামারও। দাদাকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি অনেককাল, দাদাও দিয়েছে। তুইও যদি..."

"কেন, তুই তো আছিস—" হৈমন্তী এবার মুখ তুলল, যেন সে আপ্রাণ চেষ্টা করল গগনের কথার সমস্ত গাম্ভীর্য সামান্য হালকা করে আবহাওয়াটা নরম করার।

"আমার কথা ছাড়। আমি তো তোর ছোট।"

"ইস্, তুই এখনও কচি খোকা—" হৈমন্তী হাসবার চেষ্টা করল।

গগন হেসে হেসে জবাব দিল, "আমার এখনও ম্যাচুরিটি হয় নি, তিরিশ একতিরিশ বছর বয়সে আজকাল ছেলেরা বিয়েফিয়ে করে না। দাঁড়া—ওয়েট কর—আগে কেরিআরটা তৈরী করে নি তারপর কি আর বসে থাকব—!"

"তোর সেই সাঁতার-কাটা মেয়ে বন্ধুটার খবর কি?" হৈমন্তী রগড় করে জানতে চাইল।

"আরে ধ্বাস, তার তো সাংঘাতিক বিয়ে হয়ে গেছে—জানিস না। ফরেন-সার্ভিসের এক ছোকরার সঙ্গে। বিগ ফ্যামিলি।... বুঝলি দিদি, আমি আগে থেকেই বাই-লাইনে চলে গিয়েছিলাম: ওসব বিগ ব্যাপারে থাকতে নেই। এখন একটা স্টেনো-টাইপিস্ট মেয়ের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছি, নবনীর বোন, তুই দেখেছিস, নামটা বলব?" গগন চোখমুখ ফুলিয়ে হাসছিল।

হৈমন্তী হাসতে হাসতে ডান হাত তুলে চড় মারার ভঙ্গি করল, "তোর গালে ঠাস করে এক চড় মারব। বড্ড পেকে গিয়েছিস...! পাজি...!"

"পাকাপাকির কিছু নেই। প্রেমফ্রেম না থাকলে এই বয়সটার লাইফ থাকে না। নির্মলাকে আমার পাশে দেখলেই বুঝতে পারবি তার পাশে আমার লাইফ-ফোর্স কত বেড়ে যায়।"

হৈমন্তী খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন হাসি সে এখানে কোনোদিন হাসতে পারে নি, কলকাতায় হাসতে পারত। এখানে তার পারিবারিক সম্পর্ক কোথাও নেই, এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তার এমন স্নেহমধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে। কলকাতায় মা ছিল, মামা ছিল, গগন ছিল, দু-একজন বন্ধু ছিল। কলকাতায় সে সংসারের একজন মানুষ, পারিবারিক সম্পর্কে, আত্মীয়তায় স্নেহে-বন্ধুত্বে অন্যের সঙ্গে জড়িত; এখানে সে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। আশ্রমের মানুষের কাছে সে ডাক্তার, বড়জোর মালিনীর মেদিদি। কর্তব্য পালন ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই অন্যের সঙ্গে। স্বাভাবিক জীবনের এই আনন্দ ও সুখটুকু থেকে সে বঞ্চিত হবে এমন কথা আগে ভাবে নি। এখন বুঝতে পারে, হৈমন্তীর কলকাতার জীবনটা ছিল ঘরোয়া, সংসারের মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল, ডাক্তারীটা তার পোশাকী জীবন ছিল; বাইরে কাজের সময়টুকু এই পোশাকী জীবনে সে কাটাতে পারত, তাতে অস্বস্তি হত না, কষ্টও থাকত না। কিন্তু এখানে যা হয়েছে তা উলটো, পোশাকী জীবনটাই তার সব হয়ে উঠেছে, পারিবারিক জীবনের স্বাদ কোথাও নেই।

হাসি থেমে গিয়েছিল হৈমন্তীর; অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শীতের কনকনানি গায়ে লাগল, শিউরে ওঠার মতন কাঁপল একটু। অনেকটা রাত হয়ে গেছে, দশটা বাজল। বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ি দেখে নিয়ে হৈমন্তী এবার নড়ে চড়ে উঠল। "দশটা বাজল; নে আর রাত করিস না, শুয়ে পড়।" বলতে বলতে হৈমন্তী উঠে দাঁড়াল।

"তুই তো কিছু বললি না?" গগন শুধলো।

"তোর কথা আগে শুনি। মা, মামা কি সব বলে দিয়েছে তোকে মনে করে রাখ, কাল বলিস..."

"সে আমি সুরেশদাকে বলব।"

"না, আগে আমায় বলবি।"

"সুরেশদাকে বলার জন্যেই বলেছে।"

"বলুক। আমার ব্যাপারে যা বলার আমায় আগে না জানিয়ে তুই কাউকে বলবি না।... মা মামা তোকে এখানে কারও কাছে হাত জোড় করতে পাঠায় নি।"

"হাত জোড় করার ব্যাপারই নয়..."

"না হলেই ভাল। নে শুয়ে পড়, দরজাটা বন্ধ করে দে।" হৈমন্তী দরজার দিকে পা বাড়াল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে গগন হেসে বলল, "সুরেশদার কাছে তুই আমায় এই জন্যেই থাকতে দিলি না নাকি রে?"

কথাটার স্পষ্ট কোনো জবাব দিল না হৈমন্তী। বলল, "তোর সঙ্গে কথা বলতে গল্প করতে আমায় ও-বাড়ি ছুটতে হবে নাকি! ও-বাড়িতে আমি বড় যাই না। আমার কাছে না থাকলে তোকে পাব কি করে সব সময়...নে, দরজা বন্ধ করে দে।"

অনেক রাত পর্যন্ত হৈমন্তীর ঘুম এল না। গলা পর্যন্ত লেপ টেনে শুয়ে থেকে থেকে সে কখনও চোখ খুলে নিবিড় অন্ধকার দেখছিল, কখনও চোখের পাতা বুজে ঘরের মধ্যে সঞ্চিত মাঝরাতের শীতে অস্বস্তি বোধ করছিল। তার কপাল ঠাণ্ডা, নাকের ডগাও তেমন গরম নয়, নিশ্বাসও ভারী হয়ে উঠেছে। এই শীত তাকে নিদ্রাহীন করছিল কিনা বলা যায় না, তবে শীতের প্রতি তার তেমন মনোযোগ ছিল

না; সে অন্য চিন্তা করছিল. চিন্তা থেকে যখন মন সরে যাচ্ছিল শীতের স্পর্শে সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিল। চিন্তা এবং উদ্বেগেই তার ঘুম আসছিল না।

গগন এসেছে; কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে হৈমন্তী জানে। সুরেশ্বর এবং গগনের মধ্যে কাল পরশু বা দু একদিনের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে হৈমন্তী তা অনুমান করে নিচ্ছিল এবং ভাবছিল। সুরেশ্বরের মনোভাব সম্পর্কে হৈমন্তীর নতুন করে আর বেশী কিছু জানার নেই. এই ক'মাসে ক্রমশ তা জানা হয়ে গেছে: এখন—হৈমন্তী প্রায় নিশ্চিতরূপে বলতে পারে, সুরেশ্বর গগনকে নিরাশ করবে। গগন তা জানে না. কিংবা মনে মনে তার কিছুটা সন্দেহ দেখা দিলেও সে সুনিশ্চিত করে কিছু জানে না। মা আর মামাও এতটা বোঝে নি, জানতে পারে নি। হৈমন্তী কলকাতায় গিয়ে যে ক'দিন ছিল মাকে, মামাকে তার এই ব্যর্থতার বিষয় বুঝতে দেয় নি। কিন্তু এখন গগন এখানে আসার পর সুরেশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি কথার পর কারও কিছু অজানা থাকবে না।

গগনকে নিজের কাছে রাখার পিছনে হৈমন্তীর স্বার্থ ছিল। সে চায় নি গগন সর্বক্ষণ সুরেশ্বরের কাছে থাকে। সুরেশ্বরের হাতে গগনকে ছেড়ে দিলে সুরেশ্বর তাকে কি বোঝাত, কি বলত, কোন যাদুতে বশীভূত করত—কিছুই বোঝা যেত না। গগন সুরেশ্বরকে যথেষ্ট মান্য করে, পছন্দ করে, এমন কি শ্রদ্ধাও করে। সুরেশ্বর গগনকে বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে, গগনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সরল স্নেহ-প্রীতির, আত্মীয়তার মতনই। গগনের মতন সাধাসিধে সরল ছেলেকে অনায়াসে সুরেশ্বর গলভরা কথায় মিষ্ট ব্যবহারে ভোলাত, তার মর্জি মতন চালিয়ে নিতে পারত। তা ছাড়া, গগন বড় বোকা; দিদির প্রতি তার অনুরাগ এত বেশী যে, সে দিদির জন্যে সুরেশ্বরের কাছে যে কোনো রকম দীনতা প্রকাশ করে ফেলতে পারে। তাদের সংসারের অনেক কথা আছে যা একান্তভাবেই তাদের কথা—দুর্বলতার মুহূর্তে গগন কি সে সব কথাও সুরেশ্বরের কাছে না বলে থাকতে পারত।

হৈমন্তী এ সব চায় নি। সে চায় না—তার মা, মামা বা ভাইয়ের কথাবার্তা থেকে সুরেশ্বর বুঝতে পারে তারা দীনতা প্রকাশ করছে। গগন এখানে ভিক্ষা চাইতে আসে নি, সুরেশ্বরের কাছে তারা কেউ আবেদন জানাচ্ছে না, ভিক্ষাও চাইছে না। তাদের সংসারের মর্যাদাটুকু হৈমন্তী নষ্ট হতে দিতে চায় না; সেই সঙ্গে নিজের মর্যাদা।

গগনকে নিজের কাছে রাখার বড় কারণ হৈমন্তী তাকে আগলে রাখবে। গগনকে সে এমন কিছু করতে বা বলতে দেবে না যাতে সুরেশ্বরের অহমিকা বোধ আরও স্ফীত হয়ে ওঠে। সংসারে এমন মানুষ আছে যারা এই অহমিকাকে সম্বল করে আত্মচরিতার্থতা লাভ করে, খুশী হয়। সুরেশ্বর সে-জাতের মানুষ কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হৈমন্তীর নেই, কিন্তু তার বাড়ির লোকের আচরণে যদি কাতর আবেদন ও ভিক্ষার মনোভাব প্রকাশ পায় সুরেশ্বরের অহমিকা বোধ তৃপ্ত হতে পারে। গগনকে হৈমন্তী তেমন কিছু করতে দেবে না, বরং যতটা সম্ভব গগনকে সে সুরেশ্বরের কাছ থেকে তফাত রাখার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে গগনকে সে তার পক্ষে টেনে এনে সুরেশ্বরের সঙ্গে লড়তেও রাজী, তবু ওই মানুষটার কাছে আত্মসম্মান সে নষ্ট করবে না, কাউকে করতে দেবে না।

সুরেশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইদানীং প্রায় এক ধরনের বিশ্রী তিক্ততার মধ্যে এসে পড়েছে। সুরেশ্বর পরে আবার চেষ্টা করেছিল হৈমন্তী যেন দুবেলা হাসপাতাল খুলে রাখে, তার সুবিধে মতন। হৈমন্তী দুবেলা হাসপাতালে আসতে রাজী হয় নি, তবে সে আজকাল বেলায় আরও এক ঘন্টা বেশী থাকে। তাতে তার স্নান খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের অসুবিধে ঘটছে। তা ঘটুক, তবু নিজের জেদ থেকে হৈমন্তী নড়বে না। সুরেশ্বর হৈমন্তীর এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছে, হৈমন্তীর জন্যে দুশ্চিন্তা জানিয়েছে, কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আর কোনো পীড়াপীড়ি করে নি।

সেদিন অবনীর সঙ্গে একটু রাত করে ফেরার সময় আশ্রমের বাইরে রাস্তায় সুরেশ্বরকে হৈমন্তী ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল। অবনী দেখতে পায় নি। সুরেশ্বর ঠিক কেন যে অন্ধকারে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হৈমন্তী জানে না, তবে তার সন্দেহ হয়েছিল, মালিনীর কাছে হৈমন্তীর একলা স্টেশন যাবার কথা জানতে পেরে, এবং সন্ধ্যের পরও হৈমন্তী না ফিরে আসার জন্যে হয়ত বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয়ে সুরেশ্বর ওইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যের বাসে যখন ফেরে নি তখন যে অবনীর গাড়িতে ফিরবে একথা জেনেও সুরেশ্বর কেন অধৈর্য হচ্ছিল? হয়ত সে কিছু দেখতে চাইছিল। যদি সুরেশ্বর মনে মনে কিছু দেখার আশা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে থাকে সেদিন, তবে সে দেখেছে: হৈমন্তী আর অবনী পাশাপাশি বসে রাত্রে আশ্রমে ফিরে আসছে।

পরের দিন এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কথা ওঠে নি। সুরেশ্বর আসে নি, বা হৈমন্তীকে ডেকে পাঠায় নি। মালিনীকেও কিছু জিজ্ঞেস করে নি হৈমন্তী। হতে পারে, সুরেশ্বর সেদিন রাত্রে শীতের মধ্যে এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, হৈমন্তীর ফেরা না-ফেরার জন্যে তার উদ্বেগ বা ব্যস্ততাও ছিল না। তবু সেদিন যা ঘটেছে তাতে হৈমন্তী কোথায় যেন খানিকটা তৃপ্তি অনুভব করেছে।

কয়েক দিন পরে অন্য রকম এক ঘটনা ঘটল। পাটনা যাবার আগে অবনী দেখা করতে এসেছিল। তখন অন্ধকার হয়ে আসছে, হৈমন্তী বিকেলে খানিকটা বেড়িয়ে ঘরে ফিরছে, অন্ধ আশ্রমের মাঠে গাড়ি দাঁড়াল অবনীর। হৈমন্তী অবনীকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। অনেকক্ষণ ছিল অবনী, গল্পগুজব করল, চা খেল, তারপর চলে গেল। সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু গল্পগুজবের মধ্যে উঠি উঠি করেও আর ওঠা হয় নি। শেষ পর্যন্ত সুরেশ্বরের সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

পরের দিন বেলায় হাসপাতালের সামনে সুরেশ্বরের সঙ্গে হৈমন্তীর দেখা।

সুরেশ্বর বলল, "কাল অবনীবাবু এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, পাটনায় যাচ্ছেন।"

"পাটনা! ...কখন এলেন কখন গেলেন জানতেই পারলাম না। পাটনা যাবেন জানলে একটা কাজের ভার দিতাম।...কখন যাবেন?"

"আজ রাত্তিরের গাড়িতে।"

"ও!...দেখি...", সুরেশ্বর যেন মনে মনে কিছু ভাবল, তারপর বলল, "কাল একবার দেখা হলে ভাল হত।"

হৈমন্তী পলকের জন্যে সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল, তারপর একেবারে আচমকা কেমন যেন কোনো অদ্ভুত এক ইচ্ছার তাড়নায় বলে ফেলল, "সময় পান নি। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল।"

সুরেশ্বর যে হৈমন্তীকে লক্ষ করছে হৈমন্তী না তাকিয়েও বুঝতে পারল। পরে সুরেশ্বর বলল, "তাই হবে, সময় পান নি।"

কথাটা হৈমন্তীর কানে খুব শ্রুতিমধুর হয় নি।

(ক্রমশ)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, সরকারী কর্মচারী সরকারী পরিবারেরই অংশ।—"কথাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু পরিবারের বহর দেখে মনে না করে উপায় নেই যে, সরকার অন্যদের

সম্বন্ধে যা-ই বলুন, নিজের পরিবারে পরিবার পরিকল্পনা প্রবর্তনের পক্ষপাতী নন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম, কেন্দ্র বিশাখাপত্তনমেই পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।—"কেন্দ্র অতঃপর লছিতা উত্থানমের জন্য প্রস্তুত থাকুন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সমীক্ষায় প্রকাশ, আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা মাদ্রাজেই বেশি।—"হতে পারে আক্ষরিক অর্থে। কিন্তু ভাবগত অর্থে মনে হয় বাংলাতে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেশি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, যোজনা কমিশন নাকি রাজ্য সরকারকে শহরের জমি হইতে কর আদায় করিয়া কলিকাতা উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কেন্দ্রীয় সরকার মোক্ষম পরামর্শটি এইবারে ছাড়লেন। আমরাও জানি, স্বাবলম্বীদের ঈশ্বর সহায়, সুতরাং দিল্লীশ্বরো না বলে জগদীশ্বরকেই ডাক॥"

আনন্দবাজার পত্রিকায় "কমলাকান্তের আসরে" শ্রীকমলাকান্ত শর্মা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নামে কলিকাতায় একটি পার্কের নামকরণের পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—পঞ্চাশ বছর ধরে যিনি হাসি জুগিয়ে ছেলেমেয়েদের খুশি করে রেখেছেন তাঁর সম্মানার্থ পার্কটির নাম হোক যোগীন্দ্র উদ্যান বা হাসি খুশি পার্ক'। —"হাসি খুশি পার্ক' নামটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে কিন্তু ভাবছি, হাসির কথা বললে যারা বলে—'হাসব না, না, না, না' তারা এই ব্যাপারে উদ্যোগী হবে কি?"—বলেন আমাদের হাস্যপ্রিয় বিশুখুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম, পাঞ্জাবের পুলিস বাহিনীর দুইটি কুকুরের নাম হুইস্কি এবং ব্র্যান্ডি।—"রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি মনে না করে উপায় নেই—'জানতে চাও মোর উইশ কি, একটি ছটাক সোডার জলে বাকী তিন পো হুইস্কি'। বেচারা পুলিস বাহিনী, নামকরণেন অর্ধপানম ছাড়া যে তাদের গতি নেই!!"—মন্তব্য জনৈক সহযাত্রীর।

অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে দ্বিতীয় দিনের বিতর্কে আচার্য কৃপালনী বলেন, দেশে আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বিরোধী দলের চেয়ে কংগ্রেসের দোষ বেশি। এতৎ সম্পর্কে কয়েকটি প্রদেশের উল্লেখ করিয়া কৃপালনীজী

বলিয়াছেন, এর প্রতিবাদ করার জন্য আমি যে-কোন কংগ্রেস কর্মীকে চ্যালেঞ্জ করছি। শ্যামলাল বলিল—"উত্তর প্রদেশের সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা এই চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কি না তা ঠিক বোঝা গেল না॥"

সংবাদপত্রে ছেলেদের পাতায় জনৈক লেখক একটি বিচিত্র মাছের সংবাদ দিয়াছেন এবং কিশোরদের প্রশ্ন করিয়াছেন —তোমরা কি মাছের খেলা দেখেছ? আমাদের জনৈক প্রৌঢ় সহযাত্রী বলিলেন—"না, মাছের খেলা আমরাও দেখিনি, তবে মেছোদের খেলা দেখেছি এবং আরো হয়ত কত দেখব।"

সংবাদে শুনিলাম, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"স্বর্ণ শিল্পীরা স্বস্তি বোধ

করবেন কিন্তু অতঃপর কন্যারত্ন শিল্পীদের (বাংলাটা প্রাঞ্জল হলো কি?) বিনিদ্র রজনী যাপনের পালা!!"

পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ দফতরের মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলিয়াছেন পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলিতে গৃহ নির্মাণের যতটা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল তা পায় নাই।—"তাতে ক্ষতি কিছু হয় নি; সবাই দিচ্ছেন কোঠা বাড়ি, আমার গাছতলাতে বাড়ি, এ ঘর ভাঙবে নাকো টুটবে নাকো, ক্ষয় হবে না কোন কালে"—গানটি শ্যামলাল সুর করিয়া শুনাইল।

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, সেখানে "টেরিন"-এর জামা প্যান্ট ব্যবহারের ফলে ধোপারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ মিছিল বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছে।—"সর্বসাধারণের চোখের সামনে নোংরা জামা কাচার রেওয়াজ এতই চালু হয়েছে যে, টেরিন ব্যবহার না করলেও আর কেউ জামা কাপড় ধোপায় দেবেন না"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

জাপানের রাস্তায় নাকি স্বয়ংক্রিয় ঋণ দান যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে।—"স্বয়ংক্রিয় ঋণ-শোধ যন্ত্র স্থাপিত না হয়ে থাকলে ব্যবস্থাটাকে ভালোই বলতে হয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মাও সে তুং বলিয়াছেন, আলবেনিয়া হইল পর্বত এবং রাশিয়া বালির ঢিবি। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মনে হয় সংবাদটায় ভুল আছে: শুধু বালির ঢিবি না হয়ে হয়ত চোখের বালির ঢিবি হবে!!"

নির্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা ঝড়ঝড় বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
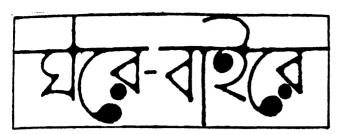
ফ্যাশনের দুনিয়ার আর একদিক

ফ্যাশনের ফাঁদে পা দেয়নি, আদবকায়দায় কাবু হয়নি এমন সমাজ কোথাও নেই। ক'দিন আগে মার্কিন মেয়ের উপকেশের আলোচনা করেছিলাম আমরা। সেদিন দেখি কলকাতারই কেশসজ্জার দোকানে সাজানো এক খোঁপা। কৌতূহল হলো, মালিক মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম এ খোঁপা দিয়ে কি হয়। আমার অজ্ঞতায় মুচকে হেসে তিনি জবাব দিলেন খোঁপা বাঁধবার যার চুলের অভাব অথবা চুল থাকলেও সাজিয়ে সুন্দর কবরী রচনায় যার অবসর হবে না তারা এই খোঁপা দিয়ে পলকে কেশরচনা করে নিতে পারেন। চাই কি এক বোঝা এলো-মেলো চুলও চটপট চাপা দিয়ে খোঁপা কাঁটা ক্লিপ ইত্যাদি দিয়ে লাগিয়ে নেওয়া যায়। একটু সামনেটা সমান করে নিলেই ফিট ফাট দেখাবে।

চুলের গুছির খবর জানতাম। নিজে বানিয়ে নেওয়া বা দোকান থেকে কিনে নেওয়া চুল ভেজাল দিয়ে কুন্তল রচনা করার চলন আজকের নয়। তারপর নাইলন, রং-করা পাট কত রকমের ভেজাল এসেছে গিয়েছে কিন্তু মানুষের চুল দিয়ে Wig বা উপকেশ একবারে তৈরি করে ব্যবহার করার কথা আজকের ভারতীয় মেয়ে মহলে নূতনই মনে হয়। হয়তো বা প্রাচীনকালে উপকেশ রচনার চলন ছিল। অজন্তার গুহাচিত্রে যেসব কবরী ছাঁদের নমুনা দেখা যায় তার দৈনন্দিন বিন্যাস সম্ভব হতো না; তাঁরাও উপকেশের সাহায্য নিতেন কিনা বোঝা যায় না। ইউরোপে Wig এর চলন বহু দিন থেকে। মিশরের মামির মাথায় উপকেশের নমুনা দেখা গেছে। গ্রীসে পরচুলার প্রচলন ছিল। রোমের রূপসীরা সেকালে সোনালী চুল পছন্দ করতেন। তাই সোনালী চুলের পরচুলা লাগাতেন। মারকাস অরেলিয়াসের পত্নী ফস্টিনার নাকি শত শত উপকেশ ছিল। ফ্রান্সে ত্রয়োদশ লুই-এর মাথায় ছিল টাক। পরচুলা পরে টাক ঢাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত মহলে কাজে অকাজে পর-চুলার চলন হলো। ইংলণ্ডের রানী অ্যান-এর বেলায়ও একই রকমভাবে রাজকীয় ফ্যাশন-এর অনুকরণে সবাই উপকেশে ভক্ত হয়ে উঠলেন। আধুনিক ফ্যাশনে পরচুলা যে শুধু চুলের অভাব গোপনের প্রয়াস তা নয়। কদম ছাঁট চুলের পরচুলাও মার্কিন দেশে চলে।

রবীন্দ্র সরণির শেখ মহম্মদ ইদরিস সাহেব কিন্তু বলেন পরচুলার ব্যবহার আমাদের দেশেও বহু দিনের, তবে থিয়েটারে যাত্রারই বেশী চলতো। সাধারণ ঘরের মেয়ের জন্য যা যেত বেশীর ভাগই অন্যের নজর এড়িয়ে। হাওড়া জেলার বিকিহাকোলা গ্রামের অধিবাসীদের পেশাই উপকেশ। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পথে মাত্র ১৮ মাইল গেলেই হাকোলা। ইদরিস সাহেবের বাড়িও সেখানে, তবে চিৎপুর রোডের দোকানে কাজ চলে সপ্তাহে ৬ দিন। রবিবার কাটে হাকোলায়।

রবীন্দ্র সরণির পরচুলার দোকান গুটি-তিনেক মাত্র। এক সময় নাকি অনেক ছিল। এখন তীর্থের চুল, নাপিতের কাট ছাঁট অনেকটাই বিদেশে রপ্তানি হয়। সেখানে তার মূল্য অনেক। ইদরিস সাহেবের কাছেও চুল কেনার খদ্দের আসে যারা সেই চুলই পাঠাবে বিদেশে।

মাথার মত করে একটি কাঠামো তৈরি করে নিয়ে নানা ধরনের চুল সাজাচ্ছিলেন মহম্মদ ইদরিস ও তাঁর দুজন আপনজন। পারিবারিক শিল্প হিসাবে নেওয়া হয় বলে ঘরে বসে ৬৫ বছরের বুড়ো বাবাও কাজ করেন, আবার ছোট মেয়ে ইয়ারুন্নিসাও কখনও সাহায্য করে। তারা হাকোলায় থাকে। চুল এনে তার প্রথম পরিচর্যার পর তাদেরই উপর। তারের জালির মধ্যে চুল ফেলে একটি একটি করে বেছে নিতে হয়, সাফ করতে হয়, তবে তা দিয়ে ইদরিস সাহেব কারখানায় অর্ডার মত পরচুলা সাজান।

বাহারের খোঁপা বা কায়দা করা চুলের পরচুলা করতে পরিশ্রম অনেক তাই তার দাম যথেষ্ট। পঞ্চাশ ষাট থেকে আরম্ভ হয় দামের হিসেব, তারপর কাজ বুঝে বেড়ে চলে ক্রমশ। হেয়ার ড্রেসারের দোকানে যে খোঁপা দেখে অবাক হয়েছিলাম তারও শিল্পী ইদরিস সাহেব বা তাঁরই মত কেউ। মাথার মাপের কাঠামোর উপর নেট বা কালো-কাপড়ের টুপি বানিয়ে তারই উপর রচিত হয় কুন্তলসৌধ। খোঁপাজাতীয় হলে কাঁটা দিয়ে লাগানো হয় মাথায় আর পুরো মাথার উপকেশ লাগানো হয় প্রায় টুপির মত টপ্ করে। মনে হয় গরমের দিনে উপকেশ লাগিয়ে কষ্টই হয়, তবে কত কষ্টই তো মেয়েরা মেনে নেয় একটু রূপসজ্জার খাতিরে।

বেগম বাহার

আখ্তার জাহান বেগম যাচ্ছিলেন আজমীর শরীফ্। পথে হলো দেখা। মিষ্টি স্বভাবের সুন্দর মানুষ অল্প

ইদ্রিস সাহেবের কারখানায়

আলাপেই পরিচয় পাকা হয়ে গেল। ঘরের কথা, আপনজনের কথা বলে কয়ে দীর্ঘ পথের সহযাত্রিণী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কাবাব-কিমা-পরোটার মাধ্যমে রসালাপের সূত্র ধরে একটি খবর রোম্যান্টিক লাগলো। বেগম সাহেবা টিপু সুলতানের নাতি প্রিন্স আনোয়ার শাহ্-এর (যাঁর নামে প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড) পুত্র বক্তিয়ার শাহের কন্যা। টালিগঞ্জে বক্তিয়ার শাহ্ রোডও আছে। আখতার জাহানের মা বসির বেগম এখনও পেনসন পান সরকারের কাছ থেকে। বাতে বেদনায় কাবু বর্ষীয়সী বেগম সাহেবাকে বার বার দেখছিলাম আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই অধ্যায় ভাবছিলাম। মহীশূরের হায়দার আলি আর তাঁর পুত্র টিপু ইংরাজের পতন সম্বন্ধে আশংকায় ফ্রান্সে নেপোলিয়নের সাহায্য চেয়েছিলেন। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে বীরত্ব সত্ত্বেও সাহায্য তাঁদের আসেনি আর ইংরাজও হার মানে নি। তার পরের অঙ্ক কলকাতায় যাতে কোম্পানী কড়া নজর রাখতে পারেন এজন্য টিপুর পরিবারকে রাখা হলো টালিগঞ্জে আর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এলেন অযোধ্যা থেকে মেটিয়াবুরুজে। পরাস্ত বিপর্যস্ত হয়েও আমিরীর রেশ রয়ে গিয়েছিল। ইংরাজের দেওয়া কাগজের টাকা সুতো দিয়ে বেঁধে ঘুড়ি বানিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মজা দেখার গল্প, প্রত্যেকটি পুরী ভাজবার জন্য নূতন করে কড়াইতে ঘি ঢালার গল্প আজও নবাবদের বংশধরেরা র‍্যাশনের কাঁকড় মেশানো দুর্গন্ধ চালের ভাত খেতে খেতে বা চক-এর গুঁড়োমেশানো আটার রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে করেন।

বেগম সাহেবা যাচ্ছিলেন তিনদিনের পথ। মাঝে অল্প বিরতি দিল্লিতে। তাঁর মা বসির বেগমের বাবা থাকতেন দিল্লিতেই। সেখানে ফরাসখানা মহল্লাতে আজও নাম করলে সবাই চেনে। আগে আগে বসির বেগম ছেলেমেয়ে নিয়ে দিল্লিতে বেড়াতে আসতেন আর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছত পালকি। মনুষ্যবাহিত শিবিকা তাঁদের তুলে দিত পরদা দিয়ে ঘেরা মস্ত মোটরে। দেশবিভাগের পর বসির বেগমের পিত্রালয় গেছে পাকিস্তানে, তাই আমার সহযাত্রিণী জিজ্ঞাসা করছিলেন সস্তা হোটেল বা সরাইখানার খবর আমার জানা আছে কিনা। খাবারের জন্য চিন্তা নেই। আজমীর শরীফ পৌঁছেও দু এক বেলা চালিয়ে দিতে পারেন এমন ব্যবস্থা সংগেই

খোঁপাটি নকল

আছে। সাদা এনামেল করা টিফিন ক্যারিয়র খুলে দেখালেন শুকনো করে রান্না সব খাবার। সহজে নষ্ট হবে না, পথে খেতেও ভাল। মোটা রুটির এক অংশ ভেঙে খেয়ে দেখলাম, চমৎকার! এখনও নিজে বানিয়ে দেখিনি কিন্তু আপনারা সফরে যেতে বানিয়ে নিয়ে দেখতে পারেন। যতটা আটা প্রায় তার এক চতুর্থাংশ ঘি বা বনস্পতি জাতীয় স্নেহ পদার্থ বেশ করে মিলিয়ে জল ঢাললেন। জলের আন্দাজটাই আসল। ঠিক যতটা জলে আটা মাখা হবে ততটা জল দিতে হবে। বেশী নয়, কম নয়। দুবার দিলে মোলায়েমত্ব কমে যাবে। জল দিয়ে বেশী ঠাসবেন না বা চটকাবেন না। এবার লেচি বানিয়ে মোটা, ছোট, গোল করে আটা দিয়ে রুটি বেললেন। চাটুতে চেপে চেপে সেঁকবেন। ফুলে উঠতে দেবেন না। ফোলার ভিতর যে ভাজ থাকে পরে সেটা জলীয় ভাব ধারণ করে রুটির বেশী দিন সংরক্ষণের বাধা হয়। ফুলে উঠবার জন্য আগুনে তো দেবেনই না বরং তাওয়ার উপরে ফোলা সামলাতে না পারলে ছুরি বা অন্য কিছু দিয়ে ফুটো ফুটো করে দেবেন। একেবারে জলশূন্য রুটি ঘি-এর জোরে নরম থেকে যাবে। আখ্তার জাহান বলছিলেন সফরে, পিকনিকে এর সঙ্গে চিনি বা গুড় মিলিয়ে বানালেও বেশ হয়।

রুটি কাবাবের কথা বলতে বলতে বেগম সাহেবা বললেন আজমীর শরীফে মইনুদ্দিন চিস্তি সাহেবের মকবরা না দর্শন করে মরতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। সাতবার আজমীরের দরগায় তীর্থ করলে একবার মক্কায় কাবা দর্শনের সমান পুণ্য হয়। আশ্চর্য, যে কোন ধর্মের যে কোন মেয়ের মতই কথা! চিস্তি সম্প্রদায়ের সুফীবাদও এমনই সার্বজনীনত্বে ভরা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষের মাটি প্রেমের ধর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। কবীর, নানক সুফী সন্তদের সবই তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। উত্তর ভারতের সুফীরা প্রায় বারোটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে কাদারি, সুরাওয়ার্দি, নক্সবন্দী এবং চিস্তিরাই ছিলেন প্রধান। আলাদা সম্প্রদায় গঠিত হলেও সাম্প্রদায়িকতা সুফীদের মধ্যে এতটুকুও ছিল না। এমন কি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও মিল তাঁরাই এনেছিলেন। এর আগে মুসলমান বিধর্মী হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে, অত্যাচার করে আনন্দ পেতেন, সুফী সন্ত এসে বললেন যেদিকে তাকাও সেদিকেই আল্লা, তবে কেন হিংসা কর। দলে দলে হিন্দু এসে তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। হিন্দুর প্রথা আর মুসলমানের প্রচার একাকার হয়ে গেল। সুফী সন্তদের সমাধি ছোট ছোট মক্কা হয়ে উঠলো। হিন্দুরও গুরু হলেন সুফী, তাদের কীর্তন হয়ে গেল কাওয়ালি। তালিফ-ই-কুলুব বা হৃদয়ের বন্ধন সকলকে বেঁধে দিল একই সূত্রে। অস্পৃশ্য হিন্দু নির্যাতিত পতিত হলো শেখ, মৌলবি খালিফা বা মুন্সী! সময়ে সময়ে বিরোধ হলেও তাদের দেওয়া নেওয়া বিনা বাধায় চললো।

বেগম আখতার জাহানও দেওয়া নেওয়ার মস্ত নিদর্শন। তাঁর পূর্বগামিনী হায়দার আলির হারেমবাসিনীরা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেন নি উত্তরকালে তাঁদেরই বংশের এক বেগম এমন ঘরোয়া বাঙালী মেয়ে হয়ে যাবে। মালদহের জমিদারবধূ হয়ে সেই ঘরে বেগম বাংলা শিখেছিলেন। বাঙালী মেয়ের মতই তাঁর আচার ব্যবহার, কাপড় জামা। বেগমসাহেবার বাক্স খুলে তাঁর অপূর্ব সব এম্ব্রয়ডারি করা তাঁতের শাড়ি দেখলাম। বিধবা বেগম সাহেবা সাদা পরেন। সেই দুগ্ধশুভ্র স্বচ্ছতায় সূক্ষ্ম সূচিশিল্পও এক বিশেষ ঐতিহ্যের ইতিহাস। ঠিক এই রকম শাড়ি আনত রসিদের মা এককালে। অল্প ছড়িয়ে ধুয়ে দিত ধোপারা। আতর, পানদান আর সুর্মার সংগে গড়ে উঠেছে আর এক কৃষ্টি। এই একই ধরনের শাড়ি পূর্ববাংলায় হত। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল শাড়ির এই বিশেষ রকমফেরকে বলা হত হাওয়ার শাড়ি। স্বচ্ছ, সহজ এ শাড়ির কদর নাকি টালিগঞ্জের নবাব পরিবারের বেগম মহলেই বেশী ছিল। বাংলার তাঁতি তাই তার নামও রেখেছিল 'বেগম বাহার'। বেগম বাহার অবশ্য বোনা হতো আজকের পশ্চিম বাংলার শিল্পীর হাতেই। বেগমবাহার-এর হাল্কা বাহার সুন্দরী সমাজে যথেষ্ট চলেছিল; কিন্তু এবার দেখলাম রসিদের মারাও আর আসে না, বাজারের দোকানেও বেগমবাহার বেশী মেলে না। আর পাঁচটা ঐতিহ্যের মত 'বেগমবাহার'ও হারিয়ে যাবে না তো?

—শ্রীমতী
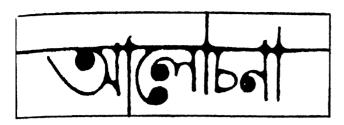
আবু সয়ীদ আইয়ুবের সমস্যা

সাধারণ পাঠকের চোখে মনে হয় শ্রীযুক্ত আইয়ুব নিজের ও রবীন্দ্রকাব্যের মাঝখানে দার্শনিক দেয়াল তুলে তা অনেকাংশে নিজেই ভেঙে ফেলেছেন। গীতাঞ্জলি পড়ে ... তার পা মর্ত্যলোকের মাটিতে ঠেকে ... নিশ্চয়ই তার রসাস্বাদের ব্যাঘাত হয় ... আর যখন তার মতে তিনি যুগপৎ ...লোকের গন্ধ পান, তখন তিনি কি ...শ্চয় যে তার কবিতার আস্বাদন পেতে ... হচ্ছে, যেহেতু তিনি চর্তীত অর্থে ... হয়ে তিনি অমৃতলোকের গন্ধে ...ন্দ্রে, তখন তিনি মনে মনে নিশ্চিন্ত ...নিত্যকেও অমৃতলোকে অধিকার ...ছ এবং কোন মতবাদের খাতিরে এ ...কের তিনি ছাড়তে রাজী নন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে যে উত্তর তিনি চেয়েছেন ... নানা দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদ ও ...র জালে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন ...ধা হবে মনে করি না। বর্তমানে ...মি ও আত্মবঞ্চনা প্রচুর, কখনো উদ্দেশ্য-...দিত, কখনো আপাতউদ্দেশ্যবিহীন ...ু পরিণামে গোষ্ঠী-স্বার্থের অনুকূল। ...র চেয়ে তার বিশ্লেষণের আর্থিক মূল্য ...। তাকে নোটবই বা ডক্টরেটের থিসিস ...বে ব্যবহার করা যায়, চাকুরির থেকে ...য় প্রাতিনিধ্য সব ব্যাপারেই তার ...ক মূল্য আছে। এ জন্য কাব্যজিজ্ঞাসা ...রণশীল। তাই বলি শ্রীযুক্ত আইয়ুব ...নিক বা সামাজিক চিন্তার লেবেল দিয়ে সাধারণে নেমে আসুন, তাহলে ...ঈশ্বরবাদ বা নাস্তিকতার বাধা থাকবে ...মৈমনসিংহ গীতিকায় এ দুটি লাইন : "ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের ...লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৌবন।" সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের দুটি লাইন ... করা যায় : "কেন সারাদিন ধীরে বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে" উদ্ধৃতি অক্ষরজ্ঞানশূন্য মানুষকেও ...র স্বাদের সঙ্গে পরিচিত করে। ...জনও সে স্বাদে বঞ্চিত হবেন না। ...য় শুধু বিদগ্ধজনের জন্য। উভয় ...ই ঈশ্বরনিরপেক্ষ কবিতা, যদিও আছে কবিতার সাধারণ উপজীব্য, যেমন প্রকৃতি ও জীবনজিজ্ঞাসা। কাব্য শব্দ-...শব্দ ও তার সাধারণ অর্থ যুগ-নির্ভর যুগ তদানীন্তন সমাজনির্ভর ও মানুষ সামাজিক জীব। অতএব বিভিন্ন যুগের ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা কাব্যে নিজস্ব ছাপ রেখে যাবেই। কিন্তু সময়ের বাধা অতিক্রম করে যেটুকু কাব্য বেঁচে থাকে তা তার অর্থবহ শব্দের জোরে, কোন মতবাদের জোরে নয়। মনে পড়ে কোন আধুনিক কবিতায় পড়েছিলাম : "কিছুই সহজ নয় আর।" অর্থাৎ পূর্বসূরীদের সহজীকরণে আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। এ বোধ হয় "ওরে মন সহজ হবি"র প্রতি অনুকম্পা। শ্রীযুক্ত আইয়ুব সহজ হবার কথা ভেবে দেখতে পারেন।

অবনীমোহন কুশারী
কলকাতা—১৯

গান্ধীজীর সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যাত্রা

শ্রীযুক্ত সুধীর ঘোষের গান্ধীজীর দূত অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়ছি। ভারতের রাজনীতি এবং গান্ধীজী সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাচ্ছে। গান্ধীজীর সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যাত্রার পশ্চাতপট কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। সোদপুর থেকে সরাসরি মাদ্রাজ যাত্রাকে উপলক্ষ করে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এন সি ঘোষকে তিনটি প্রধান রেলওয়ের চিফ এঞ্জিনিয়ারদের ডেকে গবেষণা করে শালিমার ইয়ার্ড হয়ে মাদ্রাজ যাবার লাইন বার করতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা এই মনে করে কৌতুক অনুভব করছি যে, সোদপুর থেকে নৈহাটি এবং ব্যান্ডেল তথা আসান-সোল এবং পরে খড়্গপুর হয়ে মাদ্রাজ যাবার ত রাস্তা ছিল তথাপি এত পরিশ্রম করে রাস্তা খুঁজতে হল কেন? হয়ত দূরত্ব কিছু বেশি পড়ত। ১৯৪২ সালে যখন দামোদরের বন্যায় বর্ধমানের পূর্বে রেললাইন ভেঙে গিয়েছিল তখন ই আই আর-এর অনেক ট্রেন খড়্গপুর ঘুরে আসানসোল হয়ে দিল্লি বা অন্যত্র যাওয়া-আসা করত।

অমরেন্দ্রকুমার সেন

'দিল্লী' বনাম 'দিল্লি'

'দিল্লীর ডায়েরী'তে (দেশ, ১-১০-৬৬) শ্রী সরকার 'দিল্লী' না লিখে 'দিল্লি' ব্যবহার করেছেন, কাগজের সূচীপত্রে "ল্লী" এবং শ্রী দাসগুপ্তের চিঠিতেও (ঐ কাগজেই) "ল্লী" ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দিতেও "ল্লী"ই লেখা হয়; যদিও কেউ কেউ, মাঝে মাঝে 'দেহল্লী' উচ্চারণ করেন। যতদূর মনে পড়ে 'রাজশেখর বসু "দিল্লি" লিখে-ছেন দু-এক জায়গায়।

অনেক দিন পূর্বে, ১৯২০ দশকে, "নিউ দিল্লী" নামটা বাংলায় ব্যবহার করা হত। কেন যেন "নিউ" শব্দটা কানে ভালো লাগে না; তাই দু-চারজন বন্ধু মিলে "নয়াদিল্লী" কথাটা তখনকার কালে চালু করেছিলাম আমরা। এখনো অনেকে "নয়া-দিল্লী"ই লিখে থাকেন। সেখানেও "ল্লী"ই ব্যবহার করা হত। প্রসংগত, হিন্দুস্থানী-দের "নয়ি দিল্লী" আর 'বিনয় সরকারের "নয়া বাংলা" থেকে "নয়া দিল্লী" কথাটার উদ্ভাবন।

নামটার শুদ্ধ বাংলা বানান ঠিক হওয়া

দরকার। রাজধানী শহর দিল্লী। বিকল্পে শুদ্ধ হলেও, বাংলা ভাষায় শহরটার নামে দু' রকম বানান ব্যবহার হওয়া শুধু নিরর্থক নয়, দৃষ্টিকটুও বটে।

এ নিয়ে আপনাদের কাগজে আলোচনা হলে সুখী হতাম।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়
করোলবাগ
নয়াদিল্লী।

বিশ্ববিজ্ঞান

৮ অক্টোবরের 'দেশে' 'মহাকাল' প্রসঙ্গে যে আলোচনা ('বিশ্ব বিজ্ঞান') প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যিই অনেককে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলবে।

আলোচ্য কাজিরেফের অনুমিতি সংক্ষেপে আলোচনা করে লেখক প্রশ্ন করেছেন "কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব যদি না থাকে তা হলে তার গতিবেগের প্রশ্ন ওঠে কি?"—এখানে শুধু মনে পড়ে আমাদেরই দেশে বহু যুগ আগে কণাদ ঋষি তাঁর বৈশেষিক দর্শন সূত্রে 'কাল'কে 'দ্রব্য' বলে গণ্য করেছেন। জর্মান পণ্ডিত মক্ষ মুলার বৈশেষিক দর্শন আলোচনায় 'কাল' প্রসঙ্গে বলেছেন: "The arguments in support of the substantiality of air and ether apply to time also......" ('The Six Systems of Indian Philosophy' —Max Muller-Longmans, Green and Co.).

বাণীপ্রসাদ
সিমলা-১।

চিত্রসমালোচনা প্রসঙ্গে

আমার বক্তব্য, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ৪৭ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত 'চিত্রপ্রদর্শনী' আলোচনাটি প্রসঙ্গে।

এই চিত্রপ্রদর্শনী সম্বন্ধে দুটি পত্রও পড়িলাম। প্রথম পত্রটিতে লীনাদেবী যে মন্তব্য ও যৌক্তিকতার অবতারণা করিয়াছেন তাহা অতীব হাস্যাস্পদ ও তাঁহার স্থূল বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয়। বস্তুত তিনি 'ফেলে দেওয়া জিনিসের' চিত্রপ্রদর্শনী হইতে যাহা মর্মোপলব্ধি করিয়াছেন তাহা স্বতঃই প্রতীয়মান। সুনীল-মাধব সেনের বিমূর্ত শিল্পে, দেশ পত্রিকার কলা সমালোচক যে অকস্থলের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নাকি লীনাদেবীর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য বিমূর্তশিল্পের সহিত রক্তমাংসের যোগ-সাজস বা রসসন্ধানে অকুস্থল স্থাপন বা অন্য কোনোভাবে শরীরের নিষিদ্ধ স্থান প্রদর্শন-এর যোগ চোখে পড়ে না। কিন্তু যোগাযোগ যে কোনো ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না বা হয় না একথা নিঃসন্দেহে সর্বৈব মিথ্যা। বিমূর্ত শিল্পের এই ব্যতিক্রমই ঘটিয়াছে সুনীলবাবুর চিত্রকলায়। লীনাদেবী যদি সত্যই চিত্রপ্রদর্শনী প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যে কিভাবে বিমূর্ত শিল্পের সহিত রক্তমাংসের যোগ-সাজস অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে অকস্থল (একটি ইঞ্চি পাঁচেকের ঝাঁঝরি) দেখিতে পাইলেন না—ইহা অতীব বিস্ময়। বস্তুত এই ঝাঁঝরি প্রসঙ্গে কলাসমালোচক যে ধোঁকাবাজির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে লীনাদেবীকেই ধোঁকা দিয়াছে ইহা একটি প্রমাণ। এবং ইহাই স্বাভাবিক, বহু লোকই এই ধোঁকাবাজির প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, সমালোচক বলিয়াছেন 'মেয়েটির ঐ রকম জায়গায় অনেক ঝাঁঝরি দেখে খুব কাছেই [illegible] গেছেন।' অনেকেই বলেছেন কথাটা ধোঁকা—ইহার সত্যতা লীনা দেবীর পত্রই প্রমাণিত করিয়াছে। লীনাদেবী অন্য বলিয়াছেন ইহা অশ্লীল, নিম্নশ্রেণীর চিত্র-সমালোচনা ইত্যাদি—কিন্তু তিনি অশ্লীল কাহাকে বলিয়া থাকেন—তিনি নিজে ইহা স্বীকার করিতে লজ্জা পান। সমালোচক বলিয়াছেন "শৃঙ্গার একটি রস; রস পর্যায়ে পড়ে আমাদের মতিভ্রম হয়নি। 'রতিসুখসারে' গানটি ভক্তিযুক্ত মনেই বাঙালী গেয়েছে। দ্য সাদ থেকে জুনেকে পরনোগ্রাফী বলিনি।" এক্ষেত্রে তাহার মতামত প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় পত্রের লেখিকা মনোশ্রী দেবীর বক্তব্য মোটামুটিভাবে পরিস্ফুট। শৃঙ্গার রসকে তিনি অশালীন বলেন না কারণ তিনি জানেন বর্তমানে এমন একটা গোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে "অনেকেই যেখানে শৃঙ্গার রস প্রকাশ দেখলেই, বুঝলেই অশ্লীলতা বলে চিৎকার করে উঠেন।" মনোশ্রী দেবী অবশ্য এ গোষ্ঠীতে আসেন না। কিন্তু তিনিও কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত। তাঁহার বক্তব্য—সবদিই মন্তব্যকে সুচারু রূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন। সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তিনি সীমারেখা লঙ্ঘন করিলেন কোথায়! শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উঠে না। সুনীলবাবুর 'Girl with a basket' চিত্রটির প্রকৃত ধোঁকাবাজির উল্লেখ করিয়া সমালোচক যে প্রকৃত রসিক-জনের বরেণ্য হইয়াছেন—ইহা সন্দেহাতীত। বর্তমান শতকে এই তুচ্ছ বস্তু লইয়া মাতামাতি করিবার কোনো অর্থ হয় না—ইহা নিছক পাগলামীরই পরিচয় দেয়।

শঙ্কর ঘোষ
কলিকাতা

শ্রীনিবাস
ও
শ্রী
মধুসূদন
দুটিতে
... আপনাকে
অভিনন্দন জানাচ্ছে
“ওরলন” থেকে তৈরী শ্রীনিবাসের
শাড়ীগুলি চাইবেন।
শ্রী

সাহিত্য সংবাদ

কবিতার সাপ্তাহিক, দৈনিক, [illegible]ঞ্জলী নিয়ে কিছু আলোড়ন [illegible] ঠাট্টা বিদ্রূপ হয়েছে। [illegible] একটি কথা অস্বীকার করার [illegible] নেই, বাংলা দেশে কবিতা রচনা ও [প্র]কাশের যে অভূতপূর্ব [illegible] এসেছে, [illegible] কোনো ভাষায় এর তুলনা পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র কবিতা সম্বল করে বা [illegible] নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের [illegible] অন্য কোনো প্রদেশে [illegible] আছে কিনা জানি না, পৃথিবীর [illegible] নেই। [illegible] উদাহরণ একমাত্র [illegible] থেকে প্রকাশিত [illegible] [illegible] একটি কবিতার ত্রৈমাসিক [illegible] ভাষায় কবিতার পত্রিকা [illegible] নেই।

[illegible] বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক [illegible] ২৫ বছর পেরিয়ে বন্ধ হয়েছে, [illegible] একেরেও ২৫ বছর পূর্ণ [illegible] ১২ বছর পূর্ণ হয়েছে, [illegible] উত্তর সূরীর বয়সও এক [illegible] একেবারেও বন্ধ না হয়ে সুশীল [illegible] মাসিক ধ্রুপদী ৭ বছর পেরিয়ে [illegible]।

[illegible] পূজার সময় শুধু কবিতার পত্রিকাই [illegible] হয়েছে অন্তত ১০টি। বাংলা দেশে [illegible] আবহাওয়ায় নিশ্চয়ই এমন কিছু [illegible] প্রকৃত প্রেরণা দেয়। [illegible] বছর যাদের একটি রচনাও চোখে পড়ে [illegible] পূজা সংখ্যাগুলিতে তাঁদের প্রচুর রচনা [illegible]মান। সুতরাং কবিতারও সৃষ্টির [illegible] না দেখা দেবেই। প্রায় সমস্ত পূজা [illegible]তেই কিছু কিছু কবিতা থাকে, আগে [illegible] পাদপূরণ হিসেবে অন্য রচনার [illegible] স্থান বলেই কবিতার [illegible] নাম পদ্য—এক সময় এরকম একটি [illegible] প্রচলিত ছিল)। এখন সম্মানিতভাবে [illegible]র জন্য আলাদা পাতা। তা ছাড়াও [illegible] কবিতার জন্যই আলাদা এতগুলি [illegible] পৃথিবীতে তুলনারহিত। এর কার্য-[illegible] সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকরা বা ঐতি-[illegible]কেরা গবেষণা করবেন; কিন্তু আপাতত [illegible]থা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, এই ঘটনা [illegible]দের সংস্কৃতির একটা বিচিত্র ধরনের [illegible]র পরিচয় দিচ্ছে।

[illegible]বার পূজায় প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা-গুলির মধ্যে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত **কবি ও কবিতা** বিশালায়তন ও দায়িত্বপূর্ণ, প্রবীণ থেকে নবীনতম কবিদের সমাহার, প্রখ্যাত অধ্যাপকদের লেখা ভারী প্রবন্ধ, বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পদসঞ্চার প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করেছেন। আধুনিক কথাটির এখানে ইংরেজী অর্থ। সুশীল রায়ের সম্পাদনায় '**ধ্রুপদী**' শারদ সংখ্যায় বাংলা অর্থে আধুনিক ও প্রথাসিদ্ধ কবিদের মিলন দেখা যায়। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত **কৃত্তিবাস** শুধু তরুণ ও আধুনিক-দেরই কবিতা সংগ্রহ, সাম্প্রতিক কবিতার রূপ বিষয়ক আলোচনা, কিছুটা ক্রোধ ও বিদ্রোহ-মূলক কবিতাও এর বৈশিষ্ট্য। আর একটি বিশেষ উল্লেখ করার মতো পত্রিকা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত **কবিতা পরিচয়**, এতে আছে আধুনিক কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং সেগুলি লেখেন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক ও সমালোচকবৃন্দ। এ ছাড়া বেরিয়েছে তরুণ সান্যাল ও প্রসূন বসু সম্পাদিত **সীমান্ত**, মৃণাল দত্ত ও আশিস সান্যাল সম্পাদিত **পুনশ্চ**।

আর কয়েকটি কবিতা পত্রিকা দেখলে বোঝা যায়, অতি তরুণ বা সদ্য লিখতে শুরু করেছেন এমন কয়েকজন কবি মিলে এক একটি কবিতা পত্রিকা বার করেছেন। এই পত্রিকাগুলির আয়তন কৃশ, মাত্র দু'তিন-জনেরই কবিতা সংকলন। বাংলা দেশে এখন ছাপার খরচ কম নয়, কাগজ দুর্লভ, সবচেয়ে দুর্লভ হচ্ছে টাকা। তবু যে এতবেশী কবিতার পত্রিকা ছাপা হচ্ছে, সে-জন্য এই সমস্ত যুবা কবিবৃন্দ কোনো না কোনো ভাবে শ্রদ্ধা পাবারই যোগ্য। কবিতার মান উঠছে না নামছে সে প্রশ্ন এখনই [illegible] নয়, অন্তত 'গেল' 'গেল' রব তোলার কোনোই কারণ নেই। এইসব অর্থ অন্য-ভাবে অপচয় না করে কেন যে এঁরা কবিতার পত্রিকা বার করছেন, তা কি সত্যিই বিস্ময়-কর নয়? তা ছাড়া, কবিতার আগে মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা, এখন নবদ্বীপ, বনগাঁ, চন্দন-নগর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ত্রিপুরা, শিলং থেকে প্রকাশিত কবিতার পত্রিকাও আমাদের চোখে পড়েছে। এবং সব পত্রিকায় একই কবির দল নয়, প্রত্যেক কাগজে আলাদা নতুন নামের কবি, ছোট ছোট শহরে এঁরা আলাদাভাবে দলবদ্ধ। চীনের রেড-গার্ডদের মতন বাংলা দেশের ছোট বড় সব শহরে শহরে জেগে উঠছে গোষ্ঠীবদ্ধ কবির দল, অসংখ্য। একমাত্র শান্তিনিকেতনেই এখন কবিতা বিষয়ে কোনো উৎসাহের প্রকাশ নেই। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের হিসেব অনুযায়ী গত বছরে বাংলা দেশের তরুণ কবির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার। এর মধ্যে নিশ্চিত আরও বেড়েছে। কথাটা আমি বেশ গুরুত্ব দিয়েই বলছি, কবিদের এই বিপুল সংখ্যার প্রতি দেশের শাসকদল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী সমাজ সকলেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই ঘটনা সম্পর্কে উদাসীন থাকলে দেশের একটি দারুণ ঘটনাকেই অগ্রাহ্য করা হবে। এত লোক একসঙ্গে কবিতা লিখছে, কি ব্যাপার?

পূজার প্রকাশিত আরও কয়েকটি কবিতা পত্রিকা **কাণ্ডদর্শী** এবং **অন্তর; নান্দীমুখ** নামে দুটি—একটি প্রকাশিত হয়েছে দক্ষিণ কলকাতা থেকে, অন্যটি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে। ঐ ত্রিপুরারই কৈলাসহর থেকে আরেকটি, **জোনাকি**; আসামের শিলচর থেকেও বাংলায় দুটি কবিতা পত্রিকা অতন্দ্র এবং **শতাব্দী**। কোচবিহার থেকে প্রকাশিত **ত্রিবৃত্ত** বা জলপাইগুড়ির **উত্তরের হাওয়া** উল্লেখিত কবিতা-প্রধান পত্রিকা। এ ছাড়া আরও অনেক পত্রিকা হয়তো আমাদের চোখে পড়েনি। সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে মৃণাল দেব সম্পাদিত **কবিতা-সাপ্তাহিকী** এখনো টিঁকে আছে, দৈনিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ **দৈনিক কবিতা**র একটি বিশেষ সংখ্যা আবার প্রকাশিত হবে শোনা যাচ্ছে। এই হোল কবিতা পত্রিকা সংবাদ।

পত্রিকাগুলির মধ্যে ভিয়েৎনাম বিষয়ে অনেক কবিতা চোখে পড়ে, প্রতিষ্ঠিত বা অতিতরুণ অনেকেই লিখেছেন। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় যেসব কবি বলেছিলেন যুদ্ধ নিয়ে কবিতা লেখা উচিত নয়, তাঁরা অনেকেই ভিয়েৎনাম নিয়ে লিখেছেন। অপর-পক্ষে, যাঁরা সে-সময় যুদ্ধ নিয়ে লিখে-ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ভিয়েৎনাম নিয়ে লেখেননি। আমাদের দেশের খাদ্যাভাব বা রাজনৈতিক সংকট নিয়ে প্রায় কেউই লেখেননি বলা যায়, প্রেমের কবিতার চেয়ে প্রেমকে অগ্রাহ্য করার কবিতা বেশী। জনৈক কবির বয়েস ১৫ বছর, তাঁর কবিতায় জানা গেল নারীর প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি যাঁদের চোখে পড়বে না, তাঁদের অন্তত এইটুকু জানিয়ে রাখা যায় যে, ওখানকার কবিতাগুলি ভালো কি খারাপ তা ব্যক্তিবিশেষের রুচি-নির্ভর, কিন্তু ঐসব রচনাতে প্রায় একেবারেই ব্যাকরণ ভুল বা 'ছন্দ ভুল' নেই।

এত কবিতা রচিত হলেও বাংলা কবিতার আঙ্গিক বা দৃষ্টিক্ষেপের কোনো বিশেষ পরিবর্তন এ বছরই এসেছে, তা ঠিক করে বলা যায় না। সে-রকম কোনো চমকপ্রদ বা বিমোহিত হবার মতন নবীন কবির দেখা এখনো পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠিত বা চেনা

কবিরা নিজেদের বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা বিপ্লব দেখান নি। তবু এই ভিড়ের মধ্যে কিছুটা অল্পচেনা একজন কবিকে নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া গেল। সুধেন্দু মল্লিকের রচনা আমরা আগে খুবই কম পড়েছি, এবার তিনি এক সঙ্গে অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন, তাঁর এই কবিতাগুলি একেবারে আলাদা জাতের, স্পষ্ট, টাটকা সুগন্ধময়, তীব্র রকমের ব্যর্থপ্রেমের কবিতা, যে তীব্রতা ব্যর্থ-প্রেমের বেদনাকেও ধার্মিকতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাঁর একটি কবিতার আংশিক নিদর্শন:

তুমি তো আমার মা নও
একবার লুটিয়ে পড়লেই জড়িয়ে ধরবে!
আমি ফণিমনসার গাছ নই
আমাকে এড়িয়ে যেও না;
আমি দুভাগ হয়ে যাওয়া
পুরোনো বাড়ি নই
আমাকে ফেলে যেও না!
শুধু মস্ত আকাশের নিচে আমার সেই
ছেলেবেলা
অভিমান, একটা ধূসর পাখি
গাছের নিচে বসে আমার দিকে তাকিয়ে
থাক

ক'জন তরুণ কবির সাম্প্রতিক রচনা

নির্বাসিত কথামালা। শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য। এক টাকা।

মগ্ন বেলাভূমি। মৃণাল বসুচৌধুরী। সাহিত্য। দু টাকা।

মৃত শিশুদের জন্য টফি। অমিতাভ দাশগুপ্ত। দু টাকা।

আজ বসন্ত। আশিস সান্যাল। সেকাল একাল। ৫ টেমার লেন, কলকাতা ৯। তিন টাকা।

লীলা। অলোকেন্দুশেখর পত্রী। পরিবেশক: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দু টাকা।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা একাধারে সরল এবং জটিল। যেখানে জটিল সেখানে তিনি অতিরিক্ত সপ্রতিভ। ফলে জটিলতা [illegible] না ভাবায়, তার বেশী অবাক করে। [illegible]রিয়া আর্সেনিক গিলে এই অন্তিম ভাবনা/সাঁকো বিষে বড্ডো বুক জ্বলে... [illegible] নার্স হাসপাতাল/নার্সদের স্তন নেই, দেওয়ালের মত উরু ঢাকা/গম্বুজে মার্কিন [illegible]নে... যুবোদের সমর্পিত প্রেম/বা বহতো [illegible] রক্ত ধৌত অসহ নির্ঝরে। গীতিকবিতায় অমিতাভ বরং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। 'দোলনা পুলে', 'গৌরীহাটে একাকী [illegible] না 'বুড়ী ছুঁয়ে ফিরে আসা' তিনটি কবিতা ইত্যাদি কবিতার সাক্ষ্য মেনে নিয়ে বলা যায়, অমিতাভ বরং সহজ করে গভীর কথা লিখলে। তাতেই তাঁর হাত খোলে।

আশিস সান্যাল ও মৃণাল বসুচৌধুরী কবিতায় কোনো ঝুঁকি নিতে চান নি। 'আজ বসন্ত' ও 'মগ্ন বেলাভূমি' পড়ে তাই মনে হয়। তবে দুজনেই ছন্দের মিলে বিশ্বাসী, গীতিময়তা দুজনেরই কবিতার প্রধানতম ধর্ম। মৃণাল অবশ্য বয়সে তরুণতর, এবং 'মগ্নবেলাভূমিতে' তিনি বেশ কয়েকটি সার্থক গীতিকবিতা উপহার দিতে পেরেছেন। 'আজ বসন্ত' নাম-কবিতাটি দৃশ্য কাব্যনাটিকা। সর্বাংশে সফল না হলেও পড়তে মন্দ লাগে না।

অলোকেন্দুশেখর পত্রীর 'কবিতা' সম্বন্ধে কোনো কিছু বলার সময় আসে নি। তবে তাঁর স্ব-অঙ্কিত প্রচ্ছদ চিত্রটি চমৎকার।

'নির্বাসিত কথামালা' শান্তি লাহিড়ীর দীর্ঘ একটি কবিতা। সুন্দর তুলোট কাগজে ছাপা বইটি হাতে নিয়েই কেমন ভালো লাগে। নতুন জামার মতো গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার বেশী আর যেন এগুনো যায় না। শান্তি লাহিড়ীর কবিতার দু-একটি পংক্তি বিচ্ছিন্নভাবে ভালো লাগে না এমন নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন পারম্পর্যবিহীন, অসংলগ্ন মনে হয়। হয়তো তাঁর বাক্যবন্ধের রীতিই এর জন্য দায়ী। গদ্যের মতো, অথচ পুরো গদ্য নয়, যেমন— 'রাজনীতি নিয়ে আমরা পাড়ায় অপ্রাপ্ত-বয়স্কেরা/শেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত খসড়া ভুলে ঘুড়ির লাটাই—মাঠে চাল/আজ এই অমাবস্যা মঘা কিংবা অন্য কোন নিষিদ্ধ তিথিতে যদি ফের রাজনীতি নিয়ে বসি, যদি ফের সন্ধ্যারতি ঘুড়ির লাটাই/দেবতা কখনো তুমি, অথবা দেবতা তুমি তাদের দখলে'— কাদের দখলে। ব্যাখ্যা নেই, অনুমান করাও শক্ত।

শারদ সাহিত্য

জনসেবক। সম্পাদক : শ্রীঅতুল্য ঘোষ। ১০৫/৭এ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৩·০০।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিলীপকুমার রায়, লীলা মজুমদার, ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মৃত্যুঞ্জয় মাইতির লেখা পাঁচটি উপন্যাস, জরাসন্ধের একটি বড় গল্প; বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের ন'টি ছোট গল্প একখানি সুপুষ্ট বিশেষ সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আলোচ্য পত্রিকার এবারের শারদীয়া সংখ্যাখানি আরো আকর্ষণীয় হয়েছে ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, সৈয়দ মুজতবা আলী, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, রেজাউল করিম প্রভৃতির প্রবন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন বসু ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের লেখা দুটি নাটক, দিলীপকুমার রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, দিনেশ দাস, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী প্রভৃতির কবিতার সমাবেশে। এ ছাড়াও রম্য রচনায় আছেন প্রমথনাথ বিশী ও কুমারেশ ঘোষ।

যষ্টিমধু। সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ৬৫/এ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

অভিনবত্বের দিক থেকে অত্যন্ত উপভোগ্য শারদীয় প্রকাশন হয়েছে আলোচ্য সংখ্যাটি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতে শুধু সরস নাটিকার সমাবেশ যার লেখকদের মধ্যে আছেন বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী, মন্মথ রায়, অখিল নিয়োগী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী, কুমারেশ ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টা। ওমিও, অ-গুপ্ত ও কাজীর কার্টুন সংখ্যাখানির সৌরভ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। নাটিকাগুলিতে যেমন আছে হাল্কা মেজাজে ভারি কথা, তেমনি নিছক আমোদ লাভের উপকরণ। এতে পুনর্মুদ্রিত 'অম্বিকা গুপ্তের 'কাদির

আমলের 'ছোট বৌ' সংখ্যাখানির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

শারদীয় পারাবত। সম্পাদক ঃ আনন্দ বাগচী। সহসম্পাদক ঃ অবনী নাগ। কার্যালয় ঃ প্রসন্ন ব্যানার্জি রোড, বাঁকুড়া। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য শারদ সংখ্যাটি রচনায় ও সম্পাদনায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখক-লেখিকা যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, অশোক বিজয় রাহা, সুশীল রায়, লীলা মজুমদার, হিমানীশ গোস্বামী, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, সুকৃতি বকসী, জয়ন্তী সেন, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শতদল গোস্বামী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নীললোহিত, গোপাল ভৌমিক, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অপর্ণা চক্রবর্তী, অবনী নাগ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অবিনাশ রায় ও দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি। দুটি বড় গল্প ও একটি উপন্যাস এই শারদ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ।

স্বরান্তর। সম্পাদক ঃ অমল রায়চৌধুরী। ২৯, নয়াপট্টি রোড, কলিকাতা-২৮। মূল্য ২·০০।

শুধু ছোট গল্পসম্ভারে প্রকাশিত পত্রিকা বলতে একমাত্র স্বরান্তর-এরই নাম করতে হয়। আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাখানিকে একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের সংকলন বলে অভিহিত করা যায়। লেখকদের মধ্যে আছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের অনেকেই। সংখ্যাখানি গল্পরসিকদের খুশী করবে।

মহাদিগন্ত। সম্পাদক ঃ সমীর আচার্য ও আলোক মৈত্র। ১৪, পাম্পা হাউস রোড, কলিকাতা-৩৯। মূল্য ১·৫০।

সম্প্রতি প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'মহাদিগন্ত' সাহিত্য ও শিল্পরসিকদের কাছে স্বাগত হবার যোগ্য। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প এবং সমালোচনা—প্রতি বিভাগেরই রচনা সুনির্বাচিত এবং মন দিয়ে পড়বার মত। আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যায় লেখকদের মধ্যে আছেন সরোজ আচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিষ্ণু দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রণব চক্রবর্তী, নির্মল মৈত্র, দিব্যেন্দু পালিত, বাণী রায়, প্রাণতোষ ঘটক, গুরুদাস ভট্টাচার্য, কুমারজ্যোতি নাথ প্রভৃতি।

প্রাপ্তি স্বীকার

মহর্ষি পরাশর বর্ণিত পঞ্চধা বিংশোত্তরী ও দ্বিধা অষ্টোত্তরী দশা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ কৌশল। শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায়। সেকপুরা, পোঃ ও জেলা—মেদিনীপুর। মূল্য ৩·৩৭।

মাটির মানুষ লালবাহাদুর। পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা—১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·০০।

উদার মুহূর্ত। জন কেনেথ গলব্রেথ। অনুবাদ ঃ ভূদেব ভট্টাচার্য। ইউরেকা পাবলিশার্স—৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য ৪·০০।

ঠাকুরবাড়ির কথা। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ—৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য ১২·০০।

চক্কুদোলা। পুশকিন, ডস্টয়ভস্কি, চেকভ, টলস্টয়। অনুবাদ ঃ গোলকেন্দু ঘোষ। অগ্রণী প্রকাশনী—১এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩·০০।

কাঞ্চনের দেশে। রজমাধব ভট্টাচার্য। সিগনেট বুকশপ—১২ বঙ্কিম চাটুর্জ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১০·০০।

Folklore Library—by Dr. Piyus kanti Mahapatra. Indian Publications—3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. 6.50.

স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও বাণী। ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য। অশোক প্রকাশন—এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

আটটি আপেল। গৌরী চৌধুরী। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী—৮০ আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ১·৫০।

শতদল। শ্রীনিতাইচন্দ্র সরকার। স্বপন কুঠির—স্টুডিও লেন, হালতু, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·২৫।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা রহস্য। ডাঃ নিমচাঁদ ভদ্র। বিশ্ব ধর্ম সেবা সঙ্ঘ—ভবানীপুর চর, মিলনগড়, হুগলী। মূল্য ২·৫০।
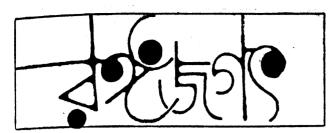
ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সেস

ফিল্ম প্রোডাকশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি। কী উপায়ে এই প্রস্তাবিত ফাণ্ড তৈরি করা যায় সে-বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরের নিকট পেশ করেছেন।

এই ফাণ্ডের প্রশাসনিক পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়োগ করবেন জানা গেল। সভাপতি ছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থ এবং বেতার ও তথ্য দপ্তরের দুজন প্রতিনিধি, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি, চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি আইন ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিরা পরিষদে থাকবেন। দুই বছরের জন্য সভাপতি ও সভ্যরা নিযুক্ত থাকতে পারেন।

প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আমোদ-করের একটা অংশ নিয়ে ফাণ্ড গঠন করা হবে। তা বাদে, প্রশাসনিক পরিষদ অন্য উপায়ের কথাও ভাবেন। ডেভেলপমেণ্ট সেস তোলা হবে টিকিট বিক্রয়ের মাধ্যমে। প্রতি আসনের (এক টাকার উপরের টিকিটের আসন) উপর পাঁচ পয়সা সেস ধরা হবে। আমোদ-করের সঙ্গেই তা আদায় করা হবে।

কোন্ শ্রেণীর প্রযোজকদের অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে সেটাই আসল প্রশ্ন। যাঁদের ছবি ফ্লপ করবে তাঁদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে। কারণ এই সাহায্যের ভিতর দিয়ে অক্ষমতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে-ছবি ব্যবসায়িক সাফল্যের অধিকারী সেই সব ছবির প্রযোজকদের অর্থ সাহায্য দেওয়ারও কোন অর্থ হয় না। মোট বিক্রয়ের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্যের একটি মধ্যপন্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সাহায্যের পরিমাণ আবগারী শুল্কের (মোট প্রিণ্টের উপর) কম হবে না, এবং কোন একটি ছবির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহায্যের পরিমাণ পাঁচ লক্ষের উপর হবে না। আঞ্চলিক চিত্রের ক্ষেত্রে (যেখানে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রসার কম) একলক্ষ টাকা বাড়ানো যেতে পারে। তবে কোন বিদেশী চিত্রের জন্য এই সাহায্য নয়।

চিত্র-সমালোচনা

শংখবেলা

বাংলা ছবির স্টার সিস্টেম বুঝি আবার সরগরম হয়ে উঠল। "শংখবেলা"য় (অনুরাধা ফিল্মস) উত্তম-মাধবী রোমাণ্টিক জোড় দেখে দর্শকরা পুলকিত। তাঁরা যেন এই নতুন 'টিম'-এর অপেক্ষায়ই ছিলেন। সেদিক থেকে "শংখবেলা"র জনপ্রিয়তা বেড়েছে, বাড়বে।

ছবির গল্পবস্তুও স্টার সিস্টেম-এর অনুকূলে। অর্থাৎ গল্প যেন স্টারের জন্য, গল্পের জন্য স্টার নয়। কাহিনীর (আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত) নায়ক-নায়িকা পরস্পরের কাছে এসেছে, একে অপরকে ভালবেসেছে। কে প্রথম কথা দিয়েছে, কে আগে কাকে ডেকেছে—সুন্দর রোমাণ্টিক পরিবেশে নৌকাবিহারে প্রণয়ী-যুগল পরস্পরের কাছে গানের মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নের জবাব চেয়েছে। বলে রাখি, এই প্রণয়-মুহূর্ত দর্শকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, মন টানে। এই দৃশ্যে অগ্রগামী পরিচালকগোষ্ঠী প্রেম সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রক্ত-মাংসের উত্তাপে এই মুহূর্তটিকে বাস্তব করে তোলার সাহসও দেখিয়েছেন।

বিয়ের পরে প্রণয়ী-যুগলের প্রেম মরে যায়নি। একে অপরের মন ছুঁতে, ধরতে, বুঝতে পারেনি। কিছুকালের জন্য। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে নায়কের উচ্চাশা। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে যে জট তৈরি হতে পারত, ছবিতে তা নেই। উচ্চাকাংক্ষার একটি মাত্র উপসর্গ, যা অত্যধিক মদ্যপান, পরিচালক বেছে নিয়েছেন এবং [illegible] নায়ক-নায়িকার

প্রসাদ প্রোডাকশন্স-এর (মাদ্রাজ) 'দাদী মা' চিত্রে বীণা রায়

"বিবর"-এর চিত্রনাট্য সমাপ্ত, ছবির শ্যুটিং শুরু হতে বিলম্ব নেই; স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনারত (বাঁদিক থেকে) ছবির প্রযোজক শ্যামল মিত্র, নায়ক উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সহকারী পরিচালক রঞ্জন মজুমদার এবং পরিচালক-চিত্রনাট্যকার জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। প্রশ্ন এই, ড্রিংক করা মানেই কি মাতাল হওয়া? আর শুধু পানাসিক্ত কি আধুনিক বিবাহিত জীবন ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে?

নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন ঘটেছে এক ডাক্তারের চেষ্টায়। নায়িকার প্রতি ডাক্তারের অনুরাগ প্রথম পরিচয়ের পর প্রকাশ পেয়েছে। যদিও প্রথমটায় ডাক্তারকে 'লেডি কিলার' ভেবে নিলে খুব দোষ হয় না। তার সহকারীরও যেন অনেকটা এই রোগ। অন্যান্য তরুণ ডাক্তারদেরও দেখা গেল, হাসপাতালের কাজ সম্পর্কে তাদের যত না আগ্রহ, তার চেয়ে বেশী উৎসাহ প্রধান ডাক্তারের নারী-ঘটিত ব্যাপারে। কৌতুক-উপকরণ হিসাবেও এই পরিস্থিতিগুলি খুব সুখদায়ক হয়নি। আগের প্রসঙ্গে আসি, নায়িকার প্রতি ডাক্তারের আকর্ষণ নিয়ে পরিচালক ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের অবতারণা করেননি। বরঞ্চ প্রত্যাশিত উপায়ে ডাক্তারকে মহৎ করে নিয়ে নায়কনায়িকার মিলন সম্ভব করেছেন।

অবশ্য অনেকের কাছে এই সহজ নাটকীয়তার আবেদনও আছে। এবং তা আরও সুখভোগ্য হতে পারত, যদি ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাক-বিপত্তি দেখা না যেত। যার যে-কথা জানবার নয়, সে তাই জানাচ্ছে। তাছাড়া, হাসপাতালে ভগ্নীপতির পক্ষে তার শ্যালিকার (নায়িকা) জীবনের কাহিনী বলাটাও অবান্তর আলাপ। (যার সূত্রে একটি ফ্ল্যাশব্যাক)।

প্রয়োগের ছোটখাটো এই সব ত্রুটি, এবং কাহিনীর দুর্বলতা সত্ত্বেও বক্সর, "শংখবেলা"-র বক্স-অফিস সাফল্য সুনিশ্চিত। অগ্রগামীগোষ্ঠী বড় অর্ট সৃষ্টির কোন ভণিতা রাখেননি ছবিতে। বরঞ্চ বেশ কিছুমাত্রায় আপসের মধ্য দিয়েই দর্শককে আমোদ দিতে চেয়েছেন। সে আমোদ দর্শকরা পাবেন। যদিও দুয়েকটি দৃশ্যে পরিচালকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় মিলেছে। যেমন ব্রেকফাস্ট-এর সময় ঘড়ির কাঁটা একটায় থেমে থাকা (নায়ক-

কার দাম্পত্য-জীবনের [illegible] ক), কিংবা বড় গাড়ির সঙ্গে পাল্লা নায়কের মোটর চালানো ও [illegible] -এর নেশা (যা তার উচ্চাশার ব্যঞ্জনা)।
বির প্রধানতম আকর্ষণ, নিঃসন্দেহে, কুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়ের নয়। উত্তমকুমার রোমান্টিক নায়কোচিত নয় ছাড়াও সংক্ষুব্ধ যন্ত্রণা ও অহংকারের ব্যক্তি অদ্ভুত ফুটিয়েছেন। চরিত্রটির গামি তাঁর অভিনয়ে একটু বেশী প্রকাশ য়েছে মনে হতে পারে, হয়ত চিত্রনাট্যের মানতে গিয়েই তাঁকে সব করতে হ্ছে। অবশ্য তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্ব সব খুঁতই রাখে।

ধবী মুখোপাধ্যায়কে রোমান্টিক কার এক নতুন ইমেজ-এ দেখতে পেয়ে করা উৎফুল্ল হবেন। শিল্পী এই দায়িত্ব কার পালন করেছেন। নাটকীয় মুহূর্তেও তাঁর অভিনয় সংবেদনশীল।
সন্ত চৌধুরীর ডাক্তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ র চরিত্র-চিত্রণের জন্য তাঁর কারীরূপে মৃণাল মুখোপাধ্যায় দর্শকের ংসা পাবেন। তরুণকুমার কৌতুক সৃষ্টি ছেন।
সুধীন দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনা ই কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁর এফেক্ট মিউজিক ণ্ডর মধ্যে রসবোধের প্রমাণ দিয়েছে। নর সুরও চিত্তাকর্ষক। "কে প্রথম কাছে ছি" (মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকার) জন- য় হবে। আরতি মুখোপাধ্যায় একটি সংগীত "জানিনে, জানিনে কিছুতে কেন মন লাগে না" নিখুঁত গেয়ে অবাক দিয়েছেন। গানটির প্রয়োগ কিন্তু ংসনীয় নয়।
দীনেন গুপ্তের ফটোগ্রাফি সুন্দর। শব্দ- ণ আরও ভাল হতে পারত।

রপুরুষ

বিত্তবান শংকর চৌধুরীর হাতে কখন প্রথমা স্ত্রীর ছবিটি এসে পড়বে এবং জানতে পারবে যে বেয়ারা সত্য তারই ন, "উত্তরপুরুষ"-এর (এম কে জি) করা বেশ কিছুক্ষণ এই অপেক্ষাতেই কন। শংকর চৌধুরী আগেই তার ডাক্তার- দের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানতে ত। কিন্তু মরবার আগে ডাক্তারকে হনীকার (অজিত গাঙ্গুলী) এই কথা যেতে দেননি। ফলে শেষরক্ষা কী-করে তা নিয়ে দর্শকের কৌতূহল স্বভাবতই ড়ুক্ষ। এবং গল্পকার এবং পরিচালক একের ছদ্মনামে) দর্শককে ক্লাইম্যাক্স-এ অসার ব্যাপারে যে টালবাহানা কেন (একটি করুণ মুহূর্ত সাজাতে য়) তাতে স্বল্পতুষ্ট নাট্যামোদী দর্শকের ধ-অস্থিরতা নিশ্চয়ই বাড়বে। যুক্তি- রের তোলে যদিও অবাস্তবের পাল্লা নক ভারী।

"এন্টনি ফিরিঙ্গি" (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে তনুজা
—ফটো-দেশ

অর্থাৎ বাবার কাছে ছেলের খাস বেয়ারার চাকুরি, নিজের বাড়িতে অপমান ও লাঞ্ছনা- ভোগ (এক্ষেত্রে ভিলেনের ভূমিকা নিয়েছে অপর এক বেয়ারা), গল্পের নায়ক শংকর চৌধুরীর প্রথম প্রেম, গোপন বিবাহ এবং তার পিতার নিষ্ঠুরতার ফলে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, শংকরের দ্বিতীয়া স্ত্রীর হৃদয় পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে নাটকীয় চমক যত বেশী, জীবনের ছায়া সে-পরিমাণে অদৃশ্য। একটি ত্রিকোণ উপাখ্যানে (শংকর ও তার প্রথমা স্ত্রী এবং ডাক্তারবন্ধুকে ঘিরে) অবশ্য জটিলতার আভাস ছিল। চিত্রনাট্য তার পাশ কাটিয়ে চিরাচরিত ধারায় ও উপকরণে দর্শকদের রূপকথার রাজ্যে নিয়ে গেছে। সিনেমার রূপকাহিনীতে যাদের অরুচি নেই, ছবিটি তাদের ভালই লাগবে। এবং তাৎক্ষণিক উপভোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখেই চিত্রকর ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সেদিক থেকে তাঁদের প্রয়াস সফল। চিত্রপরি- চালনায় একটি সংযম প্রশংসনীয়। বাড়ির মোটর-ড্রাইভার তথা মালিকের বাল্যবন্ধুর শিক্ষিতা মেয়ে গৌরীর সঙ্গে সত্য বেয়ারার (যে কাহিনীর উত্তরপুরুষ) সম্ভাব্য প্রেমের শুধু ইঙ্গিতমাত্রই দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সিনেমাসুলভ প্রেমের ঘটনা দেখাবার প্রলোভন পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার (সুনীল বসু মল্লিক) জয় করেছেন।

এই মেলোড্রামায় জীবনবোধের স্পর্শ নিয়ে এসেছেন একজন অভিনেতা। তিনি বসন্ত চৌধুরী। তাঁর অসাধারণ চরিত্রচিত্রণে

"মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" (পরিচালনা : দীপক গুপ্ত) ছবিতে নাম-ভূমিকায় শিল্পী দিলীপ রায় ও বুবু গঙ্গোপাধ্যায়

পুরীতে নাট্যোৎসব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পুরীর সমুদ্রতীরে সম্প্রতি পাঁচদিন-ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। উদ্যোক্তা পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিউজ্ঞা সম্মিলনী উপলক্ষে তাঁরা এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

২৮শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর। পাঁচ দিনে মোট পাঁচটি নাটকের অভিনয় হল। রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" আর "তাসের দেশ" ছিল; তার সঙ্গে ছিল একালে-লেখা তিনটি নাটক। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় 'তাসের দেশ'-এর কথা। একে তো জ্যোৎস্না-লোকিত নিশীথে সমুদ্রতীরে, তরঙ্গ-গর্জনের পটভূমিকায়, অভিনীত হওয়ায় 'তাসের দেশ'-এর পরিমণ্ডল এমনিতেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার উপরে অভিনয়, নৃত্য, মঞ্চ-বিন্যাস আর পরিচ্ছদ-পরিকল্পনাও ছিল নিখুঁত। বিশেষ করে সওদাগর-পুত্র, গোলাম, রানী আর দহলা-পণ্ডিতের অভিনয় সেদিন সকলেরই প্রশংসা পেয়েছে।

অন্যান্য নাটকের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। সব মিলিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরের রাত্রিগুলি যে খুবই মনোরম হয়ে উঠেছিল, অতে সন্দেহ নেই।

ইন্দোনেশীয় ব্যালে দলের "রামায়ণ"

ইন্দোনেশীয় ব্যালে দলের 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য কলকাতার রসিকজনকে এক নতুন অভিজ্ঞতায় শরিক করেছে সন্দেহ নেই। ইন্দোনেশীয়ার শিল্পীদের নৃত্যের গতি মন্থর। কিন্তু এঁদের পদক্ষেপ ও অঙ্গ-ভঙ্গির কমনীয়তা আকর্ষক। রামায়ণের আখ্যান-বিন্যাসটিও ছিল সরল। যান্ত্রিক কলাকৌশলের আড়ম্বর নেই, আলোকপাত পরিমিত। সংগীতের ব্যবহারও রসসিদ্ধ; ঢোল ও ঘণ্টাধ্বনি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। নেপথ্য থেকে কণ্ঠসংগীতের যে-সুর ভেসে এসেছিল তা অবশ্য কিছুটা একঘেয়ে।

রাম, সীতা, রাবণ ও মহাবীরের ভূমিকায় শিল্পীদের অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করেছে। বিশেষ আকৃষ্ট করেছেন মহাবীর চরিত্রের শিল্পী।

নৃত্যনাট্য পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দর-ভাবে পালন করেছেন শ্রীপাকু আলম, শ্রীসূর্য দানিন্দ্র এবং শ্রীপ্রজোতালোজোন।

ইন্দোনেশীয় দল দিল্লিতে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। তারপর কলকাতায়। রবীন্দ্র-সদনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার পুতুল-নাচ

অস্ট্রেলিয়ার মারিওনেট থিয়েটার কলকাতায় দুদিন পুতুল নাচ দেখান। বিদেশের পুতুল-নটনটীরা এ দেশের শিশুদেরকাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বয়স্কদের কৌতূহলও কম ছিল না। নতুন আঙ্গিকের পুতুলনাচ সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। রবীন্দ্র-সদনের মঞ্চে প্রথম পর্যায়ে দেখানো হল দুটি নাটকের কিছু নির্বাচিত অংশ, গানের সঙ্গে। তারপর প্রদর্শিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাম : 'লিটল ফেলা বিনডি'। পুতুলদের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য সুতোর ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। কিন্তু 'ইলিউশন' সৃষ্টির ব্যাপারে পরিচালক পিটার স্ক্রিভেন অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে "এণ্টনী কবিয়াল"

বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা নান্দিক এবার কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে প্রতি বৃহস্পতিবার, শনিবার

দীপক পিকচার্স-এর "ভক্তের ভগবান" (পরিচালনা : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে হরিধন মুখোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মন

ও রবিবার এবং ছুটির দিন "এণ্টনী কবিয়াল" নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য নাটকটি রচনা করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন অনিল বাগচী।

এণ্টনীর ও ভোলাময়রার রূপ দিচ্ছেন যথাক্রমে সবিতাব্রত দত্ত ও জহর গাঙ্গুলী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, কালীপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, সমীরকুমার, সমরকুমার, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ উপাধ্যায়, পরেশ দাস, আশু মুখোপাধ্যায়, অমিয় কর, নিশীথ চৌধুরী, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, সীতা মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, [illegible] ঘোষাল ও কল্যাণী ঘোষ। সৌদামিনী রূপে কেতকী দত্ত।

[illegible] ২৬শে অক্টোবর এই সঙ্গীত বহুল [illegible] উদ্বোধন হয়েছে।

ছবির পর ছবি

প্রমথনাথ বিশীর কাহিনী অবলম্বনে শ্যাডো প্রোডাকশন-এর প্রথম ছবি "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" এই মাসেই মুক্তি পাচ্ছে। অজিত লাহিড়ী পরিচালিত জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ছবিটির ভূমিকালিপিতে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, কমল মিত্র, গীতালী রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ভারতী রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য মৃণাল সেনের রচনা। সংগীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন।

বাসন্তী দেবী রচিত "ফিরে চল" [illegible]। [illegible] চিত্রনাট্য [illegible] ছবিটি পরিচালনা [illegible] করেছেন অভিনেতা পরিচালক অজয়কুমার। [illegible] সুরারোপিত এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন সবিতা বসু, অজয়কুমার, [illegible] মিত্র, তরুণকুমার, জহর রায়, [illegible] দাস, শীলা পাল ও অশোক মিত্র। কাহিনী বাসন্তী দেবীর।

এম বি প্রোডাকশনস-এর "সেতুবন্ধ"-র কয়েকটি গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে। শ্যামল মিত্রর সংগীত পরিচালনায় ছবির গানগুলি গেয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, নীতা সেন, সীমা মিত্র ও সুরকার স্বয়ং। অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায় ও নবাগতা শুভ্রা অধিকারী ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। সুশীল ঘোষ চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক।

অরণ্যদেব ★ লী ফক

দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে গুহায় ফিরে এলেন অরণ্যদেব ----

আগামী সপ্তাহে: রাজা (৩)

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে অন্ধ্র প্রদেশে গণ-আন্দোলন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। শ্রীঅমৃত রাও বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবিতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এরই সমর্থনে অন্ধ্রে গণ-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং রাজ্যের কয়েক স্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন ক্রমশ হিংসাত্মক পন্থা অনুসরণ করে ট্রেন পুড়িয়ে, স্টেশন আক্রমণ করে, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতির ওপর চড়াও হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তার ফলে পুলিসের গুলিতে নবেম্বর মাসের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং বহু লোক আহত হয়। পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন কনসরটিয়ামের রিপোর্ট এখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীন। তা ছাড়া দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে সরকার এখনও কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। এই অবস্থায় শ্রীঅমৃত রাও অনশন ত্যাগ করলেও আন্দোলনের গতি এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে অন্ধ্রে সেনাদলকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশী সংবাদ

৩১ **অক্টোবর**—আজ রাত ১২টার সময় পুরনো পাঞ্জাব ভেঙে দু'টি রাজ্যের সৃষ্টি হলো। নাম—পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন জ্ঞানী গুরমুখ সিং মুসাফির এবং হরিয়ানার প্রধানমন্ত্রী হলেন ভগৎ দয়াল শর্মা।

জনসাধারণের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিযুক্ত কমিশনের শ্রী আর এল মেহতার রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, জনসাধারণের অভিযোগগুলির সুরাহার পক্ষে বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। কয়েকটি জন্মগত অক্ষমতার দরুন আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া কিছু করা সম্ভব হয় না।

১ **নবেম্বর**—রাজনৈতিক শোরগোলের মধ্যে সকাল এগারোটায় সংসদের শীত অধিবেশন শুরু হয়। বিরোধীরা পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব তোলার অনুমোদন আদায় করেন। অন্যদিকে অধিবেশন শুরু হওয়ার সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই চারজন সদস্যকে কক্ষত্যাগ করতে বলা হয়।

আজ কলকাতা ও হাওড়ায় একটিও ট্রাম বের হয়নি। বিনা নোটিসে ট্রাম বন্ধ থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। দুপুরবেলা ট্রাম-কর্মীরা হেড অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ জানান।

২ **নবেম্বর**—গহনা তৈরির জন্য যে কোন বিশুদ্ধ মানের স্বর্ণ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন করা হয়েছে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের অনাবৃষ্টি ও খাদ্য-সংকট-পীড়িত অঞ্চলগুলি থেকে দলে দলে নরনারী খাদ্য ও কাজের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে এবং বিশেষ করে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে চলে আসছেন। এতে এই রাজ্যের খাদ্যব্যবস্থার ওপরই শুধু চাপ পড়ছে তা নয়, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

৩ **নবেম্বর**—দুজন প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মী শ্রী জে বি কৃপালনী ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি সমর্থন করে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন।

আজ সকালে মাদ্রাজ পোতাশ্রয়ের বাইরের দিকের দরিয়ায় আটকে পড়ে লাইবেরিয়ান জাহাজ এস এস প্রোগ্রেস ভেঙে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে জাহাজের ২৬ জন নাবিক নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাহাজে মোট ৪০ জন নাবিক যাত্রী ছিলেন। ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৪ **নবেম্বর**—[illegible] করে আইন পাস করেনি, তারা যেন [illegible] এবং [illegible] করে—এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

কাপড়, সাবান, তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আজ লোকসভায় এক পশলা প্রশ্নোত্তর হয়ে গিয়েছে। কাপড়ের দাম বাড়া প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শা বলেন যে, দু'বছর পরে মিলের কাপড়ের দাম ৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, আর এ দাম না বাড়িয়ে কোন উপায়ও ছিল না।

৫ **নবেম্বর**—বিহারের দুর্গত এলাকা থেকে কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় প্রতিদিনই দলে দলে লোক আসার যে হিড়িক পড়ে গিয়েছে, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর ফলে রাজ্যের খাদ্যাবস্থার উপর প্রবল চাপ পড়ছে।

ভারতে শিল্প ক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার না হওয়ার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তা এক্ষণে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যাটি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মতভেদ দেখা দিয়েছে।

৬ **নবেম্বর**—অন্ধ্রের কম্যুনিস্ট পার্টির বাম দক্ষিণ উভয় দলই অন্ধ্র বিধানসভায় তাঁদের দলের সদস্যদের বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কিত আন্দোলনের পরিস্থিতির জন্য বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী কে নেহরু আজ রাতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, জেলা কর্তৃপক্ষ আমার অনুমতি না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিস পাঠিয়েছেন—এটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলে আমি মনে করি। আমি চাই এই মুহূর্তে পুলিস সরিয়ে নেওয়া হোক।

ভারতীয় রেলপথের অধিকতর [illegible] বিধানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় [illegible] বাহিনী গঠনের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব রেলওয়ে মন্ত্রণালয় করেছেন। প্রস্তাব একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কমিটির কাছে পেশ হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

৩১ **অক্টোবর**—ফরাসী [illegible] ঘোষণা করেছেন, ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ [illegible] কক্ষপথে তুলে দেবে। যে পর্যায়ের রকেট মহাকাশে তুলে দেবে তারই প্রথমটি—[illegible] আজ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

১ **নবেম্বর**—দক্ষিণ ভিয়েতনামের [illegible] দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আজ [illegible] জমায়েত এক জনতার উপর ভিয়েৎকং গোটা বিশেক অতি বিস্ফোরক [illegible] ফলে কম করেও আটজনের জীবনহানি ঘটে, পাঁচশজন আহত হন।

২ **নবেম্বর**—আজ [illegible] উত্তর কোরিয়া [illegible] সীমানার [illegible] এলাকার কাছাকাছি স্থানে [illegible] মার্কিন ও একজন দক্ষিণ কোরিয়ান [illegible] মারা গেছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগে [illegible] সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন [illegible]

৩ **নবেম্বর**—[illegible] একটি [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] বলেই আমেরিকার [illegible] থাকে।

৪ **নবেম্বর**—চীনের পারমাণবিক অস্ত্র সফল পরীক্ষার পর ওই অস্ত্রের বিরুদ্ধে [illegible] উদ্দেশ্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে সাযুজ্যের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে বলে [illegible] নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা মন্তব্য করে।

৫ **নবেম্বর**—আজ প্রায় সারা ইতালী জুড়ে বন্যার তাণ্ডব চলে। কর্দমাক্ত বন্যার জল থেকে অন্তত ৪৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—ফ্লোরেন্সের শিল্প সম্পদ বন্যার তোড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

৬ **নবেম্বর**—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট কৃষ্ণ মহাদেশে দক্ষিণ আফরিকা, রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সরকার এবং পর্তুগালের নীতির সমালোচনা করেন। তিনি আফরিকা সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধানের আবেদন জানান।

কম্যুনিস্ট চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আজ একটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নয়াচীন সংবাদ এজেন্সি আজ এই সংবাদ প্রচার করে।

বুকে সর্দি
বসে থাকলে
এখুনি
সারিয়ে ফেলুন
অমৃতাঞ্জন
লাগালে অবিলম্বে যন্ত্রণার উপশম হবে
দশ রকম ভেষজ মিশিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী অমৃতাঞ্জন পেন বাম ব্যবহার করলে বুকে সর্দি বসা এবং সাধারণ সর্দি দুই-ই নিরাপদে আরাম হয়। পেশীর ব্যথা, মাথাধরা এবং মচকানোর ব্যথাতেও অমৃতাঞ্জনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একেকবারে সামান্য একটু লাগে ব'লে বাড়িতে একটি শিশি থাকলে কয়েক মাস চলে যায়। সব সময় হাতের কাছে অমৃতাঞ্জন রাখবেন।
অমৃতাঞ্জন ৭০ বছরের ওপর গৃহস্থের বিশ্বস্ত সহায়।
অমৃতাঞ্জন ব্যথা ও সর্দিতে উপকারী—একাধারে দশটি ভেষজ।
AMRUTANJAN
Pain Balm
অমৃতাঞ্জন লিমিটেড
মাদ্রাজ • বোম্বাই • কলিকাতা • দিল্লী
JWT-AM-2819A

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ নেস্‌কাফে

একমাত্র নেস্‌কাফেতেই পাবেন পরম আনন্দ

NESCAFÉ
instant
coffee

তৈরী করতে মাত্র ৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। কাপে এক চামচ নেস্‌কাফে দিয়ে তাতে গরম জল ঢালুন—রুচিমাফিক দুধ ও চিনি মেশান। বস্‌, আপনার কফি তৈরী। আর কোন ঝামেলাই নেই।

উৎকৃষ্ট কফির উপাদেয় স্বাদগন্ধে ভরপুর নেসকাফে আপনার ভাল লাগবেই। নেসকাফে তৈরী হয় বাছাইকরা সেরা কফিদানা সুনিপুণভাবে মিশিয়ে আর সেঁকে—নেস্‌কাফে খাল-আনা খাঁটি ইনস্ট্যাণ্ট কফি। হালফ্যাশানের কফি তৈরীর কায়দা হলো—কাপে শুধু এক চামচ নেস্‌কাফে আর তাতে গরম জল ঢেলে দেওয়া, বাস্। নেস্‌কাফেতে পয়সার সাশ্রয়। যার যেমন রুচি—পাতলা কিংবা কড়া—আলাদা আলাদা কাপে তৈরী করা চলবে। ফলে, অপচয়ের বালাই নেই, ফেলা যাবে না, এমন কি তলানিও পড়ে থাকবে না।

NESTLÉ
নেস্‌লের তৈরী

নেস্‌কাফে—স্বাদে অতুলনীয় কফি

* নেস্‌কাফে হল নেস্‌লের ইনস্ট্যাণ্ট কফির রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

JWT.NGE 5144A R

চুপ ! এইমাত্র ওঁর কাশি বন্ধ হয়েছে···এবার আরামে ঘুমাচ্ছেন

ফর্মুলা 44 কাশি নিবারক মিকশ্চারটি শক্তিশালী···সর্দি, ফ্লু বা ব্রঙ্কাইটিস্-জনিত কাশিতে দ্রুত কাজ দেয়, আর তার প্রভাব বহুক্ষণ ধ'রে থাকে···আপনি কাশি থেকে নিষ্কৃতি পান।

মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে ওঁর ঘুম ভেঙ্গেছিলো, আজ রাতটা কাশির দুর্ভোগে ভুগতে হবে। ঘুম আর আসবে না। আমি ওঁকে ভিক্স ফর্মুলা 44 কাফ মিকশ্চার দিলাম। সত্বর ওঁর কাশি বন্ধ হোলো, আর এখন উনি আরামে ঘুমাচ্ছেন।

ফর্মুলা 44 শক্তিশালী। এতে সত্বর কাশি বন্ধ হয়, ফলে আপনি আরামে ঘুমাতে পারেন।

ফর্মুলা 44 ফলপ্রদ। এটি সরাসরি কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কাজ করে যেখানে কাশির উৎপত্তি।

ফর্মুলা 44 পূর্ণ আরাম দেয়। এটি গলার প্রদাহ উপশম করে, বুকে ও নাকে জমা শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে দেয়, ফলে, কাশি থেকে আপনি পূর্ণ আরাম লাভ করেন।

এই কারণেই অধিকাংশ লোক কাশি থেকে সত্বর আরাম পেতে ফর্মুলা 44 ব্যবহার করেন। আপনিও পরখ করে দেখুন। ওর প্রথম চামচেই টের পাবেন ভিক্স ফর্মুলা 44 কত শক্তিশালী আর কত তাড়াতাড়ি এতে ফল দেয়।

সত্বর, নিশ্চিত আরাম পেতে হলে সঠিক মাত্রায় সেবন করুন
বড়দের, ১৪ বছর বা তার বেশী মাত্রা ১ থেকে ২ চামচ
ছোটদের ৬ থেকে ১৪ বছর ½ থেকে ১ চামচ
শিশুদের ৬ বছরের কম ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে
প্রয়োজন মত প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর মাত্রা সেবন করবেন

ভিক্স ফর্মুলা 44

শক্তিশালী কাফ মিকশ্চার

আত্মপ্রকাশ ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম কাব্যানুরাগীদের কাছে অশ্রুতপূর্ব নয় — যদিচ ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ অপ্রত্যাশিত এবং তদ্‌হেতু বিস্ময়-সঞ্চারক। এই বিস্ময় আবার বহুগুণিত হবে যখন পাঠক "আত্মপ্রকাশ"-এ এক নবীন প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাবের নিশ্চিত সূচনা প্রত্যক্ষ করবেন।

পাঠক "আত্মপ্রকাশ"-এর একটির পর একটি করে পাতা ওলটাবেন আর স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করবেন, কি অদ্ভুত নৈপুণ্য এবং কি অনুপম আন্তরিকতায় এক তরুণ লেখক সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহায়তা, নৈঃসঙ্গ্য, সুস্থ আত্মপ্রকাশের আকুল আর্তি প্রতিচিত্রিত করেছেন তাঁর এই প্রথম মৌল উপন্যাসে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর, শিক্ষায় পরিমার্জিত, দুঃসাহসিকতায় অগ্রণী যৌবন কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মহৎ আত্মবিকাশের ব্যর্থ আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে করতে ছুটে চলেছে আত্মঘাতের পথে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে সমাজকে, দেখে পাঠক শিউরে উঠবেন, আর সেই সঙ্গে সশ্রদ্ধ জানাবেন "আত্মপ্রকাশ"-এর তরুণ স্রষ্টাকে, যাঁর চোখে দ্রষ্টা কবির নিবিড় উপলব্ধি আর কলমে কাব্যের সংহত সৌরভ।

প্রকাশিত হল ॥ দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বিমল মিত্রের

সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

চলো কলকাতা

আগামী পক্ষেই

প্রকাশিত হচ্ছে

দেওয়ালের লিখন

'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও'—হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ঋষিরা এই প্রার্থনাই করে এসেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী যে-দেশে নিত্য পূজা পেয়ে আসছেন, সে-দেশে আর যাই হোক, বিচারবোধকে কোনোদিন বলি দেওয়া হয়নি। ধর্মীয় গোঁড়ামির উপর ভারতের যুক্তিবাদী মন চিরকাল প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, ভারতের দিগ্বলয় আজ অজ্ঞানতার অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন। আমরা গর্ব করে বলে থাকি যে, আমাদের দেশ যুক্তিবাদী আধুনিক দেশ। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিজ্ঞানে আমরা বিশ্বাসী। আমাদের প্রতিবেশী দেশের মত আমরা মধ্যযুগীয় ধর্মতান্ত্রিক দেশে বাস করছি না। এই রকম বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আজ যাঁরা নবীন ভারতবর্ষের রূপ মানসচক্ষে গড়ে তুলেছেন, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা তাঁদের সেই কল্পনায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। স্বপ্নভঙ্গের পর তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখেছেন—এ কোন্ ভারতবর্ষ!

সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া ভারত সরকার ও দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চায়। ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাবার চেষ্টায় প্রগতিশীল ভারতবর্ষকে পুনর্বার মধ্যযুগীয় কালিমালিপ্ত অন্ধকারে ফিরিয়ে নেবার কী বর্বর প্রয়াস! এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি হিন্দীভাষী অঞ্চল এই জঘন্য কাজে অগ্রণী।

একথা সত্য যে, ভারতীয় অর্থনীতিতে গবাদি পশুর স্থান কী হবে এ-প্রশ্নের সমাধান ভারতের অর্থনীতিবিশারদ দ্বারাই স্থিরীকৃত হতে পারে না। কেননা প্রশ্নটি খুবই জটিল এবং এর পিছনে রয়েছে অগণিত ভারতবাসীর ভাবাবেগজর্জরিত ধর্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষের এক বৃহদংশ, আজ নয়, বহুকাল ধরেই গোরুর প্রতি একটি বিশেষ দুর্বলতা পোষণ করে থাকেন, গোরু তাঁদের কাছে গোমাতারূপে উপাস্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহলে কেন গো-হত্যা নিবারণের জন্য আন্দোলন হল না? গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেলের জীবদ্দশায় তাঁদের অনুমোদনে যে সংবিধান রচিত হল, তাতে গো-হত্যা নিবারণের কোন কথাই বলা হয়নি—বলা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষির উন্নতির সঙ্গে গবাদি পশুর উন্নয়নের কথা। আরো বলা হয়েছে: বাছুর, দুগ্ধবতী গাভী ও কর্মক্ষম গোরুকে যেন হত্যা না করা হয়। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে লোকসভার আলোচনায় এ-কথা পরিষ্কার-ভাবে বলা হয় যে, এ-নির্দেশের পিছনে ধর্মের কোনো স্থান নেই, দেশের আর্থিক প্রয়োজনেই এই নির্দেশ। লোকসভায় আলোচনাকালে এমন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল যে, গোরুর প্রতি যত্ন নেওয়া ও রক্ষা করার জন্য দেশবাসীর মনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, কারুর প্রতি এ-জন্য জোরজুলুম চলবে না।

গত কয়েক মাস ধরে ভোজবাজীর মত এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে সংবিধানের নির্দেশকে শিকেয় তুলে রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নন্দ প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে ফতোয়া পাঠালেন যেন অবিলম্বে গো-হত্যা বন্ধ করা হয়। গবাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণের বিষয়, কেন্দ্রের নয়। একথা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের ভয়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দুর্বলচিত্ততা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে ওঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত 'হিন্দু সাধুসমাজ' গত ৭ই নভেম্বর ভারতের খাস রাজধানী দিল্লীতেই বিধ্বংসী তাণ্ডব শুরু করে। যার ফলে নন্দজীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হল এবং অনেক জল ঘোলা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কিছু রদবদল করতে হয়েছে।

চোখের সামনে গত সপ্তাহে যে-সব ঘটনা ঘটে গেল, তাকে গ্রীক ট্র্যাজেডীর নিয়তির শেষ বিচারের অমোঘ নির্দেশ বলে মনে হয়। চারিদিকের অরাজকতা দেখে আরও মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন, আসন্ন নির্বাচনের মুহূর্তে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। অন্ধ্রপ্রদেশের ইস্পাত-কারখানার দাবী, গো-হত্যা নিবারণের দাবী ইত্যাদি যে যা চায় দিয়ে দাও। কারা চাইছে, কেন চাইছে এবং কী চাইছে এ প্রশ্ন অবান্তর। তা না হলে দিল্লীতে যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গেল তার পরেও কেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট গো-হত্যা নিবারণের পক্ষে প্রস্তাব আনলেন। একেই বলে দেওয়ালের লিখন।

গোপনে অস্ত্র তৈরির কাজে হাত দেওয়া, এমন কি সেদিকে কোনো গবেষণা চালানোও ভারতের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব। অর্থাৎ এ বিষয়ে ভারত বর্তমানে যে-ভাবে বিদেশী সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ তাতে স্বাধীন-ভাবে তার কিছু করার সাধ্য নেই। কিছু করতে হলে এই অবস্থার বাঁধন ভেঙে তাকে আগে বেরুতে হবে।

আর্থিক ব্যাপারেও তাই। আর্থিক ব্যাপারেও ভারত সরকারের স্বাধীনভাবে চলার শক্তি সীমাবদ্ধ। সেটা ভারত দরিদ্র বলে নয়, ভারত সরকার যে-ভাবে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে বিদেশীর ইচ্ছাধীন করেছেন তার জন্যে। দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত নিউ-ক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণের জন্যে অর্থ নিয়োগ ভারত সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ভারতের বিদেশী "সাহায্যকারীরা" তা করতে দেবে না। আমেরিকা বা রাশিয়া ভারতকে সামরিক দিক দিয়ে "নিউক্লিয়ার শক্তি" হতে দিতে চায় না, এবং যতদিন পর্যন্ত ভারতের সরকারী অর্থনৈতিক পলিসি এখনকার মতো বিদেশী ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের নিউক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণে হাত দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভারত সরকার নিউক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণ করবে কি করবে না এই প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন ভারত সরকারের এ বিষয়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকবে, যা এখন নেই। সেই স্বাধীনতা পেতে হলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।

ইচ্ছা মতো করার শক্তি হলেই যে ভারতকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করতে লেগে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নেই বলে কোনো সার্থক নিউক্লিয়ার-অস্ত্র-বিরোধী নীতি অনুসরণ করাও ভারতের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে ভারত সরকার যে-নীতি অনুসরণ করছেন সেটা কোনো যথার্থ নীতিই নয়। তার বাইরের খোলসটা নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বিরোধী নীতির মতো, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার ক্রমশ প্রকাশ্য মার্কিন-সোভিয়েট মিতালির সুরে সুর মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তাতে আমাদের চীন-সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হবে বলে মনে হয় না।

৪।১১।৬৬

নন্দ বিদায়
বানপ্রস্থ
শচীন বিদায় /
না, শচীনকে
নিতেই হবে।

সুনন্দর জার্নাল

'গব্য-জিজ্ঞাসা'

স্কুলে আমাকে কখনো গোরুর ওপরে রচনা লিখতে হয়নি। তার কারণটা এখন বোধ হয় অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব ছেলেবেলায় যে মাস্টারমশাইরা আমার মতো ছাত্রদের চারণ করতেন, তাঁরা আমাদের হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছিলেন এবং আমাদের দিয়ে আত্মচরিত রচনা করানোকে সম্পূর্ণ বাহুল্য বলেই ভাবতেন।

কিনে নিন বাবু, খাওয়ালে ভাল গোবর দেবে

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য কখনো গোরুর সঙ্গে আত্মীয়তা-স্বীকারে প্রস্তুত ছিলুম না—আমাদের সত্যদর্শী মাস্টার মশাইরা যা-ই বলুন। ছেলেবেলায় গোরু সম্পর্কে রচনা লিখতে হলে তার আরম্ভে আমি নিশ্চয় লিখতুম: "গোরু অতি হিংস্র জন্তু। সে মানুষের পরম শত্রু।" এই সিদ্ধান্ত আমার ভূয়োদর্শন থেকেই আহরিত। কারণ দু-দুবার আমি গোরুর শিঙে উৎপাটিত হয়েছিলুম; আর একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে যখন পাকা আমড়ার লোভে বৃক্ষারোহণে ব্যাপৃত ছিলুম, তখন গোরু এসে গাছের তলা থেকে আমার বইখাতা খেয়ে গিয়েছিল এবং তার পরিণামে যা ঘটেছিল তা যে শিঙের গুঁতোর চাইতে অনেক বেশি করুণ—আশা করি আপনারা তা অনুধাবন করত পারছেন।

তারপর বড়ো হয়ে, জীবনের গোয়ালে ঘাস-বিচুলি চর্বণ করতে করতে গোরু নিয়ে আর কোনো গুরুতর তত্ত্বচিন্তার সুযোগ পাইনি। তবে গোরুর যে শুধু গোরুত্ব নয় গুরুত্বও আছে—কলকাতার রাস্তায় ষাঁড়ের ফ্রীস্টাইল সংগ্রাম দেখে সেটা উপলব্ধি করা গেছে; তাদের শিঙে সিঁদুর এবং গলাকম্বলে বিলম্বিত মালা ইত্যাদি দেখে জেনেছি তারা বন্দনীয়; এক মুঠো ভাতের জন্যে যখন শহরে হাহাকার তখন কলকাতার অঞ্চল-বিশেষে সের পাঁচেক চালের নিবেদিত অর্ঘ্য ভোঁস-ভোঁস শব্দে ষাঁড়কে আত্মসাৎ করতে দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভেজিটেবল ঘী এবং কনডেন্সড্ মিল্কের যুগে গোরুর সঙ্গে আর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুভব করিনি—আমার চিন্তায় গোরু ভয়, বিস্ময় এবং ভক্তির এক সুদূর রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে গোরুর দুর্দম শক্তির এক দুর্বার প্রকাশ দেখা গেল। দেখা গেল, ছেলেবেলার সেই আমি তো অতি তুচ্ছ প্রাণী, সর্বশক্তিমান পুলিসের সর্বভারতীয় মহাপতি পর্যন্ত তার শৃঙ্গতাড়নে ভূপাতিত হলেন। একটু 'সেনসাইড' হল বোধ হয়, কিন্তু যে-কোনো 'ক্রান্তিকারী' ব্যাপারেই এ-সব অঘটন ঘটে থাকে। গো-মাতা কী জয়!

ধর্মের ব্যাপারে দন্তস্ফুট করবার সাহস রাখি না—এই পাপ-জিহ্বায় 'মরা' যে কখনো 'রাম' হবে সে-রকম সম্ভাবনা নেই; রাজনীতি আমার কাছে সাধুভাষার সেই "ব্যালকুলপরিসেবিত অরণ্যবৎ" — সহস্র যোজন দূরে থাকাই নিরাপদ বলে মনে হয়। তবুও 'কমন-ম্যান' সুনন্দর বিমূঢ় বিহ্বল চিত্তে দুটো-একটা জিজ্ঞাসা জাগে। নিবেদন করে ফেলি।

গো-রক্ষার জন্যে অকস্মাৎ এই তাণ্ডবের আয়োজন কেন? ধর্মীয় প্রেরণায়? কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রে তো সে প্রশ্ন ওঠে না। (এবং ধর্মীয় এই নিষেধের অন্তরালেও কিছু বস্তুতান্ত্রিক কারণ আছে বলে যেন পণ্ডিতদের লেখায় পড়েছিলুম—অর্থাৎ গোরু এতদ্দেশীয় প্রাণী নয়, আর্যেরা তাকে বাইরে থেকে এনেছিলেন এবং অতিরিক্ত গো-মাংসভক্ষণে যজ্ঞ-টজ্ঞের পঞ্চগব্যে টান পড়ছিল বলে—কিন্তু ও-সব থাক, আমি ভীমরুলের চাকে ঘা দিতে চাই না!) আর ধর্মই যদি এর প্রেরণা না হয়, তাহলে

লেনিন বলেছেন, প্রোলেতারিয়েতদের কিছু হারাবার নেই। অতএব ভয় কিসের!

ইংরেজীতে 'ত্রিদণ্ড' অর্থাৎ ত্রিশূলধারী নাগা সন্ন্যাসীদের কেন এর মধ্যে আমদানি করতে হল? এই মহাপ্রভুরা দূর থেকেই প্রণম্য—এঁরা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হলে যে কী ঘটতে পারে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সেই নিদারুণ স্ট্যাম্পীড থেকেই কি সে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিনি?

ধরা যাক এই মহামানবেরা স্বয়মাগত—কেউ তাঁদের বরণ করে আনেনি। আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট অনেকেই গলা খুলে বলেছেন এবং বলছেন—তাঁরা গো-হত্যা বন্ধ করতে চান সমাজ-কল্যাণের দিক থেকে—দেশে দধি-দুগ্ধ-ঘৃতের অমৃতধারা বইয়ে দেবেন বলে। আদর্শ অতি মহৎ, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার রাস্তা কি এইটে?

ইয়োরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে

মাখন-দুধের যে প্রাচুর্য—তা কি এই নীতির আশ্রয়েই? গো-মাংস ভক্ষণে ওসব দেশে যে বিন্দুমাত্রও অরুচি জন্মেছে তার সংবাদ তো এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আর ভারতবর্ষের কশাইখানায় গো-হত্যা কি তুলনামূলকভাবে ইয়োরোপ-আমেরিকার চাইতেও বেশি?

পৃথিবীর বাজারে গোরুর চামড়া বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা আমদানি করে থাকি; বিশেষজ্ঞরা বলেন এ আমাদের নাকের বদলে নরুণ-প্রাপ্তি; আমাদের রপ্তানির প্রতিটি চামড়াই 'পো দা শাগ্রা'—তাদের গায়ে অলক্ষ্য অক্ষরে অপচয়, অপুষ্টি, নির্বুদ্ধিতা, শিশু আর রুগ্নে হত্যার কাহিনী লেখা; ভারতবর্ষের গো-হত্যার স্বরূপ দেখতে হলে যেতে হয় তার তৃণহীন মাঠে, তার অনাহার-পীড়িত ভাঙা গোয়ালে, তাকে বুঝতে হয় পঞ্জরসার জীর্ণশীর্ণ গোরুর দিকে তাকিয়ে। শহরের খাটালে খাটালে সেই গো-হত্যা অনিবার্য নৈঃশব্দ্যে

মাতৃস্তন্যে লালিত ও মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত দুই সন্তান

চালিয়ে যায় গোয়ালার দল—যারা নিষ্ঠাবান হিন্দু, রাম নামে যাদের চোখে প্রেমাশ্রু বয় গোপাষ্টমীর দিনে গো-বন্দনায় যাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না; বিবিধ ইনজেকশন, বিচিত্র ফুঁকায়, কাঁধের মৃত বাছুরের চামড়ার খড় পুরে—ধোঁকার টাটি তৈরি করে যারা আমাদের ঘরে ঘরে দুধের জোগান দেয়, তিন বছরের মধ্যেই স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল গাভীকে যারা কশাইখানার পথে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু অত কথা ভাববার কী আছে? গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে—এই সেন্টিমেন্টটুকুই তো যথেষ্ট। তাতেই প্রাণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে—ধর্মের টিকি হুংকারে টিকটিক করে নড়ে ওঠে—নেতারা ত্রিশূল হাতে আসরে অবতীর্ণ হন, তারপর জ্বলন্ত ভাষায় কিছু বক্তৃতা দিতে পারলেই আর দেখতে হয় না—অবিলম্বে প্রেত-তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতে পারে।

সুনন্দ ধার্মিক নয়—রাজনীতিক হওয়ার বাসনাও তার নেই। কিন্তু নিল্লীর তাণ্ডব যে ধর্মকেই আঘাত করবে—রাজনীতিকে কলঙ্কিত করবে—সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সত্যটা তার কাছে অস্পষ্ট নয়: ভারতবর্ষের বুকে হয়তো অনেক যন্ত্রণাই জমেছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের চাকাকে উলটো মুখে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে? সত্যকে পাশ কাটিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে আত্মঘাতী অগ্নিকাণ্ডে?

গো-হত্যা নিষেধ আন্দোলন চলতে থাকুক, আর সেই অবসরে ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে নিঃশব্দে—ধর্মসম্মতভাবে ব্যাপক গো-মেধ চলুক, কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে আমরা নির্বিকার হৃদয়ে চামড়া বিক্রির ডলার অর্জন করতে থাকি।

আলোচনা

আইয়ুবের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

৫ নভেম্বরের 'দেশ'-এ আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর গীতাঞ্জলিবিষয়ক আলোচনাটি যে-কোন রবীন্দ্রমগ্ন পাঠকেরই মনোযোগ গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে বলে আমার ধারণা। কিন্তু গীতাঞ্জলির কিছু শ্রদ্ধা-ভক্তির কবিতা (যথা "আমার মাথা নত করে দাও হে", "একটি নমস্কারে প্রভু", "তোমায় আমার প্রভু করে রাখি", "আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না"), যা শ্রদ্ধেয় আইয়ুবকে ভাবের দিক থেকে সাড়া দিতে পারে না, তা আমাকে কেন গভীর-ভাবে সাড়া দেয়, যদিও 'পরম নিশ্চিত, পরম কল্যাণময় অনন্ত শক্তিধর, সকল দুঃখ তাপহর কোন বিশ্ববিধানকর্তা' আমার কাছেও নিতান্তই হাস্যকর, সে-বিষয়ে আমি আমার ধারণা নিবেদন করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির প্রেরণা হিসেবে কোন ঈশ্বর কাজ করেছিলেন, আমি জানি না, তবে যে ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই, তেমন একজন ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই যে একটা নৈর্ব্যক্তিক অন্তরাল সৃষ্টি করে রেখেছে, যার প্রতি প্রত্যেক মানুষের নতজানু সমর্পণ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সংগোপন, সেই ব্যক্তি-আশ্রিত প্রাতিস্বিক ঈশ্বরের প্রতি—ব্যক্তির চিরকালীন সম্ভাবনার প্রতি অসমাপ্ত মানুষের সমর্পিত বৈভবই এই কবিতা-গুলির আকর্ষণের দিক। মানুষ যেখানে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে মৃত্যুর চিরকালীন অবসানের কাছে সীমিত, সেখানে তার একমাত্র দর্শন আগন্তুক-দর্শন (Outsiderism)। এই মৃত্যুর পটভূমিতে মানুষ জগতের দুটো রূপ উপলব্ধি করে, একটা রূপ—আমাকে নিয়ে এই জগৎ, আরেকটা রূপ—আমাকে বাদ দিয়ে এই জগৎ। এই প্রথম জগৎ মানুষের অস্তিত্বের স্বপক্ষে, দ্বিতীয় জগৎ মানুষের অস্তিত্বের বিরোধী। এই দুটো জগতের মধ্যে যেহেতু সে কোন বিশুদ্ধ সমন্বয় ঘটাতে পারে না, সেই হেতুই অসমাপ্ত দুঃখী মানুষ ব্যক্তিত্বের চিরকালীন সম্ভাবনার প্রতি—তার অস্তিত্বের গভীর স্তরের নৈর্ব্যক্তিক অন্তস্তলের প্রতি রসোপলব্ধির পর্যায়ে নতজানু, সমর্পিত। যে শিকড়হীনতা প্রত্যেকটি মানুষের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই ছিন্নমূল অস্তিত্বের রক্তাক্ত জীবনভাবনাকে নিরাময় করার জনাই ব্যক্তি তার নিজস্ব ঈশ্বরের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্পিত হয়, এবং গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের এই সমর্পিত অস্তিত্ব, যে-কোন চিন্তিত ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্বকেই উন্মোচিত করে। কারে বলেই এই কবিতাগুলির আবেদন এত গভীর।

অনেক সময়ই গীতাঞ্জলি পর্যায়ের কবিতাগুলির রসোপলব্ধির জন্য আমাকে অন্তত সুরের কাছে হাত পাততে হয়নি। পাততে হলে হয়তো বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেতো, কেননা, আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের গান বাণীর জন্য যতো সমৃদ্ধ, ততো সুরের জন্য বা সংগীতের জন্য নয়। গান শোনার জন্য আমি ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের 'আভোগী' বা ললিত-এর কাছে গিয়ে যা পাই, বাণীনিরপেক্ষ গীতাঞ্জলির যে-কোন গানের সুরের কাছে গিয়েই তা পাই না।

পরিশেষে বলতে চাই, আমি যে ব্যক্তির ঈশ্বরের কথা সমর্থন করেছি, সেই ঈশ্বর 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—ঈশোপনিষদের এই উক্তিকে সমর্থন করে বস্তুর অসারতার কথা প্রমাণ করে না, সেই ঈশ্বর শাস্ত্রীয় এবং আনুষ্ঠানিক ঈশ্বর নন, সেই ঈশ্বরকে ব্যক্তিই নির্মাণ করেন তাঁর অস্তিত্বের ক্ষতকে নিরাময় করার জন্য।

কালীকৃষ্ণ গুহ
কলিকাতা-২৭

অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন

আপনার সম্পাদিত পত্রিকার ৫ নভেম্বর সংখ্যার আলোচনা স্তম্ভে শিশির নিয়োগীর অ্যারিস্টটলের লণ্ঠন সম্পর্কিত আলোচনায় কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। একজন লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শাবার অধিকার এবং প্রয়োজনের উদ্দেশেই আলোচনা স্তম্ভের প্রবর্তন। কিন্তু ব্যক্তিগত বিবাদের ভিত্তিতে অশালীন শব্দসমন্বয়ে লেখককে আক্রমণ করবার স্থান আলোচনা স্তম্ভ নয়। কারণ, একজন লেখকের কোন প্রচেষ্টা, সে যত নগণ্য বা নিম্নমানেরই হোক, তাকে শ্রীনিয়োগীর নির্দেশিত "ঔদ্ধত্য" বলতে যে-কোন সুস্থ মানুষই আপত্তি করবে। তারপর পত্রের শুরুতেই শ্রীযুত নিয়োগী মহাশয় লিখিত "শ্রীমিত্যুর মুখোপাধ্যায় ওঁর লেখা প্রবন্ধগুলিতে শব্দের ভুল তথ্য পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হননি।" পত্রটি কয়টির মূল সারাংশ পড়ার যে শ্রীমুখোপাধ্যায় ভুল তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়কে একটা বিকৃত করে দেখতে যেয়ে নিয়োগী মহাশয় নিজস্ব হীনম্মন্যতাকে বোধ হয় বেশী প্রকট করে তুলেছেন। আমিও অন্যান্য অনেকের মত "অ্যারিস্টটলের লণ্ঠনের" নিয়মিত পাঠক। বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা যোগ থাকায় লেখাগুলিকে আমি বিশেষ একটা দিক থেকে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞানের মূল চিন্তাধারাকে সহজ করে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সাহিত্যগত দিক থেকে বিশেষ এক শিল্প-রীতির পর্যায়ে পড়ে।

শিশিরবাবুর চিঠিটা পড়ে মনে হল, তিনি বৃক্ষের দৃষ্টি দিয়ে মূল লেখাটি বা ঐ সম্পর্কে আলোচনা পড়েননি। কারণ, প্রতিবাদ লিপির রচয়িতার বয়ানে সমা-লোচনার দৃষ্টিভঙ্গীই দেখেছি আর লেখকের তরফ থেকে নিয়োগী মহাশয় নির্দেশিত "সংকলন" দেখিনি। বিস্তৃত তথ্যের কয়েকটি ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া এই ধরনের লেখার পক্ষে বিচিত্র নয়, এ কথা কিছুটা বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে নিয়োগী মহাশয় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন লেখকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ একটু ঘাঁটে দেখলেই দেখতে পেতেন। সত্যান্বেষী বিজ্ঞানের তথ্য নিত্য পরিবর্তনশীল। সেক্ষেত্রে একজন লেখক, যাঁকে নানা ভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করে লিখতে বসতে হয়, তিনি এক নিমেষে পুরোনো সত্যের আশ্রয় নিলে সেটাকে সাময়িক ভুলই বলা উচিত, তা নিয়ে "কড়া শাসন"-এর জেহাদ তোলা অন্যায়। তবে এই ভুলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যাঁরা লেখককে সাহায্য করেন, তাঁরা সমস্ত পাঠকবর্গের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু নিয়োগী মহাশয় কোন রকম ভুল বা বিচ্যুতির প্রতি ইঙ্গিত না করে "সমস্ত বিজ্ঞান সমাজের" এবং "সুধী পাঠক-বর্গের" মুখপাত্র হতে চেয়ে অত্যন্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রতি আমার অনুরোধ, কোন কিছু সমা-লোচনায় অপারগতাবশত তিনি যেন কখনো এরকম ভ্রমাত্মক রুচিবিগর্হিত চিঠি না লেখেন।

শিবব্রত ভট্টাচার্য
কলিকাতা-১৯

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

[এক]

'বাবুর যাওয়া হবে কোথায়?'

লোকটির চোখে চেয়ে দেখা, একটু হাসি হাসি ভাব দেখেই বোঝা গিয়েছিল, এরকম একটা কিছু বলবে। বাবু ছাড়া, সেই আছে। দ্বিতীয় কোন যাত্রী নেই। আর আছে মাঝি। কিন্তু এ মাঝির কাছে, জগৎ সংসার তো যেন নিরাকার। অন্যথায় সে এমন নির্বিকার কেন। নতুন শীতের এই সকালে, তার অদুর গা। গায়ে, খানে খানে খড়ির দাগ। কালো গায়ে দাগগুলো ফুটেছে পরিষ্কার। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর ওপরে গোটানো। মুখে কয়েকদিনের গোঁফদাড়ি। তাও বেশ জুতসই নয়, আধা মুকুন্দের গোঁফদাড়ি। অনেক ফাঁক আছে। চোখ দুটি কালো, ডাগরও বটে, কিন্তু যেন রাজ্যের ঘুম সেখানে জড়ো হয়ে আছে। একে ঘুমকাতর বলে, না ঢুলুঢুলু বলে, কে জানে। সে জল দ্যাখে না, যাত্রী দ্যাখে না, এপার ওপার লক্ষ নেই, বৈঠা টানছে ছপ্ ছপ্। তার যেন শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই। জলে জোয়ার না ভাঁটা, খেয়াল নেই। মাঝি তুমি কী কর। পারাপার করি। আর কী কর। পারাপার করি। মাঝির দিকে তাকিয়ে এমনি মনে হয়, তার জগত জোড়া দরজা বন্ধ।

যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা আঘাটা নয়। খেয়াঘাট নয়, আন্দাজ করেছিলাম। অতএব, এ মাঝি খেয়া পারানির বাঁধা ঘাট মাঝি নয়। * জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওপারটা হিন্দুস্থান না পাকিস্থান।'

'হিন্দুস্থান।'

মুখ না তুলে, পাটাতন ফাঁক করে, জল সেঁচতে সেঁচতে জবাব দিয়েছিল। একটা বেশী কথা বলবে, সেরকম পাওনি। অচেনা লোক, তাকিয়ে দেখতেও কি চোখ সরে না। সরলে তো দেখতোই। সকলের অমন কথায় কথায় চোখ সরে না। অর্থাৎ নড়ে না। দেখছ, জল সেঁচছি। মানুষ এলে, কী বলার আছে বল, জবাব দিচ্ছি।

কিন্তু এত সোজাসুজি হলে হয়। মানুষটা এল কোথা থেকে, দেখবে তো। তার চলা ফেরার ধাঁচ ধোচ, খেই ধরতাই দেখবে তো। শহর থেকে মানুষ এল, মানুষ নয়, বাবু এল, জানো, তার এক কথাতেই চুন খসে যায়। তোমার কাছে একটা কথা পড়বে, তারপরে যদি তুমি তার মান না রাখো।

তবে মানের বোঁচকা নিয়ে হাঁটা দাও। সে কেন মিছে বকে মরবে। রাজা মহারাজা তো করবে না হে, তবে আর হেসে তাকিয়ে কথা বলে ভেজাল মিশেল দিয়ে কী হবে। আশপাশে আরো দুচার খানা নৌকা ছিল। তাদের মাল বোঝাইয়ের বহর দেখে, কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তাই তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পার করে দেবে।'

'দু' আনা লাগবে।'

এক কথাতেই সব জবাব। দেবে কি দেবে না, অত কথার দরকার বোঝেনি। বারো নয়া তেরো নয়া, সে সবও বলেনি, সাবেকী হিসেবেই কথা। নয়া চালের কী-ই বা দেখছ এখানে। এ ইছামতী নদী নয়া নয়। এই যে জোয়ারে উজান যায়, এ নয়া নয়। যত পুবে পেছিয়ে যাবে, অনেক সাবেকী হিসাব পেয়ে যাবে। তোমার বারো নয়া তেরো নয়ায়, ইছামতীকে নয়া করতে পারোনি। আগের ভাটার যে-পলি এখনো ডোবেনি, তার রঙ সেই সাবেকী, কালো কুচকুচে, পাতায় মোড়া পাত-ক্ষীরের মত। গাঙ শালিকেরা ঝাঁক বেঁধে, চঞ্চু খুঁচিয়ে, পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে সেখানে। সূর্যের ছটা লাগা আকাশটা সেইরকমই সাবেকী। প্রথম শীতের হাওয়ায়, মেঘের ছিটে ফোঁটাও উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ঝকঝকে নীল পাথরের মত, এত চেকনাই যে, চোখ রাখা যায় না। ইছামতী জোয়ারে বাড়ন্ত, একটু ঢেউ নেই। ধোয়া মোছা একখানি আরশী, আকাশের ছায়ায় নীল। ওপারে দেখা যায় যে গ্রামখানি, তার আমজাম জরুল গাম্বিল কাঁঠাল নারকেলের গা ভরে রোদ। মস্ত মস্ত হিজল নেই গেমোর ঝাড় ঝোপ জলে নেমে দাঁড়িয়েছে কোমর ডুবিয়ে, ডাল বাড়িয়ে ইছামতীর জোয়ারে ছপ্‌ছপ্ খেলছে। মাঝে মধ্যে ক্যাওরার ঝোপ। বারো নয়া তেরো নয়ার মত নতুন কিছু নেই, সবই সাবেকী। নয়া তো তোমার মিলের ধুতির পাড়ে, মিলবাবুর জামায়, চোখের জার্মান কাঁচের কালো ঠুলিতে, শান্তিনিকেতনী ঝোলায়। কথার ভেজাল বাড়িয়ে লাভ কী। উঠে বসেছিলাম। দরাদরি করা যেত, কেননা, টিকেট যখন ছাপানো নেই। ছাপাছাপি না দেখলে, কোন কিছুতেই এক দর বলে মানতে শিখিনি। কিন্তু এ যা মাঝি, তার এক মুখ খোলা, বাকী সব বন্ধ। কথায় ভেজালে নেই, কথাই ছাপানো।

উঠে বসতেই জল সে'চা বন্ধ করে পাটাতন বসিয়ে দিয়েছিল। ছই নেই, খোলা, জেলে নোকার মত। জালের ভাজ ছিল না যে মাঝিকে মাছধরা ভাবব। ওকে এই মালবোঝাইয়ের ঘাটে যে সে বেগার দেবার জন্যে বসেছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। হতে পারে, মাছ মারে, মাল বহে, পারাপারও করে। নোকা যখন একটা আছে। কিন্তু আমার তো মনে হয়েছিল, মাঝি তুমি কী কর, পারাপার করি। এ ছাড়া আর কিছু নয়। আর কী কর। পারাপার করি।

নোকার খ'ুটি তুলে ঠেলা মারতে যাবে, তখনই ইনি এলেন, দ্বিতীয় যাত্রী। চীৎকার শোনা গিয়েছিল, 'অদরদা অদরদা দাঁড়িয়ে।'

অদর। অর্থাৎ অধর। তবে আমি অধর মাঝিকে ধরতে চেয়েছিলাম! ও ভোলার মন, সবাই কি আর অধর ধরার কল পাততে জানে। দ্যাখ, বগলে কী একটা চেপে, রঙ ওঠা গেরুয়াই হবে—আলখাল্লার মত জিনিসটা হাঁটুর ওপর অবধি তুলে কেমন ছুটে আসছিল লোকটা। কোথায় যাবে, যাবে কিনা, দর কত, কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই। অদরদা দাঁড়িয়ে, তো অধর নোকার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। অধর মাঝি একবার তাড়া দেবার হাঁক দেয়নি। কালো মুখ খানিতে, কপালে বা ভুরুতে কোথায়ও একটু এদিক ওদিক হয়নি। ঢুলুঢুলু চোখ দুটো তুলে একবার লোকটিকে দেখেছিল মাত্র। সে এসে উঠতেই নোকা ঠেলে দিয়েছিল। তারপরে শোন কথা।

'জয় মুরশেদ। বেলা হয়ে গেল। এক-টুকুন তাড়াতাড়ি আসতি পারলে জানি, পারের চিন্তা নাই। তবু যাগগা, তোমাকে মিলিয়ে দিলে গোরা সায়িবে। বেরুতি যব, হরেকেষ্ট আর তার বউয়েতে কী ঝগড়া। পাড়ায় কাক চিল থাকতি চায় না। বিত্তান্ত কি, না হরেকেষ্ট গাই দোয়াবার আগে এক ফেত্তা হ'ুকো টানতে বসেছিল। বেরুবার মুখেতেই, এসব বড় খারাপ, দিনটা না বেরথা যায়। দাঁড়িয়ে একটু জোড়াতালি দিলাম, তারপরে...।'

কিন্তু মুরশেদের জয় হয়েছে, গোরা-সায়িবে মিলিয়ে দিয়েছে, ঝগড়া মেটানো হয়েছে, সব বৃত্তান্তই বলা হয়েছিল, অধর মাঝি অধর। সে তেমনি নির্বিকার। তার চারপাশে সব যেন নিরাকার। তার বৈঠা জলে পড়ছিল ছপ ছপ, সে পারাপার করে। তার দৃষ্টি না জলে না থলে, কথা নেই, শোনে কি না কে জানে। লোকটি এমনি বসে কথা বলছিল না। ছুটে এসে, সে তার কাঁধের ঝোলা ঠিক করছিল। আলখাল্লা না জোব্বা, যা হোক, দেখে নিচ্ছিল। ছি'ড়ে যাবার ভয় ছিল বোধ হয়। দেখে ভাব-ছিলাম, ছি'ড়বে না বা কেন। ও আলখাল্লার আর আছে কী। শতখানে শতেক তালি, এখানে মচকানো, ওখানে মচকানো। ওটার নাম এখন তালিখাল্লা হলেই ভাল হয়। নয় তো কাঁথাখাল্লা। তালিতে তালিতে এমন মোটা হয়েছে, কাঁথার মতই দেখাচ্ছে। তার ওপরে যত ঝাড়ে, তত ধুলো ওড়ে। কবে যে রঙে ছোপানো হয়েছিল, কে জানে। এখন গেরুয়া জলে ধোয়া। মাথার পাগড়িটা অন্তত আস্ত আছে, মনে হয়েছিল। সেটা খুলে যখন ঝাড়া দিয়েছিল, জয় মুরশেদ, সেটিতে অজস্র ছিদ্র আর গি'টে ভরতি। অথচ বাইরে থেকে এমন নিপাট ভাজ জড়াবার কেরামতি, সব ছিদ্র বন্ধন। এক কলসীতে নয়টি ছিদ্র, নবম পদ্মদলে। মন, ছিদ্র বন্ধন কর। পাগড়ির খেলা সেই রকম দেখেছিলাম। ঘাড় অবধি

ঝাবড়া চুলে, ঝাপটা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে, আবার পাগড়ি বাঁধতে দেখেছিলাম। তারপরে ওই শোন, ইছামতীর বুকের ওপরেই ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে ঃ

আমি এসে এই দুনে,
মন মুরশেদ না নিলেম চিনে।
আমি যাব কোথা কেউ বলে না
হয় নারে মনে,
আমি ছিলাম কোনখানে
আমারে আনলে কোনজনে।

অধর মাঝি বৈঠা টানে। আর একজন মন মুরশিদকে ডাকে। তার আগে যে অত কথা, হরেকেষ্ট মুগলের গাই দোয়ানো বিভ্রাট, অধর মাঝির কাছ থেকে কি তার কোন জবাবের প্রত্যাশা নেই। থাকলে শুনতে পেতে। গোয়াসায়িবে মিলিয়ে দিয়েছে, তাই দুটো কথা। ও হল কথার কথা। আর সব মনে মনে। যাবে তো পারে হে, নায়ের নাগাল পেয়েছ, আর তো কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার যত খুশি হাঁকো, 'মুরশেদ আমার কোন শিয়রে জাগে রে।'......

উনি সাঁইবাবা না দরবেশ, তা কে জানে। গোঁফ দাড়িতে পাক ধরেছে মাত্র, অথচ মুখ দ্যাখ, ফাটাফুটি চৌচির, যেন আদ্যিকালের মুখটি। বালা পরা হাতের চেহারাও তেমনি। যত ফাটার দাগ, তত শির। তবে এই চৌচির মুখে, চোখ ইছামতী। এই রোদ লাগা চলন্ত জলের মত। ছোট ফাঁদে, কালো তারা, থেকে থেকেই নড়ে চড়ে, ঝিলিক মারে। কেবল দাঁতের কথা বলো না মুরশেদ, পান খেয়ে খেয়ে পাকা ছোপ ধরিয়ে ফেলেছে। দরবেশের গলাটা কেবল ভরাট নয়। কম করে দুটো গ্রাম পেরিয়ে শোনা যাবে, এত জোর। শহরে হলে, কী হত, বলতে পারি না। এখানে তো দেখি, পালপাড়ের গাঙ শালিকেরা একবার মাত্র ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল। তারপরে আবার পেটের ধান্দায়, চঞ্চু-পাকে লড়াই। মন-মুয়াশদের ডাক তাদের শোনা আছে। ওপারের বনে বনে, আর এই আকাশের ছায়া পড়া নীল ইছামতীর আরশীতে, মন-মুরশিদের হাঁকে কোন হকচকানি নেই। যেন পালপাড় বল, বন বল, নদী বল, মায় অধর মাঝি বল, সব যেন কান পেতে ছিল। যেন পারাপারের কোথায় কিছু সুর ছিল আবাঁধা। এবার বাঁধা হল।

নিজের কথাই বা বাদ দিই কেন। 'আমি ছিলাম কোনখানে, আমারে আনলে কোন জনে' শুনব বলে, আমি কান পেতে ছিলাম না। তবু মনে হয়েছিল, কান পেতে-ছিলাম, আমার জানা ছিল না। প্রথম কয়েক কলি বেশ হাঁক পেড়েই হয়েছিল। তারপরে ইছামতীর জলে হাত ছুঁইয়ে, আঙুল দিয়ে একটু দাড়ি আঁচড়ে নেওয়া হয়েছিল। নিতে নিতে গুনগুনানি শুনে-ছিলাম, 'মুরশেদ আমার কোন শিয়রে জাগে রে, মুরশেদ আমার কোনখানে বিরাজে রে।'

বিরাজে সম্ভবত বিরাজ। আর গুন-গুনানি যে এমন বাঁশীর সুরের মত ভাটিয় টানে সমুদ্রে যেতে চায়, আগে কখনো মনে হয়নি। তখনই দেখেছিলাম, কালো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে, পানের পাকা ছোপের দাঁতের হাসি। ছোট ফাঁদের চোখে ধরা কালো তারার বারে বারে দেখা। দরবেশের চোখে বলা বুঝতে পারি, তার সঙ্গে হাস্য কিসের। তারপরেই, সন্দেহ যা করেছিলাম, 'বাবুর যাওয়া হবে কোথায়।'

বললাম, 'ওপারে।'

'না, বোলে, চিনতি পারলাম না কিনা।'

চুপ করে থাকতে চাও, থাকতে পার। তবে অধর মাঝিকে যা মানায়, তোমাকে কি তাই মানায়। তা ছাড়া দরবেশের গলা কি তোমাকে একটুও মাতায়নি। মুরশেদের ডাক। আমারে আনল কোন জনে। জবাব দিলাম, 'কেন, অচেনা লোক কি এ তল্লাটে আসা যায় না।'

'জয় মুরশেদ!'

বাতাস লাগলে যেমন পাড়ে পাড়ে ঢেউ লাগে, দরবেশের চোচির মুখে সেই রকম লাগল। বলল, 'তা আবার যায় না। অচেনা লাগল কিনা, তাই। বোলে, সাঁইয়ের ঠাঁই তো সবখানে, এ তল্লাটে বাবুকে দেখি নাই।'

অধর মাঝি কী বলে। কিছু না, কেবল বৈঠা ছপছপ। বললাম, 'কোথায় যাব, তা জানি না। ওপারে যাবার ইচ্ছা হল, তাই যাচ্ছি। নাম কী ওপারের।'

জিজ্ঞেস করলাম। দরবেশের ঝোলা থেকে তখন একখানি পুরনো ডুপকি বেরিয়েছে। ডুপকির চামড়ায় টোকা দিতে গিয়ে, সাঁই-বাবা হেসে মরে গেল। বলল, 'বাবু বলে কিগো অদরদা। পারের নাম জানে না।'

অধর সেই রকমই অ-ধরা। সে কেবল পারাপার করে। নৌকা এখন মাঝ দরিয়ায়। আরশীর তলায় তলায় টান। উজান কি আর এমনি ওঠে। গোটা সাগর চাপ দিচ্ছে। বৈঠা হাতে নাও, তবে বুঝতে পারবে, উজানী টান কাকে বলে।

দরবেশ আবার জিজ্ঞেস করে, 'তবে যাচ্ছেন কোথায়।'

'ও পারে।'

'ওপারে!' সাঁইবাবার আবার হাসি। বলল, 'কোন ঠিকানা নাই?'

লোকটার গলায় যেন হাসির বান আটকে রয়েছে। জবাব শুনলেই কলকলিয়ে ফেটে পড়বে। তবু বলতে হল, 'না।'

একেবারে দাড়ি ওড়ানো হাসি হাসল দরবেশ। বলল, 'মজার ব্যাপার তো। বাবু যে মুরশেদ খুঁজতি বেরয়েছেন। আমারে আনলে কোনজনে, আমি ছিলেম কোনখানে। তা আসছেন কোত্থিকে?'

আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বসল। মাঝি একটা কথা জিজ্ঞেস করেনি। সাঁই-বাবার কথা ফুরায় না। আমার বাসস্থানের আধা শহরটার নাম বললাম। সে অমনি ঘাড় নেড়ে বলল, 'গেছি গেছি, আপনার দেশ ঘুরে এসেছি। তা সেখেন থিকে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন, ওপারে যাবেন বলে।'

'হ্যাঁ'

'আর ওপারের নামও জানেন না।'

জানবার দরকার কী, তা নিজেই জানি না। নিজেকে যে কথা জিজ্ঞেস করিনি, তা এ লোককে বলি কেমন করে। আমি তো নামের খোঁজে আসিনি। আমি যেতে চাই, ওই আম জাম নারকেলের ছায়ায়, যে পথ গিয়েছে, সেই পথে। যে পথ আমার অদেখা, অচেনা। আমি ইছামতীর আয়নায় আকাশ দেখব মাথা নামিয়ে। গাঙ শালিকের ঝাঁক দেখব, যতদূরে চোখ যায়, তত দূরে। আর এমনি, মন-মুরশিদের ডাক যদি শুনি, তবে তাই শুনব। আমার অজানাকে নিয়ে এত হাসি কিসের। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম ওপারের।'

'ইটিন্ডা।'

নামটা শোনা শোনা লাগল। ম্যাপে দেখেছি কি বইয়ে পড়েছি, মনে করতে পারি না। দরবেশ বলল, 'তা বাবু, ঠিকানা যদি নাই, ওপারে গিয়ে কী করবেন। দু পাক না দিতেই তো সেই বডার।'

বডার মানে বর্ডার, দুই বাঙলার সীমানা। বললাম, 'তাই নাকি। তবে কোথায় যাব।'

তাই তো, মুরশেদের ভাবনা কেড়ে নিলে বাবু, দরবেশকে যে ভাবিয়ে তুললে। ওই বেরোবার মুখে, হরেকেষ্ট আর তার বউ-ই ফ্যাসাদ করেছে। বলল, 'কাছে পিঠে কোথাও মেলা খেলাও নাই যে বলব, একটু ঘুর দিয়ে যান।'

মেলার কথা শুনে উৎসাহিত হলাম। কিন্তু দরবেশের ঠোঁট উল্টে গিয়েছে, ঘড় নড়তে আরম্ভ করেছে। বলল, 'উঁহু, এক আপনার গে সেই সাখোরের রাসের মেলা। তাও ভাঙা মেলা, দূর বেজায়।'

অতএব দু পাকের ইটিন্ডাতেই ঘুরে আসা যাক। বাঙলাদেশের ওপারের রঙটা আলাদা হয়ে গিয়েছে কিনা, দেখে আসা যাবে। দরবেশ দেখি, ডুপকিতে আঙুলের টোকা মারছে, 'ডুপ ডুপ ডুপকি ডুপকে'। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। দেখলাম, দরবেশের চোখ বোজা, নাকের পাটা ফেলানো। তারপরে হুস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হুম, যা ভেবেছি, একেবারে তাই।'

কথার শেষে, পাকা ছোপের দাঁত দেখা গেল। চোখের তারা সিগারেটের ডগায়। বোঝার উপায় নেই, কাকে বলছে, কী বলছে। আবার বলল, 'বুইলে অদরদা, এ সেই তোমার পচা কাট পুরনো ছিরেট নয়। বাবুর ছিরেটের গন্দই আলাদা। এর অনেক দাম, না বাবু।'

মন গেল, মুরশিদ গেল, মেলা খেলাও গেল এখন বাবুর ছিরেটের গন্ধ দেখ আর দাম হিসেব কর। হতে পারে, এসেছি ইছামতীর কূলে। তা বলে কি, অমন কথা শোনা নেই। এমন সকালটা না মাটি হয় মনের বিরক্তিতে। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম, দূরে পলি চরের গাঙ শালিকগুলোর দিকে। শুনতে পেলাম, ডুপকিতে চাপা তাল, তার সঙ্গে গুনগুন, 'আসিবের কালো বান্দা দিল্লি মোত লিখে। এখন কেন কান্দিস বান্দা পরের মোত দেখে।'

দ্যাখ, এখন বিরক্ত হবে, না হাসি চাপবে। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরবেশের চোখ ফেরানো দূরের নদীতে। তবে আর এত কঠিন হওয়া কেন, যদি এখন মন খচ খচ করে। যদি এমন করে শাহুরেবুদ্ধি মাথা নিচু করে। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে বললাম, 'চলবে নাকি একটা।'

'জয় মুরশেদ। আপনার কম পড়বে না তো বাবু।'

দায় দেয়া জান টনটনে। প্যাকেট খুলে সিগারেট দিয়ে বললাম, 'না।'

'তবে বাবু দিয়াশলাইখানিও দেন।'

ঘোড়াই যখন দিয়েছি, চাবুক রেখে আর কী করব। দেশলাই বের করে দিতে গিয়ে দেখি, সিগারেট দু খণ্ড করে ছেঁড়া হয়েছে। ভাবছি, অর্ধেকটুকু আপাতত ঝোলায় যাবে। তার আগেই হাত বাড়িয়ে বলল, 'খাও গো অদরদা, বাবু দিলে।'

মাঝি তখন স্রোতের টানে, বৈঠা ছাড়তে পারে না। কেবল শোনা গেল, 'রাখ।'

দরবেশ বাকী অর্ধেক ধরালো গোঁফ দাড়ি বাঁচিয়ে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা বাবু, আপনি এলাত বেলাত গেছেন?'

বেলাত যদি বা বোঝা যায়, এলাত কোথায়, জানি না। কিন্তু হঠাৎ এলাত বেলাতের কথাই বা উঠছে কেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, 'না।'

সিগারেটে আর এক টান, একেবারে খতম। কোনরকমে শেষের কাগজের চিলতে ধরে জলে ফেলে দিয়ে বলল, 'না, আজকাল সবাই তো এলাত বেলাত যায় বাবুরা, তাই জিগেসা করলাম।'

ঠোঁট চেটে, দাঁত দেখিয়ে একটু চোখ ঘোরানো হল। অধর মাঝির নৌকা তখন ডাঙায় লেগেছে। মাঝি আগে নেমে, মাটিতে চেপে খুঁটি পুঁতে দিল। ওপার থেকে যেমন নিরলা দেখেছিলাম, তেমনি নিরালা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুটিকয় বেড়ার ঘর দেখা যায়। কোথায় যেন ছাগল ছানা ডাক দিয়ে উঠল। আর মোরগের তড়পানি তাড়া, মুরগীর কক্ককানি ছুট। ঘাটের জায়গাটা শক্ত, পাঁক নেই। দু আনা পয়সা দিয়ে নেমে গেলাম।

দরবেশও নামল। নামবার আগে আধখানা সিগারেট বাড়িয়ে ধরল। অধর মাঝি সেইটি নিয়ে কানে গুঁজল। দেখি, পাটাতন সরিয়ে, জল সেঁচতে বসল আবার। কিন্তু দরবেশের পারানি কোথায়। তার বুঝি পারানি লাগে না।

এ আমার আন চিন্তা। মাঝি অধর। যাত্রী দরবেশ। 'এ ওকে ছিরেট ছিঁড়ে দেয়, ও এর জন্যে দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এ নয়া জমানার কথা নয়, সাবেকী জমানার নিয়ম। এ নিয়মে পারানির কড়ি পাটনি

কী মূল্যে যাচাই করে, তুমি জানবে কেমন করে।

সামনের দিকে চেয়ে দেখি, পথ একটা গিয়েছে পূবে। হাঁটা যাক। হারাবার ভাবনা তো নেই।

তোমার না থাক. দরবেশের তো আছে। বলল, 'কোন দিকে যাবেন।'

'যাই একদিকে।'

হাঁটতে লাগলাম। দরবেশ পাশে পাশে। বলল, 'আবার ফিরবেন কখন।'

বলতে পারলাম না, পেটে জ্বালা ধরলে। বললাম, 'দেখি একটু ঘুরে ঘেরে। ফেরার নৌকো পাব তো?'

'তা পাবেন। সব সময়েই এক আধখানা পারাপার হয়।'

দু পা চলে, আবার বলল, 'বড় মজার ব্যাপার। বাবুরা যায় হিল্লি - দীল্লি। আপনি এলেন গাঁয়ে জঙ্গলে।'

'এমনি বেরিয়ে পড়লাম।'

'জয় মুরশেদ, বড় মজার ব্যাপার।'

আবার সেই হাসি। তারপরে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সত্যি কোন কাজ নাই বাবু?'

আশ্চর্য. লোকটা আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবছে নাকি। বললাম, 'এখানে আবার কাজ কী থাকবে।'

দরবেশ বলল, 'তা বাবু, কতরকমের কাজ থাকতে পারে। জমি জিরেত কেনা-কাটা, ধানচালের খোঁজ-খবর, পাটের আগাম দরাদরি। তারপরে গে আপনার, বড়ারের কাজকম্মো।'

'বর্ডারের কাজ?'

দরবেশ এবার একটু চোখ গোল করল। বলল, 'তা আর হয় না। আপনাদের মতন বাবুরা মাঝে মধ্যিই তো গাঁয়ে গেরামে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস টুলিস নয় বাবু, আপনাদের মতন সাফসুরত জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। মানে, বুঝতে পারছেন, খবর নেয়।'

গলা সে নিচু করলো আরো। বুঝতে পেরেছি। এতক্ষণ বেশ ছিলাম। এবারে যেন বাঙলা সীমানার দুর্গন্ধ পেলাম। এখন দুই বাঙলার একটা সীমানা আছে। বললাম, 'না, আমার কোন কাজ নেই। একটু আসতে ইচ্ছে হল, চলে এলাম।'

'সে বড় মজার ব্যাপার।' হেসে বলল, 'তবে, দুনিয়ার তাবত লোকের একটা ধান্দা থাকে তো, তাই জিগেসা করলাম।'

ধান্দার কথাটা শুনে বিরক্তি লাগল। এ দরবেশকে বোঝাবার কিছু নেই। রুষ্ট হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেন বেরিয়েছ?'

'আমি?' দরবেশ ঝোলা ধরে ঝাঁকুনি দিল। ডুপ্‌কিতে দুবার তাল দিয়ে, মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'মহাপেরাণীর ধান্দায় বাবু, পেটের ধান্দায়। যদি বলেন, কিসের মজদুরি, মুরশেদের নামের মজদুরি।'

কথাটা শুনে, মনের কোথায় একটা চমক লেগে গেল। মুরশেদের মজদুর এমন সহজে পেটের ধান্দার কথা বলে। সকলের ধান্দা আছে. তোমারও কি ধান্দা নেই। কার নামের মজদুরি তোমার, কিসের খোঁজে ফেরো। সহসা দরবেশের কথার কোন জবাব দিতে পারি না। সে তখন ডুপ্‌কিতে ডুপ্ ডুপ্ করছে। আর আমার চমকের আলোয়, মনের ভিতরে একটি ছেলেকে দেখতে পেলাম। যার চোখে পড়ন্ত বেলার উদ্বেগ, যার ঠোঁটে সাবধানী চুপি চুপি শব্দ, 'যাবো, যাবো, যাবোই।'

(ক্রমশ)

"খুঁজে দেব" না "খুঁজে নেব"? (১)

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী তাঁর নির্বাণ নামক পুস্তিকার ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখছেন: "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান, সেই সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ লেখিকা মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর তিনি অতিথি হন—"

ফুটনোটে আছে "কবি এঁর বাংলা নামকরণ করেছিলেন, বিজয়া। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি সেই নামেই এঁকে উৎসর্গ করেন।"

সকলেই জানেন, পূরবী কাব্যের অনেকগুলি কবিতা ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া (বিজয়ার) ওকাম্পোর উদ্দেশে লেখা। মোটামুটি বলা যেতে পারে, বুয়েনস আইরেসে (২) ১০ নভেম্বর, ১৯২৪ থেকে ১১ ডিসেম্বর, এবং পুনরায় ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪ কবি যে-সব কবিতা রচনা করেন, তার অনেকগুলিই বিজয়ার উদ্দেশে উৎসর্গিত। বুয়েনস আইরেস ছাড়ার পরও কবি বিজয়ার উদ্দেশে কবিতা রচেছেন এবং পূরবীর সর্বশেষ কবিতার ঠিক আগের (লাসট বাট ওয়ান) 'বদল' কবিতাটিতেও কবি এবং বিজয়াতে মধুরতম কাব্যরস-পরিপূর্ণ কথোপকথন আছে। এ-কবিতাটি অবশ্য বুয়েনস আইরেসে রচিত হয়নি; হয়েছে যে-জাহাজে করে কবি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইতালির পানে পাড়ি দিলেন। জাহাজের নাম জুলিয়ো চেজারে। (৩) সে কথা পরে হবে।

১৯২৪/২৫—১৯৪১ সালের মধ্যে কবি কয়েকটি গানে বিজয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন:

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে

কিংবা

জানিনে কোথায় জাগো
ওগো বন্ধু পরবাসী
কোন্ নিভৃত বাতায়নে

কিন্তু এ বাবদ কসম খেয়ে কিছু বলা যায় না।৪

কসম খেয়ে শুধু বলা যায়, নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি কবিগুরু শ্রীমতী Senora Vittoria de Estrada—বিজয়ার—উদ্দেশে লেখা। এটি কবি রচনা করেন ৬, এপ্রিল, ১৯৪১। অর্থাৎ পরলোকগমনের ঠিক চার মাস পূর্বে, অলমোসট টু এ ডে। কবি তখন অত্যন্ত অসুস্থ এবং এর পর আর দশটি মাত্র কবিতা লিখতে (ডিকটেট করতে) সক্ষম হন। এই কবিতাটি নিয়েই আমাদের আলোচনা:

"আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জন স্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

সুখ স্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর;

---

(১) শব্দতত্ত্বে তথা অন্যান্য তত্ত্বে যাঁদের কৌতূহল নেই তাঁরা যেন ফুটনোটগুলি না পড়েন। আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

(২) কবি গোড়ার দিকে বুয়েনোস এয়ারিসের (এটা ইংরেজের উচ্চারণ, এবং জোনস সাহেবের মতে—An English Pronouncing Dictionary—ইংরেজ সাত রকম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (!) নামটি উচ্চারণ করে) লিখেছেন। পরে শুদ্ধ—অর্থাৎ খাঁটি স্প্যানিশ উচ্চারণ জেনে নেওয়ার পর—লিখেছেন 'বুয়েনস আইরেসে'। কিন্তু উভয় 'রচনাবলী'র সম্পাদকমণ্ডলী আগাগোড়া বুয়েনোস এয়ারিস ছাপিয়েছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, এটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার। (রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পূরবীর পাণ্ডুলিপি দ্রষ্টব্য)। স্প্যানিশ অভিধান অনুযায়ী একেবারে বিশুদ্ধ স্প্যানিশ উচ্চারণ বু-এ্যা-ন-স আ-ই-র‍্যা-স। অর্থ 'উত্তম পবন' (Buono=উত্তম। লাতিন Bonafide=Good faith। ইংরেজি Benevolence, মার্কিন Bonanza) পক্ষান্তরে ইতালিয়ানে Malaria (Mal=দুষ্ট; Aria=পবন; সে যুগে ইতালিয়ানদের বিশ্বাস ছিল যে, দূষিত বাতাস থেকে ম্যালেরিয়ার জন্ম। ...বহু কবিতার নিচে যদিও কবি বুয়েনোস আইরেস লিখেছেন, আসলে সেগুলো ভিক্টোরিয়ার ভিলা সান ইসিদ্রো (ইংরেজি Saint Isidore) নামক ছোট্ট শহরে রচিত। শহরটি বুয়েনস আইরেসের কুড়ি মাইল উত্তরে, সমুদ্রপারে (পূরবী, 'বীণাহারা' দ্রষ্টব্য)।

(৩) আমার এক প্রিয় সখা হালে বাঙলা সাহিত্যের আসরে নেমে প্রথম পুস্তকে দিয়েই খ্যাতি অর্জন করেছেন—আমি তাঁর লেখার অনুরক্ত ভক্ত। তাঁর একটি পুস্তকে ছিল 'জুলে ভার্নে' (Jules Verne)। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে জানাই, শুদ্ধ উচ্চারণ জুল ভার্ন। এমন কি, যে-ইংরেজ বিদেশী উচ্চারণ বিকৃত করতেও ওস্তাদ, সে-ও বলে ভার্ন। মিত্রটি ঈষৎ অসন্তুষ্ট হয়ে যা লেখেন, তার বিগলিতার্থ, হালে কিছু কিছু লোক ফরাসী-জর্মন শিখে সনাতন, চিরপ্রচলিত উচ্চারণ বদলাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং যেহেতু তিনি ছেলেবেলা থেকে জুলে ভার্নে শুনেছেন, অতএব সেইটেই সই। ...কিন্তু এটা হালের ব্যাপার নয়। এই যে এখানে কবি জুলিয়ো চেজারে লিখলেন, এটা থেকে কে বুঝবে, এটা জুলিয়াস সীজার—ইতালিয়ান উচ্চারণে? এর বহু পূর্বে কবি লিখেছেন, শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে উটরাম—আমরা 'ছেলেবেলা' থেকে শুনে আসছি 'আউটরাম ঘাট'। চল্লিশ বছর পূর্বে 'রামানন্দ চাটুয্যে প্রচলিত 'বেথুন' না লিখে বানান করেছেন 'বীটন'—শুদ্ধ উচ্চারণ। ...আমি 'টিলক' লিখে খবরের কাগজে ঐ একই কারণে কটুবাক্য শুনি। আমার বহু পূর্বে (১৯২৪) স্বয়ং কবিগুরু 'টিলক' লিখেছেন, 'গে থলে' লিখেছেন। ১৮৮০-৯০ এর কাছাকাছি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জ্যোতি, রবিঠাকুর বিদেশী শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ বাঙলাতে তৈরে করার ভার নেন। অশুদ্ধ উচ্চারণের জগাখিচুড়ি এর আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁরা প্রারব্ধ কর্ম শেষ করতে পারেননি। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ই বিদেশী শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি সচেতন ছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'যাত্রী' দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রভাত মুখোর রবীন্দ্রজীবনী—'দক্ষিণ আমেরিকায়' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যে-বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহা নিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথ জগতে

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে-প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।"

এবারে দ্বিতীয় ছত্রের এই 'আসন'টির ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই কবিতাটি 'শেষ লেখা' পুস্তিকার পাঁচ নম্বর কবিতা। চার নম্বরের কবিতাতে আছে (রচনকাল ২৬ মার্চ, ১৯৪১—অর্থাৎ পাঁচ নম্বরের ঠিক নয় দিন পূর্বে লেখা):

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি।

পাঁচ নম্বর কবিতার 'আসন' ও চার নম্বর কবিতার 'চৌকি' যে একই 'আরাম চেয়ার'—শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর ভাষায়—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠক চার নম্বর কবিতা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু উপস্থিত সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়।

গণ্গাস্বরূপা তাঁর অনবদ্য পুস্তিকা 'নির্বাণ'-এ লিখছেন:

"বাবামশায় (কবি) দক্ষিণ-আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন, 'যদিবা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল, কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।...... স্প্যানিশরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড়ো কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।'৫ এই মহিলাটি তাঁর জন্যে কত দূর ত্যাগস্বীকার করতে পারতেন, তার পরিচয় পরে পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে অনেক হাংগামা করে জাহাজ তো ঠিক হলো. ভিক্টোরিয়া Cabin de luxe রিজার্ভ ক'রে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইং রুমের একখানি আরাম চেয়ার৬ জাহাজে তুলে দিলেন, এই নিয়ে জাহাজের ক্যাপটেনের সংগে তাঁর আরেকবার তর্ক লাগল। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে কেউ পেরে উঠত না। অত বড়ো চেয়ার জাহাজের দরজায় প্রবেশ করবে না, এই ছিল ক্যাপটেনের আপত্তি. কিন্তু শেষকালে ম্যাডামেরই জয় হলো। মিস্ত্রী ডাকিয়ে দরজা খুলে সেই চেয়ার ক্যাবিনে দেওয়া হলো।"

এর পর প্রতিমা দেবী লিখছেন,

"সেই চৌকিখানি সেবার নানা দেশ ঘুরে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেক দিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যমোর মধ্যে দেখলুম, ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুমে বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন। কোনো একদিন ওই কেদারায় বসে তাঁর বিদেশিনী ভক্তের কথা মনে পড়েছিল, তাই লিখেছেন:

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন"—ইত্যাদি।

প্রতিমা দেবী এর পর ভিকটরিয়ার আরো পরিচয় দিয়ে সর্বশেষে বলেছেন,

"তাঁর (ভিকটরিয়ার) বড়ো-বড়ো কালো পল্লব-ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপনময় আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ দেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত।৭ তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হোত ক্রাইস্টের পুরোনো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্ত মহিলার নিবেদন-মূর্তি।"

বাঙালী পাঠকের চোখের সম্মুখে সংগে সংগে ভেসে ওঠে স্বামীজীর সামনে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তি।

আশা করি পাঠক আমার সমস্যাটি এতক্ষণে বুঝে নিয়েছেন। আমার সমস্যা চৌকিটির সন্ধান নিয়ে। বারান্তরে সে আলোচনা হবে॥

---

৫ পূরবীর 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় কবি বলছেন, "দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে", পুনরায় "তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি" এবং সর্বশেষে "তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে"। এটিও বুয়েনস আইরেস-এ রচিত।

৬ 'আরাম চেয়ার'—যে চেয়ার আরাম দেয়, না "আর্ম চেয়ার"?

(৭) মাদাম ভিকটোরিয়ার ফোটোগ্রাফ পাঠক পাবেন বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে, পূরবী পুস্তকে॥

[তৃতীয় নয়ন—লতিকার]

পালাম না আমি পারলাম না, অঞ্জন! টগর! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা না করলেও অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। ইহলোকে এতকাল যার নরকভোগে কাটল, ক্ষমার কড়ি গুনে ঘাট পাড়ি দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে যাবে? আমি হেরে গেছি।

অঞ্জন, জানি তুমি আমাকে খুব ভয় পেতে। তুমি যে কত ফাঁপা, কত মেকি, পাছে আমি ধরে ফেলি—সেই ভয়। এখন, চলেই যখন যাচ্ছি, তখন তোমাকে বলতে বাধা নেই অঞ্জন, ধরে আমি প্রায় প্রথম দিকেই ফেলেছিলাম। কিন্তু সে জন্যে আমি চলে যাচ্ছি না। তুমিও আমাকে ধরে ফেলেছ, চলে যাচ্ছি আমি সেই জন্যে।

টগর, অঞ্জনকে তুই যা-যা বলছিলি, আমি আড়াল থেকে তার অনেকটাই শুনেছি। যা শুনতে পাইনি, তোদের চোখ মুখ দেখে আন্দাজ করে নিতেও আমার দেরি হয়নি।

সংকোচে তুই কাঠ হয়ে যাসনে টগর, তোর কোনও দোষ নেই। আমার যতদূর জানা ও ধারণা, তুই কিছু বাড়িয়েও বলিসনি।

তা-ছাড়া তুই না বললেও নিরঞ্জন বুঝতে পারত, একটু একটু করে বুঝতে পারছিল। প্রকাণ্ড একটা জুয়ায় আমি শেষ একটা চূড়ান্ত দান ধরেছিলাম মরীয়ার মত। কিন্তু দান ধরার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম, এবারও হেরে যাব। ব্যস, ফতুর, ডাঃ মিস লতিকা দাস ফতুর।

তুই আমাকে ঘৃণা করতিস টগর, আমাকে তুই তো ধরিয়ে দিবিই। আমাকে অন্তত আমি তো ভালবাসতাম, তবু আমাকেই কি ধরিয়ে দিলাম না?

নিরঞ্জন, তোমাকে কিন্তু আমি ঘৃণা করিনি। লম্বা-চওড়া কথা বলতে বটে, আগড়ুম, বাগড়ুম। তাতে কী। আমি তো জানতাম, ব্যাটা ছেলের জাতের ধাতই ওই। একটা বিদেশী নাটকে আছে না—তুমিই পড়ে শুনিয়েছিলে, 'ছেলেরা একটা বয়সে দেখতে চায় যেন কত বড় বীর, তার পরে কত স্মার্ট, চটপটে, চালাক চতুর; আর একটু পরে কী বিশ্বস্ত প্রেমিক; পরের অধ্যায়ে সে স্নেহময় কিন্তু ব্যক্তিত্বধর পিতা, সর্বশেষ পর্বে, কত জ্ঞানী, প্রবীণ, শক্তিমান—অঞ্জন মনে পড়ে? সেই নাটকের নায়কের মত তোমরা সবাই, তোমাদের সবই, ভাষাটা কী যেন?—মনে পড়েছে—হোয়াট-দি-হেল-এভার!

নিরঞ্জন, তুমিও তাই। তোমাকে আমি পাখির মত পড়েছিলাম। একটা বদমায়েসী বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে আসছিলে, জানতাম, আসলে আমিই টেনে আনছিলাম। কারণ আমারও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

বিয়ের পরে, স্বীকার করব অঞ্জন (এই ডাক নামটা মাঝে মাঝে এসে পড়ছে ভালবাসি বলে নয়—ছোট বলে মুখে আনা, কাগজে লেখা সহজ বলে) তুমি অন্তত কর্তব্য রক্ষা করতে চেয়েছিলে। আমার শরীরটা নাড়াচাড়া করেও সাড়া নেই দেখে অবাক, আহত হয়েছিলে।

"কী ব্যাপার, লতু?"

তোমার ফ্যাকাশে মুখ আমি ভুলব না।

"কিছু না। ছাড়, ভাল লাগছে না।"

উঠে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছ, আড়চোখে চেয়ে দেখেছি। হিংসা করেছি, কারণ স্নায়ুর উপর দিয়ে আমারও তো সোজা ঝড় যায়নি? চোখ পিটপিট করে ভেবেছি হাত বাড়াই, বলি, "দাও না, আমাকেও এক টান দাও", কিন্তু ঠোঁট কামড়ে ইচ্ছেটাকে ছিঁড়েছি। একটা কঠিন ভাব তখন করেছিলাম যে, সিগারেট ছোঁব না। শেষ পর্যন্ত দেখব—এক দু' রাউনড-এর হারকে হার বলেও মানব না।

অঞ্জন, দুই এক টান দিয়ে সিগারেট ছুড়ে ফেলে তুমি ফের বিছানায় এসেছ। ঠাট্টা করে ভারী আবহাওয়াটা উড়িয়ে দিতে বলেছ—"তোমার কী রোগ আমি কিন্তু সেটা ধরে ফেলেছি।"

ভীষণ আতঙ্কে আমিও তখন ফ্যাকাশে। বালিশটা আঁকড়ে ধরে বলেছি—"কী?"

হাসতে হাসতে তুমি বলেছ, "চিরকুমারী বা বেশি বয়স অবধি আইবুড়ি থাকলে এই

রকমই হয়। এক-একটা বয়সে শরীর এক-একটা জিনিস চায়। বাঁধাধরা সময়ে বাঁধাধরা খাবারের মতন। যাকে বলে রিফ্লেকস্ অ্যাকসন। পাবলভের কুকুরের সেই লালা ঝরার গল্প জানো না? এটা নিশ্চয়ই জানো যে, পিত্তি পড়ে গেলে খিদে আর পায় না? যৌবন চলে যেতে দিলে শরীরও আর নেয় না।"

সভয়ে দু' হাতে চোখ ঢেকে বলেছি—"তা না, অঞ্জন, তা না।"

ভ্রূ কুঁচকে বলেছ, "তবে? তোমার দেহে বিশেষ ঐশ্বর্য নেই, সেই লজ্জা?"

"তা-ও না।"

তখন আমাকে জোরে জোরে নাড়া দিয়ে বলেছ, "তবে—তবে কী। তা-হলে তো ধরে নিতে হয়, আমাকেই তোমার পছন্দ নয়। বিয়ে করলে কেন তবে, এতই যদি ঘৃণা।"

তখন বলিনি, এখন বলছি অঞ্জন, ঘৃণা নয়, নিস্পৃহতা। তা-ও বিশেষ করে তোমার সম্পর্কে নয়। তুমি এর একজন শরিকমাত্র, যেহেতু গোটা পুরুষ জাতটার তুমিও একজন। সামান্য দম্পতি হলে শয্যাতেই শুনেছি সেটেলমেনট হয়ে যায়, আমার বেলা সে আরও কুটকুট কণ্টক ফোটায়।

টগরের মুখে শুনে তো বুঝেছ, তোমাকে অপদার্থ, মেকি, ধূর্ত আর ধাড়িবাজ জেনেও স্বয়ংবরা হলাম কেন? আমার উদ্দেশ্য যখন উপায় সিদ্ধি, তখন বাছ-বিচারে আমার কাজ কী?

টগর তুই আমার স্বরূপ জানিস, কিন্তু আমার ইতিহাস জানিস না। ভেবে নে একটি মেয়ে, কিন্তু তার মেয়েলি লাবণ্য কিছু নেই। কিন্তু বুদ্ধিতে সে সকলের সেরা, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। আর মাথায় যেহেতু ঢ্যাঙা, স্কুলের থিয়েটারে ছেলেদের পার্ট পায়। দস্যু সরদার, সেনাপতি খল নায়ক, পালাতে এই সব চরিত্র থাকলেই ডাক পড়ত আমার। স্কুলে তো আর কো-এডুকেশন ছিল না—ওরা ছেলে পাবে কোথায়? পুং-ভূমিকাবর্জিত নাটক নেই বললেই হয়, ললিত লবঙ্গলতাদের দিয়ে বড় জোর পরী বা মায়াকুমারী হয়, পুরুষ নইলে একটা নাটক দাঁড়াবে কিসের জোরে? শিককাবাব জানিস তো? নারীচরিত্র হল কাবাব আর পুরুষ হল শিক, নাটকটাকে গেঁথে রাখে। নইলে পালা জমে না, অভিনয় দাঁড়ায় না। ছেলেদের পার্ট করে করে এই মেয়েটি ছেলেদের মত হয়ে গেল ভাবছিস, নাটকের ওথেলো যেমন কোন্ একটা ছবিতে দেখেছিলাম, ব্যক্তিগত জীবনেও ওথেলো হয়ে যায়?

ঠিক তা-ও নয়। স্কুলের পড়া শেষ হতে পশ্চিমে চলে গেলাম, কলেজে ভর্তি হতে। তুই যেমন এক মাসীর পাল্লায় পড়েছিলি, আমারও সেখানে তেমনই এক মাসী ছিল, কলেজেই পড়াত। তবে এই মাসী ছিল বালবিধবা, কী জানি কেন আর বিয়ে করেনি। পড়াশোনাতেই মজে ছিল, তখন বিধবা বিয়ের বিশেষ চলনও ছিল না। থাকলেও মাসীর বিশেষ ভরসা ছিল না। কারণ রূপে সে ছিল ধূমাবতী, দশ মহাবিদ্যার বিকটাকার একটি আকৃতি। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম, মাসী হাত বাড়িয়ে বলল—"আয়।" দেখলুম, এই মাসী নখ কাটে না। ধারালো অস্ত্রশস্ত্র হাতেই মজুত রেখেছে।

মাসী বলল, আয়। লোকে বলে ধূমাবতী, আর তোকে যা দেখছি, কালে কালে তুই মাতঙ্গী হবি। মাসী হল ধূমাবতী আর

বোনঝি মাতঙ্গী, হা-হা। খাসা জুড়ি।" (আবার হা-হা।)

পরে মাসীর মুখে এও শুনি যে, সে ছিল দেবারিগণ, আর তার বর ছিল নর। মাসী হাসতে হাসতেই বলেছিল—"রাক্ষসীর কপালে মানুষ টেঁকে না। পেটে যায়।" বলে মাসী তার চর্বিল উদরটা দেখিয়ে দিত।

এমনিতে মাসী কিন্তু মাংস ছুঁতো না। বলত, "একটা খেয়েই চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, সারা জন্ম এর জেরই চলবে। আর না।"

মাসীর বাড়িতে জাঠ, পাঞ্জাবী, পাহাড়ী, অনেক ছেলে পড়তে আসত। মেয়েও আসত। তাদের অনেকেই আমার ক্লাসের পড়ুয়া। আমার মগজে ধার বেশি, ওদের পিছনে ফেলে, পড়ায় এগিয়ে যেতে দেরি হল না। মাসীরও তাতে খুব গর্ব আর অহংকার—মাঝে মাঝে আমাকেই বলত ওদের পড়া দেখিয়ে দিতে। নিজে চলে যেত কম্বলের তলায়।

একদিন শনিবার, খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তাতে শীতকাল। আগুনে জ্বালিয়েও ঠাণ্ডা গেল না। পড়ুয়ারাও কেউ এল না। মাসী বলল, "আজ বরফ পড়বে", শার্সিটার্সি ভাল করে এ'টে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তার একটু পরেই এল পুরন্দর। জওয়ান জাঠ ছেলে, মাথায় একটু মোটা, কিন্তু ছাতি চওড়া, বয়স কত আর—তখন আঠারো হবে কি না হবে।

মাসী বলল, "তোরা দু'জনে মিলে পড়া তৈরী কর্, তুই-ই ওকে একটু দেখিয়ে দিস, আমি আর উঠব না।"

জানলার কাচে জল চুইয়ে পড়ছিল সেই জলে আবার একটা গাছ ডাল বাড়িয়ে গা ঘষছিল।

পুরন্দর, দেখলাম উসখুস করছে, আগেই বলেছি ওর মাথা একটু মোটা, সেদিন যেন আরও মন নেই, মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

একবার ভীষণ রেগে গেলাম আমি, "বুদ্ধু, এটুকুও বোঝ না" বলে ওকে থামতে ধরলাম। ধরলাম, কিন্তু সংগে সংগে ছাড়তে পারলাম না। ওই জানালার কাচে যেমন জলের স্রোত, টের পেলাম আমারও শরীরে তেমনই স্রোত বইছে, হাত সরাতে পারছি না।

সরিয়ে নিল পুরন্দরই।

হঠাৎ দেখি আমার হাতটা ঠকাস করে পড়ে গেছে কাঠের মেঝেয়, পুরন্দর খাতা গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখের কোণে বাঁকা হাসির ছুরি। বলল, "আমি আজ পড়ব না, পড়তে আসিওনি, শুধু হাজিরা দিয়ে গেলাম। একটা জায়গায় যাব, যেতেই হবে, বাড়ি থেকে কাল কিংবা পরশু যদি জিজ্ঞেস করে, টীচারজী যেন বলে যেন আমি এখানেই এসেছিলাম।"

বুঝলাম, কিন্তু তখনও সবটা নয়। পুরন্দর সাইকেল নিয়ে যেই গেটের বাইরে দাঁড়াল, অমনই সামনের বাড়ির গাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে এল শালোয়ার-কামিজ-পরা একটা মেয়ে, ওর বাইকের রড্-এ পা ঝুলিয়ে বসল।

পুরন্দর বলল, "দেরি হল, কসুর নিহ্ লেনা। আর-একটু হলেই শিকার হয়েছিলাম। আমাকে ফাঁসাতে চাইছিল টীচারজীর বাড়ি একটা মেয়েপানা লড়কি আছে না? হো-হো, হি-হি, হা-হা।

অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব শুনলাম।

টগর, সেদিন সব জামাকাপড় খুলে

[illegible] সামনে দাঁড়িয়ে আমি কেঁদে-ছিলাম।

ওই জানালা দিয়ে লুকিয়ে এসেও যেটুকু বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ছে, আমার সারা শরীর দিয়ে সেটুকু মেয়েলিয়ানাও কেন ঝরছে না? এর কোনও প্রতিকার নেই—কোন ওষুধ, খাদ্য, কিংবা পথ্য? তখনও হরমোন-টরমোনের নাম জানতাম না।

মাসী কি সব টের পেয়েছিল? ঘরে ঢুকে দেখি, কম্বলের বাইরে ও তার চোখ দুটো রেখেছে। পলক পড়ছে না।

সেই দুটো চোখ দিয়ে মাসী আমাকে ডাকল। সেই কম্বল দিয়ে আমাকে ঢাকল। দুহাতে জড়িয়ে একেবারে টেনে নিল বুকের মধ্যে। মাসীর গায়ে, অত শীতেও জামা ছিল না।

আমার কান্না শুকিয়ে যেতে থাকল গায়ে কাঁটা ফুটল।

টগর, তোকেও যখন পাগলের মত বুকে চেপে ধরি তুই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠিস, বলিস "ছেড়ে দাও লতুদি, ছেড়ে দাও, আমি তোমার মেয়ের মত"—মনে আছে? আর আমি চামুণ্ডা গলায় হেসে বলি, "মেয়ের মত? তুই বলছিস টগর, তুই আমার মেয়ের মত, কিন্তু একদিন আমাকে তো কেউ মেয়ে বলে ভাবেনি?"

আমি ছেড়ে দিইনি। কারণ আমার সেই কম বয়সে বিধবা মাসী ধীরে ধীরে যেমন আমাকে তার সব অভ্যাস দিয়েছিল, আমি আস্তে আস্তে তার মতই হয়ে গিয়ে-ছিলাম, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, তুই-ও তেমনই ক্রমে ক্রমে আমার মত হয়ে যাবি। সেই সাঁওতালি মেয়েটা, তারও আগে আরও কতজনকে আমি তো এইভাবেই বশ করে-ছিলাম।

তবু, টগর, তোর হাবভাব, স্বভাবে আমি একটু-একটু ভয় পাচ্ছিলাম। সন্দেহ হচ্ছিল, তোর কেস দুরারোগ্য, তুই কী বলব, তুই মেয়েই। অথচ মায়া, মোহ, যাই বলিস, এমনই ঘোর লেগে গেছে, রাখতে যেমন পারি না, তেমনি ওগরাতেও যে পারি না।

অদৃষ্টের যোগসাজস, নিরঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল তখনই।

অঞ্জন, এবার একটা ভীষণ সত্য শুনতে প্রস্তুত হও—তোমাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছি।

অন্তত করব বলেই জড়িয়েছিলাম। সর্বতোভাবে মেয়ে টগর, টগরকে এমনিতে রাখা যাবে না, ঘুষ দিতে হবে। অঞ্জন, স্বামি! প্রভো! তুমি ছিলে সেই ঘুষ। প্রথম দিকে পুরুষের প্রতি টগরের স্বাভাবিক যে আকর্ষণ সেটা বরদাস্ত করতে পারতাম না। তেলে-পড়া বেগুন-পারা হতাম। পরে আপস করতে বাধ্য হলাম। আধখানা যায় যদি যাক, বাকী আধখানা তো থাক।

তোমরা করতে লুকোচুরি, আমি মনে মনে হাসতাম। বোকা দুটো উটপাখি বালিতে মাথা খুঁড়ছে।

আমাদের সেই কপট কোর্টশিপ, আর চোখঠকানো হনিমুনের দিনগুলির কথা বাদ দিই—এই শহরে ফিরেও ডালে-ডালে পাতায় পাতায় আমাদের যে-আড়াআড়ি, তা কি কম চলেছে?

দুপুরে তুমি বলেছ, "সিনেমা যাবে?" আমি বলেছি, "কেস আছে", কিংবা "মাথা ধরেছে। খুব ভাল ছবি কি? তা-হলে একাই যাও না। না-হয় টগরও যাক।"

মুখ কাচুমাচু করে বলেছ "টগরও যাবে? তোমার কাজের—মানে বাড়ির কিছু দরকার-টরকার—"

হাসি চেপে বলেছি, "যাও না! সন্ধ্যার আগে ফিরো কিন্তু।"

সিনেমায় যাও বা না যাও, সন্ধ্যার আগে ঠিকই ফিরেছ তোমরা।

তখন তোমাকে আমি তাড়া দিয়েছি—"পুরুষ মানুষ সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কী থাকবে। ক্লাব-টাব কোথাও আড্ডা দিয়ে এস।"

তোমার তাসের জুয়ার নেশার কথা জানতাম কিনা? ফিরতে ফিরতে বারোটা-একটা।

এই সন্ধ্যাটুকু আমার হোক, এই সময়টুকু আমার থাক। তারপর তো কোন-না-কোন সময়ে বাড়ি তুমি ফিরবেই—তার পরের রাতটুকু কী, প্রহসন, না ট্র্যাজেডি? একখানা কাঠ ধরে নদী পার হওয়া যদি-বা যায়, একটু কাঠি আঁকড়ে রাত পাড়ি দেওয়া যায় কি?

সে এক বিষম কষ্ট। তোমার কষ্ট, আমার কষ্ট, ও-ঘরে একা বিছানায় কষ্ট টগরেরও।

অঞ্জন, এখন তুমি সবই জেনে ফেলেছ। জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির টগর তোমাকে সব কথা তিলে তিলে না বলে পারেনি। সে হয়ত বলে থাকবে ওই ক্লিনিক খোলার টাকাবাহানাও একটা কারসাজি, জুয়াচুরি।

কিন্তু টগর তোমাকে যা কোনদিন বলতে পারবে না, সেটা হল আমার নিজের একটা কীর্তি সম্পর্কে ভয়ংকর সংশয়। সেদিন অঞ্জন, তুমি তোমার মরণাপন্ন স্ত্রী নিরুপমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যেও চলে এসে ভাল করনি। নির্জ্ঞান, অবচেতন—এই সব যদি সত্যি হয়, তবে হয়ত তোমাদের বাড়িতে পা দিয়ে, ওই পরিস্থিতি বিচার করে, তোমাকে দেখে, তোমার স্ত্রীকে দেখে, আমার নিজেরই অজান্তে আমি হয়ত তখনই বীভৎস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি আজও জানি না অঞ্জন, আমার মাথা তখন 'পরিষ্কার ছিল কি না। কে জানে, যে-মৃত্যু ঘটবেই, তাকে ত্বরান্বিত করতে, তোমার অনুপস্থিতিতে, নিরুপমাকে ভুল একটা ইনজেকসনও তো দিয়ে থাকতে পারি! আমি জোর করে বলতে পারব না।

এই যে ভীষণ সংশয় আমাকে দংশন করছে, অঞ্জন, টগর—তোমরা সে-বিষয়ে কিছু জান না। কিন্তু তোমাদেরও তো চোখ খোলা ছিল, মানুষের মমতা, মন সব ছিল, তবু আর-একটা করুণ সত্য কেন টের পেলে না?

যদি টের পেতে, যদি একটু তাকাতে, তবে কি টগর আমাকে লুকিয়ে, ঠকিয়ে...।

আমি দেখা মাত্র ধরে ফেললুম যে। টগর লুকোতে চাইছিল। কিন্তু এই অবস্থায় গায়ে একটা গন্ধ ফোটে। লেডি ডক্তার না আমি?—পালাবে কোথায়?

ওর হাত চেপে ধরলুম।—"বল, বল বলতেই হবে তোকে।"

টগর, তোর চোখে জল এসেছিল, বললি "লতুদি, ছাড়, ছাড় আমাকে।"

অজ্ঞানের দ্রূণ তোর ভিতরে—ইস্, এত তাড়াতাড়ি।—টগর তুই ভয় পেয়েছিলি। ভেবেছিলি আমি শেষ করে দিতে চাইব।

না, টগর, না। তোর চোখে জল, তোর চোখে ভয়, তাই আমারও ভিতরে যে দ্রূণটা এসেছে, ফুটছে, তাকে দেখতে পাসনি; তোর লজ্জা তুই ঢেকেছুকে ঘোর, আমারটাকে আমি।

ভয় কী টগর, ভয় কী। কাছে আয়, আয় না! এত দিন যে-ভাবে ডেকেছি, এ-ডাকা সে-ডাকা না। আমার মুখ-চোখ বদলে গেছে, তোকে ডাকছি কানে কানে ক'টা কথা বলব বলে। দুই সখীতে যেমন বলাবলি করে।

কাছে আয়, তোকে একটা গোপন কথা বলি, এই অতি-চালাকের কথা, যার গলায় দড়ি। নিজের চালে, মাইরি বলছি, সে মাত। নিজেদের লুকোচুরি, খুনসুড়ি নিয়েই মত্ত হয়ে আছিস, তেরা কি আর দেখেছিস আমারও ভিতরে, ভাব-সাব, ধরন-ধারনে আমূল বদল ঘটছে? দেখিসনি। আজকাল যেখানে যত ভালবাসার কেচ্ছা আর কথা সব খুঁজে পেতে পড়ি, পাগলের মত মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠি, গায়ে একটু গন্ধ ঢালি, তোরা ভাবিস ভীমরতি। আড়ালে হাসিস।

আসলে হয়েছে কী জানিস, আমিও মরেছি, জলজ্যান্ত, জ্বলন্ত তোরা দুটিতে আমার গায়েও জ্বলুনি ধরিয়ে দিলি। তোদের ছোঁয়াচ লেগেছে, মা শীতলার কৃপা আর কাকে বলে, তারই রকমফের আর কী। ছেলে-মেয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ক কী, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছি।

কেউ জানল না, সুযোগই দিল না। কানাকানি কেন, আজ আমি চেঁচিয়ে বলে যাব টগর যে, আমিও, অনেক কালের একটা অভ্যাসের ফাটক থেকে বেরোবার রাস্তা খুঁজছি। দেখিয়ে যাব, আমিও পারি—হাসপাতালে যে-সব অস্ত্রোপচারের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, সে-সব ব্যতিরেকেই কী পুলক, কী রোমাঞ্চ, কী অসহ্য সেই আনন্দ আর বেদনা।

আসুক, আহা, লোভ মোহ সব ক'টা রিপু আমাকে গ্রাস করুক। হেসে হেসে আজ আমি সব ক'টার পেটে যেতে পারি।

ভয় কী টগর, কাছে আয়, আয় না! কানে কানে আবার বলি। তোর পেটে যেটা এসেছে, সেটা বল দেখি ছেলে না মেয়ে? পারবি না। আমার বুকে যেটা এসেছে, সেটা কী, আমি কিন্তু জানি—বলে দিতে পারি। মেয়ে, নির্ঘাত মেয়ে! বাড়ছে, দুলছে, দে দোল্ দোল্। বুকেও যে ছাই জরায়ু থাকে, এতদিনের লেডি ডাক্তারি বিদ্যে দিয়েও আগে তো কই জানিনি।

[তিনটি নয়নই মুদিত]

টাকার মূল্য হ্রাস, দ্রব্যমূল্য ও রপ্তানি বৃদ্ধি

মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পর আমাদের রপ্তানি ভারতীয় টাকার বেড়ে গেলেও বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন আগের তুলনায় কমে গেছে। বিনিময় হার পরিবর্তনের পরবর্তী তিন মাস অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের জুন, জুলাই ও আগস্টে রপ্তানি মোট ২৫৯ কোটি টাকা হয়েছিল। নতুন বিনিময় হারে ঐ টাকা থেকে ৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার অর্জন করা যাবে। ১৯৬৫ সালে ঐ তিন মাসে রপ্তানি ও তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন ছিল যথাক্রমে ১৯৭ কোটি টাকা এবং ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সনে একই সময়ে রপ্তানি ১৯৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রার আগম ৪১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে তা যথাক্রমে ১৮৮ কোটি টাকা এবং ৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ছিল। স্পষ্টত. রপ্তানির সম্প্রসারণ হলেও গত তিন মাসে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের পরবর্তী কালের অনিশ্চয়তা, শিল্পের আবশ্যক কাঁচা মাল ও কলকব্জার অনটন এবং পর পর দু বছর জলাভাব ভারতের রপ্তানির সম্প্রসারণ ব্যাহত করেছে। সম্প্রতি আমদানি নীতি উদার করা হয়েছে বলে আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক মাসে শিল্প উৎপাদন বাড়বে এবং রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেবে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পর থেকে এ বছর সেপ্টেম্বর শেষ পর্যন্ত সময়ের ভেতর সরকার মোট ৬৪৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের আমদানি লাইসেনস্ দিয়েছে। আগের বছর একই সময়ে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল ১৯৮ কোটি টাকার। নতুন লাইসেন্সের সুযোগ গ্রহণ করতে এবং আমদানিজাত কাঁচা মাল ও কলকব্জা শিল্পসমূহে আসতে স্বভাবত সময় লাগবে। আশা করা হচ্ছে, আগামী মার্চের ভেতর শিল্পের উৎপাদন সম্যক বৃদ্ধি পাবে।

আভ্যন্তরিক দ্রব্যমূল্য

প্রসঙ্গত, টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের পর অর্থাৎ ৫ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর এই সময়ের ভেতর দ্রব্যমূল্য শতকরা ৩·৪ ভাগ বেড়েছে। এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাবার তেল, সবজির মতো খাদ্যসামগ্রীর অনটন প্রধানত দায়ী। এ বছর খাদ্যশস্য উৎপাদন আশানুরূপ হবে না এ রকম আশঙ্কাও দাম বাড়ার আরেকটি কারণ।

রপ্তানির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, যা ভারতের সব চেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে সেই পাট দ্রব্যের (বিদেশে) বিক্রি জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ সালে (আগের বছরের তুলনায়) কমে গেছে। পাট দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস অবশ্য টাকার বিনিময় হার পরিবর্তনের আগে থেকে শুরু হয়েছে। কাঁচা পাটের ক্রমাগত অনটন এবং সেই কারণে মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্য কয়েকটি দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা তার জন্য মূলত দায়ী।

ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য

যে দেশের সঙ্গে ভারতের সব চেয়ে বেশি বাণিজ্য সেই ব্রিটেনের প্রতি ভারতের রপ্তানি দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালের বার্ষিক গড় ১৬৯·৮৯ কোটি (৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার) থেকে যোজনাকালে ১৬০·৫৬ কোটি টাকা (৩২ কোটি ডলার)-র নেমে এসেছে। যে সব দ্রব্যের রপ্তানি কমে গেছে তার মধ্যে আছে চা, কাঁচা পশম, বনজ তৈল, পাটের বস্তা, পশমের গালিচা ও কম্বল, অপরিশোধিত তামাক ও লাক্ষা।

ব্রিটেন থেকে ভারতের আমদানিও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে আমাদের ঘাটতি দ্বিতীয় যোজনা কালের ১৬০ কোটি টাকা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৭১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বেশ কয়েক বছর পর ভারতের অনুকূল হয়েছে। সরকার এখন রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ, চিরাচরিত নয় এরকম সামগ্রী যেমন, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, প্ল্যাস্টিক, মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ ও নৌ-সংক্রান্ত দ্রব্যের উপর মনোযোগ দিয়ে ব্রিটেনে আমাদের রপ্তানি বাড়াবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

সন্দেহ নেই, সমৃদ্ধ দেশগুলি বাণিজ্যের বাধানিষেধ তুলে না নিলে অনগ্রসর দেশগুলি তাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উন্নতি করতে পারবে না। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বাধানিষেধ না থাকলে ভারতের পক্ষে উৎকৃষ্ট শিল্পসামগ্রী প্রতিযোগিতামূলক দামে রপ্তানি করা সহজ হবে। ভারতের পাট ও কার্পাস শিল্পসামগ্রী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ভারতের আমদানির শতকরা ৯ থেকে ১০ ভাগ আসে পশ্চিম জার্মানী থেকে, কিন্তু ভারতীয় মোট রপ্তানির শতকরা ৩ ভাগের বেশি সে দেশে পাঠানো সম্ভব হয় না। ব্রিটেন যেখানে বছরে ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় দ্রব্য কেনে, সেখানে পশ্চিম জার্মানীর মতো সমৃদ্ধ দেশেও মাত্র ৩০ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় দ্রব্য আমদানি করার কোনো মানে হয় না। দরিদ্র দেশসমূহের বৈষয়িক উন্নয়নের স্বার্থে অগ্রসর দেশগুলির সহযোগিতামূলক ও উদার মনোভাব অবলম্বনের সময় এসেছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

কলকাতার ডায়েরি

মাঝে মাঝে মনে হয়, লালন ফকির বোধ হয় কলকাতা শহরের কথা ভেবেই গান বেঁধেছিলেন, 'তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।' এমনিতেই বেশীর ভাগ রাস্তা 'রিকেটী' দোকানপাট ফুটপাত ডিঙিয়ে "অনুপ্রবেশ" করছে সদর রাস্তায়, তদুপরি দু পা যেতে না যেতেই হয় মন্দির, নয় মসজিদ—পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। শহরটা ধর্মপ্রাণ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শহরবাসী যে তার ফলে ওষ্ঠাগতপ্রাণ সে খবর কজন রাখে?

ট্রাম চলছে, বাস চলছে, গাড়ি-ঘোড়া-ঠেলারও ঠেলাঠেলি, তারই মাঝখানে প্রতিদিন চমৎকার চলছে পুজো-অর্চনা, আজান-নমাজ। আরও আশ্চর্যের কথা হিসেব নিলে দেখা যাবে গত দশ বছরে ওই দেবমন্দিরের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ফুটপাতের কাছে সুবিধেমত গাছ পেলে তার গায়ে খানিক সিঁদুর লেপে যদি এক খানা পেতলের থালা ধরে রাখা যায়, তাহলে কিছু রোজগার তো হয়ই উপরন্তু মহিমা অর্জন করতে করতে বৃক্ষটিও অচিরে অলৌকিক গৌরবে বিভূষিত হয়। মনে আছে, বছর কয় আগে শিয়ালদহ স্টেশনের অদূরে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। পুলিস তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ না করলে ওই জায়গাতে নিশ্চয়ই জব চারনক সাহেবের চেয়েও প্রাচীন একটি দেবমন্দির গাছটিকে ঘিরে মাথা তুলে দাঁড়াত এবং পথচারীদের অনবরত প্রণাম পেতে পেতে সুরলোকে উত্তীর্ণ হত!

এই মন্দির-মসজিদের জন্যে শুনেছি, অনেক রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা বানচাল করতে হচ্ছে। টালিগঞ্জের রেলপুল পেরিয়ে আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার কথা প্রায়ই শুনি, কিন্তু হবে কী করে, একেবারে ট্রামলাইনের গা ঘেঁষেই ওই রাস্তার মন্দির-মসজিদ। টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছটায় যে দেবমন্দির তার চরণতলে ট্রাম বাসের যাত্রীরা প্রতিদিন কেন বলি হয় না, অবাক হয়ে যাই।
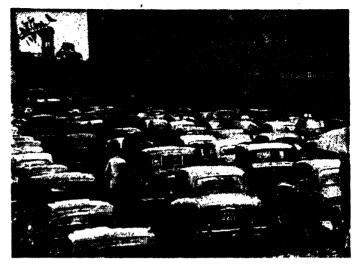
অবশ্য ওই রাস্তায় ট্রাফিক-জ্যাম করতে দেবস্থানগুলির পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি ঘটে না, ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে গাড়ি ঘোড়া আটকে পড়ে। আবার সোনায় সোহাগা হয় যেদিন ওই পাড়ায় রেস থাকে। মনে আছে এই কিছুদিন আগে টালিগঞ্জের রেলপুল থেকে ট্রাম ডিপো তক যেতে আমার পুরো পৌনে দু ঘণ্টা লেগেছিল। গাড়ি আটকা পড়তেই সামনে তাকিয়ে দেখি কুকুরটানা শেলজ আর উটের গাড়ি বাদ দিলে স্থলচর যাবতীয় যান গোটা রাস্তা দৈর্ঘ্য প্রস্থে দখল করে বসে আছে। সবচেয়ে বেশী ভিড় ওই দেবস্থানের সন্নিকটেই।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। ময়দানে তো একটি ঘোড় দৌড়ের মাঠ রয়েছেই, জনসাধারণের দুর্গতি বাড়াতে টালিগঞ্জে আবার দোসরা মাঠ কেন? ওই অঞ্চলে যখন লোকজনের ভিড় ছিল না, ছিল না যানবাহনের তেমন যাতায়াত, তখন না হয় এমন কিছু কষ্টদায়ক ছিল না, কিন্তু এখন লোকের আর গাড়ির ঠেলাঠেলির মাঝখানে রেস যেদিন থাকে হাজার হাজার ট্যাক্সি আর মোটর গাড়িতে গোটা রাস্তাটা অচল হয়ে যায়।

কলকাতার জন্যে দোসরা ঘোড় দৌড়ের মাঠের প্রয়োজন যদি নিতান্তই থাকে, তাহলে সদাশয় সরকার বাহাদুর শহরের বাইরে সোনারপুর বা বারুইপুরের দিকে তার ব্যবস্থা করুন। লোকালয়ের মাঝখানে অতিরিক্ত ঘোড়দৌড়ের মাঠ রাখার দরকার সত্যি সত্যিই আছে কি?

তাছাড়া আর একটি বিষয়ে বলার আছে। ওই রেসের মাঠের ভিতরেই গলফ খেলার মাঠ। শত শত বিঘা জমি জুড়ে বিরাট এলাকা, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গলফ খেলা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উত্তম, শহরে তার ব্যবস্থা রাখাও নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু চারধারে যেখানে জনবসতির ঘিঞ্জি, সামান্য একটুকরো খালি জায়গার জন্যে হা হুতাশ, সেখানে এতখানি ফাঁকা জায়গা, এতখানি সবুজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে আলাদা করে রাখা কি অপরাধ নয়? মাঠের সবুজ উড়িয়ে দিয়ে ওই জায়গায় বাড়ি তোলার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি না, আমার নিবেদন ও বিশাল এলাকাটি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে পাবলিক পার্ক করে দেওয়া হোক।

জানি, গলফ খেলায় আসক্ত আমারই কয়েকজন পরিচিত প্রিয়জন এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হবেন। তবে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, যাঁরা ওখানে গলফ খেলেন, তাঁদের অন্যত্রও অবসর বা চিত্তবিনোদনের নানারকম ব্যবস্থা আছে। ওই পাড়ার সাধারণ লোককে ওখানকার খোলা হাওয়া আর সবুজের শোভা থেকে বঞ্চনার বিকল্প যে আর কিছু দেওয়া হয়নি।

*

ফটিক আমার চেনা ছেলে। তাকে পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে দেখি, রিকশা-ওয়ালাদের সঙ্গে কুশ্রী ভাষায় কথা বলতেও শুনি, বখাটে বলেই তাকে এতদিন জানতাম; কিন্তু সেদিন মহাজাতি সদনে সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে সেই ফটিককে দেখে আমি অবাক। একেবারে অন্য চেহারা, কোথায় সেই নর্দামা নল পাতলুন, কোথায় সেই মুখের রুক্ষ ভাব—গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতিতে একেবারে ভব্যসভ্য ফুলবাবুটি।

আরও অবাক, বিলায়েত খাঁর সেতার এবং সুনন্দা পট্টনায়কের গানের সময় তার সমঝ-দারি হাবভাব দেখে। সে আমার পাশের সীটে

বলেছিল, স্পষ্ট অনুভব করলাম, গানের সংগীতটিকে সে মালকোষ রাগের খুঁটিনাটি বিশদভাবে বর্ণনাও করছিল। কোথায় মাথা নাড়তে হয়, কোথায় 'ওয়াহ্ ওয়াহ্' করতে হয়, সবই দেখলাম ওর জানা।

আর আমি? ওই সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, গান ভাল লাগে তাই গিয়েছি, তার বেশী কিছু নয়! কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল যথার্থে ফটিক আমার চেয়ে কত বড়।

সম্ভবত এটাই বোধ কলকাতার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গানের 'ফাংশনে' যেমন ভিড়, তেমনই ভিড় উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে। যে ট্রাম পোড়ায়, সেই ইডেন গারডেনে গিয়ে ভাল স্কেয়ারকাট মার দেখে তারিফ করতে পারে। যে দাঙ্গা বাধায়, সেই অন্য সময় রবিশঙ্কর আর বিলায়েতের বাজনার তুলনা করে রসিয়ে রসিয়ে। এবং চায়ের দোকানের আড্ডা ফেলে মিউজিক কনফারেনসের টিকিটও কাটে। সেই টিকিটের টাকা জমে দীর্ঘদিন ধরে, বরাদ্দ জরুরী খরচ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে।

ফটিক তাদেরই একজন।

চাণক্য

সংকটের ভিতরকার সংকট

স্যর্ গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের স্মৃতি-শক্তি ছিল অসাধারণ। ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলোচনার শেষে তিনি স্বয়ং তাঁদের কথাবার্তার এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। গান্ধীজীর হাতে এই সংলাপের একটি কপি তুলে দিয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের বক্তব্য তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পেশ করেছিলেন; তার জন্য তিনি গান্ধীজীর প্রশংসা অর্জন করেন। নেহরুর চিত্তেও সেই প্রথম তিনি আসন করে নিলেন। পরে তিনি ক্যাবিনেট-সদস্য হয়েছিলেন; নেহরুর আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা তখন কম ছিল না।

ক্রিপ্‌স-আয়েঙ্গার বৈঠকের দিনেই ভারতবর্ষের প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীজি ডি বিড়লা তাঁর বাড়িতে ক্যাবিনেট-মিশনের সদস্যদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজের টেবিলে ঘরোয়াভাবে নানা কথা হচ্ছিল। শ্রীবিড়লা তারই মধ্যে বলেন, "সকলেই এখানে বিশ্বাস করে যে, এবারে আপনারা ভারত-ত্যাগে বদ্ধপরিকর। তবে ভাইসরয় আর তাঁর ব্রিটিশ আমলাদের সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত বিশ্বাস কারও নেই। তা, ভাইসরয় যদি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে আপনারা কী করবেন?"

উত্তরে স্যর্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "সেক্ষেত্রে ভাইসরয়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা দেশে ফিরব।"

আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে স্যার স্ট্যাফোর্ড যে কতটা আশাবাদী ছিলেন, তাঁর এই মন্তব্য থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

১লা এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটানা আলাপ-আলোচনা চালান। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কী তাঁরা করতে চান, কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ তার একটা মোটামুটি আভাস পেলেন মিশনের কাছে। অতঃপর, নেতৃবৃন্দকে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার অবকাশ দিয়ে, মিশনের সদস্যারা ১৭ই এপ্রিল তারিখে কাশ্মীর চলে গেলেন।

গান্ধীজীর মুখ্য সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাস্ট ফেজ' ('শেষ অধ্যায়') বইয়ে সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি লিখছেন :

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যারা তখনও ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছেন। সেই সময়ে, ২৮শে এপ্রিলের অপরাহ্ণে, ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছ থেকে গান্ধীজী এইমর্মে একটি বার্তা পান যে, লর্ড পেথিক-লরেন্স আর স্যর্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখাটা ভাঙ্গী কলোনিতেও হতে পারে কিংবা ভাইসরয়-ভবনের উদ্যানেও হওয়া সম্ভব। তাঁরা শেষোক্ত স্থানেরই পক্ষপাতী। তার কারণ গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁরা একান্তে সাক্ষাৎ করতে চান। তাঁরা যদি ভাঙ্গী কলোনিতে আসেন, সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলায় গান্ধীজীই তাই ভাইসরয়-ভবনে গেলেন। সেখানে, উদ্যানের গোল জলাশয়ের পাশে বসে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা গান্ধীজীর সহকর্মী, তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে ক্যাবিনেট ডেলিগেশন সম্ভবত একটি চিঠি পেয়েছিলেন। অথচ গান্ধীজী কিংবা ওয়ার্কিং কমিটি সেই চিঠির বিষয়ে কিছু জানতেন না। ব্যাপার দেখে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান।"

এখানে উল্লেখ করা দরকার, ব্রিটিশ রাজনীতিক দুজনের কাছ থেকে গান্ধীজীর কাছে আমিই সেই বার্তা নিয়ে এসেছিলাম। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিদ্বয়কে আমিই এ-কথা জোর দিয়ে বলেছিলাম যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের একান্তে দেখা করা দরকার, এবং তাঁদের কোনও দোষ না-থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের যে গুরুতর ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। শ্রীপ্যারেলাল শুধু এই-টুকুই বলেছেন যে, একটি চিঠির কথা জানতে পেরে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান। যা তিনি বলেননি, তা আমিই বলছি। সেই চিঠিখানি মৌলানা আজাদের লেখা। সহকর্মীদের কিছু না-জানিয়ে মৌলানা আজাদই ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছে সেই চিঠি লিখেছিলেন।

মৌলানা আজাদ

কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মৌলানা আজাদের সংগে ক্যাবিনেট মিশনের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, মৌলানা স্বয়ং তাঁর 'ইনডিয়া উইন্‌স ফ্রীডম' ('ভারতের স্বাধীনতা লাভ') গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সমস্যা সম্পর্কে সেখানে (পৃ ১৩৯) তিনি লিখছেন, "সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত উদ্বেগ বোধ করছিল। এ-কথা সত্য যে, কয়েকটি প্রদেশে স্পষ্টত তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রাদেশিক স্তরে সে-সব অঞ্চলে তাই তাদের ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষে তারা ছিল সংখ্যালঘু; এবং এই ভয়েই তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিরাপদ থাকবে না।" ব্রিটিশ ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরাও বস্তুত এই একই কথা ভাবতেন। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে মৌলানা আর মিশনের মনোভাবে তাই কোনও পার্থক্য ছিল না; এ-ব্যাপারে তাঁরা পরস্পরের দরদী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে মৌলানার পন্থা ছিল এই যে, ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার যথাসম্ভব বিকেন্দ্রী-করণ করতে হবে, প্রদেশগুলিকে সর্ব-ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে, এবং কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ আর পররাষ্ট্র-নীতির দায়িত্ব। বস্তুত, এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর আর ক্যাবিনেট মিশনের মতের মধ্যে যে অনেকটাই মিল ছিল, মৌলানা নিজেই সে-কথা তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন। মিশন অতএব তাঁদের দুরূহ কাজে মৌলানাকে বন্ধু হিসেবে পেলেন। এ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়; মৌলানার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই ষোল-আনা ভালই ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যতই ভাল হক, তিনি যে তাঁর অধিকারের সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন, সে-দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। মৌলানা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, ইতিহাসে তিনি

জহরলাল নেহরু

একজন মহানায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন; উত্তরকাল বলবে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা তিনিই মিটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তারই ফলে ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাসে এইভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবার মোহেই তিনি তাঁর অধিকারের সীমানা ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন।

পণ্ডিত নেহরু ছিলেন অসামান্য নানা মানবিক গুণের সমন্বয়ে গড়া একটি ভাব-প্রবণ মানুষ। কংগ্রেস-শিবিরে তিনিই ছিলেন মৌলানা আজাদের সবচাইতে বড় বন্ধু। অন্যদিকে সর্দার প্যাটেলের সংকল্প ছিল বজ্রকঠিন; তাঁর বাস্তববুদ্ধিও খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। এবং কংগ্রেস-শিবিরে তিনিই ছিলেন মৌলানার সবচাইতে কঠোর সমালোচক। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মানুষটির চিত্ত যথেষ্ট উদার কিনা, সর্দার প্যাটেল সে সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। মৌলানার সততায় গান্ধীজীর আস্থা ছিল অটল। সর্দার এ-ব্যাপারে গান্ধীজীর সংগে একমত ছিলেন না। কিন্তু মৌলানা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীজী এবারে দেখতে পেলেন যে, মৌলানার পরিকল্পনার মধ্যে "পাকিস্তানের বীজ" রয়ে গিয়েছে। ২৯শে এপ্রিল তারিখে কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে কয়েকটি "মৌল নীতির" ভিত্তিতে মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, মৌলানার পরি-কল্পনার সংগে তার অনেকটা মিল ছিল। মিশন প্রস্তাব করলেন যে, মিশনের উদ্যোগে

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে, এইসব "মৌল নীতির" ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে, কংগ্রেস আর লীগের প্রতিনিধিদের ১লা মে তারিখে দিল্লি থেকে সিমলা যেতে হবে। এই প্রস্তাবের কথা শুনে গান্ধীজী ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মিশন অবশ্য গান্ধীজীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মিশনের উদ্যোগে সিমলায় গিয়ে মিলিত হবার আমন্ত্রণ রক্ষা করলে কোনও ক্ষতি নেই; কোনও পক্ষকেই এর ফলে কোনও বাধ্যবাধকতায় পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু গান্ধীজীর অস্বস্তি তবু গেল না। সিমলায় যেতে বস্তুত তিনি অস্বীকৃত হলেন। ক্যাবিনেট মিশন চাইছিলেন যে, গান্ধীজী সিমলায় চলুন; তার জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ লেগেই ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল ঘটেছে; কিন্তু সেটা যে ঠিক কী, তাও তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর অন্তরে তিনি কোনও সাড়া পাচ্ছিলেন না; আর সেই জন্যই তাঁর মনে হচ্ছিল যে, এ-সব ব্যাপার থেকে তাঁর এখন দূরে থাকাই ভাল। সেদিন সোমবার। গান্ধীজীর মৌন-দিবস। তাঁর চিত্তের এই অশান্তির কথা জানাবার জন্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এক-টুকরো কাগজে কয়েকটি কথা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। সেই চিরকুটটি আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। গান্ধীজী তাতে লিখেছিলেন :

"ক্রিপসসে কহো মেরি পার্টি বড় হোগি। সব ম্যানরভিলমে নহি ঠাইর সক্‌তে হে। ম্যয় কোহি খানা নহি চাতা হু। সিমলামে কোহি আরামসে রহনেকো মিল সকে তো খানা চাহ্তা। দিল চাতা হ্যায় না বাউ। মুঝে ছোড় দে তো ঠিক হোগা। ইয়ে সব মকারসে বাত করো।

নৈতিক বাত ভি হ্যায়। দুনিয়াকো এক বাত কহতে হ্যায় ঔর মেরে সে দুসরা কহতে হ্যায়। উসমে মুঝে কেঁও ডালে? তুম পর মেরে বিশ্বাস হ্যায়। ম্যয় মানতা হুঁ কি তুমহারা ঈশ্বর পর বিশ্বাস জিন্দা বিশ্বাস হ্যায়। ইস পর ঔর কুছ পুছনা হ্যায় তো পুছো।"

অর্থাৎ :

"ক্রিপসকে বলো যে আমার দল বেশ বড় হবে। ম্যানরভিল-এ (রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ি) এত লোকের জায়গা হবে না। আমি কোথাও যেতে চাই না। সিমলায় গিয়ে আরামে থাকতে পারি এমন জায়গা যদি পাওয়া যায়, তাহলেই যেতে চাইব। অন্তরের থেকে বুঝতে পারছি, আমি যেতে চাই না। আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয়। ব্রেকারকে (ক্রিপসের প্রাইভেট সেক্রেটারি) এ-সব কথা বোলো।

এর একটা নৈতিক দিকও আছে। এরা দুনিয়াকে এক কথা বলছে; আর আমাকে বলছে অন্য কথা। এর মধ্যে আমাকে কেন জড়াচ্ছ? তোমার উপরে আমার আস্থা আছে। আমি মনে করি যে, ঈশ্বরের উপরে যে বিশ্বাস তুমি রেখেছ, তা জীবন্ত। এ-বিষয়ে আর কিছু যদি জিজ্ঞেস করতে চাও তো করো।"

গান্ধীজীর মুখের উপরে বেদনার অভিব্যক্তি। দেখে আমার বুক যেন ভেঙে যাচ্ছিল। গান্ধীজী যে কী নিদারুণ অশান্তির মধ্যে রয়েছেন, ক্রিপসের কাছে গিয়ে তা আমি জানালাম। বললাম যে, এই সব আলোচনায় যোগ দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই; তাই তিনি সিমলা যেতে চান না। সব শুনে ক্রিপসও খুবই বিচলিত হলেন। গান্ধীজীর এই মনঃকষ্টের কারণ কী, তা জানবার জন্যে অনেকক্ষণ তিনি কথা বললেন আমার সংগে। ক্রিপস বললেন, যে-নীতির ভিত্তিতে তাঁরা কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন, তাতে গান্ধীজীর এত আপত্তি কেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। কেননা, গান্ধীজীর কংগ্রেস-দলের

গান্ধীজীর স্বহস্তে লিখিত চিরকুট

সভাপতি স্বয়ং মৌলানা আজাদের সঙ্গেই তো এ-ব্যাপারে তাঁদের একটা স্পষ্ট বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছে; বস্তুত মৌলানা এই মর্মে একটি চিঠিও লিখেছেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে যতই আভ্যন্তর মত-বিরোধ থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত যে তাঁর কথাই কংগ্রেস মেনে নেবে এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

গান্ধীজীর কাছে ফিরে গিয়ে আমি তাঁকে এই চিঠির কথা বললাম। শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রিপসের কথা তুমি ভুল শোননি তো? কিংবা কথাটা তুমি ভুল বোঝনি তো? আমি বললাম, আমার কোনও ভুল হয় নি, ক্রিপস ঠিক এই কথাই আমাকে বলেছেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে যখন আমার কথা হয়, তখন হোরেস আলেকজানডারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে চলে আসবার পর হোরেস আমাকে বলেন, "গান্ধীজী একটা ভয়ংকর রকমের আঘাত পেয়েছেন, ও'র মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি কী করবে, কথাটা ও'কে না-জানিয়ে তো উপায় ছিল না।"

গান্ধীজী সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলেন না। সকালে তিনি আমাকে বললেন যে, আমাকে ক্রিপসের কাছে যেতে হবে, এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে, চিঠিখানি তিনি গান্ধীজীকে দেখাতে রাজী আছেন কিনা। ক্রিপস বললেন, এটা গোপনীয় চিঠি: এবং মৌলানার এই গোপন-চিঠি পেয়ে মিশন ধরেই নিয়েছেন যে, মৌলানা নিশ্চয়ই এই চিঠির কথা তাঁর সঙ্গীদের জানিয়েছেন। যাই হোক, গান্ধীজী যখন এই চিঠির কথা জানেন না এবং চিঠিখানি দেখতে চান, তখন চিঠিখানি তাঁকে দেখানোই শ্রেয়। ক্রিপস অতঃপর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ ব্লেকারকে ডেকে চিঠিখানি আমাকে দিতে বললেন।

ভাঙ্গী কলোনিতে ছোট্ট একটি ঘরে গান্ধীজী থাকতেন। তার মেঝেয় বসে চিঠি-খানি পড়লেন তিনি। পাঠান্তে তাঁর সামনের ছোট্ট ডেসকের উপরে চিঠিখানি তিনি চাপা দিয়ে রাখলেন। ঠিক এই সময়ে খবর এল যে, মৌলানা সাহেব এসেছেন। গান্ধীজী ছাড়া ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছিলাম। আমি, রাজকুমারী আর প্যারেলালজী। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সেখানে আর-কেউ উপস্থিত থাক, মৌলানা এটা পছন্দ করতেন না। মৌলানা সাহেব এসেছেন শুনেই তাই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাঠের পারটিশন। রাজকুমারী আর প্যারেলালজী সেই কাঠের পারটিশনের পিছনে বসে গান্ধীজীর কাজকর্ম করতেন। গান্ধীজী তাঁদের এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, পারটিশনের এদিকে গান্ধীজীর সঙ্গে যারই কথাবার্তা হোক না, তা তাঁরা শুনতে পারেন। গান্ধীজী আর মৌলানা সাহেবের মধ্যে সেদিন যে-সব কথাবার্তা হল, তাও তাঁরা দুজনেই শুনতে পেয়েছিলেন। মৌলানা সাহেবকে গান্ধীজী সরাসরি প্রশ্ন করলেন, যে-সব আলোচনা চলছে, সে-বিষয়ে তিনি ভাইসরয়কে কোনও চিঠি লিখেছেন কিনা। উত্তরে মৌলানা বললেন, না, তিনি লেখেন নি। মৌলানা সাহেব জানতেন না যে, চিঠি লেখার কথা যখন তিনি অস্বীকার করেন, তখন তাঁর মাত্র কয়েক গজ দূরে গান্ধীজীর সামনে ডেসকের উপরে তাঁর সেই মূল চিঠিখানি রাখা ছিল।

কথাবার্তা বলে মৌলানা সাহেব বিদায় নেবার পর আমাকে ডেকে গান্ধীজী সেই চিঠিখানি আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, ক্রিপসকে এটি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। রাজকুমারী ইতিমধ্যে সেই
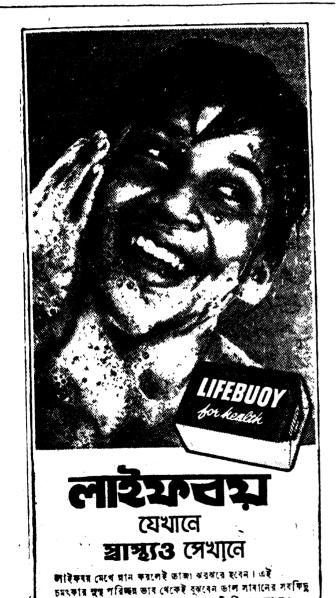
চিঠির একটি নকল রেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে সেই নকলও তাঁকে নষ্ট করে ফেলতে হল। গান্ধীজী চাইছিলেন না যে, এ-চিঠির কোনও নকল রাখা হোক। ছোট্ট চিঠি। তাতে যে খুব আপত্তিকর কিছু ছিল, এমন আমার মনে পড়ে না। যতদূর মনে পড়ে, মৌলানা তাতে লিখেছিলেন যে, গান্ধীজীকে নিয়ে, কিংবা মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে যে-সব সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষে বিশেষ উদ্বিগ্ন হবার কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত, কংগ্রেসকে দিয়ে মিশনের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করাতে পারবেন, মৌলানা যদি এমন কথাই তখন ভেবে থাকেন, তবে তা বলবার অধিকারও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। মৌলানা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, দেশের এতে উপকার হবে। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। সারা জীবন যাঁকে তিনি বিশ্বাস করে এসেছেন, এমন একজন সহকর্মীও যে এতটাই অসত্যাচারী হতে পারেন, এইটে দেখেই গান্ধীজী গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন।

গোটা পরিবেশে তখন দুঃখের ভাবটাই প্রবল। সর্দার বল্লভভাই এবং আর-একজন সহকর্মীর কাছে গান্ধীজী তাঁর মানসিক অশান্তির কথা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ-মহলে অতঃপর মৌলানার চিঠির কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। সব শুনে পণ্ডিতজী একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন। কিন্তু মজা এই যে, বন্ধুবর মৌলানা আজাদের উপরে তিনি চটলেন না; তাঁর রাগটা গিয়ে আমার উপরে পড়ল। তিনি ধরেই নিলেন যে, কাজটা আমি অনিষ্ট করার মতলব নিয়ে করেছি। পরে সর্দার প্যাটেল আমাকে বলেন যে, দেশের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যে ঐতিহাসিক আলোচনা চলেছে, তার সঙ্গে আমার যোগ-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গান্ধীজীর উপস্থিতিতেই পণ্ডিত নেহরু আমার সম্পর্কে বেশ-কিছু কড়া কড়া মন্তব্য করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, এই যোগ-সম্পর্কটা খুবই অস্বাভাবিক। আমার তো কোনও স্পষ্ট পরিচয় নেই; এমন কী, গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারিও তো আমাকে বলা চলে না। অথচ গান্ধীজীর প্রতিনিধি হিসেবে আমি কিনা দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করছি। এমন কী, রাত্তিরেও যাচ্ছি! ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তো আমার সঠিক পরিচয়টা পর্যন্ত জানেন না; তা হলে তাঁরা আমাকে এতটা বিশ্বাস করেন কেন? কেন আমাকে নানা গোপন-তথ্য পর্যন্ত জানান? পণ্ডিত নেহরু নাকি বলেছিলেন যে, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, এবং ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল ঠেকছে না।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেই সর্দার প্যাটেল আমাকে বললেন, "তোমার সম্পর্কে পণ্ডিতজীর মনে তো সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাঁর ধারণা, এর মধ্যে তোমার ভূমিকাটি বড়ই রহস্যজনক। শুনে আমার বিচ্ছিরি লাগল।"

ব্যগ্রভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাপুজী কী বললেন?"

বল্লভভাই বললেন, "বাপুজী মাত্র একটি কথাই বললেন। রাজ্যের আজে-বাজে অভিযোগ। কিন্তু তা-ও তিনি শান্তভাবে শুনে গেলেন, এবং অভিযোগ শেষ হবার পর শান্তভাবেই মন্তব্য করলেন, "উস্‌কো ম্যয় নহি ছোড়্‌ সক্‌তা।' (ওকে আমি ছাড়তে পারব না।) ব্যস, পণ্ডিতজী অতঃপর চুপ।"

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার অনুরাগে-বিরাগে বিমিশ্র সম্পর্কের সেই সূচনা। ১৯৬২ সনে ভারতবর্ষের উপরে চীনের আক্রমণ না-ঘটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার এই সম্পর্কই চলেছিল।

যাই হোক, সেই দিনই আমি আবার ক্রিপ্‌সের কাছে যাই। গিয়ে তাঁকে বলি যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যদি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তো এই অবস্থায় মাত্র একটি কাজই তিনি করতে পারেন; গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলতে পারেন। ক্রিপ্‌স সে-কথা মেনে নিলেন। তবে সর্বাগ্রে তিনি মৌলানার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে জানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রিপ্‌স বললেন, "প্রথমে আমি মৌলানার কাছে যাব, এবং তিনিই যাতে আগে সব কথা খুলে বলতে পারেন, তার সুযোগ দেব। মৌলানা যদি তাতে রাজী না হন, তো আমিই গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সব তাঁকে জানাব।"

সেই অনুযায়ী ক্রিপ্‌স প্রথমে মৌলানার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সব কথা তাঁর খুলে বলা উচিত। মৌলানা তাতে রাজী হলেন না। সুতরাং ক্রিপ্‌স অতঃপর নিজেই গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। সব শুনে লর্ড পেথিক লরেন্সও দুঃখিত হয়েছিলেন; ব্যাপারটা তাঁরও ভাল লাগেনি। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বললেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তিনিও এ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চান। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ক্রিপ্‌সের সঙ্গে তিনিও ভাঙ্গী কলোনীতে যেতে রাজী ছিলেন। তবে ভারত-সচিবের পক্ষে সেখানে যাবার একটা অসুবিধা তো আছে। গেলে হয়ত ব্যাপারটা নিয়ে নানান রকমের জল্পনা-কল্পনা চলবে। লর্ড পেথিক লরেন্স তাই আমাকে বললেন যে, সেদিন বিকেলে আমি যদি গান্ধীজীকে একবার ভাইসরয়-ভবনের পিছন দিককার বাগানে নিয়ে আসতে পারি তো বড়ই ভাল হয়। বাগানে বেড়াতে বেড়াতেই তাঁরা তিনজনে কথা বলতে পারবেন। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে কারও দৃষ্টি আকর্ষণও করবে না। ২নং উইলিংডন ক্রিসেনট হচ্ছে ভাইসরয়-ভবনের প্রাঙ্গণের মধ্যেই। সেখান থেকেই তাঁরা বাগানে যাবেন; ব্যাপারটা কারও চোখেই পড়বে না।

গান্ধীজী রাজী হলেন। সেদিন সন্ধ্যায়, প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠানের পর, মোগল-উদ্যানের পিছন দিক দিয়ে আমাদের গাড়ি ভিতরে ঢুকল। লর্ড পেথিক লরেনস আর স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রবেশ-পথেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গান্ধীজীকে নিয়ে তাঁরা বাগানের মধ্যে চলে গেলেন। দূরে বসে আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, বিষণ্ণ মুখে তিনটি মানুষ কথা বলতে বলতে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছেন।

গান্ধীজীকে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে, সিমলায় তাঁকে যেতেই হবে। যা-কিছুই ঘটে থাক না কেন, ক্যাবিনেট মিশন ও কংগ্রেস-নেতারা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে

তাঁর উপদেশ-পরামর্শ পেতে পারেন, তারই জন্য তাঁর সিমলা যাওয়া দরকার। তাঁদের অনুরোধে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত সিমলা যেতে রাজী হলেন। পরদিন সকালে তিনি ক্রিপসকে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠি-খানি এই ঃ

নয়াদিল্লি,
২৯শে এপরিল, ১৯৪৬

"প্রিয় সার স্ট্যাফোর্ড,

আমি যে কত বড় অস্বস্তির মধ্যে আছি, তা আপনি বুঝতে পারছেন না। কিছু-একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু তবু আমি সিমলা যাব। কাজের সূত্রেই অনেকে আমার সঙ্গে থাকেন। এই বিরাট দল নিয়ে রাজকুমারীর বাড়িতে ওঠা যাবে না। সুতরাং সরকারের কাছেই আমাকে আশ্রয় চাইতে হবে। জনা-পনর লোকের জন্য থাকবার জায়গা চাই। পরিচারকের প্রয়োজন হবে না। তবে তৈজসপত্র আর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাগদুগ্ধ দরকার হবে। ট্রেনে জায়গা রাখবার এবং কালকা থেকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করে রাখা চাই। সবকিছুই আমার অস্বাভাবিক ঠেকছে; তবে এও শেষ পর্যন্ত সত্য হল।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী আর তাঁর সঙ্গিদলের সিমলা-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে করে দেওয়া হল। সিমলায় রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ি 'ম্যানরভিল' থেকে সামার হিল-এর 'চ্যাডউইক' বিশেষ দূরে নয়। সেই বিরাট বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল গান্ধীজীকে। স্পেশ্যাল ট্রেনে আমরা সবাই দিল্লি থেকে কালকা গেলাম; কালকা থেকে সিমলা। সিমলায় তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্যে গান্ধীজী বিশেষভাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, তাঁর কন্যা ও শুশ্রূষাকারিণী মণিবেন, খান আবদুল গফফর খান এবং দুই কোয়েকার বন্ধু আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে, ব্রহ্ম সরকারের দপ্তর তখন ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মের গভরনর তখন সিমলার এই ;চ্যাডউইক'-এ থাকতেন। বাড়ির সঙ্গে অনেকটা জমি; তাতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠানের বিশেষ সুবিধে হল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সিমলায় পৌঁছেই গান্ধীজী আবার সেই একই অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। কিছুতেই তিনি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এই অস্বস্তিকে তিনি বলতেন 'সংকটের ভিতরকার সংকট'। হঠাৎ তিনি স্থির করলেন যে, আত্মিক এই সংকটের মুহূর্তে একমাত্র ঈশ্বরের উপরেই তিনি নির্ভর করবেন; অন্য আর কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেবেন না। এমন কী, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন সেই কয়েকটি নর-নারী, দিল্লি থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সিমলা এসেছিলেন, যাঁরা তাঁর অনাড়ম্বর অশন-ভূষণের উপরে লক্ষ্য রাখতেন, ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতেন, চিঠিপত্র লেখা আর অন্যান্য কাজ করতেন, এবং তাঁর বয়সে-জীর্ণ অশক্ত শরীরের সেবাযত্ন করতেন—তাঁদের কাছ থেকেও কোনও সাহায্য নিতে তিনি অসম্মত হলেন। সুতরাং ঠিক হল যে, পরের দিনই তাঁর সঙ্গিদল সিমলা ছেড়ে চলে যাবেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা যাত্রার উদ্যোগও করতে লাগলেন। যখন দেখলাম যে, তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী বিশ্বস্ত প্যারেলালজীও (গান্ধীজী বলতেন, 'ও ঠিক কুকুরের মত বিশ্বস্ত') সিমলা-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমি গান্ধীজীর কাছে গিয়ে বললাম, "বাপুজী, প্যারেলালভাইও তো চললেন। তাহলে আমিই বা আর কেন থাকি। মনে হয়, আমারও এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

গান্ধীজী বললেন, "না, তোমার যাওয়া চলবে না। তোমাকে আমার দরকার হবে। এই তিন ইংরেজকে আমি যতটা বিশ্বাস করি, তুমি তার চাইতে বেশী করো। আমি তোমার মতো অতটা বিশ্বাস করি না বলেই হয়ত এঁদের সম্পর্কে আমার বিচারে কিছুটা ভুল ঘটতে পারে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা নেই। সেই জন্যেই তোমাকে আমি থাকতে বলছি। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার ব্যাপারে তোমাকে আমার দরকার হবে।"

সুতরাং আমি থেকে গেলাম। গান্ধীজীর কাছে আর রইলেন তাঁর দুই কোয়েকার বন্ধু—আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডার। তা ছাড়া সদার বল্লভভাই আর বাদশা খান তো রইলেনই।

(ক্রমশ)

গোবিন্দ মাণিক্য ও গুণবতী
মাইকেল হানা ও মিরিয়াম মান্

কয়েকদিন আগে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মিলে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' অভিনয় করল। প্রাচ্যভাষা-বিভাগের নতুন থিয়েটারে শুক্র ও শনি দুরাত অভিনয়। সাতশ'র মত দর্শক। পরিচালক ছিলেন আমাদের বিভাগের নতুন সহকর্মী শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার। ইনি এখানে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য পড়ান। চর্যাপদ ও ভাষাতত্ত্বের ওপরে এঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদি দেখে এঁকে নির্বাচন করি। কিন্তু ইনি যে রবীন্দ্রসংগীত এবং অভিনয় ব্যাপারেও একজন উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেটা কাজে যোগ দেওয়ার পরে জানা গেল।

গত কয়েকবছরের মধ্যে এদেশে রবিশংকর এবং আলী আকবর খাঁ তাঁদের আশ্চর্য বাজনা শুনিয়ে গেছেন; এয়ার ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সাম্প্রতিক ভারতীয় চিত্রকলার একটি বড় প্রদর্শনী হয়েছে; এমন কি অ্যাডিলেড্ উৎসবের কল্যাণে মাদ্রাজের 'কলাক্ষেত্র' কথাকলি এবং ভারতনাট্যম্-এর সঙ্গে এ দেশী রসিকসম্প্রদায়ের কিছুটা পরিচয় পর্যন্ত ঘটিয়েছেন। কিন্তু যতদূর জানি ইতিপূর্বে এ দেশে ভারতীয় নাটকের অভিনয় হয়নি। প্রথম সমস্যা ভাষাগত। ভারতীয় কোনো ভাষায় অভিনয় হলে দর্শক বুঝবেন না, ইংরেজী তর্জমায় কথোপকথনের আড়ষ্টতা এড়ানো শক্ত। দ্বিতীয় সমস্যা কুশীলবের। এ দেশে যে অল্প কয়েকজন ভারতীয় আছেন তাঁরা অধিকাংশই গবেষক ছাত্রছাত্রী—অভিনয়ের দক্ষতা তাঁদের কাছে আশা করা অন্যায়। তৃতীয় সমস্যা হল, দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে দর্শকের মনের মিলন না ঘটলে রঙ্গমঞ্চে নাটক উতরোয় না, অথচ এই মিলনের জন্য ভারতীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে যতখানি অন্তরঙ্গ পরিচয় দরকার খুব কম অস্ট্রেলিয়ানেরই তা আছে।

মুখ্যত অতীন্দ্রের উদ্যোগে এবং ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহের ফলে এই সব সমস্যা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত 'বিসর্জন' অভিনয় করানো সম্ভবপর হল। বলা বাহুল্য মূল নাটক নয়, ইংরেজী তর্জমা। সকলেই জানেন কবি 'বিসর্জন' নাটকটিকে বেশ কয়েকবার ঘষামাজা করেন। ১২৯৭ সালের প্রথম সংস্করণের অনেক দৃশ্য ছোট করে, কয়েকটি দৃশ্য এবং অনেকগুলি চরিত্র বাদ দিয়ে, কোন কোন অংশ বদলে এবং নতুন অংশ যোগ করে ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে যে চেহারায় 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তার পার্থক্য প্রচুর। ১৩০৬ এবং ১৩৩৩ সালের সংস্করণগুলিতে তিনি আরও কিছু পরিবর্তন করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী থেকে 'Sacrifice' নামে যে ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয় বাংলা সবকটি সংস্করণের তুলনায় তা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং তার কাঠামো অনেক বেশী দৃঢ়বদ্ধ। অনুবাদে কাব্যরসের অনেকখানি লোপ পেয়েছে—এটা অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু আমার মনে হয় নাটকীয় গুণ কমেনি। রঘুপতি ও গোবিন্দ মাণিক্যের সংঘাত এবং জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে তার ট্রাজিক সমাপ্তি—নাটকের এই মূল আখ্যানবস্তু ইংরেজী তর্জমায় বোধ হয় অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট।

বইবাছার পরে কুশীলবের প্রশ্ন। এ দেশে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিজস্ব ছাত্র-অভিনেতা সম্প্রদায় আছে। স্বভাবতই নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা করার দিকে তাঁদের ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের বই অভিনয় করা হবে খবর পাওয়ামাত্র এদের মধ্যে কয়েকজন উদ্যোগী অভিনেতা অভিনেত্রী আমাদের বিভাগে খোঁজ করতে হাজির। তাদের কয়েকজনকে নেওয়া হল। বার্ট কুপার ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতিমান অভিনেতা, তাকে করা হল রঘুপতি, মাইকেল হানা গোবিন্দমাণিক্য এবং মিরিয়াম-মান গুণবতী। ভারতবিদ্যার ছাত্র রেমন্ড্ রিচ্-কে দেয়া হল জয়সিংহের পার্ট, আর সু-রাসেলকে অপর্ণার। অন্য সব ছোটখাট পার্টে আমাদের অন্য ছাত্রছাত্রীরা নামে। তারপর শুরু হয় রিহার্সাল—রোজ ক্লাসের পর সন্ধেবেলা। অস্ট্রেলিয়ান তরুণ-তরুণীর পক্ষে ভারতীয় চরিত্রের মূলে প্রবেশ করে তাকে ফুটিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। এই বাধা যে তারা শেষ পর্যন্ত অনেকটা অতিক্রম করতে পারে তার প্রধান কারণ যে আদর্শগত সংঘাত 'বিসর্জনে'র মূল উপজীব্য সেটি মাত্র মধ্যযুগের ত্রিপুরার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা সব দেশের এবং সব কালের। কবি নিজে তাঁর নাটকের এই সর্বজনীন অর্থের ইঙ্গিত দিয়েছেন ইংরেজি তর্জমার উৎসর্গপত্রে। "I dedicate this play to those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed for **the goddess of war.**"

মনে রাখা দরকার ইংরেজী অনুবাদটি প্রকাশিত হয় লন্ডনে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে। হিংসা বনাম প্রীতি, সমর বনাম শান্তি, ওল্ড টেস্টামেন্টের জিহোভা বনাম নিউ টেস্টামেন্টের যীশু, কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ বনাম রাধিকার কানু, মহাকালী বনাম অন্নপূর্ণা—এই মৌল সংঘাত সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের কল্পনা এবং বিবেককে আলোড়িত করেছে। যে মানবতন্ত্রী প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রধান সূত্র সেটি 'বিসর্জন' নাটকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট, এবং আমার অনুমান অস্ট্রেলিয়ান তরুণতরুণীর পক্ষে এই প্রত্যয়ে সাড়া দেওয়া সম্ভবত বাঙালী তরুণতরুণীর চাইতে বেশী কঠিন নয়।

কিন্তু মূল বক্তব্য নিত্যকালীন হলেও

জয়সিংহ ও অপর্ণা
রেমণ্ড রিচ্ এবং স্যু রাসেল

রঘুপতি ও জয়সিংহ
বার্ট কুপার ও রেমণ্ড রিচ্

নাটকের স্ত্রী-পুরুষেরা ত' ভারতীয় বটে। তাদের পোশাকে, আচার আচরণে দেশকালের বিশিষ্টতা ফোটানো দরকার। মেয়েদের পোশাকের এবং ভাবভঙ্গী রপ্ত করানোর ভার নিয়েছিলেন অতীন্দ্রের স্ত্রী এবং আমার গৃহিণী। রাজা, নক্ষত্ররায়, জয়সিংহ প্রভৃতির পোশাক সংগ্রহ করা হল স্থানীয় এক থিয়েটার কোম্পানীর ভাঁড়ার থেকে। রঘুপতির রক্তাম্বর, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি মাথা খাটিয়ে তৈরি করানো হল। মন্দিরের সামনে গ্রামের মেয়েদের একটি নাচের দৃশ্য রাখা হয়েছিল। অতীন্দ্রের কন্যা সুদেষ্ণা এদেশে আসবার আগে কয়েকবছর নাচ শিখেছে। সে আমাদের গুটি পাঁচেক ছাত্রীকে কয়েকমাস ধরে বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে যৌথনৃত্যে তালিম দেয়। গানের বদলে অতীন্দ্র আবহ-সঙ্গীতের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সব মিলিয়ে নাটকের ভারতীয় প্রকরণ মন্দ ফোটেনি।

কিন্তু যেটা আমাদের কাছে বিশেষ উৎসাহ-প্রদ ঠেকেছে সেটা হল দর্শকদের সংবেদন-শীলতা। অবশ্য নাটকের নিজস্বগুণ এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের দক্ষতা ও নিষ্ঠা ছাড়া কোনো বই জমতে পারে না। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আরো দুটি ব্যাপার আমাদের সাহায্য করেছে। যে সাতশ' দর্শক "বিসর্জন' দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক হয় ভারতবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রী, অথবা অস্ট্রেলিয়া-ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি সাহিত্য এবং দর্শনের সঙ্গে এ'দের কমবেশী পরিচয় থাকার ফলে তর্জমার দুরত্ব সত্ত্বেও নাটকের মর্মে প্রবেশ করা এ'দের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। সাধারণ দর্শকের মনে 'বিসর্জন' অথবা অন্য কোনো ভারতীয় নাটক কতখানি সাড়া তুলবে এখনই বলা শক্ত। তবে আমাদের পরীক্ষার সীমাবদ্ধ সাফল্যের ফলে ভারতীয় নাটক সম্পর্কে এদেশে কৌতূহল বাড়বে আশা করা অসঙ্গত নয়। আমাদের পরিকল্পনা আছে আসছে বছর রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়াও একটি-দুটি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করানোর—সম্ভবত 'মৃচ্ছকটিক' দিয়ে শুরু করা যাবে।

এই সূত্রে ভারতবিদ্যা বিভাগ এবং অস্ট্রেলিয়া-ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্পর্কে দুচার কথা বলি। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বয়েস-গিবসন্ ভারতবর্ষের প্রতি গভীর অনুরাগী। তাঁর উদ্যোগে বছর ছয় আগে এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপরে পরীক্ষামূলক-ভাবে আর্টস্ ফ্যাকাল্টিতে একটি এক বছরের কোর্সের ব্যবস্থা হয়। ১৯৬১ সালে বন্ধুবর আবু সয়ীদ আইয়ুব এই বিষয়ে পড়াবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তখন এই কোর্সে মোট ছাত্রছাত্রী ছিল আটজন। দুর্ভাগ্যবশত অধ্যাপক আইয়ুব মেলবোর্নে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং যদিও তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সৌজন্যের স্মৃতি এখানে এখনো উজ্জ্বল, তিনি মাত্র এক বছর পরে কলকাতা ফিরে যান। আমি বোম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এখানে এসে যোগ দিই ১৯৬৩ সালে; আমার সহকর্মী হন ডক্টর জে টি এফ জর্ডেনস্। ইনি বেলজিয়ামের লোক, লুভে' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দু-দর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ওপরে গবেষণা করে ডকটরেট পেয়েছেন, এবং তারপর কয়েকবছর ভারতবর্ষে থেকে সংস্কৃত চর্চা করেছেন। আমি এখানে আসার পরে ভারতবিদ্যায় পাসে তিন বছরের এবং অনার্সে চার বছরের কোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ভারতবিদ্যা বিভাগে ছাত্রছাত্রী ২০০ ছাড়িয়েছে। তিনজন অধ্যাপক ও দুজন টিউটর নিয়ে আমাদের এই বিভাগ। অস্ট্রেলিয়ার অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতবিদ্যায় স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে গত বছর ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিভারসিটিতে, পণ্ডিতপ্রবর এ. এল ব্যাশাম অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ইনি দীর্ঘকাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিক্যান স্টাডিজ-এ অধ্যাপক

লেন। এ'র লেখা The Wonder that as India প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পরে একটি অসামান্য গ্রন্থ। কিছুদিন াগে ইনি আমাদের বিভাগে অতিথি ধ্যাপক হিসেবে রামায়ণ এবং মেঘদূতের পরে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এ'র বর্তমান ী ভারতীয়া; তিনি শুনলাম আর্যদের তিহাসের ওপরে গবেষণা করছেন। ব্যাশাম নুষটি যেমন জ্ঞানী, তেমনি সজ্জন এবং রসিক। আশা করা যায় এ'র উদ্যোগে ্যানবেরাতে দু'এক বছরের মধ্যেই হয়ত ারতবিদ্যায় আর একটি বিভাগ গড়ে ঠবে।

আমাদের বি এ কোর্সে পাঠ্যবস্তুর ংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। পাসকোর্সে তিন ছরে পড়ানো হয় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ বং মহাভারত থেকে বাছাই করা কিছু ংশ; সংস্কৃত নাটক, কাব্য, গদ্যরচনা এবং াতককাহিনী; হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, ারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার তিহাস; ভারতীয় সভ্যতায় ইসলামের ান; আধুনিক ভারতবর্ষের সামাজিক-াংস্কৃতিক রূপান্তর ও রাজনৈতিক ইতি-াস; ভারতীয় সমাজের গঠন এবং বাংলা াহিত্য। সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থই ইংরেজী অনু-াদের মারফৎ পড়ানো হয়। এক একটি বভাগের তিন বছরের কোর্স মিলিয়ে একটি মজর (Major); এই রকম তিনটি মেজর এবং এক একটি খুচরো বিষয় নিয়ে বি এ পাস কার্স। আসছে বছর থেকে বাংলা ভাষায় তন বছরের আর একটি স্বতন্ত্র কোর্স শুরু হবে। পরে মারাঠী, হিন্দী এবং সংস্কৃতেও তিন বছরের একটি মেজর কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা আছে। আমাদের বিভাগের অনার্সের ছাত্ররা পাসের পাঠ্য-বিষয় ছাড়াও অন্তত একটি ভারতীয় ভাষা তিন বছর পড়তে বাধ্য; তাছাড়া ভারত সংস্কৃতির কোন দিক নিয়ে তাদের বিশেষ-ভাবে চর্চা করতে হয়, এবং চতুর্থ বৎসরে তারা একটি থিসিস্ পেশ করে।

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়ার অন্য কয়েকটি সভ্যতার ওপরে এই ধরনের কোর্স আছে। চীন এবং জাপান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হলেন হ্যারী সাইমন্; মধ্য প্রাচ্য (অর্থাৎ আরব এবং হিব্রু সভ্যতা) বিভাগ পরিচালনা করেন অধ্যাপক রোম্যান; ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বিভাগের প্রধান জেমস ম্যাকী। আমাদের এই চারটি বিভাগের সহযোগিতায় এখন একটি 'সেণ্টার অব এসিয়ান স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। এম এ পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা বিভাগগুলিতে এখন যেমন আলাদা চলছে তেমনি থাকবে। উচ্চতর গবেষণার কাজ এই নতুন সেণ্টারে হবে এবং বিভাগগুলি যুক্তভাবে সেণ্টার পরিচালনা করবে।

অধ্যাপক ব্যাশাম, লেখক ও শ্রীমতী ব্যাশাম

অস্ট্রেলিয়া-ইণ্ডিয়া সোসাইটির কাজ মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এখানে আসার পর দুটি জিনিস লক্ষ করি। আমাদের মত এদেশেও ক্লাসের বাইরে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যাঁরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহলী, তাঁদের সে কৌতূহল মেটানোর বিশেষ কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই। আমরা ঠিক করি প্রতিমাসে দুদিন আমাদের বাড়িতে কিছু ছাত্রছাত্রী এবং বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করবো। প্রথমে আট/দশজন নিয়ে শুরু করে এসে যখন আড্ডায় পঁচিশ/তিরিশজন আসতে শুরু করে তখন অনেকে প্রস্তাব তোলেন এবারে একটি প্রতিষ্ঠান করা যাক। ১৯৬৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রজন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটির পত্তন হয়। বর্তমানে সোসাইটির সদস্য প্রায় দুশোর মত, তার মধ্যে জন তিরিশেক ভারতীয়, বাকী এদেশী। এই প্রতিষ্ঠানের মারফত নিয়মিত-ভাবে ভারতীয় গানবাজনা, চিত্র প্রদর্শনী, সামাজিক অনুষ্ঠান, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা, সেমিনার, এবং আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পাদক হচ্ছেন এখানকার এয়ার-ইণ্ডিয়ার এজেন্ট শ্রীযুক্ত রুস্ ম্যাকলীন্। গত বছর এই সোসাইটি সেবাকর্মের জন্যে ভারতীয় রেডক্রসকে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছেন।

ফলত অস্ট্রেলিয়াতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহ এবং চর্চা দিনদিন বাড়ছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যে ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতার ওপরে অনেকখানি নির্ভর-শীল, এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই সেটা হৃদয়ঙ্গম করছেন।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, আমাদের দেশেও অন্তত কিছু জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি এ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছেন। কিন্তু কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে? আমাদের সাহিত্যানুরাগীরা কি প্যাট্রিক হোয়াইটের উপন্যাস অথবা কেনেথ স্লেশরের কবিতা পড়েছেন? আমাদের চিত্র-রসিকরা কি ডবেল, ড্রাইসডেল্ অথবা সিডনী নোল্যানের ছবির খোঁজ রাখেন? সবচাইতে বড় কথা, অস্ট্রেলিয়ার গণতন্ত্রের সমৃদ্ধ স্বকীয়তা নিয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে কি কোনো আলোচনা আরম্ভ হয়েছে? আমাদের দিক থেকে যদি কোনো আগ্রহ না থাকে শুধু কি একদিকের উদ্যোগে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠবে?

শিবনারায়ণ রায়
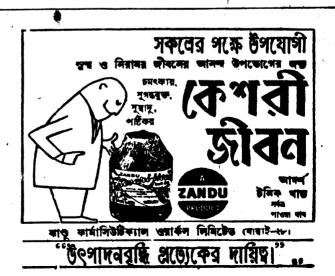
পুলিশের কাজই হচ্ছে চোর-ডাকাত-খুনী ধরা। সেটা অপরাধ নয়। তেমনি অপরাধ নয় বিড়ালের ইঁদুর মারাটা। কিন্তু আমি এ কাজকে দোষনীয় প্রমাণ করতে বহু আয়াস করে তুলেছিলাম এই ছবি। ছবির নামাকরণ করেছিলাম 'অপরাধী'।

একদিন সকালে আবিষ্কৃত হল আমাদের বাড়ির রান্না-ঘরের পিছনে একটা ধেড়ে-ইঁদুর মরে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে বিশেষজ্ঞর মত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম বেশ মোটা-সোটা ইঁদুর, দেহে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। তখনকার দিনে থ্রম্বোসিসের প্রচলন ছিল না, না হলে সেই জাতীয় একটা রোগ-জনিত কারণেই মৃত্যু ঘটেছে বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। যাই হোক, এটা যে হত্যা-কান্ড নয় সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম।

আমার এতটা নিশ্চিত হবার কারণ ছিল বৈকি! আমাদের এই বিড়াল ইতিপূর্বে এমন কোন কাজের নজীর রাখেনি যাতে করে ওকে সন্দেহ করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা জানি, এত বড় ইঁদুরকে ঘায়েল করা আমাদের ঐ বিড়াল কেন—বহু মানুষেরই কষ্টকর।

একদা স্কুলে কঠিন সংস্কৃত অক্ষরে-রচিত 'মার্জার কথা' বহু কষ্টে পড়েছিলাম। সংস্কৃত অক্ষর মন থেকে মুছে গেছে তবে মনে আছে সেই ভন্ড বিড়ালটির কথা। আমাদের বিড়ালটি কিন্তু আদৌ ভন্ড ছিল না, প্রকৃতই সে ছিল নিস্পৃহ, এবং মনে হত নবদ্বীপের কোন বিড়ালের বংশজাত। তার মাছ-মাংসে লিপ্সা নেই, রাগ-হিংসার প্রকাশ নেই, প্রহার করলেও প্রতিবাদের আভাস দেয় না। এমন কি চলা-ফেরায়ও যেন একটা অনিচ্ছার ভাব। তাহলে কী করে এই হেন বিড়ালকে আমরা এতদূর গর্হিত একটা কাজের জন্য দায়ী করতে পারি?

আমাদের বিড়ালের চরিত্র সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবহাল ছিলাম বলেই মনে মনে বিড়াল-ইঁদুরের একটা আকর্ষণীয় ছবি তুলবার কথা কল্পনা করলাম। ভাবলাম সহজেই ভাল ছবি তোলা যাবে। কীভাবে ছবি তুলব না তুলব তার সব প্ল্যান মনের ভিতর রেখে ছুটলাম, দোকানে ফিল্ম কিনে আনতে। বাড়িতে বলে গেলাম, কেউ যেন ইঁদুরটাকে না সরায়।

ক্যামেরা রেডি করে বিড়ালের সন্ধান করতে গিয়ে দেখি সেটা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। ব্যর্থ চিত্তে এদিক ওদিক করছি, আর একবার করে দেখে আসছি ইঁদুরটাকে। ওটাকে না শেষকালে কাকে নিয়ে যায়!

বেলা দুপুর পর্যন্ত বিড়ালের দর্শন পেলাম না। ওদিকে স্নান-আহারের জন্য তাগাদ আসছে ঘন ঘন। মনের ভিতর দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়ে অবশেষে চাকরটাকে ইঁদুরের পাহারায় নিয়োগ করে আমি স্নানে গেলাম।

আহারে বসেছি মাত্র, দেখি বিড়ালটা কোথা থেকে ঘরে এসে ঢুকল। মনের আনন্দে আমি তখনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করলাম না। ভাবলাম, বিড়ালকে একটু খাইয়ে ভাব জমিয়ে নি-ই, তাহলে ছবি তুলতে বেগ পেতে হবে না।

কোনমতে আহারের ঝামেলা চুকিয়ে বিড়ালটিকে নিয়ে চলে গেলাম রান্না-ঘরের পিছনে ঘটনাস্থলে। ভেবেছিলাম ইঁদুর পেলেই বিড়াল কামড়ে ধরে মুখে তুলবে, না হয় ওটাকে নিয়ে আনন্দে খেলা করবে—আর তখনি আমি ছবি তুলব একটার পর একটা। কিন্তু এ কি! ক্যামেরার ফোকাস-স্পীড সব ঠিক রেখে যখন ইঁদুরের কাছে বিড়ালকে বসালাম, তখন লক্ষ্য করলাম ওর ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। সেই নিস্পৃহ বৃন্দাবনী ভাব নিয়ে বসে রইল। তাও বেশীক্ষণ থাকতে চায় না, চলে

যেতে চায়। বুঝলাম সব প্ল্যান মাটি হল। সেই সকাল থেকে হুজ্জতি করে শেষকালে ব্যর্থ হওয়ায় মেজাজটা বিগড়ে গেল। দিলাম বসিয়ে দু'তিন ঘা। অনেক সাধু-পুরুষ থানার লক-আপে এক-নম্বর, দু'নম্বর দাওয়াইর ঠেলায় স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে, কিন্তু আমার সাধু-বিড়ালের তেমন কোন আভাসই পেলাম না। যেখানে যেভাবে বসিয়ে দেই, সেভাবেই সে বসে থাকে। কী আর করি, শেষকালে ইঁদুরের পিছনে একবার বসিয়ে একটা ছবি তুললাম। ইঁদুরটা ফেলে দিয়ে এলাম রাস্তায়।

*

আমার 'অপরাধী' ছবি কয়েকটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল এবং প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছিল। ছবিটি বেশ ভাল লেগেছিল আমার। কিন্তু এই ছবি হাতে নিয়ে যখনি ছবি তোলার কাহিনী স্মরণ করেছি, তখনি এই বিড়ালের অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জেগেছে মনে—বিড়ালটি সত্যিই কি অপরাধী ছিল? না আমিই ওকে অপরাধী সাজিয়ে নিজে অপরাধ করেছি?

—নীরোদ রায়

"এ জীবন লইয়া কি করিব ?"

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীকে একটি পর্বের অন্তর্গত ধরা হয়ে থাকে। আমার বিবেচনায় এরূপ বিভাগ সর্বাংশে সত্য নয়। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার মূলে প্রেরণা সৌন্দর্য সৃষ্টি। "সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" সেই উদ্দেশ্যেই এ দুটির সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে এদের মুখ্য উদ্দেশ্য রূপ সৃষ্টি। বস্তুত এ দুই ভিন্ন নয়, ভেদ কেবল ভাষায়। জগৎ তো সৌন্দর্যময়, তবে কবি কি কেবল অনুকারী মাত্র? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন তা নয়। "যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।" কপালকুণ্ডলার সমুদ্রের বর্ণনা পড়লে বুঝতে পারা যাবে, "স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত" কেমন করে সম্ভব। মোট কথা এই যে, এ দুই উপন্যাসের মূলে সৌন্দর্য সৃষ্টি বা রূপ সৃষ্টির তাগিদ, তদতিরিক্ত কিছু নয়। ঠিক এই অবিমিশ্র প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন উপন্যাস রচনা করেননি; পরবর্তী উপন্যাসসমূহ এরূপ অমিশ্র প্রেরণার কীর্তি নয়; সৌন্দর্য সৃষ্টির ইচ্ছার সঙ্গে নূতন ইচ্ছা সংযুক্ত হয়েছে।

মৃণালিনীর সূচনাও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদে, কিন্তু গল্পের স্রোত লেখককে অন্য খাতে এনে ফেলেছে। বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী লিখতে গিয়ে তাঁকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যে টেনে এনেছে। তাঁর পরবর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের মূল এখানে। আরও একটি কথা, মাধবাচার্য ও হেমচন্দ্রের দেশোদ্ধার আকাঙ্ক্ষাও একটি নূতন প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে, যে-প্রেরণা পুষ্টতর দেহে ও বর্ধিততর বেগে জয়ী হয়ে রাজসিংহে গিয়ে স্পৃহনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। তাঁর যাবতীয় ইতিহাসাশ্রয়ী ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের (দুর্গেশনন্দিনী বাদে) পিছনে রয়েছে বঙ্গদর্শন ও প্রচার প্রভৃতিতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এ দুয়ে মিলিয়ে পড়লে তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগুলি হিমাদ্রির চিরহিমানী, উপন্যাসগুলি তারই বিগলিত মূর্তি।

অতঃপর ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন যে, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়, সেই জন্যই সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখক মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরকে লিখতে আহ্বান করেননি; যে-সব কনীয়ান লেখকের সহযোগিতায় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার আশা তিনি করেছিলেন, কেবল তাঁদেরই আহ্বান করেছেন।

বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্তের দপ্তর প্রায় সমার্থক। দুয়েরই সূচনা একই সময়ে, সম্পাদক ও কমলাকান্ত দুজনেই বহুভাবের ভাবুক, বহু চিন্তার চিন্তক, দেশাত্মবাদী ও আদর্শনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকল্প কমলাকান্ত। অনেকে কমলাকান্তের দপ্তরে ডিকুইন্সির আফিঙখোরের জবানবন্দীর ছায়া দেখেছেন। এ ধারণা ছায়ার মতোই অলীক। কেননা, কমলাকান্ত বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, ডিকুইন্সির রচনা খেয়ালের সমষ্টি মাত্র।

কমলাকান্তের দপ্তরকে বঙ্কিম সাহিত্যের watershed বা জলবিভাজনশিখর বলেছি; কমলাকান্তের দপ্তর না বলে বঙ্গদর্শন বললেও ভুল হতো না। কমলাকান্তের পর থেকে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইলে মানুষের দুঃখের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, গভীরতর সুর বেজে উঠেছে তাঁর রচনায়। তবে এগুলিকেও প্রধানত সৌন্দর্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত বলা চলে। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তিনখানিতেও চোখের জল আছে সত্য, তবে দূরবর্তী কালের অশ্রু আমাদের হৃদয়ে এসে পৌঁছয় না। বিষবৃক্ষ প্রভৃতির চোখের জলের উষ্ণ বিন্দু হৃদয়ের উপরে পড়ে, সংশয়ের অবকাশ মাত্র রাখে না। কমলাকান্তের "মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে অন্য সুখ চাই না;" এবং "আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?" —এ রজনী উপন্যাসের অমরনাথেরও কথা বটে। দপ্তরে কথিত রূপবহ্নিতে দগ্ধ নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল; ইন্দ্রিয়-বহ্নিতে রোহিণী, দেবেন্দ্রনাথ ও হীরা; জ্ঞানবহ্নিতে চন্দ্রশেখর;

(অভি) মান বহ্নিতে ভ্রমর; ভোগ-বহ্নিতে সীতারাম; ধন ও মন-বহ্নিতে আওরঙগজেব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস "সংসার বহ্নিময়। কমলাকান্তের দপ্তর রূপে জলবিভাজন রেখার উত্তরাংশ বহ্নিময়। এই সময় থেকে সাহিত্য সৃষ্টির অপর উদ্দেশ্যটাও ক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছে। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।" "সাহিত্য ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম।" সূক্ষ্ম বিচারে নামলে দেখা যাবে যে, সত্যে, ধর্মে ও সৌন্দর্যে মূলগত পার্থক্য নাই, তবে পার্থক্য দাঁড়ায় ঝোঁকের ফলে। ত্রয়ীতে ঝোঁকটা ধর্ম ও সত্যের উপরে; দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে সৌন্দর্যের উপরে; রাজসিংহে এই দুই ঝোঁকের ভার সাম্য, Artist ও Moralist-এর সমন্বয়। এই কারণেই রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পের পরাকাষ্ঠা।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামের ব্যাক গ্রাউন্ড কিছু জটিল ও বিস্তারিত। কমলাকান্তের দপ্তরের একাধিক নিবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও বঙ্গদেশের কৃষকের সারাংশ উপাদানও প্রেরণারূপে

...নন্দমঠের দেহ গঠিত করে তুলেছে। ...মার দুর্গোৎসবের অন্তর্গত মৃন্ময়ী-মৃন্ময়ীর বর্ণনা হুবহু আনন্দমঠে গৃহীত। ...মার দুর্গোৎসব ও একটি গীতের মধ্যে ...জাকরে আনন্দমঠ। ইংরাজ আমলে ...ঙালী কৃষকের দুর্দশার যে বিবরণ বঙ্গ-...শের কৃষকে প্রদত্ত, মুসলমান ও ইংরাজ ...মলের আলো-আঁধারি অবস্থা সম্বন্ধে ...ধ করি তা আরও অধিক প্রযোজ্য। ...কটি গীতের শেষে মুসলমান আক্রমণের ...ীতিতে দেশের শঙ্কিত পাংশুলে অবস্থা ...র্বরূপ পাওয়া গিয়াছে মৃণালিনীতে। ...মলাকান্তের বিড়াল রূপকভেদে বঙ্গ-...দেশের কৃষক ছাড়া আর কে?

আনন্দমঠে লেখকের ঝোঁকটা কিছু প্রবল ...রাজ ও রাজনীতির উপরে; দেবী চৌধুরাণীতে এসে সেই ঝোঁকটা প্রবল হয়ে ...ঠেছে চিত্তসংযম ও চিত্তশুদ্ধির উপরে; ...ঙ্কিমচন্দ্রের পরিভাষা অনুসারে অনু-...শীলন। দেবী চৌধুরাণীর ভিত্তি স্পষ্টত ...ীতত্ত্ব বা অনুশীলন, পক্ষে লেখকের ...বীকারোক্তি আছে। আবার এই তিনখানিতে ...ন্যতম উপাদানরূপে আছে কমলাকান্তের ...ন্তর্গত পলিটিক্স ও বাঙালীর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ বাঙালীর সমসাময়িক ভিক্ষাজীবী ...রাজনীতি ও নির্বীর্য অবস্থার প্রতি ...ধিক্কার। এই সূত্রেই এসেছে প্রসিদ্ধ লাঠি-...খেলা। সীতারামের মুখে ইতিহাস ও অনু-...শীলন। ইতিহাস কাঠামো, অনুশীলন প্রাণ। ...বে প্রাণ এখানে অকালে বহির্গত। ভোগ-...বৃত্তিতে সীতারামের রাজ্য পুড়ে ধ্বংস হয়ে ...গিয়েছে। সীতারাম এণ্টনির অনুরূপ, কেবল তার ক্লিওপেত্রা নাই। শ্রী অজ্ঞান-...বহ্নিতে দগ্ধ। সন্ন্যাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার এই সর্বনাশটি সে ঘটিয়েছে। শান্তি ও প্রফুল্ল যা হলে হতে পারতো, শ্রী সেই সর্বনাশ। সন্ন্যাস স্ত্রীলোকের জন্য নয়, সন্ন্যাসে চরিতার্থতা নাই, সন্ন্যাসে সর্বনাশ হতে পারে, আমি যতদূর বুঝি এই হচ্ছে ...রীর ফলশ্রুতি।

রাজসিংহের ভিত্তি কৃষ্ণচরিত্র। রাজসিংহ 'সদুপাত্ত', 'চঞ্চলকুমারী হরণ' রুক্মিণী হরণের অনুরূপ। ইঙ্গিত ও অলংকার আকারে এই কথাগুলি বারবার উচ্চারণ করে পাঠকের মনে এই প্রত্যয় জন্মে দিয়েছেন লেখক। এখানে ধর্ম ও ইতিহাস এক। ধার্মিক বলেই রাজসিংহ জয়ী, অধার্মিক বলেই আওরঙ্গজেব পরাজিত। অবশেষে ইতিহাসের অর্থাৎ মানুষের ফলিত আচরণের মধ্যেই ধর্মকে খুঁজে পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে ধর্মকে তাঁর ব্যাখ্যাত অর্থে বুঝতে হবে, ইতিহাসকেও। তাঁর ধর্মের ব্যাখ্যা অনুশীলনে ও কৃষ্ণচরিত্রে, ইতিহাসের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদিতে।

বাকি থাকলো তিনখানি উপন্যাস—কপালকুণ্ডলা, রজনী ও ইন্দিরা; এ তিন-খানির Hinterland বা উপকূল-ভূমি স্পষ্ট করে দেখানো বাকি আছে। কপাল-কুণ্ডলাকে বিচার করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতা ও মানস নামে কাব্যের সমসূত্রে দাঁড় করিয়ে। যথাস্থানে অরণ্যভাব আলোচনা-প্রসঙ্গে তা করতে চেষ্টা করেছি। রজনী রূপকমিশ্রিত রচনা; সৌন্দর্য ও প্রেমের সমন্বয় ও সার্থকতা বিচার করেছেন লেখক। আরও কিছু এ বিষয়ে বলবার ইচ্ছা আছে। ইন্দিরায় লেখকের অবসর যাপন, সব নিয়ম যখন অনেক পরিমাণে আলগা হয়ে পড়েছে। তবু কিছু বলতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে অংশ প্রবন্ধাদি বিতর্কমূলক রচনা লিখে, আর যে অংশ উপন্যাসাদি সৃষ্টি করে দুয়ের মধ্যে সহ-যোগিতা সত্যই বিস্ময়কর। এক অংশ অপর অংশের হাতে বিনা দ্বিধায় ও পূর্ণ সমর্থনে সাজসরঞ্জাম যুগিয়ে দিয়েছে। এ শ্রেণীর লেখক সত্যই সৌভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের মনের দুই অংশে এমন বোঝাপড়া নাই। তিনি সচেতনভাবে যখন চিন্তা করেন অদ্বৈতবাদী, আবার কবির মন দিয়ে যখন উপলব্ধি করেন তখন দ্বৈতবাদী। এই আত্মবিরোধ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের একটি কারণ, আবার এই আত্ম-বিরোধের ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রবাহ শেষ-দিন পর্যন্ত বহতা ছিল। শেষ জীবনে এই বিরোধের একটা মীমাংসার দিকে তাঁর উপলব্ধি-প্রবাহ চলেছিল, যদিচ মীমাংসার সাগরসঙ্গমে পৌঁছবার আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই মনে সহযোগিতার ফলে কল্পনা ও অভিজ্ঞতার রস এতটুকু নষ্ট হয়নি; মাঠভরা ফসলের প্রত্যেকটি দানা ভাঁড়ারে উঠেছে। সেই জন্যই বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পড়ে শেষ করলে ভারি একটি তৃপ্তির ভাব মনে আসে; পাঠক অজ্ঞাতসারে বলে ওঠে বাঃ, বেশ। সুর সুনির্দিষ্ট সমে এসে ক্ষান্ত হলে যেমন একটি আনন্দময় শান্তি অনুভূত হয় তেমনি অনুভব করে পাঠকে। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের পরিণামে ঠিক এরূপ হয় না। একটা অশান্তি, অতৃপ্তি; যবনিকার কম্পন সত্ত্বেও অন্তরালবর্তী রহস্যের অপ্রকাশ, অজস্র প্রাচুর্য সত্ত্বেও মনে হয় যথেষ্ট হল না; এই হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের ফলশ্রুতি। রবীন্দ্র-কাব্য সত্যই প্রবাহ, চঞ্চলতা তার ধর্ম, অন্য পক্ষে, পাথরে গঠিত বঙ্কিম-সাহিত্যের ধর্ম শান্তি ও ভারসাম্য।

নরনারীর আদিম আকর্ষণ বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল প্রেরণা। এ বৃত্তি দেহী মাত্রেরই সাধারণ গুণ, তাই ইতর প্রাণীতে ও মনুষ্যে এর সমান প্রভাব। কিন্তু যেহেতু মানুষ দৈহিক রূপমাত্র নয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবও বটে, তাই এই আদিম

আকর্ষণ তার মধ্যে এসে নূতন ও উন্নত রূপ গ্রহণ করেছে। মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার, অশন-বসন, শিল্প-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক জীবন সমস্তই এই আদিম আকর্ষণের উন্নততর ও অনেকাংশে অপ্রত্যাশিত মূর্তি। কামের রূপান্তর প্রেম, প্রেমের রূপান্তর ভক্তি, শ্রদ্ধা উক্তিতে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা। এই রূপান্তর সাধনার বিষয়। যেখানে সাধনা ঈপ্সিত পথ-খোলা ধাপে ধাপে সেখানে উচ্চকোটিতে রূপান্তর হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাধনার পথ দুটি। সাধারণের জন্য দাম্পত্যজীবন, অসামান্য দু'-দশজনের জন্য সন্ন্যাস। অর্থাৎ দাম্পত্যজীবনটাই নিয়ম, সন্ন্যাসটা নিয়মের ব্যতিক্রম। এই কারণেই বঙ্কিম-উপন্যাসে মনুষ্যত্ব চর্চার পক্ষে দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব; সন্ন্যাসকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নি, তবে সাধারণের জন্য তা নয়, এ কথাও বলেছেন। মাধবাচার্য, সত্যানন্দ, চিকিৎসক ও ভবানীপাঠক প্রভৃতি অঙ্গুলিতে গণনীয় বিরল দৃষ্টান্ত। বন্দনায় জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিয়েছে, সন্ন্যাসে শান্তি নাই, ভগবানে আত্মসমর্পণ শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

সাধনা অর্থাৎ ত্যাগ, সংযম, নিয়মচর্যা প্রভৃতির ফলে কাম প্রেমে পরিণত হয়; সাধনা ব্যাহত হলে দুর্দৈব ঘটে। এমন একটি চরম দৃষ্টান্ত রোহিণী ও গোবিন্দলাল; হীরা ও দেবেন্দ্র অন্য একটি দৃষ্টান্ত, যদিচ দুয়ে ক্ষেত্রভেদ। আর একটি আংশিক দৃষ্টান্ত নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী। আংশিক এই কারণে যে, সময় ও সুযোগ পেলে কামের এখানে প্রেমে রূপান্তরিত হওয়ায় বাধা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মত এই যে, সহজাত প্রেম কালক্রমে সাধনাজাত প্রেমে পরিণত হয়, মাঝখানে যদি বিঘ্ন না এসে পড়ে। অথচ শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি; নানা কারণে বাধা এসে পড়ে; একটি প্রধান কারণ ত্যাগ, আত্মসংযম ও নিয়মচর্যায় অনিচ্ছা। অর্থাৎ মানুষ যখন ভুলে যায় সে সামাজিক জীব তখনি প্রতিকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে। আয়েষা ভোলেনি যে সে সামাজিক জীব, তাই ত্যাগ করতে সক্ষম হল। শৈবলিনী কিছুতেই ভুলতে পারে না প্রতাপকে; না পারবার অনেক কারণ, বাল্য-প্রণয় ও পরিবেশ অন্যতম। বাল্যপ্রণয় ও পরিবেশের মোহে সামাজিক সত্তা বিস্মৃত হয়েছে সে। এ বিস্মরণ আত্মবিস্মরণ, কেননা, যে সব উপাদানে মানুষ গঠিত, সামাজিক সত্তা তার অন্তর্গত। আত্মবিস্মরণ থেকে মোহ; কি না ভারসাম্যের বিপর্যয়। শৈবলিনী অধর্মের পথে পা বাড়ালো। বঙ্কিমচন্দ্র একে অধর্ম বলেছেন; পাশ্চাত্ত্য জগৎ বলে ক্রাইম, কিনা দণ্ডযোগ্য অপরাধ: বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন আধ্যাত্মিক স্তর থেকে, মানুষ আধ্যাত্মিক সত্তাবিশিষ্টও বটে; পাশ্চাত্ত্য জগৎ দেখে সামাজিক স্তর থেকে তাই শুধু ক্রাইম বা সামাজিক বিচারে দণ্ডনীয়। দুই দৃষ্টিভেদের মূলে দ্রষ্টার স্তরভেদ, কে কতদূর যেতে পারে। আর যদি বা এমন কেহ থাকে, যে শুধু দৈহিক মাত্র রূপ, তার কাছে শৈবলিনীর আচরণ না Sin, না Crime! সে বলবে সাবাশ মেয়ে শৈবলিনী। কৃচ্ছ্র নিয়মচর্যার ফলে শৈবলিনীর ভুল ভেঙেছে, কেননা, তার মধ্যে এককালে সামাজিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণ ঘটেছে। মোতিবিবি আত্ম-বিস্মরণের একটি প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত। তার বিশ্বাস স্বামী নবকুমারকে দেখবামাত্র সে ভালবেসেছে—তাই তার তাকে চাই। এ প্রেম কিনা সন্দেহ। প্রেম ত্যাগ করতে জানে। মোগল হারেম-বিজয়িনীর দুর্জয় অহংকার অদম্য রূপাকাঙ্ক্ষাই কি প্রেমের ছদ্মবেশ ধারণ করেনি? মনোরমার প্রতি পশুপতির আকর্ষণের মধ্যে প্রেম আছে বলে মনে করিনা, অদম্য রূপাকাঙ্ক্ষাই তাকে ধর্মাধর্ম ভুলিয়ে দিয়েছে।

কত দিক থেকে কত রকম বাধা এসে প্রেমের পরিণতির পথে বিঘ্ন ঘটায়। বিবাহ হলেই যে দম্পতির মধ্যে প্রেম উপজাত হয় এমন অবান্তর রূপকথায় নিশ্চয় বঙ্কিম-চন্দ্র বিশ্বাস করেন না; তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিবাহ প্রেমের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ওঠে। পশুপতি মনোরমাকে বিবাহ করতে রাজি (সে জানতো না যে মনোরমা বিধবা নয়, তার পত্নী) কিন্তু বাধা সামাজিক অনুশাসন, তাই কৃতঘ্নতা দ্বারা রাজ্য কামনা করেছিল, রাজার উপরে অনু-শাসন প্রয়োগ করবে কে? সীতারামের বিবাহিত পত্নী শ্রী, তাকে গ্রহণে সামাজিক বাধা নাই, বাধা জ্যোতিষের বচন, নিয়তির দুর্জ্ঞেয় ইঙ্গিত। অন্য পক্ষে নগেন্দ্রনাথ যথা-শাস্ত্র বিবাহ করেছিল কুন্দনন্দিনীকে, কিন্তু বিবাহের পরেই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এখানে বাধা মানসিক; নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী—তিনজনের মনেই অপ্রত্যাশিত ছায়া নেমে এল, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বমুহূর্তেও তারা অনবহিত ছিল। আদিম আকর্ষণের তাড়নায় অমরনাথ প্রথম যৌবনে লবঙ্গলতার গৃহে প্রবেশ করেছিল। লবঙ্গলতার শিক্ষায় কামদগ্ধ হয়ে প্রেমরূপে জন্মগ্রহণ করেছে অমরনাথের হৃদয়ে। সামাজিক বাধা, মানসিক বাধা, নিয়তির ইঙ্গিতের দুর্জ্ঞেয় বাধা প্রেমের সহজ পরিণতির পথে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। প্রেমের সাধনা সহজ নয়। "চণ্ডীদাস প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়", অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ, অনেক সংযম ও সাধনার বিষয়।

প্রেমের সহজ সিদ্ধির চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন, যেমন কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন। এদের জীবন ট্রাজেডির অভিঘাত থেকে দূরে অবস্থিত, নীচু গ্রামে বাঁধা; সৌভাগ্যবশত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি তাদের, হলে কি হতো বলা যায় না। মহেন্দ্র ও কল্যাণীর জীবনও সহজ সিদ্ধির চিত্র, তবে কঠিন পরীক্ষার তাদের পড়তে হয়েছে, আর তার ফলে গুপ্ত রত্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশেষভাবে কল্যাণীর চরিত্রে। মাটির তলাতে অনেক স্থানেই অমূল্য রত্ন আছে, তবে তার উদ্ঘাটন দুঃখ সাপেক্ষ। কখনো সে দুঃখ আসে নিয়তির ইঙ্গিতে, মনুষ্য-কর্তৃত্বের বাহিরে, যেমন ভূমিকম্প; কখনো আসে মানুষের কার্য-কারণের ফলে, যেমন খনি খনন। অন্যথা দাম্পত্যজীবনের ধারা সহজ অনাবিল গতিতে চলে। এ গুণের প্রতি শিল্পীর তেমন আকর্ষণ নাই, শিল্পীর আকর্ষণ দুঃখের দিকে। দুঃখেই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও পরীক্ষা, তাই দুঃখই প্রধানত শিল্পের সামগ্রী।

এ পর্যন্ত বোঝা গেল যে, নরনারী আদিম আকর্ষণ দেহধারী জীবের জীবন পথে প্রধান প্রেরণা। কিন্তু যেহেতু মানুষ দেহসর্বস্ব নয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবও বটে, কাজেই অন্ধভাবে যৌন আকর্ষণের প্রেরণায় চালিত না হয়ে তাকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চালিত করতে চেষ্টা করবে; তাতে মনুষ্যত্ব চর্চার পথ প্রশস্ত ও সুগম হয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে এ কাজ ধর্মের অন্তর্গত। যাঁরা ধর্ম পর্যন্ত যেতে রাজি নন, তাঁরা সামাজিক কর্তব্য বলতে পারেন। বঙ্কিম-চন্দ্র বলবেন, ও দুই এক, কারণ, সমাজ-সাধনা তাঁর কাছে ধর্ম-সাধনার অন্তর্গত। কাজটি স্বভাবতই কঠিন, কিন্তু কঠিনতর হয়ে দাঁড়ায় যখন যৌন আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয় সৌন্দর্য বা রূপ। সৌন্দর্য বা রূপ সম্বন্ধে, যৌন আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস জগৎ সৌন্দর্যময়। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী, মুখ্য-গৌণ্য সকলেই সুন্দর। এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি কেন?

প্রকৃতি বা মহামায়া যৌন আকর্ষণের তাড়নায় জীবকুলকে অভীষ্ট পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, সৌন্দর্য তার হাতে চাবুক। সৌন্দর্যের কশাঘাতে পাগল হয়ে সকলে অন্ধভাবে ছুটে চলেছে। জীবনের সুখ দুঃখ ট্রাজেডি-কমেডি, স্বর্গ-নরক সমস্তই এই তাড়নার পরিণামে। শিল্পী বঙ্কিম-চন্দ্র বিবিক্তভাবে এই অন্ধ উন্মত্ত ধাবমান জনতার দিকে তাকিয়ে উচ্চ অনুচ্চস্বরে বারে বারে বলে উঠেছেন, "হায়, রমণী রূপলাবণ্য এ সংসারে তোমাকেই ধিক!" সৌন্দর্যের কশাঘাত না থাকলে যৌন আকর্ষণ হয়তো দুর্বার হয়ে উঠতো না;

কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় কই? অনবরত সৌন্দর্যের চাবুক পড়ছে পিঠে. আর পাগলের মতো নরনারী অকরণীয় কাণ্ড করে বসছে।

নবকুমারের রূপযৌবনমুগ্ধ মোতিবিবি গভীরতর অধর্মের পথে পদক্ষেপ করেছে; মৃণালিনীর রূপমুগ্ধ হেমচন্দ্র গুরুহত্যা করতে উদ্যত হয়েছে;, শৈবলিনীর রূপে চন্দ্রশেখরের জ্ঞান ব্রতভঙ্গ, প্রতাপের রূপে শৈবলিনীর সংসারব্রত; কুন্দনন্দিনীর রূপে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীকে ভুলেছে, গোবিন্দ-লাল ভ্রমরকে; কল্যাণীর রূপে ভবানন্দ সন্তানধর্মে এবং শ্রীর রূপে সীতারাম রাজধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছে; প্রফুল্লর রূপে স্বভাবসংযমী ব্রজেশ্বরের আত্মবিস্মরণ, উপেন্দ্রের ইন্দিরাকে। রূপের সুন্দর বনে দাবানল, অসহায় মৃগবৃথ অভীষ্ট লাভ করতে গিয়ে আত্মদহন ঘটাচ্ছে। সৌন্দর্য এত অধর্মের কারণ! অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্ম, সাহিত্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি প্রায় সমার্থক।

"সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "ধর্ম আত্মপীড়ন নহে, আপনার উন্নতি সাধন, আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যপ্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি—ইহাই ধর্ম। ভক্তি-প্রীতি-শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?" "সাহিত্য ও ধর্ম ছাড়া আর নহে। কেননা, সাহিত্য সৌন্দর্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।" "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। "জাগতিক সৌন্দর্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীতি দয়া ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।... কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এই জন্যই কাব্য ধর্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ।"

উপরের উক্তিগুলি থেকে সৌন্দর্যের গুরুত্ব, ধর্মলাভে তার সহায়তা, প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত জানতে পারা গেল। তবে সৌন্দর্য এত অধর্মের কারণ হয় কিরূপে? আগে বলেছি, সাধনার ফলে আদিম আকর্ষণ প্রেমে এবং ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হয়। এমন আবার সেই নীতিটিকে বিষয়ান্তরে আরোপ করা আবশ্যক। সাধনার ফলে বহিঃসৌন্দর্য আন্তঃ সৌন্দর্যে পরিণত হয়, তখন আর চোখের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। রজনী শেষে চোখের অভাব আর অনুভব করেনি। সাধনার অভাব হলে চোখ বহিঃসৌন্দর্যের অধিক দেখতে সক্ষম হয়। সাধনাহীন কাম ও সাধনাহীন সৌন্দর্য একীভূত হলে সর্বনাশের কারণ ঘটায়। আগে যতগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সকলেরই মূলে এ দুয়ের অশুভ যোগাযোগ। রোহিণীর রূপে এই অশুভ যোগ, তার রূপ মানুষকে নীচের দিকে টানে। কপালকুণ্ডলার রূপ বহিঃসৌন্দর্যের প্রতীক, নীচের দিকে টানে না; সমুদ্রের অরণ্যের ও নিশীথান্ধকারের সৌন্দর্যের ন্যায় মনের মধ্যে একটা গম্ভীর রহস্যময় ভাব জাগ্রত করিয়ে দেয়। আর-এক প্রকার সৌন্দর্য আছে, জাগতিক সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত দিব্য সৌন্দর্য, যার সম্মুখে রুদ্ধবাক্ মনুষ্য একটি নীরব প্রণিপাত দ্বারা আত্মসমর্পণ করে। রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে দেখি, তসবীরওয়ালী বুড়ি, এই কারণেই হঠাৎ প্রণাম করতে বাধ্য হয়েছিল। এ হচ্ছে সৌন্দর্যের Sublimation বা ঊর্ধ্বপাতন। এ সৌন্দর্য ধর্ম আনন্দ সত্য প্রভৃতির সমার্থক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রেম ও সৌন্দর্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, দুয়ের শুভ যোগাযোগে পূর্ণতা, যেমন দুয়ের অশুভ যোগাযোগে অধর্ম। প্রেমহীন সৌন্দর্য অন্ধ, রজনী অন্ধ; প্রেম জাগ্রত হলে সৌন্দর্য দৃষ্টিলাভ করে, রজনী চক্ষুষ্মতী হয়েছে। তবে যে সৌন্দর্য এত অধর্মের কারণ, তার অর্থ, সাধনা, সংযম, নিয়মচর্যার অভাব, বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন অনুশীলনের অভাব।

"এ জীবন লইয়া কি করিব?" এই সূত্র অবলম্বনে অগ্রসর হয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রকেও সমস্ত জীবন পরিক্রমা শেষ করে ধর্মতত্ত্বে বা অনুশীলনে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। গোড়াতে বলেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত জীবন-কথা অন্যত্র যদি না-ও থাকে, তবে তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে ভাবরূপে বর্তমান আছে। সেই কথাটিই এতক্ষণ বোঝাবার দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় নিছক চেষ্টা করেছি।

শিল্পিরূপে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ মৃণালিনীতে এসে তাঁকে দাঁড়াতে হল দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্তমান দুর্দশার সম্মুখে। এ সমস্যা তাঁকে বাধ্য করেছে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম লিখতে। অন্য দিকে আবার বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল আছে। দাম্পত্যজীবন যে মানুষের অর্থাৎ সমাজের চরম নির্ভর, দেখিয়েছেন এই সব গ্রন্থে। মাঝখানে আছে কমলাকান্ত। দপ্তরে এ পর্যন্ত যা লিখেছেন তার সার, আবার যা লিখবেন তার পূর্বাভাস। ও-বইটা যেন তাঁর মনের Index বা সূচীপত্র। রজনীর সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বীজাকারে দপ্তরে। কমলাকান্ত প্রেমিক ও সুন্দরের উপাসক কবি।

'এ জীবন লইয়া কি করিব' চিন্তার প্রথম পর্বে বিসর্জন। রুসো, কোঁৎ ও মিল অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রতিষ্ঠা; কৃষ্ণ, গীতা ও মহাভারত শূন্য বেদী অধিকার করেছে। তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, মহাভারত মনুষ্য-সমাজের চিরকালীন ইতিহাস; গীতার প্রয়োজন ধর্মাচরণ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চাত্ত্যের দেশপ্রেমের সঙ্গে গীতার নিষ্কামকর্ম মিলিত হলে রাজনীতি উচ্চতর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়; মৃন্ময়ী দেশ তখন চিন্ময়ী হয়ে ওঠে এবং সর্বোপরি চতুর্বিধবৃত্তির সমন্বয়সিদ্ধ আদর্শপুরুষ কৃষ্ণ আদর্শ মানব হয়ে দাঁড়ায়। এই পথে অগ্রসর হয়েই তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, সৌন্দর্য ও সত্য ভিন্ন নয়, সাহিত্য ও ধর্ম অভিন্ন এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে মানবপ্রেমের বিরোধ নাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-সবের সমন্বয় রাজসিংহে; চিন্তার ক্ষেত্র ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলনে। অনুশীলন তাঁর চিন্তার শেষ ফল, কোঁতের পজিটিভিজমের উত্তর।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনকে গেটে ও মাথু আর্নল্ড-কথিত কালচার মনে করলে ভুল হবে। পাশ্চাত্ত্যের কালচার জ্ঞানার্জনী বৃত্তিমাত্র, বড় জোর তাতে চিত্তরঞ্জিনী-বৃত্তির স্থান আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনে ও-দুটির সঙ্গে শারীরিক বৃত্তি ও কার্যকারিণীবৃত্তি যুক্ত হয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে।...সেই-গুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।" এই ধর্ম নির্দেশেই "এ জীবন লইয়া কি করিব" জিজ্ঞাসার বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত চরম উত্তর। ধীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে এই উত্তরের মধ্যেই যাবতীয় রচনার মর্ম নিহিত, এবং সেই সঙ্গে রচয়িতার অন্তর্জীবনের মর্মও বটে। সে মর্ম আর কিছুই নয়, মনুষ্যত্বের একটি পূর্ণ আদর্শ সম্বন্ধে

চিত্ত ও জনগণকে নিত্য জাগ্রত করে রাখবার প্রয়াস। যে দেশে অনেক দিন থেকে মনুষ্যত্বের ধারা ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে, যে দেশের মজ্জায় মর্কট বৈরাগ্য এবং ধমনীতে ভ্রান্ত সন্ন্যাসবুদ্ধি, প্রাচীন সংস্কার ও নতুন বৈদেশিক মোহে যে দেশ বিভ্রান্ত সে দেশের সম্মুখে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার মহৎকার্য আর কি হতে পারে?

"এ জীবন লইয়া কি করিব"?—এই মূল জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকগুলি অনু-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা আগে বলেছি। আবার সেই সব অনু-জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝেছেন যে, জীবন-সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়," তাই সে চেষ্টা না করে মূল জিজ্ঞাসায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং খুব সম্ভব মূল জিজ্ঞাসার সমাধানের মধ্যে অন্য সব জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ত্রিলোচন কলমচি

একটি মফঃস্বলী হাসপাতাল

অনেক অনেক মানুষের মতই আমারও হসপিটাল অ্যালার্জি আছে। হাসপাতালের দৃশ্য-গন্ধ আমাকে কি রকম আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে, পেটের ভেতরে কি রকম একটা অস্বস্তি পাক খেতে থাকে। আমার দেহযন্ত্রও যে ওই অগণিত রোগীর মত পল্কা, দিশী মডেলের, গ্যারান্টি নেই, যে-কোনো সময় বিকল হতে পারে, পার্টস্ বদলাতে হতে পারে, ব্লাড-ফুয়েল রিফিল করার প্রয়োজন হতে পারে—এ কথা মনে পড়ে যায়।

তবু মাত্র কয়েকদিন আগে একটি মফঃস্বলী হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে দুশো একত্রিশ কিলোমিটার দূরে সেই শহরটি। শহর থেকেও, কি অজ্ঞাত কারণে, প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সেই সম্প্রতিখ্যাত হাসপাতালটি। পরে বুঝলাম, রোগীরা যাতে হুটহাট এসে ভিড় করতে না পারে সেই জনাই এই ব্যবস্থা! আর যদিই আসে, খানাখন্দ খোয়ায় ভরা নাচন রোড ধরে রিকশা করে আসতে হবে। গুরুতর রোগী হলে সারা রাস্তা হরিধ্বনি দিতে দিতে আসাই ভালো। পিংপং বলের মত লাফাতে লাফাতে এযাত্রায়-ও যদি টিকে যায় তবেই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে জন্ম সার্থক করবে।

অবশ্য্য এই মহাপ্রস্থানের পথেও খোয়া আর পিচ্ ঢালতে দেখে এসেছি—এতদিনে যাহোক দৃষ্টি পড়েছে। এবং আরো অবশ্য যে, রোগীমাত্রকেই পায়ে হেঁটে, রিকশা কিংবা ডুলিতে বা গোরুর গাড়িতে চেপে সেখানে পেঁছোতে হয় না। হাসপাতালের তিনখানা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আছে—খবর পেলেই কর্তৃপক্ষ রোগী কুড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তবে। তবেটা হচ্ছে এই, তিনখানা অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে একখানাই ম্লান করে, বাকি দুখানা হয়রান হয়ে ইধার উধার পড়ে থাকে। এবং সেই একখানা গাড়িও আবার কোনো কোনো প্রাতঃকালে তিনকিলো মিটার দূরের কোনো নির্দিষ্ট তৈলক্ষেত্র থেকে তেল ভরতে যায়। আর একবার পেট্রোল নিতে গেলে (লোকে বলে সেখানে নাকি বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান আছে) সর্বপ্রকারে তৈলাক্ত হয়ে আসতে প্রহরখানেক বেলা হয়ে যায়। তবে সেক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব হয় না, জরুরী নির্দেশে অন্য ড্রাইভার JEEP যার ক'রে দৌড়য়। কোনো মতে টানা হ্যাঁচড়া ক'রে তার মধ্যে স্ট্রেচার তোলা হয়, রোগীর সিকিভাগ দেহ বাইরে বেরিয়ে থাকে, মুক্ত আলো-হাওয়া খেতে খেতে তারা হাসপাতালে আসে।

এই কলেজ-হাসপাতালটির ইতিপূর্ব-ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নিই। ১৯২২ সালে একটি ক্ষুদ্রকায় বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ের অবিভক্ত বঙ্গসরকার দেশের মধ্যে একাধিক মেডিক্যাল স্কুল চালু করেছিলেন, ঐ কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন। যাই হোক, বহু ধনী ব্যক্তির বদান্যতায় এবং গুণী ব্যক্তির উদ্যমে স্কুলটি ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে গেল। ১৯২৪ সালে প্রায় অংশী বিঘা জমি-বাগানসহ এই স্কুলহাসপাতালের বাড়ি যোগাড় হল। ছাত্রদের জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্যে চোদ্দ বেডযুক্ত একটি ব্লক প্রতিষ্ঠিত হল, সেই সঙ্গে মেটারনিটি-রুম এবং অপারেশন থিয়েটার নামে একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ। সরকার দয়া ক'রে তাঁর সদর হাসপাতালে রোগী দেখে হাতে কলমে তালিম নেবার সুযোগ করে দিলেন ছাত্রদের। অনেক চেষ্টার পর এই স্কুল থেকে LMF পরীক্ষা দেবার অনুমতি মিলল বেঙ্গল কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের কাছ থেকে। বিদ্যালয়ের প্রসাধন চলল দ্রুত-গতিতে। উৎসাহী জনসমাজের চেষ্টায় ডিসেকসন হল থেকে শুরু করে স্বতন্ত্র সার্জারি ওয়ার্ড, Eye, ENT, G & O, স্টাফ কোয়ার্টার, আইসোলেশন ব্লক, ধীরে ধীরে সবই নির্মিত হল। স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার প্রাণপণ প্রয়াস চলল। ১৯৪৮ সালে নতুন ছাত্র ভর্তি করা সরকারী নির্দেশে বন্ধ রইল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রায় এক হাজার LMF ডাক্তার বেরিয়েছেন এই স্কুল থেকে। ফার্স্ট এম বি, বি-এস অ্যাফিলিয়েশন মিলল ১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৪ এবং ফাইনাল এম বি বি এস অনুমোদন ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে আগস্টে। ১৯৬১ সালে সরকার এই কলেজ এবং হাসপাতালের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তী এই পর্যন্ত, এবার ভূগোলে আসা যাক। হাসপাতালটির বৈচিত্র্য এই যে, সেটি আড়াইভাগে ভাগ করা। কলেজ, আউটডোর, এমার্জেন্সি, জি অ্যান্ড ও, এবং কটেজগুলি এক জায়গায়। জেনারেল ওয়ার্ড, ৩ টি অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার, আইসোলেশন ব্লক, স্টাফ কোয়ার্টার, অন্যত্র। উভয়ের মধ্যে প্রায় এক কিলোমিটার ব্যবধান। এপার গঙ্গা ওপার

...অজ্ঞাত কৌশলে পোশাক বাঁচিয়ে চলাফেরা করা...

গঙ্গা (গঙ্গাপ্রাপ্তির অকুস্থল অর্থে নয়) মধ্যিখানে চর—অর্থাৎ একটি বিরাট প্রান্তর, যা নাকি পুলিস বিভাগের খাসদখলের জমি। আর এস এবং হাউস সার্জনরা যেখানে থাকেন বিধাতার ইচ্ছায় টেলিফোন নেই। সুতরাং এমার্জেন্সির সঙ্গে তাঁদের সংযোগ কলবুক মারফত। ওপার থেকে কলবুক আসে সাইকেল চেপে, এপারের ডাক হলে পায়ে হেঁটে। অতএব সময় খরচের জন্যে ভাবনা করতে হয় না।

১২২ ডিগ্রী ফারেনহাইট গ্রীষ্মে কিংবা কমা-সেমিকোলন-ফুলস্টপহীন বৃষ্টিতে আর এসদের রেস দেখবার মত হয়। সেই মুষলধারা বৃষ্টিতে ছাতা যখন 'শাওয়ার বাথ্ ফর ওয়ান অ্যান্ড শেলটার ফর নান্'। তখন সার্কাসে তারের খেলা দেখানো মেয়েদের মতই নার্সের দল ছাতা হাতে এক অজ্ঞাত কৌশলে পোশাক বাঁচিয়ে চলাফেরা করে।।

বাকি আধখানার কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ডিসেক্‌সন হল আর ছাত্রাবাস, সেটি আবার তৃতীয় ভুবনে।

১৯৪৮ সালে যা ছিল ১৩৯ বেড, এখন হয়েছে ৩০০। এখন ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের সংখ্যা প্রায় ষাট। স্টাফ নার্স এবং স্টুডেন্ট নার্স প্রায় সমান-সমান, দুয়ে মিলে ওই ষাট।

ভেতরে ভেতরে যেটি আসলে পাবলিক ইউটিলিটি হাসপাতাল, টিচিং ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়ে একান্নবর্তী সংসার রচনা করলেও, সেই District Hospital Annexe-র মূল ভবনটি বিরাট ইয়াঙ্কি স্ট্রাকচার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাউন্ডফ্লোরের করিডোর একটি বৃহদাকার ক্রুসের মতই চারটুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। তার সদর মাথায় ওয়ার্ড মাস্টারের আস্তানা, খিড়কি প্রান্তে

...একটি জায়গায় পর্যন্ত এসেছে।...

কিচেন আর ডায়েটিশিয়ানের ঘর। বাড়ির বেকার ভাগনের মতই—এই অসুখের সংসারের ছোটখাটো খুঁটিনাটি সমস্ত দায়িত্বই ওয়ার্ড মাস্টারের ওপরে। ঝুল-ঝাড়ানো থেকে জমাদার চরানো পর্যন্ত।

করিডোরের চৌমাথায় একটি বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড দাঁড় করানো, তাতে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে টু-ডেজ্ অপারেশন। তলায়

এক দুই তিন নম্বর ক'রে তালিকা দেওয়া আছে। মন দিয়ে অপারেশনের লিস্টি পড়ছিলাম, চমক ভাঙলো হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট ভদ্রলোকের ডাকে, 'স্যার শুনেছেন, একটি মন্দার পর্বত এসেছে, এই ফিল্মে তাঁর চেস্ট আসছে না। সতের বাই চোদ্দ চাই।'

বলেই রিকুইজিশন স্লিপ বাড়িয়ে ধরলেন, না আমার দিকে নয়। যাঁর দিকে, তিনি খসখস করে দস্তখত করতে করতে বললেন, 'এত বড় বুকের পাটা নিয়ে কে এল, মারোয়াড়ী?'

পেশেণ্টরা সবচেয়ে ইমপেশেণ্ট, কোনো কোনো রোগীকে দেখে মনে হয়। জেনারেল ওয়ার্ডে ঘুরছিলাম। বিচিত্র কম্বিনেশন। রোগের অ্যালফাবেট অনুসারে রোগীর বেড পড়ে না। তাই একজন অ্যাপেনডিসাইটিসের পাশেই হার্নিয়া শুয়ে আছে, কার্সিনোমা অব ইনটেস্টাইনের পাশেই হয়ত অ্যাণ্টি এয়ার ক্র্যাফট গানের মত প্লাস্টার-ট্র্যাকশন করা ঠ্যাংটি নব্বই ডিগ্রি কোণ করে বাড়িয়ে রেখে কোনো চঞ্চলচিত্ত যুবক রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ছে। ও টি ফেরত একটি রোগী যখন বায়োপ্সি রিপোর্টের জন্য ঝুলে আছে ঠিক সেই সময়েই সুইসাইড ফেল করা তরুণী হয়ত কিঞ্চিৎ বিমর্ষ। ব্রংকোস্কোপের পেশেণ্টের পাশেই কেউ হয়ত সিম্পটম এবং বিহেভিয়ারে অবসিস্কয়োর হয়ে চোখ উল্টে পড়ে আছে, ডাক্তারদের উদরস্থ বিদ্যেও উল্টে যাবার উপক্রম (পেশেণ্টের পেটে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস হয়েছে কিনা ভাবছেন)। আসলে অ্যালিবি পাকা করার জন্যে কিংবা ফৌজদারী মামলা পাকিয়ে তোলার জন্যে হয়ত সে মিথ্যে পাঁয়তারা কষছে। কিন্তু অধিকাংশেরই নজর প্রতিবেশী রোগী বা রোগিণীর দিকে। পেপটিক আলসারের রোগী যখন তেল-মশলাহীন ফ্যাকাশে খাদ্য সামনে নিয়ে পাশের জীবন্ত অ্যানিমিয়াকে দিব্যি রংদার মাংসের ঝোল সাঁটাতে দেখে, তখন এই পক্ষপাত সে মুখ বুজে সহ্য করে এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া রোগীরা বড্ড স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। নার্স দিদিমণি কার তিন ইঞ্চি তফাতে দাঁড়িয়ে ভুবন-মোহিনী হাসি হেসেছে, কার সঙ্গে কথা বলেছে, কাকে টাচ ক'রেছে এবং কাকে শয্যা-গত হবার পর থেকে আর রিটাচ করেনি, ডাক্তারবাবু এলে ইনিয়ে বিনিয়ে সে দুঃখের কথা জানানো হয়। তাছাড়া মোটা দিদিমণি বড্ড ক্যাট ক্যাট করে কথা বলে, চিমসে দিদিমণির হাতে সূঁচ ফুঁড়িয়ে আগের মত আরাম হয় না, চশমাপরা দিদিমণি মোটে কাছে আসেন না ইত্যাদি।

আমাদের দেশের মানুষ যে কত দরিদ্র হতে পারে তার চাক্ষুষ ধারণা পেলাম এই মফঃস্বলী হাসপাতালে এসে। বাড়িতে প্রতিদিন একবেলাও পেটভরে খেতে পায় বহু নরনারী যে জীর্ণ দুর্গন্ধ বস্ত্রখণ্ড পরে হাসপাতালে আসে কোনো সভ্যদেশের ভিখিরীও তা দেখলে শিউরে উঠবে। অবশ্য এখানেও, জেলখানার মতই স্ট্রাইপ দেওয়া চতুর্থ শ্রেণীর পাজামা শার্ট দেওয়া হয়। সেগুলি পরার পর তাদের মনুষ্যেতর জীব বলেই বোধ হয়।

একজন ডাক্তার আমাকে বললেন, অসুখ সেরে গেলেও এদের বিদেয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

একটু আগেই অধ্যক্ষ মশাই খেদোক্তি ক'রে গেলেন, 'আমার তিন-শ বেডের হাসপাতালে তিন-শ আশীটি রোগী মশাই

আটানব্বই ডিগ্রি কোণ করে...

—এদের খাওয়াবো পরাবো কোত্থেকে?'

ডাক্তারকে শুধোলাম, 'উনি যা বলে গেলেন, সত্যি নাকি?'

'না। উনি মুখস্থ সংখ্যা বলে গেলেন, প্রতিদিনই বলেন কিনা। আসলে হাসপাতালের আনাচে কানাচে মিলিয়ে রোগীর সংখ্যা এখন চারশ।'

বলেন কি!' আমি বললাম, 'তাহলে তো ফুড সত্যিই একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

'শুধু ফুড!' ডাক্তার ভদ্রলোক এবার সত্যিই হাসলেন, 'ওষুধপত্র-স্টাফ-নার্স সবই বাড়বাড়ন্ত, কি ক'রে যে আমরা চালাচ্ছি, তা আমরাই জানি।'

সুবিধে অসুবিধের কথা অনেক আলোচনা হল। জানলাম, এমন দুচারজন প্রতাপশালী ডাক্তার রয়েছেন যাঁদের ওয়ার্ডে ভিজিট দেবার সময়ই হয় না, সপ্তাহে দুবার উঁকি দিয়ে যান বড়জোর। এ ছাড়া আর একটি মুশকিল হয়েছে ডাক্তার মাস্টার-মশাইরা টেক্সটবুকের যে পাতায় যখন বিচরণ করছেন হাসপাতালের মূল্যবান বেডগুলি তখন সেই সব রোগীদেরই ইজারা দেওয়া থাকে, তা হোক সে হাইস্ট্রোসিস অথবা আরো নগণ্য কিছু। ফলে পাবলিক সাফার করে, আর এস নিরুপায় হয়ে অনেক জরুরী রোগীকেও জায়গা দিতে পারেন না। টিচিং ইনস্টিটিউশন আর পাবলিক হসপিটাল যতদিন অংগাঙ্গী হয়ে থাকবে ততদিনই এই সমস্যা আছে। এর ওপরে আবার আছে মন্ত্রী শান্ত্রী কেষ্ট-বিষ্টু-উপদেবতাদের অনুরোধপত্র—ওরফে হুকুম-নামা। অমুক রক্ষিতের স্ত্রীকে যেন পত্রপাঠ ভর্তি ক'রে নেওয়া হয় এবং ভালো ক'রে যত্নআত্তি করা হয়। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধেও কেউ হয়ত এমন গুছিয়ে লিখতে পারে না যেমনটা কোনো সদ্য নিযুক্ত ঝি, ড্রাইভারের স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো দূরসম্পর্কীয়ার সম্বন্ধে লেখা হয়ে থাকে। ফলে ম্যালিগন্যাণ্ট কিংবা প্রশ্বাস ফেলে আগে সেই অ্যামেচার পেশেণ্টকে আপনি-আজ্ঞে ক'রে শয্যাকবুল করতে হয়। প্রাণের চেয়েও চাকরি বড়।

এছাড়া আছে পাঁচহাজারী দশহাজারী মনসবদারের দল। ১৯৬১ সনের আগে যারা অ্যাডমিশন নিয়েছে। অধিকাংশই গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছে। এই সব 'ক্যাপিটাল স্টুডেণ্ট' ডোনেশনের ইনটারেস্ট পুরোমাত্রায় উসুল করছে। প্রফেসারের টেবিলে টেপরেকর্ডারের মাউথপিস তুলে নিয়ে হিপপকেটে দুলিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেও উচ্চবাচ্য হয় না। অথরিটি নিরুপায়। আর বছরখানেক চোখকানবুজে চালিয়ে যান, এই রেয়ার স্পিসিজ শেষ হয়ে এল বলে। তখন সরকারী নিয়মকানুন স্ট্রিকটলি ফলো করা হবে।

হাসপাতালটি আবার এমন একটি শহরে অবস্থিত যেখানে ইলেকট্রিসিটি যখন তখন ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে বসে। মলয় সমীরণ দুবার হেঁচকি তুললো কি দিগন্তে একটুখানি কালশিটে পড়ার মত মেঘ করলো অমনি বিদ্যুতের নাড়ী ছিঁড়ে গেল তাই Current Affair-এ হাসপাতালটিকে প্রায়ই ভুগতে হয়। রোগীদের জন্য অবশ্য হাতপাখা, হ্যাজাক, মোমবাতি, লণ্ঠন আছে কিন্তু মুশকিল হয় অপারেশন থিয়েটারে। হঠাৎ আক্কেল গুড়ুম অন্ধকার, সংগে সংগে ড্রপ ফেলতে হয় অপারেটিং ফিল্ডের ওপর! ক্ষেত্রফল যাতে না বদলায়, পোকামাকড় না

চ্কে পড়ে! কণকাল ইন্টারভেলের পর হয়ত পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জেবলে চলে হান্টিং, যতক্ষণ-না স্পটলাইট আসে। অ্যানেস-থেসিয়ার হাইলি ইনফ্লেমেবল সূক্ষ্ম বিন্দু ভাসছে হাওয়ায় সুতরাং গ্যাস বা তেলের আলো সেখানে জবালা মানেই থিয়েটার সেন্টার পোড়ানো।

'আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে! সিরিয়াস অপারেশন থাকলে খেয়ালই হয় না অনেক সময়—' সার্জন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'একবার হয়েছিল কি শুনুন। আমি তখন ফার্স্ট অ্যাসিস্টেন্ট। একজন তা'-বড় সার্জন ডেক্সটারের মত দুহাতে চাকু চালাচ্ছে, মেজর অপারেশন, আমি ধরতাই দিচ্ছি। আমি তখনও আনাড়ি মানুষ, হঠাৎ আঁতকে উঠে ডাকলাম, "স্যার!" উত্তর এল, চোপ ডিস্টার্ব করো না, হাত ফস্কালেই বিপদ—। অনেকক্ষণ পরে থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে বলেই ফেললাম, "স্যার আলো নেই যে!" অন্ধকারে তখন তিনি কভারিং স্টিচ্ দিচ্ছেন, চমকে উঠে শুধালেন, 'অ্যাঁ! বল কি! কতক্ষণ? আগে বলতে হয়। অপারেশন শেষ হয়ে গেল যে'। সার্জন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

১৫

নিয়ম মাফিক আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বৃষ্টি না নামলেও একটা সপ্তাহ দাবদাহে জ্বালিয়ে মাসের সাত তারিখ থেকে যা আরম্ভ হলো তার আর বিরাম রইলো না। সামান্য ছিটে ফোঁটাতেই কলকাতা শহর ভেসে যায়, আর সেই অবিরাম তিনদিন তিন রাত্রিব্যাপী বৃষ্টিতে একেবারে অচল হয়ে উঠলো সব। ট্রাম বাস মোটর গাড়ি সব বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে, বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো ইস্কুল কলেজ। আপিসের বাবুরা জুতো খুলে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিপর্যস্ত হতে লাগলেন। বাচ্চারা খেলতে লাগলো কাগজের নৌকো ভাসিয়ে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা পা ভেজাতে বেরুলো ছপছপ করে। আর বাড়ি বসে থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠলেন মিত্রসাহেব। মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে রইলো।

ইদানিং বেশীর ভাগ সময়টাই প্রায় বাইরে কাটাতেন, সকালে দুপুরে রাত্রে যে কোনো সময় খোঁজ করলেই শোনা যেতো তিনি বাড়ি নেই। বাড়িটা অসহ্য লাগছিলো তাঁর, মনে মনে তিনি ভয়ানক একটা কিছু করে ফেলার জন্য অধীর হয়ে উঠছিলেন। বুঝতে পারছিলেন এভাবে আর বেশী দিন চলতে পারে না। একটা হেস্তনেস্ত দরকার। নিজের সম্মান তিনি নিজে নষ্ট করছেন, মেয়েটি তাকে একটা জেলি মাছ ভাবছে। ভাবছে লোকটা ভীরু, কাপুরুষ, মূর্খ, অপদার্থ। ভাবছে ওর শক্ত মুখ দেখে আমি ভয় পাই। আমার সভ্যতা ভদ্রতা, শিক্ষা শালীনতা কিছুরই কোনো অর্থ নেই ওর কাছে। ও ভাবে ও জয়ী আমি বিজিত। ওর কৃতজ্ঞতা নেই, স্পর্ধার সীমা নেই, আমারই প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে ও আমার মাথার উপরেই ফণা তুলে বসে আছে দিন রাত।

এবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, এবার নিশ্চয়ই তিনি প্রতিশোধ নেবেন। ওকে দেখাবেন একটা ঘুমন্ত সিংহ আহত হয়ে যখন জ্বলন্ত চোখ তুলে উঠে বসে, কী তার চেহারা হয়। ও কার সঙ্গে লড়াইতে নেমেছে, দেখুক এবার।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়া, জানালা দরজা বন্ধ করা একঘেয়ে দুপুরের আধো অন্ধকার ঘরে বসে বসে মিঃ মিত্র ক্রোধে এবং আত্মম্ভরিতায় দুর্মর হয়ে উঠলেন। শরীরটা ভালো লাগছে না. অবিরাম একটার পর একটা সিগেরেট খেয়ে খেয়ে জিবটা শুকনো, খড়খড়ে বিস্বাদ। হয়তো একটু ঠাণ্ডাও লেগেছে কাল রাত্রে, জানালাটা খোলা ছিলো মাথার দিকে, ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিলো বিছানাটা।

এলানো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ঘরের এ-মাথা ও-মাথা কঠিন পায়ে দুর্বিনীত বেগে আহত সিংহের মতোই পায়চারি করতে লাগলেন। দুই হাত পিছনে, দৃঢ়বদ্ধ করে জানালা দিয়ে আকাশটা দেখলেন একবার। মেঘেমোছা বোবা বিরস বিবর্ণ আকাশ। জঘন্য। জঘন্য। আবার হাঁটতে লাগলেন এ-মাথা ও-মাথা।

হঠাৎ এইমাত্র ধরানো জ্বলন্ত সিগারেটটা টোকা মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, জেদি জন্তুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন কতোক্ষণ, তারপর ঠাস করে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সিগারেটটা কোথায় পড়লো তাকালেন না, যদি তাতে আগুন ধরে তো ধরুক, এই ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত বাড়িটা যদি সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, যাক। এ বাড়িতে তাঁর কোনোদিন কোনো শান্তি ছিলো না, স্নেহ ছিলো না আশ্রয় ছিলো না। আজো নেই। এ বাড়ি জ্বলুক পুড়ুক থাকুক না থাকুক, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। এই মস্ত বাড়িটায় অনেক হাহাকার, অনেক অশ্রু আর অনেক দীর্ঘশ্বাস জমা আছে। আজ শেষ দীর্ঘশ্বাসটি শুনতে হবে কান পেতে, চোখের জলের শেষ বিন্দুটি দেখতে হবে একাগ্র হয়ে। হাহাকারের এই হবে শেষ অধ্যায়। বারান্দা দিয়ে দুরন্ত পায়ে প্রায় ছুটতে লাগলেন তিনি। এতো দ্রুতপায়ে বোধহয় কোনো কারণেই আর কখনো চলেন নি। এ ধরনের চলন-বলন তাঁর চরিত্রবিরোধী।

বাড়িটা একেবারে ঝিমিয়ে ছিলো। একে বৃষ্টি তায় দুপুর, আহারের পর সকলেই যে যার ঘরে নিশ্চয়ই নিদ্রামগ্ন। নইলে একটি সেবক-সেবিকাকেও দেখা যাচ্ছে না কেন? অবিশ্যি এই সময় ওরা থাকেও না কেউ, এমন কি শায়লাও না। খাবার পরে দুপুরে কয়েক ঘণ্টার জন্য ওরা স্বাধীন, ওদের ছুটি, ওরা তখন ইচ্ছে মতো তাসপাশা খেলে। বেড়ায়। গুলতানি করে অথবা ঘুমোয়। আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বাধ্য হয়েই যে যার ঘরে ঢুকে আছে, না ডাকলে আর পাত্তা মিলবে না। তারপর চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হবে ব্যস্ততা, হুকুম পালনের তৎপরতা, এক কাজে ছুটে আসবে একশো-জন।

স্বভাববিরুদ্ধভাবে মিত্র সাহেব সেদিন

শুধুই যে চঞ্চল চরণ হলেন তাই নয়, সেই চরণের ঘাসের চটি থেকে শুরু করে পরিধেয় প্যাণ্ট গেঞ্জিও তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছিলো।

বেশভূষা বিষয়ে তাঁর পারিপাট্য অথবা শালীনতা অথবা অভ্যাস একটু বাড়াবাড়ি রকমের গতানুগতিক। তিনি শোবার পোশাক পরে যেমন ঘরের বাইরে আসেন না, তেমনি গেঞ্জির উপরও কিমোনো ও ড্রেসিং গাউন না চাপিয়ে বারান্দায় দাঁড়ান না। আজ সব বিষয়েই অনবহিত, অন্যমনস্ক। নিজের অজান্তেই ঘরের ভিতরে শুয়ে বসে থাকা ধূসর রংয়ের কুচকোনো প্যাণ্টে গেঞ্জিতে একটা ইঞ্জিন বসানো দম দেয়া গাড়ির মতো ঝড়ের বেগে এক দমকে পার হয়ে এলেন বারান্দাটা, মোড় ঘুরলেন দক্ষিণ প্রান্তের ঘরের দিকে, ভেজানো দরজা ঠেলে, পর্দা সরিয়ে কারো অনুমতির অপেক্ষা না রেখে সোজা ঢুকে এলেন ভিতরে। ঘরের মাঝখানে এসে তবে থামলেন।

১৬

অসম্বৃত আঁচলে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে শুয়ে অতসী আকাশ পাতাল ভাবছিলো। ভাবছিলো এই রকম স্তব্ধ দুপুরে, যখন কেউ কোথাও নেই, সেই ফাঁকে সিঁড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে যেতে পারে কিনা। সকলের অলক্ষ্যে চুপচাপ বেরিয়ে যেতে পারে কিনা পথে। মনে মনে সে এ রকম প্রায় প্রত্যেক দিনই চলে যায় রাস্তায়, তারপর রাস্তায় গিয়েই হারিয়ে যায়, ভয় পায়, চারদিকে তাকিয়ে আবার ছুটে আসে এখানে এ ঘরে। আজ সেই ভয়টা সে ঝেড়ে ফেলছিলো মন থেকে। মনকে সে প্রস্তুত করছিলো, সাহসী হতে। উদ্বুদ্ধ করছিলো দুর্বল শরীরের অক্ষমতাকে চলমান হতে। জীবনের অনেক নোংরা দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তার, একা একটি পথ হারানো যুবতীকে দেখলে যে পথ দেখাতে অনেক মানুষই ছুটে আসবে বর্তিকা হাতে তা সে জানে। কলকাতার এই অজানা অংশটুকু থেকে তাদের বাড়ির দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত যতোটুকু অচেনা রাস্তা তাকে অতিক্রম করতে হবে, তার মধ্যে এই সব আদরের জনেরা যে তাকে অনেক সম্ভাষণ জানাবে, আমন্ত্রণ জানাবে তাও সে জানে। অথচ এখানে ও আর এক মুহূর্ত টিঁকতে পারছে না। সেটা সম্ভব নয়, স্বাভাবিক নয়। এখন সে কী করে?

চিত্রাকে মনে পড়ছিলো। বেচারা! কোথায় তলিয়ে গেল। চিত্রা দেখতে সুন্দর ছিলো, স্বভাবেরও কোনো তুলনা ছিলো না। বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও পাড়ার ঐ একটি মেয়ের সঙ্গেই ভাব হয়েছিলো, বন্ধুতা গাঢ় হয়ে উঠেছিলো। চিত্রার বাবা হাঁপানিতে ভুগতেন, মেজাজ ভীষণ খিটখিটে ছিলো। কী বিশ্রী ব্যবহারই না করতেন ওদের সকলের সঙ্গে। চিত্রার মা তো সারাদিন ভয়ে তটস্থ। বড়ো ছেলে কোথায় গেঞ্জির কলে কাজ করতো, ভালোই আয় ছিলো। খাটতো খুব, উপরি পেতো, আর তাইতেই কোনো মতে চলে যেতো সংসারটা। তারি মধ্যে কী দুর্মতি হলো (এটা চিত্রার বাবার মত) ফট করে বিয়ে করে বসলো কাকে। আর যাবে কোথায়। জুতো নিয়ে তাড়া করলেন বাপ, পঁচিশ বছরের ছেলে অনেক দিন অনেক কিছু সহ্য করেছে, সেদিন করলো না, মা বোনের দিকে তাকিয়েও সে চোখ ফিরিয়ে নিল, তারপর চলে গেল। আর সেই যে গেলো তো গেলই। এখন এদের খাওয়ায় কে? অকর্মণ্য ক্রুদ্ধ পিতার হাজারো আবদার কে মেটায়? অতএব বেরুতে হলো চিত্রাকে। চিত্রার বাবাই কোথা থেকে কী সন্ধান এনে মেয়েকে কাজে পাঠালেন। 'কী কাজ চিত্রাদি?' চিত্রার মুখে জবাব নেই, চোখে জল। অনেকগুলো ছোটো ছোটো ভাইবোন ছিলো, দেখা গেল দু'-চার মাসের মধ্যেই তারা দিদির রোজগারে দাদার রোজগারের চেয়ে বেশি ধোপ দুরস্ত হয়ে উঠেছে। বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে সংসার। বাচ্চারা নতুন বইটই কিনে নতুন জামা জুতো গায়ে পায়ে দিয়ে, পড়তে যাচ্ছে ইস্কুলে। তখন একদিন অতসী চুপি চুপি গিয়েছিলো তার কাছে, গোপনে বলেছিলো, 'আমাকে তোমার মতো একটা কাজ দেবে চিত্রাদি? আমি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি, শুধু অংকটা তেমন ভালো পারি না, নেবে না আমাকে?'

চিত্রা আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলো। হেসে বললো, 'এখানে লেখাপড়ার দরকার হয় না কোনো। তুই পাশ করিস আর না করিস তোকে পেলে তো লুফে নেবে।'

এ কথা শুনে আশায় বুক বেঁধে সাগ্রহে সে হাত চেপে ধরেছিলো, 'তা হলে আমাকে করে দাও।' চিত্রা শুধু একটু হাসলো কিন্তু চাকরী করে দিল না।

কতো যে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো তখন। কতো রাগ হয়েছিলো ওর উপরে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ করেছিলো নিজের কাজেও তেমন মন ছিলো না চিত্রার। প্রায়ই যেতে চাইতো না, কাঁদতো। মাও মেয়ের পক্ষ নিতেন, কিন্তু ওর বাবা অবিচল। চিৎকার করে গালিগালাজ করতেন, ঘাড় ধরে পাঠাতেন, আর মেয়ের রোজগারে শুয়ে বসে খেতেন।

তারপর একদিন কাজ থেকে আর ফিরলো না চিত্রাদি।

কোথায় গেল? কেন ফিরলো না? ওর মা বাবাই বা কেমন? একবারও খুঁজলো না, কাঁদলো না, টুঁ শব্দটি না করে ঢোক গিলে বসে রইলো। ওর বাবা বলে বেড়াতে লাগলেন, 'নিজে নিজে কাকে বিয়ে করেছে, তাই ছেলের মতো মেয়েকেও ত্যাগ করেছি।' এই বলে এতোদিন পরে নিজে একটা কাজের খোঁজে বেরুলেন। তিনি বি-এ পাশ ছিলেন, কর্মবিমুখতাই ছিলো তাঁর প্রধান দোষ, এবার ছেলেমেয়ের রোজগারে খেতে না পেয়ে নিজের রোজগারে সচেষ্ট হলেন। ইস্কুল মাস্টারি পেতে দেরি হলো না তাঁর। আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলো সংসার।

সেই চিত্রার কথা ভুলেই গিয়েছিলো অতসী। হঠাৎ পাড়ার একটি ছেলে এসে হাজির, 'একটা চিঠি লিখে দেবে অতসীদি?'

'কাকে?'

'চিত্রা রায়কে। তোমার খুব বন্ধু ছিলো আমি জানি।'

'চিত্রা রায়? চিত্রাদি কোথায় আছে? এতোদিন পরে তার খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?'

'সবাই তো জানে। কেন, তুমি জানো না?'

'কী জানবো?'

'কার কাছে আছে সে?'

'জানি বৈকি।' বিয়ে করেছে যখন নিশ্চয়ই স্বামীর কাছে আছে। কিন্তু তা নয়, আমি—'

'স্বামী!' বাধা দিল ছেলেটি, 'স্বামী মানে? চিত্রা রায় আবার স্বামী পাবে কোথায়?'

'তবে? ও'রা যে বললেন বিয়ে হয়েছে?'

'তা ছাড়া আর কী বলবে বলো? ঠেলে তো নিজেরাই দিয়েছিলো, এখন কলা দেখিয়ে মেয়ে খুব শান্তি দিয়েছে। বেশ করেছে। দশজনের কাছে বিক্রী হবার চেয়ে একজন অনেক ভালো।'

কথার অর্থ ধরতে পারে নি অতসী, ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তা হলে কোথায় আছে এখন? কী করছে?'

'আরে বাবা ব্ল্যাক আয়রন কোম্পানীর বড়ো সাহেব এখন তোমার চিত্রাদির দাসানুদাস। কতোবড়ো বাড়ি করে রেখে দিয়েছে, উঠতে বসতে শাড়ি গয়না দাস-দাসী— তোমার পায়ে পড়ি অতসীদি আমার হয়ে ওকে লিখে দাও একটু, একটা চাকরী খালি আছে ওখানে, যেন আমাকে নেয়া হয়— লক্ষ্মীটি—'

'এসব তুমি কী বলছো সীতেশ?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলো সে। সত্যি তার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। একজন মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অপমান আর কী হতে পারে, সে কথা ভেবে পায় নি। তারপর কারণে-অকারণে হঠাৎ হঠাৎ কতোবার তার চিত্রাকে মনে পড়েছে, কতোবার তেমনি করেই টনটন করে উঠেছে বুক। একটা নিঃশ্বাস বন্ধ করা দুঃসহ কষ্টে সে ছটফট করেছে।

'এ কী!'

হঠাৎ অত্যন্ত উদভ্রান্ত এলোমেলো চেহারায় মিঃ মিত্রকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, একটা আসন্ন ঝড়ের সংকেত টের পেয়ে

বুকটা দুরদুর করে উঠলো। এ রকম পোশাকে এ রকম না বলে কয়ে ঘরের মধ্যে চলে আসা তার সুলক্ষণ বলে মনে হলো না।

এক ঝটকায় শাড়ির আঁচল সামলে বিছানা থেকে সোজা নিজেকে সে দাঁড় করিয়ে দিল মেঝের উপর।

'এলাম।' মিঃ মিত্র হাঁপাচ্ছিলেন।

'কী চান?'

'কী না?'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে।'

'এই অসময়ে—'

'এ বাড়ি আমার, সুতরাং কোনো সময় অসময়ের প্রশ্ন নেই।'

উদ্ধত হয়ে অতসী বললো, 'আছে।'

'না। আমার ঘরে আমি পা-দেব, সে আমার আপন অধিকার।'

'অধিকারের প্রশ্ন নয়, কতোগুলো রীতি-নীতিরও প্রশ্ন থাকে মানুষের জীবনে।'

'আমি রীতির দাস নই, নীতির তো নই-ই। তাতে যদি তুমি আমাকে অমানুষ ভাবো ভাবতে পার।'

অমানুষ যে তা কি অতসী মাত্র আজই ভাবছে? একটা আগুনের কুণ্ড হয়ে জ্বলতে জ্বলতে বললো 'জন্তুদের জীবনেও কতোগুলো নিয়ম-কানুন থাকে, একই জঙ্গলে বাস করেও তারা কেউ কারো পৃথক সত্তাকে নষ্ট করে না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও এতো সব বড়ো বড়ো কথা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার একটু সময় লাগবে। অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো আমি জন্তু, এই তো?'

অতসী জবাব দিল না।

'বলতে চাইছো যেমন মানুষের আইন-কানুনের সীমা ডিঙিয়েছি তেমন জন্তুদের নিয়মও লঙ্ঘন করেছি, এই তো?'

অতসী তেমনিই চুপ করে রইলো।

'তা হলে শোনো, মানুষ যখন জন্তু হয়, ইচ্ছে করেই হয়। কিন্তু জন্তু কখনো হাজার ইচ্ছেতেও মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এবং এইটুকুই হচ্ছে আমার জিৎ। সুতরাং জন্তুর স্বভাব আর মানুষের বুদ্ধি মিলিয়ে আমি যেমন কোনো মনুষ্য সমাজের ধার ধারিনা তেমনি জঙ্গলের আইনও মানি না। আমার আসল বাসন আমার স্বেচ্ছাচার।'

ধীরে ধীরে হেঁটে তিনি অতসীর এইমাত্র পরিত্যক্ত বিছানাটার উপর এসে বসলেন, হাতের কাছে কী এক পুরোনো ছেঁড়া খোঁড়া কাগজ পেয়ে সেটাই পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। অতসী পিছন হটে হটে প্রায় দেয়ালের ঠেসানে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে মিঃ মিত্র বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

'না।'

'আমি এখন এ ঘরেই থাকবো, এ ঘরেই বিশ্রাম করবো, কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'তা হলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি বাইরে যাই।'

'তুমি বাইরে গেলে আর আমি ঘরে এলাম কেন?'

'আমি কী করবো?'

'যা বলবো তাই শুনবে।'

'আমি আপনার অসংখ্য দাসদাসীর অন্তর্গত কেউ নেই। কারো হুকুম পালন করার অভ্যেস নেই আমার।'

'তা হলে তুমি এ বাড়ির কী অতসী?' চোখ তুলে তাকালেন তিনি।

'কেউ না।'

'একেবারেই কেউ না? প্রেয়সী, প্রেয়সী, প্রিয়তমা, কিছু না?'

অতসী হাত মুঠো করলো, দাঁতে দাঁত ঘষলো।

'দরজাটা বন্ধ করে দেবে?'

'না।'

'পাওনা লক্ষ্মীটি। বেশ নিরিবিলি হওয়া যাবে।' বেডকভারের তলা থেকে বালিশটা বার করে নিলেন। পালকের নরম বালিশ। সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে বুকের তলায় নিয়ে আরাম করতে করতে বললেন, 'কী তেল মাখ? ভারি মিষ্টি গন্ধ তো।'

বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে অতসী অস্ফুটে বললো, 'অভদ্র।'

'কেন, কেন? অভদ্র কেন?'

'সে প্রশ্ন নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'তোমার বিছানায় বসেছি বলে? বালিশটা নিয়েছি বলে? তা বিছানা-বালিশের যিনি মালিক তিনিও যখন আমার, তখন—'

হঠাৎ অতসী পাশের হোয়াটনট থেকে আর কিছু না পেয়ে একটা কাচের গ্লাসই কুড়িয়ে নিল। হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ মিত্র, 'উঁহু, ওটা দিয়ে শুধু নিখন

সম্ভব নয়। আমি এতো সুস্থ লোক যে তোমার ওই নরম হাতের ছুঁড়ে মারা কাচের গ্লাস তো দূরের কথা, একটা লোহার ডাণ্ডা মেরেও আমাকে তুমি ঘায়েল করতে পারবে না।'

নেমে গিয়ে তিনি নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে অতসীর গলা চিরে শব্দ বেরুলো 'আয়া, আয়া—'

'আয়া ঘুমুতে গেছে।' খুব ঠাণ্ডা গলা মিত্রসাহেবের। 'তাছাড়া আমি হুকুম না দিলে কি সে ঘরে আসবে?'

'তবে? তবে কী হবে?'

'কিছু হবেই একটা।'

'শায়লা—শায়লা—'

'শায়লাও আমারি চাকর।'

'তাহলে আপনিই ডেকে দিননা ওদের।'

'আমি ডেকে দেব? আমাকে মারতে আমিই লোক ডেকে জড়ো করবো?' দুই চোখে হাসির বান ডাকালেন তিনি, ফুর্তির সুরে বললেন, 'এইবার একটা বাঘ আর একটা ছোট্ট মিষ্টি হরিণ, তাই না?'

বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভরে গেল অতসীর। জিব দিয়ে বারে বারে সে ঠোঁট ভেজাতে লাগলো।

'তুমি নিশ্চয়ই জানো কী জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে।'

সমস্ত ভয় ভুলে আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। কথার নিগূঢ় অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই স্পষ্ট গলায় বললো, 'জানি।'

'এতো যত্ন করে কেন তোমাকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে তাও নিশ্চয়ই জানো?'

'জানি।'

'যদিও আমার নামের অলংকরণে নারায়ণ শব্দটি বসানো আছে কিন্তু আমি যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ তাও নিশ্চয়ই জানো।'

'জানি।'

'তা হলে এখন তুমি কী করবে?'

অতসীর হাতে হাত নিবদ্ধ, পিঠ নিবদ্ধ দেয়ালে।

'ভাবছো পালিয়ে যাবে?'

'পালাবো?' সমস্ত ভঙ্গিতে ঘৃণার ফোয়ারা উদ্রিত হলো। 'কেন? আমি কি চোর? আমি কি আপনি? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'তা ছাড়া বুঝি পালাবার কারণ ঘটে না?'

'না।'

'এখন ঘটেনি?'

'না।'

'আমাকে ভয় করছে না?'

'না।'

'কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আমি তোমাকে ছোবল দিতে পারি।'

'জানি।'

'তবে?'

'সে লজ্জা আপনার, আমার নয়। নিজেকে ছোটো হতে দেবার অপমানও আপনারই।'

'বাঃ। বেশ চালাক মেয়ে তো। কথার ফন্দি মন্দ জানা নেই দেখছি। আসলে যতো সরল ভাবি ততো সরল তুমি নও। কেবল এই সব বলে আমার ভিতরে দয়ামায়া মনুষ্যত্ব ইত্যাদি গালভরা নামগুলোর সমন্বয় ঘটাবে? না, সখি সে সব বৃত্তি আমি জীর্ণবস্ত্রের মতো অনেক আগেই পরিত্যাগ করেছি। অতএব সে ছলনা বৃথা।'

অতসীর কাঁধের উপর একটা হাত রাখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অতসীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, বুকের স্পন্দন থেমে গেলো, নীল হয়ে গেল ঠোঁট। মিঃ মিত্রের চোখে চোখ ফেলে তাকিয়ে রইলো সে জা।

'কী দেখছো?' কাঁধের হাত বুকের পাশে লুটিয়ে থাকা একগুচ্ছ চুলের মধ্যে সঞ্চালিত হলো।'

একটুও নড়লো না অতসী, দৃষ্টি তেমনি অপলক।

তিনি হাত ধরলেন, আকর্ষণ করে বললেন, 'এরপর কী জানো তো?'

প্রতিপক্ষের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ নেই।

'আর এ কথা সবাই জানে আমার কোনো মনের ক্ষুধা নেই, শরীরই আমার সব।' একটা হাতের বদলে দু' হাতে দুটো হাত ধরলেন, প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'বুঝেছ?'

নড়ে গেলো অতসী। তার এতক্ষণের স্তম্ভিত চৈতন্য যেন চমক খেয়ে জেগে উঠে ভিতরের স্পন্দনকে বাইরে নিয়ে এলো। আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো সে, বড় বড় চোখ কানায় কানায় ভরে গেল জলে।

হাতের মুঠো থেকে হাত দুটো কোনো জিনিসের মতো ছুঁড়ে ফেলে এদিকে চলে এলেন মিত্রসাহেব। সোফায় বসলেন। গলায় বুকে কুল কুল করতে লাগলো ঘাম, গেঞ্জিটা ভিজে উঠলো, রাগে দুঃখে মাথা জ্বলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন আবার হেরে যাচ্ছেন তিনি, কাঙালের মতো উলটো পক্ষ থেকে প্রতিদিনের মতোই কী যেন ভিক্ষা করছেন, ভিতরকার চিরপরিচিত জন্তুটা আবার তেমনিই—তার সঙ্গে ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। সিংহের বদলে এখন তিনি শৃগালের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কী যে করবেন ভেবে পেলেন না। চোখ বুজে খানিকক্ষণ বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে রুদ্ধ গলায় বললেন, 'চোখের জলে তেষ্টা মেটে না, জল দাও একগ্লাস।'

জল দিল অতসী। তার হাত কাঁপছিলো।

'তোমার অষুধের টেবিল থেকে ওই নীল শিশিটা দাও।'

দিল।

'এগুলো ঘুমের পিল, ডাক্তার তোমাকে ঘুম পাড়াতে দিয়েছিলেন. এবার আমার ঘুমোনো দরকার। জানো, কতো রাত আমি ঘুমোই না?' শিশিটা নাড়লেন, 'অনেক আছে দেখছি, দাও তো বার করে।'

দিল।

'একটাই দিলে?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন, 'যদি ইচ্ছে করো কাগজের পুরিয়া সব কটাও গুঁড়ো করে দিতে পার, তা হলে জীবনের মতো ঘুমিয়ে পড়া যায়। সে একরকম মন্দ নয়। বরং তাই দাও। এখানে, এই বিছানায় শুয়েই স্বপ্ন দেখি। ও-সব কাচের গ্লাস-গ্লাস ছুঁড়ে মারা একেবারেই ডিগনিফাইড নয়। কার্যকরী তো নয়ই।' সেই সঙ্গে কাগজ-কলমটাও দিয়ে দাও, লিখে দি আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইস। কী বিশ্রি রকমের মাথা ধরেছে।' কপালটা টিপে চোখ বুজলেন।

একটু পরে।

'তোমার অসুখের সময় তোমাকে কিন্তু আমি অনেক সেবা করেছি। তোমারও আমাকে করা উচিত। এই যেমন ধরো আজ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মাথায়, যদি বলি একটু হাত বুলিয়ে দাও, খুব কি অন্যায় হবে?'

অতসী আবার গিয়ে শক্ত হয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি তাকালেন, 'প্রতিদান কে না চায়? স্বয়ং নারায়ণ হলেও চাইতেন, আমি তো নামের একটা পরিহাস নয়।'

হাতের ঘড়িটা দেখলেন, 'না, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।' উঠে পড়লেন চেয়ার ঠেলে, দরজার কাছে আসতে আসতে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম কি তোমার যাবার ব্যবস্থাটাই করে দেওয়া যাক, কী বলো?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবটা প্রথমে ধরতে পারলো না অতসী, তারপর তার আতঙ্কিত দুই চোখে প্রত্যাশার আলো ফুটে উঠলো, 'কোথায়?'

'যেখানে গেলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে, যেখানে গেলে এই দস্যু প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়ের করাত চালাবে না।'

'আমাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি।'

'আমার মা-বাবার কাছে?' অতসীর ভয়ার্ত মুখটা বদলে সহসা শিশুর সরল লাবণ্যে ভরে গেল।

তাকিয়ে দেখলেন মিঃ মিত্র, মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মা-বাবার কাছে।'

'সত্যি?'

'তোমার কাছে কি মিথ্যে বলা যায়?'

'আমি তবে আবার সেখানে যাবো?'

'কেন নয়?'

'কবে?'

'যেদিন তোমার খুশি।'

'আজ?'

'মন্দ কী?'

'এখুনি হয় না?'

'তাও অসম্ভব নয়।'

'আমি তা হলে এখুনি যাবো।'

দেয়ালের ঠেসান থেকে কাছে সরে এলো সে, প্রার্থনায় কাতর হয়ে উঠলো। মিঃ মিত্র অনুভব করলেন, এখনো হৃদয় থেকে তাঁর প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ওর নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এটুকুও খুব কম মনে হলো না। চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশ, গুছিয়ে নাও।'

কী গুছোবো?'

'তোমার কাপড়জামা।'

'ও তো আমার নয়।'

'কার?'

'আমি তো নিয়ে আসিনি কিছু।'

'আমি তো এনেছিলাম, আর সে সব শুধু তোমার জন্যই।'

'কিন্তু—'

'থাক, এখানকার কিছুই আর তোমাকে নিতে হবে না।'

মিঃ মিত্র দরজাটা খুলে দিলেন, যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যি যাবে?'

'আপনার পায়ে পড়ি, কথা ফেরাবেন না।' ব্যাকুল অনুরোধে ভেঙে পড়লো অতসী।

আরক্ত হলেন মিঃ মিত্র, 'কথা ফেরানো আমার স্বভাব নয়।'

'তা হলে দয়া করে এখুনি আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'তাই হবে। কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ, তিন মাস পরে এ যাওয়াটা তোমার পরিজনেরা কীভাবে গ্রহণ করবেন?'

থমকালো অতসী। তারপর বললো, 'যেভাবেই করুন, তাতে কিছু যাবে আসবে না।'

'তুমি নেহাত ছেলেমানুষ—'

'খুব ছেলেমানুষ নই। অন্তত এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আছে, এখানে যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারবে না আমার জীবনে।'

'ও। বেশ।' বেরিয়ে গেলেন বেগে, কিন্তু ফিরলেন, 'আশা করি বাড়ি চিনতে পারবে।'

'এ শহরের কিছুই জানি না আমি, কিছুই চিনি না। আপনি যদি কাউকে সঙ্গে দেন, কলোনীতে নিয়ে পৌঁছে দিলে আমি বাড়ি চিনে নিতে পারবো।'

'ঠিক আছে।' এবার আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেলেন মিঃ মিত্র। অতসী দরজাটা বন্ধ করে দিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

"মা আমারই জন্য সিনথল টয়লেট পাউডার কিনে এনেছেন...অথচ

... তিনি নিজেই বেশীর ভাগ এটি মাখেন।"

এর স্নিগ্ধ সুরভি তাঁর ভাল লাগে। বাবাও তো মাখেন! উনি বলেন, সিনথল টয়লেট পাউডারে অতুলনীয় উপাদান জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন) আছে বলে এই পাউডার মেখে তাঁর গায়ে কোন দুর্গন্ধ হয় না। অথচ ঘামাচির হাত থেকে রক্ষাপাবার জন্যে আমারই জন্য নাকি এটা কেনা হয়েছে! আমারই এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

NEW CINTHOL DEODORANT LUXURY TOILET POWDER WITH G-11 BY Godrej

সিনথল টয়লেট পাউডার এখন ৩টি সুদৃশ্য কৌটায় পাওয়া যায়।

সিনথল টয়লেট পাউডার

নিশ্চিন্তভাবে রক্ষা পাবার জন্য জি-১১ (হেক্সাক্লোরোফিন) মেশানো সিনথল সাবান মেখে স্নানের পর সিনথল টয়লেট পাউডার মাখুন।

জি-১১ এল. জিভাউর্দা এট গী এস.এ.-র ট্রেডমার্ক

INTERPUB/GCP/4 BN

ভূগর্ভের আবহ পূর্বাভাষ কি সম্ভব হবে?

লে উজবেক রাজধানী তাশখন্দের মানুষের চোখে ঘুম নেই। থেকে থেকে মাটি কেঁপে উঠছে সেখানে। ভাঙা ধসা ক্ষয়-ক্ষতিও বড় কম হয়নি। সেখানকার ভূমিকম্পের ধাক্কা এসে পৌঁছেছে কাশ্মীরে, উত্তর ভারতে। তুর্কীতেও প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে কিছুদিন আগে। শোনা যায় যে, তুর্কী বৈজ্ঞানিকরা নাকি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভূমিকম্প হবে এবং সেইজন্য তাঁরা কতকগুলি প্রদেশ থেকে লোক অপসারণের সুপারিশ করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকরা হয়ত ভূমিকম্প কোনখানে হবে তার পূর্বাভাস দিতে পারেন। কিন্তু কখন সেটা হবে সে কথা কি আগে থাকতে বলতে পারেন? ভবিষ্যতে হয়ত পারবেন কিন্তু এখনো পারেন না। তাশখন্দে এতদিন ধরে মাটি কেন কাঁপছে তা বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, তাশখন্দের ভূমিকম্পের নিজস্ব একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে তার 'এপিসেন্টার' রয়েছে শহরের ঠিক মাঝখানে মাটির তলায়। প্যালিওজোইক যুগের শিলাভিত্তির উপর এই জায়গায় দুটি গভীর ফাটল আছে। সে দুটি পরস্পরকে কেটে গিয়েছে এইখানটায় এবং সেই কাটাকাটির জায়গাটিতে পর্বতমালার হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তনের জন্যই তাশখন্দের এই ভূকম্পন। সেখানকার ভূস্তরের বৈদ্যুতিক, চৌম্বক, তাপীয় ও মহাকর্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাপারগুলির অদল বদল লক্ষ্য করে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের অবসান ঘটবার সময় এখনো আসেনি কিন্তু সেটা কতদিন চলবে তা বলা অসম্ভব।

খবরের কাগজে ভূমিকম্পের খবর বার হয় মাঝে মাঝে। অধিকাংশ দিনই সে রকম কোন খবর থাকে না। কিন্তু তার মানে কি এই যে সেই সব দিনে কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে না? না তা নয়। প্রতি বছর পৃথিবীতে লক্ষাধিক ভূমিকম্প হয়ে থাকে যদিও সেগুলির অধিকাংশই আমরা টের পাই না। টের পাওয়া যেতে পারে একমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে। শুধু তাই নয় সব সময়েই কোথাও না কোথাও মাটি স্পন্দিত হচ্ছে সেখানকার মানুষ সেটা অনুভব করতে না পারলেও। ভূত্বকের সংকোচন ও সম্প্রসারণই হচ্ছে তার মূল কারণ। সেই সংকোচন-সম্প্রসারণের পালা মাটির নিচে ক্রমে ক্রমে একটা কষাকষি জমা করতে থাকে। সেই কষাকষির চাপ মানগতভাবে বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ভূত্বকে এক বৈপ্লবিক গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে যখন স্থানচ্যুতি ঘটে পাহাড় পর্বতের, মাটির স্তর ধ্বসে যায়, পুরনো পাহাড়ের পতন ঘটে, অভ্যুদয় হয় নতুন পাহাড়ের। এই প্রক্রিয়ার নিত্যসঙ্গী হচ্ছে ভূমিকম্প। অবশ্য পৃথিবীর সব দেশে এই ধরনের ব্যাপার হয় না, কারণ সব দেশে ভূত্বকের গঠন এক রকম নয়। যে সব অঞ্চলের ভূত্বকে ফাটল ও অন্যান্য ত্রুটি থাকে (যেমন খাঁজ, খাদ, 'ফল্ট' ইত্যাদি) সেখানেই এই ধরনের ব্যাপার বেশি ঘটে। পশ্চিম এশিয়ায় জাপান ও ফিলিপাইন থেকে আমেরিকার পশ্চিম ভাগে, চাইল, ক্যালি-ফর্নিয়া ও আলাস্কা হয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের মত বিরাট যে এলাকা ছড়িয়ে আছে সেখানে এবং এশিয়া মাইনরে ভূত্বকের গঠন ভূমিকম্পের সহায়।

পৃথিবীর স্থলভাগ সম্পর্কে বলা যায় যে সেখানে সারা বছরে যতগুলি ভূমিকম্প হয় তাতে ঘণ্টায় একটি করে পড়ে। তাও স্থলের সেই সব অংশের কথা বলছি, যেখানে ভূমিকম্প রেকর্ড করবার স্টেশন আছে। যে সব জায়গায় সে রকম স্টেশন নেই সেখানকার সব কথা আমরা জানতে পারি না। তারপর ভূমন্ডলের যে তিন ভাগে মহাসাগর সেখানেও ঐ রকম কত আলোড়ন ঘটছে যার কোন হদিস আমরা পাই না। সাগরগর্ভের সেই আলোড়ন থেকেই জাপানে 'সুনামী' নামক বাত্যা-বন্যার আক্রমণ ঘটে।
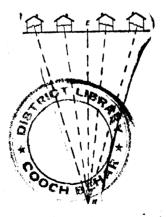
অধিকাংশ ভূকম্পন এত মৃদু যে সেগুলি মানুষের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না। তার চেয়ে জোরে যেগুলি হয় সেগুলি

মন্টপালর অগ্ন্যুৎপাতসহ ভূমিকম্পের ধাক্কায় এই পাথরটি জ্বলন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে

ঘরবাড়িতে ও রাস্তায় ফাটল ধরাতে পারে এবং সেগুলির দরুণ কিছু প্রাণহানিও ঘটতে পারে। সেই ধরনের ভূমিকম্প প্রতি বছরই হয় কয়েক ডজন। আর যে প্রচন্ড ভূকম্পন সমস্ত লোক সমেত গোটা শহরকে শহর শ্মশানে পরিণত করতে পারে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এত প্রাণহানি ঘটাতে পারে যা কোন মহামারীরও সাধ্যের অতীত, সে রকম প্রলয় ঘটে আরো অনেক কম। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের সাংঘাতিক ভূমিকম্প যতগুলি হয়েছে সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯০৮ সালে মেসিনার ভূকম্পন (মৃত্যুসংখ্যা ৮৩০০০), ১৯২০ সালে চীনের কানসু প্রদেশের ভূমিকম্প (প্রাণহানি ২ লক্ষ), ১৯২৩ সালে টোকিওর ভূমিকম্প (প্রাণহানি ৯৬০০০), ১৯৩৪ সালে ভারতের ভূকম্পন (মৃত ১০ হাজার, গৃহহীন ৫ লক্ষ)। ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি লোক সানফ্রান্সিস্কোর ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে।

আগেই বলেছি যে ভূকম্পনের পরিপ্রকাশ

হাইপোসেন্টরের গভীরতা মাপবার কৌশল

মেসিনায় ভূমিকম্পের খতিয়ান

মাটির উপরে হলেও, তার উৎপত্তি পৃথিবীর নাড়িভুঁড়ির মধ্যে। সেই উৎপত্তি-কেন্দ্র বা 'ফোকাস্'কে বলা হয় 'হাইপোসেন্টার।' সেইখান থেকে জন্মলাভ করে, কাঁপনগুলি ঢেউর-এর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জমির যেখানটা হাইপোসেন্টারের ঠিক মাথার উপর সেইখানটাই কাঁপে সবচেয়ে জোরে। সেই জায়গাটিকে বলা হয় 'এপিসেন্টার।' এপিসেন্টারের চারিদিক কিছু দূরে কতকগুলি বিন্দুতেও সমান জোরে মাটি কাঁপে। তবে সেই বিন্দুগুলি গোল রেখার দ্বারা যুক্ত করলে যে সমকেন্দ্রিক হবে তা নয় কারণ কম্পনের গতি স্থানীয় ভূত্বকের গঠন ও উপাদানের বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। তারপর এপিসেন্টার থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে ততই কাঁপনের জোর কমতে কমতে শেষকালে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া সেটা আর অনুভব করা যাবে না। যে কাঁপন মানুষ টের পায় তাকে বলা হয় 'ম্যাক্রোসীজম্', আর যেগুলি টের পায় না সেগুলি 'মাইক্রোসীজম্।' প্রচণ্ড ভূমিকম্পগুলি সাধারণত শুরু হয় কয়েকটি মৃদু কাঁপন দিয়ে। মৃদু কাঁপনের পর যে এক বা একাধিক প্রচণ্ড ধাক্কা আসে তাইতে গোটা শহর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। শেষকালে সেই ম্যাক্রোসীজম্গুলি মাইক্রোসীজমে রূপান্তরিত হয়। এক একটি ভূমিকম্প ম্যাক্রোসীজম্ ও মাইক্রোসীজম্ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা থেকে, পুরো একটা দিন এমন কি কয়েক মাস পর্যন্ত চালু থাকতে পারে (যেমন তাশখন্দে হচ্ছে)।

আজকাল ভূমিকম্প রেকর্ড করার এমন সব যন্ত্র (সীজমোগ্রাফ) তৈরি হয়েছে যেগুলি স্টেশন থেকে বহু দূরের অত্যন্ত মৃদু কম্পন পর্যন্ত ধরতে পারে। সেগুলির আঁকা 'গ্রাফ' বিশ্লেষণ করে ভূমিকম্পগুলির হাইপোসেন্টারের গভীরতা পর্যন্ত বলে দেওয়া যায়। এ ছাড়া গভীরতা জানবার আরো উপায় আছে। ভূমিকম্পের ধাক্কায় কতকগুলি বাড়ির দেয়ালে আঁকাবাঁকা ফাটল ধরলে, জমি থেকে সেই ফাটলগুলির উপর লম্বাভাবে রেখা টেনে দিলে সেই রেখাগুলির উল্টো দিক মাটির তলায় যে বিন্দুতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে সেইটিই হবে হাইপোসেন্টার। দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ ভূমিকম্পের হাইপোসেন্টার মাটির ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে থাকে। সামান্য কিছুসংখ্যক ভূমিকম্পের উৎপত্তি ১০০ কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত হয়, দুই একটি একক কম্পনের হাইপোসেন্টার ৩০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার নিচে পাওয়া গিয়েছে। হাইপোসেন্টারের গভীরতা ও ক চরিত্র নির্ভর করে উৎপত্তির কারণের কারণ তিন রকমের:—(১) ভূস্তরের পড়া বা বসে যাওয়া, (২) আগ্নেয় (৩) পাহাড়ের স্থানচ্যুতি।

বিভিন্ন মহাজাগতিক ব্যাপারের ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক আছে কি নিয়ে মানুষ বহুদিন মাথা ঘামিয়ে অ এ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে প্রচণ্ড অত্যধিক বৃষ্টিপাত বন্যা ইত্যাদি ছোটখাটো ভূকম্পন (প্রধানত মাইক্রো জম্) ঘটাতে পারে। এ ছাড়া আর অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে বসন্ত ও গ্রীষ্মের শরত ও শীতে এবং অন্যান্য তিথির অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বেশিবার ভূমি হয়েছে। তাছাড়া চাঁদ যখন পৃ নিকটতম হয় তখনও। আর চাঁ সংশ্লিষ্ট স্থানের মধ্যরেখা বরাবর তখন ভূমিকম্পের ধাক্কা সেখানে হয় সব প্রচণ্ড।

ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেবার বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা উঠে গবেষণায় নেমেছেন। আমেরিকা ৬ দেশে ১২৫টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে জাপানে আছে ২৮০টি স্টেশন, রাশিয় আরো বেশি। তাছাড়া ইংল্যান্ড, স্কটল্যা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এমন কি, আমা ভারতবর্ষেও এই নিয়ে কাজ হচ্ছে। ভূমিক পীড়িত সানফ্রান্সিস্কোর ভূগর্ভে নির্মি হচ্ছে বিশাল এক গবেষণাগার। কি ভূমিকম্পের আভাস পাওয়ার ব্যাপা জীবজন্তু পাখিরা এখনো মানুষের চে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। ভূগর্ভে আবহাওয়া বুঝবার সহজাত বৃত্তি নিয়ে তারা জন্মায়। ভূমিকম্পের ঠিক আ হাঁস মুর্গী বাঁদর ও শুয়োরেরা চঞ্চল হ উঠে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, বন্য জন্তু জঙ্গলে ছুটোছুটি করতে করতে আর্তনা শুরু করে, কুমীরেরা জল থেকে বার হ আসে সাপেরা গর্ত থেকে বার হয়ে ক্ষে বা বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ১৯০ সালের মে মাসে মন্ট পিলির অগ্ন্যুৎপাতে সংগে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল তা কয়েক সপ্তাহ আগে সেখানকার গৃহপালিত পশুরা চঞ্চল হয়ে মানুষের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াত, পাখিরা বনজঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সাপেরা লোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল এবং অন্য জানোয়ারেরা পাহাড়ের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল। হয়ত জীবজন্তুদের ইন্দ্রিয়গুলি বিশেষ করে তাদের শ্রবণশক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ন বলে এবং তাদের কান মাটির খুব কাছে বলে তারা মানুষের চেয়ে অনেক আগে ভূগর্ভে আলোড়নের শব্দ শুনতে ও কাঁপন অনুভব করতে পারে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কুড়ি

জায়গাটা গগনের খুব পছন্দ হয়ে গেল। এত পছন্দ যে প্রথম দিনটা সে পায়ে হেঁটে আশেপাশে সারাটা সকাল-দুপুর ঘুরে বেড়াল, শীতের লালচে ধুলো মাখল, রোদে পুড়ল, পুড়ে মাথার চুল রুক্ষ করে বিকেল নাগাদ বনের দিক থেকে বেড়িয়ে ফিরল। ফিরে এসে বলল, ব্রিলিয়ান্ট জায়গা, বুঝলি দিদি, চোখ দুটো জুড়িয়ে যায়। কলকাতায় আমরা তাকাতে পারি না, দু হাত অন্তর অবস্ট্রাকসান, এখানে ফুল ভিউ; এ-সব জায়গায় তাকিয়েও কী আরাম।

গগন এই রকমই, অল্পতেই উচ্ছ্বসিত, সামান্যতেই সন্তুষ্ট। সে বেড়াতে এসেছে এই ভাবটা তার প্রথম দুটো দিন পুরোপুরি বজায় থাকল। বেড়িয়ে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে, গল্প-গুজব করে দিব্যি কাটিয়ে দিল, গরুড়িয়ার শীত নিয়ে সুরেশ্বরের সঙ্গে হাসিতামাশা করল, অন্ধ আশ্রমের গল্প-গুজব শুনল, কপি কড়াইশুঁটির স্বাদ, ডিমের কুসুমের রঙ নিয়েও অনর্গল কথা বলে গেল। বোঝার যো ছিল না, গগনের মনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। আসল কথাটা সে ঘুণাক্ষরেও তুলল না; সুরেশ্বরকে বুঝতে দিল না কয়েকটা দিন বেড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ আছে।

সুরেশ্বরের কাছে কথাটা না তুললেও গগন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। সে হৈমন্তীকে খুব সাবধানে লক্ষ করছিল, এবং বোঝবার চেষ্টা করছিল দিদির মনের ভাবটা ঠিক কি ধরনের। আড়ালে দুই ভাই বোনে যেসব কথাবার্তা হত তার বেশির ভাগটাই ছিল ব্যক্তিগত; সেই কথার মধ্যে সুরেশ্বরের প্রসঙ্গটা অবধারিত ছিল। গগন এ-সব ক্ষেত্রে নিজে বেশি কিছু বলত না, যতটুকু বলত তাতে তার কিছু চালাকি থাকত। সে জানতে চাইত, দিদির মনের কোনো অদল-বদল ঘটেছে কি না, দিদি চেষ্টা করে কোনো কথা লুকোতে চাইছে নাকি তার এই তিক্ততা ও বিরক্তি নেহাতই অভিমান। এক এক সময় তার মনে হত, দিদির মধ্যে এখন যে রাগ, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে সেটা প্রকৃতপক্ষে কিছু নয়, প্রণয় কলহ হলেও হতে পারে; আবার অন্য সময় দিদির কথাবার্তা থেকে গগনের সন্দেহ হত, ব্যাপারটা ঠিক সরল নয়, দিদির মনের কোথাও এতদিনের সঞ্চিত বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নষ্ট হয়ে গেছে।

তৃতীয় দিনে গগন গেল স্টেশনে বেড়াতে। সঙ্গে হৈমন্তী। সুরেশ্বর যেতে পারল না। অবনীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় সেরে ফেরার পথে বিজলীবাবুর সঙ্গে দেখা। বিজলীবাবুর সঙ্গে পরিচয়টা প্রথম দিনেই ঘটেছিল, বাস স্ট্যান্ডে। বিজলীবাবু শুধোলেন, 'কি, কেমন লাগছে?' গগন জবাবে হেসে বলল, 'ওআন্ডারফুল'। বিজলীবাবু বললেন, 'জায়গাটা তো ভালই, বিশেষ করে এ সময়। তা এদিকে এসে থাকুন দু-চার দিন, ঘুরে ফিরে বেড়ানো যাবে।' গগন বলল, 'সেসব ঠিক হয়ে গেছে অবনীবাবুর সঙ্গে...।' বিজলীবাবু মাথা নাড়লেন সায় দিয়ে. 'তবে তো ব্যবস্থা হয়েই গেছে।' দু-চারটে আরও হালকা কথার পর গগনরা বিদায় নিল।

বাস স্ট্যান্ডে বাস হর্ন দিচ্ছিল, শেষ সময়ের যাত্রী ডেকে নিচ্ছে। আজ তেমন যাত্রী নেই। এই শীতের সময়টায় সন্ধ্যের বাসে সাধারণত ভিড় থাকে না। ফার্স্ট ক্লাসে কোনো যাত্রী নেই। গগনরা উঠল। পেছনে কিছু যাত্রী বোচকা-বুচকি নিয়ে বসে কলরব করছে।

বাস ছাড়ল সামান্য পরেই। সঙ্গে সঙ্গে কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল। পাশের জানলা-দুটো তুলে দিল গগন, তাদের মাথার ওপরে মিটমিটে বাতিটা আজ জ্বলছে না। বাজার ছাড়িয়ে আসতেই পৌষের শীতে গায়ে কাঁটা দিল, গগন গলার মাফলার জড়িয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল; হৈমন্তী দু হাতে কান চাপা দিয়ে আচমকা শিউরে ওঠার ভাবটা যেন সামলে নিল।

বাজার ছাড়িয়ে, থানা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে এসে পড়ল বাস, দু পাশে কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই, অসাড়

চরাচর, সামনে জোরালো আলোর স্রোত ফেলে বাসটা চলেছে, পেছনে যাত্রীরা কথা বলছে, কাশছে, বিড়ি ফ‍্‌ুঁকছে।

গগন বলল, "বেড়াবার ব্যবস্থাটা ভালই হল, কি বল?"

"তা হল। কিন্তু আমি তোদের সঙ্গে অত হুড়োতে পারব না।"

"না পারলি; রাত্রে তোকে সঙ্গে নেওয়াও উচিত হবে না। দিনের বেলাটায় থাকবি।"

"দেখি..., দিনে তো আবার হাসপাতাল।"

"সে ম্যানেজ করা যাবে।"

হৈমন্তী মুখ ফিরিয়ে গগনকে দেখবার চেষ্টা করল, অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যায় না, পেছনের আলোটুকুই সম্বল। "তোর সুরেশদাকে বলবি নাকি?"

"বললেই বা! বড়দিনের সময় একটু বেড়াবি তাতে আপত্তির কি আছে।"

"না, বলবি না।"

গগন সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নিয়ে হৈমন্তীর দিকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে বসল। হৈমন্তীর গলার কাছে শাড়ির ভাঁজটা ফুলে আছে, চিবুক ঢাকা পড়েছে প্রায়, গায়ের গরম কোটটা কালো, অন্ধকারে শুধুমাত্র মুখটুকু আবছা দেখা যায়।

গগন সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "তোর ব্যাপার-ট্যাপার আমার কাছে মিস্টিরিআস লাগছে।"

হৈমন্তী কথার জবাব দিল না।

গগন চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ধীরে ধীরে কয়েক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া খেল, তারপর খুব ঘনিষ্ঠ গলায় মৃদুস্বরে বলল, "তোর ইচ্ছেটা কি?"

হৈমন্তী এবারও কথার কোনো জবাব দিল না। গগনের সঙ্গে এ ক'দিন নিভৃতে তার যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাতে অন্তত একটা কথা সে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, সুরেশ্বরের কাছে তার আর কোনো রকম প্রত্যাশা নেই। ওই মানুষটিকে সে আগে যেমন করে চিনত তার সঙ্গে আজকের সুরেশ্বরের পার্থক্য যথেষ্ট। সে দিনের সাধারণ মানুষ আজ কতখানি অসা হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। হতে পারে সুরেশ্বর মাটি আকাশে উঠেছে, ছোটখাট সুখ থেকে সুখের অন্বেষণ করছে; কিন্তু হৈমন্তীর কি? হৈমন্তী কি এসব ছিল? না, সে চায় নি; চায় না।

অপেক্ষা করে করে শেষে গগন ব "দিদি, তুই আমার কাছে স্পষ্ট করে ব বলে গগন আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাব

হৈমন্তী নীরব। তার নিশ্বাস প বাসের পেছনের যাত্রীদের মধ্যে কে দেহাতী সুরে দেহাতের গান গাইছে গুন করে; একটানা—প্রায় একই রক একটা শব্দ বাসের, কানে সয়ে গেছে, হয় যেন এই শব্দটাই চিরস্থায়ী।

"দিদি..."

"উঁ।"

"তোকে তো কেউ জোর করে এখ আনে নি।"

"ঠকিয়ে এনেছে..."

"এটা তোর রাগের কথা নয় তো?"

"না।"

"তুই তো সব জানতিস।"

"না, জানতাম না। আমি এতদিন করেছি অন্যের মন রাখতে করেছি..."

"এতদিন—"

"এতদিন বই কি। ডাক্তারী পড়ার, ডাক্ত হবার শখও আমার ছিল না। আমার ভ লাগে না। তবু সাত আট বছর এই বেগ খাটলাম কেন!"

গগন সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল কথাটা তাদের পরিবারে কেউ যে বুঝত তা নয়, সকলেই বুঝত: দিদির ডাক্তার পড়ার আগ্রহটাই ছিল সুরেশদার। মা মামার তেমন মত ছিল না। অথচ তখ কেউই খুব একটা বাধা দেয় নি; দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। সকলেই ধরে নিয়ে ছিল সুরেশ্বরের আগ্রহ তার ভাবী পত্ন সম্পর্কে, হৈমন্তীকে সে মনোমত করে গড়ে নিতে চায়। ওটা তার শখ হয়ত। তা ছাড় তখন তাদের সংসার সুরেশ্বরের প্রতি এ কৃতজ্ঞ ও তার প্রতি সকলের অনুরাগ এব বেশি যে, সুরেশ্বরের ইচ্ছা ও সাধ অপূর্ণ রাখতে কেউ চায় নি। বলতে গেলে, গগনের এখন সন্দেহ হয়, দিদি সম্পর্কে তাদে সংসারের মনোভাবটা তখন যুক্তিযুক্ত হয় নি; এমনকি—মনে মনে সকলেই কে সুরেশদাকে দিদির অভিভাবক জেনে নিয়ে দিদিকে সুরেশদার মনোমতন চলতে দিয়ে ছিল। পরে, বছর দুই তিন পরে, মার কেমন সন্দেহ হয়; সুরেশদা তখন কলকাতা ছেড়েছে, মাঝে মধ্যে আসে, আবার চলে যায়। মার মনে খটকা লাগলেও দিদি তখনও কিছু বোঝে নি। 'বা বুঝলেও শান্ত হয়ে থেকেছে, বিশ্বাস রেখেছে। তারপর যতই দিন গেছে মা ততই অস্থির অধৈর্য হয়ে উঠেছে।
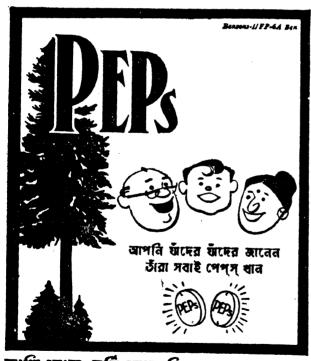
সুরেশদা যে কি করছে, কেন এই সব আশ্রম-ফাশ্রম—এতে কি হবে মা বুঝত না, মার ভালও লাগত না। মা এ-সময় থেকেই সাবধান হতে চেয়েছিল। অথচ দিদির মন মা ভাল করে জানত বলেই কিছু করতে পারে নি। দিদি যেন তখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে, ফিরে যাওয়া অসম্ভব, বাকিটুকু সে পার হয়েছে প্রত্যাশা নিয়েই, দ্বিধা যদি এসেও থাকে তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। এখন আর দিদির কোনো ভরসা নেই।

দিদির জন্যে গগনের দুঃখ হল। তার খারাপ লাগছিল। সুরেশদার সঙ্গে এখন পর্যন্ত সে কোনো কথা বলে নি, আজ বলবে। দিদির পক্ষে যা বলা সম্ভব নয়, গগনের পক্ষে তা বলতে আটকাবে না।

গগন সামান্য কুঁজো হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল কিছু সময়। ভাবছিল। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে মুখ যেন অসাড় হয়ে আসছিল। মাফলারটা কানের ওপর চাপা দিল গগন। তারপর বলল, "সুরেশদার সঙ্গে তোর সরাসরি একটা কথা হওয়া উচিত ছিল এত দিনে। তুই তো কমদিন আসিস নি।"

হৈমন্তী চুপ করে থাকল। তার মনে হল না, যা সে বুঝেছে এর বেশি কিছু তার বোঝার ছিল। এতটা বয়সে সুরেশ্বরের সঙ্গে সে ছেলেমানুষের মতন গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করবে নাকি?

"তুই কলকাতায় গিয়ে আবার এলি কেন—তাও তো আমি বুঝি না," গগন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না হৈমন্তী, সামান্য পরে বলল, "দেখতে—"

"দেখতে! কি দেখতে?"

"মহাপুরুষ—", হৈমন্তীর কথার সুরে শ্লেষ ছিল।

গগন কিছু বুঝতে পারল না। ভাবল, দিদি উপহাস করছে।

হৈমন্তী যেন বুঝতে পারল গগন কি ভাবছে; নিজের থেকেই আবার বলল, "তুই ভাবছিস আমি ঠাট্টা করছি। ঠাট্টা নয়; সত্যিই আমি মানুষটাকে দেখার জন্যে থেকে গিয়েছি।" হৈমন্তীর বলার মধ্যে উপহাস থাকলেও কোথাও যেন তার অতিরিক্তও কিছু ছিল, সেটা যে কি স্পষ্ট বোঝা গেল না।

গগন কথাটায় তেমন কান দিল না; বলল, "অনেক দেখেছিস; এবার নিজেকে দেখ।"

হৈমন্তী গাড়ির সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল: ড্রাইভারের পিঠ, কয়েকটা শিকের ফাঁক দিয়ে অতি মৃদু একটু আলো, এঞ্জিনের শব্দ...। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তী মৃদু গলায়, যেন আপনমনেই বলল, "মানুষ নিজেকে কত বড় করে দেখতে চায় তা যদি তুই জানতিস, গগন।"

গগন ভাবছিল, দিদিকে এবার সে স্পষ্ট করে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করবে, তুই ঠিক করে বল, সুরেশদাকে তুই এখনও ভালবাসিস কি না? হৈমন্তীর কথায় তার প্রশ্নটা মুহূর্তের জন্যে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। নিতান্ত কথার জবাব দেবার জন্যে বলল, "সুরেশদার কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ, তবে ওরা সকলেই একরকম।"

"কি রকম?"

"নিজেদের আর মানুষ ভাবে না। তোর আমার মতন মানুষ হলে তাদের মহত্ত্ব থাকবে না—এই ভয়ে মেকি সাজ পরে থাকে। লোকের কাছে এমন ভাব দেখায় যেন তারা ঠাকুর দেবতা।"

"হ্যাঁ, সেই রকম...", হৈমন্তী এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠার মতন হয়েছিল; "মিষ্টি করে কথা বললে, বিনয়-টিনয় ভাব করে থাকলেই মানুষ ভগবান হয় না। আমি মাটির ঘরে থাকি, জঙ্গলে এসে অন্ধ আশ্রম খুলেছি—তোমরা দেখ আমি কত বড়। আমি মহাপুরুষ।—এ-সবই লোক-দেখানো। ...আসলে মানুষটা কি তা আমি দেখতে পাচ্ছি।"

হৈমন্তীর গলার স্বর উঁচু হয়ে গিয়েছিল। গগন দিদির গায়ে হাত দিল, যেন খেয়াল করিয়ে দিল সামনে ড্রাইভার রয়েছে।

অল্পক্ষণ কেউ আর কথা বলল না। বাস লাঠটার মোড়ে পৌঁছে এল।

গগন আবার একটা সিগারেট ধরালো। তারপর অন্যমনস্কভাবে বলল, "তুই কলকাতায় ফিরে চল।"

"না—" মাথা নাড়ল হৈমন্তী।

"কেন যাবি না?"

"এখন যাব না।" বলে চুপ করে থাকল হৈমন্তী সামান্য, তারপর হঠাৎ বলল, "আমার অসুখের সময় অনেকগুলো টাকা দিয়েছিল ও। কত টাকা আমি জানি না। মা আর মামা মোটামুটি জানে। আমায় তুই জানাস তো কলকাতায় গিয়ে।"

গগন অবাক হয়ে তাকাল। "কেন?"

"ঋণ শোধ করব", হৈমন্তী কেমন এক গলা করে বলল, "আমার টাকা থাকলে আমি ওকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতাম।"

গগন হাসল না, অথচ কথাটার গুরুত্বও দিল না; বলল, "এ-সব তোর ছেলেমানুষী।"

"তোরা যখন হাত পেতে টাকাটা নিয়েছিলি তখন তো ছেলেমানুষী মনে হয় নি।"

গগন যেন অস্বস্তি বোধ করল। চুপ করে থাকল সামান্য, তারপর বলল, "শুধু টাকা তো দেয় নি, আরও কিছু দিয়েছিল..."

কথাটার অর্থ বুঝতে হৈমন্তীর কোনো অসুবিধে হল না। বলল, "আর যা দিয়েছিল—সেটা যদি দিয়েও থাকে—ও একলা দেয় নি; আমিও দিয়েছিলাম।" হৈমন্তী থেমে গেল, কয়েক মুহূর্ত আর কথা বলল না, শেষে বলল, "মনে মনে ওর যদি কোনো অহঙ্কার থাকে তবে একদিন আমার অসুখের সময় দয়া করে বাঁচিয়েছিল বলে, অন্য কোনো অহঙ্কার ওর থাকতে পারে না।"

বাস লাঠটার মোড়ে এসে দাঁড়াল। দুজন মাত্র যাত্রী। তারা নামল। কে যেন উঠল একজন। বাস ছাড়ল। গুরুডিয়ায় যাবে।

সারা মাঠ জুড়ে পৌষের হিম হাওয়া হাহা করে ছুটে বেড়াচ্ছে যেন,, গায়ের হাড়ে শীত ফুটছিল, মাঠের প্রান্ত দিয়ে শেয়াল ডেকে যাচ্ছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে বাসটা টাল খেতে খেতে চলেছে।

গগন হৈমন্তীর গায়ের দিকে সামান্য ঘন হয়ে বসে ইতস্তত করে শেষে বলল, "দিদি, সুরেশদাকে তোর আর ভাল লাগে না?"

হৈমন্তী মাথা নাড়ল। না, লাগে না।

"তোর মন বদলে গেছে?"

"জানি না।...হয়ত গেছে।"

"তাহলে এখানে থেকে লাভ কি! কলকাতায় ফিরে চল।"

"এখন না।..."

"কি করবি এখানে থেকে—?"

"মজা দেখব।...সুরেশ-মহারাজ যতটা চকচক করছে তাতে লোকে তাকে সোনা ভাবে। আমি জানি, ও-মানুষ সোনা নয়, ও কত ছোট তা আমার খানিকটা জানা হয়েছে, বাকিটা দেখব।" হৈমন্তী সমস্ত কথাটাই ব্যঙ্গ করে বলার চেষ্টা করল, অথচ গগন বুঝতে পারল দিদি যেন কিসের এক আক্রোশ অনুভব করছে।

আশ্রমে ফিরে এসে গগন বলল, "তুই যা, আমি একটু সুরেশদার ওখান থেকে ঘুরে আসি।"

হৈমন্তী বাধা দিয়ে কিছু বলল, গগন শুনল না; পিছন থেকে ডাকল হৈমন্তী, গগন সাড়া দিল না, অন্ধকারের মধ্যে হনহন করে চলে গেল। ওকে আর দেখা গেল না।

সুরেশ্বরের বাড়ির বারান্দায় এসে গগন যেন থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে কেমন যেন এক আবেগের বশে চলে এসেছে, কেন আসছে তাও যেন তার খেয়াল ছিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সে আলো নজর

করতে পারল, সুরেশ্বরের ঘরে আলো জ্বলছে। দু মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, ঘরের মধ্যে সাড়া শব্দ নেই।

গগন ডাকল।

ঘরের মধ্যে থেকে সাড়া দিল সুরেশ্বর, "গগন, এস।"

কাগজপত্র সাজিয়ে নিয়ে বসে সুরেশ্বর কাজ করছিল, টেবিলের একপাশে লণ্ঠন জ্বলছে। গগনকে দেখে চেয়ারটা সামান্য সরিয়ে নিয়ে আরাম করে বসল সুরেশ্বর, হাত মাথার ওপর তুলে ক্লান্তি নিবারণ করল। "তারপর গগনবাবু, এই মাত্র ফিরলে নাকি?" সুরেশ্বর সহাস্য গলায় বলল।

"হ্যাঁ।" গগন অন্য চেয়ারটায় বসল।

"বাসের শব্দ শুনলাম। ...কেমন বেড়ানো হল?"

"ভাল।"

"কোথায় কোথায় গেলে?"

"অবনীবাবুর বাড়িতে। সেখানেই ছিলাম। আমরা একটু বেড়াব চার দিকে, অবনীবাবুর সঙ্গে একটা প্ল্যান করা গেল; ও'র গাড়িটা পাওয়া যাবে।"

"তাহলে তো কাজ গুছিয়ে এসেছ! কোথায় কোথায় যাচ্ছ?"

গগন বেড়াবার জায়গাগুলোর নাম বলল, শেষে রাত্রে তারা কোন জঙ্গলে যাবে, কোথায় কোন হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনের কাছে ইনস্পেকসান বাংলোয় রাত কাটাবে, হরিণ দেখতে ছুটবে কোন নদীর কাছে ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করল।

সুরেশ্বর মনোযোগ দিয়ে শুনল। শেষে বলল, "রাত্তিরে জঙ্গলের মধ্যে বেশি যেও না; তুমি যে জঙ্গলের কথা বলছ ওটা তেমন ভাল না। বন্দুক-টন্দুক সঙ্গে থাকবে?"

"না। আমরা কেউ ও-বিদ্যে জানি না।"

"তবে..." সুরেশ্বর হাসল, "খালি হাতে অ্যাডভেঞ্চার।"

গগন পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল। "দিদিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। রাত্তিরে জঙ্গলে যাবার দিন নেব না, অন্য সময় নিয়ে যাব।"

"হেম যাবে বলছে?"

"হ্যাঁ, যাবে না কেন! ও তো কোথাও যায় নি। আমি থাকতে থাকতে ঘুরে না এলে আর হবে না।" গগন সিগারেট বের করে ধরাল।

সুরেশ্বর গায়ের মোটা গরম চাদরটা গুছিয়ে নিল। "বেশ তো যাক।"

"সকাল-দুপুর ওর হাসপাতাল।" গগন কি ভেবে মনে করিয়ে দিল।

"হাসপাতাল ঠিক দুপুরে নয়। যাকগে, সে ও ব্যবস্থা করে নেবে।"

গগন পর পর কয়েক টান সিগারেট খেল। সে ঠিক যে জিনিসটা বলতে চায় তার ভূমিকা কিভাবে করা যায় বুঝে উঠতে পারছিল না। না পারায় মন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে ছিল।

"খুব শীত...।" ঠাণ্ডা লেগে গেছে গলায়—" গগন গলায় কাছটায় টিপতে লাগল। "তোমার ভরতু একটু চা খাওয়াবে না?"

"ভরতুটার জ্বর হয়েছে।...আমি করে দিচ্ছি।"

"তুমি!...না না...থাক্‌..."

"থাক কেন, দু কাপ চা আমি করতে পারব না!...সকালে আমি নিজের চা নিজে করে খাই, তা জানিস।" সুরেশ্বর উঠল। গগনকে তুইটুই করে কথা বলার অভ্যেস সুরেশ্বরের পুরোনো।

গগন বলল, "আমি করছি, কোথায় কি আছে বল?"

"বলার চেয়ে করাটা সোজা—" সুরেশ্বর সস্নেহে হেসে বলল। "তা হলে ও ঘরে চল, স্পিরিট ল্যাম্পে জল গরম বসিয়ে দিয়ে গল্প করা যাক।"

পাশের ঘরের বাতিটা যেন প্রদীপের মতন মিটমিট জ্বলছিল; শিখাটা বাড়িয়ে দিল সুরেশ্বর। ঘরের এক কোণে মিটসেফের পাশে ছোট টুলে স্পিরিট ল্যাম্প। স্পিরিট ল্যাম্প জেলে চায়ের জল বসাল সুরেশ্বর।

শোবার ঘরে সুরেশ্বরের সাধাসিধে বিছানা, এক পাশে লোহার ছোট মতন এক আলমারি, আলনায় কয়েকটি জামাকাপড়, একদিকে কাঠের সাধারণ র‍্যাকে কিছু বই, হালকা একটা টিপয়, ক্যাম্বিসের চেয়ার একটা। দেওয়ালে মার ছবি।

গগন ও-ঘর থেকে একটা চেয়ার টেনে আনল, জুতো জোড়াও খুলে রাখল ও-পাশে।

সুরেশ্বর বলল, "আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবি?"

"কোথায়?"

"মিশনারীরা একটা মেলা করে ক্রসমাসের সময়, শহর থেকে মাইল আস্টেক দূরে। আদিবাসী দেখবি, নাচ দেখবি, এদিককার ক্রশ্চান দেখবি। নানারকমের মজা থাকে মেলায়। যাবি নাকি?"

সুরেশ্বর মেলাটার নানা বিবরণ শোনাতে লাগল: গাধার পিঠে উলটো দিকে মুখ করে বসে কে কতটা ছুটতে পারে—তার রগড়, উলের বল ছুঁড়ে বেলুন ফাটানো, তাসের ম্যাজিক, লটারি খেলা ইত্যাদি। আসলে মেলাটা এ দিকের দেশী মিশনারীদের চেষ্টায় অনেক দিন থেকে চলে আসছে। শালবনের মাঠে বসে যীশু-ভজনা, দরিদ্রদের পুরোনো গরম জামা-কাপড় বিতরণ, শিশুদের হাতে কিছু দেওয়া-থোওয়া। ওরই মধ্যে কোনো সেবা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে কিছু চাঁদা সংগ্রহ।

গগন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চাঁদার কৌটো নিয়ে যাচ্ছ?"
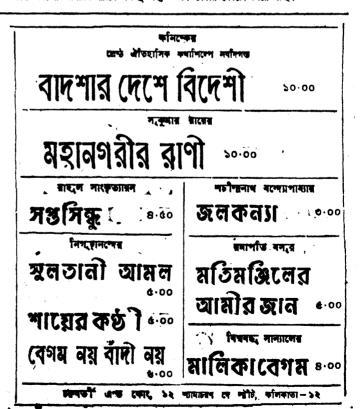
সুরেশ্বর চায়ের জলে চা-পাতা মেশাতে মেশাতে হেসে বলল, "হ্যাঁ; ভাবছি তোর গলায় একটা চাঁদার কৌটো ঝুলিয়ে দেব।"

"তাহলে আমি নেই।" গগন ভয়ের ভাব করে হাত মাথা নাড়ল।

সুরেশ্বর জোরে জোরে হাসতে লাগল। শেষে বলল, "না, তোকে চাঁদা তুলতে হবে না। আমরা ওখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন দেখাই..."

"ম্যাজিক লণ্ঠন?"

"স্লাইড শো। দেখিস নি? কলকাতায় সিনেমা দেখিস না..."

"তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কিসের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাও?"

"চোখের। কি করে চোখ ভাল রাখতে হয়, চোখের কি কি রোগ হয়—এই সব। ওদের কাছে এটা দেখানো দরকার।" সুরেশ্বর বলল। বলে চায়ের কাপ গুছিয়ে নিয়ে চা ঢালতে লাগল।

গগন একরকম মন নিয়ে এসেছিল, অথচ কথায় কথায় তার মন অন্য দিকে ভেসে যাচ্ছে বুঝে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। এই লোকটিকে গগন বরাবরই আত্মীয়ের মত ভেবে এসেছে, ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে বড় ভাইয়ের মতন, ভালবেসেছে বন্ধুর তুল্য, তর্ক করেছে, চেঁচামেচি করেছে আবার সমীহ করতেও কোথাও বাধেনি। দিদির সঙ্গে সুরেশদার সম্পর্কের এই তিক্ততা তার ভাল লাগে নি। মনে মনে সে কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের সংসারের কেউই চায় না—দিদির সঙ্গে সুরেশদার সম্পর্কটা এই অবস্থায় বরাবরের মতন ভেঙে যাক। দিদির যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে, এ-বয়সে দিদিকে কনে সাজিয়ে দেখিয়ে মা দিদির বিয়ে দেবে সে আশাও করে না। তা ছাড়া দিদির জীবনে এতকাল যা মূল্যবান হয়ে ছিল তা রাতারাতি তুচ্ছ হয়ে যাবে যে তাও নয়। মা, মামা সকলেই যা চায় তা এমন কিছু বেশি চাওয়া নয়। সমাজ সংসারে বাস করতে হলে তার কিছু কিছু নিয়ম তো মানতেই হবে। এভাবে দিদিকে রেখে দিতে পারে না সুরেশদা। যা সঙ্গত, যা উচিত, দৃষ্টিকটু নয়, অথচ দিদি যাতে সুখী হতে পারে—তুমি তাই করো। কেউ তোমার আশ্রম তুলে দিতে বলছে না, কলকাতায় ফিরে যেতেও বলছে না। তোমার এই সেবাধর্মে যদি মতি থাকে থাক, কিন্তু একটি মেয়েকে কোন আশ্বাসে তার আত্মীয়েরা এমনভাবে ফেলে রাখতে পারে।

সুরেশ্বর চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল। "নাও হে গগনবাবু, খেয়ে দেখ—"।

গগন চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়াল। সুরেশ্বর তার ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় বসল। বসে চা খেতে লাগল।

"সুরেশদা—" গগন আস্তে গলায় বলল।

সুরেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ তুলল। "বলো।"

গগন বিশ্রী এক অস্বস্তি অনুভব করছিল। সুরেশ্বরের দিকে তাকাতে পারল না। সুরেশ্বর অপেক্ষা করছে।

"কি হল...? সুরেশদা বলে যে বসে থাকলি? কি ব্যাপার?"

গগন চকিতের জন্যে যেন হৈমন্তীর বিষন্ন, ক্ষুব্ধ, তিক্ত মুখ দেখতে পেল, গলা শুনতে পেল। মুখ তুলে সুরেশ্বরকে দেখল ক' পলক গগন। "তোমার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে।"

"কি কথা?" সুরেশ্বর সহজ গলায় শুধলো।

"বলছি।...তুমি নিশ্চয় আমাদের ভুল বুঝবে না—।" গগন জড়ানো গলা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে চা খেল। হয়ত একটু সময় নিল নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে।

সুরেশ্বর বলল, "আমার বোঝার ভুল না হলে তোদের ভুল বুঝব কেন?"

"না, বলে নিলাম। তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, তোমার সঙ্গে আমাদের রিলেসন কী তা তুমিও জানো।...ব্যাপারটা যেমনই হোক আমি চাই না এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কিছু হয়।"

"বেশ তো, হবে না।"

"মা আমায় কয়েকটা কথা জানাতে বলেছে তোমাকে। মামাও বলেছে।"

"তুই তো আমায় কিছু বলিস নি—"

"না, বলব বলব ভাবছিলাম, সুযোগ হচ্ছিল না।" গগন বিছানার দিকে তাকাল, সুরেশ্বরের সঙ্গে চোখাচুখি হবার সঙ্কোচ সে অনুভব করছে।

সুরেশ্বর শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত গগন দুর্বলতা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, "দিদির ব্যাপারে তুমি কি ঠিক করলে?"

সুরেশ্বর নীরব থাকল। গগনের কথার জড়তা, তার অস্বস্তি, সঙ্কোচ থেকে হয়ত সুরেশ্বর অনুমান করতে পেরেছিল গগন এই ধরনের কোনো কথা তুলবে। বিস্মিত অথবা বিভ্রান্ত হবার মতন যেন কিছু ছিল না কথাটায়।

গগন আবার বলল, "মা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মামা বলছিল, এভাবে দিদিকে এখানে রেখে দেওয়া যায় না।...ওদের কোনো দোষ নেই; তুমি বুঝতে পারছ—দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছে, নানা দুর্ভাবনা নিয়ে থাকে। দিদির কথাটা তারা ভুলে থাকতে পারে না। হাজার হোক মেয়ে তো, তার একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাবে না।" গগন যেন এলোমেলোভাবে বলছিল।

সুরেশ্বর চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। গগনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত; তারপর বলল, "হেম কি তোমাদের কিছু বলেনি, গগন?"

"না...", গগন মাথা নাড়ল, "কি বলবে—?"

"আমি ভেবেছিলাম কলকাতায় গিয়ে সে হয়ত কিছু বলবে মাসিমাকে।"

"আমি জানি না।" গগন সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল "দিদির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কিন্তু সেটা তার কথা, তোমার তরফের কথা নয়।

সুরেশ্বর চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ ভাবছিল; শেষে বলল, "গগন, আমা[র] আজকাল মনে হয়, আমি কয়েকটা বড় রক[ম] ভুল করেছি। হেমকে এখানে টেনে আ[না] আমার উচিত হয় নি। সে যে-জন্যে এসে[ছে] আমি তাকে সে-উদ্দেশ্যে আনি নি। এখ[ন] আমার কাছে তাকে বরাবর রাখা যাবে ন[া] তোমরা যা ভাবছ তা হয় না। তাতে আরও অশান্তি বাড়বে। আমার এমন কিছু নেই যাতে হেমকে আর আমি সুখী করতে পারি।"

গগন যেন কিছু সময় কেমন দিশেহারা হয়ে বসে থাকল, ভাবতে পারছিল না, কথা বলতে পারছিল না। অদ্ভুত এক বেদনা এবং আঘাত তাকে নির্বাক করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে নিজেকে সামান্য সামলে নিয়ে গগন বলল, 'তোমার কিছু নেই?"

"না।" সুরেশ্বর মাথা নাড়ল।

"দিদিকে তুমি ভালবাসতে..."

"বাসতাম। কিন্তু সে-ভালবাসায় আনন্দ পাইনি..."

গগন অসহিষ্ণু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। রুক্ষ গলায় বলল, "এতদিন পরে হঠাৎ তোমার সেই জ্ঞানটা হল নাকি?"

"না—" সুরেশ্বর সংযত শান্ত গলায় বলল, "না গগন, আগেই হয়েছিল। তুমি বিশ্বাস করবে না, তবে জীবনে হঠাৎ হঠাৎ কিছু হয়। বাইরে থেকে ওটা হঠাৎ ভেতরে ভেতরে হয়ত হঠাৎ নয়।...একবার এক ঘটনা থেকে আমার মনে নানা সংশয়, দ্বিধা, দুর্বলতা আসে। আমার মনে হয়েছিল—ওই ভালবাসায় আমার সুখ নেই, আনন্দ নেই।"

"তুমি শুধু নিজেকেই দেখছ।"

সুরেশ্বর প্রতিবাদ করল না। সে নিজেকেই দেখছিল ঃ যেন অতীতের কোনো ঘটনার সামনে সে দর্শক হয়ে বসে আছে।
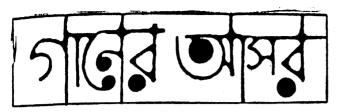
(ক্রমশ)

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

কলকাতার শীতকালীন সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন সদারংগ সংগীত সম্মেলন। শ্রোতৃবৃন্দ নব উৎসাহে সাগ্রহে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করেছেন। কলকাতায় এই সময়টি রমণীয়। শীত পড়ি পড়ি করছে আর গ্রীষ্ম বিদায় নিয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ আমরা এখন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। বলা বাহুল্য কোন প্রকার স্নায়বিক বিঘ্ন না ঘটিয়ে দীর্ঘকাল সংগীত উপভোগের এইটিই প্রকৃষ্ট সময়। সদারংগ খুব সুসময়েই আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অন্যান্য বারের মত এবারও তাঁদের শিল্পীর সংখ্যা বেশি ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের গুণপনা দেখাবার মত যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। অন্যান্য বহু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই বিষয়টি আদৌ বিবেচনা করেন না যে ভারাক্রান্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতারা বিশেষভাবে পীড়িত হন এবং বহু গোলমালের সম্ভাবনা থাকে। তাঁদের ব্যবহারে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বার্থবোধ ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁদের চিত্তকে অধিকার করে না। সদারঙ্গের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ সংযম ও সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করেছেন।

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে শিল্পীদের কিছুটা আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। অর্থাৎ, কতটা তাঁদের দেবার আছে বা তাঁদের স্বকীয়তাকে শ্রোতাদের গোচর করবার জন্য কতটুকু সময় তাঁদের আবশ্যক এটা তাঁদের ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী যদি রাত সাড়ে এগারটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত এক নাগাড়ে গান করেন বা বাজিয়ে যান তবে অনুষ্ঠান-সূচীর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না কারণ শেষের শিল্পী তখন জেদ করে ভোর পাঁচটা থেকে বেলা ন'টা পর্যন্ত তাঁর অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবেন। ফলে এই হয় যে শ্রোতারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন অথবা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন। আজকাল যাঁরা ইউরোপ, অ্যামেরিকায় যাচ্ছেন তাঁদের প্রায়ই বলতে শুনি যে, আমাদের শ্রোতারা ধৈর্যবন্ত নন অথবা তাঁরা লঘু সংগীত বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ'রাই তিন চার ঘণ্টা অনুষ্ঠান চালিয়ে শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করেন এবং এ'রাই হাততালির জন্য চটুল সংগীত পরিবেশন করেন সবচেয়ে বেশি। সুতরাং তাঁদেরই নিজেদের সারিয়ে তুলতে সচেষ্ট হবার পরামর্শ দিচ্ছি। তবলিয়ার সহযোগিতা অনেক সময় আদর্শ হয় না। নামকরা তবলিয়াদের অনেকে গান বা বাজনার গতিকে সম্মান করে চলেন না, তাঁদের গতির অনুসরণ করতে বাধ্য করেন। তবলিয়ার এই স্পর্ধা ভাল নয়। বসন্তের বাতাস যদি ঝোড়ো হাওয়া হয়ে ওঠে তবে প্রস্ফুটিত বনভূমির সমস্ত শোভাই মাটি হয়ে যায়। গানের আসরে যেখানে শিল্পীরা আসন গ্রহণ করেন সেখানে ফোল্ডিং চেয়ারে নানা রকম পোশাক পরা ব্যক্তিদের বসে থাকাটা অতিশয় অশোভন। আমাদের দেশের লোকেরা অনেক বিষয়ের মত শালীনতা সম্পর্কেও উদাসীন। প্রেক্ষাগৃহে ভদ্রজনের দৃষ্টির সম্মুখে নানা কারণে এই বিপরীত জনসমাগম না হওয়াই ভাল। আর, তা ছাড়া শিল্পীরা এতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করেন। এই রকম আরও অনেক কথাই বলা যায়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুরের ভাষণ আমাদের ভাল লেগেছে। তিনি সমীচীন কথা বলেছেন। বর্তমানে সংগীতের উন্নতির জন্য যে-সব আয়োজন করা হয়েছে সে-সব আগে ছিল না। সকলের সহযোগিতায় সংগীত-জগতের উন্নতি সাধিত হবে—এটা সকলেরই কাম্য। সদারংগ সংগীত সংসদের সেক্রেটারী শ্রীকালিদাস সান্যাল থিওরী নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন কিন্তু কেবলমাত্র প্রয়োগের পিছনে যে-সব থিওরী আছে এই ধরনের সম্মেলনে তারই কিছুটা আলোচনা হতে পারে। মিউজিকলজির অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠতে আমাদের দেশে আরও অনেক সময় লাগবে। প্রসংগত বলি শেষ অনুষ্ঠানে শ্রীকৈলাসচন্দ্র বৃহস্পতির ভাষণ আমাদের নিতান্তই হতাশ করেছে। কোন অধিকারে এই ব্যক্তি আমাদের পিঠ চাপড়ে দিতে এসেছিলেন বোঝা গেল না। নেহাৎ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চিফ এডভাইসার বলেই কি এই দেবগুরুটিকে কৈলাস থেকে সদারংগের রংগভূমিতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে? উন্নাসিক দাম্ভিকতা সহকারে মিনিট দশেক ইনি যেভাবে বাঙালীকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন তাতে এ'র সম্বন্ধে আমাদের অতি দরিদ্র ধারণা হয়েছে। থিওরীর আলোচনা যদি এইভাবে আয়োজিত হয় তাহলে থিওরীর বড়ই দুর্দিন বলতে হবে।

প্রথম অনুষ্ঠানে ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীকালিপদ পাঠক একটি বাংলা টপ্পা এবং একটি প্রাচীন রাগসংগীত গেয়ে শোনালেন। শ্রীধর কথকের রচনা "তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ" এবং "কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম ছলনা"—এই দুটি গানে তিনি প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এই দুটি গান থেকে প্রাচীন বাংলার রাগসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য শ্রোতাগণ সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ বসুর তবলা সহযোগিতা উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীপ্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগেশ্রী রসসমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি পুনরাবৃত্তি পরিহার করলে পারতেন। শ্রীযোগের ছায়ানট অত্যন্ত মধুর লেগেছে এবং শ্রীশান্তা-প্রসাদের সংগতও উপযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের ভজন ভাল লাগল। পঞ্চম অনুষ্ঠানেও এ'র গান শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ প্রদান করেছে। "নীলমাধব" নামক একটি রাগে তিনি যে-খেয়াল গেয়েছেন সেটি খেয়াল হিসাবে সার্থক হয় নি কারণ খেয়ালের উপযুক্ত বন্দেশ গানটিতে পাওয়া গেল না। বোধ করি তিনি নিজেও এটি অনুভব করতে সমর্থ হয়েছেন। তা ছাড়া এটিকে রাগ বলে স্বীকার করতেও দ্বিধা হয় কারণ যে সমন্বয়ে একটি রাগ প্রস্তুত হয় এতে তার অভাব আছে। একে রাগ না বলে ধুন বলাই ভাল। সমস্ত মিলিয়ে গানটিকে একটি উপভোগ্য রাগপ্রধান কাব্যসংগীত বলা চলে। শ্রীমতী পট্টনায়ক এই সুরটিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পর্দা এবং যোটক (কম্বিনেশন) ব্যবহার করে চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্কা এই গায়িকার একটি স্বকীয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শনিবারের অনুষ্ঠানে কৌশিকী-ভৈরোঁতে তাঁর খেয়াল, তারানা এবং অবশেষে তাঁরই স্বরচিত ভজন শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল। শ্রীমতী শরণ রানীর হেমন্ত রাগে সরোদ শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীমান আশীষ খাঁ সরোদে কৌশিক কানাড়া এবং চন্দ্রনন্দন বাজিয়েছেন। আমার মনে হয় তাঁর পক্ষে আরও প্রস্তুতির পর এই রকম বড় আসরে অবতীর্ণ হলে ভাল হয়। আরও একটা কথা তাঁকে বলি। বড় স্রষ্টা হতে গেলে সুলভ হাততালির প্রতি আকর্ষণ তাঁকে পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত শিল্পীর গুণগুলি তাঁর আছে কিন্তু অভিনিবেশ ও

প্রস্তুতি দরকার। শ্রীসর্বেশ মাথুর সমাগত। তাঁর হাম্বীরের খেয়াল মন্দ লাগল না কিন্তু তিনি রসসঞ্চারে সমর্থ হন নি। এদিকে দৃষ্টি দিলে তিনি সার্থকতা অর্জন করবেন। ওস্তাদ নিসার হোসেন জয়জয়ন্তীতে একটি গম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছিলেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে এই প্রবীণ সঙ্গীতাচার্যের ললিত ও তারানা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এঁদের অনুষ্ঠান শুনলে বোঝা যায় আমাদের রাগ-সঙ্গীতের কিভাবে সংগঠন ও ক্রমবিকাশ হয় এবং আতিশয্য ও পুনরুক্তি বর্জন করে বিশুদ্ধ রসসঞ্চার কিভাবে করা যেতে পারে। ওস্তাদ সাহেব একটি মহৎ শিল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর এবারকার অনুষ্ঠানগুলি গতবারের তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। তথাপি তাঁর মিঞা মল্লারের খেয়ালটি ভাল লেগেছে।

শনিবারের অধিবেশনে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ মালকোষে অপূর্ব রসসঞ্চার করেন। কাফী রাগে তিনি তাঁর ঘরানার যেসব কাজ-গুলি প্রদর্শন করলেন সেগুলিও উপভোগ্য হয়েছে। শেষ অনুষ্ঠানে তিনি ভংখার (ভখার) রাগ বাজিয়ে শোনান। আমীর খাঁ

ই সম্মেলনেও তাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে-
ন। তাঁর আভোগী আমাদের ভাল
গেছে।

শেষ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রী এ কাননের
ন এই সম্মেলনের একটি সার্থকতম
ল্পকীর্তি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।
নি যোগকোশে খেয়াল এবং একটি
রী গাইলেন। এটি লেখকের ব্যক্তিগত
ভমত যে শ্রীকাননের শিল্পকর্মের যথার্থ
ল্যায়ণ আমরা করিনি। প্রথম শ্রেণীর
ল্পীদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই দেখেছি
নি রসসৃষ্টি ভিন্ন স্বর প্রয়োগ করেন না,
নরুক্তি সর্বথা বর্জন করেন এবং যথা-
য়ে একটি পরিণত শিল্পরূপ শ্রোতাদের
চের করে নিবৃত্ত হন। তাঁর কণ্ঠস্বরের
ভাব-গাম্ভীর্য এবং পরিশীলিত মাধুর্যও
াকর্ষক। এই অনুষ্ঠানে একটি নিপুণ
ং নিটোল সংগীত সৃষ্টি করে তিনি প্রচুর
ধুবাদ অর্জন করেছেন। পণ্ডিত শ্রীরবি-
করের কৌশিকী কানাড়ায় দীর্ঘ আলাপ
াতাদের তৃপ্তি প্রদান করেছে। এই
লাপের গাম্ভীর্য ও গভীরতা শ্রোতারা
শেষভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর গুণপনা
ম্বন্ধে বিশেষ বলাই বাহুল্য। তবে,
ঃপর তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের পর
বৃত্ত হলেই ভাল করতেন। শেষকালে
লায় তাঁর বাজনার জবাব প্রভৃতি একান্ত
াবশ্যক ছিল। যাই হোক এগুলি যে
ই জনপ্রিয় শ্রোতাদের পুলকিত
তালিতেই তা সমর্থিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় আমরা সাতদিনব্যাপী
ধবেশনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান শুনে
তে সমর্থ হই নি। যাঁদের অনুষ্ঠান
লোচনা করা গেল না তাঁদের কাছে,
র্জনা ভিক্ষা করছি। এই অনুষ্ঠানে
গীতাংশে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন
রা হচ্ছেন কল্পনা চন্দ, শ্রীমতী আরতি
ী, শ্রীমতী গোপা সান্যাল, শ্রীমতী নমিতা
পাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা মুখার্জী, শ্রীমতী
র্ণিমা সেন; শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জী এবং
তী মঞ্জুশ্রী মুখার্জী। যন্ত্রসংগীতে
ণ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীদেবব্রত রায়
টার), শ্রীমতী আশা ট্যান্ডন (সেতার)
তী দীপা ভট্টাচার্য (সেতার), এবং
তী অপর্ণা রায় (সুরবাহার)। নৃত্যে
লন শ্রীমতী রাত্রি চক্রবর্তী।

সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে অংশ গ্রহণ
েছিলেন ওস্তাদ মোহম্মদ দবীর খাঁ,
াদ বিসমিল্লা খাঁ ও সম্প্রদায়, শ্রীমতী
া ব্যানার্জী, ওস্তাদ মুনওয়ার আলী
শ্রীমতী কল্যাণী রায় এবং শ্রীমতী
র্ণা চক্রবর্তী। সংগতে ছিলেন, শ্রীকেরামৎ
'শ্রীকানাই দত্ত, শ্রীসুদর্শন অধিকারী,
নিল রায় চৌধুরী, শ্রীনীরেন রায়,
ণিক দাস, শ্রীঅমলেশ চ্যাটার্জী।
ারেঙ্গীতে ওস্তাদ মোহম্মদ সাগীরুদ্দীন

শ্রী এ কানন

খাঁ তাঁর নৈপুণ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। সহযোগিতায় শিল্পীরা যে কতটা প্রেরণা পেতে পারেন এবং উপকৃতও হতে পারেন তা এ'র সংগত থেকে অবধারণ করা যায়। প্রবীণ পণ্ডিত গোপাল মিশ্র এবারও বাজিয়েছেন ওস্তাদ নিসার হোসেনের সংগে। এতদ্ব্যতীত ছিলেন শ্রীরামনাথ মিশ্র এবং শ্রীকেদার মিশ্র। পাখোয়াজে ছিলেন শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিশ্র।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি।

রেডিও সংগীত সম্মেলন

নানা কারণে বেতার সংগীত সম্মেলনের এপর আমরা গুরুত্ব অর্পণ করি এবং এ পর্যন্ত এই সম্মেলনটি সার্থকতামণ্ডিত হয়ে এসেছে। বেতার সংগীত সম্মেলনের কতকগুলি সুবিধা আছে। সেগুলি হচ্ছে এই যে, শিল্পীদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সহযোগিতা পান, একটি পরিচ্ছন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে গুণপণা প্রকাশ করে শিল্পীরাও আনন্দ পান। আর, এই অনুষ্ঠানে সময়ের এতটুকু অপব্যয় ঘটে না। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে শিল্পিগণ এই সম্মেলনটির প্রতি বিশেষ সহৃদয় ভাব পোষণ করে শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ দেবেন।

এবারকার সম্মেলন ৩০শে অকটোবর সকালে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রীনাসীর আমীনুদ্দীন ডাগর, শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জি এবং শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র।

ওস্তাদ আমীনুদ্দীন ডাগর [illegible] ঋষভযুক্ত আশাবরীর আলাপ শোনান। তাঁর বিধিবদ্ধ আলাপ শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে। এর পরে তিনি ভৈরবীতে মধুর আলাপ করে ধামারে তালখোঁচা প্রদর্শন করেন। এ'র সংগে পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীবিঠলদাস গুজরাতী। শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জি আলাইয়া বেলাবল রাগে খেয়াল গান করে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। এ'র সংগে তবলায় সংগত করেন শ্রীকেরামতুল্লা খাঁ এবং সারেঙ্গীতে সহ-যোগিতা করেন শ্রীমোহম্মদ সাগীরুদ্দীন। শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র শুধ্ সারঙ্গ রাগে মনোরম আলাপ করেন এবং তাঁর গৎও উপভোগ্য হয়েছে। এ'র সংগে তবলায় সংগত করেন শ্রীশ্যামল বসু।

বেনারসের গিরিজা দেবী

গত মঙ্গলবার শ্রীমতী অমলাশঙ্করের আমন্ত্রণে 'ফিল্ম সারভিস' ভবনে বেনারসের প্রসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পী গিরিজা দেবীর গান শুনবার সুযোগ ঘটেছিল। এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ক্ল্যাসিক্যাল গানের বহু শিল্পী ও গুণী সমঝদার আসরে শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকায় পরিবেশটি ছিল শিল্পীর পক্ষে অনুকূল। প্রথমে খেয়াল গাইলেন ভূপ রাগে, পরে গাইলেন ইমন কল্যাণে টপ-খেয়াল। গিরিজা দেবী মূলত বেনারসের টপ্পা ও ঠুংরী ঘরানার উত্তরসূরী। তাঁর খেয়াল গানে টপ্পার কাজ থাকায় ইমনের রাগে স্বতন্ত্র মাধুর্য ফুটে উঠেছিল। ঠুংরীর গুরু মৈজুদ্দিনের গাওয়া যে-গানটি আজও সমঝদার শ্রোতারা ভুলতে পারেননি মিশ্র গারার সেই বিখ্যাত গান 'পানি ভরেলি কৌন আলবেলি কিনারে ঝমাঝম' গিরিজা দেবী দরদভরা কণ্ঠে গেয়ে শোনালেন। আসর শেষ করলেন দাদরায় 'দিওয়ানা কিয়ে শ্যাম ক্যা যাদু ডালা' গানটি গেয়ে। বিশেষ করে শেষের এই গানটি গিরিজা দেবীর সুধাসিঞ্চিত কণ্ঠ ও গায়কীর মাধুর্যে যে যাদু সৃষ্টি করেছিল তার রেশ বহুকাল শ্রোতাদের চিত্তে গুঞ্জরিত হবে।

গানের সংগে শ্রী ভি জি যোগের বেহালা-সংগত গিরিজা দেবীকে প্রাণ ভরে মেজাজ দিয়ে গাইতে উৎসাহিত করেছিল। তবলা-সংগতে ছিলেন বেনারসের শ্রীঈশ্বর-লাল মিশ্র, 'লালু' নামেই যিনি অধিক পরিচিত। স্বর্গত পণ্ডিত আনোখেলালের এই শিষ্যের হাতের কাজ গুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তাঁর সংগত স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। কনফারেন্সের ধুমধড়াক্কা আর হৈ-হট্টগোলের পরিবর্তে এই ধরনের ছোট ঘরোয়া সংগীতপ্রেমী শ্রোতাদের আসরে শিল্পী গান গেয়ে আনন্দ পান, শ্রোতারাও তাঁর সাধনার দান শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ [illegible] হন।

—শার্ঙ্গদেব

এই গায়েমাখা সৌন্দর্য সাবানটি বিশেষ করে ইউরোপ ও
আমেরিকায় রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত করা হলেও আপনার
পছন্দসই এই সাবানটি এখন ভারতেও পাওয়া যাচ্ছে!
গোদরেজ স্যাণ্ডল···অপরূপ বৈশিষ্ট্যময়, প্রাণমাতানো
সুগন্ধে ভরা আর বিশুদ্ধ মহীশূর চন্দন তেলে সমৃদ্ধ···
অন্যান্য সব সাবানের তুলনায় বেশ বড় আর অনেকদিন
টেঁকে। আপনিও আজ থেকে এটি ব্যবহার করুন।
এর মনোরম সৌরভ আপনার মনে আনবে খুশির জোয়ার!
গোদরেজ স্যাণ্ডল—
সকলের ব্যবহারের উপযোগী প্রসাধনী
এখন
পাবেন নতুন
গোদরেজ
স্যাণ্ডল
Sandal
LUXURY SOAP
Godrej
গোদরেজ সব
সাবানের সেরা
Godrej

দিল্লির ডায়েরি

সেদিন মনে হল, কলকাতা বুঝি দিল্লি এল। হাঙ্গামা, হুজ্জত, মারামারি, ট্রামবাসে আগুন দেওয়া, আর মিছিল (আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে...) পুলিসের সঙ্গে লড়াই, দমাদম লাঠিপেটা, দুমদাম কাদুনেগ্যাস-বোমা আর বন্দুকের চ্যাটাং চ্যাটাং আওয়াজ—এ সবই একদা কলকাতার জীবনের অংশ হয়ে গেছে। সেই কলকাতা আমরা রাজধানীতে দেখলাম ৭ই নভেম্বর।

তারিখটা লক্ষ করুন, ৭ই নভেম্বর। ঐ দিনে হয়েছিল রুশ বিপ্লব, যদিও গোহত্যা নিবারণের মতো বৈপ্লবিক দাবি সামনে রেখে অসমাজতান্ত্রিক, এমন কি অ-কমিউনিস্ট কোনো "বিপ্লব" ভারতে হতে পারে কিনা, আমার আন্দাজ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে নজির নেই। বিপ্লব দূরের কথা, গরুকে নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনোকালেই সরকার-বিরোধী আন্দোলন হয়নি। এটা ভারতের একান্ত আপনার জিনিস। ইউরোপ আমেরিকায় কিছু কিছু ঢিলে-নাট্ নরনারী আছে যারা কোনো পশুর দুঃখ দুর্দশা সইতে পারে না। বিশেষত কুকুরের। তাই প্রতিবাদ উঠেছিল যখন রাশিয়া প্রথম মহাশূন্যে পাঠিয়েছিল কুকুরকে। গিনিপিগ, বাঁদর নিয়ে কাটাছেঁড়া করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারও তারা বিরোধী।

কিন্তু ভারত হল প্রধানত হিন্দুদের দেশ, এবং বহু হিন্দুর কাছে গো-মাতা হল দেবতা। দেবতা বলেই তার সহ্যগুণ অসীম। তাকে আমরা লাঠিপেটা করি যদি সে আমার বাড়ির লাউমাচার লকলকে ডগার দিকে মুখ বাড়ায়, কিম্বা আল্ ধরে যেতে যেতে আমার ধান ক্ষেতে জীভের জল ফেলতে ফেলতে নেমে আসে। আমরা ঘাড়ে দিই জোয়াল; মাল-সমেত গাড়ি টানে বয়েলরা, মুখে ওঠে ফেনা। বুড়ো বয়সে রোগে, না-খেতে পেয়ে, অবহেলায় স্বর্গ-গমন করে। দেবতা না-হলে কী করে সম্ভব মানুষের হাতে, তাও হিন্দুদের হাতে, অতো লাঞ্ছনা ভোগ করা? কদাচিৎ দু একটি গো-দেবতা শিং দিয়ে গুঁতোয়; অথবা লাথি মারে। বড় বড় দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়ে কত অপকারই না করেন, আর তাদের তুষ্ট রাখতে কতো না মানত, কতো না পুজো। কিন্তু গরু-দেবতারা একেবারে মানুষের মতো গোবেচারি। শুধু গরুর মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এমন কি কানের কাছে যখন কেউ "তুই একটা গরু" বলে অন্যকে গালাগাল দেয়, তখনও সে অপমানে প্রতিবাদ করে না।

এ-হেন গোহত্যা নিবারণের দাবিতে রাজধানীতে জ্বলল আগুন, মরল মানুষ, পুড়ল মোটর গাড়ি আর স্কুটার। দেড় লক্ষ বিক্ষোভকারী গাদাগাদি করে দাঁড়াল, বসল, বক্তৃতা শুনল পার্লামেন্ট সড়কের তিন-পোয়া মাইল জায়গা জুড়ে। গোয়ালে গরুরা তেমনি কাটল জাব, বাছুরকে দুধ না-দিয়ে সে-দুধ ঐ বিক্ষোভকারীদের ছেলে-মেয়েরা করল পান, আর ইয়া তাগড়া তাগড়া পাঞ্জাবী হিন্দুরা মিছিলের পরে পুলিসের লাঠি খেয়ে ঢকঢক করে খেল লাস্যি। আর তারস্বরে চিৎকার "গোমাতা কি জয়"।

আনন্দ মঠের সন্ন্যাসীদের যুদ্ধের পর হয়তো এই প্রথম সাধুরা রাস্তায় নেমে এল হাতিয়ার নিয়ে—ত্রিশূল আর লাঠি। এদের রাখা হয়েছিল মিছিলের প্রথমদিকে। কারণ অনেকের এখানে বিশ্বাস যে, হিন্দু পুলিস সাধু-সন্তদের গায়ে হাত দেবে না। সাধুরা, কেউ একেবারে উলঙ্গ, কেউ নেংটি-পরা, ক্রোধে মোটর গাড়ি ভেঙেছে, ত্রিশূলে দিয়ে একটি পুলিসকে আহত করেছে, আর তারপর গুলি খেয়ে নিজের রক্তের উপর কমণ্ডুলু রেখে সমাধিস্থ হয়েছে।

লোকসভার প্রবেশপথে সাধুদের প্রতিরোধ ভাঙার দৃশ্য

আমরা গোলমাল দেখে অতি অভ্যস্থ। সেই যে আরম্ভ হল কলকাতার ১৯৪৫ সন, নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস আর রামেশ্বর দিবস। ঘোড় সওয়ার পুলিস, লাঠি পুলিস আর রাইফেল রিভলবার, গুলিবৃষ্টি, লক্ষ লোকের হুঙ্কার, আর শহীদ। আমরা কয়েক বছর চোখের সামনে দেখলাম ইতিহাসের মোড় নেওয়া। সে আন্দাজে রাজধানীর এটা কিছুই না। বিক্ষোভকারীরাও প্রায় অ্যাপ্রেনটিস্; আর পুলিসও প্রায় তাই। দেখলাম কোনো পক্ষেরই নেতৃত্ব দেওয়ার শিক্ষা নেই। ঘোড়সওয়ার পুলিস এমন বোকা যে তারা দুইদল বিক্ষোভকারীর মাঝখানে পড়ে গেল। ইট-পাটকেল বৃষ্টিতে ঘোড়ারা পালিয়ে বাঁচে আর একজন পুলিস ঘোড়ার পিঠ থেকে রাস্তায় গড়াগড়ি। তেমনি বিক্ষোভ-কারীরাও। আধ ঘণ্টার পেটানোতে দেড় লক্ষ লোক পালাবার রাস্তা পায় না। এবং সাধুরা? আশ্চর্য! কোথায় যে মিলিয়ে গেল! হয়তো আবার ফিরে গেছে হিমালয়ে অথবা হরিম্বার-ঋষিকেশে।

রাজেন্দ্র নগরে শঙ্কর রোডে ছেড়ে-দেওয়া গোমাতারা দিব্যি বেড়াচ্ছে। জাব কাটে আর গাড়ি-ঘোড়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গজেন্দ্র-গমনে নিজেদের দেবতাগিরি ফলাও করে দেখায়। "গোমাতা কি জয়।"

এবং এমন একদিন হয়তো এল বলে যখন গরুতে দেশটা গরুময় হয়ে যাবে। যেদিকে চাইবেন শুধু গরু, রোগা ট্যাংট্যাঙে গরু, শুধু গরু। ১৯৬১ সনে এই দেবতাদের সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ, এবং বেড়েছে (১৯৫১ থেকে) শতকরা ১০·৬ হারে। শতকরা ৩০ ভাগ দেবতারা শুধু খান, অর্থাৎ কোনো প্রকারের কাজে আসেন না। তার মানে এই যে, যে সমস্ত গরু-গুলো দুধ দেয়, লাঙল আর গাড়ি টানে, এদের খাওয়ার অংশে ভাগ বসাচ্ছে অকেজো দেবতারা। বুঝুন, পুরোপুরি গোহত্যা গোটা দেশে বন্ধ হলে আগামী ২০ বছরে কী অবস্থা হবে। গরুরা থাকবে বটে, থাকবে না দুধ যতোখানি প্রয়োজন। আর দুধ না-থাকলে যা হয় মানুষের তাই হবে ওদিকে জুতোর দাম যাবে বেড়ে, কিন্তু আমরা সবাই প্লাস্টিকের জুতো পরব।

প্রফেসর ডানডেকর (পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের) বলেন গরুদের মৃত্যুহার বাড়া[ন] ছাড়া উপায় নেই। বিশেষজ্ঞদের ম[তে] ৬০ লক্ষ গাইগুলোর প্রায় ৯০% না[কি] এমন যে তাতে কোনো লাভ পাওয়া য[ায়] না। আনইকোনমিক। গড়পড়তায় ভারতী[য়] গাভী দুধ দেয় বছরে ৩৮২ পাউ[ণ্ড] যেখানে গো-খাদক ইউরোপে দেয় গ[ড়ে] ৬,০০০ পাউণ্ডেরও বেশি। গোটা দে[শে] গরু-মোষ মিলিয়ে দুধ পাওয়া যায় ম[াত্র] ১৫ কোটি পাউণ্ড, দৈনিক।

আমাদের দেশের লোকেরা মাথাপিছু বছরে দুধ খেতে পারে মাত্র পাঁচ আউনস ইউরোপ-আমেরিকায় ৭০০ পাউণ্ড আমাদের কাছে গরু দেবতা; আর ও[রা] দেবতাদের ধরে ধরে খায়।

—খগেন দে সরকা[র]
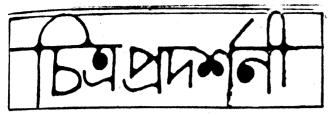
নিখিল বিশ্বাস

বাঙলার কীর্তিখ্যাত আধুনিক চিত্র-শিল্পী নিখিল বিশ্বাস গত ১০ই নভেম্বর মাত্র ৩৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

আধুনিক চিত্রকরদের মধ্যে শ্রী বিশ্বাসের স্থান ছিল প্রথম সারিতে। কেবলমাত্র বাঙলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতেই তাঁর কাজ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর আঁকা ছবির একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর বর্তমানে আয়োজন হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত এই শিল্পী জাতীয় আকাদেমী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ চিত্রাঙ্কনের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৫৬ সালে। বলিষ্ঠ রেখা এবং বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বে তাঁর আঁকা ছবি সারা দেশের সুধীজনের কাছে সমাদর লাভ করে এসেছে। প্রচারবিমুখ, মধুর স্বভাব এবং বিনয়ী এই শিল্পীর আকস্মিক লোকান্তর ভারতীয় চিত্রশিল্পের জগতকে ক্ষতিগ্রস্ত করল।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র পরিচিতি প্রদর্শনী

অনেকদিন আগে, আমাদের জানিত কলকাতার এমন কোন ভদ্রলোকের বাড়ি ছিলই না, যেখানে লুইজ পঞ্চদশ ছাঁদের চমৎকার তেরী-কাটা সোনার জল-দেওয়া কাচের আলমারীতে রকমারি পুতুল না থাকত। সেহ্‌র-এর চাকচিক্য ও ড্রেসডেনের স্নায়ু শান্তকারী অভাবনীয় মানসিকতা—আমরা চেয়ে থাকতুম।

আমরা চেয়ে দেখতুম আয়না দেরাজের দিকে, সেখানে রূপো-বাঁধান চিরুণী ব্রাশের পাশে—বহুতর ফরাসী পারফিউমের লোভনীয় শিশি, লুসী লিল'র মনজোলী, উবিগ'রে বোয়া দোরমী, সিয়াপারেলী এবং ফেরে-সেভেন-ওয়ানওয়ানের ও দ্য কোলনের আধো সবুজ ছায়ায় মনোরম লেশের উপরে একটি মূর্তি অপূর্ব দুলারি কাজ—এটি ড্রেসডেন শেফরেডেস; চিন্ময়ী সৌন্দর্য।

গত লড়াইয়ে যখন ড্রেসডেনের উপর যদৃচ্ছা বোমা পড়ত তখন আমাদের খালি মনে হত মাদমোয়াজেল ফিফি-র গল্প, কি তান্ডবলীলা।—এমনই ভাবে অনেক নিরীহ কিছু ভেঙে তচনচ হয়েছে, তখন তখন রক্তস্রোতে তা দেখা যায়নি! সেদিনও জি ডি আর-এ 'ফাইভ-ডেইস ফাইভ নাইটস' ড্রেসডেন শিল্প সামগ্রীর পুনরুদ্ধার নিয়ে ছবি হয়েছে।

জি ডি আর তার বিধ্বস্ত অবস্থাকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্যে শুধুই যে নাট-বল্টুর বৈষয়িকতায় উদ্যমশীল—তা নয়, কিছুদিন আগে আমরা তাদের চিত্রশিল্পীর অগ্রগতির একটি প্রদর্শনী দেখি, তার মান লক্ষ্য করে মনে হয় টুরিসিম-প্রসার কল্পে তারা আর্ট করে না, সত্যিই তারা ভালবাসে, ডুরার, বাক্, গ্যেটেকে ভুলে যাওয়া শক্ত!

আকাদমি অব ফাইন আর্টস ভবনে অনুষ্ঠিত এবারকার প্রদর্শনী ছিল, জি ডি আর-এর কর্মময় জগতের রঙীন ফোটগ্রাফ আর কিছু মডেল। ছবিতে চিত্রশালার অভ্যান্তর, স্থাপত্যের রূপ, আমাদের ভাল লেগেছে সব থেকে ভাল লেগেছে একটি ছোট ছেলে-মেয়েদের ছবি ক্লাবের দৃশ্য—এখানে অল্প-বয়সীরা চীনে মাটির জিনিস গড়ছে। মডেলের মধ্যে গ্রামের মডেলটি অত্যন্ত

কাশ্মীরী ফ্লকারি
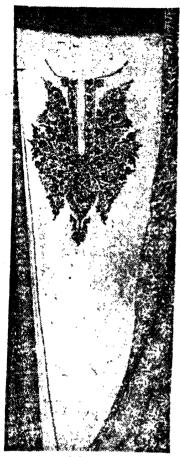
আকর্ষণীয়; বসতি, খামার, গোচারণ এবং আশ্চর্য একটি চার্চও আছে—সেটাকে যে

জি ডি আর আফিম বলে বাধা দেয়নি—এর জন্য আমরা সুখী।

চেকোশ্লোভাকিয়া ও ভারত মৈত্রী—
আকাদমী অব ফাইন আর্টস।

বেঙ্গলী ফোক ব্যালাড ফ্রম মাইমনসিঙ (মৈমনসিং)—দাসান জাবাভিতাল প্রণীত, ওবরাজকই বাঙ্গলসকা—সিলাডা গাঙ্গুলী প্রণীত এবং ব্যঙ্গলস্কে মিলোস্তনে বালাদী, ভাগবৎ গীতা এবং রবীন্দ্রনাথ টেগোর অজস্র, তাছাড়াও প্রেমচাঁদ। ইত্যাকার বই দেখে স্বভাবতই একজন দর্শকের তাক্কব লাগবে, কখন চেকশ্লোভাকিয়া ভারতের প্রতি এত মনোযোগ দিলে।

এ গল্প অনেক বড়: আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে, চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় ভারত-তত্ত্ব। তারপর অনেক চর্চা হয়েছে,—তাই ষ্টেটলিকার মর্মর মূর্তিও কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় আছে। বিশেষ করে আর দুজনের নাম করা অবশ্য কর্তব্য, তাঁরা হচ্ছেন উনটারনিৎজ ও লেজনী। এঁরা বিশ্বভারতী গঠনে অনেক সাহায্য করেন।

লেজনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনেক বই ১৯১৫-তে মূল বাঙলা থেকে অনুবাদ করেন। এবং ক্রমে অনেক বাঙলার লেখক যথা বিষ্ণু দে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীনের বইও তাদের ভাষায় অনূদিত হয়।

কাশ্মীরি শাল প্রদর্শনী—অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস বোর্ড আয়োজিত—
আকাদমী অব ফাইন আর্টস।

এখানে যে শালগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল, বোমা-বারুদের মধ্যে কাজের যা চেহারা হয় —এখানেও তাই। কাশ্মীরি বলতেই আমরা যা ভাবি তা করেও হয়ত লাভ নেই, কিনবে কে এই ড্রেন পাইপের যুগে। একবার অশোক মিত্র মহাশয় (আই সি এস) বালুচর শাড়ীর জন্যে খুব উদ্যোগী হয়েছিলেন; তুমুল অর্থ ব্যয় করে বালুচর-দুবরাজ চামারের ঐতিহ্য ফিরল, কিন্তু বাজার হল না। এখানকার শাল ২৫ থেকে ১২০০ দামের ছিল। সেলাইএর কাজ অদ্ভুত বেপট প্রায়ই চেইন সেলাই। ৬৫।১৩১৬, ৬৫।১২০১, ৬৫।৩৬০ এবং কাপড়ের ৬৫।১০২৭-এর ফুলকারী মন্দ না।

স্বপনকুমার লাহিড়ী ও অন্যান্য-র চিত্র-প্রদর্শনী—প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেন, শিবপুর হাওড়া।

হাওড়ায় চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন সত্যই

মহিলা। শিল্পী: নিতাই দাস

প্রশংসার্হ। এখানে স্বপনকুমার লাহিড়ী ও অন্যান্যের কৃত ছবির সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ খানি। স্বপনকুমার একজন অল্পবয়সী শিল্পী, এর করা তেল রঙের থেকে জলগুলি ভাল, জল রঙে 'পঙ্ক' ছবিটির লাইন বেশ সুন্দর। শংকর মজুমদারের কাজও ছিল।

হাতে তৈরি কাগজ

হাতে তৈয়ারী কাগজ বলতে আমরা তুলট কিম্বা নেপাল থেকে আগত কাগজ বুঝি। কিন্তু সম্প্রতি আকাদমি অব ফইন আর্টস ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে যে কতরকম কাগজ ছিল তা ভাবা যায় না: চিমনলাল পেপার কোং (বম্বে) ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগাড় করেন এবং এগুলি নানান ব্যবহার যোগ্য মাফিক আকারে ছাটকাট করে বাজার চল করেন। সব থেকে মনোরম হচ্ছে এদের ডিজাইন, থ্যাঙ্ক ইউ কার্ড, টাগলস, কার্ড, ককটেল ন্যাপকিন, নিমন্ত্রণ পত্র প্রত্যেকটিই চিত্রিত। আমাদের মনে হয় এঁরা যদি আঁকার কাগজ করেন ত বড় ভাল হয়। সাজাহানের বাকসটি খুব সুন্দর হয়েছে।

বিমল করের ছবি

বিমল করের সবশুদ্ধ এখানে ৩১টি ছবি ছিল। ইনি কখনও একাডেমিক কখন ডিসটরশানের পক্ষপাতী, আবার কখনও অবিকলবাদী। এঁর প্যাস্টেলগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যথা নং৩১।

নিতাই দাসের চিত্রপ্রদর্শনী
আকাদমী অব ফাইন আর্টস।

এখানে প্রায় ২০০ ছবি ছিল। এঁর অনেকগুলি ছবি, খুব আশ্চর্য যে, রাখাল দাসের কাজের সঙ্গে অবিকল মিল আছে। স্কেচ ৩৯টি খুব ভাল। কিন্তু অনেক কাজ—অর্থাৎ ছবি টানান ঠিক হয়নি।

বিশ্ব খুড়ো ট্রামে চড়িয়াই গো-পর্ব লইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—"একটা কথা আছে—কার বা গোয়াল আর কে বা দ্যায় ধোঁয়া। কিন্তু দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধুদের কাণ্ডকারখানা দেখে অন্য কেউ না হলেও ষণ্ডকুল নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন এই মনে করে যে, তারা নেহাৎ নির্বান্ধব নয়, ধোঁয়া দেওয়ার বন্ধু তাদের আছে!!"

আমাদের শ্যামলাল এই প্রসঙ্গেরই জের টানিয়া বলিল—"কিছু না বুঝে হায়, কী ভুল করেছ, শহর পোড়ায়েছ যোগী"—মনে হইল সে সুর করিয়াই গানটা শোনাতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাবাবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

নন্দজীর পদত্যাগের পরে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাকি বলিয়াছেন,—'আমি জনসেবার ক্ষেত্রে কাজ করব।' আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন "সব যেন কী রকম এলোমেলো হয়ে গেল, আমাদের ধারণা ছিল মন্ত্রিত্বটাও জনসেবারই অঙ্গ।"

নন্দজীর পদত্যাগের পরে হোম-দফতরের ভার পড়িয়াছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপরে।—"এর চেয়ে আর সুনির্বাচন হতে পারে না, হোম বা ঘর গেরস্থালিতে তো মেয়েদেরই পূর্ণাধিকার চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাগলা নাকি বলিয়াছেন যে, ছাত্ররা হিংসার পথ নিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শ্যামলাল বলিল—"তা যাতে না হয় তার জন্যেই কি এত বহ্ন্যুৎসব!!"

রেলওয়ে দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চব্বিশ দিনে সাড়ে চার লক্ষ বিনা টিকিটের যাত্রীকে পাকড়াও করা হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"যাত্রীরা নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করেছেন; নিজের বাড়ির গাড়ির ভাড়া আবার দেয় কোন্ বোকা!!"

সংবাদে প্রকাশ দীঘার সমুদ্রে নাকি ইলিশের ঝাঁক দেখা দিয়াছে এবং ইলিশ আট টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"গুজবে কান দেবেন না।"

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম ব্রেজিলে নাকি সম্প্রতি নোট বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। —"আমাদের খিদিরপুরের মাঠেও 'জ্যাকপট' থেকে নোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু খরা অঞ্চল যেমন ছিল তেমনি আছে"—বলিলেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।

ভারতীয় রেডক্রসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা ১৩ নবেম্বর হইতে এক সপ্তাহ 'পরিচ্ছন্ন কলকাতা অভিযান' চালাইবেন। আমাদের শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিল—"তাঁদের এই অভিযানের সময় নেপথ্য সঙ্গীত হিসাবে 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানটি রেকর্ডে বাজাবার ব্যবস্থা হয়েছে; মর্জিনার নাচের ব্যবস্থা করা গেল না বলেই গানটি নেপথ্যেই রাখা হয়েছে।"

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসর দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ হইবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন।—"কিন্তু মন্ত্রী ঘাটতির পরিমাণ সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করা হয়নি, হয়ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি বলে কিংবা গদিস্থান উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলে"—বলেন খুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম ভারতে নাকি একটি নূতন ধরনের হৃদরোগ দেখা দিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"না, নূতন হৃদরোগ নয়, পরীক্ষায় দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে নাকি হৃদয় বলেই কোন কিছু নেই!!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কলিকাতার সারকুলার খাল খোলাই রাখা হইবে। সংবাদে বলা হইয়াছে, এই খাল দিয়া ফরাক্কা ও সুন্দরবনে যাতায়াত করা যাইবে।—"এবং কুমীরের গমনাগমনও এই খাল পথে অব্যাহত থাকবে"—বলেন সহযাত্রী।

মহাজাতি সদনে সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করার সময় কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর বলিয়াছেন: ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন বিশুদ্ধ ধারাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের—জাতীয় সরকারের, সঙ্গীতজ্ঞদের, রসিক-সমাজের—"এবং অনুরোধের আসরের!"—শেষের মন্তব্য শ্যামলালের।

অস্ট্রেলিয়ার 'টিনটুকি' দল সম্প্রতি কলিকাতা রবীন্দ্র সদনে পুতুল নাচ দেখাইয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"আমরাও কলিকাতার হাসপাতালে তাঁদের ভারতীয় পুতুল নাচ দেখিয়েছি,—সাক্ষী আছেন টিনটুকি দলের শব্দ যন্ত্রী!!"

যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ শিল্পী ভিনসেণ্ট ভ্যান গ

(১) ওলন্দাজ পর্যায় : ১৮৫৩—১৮৮৫

কামুর লা পেস্ত্ উপন্যাসের গোড়াতে একটি ইঁদুরের বর্ণনা আছে: অকথ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে প্রাণীটি অবশেষে কাত হ'য়ে সাদা মেঝের উপর পড়ে গেল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল টাটকা এক ঝলক লাল রক্ত, তারপর শেষ। এই রক্ত একটি অপরূপ ফুলের মতো মনে হয়েছিল উপন্যাসের নায়কের। এই ঘটনার সঙ্গে ভ্যান্ গ'র শিল্পী জীবনের কোথায় যেন একটা মিল আছে—যে-শিল্পী সাতাশ বছর ধরে অবিরাম যন্ত্রণায় ছটফট করে শেষের দশ বছর রক্তক্ষরণের মতো প্রকাশ করলেন তা ক্যানভাসে আজ আমাদের কাছে সেইসব মহৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি, প্রতিভার চিরন্তন প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়, যেমন সেই মূষিকের বীভৎস যন্ত্রণায় নির্গত রক্ত লাল ফুলের মতো মনে হয়েছিল।

উরসুলা যদি ভালোবাসার উত্তরে ভালোবাসত তাহলে ভ্যান গ মানুষটি সুখ পেত, শান্তি আসত তাঁর জীবনে, হয়তো চিত্রকর না হয়ে চিত্র ব্যবসায়ে খ্যাতিমান, বিত্তবান পুরুষ হতেন, আমরা কোনোদিন দেখতাম না "তারাভরা রাত"-এর মতো ছবি, জানতাম না লম্বা, লাল চুল, গর্তে বসা দুটি গভীর নীল চোখ, অস্বাভাবিক খাড়া নাক, গাল ভাঙা, চোয়াড়ে এই শিল্পীকে; মৃত্যু হত না তাঁর সাঁইতিরিশ বছর বয়সে, অক্ষত কান দুটি নিয়ে হয়তো নাতির দিকে তাকিয়ে শান্ত নিঃশ্বাস ফেলে গত হতেন অশীতিপর অবস্থায়। কিন্তু উরসুলার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান এক দমকায় তাকে ফেলে দিয়েছিল অন্য এক খাতে যার পর থেকে একের পর এক, ঢেউয়ের মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে, দুঃখ এসেছে তার জীবনে এবং আঠারো থেকে সাতাশ পর্যন্ত অবিরাম যন্ত্রণার ভার অবশেষে মুক্ত হয়েছে

ভ্যান গ'র স্বকৃত প্রতিকৃতি

ক্যানভাসে জীবনের শেষ অধ্যায়ে—জন্ম হয়েছে অনন্য এক শিল্পীর, যে হয়তো অজ্ঞাতই থাকত যদি সেই মুখরা ইংরেজ ছুকরি বলত, "হ্যাঁ, তোমাকেই আমি ভালোবাসি, ভিনসেণ্ট"।

নেদারল্যাণ্ডের য়ুণ্ডের্ট নামক ছোট্ট শহরে ১৮৫৩ সালে এক প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রির ঘরে ভিনসেণ্টের জন্ম হয়। ইস্কুলের পাঠ আরম্ভ তাঁর বয়স যখন বারো। ষোলো বছর বয়সে তিনি যখন ইস্কুলের পাঠ রফা দিয়ে বোর্ডিং থেকে বাড়িতে চলে এলেন তখনও শিশুসুলভ সারল্য তার চোখেমুখে, কেমন যেন বোকা বোকা, হ্যালহেলে চেহারা, এদিকে লম্বা হয়েছে প্রচুর কিন্তু মনে হয় যেন এখনও পৃথিবীর ধরনধারন ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। এই সময় তাঁর এক কাকা ভ্যান গকে চাকরি দেন জুনিয়ার সেলসম্যানের, প্যারিসের ওপিল আর্ট গ্যালারির দি হেগ এর শাখায় এবং এই কাজে ভিনসেণ্ট এমন চাতুর্য দেখালেন যে বছরখানেকের মধ্যেই তাঁকে বদলি করা হ'ল লণ্ডনে। এই লণ্ডনেই আঠারো বছর বয়সে তিনি লটকে পড়লেন বাড়িওয়ালির মেয়ে উরসুলার সঙ্গে।—বহুদিন শুধু রঙিন স্বপ্ন দেখেছেন উরসুলাকে নিয়ে, শুধু এক পলক দেখে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন দিনের পর দিন কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে—প্রেম নিবেদন করলেন হঠাৎ এক সন্ধ্যায় উরসুলাকে, বিয়ে করতে চাইলেন, কিন্তু ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে উরসুলা ভ্যান গর সাহস দেখে অবাক হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মুখের ওপর, তারপর ঐ লালচুলের যুবকটিকে দূর করে দিল ঘর থেকে।—হতাশায়, অপমানে, ব্যর্থতায় ভিনসেণ্ট কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, ক্রেতাদের সঙ্গে তর্ক করে, ঝগড়া করে, যখন-তখন রেগে উঠে লোককে মারতে যায়, মাঝে মাঝে ধর্মের বুলি আওড়ায়- এমতাবস্থায় চাকরি টেঁকে না, তবু, তবু অতীতের কাজ দেখে কর্তৃপক্ষ চাকরি না খেয়ে বদলি করলেন তাঁকে প্যারিসে কিন্তু সেখানেও একই রকম ব্যবহার করে অবশেষে বাধ্য হলেন তাকে বরখাস্ত করতে। ভ্যান গও ঠিক করেছিলেন আর এইসব চাকরি নয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্ম-নিয়োগ করে জীবন কাটাব।—এরপর তিনি একটি হাইস্কুলে মাস্টারি নিয়ে লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন সমাজসেবা ক'রে ফিরে আসেন হল্যাণ্ডে আমস্টারডামের থিওলজিকাল সেমিনারিতে পাঠ নেবার জন্য। এই পাঠ নেওয়াকালে তাঁর নার্ভাস ব্রেক-ডাউন মতো হয় তার ফলে এই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে হয়। উরসুলাকে এতদিনও তিনি ভুলতে পারেননি, অবিরাম তার স্মৃতি ভ্যান গ-কে তাড়িয়ে নিয়ে যেন বেড়াচ্ছে ধ্বংসের পথে।

আমস্টারডাম থেকে এবার গন্তব্য সেই ভয়ংকর কোলিয়ারি অঞ্চল মরিনাজ, বেল-জিয়াম—ভ্যান গ-র ইচ্ছে এখানে ভ্রাম্যমাণ উপাসক হয়ে গরিব-দুঃখীদের জন্য আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজবেন উরসুলার স্মৃতির আগুন এখনো তাঁকে

ক্ত করছে। জীবনে এই প্রথম, এই শেষ
ন-গ ভালোবাসা পেয়েছিলেন—মরিনাজের
গরিব-দুঃখীদের জন্য উদভ্রান্ত ছিনি
গ্রাম করতেন তারা সত্যিই ভালোবেসে-
ভিনসেন্টকে। কিন্তু যেখানেই তিনি
শান্তি পেতেন অদৃষ্ট সেখান থেকেই
সরিয়ে নিয়ে গেছে—ব্রাসেলসের
-সম্প্রদায় তাঁকে পাঠিয়েছিল এই
য়ারি অঞ্চলে তারা ভ্যান গ-র আক্ষরিক
ষ্টানি দেখে বিরক্ত হয়ে বরখাস্ত
রলেন তাঁকে। ব্যর্থতাবোধ, হতাশা, অপমান
ান গ-র শরীরে পিন ফোটাতে থাকল।
শ বছর বয়সের এই যুবককে অবহেলা
করতে হল বন্ধুদের কাছে, দেখাতে হল
ত তার জন্য সমাজে মাথা নিচু করে

বিমান ডাকে

বিদেশে চাঁদার নতুন হার

মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ১ জুলাই হইতে বিদেশে বিমান ডাকে দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার—

এশিয়া:	
বার্ষিক	১৮৬·০০
ষাণ্মাসিক	৯৩·০০
ত্রৈমাসিক	৪৬·৫০
ইওরোপ:	
বার্ষিক	২৮০·০০
ষাণ্মাসিক	১৪০·০০
ষাণ্মাসিক	১৪০·০০
ত্রৈমাসিক	৭০·০০
আমেরিকা ও কানাডা:	
বার্ষিক	৪১০·০০
ষাণ্মাসিক	২০৫·০০
ত্রৈমাসিক	১০২·৫০
অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ফিজি প্রভৃতি:	
বার্ষিক	৩২৬·০০
ষাণ্মাসিক	১৬৩·০০
ত্রৈমাসিক	৮১·৫০
লণ্ডন অফিস মারফত:	
বার্ষিক	১১৭·০০
ষাণ্মাসিক	৫৮·৫০
ত্রৈমাসিক	২৯·৫০

—সার্কুলেশন ম্যানেজার, দেশ

ন যে-চাকুরিস্থলে গেলেন দেখলেন জন্য সেখানে দ্বার বন্ধ, সাহায্য ার অপমানে মরে যেতে ইচ্ছে করল। এই সময় তাঁর একটি উপলব্ধি হয়: বছরের ছোট ভাই থিও-কে ভ্যান গ একটি চিঠিতে লিখলেন: "......গত বছর ধরে আমি বিনা চাকরিতে আছি ন-ওখানে ঘুরে এর-ওর কাছে সাহায্য মন বসেনি কোথাও, অবিরাম রতায় সময় কেটেছে, কারণ আমার

পটেটো ইটারস্

অন্তর্গত তাদের ভিতরে এমন কিছু আছে যাকে আমি জানি না।"—এই চিঠির অভিযোগের উত্তর পেয়ে ভ্যান গ লিখলেন: "সমস্ত সত্ত্বেও আমি আবার পা বাড়া নিয়ে উঠে দাঁড়াব; সে-পেন্সিল উৎসাহের প্রত্যাখ্যানে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তা আবার খুঁজে পেয়েছি। আমি ছবি আঁকব। আমার সামনে এক নতুন দিগন্ত আমি দেখছি, থিও।" ভাইয়ে-ভাইয়ে ভালোবাসা কত গভীর হতে পারে থিও-ভিনসেন্টের সম্পর্ক তার প্রমাণ। সামান্য আয় থিওর, তা থেকেই সাহায্য করতেন ভিনসেন্টকে—শুধু অর্থেই নয়, ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, ছবি আঁকার উৎসাহ দিয়ে। ছবি আঁকার সংকল্প নিয়ে ভ্যান গ ব্রাসেলসে এলেন, এবং সেখানে মিলে, কোরো প্রভৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয়ে কপি করলেন তাঁদের প্রচুর ছবি। ১৮৮২-তে হেগে চলে আসেন এবং এখানে ক্রিস্টিন নামক এক বেশ্যার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট অনুরাগ—পরিচয় নিতান্ত রাস্তায়, এই কুৎসিত মাতাল অন্তঃসত্ত্বা রমণীর সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য, গভীর ভালোবাসা জন্মাল ভ্যান গ-র ক্রিস্টিনের প্রতি, এবং প্রায় দু'বছর একসঙ্গে কাটালেন তার সঙ্গে—কিন্তু এ-সম্পর্কও দুঃখে শেষ হ'ল, ক্রিস্টিন তাঁর ভালোবাসার মর্ম বুঝল না। ভিনসেন্ট ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অস্থিরভাবে হল্যাণ্ডের গ্রামে-গ্রামে, শুকনো রুটি শস্তা মদ খেয়ে রাত কাটাতেন খড়ের গাদায়, নিজেকে একাত্ম করলেন যত দীন-দুঃখী ব্যর্থ মানুষের সঙ্গে। তাঁর ছবির বিষয় এখন কুঁড়েঘর, মুচি, তাঁতী পুরোনো জুতো, সমাজের নিম্ন শ্রেণী। ভ্যান-গর এই পর্যায়কে ওলন্দাজ বলা হয়, যার প্রথম মহৎ চিত্রসৃষ্টি "পটেটো ইটারস" (১৮৮৫)। ছবিটির বিষয়ে ভ্যান গ-র নিজের কথাই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। থিও-কে চিঠিতে তিনি লিখছেন: "আমি আবার সেই সন্ধে-বেলা চাষীদের আলু খাবার ছবিটি শেষ করার কাজে লেগেছি। প্রাত্যহিক এক যুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা যতদিন এ-ছবিটি আমি আঁকছিলাম। আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি এ-ছবিতে, যেই লোকগুলি এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় বাতির চারধারে বসে পাত্র থেকে আলু খাচ্ছে তারাই, যে হাত দিয়ে প্লেট থেকে তুলছে, তাই দিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলেছিল এই ফসল। আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের জীবনযাত্রার সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার তফাতটা বোঝাতে চেয়েছি। সেইজন্যই আমি আশা করছি না এ ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ভালো লাগবে। আমি যে বিষয় বেছেছি ছবিটির, তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে হ'লে ছবিতে নিটোল ভাব আনলে চলবে না, তাই ইচ্ছে ক'রেই ক্যানভাসটিকে মোটা ভাবে বেঁধেছি যাতে এদের জীবনযাত্রার রুক্ষ দিকটা ফুটে ওঠে। যদি একটি চাষী-জীবনের চিত্র আলু-বেকনের গন্ধে ভরপুর থাকে তা হ'লে ঠিক আছে; তা অস্বাস্থ্যকর নয়। যদি একটি আস্তাবল অশ্ববিষ্ঠার গন্ধে ম-ম করে সেটাই হবে স্বাভাবিক—যেমন স্বাভাবিক শস্যক্ষেতে ফসলের বুনো গন্ধ। কিন্তু একটি চাষী জীবনের চিত্রে সুগন্ধি নিঃশ্বাস অশ্লীল, জঘন্য, নাক্কারজনক। তাই আমি এ চিত্রে কোথাও শহুরে নিটোল ভাব আনিনি ইচ্ছে করেই; ছবির চরিত্রগুলি যেমন অপরিশীলিত তেমনি আমার তুলিও চলেছে অপরিশীলিত গ্রামের চিত্রকরের মত এ ছবির জন্য।"

[আগামী সংখ্যায় ভ্যান গ-র ইম্প্রেশনিস্ট ও এক্সপ্রেশনিস্ট পর্যায় আলোচ্য]

শুদ্ধশীল বসু

আমরা বাজারে ব্যবহার করেছি চিরকাল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে গুঁড়ো মশলার প্রচলন ছিল তারও বেশীর ভাগ ঘরে ধুয়ে শুকিয়ে কুটে দীর্ঘদিনের জন্য রাখা হতো। কাজের সুবিধা তাতে অনেক। মশলাবাটার সময়, গৃহভৃত্যের সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব, কর্মব্যস্ত মেয়েকে গুঁড়োমশলা ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে আধুনিক বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। গুঁড়ো-মশলা নির্ভরযোগ্য না হলে কি তাতে মিশতে পারে অথবা কত বিষাক্ত জিনিস বাজারে মশলা বলে চলতে পারে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। গোরাচাঁদ রোডের ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে দেখেছিলাম পেঁপের বীজ শুকিয়ে গোলমরিচ করা হয়েছে। তবু তো তাতে ক্ষতি করবে না, কিন্তু ভাবুন আমরা হলুদগুঁড়ো কিনি, তাতে সস্তা yellow oxide of lead মেশানো থাকা অসম্ভব নয়, ধনের গুঁড়োতে ঘোড়ার শুকনো মলও কখনও কখনও নাকি পাওয়া গেছে। বিদেশে ভারতীয় 'আমচুর' থেকে এই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নাকি বিদেশীরা ভারতীয় খাদ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। কি দারুণ দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। চায়ে তো তরবর আর পাঁচরকমের পাতা, কুটোকাটি থাকে। ব্যবহার করা চায়ের পাতাকে শুকিয়ে নতুন পাতার সঙ্গে রং মিশিয়ে রং করে মেশানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। চামড়ার কুচিকাটি সংগ্রহ করা নাকি লাভজনক ব্যবসায় তাতে চায়ে ও আরও দুপাঁচটা জিনিসে ভেজালের রসদ হয়। ময়দার ওজন বাড়াতে চক ও সোপস্টোন, ময়দা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সাদা পাথরের গুঁড়ো, চক ইত্যাদি লবণে দিয়ে লবণের চেহারায় চমক লাগানোও বিরল নয়। চক আটাতেও মেশানো চলে। চালের কাঁকর এর তো উল্লেখ করারই প্রয়োজন নেই। মধুতে গুড়ের রস, চিনির সিরাপ আমরা সর্বদা খাই। ভেজালের একটি একটি করে উল্লেখ সম্ভব নয়, আমাদের জানাও নেই। যা দুচারটের খবর পাওয়া যায় তা বিশাল ভেজাল ব্যবসায়ের সামান্য অংশমাত্র।

ভেজালের, বিশেষ খাদ্যে ভেজালের পথ বন্ধ করার চেষ্টায় ১৯৩৭ সালের Agricultural Produce grading and marketing act হয়। ফল, ডিম, ঘি, তেল ইত্যাদি অনেক জিনিস পরীক্ষা করে 'আগমার্ক' দেওয়া হয়। ঘি বা তেলের টিনের উপর আগমার্ক লক্ষ করে থাকবেন। আগমার্কা দেবার প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বহু ল্যাবরেটরী, পরীক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থায় মান নির্ণয় করে এই মার্কা দেওয়া হয়। মার্কাটির কাগজ বিশেষ ধরনের যাতে সহজে নকল সম্ভব না হয়। Prevention of Food adulteration Act-টি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কিন্তু প্রয়োগের কর্তা প্রাদেশিক স্বাস্থ্য দপ্তরগুলির। পৌর প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদির মাধ্যমেই বেশী কাজ করবার কথা।

আইন করে যে এমন কিছু ফল হয়নি তা আমরা দেখতে পাই। কাজেই জনমতই এখন বিশেষ ভরসা। সরকারী গবেষণাগারে যা পরীক্ষার ফল পাওয়া যায় তা যেন সর্বসাধারণকে জানাবার চেষ্টা হয়। অজ্ঞ দরিদ্র দেশবাসীর সর্বনাশ করে যে ব্যবসায়ী ভেজাল চালাতে চায় তার সমুচিত শাস্তি কেবলমাত্র সরকার দেবেন তা নয়, জনসাধারণ তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, সমাজে তাকে হীন করে তুললে হয়তো বা অন্যায় একটু কমবে। আবার ভেজালবিহীন খাদ্য যদি ক্রেতার সমাদর পায় তবে উৎপাদকও ভেজালবিহীন খাদ্য বাজারে দেবে।

ক্রেতাসমবায় সংগঠন করে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠান যে সব জিনিসে ভেজাল সহজে সম্ভব তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন যাতে ক্রেতা তাদের কাছে খাঁটি জিনিস পায়। কৌটায়, টিনে, বাক্সে, প্যাকেটে বন্ধ করা জিনিসে ভেজালের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। প্যাকিং এমনভাবে হওয়া যাতে ঐ প্যাকিং ইচ্ছামত খোলা যাবে না। প্যাক করা মাল যদি উৎপাদকের জামিন বা guarantee নিয়ে বাজারে আসে তবে ভেজালের ভয় অনেকটা কেটে যাবে।

কিছুদিন আগে বনস্পতিকে রং করা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। বনস্পতিতে রং থাকলে সহজে ঘি-এর ভেজাল হতে পারবে না। সরকারের সদা সজাগ দৃষ্টি ও শাস্তির ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা ও ভোক্তার দৃষ্টিও সতর্কতর হতে হবে। এক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রচুর দায়িত্ব। মেয়েরা আজকাল কেবলমাত্র রান্নাঘর নিয়ে থাকেন না, তাঁরা কেনাকাটারও মালিক। নিম্নমানের জিনিস না কেনা, ভেজাল সন্দেহ হলে বর্জন করা, নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জিনিস ঘরে আনা অনেকটাই তাঁদের উপর ভরসা।

কিছুদিন আগে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উৎসাহ এসেছিল। কলকাতায় আমরা তার পত্তনও দেখেছিলাম। কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন 'ভেজাল' সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। বিদেশে ব্যবসায়ীর উপর কড়া নজর বিভিন্ন ক্রেতা সম্মেলনেরই রাখা সম্ভব হয়। অত দূর না হয়ে উঠলেও বর্তমানে বহু রকম সমস্যা তার কিছু কিছু যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান হবে আশা করা অন্যায় হবে না।

ন্যাশনাল কনজিউমারস সারভিস এখন ভারত সেবক সমাজের সঙ্গে যুক্ত। যোজনা কমিশনও কনজিউমার্স সারভিসের উপর নজর রাখেন। বিভিন্ন প্রদেশে সারভিসের শাখা আছে। কিন্তু সাধারণ তার কাজকর্ম সম্বন্ধে জানবার কতটা সুযোগ পান বলা কঠিন। অন্তত বাংলাদেশে শাখা থাকা সত্ত্বেও তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ আমরা জানি না। গৃহিণীরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে নিজেদের সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে ভেজালবিহীন খাদ্য আন্দোলন চালাতে পারেন। কেবলমাত্র বাজারের কাঁচামাল নয়, হোটেলে রেস্তরেন্টে, চা ও পানের দোকানে সর্বত্রই সাধারণভাবে মেয়েরা লক্ষ রাখতে পারেন পরিবেশনের উপর। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ও সহযোগিতা করলে কাজ এমন অসম্ভব নয়।

টুকিটাকি

ভেজালের মত ওজনের উপরও লক্ষ রাখা দরকার। পাল্লায় চুম্বক লাগিয়ে পর্যন্ত ওজন ফাঁকি দেওয়া হয়।

তুলাদণ্ডের যে দণ্ডটি থাকে অনেক সময় পারা তার মধ্যে ভরে রাখা হয়। যেদিকে ওজন ভার দিতে চায় দোকানদার সেদিকে হেলিয়ে পারার ওজন যোগ করতে পারে।

একটু খেয়াল রাখলেই দেখবেন কোন কোন ক্ষেত্রে ওজনের পাত্র দুটি সমান পুরু নয়। যেদিকে মোটা বেশী সেদিকে যা রাখা হবে ওজনে সেটি কম হবে।

দাঁড়িপাল্লার দড়িকে নানাভাবে ঘুরিয়ে চালাক ব্যাপারি ওজনে কারসাজি করে নেয়। কখনও বা সরু লোহা কাপড়ে ঢেকে দড়ির মত ব্যবহার করেও ক্রেতাকে ফাঁকি দেবার আয়োজন চলে।

তরল পদার্থ (যেমন দুধ, তেল) ওজনে ছোট পাত্র ব্যবহার করা হয়। কখনও বা পাত্রটি দেখতে বড় থাকে কিন্তু তলায় গলদ থাকে।

কিলোগ্রাম ও সের, লিটার ও সের এখনও ব্যবসায়ীর লোকঠকানোর সাহায্য করে। কাপড় কিনতে নির্ভরযোগ্য ব্যাপারির কাছে যাবেন। এমনও দেখা যায় যে, মাপবার মিটার কাঠিটি দু টুকরো করে ভেঙে আবার জুড়ে নেওয়া হয়েছে। জোড়ের মুখে যেটুকু ছোট, অনেকটা কাপড় মাপলে বেশ একটু কমে যায়।

—শ্রীমতী

সাহিত্য সংবাদ

ডঃ কালিদাস নাগের মৃত্যু

কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের প্রথম সারির আসনে অধিষ্ঠিত থেকে, ডঃ কালিদাস নাগ গত মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ডঃ নাগ ছিলেন মুখ্যত ঐতিহাসিক, কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগেও তাঁর যোগসূত্র ছিল নিবিড়। জন্ম ১৮৯১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ পাশ করেন ১৯১৫ সালে, প্যারিস থেকে ডক্টরেট পান ১৯২৩-এ।

তিনি রোমাঁ রোলাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী রচনার সময় তথ্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করেছিলেন, চীন সফরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহচর হিসেবে, পরিচালক ছিলেন প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকা-দুটির। তাঁর নিজস্ব বই, আর্ট অ্যাণ্ড আরকিওলজি অ্যাবরড, ইনডিয়ান অ্যাণ্ড দি প্যাসিফিক ওয়ার্ল্ড, উইথ টেগোর ইন চায়না অ্যাণ্ড সিলোন, টেগোর অ্যাণ্ড গান্ধী, স্বদেশ ও সভ্যতা।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঔপন্যাসিক গোকুল নাগের অনুজ এবং লেখিকা শান্তা দেবীর স্বামী।

শুধু পুরস্কার নয়

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান কাগজে একটি ছোট্ট খবর চোখে পড়লো। ব্রিটেনের আর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সংস্থার সাহিত্য পরিচালক মিঃ চার্লস অসবোর্ন ঘোষণা করেছেন যে, এবার থেকে, আর্টস কাউন্সিল শুধু কবিদেরই নয়, গদ্য লেখকদেরও আর্থিক সাহায্য করবেন। ব্রিটেনের কোনো গদ্য লেখক যদি অন্য সমস্ত কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে কোনো একটি বিশেষ বই লেখার জন্য ছ' মাস বা এক বছরের স্বাধীন সময় চান, তবে তাঁকে আর্থিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং তাঁর রচনাটির প্রতি সমগ্র মনপ্রাণ একাগ্র করার সুযোগ এনে দেবার জন্য, আর্টস কাউন্সিল সেই লেখককে বছরে এক হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত (আমাদের হিসেবে একুশ হাজার টাকা) সাহায্য করবেন। সাহায্য নির্ধারিত হবে এইভাবে, মনে করা যাক, কোনো লেখক একটি বই লিখবার বাসনা ব্যক্ত করে কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে ৫০০ পাউণ্ড অগ্রিম নিয়েছেন, তাহলে আর্টস কাউন্সিলও তাঁকে পাঁচশো পাউণ্ড দেবেন। প্রকাশকের কাছ থেকে যে-টা পেলেন, সেটা তাঁর প্রাপ্য টাকার অগ্রিম, কিন্তু আর্টস কাউন্সিল যে-টাকা দিচ্ছেন সেটা এমনিই, কোনো শর্ত নেই, ফেরত দিতে হবে না, স্রেফ সাহায্য। কোনো লেখক যদি প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম আদায় না করতেও পারেন, তাহলেও সেইরকম লেখক এই সাহায্য পেতে পারেন, যদি তাঁর আগেকার রচনায় কৃতিত্বের প্রতিশ্রুতি থাকে।

ঘোষণাটিতে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আছে। প্রথমত, **শুধু কবিদের নয়, গদ্য লেখকদেরও।** দ্বিতীয়ত, বই লেখার পর পুরস্কার নয়, বই লেখার আগেই আর্থিক সাহায্য। অর্থাৎ কবিদের এইরকম সাহায্য আগে থেকেই দেওয়া হতো এবং গদ্য লেখকরা যে-হেতু লিখে টাকা রোজগার করতে পারেন, সেইজন্য আগে এই আর্থিক সাহায্য পেতেন না, এখন থেকে পাবেন।

এই প্রসংগে ব্রিটেনে লেখকরা কী ধরনের সাহায্য পান, তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা, স্বাধীনতার পর ইংরেজদের উপরও বেশী নকল করছি, কিন্তু ঠিক ইংরেজদের ভালো জিনিসগুলো ছাড়া। আমাদের দেশে এখন ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার বা ভালো চাকুরে মাত্রই টাই পরে অফিস যাওয়া নিয়ম, দিনের প্রথম কাপ চায়ের নাম বেডটি, টেবিলে খানা, সন্দেশের বদলে ইংরেজী বাজনা, ছেলেমেয়ের মুখে ড্যাডি, মামি, পিকনিকে বীয়ার কিংবা জিনের বোতল নিয়ে যাওয়া—এই সমস্ত রেওয়াজই ইংরেজিআনা। অপরপক্ষে, জাতিগত আলোচনায় আমরা বলি, ইংরেজ-আমেরিকানরা রসকষহীন বেনের জাত, কিন্তু আমরা ভারতীয়রা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। ছবিটা কিন্তু উল্টো। আমাদের দেশে যাঁরা জীবিকায় বা ব্যবসায় ক্রমশ উন্নতি করে যতবেশী বিত্ত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেন, ততই তাঁরা সংস্কৃতিহীন হতে শুরু করেন, অনুকরণ করেন নিম্নশ্রেণীর ইংরেজদের। ওদিকে ইংরেজ-আমেরিকান যতই ধনশালী হয়, ততই সে সামাজিক সংগতির লিপ্সায় সাহিত্য শিল্পের প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করে। (জোর করে বা ফ্যাশানের খাতিরে —যে-জন্যই হোক।) ডিনার টেবিলে প্রায় সব ধনাঢ্য ইংরেজই সময়োপযোগী দু লাইন সেক্সপীয়ার, সাম্প্রতিক নাটক বা পিকাসোর ব্লু-পীরিয়াড প্রসংগে দু' চারটি কথা বলতে পারলাম—এইটেই ফ্যাশান, নচেৎ তিনি সমাজের চক্ষে সংস্কৃতিহীন বলে প্রমাণিত হবেন। অন্যদিকে, আমাদের দেশে যারা ব্যবসায়িক সাফল্য বা ধনাঢ্যতায় গৌরবান্বিত, তাঁদের পক্ষে, ডিটেকটিভ বইয়ের প্রসংগ উঠলেও, 'ওসব সাহিত্য-

টাহিত্যের আমি খোঁজ রাখি না', বলাই ফ্যাশান।
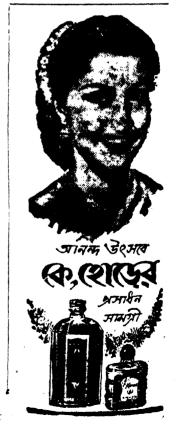
যাই হোক, ফ্যাশানের খাতিরে বা যে-জন্যই হোক, সম্পদশালী ইংরেজ যখন শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন, তিনি ছবি কেনেন। তিনি বই কেনেন, তিনি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন এবং এর সংগে তাল রাখার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও পাওয়া যায়, এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ হয় দেশের শিল্প-সাহিত্য, শিল্পী-সাহিত্যিকরা উপকৃত হন। আমাদের ধনী মহলে অনেক ইংরেজী অনুকরণ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ইংরেজের এই ফ্যাশানটির অনুকরণ শুরু হয়নি, হলে ভালো হতো খুব।

এখন দেখা যাক্‌, ওদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা কীভাবে উপকৃত হন।। শিল্প বাদ দিয়ে আপাতত শুধু সাহিত্যের প্রসংগে প্রথমেই পুরস্কার, পুরস্কার আমাদের দেশেও আছে, কিন্তু সেগুলির পরিকল্পনা অনেকটা এলোমেলো। পুরস্কারের পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাতে একই সংগে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক এবং সমগ্র সাহিত্যের উপকার হয়। কিন্তু আমাদের পুরস্কারগুলির লক্ষ শুধু প্রথমটিই। এক লক্ষ টাকার যে জ্ঞান পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, জীবনের শেষ সীমায় এসে কোনো খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত লেখক সেই পুরস্কার পাবেন—তাতে একমাত্র সেই লেখকের ছেলেমেয়ের কিছু লাভ হতে পারে, তা ছাড়া সাহিত্যের তাতে কি লাভ? অন্য পুরস্কারগুলিও অনেকটা ঐরকম। এ কথা মনে রাখা দরকার—সাহিত্যের পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, জনসাধারণের রুচি যদি কিছুটা নেমে আসে—তবে সমগ্র সাহিত্যের মানও কি নামিয়ে আনতে হবে? লেখকের উপায় নেই, পাঠক যে-রকম চায়, বেঁচে থাকার জন্য তাকে সে-রকম লিখতেই হবে—তাহলে শিল্প-সংস্কৃতি ঐতিহ্য এসব ব্যাপারগুলো কোথায় যাবে? এর উত্তর হচ্ছে, সব দেশেই, কিছু লেখক জনরুচির উপযোগী লেখা কেবল লিখবেনই, আর কিছু লেখক তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির কথা ভুলে, পরীক্ষা, প্রভৃতি, সমাজ বা বাস্তব সচেতন হয়ে নতুন ধরনের সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। এই দ্বিতীয় দলই সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু এই লেখকদের বাঁচায় কে? বাঁচাতে পারে ঐ সব পুরস্কার বা আর্থিক সাহায্য। কবিতা লিখে কোনদিনই কোনো দেশে কোনো কবির পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয়নি, তাহলে এখন এই কঠিন পৃথিবীতে কি কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে যাবে? বেনের জাত হোক আর যাই হোক, সেক্সপীয়রের দেশের ইংরেজরা ইংরেজী ভাষার কবিদের সব সময় নানাভাবে সাহায্য করে। আর, আমাদের রবীন্দ্রনাথের দেশে কবিতার প্রগতির অঙ্কুর রাখার কোনো চেষ্টাই এখনো হয়নি। যাই হোক, ইংরেজদের পুরস্কারগুলি এই জন্য উদ্দেশ্যমূলক ও ভিন্ন ভিন্ন। ওখানে প্রধান বাৎসরিক পুরস্কারের মধ্যে আছে, কবিতার জন্য রানীর স্বর্ণপদক, শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের জন্য জেমস্ টেইট ব্ল্যাক মেমোরিয়াল প্রাইজ, বছরের শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকের জন্য জে এল রীজ মেমোরিয়াল পুরস্কার, নতুন ধরনের বা ইমাজিনেটিভ সাহিত্যের জন্য হথর্নডেন পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের জন্য লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান কার্নেগি পদক, তরুণ লেখকদের জন্য সামারসেট মম পুরস্কার। এ ছাড়া আছে নানান্ প্রকাশনা ভবন ও সবাদপত্রের পুরস্কার।

কিন্তু পুরস্কার পাওয়া আসলে এমন কিছু বড় সাহায্য নয়। লেখকরা সরকারী সাহায্য পান অন্যভাবে। পৃথিবীর সব বড় দেশেই এই নীতি এখন মানা হয় যে, ভালো লেখার পর একজন লেখককে পুরস্কার দেওয়া যতটা কার্যকরী, তার চেয়ে অনেক বেশী দরকারী যে-রকম সুযোগ-সুবিধে পেলে কোনো লেখক অনেক ভালো লেখা লিখতে পারবেন, সেইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা। অবশ্য একথা কে না জানে যে, ভালো লেখার কোনো শর্ত নেই। একজন লেখক না-খেয়ে না-দিয়েও ভালো লিখতে পারেন। আবার প্রচুর আরাম উপভোগের মধ্যে থেকেও অন্য কোনো লেখকের পক্ষে ভালো লেখা সম্ভব। কেউ হুড়হুড় করে লিখেও মহৎ সৃষ্টি করতে পারেন (যেমন ডস্টয়েভস্কি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ বহু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে মেজে ঘষে অমরত্ব অর্জন সম্ভব রচনা উপহার দেন (যেমন ফ্লবেয়ার বা বঙ্কিমচন্দ্র)। কিন্তু এ কথা ঠিক, কয়েকটি জিনিস লেখকদের দরকার, সময়ের স্বাধীনতা ও ভ্রমণের সুযোগ। দারিদ্র্য নিয়ে বিলাসিতা করার ফ্যাশান আর এখন লেখকদের মধ্যে নেই, বোহেমিয়ানিজমের ফ্যাশানও পুরোনো হয়ে গেছে। এখন লেখকরা বিবাহিত ও সংসারী জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতন বাঁচতে ভালোবাসেন, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহ এখন বেশ কণ্টকর, সুতরাং জীবিকার জন্য অন্য কাজে লেখককে যদি বেশী সময় নষ্ট করতে হয়, তবে তার পক্ষে ভালো লেখার সম্ভাবনা কমে যায়। অথবা, লিখে টাটকা টাকা পাবার জন্য হাতে গরম শস্তা লেখা লিখতে হয়। এই দুটি অবস্থাই ক্ষতিকর। এই জন্যই, পুরস্কারের বদলে বিলেতের আর্টস কাউন্সিল সম্ভাবনাপূর্ণ লেখকদের মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করেন, যে-অর্থে লেখকরা নির্বিঘ্নে ছ' মাস কি এক বছর চাকরি টাকরি থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে গিয়ে পুরো সময়টা লেখার জন্য বা লেখার প্রস্তুতিতে ব্যয় করতে পারেন। এর ফলে, ঐ লেখকদের মধ্যে গড়ে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন যে সত্যি সত্যি ভালো লিখেছেন, তা পরীক্ষিত সত্য।

আর্টস কাউন্সিল সরকারী প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৬ সালে। এর কমিটির সভ্য সংখ্যা ১৬, সবাই অবৈতনিক, এঁদের নির্বাচন করেন ব্রিটিশ সরকারের অর্থ ও শিক্ষা দপ্তর—বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশের মতন, এই কমিটি সরকারী অফিসারে ভরা নয়, দেশের বিশিষ্ট কবি-লেখক-সমালোচকরাই এর সভ্য হন। সরকার এই কাউন্সিলকে সাহায্য করেন বছরে সাতাশ লক্ষ পাউন্ড। এ ছাড়া বড়লোকদের দান ও চাঁদা তো আছেই। আমেরিকায় এই ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই, কিন্তু গুগেনহাইম ফাউণ্ডেশান, রকফেলার ফাউণ্ডেশান এগুলো বিশাল বিশাল পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, এর থেকে সাহায্য পান অসংখ্য লেখক। লেখকরা কিভাবে সাহায্য পান, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি, শুনলে হয়তো রূপকথা মনে হবে, কিন্তু ঘটনাটি আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। ডনাল্ড জাস্টিস একজন মাঝারি ধরনের কবি, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, কলেজে অধ্যাপনা করেন। একদিন তিনি ঐরকম একটি ফাউণ্ডেশনকে চিঠি লিখলেন, আমি

মাস্টারী করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমার ইচ্ছে একটা কাব্য নাটক লেখার—কিন্তু মনকে সুস্থির করতে পারছি না। আমার শখ হয়, যদি কিছুদিন সমুদ্রের কাছে কোনো জায়গায় গিয়ে ছুটি নিয়ে থাকতে পারতুম, ধীরে সুস্থে বইটা লিখতে পারতুম। এক বছর ছিমছাম ভাবে কাটাবার জন্য আমার এত টাকা লাগবে। আপনারা দেবেন? আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে আগে, পড়ে দেখতে পারেন।

অবিশ্বাস্য নয়, সত্যিই তিনি এক বছরের উপযোগী টাকা পেয়ে গেলেন। শর্ত? কিছু না। যদি তুমি ভালো লেখো, সেটা সারা দেশের সৌভাগ্যের বস্তু হবে। যদি খারাপ লেখো, সেটা তোমার একার দুর্ভাগ্য।

আমরা ইওরোপ-আমেরিকার এত অনুকরণ করছি, এই ব্যাপারটা অনুকরণ করতে পারি না? টাকার অভাব? কেন জানে, আমাদের দেশে সত্যি সত্যি টাকার অভাব নেই। টাকাগুলো আসলে নানান ভুল জায়গায় জমে থাকে, বা, যাদের টাকা থাকে, তারা ঠিকভাবে খরচ করতে জানে না।

সনাতন পাঠক

সংগঠন। সম্পাদকঃ নীতীশচন্দ্র মজুমদার। বেঙ্গলী স্কুল বিল্ডিং, বিলাসপুর: আর এস: মধ্যপ্রদেশ। মূল্য ১·৫০।

প্রবাসে থাকলেও বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি যে অক্ষুণ্ণ থাকে তারই একটি সম্যক দৃষ্টান্ত এই ত্রৈমাসিকখানি। আলোচ্য সংখ্যায় এর অবিমিশ্র নিষ্ঠার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এতে প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে আছেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী, গোপাল হালদার, প্রেমদাকান্ত চৌধুরী, ডঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। গল্প লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, তেজেন্দ্রলাল মজুমদার, ভানু মজুমদার, দীপনারায়ণ সাউ, ভবতোষ দত্ত ও অম্বুজ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, ৺ মাধবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নীতীশচন্দ্র মজুমদার, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। একটি উপন্যাস লিখেছেন সাধন তপাদার।

প্রাপ্তি স্বীকার

স্মরণিকা। শ্রীবলরাম বিশ্বাস। নিরা-ভারতী—৮সি টামার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০।

পুণ্যতোয়া গোদাবরী। শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ নিকেতন—নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলী। মূল্য ২·৬৩।

রাজসিক। শ্রীপান্থ। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড—২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

মহোত্তরজের চরিতাবলী। শ্রীসুনন্দ ভট্টাচার্য। আনন্দধারা প্রকাশন—৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৬·০০।

একই গংগার ঘাট। দ্বিতীয় পর্ব। ... প্রসাদ ... এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ—২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২·০০।

রুদ্রসত্য। শ্রী... চট্টোপাধ্যায়। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—৩ ... পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০। মূল্য ৫·০০।

ভা র ত র ত্ন মা লা। শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুক এজেন্সি ২২৭ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

দশানন। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র... ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স—৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

বাঁশরী। শ্রীতপস্বীমহারাজ। শ্রীশ্রী... আশ্রম—পোঃ রামচন্দ্রপুর, ভায়া ... মানভূম। মূল্য ১·৫০।

রবীন্দ্রনাট্যধারা। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। সংস্কৃতি প্রকাশন—১০, হেস্টিংস স্ট্রীট কলিকাতা—১। মূল্য ১০·০০।

বৃহন্নলা। শ্রীহরিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউরেকা পাবলিশার্স—৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১২·০০।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান। দেবব্রত রেজ। রূপা—১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৫·০০।

স্বপ্নলোকের চাবি। দেবব্রত। রূপা—১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·৫০।

শেষ শিখা। শংকু মহারাজ। সাহিত্য—৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ৫·০০।

একটা গুলির শব্দে। বাসুদেব দেব। রথীন হালদার—দিঘীরপাড় বাজার, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·০০।

ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস। পণ্ডিত-মশাই। বুক গার্ডেন—৮/৩এ, হাতীবাগান রোড, কলিকাতা—১৪। মূল্য ৫·০০।

…এক কথায়, বিভ্রান্ত চিন্তার ফল …জাহর ইন কাশ্মীর"। নাকি অতিরিক্ত …ধির? দেশপ্রেমের সঙ্গে মোকে মাঝে …তা ও সামরিক সর্বাধিনায়কদের ছবি দেখে … বীরত্বব্যঞ্জক কথা ও গান শুনে দর্শকরা …তভালি দেন। প্রমোদ বিতরণের পরি-…কল্পনাটি, অর্থাৎ এই গুরুচণ্ডালী যোগ …চারশীল দর্শকেরা কীভাবে নেবেন বলা …শকিল।

তবে জোহরের সঙ্গে কল্যাণজী-আনন্দজী …শ্মীরে যাওয়ার ফলে ছবিটি বেশ উপভোগ্য …য়েছে। তাঁদের সুরারোপিত গান মন-…ত নো। অভিনয়ের দিক থেকে আই এস …জাহর ও সোনিয়া সাহনী দর্শকদের নিরাশ …রেন না।

শ্যাডো প্রোডাকশন্স-এর "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"-এর একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছবির পর ছবি

প্রযোজক আর ডি বনসালের নতুন বাংলা …বি "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন"। উপেন্দ্র-…কিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন

গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

সত্যজিৎ রায়। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই …হন করবেন। ছবিতে সাতটি গান থাকবে। এ মাসেই গান রেকর্ড করা হবে। ভারতের …বিভিন্ন অঞ্চলে ছবির শুটিং হবে।

…মণিহার' বাংলা ছবির হিন্দীচিত্ররূপে …তৈরি হচ্ছে নামকরণ হয়েছে "মেরা ভাই"। উত্তমকুমার ও দেব মুখার্জি
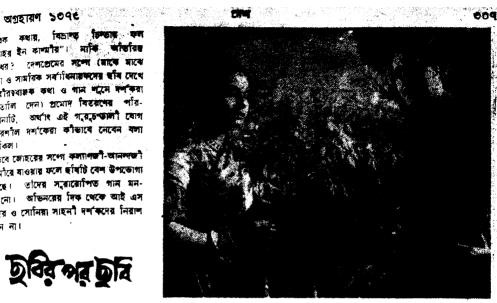
মেরা ভাই

দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করবেন শচীন দেববর্মন। গিরীন্দ্র সিংহ চিত্র-প্রযোজক। সলিল সেন চিত্রপরিচালক।

দীপক মজুমদার প্রোডাকসন্স-এর "তুঁহু মম প্রিয়তম" ছবির শুটিং বোম্বাইয়ে অনতিবিলম্বেই শুরু হচ্ছে।

তুঁহু মম প্রিয়তম

সুবোধ মুখার্জির সহকারী দীপক মজুমদার ছবির প্রযোজক-পরিচালক। কিশোর-কুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায় নায়ক-নায়িকার ভূমিকার জন্য নির্বাচিত। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পীরা হলেন অনুপকুমার (বোম্বাই), অসিত সেন, তরুণ ঘোস, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ, মধুমতী, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি। রোশনের সংগীত-পরি-চালনায় ছবির গান গাইবেন লতা মঙ্গেশকার, শ্যামল মিত্র, কিশোরকুমার নীতা সেন প্রভৃতি।

"অভিশপ্ত চম্বল" ছবির দৃশ্যগ্রহণের জন্য কলাকুশলী ও শিল্পীদের নিয়ে প্রযোজিকা-পরিচালিকা মঞ্জু দে

অভিশপ্ত চম্বল

আবার চম্বল অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন সুধীন দাশ-গুপ্ত। প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করেছেন —প্রদীপকুমার ও মঞ্জু দে। নৃত্যাংশে আছেন মধুমতী (বোম্বে)।

"সাধক রামপ্রসাদ" খ্যাত চিত্রপরিচালক বংশীচন্দ্র আশের পরিচালনায় "শচী মায়ের সংসার" (মিত্র চিত্রম)।

শচী মায়ের সংসার

চিত্রগ্রহণ শুরু হতে বিলম্ব নেই। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অনন্তকুমার চট্টো-পাধ্যায়। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল পরিচালিত সিনে প্রোডাকশন্সের ছবি 'ছায়াপথ' সম্প্রতি সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এ ছবির সুর সংযোজনার দায়িত্ব নিয়ে-

ছায়াপথ

ছেন রবিশঙ্কর। কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, কণিকা মজুমদার, মঞ্জু দে, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়,

অপরা ফিল্মস-এর "তিন অধ্যায়" (পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী) ছবিতে রবীন মজুমদার, ছন্দা দেবী ও অজয় গাঙ্গুলী

অসিতবরণ, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, শিবশংকর চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে মহাজাতি কথাচিত্রমের প্রথম ছবি "শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ"-এর সংগীত

শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ

গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। কালোবরণের সংগীত পরিচালনায় গান গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, ডলি বিশ্বাস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুরেশ রায়।

রাজা ফিল্মসের ধর্মমূলক চিত্র "মহাসতী বেহুলা"-র শুভ-সূচনা উৎসব সম্প্রতি

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত "দ্বীপের নাম সুন্দরী" নৃত্যনাট্যে মৈত্রেয়ী চৌধুরী

(সি ৬৯০)

"দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা" (পরিচালনা: মানু সেন) ছবিতে কমল মিত্র ও বেবী গুপ্তা

সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সহকারী পরিচালক

মহাসতী বেহুলা

রূপে খ্যাত পার্থ বসু। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুধীর সেন। "মহাসতী বেহুলা"-র নতুন শিল্পীর সমাবেশ হবে বলে জানা গেছে।

ইউ টি-র হাসির ছবি "মিস প্রিয়ংবদা" মুক্তি আসন্ন। দুশ্মন্ত চৌধুরী ও রবি বসু পরিচালিত এই ছবির

মিস্ প্রিয়ংবদা

কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মিনি চক্রবর্তী, জহর রায়, দীপিকা দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শিখা ভট্টাচার্য, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, মিরজু ভাণ্ডারী, অমর বিশ্বাস, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরারোপে আছেন সুধীর সেন ও আজাদ।

'দাবী' নাটকের শততম অভিনয়

আগামী ২৩ নভেম্বর '৬৬ সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত "দাবী" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মনোজ বসু প্রধান অতিথির আসনে থাকবেন।

এই উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র নাটকের সংগঠনকারী, শিল্পী ও নেপথ্য কর্মিদের পুরস্কৃত করবেন।

থিয়েটার সেণ্টারে "বিদেহী"

"থিয়েটার সেণ্টারের আগামী আকর্ষণ নজায় বৈরাগীর "বিদেহী"। আত্তংক গহরণের উপকরণে রচিত এই নাটকটি রিচালনা করবেন তরুণ রায়। আলোক ম্পাতে থাকবেন আশুতোষ বড়ুয়া এবং ংগীত পরিচালনায় শশাংক ঠাকুর। অভিনয়ে য়েছেন থিয়েটার সেণ্টারের শিল্পীরা। ডেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে "বিদেহী" ারম্ভ হবে।"

সিনেমা — থিয়েটার

"ফিল্ম"-এর শরৎকালীন সংখ্যায় পড়বার ত প্রবন্ধ আছে। পাতা ভরানোর জন্য য়েকটি চিত্রনাট্য মুদ্রিত (এই চিত্রনাট্য কাশের সার্থকতা কী জানি না)। "বাংলা বি ও বাংলা সাহিত্য" (ঋত্বিক ঘটক) প্রবন্ধে ন্তার খোরাক আছে। বহু আলোচিত মেয়বস্তু নিয়ে বাগীশ্বর ঝা লিখেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাংলার অবদান"। আন্তর্জাতিক চিত্রপরিচালক পরিচিতি" পড়ে চিত্রামোদীরা নিঃসন্দেহে খুশী হবেন। ত্যজিৎ রায়ের কর্মজীবনের কথা রয়েছে র "আমি ও আমার ছবি"—লেখায়। তিশ কের বাঙালী চিত্রপরিচালকদের চলচ্চিত্র লে যে মূল্যায়ন তাঁর রচনায় রয়েছে তা না বিচারে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই ঠন হতে পারে। মতামত লেখকের একান্ত জেস্ব, সুতরাং বলবার কিছু নেই। দেবদাস"কে বড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে হিত করা এবং ওই ছবিতে শিল্পীর ভিনয়ের অপ্রশংসা বিদগ্ধজনের মনঃপূত হবারই কথা। "অধিকার" ও "রজত-য়ন্তী"র যে উল্লেখ নেই সেটা আরও শ্চর্যকর। তিনি লিখেছেন, "পথের চালীর আগে পর্যন্ত আমি প্রিন্সেস পি বড়ুয়ার কোন ছবি দেখিনি। "পথের চালীর আগে" এবং "প্রিন্সেস" শব্দ কয়টি ক অপরিহার্য ছিল? যাই হোক, সম্পাদিত ও তথ্যবহুল "ফিল্ম" (১০এ, মানন ঘোষ লেন) চিত্ররসিকদের কাছে াদরণীয় হবে।

"বহুরূপী"-র বিশেষ শারদীয় সংখ্যায় নোরঞ্জন ভট্টাচার্যের "চক্রব্যূহ" নাটকটি াপা হয়েছে। এই একটি কারণেই বহুরূপী"-র বিশেষ সংখ্যা (১১-এ, াসিরুদ্দিন রোড) মূল্যবান হয়ে ঠেছে। তা-ছাড়া পুরনো দিনের নাটকা-ভনয় এবং আধুনিক নাট্য আন্দোলন ম্পর্কে সংকলন এবং সুচিন্তিত কিছু চনার জন্য সংখ্যাটি অবশ্যপাঠ্য।

থিয়েটার-এর (৫৯।১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯) শারদীয় সংখ্যাটি বেশ আকর্ষক হয়েছে। কয়েকটি নাটক এতে আছে, এবং কিছু মূল্যবান রচনা। শম্ভু মিত্রর "কিছু সামান্য কথা" বিশেষ উল্লেখ্য।
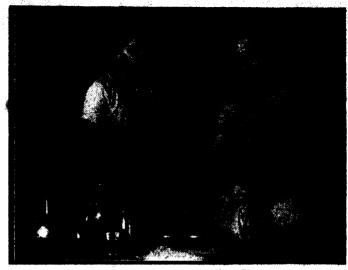
ঝিনদল ফিল্মস-এর "কেদার রাজা" (পরিচালনা : বলাই সেন) ছবিতে লিলি চক্রবর্তী ও পাহাড়ী সান্যাল

চলচ্চিত্রে 'ইউলিসিস'

জেমস জয়েস-এর 'ইউলিসিস' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে। ১৯২০ সনে আইজেনস্টিন 'ইউলিসিস'-এর চলচ্চিত্র রূপের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেখকের সঙ্গে কথা বলেন। এক সময়ে ওয়ারনারস 'ইউলিসিস' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন। এবং চার্লস লটনকে লিওপোল্ড ব্লুমের ভূমিকা দিতে চেয়েছিলেন। জয়েস পছন্দ করেছিলেন জর্জ আর্লিসকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কাজ এগোয়নি। আরও অনেকেই 'ইউলিসিস' নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। জোসেফ স্ট্রিক সাত বছর আগে এবিষয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তখন ছবি তৈরি সম্ভব হয়নি। স্ট্রিক এবার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ডাবলিনে শুটিং চলছে। ব্লুমের ভূমিকায় শিল্পী মিলো ও'শিয়া।

শিশু উৎসব

শ্রীনেহরুর জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যবিভাগ ১৪ নভেম্বর থেকে সাত দিনব্যাপী শিশু উৎসবের আয়োজন করেছেন। স্থান : ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টার। বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের শিশু চলচ্চিত্র এবং কার্টুনচিত্র দেখানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" (নৃত্যের তালে তালে সংস্থা অভিনীত)। এবং ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের পুতুল নাচ। বিনা প্রবেশমূল্যে শিশুদের আনন্দদানের ব্যবস্থা হয়েছে। বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রতিদিন ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টারে প্রবেশপত্র লভ্য।

পাঠকের চোখে

॥ প্রমথেশ প্রসংগে ॥

চলচ্চিত্রে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা আবিষ্কার করতে না পারলে ভবিষ্যতের পথের সন্ধান পাওয়া শক্ত। এ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে চলচ্চিত্র আজ জনজীবনে ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে। অর্থাৎ নিছক প্রমোদের উপকরণ হিসাবে আজ আর চলচ্চিত্র পরিগণিত নয়।

এই আত্মসমীক্ষার জন্য প্রয়োজন সার্থক সমালোচনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনা ব্যক্তিগত ভাল বা মন্দ লাগার মতামত। এর প্রধান কারণ চলচ্চিত্র শিল্পের টেকনিক্যাল পদ্ধতি এবং নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অধিকাংশ দর্শকই তাই শিল্পসৃষ্টির অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে আবিষ্কার করতে অক্ষম। অপর কারণ, রসবোধের অভাব। সহৃদয় হৃদয়সংবাদী না হলে যে, রসগ্রহণ করা অসম্ভব, এ কথা কি অস্বীকার করা যায়? তাই আমাদের দেশে সমালোচনার জগতে চলছে এক নৈরাজ্য। অবশ্য হাতে গোণা যায়, এমন দু' একজন সমালোচককে বাদ দিয়েই এ কথা বলছি। সমালোচকের দায়িত্ব একদিকে দর্শকের কাছে শিল্পসৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করে শিল্প-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা এবং অপরদিকে শিল্পীকে তার শিল্পের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সজাগ করে পূর্ণতর সৃষ্টির

লোকনাথ চিত্রম-এর "কাল তুমি আলেয়া" (পরিচালনা : শচীন মুখোপাধ্যায়) চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

কাজে সাহায্য করা। সুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে অধুনা গঠিত ফিল্ম সোসাইটি-গুলির অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই ভূমিকার প্রয়োজন হয়েছে, সম্প্রতিককালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পুরোধা প্রমথেশ বড়ুয়ার সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বর্তমান কালের দুইজন চিত্রপরিচালকের সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। উক্তি দুটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেন—" 'পথের পাঁচালী"র আগে পর্যন্ত আমি প্রিন্স্ পি সি বড়ুয়ার কোন ছবি দেখি নি। পরে অনেকগুলো দেখেছি। আমার ভাল লাগে নি। য়োরোপের অনুকৃত স্টাইল বড্ড বেশী। তাঁর অভিনয় আমার আরও খারাপ লেগেছে। উগ্র মেক আপ, আত্মকেন্দ্রিকতা। বাংলা উচ্চারণে অক্সফোর্ডের টান। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি 'দেবদাস'এ বাঙ্গালীয়ানা আছে, কিন্তু সেণ্টিমেণ্টাল প্লট আর বড়ুয়ার অভিনয় সে মৌলিকতাটাও নষ্ট করে দিয়েছে।"

(ফিল্ম—শরৎকালীন সংকলন ১৩৭৩)

শ্রীঋত্বিক ঘটক বলেন—"পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই।

আজকাল 'সাবজেকটিভ ক্যামেরা' সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পাই বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা মহারাজ 'প্রভাতকুমার বড়ুয়ার ছেলের কাছ থেকে কিছুটা শিখতে পারতেন, তাঁর পায়ের তলায় বসে।"

(চলচ্চিত্র—আশ্বিন, ১৩৭২)

উদ্ধৃত দুটি নন্দনতত্ত্বের ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। উক্তি দুটির গুরুত্ব এবং মূল্যও কম নয়। কারণ প্রবক্তাদের প্রতিভা অনস্বীকার্য।

—অমিতাভ রায়,
কলকাতা—৩৪

কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'চিত্রপটে' প্রকাশিত ধ্রুব গুপ্ত মহাশয়ের 'প্রমথেশ বড়ুয়া' সম্পর্কে আলোচনাটি আপত্তিজনক এবং বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে শিল্পীর প্রাপ্য সম্মানকে অস্বীকার করার একটা ব্যগ্রতা লেখাটির প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

কৌতুককর, রগড়, সস্তা রোমাণ্টিক আলোকসম্পাত, প্রকট 'আর্টনেস' পেলব ধ্বংসলীলা, ভিসুয়াল মেলোড্রাম, অভিনয় আণ্ডার বা ওভার না প্রপার পেলব নায়ক, মরণবিলাস, অগভীর ভাবালুতা, সস্তা দেশাত্মবোধ, চেতনাবর্জিত ভাবালুতা, 'পিগম্যালিয়ন বক্তব্য কুরুচির ছাপ, বিরক্তি-কর সংলাপের চকমকি ভিসুয়াল কমেডি, নারীঘটিত ব্যাপার, জমার কোঠায় শূন্য, বন্ধুত্বের সম্পর্কচিত্রণে চরিত্রগুলিকে ছেলেমানুষ প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি প্রমথেশ বড়ুয়ার চলচ্চিত্রে নাকি লভ্য।

বাংলা চলচ্চিত্র সাধনার একটা বিস্তৃত পরিধি (১৯৩২-১৯৪৬) প্রমথেশ পরি-চালিত আঠারোটি ছবির সঙ্গে লেখকের চাক্ষুষ পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ জাগে, তার কারণ বাংলা ১৯৪৩ (বাংলা—১৯৩২), রূপলেখা (বাংলা ও হিন্দী—১৯৩৪), মায়া (বাংলা ও হিন্দী—১৯৩৬), জিন্দেগী (হিন্দী—১৯৪০), শাপমুক্তি (বাংলা—১৯৪০), মায়ের প্রাণ (বাংলা—১৯৪১), উত্তরায়ণ (বাংলা—১৯৪১), শেষ উত্তর (বাংলা ও হিন্দী—১৯৪২), রানী (হিন্দী—১৯৪৩, চাঁদের কলঙ্ক বাংলা ও হিন্দী) ১৯৪৪), আমীরী (হিন্দী—১৯৪৫), পয়ছান (হিন্দী—১৯৪৬), ইরান কী এক রাত (হিন্দী—১৯৪৬) প্রভৃতি ছবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাই সমগ্র আলোচনাটি হয়েছে কতকগুলি অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ বাক্য সমষ্টি।

'রাজার ছেলে ফিল্ম করতে এসেছেন—এ ঘটনার একটা বিশেষ আবেদন আছে' : বড়ুয়ার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে এই বাক্যোক্তির দ্বারা লেখক ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বাঙালী দর্শকের বিচার-বুদ্ধির ওপর কটাক্ষপাত করেছেন। লেখক চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকৃতি তার রূপ-রং-রসের ব্যাখ্যায় এখনও কোনো সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারেন নি, কাজেই এটা অনধিকার চর্চার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুভাশীষ চৌধুরী
কলকাতা-৪৭

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংরেজীতে কথা আছে : "নাথিং সাক-সিডস্ লাইক সাকসেস"। চাপলিন-কন্যা জেরাল্ডিন তা প্রমাণ করেছেন। যখন তিনি সিনেমায় অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড বাধা এসেছিল তাঁর বাবার কাছ থেকে। জেরাল্ডিন বাবার ইচ্ছা উপেক্ষা করেই সিনেমায় নামলেন। আজ জেরাল্ডিনের সব চেয়ে বড় 'ফ্যান' নাকি তাঁর বাবা—চার্লি চ্যাপলিন।

জাপানের বিখ্যাত অভিনেতা **তোশিরো** মিফুনের প্রথম ইংরেজী ছবি "গ্রাঁ প্রি"। এ ছবিতে কাজ শুরু করার আগে মিফুনে ইংরেজী ছবিতে অভিনয় করার প্রায় ষাটটি 'অফার' প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, মিফুনের ভাষায়, তোহোর কাছে আমি চুক্তিবদ্ধ ছিলাম; দ্বিতীয়, ইংরেজী ছবির ভাল স্ক্রিপ্ট পাইনি।

রোমান পোলানস্কি ও শ্যারন টাটের প্রণয় অনেক দূর গড়াবে বলে ওয়াকিবহাল সূত্রে প্রকাশ। পোলানস্কির "ভ্যাম্পায়ার কিলারস" ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্যারন। এই ছবি সংক্রান্ত কাজেই পোলানস্কি হলিউডে এসেছিলেন। কিন্তু হলিউড ছেড়ে যেতে নাকি তাঁর মন সরছে না। এবং পোলানস্কি-শ্যারন ক্রমেই নাকি অবিচ্ছেদ্য যুগল হয়ে উঠেছেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

গভীর অরণ্যে অরণ্যদেবের ডেরা। বাইরের লোক সেখানে যেতে সাহস পায় না।

গোপন গুহার মধ্যে অরণ্যদেবের সিংহাসন.....

একটা বাচ্চা সেখানে বড় হয়ে উঠছে!

দ্যাখো দ্যাখো, কেমন খেলা করছে....
অরণ্য-রক্ষী-বাহিনীর কাছে এই খবরটা পাঠিয়ে দাও।
তা-তা-তা—
কীভাবে পাঠাব? শিঙাবাজি, বানার না ঢোলকের সাহায্যে?

তাড়াতাড়ি পৌঁছানো চাই। এই বাজপাখির মারফতে পাঠাব।

অরণ্য-রক্ষী-বাহিনীর ঘাটিতে সেই খবর পৌঁছে গেল.....
6/5
JUNGLE PATROL
কর্নেল উইকসের নামে চিঠি এসেছে
ভিতরে চলে যাও।

এ-খবর জেনে তাঁর কী হবে?

চতুর্দিকে খোঁজ চলল।
না স্যার, কিছু জানা গেল না।

এই নাও উত্তর।
কী করে পৌঁছবে, কে জানে।

রাজা, তুই তাহলে এখানে থাক।

লোকনাথ চিত্রম-এর "কাল তুমি আলেয়া" (পরিচালনা : শচীন মুখোপাধ্যায়) চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

কাজে সাহায্য করা। সুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে অধুনা গঠিত ফিল্ম সোসাইটি-গুলির অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই ভূমিকার প্রয়োজন হয়েছে, সম্প্রতিককালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পুরোধা প্রমথেশ বড়ুয়ার সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বর্তমান কালের দুইজন চিত্রপরিচালকের সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। উক্তি দুটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেন—"'পথের পাঁচালী'র আগে পর্যন্ত আমি প্রিন্স পি সি বড়ুয়ার কোন ছবি দেখি নি। পরে অনেকগুলো দেখেছি। আমার ভাল লাগে নি। য়োরোপের অনুকৃত স্টাইল বড্ড বেশী। তাঁর অভিনয় আমার আরও খারাপ লেগেছে। উগ্র মেক আপ, আত্মকেন্দ্রিকতা, বাংলা উচ্চারণে অক্সফোর্ডের টান। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি 'দেবদাস'এ বাঙালীয়ানা আছে, কিন্তু সেন্টিমেন্টাল প্লট আর বড়ুয়ার অভিনয় সে মৌলিকতাটাও নষ্ট করে দিয়েছে।"

(ফিল্ম—শরৎকালীন সংকলন ১৩৭৩)

শ্রীঋত্বিক ঘটক বলেন—"পন্ধতি-টন্ধতি বুঝি না মশাই আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই।

আজকাল 'সাবজেকটিভ ক্যামেরা' সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পাই বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা মহারাজ 'প্রভাতকুমার বড়ুয়ার ছেলের কাছ থেকে কিছুটা শিখতে পারতেন, তাঁর পায়ের তলায় বসে।"

(চলচ্চিত্র—আশ্বিন, ১৩৭২)

উদ্ধৃত দুটি নন্দনতত্ত্বের ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। উক্তি দুটির গুরুত্ব এবং মূল্যও কম নয়। কারণ প্রবক্তাদের প্রতিভা অনস্বীকার্য।

—অমিতাভ [illegible],
কলকাতা—৩৪

কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'চিত্রপটে' প্রকাশিত ধ্রুব গুপ্ত মহাশয়ের 'প্রমথেশ বড়ুয়া' সম্পর্কে আলোচনাটি আপত্তিজনক এবং বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হিসেবে শিল্পীর প্রাপ্য সম্মানকে অস্বীকার করার একটা বাস্তবতা লেখাটির প্রতি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

কৌতুককর, রগড়, সস্তা রোমান্টিক আলোকসম্পাত, প্রকট আর্টনেস পেলব ধ্বংসলীলা, ভিসুয়াল মেলোড্রামা, অভিনয় আন্ডার বা ওভার না প্রপার পেলব নায়ক, মরণবিলাস, অগভীর ভাবালুতা, সস্তা দেশাত্মবোধ, চেতনাবর্জিত ভাবালুতা, 'পাগম্যালিয়ান বক্তব্য কুরুচির ছাপ, বিরক্তি-কর সংলাপের চকমকি ভিসুয়াল কমেডি, নারীঘটিত ব্যাপার জমার কোঠায় শূন্য, বন্ধুত্বের সম্পর্কচিত্রণে চরিত্রগুলিকে ছেলেমানুষ প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি প্রমথেশ বড়ুয়ার চলচ্চিত্রে নাকি লভ্য।

বাংলা চলচ্চিত্র সাধনার একটা বিস্তৃত পরিধি (১৯৩২-১৯৪৬) প্রমথেশ পরি-চালিত আঠারোটি ছবির সঙ্গে লেখকের চাক্ষুষ পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ জাগে, তার কারণ বাংলা ১৯৮৩ (বাংলা—১৯৩২), রূপলেখা (বাংলা ও হিন্দী—১৯৩৪), মায়া (বাংলা ও হিন্দী—১৯৩৬), জিন্দেগী (হিন্দী—১৯৪০), শাপমুক্তি (বাংলা—১৯৪০), মায়ের প্রাণ (বাংলা—১৯৪১), উত্তরায়ণ (বাংলা—১৯৪১), শেষ উত্তর (বাংলা ও হিন্দী—১৯৪২), রানী (হিন্দী—১৯৪৩, চাঁদের কলঙ্ক বাংলা ও হিন্দী, ১৯৪৪), আমীরী (হিন্দী—১৯৪৫), পহছান (হিন্দী—১৯৪৬), ইরান কি এক রাত (হিন্দী—১৯৪৬) প্রভৃতি ছবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাই সমগ্র আলোচনাটি হয়েছে কতকগুলি অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ বাক্য সমষ্টি।

'রাজার ছেলে ফিল্ম করতে এসেছেন— এ ঘটনার একটা বিশেষ আবেদন আছে : বড়ুয়ার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে এই ব্যাখ্যাটির দ্বারা লেখক ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের বাঙালী দর্শকের বিচার-বুদ্ধির ওপর কটাক্ষপাত করেছেন। লেখক চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকৃতি তার রূপ-রং-রসের ব্যাপারে এখনও কোনো সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারেন নি, কাজেই এটা অনধিকার চর্চার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুভাশীষ চৌধুরী
কলকাতা-৪৭

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংরেজীতে কথা আছে : "নাথিং সাক-সিডস লাইক সাকসেস"। চ্যাপলিন-কন্যা জেরাল্ডিন তা প্রমাণ করেছেন। যখন তিনি সিনেমায় অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড বাধা এসেছিল তাঁর বাবার কাছ থেকে। জেরাল্ডিন বাবার ইচ্ছা উপেক্ষা করেই সিনেমায় নামলেন। আজ জেরাল্ডিনের সব চেয়ে বড় 'ফ্যান' নাকি তাঁর বাবা—চার্লি চ্যাপলিন।

জাপানের বিখ্যাত অভিনেতা তোশিরো মিফুনের প্রথম ইংরেজী ছবি "গ্রাঁ প্রি"। এ ছবিতে কাজ শুরু করার আগে মিফুন ইংরেজী ছবিতে অভিনয় করার প্রায় বাটটি 'অফার' প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, মিফুনের ভাষায়, তোহোর কাছে আমি চুক্তিবদ্ধ ছিলাম; দ্বিতীয়, ইংরেজী ছবির ভাল স্ক্রিপ্ট পাইনি।

রোমান পোলানস্কি ও শ্যারন টেটের প্রণয় অনেক দূর গড়াবে বলে ওয়াকিবহাল সূত্রে প্রকাশ। পোলানস্কির "ভ্যাম্পায়ার কিলারস" ছবিতে অভিনয় [illegible] শ্যারন। এই ছবি [illegible] পোলানস্কি হলিউডে এলেও [illegible] হলিউডে ছেড়ে যেতে নাকি [illegible] না। এবং পোলানস্কি-শ্যারন [illegible] অবিচ্ছেদ্য যুগল হয়ে [illegible]

অরণ্যদেব লী ফক

বাইরের লোক
সাহস পায় না।

গোপন গুহার মধ্যে অরণ্যদেবের সিংহাসন.....

বাচ্চা সেখানে
হয়ে উঠছে!

দ্যাখো দ্যাখো, কেমন খেলা করছে ....
অরণ্য-রক্ষী-বাহিনীর কাছে এই খবরটা পাঠিয়ে দাও।
তা-তা তা—
কীভাবে পাঠাব? শিফলাজু, রানার না ঢোলকের সাহায্যে?

তাড়াতাড়ি পৌঁছানো চাই। এই বাজপাখির মারফতে পাঠাব।

রক্ষী-বাহিনীর
সেই খবর পৌঁছে
6/5
JUNGLE PATROL

এ-খবর জেনে উঁর কী হবে?

খোঁজ চলল।
না স্যার, কিছু জানা গেল না।

এই নাও উত্তর।
কী করে পৌঁছুবে, কে জানে।

শিশুর পরিচয় জানা গেল না। দুঃখিত
রাজা, তুই তাহলে এখানে থাক।
ক্রমশ (৪)

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

চুল পাতলা হওয়া

তরুণ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও হঠাৎ দেখবেন যে চুল ক্রমে উঠে যাচ্ছে আর আপনার মাথায় অকালে টাক পড়ছে। এর কারণ হ'ল আপনার চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব।

মাথায় খুস্কি হওয়া

[illegible] উচিত নয়। [illegible] শুকনো চামড়া [illegible] গোড়ার [illegible] থেকে [illegible] টাক পড়তে আর দেরী নেই।

চুল সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞতা কি ভাবে চুল ওঠার কারণ হ'তে পারে [illegible] তার যথাযথ নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। এরা বিপদের সঙ্কেত পাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবিধান করছেন না এবং এরা চুলের যত্ন নিতে অবহেলা করেই চলেছেন। আর ফলে অবশেষে একদিন এর জন্য এদের আক্ষেপ করতে হবে। চুলের গোড়া একবার নষ্ট হয়ে গেলে কোন চিকিৎসাতেই তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনিও কি বিপদের সঙ্কেতের লক্ষণ দেখে তাকে অবহেলা করেছেন? তাহলে এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হ'ল—পিওর সিলভিক্রিন।

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। এটি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে মালিশ করলে পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবন দান করে।

সুতরাং আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এর চেয়ে সঠিক উপায় কিছু নেই।

চুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে আপনি আজই 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেন্ট.D-7 সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরী সার্ভিস, পোষ্ট বক্স ৭৫৭, বোম্বাই-১।

পিওর সিলভিক্রিন

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এতে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস আছে। একমাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবার জন্য একটি সুন্দর ড্রেসিং। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এতে পিওর সিলভিক্রিন আছে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

নাক থেকে কাঁচা জল···

চোখ ছলছল···

ধরা গলা···

শ্বাসকষ্ট···

এসব কষ্টে তাড়াতাড়ি আরাম পাবেন···শ্বাসপ্রশ্বাস কয়েক মিনিটেই সহজ হয়ে উঠবে

একেতো সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছেন, তার ওপর সেটা উপেক্ষা করে ··· ভুলে কি লাভ! তার চেয়ে এক কাজ করুন···ভিক্স ভেপোরাব মালিশ করুন, হাতে হাতে ফল পাবেন, উক্ত মালিশের প্রথম পরশে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে উঠবে। ভিক্সের ওষুধগুলির ··· গুণ যে মাত্র ৭ সেকেণ্ডের মধ্যেই সর্দি-আক্রান্ত স্থানগুলিতে পৌঁছে গিয়ে নাক ও বুকের যন্ত্রণাদায়ক শ্লেষ্মা তরল করে, পেশীর যন্ত্রণা লাঘব করে ও গলার ব্যথায় আরাম এনে দেয়।

ভবিষ্যতে সর্দি সর্দি মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে ভিক্স ভেপোরাব মালিশ করবেন। মনে রাখবেন সর্দিকে কখনও উপেক্ষা করা ঠিক নয়—পরে এথেকে অনেক কঠিন কঠিন রোগ জন্মাতে পারে। সুতরাং সময় অসময়ে দরকারের জন্য সর্বদা হাতের কাছে ভিক্স ভেপোরাব রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আজ রাত্রে সর্দিতে মালিশ করুন

ছাত্র বিক্ষোভ

আজকাল শিক্ষার রাশ ছাত্ররাই ধরে রাখে—একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হয় না। আমাদের চোখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামক জিনিসটি এখন থেকেও না-থাকার মতন; তার বদলে দেখছি ছাত্র প্রতিষ্ঠান আর ছাত্রদের দাপট। ছাত্রদের ইচ্ছায় স্কুল-কলেজ খোলে, বন্ধ হয়, তাদের ইচ্ছায় কখনও কখনও প্রবীণ মাস্টারমশাইদের মলিন বদনে শিক্ষায়তন থেকে বিদায় নিতে হয়, আবার এই ছাত্ররাই সময়বিশেষে তাদের পছন্দসই অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের চোখে অনভিপ্রেত শিক্ষককে বহাল রাখার শক্তিও ধরে। ছাত্রদের এই কর্তৃত্বের বহুমুখী পরিচয় বিস্তারিত করে দিয়ে লাভ নেই, বা এমন কথা বলাও ভুল যে, আজ যা ঘটছে গতকাল তা ঘটেনি। বেশ কিছুকাল ধরে ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের এতখানি শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। এর পিছনে কোনো যাদুকরের হাত আছে কিনা সে প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত, তবে এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, রাজনৈতিক প্ররোচনা পরোক্ষে নেই। বেশির ভাগ সময়েই থাকে। গোটা ভারত জুড়ে আজ ছাত্রদের মধ্যে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন তার কতটা প্ররোচিত আর কতটা যথার্থ ছাত্রস্বার্থের মুখ চেয়ে করা হয়, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

আপাতত কলকাতায় যা ঘটছে আমরা তার কথা বলতে পারি। তিনটি কলেজ থেকে কয়েকটি ছাত্রকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে কলেজ ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পুজোর আগে এর ভূমিকা, ছুটি ফুরিয়ে কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মুখে সেই বিক্ষোভের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে। অবস্থা এখনও শান্ত রয়েছে, এবং কোনো হাঙ্গামা শুরু হয়নি। তবে সব সময়ই একটা আতঙ্ক থাকে; এ-সব ক্ষেত্রে অতি অল্প থেকেই অতি ভীষণের আগুন জ্বলে যায়। আমরা আশা করব, তেমন কিছু যেন না ঘটে।

এই বিক্ষোভের ফলে অন্তত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার এক্তিয়ারভুক্ত কলেজগুলিতে শিক্ষার শোচনীয় ক্ষতি ঘটছে। ক্ষতিটা নানাভাবে ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের সহ্য করতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শেখা যে একটা ভীষণ সমস্যা সে-বিষয়ে অভিভাবকদের আর সন্দেহ নেই। কোনো অভিভাবকই চান না, তাঁর ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নানাদিক থেকে ব্যাহত হোক, এবং অযথা ছাত্রজীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হোক। ঠিক এই কারণেই বহু অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে চান, বহু ছাত্র নিজের থেকেই অন্যত্র চলে যেতে চায়। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট নেবার হিড়িক পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এখানকার পড়াশোনার হাল কেমন দাঁড়িয়েছে এই আবেদনপত্রগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ঠিক এই ভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ইতিপূর্বে চলে যেতে চেয়েছে কি না তাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিসেব কষে দেখতে পারেন। তবে, নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের পক্ষে এটা প্রশংসার কথা নয়।

ছাত্রদের মধ্যে মিছিলকরা ছাত্রদের যেমন একটা অংশ থাকে, তেমনই আবার নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে চায় এমন ছাত্রও থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে যা হচ্ছে তার পক্ষে ওই কলেজের অধিকাংশ ছাত্রের সমর্থন আছে কি? উত্তর কলকাতার একটি কলেজের জনৈকা ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সেখানে ছাত্র বিক্ষোভ চলছে, কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা এই যে—ওই কলেজের অধ্যাপকরা নাকি জানিয়েছেন, উক্ত ছাত্রীটিকে যদি আবার কলেজে ভর্তি করা হয়, তবে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করবেন। আমরা কি ধরে নেব একটি কলেজের সমস্ত অধ্যাপকই অন্যায় করছেন—এবং কতিপয় ছাত্র ন্যায় ও সংগত কাজ করছেন। অসংখ্য ছাত্রীর মধ্যে বিশেষ একটি ছাত্রীর প্রতি নিশ্চয় কলেজের সমস্ত অধ্যাপকের কোনো আক্রোশ নেই, থাকতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটা হট্টগোল বাধিয়ে রাখার রেওয়াজ আমাদের এত বেশি হয়ে গেছে যে, সারা বছরে পড়াশোনা যতদিন, হয় তার বেশিই নষ্ট হয় আন্দোলনে আর ছুটিছাটায়। এর পরিণাম যা হবার তা হচ্ছে। এখানকার ছাত্রদের একদার সেই সর্বভারতীয় মর্যাদা নষ্ট হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবও ম্লান, দলে দলে ছাত্ররা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে অভিভাবকরা বিরক্ত ক্ষুব্ধ, কলেজ কর্তৃপক্ষ অসহায়। এই অবস্থার অবসান যদি না হয়, তবে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং ছাত্রদের যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া খুবই কঠিন।

ক এটা হিন্দু সমাজের কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। এর চেয়ে বিভ্রান্ত অন্তর্ঘাতী নৈতিক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে? আর যদি অহিন্দু ভারতবাসীরাও গরু খাওয়া ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হয়? তখন হিন্দুরা তাদের পায়ে ধরে বলবে— ভাইসব, গরু খাওয়া ছেড়ো না?

পৃথিবীর এই একটি মাত্র দেশে মানুষ মনুষ্যেতর একটি জীবের প্রাণ বধ অকরণীয় বলে ভাবতে শিখছে। কী কারণের সহযোগে এটি হয়েছে তার বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার ভাষায় এটাও একটা "ভ্যালু" এবং এটাকে হিউম্যানিস্ট সেকুলারিজম্-এর অন্তর্গত মনে করা অযৌক্তিক নাও হতে পারে। এই ভাবটিকে অর্থনীতির দোহাই দিয়ে কুসংস্কার বলে একফুঁড়িতে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়, উড়িয়ে দেওয়া যাবেও না। গোহত্যা নিবারণের সঙ্গে অর্থ-নীতির অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই অসঙ্গতি দূর করার একমাত্র উপায় এই বহু যুগ ধরে লালিত একটি সুকোমল ভাবের মূলোচ্ছেদ, এটা সহজে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অর্থনীতিবিদদের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ, যেমন জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সাহেবী অর্থনীতিকে এ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়নি সুতরাং সাহেবদের গোপালন এবং গোভক্ষণ রীতির অনুকরণের দ্বারা ভারত-বর্ষে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। আমাদের নিজেদের কিছু অতিরিক্ত চিন্তা করতে হবে।

গান্ধীজী গোহত্যা নিবারণ করতে চেয়ে-ছিলেন কিন্তু জোর করে নয়। গোহত্যা বন্ধ করার অর্থনৈতিক দিকটা তাঁর খেয়ালে ছিল না, তা নয়। কিন্তু সেদিকের সমস্যা সমাধান তিনি অসাধ্য বলে মনে করেননি। তিনি ভীতু ছিলেন না। যাঁরা এক মুখে বলেন যে, জোর করে গোহত্যা বন্ধ করতে তাঁরা চান না কারণ সেটা "সেকুলারিজম্"-বিরোধী হবে, কিন্তু স্বেচ্ছায় গোহত্যা নিবারণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি কপচান, গান্ধীজী তাঁদের দলে ছিলেন না। তিনি অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলেন। সাহেবী কায়দায় অর্থাৎ কেবলমাত্র মানুষের খাদ্য এবং অন্য দৈহিক প্রয়োজনের স্বার্থে গরুর বধ করাকে তিনি এ ব্যাপারে শেষ কথা বলে ধরে নেননি। গোহত্যা নিবারণের পক্ষে ধর্মান্ধদের ভীড় দেখে তিনি গোহত্যা নিবারণের আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হননি, সেই আদর্শের সেবার সহৃদয় ভার প্রকৃত শিক্ষিতেরা গ্রহণ করুন, তিনি তাই চেয়েছিলেন। ত্রিশূলধারীর দাঙ্গাবাজি আর পুলিশী "চাবুক"-প্রাণ-এর কোনোটাই সেই সেবার উপকরণ নয়।

১৯।১১।৬৬

আবার রেল দুর্ঘটনা
শ্রীএস কে পাতিল
কিন্তু নিরাপদ।
বাংলা কংগ্রেস
বাঙলার বাম ঐক্য ব্যর্থ হয়েছে।
পুরানো কাসুন্দি।
মিঃ দিল্লি - ১৯৬৬
চ্যবন

সুনন্দর জার্নাল

'আধুনিক চোখে'

আধুনিক মনের বিবিধ প্রবণতার ভেতরে অনতিপূর্ব অতীত সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট আক্রোশ লক্ষ করা যায়।

ক্ষুদিরাম, পলিটিক্যাল এ্যাডভেন্চারিস্ট

যা দূরগত, চলতি ভাষায় যা 'ক্লাসিক' হয়ে গেছে, আধুনিকতা তার সম্বন্ধে অনেকটাই সহিষ্ণু, কখনো কৃতজ্ঞ, কখনো সশ্রদ্ধ, কখনো বা গভীরভাবে সত্যসন্ধ। কিন্তু অব্যবহিত অতীতের বিচারে সে প্রায়শ নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদমুখর। এই সর্বদেশীয় প্রবণতার নেপথ্যে নিশ্চয় বিশিষ্ট একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। যে প্রায় সমকালীন অথচ স্বতন্ত্র, সাহিত্যে শিল্পে বা যে-কোনো ক্ষেত্রে যে নিজেকে এর মধ্যেই অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে—সেই অগ্রজ সম্পর্কে অনুজের একটা স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য, একটা চ্যালেঞ্জের মনোভাব থাকেই এবং একই কারণে পিতৃপ্রতিমও বাদ পড়েন না। পিতামহেরা এক্ষেত্রে অনেকখানিই নিরাপদ, কারণ প্রথমত, তাঁরা ইতিহাসগত, দ্বিতীয়ত তাঁদের কোনো প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বের ছায়া সমকালের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় না। অবশ্য এই মনস্তত্ত্বেরও ব্যতিক্রম থাকে—উভয় কালকেই সমভাবে অভিভূত করতে পারেন—এমন প্রবল পুরুষও কখনো কখনো নিঃসন্দেহে আবির্ভূত হন।

কিন্তু সাধারণভাবে—যা প্রত্যক্ষ অতীত কিংবা অতীতপ্রায়, তার প্রভাবের সঙ্গে আধুনিক কালকে সংগ্রাম করতে হয়, তার ক্ষেত্রকে অধিকার করতে হয়। সেই অধিকার সহজ হয় না। বাধা আসে বাইরে থেকে—অভ্যস্ত এবং পরিচিত প্রত্যয়গুলোকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নতুনের জন্য অসংকোচে দরজা খুলে দেবে, প্রসন্ন হাসিতে বলবে: 'রুম এনাফ ফর অল'—এমন মানসিক প্রসার নথাগ্রে গণনীয়; বাধা আসে ভেতর থেকে—সেখানে অগ্রনামীর প্রভাব-শৃঙ্খল চলতে ফিরতে ঝন ঝন করে বাজে এবং সেই শেকলগুলোও ভাঙবার জন্য নিজেকেও রক্তাক্ত করবার প্রয়োজন পড়ে।

তাই উজ্জ্বল তারুণ্যকে একই সঙ্গে উদ্ধত আর অবিশ্বাসী হতে হয়। শুধু আত্মদীপ্ত হলে চলে না—অস্ত্রধারীও হয়ে উঠতে হয়। ভালো-মন্দ দুই-ই ঘটে। কখনো কখনো তার ফলে অগ্রজের নির্ভুল এবং বৈজ্ঞানিক মূল্য-নিরূপণ হয়ে থাকে — তা নিষ্ঠুর হলেও মান্য; আবার কখনো কখনো যুক্তিহীন আক্রমণ এবং সুস্পষ্ট অসহিষ্ণুতা বিদ্বেষের শূন্যতায় হারিয়ে যায়।
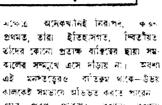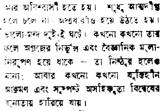
সমস্যাটা আরো জটিল হয়—যখন কালের ডানায় লাগে ঝড়ের হাওয়া; যখন বহুদিনের একটা স্থিতাবস্থা দুরন্ত দ্রুততায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে যখন রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ — শাণিত ক্ষিপ্রতায় তলোয়ারের আঘাতের মতো কালকে খণ্ড খণ্ড করে চলে — তখন সময়ের হিসেব আর শতকে নয়, অর্ধ-শতাব্দীতে নয় — এমনকি, দশকেও থেমে দাঁড়ায় না, তখন আগের বৎসরটাকেও প্রতিপক্ষ বলে মনে হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, বুর্জোয়া কালচারের অবদান

এই প্রচণ্ড দ্রুততা যে আমাদের জীবনে এখনো এসেছে তা নয়; কিন্তু অনেকখানি এসেছে। আমরা বোধ হয় 'দশকের' সীমায় পৌঁছেছি — অন্ততঃ আমাদের সাহিত্য আর ছবির দিকে তাকিয়ে সেইরকম মনে হয়। অতএব প্রাগ্‌চারী সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্মম, ভাষা 'ল্যাকোনিক', অস্বীকৃতিই আমাদের 'ইন্সপিরেশান'। বলা অনাবশ্যক, অগ্রজ বা অগ্রজপ্রেমীরাও এ-সব আক্রমণ সব সময়ে নিঃশব্দে হজম করেন না — কিন্তু সে দ্বৈরথ-সমরের কথা আপাতত থাকুক।

বঙ্কিম, হিন্দু রিভাইভালিস্ট

আমরা যারা সাধারণ মানুষ — তারা অসহিষ্ণুতাও চাই না, আবার চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতেও চাই না। একটি শতককে অস্থির সময় যতই খণ্ড খণ্ড করুক — আমরা সমালোচকের কাছ থেকে অখণ্ড একটি চেতনারই প্রত্যাশা করে থাকি। সেই চেতনায় কোনো আকস্মিকতা নেই — বিজ্ঞান আকস্মিককে স্বীকার করে না; আমরা সেই বিভাত বোধিকে প্রত্যাশা করি — যা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করে— প্রত্যেক বর্তমান, প্রত্যেক ভবিষ্যৎই অতীতের প্রসারিত শীর্ষফলক — কখনো ঋজুরেখ, কখনো তরঙ্গিত।" সেই মুক্ত বুদ্ধির আমরা প্রতীক্ষা করি — যা প্রত্যেককে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে কালের প্রেক্ষিতে প্রত্যেককে দেখে, সময় এবং ভাবনার পরিবেশে তার নতুনত্ব এবং সাহসিকতাকে স্বীকৃতি দেয়; সেই স্থিতধী সত্তাকেই আমরা চাই — যা সঠিক নির্ধারণে দেখিয়ে

ঐ আমার বাবা, মধ্যবিত্ত মানসিকতার রোগী

দেবে—আজ যাকে [illegible] মনে হয়— একদিন তার অনেকটাই ছিল সমুদ্র-গভীর; আজ যা সস্তা আবেগের মতো বোধ হয়—একদা হয়তো তার মধ্যে প্রবলতম প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিল; যে প্রত্যয়কে আজ হাস্যকর বলে বোধ হয় — একদিন তার মূল ছড়িয়ে ছিল একেবারে জীবনের মর্মকেন্দ্রে। কিন্তু সাঁৎ-বোভের মনীষা কেবল বাংলা দেশে কেন—সারা পৃথিবীতেই তো দুর্লভ।

কিন্তু হঠাৎ এসব তত্ত্বচিন্তা মনে এল কেন, বলি। সম্প্রতি বাংলা দেশে লোকান্তরিত পরিচালক এবং চিত্রাভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার 'নব মূল্যায়ন' চলছে। তিনি যে 'বিশেষ কিছু' ছিলেন না, তাঁর ছবি এবং অভিনয়ে যে বিস্তর ত্রুটি ছিল— গুণীজনদের কারো কারো কণ্ঠে এতাদৃশ সুনিশ্চিত বিচার ধ্বনিত হচ্ছে।

অসম্ভব নয়—তাঁর বিবিধ অপরাধ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যে-কালে তিনি ছবি তুলতেন—আমাদের সেই তরুণ বয়সে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতে আশ্চর্য সহজতা আর নবীনতা আমরা দেখতে পেতাম। আজ তিনি নতুন কালের বিচারে সম্পূর্ণ [illegible] হয়ে গেলেন — একথা বিশ্বাস করতে বাধে।

[illegible] অপরিণত বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে বলছি না। একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

[illegible] বছরের আগের কথা। [illegible] কলকাতার কোনো বিশেষ প্রেক্ষাগৃহে কয়েকজন আমন্ত্রিত দর্শক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী অতিথির সামনে কিছু বাংলা ছবির নির্বাচিত অংশ দেখানো হয়েছিল। সমকালীন অনেক সম্মানিত ছবির বাছাবাছা অংশের সঙ্গে বড়ুয়ার একটি ছবির টুকরোও এসেছিল — তার বিবর্ণ [illegible] কিছুটা থর-থর করে কাঁপছিল— [illegible] ব্যাপার সন্দেহ নেই।

বিদেশী অতিথিরা বাংলা জানতেন না— কোনো ছবি বা পরিচালক সম্বন্ধে তাঁদের মোহও ছিল না। [illegible] সৌভাগ্য ঘটেছিল ঠিক তাঁদের পেছনে বসবার। স্পষ্ট মনে আছে, সব নতুন এবং অভিনন্দিত ছবিগুলোর মধ্য থেকে বড়ুয়ার বিবর্ণ জীর্ণ ছবিটুকুই তাঁদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠতার সম্মান পেয়েছিল।

এই দুজন অতিথির একজন পরিচালক পুডভকিন আর একজন অভিনেতা চেরকাশভ। হয়তো তাঁরাও বিগত দিনের; হয়তো তাঁদের মতামতের কোনো গুরুত্বই নেই।

সুজিতকে চিনি না

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুজিতকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

সুজিত বলে, 'দ্যাখ, মানুষই হচ্ছে গিয়ে সব চেয়ে সেরা জানোয়ার।'

তার কথাগুলো শুনি আর হাসি।

আমার হাসি দেখে সুজিত বলে, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ডারউইন-সাহেব বলেছেন—মানুষের পূর্বপুরুষ হলো গিয়ে বাঁদর আর বন-মানুষ। তাদেরই উন্নততর সংস্করণ হলো মানুষ।'

আমার মুখের চেহারা দেখেই সুজিত ভেবেছিল হয়ত আমি বিশ্বাস করছি না। তাই সে আমাকে আরও ভাল করে বুঝাবার চেষ্টা করেছিল।

'মানুষের বাচ্চাগুলো দ্যাখ্ না। চার পায়ে হামা দেয়। হাত দুটোকে পায়ের মত ব্যবহার করে। তারপর ধীরে ধীরে হাত দুটো ওপরে তুলে উঠে দাঁড়ায়। তখন হয় মানুষ।'

সুজিতকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

বলি, 'থাম্ সুজিত, চুপ কর্ বেশি বলিসনি। আমি দুর্বল মানুষ। তোর কথাগুলো বিশ্বাস করে বসবো।'

সুজিত বলে, 'আজ না করিস, বিশ্বাস তোকে একদিন করতেই হবে।'

বিশ্বাস কিন্তু আমি করিনি। করতে পারিনি।

সুজিত ছিল বড়লোক। আমি ছিলাম গরীব।

ওই যে হালসীবাগানের বড় রাস্তার ধারে মোটা মোটা থামওলা প্রকাণ্ড বাড়িখানা—ওই বাড়ি সুজিতদের। একই সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছি আমরা। কিন্তু ওদের ওই বাড়িটার ভেতর ঢুকিনি কোনোদিন। অত বড় বাড়ি—ঢুকতে ভয় করতো। সুজিতও কোনোদিন ডাকেনি, আমিও যাইনি।

মাঝখানে অনেকদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

গরীব হওয়ার কি কম জ্বালা! প্রতিটি দিনের প্রতিটি পদক্ষেপে দুর্ভাগ্য যেন ওত পেতে বসে থাকে। নিরন্তর দুঃখ-বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলতে হয়েছে আমাকে।

এগিয়েছি কি পিছিয়েছি জানি না। সুজিতের সঙ্গে আবার যখন আমার দেখা হলো, আমি তখন গল্প-উপন্যাস লিখি আর সিনেমার ছবি তৈরি করি। অর্থাৎ সিনেমাছবির ডিরেক্টার হয়েছি।

এই দুটোর জন্যে কোনও ইস্কুল-কলেজে পড়তে হয় না। কোনও ডিগ্রিরও দরকার হয় না।

আমি তখন গাড়ি কিনেছি। কলকাতা শহরে ছোট একখানা বাড়িও করেছি।

আমার গাড়িটা সেদিন সুজিতদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলেছিল।

হঠাৎ আমার নাম ধরে কে যেন ডাকলে।

গাড়ির জানলার পথে মুখ বাড়িয়ে দেখি—সুজিত।

পরনে ফুল প্যান্ট, গায়ে বুশ-সার্ট।

তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি যখন হয়েছিল ইণ্ডিয়া তখন স্বাধীন হয়নি। ফুল-প্যান্ট আর বুশ-সার্টের রেওয়াজ তখন হয়নি। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সুজিত ঠিক এগিয়ে চলেছে। আমিই বোধহয় পিছিয়ে পড়ে আছি।

গাড়ি থেকে নেমে সুজিতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সুজিত বললে, 'চিনতে পেরেছিস তাহ'লে?'

'না চেনবার কি আছে? তুই তো এতটুকু বদলাসনি।'

সুজিত হেসে বললে, 'অনেক বদলেছি। দেখতে পাচ্ছিস না—সারা দেশটাই তো বদলে গেছে।'

সুজিতের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বললাম, 'তা দেখতে পাচ্ছি। তুই প্যান্ট পরেছিস, বুশ-সার্ট পরেছিস—'

'তুই কিন্তু একেবারে সেকেলে রয়ে গেছিস।' সুজিত হেসে হেসে বলতে লাগলো, 'এগুলো ইংরেজদের ছেড়ে-যাওয়া প্যান্ট্। ওরা বেসামাল হয়ে এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল, আমরা সেইগুলো পরে নিলাম। এখন এইটেই আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস্।'

বললাম, 'চিরকাল তোর এইরকম কথা। কই আমাদের মেয়েরা তো গাউন পরছে না?'

সুজিত বললে, 'গাউন্ নয় স্কার্ট। পরবে, পরবে। বুড়ী মা মাসিগুলো মরুক্, তখন পরবে। আমাদের আমলে পথে-ঘাটে আপিসে-আদালতে সভায়-সমিতিতে এত মেয়ে দেখেছিলি? আর এখন?'

কথায় কথায় সুজিতদের বাড়ির গেটের কাছে এসে পড়লাম।

সুজিত থমকে থামলো। আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাবার ইচ্ছে বোধকরি তার ছিল না। তবু বললে, 'এ যে একেবারে দরজায় এসে পড়লাম! তা এলি যখন, আয় এক পেয়ালা চা খেয়ে যা।'

বাড়িটা বাইরে থেকে যেমন মনে হয় ভেতরটা তেমন নয়। মনে হলো যেন অনেক লোক বাস করে সেখানে। কোন্‌দিক দিয়ে কেমন করে সুজিত আমাকে নিয়ে গেল কিছুই ভাল ঠাহর করতে পারলাম না। বড় বড় দুটো 'হল্' পেরিয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে ঘুরে ঘুরে একটা সিঁড়ি ধরে দোতলায় গিয়ে উঠলাম। বেশ সাজানো একখানা ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে সুজিত বললে, 'বোস্। মায়ের যেমন কাণ্ড! মেলা লোক না হ'লে থাকতে পারে না।'

বলেই ফট্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলো, 'গাড়িটা তোর নিজের?'

'কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

সুজিত হেসে উঠলো। বললে, 'ভাগ্যিস্ সিনেমায় ঢুকেছিলি। ছবি না করে শুধু নভেল লিখে আর গাড়ি চড়তে হতো না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ-সব তুই জানলি কেমন করে?'

সুজিত বললে, 'আমিও লিখি যে! তুই লিখতে পারিস আর আমি পারবো না?'

'কেন পারবি না? নিশ্চয়ই পারবি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিয়ে-থা করেছিস?'

'না।' বলেই সুজিত খুব জোরে জোরে ডাকতে লাগলো, 'মা! মা!'

কাঠের একটা পার্টিশানের ওপার থেকে মা বোধকরি সাড়া দিলেন, কি বলছিস?'

'দু' পেয়ালা চা।'

বলেই সুজিত সেই ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে হাত নেড়ে নেড়ে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মত বলতে লাগলো, 'না, বিয়ে আমি করিনি। নারী! নারী! পৃথিবীর এই এক অদ্ভুত সৃষ্টি—নারী। এরা চায় শুধু পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে। চায় শুধু মা হতে। নিতান্ত স্বার্থপর ওরা।'

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল। বললাম, 'স্বার্থপর না হলে যে ওদের চলে না। ভগবান ওদের—'

কথাটা আমাকে আর শেষ করতে দিলে না সুজিত। হো হো করে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বসলো। বললে, 'ভগবান কি বলছিস? তুইও কি ভগবান-টগবান মানিস নাকি?'

'মানবো না?'

'না। ভগবান নেই। আগের যুগের মানুষ কল্পনায় ভগবান তৈরি করেছিল মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে।'

সুজিতের আপাদমস্তক আর-একবার ভাল করে দেখে নিলাম। এ বলে কি?

'দুঃখু কষ্ট তো পাসনি জীবনে, ভগবানকে চিনবি কেমন করে?'

'তা হ'লে গরীব দুঃখী যারা, তারাই বুঝি ভগবানকে দেখতে পায়।'

বললাম, 'না। ভগবানকে কেউ দেখতে পায় না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে।'

সুজিত বললে, 'অনুভব, অনুভূতি—ওই সব ভুয়ো কথা আমি অনেক শুনেছি।'

এই বলে সে আর-একবার ঘরের ভেতর পায়চারি করে নিলে। একটা র‍্যাক্ আর মোটা মোটা কয়েকটা খাতা দেখিয়ে বললে, 'এই দ্যাখ্ কত বই আমি লিখেছি। শোন্ একটা কথা বলি তোকে। তুই খুব বড় হয়েছিস জানি। আরও যদি বড় হতে চাস তো একেবারে আলট্রা মডার্ন হয়ে যা। তোর ছবিগুলো আমি দেখেছি। আইডিয়ার দিক থেকে সব সেকেলে, পুরনো, কোনোটাই প্রোগ্রেসিভ নয়।'

সুজিতের হিতোপদেশ আর কত শুনবো? উঠবো উঠবো করছি, এমন সময় মা এলেন। সাদা ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং, টানা টানা চোখ, সুন্দর চেহারা, দেখলে ভক্তি হয়।

সুজিত পরিচয় করে দিল। —একসঙ্গে পড়েছি আমরা। ও আজকাল নভেল লিখছে। সিনেমার ছবি করছে।'

মা প্রথম কথাই বললেন, 'ভাল একটি মেয়ে দেখে দাও দেখি বাবা, সুজিতের বিয়ে দেবো।'

চায়ের কাপটা ঠক্ করে হাত থেকে নামিয়ে সুজিত চেঁচিয়ে উঠলো, 'খবরদার

বিয়ের কথা বোলো না বলছি। বিয়ে আমি করবো না।'

ততোধিক উচ্চকণ্ঠে মা বললেন, 'তোর কোনও কথা আমি শুনবো না সুজিত, হয় তোর বিয়ে দেবো, নয়তো জন্মের মত তোর সংগে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।'

এই বলে মা আমার দিকে তাকালেন। —হ্যাঁ বাবা, পারবে না তুমি ওর একটা-কিছু হিল্লে করে দিতে? ও কী যে করছে কিছুই বুঝি না বাবা। হয় বসে বসে লিখছে আর নয়তো টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

কথাটার জবাব দিতে পারিনি, শুধু একবার তাকিয়েছিলাম সুজিতের মুখের দিকে।

মা বলেছিলেন, 'ওদিকে কি দেখছো বাবা, আমার দিকে তাকাও।'

মার দিকে তাকাবার আগেই হাত বাড়িয়ে মা আমার হাতখানা চেপে ধরেছিলেন।

'তুমি একটু চেষ্টা কোরো বাবা—'

সুজিত চীৎকার করে মাকে থামিয়ে দিলে।

'আঃ, কী করছো তুমি! চল্, ওঠ্।' বলে আমাকে তুলে নিয়ে সুজিত চলে এলো সেখান থেকে।

সুজিতের জন্য কিছুই হয়ত করতাম না আমি। কিন্তু মার সেই মিনতিকাতর মুখখানি ভুলতে পারিনি। আমারও মা নেই। তাঁর সেই মুহূর্তের স্পর্শটুকু আমাকে বিচলিত করেছিল।

সুজিতকে বলেছিলাম, 'তোর গল্পগুলো আমাকে একবার পড়তে দিস্।'

খুব আশা নিয়ে সে তার কয়েকটা গল্প আমাকে দিয়েছিল পড়তে। পড়েছিলাম। কোনোটাই গল্প হয়নি। ভাবের দুরন্ত আবেগে পাতার পর পাতা লিখে গেছে শুধু। আবার কোনটা বা শুধু ঘটনার পর ঘটনা। মনে হয় যেন সিনেমার জন্যই লিখেছে।

কিন্তু কোনও গল্পই নিতে পারিনি। ফেরত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তুই আমার অ্যাসিস্টেণ্ট্ হয়ে যা সুজিত। কিছু টাকাও পাবি, ছবির কাজটাও শিখতে পারবি।'

বলেই অবশ্য বিপদে পড়েছিলাম।

প্রায় ছ'টি মাস সে ছিল আমার সংগে। বলেছিল, 'ওই অত বড় বাড়িতে একা-একা থাকতে তার মায়ের বুঝি ভাল লাগছিল না। তাই সে টুকরো টুকরো করে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে অনেকগুলো ফ্যামিলিকে। মাসে ভাড়া পায় দেড় হাজার টাকা।

বলেছিলাম, তোর টাকার ভাবনা নেই, তাই বুঝি কাজে তোর মন বসছে না।'

সুজিত বলেছিল, 'কেমন করে জানলি!' 'নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কোনো-দিন তো ঠিক সময়ে স্টুডিয়ো যেতে দেখি না।'

'তুই আমার গল্প নিলি না, কি জন্যে যাব?'

বলেছিলাম, 'নেবার মত হলে নিতাম।'

সুজিত বলেছিল, 'লিখছি একটা গল্প।'

কিন্তু লেখার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কখনও দেখি—সে মেয়েদের সংগে বসে বসে গল্প করছে। কখনও দেখি—সাউণ্ড-রুমে বসে আছে। কখনও দেখি—এডিটিং রুমে। বলে, 'সিনেমার সব ডিপার্টমেণ্টের সব কাজগুলো শিখে নিচ্ছি।'

চেহারা ভাল, কথা বলে ভাল, সবাই দেখি সুজিত বলতে অজ্ঞান! মেয়েরা তো দেখি সুজিতদাকে পেলে আর ছাড়তে চায় না।

একদিন আমার ছবিতে ছোটখাটো একটি

পার্টের জন্য মনের মত কাউকে পাচ্ছিলাম না।

সুজিতকে বললাম, 'তুই এই পার্টটা কর্ সুজিত।'

সুজিত জিজ্ঞাসা করলে, 'কত বড় পার্ট?'

বললাম, 'ছোট্ট পার্ট। মাত্র একদিনের কাজ।'

সুজিত ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে। বললে, 'না। এর পরে তুই যে ছবিটা করবি, তার হিরোর পার্ট যদি দিস তো করতে পারি।'

বললাম, 'না। হিরোর পার্ট তুই কোনদিন পাবি না।'

সুজিত বললে, 'তা'হলে কোনও পার্টই করবো না। —"মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!" এই আমার মোটো।'

এই বলে সে হাসতে হাসতে সরে গেল সেখান থেকে।

তার পরেই দেখি সুজিত কোনোদিন আসে, কোনোদিন আসে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আসিস না কেন?'

সুজিত বললে, 'তোর জন্যে গল্প লিখছি।'

একদিন একটি মেয়ে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বাড়িতে কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা আমি করি না। বলে পাঠালাম সে যেন স্টুডিওতে যায়।

কিন্তু স্টুডিয়োতে সে যাবে না কিছুতেই।

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'নিয়ে এসো।'

ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি। ফর্সা গায়ের রং। কালো একমাথা চুল এলো খোঁপা করে বাঁধা। চোখদুটি ভারি সুন্দর। যৌবন যেন তার সারা অঙ্গ বেয়ে উপচে পড়ছে। শরীরের কোথাও কোনও খুঁত নেই। মুখখানি যদি আর-একটু সুন্দর হতো তাহ'লে বোধকরি তাকে হিরোইন্ করা যেতো। বললাম, 'বোসো। কি নাম তোমার?'

মেয়েটি বসলো। মাথা হেঁট করে চোখদুটি তুলে বললে, 'চাঁপা। চম্পাবতী।'

বললাম, 'আমার ছবিতে তোমাকে ছোটখাটো একটি পার্ট আমি দিতে পারি।'

চাঁপা বললে, 'ছবিতে কাজ করবার জন্যে আমি আসিনি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি জন্যে এসেছ তাহ'লে?'

আমাকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটি বললে, 'আপনি দয়া করে একবার শৈলজানন্দবাবুকে ডেকে দিন।'

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝলাম মেয়েটি অস্বস্তিবোধ করছে। বললাম, 'আমিই শৈলজানন্দবাবু।'

মেয়েটি বিশ্বাস করলে না। মুচকি একটু হাসলে। ভাবলে বুঝি আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি। ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। আমি চিনি তাকে।' তারপর চোখ তুলে চাঁপা আবার আমাকে অনুরোধ করলে, 'দিন না ডেকে। —আমার নাম বলবেন না। তাহ'লে আসবে না।'

সন্দেহ হলো? পাগল নয় তো? বললাম, 'কেন? আসবে না কেন?'

চাঁপা বললে, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। দশদিন যায়নি আমাদের বাড়ি।'

কেন জানি না, চট্ করে আমার সুজিতের কথা মনে হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে দেখতে কেমন? আমার মত?'

চাঁপা বললে, 'না না আপনার মত কেন হবে? আপনার চেয়ে অনেক ভাল। আপনার চেয়ে বয়েস কম, গায়ের রং ফর্সা—'

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কপালের এইখানে ছোট্ট একটি কাটা দাগ আছে?'

খুশীতে চাঁপার মুখখানি সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চোখের ইশারায় সম্মতি জানিয়ে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। দিন না চুপি-চুপি একবার ডেকে। খালি খালি আমার সঙ্গে—ইয়ে করছেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শৈলজানন্দবাবু কে হয় তোমার?'

বিরক্ত হয়ে চাঁপা তার চোখদুটি অন্য-দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'জানি না।'

'তার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?'

এবার চাঁপা আমাকে যেন তিরস্কার করলে। বললে, 'আবার?'

'থাক্ আর কিছু বলবো না। তবে শোনো। সুজিত এখানে থাকে না।'

'এই দেখুন, আবার আমার সঙ্গে ইয়ে করছেন।'

এই বলে চাঁপা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সুজিত নয়, সুজিত নয়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।'

সুজিতের ওপর রাগে আমার সর্বাঙ্গ তখন জ্বলে যাচ্ছে। সেই রাগ চেপে হাসতে হাসতে বললাম, 'না সুজিত নয়, ভুল হয়েছিল। শৈলজানন্দবাবু এখানে থাকেন না। হাসিবাগানের মোড়ে মস্ত বড় একটা বাড়ির দোতালায় তিনি থাকেন। তুমি সেইখানে যাও।'

ভাবলাম—যেতে তো বলছি, কিন্তু বাড়ির নম্বর জানি না, রাস্তাটার নামও জানি না। বোসেদের বাড়ি বললে বাড়িটা না হয় যে-কেউ দেখিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার নাম ধরে চেঁচালেও কেউ সাড়া দেবে না।

চাঁপাও বিশ্বাস করলে না আমার কথাটা। বললে, 'বলুন আপনি যা বলছেন বলুন, আমি শুনলেই তো।'

এই বলে কি যেন সে ভাবতে লাগলো। আমিও কম ভাবনায় পড়লাম না। বুঝতে পারছি—আমার নাম ভাঁড়িয়ে সুজিত ছাড়া এ-কাজ আর কেউ করেনি। কিন্তু কী কাজ সে করেছে জানবার জন্যে আরও কি যেন তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাঁপা বললে, 'আমি বুঝতে পারছি আপনাদের সবাইকে সে বারণ করে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস

মনে কোনও দোষ আমি করিনি। দশদিন ধ্য় যায়নি—আমি এই দশদিন ধরে শুধু কেঁদেছি। এখানে আসতে সে আমাকে বারণ করেছিল কিন্তু আমি আর থাকতে পারলুম না। আমাকে শুধু সে বলে দিক —আমি কি করবো।'

বলতে বলতে বড় বড় চোখদুটি তার জলে ভরে এলো।

বললাম, 'আজ আর শৈলজাবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। কাল রাত্রে তুমি যদি এখানে একবার আসতে পারো, আমি তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবো।'

তারপর না এসেছে চাঁপা, না এসেছে সুজিত।

হয়ত-বা চাঁপার সঙ্গে দেখা হয়েছে সুজিতের। সুজিত শুনেছে চাঁপা এসেছিল আমার কাছে এবং আমি সব জানতে পেরেছি। এমনও হতে পারে—সেই লজ্জায় সুজিত তার আসা বন্ধ করেছে।

তা প্রায় আট ন' মাস হয়ে গেল সুজিত আসেনি।

একখনা ছবি শেষ করে আবার একখানা ছবি আরম্ভ করবো ভাবছি।

গল্প লিখেছি একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে। লেখাপড়া একদম জানে না, অথচ সাজ-পোশাক দেখে সহজে বুঝতে পারা যায় না যে সে বস্তির মেয়ে।

এমনি একটি মেয়ের খোঁজ করছিলাম। যে ক'জন মেয়েকে দেখেছি কাউকে পছন্দ হয়নি।

চাঁপার কথা একবার মনে হয়েছিল। কিন্তু তাকেই বা পাচ্ছি কোথায়?

গিয়েছিলাম বঙ্গ সংস্কৃতির মেলায়। কত রকমের কত মেয়েই তো যায় সেখানে। ভেবেছিলাম একটি মেয়ে হয়ত-বা সেখানে পেয়ে যেতেও পারি।

কিন্তু পেলেই বা কি হবে? জিজ্ঞাসা করবো কোন্ ভরসায়? হয়ত-বা মেয়েটির সিনেমার হিরোইন্ হবার ইচ্ছে থাকবে ষোল আনা, হয়ত-বা সেই স্বপ্নই সে দেখে দিনরাত, তবু কথাটা শোনামাত্র সে তেড়ে মারতে আসবে।

কথাটা মনে হলো সেখানে গিয়ে। তবু ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি হয়ে গেল। আমার গাড়িটা আছে কারখানায়। ট্যাক্সি করে এসেছি, আবার ট্যাক্সি নিয়েই ফিরতে হবে। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, কুড়ি-বাইশ বছরের একটি ছেলে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে, 'এখানে এসেছিলেন স্যার?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'চিনতে পারছেন না?' ছেলেটি বলে উঠলো, 'সেই যে স্যার স্টুডিওতে গিয়েছিলাম চান্সের জন্যে।'

ব্যস্, আর-কিছু বলবার দরকার হলো না। সিনেমার আর্শিতে নিজেকে দেখবার চান্স্। চলবে, বলবে, অভিনয় করবে, নিজে দেখবে, অপরকে দেখাবে। এই সুযোগ পাবার জন্যে সে তখন ব্যাকুল। একা পেয়েছে আমাকে। ছাড়বে কেন?

'তাহ'লে কবে যাব স্যার?'

আমি তখন ট্যাক্সির জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কথাটার জবাব দিলাম না।

'বলুন স্যার কবে যাব?'

বললাম, 'আমি বলতে পারবো না। আমার অ্যাসিস্টেণ্ট কমলবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

ছেলেটি বললে, 'তবেই হয়েছে! কমলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবার জন্যে বলে ফেললাম, 'তাই কোরো।'

ওইটুকুতেই আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল ছেলেটা। আশে-পাশে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা দেখছি।

ছেলেটি বললে, 'আপনার গাড়ির নম্বর বলুন। আমি খুঁজে এনে দিচ্ছি।'

বললাম, 'গাড়ি আমার নেই। ট্যাক্সি খুঁজছি।'

'ট্যাক্সি এখানে পাবেন না। আমি ডেকে দিচ্ছি। আপনি দাঁড়ান এইখানে।'

বলেই ছেলেটি ছুটে চলে গেল ট্যাক্সি ডাকতে।

ছেলেটি তখনও বেশি দূরে যায়নি, এমন সময় ঝকঝকে নতুন একখানা প্রাইভেট গাড়ি একেবারে আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। আমি সরে যাচ্ছিলাম। গাড়ির ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে, 'তাড়াতাড়ি উঠুন। আমি আপনাকে পে'াছে দিচ্ছি।'

বললাম, 'ট্যাক্সি ডাকতে গেল যে!'

ড্রাইভার বললে, 'ট্যাক্সি পাবে না। আপনি উঠুন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে বসলাম। বসবামাত্র গাড়ি ছেড়ে দিলে।

ছেলেটি দেখলাম হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তার মোড়ে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকে বারণ করে দিলাম।

ড্রাইভারকে বললাম, 'আমি বাগবাজারে যাব।'

ড্রাইভার কোনও কথা বললে না।

আবার বললাম, 'কত দিতে হবে?'

ড্রাইভার বললে, 'যা হয় দেবেন।'

গলার আওয়াজটা যেন চেনা-চেনা মনে হলো। কিন্তু মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না। পেছনে ফিরে গাড়ি চালাচ্ছে।

সিটের বাঁদিকে সরে গেলাম, মুখখানা দেখবার জন্যে।

দাড়ি রয়েছে মুখে। বোধকরি পাঞ্জাবী শিখ।

গাড়ি একেবারে ঠিক আমার বাড়ির সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

আমার বাড়িটাও সে চেনে দেখছি।

'বলুন কত দিতে হবে।'

পকেটে হাত দিয়েছি, দপ্ করে গাড়ির ভেতরের আলোটা জ্বলে উঠলো।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বললে, 'একটি পয়সাও দিতে হবে না।'

'আরে, সুজিত?'

'চিনতে তো পারিসনি।'

'কেমন করে চিনবো? মুখে একমুখ দাড়ি। ভাবলুম বুঝি-বা শিখ।'

সুজিত হাসতে লাগলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'গাড়িটা কার?'

সুজিত বললে, 'ঠিক এই কথা একদিন আমি তোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' বলেই হাসতে হাসতে বললে, 'গাড়ি আমার।'

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'আয়।'

'না। আর-একদিন আসবো।'

'বিয়ে করেছিস?'

'ধেৎ!'

'মা কেমন আছেন?'

'মা মারা গেছে।'

কথাটা এমনভাবে বললে, যেন মায়ের মৃত্যুটা তার কাছে কিছুই নয়। আমার কিন্তু কেমন যেন ধক্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। সুজিতের মার সঙ্গে সেই তো আমার মুহূর্তের পরিচয়। কিন্তু তবু আমি তাঁর সেই মমতামাখানো মুখখানি ভুলতে পারিনি। চুপ করে কত-কি ভাবছিলাম। সুজিত বলে যেতে লাগলো, 'তোর মত আমার

তো ভগবান নেই। থাকলে হয়ত বলতাম—সেই করুণাময় আমার সব বন্ধন শিথিল করে দিলে। হাতে কিছু টাকাও এসে গেল।'

'মায়ের হাতে বুঝি টাকা ছিল?'

সুজিত হেসে বললে, 'সে আর কত! হাজার-পাঁচেক। এই গাড়িটার দামই তো পনেরো হাজার। ব্যাঙ্কে কিনতে হয়েছে উনিশ হাজার দিয়ে।'

'কোথায় পেলি অত টাকা?'

'হালসিবাগানের বাড়িটা বেচে দিলাম। লাখ-দেড়েক টাকা এসে গেল।'

'এখন তাহলে আছিস কোথায়?'

'বালিগঞ্জে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।'

'বাড়ি একখানা কিনলেই পারতিস?'

'কার জন্যে কিনবো?—দিব্যি আছি বাবা, একা মানুষ, ফূর্তি করে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। ভেবেছিলাম নিজেই একখানা ছবি করি, কিন্তু নাঃ, তার অনেক ঝঞ্ঝাট!—আজ চলি।'

বললাম, 'এতদিন পরে দেখা হলো, এক পেয়ালা চাও খেয়ে যাবি না?'

'ঘড়িটা দ্যাখ একবার ক'টা বাজলো। এ সময় চা খায়?'

গাড়িতে তখন সে স্টার্ট দিয়ে চালাতে আরম্ভ করেছে।

টা—টা—!

হুস্ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল সুজিত।

সুজিত চলে যাবার পর অনেক কথাই মনে পড়েছিল আমার। কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

প্রথমেই মনে পড়েছিল চাঁপার কথা। আমার নাম ভাড়িয়ে চাঁপার সঙ্গে যে লুকোচুরি সে খেলেছিল, কথাটা বললে হয়ত সে অপ্রস্তুত হয়ে যেতো। তাই কথাটা একটিবার উঁকি মেরেই তৎক্ষণাৎ আবার অন্তস্তলের কোন্ অতল তলে ডুবে গিয়েছিল।

নতুন ছবির নায়িকার জন্য আমি যে একটি নতুন মেয়ের সন্ধান করছি—সে-কথাটাও সুজিতকে বলতে পারতাম।

কিছুই বলতে পারিনি।

মাসখানেক পরেই বোধহয়।

সুজিত আবার একদিন এলো।

হঠাৎ এসে হাজির হলো ঠিক ঝড়ের মত। তেমনি ফুল-প্যান্টের ওপর বুশ-সার্ট, তেমনি হাসি-হাসি মুখ, সেই ঝক্‌ঝকে নতুন গাড়ি, সেই সব। নতুনত্বের মধ্যে দেখলাম—গাড়ির ভেতর একটি মেয়ে বসে আছে।

এবার আর আমার বাড়িতে নয়, সুজিত এলো টালিগঞ্জের স্টুডিওতে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। ইলেকট্রিকের আলোয় আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি।

স্টুডিওর কাজ আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি যাবার জন্যে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম, সুজিত বললে, 'আমার গাড়ির পিছু-পিছু আয়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়?'

সুজিত বললে, 'আয় না!'

সোজা একেবারে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েলের কাছাকাছি।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে মেয়েটিকে সুজিত নামিয়ে দিলে তার গাড়ি থেকে। আমার কাছে তাকে নিয়ে এসে বললে, 'যাও দুজনে ওই গাছটার তলায় গিয়ে বোসো।'

আমাকে বললে, 'দ্যাখ্ যদি তোর ছবিতে কাজ করতে পারে।'

নিজে বসে রইলো গাড়ির ভেতর। আমাদের সঙ্গে এলো না। আমাকে চুপি চুপি বললে, 'মেয়েটি খুব রেসপেক্‌টেবল্ ফ্যামিলি থেকে এসেছে।'

আমি কিন্তু তখন তার উল্‌টোটাই

খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছি। তবু দেখা যাক্ যদি অভিনয় করতে পারে।

নির্জন জায়গার খোঁজে মেয়েটিকে নিয়ে হাটতে হাটতে অনেক দূরে চলে গেলাম।

চাঁপার কথা তখনও আমি ভুলতে পারিনি। তাই প্রথমেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে নিলাম, 'আমি কে জানো তো? আমার নাম জানো?'

সবই ঠিক-ঠিক বললে মেয়েটি। বললে, 'সুজিতবাবু সবই বলেছে আমাকে।'

সারা মাঠে তখন দিনের মত জ্যোৎস্নার আলো। এই আলোতে বুঝি অসুন্দরীকেও সুন্দরী দেখায়। গ্রামদেশে একেই বলে কনে-দেখা আলো। সূর্যাস্তের পর দিনের আলোর তীব্রতা যখন কমে আসে। গোধূলিলগ্নের সেই আলোর মতই ধূসর-স্নিগ্ধ। মেয়েটির রূপে যদি খুঁত কোথাও থাকে তো সে খুঁত আর চোখে পড়বে না। শুধু সেইজন্যই সুজিত আমাদের এইখানে টেনে আনলে কিনা তাই-বা কে জানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি বললে, 'নীমা। নীলিমা নাম তো। তাই সবাই আমাকে নীমা বলে ডাকে।'

'সুজিতের সংগে তোমার কতদিনের পরিচয়?'

নীমা চট্ করে জবাব দিতে পারলে না। চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

'চুপ করে রইলে কেন? কি ভাবছো?'

নীমা বললে, 'না কিছু ভাবিনি।—তো অনেকদিন।'

'অনেক দিন?'

'হ্যাঁ। তা প্রায় মাসতিনেক হবে।'

'ছবিতে অভিনয় কখনও করেছ?'

'বা-রে! ছবিতে অভিনয় আবার কখন করলুম? সে এই এতটুকু। তাকে অভিনয় বলে না। মস্ত বড় পার্ট করতে হবে বলে মুখপোড়ারা নিয়ে গেল। খুব ভাল করে মুখে রংটং মাখালে, ভাল একখানা শাড়ি পরলুম, জামা পরলুম, তারপর ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললে, এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর বললে, এই দিকে চলে যাও। বাস্, হয়ে গেল। ছবি দেখতে গিয়ে আমাকে দেখতেই পেলুম না। মা গো মা, কি লজ্জার কথা! দুজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম, ছবি দেখতে। তারা ভাবলে, আমি মিছে কথা বলছি।'

তোমার কি মনে হয়? 'ছবিতে অভিনয় করতে পারবে?'

'কেন পারবো না? খুব পারবো।'

'শুনেছি তুমি খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। কিন্তু—'

কথাটা সে আমাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, 'কিন্তু টিন্তু নয়। আমার বাপ দাদা—সব বড় বড় চাকরি করে। বাবা তো বলছিল—না, তোকে ছবিতে কাজ করতে দেবো না। আমিই জোর করে বললুম—না আমি কাজ করবোই।'

'শেষ পর্যন্ত তোমার বাবা যদি রাজী না হন? আমাদের এগ্রিমেণ্টে তাঁকে সাঁই করতে হবে। সাঁই করতে যদি না চান?'

নীমা বললে, 'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি সই করিয়ে আনবো।'

'পড়াশোনা কতদূর করেছো?'

'বি-এ পর্যন্ত পড়েই ছেড়ে দিয়েছি। দাদা বললে, আর পড়তে হবে না। আজকাল যত-সব বাজে মেয়েদের সংগে মিশছো তুমি। কোনদিন দেখবো—'

বলেই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

বললাম, 'কথাবার্তা ঠিকই বলছো তুমি। অভিনয় করতে পারবে বলেই মনে হচ্ছে।'

নীলিমার মুখখানা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শাড়িতে গয়নায় চমৎকার সেজেছে মেয়েটা। তার ওপর চাঁদের আলোয় খুব সুন্দরী না হলেও সুন্দরী-সুন্দরী মনে হচ্ছিল তাকে। বললে, 'অভিনয় করতে পারবো তাহলে?'

'হ্যাঁ, পারবে। কিন্তু ভারি মুশকিল হলো যে।'

'কী মুশকিল? কিসের মুশকিল?'

বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু বলে ফেললাম, 'এবারে যে ছবিটা আমি করবো তাতে তোমাকে আমি নিতে পারবো না।'

'নিতে পারবেন না? কেন?'

মুখখানি কেমন-যেন সংগে সংগে শুকিয়ে গেল মেয়েটির। বোধকরি অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে। সুজিত বোধকরি তাকে এমন-কিছু বলেছে, যা শুনে নিশ্চয়ই তার মনে হয়েছিল, যাবামাত্র কাজ পেয়ে যাবে।

বুঝিয়ে বললাম, নীলিমাকে। বললাম, 'দ্যাখো, এবারে যে-ছবিটি আমি করবো সে-ছবির জন্যে এমন একটি মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যে-মেয়ে তার জীবনটাকে ঠিক চিনতে পারেনি। জীবন আর যৌবন নিয়ে সে যেন ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে। স্বার্থপর কতকগুলো পুরুষের দেহের খোরাক জোগাচ্ছে, শুধু কিছু অর্থের বিনিময়ে। ভেতরে ভেতরে সে যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সেদিকে তার দৃষ্টি নেই।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল নীলিমা। আর একটু সে এগিয়ে এলো।

বললাম, 'সেইজন্য আমি যে-মেয়েটিকে চাচ্ছি সে-মেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের হবে না, শিক্ষিতাও হবে না। সুন্দরী হবে, যুবতী হবে, অথচ একেবারে অশিক্ষিতা, বোকা-বোকা একটা বস্তির মেয়ে হলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু সাজ-পোশাক চাল-চলন এমন হবে যাতে চট্ করে কেউ ধরতে না পারে।'

নীলিমা আচমকা আমার হাতখানা ধরে ফেললো। আমি চমকে উঠলাম। তার মুখের দিকে তাকাতেই নীলিমা বললে, 'বলুন, আপনি সুজিতকে কিছু বলবেন না?'

'না বলবো না। বল—কি বলবে।'

নীলিমা বললে, 'আপনি যেমনটি চাচ্ছেন, আমি ঠিক তাই। মাইরি বলছি আমি লেখা-পড়াও জানি না, আমার বাপও নেই, দাদাও নেই। ওই যে বললাম—বি-এ পর্যন্ত পড়েছি—সব মিছে কথা।'

এই বলে সে আমার হাতখানা দু হাত দিয়ে আরও ভাল করে চেপে ধরলে। বললে, 'সুজিতকে বলবেন না কিন্তু। ও আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই বলেছি।'

ভালই হলো। ঠিক এমনি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম।

সুজিতকে বললাম, 'চলবে। একেই আমি আমার পরের ছবির হিরোইন্ করবো।'

সুজিত খুশী হলো। বললে, 'আমি জানি। জানি বলেই নীলিমাকে তোর কাছে নিয়ে এলাম। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী শর্ত?'

সুজিত বললে, 'নীলিমা হিরোইন্ আর আমি হিরো।'

ভেবেছিলাম, সুজিত বুঝি রসিকতা করছে।

'কিন্তু না, দু' একটা কথা বলতেই বুঝলাম, সে রসিকতা করেনি। তার অনেক-দিনের সাধ—সিনেমার হিরো হবার। এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই।

বললাম, 'অসম্ভব। তোকে হিরোর পার্ট আমি দিতে পারবো না।'

'কেন?'

'একটা অন্তত নাম-করা আর্টিস্ট চাই। দুটোই নতুন হলে সে-ছবি কেউ রিলিজ দিতে চাইবে না।'

গুম্ হয়ে কি যেন ভাবলে সুজিত। তার-পর বললে, 'কিছুতেই দিবি না?'

'না। ছোট-খাটো একটা পার্ট তোকে আমি দিতে পারি।'

সুজিত বললে, 'ছবির সব টাকা যদি আমি দিই?'

বললাম, 'কেন টাকাগুলি নষ্ট করবি?'

সুজিত বললে, 'নষ্ট হয় হবে। সে ভাবনা আমার। তোর স্টোরি, সিনারিও, ডিরেক্‌সানের জন্যে কত টাকা নিবি তাই বল।'

বললাম, 'ভেবে বলবো।'

সুজিত বললে, ভাব্ তাহলে। আমি জেনে যাব আর-একদিন এসে।'

এই বলে সে নীলিমাকে নিয়ে চলে গেল।

গেল তো গেল, দুজনের ভেতর একজনও ফিরলো না।

না ফিরলো সুজিত, না ফিরলো নীলিমা। নীলিমার ঠিকানাটা অন্তত আমার নিয়ে রাখা উচিত ছিল।

একদিন হালসিবাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো সুজিতের সেই পুরনো বাড়িটা একবার দেখে যাই—অনেক লোক তো থাকে,—কেউ যদি তার বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানাটা বলতে পারে।

ইঁট-বের-করা থামওলা সেই প্রকাণ্ড বাড়িখানা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—লোকজন তেমনি গিজ্‌গিজ্ করছে, তাদেরই মাঝখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে ঠিক গিয়ে দাঁড়ালাম, সেই হলঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিসান-দেওয়া দরজার সামনে। কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে যে-মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিলেন, কথা বলবো কি, আমি তো তাঁকে দেখেই অবাক।

সুজিত বলেছিল তার মা মারা গেছেন। এখন দেখছি তার সেই মা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন মা?'

মা বললেন, 'না বাবা, চিনতে তো পারছি না। সুজিত এখন বাড়িতে নেই। রাত্রে যদি আসে তো কাল সকালে এসো, দেখা হবে।'

মনে হলো মা যেন আমাকে তাড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু সব কথা না জেনে আমিই-বা যাই কেমন করে? বললাম, 'সুজিত আমার সঙ্গে পড়তো ইস্কুলে। আমার কাছে কিছুদিন সে কাজ করেছিল।'

এতক্ষণে মা আমাকে চিনতে পারলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এবার চিনেছি। বোসো বাবা বোসো। একটু চা খাও।'

চা খাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, বসতেও ইচ্ছে করছিল না। সুজিতের কীর্তিকাহিনী আর শুনেই-বা কি হবে? তবু বসলাম। তবু শুনলাম। প্রথম দিন সুজিত আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল সেইখানেই বসলাম। মা একবার ভেতরে গেলেন, আবার ফিরে এলেন। কথা বলবার ঝোঁকে বোধকরি চা করবার কথা ভুলেই গেলেন।

'তুমি যদি বাবা ওকে একটু সাহায্য করতে, তাহলে কি আর ওকে আজ বোম্বাই কাল মাদ্রাজ করে ঘুরে বেড়াতে হতো? ওর গল্পগুলো সব চুরি করে করে মেরে দিলে। একটা পয়সাও কারও কাছ থেকে আদায় করতে পারলে না।'

'ওর গল্প বুঝি সবাই নিয়েছে?'

'শুনেছি তো পাঁচটা গল্প নিয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবার কথা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বাড়িটা নাকি বিক্রি করে দিয়েছে?'

মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—'কার বাড়ি? কে বিক্রি করেছে?'

বললাম, 'এই বাড়ি। যে-বাড়িতে আপনারা বাস করছেন।'

মা আবার একটুখানি হাসলেন। বললেন, 'এই বাড়িটাকে সবাই বোসেদের বাড়ি বলে। আমরাও বোস। তাই বোধহয় অনেকে ভাবে এটা আমাদের বাড়ি।

এ-বাড়ি এখন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক কিনেছেন। আমরা সেই আদ্যিকাল থেকে এখানে বাস করছি তাই আগেকার ভাড়াতেই আছি। আগে ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। এখনও সেই কুড়ি টাকা ভাড়াই দিচ্ছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুজিত এখন কি করছে?'

মা বললেন, 'গল্প বিক্রি করে একটা গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ি নিয়ে টাকার জন্যে কোথায় কোথায় না জানি ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এদিককার পার্টিশানের আড়াল থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠলো, 'মা!'

মেয়েছেলের গলার আওয়াজ!

মা চলে গেলেন। মেয়েটি বললে, 'কী যা-তা বলছো ও'কে? উনি সব জানেন। উনোনে তরকারি চড়িয়েছি, যাও দ্যাখোগে যাও।'

মা বললেন, 'তুমি যাবে ওর কাছে?'

দুজনের কথাই শুনতে পাচ্ছি। মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ যাব।'

মা বললেন, 'তোমার কি চেনা-অচেনা কিছু মানামানি নেই?'

মেয়েটি বললে, 'না, নেই।'

'বেশ তাহলে সুজিত আসুক, এলে বলবো তাকে।'

'বোলো। আর ক'দিনই-বা আছি!'

'তুমি কি সত্যিই চলে যাবে?'

মেয়েটি বললে, 'তোমার ছেলের সঙ্গে—আমার কপাল মন্দ—তাই এতদিন কাটিয়ে দিলাম।'

বলেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যে-মেয়েটি হাসতে হাসতে আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো তাকে চিনতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হলো না। সেই পূর্ণবিকশিত পুষ্পের মত যৌবনশ্রীমণ্ডিতা হাস্যাধরা চাঁপা। সেই দেহ, সেই রূপ, সেই হাসি—এতটুকু পরিবর্তন তার হয়নি।

হাতের কাছে চায়ের কাপটি নামিয়ে দিয়ে চাঁপা বললে, 'আমাকে এখানে দেখে বোধহয় অবাক হয়ে গেছেন।'

বললাম, 'মোটেই অবাক হইনি।'

চাঁপা পেছনের দরজাটার দিকে একবার তাকালে। তাকিয়ে চুপিচুপি বললে, 'আপনার কাছে আমি একদিন যেতাম। ভালই হলো—আপনি নিজেই এসে গেলেন।'

'কি জন্যে যেতে?'

'আপনি আমাকে ছবিতে কাজ দিতে চেয়েছিলেন আমি তখন রাজী হইনি। এখন রাজী আছি। দেবেন কাজ?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুজিত তোমাকে কাজ করতে দেবে কেন? সে তো তোমাকে বিয়ে করেছে।'

আবার চাঁপা একবার পেছনের দরজার দিকে তাকালে। বললে, 'বিয়ে নয়। বিয়ের চেয়ে বড়। প্রেম—প্রেম। প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি নিজেই চলে এসেছি। মা ভেবেছে বুঝি ছেলে তার বিয়ে-করা বউ নিয়ে এলো ঘরে।'

'তা সে প্রেমের বাঁধন কি অত সহজে ছিঁড়তে পারবে তুমি?'

চাঁপা হেসে উঠলো। বললে, 'বিয়ের বাঁধন ছেঁড়া শক্ত। প্রেমের বাঁধন ছিঁড়তে এক সেকেণ্ড দেরি হবে না। আপনি আমাকে কাজ দেবেন কিনা বলুন।'

'সুজিতকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

'সে আমাকে আটকাবে না। কোন ভয় নেই।'

'সুজিত যদি বলে—চাঁপা আমার স্ত্রী?'

'কোন্ অধিকারে বলবে? বললুম তো—আমি ওর স্ত্রী নই।'

'সে এখন কোথায়?'

'ভগবান জানেন। কাজ একটা করছিল। সে কাজ গেছে।'

'কি কাজ করছিল?'

'মোটর ড্রাইভারের কাজ।'

অবাক্ হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। মা একরকম বললেন, চাঁপা বলছে আর-একরকম।—'কোন্‌টা সত্যি?'

চাঁপা বললে, 'আমারটা।'

সুজিত যে বলে গাড়িটা তার নিজের?'

'সেতা কথা সে বলে না। হয়তো এক ভদ্রলোকের গাড়ি। কাজের মধ্যে কাজ ছিল সেই লোকটিকে, তার রাত্তিরে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, আর রাত্রে গিয়ে সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা। বাকি সময়টা গাড়িটা থাকতো সুজিতের হেফাজতে। সে তখন এন্তার ভাড়া খাটাতো আর রোজগার করতো। এতদিন পরে ধরা পড়ে চাকরিটা গেল।'

আর কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল না আমার। সেই গাড়িতে চড়িয়েই আমাকে একদিন পৌঁছে দিয়েছিল।

চাঁপাকে বললাম, 'তুমি যেন এসো।'

চাঁপা বললে, 'নিশ্চয়ই আসবো।'

চাঁপা এসেছিল, কিন্তু সুজিত আসেনি।

বোধহয় লজ্জায় আসছে না।

চাঁপা বলেছিল, 'লজ্জা তার নেই।'

সুজিতের কথা ভাবি মাঝে-মাঝে। বেচারার জন্য দুঃখ হয়। চেহারা ছিল, বুদ্ধি ছিল, কাজ করবার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু কী যে তার হলো—নিজের জীবনটাকে নিজের হাতেই দিলে নষ্ট করে। এই যুগের সঙ্গে তাল রেখে প্রোগ্রেসিভ হবার চেষ্টা করতে গিয়েই বোধকরি সব-কিছু গোলমাল করে ফেললে।

ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে। এডিটিং রুমে কাজ চলছে। একমনে বসে বসে কাজ করছে অমিয়।

নমস্কার।

তাকিয়ে দেখি—বাসন্তী ঘরে ঢুকলো। বেঁটেখাটো ছোট্ট মেয়েটি—হাসি-হাসি মুখ। হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ আর একটি বাংলা নভেল।

ফাঁকা একটা চেয়ার ছিল ঘরের কোণে। সেই চেয়ারটায় বসে পড়লো বাসন্তী। বসেই জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার কাজটা কেমন হয়েছে অমিয়দা?'

এই ছবিতে বাসন্তী ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছে।

অমিয় আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভাল বলেছি তাই এই মেয়েটি রোজ একবার করে শুনতে আসে।'

বাসন্তী বললে, 'ধেৎ! রোজ কোথায়? দুদিন পরে এই তো আজ আসছি। বারণ কর তো আর আসবো না।'

বলেই সে তার হাতের বইখানা খুলে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বই?'

বাসন্তী বললে, 'নভেল।'

"কার লেখা?'

'তা জানি না।'

'লেখা পড়ছো আর লেখকের নাম জানো না?'

'না। আমি গল্প পড়ি, লেখকের নাম জেনে কি হবে?'

বলতে বলতে বাসন্তী বইএর সামনের পাতাটা দেখে নিলে। বললে, 'সুজিত বসু।'

নামটা শুনেই বাসন্তীর দিকে হাত বাড়ালাম।—"কই দেখি।'

বেশ মোটা বই। দাম আট টাকা। আমাদের এই সুজিত নিশ্চয়ই।

ভেতরে দেখলাম—এই লেখকের লেখা—আরও চার পাঁচখানা বইএর নাম। বইখানা বাসন্তীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুজিতের লেখা কোনও বই তুমি পড়েছ?'

অমিয় বললে, 'পড়েছি। তেমন কিছু নয় 'নভেল-নভেল মনে হয়, কিন্তু মন ভরে না।'

বাসন্তী বললে, 'কী বলছো অমিয়দা? ট্রামে উঠে বইখানা পড়তে আরম্ভ করেছি, ডিপো পর্যন্ত সারা ট্রাম বসে বসে পড়েছি, আবার এই এখন পড়ছি। ছাড়তে পারছি না,।'

বাসন্তীর কথার কোনও জবাব দিলে না অমিয়। আবার কাজ করতে লাগলো।

সুজিতের লেখা আমিও পড়েছি। দু'চার পাতা পড়লেই ক্লান্তি আসে। আড়ষ্টতা এখনও কাটেনি। গল্প যে কি বস্তু তাও সে এখনও জানে না। তবে একাগ্রমনে যদি এই সাধনা করতে থাকে তো একদিন-না-একদিন জীবন-সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতেও পারে। প্রার্থনা করি তাই যেন হয়।

তারও মাস পাঁচ-ছয় পরেই বোধহয়।

সিনেমার কাজ তখন আমার ভাল লাগছে না। খ্যাতি প্রতিপত্তি, অর্থ সম্মান—সিনেমা আমাকে সবই দিয়েছে, তবু মনে হচ্ছে যেন সাহিত্য আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে সে-আনন্দ এখানে নেই। আবার সাহিত্যের জগতে ফিরে যাব কিনা ভাবছি—এমন সময় সকালের খবরের কাগজখানা খুলেই বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেলাম।

সাহিত্যের সব চেয়ে যে বড় পুরস্কার—সেই পুরস্কার পেয়েছে বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুজিত বসু।

তারও চার পাঁচদিন পরে একখানি বই আর একটি ছাপানো নিমন্ত্রণের চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে সুজিত আমার সুমুখে এসে বসে পড়লো। বইখানা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নে, আমার বই তো তুই পড়বি না, তবু দিলাম।—আর এই চিঠিখানা পড়ে দ্যাখ্। তোকে না জিজ্ঞাসা করেই একটা কাজ করে বসেছি।'

'কি কাজ করেছিস্?'

চিঠিখানার ওপরেই দেখলাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা—'সুজিত সম্বর্ধনা।'

সুজিত বললে, 'ওই সম্বর্ধনা-সভায় তোকে সভাপতি করা হয়েছে।'

সভা-সমিতিতে যাওয়া একরকম পরিত্যাগ করেছি।

চিঠিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে এ-টা কথা মনে পড়লো।

সুজিতকে সেটা বলে রাখা দরকার। যে-চাঁপাকে সে তার স্ত্রীর সম্মান দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল, সেই চাঁপাকে আমি সিনেমার 'হিরোইন্' করে দিয়েছি। এই নিয়ে আমার ওপর তার যদি চাপা অসন্তোষ থাকে তো সেটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। বললাম, 'চাঁপাকে ছবিতে নামিয়ে দিয়েছি তার জন্যে তুই আমার ওপর রাগ করিসনি তো?'

হো হো করে হেসে উঠলো সুজিত। বললে, 'রাগ করবো কি রে! তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস। ওকে কোথায় ফেলবো তাই ভাবছিলাম।'

'ফেলবি কেন? শুনলাম তুই ওকে বিয়ে করেছিলি।'

'না বিয়ে করিনি। মাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।'

'প্রেম করেছিলি তো!'

'দূর, দূর! প্রেম আবার আছে নাকি? যৌন ইচ্ছা পূরণের গালভরা নাম হচ্ছে—প্রেম। দুদিনেই পুরনো হয়ে গেল। ও সম্বন্ধ টেকে কখনও? দুদিন বাদে ছিঁড়ে একদিন যেতোই, ভালই হয়েছে—তার আগেই তুই নিয়ে এসেছিস্। চাঁপা! চম্পকবরণী! ও-রকম কত চাঁপা দেখলাম। ওর কথা ছাড়্ তুই, অন্য কথা বল্। আর তোর সিস্টারকে খবর পাঠিয়ে দে—আমার জন্যে এক কাপ কফি।'

কফি খেতে খেতে সাহিত্যের কথা হলো।

'হ্যাঁরে এই সাহিত্যের প্রাইজ্‌টা আমি পাইনি, তুই পেলি কেমন করে?'

'তুই চেষ্টা করেছিলি?'

'না।'

'তোর প্রকাশক চেষ্টা করেছিল?'

'না।—এর জন্যে চেষ্টা করতে হয় নাকি?'

'নিশ্চয়ই হয়। এর টেক্‌নিক আলাদা।'

বললাম, 'প্রাইজ যাঁরা দিয়েছেন তোর বইটা তাঁদের পড়তে হয়েছে তো?'

সুজিত বললে, 'পড়তে পারবে কেন? কি লিখেছি আমি তো জানি। দু'পাতা পড়লেই ঘুম পাবে।'

'তবু এই বই-এর জন্যে প্রাইজ্‌টা তুই পেলি?'

'হ্যাঁ, তবু পেলাম। আমার এক মামা আছে দিল্লীতে।'

সুজিত বলে কি? আমাদের দেশের কোনও জিনিসেরই কি তাহলে কোনও মর্যাদাই নেই?

সুজিত জিজ্ঞাসা করলে, "কি ভাবছিস? তুই যাবি তো আমার সম্বর্ধনা-সভায়?'

সুজিতের মুখের দিকে তাকালাম। আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ। গ্লানির চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। নাছোড়্‌বান্দা সুজিত। নিয়ে সে আমাকে যাবেই। এই তার চরিত্র।

'যাবি তো?'

বললাম 'যাব।'

'আমাদের গাড়ি আসবে তোকে নিতে।'

বললাম, 'আমি আমার নিজের গাড়িতেই যাব।'

সুজিত বোধহয় বিশ্বাস করলে না। যদি আমি যাব বলেও না যাই? বললে, 'না না তাই আবার হয় নাকি? নিজের গাড়িতে কেন যাবি? তোর একটা সম্মান নেই? ওরা গাড়ি নিয়ে আসবে, সসম্মানে নিয়ে যাবে, আবার বাড়িতে পৌঁছে দেবে। পাঁচটার সময় তুই তৈরি হয়ে থাকবি।'

বললাম, 'থাকবো।'

'তোর সভাপতির ভাষণে কিন্তু আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হবে।'

বললাম, 'করবো।'

আমার সম্মতি নিয়ে হাসতে হাসতে সুজিত চলে গেল।

আমার কিন্তু দুর্ভাবনা বাড়লো। সুজিতের সম্বর্ধনা-সভায় আমাকে অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হবে। সব চেয়ে বড় মিথ্যা—বলতে হবে—

আমি সুজিতকে চিনি।

"খুঁজে দেব" না "খুঁজে নেব?"

[দুই]
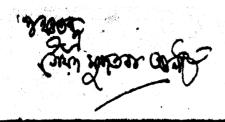
গান্ধবরূপা ছদ্মবেশিনী প্রতিমা দেবী 'বিজয়ার' যে - বর্ণনা দিয়েছেন, সেইটিই আমি গুরুদেবের আপন কণ্ঠে শুনেছি। অবশ্য তিনি সেটা জানতে পারেননি। ......এতদিন পরে আমার আর ঠিক মনে নেই, কোন্ উপলক্ষে আমি উত্তরায়ণ গিয়েছিলুম। ঐ সময়ে গুরুদেব তাঁর পরিচিতদের কাছে লেখা তাঁর সব চিঠি চেয়ে পাঠান এবং আমাকে সেগুলো নকল করতে আদেশ দেওয়া হয়। এই গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ আদৌ প্রশংসাসূচক নয়। বস্তুত 'মন্দ্রটং' কপি করার জন্য জড়ভরত নকলনবীশ নিযুক্ত করাই শাস্ত্রানুশাসন—চিন্তাশীল তীক্ষ্ণধীজন মূল পাঠ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে বলে পদে পদে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়; ফলে নকল কর্মের গতিবেগ ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত, রুদ্ধ হয়।

আমি সচরাচর উত্তরায়ণের পিছনের সংকীর্ণ পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা প্রশস্ততর মনে করতুম—হঠাৎ সম্মুখীন হয়ে কবির ধ্যানভঙ্গ করাটা যুগপৎ অসমীচীন ও বিপজ্জনক। 'পত্রগুচ্ছ' ও কপি নিয়ে পা টিপে টিপে থামের আড়াল থেকে সঙ্গোপনে তাকিয়ে দেখি গুরুদেব খুশ-মেজাজে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের সঙ্গে দিল-খোলা বিস্রম্ভালাপ করছেন—বলা বাহুল্য আমাদের সঙ্গে তিনি এভাবে কথা বলতেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা বলাও অবাহুল্য যে আমার পক্ষে এই অর্ধানিচ্ছাকৃত আড়ি পাতাটা ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছিল, কিন্তু আমার তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

গুরুদেব তখন সোৎসাহে বলে যাচ্ছেন—'দুর্ভাগ্যক্রমে আমি উপাখ্যানের পূর্বাংশ শুনতে পাইনি, ভদ্রা সুভদ্রা যে রকম অর্জুনোপাখ্যানের উত্তর খণ্ড নিদ্রালুতাবশত শুনতে পাননি— "......ভিকটোরিয়া বললেন, 'কাটো দরজা, ঢোকাও আরামচেয়ার।' (১) মিস্ত্রি ভয়ে ভয়ে বললে, 'মাদাম, কাপতেনের আদেশ ভিন্ন—' ভিকটোরিয়া বললেন, 'বোলাও কাপতেন কো।' কাপতেন এসে আপত্তি জানাতে আর যাবে কোথা! ভিকটোরিয়া রেগেমেগে তখন যা ছাড়তে লাগলেন বাক্যবাণ, সে আর কিছুতেই থামতে চায় না—একে রমণী, তায় হিসপানি (২) তার কথার তোড় থামায় কে? আমি স্প্যানিশ ভাষা জানিনে, ক্ষিতিবাবু, কিন্তু রসগ্রহণে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। ......সে দাপটে কাপতেন বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারেননি; মিস্ত্রির দিকে ইশারা দিয়ে মাদামের আদেশমত কাজ করতে বলে পালালেন।"

ফেরার পথে আমার মাথায় হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এটা ১৯২৫/২৬-এর কথা। গুরুদেব আরজেনতীনা থেকে ইতালি হয়ে আশ্রম ফিরেছেন। 'পূরবী' বেরিয়েছে। উৎসর্গে লেখা আছে 'বিজয়ার করকমলে'। কিন্তু এই বিজয়াটি কে? যাকে শুধোই, কেউ বলতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, আমি তখন গুরুদেবের লেখা চিঠি নকল করছি। কোনো বিজয়াকে লেখা তাঁর চিঠি তো তার মধ্যে নেই।...তখন অকস্মাৎ হৃদয়ঙ্গম করলুম, 'বিজয়া' সরাসরি 'ভিকটোরিয়া'-র বাঙলা অনুবাদ!......এর বহু বৎসর পর, কবির পরলোকগমনের পর প্রতিমাদেবীর পুস্তিকায় বিজয়ার প্রকৃত পরিচয় বেরোয় ও ঐ সময়ে (১৯৪২) রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে পূরবী অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানে ফোটো বেরোয় 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়া'-র।(৩)

বিজয়া অসাধারণ রমণী। পরবর্তীকালে মার্কিন 'টাইম' সাপ্তাহিকে আমি তাঁর প্রৌঢ় বয়সের ফটো দেখেছি। যতদূর মনে পড়ে তিনি জাতিসঙ্ঘে (ইউ, এন) আপন দেশ আরজেনতীনার প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন। বহু বৎসর ধরে তিনি সম্পাদিকারূপেও আপন অর্থে স্প্যানিশ ভাষায় একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক বের করেন ও রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' শিরোনামে একটি অতুলনীয় অনবদ্য প্রবন্ধ লেখেন। যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এটির অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।(৪) রবীন্দ্রসদনে এটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

গোটা আরজেনতীনাতে বিজয়ার কতখানি শক্তিশালী প্রভাব সেটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করলুম, ১৯৬১ সালে, যখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উৎসব আরম্ভ হয়েছে। শান্তিনিকেতন ডাকঘরের মাস্টারবাবু আমাকে একখানা চিঠি দেখালেন। কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ যদিও তখন দেরাদুনে, চিঠিখানা এসেছিল শান্তিনিকেতনেরই ঠিকানায় তাঁর নামে। ঐ সময়ে এদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিসহ যে স্ট্যাম্প বেরিয়েছিল, সেই স্ট্যাম্প এই চিঠিতে সাঁটা। আমি মাস্টারবাবুকে বললুম, 'এতে আর কি নূতনত্ব?' তিনি মৃদু হাস্য করে বললেন, 'ভালো করে স্ট্যাম্পটি দেখুন।' তখন দেখি, স্ট্যাম্পের উপরে ভারতের বদলে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা আরজেন্তীনা!

ঐ সময় অন্য কোনো দেশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিসহ স্টাম্প বের করেছিল কি না আমার জানা নেই।(৫) আরজেনতীনা করেছিল। পরে খবর নিয়ে জানলুম, বিজয়ার প্রস্তাবে। এবং তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন যে, তাঁরা স্ট্যাম্পে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো প্রতিকৃতি বাছাই না করে ভারতবর্ষ যে প্রতিকৃতি ছাপাবে তাঁরা সেটিই ছাপাবেন। জাতিসঙ্ঘ বা রেডক্রসের

---

(১) বলা নিষ্প্রয়োজন আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বয়ানটি রিকনসট্রাকট করছি।

(২) তুলনীয়ঃ 'একটু ও তো দেয় না আভাস এইদেশি ইস্পানি।' (পূরবী, পৃ ১৯০) 'এইদেশি ইস্পানি' অর্থাৎ ইয়োরোপের খাঁটি স্পেন (ইস্পানি) দেশের নয়, আরজেনতীনার স্প্যানিশ। আরজেনতীনার নাম লাতিন বা স্প্যানিশ আমেরিকাও বটে।......দিনেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি (তাঁকে লেখা 'চিঠি') যখন আদিকুটিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনান, তখন—আমার স্পষ্ট মনে আছে—তিনি উচ্চারণ করেন, হিস্পানি এবং খুব সম্ভব 'প্রবাসী'তেও ঐ বানান করা হয়। স্পেনের প্রাচীন লাতিন নাম হিসপানিয়া: ওদিকে ইরানে ইসপাহান, ইসফাহান শহর আছে। দুটোতে যাতে করে গোলমাল না হয় তাই উরদু ইত্যাদি ভাষাতে স্পেনকে হিসপানীয়াহ (ও ইসপেন) বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ হিসপানি কোনো উরদু-ভাষীর মুখে শুনে থাকবেন।

(৩) র র চতুর্দশ খণ্ড পৃ ১০৫।

(৪) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরেকখানি অত্যুত্তম পুস্তিকা লিখেছেন প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব উইনটারনিৎস—রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে—জর্মনে। এটিরও অনুবাদ হওয়া উচিত।

(৫) কোনো ডাকটিকিট-সংগ্রহী যদি সাচ্চা খবর আমাকে জানান, তবে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অনুরোধে ভিন্ন ভিন্ন দেশ একই স্ট্যাম্প (অবশ্য দেশের নাম ভিন্ন ভিন্ন থাকে) ছাপায় শুনেছি, কিন্তু দুই বহু দূরে অবস্থিত দুটি দেশ একই ছবি ছাপালো এরকম ধারা কখনো শুনিনি। এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু বিজয়ার দ্বারাই। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, আপন দেশে তার কতখানি শক্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ছিল।(৬)

বিজয়াকে উৎসর্গ করে যখন বিশ্বভারতী পূরবী প্রকাশ করলেন, তখন আমার মত নগণ্যজন সাহস করে গুরুদেবকে শুধোতে পারেনি, বিজয়াটি কে, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গজন, বিশেষ করে তাঁর 'শিষ্যরা'—যাঁদের ভিতর কলহের অন্ত ছিল না, এমন কি এখনো তার অন্ত দিগন্তেও খুঁজে পাচ্ছিনে(!), তাঁরা নিশ্চয়ই 'রণাঙ্গণে' আরেকটি 'প্রাণী'র আবির্ভাবে, যাঁকে কি না 'পূরবী'র মত যুগান্ত সৃষ্টিকারী একখানা কাব্য উৎসর্গ করে যেন বিজয়শঙ্খ (অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে নামও দৈবাৎ বিজয়া) বাজিয়ে কবি অভ্যর্থনা করলেন, নিশ্চয়ই শঙ্কিতা হয়েছিলেন—অবশ্যই কবিকে এ-প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন। উত্তরে কবি তাঁর পরের কাব্য 'মহুয়া' যখন প্রকাশিত হল, তার উৎসর্গে তাঁর শিষ্য, শিষ্যা তথা সর্বজনের জন্য গাইলেন;—

"শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।" ইত্যাদি।

ভিকটোরিয়া যে অত্যন্ত তেজস্বিনী নারী (তিনি এখনো বেঁচে আছেন কি না, জানিনে, বেঁচে থাকলে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু সহস্রায়ু করুন) সে বিষয়ে স্বয়ং গুরুদেব একাধিক উদাহরণ পেয়েছিলেন। প্রতিমা দেবী লিখছেন, "বাবামশায় দক্ষিণ-আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন—'যদি বা (এটা গুরুদেবের বাচনিক) ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিকটোরিয়া আমাকে কিছুই ছাড়তে চায় না। সাহেবের (গুরুদেব সখা এবং শিষ্য ইংরেজ এলমহার্স্ট্—শ্রীনিকেতন স্থাপনে ইনিই প্রচুর অর্থ ও শ্রম দিয়ে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী—তাঁর সঙ্গে সেকরেটারিরূপে আরজেনতীনা গমন করেন) সঙ্গে তার ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে; গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে।'" এর পরের অংশ পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি।

১৯২১/২২ থেকে এলমহার্স্টের সঙ্গে এ-লেখকের পরিচয়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১-র ভিতর কোনো এক সময়ে এলমহার্স্ট বহুদিন পর একবার শান্তিনিকেতন আসেন। কথায় কথায় আরজেনতীনা প্রসঙ্গ উঠলে আমি শুধালুম "মাদাম ওকাম্পো—?"

বাধা দিয়ে সায়েব আকাশ পানে মাথা তুলে যেন আল্লা রসুলকে স্মরণ করে শিউরে উঠে বললেন, "ও লর্ড! হোয়াট এ উম্যান্! একদিন আমরা দুজনা সান ইসিদ্র (বিজয়ার বাড়ি) ফিরছি—ওকাম্পো মোটর চালাচ্ছেন—এমন সময় গুরুদেবের আসন্ন আরজেনতীনা ত্যাগ সম্বন্ধে কথা উঠলো। তারপর অল্পস্বল্প বাদানুবাদ। হঠাৎ ওকাম্পো গাড়ি থামিয়ে, দরজা খুলে ধাক্কা মেরে আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। আমি ধস্তাধস্তি করলে যে বসে থাকতে পারতুম না, তা নয়, কিন্তু একজন লেডির সঙ্গে...। অতি নির্জন রাস্তা। যানবাহন বা বাস্ চলাচল নেই। আমাকে ঝাড়া চোদ্দটি মাইল হেঁটে সান ইসিদ্র ফিরতে হল। এ স্প্যারিয়াস উম্যান্!"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

(৬) স্মৃতিশক্তিকে জাহান্নমে পাঠিয়ে (৫ নবেম্বরের 'দেশে' আলোচনা-বিভাগ পশ্য) বেহায়ার মত বলছি, যেন মনে পড়ছে তখনকার দিনের ফ্রানসের গ্রাঁ ম্যাৎর বৃদ্ধ আনাতোল ফ্রাঁনসও আরজেনতীনাতে গিয়ে এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। ফল কিন্তু শেষটায় তিক্ততায় ভরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের যে দৈব চরিত্রবল ও সংযম গুণ ছিল ফ্রাঁসের তার শতাংশের এক অংশও ছিল না।

এই গায়েমাখা সৌন্দর্য সাবানটি বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত করা হলেও আপনার পছন্দসই এই সাবানটি এখন ভারতেও পাওয়া যাচ্ছে !
গোদরেজ স্যাণ্ডল···অপরূপ বৈশিষ্ট্যময়, প্রাণমাতানো সুগন্ধে ভরা আর বিশুদ্ধ মহীশূর চন্দন তেলে সমৃদ্ধ··· অন্যান্য সব সাবানের তুলনায় বেশ বড় আর অনেকদিন টেঁকে। আপনিও আজ থেকে এটি ব্যবহার করুন। এর মনোরম সৌরভ আপনার মনে আনবে খুশির জোয়ার !
গোদরেজ স্যাণ্ডল—
সকলের ব্যবহারের উপযোগী প্রসাধনী
এখন
পাবেন নতুন
গোদরেজ
স্যাণ্ডল
Sandal
LUXURY SOAP
Godrej
গোদরেজ সব
সাবানের সেরা

নুন আর রাজবন্দী

তাবং রাজনৈতিক নেতা যখন ভারতভাগ্য-নির্ধারণের আলোচনায় নিমগ্ন, গান্ধীজী তখন ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীদের দিয়ে আরও কিছু কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতার লগ্ন প্রায় সমাগত; অথচ স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই বহু সৈনিক তখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিনযাপন করছেন। গান্ধীজী তাঁদের কথা ভুলে যাননি। ভুলে যাননি দরিদ্র জনসাধারণের কথাও। গরিব মানুষরা যাতে বিনা-শুল্কে নিজেদের নুন নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে, তার জন্য তিনি দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। দিল্লিতে যখন অষ্টপ্রহর রাজনৈতিক আলোচনা চলছে, নুনের প্রশ্নটা তখনও তাঁর মনে ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্যে দিল্লিতে এসে গান্ধীজী আমাকে দুটি কাজের ভার দিলেন। প্রথমত, ভাইসরয়ের আপত্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানে ভারত-সচিবকে রাজী করাতে হবে। দ্বিতীয়, সুদিন যে আসন্ন, ভারতবাসীকে তার একটা প্রতীকী অভাসদানের জন্য ভাইসরয়কে দিয়ে লবণ-শুল্ক রদ করাবার ব্যাপারে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়াতে হবে।

ইতিপূর্বে গান্ধীজী যখন বাংলায় গিয়েছিলেন, কলকাতায় ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের বিভিন্ন কারাগারে তিনি তখন রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা গভরনর কেসিই করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তখন কেসিকে বলেছিলেন যে, রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। মিঃ কেসি সে-অনুরোধ ফেলতে পারেননি। জানুয়ারি মাসে তিনি ৪১ জন বিশিষ্ট নিরাপত্তা-বন্দীকে মুক্তি দেন; ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি দেন ৫১ জনকে। তখনও যাঁরা কারাগারে রয়ে গেলেন, তাঁদের মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা চালাবার ভার আমাকে দেওয়া হল। মিঃ কেসির পরে সার্ ফ্রেডারিক বারোজ বাংলার গভরনর হয়ে আসেন। বন্দীমুক্তির জন্য তাঁকে আমি ক্রমাগত অনুরোধ করতে লাগলাম। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজী আমাকে পুনায় ডেকে পাঠান। সেখানে ডঃ দিনশা মেটার নেচার কিওর ক্লিনিকে তিনি তখন নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। বাংলার নতুন গভরনরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিঃ বারোজকে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন; তারপর আমার হাতে সেই চিঠিখানি তুলে দিয়ে বললেন যে, গভরনরের হাতে আমাকেই সেটি পৌঁছে দিতে হবে এবং তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। গান্ধীজীর সেই চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টৌড়িওয়ালা, রোড, পুনা,
১০ই মার্চ, ১৯৪৬

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পূর্ববর্তী গভরনর মিঃ কেসি আপনার জন্য কিছু কাজের দায়িত্ব রেখে গিয়েছেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের বাদবাকী রাজবন্দীদের সম্পর্কে আপনাকেই যা করবার করতে হবে।

আপনার কাজের এই সূচনাপর্বেই আপনাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা আমার নেই। তবু যে করতে হচ্ছে তার কারণ, দমদম জেলের বিশিষ্ট বন্দীদের কাছ থেকে সদ্য আমি একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। মন্তব্য হিসেবে আমি শুধু এইটুকু বলছি যে, সন্দেহের বশে—তা সেই সন্দেহ যতই প্রবল হোক্ না কেন—এঁদের বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখাটা খুবই শোকাবহ ব্যাপার। বস্তুত এ এক কলংকজনক ঘটনা। আমার বিবেচনায়, সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এঁদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া উচিত।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

হিজ্ এক্সেলেন্সি সার্ ফ্রেডারিক বারোজ,
গভরনর অব বেংগল,
কলকাতা।

দমদম সেনট্রাল জেলের বিশিষ্ট রাজ-বন্দীদের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলেন গান্ধীজী, বারোজের কাছে সেটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন। রাজবন্দীদের চিঠিখানিতে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ আর শ্রীভূপেন দত্তের স্বাক্ষর ছিল। সহকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁরা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে একদা তাঁদের আস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তাঁরা পরিহার করেছেন এবং সহিংস আন্দোলন সংগঠনের জন্য চেষ্টা করবার ইচ্ছাও তাঁদের নেই।

এ-কথা বলায় তাঁদের মুক্তি দাবি করা গান্ধীজীর পক্ষে আরও সহজ হল। চিঠিখানি এই :

দমদম সেনট্রাল জেল,
১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৬

"মহাত্মাজী,

আপনার মুক্তিলাভের পর থেকেই বাংলায় আসবার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলা আজ আপনার সস্নেহ যত্ন চায়। শেষ পর্যন্ত, সুযোগ মিলবামাত্র, আপনি বাংলা দেশে এসেছেন, এবং আমরা আশা করছি যে, বাংলাদেশও আপনাকে তার শ্রেষ্ঠ অভ্যর্থনা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। শারীরিকভাবে আমরা যে সেই অভ্যর্থনায় যোগ দিতে পারিনি, তার জন্য আমরা দুঃখিত।

আপনাকে আমরা আমাদের আনুগত্য নিবেদন করছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আনুগত্য জানাচ্ছি আপনার আদর্শ ও কর্মপন্থার জন্য। সেইসঙ্গে জাতির নেতা হিসাবেও আপনাকে আনুগত্য জানাই। গত তিন-চার বছরে জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে অনেক পরীক্ষা, সংগ্রাম ও যন্ত্রণার ঝড় বয়ে গিয়েছে। তদুপরি এরই মধ্যে স্বজন-বিয়োগের দুঃখও সইতে হয়েছে আপনাকে। জাতি যেমন আপনার সঙ্গে জাতীয় দুঃখ-অপমান সহ্য করেছে, তেমনি আপনার স্বজন-বিয়োগের দুঃখেরও সে ভাগ নিয়েছে।

এবারে আমাদের ব্যক্তিগত কথায় আসি। কংগ্রেস যখন সংকটের সম্মুখীন তখন ব্যাপক ও গভীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের দায়িত্ব ভার আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের সামর্থ্য অল্প, সময়ও আমরা কম পেয়েছিলাম। তাতে করে কংগ্রেস-সংগঠনের কাঠামোটাই আমরা বাঁচাতে পেরেছি মাত্র; সুনির্দিষ্ট কাজের বিচারে বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। এর বছর খানেক আগে, এক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে, যুগান্তর পার্টিকে আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম; অতঃপর বিনা শর্তে আমরা কংগ্রেসে যোগ দিই। তবে কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও কার্যসূচীর খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে তখনও আমাদের সংশয় ছিল। আমরা যখন দেখলাম যে, হয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার আমাদের নিতে হবে, আর নয়ত নিখিল ভারত কংগ্রেস থেকে বাংলা দেশ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাবে, তখন কিছুক্ষণ আমরা দ্বিধায় দুলেছি। আমাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে তখন আলোচনা করেছি আমরা। লিখিতভাবে তাঁকে জানিয়েছি, কংগ্রেসের গৃহীত নীতির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কতটুকু। আপনার কাছে এবং ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের কাছে সেই বিবৃতির নকলও আমরা পাঠিয়েছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটীতে সেই বিবৃতি আলোচিত হয়; অতঃপর আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য মৌলানা সাহেব আমাদের অনুরোধ করেন।

সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা কাজ শুরু করলাম। যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের নীতি যে-পথে অগ্রসর হয়, বিশেষ করে তারই দরুন আমাদের সংশয় ও পার্থক্য দূরীভূত হল। কিন্তু ১৯৪১ সনের মে মাসে আমরা কারারুদ্ধ হলাম। অতঃপর জাপানী আক্রমণ, স্বয়ংভরতা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচী, অগস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ—যুদ্ধের জের ইত্যাদি নানা ঘটনার ফলে আমরা আপনার আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আপনার কর্মসূচী আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আমরা যখন কারারুদ্ধ হই, তার ঠিক পরেই আপনার সঙ্গে
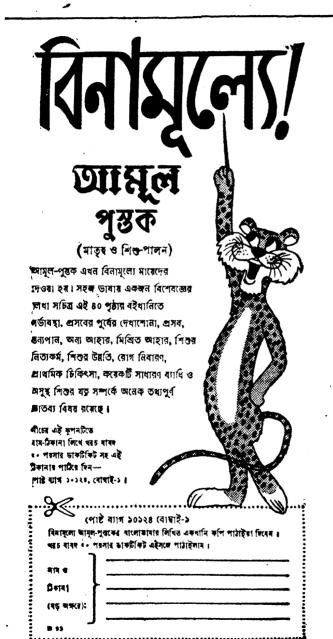
আমাদের পত্রবিনিময় হয়েছিল। আপনি তখন লিখেছিলেন, "অহিংসার আদর্শকে যে আপনারা অংশত গ্রহণ করেছেন, এইটুকু মেনে নিতেও আমার কিছুমাত্র অসুবিধে নেই। সংভাবে যদি এর প্রয়োগ হয়, তাহলে এই আংশিক বিশ্বাসই আপনা থেকে আরও প্রসারিত হবে।" আজ আমরা বলতে পারি যে, আপনার অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করতে আর কোনও অসুবিধা আমাদের নেই। এই আদর্শ যে শুধুই ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা, তা নয়; নগ্ন হিংসার ভিত্তিতে যে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, তার কবল থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবারও এটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার আপনার অহিংসা ও গঠনমূলক কর্মক্রমই (গ্রামীণ মানুষ ও নিপীড়িতের সেবাই যার প্রাথমিক লক্ষ্য) হচ্ছে সেই পথ, একমাত্র যার মাধ্যমে দাসত্ব ও দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা যাবে।

মার্ক্‌স্‌-এর পথের পথিক ছিলাম আমরা। আজ আমরা আপনার কাছে এসে উপনীত হয়েছে। মানবিক ইতিহাসে মার্ক্‌স্‌-এর অবদান যে স্মরণীয় এ-কথা অনস্বীকার্য। তবে যেখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের জন্য তাঁর কর্মপন্থা তিনি বিবৃত করেছিলেন, ইতিহাস তো সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই। কথাটা আপনার পছন্দ না-হতে পারে, তবু বলি, আপনাকে আমরা মার্ক্‌স্‌-এরই স্বাভাবিক পূর্ণ-পরিণতি হিসাবে দেখেছি। সর্বস্থানে ও সর্বকালে প্রযোজ্য কতকগুলি অপরিবর্তনীয় বিশ্বাসের তিনি জনক, মার্ক্‌স্‌কে নেহাত এইভাবে আমরা দেখিনি। পরন্তু মনে করেছি যে, ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে কর্মপন্থা নির্ণয়ের যে নীতি—তিনি তারই প্রবক্তা। এবং এইভাবে দেখবার ফলেই আপনাকে তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

১৯২১ সন থেকে কংগ্রেসে আছি আমরা; কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করছি। তবে বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় একটি মতাদর্শের প্রতিও আমাদের অনুরক্তি ছিল। সে-অনুরক্তি কখনও সুপ্ত থেকেছে, কখনও প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সনে সেই দ্বিতীয় অনুরক্তির আকর্ষণ আমরা কাটিয়ে উঠি, এবং একমাত্র কংগ্রেসের মাধ্যমেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকি। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আপনার নীতি ও কর্ম-সূচীই অভ্রান্ত, তাকেই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, সাম্প্রদায়িক উপাদানকে প্রশ্রয় না-দিয়ে, অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুগত্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে একটি সুদৃঢ় সংগঠনে পরিণত করতে হবে। আমাদের ধারণা, এমনটা না-করা হলে অন্তত বাংলাদেশে সত্যিকারের কংগ্রেসী কাজ করা শক্ত হবে। বাংলাদেশে তো দলের অন্ত নেই।

জাতিকে জাগিয়ে তুলবার ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বাংলা অনেক কাজ করেছে। সেই অতীত ঘটনার জন্য বাংলার যুবচিত্তে কিছু গোপন গর্ববোধ ছিল। যার পালা চুকে গিয়েছে, আমাদের কর্মীরা অনেক সময় তাকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। ফলে আমাদের কাজের অসুবিধে হত। গৌরবময় অগস্ট অভ্যুত্থান ও ভয়াবহ মন্বন্তরের পরে আমাদের মনে হল যে, এক নূতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। সত্যিকারের কংগ্রেসী কাজ যাতে করা যায়, এমন একটা অনুকূল পরিবেশের জন্য আমরা তখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। কারামুক্ত হয়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা যে-সব বিবৃতি দিলেন, তাতেও আমাদের প্রত্যাশা আরও বল পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, ঘটনা আবার অন্য পথে মোড় নিয়েছে, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবাস্তব রোমান্টিকতাই তাতে আবার নতুন করে প্রশ্রয় পাচ্ছে। প্রকৃত তথ্যকে বিচার করে দেখা হল না, ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হল; চাপা দেওয়া হল প্রকট ব্যর্থতাকেও। এমন কী, শীর্ষস্থানীয় নেতারাও তাল সামলাতে না-পেরে অপ্রত্যাশিত নানা উক্তি করে বসলেন। সম্ভবত আপনি তাঁদের সাবধান করে দিয়েছেন। যাই হোক, সম্প্রতি আপনি বাংলা দেশে এসেছিলেন; তখন আশা করি দেখতে পেয়েছেন যে, আবহাওয়া আগের তুলনায় অনেক নির্মল। বিশেষত, মন্বন্তরের পরে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে গঠন-মূলক কর্মসূচী অনুযায়ী এখানে কাজ করতে খুবই সুবিধা হবে। অতীতের নাগ-পাশ থেকে মুক্ত হবার এই যে শুভলগ্ন, একে ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না বলেই আমরা আশা করি; এবং এও আশা করি যে, আপনার ১৮-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনসাধারণকে যাতে সংগঠিত করা যায়, আপনারই প্রেরণায় ও নির্দেশে তার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হবে।

আমাদের পরবর্তী সমস্যা সাম্প্রদায়িক। আপনার নীতির ব্যাখ্যাকে ঘুলিয়ে দেবার ফলে এক্ষেত্রেও অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়েছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা মেনে নেওয়া এবং সেবার মাধ্যমে জনসাধারণকে তার জন্য তৈরি করাই হচ্ছে পাকিস্তান-প্রস্তাবকে প্রতিরোধ করবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ১৯৩৪-৩৭ সনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে যে অবাঞ্ছনীয় খেয়োখেয়ি চলেছিল, তাতে বাংলা দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমরা আশা করি, ভারত জুড়ে এখন আবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না।

উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম, মুক্তিলাভের পরে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা কাজ করে যাব। এখানে কাজ শুরু

করবার আগে কিছুদিন আপনার কাছে থাকতে চেষ্টা করব। আপনার পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েই ভবিষ্যতে কাজ করব আমরা। আমরা আশা করি. বাংলা দেশ এবারে ক্রমবিবর্তনশীল সেই গান্ধীকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারবে. অসাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার মূল ভিত্তির উপরেই যাঁর বিবর্তন ঘটছে।

উপসংহারে আমাদের এই বন্দী-দশা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সরকার থেকে যে সন্ত্রাসবাদের অজুহাত দেখানো হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা গ্রেপ্তার হবার আগেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ নাজিমুদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পুলিস-রিপোর্টের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন. এবং বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের কাজ ছাড়া অন্য-আর কিছুই আমরা করছি না বলে তিনি খবর পেয়েছেন। এ হল আমরা গ্রেপ্তার হবার মাত্র দু মাস আগের ঘটনা। ১৯৪৩ সনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তিনি আইন-সভায় প্রায় এই একই রকমের বিবৃতি দেন। এই যে সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তোলা হয়েছে, এটা আর কিছুই নয়, পুলিসের একটা চালাকি। এর দ্বারা তাদের

দুটি মতলব হাসিল হবে। প্রথমত, জনসাধারণের কাছে আমাদের একটা মিথ্যা ছবি তুলে ধরা হবে, এবং তার ফলে আমাদের কাজের অসুবিধে ঘটবে। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা এইরকমের একটা ধারণা সৃষ্টি করা হবে যে, সন্ত্রাসবাদী দলগুলি এখনও সক্রিয়। তার ফলে সৎ অথচ সরল যুবকরা বিভ্রান্ত হতে পারে। কংগ্রেসী কার্যসূচীকে বিঘ্নিত করবার জন্যই, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আপন মতলব হাসিল করবার উদ্দেশ্যে, এইভাবে একটা ভুয়া সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়া জিইয়ে রাখতে চাইছে। কংগ্রেসী কার্যসূচীকে এরা এইজন্য বিঘ্নিত করতে চায় যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তথা ভারত সরকারের চক্রান্তে যে পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট কাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে, এই কার্যসূচী তার মূলেই আঘাত হানতে চায়। বস্তুত, ১৯৩৪ সনের পরে বাংলা দেশে একটিও সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেনি। আজ এতদিন বাদে আমরা সন্ত্রাসবাদের কথা ভাবছি, কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভাবছে, এ-কথা বললে শুধু আমাদের বুদ্ধিকেই নয়, আমাদের দেশপ্রেমকেও অবমাননা করা হয়।

আন্তরিকভাবে আপনার
অরুণচন্দ্র গুহ
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
ও বন্ধুবর্গ

কলকাতা ছাড়বার আগে মিঃ কেসি আমাকে তাঁর পরবর্তী গভরনর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ হিসেবে বারোজ ছিলেন কেসির ঠিক বিপরীত। কেসি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিবিদ; এককালে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন; রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর বিচক্ষণতা ছিল অসামান্য; কেমব্রিজে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন; তদুপরি অস্ট্রেলিয়ার ধনী শ্রেষ্ঠদের তিনি অন্যতম। সেক্ষেত্রে ফ্রেড বারোজ তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন ইনজিন-ড্রাইভার; পরে ব্রিটিশ রেলকর্মী ইউনিয়নের তিনি চেয়ারম্যান হন। অ্যাটলি সরকারের অনেকেই ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, শ্রমিক সরকার তাঁদের অনেককেই নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেন। ফ্রেড বারোজ 'নাইট' উপাধি লাভ করলেন, এবং বাংলা দেশের গভরনর করে তাঁকে পাঠানো হল। তিনিই হচ্ছেন বাংলার শেষ ব্রিটিশ গভরনর। ফ্রেড ছিলেন খাঁটি মানুষ, বিনয়ী। পূর্ববর্তী গভরনরের খ্যাতির দীপ্তিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব অবশ্য কিছুটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই তিনি অকপটে আমাকে বলেন যে, কেসির সঙ্গে আমার যেমন সম্পর্ক ছিল, তাঁর সঙ্গেও যদি আমি তেমন সম্পর্ক রাখি তো তিনি খুশী হবেন। কথাটা শুনে আমার ভাল লেগেছিল। আমাকে এবং আমার মাধ্যমে গান্ধীজীকে, খুশী করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। গান্ধীজীর চিঠি পাবার দিন কয়েক বাদে তিনি তার এই উত্তর দিলেন :

গভর্নমেন্ট হাউস, কলকাতা,
১৬ই মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনাকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবার জন্যই এই ছোট্ট চিঠি। সুধীর ঘোষের সংগে আজ সকালে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মিঃ কেসির সংগে আপনার আলোচনার সূত্রে তাঁকে আপনি যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, তাতে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সে-বিষয়ে আমাদের যা বক্তব্য, সুধীর ঘোষকে তা আমি সবিস্তারে জানিয়েছি।

আমাকে আপনি যে চিঠি লিখেছেন, শিগগিরই তার উত্তর দেব। রাজবন্দীদের সম্পর্কে সর্বশেষ অবস্থা তাতে আপনাকে জানানো হবে।

মার্চ মাসের শেষাশেষি যে অবস্থা দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে সুধীরই আপনাকে জানাবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এফ বারোজ"

এর তিন দিন বাদে গভরনর বারোজ তাঁর দ্বিতীয় পত্র লেখেন। রাজবন্দীদের মুক্তিদানের কাজ কেমন এগোচ্ছে, এতে সে-কথা উল্লিখিত হয়েছিল।

গভর্নমেন্ট হাউস,
কলকাতা,
১৯শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

শনিবার দিন সুধীর ঘোষ আমার সংগে দেখা করেছিলেন। মিঃ কেসির কাছে যে-সব বিষয় আপনি উত্থাপন করেছিলেন, সে-সব বিষয়ে কাজ কেমন এগোচ্ছে, কথাপ্রসংগে সুধীর ঘোষকে তা আমি জানিয়েছি। তবে, আমার মনে হয় যে, আমার কাছে আপনার ১০ই মার্চ তারিখের চিঠিতে আপনি যে-বিষয়ের কথা বলেছেন, তাতেই আপনার আগ্রহ সবচাইতে বেশী। সেই বিষয়েই এই চিঠি লিখছি।

আপনার চিঠিতে রাজবন্দীদের কথা বলা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী গভরনরের নীতিই অনুসরণ করে যাচ্ছি। তবে আমার পক্ষ থেকে সঙ্গতভাবেই দাবি করা চলে যে, এ-বিষয়ে আমি দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। তার প্রমাণ এই যে, যে-সব রাজবন্দীকে খুবই বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয়, একমাত্র তাঁরাই এখনও আটক আছেন, আর কেউ আটক নেই। মার্চ মাসের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে ৬১ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১৫ই মার্চ তারিখে বন্দী-সংখ্যা ছিল ১১৫। বর্তমান মাসের শেষ নাগাদ এই সংখ্যাকে আরও অনেক কমিয়ে আনা হবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এফ বারোজ"

এম কে গান্ধী এস্কোয়্যার,
নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টোড়িওয়ালা রোড,
পুনা

ইনজিন ড্রাইভারের পদ থেকে গভরনরের আসনে উন্নীত সরলমনা এই মানুষটির কাছ থেকে এইরকমের সাড়া পেয়ে গান্ধীজী খুশী হলেন, এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার কাজ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে যে তিনি কতটা আনন্দিত, সে-কথা জানিয়ে তাঁকে লিখলেন :

নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টোড়িওয়ালা রোড, পুনা,
২২শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

শ্রীসুধীর ঘোষের মারফতে আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। তিনিই এ-চিঠি আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন; বন্দী, লবণ, ইলেকট্রিক করপোরেশনের কর্মী আর খাদি সম্পর্কে আমি এখন কী ভাবছি, তা তিনিই আপনাকে জানাবেন।

আপনাকে ও লেডি বারোজকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

হিজ একসেলেন্সি দি গভরনর অব বেংগল,
কলকাতা।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে তখনও যে-সব রাজনৈতিক কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছিল, তাঁদের—বিশেষ করে তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার—মুক্তির জন্য গান্ধীজী চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। লর্ড পেথিক লরেন্স ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স তখন দিল্লিতে। এ নিয়ে তাঁদের কাছে দরবার করবার ভার দেওয়া হল আমাকে। বলা হল যে, আমাকে গিয়ে ভারত-সচিবের কাছে কথাটা পাড়তে হবে, এবং রাজবন্দীদের মুক্তিদানে তাঁকে যেমন করেই হোক রাজী করাতে হবে। ঠাট্টা করে গান্ধীজী আমাকে
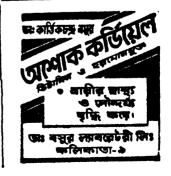
বললেন যে, এ-কাজে আমি যদি সফল হই তো তিনি আমাকে এর জন্যে একটি পুরস্কার দেবেন। কার্যত দেখা গেল, এ কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। লর্ড পেথিক লরেন্স আর স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে আমি বুঝিয়ে বললুম যে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা নয়াদিল্লি এসেছেন, তাতে যদি সফল হতে হয় তো দীর্ঘ দিনের বিরোধের স্মৃতিটাকে মুছে দিয়ে একটি শুভেচ্ছার আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে। কথাটা তাঁরা মেনে নিলেন। সমস্যা হল, ভাইসরয়কে কীভাবে রাজী করানো যায়। দীর্ঘ আলোচনার শেষে ভারত-সচিব আমাকে বললেন, "আপনি বরং এক কাজ করুন। গান্ধীজীকে দিয়ে আমার কাছে একটি চিঠি লেখান। আপনি আমাকে যা-যা এখন বললেন, সেই চিঠিতেও যেন সংক্ষেপে তা-ই বলা হয়। ব্যাপারটা নিয়ে তখন আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করব।"

শুনে তক্ষুনি আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে গেলাম, এবং তাঁকে দিয়ে এই চিঠি লেখালাম :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
২রা এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় লর্ড লরেন্স,

আমাদের উভয়েরই বন্ধু সুধীর ঘোষ আমাকে বললেন যে, যে-সব বিষয় নিয়ে তাঁকে আমি আপনার ও স্যার্ স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিলাম, আপনি সেগুলি আমাকে লিখে জানাতে বলেছেন।

কংগ্রেসী হোন আর না-ই হোন, স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষই আজ একটি বিষয় নিয়ে ভাবছেন। স্বাধীনতাকামী সেই মানুষেরা মূক জনতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। রাজবন্দীদের আশুমুক্তিই তাদের চিন্তার বিষয়। সহিংস কিংবা অহিংস, যে-আচরণের অভিযোগেই রাজনৈতিক কর্মীরা কারারুদ্ধ হয়ে থাকুন, তাঁদের প্রত্যেকেরই আজ মুক্তি কাম্য। ভারতবর্ষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, সকল পক্ষই তা আজ স্বীকার করেন; রাজবন্দীদের অতএব রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে আর এখন গণ্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আর ডঃ লোহিয়ার কথাই ধরা যাক। দুজনেই এঁরা শিক্ষিত, মার্জিতরুচি মানুষ; যে-কোনও সমাজই এঁদের মতন মানুষকে নিয়ে গৌরববোধ করতে পারে। এঁদের আটক করে রাখা নেহাতই হাস্যকর ব্যাপার। কাউকে আর এখন গুপ্তকর্মী ভাববারও কোনও অর্থ হয় না। জাতীয় সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকারই রাজবন্দীদের মুক্তি দেবেন, এই কথা ভেবে এখন যদি এ-ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকা হয়, তবে সেই নিষ্ক্রিয়তার অর্থ কারও বোধগম্য হবে না, কেউ সেটা পছন্দও করবে না। স্বাধীনতাও এর ফলে শ্রীহীন হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি জনজীবন-সংক্রান্ত। আমি লবণ-করের কথাই বলছি। এই কর-বাবদে যে রাজস্ব আদায় হয়, তা যৎসামান্য। কিন্তু জনসাধারণকে উৎপীড়িত করবার ব্যাপারে এই কর এমনই একটি অস্ত্র যার দ্বারা অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। লবণ বানাবার একচেটিয়া সরকারী অধিকার তাদের জীবনকে যদি বিড়ম্বিত করতে থাকে, জনসাধারণ তো তাহলে স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। এ-বিষয়ে আর যুক্তি দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। ভারতীয় জনমানসকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবার উদ্দেশ্যে যে-দুটি ব্যবস্থার কথা আমি ভেবেছি, তা জানালাম। এতে করে একটা মনস্তাত্ত্বিক সুফল পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত জানাই, ভিন্ন পরিবেশে এই দুটি ব্যবস্থা নিয়েই মিঃ কেসির সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, এবং বাংলা দেশের বর্তমান গভরনরের সঙ্গেও আমার পত্রালাপ চলছে। আরও জানাই যে, লবণ-কর সম্পর্কে মিঃ অ্যাবেলের কাছ থেকে আজ আমি খবর পেলাম যে, "সরকারের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।"

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

দি রাইট অনারেবল্ লর্ড পেথিক লরেন্স,
সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইনডিয়া,
নয়াদিল্লি।

অতঃপর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ মুক্তি পেলেন, এবং আগ্রা জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নয়াদিল্লির ভাঙ্গী কলোনিতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজীকে আমি পুরস্কারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা আদায় করে নিতে আর মনে ছিল না। ভারত-সচিব শুধু শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মুক্তির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সও তো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ; ভারত-সচিব তাঁকে বললেন যে তিনি যেন শ্রীনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেন, এবং আলোচনার ব্যাপারে তাঁর বন্ধুসুলভ পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ১৫ই এপ্রিল তারিখেই শ্রীনারায়ণের সঙ্গে দেখা করলেন স্যার্ স্ট্যাফোর্ড। ১৪ই এপ্রিল তারিখে রাজকুমারী অমৃত কাউরের কাছে লেখা তাঁর এক চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
রবিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় রাজকুমারী,

আমি আশা করেছিলাম যে, আজ সকালে কোয়েকার প্রার্থনানুষ্ঠানের পরে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। অনুষ্ঠানে আপনাকে দেখতে না-পেয়ে তাই দুঃখিত হয়েছি।

গান্ধীজী যে-সব বিষয়ের কথা বলেছেন, তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের হেতু আমরা বুঝি। এ-ব্যাপারে আমাদের যথাসাধ্য আমরা করছিও। তবে যা কিছুই করি, তা তো প্রশাসন-যন্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে, এবং প্রশাসন-যন্ত্র তো সর্বদা দ্রুত কিংবা সহজে চলে না। আগামী কাল নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলে আশা করছি। সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আজই করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আগে থাকতেই তাঁর আর-একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা হয়ে ছিল, তাই তিনি সময় করে উঠতে পারলেন না।

জর্জ রেকার ফিরে আসবামাত্র সুধীরের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার প্রতিশ্রুতির কথা আমার খেয়াল আছে।

চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি শিগগিরই আবার দেখা হবে, এবং তখন আমরা পরস্পরে সঙ্গে মত-বিনিময় করতে পারব।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স"

(ক্রমশ)

নতুন রেক্স জেলির প্যাকেট দেখে নিন!
REX
JELLY CRYSTALS
RASPBERRY
"টাটকা ফলের অপূর্ব আস্বাদটুকু ধরে রেখে বিশেষভাবে তৈরী নতুন, আরও চমৎকার রেক্স জেলি যখন আপনি পরিবেশন করবেন, তখন সবাই একই সুরে বলে উঠবে "আরো চাই, আরো চাই !"
রেক্স জেলি কেনবার সময় নতুন সুন্দর লেবেলযুক্ত আধুনিক প্যাকেট দেখে নেবেন। বিভিন্ন আস্বাদের প্যাকেট থেকে আপনার পছন্দমত আস্বাদ বেছে নিন— কমলা-লেবু, লেবু, চেরি, র‍্যাস্‌বেরি ; স্ট্রবেরি, আনারস। সবরকমের রেক্স জেলি ক্রিস্টালই সহজেই গরম জলে গলে যায় এবং ঠাণ্ডা হয়ে তাড়াতাড়িই বসে যায়— হাল্কা, চমৎকার সুস্বাদু, পুষ্টিকর ডেসার্ট হয়ে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সত্যিই ভাল… রোগ নিরাময়ের পর রোগীদের জন্যেও !
কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

এখানে আমার বেশী আগ্রহ ছিল দেবিকারানীর ছবি তোলা। তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর স্বামী রোয়েরিখ্ আর ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। গল্প করছিলেন ওঁরা। আমি ক্যামেরা তুলে ধরতেই তিনি যেন কিছু বললেন আমাকে। তাঁর কথায় তখন কান না দিয়েই ছবিটা আগে তুলে নিলাম। ভাবলাম পাছে ছবি তোলায় তিনি আপত্তি করেন!

কালিম্পঙে এক বৈকালিক চা-এর মজলিসে আমি উপস্থিত হয়েছি কিছু বিলম্বে। সেখানে অতি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়। আরে জানি রয়েছেন কারা কারা। মনে আছে সেদিন ওখানে গিয়ে দেবিকারানীকে প্রথম চাক্ষুষ দর্শনের পর অন্য কাউকে কেন জানি আর তেমন খেয়াল করিনি। দূরে থেকে দেবিকারানীকে দেখে তাঁর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র দাঁড়িয়েই তুলে ধরলাম ক্যামেরাটা।

দেবিকারানীকে দেখার আগ্রহ শত শত জনের মত আমারো ছিল বৈকি! চলচ্চিত্র জগতের প্রথম যুগেই অভিনয়ে শীর্ষ-স্থান অধিকার করেছিলেন, যিনি সেই 'মনকে চিঁড়িয়া বনমে বন্‌বন্—' গানে একদিন মাতিয়েছিলেন—তাঁকে এতদিন পর স্বচক্ষে দেখার এতটা আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। বিধাতা তাঁকে যতখানি রূপ আর গুণ দিয়েছেন, ততখানি শিক্ষা আর বংশ-মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তিনি। একটি ধারায় নেহরু যেমন সম্মানশীর্ষে, অপর একটি ধারায় দেবিকারানী শ্রেষ্ঠ আসনে।

ও'রা তিনজন হালকা-হাসির কথায় তখন মেতেছিলেন। কিছুটা সংযত হলেন আমি ক্যামেরা তুলে ধরতেই। রোয়েরিখ্ তাকালেন ক্যামেরার দিকে।

রোয়েরিখ্ আর দেবিকারানী। একজন রুশজাত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, আর অপরজন ভারতের রূপ-গুণ-যশসম্পন্না মহিলা। এঁদের দুজনের সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মন ছিল বলেই হয়ত এঁরা একসুরে মিলিত হবার পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। এখানে রুশ-বঙ্গ প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে, চিরন্তন সত্যকে মেনে নিয়ে দুটি প্রাণী মধুরতম জীবনযাপনে ব্রতী হয়েছেন। এঁরা কখনো বা কুলু-কাঙড়ার সৌন্দর্যময় প্রকৃতির কোলে মগ্ন থাকেন স্নিগ্ধমধুর সুখস্বপ্নে, আবার কখনো বা চলে আসেন তিব্বতী সৌন্দর্যের

রূপময় আস্বাদন পেতে কালিম্পঙের আঙিনায়।

ছবি তুলেই ক্যামেরা নামালাম। তখনো দেখছি দেবিকারানী যেন আমাকে কি বলছেন। আমি তাকিয়ে আছি তাঁরই দিকে, কোন জবাব দিচ্ছি না। এবার তিনিই এগিয়ে এলেন এবং সরাসরি প্রশ্ন করলেন—ইউ স্পীক্ বেঙ্গলী? আপনি বাংলা বলেন?

বুঝলাম তিনি আগের কথার জবাব পাননি বলে, কোন্ ভাষায় বললে জবাব পাবেন তাই জানতে চাইছেন। আমি খুশী-মনে বাংলাতেই জবাব দিলাম—বলুন, কী বলবেন।

—না শুনুন, আমি বলছিলাম কি, নেহরুর 'প্রোফিল'টা ভারী সুন্দর। কিন্তু সবাই দেখেছি ছবি তোলে মুখোমুখি, আপনি একটা প্রোফিল তুলুন।

কিন্তু আমার কথা অন্য রকম। আমি বলি—দেখুন, নেহরুর সব রকমের ছবিই আমার তোলা হয়ে গেছে। আপনার ছবি তো একটিও তুলিনি। আজ ভাবছি শুধু আপনারই ছবি তুলবো।

আমার কথায় বোধহয় একটু আব্দারের আভাস ছিল। তাই তিনি কথা মেনে নিলেন। বললেন—আচ্ছা সেটা হবে, তবে একা নয়—আমার স্বামীর সঙ্গে।

আমি তো আরো খুশী!

কিন্তু আবার সেই প্রোফিল-প্রসঙ্গ তুলে তিনি নেহরুর দিকে দেখিয়ে আমাকে ছবি তোলার কথা বলতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে দেখি নেহরু চা-এর কাপ হাতে তাকিয়ে আছেন উৎসুকভরে আমাদেরই দিকে। আমি লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু দেবিকারানী হেসে হেসে এদিক থেকে বললেন—আমি এর সঙ্গে বাংলা বলছি।

বাংলা কথা, নেহরু বুঝবেন কেন? তাই প্রশ্ন এল—হোয়াট্—হোয়াট্?

তবুও দেবিকারানীর সেই জবাব—আমি বাংলায় কথা বলছি।

এটা নিঃসন্দেহে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তবে এ শুধু নেহরুর স্নেহধন্যা দেবিকারানীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। অবশ্য তখুনি দেবিকারানী কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঐ পরিবেশে।

কিছু পরেই আবার এগিয়ে এলেন দেবিকারানী।

এবার তাঁকে দু' একটি এমন প্রশ্ন করি, যেসব মনে হল, তাঁর অতীত দিনের স্মৃতিকে স্পর্শ করেছে। ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইলেন দূরদিগন্তের পর্বতমালার দিকে। মুখ ফিরিয়ে একটু লজ্জিত বোধ করলেন, এই আনমনা ভাবের জন্য। স্মিত-হাসিতে শুধু বললেন—আপনার কথাগুলো খুব ভাল—মনে লাগে।

প্রশংসা শুনেও আমি চুপ করে আছি।

তিনিই আবার বললেন—চলুন এবার ছবি তুলবেন। আপনিই আমার স্বামীকে বলুন, ছবি তোলার কথা। উনি আসবেন নিশ্চয়ই।

*

এ-ছবি পনেরো বছর আগের। তবুও দেখলে আমার ভ্রম হয়, সেদিনের বলে। দেবিকারানীকে যেন দেখতে পাই তেমনি আমার সম্মুখে, কানে যেন স্পষ্ট ভেসে আসে তাঁর ঐ সব কথাগুলো। কিন্তু তখনি মনে হয়—আমার মনোমত ছবি সেদিন পেতে' গিয়ে তাঁর মনোমত ছবির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সেদিন নেহরুর 'প্রোফিল' তুলিনি।

নীরোদ রায়
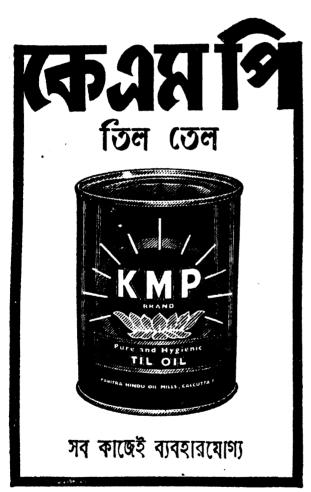
১৭

তারপরে সব চুপ। সব শান্ত। সমস্ত জগৎ থেমে রইলো গতিরুদ্ধ হয়ে। যেন টলটলে সরসী নীরে একটি ছোট্ট উৎক্ষেপ মাত্র।

এতক্ষণ অতসী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলো, এখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সৈনিক। মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। আশা-নিরাশায় দুলছে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি তেমনিই অবিরল। বেলা তিনটের দারুন ধু ধু প্রহরেও ছায়া ছায়া অন্ধকার বাইরে থেকে জানালা দিয়ে ঘরে এসে থাবা গেড়েছে, অতসী বুঝতে পারছে না লোকটা তাকে ঠকিয়ে গেল কিনা। বুঝতে পারছে না এও এক ধরনের নতুন কৌশল কিনা। কিসের কৌশল? কেন কৌশল? তার মতো একজন অসহায়, বন্দী মেয়ের জন্য আর কৌশলের দরকার কী? না, সে বুঝতে পারছে না। আসলে এই লোকটাকেই ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

বসে থেকে থেকে কখন বেলা পড়ে এলো। বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ। হঠাৎ সব অন্ধকার স্বচ্ছ করে দিয়ে খানিকটা সূর্যাস্তের আলো উছলে পড়লো ঘরে। অনেকক্ষণ আগে আয়া এসেছে, পিছনের দরজা দিয়ে। তার নৈমিত্তিক কাজে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। কাপড় ভাঁজ করছে, আলনা গুছোচ্ছে, বিছানার চাদর বদলাচ্ছে, আরো কতো কিছু। এখন অনুরোধ করছে তাকে চেয়ারে বা খাটে উঠে বসবার জন্য। ঘর মোছা দরকার। ঘরের অর্ধেক জোড়া কার্পেট তার ধুলো ঝাড়া দরকার। বেয়ারা পর্বত প্রমাণ খাদ্যসহ চা নিয়ে এলো, সবই ঠিক এক রকম, রোজের মতো। একদিন আর একদিনের প্রতিলিপি। শুধু সেই বদলটুকুই হলো না, যার আশায় নিঃশব্দে বুক বেঁধে অপেক্ষা করছে অতসী। আর কোনো সাড়া আয়ার মুখে কোনো চিহ্ন নেই বিদায় দেবার। সারা বাড়িটাতেই কোনো চিহ্ন নেই।

মিথ্যা। মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা। আগাগোড়া মিথ্যা দিয়ে তৈরি এই লোকটা। তার বুক ফেটে কান্না এলো। সে মনে মনে স্থির করলো সুযোগ বুঝে একাই এবার পথে নামবে। ঘর আর বারান্দাটুকুতেই বসে থাকবে না, ঘুরে ঘুরে আটঘাট চিনে নেবে বাড়িটার। শুনেছে দেউড়িতে তালা পড়ে যায় রাত্রিবেলা, দিনের বেলায় দারোয়ান থাকে। সেই সঙ্গে এও শুনেছে, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। পিছনের কোনো দেয়াল দিয়ে লোকেরা সব সময়েই যোগ রেখেছে বাইরের সঙ্গে। বেশ খানিকটা দেয়াল ধসিয়ে নিয়েছে টপকাবার জন্য। সেই দেয়ালই খুঁজে নেবে সে। এবং তা আজই, আজই গভীর রাত্রে।

সূর্যাস্তের লাল আলো মিশে গেল সন্ধ্যার, আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। কতদিন পরে ফুটফুটে উজ্জ্বল তারাগুলো আবার সুখী হয়ে ভাসতে লাগল সেই পরিষ্কার আকাশের বুকে, যেন মা বাবাকে ফিরে পাওয়া শিশু।

লোকটা যদি মিথ্যাবাদী না হতো তা হলে এই সময়ে সেও কি তার মা বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে সব বেদনার অবসান করতে পারতো না? মা বাবা? মা বাবা? মাগো, তুমি কেমন আছ? বাবা, তুমি কেমন আছ? তোরা কেমন আছিস?

চকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো অতসী, কাগজ কলম নিয়ে সে চিঠি লিখতে বসলো। সত্যি তো, একটা চিঠি লিখতে বাধা কী? কাউকে না কাউকে দিয়ে কোনো না কোনো সময়ে নিশ্চয়ই ডাকে দেওয়া যেতে পারবে। এরা যে তাকে চুরি করে এনে এখানে আটকে রেখেছে সেটা নিশ্চয়ই জানানো দরকার। লিখলো ঃ মা, বাবা, মালতী, চম্পা, চামেলী শিবু কানু সবু আজু পার্থ—তারপর এক পলকে তাকিয়ে রইলো নামগুলোর দিকে। মানুষগুলোকে দেখার তৃষ্ণায় আকণ্ঠ ইচ্ছা ঘিরে ধরলো তাকে। আর সেই সময়েই শায়লা এসে দরজায় দাঁড়ালো।

'কী?'

'গাড়ি প্রস্তুত।'

'গাড়ি প্রস্তুত? কী গাড়ি? কিসের গাড়ি?'

'আপনি যাবেন—'

'আমি যাবো? আমার জন্য গাড়ি প্রস্তুত? শায়লা, তুমি কী বলছো? আমাকে তুমি কী বলছো?'

'সাব্ বলেছেন আপনি কোথায় যাবেন—'

'সত্যি? সত্যি গাড়ি এসেছে সেজন্য?'

'লেকিন সে জায়গা তো হামার মালুম নেই, সাব্ বলেছেন—'

'না, না, সাহেবকে কিছু বলতে হবে না। আমি চিনি, আমি ঠিক চিনি। আমি ঠিক চিনে যেতে পারবো।'

'ঠিকানা মিললে কালকুত্তা শহরে হামাকে কেউ ঠকাতে পারবে না।'

'তা হলে আমার ঠিকানা তুমি লিখে নাও। শায়লা, আমাকে একা একা যেতে দিও না, তুমি আমার সংগে চলো। না হলে আমার ভয় করবে।'

'সাব বলেছেন—'

'সাহেব যাই বলুন—'

'সাহেব হামাকেই আপনার সংগে যেতে বলেছেন। সাব বলে দিয়েছেন—'

'আমরা তবে কখন যাবো?'

'এখুনি।'

'এখুনি? ও, তবে চল।'

বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিতে নিতে অতকাল অতসী ঘরের চৌকাঠ পার হলো। উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছিলো, ঠোঁট কাঁপছিলো, মনে হচ্ছিলো বুঝি যা স্বপ্ন দেখছে, বুঝি বা এখুনি ভেঙে যাবে সেই স্বপ্ন। শায়লার পিছনে পিছনে বাতাসের মতো সিঁড়ি বেয়ে

নেমে এলো নীচে। কোনোদিকে তাকালো না ভয়ে। কে জানে কে ওৎ পেতে আছে কোথায়, শৃগালকে দ্রাক্ষাফলের লোভ দেখিয়ে মজা করছে, খপ করে ধরে ফেলবে। এসব লোককে বিশ্বাস করতে নেই, এরা সব পারে, সব পারে।

গাড়িতে উঠে বসেও তার স্বস্তি হচ্ছিলো না, সে রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখছিলো কি না কী আবার ঘটে যায় তার ভাগ্যে।

শায়লা উঠলো ধীরে আস্তে, ড্রাইভারের পাশে ...বসলো। ...শায়লা সুন্দর পোশাক পরেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে। শায়লা বিশ্বাসী। শায়লাকে অতসী বিশ্বাস করে।

আর একজন উঠলেন। পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবী-পরা পাকা চুলের এক ভদ্রলোক। আবার ইনি কেন? আবার ইনি কেন? এ আবার কী নতুন ফন্দি। ইনি কী করবেন সংগে গিয়ে। শায়লাই তো আছে। হে ভগবান। হে ভগবান।

সেই ভদ্রলোককে দেখে শায়লা সেলাম করলো, দেওয়ানজি বলে ডাকলো। তা হলে ইনি এদের দেওয়ান? একজন বিশিষ্ট কর্মচারী? চেহারাও খুব বিশিষ্ট। না, এর থেকে তা হলে কোনো ভয় নেই।

গাড়িটা গর্জাচ্ছে। ভদ্রলোক ওঠা মাত্রই হুস করে হাওয়াইর মতো চলে এলো কোথায়। একটা বিদ্যুৎ। কেমন দেখতে না দেখতে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে গেল। লম্বা পথ ফিতের মতো পড়ে রইলো পিছনে, মিলিয়ে গেল বাড়িটা।

আঃ! শান্তি। শান্তি। না, আর কোনো ভয় নেই এখন। এখন আমি বোধ হয় সত্যি আমার মা বাবার কাছে ফিরে চলেছি। আকাশের তারাদের মতো, হারানো নীড় পাখির মতো, বাঘের মুঠো ছাড়িয়ে হরিণের মতো।

বাঘ? সত্যি কি বাঘ? লোকটা কি বাঘ ছিলো আমার কাছে? না, বাঘের পার্ট কিন্তু সে করে নি শেষ পর্যন্ত। এখন আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে সে নিজেই পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকজন দিয়ে, আমাকে সে শুধু একটা ভৃত্যকেই সঙ্গী হিসেবে দেয়নি, সম্মান দেখাবার জন্য একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও পাঠাচ্ছে পৌঁছে দিতে, হ্যাঁ, সেই জন্যই নিশ্চয় দিয়েছে। আমি আর এখন তার নিন্দে করবো না। আমি আর এখন তাকে শত্রু ভাববো না। একটু আরাম করে বসি, এতক্ষণে যেন একটু নিরুদ্বেগ মনে হচ্ছে নিজেকে।

আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা শরীরটা মেলে ধরলো অতসী। জানালা দিয়ে মুখ বার করলো। সুন্দর তো রাস্তাটা। তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। হয়তো বা একভাবে তাকিয়ে থাকার দরুনই হঠাৎ চোখ জলে ভরে গেলো। হয়তো বা দুর্বল শরীর বলেই নিন তো মা।' লম্বা খামের একটি লালচে খাম হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'কী এটা?'

'আমি তো ঠিক জানিনে। উনি দিলেন আসবার সময়ে। জ্বর হয়েছে বলে নীচে নামতে পারলেন না, নিজে হাতে দিতে পারলেন না, বলে দিয়েছেন আপনি যেন কিছু মনে না করেন।'

'জ্বর হয়েছে?' একটু যেন উদ্বেগ ফুটলো গলায়।

'বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। যা বৃষ্টি গেল কদিন। ঘরে ঘরেই অসুখবিসুখ এখন।'

অতসী খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেললো। এক লাইনের একটি চিঠি, 'গ্রহণ করলে খুশী হবো। ভালো থেকো। নীলেন্দু।'

চিঠির সংগে পিন দিয়ে গাঁথা একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক।

চিঠি এবং চেক দুয়ের দিকেই অনেকক্ষণ অতসী তাকিয়ে রইলো। তারপর ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিল খামে। চুপ করে থেকে শান্তভাবে বললো, 'শায়লা, গাড়িটা একটু ঘোরাতে হবে।'

'কোথায়?'

'তোমাদের কুঠির দিকে।'

'কিছু ফেলে এসেছেন?' ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন। অতসী ইতস্তত করে বললো, 'মিঃ মিত্রের সঙ্গেই একটা দরকারী কথা ছিলো।'

'ও। ঠিক আছে।'

গাড়ি তক্ষুনি ঘুরলো আবার, আবার ছাড়িয়ে আসা ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে গাড়ি ঢুকলো এসে ভিতরে। শারলা তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালো, অতসী বললো, 'আমি এখুনি আসছি।'

ঘর ছেড়ে মিত্রসাহেব এইমাত্র উঠে এসেছেন বারান্দায়, বয় বেয়ারা কাউকে ডাকেন নি, একা একা বসে আছেন চুপচাপ। শীত করছে বেশ। শরীর খারাপটাকে যত তুচ্ছ বলে ভেবেছিলেন, বুঝতে পারলেন ততো তুচ্ছ নয়। ক্রমেই জাঁকিয়ে বসছে, অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে, খুঁতখুঁতে কর্তাদের মতো জ্বালিয়ে খাচ্ছে নানাভাবে। বিকেলে জ্বরের মাত্রা একশোর ঘরে ছিলো, এখন তা আরো এক ডিগ্রী চড়েছে। হয়তো আরো চড়বে। তারই প্রস্তুতি এই কষ্ট।

মাথাটা কি ভার, ছিঁড়ে যাবে নাকি? বারান্দার এপাশে ওপাশে তাকালেন, আলো নেবানো ঝাপসা অন্ধকারে নিজেকে কোনো প্রাণীহীন দ্বীপের একলা অধিবাসী বলে মনে হলো।

আজ রাত্রেই যদি প্লেনটা ধরতে পারতেন, কী ভালোই না হতো। পরীর মতো পাখায় চড়িয়ে হুস করে নিয়ে যেতো দেশান্তরে। ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, কোনো নার্সিং হোমে গিয়ে থাকলে হয় কটা দিন। বাড়িটা অসহ্য, অসহ্য।

সিগারেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন একের পর এক। ধোঁয়াগুলো পাক খেয়ে খেয়ে মাথার উপর বৃত্ত তৈরি করতে লাগলো। গায়ে জড়ানো চাদরটা ভালো করে টেনে দিলেন গায়ের উপর।

আর তারপরেই অতসী এসে দাঁড়ালো সামনে। যত দ্রুত নেমে গিয়েছিলো, ততো দ্রুতই আবার উঠে এসেছে উপরে। ভেবেছিল মানুষটাকে খুঁজতে হবে, কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে আনতে হবে, পরিবর্তে সোজা বারান্দাতেই বসে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো।

দুবার সিঁড়ি ওঠা-নামা করে পরিশ্রম হচ্ছিলো তার। সে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিলো জোরে জোরে।

'কে?' চমকে গিয়েছিলেন মিঃ মিত্র দেখেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি! কী আশ্চর্য! তুমি?'

আরক্ত মুখে অতসী বললো, 'অনেক তো হয়েছে, যাবার দিনে এই পরিহাসটা না হয় নাই করতেন।'

'পরিহাস? পরিহাস কিসের?' অবাক হয়ে দুই ভুরু এক করলেন তিনি।

অতসী হাতের দুমড়োনো মোচড়ানো খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে তাঁর পায়ের কাছে, 'এই মূল্য ছাড়া মেয়েদের জন্য আর কোনো মূল্যই বোধ হয় জানা নেই আপনার।'

'ও।'

'টাকা দিয়ে তালুকমুলুক কেনা যায়, কিন্তু মানুষ কিনতে মনুষ্যত্বের দরকার হয়।'

'অত্যন্ত দুঃখিত। বিশ্বাস করতে পার এর মধ্যে তোমাকে অসম্মান করার কোনো অসাধু উদ্দেশ্য ছিলো না আমার।'

'উদ্দেশ্যের কথা থাক, তার কোনো কৈফিয়তের দরকার করে না।'

মিঃ মিত্র নিঃশব্দ থেকে বললেন, 'বসো।'

'আমি বসতে আসিনি।'

'তা জানি। তবে এলেই যদি না হয় বসলেই একটু।'

'আমার দেরি হয়ে যাবে।' যাবার জন্য ফিরলো সে।

মিঃ মিত্রও বাধা দিলেন না। তিনিও পিছন ফিরে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন গিয়ে।

কী ভেবে থামলো অতসী 'শুনলাম আপনার জ্বর হয়েছে।'

'তা হয়েছে।'

'তা হলে এই বর্ষার হাওয়ায়, খোলা বারান্দায়—'

'আমার ঠাণ্ডা লাগে না।'

'ঠাণ্ডা সকলেরই লাগে। শরীর সকলেরই সমান।'

'তা হলে লাগবে।'

'জ্বরও বাড়বে।'

'কী আর করা।'

'সতর্ক হওয়া যায়।'

ঈশ্বর তো আর সেবা করতে আসেবেন না।'

'সেবা আমি চাই না।' সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন এবার, 'কারো কাছে কখনো আমি কিছু চাইনি, ঈশ্বরের কাছেও না। কারো কাছে কিছু চাইবার আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। দয়া ক'রে তুমি দয়া দেখিও না, কৃপা করতে চেয়ো না, কুশল প্রশ্নের ভদ্রতা থাক, তুমি যাও।'

থমকে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কয়েক সিঁড়ি নেমে এসেছিলো অতসী, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলভাবে তিনিও এগিয়ে এলেন, 'না, যেয়ো না, শোনো, একটা কথা শুনে যাও কিছুদিনের মধ্যেই আমি কলকাতা ছাড়বো, অনেক দূরে চলে যাবো, আর ফিরবো না সারাজীবনে, তুমি যদি কোনো কারণে বিপন্ন হও, জানবার উপায় থাকবে না আমার। সেজন্যই আমি টাকাটা তোমাকে রাখতে বলেছিলাম, আমার অনুরোধ—'

'ক্ষতিপূরণ?' ঠাট্টায় অতসীর ঠোঁট বেঁকে গেলো।

'হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ।' উন্মত্ত হলেন তিনি, তারপরেই ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আচ্ছা স্বামী হিসেবে আমাকে কি তোমার খুব খারাপ বলে মনে হয় অতসী?'

'এ সব প্রশ্ন অবান্তর।'

'সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক কয়েকটা দিন তো দেখেছি নির্ভর ক'রে'? না জেনে না বুঝে হলেও চৈতন্যের অন্ধকারে আমাকে তো তুমি অনেকখানি জায়গাই দিয়ে ফেলেছিলে? এখন কি তার একবিন্দুও বাকী নেই কিছু?'

'আপনি জ্বর হয়ে প্রলাপ বকছেন।'

'তুমি যা খুশি তাই বলতে পার, আমি বিশ্বাস করি না একবার ভালোবাসলে হাজার ঘৃণা দিয়েও তা উচ্ছেদ করা যায়। তুমিও তা পারো নি। ভালোবাসার জাত গোত্র নেই, ভালোমন্দ নেই, সৎ অসৎ নেই। ভালোবাসা এক ভগবানদত্ত অবোধ অবুঝ আবেগ। অতসী, তার টান মৃত্যুর মতো। ভালোবাসা জল আগুন মাটি। ভালোবাসা আমাদের জীবন। ভালো সকলকেই বাসা যায়, চোর ডাকাত দেবতা লম্পট সব সেখানে এক আসনের অধিকারী—'

'আপনি একটা প্রবন্ধ লিখুন, পড়বো, শোনবার সময় নেই।'

'যদি তাই না হবে তবে তুমি ফিরে এসেছিলে কেন? কী সাহসে এসেছিলে? কী বিশ্বাসে এসেছিলে?'

'আপনি আমাকে অপমান করেছিলেন, আমি তার প্রতিবাদ জানাতে এসেছিলাম। আমি জানাতে এসেছিলাম আপনার অর্থ এবং আপনি দুইই আমার কাছে সমান ঘৃণ্য।'

'মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। আমার অর্থ তুমি ঘৃণা করতে পার কিন্তু আমাকে তুমি ভালোবাসো। প্রতিবাদ তোমার অছিলা, তুমি আমার জন্যই এসেছিলে, আমাকেই দেখতে এসেছিলে, আমাকে ভালোবাসো বলেই এসেছিলে। নিজেকে ঠকিও না।'

'আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।' গলায় সমস্ত শক্তি ঢেলে অতসী আর দাঁড়ালো না, তাকালো না, চলে গেল।

একজন মেয়ের এই আস্পর্ধায় প্রথমে মিঃ মিত্র নিষ্ফল রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন, তারপরে একটা ভয়ঙ্কর হাহাকারে বিদীর্ণ হলেন।

সেই নীলেন্দুনারায়ণ, দম্ভ যার শিরের ভূষণ, ব্যক্তিত্বের দাপটে যিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, যাঁর চোখের দিকে তাকালে প্রত্যেকটি অধীনস্থ কর্মচারীর চোখ আপনিই নত হয়ে আসে, যিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য কখনোই অনুতপ্ত নন, যিনি মনে করেন তিনি বাদে জগতের শতকরা পঁচানব্বুইজন মানব সন্তানই অর্থগৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা, কৃতঘ্নতা, নীচতা, লুব্ধতা, মিথ্যাচার, অপহরণ, উৎকোচগ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন রিপুর একাধিক রিপুর দ্বারা আক্রান্ত এবং সেই পাপের তুলনায় তাঁর নিজের জীবন নিয়ে নিজের জুয়া খেলার লাম্পট্য একজন নিঃসঙ্গ নির্জন পুরুষের পক্ষে নেহাৎই নির্দোষ একটি প্রাকৃতিক বিকার মাত্র, সেই তিনি জ্বর গায়ে সর্বস্বান্ত ভিক্ষুকের মতো বসে পড়লেন সিঁড়ির ধাপে। উপরের সিঁড়িতে ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসা বেয়ারাকে দেখেও তাঁর প্রভুত্ব উজ্জীবিত হলো না, লজ্জা হলো না। শুধু ইচ্ছে করলো দৌড়ে গিয়ে ওকে দস্যুর মতো ছিনিয়ে আনেন।

কিন্তু দস্যু হয়ে কী পাবেন তিনি? কিছু না। কিছু না।

এই ভাবনা তাঁর পলকমাত্র। উসকো খুশকো চুলে, শুকনো চেহারায় দৌড়ে নামলেন তিনি নীচে। মুহূর্তের মধ্যে চলে এলেন বড়ো হল ঘরে। এই হল পেরিয়েই খোলা বারান্দা দিয়ে বাগানে নেমে গাড়িতে উঠতে হয়।

হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'যেয়ো না, দাঁড়াও, আর একটা কথা শুনে যাও, ঘৃণার কোনো মূল্য নেই। ঘৃণার আয়ু সীমিত। আজ যে ঘৃণা কাল সে পরমেশ্বর। জগতে সব বদলায় সবচেয়ে বেশী বদলায় মানুষের মন। অতসী তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো—'

তিনি টলছিলেন, দরজার প্রান্তে অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, বাইরে বাগানে একটু দূরে ফোয়ারার কাছে অপেক্ষমান শারলাকে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছিলো, রাত্রি বেলাকার জনমানবহীন প্রকাণ্ড হল-ঘরের স্তিমিত আলোয় শব্দের তরঙ্গ ঢেউ হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো।

একটু আগেও মিঃ মিত্র যে আভিজাত্যের গৌরবে নিঃশব্দ ছিলেন, সংযমের যে দার্ঢ্যে অবিচলিত ছিলেন, আত্মপ্রবঞ্চনার যে অভ্যাস নিয়ে বারান্দায় বসে আকাশ দেখার অভিনয় করছিলেন, এই মুহূর্তে সে সবের কোনো চিহ্ন ছিলো না তাঁর মধ্যে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে তিনি কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন, উত্তেজিত-ভাবে বললেন, 'নয়তো চল, আমি নিজে গিয়েই তোমাকে দিয়ে আসছি, আমি সেখানে গিয়েই তোমাকে প্রার্থনা করবো। আমি সমস্ত কলকাতা উপড়ে আনবো তোমার জন্য, আমি সারা পৃথিবীর সব ভালো কেড়ে এনে ঢেলে দেব তোমার পায়ে—'

এতোদিন পরে সজ্ঞানে এই প্রথম অতসী চোখ তুলে তাকালো তাঁর মুখের দিকে, তাকিয়ে রইলো চোখে চোখে। সহসা দুই হাতের পাগল আকর্ষণে তিনি কাছে টেনে নিলেন তাকে, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আর কিছু দেখবার নেই, কিছু যাচাই করবার নেই, আমি তোমার, তোমার, একান্তভাবে তোমার।'

সমাপ্ত

মফতলাল গ্রুপ

টেবিলাইজড প্রিণ্টেড পপলিন

'টেরিন/কটন,' মেফিনাইজড
ও স্ট্রেচ কোয়ালিটি হিসেবে
পাওয়া যায়।

নিউ শরক (শরক) আমেদাবাদ
নিউ শরক, নদিয়াদ • ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বে
ষ্ট্যাণ্ডার্ড (নিউ চায়না) বোম্বে
ষ্ট্যাণ্ডার্ড, দিওয়াস • স্যাস্থন, বোম্বে
স্যাস্থন, (নিউ ইউনিয়ন) বোম্বে
সুরাট কটন, সুরাট
মফতলাল ফাইন, নবসারি।

বারলিনের সংস্কৃতি সপ্তাহে স্যার লরেন্স অলিভার "ওথেলো" মঞ্চস্থ করে গেলেন
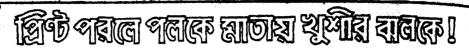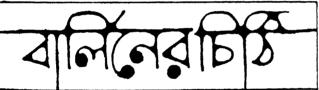
বারলিন, ৮ই নভেম্বর, '৬৬

আমার এই লেখার সময়ে চলেছে জরমানীর রাজনীতি-আকাশে এক তুমুল আলোড়ন। সারা পশ্চিম জরমানীর ঘরে ঘরে, আফিসে দপ্তরে মানুষ রেডিয়ো আর টেলিভিশান খুলে শুনছে, আর দেখছে—পশ্চিম জরমানীর রাজধানী বন-শহরে জরমান পারলামেনট-এর অধিবেশন। তর্ক-বিতর্ক, হই হট্টগোল। সপ্তাহ দুয়েক আগে এরহার্ট সরকারের মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে, পশ্চিম জরমানীর চেনসেলার পদে কে অধিষ্ঠিত হবে, কোন পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করবে, তা নিয়ে বিগত ১৮ বৎসর ধরে যে CDU | CSU | FDP পারটি-ত্রয়ের পক্ষ থেকে যে নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্রিত্ব চালিয়ে এসেছে, তার ওপর বিতর্ক। পশ্চিম জরমানীর এই রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণ অনেক—CDU | CSU পারটির মধ্যে বহু উপদল, FDP-এর সুবিধাবাদী রাজনীতি, মাঝখান থেকে NPD অর্থাৎ নয়া ফ্যাসিবাদী পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তি, ফ্রানস না আমেরিকা—কার সাথে মৈত্রী বন্ধনে জরমানী থাকবে, তা নিয়ে আদেনুয়ার-স্ট্রাউস বনাম এরহার্ট-শ্রোয়ডার সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে রাজনীতিতে স্ব ও বিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিতে বহু দল, বহু মত, জরমান মিলিটারীতে সর্বোচ্চ সৈন্যাধিপতিদের পদত্যাগ, ক্রমাগত বহু ব্যয় সাপেক্ষ আমেরিকার কাছ থেকে কেনা ৬৪টা স্টারফাইটার জঙ্গী বিমানের ভূপতন, "হাই"-নামে সাবমেরিনের জলমগ্ন হওয়া, জরমান রাজনীতি ও মিলটারীতে জরমান জনসাধারণের প্রচণ্ড অনাস্থা, জরমানীর "অর্থনৈতিক বিস্ময়ে"র ক্রমাবনতি, দেশে অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য এবং ট্যাক্স বৃদ্ধি, নানা স্থানে শ্রমিক ছাঁটাই—বৎসরে ২০ মিলিয়ারডেন মারক জরমান মিলিটারীর জন্যে ব্যয়——তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মনোভাব, তদোপরি CDU | CSU পারটি সমস্যায় FDP পারটির বিশ্বাসঘাতকতা—এ পশ্চিম জরমানীর ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী বর্তমানের চেনসেলার প্রফেসর ডঃ এরহারটের বিরুদ্ধে। যুদ্ধোত্তর কালের জরমানী বলতে যে "অর্থনীতির বিস্ময়"কে বোঝাত, সেই "অর্থনীতির বিস্ময়ের" যিনি যাদুকর, সেই অধ্যাপক ডঃ এরহারটের বিরুদ্ধে আজ তাঁর নিজের ও বিপক্ষ দলের লোকদের অনাস্থা। আজ কেবল জরমানীর ক্ষতি নয়, আমাদেরও—কেননা এই সময় ডঃ এরহারটের ভারত পরিদর্শনে আসার কথা ছিল। সেই সময় এই পতন। ডঃ এরহারটের ভারত পরিদর্শনের ওপর ভারত-জরমান সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় অপেক্ষা করছিল।

*

"আপনি ভারতীয়?"—আমাকে প্রশ্ন করলেন জরমানীর একজন অতি বিখ্যাত নগর-পরিকল্পনার আরকিটেক্ট, একটা বড় ইন্‌স্‌টিট্যুটের ডিরেকটর, বারলিনের টেকনিক্যাল ইউনিভারসিটির দুটি বড় বড় ডিপারটমেনটের অধ্যাপক। নাম তাঁর Prof. Peter Koller। বাঘা পণ্ডিত লোক। ছাত্রদের মুখে মুখে তাঁর নাম বিরাট চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়ঝাঁকড়া সাদা-বাদামী চুল।

হঠাৎ নিজের থেকে ডেকে আমার মত অতি গোবেচারা সাধারণ বিদেশী (আমাদের দেশে বিদেশী বা বিদেশিনী শব্দের মধ্যে যেমন একটা রোম্যানটিক ভাব রয়েছে, এখানে ঠিক তার উল্টো, "আউসল্যানডার" অর্থাৎ বিদেশী কথার মধ্যে রয়েছে একটা অতি অবজ্ঞার ভাব। ওঃ! আউসল্যানডার..." বলতে নাক কুঁচকে যায় এমন বহু জরমানকে দেখেছি) যাকে দেখে কেউ আকর্ষিত হতে পারে এমন কিছুই নেই—না মাথায় বীটলদের মত লম্বা লম্বা বাবরী, না এদেশের ঐশ্বর্য আর সমাজের কঠিন শাসন ক্লান্ত জীবনের প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি মূর্তিমান গামলারদের মত গায়ে ময়লা, শতছিন্ন পোশাক, না প্রদেশের "পোশাক মানুষকে রূপ দেয়" প্রবাদের কোন সার্থক প্রয়োগ রয়েছে আমার দেহের মাংস খণ্ডগুলোকে ঘিরে, তার সাথে এত বড় একজন পণ্ডিত লোক অন্তত কৌতূহল বশেও—(এ দেশে যা প্রায়ই ঘটে থাকে)—কথা বলতে পারেন, আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না। মনে মনে ভেবে নিলাম, কি হতে পারে? ভারত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন নয় ত? ওটা আমি এড়াবারই চেষ্টা করি। ভারতে ইদানীং যত ঘটনা ঘটে গেছে, মনে মনে সব একবার আউড়ে নিলাম। এত বড় একজন পণ্ডিত অধ্যাপক মানুষ ডেকে কথা বলতে চাইছেন, সঠিকভাবে আমার সব উত্তর দেওয়াই উচিত। এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল(!) করা। মনে মনে ভাবলাম—বিভক্ত জরমানীর ওপর ইন্দিরা

গান্ধীর বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন না ত? এই প্রশ্নের জবাবে—অধ্যাপকদের কিভাবে, ছাত্রদের কি ভাবে, সাধারণ মানুষদের কি ভাবে, আর জরমানীর "মাস-মিডিয়া" B. Z ও Bild পত্রিকা পড়ুয়া শ্রমিকদের কি ভাবে উত্তর দিতে হবে—আমাদের রাষ্ট্রদূত অফিস থেকে আমাদের যেভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বিভিন্ন V. V. Imp. pointগুলি মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে শেষবারের মত ঝালাই করে নেবার মত মনে মনে আউড়ে নিলাম। যেভাবেই প্রশ্ন করুন না কেন—কোন ভয় নেই—কলকাতার পুলিস-মিলিটারীর বন্দুকের গুলী বাঁচিয়ে কি ভাবে পথ চলতে হয়, যখন জানা আছে, তখন একজন জরমান অধ্যাপকের সাধারণ প্রশ্ন আর কত বিপদজনক হতে পারে! (অবশ্যই এখানকার বিরাট বিরাট ভারতীয় পণ্ডিত ছাত্র আর প্রাক্‌টিকান্‌টদের মত কথায় কথায় "জরমানরা মূর্খের জাত" বলে ঘোষণা করার মত বুকের পাটা আমার এখনো হয়নি।) তবু অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ঠিক করলাম—তিনি যে প্রশ্নই করুন না কেন, আমাকে গান্ধীর রচনায় এসে হাজির হতে হবে—"ভারত-

ভারতীয় সংগীতদলে জারমান গায়িকা শ্রীমতী লাইখ্‌জেনরিং রবীন্দ্রনাথের 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে' গানটি গাইছেন

জরমান বন্ধু, হিন্দী-জরমান ভাই-ভাই, ইন্দো-গারমানিশে স্প্রাখে (ভাষায়)। আর যদি তাতে সুবিধে না হয়, তবে যেভাবেই হোক ভারতের প্রসংগ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁকে জরমানীর বর্তমান সমস্যা, রাজনৈতিক আলোচনা প্রসংগে এনে অধ্যাপককে ফেলতে হবে। কেননা, নিজের দেশের তিক্ত ঘটনাগুলোকে ঢাকতে গিয়ে বিদেশীদের কাছে এত মিথ্যে কথা বা "অশ্বত্থমা হত ইতি গজ" জাতীয় সত্যিকথা বলতে হচ্ছে যে, মনে হয়—দু দিন বাদেই "রাম রাম" বলতে বলতে "মরা মরা" শব্দ প্রায় বের হতে চলেছে।

তাই অধ্যাপক কলারের প্রশ্নে অতি-সংকোচের সংগেই উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভারতীয়।" আগে "আমি ভারতীয়" এই ঘোষণায় কত গর্ব ছিল, এখন প্রায় প্রতি-দিনই ভারতের দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বেকারী, ধর্মের নামে উন্মাদনা, গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন, বিক্ষোভ আর মিছিলের দেশ ভারতবর্ষের ওপর যে সব করুণ সংবাদ এদেশের পত্রিকার পাতা জুড়ে থাকে, তাতে কি জানি, বহু ভারতীয়ের মতই এই ঘোষণায় তেমন উৎসাহ বোধ করি না। একটা দৃষ্টান্ত—বিক্ষোভ আর আন্দোলন।

বিক্ষোভ আর আন্দোলন সব দেশেই হয়। কিন্তু তার এমন চেহারা! সরকারের অপদার্থতার অন্ত নেই। সেই সাথে জগাই মাধাই দেশের ধনপতি আর সুবিধাভোগীদের "লাগল হরি লুটের বাহার লুইট্যা নেরে তোরা"-র কীর্তন সারা দেশ জুড়ে—যে সময় দেশের সৎলোকরা মার খেয়ে চুপ করে পড়ে আছেন জনসাধারণের নীচে, সেই সময় নেতৃত্ববিহীন দেশে রাজনৈতিক নেতাদের খোঁড়া গাধাকে খাটিয়ে নেবার মত হতাশা জর্জরিত জনসাধারণকে বারবার উদ্দেশ্যহীন হরতাল আর আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে মানুষকে আরো হতাশা আর লক্ষ্যহীন পথে ঠেলে দেওয়া।

এই সময়ে বারলিনে নবম ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহে বিধায়ক ভট্টাচার্যের "ক্ষুধা" নাটকটা দেখানো সময়োচিতই হয়েছে। নাটকটাকে কেটে ছেঁটে যেটুকু দেখানো হয়েছে, তাতেও জরমানদের প্রচুর হাততালি পেয়েছে ভারতীয়রা। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গান আর নাটক বাদ দিয়ে এভাবেই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কেননা রবীন্দ্র নাথের নাম আর গান বেশী চুকলেই অবাঙালীদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেহেতু এই চিঠির লেখককে কয়েকবার ভারতীয় গানের দল সংগঠন করতে হয়েছে, পরিচালনা করতে হয়েছে, তাই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাকে বারবার হতে হয়েছে। একটা ঘটনার কথা খুলে বলাই যাক। বারলিনে ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ ছাড়াও ভারত মজলিসের তরফ থেকে নগরীর বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। উদ্দেশ্য—ভারত ও ভারত মজলিসের সুনাম ও প্রচার। গানের কর্মসূচীর প্রশ্ন দেখা দিলেই মজলিসের তরফ থেকে এবং ব্যক্তি-গতভাবে প্রায় সব ভারতীয়কেই বলা হয়—গান বা যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করতে এবং যাঁর যাঁর নিজ প্রদেশের লোকসংগীতকে তুলে ধরতে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেলে—বেশীর ভাগ গাইয়েই বাঙালী—এবং তাদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকজন ভাল রবীন্দ্রসংগীত ও পল্লী-সংগীত গাইয়ে। যেমন, সিভিল ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর রিসারচ স্টুডেনট শ্রীসুজিৎ মজুমদারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ও শ্রীধীরাজ রায়ের কণ্ঠে পল্লীসংগীত—বহুকাল মনে রাখবার মত। এ'রা বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর যদি নাও হন, নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাইয়েদের মধ্যে পড়েন। এ'রা ভারত মজলিসের মস্ত বড় সম্পদ। লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত ও গাইয়ে। যেসব জরমান মেয়েরা ভারতীয় গান শিখতে আসে, অল্প সময়ে তাঁদের ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখানো সম্ভব নয়। বাকী থাকে পল্লীসংগীত, আধুনিক, সিনেমার গান আর রবীন্দ্রনাথের গান। এখানে লক্ষ করবার, মত—এইসব ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই লক্ষ্য থাকে—ভারতবর্ষে পাড়ি জমানোর। এ'দের মত উৎসাহী ছেলেমেয়েদের আধুনিক বা সিনেমার গান শেখাবার কোন অর্থ হয় না। প্রথমত বেশীর ভাগ সিনেমা আর আধুনিক গানের সুর বিদেশী গান থেকে চুরি করা—যেসব সুর এখানে প্রায়ই শোনা যায়। সুতরাং এইসব তথা-কথিত আধুনিক সিনে-মার গানকে ভারতীয় গান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। বিদেশী ছেলেমেয়েদের যদি কিছু শেখাতেই হয়, তবে তা এমন হওয়া উচিত—যার ব্যাপকতা ও গভীরতা বিরাট এবং একটা স্থায়ী মূল্য আছে, যাতে যদি কোনদিন তাঁরা ভারতে

ভদ্রসমাজে ভদ্র গান গাইতে পারে। ইংগে মান্‌সকে আর জোহানা লাইখজেনরিং-এর কণ্ঠে নির্ভুল উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত শনে বহ্‌ বাঙালীকে বলতে শনেছি—"মশাই, আপনার পরিশ্রম সার্থক।. আমার স্ত্রী বলছিল, ও'রা যদি এত সন্দর বাংলা গান গাইতে পারে, তবে আমি কেন ভাল বাংলা শিখতে পারবো না।" আমি মনে মনে বলি—বে'চে থাক, রবীন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রসংগীত। তাঁকে নিয়ে আমাদের আধ্‌নিক ভারতের যত দ্বিধা দ্বন্দ্বই থাক। আর আমদের অবাঙালী ভারতীয় বন্ধ্‌রে রবীন্দ্রনাথের নামে যত অস্বস্তিই বোধ করন না কেন। রবীন্দ্রোত্তর ভারত, বাইরের পৃথিবীকে এমন কিছ্‌ এখনো দিতে পারে নি, যাতে তাঁকে আমরা পাশে সরিয়ে রাখতে পারি।

প্রোটাস্ট্যান্ট গীর্জার ছাত্রমহল থেকে একটা ভারতীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা আমি নানা সমস্যার মাঝেও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধ্‌রে সাহায্যে করেছিলাম। সেখানে বেশ কয়েক-বার পাকিস্তানী ছাত্ররা নানা সভা-সমিতির উদ্‌যাপন করেছে, ভারতের তরফ থেকেও এর প্রয়োজন ছিল। নানা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা গান-বাজনার রিহার্সেল দেওয়া, ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থা করা, হল-মাইক-স্টেজের ব্যবস্থা করা—নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করা—এসব নানা সাহায্যের জন্যে ছেলেদের ডাকলে কর্মী খ‌্ুজে পাওয়া ভার—কিন্তু সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঝে "এ বাঙাল লোগোকো ফাংকশান হ্যায়" বলে ঘোষণা করার মত অবাঙালী বন্ধ্‌রে অভাব নেই। দোষের মধ্যে—সে সময়টা ছিল, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময়—তাই বেশীর ভাগ গান ছিল রবীন্দ্রনাথের তাছাড়া যেহেতু পর পর বেশ কয়েক বৎসর বার্লিনের ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার লাভ করে সত্যজিৎ রায় এদেশে খুবই পরিচিত আজ, তাই রবীন্দ্রনাথের ওপর শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবিটা দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়—যাতে জর্মান দর্শকরা এই ছবির মধ্য দিয়ে কেবল রবীন্দ্রনাথকে নয়—সেই সাথে বিগত ১০০ বৎসরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ছবিও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারেন, তাই এ ব্যবস্থা করা। (এই প্রসঙ্গে জানাতে হয়—এবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে "সাত পাকে বাঁধা" ছবিটা খুবই প্রসংশা লাভ করেছে। সত্যজিৎ রায়ের নায়ক এবার কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি।) আমাদের অবাঙালী বন্ধ্‌রা একটা জিনিস ভুল করেন—এই যে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের নাটক, গান, গীতিনাট্য ('চিত্রাঙ্গদা' এবার মঞ্চস্থ করা হয়েছে), আর কবিতা পাঠ, সত্যজিৎ রায়ের বাংলা ছবি, রবিশংকরের সেতার, বিধায়ক ভট্টাচার্যের "ক্ষ্‌ধা" নাটক, বাংলা দেশের পল্লীসংগীত, নাচবে, তাও বাঙালী ছেলে শংখজিৎ গহ, বাঙালী ছেলের কণ্ঠে কেবল রবীন্দ্রসংগীত নয়, সেই সাথে অসমীয়া আর হিন্দী ভজন গানও—সব কিছ্‌ই সর্ব-ভারতের নামে উৎসর্গিত হচ্ছে—যখন তারা এই সত্যটা ভুলে যান। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীরা যদি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েই থাকে, তার জন্যে ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত—কেননা আমাদের নাম ভাঙিয়ে সমগ্র ভারতই লাভবান হচ্ছে। অবশ্যই ভারত মজলিসে ডঃ শান্তি নাগের মত বিচক্ষণ প্রেসিডেন্ট আর মিঃ মিশ্র, বুলবুল চ্যাটার্জি, শংকর চট্টোপাধ্যায়ের মত বাঙালী কর্মীরা যেমন আছেন, তেমনি অবাঙালী বন্ধ্‌দের মধ্যে মদন কিনরা আর শ্রীধরের মত কর্মীরাও আছেন। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির নামে যখন প্রাদেশিকতার প্রশ্ন ওঠে, তখন দঃখ হয় এই জন্যে—প্রশ্নটা বাঙালী অবাঙালীর নয়—প্রশ্নটা ভারত, আর তার শিল্প ও সংস্কৃতির। সেখানে তথাকথিত সর্ব-ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থান কতটুকু, আমাদের বুদ্ধিতে তা ঢোকে না। যেখানে শিল্প মূল্যের মূল দাবি মেটানো হয়, সেখানে গণতন্ত্র আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য।

তাই অধ্যাপক কল্লার যখন বললেন—"জানেন, আমার বাড়িতে ভারতীয়রা খুবই সম্মানিত অতিথি, ভারতীয়রা চিন্তা করতে জানে—আমরা ইউরোপীয়রা তিনবার কাজ করি, একবার চিন্তা করি, ভারতীয়রা তিনবার চিন্তা করে একবার কাজ করে"—তখন আরেকবার আমার চোখের সামনে এই সব ছবি ছাড়াও অসংখ্য রোগ আর
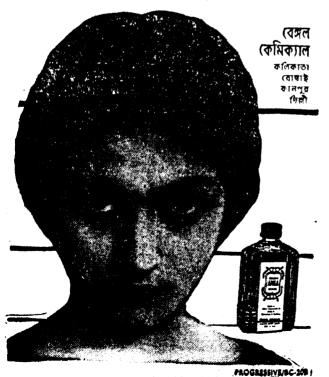
বার্লিনের সংস্কৃতি সপ্তাহে হামবুর্গের বারক সংগীতের

উঠল। কেন জানি না, এ ভাবে ডেকে বিনা মূল্যে কমপ্লিমেন্ট দিলে, মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়। সবে একটা রিপোর্টাজ পড়ছিলাম এখানের একটা সচিত্র সাপ্তাহিকীতে। ভারতকে কিভাবে সাহায্য করা যায়—তার সন্ধানে গিয়েছিলেন এক ধর্মযাজক। তিনি লিখছেন—

"কলকাতা। এক মৃত্যুপুরী। যেখানে খুব কষ্টেই মানুষ শ্বাস নিতে পারে। মুক্ত-বাতায়নে বাতাসের অবাধ সঞ্চালন সত্ত্বেও এখানকার বায়ু সেবন অযোগ্য। হাহাকার, কান্না, আর মাঝে মাঝে বাঁচার জন্য চীৎকার এ নগরীর জানালায় জানালায় বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটায়।

...ঠিক এই মুহূর্তের সময় হচ্ছে রবিবারের সকাল। জরমানীতে আমাদের দেশে দল বেঁধে মানুষ চলেছে গীর্জায় নয়ত বীয়ার আর মদের মজলিসে। আর এখানে আমি কান্নার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি।

...আমরা জরমানরা, সত্যি কি ও'দের সাহায্য করতে পারি?

নিশ্চয়ই।

যদি আমরা এই বীভৎস পরিস্থিতিতে আমাদের চোখ বন্ধ করে বসে থাকি, তবে আমরাও সেই সাথে দোষী সাব্যস্ত হবো।

কিন্তু কি ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি?

হয়ত আমরা কালো চোখভরা ফুটফুটে শিশুদের পোষ্যপুত্র করে নিতে পারতাম।

হ্যাঁ। জরমান স্বামী স্ত্রীর মারফত হয়ত বেশ কিছু শিশুকে তুলে নেওয়া যেত। কিন্তু সেই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক অচলায়তন ব্যুরোক্র্যাটিক ব্যবস্থা।" (এখানে ভারত সরকারের স্তূপীকৃত অফিসের ফাইলের উদ্দেশ্যেই এই মন্তব্য করা হচ্ছে।)

অন্য কি ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে প্রস্তাব করা হচ্ছে, কারিগরি কাজ শেখার জন্যে দলে দলে ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশ্যে যে কোন উপায়ে কোন ব্যবস্থা করা হোক জরমানদের তরফ থেকে। ভুলে গেলে চলবে না, জরমানদের দেশের আর্থিক অবস্থাও এখন বেশ মন্দার দিকে। তবু জরমানীর সর্বশেষ বাজেটে প্রতিরক্ষার পরেই অনুন্নত দেশের জন্যে অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে। ও'দের নানা সমস্যার মধ্যেও ও'রা যেভাবে ভারত বা অন্যান্য দেশের অনাহারের মৃত্যুমুখী মানুষদের কথা সযত্নে ভাবে, সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে, সেখানে আমরা আমাদের দেশের মানুষ পাপ পুণ্য সে কর্মফলেই হোক দু বেলা পেটভরে খেতে পারি, মাথার ওপর ছাদ রয়েছে, তারা যদি একবারও...। থাক ওসব প্রতিদিনের পুরনো কথা। বরং মাদার থেরেসার কথাই বলা থাক। তাঁর কথা এখানে নানাপত্রিকায় লেখা হয়েছে। বহু দুর্গাপ্রন্থ ছবি ছাপা হয়েছে। তাঁকে দেখে বারবার স্বামী বিবেকানন্দের কথাই মনে পড়ে যায়—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

টাকা সাহায্যের ব্যাপারে বলা হচ্ছে—"টাকা যদি সাহায্য করতে হয় তবে, সব চাইতে সহজ ও দ্রুত উপায়, যা সর্বপ্রকার ব্যুরোক্রেসি এড়িয়ে মাদার থেরেসার হাতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে, তা হল ক্যাথলিকদের

সাহায্য ভাণ্ডার "MISEREOR", যা দীর্ঘকাল ধরে মাদার থেরেসাকে সাহায্য করে, আসছে। POSTSCHECK-KONTO FRANKFURT 9558!

...প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের মাধ্যমে সাহায্য সংগ্রহ করা হচ্ছে "BROT FUER DIE WELT" (পৃথিবীর জন্যে রুটি) নামে। সাহায্য পাঠাবার স্থান : POSTSCHESKKONTO STUTT-GART 8001"

আর যাঁরা কোন ভারতীয় শিশুকে মানুষ করতে চান, বা কোন ছেলেকে সাহায্যকল্পে কারিগরি শিক্ষাদান করতে চান তাঁদের কাছে রেডিয়ো আর T V-তে ভারতের নানান মর্মান্তিক ফিল্ম-এর মাধ্যমে প্রায়ই আবেদন জানানো হয়, "ভারতের এই সব অনাহারী গৃহহীন মানুষদের সাহায্য করে আপনি ইউরোপকে সাহায্য করছেন। নাম পাঠাবার স্থান—Pfarrer Fritz Betzwieser, (8) Muenlhen 19, Romanstrasse 6.

আমাদের সরকারের কাছে কেবল অনুরোধ, যেসব বিদেশী সত্যিকারের শুভেচ্ছা বহন করে আমাদের মানুষদের সাহায্য করতে ভারতে যান, তাঁরা যেন সরকারী আমলা-তন্ত্রের ফাইলের অত্যাচারে হতাশ হয়ে ফিরে না আসেন। এখানকার কাগজে লিখছে ভারতের প্রায় ৩০০ লক্ষ মানুষের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই।

অধ্যাপক কলার সেদিন বলছিলেন—"আমার খুব ইচ্ছা, ভারতকে ঠিক মত জানার, দেখার।"

পরদিন তাঁর মেয়েকে অফিসে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম—"বলতে পারেন, আপনার বাবা ভারতের ব্যাপারে এত মুগ্ধ কেন?"

মেয়ে সবে ইসরাইল থেকে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে ফিরে এসেছে দেশে। বললে—"বাবা ভীষণ ভারতীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। আমাদের বাড়িতে প্রচুর ভারতীয় এসেছেন। আমি বাবাকে বলেছি—আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে।"

অধ্যাপক কলারের সেই কথাগুলি আমি এখানে নানা ঘটনায়, নানা পরিপ্রেক্ষিতে নানা জনকে বলেছি।

সেদিন পথে যেতে যেতে তাঁকে বলছিলাম—"হের প্রফেসর, আপনার মত একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্-এর পক্ষে ভারত দর্শনে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়। এত আন্তর্জাতিক সেমিনার আর কন্ফারেন্স্"—সম্বিনয়ে সেই সৌম্য পুরুষ অধ্যাপক বললেন—"শুধু কন্ফারেন্স-এ অংশ গ্রহণ করার জন্যে ভারতে যাওয়া, হোটেলে গিয়ে ওঠা আর দিনগুলি কেবল লেকচারে কাটিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, ইচ্ছাও করে না।"

—"তাহলে কোন কাজ নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসন না। আমাদের দেশে এখন বহু বিদেশী ইঞ্জিনীয়ার আর অধ্যাপক নানা কাজে আসছেন।"

বিদায় নেবার সময় অধ্যাপক কলার গম্ভীর কণ্ঠে, স্থির দৃষ্টিতে বললেন—"হ্যাঁ জানি। ওটা খুব সহজ কাজ। তবে কি জানেন, একটা দেশকে, তার মাটিকে, তার মানুষকে ভাল করে না চিনে, না ভালবেসে, সেই দেশে কাজ করতে যাওয়া, আর কোন নারীকে ভাল না বেসে তাঁর সাথে বিছানায় যাওয়া, একই রকম, আর একই পাপ।"

সেদিন সেই বিদেশী পণ্ডিতের মুখে এই কথা শুনে, কি জানি, আমার প্রায়ই মনে হয়—আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আর ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই বোধ হয় রয়েছে এই পাপ।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

অসীম মহাবিশ্বের সসীম মানুষ

শত কোটি। দুটি ছোট্ট শব্দ কিন্তু সে দুটি যে বিরাট সংখ্যা বোঝায় তা মনে যেন ধারণাই করা যায় না যেমন ধারণা করা যায় না মহাবিশ্বের আয়তন। এক মিনিট কতটুকু সময়? এত কম সময় যা চোখের কয়েক পলকে কেটে যায়। কিন্তু শত কোটি মিনিট এক সঙ্গে জুড়ে দিলে হবে ১৯০০ বছরেরও বেশি অর্থাৎ রোম সভ্যতার আমলে জুলিয়াস সীজার যখন নতুন ক্যালেন্ডার প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের গোটা ইতিহাসের বয়েস।

আমাদের ছায়াপথে কত নক্ষত্র। বৈজ্ঞানিকদের অনুমানে ১৫০ শত কোটি। সেগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক—আমাদের সূর্য, যার অবস্থান গোলাকার ছায়াপথের এক কিনারায়। ছায়াপথের সূর্য মহল্লায় বাস করি আমরা। আমরা মানুষেরা সূর্যের ছেলেমেয়ে এবং মহাবিশ্বের নাতি-নাতনী। সূর্যের তাপ ও আলো আমাদের জন্ম দিয়েছে, দিচ্ছে খাদ্য ও রসদ। আবার নানারকম মহাজাগতিক ব্যাপারের দ্বারা আমরা অহরহ প্রভাবিত হচ্ছি, এমন কি মহাকাশে পৃথিবীর গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে আমাদের শরীরের গঠনের।

রাতের দিগন্তপ্রসারী আকাশের জমিতে অসংখ্য সূর্যমুখী ফুলের মত ফুটে আছে তারাগুলি। তাদের প্রত্যেকটি যে এক একটি স্বাধীন সূর্য সে কথা আমাদের অজানা নয়। তাদের অনেকেরই আছে নিজস্ব গ্রহ পরিবার। এই নক্ষত্র সাগরের বুকে আঁকা রয়েছে রুপালী ফিতার মত— আমাদের ছায়াপথ। প্রকাণ্ড দূরবীণ দিয়ে দেখলে সেই ফিতার মধ্যে ভেসে ওঠে অসংখ্য তারকা।

থালার মত গোলাকার ছায়াপথের মর্মকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় ৬০০ পার্সেক্। পার্সেক্টা কি ব্যাপার? পার্সেক হচ্ছে মহাজাগতিক দূরত্বের একটি মাপকাঠি যা পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের ২০৬২৬৫ গুণ। ছায়াপথের ব্যাস হচ্ছে ২৬০০০ পার্সেক। মানুষকে ঘিরে আছে অগণিত পার্সেক, বছর, টন ও কিলোমিটার। ৬ ফুট দৈর্ঘ্য, ৬০।৭০ কিলো ওজন আর ৭০।৮০ বছর পরমায়ু নিয়ে মানুষের পক্ষে মহাবিশ্বের এই বিরাটত্ব কি কল্পনা করা সম্ভব?

যে তারাটি আমাদের সবচেয়ে কাছে—(আল্ফা সেণ্টাউরী)। তার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান মাত্র ১ পার্সেকের মত। দুনিয়ার আলোর চেয়ে বেগবান আর কিছু নেই। আলো প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছোটে তা সে আলো কোন অ্যাটম বোমা থেকে আসুক যা সামান্য একটা দেশলাইএর কাঠি থেকেই আসুক। সূর্য থেকে একটি আলোকরশ্মির পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে যে ক্ষেত্রে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড লাগে সেক্ষেত্রে অন্বাসন্ন থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে তার লাগে চার বছরেরও বেশি। আমাদের ছায়াপথে এমন সব নক্ষত্র আছে যেগুলির আলোকের পৃথিবীতে আসতে হাজার হাজার বছর

মহাবিশ্বের ভাষা শোনবার যন্ত্র—রেডিও দূরবীণ

কেটে যায়। ফলে এমন অবস্থায় সেইসব আলো আমরা দেখি যে অবস্থায় সেগুলি ছিল সুদূর অতীতে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তবা পৃথিবীতে মানুষের অভ্যুদয়ের আগে। ঐ সব নক্ষত্রের রাজ্যে আজ কি ঘটছে তা

ইউরোপে যে মহাজাগতিক গবেষণা কেন্দ্র খাড়া হয়েছে সেখানে এমন সব চেম্বার তৈরি হচ্ছে যার ভিতরের পরিবেশ মহাশূন্যের মত। সেই রকম চেম্বারের এই তাপীয় আবরণটি ব্রিটেনে নির্মিত হচ্ছে

মহাজাগতিক বন্দর
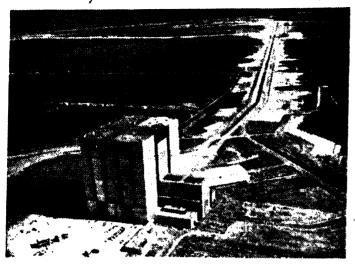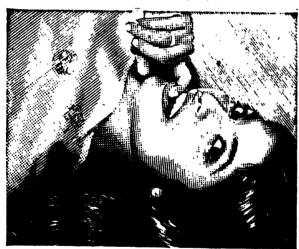
জানবার সৌভাগ্য আমাদের হবে না, হবে বহুকাল পরে আমাদের কোন উত্তর পুরুষের বৈজ্ঞানিকদের।

আমরা এ যুগের মানুষরা নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবতেই থাকব—এই মহাবিশ্বের আদি কোথায়, কোথায়ই বা এর অন্ত? স্বভাবতই তখন মনে হবে এর আদি বা অন্ত নেই। মহাশূন্যের যে অংশ পার হয়ে আসতে একটি আলোক রশ্মির, ধরুন দশ লক্ষ বছর লাগছে, সেই অংশটির চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে কোন কল্পনাই করা যায় না। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশলের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই যেন মহাবিশ্বের সীমানা দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। মহাজগতের দূর দূরান্তে এমন সব 'উপকণ্ঠ' রয়েছে যেখানকার বেতার-ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও-দূরবীণেও ধরা পড়ে না। কিন্তু 'উপকণ্ঠই বা বলি কেন? উপকণ্ঠ শব্দটি উচ্চারণ করলেই মহাবিশ্বকে সীমার দ্বারা বেঁধে দেওয়া হোল। মহাবিশ্বের কোন উপকণ্ঠ আছে এই ধারণা, পৃথিবীকে মহাজগতের মধ্যমণি ভাবা বা সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এই ধারণার মতই অচল। আসলে অসীম সম্পর্কে আমরা কোন ধারণা করতে পারি না বলেই মহাবিশ্বের উপকণ্ঠের কল্পনা করি। সীমাহীন মহাবিশ্ব, ছায়াপথের মত অসংখ্য জ্যোতিষ্ক জগত আমাদের হৃদয়ের ধ্যানধারণার অতীত।

ছায়াপথের ১৫০ শত কোটি সূর্যের একটির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজ্যের ছোট্ট একটি জগতে মানুষ নামধারী ছোট্ট জীবের বাস। কিন্তু মহাবিশ্বের বিরাটত্ব তার কল্পনাতীত হলেও সেই ছোট্ট জীবটি কিন্তু অসহায় নয়। শরীর তার যতই তুচ্ছ হোক তার আসল শক্তি কিন্তু তার শরীরে নয়, মনে বুদ্ধিতে। মানসিকতার জোরে আজ সে অসীম মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ধারের অভিযানে বার হতে পেরেছে। মননশক্তির জোরেই সে আজ বিধাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহাশূন্যে নকল চাঁদ ও নকল সূর্য পাঠাতে পারছে পার্থিব ব্যাপারের উপর মহাজাগতিক ব্যাপারের প্রভাব পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

দুই

দরবেশের পাশে পাশে, ইছামতীর ধারের গাঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে, আমার চমকের চিকুরে দেখলাম, ছোট ছেলে, পাঠশালার পড়ো, বছর দশ বয়স। ওপারে বাঙলার ঢাকা শহরের একরামপুর দিয়ে হেঁটে চলছে। জিয়সের গলিতে সে দৌড় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। মায়ের পায়ের কাছে বই সেলেট নামিয়ে দিয়ে দে ছুট। মায়ের মুখের দোষ দিও না, হাঁক দিয়ে বলল, 'ওরে মুখপোড়া, কোথা যাস্ ?'

ছেলের গলায় উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস, খেলতে।'

'খেয়ে যা রে।'

ছেলে তখন আবার একরামপুরের বড় রাস্তায়। চোখে তার পড়ন্ত বেলার রোদ। ইস্, ছোট বেলা, চলে যায়। খালি পা, গায়ে একটি পাতলা জামা, ডুরি পরানো প্যাণ্ট। জামার পকেটে তার হাত ঢোকানো। সেখানে হাতের মুঠোয়, ষষ্ঠ জর্জের মাথা ছাপানো দুটি নতুন তাঁবার পয়সা। যার গন্ধ স্বাদ ওর জানা। হাতের ঘামে যা চটচটিয়ে উঠেছে পকেটের মধ্যে। এই পয়সা দিয়ে ও যাবে যাবে যাবেই। পাঠ-শালার জেলখানা থেকে পালাতে পারেনি, হেড পড়োটা, ইঁদুর ধরা বেড়ালের মত তাকিয়েছিল। নইলে আগেই যেত। এই পয়সা দিয়ে দুটো জিভে গজা কেনা যেত। দুটো অমৃতি বা দুটো লুচি আর মোহন-ভোগ। জিভের সব লালা ও ঢোক গিলে খেয়েছে।

এ দু পয়সা তো রোজের পয়সা নয়। দুটো পয়সা, এ যে মেলে কালে ভদ্রে। এই পয়সা দিয়ে কিছু কিনে খাওয়া যায় না। তার চেয়ে অনেক বিরাট স্বপ্ন সফল করতে হয়। ও যাবে, আজ যাবেই যাবে।

কদমতলা পার হয়ে ওর পাগলা ছোটা নারিন্দার পুলের দিকে। পিছন থেকে আসে ঘোড়ার গাড়ি, সামনে থেকে আসে ঘোড়ার গাড়ি। জোড়া ঘোড়ায় টানা, যাকে বলে পালকী গাড়ি, ঢাকা শহরের সেই আমলের সর্বলোকের একমাত্র যানবাহন। তাদের চাবুকে বাজে শিস। ছোট ছেলেটার ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই দেখে হাঁক দেয়, 'আরে মাকখন, সুসরক ইয়া যা।'

ওরে মাখন, সরে যা। ছেলেটার নাম মাখন নয়, গাড়োয়ানের আদরের ডাক। ননী মাখনের থেকে, আদর করে আর বেশী কী-ই বা বলা যায়। মাঝে মধ্যে বড় লোকের এক্কা গাড়ি, বড় ঘোড়া, দুলকি চাল, চোখে ঠুলি, মাথায় শিরস্ত্রাণ। গাড়ির মধ্যে দেখবে, মোটাসোটা গোলগাল মানুষ, নয়তো সুন্দর সুন্দর বউ। গা ভরতি তাঁদের গহনা, সুন্দর শাড়ি, আর মিঠে গন্ধ। ছেলেটার এইরকম ধারণা। কচিৎ এক-আধটা মোটরগাড়ি। তাতে যে কারা চলে, ওর কোন ধারণা নেই।

একবার ও চকিত হয়, ছোটার বেগ একটু কমে। বাঁ দিকে কালাচাঁদবাবুর মাঠ। সেখানে ওর বন্ধুরা তখন অনেকে খেলায় মত্ত। টেনিস বলের লোফালুফি, রিঙ্-এর ছোঁড়াছুড়ি। কে যেন ওর নাম ধরে ডাক দিয়েছে। তাই ও একবার চকিত হয়, একটু বেগ কমে। আবার পরমুহূর্তেই বেগ বেড়ে যায়। ওর সময় নেই। বেলা যতটা পড়ন্ত, **ওর চোখে তার থেকে বেশী। ওর চোখে রোদ বাড়ন্ত। কম তো বলতে নেই। হাঁড়িতে চাল না থাকলেই বাড়ন্ত।**

বাঁ দিকের সাত্তিয়ালনগরের রাস্তা ছাড়িয়ে ও তখন নারিন্দার পুলের ওপর। নিচে বয়ে যায় তরতরানো খাল। খালে কালো জল, তাতে রোদ চিকচিক খেলা। নৌকা দেখা যায় না। টানের দিনে, খাল একটু খালি খালি থাকে। খাল ওর বাঁয়ে গিয়েছে সোজা, ডাইনে দিকহারা। হঠাৎ এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে, কোন দিকে যে চলে, তা টের পাওয়া যায় না। যাবে কেমন করে। ধু ধু মাঠের মত ওই যে সবুজ দেখা যায়, সব কচুরিপানা। তার মাঝখান দিয়ে, কোথায় যে আসল খাল তরতরিয়ে চলে গিয়েছে, হদিস পাওয়া যায় না পুলের ওপর থেকে।

না-ই পাওয়া যাক, নিচে নামলেই পাওয়া যাবে। ও তখন পুল পেরিয়ে, ডাইনের ঢালুতে নামে ছুটে। ইঁটের ভাটা পেরিয়ে ছোটে খালের ধার দিয়ে দিয়ে। ধারে ধারে পাড়া, গরীব মুসলমানদের। তাদের বাড়ির নিচে নিচে খানকয়েক ইঁট বা তক্তা বা কাঠের গুঁড়ি ফেলে ঘাটলা করা রয়েছে। এ তো পাছদুয়ার কি না। ঘাটের দখল বিবিদের। পাছদুয়ার হল খিড়কি। ওদিকে গিয়ে দেখ আগদুয়ারে সদর। মিঞাদের আনা-যানা সেখানে। ঘাটে ঘাটে তখন বিবি-দের সাফসুরতের ধোয়াধুয়ি। কেউ মাজে বাসন, কেউ ধোয় গা। মুখের সাবানের ফেনায় কারুর একটি ধানের মত নাকের নোলক গায়েব। কোন কোন ঘাটে নৌকা বাঁধা।

ছেলেটির নজর একবার বাড়ির দিকে, একবার ঘাটের দিকে। ঘাটের দিকে নয়, ঘাটে বাঁধা নৌকার দিকে। আগে দ্যাখে নৌকা, তারপরে দ্যাখে বাড়ি। ঘন নিঃশ্বাসে বুক ওঠে নামে। কপালে নাকে ভুরুতে ঘাড়ে গলায় ঘাম ঝরঝর। ত্রস্ত উৎকণ্ঠা ওর চোখে। ও যা খোঁজে, তা কোথায়।

আছে। দু কদম এগোতেই দেখতে পায়, আছে। নতুন গাবের আঠা মাখানো কোষা ডিঙিখানি। একটা বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা। টানের দিনের খাল, স্রোত কোথায় কে জানে। ঢেউ নেই এক রত্তি। যেন আয়নার ওপরে বসানো কোষা ডিঙা, উলটো করে নিজের মুখ দেখছে। ঘাটেতে

নেই কেউ। ছেলেটি ওপরে তাকিয়ে দ্যাখে, এক পাশে ঝিঙের মাচা, আর এক পাশে লাউ। মাঝখানে কোমর সমান কঞ্চির আগল। আগলের কাছে এসে ইতিউতি দ্যাখে। এক মাচার নিচে নটে শাক, আর এক মাচার নিচে বেগুনের চারা। মাঝখানে নিকানো উঠোন, দুপাশে দুই মাটির ঘর, মাথায় টিনের চাল। ছেলেটির চোখে ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে আশা। ডাক দেয়, 'নানী, ও নানী।'

দুই ডাকেতেই ঘর থেকে সাড়া। এক বুড়ির গলা শোনা যায়, 'কে রে? অ সলিমা, দ্যাখ তো ক্যাটায় ডাকে।'

সলিমা বেরিয়ে আসার আগেই ছেলেটি জবাব দেয়, 'নানী, আমি।'

মুসলমান দিদিমাকে যে নানী বলে ডাকতে হয়, ও তা জানে। সলিমা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে, ঘাড় কাত করে ওকে দেখছে। বেড়া বিনুনী বাঁধা, ছ সাত বছরের মেয়েটা। লাল রঙের ফ্রক গায়ে। চোখে সুরমা, দুই হাতের তালু মেহেদীতে রাঙানো। ছেলেটির দিকে চোখ রেখেই, নানীকে জবাব দেয়, 'একটা ইন্দু পোলা।'

একটা হিন্দু ছেলে। দিদিমা তখন বেরিয়ে এসেছে। সাদা কাপড়, ছোট আর ময়লা, গায়ে একটা পুরনো ছিটের ঢলঢলে জামা। বুড়ির ফরশা মুখের চামড়ায় মেলাই হিজিবিজি দাগ। দাঁত নেই, চোপসানো ঠোঁট দুটি পানের পিচে টুকটুকে লাল। ঠিক বুলবুলি পাখীর ইয়ের মত, ছেলেটির মনে হল। চোখে ছানি পড়েছে কি না কে জানে। লোমওঠা ভুরু তুলে, টুকটুক করে দ্যাখে বুড়ি। জিজ্ঞেস করে, 'কী কসরে সোনা।'

ছেলেটির পকেটে তখনো হাত, দু পয়সায় ঠেকানো। বলে, 'ডিঙ্গা ভাড়া চাই।'

বুড়ি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আগলের কাছে। তার কাপড় ধরে আসে নাতনী সলিমা। বুড়ি ভুরু কাঁপিয়ে দেখতে দেখতে ফোকলা মুখে হাসে। বলে, 'এতটুকু পোলা, সাঁতার জানো নি?'

ছেলেটির চোখে চকিত হতাশার মেঘ দেখা দেয়। বলে, 'জানি।'

বুড়ি হাসতে হাসতেই ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না গো সোনা, মিছা কথা কও।'

ছেলেটির মুখের ঝলকে প্রতিবাদ। বলে, 'দেখামু?'

তাতেও বুড়ির সন্দেহ যায় না। বলে, 'দেখাও তো।'

ছেলেটি এক টানে জামা খোলে। প্যান্টে হাত দিয়েই ঠেক খায়। সলিমা যে অবিশ্বাসী চোখে প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে! নানীর সামনে ন্যাংটো হওয়া যায়। তা বলে, ওই এক ফোঁটা মেয়ের সামনে! নানী বলে, 'ওদিক ফিরা খোল, কেউ দেখবো না।'

নাতনীর দিকে ফিরে বলে, 'যা তো সলিমা, গামছাখান লইয়া আয়।'

নানী বুড়ি এমনি ছাড়বার পাত্রী নয়। ছেলেটি দ্যাখে, তবু সলিমা যায় না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। সাঁতার জানার পরীক্ষা দিতেই হবে। মনে মনে সলিমাকে গালাগাল দেয়, 'পেত্নীটা, গিদ্ধরীটা।' তারপরে নানীর কথানুযায়ী, পিছন ফিরে প্যান্ট খুলেই দৌড়ে একেবারে জলে। ঝাঁপ খেয়ে এক ডুবেতেই অগাধ জলে। এবার দেখ, পাকা হাতে, কাঁথায় যেমন ছুঁচের ফোঁড় পড়ে, ছোট ছেলেটির নগ্ন শরীর তেমনি করে জলে ফোঁড় কেটে কেটে এগিয়ে যায়। যেন জলের মাছ না পোকা। মাঝ খানে গিয়ে ফিরে তাকায় পাড়ের দিকে। বুড়ি তখন ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ছেলেটি ফিরে আসতে আসতেই, সলিমা ছুটে গিয়ে গামছা নিয়ে আসে। ইন্দুর পোলাটাকে দেখে তখন তার চোখে সমীহ। নাকের নোলকটি দুলিয়ে হাসবে কি হাসবে না, ভাবছে। তারপরেই নানীর কাপড় ধরে চীৎকার করে ওঠে, 'নানী, জোঁক জোঁক।'

হ্যাঁ, গোটি তিনেক ছোট ছোট কালো জোঁক ছেলেটির পায়ে গায়ে কুচকির কাছে ধরেছে। নানী গামছা নিয়ে, আগল পেরিয়ে এগিয়ে আসে। ছেলেটির মাথায় গামছা ফেলে, টেনে টেনে জোঁক খুলে দেয়। জিভ্ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলে, 'আ আমার সোনার চাইন্, জোঁকে খাইয়া ফালাইছে।' তারপরে গামছা টেনে নিয়ে, নিজের হাতে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এমুন সোন্দর সাঁতার জান ছাও, তোমারে শিখাইল ক্যাটায়?'

ছেলেটি বলে, 'বাবার আগে আগে, তারপরে আপনে আপনে।'

ইতিমধ্যে ও প্যান্ট গলিয়ে নিয়েছে। জামাটাও পরে নেয়। পকেটে হাত দিয়ে দ্যাখে, পয়সা দুটো আছে কি না। কিন্তু তখনো ওর চোখে সন্দেহের ঘোর। বলে,

'এইবার ডিঙ্গা দ্যান।'

বুড়ি ওর মাথার জল গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে শোষে। বলে, 'দিমু রে সোনা। কতক্ষণের লেইগা নিবি?'

'এক ঘণ্টা।'

বলেই পকেট থেকে চকচকে তামার পয়সা দুটো বুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে। কোষা ডিঙ্গা ঘণ্টায় দু পয়সা ভাড়া। তামার ঝলক বুড়ির লাল টুকটুকে ফোকলা ঠোঁটে। বলে, 'সলিমা, বৈঠাখান আইন্যা দে।'

সলিমা তখন এক পায়ে খাড়া। নানীর কথামাত্র দিল ছুট। নানী পয়সা দুটো নিয়ে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে 'তোমাগো বাড়ি কই?'

ছেলেটির ব্যাকুল চোখ তখন উঠোনের দিকে। রাক্কুসীটা বৈঠা নিয়ে আসে না কেন। বেলা যে যায়। রোদের রঙ যেন লাল লাল দেখায়। নানীকে জবাব দেয়, 'আকরামপুরে।'

'আগে নি আইছ এইখানে? ডিঙ্গি নি বাইছ?'

'দুইবার, বন্ধুগো লগে।'

'এইবার যে সোনা একলা? পারবা নি?'

ছেলেটি জোরে ঘাড় কাত্ করে। সলিমা দু-হাতে বৈঠা নিয়ে আসে। ছেলেটি ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ছুট দিয়ে নামে ঢালুতে, লাফ দিয়ে কোষা ডিঙ্গায়। বুড়ি বলে চেঁচিয়ে, 'খুটার কাণ্ডিখান লইয়া যাও, লগির কাম দিব। যাইবা কোন্ দিকে?'

'গ্যান্ডাইরা।'

মনের কথা নয়, মিথ্যে কথা বলে। বুড়ি বলে, 'কিনারে যাও, ডাঙায় লগি মারতে পারবা।'

ছোট হাতের একটু টানাটানিতেই কাণ্ডির লগি খুলে যায়। সেটা ডিঙায় রেখে, বৈঠা দিয়ে ডাঙায় ঠেলা দিয়ে, ভেসে যায় অনেকখানি। পুলের ওপর থেকে খালের যে বাঁধ দেখা যায় নি, ঢাকা ছিল কচুরিপানায়, তাই এখন দেখা যায়। কালো একটা গা চকচকে সাপের মত, বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে পুবে। কচুরিপানার যত ভিড়, সব ডান দিকে, সীতানাথের আখড়ার মাঠে। মাঠে নানান খেলার ভিড়। ভলি, লাঠি, চু কিত্‌কিত্ আর রিঙ। ওখানেই বা ওর কত বন্ধুরা রয়েছে, কে জানে। তবে অনেক দূর, কচুরিপানার একটা কালো সবুজের লকলকে রাজ্য রয়েছে মাঝখানে। জলের দিকে ওদের কারুর দৃষ্টি নেই।

সবাই যখন তীরে, সবাই যখন মাঠে খেলছে, তখন এই ছোট মাঝিটি কোথায় যায়। কোন দরিয়ায় সে পাড়ি দেবে। মা ডেকেছিল পিছু পিছু।' বাড়া ভাত বুঝি এখনো পড়ে রইল। এই আসে এই আসে করে মা হেঁসেলে তুলে রাখতেও পারছে না। কিন্তু সে যে এখন মাঝি হয়ে বৈঠা টানে, তরতরিয়ে ভেসে যায় দোলাই খালে, মা তা জানে না। এ মাঝি শুধু জানে, সে খাল দিয়ে যাবে বুড়িগঙ্গায়। সেখানে কী আছে?

সেখানে আছে অথৈ জল বুড়িগঙ্গা। আর কী? ওপারে ইঁটের ভাটা, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওঠে। এপার থেকে মনে হয়, ইঁটের ভাটা জ্বালে লাল। আর কিছু না? হ্যাঁ, শশা ক্ষিরাইয়ের খেত্, মটর কলাইয়ের মাঠ। আকাশের কোন শেষ নেই। কেন, ওই সবে কী আছে। সবাই যখন শত খেলায় মেতে, একটু পরে সবার যখন বাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসার সময়, বাড়া ভাত পড়ে থাকে পিছনে, তার ওপরে অনেক রক্তচক্ষু শাসন পীড়ন, সব ভুলে তুই বুড়িগঙ্গায় কেন যাস্ ডিঙ্গা বেয়ে। খেলার আনন্দ না হয় নেই। ক্ষুধাও কি তোকে ছেড়েছে। ক্ষুধা যদি বা ছাড়ে, কোন ভয়ও কি নেই। কী সুখ তোর খাল দিয়ে বুড়ি গঙ্গায় যাবার। কিসের খোঁজে।

ও তা জানে না। ওর চোখে তখন, দোলাই মোহনার অথৈ বুড়িগঙ্গা। বাঁক পেরিয়ে ও ততক্ষণে, সোজা পুবে নেমে চলেছে। ক্যাপটেন কুক, কলম্বাস ওর পড়া, কিন্তু তাঁরা ওর মাথায় নেই। সেখানে ওর আবিষ্কারের কিছু নেই। কী এক অচিন আনন্দ যেন বুড়িগঙ্গার বুকে রয়েছে। ডিঙ্গা বেয়ে সেই মোহনায় না গেলে, তা যেন জানা যাবে না। ওর চোখে কেবল বুড়িগঙ্গার ঢেউ।

কিন্তু ডিঙ্গার তলায় যেন কেউ থাবা দিয়ে আঁচড়ায়। উলটো টানে ঠেলে নিতে চায়। মনে পড়ে, বুড়িগঙ্গার স্রোত আসছে, তারই টান। বুড়ি ঠিক বলেছিল, 'কিনারে কিনারে যাও, ডাঙায় লগি মারতে পারবা।' মাঝি নয়া, বৈঠা তার কথা শোনে না। ডিঙ্গা তো মাতাল। মাথা একবার বাঁয়ে যায় তো বাঁয়েই ফেরে, ডানে তো ডানেই। কষ্টে সৃষ্টে পাড়ের কাছে নিয়ে, লগি তুলে খোঁচা মারে মাঝি। বুড়িকে বলেছিল, গ্যান্ডারিয়া যাবে। এখন দ্যাখ, গ্যান্ডারিয়া বাঁয়ে, ডাইনে কলুটোলা। ঘাটে ঘাটে মেয়ে বউয়েরা গা ধোয়, বাসন মাজে। কলুটোলার দিকেই অনেক শান বাঁধানো ঘাট, পুরনো পুরনো মন্দির। মস্ত মস্ত বট গাছ। তার ওপারে গ্যান্ডারিয়া নতুন গজাচ্ছে। জলে ঘাট মন্দির আর গাছের ছায়া যেখানে পড়ে, সেখানেই যেন আচমকা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ছেলেটির চোখে তরাশ ফোটে। ঝুঁকে পড়ে, শরীর বাঁকিয়ে লগিতে দ্যায় ঠেলা। পাখির দল বেশী ডেকে উঠলেই, মন আনচানিয়ে ওঠে। বেলা বুঝি যায়।

বিকেলের ঘাটে, পুরুষদের আনাগোনা কম। ঘাট এখন মেয়েদের এক্তিয়ারে। নয়া মাঝিটাকে তাদের লজ্জা নেই। তারা জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে কলসী আড়াল দিয়ে। খিলখিল করে হাসে। পা দাপিয়ে দাপিয়ে সাঁতার কাটে। এমন কি নয়া মাঝিকে ডাক দিয়ে বলে, 'অই ছ্যামরা, কই যাস্?'

ছ্যামরা বলে ছোঁড়াকে। ছোঁড়ার তখন মস্করা নেই মনে। ও ডিঙ্গার তাল সামলায়, চোখে বুড়িগঙ্গা ভাসে। তবু যখন শান বাঁধানো পৈঠায় দাঁড়িয়ে, গাছকোমর বাঁধা শাড়িতে, খালি গা মেয়েটা এক পায়ে ধিন্ ধিন্ করে নাচে আর বলে 'ওই ছ্যাম্রা বান্দর, তর মায় সোন্দর। কলাগাছে

[illegible]ার চাক, ঘুইরা ঘুইরা বাপ ডাক।' তখন আর সে নিজেকে তেমন নির্বিকার রাখতে পারে না। একবার হাত তুলে থাপ্পড় দেখায়। মারে না, তাতে খিনখিনাকি মেয়েটার [illegible] আরো বাড়ে। মেয়েটা একনাগাড়ে বলে যেতেই থাকে। ছোঁড়াটা বাঁদর, তার মা সন্দেশ। [illegible] কি আবার বোলতার চাক [illegible]। [illegible] শুধু শুধু ও ঘুরে ঘুরে বাপ ডাকতে যাবে কেন। আর ডাকবেই বা কাকে। নয়া মাঝি তাই মনে মনে বলে, 'পেত্‌নীটা যেন মরে।'

মনে মনে রাগ হলেও, তা মন জুড়ে বসতে পায় না। লগির খোঁচায় খোঁচায় ও টেনে এগোয়। দ্যাখ, মুখে রক্তের বান, সারা গায়ে ঘাম ঝরে। কিন্তু লাল রোদটুকু যে কোথায় হারিয়ে যায়। [illegible] শুধু আকাশটাই থাকে। অথচ গ্যান্ডারিয়ার খেয়াঘাট পেরিয়ে, ডিঙ্গা তখনো সুত্রাপুরের বাজারের কাছে। সামনে লোহার পুল। চওড়া বড় ঝোলানো পুল, তার ওপর দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলে। পুল পেরিয়ে আবার একটা বাঁক। কিন্তু পুলের তলায়, টান পেরোতে পেরোতেই, আকাশের লালে কালিমা দেখা দেয়। ছোট ছেলেটির চোখেও কালিমা নেমে আসতে চায়।

জলের তলায় কাদের যেন বড় বড় থাবা, ডিঙ্গার তলায় খামচাতে থাকে। টেনে ছিটকে নিয়ে যেতে চায় পিছনে। অথচ, ওই তো সামনে, বাঁয়ে ফৌজী ব্যারাক, ডাইনে মালাকারপাড়া। মালাকারপাড়ায় বন্ধু বিলটু থাকে। ওদের পুরনো শ্যাওলা ধরা ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো, দূরের বুড়ি-গঙ্গাকে অনেকবার দেখেছে।

ডান দিকের ডাঙায় এখানে কয়েকটা জেলে নৌকা নোঙর করেছে। বুড়িগঙ্গায় মাছ ধরে, খালে ঢুকে, রাত্রিবাস করে। মাঝিরা হুঁকো টানছে, জাল বুনছে। ছোট মাঝিটিকে কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু তাদের কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসাবাদ নেই, ধমকধামক নেই। মাঝিটিকে বোধ হয় নয়া বলে চিনতে পারছে না। কে যেন আবার গেয়ে ওঠে, 'হায়, কী করিলি বিশ্বরূপিয়ে, নিমাইচান্দকে বিদায় দিয়ে—এ-এ-এ-হে-হে-ই!'...

কানে আসে, তাই শোনা। ছোট মাঝিটি ঝোলানো পুল পেরিয়ে, ফৌজী ব্যারাকের ডাঙা ছুঁয়েছে। এবার আবার ডান দিকে বাঁক, ছোট বাঁক। তারপরে বাঁক নিলেই, বুড়িগঙ্গা। কিন্তু তার আগেই দ্যাখ, মালাকারপাড়ার গাছের ঝুপসিতে, ঘাটে ঘাটে অন্ধকার নামে। ব্যারাকের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে। ছোট মাঝিটার এক ঘণ্টা কত মিনিটে। ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড পলের অঙ্ক কি কষা হয় না। বুড়ি নানী, ডিঙ্গার মালিকানীর মুখখানি বুঝি এখন আর মনে নেই। কেবল বুড়িগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা।

নয়া মাঝি থামে না, সে চলে লগি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। এই ডাঙাতে একটা ভয়, ব্যারাকে নাকি গোরা আর গাড়োয়ালীরা থাকে। বিলটু বলেছে, ওরা কাউকে এপারে দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু দেখতে পাবে কী? সে তো উঁচু পাড়ের অনেক নিচে। আর একটু, আর একটু। তখন একবার মনে পড়ে, একবার দেখা ঢাকেশ্বরীর প্রতিমার কথা। ধানমন্ডাইয়ের মাঠ পেরিয়ে, সেই আশ্চর্য মন্দিরে যে প্রতিমা আছে। যাকে বললে, সব আশা পূরণ হয়।

ভাবতে ভাবতেই, সহসা যেন কী ঘটে। ডিঙ্গাটাকে কে যেন সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলে। হাতের লগি হাতে থেকে যায়। তলায় তলায় যেন, কারা হাত দিয়ে ডিঙ্গা এগিয়ে নেয়। মুহূর্তে ছোট বাঁকটি ঘুরে যায়, আর একটু দূরেই, দিগন্ত খোলা। কলকল্ ছলছল শব্দ। কিন্তু বুড়িগঙ্গা কোথায়। ওপার কোথায়।

দেখা যায়, অস্পষ্ট ছায়ার মত। অন্ধকার পলে পলে বাড়ে। দূরের ওপারে কেবল, একটি আলোর বিন্দু। হয় তো ইঁটের ভাটায় জ্বলে। আর, আলো নেই, তবু বুড়িগঙ্গার বুকে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কোথাকার কোন আলো যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। সেখানেই যে সে যেতে চেয়েছিল। অথচ অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। আকাশে কখন কয়েকটি ঝিকিমিকি তারা জ্বলেছে।

কিন্তু ডিঙ্গা টেনে নিয়ে যায় কে। মোহনা ডাইনে, যেদিকে সদরঘাট গিয়েছে, সেখানে কয়েকটা মাস্তুলের ছায়া। দু একটা মিটি মিটি বাতি। ডিঙ্গা টেনে নিয়ে যায় কে। নয়া মাঝি বৈঠা নিতে ভুলে যায়। বাইতে তার আর মনে থাকে না। তার ছোট মস্তিষ্কে, কোন কার্যকারণের বোধ নেই। ডিঙ্গা ভেসে যায় কুটার মত।

তারপরে সহসা আকাশ কাঁপানো হাক, 'সামাল, সামাল।'

নয়া মাঝির বুক ধড়াসে যায়। সামনে তাকিয়ে দ্যাখে, প্রকাণ্ড এক কালো ছায়া, এগিয়ে আসছে তার ছোট্ট কোষা ডিঙ্গার ওপর। কথায় বলে, কোষাকুষি, তার থেকে জল নিয়ে তর্পণ করা চলে। যখন সে ডিঙ্গা হয়, তখন সে হা দরিয়ার মোচার খোলা। বুড়িগঙ্গার বুকে যাবে যে, তার মাথায় কিছুই ঢোকে না। সামনের প্রকাণ্ড কালো ছায়াটাই ওকে গিলিতে আসে, না কি, সে-ই তরতরিয়ে তার কালো হা-এর মধ্যে চলে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

আবার চীৎকার। এবার কয়েকজনের এক সঙ্গে। তারপরেই ঠক্ করে কী যেন একটা ডিঙ্গায় এসে পড়ে। পড়েই, ডিঙ্গা ঠেলতে থাকে এক পাশে। ঠেলতে ঠেলতে, কালো ছায়াটার কাছ থেকে সরিয়ে দেয় অনেক দূরে! গলা শোনা যায়, 'কে হে তুমি ব্যাতরিবত্ লোক। নাও বাইতে জান না?'

আর একজনের গলা শোনা যায়, 'একটা ছোট ছ্যামরা দেখি ডিঙ্গায়?'

আগের গলা, 'জিগাও তো, যায় কই?'

পরের গলা, 'কে হে তুমি, যাওন কোন্‌খানে?'

তখন নয়া মাঝিটি বুঝতে পারে, কালো ছায়াটি প্রকাণ্ড এক নৌকা। হাতীর মত তার ছইয়ের পিঠ। তার কোষা ডিঙ্গা যে টানে চলেছিল, সেই টানে ধাক্কা লাগলে, এতক্ষণে মোচার খোলা ছত্রখান। তাই লম্বা লগি দিয়ে ঠেলে, মাঝিরা সরিয়েছে। নয়া মাঝি এবার জবাব দেয়, 'ডিঙ্গাটা আপনেই যায়গা, আটকাইতে পারি না।'

'সর্বনাশ!' প্রথম গলাটাই আবার শোনা যায়, 'কাগো পোলা তুমি। নদীতে ডুববার চাও নাকি, আঁ? শীগ্‌গির লগিটা ধর।'

নয়া মাঝি তখন বড় নৌকার লগিটা চেপে ধরে। মাঝিরা টেনে বড় নৌকার কাছে নেয়। জিজ্ঞেস করে 'দড়ি আছে নি?'

নয়া মাঝি' তার ডিঙ্গার দাঁড়টা বাড়িয়ে ধরে। একজন দড়ি নেয়। আর একজন হাত বাড়িয়ে বলে, 'আইয়ো।'

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দিতেই, একজন তাকে বড় নৌকায় টেনে তোলে। তুলে একেবারে ছইয়ের ওপরে পাঠায়। সেখানে হাল মাঝির কাছে তাকে বসায়। ছেলেটি দ্যাখে, মাঝিরা ডিঙ্গা বেঁধে নেয় বড় নৌকার গায়ে। তারপরে ছইয়ের ওপরে আসে বাতি। চার মাঝিতে বাতি তুলে তাকে দ্যাখে। নয়া মাঝিটির নজর তখন পড়বে। যেখানে বুড়ি-গঙ্গা হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। চোখে তার অন্ধকার। জল আসে কি না আসে। ভাবে, 'এ যাত্রা হল না। আবার কবে কে জানে। দু পয়সা নয়, এবার চার পয়সা চাই। দু ঘণ্টার কমে হয় না। আর—আর আর—পাঠশালার ছুটির পরে নয়, আগে। পাঠশালা পালিয়ে।'...

ইতিমধ্যে মাঝিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। কাদের ছেলে সে, কোথায় যাবে। ভয় নেই, শীত নেই, মনিষ্যি কি না হে তুমি। একে একে সব কথার জবাব দেয় ছেলেটি। মাঝিরা বকা-ধমক করে, আবার খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে, হুঁকো টানে। জানায়, তারা যাবে শহরের নবাবপুরের কাছে, মালপত্র বোঝাই করতে। বুড়িগঙ্গায় যেতে-চাওয়া মাঝিটির কপাল ভাল, এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে।

এখন নৌকা চলেছে, বুড়ি-গঙ্গার স্রোতের টানে। তবু হাল মাঝি বুড়া বলে, 'জনা দুইরে দড়ি মার হে, পোলাটারে আউগাইয়া দেও আগে।'

ছোট ছেলেটি চিনতে পারে না, এরা হিন্দু না মুসলমান। হাল মাঝিটি দড়ি
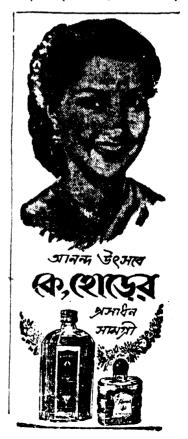
ভরাত মুখ। হাসে কি না বোঝা যায় না। ভুড়ুক ভুড়ুক হুকা টানে, আর এক-নজরে তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। চোখ দেখলে অনেক সময় হাসি বোঝা যায়। ছেলেটির মনে হয়, হাল মাঝি যেন হাসে। তারপরে এক সময়ে, হাল মাঝি যেন রহস্য করে জিজ্ঞেস করে, 'কই যাইতে চাইছিলা বাসী।'

'বুড়িগঙ্গায়।'

'বুড়িগঙ্গার কোন্‌খানে?'

'বুড়িগঙ্গায়।'

এর বেশী সে বলতে পারে না। বলতে জানে না। মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'ক্যান্‌ কী আছে হেইখানে? কিসের খোঁজে?'

'জানি না।'

'জান না?'

বুড়ো মাঝি খল্‌ খল্‌ করে হেসে ওঠে। অন্য মাঝিদের হেঁকে বলে, 'শোন, পোলায় কই যায়, কী চায়, জানে না।'

সকলেই হাসে। কিন্তু কেউ খবর রাখে না, ছেলেটির বুকে তখন কত অন্ধকার। তেমন অন্ধকার তখন দোলাই খালে, বনে, গাছে, মন্দিরে, ঘাটেও নামেনি। বুড়ি-গঙ্গার ঢেউয়ের ওপরে তখন কেবল

কতগুলো মুখ। বাবা, মা, দিদি, মাস্টারমশাই। আঃ যেন বুকের মধ্যে বেত্রাঘাত। ধুকধুকিতে ঢেঁকির পাড়।

টানে টানে, অল্প সময়েই নানীর ঘাটে এসে ওঠে। নানী তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে, বাতি নিয়ে ঘাটের ওপরে বসে। বগলের কাছে, সলিমার মুখে আলো পড়েছে। ছেলেটির শঙ্কা, বুড়ি এবার বাড়তি পয়সা দাবি করবে। এক ঘন্টা তো কখন কাবার। পাড় থেকে বুড়ির গলা ভেসে আসে, 'অ মাঝিরা, কোষাডিঙ্গা লগে, এক পোলারে নি দ্যাখছ?'

বড় নৌকা তখন বুড়ির ঘাটের কাছে, লগি ঠেলে দাঁড়িয়েছে। হাল মাঝি জবাব দেয়, 'ধইরা লইয়া আইছি। পোলায় তো আইজ বুড়িগঙ্গায় যাইতো।'

ছেলেটি ততক্ষণে কোষাডিঙ্গায় নেমে আসে। বুড়ি বাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোয়। মুখে বলে, 'অর আল্লা গো, এই পোলারে কি জিনে ধরছে।'

ছেলেটির গায়ে আলো পড়ে। সে ডিঙ্গা থেকে নেমে, কঞ্চির লগি কাদায় পোতে। ডিঙ্গার দড়ি বেঁধে দেয়। কিন্তু বুড়ির দিকে চায় না। বড় নৌকা লগি তুলে, পশ্চিমে চলে যেতে থাকে। মাঝিরা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। বুড়ি এসে ছেলেটির হাত ধরে। নয়া মাঝির হাল তবিয়ত তখন খুবই খারাপ। সলিমার চোখের পাতা পড়ে না। ইন্দুর পোলাটারে সত্যি জিনে পেয়েছে কি না, তার সুরমা-টানা চোখে তখন সেই জিজ্ঞাসা। নয়া মাঝি বলে, 'নানী, আমার পয়সা নাই।'

নানী অবাক মানে। বলে, 'পয়সা? পয়সার কী কাম?'

'আপনের ভাড়ার পয়সা।'

বুড়ির গলায় তখন স্নেহ বিদ্রূপ হাসি, মিলে মিলে খেলা করে। বলে, 'আরে আমার হজরতরে, তর পয়সার লেইগা নি ইয়া রইছি? দুধের পোলারে ডিঙ্গা দিছি, জলে ডোবে না সাপে খায়, হেই চিন্তায় মরি। তর বাপ মায়ের কী জানরে, তারা না জানি কী করতে আছে। বাড়িত যাইতে পারবি?'

বাপ মায়ের কথা উচ্চারণ মাত্রই, বুকে যেন শেল হেনে যায়। ও কোন রকমে বলে, 'পারমু।'

বুড়ি তৎক্ষণাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, 'যা গা।'

নয়া মাঝি যেমন ছুটে এসেছিল, তেমনি ছুটে যায়। পথে পথে দোকানে দোকানে বাতি। গাড়িতে গাড়িতে বাতি। ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় যাবার বেলায়, রোদ যত আতঙ্ক হয়েছিল, এখন আলোর বেলায় আঁধারকে যেন আতঙ্ক দেখছে। বড়

রাস্তা থেকে, গলির মুখে এসে, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ। স্বয়ং ঢাকেশ্বরীর ওপরেও যেন ভরসা রাখা যাচ্ছে না। গলিতে ঢুকতেই, এক জানালায় আলো। সেখানে তখন পড়া চলছে। সকলের খেলা কখন ভেঙেছে। ঘরে ঘরে সবাই বই খাতা নিয়ে পড়তে বসে গিয়েছে। আর ও এখন ফিরছে। গায়ে ওর এখনো, দোলাইয়ের জলের গন্ধ।

আর একটু ঢুকতেই, সাড়া পড়ে যায়। প্রথমে চোখে পড়ে এক প্রতিবেশীর। তারপরে আর এক প্রতিবেশীর। ছেলেটির নাম ধরে সবাই বলে, 'আইছে, আইছে।' যার অর্থ, খোঁজাখুঁজি অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। তারপরেই, একটা দোতলা বাড়ির থেকে, একটি আলো ছুটে আসে। দিদি! তার পিছনেই, মা! গেল গেল, নয়া মাঝির প্রাণটা বুঝি ভয়েই যায়। মায়ের গলা শোনা যায়, 'কই, দেখি কই ও?'

তারপরেই ঠাস্ ঠাস্, 'আরে যমরে, আরে মরণরে, তর মুণ্ডু রাখমু না।'

যেন মুণ্ড বলি দেবার জন্যেই, এত খোঁজাখুঁজি, হা-হুতাশ। মা আর দিদির কথাবার্তাতেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যে থানায় খবর দেবার কথা চিন্তা করা হয়েছে। দরজার কাছেই, ছোট আদালতের বিচার শুরু হয়। আসামীকে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে কি না। মায়ের অভিমত, না। সন্ধ্যা আহ্নিক করে, উনি এখন একটু মহাভারত নিয়ে বসেছেন। ও'র কাছে কাল সকালে হাজির করলেই হবে। দিদির অভিমত, তা নয়। উচ্চ আদালতের সাজাটা এই রাত্রেই হোক, ওর ইচ্ছা। শেষ পর্যন্ত মায়ের কথাই থাকে। দিদি আসামীকে নিয়ে উপস্থিত করে পড়ার ঘরে, যেখানে মাস্টারমশাই রয়েছেন. আর মেজদা। মেজদার চোখে রাগ না ঘৃণা, বোঝা যায় না। সেই রকম একটা কিছু। ওর নাকের পাটা ফোলানো। ওর হাতে শাস্তির ভার থাকলে, ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস-এর তামেচা কাকে বলে, বুঝিয়ে ছাড়তো। তারপরে কবুলের পালা। কবুল করতেই হয়, কেবল বুড়িগঙ্গার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। কবুলের পর হাত-মুখ ধোয়া। তারপরে, মাস্টারমশাইয়ের সামনে ঠ্যাঙ ফাঁক করে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। হায় মাঝি, পাপের কী ভরাডুবি!

কিন্তু কেউ কি জানতো, কান ধরে যখন দাঁড়িয়ে, তখন ওর চোখে বুড়িগঙ্গার ঢেউ। রাত্রে খেয়ে যখন দিদির পাশে শোয়, বাতি নিবে যায়, ওর ঘুম-জড়িয়ে-আসা চোখে, বুড়িগঙ্গা ভাসে। হাল মাঝির হুংকার শব্দ আর জিজ্ঞাসা, 'কী আছে সেখানে, কিসের খোঁজে?'......

আজ, এখন ইছামতী পার হয়ে চলেছি এক অচেনা গ্রামের পথে। সেই ছেলেটিকে দেখি, আমার রক্তে, আমার প্রাণে, আমার মন জুড়ে ব'সে। এই যে দরবেশ পুছ করে, 'আপনি কোথায় বেরয়েছেন, কিসের খোঁজে।' কী জবাব দেব ওকে। সেই ছেলেটি বলতে পারেনি। আমিও পারি না। তখন সেই ছেলেটির চোখ জোড়া ছিল রূপের তৃষ্ণা। বুড়িগঙ্গার রূপ, ওপারের রূপ। আজও তাই দেখি, দু চোখ ভরা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। কিন্তু কিসের খোঁজে, সেই অরূপের কী নাম, কে জানে। বেরিয়েছি অনেক কাল, চলেছি কালান্তরে। এখন ভাবি, এই মানুষ আর প্রকৃতির রূপের হাটে, অরূপের নাম যদি দিই, মনের মানুষ, তবে কেমন হয়।

কিছু হয় না। কেবল বলতে হয়, কোন্ মানুষে, সেই মানুষ আছে। থাকে কোথায়। চলে কোন্ আজবের কলে। দরবেশকে কিছু বলতে পারি না।

হঠাৎ হাঁক ওঠে, 'এই যে মামুদ গাজী, একটু নাম হবি নাকি?'

দরবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। আশে পাশে ঘর। বিরাট বটগাছের নিচে, ছায়ায় মুদীর দোকান। দোকানী ডাক দিয়েছে। আরো দু-একজন গাছের নিচে উটকো হয়ে বসে। এতক্ষণ যাকে জানা ছিল দরবেশ বা সাঁইবাবা বলে। সেটা অবিশ্যি নিজের মনে মনে জানা। আসল পরিচয় জানা গেল, ইনি মামুদ গাজী।

গাজী ডুপকিতে ডুপ্ ডুপ্কি শব্দ তুলে বলল, 'তা হবি নে কেন। নাম নিয়ে তো বেরিয়েছি।'

আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'আসেন বাবু, আপনাকেও একটু শোনাই।'

বলে গাজী ঝোলা থেকে বের করল ঘুংগুরের গোছা। সেটা জড়াল বাঁ হাতের আঙুলে। ডান হাতে ঠোকা দিল ডুপকিতে। অনেকটা ছড়া কাটার মত শুরু করল, 'আমি গুরু করব শত শত, মন্ত্র করব সার। যার সংগে মন মিলবে দায় দিব তার।।'......

(ক্রমশ)

ফলশ্রুতি

মহাভারত পাঠ করলে পুণ্যলাভ হয় বলে কথিত আছে। মহাভারতের মতো একাধারে কাব্য ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে পুণ্যলাভ স্বাভাবিক, সে পুণ্য যদি বিশেষার্থে সত্য নাও হয়, সাধারণ অর্থে নিশ্চিত সত্য। হৃদয় ও দৃষ্টির বিস্তার সাধন করতে এমন গ্রন্থ জগতে আর নাই। "যা নাই এ ভারতে তা নাই এ ভারতে" যথেষ্ট নয়, যা নাই এ ভারতে তা নাই এ জগতে হওয়া উচিত। মহাভারতে মানুষের চিরন্তন ইতিহাস।

কিন্তু কালিদাসাদি লৌকিক কবিগণের কাব্য পাঠ করলে পুণ্য লাভ হয় কেউ বলেছেন মনে হয় না। তবে কোন এক প্রকার লাভ নিশ্চয় হয় নতুবা হাজার হাজার বছর এসব কাব্য পঠিত হ'তো না। কী লাভ? পুণ্য নয়, তবে কী? আনন্দ? পুণ্য ও আনন্দ ভিন্ন কি না, পুণ্যের ফল আনন্দ কি না, এ সব তর্কের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে স্বীকার ক'রে নেওয়া যাক যে কুমারসম্ভবাদি কাব্য পাঠ করলে আনন্দ লাভ হয়, আলংকারিকগণ বলবেন, অহেতুক আনন্দ। উত্তম। কিন্তু কবিতে কবিতে ভেদ আছে, কাব্যে কাব্যে ভেদ আছে; শকুন্তলা ও মালতীমাধব এক রসের কাব্য নয় তবু দুয়েরই ফলশ্রুতি আনন্দ। আনন্দের স্বরূপেও কি ভেদ আছে? এ তর্কেও প্রবেশের প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলাই যথেষ্ট যে, খাদ্যের স্বাদে যতই ভেদ থাক শেষ ফল ক্ষুন্নিবৃত্তি। কাব্য পাঠের শেষ ফল ক্ষুন্নিবৃত্তি বা আনন্দ, তবে খাদ্যের স্বাদে অবশ্য ভেদ আছে। নব্য বাঙালী সাহিত্যিকগণের রচনাতে স্বাদের ভেদ আছে—যদিচ ফলশ্রুতি সেই আনন্দ।

মধুসূদনের কাব্য বিশেষভাবে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করলে প্রচণ্ড একটা শক্তির ভাব অনুভূত হ'তে থাকে। বুঝতে পারা যায় এক শক্তিমান কবি অধিকতর শক্তিমান এক সত্তার সঙ্গে লড়াই করছে। গ্রীক পুরাণে লাওকুন Laokoon নামে এক বীরের কাহিনীতে আছে যে, সমুদ্র থেকে দুটো সাপ উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে পিষ্ট করে ফেলবার উপক্রম করেছিল। বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে পাথরের মূর্তি খোদিত আছে। লাওকুনের মুখে কষ্ট ও বীর্য সমভাবে মিশ্রিত, আর তার প্রত্যেকটি মাংসপেশীতে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সেই লাওকুন, দুর্ভাগ্যের নাগপাশে বদ্ধ দুর্জয় যোদ্ধা। একদিকে অনভ্যস্ত ভাষা, অন্যদিকে প্রতিকূল নিয়তি দুয়ে মিলে নাগপাশ যতই দুর্মোচ্যতর করে তুলছে, মধুসূদনের শক্তি ও প্রতিভা ততই অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে। মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করতে করতে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়ে যায় সেই শক্তি ও প্রতিভা; পাঠকের প্রতিটি তন্তু, প্রতিটি মাংসপেশী অননুভূতপূর্ব দার্ঢ্য অনুভব করে, তার বুকের বল ভরসা অনেকটা বেড়ে গিয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্র-পাত্রীর অতি মানুষী শক্তির খানিকটা আত্মসাৎ করে নেয় সে। একটা নবলব্ধ শক্তির স্বাদ পেয়ে সে আনন্দ লাভ করে। আমি যতদূর বুঝি মধুসূদনের কাব্য পাঠের এই হচ্ছে ফলশ্রুতি।

বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ফলশ্রুতি কি? রবীন্দ্রনাথের ফিলজফি বা তত্ত্বের কথা বলে থাকেন অনেক সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের কোন ফিলজফি বা তত্ত্ব আছে বলে মনে করি না, ওটা সমালোচকদের "অবদান"; কারণ তত্ত্বের প্রসঙ্গ ওঠাতে পারলে অনেক আবোল তাবোল বকবার সুযোগ পাওয়া যায়; কাব্যালোচনার চেয়ে সে কাজ অনেক সহজ। তত্ত্বের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্টতা আছে আর রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধান ধর্ম এই যে কোন রকম নির্দেশ, গণ্ডী বা ছক তার সহ্য হয় না। বিদ্যুতের গতির সঙ্গে, নদীর স্রোতের সঙ্গে, বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে সাধর্ম্য। তিনি সারাজীবন নিজেকে ধরবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।"

এই যাঁর মনের কথা, নিজেকেই জানেন না যিনি, তাঁর পক্ষে জীবনকে একটি তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে সুসংবদ্ধ, সুসংহত রূপদান সম্ভব নয়। তিনি তাত্ত্বিক কবি হতে পারেন, তবে কোন ফিলজফি, তত্ত্ব আমাদের দান করেন নি তিনি।

তিনি তত্ত্ব দান করেন নি বটে তবে তার চেয়ে অনেক বড় জিনিস দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে নূতন আলো জেলে দিয়েছেন, যার প্রভায় চরাচর অপূর্ব

জ্যোতিতে ভূষিত হয়ে দেখা দিয়েছে। যা ছিল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, যা ছিল না মূর্তি গ্রহণ করেছে, থাকা না থাকার সীমাটাই লোপ পেয়ে গিয়েছে। এ স্রষ্টার দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্রষ্টার পদে অভিষিক্ত করেছেন। বোধকরি তার চেয়েও বেশি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে যখন বিরহী দেবতার করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হতে থাকে, তখন সেই যোগাযোগের দুর্লভ মুহূর্তে প্রাত্যহিক যবনিকার প্রান্তটি হঠাৎ কখন বিচলিত হয়ে, সরে যায়, চোখে পড়ে, আর একটা জ্যোতির্ময় কিছু, যার নাম জানি না, প্রমাণের অতীত অনুমানের সেই ধনকে সমগ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় সত্যের চেয়ে সত্যতর বলে। এ হচ্ছে Super reality বা অতিবাস্তব। ঠিক সেইসব দুর্লভ মুহূর্তে মানুষ এই জনে চৌকাঠের উপরে বসেই জন্ম জন্মান্তরে স্বাদ পায়—"এই জনমে ঘটালে মোর জ জনমান্তর।" আমার অভিজ্ঞতায় এই হ রবীন্দ্র সাহিত্যের ফলশ্রুতি।

বঙ্কিম সাহিত্যে পদক্ষেপ করবামাত্র এক প্রাণচঞ্চল কর্মবহুল নাগরিক জীবনের মা প্রবেশ করি। বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র

পরিবেশ পল্লীগত। আমাদের মনে একবার ক্ষণেকের জন্য দিল্লীর স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায়, তবে তার ধ্রুবটা হচ্ছে "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।" মধুসূদনের লঙ্কা বিপুল ঐশ্বর্যময়ী নগরী, কিন্তু সে তো কোন পৌরাণিক লোকে। রবীন্দ্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি—ছোট গল্প, কবিতা ও গান—চিরন্তন পল্লী স্বপ্নের প্রাণ থেকে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে এলেন আমাদের জটিল বিপুল নাগরিক জীবনের মধ্যে। এখানে হিংসা ঈর্ষা দ্বেষ শ্বাপদের মতো সঞ্চরমান; লোভ কুয়াশার মতো পরিব্যাপ্ত; প্রতিহিংসা ও জিঘাংসা শিকার সন্ধানে ব্যস্ত; আবার সেই সঙ্গে আছে প্রেম দয়া মায়া ও স্নেহ। লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপ, মীরকাশিমের মুঙ্গের, হিরন্ময়ীর তাম্রলিপ্ত, রাধারানীর শ্রীরামপুর, সীতারামের মহম্মদনগর, ইন্দিরার কলিকাতা, নগরী শ্রেষ্ঠ দিল্লী ও উদয়পুর। বাংলা দেশে শহর বন্দর নূতন, বাংলা সাহিত্যেও। বঙ্কিমচন্দ্রে তার আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপাত। প্রাচীন ও রবীন্দ্র সাহিত্যের তুলনায় তার পরিবেশ ভিন্ন। যে-নাগরিক জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করতে বর্তমানে আমরা ব্যস্ত, যে-প্রাচীন পল্লীর সংস্কার ও নূতন অনভ্যস্ত নাগরিক জীবনে সামঞ্জস্য সাধন করতে না পারবার ফলে হাজার রকম জটিল সমস্যার উদ্ভব, যে-সমস্যা সমাধানের উপরেই আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্বের নির্ভর; তার মূলে নাগরিক জীবনের মধ্যে মানুষের পদ প্রবেশ। এ একটি মডার্ন বা আধুনিক সমস্যা। পাশ্চাত্ত্যে এ সমস্যা অনেক দিন দেখা দিয়েছে; সমাধানের চেষ্টা চলছে তবে সামঞ্জস্য হবে মনে হয় না, কারণ Industrialism-এর দিকে ঝুঁকে তারা এগোচ্ছে। আমাদের দেশও সেইদিকে ঝুঁকেই অগ্রসর হবে মনে হয়, তবে এখনো নিতান্ত শৈশব। মোট কথা এই যে, সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের উপরে কেবল আমাদের জাতীয় জীবন নয়, বর্তমান সভ্যতার মরা বাঁচা নির্ভর করছে। বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে এত চিন্তা করে দেখেছেন কি না জানি না, তবে প্রতিভার নির্দেশে সেই পথেই চালিত হয়েছেন। এ কথা সত্য হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ও প্রধান বাঙালী মডার্ন লেখক। আগে বলেছি তিনি সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অনুকূলে নন, রীতিমতো প্রতিকূল। এবারে তার অর্থ বুঝতে পারা যাবে। প্রাণচঞ্চল কর্মবহুল নগরকেন্দ্রিক আধুনিক জীবনের মধ্যে স্বভাবতই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের স্থান সংকীর্ণ। বিচিত্র কর্মের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ নূতন সভ্যতার আদর্শ; তার উপায় মানুষের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির মধ্যে, তন্মধ্যে প্রাচীন পল্লীগত সংস্কার ও নূতন নগর কেন্দ্রিক সংস্কারকেও ধরতে হবে, সামঞ্জস্য সাধন। ঘটনার হাত থেকেই সমস্ত দেশকে এই নূতন পাঠ নিতে হয়েছে বা হবে। তারপরে প্রতিভাশালী লেখক এই নূতন প্রবণতাকে একটি রসমূর্তিদান করে। বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র এই কাজটি করে আমাদের মনকে নূতন পাঠ গ্রহণের অনুকূল করে তুলেছেন। তিনি রি-অ্যাকশনারি, মেডিয়াভেল বা রিভাইভ্যালিস্ট নন; তিনি একান্তভাবে প্রোগেসিভ ও মডার্ন; তিনি একাধারে যুগোচিত ও যুগান্তর। আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্বাস মতে এই হল গিয়ে বঙ্কিম সাহিত্যের ফলশ্রুতি এবং বঙ্কিম সরণীর মানচিত্র।

সমাপ্ত

এক্কুশ

গগন অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। যাবার আগে সুরেশ্বরকে কি যে বলেছিল সুরেশ্বর খেয়াল করে শোনে নি। গগনের গলার স্বর থেকে মনে হয়েছিল তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে; ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয় সে চলে গেছে। গগন আশা করেছিল সুরেশ্বর আরও কিছু বলবে, আশায় আশায় সে অপেক্ষা করেছে। সুরেশ্বর কিছু বলে নি। অস্পষ্ট, অসংলগ্ন দু একটা মামুলি কথা যে যথেষ্ট নয়, এমন কি কোনো কৈফিয়তও নয় —গগন সম্ভবত সুরেশ্বরকে সেই কথাটা উচ্চস্বরে জানিয়ে চলে গেছে।

গগন চলে যাবার পর সুরেশ্বর আরও কিছু সময় একই ভাবে বসে থাকল। গগনের শূন্য আসন, গগনের রেখে যাওয়া চায়ের কাপ তার চোখে পড়ছিল; অথচ গগনের কথা সে ভাবছিল না। গগন অসন্তুষ্ট হয়েছে এ-কথা বুঝেও যেন সে চঞ্চল নয়।

পৌষের রাত যে কতটা হয়েছে সুরেশ্বরের খেয়াল ছিল না। ভরতুর বদলে অন্য কে যেন ঘরে এসে রাতের খাবার রেখে গেল। সুরেশ্বর অন্যমনস্কভাবে লক্ষ করল, গগনের টেনে আনা চেয়ার পাশের ঘরে রেখে, চায়ের কাপ ধুয়ে মুছে লোকটা চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত সুরেশ্বর উঠল। বাইরের ঘরে দরজা ভেজানো, বাতি জ্বলছে, টেবিলে এলোমেলো কাগজপত্র। দরজা বন্ধ করল সুরেশ্বর: খোলা জানলা দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা ঢুকছে, জানলাটাও বন্ধ করল। কাগজপত্র গুছিয়ে, বাতি নিবিয়ে ভেতরের বারান্দায় এল। বারান্দায় একপাশে ছোট কলঘর, জলে হাত দেওয়া যায় না। চোখ মুখ ধুয়ে সামান্য আরাম পাওয়া গেল, গলাটা কেম যেন জ্বালা করছে।

শোবার ঘরে ফিরে এসে সুরেশ্বরের মনে হল, গগন যেন একবার তাকে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কি কথা? কথাটা মনে করতে পারল না সুরেশ্বর, তবে অনুমান করল গগন তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে তার স্বার্থপরতা সম্পর্কে কোনো একটা কটু মন্তব্য করেছিল।

টাইমপিস ঘড়িটাতে রাত দশটা বেজে গেছে। অন্যদিন এ-সময় তার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়। আজ কেন যেন আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। দুধটুকু সুরেশ্বর খেয়ে নিল।

ঘরের জানলা ভেজিয়ে সুরেশ্বর তার বিছানায় মশারিটা টাঙিয়ে ফেলল। গগন কি রাগ করে কলকাতায় ফিরে যাবে? কথাটা হঠাৎ মনে হল সুরেশ্বরের। পরক্ষণেই আবার মনে হল, হেমও কি হঠাৎ গগনের সঙ্গে চলে যাবে?

লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেবার আগে সুরেশ্বর তার টর্চটা খুঁজে নিল, নিয়ে বাতি নিবিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ চোখের পাতা বন্ধ করে থেকে সুরেশ্বর যেন নিজেকে শিথিল করে রাখল, স্রোতে গা ভাসানোর মতন তার মন ও চিন্তাকে যত্রতত্র ভেসে যেতে দিল। অথচ সামান্য পরেই সুরেশ্বর অনুভব করল কোনো স্থায়ী ক্ষতের বেদনার মতন তার মন ঘুরেফিরে সেই একই চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। চোখের পাতা খুলে অন্ধকারে তাকাল সুরেশ্বর। গম্ভীর অন্ধকারে দৃষ্টি যেন আরও নিখুঁত হয়ে সেই একই বিষয়ের ছবিগুলি সাজিয়ে নিচ্ছে। গগনের সামনে যাকে স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি সুরেশ্বর, যে অত্যন্ত ধূসর হয়েছিল, অতি ম্লান, এখন সে অতি স্পষ্ট। মনে হল, নির্মলা তখন এমন কোনো স্থানে ছিল যেখানে অন্যের উপস্থিতির জন্যে তাকে স্পষ্ট করে দেখা যায় নি, এখন দেখা যাচ্ছে।

সুরেশ্বর অপলকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ করে নির্মলাকে যেন দেখল। নির্মলার সেই শীর্ণ, নিবন্ত প্রদীপের শিখার মতন অনুজ্জ্বল, বিষণ্ণ মূর্তিটি বুঝি সুরেশ্বরের দিকে কেমন এক স্তিমিত আলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

সুরেশ্বর অপেক্ষা করল। নির্মলা ক্ষীণদৃষ্টি ছিল; সে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসতে পারত না; পা ফেলে ফেলে চারপাশে দেখে অত্যন্ত ধীরে ধীরে আসত। আজ, এই মুহূর্তেও সুরেশ্বর যেন নির্মলাকে তার অভ্যাসমতন কাছে আসতে দিল।

নির্মলা কাছে এলে সুরেশ্বর তার মুখটি আর নিবিষ্ট চোখে লক্ষ করল: ওই মুখে এমন কিছু ছিল যা রূপ নয় অথচ যার আকর্ষণ রূপের অধিক। নির্মলাকে এখন এত স্পষ্ট ও একান্ত করে দেখতে পেয়ে সুরেশ্বর খুব খুশী হল।

নির্মলার সঙ্গে সুরেশ্বরের পরিচয়ের মধ্যে একটা আকস্মিকতা ছিল। সুরেশ্বর এখনও সেই পার্কের কৃষ্ণচূড়ার গাছটি যেন দেখতে পায়, যার তলায় কালবৈশাখীর ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে নির্মলা দাঁড়িয়ে ছিল।

তখন বৈশাখ, কলকাতা শহরের গাছ-পালা মাটি পথ যেন কয়েক দিন ধরে পুড়ে যাচ্ছিল; সারাদিন গুমোট, কোথাও একটু বাতাস বয় না, গাছের পাতা নড়ে না। সেই দুঃসহ গ্রীষ্মে একদিন বিকেলের পর সুরেশ্বর পার্কে এসে বসে ছিল। আশেপাশে অজস্র মানুষ, বাতাসের আশায় পার্কে এসেছে, বসে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাবুগাছের পাতাগুলি নিশ্চল, বেড়া দেওয়া কলাফুলের ঝোপে একটিও ফুল নেই, আকাশ যেন সারাদিন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে মাথার ওপর ভস্মস্তূপের মতন পড়ে আছে।

সুরেশ্বর মাটিতে মরা ঘাসের ওপর চুপচাপ বসে ছিল। গরমে তার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, চারপাশে কেমন অদ্ভুত একটা থমথমে ভাব হয়ে এসেছে, সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন এই সন্ধ্যার মুহূর্তে হঠাৎ কেমন অচেতন হয়ে গেছে, গাছ পাতা কাঁপছে না, ধুলো উড়ছে না, পাখিদের স্বর স্তব্ধ, শূন্যতার মধ্যে শুধু অদ্ভুত এক শোষন চলেছে, সমস্ত অবশিষ্ট আর্দ্রতাও শুষে নিচ্ছে। সুরেশ্বরের চোখ কান জ্বালা করছিল, গায়ের চামড়াও যেন কিসের আঁচ লেগে পুড়ে যাচ্ছে।...... হঠাৎ, সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে একরাশ ধুলো উড়ে গেল। কেউ খেয়াল করে নি আকাশের এক কোণ ইতিমধ্যে সেজে উঠেছে। ধুলোর ঝাপটা থেমে যাবার পর পরই গাছের মাথায় পাতাগুলো কাঁপতে লাগল। বাতাস এল কয়েক ঝলক। তার পরই হুহু করে আকাশ ভাসিয়ে কালো মেঘ আসতে লাগল, অন্ধকার হল, ধুলোর ঝড়

এল ঝাপটা মেরে। লোকজন ততক্ষণে পার্ক থেকে পালাচ্ছে। সুরেশ্বর উঠল না, আরও একটু অপেক্ষা করে যাবে। আসন্ন ঝড়টুকু গায়ে সামান্য মেখে নিতে তার আপত্তি নেই।

দেখতে দেখতে কালবৈশাখীর ঝড় এসে গেল। সাবু গাছের পাতার ঝুঁটি টেনে শনশন বাতাস বইছে, ধুলো উড়ছে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। পার্ক তখন শূন্য। সুরেশ্বর কোনো রকমে চোখ বাঁচিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ দেখল পার্কের ফটকের কাছে কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় একটি যুবতী মেয়ে দু হাতে চোখ মুখ আড়াল করে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। চলে যেতে যেতেও সুরেশ্বর কেমন থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল, মেয়েটি এত দুর্বল যে এই ঝড়ে পা বাড়াতে সাহস করছে না।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করেছিল, তপ্ত শুষ্ক মাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে, মাটির গন্ধ, গাছের ডাল বুঝি ভেঙে পড়বে। পার্কের দু চারটি বাতি জ্বলতে জ্বলতে নিবে যাবার অবস্থা। আকাশে বিজলী।

সুরেশ্বর কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে এসে মেয়েটিকে সাবধান করে দিতে কি যেন বলতে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

নির্মলা ভেবেছিল তার দাদা প্রমথ এসেছে।

প্রমথ যতক্ষণে পার্কে এল ততক্ষণে সুরেশ্বর নির্মলাকে নিয়ে পার্কের উল্টো দিকে এক ডাইংক্লিনিংয়ের দোকানের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যেই প্রমথকে পার্কে ঢুকতে দেখে বোঝা গিয়েছিল মানুষটা বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছে। নির্মলা বলেছিল : দাদা আসবে। অনেক কষ্টে প্রমথকে ডেকে নিতে হয়েছিল দোকানে।

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে রিকশা করে যেতে যেতে পরিচয় হল। নির্মলা সামনের রিকশায়, পেছনে প্রমথ আর সুরেশ্বর।

প্রমথ বলল, "ও চোখে খুব কম দেখে। আমার ভীষণ ভয় হয়ে গিয়েছিল।"

সুরেশ্বর বলল, "বলছিলেন বটে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না।"

"কি করে বুঝব, হঠাৎ এরকম কাল-বোশেখী উঠবে।......আমারই ভুল হয়েছিল ওকে এভাবে রেখে দিয়ে যাওয়া উচিত হয় নি।"

"কোথায় গিয়েছিলেন?"

"বেশী দূরে নয়। ওর চশমার ডাঁটি খুলে গিয়েছিল, সারিয়ে আনতে গিয়েছিলাম।"

"উনি তাই বলছিলেন।"

"বিকেলে ওকে একটু বেড়াতে নিয়ে এসেছিলাম। যা গরম। সঙ্গে করে না আনলে হয় না, বুঝলেন না......। তবু রক্ষে ও একলা পার্ক থেকে চলে যাবার চেষ্টা করে নি—করলে নির্ঘাত গাড়ি চাপা পড়ত।"

সুরেশ্বর কৌতূহল বোধ করলেও নির্মলার দৃষ্টিক্ষীণতার কথা তখন কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

প্রমথ নিজের থেকেই বলছিল, "ঝড় উঠেছে প্রথমটায় আমি বুঝতেই পারি নি। দোকানটাও আবার সেই রকম, অন্দরমহলে প্রায়, ভেতরে বাড়ির মধ্যে ছিলাম, কিছু দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। তারপর যখন বুঝলাম, ছুটতে ছুটতে আসছি। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মশাই।......আপনার নামটা যেন কি?"

সুরেশ্বর নাম বলল।

প্রমথ তার পরিচয় দিল। যৎসামান্য পরিচয়। বেসরকারী কলেজে পড়ায়, থাকে কাছাকাছি এক ভাড়াটে বাড়িতে, গলির মধ্যে। বিপত্নীক, সংসারে আত্মীয়পরিজন বলতে এই বোন।

জল ঠেলে গলির মধ্যে রিকশা ঢুকল। বাতি জ্বলছে কি জ্বলছে না। চার পাশ চাপা, আকাশে তখনও মেঘ ডাকছে, দুঃসহ গরমটা বৃষ্টির জলে যেন ধুয়ে গেছে।

ঘরে এনে বসালো প্রমথ। সুরেশ্বর রিকশায় ওঠার সময় প্রথম যা আপত্তি জানিয়েছিল তারপর আর আপত্তি জানায় নি। ঠিক যে কি হয়েছিল সুরেশ্বর জানে না, কিন্তু কোনো অদ্ভুত আকর্ষণবশে অথবা কৌতূহলে সে প্রমথদের সঙ্গে চলে এসেছিল। এই আকর্ষণ কিসের, অথবা তার কৌতূহল কতটা যুক্তিযুক্ত সে কথা তখন ভাবে নি।

আকস্মিকভাবে যা ঘটেছিল সাধারণভাবে তা শেষ হতে পারত। পার্কের উল্টোদিকের সেই লণ্ড্রিতে দাঁড়িয়ে, কিংবা রাস্তায় নেমে, এমন কি রিকশাতে যেতে যেতেও সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রমথ এই তুচ্ছ ঘটনার সমাপ্তি ঘটাতে পারত। ঘটালে তাকে দোষ দেওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু প্রমথ তা দেয় নি। সদালাপী, সরল মানুষ ছিল প্রমথ, তার চরিত্রে সুসজ্জনোচিত আন্তরিকতা ছিল। বয়সে সুরেশ্বরের চেয়ে কিছু বড় হলেও প্রমথ চরিত্রমাধুর্যে সুরেশ্বরকে বন্ধুর তুল্য করে নিয়েছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের পরিচয় ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায় তার মূলে সম্ভবত নির্মলার আকর্ষণই ছিল প্রধান।

জীবনের কিছু সরল সাধারণ নিয়ম অনুসারে নির্মলা কোনো যুবকের আকর্ষণের বস্তু হতে পারে না। নির্মলার বাহ্য কোনো রূপ ছিল না। তার গায়ের রঙ ছিল ময়লা, শরীর শীর্ণ লতার মতন ক্ষীণ, সে দুর্বল ও শিশুর মতন অসহায় ছিল। শাঁখের মতন লম্বা মুখ, দীর্ঘ কপাল, সরু চিবুকে রূপের এমন কিছু কারুকার্য ছিল না যা দৃষ্টিকে নিষ্পলক করতে পারে। নির্মলা পুরু কাঁচের চশমা পরত, চশমার তলায় তার চোখের পাতা মোটা দেখাত, মনে হত চোখ বুজে আছে। ওর চোখের মণির রঙ ছিল ধূসর, নির্মলা প্রায় সব সময়ই আনত-চোখে তাকাত, যেন এই আলো বড় প্রখর, তার চোখে সহ্য হচ্ছে না।

নির্মলার রূপ ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য এক সৌন্দর্য ছিল। এই সৌন্দর্য তার শরীরে নয় এটা বোঝা যেত, কিন্তু বোঝা যেত না ঠিক কোথায় এই সৌন্দর্য আছে। কৃষ্ণপক্ষের দুর্বল চাঁদের আলোর মতন একটি আভা যেন তার ময়লা গায়ের রঙে মেশানো থাকত, এবং কখনও কখনও মনে হত, এই আভা বুঝি কোনো নিভৃত স্থান থেকে উৎসারিত হচ্ছে। নির্মলার শঙ্খ-সদৃশ মুখ কখনও কখনও এমন একটি বেদনা সঞ্চার করত যা হৃদয়ের কোনো অজ্ঞাত স্থানে অনুভব করা যেত, অথচ তাকে ব্যক্ত করা যেত না। সুরেশ্বর অনেক দিন বোঝে নি নির্মলার প্রতি তার আকর্ষণ কেন। পরেও যে বুঝেছিল তা নয়—তবু একটা ধারণা হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, নির্মলা কখনও তার অদৃষ্টের কথা বলত সহিষ্ণুতার, এ সংসারে মানুষের যে নির্দিষ্ট নিয়তি—সেই বেদনাদায়ক স্থির পরিণতির জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে, অথচ তার আচরণে ক্ষিপ্ততা অথবা ভীতি নেই; নির্মলা কখনও তার অদৃষ্টের কথা বলত না। সুরেশ্বরের কেন যেন মনে হত, নির্মলার পক্ষে এতটা সহিষ্ণুতা অনুচিত।

প্রমথ বলেছিল, নির্মলা ক্রমশ অন্ধ হয়ে আসছে, শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক কি কারণে নির্মলার চক্ষুরোগ দেখা দিয়েছিল—এ কথা কেউ বলতে পারে নি। নানা মুনির নানা মত ছিল। শিশুকাল থেকেই নির্মলার চোখে কষ্ট ছিল, বয়স বাড়ার পর সেটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম সাধারণ চিকিৎসা ও চশমা পরিয়ে ব্যাধিটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে আরও নানা রকম চিকিৎসা হয়েছে, প্রমথ সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই ব্যাধির কোনো প্রতিকার হয় নি। এখন প্রমথ নিরুপায়, শুধু অজ্ঞমের মতন

অপেক্ষা করে আছে। বস্তুত তার কিছু করার ছিল না, এক শুধু বোনকে আগলে আগলে রাখা ছাড়া, আর ছুটিছাটায় নির্মলাকে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া। প্রমথ প্রায় প্রত্যেকটি ছুটিতে নির্মলাকে সঙ্গে করে বাইরে বেড়াতে যাওয়া তাকে বলেছিল, বাইরের খোলামেলা আকাশ বাতাসে নির্মলা সাময়িক একটা উপকার পেতে পারে। উপদেশটা প্রায় সংস্কারের মতন প্রমথকে ভর করেছিল। ছুটি পেলেই সে নির্মলাকে নিয়ে বাইরে ছুটতে চাইত। নির্মলা বাইরে যেতে ভালবাসত, তবে দাদার বাড়াবাড়ি তার শরীরে সইত না। প্রমথর ইচ্ছে ছিল, সে কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যায় চাকরি নিয়ে, নির্মলার পক্ষে সেটা উপকারের হবে; কিন্তু তার ভয় ছিল বাইরে হঠাৎ কোনো গণ্ডগোল ঘটলে নির্মলার চিকিৎসা সম্ভব হবে না, বরং কলকাতায় সেটা সম্ভব; কলকাতায় তাদের পুরোনো ডাক্তার ছিল। প্রমথ এই দোটানায় পড়ে মতিস্থির করতে পারত না।

সুরেশ্বর এ সময় প্রমথদের সঙ্গে বাইরে যেতে শুরু করেছিল। কখনও কখনও এমনও হয়েছে, সুরেশ্বর প্রথমে যায় নি ওরা চলে গেছে, তারপর কয়েক দিন যেতেই সুরেশ্বর ওদের কাছে এসে পড়েছে। নির্মলার ওপর সুরেশ্বরের যে দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল তা ভালবাসা কি না স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। হয়ত ভালবাসা, হয়ত এমন কোনো অনুরাগ যা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

নির্মলা জানত, তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, অবশেষে সে অন্ধ হয়ে যাবে। এ নিয়ে তার যেন আর কোনো উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। সুরেশ্বর ঠিক এভাবে নির্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মেনে নিতে পারত না। সে অস্থির ও কাতর হত, ক্ষোভ প্রকাশ করত প্রমথর কাছে।

একবার, রাঁচির দিকে বেড়াতে এসে হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল নির্মলার। ডানদিকের চোখে দুদিন প্রায় কিছু দেখতে পেল না। তৃতীয় দিনে নির্মলার পক্ষে স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। প্রমথ বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সুরেশ্বর আরও বেশি বিচলিত, শঙ্কিত। সে চেয়েছিল কলকাতায় ফিরে যেতে। নির্মলা রাজী হয় নি।

কয়েক দিনের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠার পর নির্মলা একদিন বলল: 'তুমি নাকি বলছ, কলকাতায় গিয়ে চোখটা অপারেশন করিয়ে নিতে?'

'সেই রকমই তো শুনেছিলাম, প্রমথ বলে—কোন ডাক্তার যেন বলেছেন অপারেশান করে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে......'

'আগেও দুবার হয়েছে...কই কিছু তো হয় নি...'

'তবু...'

'তোমার খুব ভয়, না?'

'হ্যাঁ, চোখ চলে গেলে তোমার কি থাকবে?'

'আমার চোখ দুটোই কি আমি?'

সুরেশ্বর অবাক হয়ে নির্মলার দিকে তাকিয়ে ছিল; কথাটা বুঝেও যেন বুঝছিল না।

নির্মলা ধীরে ধীরে বলল, 'আমার এই হাত দুটো, কিংবা শুধু এই মুখ, এই চোখ যদি আমি হই তবে সে আমি কিছু না।... তুমি সেই গল্পটা জানো না?'

নির্মলা এক রাজা আর সন্ন্যাসীর গল্প বলেছিল। রাজা এসেছিলেন একা এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে মৃগয়াক্লান্ত হয়ে। সন্ন্যাসী যথোচিত রাজসম্মান প্রদর্শন করেন নি, কেননা তিনি রাজাকে চিনতে পারেন নি। এই অপরাধে রাজা সন্ন্যাসীকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। সেই সভার রাজা এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে 'পরিচয়' নিয়ে কূট তর্ক হল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন: হে রাজন, যদি আপনার কর্তিত একটি বাহু পথে পড়ে থাকে কেউ কি সেই বাহুকে রাজন বলে সম্বোধন করবে? যদি আপনার বিচ্ছিন্ন পদযুগল নদীর জলে ভেসে যায় আপনার কোন্ প্রজা তাকে চিনে নিতে পারবে? আপনার রথের অশ্ব কি আপনি? আপনার রাজদণ্ড কি আপনি? সর্ব পরিচয়যুক্ত হলেই আপনার পরিচয়, অন্যথা আপনার কোনো পরিচয় নেই। আমার আশ্রমে আপনি রাজবেশে রাজরথে অমাত্যদল নিয়ে উপস্থিত হন নি। আমার ভ্রম হয়েছিল। এই ভ্রম সত্য ও স্বাভাবিক।

গল্প বলা শেষ করে নির্মলা বলল, 'আমার চোখ দুটো চিরকাল থাকবে না—।'

সুরেশ্বর কোথাও যেন পরাস্ত হয়েছিল, তবু বলল, 'চিরকাল কিছুই থাকে না।'

'জানি। তবু আজীবন কিছু কি থাকে না?'

'কি থাকে?'

'থাকে। তুমি ভেবে দেখ কি থাকে?'

'একটা কথা বলবে?'

'কি কথা?'

'তোমার ভয় করে না?, চোখ হারালে তোমার কতখানি যাবে তা ভেবে দুশ্চিন্তা হয় না?'

নির্মলা মাথা নাড়ল, 'এক সময় হত। এখন বোধ হয় সহ্য হয়ে গেছে।' বলে সামান্য থেমে হাসির মুখ করে বলল, 'সংসারে কতশত অন্ধ আছে, বলো! তারাও তো রয়েছে।'

'তারাই তোমার ভরসা?'

'তোমরাও আমার ভরসা।'

'আমরা যদি না থাকি?'

'আমি তর্ক করতে জানি না। এত বড় জগতে কেউ না কেউ থাকবে।'

'ভগবান নাকি?'

'ভগবানে আমার ভক্তি আছে। মানুষেও আমার বিশ্বাস আছে।...সেদিন পার্ক থেকে তুমি তো আমায় হাত ধরে নিয়ে এসেছিলে। কেন এনেছিলে?' "

সুরেশ্বর কোনো জবাব দিতে পারে নি।

রাঁচির সেই সাময়িক দৃষ্টিহীনতাকে কাটিয়ে উঠলেও পরের বছর এক বসন্তের সন্ধ্যায় কি যেন ঘটে গেল।

(ক্রমশ)

প্রয়োজনের দিনে সেরা বন্ধু

যে কোনো ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা আমাদের সমস্যা বলে মনে করি...
কি করে আমরা আপনার সাহায্য করতে পারি দেখুন!

রিসার্চ: আমি 'অ্যাস্প্রো' রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একজন। আমাদের কাজই হচ্ছে ব্যথা বা অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা স্থির জানি যে ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার সর্বাধুনিক উপায় 'অ্যাস্প্রো' ফর্মুলাতেই পাওয়া যায়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালেও ডাক্তাররা 'অ্যাস্প্রো' ব্যবহার করে থাকেন।

শারীরিক বেদনার কি কারণ? আমাদের দেহতন্তুতে মেটাবলিক বস্তু জমা হ'য়ে নানা জায়গায় ফুলে ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

'অ্যাস্প্রো' কিভাবে কাজ করে: 'অ্যাস্প্রো' মুহূর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের সংগে মিশে যায়—ফোলা কমিয়ে—নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে—শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

কখন 'অ্যাস্প্রো' গ্রহণ করবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁত ব্যথা • গাঁটে ব্যথা • গা—জ্বর জ্বর • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বরে 'অ্যাস্প্রো' গ্রহণ করতে পারেন।

মাত্রা: বয়স্ক: দুইটি বড়ি। আবশ্যক হলে আবার গ্রহণ করা উচিত।

শিশু: একটি বড়ি অথবা ডাক্তার অনুমোদিত মাত্রা।

'অ্যাস্প্রো'
ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয়

A.G.32.66. BEN

সরকারের সমস্যা ও দায়িত্ব

বৈষয়িক অগ্রগতির স্বার্থে এখন শুধু উৎপাদনকারী শিল্প, ব্যবহারক বা ক্রেতারা নয়, সরকারের দিক থেকেও সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করবার সময় এসেছে। জাতির সবচেয়ে সুগঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সরকারের দায়িত্ব কিছু কম নয়। দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকল্পগুলির উপর ক্রমবর্ধমান সরকারী ব্যয় যদি সেই সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির চাইতে দ্রব্যমূল্য স্ফীতির সহায়ক হয়ে থাকে, তাহলে সরকারের কর্তব্য হল সুস্পষ্ট : মূল্যের যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমিত যোগানের জিনিসপত্র সুষমভাবে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের প্রচেষ্টা। তেমনি উন্নয়নমূলক শৃঙ্খলা বলতে কার্যক্রমের অধীন প্রকল্প-গুলির নির্মাণের খরচ কমিয়ে আনা এবং প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ বোঝায়।

প্রশাসনিক ব্যয়

১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক আমাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার কিছু কাল পর প্রশাসনিক ব্যয় কমাবার জন্য সংকল্প নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সদিচ্ছামূলক প্রস্তাব হিসাবে কাগজে-কলমে গৃহীত হলেও সেই সংকল্পকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়ে ওঠে নি। আক্ষেপের বিষয়, চার বছরে সরকারী প্রশাসনিক ব্যয় ২৫৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অথচ কথা হয়েছিল, রাজস্ব খাতে শতকরা ৩ ভাগ এবং মূলধন খাতে শতকরা ৫ ভাগ ব্যয় সংকোচ করা হবে। তার উপর, জলাভাব এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবির চাপ এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সরকারকে এখন বেশী খরচ করতে হচ্ছে।

আর্থিক ব্যবস্থার বর্তমান সংকট নিশ্চয়ই কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত সময় নয়। বেতন বৃদ্ধির দাবি মেটাতে গেলে স্বভাবত পরিকল্পনা ছাড়া অন্য খাতে খরচ বেড়ে যাবে। কিন্তু ঐ খরচ কমানো যাবে কি না তা নির্ভর করবে দ্রব্যমূল্য স্থিতি রক্ষার ব্যাপারে সরকারী নীতির কার্যকারিতার উপর। মূল্য স্ফীতি রোধে সরকারের ব্যর্থতা বেতন-না-বাড়ানোর যুক্তিগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

মুদ্রা স্ফীতির আশংকা

যা-ই ঘটুক না কেন, মুদ্রা স্ফীতি পরিহার করা হবে এরকম কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই আগে একাধিকবার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এ বছর যে বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের পক্ষে অর্থ সম্প্রসারণ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় থাকবে না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একে ঘটনার পরিহাস ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কিনা তা ভাববার বিষয়। বৈদেশিক সাহায্যের (সাহায্যের চাইতে ঋণ বলাই কি ভালো নয়?) অনিশ্চয়তা তো আছেই, তার উপর, আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে-দিনে ঘোর সংকটের আকার নিতে চলেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা

সমৃদ্ধ দেশগুলি অনগ্রসর দেশগুলিকে কোন্ বছরে ঋণ দেবে তা এখন নির্ভর করবে প্রাপক দেশসমূহের মূলধন কাজে লাগানোর ক্ষমতা বা আর্থিক উদ্যোগের সাফল্যের উপর—পরিকল্পনায় নিহিত সদিচ্ছামূলক সংকল্প বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর নয়। অতীতের কর্জশোধ ও সুদদানের প্রয়োজনে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ২৮৮·৬ কোটি টাকায় ঠেকেছে। আগামী পাঁচ বছরে ভারতকে প্রায় ২,২৮০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণের মূলধন পরিশোধ ও সুদদান বাবত দিতে হবে। গোড়ার দিকে কর্জ তেমন সুবিধাজনক কড়ারে নেওয়া হয় নি বলে ঋণ শোধের বোঝা এত ভারী হয়েছে। বৈষয়িক উন্নয়ন হতে এবং ঋণ প্রত্যর্পণ করতে যে সময় লাগে সেকথা আগে ভালো করে ভেবে দেখা হয় নি। উত্তমর্ণ দেশগুলি এখন কর্জশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে; বিকল্পে, পরিশোধ্য পুরানো ঋণের জায়গায় যদি নতুন করে কর্জ দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শর্ত-গুলি সম্ভবত ভারতের অনুকূল হবে।

ব্যবস্থাপনার উন্নতিসাধন

অর্থ সংগতির অনটন হলে সমগ্র চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা না হোক, বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির রদ-বদলের দরকার হতে পারে। সংগৃহীত অর্থের এখন সবচেয়ে বেশী উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে। জনসাধারণ জানতে চায় যে, আর্থিক উদ্যোগের নামে তাদের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণের অর্থ আদায় করা হচ্ছে তা এ-রকম লোকের হাতে দেওয়া হচ্ছে কিনা, যাদের কর্মক্ষমতা ও সততা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা চলে না। ঐ মোটা অঙ্কের টাকা সুষ্ঠুভাবে এবং দায়িত্বের সঙ্গে নিয়োগ করার ক্ষমতা সরকারী ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন-যন্ত্রের আছে, লোকের এ বিশ্বাস ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে। এমনতর আবহাওয়ায় যে জনসাধারণের দিক থেকে পরিকল্পনামূলক উন্নয়ন কর্মে সহযোগিতা, সাড়া বা উদ্দীপনা পাওয়া যাচ্ছে না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে দায়িত্ব বেঁধে দিতে হবে, যার ফলে একটা ন্যায্য সময়ের ভেতর নির্ধারিত উৎপাদনে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সরকারী প্রশাসন-যন্ত্র এবং সংগঠন-ব্যবস্থা এমন করে ঢেলে সাজা দরকার যাতে খুব শীঘ্র সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা সাযুজ্য বা সংগতি বজায় থাকে। আবার, প্রকল্পের কাজ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়ের মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাপনার বিচ্যুতি, ফাঁক, অসাফল্য, বিলম্ব, অভাব কি করে দূর করা যায় তা দেখবে এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা। কেবল দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে চলবে না; অক্ষমতা বা শৈথিল্যের জন্য কর্মচারী বিশেষকে দায়ী করতে হবে। সেই সঙ্গে, দক্ষতা, তৎপরতা ও ঐকান্তিকতার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত বা পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা যেন থাকে।

শান্তিকুমার ঘোষ

শুষ্কত্বক
ব্রন
মেচেতা
ছুলী
রূপ প্রসাধনে
অপরিহার্য্য
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
Basant
Malati
বসন্ত
মালতী
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

ত্রিলোচন কলমচি

যন্ত্র-তান্ত্রিক

নামের আদিতে এঞ্জিন সংযুক্ত থাকলেও বিশ্বকর্মার বরপুত্রদের সব সময় এঞ্জিনের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা থাকে না। ইট কাঠ লোহা, স্ক্রু-নাট-বল্টু, প্লাগ স্প্রীং সুইচের অন্দি সন্ধি সন্ধি সমাস, যাঁর নখদর্পণে তিনিই এঞ্জিনীয়ার। জনৈক তির্যকবাদী বলেছেন, A man who does for one dollar what any fool can do for two. তিনিই নাকি এঞ্জিনীয়ার। আমরা অবশ্য সরকারী নোকরিতে বাঁধা যন্ত্রীসমাজকে নিয়েই আজ আলোচনা করবো।

মিডশটে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মীয়মান বিপুলকায় ব্রীজের মাঝখানে একটি ঠোঁটে পাইপ চাপা, কপালে রুখু চুল উড়ে-এসে-পড়া, ধারালো নাকমুখচশমা-আঁটা জিওগ্রাফী ক্লোজ-আপে ফিজ্ করা হয়েছে—এমনতর ফিল্মী দৃশ্যের নায়ককে দেখেই যে-মেয়েরা মনে মনে স্বয়ম্বরা হয়েছে, তাদের প্রথম শক্ লাগবে কারখানা-বাড়ির মাইনে-করা এঞ্জিনীয়ারদের দেখে। ফুলশয্যার পরে প্রথম 'নাইট ডিউটি' ফেরত স্বামীর উস্কোখুস্কো চুল, রাঙা চোখ এবং কার্বন-কলঙ্কিত শার্টপ্যান্ট দেখে পয়লা দিন চমকে ওঠেনি এমন এঞ্জিনীয়ার-কোয়ার্টারিণী অর্থাৎ ঘরনী কমই আছে টাউনশীপে। সিনেমায় এবং উপন্যাসে সুটেবুটে টাইয়েটেরীতে ফিটফাট যে লক্ষ্মীমন্ত মূর্তি এতদিন জানা ছিল, তার সঙ্গে যখন নিজের জীবনে ক-অক্ষর মেলে না, তখন নিজের স্বামীকেই জলজ্যান্ত জালিয়াত বলে নিশ্চয় মনে হয়। অটোমোবাইলের ধোলাইখানায় নিশ্চয়ই লোকটা ক্লিনারের কাজ করে, নইলে এমন তেলকালিজং-ধরা কার্কনিন্দিত মূর্তিতে রাত ভোরে ফিরে আসে কি করে!

কিন্তু হায়, স্বপ্নদেখা রাজকন্যারা তো আর জানে না যে, যন্তর কেবল মন্তরে চলে না, তার জন্য হাতে-কলমে অনেক যন্ত্রণা পোহাতে হয়, জান কয়লা করতে হয়। হাসপাতালের নার্স যেমন ডিউটিকালেও রোগীর অনেক ন্যক্কারজনক বাহ্যপদার্থও না ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ডক্তার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতন, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, তার চলে না। ঠিক তেমনি লেবার ওয়ার্কার টেকনীশিয়ান যে-কাজে মুখ বাঁকিয়েছে, এঞ্জিনীয়ারকে সে কাজে হাত লাগাতেই হবে। তাই রমণীরঞ্জন চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তাঁদের সাজে না। মেডইন শিবপুর-যাদবপুর-খড়্গপুরের দস্ত বিলিতী বুড়ী ছুঁয়ে এসেও যখন কোনো ইস্পাত কারখানায় ইস্‌ট্যাচু হয়েছেন, তখন তাঁদের অকুস্থলে হাতেনাতে না ধরতে পারলে এঞ্জিনীয়ার রূপে চেনা শক্ত। হয়ত লিফ্‌টের দিকে চাতকের মত তাকিয়ে কোলিগপেনে (Colleague-pain) ভুগতে ভুগতে দিন মাস বছর যুগ গুনে চলেছেন কবে নিজের ডিপার্টমেন্টে তাঁর Bossীকরণ ঘটবে। কবে তিনি ছোকরা অফিসারদের কাছে ডেকে এতদিনের শুনে-মুখস্ত-করা স্ল্যাং ঝাড়তে পারবেন, আকারে ইঙ্গিতে ভয় দেখাতে পারবেন, সে রাজ্য-মুহূর্ত কার না গণনীয়!

শিফ্‌ট ডিউটির অকরুয়র—এ বি সি জুনিয়র এঞ্জিনীয়ারদের জপমালা। টেকনীশিয়ানদেরও। শিফ্‌টে সকলেই কাত, বিশেষ করে সি-শিফ্‌টে, মানে নাইট শিফ্‌টে। রাত পুইয়ে ঘরে ফিরে এসে কেউ খিটি-মিটি করে, কেউ জানলা স্কাইলাইট অবরুদ্ধ করে পত্রপাঠ শয্যাশায়ী হয়। কানামাছির মত কেউ চোখে রুমাল বাঁধে, কেউ মুখের ওপর দোচালার মত করে ভাঁজকরা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে নিদ্রাগত হয়। ব্যাচেলার হলে এই সাধের সমাধিতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না, কিন্তু ফ্যামিলি কোয়ার্টার হলে রেডিওর নব-ঘোরানো এবং অন্যাবিধ মানবিক চিৎকার

...নিজের স্বামীকেই জল জ্যান্ত জালিয়াৎ বলে নিশ্চয় মনে হয়

প্রুফ হবার জন্যে কানের মধ্যেও খানিকটা তুলো ভরতে হয়।

বিবাহোত্তর প্রথম নাইট শিফ্‌ট-যাত্রার পূর্বমুহূর্তে দেখলে সাবিত্রী সত্যবান যাত্রার সিন্ মনে পড়বে। এবং তার পরও কারো কারো ক্ষেত্রে বছরখানেক। কারণ, তখনও বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার পেন্ডুলাম দুলছে। তাই দেখা যায়, কারখানায় এসেও কানে কানে কথা বলার

প্রাণবল্লভের দেহলি প্রান্ত থেকে ছাড়ানো হচ্ছে

জন্যে উসখুস করছে বেচারী। সেজবসের হুমন্ত টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে টেলিপ্যাথীতে ভোগে, অনামনস্ক হয়ে মাঝে মাঝে করুণ সুর ঢেলে গায়ঃ ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

ওল্ড টাইমার হলে ঘরে টেলিফোন বাজিয়ে স্ত্রীর দূরত্ব পরীক্ষা করে দেখে, অ্যালিবি খোঁজে; কেউ তিন বছরের কন্যাটিকে কৌশলে ট্যাপ করে ক্লু বার করার চেষ্টা করে। স্বয়ং প্রিয়া টেলিফোন রেঞ্জের মধ্যে এসে গেলে চাবি-মনিব্যাগ ইত্যাদি ফেলে আসার ছুতোর অভাব হয় না। অবিশ্যি এই গৃহতল্লাসী যে সব সময় অলীক কল্পনাপ্রসূত তা নয়। ট্রুথ ইন স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকসন। কদাচিৎ স্ট্রেঞ্জারের আবির্ভাবও ঘটে বইকি-!

বাদবাকি জীবন বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক। রবিবারে বাগান খুঁচিয়ে একটু-আধটু উদ্ভিদ চর্চা, কিংবা মেয়েকে নাচগানের স্কুলে দিয়ে আসা, কিংবা সস্ত্রীক সাপ্তাহিক সামাজিকতায় বেরিয়ে পড়া, দূরের কোনো কোয়ার্টারে রিটার্ন ভিজিট দেয়া। এছাড়া হাতে রইল কমিউনিটি সেণ্টার, অফিসার্স ক্লাব, স্টীল মার্কেট। সেখানে গিয়ে বেবাক বকের মত একা একা খবরের কাগজ আর চোদ্দরকম জার্নালের পাতা ওল্টাও দুচার রকম ইনডোর ভাজো, উনিশ পয়সার টিকেটে সিনেমা দ্যাখো। উঁচুমহলের ক্লাবে গেলে মেয়েদের বেদিং কসটিউম আর বারোয়ারী নাচ, সফ্‌ট ড্রিংকস্‌ আর বিলিয়ার্ড টেবল। কিছু টুকিটাকি মার্কেটিং।

কোনো কোনো বাড়িতে অবশ্য তাস এবং তর্ক দুইই চলে। কোথাও কোথাও শখের গান। উঁচু র‍্যাঙ্কের কোয়ার্টারগুলো আরো বৈচিত্র্যহীন, আরো চুপচাপ। মালি বাগান দেখাশোনা করে, রাঁধুনী রান্নাঘর, গিন্নী আয়নার ভেতর নিজেকে নজরে রাখেন। কর্তা বাগানে বেতের চেয়ার পেতে বসন্তসন্ধ্যায় অফিসারদের সঙ্গে অফিসিয়াল টকে নামেন। অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের জন্য গৃহিণী রেডিওগ্রাম খোলেন, অ্যালবাম মেলে ধরেন এবং পরিশেষে ফ্রীজ খুলে ল্যাংড়া আম কিংবা রসগোল্লা আর ঠাণ্ডি-পানি বের করেন।

ব্যাচেলার কোয়ার্টারগুলি কিছুটা ব্যতিক্রম। তবে আসল মেজাজ দেখা যায় তরুণ

ফ্যাশন প্যারেডও চলে

অফিসারদের দশকর্মা মেস বাড়িতে, কোথাও যার নাম স্টীল হাউস, কোথাও অন্যকিছু। মেলোড্রামাটিক গ্রীনরুম যাকে বলে তাই। রাজাউজীর ব্যাচিলার বাদশার ছড়াছড়ি। কার্পেটের ওপর চোখবাঁধা বলদের মত টেপরেকর্ডার ঘুরে চলেছে — কোথাও রেফারীহীন রেকর্ডপ্লেয়ার, হাওয়ায় উড়ছে ছড়িয়ে রাখা বিলিতি জার্নালের নষ্ট কাটালগ, ভার্জিন টোব্যাকোর নানা ব্র্যান্ড, মিনিয়েচার ডাস্টবিনের মত উপচে পড়া অ্যাশট্রে—আর তারই মাঝখানে ডেফ অ্যান্ড ডাম দাবাখেলোয়াড়দের দৈবমূর্তী। কিংবা তাসের বাক্কীকর বিগ্‌গেমে নেমেছেন। কোনো কোনো শনিবার বিকেলে অজাত-শ্মশ্রুর দল যে তাসখণ্ডচুক্তিতে বসে, কখনো কখনো তা সোমবার বিকেল পর্যন্তও গড়ায়। নাওয়া খাওয়া অফিসও অধংকৃত্য রহিত হয়ে চোখে কালি আর দুগালে মোচাক গজিয়ে যায়। কেউ কেউ বিলিতি বোতলে কর্কস্ক্রুর মত অব্যর্থ। কেউ হ্যামলেট আওড়ায়। শুধু যে প্যাশন প্লে-ব্যাক চলে তাই না, ফ্যাশন প্যারেডও চলে।

একদিন এক কোয়ার্টারে পৌঁছে ত হতভম্ব! বাড়ির ভিতরে তখন কোরাস-কোলাহল পড়ে গিয়েছে। গিয়ে দেখি গৃহস্বামী খাটের ওপর আড়াআড়িভাবে বিছানা আঁকড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—আর তার পদযুগল ধরে ভৃত্য এবং ভার্যা সমানে টাগ-অব-ওয়ার শুরু করেছে। প্রথমটা দেখে মনে হয়েছিল একটি হৃষ্ট-পুষ্ট পাঁঠার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না চামড়া না, ট্রাউজার্সের চোঙা দুখানাই প্রাণবল্লভের দেহলিপ্রান্ত থেকে ছাড়ানো হচ্ছে—আর সেই কঠিন বিচ্ছেদ যাতনায় মালিকের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। কাহিনী এই রকম : নাইট শিফটে ওয়াটার [illegible] গোলমাল হওয়ায় টেকনিশিয়ানকে আপাদমস্তক দীর্ঘক্ষণ ভিজতে হয়েছিল, পরে সকালবেলায় দশ ইঞ্চি ঘেরের নতুন প্যান্টটি এই মারাত্মক রকম শ্রিঙ্ক করেছে। এই আনস্যান-ফোরাইজড স্বামীর ঠ্যাং অ্যাম্পুটেশন করার দরকার হবে কিনা ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলাম।

সম্প্রতি একটি মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে টাউনশীপে। এবং তার সম্প্রতিতম কার্যক্রম গোটা টাউনকেই চমকে দিয়েছে। প্রতি বুধবার সেখানে পালা করে সংকীর্তনের আসর বসে। কীর্তনীয়া হচ্ছেন সিনিয়ার জুনিয়ার এঞ্জিনীয়ার গৃহিণীরাই। খোল-মন্দিরা বাজিয়ে তন্গতচিত্তে নাম সংকীর্তন হয়। আজ যদি ফুয়েলের কোয়ার্টারে হলো পরের বুধবার রিফ্যাক্টরির বাড়িতে হবে, তার পরের দিন মেকানিক্যাল এঞ্জি-নীয়ারের আস্তানা নির্দিষ্ট রইল। আপনি সেই কীর্তনের আসরে গিয়ে যে মুখগুলি দেখবেন, তাদের অনেককেই চেনা চেনা লাগবে কিন্তু চিনতে পারবেন না। অন্য কোথাও অন্য সময়ে এদেরই টেকনিকালার-মূর্তি দেখেছেন, পক্ক বিম্বাধর এবং ক্যানা-ফুলের ক্যারামতি করা নখ দেখেছেন ভেবে পাওয়া শক্ত।

তবে সিনিয়ার গৃহিণীদের মেজাজমর্জি খোলতাই ছিল বেশ কিছুকাল আগে। যখন লেফটহ্যান্ড ড্রাইভ সব সময় হার ম্যাজে-স্টিস সার্ভিসে মজুত থাকতো। তখন অতিথিকে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে বাজার থেকে শুধু একগাছা খ্যাংরা আনতেও জীপ দৌড়তো। পেট্রল পুড়ছে পরোয়া নেই, খাতায় কলমে সার্ভিস কবুল করা থাকলেই চলত। কিন্তু সে পার্টিপিকনিক পরোপ-কারের দিন চলে গেছে। ন্যাশনাল এমা-র্জেন্সির কবলে পড়ে তাঁরা এখন বে-car।

ফিনিশিং টাচ তাহলে মহিলা মহল দিয়েই সেরে রাখি, ওনাদের কথাই যখন উঠল। বি-শিফটে অর্থাৎ পাঁচটার পর থেকে টাউন-শিপ প্রায় ইমপ্রেগন্যাবল থাকে কেন জানেন? নগরবধূরা তখন অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে ফ্রি-টেলিফোনের মাকু চালিয়ে যান। বাইরে থেকে তখন সে লাইভ অয়্যার টাচ করার সাধ্য কি—ওল্ড টাইমারদের সে কারণ মাথা খুঁড়তে হয় ঘরোয়া কানেকশন পেতে। দুটি মহিলাকে ডিসএনগেজড করা টেলিফোন অপারেটারের কম্ম নয়। ভাই ঘোষদি, আজ আপনার বি-শিফট চলছে তাই না? ঠিক ধরেছ! আচ্ছা ভাই তিনটে সোজা দুটো- উল্টো একটা টারছা দেবো তো? অ্যাশকালারের সংগে কি রং ম্যাচ করবে বলুন তো বৌদি? মিত্তির বোন, লাইনটা দু-ফেরতা গা না ভাই, একটু তুলে নিই। রাতে নইলে মুখ ভার হবে আবার। আমামাসী চিংড়ির মালাইকারিটা আর একবার [illegible] আমার ঠিক খুলছে না। ও

তিনটে সোজা দুটো উলটো একটা তেরছা দেবো তো?

বোন, আজকের আইন আদালত পড়েছিস? কালে কালে কি হল না! ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি, মুয়ে ঝাটা! কি বলছ? সিনেমার টিকেট কেটে ফেলেছ? বেশ আমি সেদিনের সেই বাস স্টপে...না না, সে রাত দশটার আগে না, ভয় নেই।

ইত্যাকার কেচ্ছাকাহিনী আলাপে বিলাপে মুখর হয়ে ওঠে দুরভাষিণার দল। এই বি-শিফট তাই মহিলা মহলের শিবরাত্রিরের কামনা। কারণ একমাত্র এই সময়েই তারা যাকে বলে ডিউটি-ফ্রি!

দেখে ধরতে পারছেন, নিশ্চয় ?
বিদেশ-থেকে-আনা ছবি আঁকার পোস্টার কালারকে আমরা এদেশ থেকে বিদায় দিচ্ছি।

সম্পূর্ণই গুণের জোরে, অবশ্য। এদেশের চিত্র-শিল্পীরা এখন পাচ্ছেন শালিমার পোস্টার কালার—দুনিয়ার সেরা সেরা মালমসলায় তৈরী এই রং উৎকর্ষে বিদেশ-থেকে-আনা উৎকৃষ্ট পোস্টার কালারের সমতুল্য।

শালিমার-এর অয়েল কালার আর ওয়াটার কালারও পাবেন। ঔজ্জ্বল্যে, ঘনত্বে, মিশ্রণে ও স্থায়িত্বে…দুটি রংই অতি উঁচুদরের।

শালিমার আর্টিস্টস কালার কেনা লাভজনকও বটে। এজাতীয় অন্য যে কোনো রং কিনতে আপনাকে যা দাম দিতে হত, তার চেয়ে ঢের কম দামে আপনি এই রং কিনতে পারবেন।

ছবি দেখে ধরতে পারছেন, নিশ্চয়? এবার থেকে ধরুন শালিমার।

শালিমার আর্টিস্টস কালারের রকমারি :

অয়েল কালার : ৮ সিসি টিউব—২১ রকম রং
৩০ সিসি টিউব—২১ রকম রং
৬০ সিসি টিউব—ব্ল্যাক, জিঙ্ক ও টিটেনিয়াম হোয়াইট

ওয়াটার কালার : ৮ সিসি টিউব—১৮ রকম রং

পোস্টার কালার : ৫২ সিসি বোতল (১¾ তরল আউন্স)—১৮ রকম রং

শালিমার আর্টিস্টস কালারের প্রাপ্তিস্থান :
আর্টিস্টস মেটিরিয়্যালস ডিভিশন
শালিমার পেন্টস লিমিটেড
১৩ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

এবং

শালিমার পেন্টস-এর যেকোন দপ্তর : নয়াদিল্লী—পোঃ বক্স ৮৬, বোম্বাই—পোঃ বক্স ১৫১৬, মাদ্রাজ—পোঃ বক্স ১৩৩, কানপুর—পোঃ বক্স ৩১৬ ও গৌহাটী—ফাঁসি বাজার, তাছাড়া, সমস্ত সম্ভ্রান্ত রং-তুলির দোকানেও পাওয়া যায়।

শালিমার আর্টিস্টস্ মেটিরিয়্যালস্

ট্রামে বাসে

গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনের নেতা ৭০ বৎসর বয়স্ক শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী এক সাংবাদিক বৈঠকে নাকি বলিয়াছেন—'ভীষ্ম পিতামহের চেলা হয়ে নির্বাচনে আমি একজন মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না।' —"খুব জুৎসই কথাই বলেছেন। তবে সবিনয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবো যে, ভীষ্ম পিতামহের ভারত যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাঁকে ভঙ্গ করতে হয়েছিল"—বলেন বিশুখুড়ো।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে উপমা টানিয়া বলিয়াছেন শ্রীমধু লিমায়ে—এটা যেন নূতন বোতলে পুরনো মদ। শ্যামলাল বলিল—মন্ত্রীরা অবশ্য কিছু এর উত্তরে বলেন নি, তবে শ্রীমধু লিমায়ের উপমা দিয়েই বলতে

পারতেন—তাঁর কথাটা যেন নূতন থল-[illegible]তে পুরনো চাকভাঙা মধু!!

সংবাদে শুনিয়াছিলাম ষোল নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় উল্কাবৃষ্টি হইবে; পরবর্তী সংবাদে শুনিলাম, উল্কাবৃষ্টি হয় নাই।—"বৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বাভাস প্রায় সব ক্ষেত্রেই একরূপ। সে যা হোক, উল্কাবৃষ্টি না হওয়ায় আমরা দুঃখিত নই; [illegible]জিলের মতো নোট-বৃষ্টির পূর্বাভাস হলে সে কথা ছিল আলাদা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলা হয় নাই। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"তা যখন হলোই না, তখন একবারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলাটা শেষ হয়ে গেলে খোলাই ভালো না কি!!"

সংবাদে শুনিলাম নির্বাচনের ব্যাপারে বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।—"বহু পুরাতন ভাব

নব আবিষ্কার"—কবিতায় মন্তব্য করিলেন সহযাত্রী।

ত্রিবাঙ্কুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, সেখানে মন্দিরের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবির জন্য এক হাজার মন্দিরের অধিকাংশেই দৈনিক পূজা বন্ধ থাকিবে।—"আন্দোলনকারীরা আশা করি পূজা বন্ধের ঢেউটাকে কলকাতার কালীঘাট পর্যন্ত নিয়ে আসবেন না; সমাসন্ন টেস্ট খেলার সময় তা হলে হে মা কালী করবার পথে সমূহ অন্তরায় দেখা দেবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

জোড়হাটের খবরে প্রকাশ, এক শিং-বিশিষ্ট গণ্ডারের শিং নাকি চুরি হইয়া গিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু শিং দিয়ে উনি করবেনই বা কী। বরং গণ্ডারের চামড়া চুরি করতে পারলে লাভ হতো, কেননা এই দ্রব্যটির চাহিদা বাজারে এখন খুব বেশি!!"

হৃদ্রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন, আগামী ফেবরুয়ারী মাস থেকে নাকি হৃদরোগের এপিডেমিক ইয়ার শুরু হবে, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন!!"

১৯৬৫ সালের রিকুইজিশন এবং অ্যাকুইজিশন আইন অনুসারে সরকার ১৬০০ একর ভেড়ি এলাকা দখল করিয়াছেন। —"প্রকাশ থাকে, রিকুইজিশন ও অ্যাকুইজিশন আইনে মৎস্যভক্ষণের কোন ধারা বা উপধারা নেই। —বলে শ্যামলাল।

ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনসটিটিউটের ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী নাকি বলিয়াছেন যে, উন্নত দেশগুলির সাহায্যের শর্ত আরো উদার হওয়া উচিত। —"কাঁড়া বা আকাঁড়া চালের প্রশ্ন তোলার অর্থটা হয়ত অর্থমন্ত্রী সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন" —বলেন বিশুখুড়ো।

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহভৃত্যদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—গৃহভৃত্যদের নিকট-আত্মীয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া যেন ভৃত্য নিয়োগ করা হয়। সহযাত্রী বলিলেন —"উহা নিঃসন্দেহে সদুপদেশ এবং হয়েছেও সময়োপযোগী। তবে আমরা খুব সমীহের সঙ্গে জানাতে চাই, অতি-নিকটআত্মীয় এক শ্রেণীর গৃহ-ভৃত্য (?) সম্পর্কেও গৃহিণীদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে!!"

সম্প্রতি 'পরিচ্ছন্ন কলিকাতা অভিযান' উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শহর কলকাতার পরিচ্ছন্নতার নমুনা দেখে অদূর বা দূর ভবিষ্যতে কোন বিদেশী আগন্তুক আমাদের এবম্বিধ মহান প্রয়াস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে না পারেন তজ্জন্য সম্প্রতি-প্রকাশিত মেয়র মহোদয়ের পরিচ্ছন্ন কর্মরত ফটোটি মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন!!"

আমি মন্ত্রি-সভা ছাড়ব না"—বলিয়াছেন নাকি রেলমন্ত্রী শ্রীসদোবা পাতিল। সহযাত্রী মেবার পতনের বিখ্যাত গানটার

চরণ সুর করিয়াই শুনাইলেন—"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির!!"

সংবাদে প্রকাশ, সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ নাকি বলিয়াছেন যে, এই সংকটে ডাকিলেও তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করিবেন না। সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথের গানের চরণটি একটু রকমফের করিয়া গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন —"না ডাকিতে যারে পাওয়া যায়!"

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে স্বাগত জানাচ্ছেন আই পি আই-র প্রধান কর্তা বার্যি বিংহ্যাম

দিল্লির ডায়েরি

পৃথিবীর বিখ্যাত সাংবাদিকেরা আর সংবাদপত্র প্রকাশকেরা এসেছেন রাজধানীতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। এটা কয়েকটি নোট্‌ অথবা ডায়েরি বলা যেতে পারে। অন্যদের মতো আমি মাত্র একজন দর্শক।

এর আগে এতজন আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র জগতের লোক ভারতে কোনদিন একত্রিত হননি। উপলক্ষ আন্তর্জাতিক প্রেস্‌ ইনস্টিটিউটের (আই পি আই) পঞ্চদশ সম্মেলন—এশিয়ায় এই দ্বিতীয়বার, ১৯৬০-এ হয়েছিল টোকিওতে।

প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অমিতাভ চৌধুরী

উদ্বোধন করেছিলেন ১৩ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন নিজে, সেটাই সূচিত করে আই পি আই-এর পদ-মর্যাদা। রাষ্ট্রপতির শরীর খুব ভাল নয়, বয়েসও অনেক। তাঁর ভাষণের শেষ দিকটায় গলার স্বর অত্যন্ত দুর্বল শোনা যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সম্মেলনকে অনেকক্ষণ ধরে প্রেসের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সম্মেলনের পরিবেশকে, এবং এটির আন্তর্জাতিক চরিত্রকে।

চারদিন ধরে অনেক বিষয়ে আলোচনা হল : যথা, এশিয়াতে আই পি আই, কমিউনিস্ট চীন সম্বন্ধে সংবাদ দান, রাষ্ট্র ও প্রেস, এশিয়ায় সংবাদ আদান-প্রদান এবং আই পি আই কোন্‌ পথে? আলোচনার মাধ্যমে কে কতোখানি লাভবান হন নির্ভর করে তার উপর যিনি লাভবান হতে চান। আপসে কিছুই হয় না। তবে সংগঠনিকভাবে আই পি আই হয়তো অনেক পদক্ষেপ নিতে পারে আলোচনার সূত্র অথবা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে।

ধরুন, চীন সম্বন্ধে সংবাদ দান। ক্যানাডার মিস্টার টেইলর দু বছর পিকিং ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণই ছিল খুব আকর্ষণীয়, কিন্তু মোটামুটি প্রায় সবই জানা কথা। ওখানে স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা যায় না, কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করে না, সবকিছু কমিউনিজমের ছাঁচে ঢালা ও মাও সে তুং-এর ব্যক্তিগত পূজো ও ভক্তি শ্রদ্ধার মাপকাঠিতে বিবেচিত হয়। টেইলর বললেন যে, যদি মাও সম্পর্কে কিছু না বলা হয় (বিশেষত ওর স্বাস্থ্য নিয়ে) তাহলে মোটামুটি যা খবর সংগ্রহ করা যায়, তা পাঠানো যায়, এমন কি সমালোচনাও। তবে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নয়, পাওয়ার সূত্রও অত্যন্ত সীমিত, চীনা ভাষা জানলেও।

পিকিং-এ বৈদেশিক সাংবাদিক আছেন এখন ৩০জন। অনেক সমাজতান্ত্রিক

মকতার লুবিস

প্যার তাঁগীর পোর্ট্রেট

যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ শিল্পী ভ্যান্ গ (২)

গত সংখ্যায় ভ্যান্ গ'র ওলন্দাজ পর্ব সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করেও আরো এত কিছু বলার থেকে গেছে এ সপ্তাহের জন্য যে দিশেহারা লাগছে। তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত আলোচনা করে নেওয়া যাক।

১৮৮৬ সালে ভ্যান্ গ চলে এলেন শিল্পের কেন্দ্র প্যারিসে। তার আগের বছরের শেষ দিকে তিনি অ্যান্টোয়ার্প শহরে কিছু রুবেন্স এবং জাপানী ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন যার ফলে তাঁর নতুন করে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, জগৎটা শুধু দুঃখের, দীনতার, যন্ত্রণার নয়; আনন্দ ভালোবাসার স্থানও এই গ্রহে অনস্বীকার্য। সেই বিশ্বাস গাঢ় হল যখন তাঁর চোখ ধাঁধাল ইম্প্রেশনিস্টদের রঙের খেলায়। আলাপ হল পিসারো, দেগা, গোগ্যাঁ, সিউরাট প্রমুখদের সঙ্গে। একোল দা বোসার্তের করমন স্টুডিওতে আরম্ভ হল চিত্রাভ্যাস। দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য, মানসিক আঘাতের পর প্যারিসে এসে তিনি মানুষের সখ্য পেয়ে জেগে উঠলেন, যেন এক নতুন পৃথিবীতে নতুন ভাবে তাঁর জন্ম হল—বেরিয়ে এলেন তিনি মাটির তলার সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকূপ থেকে। আলু খাওয়ার ছবিটিতে আপনারা দেখেছেন ড্যাম্প সবুজ, ম্যাটমেটে ব্রাউন আর কালো রঙের আধিক্য, কিন্তু এখন যেসব ছবি তিনি আঁকতে আরম্ভ করলেন তাতে প্রজ্বলিত রঙের উজ্জ্বল ব্যবহার দেখা গেল—ক্যানভাস ভরা এখন ফলফুলের রঙের বাহার। তবে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, ভ্যান্ গ কিন্তু অন্যের মতন ইম্প্রেশনিস্টদের ধরন অনুকরণ করেননি, তিনি এঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, পরীক্ষামূলকভাবে কিছু • ইম্প্রেশনিস্টধর্মী ছবি আঁকেন এবং পোয়াতিলিস্ত* চিত্রাদর্শের বর্ণব্যবহার সচেতনভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু সমস্ত ছবির মধ্যেই লক্ষ করা যায় তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব জীবনদর্শন। তিনি গভীরভাবে মিশেছিলেন সমসময়ের বিখ্যাত ও অখ্যাত চিত্রকরদের সঙ্গে কিন্তু সমকালীনদের জোয়ারে ভেসে গিয়ে পূর্বসূরীদের ভোলেননি, সময় পেলেই লুভরে গিয়ে দালাক্রোয়ার ছবির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলত। জাপানী চিত্রশৈলীর প্রভাবও তাঁর সমসময়ের চিত্রে আমরা লক্ষ করি বিশেষত প্যার তাঁগীর যে পোর্ট্রেট তিনি এঁকেছিলেন তাতে জাপানী ছবির মত সতেজ রঙ ব্যবহার এবং চিত্রবিন্যাস লক্ষণীয়।

কিন্তু বসন্ত গ্রীষ্ম পেরিয়ে আবার হেমন্ত, আবার শীত আসে। দস্তা রঙের আকাশ বিষণ্ণ রাস্তা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, হাড়-কাঁপানো বাতাস যখন পৃথিবীর সব রঙ মুছে নিল, তখন ভ্যান্ গ'র কাছে প্যারিস হয়ে উঠল অসহ্য, তাছাড়া, ইম্প্রেশনিজম, ডিভিশনালিজম, পোয়াতিলিজম্ এসব তাঁর জানা হয়ে গেছে, রাজধানীতে তাঁর যে কাজ ফুরিয়েছে উপলব্ধি করলেন। তুলুস লোত্রেকের পরামর্শে রওনা হলেন ১৮৮৮ সালে প্রভাঁসের আর্ল শহরে—সেই দেশ যেখানে সারা বছর ফুল ফোটে সুন্দরী তরুণীর হাসির শব্দে রাস্তা উচ্চকিত, অ্যাবসাঁত খেয়ে রাত্রে জমে ওঠে নাচ, ঘন শীতেও পাখি ডেকে ভোর হয়। ভ্যান্ গ আর্ল-এ এসে খুব খুশী, তাঁর মনে হত, তিনি যেন প্রাচ্য দেশে রয়েছেন।

ভ্যান্ গ-র শিল্পীজীবনের সবচেয়ে মনে রাখবার মত বছর এই ১৮৮৮। সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর তুলি এখন সচল, প্রত্যেকটি ক্যানভাস এক-একটি

---

* এই চিত্রাংকনশৈলী নিও-ইম্প্রেশনিস্টরা ব্যবহার করেছেন প্রচুর। একাধিক নিরেট রঙ ক্যানভাসের ওপরে ছোট ছোট আঁচড়ের সাহায্যে ব্যবহার করে চিত্রকে জীবন্ত করার প্রচেষ্টা এঁদের বৈশিষ্ট্য।

বীজবপনকারি

'তারা ভরা রাত'

স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রবিন্যাস, প্রতিটি বস্তু তার ভেতরে আঁটোভাবে গ্রথিত, বাহুল্য-হীনভাবে পরিসরপূর্ণ, ছবির মেজাজে অস্থিরতা নেই, গভীর বলে শান্ত, সংগীতময়। কিন্তু তাঁর প্রতিটি ছবিই গল্প বলে, রঙবাহারী চোখের তৃপ্তি দিয়েই থেমে যায়নি ক্যানভাস, কিংবা চিত্রকর বিন্যাসশৈলীর নৈপুণ্য দেখিয়ে ছবি থেকে সাহিত্যের অংশ বাদ দেননি। তবে মনে রাখবেন, যে গল্প শুনছেন, তার নায়ক কিংবা অপনায়ক একজনই; তিনি ভিনসেন্ট ভ্যান্ গ, এ সময়ে তাঁর আঁকা প্রত্যেকটি দৃশ্য আয়নার মতো, শিল্পীর মানসিক অবস্থার আধার হিসেবে কাজ করছে। এখানেই ভিনসেন্ট এক্সপ্রেসনিস্ট; এক্সপ্রেসনিস্টদের ছবিতে নাটকীয়তা অবশ্যম্ভাবী, কারণ, তাঁদের আঁকা সমস্ত "বিষয়ই" আসলে এক ধরনের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে, দর্শকের সঙ্গে শিল্পীর অন্তরের। ইম্প্রেশনিস্টদের ওপর এক্সপ্রেসনিস্টদের জয় সেইখানেই যে, পূর্বোক্ত দল ভুলে গিয়েছিল যে, নিরেট যোগাযোগহীন নিষ্প্রাণ সৌন্দর্য-দৃশ্য মানুষকে অভিজ্ঞ করে না, চোখকে তৃপ্ত করে শুধু এবং তাতে একটা সময়ে ক্লান্তি আসে, কেননা, সব সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতা আসলে একটিই অভিজ্ঞতা, যেখানে এক্সপ্রেশনিস্টদের দৃশ্য থেকে আমরা দ্রষ্টার আনন্দ বা যন্ত্রণা জেনে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ হই, কারণ, চরিত্র-বীক্ষণের সুযোগ আছে সেখানে এবং তাই আছে বৈচিত্র্য—এবং অবশেষে "কাথারসিস্"। মানুষ মানুষকে ছাড়া আর কীই-বা সারাজীবন ভালোবাসতে পারে?

কিন্তু পার্থিব সমস্যা পুনর্বার উত্তাক্ত করে তুলল। খাওয়ার পয়সা নেই, কেউ ছবি কেনে না, ভয়ানক দুরবস্থায় পড়লেন তিনি রাত্রে ঘুম হয় না, তন্দ্রা এলেই বিকট চিৎকার শোনেন, বোবায় ধরে: উরসুলা, সেই পেট ফোলা মাতাল বেশ্যা, ঘিরে ধরে তাঁকে স্বপ্নে, চমকে জেগে ওঠেন—আত্মহত্যা, মৃত্যু, মৃতদেহ, এ-সবের কথা মনে হয় অনবরত, ভ্যান্ গ প্রায়-অর্ধোন্মাদ হয়ে উঠলেন। এক অদ্ভুত উপলব্ধি হল তাঁর, যেন কেউ তাঁকে বলে গেছে, মৃত্যু আসন্ন, শেষ ছবি যা আঁকবার এঁকে ফেল। পাগলের মতো তিনি হুই পড়ে আছেন রঙ তুলি নিয়ে। এ-সময়কার ছবির মধ্যে ভয়ংকর এক উন্মাদনা লক্ষ করা যায়—যেন তাঁর সারা শরীরে আগুন আর তাঁর অকথ্য যন্ত্রণা মুদ্রিত হচ্ছে ক্যানভাসের ওপর সোনালী রঙের মধ্য দিয়ে। তিনি যেন ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল থেকে কথা বলছেন, যেই বিন্দুর উন্মাদ আর্তি আমাদের কানে কোনোদিন পৌঁছোবে না।

১৮৮৯ সালে গোগ্যাঁ ভ্যান্ গ-র অনুরোধে চলে এলেন তাঁর সঙ্গে থাকতে, কিন্তু অবিরাম এই দুই শিল্পীর মতানৈক্য সম্পর্ক বিষিয়ে তুলল, যার সোচ্চার প্রকাশ হল ১৮৮৯-এর খ্রীস্ট-মাস রাতে, যখন কাফেতে বসে তর্ক করতে করতে ভ্যান্ গ তাঁর মদের গেলাস ছুঁড়ে মারলেন গোগ্যাঁর মুখে। পরের দিন সন্ধে বেলা গোগ্যাঁ হাঁটতে বেরিয়েছেন নিজে, হঠাৎ পায়ের শব্দে পেছনে তাকিয়ে দেখেন ভ্যান্ গ' ক্ষুর দিয়ে তাঁকে হত্যায় উদ্যত। [illegible] ভিনসেন্ট থেমে গেলেন এবং তারপর দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে কেটে ফেললেন নিজের ডান কান এবং পাঠিয়ে দিলেন তা পাড়ার বেশ্যাকে, যে-স্ত্রীলোক ঠাট্টা করে বলেছিল, "আমায় ভালোবাসতে কত পার দেখব—পারবে নিজের একটা কান কেটে আমায় উপহার দিতে?"

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেলেন, যা তাঁর সম-সময়ের ছবি দেখেই বোঝা যায়। তৃতীয় পর্যায়ের এখানেই শেষ—মানসিক হাসপাতালে থাকাকালে যে-সব ছবি আঁকেন, শুধু সেই ক'টি ছবিই একটি বৃহৎ আলোচনার উপাদান। এই এক শো পঞ্চাশটি ছবি এক অদ্ভুত ঘোরে আঁকা; যন্ত্রণার গুমরে-ওঠা অভিব্যক্তিতে আচ্ছন্ন। এক বিখ্যাত সমালোচকের এই পর্যায়ের ওপর উক্তি তুলে দিচ্ছি—

"He painted 'The asylum'.... 'Cornfield with Cypress' 'Starry night' delirious landscapes, surging mountains, whirling suns, cypresses and olive trees twisted by heat. His colour no longer had the sonority of the preceeding period; the yellows had become coppered, the blues darkened, the vermillions browned. In compensation, rhythm became more intense: whirling arabesques, dismantled forms, perspective fleeting toward the horizon in a desperate riot of lines and colours What he represented then on his canvases he seems to have seen

[illegible]hrough a vertigo of the imagination. The fire lit by his hand was communicated to his brain. A feeling of failure overwhelmed him."

ভ্যান গ-র উন্মাদ অবস্থার ছবির মধ্যে ম্যাক্রোকজম্ ও মাইক্রোকজমের এক [illegible]রের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে—শিল্পীর [illegible] ভিতরে যে ভয়ংকর বোধ জন্ম নিচ্ছে, [illegible] প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতির এক অস্থির [illegible]র মাধ্যমে। এই চিত্রটি দেখলেই [illegible] অনবরত শেক্সপীয়ারের 'লিয়ার' [illegible] ঝড়ের দৃশ্যে লিয়ারের আর্তি [illegible] পড়ে:

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout till you have drenched our steeples, drown'd the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires, vaunt-couriers to oak-cleaving thunderbolts, singe my white head! and thou, all-shaking thunder,
Smite flat the thick rotundity of the world!"

[illegible] ছবিটি ঝড়ের নয়, কিন্তু তারা [illegible] আকাশেও ঝড় উঠেছে মনে হয় [illegible] শিল্পীর মনে এক দুর্দান্ত প্রশ্নের। ভ্যান গ' যদি কথাশিল্পী হতেন, তা হলে [illegible] ঠিক এইভাবেই আর্তনাদ করে উঠতেন আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যর্থতায়, যন্ত্রণায়, ক্ষোভে। —ভ্যান গ' আত্মহত্যা [illegible] ১৮৯০ সালে। এক মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকাকালেই।

এই আলোচনায় কোন বিশেষ ছবি নিয়ে [illegible] না করে ভ্যান্ গ-র জীবন ও [illegible] নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করলুম এবং তার উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করছি তাঁর তিনটি ছবি—প্রথমটি পার তাঁগীর পোর্ট্রেট, দ্বিতীয়টি, "[illegible]কারী" এবং তৃতীয়, [illegible] ভরা রাত"। পোর্ট্রেটটি ভ্যান গ' [illegible] এঁকেছিলেন। জাপানী প্রভাব লক্ষ করার [illegible] এ-ছবিতে। ইম্প্রেশনিস্টদের সংগে [illegible] উজ্জ্বল বর্ণের দিকে ঝুঁকেছেন [illegible]। "[illegible]কারী" ছবিটি ভ্যান্ গ' ১৮৮৮ সালে আর্লে এঁকেন। এই সময়কার ছবিতে হলদে রঙের প্রাচুর্য লক্ষণীয় এবং শান্ত, গভীর, আঁটো বিন্যাস দেখেই বুঝতে পারছেন, এ-ছবি সেই সময়ে আঁকা, যখন তিনি আর্লে সেই স্বল্প শান্তিপূর্ণ দিনগুলি কাটাচ্ছেন। নীল, হলদে, সবুজ ও ব্রাউনের নিটোল বর্ণবিন্যাস ছবিটির মধ্যে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা এনেছে। হলদে রঙের মত সূর্যকে অংশত, মানুষটিকেও গাছের ডাল দিয়ে ঢেকে দিয়ে যে বর্ণবৈপরীত্য (Contrast) এনেছেন শিল্পী তা বোধ হয় হলুদকে আরো হলদে করে ফুটিয়ে তোলার জন্যই, কেননা, ভ্যান গ-র হলুদ রঙটি ছিল বড়ই প্রিয়।

এতটা লিখে বুঝতে পারছি এবার কলম থামানো নিতান্তই প্রয়োজন, কিন্তু খালি মনে হচ্ছে, আসলে আরো অনেক কথা বলার ছিল, এই উন্মাদ ওলন্দাজ বিষয়ে যা বলা হল না। এ লেখা পড়ে আপনারা যতটা অতৃপ্ত হবেন, আমার অতৃপ্তি তার চেয়ে বোধ হয় একটুও কম নয়। আর কোনো শিল্পী বোধ হয় একই সংগে তাঁর জীবন আর শিল্প নিয়ে এত বেশী হৃদয়ে আঘাত করেন না, ভ্যান গ-র মতো।

শুদ্ধশীল বসু

মঙ্গলই হয়েছে। ইংরেজ শাসন এ-দেশে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের উপরে বর্তমান সভ্যতার আলোক নিক্ষেপ করেছে—এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত। কিন্তু, ওই শাসনের কয়েকটি কলঙ্ক-কাহিনী বোধ হয় ইতিহাসের পাতা থেকে কোনোদিনই মুছে যাবে না। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনা তার একটি। ঘৃণ্যতমটি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেরই জানা। (অতোটা জোর দিয়ে ঠিক করলাম না বোধ হয়. এ-কালের অনেক ছাত্রই হয়তো ওর নাম শোনেনি. শোনেনি হয়তো কোনো আধুনিক কবি!) সে-নৃশংসতার তুলনা নাই. সে-নৃশংসতা আপামর সাধারণ ভারতবাসীকে বিচলিত করেছিলো। বিচলিত করেছিলো অসাধারণ ধৈর্যশীল রবীন্দ্রনাথকেও। "যখন জানিলাম যে. আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম নিয়মের অনুযায়ী মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সহজ কার্য ছিল, তখন

ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর নামে

ফিল্ম সোসায়েটি ও সিনে ক্লাব জাতীয় সংস্থার সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। সভ্য-সংখ্যার তো কথাই নেই। শহরের প্রায় সর্বত্র এবং মফস্বলেও নানা প্রতিষ্ঠান বিদেশের নানা ছবি দেখাচ্ছেন। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর প্রসার ঘটছে, সেটা আনন্দের। এই আন্দোলন আজকাল বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থার ফিল্ম পত্রিকার মাধ্যমে। সোসায়েটি কিংবা ক্লাবের উদ্যোগ ছাড়াও ফিল্মের ওপর নানা ধরনের পত্রিকা বেরোচ্ছে। এগুলি তথাকথিত 'ফ্যান ম্যাগাজিন' নয়। অর্থাৎ ব্যবসার দিকটা গৌণ। অনুমান করা যায়, চলচ্চিত্রবোধের অনুশীলনের জন্যই পত্রিকাগুলির প্রকাশ। এগুলিতে অনেক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা থাকে।

এই জাতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে দেখেছি, বিদেশী চিত্র, চিত্রপরিচালক ও চলচ্চিত্রবিদদের সম্বন্ধে যত কথা ছাপা হয় তার একাংশও এ দেশের চলচ্চিত্র-ঐতিহ্য বা ইতিহাস সম্পর্কে থাকে না। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় অবশ্য বাংলা ছবির পুরনো যুগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ করা গেছে, বাংলা চলচ্চিত্র-ইতিহাসে যাঁর নাম অগ্রগণ্য এমন একজন চিত্রনির্মাতার চলচ্চিত্রকর্ম নিয়ে কোন কোন পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্যের ছড়াছড়ি। প্রমথেশ বড়ুয়া এই সমালোচনার শিকার। তাঁর চলচ্চিত্রের নতুন মূল্যায়ন যদি কেউ করতে চান তাতে আপত্তির কারণ দেখি না। কিন্তু উৎসাহের গতি, মনে হচ্ছে, অন্য খাতে প্রবাহিত। এ যেন পূর্বাচার্যদের নস্যাৎ করার ব্যস্ততা। কোন কোন দেশে পূর্ববর্তী নেতাদের স্মৃতি ও কার্যকলাপের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার যে রীতি ইদানীং দেখা গেছে, প্রমথেশ বড়ুয়াকে অস্বীকার করার নীতিটা অবশ্য তত উগ্র নয়। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে "ডিবাংকিং"-এর একটা ক্ষীণ প্রয়াস যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবশ্য এখনও তা তেমনভাবে শিকড় গাড়তে পারে নি।

প্রমথেশ বড়ুয়াকে নিয়ে কোন 'মিথ' তৈরি হয়নি যে, তা ভাঙতে হবে। প্রমথেশ তাঁর গুণেরই স্বীকৃতি পেয়েছেন। এবং বাংলা সবাক চিত্রের শৈশবে এবং কৈশোরে তিনি কী সৃষ্টি করলেন, এবং উত্তরসূরীদের জন্য কী রেখে গেলেন তার বিচার করতে হলে এমন একটি বস্তুনিষ্ঠ মনের দরকার যা পুরনো কোন কিছুর প্রতি অকারণে বীতশ্রদ্ধ নয়। অর্থাৎ সত্যসন্ধানের জন্য চাই খোলা মন। ফিল্ম পত্রিকার প্রয়োজন আছে। ফিল্ম সংক্রান্ত চিন্তাপূর্ণ আলোচনার সার্থকতাও কম নয়। কিন্তু গোঁড়ামি বা একদেশদর্শিতার কুক্ষিগত হয়ে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর আন্দোলন যাতে চলচ্চিত্র-রসিকদের ধিক্কারের কারণ না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত।

সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় নাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে থিয়েটার সেন্টার "সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা"র ব্যবস্থা করেছেন। গত মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে থিয়েটার সেন্টারের পক্ষ থেকে শ্রীতরুণ রায় এই প্রতিযোগিতার লক্ষ ও প্রস্তুতির কথা বলেন। তিনি জানান, কলকাতা থেকে প্রতি জেলায় বিচারকদের পাঠানো হবে। স্থানীয় নাট্যবিদরাও বিচারকমণ্ডলীতে থাকবেন। এবং পরে কলকাতায় বিভিন্ন জেলার নাট্যসংস্থার অভিনয়ের উৎসব করা যেতে পারে।

শ্রীরায় আরও বলেন, কলকাতার নাট্য-

ইমেজ মেকার্স-এর "তিসরি কসম" (পরিচালনা : বাসু ভট্টাচার্য) ছবিতে ওয়াহীদা রেহমান—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

অশোক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এ বি এন প্রোডাকশনস-এর "ল ব কু শ" ছবিতে রূপসজ্জায় আশিস খান

গোষ্ঠীও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। কলকাতার জন্য নগদ টাকার চারটি পুরস্কার নির্দিষ্ট। প্রতি জেলায় গুণানুক্রমে দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে। কলকাতায় এবং জেলায় প্রথম পুরস্কার নগদ এক হাজার টাকা। প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও তথ্য থিয়েটার সেন্টারে। ৩১এ চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা-২৫। লভ্য।

প্রতিযোগিতার জন্য মোট এগারোটি : নির্বাচন করা হয়েছে। যথা : সিরাজদ্দৌ গিরিশচন্দ্র), বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ (নাট্যরূপ), মুক্তধারা (রবীন্দ্রনাথ), চন্দ্রের পথের দাবী (নাট্যরূপ), রাণা প্র (দ্বিজেন্দ্রলাল), প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরো প্রসাদ), দেশের ডাক (ভূপেন্দ্রনাথ), গৈ পতাকা (শচীন সেনগুপ্ত), কেদার (রমেশ গোস্বামী), ২৬শে জানুয়ে (বিধায়ক ভট্টাচার্য) এবং সৈনিক (ধন বৈরাগী)।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী নাট্যগো এই তালিকার যে-কোন একটি না নির্বাচন করতে পারেন। এবং বি জেলার নাট্যসংস্থা তাঁদের নিজ শহরে না মঞ্চস্থ করবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রতিযোগি অভিনবত্ব সম্পর্কে বলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মি শ্রীসাধন ভট্টাচার্য ও শ্রীবীরেন ভদ্র। তাঁ বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চ নাট্যচর্চার প্রসার ঘটবে, এবং আমাদে দেশের কয়েকটি 'ক্লাসিক' পর্যায়ের নাট আবার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা সুযোগ ঘটবে।

সংগীতশিল্পী সংবর্ধনা

সাদার্ন সমিতি প্রতিবারের মত এবারেও গুণীজনসংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। এ বছর তাঁরা সংবর্ধনা জানালেন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীমান্না দেকে। শ্রীদে'র হাতে রৌপ্যখচিত সম্মান-ফলক তুলে দিলেন অন্যতম বিখ্যাত গায়ক শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে শ্রীদের সংগীতপ্রতিভার কথা উল্লেখ করলেন।

অতি অল্প বয়সে শ্রীদে তাঁর কাকা অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র নিকট সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। ছাত্রজীবনে সারা বাংলা ধ্রুপদ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীদে বলেন, এই অনুষ্ঠানের কথা আমি কোনদিন ভুলব না। এমনভাবে কেউ আমাকে কোন আসরে ডেকে আনেননি।

সংবর্ধনার আগে ও পরে চিত্রপরিচালক-অভিনেতা অজয় বিশ্বাস পরিচালিত বিচিত্রানুষ্ঠানে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা গান করেন।

গীতবিতানের রজত-জয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্রসদনে আগামী ৮ ডিসেমবর থেকে ১৪ ডিসেমবর পর্যন্ত গীতবিতানের রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে। এই উপলক্ষে কালমৃগয়া, শাপমোচন, তাসের দেশ, মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নেপথ্যে

"বালিকা বধূ"-র প্রোজেকশান ইতিমধ্যে অনেকেই দেখে ফেলেছেন। কয়দিন আগে মানা বিজয়ীদের সংবর্ধনা উপলক্ষে ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রযোজক-পরিচালক তরুণ মজুমদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে সন্ধ্যা রায়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতির একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি ছবির একজন অতিথি শিল্পী। এই তথ্যটি ইতিপূর্বে কোন সংবাদ বা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায়নি। সন্ধ্যা রায়কে ছবিতে ঝুমুরওয়ালীর বেশে দেখা যাবে। মাত্র একটি দৃশ্যে। তাঁর সহশিল্পী রবি ঘোষ। ইনিও অতিথি-শিল্পী।

গত সপ্তাহে পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় "এন্টনি ফিরিঙ্গি"র একটি দৃশ্য গ্রহণ করলেন। তরজার আসর। তরজার প্রধান শিল্পী হরিধন মুখোপাধ্যায়। একস্ট্রার খুব ভিড় ছিল সেদিন। সেটে তিলধারণের জায়গা ছিল না। কোন একজন পরিচালক একবার বলেছিলেন, ছবির 'একস্ট্রা'-দের নিয়ে একটা ছবি করবেন। একস্ট্রাদের যেন একটা আলাদা সমাজ। অপেক্ষা করে কখন ডাক আসবে, এজেন্ট বা ঠিকাদারের মারফত। তারপর দলে দলে গিয়ে হাজির হয় স্টুডিয়োয়। কে ছবির পরিচালক, কে নায়ক বা নায়িকা এর খোঁজের দরকার ওদের নেই। ওরা চেনে শুধু ঠিকাদারকে, যে তাদের সরবরাহ করে। তাদের লাভ-লোকসান, মান-অপমানের ফর্দ থাকে ঠিকাদারের খাতায়। "একস্ট্রা"র দল ও ঠিকাদারের মাঝখানে নাটকের উপকরণ খুঁজলে পাওয়া যাবে বইকি।

খবরটি পেলাম একজন কণ্ঠশিল্পীর কাছে। উত্তমকুমারের হিন্দী ছবি মুক্তি পাবার আগেই তিনি বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবির নায়িকাদের 'আইডল' হয়ে উঠেছেন। কোন একটি পার্টিতে অভিনেত্রী নন্দা নাকি বলেছেন, বাংলা ছবিতে তিনি অভিনয় করতে রাজী যদি উত্তমকুমার 'হিরো' হন। আশা পারেখও নাকি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন, ব্যক্তিত্ব ও মিষ্টি ব্যবহারের গুণে উত্তমকুমার বোম্বাইয়ের শিল্পিমহলের প্রিয় হয়ে উঠেছেন। এবং তাঁর অভিনয়শক্তি সম্পর্কেও সেখানকার চলচ্চিত্রব্যবসায়ী ও শিল্পীরা নিঃসন্দেহ।

জয় মা কালী বোর্ডিং-এর হিন্দীরূপ "বিবি ঔর মোকান" বোম্বাইয়ে মুক্তি পেয়েছে। হেমন্তকুমার প্রযোজিত এই ছবির প্রোজেকশান যাঁরা দেখেছেন তাঁরা খুব খুশী। কলকাতার দুজন অভিনেতা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। বিশ্বজিৎ ও আশিসকুমার। হৃষীকেশ মুখার্জি চিত্র-পরিচালক।

"স্বয়ংবরণ" (পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবির রোমান্টিক নায়িকা রাখী বিশ্বাস

অভিশপ্ত চম্বল-এর সব গানই রেকর্ড করা হয়েছে। সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত একটি গান থাকবে শংকর গাঙ্গুলির মুখে। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের শিল্পী হিসাবে শংকর গাঙ্গুলি কলকাতার রসিকজনের কাছে সুপরিচিত। রুমা গুহঠাকুরতার সঙ্গে তাঁর ভাঙরা নাচ ও গান অনেকেই দেখেছেন। "অভিশপ্ত চম্বল"-এ তিনি অভিনয় করছেন।

পাদপ্রদীপের আলোয়

কালিকায় "গোবর-গণেশ অ্যাণ্ড কোং"

হাসির নাটক "গোবর-গণেশ অ্যাণ্ড কোং" (সন্তোষ সেন রচিত)। রংগকাণ্ডের অবসানে

নাটকের প্রচ্ছন্ন করুণ সুরটিও মন স্পর্শ করে। দুয়ের যোগফল, বলা বাহুল্য, নাট্য-রসিকদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। অতএব, "গোবর-গণেশ অ্যান্ড কোং"-এর জনপ্রিয়তা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

: দুই সহোদর গোবর-গণেশ নিঃস্ব হওয়ার বিবিধ প্রচেষ্টায় (তাদের স্বর্গত পিতার এক অদ্ভুত উইলের শর্ত অনুযায়ী) মধ্যে নাটকের কৌতুক উপাদান বিন্যস্ত। শেষে দেখা যায়, উইল সম্পর্কে যা কিছু তারা জেনেছে তা সব মিথ্যে। অপরদিকে, [illegible]হীন হতে গিয়ে দুই ভাই তারকার পায়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে উধাও।

নাটকে কিছু অবান্তর ঘটনা [illegible] হয়েছে। ফলে নাটকটি সামগ্রিকভাবে[illegible] ও গতিসম্পন্ন হতে পারেনি। এ[illegible] প্রযোজক-পরিচালক শ্রীকালিদাস [illegible] উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজি[illegible] সমসাময়িককালের নীতিহীনতা এব[illegible] সিকতার রূপটি পরিচালক বেশ স[illegible] সংগে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। [illegible] নাচ-গানের আয়োজনও পরিচালক[illegible]

দেখেছেন। এক কথায়, প্রহসনটি উপভোগ্য।
দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে দম আটকে
যাওয়ার কথা।

দু'টি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন
রামচন্দ্র চৌধুরী ও শচীন মল্লিক। বড় ভাই
গোবর্ধনের ভূমিকায় শ্রীচৌধুরীর অভিনয়
দর্শককে অবাক করে। সরলমতি এই
চরিত্রের বিভ্রম ও আশাভঙ্গ শিল্পী অদ্ভুত-
ভাবে ফুটিয়েছেন। ছোট ভাই গণেশের
চরিত্রবিশ্লেষণেও শচীন মল্লিক কৃতিত্ব
দেখিয়েছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, নাটকের সব
শিল্পীরাই সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়
করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয়
সুধীর চৌধুরী, বিমল সেনগুপ্ত, রাজা
মুখোপাধ্যায়, বিকাশ ঘোষ দস্তিদার, কুক
রায়বর্মন ও শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকাশ
ঘোষ দস্তিদারের চমৎকার কৌতুকাভিনয়
দেখে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, শিল্পীর
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সুরেশ বিশ্বাস ও প্রদ্যোৎ ব্রহ্মচারীর
বাউল গান খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রণব রায়ের
সংগীতপরিচালনা নাটকের অন্যতম
আকর্ষণ।

বরানগর সম্মেলনী

মহাজাতি সদনে ১ ডিসেম্বর থেকে চার দিনব্যাপী বরানগর সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমদিনে রবীন্দ্রসংগীতের আসরে যোগ দেবেন সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর, সমরেশ রায় প্রভৃতি। তা ছাড়া থাকবে সাংস্কৃতিকী কর্তৃক "ভানুসিংহের পদাবলী"। দ্বিতীয় দিনে কীর্তন ও পুরাতনী বাংলা গান গাইবেন যথাক্রমে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলা ঝরিয়া। নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় "মহুয়া" গীতিনাট্য লোক ভারতী। ওইদিনকার অন্যতম আকর্ষণ। তৃতীয় দিনে বসছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর। শিল্পীরা হলেন বড়ে গোলাম আলি খান, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ পাঠক, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় চক্রবর্তী, আরতি বাগচী, ধানেশ খান প্রভৃতি। শেষদিনে আধুনিক গানের জলসায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, জহর রায়, সাগর মিত্র, হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, সনৎ সিংহ, অনুপম মজুমদার যোগ দেবেন।

মূকাভিনয়

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্ত এবার একটি নতুন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন—গুরুদেবের "রাজপুত্র"। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় শিল্পীর কলাসূচীর অন্তর্গত ছিল। ভিলাই-এ শ্রীদত্ত বিদেশী অতিথিদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। উড়িষ্যায় 'বেকার যুবক' ও 'আমার ডায়েরীর একটি পাতা' স্থানীয় দর্শকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

(দে-১১৬৮)

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিশ্বসুন্দরী নির্বাচন এই সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয় : ভারত-সুন্দরী কুমারী রীতা ফারিয়া ১৯৬৬ সালের বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিতা হয়েছেন। এই প্রথম একজন ভারতীয় নারী বিশ্বসুন্দরীর গৌরব অর্জন করলেন। কুমারী রীতার বয়স তেইশ বছর। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একবট্টিজন সুন্দরী। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, দেহভঙ্গির জন্যও এই ভারত-সুন্দরীকে বিশ্বসুন্দরী মনোনীত করা হয়েছে। কুমারী রীতা ফারিয়ার বক্ষ, কটি ও নিতম্বের মাপ যথাক্রমে ৩৫, ২৪ ও ৩৫ ইঞ্চি। কুমারী ফারিয়া ২৫০০ স্টার্লিং পুরস্কার পাবেন। সান্ধ্য-পোশাক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিনী হওয়ায় রীতা একটি রূপোর কাপও পেয়েছেন। কুমারী রীতা গত মাসেই ভারত-সুন্দরী আখ্যা লাভ করেছিলেন। লনডনে সাংবাদিকদের কাছে কুমারী রীতা বলেন, "এবার আমি আমার নিজের শহর বোম্বাই-য়ে ফিরে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করব। পশ্চিম বাংলার এক চা-বাগানের মালিক অসবোরন জোবোর বাগদত্তা আমি। জুন মাসে আমরা বিয়ে করব।

দেশী সংবাদ

১৪ **নবেম্বর**—আত্মগোপনকারী নাগাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ভারত সরকার সংবিধানের "কিছু কিছু পরিবর্তনেও" রাজি আছেন। আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় পররাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহ এরূপ ইঙ্গিত দেন।

গত ১১ নবেম্বর শিলিগুড়ির কাছে সামরিক ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনাকালে আজ সংসদের উভয় সভায় বিরোধী সদস্যরা একযোগে রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের পদত্যাগ দাবি করেন। তাঁদের বক্তব্য : শ্রীপাতিলের রেল দফতর হাতে নেওয়ার পর দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে।

১৫ **নবেম্বর**—নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন বলেছেন যে, দেশের যেখানেই হাঙ্গামা হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এবং শক্ত হাতে তার মোকাবিলা করা হবে। অপরাধীদের আইন অনুযায়ী দণ্ড পেতেই হবে।

কলকাতা রাজ্য পরিবহণের কর্মকুশলতা বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন। ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির জন্য কয়েকটি রুটে এক্সপ্রেস রুট প্রবর্তনের প্রস্তাবও হয়েছে।

১৬ **নবেম্বর**—১৮ নবেম্বর সংসদ ভবন অভিমুখে ছাত্রদের প্রস্তাবিত অভিযানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা যদি তুলে নেওয়া না হয় তা হলে তার পরিণাম গুরুতর হবে বলে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীকিষণ পট্টনায়ক আজ লোকসভায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন তাকে হুমকি আখ্যা দিয়ে বলেন যে, এই হুমকি তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীমধু লিমায়ে ও ডঃ লোহিয়াকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আজ রাজ্যসভায় তুলকালামকাণ্ড বেধে যায়। এক সময় চেয়ারম্যান ডঃ জাকির হোসেন দুজন সদস্যকে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেন।

১৭ **নবেম্বর**—আজ ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা গিয়েছে যে, আড়াই শত বৈরী মিজোর আর একটি দল এই মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মিজো পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে। প্রকাশ যে, তাদের পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে।

আগামীকাল দিল্লিতে ছাত্রদের পরিকল্পিত বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে ছাত্র মহলেই যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। তার উপর আজ লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন বিরোধীপক্ষের তীব্র উত্তেজনা ও বিক্ষোভ উপেক্ষা করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, সরকার দৃঢ় হাতে ও নির্মমভাবে হাঙ্গামা দমন করবেন।

১৮ **নবেম্বর**—আজ লোকসভায় বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ধ সরকার বিরোধী ছাত্র-বিক্ষোভ আর পুলিশী প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাকালে পর-পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। যেমন, (১) কমিউনিস্ট, এস এস পি ও কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যের সভাত্যাগ, (২) একজন কংগ্রেসী ও আর একজন পি এস পি সদস্যকে সভাকক্ষ ত্যাগের নির্দেশ, (৩) একজন এস এস পি সদস্যকে ১০ দিনের জন্য সাসপেণ্ড এবং (৪) প্রচুর হই হট্টগোল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনীতিক শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র আজ ভোরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘকাল ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল আটষট্টি বৎসর। তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান। রাজশাহী জেলার নাটোরে তাঁর জন্ম। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। তিনি ফরওয়ার্ড, লিবার্টি, অমৃতবাজার এবং যুগান্তর কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী

হিসাবে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের সাপ্তাহিক 'দেশহিতৈষী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯ **নবেম্বর**—ব্যাঙ্ক অব চন্দননগর ধামাচাপা পড়ায় রাজ্য সরকারের কয়েকজন অফিসার বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ : কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে দিল্লির কর্তারা ব্যাপারটি চেপে গেছেন এবং ফলে, নথিপত্রে দোষের সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হলো।

২০ **নবেম্বর**—আজ সরকারীভাবে বলা হয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় অন্ধ্রের কোরাপুট পুলিস থানা থেকে একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলি চালায় এবং তার ফলে ২৩ জন আহত হয়েছেন। ছয়জন আহতের অবস্থা নাকি আশঙ্কাজনক।

জাপানে রপ্তানির জন্য ১৫ হাজার টন আকরিক লোহা বহনক্ষম মালবাহী জাহাজে আকরিক লোহা বোঝাই করে আজ নবনির্মিত পারাদ্বীপ বন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ থেকে এই বন্দরে নিয়মিত সামুদ্রিক জাহাজের আনাগোনা

বিদেশী সংবাদ

১৪ **নবেম্বর**—গত রাত্রে তুরস্কের ইজমির শহরে আবার মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ হয় এবং মার্কিনীদের মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। কয়েকটি মার্কিন পরিবার নিরাপত্তার জন্য শহরের বাইরে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়।

১৫ **নবেম্বর**—সামরিক নির্দেশিত সংবাদপত্রগুলো জানিয়েছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার নেতাদের বন্দী করার একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিওকে বাঁচানোই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য।

১৬ **নবেম্বর**—মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, রাষ্ট্রসংঘে জাতীয়তাবাদী চীনের পরিবর্তে কমিউনিস্ট চীনকে গ্রহণের কোন প্রস্তাব যদি ওঠে, তা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিরোধিতা করবে।

১৭ **নবেম্বর**—রোডেশিয়ার বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটেন বলপ্রয়োগ করুক—এই মর্মে একটি আফ্রো-এশীয় প্রস্তাব আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ অনুমোদন করেছে।

১৮ **নবেম্বর**—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশনে আণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি সম্পর্কে ২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব ২টি এর আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হয়েছিল।

১৯ **নবেম্বর**—আজ দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম সরকার গুরুত্বপূর্ণ মেকং বদ্বীপ এলাকার সেনাপতি পদ থেকে লেঃ জেনারেল ডাং ভান কোয়াংকে সরিয়ে সেখানে অন্য একজন সেনাপতির নিয়োগ ঘোষণা করেছেন।

২০ **নবেম্বর**—লনডনে বিশ্বসুন্দরী শ্রীমতী রীতা বলেন : 'এখন আমি বিয়ে করছি না, মেডিকাল পরীক্ষাও দিচ্ছি না। বিশ্বের পরমা সুন্দরী পদে নির্বাচিত হওয়ায় আমার সামনে যে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে হাজির হয়েছে, আমি পুরোপুরি তা কাজে লাগাতে চাই।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅতুল তালুকদার

নাক থেকে কাঁচা জল···

চোখ ছলছল···

ধরা গলা···

শ্বাসকষ্ট···

সর্দিতে একেবারে কাহিল অবস্থা!

এসব কষ্টে তাড়াতাড়ি আরাম পাবেন···শ্বাসপ্রশ্বাস কয়েক মিনিটেই সহজ হয়ে উঠবে

একে তো সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছেন, তার উপর সেটা উপেক্ষা কোরে বাড়িয়ে তুলে কি লাভ! তার চেয়ে এক কাজ করুন···ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করুন, হাতে হাতে ফল পাবেন, উক্ত মালিশের প্রথম পরশে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে উঠবে। ভিক্সের ওষুধগুলির এমনি গুণ যে মাত্র ৭ সেকেণ্ডের মধ্যেই সর্দি–আক্রান্ত স্থানগুলিতে পৌঁছে গিয়ে নাক ও বুকের যন্ত্রণাদায়ক শ্লেষ্মা তরল করে, পেশীর যন্ত্রণা লাঘব করে ও গলার ব্যথায় আরাম এনে দেয়।

ভবিষ্যতে সর্দি সর্দি মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ কোরবেন। মনে রাখবেন সর্দিকে কখনও উপেক্ষা করা ঠিক নয়—পরে এথেকে অনেক কঠিন কঠিন রোগ জন্মাতে পারে। সুতরাং সময় অসময়ে দরকারের জন্যে সর্বদা হাতের কাছে ভিক্স্ ভেপোরাব রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আজ রাত্রে সর্দিতে মালিশ করুন

কেক তৈরী ?

আপনি খাসা তারিফ পাবেন যদি কেকগুলি দিব্যি হাল্কা ক'রে তোলবার জন্য এমন বেকিং পাউডার ব্যবহার করেন যা দু'বার ক্রিয়া করে—'ডবল অ্যাকশন' রেক্স বেকিং পাউডার !

এই হচ্ছে রেক্স বেকিং পাউডার

এক বড়চামচ পাউডার প্রতি ৩ পেয়ালা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। আপনি যখন কেক বা পেস্ট্রির জন্য ময়দা গুলছেন (বা রুটি বা স্কোনের জন্য ময়দা ছানছেন) রেক্স বেকিং পাউডার তখন ক্রিয়া করে **প্রথমবার**। এইবারে গোলা ময়দা (বা ছানা ময়দা) সেঁকবার জন্য উনুনে বসিয়ে দিন—এখন রেক্স বেকিং পাউডার ক্রিয়া করে **দ্বিতীয় বার**। এই অসাধারণ 'ডবল অ্যাকশন' ময়দাকে **দুবার** ফুলিয়ে তোলে আর সেঁকটা দিব্যি হাল্কা ও চমৎকার হয়ে ওঠে।

যতবার আপনার খুসী, দিব্যি হাল্কা জিনিস তৈরীর জন্য রেক্স বেকিং পাউডার ব্যবহার করুন !

এইবার এই সুস্বাদু খাবারগুলি যাচাই করুন !

ডোনাট

২ বড়চামচ মাখন বা মার্গেরিন □ ১ ছোটচামচ লবণ □ ¾ পেয়ালা চিনি □ ৫ ছোটচামচ রেক্স বেকিং পাউডার □ ২টি ভাল ক'রে ফেটানো ডিম □ ¾ পেয়ালা দুধ □ ১ ছোটচামচ দারচিনি □ ৩½ পেয়ালা ময়দা □ ½ ছোটচামচ জায়ফল □ ক্রীম মাখন বা মার্গেরিন ও চিনি; ডিম যোগ ক'রে ভাল ক'রে ফেটিয়ে নিন। দুধ ঢেলে পরে লবণ, বেকিং পাউডার ও মশলা সহ ময়দা ছেঁকে নিয়ে যোগ করুন। ময়দার গোলা ⅓ ইঞ্চি পুরু ক'রে আস্তে-আস্তে বেলে নিন। ডোনাট কাটার দিয়ে কেটে নিন, ১৫ মিনিট এমনি রেখে দিন; বাদামী না হওয়া পর্যন্ত বেশ খানিকটা গরম (৩৭৫°) চর্বিতে ভেজে নিন, একবার উল্টে দিন। শুষে নেবার মত কাগজের উপর নামিয়ে রাখুন। এতে ৩ ডজন ডোনাট তৈরী হবে।

মিষ্টি লেয়ার কেক

২¼ পেয়ালা ময়দা □ ½ পেয়ালা মাখন বা মার্গেরিন □ ২½ বড়চামচ রেক্স বেকিং পাউডার □ ১ পেয়ালা দুধ □ ১ ছোটচামচ লবণ □ ১ ছোটচামচ ভ্যানিলা □ ১½ পেয়ালা চিনি □ ২টি ডিম □ শুকনো উপাদানগুলি ছেঁকে নিয়ে একসঙ্গে একটা পাত্রে মিশিয়ে নিন। মাখন বা মার্গেরিন, ⅔ পেয়ালা দুধ ও ভ্যানিলা যোগ ক'রে ২ মিনিট জোরে ফেটিয়ে নিন। বাকী ⅓ পেয়ালা দুধ ও ডিমগুলি ঢেলে নিয়ে ২ মিনিট আবার ফেটিয়ে নিন। ২টি গোল ওয়াক্সড-পেপার-লাইনড ৮-ইঞ্চি লেয়ার কেক প্যানে ঢেলে নিন। উনুনে (৩৫০°) ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট সেঁকে নিন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা কাঠি ঢোকালে কাঠিটা পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হবার পর কেকগুলি প্যানগুলি থেকে সরিয়ে নিন এবং জ্যাম মাখিয়ে জুড়ে দিন।

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

প্র কা শি ত হ ল

বহুদিন পূর্বে কালীক্ষেত্রের কেন্দ্রভূমি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। সেখানে কাপালিকরা কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিত। কিন্তু যাত্রীদের আনাগোনায় তাদের ধর্ম-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হত বলে দেবীকে তারা পাথুরিয়াঘাটা থেকে কালীঘাটে স্থানান্তরিত করে। এখন আর সেই পাথুরিয়াঘাটা সেই কালীঘাট সে রকম নেই। সে কলকাতাও এখন আর সে কলকাতা নেই। সেই কাপালিকরাও এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কালের পরিবর্তনের সংগে সঙ্গে।

কিন্তু না, আসলে সেই পাথুরিয়াঘাটাও আছে, সেই কালীঘাটও আছে, সেই কলকাতাও আছে, আর আছে সেই কাপালিকরাও। এখন আর কাপালিকদের গেরুয়া বসন নেই—এখন তাদের অন্য পোশাক, অন্য আকৃতি। এখনও সেই আগেকার মত যাত্রীরা দল বেঁধে কলকাতায় আসে, আর তাদের চোখের সামনেই কাপালিকরা নরবলি দেয়। "চলো কলকাতা" সেই নরবলির রক্তাক্ত কাহিনী।

দাম ৫·০০

বিমল মিত্রের

আরও উপন্যাস

*

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমলের বৃহত্তম ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস "বেগম মেরী বিশ্বাস" শুধু ইতিহাস নয় [illegible] উপাখ্যান। ইতিহাসকেই আবার নতুন চোখে দেখা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম ২৫·০০

নিবেদন ইতি

"নিবেদন ইতি" বিমল মিত্রের বিখ্যাত এবং [illegible]

পঞ্চম মুদ্রণ। দাম ৬·০০

রং বদলায়

[illegible]

তৃতীয় মুদ্রণ। দাম ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

*

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

জীবনধর্মী উপন্যাস

আত্মপ্রকাশ

পাঠক "আত্মপ্রকাশ"-এর একটির পর একটি করে পাতা ওল্টাবেন আর স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করবেন, কি অদ্ভুত নিপুণ এবং কি অনুপম আন্তরিকতায় এক তরুণ লেখক সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহায়তা, নিঃসঙ্গ, সুস্থ আত্মপ্রকাশের আকুল আর্তি প্রতিফলিত করেছেন তাঁর এই প্রথম মৌল উপন্যাসে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, দুঃসাহসিকতায় অগ্রণী যৌবন কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মহৎ আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে করতে ছুটে চলেছে আত্মঘাতের পথে আর সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে সমাজকে, দেখে পাঠক শিউরে উঠবেন; আর সেই সঙ্গে [illegible] জানাবেন "আত্মপ্রকাশ"-এর তরুণ স্রষ্টাকে, যাঁর চোখে দ্রষ্টা কবির নিবিড় উপলব্ধি আর কলমে কারিগরের সংহত সৌষ্ঠব।

দাম ৬·০০

পঞ্চম মুদ্রণ নিঃশেষিতপ্রায়

*

সমরেশ বসুর

বহুবিতর্কিত উপন্যাস

বিবর

সমরেশ বসুর "বিবর"-এর নতুন করে পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নেই। মাত্র এক বছর হল এটি প্রকাশিত হয়েছে, অথচ এরই মধ্যে এই উপন্যাসটি সাহিত্যরসিক-মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বাঙালী সাহিত্যপাঠকদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি যদিও কোনও অনিবার্য কারণে এ বইটি অদ্যাবধি পড়ে ওঠার সুযোগ করে উঠতে নাও পেরে থাকেন, অন্তত এর নাম শুনেছেন, কিংবা কোথাও না কোথাও এর সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছেন। এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবর এই যে, একই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং তীব্র নিন্দা লাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য পৃথিবীর যে কয়েকটি আলোড়নময় উপন্যাসের আজ পর্যন্ত হয়েছে, এটি তাদের অন্যতম।

দাম ৫·০০

সাধারণ লোককে ধোঁকা দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু পেটের ভাতের কথা যেখানে সেখানে ধোঁকা দেওয়া চলে না। সেখানে অতি-নির্বোধও বোঝে, কত ধানে কত চাল হয়। পেটের ভাতের জন্যে যেখানে অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয় সেখানে যে বাইরের চাপ অনিবার্য এটা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যেকেরই বোধগম্য। আমাদের দেশে "অন্নদান" বলে একটা কথা আছে তার মানে সকলেই বোঝে। এখানে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল। ভিক্ষা এক বাড়িতে না করে পাঁচ বাড়িতে করলে ভিক্ষাবৃত্তিটা কায়েম করার দিক থেকে কিঞ্চিৎ সুবিধা হতে পারে, কিন্তু সেটা স্বাধীনতা বা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথ এ কথা হাজার প্রচারের দ্বারাও কাউকে বোঝানো যাবে না।

আর স্বাবলম্বী হবার পথ আমেরিকা আমাদের শিখিয়ে দিতে পারে এরূপ মনে করাও ভুল। ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্যনীতির অনেক অংশ যা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু মার্কিন উপদেষ্টাদের কথামতো চললেই ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে এরূপ মনে করাও মারাত্মক হবে। ভারতের সমস্যা সমাধান ভারতের মৌলিক চিন্তা এবং চেষ্টা দ্বারাই সম্ভব। মার্কিন, রুশ বা জাপানী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভের অনেক কিছু আছে কিন্তু সমস্ত সমাজ জুড়িয়ে ভারতীয় মৌলিক চিন্তার আধার না পেলে সে শিক্ষা ফলবতী হবে না। অনেক ক্ষেত্রেই সে শিক্ষা অপচয়ে পর্যবসিত হচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে।

কৃষি বা খাদ্য সমস্যা জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদা করে চিন্তনীয় বিষয় নয়। একজন মানুষ দেশের সমস্ত দিকের সমস্যাকে একসঙ্গে নিয়ে ভাববার চেষ্টা করেছিলেন, এবং একটা মোটামুটি সমাধানের পথের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু ভারতের সরকারী নেতারা সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে গান্ধীজীকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাতিল করে দিয়ে বসে আছেন। এক দিক দিয়ে সেটা অযৌক্তিক হয় নি, কারণ গান্ধীজীর চিন্তাকে ব্যবহারিক নীতিতে রূপায়িত করার শক্তি এঁদের নেই, ছিলও না। "প্রগতিশীল" বলে খ্যাত কোনো কোনো বিদেশী লেখকের লেখায় আজকাল মাঝে মাঝে দেখছি বুড়োকে স্মরণ করা হচ্ছে। অতএব আশা করা যেতে পারে, আমাদের "প্রগতিশীল"রাও কেউ কেউ কিছুকালের মধ্যে গান্ধীজীকে স্মরণ করবেন।

২৭।১১।৬৬

মহাত্তবের প্ররোচনায় কবির সাহেব সর্বভারতীয়
কংগ্রেস-বিরোধী দল গড়ার কাজে নিযুক্ত।
সাবধান! বাংলার বাঘ বেরিয়েছে।
রঙের কৌটা
এস কে দে এবার রাজস্থান
থেকে লোকসভার টিকিট
পান নি।
ভাগাড়ের
আবর্জনা?
বিহারে ভূতের উপদ্রব।
ঝা
সহায়

সুনন্দর জার্নাল

পুনশ্চ

সরকারী ব্যবসায় সংস্থাগুলোতে লাভ তো হচ্ছেই না, বরং ক্ষতির পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে—পশ্চিমবঙ্গীয় এই নব-বার্তাটিতে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছি না। সরকার তো গদিতে গণেশ বসিয়ে

খেয়ে যান। খুলে ব্যবসা করতে বসেন নি, তাঁরা নেমেছিলেন জনগণের "সেবার্থে।" সেবার ব্যাপারে লাভ লোকসানের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর, সেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশ পিঠ সোজা করে ঠায় বসে রইলেন কিংবা সাধুভাষায় যাকে বলে "অকস্মাৎ উত্তানভাবে পাতিত হইলেন"—এসব আলোচনা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্রীয় সেই বাঘ-মার্কা পরিবহণকে উৎপাটিত করবার এই যে ঘোষণা—আমার মনে হয়, এর আড়ালে শুধু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রেরণাই নেই—আরো গভীর কোনো দার্শনিক রহস্য আছে। পশ্চিম বাংলার এই রাষ্ট্রীয় যানগুলি ধাপে ধাপে কিভাবে উৎকর্ষ লাভ করছিল—আমরা তা নিয়মিত-ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছি। প্রথমে এল অচল-অটল কাচ-আঁটা এক দুর্জয় ব্যাপার রূপে (একেবারে 'কণ্টিনেন্টাল' হয়ে) এবং তাতে মিনিট পাঁচেক অবস্থানের পর 'অন্ধ-কূপ হত্যা'র ইতিহাসের বিশ্বাস জন্মে যেত; অতঃপর 'পেটকাটা' এক চেহারা নিয়ে এল এবং পরম আনন্দে ঘন ঘন নরবলি নিতে লাগল; পরের পর্যায়ে কোত্থেকে এল 'ব্যাঙ্গালোর' না 'হায়দ্রাবাদ' বডি—অকারণ পলকেই তা কাত্ হয়ে পড়তে থাকল; শেষে এল আধুনিকতম ট্রলি-বাসের এক দুরন্ত মডেল হয়ে, আরোহণ তো দূরে থাক—তার বারেক দর্শনের জন্যেই রহমানদের এই সাগর-তীর কলকাতার অঙ্গীয় বঙ্গীয় মদ্রীয়-পঞ্চনদীয় উৎরোল হয়ে উঠল। তারপরেই সমাপ্তির ঘণ্টা—ডিং-ডং বেল!

আমাদের ভারতীয় মতে, ক্রমবিকাশের পরে একটা চরম পরিণাম—এবং তারপরে, তারপরে আর কিছুই নেই। সেই ব্রহ্মলাভের ব্যাপার আর কি! পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহণও ক্রমিক উৎকর্ষের পথ বেয়ে সেই 'সুপ্রীম পার্ফেকশান'-এ পৌঁছে গিয়েছিল। ততঃ কিম্? তারপর আর কিছুই নেই—থাকবার কারণও নেই।

অতএব ফিরে আসুক সেই স্বর্ণযুগ—সেই প্রাণজুড়োনো আহ্বান : "কালীঘাট-এসপ্লানেড-শ্যামবাজার — শ্যামবাজার!" আসুক সেই বিশাল পাগড়ি, নিবিড় দাড়ি আর বালাপরা মহাভুজ—যা রাস্তায় নেমে দ্বিধাগ্রস্ত যাত্রীকেও চকিতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেবে; দেখা দিক সেই আশ্চর্য

ইন্দ্রজাল—যা চল্লিশজনের গাড়িতে একশো চল্লিশ জনকে অক্লেশে বহন করতে পারে। তিনজন যাত্রী উঠতে না উঠতে যা ত্রিশ জনকে ফেলে চলে যাবে না, 'টাইম নেই দাদু' বলে যা খালি থাকা সত্ত্বেও স্টপের সামনে দিয়ে ত্রিশ মাইল স্পীডে অন্তর্ধান করবে না, যার উদার দাক্ষিণ্যে যাত্রীদের একটা বোঁচকা, একটা টিনের স্যুটকেসও রাস্তায় পড়ে থাকবে না। অহো সুখম্!

ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল। ফিরে গেলুম সেই আনন্দঘন শৈশবে—যখন

আইয়ে...আইয়ে

চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম আর মনুমেন্ট দেখতে আমরা কলকাতায় আসতুম। এখনো মনে পড়ে বাসের তখন কত রঙ, কত চটকদার চেহারা! তাদের নাম-টামও থাকত। একবার বরানগর থেকে ফিরছি—যে বাসে চড়েছি তার নাম 'দোদুল দোলা'। খানিকটা আসতেই 'জয় গুরু'র সঙ্গে মোলাকাৎ! তারপরেই শুরু হল এক দুর্ধর্ষ রেস—কখনো 'দোদুল দোলা' আমাদের দাগ-কাটা শিশির মতো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে নিয়ে যায়, কখনো বা গুরুর নামে বলীয়ান 'জয়গুরু' আমাদের পেছনে ফেলে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কে জিতেছিল সে আর মনে করতে পারি না—কিন্তু সেই থ্রীল যেন এখনো শরীরে ঝিনঝিন করে বাজছে।

আবছাভাবে দোতলা বাসের সেই প্রথম অধ্যায়টাও মনে আসছে। ছাদহীন দোতলায় সেই সারি সারি সুখাসন পাতা। চড়া রোদ হলে কিংবা বৃষ্টি নামলে আলাদা কথা, নইলে গ্রীষ্ম-বসন্তের রাত্রে তাতে চেপে বসে

প্রাণ জুড়োনো হু হু হাওয়ায় চলতে চলতে একটিমাত্র রোমাঞ্চকর উপলব্ধি : 'হেভেন্‌লি হেভেন্‌লি !' এমন কি, কনকনে শীতের রাতেও শালে-র‍্যাপারে-মাফলারে নাক-কান ঢেকে সে কি শিহরিত পুলক ! ওপরে তারা-ভরা উজ্জ্বল আকাশ—কখনো চাঁদের প্রসন্নতা (এত ধোঁয়া-ধুলো তখন ছিল না বোধ হয়)—দু ধারে কলকাতার ফুটন্ত ইলেকট্রিক আর গ্যাসের আলো—সে এক আশ্চর্য প্লেজার-ট্রিপ ! বাস থেকে নেমে বাড়ি ফিরেই দু-একটা রোমান্টিক কবিতা লিখে ফেলা যেত।

প্রাইভেট বাসই যদি এল, তা হলে আরো একটু পেছিয়ে যেতে ক্ষতি কী ! একটা 'সাইক্লিক অর্ডারে'র কথা তো আমরা শুনে আসছি। দেখা দিক না আবার সেই সব [illegible] রঙের বাস—কলকাতার এই শ্রীহীন ধূসরতার ভেতরে আমাদের চোখে একটুখানি রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে দিক, রবীন্দ্রনাথের সেই ১৯-এর ঘ ওর ৭৫-এর মতো ব্যক্তিত্বহীন যান্ত্রিক নম্বরের বিরুদ্ধে আসুক প্রাণের ছোঁয়া-লাগা নামের দল—কেউ যাত্রী, কেউ [illegible] নওজোয়ান, কেউ আগে বাড়ো, কেউবা মা ভবানী। নামের সঙ্গে সঙ্গে তারা [illegible] হয়ে উঠুক। পাড়াগাঁয় আজও [illegible] [illegible] আনাগোনা করে—সেখানে কণ্ডাক্টর ড্রাইভারের সঙ্গে লোকের [illegible] [illegible] আবার গাড়ি আটকে গেলে [illegible] [illegible] ঠেলে তাকে চালু করে দেয়।

এই সব প্রাইভেট বাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু কি বাড়বে ? [illegible] [illegible] নিরর্থক। আমরা তো আরামের জন্যে বাসে চাপতে চাই না—যে কোনো উপায়ে দ্রুত-গতিতে অফিসে পৌঁছুতে চাই, কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারে, এস্‌প্ল্যানেড থেকে বেহালায় যেতে চাই। বাঘ-মার্কা রংচটা বাসের সীট রেক্সিন মোড়া কিনা—তাতে ফেনিল রবারের গদি আছে কিনা—টাক্সিবিলাসচারী ভাগ্যবান ছাড়া আমরা কজন তা জানবার সুযোগ পেয়েছি ? আমরা কেবল চাপতে চাই এবং পৌঁছুতে চাই, আর আমাদের এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাকে অক্লেশে পূর্ণ করতে পারে একমাত্র প্রাইভেট বাস—আইয়ে আইয়ে আহ্বানে যে অক্লান্ত, চল্লিশজনের গাড়িতে একশো চল্লিশজনকে তুলে নেবার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যার আয়ত্ত।

ঠিক কথা—প্রাইভেট বাস সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নয়—তার একটা হৃদয় আছে। সেই পাগড়ি, সেই দাড়ি, সেই পেশল বাহু এবং চওড়া চল্লিশ ইঞ্চি বুকে যেন বিশ্বপ্রেমের আহ্বান। বলা যায় না, তার ছোঁয়ায় আমাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিসর্বস্বতার দরজাটাও হয়তো আবার একটু খুলে যেতে পারে, হয়তো পুরোনো কলকাতার পুরোনো বাঙালীর মতো আমরাও আবার বলতে পারি : 'আইয়ে—আইয়ে—অন্দর আইয়ে—জায়গা হ্যায় !'

জঠর

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গণেশায় নমঃ!

সিদ্ধিলাভের আশায় নয়, চড়া রোদে ঘামতে ঘামতে গণেশ অ্যাভিনিউ-এ পড়ে হঠাৎ শশাঙ্ক মনে মনে বলে উঠল। এবং তখনই তার সিদ্ধিদাতা গণেশের কথা মনে হল। সাদা শুঁড় লাল দেহ আর পা গুটিয়ে বসার আয়েসী ভঙ্গি।

কোথাও কিছু সময় বসবার ইচ্ছায় অস্থির হল শশাঙ্ক। তার পা দুটো টনটন করছে, চোখে ব্যথা। গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। ঘাম মুছে মুছে রুমালটা ভিজে ন্যাকড়ার মতন হয়ে গেছে। হাওয়া নেই, কাছাকাছি কোথাও ছায়াও না। একটা ভয়ঙ্কর তাপ পিচ-গলা রাস্তা ফুঁড়ে উঠছে। আগুনের ঝাঁজ আকাশ চিরে নামছে।

এমন সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে সুবোধ বালকের মতন গণেশ অ্যাভিনিউ-এ এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক এবং সিদ্ধিদাতার কথা ভাবল।

এখন ওপরে তাকান যায় না। সূর্য মধ্য গগনে। ভরা দুপুর। শশাঙ্ক রাস্তা পার হবার চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছিল। ট্যাক্সি ছুটছে। গাড়ি স্কুটার মোটর বাইক আসছে যাচ্ছে। পেট্রলের গন্ধে রোদ আরও দপাদপ করছে। শশাঙ্ক ফস করে দেশলাই জ্বালাল। সিগ্রেটের প্যাকেটটা থেঁতলে গেছে। সিগ্রেট বিস্বাদ। টানতে বেশ জোর লাগছে।

ঠিক সেই সময় শশাঙ্কর এলোমেলো দৃষ্টি গণেশ অ্যাভিনিউ-এর মুখে সিনেমা হাউসের ওপর কিছু সময়ের জন্যে স্থির হয়ে থাকল। সে দেখল, একটা খুব বড় উডকাটে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ফুল সাইজ। ছেলেটির বুকের কাছে শশাঙ্কর গায়ে ঘামে ভিজে সপসপে গেঞ্জির মতন মেয়েটি একেবারে সেঁটে আছে। সে সেই উডকাটে আরও দেখল, তুষার মাথা শান্ত পাহাড় এবং নিস্তরঙ্গ একটি সরোবর আর পাশা-পাশি দুটি লাল পদ্ম।

রোদের ঝাঁজে অল্প পরে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেও শশাঙ্ক এই গ্রীষ্মের দাবদাহে কল্পনা করে নিতে পারল যে ওই পাহাড় আর সরোবরকে প্রথম বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে। তখন মুখ কপাল গলা আর ঘাড়ের ঘাম মুছে রাস্তা পার হবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সে হঠাৎ তার মা-বাবার কথা ভাবল। কেননা তখনো তার মনে সিনেমা হাউসের ওপরে টাঙানো উডকাটে দেখা যুবক যুবতী পাহাড় সরোবর তুষার পদ্মফুল—এইসব প্রতীক প্রতিমা

ছায়া ফেলছিল বলে সে প্রথম বসন্তের হাওয়াও তার ঘামে অপরিচ্ছন্ন রোমকূপ দিয়ে অনুভব করতে পারছিল।

প্রায় বছর তিরিশ আগে শশাঙ্কর মা-বাবার বিয়ে হয়েছিল। এ বিয়েতে আত্মীয়-অভিভাবকের মত ছিল না, তারা কিছু হৈ চৈ করবার চেষ্টাও করেছিল। এবং বিয়ে বন্ধ করতে না পেরে পরে নাকি বলেছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে কেউ বিয়ে করতে পারে না, যা করে তা পশুরাও করে থাকে। শশাঙ্কর মা-বাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখলেও সেইসব আত্মীয়-অভিভাবক ঠিক হিসেব রেখেছিল যে, বিয়ের ছ'মাস পরই শশাঙ্কর জন্ম হয়। সুতরাং মা -বাবার বিয়ের মতন তার জন্মও অবৈধ।

এখন মা-র কথা একটু বেশি করেই ভাবল শশাঙ্ক। তার মুখে অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনের মধ্যে একটা বিদেশী গানের কলিও কেঁপে উঠল, "লাকি মি, লাকি মি! লাকি লাকি লাকি মি! আই অ্যাম লাকি সান অব এ গান!!"

এ গান একদিন গুনগুন করে শশাঙ্ক রেণুকাকেও শুনিয়ে দিয়েছিল। রেণুকা তার স্ত্রী। মা-বাবার মতন শশাঙ্কর বিয়ে কিন্তু অবৈধ নয়, পুরোপুরি বৈধ। কেননা বিয়ের সময় শশাঙ্ক এস, ডাট এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর নম্বর ওয়ান সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ এবং অদূর ভবিষ্যতে তার সেলস ম্যানেজার হওয়ার কথাটাও পাকা। তার মাসিক আয় এক হাজার টাকা তো বটেই, কোন কোন মাসে তারও অনেক বেশি।

কিন্তু বিয়ে বৈধ হলেও শশাঙ্কর জন্ম-লগ্নে কিছু গলদ ছিল বলে রেণুকার সঙ্গে তার ব্যবহার কতকটা অশালীন প্রেমিকের মতন হয়ে উঠল। সে আর কাজকর্ম নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না, টাকা পয়সা, জিনিসপত্র—এসবের চেয়ে রেণুকাকেই বেশি ভালবাসল। ফলে তার আয় হাজার টাকা থেকে চার-পাঁচ শো'য় নামল। পরে আরও কমল। এত কম হল যে রেণুকার ঢলো ঢলো মুখ অপ্রসন্ন হল, উদ্ধত বুকেও শুকিয়ে এল। গদগদ ভাষা আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর সময় মতন একটা বাচ্চা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠল। সুন্দর চোখ-মুখ। কোঁকড়া সোনালী চুল। কাঁদে কম। জন্ম থেকেই ছেলেটা দাপাদাপি একটু বেশিই করে। কিন্তু এই সুন্দর খোকাটি বছর খানেকের হয়ে হঠাৎ ডিপথিরিয়ায় মারা গেল।

প্রথম প্রথম খুব কেঁদেছিল রেণুকা। শশাঙ্ক বিমূঢ়। বুকটা খালি-খালি। সে রেণুকার আরও কাছাকাছি থাকল। ভেবে ভেবে তাকে সান্ত্বনার অনেক ভাল ভাল কথা বলবার খুব চেষ্টা করল।

"আমার কাছে এস রেণু। না, এমন করতে হয় না। আমি তো আছিই। খোকা ঠিক আমাদের কাছেই আবার ফিরে আসবে—"

'না—না", মাথাটা জোরে-জোরে ঝাঁকাল রেণুকা।

নিঃঝুম দুপুরে শশাঙ্ক রেণুকাকে আরও কাছে টানল, আদর করল, "আমি বলছি, ঠিক ফিরে আসবে দেখো—"

এখনো শশাঙ্কর চৈতন্য হল না দেখে তার ভারে অবসন্ন রেণুকা ধরা গলায় বলল, "এসব বল না।"

"কেন রেণু?"

"না, আর কেউ আসবে না, কখনো না", রেণুকার গলা শুকিয়ে আসছিল। স্বর একটু রুক্ষ, বিরক্তি প্রকাশ করবার মতন।

কী ভেবে কথা বলেছিল রেণুকা, শশাঙ্ক বুঝল না। এমন দুপুরে রেণুকার খুব কাছাকাছি থেকে সে তার সুন্দর খোকাটির কথাও ভুলে যাচ্ছিল। রেণুকার নিশ্বাস তার মুখে ও গালে লাগছিল। নেশার মতন মনে হচ্ছিল শশাঙ্কর।

"খোকা গেছে ভালই হয়েছে" রেণুকা হঠাৎ ছটফট করতে করতে বলে উঠল।

"কোন উপায় ছিল না রেণু", খুব শক্ত করে শশাঙ্ক তাকে চেপে ধরে বলল, "ডাক্তারটা গাধা, প্রথমে ধরতেই পারেনি যে ডিপথিরিয়া—"

একটা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় শশাঙ্কর কাছ থেকে খানিকটা দূরে ছিটকে গিয়ে রেণুকা থেমে থেমে নিস্পৃহ গলায় বলল, "ভালই হয়েছে! কী হত বেঁচে থাকলে। বস্তির ছেলেদের মতন হত! না খেয়ে মরত!" রেণুকা শশাঙ্কর মাত্রা ছাড়ানো প্রেমে ক্লান্ত অতিষ্ঠ দুর্বল ও দরিদ্র হয়ে পুত্র শোকে আবার ঝরঝর করে কাঁদল।

যতটা বলল রেণুকা তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝল শশাঙ্ক। রেণুকার কান্না শুধু হয়তো ছেলের জন্যে নয়, তার নিজের ভাগ্যের জন্যে, এমন স্বামী পাওয়ার জন্যে। দায়িত্ব, কর্তব্য—এ ধরনের কথা আরও কয়েকবার শুকনো মুখে বিড়বিড় করে বলেছিল বটে রেণুকা তাকে।

সে শশাঙ্ককে স্কোয়াড্রন লীডার দাসের কথাও শুনিয়েছিল। দাস ট্রে কিম্বা ট্রলি-ট্রের দালাল নয় শশাঙ্কর মতন। এয়ার ফোর্সের অফিসার। দাস রেণুকাকে বিয়ে করবার জন্যে মাতালের মতন হয়ে গিয়েছিল।

এসব কথা বলবার সময় রেণুকার চোখে এবং মুখে স্কোয়াড্রন লীডার দাসকে হাত-ছাড়া করার দুঃখ অনুতাপ ও অনাদর —এই তিন বৃত্তি অদ্ভুত সামঞ্জস্য বজায় রেখে এমন আশ্চর্যভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, তাকে দেখতে দেখতে শশাঙ্ক না বলে পারল না, "ও বেটা তখন হাজার টাকা মাইনে পেত না বোধ হয়?"

"কী বললে?"

হালকা এলোমেলো স্বরে সোজাসুজি বলল শশাঙ্ক, "তোমার ওই বিয়ের আগের উড়ন-কার্তিক দাস, আমার মতন মাসে মাসে নিশ্চয় হাজার টাকা পেত না, তাই তোমার বিচক্ষণ পিতাঠাকুর এই দালালের ঘাড়েই—"

"চুপ করে!" মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল রেণুকার, চোখ কুঞ্চিত হল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ল। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে শশাঙ্ককে বলল, "পশুর সঙ্গে থাকা যায়, বুঝলে! কিন্তু যার ব্যাড ব্লীডিং তার সঙ্গে থাকা—" রেণুকা কথা শেষ করতে পারল না। রাগে ও ঘৃণায় সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল, কিম্বা দাঁতে দাঁত—শশাঙ্ক ঠিক বুঝল না।

কিন্তু রেণুকার কথা শুনে কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে থাকল শশাঙ্ক। তারপর তাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার পেটের মধ্যে হাসি উথলে উঠল। এবং আশ্চর্য, গলায় গানও খেলে গেল, "লাকি মি, লাকি মি! লাকি লাকি লাকি মি! আই অ্যাম লাকি সান অব এ গান!!"

এ গান গলায় খেললেই মা-বাবার কথা মনে পড়ে শশাঙ্কর এবং মা-বাবার কথা মনে হলেই গানটা গলায় খেলে যায়। এই গানের কলি আর মা-বাবার ভাবনা দামী পেটেণ্ট ওষুধের মতন শশাঙ্ককে আশ্চর্য রকম সবল ও সতেজ করে তোলে বলেই সে সব দুঃখ যন্ত্রণা গ্লানি ও ক্লান্তি জাতীয় অনুভূতি পট.পট হজম করে নিয়ে শহরের সর্বত্র ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

শশাঙ্কর মা আর বাবা! উডকাটের মতন অনেক ওপরে দারুণ গ্রীষ্মেও স্থির তিরিশ বছর আগেকার দুটি প্রেমিক প্রেমিকার ছবি। যদিও ওরা কেউ আজ আর বেঁচে নেই। শশাঙ্ক শুনেছে, বিয়ের পর তার বাবা মাকে সুখে রাখবার খুবই চেষ্টা করেছিল। বাবার আয় বড় কম। খুব কষ্টে দিন যাচ্ছিল। শশাঙ্কর জন্মের পর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে এল। আর চালান গেল না। ধারে-ধারে ডুবে তার বাবা একদিন আত্মহত্যা করে মরতে বাধ্য হল। শশাঙ্কর তখন ঠিক দু' বছর বয়স।

তারপর মা-র অবস্থা কেমন হয়েছিল, মা কী করেছিল শশাঙ্কর মনে নেই। জ্ঞান হবার পর মাঝে মাঝে শশাঙ্ক মাকে কাঁদতে দেখেছে। শেষদিন অবধি মা ভুলতে পারেনি তার বাবাকে। শশাঙ্ককে নিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছেও কখনো

হয়নি তার মা। সকালে টুাশানি করে, দুপুরে মেয়েদের একটা ছোট ইস্কুলে চাকরি করে খুব কষ্টে তাকে বড় করে তুলেছে। তারপর বছর দশ-বার আগে রোগে ভুগে ভুগে মরেছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাত্র একবার প্রেক্ষাগৃহের মাথায় যুবক যুবতীর ঘেঁষ ঘেঁষি ছবি দেখে এত কথা শশাঙ্কর মনে এল। এখন গোঁফো পুলিস বাঁশি বাজিয়েছে. হাত তুলে অন্যদিকের গাড়ি ঘোড়া থামাচ্ছে।

শশাংক রাস্তা পার হয়ে কিছু সময় ছবি ঘরেরই ছায়া-ছায়া কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটু চালাক-চতুর চেহারা করবার জন্যে ভিজে রুমাল দিয়ে নিজেকে বেশ ভাল করে ঘষা মাজা করতে লাগল। অল্প পরে আরও কয়েক গজ পার হয়ে এস্ ডাট এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর ম্যানেজারের ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা মারল, টক-টক-টক।

"মে আই কাম ইন স্যার?"

"কাম ইন প্লিজ—" শশাংককে দেখেই ম্যানেজার মুখ নামিয়ে নিলেন, ঈষৎ অপ্রসন্ন যেন, "কী খবর মিস্টার দস্তিদার?"

শশাংক হাসল। ঘরে পুরু গদি আঁটা অনেক খালি চেয়ার ছিল, ম্যানেজার তাকে বসতে বলার আগেই সে একটাতে বসে পড়ে বলল, "কী গরম পড়েছে!"

"সেই জন্যেই কি আজকাল অফিসে কম আসেন?"

"না না" শশাংক গলার স্বর বেশ কাতর করবার চেষ্টা করে বলল, "বড় ট্রাবলস-এর মধ্যে আছি স্যার—"

কিছু সময় ম্যানেজার কথা বললেন না। একটা খুব জরুরী চিঠি পড়বার ভান করলেন। শশাংকও চুপচাপ বসে থাকল। মাথার ওপর জোরে পাখা চলছে। টেবিলের ওপর আরসোলার মতন কাগজের খরর খরর শব্দ হচ্ছে। কাছেই দুটো টেলিফোন।

একটু অস্বস্তি হচ্ছিল শশাঙ্করর। অল্প শব্দ হলেও সে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আর কেউ এসে পড়ে কি না। এখন ম্যানেজারের সঙ্গে আসল কথাটা সেরে নিতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হত। টেলিফোন বাজলে কিংবা কেউ এসে পড়লে এমন মুখ বুজেই আরও বসে থাকতে হবে। অনেক পরে শুকনো গলায় ম্যানেজার শুধু বললেন, "কী হয়েছে?"

শশাঙ্কের হাতের কাছেই টেবিলের ওপর কাঁচের কয়েকটা পেপার-ওয়েট ছিল, একটা তুলে নিয়ে হাত মুঠো করে খুব শক্ত করে সে চেপে ধরল, "নানা অশান্তি, শরীরটাও খুব ভাল থাকছে না, তা ছাড়া—" টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েটটা ঘষতে ঘষতে শশাঙ্ক বলে ফেলল, "আমার ওয়াইফ-এর ইমপোর্ট্যান্ট ডেলিভারি—শী হ্যাজ অলরেডি বিন অ্যাডমিটেড টু এ নার্সিং হোম—"

ম্যানেজার শশাঙ্কর কথা শুনে মুখ তুললেন, হাসলেন, "সবাই বুঝি মিস্টার দস্তিদার! ডোমেস্টিক ট্রাবলস্ সকলেরই থাকে, কিন্তু—"

ডুবন্ত মানুষের তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে শশাঙ্ক গড়গড় করে বলে গেল, "আমি কথা দিচ্ছি, এ মাসের মধ্যেই আমি দুশো ট্রলি-ট্রে নিউ হোটেলে সাপ্লাই দেব, প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে আমার প্রায় ফাইন্যাল কথা হয়ে গেছে—"

"নিউ হোটেলের কথা আপনি তো অনেকদিন আগে থেকেই বলে আসছেন", ম্যানেজার কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন শশাঙ্কর কথা ভেবেই বেশ স্নেহপ্রবণ হয়ে

উঠলেন, "অবশ্য আপনার আগেকার রেকর্ডের কথা ভাবলে দু'শো পাঁচ শো ট্রে সাপ্লাই দেওয়া আপনার পক্ষে খুবই সহজ। মিস্টার দস্তিদার, আপনি ছিলেন আমাদের টপ সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ। স্টীল মাচ ইজ এক্সপেকটেড ফ্রম ইউ। একটু মন দিলেই আপনি আবার ম্যাক্সিমাম বিজনেস করতে পারেন—কত ভাল আপনার কানেকসন্স!"

শশাঙ্ক হাসল, বলল, "এ মাসের মধ্যেই আমি আপনাকে স্যাটিসফাই করব স্যার।"

"দেখা যাক!"

"স্যার, একটা কথা—"

শশাঙ্ক কী বলবে তা বুঝতে পেরে ম্যানেজার বললেন, "এ মাসের কমিশন এখনই ক্যাশ চাই আর আপনার লোন কিস্তি কাটব না—এই তো?"

শশাঙ্ক সপ্রশংস দৃষ্টিতে ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমার স্ত্রী নার্সিং হোমে আছে বলেই—"

কথা শেষ করেই ম্যানেজার একটা মোটা খাতা খুলতে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এবার শশাঙ্ককে বাধা দিয়ে হাসলেন, তার হাসিতে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, "এ মাসে আপনার মোটে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওনা হয়েছে", একটু থেমে তিনি বললেন, "এতে আপনার স্ত্রীর ডেলিভারির কি কিছু সুবিধা হবে?"

"ওতেই হবে স্যার", শশাঙ্কর দুই চোখ চকচক করে উঠল, "একটা ধাই-টাই দিয়ে কাজ সারতে হবে—উপায় কী!"

ম্যানেজার আরও হাসলেন, "এই না বললেন তিনি নার্সিং হোম-এ আছেন? মিস্টার দস্তিদার, আমি বলছিলাম এবার সত্যি কাজে মন দিন—" তাঁর কণ্ঠে পরিহাসের সুর বাজল, "আপনার কথা বিশ্বাস করলে এই এক বছরে আপনার স্ত্রীর চারবার ডেলিভারি হল!"

নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করার ইচ্ছায় শশাঙ্ক বলল, "কেস অব মিসক্যারেজ স্যার, বড় অশান্তিতে আছি, বাচ্চাটা ডিপথিরিয়ায় মারা যাবার পর—"

"এই নিন, এই স্লিপটা নিয়ে ক্যাশে গিয়ে আপনার কমিশন নিয়ে নিন", ম্যানেজার শশাঙ্ককে আর একবার সতর্ক করলেন, "ইউ আর ডিগিং ইওর ওন গ্রেভ মিস্টার দস্তিদার—"

কিন্তু শশাঙ্ক তখন বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা আদায়ের আশায় ক্যাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আবার গণেশ অ্যাভিনিউ-এর ওপর প্রসন্ন মুখে দাঁড়াল শশাঙ্ক। এখনো রোদ, এখনো ঘাম—কিন্তু এখন সে সব সে হজম করে নিতে পারল। এবং নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে খেতলে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কিন্তু প্যাকেটটা খালি, শশাঙ্ক সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দু-একটা খালি ট্যাক্সিও হুস হুস করে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল দেখে শশাঙ্কর মনে হল, এখন সে ইচ্ছে করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে রেণুকার হাতে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তুলে দিতে পারে।

কিন্তু অল্প পরেই শশাঙ্কের মন থেকে

বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা খালি ট্যাক্সির মতনই হুস করে মিলিয়ে গেল। কেননা তার বুক-পকেটে এক হাজার নয়, পাঁচ শো নয়, দু শো-এক শো কিংবা পঞ্চাশও নয়, মোটে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এ টাকা নিয়ে রেণুকার সামনে দাঁড়ালে সে নিশ্চয়ই আনন্দে গদগদ হয়ে উঠবে না। বিশ্রী চেহারা করে কিছু না কিছু বলবে। কাজেই লক্ষ্মীকে এমন চূড়ান্ত অবহেলা ও অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে শশাঙ্ক এখন বাড়ি না যাওয়াই স্থির করল।

বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে গৃহকোণ ছাড়াও অনেক জায়গা শশাঙ্কর জন্যে কলকাতা শহরে আছে বটে। ক্ষুধা নয়, কড়া রোদ গায়ে লাগিয়ে লাগিয়ে সে হঠাৎ অনুভব করল তৃষ্ণায় তার গলা, বুকও শুকিয়ে এসেছে। তার কিছু সময় কোথাও একা একা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিশ্রামেরও দরকার ছিল। কেননা আজই নিউ হোটেলের প্রোপাইটারের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের তাগিদ সে মনে মনে সত্যিই অনুভব করছিল। বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাকে অমানুষিক পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে সহস্র গুণ করে তোলার এক উৎকট ইচ্ছা স্বেদ বিন্দুর মতন তার মনের উপর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছিল।

আঙুলের ছোঁয়ায় চশমায় ঘামের দাগ লাগল। সব ঝাপসা ঝাপসা। রুমাল ভিজে বলে শশাঙ্ক ফিকে হলুদ রঙের হাওয়াইয়ান শার্টের খুঁট দিয়ে চশমাটা মুছে আবার চোখে পরল। এখনো দেখতে অল্প অসুবিধা হয়, চশমার কাঁচে দাগ লেগেই আছে।

শশাঙ্ক হাঁটছিল। এপাশে ওপাশে ছোটখাট রেস্তোরাঁ, মশলার কড়া গন্ধ। ধোঁয়া। ভিতরে ঠাসাঠাসি মানুষ। শশাঙ্কর শরীর চিড়বিড় করে উঠল। এইসব রেস্তোরাঁয় ঢুকে বিশ্রাম করবার কথা সে ভাবতে পারল না।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নিচু হয়ে শশাঙ্ক দেখল বুড়ো আঙুলের নখের খোঁচা খেয়ে খেয়ে বাঁ পায়ের জুতোর মাথায় ছোট একটা ফুটো হয়েছে। নখ না কাটলে আস্তে আস্তে ফুটোটা বড় হবে। সে নখ কাটবার কথাও ভাবল।

আরও পরে শশাঙ্ক দেখল গণেশ অ্যাভিনিউ ধরে আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কখন বাঁ দিকে ছোট একটা রাস্তা পার হয়ে সে ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর একটা নতুন বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার তৃষ্ণা গলার কাছে উঠে আসায় সেও আর ইতস্তত না করে কার্পেট মোড়া সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে সটান দোতলায় উঠে এল।

চার পাশ পরিচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ। একদিকে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে সম্ভবত কারুর প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। শশাঙ্কর সামনের টেবিলে একটা মোটা লোক আর একটা মেয়ে। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। খুব হাসছে, কথা বলছে। আর ঘন ঘন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। মেয়েটা যে বিশেষ পাড়ার মার্কা মারা, শশাঙ্ক দেখেই বুঝল।

এখানে ঢোকবার সময় শশাঙ্কর ইচ্ছে ছিল একটু বিয়ার খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করবে, তারপর নিউ হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকা কামাবার পথ সুগম করে নেবে। কিন্তু এখন তার সামনে বাজারের মার্কা-মারা মেয়ের সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা মোটা লোককে মাছের মতন হুইস্কি খেতে দেখে সে-ও বয়কে ডেকে ডবল পেগ হুইস্কির কথাই বলল।

আলু ভাজা, পেঁয়াজ ও বাদাম

চিবোতে চিবোতে হুইস্কির স্বাদ বড় অদ্ভুত লাগল শশাঙ্কর। কপালে অল্প অল্প ঘাম জমলেও শীততাপনিয়ন্ত্রিত পরিচ্ছন্ন নির্জন ঘরে বসে তার মনে শুধু টাকা করার ইচ্ছা সামনের টেবিলের মোটা লোকটার মতন ফুলে উঠল। একটু পরেই বয়কে আবার গেলাস ভরে দিতে বলল শশাঙ্ক।

আমার পকেটে এখন যা আছে, একটা আবেশ শশাঙ্ককে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল, তা দিয়ে আমি ওই টেবিলের মার্কা-মারা মেয়ের মতন একটা মেয়েরে সঙ্গে ঘেঁষ ঘেঁষি করতে পারি।

শশাঙ্ক পা ছড়িয়ে দিল, চেয়ারের নরম গদিতে পিঠ ঠেকাল এবং প্রতীক্ষাকাতর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের শরীরের দিকে নিবিকার চোখ বুলোতে বুলোতে ভাবল আজ যদি আমি বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা না পেয়ে শ' খানেক টাকা পেতাম, তা হলে আমি অমন মেয়ের সঙ্গে বড় মজার অনেক সময় কাটাতে পারতাম।

শশাঙ্ক খুব আস্তে আস্তে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। তার ভয় হচ্ছিল, সব এখুনি ফুরিয়ে যাবে। নারীসহ

ভোগের একটা সহজ কৌশল তার
ত্তে এসে যাচ্ছিল বলে সে একটু
শ সময় এখানে বসে থাকতে চাচ্ছিল।
মাকা-মারা মেয়ে আর ধুতি-পাঞ্জাবী-
মোটা লোকটার পিছনে সবুজ দেয়ালে
বড় একটা আয়নায় শশাঙ্কর ছায়া
ড়ছিল। সে কিছু সময় সেখানে
জর চেহারা দেখল। ঘাম মুছে মুছে
াল ভিজিয়ে ফেললেও মুখটা এখনো
ারিচ্ছন্ন, চুল উস্কোখুস্কো। একটা
ঃচোরা মূর্তি।

শশাঙ্ক আয়নায় নিজেকে দেখছিল,
তে দেখতে হাসছিল। আর অফিসের
নেজারের সামনে যাবার আগে
ক্ষাগৃহের ছায়া-ছায়া কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে
যেমন করে চেহারা ঘষা-মাজা করবার
টা করেছিল, এখন তেমন কিছু করবার
তার মনে হল না। সে শুধু চোখ
করে আস্তে তার বুক পকেটে আঙুল
াল এবং দুটো দশ টাকার ও একটা
টাকার নোট অনুভব করল। খুচরো
াশ পয়সা প্যাণ্টের পকেটে আছে।
পকেটের কাছাকাছি হাত নিয়ে এল,
...র দরকার মনে করল না।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বড় অস্থির
য় পড়েছে। এখন থেকেই শশাঙ্ক
তে পাচ্ছে, হতাশা আর বিরক্তিতে তার
র্যের বাঁধ ভাঙছে। ব্যাগ হাতে নিয়ে
ঠ দাঁড়াল মেয়েটি। হায় হায়! তোমার
াক এল না!

কী তোমার নাম? ক্লারা বেণ্ডা শীলা
লী—কী বল না? এস তুমি আমার
িলে, অল্প করে কিছু খাও। আর
ছু তো হবে না আজ। মোটে বাইশ
কা পঞ্চাশ। বিল মেটাতে হবে, তা ছাড়া
য়ের টিপস্।

গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে এল
শাঙ্ক, ছোট একটা চুমুক দিল। হাসি
াগেই ছিল তার ঠোঁটে। ডাকবে নাকি
কবার অস্থির, বিরক্ত ও হতাশ মেয়েকে?
লবে, আমি যাচ্ছি নিউ হোটেলের
প্রাইটারের সঙ্গে দেখা করতে? আবার
ামি পাব—দুশো পাঁচশো হাজার—
হিলের খটখট শব্দ হল, সান-বাঁধানো
ায়গায় গরু-ছাগলের চলাফেরার মতন।
শাঙ্কর সামনে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পা
লে বেরিয়ে চলে গেল অ্যাংলো
ণ্ডিয়ান মেয়ে। হায় হায়! তোমার বন্ধু
ল না! লাকি মি—লাকি মি'র সুরে
ছু সময় মনে মনে গুন গুন করতে
াকল শশাঙ্ক।

বেরিয়ে যাক! আরে, আমার কাছে
াজার টাকা থাকলে, এক শো টাকার টাপ
েড়িকে আমি পাত্তা দেব কেন—তখন কি
য়েও তাকাব ওদের দিকে ... বাজারের
ায়েল-আঁটা মেয়েমানুষের দিকে!
...

আমি শশাঙ্ক দস্তিদার স্কোয়ার্ডন লীডার দাসকে ধাবড়া মেরে নকশা-কাটা পিঁড়িতে বসে রেণুকোর মতন গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে বৈধ কানুনায় ঘরে এনে ভোগ করব রাতের পর রাত মাসে হাজার টাকায়। ...এক-এক হাজার রূপেয়া—লড়নেওয়ালা—নীলামওয়ালা! ভাল বংশ, ভাল ঘর—গ্র্যাজুয়েট লাড়কি—নীলামওয়ালা।

নিবিড় সুখের অনুভূতিতে ঘুম আসছিল শশাঙ্কর। আঁধার-আঁধার ঘর। সবুজ দেয়াল, লাল কাচের টেবিল, সিগ্রেটের ধোঁয়া শীততাপে নীল হয়ে উঠেছিল। পাহাড়, পদ্ম, সরোবর আর তুষারের কথা, চারপাশে তাকিয়ে এখানে বসেই এখন ভাবতে পারছিল শশাঙ্ক।

বিয়ের সময় আমার বাবার পকেটে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাও তো ছিল না। নকশা কাটা পিঁড়িতে বসতে পায়নি আমার মা। ওরা কেউ সানাই-এর পোঁ শোনেনি। হায় হায় হায়! এক বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ধাক্কা মেরে আমার মা-বাবাকে ছকের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। তখন ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতন পাহাড় তুষার সরোবর লাল পদ্ম—এই সব দেখতে গিয়েছিল।

হায় হায়! ফ‍ুকো কাপ্তেনের আবার প্রেম! মজা টের পেয়ে গেলে তো বাপ আমার! আত্মহত্যা করে মরলে।

শশাংকর মাথার মধ্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। হুইস্কির গেলাস খালি। এখন আয়নার দিকে তার চোখ নেই। তার কপালের চামড়া একটু কুঁচকে এসেছে, কয়েকটা রেখা স্পষ্ট।

শশাঙ্ক ভাবল, মা কেন গালাগাল করল না বাবাকে, খোঁটা মারল না। কেন বাবার স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকল মরবার দিন পর্যন্ত।

আমার মা-টা বোকা—তাই। বোকা না হলে আর বিয়ের ছ' মাস পরেই আমি হই।

দুপুর আর নেই। বিকেলও শেষ হয়ে আসছে। থেকে থেকে হাওয়া উঠছে। ধর্ম-তলা স্ট্রীটের ওপর ফলের দোকানে ঝোলানো পাকা আপেল আঙুর হাওয়ায় দুলছে।

শশাঙ্ক একসঙ্গে মিষ্টি মশলা দেওয়া দুটো পান মুখে গুঁজল, সিগ্রেট কিনল। আর তার বরাত সত্যি ভাল বলে বাড়ি ফেরবার জন্যে একটা খালি ট্যাক্সিও পেয়ে গেল।

রাস্তা পরিষ্কার। মিছিল, বিগড়ে যাওয়া ট্রাম বাস কিম্বা বৃষ্টি—আজ কিছু নেই। না থাকলেও টানা রাস্তা ধরে শশাঙ্ককে নিয়ে তাকে যেন একটা খুব নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই ট্যাক্সি একটু বেশী জোরে ছুটেছিল। এখন শশাঙ্কর মন প্রফুল্ল, উদ্‌গ্রীব। অবাধ-গতি ট্যাক্সির মতন তার মনে হচ্ছিল সে সকলের চেয়ে আগে বাড়ি ছুঁয়ে কাপ সে.ডল—এই সব এখুনি পেয়ে যাবে।

সাদার্ন মার্কেটের কাছাকাছি ভবানন্দ রোডে শশাঙ্কর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি থামল তখন মিটারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার বুকে ঠাণ্ডা একটা ঝাপটা লাগল। শশাঙ্কর খেয়াল নেই তার পকেটে এখন ট্যাক্সি ভাড়ার পুরো টাকা আছে কি-না। অল্প দমে গিয়ে সে পকেটে হাত দিল।

ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশিই আছে। খুশি মুখে ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে শশাঙ্ক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সম্ভবত রেণুকা জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেয়েছিল, ধাক্কা দেবার আগেই খিল খোলার শব্দ হল। কিন্তু ভেতরে ঢুকে কাছাকাছি কোথাও রেণুকাকে দেখতে পেল না শশাঙ্ক। দরজা খুলেই সে সরে গেছে।

শশাঙ্ক বোকার মতন রেণুকাকে দেখল শোবার ঘরে আয়নার কাছে। সাজের পালা প্রায় শেষ করে এনেছে সে, এখন গলা উঁচু করে মুখে পাউডারের পাফ বুলোচ্ছে।

"রেণু?" শশাংক ভয়ে-ভয়ে আস্তে ডাকল।

"উঁ", আরও জোরে জোরে পাউডার ঘষল রেণুকা। শশাংকর দিকে তাকাল না।

শশাঙ্ক এগিয়ে এল, তার শরীরের অংশ ফুটে উঠল আয়নায়। নিচু না হলে এ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক চুল আঁচড়াতে পারে না। রেণুকাকে দেখতে শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"কেন বল তো?"

"সেজেছ কি-না," শশাঙ্ক রেণুকার কাছে এসে তার একটা হাত ধরে আনকোরা প্রেমিকের মতন খুব নরম করে বলল, "তোমাকে আজ নতুন-নতুন লাগছে—"

"ছাড়", হাত ছাড়িয়ে নিল রেণুকা। শশাঙ্কর মুখে মদের গন্ধ ছিল বলে সে নাকের একটা ভঙ্গি করল। আর তার দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে সাদা একটা ব্যাগ খাটের ওপর থেকে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শশাঙ্ক পলকে রেণুকার সামনে এসে ট্র্যাফিক পুলিসের মতন দুই হাত তুলে তাকে আটকে রাখল, "আমি ফিরতে না ফিরতেই তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"সর, আমার কাজ আছে—"

শশাঙ্ক হেসে বলল, "কাজ একটু পরে হবে।"

হঠাৎ দপ্ করে উঠল রেণুকা, "না না না, যেখানে ছিলে সেখানে থাকতে পারনি আরও কয়েক ঘণ্টা?"

"পয়সা ছিল না। মোটে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পেয়েছিলাম আজ," শশাঙ্ক একটু জোরে বলল, "বেশি পেলে আমি সোজা বাড়ি চলে আসতাম!"

"না এসে ভালই করেছ।"

"আমি শিগগিরই বেশি টাকা পাব। আবার মাসে মাসে হাজার—আরও বেশি," শশাঙ্ক ট্র্যাফিক পুলিসের মতন হাত ভেঙে রেণুকাকে কাছে টানতে যাচ্ছিল, "আমি নিউ হোটেলের প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে কালকেই—"

"মাতলামি করবার আর জায়গা পেলে না?" শশাঙ্ককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রেণুকা, "এখন আমাকে তোমার খুব দরকার, না? নির্লজ্জ ব্রাফ—"

শশাঙ্ক জানত আর বাড়াবাড়ি করলে এখন আরও কিছু বিশেষণ রেণুকা ছেড়ে বসবে। সে তাকে আর কোন সুযোগ দিল না, তার কথার মাঝে হো-হো করে হেসে উঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "মোক্ষম কথাটাই বলে ফেল না রেণু, সান অব এ গান!"

শশাঙ্ক সরে দাঁড়াল।

কোথায় গেল রেণুকা, কে জানে। তার মার কাছে শশাঙ্কর শ্রাদ্ধ করতে কিম্বা কোন বন্ধু কি প্রেমিকের কাছে—সে সব ভেবে হা-হুতাশ করবার লোক নয় শশাংক। তবে ইচ্ছে করেই দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে রেণুকা বার হল—চৌরঙ্গিতে বড় বড় বাড়ি তৈরির সময় লোহা ঠোকা-ঠুকির শব্দের মতন।

এই শব্দটা রেকর্ডে গান কিম্বা বাজনার মতন হঠাৎ ধরে রাখবার ইচ্ছে হল শশাঙ্কর।

যে শব্দ মাথার মধ্যে ধরে রাখতে চেয়ে-ছিল শশাংক, রেণুকা যা করে গিয়েছিল, তা বেশি সময় থাকল না—একেবারে মিলিয়ে গেল। তা ছাড়া সাদার্ন মার্কেটের চেঁচামেচি, রাস্তার হৈ চৈ—কোন গোলমালই শশাঙ্কর কানে গেল না।

একটা খুব পুরনো সোফায় পা টান-টান করে শশাঙ্ক ঝিমোচ্ছিল। ভিজে গেঞ্জি সে দরজার কোণায় ছুঁড়ে ফেলেছে। প্যান্ট ছেড়ে ঢিলে পায়জামা পরেছে। খালি গা। হাত-মুখ ধোয়ার কথা শশাঙ্কর মনে হয়নি, কেননা তার শরীরে আর ঘাম ছিল না, শুকিয়ে গিয়েছিল।

ঘরটা চাপা, খুব ছোট। অন্ধকার ঠেসে ধরেছিল শশাংককে। তা হলেও আলো জ্বালাবার কথা তার মনে হল না। একা একা বড় নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঝিমোচ্ছিল।

শশাঙ্কর মা-র খুব বড় একটা ছবি দেয়ালে টাঙানো ছিল। হঠাৎ সে চোখ রাখল সেদিকে। লাবণ্যে ঢলোঢলো মুখ। মাথায় ঘোমটা। বিয়ের পর-পর তোলা। শশাঙ্ক জানে তখন তার মা তাকে নিজের দেহের মধ্যে বহন করছে।

মাথা বোধ হয় অল্প অল্প ঘুরছিল শশাঙ্কর। সোফাটা যেন উঠছিল-নামছিল। শশাঙ্ক ফিক করে হাসল। কে জানে এখনে একটা ভারী দেহ তাকে জঠরের অন্ধকারে ঠেলে রেখেই ঘোরাফেরা করছে কি-না।

গণেশ অ্যাভিনিউ-এর কথা মনে হল শশাঙ্কর, তার অফিসের কথাও। ম্যানে-জারের সামনে কাঁদুনি গাওয়া, ধর্মতলা স্ট্রীটের বারে একতরফা দাপাদাপি রেণুকার সঙ্গে ঝাপ্টিনপ্টি—এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে আপন মনেই আর এক বার হাসল।

শশাঙ্ক দেখল তার পা থেকে মাথা অবধি অন্ধকার আলকাতরার মতন সেঁটে আছে। একটা আরসোলা তার গা চাটল বলে সে একবার হাত ছুঁড়ল, একবার পা-ও। তারপর হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে স্বল্প পরিসর নরম সোফায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

ঘুম এসে যাচ্ছিল শশাঙ্কর।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

তিন

দু'কান আওড়াবার পর খানিকক্ষণ চললো ডুপ্‌কি মৃদংগের তাল মেলানো। বোধ হয় একেই বলে আসর জমানো। ডুপ্‌কিতে যে এতরকমের বোল ফোটানো যায়, আগে জানা ছিল না। তাও ওই শ্রীহস্তে। আঙুল তো নয়, যেন পেটা লোহার ডাণ্ডা। বোধ হয় ঘা দিলে পাথর ভাঙে। আর ডুপ্‌কির চামড়া তো সামান্য। কিন্তু সামান্য ও পলকা মিহি চামড়াখানি দেখছি গোদা আঙুলের প্রেমে মজেছে। একবার তাব দেখ।

তা হবে। কাঁটা গাছে ফুল ফোটে। তার রূপ দেখে মরি, গন্ধে ভোমরা হতে সাধ। এই বিকট কিম্ভূত পাথরের চাংড়া। দেখ গিয়ে, তার গায়ে কেমন হরেক রঙে সুন্দরী ফুল ফুটে আছে। কার রসের ধারা কোন বিজনে বহে, কে জানে। অধর মাঝি-মামুদগাজী, গাজীর হাত-পলকা ডুপ্‌কি, কাঁটা গাছ রূপের ফুল, পাথর চাংড়া-সুন্দরী ফুল, এদের মিলজুলের রসের ধারা কোন বিজনে বহে, কে জানে। কিন্তু গাজী বাবুকে কেন বিপদে ফেললে। গ্রাম জুড়ে সে তার আসর বসাক। বাবু থাক তার আসরে। গাজী আছে মহাপ্রাণীর ধান্দায়, মুরশেদের নামের মজদুরি করবে সে। বাবুর তো কোন খোঁজই জানা নেই। বাবুর বরং সেই জানাতেই যাওয়া ভাল ছিল। ভাল ছিল আরো এক কারণে। গাজী তো দু হাত তুলে বাজাচ্ছে, মাথা নিচু, চোখ বোজা। মাঝে মাঝে পিছনের বাবরিতে ঝটকা লাগছে। এদিকে শ্রোতার দল বাবুর দিক থেকে চোখ সরাতে পারে না। বাবুর রূপ দেখে নয়। বাবু কে, বাড়ি কোথায়, গাজী কেন গান শোনাতে চায়, এখানে কেন। ঘুরে ফিরে, চোখে চোখে সেই এক কথা। নৌকাতে যেমন গাজীর ছিল।

কিন্তু তার আগে এদিকে শোন, গাজী কেমন তাল ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে শিরদাঁড়ার কাছে কোথায় একটা তাল অনুভব করছিলাম। ওদিকে বটতলায় একজনের কোমরে দোলানি লেগে গিয়েছে। আমার কোমর দোলেনি। পায়ের আঙুলে তাল শুরু হয়েছে। ভিতর ছেড়া তাল লেগেছে। সব অংগ ফাঁকি দিলেও, পায়ের আঙুল মানেনি। তারপরেই আকাশের দিকে মুখ করে, গাজী সুর করে হাঁক দিল, 'ওহে দেল আমারে বলে দাও না...।'

ইতিমধ্যে আসরে অনেক শ্রোতা জুটে গিয়েছে। অধিকাংশই এল ছুটে। তারা কেউ দিগম্বর, কেউ দিগম্বরী। ভিড়ের মাঝে এসে পড়ে, তখন হাত চাপা দিয়ে লজ্জা ঢাকাঢাকি। বোধ হয়, ওদিকে খেলাঘরের ভাত ফুটে যায়। ছেলের বিয়ে আটকে থাকে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার মুখেই ডুপকি মৃদংগের ডাক পড়েছে। কচি কচি হাতে পায়ে মুখে

রাজ্যের ধুলো কাদা। তবে সকলেরই শরীর একেবারে হাট করে খোলা নয়। কারুর কারুর ফ্রক ইজের জামা, মার পাঁচ-হাতী ডুরে শাড়ি জড়ানো পাকা গিন্নীটিও আছে। তাদের সঙ্গে বড়রা এল হেঁটে হেঁটে। আঃ ছাওয়ালগুলোনে সবোত্ত জানে না। বটতলায় গাজী মামুদের আসর। এই-ই সব নয়। আসর আছে আরো। একটু চোখ তুলে দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওই যে, বেড়ার ফাঁকে, দাওয়ার নিচে, গাছগাছালির আড়ালে, ডাগরীদের চোখ যদি বা দেখে থাক, ঘোমটা সরতে দেখা যায়নি। ওইরকম কেরামতি। নজর যদি বা চলে, আসল ভাঙতে পারবে না। তার মানে, কেবল খেলাঘরের ঘরকন্নাতেই বেরাজ পড়েনি। গেরস্থের ঘরকন্না এখন মামুদগাজীর লুটের মাল। পড়শিনীদের ঘোমটার ফাঁকে চোখের ঝিলিক হাসির ছটা দেখেই বোঝা যায়, ঘরকন্নার দম ফাঁপরে, গাজী পেড়ে এনেছে নীল আকাশ। গায়ে দিয়েছে এই প্রথম শীতের বাতাস। গাজী বৃন্দাবনের কালা নাকি।

না, মুরশেদ নামের মজুরা। তার চড়া গলায় তখন একটু চাপ লেগেছে। তাল মিলিয়ে গাইছে,

এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই।
যার তরে মন খেদে প্রাণো কান্দে সম্বোদাই॥
ওহে দেল-ল্-ল্-ল্'

গান থামিয়ে তাল দিতে দিতেই, হাঁক দেয়, 'কেউ যদি জানেন, তর বলি দ্যান।'

দেল মুরশেদ নয়, বটগাছের তলায় যদি কেউ জানেন, গাজীর মনের মানুষ কোথায়, তা হলে বলে দিন। কিন্তু প্রস্তাবনায় ছিল, 'গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার।' এ গান যে সে গান নয়, তা বোঝা যায়। বোধ হয়, সেটা ছিল তার গৌরচন্দ্রিকা। তাল দিতে দিতে গান ভেজেছে আলাদা। তার কথা শুনে কেউ কেউ হাসে। গাজী আমার দিকে চেয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। তাতে আবার একটু ধন্দ ভাবের ভুরুর কাঁপন। গাজী যেন মন-কাজী। যেন আমাকে পুছ্ করে, 'বাবু কি জানেন?'

জানি না কিছুই। কিন্তু ফাটা চৌচির মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে ভুলে যাই। কেন, ও মুখ এই সকালের নীল আকাশ না ইছামতীর আরশী জল। কিসের খোঁজে বেরুনো, সেই কথাটাও ভুলিয়ে দেয় যেন। ওর আরশিতে কি আমাকে দেখে।

ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে যায়,

'যার তরেতে মন ভুলেছে
আমারে বলবে কে সে কোথা আছে।
তারে না দেখে যে হিয়া ফাটে
সদা মন তাপে জ্বলে যাই।
মনের মানুষ কোথা পাই।
ওহে দেল্...'

গাজী আলখাল্লা উড়িয়ে, মারে তিন চার পাক। গানের শেষে ডুপ্‌কি ঘুংগুর বেজে ওঠে জোরে। তারপরে দেখ, গাজীর নিজের কোমর দোলানি। কিন্তু মুরশেদ, কত জমানার, কত মুলুকের ধুলো যে জমিয়ে রেখেছে আলখাল্লায়, তার হিসাব কে রাখে। শহর হলে বলা যেত, ছ্যাকরা মোটর চলে গেল।

আবার গান,
'তারে দেখা পাবার আশে,
কত করি খুঁজি বেড়াই দেশে বিদেশে।
দেখি, কতখানে কত জনে,
(দেল্) তার দেখা না পাই।
যারে পুছি তার কথা রে,
ঘোলায় পড়ে সে জন ঘোরে, বলতে নারে।
বলে আমার প্রাণ জুড়াবে,
এমন ব্যথার ব্যথী কেহ নাই।
এখন, মনের মানুষ কোথা পাই।
ওহে দেল্...।'

এবার গানের শেষে আর পাক মারা নয়। গাজী যেন মাতাল হয়েছে। টলে টলে বাজায়, গান নতুন করে ধরে। গাজী তো তবু মাতাল, টলে চলে। কিন্তু শ্রোতার হাল তার বেহন্দ। ইছামতী পেরিয়ে, ইটিণ্ডার বটতলাতে সে বুঁদ। ভাবে, এমন গান কারা বাঁধে, কেন বাঁধে, কথাগুলো পায় কোথায়। তাদের প্রাণের ভিতর কী আছে। যারেক কি উঁকি দিয়ে দেখা যায় না। হেসে বাঁধে, না কেঁদে বাঁধে, একটু দেখতে ইচ্ছা করে। একটু দেখতে ইচ্ছা করে, কার জন্যে মন-খেদে প্রাণো কান্দে হিয়া ফাটে মন তাপে জ্বলে যায়। একটু দেখতে ইচ্ছা করে, চিনি কি না-চিনি। রূপ কেমন।

রূপ তখন হাত বাড়ালো ডুপ্‌কিতে। গান শেষ। সে কোথায়, বলতে যখন পারলেন না, এবার যা পারেন, তা দিয়ে দিন। যে গদিতে বসেছে, তার মানই বড়। নয়া হিসাবে পুরো দশ পয়সা, নেমে এসে ডুপ্‌কিতে ফেলে। ইতিমধ্যে কচি-কাঁচাগুলো সব ছুটতে আরম্ভ করেছে। বাড়ি থেকে সাজানো সিধে এনে ঢেলে দিয়ে যায় ঝোলায়। গাজী তখন আমার পাশে। সাধ্যে যা কুলায়, পকেট থেকে তুলে দিলাম ডুপ্‌কিতে। বললাম, 'ভাল লাগল বেশ। কার গান?'

মামুদ গাজীর ফাটা চৌচির মুখে তখন ঘামের দয়ানি। হাত উল্টে বলল, 'তা জানি না বাবু। কার কখন আজান লেগেছিল, কে জানে। যার লেগেছিল, সে-ই ডাক ছেড়েছে।'

তা বটে। ভিতর যখন ডাক দিয়েছে, তখন নামের ভনিতা মনে থাকে না। সে ডেকে খালাস, যে শোনে সে শোনে। কিন্তু কেতাবী ধাঁচের একটা মন বোঝানি আছে, নাম পেলে সে খুশী হয়। বললাম, 'চলি।'

গাজীর চোখ ফেরাবার সময় হল না। সে তখন নিচু হয়ে ঝোলা ভরতে ব্যস্ত। আবার সেই চোখে চোখে পরিচয় কার্যকারণের অনু-সন্ধিৎসা। পুবে হাঁটা ধরি। বটের ছায়ায়, একটু যেন শীত-শীতই করছিল। ছায়ার বাইরে রোদ লাগতেই তাপের আমেজ লাগে। কিন্তু দেখ, গাছের পাতার বোঁটায় বোঁটায় শীতের হাসা। রস নিয়ে যায়, পাতা ঝরিয়ে দেয়। অথচ বোল মুকুলের পাখিটা কোথায় বসে এখনো ডেকে চলেছে, কুহু কুহু। ওর কি সময়ের বোধ নেই। ঋতুর হিসাবে ও পেছিয়ে পড়েছে, নাকি তাড়া লেগেছে আগেই। এই অসময়ে কাকে ডাকছে এখন। সাড়া পাবে তো। কিংবা ইটিণ্ডায় ওর মৌরসীপাট্টা, সালতামামী ব্যবস্থা আছে।

যার সম্পর্কে এত চিন্তা, সে থেকে থেকে ডেকে চলেছে। যে চিন্তা করে, সে নিজে মনেই হাসে। তবে এটা ঠিক, ওর ডাকে তেমন ফুর্তি নেই। পুচ্ছ নাচানো ঝঙ্কা নেই। এও যেন সেই মন খেদে প্রাণো কান্দে অবস্থা। আর বাদবাকীদের পিক্ পিক্ কিচির কিচির শুনে বোঝা যায়, ত... এখানকার গাছগাছালির ঝোপঝাড়ের আ... বাসিন্দা। লোকে বলে ওদের বুলবুলি অ... টুনটুনি, শালিক চড়ুই, দোয়েল শ্যামা। ও... নিজেদের কী বলে, কে জানে।

একটা বুড়ো মুচকুন্দ চাঁপার প... বেঁকতেই প্রলয় হাঁক, কক্ কক্ ক... ধবধবে সাদা, মাথায় লাল তাজ, আর চিবু... লাল নয়, সব কাঁপিয়ে মোরগ দিল ছ... মুচকুন্দ চাঁপার গোড়ার তখনো ... আঁচড়ানোর দাগ। বাদশা মহাপ্রাণীর ধা... ছিলেন। আর বেয়াদপ প্রাণীটার হ... সাড়ায় চমক লেগেছে, ভয়ও পেয়েছে। ... কক্‌ককানির সঙ্গে সঙ্গেই কাছেই ঝন... করে শব্দ। অবাক হবার অবকাশ ... সামনে পুকুর। ও-পারের পিটুলির ছা... ঘাটলায়, কে যেন হকচকিয়ে ঘোমটা টা... আর টানতে গিয়ে, মুখ ঢাকা পড়ে ... কিন্তু অচেনা পুরুষের চোখে, গোটা পিঠ-খানি উদাস। পায়ের কাছে বাসনের পাঁজা।

সহবতে চল। চোখ ফেরাও, বউ বড় লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু খিড়কী দিয়ে যাচ্ছি, না সদর দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা তো একটাই। কোন ঘোমটা খোলা নিরালা অবকাশে যে হানা দেবার পথ ধরেছি, তা বুঝতে পারি নি। হবে হয়তো, এ ঘাট সদরেই পড়েছে। এরকম হয়।

পুকুর পেরিয়ে আবার একটা বাঁক। একটু দূরেই ঝাড়ালো তেঁতুল গাছটার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, যত দূরে জমিন, তত দূরে আশমান। জমির রঙ পাশ্টেছে। আকাশ রোদে নীলে মাখামাখি। জনমুনিষও চোখে পড়ে কয়েকজন। মাঠে ধান কাটা শুরু হয়েছে। আর এ সময়েই, কানের কাছে শোনা গেল, 'সবাই জিগেসা করে, গাজী বাবু আনছে কোত্থিকে।'

পাশ ফিরতেই মামুদ গাজী। বাঁ হাতে ডুপ্‌কি। ডান হাতে মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে মুখ মোছা হচ্ছে। কিছু জিজ্ঞে

করবার আগেই আবার শোনা গেল হাসি। তারপরে কথা, 'আমি বলি, আমি আনন্দ কোত্থেকে। বাবু আপনার মনে বেরয়ে পড়েছেন।'

বললেই হয়, 'তাই বুঝি।'

মাথার আবার পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'লোকের যত কথা। তা বাবু, ইদিকে কোথায় যাবেন।'

বললাম, 'সোজা।'

'সোজা!' যেন এমন অর্বাচীন কথা আর শোনা যায় নি। গাজী খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে মরে গেল।

বলল, 'সোজা কোথায় যাবেন বাবু। সোজা কি যাবার বো আছে?'

গাজীর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি চকচকে চোখ দুটিতে রহস্যের আমেজ। বললাম, 'কেন, এই তো পথ রয়েছে, মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে।'

গাজী বলল, 'কত দূর। মাঠ পার হলিই তো বডার। গিয়ে দেখবেন, ডাকিনীর মাঠ, এপারে পুলিস, ওপারে পুলিস।'

আবার সেই বর্ডার। আকাশের রোদ আমার মুখে ছায়া হয়ে ওঠে। খাকী রঙ, শিরস্ত্রাণ আর ডাকিনীর মাঠ দেখবার ইচ্ছা নেই একটু। কিন্তু মাঝখানের মাঠের নাম ডাকিনীর মাঠ কে রাখল। এমন অব্যর্থ নাম তো হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাকিনীর মাঠ বলে নাকি ওটাকে।'

গাজী ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'ওই হল আর কি, একটা কথার কথা। তা বাবু, কম করি মেয়েছেলে আর ব্যাটাছেলে মিলিয়ে, গুটি-কয়েক ওই মাঠে মরেছে।'

'মরেছে?'

'মরবে না? গুড়ুম-গাড়ুম গুলি মারলে বাঁচে কে?'

'কারা মেরেছে?'

'ওদিক থেকে এলি, ওদিককার সেপাইরা, ইদিক থেকে হলি, ইদিককার। কী অধম্মের বেড়াজাল দ্যাখেন।'

তাই গাজী নিজেই মাঠকে বলে ডাকিনীর মাঠ। কেতাবীতে বোধ হয় বলতে হবে, নো ম্যানস ল্যান্ড। তেঁতুল গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ডাকিনীর মাঠে যাব না, দেখবও না। তার চেয়ে বটের তলায়, গাজীর গান শোনা ছিল ভাল। গাজীর গানের পর, পায়ে যে রকম ছোটার তাল লেগেছিল, সে তাল দেখছি, বে-তালের ছুট। তার সঙ্গে আকাশ জোড়া নীলিমা, আর ভূমিতে নুয়ে পড়া সোনালীতে স্বপ্নের চমক। এই বেরিয়ে পড়া সকালে অধর্মের বেড়াজাল দেখতে যাব না। ওখানে শুধু সীমানা নয়। ওখানে মনের কল অচেনা, তাই মানুষ মারার কল করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঁকা পথে কোথায় যাওয়া যায়?'

গাজী যেন লজ্জা পেয়ে হাসে। বলে, 'বাবুর কী কথা। গেরামেই যান।'

এই সংবাদ দিয়েই আবার বলে, 'আমি একটা মতলব দেব বাবু?'

জয় মুরশেদ, এখন সেটাই বাকী আছে। কিন্তু ব্যাপারখানা বুঝি না। গাজী নামের মজদুরি নিয়ে কেন গ্রামান্তরে যায় না। বাবুর পিছনে দৌড়ায় কেন। তার মহা-প্রাণীর ধান্দা কি আজ এক আসরেই শেষ।

জিজ্ঞেস করেই বা লাভ কী। ইছামতীর তলার স্রোত কোন বায়ে বহে, তাই দেখা যাক। বললাম, 'কী বল তো।'

'আপনার থল জলের ভাবনা নাই তো?'

সে আবার কী। তাই যদি থাকবে, তবে

াবু ইচ্ছামতী পাড়ি দিল কেন। পথ খোঁজে কন। কিন্তু যদি, থল জলের ভাবনা নেই লে, গাজী সাগর দেখিয়ে দেয়, কিংবা ক্ষিণরায়ের ভিটায়। সেই সুন্দরবনে পাক দিয়ে আসতে বলে. তবেই তো দিক্কত্। বিপদ হয়তো আছে। আপাতত সে ভাবনা য়। কিসের খোঁজে ফেরা, তার নাম জানি া বটে, পাঠশালার পাঠ আমার জীবনে মেটে নি। সে পাঠশালার কত রূপ, কত নিয়ম, তার ব্যাখ্যা মহাভারত। সেখানে সবাই কাজের মানুষ। সবাই ঘরের মানুষ। সেখানে জীবনযাপনের জানালায় জানালায় বাতি জ্বালানো। সেখানে সবাই ঘাড় নিচু করে পাঠ মুখস্থে ব্যস্ত। সেখানটাকে ফাঁকি দিয়ে জীবনব্যাপী খুঁজে ফেরার ছোটা। তবু ফিরতে হয় সেখানে। ফাঁকির দেনা মেটাতে হয় কড়ায় গণ্ডায়। সে যাকে অকাজ বলেছে, সেই অকাজের দিগন্তকে একেবারে হাট করে খুলে দেয় নি। অতএব, থল জলের ভাবনা নেই, এক কথাতে বলা যায় না। বলি, 'থাকলেও শুনি, না থাকলেও শুনি।'

গাজী আবার জিজ্ঞেস করে, 'গোটা দিন-খানি বাবুর হাতে আছে তো।'

'তা আছে।'

'তর বাব্, এক কাজ করেন। যেমনে বখন পাড়িছেন, হাসনাবাদে চলি যান?'

'হাসনাবাদে?'

'আজ্ঞা। নদী পেরয়ে, বসিরহাট থেকে মটর ধরে হাসনাবাদে যান। হাসনাবাদ থিকে চলি যান মটর লণ্ডে করে।'

'কোথায়?'

'ফেরার গোস্তর রেখে, যদ্দ্র খ্শি। ফেরত লণ্ড পাবেন। নয় তো, যেখানে হোক নেমে যাবেন। ন্যাজাট তক্ মটর পাবেন। কলকাতায় যাবার গাড়ি পেয়ে যাবেন।'

কথাটা মন্দ লাগল না। ফেরার সময় মেপে, লণ্ডে করে যত দ্র খ্শি, তাই বা মন্দ কী। চোখ ফেরালেই তো সব অচেনা। যত দ্রেই চাই। দেখে আসি, যতটুকু দেখা যায়। দেখে আসি, কত ঘাট, কত মান্ষ। দেখে আসি, আমার বাঁধা সময়ের সীমায়, প্রকৃতি কী সাজে সেজে আছে। তব্ গাজীর প্রস্তাবে অবাক না হয়ে পারি না। তার ম্রশেদ নামের মজদ্রিতে, এমন মতলব দেবার জায়গা কোথায়। পাখি নাকি। সব ঘাটেই ঘোরা আছে বোধ হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদিকে গেছ কখনো?'

গাজী হাসে। বলে, 'না গেলি কি আর বলতি পারি বাব্। দক্ষিণের কিছ্ বাকী নাই। তা, মনটা বলে, বাব্র ওদিকটার ভাল লাগবে। তর বাব্, একটা কথা বলি, ফাসট্-কেলাসের টিকিট নেবেন। সারেঙের ঘরে পাশে বসে যাবেন, সব দেখতি দেখতি যাবেন।'

গাজীর চোখও দেখছি সজাগ। কিন্তু ফাসট্ কেলাসে বসার মজা সে জানে কেমন করে। ফেরার পথ ধরে, শেষ কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'ফাসট্ কেলাসে গেছ নাকি?'

গাজী হা হা করে হেসে বলে, 'তোবা তোবা ম্রশেদ, বাব্র কথা শোন। টিকিট কাটার ম্রোদ নাই, ফাসট্ কেলাসে যাব কি বাব্।'

'তবে কি বিনা টিকেটে?'

'তর? সারেঙকে দ্খানি গান শোনাই, তারপরে তার পায়ের কাছে বসি চলে যাওয়া।'

যাক, নামের মজদ্রিটা আছে। কিন্তু গাজী এখনো [illegible]। [illegible] যাবার রাস্তাও ঘাটে ফেরার পথেই নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'পারাপারের নৌকো পাব?'

'চলেন দেখি, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

চলেন দেখির মানেটা কী। গাজী আমার ওপার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে চলেছে নাকি। তাকিয়ে দেখি, তার মাথা নিচু, নজর পথের দিকে। গোঁফ দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ভাবের স্রোত। দেখে কিছ্ই বোঝা যায় না। কেবল গ্নগ্নানি শোনা যায়, আর তারই তালে ঘাড় দোলানি, 'আশমান জোড়া ফকির রে ভাই, জমিন জোড়া কাঁথা। এসব ফকির মলে পরে, তার কবর হবে কোথা।'...

হঠাৎ গাজীর এ চিন্তা কেন জানি না। কিন্তু তার তালের খেই ধরতে পারছি না। আশমান জোড়া ফকির কে, জমিন জোড়া কাঁথা কার, আর কোন ফকিরের কবরের ভূঁই নিয়ে তার ভাবনা, সকলই রহস্যময়। তার ভাব-সাব ব্যবহার কথাবার্তার মতই রহস্য-ময়। এখন এর উদ্ধার কোন মঃ পোয়ারো বা ব্যোমকেশ গোয়েন্দা করতে পারবেন, কে জানে।

ইতিমধ্যে সেই ইছামতী আবার দেখা দিয়েছে। যে ঘাট দিয়ে এসেছিলাম, সেই ঘাটেই ফেরা। দেখি, অধর মাঝির নৌকা বাঁধা খ্টিতে। মাঝি বেপাত্তা। গাজী বলে ওঠে, 'জয় ম্রশেদ, অদরদা এ পারেতেই আছে দেখছি। গেল কোথায়?'

বলেই গলা ফাটিয়ে হাঁক, 'অদরদা—! গেলে কোথায়।'

সাড়া নেই শব্দ নেই, বাঁ দিকের জলে ডোবানো গেমো গাছের ডাল ধরে নেমে এল অধর মাঝি। পরনের ছোট কাপড়টা সাব্যস্ত করতে করতে এল। গাজী বলল, 'বাব্ হাসনাবাদে যাবেন, পার করে দ্যাও।'

এমন ভাববার কোন কারণ নেই, অধর মাঝি তার ঢ্লঢ্ল্ চোখ দ্টিতে অবাক হয়ে তাকাবে। অবাক হয়ে দ্টো কথা জিজ্ঞেস করবে। সে গিয়ে তার খ্টিতে হাত দিল। উঠব কি উঠব না ভাবছি। মাঝির অন্মতি পাওয়া যায় নি তখনো। গাজীই তাড়া দিল, 'ওঠেন বাব্।'

আমি উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গাজীও উঠে এল। আমার বলবার কিছ্ নেই। আসবার সময় যেমন বসেছিলাম, তেমনি বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিও ওপার চললে?'

অধর নৌকা ঠেলে দিয়ে উঠল। গাজী বলল, 'হ্যাঁ। ম্রশেদে যখন মিলায়ে দিয়েছেন, আজ আপনার সঙ্গই ধরি।'

আমার সঙ্গ! গাজীর ম্খের দিকে ফিরে তাকাই। কথাটার অর্থ সঠিক হ্দয়ঙ্গম করতে পারলাম না। গাজী দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসি ফ্টিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'একা একা যাবেন, তাই চলেন একট্ ঘ্রে আসি। মটরের ভাড়াটা দিবেন বাব্, আর যদি হরিপদ সারেঙ না থাকে, তা হলি লণ্ডের ভাড়াটা—।'

কথা শেষ না করেই সান্ত্বনা দিল, 'বেশী লাগবে না বাবু, আমাকে নিচের ঘরের টিকিট কেটে দিবেন, তা হলিই হবে।'

তার মানে কী। এত দিন জানা ছিল, এক-মাত্র মাতুলালয়েই এরকম আবদার করা যায়। মোটর ভাড়া, লঞ্চের ভাড়া দিয়ে কে তাকে আমার একলাকে দোকলা করতে বলেছে। বিরক্তিতে আমার মুখের বাক্যি সরে না। এদিকে দেখ, সঙ্গদাতা ইছামতীর জল দিয়ে দাড়ি সজুত করে, আর গুনগুনার, স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্ রে ক্যাপা, বেড়াস একা, চিনতে পারলি, ধরবি কী।'...

এ সবও আমাকেই বলা হচ্ছে কিনা কে জানে। আমি যদি স্বরূপের বাজার চিনব, তবে আর ছুটব কেন। কিন্তু গাজী আমাকে চেনাবে, ধরাবে, একাকিত্ব ঘোচাবে, তা আমি চাই নি। থাক, আমার সঙ্গ দরকার নেই। সে কথাটা বলব বলে মুখ খোলবার আগেই মুরশেদের শ্রীমুখ আবার খুলে গেল, 'কী রকম তাজ্জব কথা শোনেন বাবু, "কালার সঙ্গে বোবার কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয়।" কী মজার কথা দ্যাখেন দিকি। গানটা শুনেছেন বাবু?'

'না।'

বিরক্তিতে প্রায় ধিক্কার দিতে চাই। চাইলেই তো হয় না, তারপরে শোন, 'আবার বলে কি, "আর অন্ধ গিয়া রূপ নিহারে, তার মম্মো কথা বলব কী। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়। জ্যান্তে ধরতে গেলে হাবুডুবু খায়। সে মড়া নয় কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি।"

বলেই গাজী হে হে করে হেসে উঠল। কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। যদিও নজর নদীতে নেই, মন নেই আকাশে, কেবল পিত্তি বলে বস্তুটা তখন মাথায় গিয়ে জ্বলছে। এরা কি মানুষের মন মেজাজও বোঝে না।

বোধ হয় বোঝে বলেই বাবুকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে গলুইয়ের দিকে ফিরে বলে, 'বিত্তান্তটা বুইলে অদরদা?'

জানি, সে গুড়ে বালি। অধরকে তুমি ধরতে পারবে না। মাঝি কেবল পারাপার করে। তার বৈঠা ইছামতীর জলে ছপ্ছপ্ পড়ে। ওখানে রা ফোটানো মামুদ গাজীর কর্ম নয়।

কিন্তু ভাবনা শেষ হল না। তার আগেই অবাক হয়ে শুনি, অধর মাঝির মোটা গোঙানো গলা ইছামতীর বুক থেকে উঠছে, 'তা বলব কি স্বরূপ কীরূপ, হয় অপারূপ তোমার মনে। যেরূপ অটল হইয়ে অটলেরে নিরঞ্জনে।'

আরো অবাক হয়ে দেখি, আদুর গায়ে খড়ি ওঠা, ঢুলঢুলে চোখ অধর মাঝি যেন গোলাপী নেশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু বৈঠা থামায় না। গাজী তো আকাশ কাঁপিয়ে হাঁক, 'জয় মুরশেদ, জয় অদরদা। অই, কী শোনালে গো। তারপরেতে তবে শোন, "বিজলী মেঘের কোলে, যেরূপ ভাবেতে খ্যালে, সেও কিছু স্থায়ী বলে জ্ঞান হয় আমার মনে, আমি কোথায় খুঁজে ফিরি ত্রিভুবনে।"

এ যে দেখি, খাণ্ডলা ছড়ার মত, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়।' নাকি, 'কথা পড়ল সভার মাঝে, সব কথা তার গায়ে বাজে।' বৃত্তান্ত সেই রকম। গূঢ় ভাষার ভাবের কথা, বুঝহ যে জন। আমি শুনি এক, গাজী মাঝি আর এক রকমে চোখা-চোখি করে। আমার চোখ ফেরে না অধর মাঝির দিক থেকে। সে অধর, সে হিসাব করেছিলাম তার ভাব ভঙ্গি দেখে। এখন যে দেখি, এ আর এক মানুষ, গূঢ় মানুষ। চোরাকে চিনতে পারি নি।

কথা তাদের সেখানেই শেষ নয়, অধর মাঝি একবার গাজীর দিকে দেখে, আবার চোখ তোলে সেই দূরের আকাশে। তেমনি মোটা গোঙানো স্বরেই বলে, 'যখন চোক বুজে থাকি, তখন তার টুক দেখি। যেই খুলেছি চোক আর তারে দেখতে পাই নে। পরে আশমান জমিন খুঁজি—যদি কোন-খানে।'

গাজী দু হাত তুলে ডুগ্ডুগি বাজিয়ে দিল। জলে তরঙ্গ তুলে হাঁক দিল, 'অই, মরে যাই গো অদরদা। বড় জবর শোনালে।'

কথা শেষ হবার আগেই, নৌকা এসে পাড়ে ঠেকল। অধর মাঝির কথাতেই কান পেতে ছিলাম। নৌকার ধাক্কা লাগতে সংবিৎ ফিরল। অধর আগে নেমে গিয়ে খুঁটি পুঁতল মাটিতে। সংবিৎ ফিরতেই প্রথম মনে হল, ইছামতীতে কত জল ঠাহর পেলাম কী। দুটো পাগলের পাল্লায় পড়েছি কিনা বুঝতে পারি না। লোকটাকে দেখেছিলাম নির্বিকার। চোখে তার সবই নিরাকার যেন। এখন দেখছি, যমুনার মত, নদীর তলার বাঁকা স্রোত। মাঝির মুখের দিকে তাকিয়ে দু আনা পারানি দিলাম। ভেবেছিলাম, একবার বুঝি তাকাবে। কিন্তু পয়সা গুনে নিয়ে নৌকায় গিয়ে আবার জল সেঁচতে বসল।

অধর মাঝির কিছুই জানি না। তবু কালো ভাবলেশহীন মুখটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল, অধর মাঝি বোধ হয় একেবারে অধর নয়। জায়গাটা চিনতে না পারি, তবু কী একটা জায়গা যেন তার ভিতরে দেখা গেল। সেখানকার ঝলকটা চোখের জলের না হাসির, বুঝতে পারলাম না।

গাজীর তখন হাঁক, 'বাবু, গাড়ি এসে গেছে।'

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম। জায়গা পাবার আশা নেই। কিন্তু উঠতে না উঠতেই গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তার মধ্যেই গাজীর ত্রাহি চীৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে, 'মুরশেদের দোহাই, আমারে উঠতি দ্যান কনডারবাবু। ওই যে বাবু গাড়ির মধ্যি, উনি আমার পয়সা দিবেন।'

(ক্রমশ)

বর্তমান সংকট

এ বছর ফসল ভালো হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গ্রামগুলিতে ক্রয় ক্ষমতা কমে গেলে স্বভাবত ভোগদ্রব্য উৎপাদনের শিল্পগুলিকে চাহিদা সংকোচনের সম্মুখীন হতে হবে। অন্য দিকে, খাদ্য আমদানির জন্য আরো বেশি অর্থ সাহায্য করতে হওয়ায় উন্নয়ন বাজেটে টান পড়বে এবং ফলে মূলধন দ্রব্য উৎপাদনের শিল্পসমূহের বিকাশ ব্যাহত হবে।

শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমে

ভারতীয় শিল্পের ভিত্তিটাকে এখন আরো সম্প্রসারণের চাইতে দৃঢ় ও সংহত করার প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থায় ইস্পাতের কল ও ভারী বৈদ্যুতিক কারখানার মতো যে সব প্রকল্প কাজ এর আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে সেগুলি সম্পূর্ণ করতে মূলধন নিয়োগ লাগবে। সেই সঙ্গে, শিল্প ব্যবস্থায় যে সব ফাঁক আছে সেগুলি পূরণ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঐ সব ফাঁক দূর না করলে আমাদের ক্রমবর্ধমান আমদানির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকবে না। অবশিষ্ট মূলধন সার ও পতঙ্গনাশক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের মতো জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে।

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের পর যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কি রকম ফল দেবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। আমদানি উদার করার দরুন যদি শিল্পের কাঁচা মাল ও কলকব্জার যোগান বেড়ে যায় এবং উৎপাদন তথা রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটে তাহলে আর্থিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা নির্মাণ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি আরো ২৯টি শিল্পকে লাইসেন্স নেবার প্রয়োজন থেকে রেহাই দিয়েছে।

আবার খাদ্য সংকট

গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এক টানা খরা পশ্চিম ভারতের গুজরাট থেকে পূর্বের বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। তার চেয়ে খারাপ, মাটিতে আর্দ্রতার অভাব আগামী শস্য বপণ বিলম্বিত হচ্ছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, দেশে আবার ঘোর খাদ্য সংকট দেখা দেবে। এ বছর সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল দুটি হল বিহার ও উত্তর প্রদেশ, বিশেষ করে বিহার।

উদ্বেগের আরো কারণ হচ্ছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এবার ভারতকে ১৯৬৫-৬৬ সালের বছরে খাদ্যশস্য যোগান দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব নয় (গত বছরে যুক্তরাষ্ট্র পি এল ৪৮০-র অধীন ১ কোটি টন গম ও অন্যান্য শস্য আমাদের সরবরাহ করেছিল)। কাজে কাজেই, ভারতকে এখন কানাডা থেকে ১০ লক্ষ টন এবং অস্ট্রেলিয়া হতে একই পরিমাণ যত দূর সম্ভব সুবিধাজনক কড়ারে কিনতে হবে (কানাডার ক্ষেত্রে দাম দেবার মেয়াদ বাড়িয়ে কয়েক বছর করা হতে পারে)।

বাইরে থেকে গমের আমদানি অব্যাহত না থাকলে র‍্যাশনিং ব্যবস্থার অধীন ভোগের উচ্চ-চাপ বিশিষ্ট কয়েকটি এলাকায় খাদ্যশস্যের যোগান বজায় রাখা দুরূহ হতে পারে (জাতীয় আয়ের বণ্টন, শহরের প্রসার, খাবার অভ্যাসের পরিবর্তন—এ সবই দেশে খাদ্যের জন্য চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করছে)। ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে ভারতকে [illegible] [illegible] কষ্টে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হবে সেটা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া এখন অন্য উপায় নেই।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ, যা গত এপ্রিলে ২৮৯ কোটি টাকা ছিল (নতুন বিনিময় হারে), তা কমে গিয়ে নভেম্বরে ২৭৬ কোটি টাকায় ঠেকেছে। খরা ও রপ্তানির নিস্তেজ অবস্থা ছাড়াও অতীতের ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের উপর চাপ বেড়ে গেছে। ভরসার কথা, ভারতকে এ বছর যে ১ কোটি ডলার শোধ দিতে হতো, কানাডা ইতিমধ্যেই তার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাষীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

এত সবের মধ্যে আশার কথা এই যে, চাষীরা আজ পরিবর্তনের প্রতি তাদের কয়েক শতাব্দীর প্রতিকূল মনোভাব ঝেড়ে ফেলে কৃষির নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। সে সর্বত্র আরো সুবিধা চাইছে এবং তার উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম সংরক্ষিত হওয়ায় কৃষিকর্মে মূলধন নিয়োগ ও ঝুঁকি বহনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। বিশেষ করে, জমিতে সেবার আরো জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য চাষীরা আগের চাইতে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। এখন সরকার যদি এই সব সুবিধা (যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল তোলার মোটর পাম্প কেনার জন্য কর্জদান, কূপ নির্মাণের জন্য সিমেণ্ট) বা ব্যবস্থা করে দিতে পারে, তাহলে কৃষকরা নিজেরাই একর প্রতি শস্য উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হবে। তৃতীয় যোজনার শেষে কর্ষিত জমির শতকরা মাত্র ২০ ভাগের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশ এ সময় এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যখন সমস্যার সরল কোনো সমাধান সম্ভব নয়। (প্রসঙ্গত, নিছক অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে, আগের বছরের শতকরা ৭·৭-এর তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের বৈষয়িক অগ্রগতির হার ছিল শতকরা মাত্র ৩·৭।) শুধু দরিদ্র জনসাধারণ নয়, উচ্চবিত্ত শ্রেণী, এমন কি সরকারের এখন ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ভারতের জনগণ ধৈর্যে দেবতার মতো। বহুকাল ধরে তাদের দারিদ্র্য, অভাব বা বঞ্চনা সইতে হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বা রাজপুরুষদের সততা ও ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে তাদের আস্থা আছে, ততক্ষণ তারা প্রশাসন-ব্যবস্থায় শৈথিল্য, বিচ্যুতি ও বিলম্ব কিছুটা বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু তার পরে নয়।

শান্তিকুমার ঘোষ

গান্ধীজী ও লবণ-কর রদ

রাজবন্দীদের মুক্তি আদায় করে গান্ধীজী অতঃপর লবণের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। এক্ষেত্রে কিন্তু কার্যোদ্ধার তত সহজে হল না। তার কারণ ভাইসরয়, বিশেষ করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, জর্জ অ্যাবেলের মনোভাব এ ব্যাপারে ছিল খুবই অনমনীয়। ভারত সচিবের কাছেও এই নুনের ব্যাপারটা নেহাতই তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল; গান্ধীজী যে এর উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করছেন কেন, তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তা ছাড়া তিনি ভেবে দেখলেন, এটা এমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয় যে, এক্ষুনি এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে; মাস কয়েক বাদেই তো নূতন সরকার গঠিত হবে, এবং গান্ধীজীর শিষ্যরাই হবেন তার কর্ণধার; নুনের ব্যাপারে তাঁরাই যা-হয় সিদ্ধান্ত নেবেন। ভারত সচিবের চিন্তা মোটামুটি এই পথ ধরে এগোচ্ছিল। নিজেকে অতএব তিনি এর মধ্যে আর জড়াতে চাইলেন না। তখন ঠিক হল যে, ভাইসরয়কে গিয়ে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানাবার ভার আমাকেই নিতে হবে, এবং লবণ-কর তুলে দেবার ব্যাপারে তাঁকে রাজী করাবার চেষ্টা করতে হবে।

আমার তখন মনে হল যে, সরাসরি ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে কোনও লাভ নেই, তার আগে বরং তাঁর শাসন-পরিষদে যিনি অর্থনৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, এ ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতি আর সাহায্য পেলে ভাল হয়। ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদে অর্থনৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তখন সার আর্চিবল্ড রোল্যান্ড্স; লবণ-কর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও প্রত্যক্ষত তাঁরই হাতে। সার আর্চিবল্ড ইতিপূর্বে হোয়াইটহলে কাজ করেছেন; অসাধারণ কর্মদক্ষ মানুষ বলে তাঁর সুনাম ছিল। সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে এর আগে বার কয়েক দেখা হয়েছে আমার। তাঁর অমায়িক ব্যবহার আমার ভালও লেগেছে। কিন্তু সরকারী কোনও কাজকর্ম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনও আমার কথা হয়নি। গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল এই যে, স্বাধীনতার এই পূর্বমুহূর্তে, ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটেনের সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে, লবণ-কর প্রত্যাহার করতে হবে। ঠিক করলুম, এই প্রস্তাব সম্পর্কে সার আর্চিবল্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখব যে, ব্যাপারটাকে তিনি কীভাবে নেন। কথা বললুম, এবং—যা আমি আশা করিনি—দেখতে পেলুম যে, ব্যাপারটাকে তিনি খুবই ভাল মনে নিয়েছেন। লবণ-কর যে কেন তুলে দেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নানা যুক্তি দেখিয়ে আমি একটি 'নোট' তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা আমি সার আর্চিবল্ডের হাতে তুলে দিলাম। তার প্রথমেই ছিল র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের একটি উক্তির উদ্ধৃতি:

"লবণ-কর হচ্ছে একটা জুলুম এবং অত্যাচারের ব্যাপার; জনসাধারণ তা যদি বুঝতে পারে, তবে এই কর শুধুই অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। একটা মুনাফাবাজ কোমপানি যেভাবে দরিদ্র ভারতবর্ষকে শোষণ করত, সেই শোষণেরই জের চলেছে এই করের মধ্যে।"

কথাটার তাৎপর্য যে কী, সার আর্চিবল্ড তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন। নোট-এর ভিতর থেকে যে ক'টি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তার সারবত্তা তাঁর নজর এড়াল না। যথা, সরকারী লবণ-উৎপাদন-কেন্দ্রে (১৯৪৪-৪৫) প্রতি মণ লবণ উৎপাদনে যে ক্ষেত্রে চার আনা চার পাই খরচা পড়ে, সে ক্ষেত্রে দিল্লিতে প্রতিমণ লবণের পাইকারী দাম হচ্ছে তিন টাকা আট আনা চার পাই। তার থেকে আভ্যন্তর শুল্ক বাবদে যদি এক টাকা ন' আনা বাদ দেওয়া হয়, তা হলেও দেখা যাবে যে, উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে মণ-পিছু এক টাকা এগারো আনা নেওয়া হচ্ছে। এই অতিরিক্ত পরিমাণের হিসেব দাঁড়াচ্ছে উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে শতকরা প্রায় ৬২৩। কলকাতা-অঞ্চলে সেটাই দাঁড়াচ্ছে শতকরা ১৫৯২-এ। লবণের দামে কলকাতা আর দিল্লির মধ্যে এত পার্থক্যেরই বা কারণ কী? কারণ কি এই নয় যে, লিভারপুল থেকে আমদানি-করা লবণের প্রায় সবটাই খালাস করা হয় কলকাতা বন্দরে, এবং বাংলাদেশেই তার সবটা বিক্রি হয়ে যায়? এই অস্বাভাবিক আমদানির খরচা পোষাবার জন্যে ১০ কোটি লোককে করভার বহন করতে হবে কেন? লবণের ব্যাপারে সরকার যে একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধা ভোগ করেন, এই হচ্ছে তার ভয়ংকর স্বরূপ। কিনা

লাইসেন্‌সে, কোনও কর না দিয়ে, লবণ বানাবার অধিকার যদি বাংলাদেশের মানুষদের থাকত, তাহলে মণপিছু দু-এক আনা মাত্র ব্যয় করেই তারা তাদের প্রয়োজন-মত সমস্ত লবণ তৈরি করে নিতে পারত। সার আর্চিবল্‌ডের হাতে যে নোট্‌ তুলে দিয়েছিলাম আমি, এইভাবেই তাতে যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছিল। ব্যাপারটা তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এবং আমাকে বললেন যে, সত্যি বলতে কী, লবণ-করের প্রশ্নটা ইতিপূর্বে তিনি ভেবে দেখেন নি। যাই হোক, গান্ধীজীর যুক্তি তাঁর ভাল লেগেছে; ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে গোটা ব্যাপারটা তাঁর সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেও প্রস্তুত।

৫ই এপরিল তারিখে সার আর্চিবলডের কাছে লবণ-কর নিয়ে দরবার করতে গিয়েছিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যায় তাঁকে আমি ভাঙ্গী কলোনিতে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে গেলাম। পরনে ডিনারের পোশাক; নয়াদিল্লিরই কোথাও সেদিন তাঁর ডিনার খেতে যাবার কথা ছিল। সেই পোশাকে গান্ধীজীর ঘরে ঢুকে সার আর্চিবল্‌ড তো মহা অস্বস্তিভরে একটি চেয়ারে বসলেন।

অশান্তির প্রধান কারণ, গান্ধীজী তাঁর অভ্যাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মেঝের উপরেই বসে ছিলেন। যে অন্যায় করের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে তিনি সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সে সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর সমস্ত বক্তব্য স্যার আর্চিবল্ডকে বুঝিয়ে বললেন; স্যার আর্চিবল্ডও মনোযোগ সহকারে সব শুনে যাচ্ছিলেন। বস্তুত গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, ডিনারের কথাটা তাঁর মনেই ছিল না। আর-একটু হলেই তাঁর ডিনার সেদিন ফসকে যেত। যাই হোক, বিদায় নেবার সময়ে স্যার আর্চিবল্ড বললেন যে, মাত্র তিন মাস আগেও যদি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হত, চলতি বছরের বাজেট থেকে তা হলে লবণ-করকে তিনি বাদ দিয়ে দিতেন। ওয়েল্‌স-এর এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলে খুবই ভাল লেগেছিল গান্ধীজীর। স্যার আর্চিবল্ড বিদায় নেবার পরে তিনি মন্তব্য করলেন যে, ভারতবর্ষে যে সব ব্রিটনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ইনিই তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় দক্ষতম ব্যক্তি। প্রথমজন কে, গান্ধীজীকে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি জবাব দিলেন, "ম্যালকম হেলি"।

তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, স্যার আর্চিবল্ডের সঙ্গে এই যে আমাদের কথা-বার্তা হচ্ছে, এর ফলে তিনি ভাইসরয় এবং যে আই সি এস চক্র তখন ভারত শাসন করতেন, তাঁদের বিষ-নজরে পড়বেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে যেদিন তাঁর কথা হয়, তার পরদিন সকালেই স্যার আর্চিবল্ড রোল্যান্ড্‌স্ আমাকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠালেন। এবং আমার সামনেই কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের সদস্যের নামে একখানা চিঠি ডিকটেট করলেন। চিঠিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, লবণ-কর তুলে দেবার জন্য যেন তিনি অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। স্যার আর্চিবল্ড মনঃস্থির করেছিলেন যে, লবণ-কর তিনি রাখবেন না। চিঠির একখানা নকল তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এখানে সেটি উদ্ধৃত হলঃ

ফিনান্‌স মেম্‌বার অব কাউনসিল,
নয়াদিল্লি,
৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় বিগ্‌গো,

লবণ-রাজস্ব-কমিশনারদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে তুমি যদি এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করো, যার ফলে লবণ-কর তুলে দেওয়া যাবে, তা হলে কৃতজ্ঞ হব। বলাই বাহুল্য, লবণ উৎপাদন আর বিক্রয়ের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এখন আমাদের কী ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, সেটাও আমি জানতে চাই।

আমার ধারণা, দালালদের যদি আমরা বাদ দিতে পারি, তা হলে লবণ-কর তুলে দিলেও এমন দামে লবণ বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে যাতে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাবে না। মোটামুটি এই রকমের ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করলে যে গুদাম-বাবদে আমাদের খরচা বেশ কিছু বাড়বে, তা আমি জানি; কিন্তু মূলধন হিসেবে সেটা ব্যয় করতে কোনও অসুবিধে হবে না। পরিকল্পনার কাজে হাত দেবার আগে যদি ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও তো ভাল, সানন্দে আমি আলোচনা করব।

চিরকালের জন্য তোমার
(স্বাঃ) আর্চি রোল্যান্ড্‌স।"

এইচ গ্রীনফিল্ড্, এসকোয়্যার, সি-আই-ই,
মেম্‌বার, সেনট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ

এই ব্রিটিশ রাজকর্মচারী অতি দ্রুত যে সাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন, গান্ধীজী তাতে খুশী হয়েছিলেন। তবে ভাইসরয়কে না জানিয়েই যে আর্চি রোল্যান্ড্‌স এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা তিনি জানতেন না। উৎসাহবশত লবণ-কর সম্পর্কে তিনি ভাইসরয়কে একখানি চিঠি লিখে দিলেন। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে, ফিনান্‌স মেম্‌বারের কাজের এতে আরও সুবিধে হবে। চিঠিখানি নিয়ে আমি হিজ একসেলেন্‌সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটলাম। সেই চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

৩রা তারিখে ক্যাবিনেট-সদস্যদের সঙ্গে যে দুটি বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল, সেই সম্পর্কেই এই চিঠি লিখছি।

লবণ-কর সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য স্যার্ আর্চিবল্ড রোল্যানড্‌স্ গতকাল রাত্রে আমার কাছে এসেছিলেন। আলোচনার শেষে তিনি অকপটে আমাকে জানান যে, মাস তিনেক আগে যদি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হত, তা হলে এই কর তিনি তুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে আমার আর যা যা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে, এখানে আর তার উল্লেখ করছি না। তার কারণ, যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই চিঠি লিখতে চাই। শ্রীসুধীর ঘোষকে তিনি ভালই চেনেন। এ বিষয়ে শ্রী ঘোষের সঙ্গে তাঁর আরও কিছু কথা হয়েছে। স্যার্ আর্চিবল্ড রোল্যানড্‌স্ এখন নাকি ভাবছেন যে, মাস তিনেকের মধ্যেই এই কর তিনি তুলে দেবেন। তবে আমি জানি যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন যদি না মেলে তা হলে বিশেষ একজন রাজকর্মচারীর পক্ষে—তা তিনি যতই ক্ষমতাশালী কিংবা দক্ষ হোন—কিছুই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই মানবিক কর্মে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট-সদস্যদের যা আমি বলেছিলাম, সেই বিবেচনাটাই আরও বড়।

সেটা হচ্ছে এই যে, যথাসম্ভব শুভেচ্ছাময় এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্ভব ঘটাতে হবে, দূরতম গ্রামের দরিদ্রতম গ্রামবাসীও যার স্পর্শ একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারে। আপনার যদি ইচ্ছে আর সময় থাকে, তা হলে সুধীরবাবুর কাছেই এ বিষয়ে আপনি আরও খবর জানতে পারবেন। এই চিঠি তিনিই নিয়ে যাচ্ছেন।

রাজবন্দীদের সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না। তার কারণ, শুনতে পেলাম যে, তাঁদের মুক্তি আসন্ন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী

হিজ একসেলেন্সি দি ভাইসরয়

লর্ড পেথিক-লরেন্স কিংবা স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে গিয়ে সব কথা বেশ সহজে বলতে পেরেছি। কিন্তু ভাইসরয়ের কাছে সেটা সম্ভব হল না। এমনিতেই তিনি সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু অতিশয় স্বল্পবাক। ভাইসরয় ভবনের প্রশস্ত পাঠকক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। সৌজন্যসহকারে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি আসন গ্রহণ করলাম, কিন্তু প্রথমেই কিছু বললাম না। ভেবেছিলাম, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনিই প্রথমে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু একটি কথাও তাঁর ঠোঁট থেকে খসল না; চুপচাপ তিনি বসে রইলেন। অগত্যা আমাকেই কথারম্ভ করতে হল। লবণ-কর তুলে দেবার ব্যাপারে গান্ধীজীর যে কতখানি আগ্রহ, তা তাঁকে জানালাম। বললাম যে, হিজ একসেলেন্সিকেও এ ব্যাপারে তিনি আগ্রহশীল করে তুলতে চান। লবণ-কর যে মোটেই ন্যায্য নয় এবং গরিবের জীবনে এ যে একটা দুর্বহ বোঝা, তাও বললাম। মিনিট কয়েক ধরে একটানা কথা বলে তারপর চুপ করলাম আমি। আশা করছিলাম যে, হিজ একসেলেন্সি নিশ্চয়ই এবারে কিছু একটা মন্তব্য করবেন। কিন্তু করলেন না। একেবারে নির্বাক হয়ে তিনি বসে রইলেন। অগত্যা আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় পয়েন্ট্‌টি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। কিন্তু মধ্যপথে তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রথম পয়েন্টের জবাব দিলেন। তাঁর কথা ফুরোলে আমি আবার দ্বিতীয় পয়েন্টটিতে ফিরে গেলুম। তার পর তৃতীয় পয়েন্ট্‌টিতে পৌঁছে সদ্য যখন বেশ উৎসাহভরে কথা বলতে শুরু করেছি এবং ভাইসরয়কে বোঝাচ্ছি যে, ব্রিটিশ সরকার যদি গান্ধীজীর ইচ্ছা পূরণ করেন, তা হলে সেটা তাঁদের শুভেচ্ছার একটা মস্ত প্রতীক বলে গণ্য হবে (আমার ধারণা, আমি যেন বক্তৃতামঞ্চের মত কথা বলছিলাম!), তখন—আমাকে কথা শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই—ভাইসরয় হঠাৎ বিনীতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, "আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। লবণ-করের ব্যাপারে মিঃ গান্ধীর বক্তব্য আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলেছেন। আচ্ছা, গুডবাই।"

বড়ই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। ভাইসরয়ের চিত্তে আমি রেখাপাত করতে পেরেছি কিনা, তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে রাজ্যের অস্বস্তি নিয়ে আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে এলাম, এবং হিজ একসেলেন্সির সঙ্গে আমার আলোচনার বিবরণ তাঁকে জানালাম। সব শুনে গান্ধীজী স্থির করলেন যে, তিনি এবারে নিজেই গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলবেন। অতঃপর ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে এই চিঠি লিখলেন তিনি:

বাল্মীকি মন্দির,
৮ই এপরিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় মিঃ অ্যাবেল,

আমার পরশু দিনের চিঠিতে আমি যে বিষয়ের কথা বলেছিলাম, সে সম্পর্কে আমার নিভৃততম চিন্তাকে আমি হিজ একসেলেন্সির কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক—অবশ্য তিনি যদি তাঁর মূল্যবান সময় থেকে মিনিট কয়েক আমাকে দিতে পারেন। পারবেন কিনা, এবং পারলে সেটা কখন পারবেন—তা আপনি দয়া করে আমাকে জানাবেন কি?

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

জি ই বি অ্যাবেল, এসকোয়্যার।

ভাইসরয়ের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝতে পারা গেল যে, লবণ নিয়ে তিনি আর কথা বলতে রাজী নন। স্যার্ আর্চিবল্‌ড রোল্যান্ড্‌স্ যে গান্ধীজীকে জানিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যেই লবণ-কর তিনি তুলে দেবেন, এ কথা জানতে পেরে ভাইসরয় ভীষণ চটে গেলেন। জর্জ অ্যাবেল আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের উস্কানিতে আর্চি রোল্যান্ড্‌সকে ডেকে বেশ একচোট তিরস্কার করলেন তিনি। গান্ধীজী আর আমার জন্যই স্যার্ আর্চিবল্‌ডের এই বিপদ ঘটল। ভেবে খারাপ লাগছিল যে, একজন ভাল মানুষকে আমরা না-বুঝে অসুবিধায় ফেলেছি।

তবে লবণ-করের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর লড়াই সেখানেই থামল না। সে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি থেকে সিমলায় গেলাম আমরা। সেখানে গিয়ে আমার [illegible] তিনি [illegible] একটা চিঠি লিখলেন:

ভ্যাকটিক,
সিমলা অ্যাভেনু,
৩রা মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ অ্যাবেল,

লবণের চিন্তা এখনও আমার মাথা থেকে বিদায় নেয়নি। ইংরেজদের সম্মানের কথা ভেবেই আমি বলছি, এই একচেটিয়া কারবারের সুবিধা লোপ করতে একদিনও দেরি করা উচিত নয়।

এই একচেটিয়া কারবারের ফলাফল যে কী হয়েছে, হিজ একসেলেন্সি তা যাতে সম্যক উপলব্ধি করেন, তার জন্য শ্রীপ্যারেলালের রচিত একটি অতিরিক্ত 'নোট'ও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

জি ই বি অ্যাবেল, এসকোয়্যার,
সিমলা।

ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি এর উত্তরে লিখলেন:

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া,
সিমলা
৬ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

লবণ-কর সম্পর্কে আপনার ৩রা মে তারিখের চিঠি এবং সেই সঙ্গে মিঃ প্যারেলালের যে নোট পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

২। আপনি প্রথম যখন এ বিষয়ে উল্লেখ করেন, তারপর হিজ একসেলেন্সি ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন; কিন্তু এ সম্পর্কে যে অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তার ফলাফল কী হবে তা অনুমান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আপনার আগ্রহ কত গভীর, তা তিনি বোঝেন; কিন্তু কর তুলে দিলে তার পরিণাম কী হবে, এবং যে কোনও নতুন সরকারের উপরে তার প্রতিক্রিয়া গুরুতর হয়ে দেখা দেবে কিনা, সেটা তিনি সর্বাংশে বিচার করে দেখতে চান।

আন্তরিকভাবে আপনার
জি ই বি অ্যাবেল"

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার।

এই চিঠির পর, চারদিনের মধ্যেই ভাইসরয়ের কাছ থেকেও আর একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখলেন:

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া
(সিমলা)
১০ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

ফিনান্স মেম্বার আমাকে জানাচ্ছেন যে, লবণ-কর কমিয়ে কিংবা তুলে দেওয়া হতে পারে, এই মর্মে গুজব রটার ফলে— অবিলম্বে যদি না প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা হলে— করেকটি অঞ্চলে লবণের দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ী আর পাইকারেরা লবণ-উৎপাদকদের কাছে আর নতুন করে মালের অর্ডার পেশ করছে না। তাদের মনে এই ভয় দেখা দিয়েছে যে, কর মিটিয়ে যে লবণ তারা কিনবে, তার বিরাট স্টক তাদের হাতে জমে যাবে, এবং কর উঠে যাবার ফলে সেই স্টক তাদের কম-দামে বিক্রি না করে উপায় থাকবে না। বোম্বাইয়ের লবণ-ব্যবসায়ী ও শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জোর দরবার করা হয়েছে।

২। লবণের দুর্ভিক্ষ ঘটলে দরিদ্র মানুষদের জীবনে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। সেই অবস্থা যাতে না ঘটে, তার জন্য সরকার একটি প্রেসনোট প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। তার একটি নকল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

৩। এই রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন না করে যে আমাদের উপায় নেই, আশা করি তা আপনি বুঝবেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি রচনা করেছিলেন, চিঠির সঙ্গে তার একটি অনুলিপি পাওয়া গেল। সেটি এই:

"সরকার অভিযোগ পেয়েছেন, লবণ-কর কমিয়ে কিংবা তুলে দেওয়া হতে পারে—এই মর্মে গুজব রটবার ফলে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের মনে এতটাই সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে যে, লবণ-ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে এবং লবণ-উৎপাদনেও শ্লথ ভাব দেখা দিয়েছে। বর্তমানে পরিবহণ-সমস্যা খুবই তীব্র; তদুপরি বর্ষাকালে লবণ-পরিবহণের সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়; ফলে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লবণের দুর্ভিক্ষ ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য সরকার এ কথা স্পষ্টভাবে জানাতে চান যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণভাবে তদন্ত না করে—যাতে প্রচুর সময় লাগবে—সরকার এ বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটাবেন না; এবং কর মিটিয়ে লবণ কিনে যাঁরা মজুত করেন, মজুত মাল বিক্রির যথেষ্ট সময়ও তাঁদের দেওয়া হবে।"

গান্ধীজী এই চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি পড়ে খুবই বিচলিত হন, এবং ভাইসরয়কে অত্যন্ত কড়া ভাষায় একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানা এখানে তুলে দেওয়া হল:

চ্যাডউইক,
সিমলা ওয়েস্ট,
১১ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

লবণ সম্পর্কে আপনার ১০ই তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

দায়িত্ববোধহীন চিত্ত যে কীভাবে কাজ করে, এই চিঠিই তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। গত সোমবার আমি যখন মৌন অবলম্বন করে ছিলাম, তখন অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটি জাতি দুর্নামের পরোয়া করে না। মৌন ভঙ্গ হবার পরে ক্যাবিনেট-মিশনের সদস্যরা এসে পড়লেন, এবং উচ্চস্তরের রাজনীতির আলোচনায় আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আপনার আশ্বাস অনুসরণ করে সম্ভব এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে, কোনও অন্যায় কাজ করে অপযশ কুড়োতেও ব্রিটি জাতির বিশেষ আপত্তি নেই।

অনুগ্রহ করে যে-বিজ্ঞপ্তিটি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার বিবেচনায় সেটি একটি কলঙ্কজনক ব্যাপার। আমার চিত্তে সর্বদা জনসাধারণের চিন্তাই জাগরূক; তাদের কাছেই আমার চিত্ত দায়ী এবং তাদের আহ্বানেই সে সাড়া দেয়। এ-ব্যাপারে আমার চিত্ত স্পষ্ট এই কথাই বলছে যে বিশেষ করে এই দুর্ভিক্ষের দিনে ন্যক্কারজনক এই একচেটিয়া ব্যবসা আর করের বিলোপসাধনই কর্তব্য। কিন্তু এই যে সহজ আর ন্যায্য ব্যবস্থা, আপনার মতে এইটুকুও আপনাদের পরবর্তী সরকার অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার এসে করবেন—সে সরকার যখনই প্রতিষ্ঠিত হোক।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

হিজ এক্সেলেন্সি দি ভাইসরয়

দেখে আমি উদ্বেগ বোধ করছিলাম যে, লবণ কর সম্পর্কে গান্ধীজী আর ভাইসরয়ের যুক্তিতর্ক ক্রমেই চরম সীমায় এসে পৌঁছচ্ছে। মৌলানা আজাদ তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী; তাঁর মতন মানুষও যে গান্ধীজীর কাছে এতটা অসত্যাচরণ করতে পারেন, ইতিপূর্বে এইটে আবিষ্কার করে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন; এবং তারই ফলে তিনি তখন এক আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। তাঁর নিত্যসঙ্গীদের সকলকেই তিনি তখন বিদায় দিয়েছেন; এমন কী, যাঁরা তাঁর আহার পরিচ্ছদ আর খুঁটিনাটি প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তাঁরাও কেউ তখন তাঁর কাছে ছিলেন না। তার কারণ, তাঁর ভাষায়, তিনি তখন "কোনও মানুষের উপরে নয়, একমাত্র ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে" চাইছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতার ভার যাতে লাঘব হতে পারে, বল্লভভাই কিংবা বাদশা খান কিংবা আমার পক্ষে এমন কিছুই তো করবার সাধ্য ছিল না। সকালে সন্ধ্যায় তখনও তিনি প্রার্থনায় বসতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় স্তোত্র আর গানগুলি তাঁকে গেয়ে শোনাবার মতন কেউ তখন নেই। যাঁরা গান গাইতে পারতেন, তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বল্লভভাইয়ের কন্যা মণিবেন আর আমি তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। কিন্তু হায়, আমাদের এক-জনের গলাও তো গানের গলা নয়!

সর্বোপরি লবণ কর সম্পর্কে ভাইসরয়ের এই একগুঁয়েমি। গান্ধীজী আর পারলেন না, কঠোর ভাষায় ওই চিঠি লিখে দিলেন।

চিঠির সুর থেকে মনে হল, লক্ষণ শুভ নয়। ভয় হল, এই দুর্বল শরীরেই তিনি হয়ত অনশন শুরু করবেন, এবং এমন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, সমগ্র দেশ জুড়ে যার ফলে অভ্যুত্থান ঘটবে। উদ্বিগ্ন মনে আমি সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, এবং তাঁকে বললাম যে, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু করা উচিত। ভাইসরয়ের সঙ্গে কি তিনি এ-সম্পর্কে কথা বলতে পারেন না? ভাইসরয়কে কিছু সৎ পরামর্শ দিতে পারেন না? সার স্ট্যাফোর্ড এতে সম্মত হলেন। অতঃপর গান্ধীজীর কঠোর চিঠির যে উত্তর এল ভাইসরয়ের কাছ থেকে, তাতে মনে হল, ভাইসরয় কিছুটা নরম হয়েছেন। গান্ধীজীকে তিনি জানালেন :

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া
(সিমলা)
১১ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

লবণ কর সম্পর্কে আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যদি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তো সানন্দে আমি এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আজ সন্ধ্যা সাতটায় কি আপনার অবসর হবে?

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার

সেইদিনই সন্ধ্যায় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন গান্ধীজী। যে-ঘরে তাঁরা কথা বলছিলেন, আমি তার পাশের ঘরে বসে ছিলাম। বসে-বসে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম যে, ও'দের মধ্যে যেন একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষ না ঘটে। আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে এলেন গান্ধীজী। মুখ দেখে মনে হল, আগের চাইতে তিনি ঈষৎ প্রফুল্ল। ভাইসরয়-ভবন থেকে আমাদের সামার হিল-এ নিয়ে যাবার জন্য যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল, সেটাকে তিনি ছেড়ে দিলেন; বললেন, এটুকু পথ তাঁর হে'টে ফিরতেই ভাল লাগবে। আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভাইসরয়-ভবনের বিরাট প্রাঙ্গণ তিনি পার হয়ে এলেন; বাড়ির পিছন দিককার পথ দিয়ে আমরা সামার হিলের দিকে এগোতে লাগলাম। পথ কম নয়। প্রায় দু মাইল। তার উপরে তাঁর স্বাস্থ্য তখন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। ফলে আমার ভয় করতে লাগল। সামার হিলের পথ অবশ্য খুব খাড়াই নয়। তবু চড়াই ভেঙে তাঁকে উঠতে হচ্ছে, এইটে দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এর ফল হয়ত ভাল হবে না। গান্ধীজী কিন্তু হাসতে হাসতে জিদ ধরেছিলেন যে, তিনি হে'টেই ফিরবেন। ধীরেসুস্থে চড়াই ভেঙে শেষ পর্যন্ত আমরা 'চাডউইক'-এ পৌঁছলাম। এদিকে গাড়ি আমাদের অনেক আগেই 'চাডউইক'-এ ফিরেছিল। ড্রাইভার গিয়ে বল্লভভাইকে বলেছিল যে, ভাইসরয়-ভবন থেকে গান্ধীজী হে'টে ফিরছেন। শুনে বল্লভভাই আর বাদশা খান এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তাঁরাও ভাইসরয়-ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। গান্ধীজী আর আমি যখন 'চাডউইক'-এর প্রবেশ-পথে গিয়ে পৌঁছেছি, তখন তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা। বল্লভভাই তো আমার উপরে দারুন রেগে গেলেন। গান্ধীজীকে আমি এতটা পথ হে'টে আসতে দিয়েছি বলে খুব একচোট বকুনি দিলেন আমাকে। যেন ইচ্ছে করলেই গান্ধীজীকে আমি বাধা দিতে পারতুম!

গান্ধীজীকে অবশ্য প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। ভাইসরয় যা করতে যাচ্ছিলেন, তা যে অন্যায় কাজ, সে-কথা তিনি তাঁকে বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ভাইসরয় তার পরদিনই গান্ধীজীকে এই চিঠি লেখেন :

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া
(সিমলা)
১২ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার সঙ্গে আমার আলোচনার ফলে লবণ-কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আমি আটকে রাখবার ব্যবস্থা করেছি। যে-সব ব্যবসায়ী-সংস্থা অভিযোগ তুলেছিল, ফিনান্স মেম্বার তাদের জানিয়ে দেবেন যে, লবণ কর একুনি প্রত্যাহার করবার কোনও সম্ভাবনা নেই; এবং তেমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে আগেই তাদের জানানো হবে। তিনি আশা করছেন যে, এর ফলেই যথেষ্ট পরিমাণ লবণ বাজারে পাওয়া যাবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম কে গান্ধী, এসকোয়্যার

গান্ধীজী এর উত্তরে লিখলেন :

সিমলা
১৪ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার ১২ই মে তারিখের চিঠির জন্য এবং লবণ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আটকে রাখবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম কে গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি দি ভাইসরয়

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী সেইখানেই থেমে থাকেন নি। সেই বছরই অকটোবর মাসে লবণ কর তুলে দেওয়া হল। তখন তিনি শান্ত হলেন। (ক্রমশ)

ক্যানাডার চিঠি

কয়েকদিন আগে দেশ থেকে আমার অদেখা এক সহৃদয়া মেয়ের চিঠি পেলাম। সহৃদয়া বলছি, কারণ বহুদূরে মাতৃভূমি থেকে সে অভিযোগ জানিয়েছে যে আমার পাঠানো প্রবাসী 'চিঠি'-তে ভাববার মতো কথা কিছু থাকে না। অভিযোগ সংগত, সন্দেহ নেই। কিন্তু যাদের ভাববার ক্ষমতা আছে তাদের ভাবনার খোরাক লিখে পাঠানো কি আর আমার আয়াসসাধ্য? তাই ধ'রে নিয়েছিলাম টুকি-টাকি কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই অচেনা বিদেশের একটি ঝাপসা ছবি আঁকার প্রচেষ্টাতেই আমার সাংবাদিক দায়িত্ব প্রায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে। তথাপি যখন জানতে পেলাম পত্রলেখিকা এদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আসবার কথা ভাবছে, তখন মনে হ'ল সেই সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে দু-চার কথা এখানে লিখলে হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না। এই চিঠিতে তাই আমি বিদেশে ভারতীয় ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে লিখব। উদ্দেশ্য স্পষ্টতই এবং আন্তরিক অর্থে আত্মসমালোচনা। সুতরাং, বিদেশ-অভিমুখী এবং বিদেশ-আগত আমার স্বজনেরা যদি আমার লেখা প'ড়ে ক্ষুব্ধ হন তাহ'লে তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও মিশ্রিত থাকবে একথা আশা করব। কারণ আমি জানি যে কোন সামাজিক অভিজ্ঞতার ছবি আঁকতে গেলে বাছাই-করা উদাহরণের দোষে সে-ছবি কমবেশি পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু সে-দোষ যদি মূলত নির্দোষ অভিপ্রায়প্রসূত হয়, তাহ'লে হয়তো তারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা থাকে।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সম্প্রতিকালে অনেক ভারতীয় ছাত্র আসছেন। এ'দের অনেকে মেধাবী ব্যক্তি, বিদেশী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সুনামও অর্জন করেন। বিদেশীরাও স্বভাবতই এ'দের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান করতে উৎসাহী। সুতরাং এখানে আমরা আলাপ-আলোচনায় যে-সব মতামত প্রকাশ করি খানিকটা তার ভিত্তিতেই বিদেশীরা ভারতবর্ষের একটি রূপকল্প বা ইমেজ সৃষ্টি করতে বাধ্য হন। আমিও তেমনি গত কয়েক বছর ধ'রে এদিককার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের একটি মোটামুটি রকমের ছবি পেয়েছি। অবশ্যই বিদ্যালয়ের ভালোমন্দ অনুসারে ভারতীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানেরও খানিকটা উঁচু-নিচু হয়। তবুও বলব, সব ছাপিয়ে একটা ছবি ভেসে ওঠে—যে-ছবিটি আমার কাছে দুঃখকর। বিশেষত দুঃখকর এজন্য যে, এটাই বোধহয় ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের সাধারণ ছবি, যা সে-দেশের কোন অঞ্চল বিশেষে বাস ক'রে এত সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এবং আমার ভাগ্যের গুণে বিদেশীয় বন্ধুতাও এত পেয়েছি যে এখানে আমাদের চলনে বলনে তাঁরা কী মনে করেন সেকথা দয়া ক'রে প্রায়শই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিবিশেষদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁরাই আবার যে-রকম অকৃপণ সুখ্যাতি ক'রে থাকেন তার খাতিরেই আমি তাঁদের অসংখ্য বিরূপ মন্তব্যকে মূল্য দেবার তাগিদ অনুভব করি।

আমাদের মধ্যে অন্যতম লক্ষণীয় বস্তু অনভিজ্ঞ মতামত প্রকাশের করুণ নির্বুদ্ধিতা। পশ্চিমী সমাজে ছেলেমেয়ে-দের অবাধ মেলামেশা, মদ্যপান ইত্যাদি সব কিছু সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্বন্ধে অবিলম্বে সোচ্চার সমালোচনার পর কালক্রমে একেবারে অতিপশ্চিমী হয়ে-ওঠা ময়ূরপুচ্ছধারণের কথা না হয় আপাতত বাদই দিলাম। এহেন পরিহসনীয় ব্যাপারের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া হয়তো অনুচিত। আমাদের আবুতদৃষ্টি অথবা চোখ-ঠার-দেওয়া সামাজিক আচার-বিচারেরই হয়তো এজন্য প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু ধরুন, কোন প্রযুক্তিবিজ্ঞানী ভারতীয় ছাত্রের কথা, যিনি পাঁচ মিনিটের জন্যও কোনদিন সঙ্গীততৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন ব'লে শুনিনি। তিনি সঙ্গীতবিষয়ে ওয়াকিব য়ুরোপীয় ছাত্রদের গায়ে প'ড়ে এই বাণী দিয়ে এলেন যে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সমকক্ষ হতে তাদের আরো অর্ধশতক সাধনার প্রয়োজন। অথবা, শিক্ষাশাস্ত্র-বিভাগীয় আমাদের কোন ছাত্র একদল বিদেশীকে ব'লে এল যে জগতে উত্থানের পরেই পতনের এবং তারপরেই উত্থানের নিয়ম। সুতরাং পশ্চিমী সভ্যতা ডুবল ব'লে, এবং ভারতের জাগরণের দিন আগত ঐ।

কেউ হয়তো আমাকে বলবেন, প্রথম মন্তব্যটি তো য়েহুদি মেনুহিন (অবশ্যই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গে) করেছেন। এবং দ্বিতীয় কথাটিও স্পেংলর কিংবা (সুদূর-প্রসারী ইশারায়) টয়েনবি সাহেব বলেছেন। আমাদের মধ্যে কেউ বললে দোষটা কিসের? দোষ এই যে মেনুহিন কিংবা টয়েনবির নাম পর্যন্ত না-জেনে এবং অযাচিতভাবে এসব বাণী দিতে হ'লে নিজেকে অন্তত তাঁদের নখের যোগ্য প্রমাণ করার দায় থাকে। অথবা কি কেউ একথা বলবেন যে, এধরণের বালখিল্য কথাবার্তা সব সমাজেই দু-চারজন ব'লে থাকে? দুর্ভাগ্যত, যে-কোন বিদেশী বিদ্যালয় এরকম ভারতীয়দের সংখ্যা দুই কিংবা চার নয়, এবং পশ্চিমী কিংবা অন্য কোন দেশের ছাত্রদের মধ্যে ঠিক

এ'দের সমকক্ষ নয় পণ্ডিত আমি অদ্যাবধি দেখি নি।

তারপর ধরুন, আমাদের সবজান্তা-ব্যাধি। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকেই একটি উদাহরণ দিই। স্বদেশে-বিদেশে পরীক্ষায় ভালো ফল-দেখানো কোন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে হংকং-এর একটি ছেলের আলাপ করিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমাদের প্রতিনিধি উক্ত বিদেশীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, তাঁর দেশের বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল সরকারের কার্যকলাপ অনুধাবন ক'রে এশিয়ার অন্যান্য দেশ মুগ্ধ ও গর্বিত। বিদেশী ছেলেটি হয়তো অপ্রস্তুত মৃদু স্বরে তাঁর দেশের রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ঈষৎ সংশোধনের অবতারণা করতেই আমাদের প্রতিনিধি ভুরু কুঁচকে বললেন: But, are you quite sure? এখানে আমি অজ্ঞতার কথা তুলছি না, সে-লজ্জা তুচ্ছ। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি কোন বিদেশী ছাত্র উপরচালাকির ঝোঁকে এরকম হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না।

এক সময় আমাদের দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে

জ্ঞান দেখানোর একটা সার্বজনীন প্রবৃত্তি ছিল বলে শুনেছি। আজকাল বোধহয় অর্থনীতি তার স্থান নিয়েছে। সেদিন দেখলাম দেশ থেকে সদ্য-আগত একটি অন্য বিষয়ের ছাত্র এখানকার অর্থনীতির জনৈক অধ্যাপককে বলছে: আপনি হালের খবর জানেন না (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় যে-কজন জানেন তাদের মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি একজন), য়ুরোপের অনেক দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় মার্কিন দেশের তুলনায় বেশি। অনুমানের চেষ্টায় শিক্ষকটি বললেন হয়তো সেই দেশগুলিতে মাথাপিছু আয় মার্কিন দেশের তুলনায় দ্রুততর বাড়ছে। কিন্তু তাঁর কী আস্পর্ধা, আমাদের ছাত্রটি কি আর এই সামান্য তফাৎটুকুও বোঝেন না?

এবং দেশে তিনি নাকি মোটা মাইনের চাকুরিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (মূর্খ বিদেশীরা অবশ্য ভারতীয়দের যুক্তি তথ্যের উৎকর্ষের এই মানদণ্ডটি একেবারেই বোঝেন না।) তদুপরি তিনি আপন প্রদেশের বাইরেও অনেক সময় কাটিয়েছেন। সুতরাং ভারতীয় সরকারের সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাস তথা রপ্তানিনীতি সম্পর্কেও তিনি অর্থনীতিবিদদের চেয়ে বেশি বোঝেন। এবং একাধিক প্রদেশে বাস করার ফলে আমাদের খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণই যে শেষ কথা হবে তা তো অনস্বীকার্য। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে কোথাও দুর্ভিক্ষ নেই। ভালো কথা, আছে ব'লে প্রমাণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু তাঁকে বললাম যে, তাঁর রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে অন্তত দুটি ব্যাপারের উপরে। এক, তাঁকে বলতে হবে তাঁর মতে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা কী। নতুবা, দুই, তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, ভারতীয় লোকসভার বিরোধীপক্ষ সরকারকে অন্যায় অপবাদ দিচ্ছে। আমাদের রিপোর্টার দেখলাম কাজের লোক, দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা নিয়ে অলস কচকচিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি চতুর হাসি হেসে বললেন বিরোধীদল সর্বদাই সরকারকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে। এটাই ডেমোক্র্যাসির সুস্থতার প্রকাশ, কিন্তু তা বলে তাদের কথা বিশ্বাস করা মূর্খতা। উত্তম যুক্তি, কিন্তু সরকার যখন দাবি করেন না-খেতে পেয়ে দেশের কেউ মরে নি তখন সে-কথাতেও কান না-দেওয়া যে কেন আমার অসীম নির্বুদ্ধিতা তা এই ব্যক্তির যুক্তি থেকে বোঝা গেল না।

বলাবাহুল্য, এই সব উদাহরণ বিশেষের উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না, কারণ তাতে আমাদেরই বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা হবে। কিন্তু বুদ্ধির অভাবের চেয়ে অনেক মারাত্মক তথ্যের ও সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, এমন কি তাদের সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেওয়া—যা আজকাল আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মজ্জাগত প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজেদেরই ঘরের খবর একে অন্যের কাছে লুকিয়ে রাখার অবিশ্বাস্য চেষ্টায় আমরা এক আত্মঘাতী ভবিষ্যতের সৃষ্টি করছি, এবং বহির্বিশ্বের সংঘর্ষে এই লুকোচুরির প্রবৃত্তি যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি মনে করেন যে এভাবেই বিদেশীদের কাছে আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্য হাসিল হবে, তাহ'লে অবশ্য আমার মতো ক্ষুদ্র মৎসের কিছু বলার নেই।

আমাদের আত্মপ্রতারণার নানা উদাহরণ এখানে দেখি। চট ক'রে যা মনে আসে তাই লেখা যাক। এদেশের সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনে ভারতবর্ষের খবর পরিবেষণে কিছু কিছু রাজনৈতিক প্যাঁচ থাকে, এবং সেজন্য আমাদের বিরক্ত হবারও সঙ্গত কারণ হয়। কিন্তু সংবাদ প্রচারে বিকৃতিবিশেষ সত্ত্বেও প্রধান বক্তব্যবিষয় যে অবিকৃত থাকতে পারে, এবং তা নিয়ে মাথা ঘামানোই যে আসলে আমাদের কর্তব্য একথা আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে রাখতে চান না। কাজেই, যেমন মনে করুন, উত্তর প্রদেশের কৃষিমন্ত্রী দেশবাসীদের ইঁদুরের মাংস খেতে সত্যিই বলেছেন কিনা এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলে ভারত সরকারের খাদ্যনীতি সম্বন্ধে ক্যানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং-এর পুরো প্রোগ্রামই অবশ্যবর্জনীয় হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি এটা পলায়নীমনোবৃত্তি থেকেই ঘটে। কারণ পাকিস্তান সম্বন্ধে সদৃশ তথ্যবিকৃতির ফলে পশ্চিমী প্রেসের সমালোচনা কিংবা বক্তব্যে যে কোন-রকম ত্রুটি থেকে যেতে পারে সে-কথা ভারতীয়দের মুখে কখনো শুনেছি কিনা সন্দেহ।

বিদেশীদের কাছে আমাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রয়াসও প্রায়শ শুধুমাত্র না-বাচক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, এদিককার পত্রিকায় আমি একাধিকবার দেখেছি, গোহত্যা সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক-ধার্মিক বিধি-নিষেধের আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও ফলাও ক'রে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের পথে ঘাটে বেওয়ারিশ গরু চ'রে বেড়ায়। প্রত্যেক-বারই দেখেছি কোন না কোন ভারতীয় পাঠক এই তথ্যপরিবেষণের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে সম্পাদকের কাছে দীর্ঘ ও উত্তপ্ত চিঠি পাঠিয়েছেন। অভিযোগ: বিদেশী কর্তৃক সত্যের অপলাপ। আমি নিজে অবশ্য এই সব পত্রপ্রেরকদের মতো দেশের সব রাস্তাঘাটের খবর রাখি না। তবে যতটা জানি ও দেখেছি (সম্প্রতিকালেও) তাতে উপরোক্ত তথ্যের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাবার স্পর্ধা রাখি না। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, গো-সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সামাজিক আচরণ ও নীতির সার্থকতার প্রশ্ন—শহরের রাস্তায় গরু না-চরলেও এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর আমাদের একদিন দিতেই হবে। অথচ প্রতিবাদী চিঠিপত্রের লেখকেরা এদিক একেবারেই ঘেঁষবেন না। আর যদি কেউ বলে যে আমাদের গোবিষয়ক নীতির মধ্যে কার্যত এক স্পষ্ট ভণ্ডামী রয়ে গেছে, তা হ'লে তো কুরুক্ষেত্র হবে।

আমার কাছে কিছু নির্ভরযোগ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি আছে, যার মধ্যে সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ বইপত্রের তালিকা পাওয়া যায়। এসব বইকে বেআইনি করার সার্থকতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে সুস্থ তর্কের প্রয়াস তো দূরের কথা, ছাপার অক্ষরে ঐসব তথ্য আমাদের হাতে আছে ব'লে এতাবৎ আমার মাথার খুলিটি অক্ষত থাকতে পেরেছে। বলা বাহুল্য আমার বিস্ময়ের কারণ ভারত সরকারের নীতি নয়। আমাদের সরকার কয়েকটি সমালোচনমূলক গ্রন্থকে যে আদৌ বেআইনী করতে পারেন একথা বিশ্বাস না-করার নিশ্চিন্ত ও ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য ক'রেই আমি অবাক হয়েছি। উপরন্তু, যখন প্রমাণ হ'ল যে এই সব গ্রন্থের প্রচলন সত্যিই বেআইনি করা হয়েছে, তখনও অতি অল্প সংখ্যক ভারতীয়কেই দেখলাম তার মধ্যে অন্তত দু-একখানি সংগ্রহ ক'রে পড়তে। এবং যাঁরা পড়লেন, তাঁদের মধ্যে আবার কাউকে বলতে শুনিনি যে বই-গুলিতে শিক্ষণীয়ও কিছু থাকতে পারে।

একথা আমরা কখনো কখনো ব'লে থাকি যে, ভারতবাসীরা সবাই মিলে এক অখণ্ড জাতি নয়। অসংখ্য ছোট-বড় বিভেদ আমাদের জাতীয় সংহতির পথে কাঁটার মতো

ছড়িয়ে আছে। কাঁটা অপসারণের উপযুক্ত পন্থাও প্রায় কষ্টকল্পনা। তথাপি, পন্থা সম্বন্ধে মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও, আমরা সবাই সংহতির প্রয়োজন সম্বন্ধে তর্ক কিংবা সন্দেহ অবান্তর মনে করি। এমতাবস্থায়, বিশেষত বিদেশে, আমাদের প্রত্যেকের ন্যূনতম কর্তব্য জাতীয় সংহতির অস্পষ্ট সম্ভাবনাকে অবমাননা না-করা। অন্তত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো তাই মনে হয়। শুনেছি আমাদের দেশের সেরা ছাত্রেরাই নাকি বিদেশে আসে, তাই তাদের কাছে এ-বিষয়ে খানিকটা সক্রিয় নেতৃত্বের আশা করাও হয়তো দোষণীয় নয়। অথচ কার্যত এখানে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দেখি আরো বিচ্ছিন্ন, এবং বিদেশী কর্তৃক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য তথ্যগত প্রশ্নের উত্তরেও দশজন ভারতীয়ের পরস্পরবিরোধী দশটি রিপোর্ট।

তার উপর একই দেশের এক অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেরা অপর অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে কত অজ্ঞ ও নির্বিকার থাকতে পারেন সেটাও বিদেশীদের বিস্ময়ের বস্তু। কেউ কি বিশ্বাস করবেন যে পূর্ব-ভারতীয় কোন মেডেল-জলপানি পাওয়া ছেলে স্বদেশে অবস্থানকালে কোনদিন ভাবে নি যে পূর্ব পঞ্জাবে শিখ ছাড়াও এক বৃহৎ পাঞ্জাবী-হিন্দু সম্প্রদায় আছেন। আমি জানি না এটা "পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে"-র আক্ষরিক অবদান কিনা। এই অজ্ঞতা সে আবার যথাস্থানে প্রকাশ ক'রে বসেছে, ফলে আরেক বিপর্যয়।

আবার যখন একে অন্যের খবর জানেন তখনও সে-ব্যাপারে কত সংস্কারের সৃষ্টি হয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটার দক্ষিণ ভারতীয় তাৎপর্য যেহেতু বর্ণভেদ প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব'লে শোনা যায়, সেহেতু উত্তর ভারতের মেয়েরা অনেকেই বিদেশীর কাছে সিঁদুরের ব্যাখ্যায় উক্ত আঞ্চলিক প্রথাটির উল্লেখই করতে চান না। প্রসঙ্গত, বর্ণভেদমানসতা এখনো আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে যে কতটা মজ্জাগত তার দুঃখকর প্রমাণও পাই এই দূরে প্রবাসে ব'সে। বাংলা প্রদেশে বৃহত্তর বর্ণভেদের ব্যাপার তো অবশ্যই সর্বজন আলোচিত। সম্প্রতি এখানে অন্য একটি ঘটনা দেখলাম।

একটি সৌম্যকান্তি মহারাষ্ট্রীয় যুবক আমার সঙ্গে, যে কোন কারণেই হোক, ক্ষীণ ও নিস্পৃহ সম্পর্ক রেখে চলত। সেদিন কথায় কথায় আমি তাকে বলেছিলাম যে, মারাঠা চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে ভারতবর্ষে অদ্যাবধি অনেক বড়ো বড়ো নেতার সরবরাহ হয়েছে, এবং এই তথ্যটি সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যায় দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয়। সেইদিন থেকেই এই যুবকটি আমার গৃহে তার পদধূলি বর্ষণ করতে শুরু ক'রে, এবং অতঃপর দুর্ভাগ্যত আমার প্রতি তার উৎসাহ ও শ্রদ্ধায় অন্ত নেই। এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ সে নিজে চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণ।

বিদেশী শহরগুলিতে ভারতবর্ষের সামাজিক মানচিত্রটিও বিস্ময়কর স্পষ্টতায় সঙ্গে আঁকা হয়ে যায়। সেই মানচিত্রে বিশেষভাবে দেখা যায় বিন্ধ্যপর্বতকে—বিরাট দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো। কিন্তু প্রাচীরের দুধারে থেকেও বিদ্বেষের অভাব নেই, যে-বিদ্বেষের প্রকাশভঙ্গীর দোষে আর্যাবর্ত সম্বন্ধে দক্ষিণাঞ্চলের অভিযোগের প্রকৃত কারণ বোঝা কঠিন হয়। আমি অন্তত একবারও মনে করি না যে, উপরোক্ত অভি-যোগের কোন সঙ্গত কারণ থাকতেই পারে না। কিন্তু বিদেশীদের সমক্ষে এই বিদ্বেষ যে-ভাবে কখনো কখনো প্রকাশিত হতে দেখেছি তার সার্থকতা বুঝতে পারি নি। আবার একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উদাহরণ দিচ্ছি। ব্যাপারটা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে। আমাদের এক দক্ষিণী ভ্রাতা বিদেশী ছাত্র-দের বলেছেন যে, চীনের সঙ্গে ঝগড়া উত্তর ভারতের, দাক্ষিণাত্য এই যুদ্ধে জড়িত ছিল না। অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিদেশীদের মনে এই বিবৃতির ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমানযোগ্য। কিন্তু এহেন বিবৃতির সার্থকতা কোথায়? যদি এই ব্যক্তি মনে করতেন যে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা বিবাদ ভারত সরকারের অন্যায় আচরণ কিংবা হঠ-কারিতা, এবং সেজন্য তিনি সরকারী নীতিকে সমর্থন করেন না, তাহ'লে তাঁর মতামত ও যুক্তি শুনবার জন্য আমার অন্তত আগ্রহের অভাব থাকত না। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি অবিশ্বাস্য পরিমাণে চীন ও সাম্যবাদবিরোধী। শুধুমাত্র তাঁর আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রকাশের অভিপ্রায়েই তিনি ঐ রিপোর্ট দিয়েছেন। ফলত শুধু একরাশ কুৎসিত ধোঁয়া, আলো কিংবা এমন-কি উত্তাপের চিহ্নমাত্রও যার মধ্যে নেই। এবং সাধারণ বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষ দেশটি আরো বিরক্তিকরভাবে অচেনা হয়ে পড়ে।

আমার সৌভাগ্য, আমারই একদা-স্বজন পাকিস্তানবাসীদের সঙ্গে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিধিতে হলেও, এখনো আমার আন্তরিক [illegible] [illegible] হয়েছে। আমি নিজে আকৈশোর-পদ্মার মেঘনার কোলে দাঁড়িয়, সেখানে আমার [illegible] ঘর থেকে এখনো অকস্মাৎ এক পাগলা কিশোরের মত্তো আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ আসে। সেখানকার লোকের হৃদয়ের সুখ-অসুখ কথা তাই আমি অনুভবে হয়তো বুঝতে পারি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ জটিল, এবং আমার মতো নগণ্য লোক তা নিয়ে কিছু বলতে গেলে ধৃষ্টতার অভিযোগ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বরং আমি আমার দেশবাসীর কাছে সবিনয়ে একটি সামান্য প্রশ্নই করছি। বিদেশে পাকিস্তানীরা তাঁদের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে সভায় কোরান পাঠ করলে, কিংবা এমনকি [illegible] স্বদেশাত্মক গান গাইলেও, তা আমাদের কারো কারো মুখরোচক টিপ্পনির [illegible] হয়ে দাঁড়ায় কোন্ অধিকারে? আমার বাড়িতেই দুই দেশের বাঙালীদের একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে আমাদের যে-রকম সাংস্কৃতিক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পেয়েছি তার তুচ্ছতম উদাহরণটি দিই। সকলেই জানেন, পূর্ব-বঙ্গীয়েরা জলকে পানি বলেন—যেম আমাদের দেশে বাঙালী, ওড়িয়াবাসী এব দাক্ষিণাত্যবাসীরা বাদে আর সবাই পানি বলেন। অথচ বিদেশী বাঙালী কর্তৃক এ শব্দটির ব্যবহার আমাদের অনেক গণ্যমান ব্যক্তির অফুরন্ত কৌতুকের বিষয়। কিংব বিস্ময়সূচক কথাপ্রসঙ্গে এক বাঙালী মুখে আল্লা উচ্চারিত হলে অপর বাঙালী সাংস্কৃতিক যজ্ঞে প্রায় গোমাংস নিক্ষেপ হতেও দেখেছি।

মার্কিনমুলুকে আমার সঙ্গে এক একটি ভারতীয় ছাত্রের বিবাদ ঘটেছিল ছোটোটি শহরে তার জন্য একটি বাসস্থানে সন্ধান করছিল। সৌভাগ্যত অথবা দুর্ভাগ্য তার গায়ের রং আমার চেয়েও কালো, এ তার চুলও কিছুটা কোঁকড়া। ফলত, অনে বাড়িউলি-সাহেবা তাকে প্রত্যাখ্যান ক বলেছিলেন যে, তাঁর শুভ্রশুচি অ্যাপার্টমে নিগ্রোর কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে ন আমাদের প্রতিনিধি সেই বাড়ি পাবার জ বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে প্রমাণ দেখিয়ে যে সে ভারতীয়—অর্থাৎ, নিগ্রোদের ম অচ্ছুত জাতি নয়। অবশ্য এই দিগ্বিজয় সমাধা করে সে যদি শ্বেত ও কৃষ্ণ উ সমাজেই আপন জয়বার্তা ঘোষণা থে বিরত থাকত, তাহলে তার মনুষ্যত্ব সম্ব আমি এতটা তিক্ত সন্দেহ প্রকাশ কর না। কারণ ক্লীব অপরাধবোধেরও আ কাছে সময়বিশেষে একটা মূল্য আ কিন্তু কালক্রমে বৃহত্তর ভারতীয়কে নির্লজ্জ ভূমিকায় লক্ষ করে নিজেকেই ক্ষুদ্র মনে হয়েছে। আর সেই ক্ষুদ্রতাবো তাড়নাতেই এই সব কাহিনী এখানে লি হল।

সমীর দাশগু

সুবহ চোখ পরীক্ষার যন্ত্র
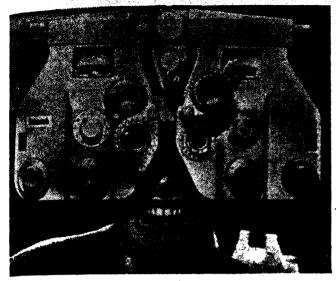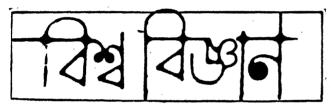
পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞান বার্তা

চোখ পরীক্ষার অভিনব যন্ত্র

জার্মান ফেডারাল রিপাবলিকে সম্প্রতি 'সমস্যা ও সমাধান' নামে এক প্রদর্শনী বসে। সেখানে এক অভিনব যন্ত্র দেখানো হয় যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুপারস্পেক্টেক্স' বা 'অতিচশমা'। জিনিসটি আসলে সব সময় পরে থাকবার চশমা নয়, পরা যাবেও না; কারণ, অত বড় জিনিস নাকে নিয়ে কেউ বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। আসলে যন্ত্রটি নাকে লাগিয়ে চোখের ডাক্তার অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে চশমার প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে পারবেন। অ্যাট্রোপিন দেওয়া, লেন্সের পর লেন্স বসিয়ে চোখের 'পাওয়ার' ঠিক করা এসবের আর প্রয়োজন হবে না। এখন পর্যন্ত চোখ পরীক্ষার যেসব যন্ত্র হয়েছে সেগুলির চেয়ে এই যন্ত্রটি অনেক ছোট এবং অনেক সহজে চোখের 'পাওয়ার' ধরে দিতে পারে।

মহাজাগতিক পরিবেশে পার্থিব আবহের অনুকরণ

ইউরোপে স্বতন্ত্র একটি মহাজাগতিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সেখানকার জন্য পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে বহু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত ও নির্মিত হচ্ছে। মহাশূন্যে উপস্থিত থেকে বিজ্ঞানীরা যাতে সেখানকার রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া, তেজস্ক্রিয় বস্তুকণার বিকিরণ-বিচ্ছুরণ ইত্যাদি ব্যাপার পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন তার জন্য পশ্চিম জার্মানীতে এক গোলাকার চেম্বার তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই চেম্বারের মধ্যে অন্যান্য গ্রহের পরিবেশও সৃষ্টি করা যাবে। সেই সব গ্রহে পাড়ি দেবার আগে এই সব তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরী।

গৃহাংশ নির্মাণের কারখানা

যত দিন যাচ্ছে একটির পর একটি ইট গেঁথে বাড়ি তোলার রেওয়াজ চলে যাচ্ছে। সেই জায়গায় আসছে কারখানায় তৈরি বাড়ির বিভিন্ন অংশ নির্মাণস্থলে নিয়ে এসে সন্নিবেশ করে দেওয়া। এতে সময় লাগে কম, বাড়িও বেশ পাকাপোক্ত হয়। হামবুর্গের নিকটে হালে এমন একটি গোলাকার কারখানা তৈরি হয়েছে যেখানে বাড়ির সব রকমের অংশ তৈরি হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় সব কিছু যন্ত্রপাতি ও মালমশলা রাখবার সুবন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া ঝড়বাদলের সময় গোটা কারখানাটি চলন্ত ছাদ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়।

মাছের কাঁটা কমানো ও মাংস বাড়ানোর গবেষণা

আমাদের যেমন রুই-কাতলা, ইউরোপের তেমনি কার্প মাছ। সেগুলি পোনা মাছের মতই সুস্বাদু এবং প্রোটিন-সমৃদ্ধ।

জার্মান ফেডারাল রিপাবলিকের ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউটে কার্প মাছের গঠনগত উন্নতি ও ফলন বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন ধরে গবেষণা চলে আসছে। তাঁদের চেষ্টার একটি লক্ষ ছিল মাছগুলির কাঁটা কমিয়ে মাংসের পরিমাণ বাড়ানো। তাঁরা হালে এই চেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন। তা ছাড়া অল্প জলে মাছের চাষ করার এক উপায় তাঁরা বার করেছেন। ইনস্টিটিউটের মৎস্যাগারের জলাধারে ২৩ ডিগ্রী তাপে মাছগুলি এখন সারা বছরই ডিম দেয়।

কার্প মাছকে বোতলে করে বিশেষ ধরনের খাবার দেওয়া হচ্ছে

অভিনব হাওয়াই বাস

ডল্‌ফিনের অনুকরণে হাওয়াই 'বাস'

পৃথিবীর বড় বড় শহরে মোটরগাড়ির ঠেলায় রাস্তা চলা মুশকিল। গন্তব্যস্থলে পৌছতেও দেরি হয়ে যায়। নিউ ইয়র্কে নাকি গাড়িতে রাস্তা এমন 'জ্যাম' হয়ে যায় যে, গাড়ির চেয়ে পায়ে হেঁটে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। তাই আমেরিকা, জার্মানী ইত্যাদি সমৃদ্ধ ও শিল্পোন্নত দেশে হাওয়াই ট্যাক্সি ও বাসের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ঐ সব দেশে পয়সাওয়ালা লোকেদের কারো কারো নিজের এরোপ্লেন বা হেলিকপটার আছে। পশ্চিম জার্মানীতে এখন হাজার দুয়েক ব্যক্তিগত এরোপ্লেন এবং শখানেক হেলিকপটার আছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে যে, আকাশে স্পুৎনিক চালিয়ে তাই থেকে ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে হাওয়াই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। যাই হোক, হালে পশ্চিম জার্মানীতে ডল্‌ফিনের গড়ন অনুকরণ করে ইঞ্জিনীয়াররা হাওয়াই জাহাজের এক নতুন নমুনা তৈরি করেছেন। দুপাশে বসানো তিন জোড়া রোটারের সাহায্যে জাহাজটি সোজা আকাশে উঠে গিয়ে 'হেক্‌ ফ্যানের' সাহায্যে উড়ে চলে। এই অভিনব বিমান হাওয়াই 'বাস্‌' হিসাবে ব্যবহারের খুবই উপযোগী হবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার ডায়েরি

লক্ষ করেছেন কি, যেদিন আপনার আলমারির চাবিটা বিগড়ে গিয়ে সহজ পাঠের সেই দন্ত-ন-এর মত হঠাৎ বসে বসে, 'যাব না তো কক্খনো', তখন হাজার চেষ্টায়ও পর পর কয়েকদিন চাবিওয়ালার দর্শন মিলবে না, আর যখন দরকার নেই, তখন ভরদুপুরের ভাত-ঘুম ভাঙাতে রোজ ওরা লোহার চাকতির অরকেসট্রা বাজিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কাঁধে কাঠের বাক্স, হাতে সেই চাকতির মালার রিং, তির্যক দৃষ্টি রাস্তার দুধারে এবং ডাক পড়লেই একেবারে অন্দরমহলে।

হরেক রকম ফিরিওয়ালার সঙ্গে এই তালা-চাবি সারাইয়ের লোকেরা শহর কলকাতার অঙ্গ হয়ে আছে। সব বাড়িতে কোন-না-কোন দিন তাদের ডাক পড়বেই। এরা বেশীর ভাগ ধর্মে মুসলমান, থাকে শহরের বাইরে। অনেকেরই নিজের জমি-জমা আছে, পরিবারের আয় বাড়াতে রোজ সকালে নাস্তা সেরে শহরে চলে আসে, সারাদিন টহল দেয়, ফের বাড়ি ফেরে সন্ধ্যাবেলায়। অ-বাঙালী কিছু আছে, তবে বাঙালীই বেশী।

সেদিন আলাপ করছিলাম আমতলার শেখ সওকত আলির সঙ্গে। ফিরিওয়ালা বা কারিক শ্রমিকের কাউকে দেখলে যেমন তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়ে ভুল হিন্দী বেরোয়, এক্ষেত্রেও তাই বেরিয়েছিল, সওকত আলি একগাল হেসে বললেন, "হিন্দীতে বলছেন কেন স্যার, আমি তো বাঙালী।"

জিগগেস করলাম, রোজ আয় কত হয়। জানালেন, "তা দিনে চার-পাঁচ টাকা হয়ে যায়। আগে আরও বেশী হত, এখন গোদরেজের তালা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ায় সারাইয়ের কাজ কমে গিয়েছে, ওগুলো নষ্ট হয় কদাচিৎ। তাছাড়া, চাবিওয়ালাদের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে ইদানীং। ঠিক কত, তা বলতে পারব না, তবে হাজার খানেক ঘুরে বেড়ায় এই কলকাতায়। আর একটা জিনিস লক্ষ করছি স্যার, আগে যেমন সব বাক্স, সব আলমারিতে তালা ঝুলত, আজকাল তা হয় না, অনেক বাড়িতেই বাক্স-আলমারির তালা লাগে না। তালা যদি না-ই থাকল, তা হলে চাবি নষ্ট হবে বা হারাবেই বা কী করে, আর আমরাই বা কোত্থেকে দু-চার পয়সা রোজগার করব বলুন।

খাঁটি কথা। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, "আর একটা জিনিস কিন্তু বলার আছে। আপনাদের ঘন ঘন ডেকে আনা বিপজ্জনক। ঘরে ঢুকে সব দেখে-শুনে গেলেন, বাস, পরদিন দেখা গেল সব চুরি।"

সওকত আলি জিব কেটে বলেন, "কী যে বলেন স্যার, আমরা সবাই চোর নই। দু-চারজন খারাপ লোক আছে বটে, কিন্তু সে তো সব পেশাতেই রয়েছে, কেবল আমাদের কেন সবাই সন্দেহ করবে? আর সন্দেহ যদি করতেই হয়, তা হলে সবার আগে করা উচিত বাড়ির ঝি-চাকরদের।"

সওকত আলি মিথ্যে বলেননি, নিউ আলিপুরের কীর্তিমান ভৃত্য নকুল জানার ব্যাপার কাগজে ছাপা হওয়ার পর কলকাতার প্রায় সব গৃহস্থ বাড়িতেই ইদানীং আতংক দেখা দিয়েছে। এতদিন যা করা হয়নি, অনেক পরিচিত বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সবাই ঝি-চাকরের বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি সব বৃত্তান্ত পরিষ্কার মোটা মোটা হরফে নোটবুকে টুকে রাখছেন।

সবারই তা করা উচিত। পুলিসের তরফ থেকে দীর্ঘকাল আগে এই ধরনের অনুরোধ করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল, নতুন কাউকে রাখলে তার ছবি, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি থানায় দিয়ে আসতে।

*

আমরা যারা কলকাতার অষ্টপ্রহরের বাসিন্দা, টের পাই না শহরের চেহারার কোন অদলবদল হল কিনা। ব্যবহারের অন্য পাঁচটা জিনিসের মত এ-ও চোখ-সহা। অনেক দিন পর যাঁরা কলকাতাকে দেখেন, তাদের কাছে পাওয়া যায় কিছু সঠিক খবর। যা আমাদের দৃষ্টিতে সমালোচনার বিষয়, তাঁদের কাছে অনেক সময় তা নয়।

পুরো তিন বছর বিদেশে কাটিয়ে 'দেশ' পত্রিকার মসকো-সংবাদদাতা বিশ্বজিৎ রায় সম্প্রতি ফিরেছেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল কলকাতার চেহারা নিয়ে। তিনি যা বললেন, তার সঙ্গে আমাদের অনেক চলতি মন্তব্যের বিস্তর তফাত।

বিশ্বজিৎ রায় বললেন, "এবার এসে প্রথমেই মনে হল, কলকাতার মধ্যবিত্তের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে, আগেকার সেই 'রিকেটী' চেহারা তেমন নেই। রাস্তাঘাটের চেহারাও অনেক ভাল। তবে তা সম্ভবত ভি-আই-পি রোডের জন্য অনেকটা। আগে দমদম নেমে যশোর রোড বরাবর আসতেই সব বিস্বাদ লাগত, এবার তা লাগেনি। তাছাড়া, এবারে লক্ষ করলাম, কলকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যে আগেকার সেই ঝাঁঝালো লড়িয়ে মনোভাব

আর নেই। ট্রাম পোড়ানো, বাস জ্বালানো, ধর্মঘট, মিছিল—সব বেড়েছে বটে, কিন্তু সব যেন রুটিনে বাঁধা, ছকে ঢালা। মনে আছে ১৯৫৬ সালে সুরেন্দ্র খানের ঘটনা নিয়ে ছাত্রসমাজে কী উত্তেজনা, কী উন্মাদনা। শুধু রাস্তায় মিছিলে নয়, বাড়িতে, রেস্তোরাঁয় সর্বত্র। আর এখন? কফি হাউসে পর পর দুদিন গেলাম, টেবিলে টেবিলে অতিরিক্ত আলোচ্য বিষয় ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন, শার্টের দর, প্যান্টের ছাঁট ইত্যাদি এবং অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাড়িতেই হিড়িক পড়ে গেছে জমি কেনার। সল্ট লেক, কল্যাণী, ইত্যাদি নাম ঘুরে ফিরে আসে। একেবারে রীতিমত 'ল্যাণ্ড-রাশ।' আগে সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়িতে রেফ্রিজারেটার থাকা ছিল

বিলাসিতা, এখন অনেকে বলেন, 'কিস্তি-বন্দী কিনে ফেললাম, ওটা ভীষণ দরকার।' মেয়েমহলে এবং ছাত্রসমাজে মদ খাওয়ার রেওয়াজটা যেন বেড়ে গিয়েছে। কলকাতায় এসেই অনেক পরিচিত বাড়িতে গিয়েছি, দেখলাম মহিলারাও একটু আমতা আমতা করেই মদের গেলাসে অনায়াসে চুমুক দিলেন। ওটা আর অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নয়। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, তার জানা একটা হোস্টেলের প্রায় সব ছাত্রই নাকি মদ্যপান অপরিহার্য বলে মনে করে। মদ্যপান খারাপ না ভালো, সেই তর্কে যেতে চাই না, আমার মনে হচ্ছে, গত তিন বছরে এফ্লুয়েন্সি বেশ এসে গিয়েছে কলকাতার সমাজে।"

বিশ্বজিৎ রায়ের কথায় আমি মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম, তিনি বললেন, "'এফলুয়েন্সি' ব্যাপারটা হয়ত বাহ্যিক, কিন্তু যাই বলুন, তিন বছর পর আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে।"

✻

সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন মিহির সেন। ঠিক আগেকার মতই হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল চেহারা। না-থাকার মধ্যে চিবুকের সেই দাড়ি। বললেন, "না আর নয়, আমার সাঁতার-দেওয়া এইখানেই ইতি। এখন কেবল নিজের আনন্দের জন্য রোজ সকালে রবীন্দ্র সরোবরের জলে সাঁতার কাটব, বরাবর যেমন কাটতাম।"

জিবরলটার, বসফরাস, দারদানেলিশ, পানামা এত জায়গায় তো সাঁতার কাটলেন, অনেক সম্মান পেলেন এবার, তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কোনটি—প্রশ্ন করলাম শ্রী সেনকে।

বললেন, "এক দেশী ভাইয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। পানামা পাড়ি দেওয়ার পর বিরাট এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ওই দেশে। নানা স্তরের গণ্য-মান্য অসংখ্য লোক হাজির। হঠাৎ দেখি ভিড়ের মাঝখান থেকে আমার দিকে ছুটে আসছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। খাঁটি বাংলায় বললেন, 'দেশের সম্মান আপনি বাড়িয়ে দিলেন, আজ আমার কত আনন্দ।' —কী ব্যাপার, আলাপ করে জানলাম এই মুসলমান বৃদ্ধের দেশ এককালে ছিল হুগলির এক গ্রামে, গত তিরিশ বছর ধরে আছেন পানামায়, এখন ওখানকার নাগরিক, ব্যবসা করেন।"

বললাম, "বাংলা ভুলে যাননি যে।"

তিনি একগাল হেসে বললেন—"মাতৃভাষা কি কেউ ভোলে?"

—চাণক্য

শুধু আমার কাছে কেন, সংবাদ-চিত্র জগতেও এই ছবিটির বিশেষ মর্যাদা আছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শেষ চিহ্ন তাঁর অস্থিভস্ম যখন রাজাজীর হাত থেকে ব্যারাকপুরের গঙ্গার জলে মিশে যাচ্ছিল, তখনই তুলেছিলাম এই ছবি। কিন্তু এই ছবি তোলার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়—ছবি না-তুলতে পারার ব্যবস্থাই হয়েছিল সেদিন। বাধা-আপত্তি এসেছিল কিছু অবিবেচক অত্যুৎসাহী লোকের তরফ থেকে।

তখন সারা দেশ আচ্ছন্ন শোকের গভীর ছায়ায়। পথেঘাটে সর্বত্রই শোকবিহ্বল জনতার নীরব নিস্তব্ধতায় চলাচল। গভীর বিষণ্ণতার ছাপ মুখে ফুটে উঠেছে, দেহে অবসাদ নেমেছে, মনের চিন্তাধারা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যেন দিশেহারা সবাই। এতকাল ধরে যিনি পথ নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ-স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে দিল্লির এক প্রার্থনা সভায়। প্রাণ-স্পন্দন বন্ধ করতে পেরেছে পিস্তলের গুলিতে, কিন্তু পারেনি প্রার্থনা বন্ধ করতে। সেই প্রার্থনা দিল্লির প্রাঙ্গণ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসের স্তরে স্তরে, সর্বত্র কানে ভেসে আসছে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'।

ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে সেদিন জনাকীর্ণ সমাবেশ মুখরিত ছিল প্রার্থনার সেই গীতে। বেদীর উপরে স্থাপিত হয়েছে ভস্মাধার, তারই চার পাশে উচ্চারিত হচ্ছে সর্ব-ধর্মীয় প্রার্থনার মন্ত্র। মাঝখানে অবনত মস্তকে বসে আছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজাজী।

শোকের সময় সবাই নীরবে বসে থাকলে চলে না। এরই ভিতর বহু কিছু করণীয় কাজ সম্পন্ন করতে হয়, এগিয়ে যেতে হয় সময়মত। তাই নানাজন ব্যস্ত নানা কাজে, তার ভিতর দু'একজন অহেতুক ব্যস্ত শুধু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এরা শুধু ছোটে, আর সব কাজেই নাক গলিয়ে বেড়ায়। আমরা কিছু লোক আছি সংবাদ-চিত্র গ্রহণে। ঘুরে ঘুরে আমাদের সবই দেখতে হচ্ছে, আর ছবি তুলতে হচ্ছে প্রয়োজনবোধে। এক সময় আমি দাঁড়ালাম ভস্মাধারটির কাছে। ক্ষণিকের জন্য মনে এল —এরই ভিতর আছে একটি মহাজাতির পথ-প্রদর্শকের শেষ চিহ্নটুকু। এই তো সেই মহাত্মা গান্ধী, যিনি পরাধীনতার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটাতে—

না, এখন এ সব চিন্তায় জড়িয়ে পড়লে চলবে না। এ চিন্তাধারার শেষ খুঁজে পাব না। এখনো আমার কাজ বাকী আছে। চিন্তা করতে হবে—কীভাবে অস্থিভস্ম বিসর্জনের ছবি তুলতে পারব।

এগিয়ে গেলাম গঙ্গার ঘাটের দিকে। খোঁজখবর নিয়ে বুঝলাম রাজাজী লঞ্চে করে কিছু দূরে গিয়ে অস্থিভস্ম বিসর্জন দেবেন গঙ্গায়। এপার থেকে সবাই তাই দেখবে। তাই না হয় সকলের হল, কিন্তু আমার ছবি তোলা? এ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে দারুণ

আপত্তি এল সেই অহেতুক বাক্যবাগীশদের কাছ থেকে—না, ফোটোগ্রাফারদের লঞ্চে যেতে দেওয়া হবে না। এপার থেকেই ওরা ছবি তুলবে।

সংবাদ-চিত্র গ্রহণকালে ফোটোগ্রাফাররা কোন বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। বাধা পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়—এটাই সংবাদ-ফোটোগ্রাফারদের ধর্ম। স্বভাবতই আমি একটু ক্ষুণ্ণমনে আমার সমস্যার কথাটা উপর-মহলে জানালাম। তখুনি স্থির হল আমাকে যেতেই হবে রাজাজীর সঙ্গে। এতে কারো ওজর-আপত্তি চলবে না। ব্যস, এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইলাম সময়মত সুযোগের অপেক্ষায়।

যথা সময়ে যথারীতি রাজাজী ভস্মাধার হস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন বিশিষ্টজন সারিবদ্ধ ভাবে। সেই সারিতে এক সময় আমিও মিশে গেলাম। একে একে সিঁড়ি দিয়ে সবাই লঞ্চে উঠছেন, আমি সিঁড়িতে পা দিয়েই লক্ষ করলাম সেই আপত্তি-মহাশয়রা আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁরা উপায়হীন।

নিমেষেই লঞ্চ চলে গেল কিছু দূরে। শোকাতুর রাজাজী কম্পিত দেহে উঠে দাঁড়ালেন ভস্মাধার হস্তে। থরথর করে হাত কাঁপছে, দেহ যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়। কয়েকজন তাঁকে প্রায় আঁকড়ে ধরে রইলেন, আস্তে আস্তে তিনি ভস্মাধার উপুড় করে বিসর্জন দিলেন অস্থিভস্ম।

চিত্রগত কাহিনীর শেষ চিত্র মহাত্মার শেষ-চিহ্নের ছবি। এ ছবির কাহিনী স্মরণ করতে গিয়ে আমার আর একটি কথা মনে আসে। ১৯৩৪ সালে গৌহাটি রেল-স্টেশনে মহাত্মার সম্বর্ধনার ছবিই ছিল আমার প্রথম সংবাদ-চিত্র। সেটি ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়।

সমাপ্ত

—নীরোদ রায়

চিত্রপ্রদর্শনী

জ্যোতিরিন্দ্র রায় ও বম্বে স্কুল অফ বাটিক পেন্টিং : ফাইন আর্টস ভবন

যে সকল কাজ ক্রমাগতই আমরা ধৌত পদ্ধতি অথবা সাদা দেশীয় কায়দায় নির্মিত এতাবৎ দেখে এসেছি, জানি—ঠিক সেই রকমের কাজ আর এক অন্য বনেদে কি যে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে, সম্পূর্ণ নূতনভাবে দেখা দিতে পারে, তা না পর্যবেক্ষণ করলে সম্যক অনুধাবন করা দুষ্কর। এখন কাজ বলতেই আমরা চিত্রগত বাস্তবতাই মনে করেছি, যেটা এক বিশেষ ধ্যান-ধারণার প্রকাশিত তত্ত্ব, এতে তার অবয়ব, কারসাজ অর্থাৎ ছন্দিত মানসিকতার সব-কিছু আছে—যা তার আঙ্গিক।

বাটিক হচ্ছে সেই বনেদ। এখানে বাঙলা-শিল্পধারার একটা আদল আছে সত্যই, কিন্তু চির পরিচিত রেখা, এমন কি প্রাচীন ভারতীয় রেখা এখানে আর এক ভাবে জাগ্রত, রঙ সম্পূর্ণ চমকপ্রদ ভাবনায় আরোপ করা হয়েছে; প্রতিটি নিদর্শনেই আধুনিক শিল্পের চিন্তার বিশেষত্ব, গুণ আমরা বুঝতে পারি।

কিন্তু কোথাও কোন রীতির গতানুগতিক অনুসরণ করা হয় নি। তার কারণ জ্যোতিরিন্দ্র রায় ভারতীয় পদ্ধতির সূক্ষ্মতা সম্পর্কে বেশ ভালভাবে অবহিত। তিনি তুলি চালনায় একজন সুকৌশলী শিল্পী ও দেশ-বিদেশের শিল্প-ধারা বিষয়ে পরিজ্ঞাত। এবং এই নূতন বনেদে তিনি নিজের সারা জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিস্ময়করভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

এতে করে যে কোন চিত্র-বিলাসীদের এই বিশ্বাস হবে যে, যাঁরাই ভারতীয় প্রাচীন থেকে বাঙলা-ধারা, তার লোক শিল্প নিয়ে রীতিমত হাতে কলমে কাজ করেছেন, তাঁরাই সত্যই নূতন কিছু সৃষ্টি করবার যোগ্য, একমাত্র তাঁদেরই দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব।

জ্যোতিরিন্দ্র রায় একাধারে যেমন শিল্পী তেমনি তাঁর হাতের কাজেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল বলেই আজ আমরা বাটিকের এই রূপ দেখতে পাচ্ছি। যাঁরা প্রায় জি সি লাহার দোকানে বাটিকের রঙের ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করেন, শাড়িতে কাজ করার জন্য, তাঁদের এই প্রদর্শনী দেখলে স্বতঃই মনে হবে—এমন একটা সাদামাটা-বনেদকে নিয়ে কি খেলা-খেলা করেছেন! শুধু কলকারী আর পাখিরই নকশা তুলেছেন। কখনও দেখতে চান নি বাটিক তার মোমের ফাটলে নিয়ে কি খেলা দেখাতে পারে! বিভিন্ন রঙের আরোপে।

মোমের ফাটল জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের নিজের

সম্পাতি   শিল্পী : জ্যোতিরিন্দ্র রায়

কাজে ত বটেই, তা ছাড়া তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাজেও অনস্বীকার্য টেকসচার তৈরি করেছে। কখনও তা আশ্চর্যরূপে প্লেন হয়েও দেখা দিয়েছে; একই ছবিতে কখনও বা নিছক ডেকরেশন ইঙ্গিত করে, চিত্রগত ফ্যানটাসী—রূপকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। যথা আশা মেট্টার ফিশার উয়ুম্যান অথবা রেখা জেসানীর রকস পিচার, কুসম মেটার হোরস্কোপ ও ইন্দিরা জাভেরীর ইজিপ্সীয়ান জারস।

জ্যোতিরিন্দ্র রায় আশা করেন, এটা তাঁর সংস্কার যে, বাটিক কাপড়ে ক্যানভাসে চিত্র-শিল্প এতাবৎ যে মান পেয়েছে, ঠিক সেই মান অর্জন করবে। তাঁর প্রবর্তিত ধারায় সে কথা বিশ্বাস হয়। এই সূত্রে বলা যায়, একদা কাগজ ক্যানভাস কিছু ছিল না, ছিল দেওয়াল; দেওয়ালের মনোভাব যদি কাগজে আবিষ্কৃত বোর্ডে মানান যেতে পারে, তাহলে এটাই বা নয় কেন?

এক একটা ছবিতে তাঁকে চারবার পাঁচবার সঠিক রঙের জন্যে ডি-ওয়াক্সিং করতে হয়েছে, কোথাও একমনে এচিং করতেও বহু সময় গেছে। তবেই যে রঙ যে ছবি আমরা দেখছি তা নির্মাণ হয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলেই সাদামাটা কাপড় না ব্যবহার করে এখানে সিল্কের উপর কাজ করে যেতে পারতেন, তাতে সিল্কের প্রকৃতিগত জৌলুস রঙকে চাকচিক্য দিতে প্যারত, কিন্তু সমস্ত কিছু প্যাটার্নে পরিণত হত—তা তিনি করেন নি, কাগজের গাম্ভীর্যের জন্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রঙকে তিনি গঠন করে স্পন্দিত করেছেন এটাই তাঁর অভিনবত্ব।

তাঁর নিজের ক্ষমতা তাঁর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ব্যপ্ত হয়েছে। কুসুম মেটা, ফ্রুট দি এনচানটারও নন্দবাবুর 'অভিসারিকার' অনুকৃতি; বিন্দু জাভেরীর, এট দি উইনো; ইন্দিরা জাভেরীর ইজিপসীয়ান জারস-এর সাদা ব্লিচিং আমাদের ভাল লাগে। এবং জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের দি উইল অব দি ফ্যামেলী একটি সৃষ্টি।

জহরলাল নেহেরুর আলেখ্য—একাডেমী স্টুডিওর শিল্পীবিজয় কৃত : ফাইন আর্টস ভবন।

এখানে সব শুদ্ধ ৩১খানি জহরলালের আলেখ্য, যদি বলা যায়, ছিল। কখনও তিনি মাইকে, কখনও তিনি জেলে বন্দী, কখনও তিনি নিজের পাঠাগারে এবং কখনও তিনি জুতে নিরীহ পশু পাখিদের মধ্যে। তাঁর চিহ্নস্বরূপে আইডেনটিটি বিশেষত টুপিতে, চোস্ত পায়জামা, সেরোয়ানী, এবং নমস্কার কোথাও কচিৎ বার্ধক্যের রেখায় ওতপ্রোত। তবু বলতে হবে কোথায় যেন একটা মুখের ভাবে মিল আছে। এই ছবিগুলি শিল্পরা ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে এঁকেছে, প্রায়ই প্যাস্টেলে। যারা ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে নি, তাদের কাজ পেন্সিলেই রয়ে গেছে। তবে এদেরই করা গতবার যেমন গোলাপের ধুম দেখেছিলুম এবার তেমন-ধারা নেই।

আরতি মুন্নার (৬)/২২নং ছবিটি অদ্ভুত হয়েছে, মহালক্ষ্মী রাওর (৮/১১ নং) জুতে জহরলাল, একটা সারসকে খাওয়াচ্ছেন। দেবারতি দাসের রঙ বেশ ভাল।

শীলা সুবরওয়াল-এর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন ॥

এক সময় হয় যে প্রসিদ্ধ আশ্চর্য মানসিকতা, দারুণ উপলব্ধি কতক নিষ্ঠাহীন চিত্রকরের হাতে নেহাতই বিশ্রী ছেলেমানুষী হয়ে দেখা দেয়। বর্ণগত ভাব ও জবাব ভঙ্গসহ রেখার অমোঘ চরিত্র কিছুই সেখানে থাকে না, শুধুই, ফ্রেমই এ ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। এতে করে হয় কি, সেই ধরনের আধুনিকতার উপর, সাধারণের আর বিশ্বাস আসতে চায় না, সবই যেন একটা গ্রাম্য মস্করা।

শীলা সুবরওয়ালের কাজগুলি দেখলে স্বতঃই মনে হবে যে, তিনি আধুনিকতার উপর বিশ্বাসকে নিজের প্রাণের সুমীমাংসিত টানে, রঙের যথার্থ সমঝে পত্তন করতে চাইছেন, বিশেষত—যথা স্টাডি (৩৯নং), সারা ছবি জুড়ে একটি রমণী দেহ—এ'টি আসীনা, রেখা আর বর্ণ নিয়ে একটা বাস্তবতা গড়ে উঠেছে।

এখানে ছবির এক কোণ থেকে অপর কোণে, অর্থাৎ হাতের আঙুলের নীচে কালচে বেগুনীর জবাবে উপরে ফলসা এবং আর এক পাশের ফিরোজার তারতম্যের অন্তর ইতিমধ্যে শুক্যর এবং সরু মোটা রেখার ব্যবহারে বর্ণিকাভঙ্গে বুঝায় যে, ছবিটি স্পর্শন প্রত্যক্ষ থেকেই এসেছে। সমস্ত অবয়বে একটি ডৌলত্ব।

ঈদৃশ চেষ্টা নিতান্ত কর্তব্য অনুরোধেই যে করেছেন, তা নয়। আধুনিকতাকে তিনি জানতে চেয়েছেন, বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, নিজের শক্ত মনোদরূপে কাজে লাগাবার জন্যে—যেহেতু তাঁর বস্তুত্বকে আরোপ করার অবশ্যই ভাবনা আছে এবং যাতে সেই

স্টাডি শিল্পী : শীলা সুবরওয়াল

আরোপ নিছক প্যাটার্নে পরিণত না হয় সেটাই তাঁর বিশেষ চিন্তা।

তিনি ছবিময় একটি ছন্দ নির্মাণ করতে অভিলাষী। আমরা জেনেছি যে, ছন্দকর্মে সমস্ত স্থানে কোন চিরাচরিত গভীরতার বিদ্যমানতা থাকে না; সেখানে পরিপ্রেক্ষিত বা বাঁকা (সুইপ) রেখা অন্যান্য রেখার ঘোরে অদৃশ্য হয়ে যায়; তাই তিনি সম্প্রতিকার শিল্প মানসে যে কাজ করেছেন সেখানেও ঐ দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত সাবেকী ছাড় নেই—সমগ্র ছবিতে একটি অবয়ব ব্যক্ত—এই কৌশলেই তাঁর নিজস্ব ভাবনা আরোপ করা হয়েছে। যথা ২৯নং সাথী।

বংশী পারিমু-র চিত্রপ্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

অনেকে সমালোচনায় 'আনারসী' বলেন, ঠিক সেই ধরনের নিদর্শন কিছু বংশী পারিমুর সম্প্রতি প্রদর্শিত ৪২ খানি ছবিতে নেই। এগুলি সবই নিরবয়ব ধর্মী। দর্শককে এই সব ছবি জেনা-জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় না। এই প্রসঙ্গে একটু গল্প করা যায়।

একদা ফ্রসোয়াজ জিলো নাম্নী যুবতী পাবলো পিকাসোর প্রণয়িনী ছিলেন। এই যুবতী নিজেও চিত্রকর্মে বেশ পারদর্শিনী। নানা চিত্রধারা অনুসরণের পর কিছুকাল তিনি নিরবয়ব ছবি আঁকতে থাকেন। একদিন যুবতীর দিদিমা তাঁর ঐ নূতন কাজগুলি দেখে বলেছিলেন, 'তুমি যে এতদিন ধরে যে সব কাজ করেছ দেখেছি... তার আমি কিছুই বুঝিনি.. এগুলো যদিও বুঝি না তবু ছবিগুলো বেশ...আনন্দ হয় দেখলে (প্লিজিঙ)...এখানে রঙের হারমনি.. কেয়ারি আমি দেখি...এগুলোতে প্রকৃতিকে তুমি দুমড়ে মুচড়ে দাওনি...তাই বেশী ভাল লাগে......' এই মন্তব্য যুবতী পিকাসোকে বলাতে তিনি হেসে বলেন, '...অবশ্যই.. নিরবয়ব চিত্রণ কোনক্রমেই ভোলমোচা (সাবভারসিভ) করে না...যদি লোকের দেখা স্বভাব আর তোমার ছবির মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তাদের মনের উপর তুমি কোন রেখাপাত করতে পারবে না..... অবশ্যই চিত্র-সমঝদারদের কথা বলছি না.. আমি সাধারণ লোকের কথাই বলছি...যাদের দেখার স্বভাবটা নিছক কনভেনশ্যনাল..... লোকে গাছটাকে একভাবে দেখবে যেমনভাবে তার স্বভাব ছেলেবেলা থেকে গড়ে উঠেছে. কিন্তু যে লোকের চোখ তৈরি (কাল্টিভেটেড) এক্সীর দৃশ্যকে সেজানের...আরল-এর দৃশ্যকে ভ্যান গগের মত দেখবে...' (পৃঃ ৬৪ লাইফ উইথ পিকাসো)

অতএব সঠিক সমঝদার না হলে বংশী পারিমুর 'প্রগ্রুডিং রেড'কে দেখতে পাওয়া দুষ্কর, কিংবা 'আফটার ক্লাটার' অথবা অয়াটম্‌নাল স্পিরিট'। এ কথা কখনই মনে হবে না যে, অবয়ব আঁকতে কৃতকার্য না হওয়ার ফলেই তিনি এই পথ নিয়েছেন। কোন বিচক্ষণ দর্শকের কাছে তাঁর বুনটক (টেকস্চার) চোখে পড়বে। আমরা বহু নিরবয়ব কাজ দেখেছি কিন্তু এরূপ হ এক আধ জায়গায় ছাড়া সাক্ষাৎ পাইনি পারিমু এখানে সব সময়ই চেয়েছেন নিরবয়ব বলেই যে একটা প্যাটার্নে পরিণতি হবে এমন নয়, একটা নঞর্থক (নেগেটিভ) ভাবে সমস্ত সংস্থান গড়ে উঠেছে, নাটক সৃষ্টি করেছে—যে সমগ্র ছবি একটা কেয়ারি হয়ে দেখা দিলেও, আদতে ঐরূপ, পরিদৃশ্যমান তার সঙ্গে চিত্রে রঙের স্বচ্ছ আর এক চেহারা দিক।
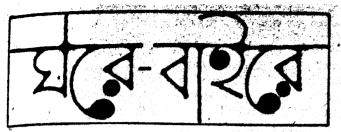
ত মাসখানেকের মধ্যে বিদেশের মাননীয় অতিথি এসেছেন গিয়েছেন অনেক। ার মধ্যে বিশ্ব গার্ল গাইড প্রধান লেডি ্যডেন পাওয়েল এবং লাওসের যুবরানী ানিলে আমাদের মহিলা সমাজের মনে াখাপাত করে গিয়েছেন। লেডি বেডেন াওয়েল এসেছিলেন "সংগম"-এর উদ্বোধন রতে। "সংগম" বিশ্ব গার্লগাইড কেন্দ্র ্সাবে গত ১৬ই অক্টোবর পুনায় ান্‌ষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত হয়েছে।

বয়েজ স্কাউট আন্দোলনের সার্থক িমকার প্রেরণা পেয়ে ১৯১০ সালে গার্ল-াইড আন্দোলন আরম্ভ হয়। বছর রেকের মধ্যে বিশ্বের বহু দেশে গার্ল গাইড ংগঠন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯২৮ সালে িভিন্ন দেশের জাতীয় গাইড সংস্থা একত্র র একটি বিশ্বসংস্থার পত্তন করে। সেই শ্বসংস্থার মূল কার্যালয় বর্তমানে ডনে।

গার্ল গাইডদের পরস্পর ভাব ও প্রীতির াদান-প্রদানের জন্য প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত া সুইজারল্যাণ্ডে। "Our chalet" এই ম দিয়ে ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন া। সুইজারল্যান্ড-এর অ্যাডেলবোডেন, রের এই বাড়িটিও এক মহিলার দান। ষ্টন শহরে শ্রীমতী স্টেরো বাড়ির িলক ছিলেন। অ্যাডেলবোডেনে দেশ-েদশের মেয়েরা এসে অল্প খরচে থাকতে র, মেলামেশা দেওয়া নেওয়ার সুযোগ র। এর পরের কেন্দ্রটি স্থাপিত হলো ডনে। লণ্ডনের কেন্দ্রের নাম ছিল ur ark"। এখন তার নাম হয়েছে ওলাভ উস। অল্পদিনের জন্য লণ্ডনে এসে র্ গাইড বা গার্ল স্কাউট ওলাভ হাউসে ান্য খরচে থাকতে পারেন। এর পর ক্সিকো কেন্দ্রের নাম হলো "Our bana"। ১৯৫৭ সালে Our bana-র পত্তন হয়। সব কেন্দ্রে ফারেন্স, সেমিনার, ট্রেনিং কোর্স ইত্যাদি গই থাকে। তাছাড়া, গার্ল গাইড-এর রা ছুটি উপভোগ করতেও আসেন। তও দেশ-বিদেশের ভাবধারার আদান-ন যথেষ্ট হয়ে থাকে।

উরোপ ও আমেরিকার পর এশিয়ার ্ স্থাপনের কথা হয়। ১৯৫৬ সাল ক জল্পনা-কল্পনা চলে, তবে তার নিশ্চিত সংকল্প হয় ১৯৬০ সালে ডেনমার্কের বিশ্বসভার অধিবেশনে। পুনাতে "সংগম" এশিয়ার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে ঠিক করা হলো। সংগম হবে মহামিলনের তীর্থ। বিভিন্ন কৃষ্টির ধারা এসে মিশে যাবে ভারতের মহাতীর্থে। আর তিনটি কেন্দ্রের মত সংগমও হবে বন্ধুত্ব ও প্রীতির মাধ্যমে শিক্ষার উৎস ও উৎসাহ।

বিশ্ব সংস্থার তরফ থেকে সংগমের জন্য যে প্ল্যানিং কমিটি হলো, তাতে শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার হলেন চেয়ারম্যান। সভ্যারা সবাই এশিয়াবাসিনী' আরব, সিংহল, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধি কমিটিতে এলেন।

মহারাষ্ট্র সরকার সংগমের গৃহস্থাপনের জন্য সাড়ে সাত একর জমি দিলেন। দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে, পুনা অতি সুন্দর শহর। বোম্বাই থেকে পশ্চিমঘাট পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ১২০ মাইল মাত্র। ট্রেন, মোটর বা বিমানে যেভাবে ইচ্ছা যাওয়া-আসা চলে। পুনের জেল [illegible] থেকে [illegible] মাইলের বেশী হবে না। [illegible] দেশের মেয়েদের পক্ষে পুনার জল-হাওয়া চমৎকার। মুঠা ও মুলা দুটি নদীর উপর পুনা শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চতায় না ঠাণ্ডা না গরম—প্রায় চিরবসন্ত।

সংগমের বাড়িটিতে ৬০টি মেয়ে থাকতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রচুর তাঁবু খাটানো চলে। সংগম পরিকল্পনায় ব্যয় হবে প্রায় দশ লাখ টাকা। তার মধ্যে তিন লাখ কেন্দ্রীয় সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকারের মিলিত দান। বাকী অর্থের অনেকটা আসবে অন্যান্য দেশ থেকে। যে দেশের অর্থে সংগমের যে অংশ গড়া হবে সে দেশের ধরনে সাজানো হবে সেই অংশ।

সংগমের ভার নিয়েছেন শ্রীমতী অনসূয়া করকরে। এতদিন তিনি ছিলেন এশিয়া অঞ্চলের ভ্রাম্যমাণ কমিশনার বা Travelling Commissioner। এখন হলেন সংগমের Guider-in-Charge।

সংগমের লক্ষ হবে গার্ল গাইড ও গার্ল স্কাউট আন্দোলনের মূল সম্বন্ধে সচেতনতা প্রসার করা এবং দেশের এবং দেশ-বিদেশের মেয়েদের সখ্যসূত্রে বাঁধা। সংগমের সুন্দর গৃহটির সামনে মুক্ত বন্ধ মূর্তিটির বাণীও সেই মৈত্রীর। চার দিকে সবুজ ছায়াঘেরা গাছপালা, পিছনে স্বচ্ছতোয়া পাহাড়ী নদী যেন

যুবরানী আনিলে লাওসের ভিয়েনতিয়ানে ভারতের দেওয়া ভারত লাওস মৈত্রী হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন। সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতপত্নী শ্রীমতী সান্যাল ও কর্নেল মুখার্জী (হাসপাতালের অধ্যক্ষ)

[illegible] প্রতীক হয়ে আহ্বান করছে [illegible], সকল দেশের মেয়েকে। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে তবেই তো সার্থক হবে সব পরিকল্পনা। বিভেদ বিধ্বস্ত দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় কথা আর কিছুই হ'তে পারে না।

এই সখ্যসূত্রের সন্দেশ নিয়েই লাওসের যুবরাজ ও যুবরানী ভারতে এসেছিলেন লেডী মেডেন পাওয়েলের পরেই। লাওস এককালে শ্যাম দেশের অধীন হয়ে যায়। তারপর ইন্দোচায়না সৃষ্টিতে ফরাসী সাহায্যে শ্যাম দেশের প্রভুত্ব পাল্টে যায়। ফরাসী ইন্দোচায়না ভেঙ্গে যখন ভিয়েৎনাম, ক্যাম্বোডিয়া ও লাওস গঠিত হয়. তখন লুয়াং প্রবাংএর রাজাকে লাওসের রাজা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

লাওস ছোট্ট দেশ। উত্তরে চীন, পূর্বে ভিয়েৎনাম, পশ্চিমে বর্মা ও থাইল্যান্ড আর ক্যাম্বোডিয়া ঘেরা লাওসের যুবরানী কিন্তু ভারতবর্ষের মেয়েদের মন ভুলিয়ে গেছেন। মিষ্টভাষিণী প্রাচ্য নারীর সরল আচরণ পদে পদে তাঁকে অনাড়ম্বর প্রীতিতে সবার সঙ্গে সমান করে দিয়েছে। কলকাতায় দিনতিনেকের বেশী ছিলেন, কিন্তু মহিলা

প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের অবকাশ তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনার মামুলি কেতায় স্থান পায়নি। আমাদের সরকারী ব্যবস্থার কাছে এইটুকু অনুরোধ যে, মহিলা অতিথি যাঁরা আসেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মহিলা সমাজের একটা যোগাযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সখ্যবন্ধনে তাতে সাহায্য হবে। নারীর সমস্যা, বিশেষত এশিয়াবাসিনীর সমস্যা প্রায় সর্বত্রই এক।

লেডি বেডেন পাওয়েল ও তাঁর দক্ষিণে কলকাতার গাইড কমিশনার শ্রীমতী মঞ্জিলা দত্ত

বিশ্ববিজয়িনী

"ধরাতলে রূপসী কে সবাকার চেয়ে"? কঠিন প্রশ্ন। বিশেষ করে দু মাস চার মাসের তফাতে যখন রূপের রানী নির্বাচন করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার মিয়ামি সাগর সৈকতে রাজধানীর রূপসী ইয়াস্মিন দাজী গিয়েছিলেন ভারত সুন্দরী হিসাবে। আবার সম্প্রতি বোম্বাইবাসিনী গোয়ান রূপসী রীতা ফারিয়া গেলেন লণ্ডনে। লণ্ডনের উৎসবে আনন্দের বিষয় হ'য়েছে ভারত-সুন্দরীর বিশ্ববিজয়। বড় বড় পণ্য-প্রতিষ্ঠান আর কাগজওয়ালারা মিলে প্রচারের সৌন্দর্যপূর্ণ পথটি বেছেছেন চমৎকার!

রীতা ফারিয়া বোম্বাইতে ডাক্তারী পড়েন। বিজ্ঞাপন দেখে খেয়ালের মাথায় সুন্দরীবরণ প্রতিযোগীতায় সামিল হ'য়েছিলেন। ভাবেন নি সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তিনি। আগামী জুন মাসে তাঁর বিয়ে। ভাবী স্বামী বাংলা মুলুকে চা-বাগানে কাজ করেন। নাম তাঁর অসবোর্ন লোবো। বরণ উৎসবের পরই যখন লণ্ডনে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছিল, তখন রীতা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, উৎসবের ঝামেলা চুকলেই একেবারে ডাক্তারী কেতাবে ফিরে যাবেন। ডিগ্রি পরীক্ষার অল্প বাকী। তারপর শোনা গেল দেশবিদেশে ভ্রমণের সুযোগটুকু সেরে তবে বই আর বরের কাছে আসবেন। ছায়াছবিতে অভিনয়, দেশবিদেশ ভ্রমণ সবই বিশ্বসুন্দরীর প্রাপ্য। ফিল্ম সম্বন্ধে রীতা ফারিয়া প্রথম থেকেই অস্বীকার করে যাচ্ছেন। অভিনয় তাঁর পথ নয়। ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে স্ত্রীরোগের চিকিৎসাই

বিশ্বসুন্দরী রিতা ফারিয়া

এক সম্বর্ধনা উৎসবে নৃত্যরত রিতা

তাঁর পেশা হবে মনে করেন।

রীতা ফারিয়া প্রথম ভারতীয় বিশ্ব-সুন্দরী। বয়স তাঁর ২৩ বৎসর। ৬১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার শ্রীমতী লিকিকা মারিনোভিক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

শ্রীমতী ফারিয়ার কথাবার্তায় পশ্চিমী সাংবাদিক দল নাকি মুগ্ধ হয়েছেন। বিশ্বসুন্দরী যে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, রসিক হবেন এমনটি সাধারণত কেউই আশা করে না। বিশেষ করে তিনি যে আবার ডাক্তারী পড়বেন, কাজকর্ম করবেন এই সব ইচ্ছা তাঁকে আরও আকর্ষণীয়া করে তুলেছে। পুরস্কারের টাকা পঁচিশ শ' পাউন্ড দিয়ে কি করবেন তাও ঠিক করতে পারছেন না। সে ব্যাপারেও সাংবাদিকদের শেষ পর্যন্ত বলেছেন আমাদের দেশের তো অনেক বিদেশী মুদ্রা দরকার। পঁচিশ শ' পাউন্ড তো ঘরে এল।

শ্রীমতী ফারিয়া উৎসবান্তে কিছুক্ষণের জন্য রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক। এ খবরও জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে!

টুকিটাকি

অধরকোণের রূপ নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য থেকে আজ পর্যন্ত কতই না বর্ণনা হয়েছে। "দন্তরুচি কৌমুদী" কিন্তু ঠিক সেই সমাদর পায়নি। বরং আধুনিক দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে দাঁতের সৌন্দর্যের সমালোচনা হয় বেশী। অথচ দাঁতের সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যের উপর কেবলমাত্র রূপ নয়, শরীরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। দাঁতের যত্ন সম্বন্ধে উদাসীন রঞ্জিত অধরোষ্ঠের ম্লান বিবর্ণ হাসি কখনও লক্ষ করেছেন কি?

দাঁতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীনতার প্রথম লক্ষণ খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ভাব। আমাদের লোককথায় বলতো প্রতি গ্রাসে মাছের মুড়ো খাওয়া ভাল। আসলে ছোটমাছ হাড়শুদ্ধ চিবিয়ে খাওয়ার প্রচ্ছন্ন উপদেশ মাত্র ছিল। আধুনিক চিকিৎসায় পাশ্চাত্ত্য জগতে এই সামান্য সত্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দন্তরোগ বা দুর্বল মাড়ি ও দাঁত বংশগত কিনা, পরীক্ষা করলেন সুইডেনবাসী ডাক্তার আলফ্রেড আণ্ডলার। নিজের ও স্ত্রীর দাঁত ছিল রুগ্ন। ছেলেমেয়ের বেলায় হাড়শুদ্ধ সার্ডিন মাছ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যে সংযোগ করার ব্যবস্থা করলেন। সুস্থ, সবল ও সুন্দর দাঁতের অধিকারী হয়ে শিশুরা বড় হলো।

দাঁত দেখতে কঠিন ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু দাঁতেরও খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজন। চারা-গাছের মত দাঁত জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে শিকড়ে। পরে তা ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন অংশে। দাঁতের জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন, এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু ভিটামিন "ডি" না হলে ক্যালসিয়ম যতই থাকুক, শরীরে তা গ্রহণ করা যাবে না। ভিটামিন "এ"-র প্রয়োজন দাঁতের কঠিন আবরণকে শক্ত ও শুভ্র রাখতে। ভিটামিন "C" চাই Collagen নামক এক পদার্থের জন্য। এই কোলাজেন সাহায্য করে দাঁতের কাঠামো গঠনে। চোয়ালের হাড়, যাতে দাঁতের পাটি বসানো, তার জন্যও ক্যালসিয়াম এবং ফস্ফোরাস যথেষ্ট প্রয়োজন।

দাঁতের কিছু নিয়মিত এক্সারসাইজ বিশেষ দরকার। তাতে মাড়ির রক্ত-সঞ্চালন হয়, দাঁত দৃঢ় হয়। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাওয়া দাঁতের শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। আমরা যতই সভ্যতার সংস্পর্শে রান্না-করা নরম খাবার খেতে শিখছি, দুনিয়ায় দন্তরোগ ততই বাড়ছে। শক্ত পেয়ারা, আম ইত্যাদি খাওয়া ভাল। রক্ত-সঞ্চালন হয়, মাড়িতে রক্ত-সঞ্চালনের ফলে মাড়ি ও দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল হয়, মুখে লালা বেশী আসে। লালাতে বীজাণু নষ্ট করে। আগে আমরা কুমড়ো বীচি, তরমুজের বীচি ভেজে খেতাম। এইসব সাধারণ আটপৌরে খাবার যে কত উপকার করতো, তা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

অসমান বা তেমন সুদৃশ্য নয়, এরকম দাঁত আজকের চিকিৎসক সহজেই সাজিয়ে সুন্দর করে দেন। নানাভাবে বন্ধনী দিয়ে, মালিশ ইত্যাদি ব্যবস্থায় অল্প বয়সে অনায়াসে সুন্দর দাঁত করা যায়। অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ব্যবস্থা কঠিন নয়। সামান্য একটু দাঁতের পরিবর্তনে সমস্ত মুখের গঠন ও সৌন্দর্য বদলে যেতে পারে।

ভাবী মা যদি সন্তান জন্মের আগে দাঁতের যত্নের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলেন, তবে সন্তান সুস্থ দাঁত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। মাতৃগর্ভে চতুর্থ মাসে শিশুর দাঁত গঠিত হয়। জন্মের পর যে দাঁত-ওঠা আমরা দেখি, সে দাঁতের মাতৃগর্ভে সূচনা হয়। যত দিনে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, কুড়িটি দাঁত তার মাড়িতে লুকিয়ে থাকে। দাঁতের পক্ষে উপকারী, এমন খাদ্য গ্রহণ করলে সন্তানের সবল বলিষ্ঠ দাঁত তো হবেই, জননীরও দাঁতের উপকার হবে।

চিঠির উত্তর :

সম্প্রতি কয়েকখানা চিঠি আমরা পেয়েছি। অনেকের ঐ সমস্যা এক ধরনের। এ-জন্য ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিলাম না। কোথাও কাটা দাগ, গভীর বলিরেখা, ত্বকের কুঞ্চনজনিত চিহ্ন ইত্যাদি যদি সৌন্দর্যের অন্তরায় হয়ে মানসিক অশান্তির কারণ হয়, তবে তার প্রতিবিধান আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির দ্বারা হতে পারে। ধরুন, এককালে নাকচাবি ব্যবহার করেছেন কেউ, এখন করেন না। ফুটোটি রাখতে চান না। শল্য চিকিৎসায় বেমালুম ফুটো মিলিয়ে যাবে। দাগ থাকবে না। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শল্য চিকিৎসা পাশ্চাত্ত্য দেশে ও জাপানে প্রচুর প্রসার লাভ করেছে। আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় রূপ চর্চার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সাধারণের দৃষ্টিও এদিকে কম। সামান্য টুকিটাকি অদলবদলে হয়তো অনেক খরচা হবে না, কিন্তু প্রথম প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। নিজে হাতে কোন রকম খোঁচাখুঁচিতে উল্টো ফল হতে পারে। যাঁরা বড় শহরে বাস করেন, তাঁদের পক্ষে সরকারী চিকিৎসকের বা বেসরকারী বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কঠিন নয়। কলকাতায় প্লাস্টিক সার্জারির বিশেষজ্ঞ আছেন। শেষ পর্যন্ত যাঁর প্রয়োজন, তিনি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।

মস্কোতে পর্যন্ত নাকি গোর্কি স্ট্রীটের কসমেটিক ইনস্টিটিউটে খাঁদা নাক টিকলো হয়, অধরোষ্ঠ বিম্বসদৃশ করা হয়, ক্ষতের দাগ মিলিয়ে যায়। জাপানে তো প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। এমনকি, চোখের উপর নীচে ছুরি চালিয়ে মার্কিন রূপসীর নকল করা হয়। খরচাও সেখানে বেশী নয়। আমাদের রূপচর্চা এখানে পৌঁছোতে হয়তো দেরি আছে, তবে ছোটখাটো খরচা তো রূপের জন্য অনেকেই করেন। এটাই বা বাদ যাবে কেন?

শ্রীমতী

ত্রিলোচন কলমচি

'হট্'প্ল্যাণ্ট

রাতের ইস্পাত কারখানায় শেষ পর্যন্ত নাক গলাতে পারব ভাবি নি, ন্যাশনাল এমার্জেন্সির পর থেকে কারখানায় ছুঁচোটি গলবার উপায় নেই। তার উপর রাতের কারখানা সেটি ত তামাশার বিজনেস নয়! উইমেন অ্যান্ড আউটসাইডার আর নট অ্যালাউড। বি-শীফট থেকেই প্ল্যাণ্ট নারী-বিবর্জিত, নাইট শীফটে বুকের গোপন লকারে রাখা ফটোগ্রাফ ছাড়া অন্য কোনো রমণীমূর্তি নেই। এহেন মারাত্মক মুহূর্তে, প্ল্যাণ্ট স্টাফেরাই যখন আই-সি (আইডেনটিটি কার্ড) শো করতে করতে হাতে কড়া পড়ে যায়, তখন আমার মত ফলস্ স্টাফের হাতকড়া পরার সম্ভাবনাই তো বেশী! তবু কায়ক্লেশে সেঁধুলাম।

কিন্তু ভিতরে ঢুকেই বিস্ময়ে ট্যারা, আই বাপ্! পদব্রজে এই পেল্লায় কারখানা দেখা তো আমার মত দ্বিপদ জীবের কম্ম নয়। তাও আবার একরাতের সিঁধেল চোর। অবশ্য ভাবনার নিরসন হল। দূর সম্পর্কের একটি শ্যালককে আবিষ্কার করে ফেললাম অচিরেই। তিনি আবার বাইপ্রোডাকট ফোরম্যান, দূরপাল্লায় বেরিয়েছেন। জামাই আদরে আমাকে জীপে তুলে নিলেন। এক চক্কর ঘুরতে চাই শুনে ফিচেল শ্যালকটি বললেন, অবোস খারাপ করে কি হবে জামাইবাবু, আপনাকে সাতপাকই ঘুরিয়ে দেবখন।

শ্যালকটির একমাত্র দোষ, বেশী কথা বলে। সাত মিনিটের মধ্যেই অ্যায়সা ননস্টপ বক্তৃতা শুরু করল যে তার কাছে রেডিও টকার কোন্ ছার! বলল, তিন শীফটে এখানে কতজন কাজ করে জানেন? পাঁচশ হাজার! এই যে সতের দফা রেল লাইনের পেটে দেখছেন এর টোটাল লেংথ কত খবর রাখেন? পঁচাশি মাইল, তার মানে হাওড়া টু দুর্গাপুরের কয়েক মাইল কম। এই রেলওয়ে ট্রাকের মত আবার সাড়ে সাতাশ মাইল লম্বা রোডওয়েজ আছে। ইলেকট্রিক কেবল আছে একশো আশী মাইল। টেলিফোন লাইন আছে পাঁচ শ'টি, আরো দুশো বাড়তে যাচ্ছে। আলাদীনের এই যে দানবমূর্তি কারখানা দেখছেন, এর পয়লা নম্বরের কাঁচা র‍্যাশন কি জানেন? জানেন

বুকের গোপন লকারে রাখা।

না তো! হাওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ এয়ার, মানে বাতাস, যা নইলে আগুন জ্বলে না। ইনি প্রত্যহ কত জলপান করেন, ধারণা আছে? নেই? ২২ মিলিয়ন গ্যালন। বিদ্যুৎ হজম করেন বছরে ২৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার্স, দ্যাট মীনস আমাদের ইন্ডিয়ার ৭০ লক্ষ মধ্যবিত্ত বাড়ির সংবৎসরের খরচা।

শ্যালকের বক্তৃতার ঝোঁক থামাবার জন্য বললাম, ওটা কি অফিস হে?

জিভ কেটে খাটো গলায় বলল, লুব্রিকেশন ডিপার্টমেন্ট, সি এম ই ও-র নবরত্নের একটি প্রধান রত্ন। আপনি হাসছেন! এই তৈল সভ্যতার যুগে কাজ পেতে হলে আপনাকে ম্যান টু মেশিন ওইভাবেই এগোতে হবে। চরিত্তির বুঝে অবশ্য লুব্রিক্যাণ্ট অয়েলের চেহারা বদলায়—কারেন্সি-কয়েন-লিকার-লিকুইড। মেশিনে ভ্যাকুলিন জে জে কিংবা টারবো টোয়েণ্টিনাইন ঢালুন, মেশিন সঙ্গে সঙ্গে ডগমগ হবে। কয়লায় অয়েল স্প্রে করুন পাবেন আরো কোক, ব্লাস্টফার্নেসে অয়েল ইঞ্জেক্ট করুন কম খরচায় হবে বেশী লোহা, ওপেনহার্থে অয়েল ফায়ার করুন হবে ফুয়েলের সুরাহা! জামাইবাবু, আর কর্তৃপদে যদি কখনো তৈলমর্দন সম্ভব হয়, বাচ্য পরিবর্তন হবে, প্রমোশনের কাঁপকল ঘুরবে, প্রচুর ভিটামিনযুক্ত কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট রচিত হবে! আমাদের কারখানা অবশ্য একটু বেশী হয়ে! বছরে তিনি ১,২৫০,০০০ লিটার তেল আর ৩৬০,০০০ কেজি গ্রীজ উপভোগ করেন।

অধিকরাত্রে আমার বাইপ্রোডাক্ট শ্যালকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আসল ছাদনা তলায়, অর্থাৎ আয়রন ম্যানদের রাজ্যে। যাঁর সঙ্গে সেখানে প্রথম আলাপ হল তাঁকে দেখেই স্টীল গোয়িং স্ট্রং কথাটা মনে পড়ল। মাথায় আকর্ণ উপড়ে করা স্টেইনলেস স্টীলের মত প্রকান্ড টাক। বড় বড় লগশীট বিছিয়ে মুদিত নয়নে চিদানন্দ উপভোগ করছিলেন। আমাদের পদশব্দে তিনি রক্তচক্ষু মেললেন। ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমি সবিনয়ে ক্ষমা চাইলাম। তিনি সর্বাঙ্গীণ হাসি হেসে বললেন, আপনি নতুন তাই ভুল করছেন, এখানে কেউ ঘুমোয় না, আমিও ঘুমোচ্ছিলাম না। আই ওয়াজ থিংকিং মাই প্রব্লেম। প্ল্যান্ট ডিকশনারীতে ঘুম বলে কোনো কথা নেই। আন্ডার অফিসার হলে বলা হয় রেস্ট নিচ্ছে—লেবার হলে বলা হয় ডজিং। সে নাক ডাকালেও। আর আমি এঞ্জিনিয়ার আমার কথা তো বলেছিই।

চমৎকৃত হলাম। শুধু ভদ্রলোককে দেখে না, কারখানার কায়দা-কানুন দেখে। কারখানার জোর নোটিস জারি রয়েছেঃ ইউজলেস পেপার, কারণ কাগজের অপব্যয় বোধ হয় আর কোথাও এমনতর হয় না। কিন্তু

অফিসারদের কাছে নোটিসটা আর একটু খন হয়ে দাঁড়ায় Useless paper-এ। এবং তারপর অনড় পেপার ওয়েটের মত লগশীটের ওপর নাইট-শীফট যাপন করা হয়। ছাপানো ফর্মায় টিফিন ক্যারিয়ার জড়িয়ে লাঞ্চ সেরে প্যাডের শুভ্র কাগজে হাত মুখ মোছা হয়। এবং দিস্তের দিস্তের ফিনফিনে কপি পেপার বাড়ি যায়।

ওয়ার্কশপে কাজকর্ম টপ স্পীডে চলার কথা, কিন্তু চলে স্টপ স্পীডে। গড়িমশি করে সাত দিনেরটা সাতাশ দিনে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর মত ফাইল-ফাইটিং এবং রেড-টেপিজম না থাকলেও মাঝে মাঝে ভেল্কি লাগে। সরকারী চাকুরি যেহেতু ভগবানও খেতে পারেন না সেহেতু সুযোগ পেলেই একটা 'নেই করেংগে' ভাব জেগে ওঠে।

ফিটার হয়ত নাটবল্টু এ'টে চলেছে, হঠাৎ একটি জায়গায় একটি পেরেক ঠোকার প্রয়োজন হল, ব্যাস! ঠোঁট বে'কিয়ে বলল, আমার দ্বারা হবে না স্যার, এ কাঠিয়াবাবার কাজ। অগত্যা কারপেণ্টার তলব হল, সে ধর তক্তা মার পেরেক করতে গিয়ে হে'চাঁক তোলার মত চমকে উঠে কাষ্ঠ হাসি হেসে জানালো যে, এ জাতীয় লক্কড় কাজে সে নেই,

কাঠে ইসকুরুপ আঁটিতে দিন বহুৎ আচ্ছা তা বলে লোহার ওপরে? ছি ছি!

বয়লার ল্যাবরেটরিতে বয়লারের কেমিস্ট ওয়াটার কালচার করছেন একটি তন্বী উপন্যাসে অধোবদন হয়ে। সুতরাং টেস্ট-টিউব ছোঁবার প্রয়োজন নেই। সুদক্ষ রাঁধুনীর মত গ্রেপ বাঁহাতের দু আঙুলে জল টিপেই তিনি জলের হার্ডনেস বুঝতে পেরে গেলেন

'কাঠে ইস্ক্রুপ আঁটতে দিন বহুত আচ্ছা তা বলে লোহার ওপরে?'

এবং তৎক্ষণাৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় রিপোর্ট ঝাড়লেন। শুধু কি জল আর ডাক্তার মানুষ এই কর্ম করছেন, উর্ধ্বলোকেও একই মহড়া চলেছে। অ্যাটেনডেন্ট রিডার আর মইবেয়ে প্রেসার গেজ পর্যন্ত উঠছেন না, স্টীম-অয়েল-এয়ার প্রেসারের মানসাঙ্ক অনেক সময় নিচে থেকেই লেখা হচ্ছে। অনেকটা আবহাওয়া অফিসের রিপোর্টের মত।

তবে হ্যাঁ, ওয়ার্কশপে 'গভমেন্ট যব' বলে একটি কথা আছে, সেই লেবেলটি মন্ত্রের মত কাজ করে। তখন অফিসার গিন্নীর অচল ঘড়ি, তাঁর বড় মেয়ের বিকল টেপরেকর্ডার কিংবা খোদ কর্তার ফোর্থ-হ্যাণ্ড হাণ্ডিসার মরিস-এইট দুসরি দিনেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নিলেমে একটি জলমূল্যে প্যারালাইজড্ গাড়ি কিনে দশ হাতে ঠেলেঠুলে কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন আপনি, তেরাত্তির পেরোলো না, ফাইভ ম্যানপাওয়ারে ইন করা আপনার সেই ঘাটের মড়া—টেন হর্সপাওয়ার মর্দানার মত বেরিয়ে এল। 'গভমেন্ট যব'-এর যাদু-মন্ত্র একেই বলে।

নাইট শীফটের ডাক্তারের ফেরার কথা ভোর ছটায়। কিন্তু মিউচুয়াল আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং-এর ফলে বেলা আটটায় ফ্রেশ ডাক্তারের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে রাতের বাসী ডাক্তার ফিরে যান স্ত্রীর হেফাজতে। অথচ শীফটের বাস তখন ফিরনেবালা কাউকে গর্ভে ধারণ করে না। তাহলে উপায়? আছে বইকি, অ্যাম্বুলেন্সকো বোলাও। ফলে এই উইটনেসই আবার উইকনেস হয়ে দাঁড়ায়, কোনো কোনো ব্রাহ্মমুহূর্তে বাইরে যেতে চায় ড্রাইভার। তথাস্তু। স্টোরের স্পেয়ার অ্যাণ্ড গুডস মায় গ্যাস সিলিণ্ডার পর্যন্ত স্টোরের উদার শূন্যে খাঁ খাঁ বাজারে বেরিয়ে যায়। [illegible] চৌকিং-এ জি এম এর গাড়িও ফটকে অনন্তকালের জন্য আটক হতে পারে কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স না।

টাপহোল-মাডগানের স্লুপ-কর্ম লক্ষ করে কিনা জানি না, প্ল্যান্টের ভাষার সব দেশেই ব্লাস্ট ফার্নেস স্ত্রীলিঙ্গ। দেশের খ্যাতনামা নারীদের নামে তাদের নামকরণ ঘটেছে। ওদেশে যেমন কুইন ভিক্টোরিয়া, কুইন এলিজাবেথ, এখানেও তেমনি...

অনেকদিন আগের একটি ঘটনা, নতুন কারখানা বসেছে, ফলস টীথের মতন ভালো করে সেট করে নি তখনো। খুঁটিনাটি লেগেই আছে, আজ ব্রেকডাউন, কাল অগ্নি-কাণ্ড, পরশু অ্যাকসিডেন্ট। একটি অগ্নি-কাণ্ডের খবর এসেছে। ফায়ার অফিসার টেলিফোনে হাই তুলে নির্বিকার গলায় কারণ জানতে চাইলেন। কারণ, শুধু আগুন লাগার খবর পেলেই তাঁদের ছুটতে নেই, কত রকমের আগুন হতে পারে, তাই আগে কজ্ অ্যাণ্ড ক্যারেকটার জেনে নিতে হয়। অপর প্রান্ত থেকে এঞ্জিনীয়ার সংক্ষিপ্ত দ্রুতভাষণে জানালেন, ডিউ টু এ মাংকি।

ফায়ার অফিসার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, হোয়াট! অল অব পার্সন এ মাংকি! এই কারখানায় মাঝ রাত্তিরে বান্দর? ইয়ার্কী পাইসেন!

ব্লাস্ট ফার্নেসের অংশবিশেষের নাম যে মাংকি হতে পারে এ কথা সেই অরসিক অফিসার স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই বলছিলাম যে, স্টীল প্ল্যান্টের মধ্যে নাম-করণ একটু বিচিত্র রীতির। পরিচিত বাইপ্রোডাক্ট অফিসাররা পরস্পরকে যে ডাকনামে ডাকেন, প্রথমটা তা শুনে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শ্যালকের মতে ওগুলো বাইপ্রোডাক্ট-নেম, আমার মতে প্রোডাকশন-নেম। যেমন মিঃ ন্যাপ, মিঃ বেঞ্জ, মিস্টার টার, মিস্টার সালফ্, অর্থাৎ ন্যাপথলিন, বেনজিন, ক্রুডটার, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি বাইপ্রোডাক্ট প্ল্যান্টের নামানুসারে।

দুর্মূল্য ফরেন এক্সচেঞ্জ ফুঁকতে যে সব ফরেন এক্সপার্টদের ইম্পোর্ট করা হচ্ছে তাঁরা বেশীর ভাগই হাতুড়ে এঞ্জিনীয়ার। হাতে-নাতে কাজ শিখেছেন, কেতাবীবিদ্যের ধার ধারেন না। মাছিমারা কেরানীর মতই, 'দেখিয়াছি যেইমত করিবারে পারি' অবস্থা। তাই 'কেন'র স্থান নেই তাঁদের মগজে, কেন কিরে বাবা! বাপের জন্মে আমরা কখনো কেন জানতে চাইনি। যাহা দেখেছি তাহা করেছি। আর এই অপদার্থ বাঙালী এঞ্জিনীয়ারগুলো সব সময় ইন্টারোগেটিভ। সোজা কথা, হ্যাবিট অ্যাণ্ড হ্যাভ ইট—এঞ্জিনকে কব্জা করতে এই ডবল ব্যারেল মন্তর তাঁরা জানেন। তাঁদের মতে, এঞ্জিনীয়ার গোজ অন ভিস্যুয়্যাল মেমরি।

তাঁদের একজনের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ের একটু নমুনা শোনাই আপনাদের। প্ল্যান্টে ভারতীয় ডক্টরেট এঞ্জিনীয়ার বেশ কিছু

"মাঝরাত্তিরে বান্দর? ইয়ার্কি পাইসেন!"

আছেন। এই ডক্টরেট কি বস্তু Raw-সাহেব তারও খবর রাখেন না। একদিন তো এক ডক্টরেটের ওপর রেগেমেগে বলেই বসলেন, উই কান্ট সিম্পলি আণ্ডার স্ট্যাণ্ড হোয়াই ইউ ইণ্ডিয়ান ডক্টর্স কাম হিয়ার? ইউ শুড্ বেটার গো টু দি হসপিটাল।

ম্যানেজমেন্ট-এ পেটাই বোনাস বলে একটি কথা চালু রয়েছে দেখলাম, খোঁজ নিয়ে জানলাম, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে কর্তৃপক্ষ মাথা না ঘামালেও, সেটির উৎপত্তি সত্যিকারের পিটুনি থেকেই। অনেক অনুনয়-বিনয়ে যে কাজ হয়নি, রাতারাতি অফিসারদের পিটিয়ে সেই বোনাস স্যাংশণ্ড হয়েছিল নাকি। কারখানার লেবার একটি প্রবলেম শুধু না, পেনও বটে। অন্তত ইলেকশনের হাইপ্রেসারে সম্প্রতি পার্সোন্যাল ম্যানেজার পর্যন্ত লেবার পেনে কাত হয়েছেন। কারখানার ওয়ার্কাররা এখন ভেমি গড়ের মত ঘুরে বেড়ায়।

(৭৩) ৩২.৯৫
পুরুষের পদমর্যাদা
অটুট রাখে
বাটার জুতো
বাটার জুতোর নির্মাণ তাদেরই কথা মনে রেখে যাঁরা কর্ম-
সাধনে তৎপর। রূপবান, বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত বাটার জুতো—তাদেরই
জন্য যাদের পদক্ষেপ অবিরাম জীবনের বিচিত্র পথে।
বাটার জুতোর গঠন আধুনিক রুচিসম্মত, নির্মাণ
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কারিগর
নিপুণ, কুশলী; উপকরণ হাতবাছাই,
উৎকৃষ্ট। ফলে আরামে চলনে দীর্ঘ-
স্থায়ী, নিশ্চিত। দিনের পর দিন,
সমাজের সকল ক্ষেত্রে, পুরুষের
পদমর্যাদা অটুট রাখে
বাটার জুতো।
টি টি পি ২৮.৯৫
Bata
২৮.৯৫

বালভবনের শিশু-রেল। স্টেশনের নাম "খেলগাঁও"

দিল্লির ডায়েরি

ছোট্ট রেলগাড়ি। ছোট্ট তার ইনজিন আর খোলা-ছাদ কামরা, অর্থাৎ শিশু রেলগাড়ি, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতোই সব কিছু তার সম্পূর্ণ, কিন্তু আকৃতিতে ছোট।

রাজধানীর কোট্‌লা রোডে "বালভবন" নামক সংস্থার একটি বহিরঙ্গ ঐ রেলগাড়ি। বাইরে থেকে মনে হওয়ার কথা যে, এটাও শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মাত্র একটা পার্ক, ঘুরে বেড়াবার একটা রেলগাড়ি আছে, ঝুলা আছে, আর আছে স্লিপ্ ইত্যাদি। একটা অঙ্গ বইকি, কিন্তু "বালভবন"-এর অল্প একটা অংশ হল ওগুলো। ভেতর থেকে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, এই সংস্থাটি ভারতে অনন্য। শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক উন্নয়নের একটি চমৎকার সংস্থা।

এবং আশ্চর্য হতে হয় যে, কলকাতার মতো অতো বড় জায়গাতে এখনো এই ধরনের সংস্থা কেন সম্ভব হয়নি। অনেক পার্ক অকেজো হয়ে আছে বস্তুত, কিন্তু তাদের কাজে লাগানোর কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অবশ্য, "বালভবন" মাত্র পার্ক নয়, সব নিয়ে একটি বেশ বড় শিক্ষা সদন।

বাড়ির বাচ্চারা ক খ গ ঘ আর এ বি সি ডি আর ১২৩৪ ইত্যাদির বাইরে একটু আধটু [illegible] কচি গলায় একটু গান বা আবৃত্তি করুক, রঙ তুলি নিয়ে সৃষ্টি করুক নতুন চোখে দেখা পুরোনো জিনিসের নতুন রূপ, বিজ্ঞানের কাটুমকুটুম শিখুক, কে না চায় বলুন? কিন্তু ইস্কুল-পাঠশালায় সুযোগ কোথায়? সময়টা বা কোথায়? সাধারণ বিদ্যালয়ে অন্ততঃ থাকে না। আর তাই এসেছে "বালভবন"। প্রচুর সুযোগ সেখানে এবং প্রশংসনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই।

পাঁচ থেকে ষোলো বছরের ছেলেমেয়েরা ভবনের সদস্য হতে পারে। দক্ষিণা নামমাত্র। তিনটি বয়স-কোঠায় ভাগ : পাঁচ থেকে আট, নয় থেকে এগারো, বারো থেকে ষোলো। তিনটি সেসন বছরে : জানুয়ারি-এপ্রিল; মে-আগস্ট; সেপটেম্বর-ডিসেম্বর। পছন্দমত, পুরো সেসনের সদস্য হতে পারে, আবার আংশিকভাবেও হতে পারে। যার যেমন প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধে, যদিও ভবনের কর্মকর্তারা চেষ্টা করেন যাতে পুরো সেসনের ছেলেমেয়েদের বেশী করে পাওয়া যায়। প্রতিটি সদস্যের জন্যে রোজ দু ঘণ্টার ক্লাস থাকে। যারা রেগুল্যার, তারা অন্তত চার দিন সপ্তাহে হাজিরা দেবে, আর ক্যাজুয়ালদের সপ্তাহে অন্তত এক দিন। স্থান সংকুলান খুব কম নয়, একুনে দেড় হাজার জনের। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষত যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে, অতো ছেলেমেয়ে নেই।

আমি ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম বাঙলা দেশের ছেলে অমিত পালের সঙ্গে। ইনি হলেন শিশু-শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত, শিক্ষক-কর্মচারী। আর্ট শিখেছেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে, কিন্তু আরো অনেক কিছু আয়ত্ত করেছেন আমেরিকায়, স্কলারশিপের দৌলতে। গোটা বালভবনের ডিরেক্টর মশায়ও (শ্রীপ্রভা সহস্রবুদ্ধে) আমেরিকায় অনেক কিছু শিখেছেন এবং অন্যান্যদের মতো অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগাচ্ছেন। ঘুরে ঘুরে অনেক দেখলাম। ভাল লাগল, আমার নিজের জন্যে নয়, ছোট ছোট বাচ্চাদের ভালর জন্যে, কিশোর-কিশোরীদের মঙ্গল কামনায়।

বালভবনের অন্তর্গত শিক্ষামূলক মিউজিয়মের এক অংশ। মিউজিয়মের নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার কথা

সবগুলো ঘরের নাম দিতে পারব না। মনে নেই। ধরুন না কেন—ছবি আঁকার ঘর। অর্ধবৃত্তাকারে একটা বাড়ির অনেকগুলো কোঠা এটা-ওটার জন্যে ভাগ করা। সামনে সবুজ লন্ (যদি প্রচুর জল দেওয়া যায়), পেছনেও; ওপারে রাস্তা, সেখানে মোটর বাস্ যাতায়াত করে, আর ফিরিওয়ালা বিক্রি করে বেলুন, কাবুলি মটরদানা, আলুসেদ্ধ, আর তেঁতুলজল-দেওয়া টক্-টক্ 'গোল-গাপ্পা'। আটদশটি ছেলেমেয়ে রঙ নিয়ে হাতড়াচ্ছে। কেউ আঁকে ছবি, কেউ দেখে রঙের রূপ। দেয়ালে অনেক ছবি, বাচ্চাদের আঁকা।

আবার সেই একইভাবে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দৌলতে ছেলেমেয়েরা শিখছে গানবাজনা, সেলাই, পুতুল তৈরি, মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি, চিনে-মাটির কাজ, রোডয়ো ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জিনিস তৈরি, জৈবিক গবেষণা হাতেনাতে, ছোটদের পশুপক্ষী-পালন—অনেক কিছু।

কর্তৃপক্ষ বলেন : আমরা চাই ছোটদের মনের বিকাশ হোক নানা দিকে, খেলা রুচির মাধ্যমে, তাদের অবসর বিনোদনে সময়ে। আমরা, যারা বড়, আমরা তাদের ভাল করে চিনতে পারব তারা কী চায়। হতে পারবে ভবিষ্যতে, তারা শিল্পে ও সংগীতে কী চায়, আর কী হতে পারে।

মিস্ মুখার্জির ঘরে একেবারে তাক কারখানা। ছোটরা কাগজ-কাপড় সেলাই ইত্যাদি নিয়ে তৈরি করেছে কতো রকম রকমারি পুতুল আর মুখোশ আর কাটকুটুম। একেবারে প্রদর্শনী। না দেখে বিশ্বাস হবে না বাচ্চারাও নিজেদের ইচ্ছে ও খেলাচ্ছলে তৈরি করতে পারে অতো চমৎকার জিনিস! তাদের রূপচিন্তা, তাদের শিশু-ভাবপ্রবণতা, সবই প্রকাশ তাদের সৃষ্টিতে।

একজন শিক্ষকের দেখলাম কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। ওটা হল নাটক বিভাগ। দুঃখ হল। কলকাতায় শিশু থিয়েটারে (সময় চ্যাটার্জি মশায়ের) স্থান দেওয়া যায় না। বাচ্চাদের, তাদের অতো ভিড়। আর বালভবনে বেচারা গালে হাত দিয়ে। বললাম : "কলকাতায় কায়দায় কিছু কর, তা না হলে কল্কে পাবে না।" কিন্তু যেখানে গানবাজনা আর নাচ, সেখানে বাচ্চাদের বেশ ভিড়। দুটি ছেলে মস্ত বড় বেহালা নিয়ে তার চাইতে বড় ছড়ি টানছে তারের উপর। একজন জোরসে হাওয়া টানছে হারমোনিয়মে। সেতারের টুংটাং অন্যটিতে। পাশের ঘরে বাজে তব্লা। দুটি মেয়ে কষে পায়ে বাঁধছে নাচের ঘুঙুর। যিনি নাচ শেখাচ্ছেন ইনিও শান্তিনিকেতনে শিখেছেন, কিছুকাল কাটিয়েছেন উদয়শংকরের সঙ্গে। অন্য একটি স্থানে আছে ফটোগ্রাফি শেখার বন্দোবস্ত। সেখানে প্রবীর দাশ, যার তোলা ছবি লেখার সঙ্গে বেরুচ্ছে।

মনে হল বালভবনে সব ব্যবস্থাই আছে যে ছেলে যে মেয়ে ক খ গ ঘ আর এ বি সি ডি-র বাইরে যা শিখতে চায়, জানতে চায় সব ব্যবস্থা আছে, শিশু-ব্যক্তিত্ব প্রকাশ কামনায়। কিন্তু অভাব ছিল যানবাহনের অতো টাকাপয়সা খরচ, ভাল ভাল শিক্ষকদের এনে রাখা। কিন্তু যানবাহনের অভাবে পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী নেই। তার ফলে অনেক সময় শিক্ষকদের মনেও ব্যর্থতার প্রভাব আসে। তারা অন্য স্থানে জীবিকা খোঁজে। এগুলো হল পরিচালনা ও সংগঠনের দুর্বলতা। বড় বড় কর্তারাও চোখ বুজে

যেন শুধু চাকুরি করে যান। ফলাফল আর কে দেখে, কে করে বিচার।

অথচ গোড়ায় একদিন সমস্ত আগ্রহ আর চেতনা এসেছিল জহরলাল নেহরুর কাছ থেকে, তারপর তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর। কিন্তু তাঁদের অতো কাজ, বাচ্চাদের কথা ক্রমাগত কী করে ভাবা যায়। সুতরাং কালক্রমে দেখা দেয় কাজে আর কর্মে প্রভেদ। বালভবনেও তা আছে।

যেমন আছে বিরাট একটি অংশে, যার নাম আমেরিকা দিয়েছে "কারনিভ্যাল"। একটি ঘরে নানা ধরনের বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামে সাজানো অনেক ধরনের জিনিস, যার মাধ্যমে ছোটরা শিখবে শিল্প আর রূপ-মাধুর্য, গতি আর আলোর মহিমা।

একটি তারের তৈরি মুরগি। সে নড়ে আর জানায় শিশুমনে কাকে বলে গতি-মতি, নড়াচড়া। একটি আলোর পিয়ানো। না, আওয়াজ নেই। চারটে চাবি টেপো, আর কত রকমের খেলা কতো না রঙের একটা কাচের বুকে। আবার আছে নানা রঙের, নানা আকৃতির দ্রব্য। সব নিয়ে খেলা যায়, আর খেলার ভিতর দিয়ে শিশুরা শিখবে সৃষ্টির মহিমা, পাবে সৃষ্টির আনন্দ।

তাদের মাস্টার মশায়দের তখন ভেতরে আসার হুকুম নেই। তারা বাইরে থেকে কাচের জানালা দিয়ে শুধু পর্যবেক্ষণ করবেন তাদের শিশু-শিষ্যদের। দেখবেন, শিশুরা কী চায়, কী পছন্দ করে। এই বিভাগে নানা কেন্দ্র থেকে আসা শিক্ষকদের শিক্ষার বন্দোবস্তও আছে। শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য কেন্দ্রে তারা শিক্ষা দেবে শিশুদের। একই স্থানে শিক্ষক আর শিশুদের শেখার সুযোগ।

মেয়েরা কাটমকুটম ("কলাজ"-কাজ) করছে একটি ক্লাসে

এই আর্ট কারনিভ্যালের সৃষ্টি আমেরিকায়। এর স্রষ্টা হলেন নিউইয়র্কস্থ মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টের ডিরেক্টর, ভিক্টর দা'মিকো। বহু বছরের গবেষণার পর, আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও শিল্পজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিশুশিল্প কারনিভ্যাল, যার জন্ম সেই ১৯৪২-এ, নিউইয়র্কে। কলকব্জা নিয়ে নানা শহরে ঘুরতো দা'মিকো সাহেবের শিশু কারনিভ্যাল। এবং ১৯৫৮-তে আসে বেলজিয়মে। ইন্দিরা গান্ধী ওখানেই প্রথম দেখেন অপূর্ব ঐ কারনিভ্যাল, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইন্দিরাজীর প্রায়সেই সম্ভব হল বালভবনের এই বিভাগ।

নিউইয়র্কের বাইরে এই প্রথম হল দ্বিতীয় একটি শিশু কারনিভ্যাল, যার প্রথম সংস্করণ রয়েছে নিউইয়র্কে। ভারত ছাড়া আর কোথাও নেই। ধন্যবাদ দা'মিকো সাহেব, আর তার সৃষ্টিকে! ১৯৬৩ সনে মিসেস্ ক্যানেডি দান করলেন ভারতের হাতে এই শিশু কারনিভ্যালকে। কিন্তু আজও আমরা সেটাকে ভাল করে চালু করতে পারিনি, আমাদের দুর্ভাগ্য!

তা হোক্। আসুন, শিশুদের রেল-গাড়িতে চড়ি। দক্ষিণা প্রাপ্তবয়স্ক আট আনা, ছোটদের ১৫ পয়সা। স্টেশন আছে, পুল আছে, ছোট্ট লাইনে বৈদ্যুতিক কনট্রোল আছে, আছে সুযোগ্য রাস্তা, রেলের সব কিছু।

বড়রা চড়ে ছোটদের ছোট্ট রেলে শিশু-মন পাওয়ার জন্যে, আর শিশুরা চড়ে রেলে বড়দের মতো বড় হওয়ার জন্যে।

—খগেন দে সরকার

কিশোর-কিশোরীদের তৈরি পুতুল নাচের কয়েকটি চরিত্র। নিজেদের তৈরি পুতুলের নাচ বাচ্চারা নিজেরাই করে

ইব্রাহিম আদিল শা ও কিতাবে নওরস

তানসেন মোগল দরবারে ধ্রুপদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরই সমসাময়িক বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শা (১৫৮০-১৬২৬) দাক্ষিণাত্যে ধ্রুপদকে বিশেষ মর্যাদার আসন প্রদান করেন। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এমন কি ফকীরুল্লা ঔরংগজীবের রাজত্বের প্রথম দিকে যখন তাঁর রাগদর্পণ লেখেন তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, ভাল ভাল মার্গ-পদ্ধতির গাইয়েরা দক্ষিণ দেশেই বর্তমান ছিলেন। আইনে আকবরীতেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক বহু সঙ্গীতজ্ঞ দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বহমনী প্রভৃতি দেশে অবস্থান করতেন। বলে রাখা ভাল যে দক্ষিণ বলতে কর্ণাটককে বোঝানো হয় নি। উত্তর ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চলে চলে এসেছিলেন। এ'রা একটি বিশেষ ধরনের উর্দুভাষা সৃষ্টি করেছিলেন যাকে বলা হত "দখনি";—এই দখনির সঙ্গে হিন্দীর সংযোগ ছিল গভীর। দক্ষিণ বলতে দক্ষিণ ভারতের মুসলমান শাসিত এই সব অঞ্চলকেই বোঝাতো। ইব্রাহিম দখনিতেই গান লিখতেন এবং সেগুলি নাকি প্রাচীনতম দখনির উদাহরণ।

বহমনী রাজ্যের ইতিহাসবিদিত দেওয়ান মাহমুদ গাওয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন ইউসুফ। ইনি নিজগুণে বিজাপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে বিজাপুরকে তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন এবং পরিচিত হলেন ইউসুফ আদিল শা নামে। এ'র পরে যথাক্রমে রাজত্ব করেন ইসমাইল আদিল, ইব্রাহিম আদিল এবং আলী আদিল। দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজাপুরের পঞ্চম সুলতান। আদিলশাহী রাজত্ব সাহিত্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। এ'দের দরবারে ইরাক, ইরান থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইব্রাহিম তাঁর দরবারে উর্দুভাষাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যদিচ ফারসীর প্রতি অনুরাগ তাঁর কম ছিল না। পারসীক কবি নুরুদ্দীন জহুরী তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থ "কিতাবে নওরস"-এর ভূমিকা লিখেছিলেন, এই গীতগুলির ফারসী অনুবাদও হয়েছিল। ফারসী কবি মীর-সঞ্জর এবং মালিক কুমিও তাঁর দরবারে ছিলেন। এ ছাড়া সকলেই জানেন যে, ফিরিশতা ইব্রাহিমের আদেশেই সুপ্রসিদ্ধ তারিখে ফিরশতা রচনা করেছিলেন।

ইব্রাহিম আদিল শুধু সাহিত্যিকই নন তিনি নিজে ছিলেন অসাধারণ সংগীতজ্ঞ। "কিতাবে নওরস" নামক গ্রন্থে তিনি স্বরচিত গানগুলিকে গ্রথিত করেন। গ্রন্থটি শুধু নওরস নামেই পরিচিত ছিল—কেউ কেউ বলতেন নওরসনামা। জহুরী কিন্তু "কিতাবে নওরস"-ই বলেছেন। গানগুলিকে মাঝে মাঝে বলা হয়েছে "নকশ"। বলা বাহুল্য ইব্রাহিম ভারতীয় সাহিত্যের নবরসকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিবেচনা করতেন এবং সুরসিক পারস্য ভাষাবিদ মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রসের পরিচয় দিতে আগ্রহী ছিলেন। নবরস শব্দটির প্রতি তাঁর একটি মোহ ছিল। একটি শহর আবাদ হলে তিনি তার নাম রেখেছিলেন নওরসপুর। এইখানে বহু গুণী ব্যক্তি তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। ললিতকলায় তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি "জগৎগুরু" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজেই একথা ব্যক্ত করেছেন—

"ইব্রাহিম গায়ে বজায়ে পর চঙ্গ জগৎ-গুরু মুরিস খেতাব পায়ে।"

"চঙ্গ" নামক তার-যন্ত্রটির উল্লেখে বোঝা যায় এই আরবী যন্ত্রটি দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত ছিল, অবশ্য উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে।

কিতাবে নওরস গ্রন্থটি ১৫৯৭ থেকে ১৫৯৯ সালের মধ্যে সম্পাদিত হয়, কেননা জহুরী ওই সময়েই বিজাপুরে এসেছিলেন। এই গ্রন্থের গানের সংখ্যা ষাটের কাছাকাছি। ঠাটকে তখন "মোকাম" বলা হত। ইব্রাহিমও "মোকামে ভূপালী"—এইভাবে রাগের উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধ্রুপদ ভঙ্গীর গানগুলিতে কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া হত। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন যে, ইব্রাহিম রচিত সঙ্গীতের ধরণটা ছিল ধ্রুপদ খেয়ালের মাঝামাঝি। তাঁর গানগুলিতে সঞ্চারী অংশ কিরকম ছিল বা আদৌ ছিল কিনা জানা যায় না। যাই হোক এই গানগুলি যে ধর্মতঃ ধ্রুপদ ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রচনাসমূহকে ইচ্ছা করেই তানসেন প্রবর্তিত ধ্রুপদের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয় নি—দাক্ষিণী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য যা আগে থেকে চলে আসছিল তাকে এই সব রচনায় সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল।

নওরসের গানগুলির সংগে এই সব রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়—কানাড়া, ভৈরব, মল্লার, কেদারা, কল্যাণ, তোড়ী, ভূপালী, রামকরী মারু, আসাওরী, গৌরী, ধনাশ্রী, দেশী পূর্বা, বরাড়ী, নওরোজ এবং হিজাজ। এর মধ্যে কানাড়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার পরেই ভৈরোঁ। তানসেনও কানাড়া এবং ভৈরোঁ দুটি রাগই পছন্দ করতেন। দরবারী কানাড়া তানসেনেরই রচনা। "নওরোজ" নামক সুরটি বোধ করি আকবর শার দরবার থেকেই দক্ষিণে পৌঁছেছিল।

রাগরাগিণীর দেবময় মূর্তিও তাঁর রচনায় পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি শাস্ত্রোক্ত বর্ণনার সংগে মেলে না। এ ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

উত্তর ভারতীয় বহু বাদ্যযন্ত্রই দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কামাঞ্চা (ছড়ি দিয়ে বাজানো হত), চঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যও বাজান হত। আকবরের সভায় প্রচলিত যন্তর (ত্রিতন্ত্রী বীণা), উপাঙ্গ (এক রকম বাঁশি) প্রভৃতি বাদ্যও প্রচলিত ছিল।

অধিকাংশ গানই সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীকে আশ্রয় করে রচিত। সুলতান ইব্রাহিম নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না। নানা দিক দিয়ে তাঁর চরিত্রের অসামান্য ঔদার্য ছিল।

বর্তমানে হায়দরাবাদ, বোম্বাই অঞ্চলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের যে প্রসার দেখা যায় তার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম সঙ্গীতে যে প্রেরণা দিয়ে যান তা অচিরে বিলুপ্ত হয় নি। তা ছাড়া এই সব অঞ্চলে কয়েকটি স্বকীয় দখনীরীতি ছিল সেগুলিও নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। আজকের দিনে শুনতে পাই অনেক ঘরানাদার প্রচার করছেন যে, মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্ত হবার পর তাঁদের পূর্ব পুরুষগণই উত্তর ভারত থেকে এসে দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচার করেছেন। ইতিহাস একথার সমর্থন করে না। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ হায়দরাবাদ, বোম্বাই অঞ্চলে বিভিন্ন ঘরানার অস্তিত্ব ছিল যা সুলতানী আমলের শেষ দিক থেকে চলে এসেছে। দক্ষিণ ভারত যেমন একটি স্বকীয় উর্দুভাষার সৃষ্টি করেছিল তেমনি সৃষ্টি করেছিল নানাবিধ স্বকীয় সংগীত রীতির। আইনে আকবরী উক্তি—মার্গ সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধিক সংখ্যক দক্ষিণাংশে বর্তমান—কথাটা অত্যুক্তি বা অনভিজ্ঞের উক্তি বলে উড়িয়ে দেবার নয়। উত্তম গবেষণার ফলে এর যাথার্থ প্রমাণিত হবে এবং অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া উচিত।

শার্ঙ্গদেব

পূর্ণ অপূর্ণ

বিমল কর

বাইশ

পরের বছর যা ঘটল তার সঙ্গে রাঁচির ঘটনার সম্পর্ক হয়ত ছিল, কিন্তু বোঝা যায় নি। কলকাতায় ফিরে প্রমথ নির্মলাকে তাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্মলার চোখে কোনো নতুন উপসর্গ খুঁজে পান নি। রাঁচিতে যা ঘটেছিল তা এতই বিচিত্র ও সাময়িক যে তার কোনো চিহ্ন আর ছিল না।

প্রমথ নিশ্চিন্ত হল।

নির্মলা যেন সামান্য পরিহাস করেই সুরেশ্বরকে বলল, 'দেখলে...!'

পরিহাসের কারণ অবশ্য ছিল। রাঁচিতে থাকতে সুরেশ্বরের কেমন একটা সদা-আতঙ্কের ভাব হয়েছিল। তার আচরণ দেখলে মনে হত, যে-কোনোদিন, যে-কোনো সময় নির্মলার চোখের শেষ দৃষ্টিশক্তিটুকু ফুরিয়ে যাবে এই দুশ্চিন্তায় সে শঙ্কিত হয়ে আছে। নির্মলা কাছে থাকলে সুরেশ্বর এমনভাবে তাকে লক্ষ করত, মনে হবে প্রতি মুহূর্তে সে নির্মলার নতুন কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে। নির্মলা পথে বেরুলে সুরেশ্বর তার পাশে পাশে ছায়ার মত থাকত, মনে হত যেন কোনো পঙ্গু শিশুকে সে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সকালে ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ না নির্মলার গলা শুনত ততক্ষণ আড়ষ্ট ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, ঘরের বাইরে আসত না।

রাঁচি থেকে কলকাতায় ফিরে সুরেশ্বরের এই সদা-শঙ্কিত অবস্থাটা কাটল। অথচ তখনও তার আচরণে উদ্বেগ ভাবটা ছিল।

একদিন কি কথায় যেন নির্মলা বলল, " 'তোমার মতন মানুষ আমি দেখি নি।"

'কেন?'

'দাদাকে কি বলেছ?"

'কি বলেছি?'

'ঘড়ির কাঁটা দেখতে আমার ভুল হয়?'

'সেদিন হয়েছিল?'

'না, কাঁটা দেখতে হয় নি; বলতে ভুল হয়েছিল। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম।'

'তবে আমারই ভুল।...'

'তোমার স্বভাবে আগে এসব ছিল না। আজকাল যেন কেমন অস্থির-অস্থির ভাব হয়েছে।'

'হয়েছে নাকি!......মানুষ বদলায়।' " সুরেশ্বর হাসত।

সুরেশ্বর যে বদলাচ্ছিল এটা হয়ত তারও জানা ছিল।

এই সময় সুরেশ্বর নিত্য অনুভব করতে শুরু করেছিল, নির্মলা তার কাছে এক আশ্চর্য আনন্দ ও অদ্ভুত বেদনার মিশ্রণ। এই আনন্দের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সে করতে পারত না। তার মনে হত, এ-আনন্দ অবারিত, স্ফূর্ত; সে ভেবে দেখত, নির্মলা তার দেহ ও মন নিয়ে যতটুকু সীমিত, যদি সেটা তার স্থূল অস্তিত্ব হয়—তবে এই অস্তিত্বের বাইরেও নির্মলার এক আনন্দ-স্পর্শ আছে; যেমন জ্যোৎস্নালোকের থাকে। সুরেশ্বর একদা এই ধরনের এক স্বপ্নও দেখেছিল : দেখেছিল, সে যেন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, আশেপাশে কোথাও নির্মলা নেই, তবু তার নির্মলার কথা মনে হচ্ছিল, এবং সে নির্মলাকে মনে মনে খুঁজছিল। হঠাৎ সে নিজের সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্নালোক অনুভব করল, তার খেয়াল ছিল না যে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে সুরেশ্বর চাঁদ দেখতে গেল, আড়ালে কোথাও বুঝি চাঁদ ছিল, দেখা গেল না। সহসা তার চারপাশে সে নির্মলার উপস্থিতি অনুভব করল, মনে হল নির্মলা কোনো অলৌকিক শক্তিবলে চাঁদের কিরণ হয়ে তার চতুর্দিকে বিরাজ করছে।

জীবনে এই ধরনের আনন্দের সঙ্গে সুরেশ্বরের পূর্বপরিচয় ছিল না। বাল্যাবধি সে যাদের মনে করতে পারে—বাবা, মা, বিনুমাসি—কেউই তার কাছে আনন্দের মূর্তি নয়। বাবা তার কাছে সব সময়েই নিরানন্দ ও বিতৃষ্ণার—এমনকি করুণার পাত্র ছিল। মা ছিল দুঃখের মূর্তি; অবজ্ঞাত বলে মার মধ্যে অভিমানের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল; মার কোথাও আনন্দ ছিল না—, মা তাকে আনন্দ বিলোতে পারত না। মার মধ্যে একটা জলুস ছিল—, এই জলুস মার অহঙ্কার। সুরেশ্বর আবাল্য আনন্দ দেখে নি, আনন্দ জানে নি—এই যেন প্রথম দেখছে নির্মলার মধ্যে।

হেমের কথা তার এ সময় খুব মনে হত। হেমের বাড়ি তার আসা-যাওয়াও ছিল। হেম বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছিল, ডাক্তারী পড়ছিল। হেমের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও সুরেশ্বর চিন্তা করত। হেম যে মাত্র সে-দিনও তার কাম্য বস্তু ছিল, সুখ ছিল—এ কথা সে অস্বীকার করতে পারত না। হেমের প্রতি তার মমতা ও স্নেহ কোনো অংশে কমে নি। কিন্তু সুরেশ্বর হেমের মধ্যে কোনো গভীর আনন্দ খুঁজে পেত না। কিংবা বলা ভাল, নির্মলার

মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যেত, হেমের মধ্যে তা ছিল না। কেন ছিল না, কেন সুরেশ্বর হেমের মধ্যে তার আনন্দ পেত না—সে জানে না।

এ সময় কলকাতায় থাকলেও সুরেশ্বর হেমদের বাড়ি আসা-যাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছিল। যেন তখন সে কোনো দ্বিধার মধ্যে পড়েছে। বুঝতে পারত না তার এই দ্বিধার যথার্থ কারণ কি? অথচ হেমের প্রতি তার মমতা বা স্নেহ হ্রাস পায় নি।

নির্মলার কাছে হেমের কথা মাঝে মাঝে গল্প করত সুরেশ্বর। হেমের অসুখ, তার হাসপাতালে থাকা, আরোগ্যলাভ, লেখাপড়া—এই সব গল্প। নির্মলা সহানুভূতির সঙ্গে শুনত, শুনতে শুনতে হেম যেন নির্মলার অতিপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

সুরেশ্বর বলত, হেমকে একদিন এ বাড়ি নিয়ে আসবে। কিন্তু আনা হত না।

মাঝেমধ্যে নির্মলাই তাগাদা দিত, "'কই, হেমকে তো আনলে না?'

'আনব।......পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখি।'

'একদিন তো আনতে পার।'

'তা পারি।'

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো—?'

'কি?'

'আনতে তোমার ইচ্ছে নেই।'

'...না, ইচ্ছে নেই যে তা নয়, তবে...।...আনব একদিন...।'

'তুমি ভাবছ, আমি তাকে ভাল করে দেখতে পাব না? ঠিক পাব।' নির্মলা যেন স্নিগ্ধ কৌতুক করল।

সুরেশ্বর ভেবেচিন্তে আস্তে করে বলল: 'তুমি পাবে, হেম হয়ত পাবে না।' "

এমন করেই দিন কাটছিল। সুরেশ্বর সেবার পুজোর সময় দেশে যাবে ঠিক করল। অনেক দিন দেশবাড়ি যাওয়া হয় নি, ঘর-দোরের অবস্থা কেমন হয়ে আছে কে জানে, দেশ থেকে হালদারমশাই চিঠি লেখেন, তাগাদা দেন যাবার জন্যে, যাওয়া হয়ে ওঠে না।

প্রথমকে বলল সুরেশ্বর, "'এবার পুজোর সময় আমাদের ওখানে চলো।'

'চলো, ভালই হবে।'

'চিঠি লিখে দিচ্ছি তাহলে—?'

'দাও। তোমাদের বাড়িতে সাপখোপ আর সিঁড়ি বেশী নেই তো?'

সুরেশ্বর অবাক। 'কেন? হঠাৎ সাপখোপ আর সিঁড়ির দুশ্চিন্তা হল কেন?'

'সাপখোপে আমার ভীষণ ভয়—' প্রমথ হাসতে হাসতে বলল, 'আর সিঁড়িঅলা বাড়িতে নির্মলাকে নিয়ে থাকতে ভয় হয়।' "

সাপখোপের দুশ্চিন্তা সুরেশ্বরের হয়নি, কিন্তু সিঁড়ির দুশ্চিন্তা হয়েছিল। নির্মলার কথা ভেবে যাওয়ার-ব্যবস্থাটা হয়ত সে বন্ধ করত, নির্মলা হতে দেয় নি।

পুজোর সময় দেশে গিয়ে সুন্দর লেগেছিল। অত বড় বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, নীচের মহলে একটা প্রাইমারী স্কুল বসেছে, ঠাকুরদালান অব্যবহৃত, জঞ্জাল জড় হয়েছে অনেক। তবু হালদারমশাই যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়েছিলেন। দোতলায় ওরা থাকত। পুবের জানলা খুললে নদীর চর আর আদিগন্ত মাঠ দেখা যেত। সেই আমবাগান আর ছিল না। রথতলার মাঠ তখনও ছিল।

নির্মলাকে ধরে ধরে ছাদে নিয়ে যেত সুরেশ্বর। ছাদের সিঁড়িটা বরাবরই কেমন ছোট ও অন্ধকার মতন ছিল। ছাদে এসে নির্মলা হাত ছাড়িয়ে নিত; ধীরে ধীরে পায়চারি করত, সকাল অথবা বিকেলের বাতাস তার খুব পছন্দ ছিল। নদীর চরে বেড়াতে নিয়ে যেত নির্মলাকে, মাঠের সবুজের দিকে তাকাতে বলত, আকাশের দিকে চোখ তুলে সাদা ভাসন্ত মেঘ দেখতে বলত। দৃষ্টিশক্তিকে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেবার জন্যে নির্মলার ব্যগ্রতা অপেক্ষা সুরেশ্বরের ব্যগ্রতা ছিল বেশি। ক্ষণে ক্ষণে সে আঙুল তুলে কাছের কিছু দেখাত; ওটা কি গাছ বলো তো? বক দেখতে পাচ্ছ ওখানে, পাচ্ছ না? তোমার পায়ের কাছে ফড়িংটা ধরো... ......

নির্মলা এক একদিন বলত, "'তোমার ডাক্তারীতে আমি মরে যাব।'

'ডাক্তারী কোথায়! এ-সব তো চোখের পক্ষে ভাল।'

'মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমার চোখ দুটো যেন তোমার, নিজের চোখ নিয়েও মানুষ বোধ হয় এত করে না......'

সুরেশ্বর কোনো জবাব দিত না।

একদিন নির্মলা সন্ধ্যেবেলায় ছাতে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলল, 'আমি কতদিন তারা দেখি না, তারা দেখতে বড় ইচ্ছে করে......'

প্রথম আপনমনে গান গাইছিল, গান থামিয়ে বলল, 'আজ তারা নেই। চাঁদের খুব আলো, কাল পূর্ণিমা।' তার কথা থেকে যেন মনে হবে, আকাশে তারা নেই বলে নির্মলা দেখতে পাচ্ছে না, তারা থাকলেই দেখতে পেত।

এমন কিছু কথা নয়, তবু সুরেশ্বরের কোথায় যেন এক বুকভাঙা বেদনা অনুভব করল। এত বড় বিশ্ব, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, এই চাঁদের আলো—সব যেন মলিন ও অর্থহীন মনে হল। সুরেশ্বর পরে বলল, 'নীচে যাওয়া যাক—হিম পড়ছে যেন।'

আনন্দের মতন নির্মলা সুরেশ্বরের কোনো বেদনারও উৎস ছিল। জীবনের নানা দুঃখের সঙ্গে সুরেশ্বরের বাল্যাবধি পরিচয়। তার বাবা, মা, বাবার উপপত্নী, বিনুমাসি, এমন কি হেম সংসারের কোনো-না-কোনো দুঃখের ছবি। এরা যে দুঃখী—তাতে সুরেশ্বরের সন্দেহ নেই। এদের দুঃখ সুরেশ্বর বোঝে। কিন্তু তার মনে হয় না, সেই সব দুঃখ আর নির্মলার মধ্যে যে বেদনার উৎস আছে তা এক।

মার দুঃখ যেন অত্যন্ত ব্যক্তিগত। অসাধারণ রূপ ছিল অথচ মা তার স্বামীর অনুরাগ ও সাহচর্য পায় নি, মা অবজ্ঞা পেয়েছে। এই দুঃখ মা পেত না যদি বাব

মার ওপর অনুরক্ত হতেন। আর সমস্ত দুঃখই একজনের বঞ্চনা থেকে এসেছে। বাবা ঠিক দুঃখী নয়, হতভাগা। বাবার কোনো দুঃখবোধ ছিল না, যা বাবাকে দেখলে দুঃখ পাবার কারণও ছিল না। অনাচারী মানুষকে দেখলে যে ধরনের করুণা হতে পারে বাবাকে দেখলে বড় জোর সেই রকম করুণা হত।

এক সময়ে হেমকেও দুঃখী মনে হত সুরেশ্বরের : যখন হেম অসুস্থ, যখন হেম হাসপাতালের বিছানায় অসহায় হয়ে পড়েছিল। সে-সময় হেমের বিবর্ণ, খড়িমাটি-ওঠা চেহারা, তার কোটরাগত করুণ দুটি চোখ দেখলে সুরেশ্বর ব্যাকুল ও অভিভূত হত। এত অল্প বয়সে ভয়ংকর এক ব্যাধি তার জীবনীশক্তিকে তিলে তিলে শুষে নিচ্ছে—এই চিন্তা সুরেশ্বরকে কাতর ও পীড়িত করেছিল। তার মনে হয়েছিল : এ-ভাবে জীবনের অপচয় ঘটতে দেওয়া অর্থহীন। হেমকে আরোগ্য করে তোলা তার কর্তব্য বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু হেমের অসুস্থতা, তার রোগশয্যা, অসহায়তা ও দুঃখ সুরেশ্বরকে বৃহৎ কোনো বেদনার সংগে পরিচিত করায় নি। তার কখনও মনে হয় নি, হেম সাংসারিক রোগ-শোকের ভোগ ছাড়া আর কিছু ভোগ করছে। তারপর হেম সুস্থ হয়ে গেল। তার আরোগ্যলাভের পর হেমের দুঃখের চেহারাটা ধুয়ে গেছে। এক সময় কিছু ময়লা পড়েছিল, এখন তা পরিষ্কার হয়ে স্বাভাবিক মানুষটি ফুটে উঠেছে—এর বেশি কিছু হেমকে দেখে মনে হয় না।

নির্মলার মধ্যে যে-বেদনা তা যেন তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য নয়। সুরেশ্বর বুঝতে পারত না—কিন্তু অনুভব করত, নির্মলা যেন মানুষের এমন একটি অবস্থাকে ইঙ্গিত করছে যার ওপর তার কোনো হাত নেই। আয়ত্তাতীত এই অদৃষ্ট, অথবা সেই পরিণতি যাকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই— নির্মলা যেন সেই পরিণতির অসহায়তা প্রকাশ করছে। শেষাবধি মানব-জীবন মৃত্যুর কাছে পরাজিত, ভাগ্যের কাছে তার সমস্ত উদ্যম মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, এই মুহূর্তের সুখ পরমুহূর্তে বিষাদ হতে পারে। শৃঙ্খলাহীন, যুক্তিহীন, স্বৈরাচারী নির্মম কি যেন এক আছে। তার কাছে জীবনের সমস্ত কিছুই যেন আকস্মিক, অর্থহীন। দুঃখ বই জীবনে বস্তুত কিছু নেই, যন্ত্রণা ও ক্ষোভ বিনা মানব-ভাগ্যের অন্য পরিণতি নেই।

সুরেশ্বরের মনে ক্রমশ এক নৈরাশ্য দেখা দিতে শুরু করেছিল। নিরর্থক জীবনধারণ, অস্থায়ী এই সুখ, অকারণ এই আত্মরক্ষার কি যে প্রয়োজন সে বুঝে উঠতে পারত না। অথচ এই নৈরাশ্য সুরেশ্বরের স্বভাবজাত নয়। সে অদৃষ্টবাদী ছিল না। নির্মলার

কেননা তার মনে এই নৈরাশ্য কেমন করে সংক্রামিত করেছিল সে জানে না, কিন্তু নির্মলার কোথাও নৈরাশ্য ছিল না। নির্মলার সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং বিশ্বাস মাঝে মাঝে সুরেশ্বরকে এত বিচলিত করত যে সে ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন হত।

"'তুমি সব বুঝেও বোঝ না,' নির্মলা বলত, 'আমাদের দুটো হাত, সবদিকে লড়াই করা যায় না।'

'তবে তো সংসারে আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে পারি।'

'না, তা পারি না।'

'কেন?......'

'জানি না। সাধ্য আর অসাধ্য বলে দুটো কথা আছে।...যা অসাধ্য তা না করতে পারলে আমার দুঃখ হয় না।' "

সুরেশ্বর যে এইসব সহজ কথাগুলো না বুঝত এমন নয়, বুঝেও কোনো মানসিক চাঞ্চল্যের জন্যে অকারণে ক্ষোভ প্রকাশ করত। সে বুঝতে পারত, এতকাল তার জীবনের যে দিকে গতি ছিল, এখন সেদিকে তার জীবন বইতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে সে অকর্মণ্য, অকারণ জীবন যাপন করে যাচ্ছিল। তার জীবনের প্রয়োজন অথবা অর্থ সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। কখনও আবেগ, কখনও অভ্যাসবশে, কখনও স্বাভাবিক দুর্বলতায় সে গা ভাসিয়েছে। কখনও স্বার্থ, কখনও অহঙ্কার, কখনও সামাজিক লোকলজ্জায় সে উদার হয়েছে। কিন্তু এর কিছুই তার অন্তরের নয়। জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন নিরপেক্ষ দর্শকের, সক্রিয়তার নয়।

মানসিক এই অশান্তি এবং চাঞ্চল্যের সময় সুরেশ্বর একদিন নির্মলার বিদায়-পর্বটা নির্বোধ, অক্ষম পশুর মতন লক্ষ করল:

সেদিন দোল পূর্ণিমা, সারাদিন কলকাতার পথে রঙের ছড়াছড়ি গেছে, লাল বেগুনী নীলের ছোপ ধরা রাস্তা, বাতাসে ফাগের গুঁড়ো উড়ছে, ছেলেমেয়েগুলোর মাথার চুল রুক্ষ, গালে-গলায় তখনও রঙের ছোপ, বাড়ির দেওয়ালে পানের পিচের মতন বিচিত্র সব রঙ ছিটোনো, বিকেলে চৈত্রের বাতাস বইতে শুরু করল, চাঁদ টলটল করে ফুটে উঠল আকাশে।

সুরেশ্বর হেমদের বাড়ি হয়ে প্রমথদের বাড়ি পৌঁছলো যখন তখন সন্ধেরাত। প্রমথ ঘরে বসে তার কলেজের ক'জন বন্ধুর সঙ্গে হা হা করে গল্প করছে, ঘরের মধ্যে অট্টরোল।

নির্মলা বলল, " 'এস, তুমি বরং আমার ঘরে বসো; ওঁরা একটু পরেই চলে যাবেন।'

সুরেশ্বর প্রমথকে মুখ দেখিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

নির্মলা দুধ-সাদা খোলের শাড়ি পরেছিল, পাড়টা ছিল কালোর ওপর মুগা করা। নির্মলা কোনো কালেই যত্ন করে চুল বাঁধত না, কোনো রকম খোঁপা জড়িয়ে নিত, সেদিন বুঝি মাথা ঘষে ছিল, রুক্ষ চুল ছিল তার পিঠময় ছড়ানো, শাড়ির আঁচলে চাপা দেওয়া।

সুরেশ্বর বলল, "'ব্যাপার কি, আজকের দিনে এরকম সাদা শাড়ি?'

'ব্যাপার আবার কি, পরেছি। কেন?'

'আজকে সাদা কিছু দেখলেই হাত কেমন করে...'

'রঙ দেবে! দাও!'

'বরং আবীর দি একটু...'

'আমি দেব, না তুমি এনেছ?'

সুরেশ্বর হাসল, 'তুমিই দাও।'

নির্মলা তার ঘরের কোন্ কোণ থেকে কাঠের পাউডার-কৌটোয় রাখা লাল আবীর এনে দিল। আবীরের সঙ্গে গন্ধ মেশানো ছিল।

'চশমাটা খোল...' সুরেশ্বর বলল।

'মুখে দেবে নাকি? না—না—'

'কপালে দেব; চশমার কাঁচে পড়তে পারে।...'

নির্মলা চশমা খুলে হাতে রাখল।

সুরেশ্বর আবীরের একটি ছোট টিপ পরিয়ে দিল, তারপর বলল, 'বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে।'

নির্মলা হেসে ফেলল। 'তোমায় একটু দি—, পায়ে দি।'

'না; পা ছোঁবে না।'

'তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আমি ছোট; তোমার পায়ে হাত দিতে আমার লজ্জা নেই।'

'কপালে দাও।'

নির্মলা শেষ পর্যন্ত অবশ্য পায়ে আবীর দিল। দিয়ে অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে দু চারটে কথা বলে শেষে বলল, 'বস, চা নিয়ে আসি।'

নির্মলা চলে যাবার পরও যেন তার দুধের মতন সাদা শাড়ির, তার আঁচল চাপা এলো রুক্ষ চুলের, তার কপালের আবীরের ছোট্ট টিপটির সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা সুরেশ্বরের চোখে ভাসছিল।

হঠাৎ কেমন যেন একটা অদ্ভুত, অবর্ণনীয় বাঁচবার আকুলতার চিৎকার ভেসে এল। দরজার শিকল খুলে ছুটে যাবার আগে যা ঘটবার ঘটে গেছে। বাড়ির রাঁধুনীদিদির সহকারিণী মেয়েটি রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে, আর রান্নাঘরে নির্মলা তখনও তার শাড়ি এবং চুলের আগুন নেবাবার চেষ্টা করছে।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় নির্মলা অজ্ঞান ছিল।

পরে, তিন দুবেক বাবার তার জ্ঞান হয়েছিল; এই জ্ঞান কুয়াশাচ্ছন্ন-চেতনার। অবশিষ্ট কয়েকটি দিন নির্মলার ওই ভাবেই কেটেছে। কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, পারত না; অস্পষ্ট করে কিছু বলত, কিছু বলতে বলতে থেমে যেত। কয়েকটি দাহের জ্বালা যেন তার দুর্বল শীর্ণ দেহটিকে শববাহকের মতন বহন করে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর কাছে নিয়ে গেছে। কিন্তু এই সরল সমাপ্তির আগেই নির্মলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কি করে হয়েছিল সেটা রহস্য। হয়ত সেদিন রান্নাঘরে চা-করার সময় সে হঠাৎ তার চোখের সামনে সব আলো নিবে যেতে দেখে বিহ্বল হয়ে চলে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে শাড়ির আঁচলে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিল, হয়ত সে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশত এবং অসতর্কতাহেতু শাড়িতে আগুন লাগিয়ে ফেলেছিল আগেই—তারপর সহসা-আতঙ্কে তার স্নায়ু আহত হয়ে পড়েছিল, সেই আঘাত তার অতি দুর্বল দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ে। অন্য কিছুও হতে পারে...। কে জানে। নির্মলা মনে করে কিছু বলতে পারে নি। বলা যায় না হয়ত।

নির্মলার মৃত্যু সুরেশ্বরের পক্ষে দুঃসহ হয়ে পড়েছিল। কি যেন তাকে সর্বক্ষণ তাড়িত করে নিয়ে বেড়াত; অন্তরের কোনো নিভৃত যন্ত্রণা ও প্রশ্ন তাকে ব্যাকুল ও বিভ্রান্ত করত; এই জীবন মূল্যহীন অর্থ-হীন মনে হত; কোনো সান্ত্বনা ছিল না, শান্তি ছিল না। এমন নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য আর কখনও মনে হয় নি নিজেকে।

সুরেশ্বর বুঝি কিছু অন্বেষণের আশায় বিভ্রান্তের মতন কলকাতা ছেড়ে চলে যায় তারপর। কয়েক মাস পরে ফিরে আসে আবার চলে যায়। এই ভাবে তার কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল। প্রমথও আর কলকাতায় ছিল না। ক্রমে সুরেশ্বর কলকাতা ছাড়ল।

সুরেশ্বর যেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠল, জেগে উঠে দেখল নির্মলা আর নেই। অন্ধ আশ্রমের ঘরে সে শুয়ে আছে, রাত কত বোঝা যায় না টাইমপিস ঘড়িটার শব্দ বাজছে, নিকষ কালো অন্ধকার, পৌষের অসহ শীত তার ঘর জুড়ে বসে আছে।

(ক্রমশ

সুরে-ভরা দিনগুলি

সাহানা দেবী

অতুলপ্রসাদ সেন-এর কথা মনে হলেই মনে পড়ে তাঁর গানের কথা, মনে পড়ে সেইসব সুরে-ভরা সংস্পর্শের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা। অতুলদা আমার আত্মীয়, আমার আপন পিসতুতো ভাই হলেও তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধের মূল্য আমার কাছে ছিল আত্মীয়তার চাইতেও বেশী, তা হচ্ছে সঙ্গীত নিয়ে সম্বন্ধ। অতুলদা ছিলেন গানপাগল, আমিও পড়ি সেই পর্যায়েই। গান পেলে হয়ে যেতাম যেন অন্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান গেয়ে যেমন মন ভরে উঠত, অতুলদার কাছেও হত সেই রকম। গান শুনে অত খুশী হয়ে উঠতে আমি কমই দেখেছি। কি যে করবেন যেন ভেবে পেতেন না। কত দীর্ঘ সময় ধরে এঁদের কাছে বসে আমি গান গেয়েছি। কখনও শিখেছি, কখনও একটানা একটার পর একটা গেয়েই চলেছি, গান শুনে কখনও এঁদের ক্লান্ত হতে দেখিনি। বরং মনে হয়েছে গান শোনার আনন্দে এঁরা ভুলে যেতেন আর সব। বড় ভালো শ্রোতা ছিলেন। অতুলদা শুধু সঙ্গীত অনুরাগীই ছিলেন না, সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণ, সত্তার নিত্য সহচর। গাইতেনও সুন্দর। আওয়াজ খুব জোর না হলেও তাঁর অন্তরস্পর্শী, মিষ্টি মধুর আর দরদে ভরা ছিল কণ্ঠস্বরটি। যখনই গাইতেন, যে গানই গাইতেন, প্রাণে লেগে থাকত তার স্পর্শ, মধুরতার একটা রেশ। অতুলদার রচিত সব গানগুলিতে আমরা পাই একটা বিশেষ মধুরতার আস্বাদ। তাঁর নিজের গান তাঁর মুখে যা শুনেছি, আর এখন যা চরাচর শুনতে পাই তা এতই তফাত যে, তা গান আর অতুলদার গান বলে চেনা যায় না।

সুদু মধুর সুরের নানা কাজের আলোছায়ার ভিতর ছোট্ট এক-একটি খোঁচ ও এক-একটি প্যাঁচড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গীতে ধরা পড়ে সূক্ষ্মতার স্পর্শ, রস, কমনীয়তা ও লালিত্য। সব জড়িয়ে তাঁর গান হয়ে ওঠে অদ্ভুত একটা 'ডেলিকেসি'। অতুলদার গানের বিশেষত্ব এইখানেই। নিজস্ব তার ছাপ, স্বকীয়তার ধরন। তারই মাঝে আমরা শুনতে পাই অতুলগীতির মর্মের সুর। এ গানের মাধুর্য এমন যে শুনলেই মন স্বতঃই বলে ওঠে, 'আহা!' এই 'এমন জিনিস'টিই দেয় অতুলদার গানের আসল পরিচয়। তাঁর সঙ্গীতে সুরচিত্রণে নেই জাঁকজমকের ঘটা, নেই চমক লাগাবার চেষ্টা, আছে পেলব মাধুর্যের স্নিগ্ধতায় ভরা মনোহরা স্পর্শ ঃ স্বরলিপিতে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। এসবের স্বরলিপি করা যায় না, করা সম্ভবও নয়। শুধু যে অতুলদার গানের বিষয় বলছি তা নয়, এই জাতীয় বিশিষ্ট শ্রেণীর বাংলা গানের সম্বন্ধেই বলছি, যে-জাতীয়

উত্তর ভারতের দানবীর ও জননেতা
অতুলপ্রসাদ সেন

গানে কথার মূল্য বিশেষভাবে ধরা হয়ে থাকে। বাংলা গানে কথার ভাব বাদ দেওয়া যায় না কেননা তার কথার সঙ্গে সুরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বিশিষ্ট শ্রেণী বলছি এই কারণে যে, গান রচনা হয়ত অনেকেই করে থাকেন, কিন্তু যেসব গীতিকারের গান তাঁদের বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ আসন পায়, একটা বিশেষ পর্যায়ে পড়ে, আমি বলতে চাইছি সেইসব গুণীদের গানের কথা। স্বরলিপিতে গানের সুরের কাঠামোটুকুই কেবল দেওয়া যায়। বাকি সব দিতে হয় গায়ককেই। সেই জন্যে যাঁরা শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলেন, রচয়িতার আসল গানকে গানের ধরনধারণ বা ধারা সম্বন্ধে যাঁদের সেরকম কোনও জ্ঞান নেই, অভিজ্ঞতা নেই, ধারণাও বিশেষ নেই, তাঁদের তোলা গানের সঙ্গে রচয়িতার গানের এত বেশী পার্থক্য থেকে যায় যে, সে গানের মধ্যে রচয়িতার গানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না তার আসল জিনিসের স্পর্শ, ফোটে না তার যথার্থ রূপ, আর বাদও পড়ে অনেক কিছুই। সুরের কাঠামোই তো গান নয়। তাই শুধু স্বরলিপি থেকে গান তোলা সম্পূর্ণ হয় না, সফলও হতে পারে না, যদি না গায়কের রচয়িতার রচনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ও বিশেষ অন্তরঙ্গতা থাকে। যদি না কোনটি রচয়িতার নিজস্ব ছাপ ও বিশেষত্ব, সেটিকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, যদি না অন্তরে তাঁর গানের অতলস্পর্শী ভাব উপলব্ধি করে থাকেন। নইলে হাজার বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপির সুরকে অনুসরণ বা অবিকল অনুকরণ করে গেলেও রচয়িতার গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না, ধরা যায় না তাঁর দেয় বস্তুটিকে আর পাওয়া যায় না তাঁর রচিত গানকে বা গানের প্রকৃত পরিচয়। যথার্থ শিল্পী মাত্রেরই থাকে তাঁর প্রতিভার নিজস্ব ছাপ, যা দিয়ে তাঁকে চেনা যায়, যেটি দেয় তাঁর পরিচয়। আমি শুধু আমাদের গীতিকারদের কথাই বলছি না। কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি শিল্পকলা জগতের সব শিল্পীবৃন্দের কথাই আমি বলছি। তাঁদের প্রত্যেককে আমরা চিনতে পারি তাঁদের নিজস্ব ছাপটি দিয়ে। এই ছাপ দিয়েই আমরা চিনতে পারি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, চিনতে পারি অতুলপ্রসাদকে। এমনি করেই দ্বিজেন্দ্রলাল শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুলকে, চিনেছি আবদুল করীম, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলী, কেশরবাঈ, ভীষ্মদেব, আর আলাউদ্দীন, হাফেজ আলী, এনায়েত খাঁ, আলী আকবর, তিমিরবরণ, পণ্ডিত রবিশংকর প্রভৃতি সঙ্গীতমুকুটমণিদের।

ছোটবেলায় অতুলদার সঙ্গে যে আমাদের খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হত তা নয়। তার কারণ তিনি থাকতেন পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ শহরে, আমরা কলকাতায় আমাদের মামার বাড়িতে। এই বাড়িই পরে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'-এ রূপান্তরিত হয়। আমাদের পিতামহের (ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত) সব নাতিনাতনীদের মধ্যে অতুলদাই ছিলেন সকলের বড়। আমরা, গুপ্তপরিবারের ভাই-বোনেরা, তাঁকে ডাকতাম 'ভাইদা' বলে। অতুলদা যখন লক্ষ্ণৌ আদালতে যোগ দেন আমরা তখন ছোটো। আমি জন্মাবার দু'তিন বছর আগেই তিনি বিলাত থেকে

ফিরে আসেন আইনজীবী হয়ে। পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে কখনও কলকাতায় এলে হয়ত দেখা হত। সে সময় প্রায়ই দেখতাম আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকেই ভাইদাকে ঘিরে বসেছেন গান শোনার আগ্রহে। বিশেষ করে তাঁর স্বরচিত গান সম্বন্ধে সকলেরই খুব উৎসাহ ছিল। মনে আছে ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজনের কারও নামকরণ হলে তাঁর রচিত এই গানটি আমরা প্রায়ই গাইতাম—

"তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে উঠেছে
কুসুম ফুটিয়া।"

গানটি আমার জ্যাঠামশায়, সার কে, জি, গুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা আমাদের তপ্‌সীদির (ইলা সেন—পাটনার গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্রবধূ, সারদাপ্রসাদ সেনের পত্নী) নামকরণ উপলক্ষ্যে ভাইদা রচনা করেন। শুনেছি তাঁর নিজের বয়স তখন খুবই কম ছিল; চোদ্দ পনেরোর বেশী নয়।

অতুলদার কাছে আমার প্রথম শেখা গান হল—"তব পারে যাব কেমনে হরি।" গানটি শিখি দার্জিলিঙে ম্যাকেন্‌জি রোডের উপর ডাক্তার পি কে রায়ের (আমাদের বড় মেসোমশায়) "রুবি হল্‌" নামক বাড়িতে বসে। সেই একই দিনে—"বঁধু ধর ধর মালা পর গলে" গানটিও শিখি। অতুলদা এসে সেবারে ওই বাড়িতে ছিলেন। আমি ছিলাম আমার বাল্যবন্ধু বুবুদের বাড়ি। অকল্যাণ্ড রোডের উপর "হ্যাভলক ভিলা" নামের বাড়িটির পাশ দিয়ে যে সরু রাস্তা নেমে গেছে, তার ঠিক অপর পারেই ছিল যে বাড়ি সেই বাড়িতে বুবুরা ছিল। ওদেরই সঙ্গে সেবার মা আমায় পাঠিয়েছিলেন। বুবুর মা, জ্ঞানদা মাসিমা, আমাদের মায়ের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমার মামা সুধীরঞ্জন দাশের (সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য) সঙ্গে পরে বুবুর বিয়ে হয়। অতুলদার কাছে গান শেখার ইচ্ছে অনেক-দিন থেকেই, কিন্তু এ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। এইবার দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম সেই সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া গেল। এত আনন্দ হল তাঁর কাছে গান শিখতে পেরে! যে ক'টা গান পারলাম শিখে নিলাম। অতুলদার গান শেখানোর ধরন আর পদ্ধতিটি এমন ছিল যে, গান শেখার আনন্দ ও আগ্রহ দুই-ই যেন দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তিনি নিজেও গান শেখাতে উৎসাহিত বোধ করতেন। দেখতাম তাঁর সঙ্গীতপিপাসু মন কি রকম রসঘন হয়ে উঠত। গান শুধু শুনতেই ভালোবাসতেন না, শেখাতেও ভালোবাসতেন সমানই। সেবার দার্জিলিঙে যখন যাই তখন কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে চলে এসেছি। খানিকটা ছাড়া পেয়ে বেশ নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা করার নিজ নতুন আনন্দের রসাস্বাদন করছি। কিন্তু হলে হবে কি। তার সঙ্গে আরও দেখেছি, চারিদিকের অজস্র অফুরন্ত রাশি রাশি অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝে কিসের হাতছানি যেন আমার মনে কেবলই ছায়া ফেলত, কেবলই যেন কোথায় কোন্‌দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত। হিমালয়ের ওই স্তব্ধতা, ওই অটলতা, ওই অকল্পিত বিরাটত্ব অন্তরের গভীরে কোথায় যেন সাড়া দিত, ধ্বনিত করে তুলত কি এক সুর তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে—আমার চিত্ত হয়ে উঠত "অকারণে চঞ্চল"। —হিমালয় পর্বতকে দেখে শুধু পর্বত মনে হত না। কেন জানি না মনে হত ধ্যান-নিশ্চল কোন্‌ এক বিরাট সত্তা। এইসব অনুভূতি এক দিকের, আবার আরেক দিকের
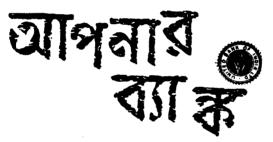
আরেকটি জিনিস আমাকে টানত যা ছেলেমানুষি, না হয় পাগলামিই বলা চলে। বাড়ি থেকে বের হলে আর সঙ্গে কেউ না থাকলে, পাকা সড়ক ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে যেখানে পথ নেই সেইসব জায়গার ভিতর দিয়ে চলতে, ওঠানামা করতে খুব ভালো লাগত। মনে আছে তখন আরও ছোটো, ওইভাবে পাহাড়ের গায়ে পথ না থাকা পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এক এক সময় এমন দিকে চলে যেতাম যে, আশেপাশে জনমনিষ্যির বসতি দেখতে পাওয়া যেত না আর তা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক যে না হত তা নয়। তবু দমবার পাত্রী ছিলাম না। কখনও এমন হয়েছে, পা হড়কে পড়বার মুখে ছোট ছোট গাছের ঝোপের খানিকটা আঁকড়ে ধরে কোনও রকমে সামলে গেছি। এইসব ঝোপঝাড়ের মাঝে ভারি সুন্দর ছোট ছোট হলদে একরকম অম্লমধুর ফল পাওয়া যেত, তার প্রতিও লোভ কম ছিল না। কখনও ফিরবার পথ হারিয়ে ফেলতাম। তা সত্ত্বেও এইসব অজানা অচিন পথে যাবার একটা প্রবল নেশা কেমন আমায় পেয়ে বসত, রোখ্ চেপে যেত। বোঝা যাচ্ছে তখন থেকেই অ্যাডভেনচার জাতীয় জিনিস বেশ পছন্দ ছিল। দার্জিলিং যাওয়া আসা আমাদের ছোটোবেলা থেকেই, তবু দার্জিলিঙের আকর্ষণ কখনও কমেনি। দার্জিলিঙে যাবার কথা উঠলেই ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম।

সেবার 'গ্লেন ইডেন' দু নম্বরের বাড়িতে ছিলেন সার নীলরতন। তাঁর মেয়েরা অতুলদা ও আমি, আমরা সবাই এক সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প বলে আমাদের খুব হাসাতেন, নিজেও হাসতেন, হাসিটি ছিল ভারি প্রাণখোলা। এমনিতে তিনি ছিলেন ভারি শান্ত, ধীরস্থির। খানিকটা লাজুক, মিষ্টভাষী ও মোলায়েম প্রকৃতির। কিন্তু অন্তরঙ্গ মহলে মানুষটি ছিলেন বেশ মজলিসী মেজাজের। সবাইকে নিয়ে যখন গল্পের আসরে বসতেন তখন কি যে জমাতেন! একদিন একটি মজার গল্প করছিলেন:—ব্রিটিশ সরকার বোধহয় টাকাকড়ির ব্যাপারে কড়াকড়ি কিছু একটা করেছিলেন, হয় আইন নয় তো অন্য কিছু, সে সব আমার অত মনে নেই। তারই বিরুদ্ধে কোনও বক্তৃতামঞ্চে নানা লোকের বক্তৃতাদি হচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে "The Government says" বলে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে ক্রমে এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে, বক্তৃতার মাঝে অবিকল হিন্দী সুরেই বলে ওঠেন—"আরে, Whose money? Your father's money?"—অতুলদার ঠিক সেই সুরটি অবিকল নকল করে বলার ধরন দেখে আমরা

লক্ষ্ণৌর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ্ অতুলপ্রসাদ সেন

হাসতে আরম্ভ করে আর থামতে পারি না। কত গল্পের পুঁজিই যে ও'র ছিল!

একবার আমরা অনেকে 'ক্যালকাটা রোড' বলে রাস্তাটি দিয়ে চলেছিলাম। অতুলদাও ছিলেন। এই রাস্তাটি ধরে সোজা গেলে দার্জিলিঙের আগের স্টেশন 'ঘুম'-এ পৌঁছনো যায়। 'ঘুম' দার্জিলিঙের চাইতে আরও বেশ উঁচুতে অবস্থিত। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা থাকতে দেখা যায়। চলতে চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এল মৃদু সুরে গান। চেয়ে দেখি সামনে পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুনগুন করে গাইছেন নিজেরই একটি গান—"কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর।" মন যেন তাঁর কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম, আমার মনও ডানা মেলল। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে এক-একবার তাকিয়ে বলছিলেন—"গা না ঝুনু, গা না রে একটা গান।" খানিক দূরে গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাকদণ্ডী দিয়ে একটু উপরে উঠে সুন্দর একটি জায়গা দেখে সবাই বসলাম। জায়গাটিতে এক একটি আলগা পাথর এমনভাবে রয়েছে যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওইভাবেই রাখা হয়েছে, বুঝি ওইভাবে তৈরি করা হয়েছে বসবার জন্যেই। পাথরগুলি বেশ ছড়ানো ছিল। যে যেটার উপর পারলাম গিয়ে বসে পড়লাম। সকলের মধ্যে একটা স্তব্ধভাব যেন জমাট বেঁধে উঠেছে। সেই সময় অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন—"পাগলা মনটা রে তুই বাঁধ।" প্রাণ ঢেলেই তিনি তন্ময় হয়ে গাইছিলেন। অদ্ভুত একটা পরিবেশের সৃষ্টি হল। এই গানটি রেকর্ডে দাশগুপ্তার গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে যখনই শুনি মনে পড়ে যায় অতুলদার সেদিনের গাওয়া এই গানটির কথা। পরে অতুলদা আমাকে গাইতে বলেন। আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান—"কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়।" শুনে অতুলদা কি যে বলবেন ভেবে না পেয়ে থেকে থেকে সমানে কেবল বলে যেতে লাগলেন—"বাঃ বেশ গেয়েছিস, বেশ গেয়েছিস।" চারিদিকের গগনচুম্বী সব ছন্দের দৃশ্য তার উপর অতুলদার গাওয়া ওই গান মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুন্দর সুরে যে, গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসছে যেন অন্য কোন্ জগৎ থেকে। সে অভিজ্ঞতা কোনো দিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ এসেছেন। আছেন "আসানটুলি" নামক বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথী বাবু ও প্রতিমাদি। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে। দেখা করতে যাবার জন্যে মন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। খুব আনন্দ হচ্ছে কবি এসেছেন শুনে। গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে, বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনে বসবার ঘরে একা বসে গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা হাসি পিয়ানো বাজিয়ে গাইছেন রবীন্দ্রনাথের গান—"চলি গো চলি গো যাই গো চলে।" ভারি মিষ্টি গাইছিলেন। পরে খবর পেয়ে

চলে এলেন। অতুলদাও গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কবি খুবই খুশী হলেন, তাঁর স্নেহ করতেন অতুলদাকে। হাসির সঙ্গে তখন আমার তেমন আলাপ ছিল না। পরে খুব ভাব হয় ও সে ভাব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হয়। সেদিন কবি বেশির ভাগ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনীই সবিস্তারে অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন। ১৯১২ সালে যে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন, সেবার তিনি আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন, সেই সব কথাই হচ্ছিল। সেই আসরে সেদিন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অতুলদা, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতুলদা আগ্রহ প্রকাশ করে জেনে নিচ্ছিলেন কবি নতুন কি কি গান বাঁধলেন, কি লিখলেন ইত্যাদি। এই সব নানা কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ কবি কি মনে করে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আমায় একটু দেখলেন, পরে বেশ একটা ভঙ্গিতে অতুলদার দিকে চেয়ে, গলার স্বরটি নামিয়ে, অর্থপূর্ণ চাপা হাসি হেসে, চোখের ইশারায় একবার আমাকে দেখিয়ে অতুলদাকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করলেন—"গানে অনুরাগ কি বলে?

গাইছে আজকাল?" অতুলদা হেসে বললেন—"গানে অনুরাগ তো খুবই দেখছি—উৎসাহের শেষ নেই। এরই মধ্যে আমার কাছে এসে ক'টা গান শিখে নিয়েছে।"—অতুলদার কথা শেষ হতে না হতে চোখে মুখে এমন এক ভাবের ছটা ফুটিয়ে রহস্যের সুরে আরও রস ঢেলে বেশ টেনে টেনে কবি বলতে লাগলেন—"ওহে, রোস, রোস, এখনও ত বিয়ে হয়নি।" ও'র সেই বলার ভঙ্গিতে ঘরসুদ্ধ লোক সজোরে হেসে উঠলেন। কবির কাছে আমি পরেও শুনেছি আমায় বলেছেন—"তোমাদের মেয়েদের হয় বিয়ে নয় গান, দুটোর মাঝামাঝি কিছু নেই।"

একবার স্থির হল 'ঘুম রক' বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেইখানে বনভোজন করতে যাওয়া হবে। সরে নীলরতনের মেয়েরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। বড় মেয়ে বেবুদি, মেজ মেয়ে আকশিদি, সেজ মেয়ে টুলী, ন'মেয়ে আমার বন্ধু বুলী। ছোট মেয়ে টুনী এই দলে ছিলেন কিনা তা ঠিক মনে করতে পারছি না। প্রতিমাদি, রথীবাবু, অতুলদা, ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্র (আমার এক পিসতুতো ভগিনীপতি) ও আমি—আমরা ছিলাম একদল। ট্রেনে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে পরে হাঁটা পথ। শুনেছি এখন এসব পথে মোটর ইত্যাদি সবই চলাচল করে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সব হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রতিমাদির জন্যে ডাণ্ডীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুন্দর চওড়া রাস্তা, মনোরম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূর গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ার পথে উঠতে আরম্ভ করা গেল। চূড়ায় ওঠার পথটি কিন্তু অত প্রশস্ত নয়। সকলেই দেখি জোঁকের ভয়ে অস্থির ও ত্রটস্থ, কার জুতোয় কখন জোঁক ঢোকে। এই রাস্তাটিতে নাকি অসম্ভব জোঁক। যথাস্থানে যখন উপস্থিত হলাম, দেখা গেল দ্বিজেনবাবু হঠাৎ লাফাচ্ছেন। কি ব্যাপার! ভাইদা হেসে বললেন—"ওহে লাফিয়ে আর কি হবে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, রক্ত খেয়ে আপনিই পড়ে যাবে।" তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সকলেই হেসে উঠলেও প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভয় ও অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। উপরে গোল মতন জায়গা আছে সেইখানে খাবারদাবার জিনিসপত্র রেখে আমরা ঘুরে ঘুরে চারিদিকের অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করছিলাম। সকলের মনই কানায় কানায় ভরে আছে। মুগ্ধচিত্তে সবাই ঘুরছি, ফিরছি, দেখছি। দেখে দেখে কারোরই যেন আশ আর মিটছে না। খানিক বাদে ফিরে এসে সেই গোল জায়গাটিতে বসে বেবুদিদের নিয়ে আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

বাংলার কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন

মধ্যে মনে আছে দার্জিলিঙের বিখ্যাত 'Vado'র দোকানের ক্রিম দেওয়া কেক কি উপাদেয়ই লেগেছিল। তারপর চলল গান গাইবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ কত কিছু। অতুলদা গাইলেন—"মিছে তুই ভাবিস মন।" আকশিদি গাইলেন, আমিও গাইলাম। কিন্তু কে যে কি গেয়েছিলাম তা মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে অনেক সাধ্যসাধনার পর রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের "তোমার কাছে শান্তি চাব না" গানটি। দার্জিলিঙে সেবার রবীন্দ্রনাথ ও অতুলদাকে এক সঙ্গে পেয়ে যে আনন্দ করব বলে অনেক আশা করেছিলাম তা আর হল না। আমাকে হঠাৎ নেমে আসতে হল।

দিলীপকুমার রায়ের নিমন্ত্রণে একবার মধুপুরে বেড়াতে যাই। অতুলদাও গিয়েছিলেন। আমরা দিলীপের মেজ মামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র) ও তাঁর পত্নী মন্দাদেবীর অতিথি হয়ে তাঁদের বাড়িতে ছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে তখন আমার সবে নতুন আলাপ। সঙ্গীতের সূত্রেই হয় এই পরিচয়। তখন কলকাতার নানা জায়গায় দিলীপকুমার রায়ের গানের জলসা চলেছে পুরোদমে। তাঁর সঙ্গীতের অনেক আসরে আমাকেও সঙ্গে নিতেন গাইবার জন্যে। বাংলা দেশ তখন দিলীপ রায়ের অতুলনীয় কণ্ঠস্বরে, তাঁর গানের ঢঙে মুগ্ধ, পাগল। কলকাতা শহরবাসী সব মেতে আছে। বাংলা গানে তিনি এনে দিয়েছেন একটা নতুন ধারা নতুন প্রবাহ; খুলে দিয়েছেন নতুন একটা দিক। অতুলদা মধুপুরে [illegible] [illegible] দিলীপ [illegible] [illegible] [illegible]

বিশেষ করে দেখেন। গানের লোভ তো আমার যথেষ্টই, তার উপর এমন সকলের সঙ্গ সাহচর্যের লোভও দেখলাম বড় কম নেই। আগে থেকেই দেওঘর যাওয়া আমার একরকম ঠিক ছিল। দেওঘরে শ্বশুরের বাড়ি রয়েছে, সেইখানে দেওর জা আছেন, তাঁদের কাছেই যাবার কথা। কিছুদিন তাঁদের কাছে থেকে মধুপুর যাব স্থির করলাম। মনে আছে মধুপুর স্টেশনে যখন নামছি তখন চেয়ে দেখি আমার কম্পার্টমেন্ট থেকে একটু দূরেই অতুলদাও নামছেন ওই ট্রেন থেকেই। হঠাৎ ওইভাবে ও'কে দেখে এত আনন্দ হল, অবাকও হয়েছিলাম খুব। কেননা ওই গাড়িতে যে অতুলদা আসতে পারেন তা আমার ধারণায়ই আসেনি। দিলীপরা স্টেশনে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ি অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। গিয়ে দেখি বাড়িভরা লোক, ও'দের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেকেই রয়েছেন। আমি রইলাম মন্দাদেবীদের সকলের সঙ্গে তাঁদের 'প্রসাদ ভবন' নামক বাড়িতে। অতুলদা রইলেন দিলীপের বড় মামা বিখ্যাত ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে—সে বাড়ি তখন খালি। পর পর পাশাপাশি তিনটি বাড়ি মজুমদারদের তিন ভাইয়ের, একটির ভিতর দিয়ে আরেকটিতে আসা-যাওয়া করা যায়। 'প্রসাদ ভবনে'র এক তলার, পিছন দিকের প্রশস্ত বারান্দায় বেশ লম্বা একটি সারি করে সব খেতে বসা হত। সে সময় চলত উপভোগ্য গল্প ও রসিকতা, আর চলত হাসাহাসির পালা। তকুমামা, দিলীপের মেজ মামা, প্রতি কথাতেই সবাইকে হাসাতেন। তার একটি নমুনা দেবার লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলাম না। নিজে বেশ গম্ভীর হয়ে বলতেন। সেদিনও দেখি গম্ভীর হয়ে বলছেন—"ফুলশয্যার সেই দারুণ শীতের রাতে লেপটি উনি টেনে নিলেন—সেই যে আমি কাঁপতে শুরু করলাম, আজও কাঁপছি!"—হাসি আর থামেই না। অতুলদা তাঁর পুঁজি খুলে বসতেন, বার করতেন রকম রকম হাসির খোরাক, ভর ভরে যেত হাসির উচ্চরোলে। দিলীপের জ্যাঠতুত ভাই শচীন্দ্রলালও এতে কম যেতেন না। তিনি ছিলেন আরেকজন, যাঁর রসিকতা করার ক্ষমতাও ছিল যেমন ঢঙও ছিল তেমনই অদ্ভুত। চায়বার খাবার সময়ই এই ব্যাপার চলত। তা ছাড়া অন্যান্য সময়েও সুবিধা বা সুযোগ পেলে কেউই আর তা বৃথায় যেতে দিতেন না। সেবার মধুপুরে যা হাসিটা হাসতাম, মনে হয় আর কখনও এমন হাসি হাসিনি। তবে তারও উপর পাল্লা দিয়ে চলত আমাদের গান। কি গানই ক'দিন গাওয়া হয়েছিল! অতুলদা যে বাড়িতে উঠেছিলেন সেখানেই হত গান। তিনি [illegible] [illegible] [illegible]

গান, আর আমরা কখনও সব গোল হয়ে বসে সকলে এক সংগে শিখতুম। কখনও বা শুধু দিলীপ আর আমি। সকালে চা খেয়ে বসতাম, শুরু হত গান। চলত বত বেলা অবধি চলে। বিকেলে সব একজোট হয়ে এক সংগে বেড়াতে যেতাম। সে সময়ও হইহুল্লোড় হাসি গল্প কিছু কম হত না। ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা আবার আরম্ভ করা যেত গান, শেষ হত রাত্রির খাবারের ঠিক আগে। প্রাণ ভরে প্রাণ খুলে মনের আনন্দে আমরা গান করতাম। কি অফুরন্ত আনন্দেই যে কাটত সে সময়টি! অতুলদাও হয়ে থাকতেন তৃপ্তিতে আনন্দে ভরপুর। গান থামাবার দরকার না হলে হয়ত আমরা আরও চালিয়ে যেতাম। অতুলদা কিংবা আমরা কেউই যে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছি এমন বোধ হত না। সে সময় অতুলদার কাছে আমরা এই গানগুলি সব শিখেছিলাম—(১) যদি তোর হৃদ্-যমুনা, (২) থাকিসনে বসে তোরা, (৩) বিফল সুখ আশে, (৪) ওগো দুঃখসুখের সাথী, (৫) ঝরিছে ঝরঝর, (৬) কে গো তুমি বিরহিণী, (৭) শ্রাবণ ঝুলাতে, (৮) চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে, (৯) ওগো সাথী মম সাথী, (১০) মধুকালে এল হোলি, (১১) আমার আঙিনায় আজি পাখী, (১২) রুমক ঝুমক ঝুমঝুম, (১৩) আমার পরাণ কোথা যায়, (১৪) জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী, (১৫) এ বনেতে বনমালী, (১৬) কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে, আর বোধ হয় "ভারতভানু কোথা লুকালো" গানটিও শিখেছিলাম ওই সময়ই। এইসব গানগুলির মধ্যে দু-একটি গান হয়ত ভুল করেও লিখে থাকতে পারি। দু-একটি হয়ত বা ফেলেও গিয়ে থাকতে পারি, অসম্ভব নয় কিছু। মধুপুরে ছিলাম ছয় কি সাত দিন, ফিরে এসেছিলাম গানের ঝুলি বোঝাই করে।

অতুলদার কাছে গেলেই গান, শুধু গান আর গান। সব সময় সুরে সুরে ভেসে বেড়াতাম। সুর চিরদিনই আমার প্রিয়, আমায় আকর্ষণ করেছে, আজও করে সমভাবেই। যখন যেখানে যেভাবে থেকেছি, সুর শুনলেই সব ভুলে মন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। অতি শিশুকালে খেলতে খেলতে সুর যদি শুনেছি কোথাও, অমনি কান চলে গেছে সেইদিকে, খেলা ভুলে গেছি। সুর আমায় গৃহকাজে করেছে আনমনা, সংসারের মন কেড়ে নিয়েছে। সুর আমার ভগবানের প্রসাদ, আমার জীবনকে করেছে ভগবদ্মুখী। সুরে পেয়েছি আলো, পেয়েছি ভগবানের নিবিড় স্পর্শ, অনুভব করেছি তাঁকে কত-ভাবে। সুর নিয়ে পৃথিবীর জীবন শুরু করেছিলাম, আজও কণ্ঠে সুর নিয়ে চলেছি বিদায়ের পথে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, যাঁরা সুরের মানুষ, আমার সুরের জীবন তাঁদের সুরে অনেকখানি আশ্রয় পেয়েছে। তাঁদের আমি যেটুকু চিনেছি, জেনেছি তা তাদের গানের ভিতর দিয়েই বেশী। অতুলদার কথা লিখতে গেলে তাই গানের কথাই আগে মনে আসে, আর সে গানের মধ্যে আমার গানও এসে পড়েই। অতুলদার জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার জীবনে তাঁর সংস্পর্শের কথা, তাঁরই সংস্পর্শভরা আমাদের সেইসব গীতমুখর দিনগুলির কথাই আমি বলতে চেয়েছি। কিভাবে তাঁকে দেখেছি, পেয়েছি তাঁর স্পর্শ, কিভাবে তিনি সাড়া দিয়েছেন, আমি লিখবার প্রয়াস পেয়েছি বেশির ভাগ সেইসব কথাই।

নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনের সময় একবার আমি অতুলদার কাছে লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। তাঁর বাড়িভরা লোক সে সময়। অতুলদার ছোট বোন ছুটকীদি (বাংগালোরের শেষাদ্রি আয়েংগারের পত্নী) তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছিলেন, হেমীদি (অতুলদার স্ত্রী) ছিলেন তাঁদের পুত্র দিলীপ সহ, তার মাঝে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম আমার শিশুপুত্র সহ। সেই প্রথম সংগীত সম্মিলনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। সর্বক্ষণ সে যে কি অসহ্য পুলক! আগ্রহের আতিশয্যে খাবার পাট কোনও-রকমে চুকিয়ে, মনে একটা অসম্ভব তাড়ার ভাব নিয়ে চলে যেতাম অতুলদার সংগে সেই সঙ্গীত-আসরে। সারা দিনরাত্রি যতক্ষণ গানবাজনা চলত, কিভাবে তন্ময় হয়ে যে সব বসে শুনতাম মনে হত যেন অন্য রাজ্যে প্রবেশ করেছি। দিলীপ সে সময় এসে-ছিলেন, তাঁর বিশেষ বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। সংগীত-পাগল আমরা সব একদল জুটেছিলাম। সব সময়ই মেতে রয়েছি গানবাজনা নিয়ে। এক একটি পর্ব সারা হলেই উন্মুখ হয়ে উঠতাম আর একটি পর্বের শুরুর জন্যে। অতুলদা, ধূর্জটিদা, দিলীপ রায় এঁদের মত উচ্চাংগের সংগীতবোদ্ধাদের সংগে একত্রে বসে সব বড় বড় গুণীদের সংগীত শোনার গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। সংগীত-সমঝদারদের সংগে বসে সঙ্গীত যে আরও বেশী উপভোগ করা যায় তাই দেখলাম। অনেক জিনিসই চেনা যায়, ধরা যায়, শেখা যায় তাঁদের সাহচর্যের গুণে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে দেখতাম, থাকতেন মণ্ডপের মাঝে বসে। সুন্দর ধ্যানী মূর্তি, বসতেন সঙ্গীতসভা আলো করে। অতুলদার বাড়িতে একদিন তিনি এসেছিলেন। অতুলদা তাঁকে আমার গান না শুনিয়ে ছাড়েননি। গান শোনানোর সে আগ্রহ তাঁর দেখার মত। কনফারেন্স শেষ হয়ে যাবার পরে ওখানকার কোন্ এক বিরাট হলে একদিন গানের এক আসর হয়। সেই আসরে আমারও গান হয়। যে আসরে মথুরার বিখ্যাত ওস্তাদ চন্দন চৌবে, ভাত-খণ্ডের প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের মত অত বড় বড় গায়কেরা গাইবার জন্যে

এসেছেন, সেই আসরে আমার মত একজনের —যার ভগবদত্ত ক্ষমতা ছাড়া গানে সে রকম শিক্ষাদীক্ষা কিছুই নেই, তার গিয়ে আসরে বসে গাওয়া যে কত বড় ধৃষ্টতা, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দেখলাম অতুলদার তার জন্যে কোনও তাপ উত্তাপ নেই, বরং মহা উৎসাহে এবং বেশ গৌরবের সঙ্গেই সকলের কাছে আমাকে তাঁর বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমার একটু কি রকম কি রকম বোধ হলেও ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়ে উঠেছিলাম অতুলদার ভগিনী পরিচয়ের সম্মান লাভে এবং আমাকে যে কতটা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তার জন্যে। অহংকার যাবে কোথায়! এই অনুষ্ঠানে দিলীপের শেখানো একটি হিন্দী গান গাইবার কথা। দিলীপ আরও একটি গান, মীরাবাঈ-এর ভজন, তালিম দিয়ে তৈরি করিয়ে রাখলেন, দরকার হলে যেন গাইতে পারি। মনে আছে সে দুটি গান তো গাইলামই, শ্রোতাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আরও দুটি গান আমাকে গাইতে হল।

একবার দিলীপ মথুরায় চন্দন চৌবের কাছ থেকে কাফি সিন্ধু রাগের একটি হোলির গান শিখে এসে আমায় শেখান। গানটি হচ্ছে—"মোহিয়া সামলিয়াকি দেখ্।" অতুলদার একান্ত ইচ্ছায় আমাকে দিয়ে সেই গান সেদিন চন্দন চৌবের সামনেই গাওয়ানো হল। দিলীপের মুখও সেদিন কম উজ্জ্বল দেখিনি। তারপর দেখি সেই আসরে এসে গাইতে বসলেন চন্দন চৌবেজী। আমরা একেবারে ও'র পাশেই, মঞ্চের ঠিক নিচে বসেছিলাম। কি অপূর্ব সব মীড়ের কাজ করতে লাগলেন! শুনেছিলাম উনি মীড়ের কাজে বিখ্যাত। একটি একটি অদ্ভুত সুন্দর কাজ করছেন আর পাশে ফিরে ফিরে কেবল আমার দিকে দেখছেন। অতুলদা খুশির সুরে বললেন, "দেখলি তো, তুই যে বড় গাইতে আপত্তি করছিলি? তোর গান শুনে বুঝতে পেরেছেন তুই একজন সমঝদার।" সেবার লক্ষ্ণৌ সংগীত সম্মিলনে মোরাদ খাঁর বীণায় (যত দূর মনে পড়ছে নাম মোরাদ খাঁই শুনেছিলাম) যে দরবারী কানাড়া শুনেছিলাম, আজও তার স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দেয়। ওস্তাদ এনায়েত খাঁর সেতার, বীরু মিশ্রের তবলা, আলাউদ্দীনের মাইহর ব্যান্ড, তাঁর সরোদ, ফিদাহোসেন, হাফেজ আলী এ'দের সরোদ—সব আমাদের কোন্ রসলোকে নিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে সে বোধ কারোরই নেই। শুধু চোখে চোখে খেলে যাচ্ছে সকলের মন-খুশির হিল্লোল। হাফেজ আলী খাঁর সরোদ বাজনা—সে সত্যি এক অতি অদ্ভুত অপূর্ব ব্যাপার, তার তুলনা নেই। প্রতিটি সুরের পর্দা থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে কি রসই যে বার করছেন—আর সে রসও কি রস! যা শুনেছিলাম, সে জিনিসই অন্য জিনিস, ওরকম আর শুনিনি। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আরেকবার দেখা হয় অতুলদার উপস্থিতিতে আমাদেরই এক গানের আসরে। অতুলদার জন্যেই সে দুর্লভ সুযোগ আবার পেলাম। সেদিন আবার হাফেজ আলীর অমন বাজনা প্রাণ ভরে শুনেছিলাম। তাঁকেও অতুলদা আমাদের গান শুনিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খাঁর বাজনা দ্বিতীয়বার শুনতে পাই আমাদেরই এই পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। ভক্ত মানুষ ওস্তাদ আলাউদ্দীন, এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাকে দর্শন করতে বাজনা শোনাতে। শ্রীমা তাঁর বাজনা শুনে খুবই ভালো বলেছিলেন। সঙ্গীত সম্মিলন হয়ে যাবার পর অতুলদা ধরে বসলেন ক'দিন আমাদের গানের আসর হোক। আমি মনে মনে ভাবলাম এমন সব গানবাজনার পরে আমাদের গান কি আর জমবে? ধূর্জটিদা ও আরও অনেকেই অতুলদার প্রস্তাবে সায় দিলেন বিশেষ জোরের সঙ্গে। অতুলদা তাঁর বিশেষ বন্ধু বিচারপতি শ্রীমিশ্রের বাড়ি আমাদের নিয়ে গেলেন। দিলীপের গান হল, আমিও গেয়েছিলাম। তারপর শুরু হল বাড়ি বাড়ি আমাদের গানের আসর—দিলীপ ও আমার গানই প্রধানত। অতুলদা, শিল্পী অসিত হালদার, প্রফেসর বিনয় দাশগুপ্ত, রাধাকুমুদ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদের কারো না কারো বাড়িতে প্রতিদিনই হত গান। প্রতিদিনই কি যে জমত! গান যত জমে উঠতে লাগল, অতুলদার উৎসাহও ততই বেড়ে যেতে লাগল আর আমার ফিরে যাওয়াও ততই পিছিয়ে যেতে লাগল। অতুলদা এসে বসতেন পাশে, তাঁর উদ্ভাসিত মুখচোখের নানা ভাবে প্রকাশ পেত তাঁর অন্তরের দোলা, তাঁর তৃপ্তি, আনন্দ। অতুলদা, ধূর্জটিদা এ'দের-মত শ্রোতা পেয়ে আমাদেরও গলা খুলে গিয়েছিল, আমরাও গানের মাঝে নিজেদের ঢেলে দিয়েছিলাম উজাড় করে। অতুলদা ছিলেন আমাদের প্রধান আকর্ষণ, আমাদের আনন্দের মধ্যমণি। তাঁর জন্যেই গানের সভা এমন জমে উঠত। তার উপর দিলীপ ছিলেন, আসর আরও জমজমাট হয়ে উঠত।

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী আইনজীবী অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে সুপরিচিত। শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর স্বভাবের গুণে, ব্যবহারে বাঙালী অবাঙালী সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করত। সম্মান করত, নিজেদের প্রিয়-পরিজনের মতই মনে করত। প্রবাসী বাঙালীদের শুধু যে তিনি একটা আশ্রয়স্বরূপ বা অবলম্বন ছিলেন তাই নয়, সর্ব বিষয়েই ছিলেন তাদের একজন মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক। তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা

থাকে থাকে, তার জন্যে তিনি কম ভাবেননি, কম করেননি। তাঁরই প্রয়াসে, সহায়তায়, এবং সম্পাদনায় "উত্তরা" মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনী" তাঁরই উদ্ভাসিত। তিনি প্রথম তার চালনা করেন। অতুলপ্রসাদের গৃহ ছিল বাঙালীদের, সাহিত্যিকদের সকলের আনন্দনিকেতন, মিলনকেন্দ্র।

অতুলদা ছিলেন উদারচেতা, আত্মভোলা, দিলদরিয়া মানুষ। হৃদয়টি ছিল যেন দরদ দিয়ে গড়া। তাঁর কাছে গেলে বোঝা যেত মানুষটি কত নরম, কত নম্র আর মধুর প্রকৃতির ছিলেন। এই স্নিগ্ধ নরম স্বভাবের জন্যে তাঁর সান্নিধ্য, সাহচর্য, সংস্রব সবই আমাদের এত মধুর মনে হত। তাই ভাবি তাঁর গানে আর স্বভাবে, কি আশ্চর্য মিলই ছিল! কত ভাবেই তাঁকে দেখেছি, তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু 'আমি আমি' এই ভাবের কোনও প্রকাশ তাঁর মধ্যে কখনও দেখিনি। সেইজন্যে কোনও কিছু নিয়ে অহঙ্কার করতেও কোনও দিন দেখা যায়নি। দেবার দিকে যেমন সহজ প্রবণতা ছিল, লাভলোকসানের দিকে তেমন হিসেবজ্ঞান মোটেই ছিল না। তাঁর দানে পুষ্ট হত অনেকেই। আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। শুধু অসময়েই নয়, সুসময়েও বহু পেয়েছি। আমার জীবনের দুঃখবিপদের দিনে, সংগ্রাম-সঙ্কটের সময় রবীন্দ্রনাথের মত তাঁকেও পেয়েছিলাম পাশে, পেয়েছিলাম তাঁর গভীর স্নেহ ভরা সহানুভূতি শুভকামনার নিবিড় স্পর্শ। তিনিও সযতনে নিয়েছিলেন আমার চোখের জল মুছে, বিপন্ন জীবনের হয়েছিলেন সহায়। মানুষের জন্যে করাই ছিল অতুলদার স্বভাব। তাঁর উন্মুক্ত দুয়ার থেকে শূন্য হাতে কোনও প্রার্থীকেই কখনও ফিরতে হয়নি। যেভাবেই যে এসেছে, সকলকেই কাছে টেনে নিতে বাড়িয়ে দিয়েছেন হাত—

"যে আসে মনের দুখে যে আসে ফুল্লমুখে
টেনে নে সবার বুকে
তোর থাক না চোখে জল রে ভোলা"—

এই লাইনগুলির মাঝে মনে হয় যেন অতুলদাকেই দেখছি। তাঁর রচিত অনেক গানে দেখা যায় তাঁর জীবনকেও।

যেসব গুণ থাকলে সচরাচর মানুষ 'অসাধারণ'-এর পর্যায়ে পড়ে, অতুলদা সেসব গুণেরই অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কারও সম্বন্ধে শুধু ওইটুকু বললেই সব বলা হয় না। পরিচয় অন্য জিনিস, নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। অসাধারণ বা গুণীজনের প্রত্যেকেরই চরিত্রের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। কারও প্রভাব মানুষকে কাছে আনে, আপন করে নেয় সহজেই। কারও প্রভাব দূরে রাখে—দূরে থেকেই তাঁকে করে সম্ভ্রম, করে শ্রদ্ধা, ভালোবাসে ভক্তিভরে। অতুলদার সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি, অতুলদা তাঁদেরই একজন, তাঁদের ঘরেরই লোক, যেন কত কাছের মানুষ। তাঁর সংস্পর্শের প্রভাবে দূরত্ব ঘুচে গেছে, দূরের মানুষের কাছের মানুষ হতে সময় লাগেনি। তাই অতুলদা ছিলেন এবং হতে পেরেছিলেন সকলেরই আপন। সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসতেন নিজেকে সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে—

—"সবারে বাস্ রে ভালো
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে
যাহা তোর আছে ভালো
ফুলের মত দে সবারে

করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন,
এবার তোর ভরা আপন
বিলিয়ে দে মন যারে তারে"—

—"সবারে কর্ রে আপন
হ' রে তুই সবার আপন"—

অতুলদারই স্বভাবের প্রতিচ্ছবি যেন।

অতুলদার কথা লিখছি আর মনে পড়ছে তাঁর সেই ধীর স্থির শান্ত উদাসী চেহারাটি। গভীর চোখ দুটি দেখলে মনে হত না-বলা কোন্ বাণীর নীরব ভাষা। দুঃখ আঘাত তিনি অনেকই পেয়েছেন, তাতে ভেঙে পড়েননি। এক দিকে তিনি অত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু আরেকদিকে ছিলেন অন্তরে বৈরাগী, ছিলেন ভক্ত। তাই জীবনের সকল শূন্যতাকে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে, উৎসর্গ করে সব কিছু—

—"কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণঘাটে
তোমার কাছে, হে মহাজন,
সবই বাঁধা রবে জবে।"

তাঁর গানের এই অপূর্ব লাইনগুলি থেকে বোঝা যায় ভগবান তাঁর নির্ভরতা, তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি, বোঝা যায় তিনি কোন্ পথ ধরেছিলেন, কোন্ পথের পথিক—

—"বলিব না রেখো সুখে
চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই ক'রিয়ো,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে
চলিব, চাবনা পিছে,
আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবিয়ো,
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।"—

কি সুন্দর আত্মসমর্পণের সুর! এ পথে এসে আরও বুঝতে পারি এর মূল্য।

লা গ্র' জেৎ দ্বীপে রবিবারের অপরাহ্ন

জর্জ সিউরা (১৮৫৯-১৮৯১)

যে সব শিল্পী ক্ষণজীবী হন তাঁদের বোধ হয় জন্মাবার মুহূর্তে কেউ কানে-কানে ব'লে দেয়, "বাপু, বেশীদিন তুমি নেই যা কাজ করবার কম সময়ে সেরে ফেল, বাকি রেখো না।" কীট্‌স, শেলি, বায়রন, ভ্যান্ গ, তুলুস্ লোত্রেক এ'রা সবাই কী কম বয়সে মারা গেছেন, কিন্তু ভেবে দেখুন কী চমৎকারভাবে, যেন জানাই ছিল, প্রধান এবং মহৎ কাজগুলি আগেই এক অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে সেরে ফেলেছেন। আজকের শিল্পী জর্জ সিউরাও এই দলেরই এক সভ্য, মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর, কিন্তু একশো-সত্তরটি ছোট কাঠের প্যানেল, চারশো একুশটি ছবি, ছ'টি বই ভর্তি স্কেচ, এবং আটখানা বড় ক্যানভাস (যার মধ্যে পাঁচটি দেয়ালজোড়া) রেখে গেছেন আমাদের জন্য।

সিউরার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সবই সীমাবদ্ধ তাঁর ছবির মধ্যে, অর্থাৎ এক একটি নতুন ছবি আঁকা হচ্ছে আর অমর হচ্ছে সেইসব দিনগুলি তাঁর জীবনের—পাগল হওয়া, বেশ্যাকে কান কেটে উপহার দেওয়া, সুদূরে প্রতীর দিকে জেলেদের নৌকোতে ক'রে ভেসে যাওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা, মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার ফলে গভীর সখ্য। এই জাতীয় শিল্পীর জীবনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি। কিংবা ছবি আঁকার ঘটনাটিকে ঘটানোর ব্যাপারেই এত ব্যস্ত ছিলেন, এবং সময় যেহেতু অল্প তাই ওসব করার ফুরসতও হয়নি। তা ছাড়া মনটাও একেবারেই বোহেমিয়ান ছিল না—প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির পরিবর্তে ছিল এক অমানুষিক ধৈর্য ও অধ্যবসায়—এবং পণ্ডিতের কৌতূহলী জ্ঞানস্পৃহা। সাধারণত হয়কি, চিত্রকররা ছবি আঁকতে আঁকতে থিওরি তৈরি করেন, কিন্তু সিউরা থিওরি আগে পরিষ্কার রেখে ছবি আঁকতেন, তাঁর বিশ্বাসের উদাহরণ দিচ্ছেন এইভাবে।

ছেলেবয়স থেকেই আঁকার ঝোঁক তাই মিউনিসিপ্যাল্‌টির যে ছবি আঁকার ইস্কুল সেখানে পাঠ নেন কিছুকাল, তারপর একোল-দা-বোনার্ত-এ দু'বছর কাটে। একোল থেকে বেরিয়ে এক বছর বাধ্যতা-মূলক মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হয়, সেখান থেকে ফিরে আর ইস্কুলে ভর্তি না হয়ে তিনি স্বাধীনভাবে আরম্ভ করেন অভ্যাস—দিনের বেলা কাটে ইস্কুলে, [illegible]না, ভেরোনিসের ছবি পরীক্ষা ক'রে এবং [illegible] কাটে শার্ল ব্ল', দুশে, [illegible] প্রভৃতির চিত্রকলার ওপর বইয়ের পাতায়। এখন [illegible] সব থিওরি জানা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি ধারার কঠিন অধ্যায়গুলো মুখস্ত, চিত্রশিল্পের ইতিহাস কণ্ঠস্থ—বয়স মাত্র ২০।

"বর্ণব্যবহার, যদি কতকগুলো নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়, তা সঙ্গীতের মতই শেখা যায়, বিখ্যাত চিত্রসমালোচক ব্ল'-র এই উক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রথমে শুধুমাত্র সাদা-কালোর বিভিন্ন শেডের ব্যবহারের সাহায্যে ছবিতে কতরকম ভাব আনা যায় তার গবেষণায় মগ্ন হ'লেন। ১৮৮০ সালে তিনি সাদা-কালোর অফুরন্ত সম্ভাবনা প্রমাণ করলেন কিছু ড্রইঙে যার ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এইসব চিত্রগুলির ভাষা কিন্তু রেখা নয়, ফর্ম। অমসৃণ ইংগ্রে ড্রয়িং পেপারে তিনি ছোপছোপ কালো-সাদার পরস্পর বৈপরীত্য কখনো প্রকট করে এবং কখনো ধুসরে মিলিয়ে দিয়ে এমন এক কবিত্বময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন তথাকথিত ছবির বিষয়ের মধ্য থেকে যে প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকল তা সমসময়ের চিত্র-সমালোচকদের। চিত্রকলার ইতিহাসে তাঁর এই কালো-সাদা পর্যায় এক নতুন দিগন্ত যা সেই সময়ে শুধু একজনই বুঝেছিলেন

স্নানার্থী

তিনি হলেন বিখ্যাত চিত্রকর সিনাক্. তিনি বলেন, "সিউরার চিত্র মূল্যনির্ভর (dependant on values); সামান্য স্কেচ্ যদিও, তথাপি কি অসাধারণভাবে প্রকাশ করে চিত্রকরের অনুভূতির তীব্রতা যে এই স্কেচ্‌গুলি থেকেই সম্পূর্ণ রঙিন ক্যানভাস আঁকা সম্ভব, মডেলের কোনো প্রয়োজনই নেই।"

কীরকম অঙ্কের মত জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন ভাবতে অবাক লাগে। কালো-সাদায় সব সম্ভাবনা অনুসন্ধান ক'রে এবং চিত্রকলা বিষয়ক যাবতীয় পাঠ্য ও অভ্যাস শেষ করে এবার যা স্বাভাবিক তাই করলেন—একটি পুরো বছর নিয়োগ করলেন এক বিশাল ক্যানভাসের ওপর এবং ১৮৮৪তে তাঁর প্রথম মহৎ চিত্ররচনা সমাপ্ত হল—চিত্রটির নাম "লে বেইন্যুজ"। যথারীতি নতুন ধরনের বলে সালঁ গ্রহণ করল না এই ছবি এবং সিউরা প্রতিষ্ঠা করলেন সিনাক্, রেদঁ, দুবোয়া-পিলে প্রভৃতির সহযোগিতায় এক স্বাধীন চিত্রপ্রদর্শনী। ১৮৮৪ সালের মে মাসে এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল এবং সিউরা প্রকাশ করলেন তাঁর সদ্য আঁকা বিরাট ক্যানভাসটি। সিউরার ভক্ত সিনাক্ পুনর্বার মুগ্ধ হলেন এই ছবি দেখে; এবং যেমনি মুগ্ধ হলেন বর্ণবৈপরীত্যের দুষ্ঠুতা ও নতুনত্বে, তেমনি অবাক হলেন কী করে এত বড় এক ক্যানভাস এমন সব ম্যাটমেটে রঙের সাহায্যে আঁকতে সাহস করল এক সেদিনের ছোকরা। কিন্তু জনতা মানেইতো গরু-ছাগল, তাই লম্বোদর সালঁর জুরিরা এ ছবিকে তাদের প্রদর্শনীতে স্থান না দেওয়ার জন্য ভালো লাগলেও তা বলতে সাহস করল না কেউ (যেমন ঠিক উল্টোটা হয় বাংলা দেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবির ব্যাপারে, ভালো না লাগলেও বলা যাবে না তা)।

সিনাকের সঙ্গে বন্ধুত্বটা সিউরার পক্ষে বোধ হয় আবশ্যক ছিল। তিনি তো এতদিন আলোর ব্যাপার নিয়ে অবিরাম ক্যানভাসে গবেষণা করে চলেছিলেন—যদিও ঠিক ইম্প্রেশনিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—তাই সিস্‌লে, রেনোয়া, পিসারো প্রভৃতির চিত্রদর্শনের সঙ্গে পরিচয়টা আবশ্যক ছিল সিউরার, সিনাকের সহযোগিতায় তা সম্পন্ন হ'ল। এঁদের ছবি থেকে সিউরা অনেক কিছু আহরণ করেছিলেন যেমন, উঁচু উঁচু ক'রে নিরেট রঙ ব্যবহারের মাধ্যমে আলো-ছায়ার খেলা দেখানো ইত্যাদি। এই সময়ে সিনাক্ ও সিউরা বর্ণবিন্যাসের এক নতুন কায়দা রপ্ত করেন—তাঁরা প্যালেটে রঙ মেশাতেন না নিরেট রঙের বিন্দুতে ক্যানভাসপরিসর পূর্ণ করতেন যার ফলে ক্যানভাসে বিপরীত রঙগুলিকে কখনো মিলিত, কখনো পৃথক, কখনো সম্পূর্ণ তৃতীয় রঙে বিলীন করে দেওয়া সহজ হ'ত। এই পর্যায়ে সিউরা তাঁর প্রধান (সাইজেও) ছবিগুলি আঁকেন যার অন্যতম শ্রেষ্ঠটি মুদ্রিত হ'ল। কখনো প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ায় মানুষ তাঁর ছবির বিষয় (আঁ দিমশ্ আ লা গ্র জেৎ; ১৮৮৬), কখনো বা এক অদ্ভুত মেকি আলোর বিষণ্ণতায় বহু মানুষ একত্র হয়েছে, যাদের আলোর পরি-প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে ছায়ামূর্তি (লা পারাদ্, ১৮৮৭—১৮৮৮), মাঝে মাঝে মাডে আঁকছেন (লো পোসেউস্, ১৮৮৮) স্টেজের আলোর নাচিয়েদের কখনো তাঁর ছবিতে প্রজাপতির মত লাগছে (লো শাহ্, ১৮৮৯—১৮৯১)—এক অসম্ভব প্রেরণায় যেন অক্লান্তভাবে এঁকে চলেছেন তিনি রাতদিন কোনো দিকে না তাকিয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মৃত্যুর আর দেরি নেই।

১৮৯১ সালের মার্চ মাসে সিউরার মৃত্যু হয়, তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নিতান্ত জ্যামিতির থিওরির মত লিপিবদ্ধ করেন তাঁর চিত্রাদর্শ—আক্ষরিক অনুবাদ করে উপস্থিত করছি, তার কারণ এই নিয়ম যে কোনো সিউরার ছবির ওপর প্রযোজ্য অতএব মুদ্রিত চিত্রটি বোঝবার ব্যাপারে তা সাহায্য করবে।

"নন্দনতত্ত্ব—শিল্প হল সমতান বা ঐক্য (harmony)। চিত্রকলায় ঐক্য হল বিপরীতধর্মী ও স্বধর্মী ভাব, বর্ণ ও রেখার আলোর প্রভাবে মিলন। আলো যদি উজ্জ্বল হয় তবে আনন্দ মিলন কেন্দ্র, যদি বিষণ্ণ হয় তবে দুঃখ।—ভাবে বৈপরীত্য আসে উজ্জ্বলতরের সঙ্গে গভীরতরের পাশা-পাশি প্রয়োগে, রঙে বৈপরীত্যের জন্য চাই বিপরীতধর্মিতা (যেমন, লাল-সবুজ; কমলা-নিল; হলদে-বেগুনি), রেখায় সমকোণের প্রয়োগ।

এবার দেখা যাক আনন্দ আবহাওয়া কী ভাবে আসে। ভাবে আনন্দ আনতে হ'লে চিত্রে উজ্জ্বলতা প্রয়োজন, রঙে প্রয়োজন উষ্ণতার, এবং রেখায় ভারটিকালের প্রয়োগ। —বিষণ্ণ-আবহাওয়ায় আনন্দ-আবহাওয়ার ঠিক বিপরীত উপায় অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ ভাবে গভীরতা, রঙে শৈত্য, এবং রেখায় হরাইজেন্টালের প্রয়োগ।

উপায়—যেহেতু একটি দৃশ্যের প্রথম অভিজ্ঞতা রেটিনার ওপর। আলোর এক মিলিত নির্যাস সেহেতু "ঐক্য" অচেতন-ভাবেই স্থাপিত হচ্ছে মনে। অতএব চিত্রশিল্পীর কর্তব্য বৈপরীত্য স্বীকার করে রঙের সঙ্গে রঙ, রেখার সঙ্গে রেখা, ভাবের সঙ্গে ভাব কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা না এঁকে খুব নিটোলভাবে মিশিয়ে দেওয়া, যাতে রেটিনা কোনো ধাক্কা না খায়।"

সিউরার চিত্রাদর্শ যথাযথ হয়তো তুলে দিতে পেরেছি, পাঠক আশা করব রঙ ছাপা তাঁর কোনো ছবি পেলে মিলিয়ে দেখবেন আদর্শের সঙ্গে কাজের কতটা মিল আছে তাঁর। আমার মনে হয় এই নিয়ম তিনি যথাযথ পালন করেছেন তাঁর অন্তত শেষ জীবনের চিত্রে। আমি তাঁর দুটি ছবি—"আঁ দিমশ্ আ লা গ্র জেৎ" এবং "বেইনেউস্", এই দুটি চিত্র উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করছি, আমার মনে হয় সিউরার চিত্রকলা বিষয়ে যে থিওরি তাই এ-ছবির চমৎকার ব্যাখ্যা, একই কথা বলে পাতা ভরাতে চাই না।

শুদ্ধশীল বসু

গান্ধীজীর দূত

'দেশ'-এ শ্রীসুধীর ঘোষ মহাশয়ের লিখিত, 'গান্ধীজীর দূত' খুব আগ্রহের সহিত পড়ছি। গত প্রথম সংখ্যায় শ্রী ঘোষের বিবরণীতে একটি তথ্যগত ত্রুটি লক্ষ করলাম। শ্রী ঘোষ লিখেছেন—'গান্ধীজী এ বিষয়ে একটি চিঠিও আমাকে লিখেন। (চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি) তাতে তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় মহম্মদ ও তাঁর শিষ্য আলির গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে।

লেখক হজরত মহম্মদের হিজরত ঘটনার কথা বলছেন। কিন্তু মক্কা পরিত্যাগের সময় পয়গম্বরের সংগী ছিলেন তাঁর প্রধান সহচর আবুবকর ছিদ্দিক, আলী এ সময় তাঁর সহচর ছিল না। মৌলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন—'এই যাত্রী যুগলের গুহায় অবস্থানকালে ঘাতকদল অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলে, (আবুবকর বলছেন) 'আমি মাথা উঁচু করিয়া দেখি, ঘাতকদল একেবারে আমাদের নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। তখনই আমি হজরতকে এই ব্যাপার নিবেদন করিলে, তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন 'আবুবকর দুইজনের কথা কি বলিতেছ? আমরা দুইজন, আল্লাহ আমাদের তৃতীয়।' (মোস্তাফা চরিত ৪২৬ পৃঃ)

পবিত্র কোরাণে এই ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখিত আছে—'যখন অবিশ্বাসীগণ তাহাদিগকে দেশান্তরীত করিয়াছিল, মাত্র দুইজন, দুইজনের একজন তিনি (মহম্মদ)। যখন তাঁহারা গুহায় অবস্থান করিতে ছিলেন। (এবং অবিশ্বাসীগণের খোলা তরবারি ও নিজেদের নিঃসহায় অবস্থা এবং আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যের ধ্বংসাশঙ্কায় যখন তাঁহার সংগী বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল)। তিনি আপন সহচর (আবুবকর ছিদ্দিক)কে বলিলেন, চিন্তিত হইও না, বিষন্ন হইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। (কোরাণ—৯।৩৯ সুরা তওবা)

মনে হয় শ্রী ঘোষ গান্ধীজীর চিঠি হারিয়ে ফেলে সঠিক তথ্য ভুলে গেছেন।

মোঃ এলাহি বকস
কোচবিহার।

২

আপনার ১৯ কার্ত্তিক (সংখ্যা ১) দেশ পত্রিকাতে শ্রীসুধীর ঘোষ মহাশয়ের 'গান্ধীজীর দূত' প্রবন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত কথাগুলি ভুল বলে অনুমান হয়।

প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে শ্রীযুক্তা অমলপ্রভা দাসের স্মরণীয় (১) আশ্রমের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমি জানি ঐ নামে কোনো আশ্রম নেই। শরনীয়া পাহাড়ে একটি আশ্রম আছে, আর সেই আশ্রম শ্রীযুক্ত দাসের তত্ত্বাবধানে এখনও পরিচালিত হয়। "শরনীয়া পাহাড়ে" অবস্থিত আশ্রমটিই শরনীয়া আশ্রম নামে পরিচিত।

---

(১) স্মরণীয় অর্থ—স্মৃতি বিশেষ। শরনীয়া অর্থ—আশ্রিত।

শ্রীস্বর্ণলতা হাজারিকা
মাওহনিয়া, আসাম

হোমসায়েন্স কন্‌ফারেন্স

১৯শে কার্ত্তিকের দেশ পত্রিকায় 'শ্রীমতী' লিখিত হোম কন্‌ফারেন্সের বিবরণ পড়লাম। শ্রীযুক্তা মমতা অধিকারী যে হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার অষ্টম অধিবেশন পশ্চিম বাংলায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং এরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় অধিবেশন সর্বাঙ্গসুন্দর-ভাবে সম্পন্ন করেছেন সেজন্য তিনি প্রত্যেকেরই প্রশংসা অর্জন করবেন।

কিন্তু 'শ্রীমতী'র সঙ্গে একটি বিষয়ে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। তিনি লিখেছেন—"মাত্র ছ'টি মেয়ে নিয়ে শ্রীমতী মমতা অধিকারী বছর কয়েক আগে হোম সায়েন্স কলেজ আরম্ভ করেন। আজ প্রবেশপ্রার্থীকে বিমুখ করতে হয় দলে দলে।" —আমরা ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে জানি যে, বিহারীলাল কলেজ অব হোম অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্স কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া 'জ্যোতিপ্রভা দাশ-গুপ্তা। তিনিই প্রথম এই কলেজে হোম সায়েন্স বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স খোলেন। ১৯৬০ সালে হোম সায়েন্স বিষয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাস করে ছাত্রীরা প্রথম তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হয় এবং এর আগেই চার বৎসর ডিগ্রী কোর্স চালু হয়েছিল।

সুতরাং শ্রদ্ধেয় মমতা অধিকারী কোন্ ছয়জন ছাত্রী নিয়ে কত সালে ঐ কলেজ আরম্ভ করেন তা বুঝতে পারলাম না।

বিহারীলাল কলেজের প্রাক্তন
ছাত্রীদ্বয়

ঘরে-বাইরে

শনিবার, ১৯ কার্তিকের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী লিখিত 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে একটু প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি লিখেছেন, ;মাত্র বছর কয়েক আগে শ্রীমতী মমতা অধিকারী মাত্র ছ'টি মেয়ে নিয়ে হোম সায়েন্স কলেজ আরম্ভ করেন।

কিন্তু এ খবর সর্বৈব মিথ্যা। শ্রীমতী মমতা অধিকারী এ-কলেজের প্রতিষ্ঠাত্রী নন। এই হোম সায়েন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা হচ্ছেন স্বর্গীয়া জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা। তিনি ১৯৫৭ সালে ছয়টি মেয়ে নিয়ে এই কলেজের শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞান ঘোষ শ্রীমতী দাশগুপ্তাকে এই ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেন। ১৯৬১ সালে শ্রীমতী দাশগুপ্তার-র মৃত্যুর পরে আমাদের অধ্যাপিকা বাণী সেন Acting Principal-এর কার্যভার গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৬২ সালে শ্রীমতী মমতা অধিকারী এই কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন।

শ্রীমতী জয়া চ্যাটার্জি
বর্ধমান।

নিকট দূরে

গত ৫ নভেম্বর ১ম সংখ্যা 'দেশ' সাপ্তাহিকে ত্রিলোচন কলমচির 'নিকট দূরে'

বিভাগটি পড়ে আশাতীত তৃপ্তিলাভ করেছি। 'দেশ' যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করেই চলেছে—এ তার চমকপ্রদ জ্বলন্ত প্রমাণ।

ত্রিলোচন কলমচি যে একজন শক্তিমান লেখক—তা আর পাঠকদের বিশেষভাবে না জানিয়ে দিলেও চলত। কারণ, তাঁর শক্তিমত্তা বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি কথাতেই পরিস্ফুট হয়েছে। এবং তিনি যা বলতে চেয়েছেন—তা অতি আশ্চর্য সুন্দরভাবে বলেছেন।

বিশেষত, আমার কথা লিখছি। লেখকের বক্তব্য হুবহু আমারই নকল করেছে। পড়তে পড়তে ভেবেছি—কথাগুলো যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। কিংবা আমার কথা জেনেই লেখক কথাগুলো লিখেছেন।

এ লেখায় লেখকের অতি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের বিচিত্র মনের কথা জানতে হলে কিংবা বুঝতে হলে যে তীক্ষ্ণ সহৃদয় মনোভাবের প্রয়োজন, তা অনেকাংশে তিনি অর্জন করতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, এই দরদ—এই সহানুভূতি ব্যক্ত করতে গেলে বক্তব্যে ঋজুতার প্রয়োজন।

এবং বলা বাহুল্য, লেখকের তা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান।

কিন্তু এত কিছু লিখেও আমায় এখন 'কিন্তু কিন্তু' করতে হচ্ছে! কারণ, এক জায়গায় লেখক বলেছেন—'সে যা হতে চেয়েছিল হয়নি। যার স্বপ্ন দেখেছিল, তার দেখা মেলেনি।' আমার কিন্তু মনে হয়, অনেক সময় সে যা হতে চেয়েছিল, তা হয়েছে; যার স্বপ্ন দেখেছিল, তাকে পেয়েছে কিংবা হয়ত তার চেয়েও ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। অপর ক্ষেত্র যেমন খুবই প্রবল, অর্থাৎ অহরহ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়—তেমনি এক্ষেত্রেও দৃষ্ট হয়। অবিশ্যি, এ কথাও স্বীকার্য সে তুলনায় এক্ষেত্র খুবই শক্তিহীন। কিন্তু সবাইকে এক দলে ফেলালে বেশ [illegible] সামান্য ভুল থেকে যায়। [illegible] বিষয়টুকু তাঁর আলোচনাসাপেক্ষ।

যাক! পরিশেষে এমন একটি পরিচ্ছন্ন বিভাগ সাপ্তাহিকে সংযোজন করাতে সম্পাদককে এবং লেখক ত্রিলোচন কলমচিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অজিত শর্মারায়
হাইলাকান্দি।

আইয়ুবের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা প্রবন্ধে সমস্যাটি যদিও 'ব্যক্তিগত' বলে নির্দেশিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে-কোনো পাঠকেরই হতে পারে।

লেখকের সমস্যাটি [illegible] পাঠক [illegible] ভক্তিরসের প্রতি বিরূপ পাঠক, গীতাঞ্জলির কবির সাথে সেই তাদাত্ম্য অনুভব করবেন [illegible] এ ধরনের গীতি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব নয়।"

আমার প্রথম প্রশ্ন এখানেই, অর্থাৎ 'এ ধরনের গীতি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধির জন্য কবির সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধের প্রয়োজন আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে নাটকের ক্ষেত্রে বা সাহিত্যশিল্পের সব ক্ষেত্রেই যেমন, গীতি কবিতার রসোপলব্ধিতে স্রষ্টা ও পাঠকের ভাবসম্মেলনের প্রয়োজন হয় না। কারণ 'ভাব' বস্তুটি ব্যক্তিগত হতে পারে; কিন্তু যখন কাব্যনির্মিতিতে একটি বিশেষ রূপ পায়, তখন তা রসে পরিণত। এবং এই রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তা যেমন রূপ পায় স্রষ্টার কাছে, তেমনি সকলের কাছেই।

এমন কি যে-কোনো 'নাস্তিকে'র কাছেও। লেখক যখন বলেন, "অনেক নাস্তিক এবং রবীন্দ্রমানসে নীতিশ্রদ্ধ সমালোচক যখন গীতাঞ্জলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন, তখন সে প্রশংসায় অন্তরের সাড়া যতটা থাকে, তার চেয়ে হয়ত অনেক বেশী থাকে কৃতবিদ্য সূক্ষ্মদর্শী সমালোচনার, বিশেষত কলা-কৌশলগত মূল্য বিচার"—এখানে 'অন্তরের সাড়া ততখানি থাকে না', এরূপ একটি অপৌক্তিক বলাকে অনায়াসে বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করা যায় না। কেবল কলাকৌশলের নিপুণ প্রয়োগে যে বিদগ্ধ মন মুগ্ধ হন না, তার প্রমাণ আছে সাহিত্যের ইতিহাসেই। গীতিকবিতার সমস্ত ছন্দ-সুরের প্রবাহের ভেতর থেকে যে ব্যাকুল আর্তি, নিবিড় বাসনা আভাসিত হয়, রসিকজন তাতেই মুগ্ধ। এর জন্য কোনো বিশেষ 'ভাবের' প্রতি আন্তরিকতা বা বিশ্বাস অপেক্ষিত নয়।

এবং এ কথা হয়ত বলতে পারি, কবির ভাবের প্রতি একাত্ম হয়ে যাওয়া হয়ত সম্যক রসোপলব্ধি নয়, তা এক প্রকার [illegible] বিভোরতা [illegible]। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—বিদ্যাসাগর যখন নীলদর্পণ দেখে চটি ছুঁড়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সার্থক দ্রষ্টা হতে পারেননি। সুতরাং, নাটকে যেমন [illegible] থাকে, তেমনি [illegible] গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে এই নাটকীয় দূরত্ব রক্ষা করে চললে, তবে গীতাঞ্জলির সুর তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছয় কি, এ কথা [illegible] প্রসঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর কথায় আসতে পারি। বিদ্যাপতির বিভিন্ন মানবীয় আবেগের কবিতাগুলি আমরা আস্বাদন করি। কিন্তু চৈতন্যদেবের ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের কবিতা বা চণ্ডীদাসের কবিতা কি ভক্তিহীন পাঠক সেইভাবেই আস্বাদন করেন না? এদের পদাবলীর সম্যক রসোপলব্ধির জন্য কি শ্রীচৈতন্য ভাবে বিগলিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে?

অশোক মুখোপাধ্যায়
হুগলী

কৃষি ও বিকিরণ

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে নামমাত্র খরচে পচনশীল তরিতরকারিকে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখবার ব্যবস্থা ৫ নভেম্বরের পত্রিকায় পড়লাম। পরমাণু বোমার মত ভীতিপ্রদ না হলেও খবরটি বিশেষ আতঙ্কজনক।

এতদিন হিমঘরের দৌলতে মরসুমের তরিতরকারির একটা মোটা অংশ খোলা বাজার থেকে উঠে গিয়ে আপনার আমার সুবিধার্থে সংরক্ষিত হত। বাজারে কৃত্রিম অনটনের ভাব দেখিয়ে মরসুমের সময়েও এদের দাম বিশেষ কমে নি: তারপর মাস কয়েক বাদে হিমশীতল পরিবেশ থেকে যখন বাইরের গরম পারিপার্শ্বিকে উপস্থিত করা হল, তখন তাদের মেজাজও গরম—অতএব দামেও গরম হওয়া স্বাভাবিক।

এবার ব্যবসায়ীর সহায়তায় আসছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। কল্পনা করা যাক, বাজারে নতুন আলু, পেঁয়াজ উঠেছে। প্রতিটি হাটে, প্রতিটি বাজারে ব্যবসায়ীরা কর্মচারী মারফত সমুদয় আলু, পেঁয়াজ কিনে নিয়ে কাছেই এক শহরের বিকিরণ কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। বস্তার মধ্যে বাঁধা নতুন ওঠা আলু আর পেঁয়াজ মাথায় করে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল ধীরগতি বেল্ট-কনভেয়ারের ওপর। কনভেয়ারটি একটি লম্বাটে হল-ঘর অতিক্রম করার পথে, পাশের জটিল যন্ত্রাংশ থেকে বিকিরিত রশ্মি এই সব আলু পেঁয়াজকে সংরক্ষিত করে দিল। তারপর? সংরক্ষিত আলু-পেঁয়াজের বস্তা লরি ও টেমপো চড়ে সেই অঞ্চলের সমস্ত গুদামঘর দখল করল। হিমঘরের খরচা কিংবা স্থান সংকুলানের প্রশ্নে তখন মাথা ব্যথা নেই কারও। মাস ছয়েকের জন্যে নিশ্চিন্ত।

কোনও কোনও ব্যবসায়ী আবার এর ওপরেও তাঁদের নিজস্ব ব্যবসা-বুদ্ধি খাটাবার চেষ্টা করবেন। বিকিরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে প্রভাবিত করে অনুমোদিত বিকিরণের ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটাবেন। তখন বহুগুণে বর্ধিত বিকিরণ রশ্মির প্রভাবে আলু-পেঁয়াজের বস্তাগুলি কয়েক বছরের জন্যেও সংরক্ষণ করা চলবে, ফলে হয়ত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হতে পারে, কিংবা সেগুলি ঈষৎ তেজস্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতে ব্যবসায়ীদের কী আসে যায়? বাইরে থেকে তো আর এদের আলাদা করে বোঝা যাবে না? উপরন্তু কয়েক বছর পরে অজন্মার জন্যে আলু-পেঁয়াজ দুর্মূল্য হয়ে উঠলে খুবই আশার কথা—বেশ ভাল মুনাফা করা যাবে।

সুব্রত চক্রবর্তী
দুর্গাপুর ২

গোহত্যা নিবারণ আন্দোলন

আজকের কাগজে পড়লাম গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলনে এক লাখ লোক দিল্লিতে মিছিল করেছেন। এবং শান্তিপূর্ণ মিছিল শেষ পর্যন্ত চরম অশান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। কলকাতায় লেখাপড়া করেছি সুতরাং মিছিল এবং গোলমাল শুনে প্রবাসে ছাত্রকর্তব্য ছেড়ে চিঠি লিখতে বসতাম না। দেশের ক্রমবর্ধমান অরাজকতা এবং বিক্ষোভে আমাদের অগণিত লোকের হতাশা এবং সমাজের ক্ষমতাশীল লোকেদের ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল তাতে সন্দেহ নেই। এবং বিক্ষোভটা প্রকাশ না করলে যাঁরা চোখ বুজে ঘুমোন তাঁদের ঘুম কোনো দিনও ভাঙবে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের আগে ক্ষমতাশীল দলের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে বিক্ষোভ চলবে এটা স্বাভাবিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও বটে। মিছিল করে দাঙ্গা করার ক্ষমা নেই। যাঁরা সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, আরও দশটা অন্যায় করে তাঁদের দায়িত্ববুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ হয় এবং যে সব রাজনৈতিক দল তাঁদের সমর্থন করেন তাঁরা ক্ষমতাশীল হলে দেশের দায়িত্ব কতখানি পালন করবেন তা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু গো-হত্যা নিয়ে মিছিলটাই ক্ষমা করা অসম্ভব। যাঁরা ভারতবাসী বা ভারতবর্ষে বিশ্বাস করেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, পাশের বাড়ির পাকিস্তানের সঙ্গে তফাতটা আমাদের কোথায়। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং প্রত্যেকের নিজের ধর্ম পালন করার অধিকারটা সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে। আমার যদি ধর্মে বলে গরু খেতে নেই (হিন্দুধর্মে স্পষ্ট করে কোথায় যে সেটা বলা আছে তা হিন্দু, আমি কুলগুরু এবং জাতিগুরু পুরোহিত বহু হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পাই নি), আমার গরু জোর করে যাতে কেউ খাওয়াতে না পারে তার জন্যে লড়াই করার অধিকারটা আমার ষোলো আনা। কিন্তু পাশের বাড়ির রহিম চাচার ধর্মে গরু সুখাদ্য (হেকফ করে বলতে পারি, পার্ক সার্কাসের মোড়ের দোকানের শিক কাবাব আমার ব্রাহ্মণ জিভে দিব্যি জল আনে), তাঁর বাড়ের ডালনা খাওয়ায় ছাই দেওয়ার অধিকারটা আমায় ভারতবর্ষের সংবিধান দেয় নি। স্বাধীন হলাম উনিশ বছর, কংগ্রেস সরকার তো উনিশ বছরে দেশটাকে প্রায় স্বর্গে তুলেছেন। এবার সব রাজ্যে গো-হত্যা বন্ধ করার জারিটা যে একেবারেই সংবিধানের মাথায় ডাণ্ডা মারা পদ্ধতি, তবে কি আমাদের মোক্ষ প্রাপ্তি সমাগত! নাকি সামনে নির্বাচন থাকলে সংবিধান কেন, স্বয়ং ভগবানের মাথায় ডাণ্ডা মারাটাও হিন্দুধর্ম।

অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারেন এমন লোক কি কংগ্রেসে একজনও নেই? তবে জনসংঘের পাগলামি সামলাতে ভয় কেন? ভয়টা যে ভূতের সে ভূতটা কি সর্ষেতেই? তাই যদি হয় তবে আগামীকালের দুঃস্বপ্নের আর দুরাচারের দোষটা কার কাঁধে চাপাবো? ইংরেজ তো গেছেই, আর চীন কিংবা পাকিস্তান তো ত্রিশূলে হাতে ভোলানাথদের নাচের তাল জানেন না। যে কুড়ুলটা পায়ে পড়ছে তা আমাদেরই হাতের কুড়ুল। ৭ নভেম্বর, ১৯৬৬।

দীপক বাগচী
ইণ্ডিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র

ট্রামে বাসে

প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধের নির্দেশ দেওয়ায় ভারতের কংগ্রেসী সদস্যগণ নাকি বিস্মিত হইয়াছেন।—"কিন্তু এতে হয়ত বিস্ময়ের

কিছু নেই। দরজায় ডাকাডাকি শুনে প্রেসিডেন্ট হয়ত অন্দর থেকে হাঁক দিয়ে বলেছেন—এখন পারবে না গো, হাত জোড়া" —বলিলেন বিশুখুড়ো।

শ্রীমধু লিমায়ে কলিকাতায় প্রদত্ত তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বাম-ঐক্যের জন্য চাপ দিতে উপদেশ দিয়াছেন—"ফল কী হবে জানিনে, অন্তত শুনেছি বায়ুমণ্ডলে চাপ সৃষ্টির ফলে নাকি অনেক সময় ঘূর্ণি-বাত্যার সৃষ্টি হয়"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গো-রক্ষণী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নাকি অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন পুরীর জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য। সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বুঝি বলা যায়, মোহমুদ্গারের নূতন ভাষ্য মোহ-প্যাচান !!"

সংবাদে শুনিলাম, দেড় কোটি অকেজো গরু-মহিষ লইয়া বিহার সরকার বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"শিবানুচরদের মধ্যে গরু-গুলিকে বণ্টন করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, দূরে বা নিকট-ভবিষ্যতে যাত্রী পরি-বহনেরও একটা হিল্লে হয়।"

অন্য এক সংবাদে জানা গেল, ভারতীয় মুখোশ নাকি বিদেশে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"ভারতীয় মুখোশে যে গাধা ও ঘোড়ার বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে এ খবর বিদেশে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই ট্রেড-সিক্রেট ফাঁস করে দেওয়ার জন্য কে বা কাহারা দায়ী, অবিলম্বে সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন !!"

"চন্দ্রের ছবি আসিতেছে"—এই সংবাদ-শিরোনামাটি পাঠ করা মাত্র আমাদের এক কিশোর সহযাত্রী উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"কবে, কোন্ হাউসে।"

মুড়ি চিঁড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেল।—"এবার পথেঘাটে মুড়ি-চিঁড়ার ধামা হয়ত সহজেই চোখে পড়বে কিন্তু সবকে আর ধামাচাপা দেওয়া যাবে না; চেষ্টা চলবে শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজাবার"—বলেন সহযাত্রী।

কতিপয় হোমরাচোমরা বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন যে, ছাত্র-অশান্তির জন্য দায়ী হইল সংবাদ-পত্র, তাঁহারা ফলাও করিয়া এই সব ঘটনা ছাপেন বলিয়াই ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ

ছড়াইয়া পড়িতেছে। শ্যামলাল বলিল—"একটি গেঁইয়া প্রবাদে বুঝি তাই বলে—মরতে মরণ শানাইয়ালার !!"

সর্বশেষ সংবাদে শুনিলাম কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের দাবি না মঞ্জুর হইয়াছে। শ্যামলাল মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"হবেই তো; যার ভাগ্যে রামের মা, তারে তুমি চেন না !!"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরেড্ডি নাকি বলিয়াছেন যে, বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবি অগ্রাহ্য হইলে তিনি আর মন্ত্রী থাকিবেন না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বহুদিন বিস্মৃত একটি সিনেমা সঙ্গীতের চরণ সুর করিয়া শুনাইলেন—"হলুদ গাঁদা ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, এনে দে এনে দে নইলে, নইলে বাঁধব না, বাঁধব না চু—উ-উ-ল।"

কলিকাতা পৌরসভা হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে,—আগামী বৎসরে আরও বেশি জল সরবরাহ করা হইবে। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদের

উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"শুনলাম আগামী বৎসর পশ্চিমবঙ্গে কাঁঠালের রেকর্ড ফলন হওয়ার সম্ভাবনা সুতরাং এখন থেকে গুম্ফ-প্রদেশে (অনেকেই তো মাকুন্দ চোপা, তাই 'প্রদেশ' বলতে হল) নিশ্চিন্তে তৈলমর্দন শুরু করা যায়!"

এক সংবাদে শুনিলাম বইয়ের নাকি দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"থ্যাঙ্ক গড্, রেস বুক এখনো সহজ প্রাপ্যই আছে।"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ,—ব্যাংক অব চায়নার ঘটনা ধামাচাপা পড়ায় রাজ্য সরকারের কয়েকজন অফিসার বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কয়েকজন মাত্র! কিন্তু সংখ্যালঘুদের দাবিতে আর কে কবে কান দিয়েছে !!"

সম্প্রতি প্রচারিত মাও-সে-তুং-এর অসুস্থতার সংবাদ নাকি একটা ছল মাত্র।—"আমরাও তাই ভাবছিলাম; যে (শত) ফুল না ফুটিতে পড়িল ধরণীতে..........কিন্তু দেখছি সত্যি এটা মাও-এর মটকা মেরে পড়ে থাকা"—বলেন সহযাত্রী।

শুনিলাম ইডেন উদ্যানে সমাসন্ন টেস্ট খেলার জন্য সি এ বি কর্তৃক আয়োজিত সীটের ব্যবস্থা সম্পর্কে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হইতে এই মর্মে এক নোটিস দেওয়া হইয়াছে যে, সি এ বি তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদের অধিকারাধীন কিছুটা জায়গা বেদখল করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এই নোটিশ প্রত্যাহার কী করে হয় জানি, কিন্তু বলব না !!!"

সাহিত্য সংবাদ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাটক

উইলিয়াম গিবসন সহাস্য ক্ষোভের সঙ্গে একবার বলেছিলেন, পনেরো বছর আগে যখন শুধু কবিতা লিখতাম, তখন একবার একটি পত্রিকার সম্পাদক আমার কবিতার একটিমাত্র শব্দ বদলাতে বলেছিলেন, আমি রাজী হইনি, কবিতাটি একেবারে ছাপাই হলো না, তবুও। আর, এখন নাটক লিখছি, এখন অন্তত পনেরোজনের কথায় পনেরোবার আমাকে নাটক বদলাতে হয়। অর্থাৎ মঞ্চস্থপতি এসে বলবেন, ওরকম সেট হয় না, বদলান, আলোক সম্পাতকারী বলবেন ও রকম ফোকাস হয় না, নায়ক এসে বলবেন, সংলাপে অত বেশী যুক্তাক্ষর কেন, সর্বোপরি পরিচালক বলবেন, ও জায়গাটা লোকে নেবে না! বস্তুত যে-কোনো জায়গার অভিনয়েই যে-কোনো নাটক নিয়ে কাটাকুটি করার যে-কোনো লোকের অধিকার। যদি সাধারণ রঙ্গালয় হয়, তবে নাটক জনপ্রিয় হলো কিনা, তার ওপরে সেখানকার বাথরুমের জমাদারের মাইনেও নির্ভর করছে. তার জন্যও নাট্যকার দায়ী। ব্যবসায়ের কাছে শিল্পের এমন নতিস্বীকার, নাটক ছাড়া অন্য কোথাও এমন অপমানজনক ও প্রকট নয়। শিল্প সব সময়েই একক মনের সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে পাঁচ জনের হাত ও মতামত যুক্ত হয়, তা কি শিল্প? তাহলে, নাটক কতখানি শিল্প?

রঙ্গালয়ে জনপ্রিয়তাই কি নাটকের সার্থকতা? সাধারণ মঞ্চে কোনো নাটক অন্তত এক বছর না চললে খরচই ওঠে না, 'রাইট অনারেবল জেন্টলম্যান' জাতীয় কেচ্ছা, আগাথা ক্রিস্টির রোমহর্ষক কাহিনী বা ট্রেনের অ্যাকসিডেন্ট দেখানো 'সেতু' বহু বছর চলে, অন্যদিকে, আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে বা সেক্সপীয়ারের আমলের ইংল্যাণ্ডে পঞ্চাশ-ষাট রাত্রি অভিনীত হলেই সেই নাটককে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা বলা হতো, এবং যতদূর মনে হয় কালিদাস-ভবভূতির আমলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও রাজা-রাজড়ার সামনে দু'এক রাত্তিরের বেশী অভিনীত হয়নি। যত আধুনিক কাল আসছে, ততই নাটক তার আত্মসম্মান হারাচ্ছে। স্যার ফিলিপ সিডনি নাটক সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন, 'এ হচ্ছে একটা অসভ্য মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষার চিহ্ন নেই, জননী কবিতার ও ও সম্মান নষ্ট করে।' নাটক সম্পর্কে আমাদের ধারণা অবশ্য এরকম ঠিক নয়, আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আপাতত বাংলা দেশে, কার্য-কারণের যোগাযোগ হেতু পেশাদারী মঞ্চ থেকে আমাদের কিছুই আশা করার নেই. নাটকের মূল্য সেখানেই, যখন সে অভিনয় নিরপেক্ষ হয়েও সাহিত্যের অংগ। নাটক সাহিত্যেরই একটা শাখা, প্রকাশের অন্যরূপ. খুব সরলভাবে বলতে গেলে, অনেক কথা যেমন কবিতায় প্রকাশ করতে গেলে স্থূল হয়ে যায়, কিন্তু গল্পে উজ্জ্বল হয়, কিংবা অনেক বক্তব্য গল্পে বলার চেয়ে প্রবন্ধে জোরালো, সেইরকম নাটকও আরেকরকম প্রকাশের বাহন যা গল্প-কবিতা প্রবন্ধে না বলে নাটকের আকার দিলেই সবচেয়ে সার্থক হয়, (তার মানে অবশ্য এই নয় যে, যাঁরা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখতে পারেন না—তাঁরাই নাটক লেখার জন্য ভিড় করবেন, সিনেমার জন্য যেমন এক ধরনের কাহিনী-লেখক থাকেন যাঁরা লেখকই নন) সমগ্র জীবনকে না তুলে জীবিত কিছু মানুষকে উপস্থাপন করা যায়, লেখকের ব্যক্তিত্ব বা উপস্থিতি—যা অনেক রচনায় কিছুটা ভারী হয়ে ওঠে, নাটকের ক্ষেত্রে তা অনায়াসে এড়ানো যায়। কিন্তু তাহলে, আমাদের বাংলা সাহিত্য গল্প-কবিতায় এত ধনী হয়েও, সাহিত্য পদবাচ্য নাটকে এখনো এত দীন কেন? কারণ সম্ভবত এই, উপন্যাস কেনার মতন, শুধু পড়ার জন্যই নাটক কেনার স্বভাব বাঙালী পাঠকদের নেই, এবং নাটক যে-হেতু চরিত্র সম্বল, সুতরাং তাদের রক্ত মাংসের চেহারায় দেখার ইচ্ছে নাট্যকারের পক্ষে স্বাভাবিক—এবং তার সম্ভাবনার অভাবেই নাটক রচনায় অনুৎসাহ।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটির কথা ভাবতে গেলে, বাংলাদেশের নাটকের জগতে সম্প্রতি নবযুগ এসেছে। বাংলাদেশের অনেক কিছুই অনন্যসাধারণ, এত বেশী নাটকের দল পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানি না, প্রায় প্রত্যেক ইস্কুল কলেজে, পাড়ায়, যে-সমস্ত অফিসে অন্তত ৫০।৬০ জন কর্মী আছে সে রকম প্রত্যেক অফিসে বছরে একবার-দুবার নাটকের অভিনয় হয়। অফিসের রিক্রিয়েশান মানেই এখন নাটক! সব মিলিয়ে শৌখিন নাটকের দলের সংখ্যা কুড়ি-তিরিশ হাজারের কাছাকাছি হবে হয়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী ঠিক সংখ্যাটি বলতে পারেন। অফিস বা কলেজের অভিনয়ে অধিক ঝুঁকি নেই, টিকিট বিক্রি হয় না—সুতরাং সে সব জায়গায় ভালো সাহিত্য-রসাত্মক নাটকের অভিনয় অনায়াসেই হতে পারে, কিন্তু এ পর্যন্ত অফিসের কর্মচারী অবশ্য সে-দায়িত্ব পালন করে নি। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁদের নাটক দেখতে যাওয়া এখনো নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু কলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি শৌখিনদল বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় ও উচ্চাঙ্গের প্রয়োগ পদ্ধতি দেখাচ্ছেন। যদিও তাঁদের উপজীব্য এখনো, বলে বা না-বলে নেওয়া বিদেশী নাটক। অ্যাডাপটেশান বা ভাবানুবাদ জিনিসটা খানিকটা অরুচিকর, এ যেন মূল লেখককে রয়ালটি ফাঁকি দেবার একটা কায়দা মাত্র। তা ছাড়া, নাটক যে হেতু জীবিত চরিত্র নিয়ে, সেইজন্য যতই অ্যাবস্ট্রাক্ট হোক, সব নাটকেই পারিপার্শ্বিক বা দেশ-কালের ছাপ থাকতে বাধ্য। এক দেশের নাটকে অন্য দেশের পোশাক (সংস্কৃতি ও আচার যেখানে ভিন্ন) পরানো ঠিক খাপ খায় না। জার্মানীতে যখন কালিদাসের কিংবা নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়, তখন তাঁরা যথা সম্ভব ভারতীয় পোশাক পরিয়ে ভারতীয় আবহাওয়া ফুটিয়েই অভিনয়ের চেষ্টা করেন, আমাদের মতন যুডিথ শাড়ি পড়ে যূথিকা হয় না, নিকলসন হয় না নিখিলেশ। ভালোবাসা-ঈর্ষা-নিঃসঙ্গতা এগুলি সার্বজনীন, কিন্তু ফরাসী যুবকের নিঃসঙ্গতা বোধ আর বাঙালী যুবার নিঃসঙ্গতা বোধ এক হতে

পারে না। যাই হোক, বহুরূপীর শম্ভু মিত্র বা নান্দীকারের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] ও মেধায় কয়েকটি ভাবানুবাদ নাটকও যথেষ্ট আবেগের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। এবং এ কথা এখন স্পষ্ট, সাহিত্য-পদবাচ্য সার্থক নাটক রচনার পথ এখনও সুগম। মঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক নিয়ে যে যতই আলোচনা করুন, শেষ পর্যন্ত সেই নাটকই মূল্য পায়, যা আসলে সাহিত্য। এবং নাট্যকার হবেন আসলে সাহিত্যিক, তিনি মঞ্চের কথা ভেবে লিখবেন না, মঞ্চই তাঁর ভাবনা অনুযায়ী চলবে।

সেই রকম চেষ্টাও এখন শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এখন নতুন করে আবার নাটক লেখা শুরু করেছেন, আমরা আশা করি এইসব নাটক গ্রহণ করার জন্য মঞ্চ ক্রমশ প্রস্তুত হবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল-ও এক সময় সার্থক নাটক লিখেছেন। বিমল কর [illegible] নামে একটি [illegible] অতি আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্র[illegible] একাধিক নাটক শৌখিন মঞ্চে সার্থক।

দীপক মজুমদারের [illegible] কুকুর ও [illegible] চতুরঙ্গ [illegible] উদাহরণ। কবিদের মধ্যে, [illegible] চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি নিজস্ব [illegible] নাটক ও ভাবানুবাদ রচনা করেছেন, [illegible] ও মৃত্যু সংবাদ এই [illegible] অভিনয়ও হয়ে গেছে। এ ছাড়া, [illegible] নাটকের একটি সার্থক ধারাও বাংলা-দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে অনেকেরই ছোট বড় কাব্য নাটক রচনা করেছেন। সম্প্রতি [illegible] উল্লেখযোগ্য ও অভিনীত কাব্য নাটক [illegible] চক্রবর্তীর প্রথম নায়ক, দিলীপ রায়ের [illegible], রামবসুর নীলকণ্ঠ, অলোক সরকারের [illegible] ও মায়া, কাননের [illegible] সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের [illegible]। রাম বসু ও দিলীপ রায়ের কাব্য নাটকের সংখ্যা চারের বেশী। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে আরো অনেকেই কাব্য নাটক লিখেছেন, যেমন [illegible] রায়ের ইঙ্গিত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের একলব্য, কৃষ্ণ ধরের এক রাত্রির জন্য, অরুণকুমার সরকারের প্রস্তাবনা, তরুণ ভট্টাচার্যের তিন চরিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শেষের প্রহর, সাজঘর, [illegible] রায়ের অভিমন্যু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের সময়ের সেতু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল প্রভৃতি ছোট ছোট কাব্য নাটক লিখেছেন। গিরিশঙ্কর, মনোজ মিত্র, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, বাদল সরকার—প্রভৃতি আরো অনেকের নাটকও শৌখিন মঞ্চে সফল হয়েছে—কিন্তু সেগুলি ঠিক আমাদের এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নাটকগুলি ও অন্য পেশাদারী মঞ্চের ভিড় জমানো [illegible] নাটকও এক হিসেবে এক, অর্থাৎ সাহিত্যমূল্য নেই। আরো অনেকের নাটক হয়তো চোখে পড়েনি বা এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না—সেগুলির নাম উল্লেখ না করার আর কোনো অন্য কারণ নেই।

কবিতা পত্রিকার মত, শুধু নাটক সংক্রান্ত পত্রিকাও কম নয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নৃপেন সাহা সম্পাদিত গন্ধর্ব, সুরুচি-সম্মত ও আধুনিক নাটক আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া আছে বহুরূপী, থিয়েটার, দৃশ্যকাব্য, মঞ্চজগৎ, প্রসেনিয়াম, [illegible]। নাটক বিষয়ে দু'তিনটি পাক্ষিক কাগজও চোখে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে নাটক সম্পর্কিত সাপ্তাহিক, দৈনিক বা [illegible] বেরুবার একেবারেই সম্ভাবনা নেই—এরকম নিরাশ উক্তি করারও কোনো কারণ দেখি না।

আরো কবিতার পত্রিকা

দুটি সংখ্যা আগের সাহিত্য সংবাদে কবিতা পত্রিকা বিষয়ে আলোচনায় কয়েকটি পত্রিকার নাম ভ্রমক্রমে বাদ পড়েছিল। তার-মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, '[illegible]', [illegible] সরকার ও [illegible] সম্পাদিত এই গুরুত্বপূর্ণ কাব্য পত্রিকাটি বেরোচ্ছে ১৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে। আর একটি পত্রিকার নাম '[illegible]', এতে স্থান পায় শুধু বিদেশী কবিতার অনুবাদ। পূর্বোল্লিখিত আলোচনার উপ-যোগিতা ছিল পুজোর সময় প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা, এ দুটি পত্রিকার কোনো সংখ্যা পুজোর সময় অবশ্য প্রকাশিত হয়নি। আর একটি ত্রৈমাসিক রেখা দত্ত সম্পাদিত আধুনিক কবিতা, এটাও প্রকাশিত হচ্ছে আট বছর। নবদ্বীপের একটি কাব্য পত্রিকার নাম 'পাল, বদল'। নবদ্বীপের আর একটি পত্রিকা 'অজ্ঞাতবাস' ও গৌহাটির 'সময়'—এ দুটিও কবিতাপ্রধান। দক্ষিণ কলকাতার 'সাম্প্রতিক' একটি মাসিক কবিতা সংকলন। 'প্রতিবিম্ব' নামের একটি ত্রৈমাসিকও বেরিয়েছে। শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতার' ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এমন কি পোস্টকার্ড সংকলনও আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়েছিল, এখন শুধু ত্রৈমাসিকটির অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া, আরও কোনো কোনো পত্রিকার নামও এখনো বাদ পড়তে পারে খাঁটি অজ্ঞানতাবশত। দেখা যাচ্ছে, শুধু কবি নয়, বাংলায় কবিতা পত্রিকার সংখ্যাও অসংখ্য।

সনাতন পাঠক

সাহিত্যিক পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম। সুনীলকুমার নাগ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দশ টাকা।

ইয়োরোপ-আমেরিকার পঁচিশজন দিকপাল সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যসাধনার মাঝারি গোছের আলোচনার বই। শুরুতে ইবসেন আর শেষে শোলোকফ। টলস্টয়, ওয়েলস, শ, মান, নুট হামসুন, আঁদ্রে জিদ হাকসলি, ফকনার, হেমিংওয়ে, সার্ত্র, কামু এরেনবুর্গ, মায় মোরাভিয়া—বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মাপের সাহিত্যসাধক স্থান পেয়েছেন এ-বইতে। লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ উনবিংশ শতাব্দীর হলেও এঁদের প্রভাব বিংশ শতাব্দীতেই বেশি অনুভূত।

উপযুক্ত পঁচিশজন সাহিত্যিকের উপরে সমসংখ্যক প্রবন্ধ ছাড়া 'পূর্বাভাষ' ও অন্তে 'বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক আরো দুটি প্রবন্ধ এই সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার বইতে স্থান পেয়েছে। লেখকের আলোচনা একদেশদর্শী নয়, কোনো প্রকার উন্নাসিকতাও নেই আলোচনায়; তবে, আলোচনার স্তরটি বড়োই সাধারণ। ছাত্র ও বিদেশী সাহিত্যে আগ্রহান্বিত সাধারণ পাঠকের ভালো লাগবে বলেই মনে হয়। তবে, বিদেশী সাহিত্যের সীরিয়স পাঠক এ-বইতে কিছু পাবেন না। যে সমস্ত পাঠক মূল বই না পড়ে কোনো প্রখ্যাত লেখক সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান জাহির করতে চান সুনীলবাবুর বই তাঁদের প্রভূত সাহায্য করবে। কারণ এ-বইতে সব লেখকের বেশ কয়েকখানা করে বইয়ের সংক্ষিপ্তসার ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

"বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক রচনাটি একেবারে স্কুলপাঠ্য রচনা-পুস্তক-মার্কা। ওটা এ-বইতে সন্নিবেশ না করলেই খুশি হতাম।

(৩২২।৬৬)

উপন্যাস

ফানুসের উপমা। সুধাংশু ঘোষ। চতুরঙ্গ, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা-১৩। তিন টাকা।

'ফানুসের উপমা' যতদূর জানি, সুধাংশু ঘোষের প্রথম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসেই এমন নৈপুণ্যের পরিচয় কদাচিৎ মেলে। ভাষার ওপর লেখকের অনায়াস দখলই হয়তো এর কারণ। বস্তুত, এমন ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন গদ্য ইদানীং কমই চোখে পড়ে।

'ফানুসের উপমা' এক হিসেবে প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু, এর কোথাও গতানুগতিকতার চিহ্ন নেই। বিভাস-ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী-বিজয়প্রতাপ, আবার বিভাস-ইন্দ্রাণী—মোটামুটি এই তিন স্তরে কাহিনীর বিস্তার; এর শুরু যখন শান্ত-চরিত্র বিভাসের কৈশোর এবং ইন্দ্রাণীরও। ইতিমধ্যে ঝড়ের মতো এসে পড়ে বিজয়প্রতাপ, চেহারা ও চরিত্রে সে বিভাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভাস ভীরু, সঙ্কোচপ্রবণ, কিছুটা দুর্বলচিত্ত। বিজয়প্রতাপ উদ্দাম ও বেপরোয়া, এবং এরই জোরে সে ইন্দ্রাণীকে ক্রমশ অধিকার করে নেয়। কিন্তু এই পরিণতিও ক্ষণস্থায়ী। কাহিনীর শেষে আবার ইন্দ্রাণীকে বিভাসের জন্য অপেক্ষমান দেখা যায়, প্রচ্ছন্নভাবে বিভাসকেও ইন্দ্রাণীর জন্য। কাহিনীর শেষটুকু বিশেষ তাৎপর্যময়।

'ফানুসের উপমা'র পটভূমি উত্তর ভারতের এক আপাত-অভিজাত শহর, ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন। যুদ্ধের অভিঘাতে পতনমুখী সমাজের চরিত্র এই গ্রন্থে সুন্দর ফুটেছে। সত্যি বলতে কি কাহিনী ভাষা চরিত্র ও পটভূমি সব মিলে এই উপন্যাসে এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে, পাঠকের মন থেকে যার রেশ সহজে মুছে যায় না।

২৮৮।৬৬

উত্তর মেলেনি। সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য উপন্যাসে নায়ক নায়িকার জীবনের উত্থান পতনের বিচার বিশ্লেষণ গতানুগতিক। গরিবের ঘরের মাতৃ-পিতৃহীন তপন শৈশবকাল হতেই মাতামহের আশ্রয়ে থেকে শিক্ষালাভ করে পরিণত বয়সে বিজ্ঞান বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয় এবং অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। শিক্ষা-দীক্ষা এবং চরিত্রগুণে সে শীর্ষস্থানীয়। মাতামহের গৃহে বসবাস করবার সময় ওই পরিবারের পরিচারিকার সপ্তদশী বোনঝি কিশোর তপনকে ভালবাসতে শুরু করে। তপন তখন নির্বিকার। পরিণত বয়সে তপনের চরিত্রের পট-পরিবর্তন আরম্ভ হয়। পরিচারিকার বোনঝি শ্রীমতী তখন কীর্তন গায়িকারূপে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। মাতামহের বাড়িতে কীর্তন উপলক্ষে শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই তপনের জীবনাদর্শের মোড় ঘুরে যায়। এ সময়ে তপন তার ছাত্রী বনাম সহকর্মী মনীষা এবং জনৈকা হোটেল-পরিচারিকা অলকার অবাধ সাহচর্য লাভ করে। এই সঙ্গলাভও তাৎপর্যপূর্ণ। এরই বেশ কিছুদিন পরে শ্রীমতী কীর্তন উপলক্ষে শহরে এসে দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং শহরের এক কুখ্যাত পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। খবর পেয়ে তপন ছুটে যায় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পূর্বেই শ্রীমতীর মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তপনও ওই একই রোগে আক্রান্ত হয়ে ওখানেই অবস্থান করে এবং নির্বান্ধব অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। গ্রন্থের

বৃদ্ধি করিয়াছেন। ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। এবং বেদান্ত-প্রাণহিত সত্যে ভগবদ্ভ রস আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইবেন। (৩৮৮।৬৬)

প্রাপ্তি স্বীকার

সায়াহ্নে সপ্তদ্বর্গা। সম্রাট সেন। সিগনেট বুকশপ—১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ১০·০০।

জগন্নাথের রথ। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক হাউস— ৩০৩এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩·০০।

হ্যামলেট। অনুবাদঃ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক হাউস— ৩০৩এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩·৫০।

বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১২·৫০।

নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০·৫০।

কৃষ্ণকথা কাহিনী। শ্রীদিলীপকুমার রায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—বর্ধমান। মূল্য ৬·০০।

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম। রাজানক ক্ষেমরাজ। অনুবাদ : শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—বর্ধমান। মূল্য ২·০০।

শ্রীশ্রীশিবতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্বভাস। সংকলক : শ্রীমৎ ১০৮ শংকর স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি বেদান্তাচার্য। শ্রীবিশ্বনাথ পাল [illegible]— মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, ২১৭, বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৭৫।

সান্ধ্য আসরের গল্প। প্রভাতকুমার দত্ত। মায়ামঞ্চ—২১বি, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫।

Village Survey Monograph on Raibaghini Investigation, Tabulation & First Draft : Arun Bhattacharya Editing & Final [illegible] of Publications — Civil Lines, Delhi. Price Rs 8.00.

পথের তীর্থে। [illegible] করুণা প্রকাশনী ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য [illegible]।

Cry For Light, by Bimalendu Nath.

রুশ সাহিত্যের রূপরেখা। গোপাল হালদার। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ—২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০·০০।

সংকলন। ভূবন সেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেন—পি ১৮ দরগা রোড, কলিকাতা-১৭। মূল্য ২·৫০।

অগ্নিকন্যা। প্রমোদ সাহা। কৌশিক প্রকাশনী—৪১, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·৫০।

গীতা ধ্যান (ষষ্ঠ খণ্ড)। মহানন্দরূপ ব্রহ্মচারী। সুদর্শন—৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য ২·৫০।

গান্ধী রচনা সংকলন। সংকলয়িতা : অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)—১৪, রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ৫·০০।

গ্রীষ্ম বসন্ত। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন—২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০।

স্টারের মূল্য

"স্টারের নাম প্রচার করে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। ছবি যদি ভাল হয় এবং তাতে স্টার থাকেন তবে টাকার ভাবনা থাকে না। স্টারের মূল্য খুব বেশী সে-সম্পর্কে প্রশ্ন নেই। কিন্তু আমরা খুব অস্বস্তি বোধ করি যখন স্টারদের পারিশ্রমিক আমাদের সাধ্যের অতীত হয়ে পড়ে। এবং একজনকে খুব বেশী দক্ষিণা দিলে অন্যকেও আঘাত করা হয়"। কথাগুলি সম্প্রতি বলেছেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের প্রোডাকশন-চীফ শ্রীরিচার্ড ডি জানুক। চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে শ্রীজানুকের মতামতের দাম খুব বেশী।

"স্টারদের নেওয়ার ব্যাপারটা", শ্রীজানুকের মতে, "অনেকটা ভোজবাজির মত। সেক্ষেত্রে দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিতে হয়। কারণ স্টাররাও এগিয়ে চলেছেন, আগামী দিনের জন্যই যেন নিজেদের চুক্তিবদ্ধ করে চলেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে প্রায় সব কোম্পানীই নিজেদের চিত্রতারকা, কাহিনীকার ও পরিচালকদের নিয়ে কাজ করতেন। তখন কোন ঝামেলা থাকত না। প্রযোজক নিজের তালিকা থেকে শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচন করে ব্যবসায়ে নেমে পড়তেন। আজ প্রযোজককে আগামী সাত-আট মাসের কথা ভাবতে হয়। ১৯৬৭ সনের জন্য আমাদের হাতে এখন ছয়-সাতখানা ছবি আছে। আমরা সেদিক থেকে নিরাপদ "অ্যাডভান্স কেটিগরি"-তে আছি। যে স্টারদের নিয়েছি তাঁদের ছবি বক্স-অফিসে কেমন ব্যবসা করছে তা জানবার যথেষ্ট সময় আমরা পাচ্ছি। এবং স্টারদের খাতে ব্যয় কমাবার জন্য নতুন প্রতিভা গড়ে তোলার চেষ্টাও করি।"

চিত্রভারতীর "তীরভূমি" (পরিচালনা গুরু বাগচী) ছবির নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

তিসরী কসম

"তিসরী কসম"-এর (ইমেজ মেকার্স) নায়কের তিনটি প্রতিজ্ঞা ছাড়াও ছবিতে আর একটি প্রতিজ্ঞা রয়েছে। সেটা অকথিত, এবং চলচ্চিত্রকার বাসু ভট্টাচার্য সম্পর্কে। যথা সম্ভব 'কনভেনশন' বর্জন করে বোম্বাইয়ে শ্রী ভট্টাচার্য এমন শিল্পগুণান্বিত একটি ছবি তৈরি করতে পারবেন সেটা আমাদের ভাবনার অতীত ছিল। প্রথম ছবি, তাই হয়ত পরিচালক সম্পূর্ণ আপসহীন হতে পারেন নি। তবুও বলব, ছবিটি মহত্বের কাছাকাছি গেছে। সেটাও কম বিস্ময়কর নয়। এত ভাল ছবি আমরা এখানে, কলকাতায় বসে, খুব বেশী দেখেছি বলতে পারব না। ছবির এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। একটি দৃশ্য দর্শকরা কোনদিন ভুলবেন না—গ্রামের পথ দিয়ে যখন গরুর গাড়িতে নায়ক-নায়িকা যাচ্ছে এবং তাদের নবপরিণীতা ভেবে গাড়ির পিছু পিছু যেখানে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা গান গাইছে। পরিবেশ এত সুন্দর, স্বাভাবিক যে ভাবাই যায় না। এ-ব্যাপারে শিল্পনির্দেশকের কৃতিত্বও কম নয়। উত্তর বিহার অঞ্চলের একটি গ্রাম্য মেলা ছবির প্রধান পটভূমি। সেখানে হীরামন তার গরুর গাড়িতে করে (গরুর গাড়ি চালিয়েই তার জীবিকা অর্জন) নিয়ে এসেছে "নওটনকী"-র নাচওয়ালী হীরাবাঈকে। দুজনের নামই হীরা। হীরাবাঈ তাই প্রথম দেখাতেই হীরামনের সঙ্গে মিতা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে।

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর "পঞ্চশর" (পরিচালনা: অরূপ গুহঠাকুরতা) ছবিতে কণিকা মজুমদার। ফটো—দেশ

দুটি মন নিয়ে এরপর গল্পের বিস্তার। ঘটনা এতে কম। পরিচালক দর্শককে নিয়ে গেছেন দুটি মনের জট আর জটিলতার মাঝখানে। সরলমতি হীরামনের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব হীরাবাঈয়ের জীবনে নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। এবং পরিবর্তন। "নওটংকী" আর মেলা ছেড়ে চলে গিয়েছে হীরাবাঈ। মিলন মেলা ভাঙবার আগে স্টেশনে দাঁড়িয়ে হীরামন তার তিসরী কসম উচ্চারণ করেছে। নওটংকীর মেয়েকে সে আর কোনদিন তার গাড়িতে তুলবে না।

কাহিনীর (ফণীশ্বরনাথ রেণু রচিত) নতুনত্বে দর্শক মুগ্ধ। চিত্রনাট্যটিও (নবেন্দু ঘোষ রচিত) তেমনি সুগ্রথিত। তার চেয়েও বুঝি আকর্ষক এর সংলাপ—যাতে বিশেষ এক সমাজের, চরিত্রের লক্ষণ সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। ছবিতে প্রেমের মাধুর্য আছে। হীরামন ও হীরাবাঈ যখন কাছাকাছি এসেছে তখন তা আমরা অনুভব করি। বুঝতে পারি, কী বলতে গিয়েও যেন তারা বলতে পারছে না। নির্মল, নিরুচ্চার প্রণয়ের প্রভাব দর্শকের মনকে অবশ করে। প্রায় সব কিছুই ছবিতে পরিমিত, পরিশীলিত। গান এবং নাচ হয়ত একটু বেশী, কিন্তু তা গতানুগতিকতার পথ ধরে আসেনি। কাহিনীর শর্তেই পালন করেছে। তবে পৌনঃপুনিকতার দরুন নাচ-গান কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। হীরাবাঈয়ের উপর চরিত্রহীন জমিদারের অত্যাচারের ঘটনাটা না দেখালেও চলত। জমিদারের ভূমিকা এর আগেই স্পষ্ট। এমন একটি উঁচুদরের ছবিতে গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা না থাকলেই হয়ত ভাল হত। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত গানগুলিতে মাটির স্পর্শ এত বেশী মেলে যে তার সঙ্গে যন্ত্রের আওয়াজ ভাল লাগে না। তবু বলি, গানগুলি আবিষ্ট করে রাখে। এ-ছবিতে সুরকারেরা যেন কাহিনীর মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন। আর অসাধারণ এই ছবির ফটোগ্রাফি। সুব্রত মিত্র তাঁর ক্যামেরায় গ্রামপ্রকৃতি এবং তার চরিত্রগুলির 'মুড' সর্বক্ষণ ধরে রেখেছেন।

রাজ কাপুর এ-ছবিতে যেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন শিল্পী। একটি গ্রাম্যচরিত্রের সঙ্গে তিনি অক্লেশে মিশে গিয়েছেন, চরিত্রটির অন্তরের গভীরে ডুব দিয়েছেন। 'টাইপ' চরিত্রসৃষ্টির এই ক্ষমতা এ ছবিতে স্পষ্ট দেখা যায়। ওয়াহিদা রেহমানও আমাদের অবাক করেছেন, তাঁর শান্ত চাহনি, অভিব্যক্তি ও মৃদু বাচনভঙ্গি দিয়ে। এই দুই বিশিষ্ট স্টারকে নিয়ে এমন অসামান্য চরিত্রচিত্রণ সম্ভব করেছেন বাসু ভট্টাচার্য। ছবির ছোটখাটো আর সব চরিত্রই স্বাভাবিক। এই ভূমিকাগুলিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন দুলারী, নবেন্দু ঘোষ, বিশ্ব মেহরা, কৃষ্ণ ধাওয়ান। এঁদের নিয়ে পরিচালক এমন একটি জগতের সন্ধান দিয়েছেন যার স্মৃতি দর্শকের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

লব কুশ

সীতাকে ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জন, বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশের জন্ম, পিতার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ ও পরে মিলন এবং সীতার পাতাল-প্রবেশ—এই রামায়ণী কথা কারো অজানা নয়। এবং ধর্মপ্রাণ দর্শকের কাছে রাম-সীতা ও লব-কুশের কাহিনীর আবেদনও গভীর। "লব কুশ" (এ বি এম প্রোডাকশন্স) চিত্রে রামায়ণের উপাখ্যান প্রধানত ভক্তিরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। ছবিতে লব-কুশের জন্মের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লব-কুশের জন্মের পূর্বে তাদের মঙ্গল-কামনায় বাল্মীকির আরাধনা এবং দুই শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেব-দেবীগণের পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছবিতে ভক্তিভাবের সঞ্চার করা হয়েছে। ভরত, লক্ষ্মণ এবং পরে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধের দৃশ্যগুলিও দর্শকরা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে দেখবেন। এইসব দৃশ্যে ট্রিক শট এবং সম্পাদনার (অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়-কৃত) কৃতিত্ব আছে।

চিত্রনাট্যকার ভূপেশ রায় এবং পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় কাহিনী বিন্যাসে আবেগের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। কাহিনী-গ্রন্থনের (সুধীরবন্ধু-কৃত) লক্ষ্যও তাই। এ ক্ষেত্রে বাহুল্যবর্জনই প্রাধান্য পেয়েছে। অতএব নাট্যাবেগ এবং ধর্মভক্তি—এই দুয়ের আস্বাদন যাঁদের কাম্য তাঁদের কাছে এই ছবি আদরণীয় হবে।

পুরাকালের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল ছবিতে সঠিক রক্ষিত এ কথা বলা যায় না। একাধিক গানের ভাষা ও সংলাপ এ যুগের। এইসব ত্রুটি বিচারশীল দর্শককে পীড়া দেবে। সর্বাঙ্গীণ বিন্যাসকর্ম ও কলাকৌশলের কাজের দিক থেকেও ছবিটি বিশেষ সন্তোষজনক নয়। তবে পরিচালক অবতার-মহিমা, ধর্মকথা ও নাটকীয়তার মাধ্যমে দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করার যে চেষ্টা করেছেন তা মোটামুটি সফল।

অতি পরিচিত শিল্পীদের রাম-সীতা কিংবা লক্ষ্মণের বেশে এমনিতেই কেমন যেন বেমানান লাগে। গোড়াকারে (রঙ আশানুরূপ নয়) অসিতবরণকে বিভিন্ন অবতাররূপে দেখে দর্শকরা কতখানি খুশী হবেন জানি না। তবে শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকায় অসিতবরণ এবং সীতার রূপসজ্জায় অনীতা গুহ নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী গুহের অভিনয়ে আবেগের শর্ত অপূর্ণ থাকে নি। বাল্মীকির ভূমিকায় শিল্পীর অভিনয় মর্যাদাসম্পন্ন। লব-কুশ বেশী শঙ্কর ও সুশোভনকে দর্শকের খুবই ভাল লাগবে। এই দুই শিশুশিল্পী ছবির বড় আকর্ষণ।

শ্রীকান্তর সংগীত পরিচালনা মন্দ নয়। গানের সুর বেশ ভাল। শেষে দশাবতার স্তুতির সংস্কৃত স্তব ব্যবহৃত হলে দর্শকমনে ভক্তির ভাব জাগত।

বিশু চক্রবর্তীর ফটোগ্রাফি ও বটু সেনের শিল্পনির্দেশ মোটামুটি একরকম।

নেপথ্যে

বোম্বাইয়ে, হিন্দীতে এক্সপেরিমেন্টাল ছবি করা কঠিন। তরুণ চিত্রপরিচালক বাসু ভট্টাচার্য সে কথা স্বীকার করেন। তবু তিনি হার মানেন নি। আউটডোরে একটি পুরো

স্টারে "দাবি"-র শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসবে ভারতী, গীতা দে, নীলিমা দাস, প্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুব্রতা, আশা দেবী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাইনে) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন অনুপকুমার

ফটো—দেশ

ছবি তিনি তুলে ফেলেছেন। নাম "উসকি কহানী"। শিল্পীরা সবাই নতুন। এ-বছরেই ছবিটি তিনি সেন্সর করাবেন। "এ-ছবি করতে গিয়ে কোন কিছুর সঙ্গেই আপস করিনি। পয়সা পাব না জানি। এক্সপেরিমেন্টের স্বীকৃতি পেলেই আমি খুশি।" পুরনো দিনের দুই বন্ধুর অদ্ভুত ছবি আজও ভুলতে পারেন নি বাসুবাবু। ওদের তিনি তাঁর ছবিতে একটি ভূমিকায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

"তিসরী কসম"-এর মুক্তি উপলক্ষে বাসুবাবু কলকাতায় এসেছেন। এতকাল তিনি ছিলেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গত বিমল রায়ের সহকারী। "তিসরী কসম" তাঁর প্রথম ছবি। সুব্রত মিত্রর ফটোগ্রাফির উপর বাসুবাবুর আস্থা গভীর। "চারুলতা"-য় সুব্রতর যে ফটোগ্রাফি দেখেছি, আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ছবিতে এত উঁচুদরের ফটোগ্রাফি দেখিনি—বলেছেন শ্রী ভট্টাচার্য।

"জোহর ইন কাশ্মীর" ছবির নাম। ছবির মুক্তি উপলক্ষে আই এস জোহর কলকাতায় এসেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে জোহর ইন কালকাটা-র মূল্য কম ছিল না। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে জোহর বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটালেন। জোহরের মুখে হাসির গল্পের শেষ নেই। "জোকস"-এর জন্য জোহর বিখ্যাত। অনেকগুলোই আমাদের শোনালেন। তার মধ্যে একটি: স্বামী-স্ত্রী তাদের বাচ্চা নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছেন। এক বেলুনওয়ালা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। শিশুটি স্বভাবতই বেলুনের জন্য বায়না ধরেছে। তার মা গেলেন বেলুন আনতে। যাবার আগে স্বামীকে বলে গেলেন: তুমি যেখানে রয়েছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। শক্ত করে খোকার হাত ধরে রেখো। আমি এক্ষুণি আসছি। তথাস্তু—স্বামী বললেন। সমুদ্রের রূপ ছিল সেদিন ভীষণ। স্ত্রী হাতে বেলুন নিয়ে এসে দেখেন স্বামীর গলা পর্যন্ত জলের নিচে। চিৎকার করে বললেন, খোকা কোথায়? স্বামী বললেন, তুমি যেখানে দাঁড়াতে বলেছিলে, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। খোকাকে খুব শক্ত করে ধরে রেখেছি।

হাসির গল্প ছাড়া অন্য কথাও হল জোহরের সঙ্গে। জোহর কি "অ্যাংরি ম্যান" (ইয়ংম্যান আর বলা চলে না)? এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। কিন্ডারগার্টেন কমেডি নিয়ে আমাদের দর্শকরা ছবি দেখে—এদের সঙ্গে বলেছিলেন জোহর। আরও বললেন, "আমার ছবি কেউ দেখেন না, ভাল বলেন না"। ডবল এম-এ পাশ করেছেন জোহর। পড়া শেষ না হতেই তিনি ফিল্মে আসেন। নিজস্ব চিন্তাধারা তিনি তাঁর ছবিতে প্রকাশ করতে চান। "নাস্তিক"-এ তার প্রমাণ মিলেছিল। আমাদের দর্শকদের যদি কিন্ডারগার্টেন দৃষ্টিভঙ্গিই থাকবে তবে "লরেন্স অব অ্যারাবিয়া"-এর মত ছবি এত ভাল চলল কী করে?—জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন। উত্তরে জোহর বললেন, লরেন্স অব অ্যারাবিয়া যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকেই ভারতীয় ছবি দেখেন না। উদাহরণ দিয়ে বললেন, আমার এক ক্লাসের বন্ধু অনেকদিন পর আবিষ্কার করলেন আমি ফিল্মে অভিনয় করি। এবং এটাও জানলেন, আমার একটা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছবিতে সবিতা দেবী আছেন"। পুরনো দিনের সবিতা দেবীর কথাই তাঁর এখনো মনে আছে। আজকের কোন খবরই তিনি রাখেন না।

কিছুকাল আগে কলকাতায় রাজেন্দ্রকুমার এসেছিলেন। বললেন, "এখন তো ঘন ঘন দেখা হবে। কলকাতার আর্টিস্টই তো হয়ে গেলাম।" "সপ্তপদী"-র হিন্দীচিত্ররূপে কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজেন্দ্রকুমার। সুচিত্রা সেন ও রাজেন্দ্রকুমারকে এই প্রথম এক সঙ্গে ছবিতে দেখা যাবে। বাংলা 'সপ্তপদী' দেখেছেন রাজেন্দ্রকুমার। বললেন, উত্তমকুমারের মত এত ভাল অভিনয় হয়ত করতে পারব না। তবু রোলটি এত ভাল লেগেছে যে কী বলব। দেখি কী হয়।

দার্জিলিঙ-এ আর ডি বনসালের "ঝুক গয়া আসমান"-এর শুটিং সেরে কলকাতায় এসেছিলেন রাজেন্দ্রকুমার। সেখানে নবদম্পতি দিলীপকুমার ও সায়রা বানুও ছিলেন। দিলীপকুমার দার্জিলিঙে যেদিন এসে পৌঁছলেন সেদিন নাকি সায়রা বানুর পক্ষে শুটিংয়ে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। দিলীপকুমার সলজ্জভাবে শুধু নাকি বলেছিলেন, "মেরা মিয়াঁ আ গয়া"। খবরটি রাজেন্দ্রকুমার আমাকে দেন নি। অন্যের মুখে শোনা। রাজেন্দ্রকুমারের মুখে শুনলাম, তিনি শিল্পীদম্পতির সঙ্গে বেশ আনন্দে কয়টি দিন কাটিয়েছেন। এবং প্রাণভরে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

স্টারে "দাবি": শিল্পী ও কলাকুশলী পুরস্কৃত

স্টার থিয়েটারের "দাবি"-র শততম অভিনয়-পূর্তির স্মারক উৎসবে শিল্পীদের সঙ্গে এসে পুরস্কার নিল সুব্রত। সুব্রত সাহা তার নাম। বয়স এক বছর দু' মাস।

তাকে দেওয়া হল একটি প্র্যাম। শিল্পী সুব্রত তখন অভিভাবকের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমে। ঘুমন্ত সুব্রতকে শুইয়ে দেওয়া হল প্র্যামে। সাধারণত এই ধরনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যা দেখা যায় সে তুলনায় এই ঘটনাটি ছিল নতুন। "দাবি"-র নাট্যকার পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত জানালেন, সুব্রতর ভূমিকায় এর আগে চারজন শিশুকে আনা হয়েছিল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করতে এসে তারা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুব্রত এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

"দাবি"-র নাট্যকার, পরিচালক, গীতিকার শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার শ্রীকালীপদ সেন এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী (যাঁরা এক শো রাত্রির প্রতি অভিনয়ে ছিলেন) অনুষ্ঠান-সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন। সুব্রত এক শো রজনীর প্রতি অভিনয়ে না থাকলেও তার জন্য নিয়ম শিথিল করা হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন শ্রীমনোজ বসু। সভাপতি ও প্রধান অতিথি নাটকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে সময়োচিত ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠান-শেষে "দাবি"-র ১৩৩ তম অভিনয় হয়।

আমজেদ আলী

ঘরোয়া আসরে আমজেদ আলী ও কিষেণ মহারাজ

যেকোনো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীর পক্ষে উপযুক্ত সমঝদার শ্রোতা পাওয়া যেমন ভাগ্যের বিষয় তেমনি শ্রোতাদের পক্ষেও কোনো গুণী শিল্পীকে আসরে বেশিক্ষণ পাওয়া কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

এমনই এক ঘরোয়া পরিবেশে নেউ আলিপুরে সরোদ ঘরানার উজ্জ্বল রত্ন উস্তাদ আমজেদ আলীর বাজনা শোনার সুযোগ ঘটেছিল। গৃহকর্তা শ্রী এস কে লাহিড়ীর আমন্ত্রণে কলকাতার শতাধিক সংগীত রসিক ও সমঝদার শ্রোতা সেদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন। ৪ ঘণ্টার এই আসরে আমজেদ আলীর সরোদ ও বেনারসের বিখ্যাত শিল্পী কিষেণ মহারাজের তবলা-সঙ্গত যে আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিল তার আস্বাদনে শ্রোতারা তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমজেদ আলী প্রথমে বাজালেন 'চন্দ্র-ধ্বনি'। এই রাগের রূপকে তাঁর ধ্যান ও ধারণা দিয়ে তিনি শ্রোতাদের সামনে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। জ্যোৎস্না-বিধৌত হেমন্ত-রাত্রির মুদিত কোমল-কোরক শিশির স্পর্শে আস্তে আস্তে তার এক-একটি পাপড়ি মেলে ধরে পরিশেষে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো অপূর্ব সৌন্দর্যে যেন সমুদ্ভাসিত। এই রাগে দ্রুতলয়ের গৎ-এ শিল্পী তাঁর বেতাজী হাতে রাগরূপ সৃষ্টির দুরূহ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে 'দেশ' রাগে মনমাতানো আলাপ, জোড় ঝালা ও গৎ বাজিয়ে আসর শেষ করলেন। আমজেদ আলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা, বয়সে তরুণ হলেও সুর আছে এঁর রক্তে, হৃদয়ও সেই সুরে রঞ্জিত। সরোদ তাঁর অঙ্গুলী স্পর্শে কথা বলে। সুরেলা ও মিষ্টি তাঁর হাত—যার তুলনা একমাত্র তাঁর পিতা হাফেজ আলী খাঁ। দ্রুত লয়ের কাজেও নির্ভুল আঙ্গুলের টিপ সুরে রাখা আমজেদ আলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তবলা-সঙ্গতে কিষেণ মহারাজ বোল ও তেহাইয়ের স্বকীয়তায় শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। কণ্ঠে মহারাজের ঘরণার 'বাজ' রয়েছে এঁর হাতে, বাঁয়ার কাজেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। বাজনায় দাপট আছে, মূল শিল্পীর উপর চড়ে যাবার লক্ষণও যে নেই তা নয়, কিন্তু সেটুকু তিনি করে থাকেন তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যেই। ভুললে চলবে না যে সঙ্গতকারও শিল্পী, দীর্ঘ দিনের সাধনা এবং অভ্যাসের দ্বারাই এই শিল্পকে তিনি আয়ত্ত করে থাকেন। সরোদ বা সেতার শিল্পী তাঁকে এক ঘণ্টা পাশে বসিয়ে রেখে আলাপ

কিষেণ মহারাজ

জোড় আলাপ তাঁর ওপর মেজাজটা দেখিয়ে গেলেন। গৎ-এর সঙ্গে তবলা সঙ্গতের যখন সুযোগ এলো তখন তাঁর বক্তব্যও তো শ্রোতাদের শুনতে হবে। সেকারণে অসহিষ্ণু হলে চলবে কেন।

মহিলা শিল্পী মহল

অল্প কয়েক বছর আগে কলকাতার মঞ্চ ও ছায়াছবির মহিলা শিল্পীরা মিলে "মহিলা শিল্পী মহল" গড়ে তোলেন। একটি মহৎ উদ্দেশ্যেই তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের জন্য একটি বিরাট বাসভবন নির্মাণ করাই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এবং অন্যান্যভাবে তাঁদের সাহায্য করাও সংস্থার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মহিলা শিল্পী মহলের অভিনেত্রীরা কয়েক বছর ধরে কলকাতার ও বাইরে নানা ব্যস্ততার মধ্যেও বিনা পারিশ্রমিকে নাটক অভিনয় করে গেছেন। তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য বাসগৃহ তৈরির জমি তাঁরা ক্রয় করেছেন। গৃহনির্মাণের কাজ অচিরেই শুরু হবে।

শিল্পিকল্যাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁরা মহাজাতি সদনে ৫ ও ৬ ডিসেম্বর "কবি" ও "মিশরকুমারী" নাটক দুটি অভিনয় করছেন। "কবি" তাঁরা এই প্রথম অভিনয় করবেন। দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সরযূ দেবী মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্ত, নীলিমা দাস, বাসবী নন্দী, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী, রেণুকা রায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, বনানী, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আত্ম-প্রকাশ করবেন।

"চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য

কলকাতা সফররত আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে গত শুক্রবার রবীন্দ্রসদনে "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা হয়। নৃত্যনাট্যটি অভিনয় করলেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর ও স্টেটসম্যান এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

বিশ্ব সাংবাদিক দল যে রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্য দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, সাধারণত আমরা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের যে অভিনয় দেখি, সে তুলনায় রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "চণ্ডালিকা"-র মান ছিল অনেক উন্নত। নৃত্যে ও গানে "চণ্ডালিকা"র ভাব-ঐশ্বর্যের পরিচয় শিল্পীরা অনায়াসেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নৃত্য-পরিকল্পনা (বালকৃষ্ণ মেনন) ছিল সুন্দর। কথাকলি ও লোকনৃত্যের সমন্বয় খুবই সুকল্পিত। "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" সমবেত নৃত্যটি (লোকনৃত্যের আঙ্গিকে) গতিছন্দে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তেমনি আকর্ষক ছিল প্রকৃতির (রিনা দাশগুপ্ত) নৃত্য ও অভিনয়। প্রায় সব শিল্পীই নৃত্যকুশলতা দেখিয়েছেন। প্রকৃতির মা (সন্ধ্যা নন্দী) এবং আনন্দও (শিব শংকরন) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৃত্যনাট্যের বিন্যাসও সুসংবদ্ধ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব ছিল রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রত্যেকটি গানই ছিল সুগীত। তবু প্রকৃতির গানেরই (সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে) বেশী প্রশংসা করতে হয়। মায়া সেনের সংগীত পরিচালনা ও তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবহসুর রচনা সন্তোষজনক।

"ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট" ছবিতে (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী) শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী

পাঠকের চোখে

প্রমথেশ বড়ুয়ার চলচ্চিত্রকর্মের নতুন মূল্যায়ণ শুরু হয়েছে। তর্কের ঝড় উঠেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত দিনের শিল্পী মনীষিকে আলোচনা করেছেন "তিসরী কসম"-এর পরিচালক শ্রীবাসু ভট্টাচার্য। আজকের তরুণ চিত্রপরিচালকের চোখে প্রমথেশ বড়ুয়াকে জানবার, বোঝবার সুযোগ পাবেন পাঠকরা।

আমার চোখে প্রমথেশ বড়ুয়া

মহাশয়,

'আমার চোখে প্রমথেশ বড়ুয়া' এই শীর্ষকে কিছু লিখতে আমার ভীষণ আপত্তি—কারণ এতে 'আমি' 'আমি' গন্ধ বড্ড বেশী। তাছাড়া, প্রমথেশ যখন তাঁর শেষ ছবি করেছেন তখন আমাদের চোখ ফোটেনি বললেই হয়।

কী স্বদেশী কী বিদেশী, সচেতনভাবে আমি ছবি দেখা শুরু করি উনিশশো পঞ্চাশের শুরুতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর অরাজকতায় ভরপুর তখনকার সিনেমা জগৎ। ভারতের নামকরা চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি হয় বন্ধ হয়ে গেছে না হয় অন্তিম অবস্থায় বিদায়ের দিন গুনছে। নীতিন বসু, বিমল রায় প্রভৃতি বম্বে গেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া নেই। দেবকী বসু প্রায় একা। সত্যজিৎ রায় ও নতুন যুগের চলচ্চিত্রকাররা তখনো আসেন নি। আমরা সিনেমা সচেতন হতে আরম্ভ করেছি। কীভাবে সে কথাও এখানে থাক। কারণ তাতেও আমি আমি গন্ধ বড় বেশী।

বর্তমান যেহেতু অশিক্ষিত পটুত্বের পক্ষপাতী নয় সেই হেতু কোন ক্ষেত্রেই কিছু করণীয় থাকলে, কর্তারও কিছু শিক্ষণীয় থাকে। তাই আমরা যারা ভেবেছিলাম 'চলচ্চিত্রই আমাদের ভবিষ্যৎ' তাদের পড়াশোনা এবং দেখা শুরু হল।

যাদের সুযোগ সাধ্য এবং যোগাযোগ অনুকূল ছিল তাঁদের হাতেখড়ি হল আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, পল রোথা, ফ্রিৎস ল্যাঙ্গ বা কার্ল ড্রেয়ারের ছবি দেখে এবং এঁদের বা এঁদের সম্বন্ধীয় লেখা পড়ে। অন্যদের জন্য রইলেন প্রথমেশ, নীতিন বোস, বিমল রায় প্রমুখ। প্রথম দিকে আমি নিজে দ্বিতীয় পর্যায়ের দলভুক্ত। আইজেনস্টাইন, পল রোথা, পুদভকিন এবং স্টানিস্লাভস্কির লেখার সঙ্গে তখন কিছু পরিচয় হয়েছে, এর বেশী কিছু নয়।

পঞ্চাশের শুরুতে সমকালীন কিছু ছবি ছাড়া 'চিত্রা' 'নিউ থিয়েটার্সের' ছবি এলেই দেখার চেষ্টা করতাম এবং সেই সময়েই আমি প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি দেখি। World Classics-এর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকতেই হয়ত দেশী স্রষ্টাদের প্রতি শ্রদ্ধা একটু বেশীই ছিল। (নেপথ্যে বলে রাখি আজ ভারতবর্ষে বাস করে World Classics-এর সঙ্গে যতটা পরিচয় থাকা সম্ভব তা আমার আছে।) আজ যে সে শ্রদ্ধার খবে একটা হ্রাস হয়েছে একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। অনেকের মতে শ্রীবড়ুয়ার শ্রেষ্ঠ ছবি 'অধিকার'। আমার দুর্ভাগ্য সে ছবি আমি দেখিনি। 'মুক্তি', 'দেবদাস', 'উত্তরায়ণ', 'রজত জয়ন্তী', 'জিন্দগী' এই জাতীয় মাত্র কয়েকটি ছবি দেখেছি। তাও উনিশশো পঞ্চাশের শুরুতে। এই ছবিগুলির সবকয়টাই যে অসাধারণ মনে হয়েছে সে কথা বলব না। কারণ প্রকাশ্যে আমি একটা কথা স্বীকার করতে চাই, সেটা হচ্ছে আগামী যুগের দর্শক হয়ে বার্গম্যানের ছবি দেখতে যতটা অসুবিধা না হয় তার চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধা হয় বিগত যুগের দর্শক হয়ে ফ্রিৎস ল্যাঙের "ব্লু এ্যাঞ্জেল" appreciate করতে। আমার ধারণা শিল্প এবং শিল্পীর আসল স্রষ্টা পরিবেশ। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে 'ইবসেন' 'ডলস্ হাউস', 'এনিমি অব দী পীপল' লিখেছিলেন তাঁর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। আর আজ সেই সব নাটক সমাদৃত হচ্ছে আমাদের দেশে। বাংলা দেশে শরৎচন্দ্র আজ সেকেলে লেখক—কিন্তু গুজরাতে শরৎবাবু আজ সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় লেখক। এ যুগের সাধারণ পাঠকের হয়ত সময়ই নেই শরৎবাবুর বই পড়বার—কিন্তু যাঁরা বাংলা সাহিত্যের কোনো ছাত্র শরৎবাবুর দানকে অস্বীকার করেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের।

অগ্রজদের অনেকের কাছে আমি শ্রীবড়ুয়ার চিত্রনির্মাণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনেছি। তার সঙ্গে ওঁর যে কয়েকটি ছবি দেখেছি তাতে আমার ধারণা যে, আমাদের দেশে প্রমথেশই প্রথম ব্যক্তি যিনি ক্যামেরার ব্যক্তিত্ব বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সেদিনের মত আজও সিনেমা সাহিত্য—আশ্রিত। আজো আমরা (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই) সাহিত্যকে অনুবাদ করার চেষ্টা করছি রূপালী পর্দায়। প্রমথেশও করেছেন। আমরা করছি এ যুগের সাহিত্য, প্রমথেশ [illegible] 'never tried to capture reality—he tried to [illegible]' এবং যে reality উনি create করার চেষ্টা করেছেন ওঁর ছবিগুলিতে। সেগুলি নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েও ওঁর নিজস্ব। সেগুলি ভাল লাগা না লাগা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেগুলিকে আজকের চোখ এবং মন দিয়ে বিচার করতে বসে একজন সেনসেটিভ শিল্পীর প্রতি অবিচার আমি করব না।

প্রমথেশের ছবির realityও যেমন তাঁর creation, ওঁর অভিনয়ও সেই অনুযায়ী একটি style। শুনেছি প্রমথেশের অভিনয়ের স্টাইল একবার সারা দেশে ফ্যাশানে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রমথেশ হয়তো এই success-এর victimও হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই জন্যেই সম্ভবতঃ প্রমথেশ যেভাবে যুগোত্তীর্ণ হতে পারতেন—তা হন নি। তবু—। প্রমথেশ প্রসঙ্গে অনেক 'তবু' রয়ে গেছে।

অনেকে বলছেন, প্রমথেশ is the last word—আবার কেউ কেউ বলছেন প্রমথেশ একটা হুজুক। আপনারা বলছেন, তাই আবার নতুন করে প্রমথেশের মূল্যায়ন হচ্ছে: প্রসঙ্গতঃ অনেক তর্কবিতর্ক। এতে আমি তো আনন্দিতই হচ্ছি। কারণ যার মূল্য নেই তার আবার মূল্যায়ণ কিসের—! 'যে' নেই 'সে' যে নেই একথা প্রমাণ করার দরকারটা কোথায় তাও বুঝি না। প্রমথেশ ছিলেন—প্রমথেশ আছেন এবং প্রমথেশ থাকবেন। প্রশ্ন কেবল কার চোখে, কীভাবে। ওটা তো একান্তই ব্যক্তিগত।

বাসু ভট্টাচার্য বোম্বাই—৫০।

অরণ্যদেব

লী ফক

রাজা আস্তে আস্তে হামা দিতে শিখল। তারপর একদিন ....
তা-তা-তা-

তা-তা-তা-
!

!

অরণ্যদেবের আজ আনন্দের সীমা নেই ...
সাবাশ রাজা!

দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল ... এই ক' বছরে অরণ্যদেব কখনও হিংস্র গোরিলার মুখোমুখি হয়েছেন .....

কখনও শায়েস্তা করেছেন ... কখনও মাকড়শার জালের চক্রান্ত ভেঙেছেন!
পোড়াও!
মারো!

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন রাজাকে .....
কেমন দৌড়াচ্ছি আমি?
ঠিক হরিণের মত!

মেরেছেন মানুষখেকো বাঘ ...

... কিংবা শায়েস্তা করবার জন্য জাদুঘোড়ায় চড়বার জ্ঞান করেছেন।

রাজা ওদিকে একটু একটু করে বড় হচ্ছে .....
6/19

রাজা এখন দামাল ছেলে ...
দাঁড়াও রাজা!
তাড়াতাড়ি এসো টমটম!
ক্রমশ ৬

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বেশ কিছুদিন আগে তথাকথিত অশোভন আচরণের অজুহাতে প্রেসিডেন্সি কলেজসহ অন্যান্য দু'-একটি কলেজ থেকে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর বহিষ্কার আদেশকে কেন্দ্র করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বিক্ষোভ ও পিকেটিং চলতে থাকে। বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীগণকে পুনর্গ্রহণের দাবিতে বিভিন্ন ছাত্র-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পিকেটিং-এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র-সংস্থা ও শিক্ষাবিভাগ এই উভয় তরফের অনমনীয় মনোভাবের দরুন শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দারুন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে চলেছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তবে দীর্ঘদিন পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ উক্ত কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ২৩ নবেম্বর সাক্ষাৎ করেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন। ছাত্র-সংস্থার নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ : ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে অচলাবস্থা সমাধানের যে কোন প্রস্তাব বিবেচনা করতে তাঁরা রাজি, তবে তাঁদের দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং তার তীব্রতার জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়। শনিবার সিণ্ডিকেটের সভায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা অসম্ভব করে তোলা হলে সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।

দেশী সংবাদ—

২১ **নবেম্বর**—আজ মাহিড়ী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও পুনর্বাসন দফতরের সচিব শ্রী ভি [illegible] বলেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে সময়মত প্রকল্প পেশ করেন নি।

ভারতের পাঁচটি রাজ্যে পাঁচটি বীজখামার স্থাপনের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া খামার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ভারতকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দান করতে সম্মত হয়েছেন।

২২ **নবেম্বর**—সরকারী বাস চলাচলে অনিয়মের বিরুদ্ধে আজ যাত্রী বিক্ষোভ কাশীপুর থেকে সিঁথিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের জন্য এদিন সকাল সাড়ে নটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত সাড়ে চার ঘণ্টা কাশীপুর রোড ও বি টি রোডে বাস, ট্রাম নয়, সমস্ত যানবাহন অচল হয়ে যায়। [illegible] কয়েক হাজার যাত্রী এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে লোকসান হচ্ছে। এমন কি দুর্গাপুর প্রজেক্টস বা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিও তৃতীয় পাঁচসালা যোজনাকালের মধ্যে সরকারী তহবিলে তাঁদের দেয় টাকার বেশির ভাগই দিতে পারেন নি।

২৩ **নবেম্বর**—ভারতীয় বস্ত্র-কল মালিক সংঘ আজ দেশের সমস্ত কাপড়ের কল তুলোর অভাবে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের ২ জানুয়ারী পর্যন্ত ১৫ দিনের জন্য বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ সময় থেকে যে সব কলে ১২ হাজারের অধিক মাকু চালু আছে তার ৬ ভাগ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সংঘ জনসাধারণকে এইমর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, কাপড় ও সুতোর সরবরাহের যে অবস্থা তাতে কলগুলির বন্ধের ফলে ক্রেতাদের কোন অসুবিধা হবে না।

২৪ **নবেম্বর**—আজ লোকসভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব তোলার জন্য বিরোধীদের একাংশের জোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ধরনের প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হতে গেলে অন্ততঃ ৫০ জনের সমর্থন থাকা দরকার। আজকের প্রস্তাবটির সপক্ষে ২২ জনের বেশী সমর্থক মেলে না।

২৫ **নবেম্বর**—প্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) বিলটি ১৯৬৬, আজ লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। নতুন বিধানে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিরা আর নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন না। মজুতবিরোধী আইন, মুনাফা নিরোধ আইন অথবা খাদ্য ও ভেষজ ভেজাল নিরোধ আইনে কমপক্ষে ৬ মাস জেল খাটলেই সে ব্যক্তি লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

কোশী বাঁধের কাজের ব্যাপারে ন্যাশনাল প্রজেক্টস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনকে বেশী টাকা দেওয়ার ও একই খাতে দু'বার টাকা দেওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

২৬ **নবেম্বর**—পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা আজ নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ভাষা সমিতির প্রথম বৈঠকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন, ইংরেজীর বদলে হিন্দীকে যদি ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হতে হয় তবে, তাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হতে হবে। তবেই অহিন্দীভাষী লোকেরা হিন্দীকে গ্রহণ করবেন।

কমার্শিয়াল অডিটের ডিরেক্টর জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাজকর্ম সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তাতে নাকি এই সরকারী শিল্পোদ্যোগটির কাণ্ডকারখানা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে পরিচালনা ও অর্থনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত গলদ-গাফিলতির ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যার ফলে কয়েক বছরে কয়েক কোটি টাকা জলে গেছে।

২৭ **নবেম্বর**—কলকাতায় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা সদর দফতর সহ আরও কয়েকটি আঞ্চলিক অফিসে বহু বিজ্ঞানী প্রকৃত কাজের পরিবর্তে শুধু ফাইলপত্র নাড়াচাড়া করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভারতে ভূবিজ্ঞানীর সংখ্যা যখন খুবই কম, তখন এঁদের কর্মশৈথিল্য সংশ্লিষ্ট মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

বিদেশী সংবাদ

২১ **নবেম্বর**—আজ ওয়াশিংটন পোস্ট-এর সংবাদে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জনসনের আদেশের ফলে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া খাদ্য সাহায্য ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এ সম্পর্কে শীঘ্র অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা নেই বলে হোয়াইট হাউস নাকি ভারতকে জানিয়ে দিয়েছেন।

২২ **নবেম্বর**—কমিউনিস্ট চীনের [illegible] বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বহু প্রতিনিধি আজ সাধারণ পরিষদে কমিউনিস্ট চীনের রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশের দাবি জানান এবং যুক্তরাষ্ট্র যথারীতি তার বিরোধিতা করে।

২৩ **নবেম্বর**—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আমেরিকান সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক ভিয়েতনাম যুদ্ধের সংবাদদাতা হয়ে ভিয়েতনাম যাচ্ছেন। সাধারণভাবে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদ সরবরাহ করবেন। লং-আইল্যাণ্ডের একখানা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করলেও অন্যান্য সংবাদপত্রে তাঁর বার্তা প্রকাশিত হবে।

২৪ **নবেম্বর**—মার্কিন ওয়াকিবহাল মহলের মতে : ভারত থেকে সেখানকার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব খবর আসছে সেগুলি নির্ভরযোগ্য [illegible] এবং যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হচ্ছে তাও [illegible] বহুলাংশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সাধারণত এই কারণেই প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতের সমস্যাবলী, ভারতে গিয়ে যাচাই করে দেখার জন্য দুজনের এক প্রতিনিধিদল ভারতে পাঠিয়েছেন।

২৫ **নবেম্বর**—চীনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিপীড়ন কক্ষ এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ ঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে পিকিং থেকে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস গতকাল খবর দিয়েছেন। আটক ব্যক্তিদের নিপীড়ন-যন্ত্রের সাহায্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

২৬ **নবেম্বর**—রাজা হোসেন ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পর আজ জেরুজালেমে কারফিউ বলবৎ করা হয় এবং সারাদিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। গতকাল জর্ডানের সৈন্যদের গুলিবর্ষণে এক প্যালেস্টাইন যুবক নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। জর্ডান মন্ত্রিসভার দুইজন ছাড়া অন্য সকল মন্ত্রী পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

২৭ **নবেম্বর**—ভিয়েতনামে আমেরিকার যে ভূমিকা, মনে হয়, থাইল্যাণ্ডেও তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে গেরিলা কার্যকলাপের মোকাবিলায় থাই সরকারের এতদিনের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর মার্কিন প্রচেষ্টা আরও জোরালোভাবে শুরু হওয়াতেই তার আভাস মিলছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীসুধীর খাস্তগীর

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

০ সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ০

বিমল মিত্রের

উ প ন্যা স

চলো কলকাতা

বহুদিন আগে কালীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। সেখানে কাপালিকরা কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিত। পরে দেবীকে তারা কালীঘাটে স্থানান্তরিত করে। এখন আর সেই পাথুরিয়াঘাটা সেই কালীঘাট সেরকম নেই সে কলকাতাও এখন আর সে কলকাতা নেই।

কিন্তু না, আছে। সেই কলকাতাও আছে, আর আছে সেই কাপালিকরাও। এখন আর কাপালিকদের গেরুয়া বসন নেই — এখন তাদের অন্য পোশাক, অন্য আকৃতি। এখন তারা নরবলি দেয়। "চলো কলকাতা" সেই নরবলির রক্তাক্ত কাহিনী।

দাম ৫·০০

বুদ্ধদেব বসুর

না টক

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" একটি চার অঙ্কের নাট্যকাব্য। এক অপাপবিদ্ধ তরুণ ঋষিকুমার এবং স্বর্ণপ্রতিমা পরম কলাবতী এক বারাঙ্গনার পুরাণোক্ত একটি প্রণয়-কাহিনীকে স্বনামধন্য কবি বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে এক অসামান্য শিল্পরূপ দান করেছেন; সঞ্চার করেছেন এতে আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।

কিছুদিন আগে এ নাটকটি "দেশ" পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় পাঠকমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। এখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

দাম ৩·০০

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনবদ্য অবদান

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

বাংলা দেশের তেত্রিশটি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

উ প ন্যা স

আত্মপ্রকাশ

তরুণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম মৌল উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ"-এ অদ্ভুত নৈপুণ্য এবং অনুপম আন্তরিকতায় সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহায়তা, নৈঃসঙ্গ্য, সুস্থ আত্মপ্রকাশের আকুল আর্তি প্রতিচিত্রিত করেছেন। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, দুঃসাহসিকতায় অগ্রণী যৌবন কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মহৎ আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে করতে ছুটে চলেছে আত্মঘাতের পথে, দেখে পাঠক শিউরে উঠবেন।

দাম ৬·০০

সুশীল রায়ের

উ প ন্যা স

অদ্বিতীয়া

"অদ্বিতীয়া" সুশীল রায়ের সব-নতুন উপন্যাস। অদ্ভুত এর কাহিনী; আশ্চর্য এর বয়ন-নৈপুণ্য। উপন্যাস রচনার যাবতীয় প্রচলিত ও স্বীকৃত রীতিনীতি এতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; অথচ এর কাহিনী, উপস্থাপন-পদ্ধতি, রচনা-ভঙ্গি, পরিবেশন-বৈশিষ্ট্য—সব মিলিয়ে পাঠকের মনে এমন একটা গভীর ছাপ এঁকে যায়, যা একমাত্র কোনও মহৎ সাহিত্যই পারে। নতুনের অভ্যর্থনায় যাঁরা আগ্রহোন্মুখ, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যাঁদের সন্ধানী সত্তা সদা-উদ্গ্রীব, "অদ্বিতীয়া" তাঁদের দ্বারা অভিনন্দিত হবে।

দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

হায় কলকাতা!

কলকাতার সমস্যাকে ইদানীং রাজ্যের সমস্যা বলে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার প্রবল ও প্রচেষ্টা দিল্লির কর্তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তার জন্যে ছল চাতুরিরও অভাব নেই, পূর্বেও ছিল না। সবচেয়ে যেটা বড় অজুহাত সেটা হল টাকা, গৌরী সেনের ভাণ্ডার হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নেই, কিন্তু যা আছে তাতে কলকাতার বরাতে কিছু খয়রাতি আটকাত না ; তবু দুর্ভাগ্য আমাদের, কলকাতার ব্যাপারে যোজনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার অতীব কৃপণ। রাজ্য সরকার কলকাতার জন্যে যে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা পেশ করেছেন, এখন পর্যন্ত যোজনা কমিশনের ও কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে অনুমোদন পাওয়া যায় নি। শোনা যাচ্ছে, এই অনুমোদন পাওয়া যাবে না। অথচ রাজ্য সরকারের যে রকম আর্থিক অবস্থা তাতে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের জন্যে নিরানব্বই কোটি টাকার পরিকল্পনাকে রাজ্য সরকার তাঁদের চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেও ঢোকাতে পারেন না। কেননা, এই রাজ্যের পাঁচশো কুড়ি কোটি টাকার পরিকল্পনাকে এমনিতেই যথেষ্ট ছাঁটতে হবে, কেন্দ্র থেকে দুশো কোটি টাকার ওপর পাওয়া যাবে না। এর ওপর রাজ্য সরকার কি ভাবে কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে আলাদা নিরানব্বই কোটি টাকার দায় ঘাড়ে করতে পারেন? অগত্যা অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারটি শিকেয় তুলে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কলকাতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণ আমাদের জানা নেই। তবে বহুদিন থেকেই তাঁদের বিরূপতা এমন একটা দৃষ্টিকটু অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছে যে, সন্দেহ হয়—এর মধ্যে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা এবং দলপরবুদ্ধি রাজনীতির গন্ধ আছে। পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতন নয়, তার বেশ কিছু সমস্যা গত উনিশ বছর ধরে জটিলতর হয়ে উঠেছে—এই সাধারণ কথাটা কেন্দ্র বুঝেও বোঝেন না। সীমান্ত সমস্যা, উদ্বাস্তু ও জনসংখ্যার সমস্যা, কৃষি সমস্যা—এ-সব তো আছেই তার ওপর পথঘাট, কল-কারখানা, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও রয়েছে। সেই পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র হল কলকাতা, যা তার রাজ্যের বিবিধ সমস্যার এবং নিজের সমস্যা নিয়ে আজ প্রায় সামর্থ্যহীন। কেন্দ্র এইসব সমস্যাকে আন্তরিকভাবে দেখতে চান না, ফলে তার মৃতপ্রায় অবস্থাটি উপলব্ধি করতেও অক্ষম। বা, দেখে বুঝেও চোখ কান বন্ধ করে আছেন। স্বভাবতই আমরা মনে করতে পারি, কলকাতা সম্পর্কে তাঁদের অনাগ্রহ প্রবল।

কলকাতা গত উনিশ কুড়ি বছরে যে পরিমাণে হাত-পা ছড়াতে বাধ্য হয়েছে তাতে আজ শহর কলকাতা কেবলমাত্র গঙ্গা আর শিয়ালদার মাঝখানে আটকে নেই ; তার চার দিকের সীমানা বহুগুণে বেড়ে গেছে। একেই বলা হয় বৃহত্তর কলকাতা। বৃহত্তর কলকাতায় জনবসতি স্ফীত হয়ে উঠেছে। শহর কলকাতায় পথঘাট, পয়ঃ-প্রণালী, জলের ব্যবস্থা যা ছিল তা সেকালের পক্ষে যথেষ্ট হলেও একালের পক্ষে স্বল্প ; তার সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতার পথঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য রক্ষা, বাসগৃহ ইত্যাদির সমস্যা জড়িত হয়েছে। এই সব সমস্যা জরুরী ভাত কাপড়ের মতন গুরুত্বপূর্ণ ; কাজেই কোনো যুক্তিতেই সেদিকে চোখ বুজে থাকা যায় না।

কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতা নিছক বাঙালীরও নয়। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ রুজি-রোজগারের জন্যে বসবাস করে এবং উপার্জনের টাকা নিজ গৃহে মাসে মাসে পাঠায়। তাদের বাসগৃহ, পানীয় জল ইত্যাদি কে যোগায়? তাদের আবর্জনা পরিষ্কারের জন্যে পৌর কর কারা দেয়? তাদের আসা যাওয়ার জন্যে পরিবহণ ব্যবস্থার দায় কি শুধু রাজ্য সরকারের? তবে কেন কলকাতার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেল-দপ্তরের কর্তারা নীরব। বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজের ক্ষেত্রে রেল দপ্তর তৎপর বলে শুনি, কলকাতার ব্যাপারে কেন নয়?

শ্রীঅশোক মেহতা একবার যেন বলেছিলেন, কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারটা কলকাতার নাগরিকদের দায়িত্ব। সম্ভবত তিনি কলকাতার বড়বাজার এলাকা দেখেন নি : দেখলে বুঝতে পারতেন—যাঁরা কলকাতার শাঁস শুষছেন তাঁরা এই মহানগরীর প্রতি যে দৃষ্টিতে তাকান সেটা নাগরিকের দৃষ্টি নয়। বস্তুত কলকাতা শহরকে খুব কম অবাঙালীই আপন মনে করেন। স্বার্থের সম্পর্কে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ যতটা তাঁদের আপন হতে পারে তার বেশি কিছু নয়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির যতটা সহানুভূতি আমাদের কেন্দ্রের তার বিন্দুমাত্র নেই।

গুলিতে নয়, দেশরক্ষা বিভাগেও চালিয়েছেন। এই দেশদ্রোহিতার ফলে লাভবান যারা হয়েছে তারা যে কেবল সরকার মনোনীত ব্যবসায়ী স্টকিস্ট-ফার্ম নয়, এ কথা অতি নির্বোধও বোঝে। এ কর্ম যদি অজ্ঞানতাপ্রসূত হত তা হলে কাগজপত্র উধাও হয়ে যেত না। কাগজপত্র সরানোর কাজ কারা করেছে তাদের সনাক্ত পাবলিক আকাউন্ট্‌স্‌ কমিটি পর্যন্ত করতে পারেন নি।

সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যকর প্রশ্ন হচ্ছে—পাবলিক আকাউন্ট্‌স্‌ কমিটির চোখে না পড়া পর্যন্ত এইরকম সাংঘাতিক ব্যাপারটা নিয়ে কোনো টুঁ শব্দ শোনা গেল না। স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন এবং ডিরেক্টর-জেনরেল অব সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিস্‌-পোজ্যাল্‌স যে মন্ত্রণালয়ের অধীন সেই মন্ত্রালয়ের ভিতর এইরকম ব্যাপার নিয়ে অনেক আগেই একটা তোলপাড় হয় নি কেন? দেশরক্ষার কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কাজের জন্যে খারাপ টায়ার যে সরকারী প্রতিষ্ঠান জেনে শুনে চালিয়ে দিতে পারে সে প্রতিষ্ঠানের গায়ে এতদিন পর্যন্ত একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। দেশরক্ষার কাজের জন্যে কেবল তো টায়ারই বিদেশ থেকে কেনা হয়নি, অস্ত্রশস্ত্রও কেনা হয়। তার ভার অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর থাকতে পারে কিন্তু একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যদি এইরকম দুষ্কর্ম হতে পারে তবে অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির উপর মানুষের আস্থা কেমন করে অটুট থাকবে? একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো একসময়ে দুষ্টু লোক থাকা অসম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অবলীলাক্রমে দুষ্টু লোকের চক্রান্ত চলবে এবং সেই চক্রান্ত ধরা পড়ার পরেও তা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই—এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস্য নয় যে, ব্যাপারটা

> অনিবার্য কারণে এ-সপ্তাহে 'পঞ্চতন্ত্র' প্রকাশ করা সম্ভব হল না
>
> —সম্পাদক

পাবলিক আকাউন্ট্‌স্‌ কমিটির চোখে ধরা পড়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী এর আগে সেটা টের পান নি। এর অনেক আগেই তাঁর অনেক কিছু করা উচিত ছিল। যেখানে আগাপাশতলা "ধোলাই" দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে ধামাচাপা দেওয়ার পথ নেওয়া হয়েছে। হায়, ডি-আই-আর! হায় সি-বি-আই!

আসলে অন্য অনেক দেশে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের ফল যা হয়েছে, ভারতবর্ষেও তাই হয়েছে। পরিকল্পনার নামে বিদেশী সাহায্য এই একটা লুটের কারবারের আস্তানা হয়েছে। কত রকমের দালালি, কত রকমের ভেস্টেড্‌ ইন্টারেস্ট্‌ যে এর ফাঁকে ফাঁকে এবং চার পাশে গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই অবস্থার রাজনৈতিক দিকটা যেমন বিপজ্জনক, অর্থনৈতিক দিকটা তেমনি ন্যক্কারজনক।

পার্লামেণ্টে এবং খবরের কাগজে সমালোচনা করে এই অবস্থার কোনো স্থায়ী সংশোধন সম্ভব—এরূপ আশা করা নিরর্থক। নর্দমার নিচে অনবরত ঝাঁট দিতে থাকলেও কোনো লাভ হয় না। আসল কথা হচ্ছে, দেখতে হবে ময়লা কোত্থেকে আসছে। ময়লা আসছে আমাদের পরনির্ভরতা থেকে। আত্মনির্ভর হতে হবে—মুখে এই বুলি আওড়াবো, আর কাজ হবে কী করে বিদেশী সাহায্য পাওয়া তার চেষ্টা—এই যতদিন চলবে ততদিন এই নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই। বিদেশী সাহায্য ছাড়া যেমন করে পারি আমরা বাঁচব এটা ভবিষ্যতের লক্ষ্য নয়, এটাকে আজকের প্রোগ্রামরূপে গ্রহণ করবার সাহস এবং উদ্যম চাই। খালি সরকারী কাজের ভুল দেখিয়ে কী হবে? ডাইনে বাঁয়ে সরকারের কোনো সমালোচকের তো এ কথা বলার হিম্মত দেখি না যে, বিদেশী সাহায্য চাই না! যতদিন না পর্যন্ত সে হিম্মত হবে ততদিন পর্যন্ত কোনো সমালোচনাতেই কোনো মৌলিক সংশোধন হবার আশা নেই।

২-১২-৬৬

সুনন্দর জার্নাল

কুড়ুলরাম রচিত, ঢেঁকিরাম বিচিত্রিত'—যতদূর মনে পড়ছে, এইভাবেই প্রথমে দুজনের দুরন্ত আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে। তারপর 'কুড়ুলরাম' হলেন অদ্বিতীয় 'পরশুরাম', 'নারদ' তখনো রইলেন যথাস্থানে। তারও পরে 'নারদ' আর

মরবেই তো, এই বুড়ি পেত্নীর দিকে নজর দিয়েছিল যে।

রইলেন না—স্বনামেই আত্মপ্রকাশ করলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

আমাদের ছেড়ে পরশুরাম আগেই চলে গেছেন। আজকের কাগজ যতীন্দ্রকুমারের মৃত্যুর সংবাদ বয়ে আনল। যাঁরা পরলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলবেন দুই 'অত্যাগসহনো বন্ধু'র পুনর্মিলন ঘটল।

আবাল্য বন্ধুত্ব বোধ-প্রতিভায় বিকশিত হয়েছিল 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র কর্মশালায়। গম্ভীরবেদী বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন 'বিজ্ঞাপনের কাপি লিখিতে গিয়া দেখি কখন তাহা' সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

সূচনা আগে থেকেই ছিল। আমাদের অস্পষ্ট ছেলেবেলায় 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র 'সিরাপে'র সেই আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আজো মনে পড়ে—সেই সঙ্গে চিড়িয়াখানার ছবিটি। ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত শরীরে 'পাইরেক্সে'র সম্পর্কে স্বভাবতই কোনো আকর্ষণ ছিল না—কিন্তু সেই ঢোলক-ধারীর অপূর্ব পোস্টার এবং 'আর জ্বর হয় না'—এই অভয় ঘোষণাতে মন তখনো পুলকিত হয়ে উঠত। বিজ্ঞাপনকে একাধারে কিভাবে শিল্প ও সাহিত্য করে তোলা যায় যতীন্দ্রকুমার-রাজশেখরের যুগল-প্রতিভা বাংলা দেশকে প্রথম তার পথ দেখিয়েছিল।

পরশুরামের সেই প্রবল সাহিত্য-প্রবেশ কি এমন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত—যদি তার সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ছবি তাকে সাজিয়ে না দিত? 'গড্ডলিকা-কজ্জলী-হনুমানের স্বপ্ন' কি এমনভাবে বাঙালীর প্রাণমন কেড়ে নিত—যদি না 'বাগর্থ-সম্পৃক্তি'র মতো পরশুরামের গল্পে রেখায় লেখায় সেই অপরূপ দ্বৈততান বেজে উঠত?

নিবিড়তম সৌহার্দ্যে দুটি মানুষ পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে চিনেছিলেন—দুজনের চিন্তায় কল্পনায় গড়ে উঠেছিল অনন্য সহযোগ। রাজশেখরের প্রতিটি চরিত্রকে রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলতেন যতীন্দ্রকুমার; আমরা যেন একটির পর একটি চলচ্চিত্র দেখে গেছি—যার কাহিনী এবং সংলাপকার রাজশেখর—ক্যামেরাম্যান যতীন্দ্রকুমার।

পরশুরামের গল্পগুলোকে চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল ছবিরা—গণ্ডেরীরাম বাটপেরিয়া, রায়-বাহাদুর তিনকড়ি, ছাগল, 'লম্বকর্ণ', ভুষণ্ডীর মাঠের কারিয়া পিরেত, শিবু, জিভ-কাটা লজ্জাবতী ডাকিনী, কবিরাজ তারিণী 'স্যান', হেকিম 'সুর্মা সুখ'! দেখা দিল 'কচি-সংসদের' নিখুঁত দলবল—ভ্রূকুটিকুটিল নকুড় মামা থেকে একেবারে নেপালী চাকর 'বোদা' পর্যন্ত। 'রে-রে-রে' রবে উপস্থিত হলেন বালখিল্যেরা, শতদ্রুর উপল-বন্ধুর তটে ঘৃতাচী যেন এই মুহূর্তে আমার সামনে দিয়ে এক পা নেচে গেলেন।

দুজনেই খতম। বেবসা আটকায় কে!

কাঁদি-পোতার গামছা খাটো করে পরা স্বয়ম্বরা এগিয়ে এসে বললেন 'ঘুৎ মনি'!' —"পাকা লংকার ফাঁক দিয়ে গুটি কয়েক কাঁচা ভুট্টার দানা" বেরিয়ে পড়ল। দেখতে পেলুম হনুমানের বজ্রমুঠিতে শূন্যে উড়তে উড়তে চলেছেন বানরীশ্রেষ্ঠা

হ্যাঁ বাবা, আমার কেচ্ছা ছাপিয়ে মজা দেখছিলে, এবার যাবে কোথায়!

চিলিম্পা—হাতের লীলা-কলমটি এখনো যথাস্থানে শোভা পাচ্ছে!

বাংলাদেশের সব লেখক, সমালোচক, পাঠক সেদিন সমস্বরে রাজশেখর আর যতীন্দ্রকুমারকে একযোগে প্রশংসা করেছিলেন। তার একমাত্র কারণ, পরশুরামের বইতে লেখা আর রেখা অচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল। যেমন সেই বিশেষ ছবিগুলো ছাড়া 'অ্যালিস ইন ওয়ন্ডারল্যান্ড'কে ভাবা যায় না, যেমন সেই দুর্লভ সংস্করণের ছবিগুলো ছাড়া 'ডন কুইক্সোট'-এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যই ফুটে ওঠে না, যেমন সুকুমার রায়ের ছবি বাদ দিয়ে 'বোম্বাগড়ের রাজা' কিংবা 'রামগড়ুরের ছানা'কে কল্পনা করাই অসম্ভব—তেমনি পরশুরামের এক-রাশ সেরা গল্প যতীন্দ্রকুমারের রেখা ছাড়া তাদের অর্ধেক সৌন্দর্যই হারিয়ে ফেলে।

এই কারণেই পরশুরামের শেষের দিকের বেশির ভাগ বই আমার কাছে যেন অনেকখানি শ্রীহীন মনে হয়েছে। সেই ফিল্মের উপমাটাই মনে এল—যেন স্ক্রীপ্টে শুনেছি, ছবি দেখিনি। যতীন্দ্রকুমারের সহযোগ থাকলে 'ধুস্তুরী মায়া', 'নীল তারা', 'রটন্তীকুমার'—'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট'-এর মতো সেরা গল্পগুলো যেন আরো অনেক বেশি প্রাণ পেয়ে উঠত।

পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়া সীরিয়াস গল্প-উপন্যাসে ছবি দেওয়ার রেওয়াজ এখন আর নেই, এমনকি উডহাউসের অধিকাংশ কাহিনীই অনলঙ্কৃত, স্টিফেন লিকক তো ছবির ধার দিয়েই যান নি। খুব সম্ভব ছবি দিয়ে পাঠকের কল্পনাকে লেখক সীমিত করতে চান না, তা ছাড়া শিল্পীর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বও হয়তো সম্পূর্ণ সাড়া দেয় না। আমাদের বাংলা সাহিত্যেই নিজের বইয়ের প্রচ্ছদপট দেখে লেখকের পুরোপুরি খুশি হতে পারার ঘটনা, খুব সম্ভব 'কোটিকে গুটিক।'

আর পাঠকমনও কি নির্বিচারেই যে-কোনো 'ইলাসট্রেশান'কে মেনে নিতে পারে? আমি অনেক সময় অনুভব করেছি বড়ো লেখকের রচনার সঙ্গে বড়ো শিল্পীর ছবি যেন প্রায়শ বেসুরো হয়ে ওঠে—দুটো প্রবল ব্যক্তিত্ব কেউ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তার ফলে আশ্চর্য লেখার সঙ্গে আশ্চর্য ছবিকে আলাদাভাবে আস্বাদ করতে হয়, অদ্বৈত-সিদ্ধিটি ঘটে না। আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ের 'মেন উইদাউট উইমেন' বইটির প্রথম মুদ্রণে যে চমৎকার স্কেচগুলো ছিল, বইটি পড়বার সময় তারা যে আমাকে খুব বেশি সাহায্য করেনি—বহুদিন পরেও সে-কথা আমার মনে পড়ছে। হয়তো এই উদাহরণ ব্যতিক্রম, কিন্তু এর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা সাধারণ সত্য আছে।

ব্যক্তিত্বের এই ব্যবধান যত বাড়বে, লেখক এবং শিল্পীর মধ্যেও সেইভাবেই পার্থক্য বেড়ে যেতে থাকবে। এমনকি, অ্যাবস্ট্রাকশান দিয়েও দুই মনের গভীরতার সন্ধি ঘটবে না। সাহুর-রেয়ালিজমের পথেও কি তা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছিল?

রাজশেখর এবং যতীন্দ্রকুমার যে-যুগে মিলেছিলেন, সেকালে ব্যক্তি প্রবণতার চাইতেও সামাজিক মননের সমভূমি তের বেশি প্রসারিত ছিল; বাংলা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের চেতনা তখনো আজকের মতো এক একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গে অধিকার করেনি। তাই তাঁদের লেখায় রেখায় এমন মণি-কাঞ্চনযোগ ঘটেছিল, দুই একজন অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

আজ যতীন্দ্রকুমারের মৃত্যু এমন একটা কালের ওপর সমাপ্তি টানল—যে-কাল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

অন্বেষণ

আলোক সরকার

অন্বেষণ অন্ধকারে নয়। আলোর ভিতরে
অন্বেষণ চাই। জাগ্রত দুপুরবেলা
নিবিড় অশথগাছ প্রশ্নাতুর, স্থির সান্দ্র স্বরে
জ্যোৎস্নার ভিতরে নদী উন্মুখর — আমি সেই মতো
এবার জেগেছি। দীর্ঘকাল শৈশবের খেলা
তামসী নিস্তব্ধ ধ্যানে স্থলপদ্ম, রক্তিম বিকচ
গোলাপ এখনো কাঁপে [illegible]
সম্মোহন [illegible] নির্দেশ। [illegible] নির্দেশের
বাসনা ভুলেছি, তাতে প্রবীণ সক্ষম দুই চোখে
প্রতিটি কণার [illegible] বিশ্লেষণ করি [illegible] সুদূর
তার অন্বেষণে চাই নির্বাচন সক্ষম আলোকে।

এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন

নবনীতা সেন

প্রিয়জনদের জন্য আমি আর দেখতে পারি না।

আমি চোখ মেলে মেলে দেখতে পারি না
এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন গলে যায়
চোখের পুকুর ঘিরে পানা ছেয়ে আসে,
প্রিয় ভ্রূর রেখাগুলি ডানা গুটিয়ে মরে-যাওয়া
পাখির মতন মুখ থুবড়ে পড়ে, এত প্রিয় ওষ্ঠাধর
ঝড়ে ঝরে যাওয়া অপক্ব ফলের মতো ধুলোয়
শুকোয়, সব কীভাবে শুকোয়, সব কীভাবে এখন
ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায় কুচি কুচি কাগজের মতো
সব কীভাবে মিলায়।

কীভাবে হৃদয় ছাউনি গুটিয়ে ফেলে প্রস্তুতিতে
পথে নেমে আসে, হাত তুলে এইমাত্র ভাড়াগাড়ি
যে-কোনো থামাবে, হাত তুলে বিদায় জানিয়ে
চলে যাবে। কীভাবে এখন দেখি হৃদয় গুটোয়।
কীভাবে অন্তর সব ঝকঝকে বাসনগুলো
তাক থেকে নিয়ে ভীষণ ঝঙ্কার তুলে মেঝেয়
ছিটিয়ে ফেলে ভাঙে, কীভাবে এমন কড়া
রোদে সব শব্দ মিশে যায়, সব চিহ্ন
গলে যায়,
এই প্রিয় মুখগুলি মেঘের মতন
আকৃতি বদল ক'রে ভেসে চলে যায়
আমি চোখ মেলে ঘাস-জন্মে-যাওয়া এত
কাছের উঠোন
আর দেখতে পারি না।

প্রাসঙ্গিক

আশিস সান্যাল

যে যার নিজস্ব পথে চলে যাও। যে কোনও প্রান্তরে
নিভৃত সৌরভ ছুঁয়ে সাজাও আঙিনা।
তবু হে কৃতঘ্ন হাওয়া, কোনোদিন আর
সার্বিক ছলনা ভুলে শ্রাবণ-মেঘের মতো শ্রদ্ধের ক্ষমায়
তোমার প্রান্তরে এসে এ ঘর বাঁধবো না।

যে পথে চলেছি জানি, চতুর্দিকে তার
আগুনের সুতীব্র প্রবাহ। যে কোনও সময়
সামান্য স্তিমিত হলে ভয়ানক অভিশাপে সমস্ত বাসনা
পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সমস্ত সঞ্চয়
মুহূর্তে বিরল এক তুষারঝঞ্ঝায়
ছ' ফুট আঁধারে এসে থেমে যাবে। হয়তো তখন
'হা-হা' করে হেসে উঠবে বান্ধবপ্রতিম
তোমরা যে যার সুখে নিজস্ব বাসরে।

তবু আমি ফিরবো না। বন্ধু হে আমার
তোমরা যে যার নিজস্ব পথে চলে যাও। যে কোনও প্রান্তরে
প্রদীপ্ত সৌরভ ছুঁয়ে সাজাও আঙিনা।
তবু হে কৃতঘ্ন হাওয়া, কোনোদিন আর
তোমার ছায়ায় এসে এ ঘর বাঁধবো না॥

দৌড়। ঝাঁপ। লাথি। লাফ। স্লিপ্‌টাং। স্বাস্থ্যবান ছেলে-মেয়েদের সকল রকম ধকল সইবে এমন জুতো বাটা স্যানডাক্ কেমিলন—নতুন যুগের নতুন জুতো। আধুনিক নকশা আর চকমকি রঙদার—ছোটদের মন মাতাবে এমন জুতো স্যানডাক্। যেমন স্টাইল তেমন টেকসই। ফ্যাশান-মাফিক—তাই বলে ফ্যাশানসর্বস্ব নয়। আর, নিটোল ফিট্—দিনের পর দিন। এ-কথা ঠিক—এর চেয়ে মজবুত জুতো ছোটদের জন্য আর নেই। হাজার ব্যবহারেও আশ্চর্য অটুট এর গঠন। আর, যত ঝড়ই এর উপর দিয়ে যাকনা কেন, দেখতে থাকে চিরনতুন—যেন এখুনি কেনা। নতুন যুগের যন্ত্রবিজ্ঞানেই এ সম্ভব, আর কেমিলন—অপূর্ব এক রাসায়নিক মিশ্রণ, বহু বছর গবেষণার ফল।

আর, ধুলো-ময়লা-কাদা—স্যানডাক্ উপহাসে উপেক্ষা করে! মায়েদের কাছে এ সানন্দ সংবাদ। কলের জলের নিচেই হোক, বা ভেজা কাপড়ের এক ঝাপটায় ধুলো-কাদা যত ময়লা—ম্যাজিকের মতো—নিমেষে উধাও।

নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনার ছেলেমেয়েদের চমৎকার মানাবে। আজই নিয়ে আসুন বাটার দোকানে।

ছেলেমেয়েদের জন্য Bata

* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কস। বাটা-অনুমোদিত-বিধি মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত

পায়রা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত শরীর যেন অকারণে শিউরে-শিউরে ওঠে। মাটি থেকে রস নিঙড়ে নেবার সময় ফুল, কিংবা দেবদারু গাছের কচি পাতা কি এই রকম শিউরোয়? কে বলবে মিহিরকে।

তার মধ্যে নানা রূপ জ্বালাতন করে মারছে। মনে হয় অনেক কথা বলার আছে। অনেক কথা শোনার আছে। কিন্তু কথাগুলো কী—সে ঠাহর করতে পারে না। কার কাছে যে শোনবার মতো কথা রয়েছে তাকে জানে না সে।

বিদেশে-বিদেশে মানুষ। হঠাৎ কলকাতায় এসে যেন সব খেই হারিয়ে গেছে।

অমল এসে বড়-বড় নোংরা নখ দিয়ে নিজের বগল আর কুঁচকি চুলকে বললো 'মাইরি! এমনো দাদ—শালাদের ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।' তারপর মিহিরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুই তো একেবারে একা। কিছু একটা পোষ—পায়রা পুষবি?'

কী রকম যেন সব জট পাকিয়ে গেছে মিহিরের মনে। বাংলা ভাষা বাড়িতে অল্পস্বল্প বলতো। বাবা তাকে কেবল

বলতেন বাঙালীর ছেলে হয়ে বাংলা বলতে না জানা লজ্জার কথা। পড়তে না পারা আরো লজ্জার। রবি ঠাকুরের বই পড়তে বলতেন। বঙ্কিমবাবুর বই পড়তে বলতেন। কিনেও দিয়েছেন অনেক বই। শুধু শরৎ চাটুজ্জের বই ছাড়া। তাঁর বই নাকি বিষ। পড়লে আর রক্ষে নেই।

তাই কপালকুণ্ডলা, তাই গীতাঞ্জলি পড়া মিহিরের কাছে অমলের কথাগুলো ঠিক যেন বাংলা বলে মনে হয় না। কথাগুলো শুনতে অবাক লাগে, লজ্জা লাগে—তবু লজ্জা চিবিয়ে চোখে জল আসলেও আবার চিবুবার মতো শোনবার ইচ্ছেটাকে চাপতে পারে না।

'পায়রা পুষবি?—এঃ—শালার দাদ!' বলে আবার ঘ্যাসঘেঁস করে কুঁচকি চুলকোতে লাগলো অমল।

'পুষবো,' বললো মিহির।

'চল তা হলে মিত্তিরদের বাড়ি। শালাদের অনেক পায়রা আছে। লোটকোন-কোটকোন —আকাশে ডিগবাজি খায়—আর মিত্তিরদের বউটাও—ইঃ, শালার দাদ—'

অমলের সব কথা ভালো করে বুঝতে পারে না মিহির। তবে আকাশে ডিগবাজি কথাটায় কেমন যেন একটা মজা আছে। মজাটা যে কী তাও সে জানে না। তবে নীল-নীল আকাশে পাখীদের মতো, শঙ্খ-চিলদের মতো উড়তে পারলে না জানি কী ভালোই লাগতো। চিলদের উড়তে দেখেছে। ডিগবাজি খেতে দেখেনি। অমল বলেছে চিলদের কথা ভালো সে জানে না। ভালো করে তাদের দেখা যায় না। ডিগবাজি খায় কিংবা খায় না তা চিলরাই জানে। তবে, হ্যাঁ—লোটকোন-কোটকোনের মতো পায়রা-দের আকাশে ডিগবাজি খেতে সে দেখেছে। আর দেখতে—এইসা মজা! বলে নিজের দাদ চুলকোতে-চুলকোতে নোংরা দাঁত বার করে হেসে বলেছে—'এইসা মজা! যেন শালার দাদ চুলকুনো!'

মিহির তক্তা থেকে উঠে দাঁড়াতে অমল বললো, 'ইস! পুষবো বললেই পোষা যায় নাকি! পায়রাগুলো তো তোর মতো ভেড়ুয়া নয়!—পায়রা পোষবার আগে চল —পায়রা মারা দেখ, শেখ।—দেখবি গুড়ুম, বন্দুকের শব্দ শুনে আবার ভিরমি খাসনি যেন! লটপট করতে-করতে গলির মধ্যে পায়রা পড়বে। ভালো গুলি লাগলে রক্ত-টক্ত দেখতেও পাবি না। হালিশহরের ছোটো কত্তা বলে গেছে আজ আসবে মদনাদের গলিতে পায়রা মারতে।—শালা মারবে ঠিকই। কিন্তু শুধু পায়রা মারার জন্যে নয়। মদনার বোনটাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে।—শালার বোনটা দারুণ মাল। হালিশহরের ছোটো কত্তা তাকে বাগাতে চায়। মেয়েটা দারুণ খেলোয়াড়। ছোটো কত্তাকে ঘেঁষতে দেয় না। খড়খড়ি ফাঁক করে ফিকফিক করে হাসে। চোখ-টোখ মটকায় আর—চল মদনাদের গলিটা হয়ে পায়রা মারা দেখে যাই।'

শেষ বৈশাখের বিকেল চারটে। দারুণ গরম। অজস্র ঘাম।—বাংলা দেশের এই ঘাম আর গালের উপরকার ব্রণগুলোর জ্বালাতন মিহিরকে যেন ভারি বোকা-বোকা করে তুলেছে। কার কাছে এইসব কথা —যার খেই নেই, যার শুরু নেই, যার শেষ নেই—বলা যায়! কলকাতায় ফিরে একমাত্র বন্ধু পেয়েছে অমলকে। তার সব কথা ভালো করে বুঝতেও পারে না।

সেই মদনাদের গলিতে এলো তারা। রক্ত-ঝার-করা রোদ সত্ত্বেও বেশ ভিড়। কেউ-কেউ উবু হয়ে বসে। বিড়ি ধরিয়ে বলছে, 'দে, ল্যাঠা চুকিয়ে।' উপরের কার্নিসে কতগুলো পায়রা উসখুস করছে। টুকটুকে পা। ছাই-ছাই রঙ। মিহির বুঝলো না হালিশহরের সেই বিখ্যাত পায়রা-শিকারী কে? জানলার খড়খড়ি খুলে মদনার সেই বোনটা যে কোন জানলার আড়ালে—তার হদিস পেলো না। মিহিরের গালের ব্রণগুলো চিড়চিড় করে ঝাল লংকা খাবার মতো একটা অদ্ভুত স্বাদ নিয়ে এলো। তারপর শুনলো ঘাঁস করে একটা গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ। তারপর ফুটবল মাঠের হুইসলের শব্দ। তারপর,

'এই হারামজাদা, শুয়োর, র‍্যাস্কেল—তফাৎ যা। হাম শিকারমে আয়া! পায়রা ভি পায়রা, আদমি ভি আদমি—তফাৎ যা, তফাৎ যা—'

মিহিরের বুকে দুরদুর করছে। 'তফাৎ যা' কথাটার মতো কথা যেন পড়েছে কোথায়। 'তফাৎ' এবং 'বুট'-এর সঙ্গে কোথায় যেন আগেকার-শোনা কথার প্রতিধ্বনি।

মিহির দেখলো ঝকঝকে নতুন গাড়ির বাঁ দিকের বনেট ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে গেছে। দেখলো সেই দুমড়ানো জায়গাগুলোয় মর্চে ধরেছে। দেখলো লাল পাৎলুন, কালো শার্ট, রঙীন গগলস-পরা একটা লোককে নড়বড় করে নামতে। কে যেন পাশ থেকে বললো, 'রাজপুত্তুর—!'

তারপর আর-একজন খেঁকুরে মতো লোক সেই রাজপুত্তুরের হাতে দো-নলা একটা বন্দুক এগিয়ে দিয়ে বললো, 'হুজুর—এই যে!'

'টোটা ঠিক আছে? বুলেট, না ছররা? ছররা দে।—একটা শুট করেই শালীকে বুঝিয়ে দেবো—'

উবু-হয়ে-বসে-থাকা বিড়ি-টানা কালো রোগা একটা লোক ফিসফিস করে বললো সকাল থেকেই মাল টেনে টং হয়ে রয়েছেন—'

কার্নিসের পায়রাগুলো ভয় পায়নি। হঠাৎ গুলির শব্দে পায়রাদের মতো মিহিরও হকচকিয়ে গিয়েছিলো। মিস্তির-দের সেই ছোটো গলিতে একটা পায়রা যেন ডিগবাজি খেয়েই পড়লো। অন্যগুলো উড়ে পালালো। জমিদার-সন্তান বললেন, দেখলি তো পণ্টা—একেবারে শিওর-শট। এই নে।'

খেঁকুরে মতো লোকটা দোনলা বন্দুক হাত বাড়িয়ে নিলো।

রাজপুত্তুর সিল্কের একটা লাল রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলো। তারপর গগলস্ খুলে উপর দিকে তাকালো। তারপর অন্য পকেট থেকে একটা হুইসল বার করে সশব্দে বাজালো।

একটা জানলার আধ-খোলা খড়খড়ি ধীরে-ধীরে বুজে গেলো।

রাজপুত্তুরের সেই বনেট-তোবড়ানো ঝকঝকে গাড়িটা সশব্দে চলে যাবার পরেও খানিকক্ষণ মিহির হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে-ছিলো। অমলের ঠেলা খেয়ে তার চমক ভাঙলো।

'কি রে! ভিরমি গেলি নাকি?—চ চ। এই গলিটা পেরুলেই মিস্তিরদের বাড়ি।' বলে মিহিরের হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে প্রায় টানতে-টানতেই অমল নিয়ে চললো।

'—মিস্তিরদের অনেক পায়রা। মিস্তির-বউকে কাল বলেছিলাম তোকে এক-জোড়া লক্কা পায়রা দেবার কথা। এক কথাতেই রাজী। হবে না? তাদের শামুদাকে তোর বাবার কাছে নিয়ে যাবে একটা চাকরি করে দেবার জন্যে। শামুদা পাস-ফাস কিছুই নয়। কোথাও চাকরি হয় না। ধারে বিড়ি ফুঁকে সমস্ত দিন ঘুরে বেড়ায়।—তার ওপর মিস্তির বউ-এর ভারি দরদ। বুঝলি না—' বলে কথাটা শেষ না করেই মিহিরের দিকে অদ্ভুত রকম চোখ মটকে হেসে ঘাসঘ্যাস করে কুঁচকির দাদ চুলকোতে লাগলো।

মিহির কিছুই বুঝলো না। বন্দুকের সেই শব্দে তার বুকের ভিতরটা তখনো তির্‌তির্ করছে।

মজলাসের গলিটা পেরিয়ে আরো ছোট্টো একটা গলিতে ঢুকে দ্বিতীয় বাড়ির সামনে অমল থামলো। বাড়িটার দেয়ালের পলেস্তরা বহুকাল নোনা ধরে ঝরে গিয়ে পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো বিবর্ণ ইট-গুলো বেরিয়ে রয়েছে। দরজার সিঁড়িতে জাঙিয়া-পরা পাঁচ ছ' বছরের একটি ছেলে খালি গায়ে বসে তোবড়ানো এলোমিনিয়মের বাটি থেকে মুঠো-মুঠো মুড়ি খাচ্ছিলো।

অমল বললো, 'এই ছোড়া! রান্নাঘরে তোর পিসির কাছে একে নিয়ে যা। আমার বলা আছে। এ বোসসায়েবের বড় ছেলে —মিহিরদা।' তারপর মিহিরকে বললো, 'আমি চললুম রে। কোবরেজের কাছ থেকে ঠাকুমার বাতের তেল নিয়ে না গেলে বাবা ধোলাই দেবে। লোটকোন-খোটকোন-কে নিয়ে তুই বাড়ি ফিরিস। সন্ধ্যেয় দেখা করবো।'

এ গলিটায় আলো অনেক কম। একটা ভিজে সোঁদা-সোঁদা গন্ধে অনেকটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। অমল চলে যেতে নিজেকে ভারি অসহায় লাগলো মিহিরের। এখানে থাকবে মা ফিরবে যখন ভাবছে ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে মুড়ি চিবুতে-চিবুতে তাকে

অবাক করে দিয়ে বললো, "আসুন!"

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার আর রীতিমতো স্যাঁতসেঁতে। বাইরে থেকে ভিতরে এলে প্রথম ভালো করে কিছুই বোঝা যায় না, অনেকটা ভার ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মনের মতো। চোখ খানিক সয়ে এলে মিহির দেখলো একজন মানুষে যাবার মতো সংকীর্ণ পথ। একটা চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে তারা গেলো। কলের মুখ দিয়ে টিপ-টিপ করে জল পড়ছে। ইট-বার-করা সিঁড়ি। অধিকাংশ রেলিংই অদৃশ্য।

দোতলায় যখন উঠে এলো তখন আলো অনেকটা। দড়ি থেকে কতকগুলো ছেঁড়া কাঁথা, রঙ-চটা ফ্রক, ছেঁড়া জাঙিয়া, আর টুকিটাকি ন্যাকড়া ঝুলছে। এখানে সেই স্যাঁতসেঁতে ভিজে-ভিজে গন্ধের বদলে একটা ভ্যাপসা তীব্র গন্ধ—তাদের বাড়ির সামনেকার পার্কের পেচ্ছাবখানাটার মতো।

তিনতলায় উঠতে আলো বাড়লো। তবে সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো তখনকার মতো চড়া রঙ আলোতে নেই। তিনতলার বারান্দা থেকে আশেপাশের নানা বাড়ির পোড়ো ছাদ চোখে পড়ে। এখনো সেখানে গজানো ঘাস আর বট-অশ্বত্থের ছোটো আগাছার চারার উপর রোদ রয়েছে বটে, তবে কেমন যেন মিইয়ে গেছে সেই রোদ।

পাশের দোতলা বাড়ির ছাত ফাটিয়ে একটা অশথ গাছের শিকড় নীচের দিকে নেমে গেছে। রোদে সেটাকে চিকচিক করতে দেখে মিহিরের যখন অজগর সাপের কথা মনে হচ্ছে এমন সময় ঠক করে একটা শব্দ হলো।

মিহির ফিরে তাকালো। ছেলেটা এনো-মিলিয়ামের তোবড়ানো বাটিটা নামিয়ে, জাঙিয়ায় হাত ঘষতে-ঘষতে বড়-বড় চোখ মেলে মিহিরকে দেখছিলো। মুখের অনুপাতে চোখ দুটো তার বড়-বড় হলেও কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি চাউনি।

পাশের ঘরের মধ্যে ছেলেটা ঢুকলো। ভিতরে যাবে কি যাবে না বলে মিহির যখন মনে-মনে দ্বিধান্বিত ছেলেটি দ্বিতীয়বার তাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "আসুন!"

প্রায় গোটা ঘরটা জুড়েই একটা উঁচু তক্তা। তার উপর ডাঁই-করা তোশক, বালিশ, কাঁথা। নীচটা নানা জিনিসে ঠাসা। দেয়ালে-ঠেসানো উপর-উপর করে রাখা নানা আকারের রঙ-চটা টোল-খাওয়া তোরঙ্গ। পাশের ঘরটাও প্রায় একই রকম। দুটো ঘরেই সেই ভ্যাপসা তীব্র গন্ধ।

তারপর এক চিলতে বারান্দা। সেখানকার গন্ধটা একেবারে আলাদা। লঙ্কা-ফোড়নের ঝাঁঝালো গন্ধ তার চেনা। তার ভালো লাগে। নাকে গেলেই যেন খিদে পায়।

বারান্দার ডান দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকের খোলা দরজার সামনে ছেলেটা

থামলো। সেই দরজা দিয়েই গন্ধটা আরো ঝাঁঝালো হয়ে বেরুচ্ছে। ছ্যাক-ছ্যাঁক করেও শব্দও কানে আসে।

ছেলেটা বললো, 'পিসী, বোসসায়েব এসেছেন।'

ছেলেটার স্পষ্ট উচ্চারণ শুনে ভালো করে তাকে দেখলো মিহির। একতলার আলোয় যাকে পাঁচ-ছ' বছরের বলে মনে হয়েছিলো, তিনতলার আলোয় মিহির বুঝলো অন্তত সে আট-ন' বছরের। তবে ভারি রোগা আর বেঁটে।

'ভেতরে নিয়ে আয়।' মেয়েলী গলা ভিতর থেকে শোনা গেলো।

ছেলেটা তৃতীয়বার তাকে বললো, 'আসুন।'

এবার আর মিহির অবাক হলো না।

ঘরটা নিঃসন্দেহে রান্নাঘর ভিতরে ঢুকেই মিহির বুঝতে পারলো। একটা পিঁড়ির উপর তার দিকে পিছন করে বসে তোলা উনুনের উপরকার কড়াইতে একটি মেয়ে খোন্তা চালিয়ে ঝাঁঝালো গন্ধ আর ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ তুলছিলো। তার ফরসা-লালচে পিঠের অনেকটা শাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। ব্লাউজ নেই।

মিহির ভিতরে এসে দাঁড়াতেই ঠক করে কড়াইটা নামিয়ে পিঁড়ির উপর ঘুরে বসে আঁচলে মুখের ঘাম মুছে মিত্তিরদের বিধবা বউ তার দিকে তাকালো। এলো চুল পাকিয়ে মাথার উপর চুড়ো করা। উনুনের আঁচে মুখটা টকটক করছে।

'আয় ভাই, আয়। তুই তা হলে মিহির? বোস সায়েবের বড় ছেলে?' হলুদ-ছোপ-লাগা আঁচলটা দিয়ে আর একবার কষকষে করে মুখ মুছে ভাঙা একটা নীচু মোড়া তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'বোস।'

'তোরা তো পাঞ্জাব না মাদ্রাজ থেকে দিন পনেরো হলো এসেছিস?'

'মাদ্রাজ থেকে', জবুথবু হয়ে মোড়াটায় বসে নীচু লজ্জা-লজ্জা গলায় মিহির বললো। কতক্ষণ পরে এই প্রথম কথা সে বললো।

'ওই একই হলো। আমার কাছে পাঞ্জাবও যা মাদ্রাজও তা। এই রান্না-ঘরটাই আমার পাঞ্জাব-মাদ্রাজ!—কতবার ভেবেছি তোদের বাড়িতে গিয়ে আলাপ করে আসি। কিন্তু এই হেঁশেল থেকে বেরুতেই পারি না।—তুই বড় ছেলে?—ইস, গালময় এতো ব্রণ করলি কী করে?' বলে এমনভাবে তাকিয়ে সে হাসলো যে, মিহিরের মনে হলো সেই হাসির সঙ্গে এই লংকা-ফোড়নের তীব্র গন্ধের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

আপনা থেকেই নিজের হাতটা মিহিরের গালে উঠে এলো।

'—থাক-থাক, আর ঢাকতে হবে না।—ময়না, এই ময়না—'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সবুজ ডোরা-কাটা শাড়ি পরে একটি মেয়ে রান্নাঘরে এলো। বোঝা গেলো দরজার আড়ালেই সে ছিলো। কত বড় হবে? তারই বয়সী নাকি?

—'এই দেখ, তোর মিহিরদা! বোস সায়েবের বড় ছেলে। এক গেলাস জল আর মুড়কি-টুড়কি এনে দে।'

মিহিরের দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে গেলো। তারও চোখ দুটি বড়-বড়, কিন্তু বেমানান বলে মিহিরের মনে হলো না।

কাঁসার গেলাসের জল আর সাদা কলাই-করা বাটির মুড়কি নামিয়ে সেই সবুজ ডুরে শাড়ি-পরা মেয়েটি মিহিরের পাশে দাঁড়িয়ে আঁচলটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পাকাতে লাগলো।

'হাঁ করে দেখছিস কী? পালা এখান থেকে। মিহিরের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

ময়না ফিক করে হেসে, তারপর তাড়াতাড়ি বুড়ো আঙুলে-জড়ানো আঁচলের খুঁটে মুখ চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আলো আরো কমে গেলো নাকি?

উনুনে ডালের হাঁড়ি কড়াই-এর লঙ্কা ফোড়ন ঢেলে সাঁতলাতে-সাঁতলাতে আবার তার দিকে পিছন করে ঘুরে বসলো মিত্তির-বউ।

'—অমলের কাছে তোর সব খবর পাই। তবে ওর সঙ্গে বেশী মিশবি না। এখন থেকেই বিড়ি টানতে শিখেছে। আমাদের পাড়ার একেবারে গেজেট।—শানুদার কথা কিছু বলেছে?' প্রশ্ন করেই মিহিরের দিকে ফিরে একেবারে মুখোমুখি বসে আবার সেই অদ্ভুত লংকা-ফোড়ন-মেশানো হাসি হাসলো।

'—এই, বলছিলো, কি যেন—'

'ঠিকই বলছিলো। তোর মা'র সঙ্গে আমি দেখা করবো। তোর বাবার সঙ্গেও। শানুদার একটা চাকরি তোদের করে দিতেই হবে, ভাই!' বলতে-বলতে ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের কাঁধের উপরকার ঘামাচি ঘসঘাস করে চুলকোতে লাগলো মিত্তিরদের বউ।

—ইস্, কী চিড়বিড় যে করে। দিন-রাতে সোয়াস্তি নেই। চিড়বিড় করছে তো করছেই। মাইরি। মনে হয় যেন ছিঁড়ে ফেলি!'

অমলের কথা বলার ঢঙের সঙ্গে মিত্তির বউ-এর কথার আদল দেখে কী রকম যেন অস্বস্তি লাগলো মিহিরের।

বাইরের আলো কমে গেছে।

মিত্তির বউ আবার উনুনের দিকে ফিরে বসে আর একটা হাঁড়ি উনুনে চাপালো। উনুনের আঁচ টকটকে হয়ে উঠলো তার মুখ।

'—ঠিক তোর ব্রণগুলোর মতো চিড়বিড় করে। তবে ব্রণ খুঁটিস না যেন, যত চিড়বিড়ই করুক না। তোর সুন্দর ফরসা মুখটায় বিচ্ছিরি কালো-কালো দাগ হয়ে যাবে।'

পিঠের কাপড় একেবারে সরিয়ে খুন্তিটা দিয়ে অধৈর্যের মতো সমস্ত পিঠটা সে চুলকোতে লাগলো। তারপর না ফিরেই বললো, 'তুই ভাই একটু ভালো করে চুলকে দে না! তোর কাছে আবার লজ্জা কি। আয়, কাছে সরে আয়!'

মিহিরের হাতটা তুলে নিজের পিঠে রেখে বললো, '—এইখানটা। এইখানটা।—

মরামারা কাঁদলনি।—খুব জোরে-জোরে। হাঁসফাঁস করে—'

মিত্তির বউ-এর পিঠ ভিজে-ভিজে হলেও অসহ্য গরম বলে মনে হলো মিহিরের।

'আর একটু ডান দিকে—হ্যাঁ, ঐখানটায়। —শামুদার চাকরির জন্যে তুই যাবি তো? লক্ষ্মী, মানিক—আরো সামনের দিকে, আরো—'

একটা অসম্ভব অস্বস্তিতে মিহিরের কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মিত্তির-বউ-এর কথাগুলো ভালো করে যেন কানে পৌঁছচ্ছে না। তারপর—

তারপর, সেই বন্দুকের গুলির শব্দেও অতো সে চমকে ওঠেনি, তার ব্রণ-ভরা গালে সশব্দে মিত্তির-বউ-এর চড় পড়তে যতটা সে চমকে উঠলো।

'—হারামজাদা ছেলে! সব শেয়ালেরই এক রা! গাল টিপলে দুধ বেরোয়—আমার গায়ে হাত!—পিঠ চুলকোতে বললাম তো—ওটা পিঠ?—দূর হ, দূর হ। ছাতে ধামায় চাপা পায়রা দুটো নিয়ে দূর হয়ে যা। শামুদার চাকরির জন্যে তোর বাপকে তুই না ধরলে তোর মা'র কাছে গিয়ে তোর সব কীর্তি ফাঁস করে দেবো। দূর হ—'

সামনে মিত্তির-বউ দাঁড়িয়ে। চুড়ো-করা চুল ভেঙে পিঠে পড়েছে। বুকের আঁচল সরে গেছে। মিহিরের মনে হলো সব আলো নিবে গেলেও সামনে তার চোখ দুটো যেন কয়লার আগুনের মতো জ্বলছে। কখন তাঁর মোড়াটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে জানে না। তার পায়ে যেন জোর নেই।

রান্নাঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো মিহির। মিত্তির-বউ পিছন ফিরে আবার পিঁড়িতে বসে খেন্তো নাড়ছে। নিজের পিঠে নয়।

বাইরে আলো নিবে না গেলেও কমে গেছে অনেক। তবু সে-আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায় ময়নার সবুজ ডুরে শাড়ি। ডান হাতের তর্জনী নিজের ঠোঁটে চেপে বাঁ হাত দিয়ে মিহিরের ডান হাত তুলে নিয়ে তাকে সে সিঁড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেলো।

মিহিরকে নেবে যেতে দেখে হাত ছাড়লো না। বললো, 'চলো, ছাতে চল, পায়রা নিয়ে যাও।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বললো, 'গালে খুব লেগেছে?'

মিহির উত্তর দিলো না।

আরো কয়েক ধাপ উঠে প্রশ্ন করলো, 'পিসী পিঠ চুলকে দিতে বলেছিলো?'

কোনো উত্তর এলো না।

'বলছিলো ডান দিকে, আরো ডান দিকে?'

নিরুত্তর।

'তারপরেই ঠাস করে গালে চড় তো?'

মিহির এবার কি কেঁদে ফেলবে?

ছাতে পৌঁছে মিষ্টি গলায় ময়না বললো, 'বেচারা'। তারপরেই আচমকা বিদ্যুতের মতো মিহির গালে যে-জায়গায় চড় খেয়েছিলো সেইখানে চুমু খেয়ে বললো, 'আমার বন্ধু হবে? আমার কোনো বন্ধু নেই!' তারপর একটু থেমে বললো, 'পিসীর ঐ এক ধাত—ছেলেদের পিঠ চুলকে দিতে বলে চড় মারা!'

আকাশ থেকে আলো একেবারে প্রায় নিয়ে গেছে। একটা প্রকাণ্ড পাহাড় যেন পশ্চিম দিক থেকে মেঘ হয়ে ফুঁসতে-ফুঁসতে ছুটে আসছে। নারকেল গাছে ঝড়ের নিশ্বাস। থেকে-থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'এই নাও তোমার জোটকেল আর কোটকোল—'

মিহিরের আলগা মুঠো থেকে পায়রা দুটো উড়ে গিয়ে অন্য এক ঝাঁক সাদা পায়রার সঙ্গে পাহাড়ের মতো কালো কোড়ো মেঘের সামনে সাদা বেলফুলের মতো যেন ভাসতে লাগলো।

এতো অবাক এতো দিশেহারা হয়ে গেছে মিহির যে, পালটা প্রশ্ন করতে পারলো না; আমার সঙ্গিনী হবে?

তবু এই প্রথম মনে হলো এই ডুরে শাড়ি-পরা মেয়েটিকে কালবৈশাখীর এই ঝড়ের মধ্যে বুঝি সব কথা বলা যায়।

কলকাতার ডায়েরি

এই সেদিনও যা ভাবা যেত না, তাই ঘটল বত্রিশ নম্বরের ট্রামে। এসপ্ল্যানেডগামী একদল মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুর মাঝখান থেকে একজন ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীকে ফিসফিসিয়ে বললেন, "যতই চেঁচামেচি করুন, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের অবস্থা আগের চেয়ে ঢের ঢের ভাল হয়েছে। একা আমার নয়, আমার চেনা-জানা সকলের।"

না, কেউ ভদ্রলোককে মারতে এল না, 'কংগ্রেসের দালাল' বলে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিল না। বরং বসা এবং দাঁড়ানো অন্য কয়েকজন অযাচিতভাবে আলোচনায় যোগ দিলেন। একজন বললেন, "ঠিকই বলেছেন। এই তো দেখুন না, আমার আগেকার শহর বরিশালের পটুয়াখালিতে পাকা বাড়ি ছিল দশ-তিন। আর এখন? ওই পটুয়াখালি এলাকা থেকে যে ক'জন আমাদের এই টালিগঞ্জ এলাকায় এসেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই পাকা বাড়ি।"

ভদ্রলোকের কথায় ফাঁক আছে, পালটা তর্ক করে তাঁকে নস্যাৎ করার যুক্তিও ছিল, কিন্তু তাজ্জব কি বাত, তামাম ট্রামের আমজনতা এই বক্তব্যের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল না, নির্বিবাদে সহ্য তো করলই, উপরন্তু আর একজন লোহার হ্যানডেলে হাত বদলে ফোড়ন কাটলেন, "আরে মশাই, পার্টিশন না হলে কলকাতার কলেজে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর, ছোট ভাইয়ের ডালহৌসি পাড়ায় চাকরি হওয়ার, এই টালিগঞ্জে বাড়ি তোলার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

বলে কী! এখনও ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপরে মাথাটা একই জায়গায় থেকে গেল? হল কী কলকাতা শহরের?

আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। চতুর্থ একজন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, সরকারের কাছ থেকে রিফিউজি-লোন না পেলে কলকাতায় তাঁর বাড়ি করার স্বপ্নবন্ধন সফল হত না।

মৃদু আপত্তি জানিয়ে আমাকে অবশেষে পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দুর রিফিউজিরূপে লাঞ্ছনার কথা, দুঃখ বরণের কথা বলতে হল। আমার কথার সমর্থন মিলল বটে, কিন্তু লক্ষ করলাম, নিজের নিজের ভাগ্য পরিবর্তনেই প্রত্যেকে মশগুল। মোটামুটি ও'রা সবাই যে আগের চেয়ে ভাল আছেন তাও প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন।

কথায় কথা বাড়ে, খানিক বাদে আলোচনা মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়াল এসে প্রস্তাবিত ট্রাম-বাস ধর্মঘটে। দেখা গেল, ওই দলটির প্রায় সবাই ধর্মঘটের ব্যাপারে মহাখাপ্পা। কনডাক্টর টিকিট চাইতে এলে তাঁর মুখের উপরেই এমন সব মন্তব্য চলতে লাগল, যা সহ্য করতে গেলে ক্ষমার সাগর হওয়া দরকার।—"বেটারা কাজে ফাঁকি দেয়, ডিউটি ভুলে যায়, আর যখন-তখন স্ট্রাইক! একে-

থায়ে মগের মুলুক হয়ে গেল মশাই দেশটা।" —"হ্যাঁ, মাইনে ওদের বাড়বে বইকি, কিন্তু কাজে ফাঁকি দাও কেন বাবারা?"—"জানেন ওভার-টাইম ছাড়া কেউ আজকাল কাজ করে না?"—"জানেন, বাসের অনেক কনডাকটার তাগাদা দিলেও টিকিট দেয় না।"—"আর মশাই বলবেন না, আপনাকে একটা দৃষ্টান্ত দি। আমিও ট্রাম কোমপানিতে কাজ করি। কর্মী" কনডাকটার-ড্রাইভাররা কী রকম গো-স্লো ট্যাকটিকস নিয়েছে, তার খবর তো আপনারা কেউ রাখেন না। এই টালিগঞ্জ লাইনে ৩৮টা ট্রামের রোজ ৩৮০টা ট্রিপ দেওয়ার কথা, কিন্তু ক'টা হয় জানেন? রোজ মাত্র আড়াইশ'টা। আর গতকাল কলকাতা শহরে ৫৮টি ট্রাম রাস্তায় বেরোতেই পারে নি, কর্মীরা গরহাজির। অ্যাকশন নিলে হরেদরে আর কাণ্ড, অতএব সব চুপচাপ।"

নানা ধরনের কথা। ইতিমধ্যে আর একজন যাত্রী খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঝাড়ু মারি এই শহরের কপালে, ওই স্ট্রাইকের কল্যাণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও শিকেয় উঠল। তারপর যখন কর্মাপটিটিভ পরীক্ষায় আমার-আপনার

ছেলে অন্য প্রদেশের ছেলেদের কাছে গো-হারা হারবে, তখন আমরা গলা চড়িয়ে বলব পারশিয়েলিটি করেছে। আর খবরের কাগজগুলো লিখবে, 'বাংলার প্রতি বিমাতৃ-সুলভ মনোভাব।' যেমন গবর্নমেণ্ট, তেমনই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো, তেমনই আমরা পাবলিক।"

না, আর ট্রামে থাকা চলে না, অভাবিত এই আলোচনা আরও ভায়োলেণ্ট টার্ন নিতে পারে, চুপ করে বসে শোনাটাও গর্হিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। বুদ্ধিমানের মত তাই ভবানীপুরে নেমে অন্য ট্রাম ধরলাম।

এগোতে এগোতে ভাবলাম, এঁরা কারা? এঁরাই কি সেই নতুন-ওঠা মধ্যবিত্ত, যাঁরা চাকরি, পেনসন, ছেলের পড়া মেয়ের বিয়ে, গিন্নির শাড়ি, ছোট্ট বাড়ি, কিস্তি-বন্দীতে কেনা রেডিও, এবং ভবিষ্যতে গাড়ি ও রেফ্রিজারেটার কেনার স্বপ্ন নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান? হয়ত তাই। কিন্তু এঁরাই কি সব? হয়ত নয়।

✻

বাংলাদেশে হরিনাথ দে কতজন আছেন ঠিক জানিনে, তবে আমি একজনকে জানি, যিনি গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ভাষা-চর্চায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তাঁর নাম শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত। সেদিন এসেছিলেন আমাদের অফিসে একগাদা বই বগলে। নাম আগেই শুনেছিলাম, এবং হিন্দী শেখার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে বছর-কয় আগে তাঁর লেখা হিন্দী ভাষাশিক্ষার সাহায্যও নিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর লেখা সব বইয়ের তালিকা দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। শুধু হিন্দী নয়, ভারতের প্রায় সব কটি ভাষাতেই তিনি পণ্ডিত। এবং সেই ভাষা শেখানোর জন্য তাঁর উদ্যমের অন্ত নেই। অসংখ্য বই, তার মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়েছেন পাঁচটি বইয়ে পাঁচটির মাধ্যমে। ইংরেজী, হিন্দী, নেপালী, মারাঠী এবং গুজরাতিতে। হিন্দী ভাষা শেখানোর মাধ্যম তিনটি। অসমীয়া, নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ইত্যাদি আরও কয়েকটি ভাষা-শিক্ষার বইও তাঁর বেরিয়েছে, তাছাড়া নানা ভাষার জন্য কয়েকটি অভিধানও লিখেছেন।

জিগগেস করলাম, "এত সময় পেলেন কী করে?" মৃদু হেসে বললেন, "ভাষাজননীর সেবা করা ছাড়া আমার কোন ব্রত নেই।" জানালেন, সম্প্রতি তিনি তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কানাড়ী, মনিপুরী, উরদু ইত্যাদি ভাষাশিক্ষার পুস্তক রচনায় হাত দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, শ্রীদাশগুপ্ত একজন গঠনমূলক কর্মী এবং গান্ধীজীর শিষ্য। তাঁর মতে রাজ্যে রাজ্যে সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ভাষা। ভাষার দুরত্ব ঘুচে গেলে মনের দূরত্ব থাকে না।

শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে আমিও একমত।

✻

অকাল বোধনের পর অকাল বাদল। আশ্বিনের মাঝামাঝি, শুধু আকাশে মেঘের আনাগোনা, বৃষ্টিও হচ্ছে যখন-তখন।

কী হল কলকাতার? শীত পড়ি-পড়ি করেও পড়ছে না। হালফ্যাশানের গরম জামাকাপড়গুলোর গতি কী হবে? আলমারির আর ন্যাপথালিন পাট করে সব জড় হয়েছে হাতের কাছে, কিন্তু নিজেদের শীতের বিশ্বাসঘাতকতায় সব শখ বুঝি মাটি হতে যায়। সামনে পড়ে আছে পৌষ আর মাঘ, তখনও যদি এমন ধারা চলে তা হলে শুধু ফুলকপি খেয়ে আর আর্ট এক্সিবিশন দেখে কি মন ভরবে?

—চাণক্য

সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বাম কমিউনিস্টদের একাই কংগ্রেসকে পরাজিত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কথাটা যিনি বলেছেন সার্কাসে সেই বীর রামমূর্তি যিনি হাতী

বুকে তুলে ধরার খেলা দেখাতেন তিনি নন, বলেছেন রাম কমিউনিসস্ট এম পি শ্রীপি রামমূর্তি।"

এক সংবাদে শুনিলাম, রাখাল বা চালক সঙ্গে না থাকিলে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা শুকর ইত্যাদি জন্তুকে কলিকাতা বা শহরতলির রাস্তায় চলিতে দেওয়া হইবে না। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমাদের মনে হয় এই তালিকা থেকে গরুকে বাদ দেওয়াই উচিত। কেন না কিং অর্থাৎ বুষরাজ ক্যান ডু নো রং!!"

পরিবহণ দফতর নাকি প্রস্তাবিত ট্রাম-বাস ধর্মঘটে পরিবহণ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন। —"কিন্তু কা চিন্তা। মা ভৈঃ বাণী শুনিয়ে দিন এবং বলুন বলং বলং পদ বলং"—বলেন সহযাত্রী।

প্রেশন বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে প্রায় তেত্রিশ হাজার স্টেশন মাস্টার ও সহ স্টেশন মাস্টারগণ নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসঙ্গত আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী প্রাক-স্বাধীনতা যুগের বিখ্যাত গানের একটি চরণ রকমফের করিয়া শুনাইলেন—"তেত্রিশ হাজার মোরা নহি কভু ক্ষীণ, হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন, ভারত গগনে পুনঃ আসিবে দুর্দিন, জগজ্জন মানিবে বিস্ময়!!"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খরা-দুর্গত-দের জন্য খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্রতী হইয়াছেন।—"নিঃসন্দেহে উহা একটি প্রশংসনীয় উদ্যম, তবু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেবো—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। তবে মাঝে মাঝে যাঁরা একক বা গণ অনশন করেন তাঁদের বেঁচে-যাওয়া রেশনটা কাটু করার কোন সরকারী চেষ্টা হয়েছে বলে শুনিনি; এখন সেই দিক থেকে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কিছুটা খাদ্য দুর্গতদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যায়। অবশ্য তাতে পরিমাণের দিক থেকে খুব আশাবাদী হওয়া চলবে না, কেন না আগেকার প্রায়োপবেশনের পরিবর্তে এখন শুনতে পাই শুধু চব্বিশ ঘণ্টা প্রতীক অনশন।"

কলকাতা ট্রাইবুনালের সম্মুখে নাকি দুই পৌরপিতার হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"বড়দিনের অবশ্য দেরি আছে, তবু হাওড়া ময়দান, মারকাস স্কোয়ার বা গড়ের মাঠে এরূপ একটা অল-ইন রেসলিং-

এর ব্যবস্থা হলে কিছু অর্থ সংগ্রহের সুবিধে হতো এবং সেই সঙ্গে ট্যুরিস্ট আকর্ষণেরও মওকা মিলত!!

আস্থা অনশন সম্পর্কে বিশুখুড়ো একটি নূতন কথা শুনাইলেন, বলিলেন—"ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে এমন একটি অপরাধের উল্লেখ আছে, যা করলে সাজা হয় না, করার চেষ্টা করলে সাজা হয়। সেটা হলো আত্মহত্যা। যাঁরা তিলেতিলে নিজেকে শেষ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করেন, তাঁদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টার দায়ে দায়ী করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে একবার আইনমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বলে মনে করি!!"

সংবাদে শুনিলাম অচিরেই নাকি ট্যাক্সি ভাড়া বাড়বে।—"ট্যাক্সি, ট্যাক্সি বলে হাঁক দিলে, সাড়া না দিয়ে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগের জন্য ট্যাক্সির স্পীডও বাড়বে কি না তা অবশ্য সংবাদে বলা হয় নি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

গৃহভৃত্যদের নামধাম ঠিকানা এবং ফটো সংগ্রহের পুলিসী অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'নিউ আলিপুর গৃহভৃত্য ইউনিয়ান' গঠিত হইয়া গেল। —"এই সঙ্গে গৃহিণী ইউনিয়ান সংগঠিত হলেই, হরিমটরের পূর্ণ ব্যবস্থা হয়"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতের নাম প্রত্যাহার করার কথা সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বলিয়াছেন

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং। সহকারী একটি ব্যাংগকৌতুক অভিনয়ের ডায়ালগ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"রাজ্ঞা-গজার সঙ্গে আইছ ফাজলামি মারাতি!!"

সংবাদে শুনিলাম হঠাৎ নাকি আবার হিন্দী লইয়া ওকালতি শুরু হইয়াছে; সমর্থকদের মধ্যে ইন্দিরাজীর নামও শুনিলাম। বিশু খুড়ো শুধু সংক্ষেপে বলিলেন—"থেকে থেকে থেকে ওঠে হিংটিংছট্।"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার বড়দিন নাকি কাটিবে ভিয়েৎনামে, তাঁর সঙ্গী হবেন প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা বব্ হোপ। সহযাত্রী বলিলেন—"এ এক অপূর্ব কৌতুক!!"

প্রেসিডেন্ট জনসন যে ভারতে খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দিয়াছেন, সেই সংবাদ আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মানিয়াম নাকি জানিতেন না। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু কেন, দক্ষিণে তো সর্ষপ তেল চলে না এবং নারকেল বা তিল তেল নাসারন্ধ্রে দিলেও নিদ্রা হয় বলে তো শুনিনি।"

ফোভিজম্

ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রেখে চিত্রকলার আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎটি কিঞ্চিৎ জেনে নিয়ে আবার ফিরে গিয়ে কোনো চিত্রকরের ছবি দেখলে তাঁর কাজের সম্ভাবনাগুলো যেন আরো পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। আমি তাই গোগ্যাঁ বিষয়ে বলবার আগে, এবং ভ্যান গ'র আলোচনার পরেই, কয়েক যুগ এগিয়ে ফোভিজম্ নামক চিত্রাদর্শ বিষয়ে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করলুম কারণ বিশ শতকে এই দুই চিত্রকর কীভাবে গৃহীত হয়েছিলেন এবং এই শতকের বিভিন্ন চিত্রাদর্শের সঙ্গে কত নিকট সম্পর্ক ভ্যান গ ও গোগ্যাঁর সেটা জানা প্রয়োজন চিত্রকলার ধারাবাহিকতাটা বোঝার জন্য।

বোনার্দের আলোচনা প্রসঙ্গে "নবি"দের নিয়ে বলেছিলুম ভুইয়ার এবং নবিস্টদের ছবি ফোভিজমের প্রথম ধাপ বলা যায়। ভ্যান গ এবং গোগ্যাঁর প্রেরণাধর্মী চিত্র ও অন্বেষণের পথ প্রদর্শক সেই পথ ধরে এগিয়েই আমরা বিশ শতকে পৌঁছোই এবং ফোভিজম্-শৈলীর অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষ করি। ভ্যান গ থেকেই এই সচেতনতা আরম্ভ হয় যে একটি ছবি, সেটি ঘোড়ার না নারীর না প্রকৃতির সেই বিবেচনার আগে যে সেটি একটি সমতল ক্যানভাস যার এক একটি অংশে এক একটি রঙে আঁকা সেই প্রশ্ন বিবেচ্য। আমি যা বললুম তার প্রমাণ মাতিস্, দেরেইন, ভ্ল্যামিঙ্ক প্রভৃতির ছবি। এঁদের চিত্র মূলত ফর্ম এবং বর্ণের সার্থক মিলন; সমস্ত কিছুর আগে ছবিটি কীভাবে আঁকা হয়েছে সেটাই আলোচ্য।

বর্ণবিষয়ে সচেতনতা, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে বর্ণই যে ছবির ভাষা যে বিশ্বাস আসছে ভ্যান গ এবং গোগ্যাঁর ছবির থেকে, প্রথম সচেতনভাবে উপলব্ধি করেন "ফোভ"রা। সালঁ অফ অটামে ১৯০৫ সালে বারোজন চিত্রকর যে চিত্রপ্রদর্শনী করেন তাতে বর্ণ ব্যবহারের যথেচ্ছাচার দেখে সমকালের বিখ্যাত চিত্রসমালোচক লুই ভসেল্ প্রদর্শনী গৃহে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন "জানোয়ার, একটি খাঁচা ভর্তি জানোয়ার যেন এই প্রদর্শনী।" ("দোনাতেল্লো পার্মি লো ফোভ") এবং এই অপরাদ্দগীরণের মতো শব্দ "ফোভ্" (জন্তু), যা বেরিয়ে এসেছিল ভসেলের মুখ দিয়ে হয়ে গেল এই নতুন দলের নাম। "ফোভ" বলে এঁরা পরিচিত হলেন রাতারাতি এবং এঁদের চিত্রাদর্শের নাম হল "ফোভিজম্।"

মাতিসকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এই চিত্রাদর্শ। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ এই তিন বছরের ইতিহাস চিত্রকলার এক স্বর্ণ অধ্যায় বলা যায়। তিনটি দল মোটামুটি ফোভিস্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক হয়েছিল বলা যায় মাতিসের নেতৃত্বে। ভ্যান ডোঙেন প্রথম আকৃষ্ট হলেন মাতিসের থিওরির দ্বারা, তারপর আতেলিয়ার গুস্তাভ মোরোর দল এবং আকাদমি কারিয়েরের শিল্পীবৃন্দ যাদের মধ্যে ছিলেন মার্কুয়ে মাঁগুই, কামোয়া, পী প্রভৃতি ফোভ দলে নাম লেখালেন এবং অবশেষে শাতো গোষ্ঠীর চিত্রকরেরা, ভ্ল্যামিঙ্ক, দেরেইন এঁরা হাত মেলালেন এসে। লো হাভ্রের শিল্পীরাও এসেছিলেন, ফ্রিজ্, দ্যুফি, ব্রাক্ এই তিনজন তো

ভীষণভাবে ফোভিস্ট হয়ে উঠেছিলেন। এ'রা সবাই গোগ্যাঁ, ভ্যান গ এবং সেজানের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন এবং অনেকদিন ধরেই স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিলেন এই তিন পূর্বসূরীর আদর্শে এক নতুন ইস্কুল, তাই মাতিসের ডাকে এ'রা সবাই একত্র হলেন প্যারিসে।

ফোভিস্টদের যেটা বিশেষত্ব রঙের ব্যবহারে তা হল চিত্রের বর্ণবিন্যাস থেকে বাস্তবতার স্থান সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে দেওয়ায়। দেরেইনের একটি ছবি যার নাম "ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ"—এই ছবিতে শহরের রাস্তা আঁকা হয়েছে সবুজে, বাড়িগুলি নীল রঙে, গাছগুলি হলুদে এবং রাস্তার পাশের ফুটপাথ মেরুন রঙে—এমন উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায় এ'দের সবার ছবিতেই। কিন্তু কেন এটা করছেন?—এ'দের কাছে ছবি ছবি ছাড়া আর কিছু নয়—সমস্ত ক্যানভাসটা এ'রা ভাবতেন শুধুমাত্র পরিসর ও বর্ণবিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। যে-রঙ চোখে ভালো লাগছে সে-সময়ে শিল্পীর তাই ব্যবহার করতে দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া বোধ হয় আরো একটা ব্যাপার আছে আমার মনে হয়। অনেক সময়ে পারিপার্শ্বের রঙ স্মৃতিতে একটি মানুষের মূর্তি মনের চোখে রঙিন করে দেয়—তার কথা মনে পড়লেই আমরা সবুজ রঙ বা লাল রঙের কথা ভাবি—মনে হয় সে ব্যক্তিও বোধ হয় রঙিন ছিল। একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই—আমি কিছুদিন আগে কোন এক সবুজ মাঠের ধারে গ্যালারিতে ব'সেছিলুম—আমার সামনে ছিল গোলাপী পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি, আরেকজন মুগা রঙের শাড়ি পরে, সামনে ছিল সবুজ মাঠ, কখন যে এসব রঙ ভিতরে চলে গিয়েছিল বুঝিওনি। কিন্তু হঠাৎ গতকাল সেই দুপুরের কথা ভাবতেই আমার মনে তিনটে রঙ হঠাৎ খেলে গেল—আমি চোখের ভিতরে যে ছবি দেখলুম তা হল এক মুগো রঙের বিস্তীর্ণ জমি তার ওপর কেউ বা গোলাপী রঙের পোশাক পরে কেউ বা সবুজ, ছুটে বেড়াচ্ছে, এক অপরূপ দৃশ্য। আমি যদি ফোভিস্ট চিত্রকর হতুম তাহলে এই ছবিতে চোখের ভিতরে যে বর্ণবিন্যাস দেখেছিলুম তাই আঁকতুম ক্যানভাসে—শরীরগুলো হয়তো সবুজ নীল-বেগুনি-গোলাপি হয়ে যেত, বাস্তবের সঙ্গে হয়তো কোনো যোগই থাকত না।

ফোভিজম্ বিষয়ে এত অবধি বলেই শেষ করছি—ব্যক্তিগতভাবে এসব শিল্পীর আলোচনায় আরো তথ্য জানা যাবে পরে। তবে এ কথাটা ভেবে দেখুন, মেরুন টুপি পরা কাউকে আপনি সবুজ মাঠে যদি দেখেন তার বিষয়ে পরে ভাবতে গেলে যে ছবি ভেসে উঠবে তা কি সবুজ মে[illegible] মেরুন মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনতর কি[illegible] একটা নয়? ভেবে দেখুন।—আসলে, সহজ কথায় এই অযৌক্তিক মনের ছবিই ফোভিস্টরা ধরতে চেয়েছিলেন—যুক্তিহীন হলেও এই দৃশ্যের চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই বলে।

শুদ্ধশীল বসু

বলা যাবে না। বাদবাকী অধিকাংশই মাঠের মানুষ। তার সঙ্গে হাটুরে বাটুরে মেশামিশি। মহিলা যাত্রীও কম নয়। তারা যে এ গাড়ির অধিকাংশদের কন্যা ঘরনী, সে ছাপ আছে তাদের বেশবাসে চেহারায়। যার হাতে সময় ছিল, যাত্রা হল কুটুম্ববাড়ি, তার একটু তেলের চিকনচাকন। ভাঙ-ভাঙা কাপড়ে ন্যাপথলিনের গন্ধ। ড্রাইভারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা মেয়েটির গায়ে নয়া ফ্রক। যাদের কাজকর্মের ফিকির, তারা একটু রুক্ষসুক্ষ। তাদের তেমন চাকা-চিকির শালীনতা নেই। বাদবাকী বয়স্থাদের মুখ দেখতে পাবে, তা হবে না সব কলাবউ। ইস্তক, ওই যে গাড় সবুজ রঙের শাড়িপরা কোলে একখানি শাঁখা পরা কালো, রেখায় ভরা প্রৌঢ়ার হাত দেখা যায় তার মুখেরও অর্ধেক ঢাকা। হতে পারে বয়স হয়েছে, নাতিনাতনী হয়ে গিয়েছে, তা বলে সধবা মেয়েমানুষের একটা সহবত তো আছে।

আরো খানিকক্ষণ ... পর বাস ... এক জায়গায় বসে পড়েছে। ... চলেছে সমানে। চলবেই, তার ... কে আছে। কথাবার্তার বিষয়বস্তুরই বা ... কী। ধানের ফলন কেমন, ... কেমন হবে, অমুকে মরে গেল, কার ছেলে হল এসবের মাঝে মাঝে মন থেকে প্রাণো কাজের বুলিও চলেছে। আমাকে বিশেষ করে উৎকর্ণ হতে হল, যখন শোনা গেল, 'বাবু পেলে কোথেকে?'

গাড়ীর জবাব শোনা গেল, 'পথ দিয়ে।' আমি আড়ষ্ট হলাম, পাছে গাড়ীর মুখ খুলে যায়। রাস্তায় ... না পাইতে আতঙ্ক করে। বাইরের দিকে তাকিয়েই ... গাড়ি চলেছে বেগে। মাঝে মাঝে ... রাস্তার দাঁড়ালো। কেউ নামে, ওঠে কেউ। কেবল শেষ নেই সবুজের। যেন ছক কাটা আছে, মাঠে ধান, ডাঙায় নারকেল সুপারির ভিড়। সেখানেই গ্রাম, সেখানেই নারকেল সুপারি। শেষ হেমন্তের রোদে চিকচিক করছে। মাঝে মধ্যে গরুর গাড়ি, গৃহস্থের ঘরের সামনে বাঁধা গরুছাগলের হাম্বা-প্যাঁপর। বাসের সহিস হাঁক দেয়, হেই হেই! শুধু তাই নয়। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় থেকে ও এসেছে। ছোকরা সহিসের গলায় অনেক মজার মজার কথা। পথ চলতি কিষেণকে ডাক দিয়ে বলে, 'ও দাদা, পয়সা পড়ে গেল যে।'

কিষেণের ট্যাঁকে পয়সা থাক না না থাক, চমকে তাকায় মাটির দিকে। সহিস ছোকরা হেসে খ্যালখ্যাল করে। কান পাতলে শোনা যাবে, ... বেগে-ওঠা ... তখন চীৎকার করছে, 'হ্যাঁ, এই যে পেঁচি। দেখা যাও।'

নিয়ে যাবার জন্যে তখন কেউ দাঁড়ায় নেই; গাড়ি অনেক দূরে। পুকুরঘাটের ধার দিয়ে, কলসী কাঁখে বউটিকে চমকে দিয়ে, গাড়ি তখন ছুটেছে। আর সহিসের ঝাঁকড়া চুলে ঝটকা লাগে, গলায় বাজে গান, 'মায়ের দেখা তোর সুরত...।'

কার সুরত দেখে, কে জানে। মনে হয়, কোন বোম্বাইওয়ালীর সুরত, তখন ওর চোখে নেই। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার ছাঁচে গড়া ... আসলে দুরন্ত গতি আর বাধাহীন দিগন্তের সামনে অন্ধই হয়ে পড়েছে। ... তাকে ধরে রাখতে পারছে না।

কে পারে। আমি কি পারি। আমি সাহস নই, কিন্তু পাখনাছাটো একটা পাখি যেন নিজের মধ্যেও দেখি। আপন বাসা ছেড়ে যে অসীমে যেতে চায়, প্রাণ অথই হয়ে পড়ে এই দিগন্তজোড়া রূপের মাঝে তাকে ধরে রাখতে পারি না। নিজের গলার গুনগুনানি চেপে রাখতে পারি না। এ অনুভূতি

তিনি পুরুষে চমকে চোখ তুলেছিল। 'আপ কা কৃপা' মানে 'দয়া করে আপনি...।' দেখেছিলাম রমণীর ঠোঁটে কুণ্ঠিত হাসি, দৃষ্টি সলজ্জ। তার মধ্যেই বার দুয়েক ভীরু, চকিত চোখে বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে দৃষ্টিপাত। তিনি যা বলে উঠেছিলেন, তার বাঙলাটা ঠিক এইরকম, 'দয়া করে আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। আর আপনার দেশলাইটা। মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি দিন, উনি এসে পড়লে আর হবে না।'

কামরায় বজ্রাঘাত হয়েছিল কিনা, মনে পড়ে না। তবে নিজের কানকে বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। আমি কি সত্যি ওই কথাগুলো শুনেছিলাম। নিজের মুখ তো দেখতে পাই নি, কেমন করে জানা যাবে, তার কী হাল হয়েছিল। কিছু একটা হয়েছিল। কারণ, কয়েক মুহূর্ত সেইমন অবশ হয়ে গিয়েছিল। আবার, প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে শোনা গিয়েছিল, 'জলদি... আপ কা কৃপা...।'

তাড়াতাড়ি সিগারেট বের করে দিয়াশলাই সুদ্ধ বাড়িয়ে ধরেছিলাম। তিনি ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলেন। আর মুহূর্তেই

না। মুখ না ফিরিয়েই বলেন, 'গোসাবা।'

মামুদগাজী ঘাড় নাড়িয়ে বলে, 'তাই তো বলি, বাবুকে তো হাসনাবাদেও কোনদিন দেখি নাই। লঞ্চ ধরে যাবেন তো?'

প্রৌঢ়ের ভুরু জোড়া যেভাবে তাঁর হানা থাকে বেঁকে ওঠে, একটা ধমক নিশ্চিত আশা করা যায়। হতে পারে অচেনা অঞ্চল, তবু আমার নিজের ধারণাই বলে, গোসাবা ক্যানিং-এর কাছে। আর ততদূর যাবার জন্যে লঞ্চ ছাড়া আর কোন বাহন আছে বলে মনে হয় না। যা আছে, তা নৌকা। গোসাবার যাত্রী নিশ্চয়ই এখান থেকে নৌকায় যাবেন না।

কিন্তু মানুষ আমার কবে চেনা হয়েছে। প্রৌঢ়ের চোখের তারার অস্থিরতা এবার শরীরে দেখা যায়। বলেন, 'তাই তো যেতে হবে। কিন্তু সময় তো হয়ে গেল, ল পাওয়া যাবে কী।'

গাজীর ফাটা মুখে, হাবজা দাড়ি হাসির তরঙ্গ। দৈববাণী শোনায়, ' পাওয়া যাবে বাবু।'

'যাবে?'

প্রৌঢ় যেন অকূলে কূল দেখছেন গাড় বরাভয় মুখে। এতক্ষণে বোঝা যায়, ত

স্টকহলমের চিঠি

স্টকহলমে শীতকাল সমাসন্ন। উত্তর সুইডেন থেকেই শীতের ঝড় বইতে শুরু করেছে, এসে পড়েছে। প্রচুর তুষারপাত হয়েছে সেখানে, প্রায় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বিরাজ করছে। স্টকহলমের অবস্থা এখনও ঠিক ততটা খারাপ হয়নি। তুষারপাত এখনও হয়নি। দিনের আলো এখনও প্রায় ৬ ঘণ্টা থাকে। কেবল নিয়নলাইটই দেখা যায়। সব প্রকৃতি এখন শীতের আগমনের আশঙ্কায়। গাছপালার পাতা হঠাৎ সবুজ থেকে হলুদ ও লাল হয়ে ঝরে গেছে। এদের মনেও এখন কাজেকর্মে মন পড়ে না। এই প্রাকৃতিক নির্যাতন ভুলে থাকার এই বুঝি শ্রেষ্ঠ উপায়।

অবশ্য এই বিবরণ থেকে হয়ত আপনাদের মনে হতে পারে যে, এখানকার মানুষের শীতকালীন জীবন নেহাতই রুক্ষ ও আনন্দবিহীন। তা কিন্তু নয়। এই সময়েই আসে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ডিসেম্বরের দিনগুলি, যখন এ দেশের মানুষদের মন উল্লাসে ভরে ওঠে ও শীতের অন্ধকার দূরে ঠেলে ওঠে আলোর রোশনাই, ঘরে ঘরে চলে উৎসব—বড়দিনের উৎসব।

সকলের কাছে এইটি হল বছরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তবে সুইডেনে পড়ে আর এক রকম চাঞ্চল্যের সাড়া, যার ঢেউ গিয়ে পড়ে সারা বিশ্বের জ্ঞানীগুণী মহলে। সেটা হল বাৎসরিক নোবেল পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান।

সুইডিশ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল তাঁর উপার্জিত প্রচুর অর্থের প্রায় সবটাই দান করে গিয়েছিলেন এক ফাউন্ডেশনে। ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সালে নোবেলের মৃত্যু ঘটে। সেই সময় তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় চার কোটি টাকা। এর কিছুটা তাঁর উত্তরাধিকারীরা পেয়েছিলেন, তবে তিন কোটি টাকার কিছু বেশী গিয়েছিল নোবেল ফাউন্ডেশনে।

নোবেল পুরস্কারগুলি সত্যিই আন্তর্জাতিক পুরস্কার। নোবেল সাহেবের উইলে তিনি তাঁর একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন যে, এই পুরস্কার যেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে দেওয়া হয়। সারা মানবজাতির কল্যাণে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অবদান যাঁর, তিনিই এই পুরস্কারের যোগ্য গণ্য হবেন। নোবেল সাহেবের ভাষায়—

"আমার একান্ত অভিলাষ—এই পুরস্কার বিতরণে যেন প্রার্থীদের জাতির প্রশ্ন আদৌই না ওঠে, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই যেন এ পুরস্কার দেওয়া হয়।"

নোবেলের অর্থ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ও পাঁচটি বিষয়ে প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল সাহেবের ইচ্ছামত—

অ্যালফ্রেড বার্নার্ড নোবেল
[১৮৩৩—১৮৯৬]

"পুরস্কারের এক ভাগ পাবেন সেইজন যিনি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন—আর এক ভাগ যাবে তাঁর কাছে যিনি রসায়নশাস্ত্রে কোন বিশেষ আবিষ্কার করায় কৃতকার্য হয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুখ্য অবদান যাঁর, তিনিও পাবেন পুরস্কারের এক অংশ। সাহিত্যের পুরস্কারের জন্য যোগ্য গণ্য হবেন সেই ব্যক্তি যিনি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ এবং আদর্শবাদী রচনা উপহার দিয়েছেন মানবজাতিকে। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে প্রীতি-মৈত্রীস্থাপন, সামরিক বাহিনীগুলির সম্পূর্ণ বর্জন বা সংকোচন, শান্তি কংগ্রেস স্থাপন এবং সম্প্রসারণ—এইসব উদ্দেশ্যে যিনি সর্বাধিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তাঁকে বা সেই সংস্থাকে দেওয়া হবে শান্তির পুরস্কারটি।"

নোবেলের ইচ্ছানুযায়ী পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার ঘোষণা করেন 'সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স'। চিকিৎসাবিদ্যার পুরস্কার দেওয়া হয় 'ক্যারোলাইন মেডিকো সার্জিক্যাল ইনস্টিটিউট' থেকে। 'সুইডিশ অ্যাকাডেমি' নির্বাচন করেন সাহিত্যের পুরস্কারপ্রার্থীর। নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট-এর নোবেল কমিটি থেকে শান্তির পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল তাঁর উইল সই করেছিলেন প্যারিসে—২৭ নভেম্বর ১৮৯৫ তারিখে। তাঁর মৃত্যু হয় ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৬ তারিখে। নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯০১ সালে এবং তখন থেকে প্রতি বছরই ১০ ডিসেম্বর অর্থাৎ নোবেলের মৃত্যুদিনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতি বছর পুরস্কার বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কারপ্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করে থাকেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা। এই প্রস্তাব সেই বছরের ৩১ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে করা নিয়ম। প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর যখন এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হয়, তখন প্রত্যেকটি পুরস্কার বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সেই বিশেষ পুরস্কার বিতরণের কারণগুলি সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নোবেল বলেছিলেন—"আমি কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে অর্থ দান করতে চাই না। এ রকম লোকের পক্ষে হয়ত কাজ ছেড়ে দেবার প্রলোভন হতে পারে। পরন্তু আমি সেইসব কল্পনাবিলাসীদের সাহায্য করতে চাই যাঁদের জীবনধারণের পথে বহু বিঘ্ন রয়েছে। এমন সব কল্পনাবিলাসী—যাঁদের হয়ত প্রতিভা আছে, কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে যাঁরা অচেনা রয়ে গেছেন

বা যাঁদের বিষয়ে কিছু ভুল ধারণা আছে—মেধাবী তরুণ গবেষক, যাঁদের গবেষণা হয়ত পদার্থবিদ্যায়, রসায়নে বা চিকিৎসাশাস্ত্রে বিরাট এক আবিষ্কারের দ্বারোদ্ঘাটন করতে পেরেছে, অথচ যাঁরা শুধু অর্থাভাবে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন না—এরাই আমার মতে যোগ্যতম ব্যক্তি।"

এমন সব ব্যক্তিদেরই তিনি বিশেষ করে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। যদিও ঠিক এমনটি করা পুরস্কার বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবু নোবেলের ইচ্ছানুযায়ী যতটা চলা যায়, সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখা হয়। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত যেসব মহান ব্যক্তিদের নাম সহজেই মনে জাগে, তাঁরা হচ্ছেন—পিয়ের ক্যুরী ও মাদাম মারী ক্যুরী, যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন ১৯০৩ সালে। গুগলিয়েলমো মার্কনি পুরস্কার অর্জন করেন ১৯০৯ সালে। ম্যাক্স প্লাংক পুরস্কার পান ১৯১৮ সালে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯২১ সালে, এবং স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন ১৯৩০ সালে এ পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর পুরস্কৃত হওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"আলোকের 'ডিফিউসন'-এর ওপর তাঁর কাজ এবং তাঁর নামে পরিচিত রমন 'এফেক্ট'-এর জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।"

রসায়নবিদ্যায় মারী ক্যুরী পুরস্কৃত হয়েছিলেন ১৯১১ সালে। মারী ক্যুরীর কন্যা ইরেন জোলিও ক্যুরী ও তাঁর স্বামী এফ জোলিও রসায়নশাস্ত্রে পুরস্কৃত হয়েছিলেন ১৯৩৫ সালে।

চিকিৎসাবিদ্যায় পুরস্কৃত স্যার রনাল্ড রস, এফ জি হপকিনস্ ও আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর নাম চিকিৎসা-জগতে সুপরিচিত। স্যার রনাল্ড রস এ পুরস্কার অর্জন করেন ১৯০২ সালে, হপকিনস সাহেব ১৯২৯ সালে ও আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯৪৫ সালে।

সাহিত্যে নোবেল লরিয়েটদের মধ্যে বহু নামের সঙ্গেই আমরা পরিচিত। তাঁদের প্রায় সকলের সাহিত্যরসও আমরা আস্বাদন করেছি, অনেক সময়ে হয়ত অনুবাদের মাধ্যমে। রাডিয়ার্ড কিপলিং পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগেরলফ এ পুরস্কার পান ১৯০৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯১৩ সালে। তাঁকে পুরস্কৃত করে স্বীকৃতি জানান হয়—"কবির সেই সুগভীর ভাবপূর্ণ স্বচ্ছ কবিতাকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর সুচারু পারদর্শিতার সাহায্যে, তাঁর চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্য সাহিত্য-রথীদের কাছে উন্মোচন করেছেন।"

অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যাঁরা এ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন

নোবেলের সমাধি —স্টকহলম

রোমাঁ রোলাঁ, যিনি এ পুরস্কার পান ১৯১৫ সালে ও আনাতোল ফ্রাঁস পেয়েছিলেন ১৯২১ সালে। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ১৯২৩ সালের নোবেল লরিয়েট ও জর্জ বার্নার্ড শ, যিনি এ পুরস্কার অর্জন করেন ১৯২৫ সালে, আমাদের কাছে সুপরিচিত। এ ছাড়া নোবেল লরিয়েটদের মধ্যে বিশেষ স্থান রাখেন ১৯২৯ সালে পুরস্কৃত টমাস মান, ১৯৩০ সালের লরিয়েট সিনক্লেয়ার লুইস ও জন গলসওয়ার্দী, যিনি এ পুরস্কার পান ১৯৩২ সালে। ইউজীন ওনীল নোবেল লরিয়েট পদে ভূষিত হন ১৯৩৬ সালে ও পার্ল বাক ১৯৩৮ সালে।

যুদ্ধের পরে যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান, তাঁদের মধ্যে আছেন টি এস এলিয়ট, যিনি এ পুরস্কার পান ১৯৪৮ সালে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্মানিত হন ১৯৫০ সালে, উইনস্টন চার্চিল ১৯৫৩ সালে ও আরনেস্ট হেমিংওয়ে ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৮ সালে বরিস পাস্তেরনাক এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এ পুরস্কার গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। আর এক সাহিত্যিক অবশ্য স্বেচ্ছায় এ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন ১৯৬৪ সালে—তিনি জাঁ পল সার্ত্র। তিনি বলেন যে, এ পুরস্কারের মূল্যকে তিনি একটি আদর্শগত ও মূল্যের সমান মনে করেন। অতএব এই পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত করে যে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে, তা তিনি গ্রাহ্য করেন না। ১৯৬৫ সালে নোবেল লরিয়েট হয়েছেন মিখাইল শলোকভ।

শান্তির ক্ষেত্রে প্রথম পুরস্কার পান রেড ক্রসের স্রষ্টা জাঁ হেনরী ডুনাণ্ট ১৯০১ সালে। তা ছাড়া এ পুরস্কার পেয়েছেন থিওডর রুসভেল্ট ১৯০৬ সালে ও উড্রো উইলসন ১৯১৯ সালে। স্যার অস্টিন চেম্বারলেন নোবেল লরিয়েট হন ১৯২৫ সালে। ১৯৪৪ সালে শান্তির জন্যে পুরস্কারটি দেওয়া হয় রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিকে। ১৯৫২ সালে সম্মানিত হন মানবজাতির কল্যাণে অক্লান্ত কর্মী অ্যালবার্ট শোয়াইৎসার। শান্তির পুরস্কারটি দিয়ে সম্মানিত করা হয় দাগ হামারশোল্ডকে ১৯৬১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর। ইনিই একমাত্র নোবেল লরিয়েট, যিনি এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন তাঁর মৃত্যুর পরে। বিশ্বের শিশুদের কল্যাণে রত UNICEF ১৯৬৫ সালে এ পুরস্কারটি অর্জন করেছে।

এ বছরের নোবেল লরিয়েটদের নাম ঘোষিত হয়ে গেছে। তবে তাতে যে সব বাৎসরিক চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। বিশেষ করে সাহিত্যের পুরস্কারটি নিয়ে প্রতি বছরই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সাহিত্যের পুরস্কার বিতরণে সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কারণ অত্যধিক সুসাহিত্যিকের মধ্যে এক কি দুই জনকে এই পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত করা খুবই কঠিন। তাই এ বছরও বিশেষ সমালোচনার সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের পুরস্কারটি। এই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দুইজন ইহুদী সাহিত্যিকের মধ্যে—স্টকহলমের প্রবাসী শ্রীমতী নেলী শাক্স্ এবং জেরুজালেম নিবাসী সামুয়েল জোসেফ আগনন-এর মধ্যে। পুরস্কার ঘোষণার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বই-এর দোকানগুলিতে তাঁদের ছবি এবং বই-এর প্রদর্শনী করা হয়েছে। এঁদের লরিয়েট নির্বাচিত হওয়ায় বিশেষ করে হয়েছেন আরও দেশবাসী। তাঁদের মতে এ পুরস্কার সাধারণের বছরে যদি হরিবর সুগীবাকে দেওয়া হয়, তাতেও তাঁরা কিছুমাত্র আশ্চর্য হবেন না।

তা ছাড়া এবার এ পুরস্কার ইংরেজ সাহিত্যিক গ্রাহাম গ্রীন পাবেন সে রকম একটা গুজবও উঠেছিল শোনা যায়। অবশ্য আগেও কয়েকবার গ্রীন-এর নামে কানাঘুষো উঠেছিল। এমন কি, স্টকহলমের কয়েকটি বইয়ের দোকানে ঐ আশায় তাঁর প্রচুর বই মজুত করা হয়েছিল। তাঁরা এ বছরও

নিরাশ হলেন। তবে অনেক [illegible] সাহিত্যিকই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্যামুয়েল বেকেট, রবার্ট ফ্রস্ট, সমারসেট মম্, বের্টোল্ট ব্রেশট, ইবসেন এবং সুইডিশ লেখক স্ট্রিণ্ডবার্গেরও এই পুরস্কার পাবার সৌভাগ্য হয়নি। প্রায়ই শোনা যায় যে, সুইডিশ অ্যাকাডেমী এই পুরস্কার বিতরণ করার সময়ে সুইডেনের "নিরপেক্ষতা" এবং রাজনৈতিক ভারসাম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেন। গত বছর যখন শলোকভকে পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন সুইডেনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক বেশ ঘোরালো ছিল। অনেকের ধারণা, সুইডিশ অ্যাকাডেমী এ বছর এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার ছোট ছোট দেশগুলির প্রতি তাঁদের সম্প্রীতি দেখাবার কথা ভেবেছিলেন। ঐ দেশগুলিতে হয়ত সুযোগ্য সাহিত্যিক তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়েছেন।

শ্রীমতী নেলী শাক্‌স্ ১৮৯১ সালের ১০ ডিসেম্বর (নোবেল দিবস) জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিটলারের ইহুদীনিধন যজ্ঞের সময় প্রাণ বাঁচিয়ে ১৯৪০ সালে তিনি স্টকহলমে আসেন উদ্বাস্তু হয়ে। প্রসিদ্ধ সুইডিশ লেখিকা নোবেল লরিয়েট সেলমা লাগেরলফের ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি নাৎসী "কনসেনট্রেশন ক্যাম্প" থেকে ছাড়া পান। সেই থেকে তিনি সুইডেনে বাস করছেন এবং এখন এখানকার নাগরিক। স্টকহলমের দক্ষিণ অঞ্চলে এক শ্রমজীবী পল্লীতে এককক্ষবিশিষ্ট ছোট একটি ফ্ল্যাটে নিরিবিলি শান্তিপ্রিয় জীবন যাপন করছেন। জার্মান ভাষাতেই তাঁর লেখনী চলে। স্যামুয়েল আগননের বয়স ৭৮। জাতিতে ইস্রায়েলী, এবং নিজ ভাষাতেই তাঁর রচনা সম্ভার। জেরুজালেম শহরের উপকণ্ঠে তিনি সস্ত্রীক বাস করেন। ইংরেজী ভাষা তিনি একেবারেই জানেন না। তাঁর মতে এটা তাঁর পক্ষে মঙ্গলই, তা না হলে তাঁর রচনার মধ্যে ইংরাজী ভাষার কোনরকম প্রভাব অবশ্যই পড়ত।

এবারের পুরস্কারের পরিমাণ ২০ হাজার পাউণ্ড প্রায়। নেলী শাকস্ এবং আগনন এই টাকা সমভাগে ভাগ করে নেবেন। এই যুগের পুরস্কার পাওয়ার মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও এই দুই সাহিত্যিকের লেখনী চলে পৃথক পৃথক ভাষায়, তবু এই দুইজনের লেখার মধ্যে আছে একটা আধ্যাত্মিক যোগসূত্র—যার মাধ্যমে তাঁরা ইহুদী জীবনের সাংস্কৃতিক ধারাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই ভাবধারাটিকেই সুইডিশ অ্যাকাডেমী এবার সম্মানিত করলেন এঁদের পুরস্কৃত করে।

এবার পদার্থবিদ্যায় পুরস্কার পেয়েছেন প্যারিসের ইকোল নর্মাল সুপিরিয়রের

প্যারিসে নোবেলের বাড়ি। এখানে তিনি বহু বছর বাস করেন

অধ্যাপক আলফ্রেড কাসলার (৬৪)। অণুস্থিত হার্টজীয় রেসোনান্সের (Hertjian Resonance) আবিষ্কার এবং সেই সম্বন্ধে আলোকপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা —এই হল অধ্যাপক কাসলারের ক্ষেত্র। তাঁরই আবিষ্কারের ফলে 'LASER BEAM'-এর আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। আণবিক গঠন সংক্রান্ত তাঁর আবিষ্কৃত বহুবিধ জটিল ইলেকট্রনিক এবং আলোকীয় পন্থার ফলে অণুর মধ্যে পরমাণুমণ্ডলীর পরিচর্যা এবং বিন্যাস, উত্তেজিত অবস্থায় মৌলিক পদার্থের মধ্যে অণুর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিজ্ঞানীর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে। রসায়নের পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত রবার্ট মালিকেন (৭০)। অধ্যাপক মালিকেন মৌলিক পদার্থের অণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক যোজনা (Chemical bonding) এবং বহির্বস্থিত পরমাণুর প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর পদ্ধতির নাম Molecular Orbital Method।

চিকিৎসাবিদ্যায় পুরস্কার ভাগ হয়েছে দুইজন মার্কিন চিকিৎসকের মধ্যে। এঁরা হলেন নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইন্সটিটিউটের পেইটন রাউস ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস হাগিনস্। ডিরজিন্ট রাউস এখন ৮৭ বছরের বৃদ্ধ। প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি ক্যান্সার রোগের কারণ

সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে Virus দ্বারা এই রোগের পরিবহণ এবং সংক্রামণের বিষয়ে আবিষ্কার করেন। যদিও সেই সময়ে অনেকেই তাঁর আবিষ্কারের বিষয় নিয়ে পরিহাস এবং অবজ্ঞা দেখান, কিন্তু প্রায় বছর ২৫ ধরে তিনি এই বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যান, এবং পরে সকলে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হয়। প্রায় ২১ বছর আগে তিনি বয়সের অজুহাত দেখিয়ে অবসর গ্রহণ করেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাঁর গবেষণাগারে হাজির হন এবং নবীন গবেষকদের কাজে অনুপ্রেরণা যোগান।

শল্যবিদ হ্যাগিনসের বয়স ৬৫ এবং ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর কাজও প্রায় ২৫ বছরের। প্রোস্টেট ক্যান্সার নিরাময় সম্বন্ধে তাঁর হর্মোন ঘটিত অস্ত্রোপচার চিকিৎসা-জগতে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

কৃষ্ণা দত্ত

ছবিগুলি নোবেল ফাউণ্ডেশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

চুল পাতলা হওয়া

তরুণ [illegible] অধিকারী হয়েও হঠাৎ দেখবেন যে চুল ক্রমে উঠে যাচ্ছে, তাতে আপনার মাথায় অকালে টাক পড়ছে। এর কারণ হ'ল আপনার চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব।

মাথায় খুস্কি হওয়া

প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিত নয়। চামড়া কুঁচকিয়ে যায় ও শুকনো চামড়া উঠে যায় ফলে চুলের গোড়ায় সাদা ভাব দেখা যায়। খুস্কি থেকে [illegible] বিপদের এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে টাক পড়তে আর দেরী নেই।

চুল সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞতা কি ভাবে চুল ওঠার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, এই তিনজনকে তার যথাযথ নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। এরা বিপদের সঙ্কেত পাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবিধান করছেন না এবং এরা চুলের যত্ন নিতে অবহেলা করেই চলবেন। আর ফলে অবশেষে একদিন এর জন্য এদের আক্ষেপ করতে হবে। চুলের গোড়া একবার নষ্ট হয়ে গেলে কোনো চিকিৎসাতেই তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনিও কি বিপদের সঙ্কেতের লক্ষণ দেখে তাকে অবহেলা করেছেন? তাহলে এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হ'ল—পিওর সিলভিক্রিন।

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। এটি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে মালিশ করলে পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে স্থায়ী খাদ্যের শক্তিতে পুনর্জীবন দান করে।

সুতরাং আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এর চেয়ে সঠিক উপায় কিছু নেই।

চুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে আপনি আজই 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেন্ট D-7 সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরী সার্ভিস, পোষ্ট বক্স ৭২৭, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

পিওর সিলভিক্রিন

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এতে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস আছে। একমাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবার জন্য একটি সুন্দর ড্রেসিং। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এতে পিওর সিলভিক্রিন আছে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই (৩)

টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার শব্দের বাংলা করা হয়েছে 'অর্বুদ'। কিন্তু তাই বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে ক্যান্সার শব্দটির অনুবাদে কর্কট রোগ লেখা বোধ হয় সমীচীন হবে না। তার চেয়ে দুষ্ট অর্বুদ বললে বোধ হয় মানেটা বোঝা যায়। আমাদের আয়ুর্বেদে যে দুষ্টব্রণের উল্লেখ আছে সেটিও সম্ভবত ক্যান্সার। তবে সব অর্বুদ হলেই বিপদ হয় না। সেগুলি হচ্ছে সাধারণ টিউমার। কিন্তু সেটি দুষ্ট (ম্যালিগন্যান্ট) হয়ে উঠলে (যেমন কার্সিনোমা, সারকোমা, মেলানোমা ইত্যাদি) তখন সেটি হলো ক্যান্সার যা আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নরহন্তা। প্রথম আসন বোধ হয় হৃদরোগের প্রাপ্য। তাই সারা দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে এই মারাত্মক শত্রুকে জানবার বোঝবার চেষ্টা, কারণ তার স্বরূপ না জানলে, তার দুর্বল জায়গাটি কোনখানে তার হদিস না পেলে, তার প্রতিষেধ তৈরি হবে কি করে। টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বহু রোগের টিকা জানা গিয়েছে এবং ওষুধও বার হয়েছে। সেই সব রোগের বিরুদ্ধে সুফল দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ক্যান্সার সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না।

আমাদের ভারতে ক্যান্সার কংগ্রেস হয়ে গেল এই তৃতীয়বার। কংগ্রেসে দেশ বিদেশ থেকে গণ্যমান্য ক্যান্সার বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়ে যা বলে গেলেন তা থেকে এই আশা করা অন্যায় হবে না যে, ক্যান্সার প্রতিরোধের ঐ দিনের আর সূর্যোদয়ের আকাশে পূর্বাভাষিত হতে বাকি খুব বেশি দেরি নেই। আংশিক সাফল্য তো ইতিমধ্যেই লাভ হয়েছে এমন কি আমাদের এই দেশেও, যেখানে কি সরকারী কি বেসরকারী মহল, মুষ্টিমেয় থেকেই ফলপ্রসূ ক্যান্সার নিবারণী গবেষণা শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার দিকে সেরকম কোন গা নেই। এখানেও ক্যান্সার চিকিৎসকেরা রোগ সারানোর যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন ও করছেন প্রধানত নিজেদের উৎসাহ ও আয়াস প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেরিকায় ক্যান্সার গবেষণার জন্য বেসরকারী মহল থেকে ৫ কোটি ডলার দান করা হয়। রাশিয়ায় ওইরকম দানের প্রশ্ন নেই। সেখানে সরকারী খরচায় সারা দেশে আড়াই শোরও বেশি ক্যান্সার ক্লিনিকের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রধান লক্ষ্য শুধু ক্যান্সার সারানো নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হচ্ছে রোগ হবার আগে তার প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সাধারণ টিউমার যাতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সেখানে এই চিকিৎসার সমস্ত খরচ সরকারের। এ ছাড়া ঐ সব দেশে জনসাধারণকে ক্যান্সার সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থা আছে, ক্যান্সার রোগীদের নাম রেজিস্ট্রী করে রাখার নিয়ম আছে, যে দুটি অত্যন্ত জরুরী। আমাদের দেশে এই সবে রেজিস্ট্রেশন চালু হচ্ছে। তারপর ক্যান্সারের চিকিৎসার যেসব আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে সেগুলি আমদানি করার সঙ্গতির অভাব এবং বৈদেশিক মুদ্রা খাতের অনুমতি মেলে না। কিন্তু [illegible] ও বাণী শুনেছি ও শিখছি [illegible] সমস্যার সমাধান কি হবে? [illegible] ব্যাধির যত সুরাহা হচ্ছে [illegible] মানুষের আয়ু বাড়ছে। ক্যান্সার [illegible] পরিণত বয়সেই বেশি দেখা যায়। তাই পরিণত বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে বলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যাও বাড়বার সম্ভাবনা। তাছাড়া অন্য রোগে মৃত্যুর সংখ্যা যত কমে যাচ্ছে ততই [illegible] মৃত্যু হার ক্যান্সারের (এবং হৃদরোগের) ভাগে বেশি পড়ছে। শুধু ভারতে ক্যান্সার রোগীর প্রকৃত সংখ্যা কি আমরা জানি? রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হলেও কি জানতে পারব? দূর-দূরান্তরের গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যে (যারা দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন) এবং শহরের মজুর ও কুলীদের মধ্যে কত লোকের ক্যান্সার হচ্ছে বা ক্যান্সারে কত লোক মারা যাচ্ছে তার হিসাব পাওয়া যাবে কি? কোন্ ধরনের ক্যান্সারের সংখ্যা কত, তার হিসাবের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট (যিনি কলকাতায়

আমেরিকায় এই আন্তর্জাতিক মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রে যে সব বিষয় নিয়ে কাজ হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে ক্যান্সার

ক্যান্সার কংগ্রেসে এসেছিলেন) আচার্য নিকোলাই ব্লখিন লিখছেন যে, অক্টোবর বিপ্লবের আগে তাঁর দেশেও এই সব তথ্য জানবার কোন উপায় ছিল না।

ক্যান্সার যে শুধু মানুষের হয় তা নয়। পশু পাখি এমন কি গাছপালারও অর্বুদ ও ক্যান্সার হয়ে আসছে পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের আগে থেকে। সোজা কথায় বলা যায় যে বহুকোষী জীবমাত্রেই ক্যান্সারের শিকার হতে পারে। খৃস্টের জন্মের বহু আগেই মধ্যপ্রাচ্যের পাশ্চাত্যের আয়ুর্বেদে এই রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ১৫ শ' শতাব্দীর মিশরীয় পাণ্ডুলিপিতে (পাপিরাস) সমাহিত কতকগুলি মমিতে হাড়ের ক্যান্সারের লক্ষণ আজও সুস্পষ্ট। গ্রীস ও ভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতেও রোগটির কথা লেখা আছে। তাছাড়া 'ক্যান্সার' শব্দটিই তো সেই আমলের। খৃস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে হিপোক্রেটেস মানুষের ক্যান্সারের বর্ণনা দিয়ে চিকিৎসার অসাফল্যের কথাও উল্লেখ করে যান। তার ১২০ বছর পরে গ্রীক শল্য চিকিৎসক লিওনিদাস স্তনের ক্যান্সারের উপর অস্ত্রোপচার করে সেই জায়গাটা গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেন। খৃস্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত রোমান চিকিৎসক গালেনের ধারণা ছিল যে রক্তের মধ্যে অত্যধিক 'কালো পিত্ত' মিশলে ক্যান্সার হয়। এই ধারণা ১৮ শ' শতাব্দীতেও বেঁচে ছিল।

আমাদের যুগের দুটি মহাযুদ্ধের তাগিদে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তার ফলে ক্যান্সার রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসার পথ হয়েছে অনেকটা সুগম। দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি সেগুলি গত ৭০।৮০ বছরের অক্লান্ত পরীক্ষামূলক গবেষণার ফল। ক্যান্সার সম্পর্কে তাত্ত্বিক গবেষণার বয়স তার চেয়েও অনেক কম মাত্র ৩০।৪০ বছর। এই ৩০।৪০ বছরের মধ্যে শল্য চিকিৎসার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে বলে অস্ত্রোপচারই এতদিন ছিল ক্যান্সার চিকিৎসার প্রধান উপায়। এক্স রশ্মি ও রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয় ৭০ বছর আগে। ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিকরা ঐ দুটি জিনিসকে ক্যান্সার নিরাময়ে অস্ত্রোপচারের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তার পর আসে রেডিও-আইসোটোপ বছর ৩৫ আগে যা আজ ব্যাপকভাবে ক্যান্সার থেরাপিতে ব্যবহার হচ্ছে। পশুর শরীরে ক্যান্সার উৎপাদক ভাইরাসের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকরা জেনেছিলেন তাও ৫৫ বছর হলো। আর ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মতে গবেষণা হচ্ছে মাত্র ৩০।৩৫ বছর। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ক্যান্সারের রাসায়নিক থেরাপির ইতিহাস ২০ বছরের বেশি নয়। কিন্তু এত অল্প সময়ে কি বিজ্ঞানের কোন নতুন ক্ষেত্রের গঠন সম্পূর্ণ হতে পারে। তাই ক্যান্সারের উৎপত্তি ও চিকিৎসা নিয়ে এখনো বাদানুবাদ এবং ভিন্ন ভিন্ন মত ও অনুমিতির অস্তিত্ব আছে।

ক্যান্সার হচ্ছে দেহকোষের এমন এক ব্যাধি যাতে শরীরের স্থান বিশেষে কোষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এবং তার ফলে সেই জায়গাটি ফুলে উঠতে থাকে। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ (ধোঁয়া, তামাক ইত্যাদি), তেজস্ক্রিয়া, হোর্মোনের গণ্ডগোল ও সম্ভবত ভাইরাস, এই ৪টি হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের মতে ক্যান্সারের সহায়। এগুলি মানুষের দেহের গোটা জৈবক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে যার ফলে প্রোটিনের ভাঙ্গন গড়নের (বিপাক ক্রিয়া) স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। তাই থেকে ক্যান্সারের

গান্ধীজীর পিতৃ হৃদয়

পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়েছি আমি। গিয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়; গিয়েছি ইউরোপে; গিয়েছি এশিয়ার দেশে দেশে। এই সফরকালে প্রায়ই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতুম আমি। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "এত অসংখ্য মানুষের উপরে গান্ধীজীর এই যে অসামান্য প্রভাব, এর কারণ কী?" উত্তরে বলি, এই প্রভাবের মূলে রয়েছে তাঁর ভালবাসা। তাঁর ভালবাসার ক্ষমতা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। এতখানি ভালবাসতেন বলেই সকলে খুব সহজেই তাঁর বশীভূত হত। তাঁর ভালবাসা নৈর্ব্যক্তিক ছিল না; শুধু মানবজাতিকে ভালবেসেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ব্যক্তি-মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, তার ব্যক্তিগত দুঃখে-সুখে সাড়া দিয়েছেন। অনায়াসেই সবাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারত; যতই ব্যস্ত থাকুন, তাদের তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। সকলের সঙ্গেই দেখা করতেন তিনি; সকলের কথাই ভাবতেন। দূরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিত্তপট থেকে কেউ মুছে যেত না। কী করে যে এত অসংখ্য মানুষকে তিনি তাঁর চিন্তায় এবং অনুভূতিতে স্থান দিয়েছিলেন, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তিনি না ছিলেন রাষ্ট্রপতি; না ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনী ছিল না। কিংবা এমন প্রশাসনযন্ত্রও তাঁর হাতে ছিল না, যার দ্বারা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তিনি অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে পারেন। কোটি কোটি মানুষ তবু তাঁকে মান্য করেছে। তাঁর দেশবাসীর একাংশের কৃত কোনও অন্যায়ের দায় যখনই তিনি নিজের উপরে টেনে নিয়েছেন, এবং বলেছেন যে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য দিন কয়েকের জন্য তিনি অনশন করবেন, সমগ্র দেশ তখনই বেদনায় উদ্বেগে উত্তাল হয়ে উঠত। দেশবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহশীল পিতা; আর তাই তাঁকে অনশন করতে দেখলে দেশবাসীর বেদনার সীমা থাকত না। দেবতারাও তো পিতার সম্মান পান। কিন্তু পিতা-গান্ধী দেবতার মত দূরবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পার্থিব পিতা; তিনি ছিলেন কাছের মানুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলত; তাঁর কথায় সায় না দিয়ে নিরস্ত হওয়া চলত। কিন্তু তাঁর স্নেহের উৎস তাতে শুকিয়ে যেত না। তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে যখন কেউ বিপদে পড়ত, তখনও তার জন্য তিনি মমতা বোধ করতেন। "আমি তো তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম"—এমন কথা বলে মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মানুষ তিনি ছিলেন না। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই কথা বলি।

১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর নাগাদই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বেধেছে, তা মেটানো সম্ভব নয়। অন্তর্বর্তী সরকারে এই দুই দলের প্রতিনিধিই ছিলেন, এবং সেখানেও তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। স্থির ছিল যে, ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। কিন্তু তাতে যোগদানের এবং বাকী সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে সংবিধান রচনায় কোনও উদ্যোগই মুসলিম লীগের তরফে দেখা যাচ্ছিল না। সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রস্তাবটির প্রতি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে মুসলিম লীগ বোম্বাইয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তাও তারা নাকচ করেনি। ফলে, মুসলিম লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিত, তবে সেইটেই হত যুক্তিসংগত ব্যাপার। কিন্তু মুসলিম লীগ যুক্তির ধার ধারেনি; নিতান্তই কুযুক্তিবলে তারা সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। এ ব্যাপারে মিঃ জিন্নার বক্তব্য ছিল এই যে, সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি কংগ্রেসও মেনে নেয়নি। তিনি বললেন যে, এক দিকে আসাম-বাংলা এবং অন্য দিকে পাঞ্জাব-সীমান্তপ্রদেশ — বেলুচিস্তান - সিন্ধুর প্রস্তাবিত গোষ্ঠী-বিন্যাসে কংগ্রেসের মনোগত আপত্তি রয়েছে। ফলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ভারতে আসবার আগে যে অবস্থা ছিল, ভারতীয় রাজনীতি আবার সেই অবস্থাতেই ফিরে গিয়েছে। সেই পুরনো প্রশ্নটাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, "পাকিস্তান, না অখণ্ড ভারত?"

এই অবস্থায় ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার সিদ্ধান্ত করলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য আরও একবার তাঁরা চেষ্টা করে দেখবেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিবদমান দলের নেতাদের নিয়ে লনডনে এক বৈঠক বসাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। শ্রীনেহরু প্রথমে লনডন যেতে রাজী হন নি; মিঃ অ্যাটলি একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে রাজী করালেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীনেহরু সর্দার বলদেও সিং, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ লনডনে গিয়ে পৌঁছলেন। লনডন সম্মেলনেও অবশ্য মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ হল। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রমিক সরকার এক বিবৃতি প্রচার করলেন। তাতে তাঁরা প্রাদেশিক গোষ্ঠী-বিন্যাস সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যকে আবার নতুন করে অনুমোদন করলেন, এবং কংগ্রেসকে এই অনুরোধ জানালেন যে, কংগ্রেস যেন এই বক্তব্যকে মেনে নিয়ে গণ-পরিষদে মুসলিম লীগের যোগদানের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য একই সঙ্গে এ কথাও বললেন যে, এই পুনরনুমোদন সত্ত্বেও যদি গণ-পরিষদ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই মৌলিক বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য ভারতবর্ষের ফেডারেল কোর্টে এটিকে পেশ করা উচিত, তবে তা করা যেতে পারে। তবে সে কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে, এবং ফেডারেল কোর্ট যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রায় দিচ্ছেন, গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত দুই প্রদেশ-গোষ্ঠীর অংশের বৈঠক ততক্ষণ মুলতুবী থাকবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করলেন যে, অন্যান্য পক্ষ যদি এই বিষয়টিকে ফেডারেল কোর্টে পেশ করতে কিংবা কোর্টের রায় মেনে নিতে রাজী না থাকে, তবে এটিকে ফেডারেল কোর্টে পেশ করবার কোনও যুক্তি নেই। কমিটি পুনর্বার তাঁদের এই অভিমত জানালেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়েছিল; সে ক্ষেত্রে গণ-পরিষদের বিভিন্ন অংশে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা ব্রিটিশ সরকার দিয়েছেন, তা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের মূল নীতিরই বিরোধী। গোটা ব্যাপারটার মধ্য থেকে এই সার সত্যটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গান্ধীজী তাঁর ১৪ই নভেম্বরের চিঠিতে (যার বিষয়বস্তু আমি ইতিপূর্বেই ক্রিপস এবং পেথিক-লরেন্সকে জানিয়েছিলাম) আমাকে যা লিখেছিলেন, তা-ই ঠিক। গান্ধীজী তাতে লিখেছিলেন, "ব্রিটিশরা যদি ভেবে থাকে যে, ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এ দেশ পরিত্যাগ করবে না, তা হলে আমার মতে তারা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছে। যা তারা করতে পারে ও যা তাদের করতেই হবে, তা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক ও যোগ্য দলের হাতে তাদের ষোল আনা ক্ষমতা তুলে দিতে হবে; এবং যথাসম্ভব দ্রুত সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অংশকে তাদের অপসারণ করতে হবে ও বাকী অংশকে ভেঙে দিতে হবে। ...শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র এইটিই হচ্ছে আদর্শ পন্থা। ক্যাবিনেট এ কথা এখনও বুঝতে পারেন নি।"

সত্যিই শ্রমিক সরকার তা বুঝতে পারেন নি। এই অভিমতকে মেনে নেননি তাঁরা। পক্ষান্তরে কংগ্রেস আর লীগের নেতাদের জন্য তাঁরা শক্-ট্রিটমেনটের ব্যবস্থা করেছিলেন। ২০শে ফেবরুয়ারি তারিখে কমনস সভায় মিঃ অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে, প্রধান দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা হোক আর না-ই হোক, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে কৃতসংকল্প। মীমাংসা যদি না-ই হয়, তবে দরকার হলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির হাতে ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে কিস্তিতে ক্ষমতা তুলে দিতেও প্রস্তুত থাকবেন; এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কার কাছে হস্তান্তরিত করা যায়, তাও তাঁদের নতুন করে ভেবে দেখতে হবে: "ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কোনও এক কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে সামগ্রিকভাবে সেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে, নাকি কয়েকটি অঞ্চলে বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের হাতে, অথবা অন্য এমন কোনও পন্থায় যা সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গতও বলে মনে হয় ও ভারতীয় জনসাধারণের যাতে সর্বাধিক কল্যাণ হয়", ব্রিটিশ সরকার তা ভেবে দেখবেন। ওই একই বিবৃতিতে মিঃ অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউনটব্যাটেনকে ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদে নিয়োগ করা হবে।

বল্লভভাই প্যাটেল এই অবস্থায় স্থির করেন যে, সামনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাস আমার পক্ষে লনডনে থাকা দরকার। তথ্য ও বেতার দপ্তর এই সময়ে লনডনের ভারতীয় হাই-কমিশনে একজন জনসংযোগ অফিসার নিয়োগের কথা ভাবছিল। এই দপ্তরটিও ছিল সর্দার প্যাটেলেরই হাতে। তিনি আমাকে এই কাজটি নিতে বললেন। আমি তাঁকে জানালুম যে, কাজটা আমার ভালই লাগবে, তবে গান্ধীজীর অনুমোদন ব্যতিরেকে এ কাজ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজী তখন নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যই ছিল দুর্গত মানুষের পক্ষে একটি পরম সান্ত্বনার ব্যাপার। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবনে সেই সান্ত্বনাই বিলিয়ে যাচ্ছিলেন গান্ধীজী। বল্লভভাই স্বীকার করলেন যে, নোয়াখালিতে গিয়ে গান্ধীজীকে এই কাজের কথাটা আমার বলা দরকার। গান্ধীজী তখন যেখানে ছিলেন, নোয়াখালির সেই সুদূর অখ্যাত গ্রামে গিয়ে বল্লভভাইয়ের প্রস্তাবটা তাঁকে আমি জানালাম। কথাটা শুনবামাত্র গান্ধীজী বললেন, "সেখানে তো কৃষ্ণ মেননই রয়েছে। লনডনে সে-ই হচ্ছে জওহরলালের আপন মানুষ। তুমি সেখানে যেতে চাইছ কেন? না, এই প্রস্তাবটা আমার মনঃপূত নয়। আমার ধারণা, সেখানে গিয়ে তুমি ঝঞ্ঝাটে পড়বে, এবং তোমার জন্য আমাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। না, তুমি ঝঞ্ঝাটে পড়ো, এ আমি চাই না। কী জানো, বল্লভভাই হচ্ছে শক্তিমান মানুষ বিরোধিতার মোকাবিলা করতে তার ভালই লাগে। কিন্তু সবাই তো আর তার মত মানুষ নয়, তারা ঝঞ্ঝাট সামলাতে পারে না। এইটে বল্লভভাই বোঝে না। না, তার প্রস্তাবে আমি খুশী হতে পারছি না। তুমি বরং বল্লভভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আর-একবার কথা বলে দেখ। জওহরলালকেও সব জানাও। তারা যা ভাল বোঝে, তাই করো।"

গান্ধীজী আমাকে যা বললেন, নয়াদিল্লিতে ফিরে বল্লভভাইকে তা আমি জানালাম। তিনি বললেন, "ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে আবার কৃষ্ণ মেননের সম্পর্ক কী? ভারত সরকারের সঙ্গে কৃষ্ণ মেননের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি সেখানে বেসরকারীভাবে আছেন। ইনডিয়া লীগ চালাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় হাই-কমিশনের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? ক্রিপস আর পেথিক-লরেন্সের মত ক্ষমতাশীল মানুষদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ, এবং তুমি যে তাঁদের আস্থাভাজন, এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য মেননের কিছুটা ঈর্ষা থাকা সম্ভব। তাঁর পথ তাই তোমার পক্ষে না-মাড়ানোই ভাল। তবে, তুমি তো যাচ্ছ সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে। কৃষ্ণ মেনন তোমার কী করবেন? বাপু এ-সব কথা বোঝেন না। কী করে বুঝবেন; তাঁকে তো আর সরকারী দপ্তর চালাতে হয় না। আমার তো মনে হয়, তোমার লনডনে যাওয়াই উচিত। মাউন্টব্যাটেন আমাদের কাছে নতুন লোক। তিনি যে কেমন লোক, তা আমরা জানি না। ক্রিপস আর পেথিক-লরেন্সের সঙ্গে তাই আমাদের একটা সরাসরি যোগ-সম্পর্ক থাকা দরকার।"

আমার যে লনডনে যাওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত করবার পরে কিন্তু বল্লভভাইকে কিছু অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। আমার নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে ভাইসরয় তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন। ভাইসরয় এই অভিমত জানালেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং ভারত সরকারের সামগ্রিক বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু বল্লভভাই ছিলেন শক্ত ধাতের মানুষ। ভাইসরয়ের চিঠির উত্তরে তিনি জানালেন, এটা লনডনে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রশ্ন নয়। সামান্য একজন জন-সংযোগ অফিসার নিয়োগের

ব্যাপার। কাজটা যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট, তাঁর ভাল একটা ডিগরী আছে, জন-সংযোগের অভিজ্ঞতাও আছে। কাজের বিচারে এমন মানুষের মূল্য [illegible] অসীম। সুতরাং তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে এ ক্ষেত্রে তিনি ভাইসরয়ের পরামর্শ মেনে নিতে পারছেন না। বল্লভভাই তখন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতেন না যে, ছ মাস না কাটতেই কৃষ্ণ মেননকে লনডনে ভারতীয় হাই-কমিশনার পদে নিয়োগ করা হবে। তা যদি জানতেন তা হলে আমাকে তিনি পাঠাতেন না। [illegible] তিনি আমাকে নিতে বললেন, [illegible] দিন দুয়েক, এবং সেই জন্যেই [illegible] হচ্ছে ইণ্ডিয়া। ঠিক [illegible] আমি [illegible] অতঃপর [illegible] বিজ্ঞাপকের কথা আমি [illegible]।

[illegible] সম্পর্কে আমি নয়া- [illegible] লনডন যাত্রা করি। [illegible] যাবার জন্য [illegible] একটা টেলিগ্রাম এল। তাতে বলা হয়েছিল : "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। বাপু।"

নয়াদিল্লি থেকে রওনা হবার আগে শ্রীনেহরুর সঙ্গেও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার কাছে তাঁর দরজা তখন ছিল অবারিত। আমি তাঁকে জানালাম যে, বল্লভভাই আমাকে লনডনে পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। কথাটা শুনে যে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হলেন, এমন মনে হল না। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "সেখানে তো স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে প্রায়ই তোমার দেখা হবে, তাই না?" বললুম, সত্যই তাঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে চাই। শুনে শ্রীনেহরু মন্তব্য করলেন, "কী জানো, তাঁকে তুমি যত বেশী দেখবে, ততই কম জানবে।" আমার মনে হল, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতন মানুষের সম্পর্কে এ এক বিচিত্র মন্তব্য। যাই হোক, কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে শ্রীনেহরুর কিছু আশঙ্কা ছিল; আমারও ভয় ছিল যে, আমার কাজে তিনি ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন। তাই, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে, শ্রীনেহরুর কাছে আমি একটি পরিচয়-পত্র চাইলুম। শ্রীনেহরু সেটা লিখে দিলেন। সংক্ষিপ্ত, নিরুত্তাপ পরিচয়-পত্র। তাতে বলা হল যে, ভারত-সচিবের দপ্তর থেকে ভারতীয় তথ্য বিভাগের ভার গ্রহণের জন্য বল্লভভাই প্যাটেল আমাকে লনডন পাঠাচ্ছেন (আমার ধারণা, নেহরু তাঁর চিঠিতে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, এই নিয়োগের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই); এই ধরনের কাজে আমার যোগ্যতা কী, তা তিনি জানেন না; তবে হ্যাঁ, কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তিনি আমাকে যোগাযোগ রাখতে বলেছেন।

আমার মনে হল, এ তো পরিচয়-পত্র নয়, সাবধান-বাণী। তবে যথাসময়ে আমি এটি কৃষ্ণ মেননের কাছে পেশ করলুম।

ক্রিপসের কাছে লেখা বল্লভভাইয়ের একটি চিঠিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলুম। তাতে ক্রিপসের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেল তা যেমন উদার তেমনি অকপট। বল্লভভাইকে লেখা আমার চিঠিতে তা আমি জানিয়েছিলাম। আমার সেই চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ইনডিয়া হাউস,
লনডন, ডবল্‌ সি ২,
১৪ই মার্চ, ১৯৪৭

"প্রিয় সদার,

আপনার কাছে চিঠি লিখতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে ব্যাপারটা এই যে, এখানকার মানুষদের মনের খবর জেনেছি, এটা না বোঝা পর্যন্ত আমি চিঠি লিখতে চাইনি। ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে যে তিনজন মানুষ জড়িত, সেই ক্রিপস, অ্যাটলি আর পেথিক-লরেনসের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমি দেখা করেছি। এখন আমি অবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত আপনাকে জানাতে পারি।

প্রথমেই আপনাকে ক্রিপসের কথা জানাব। ভারতবর্ষের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, এ ব্যাপারে ক্রিপসই এখানে কেন্দ্র-চরিত্র। ৩রা মার্চ এখানে এসে পৌঁছবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করি; নৈশাহারের পর রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ দু ঘণ্টা, তাঁর সঙ্গে আমি সেদিন আলোচনা চালিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বললাম যে, ২০শে ফেবরুয়ারি তারিখের বিবৃতিটি যখন প্রচারিত হয়,

চাইছে। ক্রিপসের ধারণা, লিয়াকত আলির প্রশ্নের রীতিটা পরিচ্ছন্ন হয় নি। সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার চান যে, মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে কংগ্রেস থেকে এ-সব প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দেওয়া হোক। নতুন ভাইসরয় ভারতবর্ষে গিয়ে পেঁছিবার আগেই কংগ্রেস যদি তা করতে প্রস্তুত থাকে, বাদ-বাকী কাজ তা হলে ব্রিটিশ সরকারই করতে পারবেন।

অ্যাটলি, ক্রিপস আর পেথিক-লরেন্স আমাকে যা বলেছেন, তা আমি সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি। টুকরো টুকরো করে, শৃঙ্খলাহীনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে বলে তাঁরা মনে করেন না; তেমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছেও তাঁদের নেই। তাঁরা মনে করেন যে, মিঃ জিন্না তো বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি শিগগিরই বুঝতে পারবেন যে, যে ধরনের পাকিস্তান তাঁর পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা পেয়ে কোনও লাভ হবে না। মিঃ জিন্নার চিত্তে এই উপলব্ধি জাগ্রত হবার পর কংগ্রেস যদি জানিয়ে দেয় যে, কী অর্থে সে ব্রিটিশ ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে, এঁদের পক্ষে তা হলে মাউন্ট-ব্যাটেনকে এমন নির্দেশ দিয়ে পাঠানো সম্ভব হবে, যাতে করে তিনি মুসলিম লীগকে গণ-পরিষদে নিয়ে আসতে পারবেন।

অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁরা ডোমিনিয়ন সরকারের মর্যাদা দিতে সম্মত কিনা, এই প্রশ্নটিও আমি তুলেছিলাম। বর্তমান সরকারকে কীভাবে ডোমিনিয়ন সরকারে রূপান্তরিত করা যায়, নয়াদিল্লি থেকে যাত্রা করবার দিন ভি পি মেনন সে বিষয়ে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া-পরিকল্পনা* দিয়েছিলেন। সেটি নিয়েও ক্রিপসের সঙ্গে আমি আলোচনা করি। ক্রিপস এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে পেথিক-লরেন্স এটিকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখছেন। আমার ধারণা, অন্তর্বর্তী সরকারকে এঁরা ডোমিনিয়ন সরকার হিসেবে, এবং পণ্ডিতজীকে তার কার্যত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, গণ্য করতে রাজী হবেন না। এঁদের যুক্তি এই যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে তো এঁরা বিদায়ই নেবেন, এবং মাঝখানের এই কয়েকটা মাস উত্তীর্ণ হবার পরেই তো ভারতবর্ষ ষোল আনা স্বাধীন হবে, তা হলে আর ব্রিটিশ সরকার এখন ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নেবেন কেন? অন্তর্বর্তী সরকারকে ডোমিনিয়ন সরকারের মর্যাদা দেবার অর্থই তো কংগ্রেস ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে প্রকৃত ও পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া। তা এঁরা করতে রাজী নন। মুসলিম লীগ সব সময়েই এর বিরোধিতা করেছে, এবং ব্রিটিশ সরকারও মনে করেন যে, এতে করে মুসলিমদের প্রতি অবিচার করা হবে, এবং কাজটা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অন্যায় হবে। আর তা ছাড়া, যার মেয়াদ হবে এখন থেকে ১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত, তাঁদের পক্ষে এখন একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করবার দরকার আছে বলেও তাঁরা মনে করেন না। তবে, ব্রিটিশ সরকারের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, কংগ্রেস যদি ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবের ব্রিটিশ ব্যাখ্যাটিকে পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে, তা হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে নতুন ভাইসরয়কে এমন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে, যাতে করে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে একটা যথার্থ ও কার্যক্ষম ক্যাবিনেটে পরিণত করতে পারেন। কথাটার অর্থ এই নয় যে, গত অগস্ট মাসের মতন আবার তাঁরা সরকার গঠনের জন্য পণ্ডিতজীকে আহ্বান করতে প্রস্তুত থাকবেন। নতুন ভাইসরয়কে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে এঁদের যথেষ্ট সতর্ক দেখা গেল। তবে এও অসম্ভব নয় যে, নতুন ভাইসরয় সরকারের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলবেন এবং তারপর আবার নতুন করে সরকার গঠন করবেন। মুসলিমদের যখন আবার নতুন করে সরকারে যোগ দিতে বলা হবে, তখন তাদের হয়ত জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সরকারকে কাজ করতে হবে একটি ঐক্যবদ্ধ ক্যাবিনেট হিসেবে; পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান পৃথক দুটি দল হিসেবে নয়। ভাইসরয় নিজেই হবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। এঁদের বিশ্বাস, ভাইসরয়ের সঙ্গে পণ্ডিতজীর সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হবে; কখনও কোনও অসুবিধে দেখা দেবে বলে এঁরা মনে করেন না। আমি এঁদের মন যতটা বুঝতে পারছি, তাতে মনে হয় নতুন ভাইসরয়কে এ ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হবে, যাতে নিজের দায়িত্বে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ক্রিপসকে আমি বললাম যে, ব্রিটিশ ব্যাখ্যাটিকে যেভাবে তাঁরা মেনে নিতে বলছেন, সেভাবে মেনে নিলে বস্তুত আসামকে বাংলার হাতে সমর্পণ করা হয়, এবং বাংলার প্রতিনিধিরাই সে ক্ষেত্রে আসামের সংবিধান সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। এ ব্যাপারে এঁদের উত্তর এই যে, 'গ' শ্রেণীতে বাংলার প্রতিনিধিরা যে একদল বিবেকহীন মানুষ হবেন, আগে থাকতেই এমন কথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়; আসাম সম্পর্কে সুবিচার-অবিচারের দায়িত্বটা তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। সত্যিই যদি তাঁরা অবিচার করেন, তা হলে কী হবে—এ সম্পর্কে এঁদের উত্তর এই যে, তখনই সেটা ভেবে দেখা যাবে; বাংলার প্রতিনিধিরা আসামের প্রতি অবিচার করলে কী হবে না-হবে আগে থাকতেই তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যে-সব অসুবিধে দেখা দিয়েছে, তার জন্যে এঁরা বাপুকে দায়ী করেন।

উপরে যা বললাম, নতুন ভাইসরয়ের কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যেতে পারে, এর থেকেই আপনি তার একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আমরা যদি তাঁর সম্পর্কে নিরঙ্কুশ বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করি, তাতে ক্ষতি কিছুই হবে না, উপরন্তু অনেক লাভ হতে পারে। এ বিষয়ে পরে আবার লিখব।

আমার জীবন এখানে সাক্ষাৎকারে ঠাসা। এখানে আমার আগমনে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমার সময়ের বেশীর ভাগ তাতেই কাটছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকদেরও অধিকাংশের সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করেছি। 'টাইমস' পত্রিকায় সম্প্রতি যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরিয়েছে, তা হয়ত আপনি দেখে থাকবেন। নিবন্ধটিতে মোটামুটি উপকারই হয়েছে। শিগগিরই আমি আমার ছোট্ট দপ্তরটি গড়ে তুলে জয়েসের কাছ থেকে দায়িত্বভার নিয়ে নিতে পারব। জয়েসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, এবং ভারত-সচিবের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন এ সম্পর্কে আমি তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছি।

আমাদের ভালবাসা জানাই।

সুধীর"

(ক্রমশ)

---

* শ্রী ভি পি মেনন তাঁর 'ট্রানসফার অব পাওয়ার ইন ইনডিয়া' ("ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর') নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, একজন 'বিশেষ দূত'-এর মারফতে এই পরিকল্পনাটি তিনি ভারত-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুস্থ,
চকচকে
চুলের
জন্য...

টাটার সুগন্ধিত
কোকোনাট হেয়ার অয়েল,
যাতে আছে বিশুদ্ধ নারকেল তেল।

বিচক্ষণ মায়েরা জানেন যে টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েলে শুধু বিশুদ্ধ নারকেল তেল আছে। এতে চুলের গোড়া পুষ্ট করে, চুল ঘন ও সুন্দর ক'রে তোলে। টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল চার রকমের মনোরম সুগন্ধে পাওয়া যায়—গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, চামেলী ও পুষ্প।

চুল সবসময় সুন্দর রাখবার জন্য টাটার সুগন্ধিত কোকোনাট হেয়ার অয়েল

Tata's Perfumed HAIR OIL COCONUT

ত্রিলোচন কলমচি

শ্মশান-বন্ধু

'আর আপনার হবি?'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'মড়াপোড়ানো।'

চমকে ওঠা উচিত ছিল আমার কিন্তু তার বদলে শুধু একজনের নামই মনে পড়ল। তিনি ঘণ্টাদা, তাঁরও এই 'হবি' ছিল। ধুতি পাঞ্জাবি গামছার একটা সেট প্যাকেট বেঁধে অফিসে রেখে দিতেন তিনি। কি জানি কখন কোথা থেকে 'কল' আসে। সব দিন রাতে বাড়ি ফেরাও হত না। বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাঁর নাম দিয়েছিল, 'মার্ট ইন বার্ন'।

প্রকৃত সমাজসেবী ছিলেন ঘণ্টাদা। মড়ার [illegible] কোনো পক্ষপাত ছিল না। পাড়ার বিয়েতে-বউভাতে শ্রাদ্ধে ঘণ্টাদাকে ওই একই পোশাকে দেখেছি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, খালি পা। গামছাটা শুধু অ্যাপ্রনের ভঙ্গিতে কোমরে বাঁধা, হাতে লুচির ঝুড়ি, পোলাও অথবা মাংস কিংবা মাছের বালতি। বিশ বছর ধরে ঘণ্টাদা যত জনকে পুড়িয়েছেন তার অর্ধেককেও যদি নিজের হাতে মারতে পারতেন তবে শাস্ত্রমতে শতমারী বৈদ্য হতে পারতেন নিশ্চয়। পিতামহলোক শেষ করে পিতৃলোক এবং তারপর নিজের জেনারেশনের অনেককে পুড়িয়েছেন ঘণ্টাদা, কিংবা বরং বলতে গেলে আর এক ধাপ এগিয়েই গিয়েছিলেন তিনি। পরের জেনারেশনের গুটিকতক নাবালককেও দাহ করে গেছেন।

'কি, আমার হবি শুনে ঘাবড়ে গেলেন নাকি?'

বললাম, 'না আপনারই মত আর একজনের কথা মনে পড়ল।'

'তাই নাকি।' ভদ্রলোক উৎসুক হলেন, 'কোন্ মহল্লায়?'

পাড়ার নাম বলতে মাথা নেড়ে বললেন,

নিট পাঁচ ফুট কিনা

'আমি শ্মশান [illegible] করেছিলাম।'

হেসে বললাম, 'তাই বলুন। ঘণ্টাদার কনস্টিটুয়েন্সি ছিল নিমতলা [illegible]।'

হাসলেন ভদ্রলোক। আমিও হাসলাম, 'সত্যি খুব পপুলার ছিলেন। ইজিলি দাঁড়িয়ে যেতে পারতেন এবারের ইলেকশনে।'

'যা বলেছেন, হয়ত জিতেও যেতেন, মরা লোকের যদি ভোট থাকতো।'

'থাকতো না কেন?' আমি বলি, 'ভোটার লিস্টে তো মরা লোকের নামই বেশী দেখি।'

ভদ্রলোক বাঁ চোখের পাতার টিপে হেসে বললেন, 'আপনার চলে।'

'কি, ও মড়াপোড়ানো? তা চেষ্টা যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে কিনা লোকে আপত্তি করে।'

হাতের ফাইল টেবিলের প্রান্তে সরিয়ে রেখে ভদ্রলোক [illegible] 'কেন?'

শতমারী বৈদ্য

'আমি কাঁধ দিলে নাকি খাট একদিকে ঝুলে যায়! নীট পাঁচ ফুট কিনা।'

আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। ক্ষণপরে চমকে উঠে বললেন, 'কি নাম যেন বললেন ভদ্রলোকের?'

'ঘণ্টেশ্বর দাশগুপ্ত। ফর্সা অভিজাত চেহারা। ডবল ব্যারেলের মত দীর্ঘ খাড়া নাকের ডগায় একটি কালো তিল উঁচু হয়ে আছে, মনে হয় মাছি বসেছে—চিনতেন নাকি ওকে?'

পাশের রেমিংটন বিহারিণী ফিরিঙ্গী স্টেনোকে চমকে দিয়ে ভদ্রলোক শিস দিয়ে উঠলেন 'আলবৎ চিনি। সেই আগুনে আমার ভাই?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। শ্মশানে গেলেই ঘণ্টাদা ওই গানটা করতেন। কিন্তু চিনলেন কি করে?'

'একই মড়ার একবার কাঁধ দিয়েছিলাম আমরা, সেই থেকে আলাপ।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। এক সঙ্গে কাঁধ দেওয়ার কথায় মনে

পড়ল অনীতার কথা। অনীতার ভাই এসে জানালো, 'দিদি আপনাকে যেতে বলে গেছে।'

বললাম, 'বেশ তো।'

ছোকরা একটু ছিটগ্রস্ত ছিল, রেগে আগুন, 'বেশ কি! এখুনি চলুন। দিদি নীলরতনে আছে।'

'হাসপাতালে? সেকি! কার অসুখ?'

'গিয়েই দেখবেন।'

ছোকরা সারারাস্তা আর মুখ খুলল না। গিয়ে দেখলাম অনীতা মরে ভূত হয়েছে। গত রাত্রে বিষ খেয়েছিল নাকি। চিঠিতে চারজনকে বাহক হিসেবে মনোনয়ন করে গেছে, জীবনে যাদের মনোনীত হতে পারে নি। অনীতা এই রকম একগুঁয়ে চাপা স্বভাবের ছিল। ক্ষ্যাপাটে বলাই ভাল। কিন্তু চারজনের অস্তিত্ব আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা ছিল, আমি ছাড়া তার শুধু আর একজন কেউ আছে। চতুরঙ্গের এক অংগ কিন্তু অকুস্থলে নিখোঁজ, ভয়েই তিনি পালিয়েছেন। সুতরাং সে গ্যাপ ফিল-আপ করল অনীতার ভাই নিজে। শ্মশানে তো চললাম, কিন্তু আমার কেমন গা ছমছম করতে লাগল। মনে হল, অনীতা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি সব বলছে। অনীতার পক্ষে সবই সম্ভব বুঝি। কি বলছে তা বুঝতেও কষ্ট হল না। সারা রাস্তা চোখ-কান বুজে কোনোমতে চলে এলাম। ঘাটে এসে খাট নামিয়ে দেখি আশ্চর্য কাণ্ড। অনীতার মুখ সত্যিই আমার দিকে ফেরানো। অথচ স্পষ্ট মনে আছে যখন কাঁধে নিয়েছিলাম, ও মুখ অন্যদিকে ফেরানো ছিল।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে আসতেই সনৎ হাজরার [illegible] করে বলল, 'ওয়াণ্ডারফুল! তুমি [illegible] করবে ভাবতেই পারিনি। [illegible] ওদিকেই আমি ছিলাম। [illegible] গল্প বটে।'

সনৎ হাজরার [illegible] হয়ত বছর দুই পরে [illegible] অন্য কোনো অসম্ভব জায়গায় হঠাৎ [illegible] এসে বলবে, মাইরি [illegible]

এবার নিজের ফ্লাস-ব্যাকে আসি।

[illegible] পয়সা কুড়িয়েছিলাম [illegible] এমন কিছু [illegible] যারা সম্পন্ন ব্যক্তি দরকার। [illegible] ঘাটের [illegible] শ্মশানের পথে [illegible] দেখেছি অবস্থা ভেবে।

তা পয়সা কুড়িয়ে সুখ ছিল [illegible] শহরে সে বিউটি আর নেই। [illegible] আগে আগে একজন কীর্তনীয়াদের [illegible] করতেন, হাতে পেতলের ঠোঙায় খই মুঠো ভরে ভরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই খই-এর মধ্যে ক্যামুফ্লাজ করে রয়েছে পয়সা। [illegible] আমি [illegible]। [illegible] আওয়াজ হত ঠং, বুকের মধ্যে [illegible] উঠত সঙ্গে সঙ্গে। তা পয়সার সাইজও ছিল বলাই তখন, যেন এক-একখানা [illegible] বাতাসা। আজকের দিনের [illegible] কপালের প্লাস্টিকের টিপ নয়, কিংবা [illegible] ভাসা তিন পয়সা নয়, [illegible] থেকে বার আনা রোজগার [illegible] কুড়ুনেদের এক-একজনের। সে খই নেই, সে পয়সাও নেই।

শ্মশানের প্রতি সেই থেকেই [illegible] জেগেছে আমার। যেখানেই বেড়াতে যাই আজো শ্মশানের খোঁজ করি। কত শ্মশান তো দেখলাম না জীবনে, কিন্তু নিমতলা শ্মশানের জুড়ি মেলা ভার। [illegible] এর সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের।

ধর হয়ে দাঁড়ান, জ্বলন্ত চিতা বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করেন। হায়ার করে আনা প্যালবেয়ারারদের মত কিছু প্রফেশনাল আসে সময় সময়। ঠাকুর ভাসানের নাচটি ছাড়া কুম্ভীরাশ্রু আর সবই থাকে। মাঝরাতে নিস্তব্ধ শ্মশানে যে স্লোগান দেয় তার বজ্রনাদ উত্তর কলকাতার জীর্ণ দেওয়ালের চলটা চুনবালিটাই খসে না, অনেক পলিত-কেশ-ও বুক ধড়ফড় করে খসে যান অনেক সময়। হরিবোল সাঁতাই হ্যায়্যাবল্ হয়ে ওঠে।

তবু ভূমিকার এখানেই শেষ নয়। শ্মশানে আসে অনেকের পায়ের ধুলো পড়ে। আসে পুলিশ, আসে ডেড-শট্ নিতে ক্যামেরা-ম্যান। আসে সাংবাদিক, পুরোহিত, আর উঠতি সাহিত্যিক অমিতাচারের দীক্ষা নিতে। ফুলের কারবারী, ফার্নিচারওয়ালা, বিছানা ঘেঁটিয়ে, এমনিতর অনেকেই ব্যবসার সন্ধে হাইফেনে ব্যস্ত আছেন। শুধু হিন্দুর আত্মা নয়, অনেক অনেক দ্রব্যই শেষ পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ হয় না, বুড়ি ছুঁয়ে আবার যথাস্থানে দ্বিতীয়পক্ষ ধরার জন্য গিয়ে দাঁড়ায়।

সদ্য নেবা চিতা ঘেঁটে ফেরে শ্মশান-বালকের দল। মূল্যবান-অমূল্যবান ধাতু-দ্রব্যের খোঁজে। মৃতদেহ থেকে সব সময় সব কিছু খুলে নেওয়া সম্ভব হয় না তো! লোকের ডামাডোলের মধ্যে সব সময় সম্ভবও নয়, সোনার দাঁত তো অনেক সময় মুখের ভেতরই থেকে যায়: খুব কম মড়াকেই দাঁত বের করে হাসতে দেখেছি।

সব মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। আত্মহত্যা আছে, অ্যাক্সিডেন্ট আছে আবার আইনের চোখে ধুলো দেওয়া খুনেও আছে। কবর-খানার সংগে শ্মশানের এখানেই তফাত। কোনো মতে চিতায় চড়িয়ে জ্বালিয়ে দিতে পারলেই হল, ছাইভস্ম তো আর কিছু ডকুমেন্ট নয়! কবর হচ্ছে আনসেফ্ ডিপোজিট ভল্ট, খুঁড়ে খুঁড়ে কবে কখন রহস্য উঠে আসবে তার ঠিক কি! টাকা থাকলে ডেথ সার্টিফিকেটের চিরকুট, আর পোস্টমর্টেমের ফুটনোট ছাপাতে আর কতক্ষণ, টাকাই তো কর্ক, টাকাই স্ক্রু। আমি এ রকম একটা খুনের কাহিনী জানি। হাত-মুখ বেঁধে আগুনে জ্যান্ত মারা হয়েছিল সেই বউটিকে। কিন্তু পুলিসে-ডাক্তারে টুঁ-শব্দটি হয়নি। সেই আধ-পোড়া মেয়েটিকে আবার শ্মশানে নিয়ে গিয়ে খুব ঘটা করে দ্বিতীয়বার পোড়ানো হয়েছিল।

এই সব সাতসতের নানা কথা ভাবছি, পুরোনো স্মৃতি বুকের মধ্যে চাগাড় দিয়ে উঠছে এমন সময় নিকটে একটি শব্দ হল।

'মশাই একটা দেশলাই কাঠি হবে?'

পকেট থেকে দেশলাই বের করে দিতেই ফের শোনা গেল, 'সাইরি দাদা, একটা বিড়ি হবে?

বিরক্ত-চিত্তে তাকালাম লোকটির দিকে। বড় বড় রুক্ষ চুলে চোখ দুটি প্রায় ঢাকা, গালে অন্তত সাতদিনের বাসি দাড়ি। অর্ধ-ময়লা ধুতি লুঙ্গির মত করে পরা। ছেঁড়া-কাটা হাফ-শার্ট।

'একটু সময় হবে না?' বিড় বিড় করে লোকটি এবার বলল, 'চমকে উঠেই চিনতে পারলাম, সায়েন্স কলেজের সনৎ হালদার! কিন্তু একি চেহারা হয়েছে।

বিস্ময়ে বাকস্ফূর্তি হবার আগেই আমার হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কানের মধ্যে শুধু রেখে গেল ছোট্ট কথা: ঘাটবাবুর ওখানে থাকিস, আসছি—

মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা নিয়ে সংকেত স্থানে পৌঁছে গেলাম, ফটকের বাঁ দিকে কাঠিরা কম্পানি, ডান দিকে ঘাটবাবু মানে ডেথ রেজিস্ট্রার। চিত্রগুপ্তের মত বিরস মুখে বসে আছেন, গলায় কালো কম্ফর্টার। সামনে বিরাট একটি লেজার-বুক খোলা, পাশে একটি মৃতকল্প টেলিফোন, মরা মাথা-পিছু দুটো করে ফ্রি-কল। লেজারে নামধাম বিবরণ সিরিয়াল নম্বর দিয়ে লেখা। এই মহাঅষ্টমীর দিন নতুন খাতা করেছেন, এখন '১৪০০ চলেছে।

সনৎ এসেই বলল, 'চল ফটোর দোকানে যাই, পুরোনো একটা নেগেটিভ খুঁজে বের করে প্রিণ্ট করতে দিয়ে এসেছি। চল সেই শ্মশান-বন্ধুর মূর্তিটা দেখে আসি।'

সনৎ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে জানতে পারলাম। একটি ম্যাডার 'কেসে'র জন্য সম্ভবত কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

কিন্তু কর্তাদার মৃত্যু নিয়ে সব জট পাকিয়েছে এখনও সন্দেহ করিনি।

Pond's

যুব সমাজের যে অনিয়ন্ত্রিত দুর্বার বন্যা উদ্বেল উচ্ছল হয়ে উঠে আমাদের সংশয় আর উৎকণ্ঠায় আকণ্ঠ করে তুলেছে তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে পাশ্চাত্ত্য জগতে। বন্ধন আর সংস্কার উপেক্ষা করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সেখানে বেগ পেতে হয় নি, কারণ পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সন্ত্রস্ত হয়েছেন, সাবধান হয়েছেন সহজেই, বিদ্রোহের পালটা জবাব দিতে গিয়ে তুমুল তুফান তোলেন নি। তাতে পরিবর্তন এসেছে অনেক। পিতামাতা গুরুজন অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকরভাবে সমপর্যায়ে এসে ছেলেমেয়ের মন রাখছেন আবার কোথাও বা হাল ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজেও কিন্তু চিরকাল এমনটি ছিল না। প্রত্যেক পিতা ঠিক উইম্পোল স্ট্রীটের ব্যারেট পরিবারের কর্তার মত সন্তানদের উপর দোর্দণ্ড প্রতাপে ফলান নি বটে, কিন্তু মা বাবার অবাধ্যতা তখন অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। প্রথম মার্কিন উপনিবেশ গড়া থেকে নিয়ে বহু দিন পর্যন্ত সে দেশেও গৃহকর্তা ছিলেন একনায়ক আর সবাই তাঁর সহযোগী। সমাজের শৃংখলায় গুরুজনের আদেশ মানার কত গল্প এদেশে বিদেশে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে তার সীমা নেই। একলব্যের গুরুদক্ষিণা, ক্যাসাবিয়ানকার জ্বলন্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা আজকের পরিস্থিতিতে অর্থহীন মনে হয় না কি? জমিদারের অত্যাচারে জনসাধারণ যেমন বিদ্রোহ করেছে, যৌথ পরিবার যেমন কালের গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে, যুবসমাজও তেমনি চিরাচরিত প্রথার প্রতিবাদে ভারসাম্য বিসর্জন দিচ্ছে। ভালমন্দর বিচার করে লাভ নেই। ঘটনাকে স্বীকার করে তবে সামনের পথ সামলাতে হবে।

তিক্ত আলোচনা বা তীব্র সমালোচনা আপাতত মুলতুবী রেখে প্রশ্ন করতে চাই যে, এ বন্যায় আমাদের মনোভাব কি ছেলে এবং মেয়ের প্রতি একই রকম? পাশ্চাত্ত্য সমাজের ভাষায় যাকে বলতে পারা যায় Freedom of the latch key অর্থাৎ সদর দরজা খোলার পূর্ণ স্বাধীনতা—তা কি যত সহজে আমরা ছেলেকে দিতে পারি তত সহজে মেয়েকে দিতে পারি? পারি না। দিনে রাতে যখন মর্জি মেয়ে এসে সদর দুয়ারে কুলুপ ঘুরিয়ে হুট হুট করে আসছে যাচ্ছে সইতে পারবেন কি? চিন্তাভাবনা তো আছেই তা ছাড়া লোকে বলবে কি? বদনাম রটাবার জন্য যে পড়শীপাশির দল পা বাড়িয়েই আছেন। তাঁরা যে আবার কি করবেন কে জানে? এ আশঙ্কা যে তথাকথিত উন্নতির গতিধাবিত পশ্চিমের দুনিয়ায় নেই তাও নয়। হাস্য কৌতুকে সমাজের ছায়াপাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ছেলের বেলায় যাই হোক মেয়ের বেলায় বাপ মা আজও যথেষ্ট সতর্ক হতে চান। তবে সতর্কতার প্রকাশ সম্বন্ধে বেপরোয়া হতে সাহস নেই কারণ সেখানকার যুবসমাজে

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের সঙ্গে আলোচনারত ডাঃ ওয়াইল

ছেলেমেয়ে আমাদের ছেলেমেয়ের চেয়ে অনেক বেশী বেপরোয়া। সংসারের বন্ধনের গ্রন্থি ভিন্ন, সমাজের আদর্শ আলাদা। এক মার্কিন কমিডিয়ান হাস্যরসাত্মক এক টেলিফোনের কথাবার্তায় বেশ বলেছিলেন যে, মেয়ে যাচ্ছে তার প্রথম সামাজিক আত্ম-প্রকাশে বা debut। সান্ধ্য আসরের নাচ গাড়ায় গিয়ে মধ্যরাত্রের মাদকতার নেশা না ধরায় এই আশঙ্কা বাপের মনে। অথচ তিনি চান না অনেক দিনের অনেক অপেক্ষার এই আনন্দপ্রহর নিষেধের তোড়ে ম্লান করে দিতে অথবা কিশোরী কন্যাকে বিরূপ করে তুলতে। তাই মনস্তত্ত্বের মারপ্যাঁচ কষে বলেন যাও, আনন্দ কর। রাত বেশী হলে ভেবো না। যত রাতই হোক, তোমার জন্য জেগে বসে থাকবো। ফিরে এসে দেখবে আমাকে "waiting at the window!" এটা কিন্তু ঠিক latch keyর স্বাধীনতা দেওয়া নয়। স্বাধীনতার ছলনা মাত্র!

আমাদের মেয়েরা হয়তো সান্ধ্য নাচের রস জানে না, জানলেও সমাজের অতি সামান্য অংশমাত্র তারা, তবে বাঁধনহারা, সংস্কারশূন্য জীবন আজ তাদের অনেকেই চায়। তারা বাইরের জীবনের স্বাদ জেনেছে, জানবার দরকারও হয়েছে। এখন কি আশা করা চলে যে পদে পদে তাদের বাধা দিয়ে সেদিনকার সেই চার দেওয়ালের অবরুদ্ধতার আংশিক প্রয়োগে আটকে রাখা যাবে? জীবনের যুদ্ধে যে মেয়েকে জগতের মুখো-মুখি দাঁড়াতে হবে তাকে জগৎ থেকে আড়াল করার মানে নেই।

জীবনের স্বাভাবিক ধর্মে উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীর উচ্ছল উচ্ছ্বাস, অকারণ আনন্দ, অকারণ বিষাদ, আবেগ চাঞ্চল্য, অজানা পরি-বর্তনের বিভিন্ন প্রকাশ একদিন নেহাত নিন্দনীয় বলে চেপে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলতো। মা, ঠাকুমা চিন্তিত হতেন, আকুল হতেন নানা লক্ষণের বৈলক্ষণ্য বা বৈগুণ্যে আশঙ্কা করে। আজ আর আমরা চিন্তা করি না। অকুণ্ঠিত, নির্ভীক সপ্রতিভ কন্যার অসংকোচ ব্যবহার আর প্রগল্ভতা দোষও নয়, নির্লজ্জতাও নয়, ধৃষ্টতা তো নয়ই। সৃষ্টির বিচিত্র চিত্রণে ব্রীড়াবনতমুখী লজ্জাশীলা মেয়েও যেমন বিচিত্রা, প্রাণ-শক্তিতে ঝলমলে, চটপটে চঞ্চল মেয়েও তেমনই সমাদৃতা।

তবে মায়ের দায়িত্ব আছে বই কি। উত্তর জীবনে স্বাধীনতা যদি স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃংখলায় দাঁড়ায়, তার পরিণামে হয়তো কন্যাকে নিজেকেই ভুগতে হবে। সেই পরিণাম থেকে তাকে দূরে রাখতে হলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হলে পুত্রকে যেমন এককালে মিত্রবৎ গ্রহণ করার বিধি ছিল, আজকের দুনিয়ায় কিশোরী কন্যাও মিত্রবৎ আচরণ আশা করেন। পিতা, স্বামী বা ভ্রাতাকে অবলম্বন করে আশ্রিত জীবনযাপন যখন সে আর করে না, তার স্বাধীন সত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার অধিকারও তার প্রাপ্য।

একথা আমরা বলি না, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ব্যবধান কমে আসছে বলে তাদের জন্মগত ও প্রকৃতিগত ব্যবধান বদলে যাবে। মহিলারা যাঁরা রাজনীতির কঠিন ব্যস্ততায় জড়িয়ে আছেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারাও মা হিসাবে, ঘরনী হিসাবে সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশী

দূরে যেতে পারেন নি। অসুস্থ সন্তান, অসুখী সন্তানকে অবহেলা করা মায়ের পক্ষে সহজ কাজ নয়। পিতা হয়তো অন্যের উপর দায়িত্বভার দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন কিন্তু মা শতকাজের আর সহস্র দায়িত্বের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও সন্তানের কথা ভুলতে সহজে পারবেন না। এই জন্মগত বৈচিত্র্যই পৃথিবীকে সুন্দর আর সম্পূর্ণ করেছে। সার্থক করেছে সৃষ্টির মহিমা। কাজেই পুত্র ও কন্যা পুরোপুরি একই পথ ধরে চলবে একথা জোর করে বলা যায় না। পথের ব্যবধান কমেছে তাই জীবনধারার ব্যবধান সেই সেকালের সমান থাকতে পারে না।

পশ্চিমী দুনিয়ায় বিবাহের আয়োজনও অভিভাবকদের বোঝাপড়া দিয়ে হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যা পরস্পরকে জানবার সুযোগ পায়। হয়তো বলবেন সে দুনিয়ায় শান্তি কোথায়? কিন্তু আমাদের কি স্বামী স্ত্রীর মনকষাকষি নেই, নেই কি বিষময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে যখন পাত্রী দেখার সবকটা পরীক্ষা দিয়ে সলজ্জ দ্বিধায় অজানা শ্বশুর ঘরের সমালোচক আত্মীয়মহলে প্রবেশ করানো হয় তখন কি সমাজের একান্ত ভণ্ডামি আর দৈন্য প্রকাশ পায় না? আরও বড় ভণ্ডামি হয় যখন পাত্রপাত্রীর দেখা শুনোর, আলাপ আলোচনার একটা অভিনয় হয়। বাপ মা মতামত ঠিক করে, জন্ম পত্রিকায় শুভাশুভ গণনা করে সিনেমার আবছা আলোয় অথবা চায়ের আসরে ছেলেমেয়েকে মন জানাজানির সুযোগ দেন। নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানো হয়েছে, গহনার অর্ডার চলে গেছে কিন্তু এটুকু ছলনা না হলে চলে না। লোকে বলবে একেবারে সেকেলে, একেবারেই সংস্কারাচ্ছন্ন। নিজের কাছেও আত্মপ্রসাদ চাই আধুনিক বলে. আর পাত্রপাত্রী তো প্রস্তুতই কাজেই সেখানেও ভয়ের কারণ নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আধুনিকতার এই হাস্যকর আয়োজন অবান্তর। অভিভাবক জেনেশুনে, বলে কয়ে ব্যবস্থা করুন। ছেলে-মেয়ে জানতে চায় যদি অপর পক্ষের অল্প-বিস্তর সংবাদ তবে তাদের আলাপ আয়োজন করুন। কিন্তু এ দুয়ের সীমানার বাইরে যে

হংকং-এর সংবাদপত্র মালিক কুমারী অ সিয়ান

দুনিয়া আছে সেখানে মেয়েদের "out of bounds" করে রাখার কাল আর নেই। নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে সেখানে বাড়তে দিন, সাহায্য করুন তাকে ভালমন্দ বুঝতে কিন্তু মুচড়ে, ভেঙ্গে টুকরো করে দেবেন না তার স্বচ্ছন্দ গতি। সহজ মেলামেশায় বলিষ্ঠ-জীবন যদি গড়ে ওঠে তবে কাঁচের ঘরে বন্দী করে দুর্বল বিচলিতচিত্তে আনুগত্যে কন্যার আগামীদিনের কঠিন জীবনযাত্রার পথে বাধা হতে নিশ্চয়ই আজকের মা চাইবেন না।

অত্যধিক নিরাপদ আশ্রয়, পরদার আড়ালে নিভৃত বাস মেয়েকে আতুর করে তুলতে পারে। সে নিরাপদ আশ্রয়ের অন্তরাল চিরদিন বজায় রাখতে পারবেন না। পারলেও মেয়ে মানবে না। কঠিন হাতে ব্যবস্থাবিধি অবলম্বন করতে চাইলে ছেলের মত সেও বিদ্রোহী হতে পারে, বিপথে যেতে পারে, আবার চিরকালের মত আপনশক্তিতে আস্থা-হীন জীবনযাপন করতে পারে। বর্তমান কঠিন, নির্মম দুনিয়ায় বিদ্রোহী হওয়ার চেয়ে একান্ত পরনির্ভরশীল, ভীরু হওয়া কিছু কম দুঃখের কথা নয়। প্রভুত্বপরায়ণ পিতামাতার ঘরে সন্তানের পরনির্ভরশীল-তার আশঙ্কা যথেষ্ট বেশী থাকে এবং পুত্র অপেক্ষা কন্যার বেলায় ভয় অধিক, কারণ স্বভাবতই মেয়েরা কোমল স্বভাব। সহজে পিতামাতাকে আঘাত করা তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

এই নমনীয় কমনীয় স্বভাব কন্যার প্রতি সেজন্য পিতামাতা অভিভাবকের দায়িত্ব বেশী। সে দায়িত্ব শক্তি দিয়ে জাহির করা যায় না, স্নেহ দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। ভাল-বাসায় তার জীবনের কলি সহস্র দল হয়ে ফুটে উঠবে, সার্থক জীবনের সন্ধানে তার যাত্রাপথ বিকশিত হবে। শাসক বা সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে মা বাবা যা পারেন না, বন্ধুর ভূমিকায় প্রীতির স্পর্শে তা সম্ভব। এক একটি সামান্য ত্রুটি এক একটি জীবনের বহু ক্ষতি করতে পারে। কাজেই মাতাপিতার দায়িত্ব আজ অনেক বেশী। স্বার্থপর হয়ে স্বৈরতন্ত্র চালাবার চেষ্টায় কর্তৃত্বের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সন্তানের মঙ্গল না হতে পারার সম্ভাবনা অনেক থাকে।

I P I বা International Press Institute-এর পঞ্চদশতম অধিবেশন হলো ভারতবর্ষে। এশিয়াতে এই দ্বিতীয়বার I P I-এর সভা সমাগম হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সাংবাদিক দল, কাগজের মালিক, প্রকাশক জমা হয়েছিলেন রাজধানী নূতন দিল্লিতে। তবে লক্ষ করবার বিষয় ছিল যে কত অল্পসংখ্যক মহিলা সাংবাদিক এসেছিলেন। মহিলা অনেক ছিলেন। তাঁদের কেউ বা স্ত্রী, কেউ বা মেয়ে কেউ বা মাকেও নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষ ঘুরে দেখাতে। অবশ্য স্ত্রী বা মেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কাগজের সঙ্গে যুক্ত। চেয়ারম্যান ব্যারী বিংহামের স্ত্রী যদিও বিনয় করে বললেন স্বামীর সাথী হিসাবে এসেছেন মাত্র, পরে শুনলাম স্বামীর কাগজগুলিতে সর্বদা সক্রিয় সাহায্য করেন তিনি।

ঠিক এরকম বিনয় করে কথা বললেন ডাঃ ওয়াইল। পশ্চিম জার্মানীর এক প্রাদেশিক সংবাদপত্রের মালিক তাঁর বাবা। ডাঃ ওয়াইল এম ডি পাশ করা চিকিৎসক। কিন্তু সাংবাদিক পরিবারের মেয়ে বলে সাংবাদিকতার উপর আকর্ষণ বেশী। ডাক্তারী করেন না। কাগজের দেখাশুনো করেন। মাঝে মাঝে পছন্দমত সাংবাদিকতার সুযোগ মিললে কাগজে লেখেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত সাংবাদিকতায় তাঁর ঝোঁক বেশী এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজটি তাঁর উপযুক্তও বটে। অন্যান্য ব্যাপারেও লেখেন কিন্তু নিয়মিত কাজ তাঁর পরিচালনা সংক্রান্ত বা managerial

হংকং এর শ্রীমতী অ সিয়ান্ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বৃদ্ধা মাকে। মা তো মেয়ের গর্বে জ্বলজ্বল করছিলেন। অ সিয়ান অনেকগুলি কাগজের মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু সক্রিয় সাংবাদিকতা বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা তিনি নন। জিজ্ঞাসা করলাম কাগজের নীতি বা কর্মপন্থায় তাঁর হাত আছে কিনা। বললেন, হাত আছে ঠিকই কিন্তু নিজে আমি লিখি না। আমার মাথায় ঘুরছিল শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর কথা।

I P I-এর এশিয়া প্রোগ্রামের কেন্দ্রীয় দপ্তর ফিলিপিনসের ম্যানিলায়। শ্রী চৌধুরী এখন সেখানকার ডিরেক্টর। মহিলা সাংবাদিক সংখ্যা বেশী নয় কেন প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন সেরকম উচ্চ পর্যায়ের মহিলা সাংবাদিক কমই আছেন। কাগজের পলিসির উপর অর্থাৎ তার নীতির উপর যাদের প্রভাব আসতে পারে এমন লোকই হয় I P I-এর মেম্বর। বিদেশেও কি কোথাও সে মর্যাদায় কোন মহিলা নেই? বারে বারে প্রশ্ন করায় বোধ হয় আমার হাত এড়াবার জন্য এগিয়ে দিলেন ম্যাগী বিংহামের উত্তরাধিকারী বর্তমান চেয়ারম্যান সিংহলবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিককে। তিনিও বললেন বটে বেশী নেই I P I-এর মহিলা সভ্য।

একথা সত্য সাংবাদিকতা কঠিন কাজ। বছর কয়েক আগে পার্শী মহিলা ফটো-সাংবাদিক শ্রীমতী খীরাওয়ালাকে কিনা নাজেহাল হয়ে ঘুরতে হতো। আর কোন কারণে নয়, একেবারে একা বলে। রাজনীতি, অর্থনীতি বাদ দিলেও সাংবাদিকতার অনেক দিক আছে। আগে শিক্ষিত পেশাসন্ধানী যুবক যেমন নূতন নূতন পেশার পথ খুঁজতো, আজ শিক্ষিত মেয়েরা সেইভাবে পছন্দমত কর্ম-জীবন খোঁজে। সাংবাদিকতার শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপকভাবে মেয়েদের আকর্ষণ করেছে কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে সংবাদপত্রে সুযোগ ক'জন পান আমার জানা নেই। আমরা মনে করি দপ্তরে বা সক্রিয় সাংবাদিকতায় অনেক কিছু আছে যা শিক্ষিত মেয়েরা সহজেই করতে পারেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে যেটুকু সুযোগ মেয়েরা পেয়েছেন, কোথাও তাঁদের অযোগ্যতা প্রমাণ হয় নি।

খবরের টুকরো

খদ্দেরের খটকা কাটাবার জন্য বিদেশে নানা রকম Consumers association বা খরিদ্দার সমিতি আছে। তাদের বিপুল পরাক্রম। সমিতির পত্র পত্রিকাও প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশনে তৎপর। ইংলন্ডের এরকম একটি ক্রেতা সমিতির পত্রিকা which-এর একটি সংখ্যা দেখলাম। আরও পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে সমিতির অনুরাগের উপর মন্তব্যগুলি বেশ লাগলো। প্রথমেই ক্রীমের কথা। অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেছে বাজারের বহু বিজ্ঞাপিত মহার্ঘ সব সৌন্দর্য সহায় আর অপেক্ষাকৃত সস্তা সাধারণ ক্রীমে তফাত বেশী নেই। কাজেই সমিতির সভ্যদের অযথা অপব্যয়ের কারণ নেই।

ঠিক এমনি ভাবেই এঁরা নখের পালিশ তোলার তথ্য পেশ করেছেন। এসব দেশের হিসেব-নিকেশ চটপট হয়। তাড়াতাড়ি তৎপরতায় দেখা গেল ৬৫০ লক্ষ মহিলা নখের পালিশ ব্যবহার করেন কিন্তু পালিশ তোলার আরকের বেলায় খদ্দের সংখ্যা ৫৭৫ লক্ষ। কি করে তা হয়?

নখের পালিশ গলিয়ে দেবার কাজে যা যা ব্যবহার হয় তার মধ্যে অ্যাসিটোনের সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ। এ ছাড়া মেথিল আছে, এথিল আছে আর আছে এথিল অ্যাসিটেট। গবেষণালয়ে পরীক্ষা চললো দিনরাত। সব নাম করা প্রতিষ্ঠানের নখের পালিশ গলাবার আরক পরীক্ষার পর সমিতি রায় দিলেন রাসায়নিক পদার্থ বিক্রেতার ঘরে যে অ্যাসিটোন, এথিল, মেথিল ইত্যাদি নিতান্ত অল্প দামে পাওয়া যায়, তারই সঙ্গে একটু সুগন্ধি বা তৈলাক্ত কিছু সংমিশ্রণ করে সুদৃশ্য মোড়কে ভরে বহু মূল্যে খদ্দেরের সামনে নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে ধরে আর তার চোখঝলসানো চমকে আর বিজ্ঞাপনের বুলিতে ভুলে সাধারণ খদ্দের কষ্ট করে উপার্জন করা পয়সার প্রতি মায়া না করে কিনে নিয়ে যায়। আবার এদের মধ্যে সস্তা দামীতে বড় একটা প্রভেদ নেই। অ্যাসিটোনের একটিমাত্র দোষ ত্বককে একটু রুক্ষ করে দেয়। তার জন্য আর পাঁচটা সহজ ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে নেওয়া চলে। অ্যাসিটোনে শতকরা ১৫ ভাগ জল মিশিয়ে নিলেও ভালই কাজ হয়। সেখানেও খরচা কিছুটা কমে যায়।

আমাদের দেশে নখের পালিশ হয়তো অনেক মেয়ে ব্যবহার করে না। তবে বেশী দামের জিনিস হলে ভাল হবে এ রকম একটা ধারণা আছে বইকি। দুঃখের বিষয় আমাদের জন্য তৎপর ক্রেতা-সমিতিও নেই আর গবেষণাগার, হিসেব-নিকেশের ব্যবস্থাও নিতান্ত সীমায়িত। কেনাকাটার দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের প্রায় নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপরই নির্ভর করে কাজ চালাতে হয়। সেই বিবেচনার উপরই রইল সাবধান হবার ভার। আর যদি কোনদিন আমাদের ক্রেতারাও সমিতিবদ্ধ হয়ে বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীর উপর সার্থক অভিযান চালাতে পারেন সেদিন আমরাও অর্জিত অর্থের সম্যক ব্যবহারের সাহায্য ও সুযোগ বেশী করে পাবো। ৭৫ লক্ষ মেয়ে নখের পালিশ তোলার সহজ সন্ধান হয়তো পেয়েই মার্কামারা জিনিস খুঁজছে না। তাদের মত আমাদেরও বিপর্যস্ত ঘরনীর খরচা কমাবার দু-চারটা উপায় জানার অবসর মিলবে।

টুকিটাকি

যাঁরা প্রেসার কুকার ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নানা পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছেন। নূতনত্ব আবিষ্কার করেছেন। এরকম দুটি খবর কানে এসেছে। দই পাতবার জন্য সামান্য ঘন এবং লালচে দুধ যদি চান তবে অল্প সময় দুধকে প্রেসারে রাখলে উভয় ফলই হবে। কতক্ষণ প্রেসারে দেবেন সেটা নিজের আন্দাজ। বেশী ঘন দরকার হলে বেশী সময় রাখবেন।

প্রেসারে নাকি চমৎকার রসগোল্লা হয়। সাধারণ রসগোল্লায় পাঁচ মিনিটের প্রেসার হলেই চলবে। একটু কড়া পাক বা চমচম জাতীয় বানাতে হলে বেশী সময় রাখা দরকার।

প্রেসারের সুবিধা এই যে পুড়বার ভয় নেই, ধরে যাবার আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারেন। এমনকি দুধ জ্বাল দিতে হলে উথলে উঠবার যে সম্ভাবনা তাও থাকে না।

শীতকালে পা ফাটে, ময়লা জমে। যাঁরা জুতো মোজা মোটেই পরেন না অথবা অনেক সময় খালি পায় চলাফেরা করেন, শীতের হাওয়ার নির্মমতম আঘাত লাগে তাদের পদযুগলে। দিনে কোন সময় বেশ খানিকটা বাইকার্বোনেট অফ সোডা গরম জলে দিয়ে পা দুটি মিনিট পনেরো ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাবেন। তবে বাইকার্বোনেট একটু শুষ্কতা আনতে পারে। এজন্য রাত্রে সামান্য সাদা ভ্যাসেলিন ঘষে ঘষে পায়ে লাগাবেন। যদি বিছানার দাগ লাগবার ভয় পান তবে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে শুতে যাবেন। সম্ভব হলে শীত বেশী পড়লে মোজা জুতো কিছু সময় পরলে পা ফাটবে না।

শ্রীমতী

তেইশ

দেখতে দেখতে ক্রিসমাস এসে পড়ল।

এ কদিন গগনরা কাছাকাছি জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অবনী প্রায় নিয়মিত আসত, দুপুরের পর পর; নিজের অফিসের কাজকর্ম এবং হৈমন্তীর হাসপাতালের কথা ভেবে এই সময়টা সে ঠিক করে নিয়েছিল। কোনো অসুবিধে হত না হৈমন্তীর, সে যেতে পারত। ইতিমধ্যে ওরা শহরে গিয়েছিল। শহরটা কিছু কম পুরোনো নয়, সেকালের মিশনারীদের বোধ হয় খুব পছন্দ হয়েছিল জায়গাটা, তাদেরও স্কুল কলেজ আর চার্চ করেছে, এখনও তার যথেষ্ট গরিমা; চাঁদমারির দিকে সরকারী অফিস-আদালত, ওদিকটায় ছবির মতন পথঘাট—কাঁকর ছড়ানো রাস্তা, দু পাশে গাছপালা, উঁচু নীচু মাঠ ময়দান, বাংলো বাড়ি। রীফরম্যাটরি স্কুল, বিহার গভর্ন-মেন্টের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ...এসবও আছে। শহরের একটা অংশ এই রকম, বাকিটা ঘিঞ্জি আর নোংরা, যত ধুলো তত মাছি।

আর একদিন যাওয়া হল সহদেও পাহাড়ে বেড়াতে। পাহাড়টা তেমন কিছু নয়, পাহাড়তলীটা চমৎকার। দূর থেকে দেখলে মনে হবে শাল আর মহুয়ার সবুজ জঙ্গল অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বৃক্ষলতাকীর্ণ পাহাড়টি ঊর্ধ্বাকাশকে নিবেদন করছে। পাহাড়তলীতে হরিণ আর অজস্র বুনো পাখি।

তারপর গগনরা গেল রাম-সীতা কুণ্ড দেখতে। গরম জলের এই কুণ্ডের কাছে মেলা বসে পৌষের শেষে, মেলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল গগনরা। এমন কি একদিন রিজার্ভ ফরেস্টও বেড়িয়ে এল রাত করে। সেদিন বিজলীবাবুও সঙ্গে ছিলেন। বিজলীবাবুকে গগন যেন আলাপে চিনত, আসল মানুষটিকে জানত না। সেদিন জানল। জেনে বিজলীবাবুর পরম ভক্ত হয়ে গেল, এমন রসিক-মানুষ বড় একটা তার চোখে পড়ে নি। বিজলীবাবু অচিরেই তার 'বিজলীদা' হয়ে গেল।

যদিও গগন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল, মুখে হাসি খুশী ছিল, তবু মনে তার বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য তার ব্যর্থ হয়েছে। আসার পর তার যদি বা সন্দেহ হয়েছিল, তবু দিদির কথাবার্তা এবং মনোভাব থেকে সে দিদিকে যতটা বুঝেছিল সুরেশদাকে ততটা নয়। দিদি কি বলছে না-বলছে এটা কলকাতায় ফিরে গিয়ে মাকে বলার জন্যে সে আসে নি, সেটা অর্থহীন হত; সুরেশদার কি বলার আছে তা জানতেই এসেছিল। এখন তার সবই জানা হয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে মাকে কিভাবে কথাটা বলবে সে বুঝতে পারছিল না। বেচারী মা একেবারে ভেঙে পড়বে।

এখানে থাকতেও যে গগনের আর কোনো ইচ্ছে করছিল তাও নয়। কিন্তু হঠাৎ চলে যাওয়া আরও দৃষ্টিকটু হত। ভেতরের গোলমালটা আরও প্রকাশ্য দেখাত, অন্তত সুরেশদার কাছে তাদের বিরক্ত, বীতস্পৃহ, ক্রোধের মনোভাব সরাসরি প্রকাশ হয়ে পড়লে যেন কোথাও একটু খেলো হয়ে থাকতে হত। গগন ভাবছিল, আর কয়েকটা মাত্র দিন কোনো রকমে কাটিয়ে সে নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতায় ফিরে যাবে।

গগনের জন্য দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছিল হৈমন্তী। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, না আপাতত রেখে যাবে।

সেদিন সুরেশ্বরের কাছ থেকে আসার পর হৈমন্তী স্পষ্ট করে জানতে চেয়েছিল সব। তার ইচ্ছে ছিল না গগন যায়; গগন ঝোঁকের মাথায় চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে গগনের বোধ হয় মনে হয়েছিল, সুরেশদা যা যা বলেছে অবিকল তা বলা হয়ত উচিত হবে। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছিল: 'তোর পক্ষে এখানে থাকার আর কোনো মানে নেই।'

হৈমন্তীর না বোঝার কিছু ছিল না; সে অন্য কিছু আশাও করে নি। তবু গগনের এই ছুটে যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে যে গ্লানি সে-গ্লানি তাকে অপ্রসন্ন, অধো-বদন করে রাখল।

তারপর এ কদিন এই ঘোরাঘুরি চলছিল। গগন মনে মনে মুষড়ে ছিল, তবু মুখে হাসিখুশী নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল; হৈমন্তী যে ঠিক কি ভাবছিল বোঝা যেত না—মুখ দেখে মনে হত তার উৎসাহ কিছু কম নয়।

মনে মনে দুই ভাইবোনে পরস্পরের কাছে কিছু যেন লুকোবার চেষ্টা করছিল। গগন বুঝি জানতে দিত চাইত না, সুরেশ্বরের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কতটা নির্মমতা আছে; হৈমন্তীও যেন বুঝতে দিতে চাইত না, সে কতটা অসম্মানিত বোধ করছে, কী প্রচণ্ড গ্লানি এবং বিতৃষ্ণা। সম্ভবত ওরা দুজনে নিজেদের মনোভাব লুকোবার জন্যে তৃতীয় এমন কিছু চাইছিল, যা সাময়িকভাবে তাদের অন্যমনস্ক করে রাখে। ওরা হয়ত কেউই এটা চাইছিল না, এখানে এমন কিছু সহসা ঘটুক যাতে সুরেশ্বর এবং তাদের মধ্যেকার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা অন্যদের চোখে কৌতূহল ও সন্দেহের বিষয় হয়ে ওঠে। হঠাৎ তারা কলকাতা চলে যেতে পারে না, অবনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সব ব্যবস্থা ঠিক করে এসে আজ আচমকা দুই ভাইবোনে তা বাতিল করতে পারে না, তারা সুরেশ্বরকেও হয়ত বুঝতে দিতে চায় না, সুরেশ্বর তাদের মনের সুখ আনন্দ হাসিখুশী সব কেড়ে নিয়েছে। এমন কিছু যেন না হয় যা প্রকট, যা কুৎসিত, যার লজ্জা তাদের দুই ভাইবোনকে মাটিতে মেশায়। বরং এই ভাল, সুরেশ্বর দেখুক—তারা সৌজন্য ভোলে নি, তারা কোথাও ইতরতা প্রকাশ করল না। তারা কলহ করল না—ক্রোধ বা তিক্ততা দেখাল না। এমন কি সুরেশ্বর এ কথাও মনে করুক, তারা স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করছে, বেড়াচ্ছে, আশ্রমে আছে—। কিছুই যেন হয়নি, যা যা হয়েছে তার গুরুত্ব যেন ওরা কেউ দিচ্ছে না।

ক্রিসমাসের আগের দিন দুপুর বেলায় গগনের হঠাৎ খেয়াল হল, সুরেশ্বর তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে বলেছিল, কোন মেলায়।

হাসপাতাল থেকে ফিরে স্নান খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হৈমন্তী বিশ্রাম করছিল। গগন এসে বলল, "কি রে, ঘুমোচ্ছিস নাকি?"

হৈমন্তী গায়ে লেপ টেনে কাত হয়ে শুয়ে ছিল, বালিশে তার মাথা, মুখ ওপাশে ফেরানো—দেখা যাচ্ছিল না। বালিশের পাশে একটা বই পড়ে আছে।

সাড়া দিয়ে হৈমন্তী বলল, "না, ঘুমোই নি।" বলল কিন্তু মুখ ফেরাল না। তার গলার স্বর উদাস, নিরাবেগ।

গগন জানলার দিকে গিয়ে দাঁড়াল একটু, ফিরে এসে রেডিয়োর সুইচ্ টিপল, নব্ ঘোরাল, সেতার বাজছিল, রেডিয়ো বন্ধ করল, আবার জানলার দিকে সরে এসে দাঁড়াল। এ সবের মধ্যে প্রায়ই চোখ তুলে তুলে সে দিদিকে দেখছিল। হেম যেভাবে পাশ ফিরে শুয়েছিল সেইভাবেই শুয়ে আছে, গগন তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত গগন বসল, বলল, "তুইও কি কাল মেলায় যাচ্ছিস?"

হৈমন্তী মুখ না ফিরিয়েই বিস্ময়ের গলায় জবাব দিল, "কিসের মেলা!"

"কি জানি! তোদেরই তো জানার কথা…। …তুই কি দেওয়াল দেখছিস?" শেষের কথাটা ঠাট্টা করে বলা।

হৈমন্তী একটু চুপ চাপ, তারপর পাশ ফিরে সোজা হয়ে শুলো, "কিসের মেলার কথা বলছিলি…?"

"আমি জানি না। সুরেশদা বলেছিল। ভাবলাম তুই জানিস। কোন মেলায় নাকি তোরা স্লাইড্ দেখাবি?"

হৈমন্তী এবার বুঝতে পারল: সে যে ব্যাপারটা জানে তা নয়, তবে শুনেছে। বলল, "তা মেলায় কি—?"

"তুই যাবি নাকি?"

"না, আমি কেন যাব!" হৈমন্তী কেমন

উপেক্ষায় সন্দেহই বলল, "ওরা যাবে—।"

"সুরেশদা আমায় যেতে বলেছিল। বিরাট নাকি মেলা মতন হয়ঃ নাচফাচ, গাধার পিঠে চড়া..."

"বলেছে তো চলে যা—।" হৈমন্তীর বলার ভঙ্গিটা ব্যঙ্গের মতন শোনাল।

"দূরে...র, আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই ওসব মেলাফেলায়।"

"তা হলে যাস না।"

"তাই ভাবছি।...মুশকিল কি জানিস, না বললে কি আবার ভাববে—তাই মহা ঝামেলায় পড়েছি।"

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না। গগনের সঙ্কোচটা যে কোথায় এ যেন খানিকটা অনুমান করতে পারছিল সে।

মনের মধ্যে কোনো খুঁত খুঁত থাকলে যেভাবে মানুষ এলোমেলো করে কথা বলে গগন সেই ভাবে কথা বলল; বলার আগে শব্দ করল জিবের। "একটা কিছু বলে দেব কি বল? শরীর-টরীর খারাপ বললেই হবে।"

"আমি কি বলব!" হৈমন্তী ওপর দিকে চোখ তুলে বলল।

গগন কিছুক্ষণ আর কথা বলল না। তার মনে যেসব কথা ক্রমাগত আজ ক'দিন ধরে তাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল, এবং যা বলে ফেলতে তার স্বস্তি হত সেসব কথা বলতে না পারার জন্যে তার কোনো একরকম অশান্তি ছিল। সুরেশবাবুর সম্পর্ক তার এখন কম্য ছিল না। গগন সব সময় মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বলতে পারে না, কি প্রসঙ্গে কোন কথা উঠবে, গগন মাথা গরম করে কি বলে ফেলবে—এইসব ভয় বা দুশ্চিন্তাগুলি তার ছিল। তাছাড়া বস্তুতঃপক্ষেই তার ওই দেহাতী মেলায় যাবার আগ্রহ নেই।

গগন বলল, "বরং আমি ভাবছি কাল স্টেশনে গিয়ে থাকব। ও'রা তো বলছিলেন সেদিন।"

হৈমন্তী গলার তলায় লেপ সরিয়ে দিয়ে এবার পাশ ফিরল, গগনের মুখোমুখি হয়ে থাকল।

"অবনীবাবুর ওখানে দিব্যি থাকা যাবে, আমাদের বিজলীদা আছেন—, খুব একটা হইহই করে কুসমাস করা যাবে।...আমার, বুঝলি দিদি, তোদের এই আশ্রম আর পোষাচ্ছে না।"

হৈমন্তী বুঝতে পারছিল গগন ঠিক যেকথাটা বলতে চায় তা বলতে পারছে না, না পেরে ভূমিকা করছে।

হৈমন্তী বলল, "তুই কবে কলকাতায় ফিরছিস?"

"পরশু..."

"ছুটি শেষ হচ্ছে কবে?"

"ওই রকমই, দু তিন তারিখে।" গগন পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। তার আগে সে উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে নিয়ে খেল।

হৈমন্তী কখন যেন গালের তলায় হাত রেখে শুয়েছে।

গগন সিগারেট খেল খানিক, তারপর বলল, "বুঝলি দিদি, আমি সেদিন সুরেশদাকে বলছিলাম, ব্যাপারটা যাই হোক, আমাদের মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। বলছিলাম বটে, কিন্তু এসব বলার কোনো মানে হয় না। সুরেশদাকে আমি খারাপ বলছি না, কিন্তু আমার আর তাকে ভাল লাগছে না। মানে আগে যেমন ভাল লাগত এখন তার তেমন লাগছে না। আমি তাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছি।"

হৈমন্তী বলল, "জানি।"

গগন দিদির মুখের দিকে তাকাল। তার মনে হল, দিদি হয়ত আরও একটু বেশি জানলে ভাল হত। জানলে এখানে আসত না। কী রকম বোকার মতন এসেছে, অন্ধের মতন!

"কাউকে ভাল না লাগার সঙ্গে হয়ত মানুষের স্বার্থ থাকে,—" গগন বলল, "কেনই বা থাকবে না। তবে সুরেশদাকে আমার এ রকম মনে হয় নি।"

হৈমন্তী নীরব, পায়ের দিকের লেপটা সামান্য নড়ল, নুপুরের রোদ সরে গেছে—ঘরে কোথাও রোদ নেই, জানলায় নেই, পরদায় আড়াল দিয়ে কিছু দেখাও যাচ্ছে না, সারা মাঠে আজ সকাল থেকে উত্তরের খেপা বাতাস ঃ সেই বাতাসের শব্দ, ধুলার ঘাটাখাম্বা উঠছে নামছে তার শব্দ, কখনও কাকের ডাক, কদাচিৎ কোনো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল।

গগন আবার বলল, "সেদিন আমার মনে হল, সুরেশদা নিজের দামটাই বেশি দেয়। ...একটা লোক সব সময় নিজের পাওনা হিসেব করবে এটা আমার কাছে অসহ্য।"

হৈমন্তী হঠাৎ বলল, "সেদিন কি বলল?"

গগন যেন না-চেয়েও শেষ পর্যন্ত অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গটায় চলে এসেছে। ইতস্তত করে বলল, "কি আর, তোকে তো বলেছি—"

"না, তুই বলিস নি।...তুই আমার কাছে লুকিয়েছিস।"

"আমি তো বললাম, সুরেশদার কথাবার্তা থেকে মনে হল না তার আর কোনো আগ্রহ আছে।"

"তুই কি বলি তা শুনেছি, ও কি বলল তা বলিস নি। তোর মুখ দেখে আমার সেদিনই সন্দেহ হয়েছে, এমন কিছু ও বলেছে যা তুই বলতে পারছিস না।"

"আমার সঙ্গে সুরেশদার এ-ব্যাপারে কথা খুব কমই হয়েছে, বিশ্বাস কর..."

"থাম—" হৈমন্তী যেন ধৈর্যহীন হয়ে ধমকে উঠল।

গগন সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল, বলল, "একটা লোক মুখে কখন কি বলে সেটা বড় কথা নয়, মুখের কথার সত্যিই তেমন কোনো দাম নেই। তবে তুই ঠিকই ধরেছিলি, সুরেশদা আর সে-মানুষ নেই। ভালবাসাটাসা তার কিছু নয়।...সুখটুখ... আনন্দ এইসব কি যেন বলছিল। আসলে কিছুই বলছিল না, চুপ করে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ-সব জ্ঞান তোমার এতদিনে হল? জবাবে বলল, না আগেই হয়েছে...। আমি কিছু বুঝলাম না। জ্ঞান যদি আগেই হবে তবে এতোদিন ধরে এইভাবে ধোঁকা দেওয়া কেন? তার কোনো জবাব নেই। মামুলি কথা: আমার ভুল হয়েছে...। ওটা কোনো জবাব নয়, কৈফিয়ৎ নয়। ...থাকগে, এ একপক্ষে ভাল, যা হবার হয়ে গেল। সেই যে—মামা বলে, মামলার তারিখ পড়ার চেয়ে জজের রায় ভাল, কথাটা ঠিকই...।" গগন যেন শেষের দিকে তার হতাশা ও ক্ষোভ দমন করার চেষ্টায় কোনোরকম সান্ত্বনা খুঁজল।

হৈমন্তী কথা বলল না, অল্প একটু শুয়ে থেকে এবার উঠে বসল, হাঁটু মোড়া, কোমর থেকে পা লেপে ঢাকা রয়েছে।

বসে থাকতে থাকতে গগন বলল, "সুরেশদা যখন আনন্দ-টানন্দ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তখন আমার মনে হয় না তোর আর এখানে থাকা চলে। মাও রাজী হবে না।... আমি চলে যাই, তুইও কয়েকটা দিন পরে আয়।"

হৈমন্তী এবারও কথার কোনো জবাব দিল না, কপাল এবং মুখের পাশ থেকে এলো-মেলো চুলের গুচ্ছ হাতে করে সরিয়ে নিতে লাগল।

গগন কেমন অপরাধীর মতন একবার দিদিকে দেখল কয়েক পলক, তারপর গলা উঁচু করে জানলার বাইরে তাকাল। শেষে ইতস্তত করে বলল, "দেখ দিদি, কথায় বলে ভালবাসা মরে যাবার পর ভালবাসার ভানটা সাঙ্ঘাতিক, ওর চেয়ে বিচ্ছিরী আর কিছু হতে পারে না। ...আমায় যদি বলিস আমি বলব, সুরেশদার ও-ব্যাপারটা আর নেই, আমার তো তাই মনে হল...; বোধহয় তোর দিক থেকেও এখন আর কোনো..." কথাটা গগন শেষ করল না।

গগনের চোখে চোখে তাকিয়ে ছিল হৈমন্তী। মনে হচ্ছিল, হৈমন্তী যেন তার অভ্যস্ত দক্ষ দৃষ্টিতে গগনের চোখের সব টুকু দেখে নিচ্ছিল। দৃষ্টি তীব্র, স্থির, প্রখর। গগন রুগীর মতন তার চোখ খুলে বসে থাকল।

হৈমন্তী বলল, "যতক্ষণ মুখফুটে না বলছিল ততদিন বুঝি তোর মনে হচ্ছিল ওর ভালবাসা আছে?"

গগন এবার নীরব থাকল, মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

"আর কি বলল—! ...বলল না যে, আমার বড় অন্যায় হয়েছে, তোমরা আমায় ক্ষমা করো, মাসিমাকে বলো তিনি যেন কিছু মনে না করেন—" ব্যঙ্গ করে করে হৈমন্তী বলছিল।

গগন মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে, বলল, "ভুলের কথা বলছিল।...একটা কথা আমি বুঝতে পারলাম না, কি বলছিল—একবার এক ঘটনা থেকে হঠাৎ তার সব কেমন হয়ে গেল, দ্বিধা-টিধা চলে এল..."

"কি ঘটনা?"

"কি জানি! কিছু বলল না।...তুই কিছু জানিস?"

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, না জানে না। কিন্তু সে বিস্মিত হয়েছিল এবং ভাবছিল।

সেদিন অবনীর আসতে দেরি হল; যখন এল তখন আর বিকেল ছিল না, পৌষের অপরাহ্ন ধূসর হয়েছে, অন্ধকার হয়ে এল প্রায়। উত্তরের বাতাসটাও আজ সারাদিন প্রখর, মাঠে-ঘাটে শনশন ছুটে বেড়াচ্ছিল। আকাশের রোদ দুপুর থেকেই ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে মেঘ জমছিল, আবার ভেসে যাচ্ছিল।

গগন বলল, "আমরা ভেবেছিলাম আজ আর আপনি এলেন না।"

অবনী বলল, "আজ তো কোথাও যাবার কথা নেই, দেরি করেই এলাম। কাল ছুটি, পরশুও; কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরেছি দুপুরে।"

গগন অবনীকে নিজের ঘরে এনে বসাল। বলল, "আজকের ওয়েদারটা কি রকম বেন! শীত খুব, কিন্তু ডাল্।"

"বৃষ্টি হতে পারে।"

"এই শীতে বৃষ্টি— ।"

"এ-সময় একটু-আধটু হয়।...আচ্ছা শুনুন, পরশুদিন আমরা কিন্তু হাইড্রো-ইলেকট্রিক ইনস্টলেশান দেখতে যাচ্ছি, ইনস্পেকসান বাংলো পাওয়া যাবে।"

"বাঃ, ওআন্ডারফুল। ওটা হলেই আপাতত হয়ে যায় আমার—" গগন হাসল, "তারপরই ঘরের ছেলে ঘরে।"

"কবে ফিরছেন?"

"পয়লা..."

"এত তাড়াতাড়ি—! সেকি, আরও থেকে যান কদিন।"

গগন হেসে মাথা নাড়ল। "না; আর থাকা যাবে না। এসেছিও তো দশ-বারো দিন হয়ে গেল। বসুন, দিদিকে ডেকে আনি।" গগন হৈমন্তীকে ডাকতে গেল।

সামান্য পরেই ফিরল গগন। বলল, "আমি তো ভাবছিলাম কাল আপনাদের ওখানে যাব। আমার একটা নেমন্তন্ন পাওনা রয়েছে।" গগন হাসল।

অবনী ততক্ষণে সিগারেট ধরিয়েছে, জবাব দিল, "চলে আসুন। বলা তো আছেই—"

"বিজলীদা মুর্গি-টুর্গি খাওয়াবে বলেছেন—"

"বিজলীবাবুর রান্নায় হাতযশ আছে;" অবনী হেসে বলল। "ঠিক আছে, ব্যবস্থা করা যাবে, আপনারা চলে আসুন।"

"দিদি কি যাবে?"

"যাবেন না? কেন?"

"জানি না। ওদের হাসপাতাল বন্ধ থাকলে যাবে। আমি সকালবেলাতেই পালাতে চাই। নয়ত ঝামেলায় পড়ব।"

অবনী কিছু বুঝল না।

গগন নিজের থেকেই বলল, "সুরেশদারা কোথায় কোন্ মেলায় গিয়ে চক্ষুরোগের প্রতিকার না কি তার স্লাইড দেখাবে। আমায় বলেছে, চল্। ধ্যাত্, ওসব আমার পোষায় নাকি? তার আগেই পালাতে চাই।" গগন সরল গলায় হেসে হেসে বলল।

অবনী হেসে ফেলল। "এই ব্যাপার?"

"আপনি কি মেলাটায় গিয়েছেন নাকি, স্যার?" মাঝে মাঝে গগন মুখফসকে রসিকতা করে 'স্যার' বলে ফেলে, এটা তার অভ্যেস।

"না।" অবনী মাথা নাড়ল; তারপর বলল, "মেলা-ফেলায় এখন যাওয়া রিসকি। সেদিন কোথায় যেন শুনলাম বিদ্ঘুটে এক রোগে কোন মেলায় দুটো লোক মারা গেছে।"

"কি রোগ?"

"কি জানি! অফিসে কে বলছিল।...এ সময়টা এদিকে গাঁয়ে-টাঁয়ে স্মল পক্সটা খুব হয়, প্লেগও শুনেছি হত।"

এমন সময় হৈমন্তী এল। ঘর বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে জেনেই যেন সে বাতি এনেছিল। বাতিটা নামিয়ে রাখল।

গগন বলল, "দিদি, কাল তোর হাসপাতাল?"

"কেন?"

"না, তাহলে সকালের দিকে স্টেশনে চলে যেতাম। বড়দিনটা ওখানেই করা যেত।"

"তুই বুঝি নিজেই পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছিস!"

"তা করেছি। সুরেশদার সঙ্গে মেলায় যাওয়ার চেয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া কি খারাপ!" গগন হাসতে লাগল।

হৈমন্তী গগনের বিছানার পাশ ঘেঁষে বসল।

অবনী বলল, "কাল আপনারা আসুন।"

হৈমন্তী হাসপাতালের কথা তুলল না, মাথা হেলিয়ে বলল, "যাব।"

গগন কেমন যেন অবাক হল। "তোর হাসপাতাল?"

"ওরা দেখবে," হৈমন্তী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, তার জবাব শুনে মনে হল প্রসঙ্গটা তার আর আলোচনা করার ইচ্ছে নেই।

গগন চুপ করে গেল। অবনীও কথা বল-

ছিল না। হঠাৎ কেমন একটা স্তব্ধতা নামল ঘরে।

শেষে গগনই কথা বলল। "চায়ের কথা বলেছিস?"

"না, মালিনীকে পেলাম না। দেখ তো ফিরেছে কিনা?"

গগন উঠল, ঘরের এক কোণে ট্রাংকের ওপর তার স্যুটকেস, স্যুটকেসের ওপর ক্যাজোর গরম জামা-টামা পড়ে আছে, পুরো-হাতা পুলওভারটা টেনে নিয়ে পরে নিল, যদিও ভেতরে তিন প্রস্থ জামা আগেই পরেছে। বলল, "আমি এই ফাঁকে বৌ ধরে সুরেশদাকে বলে আসি, কাল মেলায় যাওয়া হবে না।" বলে মালিনীর খোঁজ করতে চলে গেল।

অবনী হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকাল, দেখল, চোখ ফেরাল, তারপর আবার তাকাল। অন্য দিনের তুলনায় হৈমন্তীকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। অবনী বলল, "আপনার কি শরীর খারাপ?"

হৈমন্তী চোখ ফিরিয়ে তাকাল। "না; কেন?"

"মনে হল...," অবনী হাসল, "খুব গম্ভীর..."

"গম্ভীর থাকলে শরীর খারাপ বোঝায়?"

"জানি না, লোকে বলে, বোধ হয় ওটা অভ্যেস। আপনিই বেশি বুঝবেন, ডাক্তার-দার লোক।"

হৈমন্তী অন্যমনস্ক চোখে অবনীর সকৌতুক মুখভঙ্গি লক্ষ করছিল। অবনীর সম্পর্কে তার নানাবিধ গভীর কৌতূহল জাগে আজকাল। এখন অবশ্য সেরকম কোনো কৌতূহল জাগছিল না, বরং অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেও অন্য কিছু ভাব-ছিল। হৈমন্তী বলল, "মাথাটা বিকেল থেকে ধরে আছে; হয়ত ঠান্ডা লেগেছে। আজ খুব ঠান্ডা।"

অবনী মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, বেশ শীত; বৃষ্টি-বাদলা হতে পারে সামান্য।"

হৈমন্তী এমন একটা মুখভাব করল, মনে হল শীতের বৃষ্টি তার বিন্দুমাত্র পছন্দ নয়।

দুজনেই প্রায় চুপচাপ। অল্প পরে অবনী বলল, "গগনবাবু তো চললেন—"

"আপনি গগনকে বাবু-টাবু বলে যেরকম বাড়িয়ে দিলেন—" হৈমন্তী হালকা হবার চেষ্টা করল, "ও কত ছোট, আমার চেয়েও ছোট..."

"অল্পদিনের পরিচয়, বেশিদিন থাকলে হয়ত গগন বলেই ডাকতাম।"

"কিছু না, আপনি অনায়াসেই ডাকতে পারেন। আপনার আড়ালে ও মাঝে মাঝে যেরকম ঠাট্টা করে।"

"তাই নাকি?"

হৈমন্তী হাসবার চেষ্টা করল, পারল না। অবনীর সামনে সাধাসিধে মুখে গল্পটল্প করতে গিয়েও সে পারছে না। মাথাটা সত্যিই ধরে আছে। দুপুর থেকে ক্রমাগত সে কেন যে এত ভাবছে, কি আছে এত ভাববার, সুরেশ্বরের জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটতে পারে, তাতে তার কি আসে-যায়।

"আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—" অবনী হঠাৎ বলল।

হৈমন্তী সচকিত হয়ে তাকাল।

অবনী বলল, "আমার পাটনা যেতে হচ্ছে না।"

হৈমন্তী খুশী হল। খুশীর পরক্ষণেই তার চোখে বিমর্ষ ভাব ফুটল। "গেলেই পারতেন; এভাবে জীবনের উন্নতি নষ্ট করতে নেই।"

"আমার জীবন খুব ছোট—" অবনী হাসল, "উন্নতি আর চাই না, একটু স্বস্তি চাই।"

"এখানে স্বস্তিতে আছেন?"

"অনেকটা।"

অবনী অবশ্য আগেও অনেকবার বলেছে কথাটা। হৈমন্তী চুপ করে থাকল, কি ভাবল, তারপর বলল, "আপনারা সবাই দেখছি এই জায়গাটায় খুব স্বস্তি পাচ্ছেন।" তার কথাটা শেষ হয়েও হল না যেন।

অবনী প্রথমটায় বুঝতে পারে নি, পরে বুঝল। বলল, "আমরা কে কে—সুরেশ্বর-বাবু আর আমি! ও'র কথা আলাদা, আমি তো ছোটখাট সুখস্বস্তিতেই বেঁচে যাই।"

"তা হোক, তবু এটা জায়গার গুণ..." হৈমন্তী পরিহাস করে বলতে গেল।

অবনী পূর্ণদৃষ্টিতে হৈমন্তীকে লক্ষ করল, বলল, "আপনার বোধ হয় তেমন স্বস্তি হল না।"

হৈমন্তী চেষ্টা করল অবনীর দিকে তাকাবার, কোনো রকম অস্ফুট এক স্বরে তাকাতে পারল না। আলোর দিকে মুখ করে বসে থাকল।

অবনীও কোনো কথা বলছিল না।

শেষ পর্যন্ত হৈমন্তী নিজেকে যেন কোনো অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য বলল, "আজ স্বস্তি স্বস্তি করছেন, পরে আফশোস করবেন।"

"কেন?"

"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন বলে?"

অবনী হাসল না, হাসির মতন মুখ করল; বলল, "আফশোসের কথা বলবেন না, ওটা আমি সারা জীবনই প্রায় করে যাচ্ছি। এত-দিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে।" বলে অবনী চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে গা সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে ছাদের দিকে তাকাল। কি ভেবে সামান্য পরে বলল, "লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী দুইয়ের জনাই তো দেখি মানুষের আফশোস।...তার বাইরেও কত রকমেরই আফশোস আছে—!" অবনী যেন কথার শেষে হাসতে চাইল।

হৈমন্তী নীরব থাকল। অবনী ঠিকই বলেছে। আফশোসের কি অন্ত আছে জীবনে!

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল অবনী, হৈমন্তীর দিকে তাকাল, তার-পর মুখ নীচু করে সিগারেট ধরাল। "কে যেন বলেছিল—" অবনী মুখ তুলে বলল, "জগৎটা গড়ার সময় বিধাতা ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান বিশেষ ছিল না, কাঁচা হাতে বোকার মতন এই সংসারটা গড়ে ফেলেছেন; মস্ট ইম্‌পারফেক্ট...। কথাটা মন্দ বলে নি, কি বলেন? খানিকটা ভদ্রলোকের মতন গড়তে পারলে এত আফশোস-টাফশোস থাকত না...।" অবনী এবার হাসল। হাসিটা ছাই চাপা আগুনের মতন, ওপরে হাসি ভেতরে যেন কিসের আঁচ রয়েছে।

হৈমন্তী গায়ের চাদর খুলে আবার গুছিয়ে নিল, নিজের এই স্থির অনড় ভাবটা যেন তার ভাল লাগছিল না। সামান্য নড়েচড়ে বসল। শেষে হেসে বলল, "সংসারের গড়নটা আপনার তাহলে পছন্দ নয়?"

মাথা নাড়ল অবনী, "না। কোনোকালেই ছিল না।"

"কিন্তু কিছু করতেও পারলেন না!"

"কিছু না; শুধু বসে বসে আফশোস।"

"কি জানি...। আফশোস করেই বা কি লাভ!" হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে বলল।

"কিছু না। বিজলীবাবু হলে ওমর খৈয়াম শোনাতেন। আমার কাব্যটাব্য জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনোদিন ছাদ ফুঁড়ে দুম করে যদি কিছু পেয়ে যাই—অমূল্য রতন, তবে আর আফশোস করব না।" অবনী হাসছিল।

গগন এল। ঘরে এসে বলল, "চা দেয় নি?... আনছে তাহলে।...বুঝলি দিদি, সুরেশদাকে বলে এলাম। বললাম, কাল আমাদের স্টেশনে নেমন্তন্ন, মেলায় যাচ্ছি না।...ভেরী বিজি সুরেশদা, লোকজন রয়েছে।—" বলে কি মনে হওয়ায় গগন অবনীর দিকে তাকাল, "আপনি ঠিকই বলছিলেন স্যার, কোথায় যেন কিসের একটা এপিডেমিক ব্রেক-আউট করেছে। ওখানেও শুনলাম।"

(ক্রমশ)

দি এক্সপ্রেস — শিল্পীঃ শর্মিলা গুপ্ত

নির্মল দত্ত-র চিত্র প্রদর্শনী
ফাইন আর্টস ভবন

অনেকদিন পরে নির্মল দত্তর ছবি দেখার সুযোগ ঘটল। নির্মল দত্ত এমন একজন শিল্পী যাঁর বনেদ বাঙলা শিল্প ধারার উপর ভর দিয়ে আছে, কিন্তু সেখানেই থেমে নেই। ইদানীংকার ৬০ খানি ছবি দেখলে সমস্ত বুঝা যাবে যে অন্যান্য বিভিন্ন ধারা তাঁর কাজে লেগেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা শুধুই রঙের দিকে মন রেখে, অথবা অনেকেই, যাঁরা রেখাই সব ভেবে ছবি আঁকেন; যাতে করে অবয়বের অনুভব সঠিক ভাবে ওতপ্রোত হতে পারে না, সেখানে নেহক বাক্যগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে নির্মলবাবু যথেষ্ট সচেতন। তাঁর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বুনটে (টেকসচার) গঠিত হয়েছে—অর্থাৎ কোন কিছুর বুনট—এবং রেখা তার আধার হয়ে আছে।

শুধুই বস্তুহীন বুনট, একটা ছন্দিত রেখা—যা অনেকেই অ্যাবসট্রাক্ট কল্পনার নামে সৃষ্টি করেন—তার উপর রেখায়িত কোন অবয়ব সোজা পোস্টার বা বই-এর প্রচ্ছদরূপে দেখা দেয়, এই সহজ ধারণা স্মরণ করে যদি তাঁর 'ক্রোম মরনিং' ছবিটি দেখি, তা হলে ভাল হয়, দেখব বাস্তবতা নিজেই চতুরভাবে গড়ে উঠেছে; এখানে তাঁর চোখ তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে তাই একটুকু ভুল হয়নি, কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি সমস্ত ক্যালেন্ডারের মতিত কমার্শিয়াল আর্টে পরিণত করত।

প্রাচীনিক কথাটা তিনি তাঁর প্রায় কাজেই বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কখনও রঙের দিক থেকে, প্রায়ই রেখার দিক থেকে —কেননা, ভারতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ—এবং ভারতীয় রেখায় ঝোঁকও আছে। তাঁর ৪১নং ছবিটি অনেক দর্শকের ভাল লাগবে।

সুকুমার দাস-এর চিত্র প্রদর্শনীঃ ফাইন আর্টস ভবন

সুকুমার দাসের আঁকা সবসুদ্ধ ৭১খানি ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়; তেল-রঙ, জলরঙ, প্যাস্টেল গ্রাফিক অধিকন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবিও ছিল। সুকুমারবাবু অ্যাকাডেমির স্টুডিওতেই নিয়মিত আঁকা চর্চা করে থাকেন। কোন স্কুল বা কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন নি।

তাঁর ছবিতে পীত জাতীয় রঙ বেশী, কিন্তু তাতে করে আমাদের কোন অস্বস্তি হয়নি, তেল-রঙে তাঁর ৩নং ল্যান্ডস্কেপ, ৯নং স্টিল লাইফ, ১৫নং সুসিঙ সাইট অ্যান্ড সেরামিক উল্লেখযোগ্য জল-রঙে-হোয়াইট রুফস, ভারতীয় পদ্ধতি ৪৭নং সিটিস্কেপ ও গ্রাফিকের কাজও বেশ আকর্ষণীয়।

স্টিল লাইফটির আলট্রামেরিন—ব্রু ও লাল বেশ মিলেছে কোথাও কোথাও, অন্যত্র রেখারও বেশ জোর বর্তমান। এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন তাঁকে করা যেতে পারে যে, এত বিভিন্ন মাধ্যম ও ধারা তিনি কেন অনুশীলন করছেন,—এবং অনুরোধ করব তা যেন তিনি ভেবে দেখেন।

চতুর্থ নিখিল ভারত পরিচয় শিশুশিল্প প্রদর্শনী—ফাইন আর্টস ভবন

চাচা নেহরুর স্মৃতি শিশু দিবসে ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পরিচয় মাসিকপত্র আয়োজিত শিশুশিল্প প্রদর্শনী। ফিলিফস কোম্পানীর লোকদের ছেলে-মেয়েদের কাজ এখানে স্থান লাভ করেছিল। এঁরা খুব খরচ করে প্রদর্শনী করেন, একটি ক্যাটলগও ছাপেন। টিপোগ্রাফি সুপরি-কল্পিত হয়নি—ব্রাশ রুলের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁরা ভেবে দেখবেন।

এই প্রদর্শনী সূত্রে আমাদের একটি কথা মনে হয়। অ্যাকাডেমী ও ফিলিপস কোম্পানী কেন যে দেশে বিরাট বিরাট শিল্পী যথা অবনীবাবু, গগনবাবু, নন্দ-বাবু রবি বর্মা থাকতে—এঁদের স্মরণে কোন চিত্র প্রদর্শনী না করে হঠাৎ চাচা নেহরুর স্মৃতি দিবসে চিত্র প্রদর্শনী করেন বুঝলাম

না। এ না করে শিশুমেলা বা অন্য কিছু করলে নিশ্চয়ই ভাল হয়।

সুনীল দাস-এর চিত্র প্রদর্শনী: কেমোল্ড গ্যালারী

সুনীল দাস ইদানীং নানান টেকনিক নিয়ে কাজ করছেন। এখানে তিনি আর অবয়বধর্মী নন, এখন অবয়ব বলতে আমরা কি বুঝেছি তা তিনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারবেন। কিছুদিন আগে তাঁর হাতের খুব জাগায় জোরাল যে কাজ আমরা দেখেছি সেগুলি অবয়বধর্মী, সেগুলিতে ছিল অ্যাকশন।

এই প্রদর্শনীতে তাঁর ১৪টি কাজ স্থান লাভ করেছিল। কয়েকটি বাদে সব ফ্রেম-গুলিই বেশ বড়। জ্যামিতিক নকশা বিদ্যমান হয়ে উঠেছে, তেল সিমেন্টের সমতলে, আয়নাভাঙা, বালি, দেশলাই-এর কাঠি, লোহা, প্লাস্টিকের শীট, পেরেক, রকমারি জাতের সরঞ্জাম এবং জমিতে মোম রঙ দিয়ে প্রলেপ করা হয়—কখনও বা একটা অদ্ভুত ফ্যান্টাসী সৃষ্ট হয়েছে। ১০নং কাজটির সামনে অনেকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ভারতের অর্থনীতি

রপ্তানির সমস্যা

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস আমাদের আর্থিক অবস্থার পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে এরকম একটা আশা যে করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার কতটা পূরণ হবে সে সম্পর্কে এখন অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে। বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে ভারতের রপ্তানি মূল্যের দিক থেকে শতকরা ৫৭·৫ ভাগ সুবিধা পেয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদেশের বাজারে আমাদের রপ্তানির অংশ সব ক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে। ছয়ই জুনের পর প্রথম চার মাসে ভারতের রপ্তানি ১০ কোটি ডলার কমে গেছে। এর সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানির সম্প্রসারণ শুধু বন্ধ হয়ে যায়নি, এ বছরের প্রথম ছয় মাসে তা সামান্য কমেও এসেছে। খুব সম্ভব এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যখন আগে বিস্তারশীলতা দেখা গেছে—১৯৬১-৬২ সালে ৭·৮২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ঐ রপ্তানি ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯·৫০ কোটি টাকায় পৌঁচেছে। প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা বা সাহায্য দেবার যে নীতি সম্প্রতি অবলম্বন করা হয়েছে সে অনুসারে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বিবিধ রপ্তানি দ্রব্যকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাস থেকে লাভ এখনো অনিশ্চিত

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর রপ্তানির ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য শিল্পবিশেষকে আমদানির সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রথা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এটা মনে হয় ঠিক যে, আমদানির প্রয়োজন ও রপ্তানির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখলে রপ্তানিকারী মনস্তাত্ত্বিক কারণে রপ্তানি বাড়াবার দিকে সচেষ্ট হতে পারে। আমদানি লাইসেন্স এবং রপ্তানির দায়িত্ব এই দুইয়ের ভেতর যোগসূত্র রক্ষার কথা সরকার আবার বিবেচনা করলে ভালো হয়।

কার্পাস শিল্পদ্রব্য—যা ভারতের অন্যতম চিরাচরিত রপ্তানি, সম্প্রতি একটা সংকটের সম্মুখীন। পর পর কয়েক বছর ভালো বৃষ্টি না হওয়ায়, আরো নতুন কাপড়ের কল গড়ে ওঠার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমদানি কমে যাওয়ার দরুন দেশে তাঁত তুলোর অনটন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি, কার্পাস শিল্পকে শীঘ্র সরকারী সাহায্য দেবার ব্যবস্থা না করলে ভারতের রপ্তানি কমে যাবে। আশার কথা এই যে, খুব সম্প্রতি প্রায় ১৭০,০০০ বস্তা কাঁচা তুলো দেশের বিভিন্ন বাজারে এসে পৌঁচেছে। এখানে আরেকটি রপ্তানির কথা উল্লেখ করতে হয়। বিদেশের বাজারে ভারতের অংশ

বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের চিনির রপ্তানি যাতে—দরকার হলে সরকারী অর্থ-সাহায্য দিয়েও অব্যাহত থাকে তা দেখা উচিত।

সমৃদ্ধ দেশগুলির বাজারের গুরুত্ব

বৈষয়িক উন্নয়নের বর্তমান স্তরে ভারত বিত্তশালী দেশগুলির সঙ্গে বেশি বাণিজ্য করলে লাভবান হবে। কেন না, ঐ সব দেশ মূলধন, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, কারিগরী বিদ্যা ও দক্ষতা আমাদের বেশি করে যোগান দিতে পারে। এর থেকে যেন মনে না করা হয় যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ-সমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। আঞ্চলিক সহ-যোগিতা এবং সম্পূরক উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্ভবত শেষোক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারত উভয়পক্ষ সম্মত বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। তা সত্ত্বেও, সমৃদ্ধ দেশগুলিতে তার বাজারের সম্প্রসারণের দিকে ভারতকে এখন মনো-যোগ দিতে হবে।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের দুর্বলতা

আজও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে চিরাচরিত কাঁচামাল ও কৃষিজাত প্রাথমিক দ্রব্যাদি। কিন্তু বর্তমান যুগে যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি পদার্থের চলন হয়েছে এবং উৎ-পাদনের কাজে উপাদান ব্যবহার কমাবার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে সে সময় অগ্রসর দেশগুলিতে যে কাঁচা মালের চাহিদা খুব কমে যাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তার উপর, য়ুরোপে নিজেদের সাধারণ বাজার গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাগুক্ত সংস্থার সদস্য দেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন এবং ভারতের মতো অসদস্য দেশের রপ্তানির পথে বাধা-নিষেধ আরোপ ঐ অঞ্চলে রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। আর, ভারতে উৎপন্ন হালকা শিল্প-সামগ্রীর জন্য চাহিদা, অনগ্রসর দেশগুলির বাজারে যা-ই থাক, সমৃদ্ধ দেশসমূহে তেমন নেই। অবশ্য শেষোক্ত দেশগুলি ভারতীয় খনিজ বা ধাতুদ্রব্য আমদানি করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে পারে—বিশেষ করে তাদের শিল্পের বিরাট চাহিদা মেটাতে, কিন্তু ঐ সব দ্রব্যের ঢালোয়া রপ্তানি আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে ভারতের মত উন্নয়নকামী দেশ যাতে সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে অবাধে বাণিজ্য করতে পারে, তার জন্য সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়ার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সঙ্গে রপ্তানি-বৃদ্ধির তাগিদে আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের যে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন তা নতুন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। কিন্তু সেদিকে কোন চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

শান্তিকুমার ঘোষ
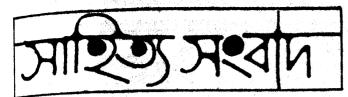
মেরুপ্রদেশের সাহিত্য

নানা বাংলা আলোচনায় প্রায়ই বিদেশী সাহিত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সাহিত্য বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধে অজ্ঞাত, অশ্রুতপূর্ব বিদেশী লেখকদের প্রসঙ্গ অবতারণা না করলে ঠিকমতো পাণ্ডিত্যের প্রকাশই হয় না। বহু অজ্ঞাত সাহিত্যের উল্লেখ দেখেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত এস্কিমোদের সাহিত্যের কোনো উল্লেখ বাংলায় আমাদের চোখে পড়ে নি। তা বলে, এস্কিমোদের যে কোনো সাহিত্য নেই, তা মোটেই নয়।

একটি ফিল্মে একবার দেখেছিলুম যে, এস্কিমোদের একটি বরফের তৈরী ঘরে রেফ্রিজারেটর পর্যন্ত রয়েছে। যে দেশটা আগাগোড়া বরফে ঢাকা, সে দেশে আবার রেফ্রিজারেটরের কি দরকার ভেবে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু আসলে, ইওরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এস্কিমো জাতির একটা অংশ ইওরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে এখন, রেফ্রিজারেটর থেকে সাহিত্য পর্যন্ত। পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ড এখন ছাপাখানা আছে, খবরের কাগজও বেরোয়।

কিন্তু, তার আগে, অনেক প্রাচীনকাল থেকেই এস্কিমোদের একটা সাহিত্যের ঐতিহ্য আছে। এই সাহিত্যের কোনো লিখিত রূপ ছিল না, সর্বাংশে মৌখিক, শুধু গান ও কবিতা।

কবিতাকে এস্কিমোরা বলে "শিল্পীর নিশ্বাস", যারা সুললিত ঝঙ্কারময় শব্দ মুখে পর পর সাজিয়ে যেতে পারে, তারা রহস্যময় পুরুষ। এইসব মৌখিক কবিতার কপিরাইটও আছে। যিনি রচনা করলেন তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন কবিতাটি তাঁরই সম্পত্তি, অন্য কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। তাঁর মৃত্যু হলে তখন কবিতাটি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়, যে কেউ আবৃত্তি করতে পারে এবং রচনাকারের কোনো নাম থাকে না, নাম মনে রাখাও নিয়মবিরুদ্ধ। 'চণ্ডীদাস ভণে' কিংবা 'কাশীরাম দাস কহে' এই উপায়ে রচনার মধ্যে কৌশলে লেখকের নাম ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারটা এস্কিমোরা জানে না।

এস্কিমোদের কিছু কিছু বিশেষ ধরনের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রচনাও আছে। তার মধ্যে এক রকম হল, প্রার্থনা-সঙ্গীত। এগুলো এস্কিমোরা বংশপরম্পরায় শিখে আসে। অসুখ, প্রাকৃতিক বিপদ কিংবা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যই এস্কিমোরা এসব প্রার্থনা-গান উচ্চারণ করে। এস্কিমোদের ধারণা, শরীরে অনেকগুলো আত্মা আছে, শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থিতে ছোট ছোট আত্মার অবস্থান—সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আত্মা থাকে ঘাড়ের কাছে, গলায় এবং বুকের মধ্যে। ভূত প্রেত কিংবা শত্রুরা ঐসব আত্মার যে-কোনো একটাকে অধিকার করে ফেলে কাবু করে দিতে পারে। এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এস্কিমোদের আলাদা আলাদা প্রার্থনা-মন্ত্র। কারুর মৃত্যু হলে কাঁদবে শুধু বাড়ির মেয়েরা এবং শোক প্রকাশের নিয়মেরও খুব কড়াকড়ি। শোক প্রকাশের কাল অন্তে বিয়োগবিধুর পরিবার গান গেয়ে বলবে, 'আমি আবার এসে বরফের পাতলা আস্তরণে পা রেখেছি, আমি এখন এই নবীনা পৃথিবীর মতই নবীন।'

প্রত্যেক সমর্থ এস্কিমোই অন্তত ১৫।২০টা এই ধরনের প্রার্থনা গীতি জানে। বুড়োদের কাছ থেকে তারা শিখে নেয়। শেখাবার সময় বুড়োরা বলে, "বিপদ থেকে মুক্তি পাবার এইসব গান বেশী ঘন ঘন ব্যবহার করো না! বেশী ব্যবহারে এদের রহস্য নষ্ট করো না!"

নিছক প্রেমের কবিতা প্রাচীন এস্কিমোদের মধ্যেই নেই। রূপগাথা, শিকারের গান, প্রবাদ উপাখ্যান—এগুলিই প্রধান। মেয়েদের অর্থাৎ স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করার জন্য পদ্মাপারের মাঝিরা যেমন গায়, 'পাবনা থেকে এনে দেবো টাকা দামের মোঠরি', তেমনি শিকার থেকে ফেরার পথে এস্কিমো মাঝিদের মুখেও গান শোনা যায়, 'বেটাকে এবার বানিয়ে দেবো সীলের চামড়ার নতুন কোট'। 'কায়াক' নৌকো

তিমির শিকার করার সময় এস্কিমোরা সব সময়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়—যাতে তাঁদের লোকেরা বুঝতে পারে তারা কত দূরে আছে—এই সময়ের জন্য কয়েকটা নির্দিষ্ট গান বাঁধা আছে, গানগুলো সংকেতের মতন, গান শুনেই তীরের লোক জানতে পারে—সেদিন আবহাওয়া কেমন, জলে বরফের ভাগ কতখানি, সেদিন সীল মাছ ধরা পড়লো কিনা। এস্কিমোদের লৌকিক প্রবাদ-গানের মধ্যে দুটি খুব সুন্দর। একটিতে আছে, একটি মৃত বাজনদার এস্কিমো বালক কবর থেকে জেগে উঠলো কঙ্কাল-শরীর নিয়ে। তারপর দেহের কঙ্কালেই সে খটাখট করে বাজনা বাজাতে লাগলো। আর একটি, ঠাণ্ডা সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে একটা দাঁড়কাক, ডুবে যাবার মুহূর্তে শেষ চিৎকারে সে গেয়ে যাচ্ছে তার মরণ সংগীত।

ছোটদের ঘুমপাড়ানী গান কিংবা পুজো-আচার মন্ত্রও এস্কিমোদের বাঁধাধরা আছে। জন্মের পর প্রত্যেক শিশুর জনাই একটা করে নতুন গান বাঁধা হয়। অর্থাৎ একই গানের সামান্য প্রকার ভেদ, সেই গানের মধ্যে সুবিধেমত ঘুরিয়ে শিশুটির নাম বসিয়ে নিতে হবে, এবং তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য সেই বিশেষ গানই গাওয়া হবে। পুরুতরাও মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলার জন্য গান বেঁধে রেখেছে।

এস্কিমোদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কবির লড়াই। বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এই কবির লড়াই অনুষ্ঠান হয়। প্রতিপক্ষে থাকে সাধারণত দু'জন পুরুষ। কিংবা দু'জন নারী। কোনো খোলা জায়গায় মুখোমুখি দাঁড়ায় দুই প্রতিপক্ষ, তাদের ঘিরে থাকে উৎসুক জনতা। দু' জনেরই কাঁধে ঝোলানো থাকে দুটি ঢোল। একজন খানিকক্ষণ ঢোল বাজাবার কায়দা দেখালে অপরজনকে আবার ঠিক সেইরকম ঢোল বাজিয়ে উত্তর দিতে হয়। তারপর কবিতায় প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নগুলিতে থাকে নানারকম ধাঁধা ও গল্পের অংশ এবং আমাদের দেশের কবির লড়াইয়ের মতই এস্কিমোদের এইসব কবির লড়াইতেও খানিকটা আদি রসের প্রাধান্য দেখা যায়। শারীরিক অংগভংগিও এইসব নাচের অন্তর্গত। তবে, এস্কিমোদের কবিত্ব-ক্ষমতা এত বেশী নয় যে, ঐসব লড়াইয়ের সময় তারা মুখে মুখে কবিতা বানাবে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই, গ্রামের বুড়োরা দু' পক্ষকেই আগে থেকে কবিতায় সব প্রশ্নোত্তর শিখিয়ে মুখস্থ করে দেয়।

এস্কিমোদের এই প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের ধারা অবশ্য এখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। ১৭২১ সালের পর থেকেই ডেনমার্ক, নরোয়ে এবং জার্মানি থেকে নানান অভিযান আসে ওদের দেশে। একটু একটু করে খ্রীষ্টান ধর্ম ছড়ায়। ইওরোপীয় মিশনারিরা এসে গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের লিখতে ও পড়তে শেখায়। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সবই শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। তবে, এস্কিমোরা ইওরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও নিজেদের ভাষা ছাড়ে নি। দক্ষিণ গ্রীনল্যান্ডের ভাষাই এস্কিমোদের মোটামুটি লিখিত ভাষা।

খুব বেশী চমকাবার কিছু নেই, বাংলা গদ্যসাহিত্য ও এস্কিমোদের গদ্যসাহিত্যের বয়েস প্রায় এক। প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছিল মাত্র এক শো দশ বছর আগে এস্কিমোরাও গত শতাব্দী থেকে উপন্যাস-নাটক-খণ্ডকাব্য লিখতে শুরু করেছে। আধুনিক এস্কিমো সাহিত্যে ডেনমার্কের সাহিত্যের প্রভাবই বেশী। হেনরিক লানড, পাভিয়া, জোনাটান পেটারসন ইত্যাদি এস্কিমো ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখক।

এস্কিমোদের বিষয়ে এই তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি অ্যালেক্স প্রেমিংগার সম্পাদিত কোষগ্রন্থ থেকে।

সনাতন পাঠক

অরণ্যদেব ★ লী ফক

ছোট্ট রাজার একটি বন্ধুও জুটেছে ----
?
আমার বল!

বল দে!
!

আঁ আঁ আঁ

রাজা আর তার বন্ধু টমটম সারাদিন হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ায়...
আয় রে টমটম!

আসছি রাজা!
টমটম হচ্ছে লেঙ্গো-সর্দারের ছেলে। আসল নাম টুমিটুমলো। কিন্তু বলে, টমটম।

রাজা আর টমটম শিখছে, কী করে বর্শা ছুঁড়তে হয়, কী করে তীর-ধনুক চালাতে হয়, কী করে ফাঁদ পাততে হয়-----

শিকারে বার হলে অরণ্যদেব আজকাল রাজাকে মাঝে-মাঝে সঙ্গে নেন।
শ-শ-শ..
6/26

তা ছাড়া আছে ডেভিল, আছে হীরো, আর আছে পোষা বাজপাখি ----

হীরোর পিঠে রাজা -----

সেই সঙ্গে পড়াশুনোও চলছে -----
কোপেনহেগেন হচ্ছে... কোপেনহেগেন হচ্ছে...
ডেনমার্কের রাজধানী

একটি ইকেবানা রূপ

দিল্লির ডায়েরি

বিরাট বড়লোকের বড় বাড়ি, অট্টালিকা। বিদেশে নয়, ভারতে। প্রবেশদ্বারে দ্বাররক্ষকের অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ঢুকেছেন কি, আপনার পিছে [illegible] বারান্দার দিকে বড়রা লোকের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ইয়া লম্বা [illegible] তার [illegible] মাথায় রঙীন রেশমী রুমাল, চোখে কালো সানগ্লাস্ (রোদ্ থাকুক কি না থাকুক), আর গা ঘেঁষে (ভাইটেলিটি ৪০-৩০-৩৪!) একটা [illegible] সোয়েটার নিচে [illegible] [illegible] [illegible] পাটে।

[illegible] ও [illegible] ধড়ফড়ানি সামলে [illegible] বিরাট বসবার ঘরে—ঘর [illegible] [illegible]; দামী কার্পেট, [illegible] পর্দা, সোফাসেট, ডিভান, অসংখ্য ছোট ছোট টেবিলে অনেক কিছু সাজান-বসান, এখানে ওখানে বই, পুতুল [illegible] মূর্তি, দেয়ালে তৈলচিত্র এক কোণে ককটেল বার, আর সিগারেট-পাইপের ধোঁয়া আর বাটিক-শাড়ির, [illegible] ঝিলমিল, আর দামী সেন্টের মনোরম সুবাস।

এমনি আধুনিকতার পরিবেশে আপনার চোখ বড় সাদাসিধে আলপেড়ে শাড়ি-পরা সুন্দর একটি মেয়ের উপর, যেন বড়লোকের আশ্রিতা আত্মীয়ার সুন্দরী কন্যা। আপনার মনটা হঠাৎ বলে ওঠে, আহা, কী সুন্দর! বাহুল্য নেই, গর্ব নেই, শুধু সুন্দর।

এটা রূপক মাত্র। বড়লোকের বাড়ি না-হয়ে ধরুন আমাদের অশোকা হোটেল। তার তিনতলায় একটা হলঘরে সেদিন দেখলাম অমনি বাহুল্যহীন, অনড়ম্বর, গর্বহীন সুন্দরদের যারা শুধু নিজস্ব সৌন্দর্য-দিয়েই নিজেদের শোভিত করে, ঐশ্বর্য-দাপটে নয়। তারা মেয়ে নয়, তারা ফুল-পাতা-কাঠি-কাঠ, আর হয়তো কাটুম-কুটুম। এসবের তৈরি পুষ্পসজ্জা, জাপানী ধরনে, যে-ধরনটির প্রাচীন নাম হল "ইকেবানা"।

না দেখলে বিশ্বাস হয় না পুষ্পসজ্জা আরো সুন্দর হতে পারে, হাতের কাছে-পাওয়া সস্তা আটপৌরে জিনিসে সাজানোটা হয়তো ভাল হতে পারে, সাঁওতালী মেয়ের মাথার খোপায়-গোঁজা মহুয়াগুচ্ছ বা চাঁপাফুলের মতন সুন্দর দেখায়। অনেকগুলো কাজ ছিল প্রদর্শনীতে, একশো প্রায় গোটা [illegible]।

তার ভিতর পাঁচটি আরো অপূর্ব। এগুলো সাজিয়েছেন যারা এক্সপার্ট, শিক্ষার্থিনী নয়। (সবগুলোই মেয়েদের কাজ। ও-মহলে তারাস বাই মালিনী।) এবং ইকেবানার শিল্প-শৈলী এতো উচ্চ পর্যায়ের যে, মুঘল-রাজপুত স্কুলের মিনিয়েচার চিত্রকেও তারা রূপ দিতে পেরেছেন পুষ্পসজ্জায়। গোড়াতেই বলেছি, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন একজন বাঙালী মহিলা, শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত সাহিত্যিক "যাযাবর" অর্থাৎ প্রেস্ কাউন্সিলের সচিব শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। সজ্জাটির নাম ছিল, "বিরহিনী নায়িকা"। দেখালে ১৭৬০ সালের ভঙ্গিমায় আঁকা একটি রাজপুত-কলমের চিত্র। দুঃখিনী এক নারী হরিণীকে যেন শোনাচ্ছেন তার কাহিনী বাঁশীর মতো একটা যন্ত্রের মাধ্যমে। তলায় পুষ্পসজ্জায় রূপায়ণ। উঁচু সাদা কাল-ফুলের গোছায় সামনে ডিম্বাকৃতি কালো কাঠের বাসনে লাল লম্বা গ্লাডিওলি যেন ঐ বিরহিনী। তার উপরে বিরহের চিহ্ন নিয়ে নোয়ানো বটল্-ব্রাশ গাছের চিকন একটা ডাল। আবার ঐ বাসনের অন্য কোণ থেকে মুখ তুলে চেয়ে গ্লাডিওলির না-ফোটা কলি, ঠিক হরিণীর মতো মুখ তুলে চেয়ে আছে নায়িকার দিকে। শুধু বলতে হয়, "আহা, কী সুন্দর।"

এই রূপে ছিল শ্রীমতী আয়েঙ্গারের "প্রদীপ সহ যুবতী নারী"। আঁচলে প্রদীপ ঢেকে দিয়ে চলছে প্রিয়-মিলনে। সাদা আঁকাবাঁকা কাঠ, উপরে পাতলা মসলিনের ঘোমটা জড়ানো, কোনায় লাল ফুল, উপরে সাদা ফুল। মিসেস্ উষা নারায়ণের "তড়ারি রাগিণী", মিসেস রায় চৌধুরীর "ফুল ও পাখি।" ওগুলোই হল মিনিয়েচার চিত্রের পুষ্পসজ্জায় রূপায়ণ।

দেখলে হয়তো কেউ বলবেন, "আরে, এ আর কী। এ তো আমিও পারি।" অনেকটা ঐ কলম্বসের ডিম বসানোর মতো। একদিন নাকি খাবার টেবিলে একটা সেদ্ধ ডিম নিয়ে বলেছিলেন, "এটাকে কে সোজা করে বসাতে পারে?" কেউ পারল না। তখন উনি ডিমটার তলার দিক একটু

শ্রীমতী গুপ্তের ডিনার সজ্জা

শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায় তাঁর ইকেবানা সজ্জার পাশে

ভেঙে বসিয়ে দিলেন। সমস্বরে চিৎকার, "আরে এতো আমিও পারি!" "পার ঠিক; কিন্তু না-দেখানোর আগে নয়।" তবে কিনা ইকেবানার পুষ্পসজ্জায় থাকে এমন একটা সৌন্দর্যবোধ ও ব্যাকরণ জ্ঞান যে, দেখলে বড়জোর অনেক কষ্টে নকল করতে পারা যাবে, এই মাত্র। অবশ্য, সৌন্দর্যবোধ থাকলে ও একটু শিক্ষা পেলে না-পারার কোনো কথা নেই।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন: ইকেবানার আসল কথা হল হাতের কাছে পাওয়া, অর্থাৎ সচরাচর পাওয়া যায় ও দাম বেশি নয়, এমনি জিনিস নিয়ে সাজানো। সেখানে আছে রেখাহীন, রঙ সম্বন্ধে সচেতনতা ও একটা সামগ্রিক সৃষ্টিপ্রয়াস।

দিল্লিতে কয়েক বছর আগে এলেন একজন আমেরিকান অফিসারের জাপানী স্ত্রী, মিসেস্ স্টীন্। নিজে প্রদর্শনী করেন প্রথম, তারপর সুদূরনগরে ক্লাস করে শেখাতে লাগলেন কয়েকজনকে। প্রথমদিকের শিক্ষার্থিনীদের অন্যতম হলেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, যিনি ফুলের চাষ (বাগানে) নিয়ে সার্থকভাবে মাথা ঘামাচ্ছেন আজ ১০।১৫ বৎসর। (অনেক পুরস্কারও পেয়েছেন)। মিসেস্ স্টীন্ চলে যাচ্ছেন। অন্য কেউ হয়তো ক্লাসটা চালাবেন। রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব শ্রীগুনেভেডিয়ার পত্নী ইকেবানার মস্ত পৃষ্ঠপোষক এবং উনিও হয়েছেন দিল্লীর "ইকেবানা ইনটারন্যাশনাল" নামক সংস্থার সভাপতি। এই বছরই হল এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে এই প্রথম। লণ্ডন, প্যারিস্, নিউইয়র্ক অনেক স্থানে আছে এই "ইকেবানা আন্তর্জাতিক।" আসল সংস্থা হল টোকিয়োতে। সেটার অনুমতি ভিন্ন কোনো স্থানে "ইকেবানা আন্তর্জাতিক" খোলা যায় না। এই আন্তর্জাতিকের স্লোগান হল: "ফুলের মাধ্যমে বন্ধুত্ব।"

ঘুরে ঘুরে সেদিন দেখলাম সৃষ্টি-সুন্দরদের। কারোর কাঁচা হাত, কারোর পাকা। কিন্তু সৃষ্টিদের যদি প্রাণ থাকত, তাহলে তারা স্রষ্টাদের জামাকাপড়-শাল-বটুয়া ইত্যাদির আধুনিকতা ও ঐশ্বর্যের চিৎকার শুনে হতভম্ব হয়ে যেতো। বাঁশের গুঁড়ি, তার মুখেচোখে খোঁচা খোঁচা শুঁয়োপোকা দাড়ি। সঙ্গে চমৎকার পাঁচটি লাল গোলাপ। নাম "পশু ও সৌন্দর্য" একটা কাঠের গুঁড়ি, এবড়ো খেবড়ো। বেঁকে উঠেছে বিজিতি কচুপাতা। আবার তিন: পাইনের ডাল সুঠামভাবে নানা কোণায় নানা ভঙ্গিমায় রাখা। মাঝে একটি মাত্র ফুল, ক্রিসেন্থেমাম্। কিম্বা: দুমড়ে-ভাঙা ম্যাগনোলিয়া ঝাড়ের পাতা কয়েকটা; ডালের সঙ্গে জোড়া কয়েকটি হলদে ক্রিসেন্থেমাম্। আরো: শুকনো ডাল, শুকনো বড় শালপাতা, শুকনো বালি। সুন্দর করে সাজানো। নাম হল: খরা। (বাস্তবের খরায় অনাহারের কদর্যতা!)

মনের খটকা আমার যায়নি। জাপানের ঘরবাড়ি হল আতিশয্যহীন; তাদের বসার ঘরে সাজ-সরঞ্জাম মাত্র একটি মাদুর, একটি ছোট জলচৌকি, আর চায়ের বাটি, দু একটা কুলুঙ্গি ফুল রাখার। সেই পরিবেশে জাপানী পুষ্পসজ্জা-রূপ খুব স্বাভাবিক দেখায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত, কি আরো বিত্তশালী ভারতীয়দের ঘরে? প্রায় ঐ সমস্ত জিনিস, যে-বর্ণনা দিয়ে লেখাটার শুরু।

"সুন্দর নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ পরিবেশে মানায় কি?" জিজ্ঞেস করলাম শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়কে। উনি বল্লেন: "হাঁ, সেখানেও তার স্থান আছে। কারণ, সেখানে অনাধারে মনকে কেন্দ্রীভূত করার যেন কিছু নেই। একটি ইকেবানা পুষ্প-সজ্জা সবকিছুকে অবজ্ঞা করে মনকে টেনে নেবে তার সহজ সরল সৌন্দর্যের দিকে।"

হয়তো দুই ঠিক। নির্ভর করে দেখার উপর। পাশ্চাত্য দেশেও জাপানের ঢেউ লেগেছে, কিন্তু এখনো গাদাগাদা ফুল একত্র করে একটা ডালি না করলে, দুডজন গ্লাডিওলাসের অথবা পঞ্চাশটি গোলাপের স্তবক না হলে তাদের মন ওঠে না, বা মন পাওয়া যায় না। আর আমাদের? কী জানি। ফুলের স্থান আমাদের হল দেবতার কাছে। আর হল মালা। আর মালার দাম সব চাইতে বড় বিয়ের রাতে ও ফুলের তোড়ার সব চাইতে বেশি ফুল-শয্যায়। বাদবাকি খোঁপায়, দক্ষিণ ভারতে বেণীতে, ভি আই পি-র জন্যে হাঁটু অবধি মালা রাজঘাটে দেওয়ার পাশ্চাত্য ঢংএর "রিদ্" ও পানজাব-দিল্লীতে বরযাত্রীদের গলায় গাঁদাফুলের মালা। কলকাতার রুচিবান ঘরের কোণায় রজনীগন্ধা পুষ্প-সজ্জার প্রায় শেষ কথা।

জাপানে ফুলকে যেমন আপনার করে নিয়েছে, সহজলভ্য জিনিস নিয়ে প্রতি ঘরে তারা যে-ভাবে সাজাতে শিখেছে সে-ভাবে আমরা কদ্দুর পারব সন্দেহ আছে। ইকেবানা-কৃষ্টি যদি প্রসার লাভ করে, মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে, তাহলে ১০।২০ বছরে একটা "পুষ্প-বিপ্লব" এসে আসতেও পারে। অন্তত বাঙলা দেশে আসুক, কামনা করি।

—খগেন দে সরকার

সুজিতকে চিনি না

শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ১০ অগ্রহায়ণের "সুজিতকে চিনি না" গল্পটি বেশ ভালো লেগেছে। সুজিতের বিচিত্র চরিত্র ও আকাঙ্ক্ষা লাভের চেষ্টা বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। কিন্তু গল্পটির সঙ্গে আলবার্তো মোরাভিয়ার রচিত 'More Roman Tales'-এ প্রকাশিত "The Film Test" গল্পটির মিল পাওয়া গেল। সুজিতের সঙ্গে মোরাভিয়ার গল্পের শিল্পপতির ড্রাইভারের চরিত্রে কোনও তফাত নেই। জানি না লেখার সময় পর্যন্ত লেখক ঐ গল্পটি পড়েছেন কিনা।

সুধীন দত্ত
কলিকাতা-৩

লেখকের বক্তব্য

আমার লেখা 'সুজিতকে চিনি না' গল্পটির জন্য আপনাদের কাছে যে চিঠিখানি এসেছে সে চিঠিখানি আমি দেখলাম। গল্পটি তাঁর ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। কিন্তু শ্রীসুধীন দত্ত মহাশয় আলবার্তো মোরাভিয়ার লেখা 'The Film test' গল্পের একটি চরিত্রের সঙ্গে আমার সুজিতের যে মিলের কথা লিখেছেন সেটি কিরকম ধরনের মিল বুঝতে পারলাম না কারণ সে-বইটি আমি পড়িনি। বইটির সন্ধানে রইলাম। পড়তে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে এইটুকু আমি জানাতে পারি সিনেমা-জগতে আমি অনেকদিন ছিলাম। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি এর আগেও কয়েকটি গল্প লিখেছি, আরও কয়েকটি লিখবার ইচ্ছে আছে। এ গল্পটিরও মূলে আছে আমার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রমথেশ বড়ুয়া

সুনন্দ তাঁর জার্নালে "আমাদের চোখে" পূর্বসূরীদের মূল্যায়ন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যা বলেছেন তা সত্যি চিন্তার বিষয়। একালের মানুষ যদি অতীতের চিন্তানায়কদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁদের অহেতুক হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন, তাহলে এই কার্যাবলীকে কি আখ্যায় ভূষিত করব এমন ভাষা বা বিশেষণ আমার জানা নেই। শুধু একটি কথাই বলতে পারি যে, যে বীর্যের প্রসাদে আমি মনুষ্যেতর প্রাণী-রূপে জন্মগ্রহণ করিনি, সেই সৌভাগ্যের প্রতি উষ্মা প্রকাশই যেন এই মূল্যায়নের প্রতিপাদ্য বিষয়। সিনেমার পটভূমিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার সমালোচনা একমাত্র তাঁর সমকালীনদের পক্ষেই সম্ভব। আর যাঁদের সম্পর্কে এই মূল্যায়নটি তুলে ধরা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে কত শতাংশ প্রমথেশ-কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত। পাঠকদের সামনে প্রমথেশ-এর মূল্যায়ন তুলে ধরতে হলে প্রমথেশকৃত ছবি-গুলি আগে তাঁদের কাছে সিনেমার পরদায় তুলে ধরতে হবে। নচেৎ সমালোচনাই বলুন আর মূল্যায়নই বলুন—সব কিছুই শূন্যে উদয়ে ঢেঁকুর তোলার সামিল।

এ-যুগের সমালোচকদের (!) জানা প্রয়োজন যে, যে প্রক্রিয়ায় প্রমথেশ বড়ুয়া একটি যুগের সৃষ্টি করেছিলেন, তারই কক্ষপথে আজও আমরা আবর্তিত হচ্ছি। আজকাল অন্তর্জাতিক বিচারের মানদণ্ডও নিম্ন-গামী। সাম্প্রতিক কয়েকটি ফেস্টিভ্যালই তার প্রমাণ।

প্রমথেশ বড়ুয়ার একটি 'Draw back' অবশ্য ছিল। চিত্রপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংগীত-পরিচালনায় অক্ষম ছিলেন।

প্রমথেশ ভারতীয় চিত্রজগতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক। তিনি কালজয়ী এবং যে-কোনো বিচারকের "ধারের" ঊর্ধ্বে।

দেবব্রত দাশগুপ্ত
আসানসোল

ছাত্র বিক্ষোভ

আপনাদের 'ছাত্র বিক্ষোভ' সম্পাদকীয় নিবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যুক্তি-পূর্ণ হয়েছে মনে করি। ছাত্ররা আজকাল সামান্য কারণেই বিক্ষোভ বা আন্দোলনের আরম্ভ হয়। আগের তুলনায় আজকের ছাত্রদের মধ্যে যে সংঘ-চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংঘ-শক্তি যে প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়, সেটা আর জোর করে বলার কোন দরকার করে না। কিন্তু ছাত্রদের এটা সব সময় লক্ষ রাখা দরকার যেন এই সংঘ-শক্তির অযথা অপব্যয় না হয়। সংগঠিত সংঘ-শক্তি যেমন নানা হিতকর কাজ করতে পারে তেমনি এই শক্তি অন্যদিকে অর্থাৎ বিপথে চালিত হলে নানা জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। যেখানে একটি ছাত্রীর জন্য কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপকরাই একযোগে পদত্যাগ করবেন স্থির করেছেন এবং অপরপক্ষে ছাত্ররা এই ছাত্রীটিকেই কলেজে রাখার জন্য জিদ ধরেছেন, সেখানে ছাত্রদের সংঘ-শক্তি যে আজ বিপথে চালিত হচ্ছে, সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তাছাড়া যেটা ঘোরতর অন্যায় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই হলো ছাত্রদের কাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। ছাত্ররাই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও নানা জটিলতার সৃষ্টি করছে।

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ
দাসপাড়া, চুঁচুড়া।

নেলি শাখস

গত ৫ই নভেম্বরের দেশ পত্রিকায় শ্রীনকুল ভট্টাচার্যের নেলি শাখস্-এর ওপর লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। আপনার অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য আরও কিছু জানাতে চাই। ব্যক্তিগত জীবনের কথা কবির কবিতা বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে হয়।

১৮৯১ সালে বার্লিনে নেলি শাখস্-এর জন্ম হয়। বাবার নাম উইলিয়াম, মার নাম মার্গারেট। তিনিই বাবা-মার একমাত্র সন্তান। বার্লিনের মনোরম 'টিয়ার গার্টেন' অঞ্চলে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছেন, ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁর বাবার সংগীত-প্রিয়তার কথা। উইলিয়াম খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তিনি যখন পিয়ানোতে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করতেন তখন নেলির চরণ দুটি নাচের তালে তালে তাকে যেন কোন্ স্বপ্ন-লোকে নিয়ে যেত, ছেলেবেলা থেকেই এমনি করে বাবার সংগীতে পেয়েছেন নাচের প্রেরণা। তাঁর ছেলেবেলার সবচেয়ে বড় সাধ ছিল নর্তকী হওয়ার। আর্ট তো তাঁর আবাল্যের সহচরী। তাই প্রথম জীবনে লেখনীর চেয়ে নাচের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সে পথে যেতে দিল না। নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁকে লেখনীই ধারণ করতে হল। তাঁর বাবার ছিল খুব বড় গ্রন্থাগার, অল্প বয়সেই সেখানে তিনি বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন জাতির রূপকথার কাহিনী পড়ে ফেলেছিলেন। সবচেয়ে বেশি করে পড়তেন রোমান্টিকদের (জার্মান?) লেখা বই আর প্রাচ্যদেশের Books of wisdom।

প্রথম কবিতা রচনার সময় ওঁর বয়স ছিল সতের। শ্রীভট্টাচার্য লিখেছেন, "যতদূর জানা গেছে, নেলি শাখ্সের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।" আমার

মনে হয়, এর আরও কিছু আগেই হয়ত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকবে। তাঁর কবিতা রচনা যখন ১৯০৮ সাল থেকে শুরু তখন নিশ্চয়ই দীর্ঘ ১৩ বছর তাঁকে সেগুলি প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। অবশ্য প্রমাণের অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

এর পরের ইতিহাস শ্রীভট্টাচার্যের লেখাতেই পাওয়া যাবে। শুধু দুটি বিষয় সংযোজনের অপেক্ষা রাখে। তাঁর অনুবাদ পড়ে সুইডিস লেখকরা তাঁর সঙ্গে শুধু বন্ধুত্বই করেনি, তাঁকে সুইডিস সাহিত্যে পুরস্কার দিয়ে প্রথম সম্মানিত করার গৌরবও অর্জন করে।

"Eli" নামে তিনি যে অতীন্দ্রিয়বাদী নাটক রচনা করেন তার পুরো নাম—Eli, ein Mysterienspiel Von Leiden Israels।

নেলি শাখসের ছেলেবেলার এই কাহিনী-টুকু যদি আপনার পাঠকদের গোচরে আনেন তাহলে বাধিত হব।

প্রণব ঘোষ
অধ্যাপক, জার্মান বিভাগ,
বিশ্বভারতী।

রঙমহলে "অতএব" নাটকের কয়েকজন শিল্পীঃ (বাঁ-দিক থেকে) জহর রায়, সরযূবালা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

জহর কোট চাপিয়ে দেন। এটা বাংলা ছবির কনভেনশন। আধুনিক তরুণের চোখে চশমা থাকা খুবে স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে কী? বাংলা ছবির তথাকথিত রোমান্টিক নায়কের চোখে আপনি সাধারণত চশমা দেখতে পাবেন না। যদিও নায়ক য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করছে (এটাও রীতি)। তবুও নয়। অর্থাৎ বাংলা ছবির নায়করা সুদর্শন, সুগায়ক, মেধাবী ও চশমা-রহিত। বলার উদ্দেশ্য, চশমা যদি তাদের পরতে হয় সেটাও এক রকম কনভেনশন-এর দায়ে। অথবা বিশেষ কোন ইমেজ-এর প্রয়োজনে। শর্মিলা ঠাকুরের চোখে যেমন চশমা দেখেছিলাম। "একটুকু বাসা"তে সন্ধ্যা রায়ের চশমা পরার বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাইনি। সেটা খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চোখে প্রথম চশমা দেখা যাবে "তীরভূমি"তে। জানি না কী কারণে।

গুজবে কান দেবেন না। ওয়াহীদা রেহমান ও বিজয় আনন্দের বিয়ে হবে বলে খবর রটে গিয়েছিল। বোম্বাইয়ের কোন একজন চিত্র-পরিচালক আমাকে বলেছেন, সংবাদটি সত্য নয়। তিনি ওয়াহীদা রেহমানকে বলেছিলেন তোমাকে নিয়ে ছবি করতে তো আর ভরসা পাচ্ছি না। বিয়ে হয়ে গেলেই 'ডেট' নিয়ে ঝামেলা শুরু হবে। উত্তরে নাকি ওয়াহীদা তাঁকে জানিয়েছেন, রটে যা, তা সব সত্য নয়।

পরিচালক সুবোধ মিত্র নির্বাক যুগের বিখ্যাত শিল্পীদের 'স্টিল' খুঁজছেন। ভ্যালেন্টিনো, ফেয়ারব্যাঙ্কস্ প্রভৃতির ছবি। এঁদের চেহারা নিয়ে পুরনো দিনের ছায়াচিত্রের হোর্ডিং তৈরি হতে পারে। "গৃহদাহ"-র জন্য। কারণ, কেদারবাবু প্রায়ই সিনেমায় যেতেন।

পাদপ্রদীপের আলোয়

রঙমহলে "অতএব"

এমন নাটকই ভাল, যা আমাদের শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে না। এমন নাটকই বুঝি সুখের, যা দেখতে বসে কঠিন অঙ্ক কষার মত জীবনের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। এবং সারবচন শুনতে হয় না। সে নাটক কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যহের দুঃখকষ্টের হাত থেকে পলায়নের পথ দেখিয়ে দিলেও ক্ষতি নেই। পলাতকের অপবাদ সানন্দে মেনে নিতে পারি। কারণ, প্রতিদানে যা পাই তাতে মন ভরে। রঙমহলে এখন অভিনীত হচ্ছে যে কমেডি নাটক, সেই "অতএব"-এর (বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত) জন্যই এই ভূমিকা। পুরোপুরি হাসির নাটক "অতএব"। কথাটা বলার উদ্দেশ্য আছে। অনেক সময় হাসির সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকে, আবার হাসির আড়ালে নাকি অশ্রুবিন্দুও খুঁজলে পাওয়া যায়। "অতএব"-এ এমন কোন জটিলতা নেই। স্ল্যাপস্টিক কমেডি, শুধু হাসি। না হেসে উপায় নেই। সংগতি-অসংগতি, বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন তুললে ঠকতে হবে, প্রাপ্য রসাস্বাদ আদায় হবে না।

কাহিনীর প্রধান পুরুষ বিত্তবান দোলগোবিন্দ। বয়স পঞ্চাশ। বিশ বছর বয়সের অমিতার পাণিপ্রার্থী। অমিতার প্রণয়ী সৌমিত্র জানে না, নিজের জ্যাঠামশাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। গল্পের ক্লাইম্যাক্স-এ অবশ্য সাসপেন্স-এর আমেজ আছে। এবং এর আগে অমিতাকে বাঁচাবার জন্য তার বোন নয়ন এবং সৌমিত্র ও তার বন্ধু যে প্ল্যান আবিষ্কার করে তাতেও কৌতুকের উপকরণ সামান্য নয়। নাটকের প্রথম দিকটায় ঘটনা অল্প। বরঞ্চ একই ধরনের পরিস্থিতির পৌনঃপুনিকতায় কিছুটা ভারাক্রান্ত। একাধিক চরিত্র একই ঢঙের, একই প্রকারের কৌতুক বার বার পরিবেশন করে যাচ্ছে। ওই মুহূর্তেও আমরা হাসি, অনেকটা যেন সুড়সুড়ি পেয়ে। সে অল্পক্ষণের জন্য। তারপরেই তুবড়ি-বাজির ফিনকির মত অনর্গল রঙ্গকৌতুক ঝরে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে সারা প্রেক্ষাগৃহে। হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত দর্শকের দম আটকে যাওয়ার পালা।

কেন বা তা হবে না? হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায় নাট্য-পরিচালক। অতএব..., রঙ্গরসে পুরোমাত্রায় দর্শকরা আশা করতে পারেন সুপরিচালিত, স্বচ্ছন্দগতি এই নাটকটিতে।

তার চেয়েও বেশী উপভোগ্য প্রধান শিল্পীদের সুন্দর অভিনয়। অভিনয় নাটকের সামান্য দোষ-ত্রুটি অনায়াসে ঢেকে দিয়েছে। জহর রায় সেজেছেন দোলগোবিন্দ। শুধু কমিক ভূমিকাই নয়, রীতিমত একটি টাইপ চরিত্রে শ্রীরায় অসামান্য অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কথাতেই দর্শকরা হেসে উঠেছেন, কোন কোন মুহূর্তে সূক্ষ্ম অভিনয়-কলার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন।

আর যিনি, যেন অলক্ষ্যে নিঃশব্দে, ক্ষণে ক্ষণে দর্শককে রঙ্গরসে মাতিয়ে তুলেছেন তিনি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (নয়ন)। এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও সাবলীল কৌতুকাভিনয় মঞ্চে বিরল। সরযূবালা দেবীও দর্শককে কম আনন্দ দেননি। তিনি সেজেছেন নায়িকার আন্টি, অভিভাবিকা। শাসন-তর্জন-গর্জন এবং দোল গোবিন্দকে বাগে আনার চেষ্টা শিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অজয় গাঙ্গুলীর সৌমিত্রকেও ভোলা যায় না। সমস্যার পড়ে কখনও হতভম্ব, কখনও বা প্রেমের প্রেরণায় অপরিণামদর্শী সাহসী, অস্থিরচিত্ত, বদমেজাজী এই চরিত্রটি শ্রী গাঙ্গুলী-কে

"এণ্টনি কবিয়াল"-এ [illegible] গাঙ্গুলী, কেতকী দত্ত, কল্যাণী ঘোষ কালীপদ চক্রবর্তী

এণ্টনি কবিয়াল

নাট্যরসিকদের একটি সুসংবাদ দেবার আছে। সারি সারি পেশাদার মঞ্চ যে অঞ্চলে সেখান থেকে একটু দূরে, [illegible] পুলের কাছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে নান্দিক-গোষ্ঠীর "এণ্টনি কবিয়াল" (বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত)। নাটকটির প্রশংসা শুনেছিলাম আগেই। পরে স্বচক্ষে দেখে এলাম। দেখলাম, আন্তরিকতার জয়। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। "এণ্টনি কবিয়াল" নাটকে [illegible] শিল্পী কয়েকজন রয়েছেন, তাঁরা অভিনয়ে [illegible] অতি [illegible]। নাটকেরও [illegible] আছে। কিন্তু সমগ্র প্রযোজনাটিতে ছড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে এমন এক নিষ্ঠা, দর্শককে সুন্দর ভাল কিছু দেবার এমন একটা তীব্র আগ্রহ, যা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। "এণ্টনি কবিয়াল"-এর আবেদন তাই অনিবার্য।

উনিশ শতকের সেই বিদেশী, জাতিতে পর্তুগীজ হয়েও যিনি বাংলা দেশকে, বাঙালীকে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁরই কাহিনী—এণ্টনি কবিয়াল। কিছু তথ্য, কিছু [illegible] এবং কিছুটা কল্পনা—এ নিয়েই নাটক। এবং নাটকের মূল আবেদন মাধুর্য ভাব ও ভক্তিরসে। এণ্টনি ও সৌদামিনীর প্রেম ও পরিণয়ে যেন আমরা মধুর ভাবের ছায়া দেখতে পাই। এ প্রেম যেন সাধনার ধন। অপর দিকে রয়েছে ভক্তি, গানের সুরে ও প্রাণের আকুলতায়। পাশাপাশি প্রবহমান দুই স্রোত—প্রিয়কে দেবতা করার প্রেম এবং দেবতাকে প্রিয় করার পূজা। দুয়ে মিলে "এণ্টনি কবিয়াল" অদ্ভুত এক রসতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে—যা দর্শকের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে। তার চেয়েও বড় কথা, এই নাটকে বাংলা ও বাঙালীর প্রাণের স্পর্শ মেলে। কবিয়াল সম্প্রদায়ের (ভোলা ময়রা ও এণ্টনির [illegible]) [illegible] এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

এণ্টনির প্রতি শত্রুতা ও তাঁর উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলি (যেখানে সৌদামিনীর কাকা খলনায়ক) স্থূলে নাটকীয়তার শর্তই বিশেষভাবে পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে আতিশয্য বর্জন করা যেত। ছোটখাটো ত্রুটি নাটকে আর যাই থাকুক না কেন, নাটকের প্রধান রস এবং গান দর্শকের মন অভিভূত করে রাখে।

নাটকের প্রধান সম্পদ সম্ভবত অভিনয়। প্রথমে কার নাম করব, সেটাও সমস্যা। সৌদামিনী-বেশিনী কেতকী দত্ত আমাদের অবাক করে দিয়েছেন। শ্রীমতী দত্তর প্রেমিকা সৌদামিনীর [illegible] তুলনা নেই। প্রাণের এত সুধা, এত আবেগ, অন্তরের বহু অকথিত কথা তিনি অবলীলায় তাঁর অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন। তার চেয়েও বেশী মুগ্ধ করে শ্রীমতী দত্তর গান। শিল্পীর এই গুণের পরিচয় পেয়ে দর্শক বিস্মিত হবেন।

ভোলা ময়রা রূপে গাঙ্গুলীর শিল্পী-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মঞ্চে এমন প্রাণবন্ত চরিত্র-সৃষ্টি আমরা খুব বেশী দেখিনি। কবিয়ালের সব লক্ষণ, কথা বলার ও গানের ভঙ্গি তাঁর চরিত্র-চিত্রণে পাওয়া যায়। এণ্টনি সেজেছেন সবিতাব্রত দত্ত। দক্ষ অভিনেতা চরিত্রটিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। অন্তর-যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিও তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। শেষের দিকে ঈশ্বরভক্ত এণ্টনিকে শ্রী দত্তর মধ্যে খুঁজে পাই। এবং তাঁর গান দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

কালীপদ চক্রবর্তী, সাধনা রায়চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ এবং তরুণ মিত্র অতি উঁচু-দরের অভিনয় করেছেন। তাঁদের চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রীমতী ঘোষ যে মঞ্চে এত ভাল অভিনয় করেন, তা আগে জানা ছিল না।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, সীতা মুখোপাধ্যায়, পরেশ দাস প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন।

'বিবাহ বিভ্রাট' (পরিচালনা: অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে অনুপকুমার ও [illegible] চক্রবর্তী

অভোর ... সুরের জন্য সংগীত-পরিচালক অমিয় বাগচী প্রশংসা পাবেন। মঞ্চসজ্জা সরল, উপভোগ্য।

নাট্যম অভিনীত "অন্তরাগ"

"নাট্যম" সংস্থা তিনকড়ি ঘোষ রচিত ও পরিচালিত 'অন্তরাগ' নাটকটি রঙমহলে মঞ্চস্থ করেন। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও উন্নত অভিনয়গুণে নাটকটি উপভোগ্য হয়।

"সপ্তপদী প্রজাপতি" (পরিচালনাঃ ... চক্রবর্তী) ছবিতে কিশোরকুমার ও তনুজা

নাটকটি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণহীন মনে হয় নি। বিভিন্ন ভূমিকায় শ্যামলী চক্রবর্তী, অতীন রায় চৌধুরী, রথীন চন্দ, চুণীলাল রায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় ঘোষাল, নরেশ বাগচী, কমল দত্ত, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পুতুল চক্রবর্তী ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় সুঅভিনয় করেন।

মুক্তঅঙ্গনে 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু'

'সুন্দরম' মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে প্রতি রবিবার সকাল দশটায় নিয়মিত অভিনয় আরম্ভ করেছেন। অক্টোবর এবং নভেম্বরে, তাঁরা পরীক্ষামূলক নতুন একাংক 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড' 'ভিসুভিয়াসের মৃত্যু' ইত্যাদির অভিনয়ের পর ডিসেম্বর মাস থেকে সকালে 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু' নাটকটি অভিনয় করছেন। নাটকগুলির নাট্যকার নির্দেশক এবং সংগীত নির্দেশক পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

দাক্ষিণাত্যে শিশু রংমহল

শিশু রংমহলের পঞ্চাশজন শিল্পীর দলটি দাক্ষিণাত্য ঘুরে কলকাতায় এসেছে। 'সঙ অব ইণ্ডিয়া' "লাল নুপুর" ও 'বুড়ো আংলা' দক্ষিণে যে আলোড়ন এনেছে তা যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবজনক।

মাদ্রাজের একটি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকার সমালোচক বলেন যে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য শিশুরংমহল দেখিয়েছে—তার তুলনা হয় না। শিল্পমন্ত্রী শ্রীভেংকটরমণ অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর বলেন, "সঙ অব ইণ্ডিয়া" আমাদের মত প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্বুদ্ধ করেছে। মাদ্রাজেও শিশুরংমহল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মাদ্রাজের বালমন্দির নামক অনাথ আশ্রমের জন্য প্রায় ২০০০০ টাকা শিশু-রংমহলের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোলা হয়। মাদ্রাজের পর পণ্ডিচেরী, বাংগালোর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদেও শিশুরংমহলের অনুষ্ঠান হয়।

হায়দ্রাবাদে রবীন্দ্র ভারতীতে সি এল টির "লাল নুপুর" ও "ভারতছন্দ" যেভাবে উপস্থিত নাগরিকদের প্রভাবিত করে তাতে মন্ত্রী শ্রীআপ্পা রাও বলেন, "এখানেও শিশু রংমহল আমরা প্রতিষ্ঠা করব। এমনটি আমরা আগে দেখিনি।"

দেশে ফিরবার পথে ওয়াল্টেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ তারিখে এক জন-সমাগমের মধ্যে "লাল নুপুর" প্রদর্শিত হয়।

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্প

গত ২৬শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কল্যাণ পরিষদ পরিচালিত শিশু উৎসবের দ্বিতীয় দিনে কলিকাতা ... বাল-সেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পের ছাত্রীবৃন্দ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাল-সেবিকাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটক অভিনয় করেন। সামগ্রিক অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

ব্রিটেনে রবীন্দ্রসংগীত ও লোকসংগীত উৎসব

"ইংলণ্ডে আগেও গান গাইতে এসেছিলাম। কিন্তু এবার সংবাদপত্র মহল ও জনসাধারণের মধ্যে যে উদ্দীপনা লক্ষ করলাম তা আগে কখনও দেখিনি।" গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীহেমন্ত-কুমার মুখোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রশঙ্কর। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় ইংলণ্ডে ১০ অক্টোবর থেকে সাত দিনব্যাপী "ফেস্টিভ্যাল অব লাইট অ্যাণ্ড ফোক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

(স-১৮৮৬)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সম্পাদক: শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

প্রকাশিত হল

বিমল করের

নূতন উপন্যাস

পরিচয়

দাম ৪·০০

পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে হাজারিবাগে বেড়াতে যাচ্ছে প্রায় অভিভাবকহীন একটি ছোট দল, যে দলে আছে তিনটি যুবক, দুটি যুবতী আর একটি কিশোরী, বাঁধনছাড়া, স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। ট্রেনে পরিচয় হল এক স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে—ভদ্রলোক প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত সুখী ও পরিতৃপ্ত, ভদ্রমহিলা [illegible] অন্যমনস্ক। হাজারিবাগে পৌঁছল তারা, উঠল কাছাকাছি বাড়িতে, কদিনের অন্তরঙ্গতা—কিন্তু ওরই মধ্যে সুখী দম্পতির দুঃখতাড়িত আশ্চর্য এক নাটক যেন অভিনীত হয়ে গেল পাঠকের চোখের সামনে। "পরিচয়" নিছক প্রেমের উপন্যাস নয়, বিষাদময় জীবনের নেপথ্যলোকের উপাখ্যান। বিমল করের মধুর ও বিস্ময়কারী রচনাশক্তি এর মর্ম তাৎপর্য ব্যক্ত করেছে। এরকম প্রাণবান রচনা ইদানীং প্রায় দুর্লভ বলা চলে।

● সদ্য প্রকাশিত আরও গ্রন্থ ●

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

এ গ্রন্থটিতে দক্ষিণরায়, মানিকপীর, ওলাবিবি, পাঁচুঠাকুর, বারাঠাকুর, পঞ্চানন, ভাদু, মাকাল, টুসু, ঘেঁটু, উত্তরবাহিনী, রঙ্কিণী প্রমুখ তেত্রিশটি লৌকিক দেবতার মূর্তি বা প্রতীক, পূজাপদ্ধতি, পূজক সম্প্রদায়, মাহাত্ম্য বা এঁদের সম্বন্ধে লোকপ্রচলিত কাহিনী, কোন্ কোন্ অঞ্চলে এঁরা পূজিত এবং ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলের লৌকিক দেবতার সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য বর্তমান প্রভৃতির বিবরণ এঁদের মূর্তি বা প্রতীকের চিত্র সহ বিবৃত হয়েছে।

বিমল মিত্রের

উ প ন্যা স

চলো কলকাতা

বহুদিন আগে কালীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। সেখানে কাপালিকরা কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিত। পরে দেবীকে তারা কালীঘাটে স্থানান্তরিত করে। এখন আর সেই পাথুরিয়াঘাটা সেই কালীঘাট সেরকম নেই।

কিন্তু না, আছে। সেই কলকাতাও আছে, আর আছে সেই কাপালিকরাও। এখন আর কাপালিকদের গেরুয়া বসন নেই—এখন তাদের অন্য পোশাক, অন্য আকৃতি। এখনও তারা নরবলি দেয়। "চলো কলকাতা" সেই নরবলির রক্তাক্ত কাহিনী।

দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

উ প ন্যা স

আত্মপ্রকাশ

তরুণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম মৌল উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ"-এ অদ্ভুত নৈপুণ্য এবং অনুপম আন্তরিকতায় সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা, সুস্থ আত্মপ্রকাশের আকুল আর্তি প্রতিফলিত করেছেন। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, দুঃসাহসিকতায় অগ্রণী যৌবন কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মহৎ আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে করতে ছুটে চলেছে আত্মঘাতের পথে, দেখে পাঠক শিউরে উঠবেন।

দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটিশ ভণ্ডামি

রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন প্রয়োগ করার জন্যে ইউ এন-এর নিকট বৃটিশ আবেদনের মুখ্য তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ইংরেজের গায়ে হাত দেবে না এবং আর কেউ যাতে হাত দিতে না পারে, তার জন্য এমন কোনো ফাঁকিবাজি নেই, যা বৃটিশ গবর্নমেন্ট করতে প্রস্তুত নন। নরম স্যাংশন দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোডেশিয়ার "বিদ্রোহী" স্মিথ গবর্নমেন্টকে কাত করে ফেলা যাবে এই মেঠো কথা দিয়ে উইলসন সাহেব কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের এক নম্বর বোকা বানিয়ে রেখেছিলেন। সত্যি সত্যি বোকা কেউ বনেন নি। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে দু-একজন খোলাখুলি বৃটিশ গবর্নমেন্টের ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু সময়ের ফাঁকা এমন অবস্থাও হয়েছিল যে, কমনওয়েলথ বুঝি ভেঙে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ দেশের প্রতিনিধিরা অত দূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বৃটিশ গবর্নমেন্টকে আবার সময় দেওয়া হল। কমনওয়েলথ উইলসন সাহেবের দ্বারা কতকগুলি প্রতিশ্রুতি স্বীকার করিয়ে নিয়ে এরূপ বিশ্বাস করার ভান করলেন যে তাতে কাজ হবে। যত সময়কে পাশ কাটিয়ে নিয়ে অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধিরা কূটনৈতিকতা দেখালেন। বৃটিশ গবর্নমেন্টও সেই মতে ছিলেন।

আসল কথা হচ্ছে যে, মাও ধরনে অনেকেই প্রস্তুত নন। রোডেশিয়ার স্মিথ কোম্পানিকে না সরালে বিপন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকার লাভ অসম্ভব। কেবল স্যাংশনের দ্বারা স্মিথ কোম্পানিকে সরানো যাবে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না, সেইজন্যে নিছক ভণ্ডামির অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্যে মুখে বলা হচ্ছে, দরকার হলে স্মিথ কোম্পানিকে সরাবার জন্যে বৃটিশ গবর্নমেন্টকে বলপ্রয়োগ করতে হবে, যদিও কারো মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বৃটিশ গবর্নমেন্ট সাদা জাতভাইদের গায়ে কখনো হাত তুলবেন না। জেনে-শুনে ধোঁকা খাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ কমনওয়েলথ দেশগুলির হাঙ্গামা করার সাহস নেই, শক্তিও নেই। বলপ্রয়োগ ছাড়া স্মিথ কোম্পানিকে সরানো সম্ভব নয় বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা এও জানেন যে, বৃটিশ গবর্নমেন্ট বলপ্রয়োগ করবেন না, তাঁরা যদি কিছু করতে চান, তা হলে বিকল্প বলপ্রয়োগের ব্যবস্থার দিকে তাঁদের এগুতে হয়। সেটি কারো হিম্মতে কুলোচ্ছে না। অন্যদের কথা ছেড়ে দিই, দু-একটি ছাড়া আফ্রিকান দেশগুলিরও সেদিকে এগোবার উৎসাহ নেই। বৃটিশ গবর্নমেন্ট এর পুরো সুযোগ নিচ্ছেন।

কমনওয়েলথ কনফারেন্স বৃটিশ গবর্নমেন্টকে দিয়ে যে প্রতিশ্রুতিগুলি স্বীকার করিয়ে নিয়েছিল, সেগুলির কার্যকারিতাও স্মিথ কোম্পানি মানতে রাজী নয়। স্মিথের মুখদর্শন করব না বলে উইলসন সাহেব গোঁ ধরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে বৃটিশ রণতরীতে স্মিথ-উইলসনের নাটকীয় সাক্ষাৎকার হল। একটা মিটমাটের ভিত্তির খসড়াও তৈরী হল, ঠিক হল দুজনে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গিয়ে স্ব স্ব ক্যাবিনেটের মত গ্রহণ করবেন। উইলসন সাহেবের ক্যাবিনেটের অনুমোদন পাওয়া গেল, কিন্তু স্মিথ সরকারের থেকে সাফ জবাব এলো—রাজী নই। সুতরাং বৃটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিকে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত হতে হল রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যানডেটরী স্যাংশনের আবেদন নিয়ে। ম্যানডেটরী স্যাংশনের দ্বারা স্মিথ কোম্পানিকে ভূপাতিত করার আশার চেয়ে বৃটিশ গবর্নমেন্টের বড় লক্ষ্য হচ্ছে, রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে আর কেউ যেন বলপ্রয়োগ করতে না পারে। কোর্টে মামলা দায়ের করে ইনজাংশন দিয়ে বিচারাধীন সম্পত্তিতে অন্যের হস্তার্পণ ঠেকানো যেমন, এটাও অনেকটা তেমনি ব্যাপার।

বৃটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন প্রয়োগের আবেদন নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যাওয়ার মতো বিচিত্র ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। রোডেশিয়া আইনত বৃটিশ রাজ্য। বৃটিশ আইনের চোখে স্মিথ সরকার পদবাচ্য নয়, বিদ্রোহী সংস্থা। স্মিথ কোম্পানির স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৃটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, বৃটিশ রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করে। এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বৃটিশ গবর্নমেন্টের বিদ্রোহী প্রজার বিদ্রোহকে দমন করার দায়িত্ব বৃটিশ গবর্নমেন্টেরই। কোনো রাজ্যের মধ্যে বিশেষের অধিবাসীদের একদল যদি বিদ্রোহী হয়, তবে তাদের দমন করার জন্যে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে স্যাংশন জারি করার জন্যে আবেদন কোন বিধির মধ্যে পড়ে? রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্যাংশন জারির দ্বারা স্মিথ "সরকারের" স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে নাকি? স্মিথ সাহেব এ প্রশ্নটা তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন জারি করার অর্থ হবে রোডেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়া। কোনো অরাজক ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে স্যাংশন হয় না, স্যাংশন হয় অন্য কোনো রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। স্মিথ কোম্পানি নরম স্যাংশন ব্যর্থ করে দিয়েছে, যদি ম্যানডেটরী স্যাংশনও ব্যর্থ হয়, যার সম্ভাবনা খুবই বেশী, তা হলে এই স্যাংশনের অজুহাতের নীট ফল হবে এই যে, স্মিথের রোডেশিয়ার কার্যত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ হবে।

বৃটিশ গবর্নমেন্ট সহজেই বলপ্রয়োগের দ্বারা স্মিথ কোম্পানির বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন, যেটা তাঁদের কর্তব্য ছিল। তা না করে বৃটিশ গবর্নমেন্ট স্যাংশনের হুকুম তুলে এক দিকে স্মিথ কোম্পানির অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাকে নিবারণ করলেন এবং অন্য দিকে রোডেশিয়ার বেআইনী স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সহজ করে দিলেন।

রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ গবর্নমেন্ট কেন বলপ্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বৃটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা যে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার তুলনা বিরল। বৃটিশ গবর্নমেন্ট অহিংসা-পন্থী নন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ হাতছাড়া হয়ে গেলেও এখনও যেখানে যেখানে বৃটিশ কলোনিয়াল স্বার্থের আস্তানা আছে, সেখানেই বৃটিশ গবর্নমেন্ট নিজের অর্থনৈতিক শক্তির সীমানা ছাড়িয়েও ছোটোবড়ো সামরিক ঘাঁটি রেখেছেন। রোডেশিয়ায় নিজেদের বিদ্রোহী জাতভাইদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করার সাফাই গাইবার সময়ে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের বোমাবন্দুক সমানে চলছে।

ম্যানডেটরী স্যাংশন কতখানি সফল হবে, তার পূর্বাভাষ বৃটিশ গবর্নমেন্টের কথা থেকেই পাওয়া যায়। স্যাংশনের প্রস্তাব করার সময় সঙ্গেই বৃটিশ গবর্নমেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বৃটিশ গবর্নমেন্ট কিন্তু দক্ষিণ

কর্তার এক
সর্ব ভারতীয় দল
গড়েছেন।
আমিও এক নেতা
ডাঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে বাম ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা বাঙলা দেশে সমঝোতায় আসতে পারে নি।
ঝামেলা আসন নিয়ে
পরাজিত কৃষ্ণন।

কেশ তৈলের বিজ্ঞাপনে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফলে বিকিনি-মিনি স্কার্ট রোমাঞ্চিত ওদেশেরও কিছুটা অরুচি জন্মেছে এমন সন্দেহ হল একটি পত্রিকার কার্টুন দেখে: তাতে পবিত্র বাইবেল থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বইয়ের প্রচ্ছদপট পর্যন্ত কিভাবে ললনাশোভিত করা হয়, তার কতগুলো নমুনা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের অবশ্য এখনো অতটা বাড়াবাড়ি হয়নি, গুরুপাক অবস্থাটাও আসেনি। আমরা এখনো রোমান্টিক, আজো নারীকে সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা বলে কল্পনা করে থাকি, ক্যালেণ্ডারে কোনো চিত্রহারিণীর ছবি থাকলে বছরের শেষেও তার মায়া কাটাতে পারি না—মুখ চোখের সামনে সেটিকে ঝুলিয়ে রাখি। আমার মনোবেদনা অন্য কারণে।

এখনকার বিজ্ঞাপনে পুরুষেরা প্রায়ই সেকেণ্ড ফিডল। তাঁরা আগুনিকতম ফেব্রিকের স্যুট পরেন—কারণ মহিলারা তাঁদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাবেন; বিশেষ ব্লেড দিয়ে তাঁরা দাড়ি কামাবেন, কেননা মহিলা-সমাজে তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। যৌথ রোমান্টিক ছবিতে অবশ্য পুরুষদের মধ্যে মধ্যে মন্দ দেখায় না, কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে—আসলে তিনি সঙ্গিণীটির ব্যাক-গ্রাউণ্ড ছাড়া আর কিছুই নন। কুকার কিংবা ভেজিটেবল ঘী-র বিজ্ঞাপনজাতীয় ব্যাপারে কখনো কখনো অবশ্য পারিবারিক চিত্র দেখা যায়, কিন্তু তার এফেক্ট ঠিক ঈসথেটিক নয়, তা একাধারে কমিক এবং ডাইডাক্টিক; আর তারও ফোকাস মহিলাটির ওপরে—সেই নাটকেও তিনিই নায়িকা!

পুরুষমুখো বিজ্ঞাপন কি রকম? দেখা যাচ্ছে, তিনি বিকৃত মুখে নানাভাবে খাক-খাক করে কাশছেন—অপেক্ষা করে রয়েছেন, কখন একটি বিশেষ মালিশ সহযোগে সেই দুর্জয় কাশি বিদূরিত হবে। কেউ বা একমাথা টাক নিয়ে বাজার মধ্যে ঢাকিয়ে আছেন—একটি কেশপ্রসাধনীতে তাঁর অকাল-বার্ধক্য দূর হবে বলে বিজ্ঞাপন-দাতা আশ্বাস দিচ্ছেন। কখনো তাঁকে দারুণ মাথার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে দেখা যাচ্ছে—মনোমত মোক্ষম বড়িটি পাওয়া গেলে তারপর তিনি ঘুমোতে পারবেন।

অর্থাৎ পুরুষেরা বিকৃত, বিকট, ব্যাধি-গ্রস্ত, আর সাবানে-তেলে-ক্রীমে যাঁরা সদ্য-ফোটা গোলাপের মতো বিকশিত হচ্ছেন—তাঁরা সকলেই চিত্তহারিণী মহিলা। সৌন্দর্য তত্ত্বের দিক থেকে এর একটা ভাল ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু বাস্তবের চিন্তায় পুরুষদের পক্ষ থেকে এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সাবান-তেল-সুগন্ধির প্রতি পুরুষের কোনো আকর্ষণ নেই—অতি বড়ো নিন্দুকও নিশ্চয় এ-কথা বুক ঠুকে বলতে পারেন না; আর ইভা-নন্দিনীরাও যে কখনো খকর-খকর করে কাশেন না এবং তাঁদের কারো কারো মাথায় এক একটি সুদর্শন টাকের আবির্ভাব হয় না—কোনো "দুর্মর" রোমান্টিকও কি সে-কথা জোর করে বলতে পারেন?

টায়ারের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত নারীমূর্তি —কারণ দুর্বোধ্য

অন্ততঃপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে না বলেই আমার দীন নিবেদন: একটা সামঞ্জস্য করা হোক শুধু কলকব্জা আর বাশি-টায়ারের বিজ্ঞাপনেই পুরুষকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর একটা বাহিক ফোটোর সুযোগ দেওয়া হোক—নতুন স্যুটে এবং শ্যাম্পুতে যে শুধু কামিনীকান্ত হওয়ার সাধনাই তিনি না করেন। একালের জাগ্রতা মহিলাদেরও এই লাঞ্ছনার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হোক - যাঁরা এরোপ্লেন চালান এবং পার্লিয়ামেন্টে যান—তাঁরাই বা কেন নিছক পটের বিবিটিই সেজে থাকবেন?

আশা করব—এরপর মহিলাদের পক্ষ থেকেও অন্যভাবে দাবি উঠবে। যেদিন ভৈরবীমূর্তিতে খাঁড়া হাতে নিয়ে তাঁরা "বঙ্গনারীর পাঁঠা"র সাইন বোর্ডে পাঁঠা কাটতে থাকবেন—সেই শুভদিনটিতে তাঁরা আরো গরীয়সী হবেন, আমরাও চরিতার্থ হবো।

নীরার অসুখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিভে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি নিভন্ত জ্বলার আগে
জেনে নেয়,
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে।
অফিস-সিনেমা-পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুল মালায় তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশী!
হঠাৎ উন্মাদ হাওয়া একোমেলো পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে
আকাশ জুড়ে খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ
বেড়াতে গিয়েছে!

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখবোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে লরি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌমাথায়
শুকনো মুখে পথে পথে মানুষের মুখ কালো,
বিচ্ছেদের বিষণ্ণ মুখোশ—
ভয় পেয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই,
গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মনখারাপ করে আছো?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, শিল্পীর সম্মুখে নয়
আয়না দেখার মতো, দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর!
অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও
খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিঁট খোলে, ট্রামের সঙ্গে টেমপো, মোটরের সঙ্গে
রিকশা মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে,
বেঁচে থাকা কম সুখ নয়।

নীরার খবর নেই, আজ বুঝি নীরার অসুখ
সমস্ত কলকাতা তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের ফাঁসি চায়
সব কাজ বন্ধ, ক্রমে ট্রামে-বাসে ধর্মঘট শুরু হবে
অফিসে-ইস্কুলে আর কেউ যাবে না এক অভিমান!
আরও লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, টেলিফোন-পোস্টঅফিসে
আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
নীরার গভীর কাছে তার কেউ [illegible] নয়।
কোটি কোটি কণ্ঠস্বরে তীব্র প্রশ্ন, কোথায় এখন নীরা?
নীরাকে সারিয়ে দাও,
দাও!

নীরার অসুখ সারলে কলকাতায় ফের সুবাতাস
আমি [illegible]
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদেরও দাবি মিটে যাবে।

দু'হাত তুলে বলেছিলাম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দু'হাত তুলে বলেছিলাম—ফিরিয়ে নাও
আমায় তোমার চাকর করো,
আমার চোখের জ্যোৎস্না জলে আলতা পরো
চুল ভিজিয়ে বেণী বানাও—
দু'হাত তুলে বলেছিলাম, ছুঁয়েই দেখ
সবটা হয়ত পাথর হয় নি,
একটুখানি ফাঁক পেলেই তো গলাতে পারে
বুকের খাঁচা, খাঁচার পাখি, পাখিটার বুক।
তুমি এমন কৃপণ হয়েছ, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হলে আমায় দোষ দিও না।

বলেছিলাম, বসে থাকবো,
চিরটাকাল ধুলো হয়ে পাপোশে থাকবো—
যতদিন না চটির থেকে একটু গোবর
দিয়ে আমায় শুদ্ধ করছো।
চিরকাল যে অনন্তকাল...শূন্যতা যে বড়ো অসুখ!...
দেখা হয় না, দেখা হয় না,
কোন বিদেশে বুড়ো হচ্ছ
দিয়ে যাও সেই একটা খবর।
তুমি এমন কৃপণ রইলে, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হবো, আমায় দোষ দিও না।

AMRUTANJAN
Pain Balm

তনিমা এখন সোজা গিয়ে উঠবে পূর্ব কলকাতায় ক্রীক রো-য় তার মাসিমার বাড়ি। ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলে ভালই। বড়লোক বলে তনিমা বিশেষ আমল দেয় না ওখানে। আজকে ওখানে না খেলে কলেজ স্ট্রিটে বন্ধু সুমিত্রার মেস-এ ঠিক হ'য়ে যেতে পারে। সেখানে সুবিধা না হলে অগত্যা হোটেল খোলা আছে।

যাই হোক, খাওয়া যেখানেই হোক—সুবীরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বেলা একটা নাগাদ। ঠিক রাজভবনের সামনে—যেখানে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট হয়েছিল। সুবীর সেখানে তনিমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তনিমা এলে ওখান থেকে তারা মার্টিন ট্রেনে চেপে আমতা পর্যন্ত যাবে। আমতা থেকে মাইল তিন-চার দূরে নির্জন নিরিবিলি গ্রামে তনিমাদের বাড়ি। সেই তনিমাদের বাড়িতেই যাবে সুবীর। তনিমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কলকাতা থেকে মাইল তিরিশের মত দূরত্ব। অথচ কতখানি অজ পাড়াগাঁ। মাটির আঁকাবাঁকা পথ, বনগাছপালা আশশ্যাওড়া জংগল কাশফুল আর আকন্দগাছের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ। যানবাহন বলতে গরুর গাড়ি আর পাল্কি আর পাল্কি। এই দুটো জিনিস ছাড়া যাতায়াতের আর কিছু নেই। তনিমা বলেছে, গরুর গাড়িই ভাল। সুবীর বলেছে—পাল্কি। তনিমা গরুর গাড়ির কথায় বলেছে কেমন ছই টাঙিয়ে ঠুকুস ঠুকুস করে যান। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে গল্প করতে করতে। সুবীর বলেছে, না, পাল্কি-ই ভাল। গরুর গাড়ি হ'ল বড় বেদনাদায়ক। শরৎদার উপন্যাসের শেষ দৃশ্যের মত। কথাটা দু পক্ষ থেকে ঠিক হয়েছিল—আচ্ছা, মার্টিন লাইট রেলগাড়িতে চেপে বাড়ি ধরা হবে—কোনটায় যান। বাড়িতে যা উঠবে তাই স্বীকার করে নিতে হবে। পাল্কি কিংবা গরুর গাড়ি—দুটোর একটা।

তনিমা এসেছে মার্টিন লাইট রেলপথে আমতার দিক থেকে। সুবীর এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ব্রড গেজ লাইন গাড়িয়ে কোলাঘাটের আশপাশে কোন গ্রাম থেকে। দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এখানেই।

কথাটা শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটের সময় প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে বসে ঠিক হয়েছিল দুজনার
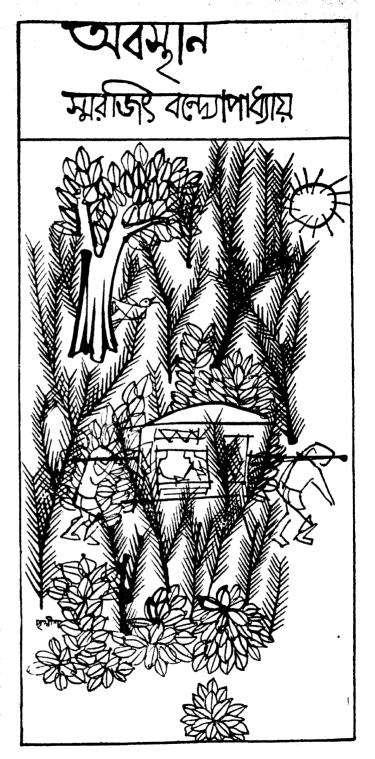
মধ্যে। তারপর নানারকম অর্থচিন্তা, দুর্ভাবনা, চাকরির দুর্দশা, কলকাতার বর্তমানের লোকসংখ্যা, যানবাহন সংকট, সংবাদপত্র, সভাসমিতি, মিছিল, লাল শালুর রং শ্লোগান শিক্ষকদের বক্তৃতা সব কিছুর ভিতর তনিমাদের বাড়ি যাবার কথাটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে সময় সুযোগ ক'রে ক'রে কথাটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল দুজনেই।

তারপর আইনভঙ্গের দিন ঠিক করতে পারেনি ওরা পুলিসের ভ্যান-এ চড়ে জেলে যাবে কিনা। দুপুর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা অমান্যের কথাটা বিচার করতে পারেনি। নানারকম ভেবেছে। তারপর একসময় ঠিক হয়েছে, দুজনেই জেলে যাবে। এবং সব ঠিক ক'রে নেবার পর তনিমার দূরসম্পর্কের এক দাদার বন্ধু মালা এনেছিল। ওরা সে মালা না পরে লোকজন ছিঁড়েখুঁড়ে বিচ্ছিন্ন-ভাবে চলে গিয়েছিল।

তারপর জেল থেকে মুক্তি পেয়েই একবার টাকাকড়ির কথা চিন্তা করে ও বাড়ির কথাটা মনে ভেবে নেবার পর ঠিক হয়েছিল —না, যাওয়া হবে। তনিমার বাড়ি যাওয়া হবেই। সুবীর জেল থেকে বেরিয়ে বলেছিল, তুমি তাহলে একটা নাগাদ রাজভবনের কাছে আসছ ত!

তনিমা বেশ হাসিখুশির মধ্যে বলেছিল —হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে! খেয়ে রেডি হ'য়ে আসবে নিশ্চয়।

(২)

জেল থেকে বেরিয়ে মনে কেমন অগাধ আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। কেমন তীর্থ করে আসা পুণ্যবান লোক মনে হয় নিজেদের। মনে সাহস সঞ্চিত হয়ে সব কিছুকে তাই দিয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। দাড়ি বড় হয়ে খচ-খচ করে লাগলেও জেল-মুক্তির পর আলো বাতাসের দিকে চেয়ে কোথা থেকে যেন অজস্র আনন্দ ফিরে আসে। স্বদেশী স্বদেশী মনে হয় নিজেদের। কলকাতাকে যেন বেশ খানিকটা চেনা হ'য়ে গেল—এই ভাবটা ছড়িয়ে আছে সবার চোখে মুখে।

তনিমা জেল-মুক্তির পর বাইরে বেরিয়ে ছটফট করতে করতে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। কথার তুবড়ি নিয়ে অবশেষে সবটুকু প্রকাশ করতে না পেরে খুব তাড়া-তাড়িতে ট্রাম স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল এবং সংগে সংগে একটা ট্রাম এসে গেলে কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত লোকের মত ট্রামে উঠে পড়েছিল তনিমা। ভিড়-ট্রামেই উঠে পড়েছিল। সুবীর নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে বিদায় দিয়ে নিজে অন্য দিকে যাবে। ট্রাম গুটিগুটি চলতে শুরু করে দিয়েছে। তনিমাকে দুজন পুরুষ কোণের কাছে টেনে নিয়ে ট্রামের অন্ধকারে অদৃশ্য ক'রে দিল। এটা দেখার পর সুবীর বিষন্ন মনে কলকাতার পথ হাঁটতে লাগল।

কাঁধের ঝোলা ব্যাগে ময়লা একরাশ জামা কাপড়। সেই সংগে একটা ছোট গীতাও রয়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় মা ওটা ব্যাগে পুরে দিয়েছিল। সেই সংগে ওটা পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছিল মা। ওটা নিয়মিত পাঠ করলে সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। সরকার সব দাবি স্বীকার করে নেবে। সুবীর ফুটপাথ ধরে চলছিল। বিজ্ঞাপন, শো-কেসে হিন্দী ছবির মারাত্মক অশ্লীল পোস্টার দেখে পথ চলছিল। ছোট বোনের একটা প্লাস্টিকের পয়সা রাখা ব্যাগ এনেছিল। তাতে ধার করার অবশিষ্ট পাঁচ টাকা পড়ে আছে। কিছু আধময়লা জামা-কাপড় আর নগদ পাঁচ টাকা নিয়ে কি তনিমাদের বাড়ি যাওয়া যায়। দাড়িটা ত' কত দিন কামানই হয়নি। পেটে অস্বাভাবিক খিদে। এই টাকা নিয়ে আজ সুবীর হোটেলে খেতে যাবে। গাড়িভাড়া টিকেট যদি তনিমা করে ত' ভালই। তনিমা অন্তত আমার অবস্থাটা ভাল করেই বুঝবে। কথাটা এভাবে ভেবে সুবীরের হাসি পেল। তনিমা আমার অবস্থা বুঝবে আমি তনিমার অবস্থা বুঝব। আমরা পরস্পর উভয়ে উভয়ের অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে সজ্ঞান হয়ে আছি। আর তার মাঝখান থেকে কেবল অর্থ নামক বস্তুটি দুর্বল ক্ষীণ হয়ে আমাদের কোনরকম স্থিরতা দিচ্ছে না।

(৩)

ক'দিন কলকাতায় বেশ কাটল। কেবল বসে বসে মিছিল দেখেছে। মিছিল। বক্তৃতা আর মানুষের বন্যা। দুঃখ আর দুর্দশার চিত্র দেখেছে। চিৎকার করে গলা ধরে গেছে। প্যাণ্ডেলে বসে পাওনা সিগারেট খেয়ে খেয়ে ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেছে। আর, আর। মায়ের কথাটাকেও একেবারে
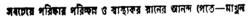
অবহেলা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেনি সুবীর. শোবার পর মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে চাদরের ভিতর গীতা খুলে পড়েছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে চায়ের বিজ্ঞাপন দেখেছে। কেটলির চা কাপে ঢেলে পর পর চার কাপ চা ভর্তি হয়ে যাবার পর চার কাপ চা শূন্য অন্ধকার কলকাতা খেয়ে ফেলেছে বারবার।

জামাকাপড়ের অবস্থা যা হয়েছে এ নিয়ে তনিমাদের বাড়ি যাওয়া যাবে কি করে। যাই হোক, আপাতত স্নান ও খাওয়া দরকার।

এ টাকায় কি হবে। গঙ্গায় স্নান করাটা খুব প্রয়োজন। স্নান করলে সুস্থ হতে পারবে। স্নান করে ওখানেই একটা গরম চা জলখাবার খেয়ে নিলে অল্প পয়সায় হতে পারে। জলখাবার খেয়ে রাজভবনের সামনে ভাঙা প্যাণ্ডেলের কাছে তনিমার জন্যে অপেক্ষা। অবস্থান।

(৪)

সবীরকে দেখে বোঝার উপায় নেই আজ পেটে ভাত পড়েনি তার জল-খাবারে পুষিয়েছে। দাড়িটা কামিয়ে নিয়েছে। ফলে গালটা তরতর করছে। গঙ্গাস্নান করে শরীরটা শান্ত করে নেবার পর কার্জন পার্কে এসে মাথায় ব্যাগটা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। কোথাও বেশী ঘোরাঘুরি করতে চায় না। সামান্য খেয়ে মুখে মশলা পুরেছে। ঘোরাঘুরি করলে খাবারটা হজম হয়ে যেতে পারে। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুঝতে হবে ত! তারপর আনন্দ পেঁছিলে। তার ওপর যদি আবার ভাগ্যে গরুর গাড়ি জোটে ত রক্ষে নেই।

ঘুম ধরে আসছিল। ত্রিশিরা মনসার ছায়া তৈরির কাছে মাথা রেখেছিল। ছায়া সরে গেছে একটু।

ঘাসে জুতোর শব্দ হতেই কপালে চোখ তুলে সুবীর দেখল শুভ্রাংশুকে। শুভ্রাংশু এসে দাঁড়িয়েছে।

"আরে কি ব্যাপার! শুয়ে যে!"

টেরিলিনের টাইট জামা-প্যাণ্ট। টাই ঝুলছে। ছুঁচলো জুতো। চুল রুখু। হাতে সিগারেট জ্বালানো। শুভ্রাংশু। দিনকতক আগে তনিমার কি এক পিসতুতো দাদার সঙ্গে অবস্থান ধর্মঘটের সময় এসেছিল। পিসতুতো দাদার বন্ধু হিসাবে তখনই শুভ্রাংশুর সঙ্গে পরিচয় হয় তনিমার। সুবীরের সঙ্গেও একই সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়ই এই ধর্মঘট সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে ঔৎসুক্য দেখিয়ে তনিমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইছে। কোথায় যেন চাকরি করে প্রচুর ঘুষের পয়সা। নতুন দামী জামা-কাপড় সব সময় পরছে। দামী ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ড নিয়ে প্রায়ই ঘোরে। এখানেও কয়েকটা ফটো তুলেছে। কিছু বক্তৃতা ও তনিমার গান টেপ করে নিয়েছে।

ধর্মঘট মিটে যাবার পর আজও সুবীর এখানে শুয়ে আছে। শুভ্রাংশু-ও এসেছে। ঠিক যেন ঠাকুর বিসর্জনের পর শূন্য প্যাণ্ডেলে বসে থাকার মত ওদের দেখাচ্ছে।

শুভ্রাংশু রেলিং-এ বসে পড়েছে। বসার পর বলল "তনিমা কোথায়! তনিমা।"

"নেই ত। কেন?" বলে সুবীর ওর দিকে তাকাল।

"এই বলছি, মানে আপনারা ত আজকেই রওনা—"

"হ্যাঁ, আজকেই যাচ্ছি।" বলে সুবীর বলল, "আপনি এখন—"

"হ্যাঁ, জানেন ত ডালহৌসীতে অফিস। টিফিনটাইম। একবার ভাবলাম সময় আছে ঘুরে আসি। আপনাদের ব্যাপারটা কি হল। তনিমার কাছ থেকে শুনতে চাই।"

"ওসব মেটেনি। কবে আর মিটেছে বলুন।"

(৫)

কথা বলতে বলতে সময় কাটছিল। তনিমার আসার সময় এখনও হয়নি। শুভ্রাংশু কতক্ষণ বসবে কে জানে। একটার

পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। আবার একটা সুবীরকে দেবার পর নিজে একটা ধরালো।

সুবীরের কাছে অসহ্য লাগছিল শুভ্রাংশুর উপস্থিতি।

ঠিক এমন সময়েই সুবীর দেখল তনিমাকে। পার্কের ও কোণ দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শুভ্রাংশু থাকায় সুবীর তেমন আনন্দ প্রকাশ করতে পারছিল না। আর ঠিক তনিমাকে কাছে দেখতে পাওয়ার সংগে সংগে সুবীরের পেটের খিদেটাও প্রচণ্ড মুক্তি পেয়েছিল। খালি পেটে কয়েকটা নিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই।

"কি হল, এত সকাল সকাল এসে পড়লে!" সুবীর হালকা গলায় তনিমাকে বলে উঠল।

"মনে কর সকাল সকাল ট্রেনেই যাব।" তনিমা কাঁধ-ব্যাগ নিয়ে ঘাসের ওপর বসতে চাইছে।

শুভ্রাংশু লাফিয়ে উঠে পড়ল—"আসুন আসুন তনিমা দেবী। কি ব্যাপার আরে, জেল-টেল খেটে কি হয়ে গেছেন একেবারে।"

শুভ্রাংশুর আচরণ কথাবার্তা সুবীরের সহ্য হচ্ছিল না। নিজের পেটটা অসম্ভব খালি বোধ হচ্ছে। তনিমা খেয়ে এসেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা উচিত কিন্তু শুভ্রাংশু থাকায় জিজ্ঞেস করতে পারল না।

শুভ্রাংশু তনিমার দিকে ঘুরে বসে কথা জুড়েছে। "আপনাকে কিন্তু আজ বড় সুন্দর দেখচ্ছে। লো-কাট পরেছেন। চাপা শাড়ি। ওয়েল-ড্রেস। একেবারে আধুনিক কলকাতা যাকে বলে।"

তনিম ঘাড় নিচু করে ঘাসে চেয়ে বলল, "আমার কাপড়-চোপড় সব লন্ড্রীতে দিয়ে এলাম। এগুলো সব বেলার। ওর সর্বস্ব আজ আমায় পরিয়ে দিল।"

"খুব ভাল লাগছে আজ দেখতে।" শুভ্রাংশু সিগারেট ঠুকছিল।

আর সুবীর তার অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ ট্রাম স্টপেজে নন্তুদাকে আবিষ্কার করতে পেরে একটু ইতস্তত করল। তারপর কাকেও কিছু না বলে ছুটল নন্তুদার উদ্দেশে।

(৬)

তনিমা অপেক্ষা করে আছে সুবীরের জন্য। কথায় কথায় শুভ্রাংশু খাওয়া-দাওয়ার কথা তুলেছে। খাওয়া সারা হয়েছে কি হয়নি ইত্যাদি কথায় দ্বিধার মাঝখানে পড়ে হঠাৎ তনিমাকে খাওয়াবার চেষ্টায় শুভ্রাংশু তাকে চৌরঙ্গীপাড়ার কোন হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছে। শুভ্রাংশু উঠে পড়েছিল। তনিমা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল সুবীরকে।

পার্ক পেরোতেই সুবীর এসে জুটলো। "তোমরা কোথায় চললে?"

"তুমি কোথায় বেরিয়ে গেলে হঠাৎ?" তনিমা ঘাড় ঝুঁকিয়ে কথা বলল।

"নন্তুদার সঙ্গে দেখা হল। কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে এলাম।"

শুভ্রাংশুকে বাধ্য হয়েই বলতে হল—"তনিমার যে আজ খাওয়া হয়নি—সুবীর-বাবু, আপনার বোঝা উচিত ছিল। কিছু করতে পারতেন একটা।"

"অনেক কিছু উচিত তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু কি করা যাবে বলুন। খাওয়া ত আমারও হয়নি। বুঝতে নিশ্চয় পেরেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করেন নি কেন?"

শুভ্রাংশু আঘাত খেল। আঘাত খেয়ে শুধু চলতে লাগল সামনে। কোন কথাই সে বলছিল না।

কিছু টাকা ধার করে নিয়ে আসার জন্যে সুবীর শুভ্রাংশুর ওপর আক্রোশ ছুঁড়ে মারতে পারল। রাগ আক্রোশ দ্বিধা লজ্জা ও ক্ষুধায় ভাঙতে ভাঙতে তারা চৌরঙ্গী-পাড়ায় চলতে লাগল।

একটা হোটেলে এসে তিনজনে বসল। শুভ্রাংশু খাবে না। যেন বসে থেকে তদারকি করে খাওয়াবে দুজনকে।

(৭)

খাওয়ার বিল মেটাবার সময় সুবীর কাউন্টারে আগে টাকা গুঁজল। শুভ্রাংশু কোনরকম আমল না দিয়ে করকরে নোট গুনে বার করল। ঘুষের পয়সা তার। প্রায়ই তাড়া তাড়া নোট বার করে। নোটের গন্ধ শোঁকে। টাকা দিয়েই মুখে মসলা পুরে শুভ্রাংশু আলোয় এসে দাঁড়াল।

সুবীর তাড়া লাগাল—"তনু, এবার তোমার গাড়ির সময় হ'য়ে এল।"

"হ্যাঁ, চলি তা হলে।" তনিমা শুভ্রাংশুকে বিদায় জানাল। খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে দুজনে বাস ধরল। শুভ্রাংশু একা দাঁড়িয়ে থাকল। ডিজেলের একরাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

দুজনে বাসে উঠে এলোমেলো কথা, মিছিল, জেলের কথা, নানারকম টুকরো-টাকরা কথাবার্তা গল্প বলতে বলতে কলকাতার ইতিহাস তৈরি করছিল। তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে গোটা কলকাতাটা বর্তমানে একটা কার্টুন ছবি হ'য়ে উঠছিল তাদের সামনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মার্টিন লাইট রেলওয়ে স্টেশন হাওড়া ময়দানে এসে দাঁড়াল। সুবীরই দুখানা টিকিট কেটে আনল।

তারপর ছোট ডিব্বাডিব্বে একটা কামরায় দুজন বসে পড়ল নির্ভাবনায়।

(৮)

ট্রেনটা ফাঁকা হ'য়ে আসছিল। ফাঁকা হ'তে তনিমা একটা লম্বা সীটে আধশোয়া হ'ল। সুবীর অন্য একটা সীটে বসে সামনের বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। সিগারেট শেষ করার পর তনিমার দিকে তাকাল সুবীর। এতদিনে যেন ওর চেহারা থেকে শিক্ষিকা সাজটা মুছে গেছে। ছাপা শাড়ি পরেছে। সরু হাতা ব্লাউজ। দেহটা যেন স্যান্ডুইচের মত দেখাচ্ছে। মুখটা তেল-তেলে। যেন মুখে দুধের সর মেখেছে। মসৃণ। সুন্দর। তনিমা তার নামের সংগে মিলিয়ে মনোরম কৃশতা পেয়েছে। এতদিনে তার আগেকার অনেক স্বভাব পাল্টে গেছে।

সুবীর বলল, "তনিমা, তুমি অঙ্ক জানো।"

"ততটা ভাল নয়।"

"ম্যাট্রিকের অঙ্ক জানলেই হবে।"

"বল।"

"অঙ্কটা হ'ল—", সুবীর ঠোঁট কামড়ে বলল, "মনে কর, শহরে খাদ্য আন্দোলন হচ্ছে এবং হরতাল। এই উপলক্ষে সরকার আন্দোলনের নেতা ও ধর্মঘট-ব্যাপারে জড়িত কিছু লোককে বন্দী করলেন। খাদ্য আন্দোলনের নেতা ও ধর্মঘটে জড়িত ধৃত লোকজনের সংখ্যা সাকুল্যে দুশো।"

"আচ্ছা।"

"এবার কাগজ ও পার্টির তরফ থেকে বন্দী মুক্তির জন্যে চাপ দিলে সরকার প্রথম মুক্তি দিচ্ছেন দশজনকে।"

"হ্যাঁ।"

"তারপর আবার কিছুদিন পর ৩০ জনের মুক্তি।"

"হ্যাঁ। ৪০ জন হল।"

"তারপর আরো ৬০ জন।"

"১০০ জন হ'ল।"

"তারপর ৯০ জন।"

"১৯০ হ'ল।"

"বাকি দশজনের মুক্তি হয় না। তারপর

সংবাদপত্র ও পার্টির তরফ থেকে চিৎকারের ফলে খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপারে বাকি সর্বশেষ দশজনের মুক্তি হ'য়ে গেল।"

"হ্যাঁ, ২০০ জনই ছাড়া পেল।"

"তা হলে—" বলে এবার সুবীর অংকটা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে খাদ্যবস্তুর দাম উঠল কি নামল। যদি খাদ্যের দাম ওঠে তবে তা কত! এবং যদি দাম কমে তবে সেটা যা কত!"

তনিমা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "বারে, এটা কি একটা অংক হ'ল নাকি!"

সুবীর উঠে বসল। সিগারেট ধরালো। তারপর বলল, "হ্যাঁ, এটার একটা উত্তর আছে। অর্থাৎ খাদ্যবস্তু উধাও হ'য়ে দূরে—অনেক দূরে চলে গেল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল মার্টিন লাইট রেলের ইঞ্জিনটা, ছাগলের মত মুখ নেড়ে শিস টেনে টেনে চলছিল। ওরা মুখে অন্যরকমের হাওয়া আলো লাগাচ্ছিল। বিভিন্ন গাছপালা দৃশ্যের ভিতর দিয়ে ওদের রেলগাড়ি ছুটছিল।

সুবীর এম সময় বলল, "তা না হলে কে থাকার কে এক শুভ্রাংশু টেরেলিন পরে ঘুষ খায়, কোন চৌদ্দ পুরুষের লাউখোলা—তার পকেট থেকে পয়সা বেরুল, চৌরঙ্গীপাড়ায় হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে শেষে আজ এক জায়গায় অন্ন জুটলো।"

(৯)

অবশেষে পাল্কিই ঠিক হয়েছিল। কয়েকটা কাগজের টুকরোয় নাম লিখে টুকরোগুলো পাকিয়ে তারপর হাতের মধ্যে নেড়ে নিয়ে সুবীর তনিমাকে যে-কোন একটা টুকরো তুলে নিতে বলার পর বাকি টুকরোগুলো সুবীর ফেলে দিয়ে তনিমাকে তার নিজেরটা দেখতে বলেছিল—টুকরোতে কি লেখা আছে। তনিমা কাগজ দেখে বলেছিল, "ইস্, পাল্কি।"

পাল্কিতে বসার পর সুবীর কথাটা ফাঁস করল। সুবীর বলল, "সব কাগজের টুকরোয় কিন্তু ওই 'পাল্কি'ই লেখা ছিল।

কথাটা শুনে দুজনেই হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে ওরা মুখোমুখি বসে গ্রাম দেখছিল। নিচু নিচু গাছপালা মাঠ, বিষণ্ন আলো। কাঁটা ফুলগাছ আকন্দ শিরীষ কণ্টিকারি। হিজলগাছ। তিরি পাখি, মাছ-মোরলার ডাক শুনেছিল। পিঠুলিগাছ আর করমচার ফুল দেখছিল। পাল্কি বাহকের গান শুনেছিল। দুজনে চুপ করে বসেছিল পাল্কির মধ্যে।

গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন তারা বর্তমানের ভারতবর্ষের কাছ থেকে অনেক দূরের নগণ্যতায় অবহেলিত হয়ে চলে যাচ্ছে। অনেক অতীতের নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াগাঁয়ে তারা ফিরে যাচ্ছিল। থাকছিল। শান্তি পাচ্ছিল।

থসমস তলা রয় হিম্পো—
হিম্পোলো হুকুম্না
সদর গলি হিম্পো—
হিম্পোলো হুকুম্না
ডাইনে ঝটকি বাঁয়ে ঝটকি হিম্পো—
..............হুকুম্না
ওলাফুটো তলা রয় হিম্পো—
..............হুকুম্না
ঠিক্রি তলা রয় হিম্পো—
..............হুকুম্না
ভিতরে গোঁজা হিম্পো—
..............হুকুম্না
বাঁয়ে কালাহাতি হিম্পো—
..............হুকুম্না
পাছাভারে হিম্পো—
..............হুকুম্না
যে যার বশে চলো হিম্পো—
..............হুকুম্না
দিগম্বরী তলা রয় হিম্পো—
..............হুকুম্না

'যাও ডুবে যাও, যাও ডুবে যাও' বলতে বলতে কাঁধ পালটাপালটি করে পাল্কি-বাহকরা আরো দূরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
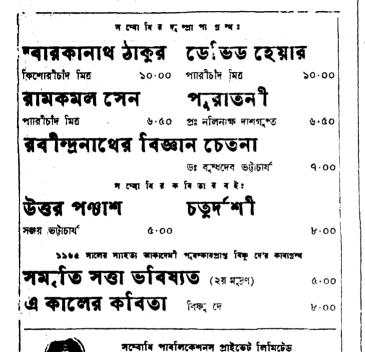
কলকাতার ডায়েরী

এসেছিলেন অনেকেই, কিন্তু সবার নজর ছিল একজনের দিকে। তাঁর নাম রানী গ্যইদালো — নাগা-ইতিহাসের দুর্ধর্ষ নায়িকা। তাঁর কৈশোর আর যৌবন কেটেছে ইংরেজের কারাগারে। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি তাঁর উপজাতিদের 'রানী'; একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

গ্যইদালোর এখন বয়স হয়েছে। তেহারা বেঁটেখাট চেহারা, পরনে দেশজ বেশ, চোখে কালো চশমা, দুহাতে দুটো ঘড়ি। কী দমদম বিমানবন্দর, কী রবীন্দ্রসদন, কী শতবার্ষিকী ভবন—সর্বত্রই তিনি ছিলেন মধ্যমণি, তাঁর কাছেই লোকের ভিড়।

একই আগ্রহ ছিল রবীন্দ্র সরোবরে ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাবের বাড়িতে। জাতীয় আলোচনাচক্রে যোগ দিতে যে-সব পাহাড়ী নেতা এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁদের সেদিন ওখানে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। আমরা যাঁরা গিয়েছিলাম, নিরাশ হলাম—গ্যইদালো এলেন না। তিনি ক্লান্ত।

তবে অন্যদের নিয়ে সেদিনকার আসর জমজমাট ছিল। গারো, খাসী, মিরি, মিকির, নাগা, মণিপুরী, টিপরাই নানা জাতির নেতারা। তাছাড়া ওই বিষয়ে উৎসাহী কিছু সজ্জন ব্যক্তি। প্রধান উদ্যোক্তা পান্নালাল দাশগুপ্তও আছেন সকলের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে। ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণ-দেহ এই মানুষটি যখন সলজ্জ ভঙ্গীতে কথা বলছিলেন, তখন একবারও মনে হয়নি, ইনিই সেই দুর্ধর্ষ পান্নালাল দাশগুপ্ত যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

সেখানে আলাপ হল মিসেস ইংটির সঙ্গে, বাপের বাড়ি গারো পাহাড়, শ্বশুর-বাড়ি মিকির পাহাড়। বাংলা বলেন চমৎকার। সেখানেই এক বাঙালী মহিলার সঙ্গে পরিচয়। নাম আশা হোরাম। না, বাঙালী কোন পদবী নয়, বিয়ে করেছেন জনৈক নাগা অধ্যাপককে। আলাপ হল মিজো নেতা বাওছয়াকা, গারো-নেতা উইলিয়ামসন সাংমা, খাসী নেতা নিকোলাস রায়, নাগানেতা টমলং এবং ফিজোর ভাইঝি রানো সারজা-র সঙ্গে। 'লোক ভারতী' গান গেয়ে শোনাচ্ছিলেন, বাংলাদেশের লোকসংগীত। গানের তালে তালে সবাই তালি বাজাতে শুরু করে দেন। আর নির্মলেন্দু চৌধুরী যখন গাইতে ওঠেন, ফিজোর ভাইঝি বলেন, 'ওর রেকর্ড কিনব, পাওয়া যায়?' বাওছয়াকা আমার পূর্ব পরিচিত, তিনি পাশে বসে ছিলেন। বললেন, গান শুনে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।

ছেলেবেলা? আপনার তো বাড়ি লুসাই পাহাড়ে!—আমি অবাক হয়ে বলি।

বাওছয়াকা একটু হেসে জানান, ছেলেবেলা থেকে তাঁর পড়াশোনা ঢাকায়।

গানের সুর ইতিমধ্যে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। বাংলা গান শেষ হতেই উইলিয়ামসন সাংমা সদলবলে ছুটে এসে গারো গান শুরু করে দিলেন। এবার আমাদের তালি দেবার পালা।

অদ্ভুত পরিবেশ, মনেই হচ্ছিল না কলকাতা শহরে আছি, যেন আসামের কোন গাঁয়ে চলে গিয়েছি। সমতলে পর্বতে গুরুত্ব দূর হয়ে গিয়েছে।

দু দিনের আলোচনাচক্রে লাভ কতটুকু হয়েছে, আমি ঠিক জানি না, তবে এইটুকু বলতে পারি, সেদিনের মত মেলামেশা আমরা যদি আরও আগে থেকে শুরু করতাম, তাহলে হয়ত অনেক সমস্যাই মাথা চাড়া দিয়ে আজ এত ভয়ানক হয়ে উঠত না, ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারত না।

ঠিক ওই কথাই বললেন শ্রীসোনারাম থাওসেন। থাওসেন থাকেন হাফলঙে। নর্থ কাছাড় ও মিকির পাহাড় জেলা পরিষদের তিনি চিফ এক্জিকিউটিভ মেমবার। তিনিও ওই আলোচনাচক্রে যোগ দিতে কলকাতায় আসেন।

থাওসেন বাংলা বলেন যে কোন বাঙালীর মত। বললেন, "আমরা রয়েছি মাঝখানে। এদিকে অসমীয়া সংস্কৃতির ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ওদিকে বাংলা সংস্কৃতির সুরমা উপত্যকা, দুটোরই কিছু কিছু আমাদের নিতে হয়েছে। তবে জোর বাংলার দিকেই বেশী। আমাদের প্রাচীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

(থাওসেনরা কাছাড়ী। কাছাড়ীরা নিজেদের বলেন 'ডিমাছা', দাবি করেন ঘটোৎকচের বংশধর বলে। কাছাড়ই সর্বশেষ স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিশ দখলে আসে।)

থাওসেন হিন্দু, তাঁর জেলার অধিকাংশ লোকই তাই। আলাদা পাহাড়ী রাজ্য গঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একটু অন্য রকমের। বললেন, "দেখুন দাবিটা প্রধানত আসছে আমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত নেতাদের কাছ থেকে, সাধারণ লোকেরা ওসব নিয়ে এত মাথা ঘামায় না। নাগাদের ব্যাপার অবশ্য একটু আলাদা। তবে যত দিন যাচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি ততই বাড়ছে। আমরা যারা পাহাড়ী এলাকায় থাকি,

তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের কৌতূহল আছে, কিন্তু আগ্রহ নেই। আমাদের কিছু নাচ-গান আর জামা কাপড় সম্পর্কে আপনারা উচ্ছ্বসিত, অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, এত ঘটা করে প্রচার করা সত্ত্বেও আমরা কে কোন্ এলাকার লোক, তা'ও কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা জানেন না। উইলিয়ামসন সাংমা গারো পাহাড়ের নাম-করা নেতা, আসাম বিধানসভার বিরোধীদল নেতা; কিন্তু কলকাতার একটি কাগজে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে 'খাসী নেতা' বলে। আমাদের মনে ক্ষোভ জাগাটাও স্বাভাবিক। এই আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে আমরা সরাসরি অনেক কথা বলতে পারলাম, পরিচয় হলও অনেকের সঙ্গে, দুই তরফের দৃষ্টিকোণও আঁচ করা গেল। আমার তো মনে হয়, এটাই এই সম্মেলনের বড় লাভ।"

শ্রীথাওসেন তারপর একটি বিনীত অনুরোধ জানালেন, আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা তিনি দেখতে চান।

উত্তম প্রস্তাব; আমি খুশী, তবে এত দ্রষ্টব্য থাকতে খবরের কাগজের অফিস কেন?

আমার প্রশ্নের জবাবে শ্রীথাওসেন বললেন, "আমি রোজ ১৮টি দৈনিক কাগজ পড়ি। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড। আপনাদের কাগজে আমি লিখেছিও যে!"

❋

কালীঘাটের মা কালী যে সত্য সত্যই জাগ্রত, তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল সাউথ ক্লাবের টেনিস মাঠে। খবর পেলাম, ডেভিস কাপ খেলার শেষদিনে রামনাথন কৃষ্ণণ মা কালীর পুজো তো দিয়ে এসে-ছিলেনই, সাউথ ক্লাবের সদস্য অনেক কট্টর বাঙালী সাহেবও নাকি কালীর কাছে মানত করেন। মা তাঁদের কথা রেখেছেন।

—চাণক্য

মুদ্রা মূল্য হ্রাস ও রপ্তানি

বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৫ সালে যেখানে রপ্তানি ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৩½ ভাগ, সেখানে আমদানি শতকরা ৬ ভাগ হওয়ায় ৬০০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট আমদানির শতকরা ২১ ভাগে ছিল কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচা মাল; শতকরা ৩০ ভাগ ছিল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। স্পষ্টত, পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি সংকোচনের আর সম্ভাবনা নেই বলে রপ্তানি থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সবচেয়ে বেশী করে তোলা জরুরী হয়ে উঠেছে।

চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্য

কার্পাস শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে, ১৯৪৮-৫০ সালে বিশ্বের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের যে অংশ ভারত রপ্তানি করতো, অভ্যন্তরিক ব্যয় ও মূল্য দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় তা-ও টিকিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে উঠেছে। বিগত দশকে জাপানের অংশ সমানে বেড়ে গেছে। ব্যয় বৃদ্ধির দরুন কার্পাস দ্রব্য রপ্তানির অসুবিধা টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে মনে হয় কাটিয়ে উঠা যাবে এবং আমাদের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতার বৃদ্ধি হবে।

১৯৫০ ও ১৯৬৫ সালের ভেতর বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ পাট দ্রব্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬ থেকে ৭১ ভাগে এবং চা-এর বেলা শতকরা ৪৭ থেকে ৩৫ ভাগে নেমে এসেছে। পাটশিল্পদ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের রপ্তানির সহায়ক হওয়ায় পাকিস্তান তার উৎপাদন-ক্ষমতার-সম্প্রসারণে নিরুৎসাহ হবে বলে মনে হয়; ফলে পাকিস্তানের প্রতিযোগিতা থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমে যাওয়ার আশংকা হ্রাস পাবে। পাট শিল্পকে যখন নিস্তেজ বলা যায় না তখন ঐ শিল্প যে পাটের নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন করবে সেটা আশা করা হয়তো অন্যায় হবে না। পাট ও কার্পাসদ্রব্য শিল্প সম্প্রতি কাঁচামালের অনটন থেকে যে অসুবিধা ভোগ করছে আরো আমদানি দ্বারা তা দূর করার জন্য চেষ্টা করলে ভালো হয়। এক কথায়, চিরাচরিত শিল্পগুলি যাতে নতুন নতুন পরিবর্তের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে সেজন্য সেগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

চা-এর রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব আফ্রিকা এবং নিকৃষ্ট জাতের চা-রপ্তানিকারী অন্যান্য দেশগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার দরুন ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের রপ্তানির অংশ যে কমে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হবে, আশা করা যায়। খনিজ ধাতু ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির বেলা অবশ্য ব্রেজিলের খনি-সংক্রান্ত কোম্পানিগুলির সংগে আমেরিকার ইস্পাত কোম্পানিগুলির একটা বন্ধন-ব্যবস্থা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্রেজিলের ম্যাংগানিজ রপ্তানির সুবিধা বজায় থাকবে এবং টাকার মূল্যে হ্রাসের ফলে তা সম্ভবত দূর হবে না। কিন্তু সেখানেও রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা

জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়ের ভেতর আমাদের রপ্তানি গত বছরের ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার থেকে এ বছর ৪৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারে নেমে এসেছে। রপ্তানির নিস্তেজ অবস্থার একটা কারণ হচ্ছে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই মূল্যে স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তন এবং অর্থসাহায্যের জন্য যখন দাবি উঠেছে সে সময় এটা স্বাভাবিক ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্যে যেখানে কমে গেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বাড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচা মালের সাম্প্রতিক অনটনের দরুণ বেশীর ভাগ রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো এখনই সম্ভব হচ্ছে না। আশার কথা এই যে, এ বছর অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পগুলির উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় বেশ কিছু বেড়েছে। তার মধ্যে, পুঁজিসংগঠনাত্মক দ্রব্য, ট্রাক্টর ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনের শিল্পগুলি আছে। আমদানিলব্ধ কাঁচামাল আসতে আরম্ভ করলে ঐসব শিল্পের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

টাকার মূল্যে হ্রাসের ফলে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাস্তবভিত্তিক হয়েছে। স্বভাবত, রপ্তানির জন্য বিবিধ সরকারী সাহায্যের এখন আর প্রয়োজন থাকার কথা নয়। অবশ্য রপ্তানির ব্যাপারে এখনো কয়েকটি শিশু শিল্পের অন্তত কিছু সময়ের জন্য বিশেষ সাহায্য লাগতে পারে। বস্তুত, অর্থসাহায্য ছাড়া কোনো কোনো দ্রব্যের রপ্তানিই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের পর যে আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিদেশে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে পাওয়া আগের চাইতে সহজ হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অর্থ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

টাকার বিনিময়-মূল্যে হ্রাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরিক দ্রব্য মূল্য এবং বিদেশের দ্রব্য মূল্যের মধ্যকার বৈষম্য সংশোধন। বস্তুত, মুদ্রা মূল্য হ্রাসের সময় সংকল্প হয়েছিল যে, খরচ বাঁচাবার সব রকমের চেষ্টা করা হবে এবং কোনো মতেই অর্থ সম্প্রসারণ করা হবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে দেশে ৪০০ কোটি টাকার মতো মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এবং তার পরিপূরক হিসাবে কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। বাজেটের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করার জন্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কর্জ নেওয়ায় দেশে টাকার যোগান বেড়ে গেছে।

১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন বেশ কমে গিয়েছিল বলে এ বছর ফাঁকা মরসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় যদি অনবরত খাদ্য আমদানি (প্রধান খাদ্যশস্য এখন মোট আমদানির একের পাঁচ ভাগের বেশী) করতে হয় তাহলে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। খাদ্যশস্যের সংকট অথবা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বিনিময়-হারের পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে দায়ী করা যায় না। কিন্তু খাদ্যের অনটনের সময় বাজেটের ঘাটতি থেকে অর্থের সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। স্পষ্টত, আভ্যন্তরিক মূল্য স্থিতি সংরক্ষণে সরকার ব্যর্থ হলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

শান্তিকুমার ঘোষ
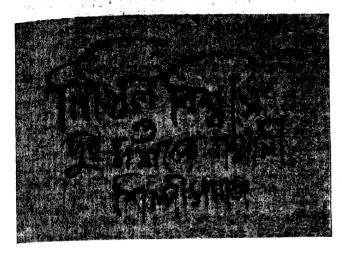
প্রণবরঞ্জন রায়

আমরা যারা ১৯৩০ সালের পরে জন্মেছি, এই ভারতবর্ষেই অনেক মারক অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি. মহাযুদ্ধে গণ-হত্যার কথা শুনেছি, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরের আত্মত্যাগের মহত্ত্বের কাহিনী শুনেছি, মারীতে দুর্ভিক্ষে লোক-ক্ষয়ের কথা শুনেছি, আণবিক বিস্ফোরণে মৃত্যুর কথা শুনেছি। অনেকে আত্মীয় বিয়োগে শোকাভিভূত হয়েছি। এসব মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই অনেকাংশে আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে একটি পরোক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে থেকেছে। কখনও হয়তো কোন বিশেষ উপায়ে মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত বিচলিত করেছে; যখন তা হয়েছে তখন হয়তো সেই পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই অত্যন্ত গভীর হয়েছে। কিন্তু বেশীভাগ সময়েই এই সব মৃত্যুর শিকার অন্য লোক। যতক্ষণ না আমরা নিজেদের অত্যন্ত প্রেমাস্পদ সহমর্মীর মৃত্যুশোকে অভিভূত হয়ে নিজেকে মৃত্যুর শিকার হিসাবে কল্পনা করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি ততদিন মৃত্যু-অভিজ্ঞতা সত্যিকারের অভিজ্ঞতা নয়, জ্ঞান মাত্র।

এগারোই নভেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্যামলের প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীর শেষ দিন ছিল। সন্ধ্যা থেকেই বন্ধুবান্ধবরা সবাই একে একে এসে জড়ো হচ্ছিলেন। অরুণ ছিলেন, প্রকাশ ছিলেন। ছিলেন সুনীল, সনৎ, অনিল আর আমাদের গুজরাতী শিল্পীবন্ধু পারেখ। শিল্পী বন্ধুদের মধ্যে কে কে প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন আর কে কে আসেন নি তার হিসাব-নিকাশ হচ্ছিল। আমি বলছিলাম, 'দেখলি, নিখিলটা এল না।' কথাটা পড়তে পারল না। রঞ্জন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'সে আর কোন একজিবিশনে আসবে না।' রঞ্জনের চেহারা ছবি-ভঙ্গি কৌতুকলেশহীন। আমাদের অজান্তেই তার সামগ্রিক উপস্থিতিতেই কোন অঘটনের স্পর্শ যেন অনুভব করলাম চৈতন্যে। হয়তো বা নিজের অজান্তেই তখন কারো মুখ দিয়ে আশংকিত প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে থাকবে, 'মানে?' রঞ্জন হয়তো বা তার উত্তরে বলে থাকবেন, 'আজ বিকেলে পি জি হাসপাতালে নিখিল মারা গেছে।' আর সে মুহূর্তেই হয়তো মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে থাকবে। কারণ আমরা তো কেউই আমাদের এই তিরিশ থেকে ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। নিখিল তো তিল তিল করে মৃত্যুর সমনাসামনি দাঁড়াবার জন্য আমাদের তৈরি করেন নি। বৃষস্কন্ধ দীর্ঘদেহী সবল পুরুষ নিখিলকে তার সবচেয়ে পুরোন ক্ষীণ খর্বকায় শিল্পী-বন্ধু শ্যামল ডাকতো মহিষাসুর বলে। এই গত পুজোর পরে যেদিন সুতৃপ্তিতে নিখিল এসেছিলেন, শ্যামল তাকে বলেছিল এ-পুজোয় কোথায় কোথায় মহিষাসুরের অভিনয় করে টাকা রোজগার করলি?' কে জানতো শরীরযন্ত্রের ভিতর থেকেই মহিষাসুর বধ পালার আয়োজন হচ্ছে। আর জানতাম না বলেই মৃত্যু ছিল পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। তাই রঞ্জন যখন তাঁর সর্ব-অস্তিত্ব দিয়ে নিখিলের মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনলেন তখন, সেই সতীর্থ সহমর্মীর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সকলের সামনে মৃত্যুর ভয়ংকর অনিবার্য বিধিরূপ মেলে ধরলো।

নিখিল অবশ্য বলতে পারতেন—"না, আমি তোমাদের ঠকাই নি। আমি তোমাদের তো বহুকাল থেকেই মৃত্যু-চেতন করতে চেয়েছিলাম। আমি শিল্পী, আমার শিল্পের মধ্য দিয়েই আমি তোমাদের অনিবার্য মৃত্যু সম্পর্কে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। তোমরা আমার ছবিতে মৃত্যু দেখেছো।—দেখেছো সে মৃত্যু প্রশান্ত মৃত্যু নয়, দেখেছো সে মৃত্যু স্বেচ্ছা-মৃত্যু নয়, দেখেছো সে মৃত্যুর করুণ হত্যা, ঘাতকতা, নাশকতা। দেখেছো সে মৃত্যু সংঘটিত মৃত্যু, যাতে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে

আলোর জন্য

শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

মানুষ মরে। তোমরা আমার ছবিতে আরো দেখেছো যে যারা মরছে, তারা মহৎ তারা বীর। তারা অন্ধকারে আত্মগোপনকারী কুটিল কুচক্রী গুপ্ত আততায়ীকে ভয় পায় ঠিকই, কিন্তু মরবার সময়ে সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মরে। তোমরা কি বোঝনি, জীবনস্পৃহ শিল্পী হিসাবে আমি বরাবরই সেই অসুন্দর জীবনবিরোধী মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গেলাম। আমি জানতাম মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু শিল্প মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক একটি জয়ের ফল। তোমরা শিল্পকে জীবন থেকে আলাদা করে বলে মৃত্যুকে দেখনি। জীবনকেও না। কিন্তু আমার কাছে শিল্প ছিল জীবন এবং অভিজ্ঞতারই প্রকাশ। আমার শিল্প থেকেই আমার জীবনটাকে বইয়ের মতন পড়ে নিতে পারবে। মৃত্যুকেও। মৃত্যু চেতনা আমার কাছে শুধু মাত্র শৌখিন শিল্প-উপকরণ ছিল না; বরং আমার শিল্পই ছিল সেই জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ মাধ্যম। সুতরাং তোমরা বলতে পারবে না যে আমি তোমাদের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রস্তুত করি নি। আমি বেঁচেছি পরিপূর্ণভাবে, কারণ আমার কাছে বাঁচাটা ছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের লড়াইয়ের মহৎ প্রকাশ; আমি মরেছি ঘোষণা করে, কারণ মৃত্যুটা ভীষণ অনিবার্য। এ সবই আছে আমার ছবিতে।"

কথাগুলো নিখিল বলেন নি। কিন্তু বলতে পারতেন। আমরা যারা নিখিলকে কিছুটা জানতাম, চিনতাম, তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে খানিকটা পরিচয় লাভ করেছি, তারা সবাই বিশ্বাস করি নিখিল বিশ্বাস একথা বলেছেন।

নিখিলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯৫৪ কিংবা ৫৫ সালে; ঠিক মনে নেই। 'চিত্রাংশু' গোষ্ঠীর একটি এক্জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ হয় আরও চার পাঁচ বছর আগে। ওর নিমন্ত্রণেই ওদের চিত্রাংশুর এক্জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। শ্যামলের মুখেই 'চিত্রাংশু'র অন্যান্যদের পরিচয় পেয়েছিলাম। নিখিল সম্বন্ধে বলেছিল, নিখিল আর্ট কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ছিল একজন দক্ষ শিল্পী। জলরঙে তখন থেকেই ওর হাত ছিল পাকা। প্রথাগত উপায়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে ধুয়ে নিখিল রঙ লাগাতো না। ফলে ওর রঙ হত খুব উজ্জ্বল, আর তা অসম্ভব জোর পেত। তখন থেকেই ওর ড্রইং ছিল খুব সাবলীল। ছবিতেও তার পরিচয় পেলাম। 'ইনিই নিখিল বিশ্বাস'—ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেখি শ্যামলের পাশে দাঁড়িয়ে এক খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা এক সবল দীর্ঘদেহী যুবক। স্বাস্থ্য প্রাচুর্য, পরিধেয়র মলিনতায়, রুক্ষ দাড়িতে আর অযত্ন চালিত চুলে এক কঠোর রুক্ষতার ছবি। নমস্কার করে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমাদের কাজ কেমন লাগছে?' কণ্ঠস্বরের সঙ্গে চেহারা-ছবির কোন মিল নেই। কণ্ঠস্বর সুসংস্কৃত, কমনীয়, একটু বুঝিবা লালিত্যের ছোঁয়া লাগা। রথীনবাবু সেদিন বলছিলেন, নিখিলের বাইরেটা ছিল লড়িয়ের আর ভিতরটা ছিল আশ্চর্য নরম, সংবেদনশীল। যারা নিখিলকে চিনেছিলেন জেনেছিলেন তাঁরা সবাই এই এক কথাই বলবেন। নিখিলের ছবিতেও তো ঠিক সেই জিনিস। নিখিলের ছবির সেই অসম শক্তিধর মানুষেরা বীরের মতন লড়ছে, ত্রস্ত ঘোড়ারা বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী নিয়ে পিছপায়ে উদ্যত, বিশাল দেহী ষণ্ড অথবা বন্য বরাহ আক্রমণোদ্যত, কিন্তু তারা শঙ্কার পরিবর্তে করুণা উদ্রেককর। কারণ তাদের চোখে আর্তি, ভঙ্গীতে যন্ত্রণার প্রকাশ। কারণ, তাদের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গী আত্মরক্ষার ভঙ্গীরই নামান্তর। তারা ভয়ঙ্কর অন্ধকার আততায়ীর হাতে গুপ্ত হত্যার শঙ্কায় পলায়মান। কুটিল ক্রূর মারক শক্তির হাতে সবলশক্তিমান জীবনীশক্তির পরাজয়-চেতনা নিখিলকে দিয়েছিল একটি sense of tragedy। তার চরিত্রে আর সৃষ্টিতে সেই sense of tragedy মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে একটি অপ্রতুল sense of irony তার চরিত্রে এসে মিশেছিল। সে irony চেতনা থেকে প্রায় মধুসূদনের মতন। সে দুর্গার দেবীত্বকে ব্যঙ্গ করে মহিষাসুরের tragic fateকে মানুষের পক্ষে মহত্তর দৃষ্টান্ত বলে মনে করতে পারত। শিরস্ত্রাণে মুখ ঢাকা বর্শা হাতে মৃত্যুদূতের চেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় শায়িত শক্তিধর অশ্ব তার কাছে অনেক মহৎ মানুষ ছিল। সেই অশ্বের মৃত্যু যন্ত্রণার কারুণ্য তাঁকে ছবি আঁকিয়েছে, বেদনার্ত করেছে সংঘাত আর দ্বন্দ্বে মানবিকতার মৃত্যু, মানবিক মানুষের মৃত্যু সব সময়েই তাঁর চেতনাকে মথিত করেছে। এই কারণেই তিনি রাজনীতি থেকে মনে মনে খুব দূরে থাকতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ছবি কখনও রাজনৈতিক ঘটনায় এবং বিশ্বাসের নিরস বিবৃতিতে পরিণত হয় নি। ১৯৬০ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, অহী-ভূষণ মালিক আর বম্বের সলিল ঘোষের উদ্যোগে বম্বেতে কলকাতার তরুণ শিল্পী-দের এক প্রদর্শনী হয়, কন্টেম্পোরারি ইয়ং আর্টিস্ট অফ বেঙ্গল নাম দিয়ে। নিখিল ছিলেন তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। সে প্রদর্শনীতে নিখিলের একটি ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সে ছবিটির নাম ছিল 'কঙ্গো, ১৯৬০'। প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যার প্রতিক্রিয়াতে ছবিটি আঁকা হয়। ছবিটিতে ছিল একটি কসাইয়ের ছুরি আর ছাল ছাড়ানো উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা দগদগে লাল-সাদা একটি কসাইয়ের দোকানের ছাগল। ছবির ভাষায় ওটি ছিল একটি 'স্টিল লাইফ'। কিন্তু কি জান্তব স্টিল লাইফ, কি ভীষণ প্রতিবাদ!

নিখিল-শ্যামলদের 'চিত্রাংশু' এই বম্বাই এক্জিবিশনের অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল। অরুণ, সনৎ, সোমনাথদাদের আর্টিস্টস সার্কল তখন টিঁকে ছিল। বম্বের সাফল্যময় এক্জিবিশনের পরে সকলে মিলে ঠিক করলাম নতুন সংস্থা করা হবে। জন্ম হলো সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিসটস-এর। নিখিল, শ্যামল, শৈলেন, অরুণ, সনৎ, অহীভূষণ হলেন উদ্যোক্তা। এলেন অনিল, বিজন, প্রকাশ, সোমনাথ, রেবা, কমলা, সুকান্ত। একটু পরে সুধীর-রঞ্জন, সুকুমার, সুনীল, রঘুনাথ, শর্বরী। অর্থাৎ বাংলাদেশের চিত্র ও ভাস্কর্য জগতে নাম করতে পারা যায় এমন সবাই এলেন। আর্টিস্ট্রি হাউসে দারুণ প্রদর্শনী হলো। তার পরেই ধরলো ভাঙ্গন। সবাই তারুণ্যের তেজে, ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচিতে ছিলেন অবিচল এবং গরিমাদৃপ্ত। কিছুটা অসহিষ্ণু। মতপার্থক্য হতে লাগলো। নিখিল, বিজন, কমলা, প্রকাশ, অহীভূষণ গ্রুপ ছেড়ে চলে গেলেন। বন্ধুত্ব কিন্তু নষ্ট হলো না। কারণ শিল্প সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় আমরা সকলেই যে ছিলাম যুগ-শরীক সতীর্থ। বছর দুয়েক পরে রঞ্জন এলেন আমাদের নতুন বন্ধু হয়ে। রঞ্জন, বিজন, নিখিল আর গোপাল, রবীন, বিমল মিলে গড়লেন 'ক্যালকাটা পেইণ্টার্স' গ্রুপ। নীরোদ মজুমদার মশাই তাঁদের প্রাথমিক প্রেরণা যোগালেন। তারপর নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বার পর তাঁর জায়গা নিলেন পরিতোষ সেন। বিমল, গোপাল, রবীন একটু দূরে সরে গেলেন। কাছে এলেন প্রভাস সেন, শর্বরী আর মিলু। প্রকাশ কিন্ত সেই কন্টেম্পোরারি সোসাইটি

ছাড়ার পর থেকে একক। অথচ সবাইয়ের অত্যন্ত নিকট বন্ধু। 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' গ্রুপ এর মধ্যে একটা সযত্ন রক্ষিত দরেত্ব বজায় রেখে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। অনেকেই একটু ক্ষুন্ন হলেন। কেউ কেউ একদা রেবেল নিখিল আর বিজনকে একটু ভুলও বুঝলেন। এর মধ্যে নিখিল অনেকগুলি একক প্রদর্শনী করে ফেলেছেন, অনেক গ্রুপ শো-তে অংশ গ্রহণ করেছেন। বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ছবি বেশ বিক্রি হচ্ছে। বাড়িতে বিদেশী, বিদেশিনী ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। চেতলার সরু গলিতে গাড়ি থেকে বিদেশী মুখ দেখা গেলেই পাড়ার লোকেরা আঙ্গুল তুলে 'ঘারাদা'র অর্থাৎ নিখিলের বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে। এমন সময়ে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে এলেন শিল্প ঐতিহাসিক ডিরেক্টর স্মিডট ও তাঁর স্ত্রী, বললেন, পূর্ব জার্মানীতে তাঁরা নিখিলের প্রদর্শনী করবেন। যেমন বলা তেমন কাজ। নিখিলের বিশাল বিশাল ড্রইংগুলি বেঁধে নিয়ে তাঁরা উঠলেন। কলকাতার পশ্চিম জার্মানীর কন্সালের আপিসের কর্তা ব্যক্তিরা বললেন, শুধু পূর্ব জার্মানীতে দেখালেই চললে না, তুমি মত দাও আমরা ওগুলো পশ্চিম জার্মানীতে দেখাই। নিখিল মত দিলেন। এগারোই নভেম্বর ডিরেক্টর স্মিডট ড্রেসডেন থেকে নিখিলকে যখন লিখলেন, 'লাইপৎসিগ, আর হাল্লেতে তোমার প্রদর্শনী অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কাগজপত্রে যে সব প্রশংসাসূচক সমালোচনা বেরিয়েছে তার কাটিং এর সঙ্গে পাঠালাম। ড্রেসডেনেও এ পর্যন্ত তোমার ছবি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। এর পর প্রদর্শনী যাবে বার্লিনে। তোমার ছবি বিক্রির টাকা কিভাবে পেতে চাও জানাও। আর তোমার পক্ষে কি এদেশে আসা সম্ভব?' তখন, কি তিনি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে সেদিন বিকেলেই কলকাতায় নিখিল সব প্রশ্ন আর উত্তরের বাইরে চলে গিয়েছে।

নিখিলের মৃত্যুতে আমরা আবার অনেক দিন পরে সবাই মিললাম। ২০শে নভেম্বর, রবিবার সকালে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের ছবির নীচে সুধীর খাস্তগীর আর নীরোদ মজুমদারের ছবির মুখোমুখি, গোপাল ঘোষ আর আমিনা করের ছবির দিকে মুখ ফিরে, সোমনাথ, অরুণ, সনৎ আর শ্যামলের ছবির সামনে আমরা আবার সকলে বসলাম। আমরা সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্ট্‌স-এর সবাই। আমরা 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স'-এর সবাই। এসেছিলেন তরুণতর 'ষড়ঙ্গ' গোষ্ঠীর সবাই। আরও সব চিত্রকর, ভাস্কর আর কলকাতার শিল্পরসিক বন্ধুরা।

ঠিক করা হলো নিখিলের স্ত্রী বীণা আর বাল্য সুহৃদ-সহচর কর্মী নির্মলের কাছে আর অন্যান্য বন্ধুদের হেফাজতে নিখিলের যে সব ছবি আছে তার একটা বিশদ তালিকা করা হবে। ঠিক করা হলো, নিখিলের ছবির দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের কাছে অনুরোধ জানানো হবে তাঁদের কাছে যে সব ছবি আছে তার বিশদ বিবরণ যেন তাঁরা দয়া করে জানান। ঠিক করা হলো, নিখিলের কিছু নির্বাচিত ছবির রঙিন আর দু' রঙা ফটোগ্রাফ তুলে রাখা হবে।

নিখিল পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন. ভীষণ বেশী করে বেঁচে ছিলেন। ভালবেসেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন। দায়িত্বশীল স্বামী হয়েছিলেন। দুই সন্তানের স্নেহময় পিতা হয়েছিলেন। অসংখ্য লোকের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলেন। প্যাসান নিয়ে বন্ধুত্ব করেছেন, প্যাসান নিয়ে ঝগড়া করেছেন। প্রচণ্ড কাজ করতে পারতেন, খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন। ছবি যখন এঁকেছেন ভূতগ্রস্তের মতন মগ্ন হয়ে ঝড়ের মতন এঁকে গেছেন। হাজার হাজার ছবি এঁকেছেন। তাঁর বিভিন্ন পর্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন অন্তত হাজার খানেক ভালো ছবি তো বীণা দেবী, নির্মলবাবু আর সেন মশাইয়ের জিম্মাতেই আছে। বন্ধুরা সেদিন একমত হয়ে বললেন, নিখিলের ছবির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী করা বাংলাদেশের শিল্পী সমাজের আশু কর্তব্য। উপস্থিত শিল্পীরা এবং শিল্পী-সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা অর্থ এবং পরিশ্রম দিয়ে সেই প্রদর্শনীকে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ হলেন। কিন্তু অতবড় প্রদর্শনীর জন্য জায়গা কোথায় পাওয়া যায়! অন্তত পনেরো দিনের জন্য অত বড় জায়গা নেবার মতন পয়সা কোথায়? একমাত্র অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এরই অতবড় জায়গা আছে। কিন্তু অ্যাকাডেমি কি পনেরো দিনের জন্য বিনা খরচে অতবড় জায়গা ছেড়ে দেবেন? কে যেন বললেন, 'দেবেন নাই বা কেন? ওঁরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে পুরনো শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান; বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রতি ওঁদের কর্তব্য তো সবচেয়ে বেশী।' অন্য আরেকজন বললেন, বাংলা দেশের নামী তরুণ শিল্পীরা এবং তাঁদের সংস্থাগুলি যদি লেডি মুখার্জি এবং রথীনবাবুর কাছে অনুরোধ জানান তবে ও'রা তো অমত করবেনই না, বরং সানন্দে রাজী হবেন।' ঠিক হলো নিখিলের ছবির Retrospective Exhibition-এর জন্য অ্যাকাডেমির সাহায্য চাওয়া হবে। দিল্লীতে প্রদর্শনীর জন্য চাওয়া হবে ললিতকলা অ্যাকাডেমি এবং অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফট্‌স সোসাইটির সাহায্য, আর বম্বের জন্য আর্টিসট্‌স এইড সেণ্টারের সাহায্য।

কিন্তু মিত্র ইনস্‌টিট্যুশনের কলাশিক্ষক নিখিল বিশ্বাসের স্ত্রীর কথা কি আমরা একবারও ভাবব না? অবশ্যই ভাবব। ঐ বড় এক্‌জিবিশন থেকে ছবি বিক্রির চেষ্টা করা হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের সবই যাবে তাঁর কাছে। ললিত-কলা আকাদেমিকে বলব, আপনারা আপনাদের স্থায়ী শিল্প সংগ্রহশালার জন্য নিখিলের ছবি কিনুন। সে আবেদন জানাব ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টস-এর কিউরেটর প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছে। লেডি মুখার্জিকেও বলব ওঁদের নবনির্মিত স্থায়ী গ্যালারীর জন্য নিখিলের বেশ কিছু ছবি কিনতে।

ঠিক হলো ললিতকলা আকাদেমির সাধারণ সম্পাদক ভবেশচন্দ্র সান্যাল মশাই আর পত্রিকা সম্পাদিকা জয়া আপ্পাস্বামীকে অনুরোধ করা হবে ললিতকলা আকাদেমির আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের পরিচয়সূচক পুস্তকমালায় নিখিলের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করার জন্য।

অনেক কিছু করতে হবে। শিল্পীদের নিজেদেরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংহত হয়ে করতে হবে। এ-করা শুধু নিখিলের জন্য নয়। এ-করা আমাদের জেনারেশনের শিল্পের জন্য। এ-করা আসলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

কার্জন রোডের ম্যাক্সমুলার ভবন

"ম্যাকসমুলার ভবন" অনেক প্রকারের অনেক ভবনদের মধ্যে একটি হলেও, ভারতবর্ষে এই স্বদেশী-বিদেশী সংস্থাটি এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের কাছে, বিশেষত যারা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় এগিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য ম্যাকসমুলার ভবন অত্যন্ত সহায়ক।

এখানকার ভবনটিই সবচাইতে প্রাচীন, ১৯৫৭ থেকে। তারপর হয়েছে আরো ছটি: কলকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, পুনা, রুরকেল্লা আর হায়দরাবাদ। বোম্বেতে একটি খোলা হবে অদূর ভবিষ্যতে। বছর ষাট-সত্তর আগে জর্মান পণ্ডিত ম্যাকসমুলার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে যেমন আবিষ্কার করেছিলেন ভারতকে পাশ্চাত্য জগতের কল্যাণে, আজ ম্যাকসমুলার ভবনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশ আবিষ্কার করছে জার্মানীকে—জর্মান ভাষা, চারুশিল্প, সংগীত বিজ্ঞান, টেকনোলজি, ইতিহাস—এক কথায় কৃষ্টিকে।

শুরুতে এই সংস্থা পরিচালিত হচ্ছিল পশ্চিম জার্মেনীর দূতাবাসের কৃষ্টি-শাখা দ্বারা। ১৯৬২-৬৩ থেকে পরিচালনার ভার নিয়েছে মুনিখের বিখ্যাত সংস্থা, গোটে ইনস্টিটিউট এবং ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন ডক্টর ভের্নের রস। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল সেদিন ছোট্ট একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, জার্মান প্রেস আতাশে কেম্পলিনের বাড়িতে। উনি ভারতীয় সংগীতের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, জার্মেনীতে প্রচুর সুযোগ আছে ভারতীয় নৃত্য-গীত-সংগীত দেখানো-শুনানোর। তাঁর মতে, দুই দেশের ভিতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান (যেমন হচ্ছে ম্যাকসমুলার ভবনের সহায়তায়) ছিল দুই সভ্যতার ভিতর যোগসূত্র স্থাপন করা, দুই সভ্যতার পারস্পরিক জানাশোনা, পরিচয় বন্ধুত্ব।

ভারত আজ উঠতি দেশ, শিল্প, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিকে। দেশের বহু ছেলেমেয়ে পারদর্শী হতে চায় কল-কারখানার নানা কাজে, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে। আজ তাদের সামনে সুযোগও অনেক। জার্মান ভাষা শিখে জার্মান দেশে বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়া হল একটা মস্ত সুযোগ, যেমন সুযোগ আছে ইংরিজীর মাধ্যমে আমেরিকা ও ইংলন্ডে। (অধুনা তৃতীয় স্থান বোধ হয় রুশ ভাষার।) ম্যাকসমুলার ভবনের কাজ-কর্মের একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তাই—জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া।

দিল্লীর ম্যাকসমুলার ভবনের দুটি অংশ : একটি তিন নম্বর কার্জন রোডে, অন্যটি কনট্প্লেসে "ই" ব্লকে, মার্কেনটাইল

ডক্টর রস্, ডাইরেকটর-জেনারেল, গোটে ইনস্টিটিউট, মুনিখ

ম্যাকসমুলার

একটি সংগীত বৈঠকে কয়েল-রয়টের বাঁশী বাজাচ্ছেন। গান করছেন তাঁর স্ত্রী এবং পিয়ানোতে আকাশবাণীর শ্রীমতী নানাবতী

ব্যাংকের উপরে। কার্জন রোডে ভাষা শিক্ষার ক্লাস, আর আছে একটি মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ। এখানেই তৈরী হচ্ছে এদের নতুন বাড়ি। ভারতে এই প্রথম হচ্ছে ম্যাকসম্যুলার ভবনের নিজস্ব ভবন। আরো বছর খানেক লাগবে সম্পূর্ণ হতে। ভাষা শিক্ষার দুটো সেমেস্টার প্রতি বৎসর জানুয়ারি থেকে মে, এবং অগস্ট থেকে ডিসেম্বর। পুরো কোর্স শিখতে বছর চারেক লাগে। এটা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের উপর। ভাষা শিক্ষার জোর হল ব্যাকরণ আর কথা বলার দিকে। গোড়া থেকে শেখানো হয় আধুনিক ডাইরেকট্ মেথডে: অর্থাৎ জার্মান ভাষায় সোজাসুজি শেখানো। এখানে আছেন তিনজন জার্মান অধ্যাপক, আর চারজন ভারতীয়।

গ্যেটে ইনস্টিটিউটের অধীনে এঁরা যে ম্যাকসম্যুলার কেন্দ্র খুলেছেন পুনাতে সেখানে আছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব জার্মান স্টাডিজ। ওটা হল শিক্ষক তৈরি করার আবাসী-কলেজ। ডক্টর রস বললেন: "আমরা প্রয়োজন অনুভব করছি, আরো বেশী করে ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের, যাঁরা নিজেরাই শেখাতে পারবেন জার্মান ভাষা। আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান তাতে আরো বাড়বে, আরো উন্নত হবে।"

কনট্ প্লেসের শাখায় আছে লাইব্রেরি ও লেকচার রুম। প্রত্যেক সপ্তাহে বসে একটি করে আলোচনা বৈঠক। প্রতি দুই সপ্তাহে একদিন (শনিবার) রেকর্ড-করা সংগীত। আরেকটি আছে নাট্যচক্র। কিছু দিন আগে এরা অভিনয় করেছিল কয়েকটা দৃশ্য, ব্রেখট্-এর "সেজুনের ভালো মানুষ" থেকে। অন্যান্য সংস্থার মতো এদেরও রয়েছে সিনেমা বিভাগ। প্রায়ই দেখান হয়।

রাজধানীর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, এখানকার ম্যাক্সমুলার ভবন একজন পরিচালক পেয়েছে, যিনি শুধু জার্মান ভাষায় পণ্ডিত নন, একজন নাম-করা সংগীতজ্ঞও বটেন। উনি হলেন প্রফেসর কয়েল-রয়টের। নিজে ভাল বাঁশী বাজান, আর ও'র স্ত্রী মার্গারিটা অপেরা-গায়িকা, সোপ্রানো। প্রফেসর কয়েল-রয়টেরের অবদান প্রচুর। গত কয়েক বছরে ইনি পাশ্চাত্ত্য সংগীত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন সংগঠনমূলকভাবে। ইনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এখানে দিল্লী চেম্বর অর্কেস্ট্রা। একটি যৌথ সংগীতের "কয়ের" গঠন করেছেন, এবং হনুমান রোডে জুনিয়র মডার্ন স্কুলে নতুন একটা ক্লাস খুলেছেন পাশ্চাত্ত্য সংগীত শেখানোর। পিয়ানো, বেহালা, বাঁশী আর কণ্ঠসংগীত। স্বামী স্ত্রী দুজনেই শেখান। প্রফেসর নিজে হলেন ভারতের সমস্ত ম্যাকসমুলার ভবনগুলোর সুপারভাইজার, এবং দিল্লীর ভবনটির ডাইরেক্টর।

ম্যাকসমুলার ভবন নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন বস্তুত ডক্টর রাউ। উনি গত বছর ডিসেম্বর অবধি ছিলেন। তার আগে ছিলেন ডক্টর কেরকফ্ ও ডক্টর ব্রেসগেন্। সমস্ত কেন্দ্রের পরিচালকরা প্রত্যেকেই জার্মান ভাষা ও সাহিত্যে স্কলার। আরো আছেন দুজন জার্মান শিক্ষক, যাঁরা ডক্টর রাউ-এর সহায়তা করেছেন প্রচুর। একজন হলেন মিস্টার ডানিস্, যিনি এখানকার ভাষা-শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অন্যজন হলেন বর্তমান ভাষা-শাখার কর্তা, মিস্টার পোলে। গত যুদ্ধের আগে ইনি কলকাতায় অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এখানে ইংরেজদের হাতে বন্দী হন।

কার্জন রোডের বাড়িতে আরো একটি সংস্থা আছে। এটি ম্যাকসমুলার ভবনের অন্তর্গত নয়। নাম হল জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় খবর দেওয়া; শিক্ষক ও স্কলারদের আদান-প্রদান; স্কলারশিপ দেওয়া ইত্যাদি কাজ। অধিকাংশই স্থির হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। পরিচালক হলেন ডক্টর হেস্‌চারগার। আগে ছিলেন মিস ডুকভিটস। যিনি এখন হলেন সাংস্কৃতিক বিভাগের সহকারী, আর যাঁর কাছে সংগ্রহ করা এই লেখার মাল-মসলা।

কনট্ প্লেসের লাইব্রেরীতে আছে প্রায় দশ হাজার বই, জার্মান ও ইংরিজী ভাষায়। ভারতীয় প্রাচ্যবাদ, জার্মান সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি অর্থনীতি নানা বিষয়ে।

খগেন দে সরকার

লাইব্রেরির একাংশ

দু'টি ঐতিহাসিক চিঠি

ভারতবর্ষের নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২০শে মার্চ তারিখে লণ্ডন থেকে যাত্রা করেন, এবং ২২শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লীতে পৌঁছন। ১৯শে মার্চ তারিখে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ভারত-সচিবের দপ্তর থেকে তিনি তখন তাঁর কার্যভার বুঝে নিচ্ছিলেন। সেই সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপটেন ব্রকম্যান আমাকে ফোন করে বলেন যে, নবনিযুক্ত ভাইসরয় ভারতে রওনা হবার আগে আমি যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি ও কথাবার্তা বলি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি এমনভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন যেন আমি তাঁর অনেক কালের বন্ধু। তিনি বললেন যে, [illegible] ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কাছে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাও তিনি জানেন। অতঃপর ভারত সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থার একটা আভাস আমাকে দিলেন তিনি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যা-কিছু তিনি শুনেছেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। জানালেন, ভারতবর্ষে পৌঁছে পর পর কাদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। এত খোলাখুলিভাবে তিনি আমাকে সব কথা জানাচ্ছেন কেন, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একটু বাদেই সেটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আলোচনা শেষ করে তিনি বললেন, ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে রক্তপাত অনিবার্য। যাই হোক, আপনি যদি একটা উপকার করেন তো বড় ভাল হয়। নয়াদিল্লি পৌঁছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমি মিঃ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সর্বাগ্রে আমি তাঁরই সঙ্গে দেখা করব। তবে ভারত-সচিবের কাছে শুনতে পেলাম যে, তিনি এখন দিল্লি থেকে অনেক দূরে। বিহারে যেখানে খুব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল, তিনি নাকি এখন সেইখানে রয়েছেন। তিনি দিল্লি আসতে রাজী নন। এমন কী, মিঃ নেহরুও তাঁকে নাকি দিল্লি আসতে রাজী করাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আপনি কি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেবেন? চিঠিখানা আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আজ রাত্রেই চিঠিখানা আপনাকে লিখে ফেলতে হবে, এবং কাল সকাল আটটায় সাটকে ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িটা হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদের ঠিক পেছনে। সকাল আটটার কিছু পরেই আমি বিমানযোগে ভারত-যাত্রা করব। আমি আপনাকে যা-যা বললাম, মিঃ গান্ধীকে তার বিবরণ আপনি চিঠির মধ্যে জানিয়ে দিন, এবং দিল্লি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে রাজী করাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

বস্তুত এটি পরিচয়পত্র ছাড়া আর কী; আর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভাইসরয় কিনা আমার মতন মানুষের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিচ্ছেন! লর্ড ওয়াভেল এমন কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু নতুন ভাইসরয় সেই তুলনায় অনেক বেশী বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গান্ধীজীকে দিল্লি আনাবার জন্য কাকে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

আমার বন্ধু উডরো ওয়াট এবং পারলামেন্টের আরও কয়েকজন তরুণ শ্রমিক-সদস্য সে রাতে কমন্স সভার রেস্তোরাঁয় আমাকে সস্ত্রীক ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হোয়াইট হল থেকে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ পর্যন্ত হেঁটে

দিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাঁদের বললাম যে, নতুন ভাইসরয় আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে একটি চিঠি লিখতে বলেছেন; চিঠিটা আজই লেখা দরকার, কাগজ পেলে সেখানে বসেই চিঠিটা আমি লিখে ফেলতে পারি। 'কমন্‌স সভা'র ছাপ-মারা কাগজ ছাড়া অন্য রকমের কাগজ তাঁরা দিতে পারলেন না। এ কাগজ সাধারণত পার্লামেন্টের সদস্যরাই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কী আর করা, অন্য কাগজ না থাকায় তারই উপরে চিঠিটা আমি লিখে ফেললাম, এবং পরদিন সকালে সেটি ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে পেণীছে দেবার ব্যবস্থা করলাম। যথাসময়ে মহাত্মার কাছ থেকে উত্তর এল। উত্তরে তিনি লিখলেন :

পাটনা,
২১-৪-৪৭

"চিরঞ্জীব সুধীর ও শান্তি,

তোমাদের সমস্ত চিঠিই আমি পেয়েছি। কাজের চাপ এখন এত বেশী যে, নিতান্ত জরুরী চিঠি ছাড়া অন্য চিঠির উত্তর দেবার মত সময় পাই না। তোমাদের আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তোমাদের যদি আমাকে কিছু জানাবার থাকে, শুনব। ভাইসরয় সম্পর্কে যা-কিছু আমার করতে হয়েছে, তার খবর তোমরা নিশ্চয় পেয়ে থাকবে। পরস্পরকে আমাদের ভাল লেগেছে। ঘটনাই প্রমাণ করবে, তিনি কী ধাতু দিয়ে গড়া মানুষ। তবে, নৌ-বাহিনীর মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তিনি খুব পরিশ্রম করছেন।

তোমাদের দুজনেরই ওখানে পরীক্ষা চলেছে। তোমরা যে এতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। শান্তি কেমন আছে? তার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে তো? ওখানে সে কী শিখছে?

আমার কাজ খুবই কঠিন। কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। কাজটা যখন হাতে নিই, তখনই তো এর দুরূহতার কথা আমি জানতুম। আশা করি, কিছু কিছু ভারতীয় কাগজপত্র তোমরা পাচ্ছ। আগাথা ও অন্যান্য বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানিও। আশা করি কার্লের স্বাস্থ্য এখন আগের চাইতে ভাল।

তোমাদের দুজনকেই আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু"

হাতের লেখা কাঁচা; দেখে মনে হল, বাচ্চা কোনও মেয়েকে দিয়ে চিঠিখানি লেখানো হয়েছে। চিঠির একেবারে শেষে গান্ধীজী তাঁর আপন হাতে দু' লাইন লিখে দিয়েছেন। "কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছি, তাতে বোকামি করে ভুল ঠিকানা লেখা হয়েছিল; এটি তারই নকল। মূল চিঠি আমি আপন হাতে লিখেছিলাম।" এত তাঁর দুঃখ, এত তাঁর নিঃসঙ্গতা, কিন্তু তার মধ্যেও—পাছে আমি বেদনা পাই, তাই—তিনি জানাতে ভোলেন নি যে, নিজের হাতেই তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পিতা তাঁর সন্তানের কাছে আপন হাতে চিঠি লেখেন নি, অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, এমন ধারণা করে আমি হয়ত কষ্ট পেতে পারি। কী গভীর ছিল তাঁর ভালবাসা, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

মূল চিঠিতে ভুল করে আমার ঠিকানা লেখা হয়েছিল : "সুধীর ঘোষ, হাউস অব কমন্‌স, লনডন"। পরে অবশ্য সেটিও পেলাম। ব্রিটিশ ডাক বিভাগ কর্মদক্ষ। আমার প্রকৃত ঠিকানা খুঁজে বার করে কেনসিংটনে আমার ফ্ল্যাটে তাঁরা চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত বেশ ভালয়-ভালয় কাটল। তার দিন কয়েক বাদেই শুরু হল আমার বিপদের পালা। বাপু যা আশঙ্কা করেছিলেন, তা-ই সত্য হল। শ্রীনেহরুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম আমি। ৬ই এপরিল তারিখে লেখা চিঠি; উপরে লেখা 'ব্যক্তিগত'। তাতে তিনি জানালেন :

১৭ ইয়র্ক রোড,
নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ
৬ই এপরিল, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

লনডনে ভারত-বন্ধু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাগজে এই খবর পড়ে আমি কিছুটা বিস্ময় বোধ করেছি। এ-রকম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যে ভাল কাজ সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের কোনও সমিতি গঠনের উদ্যোগ করলে তাতে সুবিধে হয় কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। এমন কী, কংগ্রেসও এই ধরনের কাজ করেনি; তার কারণ কংগ্রেসের মনে হয়েছিল যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষণার ব্যবস্থা থাকলে এই ধরনের সমিতির মূল্য কমে যায়। ভারত সরকারের পক্ষে এ কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। উদ্যোগটার অপব্যাখ্যা হতে পারে, এবং বলা হতে পারে যে, এটা একটা দলীয় উদ্যোগ।

২। এ বিষয়ে আমি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছি; ভেলোডির কাছেও লিখছি। যা করা হয়েছে, তা ভেঙে দেওয়া হোক, এমন কথা আমি বলি না। সেটা করা শক্ত হবে; তার ফলাফলও অবাঞ্ছনীয় হতে পারে। তবে তুমি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে খুবই সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হবে, এইটেই আমি চাই।

৩। সমিতির লোকজনদের যে তালিকা দেখছি সেটাকে অবশ্যই ভালই মনে হচ্ছে। তাদের মেলামেশার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাও ভাল। তবে সরকারীভাবে এর উদ্যোগ হওয়াটা আমার মনঃপূত নয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে কাজ তুমি করবে, সেটাকে দলীয় কাজ বলে মনে করা হবে, আর লণ্ডনে কিংবা অন্যত্র ভারতীয়দের মধ্যে তা নিয়ে সমালোচনা হবে, এটা আমি চাই না। আমরা এখন একটা অস্বস্তিকর এ দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি, এবং কী আমরা করব এবং কীভাবে তা করতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

শ্রীসুধীর ঘোষ,
ইনডিয়া হাউস,
লনডন

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, লনডনে কিছু মানুষকে আমি এক জায়গায় এনে মিলিয়েছিলাম। এই গোষ্ঠীটিকে বলা হত 'ভারত-বন্ধু'। শ্রীনেহরুর পুরনো বন্ধু এইচ এন ব্রেলসফোর্ড ছিলেন এর নেতা। ভারতবর্ষের সমস্যা আর অসুবিধার কথা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলাই ছিল এঁদের কাজ। ভারত সরকারের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কোনও সম্পর্কই ছিল না। উদ্যোগটা আমারই বটে, কিন্তু সরকারী সম্পর্কের কোনও নামগন্ধ এতে ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বিশিষ্ট ব্রিটনদের এই গোষ্ঠী যদি ভারতবর্ষের বক্তব্য ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তাতে আশু কাজ হবে; এবং ভারত সরকারের বেতনভোগী কর্মচারীরা যা করবার চেষ্টা করছেন, এতে করে তার জোর আরও বাড়বে। গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য কী, এইচ এন ব্রেলসফোর্ডের লেখা এই চিঠিখানি পড়লেই তা বুঝতে পারা যাবে।

৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেন্‌স্‌,
লনডন, এন ডবলু, ৩
২৬শে মে, ১৯৪৭

"প্রিয় জওহরলাল,

এই চিঠি আপনার কাছে আমার ও আমার স্ত্রীর গভীর ও সস্নেহ শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কাজে-ঠাসা এই জটিল দিনগুলিতে সারাক্ষণই আপনার কথা চিন্তা করি আমরা, এবং আপনার শক্তি ও মানসিক শান্তি কামনা করি। জানি না, এর মধ্যে দিন-কয়েকের জন্য আপনি পাহাড়ে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পেরেছেন কিনা।

এবারে জানাই আমাদের নতুন গোষ্ঠী ভারতবন্ধু-সমিতির কাজ কেমন চলেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের কিছুটা বন্ধু-সুলভ আগ্রহ আছে ও স্বাধীনতার নবযুগে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, সব দল থেকেই এখন ইংরেজদের আমরা এই সমিতির মধ্যে টানতে চাই। আপনি তা নিশ্চয়ই বুঝবেন। শুধুমাত্র ব্রিটিশরাই এর সদস্য হতে পারবেন। এই ব্যাপারটার উপরে আমি এইজন্যে গুরুত্ব দিচ্ছি যে, লনডনের কিছু ভারতীয় এর উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝেছেন, এবং ভেবেছেন যে, এটা বুঝি ইনডিয়া লীগেরই একটা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য ও সংগঠন কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। এর সদস্যদের মধ্যে সর্বদলেরই লোক আছেন। তবে বলাই বাহুল্য, যে কজন টোরি আমাদের সঙ্গে আছেন, স্বাধীনতায় তাঁদের সম্মতি আন্তরিক। এ পর্যন্ত যে ক'জন সক্রিয় সদস্য পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন সার স্ট্যানলি রীড, সার জর্জ শুস্টার, লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট, উইল ওয়াট ও আমি। তবে অবশ্য অনেকেও আমাদের কোনও-না-কোনও আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন লর্ড বীভারিজ, সার হ্যারল্ড নিকলসন ও গ্রাহাম হোয়াইট। আর এন বাটলার আমাদের প্রথম সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুধীর ঘোষের মাধ্যমেই এ যাবৎ আমরা যোগরক্ষা করেছি; তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকলেরই খুব উঁচু ধারণা। ঠিক লোককেই আপনি নির্বাচন করেছেন। তাঁর চাইতে পছন্দসই ও জনপ্রিয় জন-সংযোগ অফিসারের কথা ভাবাই চলে না। তিনি খুবই উদ্যোগী ও কল্পনাশীল মানুষ; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁর কাজের সুফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, জনসাধারণ আরও বন্ধুভাবাপন্ন ও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের এই গোষ্ঠী কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ভাবছি, স্টার্লিং ব্যালান্‌স নিয়ে খুব শিগগিরই একটা প্রকাশ্য আলোচনার ব্যবস্থা করব। একজন ভারতীয় সেখানে আপনাদের বক্তব্য বিবৃত করতে পারেন। জনসাধারণের মধ্যে যারা ভারতের অনুরাগী এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য তাদের কাছেও এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি। তবে সময়-নির্বাচনটা যাতে ঠিক হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কী সিদ্ধান্ত যে নেব, তা

আমরা এখনও জানি না। তবে একটা কথা ঠিক, সেটা এই যে এই গোষ্ঠীকে ঘিরে বেশ বড় ও প্রভাবশালী একটা 'বন্ধু' মহল আমরা গড়ে তুলতে পারব।

আমার আশঙ্কা, ভারতবর্ষে একটি ফেডারেল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়ত আপাতত পরিহার করতে হবে। তাই যদি হয়, তবে তার বিকল্প হিসেবে এখন থেকেই কি কনফেডারেশনের কথা চিন্তা করা চলে না? একমাত্র এই পথেই জাতীয় সৈন্যবাহিনীকে অখণ্ড রাখার আশা করা যেতে পারে। দ্বৈত রাজতন্ত্রের পুরানো প্রথাটিকে এ ক্ষেত্রে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অস্ট্রিয়া ও হাংগারি, এরা উভয়েই ছিল সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল এক। সরবরাহের ব্যাপারে ভোট দেবার জন্য তাদের প্রতিনিধিরা (প্যারিটির ভিত্তিতে) বছরে একবার মিলিত হতেন। যৌথ-মন্ত্রী ছিলেন তিনজন; তারা পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

ব্যবস্থাটা কার্যকর হতে পেরেছিল (কিছু-কিছু বিরোধ অবশ্য বাধত), তার কারণ হ্যাপ্‌সবার্গ রাজতন্ত্র এ ক্ষেত্রে যোগরক্ষার

কাজ করেছে। তা ছাড়া এ দু'টি দেশের শুল্ক-ব্যবস্থাও ছিল যৌথ।

হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি এইভাবে যোগসূত্র রচনা করা যায়, তবে সেই কনফেডারেশনের একজন প্রেসিডেন্ট ঠিক করতে হবে।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলও শেষ পর্যন্ত সেই কনফেডারেশনে যোগ দিতে পারে।

তবে আমি কল্পনা করতে পারি যে, কতখানি ব্যগ্রভাবে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা এখন সম্ভাব্য নানা ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখছেন, এবং এর চাইতে আরও ভাল ব্যবস্থার সন্ধান হয়ত আপনারা পাবেন।

আমি ও আমার স্ত্রী আপনাকে, ইন্দিরাকে ও আপনার নাতিটিকে আমাদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

চিরকালের জন্য আপনার
নোয়েল ব্রেল্‌সফোর্ড"

এই চিঠিতে অবশ্য কোনও ফল হল না। অবস্থা ক্রমে বাড়তেই লাগল। শ্রীনেহরু ও সর্দার বল্লভভাইয়ের লেখা দু'খানি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

নয়াদিল্লি,
২০শে জুন, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠির উত্তরে দিন কয়েক আগে আমি একটি ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই সর্দার প্যাটেল তাঁর কাছে লেখা তোমার ২৮শে মে তারিখের চিঠির একটি নকল আমাকে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিশ্চয় আলাদাভাবে তোমাকে চিঠি লিখবেন। তবে আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটা খোলাখুলিভাবে তোমাকে আমার জানানো উচিত।

প্রথমেই একটা কথা সকলের স্পষ্ট বোঝা দরকার, সেটা এই যে, লনডনে তুমি সর্দার প্যাটেলের প্রতিনিধিত্ব করছ এবং আমার প্রতিনিধিত্ব করছেন আর কেউ— এ কথা নেহাতই উদ্ভট এবং অর্থহীন। এমন কথা বলাও নেহাত বোকামি যে, সর্দার প্যাটেল ও আমি সরকারে দুই পৃথক নীতি অনুসরণ করে চলেছি। বুদ্ধিমান মানুষদের মধ্যে মতের পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক; কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা কাজ করে থাকি। তার কারণ শুধুই এই নয় যে, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল; বর্তমান অবস্থায় সেই সহযোগিতা অত্যাবশ্যকও বটে। লনডনে তুমি বিশেষ কোনও একজন মন্ত্রীর কিংবা অন্য কারও প্রতিনিধি নও; সেখানে তুমি ভারত সরকারেরই প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছ। এ ব্যাপারে সরকার যে-সব নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, স্বভাবতই সেই নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে।

সরকারের রুটিনে-বাঁধা কাজ মাঝে মাঝে লালফিতের ফাঁসে জড়িয়ে যায়। সংগত-ভাবেই এর নিন্দাও করা হয়ে থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে রুটিন আর শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাশীল থাকারও কিছুটা মূল্য আছে। এই কারণেই যথাবিহিত পন্থায় কাজ করা দরকার। তা

নইলে বিশৃঙ্খলা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। লনডনে হাই কমিশনারই তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তা। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার উপদেশ চাওয়া উচিত, এবং যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তিনি যে শুধুই তোমার উপরওয়ালা, তা নয়; জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক বেশী অভিজ্ঞ, লনডনে তিনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, এবং তাঁর পরামর্শ নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত সরকারের যে দপ্তরের সঙ্গে তুমি বিশেষভাবে যুক্ত, সেই তথ্য ও বেতার দপ্তরের সঙ্গে তুমি সরাসরি যোগ রাখতে পারবে না।

সরকারী কাজের প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানছি। যেমন অন্যান্য ব্যাপারের, তেমনি এরও একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। তোমার চিঠি থেকে এবং অন্যান্য কিছু কিছু বিবরণ থেকে মনে হয়, লনডনে তুমি কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলে এবং তোমাকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ কথা জেনে আমি বিস্মিত হইনি। নতুন জায়গায় গিয়ে মানুষকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হয় এবং সহকর্মীদের শুভেচ্ছা লাভের চেষ্টা করতে হয়। তা নইলে সন্দেহ দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি এখন জটিল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে সেইরকমই মনে হয় এবং প্রত্যহ এখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক কী যে ঘটছে এবং কোন্ নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে, সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সর্বদা সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। নতুন সরকার আসায় নীতির কোনও পরিবর্তন সূচিত হল কিনা তাও স্বভাবতই তাঁরা জানবেন না।

তার উপরে আবার লনডন হচ্ছে ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি। ভারতীয় সংগঠনের সংখ্যা সেখানে কম নয়। তাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই অবশ্য নেহাতই খাতায়-পত্রে। ইংলনড-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে স্বভাবতই সর্বরকমের মানুষ রয়েছে। কেউ কেউ অতি চমৎকার মানুষ; আবার কেউ কেউ সর্বতোভাবে অবাঞ্ছনীয়। বাদবাকীরা উপর উপর ভেসে বেড়ায়; অন্যের সমালোচনা করাই তাদের কাজ। নবাগতকে এই সমস্ত-কিছুরই সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর কর্মপদ্ধতি যদি আদৌ আক্রমণাত্মক কিংবা বিস্তারশীল হয়, তবে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন।

তোমার চিঠিতে তুমি কৃষ্ণ মেনন ও লনডনে তাঁর সহকর্মীদের উল্লেখ করেছ। ইনডিয়া লীগেরও উল্লেখ করেছ তুমি। কৃষ্ণ মেননকে আমি ভালভাবেই চিনি। লনডনে তাঁর কাজের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইনডিয়া লীগের কথাও জানি আমি। কৃষ্ণ মেনন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা খুবই উঁচু। তাঁকে আমি আমাদের একজন দক্ষতম মানুষ বলে গণ্য করি। চমৎকারভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতে তিনি এর চাইতেও বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবেন।

ইনডিয়া লীগের মধ্যে নানান রকমের মানুষ রয়েছেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণের বিচারে বলা যায় যে, এটিই হচ্ছে ইংলনডে সবচাইতে কার্যক্ষম সংগঠন। এর যে ত্রুটি নেই তা নয়; অতীতে এই প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু ভুল করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কিংবা অন্যত্র যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই সে কথা বলা যায়। যতটা সম্ভব, ইনডিয়া লীগের কাজের পূর্ণ সুবিধা আমরা নিতে চাই।

তুমি যখন ওখানে যাও, তারপর থেকে কৃষ্ণ মেনন প্রায় একটানা ইংলনডের বাইরে রয়েছেন। আমাদের হয়ে অন্য কিছু কাজ তাঁকে করতে হবে; সেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে শিগগিরই তিনি ইংলনডে ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রাখা উচিত, তোমার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাঁকে সে কথা জানানো উচিত। সাধারণ অবস্থায় তোমাকে অবশ্য ভেকোড়ির পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

আশা করি, শিগগিরই তোমার অসুবিধা তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে। কত তাড়াতাড়ি পারবে, প্রধানত সেটা তোমারই উপরে নির্ভর করছে। অন্যদের তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না; তবে নিজেদের আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যাতে অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা যায়। আমার মনে হয়, ইংলনডে তোমার পক্ষে খুবই ভাল কাজ করা সম্ভব; তার কারণ, তুমি কার্যোৎসুক, বুদ্ধিমান, উদ্যোগী। লোকের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করতে পারো, অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে পারো। তবে তোমার আর-একটু অভিজ্ঞ হওয়া দরকার; এখনও তুমি একটু কাঁচা। এটা [illegible] শিগগিরই কেটে যাবে। [illegible] এটা এমন কিছু

রেডর ব্যাপার নয়। তবে এর ফলে
সুবিধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমার ধারণা, রাজনীতির সঙ্গে
আমার প্রাথমিক যোগ-সম্পর্কটা ঘটেছে
স্টোভাবে। সূচনাতেই 'তুমি রাষ্ট্রীয়
নীতির বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে উঁচু একটা
স্তরে মন্ত্রী ও অন্যান্যদের সংস্পর্শে
এসেছ। এ ক্ষেত্রে তুমি নেহাতই আমাদের
প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলে বটে,
কিন্তু এরই ফলে এমন একটা কার্যধারায়
তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাও, যা ঠিক স্বাভাবিক
কার্যধারা নয়। তোমার নিশ্চয় মনে আছে,
মাস কয়েক আগে যখন তুমি আমার সঙ্গে
দেখা করেছিলে, তখন আমি তোমাকে
বলেছিলাম যে, এই যে সরাসরি তুমি
লন্ডনে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করো,
মাঝে-মাঝে এতে কাজের সুবিধে হয় বটে,
কিন্তু এর অনেক ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে
তাঁরা হয়ত মনে করবেন যে, তুমি আমাদের
প্রতিনিধিত্ব করছ, অথচ বস্তুত তুমি হয়ত
তা না-ও করতে পারো। এর ফলে আমাদের
উপরে হয়ত দায়িত্ব এসে পড়তে পারে;
অথচ অন্য পক্ষ সেই দায়িত্বের জালে
নিজেকে জড়াবেন না।

অতীতে এবং ইদানীং তোমার যে-সব
চিঠি পেয়েছি, তার থেকে মনে হয়,
সংযমের শাসনে নিজেকে তুমি বাঁধতে
পারোনি; অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের
দায়িত্ব যাঁর হাতে, আত্মসংযম তাঁর পক্ষে
একটি অত্যাবশ্যক গুণ।

আমি তোমাকে খোলাখুলি সব
লিখছি। তার কারণ আমি তোমাকে পছন্দ
করি, আর চাই, তোমার উন্নতি হোক।
তোমার কাজে যাতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি
হতে পারে এমন কিছু ঘটুক, এটা আমি
চাই না। তা যাতে না ঘটতে পারে, বলা
বাহুল্য, তারই জন্য আমি চেষ্টা করব।
কিন্তু আমি আশা করি যে, তুমি নিজেকে
আর একটু শৃঙ্খলার শাসনে বাঁধবে,
এবং আর একটু সংযত হবে। আমাদের
সকলকেই এখন ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের ভার
নিতে হবে; তা যাঁরা নিতে পারেন, তাঁদের
সংখ্যা খুবই সামান্য।

এ চিঠি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত: আর
কাউকে এটা দেখাবার দরকার নেই। তবে
আমার মনে হয়, সর্দার প্যাটেল ও মিঃ
ভেলোড়ির এটা দেখা উচিত। তাঁদের কাছে,
অতএব, এর নকল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

সুধীর ঘোষ,
অফিসার অব দি হাই কমিশনার ফর
ইন্ডিয়া ইন লন্ডন,
ইন্ডিয়া হাউস,
লন্ডন।

চমৎকার এই চিঠিখানির সুরটা ছিল
কূটনৈতিক। সেইটে আমার ভাল লাগেনি।
শ্রীনেহরু এই চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে,
আমাকে তিনি পছন্দ করেন, আমার উন্নতি
তাঁর কাম্য, আমাদের সকলকেই ক্রমবর্ধমান
দায়িত্বের ভার নিতে হবে, এবং তা যাঁরা
নিতে পারেন তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য।
এর দ্বারা তিনি কি সত্যি এই কথাই
বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দায়িত্ব নেবার
যোগ্যতা যাঁদের আছে, আমাকে তিনি
তাঁদেরই একজন বলে মনে করেন?—এবং
ভালভাবে কাজ করে আমি যদি তাঁকে
সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে আমাকে তিনি
দায়িত্বের পদ দেবেন. এই কথাই কি
বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? না, তা তিনি
আদৌ বোঝাতে চাননি। সমস্ত মহত্ত্ব সত্ত্বেও
ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তিনি
ছিলেন ভীষণ জেদী। আমার দুর্ভাগ্য এই
যে, নয়াদিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে
যখন কথাবার্তা চলছিল, আমাকে তিনি
তখন অপছন্দ করতে শুরু করেন। আপাত-
দৃষ্টিতে তাঁর চিঠিখানিকে খুবই যুক্তিযুক্ত
বলে মনে হয়, কিন্তু বস্তুত তাঁর অযৌক্তিক
ধারণাই এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।
চিঠিতে তিনি বলছেন যে, ক্যাবিনেট মিশন
লন্ডনে ফিরে যাবার পরে ক্রিপস আর
পেথিক লরেন্সের কাছে আমি যে চিঠিপত্র
লিখতাম, তাতে বিপদের ঝুঁকি ছিল;
কেননা, আমার মতন মানুষ এইভাবে চিঠি
লেখার ফলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের
কোনও প্রতিশ্রুতির দায়ে আবদ্ধ না হওয়া
সত্ত্বেও কংগ্রেস দলের উপরে হয়ত দায়িত্ব
এসে পড়তে পারত। কথাটা
অর্থহীন। ক্রিপসের অনুরোধে আমি
চিঠি লিখতাম। তিনি বলেছিলেন, আমার
চিঠি পড়ে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর
তাৎপর্য বুঝতে তাঁর সুবিধে হয়; আমার
চিঠিকে তাই তিনি মূল্যবান মনে করেন।
প্রতিটি চিঠি পাঠাবার আগে গান্ধীজী তার
খসড়া একবার পড়ে দিতেন। তিনিও মনে
করতেন যে, ক্রিপসের কাছে এই যে আমি
চিঠি লিখছি, এতে কাজের খুবই সুবিধে
হচ্ছে। শ্রীনেহরু যখন লর্ড ওয়াভেলের
অধীনে মন্ত্রী, তখন ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে
যোগাযোগ করবার অবাধ উপায় তাঁর ছিল
না। আমার বিশ্বাস, শ্রমিক মন্ত্রিসভাকে
তাঁর মতামত জ্ঞাপনের ব্যাপারে আমার এই
চিঠিগুলি তখন তাঁর পক্ষেও একটি
সুবিধাজনক মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

সবচাইতে দুঃখ পেলাম এই কথা
বুঝতে পেরে যে, চিঠিখানি আমাকে
সম্বোধন করেই লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু
আমি এর উদ্দিষ্ট নই, আসলে এর উদ্দিষ্ট
হচ্ছেন বল্লভভাই প্যাটেল, এবং ভেলোড়ি।
(ভেলোড়ি তখন অস্থায়ীভাবে হাই
কমিশনারের কাজ চালাচ্ছেন।) তাঁদের
দুজনের কাছেই শ্রীনেহরু এই পত্রের
অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতই যদি
এটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি হত, এবং একটি
তরুণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে কিছু
প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াই যদি শ্রীনেহরুর
লক্ষ্য হত, তা হলে তিনি কিছুতেই হাই
কমিশনারের কাছে এ চিঠির অনুলিপি
পাঠাতেন না। চিঠির মধ্যে ভাল ভাল যে-
সব কথা রয়েছে, সেগুলি আমাকে উদ্দেশ
করে ততটা লেখা হয়নি, যতটা বল্লভভাই
প্যাটেলকে উদ্দেশ করে। শ্রীনেহরু জানতেন
যে, তিনি আমাকে পছন্দ করেন না বটে,
কিন্তু আমার উপরে গান্ধীজী আর
বল্লভভাই প্যাটেলের প্রভূত আস্থা রয়েছে।
কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে সুধীর ঘোষের বিরোধে
শ্রীনেহরু একা ছিলেন এক দিকে; অন্য দিকে
ছিলেন গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল।

এর কিছুকাল বাদে, ভারতবর্ষে ফিরে
এসে, গান্ধীজীকে আমি চিঠিখানি দেখাই।
তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানি
পড়লেন। তারপর মন্তব্য করলেন, "বিচিত্র

চিঠি। তিনি লিখেছেন, তিনি একজন মহৎ মানুষ। স্বভাবতই তিনি দয়ালু এবং উদার। একজন তরুণের প্রতি সুবিচার করবার জন্যে তিনি এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু আর এক দিক থেকে তাঁর উপরে আরও প্রবল চাপ পড়ায় তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।" বলা বাহুল্য, গান্ধীজী এখানে কৃষ্ণ মেননের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। মেনন তখন নেহরুর ছায়াস্বরূপ।

এই একই বিষয়ে ডেপুটি 'সিংহ' বল্লভ-ভাইয়ের বক্তব্যও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর এই চিঠি থেকেই তা বোঝা যাবেঃ

তথ্য ও বেতার দপ্তর,
ভারত সরকার,
নয়াদিল্লি, ২৯-৬-৪৭

প্রিয় সুধীর,

তোমার ২৮শে মে, ১৯৪৭ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। চিঠিখানি পেয়ে তোমার সম্পর্কে আমার উদ্বেগ কিছুটা কাটল। যেসব অসুবিধের মধ্যে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এ ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া কী, স্বভাবতই তা আমি জানতে চাইছিলাম। এখন জেনে খুশী হলাম যে, অসুবিধের তুমি মোকাবিলা করছ। নৈরাশ্য আর ভগ্নোদ্যম ভাবটাও আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু তোমার মতন গুণী ও যোগ্য মানুষ অসুবিধের মোকাবিলা করতে গিয়ে এইভাবে মুষড়ে পড়বে, এটা ঠিক নয়। জনসংযোগ-অফিসারের জীবন তো সুসময়েও এবং অনুকূল অবস্থাতেও পুষ্পশয্যার জীবন নয়। সে ক্ষেত্রে তোমাকে কেন্দ্র করে যে পক্ষপাতদুষ্ট বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে, তাতে ধৈর্য, সাহস আর কৌশল আরও বেশী মাত্রায় থাকা চাই। এইসব অসুবিধের সঙ্গে তোমার পরিচয় যতই বাড়বে, ততই তুমি বুঝতে পারবে, কীভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়। এ আমি নিশ্চিত জানি।

জওহরলাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। চিঠিখানিতে এমন কিছু আছে, যা হয়ত তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু তার জন্য ভগ্নোদ্যম কিংবা হতাশ না হতেই আমি তোমাকে অনুরোধ করব। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, শান্তভাবে, বিনম্র মর্যাদায় তা তুমি গ্রহণ ক'রো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে, এ ব্যাপারে তোমার দিকের বক্তব্যও আমি সম্পূর্ণ জানি, এবং আমার উপরে সর্বদাই তুমি এই আস্থা রাখতে পারো যে, তোমার অবস্থাটা আমি সহানুভূতি সহকারেই বিবেচনা করব। যাঁরা তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তাঁদের সন্তোষ-বিধানের জন্য তোমাকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু তাই বলে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের পরামর্শ তোমাকে আমি দেব না। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে এমন কোনও কথা নেই, যার জন্য তোমাকে তা করতে হতে পারে; যদি তোমাকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে এইসব সম্পর্ক ছেদ করতে বলেন, তা হলে তিনি নিজের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করবেন মাত্র। বস্তুত, ওখানেই তুমি যে কাজ নিয়ে রয়েছ, শুধু যে তারই সুবিধের জন্য এইসব যোগ-সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার তা নয়, এতে করে আমাদেরও এখানে কাজের কিছুটা সুবিধে অবশ্যই হতে পারে। তবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, হাই কমিশনারের মনে যেন এমন ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, তুমি তাঁর অজ্ঞাতসারে কিছু করছ। তুমি যদি বিচক্ষণ হও, এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে হাই কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, তা হলে নিশ্চয় তেমন ধারণা তাঁর হবে না।

ওখানকার সংবাদপত্র এবং ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের সঙ্গে তুমি যে মূল্যবান যোগসূত্র গড়ে তুলতে পেরেছ, এ কথা জেনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। যে কঠিন কাজ তোমার হাতে, তা সম্পাদনের ব্যাপারে এতে নিশ্চয়ই তোমার অনেক সুবিধে হবে। কাজে-কর্মে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য যোগ্য একজন লোক পাঠাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্য-বশত, লোক-নির্বাচনের ব্যাপারে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বড়ই সময় নিচ্ছেন। লোক-নির্বাচন হয়ে গেলে, এবং নিয়োগটা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে তারপর আর তার কাজে যোগ দিতে বিলম্ব হবে না।

জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের যে গোষ্ঠী গড়া হয়েছে, আমার মনে হয় না যে, তার থেকে নিজেকে তোমার ছিন্ন করা উচিত। ভারতবর্ষের মর্যাদায় যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, তোমার দায়িত্ব-ভারের গুরুত্বও তার ফলে বৃদ্ধি পাবে; এবং বেসরকারীভাবে যেসব যোগসম্পর্ক তুমি গড়ে তুলেছ, এতে আমাদের কাজের তখন অনেক সুবিধে হবে। আর কিছু না হোক, যারা আমাদের ঘোর বিরোধী, ব্রিটিশ জনসাধারণের সেই অংশের পুরনো বিদ্বেষটা তখন দূর হবে, এবং ভারতবর্ষকে নিয়ে দলাদলির প্রশ্ন উঠবে না। এই কারণেই আমাদের প্রচারব্যবস্থায় এমন একটি নির্দলীয় গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ ঘোষণাটিকে এখানে খুবই ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কাগজে তার খবর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এবারে অভিযোগ উঠেছে মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধেই। বলা হচ্ছে যে, ঘোষণাটিকে তিনি সরাসরি মেনে নেননি, পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। দেশ-বিভাগ হলে প্রশাসনিক যে-সমস্ত প্রশ্ন দেখা দেবে, তারই বিবেচনায় আমরা সবাই এখন ব্যস্ত রয়েছি, এবং যথাসম্ভব শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করবার চেষ্টা করছি।

দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যাটি এখন আমাদের সামনে এক বিরাট বাধা। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ মনোভাব অবশ্যই কাজের অনুকূল; তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পলিটিক্যাল দপ্তরের আমলারা ইতিপূর্বে যেসব দায়দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রেখেছেন, এবং যে পন্থায় কাজ করেছেন, তার ফলে আমাদের পথে এক গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। এইসব অফিসারের অসহযোগী, এমন কী বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী মনোভাব জনচিত্তে যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে, ব্রিটিশ সরকার সে বিষয়ে অবহিত হলে আমি খুশী হতুম। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বিশ্বাস করে যে, প্যারামাউন্টে ক্ষমতার অবসানের পর তারা স্বাধীনতা লাভ করতে অধিকারী। এইসব রাজ্য সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়, যথাসময়ে তা আমরা বুঝতে পারব। তবে ভেবে দুঃখ হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আমলারা যদি না আমাদের পথের উপরে এইভাবে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, বহু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তা হলে আমরা রক্ষা পেতাম।

টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সম্পর্কে তোমার টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি। নিবন্ধটির শুধু সংক্ষিপ্তসারই দেখেছি আমি। জওহরলাল নিজেই অনেকবার যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, মনে হচ্ছে সেইটেই এতে প্রতিফলিত। এ নিয়ে তোমার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

শান্তিকে ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে তোমার
বল্লভভাই"

সুধীর ঘোষ, এস্‌কোয়্যার,
জন-সংযোগ অফিসার,
ভারতীয় হাই কমিশনারের দপ্তর,
ইনডিয়া হাউস, অলডুইচ, লনডন, ডব্লু
সি ২

(ক্রমশ)

Formula
44
COUGH MIXTURE

ভিক্স্ ফর্মূলা 44
শক্তিশালী কাফ মিকশ্চার

টোকিওর চিঠি

'Do you think I am an Indian?'
'Of course!'
'Do you think my ability and intelligence are less than any of your average people?'
'I don't think so.'
'Then?'
'Then what?'

মুখের কথাটা ছ‍ুঁড়ে দিয়ে সে তখনও মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও বিদেশী হিসেবে প্রধানত আজকের পৃথিবীর কাছে যে জায়গার কথা বলছি সেখানে আমার বড় একটা কৌলীন্য নেই। স্থান Sophia Universityর আন্তর্জাতিক শাখার সাধ্য-বিভাগ। জাপানে বাইরের লোকের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ভাষা। এখানে শিক্ষা বিভাগের সব কিছুই এ‍ঁদের নিজেদের ভাষায়। বিজ্ঞানের যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব বা ব্যাখ্যাকে এ‍ঁরা নিজেদের ভাষায় সুন্দর তর্জমা করেছেন। প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগে। এখনও যা আমাদের কল্পনার বাইরের বলা চলতে পারে। শুধু তাই নয়, আজকের জাপান নিজের আভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন জিজ্ঞাসায়ও ইংরেজী ভাষার বিশাল প্রভাবকে এমন সুন্দরভাবে এড়িয়ে যে পৃথিবীর সামনের সারিতে আসতে পেরেছে সেটা আমার কাছে এক বিরাট বিস্ময়। যে-কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস রচনায় কোথাও এতটুকু অসুবিধা নেই। আর এক দিকে তাকাও—বৈদেশিক প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি কেমন সুন্দরভাবে একে অপরকে নিজেদের ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছে—কী কথায়, কী লেখায়।

কিন্তু আজকের জাপানের নূতন যুব সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছে—'ইংরেজী শিখব'। কি ছেলে কি মেয়ে। দেখেছি কি ভীষণ উৎসাহ আর উদ্যম। ইংরাজী ভাষা আজ আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই এরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিচার করলে দেখব আমরা দু শ' বছরে যা শিখেছি তার তুলনায় এরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে তুলনামূলক মান নির্ণয়ে আমাদের অনেক উর্দ্ধে। কারণ, জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রধানত মেয়েদের শিক্ষায় আইন করে ইংরেজী ভাষা শেখা বন্ধ ছিল।

কয়েকদিন আগে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গার রাস্তায় ব্যক্তিগতভাবে চার শ স্কুল এবং কলেজের ছেলেকে ধরে জিজ্ঞাসা করেছেন, কার কতটা ইংরাজী ভাষায় দখল। তাতে দেখেছেন প্রায় তিন শ-র উপরে শুধু পড়তে পারে, এক শ-র উপর পড়তে এবং বুঝতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ জন পড়তে-বুঝতে এবং বলতে পারে আর প্রত্যেকের সঙ্গে ইংরেজী শেখার একটা ছোট্ট বই আছে। আমাদের দেশের মতনই এদের কোন সুযোগ নেই ইংরেজীতে কথা বলার। দ্বিতীয়ত, এদের লাজুক প্রকৃতি আরও প্রতিবন্ধক। আমি বিশ্বাস করি, আগামী যুব-সম্প্রদায় সব কিছুর মতনই খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজী ভাষাটাও দখল করে নেবে। কারণ এরা ওই একটা ব্যাপারে অতুলনীয়।

Sophia Universityতে International Division নাম দিয়ে আমাদের মতন জাপানী না-জানাদের জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বহুরকম বিষয়ের উপর কিছু পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। অনেক দেশের ছেলে অনেক রকম চেহারা আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেখানে বিদ্যমান। বেশীর ভাগই আমেরিকাবাসী। আমার ক্লাসের চারিদিকে তাকিয়ে দেখি গোঁফ শুধু আমারই আছে—আর তা নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে, অনেক উত্তরও দিতে হয়েছে। ভারতীয় হিসাবে আমিই সেখানে একক। পাশে এসে বসে আফ্রিকা থেকে আগত একটি নিগ্রো ছেলে। বেশ দেখতে পাই জাপানী ছেলেরা আর কয়েকজন এশিয়াবাসী ওর মধ্যেই কেমন এক দিকে সুপ্ত হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আলোচনাও আমাদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ।

যে ধরনের ভারতীয় খবরাখবর এরা পেয়ে থাকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার সত্যতা হয়ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর বিকৃতিতে তার যে রূপ পরিগ্রহ করে তাতে সংবাদের মূলধারাই শুধু ব্যাহত হয় তা নয়, মাঝে মাঝে তা ব্যক্তিগত চিন্তাক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তখন তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝে কার সাধ্য? দেখতে পাই, সাধারণ একটা ঘটনার উপর চোখ বুলিয়ে হাটে-বাজারের কয়েকটা মুখরোচক আলোচনার উপর ভিত্তি করে একজন একটা লেখা লিখে ফেলেছে। অবশ্য আমাদের দেশেও যে এর অভাব তা নয়। তা না হলে ভারত থেকে সংবাদ আসে "......কোথায় বানর মারতে গেলে মানুষ বুক পেতে দিচ্ছে......কোথায় হাতী পাগল হয়েছে......কোথায় দিনের বেলায় বাঘে মানুষ খেয়েছে......আর 'গরু'? সে তো রোজকার খবর।" হয়ত খুঁজলে দেখতে পাব এর পেছনেও লুকিয়ে আছে দুনিয়াকে দাবার চাল।

তাই সেদিন যখন একটা ছেলে ভারতের কথা প্রসঙ্গে সযত্নে পকেট থেকে একটা জাপানী দৈনিক সংবাদপত্রের অংশ, যা সে আমার জন্য কেটে এনেছে, বার করল, তখন স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম :

'এটা কি?'

ভাবলাম নিশ্চয়ই আমরা 'গরু মারা বন্ধ' করছি বা গরু খেতে 'কেন' শুরু করছি না তার উপর অসংখ্য লেখার উপর একটা।

সত্যই যে দেশে হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, বাড়িতে, খাবারের দোকানে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং তোলপাড় করা সংবাদ একটা মামুলী হাসির খোরাক মাত্র, সে সম্বন্ধে বলা বা লেখাটা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। এরাও আমাদের মতন ভীষণ একটা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিন কাটাত। কোন এক সময় 'মেইজী' শাসনে ভীষণ খাদ্যাভাবে 'মেইজী' স্বয়ং খাদ্যের প্রতিবন্ধকতা ভঙ্গ করলেন। তারপর কয়েকটা যুগ পার হয়ে এসে এরা কেমন সব কিছু মানিয়ে নিয়েছে। কোন রোষ-বহ্নি এদের

দণ্ধ করে নি। সেই কারণে অহেতুক যুক্তি-তর্কে এরা আজ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এদের কাছে আজ আর বিরাট কোন অস্তিত্ব নিয়ে ভর করে নেই। এদের ভিতর ধর্মের নামে সততার ভণ্ডামি নেই. সাধারণভাবে সত্যকারের সততাই এদের জীবনে শিকড় গেড়ে বসেছে। তার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু সাধারণ ঝড় বিরাট মহীরূহকে কি করতে পারে? সততার বিশালত্বকে ক্ষুন্ন করে সমগ্র জাতির উপর একটা পাপ-বোধ আসবার কোন সম্ভাবনাই এদের আজ নেই।

জাপানী কাগজে জাপানী ভাষায় লেখা। ছেলেটি ইংরেজীতে তর্জমা করছে, আমরা শুনছি। তাতে অনেক সত্য আছে, অনেক অসত্যও আছে। অনেক বাজার-গুজবকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়াও হয়েছে। হয়ত এমন লেখা অনেকই বার হয়। লেখক ভারত ঘুরে এসে খানিকটা অভিজ্ঞতা দিয়েছেন।

তার মতে ভারতবাসী কাজের চাইতে আলোচনা বেশী করে। কয়েকজন এক-জায়গায় হলেই যে-কোন বিষয়ে তারা আলোচনা শুরু করে, যে-আলোচনাকে কেন্দ্র করে কোন ফলপ্রসূ উপসংহারে পৌঁছয় না।

বললাম—'তোমাদের মতে স্বার্থগত মূল্য-বোধ নেই এই তো? কিন্তু, একক চিন্তাধারা অপরের কাছে ব্যক্ত করেই তো সৃষ্টি হয় দর্শন-সাহিত্য, গড়ে ওঠে জীবন-জিজ্ঞাসার নূতন উপলব্ধি আর উপাদান।'

কিন্তু কে বুঝবে? বোঝবার, ভাববার সময়ই বা আজকের পৃথিবীর কোথায়?

তারপর—পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার নাকি বিদেশী দেখলেই ন্যায্য ভাড়ার চাইতে বেশী দাবি করে আর নাকি তাকে 'গুরু নানকে'র নাম স্মরণ করিয়ে দিলেই সংগে সংগে সঠিক ভাড়াটা নিয়ে দুবার সেলাম ঠুকে রেহাই দেয়।

আর 'গরু দেবতা'র কথা তো আছেই। যেন গো-ভক্ষণ শুরু করলেই আমাদের খাদ্যসমস্যার সব সুরাহা হয়ে যাবে। সব-শেষে খাদ্যাভাব নিয়ে এক বিশাল পর্ব। আমাদের কি করা উচিত, কিভাবে এধরনের জীবনযাত্রা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার উপর বৃহৎ আলোচনা।

পড়া শেষ করে ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। আরও কয়েকজন ছেলের করুণা-ভরা দৃষ্টিও তখন আমার উপর। যা আমার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ববোধকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। ভাবটা যেন—"হায় রে ভারত-বাসী......"।

কি বলব! খবর একেবারে টাটকা। গো-হত্যার জন্য দেশে উত্তেজনা। তাকে কেন্দ্র করে দেশের মন্ত্রীর পদত্যাগ, গুলি-চালনা, মৃত্যু। ধরুন, আজ যদি বিলেত থেকে ফিরে 'গোবর খাচ্ছে না কেন?' বলে অন্য কোন দেশে এমন উত্তেজনা হত তখন আমরা কেমনভাবে জিনিসটাকে গ্রহণ করতাম? এদেরও তো তাই! যার পেছনে সত্যই কোন ঐতিহ্য আছে কিনা সেটা ভাববার সময় আজকের পৃথিবীর কারুর নেই, আমাদেরও আছে কিনা সন্দেহ? যাই হোক তখনও খানিকটা বাকি। তাদেরই একজন বলে উঠলো—"সত্যই তোমাদের মতন কয়েকটা দেশের জন্য দুঃখ হয়। যখন এশিয়ার অনেক দেশ আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে সেখানে তোমরা যেন দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছ......।"

তাই আস্তে আস্তে ওই কথাগুলো বলে ফেললাম তার "Then what?"-এর শেষ হওয়া পর্যন্ত।

তারপর বিদেশে বসে যেটুকু ব্যাখ্যা করা সম্ভব, করতে চেষ্টা করেছি। কারণ, আমাদের দেশের so-called বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কতটুকু দেশ সম্বন্ধে জানি, কতটুকু আমার দেশ সম্বন্ধে জানা সম্ভব? এখানে এমন কোন publicityর বন্দোবস্ত নেই যেখানে এদের মতন দু একজনকে নিয়ে গিয়ে, আমার অজ্ঞতার বাইরে আমার দেশকে, দেশের সত্যকারের দুঃখ দুর্দশা এবং তার প্রতিকারের প্রতিবন্ধকতাকে তাদের সামনে তুলে ধরা যায়।

আমাদের অনেকের সমস্যার কোনটা কতটা বলি—বলা সম্ভব! আর অত সময়ই বা কোথায় তাদের যে, আমার কথা শুনবে, ভাববে? সাধারণভাবে চোখের সামনে যেটা দেখছে, শুনছে বা শোনান হচ্ছে, সেইটা দিয়েই বিচার করছে। দোষ দেওয়া যদি হয় সেটা আমাদেরই ভুল হবে।

তবুও না বলে পারলাম না তার "then what?"-এর সূত্র ধরে।

"দেখ, তোমার সহানুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এটা তো বিশ্বাস কর যে স্বদেশবাসী তার দেশকে বিদেশের চাইতে বেশী ভালবাসে। ভারতবাসীও তার নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নয়। আমার মত অগণিত মানুষ আমাদের দেশে আছে যারা চায় এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হোক, যা দিন দিন আমাদের

দুঃখ বাড়াচ্ছে, যা একটু একটু করে পৃথিবীর চোখে আমাদের ছোট করে দিচ্ছে। তোমাদের দেশে যেমন আমার চাইতে বেশী এবং কম দুই সম্প্রদায়ের কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিজীবী আছেন, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। যাঁরা সত্যই বোঝেন—একটা সুষ্ঠু-পরিবেশকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন বা সমস্ত জাতিকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে চান। পৃথিবীর চোখে আমাদের দেশেও জন্মগ্রহণ করেছেন একের বেশী মহাপুরুষ খুঁজলে আজও পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী বোঝেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা সমস্যা একে অপরের সঙ্গে এমন-ভাবে জড়িয়ে আছে তাকে ছাড়ান কি এক দিনে বা একটা মুখের কথায় সম্ভব? প্রথমতঃ, আমরা দলীয়ভাবে কোন গোষ্ঠীভুক্ত হতে চাইনি। আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখ, এশিয়া বাসীরা কেমন দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। সাধারণ দৃষ্টিভংগীতে জীবিকার মান নিয়ে তারাই জিতেছে যারা ধনী সম্প্র-দায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তোমাকে অনুরোধ করছি "then what?"-এর পর তুমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা কর একজন ভারত-বাসীর মন নিয়ে, শুধু একজন দর্শকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে নয়।"

যা বলতে পারলাম তার চাইতে জানলাম অনেক বেশী।

কই এরা তো আলোচনা বড় একটা করে না। আজকের যুব-সম্প্রদায়কে দেখেছি গাড়ীতে, অফিসে, খেলার মাঠে, রাস্তায় কোথাও সে ধরনের আলোচনা নেই। এই তো আজকে এদের সাটো-গভর্নমেণ্ট টলটলায়-মান। মাত্র বাহাত্তর দিন মন্ত্রিত্ব করবার পর নিজের জেলার কোন এক ছোট স্টেশনে রেল-ট্রেন থামবার অনুমতি দেওয়াতে, অন্তত অফিসের কাগজপত্রে সেইভাবেই আছে, Transportation Minister পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন বিরোধী দলের চাপে। ছুটে আসতে হল Defence Ministerকে সুদূর আমেরিকা থেকে তাঁর সফর অর্ধ-সমাপ্ত রেখে। কোন এক-সময় তিনি সামরিক যানবাহনে নিজের ব্যক্তিগত কাজে নিজের দেশে গিয়েছিলেন, সেখানে সামরিক বাজনাদাররা তাঁকে অহেতুক সংবর্ধনা জানায়, যেটা সরকারী ভাবে নীতিবিরুদ্ধ। সেই নিয়ে কিন্তু ভীষণ নাজেহাল। কতটা সত্য-মিথ্যা তা আলোচনা হচ্ছে তাদের Diet-এ, আমাদের দরকার কি? এদের পরিস্থিতির বিশেষ অনুযায়ী আমাদের দেশের তুলনায় কোনরকম আলোচনা নেই এইটাই বড় কথা। সেখানে ভাল-খারাপের প্রশ্ন নেই। আর যেটুকু আলোচনা আছে, তা নেহাত ঘরোয়া, যা রেল-ট্রাম-বাস সরগরম করছে না, কেউ অফিসের কাজ রেখে বলছে না—"আরে, রাখুন মশায় কাজ, ওদিকে গেল যে......"

এদের অধুনা প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের চিন্তা নিয়ে নিজে ব্যস্ত; কারণ, তাঁর নিজের দলেই ভাঙন ধরেছে। খুব কম লোকই ভাবছে, আর এক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে কি হবে?

তবে কি এরা রাজনীতিতে উদাসীন? নিজেদের সম্বন্ধে ততো ওয়াকিবহাল নয়? তাই বা কি করে বলি?

হয়ত মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধের দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করে সাময়িকভাবে সব কিছুতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বেশী পছন্দ করছেন। তাই বলে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে তাঁদের চিন্তাধারায় কোনরকম মালিন্য এসেছে। আজকে তাঁরা ছোটোখাটো রাজ-নীতিক বা স্বার্থগত, ব্যক্তিগত বা দলীয় যাই হোক না কেন, গোলযোগ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেই বেশী মনোযোগী। যে বিরাট ঝড় তাদের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তাকে প্রত্যক্ষ করে আজ যারা বেঁচে আছে, তার চেয়ে একটা সুস্থ জীবন-প্রবাহ ... সমগ্র জাতির উপর একটা পরিপূর্ণ দায়িত্ব-দায়িত্ব-মমতাবোধ এনে দেবে। দু' বেলা পেট ভরে খাওয়া ও আপন-জনের অশ্রুভেজা চোখে হাসি ফুটিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বিনিময়ে এরাই বা সূক্ষ্ম অনুভূতির কিছুটা সাময়িক ক্ষুণ্ণতা। তারা বাঁচতে চায় বর্তমান নিয়ে। ইতিহাস কবে কি করবে তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই।

কিন্তু উঠতি যুব-সম্প্রদায়? এই তো সেদিন Yokohama বন্দরে আমেরিকার আণবিক শক্তিসম্পন্ন জাহাজকে "কেন ঢুকতে দেওয়া হল?" তাই নিয়ে ছাত্ররা কি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এখানেও কাঁদুনে গ্যাস-লাঠিতে শেষ পর্যন্ত শেষ হল। কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি—সাময়িক শান্ত হল, কিন্তু ক্ষান্ত হল না।

আজকের শিল্পোন্নত জাপানের চিন্তা-ধারাকে কেন্দ্র করে হয়ত অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। হয়ত আমার ব্যক্তিগত চিন্তাধারাটা ভুল হতে পারে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করে আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই হয়ত কিছুটা ধরা পড়বে।

তবুও আমি চোখকানকে সজাগ রাখি। কোন রসিক বন্ধু যখন হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে, "না—তোমাদের ভারতে আর যাওয়া হল না—"। কেন "ধর, গাড়ি চালাতে চালাতে যদি কোন গরু চাপা দিয়ে ফেলি—সে-ও তো গো-হত্যা, নিশ্চয়ই আমায় শাস্তি পেতে হবে..."। তার মধ্যেই ধরে বেড়ায় এদের হালকা মনের পরিচয়। সে মনে গভীরতার ছোঁয়া নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় চার মিলিয়ন যুবক প্রাণ হারিয়েছে। আজ জাপানের

চারদিকে ছোট-বড় যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা চায় কাজের লোক। আমি একটা ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপাতত যুক্ত আছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন এদের Employment Exchange--এ নাম লেখাতে গেলাম। চাকরির জন্য নয় চাকুরিজীবীর জন্য। সেখানে চারদিকে বড় বড় অফিস, কল-কারখানা থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—"কাজের লোক চাই।" সব থেকে নিম্নতম বেতন সেখানে আমাদের দেশের আজকের সাড়ে চার শ' টাকা। আমার চোখে আশ্চর্য লাগাই তো স্বাভাবিক।

মনে পড়ল বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সবে কলেজের গণ্ডি পার হয়েছি। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেক পরিচয়-পত্র পেশ করেছি। স্বভাবতই সাড়া পাইনি। ছাত্র-জীবন আর বাস্তব-জীবন তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত। ছাত্র-জীবন বিধ্বস্তপ্রায়। সমগোত্রীয় কয়েকজন বসে আছি মফস্বল শহরের কোন-এক বন্ধুর পড়বার বাইরের ঘরে। শীতের দুপুর। কলেজের ইউনিয়ন, খেলাধুলোও যেন ওই বেকারত্বের যূপকাষ্ঠে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। সকলের চুপ করে থাকাটা ক্ষুন্ন করল এক বন্ধু। হঠাৎ জানালার লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল, "দেখ কেউ যদি ওই রাস্তাটা থেকে ডাকে, 'এস চাকরি দেব', তা হলে তখনই দরজা দিয়ে বের হয়ে ছুটব না—এই গারদ ভেঙেই লাফ দেব।" বড় করুণ শোনাল ওর গলার স্বর। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা সকলে এক অদ্ভুত হাসি হাসলাম। সান্ত্বনা দেবার মতন কোন আশ্বাস আমাদের ছিল না। ওই [illegible] লোহাগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই দশ বছর আগের দিনটাতে ফিরে গেলাম। কানে বাজল সেই করুণ স্বরটা। সেদিন সে জানত, ওই লোহার গারদ ভাঙা সম্ভব নয়। তার অলীক কল্পনা একটা অবাস্তব আশা করেছিল যে, তার পরিপূর্ণ আনন্দটা নিশ্চয়ই তাকে কোন আসুরিক বলে বলীয়ান করবে। সে যাক গে। ছেলেটি আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাইবেলের কথাটা মনে পড়ে—"কোন জিনিস অন্তর থেকে চাইলে তুমি পাবেই।"

জাপানে ছেলেরা বা মেয়েরা তাই হাই স্কুলের গণ্ডিটা পার হয়েই একটা কোন কাজে ঢুকে পড়ে। কারণ, উচ্চশিক্ষা এখানে ভীষণ খরচ-সাপেক্ষ। উপরন্তু যে-সব সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাকেন্দ্র আছে সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় পার হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করা সাধারণ ছেলের পক্ষে খুবই মুশকিল।

একটা ছেলে হাই স্কুল পার হল। ভাবতে হল না কি করে চাকরিতে ঢুকব। ভাবল আর ঢুকে পড়ল। সারা দিন কাজ করল। সেখানে ফাঁকি নেই। সন্ধ্যায় বেশীর ভাগ একজন "Girl friend,—যার প্রকৃত অর্থ এখনও আমার বোধগম্য হয়নি—নিয়ে গল্প-গুজব করল, নয়ত বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করে কোন পানশালায় বসে গেল। আর তা-ও না করলে চলে গেল "মাজাং" খেলতে। এও এক ধরনের জুয়া, অনেকটা দাবার মতন। আমি খেলা জানি না—তবে পয়সা বিনিময় হয় তা জানি। তারপর বাড়ি ফেরা। আর কি চাই? জনৈক ভদ্রলোক আমায় ঠাট্টা করেছিলেন: Never return home early at night, your neighbours will think you have no money to spend ...." নইলে এদের ভাষায় বলবে, 'চিচকে'—কৃপণ। ওতেই নাকি পাড়াতে কৌলীন্য বাড়বে, কে কত রাত্রে ফিরছে। দেখেছি, রাত্রের ফিরতি ট্রেনে অর্ধেকের উপর মানুষ মদ্যপানের আমেজ নিয়ে ঘরে ফিরছে, কিন্তু কোন অভদ্রতা নেই। অবশ্য কি একেবারেই নেই? অবশ্যই চোখে পড়ে, তবে খুবই কম।

সকালে উঠেই ছুটছে। হাজিরা-খাতায় সইটি ঠিক সময় হওয়া চাই। সব মিলিয়ে জীবন-সমস্যা নিয়ে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। পাস কর আর না কর চাকরি করব মনে করলেই চাকরি; চাকরি করলেই পয়সা; পয়সা নিয়ে দোকানে গেলেই জিনিস পাওয়া যায়, আর বাড়তি পয়সা যদি থাকে—চিন্তার কোন কারণ নেই খরচ করবার সহস্র উপায় হাত বাড়িয়ে আছে। অতএব আপাতদৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই, অত ভাববার দরকার নেই। আমি নিজেকে দিয়েই ভেবেছি। স্কুল ছাড়ালে তো কোন কলেজে কি করে ভর্তি হব, সে এক দুর্ভাবনা। ঢুকলাম কলেজে, পাসও করলাম। কোথায় চাকরি? জুতোর তলা ক্ষইয়ে যদিও বা কোন একটা জুটল
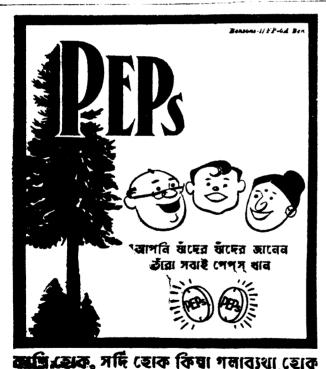
তাতে এদিকে কুলোয় তো ওদিকে কুলোয় না। তারপর সাধারণ জীবনে যা হয়, নতুন করে মনে করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এই বাধাগুলোই আস্তে আস্তে আমাদের মানসিক বিকারে পরিণত হয়। যত দিন যায় যত বাধা পেতে থাকে, ততই ভয়াবহ রূপ নেয়। তারপর একটু বেশী জ্ঞান হলে—যখন কোন উপায় থাকে না, তখন "গভর্নমেন্ট" নামক কোন এক অসার শব্দের প্রতি নির্ভুল দোষারোপ করি।

কিন্তু এরা? আমাদের দেশের যে-কোন এ ধরনের সমস্যার একটাও কি আমাদের মত অত গভীরভাবে ভাবতে হয়? না, ভাবতে হয় না—ভাববার দরকার নেই। চিন্তা করতে হয় না। রেশন—অসুখ—কিউ......। কিন্তু কেন? শুধু কি চাকরি আর চাকরির আয়োজন আছে তাই? এটা তো তাদেরই সৃষ্টি। তাদের সৃষ্টির সুখই তারা নিজেরা ভোগ করছে।

আজকের পৃথিবী পাঁচ শ' বা দু' শ' বছর আগের পৃথিবী থেকে অনেক তফাত। দু' শ' বছর আগে আমাদের দেশে ইংরাজ এসে যে কায়েমী বসবাস শুরু করেছিল তাও তাকে একদিন ছাড়তে হল। দু' শ' বছর বা তার আগে "স্বাধীনতা" অর "পরাধীনতা"-র যে সংজ্ঞা ছিল, আজ আর তা নেই। কারণ, পৃথিবীর রূপ পালটে গেছে, মানবমনে চেতনা অনেক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যে ক্ষমতার লোভ আর পদদলিত মনোভাব মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে তাকে উপড়ে ফেলবে, কার সাধ্য। সে আজ যেমন আছে, কালও থাকবে। কিন্তু সেই দলের তারাও সচেতন হয়ে গেছে, তারা জেনেছে যে, ওই দুটো শব্দের সংজ্ঞা পালটে গেছে। আজ তারা অন্য পথ ধরেছে। মানব-সভ্যতার নাম দিয়ে যে যার নিজের মনোবৃত্তিকে এবং চিন্তাধারাকে অপরের উপর চাপাতে পারলেই সন্তুষ্ট। সেখানে বিভিন্ন এশিয়াবাসী ওইটুকু নিয়েই কেমন একে অপরের সংগে বোঝাপড়া করছে ও নিজেদের শক্তিক্ষয় করছে। কই ফ্রান্স, ইংলন্ড বা আমেরিকা তো তা করছে না, যদিও বোঝাপড়া করবার অনেক কিছুই তো তাদের বাকি আছে। তারা জানে, ওটুকু "বাকি" থাকবেই। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ওটুকু পূরণ হবে না—এক লোকসান ছাড়া। তাদেরকে তা হলে বুদ্ধিমানই বলতে হয়। জাপানকে এশীয় দেশ হিসাবে বুদ্ধিমানই বলব। জাপান আজ ব্যবসায় নেমেছে। সত্যই তো, আমাকে যখন ব্যবসা করে খেতে হবে তখন ব্যবসাদারের মতই চলতে হবে বইকি। জাপানকে সবচেয়ে বেশী খাদ্য বাইরে থেকে কিনতে হয়। তার বদলে বাইরে যায় ভারী মালের উৎপাদন—যেমন ইস্পাত। সেদিন এদের শিল্প-উন্নয়নের মান দেখছিলাম। গত কোরিয়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের হার হঠাৎ বেড়ে গেছে।

যারা ব্যবসা করে, তাদের দেখা উচিত, কি করে, কোন্ পরিস্থিতিতে কতটা বেশী মালের কাটতি হওয়া প্রয়োজন। সেখানে অযথা কোন ন্যায়-অন্যায় বোধকে বা পুরোন মান-অভিমান আর বাক-বিতণ্ডাকে টেনে এনে পরিস্থিতিকে বেশী ঘোরাল করবার যুক্তি নেই। আজকের পৃথিবীর চাহিদা অনুযায়ী তারা সকলকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করছে। নিজের প্রয়োজন মত যে-কোন দেশ থেকে কাঁচা মাল কিনতে প্রস্তুত। লাল চীন থেকে চাল আমদানি করছে। তার বদলে যাচ্ছে ইস্পাত, জমিতে দেবার সার। দেশের জিনিস সমানভাবে বিক্রি হচ্ছে—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে। যে-কোনো দেশ যে-কোনো প্রয়োজনে তার কাছে চাইলেই জিনিস
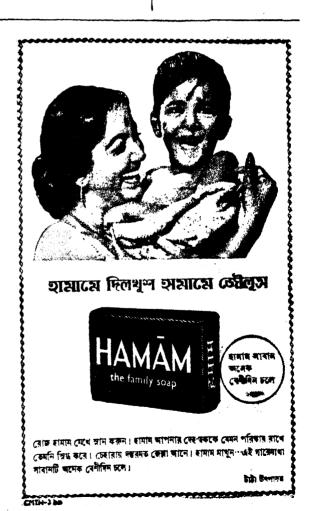
পাবে। সে ব্যবসাদার। সে জিনিস কি কাজে লাগাচ্ছে বা তাতে কতটা মানবতাবোধ লুকিয়ে আছে সে খোঁজে প্রয়োজন কি? সব দেশই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার সুযোগ বেশ ভালভাবেই নিচ্ছে। যে ব্যাখ্যাই তার হোক না কেন, আমি বলব, সে বুদ্ধিমান। আজকের পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে ওটুকু অবশ্যই প্রয়োজন।

আজকের জাপান ছাত্র-অধ্যাপক-ব্যবসায়ী নানাবিধ মুখপাত্র লালচীনে পাঠিয়ে ব্যবসার সম্পর্ক আরও বাড়াবার চেষ্টা করছে। নূতন করে আবার এদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চীন বলেছে, তোমরা বেশী চাল কেন, আমরাও বেশী Fertiliser কিনছি। সেদিনের ম্যানিলা-সম্মেলনে দর্শক হিসাবেও কাউকে পাঠায়নি। লাল চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে বসতে দেবার পূর্ণ সমর্থন এদের আছে। কোন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসুক বা লোকক্ষয় বন্ধ হোক এরা অবশ্যই চায়। কিন্তু তার পেছনে ভীষণভাবে লেগে থেকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে একটা ফাঁকা বাহবা নেবার মতন বাতুলতা এদের নেই।

কয়েক দিন আগে বৃহৎ ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর (Steel Mills) একটা সম্মেলন হয়ে গেল। গত কয়েক মাস আগে Daily Commodities এবং Heavy Industry-র মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, কিছু সময়ের জন্য কোন Steel Mills তাদের Ultra-Modern mechanism ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, ভারী-মালের উৎপাদন চাহিদার চাইতে বেশী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিনের আলোচনায় তারা সে চুক্তি ভংগ করল। কারণ, আজকের পৃথিবীর কাছে আরও ইস্পাত প্রয়োজন। জাপান বুক ফুলিয়ে বলছে, "আমি তোমায় অবশ্য দেব।" কারণ সুস্পষ্ট।

আজকের এই অগ্রগতির পেছনে কিছু সাদামাঠা যুক্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু সেইটাই সব নয়। সামরিক খাতে এদের ব্যয় নেই বললেই চলে। প্রায় সমস্ত National income-টা এরা নিজেদের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারছে। সেখানে ভারতকে তার অর্ধেকের বেশী ব্যয় করতে হচ্ছে সামরিক খাতে। সে খরচটা দেশের কোন মানব-কল্যাণে লাগে না। বাস্তবতার দিক থেকে উঠতি দেশের উন্নতি সাধনে সে অংশটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধক।

গত বিশ্বযুদ্ধের চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা তার সামরিক শক্তি দিয়ে জাপান পাহারায় রত। খারাপ লাগে না এদের সম্পর্কটা দেখতে। মনে হয়, এক বৃহৎ শক্তি যেন বলছে, "তুমি কাজ করে যাও, আমি তোমাকে পাহারা দিচ্ছি।" আর সেই সংগে যোগ দিয়েছে জাপানের সহস্র সহস্র কর্মক্ষম যুবক-যুবতী, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, যার মৌলিক সাধনা। কর্মক্ষমতা, সহনশীলতা, [illegible] ন্যায়নিষ্ঠা, আর যে-যে গুণ থাকলে একটা জাতি সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, এদের মধ্যে তার সব কিছুই বিদ্যমান। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই।

সেদিন আমার এক বন্ধু জাহাজে এসে বেশ কয়েক দিন থেকে গেল। কারণ জাহাজ মেরামত করার প্রয়োজন হয়েছিল।

বিলিতী কোম্পানীর জাহাজ। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোরা যাচ্ছিস ইংলণ্ড, ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ, জাপানে সারাচ্ছিস কেন?"

বলল, "আরে জানিস না, এখানে যে কাজটা এক মাসে হচ্ছে, ইংলণ্ডে কম করে সেটা তিন মাস লাগবে।"

কিছু দিন আগে আমেরিকা এবং জারমানি থেকে দুটো Ship Building Experts-এর দল এসেছিল জাপানে। জাপান আজ Ship Building এর মান-নির্ণয়ে সর্বপ্রথম। তাই তারা দেখতে এসেছিল কি এমন Extra technical know how আছে, যা এদেরকে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতে পেরেছে। দেখে পরিষ্কার রিপোর্ট দিয়ে গেছে: Hard work and sincerity of the labours and technicians"

এরকম নানা কিছু রয়েছে যে সুখ আর ঐশ্বর্যের ডালি নিয়ে আজকের জাপান সকলকে ডাকছে। এই চোখ-ঝলসান রূপের সামনে অসংখ্য দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কি করে দিন-কি বছর কাটাই—দু'শ বছর পরাধীনতার পর আজকের স্বাধীন ভারতের সংগে যেন ওইখানেই সকলের একতা, যে তার নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে [illegible] চায়, বাঁচতে চায়।

বিকাশ বিশ্বাস

সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের এক লেবরেটরীতে আচার্য ব্লখিন
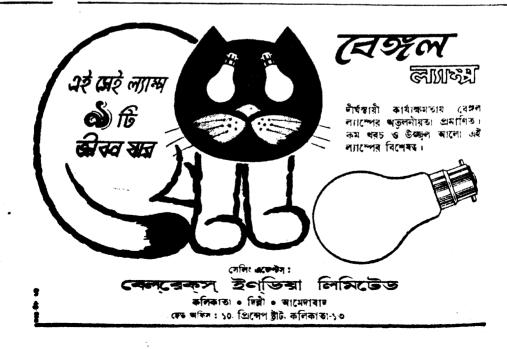
ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই (২)

আগেই বলেছি ক্যান্সার হচ্ছে দেহ-কোষের ভিতরের ব্যাপার। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন শ্রমবিভাগ রয়েছে, তেমনি কোষের মধ্যেও শ্রমবিভাগের জন্য রয়েছে কতকগুলি ক্ষুদ্রতর পদার্থ যেগুলিকে বলা হয় অর্গানেলস। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এই রকম দুটি পদার্থের নাম রিবোসোম ও মিটোকন্ড্রিয়ন। প্রথমটির কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ করা, দ্বিতীয়টির কাজ শক্তি উৎপাদন করা। এ ছাড়া আরো তৃতীয় একটি অর্গানেলের সন্ধান পেয়েছেন লুভেঁর আচার্য ক্রিশ্চিয়ান দ্য দুভে। সেটির নাম লাইসোসোম। সেগুলির নিজস্ব এনজাইম আছে, যেগুলি ডি এন এ, আর-এন-এ সমেত প্রোটিন পদার্থে বিভাজন ঘটাতে পারে। ঐ ধরনের একটি এনজাইমের নাম অ্যাসিড ফসফেটেজ। অসুস্থ অবস্থায় ঐ অ্যাসিড কোষ গলিয়ে দিতে পারে। হালে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, কোষের মধ্যে লাইসোসোমগুলি ক্যান্সার উৎপাদক বস্তুগুলির আক্রমণ কেন্দ্র হতে পারে। এই নিয়ে বর্তমানে ব্রিটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল গবেষণা করছেন। লাইসোসোমের এনজাইম যদি বেশি মাত্রায় সাইটোপ্লাজমে গিয়ে মেশে তাতে কোষের যে ক্ষতি হয় তাতে কোষের মৃত্যু ঘটতে পারে এবং তার মধ্যে ক্যান্সার [illegible] বিচিত্র নয়, এই হচ্ছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডঃ অ্যান্টনী অ্যালিসনের মত। ক্যান্সারের কারণ সম্পর্কে আরো অনেক মতামত আছে।

ক্যান্সারের প্রধান কারণ যদি ভাইরাস হয় তবে বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের মত ক্যান্সারেরও টিকা আবিষ্কৃত হওয়া স্বাভাবিক। টিকার সাহায্যে শরীরে রোগের প্রতিবিষ (অ্যান্টিবডি) তৈরি হয়। দেশে দেশে ভাইরাস বিজ্ঞানী ও ইমিউনোলজিস্টরা সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অবশ্য মানুষের ক্যান্সার ভাইরাস থেকেই হয়, এ-কথা এখনো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নি।

যাই হোক নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল সেন্টারে একজন রোগীর ক্যান্সার টিস্যু আর একজন রোগীর গায়ে জুড়ে দিয়ে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় রোগীর দেহে রক্তের কিছু নতুন শ্বেতকণিকা তৈরি হয়েছে যেগুলি বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাতে পারে। তার কিছু শ্বেতকণিকা প্রথম রোগীর দেহে সঞ্চারিত করা হয়। এইভাবে ৪০জন রোগীর আরো কিছু সংখ্যক রোগীর অবস্থার উন্নতি দেখা যায় এবং ১ জনের নাকি ক্যান্সার সেরে গেছে। এই ধরনের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেশেই চলেছে।

প্রতিষেধ ও চিকিৎসা

ক্যান্সার নিরাময়ের প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে অস্ত্রোপচার ও রশ্মি চিকিৎসা। কোবাল্ট রেডিয়াম ইরিডিয়াম ইত্যাদির আইসোটোপ ক্যান্সার টিউমারের মধ্যে ঢুকিয়ে এবং হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিয়ে থেরাপি করা হয়। আজকাল নানা রকমের ফলপ্রদ ওষুধও বার হয়েছে (যা দিয়ে করা হয় রাসায়নিক থেরাপি) যেমন থিওফস্ফামাইড, সাইক্লোফস-মাইড ইত্যাদি। এক একটি এক এক জায়গার ক্যান্সারে ব্যবহার হয়। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও হাতুড়ে চিকিৎসকের অভাব নেই। অমুক লোকের অমুকের টোটকা ওষুধ খেয়ে ক্যান্সার সেরে গিয়েছে এই ধরনের গুজব বাজারে ছেড়ে এই হাতুড়েরা পয়সা রোজগারের জমি তৈরি করে। ব্র্যান্ডির সঙ্গে চিংড়ি মাছ বা দুধের সঙ্গে ঘোড়ার পায়খানা মিশিয়ে খেলে ক্যান্সার সেরে যায় এই ধরনের গুজবও প্রচারিত হয়েছে। এই রকম চিকিৎসায় আরোগ্যের পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে হয় তাদের ক্যান্সার হয় নি, না হয় হাতুড়ের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে তারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও করেছে।

আসল কথা, ঠিক সময়ে অসুখ ধরা পড়লে বিশেষ করে অসুখের পূর্বলক্ষণ-গুলি প্রকাশ পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সার

রোগ আজকাল ঠেকানো যায়। অবশ্য সব-রকম ক্যান্সারের চিকিৎসা সোজা নয়। বৃহদন্ত্র, স্তন, ফুসফুস, প্রস্টেট গ্রন্থি, জরায়ু, মুখ ও চামড়ার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাফল্যের সংখ্যা বেশি। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, জীবিকা, লোক স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিভিন্নতার দরুন ক্যান্সারের আক্রমণস্থলের কিছু কিছু পার্থক্য হয়। যেমন এশিয়া ও আফ্রিকার চেয়ে ইউরোপে পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা বেশি, মুখের ক্যান্সার বেশি দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চুন ও দোক্তা খাবার অভ্যাসের দরুন। মুখের চামড়ার ক্যান্সারের সংখ্যা দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি।

ক্যান্সার অবশ্য শরীরের যে কোন অঙ্গে হতে পারে। উপরে যে অঙ্গগুলির নাম করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও গলনালী, স্বরযন্ত্র

অণুবীক্ষণের চোখে লাইসোসোমের কার্যকলাপ

চোয়ালের হাড়, পায়ু, প্রস্টেট গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, বৃক্ক, যকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও রোগ হতে পারে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রোগের স্বতন্ত্র কারণ আছে। যেমন বলা যায় যে পাকস্থলীর ক্যান্সার দেখা যায় প্রধানত খাওয়ার বদভ্যাসের ক্ষেত্রে। মেয়েদের স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থির ক্যান্সার বেশি দেখা যায় তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিশুকে স্তন্যপান করান না। দেখা গিয়েছে যে সন্তানহীনাদের ক্ষেত্রে ঐ রকম ক্যান্সার সন্তানবতীদের তুলনায় তিন গুণ বেশি। অত্যধিক গরম চা, দুধ, অর্ধচর্বিত খাদ্য, দোক্তার রস ইত্যাদি থেকে গলনালীতে যে স্থায়ী ক্ষত হয় তাই থেকে ক্যান্সার হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে যাদের ফুসফুসের ক্যান্সার আছে, তাদের শতকরা প্রায় ৮৫জন অত্যধিক সিগারেট খায়। এ ছাড়া শহরের ধোঁয়াশাও ক্যান্সারের অনুকূল।

প্রতিটি জায়গায় ক্যান্সার হবার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি খুঁটিনাটি লক্ষণ আছে যেগুলি অনুশীলন করে চিকিৎসকরা রোগ সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ করতে পারেন। তাই নিজের ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ হলে কর্তব্য হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে বলা এবং পরীক্ষা করানো। এটা যদি সবাই করেন তবে রোগ মারাত্মক হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

কোন দেশকে ক্যান্সারের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু প্রতিবিধান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে জনসাধারণ যাতে স্বাভাবিক পরিবেশে সুস্থ শরীরে ও নির্মল আবহাওয়ায় কাজকর্ম ও বসবাস করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা। সেটা শুধু ক্যান্সার কেন, যে কোন রোগের প্রতি-ষেধক। দৈন্যদশা, অভাব অনটন, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অস্বাস্থ্যকর কর্মস্থল, এ সবই অন্য রোগের মত ক্যান্সারেরও সহায়ক। এই সব সমস্যার সুরাহা করা যে কোন দেশের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, যেমন তাঁদের দায়িত্ব জন-সাধারণকে ক্যান্সার রোগের লক্ষণ ও কারণ-গুলি এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের দ্বারা অবহিত করা, দেশময় ক্যান্সার নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে সেগুলিকে ক্যান্সার রোগ সংক্রান্ত যাবতীয় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা সুসজ্জিত করা, ক্যান্সার গবেষকদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া। আমেরিকা থেকে হার্ভে লেসার রশ্মির সাহায্যে বিনারক্তপাতে অর্বুদ অপসারণ করার (ওহিওর ডঃ টমাস ব্রাউন) এবং মস্তিষ্ক ও চোখের ক্যান্সার ধরবার জন্য শ্রবণাতীত শব্দ তরঙ্গ ব্যবহারের সংবাদ এসেছে (ফিলাডেলফিয়ার ডঃ ম্যা স্মিথ।) এই সমস্ত ব্যবস্থার সুযোগ বাদও দিই তবু অন্যান্য সাধারণ সুযোগ সুবিধা ভারতের মানুষ পাবে না কেন?

আমাদের দেশ থেকে কিছু কিছু ক্যান্সার-গবেষক বিদেশে গবেষণা করে এসেছেন (যেমন ডঃ রণেশ চক্রবর্তী) করতে যাচ্ছেন (যেমন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রাম প্রসাদ) সেটা খুব ভাল কথা কিন্তু এদেশে ফিরে আসার পর তাঁদের কাজ করবার কতটুকু সুযোগ-সুবিধা ও সাজ সরঞ্জাম দেওয়া হবে সেটাই ভাববার কথা।

রোগটি একজনের থেকে আর একজনের দেহে বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। ক্যান্সারের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে অনারোগ্য ক্যান্সারের রোগীদের রাখা হয়েছে আজ বহু বছর। সেখানেও সংক্রমণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ক্যান্সার রাতারাতি হয় না কারণ বিভিন্ন কারণের গোটা শরীরের স্বাভাবিক জৈব ব্যাহত হতে হতে তবে জমি তৈরি হয় ক্যান্সারের। সুতরাং ক্যান্সার স্থানীয় ব্যাধি নয়। গোটা শরীরের অসুস্থতা অস্বাভাবিক অবস্থার একটি চরম প্রকাশের কেন্দ্র হচ্ছে ক্যান্সার। ধরুন প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সারের কথা। শরীরের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী হোর্মোনের সমতা যেখানে নষ্ট হয় সেখানেই এই ক্যান্সার বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাংসপেশীতে দীর্ঘকাল নিয়মিত ভাবে হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থির ক্যান্সারেও ঐভাবে হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এই ব্যাপার থেকে মনে হয় যে সারা দেহের অবস্থাকে ওষুধের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে পারলে ক্যান্সার সারবার অনুকূল অবস্থা শরীরের মধ্যে তৈরি হয়। প্রস্টেটের ক্ষেত্রে যে সাফল্যলাভ করা গিয়েছে ভবিষ্যতে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রেও হয়ত তা লাভ করা যাবে।

প্রাক্-ক্যান্সার পূর্বলক্ষণ ও উপসর্গগুলি বহুদিন ধরে প্রকাশ পাবার পর ক্যান্সার রোগের উদ্ভব হয়। ক্যান্সার রাতারাতি হয় না বলে রোগ ধরে চিকিৎসা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। ক্যান্সার চিকিৎসার সাফল্য তাই প্রধানত নির্ভর করে ঠিক সময়ে রোগ ধরার উপর।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দেপগচ্ছ — চিত্রা দত্ত
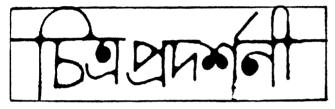
জ্ঞানব্রত ঘোষাল-এর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টিস্ট্রি হাউস

যদিও জ্ঞানব্রত ঘোষাল আরোপ করার মাধ্যমে, টেকনিকে, পেরেক চুড়ি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিস কাজে লাগিয়েছেন—তবু খুব আশ্চর্য এই যে, বলার বিষয় তাঁর নিছক প্রকৃতি—যেখানে ঘাস বৃদ্ধ হয়। এরূপ গঠনের সম্মুখে দর্শককে থামতেই হয়। অবশ্য অপ্রাকৃতিক কল্পনা যে তিনি নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন নি এমন নয়।

উক্ত কাজের স্বপক্ষে তত্ত্ববিদরা বলেন, কোন নির্দিষ্ট এটা-সেটাকে তখনই কাজে লাগানো যেতে পারে যখন তার কর্মকারিতাকে, ফাংকশনকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়—একেবারেই মনে হবে না সেটার মধ্যে পেরেকত্ব আছে, অর্থাৎ আর একভাবে তা দেখা দিয়েছে। চিত্রগত আলোছায়াতে সেটা আর পেরেক নয়।

এখানে তেমনি জিনিসগুলিকে কখনও রেখা বা রঙ হিসাবে ধরা হয়েছে। তার মন লাইট নাইট লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কিশোরী কাউল-এর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

কুমারী কিশোরী কাউল কাশ্মীরের নামকরা শিল্পী নারায়ণ মুর্তসগরের পৌত্রী; ইনি বরোদা কলেজ অব ফাইন আর্টসের একজন কৃতি ছাত্রী। ইতিপূর্বে দিল্লি বোম্বাই ও আলিগড়ে তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে।

কুমারী কাউলের ছবি দু ভাগে ভাগ করা যায়. একদিকে তিনি ওতপ্রোত বর্তমানতাকে নিয়ে কাজ করেছেন, অন্যদিকে, রঙ রেখা ছন্দ এবং বুনট নিয়ে (টেকসচর) ছবি এঁকেছেন: যেমন টেকসচুরাল স্টাডি, কম্পোজিশন ইন স্ফিয়ার্স, আবার অন্যদিকে শ্রীনগর হ্যাবিটেশন, রিদমিক বোউটস।

ফলে দেখা যাবে তিনি বিশ্লেষণবাদী; এবং বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে তিনি বিষয়ের দিকে চেয়েছেন: আঁকার বিভিন্ন রীতি বর্ণিকা ভঙ্গ কেমন করে দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে মিলবে তা, অর্থাৎ সেই ভাবনা, প্রতিটি ছবিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অপ্রাকৃতিক কাজ যেহেতু সাধারণত কোন চিরাচরিত পরিপ্রেক্ষিত থাকে না, সেখানে ক্রমাগত ছবি একটি নকশা: কখনও রঙের টেনসনে রঙ, অথবা রেখার টেনসনে রঙ দাঁড়িয়ে থাকে—এবং যেহেতু এই ধরনের কাজ তাঁর বেশী তাই দেখা যাবে প্রাকৃতিক অর্থাৎ অবয়বধর্মেও সেটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

তাঁর প্রকৃতির ছবি তাই কোথাও যে একটা বস্তু হয়ে গড়ে উঠেছে এমন নয়. শুধু আলগা তুলিতে করা কতক আন্দোলিত ছন্দ; অবশ্য এ কথাও হয়ত ঠিক যে রেনেসাঁস-কৃত পরিপ্রেক্ষিত আধুনিক ধারায় আর কাজে লাগে না। ফলে অবয়ব আর নিরবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য রয়ে গেছে; তাঁর রিদমিক বোউটস ও টিডি ইন প্লেন উল্লেখযোগ্য কাজ।

সংগীত শ্যামলা-র চিত্র-প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

সংগীত শ্যামলা একটি শিল্প শিক্ষা সংস্থা। এই প্রদর্শনীতে অজস্র রকমের কাজ ছিল যথা, তেল রঙ, মিউরাল, সিল্ক পেন্টিং, জলরঙ—তাছাড়া বাটিক ও শিশুদের আঁকা অনেক ছবি।

সব থেকে ভাল লাগল যে, এই সংস্থা এখনও ভারতের নিজস্ব ধারার উপর জোর দেন, এখানে কাংড়া তথা পাহাড়ী চিত্রের অনেক নকল ছিল, হয়ত মুখগুলি তেমন নয়ন-সুখকর হয়নি, তবু এ কথা ঠিক যে, শিক্ষার্থী সেই ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিল, সেই ছবিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছিল।

সিল্ক পেন্টিংগুলি ভারী সুন্দর হয়েছে, যথা, শকুন্তলা মহেশ্বরী ও আশা জৈনের কাজ।

মিস চিত্রা দত্ত-র চিত্র-প্রদর্শনী : ইনডো-আমেরিকান সোসাইটি

চিত্রা দত্ত অনেকদিন পর প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এখানে তাঁর সর্বসমেত ২২খানি ছবি ছিল। তেলরঙ ও প্যাস্টেলে-করা। এইগুলিকে সমগ্রভাবে ইম্প্রেশানইস্টিক কাজ বলা যায় কি না তা বিশেষজ্ঞরা ভাববেন।

তার ফ্লাউয়ার স্টাডির বাঁ পাশের গ্রে ছায়াটা আমাদের সঙ্গত বলে মনে হয়নি, কিন্তু অন্য দিকে রিভারবিয়াস কুলু-র ছবিতে স্রোতের ডান ধারের লাল ছোঁয়া খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছে, কিন্তু উপরে গাছের ডেপথটার সম্পর্কে নিশ্চয় উনি ভেবে দেখবেন আশা করি। তাঁর কোতদাবের ছবিটি ছোট, কিন্তু বিরাট হয়ে দেখা দেয়।

ত্রিলোচন কলমচি

দো আঁখে

প্রাপ্তবয়স্কদেরও একটি রূপকথার জগৎ আছে। সেই অপরূপ কথার জগতে প্রতিদিন এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। সেই অতি-নাটকীয় জগতে সবই সম্ভব, সব কিছু। ইকনমিক-অ্যানিমিয়া, পলিটিক্যাল জন্ডিস কিংবা ডিপ্লোম্যাটিক পাইলস কিছুই সেই স্বপ্নেরেছির দেশবাসীকে কব্জা করতে পারেনি। সেখানে নানা রঙের দিনগুলি এখনো সোনার খাঁচায় মনোহারী পাখির মত হরবোলা।

নাচে গানে নিশ্চিন্তিতে ভরপুর সেই রাজ্যে কোটিপতি রাজার কন্যার সংগে কনিষ্ঠ কেরানীর বেকার পুত্রের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান শেষ পর্যন্ত শাখা-সিঁদুর-হুলুধ্বনিতে পাকা হয়। আবার অন্য দিকে নায়ক রাজপুত্রের ছদ্মবেশে বস্তির ঘরে এসে ওঠে নিছক আদর্শের তাড়নায়; অনেক প্রকার মুশকিল আসান করে অনেক অরক্ষণীয়াকে অভাবনীয়ভাবে পার করে দেয়। এমনিভাবে প্রতি মুহূর্তে ট্রামে-বাসে ট্রেনে-স্টীমারে, ঘাটে-অঘাটে পলকের দেখা অপলক হয়ে থাকে। সুদিকের অগণিত সমস্যা অনায়াসে ক্রস-ওয়ার্ড পাজল-এর মত অক্ষরে অক্ষরে সলভ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভিলেনকে বেদম আউট করে নায়ক স্ট্রেট ছাঁদনা তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সংগে সংগে শিলাবৃষ্টির মত ক্ল্যাপ পড়ে ঘর ফেটে যায়।

অথচ আমাদেরই চেনা সংসারের বাউন্ডারীর মধ্যে এইসব উপাস্য দেবদেবীর ফিল্ড ওয়ার্ক চলেছে। সেই লেক, সেই ময়দান, সেই স্টেশন, সেই অফিসপাড়া, প্রতিদিনের চেনা ফুটপাথ, লোকাল ট্রেন, দুর্ভোগ্য হোটেল কিংবা দুরান্তের জনপদ। উড়ন্ত কর্কপিট থেকে ছুটন্ত টাইপরাইটার পর্যন্ত সেই চিত্রনাট্য ছড়ানো। যে-কোনো ঘটনাই সেখানে গল্প, যে-কোনো গল্পই লোভনীয় নাটক। দশ-দেড়েক ফুট লম্বা এক-একটি মিনিট যেন এক-একটি সাসপেন্স-ড্রামা।

ঠিক দিনের পর দিন যখন আমরা জীবনের ডিভ্যালুয়েশান, হং অ্যাসেসমেন্ট আর মিস্‌ক্যারেজে ভুগছি, ওভারটাইম আর টিউশানীতে রুদ্ধশ্বাস: ধার দেনা তাপ্পি দিয়ে কোনোরকমে কার্নিক-খাওয়া ঘুড়ি উড়ছে আমাদের। ত্রিশঙ্কুর মত অদৃশ্য ফুটবোর্ডে প্রমাণ সাইজে ঝুলেছি, যে-কোনো মুহূর্তেই পৃথিবী থেকে নক্-আউট হবার সম্ভাবনা। মিথ্যা এবং বাদিতে গড়া এই আমাদের লাইফ: ঘরে প্রতি-বছরের জমানো ক্যালেন্ডারের মত অনিবার্য শিশুপাল, দাম্পত্য কলহরূপী home-যজ্ঞ, বেডরুমে পিকেটিং। সব মিলিয়ে বেশ ছিলাম হয়ত, সেলুলয়েড ইনফেকশন ঘটেই বিপদ বাধলো। অসম্ভবের নেশা ধরল চোখে। গায়ে কিস্তর ব্যথা জমিয়ে ছায়াধরার ব্যবসায় নামলুম। প্রতিদিন প্রায় ৪২০০টি শো-হাউস থেকে নিদেনপক্ষে আধ কোটি লোক আফিংখোরের মত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসছি আর মনে মনে নিজের ভবিষ্যতের একসট্রেম-প্যারী নাটক ভাবছি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, অমনি দাদার জরুরী টেলিফোন। দৌড়ালাম হিন্দুস্থান পার্কে। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে শুধালাম, কি ব্যাপার?

ধূমায়মান সিগারেটটাকে খড়ির মতন তিন আঙুলে ধরে দাদা আমার তখন শূন্যে কিছু কাল্পনিক কথা লিখছিলেন। চমকে উঠে বললেন, কে? ওঃ তিলু! যা ভেতরে যা। দেখগে, আবার সেই আরম্ভ হয়েছে!

মনের মধ্যে এই রকমই একটা আশঙ্কা ছিল, যদিও টেলিফোনে দাদা কিছুই বলেননি এবং বলবার সুযোগও দেননি।

জিগ্যেস করলাম, আজ কি বই ধরেছেন? দীপ জেনলে যাই না, সাত পাকে বাঁধা?

হুঙ্কার ছেড়ে দাদা বললেন, দয়া করে ইয়ার্কি মেরো না! যাও ভেতরে গিয়ে নিজের চোখে দ্যাখো।

শোবার ঘরের সামনেই ইন্টারভিউ ঘটলো। দেখি বউদি এই সাত সকালেই (তখন সকাল ঠিক সাতটা) চুল বেঁধেছেন অভিনব কায়দায়, জবরদস্ত পোশাক

Hero in

পরেছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বিচিত্র হেসে অদ্ভুত কায়দায় দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ছলছলে চোখে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, কী ব্যাপার? আবার জ্বালাতে এসেছ।

জবাবী ডায়লগ আমার জানা ছিল না, তাই হিতে বিপরীত হবে ভয়ে জবাব দিলাম না। পকেটে অটোগ্রাফের খাতাটা এনেছিলাম বুদ্ধি করে। বিনীত ভঙ্গিতে সেটা খুলে বাড়িয়ে ধরলাম বউদির দিকে। কয়েকটি কি-হয় কি-হয় মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তারপর অকস্মাৎ ফল ফলল, মুখ-চোখের ভঙ্গি বদলালো। আমার কাছ থেকেই কলম চেয়ে নিয়ে খসখস করে কি লিখলেন। কি লিখলেন ভাবতে পারেন? লিখলেন—শুভেচ্ছা সহ সুচিত্রা সেন।

শুধু লেখায় নয়, আমি জানি, আমার এম-এ পাশ বিশ্বেশ্বরী বউদি এই মুহূর্তে মনে মনে সুচিত্রা সেন হয়ে গেছেন, হয়ত সারা দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা এই স্বপ্ন মায়া-মতিভ্রমের মধ্যে কাটবে। এবং এই অবস্থায় স্বামী-সমাজ-সংসার সব তাঁর কাছে মিথ্যে, দারুণ মিথ্যে। কোনো একটি ছবি কিংবা একাধিক ছবির টুকরো টুকরো দৃশ্য এলোমেলোভাবে অভিনয় করে যাবেন, স্মৃতি থেকে একতরফা মনোলগ্ ঝাড়বেন, সলিলকিও চলবে। মাসে দু' মাসে এরকম হয়।

এ প্রবলেম শুধু দাদার একলার, এ কথা বিশ্বাস করি না। অনেক বাবা মা দাদা বউদি হয়ত এইরকম সমস্যায় ভুগছেন, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও হয়ত কেউ কেউ দৌড়চ্ছেন। ওয়ান্ডার হিস্টিরিয়ার কেস-হিস্ট্রি জানা গেলে দেখা যেত তার তিন ভাগের দু' ভাগই ফিল্মের অবদান।

এরকম মোক্ষম রকম ক্ষ্যাপেনি তবে অল্পস্বল্প ছিটগ্রস্ত হয়েছে, এমন ফিল্ম-রি-অ্যাকটর তো দেশে কোটি কোটি। আমাদের দেশে অশনে বসনে এই উন্মাদনা দেখা দিয়েছে তাই নিউ মার্কেট, ওল্ড মার্কেট সর্বত্র স্বর্ণকার থেকে বর্ণকার পর্যন্ত সিনেমার নাম ভাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। সিনেমার আদি যুগ থেকেই এই হুজুগ চলে আসছে। কাননবালা ব্লাউজের যুগ থেকে সঙ্গম শাড়ি, স্যরি ম্যাডাম, রিবন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখলাম। এবং বছরে বছরে আরো দেখবো। বসনে ভূষণে আপটুডেট হতে হলে সিনেমাকে চোখে চোখে রাখতেই হবে। মেয়েরা ছবি দেখতে গেলে কানে গল্প শোনেন, চোখে নায়ক-নায়িকার নখ থেকে চুল পর্যন্ত স্ক্রুটিনি করেন। ব্যাকরণে ভুল হলেও তাঁরা সব্যসাচী।

পথে দু' বেলা যত মেয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ব-কলমে সেজেছে। সিনেমা কালচারিস্ট হলে আপনার চোখে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত। কারো জুলপি কচুরি-পানার শিকড়ের মত নীচে নেমেছে, কেউ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের মত সিঁথি উড়িয়ে চুল সমান করে ফেলেছে, কারো চুলে বিশেষ ধরনের বুনোনি, কারো খোঁপা সেকালের মোটরের পিছনে বাঁধা একস্ট্রা টায়ারের মত অটল, কারো বা খোলা চুল স্ন্যাক্ক ভাসের মত অম্বপুচ্ছ। শুধু কি তাই, কপালের টিপ, ভুরুর ছাটকাট, ব্লাউজের ঊর্ধ্ব-নিম্ন লঘুকরণ, শাড়ির মার-প্যাঁচ, চলন-চাউনি, কুট কটাক্ষ, কোনোটাই কি তার নিজের? সবই অনুবাদ রচনা, শুধু স্বীকৃতি নেই, এই যা।

তবে এই কপীজম্ (Copyism) শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমিত নেই, ছেলেরাও অতি দক্ষ হাতেই টুকলি করে চলেছে। উত্তমরূপে তারা চুল ছাটছে, কপালের ওপরে জ্ঞানবাবুর দোকানের বৃহৎ আকারের সিঙাড়ার মত যে হিলক নির্মাণ করছে, তার পিছনে হিরো ওয়ার্শিপ রয়েছে। হাত গুটোনোর কায়দা থেকে শুরু করে মেষের সিং-এর মত ছুঁচোলো জুতো সবই চলচ্চিত্রকল্প ব্যাপার। পাড়ায় পাড়ায় রক-ফেলোরা অন্তর্টিপুনি প্যাণ্ট পরে কোমরে দু হাত সেট করে যখন ঘুরে বেড়ায় তখন আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় ক্রাচে ভর দিয়ে চলেছে। অপারেশন স্টিচের মত ঐসব প্যাণ্টের সেলাই দেখলেই মনে হয় পরার পরে সূচীকর্ম করা হয়েছে।

'মনে হয় ক্রাচে ভর দিয়ে চলেছে'

কিন্তু আমি নিতান্তই সেকেলে, নইলে এত বাঁকা চোখে সিনেমার দিকে তাকাচ্ছি কেন। আসলে সিনেমাই আমাদের শেষ আশ্রয়, আমাদের মুক্তি, আমাদের নব-জাগৃতি এর মধ্য দিয়েই আসবে। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়, কোনো ধর্মসভার উপদেশ নয়, প্রকৃত সাম্যবাদ এই ছায়াছবি এনে দেবে।

উত্তর কলকাতার এঁদো ঘর থেকে নিউ আলীপুরের প্রাসাদ পর্যন্ত এর কীর্তি বিস্তার করার সাধ্য একমাত্র এরই আছে। এক সুরে উচ্ছৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণা বাঁধা পড়েছে এরই দৌলতে। ঘুচে গেছে বয়স, ঘুচে গেছে পর্দাঘেরা, প্রাদেশিকতার প্রাচীর পড়েছে ভেঙে।

দুপুরবেলা সোফায় বসে অলস দুপুরে উল বুনতে বুনতে বালীগঞ্জের লিপস্টিক-রাঙা অধর যখন গায়, মেরা নাম Rita Christina আই আই আ, তখন নাথের-বাগানের বস্তীর ঘরেও রণকণ্টকিতকণ্ঠে আর একটি বালিকা হয়ত ঠিক ওর পরের লাইনটিই গাইছে। সত্যি ভাবলেও দেহ পুলকিত হয়। বুটপালিশ আর কেক-বাইন্ডার থেকে শুরু করে ছোকরা ডেপুটি কিংবা মাবনাখী ঘোরেল এম এল এ গানের সুরে বানান করছেন বি ই টি টি ই আর বেটার, এম এ টি টি ই আর ম্যাটার, কিংবা তিন বছরের শিশু আধো আধো উচ্চারণে কবুল করছে, পাগল মুঝে কর দিয়া জাপান লাভ ইন টোকিও তখন মনে হ

খানিতে ঢাকনা নেই। তার সঙ্গে নগর-বাসিনীর কোমর কাঁধের ওপরে এক ফালি রোদের মত গোরা রঙের ঝিলিক দেয়। কী বেলাজ বাতাস দেখ, অব্যর্থ চমকে দিয়েছে। ঝাঁটাঁত ঠোঁট রাঙানো সামলে নিয়ে আঁচলে টান দিল। সেই ফাঁকে টুক্ করে দেখে নেওয়া, আপন জন নয়, ভিন্ মানুষে। চোখ ফেরাবার সময় পেলাম না। যুবতীর মুখে রঙ ধরে গেল।

নিজের ভিতরে দেখি, কে যেন চুপি চুপি হাসি সামলায়। মনের পড়ুশীর মজা লাগে। যোগী সে নয় বটে, কিন্তু মনে হয়, এ সবই যেন এ দিগন্তে একাকার। গাজীর মত এও যেন ভেদে ভেদে অভেদ অখণ্ড। বেশ তো, বাতাস আসুক বেগে। যুবতী সাজুক। এ দিগন্তে সবই সাজে।

সহসা প্রচণ্ড হাঁক, 'হুঁশিয়ার!'

লঞ্চ উলটো পাড়ের সীমায়। জোয়ারের জল থইথই। উঁচু বাঁধের কাছ ঘেঁষেই লঞ্চ দাঁড়ায়। তার যন্ত্র বন্ধ হয় না। খালাসী হুঁশিয়ার বলে মোটা তক্তা এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দেয় বাঁধের ওপরে। তারপরে বাঁধের মাটিতে বাঁশ ঠেকিয়ে উঁচু করে ধরে। যাত্রী দুজন। জোয়ানের হাতে টিনের স্যুটকেস্। জামার ওপরে, কোমর বেড় দিয়ে চাদর বাঁধা। কাপড় ঠেকেছে গিয়ে হাঁটুর কাছে। আর এক হাতে ধরা বছর কয়েকের ছেলে। তার গায়ে জামা আছে, কিন্তু তলায় কেন কিছু নেই, কে জানে। ওদিকে নাকের ফুটো দিয়ে দয়ানি ভেসে যায়।

যাত্রীদের ওঠার পরেই আবার তক্তা টেনে নেয় খালাসী। লঞ্চ মাঝ দরিয়া নিশানা করে দক্ষিণে ভেসে যায়। যত দূরে চোখ যায়, নদী আর উঁচু বাঁধ। পশ্চিমে তীরে তবু কিছু গ্রাম চোখে পড়ে। আম জামের মাথা ছাপিয়ে সুপারি, তাকে ছাপিয়ে নারকেলের মাথা দোলানো। তাও কেমন দূর হয়, গ্রাম অনেক দূরে। নদীর ধারে তাকে বেঁধে রেখেছে উঁচু পাড়। পাড়ের আড়ালে আড়ালে, গ্রামের বাইরে বাইরে, পাকা কিংবা আধপাকা, সবুজে-পাংশু ধানের খেত। পুবে দিকেতে, উঁচু পাড়ের আড়ালে, নিবিড় চোখে যত দূরে দেখ, কোথাই ধান। দেশপানে ঘরে ঘরে এত যে নাই নাই, এখানে সে খবর নেই। এখানে সে যেন সিক-জোড়া পাতা মর্দ। আর দেখ, তার সবুজে পাংশু ছোপ অথই-এর বুকে থেকে, মাঝে মাঝে একটা লম্বা তীর যেন সোজা আকাশে উঠছে। উঠতে উঠতে হঠাৎ ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। পাখিগুলোর নাম কী, কে জানে। দূর থেকে দেখি যেন হাজার প্রজাপতি উড়ছে। উড়তে উড়তে আবার ঝাঁপ খেয়ে ধান খেতে ডুব দিচ্ছে। হয়তো বন-চড়ুইয়ের দল। ঘরেতে ওদের মন নেই, বনভোজনে মত্ত।

তবু এ নদীর পাড় যেন কেমন খাঁ খাঁ করে। চাংড়া চাংড়া মাটির ঢিবি, নদী বরাবর দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তার তেমন সবুজের সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে, দু চারটে ঝাড়ালো গেমো গাছ। কোথাও নাম না-জানা জলজ জঙ্গল। যেখানে পাড়ের নীচে কিছু কিঞ্চিৎ জমি জলে ডোবেনি, সেখানে গাঙ শালিকদের নিঃশব্দ ঠোঁট খোঁচানো। এত বড় একটা জলযান যে দু পাড়ে শব্দ ছড়িয়ে যায়, একবার তাকিয়ে দেখে না। বোধ হয়, এই পাকের পোকাশালে বসে রোজ দেখা শোনার ব্যাপার। যত ভয় তো অচেনাকে। ওই জল-ভড়ভড়িয়াকে দেখা আছে, প্রথম ডিম কেটে বেরিয়েই।

'বাবু!'

কানের কাছেই ডাক শুনে ফিরে দেখি, গাজীর বাবরি বাঁধা পাগড়ি আমার মুখে লাগে প্রায়। বলে, 'কেমন বোঝেন বাবু?'

তার চোখের ঝিলিকে যেন রহস্য। ভুরু নেচে নেচে ওঠে। কী বোঝার কথা বলে গাজী? কথা আসে কোন বায় থেকে? জিজ্ঞেস করি, 'কিসের?'

গাজী ঘাড় দুলিয়ে, দূরের দিকে দেখিয়ে বলে, 'এই ভেসে পড়া?'

ভুলে গিয়েছি, এই ভেসে পড়া গাজীর মতলবে। ভাল লাগা, মন্দ লাগার দায় এখন তার কাঁধে। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মনে হয়, এই যে কোথাও কিছুর শেষ নেই, তার মধ্যে আমার ভাল-মন্দ সব কিছুর হদিস যেন হারিয়ে গিয়েছে। বরং জিজ্ঞেস করি, 'এই রকম উঁচু পাড় কতখানি?'

গাজী বলে, 'যত দূরে যাবেন। এ তো বাবু ভেড়ির বাঁধ, নদী সামাল দিয়ে রেখেছে। এক ফোঁটা জল যেন জমিনে না যেতি পারে।'

'কেন?'

'লোনা। এ গাঙের জল যে তিতা লোনা। ফসল হতি দেয় না।'

বাঁধ দিয়ে তাই নদী বন্ধন। এ জল যে লোনা, তা জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করি, ইছামতীর যে জল দেখে এলাম, সেও কি লোনা নাকি?'

'আজ্ঞা। উনিশ বিশ হতি পারে, তয় বাবু, লোনা। সাগর যে এখেনে আসা-যাওয়া করেন। এখানে বার মাস লোনা। এই টানের দিন এল, এবার একটু কম পড়বে।' বলে সে দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে। গাজীর সবই রহস্যময়, হাসবার কী আছে বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দেয় গাজী নিজেই, 'বাবুর যে কথা! বলে, যে জল দেখে এলাম, তাও লোনা নাকি। বাবু, মানুষ দেখে কি সুমন কুমন বোঝা যায়। জল দেখে কি কেউ বলতি পারে, লোনা, না মিঠা।'

যথার্থ কথা। নিজের বাস মিঠা জলের কূলে। গঙ্গার ধারে বসত। টানের দিনে সে জলের যেমন রঙ, এ জলেরও সেই রকম। তার জোয়ার ভাটায় যেমন তরঙ্গ, সেই তরঙ্গে রোদ যেমন চলকায়, এখানেও সেই রকমই দেখি। লোনা মিঠার স্বাদ নদীর গায়ে লেখা নেই।

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবে দেখতে গেলে ঠিক বলেছ তুমি।'

বলে একটু লম্বা টানের হাসি। কথা ধরেছেন গলাবন্ধ কোট, কেশ বিবাগী মাথা মাথা। তিনি যে আমার মুখোমুখি, সেই খেয়াল নেই। অবাক হয়ে লাভ নেই, বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, কেশ বিবাগী মাথা দুলছে। যেন গাজীর সঙ্গে তাঁরও রহস্য চলেছে। তারপরেই ডাক দিয়ে বলেন, 'শুনছো, এই যে! এই যে, ওরে ঝিনি, জানিস তো, এ জল কিন্তু লবণাক্ত। মানে, সী ওয়াটার যাকে বলে।'

ওপাশের বেঞ্চ থেকে দু জোড়া চোখ ফিরল বটে। পর মুহূর্তেই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি। যুবতীর হাসির মধ্যেও, লতা যেমন বাতাসে কাঁপে, তেমনি ভুরু কেঁপে যায়। সেই কাঁপনে হাসির ছটা নেই। ক্ষোভের বক্রতা যেন। প্রৌঢ়াও যেন একটু নাকছাবিতে ঝিলিক হানেন। গলাবন্ধ কোটকে যেন বিদ্ধ করতে চান। তাতে এই ধারণা হয়, সী ওয়াটার লবণাক্ত কি না, সে ভাবনার থেকে অন্য কোন লবণাক্ত ভাবনা সেখানে। কিন্তু কেশ বিবাগী মাথাখানিতে দরিয়ার ঝলক হেনে তখন তিনি আমাকে লক্ষ করেছেন, 'ইয়েস, রাইট, সল্ট ওয়াটারে ক্রপ্ নষ্ট হয়ে যায়, হানড্রেড পার্সেন্ট করেক্‌ট।'

বলার ধরনটা যেন গাজীর কথায় আমার প্রত্যয় হয় নি। তাই প্রত্যয়সিদ্ধ করার দায় ওঁর কাঁধে। ঘাড় নেড়ে জানাতে হয়, কথাটা উনি যথার্থ বলেছেন। এ জল সল্ট ওয়াটার, এতে ক্রপ্ নষ্ট হয়। তার চেয়ে দেখি, গাজী গলাবন্ধ বাবুকে হাঁ করে দেখছে। মুরশেদ হাপিস্, গোসাবা-যাত্রী বাবুর কথা বীজমন্ত্রের থেকে কঠিন।

তা হোক, প্রৌঢ় আবার উলটো আসনের দিকে মুখ করেছেন। মনে হয়, ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছাড়বেন। কে জানতো, এই মানুষে কোন মানুষ আছে। সু কু ছাড়ো, দরিয়ার জল দেখলেই তার স্বাদ বোঝা যায় না। বললেন, 'টাকিতে, হাঁদুও ঠিক এই কথাই বলেছিল, বুঝলে। এই যে দেখছ বাঁধ, উঁচু উঁচু ঘোড়ির বাঁধ—।'

গাজী বাইরের থেকে জানালা দিয়ে মুখখানি আর একটু তুলে তাড়াতাড়ি বলে, 'ঘোড়ি নয় বাবু, ভেড়ি—ভেড়ির বাঁধ।'

কিন্তু সেটা কোন কথা নয়। এখন বিষয়ে আসা গিয়েছে। গাজীর দিকে হাত তুলে, উলটো আসনের দিকে ফিরে বলেন, 'ওই হল। ঘোড়ি আর ভেড়ি, তোমাদের কোনটারই কোন মানে হয় না। বাঁধের আবার ঘোড়ি

আর জোড়।......তা বুঝলি ঝিনি, এতেই প্রমাণ হয়, লবণের একটা ক্ষয় করবার ক্ষমতা আছে......।'

এই পর্যন্তই। সহসা প্রৌঢ়ার সিন্দুর-বিন্দুতেই যেন ধমক বেজে ওঠে, 'কী তখন থেকে ঝিনি ঝিনি করছ। অলকা বলতে পার না?'

বলেই একবার খোপের ভিন্ যাত্রীটিকে দেখে নেওয়া। আহ্, এবার শোন গড় কথা। লবণাক্ত জলের বিচার এক দিকে, আর এক দিকে লবণাক্ত ভাবনা কোন চলে বহে, তাই দেখ। প্রৌঢ়র অবস্থা যেন ভাসন্ত নৌকা আচমকা ডাঙায় ঠেক খায়। প্রথম শব্দ হয়, 'অ্যাঁ?'

শব্দের পরেই অধীনের প্রতি একবাণ কটাক্ষ। এখন কে লজ্জায় পড়ে, ভেবে দেখ। চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। সত্যিই তো, তখন থেকে ঘর করছে অন্তগ্রহরের নাম ধরে ডাকা কেন। বাইরে লোকজনের সামনে কি পোশাকী নামটা বলা যায় না। ভিন যাত্রী তুমি না হয় 'ঝিনি' নাম ধুয়ে জল খাবে না। ঘরের লোক হয়ে তুমি ঘর বারটা বজায় রাখবে তো। একটা সাবান্ত বলে কথা আছে। গাড়ীর চোখে

মুরশেদ অকূলে। তার গোঁফদাড়ির ফাঁকে, হাঁ মুখে জিভখানি দেখা যায়। যেন সে আমাকে চোখে জিভে দুয়েতেই দেখে। দেহতত্ত্বের রহস্য থেকেও বড় রহস্য কী যেন ঘটে গেল, ধরতে পারল না।

প্রৌঢ় তৎক্ষণে আবার ধরতাই ধরার তাল করেন, 'ও, সেই কথা বলছ।.. মনে থাকে নাকি সব সময়। আচ্ছা, অলকাই বলা যাবে। তোদের আবার......।'

আবার ঠেক্। বোঝা যায়, ইশারা হয়েছে। জিন্ যাত্রীকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে সীমন্তিনী চুপ ধমকে চুপ করান। বোধ হয় সেই জন্যেই প্রৌঢ়ের গলায় পুরনো কথার জের: যেন সহজ গলাতেই বলছেন, 'হ্যাঁ, ওই আর কী, নুনের কথা হচ্ছিল। নুন দেখবে, লোহা পর্যন্ত ক্ষইয়ে দেয়। এই যে বাঁধ দেখছ, ওই নোনা জলের জন্যেই। তা নইলে তো ধান কিছুই হত না।'...

মনের দোষ, চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, উল্টো দিকের সাড়া কেমন। কিন্তু পারা গেল না। ভিতরে যেন কোথায় তিন যাত্রীর আত্মসম্মান টনটনে হয়ে ওঠে। অথচ, তার মধ্যেই কোথায় একটা কুলু কুলু লজ্জা বাজে। তবে সাবধান, হাসি নিষেধ। গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'এ নদীতে ঘাট নেই? কেউ চানও করে না?'

এখন এক চোখের পীড়া। মনেও সেই পীড়া লাগে। লোনা বলে কি সেই দরিয়ার কূলে মানুষের ছায়াও পড়তে নেই?

গাজী ভুরু তুলে চোখের ফাঁদ বড় করতে চায়। বলে, 'দোহাই মুরশেদের, অমন কথা বলেন না বাবু। এ জলে যে শমন আছে।'

'শমন? সে আবার কী? কুমীর নাকি?'

'না বাবু, কুমীর নয়, কামট।'

'সেটা কী রকম?'

'সে বাবু নেজার রকম। কুমীরের মতন উনি ডাঙায় ওঠেন না। জলে ডুবে ডুবে ধারে কাছে ঘোরাফেরা করেন। একবার কেউ নাগালে হয়। যেটুকুন পাবেন, এক গরাসেই সাবাড় নিয়া যাবেন।' খোপের ঘরে ভয়ের ডুকরানি, 'মা গো!'

তাকিয়ে দেখি, ঝিনি বল, অলকা বল, ওরে শরীর হিলহিলানো। গাজীর দিকে কাজল কালো চোখে যেন আস্ত কামট ভাসে। প্রৌঢ়ারও সেই অবস্থা। গলাবন্ধ কোটের হাল দেখবার আগেই গলা বেজে ওঠে, 'ডেঞ্জারাস্! হাঁদু বলেছিল বটে—।'

তৎক্ষণে গাজী আবার ধরে দিয়েছে, 'তা বাবু, যার যেখেনে বাস, না কী বলেন। ইদিককার গোটা গাঙ জুড়ে ও'নাদের রাজত্ব। কুমীর মশায়ের থেকে ও'য়ারাও বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু কম ধরেন না। এই যে মোটর লঞ্চখানি চলেছে, জলে গিয়া দেখেন, ও'য়ারাও সঙ্গ নিয়ে চলেছেন।'

'কিন্ত?'

'যদি আস্তো মানুষটা জলে পড়ে, তা একটু তোফা হয়।'

উলটো আসন থেকে আবার মেয়ের আর্তস্বর, 'ও মা, শুনেছ?'

প্রৌঢ়া সীমন্তিনী গলাবন্ধ কোটের দিকে ফেরেন। তাঁরও যেন বুক ধড়াসে যায়। বলেন, 'হাঁদু তোমাকে কিছু বলেনি?'

প্রৌঢ়ের সামনে যেন কামটের হাঁ। ঘাড় নেড়ে বলেন, 'নো। মানে, হাঁদু আমাকে কামটের কথা যেন কী বলেছিল, কিন্তু এরকম কিছু বলেনি। বাট দিস্ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তার বলা উচিত ছিল।'

কেন, জলে পড়ে নাকি সবাই। কামটেরা ঘিরেছে নাকি। জলযানে এত মানুষ, মেয়ে মন্দ ছা, যারা ঘর করে এই নদীর কূলে, তাদের প্রাণ কি সব হাতে নাকি। খবর কি তাদের অজানা? তাই যদি তো যাত্রা কেন। গন্তব্যে পাড়ি কেন। তবে হ্যাঁ, বলতে পার, সংবাদ নতুন। অচিনকে বড় ভয়। তা বলে তোমাকে কেউ কামটের মুখে নিয়ে চলেনি। যদি ধরে নেওয়া যায়, সম্পর্কে এই তিনে বাপ মা মেয়ে দেখ গিয়ে, আরো অমন বাপ মা মেয়ে যায় এই জলযানে। অন্য মানুষে কি খেয়াল নেই। কিন্তু আমি দেখি মুরশেদ নামের মজদুরকে। তার কালো চোখের ঝিলিকে, দাড়ির ভাঁজে হাসিতে এখন যেন সে আর গাজী নয়। শমনের দোসর নাকি সে। যেন অকূলে ভাসিয়ে এখন প্রাণ নিয়ে খেলা করে। 'ইন্ট নাম জপ কর হে, কালের দেশে এবার কাল ঘনিয়েছে।'

না, শমনের দোসর নয়, খবর দিয়ে মজা দেখে। নিজেই তাড়াতাড়ি জানালার হাত তুলে বলে, 'ডরাবেন না মা-ঠাকরুন। অ দিদি, কিছু ডর নাই। ও'য়ারা তক্কে তক্কে থাকেন বটে, ভয় জানাবেন, মানুষকে ভয় পায় না, এমন জীব খোদায় বানায় নাই। তয়, হ্যাঁ, এইসব গাঙে চলাফিরা করতি গেলে একটু হুঁশিয়ার। পড়লেন আর ধরলে, তা নয়, তয় বলা তো যায় না এই আর কি। এ'য়ারা আবার মানুষজনের কাছাকাছি থাকেন কিনা।'

গাজীর এক হাতে বরাভয়, আর এক হাতে ভরাডুবি। এক ন[illegible] নেই সে। ভয়ের কিছু নেই, তবে হ্যাঁ অসাবধান হলে সেটা কপালের লিখন। এখন যেমন বোঝ। কাজের কথা জিজ্ঞেস করি, 'সেরকম দুর্ঘটনা ঘটে নাকি?'

গাজী বলে, 'তা বাবু, যা নিয়া আপনার ঘর কন্না, তা একেবারে রেয়াত না দিলি কি চলে। এই তো সিদিনের কথা বলছি। ডাঙার কাজ সেরে জলের জানা গেলে তুমি গাঙে। তোমার জম্মো কম্মো এখেনে, সব তোমার জানা। অই, বলে কে, একলাসের

ফারমান এসেছিলেন। যেই গিয়া হাটুভর জলে নেমে বসা, অমনি জরিমানা। হাটুর কাছ থিকে কুটুস্ করে একখানি পা।'

কুটুস্ করে একখানি পা। বাহ্ গাজী, এজলাস ফারমান জরিমানা বলে টুকুস টুকুস দিচ্ছে বেশ।

ওদিকে গলাবন্ধ কোটের রুদ্ধ উত্তেজিত গলা, 'নেকস্‌ট? তারপর?'

'তারপর আর কী। হাঁকে ডাকে লোকজন গিয়া তুলি নিয়ে এল। পাঠিয়ে দিয়া হল

বসিরহাটের হাসপাতালে। ততক্ষণে পচন ধরেছে। ওই এক ব্যাস, বিষ বড় খারাপ। দেখতি দেখতি পচে, আর—।'

গলাবন্ধ কোট ধমকে ওঠেন, 'আরে, দূত্তোরি পচাপচি, লোকটা বাঁচল কিনা বলবে তো।'

গাজীকে চেনা ভার। তখনো দাড়ির ভাঁজে, ফাটা মুখে মিটিমিটি হেসে বলে, 'সে জব তো আগেই দিলাম বাবু। বললাম না জরিমানা। নইলে তো ইনতেকাল হত। ফাঁসির হুকুম হয় নাই। তয়, উরুতের কাছ-থান অবধি বাদ দিতে হয়েছিল।'

প্রৌঢ়ার গলা, 'কী সর্বনাশ!'

প্রৌঢ় চোখ ঘুরিয়ে তাল দেন, 'অবকোর্স'!'

ঝিনি না অলকা যার নাম, সে বুঝি সাজ-পোশাক ভুলে যায়। ভয়ে আর বিরক্তিতে ঠোঁট উলটে বলে, 'কী বিচ্ছিরি জায়গা। আগে জানলে কে আসত।'

গাজী আবার অভয় দেয়, 'ডরাবেন না দিদি, ও সবই নসীব। এই যে এত লোক আছে, কেউ যায় না, তুমি কেন গেলে? তোমার অজানা তো কিছু না। এই ধরেন না, আপনাদের কলকাতায় দেখছি, এই পেকাণ্ড গাড়ি, মানুষ গাড়িরে নিয়ে দৌড়। সে রাস্তাও তো কামটের গাঙ দেখি।'

গলাবন্ধ ধমক দিলেন, 'আরে তুমি থাম। কোথায় কামটের নদী, আর কোথায় কলকাতা। সেখানে লোকে গাড়ি চাপা পড়ে অসাবধানে।'

গাজী হেসে সাক্ষী মানে স্বয়ং প্রৌঢ়াকে, 'তাই শোনেন মায়ের কথা, আমি তো সেই কথাখানিই বলছি। বেহুঁশিয়ার হয়েছ কি গেছ। না, কী বলেন মা, আঁ? আবার সাবেন গিয়া, যে গাড়ির তলে মানুষ, সেই গাড়ি চড়ার মানুষে। এখানে দ্যাখেন গিয়া, রোজ একটা-দুটো কামট জেলের জালে ধরা পড়তিছে, আর মুগুরের মার খেয়ে মরতিছে।

প্রৌঢ়: 'ধরা পড়ে?'

অলকা: 'দেখতে কেমন?'

গাজী দিদির কথারই 'জব' দেয়, 'সে আর বলতি হচ্ছে না দিদি, একেবারে শোরের মতন। দাঁত যদি দ্যাখেন তো ভিরমি। ছুতোরের করাতকে বলে ওদিক থাক। অইরকম দু' পাটি।'

অলকা নাম্নী গালের চুল সরাতে ভুলে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কত বড় হয়?'

'কুমীরের মতন অত বড়টা হয় না, একটু ছোট। ওর গায়ে চাকা নাই।'

দিদির মুখের অবস্থা দেখে গাজীর মুখে আবার হাসি ফোটে। কামটের দুঃস্বপ্নে দিদির ঠোঁটের রঙে আর তেমন

...ক লাগে না। গাজী বলে, 'কোন ভয় ...ই দিদি, মনের সুখে যান।'

গলাবন্ধ কোট প্রায় কাঁচকলা দেখায়। ...লেন না, বলা ভাল, খেঁকোন; 'মনের সুখ ...র রাখলে কোথায় বাবা।'

...অধীনে ভাবে, তা বটে, সব যে কামটেই ...লা। আর সে দায় যেন সব গাজীর। ...বার বোধ হয় গাজী তাই দায়-ভঞ্জনের ...ণী বলবে। কিন্তু না, তাকিয়ে দেখি, ...জীর দাড়ি ওড়ে বাতাসে। সে আমার ...কে চেয়ে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে ...খে গলাবন্ধ বাবুকে। এমন কেউ নেই, ...র দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলে, 'পাজী।' ...রেশের নামে বেশ মজায় আছে। কিন্তু ...ই চোখের মজার সাক্ষী একমাত্র আমি ...কনা তা বোঝবার জন্য চোখ ফেরাতে হয়। ...না, অন্য সাক্ষীরা তখন নিজেদের মধ্যে ...ত। এই অঞ্চল যে একদা সুন্দরবনের ...েটে ছিল, প্রৌঢ় মা-মেয়েকে তাই ...বেছেন। যদিও মেয়ের চোখের নজরটা ...ন্য দিকেতে খেলছে, তা বোঝা আমার ...র্ম নয়। শুনেছি কিনা, চোখে অনেক ...মন বসন্ত করে। তখন আর নজর ...পে নজর বোঝা যায় না।

...এদিকে গাজী গলা যতই নিচু করুক ...র মুক্তি আমার শ্রবণ থেকে দূরে নয়। ...সে গুনগুনায়, 'অসুখ যেখেনে, ...খ সোখেনে, জ্যাপা খুঁজে দ্যাখ না ...নে মনে।'

...বাইরে ফিরে তাকাই। যে গাঙ নিয়ে ...র কথা, সেই গাঙের জল দেখি। ...শেষ নীলের ঝলক রোদ্রে চলকায়। ...গড়ানো রূপায় নীলায় খেলে যায়। ...ছলকে বলকে কিসের। ছলকে বলকে ...উজানী গাঙ কখনো সাগরের ডাক ...েছে। যেন মায়ের কাছ থেকে মেয়ে ...দিয়েছিল। ডাক শুনে চলে দৌড় ...েছে। ছলকে বলকে তাই, 'যা-ই, যা-ই।' ...ভেতরে পাবে নীরবতা। পাবে ...ছায়া আরশি। এই নদী দেখে ...তার জল নোনা, তলায় অতল ...ক্ষুধা, হাঁ করে আছে। মানুষে ...যখন সুকু মনের হদিস পাও না ...পাবে কেমন করে। ঘর কর, ...থাক, জানবে।

...এখন গ্রামের খোঁজ নেই। গ্রামগুলো ...কোথায় গিয়েছে, দিগন্তে তার কোন ...কনা দেখা যায় না। জেটির বাঁধের ...নেই, দুপাড় ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। ...দরের নোনা গাঙ, এখানে আমাদের ...মেহেরের সিন্দুক। যা কর বাঁধের ...এদিকে নজর দিও না। বাঁধের ...র মাঝে মধ্যে গাছ চোখে পড়ে। ...ধিকাংশই গোমো, আড়ালো খাটো খাটো। ...এক ধরনের গাছ, তার নাম জানা নেই। ইচ্ছে করে বলি, কৃষ্ণচূড়া। সার পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচূড়া যেমন ছড়ায়, তেমনি উঁচুতে ওঠে। আর, এ যেন কেবলই ছড়ায়, আর ছড়ায়। ক্রমে ক্রমে পাখির ঝাঁকের মেলা লাগে। লাগবেই। নদী যায় ভাঁটায়, চর জাগে জগতে। নোনা পলিতে অনেক খাবার ছড়ানো। ঠোঁট ঠুকে তুলে নেওয়া। দিনান্তে তো দুই দফে খাওয়া, দুই ভাঁটিতে যা পাওয়া যায়। গাঙ শালিকেরা দূরে চারে চলে না, ঝাঁকের ভিড়ে তারা অগণ্য। তার ওপরে, পালর রোদে ছায়া পড়ে দেখায় যেন অজস্র। ফাঁকায় ফাঁকায় আছেন ধার্মিক, কালো আর সাদা। বকধার্মিক। নজর একটু ...ভুর দিকে।

বাঁধের ওপারে মানুষের আহার। চরায় পাখির ভোজ। জলে যে ফেরে, হয়তো সে ...ছন্দে, জীব নিয়মের বাইরে নয়। গাজীর ...কথা কলকাতার পথের কথাটাও ভুলতে পারি না। তবু সব মিলিয়ে এই দিক্‌হারা দিগন্তে কে উদাসী বিরাজে। মন বলে ...চল যাই এক অচিন স্বপ্নের খোঁজে।

তখন শুনি, মোটর-বাসের ভেঁপুর ম... প্রায় কানের কাছেই প্যাঁক প্যাঁক বাজে। তারপরেই টিঙ্‌ টিঙ্‌ ঘণ্টা। অমনি ছাদের চোঙায় ভড়্‌ ভড়্‌ শব্দ মন্থর হয়ে যায়। ভুলে যাই, আমার কাঠের দেয়ালের ...এক পাশেই সারেঙ বসে আছে। তাকিয়ে দেখি, সামনেই বাঁধ। নদী কখন মোড় ফিরেছে, খেয়াল ছিল না। দেখছি মাঝদরিয়া ছাড়িয়ে কখন বাঁধ আমার হাতের কাছে। কী যেন কয়েক নাম-না-জানা গাছ বাঁধের বুকে। দূরে একটি কাশ্চে রেখায় গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের ...ছিনি মাথা, সেই স্বর্গ ব্রাহ্মণবৃক্ষ নারকেল মাথা তুলে আছেন। গোটা দশ-পনের যাত্রীতে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। এদিকে দেখ, এখনো লঞ্চ থামেনি। যাত্রীদের কাঠের সিঁড়ি নামেনি। টিকেট কাটার ব্যবস্থা নেই। সে-সব লঞ্চে উঠেই হবে। বাঁধের ওপর তো কয়েকটি গাছ ছাড়া, একখানি পাতার ঘরও দেখি না। এ কেমন ঘাট কে জানে।

যাত্রীদের মধ্যে কত ... সাহেব বিবি ছাওয়াল পাওয়াল সব রকমই আছে। বোচকা-বুচকির মধ্যে একজনের হাতে যেটি চোখে পড়ে, সেটি একটি নধর ছাগলছানা। বেচারীর চোখে কী তরাস! গলায় কাতর ডাক। মাকে ছেড়ে হয়তো যেতে হচ্ছে। জন্মভূমিও বটে। কোথায় নিয়ে যায়, কে জানে।

সিঁড়ি পড়তে না পড়তেই যাত্রী পা দেয়। তবে এবার বাঁধের গায়ে নয়। জল নেমে গিয়েছে ভাঁটায়। সিঁড়ি গিয়ে লাগে চরায়। সবাই নেমে এসে ওঠে।

উঠুক, কিন্তু যেভাবে সব হাঁটুভর পাঁক ঠেলে উঠছে, পিছলে না পড়ে। অনেকেরই টলমল ভাব। তার থেকে বেশী ভয় লাগে কলা বউটিকে দেখে। তবে উনি বউ কি বিবি, কে জানে। লম্বায় হাত তিনেক, বহরে বড় দেখি। লাল পাড় বাসন্তী রঙের জমিনে বেজায় লাল ফুলের ঝলক। তা বলে মুখ দেখতে পাবে, সে আশায় নিমাই। শাড়ির মধ্যে কোথায় যে আছেন, ... আর খুঁজি পেতি হস্‌সে না।

তা বেশ তো, ছায়া বজায় থাক, কেউ কি একটু হাতটা ধরতে পারে না। পারতো, যদি মা শাশুড়ী থাকতো। স্বামীতে হাত ধরলে আর ছায়া কোথায় থাকে। তিনি তো বোধ হয় ইতিমধ্যে লঞ্চে উঠে পড়েছেন।

আহ্‌, কী অশুভ ভাবনা দেখ। বউটি কাঠের সিঁড়ি থেকে হাঁটা দিল একেবারে ডাইনে বেঁকে। গেল গেল শব্দ ওঠার আগেই বউ নিচে। এ কে বলে দক্ষিণের পলি পাঁক। একেবারে কোমর অবধি নিচে। অমনি ঘোমটা ফাঁক। এবার দেখ, জোট-জড়ানো আট-দশ বছরের মেয়েটি। শ্যামা শ্যামা তেলতেলে মুখখানিতে দুলে নোলকে সাজ। কপালে সিঁথের ডগডগে সিঁদুর। চিলের মত এক চিৎকার, 'আঁ আঁ বাবা গো।'......

বউয়ের কান্না, লোকের গেল গেল, তার ...মাই একজনকে দেখা গেল, এক লাফ। ...মন্দর এদিক নেই, ওদিক আছে। ...ভের বোঁচকাটি তিনি ছাড়েননি। কালোর ...পরে গতরখানিও বেশ দশাসই। গোঁফের রেখামাত্র পড়েছে। কুড়ি কিংবা ত্রিশ বয়সের ...বয়ার কে জানে, মুখখানি বাঁধের মতই এবড়োখেবড়ো। বোঝা গেল, কলাবউ ...রই গিন্নী। উনি দিয়ে তুলে একেবারে ...বুকে সতী। কে যেন আবার হেঁকে ...লে, 'বউ তো?'

ভেবেছিলাম, রাগের জবাব জানাবে। তাই কখনো হয়। ওই সংসার খাওয়া পাক ঠেলে উঠতে উঠতে মন্দ হাসি চাপতে পারে না। সলজ্জ হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' তারপরে শোন হাসি। ছাদের খুপরিতেও হাসি খিলখিলিয়ে উঠছে। মায়ে মেয়েতে গড়াগড়ি। কেবল কর্তার মুখ বিরস। ঘটনা দেখতে দেখতে বলেন, 'যাচ্ছেতাই ... লেস।' গাজী ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাসতে হাসতে হাঁক দেয়, 'ভাগ্যি চোরাবালি নয়, তালে আর বউ পেতি হত না হে।'

বেচারী ছাড়া কী বলবে। তখন হাত ধরে নি। এখন কাঁধে ফেলে তুলছে। নিজের গায়ে অমন পাট-ভাঙা নীল রঙের জামাটা কাদায় মাখামাখি। বধূটির মাথায় আবার ...পিং। মুখখানি স্বামীর ঘাড়ে গোঁজা। লজ্জা করে না বুঝি। হতে পারে আট দশ বছর বয়স। বউ তো।

কর্তা গিন্নী উঠতে না উঠতেই সারেঙের ঘরে টিঙ টিঙ। অমনি যন্ত্রের গর্জন জোরে বেজে ওঠে। লঞ্চ মোড় ঘুরে সরে যায়। খালাসী সেই অবস্থায় সিঁড়ি টেনে তোলে। দিগন্ত আবার খুলে যায়।

(ক্রমশ)

সঙ্গীতের থিওরী

এ বছর উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত সম্মেলন-গুলিতে থিওরীর আলোচনা নিয়ে কিঞ্চিত সাড়া পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গীতের থিওরী বলতে আমাদের প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে সেটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ নয়—এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বহু শত বৎসরে সঙ্গীতের সঙ্গে আরও নানা বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সঙ্গীতের থিওরী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেগুলিও মুখ্য হয়ে ওঠে। আমরা এখনও সঙ্গীতকে তেমন সর্বাঙ্গীণভাবে দেখতে অভ্যস্ত হইনি।

প্রচলিত ধারণায় থিওরীর আলোচনা মানে রাগরাগিণীর লক্ষণসমূহ নিয়ে আলোচনা। কোন রাগে কোন কোন পর্দা লাগে, কীভাবে তার বিন্যাস হয়, তার বিশেষ অলঙ্কারগুলি কী কী, তার বাদী, সম্বাদী নির্ণয়, আর গায়ন পদ্ধতি—এইগুলিই হল বর্তমান ধারণায় থিওরীর অন্তর্ভুক্ত। এর যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কারণ, সঙ্গীত একটি প্রযুক্ত বিদ্যা—প্রয়োগেই এর সম্পূর্ণ সার্থকতা। অতএব যাঁরা বিবিধ রাগ-রাগিণীর সার্থক রূপায়ণে সক্ষম তাঁরা নিশ্চিতভাবেই পণ্ডিত কিন্তু সঙ্গীত এমন একটি বিদ্যা যার পূর্বাপর সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে এই জ্ঞানটিই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আরও বিবিধ বিষয় জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটি মিলিয়ে সঙ্গীত। এই কারণে সঙ্গীতকে তৌর্যত্রিক বলা হয়। থিওরীর দিক দিয়ে বিচার করে বলব—সাহিত্য, ছন্দ এবং ইতিহাস—এই তিনটি বস্তু নিয়েই থিওরীর আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। এই তিনটি বিষয় নিয়েই সংগীতচিন্তা গড়ে উঠেছে এবং আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে এই সঙ্গীতচিন্তাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও দু-একটি বিষয় সঙ্গীত-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—এগুলি দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। ধ্বনি এবং নাদের তত্ত্ব বা রাগ-রাগিণীর দেবময় মূর্তির পরিকল্পনাকে দার্শনিক বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?

খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ভরত প্রযুক্ত বিদ্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের যে কী সম্বন্ধ সেটিও তিনি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন। নাটকে কোথায় কীভাবে সংগীত যোজনা করা হত এবং সেই সব সংগীতের স্বরূপ কী ছিল তা বোঝাবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ছন্দকে অবলম্বন করে কীভাবে বিভিন্ন সংগীত সৃষ্ট হয়েছিল—সে বিষয়েও তিনি কম আলোচনা করেননি। অথচ, দুঃখের বিষয় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ওপর মোটামোটা গ্রন্থ রচিত হলেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত আমরা সব বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আলোচনাকেই স্বীকার করি, তাঁদের পক্ষে সঙ্গীতের এই সব জটিল বিষয় বোঝা শক্ত বলে তাঁরা এদিকে অগ্রসর হননি—আমাদের দেশের মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী স্কলাররাও তাঁদের চোখ দিয়েই সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত। অতএব যেটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে সেটা এঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। মাপ করবেন, রূঢ় হলেও যা সত্য তা না বলে পারি না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভারি ভারি গ্রন্থ যখনই রেফারেন্সের জন্য পড়তে হয়েছে তখনই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইনা। মনে হয়েছে তাঁরা পরিশ্রম করেছেন বিস্তর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর মর্মগ্রহণ করতে সমর্থ হননি। তাঁদের গ্রন্থগুলি অধিকাংশই বিবলিওগ্রাফির দিক থেকে উত্তম, কিন্তু ব্যাখ্যার দিক দিয়ে দরিদ্র। অথচ, যাঁদের টুলো পণ্ডিত বলা হয় তাঁদের কাছ থেকে সব প্রশ্নের সদুত্তর মিলেছে। অতএব আমাদের বস্তু নিয়ে আমাদেরই আলোচনা করতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ আলোকপাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এছাড়া সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সঙ্গীত-সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সংস্কৃত-সাহিত্যের এত ভারি ভারি গ্রন্থাদির মধ্যে সঙ্গীতসাহিত্যের উল্লেখ নগণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই যখন চর্যাপদ সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করলেন, তখন তাঁর একবারও মনে হল না যে, চর্যা যখন সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত তখন সংগীতসাহিত্যে এর উল্লেখ মেলে কি না। চেষ্টা করলে তিনি বিফল হতেন না, কিন্তু এটা তাঁর মনে হয়নি। বড়ু চণ্ডীদাসের তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। সঙ্গীতের দিক থেকে এই গ্রন্থের মূল্যায়ণে খুব কম ব্যক্তিই তৎপর হয়েছেন। নানা বিষয়ে আমাদের অন্ধভক্তি প্রচুর আছে, তেমনি আছে অন্ধ বিদ্বেষ। আচার্য অভিনবগুপ্তের নাট্যশাস্ত্রের টীকা নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের সংগীতাংশের টীকায় অভিনবগুপ্ত আদৌ আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন কি না সন্দেহ। এই টীকা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে গিয়ে এমন প্রতীতি হওয়া আশ্চর্য নয় যে, তিনি সংগীতে আদৌ

অভিজ্ঞ ছিলেন না, অথচ স্কলারদের কলমে এই টীকারই জয়জয়কার হবে এবং তাও এই দুর্বোধ্য টীকায় আদৌ প্রবেশ না করে। তাঁরা কি এটা স্বীকার করবেন যে সঙ্গীত-রত্নাকরের সাহায্য না পেলে নাট্যশাস্ত্রে প্রবেশ করা দুরূহ। আমার তো মনে হয় কল্লিনাথ যদি নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা করতেন, তাহলে আমরা অনেক বেশী লাভবান হতাম। সঙ্গীতের থিওরীর আলোচনায় এই সব বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আমাদের নাট্যসঙ্গীত কেমন ছিল, কিভাবে রাগ-সঙ্গীতের উৎপত্তি হল, এই যে বিরাট প্রবন্ধসঙ্গীতের বর্ণনা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে বর্তমান বিভিন্ন দেশী সঙ্গীতের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কি না এবং তাদের বিবর্তন কেমনভাবে হয়েছে—এ সবই ব্যাপকভাবে আলোচনা করা দরকার। তাল সম্বন্ধে আলোচনাও প্রায় কিছুই হয়নি। মার্গতাল সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। বর্তমান তিন তাল এক ফাঁক পদ্ধতির আগে দেশী তালের প্রয়োগ কিভাবে হত সে সম্বন্ধেও কোন আলোচনা হয়নি। সঙ্গীতশাস্ত্রের বহু অংশ দুর্বোধ্য। তাকে সুবোধ্য করতে হলে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের ইতিহাস সংগঠন করা সম্ভব, নইলে নয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে অনেকে দোষ দেন যে, তাঁর রাগসম্বন্ধীয় থিওরী ঠিক নয়। কিন্তু ভদ্রলোক করবেন কি? বর্তমানে ঠাট হিসাবে রাগসঙ্গীতকে ভাগ করা ছাড়া বোধ হয় আর কোনও উপায় নেই। তিনি নানা থিওরী ঘেঁটেই এই মতবাদে পৌঁছেছিলেন। এই ব্যাপার আজকাল আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে। যেরকম মিশ্ররাগ এবং ধুনের বহর দেখা যাচ্ছে তাতে এই থিওরীকেও বজায় রাখা কঠিন হবে। আমার তো মনে হয় নানারকম চটকদার নাম দিয়ে রাগ বলে যে সব "ইনকমপ্যাটিবল্ মিক্সচার" তৈরী হচ্ছে তার কঠিন সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রগতিরও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা দরকার। এসব ক্ষেত্রে তা আছে কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন। কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষেরা এদিকে এগুবেন কি? সন্দেহ আছে—কারণ যাঁদের নিয়ে এত ঘটা তাঁদের কোন প্রকার উত্তেজনা ঘটাতে বোধ করি তাঁরা রাজী হবেন না।

মুসলমান শাসনের কয়েক শত বৎসরের সাঙ্গীতিক বিবর্তন আমরা অল্পই জানি। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানেও আমাদের উৎসুক্য দেখা যায় না। তানসেন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী গালগল্প নিয়ে আমরা তথাকথিত ইতিহাস রচনা করি। কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস কী বলে সে সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করি না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহে এখনো প্রচুর পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে যা ছাপা হলে আমাদের অনেক কৌতূহল মিটতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিনি। মোগল যুগের যে সমস্ত ইতিহাস-গ্রন্থ বহু বৎসর পূর্বে ছাপা হয়ে গেছে সেগুলি আর নতুন করে ছাপা হয়নি। অনেক লাইব্রেরীতে সে সব বই এমন অবস্থায় আছে, যে নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঝরঝর করে গুঁড়ো হয়ে পড়ে। এসব গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হওয়া যে অত্যাবশ্যক তাও ঘোষণা করে জানাতে হয়।

থিওরীর আলোচনায় আমার মনে হয় এই সব বিবিধ বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গীতের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করা দরকার। প্রত্ন বিদ্যার আলোচনা তো আছেই কিন্তু সঙ্গীত যে একদা সাহিত্যের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল এবং ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিবর্তন হয়েছিল—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারলে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু আলোকপাত ঘটতে পারে এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতকে আমরা যেভাবে দেখি তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখতে হবে—তবেই এটা সম্ভব হবে।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একাজ হবে না। আজ চোদ্দ পোনেরো বছর ধরে যে সমস্ত কনফারেন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাতে মনে হয় এঁদের পক্ষে এই ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বীকার করুন না না করুন, ব্যাপারটা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। থিওরীর আলোচনায় লাভের অবকাশ নেই এবং শূন্য প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা দিয়েও কেউ সুখ পাবেন না। কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষিত সাংস্কৃতিকসংস্থা ভিন্ন একাজের দায়িত্ব অপর কারুর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, দর্শন বা ইতিহাসের কনফারেন্স যেভাবে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনাও সেইভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই তার গুরুত্ব থাকবে এবং তাঁরা যে সব রেজোলিউশন গ্রহণ করবেন তা উচ্চতর মহলে গ্রাহ্য হবে। আমরা এই আশায় রইলাম যে অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত পটভূমিকায় উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় উপযুক্ত পরিবেশে সঙ্গীতবিদ্যার দুরূহ আলোচনার সূত্রপাত হবে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সঙ্গীত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

একটি পত্র

মহাশয়,

আমার অগ্রজ স্বর্গত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগরের সুরারোপিত ১২ খানা গানের যে লং প্লেইং রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানি সম্প্রতি প্রকাশিত করেছেন সে সম্পর্কে আপনার (লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই) সুচিন্তিত সমালোচনা পড়েছি। এই সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে।

আপনি লিখেছেন, "গ্রামোফোন কোম্পানি এঁদের (অর্থাৎ যাঁরা প্রথম যুগে সুরসাগরের গান রেকর্ড করেছিলেন) রেকর্ডগুলিকে পুনর্জীবিত করেন নি, কিন্তু

করা যেতে পারত এবং তা হলেই বোধ হয় এই ক্লাসিকাল সৃষ্টিগুলি সুরক্ষিত হত।" আপনি আলোচ্য লং প্লেইং রেকর্ডখানা ভাল করেই শুনেছেন। কারণ আপনি যে দুখানা গানের কথা উল্লেখ করেছেন শুধু-মাত্র সেই দুখানা গানই আগেকার গায়কীর তুলনায় কিছুটা ম্লান হয়েছে, কিন্তু বাকি দশখানা গানই আগেকার গাওয়া রেকর্ড থেকে উন্নতমানের হয়েছে। আগেকার রেকর্ডগুলিকে পুনর্জীবিত করার থেকে গানগুলিকে পুনর্জীবিত করাই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে। আপনি লিখেছেন, "এ যুগের শিল্পীরা যদি গত যুগের শিল্পের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারেন, তবে দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করব, তাঁদের নয়।" হয়ত আপনার বলার উদ্দেশ্য ছিল "গত যুগের শিল্পীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্পর্কে। সব যুগেরই শক্তিমান শিল্পীদের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা স্টাইল আছে যা অননুকরণীয়। পরবর্তী যুগের শিল্পীরা সেই সব শিল্পীদের ব্যর্থ ও অন্ধ অনুকরণ না করে যদি তাঁদের নিজস্ব স্টাইলে মূল-শিল্পের ব্যতিক্রম না করে ঐসব গান করেন তাহলে তাতে দুর্ভাগ্যের কিছু নেই, বরঞ্চ এইটাই তো একমাত্র পথ। যাঁরা সাহানা দেবী বা রেণুকা সেনগুপ্তের গাওয়া অতুল-প্রসাদ সেনের গান অথবা ইন্দুবালার গাওয়া নজরুল ইসলামের গান শুনেছেন তাঁদের একটা "নস্টালজিয়া" থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁরা ৩০।৩৫ বৎসর আগেকার ঐ সব রেকর্ড শোনেন নি, কিম্বা যারা বর্তমান যুগের মানুষ তারা কি তাই বলে অতুল-প্রসাদ বা নজরুল ইসলামের গান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আপনি লিখেছেন, "কয়েকটি গানে সুপরিচিত অপর কণ্ঠের ছায়াপাত ঘটেছে, এমন কি ট্রেনার মহাশয়ের কণ্ঠের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিড়ম্বনা পরিহার করা যেতে পারত।"

আলোচ্য রেকর্ডের শিল্পীদের ট্রেনিং দিয়েছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুরসাগরের গানের একমাত্র ভাণ্ডারী কি না জানি না, তবে ইনি অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

সুরসাগরের জীবদ্দশায় সঙ্গীতের ব্যাপারে যে দুজন তাঁর সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা হলেন স্বর্গত কবি শৈলেন রায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুরসাগরের যে সব গান এইচ এম ভি-তে রেকর্ড করা হত তার বেশীর ভাগ ট্রেনিং সন্তোষবাবু দিতেন। সুরসাগরের গানের প্রামাণ্য স্বর-লিপির বই সন্তোষবাবুরই লেখা। কাজেই "কয়েকটি গানে সুপরিচিত অপর কণ্ঠের ছায়াপাত" যদি ঘটেই থাকে তাতে বিড়ম্বনার কিছু নেই বরঞ্চ ততটই প্রামাণ্য হয়েছে।

সুধাংশুকুমার দত্ত
কলকাতা-২৬

লেখকের বক্তব্য

৮। আগেকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা থাকলে সেটাই ভাল হত—একথা জোর দিয়েই বলব। গ্রামোফোন কোম্পানিও যে অপরক্ষেত্রে এটা করেননি এমন নয়। কেন, তার কারণ পত্র-লেখক বুঝতে না চাইলেও পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝেছেন। তার প্রমাণ আমার সমালোচনার বিরুদ্ধে এই একটিমাত্র চিঠি ছাড়া আর একখানিও প্রতিবাদপত্র আসেনি। বর্তমান শিল্পীরা অতীত স্রষ্টাদের রচনা থেকে বঞ্চিত থাকবেন বা গাইবেন না—এমন অন্যায় ইঙ্গিত আমার সমালোচনা থেকে পত্রলেখক কি করে খুঁজে পেলেন তাই ভাবছি। একান্ত বিদ্বেষ প্রসূত, পরোক্ষ প্ররোচনা ভিন্ন এটা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ আমাদের রেকর্ড দেন সমালোচনার জন্য—নিছক স্তুতিবাদের জন্য নয়, এটা পত্র-লেখকের বোঝা উচিত ছিল।

আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ওই যে "নিজস্ব স্টাইল" —ওইখানেই সবচেয়ে গোলমাল। এই নিজস্ব স্টাইল প্রায় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট শিক্ষা, অভিনিবেশ, অভিজ্ঞতা এবং পরিমার্জনা থেকে উদ্ভূত হয় না। ফলে যেখানে স্রষ্টার একটি ছোট্ট মীড় বা গমকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না বা কণ্ঠে রূপায়িত হয় না সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে এই নিজস্ব স্টাইল। এই কারণেই গত যুগের "শিল্পকে" বোঝবার কথা বলেছি, যার মানে কম্পোজিশন। এছাড়া ভঙ্গী বা ম্যানারিজম সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সেটা দোষের পর্যায়ে পড়ে। তাকে স্টাইল বলে চালানো অন্যায় এবং অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে বলি,—পত্রলেখকের অগ্রজ সুরসাগর মহাশয় অতুলপ্রসাদ সেনের "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করবার সময় বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, তিনি কবির কাছে এই গানটি বহুবার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে শুনে তারপরে স্বরলিপি করে-ছিলেন যাতে তাঁর নিজের গায়নভঙ্গীর বা স্বকীয় ধরণের কোনরকম ছায়াপাত না ঘটে। খুব সম্ভব "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে ফুটনোটসহ এই স্বরলিপিটি বেরিয়েছিল। এই থেকেই বোঝা যাবে স্রষ্টার সুরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন। পত্রলেখকের উক্তি পরস্পর-বিরোধী। তিনি পরবর্তী শিল্পীদের মূল শিল্পের ব্যতিক্রম না করে গান করবার কথা বলছেন, আবার সেই সঙ্গেই বলছেন অপর কণ্ঠের ছায়াপাত ঘটলে সেটা প্রামাণ্য হবে। এইরকম বন্ধুভাগ্য আশা করি খুব কম সঙ্গীতস্রষ্টাই কামনা করবেন।

পত্রলেখকের শেষের মন্তব্য যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদের শরীরকে বাদ দিয়ে ছায়াকেই আশ্রয় করতে হয়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে কোনও কোনও গায়ক অন্তরঙ্গ-ভাবে যুক্ত ছিলেন যাঁরা ওস্তাদ মানুষ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁদের ওস্তাদির ছায়াপাত ঘটলে সেটাকে তত প্রামাণিক বলে যদি ধরে নিই তাহলে ফল কি দাঁড়াবে বলাই বাহুল্য।

শার্ঙ্গদেব

চব্বিশ

পথ মাইল পঞ্চাশের কিছু বেশি। অবনী দুপুরে নাগাদ এসেছিল, বেরুতে বেরুতে তিনটে বাজল।

হৈমন্তীও যাচ্ছে। তার যাবার কিছু ঠিক ছিল না; বরং বরাবরই সে বেশি দূর পথ যেতে, বাইরের ঠাণ্ডায় রাতে ঘোরাঘুরি করতে অনুৎসাহ দেখিয়েছে। গুরুডিয়া থেকে অতটা পথ জিপে করে গিয়ে মাউআদের বনজঙ্গল পাহাড়ের মাঝখানে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস দেখার উৎসাহ তার ছিল না। তাছাড়া সারা রাত সেখানে কাটাতে হবে। অসুবিধেও ছিল। তবু সে শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে।

গতকাল, অবনীর বাড়িতে গগনের সঙ্গে বড়দিন করতে এসে সারাটা দিন ভালই কেটেছিল। গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, বিজলী-বাবুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, অনেক দিন পরে হঠাৎ গগনের পাল্লায় পড়ে তাস খেলা—এসব যেন মনের কোনো গুরুভার সাময়িকভাবে অনেকটা হালকা করে দিয়েছিল। ফেরার সময় অবনী বলল, 'আপনিও চলুন কাল, সাইটটা খুব সুন্দর, বাঁধের গায়ে পাহাড়ের ওপর ইনস্‌পেকসান বাংলো, চমৎকার লাগবে। একটা তো রাত। অসুবিধে খুব হবে না। পরশু দিন বেলা ন'টার মধ্যে যথাস্থানে পৌঁছে দেব আপনাকে।'

গগন বলল, 'চল্ দিদি, এই চান্স। পরে আর তোর যাওয়া হবে না।'

হৈমন্তী তখনও স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। সে গগন নয়, যাব বললেই যেতে পারে না। কিছু যেন ভাবার ছিল।

আজ সকালে হাসপাতালে রুগী ছিল না; অনেকটা বেলায় দুজন এল: একটার চোখ উঠেছে, অন্যটার ঠাণ্ডায় চোখমুখ ফুলে টসটসে। তারপর এল সুরেশ্বর, সঙ্গে শিবনন্দনজী। দুজনেই যেন ব্যস্ত; কথা বলতে বলতে এসেছিল, কথা বলতে বলতেই চলে গেল, কেন এসেছিল বোঝা গেল না। কিন্তু মনে হল, যেন এই আসা-যাওয়ার মধ্যে হৈমন্তীকে দেখে গেল।

হাসপাতালে বসে থাকতে থাকতে হৈমন্তী স্থির করে ফেলল : সে যাবে। আসার সময় যুগলবাবুকে বলে এল, কাল আসতে তার বেলা হবে, রুগী এলে যেন বসিয়ে রাখা হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে গগনকে বলল, আমরা আজ থাকছি না তোর সুরেশদাকে বলে আয়।

পথটা নতুন: এর আগে হৈমন্তী আর ওদিকে আসে নি। ছড়ানো কালো ফিতের মতন পথ, যত যাও ততই যেন ফিতেটা খুলে যাচ্ছে, আঁকবাঁক তেমন একটা নেই, পরিষ্কার ছিমছাম, ডাইনে বাঁয়ে ঢেউ-ভাঙা প্রান্তর, দূরে গায়ে গায়ে কোথাও পাহাড়ের টিলা, কোথাও বা তরুলতায় আচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। শীতের মরা রোদ পার্বত্য পাদদেশকে ক্রমশই নিষ্প্রভ করে আনছিল। ছায়া নেমেছে তরুমূলে, ছোট-খাটো দেহাতী গ্রাম, অল্প স্বল্প ক্ষেত খামার, সবজি খেতে মটরশুটি, কাঁচা কুয়ো থেকে জল তুলছে বউ ঝি, কুল ঝোপ, দু একটা কুকুর। কদাচিৎ এক আধটা বাস চলে যাচ্ছিল।

সামনে অবনী, পাশে বিজলীবাবু। পেছনে হৈমন্তী আর গগন। নেব না নেব না করেও কয়েকটা জিনিস হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিছানার ব্যবস্থাই প্রধান, ছোটখাটো সুটকেশও। হৈমন্তীর জন্যে গগন কম্বল নিয়ে নিয়েছিল, আর দুই ভাইবোনের কিছু গরম বস্ত্র। গগনরাও সুটকেশ নিয়েছে একটা। জল আর চায়ের ফ্লাস্ক, টিফিন কেরিয়ার—এ-সব বিজলীবাবুর ব্যবস্থা। উপরন্তু বিজলীবাবুর আরও একটি ব্যবস্থা ছিল, হৈমন্তী আসছে শুনে তিনি সংকুচিত ও বিব্রত হয়ে আগেভাগেই সেটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ চলে আসা গেল।

বিজলীবাবু বললেন, "মিস্তিরসাহেব এবার একটু রেস্ট দিন। বিকেলের চা-টা খেয়ে ফেলা যাক।"

"ক'মাইল এলাম?" গগন শুধলো।

"প্রায় আধাআধি, মাইল পঁচিশ হবে—" বিজলীবাবু জবাব দিলেন।

"বিজলীদার দেখছি মাইলেজ পর্যন্ত মুখস্থ," গগন হেসে বলল।

"এখানকার দেহাতী লোক ভাই, কোথায় কি তার একটা মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে চলে!" বলে বিজলীবাবু ডান হাত তুলে দূরে একটা পাহাড় দেখালেন, বললেন, "ওই পাহাড়টা হল চন্দ্রগিরি, এখানকার লোকে বলে চাঁদওয়ারি, ওর নীচে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।"

"পাহাড়টা তো কাছেই," গগন বলল।

"মাইল ছ'য়েক—" বিজলীবাবু বললেন।

গগনের বিশ্বাস হল না, বলল, "ছ মাইল? কি বলছেন!...এখানের মাইলের হিসেবটাও কি দেহাতী?"

বিজলীবাবু হেসে জবাব দিলেন, "পাহাড় জিনিসটা ওই রকমই; মনে হয় পাই পাই তবু তারে পাই না।"

বিজলীবাবুর বলার ভঙ্গিতে গগন জোরে হেসে উঠল। হৈমন্তীও হেসে ফেলল।

অবনী হাসতে হাসতে বলল, "বিজলীবাবু, এটা ওমর খৈয়াম নয়।" বলে চা খাবার জন্যে গাড়ি দাঁড় করাল।

বিজলীবাবু সহাস্য মুখে জবাব দিলেন, "না, ওমর খৈয়াম নয়। এ হল পুরনো দিনের বাংলা গান: সে যে দেখা দিয়ে দিয়ে দেখা দেয় না, ধরা দিয়ে হায় ধরা দেয় না। জংলা-কারফা।"

অবনী গলা ছেড়ে হেসে উঠল। গগনও হাসতে লাগল।

অবনী বলল, "বিজলীবাবুর তা হলে পুরোনো বাংলা গানও জানা আছে।"

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন বিজলীবাবু, পথে দাঁড়িয়ে গায়ের জামাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "একটু আধটু আছে। আমার বাবার মুখে শুনেছি। হারমোনিয়াম বাজিয়ে ডুগি তবলার সঙ্গে সংগত করে গাইতেন।" বলে বিজলীবাবু গাড়ির মধ্যে হাত বাড়ালেন, হৈমন্তীকে বললেন, "দিন তো দিদি, চায়ের ফ্লাস্কটা।

ওই যে হলুদে মতন কাপড়ের থলে ওর মধ্যে কাপটাপ আছে।"

গগনও নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। অবনী রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিপ গাড়িটার সামনের চাকায় বার কয়েক জুতোর ঠোক্কর মেরে কি যেন দেখে নিল।

হৈমন্তী চায়ের কাপ বের করল। বিজলীবাবুর সব কাজ ব্যবস্থা মতন, কোথাও এতটুকু ভুল হবার যো নেই। চায়ের কাপ, জলের গ্লাস, কলাপাতায় মোড়া পান। হৈমন্তী গাড়ির পিছন দিক থেকে জলের ফ্লাস্ক নিয়ে কাপ ধুতে ধুতে বলল, "বাড়ি থেকে সব গুছিয়ে নিয়েছে না?"

বিজলীবাবু হাসলেন। "ওই টুকুই সুখ, কোথাও যাব বললে আর রক্ষে নেই, মরণকালে মুখে দেবার গঙ্গাজলটুকু পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।"

হৈমন্তী হাসিমুখে ভর্ৎসনা করল, "ছি, ও কথা বলবেন না।"

গগন বলল, "আপনি এমন তোফা আছেন বিজলীদা যে আপনাকে দেখে ম্যারেজ্ সম্পর্কে আমার প্যানিকটা কেটে যাচ্ছে।"

"ফক্কড়...!" হৈমন্তী ধমক দিল যেন।

হাসাহাসির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাওয়া হল। হৈমন্তী নামল না।

মাঠ ঘাট থেকে রোদ এবার উঠতে শুরু করেছে, যেন এতক্ষণ সারাটা সকাল দুপুর ধরে আকাশ এসে মাটিতে রোদ মেলে দিয়েছিল, এবার বেলা পড়ে যাওয়ায় দ্রুত হাতে তা তুলে নিয়ে কোলে জড় করছে।

অবনী এসে গাড়িতে বসল, ঠোঁটের ডগায় সিগারেট। বিজলীবাবু পান মুখে পুরেছেন, জিবের ডগায় একটু চুন ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে গাড়ির মধ্যে উঠে এলেন। গগনও সিগারেট টানতে টানতে উঠে পড়ল।

প্রায় সাড়ে চার বাজছে। রোদ পালাচ্ছে বলে বুঝি শীতের দমকা উত্তরের বাতাস তাকে তাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। গাছের ছায়াগুলি এখন বেশ দীর্ঘ এবং মাটির রঙের সঙ্গে ছায়ার রঙ মিশে আছে।

অবনী গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"কতক্ষণ লাগবে পৌঁছতে?" গগন জিজ্ঞেস করল।

"ঘণ্টা খানেক," অবনী বলল; বলে বিজলীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "নাওদা না কি বলে যেন, ওখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা ধরলে নাকি শর্টকাট হয়।"

বিজলীবাবু মাথা নাড়লেন, "রাস্তা খুব খারাপ, আমার চেনা নেই; পুরনো রাস্তাই ভাল।"

গাড়ি চলতে শুরু করল। অল্প এগিয়েই অতি শীর্ণ এক নদী, নদীতে জল নেই, বালির ওপর ছায়া নেমেছে, ধীরে ধীরে যেন বনাঞ্চলের মধ্যে রাস্তাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বড় বড় শালগাছ, অজস্র হরিতকী আর নিম। শীতের বাতাস এসে গাছপাতায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁপুনি তুলেছে, আমলকি বন যেন হঠাৎ ছুটে এসে পালাল, আর কোথাও গাঁ-গ্রাম চোখে পড়ছে না, শুধু জঙ্গল, বিচিত্র গাছপালা, পথে মানুষ জন নেই, গাড়ি নেই, নির্জন নিস্তব্ধ এক জগতে যেন ক্রমশই গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে।

বিজলীবাবু তাঁর হাতে-পাকানো সিগারেট ধরিয়েছেন। হৈমন্তীর শীত ধরতে শুরু করেছিল, গায়ের কোটটা জড়িয়ে নিল। গগন ঝুঁকে পথঘাট দেখছে, অন্যমনস্ক।

অবনী বলল, "বিজলীবাবু, আপনার কপিলকে দিয়ে ক্লাচটা একবার দেখাবেন তো, মাঝে মাঝে বড় ডিস্টার্ব করে...।"

বিজলীবাবু অবনীর পায়ের দিকে তাকালেন।

গগন হঠাৎ বলল, "আমরা কি পাহাড়ের তলায় এসে পড়লাম?"

"হ্যাঁ," বিজলীবাবু জবাব দিলেন, "আর একটু এগিয়েই দু দিকে পাহাড় পড়ে যাবে, মাঝ দিয়ে রাস্তা।...চন্দ্রগিরির এক গল্প আছে"

"কি গল্প?"

"এখন তো বলা যাবে না...চেঁচাতে হবে; পরে বলব।"

গগন চুপ করে গেল।

সামান্য পরেই চার পাশ থেকে পাহাড়ের আড়াল উঠে এল, যেন বনবৃক্ষ ও লতাগুল্ম-পূর্ণ পাথরের এক মস্ত ঝাঁপি তাদের দু পাশে। দীর্ঘশীর্ষ গাছ, কুণ্ডলী পাকানো জটাজুটধারী অশ্বত্থ, স্তূপীকৃত ছায়া, কদাচিৎ কোনো সূর্যরশ্মির রেখা, গভীর খাদ, আর পরিপূর্ণ স্তব্ধতা; শুধু গাড়ির শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন কানের পরদায় মিশে আছে।

তারপর কখন যেন এই ঝাঁপি খুলে যেতে লাগল, মাথা তুলে দাঁড়ানো আড়াল সরে যাচ্ছে, বনজঙ্গল বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়ে আসতে লাগল, সামনে উতরাই, শেষ বিকেলের ম্রিয়মাণ আলোয় ঝাঁক বেঁধে পাখি উড়ে যাচ্ছে, নিমফুলের গন্ধের মতন কেমন এক গন্ধ এল, কয়েকটি বনজ কুসুম।

গগন এতই মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিল যে সে হঠাৎ গাইতে শুরু করল: 'বাঁধ বেলা বয়ে যায়, কাননে আয় তোরা আয়...'।

গগন গানে পারদর্শী নয়; তবু তার মোটা সাদামাটা গলা, তার উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ হৃদয়, গানটিকে কেমন সুন্দর ও জীবন্ত করে তুলল।

বিজলীবাবু ঘাড় পিছু দিকে হেলিয়ে দিয়ে গান শুনতে লাগলেন। অবনী একবার ঘাড় ফেরাল। হৈমন্তী হাঁটুর ওপর

কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

গান শেষ হলে বিজলীবাবু বললেন, "বাঃ!"

গগন যেন এবার লজ্জা পেল। হৈমন্তীর দিকে চকিতে চেয়ে বলল, "হঠাৎ কেমন ফিলিং চলে এল বিজলীদা, আমি গাইয়ে নয়।"

"না হলে গাইয়ে, কিন্তু বেশ গেয়েছ। দেখ ভাই, গান হল আধা-গাইয়েদের জন্যে; আর সুর হল পাকা-গাইয়েদের জন্যে।"

গগন কেমন অবাক হয়ে বলল, "সেকি! মানেটা তো বুঝলাম না।"

বিজলীবাবু হেসে বললেন, "মানেটা সহজ। একটা হল অন্তরের জিনিস, অন্যটা যন্তরের।"

ঠিক যেন গোধূলি বেলায় মাদাউআলের কাছে ওরা পেণছে গেল। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সরকারী জংগল দু পাশে, মনে হল এক সময়ে এই জংগল কেটে মাঠ হয়েছিল, আবার নতুন করে সামনের দিকটা গাছের চারা পোঁতা হয়েছে। ছোট ছোট গাছ, সাজানো গোছানো, একটা সজারু ছুটে গেল, কিছু পাখি, শীতের ধূসরতা নেমে গেছে, আকাশ গড়িয়ে গোধূলির আলো মেঘের আড়ালে ডুবে যাচ্ছে, ঠান্ডা কনকনে মুঠো ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছে শীতের।

দেখতে দেখতে এই বনের মধ্যে মানুষের পদচিহ্ন ফুটে উঠল। হলুদ রঙের কোয়ার্টারস, মস্ত মস্ত লোহার থাম, ওভারহেড লাইন, নদীর রেখা, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। যেতে যেতে সরকারী জংগলে গগন একটা হরিণ দেখতে পেল। আঙুল দিয়ে হরিণটা দেখাবার আগেই সে অদৃশ্য।

অবনী ডাইনে বেঁকল, তারপর আবার বাঁয়ে। সামান্য পথ এগিয়েই চোখের সামনে বাঁধটা দেখা গেল। এপাশ ওপাশ যেন আর দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে, অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাতি জ্বলছে, দুরন্ত তীক্ষ্ম এক বাতাসের দমকা এসে সর্বাংগ শিহরিত করল।

বিজলীবাবু বললেন, "বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলাম মিস্তিরসাহেব, তখন কাজ চলছে। এখন দেখছি ভোল পালটে ফেলেছে।"

অবনী বলল, "আসতে তো চাইছিলেন না, জোর করে নিয়ে এলুম।"

গগন বলল, "ইস্, এখানে এসে সাতটা দিন থাকলেই হত। মার্ভেলাস সাইট্।... কি রে দিদি, ভাল লাগছে না?"

হৈমন্তী ঘাড় কাত করল। তার ভাল লাগছিল।

যতক্ষণ ভেতরে ছিল মনে হচ্ছিল এ এক রহস্যপুরী, যা দেখা যায় তার চেয়েও যা দেখা যায় না তার চিন্তাই যেন বিহ্বল করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উদাসীন বিরাটাকার কতক যন্ত্র ধ্যানীর মতন বসে আছে, কোথাও তার ভ্রূক্ষেপ নেই, অথচ তার আভ্যন্তরিক রহস্যের পরিচয় শুনলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। দুর্বোধ্যের সামনে দাঁড়ালে চমৎকৃত হবার যে স্বাভাবিক আবেগ, গগনরা সেই আবেগে চমৎকৃত ও বিহ্বল হচ্ছিল। অবনীর পক্ষে বিমূঢ় অথবা বিস্মিত হবার কোনো কারণ ছিল না। বরং পাওয়ার-হাউসের ছোকরা মতন শিফট্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস্তব যা দেখাচ্ছিল এবং বোঝাচ্ছিল অবনী তার বিস্তৃত ও সরল ব্যাখ্যা করে গগনদের কৌতূহলকে মোটামুটি পরিতৃপ্ত করছিল। যন্ত্রের সেই জটিল জগৎ, যেখানে কেমন একটি নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন ছিল, যেখানে প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষে এবং অন্তরালে কত বিচিত্র কিছু হয়ে যাচ্ছিল, যেখানে আলোকিত মঞ্চে কয়েকটি মাত্র কুশীলব দৈত্যসদৃশ লৌহপিণ্ডকে করতলগত করে রেখেছিল—সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে গগন বলল, 'এসব দেখলে মানুষের ওপর ভক্তি বেড়ে যায়। জলস্থল তাও তার হাতে বাঁধা পড়ল।'

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারপাশে কেমন একটা ময়লা আলোর ভাব, টিলা আর পাহাড় গাছপালার অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের শুরু, চাঁদ উঠে আসছে, দূরে দূরে বাতি জ্বলছে, যেন একটি আলোর মালা সমস্ত উপত্যকার গলায় ঝোলানো, বাতাসের ধারালো চোট গায়ে লাগছে, কুয়াশা-ঝাপসায় ডান দিকের বাঁধটি মাঝরাতের তেপান্তরের মাঠের মতন দেখাচ্ছিল।

হৈমন্তীর শীত করছিল, গগন কুঁকড়ে গিয়েছে। বিজলীবাবু কান মাথা ঢেকে নিয়েছেন চাদরে। খানিকটা পথ চড়াই উঠে ইনস্পেকসান বাংলো।

গগন শীতের চোটে সিগারেট ধরালো। বলল, "ভেতরে যতক্ষণ ছিলাম মনেই হয়নি বাইরে এরকম ঠান্ডা।"

বিজলীবাবু বললেন, "একে উঁচু জায়গা, পাহাড়ী; তার ওপর ওই বেঁধে রাখা জল—কুল কিনারা দেখছি না; শীতের দাপট রাত্রে বোঝাবে।"

হৈমন্তীর মনে হচ্ছিল একটা স্কার্ফ কিংবা মাথায় গলায় জড়ানো কিছু সে না নিয়ে এসে সে ভুল করেছে। নিয়ে নিলেই হত। গাড়ি থেকে নেমেই তারা সটান চলে এসেছিল। জিনিসপত্র যা, বেয়ারা-খানসামাগুলো ঘরে নিয়ে চলে গেল। বাংলোয় তারা ঢোকে নি পর্যন্ত।...একটা জিনিস হৈমন্তী লক্ষ করল, অবনীর চাকরির মর্যাদা এখানে বেশ। তার পরিচয়—অন্তত সরকারী পরিচয় এরা জানে হয়ত, খাতির কিছু কম করল না। সাধারণের জন্যে যা নিষিদ্ধ, নানা বিষয়ে যে কড়াকড়ি তার কিছুই তাদের পোয়াতে হল না। দিব্যি সব ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে দেখে এল।

রাস্তাটা সুন্দর, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে, তফাতে তফাতে বাতি, পাশে গাছপালা, নীচে তাকালে স্টাফ কোয়ার্টারসের আলো চোখে পড়ে। ওপাশে দৈত্যের মতন ড্যাম।

অবনী বলল, "আপনার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে?"

হৈমন্তী হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল, "তেমন কিছু নয়; একটু ঠান্ডা লাগছে।"

"আর বেশি হাঁটতে হবে না, কাছেই..."

"আপনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন?"

"না; বার দুয়েক কাজে আসতে হয়েছে।"

"আপনাকে চেনে..."

"ঠিক সেভাবে নয়। তবে এখানের যিনি কর্তা ছিলেন মিস্টার মজুমদার তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কাজের ব্যাপারেই হয়েছিল। চমৎকার মানুষ। তিনি এখন নেই। বদলি হয়ে গেছেন।"

বিজলীবাবু ও গগন অন্যপাশে কথা বলছিল।

কথা বলতে বলতে পথটুকু পেরিয়ে এসে ওরা বাংলোয় উঠল।

দুটো ঘর, প্রায় মুখোমুখি। মাঝখানে ঢাকা বারান্দা। ঘরে আসবাব পত্রের বাহুল্য না থাকলেও মোটামুটি খাট, টেবিল, চেয়ার ছিল; দেওয়ালে গাঁথা র‍্যাক। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। ঘরের জানলায় কাঁচ আর খড়খড়ি।

বেয়ারা-খানসামাগুলো জিনিসপত্র ঘরে তুলে রেখেছিল।

চায়ের পাট বসল পুবের ঘরটায়। জানলা বন্ধ, দরজা ভেজানো, বাতি জ্বলছে। ঘরের আবহাওয়ায় অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছিল হৈমন্তী।

গরম জল, রাতের খাওয়া দাওয়া, ঘরে আগুন তুলে দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদির তদারকি শেষ করে এসে অবনী বলল, "আপনাদের বিছানাপত্র পেতে দিক; গরম জল দিচ্ছে বাথরুমে—মুখহাত ধুয়ে বিশ্রাম করে নিন খানিক। আমরা ওঘরে আছি।"

অবনী আর বিজলীবাবু তাদের ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে বিজলীবাবু বললেন, "মিত্তিরসাহেব, সবই তো ভাল হল, কিন্তু শেষরক্ষা হবে তো?"

অবনী বুঝতে পারল না, সিগারেট ধরাতে ধরাতে তাকাল।

বিজলীবাবু হেসে বললেন, "অমন হুইস্কিটার একটা গতি করা দরকার।"

অবনী হেসে ফেলল।

বিজলীবাবু চাদর বালিশ বের করতে করতে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম উনি আসবেন না।...যখন শুনলাম আসছেন তখন থেকেই ঝিমিয়ে পড়েছি। মানে, আর কিছু নয়, আমাদের হল চোরের মন, সিঁদ দেবার আগে ধরা পড়ার ভয় থাকে।"

অবনী হাসতে হাসতে জানলা-ঘেঁষা খাটের ওপর গিয়ে বসল, বসে পায়ের ওপর পা তুলে নিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, "আপনি তো গুণী লোক, বুঝেসুঝে ব্যবস্থা করুন।"

বিজলীবাবু ঘরের চারপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, বললেন, "তা তো করতেই হবে, কোলের ছেলে বয়ে এনেছি বাঁধের জল ভাসিয়ে দিয়ে যেতে তো পারব না।"

অবনী জুতো জোড়া খুলে ফেলে গায়ের কোট খুলল। খোলা হোল্ডঅল থেকে র‍্যাগ, স্লিপার এটা ওটা বের করতে লাগল।

"খানসামাটাকে সোডার কথা বলেছিলেন?" বিজলীবাবু শুধোলেন।

"আনিয়ে রাখবে।"

"তা হলে আমার বিবেচনায়, দুটো মুখে দিয়ে—ও ঘরের দরজা বন্ধ হলেই শুরু করা যাবে।"

অবনী মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

বাথরুমে জল দিয়ে গিয়েছে বেয়ারা, অবনী চোখে মুখে জল দিতে গেল। বেয়ারা এসেছিল। ঘরের বিছানা গুছিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বিজলীবাবু তাঁর বিছানাটা হাতে করে ঝাড়লেন, অকারণে, তাঁদের আনা চাদর বালিশই বিছানায় পাতা হয়েছে। বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে আপন মনে গুন গুন করে গাইছিলেন: 'সে দেখা দেয় দেয়, দেয় না, ধরা দিয়ে হায় ধরা দেয় না।' বিজলীবাবুর চোখেমুখে কিছু অন্যমনস্কতা; কি ভেবে ভেবে যেন কোনো হাসিও ঠোঁটে লেগে ছিল। স্যুটকেশ টেনে দু'একটা কি যেন বের করলেন, মাথার গরম টুপিটাও।

অবনী বাথরুম থেকে সামান্য পরে বেরিয়ে এল, ট্রাউজারস বদলে পাজামা পরেছে, গায়ে পাঞ্জাবির ওপর পুরু পুল-ওভার। বিজলীবাবু তখনও চেয়ারে বসে গুন গুন করে গাইছেন: 'সে যে ধরা দিয়ে ধরা দেয় না, শুধু আশার ভাষায় ফিরে চায় না।'

অবনী হেসে বলল, "আপনার সেই গা—ন?"

"সুরটা একবার আনবার চেষ্টা করছিলাম", বিজলীবাবু হেসে হেসে জবাব দিলেন, "ঠিক আসে না। বুঝলেন মিত্তির-সাহেব, এও ওইরকম—ধরা দিয়ে ধরা দেয় না।" বলে তাঁর সকৌতুক চাপা চোখ নিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, পরে বললেন, "জগতে এ বড় মজার খেলা, না মিত্তিরসাহেব, ধরা দিয়েও ধরা দেয় না।"

অবনী বিজলীবাবুর চোখের দিকে দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "সব খেলাই মজার।...যান, গরম জল ঠান্ডা হয়ে যাবে, ঘুরে এসে বসুন।"

বিজলীবাবু আর কিছু বললেন না, বাথরুমে চলে গেলেন।

অবনী অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল।

হৈমন্তীর ঘরে বসে গল্পগুজব হচ্ছিল। ঘরে আগুন রেখে গেছে বেয়ারা, জানলা বন্ধ, দরজাও ভেজানো; বাইরে শীতের প্রচণ্ডতা এখন আর অনুভব করা যাচ্ছিল না। গগন খানিকটা গল্পগুজব করার পর বিজলীবাবুর গান শুনতে উঠে গেল। আসলে গগন বিজলীবাবুর সঙ্গে খানিকটা রঙ্গরসিকতা করতে চায়। তাছাড়া, সে আপাদমস্তক আবৃত হয়েছে, উদ্দেশ্য: বিজলীবাবুকে টেনে নিয়ে পশ্চিমের ঢাকা বারান্দায় গিয়ে জ্যোৎস্নালোকে বাঁধের জল দেখবে।

অবনী আর হৈমন্তী মুখোমুখি বসে, হৈমন্তী বিছানায়, অবনী কাছাকাছি চেয়ারে।

অবনী বলল, "আপনিও একবার বাইরে গিয়ে দেখলে পারতেন। এতটা উঁচু থেকে সামনের লেকটা দেখতে এখন ভালই লাগত। চাঁদের আলোয় অতটা জল, আশেপাশে পাহাড় জঙ্গল, অদ্ভুত দেখায়।"

"দেখব—" হৈমন্তী বলল, "এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না, কুঁড়েমি ধরে গেছে ঠান্ডায়।"

"আপনারা দুই ভাইবোনেই ঠান্ডায় বেশ কাবু হয়ে পড়েন", অবনী হাসিমুখে বলল।

"অভ্যেস নেই। গগনের তো একেবারেই নেই, আমি তবু খানিকটা সইয়ে নেবার সময় পেয়েছি।" হৈমন্তীও হাসি মুখে জবাব দিল।

"তবু সইছে না—" অবনী ঠাট্টা করে বলল।

"না।" হৈমন্তী মাথা নেড়ে হেসে উঠল।

অবনী চোখ সরাল না, হৈমন্তীর হাসি দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি—"

হৈমন্তী তাকিয়ে থাকল, মুখের হাসি তখনও মুছে যায় নি।

অবনী বলল, "আমার আজকাল মনে হয়, এই জায়গাটা আপনার কোনো দিক থেকেই সইছে না।"

হৈমন্তীর মুখের হাসি মুছে গেল; ভীরুর মতন, হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়ার মতন তার চোখের কোলে এবং পাতায় কেমন অসহায়তার ভাব ফুটল। দৃষ্টি নত করে নিল।

অবনী অপেক্ষা করল, কেন করল সে জানে না ঃ হৈমন্তী কিছু বলবে এই আশায় হয়ত; বা এই দ্বিধায়, হৈমন্তী অসন্তুষ্ট হল কি হল না?

"কিছু মনে করলেন?"

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, না মনে করেনি।

অবনী সামান্য নীরব থেকে বলল, "আপনাকে আমি বন্ধুর মতন একটা কথা বলতে পারি।...প্রথম যখন এসেছিলেন—কি রকম, মানে আপনাকে অন্যরকম দেখাত ঃ আমার মনে হয়েছিল, আপনিও ডেডিকেটেড, সুরেশ্বরবাবুর মতন, ওই ধরনের কিছু...। আমি বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারছি না, নয়—" অবনী দ্বিধার হাসি হাসল। "সে যাই হোক, আপনাকে এখন তা মনে হয় না।...আপনার এখানে ভাল লাগছে না: অ্যানহ্যাপি। অন্ধ আশ্রমে আপনার কোনো টান নেই। আপনি ডেডিকেটেড নন।"

হৈমন্তী নিস্পন্দ বসেছিল; অবনীর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না। তার কোথাও ক্রোধ নেই, বিরক্তি নেই, অসন্তোষ নেই।

অবনী মুহূর্ত কয় অপেক্ষা করল। "আমি ভেবে পাই না, ঘরবাড়ি মা ভাই ছেড়ে কেন আপনি এখানে এলেন?... নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আপনি খুব জীবন্ত।...সুরেশ্বরবাবুর কাজকর্ম আপনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর সেবাটেবা দয়া-ধর্ম এসবেও আপনার মতি নেই।...কৃশ্চান নান্, আমি দেখেছি, আপনি নান্ নন।"
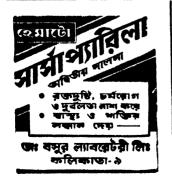
হৈমন্তী পায়ের ওপর থেকে শাল সামান্য তুলে নিল। তার ঈষৎ কুঁজো হয়ে নত মুখে বসে থাকা, তার নীরবতা, অসহায় আড়ষ্ট ভঙ্গি এখন কেমন ছেলে-মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। যেন এই হৈমন্তীর মধ্যে বয়সের দৃঢ়তা নেই; তার সেই গাম্ভীর্য, পেশার পৃথক মর্যাদা, ব্যক্তিগত সংযম ও গোপনতাও আর নেই।

"যেখানে আপনার মন নেই, যা ভাল লাগে না, যাতে বিশ্বাস নেই—সেখানে আপনি কেন এলেন আমি জানি না।" অবনী যেন ধৈর্য হারাচ্ছিল।

হৈমন্তী হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। "বেশিদিন আর থাকব না।"

অবনীর মনে হল হৈমন্তীর গলার স্বরে শীতের বাতাসের মতন ঠাণ্ডা কনকনে একটা ভাব ফুটল।

"আমার কথায় রাগ করলেন?"

"না।"

"আমার পক্ষে হয়ত এ-সব কথা বলা উচিত হল না। তবু বললাম।...আপনাকে আমার অদ্ভুত মনে হয়...কেন এসেছেন, কেন আছেন..."

"কিছু না। হয়ত শখ..."

"শখ নয়।"

"তাহলে কিছু ভেবে এসেছিলাম।... আপনি কি শুধু চাকরির জন্যে এখানে এসেছেন?"

অবনীর চোখ মুখের ওপর প্রবল জোরে যেন কেউ ফুঁ দিল, চমকে ওঠার মতন হল অবনীর। হৈমন্তীকে দেখল, বলল, "সত্যি কথা শুনবেন?"

হৈমন্তী তাকিয়ে থাকল।

"আমি পালিয়ে এসেছি।"

হৈমন্তী কথা বলল না, কিন্তু তার চোখে গভীর কৌতূহল ও প্রশ্ন ছিল, যেন তার দৃষ্টি বলছিল ঃ পালিয়ে এসেছেন? কিন্তু কেন?

অবনী হৈমন্তীর চোখের বিস্ময় ও প্রশ্ন লক্ষ করতে করতে বলল, "আমার আর কিছুই ভাল লাগত না, চাকরিবাকরি, বন্ধু-বান্ধব, বাড়ি—কিছু না। সব কেমন একঘেয়েমির মতন হয়ে উঠেছিল। খুব ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম।" অবনীর মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ভাব ফুটছিল, গলার স্বরে হতাশা। "বোঝানো মুশকিল, ঠিক যে কি বোঝাতে চাইছি তাও জানি না—" অবনী ম্লান একটু হাসল, "আমার মনে হত, আমার মধ্যে আর কিছু নেই, শুকিয়ে গেছে, বা যা ছিল পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জীবনের এই অবস্থাটা এত খারাপ... অসহ্য..."

হৈমন্তী অপলকে তাকিয়ে থাকল। মনে মনে যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল।

কিছু সময় দু পক্ষই নীরব। শেষ পর্যন্ত অবনী এই বিষণ্ণ স্তব্ধতা কাটাবার জন্যে নড়েচড়ে বসল, সিগারেট ধরাল, তার পর বলল, "আমার আসার সঙ্গে আপনার আসার কোনো মিল নেই। আমি যেন অনেকটা পালিয়ে কোথাও মাথা লুকোতে এসেছি; আপনি তো তা নন—আমার ধারণা, আপনি কোনো আশা নিয়ে এসেছিলেন।"

হৈমন্তী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল না, কিন্তু বুকপিঠের ওঠাপড়া লক্ষ করা গেল।

সামান্য পরে হৈমন্তী হঠাৎ বলল, "চলুন, বাইরেটা দেখে আসি।"

স্বপ্নের মধ্যে দেখা বুঝি ঃ অস্পষ্ট কোমল কেমন এক আচ্ছন্নতার জগৎ যেন স্থির হয়ে আছে। হিম-জ্যোৎস্নায় জড়ানো চরাচর, ব্যাপ্ত শূন্যতার মধ্যে কোনো স্তব্ধ শান্ত বিশাল এক হ্রদ যেন পড়ে আছে নীচে, দূরে রেখার মতন পার্বত্য অঞ্চল, স্লুইস্ গেটের পদতলে বিষণ্ণ এক নদী। হৈমন্তী শূন্য দৃষ্টিতে দেখছিল, তার চেতনার কোথাও বুঝি কিছু ছিল যার অদ্ভুত এক অনুভূতি তাকে নির্বাক, পরম দুঃখী, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। বাঁধের জলের দিকে চোখ রেখে হৈমন্তী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, শীত আবার তাকে শিহরিত করল।

অবনী বলল, "ঘরে যাবেন?"

হৈমন্তী নীরব। তার মাথায় ঘোমটার মতন শাল জড়ানো, শালের পাড়ের একটা পাতা কপালের কাছে শুকনো পাতার মতন কালচে দেখাচ্ছিল।

অবনী আবার কি বলতে যাচ্ছিল, হৈমন্তী মুখ ফেরাল।

"চলুন, যাই—" হৈমন্তী বলল, "কেমন যেন লাগে দেখতে—"

"থাকবেন আর খানিকটা?"

"না। আমার বেশি ঠাণ্ডা লাগানো উচিত না—" হৈমন্তী ফেরার জন্যে পা বাড়াল। ফিরতে ফিরতে বলল, "আজ এসে ভালই করেছি। না এলে কত কিছু দেখতে পেতাম না।"

অবনীর মনে হল, হৈমন্তী 'কত কিছু' কথাটা যেন কেমন করে বলল।

মাঝ এবং শেষ রাতের কোনো সময়ে অবনীর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, কে যেন তাকে ডাকছে। নেশায় সে কিছু শুনছে কি শুনছে না, অথবা ঘুমের ঘোরে শুনছে, বুঝল না। ঘর অন্ধকার। বিজলীবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

অবনী বালিশ থেকে সামান্য মাথা তুলে শোনবার চেষ্টা করল, কে তাকে ডাকছে।

(ক্রমশ)

পাড়ে, আঁচলে, জাঁকজমকে সুন্দর সমন্বয় এনেছে কোমল সৌন্দর্য
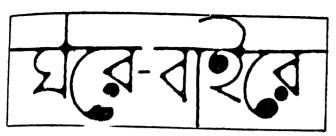
কাঞ্চীপুরম শাড়ির কথা

ভারতের অর্থনীতির বাঁধনহারা অধোগতি কার্পাস শিল্পে সংকটের সম্ভাবনায়ও হাত বাড়িয়েছে। রেশম শিল্পের সংকট তারও আগে সূচিত হয়েছে, তবে সাধারণের দৈনন্দিন কেনাকাটার সামগ্রী নয় বলে হয়তো আমরা খবরের কাগজের তোলপাড় করা খবরে জানিনি। রেশম, বিশেষত বাংলার রেশম সংকটাপন্ন। অল্প দামে যা বাজারে রেশমী শাড়ি বা কাপড় চালানো হয়, তার কোনটাই খাঁটি রেশম নয়। আবার মূল্য বেশী দিতে খদ্দের নারাজ। কারণ, তথাকথিত মুর্শিদাবাদ শাড়ির চেয়ে চমকদার, ঘন বুনুনি টেকসই রেশম দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা থেকে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় শহরে আমদানি করা হয়। যে-সব প্রতিযোগী রেশমশিল্প সুন্দরী সমাজকে বাংলার গরদ তসর রেশম থেকে আকর্ষণ করে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর এবং কাঞ্চিপুরী প্রধান।

রেশম শিল্পের জন্ম কোথায়, আমরা জানি না। তবে সাধারণ বিশ্বাস, চীনেই প্রথম তুঁতগাছের রেশম কীট কাজে লাগানো হয়। সেখান থেকে এক দিকে কোরিয়ার পথে জাপান, অন্য পথে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়ে ভারতবর্ষে রেশম-গুটি প্রথম যাত্রাপথ খুঁজে পেয়েছিল। কথিত আছে, চীন সম্রাজ্ঞী সিলিং ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট হুয়ানতির পত্নী। তিনিই রেশম শিল্পের পথপ্রদর্শয়িত্রী কিন্তু সে শিল্প অন্যত্র প্রসার লাভ করবে, সহ্য করতে পারতেন না। দারুণ কড়া নিয়ম এড়িয়ে কোন এক চীন রাজকন্যা মাথার চুলে রেশম কীটের ডিম লুকিয়ে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শ্বশুরঘর করতে এসেছিলেন। জাপানীরা তো আজও তাদের শ্রেষ্ঠ রেশম গুটির বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। আবার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নজিরে কখনও-বা ধরা হয়েছে রেশম ভারতবর্ষেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছে। গঙ্গার উপত্যকা থেকে খোটান, পারস্য, মধ্য এশিয়া ইত্যাদিতে রেশম শিল্প ছড়িয়ে যায়। অ্যারিস্টটলের লেখাতে ভারতের রেশমের উল্লেখ আছে। আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর মুখে মুখে হয়তো ভারতের আর পাঁচটা ঐশ্বর্য ঐতিহ্যের মত রেশম কাহিনীও পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময় হয়েছিল।

এতো সব পুরোনো ইতিহাস। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের পাতায় দাক্ষিণী শাড়ি ও রেশমী কাপড়ের মহিমায় যে-সব এলাকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার মধ্যে বারানসী এবং কাঞ্চীপুরে প্রধান বললে অত্যুক্তি হয় না।

মাদ্রাজ শহরের ৪৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঞ্চীপুরম শহর। ব্রিটিশ আমলে শাসকদের সংগে সংগে আমরা কাঞ্চীপুরমকে বলতাম কাঞ্জীভরম। তাই শাড়ির নামও হয়েছিল কাঞ্জীভরম শাড়ি। ছোট-বড় মন্দিরময় এই নগরী এক সময় পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল এবং ইতিহাসে তার গরিমার অন্য রূপও ছিল। তারপর চোলা ও বিজয়নগর রাজ্যের অধীনেও গরিমার মর্যাদা বজায় ছিল। সেকালে এ অংশের নাম ছিল থোণ্ডাই-মণ্ডলম। চোলা রাজ কারি কাল নাকি বনজঙ্গল কেটে কূপ আর দীঘি কাটিয়ে নানাভাবে থোণ্ডাইমণ্ডলমের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন। খ্রীষ্টোত্তর দুই শতাব্দীতে পল্লব রাজাদের শুরু থেকে কাঞ্চীপুরম এই থোণ্ডাইমণ্ডলমের বর্ধিষ্ণু শহর। কিন্তু রেশম শিল্প কবে থেকে কিভাবে কাঞ্চীপুরমের বৈশিষ্ট্য হয়েছে, তার কোন খবর কোথাও স্পষ্টভাবে রাখা নেই। আমাদের রেশম শিল্প যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদির তুঁতগাছের চাষ, রেশম কীট পালন থেকে নিয়ে তাঁত বোনা পর্যন্ত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাঞ্চীপুরমের শিল্প মোটেই তা নয়। কাঁচামাল হিসাবে রেশম আসে বাইরে থেকে, সোনা-রূপোর জরি আসে সুরত থেকে। রেশমের অধিকাংশ ব্যাঙ্গালোর এলাকার। মহীশূর মালভূমি রেশম কীট উৎপাদনের জন্য আদর্শ। বাতাসের আর্দ্রতা তাপমাত্রা যেন ঠিক মাপ করা। ব্যাঙ্গালোর রেশমই নাকি আবার বাংলার কাঁচা রেশমের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

যেখান থেকেই কাঁচামাল আসুক, শিল্পের ইতিহাসও কিন্তু কাব্যের ছিটেফোঁটায় সেই অতীত গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চায়। তামিল সাহিত্যের মহাকাব্য শিলপ্পাধিকরম। অনুমান খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীতেই লেখা। সে সময় কাবেরী-পুমপট্টিনম ছিল জমজমাট বন্দর। শিলপ্পাধিকরমে সেখানকার রেশম, পশম ও কার্পাস শিল্পের কথা আছে। কাবেরী-পুমপট্টিনম একদিন সাগরজলে তলিয়ে যায়। হয়তো বা যারা বেঁচেছিল তাদের মধ্যে কিছু তন্তুবায় বা সালিয়ার কাঞ্চী-পুরমে আশ্রয় নেন। সেই সালিয়াররাই প্রধানত কাঞ্চীপুরমের সুন্দরী মনোহরণ শিল্পের শিল্পী। সালিয়ার জাতি বলেন, তাঁরা ঋষি মৃকণ্ডের উত্তর পুরুষ। মৃকণ্ড ঋষি দেবতাদের তন্তুশিল্পী। আবার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে আছে যে, সালিয়ার তন্তুবায় জাতি বেশীর ভাগই তাঞ্জোর জেলায়। তাদের আদিবাস অন্ধ্র দেশে। চোলা রাজা প্রথম রাজা রাজা (Raja Raja) পূর্ব চালুক্য এবং চোলা মিলনের পর অন্ধ্র দেশ থেকে সালিয়ারদের আমন্ত্রণ করে আনেন।

কাঞ্চীপুরমের শিল্পী নাকি এককালে কার্পাস বস্ত্র বয়ন করতেন। কিন্তু পাড় ও আঁচলে রেশম রাখতেন। অন্ধ্র দেশের গাধোয়াল বা নারায়ণ পেট শাড়িতে এখনও যেরকম হয়। ক্রমশ সুতীর অংশ কমিয়ে দিয়ে অবশেষে পুরো রেশমের আভিজাত্য-পূর্ণ রেশমী ও জরির কাজ চলন হয়েছে। আজও কাঞ্চীপুরের প্রত্যেক তাঁতী যে রেশম শিল্পী তা নয়। যাঁরা রেশমী শাড়ি বোনেন, সমাজেও তাঁদের মর্যাদা বেশী। তাঁরা সুতীর কাপড় বোনাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিল্প মনে করেন ও নিজেরা কখনও বুনতে রাজী হন না।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, সোনালী জরির কাজ এখন কত কম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিছু রাসায়নিক প্রণালীতে কৃত্রিম জরি তৈরি হবার খবর শুনেছি. কিন্তু ব্যাপকভাবে ভাল জরির ব্যবহার যা হয়, তার মান কিছু নেমে থাকলেও সোনা-রুপোর সামান্য ব্যবহার এখনও হয়। সোনা-রুপোর দামের উপর তাই জরি এবং জরিযুক্ত কাপড় নির্ভর করে। সোনালী জরিতে রেশমী সুতের উপর রুপোলী জরিই জড়ানো হয়, তবে সেই রুপোলী জরিকে সোনার জল করে ধুয়ে নেওয়া হয় বা গিল্টি করা হয়। যদি শতকরা ৭৮ ভাগ রুপো হয় তো ২১ ভাগ রেশম এবং মাত্র এক-শতাংশ সোনা। এক সময় সোনা বা রুপোর অংশ এত বেশী হত যে, বেশী কাজ-করা শাড়ির ওজন হত ভারী আর শাড়ির জরি গলিয়ে সোনা-রুপো পুনরুদ্ধার পর্যন্ত করা যেত। কাঞ্চীপুরম শাড়ির জরিও সব সময় উচ্চ মানের হয় না, তবে সরকারী তথ্য সংগ্রহে ঐ শতকরা হিসাবই রাখা হয়েছে। কাঞ্চীপুরমের টিস্যু শাড়িও আজকাল বেনারস টিস্যুর মত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাড় এবং পড়েন বা আড়াআড়ি সুতো সোনালী রুপোলী রেখে টিস্যুর বোনা সতর্কভাবে শিল্পী চালিয়ে যান। জরির বুনুনি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ নিপুণতার নিদর্শন।

আমাদের বাংলার তন্তুবায় সংসারের মত কাঞ্চীপুরমের শিল্প প্রায় পারিবারিক আয়োজন। সুতো জড়ানো থেকে আরম্ভ করে শাড়ি পাট করা পর্যন্ত তন্তুবায় সংসারে সবাই অল্পবিস্তর সাহায্য করে যান। সমাজেও অন্ন-সংস্থান বা উপ-জীবিকা হিসাবে শিল্পের নানা অংশ নানা লোকের মধ্যে ভাগ করা থাকে বলে বহু লোকের উপায় হয়। ১৯৬৪ সালের হিসাবে কাঞ্চীপুরমের লোক-সংখ্যা ছিল এক লাখের কিছু কম। তার মধ্যে ২০,০০০ তাঁত চলে। ৬৫০০ তাঁত রেশমের। প্রায় আড়াই হাজার পরিবার তাঁতের কাজে উপজীবিকা সংগ্রহ করেন, কিন্তু অন্যান্যভাবে তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপজীবিকা অর্জন করেন প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার লোক। এ ভিন্ন অল্প সময় সামান্য কিছু কাজ প্রায় বহু সংসারের মেয়েরা, এমনকি, ছোট ছেলেরাও করে।

কাঞ্চীপুরম শাড়ির আধুনিক নমুনা
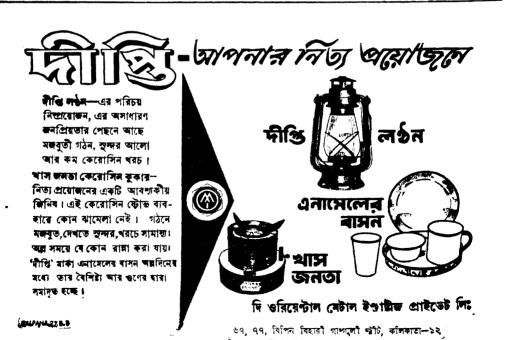
নকল করতে গিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে কিছু পরিমাণ। ব্যবসায়ীরা বলেন, রুচির সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে হলে সিনেমার নামে শাড়ি অথবা বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মনোরঞ্জক নকশা, বাহার, সবই প্রয়োজন। আমাদের যেমন 'মানে-না-মানা' অথবা কোন বোম্বাই ছবির নামের শাড়ি হয়, কাঞ্চীপুরম শাড়িতেও হয় "কল্যাণ পরিসু" বা "নেন নীলভু"। সারা ভারতের যা লোকপ্রিয় "motive" বা অলংকরণ তারই দু-একটা রকমফের কাঞ্চীপুরম শিল্পেরও অবলম্বন। "পাতা, ফুল, আম, দীপক" ইত্যাদি পরম আদরণীয় অলঙ্করণ। আবার নূতনত্বের আমেজ এনে শিল্পী কোথাও-বা নকশা দিলেন "নয়া পয়সা"!

কাঞ্চীপুরম শাড়ির কদর বাইরেও যথেষ্ট, কিন্তু দক্ষিণী মহিলা সমাজ কাঞ্চীপুরম শাড়ির সবচেয়ে বড় খদ্দের। শতকরা ৭৫টি শাড়িই মাদ্রাজ প্রদেশে বিক্রি হয়। তবে মাদ্রাজের বাইরে মহিলা সমাজের রুচি সম্বন্ধে কাঞ্চীপুর সচেতন হয়ে উঠছেন। শুনে অবাক হলাম যে, বিক্রির হিসাবের উপর নির্ভর করে কাঞ্চীপুর তাঁতী সম্প্রদায় মন্তব্য করেছেন যে কলকাতার মেয়েরা কোমল ও মোলায়েম রং ও কারুকার্য পছন্দ করেন। হালকা নীল গোলাপী, ধূসর ইত্যাদি বাংলার রুচির জন্য তাঁরা বেশী তৈরি করেন। ওদিকে মাদ্রাজে নাকি গাঢ় রং, যেমন কমলা, ঘোর নীল, সবুজ ইত্যাদির কাটতি বেশী। আবার অলংকরণের বেলায়ও মাদ্রাজের মেয়ে যেখানে ঢালা জরির "আয়াম" বা হাঁসে কিনারা খুঁজবেন, বাঙালী মেয়ে খুঁজবে ছোট আম বা দীপকের বাহার।

"আম" অলংকরণটি সম্বন্ধে আমার নিজস্ব একটু কথা অবান্তর হলেও, বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কাশ্মীরী শালের কল্কা থেকে নিয়ে দক্ষিণী নকশা "আম" মনে হয় একই ধারার বিভিন্ন নাম। হিল্লোলিত পাইন শাখা থেকে শালের কল্কা এসেছে, না, ঝেলাম নদীর মন্থরগতির বাঁক থেকে কল্পিত হয়েছে কল্কা, জানি না, কিন্তু আমও ঐ কল্কারই মত। ভারতবর্ষের যত রকম অলংকরণ নজরে ঠেকেছে, তার একটা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায়, এই কল্কা বা আম জাতীয় মোটিফ দেশজোড়া শিল্পের সংহতির চমৎকার নিদর্শন। মনে হয় আমাদের দেশে যে জরি বা সুতী কি সিল্কের দাত হত, তা-ও এই একই ভাবের প্রভাব অথবা তার অপভ্রংশ। ওয়াটসন সাহেব তাঁর বই "Textile Manufacturers and Costumes of People of India" বইখানাতে আমাদের রুচির দ্রুত পরিবর্তন বিরোধিতা সম্বন্ধে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন:

"Among the people of India, there is not that constant desire for change in the costume which is noticeable in Europe. Some patterns have been there for centuries.......Indian taste in decoration is in the highest degree refined. Such combination of form and colour as many of these specimens exhibit, everyone will call beautiful, and this beauty has one constant feature—a quietness and harmony which never fail to fascinate."—

নীল শাড়িতে, কমলালেবু রং-এর উপর জরির চাটাই পাড়। দুখানা শাড়িতেই "আম" অলংকরণ লক্ষ করবেন পাড়ের তলায়

পাশ্চাত্ত্য সুন্দরীদের এ-মাসে ও-মাসে রং বদলায়, নমুনা বদলায়। আমাদের সজ্জায় আমরা শিল্প-সৌন্দর্যকে ঐতিহ্যময় করে তুলতে চাই। তাই কাশ্মীরের দোদুল্যমান পাইন শাখই হক বা হাওয়ায় লুটিয়ে-পড়া দেবদারু শীর্ষই হক, ঝেলামের বাঁকই হক বা পল্লব ঘন আম্রকাননের একটি রসাল ফলই হক—রূপসৃষ্টির বেলায় আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রত্যেক শিল্পীর মন একই রসে হিল্লোলিত হয়, আর রসিক সুন্দরী তার নমুনা নেন সাদরে; গ্রহণ করে [illegible] সাত্ত্বিক অথবা কল্পনা থেকে [illegible] বেশভূষায়।

শ্রীমতী
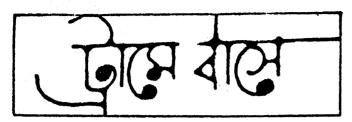
শ্রী রাজাগোপালাচারী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত গো-হত্যা আন্দোলন বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন

—"বুড়ো হলে কী হবে, রাজাজীর চোখে এখনো ছানি পড়েনি। কালো চশমার আড়ালেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন, নির্বাচন ক্ষেত্রে গো-হত্যা অনিবার্য, সুতরাং আগে-ভাগে এই নিয়ে ঝামেলা করার মানে হয় না!!"

একটি বিদেশী সংবাদে শুনিলাম, কোন এক বিবাহিত ভদ্রলোক স্ত্রী বর্তমান সত্ত্বেও প্রেম করিয়া বেড়াইতেন। ইলেকট্রিক শক-এর সাহায্যে তাঁহার প্রেমের ভুত তাড়াইবার ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল। পর্দায় প্রেমিকাদের একটি একটি ছবি ভাসিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ে লাগে ইলেকট্রিক শক। —"পুরনো দিন হলে এত ইলাহী ব্যবস্থার প্রয়োজন হত না। ইলেকট্রিক শক-এর বদলে একটি মুড়ো ঝাঁটাই ছিল যথেষ্ট"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির বহু সদস্য সরকারকে চতুর্থ যোজনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাঁদের সঙ্গে এই অনুরোধ আমরাও সরকারকে করি। তবে মনে হয় খাদ্য উৎপাদন জোরদার করতে হলে ছাত্রদের অনুরোধ জানানো উচিত। বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ; 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে'র সুবিধেও নেই, সুতরাং আমরা চাষ করি আনন্দে!!"

ডেভিস কাপ খেলার শেষের দিনে শ্রীকৃষ্ণন নাকি বলিয়াছেন যে তিনি কালীঘাটের প্রসাদ খাইয়া খেলায় জিতিয়াছেন। কোন কোন উগ্র সমর্থক নাকি কালীঘাটে পুজো দিয়া মায়ের সিন্দুর কৃষ্ণনের কপালে পরাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রসাদ খাইতে দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"ব্রেজিলের বিজিত কক যেন না মনে করেন মা কালীর প্রসাদই তাঁর হারের কারণ; কৃষ্ণন যা র‍্যাকেট চালিয়ে গেলেন তার ধার মা কালীর খড়্গেও নেই!!"

একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, ভেজালে স্থান নাকি রাজস্থানের প্রথম সারিতে। সহযাত্রী সখেদে বলিলেন—"হায় বাংলা, তুমি এই সামান্য ব্যাপারেও কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলে না!"

পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে মৃগদাব রচনার কথা চিন্তা করা হইতেছে। —"হলে খুবই ভালো, না হলে—'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে'—গান তো আছেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বহু শলা-পরামর্শেও নির্বাচন-যুদ্ধে বাম-ঐক্য সাধন সম্ভব হইল না, দু'টি বিরোধী নির্বাচনী ফ্রন্ট অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে এবং বাম-কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি ফ্রন্ট ইতি-মধ্যেই জন্ম নিয়াছে। —"আর মাত্র দু' মাস পরে নব-জাতক কি নির্বাচনী ফ্রন্টে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করতে পারবে"—প্রশ্ন করে আমাদের শ্যামলাল।

"সুবর্ণ গান্ধী নিন্দুকের ভূমিকায়"—একটি বেদনী রোনাম নিয়া আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল শল্য হলো রথী।"

এক সংবাদে প্রকাশ, ন্যায্যমূল্যের দোকানে নাকি দুর্নীতি চলিতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সখেদে মন্তব্য করিলেন—"শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথা।"

সরকার "প্রেক্ষাগৃহগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন সমস্ত শো-এর শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজাইতে হইবে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্তি পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে দণ্ডায়মান থাকতে দর্শকদের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা সে সংবাদ এখনো পাইনি"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে পড়িলাম, রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ সরকারের নেতা আয়ান স্মিথ এমন কোন শাসনব্যবস্থায় রাজী হইবেন না যাহাতে শ্বেতাঙ্গরা ক্ষমতার স্বর্গ হইতে নির্বাসিত হয়। সম্পাদক মশাই অতি সত্য কথা বলেছেন। অনেকে বলছেন উইলসনের এ সম্পর্কিত পাঁচটি ভাওতা মাত্র। অবশ্য শ্বেতাঙ্গরা ও গান ধরে নাটক ক

...গান—আয়ান দাদা গো বউ ধরা এক কুম্ভীর এল যমুনায়"—সহযাত্রী কবিয়ালের গানটি সুর করিয়া শুনাইলেন।

ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া গেলে 'ট্রামে-বাসে'র কী হইবে এ প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"খুড়ো শ্যামলালরা রাজী হলে আমরা ঠেলা-টেম্পোতেই চলব; কী আর করা যাবে, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে"—বলেন সহযাত্রী।

অ্যারেন্‌জ্‌মেণ্ট ইন গ্রে অ্যাণ্ড ব্ল্যাক

সাদা-কালোর বিষণ্ণতা : জেমস হুইসলার

শিল্পকলায় যখন নতুন কিছু হয়, সমসাময়িক পঞ্চাশ উর্ধ্বের লোকেরা বলে, গোল্লায় গেল জাতি, নীতিবাদ, বিশ্বাস—চল্লিশের নিচে যারা তারা গোপনে গোপনে স্বীকার করে, বেশ ভালোই লাগছে—তিরিশও যাদের হয়নি তারা লাফালাফি মাতামাতি নকলে পাগল করে দেয়। হুইসলারের অভ্যর্থনা মার্কিন দেশে পরিষ্কার উক্ত ফর্মুলায় পড়ে যায়। বুড়োরা ক্ষেপে অস্থির, সদ্যবিগতযৌবনরা কিছুটা দুগ্ধ ছেলে-ছোকরাদের উল্লাসে টেঁকা যায় না।

১৮৩৪ সালে জন্ম হয় ম্যাসচুসেট্‌সের লওয়েল শহরে। বাবা ছিলেন বিখ্যাত ওয়েস্ট পয়েণ্টে পাস করা জেনারেল এবং সেই সময়ে মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেলের ইঞ্জিনিয়ার। সব ছেলেই ছোট বয়সে বাবার পায়ের রেখায় চলে, হুইস্‌লারও তাঁদের মতো ভর্তি হয়েছিলেন মিলিটারি ইস্কুলে—কিন্তু দুদিনেই অসহ্য হয়ে উঠলেন। এর পরের দৃশ্য প্যারিসের কাফে গুয়েরবোয়ায় হুইস্‌লার, ব্রাকমোঁ, বোদলেয়ার, ফাঁতাঁ লাতুর প্রভৃতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগে পুরোপুরি পারিসিয়ান।

১৮৬০ সালে হুইস্‌লারের প্রথম প্রদর্শনী হয় সালঁতে এবং কুর্বে তাঁর ছবির ভক্ত হয়ে ওঠেন। এর পর তিনি আর একটি ছবি পাঠান সালঁ প্রদর্শনীর জন্য কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভয়ঙ্কর রেগে যোগাযোগ করেন তখনকার বিখ্যাত বিদ্রোহী ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে এবং বাস্তববাদী ঢঙ ছেড়ে এদের ধারায় ছবি আঁকা শুরু করেন। হুইস্‌লার শুধু যে পূর্বসূরিদের রূপেশী বাঁধনই নাকচ করলেন তা নয়, রোমাণ্টিকদের বায়বীয় উচ্ছ্বাসও তাঁর ভালো লাগল না। এই সময়ে তিনি একবার কিছুদিনের জন্য চিলিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর ছবিতে, এতদিন যা দেখা যায়নি, এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র মেজাজ দেখা গেল, বা থেকেই তাঁর সত্যিকারের তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকরের জীবন আরম্ভ। ১৮৯০ পর্যন্ত হুইস্‌লার অনবরত ভ্রমণ করেছেন ইউরোপের নানা দেশে, কখনো ভেবেছেন ইটালিতেই থেকে যাব, কখনো বেলজিয়ামে, কিংবা মনে হয়েছে এর কোনো জায়গাই অনুকূল নয়, মার্কিন দেশেই ফিরে যাব, কিন্তু মার্কিন দেশে তাঁর ফিরে যাওয়া হয়নি; প্যারিসেই আস্তানা গেড়েছেন ১৮৯০-এর পর থেকে। তবে তাঁর মাঝের অনেক বছর কেটেছে লণ্ডনে। রাস্‌কিনের সংগে এই লণ্ডনে সেই ঐতিহাসিক মামলা হয় তাঁর।

আসলে ভিক্টোরিয়ানরা হুইস্‌লারকে দেখতে পারত না কারণ অন্ধকারধর্মী তাঁর ছবির মধ্যে না ছিল নীতিকথা, না ছিল কোন আশাবাদ, এবং তিনি যেহেতু সত্য কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ক্যানভাসে, তাই রাস্‌কিন প্রভৃতি ভিক্টোরিয়ান কপটরা সুযোগ পেলেই কলমের আক্রমণ চালাতেন হুইস্‌লারের ওপর। রাস্‌কিনের এই আক্রমণ একবার একটু বেশী হয়ে গেল। সেই ছবি "নক্টার্ন ইন সিলভার অ্যাণ্ড ব্ল্যাক", তার জন্য হুইস্‌লার দাম ধরেছিলেন

দ্য শো গিনি—এটা ঠিকই, তিনি ঈষৎ গর্বিত আর চালিয়াত গোছের ছিলেন, কারণ, কোনক্রমেই তাঁর এই ছবিটির দাম এত হতে পারে না, ওটা শুধু একটু লোক দেখানো ব্যাপার ছিল, কিন্তু তাতে রাস্‌কিনের এত ফোসকা পড়ার কী আছে—তিনি লিখলেন, "আমি এই ধরনের ছোটলোকী গর্ব অনেক দেখেছি, কিন্তু কখনো এমন নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখিনি যে, একটা ফালতু চালিয়াত দ্য শো গিনি দাম হাঁকছে এক ভাঁড় রঙ লোকের মুখে ছুঁড়ে দেবার জন্য"। অনেক দিন ধরেই রাস্‌কিন যাহা-তাহা গালাগাল দিচ্ছিলেন তাঁকে নানা পত্রিকায়, কিন্তু এবার আর সহ্য হল না, হুইস্‌লার মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন। এই মামলার ব্যাপারটা লোকের খুব মজার ঠেকেছিল এবং মামলা-গৃহ নাকি সেদিন লোকের হাসিতে ফেটে পড়েছিল যখন দেখা গেল হুইস্‌লার মামলার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে, এক ফার্দিং ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেয়ে দর্পিত ভঙ্গিতে বিজয়ের হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই মামলার জন্য হুইসলার এত খরচ করেছিলেন যে, তাঁর অর্থনৈতিক ধাক্কার জের ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জীবনের ব্যাপারগুলো অনেকক্ষণ বললুম, তাঁর ছবির বিষয় কিন্তু এখনো কিছুই জানা হ'ল না। যদিও হুইসলারের ছবিতে সেই ঝাঁজ বা নেশা নেই, যা একটি যুগকে জয় করে নিতে পারে, তবু তাঁর

নকটার্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিলভার
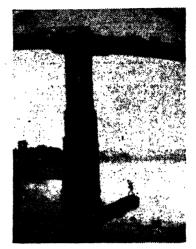
ছবিতে বর্ণবিন্যাস এবং বিষয়-বিন্যাসের আশ্চর্য মিলনে যে দৃশ্য-কবিতার জন্ম নেয়, তাকে অপূর্ব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি ইম্প্রেশনিস্টদের মতো এক-একটি রঙের সুর অন্বেষণে ব্রতী ছিলেন, যা তাঁর ছবির কয়েকটি নাম বললেই বুঝতে পারবেন—যেমন "হারমনি ইন গ্রে অ্যান্ড গ্রীন", কিংবা "অ্যারেন্জমেন্ট ইন গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক" বা "সিম্ফনি ইন হোয়াইট" প্রভৃতি। তাঁর ছবির মধ্যে এক ধরনের আগন্তুকের দৃষ্টি ছিল, তিনি কখনোই একাত্ম হতেন না তাঁর "বিষয়ে"র সঙ্গে, তারা শুধুমাত্র কম্পোজিশন বা ছবি বা রঙ হ'য়েই ছবিতে উপস্থিত। এখানে ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে তাঁর একটি বিরাট তফাত। তাঁর চিত্ররীতি বা শৈলী খুব নিঃসন্দেহ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাঝে মাঝে সামান্য অস্বস্তিকরও হয়ে ওঠে, কারণ, চিত্রে ভাস্কর্যের যে স্থান রয়েছে, যার ফলে ক্যানভাসে "বিষয়" আঁটো ভাবে গেঁথে আছে মনে হয়, তা তিনি সম্পূর্ণ নাকচ করেছেন তাঁর ছবি থেকে। কিছুটা বায়বীয় তাই তাঁর অনেক চিত্র। যে-কোনো শিল্পই যদি অধিক মনোরম হ'য়ে পড়ে তা হলে মহৎ হ'তে পারে না, তা হুইস্‌লারের এটাই ছিল অসুবিধে।

আসলে তাঁর ছবিতে কবিতার দিকটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়, তাঁকে বলাই হয় "টেমস নদীর কবি"। টার্নার যেমন টেমসে দেখেছিলেন রঙের এক প্রোজ্জ্বল সংমিশ্রণ, হুইস্‌লার ঠিক সেই চোখ নিয়েই দেখতে পেয়েছিলেন অন্ধকারে নদী শরীর হারিয়ে হালকা হাওয়া, আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। হুইস্‌লারের ছবি অতীতের কথা বলে, স্মৃতি থেকে উঠে-আসা গুঞ্জন, কণ্ঠস্বর, মুখ, শরীর ভেসে বেড়ায়। উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করা যাক, "অ্যারেন্জমেন্ট ইন গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক" এবং "নকটার্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিলভার" দুটি চিত্র রচনা।

দুটো ছবির, যদিও একটি পোর্ট্রেট এবং অপরটি দৃশ্য, কোনোটাই যেন এঁকে দেখা নয়, অতীতের দৃশ্য হঠাৎ চোখে ভেসে এল। পোর্ট্রেটটি চিত্রকরের মায়ের, কিন্তু লক্ষ করুন, কোথাও কোনো আলো নেই, বিষণ্ণতা হাওয়ায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, ঘুমের নেশার মতো লাগে। চিত্রবিন্যাস সরল, অনাড়ম্বর, কিন্তু নির্মিত—ছবিটির "চরিত্র"কে তুলে ধরে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে না, সাদা-কালোর এবং 'বিষয়ে'র বিন্যাসের মধ্য থেকেই বিষণ্ণতার সুর উঠে আসছে। এই ছবিটি থেকে এক ধরনের নরম বাজনা বাজে, চারিদিকের আবহাওয়া শীতল হ'য়ে যায়।

অন্য ছবিটিও তাই, প্রায়ান্ধকারে যে ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, তা শুধু একটি কম্পোজিশন মাত্র, সমস্ত জিনিসটা নির্ভর করছে সাদা কালোর এক বিশেষ জায়গায় উপস্থাপনের মধ্যে—আমাদের হারিয়ে-যাওয়া সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যেন নেশার ঘোরে আসলে এ ছবিতে কিছুই নেই তাঁর হাওয়াটা ছাড়া; এক ভয়ংকর মন-খারাপ করা সন্ধ্যা যেন মনে পড়ে যায়, যার বিষয় শুধু দু-একটি রঙ আর রেখা ছাড়া আর সবই ভুলে গেছি।

শুদ্ধশীল বসু

ছাত্র আন্দোলন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গত দু'মাস ধরে কলকাতায় যে ব্যাপক ও বিরাট ছাত্র আন্দোলন চলছে তার সপক্ষে ও বিপক্ষে আমার কিছু বলবার আছে। আমি নিজে একজন ছাত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে বার বার ছাত্রসভায় অংশ গ্রহণ করেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সামান্য বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যে হাজার হাজার ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা ধারণার বাইরে। গত ১২ই নভেম্বর ল' কলেজে একজন ছাত্র বলেছেন, ল' পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলে নাকি তাঁর চাকুরি-স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের স্থান থেকে বিচ্যুত হবেন। তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কোথায়? বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষিত ছেলেদের চাকুরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। যাদের ভিতরে জোর আছে তাদের কথা পৃথক কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়। তাদের কথা, সর্বোপরি দেশের শিক্ষা-জগতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ একটা মীমাংসার পথে আসতে পারতেন।

এবার ছাত্র আন্দোলনের কথা বলি। ছাত্র আন্দোলন কলকাতার কলেজে নতুন নয়। তবে এবার নির্বাচনী বৎসর। ছাত্র-আন্দোলনের প্রহসনকে জিইয়ে রাখতে পারলে বিরোধী দলগুলির সুবিধা কিঞ্চিৎ বেশীই হবে। কারণ তারা দেশের স্বার্থ দেখে না—ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দেখে না। দেখে নির্বাচনে জিততে পারলে নিজেদের কি করে সুবিধা হতে পারে।

এই যদি পরিণাম হয় তাহলে আমি মনে করি আইন করে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ান বন্ধ করে দেওয়া হোক। বিশ্বাস করি ছাত্র নেতাদের শক্তির কথা। কিন্তু সাধারণ ব্যাপার নিয়ে যদি প্রায়ই বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে যারা সত্যিকারের পড়াশোনা চায় তাদের উপায় কি হবে?

পরিশেষে আমার অনুরোধ, ছাত্র-সংঘগুলি একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন—যাতে ছাত্র-সমাজের মঙ্গল হয়। অন্যায় আর অবিচারের প্রতিকার নিশ্চয় আমরা চাই কিন্তু সেই প্রতিকার কেবলমাত্র ছাত্র কল্যাণের পর প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক চক্রান্তের পরিণতি ভয়াবহ—তার দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র আন্দোলন।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিমল পাচাল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ

ডাকটিকিটে রবীন্দ্রনাথ

৩৪ বর্ষ ৭৯ সংখ্যার 'দেশ'-এ সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র প্রবন্ধটির 'খুঁজে দেব' না 'খুঁজে নেব' পর্যায়ের ৫ নম্বর পাদটীকায় জানতে চেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আর্জেন্টিনা ব্যতীত অন্য কোন দেশের সরকার বিশেষ ডাকটিকিট প্রচার করেছিলেন কিনা। জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি—কারণ বিশ্ব-কবির শতবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর মোট ৫টি দেশে ডাকটিকিট প্রচার করা হয়। দেশগুলি (১) ভারতবর্ষ (২) আর্জেন্টিনা, (৩) সোভিয়েট রাশিয়া, (৪) ব্রাজিল, (৫) রুমানিয়া। অবশ্য আর্জেন্টিনা ব্যতীত অন্য কোন দেশ ভারতে প্রচারিত ডাকটিকিটের রবীন্দ্র প্রতিকৃতির অনুকরণ করেননি। তবে একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক হিসেবে একথা বলতে পারি যে অপর তিনটি দেশের ডাকটিকিটে মুদ্রিত রবীন্দ্র প্রতিকৃতিগুলিও অনন্যসাধারণ ও সুন্দর।

নির্মলকুমার দাশগুপ্ত
কলিকাতা—১০

'খুঁজে দেব না খুঁজে নেব'

রসিক ও পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের 'খুঁজে দেব না খুঁজে নেব' নামক 'পঞ্চতন্ত্র'র অন্তর্গত রচনাটি আগ্রহ সহকারে পড়ছিলুম, কিছু নতুন কথা শোনার আশায়। মূল কাহিনীতে নয়, পাদটীকায় তিনি কিছু নতুন কথা বলেছেন। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

রচনাটির প্রথম অংশের ২নং টীকায় তিনি বলেছেন—"সান ইসিদ্রো (ইংরেজি Saint Isidore)..বুয়েনস আইরেসের কুড়ি মাইল উত্তরে, সমুদ্রপারে" (২০৩ পৃঃ দেশ, সংখ্যা ৩)। কিন্তু প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীতে দেখলাম কথাটা 'San Isidore (২০১ পৃঃ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং)। ভূগোল গ্রন্থে, মানচিত্রে ও ভ্রমণ বিষয়ক বইয়ে 'San' পেলাম, আলী সাহেবের মত অনুযায়ী 'Saint' পেলাম না। যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়র্লড ট্রাভেল, ভল্যুম টু গ্রন্থের ৩২৩ পৃষ্ঠার ঐ San Isidore-ই আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।

তা ছাড়া সান ইসিদ্রো 'সমুদ্রপারে' নয়, প্লেট নদী বা লা-প্লাতা নদীতীরে অবস্থিত।

উক্ত রচনার দ্বিতীয় অংশের ২নং পাদটীকায় (৩৪ পৃঃ দেশ, সংখ্যা ৪) তিনি পূরবীর 'চিঠি' কবিতার ষষ্ঠ চরণটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন '...এই দেশি ইস্পানি'। কিন্তু মূলগ্রন্থে বানান আছে 'এই দেশী'।

অবশ্য এগুলি গৌণ ব্যাপার। 'ইস্পানি' সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা বক্তব্যের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রধান আলোচনা। 'ইস্পানি' বাস্তবার্থে কোন দেশের নাম নয়, সরাসরি একটি বিদেশী ফুলের নাম। রবীন্দ্রনাথ বিজয়ার 'মিরালরিয়ো' (নদীশোভনা) নামক যে বাড়িটিতে ছিলেন সেই বাড়িটির ঐশ্বর্য ছিল এক বিরাট পুষ্পবাগিচা। কবির অবস্থানকাল নভেম্বর-ডিসেম্বর

অর্থাৎ তখন আর্জেণ্টিনায় গ্রীষ্মকাল। আর্জেণ্টিনায় এই ঋতু ফুলের ঋতু। ('নিউ হরাইজনস্ ওয়রল্ড গাইড ॥ প্যান আমেরিকান ওয়রলড এয়ারওয়েজ' গ্রন্থের ৩৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। রবীন্দ্রনাথের বিশ্রামবাসকালে 'নদীশোভনা'র বাগানেও ফুটেছিল অজস্র ফুল। এই পুষ্পসৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন 'বিজয়া' স্বয়ং—তাঁর স্বরচিত একটি প্রবন্ধে। তিনি বলছেন, "It was the season of the sweetest-smelling flowers: espinillos', honey-suckle, roses." (টেগোর অন দি ব্যাঙ্কস্ অব দি রিভার প্লেট, পৃঃ ৩৩, এ সেনটিনারী ভল্যুম, ১৮৬১—১৯৬১)। লক্ষণীয়, 'espinillos' কথাটি উদ্ধৃতিচিহ্নাঙ্কিত। বিজয়া কবির কাছে 'চিঠি' কবিতাটির তর্জমা শুনেছিলেন। কারণ, কবির সদ্য রচিত কবিতার নাছোড়-বান্দা শ্রোতা ছিলেন বিজয়া। তাই পরে প্রবন্ধটি লেখার সময় উদ্ধৃতিচিহ্নিত করেছেন পুষ্প নামটিকে। বা বিজয়াই হয়তো কবিকে ফুলটির নাম ও পরিচয় বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিজয়া-বর্ণিত এই 'Espinillo'কেই 'ইস্পানি' বলেছেন ছন্দের খাতিরে। ছন্দের খাতিরে রাখতে গিয়ে তিনি অভিধান-বহির্ভূত অনাচার করেন নি। 'Espinillo' শব্দটি অপ্রচলিত আমেরিকান শব্দ। এই শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ ESPINO থেকে। 'Espino' সম্বন্ধে উদ্ভিদবিদ্যার বই বলছে, এটি একটি কাঁটা আগাছার ফুল। রঙ সাদা, কখনো ক্রীম। স্পেনে একে Hawthorn বা Buckthorne বলে। (Eng.-Span. and Span.-Eng. Dictionary, Martinez Amador(তা ছাড়া Webster's New International Dictionary, 2nd edition. এর ৮৭৩ পৃষ্ঠায় ঐ 'ইস্পিনো'র বর্ণনা আছে।

এই 'ইস্পিনো' থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'ইস্পানি' করেছেন। ইস্পানি ফুলকে বলেছেন জুঁই। ফুলের সঙ্গে মিল, গাছের সঙ্গে নয়। (অমরনাথ রায়ের 'পুষ্পাভিধান' অনুযায়ী এই ফুলটিকেই কি 'ওনকোনা স্পিনোসা' বলে?)।

'ইস্পানি' স্থাননাম সম্পর্কিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'ইস্পানী' লিখতেন। এবং পূর্ব-চরণের 'বাংলা দেশের বাণীর সঙ্গে সুমিল হত।

তা ছাড়া চিঠি কবিতাটি পুষ্পবিষয়ক। পুষ্পপ্রেমিক, পুষ্পসচেতন ও পুষ্প-নামকরণবিদ রবীন্দ্রনাথ 'চিঠি' কবিতাটির চার দিন আগে, ভুবনডাঙার মাঠের আকন্দকে স্মরণ করে 'আকন্দ' কবিতাটি লেখেন। এবং মাসেই নভেম্বর লিখছেন রূপকথনী 'বিদেশী ফুল'। রবীন্দ্রকাব্যধারায় পূরবী কাব্যেই এসেছে সর্বাধিক সংখ্যক ফুলের নাম।

তাই আমাদের বিনীত নিবেদন যে, 'ইস্পানি'কে হিসপানি বা হিসপানীয়াই বলা ঠিক নয়। যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলী সাহেবকে অনুরোধ করি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বিশদ করার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সামন্ত
বাংলা গবেষণা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার নাট্যসাহিত্য

গত ৩ ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে 'বাংলা দেশের সাম্প্রতিক নাটক' আলোচনাটি সত্যিই একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত রচনা হয়েছে। বর্তমান বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধন্বান্ত দেখে আমরা যারা পীড়িত হই তাদের কাছে সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের এই সমীক্ষাটি কিছু ভাবনার উদ্বোধন নিশ্চয় ঘটাবে। অন্তত, একটি আমার মনে কিছু ভাবনা জাগিয়েছে আর তাই এ চিঠি না লিখে পারছি না।

তিরিশের যুগ থেকে বাংলা দেশে সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগে আন্দোলনের নামে কিছু একটা হয়ে গেছে। উত্তরচারণে "নব নাট্য আন্দোলন"-এর নামে আধুনিক নাট্যকর্মীদের রঙ্গ দেখা দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু তাতে নাট্যসাহিত্যের কি প্রাপ্ত ঘটেছে? লাভ যেটুকু হয়েছে সে অভিনয়ে, মঞ্চস্থাপত্যে, আঙ্গিক কারুকর্মে। আধুনিকতম নাট্যপ্রচেষ্টাগুলিতে পরিচালকরা জয়লাভ করেছেন, নাট্যকাররা হয়েছেন পরাজিত। অভিনয়যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই নাটকের সার্থকতার নিরূপক কিন্তু তা বলে সেগুলোই নাটকের শ্রেষ্ঠতা বা শিল্পগুণের পরিমাপক নয়।

এ কথা বোঝবার আজ সময় এসেছে।

জনতার বোবাকান্নাকে বাণীরূপ দিতে গিয়ে পৃথিবীতে যে কল্লোল উঠেছে, দলীয় রাজনীতির বেড়া ডিঙিয়ে, সাময়িক উত্তেজনার স্পর্শ বাঁচিয়ে, চিরন্তন নাট্য-সাহিত্যে সে কি অবদান রেখে যাবে? রাজনীতি নাটকে অবশ্যই থাকবে, কারণ মানুষের সমাজকে নিয়ে নাটক এবং সেই মানুষের সমাজে রাজনীতি একটা বড় অংশ। কিন্তু যে অবজেক্টিভিটি নাট্য-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তাকে উপেক্ষা করে পরিমিতি বোধ হারিয়ে মঞ্চের ওপর সোচ্চার শ্লোগান তুললে, দলীয় পতাকাকে বারবার ওড়ালে আর যাই করা হোক নাট্যশিল্প সৃষ্টি করা হয় না। অথচ তেমন নাট্যকার থাকলে আমাদের এই বিপর্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ে ভাল নাটক লেখা হতে পারত। দুর্নীতির বিবরণে ভরা, নীতিভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট এই বর্তমান বাংলাকে নিয়ে আমার তো মনে হয় কিছু সার্থক কমেডী নাটকের আবির্ভাব হওয়া উচিত ছিল কারণ কমেডীর উদ্দেশ্যই তো রঙ্গরসের উপকরণে নতুন মূল্যবোধকে জাগরূক করে তোলা, সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার শৈথিল্য পুনরায় ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করা। নাট্যকারের অভাবে তেমন কমেডী আমরা ইদানীং একটিও পাইনি। আজকের নাটকগুলিতে দেখি কেবলই একই সমস্যার পৌনঃপুনিকতা, আর নয় সস্তা জনমনোরঞ্জনের অকৃপণ আয়োজন।

আধুনিক কাব্যনাটক প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশা অসীম। তবে এখানে বলার কথা, ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর মেলবন্ধন যেন কাব্য নাটকগুলিতেও ঠিক হচ্ছে না। সামগ্রিক বিচারে বাংলার নাট্যকাররা আমাদের শুধু হতাশই করছেন। একটা কথা আমি বুঝতে পারি না যে, কেন হালের বাংলা নাটকের উপর রবীন্দ্র-নাটকের উত্তরাধিকার বর্তাল না? রবীন্দ্র-নাটকে সাহিত্য মূল্যের কথা যেমন কোন সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না তেমনি তার নাট্যীয়

উপাদান-সৌন্দর্যও এখন রসিকজন-স্বীকৃত। বিশেষ করে শ্রীশম্ভু মিত্রের পরিচালনাধীনে বহুরূপীর একাধিক রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনায় কবিগুরুর নাটকের মঞ্চসাফল্য প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তাই আমার আবেদন-বাংলা নাটকের মরা গাঙে আবার বান আনবার জন্য আজকের তরুণ নাট্যকারেরা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সত্যিকারের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হোন আর যেহেতু সব আন্দোলনই (তা সে আদর্শ ও উদ্দেশ্য যত শুভ ও মহৎই হোক) এক সৃজনীশক্তিসম্পন্ন নেতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সেই আন্দোলনের নেতা হিসাবে গ্রহণ করুন। আসল কথা, রবীন্দ্র-নাটকের প্রকৃত উত্তরাধিকার লাভেই আমাদের নাট্যসাহিত্যের মুক্তির মন্ত্র লুকিয়ে আছে।

সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হুগলী।

জল ও 'পানি'

গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমীর দাশগুপ্তের ক্যানাডার চিঠি পড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। বিশেষত ঐ চিঠিতে আমাদের দেশী বাবুদের ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে স্বদেশ সম্বন্ধে তাদের যে অজ্ঞতার চিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, এদেরই ভেতর অনেকেই পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের কাছে আমাদের দেশের নীতি, আদর্শ ও অন্যান্য বাস্তব সমস্যার এমন বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করেন যার ফলে আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিদেশীয়দের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে অতি সঙ্গত কারণেই। তাই বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতার পেছনে এদের অবদানও নেহাত তুচ্ছ নয়। গেল বছরের পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের বক্তব্য পশ্চিমীদের বোঝাতে নেতারা নাজেহাল হয়েছিলেন কি পরিমাণ তা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পরিশেষে শ্রীদাশগুপ্তের চিঠিতে একটি ত্রুটি নজরে এল। তিনি লিখেছেন, "পূর্ববঙ্গীয়রা জলকে পানি বলেন—যেমন আমাদের দেশে বাঙালী, ওড়িয়াবাসী এবং দাক্ষিণাত্যবাসীরা বাদে আর সবাই পানি বলেন।" মন্তব্যটি ঠিক নয়। পূর্ববঙ্গের সবাই জলকে পানি বলেন না। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলার লোকেরাই কেবল জলকে পানি বলেন। ওড়িয়াবাসীরাও জলকে পানি বলেন।

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য
ওড়িষ্যা

গো-হত্যা নিবারণ

১৬ই নভেম্বরের দেশে 'বৈদেশিকী' পড়লাম; গো-হত্যা নিবারণের ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলো। "পৃথিবীর এই একটি মাত্র দেশে মানুষ মনুষ্যেতর একটি জীবের প্রাণবধ অকরণীয় বলে ভাবতে শিখেছে।" একটি জীব নয়, আরও আছে—ষাঁড়, হনুমান, লাটুয়ার বাড়ির ইঁদুর যা ধরা পড়লে রাস্তার ওপারে লাটুয়ার বাড়ির দোরগোড়ায় চালান হয়—কিন্তু মারা যায় না। ইত্যাদি

আবার, আমাদের দেশের মানুষ মাত্রের বেলায়ই এভাবে বলা যায় না। অনেকেই Beef খাওয়ায় বিশ্বাসী। যদিও গরু খাওয়ায় নাও হাত পারেন। আবার অনেকে সন্ধ্যার পর কিছুই খান না জীব হত্যারই ভয়ে।

এক শ্রেণীর মতবাদ অন্যান্য শ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দেওয়াই কি হিউম্যানিস্ট সেকুলারিজম?

আমি নিজে মাছ মাংসই খেতে পারি না। সেন্টিমেন্টে লাগে। পাঁঠা খাবো, গরু খাবো না আমি হিন্দু হয়েও মেনে নিতে পারি না। অবশ্য যাঁরা গরু খেতে চান না, গোসমস্যা মেটাবার জন্য তাঁদের খাওয়াতেই হবে একথাও আমি বলি না। খাওয়াবার প্রয়োজনও হবে না।

গান্ধীজীর কথা তোলা হ'য়েছে। গান্ধীজী গো-হত্যা নিবারণ করতে বলেছিলেন, আবার প্রয়োজন হলে গো-হত্যা করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

অধীরলাল ব্যানার্জী
দেওঘর।

অরণ্যদেব লী ফক

হেস্টিংসের যুদ্ধ হয়েছিল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ··· হেস্টিংসের যুদ্ধ হয়েছিল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে··· হেস্টিংসের যুদ্ধ হয়েছিল···
?!
আমার পড়তে ভাল লাগে না। আমি শুধু শিকার করতে চাই।
অর্থাৎ তুমি একটি বোকা হতে চাও। ও সব চলবেনা।

অরণ্যদেব রাজাকে বোঝাচ্ছেন, পড়াশুনোও করা চাই।
বেশ।
!

আমি খুব ভাল-ভাবে পাশ করেছি।
আমিও।
চমৎকার। এবারে চলো, তোমাদের নিয়ে শিকারে যাব।

সামনের জঙ্গলেই একটা সিংহী একটা মোষকে ধরেছে।
!!
7/3

বুনো মোষের সঙ্গে সিংহীর লড়াই চলেছে!
সিংহীটা নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত। তা নইলে কি আর বুনো মোষের সঙ্গে লড়তে যায়!
!
!

ব্যাপার দেখে রাজা তো হতবাক।

সেটোই মারা গেছে!
?
ইয়াও—ইয়াও···

!
ইয়াও···ইয়াও···

সিংহের বাচ্চা। আমি এটাকে পুষব।
আর- একটা বাচ্চা জুটল···
বেশ তো, পুষতে চাও পোষো—
ক্রমশ (৮)

সাহিত্য সংবাদ

সোদরপ্রতিম ভাগিনেয়

অনেক সাহিত্যপাঠক গোয়েন্দা গল্পকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। সে যাই হোক, যাঁদের গোয়েন্দা গল্প পড়ার নেশা আছে, তাঁরা, যে-হেতু বাংলায় ভালো গোয়েন্দা গল্প দু একখানা মাত্র লেখা হয়—ইংরেজী বই-ই পড়েন। অতি জনপ্রিয় গোয়েন্দা গল্প-গুলোতেও একটা জিনিস দেখা যায় যে—(এখানে আগেই একটি কথা প্রকাশ করা ভালো, আমাদের এই আলোচনার সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই) লেখাতেও বানান কিংবা ভাষার ভুল প্রায় থাকেই না বলা যায়।

কেন যে লোকে ডিটেকটিভ গল্প লেখেন? নিশ্চয়ই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয়, টাকা রোজগারেরই জন্য, যে-হেতু বহু পাঠক ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালোবাসে। বহু গোয়েন্দা গল্প পড়ার পর, আমার মনে হয়েছে, ঐ সব লেখকের অনেকেই যেন একটু ইচ্ছে করলেই সাহিত্যিক হতে পারতেন, ইচ্ছে হয়নি বলে, বা অভিমান-বশত, সাহিত্যের দিকে ঝোঁকেন নি। একালের দিনের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা লেখক জর্জ সিমেনো সম্পর্কে আঁদ্রে জিদ বলে-ছিলেন, সিমেনো একটু ইচ্ছে করলেই শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম হতে পারতেন। খুব নিকৃষ্ট ধরনের, [illegible] গল্প লেখেন যে মিকি স্পিলেন, তিনিও তো [illegible] উইথ দা [illegible] নামের বিস্ময়কর ছোট গল্পটি লিখেছেন. যাঁরা জানেন, এইরকম কয়েকটি গল্প লিখলেই কোনো লেখকের এক জীবনের সাহিত্যিক সম্মান জুটে যায়। তিনি তবু লেখেন নি। ডরোথি সেয়ার্স-ও বড়ো গোয়েন্দা গল্প লেখিকা, কিন্তু তিনি একজন বিদুষী মহিলা, একসময় প্রাচীন ফরাসী সাহিত্য থেকে ইংরেজীতে দক্ষ অনুবাদ করেছিলেন। সাহিত্যের পাঠক অনিশ্চিত, সাহিত্য থেকে অর্থলাভের সম্ভাবনা জুয়োয় বাজি ধরার মতন, তা ছাড়া, অমরত্বের বদলে যে-হেতু ইহজীবনের সুখই অনেকের কাম্য, সেইজন্য নিশ্চিত অর্থ উপার্জনের জন্য এঁরা রহস্য-গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন। এঁদের অনেকের অর্থ-ভাগ্যও অকল্পনীয়। জর্জ সিমেনো পৃথিবীর নানান দেশে বাড়ি বানিয়েছেন, এক এক মাস এক এক দেশে কাটান। আগাথা ক্রিস্টির টাকা পয়সা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা যেত। জেমস বণ্ড লিখে ফ্লেমিং-এরও টাকা পয়সার অন্ত ছিল না। টাকার জন্যই এঁরা লিখছেন, সে তথ্যে কোনো কারচুপি নেই।

কিন্তু যে কারণে এঁদের উল্লেখ করে আলোচনা শুরু করেছি, তা হলো এই যে, টাকার জন্য লিখলেও, যা লিখছেন তাতে এঁরা কখনো ফাঁকি দেন না। টাকার জন্য অনেকেই লেখেন—শেষ পর্যন্ত টাকা পাওয়া যাক্ বা না যাক্—কিন্তু সে হিসেবে বেশী সৎ এইসমস্ত গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকরা। ফ্লেমিং যখন জেমস্ বণ্ডকে জাপানে পাঠাচ্ছেন, তখন সেটা মন-গড়া জাপান নয়, জাপানের নিখুঁত বর্ণনা, জাপানীদের আচার ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় ঠিকই পাওয়া যায়। আর্ল স্ট্যানলি গারনারের নায়ক পেরি ম্যাসন নানারকম অলৌকিক বুদ্ধির পরি-চয় দেয় বটে কিন্তু ওয়ুধপত্র বা বিষের প্রক্রিয়ার বর্ণনায় কোনো ভুল নেই—অনেক বইতেই তিনি কোনো না কোনো বিশ্ব-বিখ্যাত বাস্তব ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিকের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানান। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ব্যাপারে সিমেনোর নিষ্ঠা অপরিসীম। মিকি স্পিলেন বা পীটার চেনিও যখন সমাজের উঁচু-নিচু নানা ধরনের মানুষের বর্ণনা করেন, তখন তাঁদের সংলাপে-কথাবার্তায় কোনো খুঁত থাকে না। বানান ভুল বা ছাপায় ভুল তো এ পর্যন্ত কখনো চোখে পড়ে নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাংলা দেশে এখন তো আলোচনার যোগ্য আর কোনো গোয়েন্দা গল্পলেখকই নেই। তবে, এইসব ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিছু কিছু রগরগে ভ্রমণকাহিনী ও সিনেমা পত্রিকার গোল গোল প্রেমের উপন্যাস এর অনেকগুলোই যে শুধু টাকার জন্য লেখা হচ্ছে, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। দোষেরও কিছু নেই, ফ্যাশন অনুযায়ী যেমন পোশাকের ধরন বদলায়, তেমনি পাঠকদের রুচি অনুযায়ী কিছু কিছু লেখক লিখবেনই। কিছুদিন আগে জনপ্রিয় ছিল সাধু-সন্ন্যাসীর কেচ্ছা, এখন চলছে ঐতিহাসিক কাহিনী, এর পরই বোধ আসবে (আমার ফোরকাস্ট) গুপ্তচর-ছত্রীবাহিনীর গল্প। টাকার জন্য এসব লেখা হচ্ছে, হোক, কিন্তু যে কথা আলোচ্য, ছাপা অক্ষরের একটা নির্দিষ্ট শ্লীলতা আছে, সেটা নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। একখানা ছাপা বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করার পর সেটা ভালো লাগুক, খারাপ লাগুক—তা পৃথক প্রশ্ন, কিন্তু পদে পদে ভাষায় ভুল, বানান ভুল, ছাপায় ভুল, তথ্যে ভুল—এগুলো পরিহার করার মতন বয়স্ক-যোগ্যতা কি বাংলা সাহিত্য এত দিনে অর্জন করে নি? অর্থোপার্জনের জন্যই এসব লেখা, ঠিক আছে, কিন্তু সব অর্থোপার্জনের পথেই পরিশ্রম করতে হয়, পুস্তক রচনাও পরিশ্রম দাবি করে। যারা অসাহিত্যপাঠক, তাদের অনেকেরই ধারণা, ছাপা অক্ষরে কখনো মিথ্যে কথা থাকে না। সুতরাং সেইসব সরল-হৃদয়ের কাছে গাঁজাখুরী তথ্য পরিবেশন করা পাপ। হ্যাঁ, আমি পুনরুক্তি করছি, পাপ!

প্রত্যেক দিন খেতে বসার সময় আমার একটা বই লাগে (খাদ্য পদের অনটন ও বিস্বাদ রান্নার দুঃখ ভোলার জন্য)—সুতরাং প্রায় সব ধরনের বাংলা বই-ই আমার পড়া হয়ে যায়। অনেকরকম মজার মজার কাণ্ড দেখে একা একা হাসি। এবার পুজোর সময় দুজন অতি বিখ্যাত লেখকের উপন্যাসে প্রায়ই পাত্রপাত্রীর নাম উল্টে গেছে। মনে করা যাক, অ-দেবী নায়িকা, ক-বাবু নায়ক আর খ-বাবু ভিলেন। হঠাৎ দেখি নায়িকা ভিলেন খ-বাবুর বুকে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন, আর নায়কবাবু গেছেন রেস খেলতে। চমকে উঠে ভাবলুম, গল্প কি হঠাৎ এভাবে বদলে গেল। কয়েক পাতা গিয়েই আশ্বস্ত হলুম, না, নায়ক-নায়িকা ঠিক আছে, লেখক তাঁর মানসপুত্র-পুত্রীদের নাম ভুলে গিয়ে-ছিলেন। নায়ক-নায়িকার দারিদ্র্য বোঝাতে এখনও তাদের বাই-লেনের বাসিন্দা হতে হয়। সে-সব রাস্তার নামও রত্নেশ্বর পাইন বাই লেন বা এইরকম বিদঘুটে কিছু। কিন্তু বেলেঘাটার অন্ধগলির বাড়ি থেকে সকালবেলা বেরিয়ে সন্ধেবেলা যে নায়ক কি করে বাড়ির সামনে ট্রাম থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে আধ মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যান তা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। বেলেঘাটায় ট্রাম চলে? যাই হোক, এগুলো গুরুতর কিছু না—যদিও অনুচিত।

আর এক রকমের ভুল হচ্ছে, ভাবার ভুল। অনেক শৌখিন লেখকের বহু বই প্রতি বছর বেরোয়, তাতে ভাষার হেরফেরের অসাধারণ দৃষ্টান্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, ঠিক নিছক ভুল নয়, ঔচিত্যবোধের ব্যাপার। একজন ভ্রমণকাহিনী লেখক—তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর স্নেহভাজন ভাগিনেয়কে, লিখেছেন সোদরপ্রতিম ভাগিনেয়। যতই স্নেহভাজন হোক, ভাগ্নেকে সোদরপ্রতিম বলাটা বড্ডই বাড়াবাড়ি। আর একটি কবিতার বইয়ের উৎসর্গ : 'অগ্রজ বড় দাদাকে।' ভুল নয় নিশ্চিত, কিন্তু যেন কেমন কেমন। মাদ্রাজীদের বোঝাতে অনেকেই 'মদ্রদেশীয়' কথাটা ব্যবহার করেন, ধ্বনিগত মিল আছে, তবে মহাভারতের মদ্রদেশ-তনয়া মাদ্রী ছিলেন পাঞ্জাবিনী। সুন্দরবনের নদীনালার বর্ণনায় একজন

লিখেছেন নদীতে এত মাছ যে, সেখানে অসংখ্য মাছরাঙা, পানকৌড়ি আর 'কুর্‌বকে'র ছড়াছড়ি! লেখকের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সব ক'টা পাখির নামই চার অক্ষরের ব্যবহার করা। এইসব লেখকের অনেকেরই সাহিত্যের প্রতি মমতা বা আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু সামান্য অনুশীলনের অভাব ও দায়িত্বহীনতার ফলে এরকম বিভ্রাট ঘটে। ব্যাপারটা সোদরপ্রতিম ভাগিনেয় হয়ে যায় আর কি! এসব ক্ষেত্রে প্রকাশকদেরও দায়িত্ব আছে। লেখকদের হাতের লেখা যেমন খারাপ হতে পারে, তেমনি দু-একটা বানান্ ভুল বা শব্দ ভুলও বিচিত্র নয়। উপযুক্ত লোক রেখে প্রকাশকদের উচিত নির্দিষ্ট মান রক্ষা করা। বাংলা বানানের এখন একটা মোটামুটি সমতা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তাও সর্বত্র এক রকম নয়, লেখকদের খেয়াল অনুযায়ী চলছে। মূল উদ্ধর্ব শব্দের বানান ঊর্ধ্ব, উর্ধ্ব, উর্ধ —সবই চলছে। পূর্বাভাস শব্দটিকে অনেক প্রখ্যাত লেখকও লেখেন পূর্বাভাষ। আর যাই ছাড়ি না কেন, ভাষণ দেবার লোভ আমরা কেউই সহজে ছাড়তে পারি না।

সনাতন পাঠক

শিকারকে নিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতো আগাগোড়া রঙ্গরসিকতা করে তার বধের ভয়কে গোঁফের কমিকে পরিণত করেছেন, মাঝে-মাঝে তোফা সিচুয়েশন বানিয়ে গা-ছম-ছমাও যে না করিয়েছেন এমন নয়।

তাঁর গল্প পড়ে মাত্র একটি কথা, মানে একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারি—'সাবাস্'। সমস্ত ভাষায়, ভঙ্গিতে, টিপ্পনীর মোচড়ে—বক্তব্যের কেরিকেচারে তিনি পাঠককে কেবলই স্মরণ করান, 'এসব চাল গিয়ে ওস্তাদের মার' এবং পাঠকও বলতে পারেন কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ। জঙ্গল মহল-এর সব গল্পই সাচ্চা চীজ, এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ছাপা হয়ে গিয়েছে—এখন সেইসব ছাপা এক বাণ্ডিল গল্প কুড়িয়ে এই মন-মেজাজ শরিফ করা বই। ভাষায় তাঁর একটা নিজস্ব মেজাজ আছে, উর্দু বয়েৎ-এর উড়ন তুবড়ি যখন ছাড়েন তখন মন আলোয় ঝলসে ওঠে। প্রত্যেকটি গল্প ধরে তার কেরামতি—নুনে ঠিক হয়েছে কিনা—সমালোচনা করার এই মামুলি পদ্ধতিতে বর্তমান (সমালোচক নয়) পরিচায়ক নারাজ। আমি পাঠককে বাজনটি পরখ করে দেখতে বলছি। হাতেহাতে বই-ওঠা লোক মেজাজ ভালো করে উঠে যাবে—নিন্দুক আর মুখ-খেজার ভদ্রলোক সহাস্য না হন তো কি বলেছি। বুদ্ধদেব ক্রমাগত লিখবেন। শিকারের আড়ষ্ট শার্দুল-শিহরিত মিয়ার স্টেটমেন্ট-এর প্যাটার্নকে তিনি একেবারে খোল-নলচে বদলে অনন্যসাধারণ, অভিজাত এক রসিকতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের অনেক কিছুই গিলতে হয় সময় খুন করবার জন্যে, সময়কে ভোগ করার জন্যে বুদ্ধদেবের গল্পের সঙ্গে মেলবাৎ অত্যাবশ্যক।

জীবনী

ভারতরত্নমালা—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দি বুক একসচেঞ্জ'—২১৭ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। শোভন সংস্করণ মূল্য ৪·০০ টাকা, সাধারণ সংস্করণ মূল্য ২·০০ টাকা।

ভারত-জননীর বহু কৃতি-সন্তানের জীবনচরিত ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে এ পর্যন্ত ভারতের যে ১৪ জন কৃতি-সন্তান 'ভারতরত্ন' পদক ও উপাধি পেয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁহাদের নাম যথা-ক্রমে সমাজসেবী কারভে, কর্মযোগী বিশ্বেশ্বরেয়া, সমন্বয়বাদী ভগবান দাস, আধুনিক চাণক্য রাজাজী, ঋষি কানে, বঙ্গগৌরব বিধানচন্দ্র, হিন্দী প্রাণ পুরুষোত্তম, ত্যাগমূর্তি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজনৈতিক পন্থজী, মহামনীষী রাধাকৃষ্ণান, বিজ্ঞানসাধক রমণ, ভারতজ্যোতি জওহরলাল, শিক্ষাবিদ ডঃ জাকির হোসেন, প্রিয় নেতা শাস্ত্রীজী। এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকার যাঁদের উপদেশ এবং নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা মহারাষ্ট্র নিবাসের কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা আকাশবাণী কেন্দ্রের শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করি এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সবিশেষ উপকৃত হবেন।

৪২৫।৬৬

কাব্যগ্রন্থ

কর্ণ-কুন্তী। বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার। পরিবেশক : দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। ১·৫০ পঃ।

আধুনিক কাব্যরীতিতে নয়, সাবেক কাব্যরীতিতেই এই বইটির প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করেছেন রচয়িতা। মহাভারতের দুটি বিশিষ্ট চরিত্র কর্ণ ও কুন্তী; এই দুই চরিত্রের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা, ও অন্যান্য এখানে পরিস্ফুট। যাঁরা রামায়ণ মহাভারতের রস অন্যত্র, অন্য আধারে, অন্য ভঙ্গিতে পেলেও কৌতূহলী হবেন, উপভোগ করবেন, বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারের 'কর্ণ-কুন্তী' নামক গ্রন্থটি তাঁদের তৃপ্তি দেবে। মহাভারতে কর্ণ একটি প্রধান চরিত্র, নারীচরিত্রে কুন্তীও এক বেদনাবিক্ষত কারুণ্য-প্রতীক—কাব্যাকারে, নাট্যাকারে, যে কোন মাধ্যমে তাঁদের নিয়ে কথা ফলানো হয়। লেখকের প্রয়াস সেদিক থেকে সফল।

প্রাপ্তি স্বীকার

কনে দেখা আলো। গৌরেশ্বর বসু। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন: ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

মিথুন মহল। অরুণকান্তি সেন। উমেশ প্রকাশ : ১৭৩ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ৪·০০।

বিপ্রলব্ধ। বিনয় চৌধুরী। শ্রীমতী কনক দেবী : ৭।৪ বনমালী ঘোষাল লেন, কলিকাতা-৩৪। মূল্য ১০·০০।

বাঙলার লৌকিক দেবতা। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড: ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

বিবাহ। জীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশ প্রকাশ : ১৭৩ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ৬·০০।

রঙ্গজগৎ

রূপছায়া চিত্রর "খেয়া" (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। বিদেশী মুদ্রাও আসছে। কিন্তু বিদেশে ভারতের ছায়াছবির ব্যবসা-ক্ষেত্র যতটা বিস্তৃত হতে পারত, ততটা হয়নি। অনেকেই বলেন, এর মূলে রয়েছে ঔদাসীন্য ও উদ্যোগের অভাব। কোন তরফের বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকার উভয়েই সমান দায়ী। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, যে দেশ থেকে আমরা খুব বেশী ছবি আমদানি করি সে দেশেই সবচাইতে কম সংখ্যক ছবি পাঠানো হয়।

কেউ কেউ বলেন, বাইরে ভারতীয় ছবির ব্যবসার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এ দেশের চলচ্চিত্রের ভিন্ন ঐতিহ্য ও প্রমোদ-উপকরণ। ভারতীয় ছবিতে বহুজনের মনোরঞ্জনের বহুবিধ ব্যবস্থা থাকে, যার আকর্ষণ এ দেশেই সীমাবদ্ধ। তাই বিদেশী-দের কাছে ভারতের চলচ্চিত্রের আবেদনও সামান্য।

অপর দিকে, বিদেশী দর্শকের রুচির প্রতি নজর রেখে ছবি তৈরিরও বিপদ আছে। তা হলে স্বদেশে ছবি চলা কঠিন হবে। দুই দিক কীভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই এখন বিবেচ্য। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী সাহায্য করতে পারেন সরকার। কোন্ ফেস্টিভ্যালে কী ধরনের ছবি পাঠানো দরকার সে বিষয়ে সরকারকে অবহিত হতে হবে। বিদেশে ওইসব ছবির প্রচার যাতে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করা উচিত। এবং ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সরকার প্রযোজকদের সাহায্য করতে পারেন। এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের প্রযোজকরা বিদেশে ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে নাকি প্রায়শই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের সহ-যোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। ভারত সরকারের বিদেশস্থ প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে প্রযোজক-দের সাহায্য করলে সমস্যা সমাধানের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হতে পারে।

জাঁ কক্‌তোর "অরফী"

জাঁ কক্‌তোর "অরফী" শেষ পর্যন্ত কলকাতায় দেখানো হল। ছবিটির প্রতীক্ষায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের হয়ত আনন্দের অবধি ছিল না। ছবিটা দেখে কিছুটা উদ্দীপ্ত, কিছুটা আশাহত হয়েছি। "অরফী"-তে গ্রীক পৌরাণিক

রঙমহল ফোনঃ ৫৫—১৬১৯

প্রতি বৃহ ও শনি ঃ ৬॥
রবি ও ছুটির দিন ঃ ৩—৬॥
রোমাঞ্চকর হাসির নাটক!
বিধায়ক ভট্টাচার্যের

অতএব

ঃ পরিচালনা ঃ
॥ হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায় ॥
শ্রেঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ জহর রায় ॥
হরিধন ॥ অজিত চট্টোঃ ॥ অজয় গাংগুলী ॥
মৃণাল মুখোঃ ॥ মিণ্টু চক্রবর্তী ॥
দীপিকা দাস ও সরযূবালা ॥
— অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন —

মুক্ত অঙ্গনে (৪৬-৫২৭৭)
চতুর্মুখ

অনেকের মৃত্যু
অনেকের মৃত্যু
অনেকের মৃত্যু

বৃহস্পতিবার/বাইশে ডিসে/ সন্ধ্যা সাতটা
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

(সি-২১২৯)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

মাণিকতলা পুলের পাশে ফোন ৩৫-৩০১৮
বৃহ ও শনি ৬॥ রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥

এন্টনী কবিয়াল

শ্রেঃ জহর গাঙ্গুলী । মিহির ভট্টাচার্য । জীবেন বোস । কালীপদ চক্রঃ । তরুণ মিত্র । কল্যাণী ঘোষ । গীতা মুখার্জী । সাধনা রায়চৌধুরী । জয়নারায়ণ । পরিমল সেন । সমরকুমার । কেতকী দত্ত । সবিতাব্রত (রূপকার) ।

(সি-২০৬৫)

বিশ্বরূপা

বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

"বনফুল"-এর "পঞ্চপর্ব" উপন্যাস অবলম্বনে
নাটক ও পরিচালনা — রাসবিহারী সরকার
(ভূমিকালিপি পূর্ববৎ)
বিঃ দ্রঃ বর্তমানে নাটকটি বহুবিধ দৃশ্যপটসহ দুর্বারগতিসম্পন্ন এক চমকপ্রদ নূতন নাট্যপ্রথায় অভিনীত হচ্ছে॥

[শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

ষ্টারে নূতন নাটক

দাবী

ঃ রচনা ও পরিচালনা ঃ
দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক ঃ অনিল বসু
সুরকার ঃ কালীপদ সেন
গীতিকার ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
* * * *
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ঃ ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ঃ ৩টা ও ৬॥টায়
* * * *
—ঃ রূপায়ণে ঃ—
কানু বন্দ্যো ॥ অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী
নীলিমা দাস ॥ সুব্রতা চট্টো ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস
সতীন্দ্র ভট্টা ॥ গীতা দে ॥ প্রেমাংশু বোস
শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর ॥ অশোকা দাশগুপ্তা
শৈলেন মুখো ॥ শিবেন বন্দ্যো ॥ আশা দেবী
অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যো

শুভারম্ভ শুক্রবার ১৫ই ডিসেম্বর!
আপনার কল্পনাতীত একটি মিষ্টিমধুর প্রণয় চিত্র

হিন্দ ঃ কৃষ্ণা ঃ মেনকা ঃ খান্না ঃ কালিকা

ইণ্টালী অজন্তা (বেহালা) খাতুনমহল (মেটিয়াবুরুজ) রিজেণ্ট (কাশীপুর) অলকা (শিবপুর) নিশাত (সালকিয়া)
শান্তি (কদমতলা) সন্ধ্যা (খড়দহ) বিভা (বেলঘরিয়া) রামকৃষ্ণ (নৈহাটি) জয়ন্তী (রিষড়া) স্বপ্না (চন্দননগর)
কৈরী (চুঁচুড়া) ও অন্যত্র

"আয়ে দিন বাহারকে" (পরিচালনা : রঘুনাথ ঝালানী) ছবিতে ধর্মেন্দ্র ও আশা পারেখ—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

কাহিনী এ কালের পটভূমিতে বিন্যস্ত। ভূমিকায় বলা হয়েছে, এ ধরনের রূপকথার কোন বিশেষ স্থান-কাল নেই; কাহিনী কোন বিশেষ যুগের নয়, "এজলেস"।

"অরফী"তে কক্‌তো দার্শনিকের ভূমিকা নিয়েছেন। এবং তাঁর এই ছবি দেখে মনে হয়েছে, চলচ্চিত্রকে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তার একটি প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবেই ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ "অরফী" চলচ্চিত্রের শিল্পরীতি অর্থাৎ, এক কথায়, আর্ট-ফর্মের দিক থেকে কোন নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। বক্তা ও ভাবনার এই চিত্র আমাদের বুদ্ধিকে সতেজ করে তুলেছে। জীবন-মৃত্যু কাহিনীতে একাকার। এই দুই বিপরীত সত্যের সীমারেখায় মানুষের চেতন-অবচেতন বাসনা ও উচ্চাশা বিশ্লেষিত। কবির মৃত্যুপ্রেমের (অরফীর নায়ক অরফিয়স কবি) কথা আমরা কবিতায় পড়ি। ছবিতেও দেখলাম। এখানেই "অরফী"-র প্রকৃত পরিচয়।

পরিবেশ, কবিদের কাফে ও সেখানে হাঙ্গামা, কবির বিবাহিত জীবনের প্রেম ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে কক্‌তোর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় মেলে। কিন্তু "অরফী"-তে কক্‌তোর চিন্তা ও মনন এত বেশী থাকা সত্ত্বেও ছবিটি দেখে এমন শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয় কেন? কবি, কবিপত্নী কিংবা মৃত্যুর প্রতিনিধি সেই কাল্পনিক রমণীর মনের নিঃসঙ্গতা কি কক্‌তোর বিশ্লেষণের বস্তু ছিল? কিন্তু এই একাকিত্বও তো আমাদের মন ভরল না।

ফ্রাঁসোয়া রাইখেনবাখের "বক্সারস হার্ট"-এ পরিচালকের ভাষা লক্ষণীয়। সেদিক থেকে "বক্সারস হার্ট" একটি আধুনিক চলচ্চিত্র। বক্সার যখন জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করতে পেরেছে তখনই ছবি শেষ। এই ক্লাইমেক্সে পৌঁছবার জন্য এত বড় ছবির কী দরকার ছিল। এতে একজন বক্সারের মনোবিশ্লেষণ, কেমন করে জয়লাভের জন্য সে তৈরী হয়, তার সাধনা ইত্যাদির একটি প্রামাণ্য রূপ ছবিতে দেখা যায়।

জাঁ ভিগোর লাতালাঁত-এ পরিচালকের স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজ-এর "ফিরে চল" (পরিচালনা : অতনুকুমার) ছবিতে সবিতা বসু ও অতনুকুমার—এ-সপ্তাহে ছবির শুভমুক্তি

অকালমৃত্যু না ঘটলে তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।

নেপথ্যে

গত সপ্তাহে তিনটি নতুন ছবির কাজ শুরু হল। একটি অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "আরোগ্য নিকেতন"। ইতিপূর্বে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনী। ছবিটি পরিচালনা করবেন বিজয় বসু। রবীন্দ্রনাথের "জীবন যখন শুকায়ে যায়" গানটি গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আর একটি গান রেকর্ড করা হল। গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়েই ছবির শুভসূচনা। ছবির সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক বিজয় বসু জানালেন, ছবির সব শিল্পী নির্বাচন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তবে বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী ছবিতে অভিনয় করবেন।

আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?
আমি বিয়ে করিনি।

যাঃ, আমি কি তাই বলেছি
না, ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখলাম।

সামান্য এই কয়টি কথার মধ্য দিয়েই "কখনো মেঘ"-এর মহরত দৃশ্য নেওয়া হল। নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক দুজনেই ছিলেন মহরতের শিল্পী। প্রশান্ত দেবের কাহিনী নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত। বিভূতি লাহা ছবির প্রযোজক। সুররচনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বঙ্কিম ঘোষ, কামু মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্যান্য প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে "নল-দময়ন্তী" ছবির কাজ আরম্ভ হল গান রেকর্ডিং-এর ভিতর দিয়ে। গান গাইলেন মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেনের সুরে।

ডালটনগঞ্জে "পঞ্চশর"-এর কিছু রোমাণ্টিক দৃশ্য গ্রহণ করে পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা তাঁর ইউনিট নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। দৃশ্যগুলি তোলা হল রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। সম্প্রতি কোন ছবিরই আউটডোরের কাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সম্পূর্ণ হতে পারে নি। "খেয়া" এবং "প্রস্তর-স্বাক্ষর"-এর আউটডোর শুটিং অসমাপ্ত রেখেই যথাক্রমে পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সলিল দত্ত কলকাতায় ফিরে এসেছেন। "খেয়া"-র যে কয়টি দৃশ্য তোলা হয়েছে তাতে ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার প্রভৃতি। খেয়া নৌকোর মাঝি সেজেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

গীতবিতান-এর রজতজয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্রসংগীত চর্চার বিশিষ্ট শিক্ষায়তন গীতবিতান-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত সপ্তাহে, রবীন্দ্র সদনে। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে গীতবিতান-এর বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

গীতবিতান-এর সভাপতি এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের অনুশীলন সর্বত্র। এবং রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার মূলে গীতবিতান-এর দান অস্বীকার করা যায় না। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রসংগীত চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের গানের উৎকর্ষ বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হবেন। তিনি অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান।

৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় রজতজয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। গীতবিতানের ছাত্র-ছাত্রীরা বেদগান (সংগচ্ছধ্বং) ও পরে সম্মেলক রবীন্দ্রসংগীত (আনন্দধ্বনি জাগাও) গেয়ে শোনান। তারপর সভার অন্যান্য কর্মসূচী পালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত এক শুভেচ্ছাবাণীতে বলেন, শুধু সুর ও ভাবের মাধুর্য নয়, গুরুদেবের রচনার মানবতাবোধ এবং গভীরতাই এই গানকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির তরফ থেকেও এক শুভেচ্ছাবাণী আসে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর বাণীতে বলেন, 'গীতবিতান' রবীন্দ্র ভাবধারা প্রচারে সাহায্য করেছে। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও শুভেচ্ছা পাঠান। গীতবিতানের অধিকর্তা শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি সভাপতির নিকট গীতবিতানের দীর্ঘায়ু কামনা করে এক বাণী প্রেরণ করেন।

গীতবিতানের উদ্দেশ্য, কৃতিত্ব ও আদর্শের কথা বলেন শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার। শ্রীনীহারবিন্দু সেন গীতবিতানের পুরোনো দিনের কথা বর্ণনা করেন। মাংগলিকী পাঠ করেন ডঃ সরোজকুমার দাস। পঁচিশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের যাঁরা সূচনা করেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক বসু ছাড়া ছিলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীনীহারবিন্দু সেন, শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী কনক বিশ্বাস (অধ্যক্ষা), শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী প্রভৃতি।

গত ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী গীতবিতানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। আটজন শিক্ষার্থী নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, বর্তমানে বিভিন্ন শাখায় তার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২২০০ জন। সভায় গীতবিতানের প্রথম যুগের কর্মী পরলোকগত সুজিতরঞ্জন রায়, প্রথম সভাপতি কালিদাস নাগ ও অন্যান্যদের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদন মঞ্চেই 'কাল-মৃগয়া' অভিনীত হয়। গীতবিতান এই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্ন দিনে মঞ্চস্থ হয় "শাপমোচন", "তাসের দেশ" ও

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ৮ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেটের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ' দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হলো। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল বিভাগ বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অন্য কয়েকটি কলেজের ছাত্র বহিষ্কারের ব্যাপার নিয়ে পুরো তিন সপ্তাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাত্রদের পিকেটিং-এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পিকেটিং চলেছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হাত নেই। রেজিস্ট্রার বলেছেন যে, প্রশাসনিক, ছাত্র ভর্তি এবং ছাত্র বহিষ্কারের ব্যাপারে স্ট্যাটুট এবং অর্ডিন্যানস অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলির ওপর কোন কিছু করণীয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ খোলা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন তাঁরা তা প্রত্যাহার করেছেন।

দেশী সংবাদ—

৫ **ডিসেম্বর**—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন আজ লোকসভায় বলেন যে, উত্তরপ্রদেশের গো-হত্যা নিষিদ্ধ আইনটি শীঘ্রই দিল্লিতে প্রসারিত হবে। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশনামা রূপায়ণের জন্য সরকার 'জোর চেষ্টা' করবেন।

শ্রী এস কে পাতিল ও শ্রীস্বর্ণ সিং-সহ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের জন্য শ্রীমধু লিমায়ের নেতৃত্বে বিরোধী সদস্যরা আজ লোকসভায় আবার নতুন করে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। অধ্যক্ষ শ্রীহুকুম সিং তাঁদের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

৬ **ডিসেম্বর**—শেষ পর্যন্ত বাম কমিউনিস্টরা নির্বাচনী ফ্রন্ট দাঁড় করাতে পেরেছেন। ছোট ও মাঝারি ছ'টি বিরোধী দল তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ফ্রন্টের নাম হচ্ছে সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট; লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠন।

আজ রাজ্যসভায় ১৯৬৬ সালের নিবারক নিরোধ বিলটি গৃহীত হলে সমগ্র বিরোধী দল প্রতিবাদস্বরূপ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। তাঁরা এটিকে কালা কানুন বলে অভিহিত করেন। এই বিল গৃহীত হওয়ায় নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আরও তিন বৎসর বেড়ে গেল।

৭ **ডিসেম্বর**—অতঃপর সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজ্য সরকারের কর্মীরা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস-ভবন, খোলা জায়গা, চত্বর প্রভৃতি স্থানে সভা-সমাবেশ করতে পারবেন না। "আপত্তিজনক লেখাযুক্ত" ব্যাজ পরিধানও নিষিদ্ধ।

জরুরী কাজকর্ম চালু রাখার আদেশ জারী করা সত্ত্বেও আজ উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারের শতকরা ৯০ জন কর্মচারী "অনির্দিষ্টকালের জন্য" ধর্মঘট করায় রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

৮ **ডিসেম্বর**—আজ অপরাহ্নে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ দেবজ্যোতি বর্মন তাঁর মধ্যমগ্রামের বাসভবনে করোনারি থ্রমবসিসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬২ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বর্তমান। তিনি মৃত্যুদিন পর্যন্ত আনন্দমোহন কলেজের (সান্ধ্য বিভাগ) অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন।

আজ মহাকরণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে পুলিস ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে সেখানে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধৃত সহকর্মীদের মুক্তির দাবিতে কয়েক হাজার সরকারী কর্মচারী পুলিস বাহিনীকে ঘিরে দু' ঘণ্টাকাল অবস্থান করার পর ৪ জন কর্মীকে ব্যক্তিগত মুচলেখায় জামিনে মুক্তি দিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

৯ **ডিসেম্বর**—রাইটার্স বিল্ডিং-এর আটজন সরকারী কর্মচারীকে আজ সাসপেনড করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে চারজনকে গতকাল পুলিস গ্রেফতার করে পরে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেয়। এই চারজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির চারটি ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের কেরানী শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অন্য তিনজনকে ৪ লক্ষের বেশী সরকারী টাকা সম্পর্কে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গত শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী কে কে সেনগুপ্তের এজলাসে হাজির করা হয়। গত বুধবার কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস আসামীদের গ্রেফতার করে।

আগের দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ছাত্রদের উপর পুলিসের লাঠি চার্জ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ এবং সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণার ফলে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী একদল ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের তালা ভেঙে কেমিস্ট্রি লেবরেটরিতে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে দেয়।

১০ **ডিসেম্বর**—মজঃফরপুরে রামদয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আজ প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য পুলিস ৪ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ওই কলেজের অধ্যাপক নিগমানন্দ কুমার ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং একজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হন। পরে তিনি সদর হাসপাতালে মারা যান। রাজ্য সরকারের আদেশে আজ বিহারের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১১ **ডিসেম্বর**—ভারতের প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরী আরমস, এইমস অ্যানড অ্যাসপেকটস নামে যে বই লেখেন, তার যথেষ্ট সমালোচনা হলেও তার জের মিটে গিয়েছে। কিন্তু এ দেশের (বৃটিশ মালিকানাধীন) একটি সংবাদপত্রে সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে যে স্বীকারোক্তি তিনি করেন, তার জের হিসাবে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরকেও শেষ পর্যন্ত না নাড়া দিয়েছে।

নিমজ্জমান দেশকে উদ্ধারের জন্য সাধারণ নির্বাচনের পর সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। আজ নিখিল ভারত ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন অব ইন্ডিয়ার সভায় সভাপতিত্ব করার সময় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রস্তাব করেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার 'বিদ্রোহী' প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথ আজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব-সম্বলিত খসড়া নথিটি অগ্রাহ্য করেছেন। রোডেশিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের জন্য জিব্রালটারে সাম্প্রতিক আলোচনার পর এই নথিটি তৈরি হয়েছিল। ব্রিটেন রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

৬ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার স্মিথ সরকার আজ সরকারীভাবে এক বিবৃতিতে বলেছেন : ব্রিটেন চায় যে, আমরা তার কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করি। সেটা সম্ভব নয়। লন্ডন থেকে ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন।

৭ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা আরোপ করতে চাইলে, তা প্রয়োগ না করার জন্য রোডেশিয়া সরকার আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। সাউথ আফ্রিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এ খবর দিয়েছেন।

৮ **ডিসেম্বর**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আরও কয়েকটি দেশ মহাকাশে পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করার বিষয়ে একটি চুক্তির খসড়া সম্পর্কে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন আজ টেকসাসে এ কথা প্রকাশ করেন।

৯ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার অর্থনীতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন প্রায় ১২টি মূল পণ্যের রোডেশিয়া কর্তৃক আমদানির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য ব্রিটেন গতকাল স্বস্তি পরিষদকে অনুরোধ করেছে।

১০ **ডিসেম্বর**—শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্য রোডেশিয়ায় রফতানি নিষিদ্ধ করার যে প্রস্তাব ব্রিটেন তুলেছে, নিরাপত্তা পরিষদে জাম-বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসাইমন এম কাপওয়েপওয়ে তা একেবারেই অকেজো বলে খারিজ করে দেন। পরিবর্তে তিনি রোডেশিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য-আমদানি ও রফতানি দুই-ই পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি জানান।

১১ **ডিসেম্বর**—নেপোলিয়নের চুল নিয়ে অন্যত্র যে গবেষণা চলছে, তারই সাহায্যে কুওমিনটাং চীনের একজন বিজ্ঞানী আণবিক বিকিরণের মধ্যে আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ঔষধ উৎপাদনের সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

সূচীপত্র

Macleans
TOOTH PASTE

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীবিপুল সেনগুপ্ত

শীতের আগমন

মাসটা পৌষ; শীতের প্রথম মাস। 'প্রথম শীতের মাসে শিশির লাগিল ঘাসে, হু হু করে হাওয়া আসে, হি হি করে কাঁপে গাত্র—'। বলা বাহুল্য, কলকাতা শহরের মানুষ, যাঁদের পায়ের তলায় বাঁধানো সড়ক তাঁরা ঘাসের শিশির লক্ষ করবার মতন সুযোগ যদি বা নাও পেয়ে থাকেন সম্প্রতি হু হু হাওয়া এবং হি হি কাঁপুনি থেকে হয়ত শীতের আগমন অনুভব করতে পারছেন। আকাশের রোদের প্রতি যাঁদের এখনও মায়া পড়ে নি তাঁরা নিতান্তই হতভাগ্য। অবশ্য রোদ বা হাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়েও কেউ কেউ শীত অনুভব করতে চান, তাঁদের জন্যে একদিকে উলের দোকান অন্যদিকে শালকরের ঝাঁপি খোলা আছে। তা সে যাই হোক, রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে এবারে শীতের আগমনে তেমন একটা অনিচ্ছুক ভাব নেই। আজকাল আমাদের কপালে মন্দ খবরও তেমন প্রসন্ন চিত্তে আসে না; খেয়াল খুশিতে তাদের আসা-যাওয়া; এসেই যাই-যাই ভাব। এ পোড়ার দেশে বুঝি দু দণ্ড কারও থাকতে ইচ্ছে করে না। আপাতত তাই শীতের আগমনে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারি। হাওয়া যতই কেন না হু হু করে আসুক, তবু বলি শীত তুমি থাক। তোমার জন্যে সদ্য লেপ কম্বল বের করেছি, বাক্স আলমারি ঘেঁটে কোট প্যাণ্ট সোয়েটার, দোকানে দোকানে ঘুরে দুর্মূল্য উল কিনেছি—এত আয়োজন নেপথালিনের গন্ধ শুকোতে শুকোতে যদি ফুরিয়ে যায় তবে সবই নিরর্থক হবে।

শীতের পথ চেয়ে বসে থাকা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। 'এসেছে শীত গাহিতে গীত'—এ বড় সত্য কথা। শীতের সেই গান পল্লী বাংলার আকাশে বাতাসে মাঠে ঘরে ঘরে একদা শোনা যেত; ধানের ঝাড়াই মাড়াই, গোলায় তোলা ফসল ঘর কলাই তোলার সম্ভার সবজি ক্ষেতে মটরশুঁটির লক্ষ পুকুরের ঠান্ডা জলে মাছের প্রাচুর্য, সেই পাটালী গুড়ের ঘ্রাণ—এ সবই শীতের গীত'। দু হাত উজাড় করে দিয়ে যেত এই শীত। পৌষ লক্ষ্মীর বন্দনা তাই বাংলা দেশের ঘরে ঘরে; নবান্ন আর পিঠে-পার্বণে; গ্রাম্য উৎসবে।

একালে, বিশেষ করে কলকাতায় বসে, ভাবতে কষ্ট হয়—এমন 'শীতের গীত' এখনও আছে। হয়ত নেই, বা যা আছে তা যেন সব দিক থেকেই সংক্ষিপ্ত। মাঠের ধান খরায় নিয়েছে, অর্ধেক গোলা শূন্য, সরকারী খয়রাতিতে জীবনযাপন। এমন অবস্থায় 'শীতের গীত' হয়ত প্রহসনের মতন শোনাবে।

তবু এই শীত একেবারে নির্মম এমন কথা বলা যায় না। খুঁজে দেখলে হয়ত কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। সান্ত্বনা এই, প্রকৃতি খেয়াল বশে যা নিয়েছে তার কিছুটা হয়ত আগামী মরশুমে পুষিয়ে দেবে।

আমরা, কলকাতা শহরে যারা থাকি, তারা যে সুখে আছি তা নয়। বরং সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশি। শীতের সবজি এখনও তেমন করে বাজারে এসে পৌঁছোয় নি, যা এসেছে তার দাম শুনলে শীতের বাতাসের ঝাপটা গায়ে লাগার মতন কেঁপে উঠতে হয়। মাছ ডিম দিনে দিনে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এর ওপর রেশনের চাল—আজ এক, কাল অন্য। সাংসারিক জীবনে আরও পাঁচ রকম শীতের চিন্তা এসেছে : ছেলেমেয়ের পরীক্ষার পাট চুকেছে, পাশ করবে না ফেল করবে, পাশ করলে নতুন বই কেনার ঝঞ্ঝাট, ফেল করলে দুঃখ, বছর খানেকের খরচ-খরচা জলে গেল। তবু আশা নিয়ে থাকা, ভরসা করা। তা বলে পরীক্ষান্তে তাদের মুখের হাসি কে বা কাড়ে!

এমন দিনেও কলকাতা শীতের সাজে সেজে উঠছে, যদিও পথে ট্রাম নেই—স্টেট বাস রাস্তায় নামে নি দিন দুই—তবু কলকাতার চারপাশে শীতের আমন্ত্রণ পুজো ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়-চোপড়ের দোকান থেকে দমকা বাতাসে যেন নাইলন-টাইলন বিদায় নিয়েছে, তার বদলে এখন লাল শালুতে মস্ত করে লেখা হয়েছে 'গরম বস্ত্রের বিপুল আয়োজন' বা উইণ্টার সেল; শাল, কম্বল শোভা পাচ্ছে দোকানে, শো-কেসে ক্লোক ঝুলছে, সোয়েটার ঝুলছে। উলের দোকানে অষ্টপ্রহর ভিড়। এবং ইতিমধ্যে—কোনো কোনো ভাগ্যবান শ্বশুরবাড়ি পাওয়া নতুন শালটি গায়ে চাপাতে পারছেন; কেউ কেউ মাঘের অপেক্ষায় আছেন ওদিকে চিড়িয়াখানার ফটকে ভিড় বাড়ছে দিন দিন, শিবপুরে হাওয়া-গাড়ি ছুটছে হরেক রকম সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন, সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, আর ক্রিকেটে টেস্ট খেলা দেখার জন্য রীতিমত টিকিটের হাহাকার শোনা যাচ্ছে।

সুখদুঃখে মেশানো এই শীতকে উদার ভাবে অভ্যর্থনা করার ভাগ্য আমাদে হল না হয়ত, তবু তাকে নিতান্ত গোমড়া মুখে ফিরিয়ে দিতেও প্রাণে লাগে।

বৈদেশিকী

প্রেসিডেন্ট জনসন

ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জটিলতা

উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিন বোমা-বাজির বহর আরো বাড়ল। এতদিন উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয়-এর আশে-পাশে তথাকথিত "সামরিক লক্ষ্য"র উপর বোমাবর্ষণ চলছিল। এখন হ্যানয় শহরের বস্তির উপর বোমা পড়ছে। আগে এক একবারে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ মারা যাচ্ছিল, এখন এক একবারে শ'য়ে শ'য়ে বা হাজারে হাজারে মানুষ মরছে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট জনসন একটি "বড়োদিনের বাণী"তে (হায় বড়োদিন!) বলেছেন, "ভিয়েৎনাম যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা বেড়েছে।" তার মানে বোধহয় এই যে, এইবার নিজেদের মুখরক্ষার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনকে হয় উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে নামতে হবে, অথবা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন উত্তর ভিয়েৎনামকে মার্কিন শর্তে সন্ধির আলোচনায় যোগ দিতে দেবে অথবা যোগ দিতে বাধ্য করবে। আমেরিকার বোধহয় ধারণা যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীন সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এইবার উত্তর ভিয়েৎনামকে বাগমানানো কঠিন হবে না।

হ্যানয়, মস্কো এবং পিকিং-এর পারস্পরিক সম্বন্ধও বড়ো জটিল। উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্য করার ব্যাপারে মস্কো ও পিকিং-এর মধ্যে মতের ঐক্য নেই। উত্তর ভিয়েৎনামকে সাহায্য করার ব্যাপারে একটা যৌথ নীতি অনুসরণ করতে চীন বাধা দিচ্ছে। মস্কো দীর্ঘকাল ধরে এই অভিযোগ করে আসছে। অন্যদিকে চীন বলে আসছে যে, মস্কো যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুদ্ধবাজদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। অনেকের ধারণা যে, চীন যতটা আপোসের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ততটা নয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট জগতে মুখ রক্ষা করতে হলে চীন যতদিন নাছোড়বান্দা হয়ে থাকবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের আপোসের পক্ষে প্রকাশ্যে কোনো কিছু করার উপায় নেই। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের বিবাদ এখন যে-পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন কম্যুনিস্ট জগতের বিভাগ মেনে নিয়ে চীনকে সোজাসুজি একঘরে করার দিকে ঝুঁকেছে বলে মনে হয়। তাহলে উত্তর ভিয়েৎনাম সম্পর্কে চীনের বিরুদ্ধে যেতেও হয়ত মস্কো এখন প্রস্তুত, এরকম ধারণা হয়ত ওয়াশিংটনের হয়েছে। তাহলে "জেনেভা কনফারেন্স"—যার যুগ্ম সভাপতি হচ্ছে ব্রিটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন—তার পুনরধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হতে পারে। ব্রিটেন জেনেভা কনফারেন্সের পুনরধিবেশন আহ্বান করার জন্য অনেকদিন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুরোধ করে আসছে কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন তাতে রাজী হয় নি। আমেরিকার বোধহয় এখন আশা হয়েছে যে, ভিয়েৎনাম সম্পর্কে চীনের থেকে প্রকাশ্যে পৃথক স্ট্যান্ড নিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের এখন আপত্তি হবে না। ওয়াশিংটনের এই ধারণা হয়তে হয়েছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আলগা দেয় এবং চীনও আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত না থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিন প্রহার ধ্বংসকারী রূপে ধারণ করে তাহলে হ্যানয়-এর মাথা নোয়ানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না। প্রেসিডেন্ট জনসন, বোধহয় একেই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনামের উপর আমেরিকার নৃশংস আক্রমণ থেকে প্রেসিডেন্ট জনসন যে ফল লাভ আশা করছেন সেটা অবশ্যম্ভাবী নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত না হতে পারে, চীনের থেকে আলাদার

পথ নিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত হতেও পারে, কিন্তু যাতে দেখা যাবে আমেরিকার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য হচ্ছে, এমন কোনো পথ সোভিয়েট ইউনিয়ন নিতে পারে কিনা সন্দেহ। সুতরাং চীন যদি উত্তর ভিয়েৎনামকে না ছাড়ে তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাকে কখনও ছাড়তে পারবে বোধহয় না। ভিয়েৎনামীদের মরতে দিতে চীনের অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের অত্যধিক চক্ষুলজ্জা কল্পনা করার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নেই। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর আমেরিকার প্রহার আরো বাড়লেও চীন বর্তমান অবস্থা চলতে দিতে পারে। সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে না নেমেও চীন কোরিয়ায় যেমন করেছিল বিপুল সংখ্যায় চীনা "ভলান্টিয়ার" সেনা ভিয়েৎনামে পাঠাতে পারে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ এখন সুগম হয়েছে—প্রেসিডেন্ট জনসন-এর এই কথাও যেমন নির্ভরযোগ্য নয়, তেমনি উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ হলেই শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অদূরবর্তী হবে এরূপ আশারও কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই।

⁂

সিকিউরিটি কাউন্সিল রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যানডেটরী স্যাংশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যে-সব জিনিস রোডেশিয়ায় পাঠানো নিষিদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে খনিজ তেলও আছে। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়েই যাঁরা অস্ত্রপ্রস্তাবক নন তাঁরা দেখেছেন এবং অনেকে খোলাখুলি বলেছেন যে এর দ্বারা স্মিথ গবর্নমেণ্টকে কাবু করা যাবে না। যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগালের হাত বাঁধা না যাবে ততদিন স্মিথ গবর্নমেণ্ট সিকিউরিটি কাউন্সিলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলতে পারবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যাদের বেশি কাজকারবার, তারা কী করবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রিটেনেরও তো কথাই নেই আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা কেউই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তাদের লেনদেন একচুলও কমাবে না। ইউ এন-এর জেনারেল অ্যাসেমব্লীতে এদের কেবল সমালোচনা করলে কী হবে? ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট রোডেশিয়ায় তাঁদের ভাই বেরাদারদের কর্তৃত্ব যতকাল সম্ভব বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে—এই হচ্ছে ম্যানডেটরী স্যাংশনের অর্থ।

১৭।১২।৬৬

নবীন ভারত
কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহার
স্বতন্ত্র পার্টি নির্বাচনী ইস্তাহার
বাংলা কংগ্রেস
জনসংঘ নির্বাচনী ইস্তাহার

'পদযাত্রা'

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার—' এই রবীন্দ্র-গীতিটি আপনারা সকলেই শ্রুত আছেন এবং এর দ্বিতীয় পংক্তিটিও নিশ্চয়

গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন: 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলি হয়েছে বোঝা।' ট্রাম যখন অচল, দুর্বোধ্য প্রাইভেট বাস যখন আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে 'চকিত বিদ্যুতের' মতো বেরিয়ে গেল, তিন চাকার 'ভাড়ে কা গাড়ি'—অর্থাৎ টেম্পোর 'হিউম্যান ট্রাফিকে'র অবস্থা দেখে যখন 'রোক্‌খে—রোক্‌খে' বলতেও সাহস হল না, তখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, ঈশ্বরপ্রদত্ত বেসুরো গলায় আমি প্রাণমন ঢেলে এই গানটি গাইতে লাগলুম।

শ্রীভগবান (অথবা শ্রীপ্রকৃতি) আমাদের প্রত্যেককে দুখানি করে পা দিয়েছেন। তা দিয়ে ফুটবল খেলা যায়, বাড়ির পোষা কুকুর-বেড়ালকে পদাঘাত করা যায়, পেছলানো যায় এবং আছাড় খাওয়াও চলে, কিন্তু পায়ের আসল উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই চলা। এবং যে চলিষ্ণু—'অস্রুসা ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'-কে যে গ্রাহ্যও করে না—তারই অদৃষ্টে লক্ষ্মীলাভ ঘটে, আমাদের শাস্ত্র এ-কথা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে। তার ফলে,

আমাদের পূর্বপুরুষেরা চরণযোগে বদ্রীনাথ থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত তীর্থ করেছেন, দীপংকর পায়ে হেঁটেই তিব্বত পাড়ি দিয়েছেন। সেণ্ট পল্‌ পায়ের জোরেই অর্ধখানা দুনিয়া চষেছেন, মার্কো পোলো কত মাইল হেঁটেছেন তার হিসেবই নেই। হুয়েনৎসাং—ফা-হিয়েন ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিই—এই সেদিনও বিদ্যাসাগর বীরসিংহ থেকে কলকাতায় হেঁটে আসতেন? গান্ধীজী-ভাবেজীর পদযাত্রা তো চোখের সামনে।

অথচ, এই কলকাতায়, এক মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটার কথা ভাবলেই আমাদের হাঁটু টনটন করে। জীব-বিজ্ঞান বলে, প্রকৃতির আইনই হল—যে অঙ্গটি আমরা ব্যবহার করব না ধীরে ধীরে তা লুপ্ত বা অকেজো হয়ে আসবে। প্রকৃতির সেই প্রতিশোধটি এই মুহূর্তেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। যে পদযুগল একদা দ্বারকা থেকে পশুপতিনাথ পর্যন্ত পরিক্রমায় অক্লান্ত ছিল, সেই উত্তরাধিকারলব্ধ ঠ্যাং দুটি এখন যানের অভাবে দেড় মাইল-দু মাইল দূরের অফিসে যেতেও গররাজী! নিজের ওপরেই অশ্রদ্ধা এসে গেল। আত্মগ্লানি আরো নিবিড় হল, যখন মনে পড়ল আমাদের গোয়ালা দুর্বলরাম এই সেদিনও দেশ থেকে তিনটে গোরু হাঁটিয়ে এনেছে—অন্তত শ-আড়াই মাইল তো বটেই। দুর্বলরামের পদ-প্রতাপই যখন এই রকম, তখন দেহাতী সবলরামের কথা তো কল্পনাই করা যায় না!

তা হলে উদ্বুদ্ধ হওয়া যাক। আজ ট্রাম নেই, কাল বাস বন্ধ, পরশু জ্যৈষ্ঠ মাসের ডাব আর আষাঢ় মাসের কাঁঠালের মতো গাদি হয়ে টেম্পো-ট্রাক চড়ে অফিসযাত্রা—এই আত্মিক অবমাননা তো আর সহ্য করা চলে না! আসুন, হাঁটাই যাক। লজ্জা পাবেন না, খোদ আমেরিকায়—মোটরচারীদের স্বর্গরাজ্যেই এখন পায়ে-চলার আন্দোলন চলছে। তাঁরা বুঝেছেন, নিউইয়র্ক-চিকাগো-ওয়াশিংটনের

পদযাত্রাকে রমণীয় করে তোলার উপায়

পদযাত্রায় ক্লান্তি লাঘবের উপায়

মতো শহরে মোটর-চড়ার চাইতে পায়ে-হাঁটাই বেশি সুবিধেজনক। আর এই আমিই তো মাস তিনেক আগে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রামে চেপে শিয়ালদা পৌঁছেছি ঠিক একঘণ্টা সাতাশ মিনিটে—বড়বাজারের ভিড় ঠেলে গজেন্দ্র-গমনে হেঁটে এলেও বোধ হয় মিনিট পঞ্চাশের বেশি সময় লাগত না।

এই পদযাত্রায় প্রবুদ্ধ হতে হলে আমাদের অবশ্য অভ্যাসগুলো কিছু বদলাতে হবে। অর্থাৎ 'আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ'—এই মূলমন্ত্রটি ফিরে আসবে আমাদের জীবনে। সাতটার বদলে বাজারে বেরুতে হবে সাড়ে পাঁচটায়, ফলে মর্নিং-ওয়াকটি উপরি-লাভ। খেয়ে-দেয়ে ধীরে-সুস্থে হেঁটে হেঁটে অফিসে গেলে যত ইচ্ছে পান চিবুনো এবং পিকফেলা চলবে, একটির পর একটি বিড়ি নিশ্চিন্তে টেনে যাওয়া যাবে—কারো সাধ্য নেই যে পঞ্চাশ টাকা জরিমানার ভয় দেখাতে পারে। তারপর অফিস করে, আড়াই-তিন মাইল হেঁটে যে ভাগ্যবান ঘরে ফিরবেন—আর্লি টু বেড তাঁর অনিবার্য; এবং যে সুখনিদ্রাটি তাঁর লাভ হবে, কানের কাছে ক্ল্যাকার ফাটলেও সেটি টোল-খাওয়ার সম্ভাবনা কম।

ট্রামে-বাসে আমরা প্রত্যেকেই লোভী আর স্বার্থপর হয়ে উঠি। কারুর পা মাড়িয়ে, কাউকে গুঁতিয়ে, কাউকে গাল দিয়ে এবং কারুর গাল খেয়ে ওঠা-নামার পর্ব, একটা সীট খালি হলে কী করে আরো পাঁচ জোড়া হুঁশিয়ার চোখকে ফাঁকি দিয়ে টুপ করে সেখানে বসে পড়ব, তার অক্লান্ত সাধনা; প্রতিটি নতুন যাত্রীকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করব এবং আশপাশের প্রত্যেককেই সন্দেহ করতে থাকব, কারণ 'চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমার নিকটেই আছে।'

কিন্তু চলিষ্ণুতায় কোনো প্রতিযোগিতা নেই। দুটো-একটা গোরু, এক-আধটা কলের খোসা অসতর্কের ছাতার বাট—এই রকম কিছু কিছু বাধা আছে বটে, তবু হিসেব করে দেখলে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি; নেহাত তালকানা না হলে চাপা পড়বার ভয় নেই, অথচ ট্রাম-বাসের পা-দানি বৈতরণীর দিকে এগিয়েই আছে। মিছিলে পথরোধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ট্রাফিক জ্যাম হলে অকুতোভয়—যাতায়াতে যে পয়সা বাঁচবে, তাতে চীনে বাদাম, তেলে-ভাজা, ফুচকার অপূর্ব পসিবিলিটি!

আর মনের কী আশ্চর্য মুক্তি! ধরুন শ্যামবাজার থেকে দশজন একসঙ্গে ডাল-হাউসি স্কোয়ারে হেঁটে আসছি, খোশ-গল্প চলছে, হৃদয়ে একটা গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কেউ কারুর পা মাড়াচ্ছি না, কারু পাঁজরায় হাতের ব্যাগটা দিয়ে খোঁচা দিচ্ছি না, কাউকে খেঁকিয়ে বলছি না: "আচ্ছা লোক তো মশাই, চোখে দেখতে পান না?" ঘণ্টা দুই সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছি, স্ত্রী-সিনেমা-ক্রিকেট-রেশন-পরচর্চা-পলিটিক্স্ নিয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করতে করতে চলেছি, দু-চারজন চেনা-জানার সঙ্গে দেখা হলে একটু দাঁড়িয়ে কুশলের আদান-প্রদানও করা যাচ্ছে। বেশ এক্সারসাইজ্ হচ্ছে, বাত এবং ডায়বেটিজের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে, 'থিনলেগেড্ ইন্ডিয়ান'—এই অপবাদের প্রতিবাদে—

আরো অনেক ভালো ভালো কথা জোয়ারের মতো বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু থামতে হচ্ছে। সুনন্দর পাতায় জায়গা কুলোবে না। শুধু একটা সমস্যা আছে—জুতোর। এই পদযাত্রার ফলে একজোড়া জুতো মাস দুয়েকের বেশি টিঁকবে বলে ভরসা হয় না। তার সমাধান হল, পশ্চিমের দেহাতী নাগরা। সেই আশ্চর্য কাঁচা চামড়ার জুতো—যা মাস দুই তেলে ডুবিয়ে রেখে তবেই চরণে ধারণ করা চলে। প্রথমে একটু রক্তারক্তি হবে, কিন্তু তারপর সারা জীবন নিশ্চিন্ত—এমন কি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমেও চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আসুন, পদযাত্রাই করি।

বিমান ডাকে

বিদেশে চাঁদার নূতন হার

মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ১ জুলাই হইতে বিদেশে বিমান ডাকে দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার—

এশিয়া:	
বার্ষিক	১৮৬·০০
ষান্মাসিক	৯৩·০০
ত্রৈমাসিক	৪৬·৫০
ইওরোপ:	
বার্ষিক	২৮০·০০
ষান্মাসিক	১৪০·০০
ষান্মাসিক	১৪০·০০
ত্রৈমাসিক	৭০·০০
আমেরিকা ও কানাডা:	
বার্ষিক	৪১০·০০
ষান্মাসিক	২০৫·০০
ত্রৈমাসিক	১০২·৫০
অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ফিজি প্রভৃতি:	
বার্ষিক	৩২৬·০০
ষান্মাসিক	১৬৩·০০
ত্রৈমাসিক	৮১·৫০
লন্ডন অফিস মারফত:	
বার্ষিক	১১৭·০০
ষান্মাসিক	৫৮·৫০
ত্রৈমাসিক	২৯·৫০

—সার্কুলেশন ম্যানেজার, দেশ

পানিহাটি

উমা দেবী

পানিহাটির গঙ্গাতীরে আশ্চর্য শান্তির
প্রতিশ্রুতি ছড়ানো রয়েছে। শুধু গিয়ে বোসো
ধসে-যাওয়া ভাঙা ঘাটে—যেখানে দু'পাশে
বকুলবৃক্ষও যেন বটবৃক্ষ স্পর্ধাশায়ী।
কোমল ছায়ার লীলা—
নীলাম্বরী-পরা
সুন্দরী কিশোরী কোনো জল নিতে এসে
মনে হবে—মনে হবে—এইমাত্র—এখনি যেন বা বুঝি
হয়েছে সে নীল ও নবীন ছায়া।
পরিপূর্ণ স্পষ্ট সূর্যালোক
গৌরাঙ্গ-বিভায় মূর্ত।
সরু পথ দিয়ে—যেতে যেতে দেখা যাবে রাঘবের ভাঙা বাড়ি।
একটি মাধবীলতা
প্রবল প্রাণের শক্তি সহাস্যে ছড়ায়—
কুসুমে কুসুমে ভরে ভাঙা থাম—বন্ধ্যা ধূলি।

হঠাৎ সমস্ত তর্ক থেমে যাবে।
শহরের বিচ্ছিন্ন চিন্তার জালগুলি মেরামত হবে
পুরোনো কালের স্রোতে নিক্ষিপ্ত হয়েই
তুলে আনবে অমূল্য-পসরা—
দু'-এক গানের কলি—মহাজন পদাবলী— দু'-একটি সুরের মন্ত্রণা।

অবশ্যই দণ্ডঘাটে দেখা যাবে বায়ুসেবী শৌখিন বৃদ্ধকে—
ফিরিওলা চিনেবাদামের—

ভাঙা ঘাটে সিঁড়িতে সিঁড়িতে খেলা
নির্বিঘ্ন বন্ধুর বিবমিষা।
কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। সম্মুখে গঙ্গা-
বীচিভঙ্গ লীলায়িত স্রোতের শিখরে
ভেঙে ভেঙে উঠবে এক রঙিন কুহেলি
অস্তসূর্যে মেঘে মেঘে রঙিন আবীর-
আকস্মিক আলোর ঝিলিকে এক দীপ্ত চেলাঞ্চল—
আবার মুছেই সব একাকার।

নিদ্রার মতন স্নিগ্ধ সৌরভ জোয়ার
ভরে উঠবে কূলে কূলে হৃদয়ের—
পঞ্চদশ শতাব্দীর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাথায় মাথায়।
কিংবা আরো— আরো এক অতল গভীর থেকে
আরো এক অকাল বিস্তার
ভরে দেবে অস্তিত্ব তোমায়।

সত্যই আশ্চর্য এক শান্তির প্রতিজ্ঞা
উচ্চারণ করেছে সেই পানিহাটি।
গঙ্গার উত্তর থেকে সমুদ্রের উদার দক্ষিণে
প্রসারিত বাণী তার—
রাঘবের ঝালিতে ও জীবনের গম্ভীর প্রত্যয়ে
সুদৃঢ় সম্যক ধৃত।

বধ্যভূমি

রত্নেশ্বর হাজরা

পিতৃত্ব লাভের আগে পুরুষেরা অন্তত একবার হিংস্রতম
হয়ে ওঠে
আত্মজের রক্তে হাত ধোয়
পিতৃত্ব লাভের আগে পুরুষেরা নিজের ছায়ায়
বসে কাঁদে
যমুনা পারের শ্যাম বটে
মহানিমে
আত্মজের শব

বেঁধে আসে
বধ্যভূমি একান্ত আপন করে তোলে—
পিতৃত্ব লাভের আগে পুরুষেরা দক্ষিণের বিল
শিশুর কঙ্কালে ভরে রাখে
মধুকরে ঝাঁঝা ডাকে
চারাগাছ কাটে
মৃণালের ডানা ভেঙে হাতের তালুতে জড়ো করে
মহানিমে শব বেঁধে আসে
আত্মজের রক্তে হাত ধোয়—
পিতৃত্ব লাভের আগে মানুষেরা
নিজের ছায়ায় বসে কাঁদে।

কলকাতার ডায়েরী

এতদিন কলকাতার কুখ্যাতি ছিল 'মিছিলের শহর' বলে, এখন বলা যেতে পারে 'ধর্মঘটের শহর।' অবাঙালী কেউ এই মন্তব্য করলে অবশ্য আমরা চটে যাব, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, ইদানীং ধর্মঘট ব্যাপারটা মহামারীর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ছোট বড় একটা না একটা তো লেগেই আছে, তদুপরি কিছুদিন আগে এক সঙ্গে পর পর ঘোষণা করা হয় ট্রাম, বাস, ছাত্র, বন্দর ও করপোরেশন ধর্মঘট। ছাত্রধর্মঘট অবশ্য গাসহ্য, ইতালিতে ঝাড়ুদারের প্রতি 'নির্যাতন', কিংবা আলজিরিয়ায় কেরানী বরখাস্তের প্রতিবাদেও এই শহরে যখন তখন ছাত্ররা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু অন্য কয়টি ধর্মঘটের ব্যাপারে শহরবাসী ভাবনায় পড়ে যান। বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল, ট্রাম-বাস যদি না চলে, তাহলে কী হবে?

শেষপর্যন্ত বিশেষ কিছু হল না, ট্রামের বদলে এল প্রাইভেট বাস, টেমপোরারি ব্যবস্থা হিসাবে, টেমপো; ঘোড়ার গাড়ি, রিকশাও বেশ দু পয়সা কামালো এবং দুদিনের মাথাতেই স্টেট বাসের ধর্মঘটী কর্মীরা আন্দোলনের ঝান্ডা গুটিয়ে নিলেন, মুচলেকা দিয়ে অনেকে কাজে যোগ দিলেন।

ধর্মঘটের সময়ে স্টেট বাস কিছু চলছিলই, তৃতীয় দিনে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা। বরং প্রাইভেট সেকটর আর পাবলিক সেকটর সহাবস্থান করে ট্রাম-লাইনের ফাঁকা জায়গা ধরে ছুটে চলল আরও ত্বরিৎ গতিতে।

কর্মী ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহারের একটি কারণ দেখালেন, 'যাত্রীসাধারণের হয়রানি।' যুক্তিসঙ্গত কথা, কিন্তু ধর্মঘট ঘোষণা করার সময় ওই হয়রানির কথা কি তাঁদের মনে ছিল না?

*

ট্রাম আর বাস ধর্মঘট যখন ঘোষণা করা হয়, তখন মনে পড়ছিল ১৩৯ বছর আগেকার একটি ঘটনা। সেই বছরই কলকাতায় হয় প্রথম ধর্মঘট এবং সেটি ওই পরিবহনেরই।

না, ট্রাম আর বাস তখন কোথায়, হাতি-ঘোড়া বাদ দিলে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল পালকি। সেই পালকি বেহারারাই ১৮২৭ সালের বাইশে মে কাজ বন্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যতের কলকাতার গোড়াপত্তন করল। এবং এই ব্যাপারে পথিকৃৎ বাঙালী নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার অধিবাসীরা।

১৯৬৬ সালে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহারের অন্যতম কারণ যেমন "পুলিসী জুলুম", সেই বছর প্রথম ধর্মঘটের প্রধান কারণও ছিল ঠিক তাই। আর ছিল ভাড়ার টাকা নিয়ে মতান্তর। শহর জুড়ে হই চই, বৈঠকের পর বৈঠক, দর কষাকষি এবং অবশেষে চারদিন পর আবার রাস্তায় রাস্তায় পালকির আবির্ভাব।

তখনও পরিবহন-ব্যবসায়ে সরকার নামেন নি, স্টেট-পালকি ও প্রাইভেট পালকি আলাদা ছিল না, তাই ভালমন্দ বিচার না করেই ওড়িয়া বেহারাদের কথামতই ভাড়ার টাকা ঠিক করতে হয়েছিল।

তবে সব প্রাইভেট হওয়ার জন্যে আর একবার কলকাতাবাসীকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। ১৮০৩ সালের তার একটি মে মাসে হঠাৎ দেখা যায়, শহরের সব পালকি হাওয়া।

খবর নিয়ে জানা গেল, ধর্মপ্রাণ কিছু বঙ্গ সন্তান হাজারের উপর পালকি ভাড়া করে পুরীতে জগন্নাথদর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। এদিকে শহরে তুলকালাম কান্ড। নগরবাসী দরবার করলেন সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে, প্রার্থনা জানালেন পুলিসের হস্তক্ষেপের। কিন্তু পুলিস কী করবে, পালকিগুলোর রাষ্ট্রীকরণ হলে না হয় কথা ছিল।

অবশ্য পাবলিক সেকটরে নিয়ে গেলেই মুশকিল আসান হত না। তার প্রমাণ এখনকার স্টেট বাস। পালকি বেহারারা সে সময় মুনাফা থেকে প্রতি বছর নিজেদের দেশে পাঠাত গড়ে তিন লাখ টাকা, স্টেট পালকি চললেই মুনাফার অংক নামত লোকসানে।

*

শীত ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে, বড়দিনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট পাড়ার দোকানে দোকানে মাজাঘষা চলছে, নিউ মারকেটে ক্রীসমাস কার্ড আর ক্রিসমাস ট্রি বিক্রির ধুম লেগেছে এবং কোথায় কোন্ রেস্তোরাঁয় ক্রীসমাস-ঈভের রাত কাটানো যায়, তার জল্পনা-কল্পনা মুখে মুখে ঘুরছে।

আর একটি 'পরব' আসছে বড়দিনের ঠিক পরে, সেখানে হাজির হবার প্রবেশপত্র পাওয়ার জন্যেও ইতিমধ্যেই হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। যেখানে যান, সেখানেই শুনবেন একটিমাত্র কথা—'ক্রিকেটের একটা টিকিট দিতে পারেন?'

এবং সব জায়গাতেই এক উত্তর—"কোথায় কাকে ধরলে পাওয়া যায় বলুন তো, আমিও যে খুঁজছি মশাই।'

শুনলাম, একশ টাকার টিকিটের বে-সরকারী দর এখনই পাঁচশ টাকায় উঠেছে এবং ষাট টাকার দর তিন শ টাকায়।

বড়দিনের মুখে মুখে দর নাকি এবার আরও বাড়বে। তার কারণ ভারত ওয়েস্ট ইনডিজ টেসটের পরই সাধারণ নির্বাচন। চাহিদাটা তাই একটু বেশী এবং প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীকেই গন্ডাগন্ডা পাড়ার ছেলেকে খুশী রাখতে হচ্ছে।

এদিকে শুনতে পাচ্ছি, পাঁচশ টাকা ফেলার হিম্মত এবং মাতব্বর গোছের কাকা-দাদা-মামা যাঁদের নেই, তাঁরা তলপি-তলপা বেঁধে এখনই ইডেন গারডেনে লাইন দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

—চাণক্য

ছুটি মানেই ছিপ। ছিপ মানেই পুকুর। আর পুকুর মানেই মাছ। অর্থাৎ প্রত্যেক ছুটির দিনে কাঁধে হুইল ছিপটি ফেলে, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট একই পুকুরের উদ্দেশে যাত্রা করা, যেখানে গভীর জলের ছায়াচ্ছন্ন শীতল অন্ধকারে মাছেরা পাখনা নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মাছ ধরা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, অনেক ফৈজত অনেক তবিবত। সুতরাং ছুটিটা সনতের কাছে ছুটি নয়, অনেক গুরুতর ব্যাপার।

মালতী হাসে। তুমি এতও পার। রোজ রোজ ছুটির দিনে এমনি ছুটো-ছুটি করতে ভালও লাগে।

ভালো লাগে কি মালতী, সনৎ হাসে, দিন কতক একটানা কোন পুকুরে মাছ ধরতে পারলে দেখবে চেঞ্জের কাজ হয়েছে। অর্থাৎ মোটা হয়ে গিয়েছি।

সনৎ খোল ভাজছে, চার করতে হবে। চারের কত রকম সাজসরঞ্জাম। মালতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। হ্যাঁ! তাই তো! তা না হলে এরকম চেহারা হয়! কোনদিন আয়নায় তাকিয়ে দেখবার অবকাশ হলে চোখ মেলে দেখো।

কড়ায় খুন্তি দিয়ে নাড়তে থাকে সনৎ। একটা ভাজা ভাজা সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভুর ভুর করে ছড়িয়ে পড়ে। নাকের কাছে খুন্তি তুলে দীর্ঘ আঘ্রাণে সুগন্ধটুকু টেনে নিয়ে বলে, তুমি নিশ্চয়ই রঙের কথা বলছ মালতী!

রঙ! মালতী বড় বড় চোখ মেলে তাকায়। শুধু রঙ! চেহারাটা যে দিনকে দিন গাঁজাখোর গুলিখোরের মত পাকিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখেছ!

সনৎ গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। তুমি রেগেছ। চেহারায় তোমাদের উত্তমকুমার না হই, একেবারে অধমকুমার কিছু নই। তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ।

হ্যাঁ, তাই বলছি আর কি! ভাল জ্বালাতন। নিজের ওপর রাগ হয়। চুলের গোড়ায় চিরুনি চালিয়ে জোরে জোরে টান দেয় মালতী। দাঁড়ের সঙ্গে জড়িয়ে কয়েকটি চুল পাকিয়ে ছিঁড়ে আসে। মাথাটা জ্বালা জ্বালা করে। রাগ রাগ গলায় মালতী বলে, আমার বয়ে গেছে।

একাঙ্কী, মেথীর সঙ্গে খোল ভাজা-গুলো ঝুরো ঝুরো করে দু হাতে মাখতে মাখতে সনৎ মুখ তুলে একগাল হাসল। না। তুমি সত্যিই রেগেছ দেখছি।

আমার রাগের তুমি থোড়াই পরোয়া কর! আমি মরলুম, কি বাঁচলাম তাতে তোমার বড্ড এসে গেল! তোমার হাতে ছিপকাঠি থাকলেই হল। মালতী দুম-দাম শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

এই দেখ। কি ফ্যাসাদে পড়লাম। সনৎ মনে মনে ভাবল। ঠোঙ্গায় ঝুরো মসলাগুলো পুরে নিল সনৎ, এখনও চারের অনেক কিছুই বাকি। পচা পনিরের ডিবেটা আনা হয়নি। ঘিয়ের গাদ দিয়ে আতপ চাল ক'টা ভেজে নিতে হবে। ভাতের ডেলা ন্যাকড়ায় মেড়ে ছেঁকে ভাতের টোপ তৈরি করতে হবে। কি জানি, চারে যদি আবার কাতলা ভেড়ে। হাতঘড়িতে সময় দেখল সনৎ। পাঁচটা বেজেছে সবে। কম্পিটিশন শুরু হবে রাত আটটায়। মিহির গাড়ি নিয়ে আসছে। পৌঁছতে বড় জোর ঘণ্টাখানেক লাগুক! মনে মনে হিসেব করল সনৎ। তা হলে হাতে এখনও খানিক সময় আছে।

কই, কোথায় গেলে, একটা থালা-টালা দিয়ে যাও না। গম্ভীর অথচ খুব নরম নরম স্বরে ডাকল সনৎ। মালতী এসে কানা উঁচু কাঁসার থালাটা এগিয়ে দিল। বড় পাউরুটিটা জলে ভিজিয়ে চিপে নিয়ে বাদামের খোসা ছাড়ানোর মত ওপরের শক্ত পোড়া অংশটুকু ফেলে দিল সনৎ। তাল পাকিয়ে থালায় রেখে ময়দা মাখার মত টিপে টিপে ঠাসতে লাগল। রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি! আজই শেষ। আর কোনদিন......

কথাটা শেষ হল না। মালতী ঘুরে দাঁড়াল। ঐ স্তোকবাক্য চার বছর ধরে শুনেছি। সনতের হাতের দিকে নজর পড়ল মালতীর। কি যেন ভেবে, মুখ ফিরিয়ে ফিক করে হাসি চাপল। ঐ টোপটা দেখলেও হিংসে হয়। কত বড়।

সনৎ জিভ কাটল। মাইরি বলছি মালতী। আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। হাতে পায়ে ধরাধরি করতে লাগল মুরারি। বললে, এ যাত্রা কম্পিটিশনে প্রাইজটা পাইয়ে দে সনৎ। পর পর দু বছর পেয়েছি আমরা।

আর সেই শুনে তুমি ছুটলে। তুমি সেই বান্দা কি না? মালতী বলল, নিজের ঝোল আনা হচ্ছে, আবার অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান হচ্ছে।

সনৎ হাসল। তোমার কাছে পার পাবার যো নেই। ঠিকই ধরেছ। ছিপ ফেলার নাম শুনলে, হাত নিশপিশ করে।

খোঁপায় ফিরিয়ে তুলে কাঁটা গোঁজে মালতী। মাছের নাম শুনলে হাত নিশপিশ করে, অথচ একটা মানুষে যে ঘরের মধ্যে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে, সে দিকে চোখ তুলে দেখার সময় নেই বাবুর। একটা ছুটিছাটার দিনে ঘরে থাকবে না। এমন মানুষকে নিয়ে ঘর করা যায়? কতদিন ধরে সেজমামীমা বলছেন, মলি, একবার জামাইকে নিয়ে আয়। দেখে ঘুরে বেড়িয়ে যা। দেখে যা কত সুন্দর জায়গাটা। তা একবারও কি যাবার সুযোগ হল? এই সেদিনও খোঁটা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, আমরা না হয় গরীব মানুষ, তা বলে কি আমাদের বাড়ি একবারও আসতে নেই। দুনিয়ার সকলকে কত আর বোঝান যায়! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মালতীর। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি এ কি ধরেছ? এই রাত-বিরেতে মাছ ধরতে যাওয়া? সেদিন গেলে। কোনরকমে একলা দম বন্ধ করে চোখ বুজে জেগে কাটিয়ে দিলাম। আজ আবার যাচ্ছ। বল, আজও কি জেগে কাটাব?

কিটসব্যাগে মসলার কৌটো, চায়ের বাটি, টোপ, টিপি তুলে ফেলল সনৎ। ভাঁজ করা ছিপ খুলে ভাল করে সুতো দিয়ে বেঁধে নিল। বঁড়শির বাক্স, ফাতনার ময়ূরপুচ্ছ, হুইল সব গুছিয়ে গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলল, কেন? সেদিন ত আমি মাসীমাকে বলে গিয়েছিলাম!

আলনা থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলল মালতী। এই না হলে বুদ্ধি! মাসীমা বুড়ো মানুষ। তার ওপর ঘরে ঐ একটা রুগ্ন মেয়ে। তিনি সারা রাত ধরে একবার মেয়ে আর একবার ওপরতলার বউমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করবেন? বলি-হারি যাই তোমার বুদ্ধিকে!

সনৎ বলল, বেশ, তোমার কথা মানছি। কিন্তু প্রণব তো আছে!

মালতী হেসে ফেলল, বেশ বলেছ। সারা দিন কলেজ করে, টিউশনি সেরে, রাতে সে এসে তোমার বউকে পাহারা দেবে!

তা কেন? একটু খোঁজখবর নেবে আর কি!

মালতী কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল। ঐ একটু খোঁজখবর নিতে নিতে যদি বেশী খবর নেবার ইচ্ছে হয়?

সনৎ রেগে উঠল। ঐ একটুকু ছেলেকে নিয়ে ইয়ার্কি দিতে তোমার বাধছে না?

মালতী লজ্জা পেল। নতমুখে বলল, অন্যায় হয়ত বলেছি। কিন্তু সাধে কি বলি? নিজের ক্ষেতে নিজেই পাহারা দিতে হয়। তোমার চুরি গেলে অপরের কি ক্ষতি?
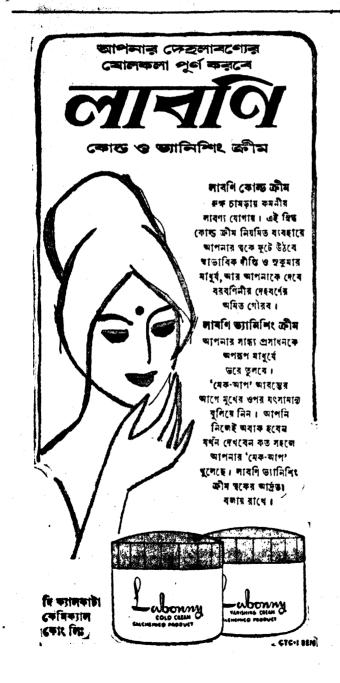
ঠিক সাড়ে ছটার সময় মুরারি এসে

হাজির। সিঁড়ি উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে ওঠে মুরারি—বউঠান।

দোরগোড়ায় এগিয়ে আসে মালতী।

এই যে, আসুন ঠাকুরপো, এদিকে। মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়।

মুরারি এক ঝলক তাকিয়ে দেখে। গা ধরে কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি পরেছে মালতী। গায়ে কালো ভয়েলের ব্লাউজ। খুব হালকা হাতে মুখে পাউডার বুলিয়ে প্রসাধন সেরেছে। এমনিতেই সুশ্রী, সুডোল মুখ। রঙ একটু চাপা। অপ্রসন্ন গৌর বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। মালতী না-সাজা না-সাজা ভাবে এমন সাজে যে, দেখলে মনেই হবে না মালতী সেজেছে। অথচ কপালের টিপ, চোখের কাজল, ঠোঁটের হাসি, খোয়ান আঁচল, যেখানের যেটি সেখানেই পরিপাটি। দেখলে তারিফ করতে হয়। আর সকলের উপর একটা আলগা শ্রী ফুলের সুবাসের মত যেন ঘিরে আছে মালতীকে। মুরারি সোল্লাসে ফেটে পড়ল। —বাঃ! ওয়ানডারফুল!

কি? মালতী বলল।

আপনি। মুরারি হাসল। ঝুরো চুলের ঐ পাকান কগাছি রিং, মস্ত মেরির টিপ আর ভগবানের দেওয়া গালের ঐ তিলটা মিলিয়ে আজ আপনি তিলোত্তমা।

তাই নাকি? মালতী চোখ টেনে টেনে চাইল। সত্যি? আপনার ঐ বন্ধুটিকে বলুন ঠাকুরপো। কোনদিন তো চোখ তুলেও দেখল না।

চাকা চাকা পিঁয়াজ দেওয়া ডিমের দোপেঁয়াজির সংগে ভাত মেখে খেতে খেতে সমং বলল, তাও তো হাতের রান্না খাসনি। খেলে বুঝতে পারতিস। রন্ধনে দ্রৌপদী।

থাক। আর অয়েল করতে হবে না।

থাকবে কেন বউঠান। মুরারি হাসল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আকাশের সবটাই পরিষ্কার নীল নয়। এক কোণে একটু কালচে মেঘের ছায়া যেন। রেগেছেন নিশ্চয়ই!

চোখ বড় বড় করে মালতী বলল, বলুন তো রাগ হয় কি না?

সব দোষ কিন্তু আমার। মুরারি জোড়-হস্ত হল। যা শাস্তি দেবেন, অধমকে দিন।

মালতী হেসে ফেলল। শাস্তি দিতে গেলে যে মাছের মুড়োটা রেঁধে পাতে দিতে হয়। ধরে আনুন আগে। শাস্তি তোলা রইল।

আভূমি কুর্নিশ করে মুরারি বলল, এমন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।

হাত মুখ ধুয়ে সনং কাপড় পরতে শুরু করল। সাতটার আগেই বের হতে হবে। রাস্তাটুকু পাড়ি দিয়ে একটু আগেভাগে মাচায় গিয়ে বসতে পারলে ভাল হয়। রাতের অন্ধকারে বাতি জেললে কাজ। তার ওপর আমাশার মত বৃষ্টি লেগেই আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রেনকোটটা ঝাড়তে শুরু করল সনং।

বউঠান, শাপমন্যি দেবেন না তো? মুরারি বলল।

শাপমন্যি? ওমা, কেন?

শ্রাবণ মাসের এমন বর্ষার বাজারে বন্ধুটিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেলাম বলে।

তাতে কি হয়েছে!

কি হয়নি? এই এত বড় রাত্তিরটা বিরহে কাতর হয়ে একা একা বিছানায় ছটফট করে কাটাতে হবে?

ইস্! তাই নাকি! আজ আমি চাদর মুড়ি দিয়ে পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে ঘুমবো।

না, না, বউঠান। মুরারি গম্ভীর হল, আমি রহস্য করছি না। একটা কাচ্চাবাচ্চা থাকলেও হত। এই একেবারে একা একা থাকা।

জলবিছুটি লাগার মত সারা গা হাত পা চিড়বিড় করে উঠল মালতীর। তা আমাকে বলা কেন? আমি কি হাসপাতাল থেকে একটা কুড়িয়ে আনব! আপনার ঐ বন্ধুটিকে বলতে পারেন না?

সনৎ বলল, নে, খুব হয়েছে, চ। দেরি হয়ে যাবে আবার।

মুরারি উঠতে উঠতে বলল, ওটা মানুষের বার, আপনি হাল ছাড়বেন না। আজ আমি মাছের দিব্যি দিয়ে রাজী করাব।

তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। মালতী হাসতে হাসতে বলল, ও বড় শক্ত ঘাঁটি। পিছটান পড়বে যে। এমন ছুটিছাটার দিনগুলো মাঠে মারা যাবে।

তা যা বলেছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সনৎ ডাকল, মাসীমা। গৌরীর মা মুখ বাড়ালেন, কি ব্যাপার।

এই আর কি। আপনার বউমা রইল, একটু দেখবেন। আজ আবার যাচ্ছি কি না!

স্বচ্ছন্দে যাও। আমি আছি। ভয় কি!

ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে শুয়ে গৌরী বলল, খালি টাকার মত মাছের আঁশ দেখালেই চলবে না সনৎদা। এবার মাছের পেটি চাই।

আচ্ছা, তাই হবে। সনৎ হাসতে হাসতে বলল।

সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মালতী ঘরে এল। গৌরী এখন কেমন আছিস?

গৌরী হাসল। এস, বস। আমার আবার এখন তখন কি? সব সময়েই একরকম।

গৌরীর-এলো চুলে হাত রাখল মালতী। চুল বাঁধিসনি কেন?

কি হবে। কে দেখবে বল?

মালতী হাসল। সব কি অপরের দেখার জন্যে।

তা নয় ত কি! গৌরী বলল, আমাদের মেয়েমানুষের কোনটা নিজের জন্যে বল? শরীরের কথাই নেই, মনটাও পরবশ। সাজ-সজ্জা? পুরুষে না দেখলে তারই বা দাম কি?

মালতী হাসল। কথাটা এক পক্ষে খাঁটি।

এক পক্ষে নয়, ষোল আনাই। এই যে তুমি রাজরানীর মত সেজেছ, অথচ সনৎদা গেল মাছ ধরতে, বল, মনটা তোমার ভাল লাগছে?

শুয়ে বসে বসে তোর বড্ড পাকামি বেড়েছে। মালতী হাসি হাসি মুখে বলল।

পাকামি নয় বউদি। সত্যি কথা। শুয়ে শুয়ে আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি। তোমরা দিনরাত ব্যস্ত থাক, চল ফের, তাই সহজ সত্যিটা ধরতে পার না। কিন্তু যেদিন সহজ কথা সহজ হয়ে ধরা দেবে সেদিন নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হবে।

মালতী উত্তর দিল না, শুধু হাসল। বাইরে হাওয়ার সোঁ সোঁ গর্জন উঠেছে। বৃষ্টি আসবে বোধ হয়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল মালতী। ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। ঘন কালো কুচকুচে মেঘ। আকাশের দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের ঠাণ্ডা ঝাপটা আসছে। নিশ্চয়ই দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

জানালাগুলো বন্ধ করে দেব গৌরী? বৃষ্টি আসবে। মালতী বলল।

থাক বউদি। গৌরী বলে, ওই খোলা জানালা দিয়েই যেটুকু আলো-বাতাস ঝড়-বৃষ্টি কাছে আসে। একদিন না হয় একটু ভিজেই যাব।

মেয়ের শখ দেখ। গৌরীর গাল টিপল মালতী, ভাল হ। সেরে ওঠ। তখন দেখব কত ভিজতে পারিস!

তখন ভিজতে যাব কোন দুঃখে! ভজতে যাব।

—আর ভজাতে! মালতী বলল। এ ওর চোখে চোখ রেখে দুজনেই হেসে উঠল।

ঘরে ঢুকে টুকিটাকি হাতের কাজগুলো সেরে নিল মালতী। জানালার পর্দাগুলো টান টান করে টেনে দিল। সনতের ছাড়া কাপড়চোপড় গুছিয়ে তুলে ফুলঝাড়ু বুলিয়ে ঘরটা একবার পরিষ্কার করল। আয়নার সামনে বসে চুলের গুছি দুটো পাকিয়ে পাকিয়ে ঠিক করে নিল। হালকা হাতে ফেসপাউডার মুখে বোলাল।

কোচে বসে একটা সিনেমা পত্রিকা টেনে নিল মালতী। রাজ কাপুর, বৈজয়ন্তীমালা...

উত্তমকুমার মাধবী মুখার্জি... রক হাডসন জিনা লোলোব্রিজিডা... উল্টেপাল্টে ছবিগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একটু পড়তে চেষ্টা করল। শেষে হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুতেই একা থাকতে পারে না মালতী। অথচ এমনই ভাগ্য যে, একা একাই থাকতে হয় বেশীর ভাগ সময়। মালতী আমুদে স্বভাবের। গান, গল্প, হাসিতামাশায় জীবনটাকে সহজ সরলভাবে কাটিয়ে দিতে পারলে আর কিছু চায় না। এমন সন্ধ্যে বেলা জমিয়ে চার পাঁচজনে আড্ডা হবে; না হয় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তি লাগবে, পা টন্‌টন্‌ করবে। তারপর ঘরে এসে খেয়ে শোয়া। এক ঘুমে রাত কাবার। কি করে লোকে যে চুপচাপ থাকে? মালতী ভাবল। স্কুলে কত বকুনি খেয়েছে পড়ার সময় গল্প করার জন্য, কলেজে সেনাগিন্নী একদিন ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

নিঃসঙ্গ নির্জনতা বরফের মত চাপ চাপ হয়ে জমছে। থমথমে আকাশের খানিকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরটা কেমন যেন ভারি ভারি করে তুলেছে। মালতী জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। ঘরে আর একটু থাকলে দম বন্ধ হবে বোধ হয়। মালতী ছাদে এল। ঝড়বৃষ্টির রাস্তা। এমনিতেই লোক চলাচল কমে এসেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি হুস্‌ হুস্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। হেড লাইটের আলো রাস্তার জলে, জলে ভেজা ঘরের দেওয়ালে কি রকম যেন ভেঙে ভেঙে পড়ে গলে গলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চাকার চাপে পিচকারির ফোয়ারার মত জলগুলো এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে পড়ছে। পথ চলতি পথিক চট্‌ করে লাফিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে।

প্রথম প্রথম বেশ লাগত। এই যখন মাছ ধরে আনত সনৎ। বড় বড় টাটকা মাছ, রুপোর পাতের মত চকচক করছে। পাকা রুইগুলো আবার সিঁদুরে গোলা। এক একটা এত ভারি যে, হাতে তুলে বঁটিতে কুটতে কষ্ট হত মালতীর। কেটেকুটে গৌরী-দের বাড়ি দিত, সময় থাকলে ননদের বাড়ি পাঠাত। আর বাকিটা ঝাল, ঝোল, ভাজা, অম্বল হত। খেয়েদেয়ে সেরেসুরে শুতে যেতে রাত বারোটা বেজে যেত। এই এত সরু সুতো আর ওই অত বড় মাছ। মালতী ভেবে অবাক হত। আশ্চর্য! কি করে তুললে? মালতী জিজ্ঞাসা করত।

কেন? খেলিয়ে খেলিয়ে।

হাঁ, খেলিয়ে খেলিয়ে। তুমি আমায় বোকা বানাচ্ছ। হ্যাঁচকা টানে তোলে।

সনৎ হাসত। ওর বোকামি দেখে মজা পেত। ধরো, তোমাকে ধরছি খাব বলে। তুমি সহজে ধরা দেবে! আঁশ আঁশ গন্ধভরা হাতে সনৎ জড়িয়ে ধরত মালতীকে। মালতী ধস্তাধস্তি করত। বলত, ছাড়, ছাড়। সনৎ ছাড়ত না। ধস্তাধস্তি হত দুজনে। মালতীর শাড়ি খুলত, সনতের ভিজে জামা ছিঁড়ে যেত। কাবু হয়ে মালতী হাত জোড় করত, —বুঝেছি, বাবা বুঝেছি।

সনৎ বলত, তুমি স্থলের প্রাণী আমার দু হাতের নাগালের মধ্যে। তুমি এত ফাইট করলে। ভাব ত ছোট্ট একটা বঁড়শি কাঁটা, সরু সুতো, দু শো গজ দূরে বিশ হাত জলের মধ্যে মস্ত একটা মাছ, সে কি ভীষণ ধুন্ধুমার করবে। দুজনের জীবন-মরণ সমস্যা, যাকে বলে টাগ-অব-ওয়ার।

আচ্ছা, কি করে বোঝ কি মাছ? চোখে তো দেখতে পাচ্ছ না? মালতী জিজ্ঞাসা করত।

তুমি কি করে বোঝ আমি আসছি, কি মাসীমা আসছেন, কি প্রণব আসছে? সনৎ পাল্টা প্রশ্ন করত। পায়ের শব্দ শুনে। আমাদের প্রত্যেকের পায়ের শব্দ যেমন আলাদা, তেমনি প্রত্যেক মাছের ফুট আলাদা। কাতলা আসবে বড়ির মত বড় বড় ফুট কাটতে কাটতে। মৃগেল মিহি-দানার মত বুজবুড়ি ছড়িয়ে আর রুই আসবে গরম তেলে ভাজা ছাড়ার মত দানা দানা ফুট কেটে।

বাব্বাঃ! মালতী অবাক হত। জলের মাছ স্থলে বসে নির্ণয়।

হ্যাঁ। যে সে কর্ম নয়। যাকে বলে শিকার। সনৎ বলত। এ এক সাধনা। আর যেরকম নর্তকী সেইমত দক্ষিণা। অর্থাৎ যেরকম মাছ সেইমত টোপ। কেউ টিপি মাথা পাঁউরুটির ভক্ত, কেউ বা ভাতের টোপে ঘিয়ে ভাজা খোল। কারও চাই বোলতার ডিম, কারো বা টাটকা কেঁচো। কথায় বলে, বড় কাতলা ধরতে চাও, খাজা কাঁঠালের কোয়া দাও।

ও মা এত? মালতী অবাক হত। আমি ভাবি, কি না কি।

সনৎ বলত, মাছ ধরা শুধু শিকার নয়, মাছ ধরা একটা আর্ট।

আমারও ইচ্ছে হয় এক এক দিন মাছ ধরতে। মালতী বলত, আমায় শিখিয়ে দেবে?

সনৎ হাসত, তোমায় শেখাব কি। তুমি নিজে আশ্চর্য শিকারী। দিনরাত বঁড়শি বেঁধা মাছের মত কোঁত কোঁত করছি, এতেও বুঝতে পারছ না।

মালতী হাসত। আর বলত, যাও।

কিন্তু অল্প দিনেই রোমাঞ্চ ফুরিয়ে গেল। ছুটি মানেই ছিপ। ছিপ মানেই পুকুর। বছরের মধ্যে পাঁচটা মাসই

বরবাদ। কোথাও কোনও ছুটিতে যাবার জো নেই। যেতে হয় একলা যাও। না হয় বেছে সংগী যোগাড় কর। কিন্তু গরজ বড় বালাই। টুকিটাকি কেনাকাটা আছে। মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার, আর এক আধ দিন কি রেস্তোরায় ঢুকে পর্দা ফেলা কেবিনে বসে চপ কাটলেট খেতে ইচ্ছে হয় না! পুকুরের পাড়ে কচুবনের ধারে, গোঁশি-গুগুলির পাহাড় সরিয়ে সে বাবু ছিপের ফাতনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবেন, আর মালতীকে খোশামোদ করতে হবে অন্য লোকের। প্রথম প্রথম বড্ড খারাপ লাগত। মাসীমা বলতেন, তাতে কি হয়েছে? যাও না প্রণবের সংগে! আমার যদি বেটার বউ থাকত তা হলে কি হত?

তালের রসে জল মিশিয়ে যখন জ্বাল দেওয়া হয় তখন গ্যাঁজলা ওঠে। গুড় হয়ে যখন জমাট বাঁধে তখন গ্যাঁজলা থাকে না। প্রথম প্রথম বাঁকা করে চাইত সবাই। ওর ননদও ছেড়ে কথা কইত না। দাদা যেন কি? সব সময়ই দেখি তোমরা দুজন, লোকে যদি কিছু ভাবে।

সনৎ মালতীকে সান্ত্বনা দিত। বাসে উঠতে গেলে লোকের সংগে গা লাগে, ধাক্কাধাক্কি হয়। তাই বলে বাসে চড়া ছেড়ে দেবে লোক? মজুর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কান না দেবার চেষ্টা করত মালতী। কিন্তু কেউ যদি কান টেনে কথাগুলো গুলি পাকিয়ে কানের মধ্যে ছুঁড়ে দেয় তবে কি করা যাবে। মালতীর রাগ হত। এক একদিন চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠত। সনতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে কেটে একশা করত। তুমি কি? তুমি কি? আমার চেয়ে কি মাছই তোমার বড় হল? ক্রমশ ক্রমশ সেসব ঝামেলা চুকে গিয়েছে। প্রণব ও মালতী অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মাসীমা, গৌরী, ওরা সবাই যেন একই পরিবারের লোক। ভালয় মন্দয়, শুভ-অশুভ মিলিয়ে ওদের একই হাসি-আনন্দ, ব্যথাবেদনা।

বৃষ্টি শুরু হল। ইলশে গুঁড়ির মত অজস্র জলের ফোঁটা চুলে মাথায় গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। মালতী ঘরে এল। এখন অনেক ভাল লাগছে। এবার খাওয়াটা সেরে নিলে হয়, মালতী ভাবল। খাবার বেড়ে একা একা খেতে গিয়ে মালতীর যেন কান্না এল। অন্য দিন সনৎ থাকে। প্রণব এসে বসে। ওরা গল্প করতে করতে খায় আর সোফায় শুয়ে শুয়ে প্রণব ফুট কাটে। এমন মজার মজার হাসির কথা বলতে পারে যে, খাওয়াটা দিব্যি জমে ওঠে। সেদিনের কথাটা মনে পড়ল মালতীর। একটা সিনেমা দেখে প্রণব ও মালতী একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেতে বসেছে। কয়েকটা জায়গা ভাল বুঝতে পারেনি মালতী, প্রণব বুঝিয়ে দিচ্ছে। মালতী দেখল, একটা লোক পরদার ফাঁক দিয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। মালতী বলল, এই দেখ, দেখ। প্রণব তাকিয়ে হাসল। লোকটা সুট করে মাথা টেনে নিয়ে খেতে লাগল। ন্যাকা, যেন কিছু জানে না। মালতী বলল, হাসলে কেন?

প্রণব হাসতে হাসতে বলল, ও বেটা ভেবেছে আমরা বোধ হয় কপোত কপোতী, মানে লাভার।

আর এক দিন আরও মজা হয়েছিল। সে কথাটা মনে পড়লেই হাসি পায় মালতীর। নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে আসছিল ওরা। একটা মেয়ে খুব সুন্দর। অথচ খুব কষ্টে হাঁটছে। মালতী বলল, মেয়েটার পা খোঁড়া নাকি? অমন করে হাঁটছে কেন?

প্রণব পথের মাঝে হো হো করে হেসে উঠল। তুমি একদম বুদ্ধু। কাপড়ে কাপড়ে সেফটিপিন এঁটে স্টাইল করে হাঁটছে। ওকে বলে টকিং বাটাক্, সাদা বাংলায়—মুখর নিতম্ব।

কি বললে? কথাটা মনে করে মালতী মুখে কাপড় গুঁজে ফুলে ফুলে হাসল। টকিং বাটাক্।

খাওয়া শেষ করে উঠে বুক সেলফের উপর রাখা অ্যাকোয়্যারিয়ামটার দিকে নজর পড়ে মালতীর। অন্ধকার কাচে মাছ-গুলো মুখ ঘষছে। ইস! আজ খেতে দেওয়া হয়নি। মালতী ভাবল। রোজই খেতে দেয় সনৎ। ওটা ওর কাজ। আজ বোধ হয় তাড়াতাড়ির চোটে ভুলে গিয়েছে। আলোটা জ্বালল মালতী। কাঠি করে তুলে খানিকটা কেঁচোর পেস্ট জলের মধ্যে রাখা টিউবে ভরল। সংগে সংগে কেমন করে বুঝতে পারল ওরা। লাল, নীল, সবুজ, কাল নানা রঙের মাছের পোনা ছুটে এসে ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করল। মালতী দেখল, এক একটা মাছ ছোট্ট ছেলেকে চুমো খাবার মত দুটো ঠোঁট জড়ো করে খাচ্ছে, আর এক একটা মুখে এক টুকরো খাবার নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে জলে রাখা শ্যাওলার কাছে।

মালতী আশ্চর্য হল। যেন স্বপ্ন দেখছে। কি সুন্দর রঙিন পাখনা মেলে হেলে দুলে ওরা ছুটোছুটি করছে, অথচ এক ফোঁটা জলও গায়ে লাগছে না, নিশ্বাসগুলো টোপ টোপ মুক্তোর মত জলের ওপর ফুটে উঠছে। মাছের নেশা সর্বনাশা। মালতী ভাবল। কিন্তু সর্বনাশা বলেই কি এত সুন্দর? মালতী যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। মাথা ঝিমঝিম করছে।

কপাল মুছে নিল মালতী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। বাইরের দিকে চাইল। অল্প দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ভ্যাপসা গরমে ধরব বাতাস ভারী হয়ে আছে। এবার জোরে বৃষ্টি নামবে। কাপড়-জামা ছাড়ল মালতী, ছোট জামটার উপর হালকা ফিকে শাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাখাটা অল্প করে খুলে দিল। তিরতির করে হাওয়া বইছে। একটু বসি। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নি। মালতী ভাবল। আঃ! আরামে চোখ বুজল মালতী। খোলা গায়ে বাতাসের মিষ্টি আমেজ আর শরীরে হালকা সুবাস। চোখ বুজে নিশ্চুপে বসে থাকল মালতী। আর স্বপ্ন দেখল যেন। রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে একটা চোর ওপরের দিকে উঠে আসছে। মালতী দেখছে লোকটা আসছে, আসছে, আরও উপরে আসছে। মালতী দেখছে, দেখছে আর দেখছে। মালতীর ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে। আবার কৌতূহল হচ্ছে দেখি না, কি করে। মালতীর জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, গলার মধ্যে স্বর বসে যাচ্ছে, মালতী ঠকঠক করে কাঁপছে তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মালতী। চোরটা আসছে, আসছে, আসছে। একেবারে কাছে এসে গেছে। গায়ে নাড়া দিচ্ছে যেন; আরে, শুনছ! শুনছ!

শিউরে ধড়মড় করে জেগে উঠল মালতী। ভয় ভয় চমক লাগা বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। প্রণব বলল, ব্যাপার কি? দোর-তাড়া সব খুলে রেখে সন্ধেবেলা ঘুম মারছ?

মালতী লজ্জা পেল। গায়ে পায়ের কাপড় ঠিক করে বলল, আরে এস। এই এতক্ষণে বাবুর আসবার সময় হল বুঝি?

কেন ইন্তেজার করছিলে না কি?

মালতী হাসল। তা একটু ভেবেছিলাম বইকি!

ভাগ্যি! প্রণব বলল, ঘুমিয়ে থই পাচ্ছ না, আবার বলে তোমার কথা ভাবছি। দাও রেডিওটা খুলে দাও, খুব ভাল একটা পল্লী-গীতি হচ্ছে।

রেডিও খুলল মালতী। পদ্মানদীর চর। সেই চরে থাকে কৈমী। আষাঢ় শ্রাবণের উত্তাল রাতে সদু মদু নৌকা বেয়ে পদ্মানদীতে মাছ ধরতে যায় ফকির। সেই মাছ এনে পরের দিন ভাত জোটে। পোড়া পেটের জন্যে হৃদয়ের হাহাকার কেউ শোনে না। পদ্মার জল সাক্ষী, নদীর চরের ডাহুক সাক্ষী, আকাশের মেঘ সাক্ষী, আজ জলে ডুবে মরবে কৈমী। যৌবনজ্বালা আর সহ্য হয় না।

পা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে দিতে প্রণব বলল, বাঃ! অদ্ভুত!

মালতী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ওর মনের কথাগুলো যেন ভাটিয়ালি সুরে ফুটিয়ে তুলছে। সনতের ওপর রাগ হল মালতীর। ভীষণ রাগ। মনে হল, চোখের ঐ মণিটার পিছনে একটু একটু করে বাষ্প জমছে। হয়ত এখুনি কেঁদে ফেলবে মালতী। আর লজ্জায় পড়বে প্রণবের সামনে। দাঁতে দাঁত চিপে উদ্গাত অশ্রু চাপে মালতী।

দাঁত কিড়মিড় করছ কেন? তুমি একদম ছেলেমানুষ মালতী।

মালতী হাসতে চেষ্টা করল। আবার নাম ধরে ডাকা হচ্ছে।

কনট্রাক্ট! প্রণব ঘাড় কাত করল, সকলের সাক্ষাতে বউদি বলব। আড়ালে মালতী। ঐ অমন মিষ্টি নামের পেছনে একটা লেজুড় জুড়ে অতখানি মাধুরী নষ্ট করতে পারব না।

মালতী হেসে ফেলল। দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্ছ তুমি।

আর তুমি? দিন দিন সুন্দর!

এই, আবার ইয়ার্কি। মালতী চোখ পাকাল। নিঃশব্দ কথাকথির ভঙ্গীতে হাসল প্রণব। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ইয়ার্কির উই আর ফ্রেন্ডস, মানে বন্ধু।

মালতী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দূরে একটা মোটরের হর্ন বাজল। মাসীমা কোথায়? মালতী প্রশ্ন করল।

পুজোয় বসেছেন। এখন ঝাড়া দু ঘণ্টা। হাতে ধরা সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে প্রণব বলল, ছবিগুলো দেখা হয়েছে?

অনেক দূর থেকে যেন চমকে ফিরল মালতী। ছবি? তারপর হেসে ফেলল, ইস্!

প্রণব ভুরু নাচাল। ফেরত দেবে। দিতে পারি কিন্তু আমার সামনে দেখতে পাবে না বলে দিচ্ছি।

কাগজটা এগিয়ে দিয়ে মালতী আলমারি খুলল।

সোফায় হেলান দিয়ে নখ খুঁটতে শুরু করল মালতী। পায়ের ওপর পা জড়িয়ে দিল। বাইরে ঘনঘোর ঘটা। জোর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জল নামল বলে। লোকটা যেন কি? মালতী ভাবল। মাছ মাছ করেই গেল। কি হবে অত মাছ দিয়ে? প্রাণী তো মাত্র দুটি।

জান, দিনের বেলায় দিকদারি। সনৎ

বলে, বড় মাছ ধার রাত্রে।

আচ্ছা অত বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে যাও ভয় করে না?

ভয়! কিসের ভয়! তোমাদের রাধিকা যে তিমিরাভিনয়ে যেতেন, তাঁর ভয় করত? এও এক ধরনের প্রেম। নাম শুনলেই ছুটে যেতে হয়। ঘরে থাকা হয় না।

তাই দেখছি।

সত্যিই তাই।

প্রণব উসখুস করে। কি ভাবছ?

কিছু না। মালতী হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে।

শোবে? তা হলে যাই।

না। না। বস আর একটু। মালতী অনুনয় করে। সামনে অখণ্ড রাত। এই এত বড় রাতটা একা একা কাটাতে হবে, এ কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে গুরগুর করছে। আবার এইমাত্র চোরের স্বপ্ন দেখেছে জেগে জেগে। যতখানি সময় বকবক করে কাটিয়ে দেওয়া যায় ততটুকুই ভাল।

প্রণব সিগারেট ধরাল। সনৎদা যে কি এমন মজা পায়, আমি হলে তোমায় ছেড়ে কক্ষনো যেতুম না।

ও সবাই বলে। মালতী বলে, আমাদের দিকে কে আর তাকিয়ে দেখছে বল।

প্রণব চোখ তুলে দেখল। মালতীর মুখটা থমথমে। একটু জোরে জোরে যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে মালতী। নাকের কোণ ফুলে ফুলে উঠছে। চোখ দুটো তেলপালিশ পাথরের মত চিক্‌চিক্ করছে। প্রণব বলল, কষ্ট হচ্ছে।

কিসের কষ্ট। মালতী হাসতে চেষ্টা করল। তারপর হাল্কা সুরে বলল, তুমি কখনও মাছ ধরেছ প্রণব?

প্রণব হাসল। অনেক।

ইস্! মিথ্যুক কোথাকার। জান, আমি মাছের এনসাইক্লোপিডিয়া। আমার কাছে চালাকি চলবে না।

বেশ। প্রণব আবার হাসল। প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, বল। আঙুল দিয়ে ভাবনার ভঙ্গীতে রগে টোকা দিল মালতী, মাছ ধরতে গেলে কিসের চার দেবে?

কি মাছ? বড় না ছোট?

ছোট মাছের কথাই আগে হোক।

লজেন্স। প্রণব গম্ভীরভাবে বলল।

মালতী ভুরু কোঁচকাল। অ্যাঁ। লজেন্স!

হ্যাঁ। প্রণব বলল, ঐ মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ আর গন্ধে ওরা ধরা দেয়। নিজেদের সামলে রাখতে পারে না।

এমন সুরের কথা মালতী জীবনে শোনেনি। মালতী অবাক হল। হলেও হতে পারে। তারপর প্রশ্ন করল আর বড় মাছের?

প্রণব উঠে দাঁড়াল। মালতীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ভালবাসার।

কলকল হাসিতে ফেটে পড়ল মালতী। ইয়ার্কি হচ্ছে!

প্রণাম স্বরে প্রণব বলল, ইয়ার্কি নয়। সত্যি। সত্যি। সত্যি! প্রেমের সুতোয়, ভালবাসার চারে, কামনার টোপে আমি মাছ ধরব মালতী। কি হবে আমার রাতবিরেতে জলে জঙ্গলে ছুটে! এরাই আমার পুকুর। মাছ আমার জিয়ানো।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। জানালা দিয়ে ছাট আসছে। মালতী প্রণবের মুখের দিকে তাকাল। থরথর শিখার মত কাঁপছে প্রণবের চোখের তারা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। অস্থির আঙুলগুলো বাতাস আঁকড়ে ধরছে। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে উঠছে প্রণব, ফুঁসছে। হঠাৎ ফোটা যৌবনসুবাসে সমস্ত ঘরটা যেন ভরে উঠেছে। অজানা পুলকে মালতীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হল। মালতী যেন তাকিয়ে দেখতে পেল, সনৎ মাছ ধরছে। ঐ, ঐ কচুবনের পাশে। টপ টপ করে কচুর পাতায় বৃষ্টির জল পড়ছে। ব্যাঙ ডাকছে। ভনভন করে মশা উড়ছে। একটা জোঁক গুটি গুটি এগুচ্ছে। এবার, এবার ধরবে সনতের পায়ে। নিঃশব্দে রক্ত খাবে। বুল লাইটের আলোয় ফাতনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সনৎ। জলের তলায় মাছের পাখনা নড়ছে। চারে এসেছে, টোপ ধরেনি এখনও। সনৎকে দেখে করুণা হল মালতীর। বোকা! বোকা! মালতী বলল যেন। সনতের চেয়ে মালতী ঢের বড় শিকারী। অনেক বড়। ঘরে বসে বসেই সে গেঁথেছে মস্ত একটা মাছ। আর দিনের পর দিন মাছটা খেলেছে, আজ সে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তুলছে। প্রচণ্ড হাসির বেগে ফুলে ফুলে ফেটে পড়ল মালতী। আঃ! কি আরাম! কি তৃপ্তি! বিহ্বল আনন্দে সোফায় গড়িয়ে পড়ল। বলকে বলকে হাসির ফোয়ারা খাট, আলমারি, সোফায়, চেয়ারে ছড়িয়ে পড়ে উষ্ণ বাতাসে সুড়সুড়ি দিল। ফোটা-জল কেতলির ঢাকার মত মালতীর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল। চুলের গুচ্ছি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হল, বেশ উদাস। কি বোকা সনৎ! কি বোকা! হাসতে হাসতে চোখে জল এল। সে জল বৃষ্টির জলে মিশে টোপ টোপ কান্নার মত ঝরে পড়ল। হতবাক প্রণব বলল, তুমি কাঁদছ!

হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছল মালতী। আর কাঁদব না। এই দেখ আমি হাসছি। খুব ধীর মৃদু স্বরে মালতী বলল, দরজা ভেজিয়ে দাও প্রণব। ছাট আসছে।

অ্যাকোয়্যারিয়ামের মাছগুলো ঘরের নির্জন নীল অন্ধকারে আবার হেসে উঠল। মালতী জানে না, মালতী নিজেও কখন মাছ হয়ে গিয়েছে।

'চলো যাই বেথলেহেম!'

দরবেশ

ই, ঠিক সেই জায়গাটা আমি খুব মন
দিয়ে দেখছিলাম যেখানে উনি জন্মে-
লেন। তখন ওটা ছিল একটা মুসাফির-
নার নোংরা আস্তাবল। রোমান সাম্রাজ্যের
শয়ান এই অঞ্চলে তখন চলছিল আদম-
মারি। শহরটার নাম বেথলেহেম।
শপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা লোক-
ানার যোগ দিতে এসেছিল। তখনও,
ইদিনও উনি জন্মান নি। ওঁর অন্তঃসত্ত্বা
মেরীও নিজেকে গোনাতে এসেছিল।
ন্তঃসত্ত্বা বলে হোটেলে জায়গা পায় নি।
ঙ্গে ছিল ইহুদি জোসেফ। পাশের নজরথ
াঁওয়ের ছুতোর মিস্ত্রী। আর তাঁর আগের
রের গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে।

মুসাফিরখানার আস্তাবলে জন্মাল
ফুটফুটে খোকা।

তারপর প্রায় হাজার দুই বছর কোথা
থেকে কোথা দিয়ে চলে গেল, তবু ওই
আস্তাবলটা চিহ্নিত থেকে গেল পৃথিবীর
ইতিহাসে।

বেথলেহেমের সেই আস্তাবলের সেই
জায়গাটাই আমি বিংশ শতাব্দীতে
দেখছিলাম। এখন এখানে চার্চ অব
নেটিভিটি, পৃথিবীর পবিত্রতম গির্জাঘর।

সবুজ হলুদ পাহাড়ী ঢেউ। ঢেউয়ের
পেছনে সিরিয়া দেশ। সেখানে বিশ্বের
প্রাচীনতম নগর ডামাস্কাস যাতে আজও
ঘন বসতি এবং রাষ্ট্রীয় রাজধানী। এ ধারে
মৃতসাগর, যার চারধারের জমিন হঠাৎ করে
চলে গেছে ভূমধ্যসাগরের লেভেলেরও বেদম
নীচে। তারই কাছে বেথলেহেম।
জেরুজেলাম। কাঁটাতারের আড়াআড়ি বেড়া।
ব্রেনগান কাঁধে অষ্টপ্রহর টহল দিচ্ছে কাটা-
ছেঁড়া দু রাষ্ট্রের সৈনিক। ওপারে ইহুদী
রাষ্ট্র ইজরেল। যথাস্থানেই ইজরেল, মিশর-
বিতাড়িত প্রফেট মজেস যেখানে ইহুদীদের
জন্য স্বদেশ খুঁজে বের করেছিলেন।
যেখানে উনি ঈশ্বরদত্ত "টেন কমান্ডমেন্ট"
পেয়েছিলেন সেটা অবশ্য এইদিকে, মৃত-
সাগরের তীরে; এখানে তাঁর সমাধিও নাকি
আজও টিঁকে আছে। তবে তা আমি এখনো
দেখিনি।

পাহাড়ী খুনসুটে শহরের এই বেথলেহেমে
এইখানেই ওঁর জন্ম। যীশু খ্রীষ্ট। তখনকার
কালে জগতের কোথাও রাজার চেয়ে বড়
কারোকে স্বীকার করার প্রশ্ন উঠত না।
রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের চাইতে বুদ্ধিমান
বা বড় তো কারো হবার কোনো যুক্তিই
ছিল না। দু হাজার বছর আগে সে ছিল
এক "গৌরবময়" বিরাট ইতিহাসের যুগ।
বর্তমানকালের মতন অস্থিরভাবে অশান্ত।
জীবনের নেই-নেই হাহাকার এখনকারই
মতন। গোটা জানা পৃথিবীটা তখন ছিল
অশান্ত। ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের জন্মের
পাঁচ শতাব্দী পরে। গ্রীস দেশে সক্রেটিস,
প্লাটো এঁরাও তখন ঈশ্বর আছেন কি নেই
এই বিষয়ে ভেবে নিয়েছেন। এমন সময়
জন্মাল ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে যীশু। ভারি
মিষ্টি চেহারার গোলগাল দেবতুল্য শিশু।

খেটেখুটে অন্যান্য ভাইবোনেদের মতনই
বড় হচ্ছিল হেসে খেলে বালক যীশু।
হয়েও ছিল; যখন তিরিশ বছর বয়স তখন
সহসা যেন ওঁর জন্মান্তর হল। আমি
ইতিহাসের কথা বলছি, ধর্মের নয়।

রোমান অধিকৃত আরব দেশের তরুণ
যীশু। তখনও মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক
হজরত মহম্মদ জন্মান নি। ওই তিরিশ
বছর বয়সে ওস্তাদ ছুতোর যীশু ওঁর
খুড়তুতো ভাই জন-এর কাছে দীক্ষা নিল।
এই জনকে ইতিহাস জানে জন দি ব্যাপ্টিস্ট
নামে। পরে এঁর মাথাটা ধড় থেকে একদম
আলাদা করে ফেলেছিল জেরুজেলামের
রোমান লাটসাহেব। সেই ধড়চ্যুত মাথাটা
যেখানে রাখা রয়েছে সেই জায়গাটাও আমি
বহুবার দেখেছি। ডামাস্কাসের উমায়েদ
মসজিদ আজ সেখানে। অত বড় মসজিদ
বিশ্বের আর কোথাও নেই। মক্কা য
করাচিতেও নয়। মক্কা থেকে মহম্মদকে
পালাতে হয়েছিল। করাচি পর্যন্ত মহম্ম
আসেন নি। যদিও শোনা যায় ছদ্মবেশে
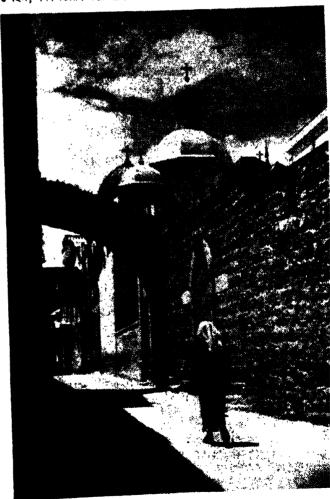
যীশুর জন্মস্থান। বেথলেহেম

যীশুকে যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল জুডাস।

তিনি কাশীধামে এসেছিলেন; যীশুও নাকি কাশী-গয়া তীর্থে এসেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সে যাত্রার সাক্ষী কি না সে প্রমাণ আজও নির্ভুলভাবে পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভব ব্যাপারটা গুজব। আরো দশ-বিশটা ও'র অলৌকিকতার মতনই একটা কিংবদন্তী।
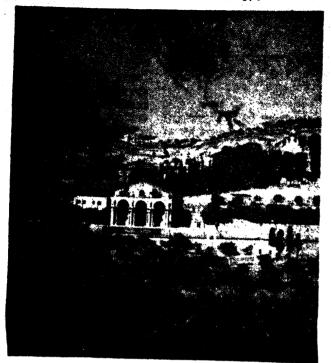
এই যীশু দীক্ষা নেবার পর একদিন জেরুজেলামে হাটের মাঝে কিনা বলে বসল, 'ভাইরা, তোমরা কাউকে ভয় পেও না। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।'

রোমান সাম্রাজ্যের ত্রিসীমানায় আগে এমন উদ্ধত বাণী কেউ কখনো শোনে নি।

আর একদিন ছুতোর মিস্ত্রী যীশু বলল, 'ঈশ্বর আমাদের পিতা তো? তা হলে আমরা সকলে পরস্পরের আপন ভাইবোন। সুতরাং রাজাও যা, আমরাও তাই।'

ভীষণ মারাত্মক আবিষ্কার। সিডিশন। টনক নড়ল জেরুজেলামের রোমান লাট-সাহেবের।

জেরুজেলাম মাত্র বেথলেহেমের পাঁচ মাইল অদূরে।

রোম সম্রাটকে অন্যান্য দশজনের মাপে সাধারণ মানুষ বলে ঘোষণা করাটা ছিল ইতিহাসের একটা মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। রাজদ্রোহী এমন ঘোষণা এর আগে কেবল আর একজন করেছিল। মিশর সম্রাট তরুণ ইখনাটন স্বয়ং। বিশ্বের তিনি প্রথম কবিও। বুদ্ধদেবের বহু পূর্বের ঘটনা। তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে বণিক-লালিত পুরোহিতরা।

যীশু-মুখে অমন ঘোষণার ভিত্তি ছিল আরবদের সামগ্রিক দারিদ্র্যতে; সামাজিক নৈতিক ভাঙনেতে, রাষ্ট্রিক অরাজকতায়।

ধর্মটা এসেছিল পরে। আগে সমাজের সব তরফে উচাটন উচ্ছৃঙ্খলতা যার সবিশেষ বিবরণ ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে।

তাই আমি সেই জায়গাটা দেখছিলাম যেখানে যীশু নামের মহাপুরুষ জন্মে-ছিলেন। ও'র তেত্রিশ বছর বয়সে রোমান লাটসাহেব সর্বাঙ্গে ছুঁচলো গজাল সেঁটে ও'কে কাঠের ক্রসে গেঁথে লটকে দিয়ে একটু একটু করে হত্যা করেছিল।

যেখানে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিহত পবিত্র দেহ জেরুজেলামে বর্তমানেও যেখানে রক্ষিত সেই গির্জাঘরও আমি অনেকক্ষণ ধরে ধরে দেখেছি অনেকবার। দেখতে দেখতে প্রতিবার আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এখন আমি দু চোখ ভরে দেখছিলাম শান্ত যেন আধঘুমন্ত বেথলে-হেমের সেই অবাক জায়গাটা, যেখানে এই কালজয়ী মানুষ জগতের প্রথম ক্রিসমাসে জন্মেছিলেন।

অত্যন্ত হাসিখুশী মানুষ ছিলেন উনি। ও'র যেসব প্রতিমূর্তি এ-দেশে ও-দেশে গির্জায় গির্জায় দেখি তাতে বিষাদমূর্তি। ও মূর্তিটা আশ্চর্যরকম ভুল। এ কথা আজ খ্রীশ্চানরা সকলে স্বীকার করেন। যীশুর ইতিহাস বাইবেলের বাইরেও বিশদভাবে লেখা হয়ে গেছে যেখানে ও'কে মানুষভাবে চিনতে চেষ্টা করা হয়েছে। কোনোদিনও ও'র মুখে বা কথাবার্তায় কেউ বিষাদ দেখে নি। উনি সদাসর্বদা বলতেন, 'জীবনটা আনন্দের জন্য, জেলখানা নয়।'

এ কথা আজ জগদ্বাসী জানে, যীশু ছিলেন জনতার মানুষ। জনতার মাঝ থেকেই উনি বেছে নিয়েছিলেন ও'র শেষজীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের, কেউ কুমোর, কেউ ছুতোর, কেউ কেরানী, কেউ ট্যাক্স-কলেক্টর— এই ধরনের সব সঙ্গীসাথী। আজ তাঁরা সকলে সেন্ট বা সন্তজী বলে জগদ্বরেণ্য, অথচ যীশুকে অ্যারেস্ট করার সময় ও'কে ফেলে ও'দের সবাই যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর এ কে না জানে, ওইসব বিশ্বখ্যাত সঙ্গীদেরই একজন, জুডাস, ও'কে ধরিয়ে দিয়েছিল।

জেরুজেলামে যাত্রীদের টুরিস্টদের আর মজা-লুটনেওয়ালাদের চোখে যা খুব বেশী করে পড়ে সেটা হল মানি-চেঞ্জারের সাইন-বোর্ড। অলিতে গলিতে। ওরা সবাই বেনে। পাউন্ড ডলার ডয়েশমার্ক রুবেল টাকা কী চাই, সব ওদের সিন্দুকে থরে থরে সাজানো আছে। এই আজও। ঠিক যেমন ছিল দু হাজার বছর আগে সেই যীশুর কালে।

তখন কড়া সুদে ওরা কর্জ দিত। এই বেনেদের বিরুদ্ধে জীবনে প্রথম উনি কটু কথা বলেন। জনগণের প্রধান শত্রু ওরা। স্বার্থপর যারা টাকার কুমির, তারা নির্দয়। এসব তো বাইবেলেই বেশ গুছিয়ে সহজ ভাষায় লেখা আছে। ইতিহাসে তো আছেই। হেরোডোটাস, ইতিহাসের জনক যাঁকে বলা হয়, তিনি এই জেরুজেলামে এসে এই বেনেদের কাণ্ডকারখানা দেখেছিলেন।

জুডাস ঘুষ খেয়েছিল বেনেদের কাছে। ত্রিশটা না কটা যেন রুপোর টাকা। ঘুষ খেয়ে যীশুর শেষের রাতে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্ধুকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেয়। যেখানে ধরিয়ে দেয় যীশুকে, জেরুজেলামের পাশে সেখানেও আজ ঘণ্টাওলা একটা গির্জা। তাতে রঙীন ফুলে ভরা বিরাট বাগান। গার্ডেন অব গেথসমানে।

ওই বাগানভরা মন্দিরটা দেখবার আগে আমি ভেবেছিলাম বুঝি একটা অন্ধকার ঘুপচি ছোট্ট কোনো জায়গা দেখব। দেখব এমন নরক, যেখানে সূর্যালোক কখনো প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু হায়।

একদম ভুল ভেবেছিলাম। আলোয় আলো ভরা ওই বিশ্বাসঘাতকতার মন্দির।

এখনো আমি কিন্তু বেথলেহেমের সেই পুণ্যস্থানটাই কেবল দেখছি যেখানে জন্মান মহাপুরুষ যীশু।

বিচিত্র শান্ত শহর এই বেথলেহেম। চার হাজার বছরের উঁচুনিচু সেইসব পাহাড়

রাস্তা। কাশীধামের মতন এখানেও এমন রিটায়ার্ড বৃদ্ধোবৃদ্ধার বসবাস। এদের অনেকের পূর্বপুরুষরা ইউরোপ থেকে দলে দলে এখানে এসেছিল। এসে থেকে গেছে বরাবর। যে রোম সম্রাটের আদেশে যীশু-হত্যা সেই সম্রাটকেও আজ কেউ চেনে না। সেই সম্রাটের বংশধররাও এখানে এসে যুগ যুগ ধরে ধরনা দিয়েছে যেমন করে আমরা তারকেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে দিই। অবিকল তেমনি।

বীয়ারখানা। মুসাফিরখানা। সেইসব আগেরই মতন সব। যীশুর জন্মদিনে এখানকার উৎসব ভুলবার নয়। গির্জার পবিত্র ঘণ্টাধ্বনিতে সত্যের আহ্বান।

যীশুর পরে অপর কোনো ধর্মের কথা ওঠে নি। তারপর থেকে উঠেছে অর্থনৈতিক মতবাদের প্রশ্ন। ধর্ম, রিলিজান, এসব সত্যের পথে থেকে বেঁচেবর্তে থাকার একটা পথমাত্র। কীভাবে বাঁচব, কেন বাঁচব তার পথ দেখিয়েছে ধর্ম।

বেথলেহেমে যীশুর জন্মস্থানে বারংবার আমার কেবল সেই কথাই মনের মধ্যে আন্দোলন করছিল। বেঁচে থাকার পথ যাঁরা দেখান তাঁরাই অমর। খুনী রোমান সম্রাটকে পৃথিবী ভুলে গেছে। এমন কী, বীর আলেকজাণ্ডারকেও।

যীশুকে কিন্তু ভোলে নি কেউ।

ভোলে নি কেন না উনি ছিলেন শান্তির প্রতীক। পথ দেখিয়ে গিয়েছেন জগজ্জন কী করে শান্তি পেতে পারে। এই পথ দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব, সম্রাট অশোক। এবং অতি আধুনিক কালে অ্যালবার্ট সোয়াইৎসার। যীশু শান্তির দূত। কাজেই দেবপুত্র। দেবত্বটা পরে বর্তেছে ওঁতে। আগে নয়।

ক্রসের উপর হাত-পা বেঁধে মস্ত মস্ত পেরেক সেঁটে ছেঁদা করার পরেও ক্ষমার হাসি হেসে উনি সেই জগৎ-বিখ্যাত কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন, 'ওদের ক্ষমা করো প্রভু, ওরা জানে না ওরা কী করছে।'

এমন অপূর্ব ক্ষমার উদাহরণ আমরা আগে বা পরে আর কখনো শুনি নি। মরবার সময় "মাই লর্ড" বলে উনি নিজের আত্মার মুক্তিও চান নি। চেয়েছিলেন অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে! নারকীয় সেই হত্যাভূমি দেখতে দেখতে আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। তখন কোনো ভগবানের দূতকে আমি দেখছিলাম না। দেখছিলাম নিপীড়িত মানুষের বন্ধু যীশুকে। ওঁকে হত্যা করার আগে ওঁরই ঘাড়ে কাঠের বিশাল ক্রস চাপিয়ে দিয়ে ওঁকে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, জেরুজেলামের সেই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি নিজের দেশের কথা ভাবছিলাম।

ওই রাস্তাটার নাম "দুঃখের রাস্তা"।

এখন, এত বছর বাদেও ওটা শুধু সঙ্কীর্ণ একটি গলিমাত্র। ওই গলির দু কিনারে কফিখানা, মাদুলি ইত্যাদির দোকান। আর মানি-চেঞ্জার।

সভ্যতার আদিমকালের ওই মানি-চেঞ্জার থেকেই পুঁজিবাদীদের জন্ম। ওদের সম্বন্ধে যীশুর বক্তব্যে কোনো ক্ষমা নেই। রোমান লাটসাহেবকে ভাতিয়ে তোলে এই বেনেরা। তবু দুঃখের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমি যেন জীবন্ত যীশুর হাসিমুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, 'প্রভু, এদের ক্ষমা করো।' কল্পনার সেই ক্ষমাসুন্দর মুখ দেখতে দেখতে এসেছিলাম বেথেলেহেম, যীশু-জন্মস্থানে।

স্থানমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করতেই হয়। এর সম্মোহনী তাপ লাগে গায়ে। মানুষের ভাষায় এই তাপের বুঝি উপযুক্ত কোনো ব্যাখ্যা নেই। "ভগবান", "ঈশ্বর", "গড" এঁরা কোথাও কেউ আদৌ আছেন কি না এ নিয়ে নানা মুনির নানান মতামত। ভারতবর্ষের কোনো সম্ভ্রান্ত পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে বড় একটা আলোচনা কখনো হয় না। ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপান ওসব দেশের প্রধান প্রধান দৈনিকে পর্যন্ত এ নিয়ে তুমুল-ভাবে আলোচনা হয়। এই ক'মাস আগেও আমেরিকান "টাইম" সাপ্তাহিকে 'ভগবান মৃত?' এই ছিল মলাটের উপরকার প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা। এ এক অভূতপূর্ব সাংবাদিকতা। এপ্রিল মাসের ঈস্টারে যীশুকে হত্যা করা হয়। সেই মাসে এই আত্ম-জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসায় জ্ঞানীগুণী বহু পণ্ডিত যোগদান করেছিলেন। কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, 'ভগবান আছে কি না তাতে আমার

মাথাব্যথা নেই।' কেউ বলেছেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস কখনো আমি করব কি না আমি জানি না, তবে যীশু লোকটা আমার মনের মত।'

সেই লোকটার জন্মভূমিতে এসে হিন্দু হয়েও আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

কী ভীষণ সুন্দর সেই স্মৃতি। ক্রুসে বলেছেন যীশু। বলছেন, প্রভু ক্ষমা করো... আর তিনি স্বয়ং জন্মেছিলেন এই বেথলে-হেমে। এই বেথলেহেমের হোটেলে মা মেরীর জন্য জায়গা ছিল না।

এই শতাব্দীতে সময় নেই আমাদের; জায়গা নেই মনেতে কারো কথা শোনার, না যীশুর, না বুদ্ধদেবের, না শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, না মহাত্মা গান্ধীর। জায়গা নেই সত্যের জন্য। কাজেই নকলের জয় সর্বত্র, এমন কি নকল নেতাদেরও। তবু ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র তিন বছরে যীশু যা দিয়ে গেছেন, তা ফুরোবার নয়। তাই যীশু-জন্মদিনে পৃথিবীময় কোটি কোটি মানুষের মুখে শোনা যায়, 'চলো যাই বেথলেহেম।'

শীতের সকালে লেপ, রোদ আর হিংস্র কুকুর

অবশেষে "লোকটা" মারা গেল। খোলা আকাশের নিচে, মুখ স্বর্গের দিকে ঈষৎ হাঁ-করে আছে। সেই যেন গৌর ঘোষের "লোকটা", কিন্তু তার নাম ছিল না, ধাম ছিল। রাজধানীর লোকটার না ছিল নাম, না ছিল ধাম। তাই ঠান্ডায় জমে উনি জীবনে আর কিছু না পান পঞ্চত্বটা পেলেন, অবশেষে।

শুধু লোকটা। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল পরিচয়হীন লোকটার মৃত্যুর খবর সেদিন। তার দেহ ভোরের আলোয় দেখা গেল আজমিরি দরওয়াজার, কিম্বা কাশ্মীরী দরওয়াজার কাছে, কিম্বা পরোটাওয়ালা গলিতে, কিম্বা কাচ্চা গলি অমুক দরিয়া অঞ্চলে। তারা সবাই ঐ লোকটার একই গোত্র-বিশিষ্ট, গোত্রহীন গোত্রের লোকেরা। তার অর্থ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার প্রথম বৎসর, অন্যান্য বছরের মতো, শীত নেমেছে ঠেসে, আর সেই শীতে যারা আহ্লাদ করে ফুটপাতে শুয়ে থাকে, তাদের অনেকে পটাপট পটল উৎপাদন করে। এক সপ্তাহে হাতের আঙুলে গুনলাম অমনি চারটে "লোকটা"। কেউ থাকত উপরাষ্ট্রপতি মহাশয়ের প্রাসাদের কাছাকাছি। কেউ থাকত মিন্টো ব্রিজের তলায়, আর কেউ কেউ রাস্তায় জড়ো করা পাইপের ভিতর।

সেই পাইপে-বাসা লোকটা, কিম্বা পুলের তলায় লোকটা রাত্রে যখন জীবনের বাতি নিবে আসছিল, সে তখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল খোলা আকাশের নিচে আলো আর বাতাসের জন্যে, যে-দুটোই কী কারণে যেন তার কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিচ্ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির পাশুটে বিজলি আর ভগবান নামক দেবতার দেওয়া দূরের আলো। কিন্তু ঠান্ডা বাতাসের আর শেষ নেই, এত বেশি যে লোকটার শেষ নিশ্বাসও সে কেড়ে নিল।

পরদিন ভোরে পুলিস "আবিষ্কার" করল দেহটা। একপাল বড় বড় ইঁদুর মরো-মরো লোকটার নাক-মুখ কামড়ে খেয়ে গেছে। লাসটা আলোয় ভরা শীতের দিনের চমৎকার সকাল-আকাশের দিকে তখনো চেয়ে। কাছেই পুরোনো আমলের পুরোনো দেয়াল, যেখানে একদিন শেষ হয়েছিল শাজাহানের রাজধানী, আর আরম্ভ হয়েছিল ইংরাজদের নতুন রাজধানী, যে-দেয়ালে এখনো ঘায়ের শুকনো দাগের মতো লেগে আছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কামান দাগার দাগ, আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের।

আর আমাদের "লোকটা" কালের যুদ্ধে না নেমে বিনা প্রতিবাদে মরে গেল স্রেফ ঠান্ডায় জমে।

ঠিক, মরতে একদিন হবেই, অমর কে কোথা কবে। কিন্তু লোকটার কেন আর সবুর সইলো না। এই সেদিন দিল্লি প্রশাসন, ঐ আমাদের উপরাষ্ট্রপতির উপ-দেবতারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা এযুগে আড়াইশো তিনশো কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন দিল্লির উন্নতির জন্যে। অতো টাকা কন্‌ট্রাক্টারদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়বে, চকমিলান দালান উঠবে, মিঞা-বিবিদের মুখে ফুটবে হাসি, আর আমাদের "লোকটা"র কিছুতেই তর সইলো না। তাই বা কেন। রাজধানীর মুনিসিপালিটির বাবুরা বলেছেন যে, ৪।৫ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁরা করোনেশান উদ্যানকে আরো চমৎকার করে তৈরি করবেন। বাগানটা হতো, মরতে হয় তখন মরিস। সেই তো মরলি বাগানের কাছাকাছিই। একটু সবুর করলে কী দোষ হতো? সেই বাগানে উঁচু উঁচু পাথরের বেদিতে রাখা হবে ইংরাজ আমলের ইংরাজ শাসকদের ব্রোনজ মূর্তিগুলো, যারা এখন ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। ঠাঁই পাবে তারা, হোক না ব্রোনজের মূর্তি, সাহেব তো! আমাদের লোকটা শীতে জমে পাথর হলেও বাগানে জায়গা পাবে না।

লোকটা খবরের কাগজও নিশ্চয়ই পড়তো না। তা না হলে কি দেখতো কী চমৎকার সমস্ত বিজ্ঞাপন: আসুন, কিনুন, আমাদের কোম্পানির তৈরি মাখনের মতো নরম পশমের কাপড়। কিনুন সোয়েটার বোনার উল। আসুন, আমি হলাম ভারতের শ্রেষ্ঠ দরজী। এমন স্যুট তৈরি করে দোব যে লোকে মনে করবে সত্যিকার সাহেব! আসুন,

ফুটপাতে রাত কাটানো লোকেরা। এরা ভাগ্যবান, গায়ে লেপ কম্বল জোটে। দিল্লি প্রশাসন চেষ্টা করছে যাতে লোকেরা ফুটপাতে রাত্রি যাপন না করে

কিনুন আমার কোম্পানির তৈরি তুলতুলে মুলমুলে কম্বল যা কিনা আপনি জড়িয়ে ধরতে ভালবাসবেন, যেমন বাসেন বাহুলতায় জড়াতে আপনার প্রেয়সীকে। আসুন, অবিলম্বে আসুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন।

আরো কতো সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন। সুন্দর, কেননা সুন্দরী মডেলদের চোখ চমৎকার শাড়ি-জামার বাহার দেখিয়ে আপনার চোখের দিকে চেয়ে। এই তো গরম কাপড়, আসুন না? তাতে না কুলোয়, এই যে শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ কলকব্জা, আর অসংখ্য প্রকারের বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম। আপনার আরামের জন্য সারা দুনিয়ার চোখে ঘুম নেই। পুলের নিচে লোকটার চোখেও সে-রাত্রে ঘুম ছিল না।

অথচ শীতের দিনের সুন্দর সকাল রাজধানীর। গায়ে শীতের জামা চড়িয়ে চলে যান স্বাস্থ্য সন্ধানে। রিজ রোড দিয়ে হেঁটে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে হাঁটা-লাঠি, কারোর পেছনে অ্যালসেশিয়ান। না হয় তো টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে ক্লাবে, নয়তো স্কোয়াশ, নয়তো গলফ। নয়াদিল্লির বৃক্ষ-বহুল রাস্তায় সকালের রোদ জাম গাছ আর নিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে বর্শাফলার মতো নেমে আসে। রাজপথের দুপাশের মাঠে আয়োজন হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সপ্তদশ প্রজাতন্ত্র দিবসের। সকাল থেকে বিকেল অবধি ঝাণ্ডি খোঁড়া, লোহার বেড়া লাগানো, গ্যালারি ফিট করা, বেদী তৈরি, সেদিন কতলোক আসবে যাবে, কতো মিছিল, কতো বাদ্য আর লেফট-রাইট-লেফট, অভিবাদন গ্রহণ, আর মিছিল ও মার্চ, পঞ্চম জর্জের মূর্তি পেরিয়ে, কার্জন সাহেবের নামে রাস্তা বাঁট দিয়ে আক্রান্তে আক্রান্তে কনট সাহেবের নাম জপতে জপতে একেবারে সাজাহানের লাল কেল্লায়।

লোকটার নয় ছিল কবিত্ব, না ছিল দেশপ্রেম, সমাজতান্ত্রিক দেশে অসামাজিক নাগরিকের চরম উদাহরণ তুলে ধরে লোকটা কিনা খোলা আকাশের নিচে হাঁ-করে মরে রইল স্রেফ ঠাণ্ডায়। বাপু, আমাদের তাতে কী আসে যায়। তুমি তো বাপু শ্রীমতী অমুকের নামও শোনোনি জীবনে। উনি মস্তবড় আই সি এস মহাশয়ের স্ত্রী। সারাটা জীবনপাত করে গেলেন সমাজসেবায়। এই সেদিন তাঁর রূপসী কন্যারা কী সব ফ্ল্যাগ বিক্রি করল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর কাছে। আস্ত ছা দস্তুর মতো ছবি বেরিয়েছে খবরের কাগজে প্রথম পাতায়। পরোপকার করার পরপরই শ্রীমতী অমুক ও শ্রীমতী তমুকেরা চলে গেলেন গোলাপফুল ও চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনীতে। কী গোলাপ, কী চন্দ্রমল্লিকা কী তাদের রূপ আর মহিমা। তাও কিনা "যুবতী নারীদের খৃষ্টান সমিতি"তে।

তুমি তো বাপু শীতের সকালে চো দুটো মটকে চিৎ হয়ে থাকলে সরকারি রাস্তায়। না দেখলে গোলাপ, না দেখলে "যুবতী নারীদের" সমিতিতে বুড়োবুড়িদে ভিড়। না দেখলে এক ডজন চিত্রকল প্রদর্শনী রবীন্দ্র ভবনে, আর্টফাকস হলে ত্রিবেণী গ্যালারিতে। না-শুনলে (যখ তুমি পুলের নিচে ধড়ফড়াচ্ছিলে) স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ারের উদ্দিপনাম ভাষণ ("আসুন, আমরা নৈতিক বলে উৎখা করি বাজারি বেশ্যাবৃত্তি", উনি বলেছেন ছবি বেরিয়েছে খবরের কাগজে), কিম্ব স্বতন্ত্র দলের নেতাদের বক্তৃতা সপ্রু হাউসে জানলে বাপু, রাশিয়া আমাদের ২৫০ কোটি টাকার সাহায্য করছে নতুনভাবে, কতো হবে লোহালক্কড়ের কারখানা, কতো হবে কতো কিছু, চুক্তিপত্র সহি করার ছবি অবধি বেরিয়ে গেছে খবরের কাগজে প্রথম পাতায়।

তুমি বাপু লোকটা সবুর করতে পারলে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে, গণতান্ত্রি সমাজতন্ত্রের রাজধানীতে না খেয়ে মা দে শীতের সুন্দর সকালে স্রেফ ঠাণ্ডায় পুলের তলা থেকে দেহটাকে টেনেটুনে রাস্তা এনে ইহলোক ত্যাগ করলে।

লোকটা আর মানুষ হল না।

খগেন দে সরকার

স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে করে ভারতে খাদ্য আসা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের সরকার অন্তত আভ্যন্তরিক খাদ্য-শস্য যোগানের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে বাধ্য হবে। আক্ষেপের বিষয়, খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি যাতে তাদের উদ্বৃত্ত শস্য ঘাটতি রাজ্যগুলিকে দেয় তার নিশ্চিত বন্দোবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত করতে পারেন নি।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় খাদ্য বাজেট প্রণয়নের প্রস্তাবের সারবত্তা বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সম্প্রতি স্বীকার করেছেন। এর তাৎপর্য হল, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে কোন্ কোন্ রাজ্য উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি তা নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি নয়, একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা। স্বাবলম্বনের দিকে এটাকে অগ্রগতি বলা যেতে পারে; ভোগের ন্যায়সংগত চাহিদা মিটিয়ে পুনর্বণ্টনের জন্য হয়তো আরো বেশি উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে।

খাদ্যের পুনর্বণ্টন

বলাই বাহুল্য, জাতীয় খাদ্য বাজেট প্রস্তুত করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, দেশের বৃহত্তর অংশে পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্পন্ন কৃষকদের জমিয়ে রাখা শস্য আদায় করার ব্যাপারে—বিশেষ করে এ সময় —রাজনৈতিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

খাদ্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুষম বণ্টনের জন্য একটা দেশব্যাপী সর্বাঙ্গীন র‍্যাশনিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া এখন আর উপায় নেই। আবশ্যক সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে সংযম দেখাতে হবে। আবশ্যক দ্রব্যের প্রয়োজন অনুযায়ী র‍্যাশনিংয়ের সমান্তরাল ব্যবস্থা হিসাবে অপ্রয়োজনীয় অথবা অপচয়মূলক ভোগের সংকোচন সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অনাবশ্যক সামগ্রীর চাহিদা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সেগুলির মূল্যকে বাড়তে দেওয়া নীতির দিক থেকে সংগত হবে। এখানে বাজারের মূল্য ব্যবস্থার একটা ভূমিকা থাকবে। কেবল ঘরের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র অথবা মোটর গাড়ির মতো বিলাসব্যসনের দ্রব্য নয়, উৎকৃষ্ট জাতের অথবা সূক্ষ্ম কাপড়-চোপড় উৎপাদনে আমাদের পরিমিত উপাদান ও কাঁচা মাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমন কি তার জন্য দেশকে বাইরে থেকে উপকরণ আমদানি করতে হয়। খরচ বেড়ে যাওয়ার দরুন অথবা আবগারি শুল্ক বসানোর ফলে যদি সেই সব জিনিসের দাম বেড়ে যায় তাহলে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদার খানিকটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে এবং আভ্যন্তরিক উৎপাদনের আরো বেশি অংশ রপ্তানির কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই রকম, আভ্যন্তরিক উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যকার বৈষম্য থাকায় ভারতকে যেখানে এখনো প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত আমদানি করতে হয়, সেখানে ইস্পাতের সুষ্ঠু ব্যবহার বজায় করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত হবে।

চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেশের ভিতর জিনিস-পত্রের যে সব ভোগ বা ব্যবহার আমাদের রপ্তানির পথে বাধা হয়ে উঠেছে অথবা আমদানির চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে এখন সে-গুলির সংকোচন দরকার। ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অবস্থা আগের চাইতে আরো খারাপ হয়েছে। তৃতীয় যোজনা কালে—১৯৬১-৬৬ এই পাঁচ বছর রপ্তানি থেকে আমাদের আমদানি এবং বৈদেশিক ঋণশোধ বাবদ সমস্ত পাওনার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মেটানো সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত, ১৯৬৫-৬৬ সালে রপ্তানির উপার্জন হতে ভারতের মোট দেয় টাকার মাত্র অর্ধেক সংস্থান হয়েছে।

চলতি রপ্তানি থেকে আয়ের একটা বড়ো অনুপাত বৈদেশিক ঋণশোধের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় ভারতের আমদানি বিদেশের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অতীতের ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য যে চেষ্টা চলছে তা সফল হলে এদিককার বোঝা খানিকটা কমবে। আবার, তেল, গন্ধক এবং লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতু আমদানির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা নেই বলে স্বভাবত আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের উপর টান পড়েছে (ঐ সংরক্ষণ এখন ২৭৬ কোটি টাকায় ঠেকেছে)।

বর্তমান অনিশ্চয়তার তাৎপর্য

বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে এখনো অনিশ্চয়তা থাকায় নিকট ভবিষ্যতে আবশ্যক দ্রব্যের আমদানি অব্যাহত রাখা যাবে কি না সন্দেহ। এবম্প্রকার অনিশ্চয়তার ফলে আমদানিজাত দ্রব্য মজুত করে রাখার একটা প্রবণতা বা চেষ্টা দেখা যেতে পারে। সে অবস্থায় কাঁচা মাল এবং কলকব্জার অধিকতর যোগান শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে কতখানি পারবে তা বলা শক্ত।

কৃষিকর্মের দুরবস্থা এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভের অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজেদের সম্পত্তির মধ্যে যাতে সমস্ত কাজকর্ম চালানো যায় সেদিকে সত্যকার চেষ্টা করার সময় এসেছে। প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ এবং সম্পদ ও উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহার—উদ্দেশ্য হিসাবে এগুলির যাথার্থ্য ও গুরুত্ব আগেই স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু সেই অভীষ্টগুলিকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব আর ফেলে রাখলে চলবে না।

শান্তিকুমার ঘোষ

গান্ধীজীর অন্তিম প্রয়াণ

আমার ব্যক্তিগত সমস্যার খবর জানিয়ে গান্ধীজীকে বিব্রত করিনি আমি। কতুত সপ্তাহ কয়েক তাঁর কাছে কোনও চিঠিই আমি লিখিনি। আমি যদি তাঁর কাছে চিঠি লিখি তো তাঁকেও আবার তার উত্তরে একটা চিঠি লিখতে হয়। তার মানেই বাড়তি কাজ। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ সেই মানুষটি, তাঁর তখন মনে হচ্ছিল যে, সমস্ত বন্ধু তাঁকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে, বাকী জীবন তাঁকে একা-একা পথ চলতে হবে; সেই অবস্থায় তাঁর কর্মভারের উপরে কে আর একটা বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়! আমি চাইনি। অথচ আশ্চর্য এই যে, এত কাজের মধ্যেও তিনি অকস্মাৎ এক-একটা ছোট্ট চিঠি লিখে আমাদের খবর নিতেন। তারই একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

১০-৭-৪৭ এন ডি

'প্রিয় সুধীর,

প্রায়ই আমি তোমাদের দুজনের কথা ভাবি। আশা করি তোমরা ভাল আছ। মাঝে-মাঝে চিঠি লিখো।

তোমাদের দুজনকে আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু'

ছোট্ট [illegible] মধ্যে তাঁর মনের খবরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে পারতেন। মানুষের পক্ষে মানুষকে যা বলতে চাওয়া স্বাভাবিক, তার সবটুকুই তাতে ব্যক্ত হত।

ভারতবর্ষে পৌঁছে মাউন্টব্যাটেন কী করেছিলেন, অন্যেরা তার বিবরণ ইতিমধ্যেই লিখেছেন। আমি সেই পর্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলুম না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মীমাংসার কোনও আশা না থাকায় ভারতবর্ষে একটি ডোমিনিয়নের হাতে কিংবা —ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে যদি দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে —দুটি ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য, ভি পি মেননের সহযোগিতায় তিনি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন :

(ক) ভারত-বিভাগ হবে কি হবে না, সে সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত জানবার জন্য যে বিধি নির্ধারিত হয়েছে, সেভাবে তা জেনে নিচ্ছেন;

(খ) ভারতবর্ষে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবেন, এমন সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়, তা হলে ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে বর্তমান গণ-পরিষদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে;

(গ) ভারতবর্ষে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়, তা হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার, আপন-আপন গণ-পরিষদের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে, ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন;

(ঘ) পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির যে-কোনটি অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক, ডোমিনিয়ন মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য সংশোধিত ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনের ভিত্তিতেই তা হবে;

(ঙ) দুই ডোমিনিয়নের একই গভরনর জেনারেল থাকবেন; এবং বর্তমান গভরনর জেনারেলকেই পুনর্নিয়োগ করতে হবে;

(চ) দেশবিভাগের সপক্ষে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা হলে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে;

(ছ) দুই রাষ্ট্রের প্রতিটিতেই সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক গভরনর নিয়োগ করা হবে;

(জ) দুটি ডোমিনিয়ন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। কার ভাগে কোন ইউনিট পরবে, সেটা ঠিক করা হবে রিক্রুটমেন্টের আঞ্চলিক ভিত্তিতে; তারা আপন-আপন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিমিশ্র ইউনিটের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে একটি কমিটির হাতে। ফীল্ড মারশাল সার ক্লড অচিনলেক এবং দুই ডোমিনিয়নের দুই চীফ অব জেনারেল স্টাফকে নিয়ে সেই কমিটি গঠিত হবে। গভরনর জেনারেল এবং দুই প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ এর তত্ত্বাবধান করবেন। বিভাগের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিষদেরও আয়ুষ্কাল শেষ হবে।

এই পরিকল্পনাটি সঙ্গে নিয়ে ১৯শে মে তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন লনডনে প্রত্যাবর্তন করেন। যে-সরকারের তিনি প্রধান, তার একজন অফিসার হিসেবে তাঁর প্রতি আমার সম্মান নিবেদনের জন্য যথা-কর্তব্য আমি বিমান-বন্দরে যাই। প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি স্বয়ং এবং ভারত-সচিব লর্ড লিস্টওয়েলও (লর্ড পেথিক-লরেন্স ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছিলেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৃহৎ ব্যক্তিরা ভাইসরয়কে

অভ্যর্থনা জানালেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দূরে। চারপাশে তাকিয়ে ভাইসরয় দেখতে পেলেন যে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখে আমার দিকে তিনি এগিয়ে এলেন; বললেন, "সুধীর, তোমার সেই চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিখানায় কাজ হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন প্রামক মন্ত্রিসভা। পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে। তবে, ভি পি মেনন যে একটি ডোমিনিয়নের প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা মেনে নেওয়া হল না। স্থির হল, ডোমিনিয়ন হবে দুটি। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। মিঃ অ্যাটলি ৩রা জুন তারিখে কমন্স সভায় মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সনের জুন মাসে নয়, ১৯৪৭ সনের অগস্ট মাসেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, এই দুই ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করেছিলেন, দুই ডোমিনিয়নের প্রধান হিসেবে একই গভরনর জেনারেল থাকবেন। সেটা অবশ্য হল না। ভারতবর্ষের গভরনর জেনারেল পদে মাউন্টব্যাটেনই অধিষ্ঠিত রইলেন। পাকিস্তানের গভরনর জেনারেল হলেন মিঃ জিন্না। ১৫ই অগস্ট তারিখে, ঈষৎ নিরানন্দভাবে, আমরা অলড্রইচে স্বাধীনতা উদ্যাপন করলাম। জেনারেল জে এন চৌধুরী তখন লনডনে ছুটি কাটাচ্ছেন। তাঁর সহযোগিতায়, ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আমরা। ভারতীয় সৈনিকরা সেই অনুষ্ঠানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-পতাকাকে অভিবাদন জানালেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যূষে আমি একটি টেলিগ্রাম পাই : "ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। স্ট্যাফোর্ড ও ইসোবেল ক্রিপসের ভালবাসা নাও।" গ্লসটারশায়ারের গ্রামের বাড়ি থেকে এই তার পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। পরদিন তাঁরা লনডনে এলেন। সেই রাত্রে আমি সস্ত্রীক তাঁদের সঙ্গে নৈশাহারে যোগ দিয়েছিলাম। বল্লভভাই প্যাটেলের মতন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকেও সকলে শক্ত মানুষ বলে জানত। সেদিন কিন্তু তাঁকে খুব বিষণ্ণ দেখলাম। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী, ভারত-সচিব এবং আরও অনেকের সঙ্গে জওহরলাল শুভেচ্ছা-বিনিময় করেছেন, কিন্তু তাঁর শুভেচ্ছা-তারবার্তার কোনও উত্তর দেননি। শ্রীনেহরু ছিলেন সৌজন্য ও দয়ার প্রতিমূর্তি। কিন্তু, যাঁরা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, তাঁদেরও অনেকের প্রতি মাঝে-মাঝে তিনি নির্মম হয়ে উঠতে পারতেন। সার স্ট্যাফোর্ড সেদিন ডিনার-টেবিলে আমাকে বলেন যে, জওহরলাল যদি তাঁকে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ তা হলে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত হত না। আজও আমার বিশ্বাস এই যে, তিনি ভুল করেন নি।

১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্ট তারিখে, আমাদের প্রথম স্বাধীনতা-দিবসে, কৃষ্ণ মেনন লনডনে ভারতের হাই-কমিশনার হলেন। তিনিই হলেন আমার উপরওয়ালা। অতঃপর দ্রুত একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমার পক্ষে আর লনডনে কাজ করা সম্ভব হবে না। অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে আমি বল্লভভাই প্যাটেলের কাছ থেকে একটি তার-বার্তা পাই। তাতে তিনি আমাকে জানান যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চীফ অব স্টাফ লর্ড ইজমে শলা-পরামর্শের জন্য লনডন যাচ্ছেন; তিনি যখন লনডন থেকে নয়াদিল্লি ফিরবেন তখন তাঁর বিশেষ বিমানে করে আমিও যেন

দিন কয়েকের জন্য দিল্লি আসি। লর্ড ইজমে গান্ধীজীর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন আমার জন্যে। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটিও ছিল : "আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে ও-জায়গা ছেড়ে আসা উচিত।"

দিল্লি পৌঁছে দেখলাম, বিড়লা-ভবনে গান্ধীজী আমার থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি নিজেও তখন সেইখানেই ছিলেন। তাঁকে আমি সমস্ত কথা খুলে বললাম। মন দিয়ে তিনি খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো আমাকে সমস্ত কথা জানিয়েছ। এ-ব্যাপারে এখন যা করবার হয়, আমিই করব। যাও, এখন হালকা মনে ঘুরে বেড়াও।" এমন কথা তিনি বললেন না যে, এমন যে হবে, তা তো তিনি আগেই বলে-ছিলেন।

গান্ধীজী আমাকে বললেন যে, কৃষ্ণ মেনন আর আমার মধ্যে যে বিরোধ চলছে, তারই ফলে একটা গুরুতর সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে বল্লভভাই আর শ্রীনেহরুর মধ্যে। "দুই সিংহকে এইভাবে আমরা লড়াই করতে দিতে পারি না। লড়াই যদি তাঁরা করতেই চান তো অন্য কিছু নিয়ে করুন; তোমাকে কেন্দ্র করে লড়াই বাধবে এ আমি চাই না। সুতরাং তুমি জওহরলালের কাছে যাও; তাঁকে গিয়ে বলো যে, তাঁর নিজের লোক যখন হাই-কমিশনার ছিলেন না, পালা-বদলের সেই সমস্যাজটিল সময়ে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য তোমার যথাসাধ্য তুমি করেছ, কিন্তু এখন আর তুমি লনডনে থাকতে রাজী নও, তার কারণ সেখানে তুমি থাকলে কোনও সত্যিকারের কাজ হবে বলে তোমার মনে হয় না।"

তা-ই আমি করলাম।

মনে আছে, গান্ধীজীর সঙ্গে সেই আলোচনার সময়ে শ্রীনেহরু সম্পর্কে আমার কথায় কিছু ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, "বাপু, আমার মনে হয় যে, এই কৃষ্ণ মেননই হয়ত একদিন পণ্ডিতজীকে ডোবাবেন।"

গান্ধীজী তাতে বললেন, "তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। জওহরলাল খুবই মহৎ মানুষ বটে, কিন্তু তিনি লোক চেনেন না, এই তো তুমি বলতে চাও? তা এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু বলো ত, ভারতবর্ষে কি তাঁর চাইতে ভাল মানুষ আর কেউ আছে?"

কথাটার উত্তর দিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। বললুম, "না, তা নেই।"

"তা হলে আর দুঃখ ক'রো না; তাঁর মধ্যে যে-সব সদ্গুণ রয়েছে, তার প্রতি অনুগত থাকো। তা যদি করো, তা হলেই তুমি ঠিক থাকতে পারবে। আর তা না করে যদি ক্ষোভ পোষণ করো, তা হলেই বুঝব যে, তুমি হেরে গিয়েছ। আমি চাই না যে, তুমি হেরে যাও। তোমার সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে যে কিছু সংস্কার রয়েছে, তা আমি জানি। কিন্তু উপায় কী। ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। যা ঘটেছে, তাকে মেনে নাও; মেনে নিয়ে কাজকর্ম করো।"

গান্ধীজী আরও বললেন যে, এইচ এন ব্রেলসফোর্ড যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ মেননের ব্যক্তিত্বকে বিচার করেছেন, তার মধ্যে কোনও ভুল নেই। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। এই বলে গান্ধীজী আমার হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিখানি ব্রেলসফোর্ডের লেখা। সেটি এখানে উদ্ধৃত হল :

৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেনস,
লনডন, এন ডব্লু ৩,
২৪শে অকটোবর, ১৯৪৭

"প্রিয় গান্ধীজী,

আমার ও আমার স্ত্রীর শুভেচ্ছা ও গভীর সহানুভূতি জানাই। এই দুঃসময়ে আপনার উপরে যে গুরুভার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তা বহন করবার মতন শক্তিও আপনার থাকবে, এই আশাই আমরা করি।

সুধীর ঘোষের সমস্যা সম্পর্কে আমার যা ধারণা, যদি অনুমতি করেন তো তা আপনাকে জানাই। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে করতে হয়, তিনি তার উপযুক্ত; আমার মনে হয়েছিল যে, এ-ব্যাপারে ঠিক লোককেই নির্বাচন করা হয়েছে। মানুষের মনে তিনি চট্ করে আস্থা জাগাতে পারেন। সবাই তাঁকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ সম্পর্কে এ-দেশে বন্ধুসুলভ আগ্রহসঞ্চারের নব-নব পন্থা উদ্ভাবনে তিনি উদ্যোগ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক, তাতে তাঁর কর্মপ্রতিভা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। পরিবেশ অনুকূল হলে তাঁর কাজ আরও ফলপ্রসূ হতে পারত।

মনে হতে পারে যে, আমি অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছি। কিন্তু সেই ঝুঁকি নিয়েই কি আমি কৃষ্ণ সম্পর্কে এক-আধটা কথা বলতে পারি। তাঁকে আমি অনেক বছর ধরে জানি। তাঁর সংগে কাজকর্মে আমার কখনও বিরোধ ঘটেনি, কিংবা ব্যক্তিগত অপ্রীতিরও সৃষ্টি হয় নি। তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি এমন একজন রুগ্ন মানুষ, সহকর্মীদের সংগে যাঁর সম্পর্ক কখনও স্বাভাবিক অথবা সুখকর হতে পারে না। মনে হয় যেন নিজের চারদিকে সর্বদাই তিনি সন্দেহ আর চক্রান্তের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখেন। লনডনের ভারতীয় সমাজে তিনি ফাটল ধরিয়েছেন, এবং বছরের পর বছর যেভাবে তারা অনৈক্যের পরিচয় দিয়েছে, তা বেদনা-দায়ক। ইংরেজদের সংগে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি এর চাইতে সফল হতে পারেন নি। সোরেনসেন আর আগাথা হ্যারিসনের মত জনাকয়েক একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু তাঁর সংগে কাজ করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু এমন অনেককে তিনি চটিয়েছেন, তাঁর চাইতে আর-একটু সদয় এবং বিচক্ষণ লোকের পক্ষে যাঁদের বন্ধুত্বলাভ সম্ভব হত। কয়েকটি

ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর; কিন্তু অন্যদের প্রতি—তা তাঁরা তাঁর সমকক্ষই হোন আর অধীনস্থ মানুষই হোন—আচরণে বন্ধুভাবাপন্ন ও আস্থাশীল হওয়া তাঁর ধাতে নেই।

আপনার কথা, ভারতবর্ষের কথা এবং আমাদের অন্যান্য বহু ভারতীয় বন্ধুর কথা আমরা দুজনেই খুব গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করি। সহানুভূতির সঙ্গে উদ্বেগও মিশে থাকে।

চিরকালের জন্য আপনার
নোয়েল ব্লেসকোর্ড"

গান্ধীজী সিদ্ধান্ত করলেন, আমাকে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হবে। নয়াদিল্লি থেকে যেদিন আমি লনডন রওনা হই, সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমার স্থান ভারতবর্ষে। তোমার মত লোকের এখানে কাজের অভাব হবে না। বল্লভভাইয়ের গভীর আস্থা রয়েছে তোমার উপরে। নানান রকমের কাজের মধ্যে যেটা তোমার পছন্দ হয়, সেইটাই তুমি বেছে নিতে পারবে। তা ছাড়া, যদি তুমি ভারতবর্ষে থাকো, তা হলে আমারও অনেক কাজ করে দিতে পারবে তুমি। আমার সেটা ভালই লাগবে।

সুতরাং কাজের জাল গুটিয়ে নেবার জন্যে আমি লনডনে ফিরলাম। সেখান থেকে ১৯৪৭ সনের ডিসেমবর মাসে আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসি। শীতের লনডন কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ভাল লাগবার কথা নয়। বিলেতের আবহাওয়া আমার স্ত্রীর মোটেই ভাল লাগত না। রোদ্দুর-ঝলমল শীতের দিল্লিতে আমরা ফিরে যাচ্ছি, এই চিন্তায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ডাক্তার। লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠ নিচ্ছিলেন। সামনের এপ্রিলেই তাঁর একটা পরীক্ষা দেবার কথা। তবে, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নিতান্ত এই জন্যেই তিনি পড়ছিলেন; মাঝপথে যে পড়ার পালা চুকিয়ে দিতে হল, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না। দেশে ফিরবার জন্যে তিনি জিনিসপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় এল গান্ধীজীর চিঠি। তাতে আমার স্ত্রীকে তিনি জানালেন যে, আমি ভারতবর্ষে ফিরছি বটে, কিন্তু তাঁর এখনই ফিরে যাবার কোনও কারণ নেই; চিকিৎসাশাস্ত্রের যে কোর্সটি তিনি পড়ছেন, সেটি শেষ না করে তাঁর ফেরা চলবে না। গান্ধীজী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পরবর্তী এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে স্বনির্ভর হয়ে লনডনে থাকতে হবে। তবে তাতে তাঁর চিন্তার কোনও কারণ নেই। আগাথা হ্যারিসন এবং অন্য কয়েকজন কোয়েকার বন্ধুকে তিনি চিঠি লিখে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন তাঁর দেখাশোনা করেন।

আমার স্ত্রী কী করবেন, তা নিয়ে আমরা কেউ গান্ধীজীর উপদেশ-পরামর্শ চাইনি। নেহাতই তুচ্ছ একটা ব্যক্তিগত সমস্যা; সেই দুঃসময়ে তা নিয়ে আর কে তাঁকে বিরক্ত করতে চাইবে। তাঁর চিত্ত তখন দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর পিতৃহৃদয় মনে রেখেছিল যে, ৬০০০ মাইল দূরে তাঁর স্নেহের পাত্রী একটি তরুণী মেয়ের পড়াশুনো মাঝপথ পর্যন্ত এগিয়ে আছে; এক্ষেত্রে কী করা কর্তব্য তাও ঠিক করেছেন তিনি, এবং যথাসময়ে তাঁর সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধান্তটা আমরা মস্তকে মেনে নিলাম।

ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পরে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় শ্রী কে এম মুন্সীকে সাহায্য করবার জন্য অল্প কিছু দিনের জন্য আমাকে হায়দরাবাদে পাঠানো হয়। শ্রীমুন্সী তখন সেখানে ভারত সরকারের এজেনট জেনারেল। দেশীয় রাজ্য দপ্তরের কাজে অতঃপর আমাকে পাঞ্জাবে পাঠানো হয়। পাতিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা, ঝিন্দ, ফরিদকোট, কালসিয়া আর নালাগড় রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবসানে সাহায্য করাই ছিল আমার কাজ। হায়দরাবাদে থাকতে ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে আমি গান্ধীজীর কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। তাতে তিনি আমাকে দিল্লি গিয়ে দিন কয়েক তাঁর কাছে কাটিয়ে আসতে বলেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীকে কাজে না লাগিয়ে হায়দরাবাদকে ভারতভুক্ত করা সম্ভব কিনা। যোগাযোগটা প্রায় দৈব। যেন নিয়তিই তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে আমাকে আবার তাঁর কাছে টেনে আনল। ১৯৪৮ সনের ২৮, ২৯ ও ৩০শে জানুয়ারি—গান্ধীজীর জীবনের এই শেষ তিন দিন আমি তাঁরই কাছে ছিলাম। ৩০শে জানুয়ারির দুপুরবেলায় তিনি আমাকে বিড়লা-ভবনের পিছন-দিককার বাগানে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি, জানুয়ারির রোদ্রালোকে বসে তিনি আপন-মনে কাজ করছেন। মাথায় বর্মী কৃষকের টুপি। এর কিছুকাল আগে

আউঙ্গ সান দিল্লি এসেছিলেন; তখন গান্ধীজীকে তিনি এই টুপিটি উপহার দেন। আমাকে দেখে তিনি একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন। চিঠিখানা আগাথা হ্যারিসনের লেখা। তার সঙ্গে রয়েছে লনডনের টাইমস পত্রিকার একটি ক্লিপিং। আগাথা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর দুই শিষ্য, শ্রীনেহরু আর বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য চলছে, এই কানাকানিটা লনডনেও পৌঁছে গিয়েছে, এবং টাইমস পত্রিকায় তাঁদের এই মতানৈক্য সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে একটি অশুভ সংকেত বলে গণ্য করা যায়। গান্ধীজীর কি এ-বিষয়ে কিছু করবার নেই?

চিঠি ও সম্পাদকীয় পড়ে চুপ করে রইলাম। আশা করছিলাম, গান্ধীজী কিছু বলবেন। তিনি তখন কী যেন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে, যেন নিজেকে শুনিয়ে, তিনি বললেন, "আমি এ-ব্যাপারে কী করতে পারি?" আমি বললাম, "এ'রা দুজনেই এত বৃহৎ মানুষ যে, এ নিয়ে কেউই এ'দের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। তবে তাঁদের পিছনে অনেকেই এ নিয়ে কানাকানি

করে। কখনও হয়ত আপনার মনে হবে যে, এ সম্পর্কে তাঁদের দুজনের সঙ্গেই আপনার কথা বলা দরকার। একমাত্র আপনিই তা পারেন।" আমার কথাটা তিনি ভেবে দেখলেন। তারপর বললেন, "কথাটা তুমি খারাপ বলো নি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, আমাকে এ সম্পর্কে কথা বলতে হবে। আজই সন্ধ্যায়, প্রার্থনার পরে, আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বল্লভভাই আজ চারটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। জওহরলাল আসবেন সাতটায়। আমি শুতে যাবার আগে তুমি বরং এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।" তাঁকে আর বিরক্ত না করে আমি চলে এলাম। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন।

বিকেল চারটের আমি গেলাম দেশীয় রাজ্য দপ্তরে। হায়দরাবাদের জনাকয়েক মন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে দপ্তরের কয়েকজন অফিসারের আলোচনা হচ্ছিল। বিকেল পাঁচটার একটু বাদেই বাইরে থেকে কে একজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, এবং উত্তেজিতভাবে বললেন, "গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।" তৎক্ষণাৎ আমরা উঠে দাঁড়ালাম; কিন্তু সত্যিই যে গান্ধীজী নিহত হয়েছেন, কারও যেন তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর মতন মানুষকে কি কেউ হত্যা করতে পারে? দশ মিনিটের মধ্যেই বিড়লা-ভবনে পৌঁছে গেলাম আমি। পৌঁছে দেখলাম, বাড়ির বাইরে বিরাট এক জনতা। ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে আমি ভিতরে ঢুকলাম। একতলার পিছন-দিককার একটি ঘরে গান্ধীজী থাকতেন। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, ঘরের মেঝের পাতা যে তোশকে বসে তিনি কাজ করতেন, তার উপরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশেই বসে আছেন তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য, জওহরলাল আর বল্লভভাই। প্রথমজন আবেগপ্রবণ মানুষ; গান্ধীজীর বস্ত্রে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মত কাঁদছেন। দ্বিতীয়জনের ব্যক্তিত্ব বজ্রকঠিন, নিহত পিতার নাড়িতে হাত রেখে স্তম্ভিত-ভাবে, নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতন, তিনি বসে আছেন। পিতা যে নিহত হয়েছেন, তা যেন তিনি ভাবতেও পারছিলেন না; নাড়ির উপরে হাত রেখে ভাবছিলেন, যদি জীবনের স্পন্দন মেলে। বিকেল চারটের সময় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বল্লভভাই; পিতা যখন অন্য পুত্রটির সঙ্গে তাঁর মতান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। অনেক কথাই তাঁর বলবার ছিল। বুকের ভার নামিয়ে দিয়ে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন। কথা যেন আর ফুরোতে চাইছিল না।

পাঁচটা বেজে যখন পাঁচ মিনিট, তখন আভা (গান্ধীজীর পৌত্র কানু গান্ধীর স্ত্রী) এসে গান্ধীজীর ঘড়িটিকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। প্রার্থনা-সভায় যেতে গান্ধীজীর কখনও এক মিনিটও দেরি হত না। আজ দেরি হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী বললেন, এবারে তাঁকে যেতেই হবে। বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, প্রার্থনা-সভার দিকে যাত্রা করলেন। সমবেত জনতার সামনে গিয়ে তিনি যখন জোড়হস্তে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন, একটি মানুষ তখন অকস্মাৎ তাঁর কাছে এসে নুয়ে দাঁড়াল। সবাই ভেবেছিল, সে নত হয়ে গান্ধীজীকে প্রণাম করতে যাচ্ছে। কিন্তু তা নয়। নুয়ে পড়ে সে গুলি চালাল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন গান্ধীজী। তিনি যখন পড়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল তাঁর ঈশ্বরের প্রিয়নাম : "হে রাম"। সেই তাঁর শেষ কথা।

সারা রাত্রি সেদিন সবাই জেগে কাটিয়েছে। সারা রাত্রি সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে বিড়লা-ভবনে; শেষবারের মতন তারা দেখেছে তাদের পিতাকে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, মস্কোতে লেনিনের মৃতদেহ যেভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, গান্ধীজীর মৃতদেহও সেইভাবে সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা হোক। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল এই প্রস্তাব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্যারেলালজী সেই আলোচনায় ছেদ টেনে দিলেন। গান্ধীজীর তিনি প্রিয়শিষ্য, সচিব ও স্নেহভাজন বন্ধু। তিনি বললেন, বাপু চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পরে নিকটতম শ্মশানে যেন তাঁকে দাহ করা হয়। পরদিন, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে, রাজঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। মৃত্তিকায়, সলিলে, আলোকে, অনিলে আর অন্তরীক্ষে মিশে গেল তাঁর নশ্বর দেহ। আমাদের পিতা, আমাদের বাপু, তাঁর রামের কাছে ফিরে গেলেন।

সকলের মতন আমিও সেদিন অঝোরে অশ্রুমোচন করেছি। কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও ভেবেছি যে, এই যে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, এ হয়ত তাঁর পক্ষে ভালই হল। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে ক্রমেই তো তাঁকে আরও নিঃসঙ্গ বোধ করতে হত। আর তা ছাড়া, জীবনের এর চাইতে মহিমময় অবসান তো তাঁর মতন মানুষের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। মুসলিমের প্রাণরক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি; হিন্দুর হাতে তাঁর মৃত্যু হল। জওহরলাল নেহরু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শুধু আমরাই যে তাঁর জন্য কাঁদছি, তা নয়, পাকিস্তানের মানুষেরাও তাঁর জন্য সমানভাবে কাঁদছে। সেই অসামান্য মানুষটিকে এর চাইতে বৃহত্তর সম্মান নিবেদন করা যেত না।

(ক্রমশ)

আমেরিকার উড়ন্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী

জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু নতুন তথ্য ও অনুমিতি

পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক মহাশূন্যে কত যে উড়ন্ত লেবরেটরী ছাড়া হয়েছে ও হচ্ছে তার কোন হিসাব আমরা আর রাখি না। ব্যাপারটা যেন মুড়ি-মিছরির মত এক মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে রোজই হয়ত আপনি এক-আধটি উল্কার মত জ্বলজ্বলে বস্তু ভেসে যেতে দেখবেন। সেটি উল্কা নয়, স্পুৎনিক। আসলে কিন্তু চন্দ্রমুখী বা শুক্রজয়ী মহাকাশযানের চেয়ে মানুষের পক্ষে এই উড়ন্ত লেবরেটরীগুলির গুরুত্ব অনেক বেশী; কারণ, এগুলি মানুষকে এমন সব মহাজাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে খবরাখবর পাঠাচ্ছে যেগুলি আমাদের পার্থিব জীবন প্রভাবিত করে।

ধরুন 'কজমস্—১১০' স্পুৎনিকের কথা। সেটি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মহাকর্ষশূন্য অবস্থায় কোন জীব যদি দীর্ঘকাল থাকে তা হলে তার শরীরের ক্যাল-সিয়াম 'ধুয়ে' যায় হয়ে যায় যায় ফলে তার হাড়ের কোষবিন্যাস পাল্টে যায়। ব্যাপারটায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ, ভারশূন্য পরিবেশে কঙ্কালের অত কাঠিন্যের কোন প্রয়োজন নেই। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, পৃথিবীতে জীবের অস্থির 'টিসু'র গঠন ও উপাদান মহাকর্ষের মাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং সেই মহাকর্ষ আবার নির্ভর করে আমাদের গ্রহের ঘন-মানের উপর। সুতরাং চাঁদে বা অন্য কোন জগতে যেখানে মহাকর্ষের মাত্রা অনুসারে জীবের হাড়ের গঠন হবে, অবশ্য সেখানে জীব যদি থাকে।

মানুষ শুধু সূর্যের সন্তান নয়, মহা-বিশ্বেরও সন্তান। সূর্য ও মহাবিশ্বের সঙ্গে তার হাজার হাজার যোগসূত্র। সূর্যের আলো ও তাপ না পেলে মানুষের উদ্ভবই হত না। সৌরশক্তিই তাকে যোগায় খাদ্য ও ইন্ধন। মহাজাগতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল বলেই তার মানবজন্ম সম্ভব হয়েছিল। মহা-জাগতিক বিকিরণ আজ মানুষের পার্থিব পরিবেশ প্রভাবিত করে চলেছে।

মহাজাগতিক ব্যাপারগুলির চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন, পৃথিবী বারবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, সূর্য প্রদক্ষিণ করছে আমাদের ছায়াপথের মর্মকেন্দ্রকে। সৌরক্রিয়াগুলিও পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এবং সেগুলির প্রভাবে পৃথিবীতেও ঘটছে পালা করে, কতকগুলি ব্যাপার যথা ভূগর্ভের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক ভূকম্পন। এই সব ঘটনা আবার পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর আকৃতি বদলে দিচ্ছে, কখনো পাহাড় খাড়া করে দিচ্ছে, কখনো বা দিচ্ছে ভূস্তর ধসিয়ে। এই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কখনো চলে চড়াভাবে, কখনো আবার আসে মন্দাভাব। ভূমণ্ডল গঠনের ইতিহাসে ক্যালিডোনিয়ান, অ্যাল্পাইন প্রভৃতি যুগ এসেছে একের পর এক মোটামুটি সাড়ে বারো কোটি বছর অন্তর অন্তর, পৃথিবীর পাহাড় পর্বতে রেখে গিয়েছে তাদের অমোচনীয় ছাপ। এই সব যুগান্তকারী কাণ্ডকারখানার পিছনে কি মহাবিশ্বের

রাশিয়ার একটি উড়ন্ত লেবরেটরী

পর্যায়ানুক্রমিক কার্যকলাপের কোন হাত নেই?

হ্যাঁ, হাত আছে। একটি উদাহরণ দিই। আমাদের পৃথিবী কতকগুলি মহাজাগতিক গতির শরিক। সেই গতিগুলি শুধু যে পৃথিবীর চারপাশে চলছে তা নয়, চলছে ছায়াপথের কেন্দ্রেরও চার দিকে। সেই রকম একটি আবর্তনশীল গতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "ছায়াপথ বৎসর"। সেই বৎসরের মেয়াদ নাকি ২৫ কোটি বছর এবং ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে তিনবার পর্বত গঠনের যুগের আবির্ভাব হয়।

হালে কয়েকজন রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক অনুমিত পরিবেশন করেছেন। তাঁরা বলছেন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথ এমনভাবে গিয়েছে যাতে একদিকে পথটি সূর্য থেকে একটু বেশী দূরে সম্প্রসারিত হয়েছে (সম্প্রসারিত চক্র)। সূর্যও নাকি ছায়াপথের কেন্দ্রের চারিদিকে ঐ রকম পথে ঘোরে। তাঁদের ধারণা, সূর্য যখন তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কক্ষের সম্প্রসারিত এলাকায় ছায়াপথ কেন্দ্র থেকে বেশী দূরে সরে যায় তখনই পৃথিবীতে আসে পর্বত গঠনের যুগ। তাঁদের বক্তব্য, এখনো অনুমিতির গণ্ডী পার হয় নি। কিন্তু সেটি যদি সত্য হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছায়াপথে নক্ষত্রপুঞ্জের বিন্যাস সব জায়গায় সমান নয়; কারণ, মহাজাগতিক বস্তুর বণ্টনও সমান নয়। তাই ছায়াপথের মধ্যে সৌরজগতের অবস্থান পরিবর্তিত হলে পৃথিবীর উপর ছায়াপথের মহাকর্ষের মাত্রাতেও পার্থক্য ঘটে এবং সেই পার্থক্যের প্রভাব পড়ে পৃথিবীর সব কিছুর উপর—জলবায়ু, পাহাড় পর্বত গঠন, জীব-জন্তু ও গাছপালার উপর।

সূর্যের কার্যকলাপের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের কিছু কিছু সম্পর্ক আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা হালে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নাকি যাচাই করে দেখেছেন যে, চড়া সৌরক্রিয়ার সময় পৃথিবীতে হৃদরোগের আধিক্য ঘটে। সৌরকলঙ্কগুলি যখন সূর্যলোকের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায় তখনই নাকি দুরারোগ্য হৃদরোগের শতকরা ৮০টিরও বেশী ক্ষেত্রে রোগ সংকটজনক হয়ে ওঠে। আলেকজান্ডার চিজেভস্কি নামে এক রুশ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে প্লেগ রোগ যতবার মহামারীর চেহারা নিয়েছিল সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০ শতক থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যতবারই প্লেগ রোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ততবারই সেই সঙ্গে সূর্যদেহে কলঙ্কের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। কলেরা, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি রোগ সম্পর্কেও নাকি একই কথা খাটে।

কিন্তু মহামারী রোগগুলি তো সংক্রামক অর্থাৎ সেগুলি বীজাণুজাত। সুতরাং চিজেভস্কির কথা যদি সত্য হয় তা হলে সৌরক্রিয়ার সঙ্গে রোগবীজাণুর কার্যকলাপের নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক থাকবে। তিনি নাকি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কোন কোন ব্যাক্টিরিয়ার সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রং বদল হতে থাকে। যাই হোক, সৌরক্রিয়ার সঙ্গে জীবাণুজগতের সম্পর্ক অনুশীলনের গুরুত্ব শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে নয়। পৃথিবীতে বস্তুর চক্রাকার গতির মধ্যে জীবাণুগুলির বিরাট এক ভূমিকা রয়েছে। সেই দিক থেকেও এই অনুশীলনের গুরুত্ব।

নিকোলাই সাভজ নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে, সৌরক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মানুষের শরীরে রক্তের উপাদানে কিছু কিছু অদলবদল হয়। সৌরক্রিয়া যখন বাড়ে তখন লাল কণিকার সংখ্যা বাড়ে এবং শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমে। মানুষের হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা সৌরক্রিয়ার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় সেটা জানলে স্বাস্থ্যনিবাসে হৃদরোগীর চিকিৎসা আরো ফলপ্রসূ হবে সন্দেহ নেই। এমন দিন ভবিষ্যতে আসা বিচিত্র নয়, যখন চিকিৎসকরা যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের দেহে মহাজাগতিক প্রভাব 'স্ক্যান' করে দেখে নিয়ে তারপর চিকিৎসার হাত দেবেন। মোট কথা, পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যাপারের উপর, বিশেষ করে জীবের উপর, মহাজগতের বিভিন্ন প্রভাবের প্রতিক্রিয়াগুলি উদ্ঘাটিত হলে মানুষ পৃথিবীর বহু প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটবার আগেই সেগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে এবং মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবহার করতে পারবে মহাবিশ্বের শক্তিগুলি।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভাবছিলাম ইংরেজকে কি খবরের কাগজের পোকা বলা যায়। পোকা মানে ত পড়ুয়া। শিরোনাম থেকে শেষ পাতার শেষ লাইন পর্যন্ত পড়া। না পরিচয়টা ঠিক হল না। তবে একটা গুণ—বিলেতে প্রচুর লোক কাগজ কেনে। সকালে বিকেলে নতুন কাগজ। অন্য কোথাও লোকে এতো কাগজ কেনে না।

এক ইংরেজ বন্ধু আমায় প্রশ্ন করে—কেনো লোকে এত কাগজ কেনে জান?
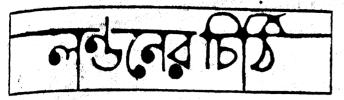
—সহজ সরল ব্যাপার, পড়ার জন্যে।

—একেবারে ফেল। কাগজ কেনে পাঁচিল তোলার জন্যে। বিশ্ব রসাতলে গেল কি না গেল তাতে কিছু যায় আসে না।

—পাঁচিল গড়তে ত চুন সুরকি লাগে, ইঁট লাগে।

—কাগজেও হয়। কাগজ পড়ার ছুতো করে চোখের সামনে তুলে ধরলে। অফিসারদের মত ঘেরা চেম্বার হয়ে গেল।

আরও বিশদভাবে বলি—ধর ট্রেনে চলেছ। সামনের সিটের ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন। এইবার হয়ত বলবেন, কি পচা বৃষ্টি হচ্ছে। তারপর কি জানি আরও কত কি...। হয়ত গল্প জুড়ে দেবেন। ঠিক আছে, খবরের কাগজ তুলে ধর চোখের সামনে। পড়া না পড়ায় কিছু যায় আসে না। ব্যাস, পাঁচিল উঠে গেল, একেবারে দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন। কথা বলার সুযোগ কেউ পাবে না।

আমি ভাবি, ইংরেজের একটা বড় গুণ। আত্মবিশ্লেষণে তারা পিছপা নয়।

তবে হ্যাঁ পাবলিক হাউস, যাকে চলতি কথায় বলে 'পাব', তার রূপ আলাদা। পাব মজলিসি জায়গা। এক পাইট বিয়ার খেয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এই পরিবেশে লোকের মন উদার হয়। সোমরসের মাদকতায় মানুষকে বন্ধু ভাবাপন্ন করে। মন খুলে গল্প হয়।

সেদিন পাবে ঢুকে পেলাম পরিচিত মুখের সন্ধান। ভদ্রলোক প্রৌঢ়। ঘনিষ্ঠ বলতে পারি না, তবে চেনা। নাম জানি, দু-চারটে ওপর ওপর কথা হয় যেমন, আবহাওয়া, হলিডে, খুসমাসু, ভাসা ভাসা রাজনীতির কথা। তারপর ফুলস্টপ। বেশী জানাশোনা না হলে রাজনৈতিক তর্কও খুব জমে না। পরম হৃদ্যতা না থাকলে গরম আলোচনা চলে না।

একটা টুল টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বসলাম।

বললাম—কি ব্যাপার। অনেক দিন দেখিনি যে?

বলেন—আজ যে দেখা হল সেইত ভাগ্য।

উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—কেন কি হল? অসুখ করেছিল? কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো?

পরমুহূর্তে মনে হল, এতখানি উতলা হওয়া উচিত হয়নি। নোসি পার্কার ভাববেন না তো। একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। মনে করবেন হয়ত যে অন্যায়ভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে গেছি। কি করব। জ্যা মুক্ত বাণকে কোন কলাকৌশলে ফিরিয়ে আনা যায় না—দ্রোণাচার্যও পারতেন না।

অন্যদিন হলে হয়ত কিছু মনে করতেন। ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ......

বলেন—ভালো থাকতে দিল কই। দেশের যা অর্থনৈতিক অবস্থা। জিনিসের দাম বাড়ছে। বেকারের সংখ্যাও প্রায় পাঁচশ' হাজারে দাঁড়াল। কেউ কেউ বলছে হয়ত এক মিলিয়ন লোক বেকার হতে পারে। মিলিয়ন সংখ্যা শুনলেই আতঙ্ক হয়।

বলি—বেকার জীবন দুর্বিসহ। কোন সরকার চায় না দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ুক। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ত দেখতে হবে। সে যদি রুগ্ন হতে থাকে তার যদি রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

এক্সপোর্ট থেকে ইমপোর্ট বেশী। বৈদেশিক মুদ্রায় খরচ বেড়ে যাচ্ছে অথচ আয় যাচ্ছে কমে। ব্যালেন্স অফ ট্রেড আনব্যালেন্সড হয়ে পড়ছে। বিদেশে পাউণ্ডের মর্যাদা কমছে। সরকারের পক্ষে ক্রেডিট স্কুইজ করা ছাড়া উপায় কি?

আরও দেখুন, লোকে দফায় দফায় মাইনে বাড়াবার দাবি করছে। কলকারখানা কারিগরের জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তবু পাচ্ছে না। আরও পয়সা বাড়িয়ে দিচ্ছে লোক ভাঙিয়ে আনার জন্যে। আবার কোন কোন কারখানা কাজ না থাকলেও লোক ছাঁটাই করে না। মিছে মিছে বসিয়ে রাখে। যদি বড় অর্ডার আসে তখন কি করবে? কোথায় লোক পাবে সেই ভয়ে।

সরকারের পক্ষে অর্থসংকোচন না করে উপায় কি? বেকার না থাকলে কারখানার কর্মচারীর অভাব মিটবে না। কলকারখানা কর্মতৎপর হবে না। প্রডাকশন বাড়বে না।

একে ঠিক unemployment বলা যায় না, বলতে হয় redeployment। লোকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে যাচ্ছে হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে, হোটেলে বা ফ্যাশনের কাপড়জামা বিক্রির দোকানে। সরকার চায় আগে কারখানার কর্মচারীর অভাব মিটুক অবশিষ্ট যাবে servicing-এর ব্যবসায়। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন—গালভারি কথা, redeployment। শুনতে খারাপ লাগে না। Unemployment শব্দের কদর্যতা এতে নেই। কিন্তু যারা চাকরি হারিয়েছে ওই সংজ্ঞা দিয়ে কি তাদের সান্ত্বনা দেওয়া যাবে।

লেবার পার্টি জনসাধারণের। দলের নেতারা নির্বাচনের আগে বলেছিলেন তাঁদের রাজত্বে সরকার কখনও ইচ্ছে করে বেকার সৃষ্টি করবেন না। তাঁরা নিজেদের জীবন এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন· বেকারত্বের

সাম্প্রতিক বৃটিশ সংবাদ-পত্রের হেডিং
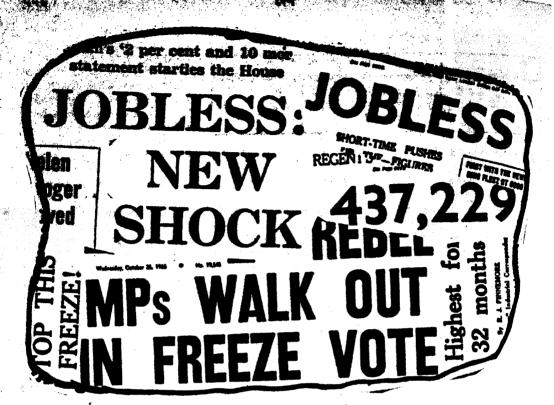
দুর্দশা। ১৯৩০ সালের কথা তাঁরা কোনদিন ভুলবেন না। বিখ্যাত বামপন্থী নেতা মিঃ উইলসনের পরমপ্রিয় নেতা আনুরিন বিভান বহুকাল বেকার ছিলেন। ওয়েলস-এর কয়লার খনিতে বহুলোক তখন বছরের পর বছর বেকার থাকত। প্রথম নির্বাচনে দাঁড়াবার সময় বিভানের পরিচয় ছিল unemployed miner।

লেবার পার্টি টোরির নাম দিয়েছিল Stop Go & Co—অর্থাৎ নির্বাচনের মুখে প্রাচুর্য। চাকরির ছড়াছড়ি। ধার পাওয়া জলবৎ তরলং। সবার বাড়ি, গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজ রেটর। সব নাকি কৃত্রিম প্রাচুর্য। তাই নির্বাচন মিটতে না মিটতেই বসে ক্রেডিট স্কুইজ। সুদের হার আকাশে ওঠে। ব্যাংকের ম্যানেজার ডুমুরের ফুল। ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে দেখা হয়ত মিলত। কিন্তু পায়ে ধরে সাধা, রা দিল না রাধা—ধার মিলল না।

লেবার পার্টি আরও আশ্বাস দিয়েছিল তাদের হাতে ক্ষমতা এলে দেখিয়ে দেবে কি করে অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হয়। মানুষ মারা কল হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে তার সুব্যবস্থা করলেই অনেক সুরাহা হবে। তাছাড়া তারা প্রডাকটিভিটি বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করবে। বেকার সৃষ্টি করে সমস্যা কমে না, তা আরও জটিল হয়। ব্যক্তিকে বলি দিয়ে রাষ্ট্র বাঁচান অর্থহীন। টোরি পার্টি বড়লোকের পার্টি। দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়লে তাদের গায়ে আঁচ লাগে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীন নিয়েই লেবার পার্টি।

আমি ভাবি, বলেছিল বটে লেবার প্রগতিশীল পার্টি। বৃটেনকে আধুনিক করবে। শিল্পকে মর্ডানাইস করবে। কম্পুটার আসবে। মানুষের বদলে মেশিন কাছ করবে। বিশিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্যে দেশ ভুগবে না। কিন্তু কাজের বেলা বসান হল সেই আদ্যিকালের টোটকা স্কুইজ। ইকনমিক প্ল্যানিং, প্রডাকটিভিটি হোঁচট খেয়ে মাঝপথে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

বলি—আসলে আমার কি মনে হয় জানেন, আপার লেভেলে লোকে যখন উঠে যায়, ব্যক্তিবিশেষের সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করলে তাদের চলে না। তারা মাটির মানুষের কথা আর ভাবে না। তাদের কাছে সংখ্যা তত্ত্বই তত্ত্ব কথা। ফরেন একসচেঞ্জের ব্যালেন্স হচ্ছে না। করতেই হবে। যেন তেন প্রকারেণ। আর না করেই বা উপায় কি!

ভদ্রলোক বলেন—তা বুঝলাম কিন্তু এটা দুদিন আগে থেকে ভাবা উচিত ছিল না। নেতার প্রধান গুণ ত দূরদৃষ্টি, অন্ধ অর্থনৈতিক থিয়োরিতে বিশ্বাস নয়। আমার ধারণা দেশের এই অবস্থার জন্যে লেবার সরকার পুরোপুরি দায়ী। আশ্চর্য লাগে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে চলেছে। পাউণ্ডের দাম কমছে। গোল্ড রিসার্ভ কমে যাচ্ছে। অথচ সরকার চুপ করে বসে আছে। ধনুকভাঙা পণ স্কুইজের ধারে কাছে যাবে না। ফলে রোগীর নাভিশ্বাস। মনে হয় বুঝি হরি-নাম জপ করা ছাড়া আর গতি নেই। সরকার মরিয়া হয়ে রাশ টেনে ধরলে। দেরি করায় দ্বিগুণ জোরে টানতে হল—লোকের দ্বিগুণ দুর্ভোগ।

এরা টোরি পার্টির নাম দিয়েছিল Stop Go & Co.। নিজেদের প্রাচীরপত্রে লিখিত Go with Labour, Go কথাটার জোর দেবার জন্যে অন্য অক্ষরের তুলনায় বিরাট করে লেখা। কিন্তু কোথায় গেলো Go? ওদের এখন লেখা উচিত Stop with Labour।

আমি জুড়ে দেই, মজার কথা কি জানেন, এককালে টোরি পার্টির নেতা মিঃ ম্যাকমিলান বলেছিলেন, We have never had it so good। তখন তাঁর কথা শুনে

মনে হত ঘরে ঘরে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার, মোটর গাড়ি তা যেন ম্যাজিশিয়ানের দান। আবার এখন যদি ওই সব জিনিস কিনতে পয়সা দিয়েও কেনেন, উল্টোদের অনেকে ভাববেন, তারা দেশদ্রোহী।

আরও আছে, সরকার বড় গলায় প্রচার করছে এইসব বলেছে, দারিদ্র দেশকে ঢেলে সাজাবার জন্যে। উদ্দেশ্য এক্সপোর্ট বাড়ান, ইনডাসট্রিকে আধুনিক করা এবং ইমপোর্ট কমান। অথচ স্কুইজের ফলে, কার ইনডাসট্রি সব চেয়ে দুর্ভোগ ভুগছে। সেখানেই বেশী চাকরি ছাঁটাই—সেখানেই প্রডাকশন কমছে। এবং ওই শিল্পই সব-চেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে।

এবার ব্যক্তিগত উদাহরণ দেন—একজনকে জানি, মিডল্যান্ডে কাজ করত। কার ফ্যাক্টরিতে। চাকরি গেল। কাছাকাছি কলকারখানায় ঘুরে বেড়িয়েছে কয়েক দিন। সুবিধে হয়নি। চলে এল লন্ডনে, ভাবল যদি কাজ পাওয়া যায়। হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছে কুকের অ্যাসিসটেন্ট। অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে সে এল সার্ভিসিং-এ। অথচ উল্টোটা ঘটাবার জন্যেই এই স্কুইজ। শুধু তাই নয়, তার মাইনে হল অর্ধেক

একা মানুষ হলে হয়ত এগুলো সাময়িক ভাবে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ধর বার্মিং-হামে যাদের নিজেদের বাড়ি। সে সব ওলট পালট করে আসবে কি করে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনের কথা না-হয় ছেড়েই দাও। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করা কি সুবুদ্ধির কাজ। নতুন একদল ছিন্ন-মূলের সৃষ্টি হবে।

আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট আছে, ন্যাশনাল অ্যাসিসটেন্টস্ আছে। হয়ত খেয়ে বাঁচার মত টাকা তারা পাবে কিন্তু বাড়ির দেনা শোধ করার জন্যে মর্টগেজ দিতে হয়। হায়ার পার্চেসে কেনা গাড়ি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন আছে। সেগুলোর দেনা কি করে মেটাবে। হয়ত অর্ধেক পয়সা দিয়েছে আর দেওয়া সম্ভব নয়। পাওনাদার দুদিন বাদে সব তুলে নিয়ে যাবে।

বলি—যাইহোক আমার আপনার অন্নে এখনও টান পড়েনি। সুতরাং সমালোচনা করে নিশ্চিন্ত হতে পারি। বেকার হলেতো রাতে ঘুম হত না।

—মাঝরাতে এক এক দিন ঘুম ভেঙে যায় বটে। আজ তিন সপ্তাহ চাকরি নেই। আমার আত্মকাহিনী বোরিং লাগবে না তো? যাই হোক বলে যাই, যদি খারাপ লাগে বলবেন, থেমে যাব।

—তাই নাকি? শুনে খুব খারাপ লাগল। তিনি বলেন—তাই আপনাকে উতলা হতে দেখেছি। আর্কিটেক্টের অফিসে চাকরি করতাম। অবশ্য ড্রইং বোর্ডের কাজ নয়। ফাইল দেখা, চিঠি লেখা সাধারণ সুপারভিশন করা। চাকরি গেল। তখনও ভেবেছিলাম, আত্মবিশ্বাস লেখায় নেই। লেখাপড়া করেছি। সুতরাং চাকরি একটা পেয়ে যাব। হয়ত পেতাম। বাদ সেধেছে বয়েস। অভিজ্ঞতার দাম আছে, কোম্পানি বয়েসের অসুবিধে আছে। শুধু-এর জন্যে বয়েসের বাধাটাই বড় বলে মনে হচ্ছে। ছেচল্লিশ বছর বয়েসেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ফেলেছে অথচ রিটায়ার করার বয়েস পঁয়ষট্টি।

—তাহলে সংসার চলছে কি করে?

—এখনও চলছে জমানো টাকা ভাঙিয়ে। বাড়িতে কেউ জানে না। সংসারের মধ্যে গৃহিণী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে সাবালক। আলাদা থাকে। মেয়ে এখনও স্কুলে পড়ছে।

গৃহিণী সেজেগুজে তৈরি হয়ে থাকে। চাকরি করে ফিরছি বলে আদর যত্ন করে। আমি নিয়মিত সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাড়ি থেকে বার হই। মাঝে মাঝে ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে খুব খারাপ লাগে। তখনও অন্ধকার, তার বেশ শীত পড়ে গেছে। কাজের তাড়া থাকলে তবু না হয় কথা ছিল। কিন্তু প্রাণের দায়। চাকরি-জীবনে যদি বা দেরি করে বেরিয়েছি এখন কাঁটায় কাঁটায় বেরোতে হয়—ধরা পড়ে যাবার ভয়।

পাড়া প্রতিবেশী এবং সমাজের কথা চিন্তা করে দেখেছি। বাড়ির কর্তা বেকার হয়ে বসে আছে ভাবতেও অপমান বলে মনে হয়। আমি বাড়ি বসে থাকলে স্ত্রী আর কন্যার হয়ত বাড়ি থেকে বেরোবার মুখ থাকবে না। বলি—আপনিত একা নন, পাঁচ শ' হাজার লোক বেকার। এতো সবাই জানে—এ সরকারী পরিকল্পনা—আত্মগ্লানির কি আছে।

—হয়ত কিছু নেই। কিন্তু সব মানুষের চিন্তাধারা ত সমান নয়।

জিজ্ঞাসা করি—সময় কাটে কি করে?

—সপ্তাহে একদিন বেকার ভাতা সংগ্রহ করতে কেটে যায়। নিজের দলের বহু লোক দেখে তবু আশ্বস্ত হই। তাদের সঙ্গে গল্প করি আর সরকারের উদ্দেশ্যে মনের বিষোদগার ছুঁড়ে দেই।

আবহাওয়া ভাল থাকলে একটু ঘুরে বেড়াই। আবার বেশী ঘোরার সাহস হয় না। কারণ ঘুরলে পয়সা খরচ, হোটেলে খেতে বেশী খরচ। স্যান্ডউইচ নিয়ে ডিকেটটিভ বই পড়ি। আর কিছু পড়ার ধৈর্য নেই। একদিন ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে গেলাম। একদিন সায়েন্স এগজিবিশনে। তবু বাঁচোয়া আমার ওপর চার্জ নি—বললুম না পয়সা খরচ হয় না। লোকে তাকিয়ে দেখে না। কেনসিংটন পার্ক-এ বসে কিছু সময় কাটাই।

কিন্তু পয়সার কুল দিচ্ছেন কি করে?

—গৃহিণী জানে না। সুতরাং সংসার চালানোর খরচ পাই পয়সা হিসেব করে দিতে হয়। চাকরি হারানোর খেসারত হিসেবে কিছু টাকা পেয়েছি, কিছু জমানো টাকা ছিল। সেই টাকা থেকে চলছে। জানি না কতদিন টানতে পারব। ন্যাশনাল অ্যাসিস-টেন্ট বোর্ডে সাহায্যের জন্যে আবেদন করতে পারি। প্রথম আত্মসম্মানে লাগছে, দ্বিতীয় বাড়িতে জানাজানি হবে। পাড়া প্রতি-বেশীর খোশ গল্পের বিষয়বস্তু হবে।

আত্মসম্মান: প্রতিবেশীর কাছে মর্যাদা, স্ত্রী ছেলে মেয়ের কাছে শ্রদ্ধা এগুলো ধূলিসাৎ হবে। সহানুভূতি কিছু মিলবে কিন্তু সে ত আরও মর্মান্তিক। হয়ত আমি আধুনিক নই। যুগের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারি না, তাই এই মনোবিকার।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পথে চলতে চলতে ভাবছিলাম। 'প্রগতিশীল' সমাজে হয়ত প্রতি চার পাঁচ বছর অন্তর এই আলোড়ন আসবে। ওলট পালট হবে। অনেক লোক বেকার হবে। কিন্তু বেকারত্বের আত্মগ্লানি কি মানুষের মন থেকে মুছে যাবে।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

ছয়
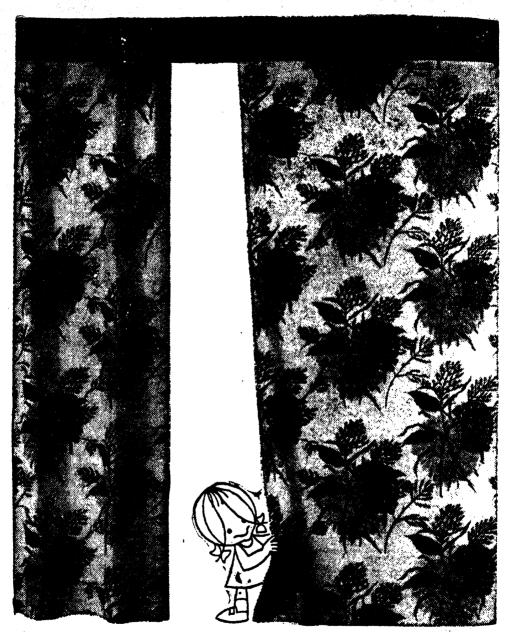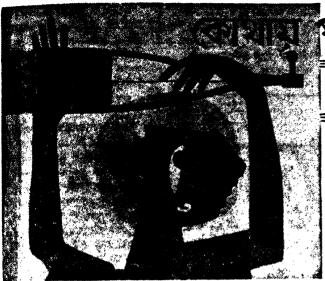
মাঝ নদীতে এসে মনে হয়, একটু আগের সমস্ত ঘটনা যেন বহুদিন গত। এ যাত্রা নিরবধি কালের। কিন্তু ওদিকে মায়ে-ঝিয়ের হাসাহাসি থামে নি। বাইরের দিকে মুখ করে তাদের কথা চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে, কাজল কালো চোখের কোণে, খুপরিটাকে এক নজরের তদন্ত। কেন, সে কথা পুছ ক'রো না। জীবন-মনের কি একটা ধর্ম নেই! কথাবার্তার টুকরো যেটুকু ছিটকে আসছে, তাতে পাকে পড়া কলা বউ এবং স্বামী সংবাদই আলোচ্য।

'ওরে, তোদের হাসি যে থামে না!'

প্রৌঢ়ের প্রাণে বোধ হয় সইল না। যদিও গলায় তাঁর রাগ বিরক্তি নেই। বরং, একটু ধন্দে পড়ি, টাকের থেকে ওঁর চোখ মুখই যেন ঝলকাচ্ছে বেশী। কখন আসনের ওপর পা তুলে নিয়েছেন। জোড়াসন করে বসে বেশ একটু মেজাজেই যেন হাঁটুতে তবলার ঠেকা তাল মারছেন। ঘন ঘন খাঁকারি কয়েকবার। তারপরে, ওঁর পক্ষে গলা বেশ নামিয়েই বললেন, 'দেখ্ ঝিনি, তাই যদি বলিস্, বিয়ের সময় তোর মায়ের বয়স ছিল কত, জিজ্ঞেস কর। খুব বেশী তো এগারো, না কী বল।'

উলটো আসনে প্রথমে চমক। ঝিনির তো মুখের প্রলেপ ছাপিয়ে রক্তাভা ছলকায়। প্রৌঢ়া ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও ভিন্‌যাত্রীটার দিকে একবার দেখে খস্ করে ঘোমটা টানেন। তার পরের ঘাড় ফেরানোকে নীরব ঝামটা বলে কিনা জানি না। তবে যে কথাটা জানা ছিল, যুবতী বিহনে অনেক কিছু মানায় না, আর তা বলতে পারবে না। কাঁচা পাকা চুলের মাঝে সিঁদুর পরা প্রৌঢ়াকে যেন যুবতীর থেকে মিষ্টি দেখি। কিন্তু সাক্ষী মানেন নিজের ডাগর মেয়েকেই, 'দেখছিস? ভীমরতি!'

এবার দেখ মজা। প্রৌঢ়ের মেজাজ এখন চলন্তা। ঘাটের ঘর থেকে কুড়ির ঘরে ফিরে গিয়েছেন, না দশের ঘরেই, তা কে জানে। বলেন, 'আরে তাতে আর কী হয়েছে, একটা কথার কথা বই তো নয়। এ তো ছেলে-মানুষ, মা কী বলেন।'

কাকে বলেন। চোখ তুলে দেখি, নজর ভিনযাত্রীর দিকে। হতে পারে ভুরুতে সাদা রঙ লেগেছে, কেশ মাথা ছেড়ে গিয়েছে, চোখের চারপাশে রেখার ভাঁজ। তবু যেন দুটি তরুণ চোখে রঙের ঝিলিক। ছেলে-মানুষ বললেও, 'আপনি' সম্বোধনের ভব্যতাটা আছে। কিন্তু শেষে সাক্ষী কিনা সকল লজ্জা যায় ভরে। মাথা নেড়ে সায় দেবার সাহস নেই। কথা বলা আরো কঠিন। তবু সাক্ষী একেবারে কানা কালা বোবা হয়ে থাকতে পারে না। কোনরকমে একটু হাসো।

হাস্য পরে, তার আগেই ঝিনির গলায় চাপা ঝঙ্কার, 'আঃ বাবা, চুপ কর না।'

না, বাবা আর তা মানবেন না। বলেন, 'ওই তোদের এক দোষ ঝিনি। আমি কথা বললেই তুই আর তোর মা খালি চুপ করতে বলবি।'

মা এবার সরোষে বলেন, 'আবার ঝিনি ঝিনি কেন, বারণ করা হল না?'

কিন্তু চলন্তার টান জানো না। সেই স্রোতে সব কুটোকাটি হয়ে ভেসে যায়। বলেন, 'আরে আগের থেকে যখন বলেই ফেলেছি, এখন আর না বললে কী হবে। এর তো জানাই হয়ে গেছে।'

বলে হাত উল্টে তুলে দেখান আমার দিকে। এখন কে ফাঁপরে পড়ে দেখ। ইচ্ছা করে হেঁকে বলি, 'আজ্ঞে না, জানা নেই।' এখন না যায় বাইরে মুখ ফেরানো, না যায় মুখ নিচু করা। তার চেয়ে ভরাডুবি, দাঁত দেখিয়ে ঘাড় নাড়া।

ওদিকে মায়ে-ঝিয়ের নাড়ি বন্ধ। মুখে কথাটি ইস্তক নেই। চেয়ে দেখি, পরস্পরে মুখোমুখি, চোখাচোখি। তারপরে খোপ ফাটানো হাসি। সেই একরকম আছে না, এ লোকের কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো। সেটা এক কথার কথা। কাঁদলে রসাতল। কিন্তু এ সে ঠাঁই নয়। তাই মায়ে-ঝিয়ের হাসিতেই খোপ ফাটে। হাসির মধ্যেই একজনের গলায় শোনা যায়, 'কী জ্বালাতন!' আর একজনের, 'বাবাকে নিয়ে আর পারা যায় না সত্যি।' বলতে বলতে দুজনেরই নজর একবার ছুঁয়ে যায় ভিন্‌যাত্রীর মুখ। যদিও তাতে হাসি থামে না। এ মা মেয়ে, না দুই সখী? ধূসরে আর কালো কেশে, মুখের রেখায় আর নিভাঁজ ললিত মুখ দেখে মন বিচারে যেও না। মন-বুঝের ছন্দ আছে মনে মনে। পুছ কর গিয়ে প্রকৃতিকে। মায়ের কাছে ছাড়া কি মেয়ে হতে শেখা যায়। ছেলেরা যে সবাই ছেলে। বাবাও তো এক ছেলে। অবুঝ ছেলে। আর মেয়েতে মেয়েতে মা মেয়ে। প্রকৃতি রহস্যের জানাজানি এই দুজনে। ভাবের দরিয়ার খেল্ যদি ঠিক থাকে, তবে মা মেয়েতেও সখী।

কিন্তু ভিন্‌যাত্রীর মুদ্দা হাল। ভিতরে কলকলায়, বাইরে আসতে পায় না। সহবত নেই নাকি। হতে পার তুমি এক সাক্ষী।

তা বলে, মহিলারা হাসলে তুমিও কি হাসবে। দম রাখ, দমিয়ে রাখ। চোখে মুখে যদি ফুটে বেরোয়, তার কি উপায় আছে। আকাশে সূর্য থাকলে রোদ দেখা যাবেই।

তবু একবার গাজীর দিকে চোখ না পড়ে যায় না। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। অথচ চোখ দেখে মনে হয়, এ গাজী চোরা। যেন কোন দূরের এক ফাঁক থেকে চুপি চুপি দেখে। দেখে, আর মিটিমিটি হাসে দাড়ির জটায়। ইস্, যেন অন্তর্যামী বসে আছেন, মজা দেখেন বসে বসে।

প্রৌঢ় কিন্তু বেহাল নন এক ফোঁটা। ওদিকে হাসির দগর, এদিকে উনি চোখ

•

দ্‌টি উপচে বলেন, 'তা কি আর মিথ্যে বলেছি, কী বলেন? আপনি কি আর ওর ঝিনি নামটা শ্‌নতে পাননি?'

পেয়েছি নাকি। কই, জানি না তো। কন্যে ঝিনি না অলকা, তিন্‌যাত্রীর তা জানতে নেই। কিন্তু, সে তো আপন ব্‌ঝ। এখন সোজা কথায় জবাবটা যে চাই। তবে ওই শোন, আমি ম্‌খ খোলবার আগেই ঝিনি কেমন কল্কৃত হয়, 'আচ্ছা হয়েছে বাবা, উনি শ্‌নতে পেয়েছেন।'

পরম উম্ধার। কৃতজ্ঞতায় একবার চোখ তুলে না তাকালে মানায় না। উম্ধারকর্তাও দেখি, নজরে রেখেছেন। ভাবখানা, 'আমার বাবা এমনি মজার।' এরকমটা হলে তব্‌ একট্‌ গলা খ্‌লে কলকলানো যায়।

ওদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে নাকছাবির তপেদন' প্যাকরে ঝিনিক। এই দিগন্ত যেন বিচার করে, ওঁর গলায় কণ্ঠ মেলে কি না। বলে, 'তাতে হয়েছে কী।'

এুকে বলে ঝিকে কোম্পানি। কর্তা গলাবন্ধ কোট সহ ব্‌কখানি সামনে চিতিয়ে আনেন। তর্জনী দিয়ে নিজের হাঁট্‌তে ঠ্‌কে বলেন, 'হয়েছে তো তোমাদেরই। আমি বলছি, নাম কখনো খারাপ হয় না। আপনি কী বলেন, ঝিনি নামটা খারাপ।'

ম্‌খ দিয়ে যেন তাড়াতাড়ি অপরাধ ভঞ্জন করি, 'না না।'......

বলেই শিরদাঁড়াতে কাঁটা। শরীর একেবারে আড়ষ্ট। ছি ছি, এ ম্‌খ খ্‌লে গেল কী করে। ভয়ে, নাকি সহবতে। উলটো দিকে ম্‌খ ফিরিয়ে এবার হায় মানার হাসি। এ মান্‌ষ নিয়ে কী করা যায়।

কিছ্‌ না। চলন্তার জল ধরে রাখা যায় না। তিনি কল্‌কল্‌ করে চলেছেন, 'জানিস্‌ তো, এ নামটা রেখেছিলেন তোর ঠাকুর্দা—।'

কথা শেষ হতে পায় না। তার আগেই গিন্নি ঝেঁঝে কোপ দেন, 'তা সে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার দরকারটা কী।'

কর্তা কোপেও কাটেন না। বলেন, 'না, দরকার কিছ্‌ নয়। বাবা তো খ্‌ব ভাল-বাসতেন ঝিনিকে। শেষ দিকে তো খালি ওকেই কোলে নিয়ে বসে থাকতেন, আর বলতেন, "ঝিনি ঝিনি ঝিনিক ঝিনিক, ঝিন্‌কি জগো ঝম্পো ঝাঁ।" তোমার মনে আছে সেই কথা?'

পরিবারকেই জিজ্ঞাসা। মা মেয়ের আবার হার মানা। মা বলেন মেয়েকে, 'দেখছিস্‌ তো।' দেখছে কিন্তু সামলায় কে। প্রৌঢ় বলেন, 'না, কথাটা উঠল, তাই আর কী। নাম কাকে বলে। নাম হল একটা জিনিসকে বা কাউকে বিশেষভাবে বোঝাবার জন্যে, কী বলেন। তুমি একটা কালো পাখী দেখিয়ে বললে, এটা কাক, আর একটা সব্‌জ ফল দেখিয়ে বললে, এটা কাঁকুড়, এই রকম আর কী। মান্‌ষের বেলায় তা হয় না, তখন তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন তুমি যদি বল, অম্‌ক ইস্কুলের অম্‌ক রিটায়ার্ড হেড মাস্টার এই লোকটা, তা বললে হবে না। তখন আমার নামটাও বলতে হবে ব্রজনারায়ণ চক্রবর্তী।'

খবরদার, বিষম লাগে না যেন। এমন নাম অতীতে শোনা না থাকতে পারে। কিন্তু সামনে মাস্টারমশাই। হেড মাস্টার-মশাই। কথায় থেকে সেরকম একটা ধন্দ মনে ছিল। শ্রীম্‌খে সেই জবানি আপনি ফোটে। তব্‌ কোথায় যেন একট্‌ রকমফেরের খেলা দেখি। এ যেন সেই কঠিন দ্‌ষ্টি কুটিল চোখ নন। হাসতে মানা রামগর্‌ড়ের ছানা, পান থেকে চুন খসায় নীতিতে থমথমে নয়। ব্রজনারায়ণ চক্রবর্তী হাত ঝটকা দিয়ে বলেন, 'তা সে কথা থাক। যে কথা নিয়ে কথা উঠল, তোর মার কথা বলছি,

এগারো বছর বয়সে তাই মুর্শিদাবাদের সিল্কের ডোরা জড়িয়ে—?

এবার একেবারে রূপনারায়ণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বা এবার জোরে জবাব দিলেন, দেখ্ ঝিনি, এবার কিন্তু আমি সত্যি রাগ করব বলে দিচ্ছি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

বলেই মুখ একেবারে দিগন্তের আকাশে। এবার দেখ হেডমাস্টারের হাল। বাঁধানো দাঁতে জিভের গুড়ো ঠুকে টেনে টেনে হাসেন। মন রে আমার, এ হাসির নাম কি ব্রহ্মনারায়ণী। গৃহিণীর পিছন ঘোমটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, বলছি মা। ওই খুকীটিকে পড়ে যেতে দেখলাম কিনা, তাই দু একটা কথা মনে পড়ে গেল, এই আর কী।'

বলে হেডমাস্টার ব্রহ্মনারায়ণ তাঁর তরুণ চোখ দুটি তুলে তাকান আমার দিকে। দেখি, বুড়োটা চ্যাংড়ার মত মিটি মিটি হাসে, চোখ পিটপিট করে। ভিতরের কলকলানি যেন আর ধরে রাখতে পারি না। মুখ ফিরিয়ে দেখি, ঝিনি চোখ ফেরাবার সময় পেল না। কালো তারা দুটি ছিটকে যাবার আগেই একটু লজ্জায় পড়ে যায়। তারপরে মুখখানি টকটকিয়ে ওঠে।

আবার এদিকে শোন, ডুপ্‌কিতে কেমন তাল লেগেছে। জোরে নয়, ডুপ্‌কি ডুপকি ডুপ্‌কি বাজে, ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্‌কি ডুপ্‌কে ডুপ্‌কে। তাকিয়ে দেখি, সেই তালেতে মৃদু মৃদু দাড়ি নাচে, বাবরি নাচে। আর নাচে চোখের তারা। হাসি আছে ভাঁজে ভাঁজে। যেন জিজ্ঞেস করে, 'কেমন বোঝেন বাবু।'

কী বোঝো মন। বোঝাবুঝি ভিতরে বাজে। মুখেতে বোল বাজে না। রূপ অরূপের তরঙ্গ স্রোতে বহে যায়, আলোকের স্রোতে—অলক্ষের টানে থাকে বলে। কথায় কী বোঝাবে। ব্যাখ্যার কথা কি জানা আছে। এত যে ভাগ-বাঁটোয়ারার চিন্তায় ছিলে, এবার দেখ, খোপ কেমন ঢাকনা খুলে দেয়। কেমন করে দিগন্তে একাকার। বাইরে দেখি ভাটির নদী, তীরে পাখীর মেলা। মনে তো পড়ে না, এত পাখী কবে দেখেছি। ঝাপ্‌সা কালো পিঠের নিচে সাদা সাদা বুক পাখীগুলোর। তবে জল ভজভজিয়ার সঙ্গে বোধহয় এ এলাকায় তেমন জান পহছান্ নেই। শব্দেতে সব একযোগে মুখ তোলে। তারপরে দে ওড়া। একা দোকা নয়, শতাবধি। পাখায় বিস্তারে যেন ছায়া ঘনিয়ে দিয়ে যায়। শরতের মেঘের মত নদীর বুকের রোদে একখানি ছায়া চলে যায়। দলপতিকে চিনবে না, তবে নির্দেশ আছে জানবে। 'চঙ্গ ভাগি, জল দোলানো সেই প্রকাণ্ডটা আসছে।'

বাঁধ যে নির্বস শূন্য, তা বলা যাবে না। মাঝে মধ্যে দু-একজনাকে দেখা যাবে, কোথায় যেন যায়। পিছনে তাদের আসমান জমিন, সেই কোথায় যেন গিয়েছে। কোথায় গিয়ে যেন ঠেকেছে। বউ-ঝিয়েদের দু-একজনও যে চলাফেরা করে না, এমন নয়। হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে না। বলা যায় না, কে যায় নষ্টে। তারপরে উপশান্ত নালিশ, বউটা বাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখে। বলা তো যায় না। তবে হাঁ, মাঝে মধ্যে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ দু-একজনকে দেখতে পাব! সেই মেয়ের কাছে ঘোমটার আশা ক'রো না। 'চোখ আছে তাই দেখি। কোন দেশের মানুষ যেন কোন্ দেশেতে যায়, তাই দেখি।' গায়ে গতরে অত ঢাকাঢুকির সহবত পাবে না। তাতে যদি বলো, যেন ঘোটন পায়রা বুক ফুলিয়ে যায়, তা বলতে পার।

সেই যে বলেছিলে, মন চল যাই দিগন্তে, সব কিছুতেই সেই খেলা। এবার অবুঝ, কী চাও, কোথায় যাও, কিসের খোঁজে, জবাব না পেলে, পাড়ি পাড়িতেই ভাসো। আর হাসতে যদি চোখ ঝাপসা হয়, হোক। জানবে, দিগন্তের সেই হয়তো দান।

গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'নদীর নাম কী।'

গাজী বলে, 'নদীর নাম বাবু ডাংসা।'

ডাংসা! এদিককার অনেক নদীর নাম শুনেছি, এমন নাম কখনো শুনিনি। হয়তো হবে। আমার চেনা সীমানায় নয়। মায়ের মজদুরিতে যার আনাগোনা, সে-ই জানবে ভাল।

তা বললে তো হয় না। ব্রহ্মনারায়ণ কাটান দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, 'কী বললে?'

গাজী ডুপ্‌কি থামিয়ে বলে, 'ডাংসা। তবে এইবার যে ডাইনে ঘুরবি, তাতেই গিয়ে বিদ্যেধরীতে পড়বেন।'

ব্রহ্মনারায়ণ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'তুমি জান কাঁচকলা।'

'কেন বাবু।'

তা বলতে হবে বইকি, গাজী কেন কাঁচকলা জানবে। জানতে হবে এইজন্যে যে, বাবুর হাতে বোধ হয় পাকা কলা। তিনি বলেন, 'এটা কালিন্দী নদী।'

গাজী দাড়ি ঝাড়া দিয়ে খ্যাকখেঁকিয়ে হাসে। বলে, 'শোনেন, বাবু কী বলেন। সে তো বাবু পুবে, বডার ঘেঁষে কালিন্দী নেমেছেন।'

হেডমাস্টার মানতে রাজী নন। মাথা নেড়ে বলেন, 'তুমি কিছুই জান না। তোমরা তো কেবল যাও আর আস, নদীর নাম ধাম তোমরা জানবে কী করে।'

তা বটে। কোথায় তোমার বাস, তা তুমি জান না। তুমি কেবল বাস কর। কেন। না, তবে শোন, ব্রহ্মনারায়ণ বলেন, 'হাঁদু আমাকে বলেছে, এটা কালিন্দী নদী।' গাজী একবার আমার দিকে চায়। হেসে হেসে যেন অবোধকে বুঝ দেয়, 'না বাবু, তা হতি পারে না। আপনার হাঁদু যা বলেছেন, সেটা অন্য জায়গা। তয় তো

আমরা হিঙ্গলগঞ্জ দিয়া আসতাম। কালিন্দী হল গিয়া আপনার বড়ায়ের নদী। ভালো যদি আমরা উজানি এলাম। এবার বিদ্যা দিয়া নামা। আপনে ক্যানিং হয়ে, মাতলা দিয়া গোসাবায় যাবেন।'

ব্রজনারায়ণ এবার অন্যদিকে সাক্ষী ডাকেন, 'হ্যাঁ রে ঝিনি, হাঁদু তো তাই বলেছিল না। দু বছর আগে যখন গেছলাম, তখন তো তাই বলেছিল।'

ঝিনি এবার একটু সহজ। বাবার দিকে ফিরে বলে, 'হাঁদুদার কথা তো। না জেনেই বলেছে হয়তো।'

'না জেনে বলেছে? তা হলে তো হাঁদুটা একটা গাধা।'

অন্ততঃ ব্রজনারায়ণ তাই বলেন। তিনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেননি, তাই মায়ের দিকে তাকান। অথবা, সেখানে চোখাচোখি, হাসাহাসি। তবে কর্ত্রীর মুখ একটু বাইরে। বাস করে আছেন যে। কর্তা হাসি দেখতে পান যদি।

কিন্তু গাজী আবার কী জিজ্ঞেস করে

শোন, কে হাঁদু বলেন তো। কোন্ বাড়ির?'

ব্রজনারায়ণ হার মানতে, 'কোন্ হাঁদু, কোথাকার হাঁদু, তা তুমি কী করে জানবে?'

গাজীর মুখে হাসিটি তুমি কাড়তে পারবে না। বলে, 'আজ্ঞে, শাঁখচূড় থিকে উঠলেন তো। বাড়ির কথা বললি চিনতি পারি।'

'পারলেই হল। শাঁখচূড়ের সবাইকে তুমি চিনে বসে আছ? তোমার বাড়ি কোথায়?'

বোঝ এবার, কাকে ঘাঁটাতে গিয়েছ। কিন্তু গাজীর কি মাস্টারেও ভয় নেই। দাড়ির ভাঁজে তেমনি হেসে বলে, 'বাড়ি আর কবেন না বাবু, বলেন গুজরানের চালা। বসিরহাটের শহরের এক পাশেই থাকি।'

'তা বেশ তো। তুমি থাকো বসিরহাটে। শাঁখচূড়ের লোক তুমি চিনবে কী করে?'

গাজী এবারে গলার আওয়াজ চাপতে পারে না। হা হা করে হেসে বলে, 'নামের মজুরায় ফিরি কি না। যাওয়া আসা সবখানে. তাই জিগেসী করলাম।'

ব্রজনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত গাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরে ঘোর অবিশ্বাসে বলেন, 'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম শুনেছ? তাঁর বাড়ি।'

গাজীর মুঠায় দাড়ি। হাসির মধ্যে নজর যেন কোন্ কূলে। একটু একটু ঘাড় নেড়ে বলে. 'ওই গিন্না আপনার যানাদের বাড়িতি দুইখান বেলাতি সাবুর গাছ আছে?'

'বেলাতি সাবুর গাছ?'

ব্রজনারায়ণের ভুরু নয় কেবল, ব্রহ্ম শুদ্ধ কুঁচকে ওঠে। বলেন, 'কী বললে?'

'আজ্ঞা, বেলাতি সাবুর গাছ।'

গাজী এবার মাস্টারকেও ঘোল খাইয়েছে। ব্রজনারায়ণ একবার আমার দিকে, তারপরে কন্যার দিকে ফেরেন। কন্যার ঠোঁটের কূলে কূলে হাসি। বলে, 'বোধ হয় পাম্ গাছ দুটোর কথা বলছে।'

গাজী বলে, 'তা হতি পারে। আমরা বাবু অতশত জানি না তো। কে যেন একদিন বললে, দেউড়িতেও দুখান বেলাতি সাবুর গাছ. তাই জানি।'

ব্রজনারায়ণ তবু ধমকান, 'তোমার মাথা। ওই যে কী সব নদীর নাম বললে, থাম্সা না হাম্সা—?'

'ভাংসা বাবু ভাংসা।'

'আরে, অই হল। তোমাদের ভাংসাও যা, থাম্সাও তাই।'

কিন্তু গাজীর প্রাণে কী সাহস দেখ। তেমনি হেসে হেসেই বলে, 'সব গিন্না তো সেই সাগরেই চলে। নাম যাই হউক গা। তয় বাবু, আপনার শাঁখচূড়ের ঠাকুরমশায়রে চিনতি পেরেছি। ওঁয়ার বড় দুই ছেলে কলকাতার বড় কাম করে। ছোট মিনি মাগনায়, ওই গিন্না আপনার কী ওষুধ বলে, চিনির বড়ির মতন, সেই ওষুধ সবাইরে দ্যান, তাই কিনা বলেন। আর ওই যে হাঁদুবাবুর কথা বলতিছেন, ওঁয়ার একখানি দোকান আছে বসিরহাটে। আঁ, তাই কি না?'

ব্রজনারায়ণ ভুরু কুঁচকে চোখ পিটপিট করেন। আর চোখাচোখি করেন ঝিনির সঙ্গে। ঝিনির রাঙানো ঠোঁটের কূল পাছে হাসিতে ভেসে যায়, তাই ভ্যানিটি ব্যাগ আড়াল করে। বলে, 'ঠিকই তো বলছে বাবা। হাঁদুদার তো দোকান রয়েছে বসিরহাটে। গেদুদা আর নেদুদা তো কলকাতায় চাকরি করেন।'

তা বলেই বা মানবেন কেন। কন্যাকেই জিজ্ঞেস করেন. 'আর ওই যে কী সব বলছে, ওষুধ দেন চিনির বড়ির মতন।'

'বড় মামা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেন তো সবাইকে।'

'কিন্তু সেটা চিনির বড়ির মতন নয়।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'মুমুধু মানবে বাবু, নাম টাম তো জানি না। তবে ওই দিদি যা বললেন, তাই। আমাকে একবার দিইছিলেন কি না।'

'তোমাকে?'

'হ্যাঁ। নামের মজুরায় গেছিলাম। তা শরীলটা বাবু ভাল ছিল না। গান শুনি খুশী হয়ে কাগজের মোড়ক করি চার পেন্থ ওষুধ দিয়া দিলেন। একদিনেই শরীল একেবারে ঝরঝরে।'

ব্রজনারায়ণ গম্ভীর হলেন। গাজীর এতটা জানা শোনা যেন তাঁর ভাল লাগে না। এক তো, দেখ, ঠেক মারলে ব্যাটা ভেড়ির বাঁধ নিয়ে। তারপরে নদীর নাম নিয়ে। এখন আবার তাঁর নিজের আত্মীয় নিয়ে। গাজীটা সত্যি পাজী। এবার চুপ দিলে হয়।

তাই কি হয় নাকি। কবুল করিয়ে নিতে হবে তো। গাজী বলে, 'তয় বাবু, ঠিক হলি তো। আমি যানার কথা বললাম, তানার কথাই আপনি বলছেন তো?'

ব্রজনারায়ণ নাক টানেন। বলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তুমি কী?'

এ আবার কেমন কথা, কোন্ ঘাটে যায়? গাজী বলে, 'কিসের কথা জিগেসী করেন বাবু।'

মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি সাধু, না ফকির?'

কৌতূহলের থেকে যেন বিরক্তিই বেশী। এবার বুঝুক গাজী, কাকে বারে বারে ঠেক দিতে যাওয়া। কিন্তু যে বলে, 'কালার সঙ্গে বোবার কথা কয়, কালা গিন্না শ্রবণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিন্না রূপ নেহারে, মর্ম কথা বলব কি' সে যে সোজা জবাব দেবে, তেমন আশা ক'রো না।

হেসে বলে, 'বাবু, সাধু ফকিরে ভেদ নাই। আপনি যা বলেন, আমি তাই।'

ব্রজনারায়ণ হাত উল্টে ঘাড় নাড়েন। বলেন, 'তা বললে কি হয়। আমি জানতে চাইছি, তুমি হিন্দু, না মোছলমান?'

গাজী একবার সেই দূরের আকাশের দিকে চায়। যেন কার দিকে চেয়ে হাসে। সেদিকে চোখ রেখেই বলে, 'মুরশেদের নাম করি বাবু, তাঁর কাছে তো কোন জাত নাই। তয় যদি জন্মের কথা বলেন তো বলি, আমার বাপ মোছলমান।'

ব্রজনারায়ণ যেন আবার ঠেক্ খেয়ে চমকে ওঠেন। তাকান আমার দিকে। বলেন, 'সে আবার কেমন কথা হে। বাপ মোছলমান, আর তুমি কী?'

'মুরশেদের দাস, ওখেনে আপনার হিন্দু মোছলমান নেই।'

বলে গাজী চোখ ঘুরিয়ে হাসে। তুপ্‌কিতে শব্দ তুলে বলে, 'বাবু একটা গান করি শোনেন।'

বেশ গলা খুলেই আপমানে গলা তোলে গাজী—

'সব লোকে কয়, তুমি কী জাত সংসারে।
আমি কই, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে।
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ, বামনী চিনি কী ধরে।'

(ক্রমশঃ)

DISTRICT LIBRARY,

COOCH BEHAR.

ত্রিলোচন কলমচি

নট-Naughty-কথা

আমার বন্ধুবান্ধবীদের অনেকেই কি অজ্ঞাতকারণে জানিনা পর্দান্ধ হয়েছেন। কন্দর্পকান্তি আমিই শুধু গ্রহের ফেরে (আসলে দৈহিক নিম্নতার দরুন; ৫ ফুটকে কি কেউ উচ্চতা বলে!) কালির ব্যবসায় নেমেছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, গত সংখ্যার আগের সংখ্যায় নিজের উচ্চতা প্রকাশ করে ফেলায় অনেকার পত্রোপদেশ পেয়েছি ঃ ভবিষ্যতে সী-লেভেল থেকে হাইট ধরবেন, তা হলে হয়ত কিছুটা কহতব্য হবে।

আমার এক বাল্যবান্ধবী এখন ফিল্মের দুরন্ত হিরোইন। গতকাল তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই সে ক্যামেরা কনসাস হাসি হেসে জানতে চাইল, 'কি চাই অটোগ্রাফ? না লাইফ?'

'লাইফ?' ওর ঘরের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠার ভান করে বললাম, 'ওঃ মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে—'লাইফ আজ আর হয় না!'

অনেক পরে রসিকতা বুঝতে পেরে টাসেলটা দিয়েই চাবকাতে এল আমাকে। আমি হেসে ফেলে বললাম, 'মেয়েদের লাইফকে ক'ভাগে ভাগ করা যায় জানো?'

কৃত্রিম কোপের ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি একটি আস্ত হতভাগা! মেয়েদের লাইফ ভাগের জিনিস নয়।'

'তা গুণের এবং যোগের জিনিসও বলতে পারো। তবে শুনেছি আট ভাগে নাকি ভাগ করা যায়।'

ওর চোখে এবার কৌতুক ঝিলিক দিল, 'যথা?'

আমি বাঁ হাতের কর গুনতে গুনতে বললাম, 'যথা,—বালিকা, কিশোরী, যুবতী, যুবতী যুবতী যুবতী যুবতী যুবতী।'

সেন্টার টেবিলে কফির পেয়ালা প্রায় উল্টে দিয়েছিল সুন্দরী। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার খিলখিল হাসি থামলে বলল, 'তুমি সেই আগের মতই বিচ্ছু আছ।'

'তাই সই, তাই আছি।' তথাস্তু ভঙ্গীতে হাসলাম, 'শুঁয়ো পোকা হলে একটা হাই-লিফ্‌ট পেয়ে যেতাম হয়ত।'

অবিশ্যি মেয়ে না বলে অভিনেত্রী বললেই ঠিক বলা হত, কারণ উর্বশীর মতই তাদেরও বয়স নেই। উইকেট বাঁচিয়ে ছেলের বয়সীর সঙ্গেও চুটিয়ে খেলে যান, অনেক হিরোইনকেই তখন বোল্ড আউট করা সহজ হয় না। অকালে মারা গেলে কখনো সখনো প্রেসের হাত ফস্কে বেরিয়ে যায় ঃ

'এখন ফিল্মের দুরন্ত হিরোইন'

মৃত্যুকালে তিনি তিনটি কন্যা, দুইটি পুত্র, একটি (!) স্বামী ও [illegible] বৎসর পৃথিবীতে ফেলিয়া গিয়াছেন।

ক্যামেরা দল [illegible], মিস্টেক মনে করে দস্তুর থাকে।

আমার এক অবাঙালী ফিল্ম-ক্রিটিক তামাশা করে বলেছিলেন, In India there are only two classes of people, orphan or fan। তবে কথাটা একেবারে তামাশা নয়।

অর্ধেক রাজত্ব আর নিত্য নতুন রাজকন্যা জোটে যাদের এক একটি চিত্র-স্বাক্ষরে, তারা কি সহজ মানুষ! তারা সুপার ম্যান। বিরাট বাড়ি, দামী গাড়ি আর লকারে অফুরন্ত টাকা। নায়ক-নায়িকা হওয়া তো মুখের কথা নয়, যদিও মুখশ্রী আর মুখের কথা দিয়েই তাঁরা বড় হন। আর পিছনে থাকে এক হৃদয় দ্রবীভূত করা গল্প। সেই গল্পের মই বেয়ে তাঁরা আকাশে ওঠেন, উঠে নক্ষত্র হন। তাঁরা তখন ক্যান, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। শুধু চিত্রনাট্যের চমক দিয়ে দর্শকের মন ভুলালে চলে না, ব্যক্তিগত জীবনের নাটকও চাই।

অন্তত স্ক্যাণ্ডেল মণ্ডার মাসের জন্য চাই উদ্ভট আর উত্তেজক গল্প। নায়ক-নায়িকার একান্ত গোপনীয় জীবনের কিছু ককটেল। নিষিদ্ধ মাংসের শিককাবাব কার না বাঁকা চোখের শিকার হয়। হলিউড আবার এসব বিষয়ে বুঝি অগ্রণী। তাদের প্রেস-এজেণ্টরা লাইফ-ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা খুলে বসেছেন। নানান রহস্যময় ফটো-স্কুপ্ তৈরি করে এইসব স্টার হকাররা রাতারাতি সাত-সাগর তোলপাড় করে ছাড়েন। হয়কে নয় বানাতে তাঁদের জুড়িদার নেই। প্রিলিং নিউজে কত পার্সেণ্ট অ্যালকোহল, সেক্স আর স্টাণ্ট মেশাতে হয় তা ভালো করেই তাঁরা জানেন। কোন্ দুর্ধর্ষ অভিনেতা সিনেমায় ছাড়া নারীকে কখনো স্পর্শ করেন না, কোন্ মোহিনীমায়া রাত্রে শুধু মোজা পরে ঘুমোতে ভালোবাসেন তা বানাতে তাঁদের কৃতিত্ব অসাধারণ। বাংলাদেশেও এই টেকনিক শুরু হয়েছে এবং তার ফলে কার ক'টি ল্যাপডগ আছে, কে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসে ফিল্ম ম্যাগাজিন মারফত আমরা সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সবারই যে এ জিনিসটা পছন্দ তা নয়। নিজের জীবনটাকে রহস্য উপন্যাস বানিয়ে অন্যের উপাস্য হতে সবাই চান না। অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকতে চান তাঁরা, ব্যক্তিগত জীবনের অতি নাটক দিয়ে নয়। গতকালের সিনেমাজগতে এই জিনিসটি ছিল না। চিত্রশিল্প তখন ছিল সাধনার বিষয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে তখন শিক্ষণ আর
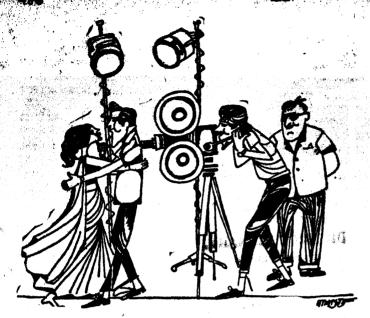
...'ক্যামেরার চোখের আড়াল হন নি...'

শিক্ষানবীশী এই দুটি ব্যাপার ছিল।

স্টেজ জিনিসটা অনেক চিত্রশিল্পীর কাছেই আজ হয়ত ওয়েস্টেজ অব এনার্জি। সটান ফিল্মে এসেছেন এবং এক দণ্ডের তরেও ক্যামেরার চোখের আড়াল হন নি এমন অনেকে নিজেদের অভিজাত মনে করেন। উন্নাসিক হাসি হেসে আড়ালে হয়ত স্টেজের হিরোইনকে বেপর্দা মেয়েছেলে বলে নাক-সিটকোন। কিন্তু সত্যি করে ড্রামাকে বুঝতে হলে স্টেজে নিজেকে কিছুকাল মকশ করা দরকার। পাবলিককে এনকাউণ্টার করবার কাউণ্টার ওই একটিই আছে।

চিত্রশিল্পী হচ্ছেন 'পীস-মিলে'র কারবারী, টুকরো টুকরো শটে কাজ করছেন তাঁরা, শিল্পদের পর্দায় নব্বই মিনিট চলতে অন্তত নব্বই দিন লাগে কম করে। কোথাও কোথাও ছ' মাস এক বছরও গড়িয়ে যায়। বয়স বাড়ে, মেজাজ এবং চেহারা বদলায়। পুরোনো কথা ভুল হয়ে যায়, নতুন কথাও মুখস্থ থাকে না। দ্রৌপদীর মত পাঁচ ছবির ঘর করতে গিয়ে কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাশ হয়ে গিয়ে মনটাজ তৈরি হয়। আউট-ডোর ইনডোরের দুই পর্ব আছে। আছে shot-এ শাটাং-রীতি। এক সেটের মধ্যেই হয়ত ড্রামার ল্যাজা এবং মুড়োটি পড়েছে। ধরুন ড্রইং-রুম সেটের মধ্যেই পূর্বরাগ আর বিরহের পালা আছে, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাবের ব্যাপার, নাটকের দুই মেরু, অথচ ক্যামেরা একগ্রাসে মুখে পুরতে চায় দুটোকেই। তাই মুশকিল হয় নায়কের, বিপদ আরো হয় নায়িকার। ঠিক সময়ে ঠিক ফিলিংসটি আসে না, চোখ দিয়ে জল গড়ায় না।

একবার শুটিং-এ এমনি একটা মজার ঘটনা দেখেছিলাম। নায়কের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও নায়িকার চোখে জল আসছে না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হচ্ছে না। কারণ নায়ক তখন জ্বলজ্যান্ত পাশে দাঁড়িয়ে মিটির মিটির হাসছে। এদিকে পরিচালকটিও বড্ড খুঁত-খুঁতে লোক, একগুঁয়ে এবং বেতোয়াক্কা মানুষ। সকাল থেকে জিদ ধরে লেগে আছেন ওই একটি পয়েণ্টে। কেন হবে না। রাশি রাশি নেগেটিভ নষ্ট হচ্ছে। ক্যামেরা-ম্যান আর রেকর্ডিস্ট রেগে লাল। কিন্তু নায়িকা হোপলেস, কেন যেন সেদিন কিছুতেই উতরাচ্ছেন না। অবশেষে পরি-চালকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, ক্ষিপ্ত হয়ে নায়িকার গালে মারলেন এক থাপ্পড়। আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে ফল, চোখের কূল ছাপিয়ে কোল ভিজে গেল নায়িকার। এক চড়েই সেদিন মা করেছিলেন নায়িকা, শট হয়েছিল ইউনিক। কিন্তু সেই চপেটাঘাতও নাকি পরে মূল্যবান হয়েছিল আরো। কনট্রাক্টের ওপরেও দু হাজার টাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল নাকি।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সিনেমা তুলনায় অনেকখানিই কৃত্রিম, আর সেই কারণেই কঠিন। আবার থিয়েটার একঝোঁকে এবং ঝুঁকিতে টেনে নিয়ে যাবার ব্যাপার, দর্শকের চোখ ক্যামেরার চোখ নয়, সেখানে সেকেণ্ড চান্স বলে কিছু নেই। সেই জন্যে সেখানে অত্যন্ত কঠিন এবং নগদ বোঝা-পড়ার ব্যাপার আছে।

তবু ফিল্ম হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে অভিনয় করে রাতারাতি বিখ্যাত এবং বড় লোক হওয়া যায়। নানা মত নানা ভাষা নানা পরিধান। সিনেমার মাঝে দেখি মিলন মহান। একমাত্র সিনেমাই ঘরের চৌকাঠ শুধু ডিঙোয়নি সমস্ত প্রাদেশিকতার গণ্ডি টপকে গেছে। ভাষা সেখানে কোনো বিতর্কের জিনিসই নয়। বৈজু, সাধনা, সায়রাবানু আর

পর দিনের সংগ্রাম, প্রতীক্ষা, অপেক্ষা এবং উপেক্ষা। মেয়েদের তো বিশেষ করে। সবাই শেষ পর্যন্ত নায়িকা হন নি, প্রতিনায়িকা হয়েই হয়ত ফিরে যেতে হয়েছে কাউকে কাউকে। কিন্তু প্রযোজক পরিচালকের খেলার পুতুল তো অনেককেই হতে হয়েছে একবার না একবার। কত রকম ইশারা, কত রকম ইঙ্গিত, কত রকমের নিমন্ত্রণ। তাদের হয়ত অনেকেই সুযোগ সন্ধানী, এসেছে ভুয়ো পরিচয় নিয়ে। কেউ এসেছে সেজেগুজে দেখতে, যাচাই করতে। সিরিয়াস রোলের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন কোনো অভিনেতা, হয়ে গেলেন ট্রেডমার্ক কমেডিয়ান। রোমান্টিক মনের মানুষ হলেন জাজ্বল্যমান খল নায়ক। যা চেয়েছিলেন তাকি হল? তাকি হয় কখনও! মনের মত কাহিনী মনের মত গল্প কজন নায়ক খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের জীবনে?

পথ চলতে একবার মাত্র দেখা হয়েছিল দুজনের, তারপর জোড় ভেঙে গিয়েছে। পথ গেছে বেঁকে। এক গল্পের ছাদনা তলায় আর এসে দাঁড়ানোর সুযোগ হয় নি হয়ত তাদের। কারণ পাবলিক চায় অন্য পেয়ার। কিংবা সে কোথায় হারিয়ে গেছে ছবির রাজ্য থেকে অন্তঃপুরের বিস্মৃতিলোকে। পুরনো ছবি দেখে হঠাৎ হয়ত দীর্ঘনিশ্বাস পড়বে, অদ্ভুত রকম কান্না পাবে। ওরা কি শুধু হারায় পাখি, ঐ সব মায়ামৃগের দিনগুলো!

চিত্রলোকেও মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কানাকানি দেখা যায়। নায়িকার হৃদয় শুধু সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি নয় সেকথা প্রমাণ হয়ে যায়। লস এঞ্জেলেস সিটি মর্গের সেই ৮১১২৮নং মৃতদেহটির কথা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যান নি। যার মৃত্যুশোকে টোকিওতে একজন তৎক্ষণাৎ সচিত্র সলিল-সমাধি লাভ করেছিল। আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল গ্রীসে ইরানে তুরস্কে মেক্সিকোতে। একা নিউ ইয়র্ক শহরই বলি দিয়েছিল পঁচিশটি প্রাণ। কি নাম যেন তার? নর্মা জন বেকার, নাকি মেরিলিন মনরো? কিংবা সেই অদ্ভুত মেয়েটি, ব্রিজিট বার্দোট?

স্বরচিত মৃত্যুর দিকে কেন এই ঝোঁক কে জানে। আমাদের বাংলা দেশেও সফল বিফল আত্মহত্যার ঘটনা কয়েকটি আছে।

সুতরাং ফিল্মের হিরোইনরা বুকের ভেতরে কেবল হৃদপিণ্ডই বয়ে বেড়াচ্ছেন এমন না, একটি (একাধিকও হতে পারে, হলপ করে বলতে পারি না) হৃদয়ও চেস্ট ক্যাভিটির মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন হয়ত বা।

'জাজ্বল্যমান খলনায়ক'

'ট্রেডমার্ক' কমেডিয়ান'

সুচিত্রা মাধবী সুপ্রিয়া এক নিঃশ্বাসে এদের নাম হয়। মেহমুদ, মমতাজ আর জহর রায় আমাদের সকলকেই হাসায়। আমাদের সকলেরই এরা ঘরের মানুষ। আমাদের অ্যালবামে, ঘরের দেওয়ালে, পার্সের মধ্যে, এমনকি ওজনের কার্ডেও এদের ছবি। এদের অটোগ্রাফের জন্য আমরা জীবন পণ করি। আমরা তো আমরা, আমাদের দাসদাসীরা পর্যন্ত।

এই তো সেদিন। নিউ আলিপুরে পুষ-হত্যাসম্পর্কে অভিযানের নাকি এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। জনৈক পলাতক ভৃত্যের কক্ষ তল্লাসী করতে গিয়ে তার ঘরের ডেকরেশন দেখে তাক লাগবার উপক্রম। ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে অজস্র নায়িকার সমারোহ। ইংরেজী বাংলা হিন্দী সিনেমা পত্রিকা এবং মাসিক ও সাপ্তাহিকের পিছনের পাতা থেকে সিজরিয়ান করে এই নায়িকারাজি সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া তোরঙ্গের মধ্যে ভিজ ফটোগ্রাফ, কিছু কাচা ফিল্মের ছাটকাট। আর বিছানায় নিচে বহু চিত্র-কন্যার উত্তেজক জীবনী।

কিন্তু এত করেও মন ভরে না, খ্যাতির শিখরে উঠেও শিল্পীর মনের মধ্যে তিক্ত অভিজ্ঞতার বেদনা বেজেছে বই কমে নি। খেলাঘর বাঁধতে লাগার সেই প্রথম দিনগুলি লাঞ্ছনা, অপমান, আত্মবিক্রয়, ব্যর্থতা। দিনের

পঁচিশ

গভীর স্তব্ধতার মধ্যে অবনী কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করল; কোনো সাড়া শব্দ নেই, কেউ তাকে ডাকছে না। মনে হল, সে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠেছে, জেগে ওঠার সময় মনে হয়েছিল কেউ ডাকছে; বা স্বপ্নের মধ্যে সে কাউকে ডাকতে শুনেছিল। অথচ কোনো স্বপ্ন অবনীর মনে পড়ল না। সহসা ডাক শুনে ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠায় সে সামান্য চঞ্চল ও বিস্মিত হয়েছিল; ভ্রম দূর হলে নিশ্বাস ফেলল।

বালিশে মাথা রেখে চোখের পাতা বুজে অবনী আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল। অন্ধকারে কয়েকটা মাছির মতন তার চোখের পাতার তলায়, চেতনায় কি যেন উড়ছিল; তারপর মনে হল, মাছিগুলো উড়ে গেলে সর্ষের দানার মতন কি যেন বা এক মুঠো ঠিক তার চোখ, নাক এবং কপালের মাঝখানে—ভুরুর কাছাকাছি কেউ ছুঁড়ে দিল। অবনী অস্বস্তি বোধ করল। কিছু না, তবু এই মাছি বা দানার মতন কোনো কিছুর অনুভূতি চোখের ওপর ভুরুর কাছে অনুভব করা অস্বস্তিকর। অবনী চোখ খুলল।

চোখ চেয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে শুয়ে থাকল। মনে করবার চেষ্টা করল, কোনো স্বপ্ন দেখেছিল কি না। কোনো স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল না ঃ এইমাত্র মনে পড়ল যে—ঘুমের মধ্যে কোনো এক সময়ে সে সুরেশ্বরকে দেখেছিল। সুরেশ্বর নির্জন কোন পথ দিয়ে যেন হনহন করে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ মাটি থেকে ওপরে ওঠে হাত পা এলিয়ে—মাথা উঁচু পা নিচু করে—বাতাসে ভেসে যাওয়া মস্ত একটা খোলা খবরের কাগজের মতন ভেসে যেতে লাগল। হাড়গোড়বিহীন রক্তমাংসশূন্য সেই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখে অবনী প্রথমে ভীষণ অবাক হল, পরে 'মশাই মশাই' বলে ডাকল। পরের আর কিছু অবনীর মনে পড়ল না।... সুরেশ্বর তাকে উড়ন্ত অবস্থায় ডেকেছিল বা দেখেছিল বলেও অবনীর মনে হল না।

গায়ের র‍্যাগ গলার ওপর চিবুক পর্যন্ত তুলে নিলে অবনী। ঘরের বাতাস শীতে যেন জমে শক্ত হয়ে আছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বিজলীবাবু জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন, তাঁর নাক বন্ধ হয়ে গেছে। হুইস্কির গন্ধ ঘরে আছে কি না অবনী বুঝতে পারল না।

কখনও চোখ বন্ধ করে, কখনও চোখ চেয়ে অবনী শুয়ে থাকল, অপেক্ষা করল, ঘুম এল না। শেষে একটা সিগারেট ধরাল। ধীরে ধীরে, গলা ভরতি করে কয়েক টান ধোঁয়া নিল, খেল, হাই তুলল একবার, তারপর পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। হাতের আঙুলে সিগারেট জ্বলছে।

ঠিক কেন যে ঘুম ভেঙে গেল অবনী বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মনে হল, ঘুম আর আসবে না। তন্দ্রাচ্ছন্ন অথবা আলস্যের কোনো ভাব নেই, তার চোখ বুজে আসছে না, এমন কি সে ক্লান্তি অনুভবও করছে না। অথচ কি যেন তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না, অন্যমনস্কচিত্তের মতন সে অস্থির বোধ করছে।

এখন কত রাত হতে পারে অবনী অনুমান করার চেষ্টা করল। তিনের কম নয়, অবনী অন্যমনস্কভাবে হিসেব করল, তাদের শুতে শুতে বারোটা বেজে গিয়েছিল প্রায়, ঘণ্টা তিনেক সে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে, হুইস্কির পর আরও ভাল ঘুম হওয়া উচিত ছিল। এখন সে প্রায় কিছুই অনুভব করছে না।

শুকনো গলায় আচমকা এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া টেনে ঢোক গিলতে গিয়ে কণ্ঠনালী জ্বালা করল; কাশি এল। অবনী কাশল। নিঃশব্দ অসাড় ঘরে নিজের কাশি কানে শুনে হঠাৎ মনে হল, সে অন্য কারও গলার শব্দ পাচ্ছে। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে এরকম মনে হলেও অবনী বিশেষ কিছু ভাবল না, আবার চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করল।

সুরেশ্বর একটা ছড়ানো মস্ত কাগজের মতন বাতাসে ভেসে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটা আবার তার মনে এল। এবং তার পরই হৈমন্তীর কথা। হৈমন্তী নির্বোধ। অবনীর মনে হল, কলকাতা থেকে ছুটতে ছুটতে হৈমন্তী একটা উড়ন্ত কাগজ লুঠতে এসেছিল, ঠিক যেভাবে কিছু বাচ্চাটাচ্চা কাটা ঘুড়ির পেছনে পেছনে ঘুড়ি লুঠতে ছোটে, আর শেষ পর্যন্ত অনেকটা দৌড়োদৌড়ি করে হাঁপিয়ে ঘুড়ি ধরতে না পেরে ফিরে আসে। হৈমন্তীর জন্যে দুঃখ ও সহানুভূতি বোধ করল অবনী।

সিগারেটের টুকরোটা আঙুল থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, পোড়া সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগতে অবনী উঠব কি উঠব না করে শেষ পর্যন্ত উঠল। অন্ধকারে লাইটার জেলে আলোর সুইচ দেখল, আলো জ্বালল। পোড়া সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে বাথরুমে গেল'

ফেরার পথে অবনী ঘড়ি দেখল, সাড়ে চার। তার অনুমানে ভুল হয়েছিল তবে। প্রায় ভোর হয়ে আসছে। আর সামান্য পরেই সকাল। আপাতত কি করা যায় অবনী বুঝতে পারল না। তার ঘুম আসবে না আর, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে সময় কাটানো ছাড়া উপায় নেই। বাতিটা অকারণে ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখতেও তার ইচ্ছে হল না। শুকনো কাশ কাশল বার কয়েক, পুলওভারটা টেনে নিয়ে গায়ে দিল, ঠাণ্ডা লাগছিল। বাতি নিবিয়ে আবার বিছানায় এল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে অবনী যেন অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করল, যে অস্বস্তিবশে সে জেগে উঠেছে সেই অস্বস্তি তার বুকের কোথাও এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এখন আবার দেখা দিতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা লাগার বেদনার মতন একটি বেদনা অবনী অনুভব করছে। এই বেদনা সম্পূর্ণ শারীরিক হতে পারে, হয়ত রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা লেগেছে। বা এই বেদনা শারীরিক নাও হতে পারে। কিছু বোঝা যায় না।

বুকে হাত রেখে অবনী বেদনা অনুভব করল। কখন ঠাণ্ডা লেগেছে, কি ভাবে লেগেছে সে অনুমান করার চেষ্টা করল, পারল না। অগত্যা নিজের বেদনার ওপর সেঁক দেবার মতন গরম হাতটি রাখল, আস্তে আস্তে হাত ঘষল। হাত ঘষার সময় তার বুকের পাঁজরার একটি ভাঙা হাড়ের ওপর বুড়ো আঙুল রেখে স্থির হয়ে থাকল।

তার বুকের পাঁজরার একটি হাড় ভাঙা, কবে ভেঙেছিল মনে নেই, নিশ্চয় খুব ছেলেবেলায়, যখন তার তেমন কোনো জ্ঞান জন্মায় নি, পরে ভাঙলে তার মনে থাকত। হাড়ের জোড়টায় কিছু খুঁত তখন থেকেই থেকে গেছে, জোড়ের জায়গাটা সামান্য উঁচু, আঙুল দিলে বোঝা যায়। অসতর্কভাবে হাত পড়ে গেলে কিংবা জোরে কিছু লাগলে ব্যথা লাগে। না, ঠিক ব্যথা নয়, বেদনার মতন। হয়ত বাস্তবিকই ওখানে কোনো ব্যথা নেই, তবু কোনো কারণে ছেলেবেলা থেকেই মানসিক একটা বেদনার ভাব ওখানে জমে উঠেছে। একবার, অবনীর মনে পড়ল, ললিতা বিছানার মধ্যে খেলাচ্ছলে তার বুকের ওপর মাথা রেখে গড়াগড়ি করছিল, হঠাৎ সে মাথা তুলে আবার যখন মাথা রাখতে গেল অবনী তীব্র বেদনা বোধ করেছিল। ললিতাকে বলেছিল, এই জায়গাটা বাঁচিয়ে—। ললিতা আঙুল বুলিয়ে জায়গাটা দেখেছিল; সে পরে অনেকবার ওখানে আচমকা ধাক্কা মেরেছে, হাতের বালা দিয়ে আঘাত করেছে, এমন কি প্রাণপণে হাতের মুঠো ছুঁড়েছে যাতে অবনী ভীষণ কোনো ব্যথা পায়। আশ্চর্য, অবনী যা লুকিয়েচুরিয়ে বাঁচাতে চাইত, যে-আঘাত সে ভয় করত, ললিতা তা বাঁচাতে দিত না। ললিতার কাছে অবনীর এই দুর্বলতা কেন যে সুখকর আনন্দ ছিল অবনী বুঝতে পারত না। তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে অবনীর ভয় বা ক্লেশ ছিল না, ললিতা হিংস্রভাবে সেই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দংশন করলেও অবনী অনায়াসে সহ্য করতে পারত।

ললিতার কথায় এবং বুকের বেদনায় বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যে অবনীর হঠাৎ মনে হল, সে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে : জলের মধ্যে ডুবে সাঁতার কেটে খেলা দেখাবার সময় শরীর যেমন নির্ভার হয় এবং হাত পা শিথিল হয়ে ভাসে। অল্পক্ষণ এই রকম মনে হলেও অবনী আবার স্বাভাবিক অনুভবের মধ্যে ফিরে এল। নিজের এই রকম শিথিল নির্ভার অনুভূতি তাকে সুরেশ্বরের কথা মনে করাল। সুরেশ্বরের মতন সেও কি

উড়ন্ত কাগজের মতন ভাসবে?' অবনী হাসল, মৃদু হাসি।
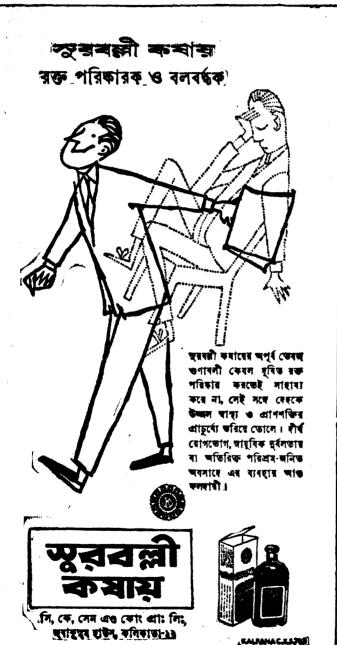
অথচ, আরও কয়েক দণ্ড পরে, অবনী পুনরায় অনুভব করল তার জাগ্রত এবং শায়িত অবস্থার মধ্যেও সে ভেঙে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। নিজের ভিন্ন দুই অস্তিত্ব অনুভব করার সময় আয়নার সামনে মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা ভাবা চলে। অবনী তেমন কিছু ভাবল না, বরং তার মনে হল, কি যেন তার শরীরের তলা থেকে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলায় অবনী তার মার একটা ছবি দেখত : মা অবশ বিহ্বলা যুবতী হয়ে পালঙ্কে শুয়ে আছে, আর মার মাথা, পা ও পিঠের দিক থেকে ক'টি বৃহৎ ধূপদানের ধোঁয়া মাকে যেন জড়িয়ে ধরছে। ছবিটা মার থিয়েটারের, রঙ্গমঞ্চে, ফ্রেমে বাঁধানো ছিল। ওই ছবি সম্পর্কে মার দুর্বলতা ছিল, কেননা ওই নাটকে মা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং সোনার মেডেল পেয়েছিল। অবনীর বরাবরই মনে হত, ছবিটা শ্মশানঘাটে চাপানো চিতার মতন। সতীদাহের কোনো জমকালো দৃশ্য।

অবনী এ-সময় আবার একটা সিগারেট ধরাল। হয়ত কিছুই নয়, তবু লাইটারের আলো, ঠোঁটের সিগারেট এবং ধোঁয়ার ঘ্রাণ থেকে এই মুহূর্তে নিজের জীবন্ত অস্তিত্বটা পরখ করে নেওয়া হল। চুপচাপ, আস্তে আস্তে সিগারেট খেতে লাগল অবনী। আপাতত তার আর কিছু মনে হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ মানসিক স্থিরতার মধ্যে কাটল। এলোমেলো বিশৃঙ্খল চিন্তা বুদ্বুদের মতন উঠছিল, কিন্তু অবনী তাতে মনোযোগ দিচ্ছিল না। ক্রমশ সিগারেট শেষ হল। সিগারেটটা ফেলে দেবার আগে আর-এক মুখ ধোঁয়া নেবার সময় সহসা সে অনুভব করল, কি যেন এবং কিছু যেন তার মধ্যে থেকে বাইরে আসার জন্যে ছটফট করছে, চাপা এবং অনির্দিষ্ট এক ব্যাকুলতা এতক্ষণে তীব্র হয়ে আসছে। ফলে গলা এবং বুকের কাছে শ্বাস থেমে গিয়ে কেমন কষ্ট হচ্ছে। অবনী সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নিল। তার বুকের পুরোনো ভাঙা হাড়ের জায়গাটা কনকন করে উঠল।

বিছানার ওপর উঠে বসে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে নিবিয়ে ফেলল অবনী। বসে থাকল কয়েক দণ্ড। অন্ধকারে তার মনে হল, খুব কাছাকাছি—প্রায় মুখের সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি এখন তার মনে হল, হাত বাড়ালে সামনের মানুষটিকে সে স্পর্শ করতে পারে। কি কারণে অকস্মাৎ তার বুকে উত্তেজনার তাপ সঞ্চারিত হল, মুহূর্তের জন্যে ভীত এবং সঙ্গে সঙ্গে আবেগবশে অস্থির হয়ে ওঠায় হৃৎপিণ্ড দ্রুত হয়ে উঠল। সেই অন্ধকারে অবনী হেমন্তীর উপস্থিতি অনুভব করল।

অবনীর কেমন সন্দেহ হল। সন্দেহ হল, সে হেমন্তীর স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল। সুরেশ্বরের সেই অদ্ভুত উড়ন্ত অবস্থাটি দেখার পর, হয় সেই বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে, অথবা আলাদা ভাবে হেমন্তীকে দেখেছিল। যেমন করে চোখ বন্ধ করে ভুরুতে আঙুল রেখে অবনী কোনো প্রয়োজনীয় চিন্তা করে সেইভাবে চোখ বুজে হাতের আঙুলে ভুরু টিপে সে স্বপ্নের দৃশ্যটি মনে করবার চেষ্টা করল।

আশ্চর্য, কিছুই মনে আসছে না। কিছুই নয়। যেন অবনী অন্ধ, অন্ধতাহেতু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

অবনী এতক্ষণে তার ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার কারণটা যেন ধরতে পারল। এ-রকম হয়, চোখের সামনে অনেক জিনিসের মধ্যে ছিল বলে বোঝা যায় নি যে কিছু হারিয়ে গেছে; হঠাৎ চোখে পড়ল, বা খেয়াল হল, ওটা হারিয়ে গেছে। হেমন্তীকে অবনী স্বপ্নে দেখেছিল কি না অথবা স্বপ্নে হেমন্তী তাকে ডেকেছিল কি না—অবনী মনে করতে পারল না; কিন্তু নিঃসন্দেহে অনুভব করল তার সমস্ত অস্থিরতার মধ্যে হেমন্তী রয়েছে। এই যে ঘুম ভেঙে গেছে, এই যে সে এক টুকরো স্বপ্নে সুরেশ্বরকে গা-হাত-পা এলিয়ে বাতাসে ভাসতে দেখেছে, ললিতার কথা এবং তার বুকের ভাঙা হাড়ের বেদনার কথাও তার মনে আসছে—এ-সবই হেমন্তীর জন্যে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার নানারকম অদ্ভুত চিন্তা, এক একবার এক এক রকম মনে হওয়া, ঘুম না আসা, অস্থিরতা বোধ—সমস্ত কিছুর পিছনেই হেমন্তী।

হারানো জিনিসটা খুঁজে পেলে যে-রকম

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যায়, অবনী অনেকটা সেই রকম নিশ্বাস ফেলল স্বস্তির। তার উত্তেজনা, অস্থিরতা কমে এল। প্রায় শান্ত স্থির হয়ে বসে থাকল কিছু সময়।

বসে থাকতে থাকতে অবনী মনে মনে হৈমন্তীকে সামনে বসিয়ে রেখে একটা কাল্পনিক কথোপকথন তৈরী করছিল :

'আপনি তাহলে ফিরে যাবেন?' অবনী বলছিল।

'যাব।'

'সুরেশ্বর বোধ হয় খুব আশা ভরসা করে এনেছিল।'

'অন্য কাউকে আনবে।'

'ডাক্তার......'

'হ্যাঁ......'

'আপনাকে ঠিক সেভাবে বোধ হয় সুরেশ্বর আনে নি।'

'কি জানি। নিজের স্বার্থে এনেছিল।'

'আমার প্রথম প্রথম নানারকম কৌতূহল ছিল; পরে দেখলাম—আপনি ওকে ভাল বেসেই এসেছিলেন।...আপনাদের অনেক দিনের পরিচয়...'

'অনেক দিনের!'

'ভালবাসা?'

হৈমন্তী জবাব দিল না।

অবনী বোধ হয় বুঝতে পারল। বলল, 'সুরেশ্বরকে আমি আকাশে উড়তে দেখলাম। স্বপ্নে। আপনি সার্কাসে ট্রাপিজ খেলা দেখেছেন? ট্রাপিজ খেলোয়াড়রা যেভাবে হাত তুলে পা সোজা করে ঝাঁপ দেয়, অনেকটা সেইরকম ভঙ্গিতে সুরেশ-মহারাজ আকাশ দিয়ে উড়ছে।......বেশ মজার স্বপ্ন।'

হৈমন্তী জবাব দিল না; কিন্তু মনে হল সে বর্ণনাটা উপভোগ করল।

অবনী হাসল; হাসতে হাসতে হঠাৎ সে কেমন আক্রোশ অনুভব করল সুরেশ্বরের ওপর। বলল, 'একটা উড়ন্ত মানুষকে ধরবার জন্যে ছোটাছুটি করাটা ছেলেমানুষী, নিছক খেলা।...আমার ধারণা, এ-রকম খেলা কোনো কাজের নয়।'

'আমি আর খেলছি না।'

'ফিরে যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ—।'

অবনী একটু ভাবল। 'আর থাকতে পারেন না?'

'না; কি হবে থেকে!

'সুরেশ্বরের অন্ধ আশ্রমে থাকার কথা বলছি না।...অন্য কোথাও।'

হৈমন্তী চোখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। তার দুই চোখ বড় হল, টলটল করে উঠল, ঘনান্ধকার চোখের মধ্যে অতি দূরে বিজলী ঝলকের মতন চোখের তারায় চকিতের জন্যে আলো ফুটল।

অবনী বলল, 'আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

'জানি', হৈমন্তী অস্ফুটস্বরে জবাব দিল।

অবনী চঞ্চল হল, অস্থিরতা বোধ করল। 'তা হলে যাবেন না।'

হৈমন্তী যেন ভাবল সামান্য, কি যেন বলল, এত ধীরে এবং জড়ানো গলায় যে অবনী শুনতে পেল না। তার মনে হল, হৈমন্তী বলল : আপনার কি মনে হয়, আমি থাকতে পারি?

অবনী সংগে সংগে মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ—পারেন; কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না, কি যেন বাধা এল, কথাটা জিবের ওপর থেমে থাকল।

হৈমন্তী তার দিকে অপলকে চেয়ে আছে। অবনী বিব্রত বোধ করছিল। যে-বাধা তার মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে আছে সেই বাধা সরাবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল : যেন ঝটকা মেরে এই কুৎসিত হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল। পারল না। না পেরে অসম্ভব ক্রোধে এবং ঘৃণায় ললিতা ও কুমকুমের দিকে তাকাল। ওরা দুজন যেন কখন নিঃশব্দে, অবনীর অজ্ঞাতে কাছে এসে গেছে।

অবনী চুপ; হৈমন্তী অপেক্ষা করছে। এতটা বিলম্ব যেন তার প্রত্যাশিত নয়।

আমি জোচ্চোর, প্রবঞ্চক বা শঠ হতে পারি না, অবনী অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল, ঠকানো মুশকিল। শেষ পর্যন্ত অবনী বলল, 'আমার স্ত্রী ছিল, মেয়ে আছে। স্ত্রীর সংগে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ডিভোর্স চেয়ে নেব।'

'মেয়ে!'

'কুমকুম।...কুমকুমকে...' অবনী ব্যাকুল চোখে হৈমন্তীর দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, কুমকুম বাচ্চা, একেবারে বাচ্চা, সে কলকাতায় তার মার কাছে আছে, অযত্নে, নানা অভাব-অসুবিধের মধ্যে, তার মা তাকে নষ্ট করে ফেলছে, কুমকুম দেখতে বড় সুন্দর : ছিপছিপে, ফরসা, তার গলার স্বর খুব মিষ্টি; কাছে রাখলে, যত্ন করলে, ভাল শিক্ষা দিলে...। পাগলের মতন এবং ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে অবনী এইসব ভাবতে ভাবতে বা বলার জন্যে ব্যাকুল হয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু বলতে পারল না।

হৈমন্তী বলল, 'মেয়েকে আপনি ছাড়তে পারেন না।'

অবনীর কেমন অদ্ভুত এক দুঃখ হল। যাকে সে ধরে রাখে নি, তাকে ছাড়ার কথা ওঠে না। তবু, মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা অনারকম। অস্বীকার কি? অবনীর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

হৈমন্তী বলল, 'আপনি বলছিলেন, আপনার মধ্যে কিছু নেই, শুকিয়ে গেছে—পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে...'

'তাই মনে হত।'

'এখনও মনে হয়?' হৈমন্তী যেন স্নিগ্ধ সুন্দর করে হেসে বলল।

অবনী চুপ করে থাকল। মুখ নীচু করে কিছু ভাবছিল। তারপর যখন চোখ তুলল—হৈমন্তীকে আর দেখতে পেল না।

শূন্য দৃষ্টিতে অবনী কিছু সময় বসে থাকল। কল্পনায় হৈমন্তী এসেছিল। চলে গেছে। অথচ অবনীর মনে হচ্ছিল, এই আসা-যাওয়ার মধ্যে হৈমন্তী হঠাৎ যেন তার বুকের পুরোনো বেদনার জায়গায় পরম সহানুভূতিতে হাত বুলিয়ে গেছে।

কুয়ার মধ্যে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখার মতন অবনী তার হৃদয়কে দেখার চেষ্টা করছিল। একসময় তার মনে হয়েছিল প্রখর তাপে, অসহ দাহে যেমন করে কুয়ার জল শুকিয়ে যায় এবং অভ্যন্তরে, গভীরে জলস্তরও শুকিয়ে আসে—সেই রকম তার সমস্ত হৃদয় আর্দ্রতাহীন ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোনো রকম আর্দ্রতা ছিল না। অথচ এখন মনে হচ্ছে, কেমন করে যেন তার

শুধু ক্লান্ত হয়েছে কিন্তু আর্দ্রতা সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত এই আর্দ্রতার সম্ভাবনা কিছু ছিল, অবনী খেয়াল করে নি। সম্ভবত এখন সেই আর্দ্রতা জলবিন্দুর মতন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ক্রমে ক্রমে কিছুটা সঞ্চিত হয়েছে। হয়ত তার পক্ষে এখন এই সজীবতা অনুভব করা সম্ভব হচ্ছে।

কোনো আশ্চর্য সান্ত্বনার মতন, সুখের মতন অবনী প্রসন্ন বোধ করছিল।

দরজা খুলে বাইরে এল অবনী। সবেমাত্র বুঝি প্রত্যূষ হয়েছে। চারদিকে কুয়াশা, কুয়াশা এবং হিমের স্তরে স্তরে ভোরের সাদাটে আলো জমছে, কনকন করছে ঠাণ্ডা, এখনও বড় বেশি কিছু চোখে পড়ছে না, কুয়াশা এবং অস্পষ্টতায় ঢেকে আছে।

শীতে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে অবনী কয়েক পা এগিয়ে গগনদের ঘরের দিকে এল। দরজা জানলা বন্ধ। গগনরা এখনও ঘুমোচ্ছে। অবশ্য ঘণ্টাখানেক সময় আছে। তারপর ফিরতে হবে। রোদ ওঠার সময় সময় অবনী বেরোতে চায়।

ঘরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় অবনীর চোখে পড়ল দরজার তলা দিয়ে আলো আসছে। গগনরা কি উঠে পড়েছে? নাকি আলো জেলে রেখেই শুয়েছিল? বা এমনও হতে পারে এই মুহূর্তে কেউ জেগে উঠেছে। অবনী অপেক্ষা করল। চারপাশ এত হিম হয়ে আছে যে অবনী কেঁপে উঠল আবার। গগনদের ঘরের বাতি নিবছে না। তবে কি ওরা জেগে উঠেছে? কে জানে, হয়ত এভাবে নতুন জায়গায় ওদের ঘুম হয় নি, গগনের বা হৈমন্তীর।

ঘরের মধ্যে থেকে কোনো সাড়া শব্দ আসছিল না। অবনীর মনে হল না, দুজনেই জেগে আছে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অবনী, ইতস্তত করে আঙুলের টোকা দিল দরজায়। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শীতের দাপটে আঙুল এত ঠাণ্ডা হয়ে ছিল যে, জোরে টোকা দেওয়া যাচ্ছিল না। এবার অবনী মুঠো করে দরজায় শব্দ করল।

"কে?" ভেতর থেকে হৈমন্তীর গলা শোনা গেল।

"আমি।"

হৈমন্তী দরজার ছিটকিনি নামাল, শব্দ পেল অবনী।

দরজা খুলে দিল হৈমন্তী। গরম চাদরে তার মাথা গলা বুক জড়ানো।

"বাতি জ্বলছে দেখে ডাকলাম", অবনী বলল, "সকাল হয়ে গেছে।" বলে হৈমন্তীর ভোরবেলার বাসি মুখের দিকে তাকাল। সকালের এই মুখে রাত্রের, বালিশের, চুলের, ঘুমের, হয়ত বা জাগরণের কেমন এক অদ্ভুত স্বাদ মাখানো আছে।

"হ্যাঁ, আমি জেগে ছিলাম। ঘড়ি দেখেছি।"

"ঘুমোন নি? ঘুম হয় নি?" অবনী বলল। বলার সময় নজরে পড়ল তার কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

"ওই এক রকম।...খুব ঠাণ্ডা, ভেতরে আসুন।"

চৌকাঠের কাছ থেকে অবনী ভেতরে পা দিল। "গগনবাবু খুব ঘুমোচ্ছেন।... আপনার কি নতুন জায়গায় ঘুম হয় না?"

"খানিকটা। অস্বস্তি হচ্ছিল। ঠাণ্ডাও খুব।"

"সারা রাত জেগে—?"

"না, মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছি।"

"তবে তো কষ্টই হল।"

"না, কষ্ট কিসের?"

"আমারও ভাল ঘুম হয় নি; অনেকক্ষণ থেকে জেগে আছি।" অবনী হৈমন্তীর চোখের দিকে তাকাল। মনে হল যেন সে বোঝবার চেষ্টা করছে হৈমন্তীর ভাল ঘুম না হবার বা জেগে থাকার অন্য কোনো কারণ আছে কিনা।

বিছানার খানিকটা পরিষ্কার করে হৈমন্তী যেন বসবার মতন ব্যবস্থা করল। বলল, "আমরা কখন বেরুবো?"

"ছটা সাড়ে ছটার মধ্যে।"

হৈমন্তী হাতে ঘড়ি পরে নিয়েছিল, সময় দেখল। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

চুপচাপ। গগন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শব্দ করল।

"বাইরে এখন খুব ঠাণ্ডা, না হয় এখানের সকালটা দেখতাম—" হৈমন্তী বলল; "বসবেন না?"

"এখন বসে আর লাভ নেই, যাবার আয়োজন করতে হবে।"

"বিজলীবাবু উঠেছেন?"

"না।...ও'কে ওঠাতে সময় লাগবে বোধ হয়—" অবনী হাসল।

হৈমন্তীও হাসল। "গগনও ভীষণ কুঁড়ে, শীতকালে ওকে বিছানা থেকে ওঠানো যায় না।"

অবনী ফাঁকা চেয়ার এবং হৈমন্তীর বিছানার দিকে তাকাল। তারা দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, বাইরে সকাল হচ্ছে বোঝা যায় না, এখানে রাত্রের মতন সব। অবনী বলল, "কাল একটা মজার স্বপ্ন দেখলাম", বলে হাসল, "সুরেশ্বরবাবু..."

কথাটা শোনার আগেই হৈমন্তী বাধা দিয়ে বলল, "আপনার গলার কাছে ওটা কি হয়েছে?"

গলার কাছে হাত দিল অবনী।

"ওখানে নয়, আরও ওপাশে ঘাড়ের দিকে।"

"কি জানি!......" অবনী অন্য জায়গায় হাত রাখল।

হৈমন্তী সামনে এগিয়ে ঝুঁকে বলল, "আলোর দিকে ফিরুন।"

অবনী আলোর দিকে মুখ করল।

হৈমন্তী দেখল, তারপর আস্তে করে আঙুল তুলে দাগের পাশে গলার চামড়ার কাছে রাখল। অবনী ঠাণ্ডা অথচ কোমল আঙুল তুলে ঘাড়ের পাশে গলার চামড়ায়

"কিছু কামড়েছে?"

"মনে করতে পারছি না।"

"ব্যথা আছে?"

অবনী আঙুল তুলে ব্যথা অনুভব করতে গেল, হৈমন্তীর আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে আঙুলটা থামল। "না; তবে জ্বালা করে উঠল যেন।"

হৈমন্তী হাত নামাল। দু পলক তাকিয়ে তাকিয়ে অবনীর চোখ মুখ দেখল। "কিছু না হয়ত।"

"পোকাটোকা কামড়াতে পারে..."

"বোধ হয়। ...লালচে দেখাচ্ছে। আমার কাছে ক্রীম আছে, লাগিয়ে নেবেন একটু।"

অবনী হাসল। "নেব।"

হৈমন্তী সামনে থেকে সরে গিয়ে দরজার দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর বলল, "বেশ ফরসা হয়ে গেছে।"

অবনী ঘুরে দাঁড়াল। বাইরের ফরসা দরজার চৌকাট পর্যন্ত এসে গেছে।

গুরুডিয়ায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে নটা বাজল। ল্যাটঠার মোড়ে এসে গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার সময় অবনী জিজ্ঞেস করেছিল, কটা বাজল?

ঘড়ি দেখে সময় বললেন বিজলীবাবু, নটা পনেরো।

অফুরন্ত পৌষের রোদ, শিশির-শুকোনো মেঠো গন্ধ, শাল আর পলাশের চারা ঝাপটানো উত্তরের বাতাস, কয়েক মুঠো ফড়িং যেন সারাটা পথ পাশে পাশে ছুটে এল। দু হাত বিস্তার করে সেই মাঠ, ঘাট, শিশিরের সজীবতা নিয়ে গাড়িটা অন্ধ আশ্রমের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

বিজলীবাবু নামলেন, অবনী নেমে দাঁড়াল। গগনও নেমেছে।

নামতে নামতে হৈমন্তীর চোখে পড়ল সামান্য দূরে একটা খোলা গরুর গাড়ি ঘিরে

ভিড়ের মতন হয়েছে। বিজলীবাবু, অবনী সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ওদের গাড়ির ভেতর থেকে তাদের হোল্ডঅল আর স্যুটকেশ বের করে নিচ্ছিল।

গাড়ির শব্দে ভিড়ের অনেকেই এদিকে তাকাল। মালিনীকেও দেখা গেল। মালিনী হৈমন্তীকে দেখতে পেয়ে দ্রুত পায়ে আসছিল।

কাছে এসে মালিনী রুদ্ধশ্বাসে বলল, "মনোহর ছুটি নিয়ে মেলায় গিয়েছিল না হেমদি, পরশু ফেরার কথা, ফেরে নি। কালও নয়। আজ এতক্ষণে ওকে কারা নিয়ে এসেছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। গা নাকি আগুনের মতন গরম।"

"কি হয়েছে?"

"জানি না। ওরা বলাবলি করছে, এই রোগে মেলায় খুব লোক মরছে, এখানে সব জায়গায়..." মালিনী বিহ্বল, ভীত, বিচলিত, "দাদা একটা ঘর খালি করাতে গেছে, ওকে রাখার জন্যে।"

হৈমন্তী অবনীর দিকে তাকাল। অবনী এবং বিজলীবাবু চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। অবনী বলল "সেই এপিডেমিক না কি?"

(ক্রমশ)

পারিবারিক জীবন ও পরিবর্তনশীল দুনিয়া

[UFO বা পরিবার কল্যাণকামী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Union of Family Organisations এবার নূতন দিল্লিতে ১১ই থেকে ১৭ই তাঁদের সপ্তদশতম অধিবেশন সমাপ্ত করলেন। ভারতের তরফ থেকে সহযোগী ছিলেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, অ্যাসোসিয়েশন ফর মরাল অ্যান্ড সোস্যাল হাইজিন ইন ইণ্ডিয়া এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সেস। কনফারেন্স উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং মন্ত্রী ডঃ সুশীলা নায়ার। ভারত সরকারের সঙ্গে কনফারেন্সের সাক্ষাৎ যোগ না থাকলেও সরকারী পরিবার পরিকল্পনা পক্ষে (৫ই ডিসেম্বর থেকে ১১শে ডিসেম্বর) অনুষ্ঠানটি হওয়াতে কনফারেন্সের বিশেষ গুরুত্ব হয়। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির পত্তন ১৯৪৫ সালে প্যারিসে হয়েছিল। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুইজারল্যান্ডবাসী এক শিশু অপরাধবিচারক Veillard। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারিবারিক জীবনে বহু বিপর্যয় ঘটে ও পাশ্চাত্য সমাজ পারিবারিক সুখ ও আত্মীয়তা বন্ধন সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশ্ব সমাজ, আন্তর্জাতিক মঙ্গল, জাতীয়তাবোধ সবই যে পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একথা চিন্তাশীলজন আবার নূতন করে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। যত পরিকল্পনা, যা কিছু অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়ন সবেরই শেষ লক্ষ্য সুখী পরিবার। বিজ্ঞাপনের ও প্রচারের চটকে পারিবারিক সুখ বলতে গেলেই পরিবার পরিকল্পনার কথা মনে আসে। পরিবার পরিকল্পনা পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধির মস্ত বড় অঙ্গ, বিশেষ ভারতবর্ষের মত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কঠোর সংগ্রামরত দেশে। কিন্তু পরিবারের সামগ্রিক সুখ বলতে আরও অনেক কিছু বোঝায়। সেই সামগ্রিক সুখের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করা এই সংস্থার উদ্দেশ্য। দেশে দেশে পরিবার পরিকল্পনা থেকে নিয়ে যতরকম পরিবার কল্যাণ প্রতিষ্ঠান আছে তারা এর সভ্য হতে পারেন। সরকার সভ্য হতে পারে। ভারত সরকার এখনও সভ্য নন। প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট তাই ঠাট্টা করে বললেন, "এবার ওঁদের সভ্য হতে অনুরোধ করবো বলেই এশিয়ার প্রথম নূতন দিল্লিতে অধিবেশন হলো।" প্রেসিডেন্ট গিবুর্জ ফরাসী।

পরিবার বা ফ্যামিলি বলতে সব দেশে যা সব সময় একই গোষ্ঠী বোঝায় তা নয়। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও ছেলে বড় হলে তার পত্নী পুত্রকন্যা নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি একক গঠন করবে আমরা আজও সে আদর্শে পুরোপুরি সায় দিতে পারছি কই? সমাজের একটা অংশ পাশ্চাত্য প্রথা মেনে নিয়ে তাদের সামাজিক আচরণ অনুকরণ করা সত্ত্বেও দেশের বেশীর ভাগ পরিবারই বৃদ্ধ পিতামাতা এমনকি খুড়ো জ্যাঠাকেও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আপন জ্ঞান করেন। কাজেই পরিবারের সুস্থ জীবনযাত্রা সব দেশে একই ছাঁচে ফেলা যায় না। পরিস্থিতি ও পরিবেশ হিসাব করে পারিবারিক কল্যাণ কি তার বিচার করা দরকার। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দ্রুতগতি ও আমূল পরিবর্তন না হলেও আমাদেরও পরিস্থিতি ও পরিবেশ, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা সবের এতই অবস্থান্তর ঘটেছে যে, তার সঙ্গে পরিবারকেও কিছুটা মানিয়ে নিতে হবে। ভাল মন্দের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন পরিবর্তন ও তার সঙ্গে মানিয়ে চলা। বিবাহ বিচ্ছেদ কি হিন্দু সমাজের এক বিরাট পরিবর্তন নয়? ছেলে মেয়ে সমান শিক্ষালাভ করবে, মেয়েরা স্বাধীন উপার্জনের ভরসায় স্বাবলম্বী হবে কবে কে ভেবেছিল? নিরাপদ আশ্রয়ের নিভৃতবাস দূরে রেখে জীবনযাত্রার দুর্গম পথে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে এসে তারা যদি স্ববশ, স্বচ্ছন্দগতি দাবি করে সামাজিক পরিবর্তনে, সে অধিকার তাদের মঞ্জুর করতে হবে। এই রকম নানা দাবি মানবার ভূমিকায় আজকের পিতা মাতার আরও একটি নূতন দায়িত্ব এসেছে। আধুনিকতার বন্যায় ভেসে যাওয়ার বিপর্যয় থেকে আগামী দিনের মানুষকে গৃহের বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন করা। পরিবারের অংশ হিসাবে তার শিক্ষাকে সার্থক করা, সুন্দর করা।

মার্কিন দেশের বিরাট সংস্থা National Council of Family Relations। তার প্রতিনিধি ইভলিন ডুভল এই কনফারেন্সের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যুব সমাজের যা কিছু অনিয়ন্ত্রিত, বিশৃঙ্খল যথেচ্ছাচারিতা তার মূলে পারিবারিক প্রভাবের অভাব। আমাদের দেশেও কি কতকটা তাই? তথাকথিত প্রগতির তাৎপর্য কি অবশেষে পারিবারিক জীবনের বন্ধন বা প্রভাবের শৈথিল্যে পরিণত হয়েছে? শ্রীমতী ডুভল আরও বলেন, পারিবারিক জীবনের যে রেখাপাত অল্প বয়স্ক শিশু ও কিশোরের মনে হয় তা কখনও মুছে যায় না। মানসিক অনুভূতির এই বিচিত্র প্রভাব উত্তরকালে তাদের জীবনের ধারা সূচিত করে। অথচ মার্কিন দেশ কেন, আমাদের চিরকালের গৃহগতপ্রাণ

অ্যাসোসিয়েশন অব মরাল অ্যান্ড সোস্যাল হাইজিন-এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মহিন্দর কউর (মহারানী পাতিয়ালা), শ্রীমতী গান্ধী, ডাঃ সুশীলা নায়ার ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী আভাবাই ওয়াডিয়া

*IUFO*র প্রেসিডেন্ট গির্বুজ ভাষণ দিচ্ছেন

জীবনধারাও কি এই বিরাট দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন? ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাওয়া পারিবারিক জীবন যে কি অসহায় শৈশবের কারণ হতে পারে, ক'জন পিতামাতা তা চিন্তা করেন। সরকারীভাবে আদালতের আদেশমানা বিচ্ছেদই যে ভাঙ্গা তাও নয়। অশান্তি উত্তেজনার টান-পড়া অবস্থা কোনটাই শিশু বা কিশোরের পারিবারিক দায়িত্ব গঠনের উপযোগী আবহাওয়া নয়।

সভায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বহুভাবে আলোচিত হয়। নরনারীর সম্পর্ক ও শিশুর জন্ম সম্বন্ধে শিক্ষা। আমরাও এ বিষয় দু-একবার আলোচনা করেছি। যৌবনারম্ভে নানা সমস্যা কিশোর কিশোরীকে চঞ্চল করে তোলে। সে সমস্যা অহেতুক সঙ্কোচে ঘিরে তাকে বিব্রত বা বিপথগামী না করা উচিত। রজোদর্শনারম্ভে মেয়েরা অনেক সময় বিশেষ বিচলিত হয়ে যায়। বোম্বাইস্থ ফ্যামিলি প্ল্যানিং ট্রেনিং ও রিসার্চ সেনটারে ১৯৫৮ সালে একটি ব্যাপক নিরীক্ষণে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ। অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকায় যে মানসিক অশান্তি, চাঞ্চল্য ইত্যাদি মাত্র হয় তা নয়। মানসিক অসুস্থতার দরুন শারীরিক নানা কষ্ট, যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। দেখা গেছে সম্যক শিক্ষা ও জ্ঞানে এ ধরনের অসুবিধা অনেকাংশে দূর হয়। এই নিরীক্ষণে ধরা পড়ে যে বেশীর ভাগ মেয়ে মাসিক ঋতুর কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ২৭৬টি প্রথম রজোদর্শনোত্তর অবস্থায় মেয়েদের প্রশ্ন করা হয়। ১৫৪টি মেয়ে আগে কিছুই জানতো না। ১২২জন কিছু সামান্য যা জানতো তার অনেকটাই নানাভাবে সংগ্রহ করা টুকরো টুকরো কথা, কিছু ঠিক কিছু বা ঠিক নয়। অজ্ঞতায় যেমন আশঙ্কা ভ্রান্ত ধারণার আশঙ্কা আরও বেশী। নানা উদ্ভট চিন্তা, মানসিক বিকার নানা ভ্রান্ত ধারণায় সৃষ্ট হয়।

অ্যাসোসিয়েশন অব মরাল অ্যান্ড সোস্যাল হাইজিন-এর অন্ধ্রপ্রদেশ শাখার প্রতিনিধি ডাঃ উষা আনন্দ আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সেটি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সদ্ভাব বা সুখী বিবাহিত জীবন। ডাঃ আনন্দ মনোবিজ্ঞানের ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ। দিল্লি ও হায়দ্রাবাদ দুটি শহর এলাকায় জটিল পারিবারিক সমস্যার পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে প্রধানত দুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রথমত আমাদের দেশে পারিবারিক সমস্যা সমাধানকল্পে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের একান্তই অভাব। কোথাও কখনও যদি বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়াও যায় অস্বাভাবিক সঙ্কোচ সম্যক-সমাধানের অন্তরায় হয়। পরামর্শদান কালে ডাঃ আনন্দ লক্ষ করেছেন যে পরামর্শ বা সাহায্য নিতে যেন নিতান্ত সঙ্কোচ ও ভয়ের সঙ্গে মক্কেল আসে। তারা অনবরত তাদের সমস্যা গোপন রাখতে বলে। সমস্যা গোপন রাখার অনুরোধ রক্ষা করা চিকিৎসকের কর্তব্য কিন্তু পারিবারিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মক্কেলের সমস্যা খোলাখুলি না হলে সমাধান সফল হয় না, কারণ অপর পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না হলে সমস্যা থেকেই যায়। মানসিক বিকারে যেমন চিকিৎসা প্রয়োজন, পারিবারিক সংঘর্ষেও পরামর্শে কাজ হতে পারে। তবে পরামর্শ বিশেষজ্ঞের হওয়া দরকার।

প্রশ্ন উঠতে পারে পরামর্শ না নিয়ে কি সংসারগুলি সুখের ছিল না? আবার সেই একই উত্তর। পরিবর্তনশীল সমাজেই আবার নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। চিরাচরিত আয়োজন তখন আর যথেষ্ট মনে হয় না। পারিবারিক জীবনে আমাদের দেশে যে সব পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি একটি কারণ। আর একটি কারণ ঐতিহ্যে, প্রথায় যা কিছু আমরা মেনে এসেছি অভাবিতভাবে সেই মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। শিশুর প্রথম মানসিক বিকাশে যে একান্ত নির্ভরতা যৌথ পরিবারে সহজ ছিল আজকের পারিবারিক পরিস্থিতিতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। পাঁচজনের সংসারে ভাই বোন, ঠাকুমা, পিসিমার উপস্থিতি কখনও শিশুকে অসহায়ভাবে একলা হতে দেয়নি আর এখন পিতা-মাতার সাহচর্য সে অল্পই পায় ও যা পরিবর্তে পায় তা পারিবারিক স্নেহের ঠাসবুনুনির বদলে পয়সা দিয়ে কেনা দাসী বা গৃহভৃত্যের অবহেলার তত্ত্বাবধান। কখনও বা নানা কুশিক্ষা ও কুসঙ্গী তাদের শৈশবকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যৌবনে বিবাহ সমস্যারও পরিবর্তন এসেছে। ক্রমশঃ অভিভাবকের দায়িত্বে বিবাহ কমে আসছে ও পাত্রপাত্রী স্বয়ং নির্বাচনের ভার নিচ্ছেন। উপার্জনের সন্ধানে মা ও বাবা দুজনেরই বাইরে যাওয়া আরও একটি বড় পরিবর্তন। পিতা-মাতাকে আদর্শ মনে করা কমে এসেছে। ক্রমশ অভিভাবকের দায়িত্বে পিতামাতাও সেকালের মত শাসন করতে দ্বিধা করেন।

এইসব পরিবর্তনের প্রভাবে যে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার। দরিদ্র দেশে বিশেষজ্ঞের সাহায্য সহজপ্রাপ্য ও অনায়াসসাধ্য হতে হলে আর পাঁচটা আয়োজনের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে হবে। আলাদা ব্যবসায় হিসাবে প্রচলিত হলে সেও ধনীর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হবে। এমনিতেই পারিবারিক সমস্যার হিসাব আমরা সযত্নে গোপন রাখতে চাই। সেটাই ভারতীয় সমাজের রীতি। রীতির মূলে আঘাত দিলে কাজ সহজ হবে না। সেজন্যই আর পাঁচটা ব্যবস্থায় মিশিয়ে দিতে পারলে সুস্থ সবল স্বাবলীল পারিবারিক জীবন সর্বসাধারণের হতে পারে।

শ্রীমতী

গান্ধীজীর দূত

"গান্ধীজীর দূত" প্রবন্ধটির এক জায়গায় দেখলুম, "মৌলানা আজাদ তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী, তাঁর মতো মানুষও যে গান্ধীজীর কাছে এতটা অসত্যাচরণ করতে পারেন, ইতিপূর্বে এইটে আবিষ্কার করে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন, এবং তারই ফলে তিনি তখন এক আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন।" (৪৫৮ পৃষ্ঠা)

"অসত্যাচরণ" বলতে লেখক কী বোঝেন তার জন্যে ২৪৮ পৃষ্ঠায় ফিরে যেতে হয়। "মৌলানা সাহেবকে গান্ধীজী সরাসরি প্রশ্ন করলেন, যে-সব আলোচনা চলছে সে-বিষয়ে তিনি ভাইসরয়কে কোনও চিঠি লিখেছেন কিনা। উত্তরে মৌলানা বললেন, না, তিনি লেখেন নি। মৌলানা সাহেব জানতেন না যে, চিঠি লেখার কথা যখন তিনি অস্বীকার করেন, তখন তাঁর মাত্র কয়েক গজ দূরে গান্ধীজীর সামনে ডেসকের উপরে তাঁর সেই মূল চিঠিখানি রাখা ছিল।"

কিন্তু সুধীরবাবুর তো জানা ছিল যে মূল চিঠিখানি আদপেই ভাইসরয়কে লেখা নয়। আরো আগে ২৪৫ পৃষ্ঠায় সুধীরবাবুই তো লিখেছেন যে, "সহকর্মীদের কিছু না-জানিয়ে মৌলানা আজাদই ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছে সেই চিঠি লিখেছিলেন।" তা হলে দেখছি গান্ধীজীর প্রশ্নটাই ভ্রমাত্মক ছিল। তিনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন, "ক্যাবিনেট মিশনকে কোনও চিঠি লিখেছেন কিনা" তার উত্তরে মৌলানা অবশ্য বলতেন, "হাঁ।"

মৌলানা আজাদের চিঠির তারিখ বা গান্ধীজীর জিজ্ঞাসার তারিখ সুধীরবাবু দেন নি। মৌলানা তখন কংগ্রেস সভাপতি। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে কথাবার্তা ও চিঠি-পত্র তাঁর কর্তব্যের সামিল। তাঁদের সঙ্গে ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলোচনার পর তিনি ১৫ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখে যে ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন তা আমাদের কারো কারো মনে আছে। লেনার্ড মজলে "ব্রিটিশ রাজের শেষ দিনগুলি" নামে ইংরেজীতে যে বই লিখেছেন তাতে মৌলানা সাহেবের সেই বিবৃতি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গোপন করবার মতো কিছুই তাঁর ছিল না। কংগ্রেসকে দিয়ে তিনি তাঁর ফরমুলা মানিয়ে নিয়েছিলেন। সে ফরমুলার সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন আরো একটি জিনিস যোগ করে দেন। এ, বি ও সি গ্রুপ। সেটার জন্যে তিনি দায়ী নন। "পাকিস্তানের বীজ" যদি থেকে থাকে তবে সে বীজ বুনেছিলেন ক্যাবিনেট মিশন। আসলে মৌলানার সমাধান মহাত্মার নিজস্ব সমাধানের থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। উভয়েই চেয়েছিলেন শক্তিশালী প্রদেশ, সীমাবদ্ধ কেন্দ্র। পটেল, নেহরু, জিন্না কেউ সেটা চান নি। ইতি। বিনীত

অন্নদাশঙ্কর রায়

গীতাঞ্জলি বিষয়ে

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়ের চিঠি ('দেশ', ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩) পড়ে মনে হ'ল তিনি আমার গীতাঞ্জলি বিষয়ক প্রবন্ধের দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঠিকমত লক্ষ্য করেন নি, অথবা আমার বক্তব্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। অন্য কোনো কোনো পাঠকেরও অনুরূপ অসুবিধা ঘটে থাকতে পারে আশংকা ক'রে আমার বিতর্কিত কথাগুলি আরো একটু পরিষ্কারভাবে বলবার চেষ্টা করছি।

নাট্যবর্ণিত পাত্র-পাত্রীর ভাববৈচিত্র্যের সুপরিকল্পিত বিন্যাসে সমগ্র নাটকটি রচিত হয়। এই ভাবগুলি নাট্যকারের লেখনীতে যে-রূপান্তর গ্রহণ করে তাকেই সাধারণত রস বলা হয়ে থাকে। কিন্তু নাট্যকারের স্বকীয় একটি মূলভাবও সমগ্র নাটকের অখণ্ড শিল্পসত্তার মাধ্যমে রসরূপেই অভিব্যক্ত হয়। এই রসকে নাটকের মূলরস বলা যায়; প্রতিতুলনায় পূর্বোক্ত রসগুলি (পাত্রপাত্রীদের ভাবের কাব্যরূপ) নাটকের উপাদান রস। মূলরস ও উপাদানরস ভিন্ন জাতীয়, তাদের আস্বাদনও মনের ভিন্ন স্তরে হয়। যদি খবরের কাগজে পড়ি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহবশতঃ তাকে খুন ক'রে বসল, তবে স্বামীর ঈর্ষা ও ক্রোধের ভাব আমরা অনুমানে জানি কিন্তু অনুভবে পাই না। শেকস্‌পীয়রের নাটক দেখা বা পড়ার সময়ে ওথেলোর ঈর্ষা ও যন্ত্রণা আমদের শুধু জ্ঞানের নয়, অনুভবের বিষয় হয়ে ওঠে। তবু একটু দূরত্ব থাকে এই রসানুভবে। ওথেলোর অনুভূতিকে তারই অনুভূতিরূপে পাই,

সে অনুভূতি আমার নিজের এমন প্রত্যয় মুহূর্তের জন্যেও জন্মায় না। কিন্তু শেকস্‌পীয়র তাঁর স্বকীয় যে-ট্র্যাজিক উপলব্ধিটি ব্যক্ত করেছেন এই নাটকে, তা আমরা ওথেলোর ঈর্ষা বা ইয়াগোর অসূয়ার মতো কেবল আস্বাদন করি না, সে মূলরস আমাদের মনের গভীরতম স্তরকে কাঁপিয়ে তোলে।

ভাব যখন রসে পরিণত হয় তখন তার একপ্রকার সাধারণীকরণ ও শুদ্ধীকরণ ঘটে বই কি! কাব্যাধারের বাইরে দৈনন্দিন জীবনে অনুরূপ ভাবোদয় হ'লে সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের উপযোগী কিন্তু রসসম্ভোগের প্রতিকূল অন্যান্য ভাব ও বাসনাও জাগে; যথা, ভাবটি সুখকর হ'লে তার বিলুপ্তির আশংকা ও স্থায়িত্বের কামনা, যে-বাহ্য বস্তু বা অবস্থার উপর তা নির্ভরশীল তাকে আয়ত্তগম্য করার অভিলাষ ও অভিসন্ধি, ইত্যাদি। কাব্যজনিত রসোপলব্ধিতে এই বিঘ্নকারী চিত্তবৃত্তিগুলি নিবৃত্ত থাকে, সেই কারণে তাকে বিশুদ্ধ বলা হয়।

কিন্তু জীবনেই হোক আর কাব্যেই হোক ভাব কোনো অবস্থাতেই ভাবমাত্র নয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র ইমোশন্ নয়, তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ ইন্টেলেক্‌শন বা মনন জড়িত থাকে। শিল্পে ভাবের শুদ্ধীকরণ মানে জৈবপ্রবৃত্তি ও কর্মপ্রেরণা থেকে তার মুক্তি, জ্ঞানধর্মিতা থেকে ভাবের বিশ্লেষণ নয়। রসের কথা যখন হচ্ছে তখন রসবাদীদের ভাষাতেই বলা যাক "রসের মধ্যেও একটি জ্ঞানস্বরূপতা বিরাজ করে এবং জ্ঞানস্বরূপতার মধ্যেও রস।" ওথেলোর ঈর্ষা ও ক্রোধের সঙ্গে জড়িত আছে ডেস্‌ডিমোনা তাকে প্রতারণা করেছে, সে ক্যাসিয়োর গুপ্ত প্রণয়িনী, দুষ্টস্বভাবা ইত্যাদি দুরূপনের প্রত্যয়। ওথেলোর অনুভূতিগুলি যখন আমরা নাটকের মাধ্যমে রসরূপে আস্বাদন করি তখন তার সে অনুভূতি-সংলগ্ন সংবাদটিও অবগত হই।

সব রস সম্বন্ধেই এ কথাটা সত্য, কিন্তু নাটকের এবং কাব্যমাত্রের মূলরস সম্বন্ধে বিশেষরূপে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো নাটকের বা কাব্যের মূলরসে অনুভূতি অবশ্যই থাকে, কিন্তু সে অনুভূতি কবির হৃদয়তন্ত্রীতে জগতকে ও মানুষকে তিনি যে-বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন ঐ কাব্যে তারই অনুরণন। আমাদের দেশের রসবাদী আলংকারিকদের মধ্যে অন্ততঃ অভিনবগুপ্তের অন্তিম সিদ্ধান্ত আমার বক্তব্যের অনুকূল : "অভিনব যদিও কাব্যার্থকে রস বলিয়া বলিয়াছেন এবং কাব্যের একান্ত তাৎপর্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্বভুবনের সত্তাকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন"। (সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—'কাব্যবিচার', পৃঃ ১৩৪।)

ওথেলো, ডেসডিমোনা, ইয়াগো প্রভৃতি ও দর্শকের মাঝখানে যে-নান্দনিক দূরত্ব স্বাভাবিক, ওথেলো নাটকের রচয়িতা ও দর্শকের মধ্যে সে-দূরত্ব থাকে না, থাকা সঙ্গতও নয়। শেকস্‌পীয়র যে-মহান দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন মানুষকে এবং জগতকে ঐ নাটকখানিতে, তার সঙ্গে আমরা নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করি। কবির এই দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির আনুপূর্বিক মিল থাকবে এমন কথা অবশ্য আমি বলছি না। কিন্তু আমার মতে সম্যক্ রস গ্রহণের ন্যূনতম শর্ত এই যে কবির সম্পূর্ণ উপলব্ধি—শুধু তার অনুভূতির দিকটা নয়, তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিও—পাঠকের দ্বারা গৃহীত না হোক্ অন্ততঃ তার কাছে গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ঠেকবে। যদি কবির সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিভেদ এতই মৌলিক হয় যে পাঠক কবির দৃষ্টিকে কেবল অগ্রাহ্য নয়, অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, তবে সেক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে হার্দ্য-সংযোগের এমন কোনো প্রণালী খুঁজে পাওয়া যাবে না যার মধ্য দিয়ে রসের ধারা বইতে পারে। তেমন কবির রচনাকে আমরা সাধুবাদ দিতে পারি; অন্তরে স্থান দিতে পারি না।

এলিয়ট যদিও দান্তে প্রসঙ্গে জোর গলায় বলেছিলেন, "কবির মতবিশ্বাসের সঙ্গে পাঠকের মতবিশ্বাস এক না হ'লে রসসম্ভোগের ব্যাঘাত ঘটবে একথা আমি সরাসরি অস্বীকার করি" তবু শেলি ও কীট্‌সের আলোচনায় তাঁকে ভিন্ন সুরে কথা বলতে হয়েছে। তার কারণ শেলির অনেক কবিতাই তাঁর ভালো লাগতো না, এবং আত্মবিশ্লেষণ ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "শেলির মতামত আমি অপছন্দ করি ব'লে তাঁর কাব্যসম্ভোগে বাধা পাই; শেলির কতকগুলি মত আমার এতই বাজে ('puerile') মনে হয় যে, যে-সব কবিতায় ঐ মতের ছায়া পড়েছে তাতে আমি কোনো রসই খুঁজে পাই না"। ফলে তাঁর পূর্বোক্ত সরাসরি অস্বীকৃতিকে একটু সংস্কৃত ক'রে অনেকখানি মোলায়েম ক'রে এলিয়ট শেষ অবধি যে ফরমুলায় পৌঁছলেন তা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত :

"When the doctrine, theory, belief, view of life, presented in a poem is one which the mind of the reader can accept as coherent, mature and founded on the facts of experience, it imposes no obstacle to the reader's enjoyment, whether it be one that he accept or deny, approve or deprecate"। 'when' কথাটার উপর কিন্তু আমি জোর দিতে চাই এবং যে-তিনটি বিশেষণের দ্বারা কাব্যব্যক্ত 'অবিঘ্নকারী' মতবিশ্বাসকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলির উপর। এতগুলি গুণবিশিষ্ট যে-মত তা আমার আপন না হ'লেও, খুব অনাত্মীয় অন্ততঃ অনার্য ঠেকবে না আমার কাছে। আমি তাকে স্বীকার ('accept') না ক'রলেও তিরস্কার ('deprecate') ক'রব কেমন ক'রে? আলোচ্য প্রবন্ধে আমি রসসম্ভোগের সমস্যাটি তুলেছিলাম সেই ক্ষেত্রে যেখানে বিরোধ মৌলিক—এতদূর যে তাকে 'হার্দ্য-বিচ্ছেদ' বলা যেতে পারে; যেখানে কাব্য-বর্ণিত মূলভাব এমন যে "সে জাতীয় কোনো ভাব জাগবার অনুকূল মনই পাঠকের তৈরি নেই"। উদাহরণতঃ, প্রশ্ন তুলতে পারি—গীতাঞ্জলি কাব্যে অভিব্যক্ত ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস এবং শুভ ও সুন্দরের প্রতি নিটোল আস্থা কি ঘোর জড়বাদী, বদ্ধমূল মার্ক্সবাদী, কিম্বা যাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিরেট কদর্যতাকে নিপট সত্য ব'লে জানেন তাঁদের কাছে "coherent, mature and based on the facts of experience" ঠেকবে? না যদি ঠেকে তবে কি এলিয়টের সূত্র-অনুযায়ী তাঁদের কাব্যরসসম্ভোগ বিঘ্নিত হবে? হবে না কি? এই ছিল সমস্যার এক পিঠ। অন্য পিঠ ছিল আমার ব্যক্তিগত সমস্যা। সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত ক'রে বলার প্রয়োজন নেই।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

লাল-এর চিত্র প্রদর্শনী/আর্ট একাডেমী—রমণী চ্যাটার্জি রোড (গড়িয়াহাট মোড়)

তুলি চালনায় মধ্যে যে আশ্চর্য আছে, তেমন ভিজে কাগজের উপর রঙ আরোপে যে মেঘ কাটে—তা দেখা, সেই প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা খুবই একটা কাজ। আমরা জানব, ঐ দুটির অমোঘ প্রকৃতি আছে; সেগুলি নিজেই বাঁচতে চায়, আমরা সকলেই চাই যে তা আর বিবেচনার মধ্যে দিয়ে দেখা দিক।

বহু দিন পূর্বেই চীন ঐ মুখ্য সত্যটি জেনেছে এবং সেই শুদ্ধতা বোধ দিয়ে শিল্প-জগতকে সুখী করেছে। অনেক প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে রূপ দেওয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করে, সেখানে ফ্রেম আর চিত্রগত সত্য এবং নেত্রগোচর বস্তু ও ঐ সকল রীতি মিলে দারুণ একটি মায়িক ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে তা দেখতে পাই।

কিন্তু আমরা কখনও ঐ সকল চীন শিল্পীদের ছবি চোখের দেখাও দেখি না, অথচ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেই পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন, অবনীবাবুর পূর্ববঙ্গ ল্যান্ডস্কেপগুলির কথা বলা যায়। ঐ কাজও আমরা এখন দেখতে পাই না। দেখলে বুঝতাম ঐ সকল প্রকৃতিকে—যা আমরা রঙ তুলি কেনার সংগে সংগেই জানতে পারি—তা তিনি কেমনভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

'লেফে' কথাটাই চীন কাজের একটি অভাবনীয় সূক্ষ্মতা, এই সূক্ষ্মতা বোধ কি চিত্র-চিন্তায় কি কাব্যজগতে অলৌকিক প্রজ্ঞা আলোড়ন এনেছে; এতে করে চিরাচরিত বিতুমেনও পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিহ্ন হল। এমনও যে, নাটকীয় ব্যঞ্জনা অভিব্যক্তিরও কোন কদর রইল না।

(এই সূত্রে, বলা যায়, একদা জোলাকে সেজান তাঁর 'ভোলমের সমস্যার' (ভলিউম) কথা বলেন, তাতে জোলা উত্তর করেন, "তোমার প্রতিভা আছে, তুমি গুণী—তুমি যদি ব্যঞ্জনা অভিব্যক্তি নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে—তোমার ছবির লোকগুলির মুখে কোন ভাব নেই..." এই উপদেশে সেজান উত্তেজিত হয়ে বলেন, "মানে...ভাব...ভাব... আমার পিছনের কথাটাই ধর না...সেটা

'আলেখ্য' শিল্পী : লাল

তোমার কথা মত কোন ভাব প্রকাশ করে...?—জ্যাঁ রেনোয়া—'রেনোয়া মাই ফাদার'—১১২ পৃঃ)

লেফে বা আদল সত্যটি লাল তাঁর অনেক ছবিতে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রৌদ্র ও রঙের খেলা দুই ভালভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বোল্ড একসপ্রেশান ও টু সিস্টারস-এ তুলি চালনা সুচিন্তিত।

অজয় মুখার্জির চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইসটি হাউস

অবয়ব যখনই অজয় মুখার্জির ছবিতে দেখা যায় তখনই আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষ করি একটা নকশার মতন; কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ পর আমরা বুঝি এটা কাঠামো। অবশ্য এই তত্ত্বটা পরিষ্কার যে, যে কোন কাঠামোই নকশা। তবে নকশা বলতেই যে জিনিস বুঝায় তা তার অন্য ছবিতে আছে।

তাঁর মধ্যে যে সরলতা প্রায় তেল রঙ ছবিতে ঘটে উঠতে চাইছে, সেটা হচ্ছে সব দিক থেকে নিজক বস্তু। এবং এই সূত্রে আমরা দেখব রঙের বিবেচনা যেহেতু তাঁর আছে এবং আরোপ কৌশলে তিনি যথারীতি পটু, তাই অনেক স্থলে কাজ মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

জল রঙে টোনাল তারতম্য বজায় রাখার জন্য রেখাকে মানান সই করতে হয়—এবং একথা তাঁর হ্যালুসিনেশন ছবিটিতে সুস্পষ্ট; কিন্তু তেল রঙে ঠিক সেই ধরনের রেখা যে কার্যকরী হবে এমন নয়, তাই ভার্জিন ছবিটির রঙ আরোপ অদ্ভুত ভাল হয়েও রেখা সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন থেকে যায়।

অথচ মিনুসেটরস ছবিটা এই দিক থেকে বেশ সুষ্ঠু—যদিও রেখা কোন আপাত নিপটভাবে ধরে নেই অর্থাৎ বস্তুদ্বয়ের বিশেষ কোন রঙ প্রধান বৈপরীত্য না থেকেও—চমৎকারভাবে একটা লীলার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যত্র, যেমন 'মাদার' ছবিটি—এখানে আশ্চর্য দুটি ভোলম উঠে গেছে।

তবু এখানেও—মাদার ছবিতে—দুটি চৌক স্থান ভোলমকে কিভাবে সাহায্য করছে তা আমরা বুঝতে পারলাম না। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে, পূর্বেও বলেছি, তাঁর হাত রঙ বিবেচনা যথার্থই আছে—তাই বলতে পারি হঠাৎ-এর উপর নির্ভর না করে কোথাও কোথাও ভেবে দেখলে পারতেন।

ধর্মরাজপূজায় আজও পিঠবান-চড়ক

নেপাল মজুমদার

বীরভূমে ধর্মরাজ পূজায় আজও পিঠবাণ বা পিঠে বঁড়শি বেঁধা চড়ক অনুষ্ঠান হয়, এ কথা শুনলে বিংশ শতাব্দীর মানুষ চমকে উঠবেন।

এইসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির ভালো-মন্দের প্রশ্ন নয়; বাংলা লোক-ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে এই-গুলি অতীব মূল্যবান তথ্য ও উপাদান, এ কথা আজ প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন।

এক শ' বছর পূর্বে বাংলা দেশের (বিশেষত পশ্চিম বাংলার) প্রায় সর্বত্রই ধর্মরাজ পূজায় ও চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক, জিভবাণ ইত্যাদি হত। ১৮৬৩ সালে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এইসব বীভৎস ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করে দেন। কিন্তু তার পরেও বহুকাল গোপনে চড়ক জিভবাণ ইত্যাদি চলেছিল এবং আজও কিছু কিছু জায়গায় ঐগুলি আছে। তবে সত্যি-কারের পিঠবাণ ও চড়ক প্রায় উঠে গিয়েছে বললেই চলে; আজকাল কোমরে দড়ি বা গামছা ইত্যাদি বেঁধে চড়কগাছে ঘোরান হয়। কিন্তু বীরভূমে আজও দুটি জায়গায় ধর্ম-রাজ পূজায় সত্যিকারের চড়ক অনুষ্ঠান হয়। আর কোথাও হয় কিনা জানি না। বেশ কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মশায় 'শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালীর জীবনের ছবি'—এই শিরোনামায় 'প্রবাসী'তে একটি সচিত্র প্রবন্ধ (প্রবাসী—কার্তিক ১৩৩৯। পৃ ৪৮-৬০) লিখেছিলেন। তাতে তিনি চড়ক, জিভবাণ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির ছবি ও বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐগুলি এখন আর হয় না। তার প্রতিবাদে অল্প কিছুদিন পরেই শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য প্রবাসীতে লিখলেন, শ্রীহট্ট জেলায় আজও ঐসব আচার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তিনি লিখলেন।

..."কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট জেলার নানা স্থানে এখনও বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক-পূজা হইয়া থাকে। চড়ক-পূজা নামক অনুষ্ঠানটি চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হইয়া থাকে। প্রবন্ধের ৫নং ছবিতে চিত্রিত সকল 'দেহ পীড়াদায়ক ভীষণ অনুষ্ঠানই' এতদঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে।"

[প্রবাসী—পৌষ, ১৩৩৯। পৃ ৩৮০]

সেই সময় প্রবাসীতে আর কারও প্রতি-বাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখি না। শ্রীহট্ট জেলায় আজও এই পিঠবাণ ও চড়ক হয় কিনা জানি না। শুনেছি, বাঁকুড়া জেলায় দু' একটি জায়গায় ঐসব অনুষ্ঠান হয়; তবে এখনও পর্যন্ত কারুর লেখায় তা চোখে পড়েনি।

বীরভূম জেলায় আজও যে দুটি গ্রামে ধর্মরাজ পূজায় ঐসব অনুষ্ঠান হয়, সে দুটি গ্রামই দুবরাজপুর থানা এলাকায়। গ্রাম দুটির নাম 'মেটেলা' ও 'বাঁধেরশোল'।

মেটেলা গ্রামটি দুবরাজপুর-বক্রেশ্বর রোডের পাশেই পড়ে—দুবরাজপুর স্টেশন থেকে মাত্র ৫ মাইল রাস্তা। এখন কয়েকটি বাসই ঐ রাস্তায় যাতায়াত করে। মেটেলা থেকে বক্রেশ্বর মাত্র দু মাইল রাস্তা।

গ্রামটির নাম 'মেটেলা' কেন হল চিন্তা করা দরকার। কেউ কেউ বলেন, এখানকার মেটেল মাটির জন্যই এর নাম মেটেলা হয়েছে। তা ছাড়া সম্ভবত এককালে এ গ্রামে মেটেবাগ্দীদেরই প্রাধান্য ছিল। এখনও কিছু বাগ্দী আছেন এবং তাঁরাই এখানকার ধর্মরাজের মূল দেয়াসী। এখন গোয়ালা বা গোপ শ্রেণী সংখ্যায় বেশী—শতকরা ৮০/৯০ জন। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কর্মকার, সদ্গোপ আছেন। তা ছাড়া বাগ্দী, ডোম, বাউরী, মুচি ইত্যাদি অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাও আছেন।

মেটেলা গ্রামে ধর্মরাজই প্রধান দেবতা এবং এই অঞ্চলের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা বলে লোকের বিশ্বাস। এখানকার ধর্মরাজের মূর্তি শিলামূর্তি। বীরভূমের অধিকাংশ ধর্মরাজ মন্দিরই খড়ের অথবা টিনের চালাঘর। এখানকার মন্দিরও খড়ের চালাঘর, আর তার সমুখেই ছোট্ট একটি আটচালা। সম্প্রতি ধর্মরাজ মন্দিরের ঠিক পশ্চাতেই একটি পাকা একতলা মন্দির তৈরী হচ্ছে। লক্ষ করবার বিষয়, মন্দিরের মুখ দক্ষিণ দিকে। পাশেই সিমেণ্ট বাঁধানো বেদীতে মনসা আছেন। পূজার সময় এখানে বাণেশ্বর ও কালারায়কেও রাখা হয়। তা ছাড়া, গ্রামে দুর্গা, কালী, শীতলা এবং আরও একটি মনসা আছেন। এর মধ্যে মনসা ছাড়া অন্য সব দেবীই গ্রামের ব্রাহ্মণদের কুলদেবী। শেষোক্ত মনসাটি এই গ্রামের সদ্গোপদের।

ধর্মরাজের মূল দেয়াসী বর্তমানে নারায়ণবাগ্দী। পুরুষপরম্পরানুক্রমে এঁরাই মূল দেয়াসীগিরি করে আসছেন; অর্থাৎ আদিতে এঁরাই এখানকার ধর্মরাজ পূজার প্রবর্তন করেছেন বলে মনে হয়। ধর্মরাজের

মেটেলায় ধর্মের গাজন

মেটেলার জিভবাণ

নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। গোপদের ব্রাহ্মণ পুজো ও পুরোহিতের কাজ করেন। ধর্মরাজের কিছু জমি-জায়গা ও সম্পত্তি আছে। তার আয় থেকে বাৎসরিক পুজো ও নিত্যসেবার খরচা চলে। চারটি সেবাইত দেয়াসী পরিবারের উপর এই সবকিছু দেখাশুনা ও পরিচালনার ভার আছে। তার মধ্যে দুটি গোপ সম্প্রদায়ের সেবাইত আছেন।

মেটেলার ধর্মরাজের পুজো হয় বৈশাখী বা বুদ্ধ-পূর্ণিমায়। কোন কোন বছর বৈশাখ মাস মলমাস পড়লে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পুজো হয়। পূর্ণিমার ৮ দিন পূর্বে ঘটস্থাপন করা হয়। এই ৮ দিন ভক্তরা প্রত্যহ রাত্রে ঢাকের বাজনা ও গাজননৃত্য করে ধর্মরাজকে আহ্বান জানায়। পুরোহিত পুজোও করেন। চতুর্দশীর দিন সমস্ত বলভক্তরাই 'বার' করেন; অর্থাৎ উপবাস এবং পবিত্র ও সংযত হয়ে থাকেন। ঐদিন রাত্রে বাণেশ্বরকে স্নান করিয়ে ভক্তরা মাথায় করে সকলে গ্রামের অদূরে 'বোসকাঁদা বাগান' নামে একটি বাগানে যান। সেখানে একটি তেঁতুল গাছের তলায় 'কালা রায়' থাকেন। কালারায়ের মূর্তি হচ্ছে একটা কাঠের এক হাত উঁচু ঘোড়া। পুরোহিত সেখানে 'বাণেশ্বর' ও 'কালারায়ের' পুজো করলে পর বলভক্তরা সকলে গাজন নৃত্য করে বাণেশ্বর ও কালারায়কে ধর্মরাজতলায় নিয়ে আসেন। ধর্মরাজ মন্দিরের পাশের বেদীতে (যেখানে মনসা থাকেন) তাঁদের রাখা হয়।

পূর্ণিমার দিন পুজো ও হোম। ঐদিন সকালে ১১টা নাগাদ 'ভাড়ার' আনার আদেশ পাবার জন্য ধর্মরাজের মাথায় ফুল চড়ান হয়। ফুল পড়লে বুঝতে হবে, ধর্মরাজের আদেশ বা অনুমতি পাওয়া গেল। এই 'ফুল পড়া' দেখার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয়। প্রচণ্ড ঢাকের বাজনা আর ভক্তদের 'চলো বাবা ধর্মরাজে'—এই ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করে। ফুল পড়ার পর মন্দিরের সামনের আটচালায় হোম বা যজ্ঞ করা হয়। হোম ও পুজোর পর বলভক্তরা সকলে 'ভাড়ার' আনতে যান।

'ভাড়ার' আনার উৎসবটি তাৎপর্যপূর্ণ। মূল দেয়াসী একাদশীর দিন পবিত্রভাবে একটি হাঁড়াতে মদ তৈরি করে। পুজোর দিন হোমের পর মূল দেয়াসী ঐ মদের হাঁড়াটি মাথায় করে গ্রামের অদূরে 'বুড়ো-রায়'তলায় নিয়ে যান। সংগে অন্যান্য বলভক্তরা যান। সেখানে মূল দেয়াসীই নিজ হাতে পুজো করেন এবং পুজোর পর তিনিই মাথায় করে ভাড়ার আনেন। পথে তাঁর অনেকবার 'ভর' হয়। অবশেষে ধর্মরাজ মন্দিরে ভাড়ার নিয়ে আসার পর দেখা যায় হাঁড়ার মধ্যে বিন্দুমাত্রও মদ পড়ে নেই; অন্তত এই হচ্ছে ভক্তদের ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ভাড়ার আনার পর পাঁঠা বলিদান হয়। বলিদানের পর সমস্ত ভক্তরা ধর্মরাজকে 'পূর্ণাহুতি' দেন। তারপর পুষ্প ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যার সময় অধিকাংশ ভক্তই মদ খায়। ঐদিনই রাত্রে জিভবাণ অনুষ্ঠান হয়। রাত্রি ১০।১১টা নাগাদ ভক্তরা গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে 'মধুর পুকুর' নামে একটি পুকুরে সমবেত হন। ভক্তরা স্নান করে 'মালকোচা' দিয়ে শাড়ী কাপড় পরেন। কোমরে বাঁধেন ঘুঙুর। তারপর কর্মকার ভক্তদের 'নবরঙ্গ বাণ' ও 'জিভবাণ' ফুড়ে দেন। 'নবরঙ্গ বাণে'-র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কোমরের দু পাশে দুটি বড় বড় লোহশলাকা ফুটিয়ে দিয়ে তার দুই প্রান্তে তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। আর মাথায় শ্যাওলা চাপিয়ে তার উপর লোহার ধুনুচির মত একটি জিনিসেও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য ভক্তরা জিভবাণ ফোটান। লেড পেন্সিলের মত মোটা এবং ২ ফুট থেকে ৫ ফুট লম্বা লোহশলাকা ভক্তদের জিভে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তার দুই প্রান্তে দুটি পদ্ম-কুঁড়ি গেঁথে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় তারা সারিবদ্ধভাবে গাজননৃত্য করতে করতে ধর্মরাজ মন্দিরে এসে উপস্থিত হন! সে যেমনই ভয়াবহ তেমনই রোমাঞ্চকর দৃশ্য। তারপর 'দোলসেবা' ও 'ফুল খেলা' অনুষ্ঠান। 'দোলসেবা' হচ্ছে—ফাঁসিকাঠের মত একটা কাঠের ফ্রেমে ভক্তের পা দুটো দড়িতে ফাঁস দিয়ে মাথাটি নিচে দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে দোলা দেওয়া হয়। তার সামনে অগ্নিকুণ্ড করা হয়। ভক্তরা ঐ অবস্থায় দোল খেতে খেতে ধর্ম-রাজের নাম নিয়ে এক মুঠো ফুল ও ধূপ-ধুনা অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেন। এইভাবে আহুতিদানের পর ভক্তরা ঐ আগুন হাতে নিয়ে লোফালুফি করেন। তারপর ধর্মরাজ-তলায় কণ্টকারীর কাঁটা বিছিয়ে দেওয় হয়। প্রথমে মূল দেয়াসী ও তারপর অন্যান ভক্তরা তার উপর গড়াগড়ি দেন। এবে বলা হয় 'লাগুড়া ভাঙ্গা'। এইদিন সব শেষে ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে বসলে পু পুরোহিত তাদের কাঁধে কাঁধে চড়ে চলে যান। একে বলা হয় 'জাঙ্গাল দেওয়া' তারপর ভক্তরা বাড়ি গিয়ে ফলজল খান।

পরদিন সকালে নিত্যসেবার পর চড় অনুষ্ঠানের আদেশের জন্য ধর্মরাজের উপ ফুল চড়ান হয়। ফুল পড়ার পর ভক্ত সকলে মিলে সামনের 'ন বাঁধ' নামে পুকু থেকে চড়কগাছটি তুলে আনেন। সন্ধ্যা অধিকাংশ ভক্তই মদ খান। তারপর চড়ক গাছটি মাটিতে পোঁতা হয়। রা ১০।১১টা নাগাদ দেয়াসী ও ভক্তরা স্না করে তিলকমালা পরে কোমরে ঘুঙুর বেঁ গাজননৃত্য করে এসে ধর্মরাজকে মাল্যদা করেন। তারপর সকলে মিলে তা তালে পা ফেলে নাচতে নাচ ধর্মরাজ মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করেন এত সুন্দর অথচ পৌরুষদ নাচের ভঙ্গিমা অন্য কোথাও গাজননৃ দেখি নি। সাজে-সজ্জায়ও খানিক বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তরা প্রায় সকলে মালকোঁচা দিয়ে শাড়ী পরেন। গলায় মাথায় গুলঞ্চ ফুলের ও পদ্মফুলের মাল

কোমরে ঘুরুর। ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্তদের সমবেত পদক্ষেপ ও অঙ্গ-সঞ্চালন ও নানান অঙ্গ-ভঙ্গিমা—এই সবটা মিলিয়ে এমন একটা মনোরম ও সজীব প্রাণোদ্দীপ্ত ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এই নৃত্যের মধ্যে ঘুন্ধযাত্রার ও যুদ্ধের নানা কৌশল-কসরতটাই হচ্ছে এর ভেতর-কার কথা।

যাই-ই হোক ধর্মরাজের ... ভক্তরা কর্মকারকে মাল্যদান করেন। প্রায় রাত্রি ১২টা নাগাদ চড়ক শুরু হয়। মূল দেয়াসী ও ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বয়সে প্রবীণ তাঁরাই প্রথমে চড়কে ঘোরেন। প্রথমে ভক্তরা সকলে আটচালায় সমবেত হন। তখন প্রবীণতম দেয়াসী এগিয়ে এসে ধর্মরাজের দিকে মুখ করে প্রণামের ভঙ্গিতে বসে পড়েন। কর্মকার তখন যে জায়গায় বঁড়শি বিঁধবেন সে জায়গায় লম্বা করে পিটুলীর দাগ দিয়ে দেন। এর পর অন্য একজন তার পিঠের চামড়াটা শুদ্ধ করে খিমচে ধরে টেনে তুলে ধরলে পর কর্মকার বঁড়শি দুটো সেই চিহ্নিত জায়গায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পট পট করে বিঁধিয়ে দেন। একগাছা শক্ত ও মজবুত দড়িতে বঁড়শি দুটো বাঁধা থাকে। তারপর সেখান থেকে কাঁধে করে তাকে চড়কতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে চড়কগাছের এক প্রান্তে সেই বঁড়শি-বেঁধা দড়িটা বেঁধে দেওয়া হয়। অপর প্রান্তে দড়ি বেঁধে প্রায় ১০।১২জন লোক চরকির মত পাক দিয়ে তীব্র গতিতে ঘুরতে থাকে। চিল যেমন ডানা ছড়িয়ে আকাশে ওড়ে তেমনি করে ভক্তটি শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে দু হাত প্রসারিত করে দিয়ে, কখনও বা হাততালি দিয়ে কসরত দেখিয়ে চিৎকার করে ধর্মরাজের নাম নেয়। এই চড়ক দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক জমা হয়। একটা ছোট-খাটো মেলাও বসে যায়। এইভাবে একজনের পর একজন ভক্ত চড়কে ফেরেন। কম করে ৮০/৯০ জন ভক্ত পিঠবাণে চড়কে ঘোরেন। বয়সে যারা খুবই ছোটো তাদের কোমরে গামছা বেঁধে চড়কে ঘোরান হয়। এবারে ১৩/১৪ বছরের কয়েকটি ছেলেকেও পিঠবাণে চড়কে ঘুরতে দেখলাম। এবারে বিশেষভাবে আমাদের দেখাবার জন্যই একজন ভক্ত জিভবাণ সহ পিঠে বঁড়শি বেঁধে চড়কে ঘুরলেন। গয়ারাম বাউরী নামে অশীতিপর এক বৃদ্ধ ভক্তকে দেখলাম। তিনি, তাঁর যৌবনকাল থেকেই প্রতি বছর চড়কে ঘুরে আসছিলেন; সম্প্রতি কয়েক বছর আর ঘোরেন না। তাঁর আফসোস, পিঠ ফোঁড়ার আর জায়গা নেই—সারা পিঠে তাঁর বঁড়শি বেঁধার দাগ। আজ পর্যন্ত চড়কে ঘোরার সময় কোনো দুর্ঘটনা

মেটেলার পিঠবাণ

ঘটেনি কিংবা পিঠবাণ বা জিভবাণের জন্য আজও পর্যন্ত কারুর দূষিত ক্ষত হতে দেখা যায় নি বলে শোনা গেল। অথচ তাঁরা জীবাণুনাশক কিছু ব্যবহার করেন না। কেউ কেউ চড়কে ঘোরার পর পিঠটা চড়কগাছে ঘষে নেন। চড়কে ঘোরার পর এবার কয়েকজন ভক্তকে মেলায় দিব্যি ঘুরে বেড়াতে ও তেলে ভাজা খেতে দেখলাম। পিঠের ক্ষত থেকে সামান্য একটু রক্তের দাগ জমাট বেঁধে গেছে দেখলাম। সঙ্গে অভিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধু ছিলেন—চোখ বড়ো বড়ো করে তিনি সবটা শুধু দেখলেনই, মুখে কোন কথা ছিল না।

পাশেই তাঁতিপাড়া ও ধানকুল গ্রামের ধর্মরাজের সং খুব বিখ্যাত। এখানে চড়ক দেখে দলে দলে লোক ছোটে তাঁতি-পাড়া ও ধানকুলের সঙের প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে।

বাঁধেরশোল গ্রামের ধর্মরাজ পুজাও এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ। গ্রামটি দুবরাজ-পুর-সিউড়ী রোডের পাশেই অবস্থিত—দুবরাজপুর থেকে মাত্র তিন মাইল পথ।

গ্রামটির নাম বাঁধেরশোল হল কেন তা জানা দরকার। এখানকার ধর্মরাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য জিভবাণ। পেন্সিলের মত মোটা ৬/৭ ফুট লম্বা কয়েকটি বাণই এখানকার ধর্মরাজের মন্দিরে আছে। খুব সম্ভবত এই বাণগুলির জন্যই গ্রামটির নাম "বাণেরশাল" হয়েছিল; পরে লোকমুখে তা বাঁধেরশোলে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে চলতি প্রবাদ আছে যে, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামের একজন কুমোর মাটির কাজ সেরে 'কামুলে পুকুর' নামে একটি পুকুরে স্নান করতে যায় কিন্তু সেদিন সে আর ফিরে আসেনি। তার সাত দিন পরে ঐ বংশেরই একজনের উপর ধর্মরাজের স্বপ্নাদেশ হয় যে, কামুলে পুকুরের ঈশান কোণে তিনি আছেন এবং ধর্মরাজপুজার উপকরণাদি

মেটেলার চড়ক

নিয়ে পুজো-অর্চনা করলে তিনি আবির্ভূত হবেন। সাত দিন পর সেই স্বপ্নাদেশমত পুজো করলে পর সেই ডুবে-যাওয়া ব্যক্তি মাথায় একটি জলচৌকি সহ কাদামাটি হাতে পুকুরের জল থেকে উঠে আসেন। সেই চৌকিতে ধর্মরাজের শিলামূর্তি এবং পূর্বোক্ত বাণগুলি পাওয়া যায়। সেই থেকে ঐ কুমোর পরিবার (পাল উপাধি) ধর্ম-রাজকে প্রতিষ্ঠিত করে বংশানুক্রমে তাঁর পুজো করে আসছেন। এই বংশেই মূল দেয়াসী হওয়ার নিয়ম, আর আজও তাই-ই আছে।

এখানকার ধর্মরাজের বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের মধ্যে বারো মাসই 'বাণেশ্বর' থাকেন। প্রথমে মাঠের মাঝখানে ধর্মতলা নামে একটি জায়গায় ধর্মরাজকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখান থেকে পরে লক্ষ্মীতলা বলে একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখান থেকে বর্তমান জায়গায় মন্দিরটি যে কখন কিভাবে গড়ে উঠল তা কেউ বলতে পারেন না। বহুকাল পূর্বে হেতমপুরের রাজারা ধর্মরাজের নামে কিছু জমি-জায়গা দিয়ে-ছিলেন; তার থেকেই সব খরচা চলে। শোনা যায়, প্রথমে মূল দেয়াসীই নাকি ধর্মরাজের নিত্যসেবা করতেন; কেবল বাৎসরিক পুজো ব্রাহ্মণে করতেন। এখন ব্রাহ্মণেই সব পুজো করেন।

এখানে ধর্মরাজের পুজো হয় জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে। মেটেলায় হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। লক্ষ করবার বিষয়, বাঁধেরশোল থেকে মেটেলার দূরত্ব মেঠো পথে তিন মাইল মাত্র। পাশাপাশি গ্রামে ধর্মরাজ পুজো থাকলে প্রতিযোগিতা হয় এবং পুজোর আকর্ষণ বাড়াবার জন্য মনে হয় তাঁরা এই ধরনের আগে-পিছে পুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে বাঁধেরশোল গ্রামের পূর্বেই মেটেলাতে ধর্মরাজপুজোর প্রবর্তন হয়েছিল তাতে আর সন্দেহের কারণ নেই।

এখানে ধর্মরাজ পুজোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার মাত্র দু দিন পূর্বে অর্থাৎ ত্রয়োদশীর দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মরাজের পুজো শুরু হয়। এই দিন শুধু মূল দেয়াসীই 'বার' করেন অর্থাৎ নূতন হেঁশেলে এক বেলা নিরামিষ আহার করতে পান।

পরদিন চতুর্দশী তিথিতেও মূল দেয়াসীকে সারা দিনই উপবাস ও কঠোর শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। এইদিন রাত্রে 'টোকাভাঙা' উৎসব অনুষ্ঠান হয়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : একটি নূতন টোকার মধ্যে দুটি মাটির ঘোড়া, ৮টি কড়ি এবং ৫টি তামার পয়সা থাকে। দেয়াসী মাথায় করে ঐ টোকাটি মহাতোপুকুরে নিয়ে যান। সঙ্গে বিরাট ভক্তের দল ধূপধুনো ও ঢাকের বাদ্য সহ গাজননৃত্য করতে করতে যান। অন্য একজন ভক্ত মাথায় করে বাণেশ্বরকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

টোকা মাথায় দেয়াসী পুকুরে স্নান করেন, ঐ সাথে বাণেশ্বরকেও স্নান করান হয়। তারপর পুরোহিত পুজো করেন। পুজোর পর দেয়াসী টোকা মাথায় করে ধর্মরাজ মন্দিরে ফিরে আসেন। পথে ঘন ঘন তাঁর 'ভর' হয়।

পূর্ণিমার দিনই ধর্মরাজের আসল পুজো। ঐদিন সকালে 'ফুল খেলা' অনুষ্ঠান হয়। এই ফুল খেলায় তিনটি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে ধর্মরাজ মন্দিরের সামনে কণ্টকারী কাঁটা বিছিয়ে তার উপর ভক্তরা গড়াগড়ি দেন। তারপর বাবুইয়ের আঁটি শক্ত করে ছাঁড়র মত পাকিয়ে ভক্তরা তাই দিয়ে পরস্পরকে খুব জোরে চাবুকের মত সপাত সপাত করে আঘাত করে। একে বলে 'বাবুই খেলা'। তারপর মন্দিরের সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড করা হয়। আর সেই আগুনের উপর প্রথমে মূল দেয়াসী ও ভক্তরা হেঁটে যান এবং পরে সেই অগ্নিকুণ্ড হতে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়ে তাঁরা লোফালুফি করেন।

দুপুরের দিকে 'ভাড়ার' আনার উৎসব। ঐ গ্রামেরই মদশালের শুঁড়ি একাদশীর দিন খুব শুদ্ধাচারে একটি নূতন হাঁড়াতে মদ তৈরি করেন। পূর্ণিমার দিন তিনি ঐ মদের হাঁড়াটি মহাতোপুকুরের ডাঙায় রেখে আসেন। উপবাসী দেয়াসী ও ভক্তরা দুপুরের দিকে ঢাক বাজিয়ে ভাড়ার আনতে যান। ঐ পুকুরে স্নান করে তাঁরা ঐ হাঁড়ার সামনে প্রচুর ধূপধুনো দিয়ে ঢাক বাজিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ধর্মরাজের নাম নিতে থাকেন। তারপর একসময় নাকি এই হাঁড়ার মধ্য থেকে মদ উপচে পড়তে থাকে। তখন মূল দেয়াসী মাথায় করে ঐ মদের হাঁড়াটি নিয়ে নাচতে নাচতে লক্ষ্মীতলায় যান পথে তাঁর ঘন ঘন 'ভর' হয়। তারপর ঐ

মদ দেয়াসী ও ভক্তরা ভাগ করে খান।

ছাড়ার আনার পর পুনরায় সকলে ধর্মরাজতলায় সমবেত হন। তারপর হয় হোম ও পূজা। পূজা শেষ হলে পর পাঁঠা বলিদান হয়। তারপর ভক্তরা ধর্মরাজের পুষ্প নিয়ে বাড়ি যান।

ঐদিনই রাত্রে জিভবাণ হয়। বলা বাহুল্য, এতে এই অঞ্চলের ডোম, বাউরী, বাগদী ইত্যাদি অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলেছি, এখানকার জিভবাণ খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বাণগুলিও অন্যান্য জায়গার থেকে বড়। রাত্রি ১০।১১টা নাগাদ এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। কর্মকার ভক্তদের জিভে ঐ বাণ বা লোহশলাকাগুলি ফুটিয়ে দিলে পর তারা ঐ অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে ঢাকের বাজনার তালে তালে নানা অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকেন। প্রায় দু ঘণ্টা এইরকম নৃত্য চলে। মাঝে মাঝে বাণগুলিতে গাওয়া ঘী মাখিয়ে দেওয়া হয়। জিভবাণ অনুষ্ঠানের পর ধর্মরাজের পুষ্প, বেলপাতা ইত্যাদি চিবতে চিবতে ভক্তরা বাড়ি ফিরে যান।

পরদিন সকালে ধর্মরাজের নিত্যসেবা ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না। ঐদিন রাত্রে চড়ক। ঐদিন বিকেলে ভক্তরা মিশিরপুকুর থেকে চড়কগাছটি তুলে পুকুরের পাড়ে পুঁতে ফেলেন। তারপর পুরোহিত এসে চড়কগাছটি পূজো করেন। রাত্রি ১২টা নাগাদ চড়ক শুরু হয়। তবে মেটেলার মত এখানে অত বেশি সংখ্যায় ভক্তরা চড়কে ঘোরেন না; এখানে ১০।১২ জন পিঠবাণ নিয়ে চড়কে ঘোরেন। এই গ্রামেও আজও পর্যন্ত চড়ক বা জিভবাণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে শুনা যায় নি।

তার পরদিন ভক্তরা বাণেশ্বরকে মাথায় নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল-কলাই-পয়সা সংগ্রহ করেন। সেই দিয়ে ভক্তরা উৎসব করে একদিন খান।

বীরভূমে ধর্মরাজ পূজায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেগুলি হচ্ছে এই:

(১) বীরভূমে ধর্মরাজ পূজা প্রধানত সিউড়ী সদর মহকুমা এলাকায়—বিশেষত অজয় নদের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলিতে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ধর্মরাজ আছেন—কোনো কোনো গ্রামে ২।৩টি ধর্মরাজ আছেন। অথচ রামপুরহাট মহকুমার ধর্মরাজ পূজা সংখ্যায় খুবই কম। এখানে উল্লেখযোগ্য, অজয় নদের তীরে জয়দেব কেন্দুলি আর তার অপর পারেই ইছাই ঘোষের দেউল ও সেনপাহাড়ী গড়। "বীরভূম বিবরণ"কার শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মশায় এই এলাকার যেসব প্রবাদ-প্রবচন এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাতে এই এলাকায় ধর্মরাজ পূজার প্রাদুর্ভাবের একটা যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় (দ্রঃ —বীরভূম বিবরণ—১ম ও ৩য় খণ্ড)।

(২) বীরভূমে এই এলাকায় ধর্মরাজই হচ্ছেন সত্যিকারের গণদেবতা। অর্থাৎ গোপ, কর্মকার, কুম্ভকার, সদগোপ এবং ডোম-বাউড়ী-বাগদী ইত্যাদি অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুর প্রধান উপাস্য দেবতা ধর্মরাজ। মনসা ও কালীপূজোও এইসব শ্রেণীর লোকেরা করে থাকেন তবে ধর্মরাজ পূজার আকর্ষণ তাদের সবচাইতে বেশী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বীরভূমে এই এলাকায় ধর্মরাজ কদাচিৎ শিব-এ পরিণত হয়েছেন (এক হেতমপুরে ধর্মরাজ-শিব ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা নেই) এবং ডোম, বাউড়ী, বাগদী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা শিবপূজায় (শিবচতুর্দশী কিংবা চৈত্র সংক্রান্তিতে) কোনই অংশ গ্রহণ করে না। একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই যে, মেটেলা থেকে বক্রেশ্বরের দূরত্ব মাত্র দু' মাইল অথচ আশেপাশের অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা বক্রেশ্বরের শিবকে তাদের নিজেদের দেবতা বলে গ্রহণ করেনি এবং বক্রেশ্বরের পূজায় ও মেলায় কোনো অনুষ্ঠানে তারা কোনো অংশ গ্রহণ না। উল্লেখযোগ্য, বক্রেশ্বর শৈবতন্ত্রের প্রাচীনতম পীঠস্থান। তা ছাড়া আরও একটা লক্ষ করবার বিষয়, বীরভূমে এই অঞ্চলে চড়ক, পিঠবাণ, জিভবাণ, 'ফুল খেলা' ইত্যাদি বিশেষভাবে ধর্মরাজ পূজার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবেই প্রচলিত আছে, অথচ চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজো অনুষ্ঠান এখানে প্রায় নাই বললেই

চলে। যে দু'একটি জায়গায় ধর্মরাজ শিবে পরিণত হয়েছেন সেখানে চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূজা-হোম ইত্যাদি হলেও জিভবাণ, পিঠবাণ চড়ক হয় না। বীরভূমে এই অঞ্চলে শিবপূজো প্রধানত ব্রাহ্মণ এবং গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত আছে। এবং প্রায় অধিকাংশ শিবমন্দির তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন আর সেই শিব হচ্ছেন লিঙ্গমূর্তির শিব।

(৩) বীরভূমের এই এলাকায় প্রায় সমস্ত ধর্মরাজেরই শিলামূর্তি। কূর্মমূর্তি আজও পর্যন্ত এ অঞ্চলে চোখেই পড়েনি আমার। আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানকার অধিকাংশ ধর্মরাজের মন্দির টিনের অথবা খড়ের চারচালা ঘর আর তার সামনে থাকে একটা নাটশালা। অবশ্য যাঁদের তত খ্যাতি নেই তাঁরা বাঁধানো বেদীতে কিংবা কোনো গাছতলায় অবস্থান করছেন। অধিকাংশ ধর্মরাজের পাশেই মনসাও বিরাজ করছেন, দেখা গেছে। মেটেলা গ্রামের পুরোহিতঠাকুর তাঁদের ধর্মরাজের যে ধ্যানমন্ত্রটি আমাকে দিয়েছেন, সেটি এই:

"নাকারং নৈবরূপম ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মেপীযস্য যোগীন্দ্র ধ্যানগম্যং।
ভক্তানাং কামপূরণম ত্রিভুবনবিজয়ী নঃ শূন্যমূর্তিং ধাং ধ্রুং ধর্মরাজায় নমঃ॥"

লক্ষ করবার বিষয়, "ধর্মরাজ পূজা বিধান" গ্রন্থে (দ্রঃ—ধর্মরাজপূজা বিধান—পৃঃ ৭০) ধর্মরাজের যে ধ্যানমন্ত্রটি আছে তার সঙ্গে এটির খুবই সাদৃশ্য বা মিল আছে।

শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে ধর্মরাজের কূর্মমূর্তির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"ধর্মরাজের কূর্মমূর্তিই আসল, বাকি সব আসল মূর্তির অভাবে বিকল্প প্রতীক মূর্তি মাত্র।"

তিনি কি কারণে এ মন্তব্য করেছেন বোঝা গেল না। বীরভূমের এই এলাকাগুলিকে ধর্মরাজপূজার প্রাচীনতম ও অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলে মেনে নিতে কারও আপত্তি থাকবে না। এখানে প্রতি গ্রামে গ্রামে ধর্মপূজা কিন্তু কোথাও কূর্মমূর্তি নেই—সর্বত্রই শিলামূর্তি। বিনয়বাবু টোটেম পূজা হিসেবে কূর্মপূজো এবং তার থেকে ধর্মের কূর্মমূর্তির রূপ নিয়েছে এইরকম তাঁর দৃঢ় অনুমানের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বীরভূমে এই এলাকায় কূর্মপূজা নেই এবং কচ্ছপ মারা বা খাওয়া অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে নিষিদ্ধ তো নেইই, পরন্তু কচ্ছপ পেলে তারা তা পরমানন্দে খায়। অথচ লক্ষ করবার বিষয়, সাপ, পেঁচা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা ভয়ানক সংস্কার মেনে চলে। এমন কি বিষধর সাপও গরীব অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা সহজে মারতে চায় না।

(৪) বীরভূমে ধর্মরাজ মন্দিরগুলি অধিকাংশই হয় দক্ষিণ কিংবা পূর্বমুখী; —পশ্চিম-মুখী একটিও দেখিনি। 'Obscure Religious Cult' ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে ধর্মরাজ পূজার ঐসলামিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন (দ্রঃ—ঐ পৃ ৩০৫-০৬)। তিনি পুঁথিগত আলোচনা ছাড়াও ধর্মপূজা পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যথা—ধর্মরাজের মন্দির পশ্চিম-মুখী, জীবজন্তু পশ্চিম মুখ করে জবাই করা হয়, ইত্যাদি। পূর্বেই বলেছি, এখানকার কোনো ধর্মরাজ মন্দিরই পশ্চিমমুখী দেখিনি, পাঁঠা-ভেড়া ইত্যাদি পশ্চিম মুখে জবাই করতে দেখিনি—সাধারণত অন্যান্য পূজায় যেমন বলিদান হয়, তেমনি ধর্মরাজ পূজাতেও হয়ে থাকে।

(৫) বীরভূমে প্রায় সমস্ত বিখ্যাত ধর্মপূজা বৈশাখী পূর্ণিমাতে হয়ে থাকে। সাধারণত পূর্ণিমার ৮ দিন পূর্বে পূজার অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এদের গাজন নৃত্য। এখানকার গাজননৃত্যে যে মনোরম অথচ পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গি ও আঙ্গিক-কৌশল দেখা যায়, তার সঙ্গে এখানকার 'রাইবেশে নৃত্যের' বেশ কিছুটা সাদৃশ্য বা মিল আছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখলে সেদিনকার বাংলা দেশের গণবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার চিত্রটিই কল্পনাক্ষেত্রে ভেসে উঠে।

'ধর্ম'এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও ঐসলামিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও সাধনার ধারার সংমিশ্রণই ঘটেছে। অবশ্য আদিতে সত্য, ধর্ম ও ন্যায়-বিচারের দেবতা হিসেবেই ধর্মরাজ পূজিত হতেন বলেই অনেকের ধারণা। তবে মঙ্গলকাব্য-যুগের পর থেকেই ধর্মরাজ যুদ্ধের-দেবতায় পরিণত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়। লাউসেন ধর্মের বরপুত্র ছিলেন এবং ধর্মপূজা করেই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। সম্ভবত এই ঘটনাটি বা আখ্যানের সূত্র ধরেই কালে ধর্মরাজ যুদ্ধের দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের সামন্ত রাজাদের সকলের নিজস্ব সেনাদল ছিল। আর এই সেনাবাহিনীতে ডোম, বাউরী, বাগ্দী ইত্যাদি অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই সৈনিক ছিল। যুদ্ধে হার-জিতে তারাই মারা পড়ত। এবং কালে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তাদের মধ্যেই ধর্মরাজ পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—ধর্মের সঙ্গে বাণের সম্পর্ক কী? ধর্মের সাধনা অত্যন্ত সুকঠিন। রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় শালেভরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল থেকেই আত্মপীড়ন দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করার রীতি চলে আসছে; যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মসাধনার প্রভাবে তার রূপান্তর ও বিকৃতি ঘটে এসেছে। কিন্তু দেহে বিশেষভাবে বাণবিদ্ধ করার পশ্চাতে কী উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য থাকতে পারে? এর একটা তাৎপর্য এই হতে পারে—ধর্মের বাণ অমোঘ অস্ত্র রূপেই কল্পনা করা হত। শত্রু-নিধনের অমোঘ অস্ত্র প্রার্থনা করে ধর্মরাজ পূজায় একদা যেসব বাণ মন্ত্রপূত করা হত, কালে সেই বাণ ভক্তরা নিজ দেহে বিদ্ধ করে এবং অন্যান্য আত্মপীড়নমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মরাজকে তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন বলে মনে হয়। তা ছাড়া, বাণ ফোঁড়া চড়ক, গাজন-নৃত্যের উপলক্ষে পাশাপাশি গ্রামবাসীদের মধ্যে শৌর্য, বীর্য ও পৌরুষ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল মনে হয়। বীরভূমে ধর্মের গাজননৃত্য দেখলে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে।

(৬) বীরভূমে বিখ্যাত ধর্মপূজোগুলিতে কোথাও সন্তান কামনায় মেয়েদের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের রীতি (বস্তুত মেয়েদের কোন ভূমিকাই নেই এই পূজায়) নেই। অবশ্য সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর দেয়াসীরাই অসুখ-বিসুখের জন্য ওষুধপত্র দিয়ে থাকেন। যে অঞ্চলে যে রোগের প্রকোপ বেশী সেখানকার ধর্মদেয়াসীরা সেই ওষুধ দিয়ে থাকেন। বীরভূমে বিখ্যাত কয়েকটি ধর্মরাজের দেয়াসীরা বাত ও হাঁপানির ওষুধ দিয়ে থাকেন।*

* আলোকচিত্র: শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে।

পল গোগ্যাঁ ঃ সোনালী স্বপ্ন

ভারতবর্ষে বসে, কিংবা প্রাচীর যে কোনো দেশে বসে গোগ্যাঁর ছবি কারুর আবেগের সঙ্গে ভালোবাসা সম্ভব নয়, যদি না সেই ব্যক্তি এমন একজন হন যিনি সমস্ত জীবনই শহরে কাটিয়েছেন, কাটিয়েছেন সত্যিকারের নাগরিক জীবন, যা আমার মনে হয় ভারতবর্ষের কোনো শহরেই সম্ভবপর নয়। শুধু ভারতবর্ষের কেন প্রায় সমগ্র পূর্ব জগতেই; নগর থাকলেও, জীবনযাত্রা সেখানে মফস্বলের। অবশ্য যে-কোনো চিত্রকলা-প্রেমিক লোকই বুঝতে পারবে তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভা, কেন তিনি বিশ শতকের চিত্রকরদের দ্বারা পূজ্য, কিংবা এমনকি চোখ ধাঁধিয়েও তাঁর ছবি হয়তো দেবে আমাদের, কিন্তু হৃদয় দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, তাকে বোধ হয় আমরা ভালোবাসতে পারব না, কারণ—একটু পরে বলছি।

গত দু'তিন দিন আগে আমি তাঁর জীবনী আরেকবার পড়ছিলুম, এমন এক সন্ধেবেলায় যখন আমার মনটা এমনিই ভালো ছিল না তাই তাঁর যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ জীবনের অস্থিরতা যেমনভাবে উপলব্ধি করেছিলুম আজ পড়লে হয়তো তা পারতুম না, কিন্তু সেদিনকার অনুভূতির স্মৃতি নিয়ে লিখছি যেহেতু তাই এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে তিনি কী-রকমভাবে বেঁচেছিলেন সেটা বললেই বোধ হয় তাঁর সব ছবি আমরা বুঝতে পারব। যদিও বুদ্ধি দিয়ে বুঝি সেটা বোধ হয় ঠিক নয়।

জীবনের প্রথম পঁয়তিরিশ বছর কিন্তু পুরোপুরি বুর্জোয়ার। ১৮৪৮ সালে প্যারিসের নতরদাম-দ্য-লরেৎ রাস্তার উপর এক প্রভাবশালী প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী সাংবাদিকের ঘরে জন্ম—তাঁর মা আলিন সাজাল ছিলেন চিত্রকর অঁদ্রে সাজালের কন্যা। প্রজাতন্ত্র-বিশ্বাসী পিতা ক্লোভি গোগ্যাঁ লুই নেপোলিয়নের ক্যু দেতাতের সময় পেরুতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পালিয়ে আসার পথেই মারা যান—পলের তখন তিন বছর মাত্র বয়স। পেরুতে মাতা-পুত্র চার বছর কাটান, তারপর ফিরে আসেন ফ্রান্সের অর্লিয়ঁস এবং বালক পল ভর্তি হন গ্রামের ইস্কুলে। পলের যখন সতেরো বছর বয়স তখন নৌ-বিভাগে যোগ দিয়ে তিনি রিয়ো-ডি-জেনিরো, বাহিয়া, সুইডেন এবং ডেনমার্ক ঘুরে আসেন। মাতার মৃত্যু হলে জাহাজ ছেড়ে তিনি প্যারিসে এক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে আর পাঁচজনের মতই তথাকথিত স্থিতিশীল জীবনের উদ্দেশ্যে এইরকম ভাবতে আরম্ভ করেন; চাকরির উন্নতি হয়, মাইনে বাড়তে থাকে। এমন চমৎকার ছেলে, সে যখন বিয়ে করতে চাইবে কোন মেয়ে 'না' বলবে—এক ওলন্দাজ কন্যাকে ভালোবাসা জানালেন, খুবই সুন্দরী সে, সেই সোনালী চুল নীল চোখ ধাঁচের সুন্দরী, যাদের কাছ

তোমাকে নমস্কার

থেকে "হ্যাঁ" শুনলে মনি আনন্দে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে, এইরকম। মেয়েটিকে তিনি প্রেম নিবেদন করেছিলেন, গল্প আছে, দূর থেকে প্রথম দেখার পরের দিনই প্রথম আলাপে এবং ব্যাপারটায় সোফিয়া একটু মজা পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, তারপরে ক্রমশ আলাপে গোগ্যাঁর অর্থ, স্থিতি, ব্যক্তিগত মোহে মুগ্ধ হয়ে অবশেষে বিবাহে মত দেয়। সন্তান পালন করে, ঘর গুছিয়ে, গয়না কিনে, টাকা জমিয়ে যে ধরনের দাম্পত্য জীবন সোফিয়া ভেবেছিল তা বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই (এর মধ্যে অবশ্য চারটি সন্তান হয়ে গেছে) বেচাল হয়ে গেল। শাফেনেকার নামক এক সহকর্মী চিত্রকলাপ্রেমিক গোগ্যাঁর ছবিতে উৎসাহ দেখে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে ছবি আঁকতে। ক্যানভাসে তুলি চালিয়ে গোগ্যাঁর এক অদ্ভুত উপলব্ধি হল, ভেতরে যে লুকিয়ে ছিল হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সে, তুলি ছোঁয়ার তিন দিনের মধ্যে পল বুঝলেন এই তাঁর কাজ, এই নিয়েই তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। ১৮৮৩ সালে পল চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রঙতুলির জগতে সমর্পণ করলেন নিজেকে।

চাকরি ছেড়ে দেবার ব্যাপারে কোন স্ত্রীর-ই বা মত থাকে? বিশেষত সোফিয়ার মতো অমন সাংসারিক মেয়ের পক্ষে ছবি আঁকার জন্য কাজ ছেড়ে দেওয়া তো এক উন্মাদের কাজ বলে ঠেকল। খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি অবিরাম, এবং দু'একবার প্রচণ্ড ফেটে-পড়া ঝগড়া, কয়েকদিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনে ভাঙন আনল। তা ছাড়া এতদিন সোফিয়া আসন্ন দারিদ্র্যের কথা ভেবেই শিউরে উঠছিলেন, এবার যখন তা সত্যি দেখা দিল জমানো টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরিয়ে যাওয়ায়, তখন অনেকটা বাচ্চাদের কথা ভেবেও সোফিয়া তাঁর ধনী পিতামাতার কাছে কোপেনহেগেনে চলে গেলেন। প্রথমে গোগ্যাঁও গিয়েছিলেন ডেনমার্কে কিন্তু ঘরজামাই হয়ে থাকা তো অসহ্য তাই ফিরে এলেন প্যারিসে প্রিয়তম সন্তান ক্লোভকে নিয়ে। জীবনের দুঃখের, দারিদ্র্যের দিন আরম্ভ হল। কিন্তু এই অকথ্য দারিদ্র্যেও যখন ক্লোভকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারাও তাঁর সাধ্যাতীত, ছবির কোনোই বাজার দর নেই, গোগ্যাঁ চালিয়ে গেলেন তাঁর চিত্ররচনা।

১৮৮৬-র শীতের শেষে গোগ্যাঁ পঁত-আভেঁ নামক ব্রিটেনের (ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে) গ্রামে আস্তানা বদলালেন। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে ঠিক আছে তথাপি সেখানে তাঁর বেশীদিন ভালো লাগল না—বন্ধু শার্ল লাভেলের সঙ্গে পানামায় রওনা হলেন—কারণ শৈশবের সেই মরু প্রদেশের স্মৃতি তাঁকে উদ্বেল করে তুলেছিল। কিন্তু পানামায় তখন টাইফয়েড-মড়ক চলেছে বাধ্য হয়ে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না।

কিন্তু একা ফেরেননি, দশ বারোটি উজ্জ্বল ক্যানভাস নিয়ে নাবতে দেখা গেল তাঁকে ফ্রান্সের বন্দরে—এই পর্যায়ের ছবিগুলিতে উজ্জ্বলতার আধিক্য অনেক বেশী পূর্বাঙ্কিত তাঁর চিত্ররচনাগুলির চাইতে—তবুও এখনো তিনি ইম্প্রেশনিস্ট পুরো দরেই। কিন্তু রঙ ব্যবহারে সারল্য, মিশ্রণের চেষ্টা নেই, আলোর প্রভাব অল্প—এমন সব ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে টুকিটাকি পার্থক্য দেখা গেল তাঁর এই ছবিগুলির মধ্যে যা উল্লেখযোগ্য। এই সময় থিও ভ্যান গ তাঁর ছবির একটি ছোটো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং কয়েকটি ছবিও বিক্রি হয়, অবশ্য অকথ্য দামে।

প্রদর্শনী থেকে যে-অর্থ লাভ হল অস্থির গোগ্যাঁ তাই নিয়ে আবার রওনা হলেন পঁত আভেঁ গ্রামে গ্রীষ্মটা কাটানোর জন্য। এই গ্রীষ্ম তাঁর শিল্পীজীবনের এক বিরাট ঘটনা কেননা চিত্রশৈলী তিনি আর ইম্প্রেশনিস্ট রাখলেন না—কাজ করতে লাগলেন বিরাটাকার সমতল পরিসরের উপর, সরল রেখাঙ্কনের দ্বারা বস্তুকে সাজিয়ে, উজ্জ্বল বিপরীতধর্মী বর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সেজানের আদর্শে তিনি সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত হলেন যে ক্যানভাস শুধু এক বায়বীয় উচ্ছ্বাস নয়, তা বস্তুতে ঠাসা, তাই তাতে কাঠামোর দরকার। এবং শিল্পীর কর্তব্য হল বস্তুর মধ্যে বস্তুত্ব এনে বিন্যাস সাধন। গোগ্যাঁ সেজানের দ্বারা এমন সোজাসুরূপে মুগ্ধ ছিলেন যে শোনা যায় সেজান লুকিয়ে রাখতেন তাঁর ছবি গোগ্যাঁর কাছ থেকে এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর বিন্যাস এবং টেকনিক এই ছোকরা চুরি করে নেয়।

আসলে গোগ্যাঁর ছবি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেজানের থেকে, কারণ বর্ণব্যবহারে প্রতীকিতা তিনিই প্রথম পরিচিত করেন। তিনি চেয়েছিলেন চিত্রকরের বিশ্বাসের

সঙ্গে প্রকৃতি বা বাস্তব কিংবা ঘটনার এক মিলনসাধন, যার জন্য "বিষয়ের" সরলীকরণ মাঝে মাঝে এমনকি "বিষয়" ভঙ্গন (distortion) এবং বাস্তবকে অস্বীকার করে রঙের ইচ্ছেমত ব্যবহার দেখা যায় সমসময়ের ছবিতে।
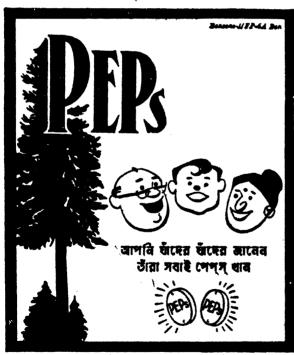
১৮৮৮-র হেমন্তে গোগ্যাঁর সঙ্গে ভ্যান গগ্‌র দেখা হয়। যদিও পরস্পরের মধ্যে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে দুই শিল্পীই পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। প্যারিসে এই রকম সময়ই ১৮৮৯-এর বিশ্ব-মেলায় একটি কাফেতে গোগ্যাঁ এবং তাঁর পঁত আভে' শিল্পী সম্প্রদায় এক প্রদর্শনী করেন। যদিও কিছুই স্বীকৃতি পেল না এই প্রদর্শনী চিত্রকলা-বিদদের কাছে, তবু অখ্যাত তরুণেরা উন্মুখ হল এই নতুন চিত্রাদর্শের সম্ভাবনায়। এবং এই প্রদর্শনীরই অবিলম্ব ফলাফল "নাবি" সম্প্রদায়।

কিন্তু এই মানুষটির অস্থিরতা থামল না। পঁত আভে' ভালো লাগল না, চললেন লে পুল্ডু, সেখানে কিছুদিন ছবি আঁকলেন —এই সব ছবিতে একটা নতুন দরজা দেখা গেল, ক্যানভাসের গভীরতা তিনি সম্পূর্ণ নাকচ করে সমতল করে দিচ্ছেন তাঁর "ফর্ম", অনেকটা মিশরী ছবির মত সিল্যুয়েতের প্রাচুর্য। গতিহীনতা, চিরন্তন স্তব্ধতা, এবং এক ঐশ্বরিক সারল্যের সন্ধান তাঁর ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য।—তিনি সেজানের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন। এই সময়কার ছবি দেখে সেজান কী বলেছিলেন জানেন—"পল গোগ্যাঁ আমাকে কখনোই বুঝতে পারেনি। আমি কখনো স্বীকার করব না যে চিত্ররচনা অনুক্রম-পরম্পরা বা বর্ণের সুর পরিবর্তন ব্যতীত সম্ভব। খুবই বোকার মতো কথা। গোগ্যাঁ চিত্রকরই ছিলেন না, শুধুমাত্র চীনে মুখচ্ছবির নকল ছাড়া আর কিছুই করেন নি তিনি।"

—আসলে সেজানই গোগ্যাঁকে বোঝেন নি। তিনি যে-শিল্পীকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রভাব সেজানের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় বিশ শতকে। ডেনিস লিখেছিলেন, "প্রকৃতিকে নকল করবার যে অর্থহীন দায়িত্ব ইম্প্রেশনিস্ট এবং বাস্তববাদীরা পরবর্তী যুগের শিল্পীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে গোগ্যাঁই আমাদের মুক্ত করেন।" আজ বিশ শতকের নন রিপ্রেসেন্টেটিভ চিত্রকরদের যে আদর্শ, ক্যানভাস প্যাটার্ন-নির্ভর, তা আসছে কিন্তু গোগ্যাঁ থেকে।

সবই তো হল কিন্তু অস্থিরতা, সভ্যতা ছাড়িয়ে উজ্জ্বল আকাশের নিচে, তাল সুপুরির বনের ছায়ায়, অসংখ্য রঙ আর দেহাতী মেলার স্বপ্ন, আবার ঠেলে বের করল গোগ্যাঁকে। সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয় নি, মানুষের সঙ্গে তার সখ্য অসম্ভব, প্রায় যেন পালিয়ে চলে এলেন পল তাহিতি দ্বীপে। সমস্ত ছবি নিলেমে তুলে যা পেলেন তাই দিয়ে যাত্রাখরচ মিটল। প্রথমে এই দিকে তিনি ছিলেন পাপীত নগরে, কিন্তু সেখানেও ফরাসী, এক রাত্রে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাটতে শুরু করলেন, হাটতে-হাটতে এসে পড়লেন এক গ্রামে। এই গ্রামের কথাই যেন তিনি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ভাবছিলেন—সোনালী কঞ্চির কুঁড়ে ঘর, উজ্জ্বল আকাশ, রঙিন বুনো ফলের মতো মেয়েরা, দুপুরে ঠাণ্ডা সরবৎ, মসলার ঝাঁঝ, অলস পাহাড়, অবিরাম সমুদ্রের গর্জন, এই স্বপ্ন তিনি কতদিন, রাতের পর রাত, ঘুমের মধ্যে, ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে, শুধু ভেবেছেন; আজ তা হঠাৎ বাস্তব হয়ে উঠল। গোগ্যাঁ একটি বাঁশের ঘর বানালেন, সারাদিন মাছ ধরে, ছবি এঁকে আম পেড়ে, মাদুরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটতে লাগল, সঙ্গী হল এক "ভাহিনে" (স্থানীয় বউ), বুনো ফল যেন, এত সুস্বাদু, এত পাকা, যেন ফেটে যাবে এক্ষুনি।

কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে অর্থের প্রয়োজন, যা গোগ্যাঁর ক্রমশই ফুরিয়ে আসতে লাগল—এদিকে স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে, কারণ সেই মারাত্মক ব্যাধি উপদংশ তার শরীরে। চিকিৎসার জন্য পাপীতে এলেন কিন্তু তার খরচ যোগানো প্রায় অসম্ভব, কারণ প্যারিসে যে সব তাহিতি-চিত্র পাঠিয়েছিলেন তার বিক্রির কোনো খবর নেই। কোনো রকমে দেশে ফিরে এলেন বন্ধুদের পরামর্শে। এই সময়ে তাঁর কিছু ছবি বিক্রি হয়, একটা প্রদর্শনী আয়োজন করেন দুরাঁদ রুয়ে।

কিন্তু বহু টাকা তিনি খরচ করলেন ডেনমার্ক গিয়ে, এবং তারপর পুনর্বার কপর্দকশূন্য অবস্থা। কোনো রকমে ফিরে গিয়েছিলেন আবার তাহিতিতে, সেখানে গিয়ে দেখলেন গ্রামকে গ্রাম শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত, সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে জেলে যেতে হল। এর পর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উপদংশ তার শরীর ছেয়ে ফেলেছে, নড়তে পারেন না, শরীরে মাছি বসে, অনাহার। ১৯০৩ সাল তখন, গ্রীষ্মে উজ্জ্বল তাহিতি, গোগ্যাঁর মৃত্যু হয় সেই কুঁড়ে ঘরে।

গোগ্যাঁ তাহিতিতে চলে গিয়েছিলেন সরলতার সন্ধানে। নিজেকে ভুলে স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বুনোগন্ধ, ধোঁয়াহীন দৃশ্য, বুনো শরীর, অফুরন্ত প্রাণ। তাঁর এই চাওয়া প্রাচীতে সম্ভব নয়, কারণ শহর আমাদের কাছে নতুন, গায়ে এখনো জল-জঙ্গলের গন্ধ লেগে আছে। একজন ইউরোপিয়ান, যার কাছে সভ্যতা, নাগরিকতা বহু দিনের পুরোনো হয়ে গেছে, শান-বাধানো রাস্তা জন্ম-জন্ম দেখে যার গলা শুকনো, শরীর শুকনো, তার গোগ্যাঁর ছবিতে যে উপলব্ধি হবে, তা আমাদের সম্ভব নয়। কারণ, আমরা এখনো নতুন শহুরে। এখনো স্বপ্ন আমাদের নু্যইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডন—হিমালয়ের কোনো বুনো উপজাতির ছোট গ্রাম নয়।

গোগ্যাঁর দুটি তাহিতি পর্যায়ের ছবি প্রকাশ করলুম—সমস্ত লেখাটা পড়লেই এ ছবি বোঝা যাবে, আর কিছু বিশেষ বলবার প্রয়োজন নেই।

শুদ্ধশীল বসু

বিশুখুড়ো বলিলেন—"আজ বোধ হয় এই প্রথম সাত টাকা কেজির পোনা মাছ কিনতে গিয়ে আর সরকারী মৎস্য দফতরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিনি। সকাল বেলা খবরের কাগজের পাতা খুলেই চোখে পড়ল, বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করা

হয়েছে। এই আনন্দ সেলিব্রেট করতে কে আবার দরের কথা ভাবে, সাত টাকা সাত টাকাই সই। এমন কি স্টেট বাস কর্মী ইউনিয়নের কোন কর্মীর সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেলে সেই মাগ্‌গিগণ্ডার মাছ তাঁর সঙ্গে ভাগ করে খেতেও বাধতো না।"

প্রসঙ্গত ট্রামের কথাটাও আসিয়া পড়িল এবং অনুরূপ কোন একটা মিটমাটে ট্রাম ইউনিয়ন রাজী হইবেন কিনা এ প্রশ্নও অনেকেই করিতে লাগিলেন। শ্যামলাল বলিল—"তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, কেননা ট্রামের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি। কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, জনসাধারণের এই দুর্গতিতে ট্রামকর্মী ইউনিয়ন সহানুভূতিসম্পন্ন না হলে তাঁদের 'সি টি সি' নাম হয়ত লোকের মুখে মুখে 'ছিঃ টি ছিঃ' হয়ে ফিরবে!!"

১৯৫৫ সালের উত্তরপ্রদেশ গো-হত্যা নিবারণ আইনটি কেন্দ্র শাসিত দিল্লিতে সম্প্রসারণের কথা ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মিছিল-রাগের ঘরনাভঙ্গিতে চেঁচাইয়া বলিলেন—"গো-মাতাকী জয়, বলদজী জিন্দাবাদ!!"

বিজ্ঞাপনের [illegible] হইয়া গিয়াছে। —"এবং কাজে কাজেই বিজ্ঞাপনে সুন্দরী, গৃহকর্মসুনিপুণার সঙ্গে 'শিক্ষিতা' কথাটা হয়ত নেহাত অবান্তর হবে; হবু বরেরা কথাটা ভেবে দেখবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পিকিং রেডিওতে নাকি বলা হইয়াছে, —ভারতবাসী মাও সে তুঙ-এর দর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদ-পরিবেশক এই সংবাদের শিরোনামা দিয়াছেন—'উদ্ভট দাবী'। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমরা সংবাদ-পরিবেশনের সঙ্গে এক মত হতে পারলাম না। 'এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই' এটা মাও-এরই দর্শন এবং সে দর্শনে অনেকেই দার্শনিক হয়ে উঠেছেন সুতরাং দাবিটাকে আর উদ্ভট বলতে পারলাম কই!"

কেন্দ্রীয় অর্থ দফতর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, অচিরেই নাকি পাঁচ পয়সার নূতন মুদ্রা বাজারে চালু করা হইবে। —"কিন্তু মনে হয় নূতন মুদ্রার কোন প্রয়োজন ছিল না। পাঁচ পয়সার মুদ্রা

বাজারে চালুই আছে। তবে আগামী নির্বাচনে সিম্ব-মানং-এর প্রয়োজনে যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা হলে বলব সো পাঁচ আনার কোন মুদ্রা চালু করা হলে সেটা নূতনত্বের দিক থেকে লোকপ্রিয় হতো"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা দেখার জন্য নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানাইবার কথা চিন্তা করা হইতেছে। —"তাঁদের উদ্দেশ্যকে নিশ্চয়ই তারিফ করব। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে সমাসন্ন চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা দেখতে শ্রীমতী ইন্দিরার পক্ষে হয়ত ভারত ত্যাগ সম্ভব হবে না"—বলেন সহযাত্রী।

ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যালে শ্রীকৃষ্ণন জিতিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমেনন নির্বাচনী ফাইন্যালের টিকিট জয়ের খেলায় পরাজিত হইয়াছেন। —"কিন্তু শুনছি তিনি নাকি তাঁর অনুরাগীদের বলেছেন—'ডু নট হোলড ব্যাক হরসেস'। কিন্তু শ্রীমেনন মনে রাখবেন, জেনজারাস রাইডিং স্টুয়ারডসরা অনুমোদন করেন না"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

হুগলী হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক হনুমানের অত্যাচার বন্ধের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"হনুমানের অত্যাচার থেকে বাগবাগিচা বাঁচানোর অনুরোধ সত্যিই অন্যায্য নয়, কিন্তু পত্রপ্রেরক হয়ত ভুলে গেছেন, রামরাজত্বে হনুমানের বিরুদ্ধে এবম্বিধ প্রয়াস রাজদ্রোহেরই সামিল!!"

ফারাক্কা বাঁধের কথা শোনার পর পাকিস্তান পদ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়াছে। —"পশ্চিম পাকিস্তান হয়ত জানে না পদ্মার অন্য নাম কীর্তিনাশা। সুতরাং ভারতের সঙ্গে বাঁধ বাঁধাবাঁধির ক্রীড়াকীর্তি (মুকুলবাবুর সৌজন্যে) দেখাতে গিয়ে টাকাটা না জলে যায়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কুওমিনটাং চীনের জনৈক বিজ্ঞানী নাকি চুল হইতে আণবিক বিষয় বটিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। —"বব চুলের জন্য আরো জোর প্রচার চালালে বটিকা প্রস্তুতে উপাদানের অভাব হবেনা।"—বলেন সহযাত্রী।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন—পরিবার পরিকল্পনাই দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায়। খুড়ো বলিলেন—"হবেও বা। তবে এটাও স্মরণ করিয়ে দেবো যে, লুপ-এর সাহায্য না নিয়েই আমরা খানিকটা দারিদ্র্য দূর করেছি; লেখা পড়ার খরচ আর নেই!!"

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার সময় শ্রীবিজয় মার্চেণ্ট খেলার ধারা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশের সময় ফাস্ট বোলার-এর জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরি-

কল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। —"কথাটা তিনি রসিকতা করে বলে থাকলেও আমরা বলব এটা সুরসিকতা এবং একথাও বলব যে শুধু স্পীনের চন্দ্রশেখরে হবে না, পেস-এর প্রতাপ না হলে উপন্যাস উতরোবে না"—বলেন আমাদের ক্রীড়ারসিক বিশুখুড়ো।

শিল্পীর চোখে আজকের জাপান

সত্যেন ঘোষাল

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান, প্রাকৃতিক লীলাভূমি স্বপ্নময় দেশ জাপান, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল দেশ জাপান। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি সুযোগ ঘটায় সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য সেই দেশ দেখে এলাম। গত মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর রূপ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে দেখেছি। প্রাচ্যের দিগ্‌বলয়ে অবস্থিত এই সুপ্রাচীন দেশটি আজ যেভাবে প্রগতির আলো সারা পৃথিবীতে সঞ্চারিত করে তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে, তার ফলে কোন্ রূপে তাকে দেখব, তার কিছুটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানতাম যে, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার স্বপ্নে বিভোর সেই দেশটিকে আর দেখা যাবে না এবং দেখবো না কিমোনোয় ঢাকা কমনীয়-সৌন্দর্যে-রূপময়ী জাপানী মেয়েদের। কালো রেখা-টানা সাবলীল স্বচ্ছন্দ লাইনে আঁকা 'সুমী' আর্ট, বা 'ইয়ামাতো-এ' ধরনের প্রসিদ্ধ জাপানী ছবিও সংগ্রহশালা ছাড়া যে আর কোথাও দেখবো না, তা-ও জানতাম; কিন্তু ভাবিনি যে, যা দেখব, তা আমার কল্পনার পরিধি ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

জাপানীরা একটি কথা প্রায়ই বলে থাকে ও মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করে। কথাটির ইংরেজী অর্থ হল, "After disaster, prosperity।" তাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এটি বহুবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটি যে কী আশ্চর্যজনকভাবে নূতন সাজে সেজেছে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়। এর জন্য তারা অবশ্য পুরাতনের যা কিছু ভালো, তাকে একেবারে অস্বীকার করেনি, সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে যথাস্থানে। প্রাচীন যুগের প্রস্তর আলোকবর্তিকা ও চোখ-ঝলসানো নিয়ন-সাইন, সহস্র বর্ষ পূর্বের বুদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টার গুরুগম্ভীর ধ্বনি ও অতি-আধুনিক যন্ত্রমহলের ঝনঝন আওয়াজ, মধুর গন্ধে-ভরা চেরিফুলের অপরূপ সৌন্দর্য ও তার পাশেই যন্ত্র-দানবের উদ্গীরিত কালো ধোঁয়ার মেঘ। ওদের প্রাণবন্ত যুবশক্তি ঐতিহ্যের জীবন-রসে সিঞ্চিত হয়ে আধুনিক কালকে নূতন করে আবিষ্কার করে চলেছে প্রতি পদক্ষেপে।

জাপানের জাতীয় পরিষদের প্লাস্টিক আর্টের আন্তর্জাতিক সংস্থার সৌজন্যে টোকিওতে আমার ছবির প্রদর্শনী সম্ভবপর হয়েছিল, এবং তাঁদের আয়োজন-করা ব্যবস্থায় ওখানকার প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁদের কাজ দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু জাতীয় শিল্প-সংগ্রহশালা ও চিত্র-সংগ্রহগুলিতে জাপানী শিল্পীদের কাজ দেখেছি। ওদের কাজের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যে মূল-প্রবাহ বয়ে চলেছে, তা কীভাবে সম্ভব হলো তা বলতে গেলে আমার আগের লেখা কথারই আরও বিশদভাবে বর্ণনা করতে হয়। যে-সভ্যতার মধ্যে আজকের জাপানী শিল্পীরা বাস করছেন তাকে আধুনিক যন্ত্রযুগের সভ্যতা বলা চলে। টোকিওর প্রসিদ্ধ হানেডা বিমানঘাটিতে নেমে গল্পে-পড়া প্রাচ্য দেশটির ধারণা মনে নিয়ে অগ্রসর হলে কী দেখবেন? গাড়ি আপনাকে মাটির উপর দিয়ে তৈরি করা Super-Highway আশ্রয় করে তীব্র গতিতে নিয়ে যাবে, পথে দেখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে দূরপাল্লার 'Monorail' আপনার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে, অন্য পাশে আপনার মাথার উপরের লাইনে "New Tokaido line"-এ বন্দুকের গুলির গতিবেগে "Bullet train"-এর অবাধ গতি। পথের উপরে পথ, তারও উপরের পথের উপর দিয়ে

শহরতলীর সুন্দরী
শিল্পী : কাবুরাকি, কিয়োকাতা

আদিম ছায়া — শিল্পী : [illegible]

হরিণেরা — শিল্পী : মাতাজো কায়ামা
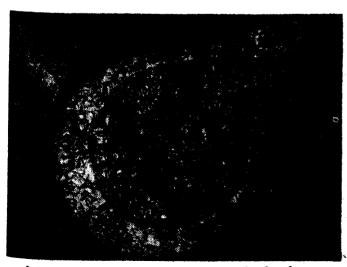
চলার সময় গাড়ির জানালার বাইরে আপনি দেখবেন নূতন ঝকঝকে সাজানো টোকিও শহরের বিরাট অথচ সুদৃশ্য রূপ। গাড়ি, বাড়ি, লোকজন, সমস্তই যেন সব সময়েই উৎসবের সাজে সেজে রয়েছে। পথের দু পাশে বিশাল প্রাসাদের মতো সারি সারি বাড়িগুলি ঝকঝকে কাঁচ ও কংক্রিট-এ তৈরি স্থাপত্যের functional রূপ। এক কথায় আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থিরভাবে জানতে পারবেন যে একটি সুখ সমৃদ্ধ আধুনিক শহরের ততোধিক আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন—যার লোকসংখ্যা সমগ্র জাপানের লোকসংখ্যার এক নবমাংশ। পৃথিবীর এই সবচেয়ে বড়ো শহরে বাস করেন জাপানে যতো শিল্পী তার নব্বই ভাগ, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ হাজার শিল্পী বসবাস করছেন এই শহরে যার সভ্যতার আধুনিকতা ও উৎকর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকার অতি উন্নত শহরগুলির সঙ্গে সর্ব বিষয়ে সমতুল্য। এই কারণেই জাপানী গণজীবনের ধারার সঙ্গে পশ্চিম দেশের শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল দেশগুলির জীবনধারা ও ধ্যানধারণার বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। আজকের দিনের জাপানী শিল্পীর সমস্যা একই যা অন্যান্য আধুনিক সভ্যতায় গড়ে ওঠা দেশের শিল্পীদের চোখের সামনে রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কেমন করে বিস্তার লাভ করবে তাদের মধ্যে যাদের মন আজীবন শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে বর্ধিত হয়ে উঠছে এই সকল যন্ত্রযুগের সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে! এ ছাড়া গত মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের পর তাদের সমাজ চেতনায় সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে যে সমস্যা তা হল কী ভাবে তারা সকল অগ্রসর দেশগুলিকে পিছনে ফেলে সর্বদিক থেকে এগিয়ে যাবে!

কারুশিল্প, স্থাপত্য ও কারিগরী শিল্পে জাপানের বিস্ময়কর অগ্রগতি যেমন সুপরিচিত তেমনি তারা সমান ভাবে উৎকর্ষ দেখিয়েছে ভাস্কর্য ও চারুশিল্পের ক্ষেত্রে। এক টোকিও শহরেই অসংখ্য কলানিকেতন ও চিত্র-সংগ্রহশালায় প্রদর্শনী চলছে, সারা বৎসর কোনও বিরতি নেই, নেই কোনও বিশেষ সময়ের অপেক্ষা। এই সকল প্রদর্শনীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আধুনিক ধারার গভীর প্রভাব দেখা গেলেও আরও দুইটি ধারা—যেমন জাপানী "ইয়ামাতোয়ে" শিল্প ও আধুনিক জাপানী পদ্ধতির ছাপও লক্ষ করা যায়। হোকুসাই, মারুয়ামা ও তারপর ওকাকুরার প্রভাবে হিসীদা, শিমোমুরা, ইয়োকোয়ামা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ Traditional পন্থীদের কাজ যাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে এমন কিছু সংখ্যক শিল্পী যেমন ইমামুরা, কেবায়াসী, সেতাতসু, মারুকি, আরাই, কাবুরাকী প্রভৃতি জাপানী জনসাধারণের মনে এখনও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে আছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বেশ কিছু সংখ্যক জাপানী শিল্পী ইউরোপীয় academic এবং impressionistic ধরনের কাজ করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের কাজে যথেষ্ট উৎকর্ষতা লক্ষ করা গেছে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কীসিদা। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর থেকে পশ্চিম দেশে Cubism, Surrealism ও abstract art-এর প্রচলন হওয়ায় তার প্রভাব এই সকল শিল্পীর কাজের মধ্যে এসে পড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই। এই ধরনের কাজেও জাপানী শিল্পীদের একটি দল বিস্ময়কর উন্নতি দেখাতে পেরেছেন।

আজকের দিনের নূতন জাপানী শিল্পের ধারা যা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে তা এই দুই পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলা চলে, অর্থাৎ এই সকল বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণে এর উৎপত্তি। প্রাচ্য দেশীয় ভাবধারার মূল ভাবকে আশ্রয় করে আজকের দিনের অনেক ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় সভ্যতার পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে যে আন্তর্জাতিক শিল্প ভাষার সৃষ্টি হতে চলেছে তাকে সাদরে আহ্বান করে এনে যাঁরা নূতন ভাবধারার রূপ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন ওকাদা, ইয়ামাগুচি, সাইতো, মুরাই, নামথাতা, কাজুকি, মাজিমা প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীগণ। আমার প্রদর্শনী চলার সময়ে ও তারপর এঁদের অনেকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এঁদের কাজের উচ্চমান ও গভীর অনুপ্রেরণা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে, এবং আজকের দিনের সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় এই সত্যই পরিষ্কার হয়ে দেখা দিয়েছে যে, যে-বর্তমান কালের মধ্যে আজ আমরা বাস করছি তা সেই একই বর্তমান কাল যা অন্যান্য সকল দেশের মধ্যে আজও বর্তমান রয়েছে।

বিলায়েৎ খান

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

সদারঙেগর পর অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর তানসেন সংগীত সম্মেলন মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল। উক্ত সংঘের এটি ঊনবিংশতিতম অধিবেশন। আটটি অনুষ্ঠানে গত সাতরোই ডিসেম্বর এই অধিবেশন সার্থকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সংঘের কর্তৃপক্ষ এই দুরূহ কর্তব্যটি সুচারুরূপে সম্পাদন করাতে শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বেশ কয়েক বৎসর হয়ে গেল এই সব সম্মেলনে নিয়মিতভাবে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকছি। প্রাথমিক উচ্ছ্বাস অনেক-কাল গত হয়েছে। এখন যেন প্রায় অনুষ্ঠানই গতানুগতিক বলে মনে হয়। হয়ত প্রখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানগুলি বারম্বার শুনেই আর নূতনত্ব খুঁজে পাই না—হয়ত বা তাঁদের কেউ কেউ ঠিক আগের প্রস্তুতিতে নেই, কারুর বয়স হয়ে গেছে, কেউ বা নিয়মিত অভ্যস্ত রীতিতে পরিবেশন করে চলেছেন, —আবার কেউ বা তাঁদের ধারণা মত শিল্প-কার্যে পরিবর্তন এনেছেন যার সংগে আমরা ঠিক খাপ-খাওয়াতে পারছি না। যাই হোক, নবতর অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় আছি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এ আশা সফল হবে।

আটদিনব্যাপী অধিবেশনে দুটি প্রায় রাত্রির প্রোগ্রাম ছিল। এর মধ্যে একটিতে বিশেষ কারণে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি, এমন আরো দু-একটি অনুষ্ঠানে ঘটেছে। ১৮ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান তালিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা এবং আরো দু-এক সন্ধ্যার কোনো কোনো শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠানের আলোচনা না দেখলে মার্জনা করবেন। তাঁদের অনুষ্ঠান শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমান নাসির জায়েরুদ্দিন ও ফৈয়াজ জায়েরুদ্দিন ডাগরের যুগ্ম ধ্রুপদানুষ্ঠান সুন্দর লেগেছে। এরা কাম্বোজী রাগে আলাপ করলেন। এ'রা যেটি গাইতে চেয়েছেন তার রূপটি স্পষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। এই ধরনের রাগ সম্বন্ধে একটু পরিচয় শ্রোতাদের গোচর করে রাখলে ভাল হয় এবং রস সম্ভোগের সহায়ক হয়। শ্রীরবীন ঘোষের বেহালায় রাগেশ্রীর আলাপ খুবই মধুর হয়েছে। এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হয়। বোম্বাই-এর শ্রীমতী স্বরূপলতা শঙ্করায় খেয়াল গেয়ে বিশেষ প্রভাব সঞ্চার করতে পারলেন না। তাঁর পরবর্তী অনুষ্ঠান আড়ানায় খেয়াল সম্বন্ধেও একই মন্তব্য করতে হয়। বিস্তারের রীতি আরও সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত না করলে তাঁর পক্ষে শ্রোতৃচিত্ত জয় করা কঠিন।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আচার্য শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলীর হেমবেহাগে সরোদ ভাল লেগেছে। তাঁর প্রবীণ নৈপুণ্য সম্বন্ধে বেশী বলবার আবশ্যকতা বোধ হয় নেই। ওস্তাদ সরাফাৎ হোসেন খাঁর সাওনী এবং হোসেনী কানাড়া উৎকৃষ্ট; কিন্তু পুনরুক্তির জন্য অধিকসময় ব্যয় হয়েছে বলে মনে হয়।

তৃতীয় সন্ধ্যার আসরে কুমারী ইরা মুখোপাধ্যায়ের কেদারায় খেয়াল ভাল লেগেছে। এ'র মধ্যে প্রতিশ্রুতি বর্তমান। শ্রীমান প্রদীপ চক্রবর্তীর কলাবতী রাগে সেতার সাধারণ পর্যায়ের উর্ধে যায় নি। এ'রা তানসেন সংগীত সংঘের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সম্মেলনে শিল্প পরি-বেশনের যোগ্যতা লাভ করেছেন বলে ঘোষণা করা হল। উৎসাহ প্রদানের এই রীতিটি প্রশংসনীয়। শিল্পী বাহাদুর খাঁর কৌশিক-রঞ্জনীতে সরোদ মন্দ লাগেনি। তবে তাঁর ব্যবহৃত রাগের রূপটি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। এক্ষেত্রেও রাগের স্বল্প পরিচিতি পেশ করলে ভাল হত। শিল্পীর প্রয়োগগুলি বলিষ্ঠ এবং তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণও দেখা গেল। শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ রাগে অভোগীতে খেয়াল গাইলেন। আগের তুলনায় তাঁকে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ মনে হল। তথাপি তাঁর অনুষ্ঠান মোটামুটি মন্দ লাগেনি। এই সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন আচার্য শ্রীশচীন দাস মতিলাল। প্রায় একযুগ পরে আবার তাঁর অনুষ্ঠান শোনা গেল। গম্ভীর এবং সুললিত ভঙ্গীতে তিনি সুঘরাই কানাড়ায় খেয়াল গেয়ে শোনালেন।

আমীর খাঁ

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

এ'দের অনুষ্ঠান শুনলে আগেকার সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও নিষ্ঠার কথা মনে পড়ে। তাঁর ঠুংরী চমৎকার লাগল। ঠুংরীতে তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গী উপযুক্ত-ভাবে রক্ষিত হয়েছে। "না মানুঙ্গী" গানটি তিনি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন বলে মনে হল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে আর একটু সময় দিলে খুশী হতাম। প্রসংগত বলি এবারকার মাইকের বন্দোবস্ত আশানুরূপ হয়নি। শুধু অনেক শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজ মাইক মারফৎ সুস্পষ্ট হয়নি, বিশেষ করে ঠুংরী এবং যন্ত্রসংগীতে এই ত্রুটি অসুবিধার কারণ হয়েছে।

চতুর্থ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী মালবিকা কাননের কলাবতী রাগে খেয়াল এবং ঠুংরী অতি উপভোগ্য হয়েছে। বিশিষ্ট গায়নভঙ্গী, সুরেলা কণ্ঠ এবং দরদে তিনি এই সন্ধ্যায় শ্রোতৃচিত্ত জয় করেছেন। আচার্য শ্রী ভি জি যোগ মারু বেহাগে বেহালা বাজালেন কিন্তু তাঁর পরিক্রমা খুব একনিষ্ঠ

ভি জি যোগ

নয়। একজন সুযোগ্য, আবেগপ্রবণ শিল্পী খুশীর খেয়ালে বাজালে যেমন শুনতে হয় তাঁর বাজনাও তেমন; —মিষ্টি, সুখশ্রাব্য কিন্তু রাগসংগীতের বিচারে এর তাৎপর্য বোধ হয় বেশী নয়।

ষষ্ঠ অনুষ্ঠানে দিল্লীর শ্রীমতী সুমিত্রা আনন্দপাল সিংহ সর্বেশ্বরী নামক তথা-কথিত রাগের ধ্রুপদে কোনো রেখাপাত করতে সমর্থ হননি। এই সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছিল ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতার এবং ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর শানাই। এ'রা পূর্বী বাজালেন। বিসমিল্লা পূর্বীর শান্ত গাম্ভীর্য বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন এবং বার বার সম্বর্ধিত হয়েছেন। বিলায়েৎ খাঁর মিষ্টি কাজের তুলনা নেই। সেতারে এক একটা মীড়ে তিনি যে

মিয়া বিসমিল্লা খান

চমৎকারিত্ব দেখাচ্ছিলেন তাতে তাঁর সাধনার সার্থকতা উপলব্ধি করে বিস্মিত হতে হয়। পুলকিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে উচ্ছসিত করতালিতে ক্ষণে ক্ষণে সাধুবাদ প্রদান করেছে। আশা করি, যে উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাগৃহ তিনি অনুষ্ঠানের সময় আলোকসমুজ্জ্বল রাখতে চেয়েছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, শানাইয়ে যা বাজছিল সেতারে বার বার তার পুনরাবৃত্তি না করলে চলত। সেতারের স্বকীয় পদ্ধতিতে তিনি যদি নতুন নতুন কাজ করে যেতেন তাহলে এই দ্বৈত সংগীতে তাঁর স্বকীয়তা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হত এবং একটা নতুন সুরলহরীর সৃষ্টি হত' অর্থাৎ দুজনে দুদিক থেকে ওরিজিন্যাল থাকলেও একটা বিস্ময়কর বস্তু তৈরি হতে পারত।

সপ্তম অনুষ্ঠানের আলোচনা নেহাৎ প্রাথমিক। তাছাড়া আলোচনা "কমনসেন্স"-এর ওপর নির্ভর করেই চলেছিল। অধীতবিদ্যার অভাবে নাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যা আদৌ সার্থক হয়নি। এই রকম ইস্কুল সুলভ আলোচনা দেখে মনে হয়, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের জ্ঞান সম্বন্ধে লঘু ধারণা পোষণ করেন। এর চেয়ে দু একটি উচ্চস্তরের প্রবন্ধ পাঠ করলেও মন্দ হত না। বিদগ্ধ শ্রোতাদের সম্মুখে তানসেন সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যদি ইস্কুল মাস্টারের ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহলে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়। যাইহোক আলোচনার ব্যবস্থা তাঁরা একটা ঐকান্তিক উন্নতির ইচ্ছা নিয়েই করেছেন। সেজন্য তাঁদের সাধুবাদ প্রদান করি তবে ভবিষ্যতে এর প্রতি অনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য—নতুবা বাদ দেওয়াই ভাল। মীড় এবং মূর্ছনা বাজনায় যা দেখান হয়েছে তা ভুল। মনে হয় মূর্ছনার "ডেফিনেশন" এ'দের জানা ছিল না। মীড় সম্বন্ধে ধারণার অভাব অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

অষ্টম অধিবেশনে পণ্ডিত রবিশংকর পূরিয়া রাগে মনোজ্ঞ আলাপে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ রচনা করলেন; তাঁর পিলুও উপভোগ্য। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী পর পর দরবারী কানাড়া আভোগী এবং যোগিয়া রাগে তাঁর কৃতিত্বে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর দরদ এবং মনোরম গীতিভঙ্গী এক এক সময় আবদুল করিম সাহেবের কথা মনে করিয়া দিচ্ছিল। এটি নিশ্চিতভাবে এই সম্মেলনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। শ্রী ডি সি রানাডের যোগরাগে বেহালা চলনসইভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ওস্তাদ আমীর খাঁর রামকেলি এবং তারানা উচ্চাঙ্গ পর্যায়ের অনুষ্ঠান। ক্রম এবং বিন্যাস বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে তিনি যে গম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছিলেন তাতে এই সম্মেলনের মান উন্নীত হয়েছে। সব শেষে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ বসন্তমুখারী রাগে অপূর্ব রসসঞ্চার করেন। এই অনুষ্ঠানেও তাঁর স্বকীয় কর্তব্যগুলি প্রদর্শন করে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখলেন।

এইসব শিল্পীদের সঙ্গে সারেঙ্গীতে ছিলেন ওস্তাদ সাগীরুদ্দিন খাঁ, লছমন খাঁ পণ্ডিত রামনাথ মিশ্র এবং বাচ্চালাল মিশ্র। মৃদঙ্গ এবং তবলায় যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ, শ্রীকানাই দত্ত, শ্রীউত্তম সিং, শ্রীশ্যামল বসু এবং শ্রীশঙ্কর ঘোষ।

শার্ঙ্গদেব

অচেনা আত্মীয়

১৯১৩ সালে ছাপা হয়েছিল অ্যাপোলিনেয়ারের প্রবন্ধ, 'দি কিউবিস্ট পেইন্টার'। তখন অ্যাপোলিনেয়ারের দুজন স্বল্পখ্যাত বন্ধু পিকাসো এবং ব্রাক—চিত্রশিল্পে যে নতুন রীতির সূচনা করেছিলেন, অ্যাপোলিনেয়ারের প্রবন্ধেই তা সর্বাধিক পরিচিত এবং মনোযোগ যোগ্য হয়ে ওঠে। শেষবারের মত তাহিতি দ্বীপে যাবার আগে অদ্ভুত [illegible] পল গগ্যাঁ যখন প্যারিসে তাঁর সমস্ত ছবি ও জিনিসপত্র নিলামে চড়িয়েছিলেন, তখন গগ্যাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কবি মালার্মে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, 'এত রং অথচ তবু এত রহস্য'। ভাস্কর রদাঁরও প্রথম জীবনের দুঃসময়ে সাহায্য করতে এসেছিলেন মালার্মে। জার্মানী থেকে রিলকেও এসেছিলেন রদাঁর জীবনী লিখতে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে চিত্রশিল্পে রিয়ালিজমের প্রসারে যখন প্রচুর বাদ প্রতিবাদ ওঠে, তখন এদুয়ার মানের সপক্ষে জোরালো কলম তুলে ধরেছিলেন এমিল জোলা, গুস্তাভ কুর্বের সমর্থনে এসেছিলেন প্রুধোঁ এবং শাঁফ্লরি। দেলাক্রোয়ার মৃত্যুর পর এক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠানো বোদলেয়ারের দীর্ঘ চিঠি চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এলোমেলো ভাবে এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করলুম পাঠকদের আবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, ফরাসী সংস্কৃতির সুবর্ণ-যুগে, সাহিত্য এবং চিত্র শিল্পের কতখানি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সিম্বলিজম, ডাডা, সুররিয়ালিজম ইত্যাদি আন্দোলনগুলি সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে সমানভাবে অঙ্গাঙ্গী। ইম্প্রেসানিস্টদের থেকে আলাদাভাবে বোঝবার জন্য যখন এক্সপ্রেসানিজমের জন্ম হলো ফরাসী চিত্রশিল্পে, সেই এক্সপ্রেসানিজম আবার ছবির বদলে সাহিত্যকে প্রভাবিত করলো জার্মানীতে। অর্থাৎ ওরা মিলেমিশে ছিল এবং এখনও আছে। ফরাসী জীবিত লেখকদের মধ্যে আঁদ্রে মলরো, আঁরি মিশো, রেনে শার, ইভ বনফোয়া প্রভৃতি অনেকেই চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং শিল্প সমালোচক।

এখন, আমাদের প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে এ ঘটনাটি কী-রকম। বাংলাদেশে লেখক ও চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবে প্রধানত ও সূক্ষ্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লেখকরাই, শিল্প ও ভাস্কর্যের গুণ সাহিত্যে উপস্থিত হয় নি তেমনভাবে। জেমস জয়েস সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, ও'র চোখ খুবই খারাপ ছিল, চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না বলে, ও'র রচনায় চিত্রিত বর্ণনার বদলে শব্দের ধ্বনি নিয়ে পরীক্ষা এত বেশী। আমাদের বাঙালী লেখকদের সকলেরই চোখ খারাপ নয়, কিন্তু রচনায় চোখের ব্যবহার কম। ফলে, বাংলা সাহিত্যে এখনও সংগীতের প্রতি একটা পিছুটান রয়ে গেছে। সংগীতময়তার দিকে ঝোঁক আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর—ঠিক কী হিসেবে ক্ষতিকর, তা অন্য বিশদ আলোচনার বিষয় এবং আমার চেয়ে যোগ্যতর কোনো লেখক সে আলোচনার অধিকারী। যাই হোক, দ্বিতীয় ক্ষতি হয়েছে শিল্পীদের, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে ছবি এঁকে গেছেন, কিন্তু শিল্পের মধ্যে কোনো বিশেষ দর্শনের প্রকাশ করতে পারেন নি। তৃতীয় ক্ষতি সমগ্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির, কারণ, সংগীত ও সাহিত্যের মতন চিত্রশিল্প সঠিকভাবে বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রকৃত অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। কিছু সুরম্য হর্ম্যের অভ্যন্তরে সুশোভিত হলেও—বাঙালী শিল্পীরা সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় অপরিচিত।

ফরাসী শিল্পের প্রদর্শনীতে 'বুর্জোয়া'-দের ভূমিকা সম্পর্কে বোদলেয়ার যে কটাক্ষ করেছিলেন, বাংলাদেশে এখনো সেই পরিবেশ। বস্তুত, আমাদের দেশের একজন চিত্রশিল্পীর সার্থকতা বলতে কী বোঝায়? তাঁর ছবি কিছু অপরিমিত বিত্তবান বা বিত্তবতীরা কিনে নিয়ে যাবেন, অথবা বৈদেশিক দূতাবাসের ও টুরিস্ট সাহেবরা নিয়ে যাবেন বিদেশে, বড়জোর কেন্দ্রীয় সরকার দু'-একখানা ছবি রেখে দেবেন সংগ্রহশালায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উৎসুক সাধারণ মানুষের সে ছবি দেখার কোনো সুযোগই নেই। শুধু দেখা নয়, আধুনিক ছবি নিয়ে যে নানারকম বিপ্লব চলছে, বহু শিল্পী যে শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু বাজি ধরেছেন শিল্পের উত্তরণে—সে সম্পর্কে জানারও সুযোগ নেই। কলকাতায়, বছরে একবার কি দুবার, কয়েকদিনের জন্য মাত্র কোনো শিল্পীর প্রদর্শনী হয়, অনেক সময় সেগুলোর ঠিক মতো খবরও পাওয়া যায় না—খবরের কাগজে সমালোচনা বেরোয় প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাবার পর—কোনোক্রমে কিছু উৎসাহী খবর পেলেও যদি আবহাওয়া খারাপ বা ট্রাম-বাস ধর্মঘটের জন্য যাবার সুযোগ না হয়, তবে শিল্পী আবার ফিরে গেলেন তাঁর অজ্ঞাতবাসে। ধরা যাক, তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর অনেকেই পড়েছেন, এই দুর্দান্ত যুবা বাংলা শিল্পে অনেক ভাঙা-গড়া শুরু করে-ছিলেন, কোনো সং আগ্রহী—যিনি এ পর্যন্ত তাঁর কোনো ছবি দেখেন নি, এখন দেখতে চাইলে—তার কোনো আচির উপায় নেই। সাহিত্যের সৃষ্টি বিনা আয়াসে বাড়িতে সংগ্রহ করা যায়, শিল্পের সৃষ্টি বহু আয়াস ও আগ্রহ সত্ত্বেও লভ্য হয় না।

চিত্র প্রদর্শনীর তো এই দুরবস্থা, তার চেয়েও দুরবস্থা ছবি ছাপার ব্যবস্থায়। ছবির যথাযথ মুদ্রণের সৌভাগ্য তো বহু শিল্পীরই ইহজীবনে হয় না। সংবাদপত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে দু'-একটি ছবি ছাপা হয়, ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইটে, যে শিল্পীর সমগ্র

[illegible] নিজস্ব, রঙের খেলাই যাঁর প্রেরণার মূলে—তাঁর ছবিরও সাদা-কালো প্রতিলিপি কি করুণ! অবশ্য, ছাপা যতই ভালো হোক, ছাপা ছবি মূলের ব্যঞ্জনা সামান্যই ফোটাতে পারে—অনুবাদ কবিতা যেমন দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ।

ছবির জগৎটা এত দূরে বলেই, বাংলা দেশে প্রকৃত রুচিবান বহু ব্যক্তিরও ছবি দেখার কোনো স্বভাব বা দৃষ্টি গড়ে ওঠে না। সুতরাং, দৈবাৎ কখনো কোনো আধুনিক ছবি চোখে পড়লে—সেগুলিকে উদ্ভট ও পাগলামি আখ্যা দিতে রসনা উদগ্রীব হয় অনেকেরই। বাংলাদেশে আধুনিক কবিতাও এক সময় এ রকম আখ্যা পেতো, এখন যেন অনেকেরই তা সহ্য হয়ে গেছে। আধুনিক কবিতা ও গল্প নিয়ে নানা রকম লেখালেখি সভা-সম্মেলন করার পর, এখন আধুনিক সাহিত্যের প্রতি যথার্থই অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়, আধুনিক চিত্রকলা নিয়ে প্রকাশ্যে ও লিখিতভাবে যদি খোলা-খুলি নিন্দেমন্দ ও প্রশস্তি ও আলোচনা শুরু হয়, তবে চিত্রকর ও উপভোক্তার দূরত্ব ঘুচতে পারে, সর্বাংশে সমৃদ্ধ হয় বাংলার শিল্প। এই সব আলোচনায় সাহিত্যিকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের কবি-লেখকদের সঙ্গে শিল্পীদের কখনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল কিনা জানি না। অন্তত তেমন কোনো লিখিত প্রমাণ পাই না। (যামিনী রায়ের ছবি সম্পর্কে বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, কিন্তু নন্দলাল বসুর মৃত্যুর পর কোনো সাহিত্যিকের লেখা চোখে পড়েনি। কমলকুমার মজুমদার ছাড়া আর কোনো লেখক সমসাময়িক চিত্রকরদের সম্পর্কে মনোযোগী কিনা সে-খবরও পাওয়া যায় না।) ফরাসী দেশের মতন, এখানকার লেখক ও শিল্পীরা এক সঙ্গে মিলে হই-হল্লা ও আড্ডা দেন কি না, রেস্তোরাঁ ও পানাগারে অকস্মাৎ তর্কে মেতে ওঠেন কিনা জানতে কৌতূহল হয়। বরং একবার যেন শুনেছিলাম, অবশ্য গুজবও হতে পারে, কয়েক বছর আগে পার্ক স্ট্রীটে নাকি একদল কবি ও শিল্পী কি কারণে যেন হাতাহাতি খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তবে, এখন লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মিলনের একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। চেষ্টা করে, কৃত্রিমভাবে এই মিলন কতদূর সফল হবে—সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, কিন্তু চেষ্টা যে শুরু হয়েছে, তা অভিনন্দন যোগ্য। এই উদ্দেশ্যে ছোট একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে গত সপ্তাহে। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল ও গৌরকিশোর ঘোষ। রবিবার বিকেলবেলা অল্প টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে পার্ক সার্কাসে একটি বাড়ির হলঘরে মিলিত হয়েছিলেন কয়েকজন। লেখকদের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, শঙ্খ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী ও আরো কেউ কেউ। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পরিতোষ সেন, অহিভূষণ মালিক, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্তরায়, রঞ্জন রুদ্র, নবীন মণ্ডল প্রভৃতি। গোড়ার দিকে প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা। কবি ও লেখকের দল মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসে রইলেন, প্রায় নির্বাক, যে-যার সিগারেট টানছেন, মাঝে মাঝে শুধু অ্যাসট্রেটা এগিয়ে দিন তো, আপনার কাছে দেশলাই আছে, আজ কি অসময়ে বৃষ্টি এলো—ইত্যাদি। দূর থেকে দেখে আমার মনে হলো, যেন দু'জন অতি-নিকট আত্মীয় বহুদিন দুই বিদেশে থাকার পর আবার মিলিত হয়েছেন। নিকট আত্মীয়তার কথা ও'রা জানেন, কিন্তু বহুদিন না-দেখার আড়ষ্টতা কাটছে না। আস্তে আস্তে কথা-বার্তা শুরু হলো।

মনে হয়, বেশ কিছুদিন দেখা শুনো হওয়া সত্ত্বেও এই আড়ষ্টতা সহজে কাটবে না। সম্পর্ক তখনই সহজ হবে, যখন ওঁরা পরস্পরের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হবেন—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আবার দেখাশুনো বন্ধ না হয়ে যায়।

সনাতন পাঠক

মহাশয়ের কথার প্রতিধ্বনি করে বলবো: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য সার্থক হইয়াছে। (২৮৬।৬৬)
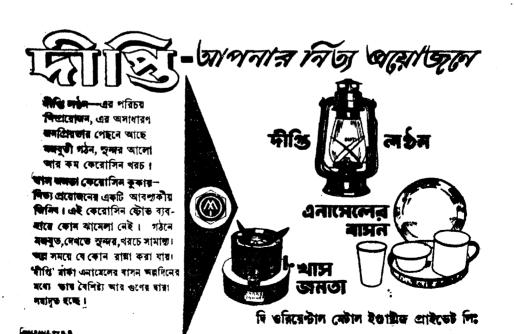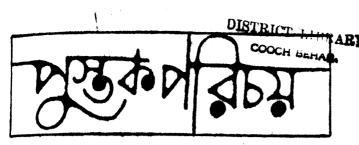
গান্ধী-রচনা

গান্ধীরচনা সংকলন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত। (Selections from Gandhi-র অনুবাদ) অনুবাদক : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলা। মূল্য ৫.০০।

"আমার জীবনই আমার বাণী", বলেছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বস্তুতঃ, নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসকে নিজের জীবনে এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ আর কোনো মহাপুরুষে সম্ভব হয়েছে কিনা, বলা মুশকিল। স্মরণ রাখতে হবে, গান্ধী গুহাবাসী সাধক অথবা আশ্রমবাসী মুনি ছিলেন না; তিনি ছিলেন জননেতা, স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতি, এবং এক খণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন জাতির জনক। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জননেতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য, সংকলকের ভাষায়, 'গান্ধীজীর জীবনের ভিত্ত ছিল ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং সমগ্র মানব পরিবারের ঐক্যে আস্থা।" ঈশ্বর অর্থে সত্য। গান্ধীর আত্মজীবনীর অপর নাম 'সত্যের প্রয়োগ।' গান্ধি-সৃষ্ট রাজনৈতিক হাতিয়ার 'সত্যাগ্রহ'। গান্ধী দর্শনের মূলবস্তু অহিংসা। পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো কালে কোনো জননায়ক এবম্বিধ বস্তু তাঁর আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নি। বুদ্ধ, যীশু বা চৈতন্য যদি কোনো জাতির জনকের ভূমিকা নিতেন তবে তাঁরাই হতেন একমাত্র গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শের শরিক। কারণ একমাত্র তাঁরাই প্রবর্তন করেছেন মহদাদর্শ এবং তাঁরাই তাঁদের আদর্শকে গান্ধীর ন্যায় নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন।

গান্ধীজীর জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁর সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন—বেশির ভাগ ভারতীয়রই তা ছিলেন—তাঁরা তাঁর বক্তৃতা বা রচনা পাঠ না করেও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। (জানা ও বোঝার মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে।) কিন্তু, তাঁর অন্তর্ধানের উনিশ বছর পরে, আজ যখন তরুণ শিক্ষিত ভারতীয় চেনে তাঁকে তাঁর তৈলচিত্র মারফত—তাঁর আদর্শ ও মতবাদ সম্পর্কে জানতে গেলে তাঁর রচনা পাঠ আবশ্যিক।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত Selections from Gandhi এ সম্পর্কে এক প্রামাণ্য পুস্তক। গান্ধীজীর প্রশংসাধন্য এ-পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা) এক পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কৃত-অনুবাদ প্রাঞ্জল।

আজকের আদর্শহীনতা, বিভ্রান্তি, উচ্ছৃংখলতা, নৈতিক অধঃপতনের যুগে গান্ধী-রচনাবলীর পাঠক খুব বেশি জুটবে বলে মনে হয় না। কিন্তু, পুনরুক্তি হলেও বলি, পৃথিবী তো বিপুল এবং কাল নিরবধি। ঐতিহাসিক পুরুষ, যুগন্ধর মহামানবের বাণী নিশ্চয়ই অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারবে। (৪৫৯।৬৬)

বিবেকানন্দ : শতবার্ষিক রচনা

Vivekananda Commemoration Volume 1963—The University of Burdwan. Price Rs. 5.00.

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে-কখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি। চমৎকার কাগজ, সুন্দর ছাপা (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে), সুদৃঢ় বাঁধাই, নিরাড়ম্বর সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, বৃহদায়তন এই গ্রন্থে ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে বিবেকানন্দ-প্রশস্তি নয় কেবল, স্বামীজীর জীবনী, বাণী ও আদর্শের উপরে কতকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, জনার্দন চক্রবর্তী, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, গোপালচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধনকল্পে ডকটর রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতাদি এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

স্মারক গ্রন্থের বেশির ভাগ প্রবন্ধই গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের "কালের যাত্রা ও বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে চিন্তার খোরাক আছে। গোপীনাথ কবিরাজের Bengali Pandits in Mediaeval Varanasi প্রাসঙ্গিক না হলেও অতি মূল্যবান প্রবন্ধ।

স্থানাভাবে প্রবন্ধসমূহের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু প্রাক্তন উপাচার্য

অনুবাদ

চতুর্দোলা। গোলোকেন্দু ঘোষ। অগ্রণী প্রকাশনী, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

চারজন বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যিকের চারটি বিশ্ববিখ্যাত ছোটো গল্পের অনুবাদ 'চতুর্দোলা'। পুশকিনের 'ইশকাবনের বিবি', ডস্টয়ভস্কির 'সৎ চোর', চেখভের 'প্রিয়া' ও টলস্টয়ের 'কি লাভ এতে?' এ-চারটি গল্প ইংরেজী অথবা বাংলায় ইতিপূর্বে অনেকেই পাঠ করেছেন। চারটি গল্পই প্রতিনিধিস্থানীয় দিকপাল লেখকদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-কর্ম আশানুরূপ নয়। গোলোকেন্দুবাবু এ-কাজে হাত লাগিয়েছেন। তাঁর যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। আশা করবো, বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত ছোটো গল্পসমূহের অনুবাদ-প্রকাশের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস লিখিত "পরিচিতিটিও" সুলিখিত। (৩৫৯।৬৬)

উপন্যাস

ভুল সবই ভুল। শেফালী চট্টোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা এবং এই গ্রন্থখানি তাঁর প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির কাহিনী বিন্যাসের কলা-কৌশল অনুধাবন করলে লেখিকা যে সাহিত্য-তীর্থে প্রথম পদার্পণ করেছেন তা অনুমান করা কঠিন। রচনার মধ্যে কোথাও কোনপ্রকার আড়ষ্টতা নেই। সাবলীলভঙ্গিতে প্রত্যেকটি চরিত্র সৃষ্টি এবং এই নতুন লেখিকার অনায়াস-লব্ধ রচনাশৈলী পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গ্রন্থের প্রধান চরিত্র মহুয়ার সাময়িক ভুলের মাশুল হিসাবে তার জীবনব্যাপী আত্মত্যাগ এবং মনের দৃঢ়তা পাঠক-মনকে অভিভূত করে। মহুয়ার একমাত্র পুত্র রাজার আবাল্য বুদ্ধি-দীপ্ত আচার-ব্যবহার এবং উক্তি লেখিকার রচনা-বিন্যাসের গুণে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছে। একাধারে বিয়োগান্তক এবং মিলনান্তক এই মিশ্র পরিণতিতে গ্রন্থ শেষ করে লেখিকা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বইখানা পড়তে আরম্ভ করলে মধ্যপথে কোথাও বিরতির অবকাশ পাওয়া দুষ্কর। লেখিকার প্রারম্ভিক রচনার সূচনা থেকে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত। কিছুটা মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর।

কবিতা

মুক্তিধারা। প্রফুল্লকুমার দত্ত। প্রকাশক: প্রবেশ গৃহ। ৪০ সাউথ রোড। কলকাতা-৩২।

প্রফুল্লকুমার দত্ত ইতস্তত পত্রপত্রিকায় কাব্যচর্চা করে থাকেন। 'মুক্তিধারা' তাঁর আট পৃষ্ঠার একটি কাব্য-পুস্তিকা। ছাপা চক্ষু-পীড়াদায়ক নয়। পাইকা হরফ। বক্তব্য, একজন অন্তর্দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত মানুষের। মুক্তির জন্য যার আকুতি সোচ্চার। কংকাল-সার বাংলাদেশ, তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের নানা দুঃখ দীর্ঘ কবিতাটিতে অনুরণিত।

বিবিধ

পরিবার নিয়ন্ত্রণ ও শিশুকল্যাণ। ডাঃ প্রমোদনাথ রায়। মেডিকো সাপ্লাই কর্পোরেশন: ১৪৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৭৫।

খাদ্যাভাবের প্রসঙ্গে দেশের এখন বড় সমস্যা হচ্ছে পরিবার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। বস্তুত জন সংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার পরিবার নিয়ন্ত্রণ। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়টিই অত্যন্ত সরলভাবে আলোচিত হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে এতে লৈঙ্গ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ থাকলে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হতো। তবুও বিবাহিত জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শিশু পালন সম্পর্কিত নির্দেশাদির জন্য গ্রন্থখানি জনসাধারণের কাজে লাগবে।

পত্রিকা

কবিতা-পরিচয় (পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংকলন) সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ১এ কলেজ রো। কলকাতা-৯। এক টাকা।

কবিতা-পরিচয় কাগজটির সবচেয়ে লোভনীয় তার চেহারা। দেখলেই পাতা ওল্টাতে ইচ্ছা করে। এবং পাতায় পাতায় কাব্যপিপাসুর মন ভ্রমরের মত আটকে যায়। কবিতার পাঠ ও সৃষ্টির চর্চায় যাঁরা ব্যাপৃত তাঁরা এই কাগজটির বৈভবের সংস্পর্শে এসে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। এখানে প্রধানত একজন বিশিষ্ট কবির একটি কবিতাকে পছন্দ করে নেওয়া হয়ে থাকে—এবং সেই কবিতাটি এমন হওয়া চাই যার মধ্যে রচয়িতার কাব্যরুচির ছাপ ধরা পড়ে, ছাঁচ বোঝা যায়। তারপর সেই কবিতাটি একজন নির্ভরযোগ্য কবি বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। পদ্ধতিটি পাঠকের পক্ষে খুবই লাভজনক। এবারের বেছে নেওয়া কবিতা রবীন্দ্রনাথের (দুঃসময়), অমিয় চক্রবর্তীর (বাসাবদল), দিনেশ দাশের (সিংহিনী), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়)। কাব্য বিচারে নরেশ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অরুণকুমার সিকদার। বর্তমান সংখ্যার "আলোচনা" অংশ সমান গুরুত্বপূর্ণ—কবিতার বিভিন্ন সাংসারিক কাজকর্ম পারিবারিক হেতু-অহেতু, ছন্দ-গ্রন্থি প্রভৃতি নিয়ে হরেক বিজ্ঞ তার্কিকতা ঘনীভূত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলবার দায়িত্বে কবিতা-পরিচয়ের শুভ ভূমিকা প্রশংসনীয়।

জোছনা। সম্পাদক: অরুণ বসাক। রহড়া, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০।

নতুন যুগের প্রতিভাবান লেখকদের রচনা সম্বলিত আলোচ্য সংখ্যাটিকে এ বছরে পূজাকালীন একটি বিশিষ্ট প্রকাশন বলে উল্লেখ করা যায়। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধে একটি সুখপাঠ্য সংকলন। সুসম্পাদিত পত্রিকাখানির প্রতিটি রচনাই উপভোগ্য।

চতুরঙ্গিকা। সম্পাদক: অমল লাহিড়ী। ৫০, অধরচন্দ্র দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০।

মুখ্যত গল্প ও কবিতাই এই সদ্য প্রকাশিত ত্রৈমাসিকখানির সম্বল। এই সঙ্গে আছে ছোটদের বিভাগ। নতুন যুগের নামকরা কবি ও কথা-সাহিত্যিকের সঙ্গে বেশ কতক শিক্ষানবীশ লেখকের রচনাও স্থান পেয়েছে, যাদের অধিকাংশেরই রচনা পত্রিকাখানির একটা মান দাঁড় করানোয় বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন লেখকদের প্রতিভাকে উৎসাহিত করা, আর অযোগ্য রচনায় পাতা ভরানো যে এক নয়—এ তত্ত্বটি পত্রিকাখানির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত।

অন্তর্জাতিক জার্নাল—সম্পাদক: কল্যাণ সরকার ও নির্মলেন্দু দাস। ১২০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

চলচ্চিত্র আর্ট সম্পর্কে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার দিকে কিছুকাল ধরে বেশ একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই সংকলনটির পরিচয় পাওয়া যায় চলচ্চিত্রের তত্ত্ব সম্পর্কিত গুটিকয়েক পত্রিকার প্রকাশে। আঙ্গিক সেই কতিপয়ের একটি এবং ক্ষুদ্রাকার হলেও প্রশংসনীয় উদ্যম। আলোচ্য অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে প্রবোধ ঘোষের রচনা জয়দেব বসুর ছোট ছবি। ধ্রুব গুপ্তের যুদ্ধ-বিরোধী চলচ্চিত্র এবং তপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ঋত্বিক ও তাঁর ভাবনা' প্রবন্ধ চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের মনের খোরাক যোগাবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

জীবন দেশের গল্প। সন্দেশ পাবলিকেশানস প্রাঃ লিমিটেড: ১২ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ২·৫০।

জ্যোতিষে মেয়েদের ভাগ্য। শ্রীভাস্কর। আনন্দধারা প্রকাশন: ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

War Against Crime—by N. R. Guha Roy. Security Publishers. 116A Narkeldanga North Road, Calcutta-11. Price Rs. 10.00.

লেস্থর কাহিনী। হেনরি বিলিংস। অনুবাদ: শিশিরকুমার সেন। হোমশিখা প্রকাশনী: কৃষ্ণনগর। মূল্য ১·০০।

মাটি থেকে মহাকাশ। ক্লাইড অর জুনিয়র। অনুবাদ: শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। হোমশিখা প্রকাশনী: কৃষ্ণনগর। মূল্য ১·০০।

ডিজনিল্যাণ্ড—(ডাইনে) ওয়ালট ডিজনি ডিজনি

রঙ্গজগৎ
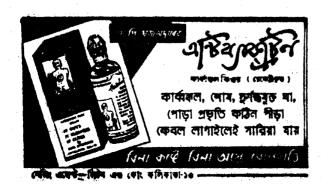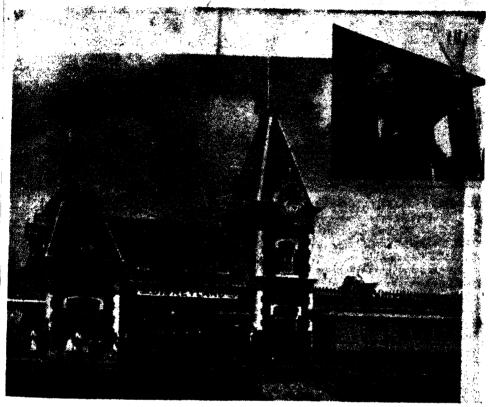
ওয়ালট ডিজনি নেই

শিশুদের কাছে স্বপ্নপুরীর গল্প বলা সহজ। স্বপ্নের দেশে হাত ধরে তাদের নিয়ে যেতে পারেন ক'জন? একজন পেরেছিলেন। এক আশ্চর্য কারিগর। দিনে দিনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেই অদ্ভুত মায়াকানন—ডিজনিল্যাণ্ড। এ-যুগের বিশ্বকর্মার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সারা পৃথিবীর শিশু অপরূপকে দেখে এসেছে দুটি নয়ন মেলে। ভবিষ্যতেও দেখবে। দেখবে সারা বিশ্বের মানুষ। ডিজনিল্যাণ্ড আছে, থাকবে। শুধু ওয়ালট ডিজনি নেই। পয়ষট্টি বছর বয়সে আদুকর মারা গেছেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটি 'লিজেনড'-এর অবসান হল। অর্ধাধিক চার দশকের সাধনায় ডিজনি মোট ৩৯টি 'অস্কার' এবং প্রায় ৮০০ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেন। ডিজনির তৈরি ছবির সংখ্যা ছয় শতেরও বেশী। এর মধ্যে 'অ্যানিমেটেড' কার্টুন চিত্র, প্রকৃতি ও পশু পাখির রহস্য সম্বলিত ছবি, অ্যাডভেঞ্চার, রূপকথা প্রভৃতি সবই আছে। আমেরিকা ও ক্যানাডার টিকিটঘরের বিচারে একশোটি 'হিট' ছবির তালিকার পুরোভাগে রয়েছে ডিজনির তেরোখানি চিত্র। ১৯২৩ সনে তিনি তাঁর ভাই রয়ের সহযোগিতায় "অ্যালিস ইন কার্টুনল্যাণ্ড" তৈরি করেন। সেটাই তাঁর প্রথম ছবি। ১৯২৮ সনে 'মিকি' মুক্তি পাবার পরই ডিজনির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছবি তৈরির কাজে ডিজনিকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি ছিলেন কার্টুনিস্ট। "স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ারফস" ডিজনির প্রথম পূর্ণাঙ্গ রঙিন চিত্র। সত্যিকারের মানুষদের নিয়ে তিনি যে-সব ছবি করেছেন

[illegible]

শ্রীলোকনাথ চিত্রম-এর 'কাল তুমি আলেয়া' (পরিচালনা : শচীন মুখোপাধ্যায়) ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছবির দুটি আলাদা

তার মধ্যে 'রবিন হুড', 'দি ট্রেজার আইল্যান্ড', 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দি সী', 'দি ওল্ড ইয়েলার' প্রভৃতি ছবিগুলি চিত্রামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মৃত্যুর পূর্বে ফ্লোরিডায় তিনি ডিজনিল্যান্ড-এর চেয়েও বড় একটি উদ্যান নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন। সে কাজ অসম্পূর্ণ।

ওয়াল্ট ডিজনির মৃত্যুসংবাদ সমগ্র বিশ্বের চিত্ররসিক মহলে শোকের ছায়া এনে দিয়েছে। তাঁর নিজের দেশে তো বটেই। ডিজনি স্টুডিওর এক অপারেটর খবরটি শুনে বিশ্বাস করতে চান নি। অলৌকিক সৃষ্টির স্রষ্টা যাঁর উপর তিনি কি মরতে পারেন? পরমুহূর্তেই তিনি কেঁদে ফেললেন। কান্না তখন থামতে চায়নি।

চিত্র-সমালোচনা

ফিরে চল

"ফিরে চল" (অলকানন্দা এন্টারপ্রাইজ) ছবিটি স্টারসিস্টেম বর্জিত। ছবিতে স্টার থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ "ফিরে চল" এক্সপেরিমেন্টাল, চিত্রধর্মী ছবি তো নয় যে আর্টই এখানে প্রধান। বরঞ্চ পুরোপুরি সিনেমারই গল্প (বাসন্তী দেবী রচিত) নিয়ে তৈরি এ-ছবি। অর্থাৎ যে গল্প দর্শকের কৌতূহল ক্ষণে ক্ষণে উজ্জীবিত করে, দর্শককে বিশেষ কোন অনুভূতির শরিক করে তোলে না। তবে স্টার নেই বলে এ-ছবির প্রতি দর্শকের অনাদর হবার কথা নয়। পরিচালক অতনুকুমার গল্পটি জমাতে পেরেছেন। চিত্রনাট্য প্রথম থেকেই মনোযোগ আকৃষ্ট করে, শেষের পরিণতির জন্য দর্শক সাগ্রহে অপেক্ষা করেন। কাহিনীর নায়িকা বিয়ে ঠিক হবার পর পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছে। সে অপরিচিতার এক পত্রে পাত্রের চরিত্রহীনতার কথা জেনেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যে যুবকের সান্নিধ্যে সে এসেছে তাকেই সে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছে। বলা বাহুল্য, ছবিটি মিলনান্তক। মিলন কী-ভাবে ঘটল তা বসে দেখতে বেশ ভালই লাগে।

ছবির 'টেকনিক্যাল' কাজ কাঁচা। পরিচালনাও সহজ, সরল। তবে নায়ক অতনুকুমার (চিত্র-পরিচালনাও তাঁর) এবং নায়িকা সবিতা বসু আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী বসুর অভিনয় বেশ প্রাণবন্ত। অতনুকুমারকে রোমান্টিক নায়ক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অসিতবরণ প্রথমে লম্পট এবং পরে অনুতপ্ত এক বিত্তবান যুবকের চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন। জহর রায় ও তরুণকুমার কৌতুকের উপকরণ জুগিয়েছেন। নায়িকার পিতার চরিত্রে অশোক মিত্র বাস্তবরূপে। বিশেষ চরিত্রে কমল মিত্র, আরতি দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেছেন।

সংগীত পরিচালক ভি বালসারা সুরারোপিত গান ছবির বিশেষ আকর্ষণ।

আয়ে দিন বাহার কে

শীত যদি আসে, বসন্ত কি আর দূরে পড়ে রইবে? এক শ্রেণীর 'হিন্দী' ছবির বেলায় কিন্তু এই উক্তি খাটে না। এখানে বসন্ত আগে আসে, শীত পরে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ঘরের নায়ক বিত্তবানের কন্যাকে অতি অল্প আয়াসেই প্রেমিকা রূপে পেয়ে যায়। আয়াস মানে নায়িকার পিছু পিছু ঘোরা, তাকে নানাভাবে জ্বালাতন করা। তারপর নায়িকা 'বদলা' নিতে গিয়ে বদতমীজকেই ভালবেসে ফেলে। "আয়ে দিন বাহার কে" (ফিল্মযুগ) ছবিতে নায়ক-নায়িকার জীবনে বসন্ত এই একই ফরমুলায় এসেছে। তারপর শীত, অর্থাৎ বিরহ, বিচ্ছেদ।

নায়িকার পিতা যখন সানন্দে তার কন্যাকে (আশা পারেখ) নায়কের (ধর্মেন্দ্র) হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন তখনই দর্শক অনুমান করে নিয়েছেন, গোলমাল শুরু হতে বিলম্ব নেই। বাগদান-উৎসবে জানাজানি হয়ে গেল নায়ক তার জননীর অবৈধ সন্তান। এর পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়।

ইস্টম্যান কালারের ছবিতে 'বাহার' আবার ফিরে এসেছে শেষ মুহূর্তে। রেল লাইনের

জে আর প্রোডাকশন্সের "নল দময়ন্তী" ছবির গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে (বাঁ-দিক থেকে) মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরকার কালীপদ সেন ও উত্তমকুমার

বি আই প্রোডাকশন্স-এর "গাবন" (পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখার্জি) ছবিতে সুনীল দত্ত ও সাধনা—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

উপর দিয়ে নায়িকা ছুটে যাচ্ছিল চলন্ত গাড়ির দিকে, নিচে পড়ে মরবে বলে। নায়ক পিছন থেকে দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা মেরে জলে দিয়ে পরে বুকে তুলে নিয়েছে। বলা বহুল্য, এর আগে নায়ক জেনেছে সে অপরিণীতার সন্তান নয়। পিতার (বলরাজ সাহনী) সন্ধানও সে পেয়েছে।

একেবারে ছকে বাঁধা গল্প। কৌতুকের নামে সেই ছ্যাবলামি, সেই নাচ, গান, অপ্রাসঙ্গিক মিলন, বিরহ, পুনর্মিলন। কিসের পর কী ঘটবে দর্শক আগেই তা বলে দিতে পারেন। অতএব পরিচালক রঘুনাথ ঝালানির কাছ থেকে এই ছবির দর্শকরা নতুন কিছু পাবেন না। তবে কিছু সুশ্রাব্য গান উপহার পাবেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের কাছ থেকে।

এই ধরনের ছবির অভিনয় যেমন হয়, ধর্মেন্দ্র ও আশা পারেখ তা-ই করেছেন। অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলরাজ সাহনী।

নেপথ্যে

দিলীপকুমার তাঁর নিজের ছবির জন্য গল্প খুঁজছেন এই সংবাদ আমরা কিছুকাল আগে পেয়েছিলাম। গল্প খোঁজার পর্ব এখন শেষ হয়েছে। গল্প তিনি পেয়েছেন। শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জনপদ বধূ" ও "সিঁদুর টিপ" গল্প দুটির হিন্দী অনুবাদ বেরিয়েছিল। দিলীপকুমার হয়ত গল্প দুটি পড়েছিলেন। তারপর লেখককে খুঁজে বের করলেন তিনি। বললেন, গল্প চাই। দিলীপকুমারের অনুরোধে বোম্বাইয়ে গেছেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি গল্পও লিখে ফেলেছেন। তারই ভিত্তিতে তৈরি হবে দিলীপকুমারের ছবি। ছবির নামকরণ এখনও হয় নি।

কলকাতায় "মেরা ভাই" (মণিহার-এর হিন্দী) ছবির শুটিং হবে। উত্তমকুমার ও দেব মুখার্জি সাজবেন দুই ভাই। দুই ভাইয়ের মাঝখানে নায়িকার বেশে কে আত্মপ্রকাশ করবেন সে-সম্বন্ধে ছবির প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহ ও পরিচালক সলিল সেন নীরব। নতুন কোন শিল্পীকে নায়িকা রূপে দেখা যাবে এ-কথাও রটেছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, নতুন কেউ নয় জনপ্রিয় অভিনেত্রীদেরই একজন হবেন নায়িকা। শর্মিলা ঠাকুর কি?

উত্তমকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে একসঙ্গে আবার কোন্ ছবিতে দেখা যাবে? যতদূর জানি, "বিবর"-এ। "খেয়া"-র পরেই "বিবর"-এর কাজ শুরু হবে। দুটি ছবিরই প্রযোজক শ্যামল মিত্র। পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এখন রয়েছে "খেয়া" ও "দুরন্ত চড়াই"। তারপর তিনি "বিবর"-এ মনোনিবেশ করবেন।

বি কে প্রোডাকসন্স প্রযোজিত "নায়িকা সংবাদ" খুব শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। নিখোঁজ এক চলচ্চিত্র নায়িকার গল্প এই "নায়িকা সংবাদ"। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা

সম্প্রতি ডালটনগঞ্জে ফিল্ম ক্র্যাফট-এর "পঞ্চশর"-এর কিছু রোমান্টিক দৃশ্য তোলা হয়—(উপরে) পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা, (নিচে) রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফটো-দেশ

উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরে এই কাজ সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনার জন্য সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। নয়জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে ই-আই-এম-পি-এ এর চারজন প্রতিনিধি, কিনেমাটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসায়েটি, সিনেমা এক্‌জিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন, হোটেল অ্যাণ্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থার একজন করে প্রতিনিধি এবং একজন সেন্সর অফিসার ও রাজ্য সরকারের প্রচার অধিকর্তাকে নেওয়া হয়। ১৯৬১ সন থেকে প্রচার-চিত্রের সেন্সর-শিপের একটি নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও শ্রম-মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার এই সেন্সরশিপের উদ্দেশ্য এবং বিধি-প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেন। অ্যাডভাইসরি কমিটি সেন্সরশিপের যে 'কোড' প্রণয়ন করেছেন তাও শ্রীনাহার উল্লেখ করেন। প্রদর্শনী প্রচারের জন্য যে-সব বিজ্ঞাপন-চিত্র ব্যবহার করা হবে তা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকবে। এমন কোন ছবি তাতে থাকবে না যা মানুষের নিম্নপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, যা ধর্ম-বিরুদ্ধ, বিভীষিকাময় এবং সমাজবিরোধী। শ্রীনাহার আরও জানান, গত মাসে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে মোট ৩৪টি ছবির পোস্টার, স্টিল, শো-কার্ড, বিজ্ঞাপন (সংবাদপত্রের জন্য) ও স্লাইড সেন্সর করা হয়েছে।

পরিশেষে শ্রীনাহার সেন্সরশিপের কাজে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। এবং জানান, উপদেষ্টা কমিটিতে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর একজন সভ্য নেওয়ার কথা তাঁরা ভাবছেন।

পরলোকে গীতিকার শৈলেন্দ্র

হিন্দী ছবির বিশিষ্ট গীতিকার ও কবি শৈলেন্দ্র (শংকর শৈলেন্দ্র) গত ১৪ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের এক নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেছেন।

ছায়াছবির গান রচনার কাজে শৈলেন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেন রাজকাপুর। শ্রীকাপুরের "বরসাত" ছবির মাধ্যমেই শৈলেন্দ্র সিনেমার গীতিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এরপর আওয়ারা, দাগ, আনারকলি, বুট পালিশ, দো বিঘা জমিন, পুনম, শ্রী৪২০ জাগতে রহো, চোরি চোরি, সীমা এবং ইদানীংকালে বহু বিখ্যাত ছবির গীতিকার রূপে শৈলেন্দ্রর খ্যাতি দিনের পর দিন বাড়তে চলে। কয়েকদিন আগে তাঁর শেষ গান রাজ কাপুরের "মেরা নাম জোকার"-এর জন্য রেকর্ড করা হয়।

শৈলেন্দ্র প্রযোজিত "তিসরী কসম" সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। এই একটি ছবিই তিনি প্রযোজনা করেছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রজগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ কাপুর আর কে স্টুডিওর কাজ বন্ধ করে দেন, এবং জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছেড়ে নার্সিংহোমে গিয়ে উপস্থিত হন। এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর আরও একাধিক ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬২ সনে "প্রোফেসর" ছবির গান রচনার জন্য শৈলেন্দ্র বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে শ্রেষ্ঠ গীতিকারের পুরস্কারে ভূষিত হন।

অমায়িক চরিত্রের এই গীতিকবি চলচ্চিত্র-মহলের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

কণ্ঠশিল্পীর বিদেশ-সফর

ভারতীয় ছায়াছবির দুই জনপ্রিয় নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্ত ও সুবীর সেন বিদেশ সফর করে এসেছেন। আমন্ত্রিত এই দুই শিল্পী প্রথমে সুরিনামে গান করেন। সেখানে তাঁদের গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল ছয়টি। ব্রিটিশ গায়নাতে মোট আটটি আসরে তাঁদের গান করতে হয়েছিল। ত্রিনিদাদ ও সানফারনানদোতেও তাঁদের গানের ব্যবস্থা হয়। তাঁরা বিদেশ যাত্রা করেছিলেন গত সেপ্টেম্বর মাসে। এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সুবীর সেন বলেন, ওই সব স্থানে আধুনিক বাংলা ও হিন্দী গান শ্রোতারা এতটা আগ্রহের সঙ্গে শুনবেন তা ভাবতে পারিনি।

প্রত্যেক শহরেই শিল্পীরা অভিনন্দিত হন। সুবীর সেনের ইংরেজী গান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কোআইত সরকারের

অজোয়ার 'আরোগ্য নিকেতন'-এর গান রেকর্ডিং-এর সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক বিজয় বসু ও সন্ধ্যা রায় ফটো-দেশ

বিদেশ সফর কালে গীতা দত্ত ও সুবীর সেন

আমন্ত্রণে সেখানকার আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে শিল্পীরা গান গেয়ে শোনান। কোআইতে তাঁদের টেলিভিশন প্রোগ্রামেও যোগ দিতে হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় বাংলা ও হিন্দী আধুনিক কণ্ঠসংগীতের সমাদর ক্রমবর্ধমান—বিদেশ-সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে শ্রীসেন এই মন্তব্য করেন। শিল্পী দলে নৃত্যপটিয়সী কাঞ্চনমালাও ছিলেন।

পাঠকের চোখে

প্রমথেশ-প্রতিভা

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার চলচ্চিত্রের শিল্প-মূল্য নিয়ে আজ বাদানুবাদের শেষ নেই। অনেকে এখনও তাঁকে সঙ্গত কারণেই বাংলা দেশের তথা ভারতের শিল্প-চিত্রের পথিকৃত বলে মনে করেন। আবার চলচ্চিত্র-চিন্তায় ব্যস্ত নতুন এক দল 'প্রমথেশ কিছু নয়' এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। এই সব সমালোচক সোৎসাহে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বকেই আঘাত করছেন। ভাবখানা এই : শ্রীবড়ুয়ার চলচ্চিত্র-শিল্পে অধিকার জন্মেছিল নেহাত পারিবারিক প্রতিষ্ঠার জোরে।

গত বছরের প্রথম দিকে ফরাসী চলচ্চিত্র সমালোচক জর্জ সাদুল ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বড়ুয়া-চিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তিনি "দেবদাস" ছবিটি দেখতে চেয়েছিলেন: প্রিন্ট না থাকায় সেটি দেখবার সুযোগ পান নি। দেখেছিলেন "শাপমুক্তি"। "শাপমুক্তি" বড়ুয়ার ভাল ছবির অন্যতম নয়। সাদুল কিন্তু ওই ছবির মধ্যেও বড়ুয়ার সিনেমাটিক একসপ্রেশনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করেন। "দেবদাস", "অধিকার", "গৃহদাহ", "রজত-জয়ন্তী" প্রভৃতি ছবি দেখলে তাঁর প্রশংসা আরও কত জোরালো হত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সত্যজিৎবাবু কিছুকাল আগে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, বড়ুয়ার ছবি তিনি বহুদিন পূর্বে দেখেছেন; "দেবদাস", "অধিকার", "রজত-জয়ন্তী", "গৃহদাহ" প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কিছু মনে নেই। সম্প্রতি তিনি "মুক্তি" দেখেছেন; সেটি তাঁর ভাল লাগেনি। তবে কিছু কিছু ক্যামেরার কাজ তাঁর মতে ভাল। বি-এফ-জে-এ আয়োজিত এক সভায় শ্রী রায় কতকটা ওই ধরনের অভিমতই ব্যক্ত করেন। তবে সেখানে তিনি বলেন, বড়ুয়ার খুব অল্প ছবি তিনি দেখেছেন; অতএব তাঁর প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে তিনি অক্ষম। সম্প্রতি 'ফিল্ম' পত্রিকায় তিনি সরাসরি বড়ুয়ার ছবির নিন্দাই করেছেন। বলেছেন, বড়ুয়ার ছবি তিনি দেখেছেন, তবে "পথের পাঁচালী" তৈরি হবার পর। এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে বড়ুয়ার দানকে তিনি অস্বীকার করতে চান।

সত্যজিৎবাবুর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগায় অবশ্য শিল্পের ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায় না, শিল্পও না। যে-কোনও জিনিসের মত শিল্পেরও উন্নতি হয় ধাপে ধাপে। ১৯৩৫ সনে প্রমথেশের সৃষ্টি "দেবদাস"কে সেকালের সমালোচকদের কেউ কেউ প্রথম ভারতীয় শিল্প চলচ্চিত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সে-বছর "দেবদাস" নির্মিত না হলে ১৯৫৫ সনে "পথের পাঁচালী" হয়ত আমরা পেতাম না। হয়ত আরও কয়েক বছর তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হত। বারগম্যান, ফেলিনি, আনতোনিওনিকে যখন আমরা শ্রদ্ধা জানাই, তখন কি আইজেনস্টাইন-চ্যাপলিনের দানটুকু অস্বীকার করি? স্বদেশের বেলায় অনুরূপ সৎ বিচারবোধ এবং উদারতা থাকবে না কেন?

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া

বোম্বাইয়ে মলয় গীতবীথি

প্রবাসী বাঙালী মহিলা সমিতির রৌপ্য-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত খ্যাতনামা সংগীত সংস্থা মলয় গীতবীথি সম্প্রতি পরিবেশন করেন 'শ্যামা' ও 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্র-নাট্য মন্দিরের দু দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন শেফালী সান্যাল। অনুষ্ঠান-প্রারম্ভে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সান্যাল। দু দিনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন শক্তি নাগ, নরেশকুমার, রূপশ্রী মৈত্র, তপতী দাশগুপ্ত, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ দাস, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রীবৃন্দ।

সংগীতে ছিলেন রাখাল রক্ষিত, নিখিলেশ সেন, স্বপন রায়, বনানী দাশগুপ্ত, মনীষা গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জনা দাশগুপ্ত, স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমরেন্দ্র দত্ত ও অজিতকুমার সান্যাল।

"অপারেশন বেইরুট" চিত্রের একটি দৃশ্যে রিচার্ড হ্যারিসন ও ক্যারল ব্রাউন

বিশ্বরূপার "জাগো" নাটকের কয়েকজন শিল্পী : (বাঁদিক থেকে) রূপক মজুমদার, অসিতবরণ, জয়শ্রী সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার

ফটো-দেশ

পাদপ্রদীপের আলোয়

বিশ্বরূপায় "জাগো"

ফিল্মের ক্ষেত্রে আজকাল "ডি-ড্রামাটাইজেশন" বা বি-নাটকীয়তার কথা খুব শুনতে পাই। নাটকেও তার কিছুটা আভাস দেখতে পেলাম বিশ্বরূপার বর্তমান আকর্ষণ "জাগো"-তে। অবশ্য নাটকটি নাট্যরসহীন নয়। বরঞ্চ বলতে পারি নাট্যরসের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে "জাগো"-তে। বনফুলের "ত্রিবর্ণ" উপন্যাস অবলম্বনে এই নাটক রচিত। শুরুতে দেখি, এক নাট্যকার একটি ডায়েরী কুড়িয়ে পেয়েছে। একটির পর একটি ডায়েরীর পাতা উল্টে যাওয়ার মতই নাটকের চরিত্র ও ঘটনাগুলি মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার মিছিলের মত। আদি-মধ্য-অন্তবিশিষ্ট কোন নিটোল গল্প "জাগো"-তে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেটা বোধহয় নাট্যপরিচালক রাসবিহারী সরকারের লক্ষ্যও ছিল না। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আদর্শনিষ্ঠ কয়েকটি চরিত্রের সংগ্রাম, পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সংঘাত এবং অবাক প্রেম নিয়েই নাটকের মূল ভাবকল্প। গণেশ হালদার, সুবেদার খাঁ, ঝিনুক ডাঃ সুঠাম মুখার্জি প্রভৃতি চরিত্র নাটকের ভাব ও ভাবনার প্রতীক।

এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটিকে বিচার করলে দর্শকরা রসগ্রহণে বঞ্চিত হবেন না। গণেশ হালদার, সুবেদার খাঁ, ও ঝিনুকের লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশ থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। সে-কারণে তারা দর্শকের সহানুভূতি হারায় না। এবং তাদের "অ্যাডভেঞ্চারিজম"-এ রোমান্সের উপকরণও মেলে। চরিত্রহীন ডাঃ ঘোষালেরও একটি 'চরিত্র' আছে। সে অসহায় ও প্রাণবন্ত, ভালবাসা পেতে চায়। ঝিনুকের মনে সাড়া জাগায়। পরিচালক শ্রীসরকার তিনটি চরিত্রের (ডাঃ ঘোষাল, ঝিনুক ও গণেশ হালদার) মধ্যে অনুচ্চার প্রেমের যে জট সৃষ্টি করেছেন তা দর্শকের মন স্পর্শ করে। ডায়েরীর পাতার মত আবেগের কণাও নাটকে অসংলগ্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। শেষ দৃশ্যে দর্শক যেন সেগুলি একসঙ্গে কুড়িয়ে নেন।

দেশাত্মবোধ নাটকে যে-ভাবে রাখা হয়েছে তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। নাটক শুরু হবার আগেই দেশপ্রেমের গান দর্শকের মন স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। কিন্তু বর্তমান শাসনব্যবস্থা ও সরকারী নীতির যে সমালোচনা নাটকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও বিপ্লব সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করে তোলার যে আহ্বান জানানো হয়েছে তা যেন শুধু জনমানসের তুষ্টির জন্যই সযত্নে সংযোজিত। নাটকের এই "বৈপ্লবিক" চিন্তাধারার মধ্যে গঠনমূলক দেশসেবা বা আদর্শবাদের স্বীকৃতি সামান্য। তবে সুখের বিষয়, কোন দলীয় রাজনীতি প্রচারের প্রয়াস নেই নাটকে।

প্রয়োগকার হিসাবে শ্রীসরকার "জাগো"-তে আবার তাঁর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। স্বল্পতম মঞ্চসজ্জার সঙ্গে পশ্চাতে দৃশ্যপট ও 'স্লাইড'-এর সাহায্যে এবং নেপথ্যে নানাপ্রকার ধ্বনি ও শব্দের মাধ্যমে পরিচালক বিভিন্ন ঘটনার পরিবেশ ও পটভূমি যে-ভাবে রচনা করেছেন তা দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অভিনয় সম্ভবত নাটকের সব চাইতে বড় সম্পদ। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ ঘোষাল), অসিতবরণ (ডাঃ সুঠাম মুখার্জি), নির্মলকুমার (গণেশ হালদার) ও রূপক মজুমদার কয়েকটি পুরুষচরিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছেন। চরিত্রগুলিকে অনেক মুহূর্তে কৃত্রিমতার উপরে তুলে ধরেছেন। এঁদের প্রত্যেকের অভিনয় অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দেয় ঝিনুক। এই চরিত্রে অনুচ্চার প্রেম, দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা সবই আছে। এবং চরিত্রটির অন্তরের কথা ও ব্যথা অতি চমৎকার প্রকাশ করেছেন জয়শ্রী সেন। মঞ্চাভিনয়ে একটির পর একটি নাটকে তিনি যে নৈপুণ্য দেখাচ্ছেন তা সবিস্ময়ে লক্ষ করার মত। ক্রীতদাসীর বেশে তিনি নৃত্যকুশলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই নাচ কি অপরিহার্য ছিল?

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন সুস্মিতা সান্যাল, বিদ্যুৎ গোস্বামী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও আরতি দাস।

বিবিধ প্রসঙ্গ

চার্লি চ্যাপলিনের "এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং" লণ্ডনের কার্লটন থিয়েটারে ৫ জানুয়ারী মুক্তি পাবে। ছবির শুটিং শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যেই "এ কাউন্টেস..." দেখবার সুযোগ পাবেন দর্শকরা। সোফিয়া লোরেন ও মারলোন ব্র্যাণ্ডো অভিনীত এই ছবির কাজ শুরু হয়েছিল এ বছরের ২৪ জানুয়ারী।

চেকোস্লোভাকিয়ার আধুনিকতম ছবিতে 'সেক্স' যে পরিমাণে দেখা যাচ্ছে তাতে নাকি সেখানকার দর্শক ও সরকার রীতিমত চিন্তিত। প্রাগের একটি সংবাদপত্রে সম্প্রতি "সিক্স টাইমস সেক্স" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে এই সমস্যার আলোচনা আছে। 'সেক্স' বাদ দেওয়ার কথা প্রবন্ধে বলা হয়নি। "লভস্ অব এ ব্লণ্ড"-এর 'বেডরুম' দৃশ্য বাদ দিলে ছবিটির কোন অর্থ থাকে না—সে কথা প্রবন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধকার বলেন, অনেক ছবি থেকে অনুরূপ দৃশ্য বাদ গেলে ভাল হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

ট্রাম ও বাস ধর্মঘট আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১২ ডিসেম্বর ট্রাম এবং ১৩ ডিসেম্বর বাস ধর্মঘট শুরু হয়। আংশিকভাবে বাস ধর্মঘট মাত্র দু'দিন চলেছে। দ্বিতীয় দিন অধিক রাত্রে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ এবং অ্যাসিড বালব ছোঁড়া ব্যতীত অন্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। যেসব স্টেট বাস কর্মী ধর্মঘটে যোগ দেন নি তাঁদের সাহায্যে এ দু'দিন কয়েকটি নির্দিষ্ট রুটে কিছু সংখ্যক স্টেট বাস চালানো হয়। এই সব রুটে প্রাইভেট বাসও যথারীতি চলাচল করে। সরকারী মতে প্রায় ৫০০ কর্মীকে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটের প্রারম্ভ থেকে প্রায় একশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে পরওয়ানা রয়েছে। ইতিমধ্যে বহু কর্মী নাকি মুচলেখা দিয়ে কাজে যোগদান করেছে। সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে নি। প্রাইভেট বাসের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রাম ধর্মঘটের অবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

দেশী সংবাদ—

১২ **ডিসেম্বর**—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনায় ৫২০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাবটি এবারে অনুমোদন করেছেন বলে জানা যায়। রাজ্য সরকার তাঁদের নিজস্ব সম্পদ থেকে এর মধ্যে ২২৫ কোটি টাকার মত যোগান দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রচুর অর্থ দিতে চেয়েছেন বলে বোমবাই-এর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সংবাদ বেরিয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্পর্কে বলেন : "এই সংবাদ কেবল মিথ্যা ও ভিত্তিহীনই নয়, বিপজ্জনকও বটে।"

১৩ **ডিসেম্বর**—বিহার মন্ত্রীসভা আজ মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শানিদারের গুলির ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শ্রী পি কে জে মেননের সাহায্য চেয়েছেন। শ্রীমেননকে নিয়ে একজনের তদন্ত কমিশন গঠিত হবে।

১৪ **ডিসেম্বর**—প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসির ফলে কংসাবতী প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। আশু কোন সুরাহা না হলে প্রস্তাবিত কাজে বাধা ঘটবে এবং তার ফলে যে ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহের কথা ভাবা হয়েছিল তা পণ্ড হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাবার জন্য দেশে পুলিস বাহিনী পুনর্গঠনের আবেদন জানান। তিনি বলেন, পুলিসের কাজকর্ম যে ক্রমশই জটিল হয়ে পড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের সব প্রয়োজনের মোকাবেলা করার জন্য পুলিস বাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৫ **ডিসেম্বর**—অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল কর্মচারীই বাড়িভাড়া ভাতা পাবেন এবং সেজন্য ২৫০ টাকা পর্যন্ত বেতন-ভোগী কর্মীকে কোন রসিদও দাখিল করতে হবে না। এতদিন শুধু কলকাতা ও হাওড়ার কর্মীরাই এই ভাড়া ভোগ করতেন। রাজ্য কর্মীদের ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন ভাতা এবং বর্ধিত চিকিৎসা ভাতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাও সত্বর কার্যকর হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন গতকাল একথা ঘোষণা করেছেন।

যাত্রী বিক্ষোভের দরুন আজ শিয়ালদহ-বজবজ লাইনে আটঘণ্টার মত ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। এইদিনই ওই লাইনে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে। বিক্ষোভের কারণ সেই—বগির সংখ্যা কম। সকাল সওয়া সাতটা নাগাদ বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ চরমে ওঠে। তারপর থেকেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

১৬ **ডিসেম্বর**—ছাত্র বেতন এবং অন্যান্য সূত্রে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। অবস্থা এতই গুরুতর যে, অধ্যাপক ও কর্মচারীদের ডিসেম্বরের বেতন দেওয়ার প্রয়োজনীয় টাকাও তাঁদের হাতে নেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেন। মাসে বেতন বাবদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা।

কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত এলাকায় চীনাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া সর্বত্র পাকিস্তানের ফৌজী তৎপরতা বাড়ছে। ফলে, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিদর্শকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে।

১৭ **ডিসেম্বর**—বোমবাই-এর রেলওয়ে সদর দফতরে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রেলওয়ের তাপ্তী ভ্যালী লাইনে নন্দুর-সুরাট সেকশনের খান্দরা ও কুয়াতগাও স্টেশনের মধ্যে সুরাটগামী প্যাসেনজার ট্রেনখানি লাইনচ্যুত হওয়ায় দু'টি শিশু সহ ১৩ জন যাত্রী নিহত ও ২৪ জন আহত হয়েছেন।

আকালি নেতা সন্ত ফতে সিং আজ সকাল থেকে তার পূর্ব ঘোষিত অনশন শুরু করেছেন। অনশন না-করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। শিখ নেতার দাবি—পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে সব সাধারণ সূত্রগুলি ছেদ করতে হবে, চণ্ডীগড় এবং আরও কিছু এলাকা পাঞ্জাবকে দিতে হবে, ভাকরা প্রকল্পের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করতে হবে। দাবি পূরণ না হলে, ২৭ ডিসেম্বর তিনি আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করবেন।

১৯ **ডিসেম্বর**—আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সহ সকল বিভাগ খুলেছে। পূজার এক মাস ছুটি নিয়ে সত্তর দিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম এইদিন থেকে আবার শুরু হওয়ার কথা। ১৯৪৬ সালের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদিন ধরে বন্ধ থাকার ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রেসিডেন্সি কলেজ অবশ্য বন্ধ রইল।

বিদেশী সংবাদ

১২ **ডিসেম্বর**—পাকিস্তান প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের এক খবরে প্রকাশ, মাদারিপুরের নিকটবর্তী নদীতে একখানি লঞ্চ উলটে জলমগ্ন হওয়ায় একশত লোক নিখোঁজ হয়েছে। লঞ্চখানিতে চারশত যাত্রী এবং মালপত্র বোঝাই ছিল।

১৩ **ডিসেম্বর**—গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট এবং মার্কিন কূটনীতির পাল্লায় দু'পক্ষ সমান-সমান প্রতিপন্ন হন। একটি প্রস্তাব দিয়ে সোভিয়েট পক্ষ চাল দেন। দ্রুত পালটা চালে মার্কিন তরফ সেটি বানচাল করে দেন। সোভিয়েট প্রস্তাবটি ছিল : ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে, ডোমিনিক প্রজাতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করে এবং বিদেশে বহু স্থানে ঘাটি করে আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অমান্য করছে। এসব বন্ধ হওয়া দরকার।

১৪ **ডিসেম্বর**—কেপ কেনেডির এক সংবাদে প্রকাশ : কয়েক হাজার পোকামাকড় কীট-পতঙ্গকে আজ মহাকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওদের মধ্যে আছে বোলতা, গুবরে পোকা, বাসি রুটির ছাতা, ব্যাকটিরিয়া, আমফিব্যাঙের ডিম, বোলতার ডিম, গুবরেপোকা এবং উইপোকা। জীবকোষের উপরে মহাজাগতিক বিকিরণ ও ভারহীনতার ক্রিয়া কি হতে পারে তা জানাই ইহার উদ্দেশ্য। এই কাজে ব্যয় হচ্ছে দশ কোটি ডলার।

১৫ **ডিসেম্বর**—অটোয়ার এক খবরে প্রকাশ : কানাডার সেনেট সরকারপক্ষের নেতা সেনেটর জন কনোলী বলেন, বিহার ও উত্তর প্রদেশের সাত কোটি বুভুক্ষু লোকের সাহায্যের জন্য ভারতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার (পৌনে) এক কোটি টাকা) মূল্যের গম, ময়দা ও গুঁড়ো দুধ পাঠানো হবে।

১৬ **ডিসেম্বর**—উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের উপর বারংবার মার্কিন বিমান হানার জন্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের পদস্থ কর্মচারীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। থান্ট গতকাল এক বিবৃতিতে এই হানার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের হানার বিপজ্জনক পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

১৭ **ডিসেম্বর**—'বিদ্রোহী' রোডেশিয়ায় তৈল ও তৈলজাত সামগ্রী সরবরাহ বন্ধের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আজ সকল রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন। প্রধান প্রধান ১২টি পণ্যের রোডেশিয়ায় রফতানি বন্ধ বাধ্যতামূলক করার জন্য ব্রিটেন যে প্রস্তাব আনে, গৃহীত প্রস্তাবটি তারই সংশোধিত রূপ। সংশোধন করেন আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহ।

১৮ **ডিসেম্বর**—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রধান রাজনৈতিক কমিটি মহাকাশে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এটি গৃহীত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রস্তাবটি স্বভাবতই সমস্ত মহলে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হচ্ছে।

কেক তৈরী?

আপনি খাসা তারিফ পাবেন যদি কেকগুলি দিব্যি হাল্কা ক'রে তোলবার জন্য এমন বেকিং পাউডার ব্যবহার করেন যা দু'বার ক্রিয়া করে—'ডবল অ্যাকশন' রেক্স বেকিং পাউডার।

এই হচ্ছে রেক্স বেকিং পাউডার

এক বড়চামচ পাউডার প্রতি ও পেয়ালা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। আপনি যখন কেক বা পেষ্ট্রির জন্য ময়দা গুলছেন (বা রুটি বা কোনের জন্য ময়দা ছানছেন) রেক্স বেকিং পাউডার তখন ক্রিয়া করে **প্রথমবার**। এইবার গোলা ময়দা (বা ছানা ময়দা) সেঁকবার জন্য উনুনে বসিয়ে দিন—এখন রেক্স বেকিং পাউডার ক্রিয়া করে **দ্বিতীয় বার**। এই অসাধারণ 'ডবল অ্যাকশন' ময়দাকে **দুবার** ফুলিয়ে তোলে এবং তাতে সেঁকাটা দিব্যি হাল্কা ও চমৎকার হয়ে ওঠে।

যতবার আপনার খুসী, দিব্যি হাল্কা জিনিস তৈরীর জন্য রেক্স বেকিং পাউডার ব্যবহার করুন!

এইবার এই সুস্বাদু খাবারগুলি যাচাই করুন!

ডোনাট

২ বড়চামচ মাখন বা মার্গেরিন □ ১ ছোটচামচ লবণ □ ¾ পেয়ালা চিনি □ ৫ ছোটচামচ রেক্স বেকিং পাউডার □ ২টি ভাল ক'রে ফেটানো ডিম □ ¾ পেয়ালা দুধ □ ১ ছোটচামচ দারচিনি □ ৩½ পেয়ালা ময়দা □ ½ ছোটচামচ জায়ফল □ ক্রীম মাখন বা মার্গেরিন ও চিনি; ডিম যোগ ক'রে ভাল ক'রে ফেটিয়ে নিন। দুধ ঢেলে পরে লবণ, বেকিং পাউডার ও মশলা সহ ময়দা ঢেলে নিয়ে যোগ করুন। ময়দার গোলা ⅓ ইঞ্চি পুরু ক'রে আস্তে-আস্তে বেলে নিন। ডোনাট কাটার দিয়ে কেটে নিন, ১৫ মিনিট এমনি রেখে দিন; বাদামী না হওয়া পর্যন্ত বেশ খানিকটা গরম (৩৭৫°) চর্বিতে ভেজে নিন, একবার উল্টে দিন। শুষে নেবার মত কাগজের ওপর নামিয়ে রাখুন। এতে ৩ ডজন ডোনাট তৈরী হবে।

মিষ্টি লেয়ার কেক

২¼ পেয়ালা ময়দা □ ½ পেয়ালা মাখন বা মার্গেরিন □ ২½ বড়চামচ রেক্স বেকিং পাউডার □ ১ পেয়ালা দুধ □ ১ ছোটচামচ লবণ □ ১ ছোটচামচ ভ্যানিলা □ ১½ পেয়ালা চিনি □ ২টি ডিম □ শুকনো উপাদানগুলি চেলে নিয়ে একসঙ্গে একটা পাত্রে মিশিয়ে নিন। মাখন বা মার্গেরিন, ⅔ পেয়ালা দুধ ও ভ্যানিলা যোগ ক'রে ২ মিনিট জোরে ফেটিয়ে নিন। বাকী ⅓ পেয়ালা দুধ ও ডিমগুলি ঢেলে নিয়ে ২ মিনিট আবার ফেটিয়ে নিন। ২টি গোল ওয়াক্সড্-পেপার-লাইন্‌ড্ ৮-ইঞ্চি লেয়ার কেক প্যানে ঢেলে নিন। উনানে (৩৫০°) ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট সেঁকে নিন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা কাঠি ঢোকালে কাঠিটা পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হবার পর কেকগুলি প্যানগুলি থেকে সরিয়ে নিন এবং জ্যাম মাখিয়ে জুড়ে দিন।

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায়

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

চাকুরির নোটিস নং ১২/৬৬

নিম্নোক্ত পদগুলির নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে: পদগুলি প্রথমত অস্থায়ী, তবে যথাসময়ে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনুমোদিত বেতনক্রমে বেতন ব্যতীত, সমস্ত পদগুলিতেই (ট্রেড অ্যাপ্রেণ্টিস ব্যতীত) প্রচলিত ভাতাদি, বিনা খরচায় ডাক্তারি চিকিৎসা, রেলওয়ে পাস/পি-টি-ও এবং সময়ে সময়ে প্রবর্তিত রুল অনুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা আছে:—অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ/ট্রেনিং-এর সময়কালে অনুমোদিত স্কেলে স্টাইপেণ্ড সহ কেবলমাত্র দুর্মূল্য ভাতা (অন্য কোনরূপ ভাতা নহে) প্রদেয় হইবে।

২। দরখাস্ত এই রেলওয়ের বা যে-কোন রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে, এই ফরম ২ টাকা আদায় দিয়া (তফসিলী জাতি / তফসিলী উপজাতি, ১-১-৬৪ তারিখে বা তৎপরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত উদ্বাস্তু এবং দৈহিক দিক হইতে অসুবিধাগ্রস্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ পঃ) ভারতের প্রধান প্রধান রেলওয়ে স্টেশন হইতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজিতে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং খামের উপরে পদের নাম এবং পর্যায় উল্লেখিত দরখাস্ত নিম্নলিখিতের নিকট ২০-১-৬৭ তারিখ বেলা ৪-৩০টার পূর্বেই পৌঁছা চাই। ইহার পরে প্রেরিত কোন দরখাস্ত (যথাযোগ্য অফিসারের মারফত প্রেরিত দরখাস্ত সহ) কোন ক্ষেত্রেই বিবেচিত হইবে না:

দি চীফ পার্সোনেল অফিসার
(রিক্রুটমেণ্ট),
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও
রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার্স, গৌহাটি—
১১ (আসাম)

৩। ভুল দরখাস্ত ফরমে দাখিল করা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে।

৪। যাঁহারা ইতিমধ্যেই সরকারী চাকুরিতে (রেলওয়ে সহ) স্থায়ী বা অস্থায়ী হিসাবে কর্মরত আছেন, যথাযোগ্য অফিসারের মারফত প্রেরিত তাঁহাদের দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ ২০-১-৬৭ তাং মধ্যে) অবশ্যই এই অফিসে পৌঁছা চাই। তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তাঁহাদের বিভাগীয় প্রধানের মারফত প্রেরিত দরখাস্ত পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা নির্ধারিত ফরমে তাঁহাদের দরখাস্ত (সমস্ত দিক হইতে পূরণ করা) সরাসরি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত **"নো অবজেকশন সার্টিফিকেট"** দেখাইলেই তবে তাঁহাদিগকে লিখিত পরীক্ষা/ব্যবহারিক পরীক্ষা / সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইবে।

৫। দরখাস্ত সমস্ত দিক হইতে নির্ভুলভাবে পূরণ করা না হইলে এবং উহার সঙ্গে দরখাস্তে উল্লেখিত মত বয়স, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার সমর্থক প্রশংসাপত্রের এবং উত্তীর্ণ সমস্ত পরীক্ষার মার্কশীট প্রভৃতির প্রত্যায়িত (প্রত্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা উল্লেখিত এবং অফিসের সীলমোহরযুক্ত) নকল না থাকিলে, উহা বিবেচিত হইবে না।

৬। ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা (সমস্ত বয়ঃসীমা ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬ তারিখে পরিপূরিত হওয়া আবশ্যক) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে নিম্নোক্তরূপে শিথিলযোগ্য:—

(ক) তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতির প্রার্থী এবং ভারতে পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা ফরাসী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর;

(খ) সিংহল-প্রত্যাগত ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতের পূর্বতন পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ-এর বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসর;

(গ) যুদ্ধ চাকুরিয়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, যতদিন যুদ্ধ চাকরি এবং পরে সামরিক চাকুরি করিয়াছেন ততদিন;

(ঘ) রিক্রুটদের ক্ষেত্রে ৪০ বৎসর পর্যন্ত;

(ঙ) সামরিক শ্রমিক বাদে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর রেলওয়ে কর্মীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বে যথাক্রমে ৩ এবং ১০ বৎসর সাপেক্ষে যতদিন নিয়মিত চাকুরি করিয়াছেন ততদিন;

(চ) যে-সব উদ্বাস্তু ১-১-১৯৬৪ তারিখ বা তাহার পরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে:

(১) ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত; তফসিলী জাতি / উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আরও ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য;

(২) অ্যাপ্রেণ্টিস পর্যায় হইতে নিয়োগের জন্য ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য।—দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের ট্রানজিট সেণ্টারের ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট অথবা বিভিন্ন রাজ্যের রিলিফ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট অথবা প্রার্থী বর্তমানে যে-এলাকার বাসিন্দা সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটই শুধু বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। প্রার্থীকে অবশ্যই তাঁহার সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি ফটোগ্রাফ এই রেলওয়ের দরখাস্তের ফরমের ডানদিকে নীচের কোণে (এতদুদ্দেশ্যে একটি খালি জায়গা দেওয়া আছে) অথবা ২ (দুই) নং পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিতে হইবে। **ফটোগ্রাফ ব্যতীত কোন দরখাস্ত কোন ক্ষেত্রেই বিবেচিত হইবে না।**

৮। কোন প্রার্থী যদি মনোনয়নের ফলাফল তাঁহার (পুরুষ / মহিলা) নিকট ডাকযোগে জানাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে দরখাস্তের সঙ্গে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ১৫ পঃ মূল্যের ডাকটিকিটযুক্ত একটি লেফাফা পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৯। (ক) তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে যোগ্যতাবলী এন এফ রেলওয়ে রিক্রুটমেণ্ট কমিটির বিচার-বিবেচনায় শিথিলযোগ্য হইতে পারে।

(খ) তফসিলী জাতি / উপজাতির প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদগুলি, ঐ ঐ সম্প্রদায় হইতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে অসংরক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১০। প্রার্থীদিগকে একটি লিখিত পরীক্ষা / ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হইবে এবং পরে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইতে হইবে। দূরত্ব ২৪ কিমি-এর বেশী হইলে পরীক্ষা / সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত হওয়া এবং ফিরিয়া যাইবার জন্য ফ্রি রেলওয়ে পাস নিম্নোক্তদের দেওয়া হইবে—

(ক) যোগ্য তফসিলী জাতি / উপজাতির প্রার্থী এবং অসুবিধাগ্রস্ত প্রাক্তন মিলিটারি পার্সোনেল;

(খ) ১-১-১৯৬৪ তারিখে বা উহার পরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত প্রকৃত উদ্বাস্তু;

১১। অ্যাপ্রেণ্টিস হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে একজন জামিনদার সহ এক মর্মে একটি বণ্ড/এগ্রিমেণ্ট সম্পাদন করিতে হইবে যে, সফলতার সহিত অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ সমাপ্তির পর তিনি অন্ততঃ ৫ বৎসরকাল রেলওয়ের অধীনে চাকুরি করিবেন, অন্যথায় তাঁহাকে (পুরুষ / মহিলা) ট্রেনিং এর সময় স্টাইপেণ্ড বা বেতন এবং [illegible] পোশাক এবং অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ এর সময় তাঁহাকে (পুরুষ/মহিলা) প্রদত্ত সমস্ত [illegible] ফেরত দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

১২। এই অফিস [illegible] সঙ্গে রিক্রুটমেণ্ট সম্পর্কে [illegible] [illegible] উল্লেখিত হইয়াছে [illegible] [illegible] পত্রালাপ করা [illegible]।

১৩। **এই অফিসে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যায় না এবং ফরমের জন্য কোন অনুরোধ এই অফিস কর্তৃক বিবেচিত হইবে না।**

১৪। কেন্দ্রীয় কোন চাকুরি বা পদে নিয়োগেচ্ছু প্রার্থীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে:—

(ক) ভারতের নাগরিক [illegible] সিকিমের প্রজা, বা (গ) নেপালের প্রজা বা (ঘ) ভুটানের প্রজা, বা [illegible] [illegible] ভারতে বসবাসের ইচ্ছায় ১লা জানুয়ারি ১৯৬২ তারিখের পূর্বে ভারতে [illegible] তিব্বতী শরণার্থী, বা (চ) [illegible] [illegible] বসবাসের ইচ্ছায় পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল এবং কেনিয়া, উগাণ্ডা [illegible] সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন [illegible] ও জাঞ্জিবার) প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ হইতে আগত ভারতীয় [illegible] [illegible], অবশ্য (খ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) পর্যায়ে উল্লেখিত প্রার্থীকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতার সার্টিফিকেট [illegible] দাখিল করিতে হইবে এবং [illegible] [illegible] যদি (চ) পর্যায়ভুক্ত [illegible] তাহাকে [illegible] ভারতীয় [illegible] অর্জন সাপেক্ষে চাকুরিতে রাখা হইবে।

১৫। কোন রকমের তদ্বির-তদারক প্রার্থীকে অযোগ্য বলিয়া সরাসরি বিবেচনা করা হইবে।

পর্যায় নং ৬৪ : টেলর-এর [illegible] (১টি) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** [illegible] মিডল স্কুল অথবা ৮ম শ্রেণীর মান [illegible] (খ) সরকার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন হইতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হওয়া চাই; (গ) পূর্ববর্তী

সাংবৎসরিক হিসাব

আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে স্বদেশী পঞ্জিকার হিসাব, অফিসে আদালতে স্কুলে কলেজে ব্যবহারিক জীবনে বিদেশী ক্যালেণ্ডারের। সে-হিসেবে একটি বছর সদ্য গত হল, নতুন আর-একটির পদক্ষেপ ঘটল। যে বছরটি গত হল, ১৯৬৬ সাল, তার সাংবৎসরিক জমা খরচের হিসেবটি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ এখানে নেই; তবে এর মোটামুটি একটা প্রাপ্তিফল আমরা বিচার করতে পারি। ১৯৬৬ সালটি ভারতের পক্ষে খুব শুভপ্রদ হয়নি। তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর বেদনা-দায়ক মৃত্যু, নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কিছু পরিবর্তন, দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি, খাদ্য সংকট, বিহার ও উত্তর প্রদেশের খরা অঞ্চলে জন-সাধারণের অশেষ দুর্গতি, সমস্ত দেশ জুড়ে ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ, একা-ধিক "বনধ্" উদযাপন, কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন, ডান ও বাম কম্যুনিস্টদের মধ্যে রেষারেষি, বামপন্থীদের মধ্যে প্রত্যেকটি সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা, মুদ্রামূল্য হ্রাস, মর্মান্তিক কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি ১৯৬৬ সালের বারোটি মাসের পাতাগুলিকে ভরে রেখেছে। এর কোনোটাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল না, তবু সবই স্বীকার করে নিতে হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে এতগুলি সমস্যা যেমন, তেমন আমাদের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্কও বহুক্ষেত্রে সুখের হয়নি। পাকিস্তান তাসখন্দ চুক্তির শর্ত পালনে গাফিলতি দেখিয়ে আমাদের বিব্রত করছে, চীনের হুমকি এবং তার মতিগতি সর্বক্ষণের উৎকণ্ঠা হয়ে রয়েছে আমাদের, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কটা অবনতির দিকে চলেছে, একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো মনোমালিন্য ঘটেনি, যদিও সেখানে প্রাপ্তিযোগ আমাদের তেমন কিছু ঘটেনি। সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে দেখলে বোঝা যায় ১৯৬৬ সাল আমাদের পক্ষে দুঃসময় গিয়েছে।

গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে তাও বেদনাদায়ক। ১৯৬৬ সালকে পশ্চিমবঙ্গের "বিক্ষোভ বৎসর"-ই বলা যায়। বছরের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এত বিক্ষোভ অন্য কখনও ঘটেছে কিনা সন্দেহ! সরকারী খাদ্যনীতি পরিবর্তন করার জের হিসেবে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে যে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছে আজও তার বিরাম ঘটল না, "বাংলা বনধ" ধ্বনি তুলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে অসহায় কিছু মানুষ মরেছে পুলিসের গুলিতে, কোথাও হয়েছে অশেষ পুলিসী নির্যাতন, কোথাও হাঙ্গামাকারীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। "বাংলা বনধ"-এর পর ধর্মঘটের এবারে ছড়াছড়ি গেছে পশ্চিমবঙ্গে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ-বছরটি পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতার বৎসর। সারা বছরে বুঝি পুরো চারটি মাসও স্কুল-কলেজ হয়নি, কখনও ছাত্র আন্দোলন, কখনও খাদ্য আন্দোলন; শিক্ষক ধর্মঘট, পরীক্ষা বর্জন, আবার কখনও বা অদ্ভুত কোনো ছাত্র দাবির দাপটে কলেজ বন্ধ থেকেছে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। সরকারী অফিসে বিক্ষোভ সারা বছরই লেগে ছিল, বেসরকারী অফিস কল-কারখানাতেও ধর্মঘটের যথেষ্ট হিড়িক গিয়েছে। এমন কি এখনও শহর কলকাতায় ট্রাম ধর্মঘট চলছে, সরকারী বাস অনিয়মিত। সাধারণ মানুষের জীবনে একটির পর একটি পাষাণ ভার চাপছে, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাজারে ডাল, তেল, সাবান থেকে মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারি—সবেরই সৃষ্টিছাড়া দর। চালের জন্যে বঙ্গবাসীর হাহাকার তো আছেই।

মনে হতে পারে, ১৯৬৭-র নির্বাচন আসন্ন বলেই ১৯৬৬ এত দুর্যোগপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কথাটা সর্বাংশে মিথ্যা নয়, কিন্তু পুরোপুরি সত্যও নয়। নির্বাচনে আসন লাভ সকল রাজনৈতিক দলের অন্তিম লক্ষ্য হলেও যা ঘটেছে তার সবটাই রাজনৈতিক কৌশল নয়। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, আমাদের খাদ্যনীতির কোনো কোনো দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি, নির্বুদ্ধিতা এবং অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ছোট বিশৃঙ্খলাকে বড় আকার দিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের ক্লেশ ও হতাশা না ডান না বাম কোনো পক্ষই সর্বান্তঃকরণে অনুভব করার চেষ্টা করেন নি।

১৯৬৭ সালের প্রারম্ভে আমরা এমন কোনো শুভ লক্ষণ দেখছি না যাতে মনে হতে পারে নতুন বছরটি সুখে কাটবে। নির্বাচনের আর দেরি নেই, ইতি-মধ্যেই চারদিকে সাজ সাজ রব; অন্তত নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কপালের কোনো দুর্গতিই যে ঘুচবে না তা অন্তত বলা যায়। তবু কামনা করি, নতুন বছরটি যেন শুভ হয়।
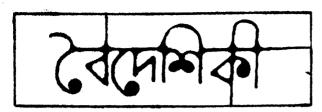
হাতে ভিক্ষাপাত্র ঃ গলায় আহম্মকির সার্টিফিকেট

ভারত সরকারের অনেক কাঁদাকাটার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতে নয় লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য পাঠাতে রাজী হয়েছেন। আমেরিকার কাছে ভারতের ঋণ বাড়ল এবং যাতে আরো বাড়ে তার জন্যে অবিরাম ধর্না দেওয়ার ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো বৃহৎ জাতির এরূপ অন্নদাসত্বের অনির্বাণ লালসার দৃষ্টান্ত নেই। আগের মতো এই খাদ্যের কিস্তিও "পি এল—৪৮০" নামধারী মার্কিন বিধি অনুযায়ী চুক্তি অনুসারে আসছে। অর্থাৎ এর দাম ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ্য, যার একটা অংশ মার্কিন সরকারের নামে জমা থাকবে এবং বাকীটা মার্কিন সরকার ভারতে যথেচ্ছ খরচ করতে পারবেন। এমনি করে ক' বছর ধরে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার পেটের মধ্যে বহু শত কোটি টাকার একটি মার্কিন টিউমার বড়ো হয়ে উঠছে। কেবল অর্থনৈতিক নয়, এর রাজনৈতিক কুফল কী তাও কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই অজানা নেই। কিন্তু যা মারাত্মক, যা লজ্জার বিষয় তাই শুভসংবাদ বলে বিজ্ঞাপনের মতো প্রচারিত হচ্ছে।

অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে, কী অকিঞ্চিৎকর সাহায্যের জন্যে আমরা কী সাংঘাতিক মাশুল দিচ্ছি। এই নয় লক্ষ টনের হিসাবই ধরা যাক। সমস্ত ভারতের লোকসংখ্যা ধরলে এই সাহায্যের পরিমাণ মাথাপিছু এক ছটাকও নয়। এই এক আধ ছটাকের জন্যে কতো দিক দিয়ে কতো ক্ষতি কতো ক্ষত জাতিকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে! একজন বিদেশীর একটা কথা এখনো মনে পড়ছে। কথায় কথায় তিনি একদিন বললেন, "আচ্ছা, বৈদেশিক সাহায্যের জন্যে এতো হইচই এখানে শুনি কেন? তোমরা হিসাব করে দেখেছ প্রতিদিন একটা পয়সার বাড়তি কাজ যদি তোমাদের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি করে তা হলে বছরে কত বেশী টাকা মূল্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে?" পৃথিবীতে দেখা গেছে যে, কোনো জাতি যখন তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয় তখন খুব অল্প মূল্যেই বিকিয়ে দেয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁরা ভিয়েতনামে মার্কিন সরকারের ক্রিয়াকলাপকে অমানুষিক, নরঘাতী বলে নিন্দা করতে পঞ্চমুখ তাঁদের কাউকেও বলতে শোনা যায় না যে, প্রেসিডেন্ট জনসনের করুণায় দান অস্পৃশ্য। প্রেসিডেন্ট জনসনকে যাঁরা রাক্ষস বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেন না তাঁদের দলকেও কখনো সোজাসুজি মার্কিন সাহায্য গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখা যায় না। হঠাৎ গোসা হলে আমাদের সরকারী কর্তারা একবার বলে ফেলেছিলেন যে, আমেরিকার দেওয়া অন্ন পাপান্ন। সেই গোসা হজম করতে বেশী

প্রেসিডেন্ট জনসন

দেরি হয় নি। দেখতে না দেখতে পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। আবার রঙ্গমঞ্চে রাজবেশধারী ভিক্ষুকের দল "ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি" বলে বেরিয়ে পড়ল।

যারা ভিক্ষা দিয়ে আমাদের পদানত করে রাখতে চায় বলে আমরা মনে করি তাদেরই বুদ্ধি নিয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করছি। এর চেয়ে আহাম্মকি আর কী হতে পারে? কিন্তু সেই আহাম্মকিরই বিদেশী-প্রদত্ত সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে আমাদের কর্মকর্তারা আবার ভিক্ষায় বার হন। প্রেসিডেন্ট জনসন নাকি বলেছিলেন যে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের স্বকীয় চেষ্টা যথেষ্ট কিনা এবং স্বীয় প্রয়োজনের হিসাব ভারত ঠিকমতো উপস্থিত করছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের নিরসন না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা নতুন খাদ্য সাহায্য দেবে না। ইতিমধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের একজন সদস্য ভারতদর্শনে এলেন। তাঁরা নাকি ভারতের স্বকীয় প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে দেশে ফিরেছেন। সেই সার্টিফিকেট নাকি প্রেসিডেন্ট জনসনের অঙ্গুলের [illegible] নয় লক্ষ টন গলাতে সহায়তা করেছে।

এ সবই আজগুবি কথা। [illegible] গ্রহীতার যোগ্যতার বিচার [illegible] করে মার্কিন সরকার দানের [illegible] স্থির করেন এরূপ অপবাদ [illegible] সরকারকে কেউ দিতে পারে না। [illegible] চীনে, কোরিয়ায়, দক্ষিণ ভিয়েতনামে [illegible] "সাহায্য দানের" ইতিহাস [illegible] পাকিস্তানকে আমেরিকা যা [illegible] দিয়েছিল তার কী ব্যবহার [illegible] আমরা জানি। তবেও, [illegible] পাকিস্তান সামরিক [illegible] পরেও পাকিস্তানের [illegible] হদলাতের সম্ভব হয় নি। [illegible] স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার যথাসাধ্য [illegible] কিনা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ [illegible] প্রেসিডেন্ট জনসন সাহায্য দিতে ইচ্ছুক [illegible] কোনো কথাই নয়। [illegible] ভারত সরকার কোন [illegible] মার্কিন সরকারের ইচ্ছানুযায়ী [illegible] প্রস্তুত।

মার্কিন কংগ্রেসম্যান যাঁরা [illegible] করে দেশে ফিরে গিয়ে [illegible] প্রশংসা করেছেন তাঁরা ভারতের [illegible] সহানুভূতিশীল হতে পারেন কিন্তু [illegible] সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে [illegible] আমাদের পক্ষে বেশী লজ্জাকর [illegible] হতে পারে না। কারণ, ভারতের [illegible] দিক থেকে ঐ সার্টিফিকেটটা [illegible] মার্কিন পরিদর্শকরা হয়ত কোনো [illegible] বিষয়ে আমরা মার্কিন পরামর্শদাতাদের [illegible] করার চেষ্টা করছি দেখে খুশী হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা সহজেই বোঝা যায় [illegible] আমরা যদি সত্যই যথাসাধ্য চেষ্টা [illegible] থাকতাম তা হলে এই আধছটাকী সাহায্যের জন্যে প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে [illegible] করে কান্নাকাটি করতে হত না। [illegible] আজ ওয়াশিংটনে নয়, পৃথিবীর [illegible] রাজধানীতে যত ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি কেবল ভিক্ষা আদায়ের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন তাঁদের বাবদ ভারতবর্ষের [illegible] এপর্যন্ত খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে [illegible] হিসাবটা বার করার জন্যে কোনো মার্কিন রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কি?

৩১-১২-৬৬

ফানুস ও ধ্রুবনক্ষত্র

বনফুল

অনেক শখ ক'রে
অনেক রাংতা, অনেক জরি, অনেক ঝালর
অনেক রঙীন কাগজের সমারোহে
অনেক আগ্রহে
অনেক দিন ধ'রে
তৈরি করেছিলাম ফানুসটা।
তৈরি যখন হ'ল
তখন নিজের কীর্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম নিজেই।
তারপর
তার ভিতরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীর্ঘ একটা বাঁশের ডগায় তুলে
আকাশ-প্রদীপ ক'রে
পাঠিয়ে দিলাম তাকে আকাশের দিকে।
ভাবলাম গর্ব ভরে
দেবতারাও দেখুক মানুষের কীর্তি।
সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ফানুসটার দিকে
বহু বর্ণের একটা নক্ষত্র যেন।
কিন্তু হায়—
অকস্মাৎই এল আঁধি,
প্রদীপের আগুনেই পুড়ে গেল ফানুসটা।
তারপর উড়ে গেল ঝড়ে
দাঁড়িয়ে রইল শুধু গাঁট-গাঁট বাঁশটা।

কেন এমন হ'ল!
আকাশকে প্রশ্ন করি
উত্তর মেলে না।
সে নির্বিকার, বধির।
সহসা একদিন পেয়ে গেলাম কিন্তু
অপ্রত্যাশিত উত্তরটা।
যে নক্ষত্রের আলো
পৃথিবীতে পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগে
সেই ধ্রুবনক্ষত্র
উত্তর পাঠাল একদিন
মনের সেই বেতার-যন্ত্রে
যেখানে নিগূঢ় সত্যের অনুরণন চলছে অহরহ।
ধ্রুব বললেন — আমরাও ফানুস
কিন্তু আমরা তপস্যার সত্য-শিখায় জ্বলছি
সহজে নিবব না।
তোমার ফানুস নিবল
কারণ তা তোমার শখ ছিল
তপস্যা ছিল না।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন মণ্ডলীর মনোনয়ন-পত্র
বিতরণ শেষ হয়েছে।
কার ছিপে কটা ধরা পড়ল ?
সুচেতা কৃপালনীকে লোক-সভার প্রার্থী হিসেবে
মনোনীত করা হয়েছে।
কংগ্রেস সার্কাসের চমৎকার খেল !
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

তা হলে নির্ভেজাল লোককান্ত এবং কামিনীমোহন কারা? সংস্কৃতি সম্মেলনের সেই অভিলষিত সংস্কৃতিবানেরা—সোজা বাংলায় গাইয়ের দল? উঁহু, পুরোপুরি মানা যায় না, সন্দেহ হচ্ছে. বাংলা দেশে তার সঙ্গে 'এ গ্রেন অভ সল্ট' দরকার। স্বকর্ণে উদ্যোক্তাদের বলতে শুনেছি—প্রথমে একটি সুপরিচিত কুটুম্ব-সম্ভাষণ—অতঃপরঃ 'এতগুলো টাকা নিলে, ভেবেছিলুম অন্তত ছ'খানা গান গাইবে, তা নয়—চারখানা গেয়েই পালালো। ইচ্ছে করছে বাটাকে আচ্ছারকম ধোলাই দিয়ে দিই।'

অতএব সাংস্কৃতিক শিল্পীদেরও ঈর্ষা করা যায় না।

চিত্রতারকারা?

আমি জানি, এইবারে আপনারা সবাই একসঙ্গে হাত তুলেছেন। সন্দেহ কী, সেই রুপালী জগতের মানব-মানবীরা আমাদের দিনের জল্পনা, রাতের কল্পনা। তাঁদের একবার চর্মচক্ষুতে দর্শন করার জন্যে পুলিসের ঠ্যাঙানি খেয়েও আমরা চব্বিশ ঘণ্টা গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকতে পারি। তবুও আমার মনে হয়, এই আকুলতা মাত্র অহৈতুকী ভক্তি প্রসূতই নয়—এর নেপথ্যে সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল বিদ্যমান। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে যাঁরা কিন্নর-কিন্নরী, তাঁরা আমাদের মতো দ্বিপদ নিয়মের অধীন কিনা, চলার সময় তাঁদের পা মাটি ছোঁয় কিনা, তাঁরা খাওয়ার সময় দাঁত বের করেন কিনা এবং চিবুনোর সময় কচর-মচর শব্দ হয় কিনা, তাঁরা গান গাইবার জন্যে হাঁ করলেই অন্তরীক্ষে বেণু-বীণা-পিয়ানো-বেহালা-চেলো-গং ইত্যাদি বাজতে শুরু করে কিনা—এইগুলো জানবার জন্যেই আমাদের প্রাণমন হাহাকার করতে থাকে। সোজা কথায়, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা সেই কৌতূহলেরই উদ্রেক করেন—যার তাড়নায় আমরা ছ'পেয়ে গোরু এবং শিংওলা সাপ দেখতে ছুটে যাই। (আশা করছি, এই সিদ্ধান্তের জন্যে আমি মানহানির দায়ে পড়ব না।)

আমার জিজ্ঞাসার উত্তর মিলেছে কাল সন্ধ্যায়। স্থান—কলকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ে। শীত-কুয়াশা-অন্ধকারে ঢাকা এই পথটিতে রহস্যময় সব পিলে, বিস্ময়কর সব উইভারশান, চমক-জাগানো সব বাঁক সূর্য ডুবলেই মোটরচারীদের হৃৎকম্প জাগায়। কাল সন্ধ্যায় সে পথে অবিরাম মোটরের পর মোটর ছুটেছে—প্রাণ যায় যাক—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল কলকাতায় আসছে—তাদের একবার দর্শন-স্পর্শন লাভ করবার জন্যে: 'আমার যে সব দিতে হবে, সে তো

বিমান ডাকে

বিদেশে চাঁদার নূতন হার

মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ১ জুলাই হইতে বিদেশে বিমান ডাকে দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার—

এশিয়া:

বার্ষিক	১৮৬.০০
ষান্মাসিক	৯৩.০০
ত্রৈমাসিক	৪৬.৫০

ইওরোপ:

বার্ষিক	২৮০.০০
ষান্মাসিক	১৪০.০০
ষান্মাসিক	১৪০.০০
ত্রৈমাসিক	৭০.০০

আমেরিকা ও কানাডা:

বার্ষিক	৪১০.০০
ষান্মাসিক	২০৫.০০
ত্রৈমাসিক	১০২.৫০

অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ফিজি প্রভৃতি:

বার্ষিক	৩২৬.০০
ষান্মাসিক	১৬৩.০০
ত্রৈমাসিক	৮১.৫০

লন্ডন অফিস মারফত:

বার্ষিক	১১৮.০০
ষান্মাসিক	৫৯.০০
ত্রৈমাসিক	২৯.৫০

—সার্কুলেশন ম্যানেজার, দেশ

আমি জানি!' পাতিপুকুরের পথটা দেখিনি, কিন্তু কল্পনা করতে পারছি।

এই হচ্ছে বীরপূজা, এই হল হৃদয়বেদী ভক্তির উচ্ছ্বাস। আজকের সকালে এই ভক্তদের দুর্ভোগের করুণ কাহিনীও পড়লুম। প্লেন আধ ঘণ্টা আগেই হাজির, সকলকে ফাঁকি দিয়ে বাসের প্রস্থান, কাঁদছে রূপসী তরুণীর দল, হাতের মালা শীতের বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। একটা সার্বজনীন ট্র্যাজিডী!

নেতা, সাহিত্যিক, গাইয়ে, চিত্রতারকা—পরজন্মে কী হতে চাই এ নিয়ে বার বার স্বপ্ন বদল করেছি। কিন্তু কাল সন্ধ্যায়, শীত-কুয়াশা-অন্ধকারে ঢাকা কলকাতা-দমদম সুপার হাইওয়েতে আমার সব সংশয়ের নিরসন ঘটেছে।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
চিরকালীন জীবনকাব্য

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১ম খণ্ড — ৬
২য় খণ্ড — ৬
৩য় খণ্ড — ৬
৪র্থ খণ্ড — ৬

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫·৫০ ভক্ত বিবেকানন্দ ৪॥

অনুরূপা দেবীর
মা ৭
মন্ত্রশক্তি ৭

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৬
উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫

নিরুপমা দেবীর
শ্যামলী ৫
অনুকর্ষ ৪

আশাপূর্ণা দেবীর ক্লাসিক উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি (২য় মুদ্রণ) ১৪

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥
(চলচ্চিত্রে রূপায়িত)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপকণ্ঠে ৯ বহ্নিবন্যা ৮।
প্রভাতসূর্য ৪ জ্যোতিষী ৩॥

জরাসন্ধের
লৌহকপাট (৪র্থ পর্ব) ৭
ছবি ৪ ছায়াতীর ৫

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবি ৪॥ কালিন্দী ৭॥
অভিযান ৬ গন্নাবেগম ৮

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
কঙ্কাবতী ৫·৫০

নলিনীকান্ত সরকারের
দাদাঠাকুর ৫॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অস্তি ভাগীরথীতীরে ৭॥

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১৪

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৬
জলকল্লোল ৫॥ তুচ্ছ ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাঁচালী ৬॥
অপরাজিত ৯

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
স্বপ্নতনু ৪॥
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥

নয়ান বৌ ৬
মিলনান্তক ৪॥০
কথাচিত্র ৩
আর এক সাবিত্রী ৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
ক্লাসিক উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী

১ম — ৫
২য় — ৫॥০
৩য় — ৬

সুমথনাথ ঘোষের
বাঁকা স্রোত ৬॥

বিমল মিত্রের
একক দশক শতক ১৪

মনোজ বসুর
বন কেটে বসত ১০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রঞ্জন

বাষট্টি, প্রায় তেষট্টি, বছর বয়সে মৃত্যুকে অকালমৃত্যু অভিহিত করা অসহজ বিশেষত পৃথিবীর এই অশীতল অঞ্চলে। ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শচীন চৌধুরীর অন্তর্ধান তবু মন্তব্য আদেশ করে এই জন্যে যে তাঁর অনস্বীকার্য ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বৃহত্তর শক্তির পারম্পর্যে অন্যতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। তিনি এমন একটা প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক হয়ে কলকাতা থেকে বম্বাইয়ে প্রস্থান করেছিলেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে তাঁকে প্রবাসী বলাই সমীচীন হতো। অথচ, লোকটাকে দেশের অন্যত্র বা বিদেশে কখনো বিদেশী বলে বিবেচিত হতে দেখিনি। আপন হতে জানতেন শচীন চৌধুরী, জায়গা হোক আলমোড়া বা অলম্বো।

শচীন চৌধুরীর মতো বিলীয়মান বাঙালী প্রবাসীর প্রসঙ্গ বর্তমান বঙ্গসন্তানের চিন্তনীয় এই কারণে যে উন্মোচনশীল নব ভারতে বাঙলার অপ্রাসঙ্গিকতা গভীর অভিনিবেশে আজ তদন্তযোগ্য। এক কালে বাঙালীর অহঙ্কারের বা ঔদ্ধত্যের অন্ত ছিল না। অধুনা আহত অভিমানের পালা। সবই নাকি বাঙালীকে জব্দ করতে উদ্যত। ইদৃশ উদ্যম বঙ্গদেশে ক্ষীয়মাণ প্রত্যক্ষ করলে সানন্দে তা স্বীকার করা যেত। সত্য অন্যথা।

*

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রতিক অপ্রাধান্য, প্রায় অবান্তরতা, বিধির বিধান ছিল না—যদিও বর্তমান বাঙলীর সামান্যতায় বিধানচন্দ্র রায়ের অনীপ্সিত "অবদান" হয়তো অল্প নয়। দ্বিবিধ নির্দেশনা বিশেষ লক্ষণীয়। বিধানচন্দ্র বিহারসন্তান, ক্রমশঃ বাঙালী। শচীন চৌধুরী বিশুদ্ধ, প্রায় অপরিশোধ্য, বাঙালী। তবু দীর্ঘ নির্বাসন পশ্চিম সৈকতে। বাঙালীত্ব ঘোচেনি কখনো। চিত্তে তবু ছিল যেন বিশ্বজনীনতা। রামমোহন কেন বার্তা পাঠালেন ফরাসী বিপ্লবীদের? মাইকেল কেন সেলাম জানালেন স্প্যানিশ বিদ্রোহীদের? বুদ্ধির ক্ষেত্রে জগৎটা তখন এক ছিল; ইরেসমাস অক্সফোর্ডে আনন্দে ছিলেন। শচীন চৌধুরী কিছু কাল কেম্ব্রিজে ছিলেন, সমান আনন্দে। সাহচর্য স্থান পেয়েছিল শিক্ষণের ঊর্ধ্বে।

বাঙালীর বহির্মুখিতার অন্তরায় আজ অসংখ্য। জমির জওয়ানদের দাবি আজ সর্বত্র মুখর। দক্ষিণীরা আগ্রাসী; পাঞ্জাবীরা ভূরোদর্শী। কূপমন্ডূকতা পরিহার করে যে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী ভারতের অপর প্রান্তে প্রয়াসের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, শচীন চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। বাঙালীত্ব তাঁকে পঙ্গু করেনি, বল দিয়েছিল।

*

বাংলার বর্তমান যন্ত্রণা, ছাত্রঘটিত বা রাজনীতির নিকষিত হেমে প্রসূত, কোনো আভ্যন্তর গভীরতর ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শচীন চৌধুরী এই সমস্যা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন। যাবতীয় যৌব আতিশয্য সম্বন্ধে তিনি পোষণ করতেন প্রায় অন্তহীন সহনশীলতা। এর উৎস সন্দেহ করি, ছিল শচীন চৌধুরীর বিপ্লব বিহ্বলতা। প্রতিবাদের প্রমুখ্যতা ছিল তাঁর কাছে সর্বোচ্চ আদর্শ এবং সরকার জানেন, শচীন চৌধুরী পরিচালিত কোনো পত্রিকা সমর্থনের বাহন হিসাবে আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিল না।

কিন্তু বর্তমান এবং ক্রমবর্ধমান বাঙালী বিপর্যয়ের সঙ্গে শচীন চৌধুরীর তিরোভাবের আলোচ্য সম্পর্ক এই যে, বম্বাইতে যতই কোষারোপ হয়ে থাক (এল আই সি, রিজার্ভ ব্যাংক) কলকাতার দোষারোপ বা আক্রোশারোপে তার প্রতিকারের আশা সামান্য। প্রথমে ইকনমিক উইকলি এবং পরে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি নিঃসন্দেহে বাঙালী ছিল। শচীন চৌধুরীই প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, বিশ্বব্যাঙ্ক পর্যন্ত ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে নিরর্থকতার আখ্যা দিয়েছিলেন এই জন্যে যে কলকাতা শহরের নানাবিধ সমস্যা তাতে অবহেলিত হয়েছে। শচীন চৌধুরী নিশ্চয়ই কলকাতার প্রশ্ন নিয়ে যৎপরোনাস্তি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এ হতেই পারে না যে সর্বদেশীয় অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার এখনো অনবদমিত আবশ্যকতা শচীন চৌধুরীর বিবেচনায় অগ্রাধিকার পায়নি। শচীন চৌধুরীর সার্বজনীনতা সার্থক হয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে তা স্বাদেশিকতা তথা প্রাদেশিকতা অন্তঃস্থ করতে পেরেছিল অনায়াসে।

রাজনীতিতে বাঙালীর উৎসাহ প্রায়শ উদ্দাম; অর্থনীতিতে কৌতূহল অতি পরিমিত। এই অননুরাগ কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর,

শচীন চৌধুরী

কেননা একাধিক ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছিল এই তথাকথিত ভাবপ্রবণ এবং সমৃদ্ধি-উদাসীন বঙ্গদেশে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু ব্যর্থ বাণিজ্যাভিযানের বিস্তৃত বিবরণ আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় আছে ঠাকুরপরিবারের মজ্জাগত দ্যুতিবিলাসের বৃত্তান্ত। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনরুত্থানের অভ্যুদয়-পতনের ইতিহাসের মূলে নিশ্চয়ই ছিল আর্থনীতিক রক্তশূন্যতা। কিন্তু এমন প্রমাণ নেই যে চিন্তার রাজ্যে সমৃদ্ধি আর সংস্কৃতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। শচীন চৌধুরী ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের উদ্ধত সন্তান। সেই ঔদ্ধত্যের সঙ্গী ছিল অপরিসীম ব্যক্তিগত কোমলতা। এমন দুর্লভ সমন্বয় বাংলার বর্তমান দুর্দিনে নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। "ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি" শুধু একটা কাগজের নাম নয়। ওটা একটা যুগের বিদায়ী স্বাক্ষর। আমার বর্তমান রচনার বৃহত্তম প্রণামী এই যে, শচীনদা এটা পড়ে বলতেন, আমি আজও ভাবাপ্লুত বাঙালী রয়ে গেছি!

ঘরের অন্ধকার

সোমনাথ ভট্টাচার্য

রোদ ছিল ঝকঝকে। বাতাস মিঠে। দুলু মেঝেতে মাদুরে বসে দুলে দুলে 'আমাদের ছোটনদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার ......'পদ্য মুখস্থ করছিল। টুনি স্লেটের ওপর পেন্সিলটার তলা চেপে ধরে, জিভ প্রায় নাকের ডগায় ঠেকিয়ে, ঘাড় কাত করে ক-খ লিখছিল সজোরে। তার ছোটটা, দু হাতে [illegible]-এর টিনের ঢাকনা মুখে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে খাচ্ছিল; দু হাত কনুই বেয়ে লালা ঝরছিল টুঁপিয়ে। দোরগোড়ায় [illegible] মাথার বালিশ করে ঘুমোচ্ছিল পুষি। চারটে বাচ্চা ছোট ছোট থাবা দিয়ে পেট টিপে টিপে দুধ খাচ্ছিল চুকচুক। কড়িকাঠে গুনগুনিয়ে ফিরছিল এক জোড়া ভোমরা। রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসনের, আঁচলের চাবির ঝনঝন শব্দ আসছিল। তক্তাপোশের ওপর পা

ঝুলিয়ে বসে এসব দেখতে দেখতে প্রশান্ত, পায়ের পাতার ওপর যার নরম রোদ, গরম ভাত আর পান-জর্দার রসের আলস্য যার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে, অনুচ্চস্বরে, 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে...' গাইতে গাইতে প্রথমে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত মাইল কয়েক, তারপর ন'টা দশের লোকালের ট্রেন ধরে অফিস যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

প্রশান্তর পরনে আন্ডারওয়্যার, গেঞ্জি, পায়ের তলায় পা ছাড়া স্ট্র্যাপ দেওয়া খড়ম। 'তোমরা যে বলো দিবস-রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা...' প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিস্টওয়াচ তুলে নিয়ে সময় দেখে, আর না, উঠতে হয় এবার, ভেবে উদ্‌যোগী হল। 'সখী ভালোবাসা কারে কয়', উঠে দাঁড়িয়ে আলনা থেকে ধুতি টেনে নিল। ছোটটা একইভাবে ঢাকনা কামড়াতে কামড়াতে মুখের দিকে তাকাতে প্রশান্ত ধুতির গিঁট কষা শেষ করে ঠোঁট মুচড়ে চুমো দেবার ভঙ্গি করল। কোমর ভেঙে নুয়ে 'সে কি কেবলই যাতনাময়...' কোঁচা-পালিশ করতে গিয়ে প্রশান্ত থমকাল, তার পর, চীৎকার করে উঠল, 'শুনে যাও, শিগগিরি শুনে যাও—'

দুলু পদ্য মুখস্থ করা থামিয়ে, ইতি বাহুর উল্টো পিঠ দিয়ে সামনের ঝুলে-পড়া চুলের গোছা সরিয়ে প্রশান্তর দিকে তাকল। ছোটটার মনোযোগ ব্যাহত হতে, হাতের ঢাকনা ফেলে দিয়ে 'তা-তা' করতে করতে বেড়ালের ল্যাজ ধরার জন্য পাছা-ছেঁচড়ে এগিয়ে যেতে থাকল। রমা অতি দ্রুত আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় শুয়ে থাকা পুষি হঠাৎ ভয়ে তড়াক করে পাক খেয়ে উঠে দাঁড়াল। বাচ্চা ক'টা ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিকে।

'কি হল!' রমা শঙ্কা নিয়ে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

প্রশান্ত মুঠোর মধ্যে ধরা কোঁচা জাপানী হাতপাখার মত ফরফর করে মেলে ধরল। চোখের সামনে প্রশান্তর একটা গোটা উরু, রোমশ পায়ের সবটা, হলুদ ছোপধরা আন্ডার-ওয়ার। তারপর সামনে মেলে ধরা ধুতির কোঁচার অংশটার দিকে চোখ পড়তে 'ও কি!' প্রশান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে রমা বলল, 'কি করে হল!'

'আমি তো তাই-ই জিজ্ঞেস করছি।' প্রশান্তর স্বর তিক্ত।

রমা উত্তপ্ত হয়ে উঠল, 'আমি কি করে বলব? নতুন ধুতি সবে গোটা দুয়েক ধোপ পড়েছে—নিজেই কোথায় খোঁচা-টোঁচা লাগিয়ে এনেছ।'

'বাজে বকো না—এটা খোঁচা লেগে ছেঁড়ার মত?' প্রশান্ত ধুতির ছেঁড়া অংশটা হাতের চেটোর ওপর বিছিয়ে জাল করে দেখাবার জন্যই যেন দু কদম এগিয়ে এল —'চোখে চশমা লাগাও—'

'তা হলে বোধ হয় ধোপা—।'

'না, ধোপা নয়', প্রশান্ত ধমকে উঠল। 'সোমবার থেকে পরছি, তা হলে আগেই নজরে পড়ত। একটা কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে পারলেই হল, না।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে রমা মুখের সামনে দুটো হাত নাড়ল, 'তা হলে আমিই দাঁতে করে......'

প্রশান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠতে যাচ্ছিল। তার আগেই রমা বলল 'ভাম।'

রমার চোখে চোখ রাখল প্রশান্ত, 'কি যা-তা বলছ?'

'ওই দেখ মা, বোন বেড়ালবাচ্চা ধরেছে।' ইতি সাবধান করার আগেই বেড়ালবাচ্চাটা ফ্যাস্ করে হাতে থাবা কষিয়ে তক্তপোশের তলায় গিয়ে সেঁধুল। মেয়েটা ডুকরে উঠল। রমা কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত হাতটা দেখে নিল নখের দাগ পড়েছে কিনা। 'চুপ্ চুপ্', গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করতে করতে রমা প্রশান্তর দিকে মনোযোগ দিল আবার, 'কাল রাত্রে, রান্নাঘরে ওদের খেতে দিয়ে ভাবলাম, মেয়েটা একলা অন্ধকার ঘরে ঘুমচ্ছে, দেখে আসি একবার। ঘরে ঢুকতেই ভামটা জানলা গলে পালাল। ভাবলাম, তক্তপোষের তলায় বেড়ালবাচ্চা-গুলো ঝুড়িচাপা রয়েছে, সেই লোভে ঘরে ঢুকেছে। তারপর আলনার কাছে গিয়ে দেখি, গোছান জামাকাপড়গুলো তলায় ছত্রকার হয়ে রয়েছে। তোমার ধুতিটাও ছিল। অন্ধকার অতোশতো লক্ষ করিনি। তখনই বোধ হয় ভামটা—'

'ধ্যুত, ভাম ইঁদুরের মত কাপড় কাটে নাকি?' প্রশান্তর স্বরের কর্কশতা কমে এসেছিল। বরং রমার ধারণাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে না পেরে ধুতির ছেঁড়া অংশ ঘাড় নামিয়ে পরীক্ষায় রত হল।

রমাও লক্ষ করছিল, 'ইতু ধরতো বোনকে একবার—।'

ইতি উঠে এসে 'বোন আয়' বলে হাত বাড়াল। মেয়েটা কলকল হেসে রমাকে আরও আঁকড়ে ধরল। পেটেপিঠে পা দাপাতে লাগল। জোর করে ছাড়িয়ে ইতির কোলে দিতে কান্না ধরল। রমা এগিয়ে এসে প্রায় জোর করে প্রশান্তর হাত থেকে কোঁচাটা হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

ইতি বোনকে কাঁখে নিয়ে ভার সামলাতে বিপরীত দিকে শরীর হেলিয়ে টলমল করতে করতে দরজার দিকে এগুচ্ছিল, মার দিকে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুলু প্রশান্তর পেছন থেকে মা কি করছে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল। রমা মাথাটা আরও ঝুঁকিয়ে কাপড়ের ছেঁড়া অংশের আশেপাশে নাক লাগিয়ে বেড়ালের মত শুঁকছিল।

একটা লম্বা লোক, একটা মেয়েমানুষ কোমরের নীচে মাথা ঝুঁকিয়ে কী করছে, এক দিকের উরু উদোম্, ছেলেমেয়েরা রয়েছে—দৃশ্যটার কথা চিন্তা করে প্রশান্ত জ্বলে উঠল, 'আঃ, আরম্ভ করলে কি তুমি। ছাড়ো—' রমার হাত থেকে কাপড় টানতে টানতে প্রশান্তর ভ্রূ বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল।

প্রশান্তর পায়ের পাতার ওপর কোঁচা লুটিয়ে পড়ল।

'ভামের আর দোষ কি? এমন সুন্দর মাংসের গন্ধ।' কথা শেষ করেই রমা ফিরল। 'হারামজাদী মেয়ে, বোনকে একটু চুপ করাতেও পার না।' ইতির চুলের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে রমা ছোটটাকে কোলে তুলে নিল, 'আর একবার গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে দেখ, দেব গলা টিপে শেষ করে।' ছোটটা আরও ককিয়ে উঠল।

প্রশান্ত ভীত, বিমূঢ়, নিশ্চল।

ছোটটাকে নিয়ে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দুলু কৌতূহল চেপে আর রাখতে না পেরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবার কাপড়টা ভামে কেটেছে মা, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ বাবা—', রমা খনখন করে উঠল, 'খরচ কুলোতে পারছে না বলে তোমার বাবা বাড়ীতে সপ্তায় দুদিন মাছ-মাংসের বরাদ্দ দিয়ে, নিজে লুকিয়ে পাঞ্জাবী হোটেলে মাংসের প্লেট সাবড়ে আসছেন। ছেলে-মেয়েদের ঠকানো, এতো পাপ কখনো সহ্য হয়, ঈশ্বর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।' দু চোখে শিকারী টর্চের আলো জ্বেলে রমা, প্রশান্তর চোখে চোখ রাখল। রমা যেন শিকারী। অন্ধকার থেকে দপ করে আলো ছুঁড়ে প্রশান্তকে অন্ধ করে দিয়েছে। প্রশান্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রমা শিকারের অবস্থা লক্ষ করে ধীরেসুস্থে নিশানা স্থির করে ট্রিগার টিপল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'জিভে পোকা পড়বে।'

রমা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রশান্ত আহত জন্তু। অন্ধকারে কারের যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে নিষ্ফল আক্রোশে মাড়ি উল্টে, চোয়ালে চোয়াল চাপা দাঁত দেখিয়ে গরগর করতে লাগল। ইতি পেছন ফিরে দেয়ালে শরীর লেপটে সর্দি টানতে টানতে কাঁদছে। প্রশান্তর দৃষ্টি দুলুর ওপর পড়ল। দুলু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে পদ্য মুখস্থ করতে লাগল, 'পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ী......।'

গেট্-এর পাশেই লাইট-পোস্ট। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা কম্পাউন্ডের ওধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালপালা এসে আবার আড়াল করে রেখেছে আলোটা। সেই নিস্তেজ আলোর চোখের দৃষ্টি সরু করে

প্রশান্ত দারোয়ানের হাত থেকে বাঁধান খাতা টেনে নিয়ে তারিখের ঘরে তারিখ দিল, সময়ের ঘরে সময়, তারপর নিজের নাম, 'হুম উঁদু সাঁ'-র ঘরে লিখল মিঃ এ মিটার—পরের ঘরটা উপস্থিত খালি রইল. বেরিয়ে যাবার সময় সময় লিখে দিয়ে যেতে হবে। দরোয়ান খাতা ফেরত নিয়ে বিরাট লোহার গেট্‌টা সামান্য একটু ঠেলে ফাঁক করে সরে দাঁড়াল। প্রশান্ত ফাঁকটুকু দিয়ে শরীরকে ভেতরে গলিয়ে দেবার সময় আড়চোখে একবার দরোয়ানের মুখের দিকে তাকাল। অচেনা লাগল। পুরোনো কেউ হবে, তাকে গেট্-এর পুরো একটা পাল্লা খুলে ধরার মর্যাদা না দিলেও 'মিত্তির সাহাবকা ভাই' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে ছোট একটা সেলাম দেবার অন্তত ভঙ্গি করত।

চওড়া কংক্রীটের রাস্তা। রাস্তার দু ধার দিয়ে হাঁটুভর উঁচু কেয়ারি করা হেজ। সেখানে মানানসই ভিত্তিতে গোল, লম্বা, ত্রিকোণ মরসুমী ফুলের বেড্। কাইট-পোস্টে লাইট-পোস্টে ফ্লুরেসেণ্ট টিউব। টেনিস-কোর্টে জোড়ে খেলা চলছে। গঙ্গার দিক থেকে হাওয়া বইছে—সেইজন্যই সম্ভবত ব্যাডমিণ্টন্ কোর্টে আজ আলো জ্বলেনি। ওপারে, গঙ্গার ধারে জি টি রোডে হেড-লাইটের মিছিল। এতক্ষণে শব্দটা মৃদু ছিল, প্রশান্ত একটানা তিনতলা কোয়ার্টারগুলোকে পাশে ফেলে বাঁক নিতেই শব্দটা যেন বানের ঢেউয়ের মত হুড়মুড় করে তার ওপর ভেঙে পড়ল। ওদিকটার কম্পাউণ্ডে প্রায় গা লাগিয়েই স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট। ঝমঝম করে চলেছে চব্বিশ ঘণ্টাই। এই খোলামেলায় শব্দটা যতটা বিরক্তিকর মনে হয়, প্রশান্ত দরজা-জানালা বন্ধ কোয়ার্টারের মধ্যে বসে অনুভব করেছে, শব্দটা ঠিক ততখানি বিরূপ লাগে না। বরং মন-মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে ভালোই লাগে;—সোফায় গা ডুবিয়ে, ফ্যানের তলায় চায়ে চুমুক দিতে দিতে চোখ বন্ধ করে রাখলে জলপ্রপাতের শব্দের মত লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে ঝকঝকে পালিশ করা প্রকাণ্ড দরজাটার সামনে এসে প্রশান্ত দাঁড়াল। দরজার ফ্রেমে কলিং-বেলের সাদা বোতাম। দরজার ওধার থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছে। রীতা নাচ প্র্যাকটিস করছে। জামাকাপড়গুলো সামান্য ঝেড়েঝুড়ে, রুমালে মুখ-গলা ঘষে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে প্রশান্ত কলিংবেলের বোতাম টিপল। তারপর দরজার ওধারে কলিং-বেলের শব্দের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘুঙুরের শব্দ থামল, চুপচাপ, ঘুঙুর এগিয়ে আসছে।

'আরে কাকু—' দরজার ফাঁকে রীতার উদ্ভাসিত মুখ, জলজলে চোখ। 'উঃ, কত দিন পরে এলে বলত...' বলতে বলতে রীতা দরজার দুটো পাল্লাই প্রশান্তর সামনে হাট করে মেলে ধরল। বেরিয়ে এসে প্রশান্তর পাশ দিয়ে পেছনে সিঁড়ির দিকে তাকাল, 'কাকীমা কই? ওরা?'

'কেউ আসেনি রে—' প্রশান্ত বাঁ হাত দিয়ে রীতাকে পাশে টেনে নিল।

'আনলে না কেন?'

পাশে পাশে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে, ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুম্। পাশাপাশি গোটা চারেক ঘর। বসবার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে প্রশান্ত চোরাচোখে একবার দালানের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছে অমিত। ঐটুকু না করলে নেহাত অভদ্রতা হয়, সেইরকম তাকাল একবার

এদিকে। চশমার পেছনে চোখ দেখতে পেল না প্রশান্ত। মনে হল, ঠোঁট দুটো যেন সামান্য একটু প্রসারিত হল। মনে মনে হয়ত ভাবছে, নাও, এখন আবার এক উটকো আপদ এসে জুটল। প্রশান্ত দাঁতে দাঁত পিষল মনে মনে, রাস্কেল। অথচ, ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস, প্রশান্ত ভাবল, তাকে আজ মূলত ওর কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশান্ত বলল, 'আনব কি রে—? আমি কি বাড়ী থেকে আসছি, সোজা অফিস্ থেকে......।'

মেঝেতে কার্পেট বিছান। তার ওপর কোচ্, সোফা, পাশে পাশে লো টেবিল, মাঝখানে সেন্টার-টেবিলের ওপর বোনা-টোনার বিদেশী পত্রিকা, স্টেটস্ম্যান্, সিনেমা আর খেলাধুলোর ইংরিজী সাপ্তাহিক। বউদি দাদা রীতা অমিত তিনতলার তিনঘরযুক্ত কোয়ার্টার, জল-প্রপাতের শব্দ আবহসংগীত। আলমারির তাকে রবীন্দ্ররচনাবলী, কেষ্টনগরের পুতুল, মাটির ফলফুলুরি, আনাজ্। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বলল, 'দাদাকে দেখছি না যে—?'

রীতা যে সোফাটায় প্রশান্ত বসেছিল, তার হাতলের ওপর বসে নীচু হয়ে ঘুঙুর খুলেছিল। বলল, 'বাবার তো বি শিফট্ তুমি আসার মিনিট দশেক আগেই তো চা খেয়ে বেরিয়ে গেল।'

'মাকে ডাকো।'

'মা-ও নেই, নাইট্ শোয়ে মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে ফিল্ম্ দেখতে গেছে।'

রীতা উঠে দাঁড়াল। সালোয়ারের ওড়নাটা গুছিয়ে ঘুঙুরে দুটো দু হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে বাজাতে বাজাতে দাঁড়াও, তোমার জন্য চা বলে আসি', বলে পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অন্যমনস্কের মত টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিয়ে এলোমেলো পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা আশংকায় প্রশান্তর বুকে দুরদুর করে উঠল। প্রশান্ত দেয়ালের দিকে তাকাল, সামনের দেয়ালে জোড়া টেনিস্ র‍্যাকেট্ ঝুলছে, ওপাশের দেয়ালে এক জোড়া ব্যাড্‌মিণ্টন্ র‍্যাকেট, ভেতরে যাবার দরজার পর্দার দিকে দ্রুত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। নাঃ, আহ্, আছে—র‍্যাকেটের ওপর, ক্যাম্বিসের খোলে মোড়া...যেমন থাকে, তেমনিই রয়েছে। প্রশান্ত গভীর প্রশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল।

কব্জি উল্টে সময় দেখে প্রশান্ত আর সময় নষ্ট করা সমীচীন হবে না মনে করল। সাড়ে আটটা বাজে, সাড়ে নটায় শেষ বাস। তারপর রীতা এসে পড়লে প্রশান্তর পক্ষে কথাবার্তা চালান একটু শক্ত হয়ে পড়বে। প্রশান্ত গুটিগুটি দালানের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল।

'কেমন হচ্ছে পড়াশুনো?'

'ওই...', অমিত বই থেকে চোখ না তুলেই বলল।

প্রশান্ত মনে মনে জ্বলে উঠল, এই বয়সেই ডাঁট শিখে গেছে বেশ, চোখেমুখে, কথাবার্তায় সব সময় যেন মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে, আমি চট্‌কলের হাজারী মনসবদারের পোলা।—সে তোর বাবা, তুই কি রে? কোন রকমে তো গড়িয়ে গড়িয়ে ক্লাসে উঠিস্। প্রশান্ত আগেও লক্ষ করেছে, যখন দাদা-বউদি রীতা আর অমিতকে নিয়ে ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাড়িতে যায়, অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের বেশী থাকে না কখনই—ইলেক্‌ট্রিক আলো নেই, ফ্যান্ নেই, রাস্তার কলে জল ধরতে হয়, পুকুরে স্নান সারতে হয়—তখন রীতা দুলু ইতিদের নিয়ে সারা উঠোনময় হুড়োহুড়ি করে খেলা করে, অমিত তখন কোমরে হাত দিয়ে পায়চারি করে, বসে না পর্যন্ত, রমা খবার দিলে দু আঙুলে একটা মাংস তুলে নিয়ে আলগোছা মুখে ফেলে যেন কোনরকমে গলাধঃকরণ করে, গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়াবার আগে জিজ্ঞেস করে, জল ফোটান কি না। ওরা উঠোনময় হুড়োহুড়ি করে বেড়ায়, তখন পায়চারি করতে করতে এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যেন পাঁচতলা বাড়ির জানলা থেকে বস্তির ছেলেদের ড্রেনটের জলে স্নান করা দেখছে।

এখন নিজের গরজ। প্রশান্ত গলার স্বর যথাসম্ভব ভারি করে বলল, 'কোন লাইনে যাবে ঠিক করেছ?'

অমিত এবার সরাসরি চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রশান্তর চোখের দিকে তাকাল, 'পরীক্ষাটাই তো আগে হোক্...।'

একদলা কাদা কেউ যেন প্রশান্তর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেবার মত থাবড়ে বসিয়ে দিল। ঢোক গিলে প্রশান্ত উপেক্ষাটা হজম করল। প্রশান্তর ভেতরে দু দিক থেকে তাড়া আসছে, রীতার আসার আর দেরি নেই, শেষ বাস ধরতেই হবে।

প্রশান্ত টেবিলের ওধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। অমিত চোখ তুলে দেখে বইয়ে খুব গম্ভীর অবস্থা। টেবিলের ওধার থেকে অমিতের ঘাড়ের দিকে চোখের দৃষ্টি সরু করে ফেলে প্রশান্ত চিন্তা করতে লাগল— কিভাবে এগুনো যায়, কেমন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছন যায়?

'তুমি তো এন সি সি নিয়েছ, না?'

'অমিত মাথা নাড়ল।

'ওখানে কী শেখায় তোমাদের?'

'মার্চ, রাইফেল, শুটিং...এইসব।'

'বাঃ বাঃ।' কথাটাকে প্রায় লুফে নিয়ে প্রশান্ত চোখেমুখে একটা প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলল, 'রাইফেল্ শুটিং-এ তোমার হাত নিশ্চয়ই বেশ খুলে গেছে এখন?'

অমিত খানিকটা বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল, 'কেন?'

'বাঃ, তোমার মনে নেই—', প্রশান্ত টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল, 'সেবার, তুমি বাড়িতে তোমার এয়ার-রাইফেলটা নিয়ে গেছিলে? অত গাছের মগডাল থেকে একটিমাত্র গুলিতে তুমি যেভাবে কাকটাকে নামিয়ে আনলে, খুব উঁচুদরের নিশানাজ্ঞান না থাকলে ও-রকম হয় না। তারপরের কাণ্ডটা মনে আছে তোমার, দেখতে দেখতে এক হাজার কাক জুটে গেল,...সাঁ-সাঁ করে বাড়িটাকে ঘিরে পাক খেতে লাগল, আর চীৎকার, বাড়িতে তিষ্ঠানোই দায় হয়ে উঠল।'

অমিত হাসল। চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে বসল। 'ওটা কিন্তু আন্দাজেই...'

'আরে না না, আন্দাজে হবে কেন?' অমিতকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রশান্ত নিজের জিভে টোকা দিল, 'আমার মধ্যে অনেক জিনিস থাকে, ওইরকম হঠাৎ একদিন তা বেরিয়ে পড়ে।...আমাদের সময় ম্যাট্রিকের সিলেবাসে ওই ধরনের একটা পিস্ ছিল। এক জেলে, যাকে পাখি বললেই তার শরীরের কী যেন ভর করে।'

প্রশান্ত একটু সময় নেয় দিল। অমিত কেমন প্রস্তুত হল, বোঝবার চেষ্টা করল। প্রসঙ্গটায় একেবারে সরাসরি না গিয়ে প্রশান্ত আরও একটু ঘুরপথে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করল। 'আচ্ছা, তোমার এয়ার-রাইফেলটায় পাখিটাখি ছাড়া কুকুর-বেড়ালটেড়াল মরে?'

'কুকুর মরে কি না জানি না, আমি একবার একটা বেড়াল মেরেছিলাম।' অমিত একটা কাগজে আঁক কাটতে কাটতে বলল, 'ঠিক তক্ষুনি মরেনি, শটস্টা গলায় লেগে ভেতরেই থেকে গিয়েছিল। তিন চার দিন বাদে দেখি, টেনিস্ কোর্টের পেছনে এক কোণায় মরে পড়ে রয়েছে। শটস্গুলো তো লেড্-এর। লেড্-পয়েজনিং হয়ে গেছিল।'

ভেতরের ঘরে কাপ্-প্লেটের শব্দ হচ্ছে। রেফ্রিজেটার খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। রীতা এখনই চা নিয়ে এসে পড়বে।

প্রশান্ত আর সময় নষ্ট করা ঠিক বলে মনে করল না।

'তোমার এয়ার-রাইফেলটা আমায় একবার দিতে পার? এই দিন দুয়েকের জন্যে? গুলিটুলি আছে তো?'

'আছে বোধহয় কিছু—।' অমিত রীতিমত কৌতূহলী, 'কি করবেন?'

এরকম এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়ায় প্রশান্ত অমিতের ওপর দারুণ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতেই তুমি থেকে তুই-তে এগিয়ে গেল। 'আর বলিস্ কেন?' বলতে গিয়ে প্রশান্ত থমকাল। এখন বলতে গেলে সবিস্তারে সব বলতে হবে। জাম-টামের

ব্যাপার শুনলে অমিত হয়ত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে থাকবে, এদিকে শেষ বাস ধরাতেই হবে। এখন চা খেয়ে বন্দুকটা নিয়ে উঠতে পারলে হয়। ছেড়ে দেওয়া কথার খেই খুঁজে নিয়ে প্রশান্ত বলল এক ব্যাটা পাগলা কুকুর কদিন হল কোথা থেকে এসে বাগানে ডেরা করেছে। দিনরাত খ্যাঁচ্‌খ্যাঁচ্ করে লোকজন তাড়া করছে... ওর বাপধনকে এমন শিক্ষা দেব—।'

একটা ট্রেতে করে রীতা খাবারের প্লেট আর চা নিয়ে এল।

'কাকু, পুডিংটা খেয়ে বল কেমন হয়েছে. —আমি তৈরি করেছি।' রীতা ট্রে থেকে পুডিং আর কাজুবাদামের প্লেট দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

এত সহজে কার্যোদ্ধার হবার আনন্দে প্রশান্তর বুকের ভেতরটা হাল্কা-হাল্কা লাগছিল। রীতার মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বলল 'খুকুটা যে গিন্নী হয়েছিস—'

'তোর, শর্টস্ আছে কি না?' অমিত চেয়ার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে রবারের চটি বাজিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

চামচ করে পুডিং কেটে মুখে দিয়ে প্রশান্তর বাড়ির কথা মনে হল। বাড়ি গিয়ে হয়ত দেখবে, রমা তার বুদ্ধির বহুব্যবহৃত অস্ত্রটাই বেছে নিয়েছে এবারও। অর্থাৎ অনশন বন্ধ। ঘাড় তুলতে দেখল, রীতা মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রশান্ত সমস্ত চোখেমুখে রস টেনে আনল, '—দারুন!' তারপর হাঁক পেড়ে বলল, 'ওরে অমিত, গুলিটুলি একটু বেশী করে আনিস্। তুমি তো আবার ইণ্ডিয়ার পয়লা নম্বরে কাদার-পায়রা শুটার—।'

শেষ বাস পেল না। সাইকেল-রিকশা করতে হল। হাতে ক্যাম্বিসের খোলে মোড়া বন্দুক। রিকশার ঝাঁকুনিতে পকেটের ভেতর গোল পিচবোর্ডের বাক্সে সীসের গুলিগুলো সড়সড় করে উঠছে। সমস্ত শরীরে উত্তেজনা। প্রশান্ত রিকশা ভাড়ার বাড়তি খরচের আফসোসটুকুকে আমলই দিল না।

রমা দরজা খুলে দিল। সদর দরজার খিল ছিটকিনি ঠিকঠাকমত লাগিয়ে প্রশান্ত দেখল, শোবার ঘরের দরজার গোড়ায় হ্যারিকেন্ নামিয়ে রাখা। ঘরে এসে দেখল, রমা মেঝেতে পাতা বিছানার মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নিজের অনুমানকে প্রশান্তর সত্য বলেই মনে হল। রমা সেই সকাল থেকে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে। ছেলেমেয়েরা ঘুমচ্ছে। তক্তপোশের ওপর প্রশান্তর বিছানায় মশারি ফেলা।

প্রশান্ত বন্দুকটা ঠেসান দিয়ে রাখল দেয়ালে। কোমর ভেঙে নীচু হয়ে মশারির দড়ির তলা দিয়ে গলে টেবিলের কাছে গিয়ে একে একে পকেটের জিনিসগুলো বার করে রাখল। হাঙারে পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে দিল। কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। প্রশান্ত জানে, মশারির ভেতর থেকে এক জোড়া চোখ সব লক্ষ করছে, সব কিছু দেখছে।

আওতার ভেতর গোছান রয়েছে সব। র‍্যাকের ওপর বালতিতে হাতমুখ ধোবার

জল, কাপড় শুকতে দেবার দড়িতে গামছা, রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া রাত্রের খাবার, তক্তপোশের তলায় ডাবরের ওপর সাজা পান, জর্দার কৌটো।

পান চিবোতে চিবোতে তক্তপোশের কোণের দিকে মশারি সুদ্ধ বিছানাটা একটু উল্টে দিয়ে প্রত্যহের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে প্রশান্ত সিগারেট ধরাল। ঠোঁটে সিগারেট চেপে ক্যাম্বিসের খোলের মধ্য থেকে বন্দুকটা টেনে বার করল। হ্যারিকেনের আলোয় বন্দুকটা দেখাল আরও ঝকঝকে, আরও মসৃণ। প্রশান্ত বেশ অনুভব করল, বন্দুকটা হাতে নিতেই তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তেতে উঠেছে।

খোলা দরজা দিয়ে প্রশান্ত বাইরে তাকাল। আমগাছটার যে ডালটা বাড়ির ঘেরা পাঁচিলের ওপর এসে পড়েছে, সেই দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ করল। এখনও কোন সাড়াশব্দ নেই। বন্দুকের ট্রিগার, নল, মাছি, গুলির চেম্বারের ওপর আলতো করে হাত বোলাল। অমিত চেম্বার ভর্তি করে গুলি দিয়ে দিয়েছে। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। টুকরোটা দু' আঙুলের টোকায় বেশ খানিকটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশান্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে টেনে দরজা ভেজিয়ে দিল।

আকাশে ফিকে একটু চাঁদের আলো রয়েছে। হালকা কুয়াশা ঝরছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশান্ত এমন একটু জায়গা খুঁজল যে জায়গাটা একটু অন্ধকার—ঘুপচি মতন—যেখান থেকে আমগাছের যে ডালটা পাঁচিলের ওপর এসে পড়েছে, সেই জায়গাটা পরিষ্কার লক্ষ্যের মধ্যে রাখা যায়। ওইটাই আসা-যাওয়ার রাস্তা। অনেকদিন প্রশান্ত ঘরে বসে দেখেছে, বাড়ির আলো নিবলে ভামটা আমগাছের ডাল দুলিয়ে ঝুপ্ করে নামল পাঁচিলের ওপর। নেমে অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে পাঁচিলের ওপর কালমেঘ আর ডাকাত্রেপাতার ঝোপের মধ্য দিয়ে তরতর করে চলে এল একেবারে রক পর্যন্ত। লাফিয়ে নেমে পড়ল রকের ওপর—এমনি করে নামে, তারপর চষে বেড়ায় সারাটা বাড়ি। বাসনধোবার জায়গায় গিয়ে টুকিয়ে টুকিয়ে এঁটোকাঁটা খায়, টালির ফাঁক দিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে, বেড়ালবাচ্ছাগুলো ভাল করে চাপা দেওয়া না থাকলে পরদিন দেখা যায় ঘাড় মটকে পড়ে রয়েছে—শরীরে একবিন্দু রক্তও অবশিষ্ট নেই, রমা পাউরুটি বা দুধের বাটি জালের আলমারিতে তুলে রাখতে ভুলে গেলে সকালে আর কিছুই পাওয়া যায় না। রাত্রে অনেক সময় এমনও হয়েছে, খুটখাট শব্দে প্রশান্তর ঘুম ভেঙে গেছে, শুয়ে শুয়েই তাড়া দিয়েছে—অন্ধকারে চকিতে একটা কালো ছায়া লাফ দিয়েছে জানালার বাইরে।

জায়গা খুঁজতে গিয়ে প্রশান্ত রান্নাঘরের পাশটাই পছন্দ করল। ওখান থেকে আমগাছের ডাল, পাঁচিলের সমস্তটাই নজর এবং নিশানার মধ্যে থাকে। লুঙ্গি গুটিয়ে বন্দুকটা সযত্নে পাশে রেখে প্রশান্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদ খুব মৃদু জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে শিরশিরে বাতাস গাছের ডালপালা নাড়িয়ে দিচ্ছে। চারিদিক নিঃশব্দ ছিল, কাছেই একটা শেয়াল ডাকল। হুইহুই পড়ে গেল চতুর্দিকে।

প্রশান্ত সচেতন হল। খুব পরিচিত শব্দ, অনেকটা তেল-না-দেওয়া সাইকেলের চাকার কিচকিচ্ শব্দের মত। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে-পড়া আমগাছের ডালটার দিকে। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, ডালটা নড়ছে হাওয়ায়, না কোনও শরীরের ভারে। কিন্তু ভামটার উপস্থিতি এখন প্রশান্তর কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট! চাপা শব্দ হচ্ছে, কিচকিচ্, কিচ্‌কিচ্। প্রশান্ত বন্দুকটা হাতের মুঠোয় তুলে নিল অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রশান্ত বুঝল, তাকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে না। একসময় দেখল একটা শরীরী ছায়া আমগাছটার ডাল বেয়ে নিঃশব্দে পাঁচিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমগাছের ডাল ঝরঝর করে নড়ে উঠল। —ঝুপ্ করে ছায়াটা লাফিয়ে নামল পাঁচিলের ওপর। প্রশান্ত দ্রুত বন্দুকটা কাঁধে লাগিয়ে ডান চোখ বুজিয়ে পাঁচিলের দিকে নল স্থির করল। আমগাছের ছায়া পড়েছে পাঁচিলের ওই অংশটায়। দেখা যায় না, কিন্তু ছায়াটার উপস্থিতি নড়াচড়া অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ছায়াটা গুটিগুটি পাঁচিলের ওপর দিয়ে এগুচ্ছে আলোয় বেরিয়ে এল! খুব সাবধান, সন্তর্পণ ভঙ্গি। প্রশান্ত পুরোপুরি সমস্ত শরীর নিয়ে এবার ভামটাকে দেখতে পেল। বন্দুকের ইউ-সেপ্ মাছি আর ভামটাকে একটা সমান্তরাল রেখায় এনে অপেক্ষা করতে লাগল, সময় যেতে দিল। ভামটা এগুচ্ছে। প্রশান্তও চোখের দৃষ্টি, বন্দুকের ইউসেপ, মাছি এবং লক্ষ্যবস্তু একটা কঠিন সমান্তরাল রেখায় বন্দী রেখে বন্দুকের নল ঘোরাচ্ছে। ভামটা রক্-এর ওপর লাফিয়ে নামার নির্দিষ্ট জায়গাটায় এসে থামল। প্রশান্ত বন্দুকের নলটা ভামটার ঠিক মাথার সমান্তরালে এনে প্রশ্বাস চেপে ট্রিগার টিপল।

ঠাস্ করে একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভামটা পাঁচিলের ওপর স্প্রিং-এর মত হাতখানেক লাফিয়ে উঠে নীচে কচু গাছের ঝোপের মধ্যে পড়ল। প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছে। দু' চোখে হতভম্ব দৃষ্টি, নিজের লক্ষ্যভেদের অব্যর্থতায় বিমূঢ়। কচুগাছের ঝোপে তখন দারুণ আলোড়ন চলেছে। অবস্থাটা দ্রুত কাটিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ঝোপ লক্ষ্য করে আরও কয়েকটা ঠাস্ ঠাস্ গুলি ছুঁড়ল। আওয়াজে বুঝল, গুলিগুলো সবই কচুপাতা ফুটো করল, না হয় পাঁচিলের খানিকটা করে নোনা খসাল।

ঝোপটা স্থির। প্রশান্ত বন্দুকটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে ঘরের দরজা খুলে

হ্যারিকেন্ বার করে ঝোপটার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ফিরতে দেখল, জামটা বার দুয়েকের চেষ্টায় লাফিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে আমগাছের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রশান্ত বন্দুকটার দিকে তাকাল। বুঝল, এখন আর চেষ্টা করা বৃথা।

হ্যারিকেন্ নিয়ে প্রশান্ত এগিয়ে গেল। ঝোপটা ছিঁড়েখুঁড়ে এলোমেলো। হ্যারিকেন্ আরও কাছে নিয়ে গিয়ে ভাল করে লক্ষ করল—পাতার ওপর টাটকা রক্তের ছিটে, পাঁচিলের গায়ে রক্তের ফোঁটা আলোয় চোখের মত চকচক্ করে উঠল।

বিছানায় শুয়ে প্রশান্ত স্থির করবার চেষ্টা করল, গুলিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগতে পারে? মাথায়? নিশ্চয়ই নয়, তাহলে আর পালাতে পারত না! একটিমাত্র গুলির আঘাত কী অত বড় জন্তুটাকে নিহত করতে পারবে! গুলিটা এখনও বিঁধে আছে তো, নাকি জামটা তার সুচোল ঠোঁট ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁতে করে গুলিটাকে টেনে বার করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

পাশ ফিরতে গিয়ে প্রশান্ত দেখল, রমা মশারির ওধারে তক্তপোশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানার মধ্যে আসার জন্যে সাবধানে মশারি ওঠাচ্ছে। প্রশান্ত রমাকে জায়গা দিতে বিছানার পাশের দিকে সরে গেল। বালিশের এক দিকে মাথা সরিয়ে নিল, যাতে রমাও মাথা রাখতে পারে। প্রশান্ত চিত হয়ে শুয়ে ছিল, রমা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে প্রশান্তর বুকের ওপর হাত তুলে দিল।

মশারির চালের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বলল, 'জান, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, গুলিটা ওর গলায় গিয়ে লেগেছে।'

'সত্যি?' রমা প্রশান্তর বুকের রোমের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিল।

'শুধু লেগেছে নয় বিঁধে রয়েছে।' প্রশান্ত বলল, 'দেখ গে, এতক্ষণে হয়ত লেড্ পয়জনিং শুরু হয়ে গেছে।'

রমা প্রশান্তর ঘাড়ে মুখ গুঁজে দিল। কানের লতিতে নাক ঘষল।

'বুঝলে, কাল থেকে কদিন—' প্রশান্ত বলল, 'এদিক-ওদিক একটু খুঁজতে-টুঁজতে হবে। হয়ত একেবারে কালই মরবে না, আমাদের দু-একদিন একটু খাটতে হবে, বিষটাকে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাবার জন্যে খানিকটা সময় দিতে হবে বইকি।'

রমা আরও সরে এল, 'তা তো দিতেই হবে। আমি বরং দুলে-টুলিকে বলে দেব, কোথাও পচা গন্ধ পেলেই যেন আমায় বলে। —পাড়ার ছেলেদেরও বলে রাখব।'

প্রশান্ত এতক্ষণে যেন নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে রমার শরীরের উত্তাপ টের পেল। পাশ ফিরে মুখোমুখি হল। রমার ঠোঁটে আলতো করে আঙুল বোলাল, 'আজ থাক, সারা দিন তুমি কিছু খাওনি—'

রমা প্রশান্তর হাতের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে নিয়ে পিঠে চাপ দিল, 'সেসব চিন্তা তোমায় করতে হবে না।'

রমা নিজের বিছানায় ফিরে গেছে। প্রশান্তর দু চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। হঠাৎ একটা চকিত চিন্তায় প্রশান্তর মাথার শিরা উপশিরায় ঝন্ঝন্ করে উঠল। দু চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল প্রশান্ত। জামটাকে হত্যার অভিলাষে রমা এত খুশী কেন? আজ সকালেই তো জামটা' তার একটা গোপন পাপের খবর রমার হাতে পৌঁছে দিয়েছে। আজই সকালে জামটা রমার কাছে ঈশ্বর ছিল? তা হলে! তা হলে তা হলে তা হলে তা হলে তা হলে—প্রশান্ত কেঁপে উঠল, রমারও কী কোন গোপন পাপ আছে!

ঘরের মধ্যে প্রবল অন্ধকার।

অন্ধকার ক্রমেই জমাট আর ভারী হয়ে বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে চাইছে। অন্ধকারে প্রশান্ত নিজেকে খুব অসহায়, ভয়ংকর বিপন্ন মনে করল।

নরেন্দ্র দেব

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি নিয়ে বেশ একটু মতভেদমূলক আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

সাহিত্য যে সভ্যজগতের সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দান, আশা করি এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত হবেন না। মানুষের মনোরাজ্যের নানা দিকেই সাহিত্য আজ ব্যাপকভাবে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্য কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় চিন্তারই ধারক ও বাহক নয়, সে আমাদের আশেপাশের পরিচিত প্রতিবেশী মানুষগুলিরও অন্তর-বাহিরের স্বরূপটি চোখের সামনে মেলে ধরছে। মনের অগোচরে আমাদের যা কিছু গুপ্ত হয়ে রয়েছে তারও একটা সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রকাশ্য আলোকে সর্বসমক্ষে প্রতিফলিত করছে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন নিজেকে আর নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, সাম্প্রতিক সাহিত্য-মুকুরেও তেমনি তার অন্তরের একান্ত প্রতিচ্ছায়া আজ আর তার নিজের কাছেও গোপন থাকছে না।

জীবনের এই গুহানিহিত রহস্যের মূলে তত্ত্বটি প্রকাশের ভাষা জানেন কেবলমাত্র শক্তিধর শিল্পীরাই, যাঁদের রচনাভঙ্গীর মধ্যে নিজস্ব প্রতিভার অসাধারণত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আপন মাধুর্যেই। তাঁদের নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণও শিল্পসমৃদ্ধির গুণে সার্থকতা মণ্ডিত হয়ে ওঠে। কারণ, তাঁদের দৃষ্টি সেখানে দার্শনিকের চোখের। তাঁরা ভোক্তা নন। অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মতো তাঁরা শুধু দ্রষ্টা।

কালের নিয়ত পরিবর্তনশীল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রবহমান যুগের প্রভাব শিরোধার্য করে নিয়ে যে সাহিত্য আপন রূপ ও রং ক্রমাগত বদলে বদলে চলে সেই হয়ে ওঠে সত্য ও সজীব সাম্প্রতিক সৃষ্টি। প্রত্নতত্ত্বের মোহে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে সাহিত্যের স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে মজে ওঠে। নব নব সৃজনোন্মুখ প্রতিভার তরণী সে পথে সহজ গতিতে অগ্রসর হতে পারে না বলে সে নূতন পথ কেটে নিয়ে দুঃসাহসীর মতোই অগ্রসর হয়। কোনো বাধাই সে মানে না।

সাহিত্যের জগতে শতাব্দীকাল আগেও এমন একটি প্রাচীন মান্ধাতার যুগ বিদ্যমান ছিল যা অলংকারশাস্ত্রের কঠোর শাসন-বিধি মেনে কেবলমাত্র প্রচলিত ও অনুমোদিত সামাজিক রীতিনীতি ও পদ্ধতির নির্দিষ্ট আদর্শ অবলম্বন করে পাপের লয় ও পুণ্যের জয়ের পথে সাবধানে চলতে অভ্যস্ত ছিল। স্বাধীন চিন্তার সুযোগ নেবার অধিকার ছিল না তার। কতটুকু বলা চলে আর কতটা বলা চলে না, প্রকাশ্যভাবে তার নিখুঁত হিসাব রেখে তাকে অতি সাবধানেই লেখনী পরিচালনা করতে হত। সেকালের সমাজ কারুর পদস্খলন ক্ষমা করতো না।

কিন্তু সে প্রাচীন সমাজ কি আর আছে? তার বহুকালের সযত্নপোষিত কুসংস্কারের জের কিছুটা এখনও দুর্গম পল্লীতে অবশিষ্ট রয়েছে বটে, কিন্তু, তার তেজ আজ একেবারেই নিষ্প্রভ হ'য়ে এসেছে। মাঝে মাঝে গর্জন করে বটে, কিন্তু দংশনের দাঁত ভেঙ্গে পড়েছে তার।

ভিক্টোরিয়ান যুগের শৃংখলভাঙা নবীন পাশ্চাত্ত্য জগতের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্পর্শে এসে শিক্ষায়, দীক্ষায় ও জীবনের অভিজ্ঞতায় অগ্রসর বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে লেখনীর যে সতর্ক বাঁধন ছিল তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক সাহিত্য-স্রষ্টারা আর সেই সাবধানে চলার প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না।

সাম্প্রতিক সাহিত্য-শিল্পিরা এ সত্যটা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন নিয়ে জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম হবার পর তাঁরা নরনারীর চরিত্রের অকপট অকৃত্রিম চিত্রই রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই সাহস ও সত্যনিষ্ঠা যথার্থই প্রশংসনীয়। আজকের সাহিত্য তাই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আগের কল্পনাশ্রয়ী ও নীতিপ্রচারী রচনাবলী আর এ যুগের পাঠকদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না।

অসহায়ের মতো নিষ্ফল আক্রোশে কটু সমালোচনা করে দুর্নীতির দোহাই পেড়ে এর সহজ স্বাভাবিক গতিকে রোধ করা যাবে না। চলমান স্রোতের বেগকে নিন্দার উপল-আঘাতে কি রোধ করা সম্ভব? কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবোধের এ দুশ্চেষ্টা তাদের নিজেদেরই উপহাসাস্পদ করে তুলছে।

নীতি নিয়মের কঠিন নিগড়কে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে বাধা স্বরূপ মনে হওয়ায় নবযুগের শিল্পীরা তাঁদের নিজ নিজ প্রগতিশীল জীবনবোধের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির কাজে সাহসের সঙ্গেই অগ্রসর হয়েছেন। সমাজ-প্রচলিত নীতির অনুশাসন থেকে সবলে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে তাঁরা মানব-

মনের গোপন রহস্য ও জীবনের অনন্ত ইতিহাসকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই অনাবৃতভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের মধ্যে তাই নিরাবরণ সত্য ছাড়া কোনও মিথ্যার অবগুণ্ঠন নেই। নির্মম সত্যের এই উজ্জ্বল আলোক যাদের মনের অন্ধকার কোণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে সকলের সামনে টেনে এনে বেইজ্জত করছে, তাদের পক্ষে এ কাজটাকে সুনজরে দেখা সম্ভব নয়। বেয়াদবি মনে করে রেগে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিসম্পাত দেওয়াও বৃথা। চোখ রাঙিয়ে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই সৎ, অসৎ বা ভালো মন্দ দুটো প্রবৃত্তিই আছে। ভালোর মন্দয় মিশিয়েই তো গোটা মানুষটার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই। সমাজজীবনে আমরা অনেকেই নিরীহ ভালোমানুষের ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়াই, নিজ নিজ গৃহাভ্যন্তরে চরিত্র ততটা সাবধানে চলি না। বাইরে সাধুচরিত্রের ভূমিকাটি এমন নিখুঁতভাবে আমরা অভিনয় করি যে, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ বলে কেউ ধরতেই পারে না। সচ্চরিত্র ভালোমানুষ ভেবে অনেকেই একটা মস্ত ভুল ধারণা করে বসেন। কিন্তু কখনো অসাবধানে সেই মুখোশটি হঠাৎ খসে পড়লে আমাদের আসল রূপটি ধরা পড়ে যায়। এই ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাটা কেউ সহজে হজম করতে পারেন না।

মনোবিকলনবিজ্ঞান এ যুগের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের বেশ একটু সচেতন করে তুলেছে। মানুষের নির্জ্ঞান মনের রহস্যটুকু আজ আর আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। যদিও এ কথাটা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল যে, মনের অগোচর পাপ নেই কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল।

সাম্প্রতিক সাহিত্য মানুষের মনের সেই গোপনতাটুকুকে একেবারে বে-আবরু করে দেওয়ায় অনেকেই এ বেয়াদবি সহ্য করতে পারছেন না। আজ আমরা নিজেকে নিজে যেমন বিশ্লেষণ করে দেখতে শিখেছি আগে সেটা পারতুম না। লজ্জা ও ভয় ভেঙে গেলেই অনেক মানুষই বে-পরোয়া হয়ে ওঠে।

এই বেপরোয়া মানুষেরা কেউ অজানা জীব নয়। তোমার আমার মধ্যেই আছেন। সময়বিশেষে তাঁরা নিজ মূর্তি ধারণ করেন। সে মূর্তি দেখে আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। তাদের মনুষ্যত্বের ঘাটতিটুকু হয়তো শৈশবেই তাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। যৌবনের হাওয়ায় তা প্রকট হয়ে উঠছে। বর্তমানে সাহিত্যের দর্পণে অনেক সাজা ভালোমানুষের আসল রূপটি প্রতিফলিত হয়ে পড়ছে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠে কোনো কোনো সমালোচক নীতি ও রুচির মালকোঁচা বেঁধে সাম্প্রতিক লেখকদের হাতের কলম কেড়ে নেবার জন্য আওয়াজ তুলছেন।

কিন্তু এ কথা হয়তো আমরা অনেকেই ভেবে দেখি না যে, রুচি ও নীতির দোহাই পাড়েন জোর গলায় তাঁরাই, যাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা চারিত্রিক দুর্বলতা বাসা বেঁধে আছে এবং সেটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এই আতঙ্কটাই তাঁদের মনের মধ্যে প্রধানত কাজ করে।

মানুষের জীবনে হয়ত এমন অনেক কিছু ঘটনাই ঘটে যেটাকে কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কারুর কাছেই বলা চলে না। প্রকাশ্যভাবে বইয়ের পাতায় ছাপার হরফে তাকে মুদ্রিত করা নাকি অমার্জনীয় অপরাধ। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে—কেন? কি হিসেবে অপরাধ! ওটার মূলে কারণ তো ব্যক্তিগত লজ্জা ও নিজেদের সংকোচ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মুখে মুখে সে কলঙ্ককাহিনী তো পাড়াপ্রতিবেশীদের অজানা থাকে না। তবে এ দ্বিধা ও সংকোচ কিসের জন্য। মনকে চোখ ঠারা বই তো নয়। বরং সাহসের সঙ্গে সত্যকে স্বীকার করে নিলে অনেক কুৎসিত গ্লানি ও মিথ্যার রং চড়ানোটা বন্ধ হতে পারে। অপরাধীদের পক্ষে জনসাধারণের কাছে মার্জনা পাওয়া সহজ হয়। দুর্বলতা কোন্ মানুষের মধ্যে নেই? প্রলোভন জয় করা যে সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এটা তো সর্ববাদীসম্মত সত্য। সুতরাং মানব-চরিত্রের এই অক্ষমতা যদি কোনো গ্রন্থে আলোচিত হয় তবে সেটা অপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে কেন? অদ্বৈতবাদী সাধক শংকরাচার্যকেও যৌনজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য রাজা অমরুকের মৃতদেহের মধ্যে যোগবলে প্রবেশ করতে হয়েছিল। জীবনের সব দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যাঁরা সাহিত্যিক, তাঁরা শিল্পী। মানব-জীবনের এতাবৎ অপ্রকাশিত ইতিহাস লেখবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন তাঁরা। সুতরাং তাঁদের পক্ষে রুচি ও নীতির প্রাচীন দোহাই মেনে সত্যকে গোপন করা সম্ভব নয়। যেটা বলা উচিত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য সেটা না বললে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হবে। মানুষের জীবনে ও সমাজে যা ঘটছে তার সত্য রূপ প্রকাশ করাই সাহিত্যের ধর্ম।

আদি কবি বাল্মীকি, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই দুই মহাকাব্যে দেবদেবীদের সঙ্গে বিশিষ্ট নরনারীরও মহাজীবনের মহাকাব্য রচনা করতে বসে তাঁদের জীবনের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার চিত্রও আমাদের সামনে তুলে ধরতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি,

এমনকি ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত ঋষি-তপস্বীদের পদস্খলনও অকপটে বর্ণনা করেছেন; কারণ; তাঁরা জানতেন, মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার দিকটা যদি গোপন করে রাখেন তবে তাঁদের সে মহৎ সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানবগোষ্ঠীর চরিত্র পাহারা দেওয়া তো সাহিত্যিকের দায় নয়। সে স্রষ্টা। তার লেখনী জগতের ভাল মন্দ কোনটা বাদ দিতে পারে না। সে আবার দ্রষ্টাও বটে। সমাজ ও জীবনের পঙ্কিলতা, নোংরামি ও ব্যভিচার দেখে সে কি অন্ধের মতো দু চোখ বন্ধ করে থাকবে? সাহিত্য যে মানবজীবনের যথাযথ প্রতিচ্ছবি। নীতিশিক্ষার জন্য তো আমাদের কি প্রাচীন, কি অর্বাচীন অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তাঁরা সাহিত্যের রসাস্বাদন পরিহার করে অষ্টাদশ পুরাণ পড়ুন, বেদ উপনিষদ পড়ুন, মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা পাঠ করুন। এইসব সদ্‌গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রচলন করে তাঁরা জাতির ধর্ম ও চরিত্র রক্ষা করুন। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বোধোদয়', 'চারুপাঠ', 'কথামালা' প্রভৃতি যেসব নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ ছাত্রজীবন থেকে আমরা পড়ছি এবং পড়াচ্ছি সেসব গ্রন্থের নীতিবাক্যগুলি উত্তরজীবনে আমরা সকলেই কি মেনে চলি? না, অনুসরণ করি? 'সদা সত্য কথা কহিবে, কদাচ মিথ্যা বলিও না'—বলুন তো বুকে হাত দিয়ে ক'জন আমরা এ নীতি উপদেশ পালন করি?

সাহিত্য স্রষ্টারা তো নীতিশাস্ত্র রচয়িতা নন। তাঁরা ঋষি-তপস্বীও নন। তাঁরা সাহিত্যসাধক মাত্র, আর সাহিত্য যখন মানবজীবন সম্পর্কীয় সমাজচিত্র, তার মধ্যে সুনীতি দুর্নীতি দুইয়েরই স্থান আছে। দুটো রঙের একটাকে বাদ দিয়ে একটা নিয়ে কারবার করলে জীবনের ছবি অসম্পূর্ণ এবং একপেশে হতে বাধ্য।

এ কথা আমাদের ভুললে চলবে কেন যে, প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনের নিভৃত গোপন অন্তঃপুরেও সাহিত্য স্রষ্টাদের অবাধ গতি-বিধি রয়েছে। তাদের সন্ধানী দৃষ্টির কাছে আমাদের সব দুর্বলতা ধরে পড়ে যায়। শক্তি-মান শিল্পীর লেখনী নিখুঁতভাবে সে চিত্র প্রকাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। যিনি প্রতিভাবান লেখক, শক্তিমান শিল্পী, তিনি অকপটে সত্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হন না। বিরুদ্ধ-বাদী সমালোচকদের নিক্ষিপ্ত নিন্দার লোষ্ট্র সে কঠিন সত্যের অঙ্গস্পর্শ করতে পারে না।

অনেকের মুখেই এ আক্ষেপ শোনা যায় যে, সাহিত্যমন্দির এখন নাকি একেবারে কলুষিত হয়ে উঠেছে। 'সৎ সাহিত্য' বলে এ যুগে নাকি আর কিছু নেই! সাহিত্যের বাজারও এখন নকল ও ভেজালে ভরে উঠেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, খাঁটি সাহিত্যটা কী বস্তু? আর নকল ও ভেজালই বা নির্ণয় করছেন তাঁরা কী উপায়ে? সাহিত্য সমালোচকেরা কি Chemical Examiner-দের মতো তাঁদের ল্যাবরেটরিতে বসে সাহিত্যরসের অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার দ্বারা সেটার প্রামাণিক পরিচয় সঠিক নির্ণয় করতে পেরেছেন? যেটাকে তাঁরা নকল, ভেজাল, নোংরা সাহিত্য বলে ঘোষণা করছেন, সেটা যে সাহিত্যবস্তুরূপে মূলে খাঁটি original base, তথা organic element নয় এটা কি নিঃসংশয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে?

আমাদের মতো অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতার সন্দর্ভেই বলতে পারি, ছায়া, ভেজাল, নকল ও নোংরা বলে যেসব ঘটনাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সেটা সহজে উড়ে যাবে না। আমাদের ঘরের প্রাঙ্গণেই তার শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে যেখান থেকে সে রস আহরণ করে গজিয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে তার বীজ উড়ে আসেনি।

প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার, তেমনি আমাদের জীবনদীপের তলদেশেও ছায়ার মতো অন্ধকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। ছায়াকে বাদ দিয়ে কায়ার সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। যে-কোনও প্রাথমিক শিল্পীও এ কথা জানে। তেমনি সাহিত্যে কোনও নরনারীর সম্পূর্ণ রূপটি ফুটিয়ে তুলতে হলে তার দোষগুণ, তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা, তার চিন্তার 'সু' এবং 'কু', তার মনের আলোর দিক ও কালোর দিক সবটুকুই না দেখালে সে চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শ্লীলতা ও সুরুচির দোহাই দিয়ে যেসব নীতিবাগীশ সমালোচক সস্তার বাজার সরগম করতে চান তাঁরা শিল্পী নন। তাঁরা ভুলে যান যে মেয়েমানুষ জাতটা শুধু মেয়েই নয়, তারা মানুষও বটে। মানুষের যা কিছু দোষ গুণ ত্রুটি বিচ্যুতি তার মধ্যেও নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুতরাং তাদের জীবনেও পদস্খলনটা খুবই স্বাভাবিক। নারী ও পুরুষ সংসারে একই বিপদসংকুল পথের যাত্রী। প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে জৈব ধর্মের প্রাকৃতিক নিয়মে মেয়েদের 'মা' হতে হয় বলে তাঁরা পুরুষের চেয়ে একটু বেশী সংযমী, কিন্তু দেহ-দহে যখন কামনার প্লাবন আসে তখন নীতি ও সংস্কারের বাঁধ আপনিই ভেঙে পড়ে, এইটেই স্বাভাবিক। নারীপ্রকৃতি তার প্রিয়জনের প্রতি স্বতঃই বিশ্বাসপ্রবণ, ফলে দুশ্চরিত্র পুরুষের পক্ষে তাকে প্রবঞ্চিত করা সহজ হয়ে পড়ে। অপরিচিত ও অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশার সুযোগ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও একেবারেই ছিল না। কিন্তু দ্রুত সমাজের রূপ বদলে চলেছে। নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার কোনো বাধাই এখন আর নেই। এ ক্ষেত্রে দুটি তরুণ তরুণীর মিলনের ফলে যদি অবাঞ্ছিত কোনও অবস্থার উদ্ভব হয়, সে স্থলে কোনও শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী তাঁর রচনায় সে দুর্ঘটনার কাহিনী মুন্সিয়ানার সঙ্গে খোলাখুলি বিবৃত করেন তবে কি তাঁকে দুর্নীতি প্রচারের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে? যদি কেউ তা করেন, তবে তাঁকে আধুনিক গল্প উপন্যাস না পড়ে গীতা-ভাগবতে মনোনিবেশ করতে বলবো। কারণ, প্রচলিত যুগের কথাসাহিত্য বিচিত্র মানব-চরিত্রের প্রামাণ্য ইতিহাস, কাল্পনিক উপাখ্যান নয়। নিজেকে চোখ ঠেরে সাম্প্রতিক সাহিত্যকে অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক বলে চিৎকারের মধ্যে আর যাই থাক, সততার আভাস মাত্র নেই।

মানুষের মনের অগ্রগতিকে শাস্ত্রবচনের বেড়া দিয়ে, পুরাণ, কোরান ও বাইবেল-আবেস্তার দোহাই দিয়ে কতকাল আর ঠেকিয়ে রাখা যায়? অবিরত সামনের দিকে ছুটে চলা কালের অপ্রতিহত গতিকে পিছন দিকে টেনে ধরে রাখা কোনো ঐরাবত সম্প্রদায়েরও পক্ষেও সম্ভব নয়। সময়ে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রু এ রসবোধেরও স্বাদ বদলায় এবং ত জীবনযাত্রার রীতিনীতিরও যে রূপান্ ঘটে এ তো আমরা চোখের সামনেই দেখ পাচ্ছি। সমাজ তো এদের নিয়েই, সুতর সে যে আজও অচলায়তন হয়েই থাক এ আশা যাঁরা করেন তাঁদের আশাভঙ্গে জন্য আমরা দুঃখিত হতে পারি কি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাতে প্রস্তু নই; কারণ, সাম্প্রতিক সাহিত্য মানুষে চলমান জীবনের গতি নিয়েই কারব করে। সুতরাং মানুষের স্খলন-পতনে বিবরণ তাতে বর্ণিত হওয়া অনিবার্য।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটে, রসবোধেরও স্বাদ বদলায় অতি আধুনিক ছেলেমেয়েদের সাজপোশা আর চালচলন দেখলেই তো সেটা বো যায়। সুতরাং আজকের সাহিত্যে য ড্রেন পাইপ প্যাণ্ট, ছুঁচোমুখো জু এবং নাইলন শাড়ি আর পেটাপিঠ-ক ব্লাউজ পরা ছেলেমেয়ে এসে বসবার ঘ ঢুকে পড়ে তাদের তাড়াবে তোমরা ক উপায়ে? তারা তো গৃহের শোভা অসবা পত্র নয় যে, কুলি ডেকে রাস্তায় তুলে দে দেবে? তারা এ যুগের জলজ্যান্ত মানু যে! তোমার আমার ঘরেরই ছেলেমেয়ে!

মেয়েরা আজ পর্দা সরিয়ে, ঘোমটা খু অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙে বাইরে বেরি এসেছে। স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষা পে পুরুষদের সব বিষয়েই 'চ্যালেঞ্জ' করছে সাম্প্রতিক সাহিত্যে আমরা এই মেয়েদেরই দেখা পাই। আগের দিনের ম

ঠাকুরমাদের মত স্বামী-পুত্রের দয়াদাক্ষিণ্যে এরা পরাধীন জীবন যাপন করে না। এ কালের মেয়েরা পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির আইনসম্মত উত্তরাধিকার পেয়েছেন। অনেকে উপার্জন করেও আজ আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করছেন। মন্ত্র পড়ে শালগ্রামশিলা ও অগ্নি সাক্ষ্য রেখে যে বিবাহবন্ধনে তাদের বাঁধা হত সে বন্ধন আজ আর অচ্ছেদ্য নয়। পুরোহিতের পরিবর্তে রেজিস্ট্রারের ঘরে দলিলে সই করেও সবর্ণ অসবর্ণ সব বিবাহই এখন চলছে। এই যুগে যা সত্য তাকে মিথ্যার আবরণে কত দিন আর ঢেকে রাখা চলবে? উপদংশের দুঃস্থ ক্ষতের মত সে যে সমাজের সর্বাঙ্গে আজ ফুটে বেরুচ্ছে। সে কদর্যতার প্রকাশকে কি তিরস্কারের লজ্জা দিয়ে নিবারণ করা যাবে? তাকে স্বীকার করে নিলেই চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ সম্ভব। চেপে রাখলে সমগ্র সমাজ ভিতরে ভিতরে পচে বিষাক্ত হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সাহিত্য এই সর্বনাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বন্ধুর কাজই করছেন। এঁদের নিন্দা করা নির্বুদ্ধিতা।

বাগ্দেবীর দেউলের নাটমন্দিরে আজ যদি 'রামায়ণ গান' বা 'কৃষ্ণযাত্রা'র পরিবর্তে 'খ্যামটা নাচ' বা 'তরজা গান' হয় দর্শক ও শ্রোতার অভাব হবে না। পাশ্চাত্যের 'টুইস্ট নাচ' তো আজ ভারতের ভদ্র সমাজেও অসংকোচে চলেছে! কাজেই রুচির পরিবর্তন অনস্বীকার্য। সুতরাং এ যুগের প্রগতিশীল সাহিত্যকে এত শালীনতার দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবার এ হাস্যকর প্রচেষ্টা কেন? যাঁরা নিজেদের ঘর সামলাতে পারছেন না তাঁরা চান সাহিত্যের মুখ বন্ধ করতে? চির অগ্রগামী কালের প্রবহমান প্রবল স্রোতকে রুদ্ধ করতে পারেন তাঁরা কি এমনি শক্তিমান?

যুগধর্ম অনুসারে বর্তমানে বিবিধ সমস্যা-সংকুল জীবনের জটিলতা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মধ্যে সমান কঠিন হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তারই নগ্ন রূপ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে। এ যে অনেক দিনের লুকিয়ে রাখা পুরোনো পাপ। আমাদের আত্মশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্য বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং অরণ্যে রোদনের মত এ বৃথা কান্না হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনের এতাবৎ অশ্রুত রাগিণীর প্রাণবন্ত সুরটিই সাম্প্রতিক সাহিত্যের নিঃসংকোচ করস্পর্শে তাঁদের নবীন বীণায় উদারা-মুদারায় ঝংকৃত হয়ে উঠছে। জীবনের জয়গান আজ কৃত্রিমতামুক্ত বলেই এমন মর্মস্পর্শী শক্তি পেয়েছে।

এ কথা তো সবারই বিদিত যে, সাগরপারের সূতিকাগারেই বাংলা সাহিত্য প্রথম ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'মেটার্নিটি ওয়ার্ড'ই তার প্রকৃত আবাস। পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতেই সে আজও লালিতপালিত ও বর্ধিত। তাই বাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্যে ও ললিতকলায় আজ নানা 'ইজমে'র আবির্ভাব ঘটেছে। 'রোম্যান্টিসিজম' বা নন্দনতত্ত্ব যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছিল, সে জাল কেটে বেরুতে না বেরুতেই তাকে ঘেরাও করেছে 'রিয়েলিজম' বা বাস্তববাদ। এ বাদ অবাধ। কারুর পরোয়া করে না। এরই পিছু পিছু এসেছে 'ন্যাচারালিজম' বা স্বভাববাদ অর্থাৎ যা সকল কৃত্রিমতা মুক্ত। আবার সেই সঙ্গে এসেছে 'ইম্প্রেশনিজম' বা সংবেদনবাদ; যা মানুষের গভীর অনুভূতিসাপেক্ষ। বাংলার

একই পঙ্‌ক্তিভোজনে [illegible] হয়েছে। এখন সে গদ্যে ও পদ্যে বিবিধ 'প্রতীক' ও 'ইমেজ' সাহায্যে তার মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করছে। যার ফলে পৃথিবীর সাহিত্য আজ পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। কাজেই এ যুগের সা হি ত্য প্র বা হে দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিকতার গর্বোন্নত ঢেউ। এই অগ্রগামী সাম্প্রতিক সাহিত্য যা জীবনের রূপে রসে আশ্চর্য সমুজ্জ্বল ও সত্যের দীপ্ত আলোকে জ্যোতির্ময় তাকে আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জানানোই কর্তব্য মনে করি।

কলকাতার ডায়েরি

লকাতারডায়েরিকলকাতারডায়েরিকলকাতারডায়েরিকলকাতারডা

এমন লোকের অভাব নেই, যাঁরা এই কলকাতায় একটানা পনের ষোল বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, এক দিনের জন্যেও বাইরে যাননি। আমাদের তারিণীবাবু তাঁদেরই একজন।

তারিণীবাবু হঠাৎ একটা কাজে গত হপ্তায় গিয়েছিলেন দুর্গাপুরে। ফিরে এসে তিনি অন্য মানুষ। আগে তাঁর বাড়িতে গেলে কেবল শুনতাম, 'কিছুই হয়নি দেশের।' এবার আগ বাড়িয়েই বললেন, "মশাই অ্যাদ্দিনে আমার চোখ খুলল। কলকাতায় থেকে থেকে টের পাইনি দেশটা পালটে যাচ্ছে। দুর্গাপুরে গিয়ে টের পেলাম, আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। কারখানার পর কারখানা, নতুন নতুন বাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, হাজার হাজার লোক খাটছে, শালবন কেটে চোখজুড়ানো বসত—এলাহি কারবার।"

তারিণীবাবুর বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝি। এই কলকাতাকে দিয়ে আমরা সারা দেশের বিচার করি এবং তার অনড় অটল চেহারা দেখে আক্ষেপে মরে যাই। সত্যিই তো, তিন তিনটে যোজনা গেল, কিছু ভিড় আর জঞ্জাল বাড়া ছাড়া কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। দুর্গাপুর, ভিলাই বা রাউরকেলার কথা না হয় বাদ দিলাম, দিল্লি, বম্বে, মাদরাজের যা বদল ঘটেছে, তাও কলকাতার হয়নি। চৌরঙ্গী পাড়ায় দু-তিনটি স্কাইস্ক্র্যাপার, গড়িয়াহাট মাঝেরহাট আর টালায় পুল, একটি প্ল্যানেটেরিয়াম, ভি-আই-পি রোড এবং গান্ধী-সুভাষের মূর্তি ছাড়া বলার মত নতুন কিছু নেই এই শহরের। আর হ্যাঁ, কয়েকটি রাস্তা নামে স্বদেশী হয়েছে গত কয়েক বছরে।

তা ছাড়া কলকাতাকে দেখলে কে বুঝবে, হাজার হাজার কোটি টাকার বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে সারা ভারত জুড়ে। না হয়েছে তার যানবাহন সমস্যার সমাধান, না মিটেছে তার বাড়িভাড়ার ফ্যাসাদ। উলটে লোক আসছে লাখে লাখে, ভিড় বাড়ছে গাড়ি-ঘোড়ার। আর সেই সনাতন চেহারা নিয়ে গোটা শহর অকূল জনসমুদ্রে ভাসছে। অন্য অনেক কিছু বাদ দিলাম, তিন যোজনায় তিন পাঁচে পনের মাইল নতুন রাস্তা এই শহরে হয়েছে কিনা সন্দেহ। সি-এম-পি-ও রয়েছে বটে, কিন্তু তারা নয়া নয়া পরিকল্পনা পেশ করেই খালাস। আর ওদিকে যোজনা-কমিশন তাঁদের সব পরিকল্পনা নাকচ করার ঐতিহ্য সমানে বজায় রেখে চলেছেন। সারকুলার রেল, স্টেডিয়াম আর গঙ্গায় দ্বিতীয় পুলের কথা হরদম শুনতে পাই ঠিকই, তবে তা যে অদূর ভবিষ্যতে হবে না, এ কথাও কলকাতার লোকেরা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে।

একই অবস্থা শহরতলির, একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের অন্য দশটা মফস্বল শহরের। ভাঙা রাস্তা, ফুটো জলের কল আর নড়বড়ে ঘরদোর নিয়ে বছরের পর বছর চলেছে, দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে তার যেন যোগ নেই। ডালহৌসি আর চৌরঙ্গীতে দুটি সাবওয়ে গড়ার আশ্বাস আমরা কয়েকবারই পেয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট-বক্তৃতায়, ইদানীং বাজেট-বিবরণ থেকেই প্রসঙ্গটি বাদ পড়ে গিয়েছে।

ওদিকে দুর্গাপুরে কিন্তু অন্য ব্যাপার, কলকাতা থেকে সওয়া শ' মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছালেই নতুন ভারতের প্রাণস্পন্দন স্পর্শ করা যায়, মনে হয় দেশটা এক জায়গায় থেমে নেই। তাই তারিণীবাবুরা যখন কলকাতার হাল নিয়ে গালমন্দ করেন কিংবা দুর্গাপুর থেকে ফিরে মত বদলান, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এ-কথা সে-কথার পর তারিণীবাবু শেষমেষ বললেন, "বুঝলে ভায়া, ঠিক করেছি, গড়িয়ার জমিটা বেচে দিয়ে দুর্গাপুরের কাছাকাছিই বাড়ি করব। কলকাতার কিছু হবে না। আর আসল কথা কী জান, এই শহরে থাকলে মনে হয় যেন ব্রিটিশ আমলেই আছি।"

*

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের যে আর দেরি নেই, তার প্রমাণ কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে ফুটে উঠেছে। সিনেমা-থিয়েটারের পোসটারের পাশাপাশি 'অমুককে ভোট দিন', 'অমুককে জয়যুক্ত করুন' ইত্যাদি লেখা ছোটবড় বিজ্ঞাপন দেয়ালের গায়ে গায়ে ঝুলে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ফাঁকা পাঁচিল কিংবা বাড়ির গায়েও ইয়া মোটা মোটা কালির পোঁচে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে।

শহরটা এমনিতেই নোংরা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সবিনয় নিবেদন, দয়া করে আলকাতরার পোঁচে পোঁচে আর কলংক বাড়াবেন না।

*

কলকাতার টেলিফোন লাইন পাওয়া আজকাল কী রকম কঠিন ব্যাপার, ভুক্তভোগী সবাই জানেন। ক্রস-কানেকশন ও রং নাম্বার অনিবার্য ঘটনা। শেষ সম্বল ছিল যে 'অ্যাসিস্ট্যানস'। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে দেখছি, তাও পাওয়া যায় না,—হয় এনগেজড্, নয় নিঃসাড়।

অ্যাসিস্ট্যানসের লাইন পাওয়ার জন্য কত নম্বর ডায়াল করতে হবে, টেলিফোন অফিস যদি জানিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়।

—চাণক্য

বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে
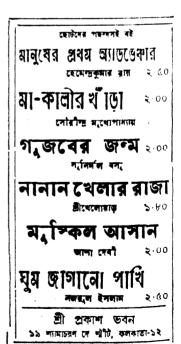
আশিস সান্যাল

অভিধান হচ্ছে, সর্বদা ব্যবহার্য একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক অভিধানের অভাব কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, জাতির অগ্রগমনের গতিকেও ব্যাহত করে। একটি সঠিক অভিধানের অভাবে একই ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, সংহতি এবং সাহিত্য রচনায় পথ কণ্টকিত হয়। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে বৈজ্ঞানিক অভিধানের অভাব, সেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু দুঃখের হলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, এখনো পর্যন্ত বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচিত হয় নি। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন—

"বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় যে পেতে ইচ্ছা করে, তোমার বই ছাড়া তার অন্য গতি নেই।"

এ কথা এক দিক দিয়ে হয়ত সত্য। কিন্তু এর দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ পরিচয় যে কখনই পাওয়া যায় না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'সংসদ বাংলা অভিধান' বা সুধীরচন্দ্র সরকারের বিবিধার্থ অভিধান সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত এমন অভিধান রচিত হয় নি, যা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে সক্ষম। বাংলা ভাষার অভিধানগুলির অপূর্ণতা প্রধানত তিন দিকে—

(ক) আঞ্চলিক শব্দের অভাব।

(খ) সঠিক উচ্চারণ নির্দেশের অভাব।

(গ) শব্দের প্রাদেশিক রূপ, বিবর্তন-ধারা নির্দেশ এবং শব্দগ্রহণে উদারতা-বোধের অভাব।

অভিধানের অর্থ কি?

কোনও ভাষায় প্রচলিত শব্দভাণ্ডারকেই অভিধান বলা যেতে পারে। এতে থাকবে ভাষায় প্রচলিত সমস্ত শব্দ বর্ণানুক্রমিক-ভাবে সাজানো এবং প্রতিটি শব্দের উৎপত্তি, ধ্বনিগত এবং রূপগত বিবর্তন, লুপ্ত এবং প্রচলিত অর্থ, অঞ্চল বিভেদে বিভিন্ন অর্থ, পদ-পরিচয়, তাৎপর্য, সমশব্দ, প্রতিশব্দ, প্রয়োগ-রীতির দৃষ্টান্ত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য। সুতরাং অভিধান প্রণেতার পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম পাণ্ডিত্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যদি সংকীর্ণ হয়, তাহলে অভিধানের পক্ষে তা মারাত্মক অন্তরায়। ভাষায় প্রচলিত সমস্ত শব্দ সম্পর্কেই থাকবে তার সমান মমত্ববোধ। অভিধান এবং অভিধান প্রণেতার বৈশিষ্ট্যের উপর্যুক্ত অনুধাবনার ভিত্তিতে বাংলা অভিধানের প্রধান দুর্বলতাগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক শব্দের অভাব

বাংলা অভিধানগুলির একটি প্রধান অসম্পূর্ণতা হলো আঞ্চলিক শব্দের অভাব। এক সময়ে বিচারপতি F E Upargitar বাংলা অভিধানের এই দুর্বলতা লক্ষ করে একটি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান রচনা করেন। তাঁর সেই গ্রন্থটি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Vocabulary of Peculiar Bengali Words নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি যা বলেছিলেন, তা বর্তমান প্রসঙ্গের বিস্তারে বিশেষ সহায়ক মনে করে এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ

"First it will preserve vernacular words and meanings which are not generally known and might be lost in time. Secondly, it helps to trace the modifications of words and their meanings, for a word that is puzling in one district may appear in another district in a form or with a meaning that elucidates it at once. Thirdly, it will aid the elucidation of the composite nature of Bengali language.

অবশ্য Pargitar মহাশয়ও যে তাঁর গ্রন্থে এই সব অসম্পূর্ণতাকে দূরীভূত করতে পেরেছিলেন, তা নয়। তবে একজন বিদেশী হিসেবে তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি যে বাংলা অভিধানের অন্তত একটি অভাবকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আঞ্চলিক শব্দগুলিতে মর্যাদা না দিলে অভিধান কখনই পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, বলা যায় না। কিছুদিন পূর্বে আলোচনা সূত্রে দেশ-এ 'বিদুর' যথার্থই বলেছেন, "যে সব শব্দ দীর্ঘকাল থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ও ভাব-প্রকাশের বাহন হয়েছে, সেগুলোকে আমরা এভাবে বর্জন করতে পারি না।" বরং এই সব প্রচলিত শব্দগুলিকে অবহেলা করলে ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি হবে রুদ্ধ এবং জাতির অগ্রগমনের পথ হবে কণ্টকিত। শুধু আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন আঞ্চলিক শব্দের প্রতিও আমাদের অভিধান প্রণেতাদের রয়েছে তীব্র অনীহা। এই সব শব্দের অর্থ, ধ্বনিগত বিবর্তন, প্রতিশব্দ, পদ পরিচয় ইত্যাদির জন্য বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত কোন অভিধান রচিত হয় নি। প্রসঙ্গত, এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) "রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খন্তি, ডোড়োং ও নেড়ির কাঁব; তারপর বৈরাগী-

দের দু'তিন দল নিমখাসা কেত্তন; তার পেছনে সঙ্কীর্ত্তন গাওনা।"

[হুতোম প্যাঁচার নকশা]

(খ) উহু, আমি একানে হবো।...কোন কোনদিন পদ্মবীজ এনে দিত্তো। বলত্তো, তোমাকে রোজ রোজ পদ্মের টাটি এনে দিচ্ছি গিরিদাদা, পদ্মার বই কিন্তু দিতে হবে আমায়। [বনপলাশীর পদাবলী]

উপরের উদ্ধৃত দুটো অংশে 'তোড়ং', 'নেড়ির কবি', 'নিমখাসা', 'একানে', 'টাটি' ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ কি, এবং তার তাৎপর্য, পদ পরিচয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দেবার মত কোন অভিধান বাংলা ভাষায় নেই। অথচ সাহিত্যে এই শ্রেণীর শব্দের ব্যবহার নিতান্ত কম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সুবোধ ঘোষ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকদের রচনা থেকে এর বহু উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রচলিত লোক-সঙ্গীত, ছড়া, গীতিকা ইত্যাদির কথা ধরলে তো, এই অভাব বোধ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। কেননা, যে কোন ছড়া, গীতিকা সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। বাংলা অভিধান রচনার প্রথম যুগে বরং আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল। এর কারণ, হয়ত এই, যে সমস্ত বিদেশী এই বিষয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের সামনে বাংলা ভাষার তেমন কোন ভিত্তি ছিল না। ফলে, প্রচলিত লৌকিক শব্দই ছিল তাঁদের প্রধান অবলম্বন। বাংলার প্রথম অভিধান প্রণেতা মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর গ্রন্থ থেকে নমুনা হিসেবে একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

পুই বাইবাসাছি।...দুধের খোওরা কওরা...।"

এ সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন ঢাকা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা। উইলিয়ম কেরীর অভিধানেও তৎকালীন আঞ্চলিক শব্দ পাওয়া যায়। তখনও পর্যন্ত লেখ্য এবং কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য এত ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। ফোর্ট উইলিয়মের যুগ থেকেই এর সূচনা। বাংলা অভিধানেও তখন থেকেই তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এখনও পর্যন্ত বাংলা অভিধানের আদর্শ অনুরূপ। এই মনোভাবের পরিবর্তন অতি প্রয়োজনীয়। না হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হবে না।

সঠিক উচ্চারণ নির্দেশের অভাব

কোনো ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করাও অভিধানের একটি বিশেষ কর্তব্য। অথচ বাংলা অভিধানগুলি এদিক দিয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। একথা ঠিক, বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা খুব সহজ নয়। তাছাড়া অঞ্চল বিশেষে একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর যে কোন ভাষা সম্বন্ধেই অবশ্য একথা প্রযোজ্য। একই বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণও দুর্লভ নয়। পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও এই উচ্চারণ বৈচিত্র্য আছে। ইংরেজী ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।—

march, chalk, chant—'a' এর বিভিন্ন উচ্চারণ।

cane, come, cult—'c' এর বিভিন্ন উচ্চারণ।

কিন্তু উন্নত ভাষার অভিধানগুলিতে এই সব উচ্চারণ বৈচিত্র্যের সুস্পষ্ট নিয়ম নির্দেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার অভিধানে উচ্চারণের এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকায় বিভিন্ন জনের মুখে একই বর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তিদের মধ্যেও এই বিভ্রান্তি দুর্লভ নয়। 'বেঙ্গল ল্যাম্প' এই কথাটি সহজেই একজন পূর্ব বা উত্তর বঙ্গীয় শিক্ষিত জনের মুখে শোনা যায় 'ব্যাঙ্গাল লেম্প।' 'ক্যামন আছেন', এইটির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নির্দিষ্ট না হওয়ায় আবার কেউ কেউ উচ্চারণ করেন, কেমন (keman) আছেন।' 'এক' এই শব্দটির আবার কত উচ্চারণ। কেউ বলছেন 'এক' (Eka), কেউ বলছেন 'অ্যাক'। 'অ' 'এ' ইত্যাদি বর্ণের হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত স্বর নিয়ে উচ্চারণের যে ব্যাপক বৈষম্য বর্তমান, তার স্পষ্ট নির্দেশ বাংলা অভিধানগুলিতে অনুপস্থিত।

বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলিকে তৎসম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই সব শব্দের ক্ষেত্রেও উচ্চারণ নির্দেশে অভিধানগুলি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই তৎসম শব্দগুলি বানানের দিক দিয়ে তৎসম, কিন্তু উচ্চারণের দিক দিয়ে নয়। তৎসম শব্দে 'অ' বর্ণটি তার তৎসম উচ্চারণ হারিয়ে বাংলায় নিতান্তই 'অ' হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-এর মত। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব 'আ'-কার। 'ঐ' 'ঔ' এর উচ্চারণ সংস্কৃতে ছিল 'আই' 'আউ'। কিন্তু বাংলায় এর উচ্চারণ হয়েছে 'ওই' 'ওউ'। কিন্তু 'ঐরাবত' উচ্চারণের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। সংস্কৃতে 'ব' ছিল অধস্বর 'উয়' (w)= বাংলায় বর্গীয় 'ব' (b)। যেমন—বাদ=উআদ [wa : da]। সংস্কৃত 'ঋ', বাংলায় রি (রী)তে পরিণত হয়েছে। এইরূপ 'স, ষ'; হয়েছে 'শ'; 'ণ' হয়েছে ন (দন্ত্য)। ঞ্চ ঞ্ছ, ঞ্জ, ইত্যাদি যথাক্রমে হয়েছে 'নচ' 'নছ', 'নজ'। যেমন—অঞ্চল=অন্‌চল, বাঞ্ছারাম= বান্‌ছারাম ইত্যাদি। ক্ষ (ক+ষ) এখন উচ্চারিত হয় 'ক্‌খ' রূপে। 'আত্মা' এখন আততা। এইভাবে আরো অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

উচ্চারণের আরও একটি মারাত্মক ত্রুটির কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দের মুখোমুখি হতে হয়, যার বানান এক, অথচ উচ্চারণ এবং অর্থ আলাদা। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যেমন—

'কোনদিন' এর উচ্চারণ কোনোদিন বা কোন্ দিন। কিন্তু উচ্চারণের জন্যই অর্থ ভিন্ন।

কোনদিকে—'সে কোন্‌দিকে গেছে' এখানে আবার অন্য উচ্চারণ। এইরূপ, 'মত' —'মতো' [তার মত লোক]; মত্ [আমার অভিমত হলো]; 'চল'—চলো [চল যাই, ঘোরা যাই], চল্ [চল্, বাজারে যাই]।

এই শব্দগুলির উচ্চারণ হয়ত দীর্ঘ দিনের অভ্যাসবশত কারো কারো কাছে তেমন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু নতুন শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি মারাত্মক অন্তরায়। বিশেষ করে যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, তাদের কাছে এই সব উচ্চারণ-বৈচিত্র্য মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটায়। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্ব অভিধানগুলির। বাংলা ভাষার

রচিত অভিধানগুলিতে এই দিক থেকে অপূর্ণতা অপরিসীম।

শব্দ নির্বাচনে সঙ্কীর্ণতা বোধ

বাংলা অভিধানগুলি যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি, তার একটি প্রধান কারণ, শব্দ নির্বাচনে সঙ্কীর্ণতা বোধ। অধিকাংশ অভিধান প্রণেতাই মূলত তৎসম শব্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তদ্ভব, বা আরবী, ফারসী, ইংরেজী, আঞ্চলিক শব্দকে 'ইতর' শব্দ আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অবশ্য একেবারে প্রথম দিকে এই প্রবণতা ছিল না। কারণ, তখনও পর্যন্ত কথা ভাষা এবং লেখা ভাষার ব্যবধান সূচীত হয় নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই ব্যবধানের সূত্রপাত হল। সাহিত্যে যেমন সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলার প্রাধান্য সূচিত হল, অভিধানেও তেমনি সংস্কৃত শব্দের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হল। এখনও পর্যন্ত বাংলা অভিধানগুলির আদর্শ মোটামুটিভাবে অনুরূপ। অথচ বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশই যে অসংস্কৃত, সে বিষয়ে বাংলা অভিধান প্রণেতারা প্রায় নিশ্চুপ। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখেছিলেন—

"আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।"

[শব্দতত্ত্ব—পৃঃ ৯৮]

বাংলা অভিধান সম্পর্কেও এই উক্তিটি উল্লেখ্য। অভিধান প্রণেতারা বাংলা অভিধান নাম দিয়ে 'সংস্কৃত' নীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা সর্বাধিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে। তাঁরা কেবল তৎসম শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারেই অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। অন্যদিকে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের তদ্ভব, গ্রামীণ, আরবী, ফারসী ইত্যাদি শব্দগুলিকে 'ইতর' এবং অশিষ্ট আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আবার একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অভিধান প্রণেতা বিচারক নন, নিরপেক্ষ সংগ্রাহক। তাঁর কাজ ভাষার ব্যবহৃত সমস্ত শব্দকেই সাদরে গ্রহণ করা এবং তার অর্থ পদ-পরিচয় ইত্যাদি নির্দেশ করা। কিন্তু বাংলা অভিধান প্রণেতারা প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে, একমাত্র তৎসম ছাড়া অন্যান্য শব্দের প্রতি তাঁর অনীহা প্রকাশ করেছেন। ফলে, শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে বাংলা অভিধানগুলিতে মারাত্মক ত্রুটি বর্তমান।

বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন হাজার বছর আগেকার চর্যাপদ। এর ভাষা মোটামুটি-ভাবে পুঁথি নিবদ্ধ ছিল। মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষার মোটামুটি বৈশিষ্ট্যও এই। সুতরাং বাংলা অভিধানগুলিতে এই সব পুঁথি-নিবদ্ধ শব্দের পরিচয় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তুর্কী আক্রমণের পর, যে সমস্ত পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি পাওয়া গেছে, তা অনুধাবনা করলে দেখা যাবে, তাতে বহুল পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ সংমিশ্রিত হয়েছে। এই সব মিশ্র শব্দ বাংলা ভাষায় এখনও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বা 'হিতোপদেশ' গ্রন্থেও এইরূপ অজস্র উদাহরণ আছে। কিন্তু বাংলা অভিধানে এই সব শব্দের মর্যাদা স্বীকৃত না হওয়ায় এর মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা যে কোন বিবেকবান পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির ক্ষেত্রে প্রাচীন বা আধুনিক; প্রচলিত-অপ্রচলিত যে কোন শব্দই অভিধানে পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ অভিধানের এ একটি প্রধান লক্ষণ। বাংলা অভিধানে এর অভাব পীড়াদায়ক।

পূর্ব বাংলার প্রয়াস

বাংলা ভাষার একটি আদর্শ অভিধান রচনার জন্য পূর্ব বাংলার 'বাঙলা একাডেমী' অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এই অভিধানটি সম্পাদনা করছেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। অভিধানটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহ্‌সান লিখেছেন—

"Works on the compilation of a comprehensive dictionary comprising three parts, viz., A Dialectical Dictionary of East Pakistan; Functional Bengali Dictionary and an Encyclopaedia of Bengali literature are in progress.

[UNESCO Information Bulletin on Reading Material Vol. 5. No. 3]

প্রথম খণ্ড প্রায় সমাপ্তির পথে। ৪৮০ জন শব্দ সংগ্রাহকের প্রচেষ্টায় এই অভিধানটির জন্য শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। তবে এই শব্দ সংগ্রহের বিষয়টি যে পূর্ব বাংলার মধ্যেই সীমিত ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একাডেমীর পরিচালক আরো জানিয়েছেন—

The ground plan for this volume has three notable features:—

(a) Inclusion of new words not included in other dictionaries;
(b) Incorporate of well-known Arabic and Persian words used in the works of Muslim writers and ignored by the other compilers; and
(c) Indication of gradual changes in meaning, sound and spelling of words.

(ঐ)

বাংলা অভিধান প্রণয়নে তাঁদের এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তবু শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সম্পূর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চলের জন্য না হয়ে, কেবলমাত্র একটি সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের জন্য সীমিত হল কেন তাঁদের এই প্রচেষ্টা? এতে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠবে কি? একদিক থেকে তাই তাঁদের এই উদ্যম, সমগ্র বাংলা ভাষী জনতার দাবি পূরণে সক্ষম হয় নি, বলা যেতে পারে।

আজকের প্রয়োজন

আজকের প্রয়োজন হল, বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধানের। বৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক অভিধানের দিকেও দৃষ্টি দিতে

হবে। কিন্তু তারো আগে প্রয়োজন ভাষার অভিধানের। আজ উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার দাবি শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় চাকুরির পরীক্ষায় যখন প্রাদেশিক ভাষাগুলির স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন বাংলা ভাষী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ভূমিতে স্থাপন করা। এরই জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধানের। কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এইরূপ একটি ব্যাপক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই বলি—

বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় পুস্তক প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার—এদের সহযোগিতায় এ ধরনের অভিধান প্রকাশ অসম্ভব নয়।

বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা হলে, হয়ত কিছু উপকার হতে পারে। বাংলার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ভাষাতত্ত্ববিদদের এই বিষয়ে অগ্রসর হবার জন্য আবেদন জানাই।

নেহরু যুগ : বিপ্লবের স্বপ্ন

নেহরুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অনুরাগে-বিরাগে বিমিশ্র। এমন একটা ক্ষেত্র ছিল সেই সম্পর্কের মধ্যে, বিরাগকে দূরে ঠেলে দিয়ে অনুরাগই যেখানে বেশ কিছুদিনের জন্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফরিদাবাদের সমষ্টি-উন্নয়নমূলক প্রকল্পটিই ছিল সেই অনুরাগের ক্ষেত্র। ভারতবর্ষে এমন প্রকল্পে এর আগে হাত দেওয়া হয়নি। ফরিদাবাদ হচ্ছে পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার অন্তর্গত এলাকা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আমি সেখানে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করেছি। ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে গান্ধীজী নিহত হন। তারপরে মাস কয়েক আমি বল্লভভাই প্যাটেলের দেশীয় রাজ্য দপ্তরে পূর্ব-পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহের আঞ্চলিক কমিশনার হিসেবে কাজ করেছি। পাতিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা, ঝিন্দ, ফরিদকোট, কালসিয়া আর নলাগড়, এই কটি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া, এবং পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য-মণ্ডলীর (পেপসু) মধ্যে তাদের একীভূত করার কাজে সাহায্য করাই ছিল আমার কাজ। এই দেশীয় রাজ্যমণ্ডলীকে পরে পাঞ্জাব রাজ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। আমার সদর দপ্তর ছিল সিমলায়। সেখানে একটি রাজপ্রাসাদ—র‍্যাভেন্সউড—আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার দপ্তর আর বাড়ি, দুই-ই ছিল সেই প্রাসাদের মধ্যে। সেখানে একটা উঁচু জায়গা থেকে সুন্দর একটি উপত্যকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হত। দেখতে পেতাম, তার পিছনে নীল পাহাড়ের পর্বতমালাকে কে যেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে রেখেছে। আমি আর আমার স্ত্রী, আমাদের দুজনেরই সেই দৃশ্য বড় মনোরম লাগত। প্রতি মাসেই অনেক বার আমাকে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসতে হত, সাতটি দেশীয় রাজ্যের ভিতরে গিয়ে ঘুরতে হত। সেই সফরও খুব ভাল লাগত আমার। কাজের সূত্রেই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত আমাকে। দেখতে হত, যে পাঁচ লক্ষ একর উর্বরা কৃষিভূমিকে ফেলে রেখে মুসলমানরা সেখান থেকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, হিন্দু আর শিখ প্রজারা যেন বে-আইনীভাবে তা দখল করে না নেয়। পূর্ব পাঞ্জাব সরকার স্থির করে রেখেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু আর শিখ বাস্তুহারাদের এখানে পুনর্বাসিত করা হবে।

কিন্তু মাস দশেক কাটবার পরেই রাজ-প্রাসাদ-এর নীল পাহাড়ে আমার বিরক্তি ধরে গেল। কোন্‌টা কোন্ মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর কোন্ সম্পত্তিটার মালিকানা রাজ্যসরকারের, সরকারকে তার হিসেব-নিকাশে সাহায্য করার চাইতে আর-একটু উদ্দীপক কাজে হাত লাগাবার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। একটি রাজ্যে এক বিচিত্র ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। দেখলাম, আগের ঘটনাবলীকে আন্দাজ করে নিয়ে, মহারাজা সেখানে রাজস্বের নথিপত্রে প্রতিটি জমির মালিক হিসেবে নিজের নাম লিখিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চাইছেন, তাঁর রাজ্যের যাবতীয় জমি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগতভাবে মহারাজারা আমার সঙ্গে খুবই সদ্ব্যবহার করতেন। তবু, মহারাজাদের সঙ্গে এই যে কূটনৈতিক খেলা, কিছুদিন বাদেই আমার এটা একঘেয়ে লাগতে লাগল, এবং 'পেপসু'র প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি বল্লভভাই প্যাটেলকে অনুরোধ করলাম, আমাকে যেন অন্য কাজে বদলি করা হয়।

আমি চাইছিলাম শক্ত কাজ। তা শক্ত কাজই আমাকে দেওয়া হল। ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে বদলি করা হল আমাকে; পদটা হল ডেপুটি সেক্রেটারির। ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ষাট লক্ষ হিন্দু আর শিখ বাস্তুহারা হয়ে ভারতে চলে আসে। ভারত-বর্ষ থেকেও প্রায় একই সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এইভাবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়নি। জওহরলাল নেহরুর যা-কিছু সদ্‌গুণ, তাঁর সহানুভূতি, তাঁর মমতা,—লক্ষ লক্ষ এই ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন-ব্যাপারেই তাঁর আশ্চর্য প্রকাশ লক্ষ করা গেল। এমনিতে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু মানুষ, বিশেষ করে নির্বোধ লোকদের তিনি আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু

বাস্তুহারাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তাদের জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছেন; কখনও একটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

এক দিল্লিতেই পনর লক্ষ বাস্তুহারা আশ্রয় নিয়েছিল। দিল্লির চারপাশের জেলাগুলিতে উম্বাস্তু-শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল আরও লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ। বাস্তুহারাদের হাতে একটি অব্যর্থ হাতিয়ার ছিল। কোনও ব্যাপারে কোনও অভিযোগ জানাবার থাকলেই সেটি প্রয়োগ করত তারা। দলে দলে তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওনা হত, এবং সেখানে গিয়ে তাঁর বাড়ির প্রবেশ-পথের উপরে বসে থাকত। অভিযোগের হেতুগুলিকে দূর করবার একটা-কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে নড়ত না। দায়িত্বটা আমার হোক আর না-ই হোক, এরই সূত্রে দিনে রাত্রে যে কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন। ডাক পড়লেই বুঝতুম, বাস্তুহারারা তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে, তাদের অভিযোগ সম্পর্কে একটা-কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। একদিনের কথা বলি। সেদিন রাত্রে আমাকে ফোন করে শ্রীনেহরু জানালেন যে, তিনি খেতে বসতে পারছেন না। কী ব্যাপার? না গোয়ালিয়রের এক শিবির থেকে একদল বাস্তুহারা এসেছে। তাঁর দোরগোড়ায় বসে আছে তারা, কিছুতেই নড়তে চাইছে না। মুশকিল হয়েছে এই যে, তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি রয়েছেন, এবং সে অতিথিটি হচ্ছেন ইনদোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মহম্মদ হাতা। সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তি-কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গেলুম। সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলুম বাস্তুহারাদের সঙ্গে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের আবার গোয়ালিয়রে ফিরে যেতে রাজী করালুম। তার জন্য গোয়া-লিয়রের কমিশনারকে ফোন করে এই ব্যবস্থা করতে হল যে, বাস্তুহারাদের অভিযোগের তিনি একটা প্রতিকার করবেন। কিন্তু সমস্যা বাধল বাস্তুহারাদের ফেরার ব্যবস্থা নিয়ে। রেলের টিকিট কাটবার পয়সা তাদের নেই। অবস্থাটা অতঃপর এই দাঁড়াল যে, শ-তিনেক টাকা পেলে তবেই তারা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে গোয়ালিয়রে ফিরতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর পকেটে কখনও মনিব্যাগ কিংবা টাকাকড়ি থাকত না। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলুম। তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না। সেক্রেটারি এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাত্র গুটিকয়েক টাকা পাওয়া গেল। অগত্যা কী আর করা, একটা গাড়ি নিয়ে সেই রাত্তিরে আমি বেরিয়ে পড়লুম, এবং কাছাকাছি যে-সব বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে ক্রমে ক্রমে শ-তিনেক টাকা যোগাড় করে আবার বীরদর্পে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ফিরে এলুম। বাস্তুহারাদের হাতে সেই টাকাটা তুলে দিয়ে তাদের গোয়ালিয়রে ফেরত পাঠানো হল। নইলে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অতিথি খেতে বসতে পারছিলেন না। পরদিন সকালেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাহায্য তহবিল থেকে একটা চেক কেটে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। চেকের সঙ্গে এল সুন্দর একটা চিঠি। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "কাল রাত্তিরে জাদুবলে তুমি যে তিন শো টাকা যোগাড় করেছিলে, এই সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিলাম।"

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে কাজ করবার সময়ে আমি দেখতে পাই যে, বাস্তুহারাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছি; কিন্তু এই বিপুল ব্যয় যে কখনও বন্ধ হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। বাস্তুহারাদের মধ্যে যারা কৃষিজীবী, তাদের পুনর্বাসিত করা মোটামুটি সহজ কাজ। ভারত থেকে যে-সব মুসলিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, তাদের পরিত্যক্ত জমি যদি এদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়, এবং হালের বলদ আর কয়েকটা মরসুমের বীজ কেনার ব্যাপারে যদি এরা সরকার থেকে কিছু সাহায্য পায়, তাহলেই এরা চটপট পুনর্বাসিত হতে পারে। সেই তুলনায় বাস্তুহারাদের মধ্যে যারা শহরাঞ্চলের মানুষ, তাদের পুনর্বাসিত করা অনেক শক্ত। বিশেষ করে যারা ফড়ে শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ যারা উৎপাদন করে না, একের কাছ থেকে পণ্য কিনে অন্যকে বিক্রি করে, এবং এইভাবে কিছু পয়সা রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের পুনর্বাসিত করাই সবচাইতে দুরূহ ব্যাপার। দিল্লির কুড়ি মাইল দক্ষিণে দিল্লি-আগ্রা সড়কের উপরে ফরিদাবাদ গ্রাম; সেখানকার শিবিরে এই রকমের প্রায় চল্লিশ হাজার বাস্তুহারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত হিন্দু আর শিখ পাঠান; স্বভাবে খুব তেজী। শিবিরের কমানডান্টের সঙ্গে প্রায়ই এদের বিরোধ বাধত। কমানডান্ট ছিলেন একজন আর্মি কর্নেল। তিনি মাথাপিছু এদের দৈনিক এক টাকার মতন সাহায্য দিতেন; চিকিৎসা আর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেটুকু না করলেই নয় সেটুকুর ব্যবস্থা করতেন; এবং লক্ষ্য রাখতেন যাতে শিবিরে মোটা-মুটি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। শিবিরে গণ্ডগোল বাধলেই আমার ডাক পড়ত; সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই তেজী পাঠানদের শান্ত করতুম আমি। মানুষ হিসেবে তাদের আমার ভালই লাগত।

শ্রীনেহরুকে বললাম, এই চল্লিশ হাজার বাস্তুহারাকে নিয়ে আমি একটা সামাজিক পরীক্ষায় ব্রতী হতে চাই, তিনি কি তাতে সম্মতি দেবেন? সরকার থেকে এদের খাদ্য আর আশ্রয় বাবদ মাথাপিছু রোজ এক টাকার মতন খরচা করা হয়। তার মানে দৈনিক এদের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা খরচা হচ্ছে; মাসে খরচা হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা। বার্ষিক ব্যয়ের অংকটা সেক্ষেত্রে হয় এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। সেই হিসেবে স্রেফ এদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিন বছরে সরকারের মোট চার কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা খরচা হবে। সরকার তো খয়রাত হিসেবেই এ-টাকা এদের জন্য ব্যয় করতে দায়বদ্ধ। সেক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করছি যে, এদের পক্ষ থেকে ঋণ হিসেবে এই টাকাটা আমি গ্রহণ করব। এদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করব আমি, এবং সেই কাজে এই টাকাটাকে মূলধন হিসেবে এমনভাবে বিনিয়োগ করব যাতে সেই কাজের মাধ্যমেই নতুন একটি শহর গড়ে ওঠে। সেই শহরই হবে এদের স্থায়ী বাসভূমি। সেখানে শিল্প থাকবে; সেই শিল্প থেকেই এদের জীবিকা-র্জনের স্থায়ী ব্যবস্থা হবে। অতঃপর এই শিল্প-নগরকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে গড়ে উঠবে দুশো গ্রামের এক পল্লী-কৃষি-জীবী সমাজব্যবস্থা। এই বিনিযুক্ত মূলধন থেকে বার্ষিক যে-টাকা আয় হবে, তা থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই সরকারী ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া যাবে। পরীক্ষাটা যদি সফল হয়, তাহলে আমরা একে হাজার-গুণে বাড়িয়ে তুলব।

প্রস্তাব শুনে শ্রীনেহরু তো দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বিপ্লবী; তার জন্য রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁর হয়নি। অন্য দেশের বিপ্লবে তিনি, তাতে তাঁর কোনও ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও, উৎসাহ বোধ করতেন। রাশিয়া আর চীনের বিপ্লবে যে তাঁর চিত্তের সায় ছিল, এইটেই তার কারণ। অথচ নিজে তিনি ছিলেন অত্যন্তই সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শকাতর মানুষ; রুশ আর চীনা বিপ্লবের যেটা নিষ্ঠুর দিক, তাঁর চিত্তকে তা পীড়িতই করেছে।

শ্রীনেহরুকে আমি বললাম যে, এই ধরনের পরিকল্পনাকে সরকারের আমলা-তান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি তাঁর সমর্থন চাইলাম। বললাম, স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে এটিকে কাজ করতে দিতে হবে; এটি হবে টেনেসি ভ্যালি অথরিটিরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো। শ্রীনেহরু শুধু যে এই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, তা নয়; ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও পুরো তিন বছর ধরে এর প্রতিটি মাসিক বৈঠকে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। হাতে-কলমে কাজ করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি, তাতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ছোট্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। ১৯৫০ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হন। অতঃপর বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন ডঃ এইচ এন কুঞ্জরু। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে এবং সেবাগ্রামে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সংস্থার কর্মী দেবী আর্যনায়কমকেও আমরা বোর্ডের সদস্য হিসবে পেয়েছিলাম। ফরিদাবাদের কাজে এঁদের দুজনেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। এঁদের কাছে শুধুই নৈতিক সমর্থন নয়, আত্মিক প্রেরণাও আমি পেয়েছি। আমার সহকারী ছিলেন লক্ষ্মী জৈন। তরুণবয়সী এই মানুষটার মধ্যে মমতা ও পরিচালন-দক্ষতার এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন এক অমূল্য সম্পদ।

নয়াদিল্লির শীততাপনিয়ন্ত্রিত দপ্তর থেকে অতএব বেরিয়ে এলাম আমি; সস্ত্রীক ফরিদাবাদে চলে এলাম। সাড়ে তিন হাজার একর খাঁখাঁ শূন্য মাঠ; একটিও দালান-কোঠা তার উপরে চোখে পড়ে না। আর্মি ডিসপোজাল থেকে যুদ্ধকালীন চারটে টিনের চালা কিনে নিয়ে সেই মরুভূমির তুল্য প্রান্তরে গিয়ে কাজ শুরু করলাম আমরা। সেই টিনের চালার মধ্যেই আমাদের সংসার, আমাদের দপ্তর। এ হল ১৯৪৯ সনের গ্রীষ্মকালের কথা। তার মাত্র তিন বছর বাদে, ১৯৫২ সনের ২রা মার্চ তারিখে, ফরিদাবাদ প্রকল্পের কাজ দেখে এসে, মিসেস ইলিনর রুজভেল্ট তাঁর বিখ্যাত কলাম 'মাই ডে'-তে লেখেন:

"ফরিদাবাদের এই অভিনব প্রকল্প যদি সফল হয়, তাহলে নেহাত শতগুণে নয়, সহস্রগুণে একে প্রসারিত করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এইভাবে কাজ করতে হবে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এর যেটা নির্মাণের দিক, তার প্ল্যান করেছেন একজন মার্কিন স্থপতি, মিঃ অ্যালবার্ট মায়ার। তিনি নিউ ইয়র্কে কাজ করেন, এবং মাঝে-মধ্যে ভারতবর্ষে যান। পরিকল্পনাটির লক্ষ্য অতি বিরাট; অথচ খুবই সহজ-সরলভাবে একে রূপায়িত করে তোলা হচ্ছে। লোকজনরা এখানে নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়ে নেন। বাড়ি বলতে দুটি ঘর আর একটি রান্নাঘর। সেই সঙ্গে আরও একটি ঘর রয়েছে, যেটা একদিন হয়ত বাথরুম হয়ে উঠবে; আপাতত সেটি কলতলা। স্যানিটারি প্রিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে, টিউবওয়েলও বসানো হয়েছে। জল ভাল; সাড়ে তিন শো ফুট নীচ থেকে সে-জল উঠে আসছে।

"মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা; তাকে ঘিরে বিন্যস্ত হয়েছে এই শহর। বাড়িগুলির পিছনেই যাতে গৃহপালিত পশুর আশ্রয় গড়ে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশুপালনের জন্য যে আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে, সেখানেও এই আশ্রয় বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি এলাকাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছোট্ট গ্রাম। তাতে দুটি করে স্কুল, একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর একটি বাজার রয়েছে। কারিগররা সেখানে জায়গা কিনে তাদের পণ্য বানাতে পারে, ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে পারে তাদের জিনিসপত্র। দেড় শো শয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতালটি যে শুধুই শহরবাসীদের প্রয়োজন মেটাবে তা নয়; পার্শ্ববর্তী দু লক্ষ একর জমিতে যে ২ লক্ষ গ্রামবাসী কৃষিকর্ম করে, তাদেরও এতে উপকার হবে। সেইভাবেই এই হাসপতালটি পরিকল্পিত।

শহরের এক প্রান্তে কারখানা-এলাকা। যে-কোনও ঘনবসতি জনপদে জীবনধারণের সুবিধার জন্য যে-সব সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখতে হয়, কিছু লোক তারই কাজে ব্যস্ত থাকবে; বাকী লোককে কাজ দেওয়া হবে এই কারখানা-এলাকায়। কিছু কারখানার মালিকানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের। সেগুলি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এর একটি অংশ সংরক্ষিত রয়েছে সমষ্টি-মালিকানায় পরিচালিত একটি ডিজেল ইন্জিন কারখানার জন্য। সেখানে ডিজেল যন্ত্র এবং ছোট ছোট প্রাইমাস স্টোভ তৈরি হচ্ছে। এটি একটি সমষ্টি-প্রকল্প; শহরের স্বাস্থ্য আর শিক্ষার পিছনেই এর লভ্যাংশ ব্যয়িত হবে। শহরের বিভিন্ন সার্ভিসের পরিচালনা-ব্যয় নির্বাহ এবং ঋণ পরিশোধ বাবদে প্রতিটি ব্যক্তিকে এখানে মাসিক দশ টাকা করে দিতে হয়। এখানে যাঁরা বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের সাহায্য করবার জন্য তিন বছরে সরকারকে যে-টাকা ব্যয় করতে হত, একটি সংস্থা গঠন করে সেই টাকাটা সরকারের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়। সেই সংস্থার থেকেই এই প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

"আগে যারা দোকানী কিংবা কেরানীর কাজ করত, উপকরণ কিনে দিয়ে আর বেতন দেবার ব্যবস্থা করে সংস্থা তাদের কাজে লাগালেন; তারা যাতে আপন হাতে নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। দায়িত্বটা সহজ ছিল না। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল; তদুপরি দোকানীদের ধারণা, খেটে-খাওয়া মানুষদের চাইতে তাদের বৃত্তি অনেক ভাল। এত সব বিঘ্ন সত্ত্বেও এদের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

"পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার মোড়লস্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমার কথা হল। তাঁরা বললেন, তাঁদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে জল। অবস্থা দেখেই সেটা টের পাওয়া গল। সেচের ব্যবস্থা হলে এদের শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়বে; ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যার সমাধানে তাতে সাহায্য হবে। গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দেখলাম ঘরগুলি মাটির তৈরি, দেওয়ালও তাই। ঘরের ভিতরকার অবস্থাও আমি দেখেছি। তাদের গো-মহিষ আর সাধারণ জীবন-বিন্যাসও দেখলাম। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা দরকার, তা করতে সময় লাগবে। ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির কথ যখন চিন্তা করলাম আমি, এবং যখন ভেবে দেখলাম, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে তালিম দেবার জন্য একজন মাত্র স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে এখানে এসে কাজ করেন, তখন বুঝতে পারলাম ভবিষ্যতের শিক্ষা-সমস্যা এখানে কী দুরূহ।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে, আমার মনে হত যে, আমাদের বেকার সমস্যা খুবই মারাত্মক। কিন্তু এখানে যাঁরা কর্মনিরত, তার চাইতেও বৃহৎ সমস্যার তাঁরা মোকাবিলা করছেন। আশার কথা এই যে, এই প্রকল্পের নিয়ন্তা ডঃ সুধীর ঘোষ এ-কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য। প্রেরণাদায়ক আদর্শনিষ্ঠ যে-সব শ্রেষ্ঠ

মানুষ এ-যাবৎ আমি দেখেছি, তিনি তাঁদেরই একজন।"

ফরিদাবাদ আজ পাঞ্জাব রাজ্যের বৃহত্তম শিল্প-নগর। সেখানকার লোকসংখ্যা আজ আশি হাজারে গিয়ে পেণছেছে। বৃহৎ ও জটিল বহু শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে। গড়ে উঠেছে পাঁচ শো একর জমির উপর রাবারের টায়ার তৈরির একটি কারখানা। সেই সংগে আধুনিক কালের উপযোগী ট্রাক্টর, মোটর-সাইকেল, স্কুটার, বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির কারখানাও গড়ে উঠেছে। যা ছিল সাড়ে তিন হাজার একর জমির উপর একটি উদ্বাস্তু-বসতি মাত্র, তাকে ঘিরেই দ্রুত বিকশিত হয়েছে এই শিল্প-নগর। এত দ্রুত যে এখানে শিল্পের প্রসার সম্ভব হল, এর কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, যে উদ্বাস্তু-জনপদের এখানে পত্তন করা হয়েছিল, শ্রমিকদের একটি সমাজকে সেখানে তৈরি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সেখানে তারা আপন হাতে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিতে পেরেছিল; সেখানে তাদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছিল বিদ্যুৎ-শক্তি আর জল সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, এবং শিল্প-গঠনের অন্যান্য যাবতীয় আয়োজন। যে ফরিদাবাদকে আজ আমরা দেখছি, অর্থ-নৈতিক বিচারে তাকে এক বিরাট সাফল্য বলেই গণ্য করতে হয়; কিন্তু এ আমার স্বপ্নের ফরিদাবাদ নয়। যে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম, তার কোথায় ছিল ত্রুটি আর কোথায় ছিল সাফল্যের অংকুর, এর ব্যর্থতা আর সাফল্যের কারণই বা কী, উত্তরকালের কাছে তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আজ বিবৃত করা দরকার। উত্তরকালের তাতে উপকার হবে। তাঁদের জানা দরকার যে, এই উদ্যোগে হাত দিয়ে আমি ব্যাপক-ভাবে এমন কতকগুলি শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম, নবভারত গঠনের উদ্যমকে যারা ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ করে মারছে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল এই যে, এই চল্লিশ হাজার নরনারীর মধ্যে যারা কর্মক্ষম, আমরা তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করব। তারাই ইঁট বানাবে; তারাই দরজা, জানালা, খাট, বলটু তৈরি করবে; তারাই নিকটবর্তী পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে আসবে। মাটি খোঁড়া, রাস্তা বানানো, বসত-বাড়ি আর সরকারী বাড়ি নির্মাণ করা—এ-সবও তারাই করবে। তখনকার যা বাজার দর, সেই অনুযায়ী প্রত্যেককে তার কাজের মজুরি দিয়ে দেওয়া হবে। এবং সকলের এই কাজের মাধ্যমে যা গড়ে উঠবে, তা হবে তাদেরই সামবায়িক প্রয়াসের ফল। দোকানীরা প্রায় প্রত্যেকেই হচ্ছেন স্বাতন্ত্র্য-বাদী মানুষ। সমবায়-সংস্থার সদস্য হতে তাঁদের রাজী করানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি যখন প্রথম তাদের বললাম, "এসো, আমরা সবাই মিলে একটা শহর গড়ে তুলি", তখন তারা ভেবেছিল যে, আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রথম ছটা মাস আমি শুধু তাদের বুঝিয়েছি যে, এটা একটা অসম্ভব প্রস্তাব নয়। বোঝাতে বোঝাতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যেত। তাদের মধ্যে যারা নেতা-স্থানীয়, সকালে দুপুরে রাত্রে অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষণই এ নিয়ে তাদের সংগে কথা বলতে হত। বোঝাতে হত যে, সরকারের দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার কোনও লাভ নেই; বোঝাতে হত যে, নিজের হাতে কাজ করে জীবিকার্জন করতে হবে। উত্তরে তারা বলত যে, তারা তো কাজ করতেই চায়, কিন্তু করবে কীভাবে, এ-সব কাজ তো তারা জানে না, তারা দোকানী। শুধু কি তারা, তাদের বাপ-ঠাকুর্দাও দোকানী ছিল, তারা কীভাবে শহর বানাবে? শহর বানাবে ঠিকাদার-বাবুরা, শহর বানাবে ইনজিনিয়ার-বাবুরা। আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছি; তা নইলে আর দোকানীদের দিয়ে আমি শহর বানাতে চাইব কেন?

শহর বানাবার জন্য কয়েক কোটি ইঁট দরকার। সেই ইঁট বানাতে তাদের রাজী করানোই হল আমার প্রথম কাজ। ধৈর্য না-হারিয়ে শান্তভাবে তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, ইঁট বানানো মোটেই শক্ত কাজ নয়। মাটিতে জল মিশিয়ে কাদার তাল তৈরি করতে হবে, তাকে কাঠের ছাঁচে ফেলে ইঁটের চেহারা দিতে হবে, সেই নরম ইঁটকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে; তারপর গোল করে মাটি খুঁড়ে সেই গর্তটাকে রোদে-শুকোনো ইঁট দিয়ে ভর্তি করতে হবে, গর্তটাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, তারপর তার উপরে গোটা দুই চিমনি বসিয়ে দিতে হবে, যাতে গর্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে চিমনি দিয়ে তার ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারে। গর্তের এক প্রান্তে কয়লায় আগুন ধরিয়ে দিলেই হল, সেই আগুনই ধীরে ধীরে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হবে। আগুন নিবে যাবার পর ইঁটগুলিকে ঠান্ডা হতে দাও; ঠান্ডা হয়ে গেলে সেগুলি সেখান থেকে সরিয়ে দাও; তারপর নতুন করে অবার সেই গর্তের মধ্যে রোদে-শুকোনো ইঁটের পাঁজা সাজিয়ে তোলো। ইঁট বানাবার কাজ এইভাবে চলতেই থাকবে, থেমে থাকবে না।

কিন্তু কাকে এ-সব কথা বলা! যত বোঝাই, দোকানীরা ততই মাথা নাড়ে আর বলে, এমন কাজ তারা জীবনে কখনও করেনি। অগত্যা কী আর করা, ইঁট বানানো যাদের পেশা, গ্রাম থেকে এমন কিছু লোককে আমরা নিয়ে এলাম। (সংখ্যায় তারা বেশী নয়, মোট লোকসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মাত্র।) অন্যদের তারাই হাতে-কলমে দেখিয়ে দিল, কী করে ইঁট বানাতে হয়। কিন্তু বংশানুক্রমে যারা দোকানী, স্বচক্ষে সব দেখেও তারা উৎসাহিত হল না। ফলে আমি মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম যে, শহর বানাতে যত ইঁট দরকার হবে, কুড়িটি ইঁটের পাঁজা থেকে আড়াই বছরের মধ্যেই তার সমস্ত ইঁট আমরা তৈরি করে নেব। তাই দিয়েই তৈরি হবে ছ' হাজার বাড়ি, বড় একটি হাসপাতাল, কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাওয়ার হাউস এবং অন্যান্য সরকারী ভবন। গড়তে হবে কুড়িটি সমবায়-সংস্থা; তার এক-একটির সদস্য হবে পঞ্চাশটি করে পরিবার। ইঁট বানাবার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার; বোর্ড তাঁদের মূলধন হিসেবে যে আড়াই কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন, তার থেকেই অগ্রিম হিসেবে এই দশ লক্ষ টাকা সমবায়-সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সমবায়-সংস্থাগুলি সেই টাকা বিনিয়োগ করে ইঁট বানাবেন, এবং সমষ্টি-প্রকল্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সে-ইঁট আমি কিনে নেব। বাইরে থেকে যাদের কাজে নেওয়া হয়েছে, ইঁট বিক্রির টাকা থেকেই মেটাতে হবে তাদের প্রাপ্য; কিস্তিবন্দীভাবে মূলধনী ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখতে হবে; অবশিষ্ট টাকা সমবায়-সংস্থাগুলি তাঁদের সদস্যদের মধ্যে বেঁটে দেবেন; এবং এই-ভাবেই ৫০×২০=১০০০ পরিবার তাদের জীবিকা অর্জন করবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রাজী করানো গেল তাদের। কথাগুলি যে তাদের বিশ্বাস হয়েছে, এমন মনে হল না; তবে দ্বিধা সত্ত্বেও তারা বলল যে, তারা একবার চেষ্টা করে দেখবে। চোখের সামনে যখন একটা বিরাট কাজের উদ্যোগ চলেছে, তখন মনে যতই দ্বিধা-সংশয় থাক, সাধারণত কেউ তার থেকে দূরে থাকতে চায় না। তারা তখন ভাবে যে, কী জানি, ফল যদি ভাল হয়, তো তার অংশ থেকে তারা বাদ পড়বে। তেমনভাবে বাদ পড়তে কেউ চায় না। আর তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা কাজে হাত লাগাল। প্রথম পাঁজাটিতে কাজ শুরু হবার পর দেখা গেল, ইঁট বানাতে যে খরচা পড়ছে এবং যে-দামে সে ইঁট আমরা কিনছি, তাতে প্রতি হাজার ইঁটে তাদের দশ টাকা করে লাভ থাকে। পেশাদার শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার পরেও এতটাই তাতে লাভ রইল যে, বুঝতে পারা গেল, ইঁটের ব্যবসায়ে পয়সা আছে। কুড়িটি পাঁজায় অতঃপর সমানে ইঁট তৈরি হতে লাগল। সেই কোটি কোটি ইঁট দিয়েই গড়ে উঠেছে ফরিদাবাদ শহর।

(ক্রমশ)

মিশরের 'ওয়াদি হালফা' কৃত্রিম হ্রদ

কৃত্রিম হ্রদ ও বাঁধের কয়েকটি সমস্যা

ডি ভি সি, ভাকরা-নাংগাল প্রভৃতি জল নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দৌলতে দেশবাসী বিদ্যুৎ, সেচের জল প্রভৃতি নানা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সন্দেহ নেই। হিন্দু রাজত্বের আমলেও ভারতে বহু কৃত্রিম হ্রদ ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। আজমীরের আনা-সাগর সেই রকম একটি হ্রদ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম হ্রদ খননের ফলে অর্থনীতির সমৃদ্ধিলাভের পথ যতই সুগম হোক, ব্যাপারটির আর একটি দিক আছে যা অবাঞ্ছনীয় বলে আগে থাকতে সেই দিক সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

শুধু আমাদের দেশ কেন, হালে-স্বাধীন অন্যান্য গরম দেশেও এই ধরনের সব হ্রদ ও বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে, জল সংরক্ষণ, সেচ ও জলবিদ্যুতের স্বার্থে। আফ্রিকার মত সমতল ভূমি-প্রধান দেশে বাঁধ-দেওয়া নদীর কিনারা বরাবর ঐ সব হ্রদ মাইলের পর মাইল বিস্তৃত হয়ে পড়ে (যেমন মিশরের উচ্চ বাঁধ)। ঘানাতে সেই রকম ভল্টা হ্রদ ভল্টা নদীর ধার বরাবর চলে যাবে একেবারে ২০০ মাইল। এই ধরনের বিরাট হ্রদ থেকে জলের যে বাষ্পীভবন হয় তা প্রভাবিত করতে পারে সারা এলাকার জলবায়ু। সেখানকার বায়ুতে এইভাবে আর্দ্রতা বাড়লে কতকগুলি রোগের অনুকূল জমি তৈরি হতে পারে।

মোটামুটি বলা যায় যে একটি বাঁধ খাড়া করতে বছর পাঁচেক লাগে। লোকবল লাগে, হাজার খানেক যন্ত্র কৌশলবিৎ ও ১০ হাজারের মত সাধারণ শ্রমিক। সেই ৫ বছরে তাদের ছেলেপিলে হয়ে মোট লোকসংখ্যা বছরে শতকরা ৩০ জনের মত বাড়তে থাকে। এই হাজার ২৫ লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা করা, তাদের টিকা দেওয়া ও রোগের চিকিৎসা করা সহজ কাজ নয় বলে জায়গাটিতে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ থাকে। যেখানে আগে শুধু প্রবহমান নদী ছিল সেখানে বিরাট এক স্থাণু জলাশয় তৈরি হলে রোগবাহী মশা, মাছি, শামুক প্রভৃতির পাকা আড্ডা-আস্তানা গড়ে উঠতে পারে। লোকসংখ্যা হঠাৎ ২০।২৫ গুণ বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্য রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা এশিয়া বা আফ্রিকার মত অনুন্নত অঞ্চলে অসম্ভব বললেই চলে। কাজে কাজেই যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি নানা রোগের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে সেই অঞ্চল, বিশেষ করে সেখানে যদি জলাশয় থাকে। নদীও কিছু কম বিপজ্জনক নয়, বিশেষ করে আফ্রিকায়। নিদ্রা রোগবাহী সীসী মাছির আড্ডা নদীর ধারে। আর এক রকমের মারাত্মক মাছি আছে যার নাম সিমুলিয়াম।

উগাণ্ডার জিঞ্জা বাঁধ

নাইগার নদীর বাঁধে সিমুলিয়াম মাছির আড্ডায় ডি ডি টি ছড়ানো হচ্ছে
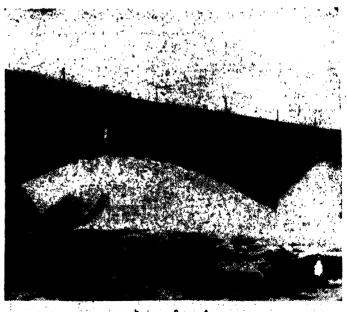
এই প্রাণী 'অংকোসার্মিয়াসিস্' রোগের বাহন, যে রোগ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আফ্রিকায় জলবাঁধগুলির কাছে এগুলিকে হামেশাই দেখা যায়। ম্যালেরিয়া বীজাণু-বাহী অ্যানোফেলিস মশাগুলিও জলে ডিম পাড়ে। আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি বাঁধে কিছুদিন অন্তর অন্তর জলের 'লেভেল' উঠিয়ে নামিয়ে মশার আড্ডা নষ্ট করা হয়। কিন্তু আফ্রিকার অতিকায় বাঁধগুলির ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত আফ্রিকার জল নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প-গুলির আশপাশে রোগটির প্রকোপ খুবই বেশি। এশিয়ার ক্ষেত্রেও ছবি একই রকম হওয়ার কথা।

এক সময়ে পীত জ্বর বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটাতো। আজ অবশ্য ঐ রোগের টিকা হয়েছে। প্রথমবার পানামা খাল ও তার গাটুন হ্রদ (জেনেভা হ্রদের প্রায় সমান) খননের সময় ফার্ডিনান্ড ডিলেসেপ্সের ইউরোপ থেকে আমদানী করা শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশ পীতজ্বরের শিকার হওয়ায় তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। তারপর ১৯০৪ সালে নতুন করে যখন খালটি খোঁড়া আরম্ভ হয় তখন সেই সংগে মশা নিবারণের ব্যবস্থা করার কাজে আর কোন বাধা হয়নি।

সুদানের কৃত্রিম হ্রদগুলিতে এক রকমের শামুক আছে যা বিল্‌হার্জিয়া নামে এক রোগের বাহন। হ্রদের মধ্যে সেগুলিকে বাগে ফেলা সোজা নয়। সেই হ্রদের জলের সাহায্যে কোন সেচ প্রকল্প রচনা করার বিপদ আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এ ক্ষেত্রে জলবাঁধ বা কৃত্রিম হ্রদ যেখানে নির্মাণ করা হবে সেই জায়গার গ্রামবাসীদের অন্য জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত পুনর্বাসন এবং শ্রমিক-দের যে নতুন বসতি গড়ে উঠবে সেখানে তাদের জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া, যাতে তারা বিভিন্ন সংক্রামক আদিব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। এইগুলি হচ্ছে অত্যন্ত জরুরী কাজ। দেখা যায় যে, বাঁধের কাজ যত এগিয়ে চলে ততই স্থানীয় গ্রামবাসীরা পেছোতে পেছোতে জলাশয়ের কিনারায় এসে ঠেকে। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নির্বাচিত এলাকায় নিয়ে গিয়ে বসাতে হবে। মিশরের বড় বাঁধ তৈরির সময় ওয়াদি হাল্‌ফার অধিবাসীদের বহু দূরে নিয়ে গিয়ে কশম অল্ গির্বা নামে এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের সামনে এক বিপদ ঝুলে আছে যা এর আগে কোনদিন তাদের সামনে ছিল না। এলাকাটি আট্‌বারা নদীর কাছে এবং নদীটি ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের মাছির আড্ডা। শুধু তাই নয় ইথিয়োপিয়ার সিমুলিয়াম মাছি ঐ নদী বরাবর সেখানে গিয়ে হাজির হতে শুরু করেছে। অবশ্য মিশর সরকার সে বিষয়ে সচেতন এবং পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন। জিঞ্জা নামে শহরের কাছে সিমুলিয়াম মারার জন্য নদীর জলে ডিডিটি দেওয়া হয় এবং সেই ডিডিটি হোয়াইট নাইল বরাবর বয়ে গিয়ে বহু দূর পর্যন্ত ঐ মাছি ডিমশুদ্ধ মেরে ফেলে।

এই সমস্ত বিপদ আছে বলে যে বাঁধ নির্মাণ বা হ্রদ খনন করা হবে না তা নয়। সিমুলিয়াম ও সীসী মাছি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই, ম্যালেরিয়ার মশাও তাই। কিন্তু তেমনি জল বাঁধ হচ্ছে জলবিদ্যুতের উৎস, শুকনো জমিতে সেচের উৎস হচ্ছে কৃত্রিম বাঁধ। যেমন ধরুন নাইগার নদী প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হলে শুধু যে বিদ্যুৎ ও সেচের ব্যবস্থা হবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নাইগার সাধারণ-তন্ত্র থেকে সমুদ্রে যাবার এক জল পথ তৈরি হয়ে যাবে, সেখানকার লোকে পাবে প্রচুর প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ। সুতরাং বাঁধ চাই, হ্রদও চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো চাই বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিপৎনিবারণী ব্যবস্থা।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়
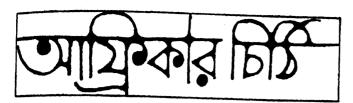
নাইজেরিয়ার বটতলা হল ওনিটশা, কিন্তু বটগাছের প্রাচুর্যের জন্য নয়। বাংলাদেশের বটতলা সাহিত্য বলতে যেমন "রূপসীর রঙ্গনৃত্য" "শশীমুখীর পদস্খলন" কিংবা "পাপীয়সী না মহীয়সী?" জাতীয় চটকদার উপন্যাস বোঝায়, ওনিটশার বাজার-সাহিত্যেও তেমন এই ধরনের বইএর ছড়াছড়ি। অবশ্য ওনিটশা তথা পূর্ব নাইজেরিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় এইখানেই সম্পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশের বটতলা সাহিত্যের ওপরে গিয়ে যেমন সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিকরা সরস্বতীর সেবা করেছেন, নাইজেরিয়ায়ও তেমনি জীবনধর্মী লেখকরা (যথা চিনুয়া আচেবে, সিপ্রিয়ান একোয়েন্সি, ওলে সোয়িন্কা, ওনুওরা নজেকু প্রভৃতি) দস্তুরমত ভাল উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প লিখেছেন, যাতে বাস্তব জীবনের অঙ্কে গোঁজামিল দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করবার প্রয়াস নেই। তফাং এইখানে, বাঙালী সাহিত্যিকেরা লিখেছেন বাংলা ভাষায়। আর ওনিটশার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ইংরাজীতে। বাঙালী সাহিত্যিকেরা ইংরাজী তথা ইওরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও প্রেরণা পেয়েছেন। নাইজেরিয়ার সাহিত্যিকেরা অবশ্যই বিষয়বস্তু নিয়েছেন নিজ নিজ সমাজ থেকে, কিন্তু রচনার আঙ্গিক, প্রকাশভঙ্গী, চরিত্রায়ণ আর প্লটের ক্ষেত্রে ইওরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজী প্রভাব সুস্পষ্ট।

নাইজেরীয় সাহিত্যসাধনার সবচেয়ে বড় অংশীদার হল পূর্বাঞ্চলের ইবো লেখকগণ। আর পুস্তক প্রকাশ হয়ে থাকে প্রধানতঃ ওনিটশা শহরে। এ শহরটি নাইজার নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। বিভিন্ন ইওরোপীয় মিশনারীরা এখান থেকে তাঁদের প্রচার চালিয়েছেন। এখানে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি স্কুল ও কমার্সিয়াল কলেজ। মিশনারী প্রচার এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি ছাপাখানা চালু হয়েছে। তাছাড়া ওনিটশা পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম গঞ্জও বটে। নদীর ধারে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে বিরাট বাজার। ব্যবসার জন্য এখানে এসেছে পশ্চিম থেকে য়োরুবা দোকানদার, উত্তরের ফুলানি কসাই আর হাউসা মল্লম, সাগরপার থেকে গ্রীক, সিরিয়ান, পর্তুগীজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী, এবং পূর্ব নাইজেরিয়ার আরা-কালাবার, এফিক ও ইবোরা। এদের মধ্যে অবশ্য ইবোরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থে সামর্থ্যে ওনিটশা হয়ে উঠেছে ইবোভূমির হৃৎপিণ্ড স্বরূপ।

অন্যান্য ব্যবসায়ের পাশাপাশি অর্ধ ও অল্পশিক্ষিত লোকের অবসরবিনোদনের জন্য ওনিটশায় বেশ বড়রকমের ব্যবসায় গড়ে উঠেছে : সিনেমা হল (যেখানে "মহব্বতসে প্যার", "সার্কাসওয়ালী", "হর রোজ চলে ইশ্‌ক্" প্রমুখ এমন হিন্দি ফিল্ম দেখানো হয়, যাদের নামও আমরা দেশে থাকতে শুনিনি), বীয়ার হল, ডান্স হল, ফুটবল আর বক্সিং ক্লাব আর বটতলার গল্প-উপন্যাস। শুনলে আনন্দ কি দুঃখ হবে জানি না, এই ধরনের বটতলীয় উপন্যাস প্রথম আসে ভারতবর্ষ থেকে। পাতলা চটি বই, তাতে মনভোলানো ছবি, এর টিপিক্যাল প্রচ্ছদপটে থাকত লাস্যময়ী এক সুন্দরীর ছবি, ষণ্ডামার্কা এক যুবক তাকে চুম্বনরত। পেছনে থাকত, বাঞ্ছিতার প্রেমলাভ, মামলা বিজয়, পরীক্ষা পাস আর অফিসের বড়বাবুর মনোরঞ্জনের অমোঘ কবচের বিজ্ঞাপন। এমন বই আসতে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি। কিছুদিন পরে নাইজেরীয় ব্যবসায়ীরাও একাজে হাত দেয়।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত সিপ্রিয়ান একোয়েন্সির উপন্যাস "প্রেম যে চুপে চুপে" ওনিটশার বটতলীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় শ' তিনেক বই বেরিয়েছে।

বটতলার মত ওনিটশার বাজার-সাহিত্যেও সস্তা রোম্যান্স হল মূল উপজীব্য। কতকগুলি বইএর নাম দিই : "ন্যান্সি ভালবেসেছে শুধু আমার টাকাকে", "যুবকদের প্রতি আধুনিকাদের নিবেদন", "এলিজাবেথ ও ট্যাক্সিচালক", "টমীর প্রেমের জন্য মিস কমফার্টের বুক ফেটে যায়", "কীভাবে একজন টিকিট কালেক্টর জনৈকা শিক্ষিকাকে প্রেমাসক্তা করল" ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে থাকে যথাযথ উপদেশ। এমন কি পাঠক-পাঠিকাকে প্রলোভনমুক্ত করার প্রচেষ্টা উপন্যাসের নামেও ফুটে ওঠে। যেমন, "ওগো, বালা! সাবধান!" "নারীকে নেই বিশ্বাস" "রূপ মানেই ঝামেলা"।

প্রেমের গতানুগতিক সমস্যা গতানুগতিক প্রথায় বর্ণিত হয়েছে অনেক রচনায় (যথা : শ্রীওগালি এ. ওগালি লিখিত নাটক "আমার কন্যা : ভেরোনিকা")। সুন্দরী তরুণী ভেরোনিকা ভালবাসে গরীব কিন্তু সুশ্রী, সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত এক যুবককে। তার অর্থপিশাচ বাবা টাকার জন্য মেয়েকে তুলে দিতে চায় অর্ধশিক্ষিত এক ধনী বৃদ্ধের হাতে। অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গিয়ে অবশেষে ধর্মের জয় হয়। অর্থাৎ আনন্দোচ্ছল দর্শকদের সোৎসাহ করতালির মধ্যে ভেরোনিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দর্শকরা খুশী, সঙ্গে থিয়েটারকর্তা, প্রকাশক, আর লেখক স্বয়ং। কারণ এমন না হলে ওগালির নাটকের ৬০,০০০ কপি বিক্রি হত না।

নাইজেরিয়ার বটতলীয় সাহিত্য অনেককে যুগিয়েছে আনন্দ, আর কিছু লোককে অর্থ। নগরায়ণ, শিক্ষার বিস্তার ও সনাতন সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবসর বিনোদনের নতুন নতুন উপায় বেরোচ্ছে। লেগস, পোর্ট হার্কুট, এনুগু বা ওনিটশা শহরের ছেলেমেয়েদের আজকাল সনাতনী নাচগান আর সান্ধ্য আড্ডা মন ভরাতে পারে না। শহরে সে আবহাওয়া নেই, উপজাতীয় গোষ্ঠীবন্ধতা অনেকাংশে বিপর্যস্ত। তাছাড়া রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। এসেছে রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমা, টেলিভিসন, ফুটবল ম্যাচ, ডান্স হল আর রুপেয়া থাকলে, নাইটক্লাব। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বই পড়া।

তবে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও সীমিত। বেশীর ভাগ পড়ুয়া হল মধ্যম-শিক্ষিত, অনেকে অর্ধশিক্ষিত, পেশায় এরা হল অফিস-আদালত ও বন্দর-রেলপথের কেরানী, কর্মচারী ও ক্ষুদে অফিসার, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ব্যবসায়ী। নাইট ক্লাব ও টেলিভিসন এদের পকেটের বাইরে। সিনেমা ও ডান্সহলে প্রতিদিন যাওয়া পোষায় না। সস্তা উপন্যাসপাঠের দক্ষিণাও সস্তা। তাই এরা হল নাইজেরিয়ার

বটতলার প্রধান খরিদ্দার। তাছাড়া অনেকের পক্ষে বাস্তবজীবনে যা না পাওয়া যায়, উপন্যাসপাঠে তার আস্বাদন মেলে। এক্ষেত্রেও রোমান্টিক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

ভারতবর্ষে এমন সাহিত্য রচিত হয় দেশীয় ভাষায়। আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা তার স্থান দখল করেছে। নাইজেরিয়ার স্কুলের প্রথম ধাপ থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরেও ইংরাজী হল শিক্ষার বাহন। শুধু তাই নয়, ইংরাজী হয়েছে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ভাববিনিময়ের ভাষা। শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজের ভাবপ্রকাশমাধ্যম। ইংরাজী বইএর বাজার সারা নাইজেরিয়া—যার লোকসংখ্যা হল পাঁচ কোটি। পক্ষান্তরে ইবোদের সংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ। বটতলীয় লেখকেরা প্রধানত ইবো হলেও তাদের উপন্যাস লেখা হয়েছে ইংরাজীতে। তবে পাঠক-পাঠিকারা অর্ধশিক্ষিত, তাদের সাংস্কৃতিক মান নীচু। তাই যে কারণে গড়পড়তা বোম্বের ফিল্ম নীচু দরের হয়, সেই একই কারণে ওনিটশার বাজারে সাহিত্য বটতলীয় হতে বাধ্য।

ছাপাখানার মালিক ও প্রকাশকদের সঙ্গে সঙ্গে নাইজেরিয়ার বুদ্ধিজীবীরাও ওনিটশীয় বাজার সাহিত্যের মুনাফা কুড়িয়েছে। ওগালি এ. ওগালির মত নামকরা লেখক হলে তো কথাই নেই, তরুণ উঠতি বুদ্ধিজীবীরাও একবারে বাদ যায়নি। বাংলা দেশের মত অনেক আনকোরা লেখক অল্প দক্ষিণার বিনিময়ে তাদের রচনার পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রকাশক সব লাভটা নিয়েছে এবং লেখক হিসেবে নিজের নাম ছাপিয়েছে। বদলে আসল লেখক পেয়েছে চার থেকে পাঁচ শ' টাকা।

আগে বলেছি, নাইজেরীয় সাহিত্যের প্রেরণার প্রধান উৎস হল ইংরাজী সাহিত্য। বটতলীয় নাটক-উপন্যাসে অবশ্য আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছায়া পড়ে না। তবে চিরাচরিত ইংরাজী সাহিত্যের ছিটেফোঁটা পরিচয় সহজেই মেলে। শ্রীটমাস ইসু লিখিত "অ্যাগনেস—একনিষ্ঠ প্রেমিকা" নামক নাটকের নায়িকা অ্যাগনেস নিজেকে শেক্সপীয়রের নায়িকা জুলিয়েটের সঙ্গে তুলনা করে। এবং বিয়োগান্ত নাটকের শেষে ঘটে বিশুদ্ধ রোমিও-জুলিয়েটীয় কায়দায় নায়ক-নায়িকার আত্মহত্যা। লেখকের অন্য এক নাটকের নায়িকা (বোধহয় জুলিয়েটের সঙ্গে উপমিত হওয়ার জন্যই) এমন এক যুবকের প্রেমে পড়ে যার পরিবারের সঙ্গে নায়িকার পরিবারের আদায়-কাঁচকলা সম্পর্ক। নাইজেরিয়ার পট-ভূমিকায় অবশ্য বিবাদের মূল কারণ হয় একখণ্ড জমির মালিকানা বিষয়ে মতভেদ—সাম্প্রতিক সামাজিক রূপান্তরের তাৎপর্য-পূর্ণ ইঙ্গিত। এক্ষেত্রে ইংরাজী প্লটের ফাঁক দিয়ে নাইজেরীয় বিষয়বস্তু উঁকি মারছে। অবশ্য দ্বিতীয়টিকে বাদ দেবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। ওনিটশার বাজার-সাহিত্য নাইজেরীয়, বিলাতী প্রভাব সত্ত্বেও। নাইজেরিয়ার সনাতন সমাজের অবক্ষয় জনিত সমস্যার ছাপ তো এখানে পড়বেই, যদিও বটতলীয় স্তরে বিলাতী ধরন-ধারনের আকর্ষণ বেশী।

বিষয়বস্তু ছাড়া রচনাভঙ্গীতেও স্থানীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ না পড়ে পারেনি। অন্যের কথা তথা প্রবাদ উদ্ধৃত হল ইবো বাচনভঙ্গীর অন্যতম অঙ্গ। ওদের নিজেদের মধ্যেই একটা চলতি কথা আছে, প্রবাদ-উদ্ধৃতি ছাড়া বক্তৃতা প্রচেষ্টা হল দাঁড়ি বিনা তালগাছে ওঠার সামিল। ইংরাজী সাহিত্যের যেখানে এত কদর, সেখানে স্বভাবতঃই উদ্ধৃতি-সরবরাহ হবে সে-সাহিত্যের রথী-মহারথীদের লেখা থেকে। শ্রী ওগালি তাঁর পূর্বোল্লিখিত নাটকের কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে শেক্সপীয়র, কিপলিং, লংফেলো ও অন্যান্য মনীষিদের সুভাষিতা-বলী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যান্য রচনায় স্যার ওয়াল্টার স্কট, এডমণ্ড বার্ক, বায়রন, ওয়র্ডসওয়ার্থ প্রমুখ লেখকেরা যথাযোগ্য স্থান পেয়েছেন। কোন কোন সদাশয় লেখক গ্যেটে ও দান্তেকে নিরাশ করেন নি।

ওনিটশা থেকে শুধু চটকদার উপন্যাসই প্রকাশিত হয়নি। হরেক রকমের বই প্রকাশকরা ছাপিয়েছে! "কেমন করে ইংরাজী রপ্ত করা যায়", "কেমন করে অফিসের চিঠিপত্র লিখতে হয়", "মিটিং-এ সভাপতিত্ব করার নিয়মাবলী", "সহজ ব্যবসা শিক্ষা"। এছাড়া আছে "হ' মাসে কাউসা ভাষা শিক্ষা", "য়োরুবা-ইবো কথোপকথন" ইত্যাদি। একাধিক পত্র-পত্রিকাও এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর আগে ওনিটশার বটতলীয় লেখকেরা এক লেখক সমিতি স্থাপিত করেন। এবং এই সমিতির তরফ থেকে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সগর্বে ঘোষিত হল, "রাজা উপাধির চেয়ে 'লেখক' উপাধি গৌরবজনক"। কিন্তু এই মহান ঘোষণার অল্পকালের মধ্যেই পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে।

ওনিটশার বটতলা হল নীচের তলার মানুষদের জন্য। কিন্তু ওনিটশার এক বর্ধিষ্ণু উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজও আছে। এদের মধ্যে থেকে বেরিয়েছে শিক্ষক-অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, মিশনারী ও রাজনৈতিক নেতা। ইবোভূমি তথা নাইজেরিয়ার নেতৃত্ব অনেকাংশে এসেছে ওনিটশা থেকে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ নামদি আজিকিওয়ে স্বয়ং ওনিটশার নাগরিক।

অন্যদিকে ইবো সাহিত্যসৃষ্টি বটতলাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইবো লেখকদের রচনা ছাপিয়েছে নামকরা বিলাতী প্রকাশালয়। ওলে সোয়িনকা, চিনুয়া আচেবে আর সিপ্রিয়ান একোয়েন্সির মত লেখকরা যে কোন দেশের গৌরব। সোয়িনকার নাটক ইংল্যাণ্ডে মঞ্চস্থ হয়েছে। আর আচেবের উপন্যাস তো আজ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

অংশু দত্ত

পাবো তারে

কালকূট

সাত

আমার বুকে চলকে ওঠে কী এক রস। হঠাৎ যেন একটা ব্যথা ধরিয়ে দেয়। তবু হাসিতে ডগডগিয়ে ওঠে প্রাণ। চমকে ফিরি গাজীর দিকে। এমন কথা শুনি নি আগে। কে বেঁধেছে এমন কথা। কে গেয়েছে সুর করে। কোথা থেকে আসে গাজীর ভাণ্ডারে। মনে হয়, এক কথাতে জগত জোড়া জাতের বিচার দিলে মিটিয়ে।

এখন দ্যাখ, গাজীর ভুরু নাচে, চক্ষু নাচে, আর নাচে দাড়ি। বসে বসেই কোমর নাচে, মাথার বাবরি নাচে, আর নাচে অঙ্গুলি। আরশি চোখে হাসির ঝলক, যেন চলকে চলকে পড়ে। বলতে হয়, লোকটার মুখ মিটমিটে ভরা। কী রহস্য যেন করে। ডুগ্‌গির তাল ঠিক চলে। আকাশের দিকে চেয়ে, সুর করে ডাক দেয়, 'ওহ্ ওহ্ ভোলা মন রে আমা-আ-আ-আর... !'

ওদিকে, ব্রজনারায়ণ যেন এক জবর ধাঁধা শুনেছেন। কপালে ঢেউ দিয়ে ভুরুতে কোঁচ বিঁধে, এক নজরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন গাজীর দিকে। গাজী ঘাড় নেড়ে, দাঁত দেখিয়ে, আবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করে। 'অ বাবু, বলতে পারেন নাকি।'

ব্রজনারায়ণ যেন কোথায় ডুবে ছিলেন। চমকে উঠে জবাব দেন, 'অ্যাঁ?'

গাজী হা হা করে হেসে ধরে, 'সব লোকে কয় তুমি কী জাত সংসারে।'...

আবার সব কলি কাটিই ফেরত আনে গাজী। দুলে দুলে গায়। আবার চোখের ছটার ঝিলিক হানে উলটো আসনে, মায়ে ঝিয়ের দিকে। মা বেশ মজা পেয়েছেন। মেয়ে তার থেকে বেশী, সে যেন মজেছে। নাগরিকা মুগ্ধ চোখে গাজীকে দ্যাখে।

ব্রজনারায়ণ ঘাড় ঝেঁকে বলেন, 'তা ঠিক, মানতে হবে। কিন্তু, ওই কথাটা শোনা শোনা, অথচ ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না।'

গাজী ডুগ্‌গিতে তাল রেখে বলে, 'কোন কথাটা বাবু?'

'ওই যে কী বললে, ছুন্নত।'

আহ্, ওহে ভিনযাত্রী ভদ্রলোক, কান লাল করো না। কী বেয়াক্কেলে, ঝিনির চোখ পড়বি তো পড় ভিনযাত্রীর দিকেই। যেন রক্তাঘাতে লাল হল তার মুখ। কিন্তু হেডমাস্টার ব্রজনারায়ণ সরল মানুষ। আজে বাজে কথায় নেই। যা জানেন না, তা জানতে চান। তবে তার আগেই যে মেয়ের গলায় সলজ্জ অস্ফুট ধমক ফোটে, 'আঃ বাবা!'

বাপ মেয়ের দিকে ফেরেন। মেয়ের ততক্ষণ আসমানে নজর। কিন্তু রঙঝালর সিল্ক শাড়িতে যে কাঁপন। শরীরের কাঁপুনি ধরে রাখা যায় না। হাসিতে সে অধরা। এ অধীনের অবস্থা তথৈবচ। কোনদিকে মুখ ফেরানো যায়, ভেবে পাই না। ব্রজনারায়ণের দিকে তাকালে অট্টহাসি ফাটবে। উলটো দিকে আরোই অসম্ভব। ভাবলাম, খোপ ছেড়ে যাই।

কিন্তু গাজী বলে ওঠে, 'সুন্নত জানেন না বাবু। মুসলমানের ব্যাটাদের ছেলে-বেলাতেই হয়—।' কথা শেষ হবার আগেই, ব্রজনারায়ণ তর্জনী তুলে হাঁকেন, 'ও ইয়েস ইয়েস, মনে পড়েছে। তাই তো বলি, কথাটা শোনা শোনা লাগছে, অথচ...। ওই তোমার গিয়ে যাকে বলে—'

সর্বনাশ, ব্যাখ্যা করবেন নাকি! উলটো আসন থেকে প্রায় আর্তনাদ ওঠে, 'বাবা!'

'অ্যাঁ?'

ব্রজনারায়ণ আবার থতমত। মেয়ে ডাক দিয়েই মুখ ফেরায়। মাস্টারমশাই একবার আমার দিকে ফেরেন। তারপরে বলেন, 'না আমি বলছি, গানটি ভোলা। বেশ ধরেছ হে। গাও গাও, তারপর?'

গাজী গেয়েই অঙ্গে,

'কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।
ওহ্ ভোলা মন... !'

হ্যাঁ, ভোলা মন, মন দিয়ে শোন। যখনে তোমার কী এক নেশা ধরে যায়। সেই নেশায় মন দিয়ে দ্যাখ, কত পথানের হাই, কথনের ধুলো একাকার হয়ে গিয়েছে। সেই একাকারে হাতড়ে দ্যাখ, কী জাত লেখা আছে। কিন্তু ভাবি, এ গানের বাঁধনদার কোন্ বিদ্রোহী কবি। এ কবিতে সে চোটপাট নেই, সে খিচ্ছর নেই, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।'

এ বলে, 'সব লোকে কয় আমায় কি জাত সংসারে।' সমুদ্রের জল বিচার করে কে। মানুষের জাত বিচার করে কে। কলের নয়, মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে যেন কোন দূরকালের কথা শুনি। তাও শোনায় কি না ধুলোয় আলখাল্লা গায়ে কোন এক পথের গাজী। বাহ্ বাহ্ বলে উঠি, গলায় তেমন ফাঁক নেই। সব যেন টাবুটুবু ভরা, ভর ভর জমাট।

অবাক একটু লাগে ঝিনির মুখে ঔৎসুক্যে। কুটুস্ বায় ব্যাগ খোলে, আকাশ দেখিয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে, চুলেতে যার কোনাও কপচানি। এমন কোন বিপত্তি। রসিকা নাগরিকা, গাজীর গানে সে যেন এত উৎসুক। কাজল মাখা চোখে যে পলক পড়ে না।

তা হোক, কিন্তু ব্রজনারায়ণের বেদবাক্য শোন। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'করেক্ট! গুড্, ভেরী গুড্!'

মাস্টারমশাইয়ের সার্টিফিকেট। তবে কানের দোদিকে খেয়াল নেই। সে অস্থির চেপে বসে নেই, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে

খাড়া বসেছে। দুলুনি হয়েছে দ্বিগুণ,
বাবরিতে ঝটকা ত্রিগুণ। সে গায়,
'ও বাবু—গন্ডে গেলি কূপজল কয়
গঙ্গায় গেলি গঙ্গাজল হয়
মূলে এক জল সে ভিন্ন নয়
ভিন্ন বলে পাত্রর অনুসারে।
ওহ্ জেতা, জগত বেড়ে জেতের কথা
লোকে গল্পয় করে যথাতথা
আমি সেই জেতের ফাতা
বিকিয়েছি সাতবাজারে।
সব লোকে কয়...।'

এখন আর গাজীর চোখ নাচে না, ভুরু নাচে না। দোলানি থাকে, কিন্তু চোখ বুজে আসে। গলার চড়া স্বর যেন ক্রমে নিবিড় হয়। যেন স্বপ্নে গায়। তারপরে হঠাৎ জেগে উঠে হাসে। মুরশেদের নামে, দোষ নেই, সেই লাল ছোপানো দাঁত দেখিয়ে হেসে বলে, 'তর কন বাবু, জাতের কথা কী বলব। এই আমার জাতের কথা।'

বলবার আর কী থাকতে পারে। দেখলাম তো, চন্নার পাঁজির ভোজ ফেলে পাখীরা চেয়ে চেয়ে গান শুনলো। যারা উড়ে গেল আকাশ দিয়ে, তারাও। কী বুঝলো কে জানে। কথা কিছু আসে না, মনে মনে বলি, চল গাজী, কোন মতলবে কোথায় নিয়ে যাবে, যাই তোমার সঙ্গে। জেতের ফাতা বিকিয়ে আসি সাতবাজারের হাটে।

হেডমাস্টার রায় দেন, 'ইয়েস, আই এগ্রি, এর পরে আর জাতের কথা তোমাকে বলা চলে না। কী বলিস ঝিনি, গানটা বেশ ভালই গেয়েছে।'

'চমৎকার। সুন্দর!'

শুধু ভালতে ভাল বলা যায় না। নাগরিকার গলায় যেন স্বপ্নের আমেজ। কোথায় ডুবে আছে। ডুবো ঠাঁই থেকে কথা আসে। দ্যাখ, আগের সেই চেতনে নেই। গোটা আদুর ডানাখানি বেআবরু। কাঁধকাটা জামার কপড়ে এক রঙ। যুবতী অচেতন, আপনাতে আপনি ফুটে গিয়েছে। কটির ওপরে রোদের মত খোলা জায়গাটিতে শাড়ি চাপতে ভুলে যায়। বলে, 'আর একটা গাইবে?'

মায়ের মুখেও সেই ইচ্ছা। গাজী সমঝদারের খিদমদ্গার। কেবল কি তাই। আরশি চোখে গুণটানা দেয় যেন। বলে, 'তা দিদি, আপনি কইলি না গাইতে পারি। শোনেন তয় গাই।

এ যেন ক্ষুধার্তকে খেতে বলা। তৃষ্ণার্তকে জল ভরা পাত্র দেওয়া। গান কি তার কাছে সেইরকম। অন্যথায় এক কথায় সায় কেন। ঝিনি খুশী। আবার যুবতী লজ্জাও পায়। বাবাকে দ্যাখে, মাকে দ্যাখে, তারপরে গাজীর দিকে। গাজী ডুপ্কিতে তাল দেয়, ঘাড় কাত করে তাকায় আমার দিকে। ঘাড় নাড়ে এমন ভাবে, যেন আমি জানি, তার ডুপ্কির বোল কী বলে। গান ধরে,

'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলে সে ধন দেখি চক্ষেতে।'

দু' কলি গেয়েই গাজী, ঝিনির দিকে চেয়ে চোখ ঘোরায়। এবার সে বাঁয়া হাতে ঘুংগুর নিতে ভোলে নি। বলে, 'কেমন কি না দিদি, কেউ কি দ্যাখে।' ঝিনি হেসে ওঠবার আগেই আবার ধরে;
(কী বলব বলেন) আপন ঘরে বোঝাই সোনা
(হায় রে) পরে করে লেনাদেনা
(আর) আমি হলেম জন্মকানা
না পাই দেখিতে।'

বলে, 'ওই যে দিদি বলে না, "প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা" সেই মতন আর কি। শোনেন,

রাজী হলে দরোয়ানি
দরজা ছেড়ে দিলেন তিনি
(হায়রে) তারে যা কই চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।'

এই পর্যন্ত গেয়ে গাজী যেন আর্ত স্বরে ডাকে,

'(ভোলা মন) এই মানুষে আছে রে মন—
যারে কয় মানুষ রতন
ক্ষ্যাপা কয় পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে।'

আবার সেই কথাটাই মনে আসে, এ গান কে বাঁধে, কেন বাঁধে। কী যেন বলে, কী এক অচিন কথা। মনে করি, ধরতে পারি, তবু অধরা। গলা খুলে, কথা বলে, সুরে গাওয়া হল যেন সদর দরজা হাট। আর এক দরজা ভিতরে, বন্ধ দরজা। হাতড়ে ফিরি, খুঁজে পাই না। হয় তো আছে কোন তত্ত্ব পর্দায় ঢাকা। থাকুক, তবু যেন, বেরিয়ে পড়া ঘর ছাড়াকে, আর একবার ঘরছাড়া করালে গাজী। দিগন্ত চলে যায়, চরাচর হারায়। নিজের মধ্যে আর্তস্বর, কোথায় যাই, কেন যাই, কিসের সন্ধানে। টান্না করে, আমিও ধরি, 'পারলাম না রে চিনিতে।' অথচ দ্যাখ, আমার ভিতরে কেন এক পাগলা হাসি বাজে। আমার চোখ ঝাপসা করে দিতে চায়।

ঝিনির গলায় শুনি, 'অপূর্ব!'

তারপরেই কুটুস্ ব্যাগ খোলা। হাতড়ে তুলে আনা করকরে একখানি এক টাকার নোট। ব্রজনারায়ণের পাশ দিয়ে, হাত বাড়িয়ে বলে, 'নাও।'

ঝিনির চোখ মুখ বলে, এ টাকা কিছু নয়, তুমি ঝিনিকেই লুটেছ গাজী। তবে কি না, সে লুট তো তোমার দেখা যায় না। একটি টাকা দিয়ে জানানো। আর গাজীকে দ্যাখ, বিগলিত। হাসিখানি লম্বায় বাড়ে, হেঁ হেঁ হেঁ...। মুখে কথা নেই। মনের কথা পড়তে যদি পারো, তবে শোন, 'দিদি আপনি দিলি কি না নিয়ে থাকতি পারি। হেঁ হেঁ হেঁ...।' মুরশেদের নামের মজুরা আজ বেশ মুতের। টাকাটি চার ভাঁজ করে ঝোলায় পুরতে পুরতে একবার আমার দিকেও দেখে নেয়। এই দ্যাখ, আমার মনটা কেমন খচখচিয়ে ওঠে। যেন আমার গুণের ধনকে আগে অন্যে মেরাত দেয়।

কিন্তু ওদিকে যেন কেমন একটু চোখ টাটানি ভাব। ব্রজনারায়ণের হাসিটি যেন তেমন খোলতাই নয়। এমন কি তস্য গিন্নিরও। দুটি গান শুনে, আস্ত একটি টাকা! ব্রজনারায়ণ বলেই ফ্যালেন, 'একেই বলে ফিলজফি পড়া মেয়ে। তোর সেই হাতীর টুইশান কী বুঝি নিয়ে এসেছিলি?'

ঝিনি হেসে ভুরু বাঁকায়, আবার ঠোঁট ফোলায়। বলে, 'আহা, বাবার যেমন কথা। কলকাতায় বসে যা দিনরাত্রি শুনতে হয়, তার চেয়ে এ অনেক ভাল।'

মা তৎক্ষণাৎ মেয়ের দলে। আওয়াজ দেন, 'সে কথা ঠিক।'

কিন্তু এবার ধাঁধা আমার মনে। এও যে দুপ অরূপের খেলা। একদিকে 'দর্শন' আর একদিকে পায়ের নখের ময়লা থেকে অপদার্থের কেশ বাঁধুনি। এই যোগের, ভিতর দুয়ার হাতড়ে পাওয়া দায়। এ দুয়ের আনাগোনা কোন দরোজায়। সাবধান, মানুষ চেনায় রসিক তুমি নও। নাগরিকা যদি বলেছ, তবে কন্যে কয়, এ মেয়ে বিদুষী। আবার সেই কথা, জল দেখে কি জল চেনা যায়। শুধু 'দর্শন' পড়া নয়, আপন শ্রমের টাকা। ঝিনির জীবিকাও আছে।

ভাবনা যাক, ওদিকে ব্রজনারায়ণের ডাক পড়েছে, 'আপনি যে কোন কথাই বলছেন না। কেমন শুনলেন?'

অতি মাত্রায় চকিত হয়ে উঠি, 'আমাকে বলছেন।'

ব্রজনারায়ণ ঠোঁট উলটে বলেন, 'ওহ্ বাবা, আপনার তো দেখছি খেয়াল নেই।'

মাস্টারমশাই বলে কথা। তাড়াতাড়ি বলি, 'খুব ভাল।'

সে তো বুঝতেই পারছি। যেরকম ভাব লেগে গেছে। আপনারও কি ফিলজফি টফি পড়া আছে নাকি।'

ঝিনির অমনি ভুরু কেঁপে যায়। ঘাড় বেঁকে যায়। আমি বলে উঠি, 'না না, ওসব পড়াশুনো কিছু নেই।'

ব্রজনারায়ণ জিভ দিয়ে দাঁত খাঁকানি দিয়ে বলেন, 'দেখবেন। ফিলজফি মানেই সেন্টিমেন্ট। আপনিও হয় তো পকেট উজাড় করে দিয়ে দিতেন।'

ঝিনি যেন আর পারে না, এবারে তার বেহদ্দ হার। তিন্‌যাত্রীর দিকে সোজা-সুজি তাকিয়েই হেসে ফেলে। বাবার দিকে ফিরে বলে, 'ওটা তোমার সত্যি কথা নয়। মেয়েদের ফিলজফি পড়াই তোমার কাছে বাজে বাজে।'

'তাই কি না, আপনিই বলুন।'

তাই কখনো বলতে পারি। একে যুবতী, তায় দার্শনিক। ধর্ম বলে একটা কথা নেই। কিন্তু মাস্টারমশাইকে ঘাঁটালে, তেমন সাহসও নেই। শাঁখের করাতের তলায় পড়ে, এদিক ওদিক করি।

ব্রজনারায়ণ হেসে বলেন, 'ভদ্রলোক লজ্জা পাচ্ছেন। আপনি যাবেন কোথায়?'

এবার আর সাক্ষী মানা নয়, তার চেয়ে দুরূহ প্রশ্ন। আগের কথায় জবাব যদি বা ছিল, এবার তাও নেই। কারণ আমার যাওয়া গাজীর মতলবে। গন্তব্য জানা নেই। কী বলব ভাবতে গিয়ে গাজীর দিকে ফিরি। গাজী তখন মিটি মিটি হাসে। ব্রজনারায়ণের দিকে ফিরে বলে, 'বাবু জানেন না, বাবু কোথায় যাবেন।'

ব্রজনারায়ণ এতক্ষণে আর একটা কিছু পেলেন। তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে বসে বলেন, 'সে কি, কোথায় যাবেন তা জানেন না?'

বলে, ঘাড় নেড়ে নিজের বিস্ময় ছড়িয়ে দেন স্ত্রী কন্যার দিকে। আবার বলেন, 'এরকম তো কখনো শুনি নি। কোথায় যাচ্ছেন, তাই জানেন না?'

ন্যাকা তো নও হে বাপু। এমন কথা শুনে বাপ মা ঝি অবাক হয়ে না তাকাবে কেন। পথ চলার একটা বাত পুছ্ আছে। লোক মানানো জবাব চাই। বলি, 'ঠিক কোথাও যাব বলে বেরুইনি। এমনি একটু চলেছি।'

আমার কথায় থেকে ব্রজনারায়ণের বিস্ময় আর হতাশাতেই যেন উলটো আসনের কাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে। এবার একবার আমায় আপাদমস্তক দ্যাখেন। সহযাত্রীটিকে ঠাহর করার চেষ্টা। যদিও, এই খোপের দেয়ালে রেলগাড়ির সেই সাবধান করা নেই।

'চোর পকেটমার নিকটেই আছে।' নজরের খোঁচায় ভত্তটা উঠেছেন কি না বুঝতে পারি না। তবে এমন দেখাচ্ছেন বোধ হয় আর দ্যাখেন নি। বলেন, 'এমন একটু চলেছেন বলে, একেবারে লগে চেপে পড়েছেন। আসছেন কোত্থেকে?'

ইচ্ছে করলে চুপ দিয়ে থাকতে পারো। সে যে আর এক বেয়াজ। তা পায়া যায় না।

নিজের দেশের নাম করি। শুনে ব্রজনারায়ণ আর একদফা নড়েন চড়েন। চশমা সুদ্ধ চোখ কপালে। বলেন, 'সেখান থেকে এখানে চলতে।'

বলি, 'এই আর কি, একটু ঘোরা-ঘুরি।'

ব্রজনারায়ণ স্ত্রী কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বোঝ।'

বোঝার থেকে ওখানে হাসির ছলকই বেশী। কী এক চোর দায়ে যেন ধরা পড়লাম। কওয়ার বলার, সামান্যকে কত অসামান্য করে তোলা যায়, ব্রজনারায়ণ তাই দ্যাখান। এ কি বেয়াজ বিপদ বল।

ঝিনি যেন বিপদগ্রস্তকে হেসে করুণা করে। বাবাকে বলে, 'তাতে কী হয়েছে। এদিকে কি বেড়াতে আসা যায় না?'

ব্রজনারায়ণ হাত তুলে হাঁকেন, 'আরে সে তুমি এখন ধাপার মাঠে বেড়াতে যাও না, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। বেড়াবার একটা জায়গা আছে তো। এখানে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। লোক নেই, জন নেই, নোনা নদী, তার ওপরে কাষ্ট, আর এই তো টানা ঘেড়ির বাঁধ—।'

গাজী তাড়াতাড়ি সংশোধন করে, 'ঘেড়ি নয় বাবু, ভেড়ি।'

'তুমি থামো তো হে, মেলা ঘেড়িভেড়ি করো না। দুটোই এক কথা।

গাজী যেন শিশুর খেলা দেখে হাসে। ঝিনি বলে, 'তা কি হয়েছে। এসব কি দেখতে ইচ্ছে করে না।'

বলুক, বিদুষী একটু বলুক। কিন্তু কথা টেনে নেয় গাজী। বলে, 'তয় দিদি, আমি বলি শোনেন। সকাল বেলা বাবুকে দেখি, ইটিণ্ডায় চলেছেন বেড়াতি। তা সেখানে আর যাবেন কোথায়। দেখলাম কি যে বাবুর কোন ঠিক ঠিকানা নাই। বলেন, "বেয়রে পড়িছেন।" তাই আমি বললাম, তবে আর এখেনে কেন, চলেন হাসনাবাদ দিয়া লগে করি ঘুরি আসবেন।'

ব্রজনারায়ণ বলেন, 'ও, তোমার মতলবেই যাওয়া হচ্ছে। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ।'

'বাবুর সঙ্গে।'

ব্রজনারায়ণ আবার হাত উলটে, স্ত্রী কন্যার দিকে ফিরে বলেন, 'বোঝ।'

মা-মেয়েতে আবার সেই সখীর হাসি। কিন্তু এবার আর আমি নয়, এখন গাজী। ব্রজনারায়ণ প্রায় ধমকে ওঠেন, 'বাবুর সঙ্গে তো বুঝলাম। তার মানে, বাবুই তোমায় সঙ্গে যাচ্ছেন। তা যাচ্ছটা কোথায়।'

গাজী টেনে টেনে বলে, 'ভাবতেছি, কালীনগরতক যাব।'

'আপনি চেনেন কালীনগর?'

আবার আমাকে। বলি, 'না।'

'তবে, চলে তো যাচ্ছেন দিব্যি। ফিরবেন কী করে, সেটা ভেবেছেন।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'কেন বাবু, কালীনগরের ওপারে ন্যাজাট যাব, ন্যাজাট থিকে মটর পাব বসিরহাটে যাবার।'

'তারপরে?'

পথের হাল হদিস সব ব্রজনারায়ণেরই দাবি। যেন গাজীকে এবার ঠিক প্যাঁচে ফেলবেন। গাজী হেসে বলে, 'বসিরহাট থেকে বাবুকে কলকাতার গাড়ি ধরায়ে দিব।'

ব্রজনারায়ণ হঠাৎ কোন কথা বলতে পারেন না। বোঝা যায়, গাজীর কাছে আবার ঠেক খেয়েছেন। গাজী হেসে বলে, 'পথ তো সব বাঁধা বাবু। যেতি মন করলেই হয়।'

কিন্তু ব্রজনারায়ণের কান সেদিকে নেই। আমার দিকে ফিরে বলেন, 'কী জানি, বুঝি না।

তাঁর কথায় আমার ভিতরের কলকলানি, গলার দরজা ঠেলে আসতে চায়। কে এক ভিখারী, সে কোথায় যায়, কার সঙ্গে, কী তার কেরার সমস্যা, এসব ঠিক তাঁর মনের তারে মেলে না। তাই মন কিছুতেই বুঝ মানে না। চিরদিন ঠিক বুঝিয়ে। এমন বেঠিক মনকে কী বোঝাবেন, বুঝতে পারেন না।

কিন্তু আমি গলায় আগল দিলে কী হবে। ওদিকে মা-মেয়েতে আগল খোলা। সেই খোলাতে, আমার আগলও মড়মড়িয়ে যায়। ঝিনির সহজ গলা শোনা যায়, 'বাবা একটু ইয়ে।'

এ আবার সেই, কথা সভার মাঝেই পড়ে, যার কথা সে নিক। চোখের তারা লক্ষ করে বুঝতে অসুবিধে নেই, ভিন-যাত্রীকে মেয়ে বলে, তার বাবাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। এমন সময়েই মোটা গলাটি শোনা যায়, 'আপনাদের টিকেটগুলো নিন তো।'

জানালা দিয়ে দেখি, টিকেটবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। খোপের ভিতরে আসবার দরকার নেই। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়েই হবে। বাবুর এক হাতে টিকেটের গোছা, আর হাতে পেন্সিল। খাওয়ার সময় পেয়েছেন কি না কে জানে, নাওয়ার সময় পাননি। রুক্ষ চুলে চোখ ঢাকা পড়েছে প্রায়। গলায় আছে খকর খকর কাশি। অথচ বুকখানি হাট করে খোলা।

গাজী বলে, 'দুইখান টিকেট দ্যান, কালীনগরের একখান ফাস্কেলাস, আর একখান আমার।'

টিকেটবাবু দাম বলেন টিকেট লিখতে লিখতে। আমি জানালা দিয়ে দাম বাড়িয়ে ধরি। সহসা ব্রজনারায়ণের গলার খোঁচা এসে বেঁধে, 'ওর ভাড়াও কি আপনি দিচ্ছেন।'

গাজী নিজেই জবাব দেয়, 'তয় আর কে দিবে বাবু। বাবুর সঙ্গে যাচ্ছি—।'

কথা আর শেষ করে না সে। মুরশেদের নামে একটু হাসে, যদিও তা ব্রজনারায়ণ ভোলানো হাসি হয় না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আবার ফিরবে কখন?'

গাজী তেমনি হেসে বলে, 'বাবুর সঙ্গেই ফিরব।'

এবার যা বোঝার তা বুঝে নাও। ব্রজ-নারায়ণ ঘাড় নেড়ে বলে ওঠেন, 'বাহবা বাহবা বাহবা। ও, ঝিনি, এ যে তোর ফিল-জফির ওপরে যায় রে। সারাদিনের ভরণ-পোষণ আর রাহা খরচের দায়দায়িত্ব ইস্তক নিয়ে বসে আছে।'

ঝিনির সহজ হাসি সহজভাবেই মুখো-মুখি ঝরে পড়ে। গাজী তখন নিজের হাতে টিকেট নিয়ে নিজের মনেই টিকেট দ্যাখে। আবার গুনগুন করে, 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা...'

ক্রমশ
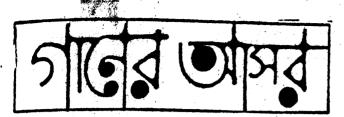
হোল-নাইট

সংগীত সম্মেলনের "হোল নাইট" অনেকের কাছে উপভোগের বস্তু। সেটা সম্পূর্ণ সংগীতের জন্য কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু শ্রোতাদের একটা ভারী অংশ যে হোল-নাইটের পক্ষে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলোকসমুজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহের অধিকাংশ ব্যক্তিই চিত্তাকর্ষক হতে চেষ্টা করেন। পোশাক, পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী—সবই যেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানের ফাঁকে সুবেশা তরুণ-তরুণীর মধুরালাপ দেখে পুলকিত হয়েছি, আরও চমৎকার লেগেছে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মনোরম সঞ্চরণ। এই রাতটিতে তাঁরা মুক্ত। বাইরে অনেকেরই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যূষে তাঁদের অনেকে নিজেরা ড্রাইভ করে ঘরে ফিরবেন। সারাদিন বিশ্রামের অখণ্ড অবকাশ। এক এক সময় মনে হয় হোল নাইট যেন একটা স্বপ্ন। বাইরে গভীর রাত, স্তব্ধ অন্ধকার; —আর "ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া।" ধীরে ধীরে এই আলোগুলি মৃদু হয়ে যাবে—স্টেজের ওপর দেখা যাবে শিল্পী এবং সহযোগীদের, —যেন নাটকের উত্তম পাত্রপাত্রী। তাঁরা সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হবেন। ক্রমে সুখাসীন শ্রোতাদের চোখে যেন নেমে আসবে তন্দ্রার ঘোর। সেই আধোজাগরিত চিত্তে অতি স্নিগ্ধ সুরলহরী লুটিয়ে পড়তে থাকবে আর তাঁরা বিভোর হয়ে যাবেন একটা মগ্নচৈতন্যে।

এক সময় হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠবে। তাঁরা নড়ে চড়ে বসবেন। আইটেমটা শেষ হল। তাঁরা ঘড়ি দেখবেন। ইস্—প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল এরই মধ্যে। সিট থেকে উঠবেন তাঁরা—এবারে যাবেন চা খেতে। দেড়া দামে নিকৃষ্ট চা এবং সমান নিকৃষ্ট চপ কাটলেট কিনবেন কিউ করে দাঁড়িয়ে; —যা তাঁরা অন্য অবস্থায় ভাবতেই পারেন না। তারপর একটা টেবিলে বসে দেখবেন পরিচিত কেউ আছেন কি না। ওমা—মিসেস্ গুপ্ত যে! তিনিও এগিয়ে এসেছেন।

"মিসেস রায় আপনি? কর্তাও এসেছেন নাকি?"

"না ভাই উনি একটা প্রোজেক্টের ফাউণ্ডেশন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। ঘরজোড়া ড্রয়িং ছড়িয়ে বসে আছেন—হয়তো ফিরে দেখব তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।"

"মিলি এসেছে বুঝি? কই গেল কোথায়?"

"মিলির জন্যেই তো আসা। সুস্নিগ্ধ এসেছে আজকে। বললে উনি সঙ্গে থাকলে মিউজিক বুঝতে সুবিধে হয়। সুস্নিগ্ধ জার্মানি থেকে সবে ফিরেছে। ওয়েস্টার্ন মিউজিকে মেলোডি দিয়ে কীসব এক্সপেরিমেণ্ট করছে আজকাল।"

অদূরে দেখা গেল নিখুঁত পাশ্চাত্ত্যবেশী সুস্নিগ্ধ ভারি মিষ্টি ভঙ্গীতে মিলিকে কি একটা বোঝাচ্ছে; আর মিলির মুখটা যদিও দেখা যাচ্ছে না তথাপি মিষ্টির দোকানের দরবেশের চুড়োর মতো ওর খোঁপাটা মাঝে মাঝে দোলায়িত হচ্ছে।

পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা হল। সবাই উঠলেন। বারান্দায় কিছু লোক বসে আছেন বা ঘোরাঘুরি করছেন, এঁরা বড় একটা ভেতরে যান না। পরিচিত কাউকে দেখলেই দু-চারটে কথা বলেন। মনোহরদাস পান চিবুচ্ছেন। পরনে দামী গরম পাঞ্জাবী, আরও দামী শাল, পায়ে সুদৃশ্য মোজা। ম্যানেজমেণ্টের অনেকে তাঁর সঙ্গে দু চারটে কথা বলে যাচ্ছেন। উনি গম্ভীরভাবে মাথা

মাড়ছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় উনি একজন বিশিষ্ট পেট্রন। সুভেনিয়রে তাঁর ছবিটি প্রথমেই দ্রষ্টব্য। এক আধবার বাইরে বেরিয়ে মোটরে ঢুকছেন—পানের কৌটো ভরে নিয়ে আসছেন। এই সময়টা তিনি একটু গুণ গুণ করছেন বেসুরো গলাতে। ওটা বোধ হয় গাড়ির ভিতর সযত্নে রক্ষিত পানেরই গুণে। এমনি আরও কয়েক ব্যক্তির মোটরে পানের সরঞ্জাম রয়েছে এবং তাঁরাও মাঝে মাঝে যাচ্ছেন, আসছেন।

এই সঙ্গে দেখা যাবে কালো প্যান্ট আর সোয়েটার পরা কতিপয় যুবক। মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে ধূমপান করছে।

"এই, কি রে? ডুব মারবি নাকি কাল। যা দেখছি, বেলারেৎ সকাল দশটা পর্যন্ত সেবে।"

"না রে ক্যাজুয়েল আর আছে নাকি এই ডিসেম্বরের শেষে। ভোর বেলায় পিটটান দেব—একবার যেতেই হবে আপিসে।"

"মাইরি রবি সেনকে দেখেছিস? দল নিয়ে এসেছে। বোঝে তো কচু, খালি ফ্যাশান।"

"তুই-ই বা কি বুঝিস। আপিসে চাল মারবার জন্যে তো সারারাত না ঘুমিয়ে কাটালি।"

"দ্যাখ্, বোঝার কথা যদি বলিস তাহলে বলব এই হলের থ্রি-ফোরথ্ কিছু বোঝে না। তুমি বাবা কোথাকার এক ডিপ্লোমা নিয়ে ভারি সমঝদার বনে গেছ। তবু যদি রেডিওতে একটা চান্স পেতে। যা গাস তাতো জানাই আছে।"

বিচ্ছেদ হয়ে যায়, দুজনে দুদিক দিয়ে হলে ঢুকে পড়ে।

শিল্পীরাও নাকি হোল নাইটের স্বপক্ষে। যাঁর অনুষ্ঠান যত গভীর রাত্রে পড়ে তাঁর আভিজাত্য তত বেশী। রাত্রির বারোটায় যাঁর প্রোগ্রাম তিনি ভাগ্যবান। অন্ততঃ দু ঘণ্টা তিনি অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারেন এবং সেই সময়টা শুনতেই হবে, না শুনে উপায় নেই। অনেক শিল্পীকে রাত দশটার আগে প্রোগ্রাম দেওয়াতে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। কেউ কেউ রাত তিনটে নাগাদ অনুষ্ঠানও পছন্দ করেন। এই সময় অন্ততঃ গান করাটা অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক। কিন্তু অনেকেই এই অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের গলা বসে যায় না। রাত্রি জাগরণও তাঁদের কাবু করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য সমাজে যেটা "আন আর্থলি টাইম" সেটা আমাদের সঙ্গীতসমাজে কাম্য বলে গণ্য।

কোনও এক হোল-নাইটে লেখকের পাশে একজন বয়স্ক ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনিও হোল-নাইটের স্বপক্ষেই বলেছিলেন—শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এর সঙ্গে হোল-ডে যুক্ত হলেই উপযুক্ত হয়।

রাত আড়াইটের সময় তিনি একটি অনুষ্ঠান শুনে পুলকিত হয়ে বললেন—"—যাই বলেন মশাই, সময় নিয়ে না গাইলে কি গান হয়? গান বাজনা মেজাজের ব্যাপার, ওসব একটু রাত করে না হলে জমে না। এ আমি বরাবরই দেখে আসছি।"

তিনি যা বরাবরই দেখে এসেছেন তা একটু বিশদ করে বললেন—"হাফেজ আলী বেশীক্ষণ বাজাতেন না, কিন্তু একবার অনেক রাত্রে তাঁর বাগেশ্রী শুনেছিলুম সে আমি কোনদিন ভুলব না। রাত ছমছম করছে আর হাফেজ আলি বাজাচ্ছেন। কিন্তু মিনিট পাঁচেক বাজিয়েই উঠে পড়লেন। একটা স্বপ্ন যেন মিলিয়ে গেল।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন—"কিন্তু মশাই রাতের সব কটা রাগ তো শোনা যাচ্ছে, দিনের রাগগুলো কি হবে? এই ধরুন তোড়ী, জৌনপুরী, গৌড়-সারং, মুলতান, ভীমপলশ্রী—এইসব? আগে কিন্তু দিনের বেলায় কনফারেন্সের সিটিঙ হত, সেসব রাগ শোনা যেত। এখন আর সেগুলি শোনবার উপায় নেই।" সত্যি কথা। আগে অবশ্য কনফারেন্সের সংখ্যা ছিল দু একটি তাই কোনরকমে ম্যানেজ করা যেত। কিন্তু এখন সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অধিবেশনও চলছে সাত আট দিন, তার মধ্যে অন্ততঃ দুটি হোল-নাইট। এর সঙ্গে হোল-ডে যুক্ত হলে সমালোচকদের অবস্থা হবে করুণতম। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছে হল না। তাঁকে কর্তব্য সমাপন করতে হচ্ছে না—রিটায়ার্ড জীবন উপভোগ করছেন। দিনের বেলায় ঘুমোবার সময় নিশ্চয়ই তাঁর প্রচুর।

তাঁর কথায় নীরবে সায় দিয়ে চলমান অনুষ্ঠানের দিকে মন দিতে হল। মিনিট কয়েক পরে স্কন্ধদেশে একটি ভারী বস্তুর পতনে চকিত হয়ে লেখক দেখলেন সেটি উক্ত ভদ্রলোকেরই নিদ্রিত মস্তক। অনুষ্ঠান চলাকালীন পরবর্তী সময়টুকু তাঁর মস্তকটি ওইভাবেই রইল। অবশেষে করতালিতে জাগরিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন "বেশ বাজিয়েছে চমৎকার। আমাদের দিনে এমন কালচার্ড ডিমনস্ট্রেশন দেখা যেত না।"

তাঁর হাফেজ আলীর বাগেশ্রী শোনাও এই ধরনের ব্যাপার কিনা কে জানে।

যাই হোক, হোল-নাইট জয়যুক্ত হোক।

শার্ঙ্গদেব

হেস্টিংস-এর একটি দলিল

চিত্তপ্রিয় মিত্র

ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বাক্ষরিত দলিলটি অধুনালুপ্ত জমিদার শ্রেণীর বংশজাত এক বুদ্ধিজীবীর নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। দলিলটির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশের তদানীন্তন কালের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা গেল। দলিলের শিরোভাগে শীলমোহরে ফার্সী ভাষায় লেখা আছে, "আংরজী কোম্পানী, অনুগত দেওয়ান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পবিত্র মোহর, ১৭৭৬।" নবাবী আমলে ফার্সী ভাষার সঙ্গে সাধারণত হিজরী সনের উল্লেখ থাকিত। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে এই দলিলে হিজরী সনের পরিবর্তে ইংরেজী সনের উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দলিলের নিম্নভাগে ফার্সী ভাষার বাংলা অনুবাদ আছে। ইংরেজী ১০ মাহ জুন ১৭৮০ সন তারিখের সহিত বাংলা ৩১ মাহ জ্যৈষ্ঠ ১১৮৭ সন তারিখের সন্নিবেশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারী কাগজপত্রে ফার্সী ভাষার বিলুপ্তির প্রাক্কালে বাংলা ভাষা সংযোজনার সর্বপ্রথম নিদর্শনস্বরূপ দলিলটি খুবই মূল্যবান। শীলমোহরে অঙ্কিত "অনুগত দেওয়ান"-এর কার্যকলাপ সর্বদাই দেশের স্বার্থবিরোধী ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইবার পর পুরাতন জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধনে মনোনিবেশ করে। প্রতি বৎসর নীলাম বিক্রয়ে জমি বন্দোবস্ত দিয়া নূতনভাবে জমি বিলির ব্যবস্থা করা হয়। জমিদারের পরিবর্তে জমির মালিকের নূতন নামকরণ হয় 'ফার্মার'। প্রজাদের সহিত দিল্লীর সম্রাট ও তৎপ্রতিনিধি বাংলার নবাবের যোগসূত্র সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য ইংরেজরা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ করে। মোঘল শাসনকর্তারাও হিন্দু আমলের পুরাতন শ্রেণীর উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের অনুগত তাঁবেদার জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, মোঘল আমলে জমিদারেরা স্বাধীন রাজাস্বরূপ ছিলেন, যেমন বাংলার বার ভুইয়া।

ফার্সীতে একটি বয়ান আছে, যাহার অর্থ—বাষ্প যে দেশ হইতে জল আহরণ করে, বৃষ্টিপাত করিয়া সেই দেশেরই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। তদনুরূপ মুসলিম শাসনে দেশের সংগৃহীত অর্থ সেই দেশেরই ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে ব্যয় হইত। পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসকেরা এ দেশের অর্থ শোষণ করিয়া মূলত ইংল্যাণ্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যয় করিত। নেপোলিয়ান ইংরেজ জাতিকে Shopkeeper's nation আখ্যা দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজনীতির প্রধান

হেস্টিংস-এর দলিল (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সৌজন্যে) আলোকচিত্র: শ্রীঅরুণ

বিষয়বস্তু ছিল অর্থনীতি। সাজাহানের কন্যাকে সুস্থ করিবার পর ইংরেজ চিকিৎসক ডঃ গ্যাব্রিয়েল বটন পুরস্কারস্বরূপ বাংলা দেশে ইংরেজদের কুঠি নির্মাণ ও বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাট ফররুক সিয়ারকে নীরোগ করিয়া ইংরেজ চিকিৎসক ডঃ হ্যামিলটন বাংলা দেশে বিনা শুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধিতে কলিকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য বাসিন্দার জন্য ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। তখনও পর্যন্ত ইংরেজদের এ দেশের ভূখণ্ডের উপর কোন দাবি ছিল না। ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ পলাশী-চক্রান্তের সফলতা হইতেও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। "মোতাক্ষরিণ" পুস্তকে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের অভিমত—দেওয়ানী প্রাপ্তি সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা গরুর হাটে গরু, গাধা বিক্রির ন্যায় সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ঐরূপ চুক্তিপত্র দুই দেশের অভিজ্ঞ রাজ-প্রতিনিধিদের বহুকালব্যাপী কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল। ইংরেজরা জানিত, এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পর্যুদস্ত করিতে পারিলে রাজনৈতিক শক্তি অনায়াসে হাতের মুঠায় আসিবে। এই উদ্দেশে নবাবের সহিত প্রতিটি সন্ধি চুক্তিতে রাজকোষের অর্থভাণ্ডার ভাগ-বাঁটোয়ারায় তাহাদের অধিকতর মনোযোগ ছিল। বিভিন্ন নবাবের মসনদে বসিবার সময় কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ উপঢৌকন ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২৯,৪৮২,৯১৩ পাউণ্ড গ্রহণ করে।

মীর্জাফরের মৃত্যুর পর মুন্নি বেগমের ১৭ বৎসরের পুত্র নজমৎদৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসাইয়া ইংরেজরা নাবালকের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বেআইনী কাজ করিয়াছিল। সন্ধির শর্তস্বরূপ নবাবকে ইংরেজ মনোনীত ডেপুটি নবাব নিযুক্ত করিতে বাধ্য করা হয়। মুন্নি বেগমের ইচ্ছা ছিল মহারাজা নন্দকুমারকে ডেপুটি নবাব নিযুক্ত করা। নন্দকুমারকে ডেপুটি নবাব পদে বসানো হইলে শাসনক্ষমতায় হিন্দু শক্তির অভ্যুত্থান হইবে, ইংরেজরা মুসলমানদের এইরূপ বুঝাইল। ইংরেজ কূটনীতিতে প্রথম হইতেই দ্বি-জাতি-তত্ত্বের বীজ রোপিত ছিল, উক্ত মনোভাব তাহার প্রমাণ দেয়।

পারস্য দেশ হইতে আগত সৈয়দ সাদী আলী খাঁ ছিলেন আলীবর্দীর গৃহ-চিকিৎসক। তাঁহার পুত্র রেজা খাঁর সহিত আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাবেয়া বেগমের কন্যার বিবাহ হয়। মীর্জাফর-পরিবার বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে মনে করিয়া প্রতিবন্ধকস্বরূপ সিরাজ ও আলীবর্দী-পরিবার সম্পর্কিত রেজা খাঁকে ইংরেজরা ডেপুটি নবাব পদে নিয়োগ করা শ্রেয় মনে করে। মহম্মদ রেজা খাঁ নবাব মৈমুদ্দৌলা এবং মোজাফ্ফর জং উপাধি পাইয়াছিলেন। মুন্নি বেগমের অভিযোগ ছিল রেজা খাঁ চিকিৎসক পরিবারভুক্ত; সুতরাং রাজকার্যের গুরুদায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত। অধিকন্তু রেজা খাঁ যখন ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন রাজকোষের ২০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। নজমৎদৌলা, মুন্নি বেগম ও নন্দকুমারের পরামর্শে যাহাতে রেজা খাঁকে ডেপুটি নবাব পদ হইতে অপসারণ করিতে না পারেন, সন্ধিপত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করা হয়। ডেপুটি নবাব পদে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হয় বাৎসরিক ৯ লক্ষ টাকা। ইংরেজ আনুকূল্যে রেজা খাঁ প্রধানমন্ত্রীস্বরূপ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরেজ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। মীর্জাফর ও মীরকাশিমের মত ভবিষ্যতে রেজা খাঁও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন মনে করিয়া রেজা খাঁর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিশ্বস্ত রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করা হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রেজা খাঁ কোম্পানীকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিতে সাহায্য করেন। কোনও প্রতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থায় পদপ্রাপ্তির নিদর্শন ভারতীয় ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম। প্রতিদানে কোম্পানী তাঁহাকে ডেপুটি দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং বেতন বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করে। দেওয়ানী লাভের পর বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিদেশী কোম্পানীর উপর বর্তিল। সম্রাটের ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব ও নবাবের জন্য সর্বসমেত ৫০ লক্ষ টাকা বৎসরিক ভাতা নির্ধারিত হইল। নূতন ব্যবস্থায় নবাব নজমৎদৌলা নর্তকীদের নৃত্যগীতে সময় অতিবাহিত করিতে পারিবেন বলিয়া উল্লসিত হইলেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের বাংলার উপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। সুতরাং কোম্পানীর মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় তাঁহার স্বার্থ কায়েম হইল। কোম্পানীর সৈন্য সংরক্ষণের সমস্ত ব্যয়ভার বাংলার রাজস্ব হইতে বহন করা হইবে স্থির হইল।

দেওয়ানী প্রাপ্তির পর স্বহস্তে রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানী বিভিন্ন স্থানে 'Supervisor' নিযুক্ত করে। রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নাম ছিল আমিল। আমিলরা নবনিযুক্ত 'Supervisor'দের নিয়ন্ত্রণে কাজ করিতে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিল। বিদেশী 'Supervisor'রাও রেজা খাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকায় রাজস্ব আদায়ে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন দেশে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ব্যক্তির খুবই অভাব। কারণ, মীরকাশিমের সময় দেশী-বিদেশী বহু গণ্যমান্য লোককে হত্যা করা হয়। ইংলণ্ড হইতে অনেক যোগ্য ব্যক্তির অযোগ্য পুত্ররা কোম্পানীর অধীনে চাকুরি করিতে এ দেশে আসিতে লাগিল। নবাগত ইংরেজদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশে অল্প কিছুদিন চাকুরি করিয়া যেনতেনপ্রকারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া স্বদেশে ভারতীয় নবাবদের মত বিলাসে দিন কাটাইবে। ক্লাইভ স্বয়ং বিরাট সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য দেশে ফিরিয়া যান। কোম্পানী কর্মচারীদিগকে সামান্য বেতন দিত। সুতরাং কর্মচারীরা স্বনামে ও বেনামে এ দেশে নানা ব্যবসায় লিপ্ত হয়। দেশীয় ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের দস্তকের অপব্যবহার করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিত। সরকারী কাজে পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও অনুগ্রহ দেখাইয়া তাহারা এ দেশের শাসক শ্রেণীর মত নজরানা, সেলামী, প্রণামী প্রভৃতি নানা ধরনের উপঢৌকন গ্রহণ করিত। ইংরেজ সাংবাদিক Mr Hicky—ভারতের সর্বপ্রথম সাংবাদিক—দুর্নীতির জন্য প্রধান বিচারপতি ও হেস্টিংসকে সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের সততা রক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্মকর্তারা দৃঢ় মনোভাব দেখাইতে নৈতিক সমর্থন পাইত না। ইংরেজ কর্মচারীরা নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। তাহাদের কার্যকলাপ দেশীয় বিচারালয় কিংবা কলিকাতা মেয়র কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। গোমস্তারা তাহাদের দস্তকে প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানাভাবে জুলুম চালাইতে লাগিল। ইংরেজ স্বার্থে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শাসন-ব্যবস্থা ধসিয়া পড়িল। ১৭৬৭ সালে সিলেক্ট কমিটির বিবরণীতে দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ আছে।

". . . . . Presidency divided, government without master, a treasury without money, a service without sub-ordination, discipline or public spirit . . . . . individual rich ...... unsettled price, people governed under the united pressure of decentralised power, ... poverty ...... oppression."

দেওয়ানী প্রাপ্তির পর জমির নূতন বিলি-ব্যবস্থায় ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতার পরিপুষ্ট কলিকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেকে জমি বন্দোবস্ত লইল। নূতন জমিদার শ্রেণী প্রজাদের উপর উৎপীড়ন

করিয়া যে কোন প্রকারে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পদিনের জন্য জমির বন্দোবস্ত দেওয়াতে প্রজাদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক বা মমত্ববোধ গড়িয়া ওঠে নাই। পুরাতন জমিদারদের উপর দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। 'ফারমার'-দের শাসন সম্পর্কিত দায়িত্ব না থাকাতে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। রাজসাহীর পাঁচ শত কৃষক প্রজা পায়ে হাঁটিয়া সুদূর কলিকাতায় কোম্পানীর কর্তাদের নিকট তাহাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাইতে আসিল। সম্ভবত ইহাই গণ-ডেপুটেশনের প্রথম নিদর্শন। সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ সেনের (১৭১৮--১৭৭৫) গানে তৎকালীন জমিদারী পরিবর্তনের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

"পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে
নীলামজারী

ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি তার
দিলে জমিদারী।"

কবি নিতান্ত সহজ কয়টি কথায় ক্ষুধা-পীড়িত জন্মভূমির মর্মান্তিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেনঃ

"অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো
অন্ন দে
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা,
কাতর হইও না প্রসাদে।"

১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির জন্য দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া খ্যাত। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য রেজা খাঁ খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের বেনামীতে ব্যবসা চালানো নিষেধ করেন। কোন শহরে চাউলের অভাব দেখা দিলে চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী-প্রেরণ করিয়া মজুতদারদের গোলা হইতে ধান সংগ্রহ করিবার পর তাহা খোলা বাজারে বিক্রয় করিবার আদেশ দেন। ইউরোপীয় কিংবা দেশীয় জাহাজে চাউল বিদেশে রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য হুগলীর ফৌজদারকে জাহাজ তল্লাসী করিবার ক্ষমতা দিলেন। নাবিকদের যাত্রাকালীন রসদের জন্য যতটুকু চাউল প্রয়োজন হইত, তার চেয়ে বেশী চাউল মজুত করা নিষিদ্ধ হইল। দুর্ভিক্ষের জন্য চাউলের দাম প্রথমত টাকায় ৬।৭ সের ও ক্রমশ টাকায় তিন সের পরিমাণে বিক্রয় হইতে লাগিল। অবশেষে চাউল দুর্মূল্য হইতে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অনাহারে যাহাতে কোন লোক মারা না যায়, সেজন্য রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদ শহরে ৬।৭টি লঙ্গরখানা বা অন্নছত্র খুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য কোম্পানী ৪০,০০০, নবাব ২১,০০০, রেজা খাঁ ১৬২৫০, রায়দুর্লভ ৩০০০, জগৎশেঠ ৫০০০ এবং আরো অনেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। কৃষকগণ অন্নাভাবে বীজ ধানগুলিও কোম্পানীর গোমস্তাদের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অনাবৃষ্টির জন্য খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতিতে জলাভাব দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে গবাদি পশুর মড়ক আরম্ভ হয়। সংক্রামক রোগে কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা নিঃশেষ হইতে থাকে। এমন কি, নবাব সৈফুদ্দৌলারও বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। অনেকের মতে, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়। মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার —বার মাইলব্যাপী শহর ধ্বংস হইয়া যায়।

লোকাভাবে চাষ-আবাদ ও সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। কুটির-শিল্পের উপর নির্ভরশীল শিল্পীদের খাদ্যাভাবে কুটিরশিল্প বন্ধ হইয়া যায়। বাংলা দেশ শুধুমাত্রই কৃষিপ্রধান ছিল না, কুটিরশিল্পেরও প্রাচুর্য ছিল। শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি দ্বারা দেশের মূলধন বৃদ্ধি বরিত। দুর্ভিক্ষের পরে কুটিরশিল্পের বিলুপ্তি ঘটিয়া বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান হইয়া ওঠে। এই সুযোগে ইংরেজরা এ দেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে শুরু করে এবং ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়।

চাউলের অভাবে নদীয়াতে লুঠতরাজ দেখা দেয়। নদীয়ার 'Supervisor' দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কলিকাতার কর্তাদের নিকট দুই কোম্পানী সৈন্য চাহিয়া পাঠান। খাদ্যাভাবে অনেকেই স্থানান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে অনেকে আশ্রয় নেয়। ঐ অঞ্চল হইতে সন্ন্যাসীরা দলে দলে কোম্পানীর এলাকায় দৌরাত্ম্য করিতে শুরু করে। সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুরূহ হইয়া ওঠে। তাহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান বা গন্তব্যস্থল

না থাকাতে কোম্পানীকে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। অধিকন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহে প্রজা, জমিদার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন ছিল। অনেক প্রজা সন্ন্যাসী দলে যোগ দেয়। মুসলমান ফকিরেরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" তৎকালীন অরাজকতা, অজন্মা ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা হইয়াছে। তিনি জাতির কল্যাণ কামনায় 'বন্দে মাতরম্' গানে দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ সংগীতের প্রধান বিষয়বস্তু শক্তির উপাসনা। "জনমি ভারতভূমি মা, কি কর্ম করিলাম আমি, আমার এ-কূল ও-কূল দুকূল গেল অকুল পাথারে ভাসি।" বিশেষ লক্ষণীয় 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে বঙ্গমাতার বর্ণনা পাওয়া যায়—সাধক কবির লেখনীতে বঙ্গমাতা ভারতমাতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তদানীন্তন ইংরেজ কবি সার জন সোরের কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনাতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—

"Hush to the jackal's yell and vultur's cry
The dog howl, amidst gloomy day
The rich unmolested on their
.... prey
Dry scenes of horror, which no pen can trace
Nor rolling years from memory efface".

সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্মকর্তারা ও পার্লামেন্টের সভ্যরা এ দেশের শোচনীয় দুর্দশার কথা জানিতে পারিলেন। লণ্ডন শহরে লিডেন হল স্ট্রীটে নন্দকুমারের এজেন্ট মারফত এ দেশের খবর পার্লামেন্টের সভ্যদের নিকট পৌঁছিত। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য কোম্পানীর কর্মকর্তারা হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল করিয়া পাঠান। দুর্ভিক্ষের জন্য রেজা খাঁকে দায়ী করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিতে আদেশ দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্ট মিডলটনের আদেশে অ্যান্ডারসন রেজা খাঁকে নিজ আবাসস্থল আরামবাগ প্রাসাদে শেষ রাত্রিতে ঘেরাও করিয়া বন্দী করেন। গোপন নির্দেশে কোম্পানীর ডাইরেকটারগণ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য মহারাজা নন্দকুমারের সাহায্য লইতে পরামর্শ দেন। বন্দী অবস্থায় রেজা খাঁকে কলিকাতায় আনা হয়। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীস্বরূপ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া ইংরেজরা প্রমাণ করিল যে, প্রকৃতপক্ষে নবাবের কোন ক্ষমতা নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনে রেজা খাঁ প্রমাণ করেন যে, নিজ স্বার্থের জন্য তিনি চাউলের কোনরূপ ব্যবসা করেন নাই। বহরমপুর ও কলিকাতায় অবস্থিত কোম্পানীর সিপাহীদের জন্য তিনি প্রচুর চাউল সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও বহরমপুরে সৈন্যাবাসের জন্য পাটনা হইতে ৮০ হাজার মণ চাউল আমদানি করান। সেই স্থানে ইংরেজ আশ্রিত লোকদের জন্য বরিশাল হইতেও প্রচুর চাউল আমদানি করা হয়। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, কোম্পানী দুর্ভিক্ষের সময়ও চাউলের ব্যবসায় প্রচুর লাভ করে। ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য দায়ী থাকাতে কোম্পানী কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিতে সাহস পায় নাই। রেজা খাঁ অন্যায় করিলে মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ বিচার তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ায় ইংরেজরা রেজা খাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। রেজা খাঁকে পুনরায় ডেপুটি নবাব পদে নিযুক্ত না করাতে নন্দকুমারের আশা হইয়াছিল, তিনি হয়তো রেজা খাঁর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। নন্দকুমারকে হাতে রাখিবার জন্য তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে নিজামতের খালসার দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজরা ডেপুটি নবাবের পদটি উঠাইয়া দিলেন এবং রাজস্ব বিভাগ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। অতঃপর সরকারী কার্যে চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাসের প্রচলন হইল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সুপারভাইজার পদটি সর্বপ্রথম কালেকটারের পদে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতি জেলায় একজন ইংরেজ কালেকটার নিযুক্ত করা হইল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারের পদ উঠাইয়া কালেকটারদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায় বাংলা দেশে কাজীর বিচারের সমাপ্তি ঘটে। কাজীর বিচারে অপরাধীদিগকে বিকলাঙ্গ করা হইত। মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী নবাবী শাসনের পরিবর্তে এ দেশে আইনগত শাসনের প্রবর্তন হইল। রামপ্রসাদের গানেও আইন-আদালত সম্পর্কিত কতকগুলি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যথা—ডিসমিস, কালেকটরী, ডিক্রি ইত্যাদি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চরম দুর্দশায় পৌঁছিলেও বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা ইংরেজ আইন-আদালতের প্রতি ক্রমশ আস্থাবান হইতে লাগিলেন।

সরকারী কর্মচারীরা দেশের আভ্যন্তরীণ দূরবর্তী স্থান হইতে রাজস্ব আদায় করিতে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। বাংলা দেশ খাল বিল জলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকাতে এবং ঐ সকল স্থানে যাতায়াতের পথঘাট না থাকায় কোম্পানী পুনরায় চিরস্থায়ী প্রথা প্রবর্তন করিয়া জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় শ্রেয় মনে করিল। প্রথমত, ১ বৎসর পরে ৩ বৎসর ও দশ বৎসর, এবং শেষ পর্যন্ত পুনরায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। আলোচ্য দলিলের কয়েকটি লাইনে জমিদারদের শাসন-ক্ষমতার পুনঃ প্রবর্তনের আভাস পাওয়া যায়—যথা গ্রামে চৌকী প্রথা বা পাহারার বন্দোবস্ত, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ, পথিকের নিরাপত্তা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা, এমনকি, যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহের দায়িত্ব এবং যুদ্ধকালে সৈন্যদের রসদ জোগান ইত্যাদি। নূতন তাবেদার শ্রেণীর জমিদারদের বংশধরেরা বাংলা দেশে শতবর্ষব্যাপী সংস্কৃতির ধারাবাহক ছিলেন।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে জমিদারী বন্দোবস্তের চিরাচরিত প্রথাকে উচ্ছেদ করাতে দেশে যে শাসন ও অর্থনৈতিক সংকট ও বিপর্যয় দেখা দেয় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। উদ্ধৃত দলিলটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তুতির নিদর্শন। কায়েমী স্বার্থ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই 'ফার্মার' প্রথা সে যুগে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাথে জমি বন্দোবস্তের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধারণের গ্রহণযোগ্য মানসিক প্রস্তুতির জন্য প্রধানত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সুচিন্তিত লেখনী ও প্রেরণার প্রয়োজন।

বিশ শতক : বিমূর্ত শিল্প

উনিশ শতকের চিত্রকরদের বিষয়ে মোটামুটি কিছুটা ধারণা পাওয়া গেল। অতঃপর বিশ শতক। সেজানকে, লিখেছিলুম, পরে আনব, বিশ শতকের মাথায় এসে, এবং এ সপ্তাহে তার বিষয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, কিন্তু লিখতে বসে পরিকল্পনাটা একটু অদল-বদল করলুম এই ভেবে যে বিশ শতকের চিত্রকলা বিষয়ে সামান্য একটু ভূমিকা বোধ হয় সরাসরি চিত্রকরদের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে প্রয়োজন। ঐতিহাসিক দিক থেকে সেজান উনিশ শতকের শিল্পী হলেও তাঁকে আমি বিশ শতকের প্রথম চিত্রকর বলেই পরিচয় দেব।

"অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট" নিয়ে কথাবার্তা সর্বত্রই শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, "কয়েক ছোপ রঙ আর দু' একটা মাথামুণ্ডুহীন রেখা আঁকলেই যদি মডার্ন আর্টিস্ট হওয়া যায়, তা হলে আমিও পারি।" কেউ কেউ আবার শুনেছি উল্টোটাও বলছে "আজকাল বুঝলি অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ছাড়া অর কিছুই দেখতে ভালো লাগে না।"—এইরকম হরেকরকম কত কথাইতো শোনা যায়, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি কী, কেন ছবি থেকে বস্তবকে ঝেড়েফেলা হচ্ছে, কী এই সব চিত্রকরের জীবনদর্শন সে বিষয়ে ধারণাটা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। তাই এ সপ্তাহে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা নন্-রিপ্রেজেন্টেটিভ আর্ট বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা ঠিক করলুম।

দুটি শিল্পকে বিমূর্ত বলা যেতে পারে—সঙ্গীত এবং আর্কিটেকচার, কেন না এই দুই শিল্প কোনো কিছুর "প্রতিনিধিত্ব" করে না, যেখানে কবিতা, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যকে বলা যায় প্রতিনিধিমূলক শিল্প-মাধ্যম। বিশ শতকে পৌঁছে চিত্রকরদের মধ্যে এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার দিকে ঝোঁক গেল, তাঁরা চাইলেন সঙ্গীতের মত, তাদের শিল্পও বাস্তবের আইনকানুনের ওপর নির্ভর না করে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মে চলুক, তাদের স্বাধীনতা, তাদের বন্ধন যেন বাস্তবের রীতি নীতির পথাশ্রয়ী না হয়। কাণ্ডিন্স্কি, তাঁর সঙ্গীতময়তার দ্বারা, এবং মণ্ড্রিয়ান তাঁর আরকিটেকচারের আদর্শে বিমূর্ত-শিল্পের দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে প্রতিনিধিমূলক শিল্পের সঙ্গে অপ্রতিনিধিমূলক শিল্পের বিভক্ত রেখা কোনখানে টানব—অন্যভাবে বলি, কোনো চিত্রকে অন্য আরেকটি চিত্রের সঙ্গে তুলনায় প্রতিনিধিমূলক যখন বলছি তখন কি আমাদের বিচার পুরোপুরিই আপেক্ষিক? না কি, কোনো চূড়ান্ত বিচার আছে?—আরেকটা প্রশ্ন আলোচনার যোগ্য, সত্যিই কি এই বিমূর্ত শিল্প পুরোপুরি বিশ শতকের শৈলী, নাকি তার অঙ্কুর অতীতেই ছিল?

'বিমূর্ত শিল্প' এই বিশেষ শব্দটির মধ্যেই গোলমাল আছে। সব শিল্পই তো একদিক থেকে বিমূর্ত, তাই না। আবার কোনো শিল্পই বিমূর্ত নয় এমন কথাও তো প্রমাণ করা যায়। এখন প্রশ্ন, বিমূর্ত বলতে কি বুঝছেন এঁরা? আমার মনে হয় ধারনাটা এই, যে শিল্প বাস্তবের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় না, তার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে না তাই বিমূর্ত শিল্প। যদি সেই শিল্পের আরম্ভ-বিন্দু বাস্তবও হয় তাও কিছু এসে যায় না।

বিমূর্ত শিল্পের প্রথম ঢেউ আসে ১৯১০ থেকে ১৯১৬-তে। এই সময় বাস্তবধর্মিতার প্রতি শিল্পীদের বিমুখতাই বিমূর্তির কারণ বলা যায়। দ্বিতীয় ঢেউ আসে ১৯১৭ সালে যখন দ্য স্টিল সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বললেন, "অ্যাবস্ট্রাকশন ফর অ্যাবস্ট্রাকশন সেক"। প্রথম ঢেউকে বলা যেতে পারে "বিমূর্ত শিল্প", এবং দ্বিতীয় ঢেউকে "অপ্রতিনিধিমূলক শিল্প"।

ফর্ম এবং বর্ণ, এই দুইয়ের সম্ভাবনা অন্বেষণ করেছিলেন নানা পরীক্ষার মাধ্যমে কিউবিস্ট এবং ফোভিস্টরা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। তারপর প্রথম স্বেচ্ছাকৃত বিমূর্ত চিত্র আঁকেন ১৯১০ সালে কাণ্ডিন্স্কি—চিত্রটিতে বিন্দু বিন্দু বর্ণের মিশ্রণের ফলে গতিশীলতার ভাব আনা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোথাও বাস্তবতার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। এই বছরই কাণ্ডিন্স্কি "কন্সার্নিং দ্য স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট" পুস্তকখানি লেখেন। কাণ্ডিন্স্কি চিত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা নিয়ে কথা বলতে বলতেই খুঁজে পান নিজের চিত্রাদর্শ—সঙ্গীত আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি গ্রাহ্য হয়, এবং চিত্রও তাই—শুধু তফাত, একটি আমরা শুনি আরেকটি দেখি। কিন্তু, আঁদ্রে জিদের "সিম্ফনি পাস্তরাল" উপন্যাসের অন্ধ নায়িকা যেমন বেঠোফেনের ষষ্ঠ সিম্ফনি শুনতে শুনতে বুঝতে পেরেছিল কাকে বলে লাল, আর কাকে সবুজ, জন্মান্ধের কাছে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল দৃষ্টির ইন্দ্রিয়কে, তেমনি একটি ছবির থেকেও যে বাজনা উঠে আসতে পারে তা বুঝেছিলেন কাণ্ডিন্স্কি। সেইজন্যই হয়তো তাঁর সব ছবিই হয় ইম্প্রোভাইজেসন, নয় কম্পোজিসন নামে পরিচিত।

কাণ্ডিন্স্কিকে আমরা সঙ্গীতমুখর বলতে পারি, কিন্তু সব বিমূর্ত শিল্পই সঙ্গীতময় তা ঠিক নয়। হল্যাণ্ডে বিমূর্ত

শিল্পকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন মাশ্চ্রমান, ভ্যান ডোস্‌বুর্গ প্রভৃতিরা। এঁরা চিত্র থেকে লিরিকের অংশটা সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন, যেটা কান্ডিন্‌স্কি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ফোভিস্ট এবং এক্সপ্রেশনিস্টদের কাছ থেকে। এঁরা সমস্ত শিল্পজগতে যে বিমূর্ত আভা তাকে কয়েকটি সমলয়েখা এবং গাণিতিক ছকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলেন অপনয়নের মাধ্যমে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়টাতে সুরিয়ালিজমের প্রভাব খুব গভীরভাবে পড়ে কিছু কিছু শিল্পীর মধ্যে। এই আদর্শ বিমূর্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কিন্তু তা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল একটি দলের মধ্যে তাই কয়েক বছরের মধ্যে পুনর্বার অ-প্রতিনিধিমূলক চিত্রকলায় ফিরে আসেন সবাই। ১৯৩০ সালে প্যারিসে প্রথম একটি বড় বিমূর্ত শিল্পের প্রদর্শনী হয়।

আজ এই অবধি বলেই থামছি। পরে এর অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীদের প্রসঙ্গে।

শুদ্ধশীল বসু

ছাব্বিশ

পৌষ ফুরিয়ে মাঘ এসে পড়েছিল। মধ্যে কদিন মেঘলা মেঘলা, অল্প স্বল্প বৃষ্টিও গিয়েছে, শীত চাপা পড়েছিল সামান্য; তারপর আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলে মাঘের প্রখর শীত সব কিছু যেন কামড়ে ধরল। পৌষের শীতে কোথাও কিছু চঞ্চলতা ছিল, মাঘে সবই অচঞ্চল, পরিণত। উত্তরের বাতাসে আর তেমন এলোমেলো দমকা নেই, একটানা একই মুখে বইছে; গাছের পাতা ঝরতে শুরু হয়েছিল; রোদের তাতেও শীতের গুঁড়ো যেন জড়ানো; সকালে ঘাস ডোবানো শিশির, রাতে হিম আর কুয়াশা। সব যেন অবশ করে দিচ্ছিল।

গগন ফিরে গেছে; তার যাবার পর সপ্তাহ দুই কেটে গেল। যাবার সময় গগন কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে গেছে। সে থাকতে থাকতেই মনোহর মারা গেল। মনোহরের কি হয়েছিল বোঝা যায় নি, ধরা যায় নি। সকলেই বলছিল মেলা থেকে আনা রোগ। আরও কয়েকটা মৃত্যু সংবাদের কথা কানে আসছিল। কেউ বলছিল চাপা বসন্ত, কেউ বলছিল প্লেগ। এর কোনোটাই ঠিক নয়। অসুখটা অদ্ভুত। যাবার আগে গগন হৈমন্তীকে বলেছিল, তোদের এখানে এ কি অসুখ-বিসুখ শুরু হল! সাবধানে থাকবি। আমরা খুব দুর্ভাবনায় থাকব। তেমন কিছু বুঝলে কলকাতায় চলে আসবি। এমনিতেও তো তোর আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না।

কলকাতায় ফেরার দিন গগন অবনীর সঙ্গে দেখা করতে অবনীর বাড়ি গিয়েছিল, সঙ্গে হৈমন্তী। অবনী তখন প্রায় শয্যা-শায়ী; তার সেই গলা-ঘাড়ের কাছাকাছি লাল ছোট ছোট ফুস্কুড়িগুলো শেষ পর্যন্ত 'হার্পিস'-এ দাঁড়িয়ে ছিল, পিঠ বেয়ে নেমে এসেছিল অনেকটা। হৈমন্তী অনেকটা এই রকম সন্দেহ করেছিল প্রথমে। যে কদিন গগন ছিল, স্টেশনে যেত আসত, অবনীর অসুখের খবরটা সেই নিয়ে আসে। হৈমন্তীও গেল একদিন, ওষুধপত্র লিখে দিয়ে এল। বাকিটা করাছিল স্টেশনের কালা ডাক্তার।

গগন যাবার আগে অবনীকে বলে গিয়েছিল: দিদিকে একটু দেখবেন, যে-রকম শুনছি তাতে তো ভয় করছে। অবস্থা খারাপ বুঝলে ওকে আর আশ্রমে থাকতে দেবেন না, সোজা কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। ও বড় জেদী। আর হঠাৎ তেমন কিছু দেখলে অন্তত এখানে নিয়ে আসবেন। হৈমন্তী গগনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; সবই শুনল, কিছু বলল না।

গগন যাবার পর পরই অন্ধ আশ্রমের বুড়ো তিলুয়া অসুখে পড়ল। অনেকটা একই ধরনের অসুখ বলে মনে হচ্ছিল। মনোহর জোয়ান গোছের বলে এই অদ্ভুত ব্যাধির সঙ্গে কদিন লড়েছিল, তিলুয়া পারল না, তার বয়েস হয়েছিল, প্রথম ধাক্কাতেই শরীরের কলকব্জা বিগড়ে জটিলতা সৃষ্টি হল, মারা গেল নিউমোনিয়া হয়ে।

আপাতত আর-একজন বিছানায় পড়ে আছে—সে যাবে না থাকবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এ-সব চিকিৎসা হৈমন্তীর করার কথা নয়; সে চোখের ডাক্তার, তবু বাধ্য হয়ে

তাকে এই অদ্ভুত রোগের চিকিৎসাও করতে হচ্ছে; যথাসাধ্য করছে বটে—কিন্তু বুঝতে পারছে না, ভাল করছে না মন্দ করছে। চোখের ছোট্ট একটা হাসপাতাল, সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় নেই, ওষুধপত্রও না। তবু চিকিৎসা।

সুরেশ্বর একদিন বলল, "হেম, অসুখটা কি সত্যিই ছোঁয়াচে বলে মনে হচ্ছে তোমার?"

ঘাড় নাড়ল হৈমন্তী, "তাই তো মনে হয়।" বুড়ো তিলুয়া যেভাবে মনোহরের রোগ শয্যায় আসা যাওয়া করত তাতেও এ-রকম সন্দেহ হয়।

"অসুখটা কি?"

"কি জানি! বুঝতে পারছি না।"

"তবু.... তোমার কি মনে হয়?"

"আন্দাজে রোগ বলা যায় না। আমি চোখের ডাক্তার, এ-সবের তেমন কিছু বুঝি না।"

"অতদিন লেখাপড়া করলে"—সুরেশ্বর যেন হতাশ হল। সে কিছু জানতে চাইছিল। তার এই ব্যগ্রতা স্বাভাবিক। তার মনে হত, হৈমন্তী অন্তত একটা কিছু অনুমান করতে পারবে। এ-রকম কেন মনে হত সে জানে না। হয়ত এই জন্যে যে, অন্য কোথাও থেকে কিছু জানার উপায় ছিল না; যা সুরেশ্বর ভাবত, হেম কলকাতায় ডাক্তারী কলেজে অতদিন ধরে পড়েছে, তার পক্ষে এই অসুখ জানা সম্ভব। হয়ত এ-সবও কিছু না: অথচ আশ্রমের মধ্যে রোগটা ঢুকে পড়ায় সে উদ্বেগ বোধ করছিল; যদি এমনই হয়—লোকে যা বলাবলি করছে—এটা একটা নতুন উপদ্রব, এ তল্লাটে দেখা দিয়েছে, তবে কি করে কেমন করে আশ্রমের মানুষগুলোকে নিরাপদে রাখা যায় সুরেশ্বরের সেই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া এখানে এমন কিছু নেই যাতে অন্য কোনো ব্যাধির চিকিৎসা হতে পারে। সাধারণ জ্বর-জ্বালা, এমন কি এ-সময়ে এখানে যেটা হয়—জল বসন্ত— এ-সবে কোনো ভয়-ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন যা শোনা যাচ্ছে তাতে উদ্বেগ বোধ না করে উপায় নেই।

হৈমন্তীর ওপর সুরেশ্বরকে ভরসা করতে হচ্ছিল। রোগটা কি? রোগটা কি ছোঁয়াচে? সত্যিই এপিডেমিক দেখা দিল? যদি তাই হয় তাহলে কি করা আর বলতে পার? কি করে এখানের লোকগুলোকে নিরাপদে রাখি? কেমন করে বাঁচাই? অসুখের চিকিৎসারই বা কি হবে? ওষুধপত্র কোথায়? এটা কি ধরনের ছোঁয়াচে রোগ?—এই ধরনের প্রশ্ন, উদ্বেগ তাকে চিন্তিত করছিল, এবং পরামর্শের জন্যে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছিল।

"প্লেগ বলে মনে হয় তোমার?" সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করল আর একদিন।

"না—না।" হৈমন্তী মাথা নেড়ে বলল।

"তবে! কি এমন রোগ?"

"জানি না। কত রকমের রোগ আছে। সব সময় সব রোগ বোঝাও যায় না। মাঝে মাঝে এক আধটা অদ্ভুত রোগও আসে..."

সুরেশ্বর আর কিছু বলল না।

হৈমন্তী তার সাধ্যমত ভেবেছে, ভেবে দেখেছে এই বিচিত্র রোগ তার জ্ঞানের বাইরে। রেটিনাইটিস, কেরাটাইটিস, গ্লুকোমা—এ-সব হলে সে বলতে পারত, কিন্তু এ-রোগের সে কি জানে, কি বা বলতে পারে! যদি কেতাবী বিদ্যেতে সন্দেহ করতে হয় তবে হৈমন্তী সন্দেহ করবে 'মনোনিউক্লোসিস'; অথচ পুরোপুরি তা নয়; 'স্কারলেটিনার'ও লক্ষণ পাওয়া যায়। এই দুই রোগ সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। থাকার কথাও নয়। দ্বিতীয় রোগ এক আধটা তবু দেখেছে—প্রথমটা আদপেই নয়। মনোহরের বেলায় কিছুই বোঝা যায় নি, বুড়ো তিলুয়ার বেলায় কিছু একটা ঠাওর করার আগেই সে নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল, আপাতত যে পড়ে আছে, গিরিজা, তাকে দেখেই হৈমন্তীর এই রকম মনে হচ্ছে। তবে তার এই অনুমান ভুল হতে পারে, হওয়াই স্বাভাবিক। এ-সব রোগে মানুষ ভোগে কিন্তু কদাচিৎ মারা যায়। প্রথমটা তো সাধারণত কমবয়েসীদের।... এ সবই তার নিছক একটা অনুমান, নিজেরই শত সন্দেহ। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে তার কতটা গুজব, কতটা সত্যি তা কেউ জানে না। হতে পারে এদিকের এ-মেলা সে-মেলায় দশ বিশ জন মারা গেছে, কিন্তু তারা কোন রোগে মারা গেছে কে বলবে! শীতে দু চারটে বুড়ো-বুড়ি অনায়াসেই মরতে পারে: যে রকম ঠাণ্ডা তাতে মেলার ফাঁকা মাঠে প্রায় নির্বস্ত্র ক'টা গরীব রাতের হিমঠাণ্ডায় যে নিউ-মোনিয়া বাধায় নি তাই বা কে জানছে। যে সব খাদ্য মেলায় খাচ্ছে তাতেও দু পাঁচটা মরতে পারে, বিচিত্র কি! তার ওপর শোনা যাচ্ছে কোথাও কোথাও বসন্ত শুরু হয়ে গেছে, যদি তাই হয় তবে এমনও হতে
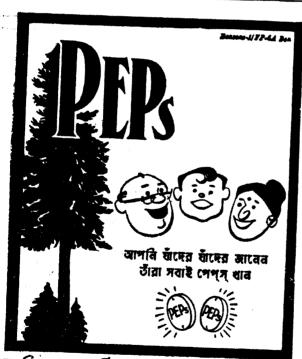
পারে মেলায় গিয়ে কারও জ্বর হয়েছে, বাড়িতে ফিরেছে বসন্ত নিয়ে, বাড়ি এসে পরে মরেছে। কে জানতে যাচ্ছে কি হয়েছিল? এ তো শহর নয়, ডাক্তারবদ্যিও নেই, চিকিৎসাও হয় না। বিক্ষিপ্ত লোকালয়, ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও দশ বিশ ঘর, কোথাও কিছু বেশী বাসিন্দে; এক গাঁয়ের খবর অন্য গাঁয়ে পেঁছিতে একটা বেলা কেটে যায়—, এমন অবস্থায় ঠিকঠাক কিছু জানার উপায় নেই। বেচারী অজ্ঞ-মূর্খে কি বলছে সেটা কোনো কাজের কথা নয়। রোগটা মেলা থেকে ছড়াচ্ছে, রোগটা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে—এ-সব অজ্ঞেই বলছে। তারা বলছে বলেই মেনে নিতে হবে।

মনোহর এমনভাবে মারা গেল যে কিছুই ধরা গেল না। হৈমন্তী স্তম্ভিত ও বিস্মিত হলেও কোনো কিছু স্থির করে নেয় নি। তারপর গেল বুড়ো তিলুয়া। তিলুয়ার সময়েও রোগ ধরা গেল না—কিন্তু কয়েকটা প্রাথমিক লক্ষণ মনোহরের মতন দেখাল, যদিও তিলুয়া শেষাবধি নিউমোনিয়া হয়ে মরল। এ-বারও কিছু বুঝল না হৈমন্তী। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল।

মেলায় অসুখ দেখা দিয়েছে এই গুজবটা ত কানে এসেছিল অন্ধ আশ্রমের কারও কারও, সে গুজবে কেউ কান দেয় নি। মনোহর মারা যাবার পর গুজবের হাওয়াটা আরও জোরে এসে লাগল। তিলুয়া বুড়ো মারা যাবার পর সকলেই ভয় পেয়েছিল। তারপর গিরজা। অন্ধ আশ্রমে এখন একটা চাপা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সুরেশ্বরও বেশ বিচলিত, শিবনন্দনজীও। এই আতঙ্ক স্বাভাবিক : অন্ধ আশ্রমের মধ্যে দু দুটো লোক পনেরো বিশদিনের মধ্যে হুট করে মারা গেল, আর-একটা বিছানায় পড়ে আছে—এ কি উদ্বেগ আতঙ্কের পক্ষে কম হল!

সুরেশ্বর রীতিমত উদ্বেগের মধ্যে একদিন শিবনন্দনজীকে সঙ্গে করে টাউনে গেল। সেখানে সরকারী হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে, হেলথ্‌-ডিপার্টমেণ্ট আছে। ঘুরে এসে বলল, রোগের খবরটা হেলথ-ডিপার্টমেণ্টেরও কানে গেছে, তারা খোঁজ খবর শুরু করেছে। সরকারী হাসপাতালে এ-ধরনের রোগী গোটা চারেক এসেছিল। দুটো মারা গেছে, একটা বেঁচেছে; একটা ভুগছে এখনও। রোগটা অদ্ভুত, কি রোগ কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে 'টাইফাস', কেউ বলছে অন্য কিছু।

আরও দশ পনেরোটা দিন এই ভাবেই কাটল। গিরজা কেমন করে যেন বেঁচে গেল।

তারপর বেশ বোঝা গেল, রোগ যাই হোক—মহামারীর চেহারা নিয়েই সেটা এ তল্লাটে দেখা দিয়েছে। প্রথমে যদি বা সন্দেহ ছিল, এখন অন্তত মনে হয় রোগটা যতই বিচিত্র হোক সংক্রামক রোগের মতনই সেটা ছড়িয়েছে। এই সময়টা এদিকে মেলা-টেলার সময়, নানা জায়গা থেকে ব্যাপারী আসে, কেনাবেচার জন্যে লোকে এ-মেলা থেকে ও-মেলা যায়, কিছু ধুনিঅলা সাধুবাবা থেকে ছেঁড়া তাঁবুতে ম্যাজিক-দেখানো ম্যাজিসিয়ান পর্যন্ত মেলায় মেলায় টহল দিয়ে বেড়ায়, রামলীলার দল আসে, নাওটাঙ্গীর নাচ—তাও থাকে। মেলাতেই প্রথমে রোগটা কেউ বয়ে এনেছিল, তারপর এ-মেলা ও-মেলা হয়ে সেটা ছড়িয়েছে, এখন মেলা-ফেরত মানুষের সঙ্গে ক্রমশই গাঁ-গ্রাম গিয়ে ঢুকেছে। শহর-টহর হলে, ঘন বসতি থাকলে হয়ত রাতারাতি রোগটা মারাত্মক হয়ে ছড়িয়ে পড়ত, দূর-দূরান্তে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো গাঁ-গ্রামের বসতি, হয়ত তাই ব্যাধিটা ছড়াতে বিলম্ব হচ্ছিল। এক পক্ষে এটা ভাল, অন্য পক্ষে মন্দ। মন্দ এই জন্যে যে, শহর-নগরে হলে একটা হইরই বাধত, মিউনিসিপ্যালিটির টনক নড়ত, ডাক্তার-বদ্যি ছোটাছুটি করত, সরকারী নজর পড়ত। তাতে দশটা মরত বাকি নব্বইটাকে বাঁচাবার চেষ্টা হত। এ-জায়গাটা শহর নয়, না মিউনিসিপ্যালিটি না ইউনিয়ন বোর্ড, কোথাও কোথাও নামে নাকি পঞ্চায়েত আছে, ডাক্তার-বদ্যির বালাই নেই, কাজেই কোথায় কোন দেহাতে কে মরছে, কি রোগ হচ্ছে—কে তার খবর রাখে। সরকারী নজরটাও এতদিনে পড়ে নি। গা এড়িয়ে কে কি দেখছে কিছুই বোঝা যায় না। শোনা যাচ্ছে, হাকিম নাকি মেলা-টেলা বন্ধ করার হুকুম দেবেন। হেলথ ডিপার্টমেণ্টের লোক কতক মুদ্দোফরাস জোগাড় করে কিছু ব্লিচিং পাউডার আর মশা মারা তেল দিয়ে কয়েকটা গাঁ-গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকজন টিকাদার বেরিয়েছে বসন্তের টিকে দিতে। বসন্তের টিকে এরা বড় কেউ নেয় না, টিকাদার দেখলে ঘর ছেড়ে ক্ষেতিতে পালায়, মেয়ে বউরা কান্নাকাটি শুরু করে, বাচ্চা-গুলো 'চুহা'-র মতন লুকোয়।

শিবনন্দনজীর কাছ থেকে এই সব খবর পাওয়া যাচ্ছিল। একদিন তিনি বললেন, এ অঞ্চলে কলেরা-বসন্তের মহামারী হতে আগে তিনি দেখেছেন, মহামারীটা আসে যেন পঙ্গপাল আসছে : প্রথমে ফড়িংয়ের মতন পাঁচ দশটা কোথ থেকে ছিটকে আসে, কেউ খেয়াল করে না, বোঝেও না, তারপর দেখতে দেখতে হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আসার মতন এক ঝাঁক পঙ্গপাল এসে পড়ে; তখন খেয়াল হয়, সামাল দেবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়, কিন্তু ততক্ষণে আকাশ কালো করে অন্তহীন এক মেঘের মতন তারা এসে গেছে। সেই ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আর কিছু করার সাধ্য মানুষের থাকে না।

কথাটা শিবনন্দনজী বোধ হয় ঠিকই বলেছিলেন, মহামারীটা আকাশ কালো করা পঙ্গপালের মেঘের মতনই এসে পড়ল। গাঁ গ্রাম থেকে চোখ দেখাতে অন্ধ আশ্রমে

রোগী আসার সংখ্যাও ক্রমশই কমে গেছে। এখন দু একজন যদি বা আসে। ঔষধিপত্র মাষ ফুরিয়ে আসছে।

সেদিন বিকেলের শেষ দিকটায় সুরেশ্বর এল। হৈমন্তী বাড়ির সামনে মাঠে পারচারি করছিল. মালিনী ছিল এতক্ষণ, কাছাকাছি এইমাত্র ঘরে গেছে।

সুরেশ্বর এসে বলল. "তোমার কাছেই এলাম।"

হৈমন্তী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পারল না দাঁড়িয়ে থাকবে, হাঁটবে, নাকি ঘরে যাবে। সুরেশ্বর কেন এসেছে তা জানতে তার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। আজকাল মাঝেমাঝেই সুরেশ্বরকে তার কাছে আসতে হচ্ছে, তাগিদ হোক প্রয়োজন হোক—এ সবই সুরেশ্বরের; অসুখটা আশ্রমে ঢুকে না পড়লে সুরেশ্বরের হৈমন্তীকে প্রয়োজন হত না; সুরেশ্বর বিপাকে পড়েছে, হৈমন্তীও আজ হঠাৎ প্রয়োজনীয় মানুষ হয়ে উঠেছে। হৈমন্তী মনে করে না, এর কোনো মূল্য আছে, তার ভালও লাগে না। বরং কখনো সখনো সে কৌতুক অনুভব করে, উপহাসের ইচ্ছে জাগে, বিতৃষ্ণা আসে।

সুরেশ্বর বলল, "এখনও সন্ধ্যে হয় নি, চলো একটু হাঁটি।" বলে পা বাড়াল সুরেশ্বর।

হৈমন্তীও বাধ্য হয়ে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বর বলল, "একটা খবর শুনেছ?"

এখনকার সব খবরই রোগ-মহামারীর মৃত্যুর। হৈমন্তী কোনো উৎসাহ বোধ করল না। বরং তার বিরক্তি হচ্ছিল। কেন যেন আজ দুপুর থেকে সে অবনীর প্রত্যাশা করছিল। দু সাত দিনের মধ্যে অবনী আর আসে নি। আজ সে আসবে এই রকম মনে হচ্ছিল।

সুরেশ্বর বলল, "পাটনা থেকে কিছু ডাক্তারটাক্তার আসছে শুনলাম, ভলোণ্টিয়ারও আসতে পারে। তাঁবু ফেলে থাকবে। তা তাড়াতাড়ি এসে পড়লেই ভাল, কি বল? এদের তো সব কিছুতেই গড়িমসি।"

হৈমন্তী নীরবে হাঁটতে লাগল। কারা আসবে, কখন আসবে, কোথায় কোথায় তাঁবু পাতবে—এর কোনো কিছু জানার জন্যে সে ব্যগ্র নয়। যদি ডাক্তার নার্স ভলেণ্টিয়ার ওষুধপত্র আসে—ভালই হবে; আসা উচিত—এই পর্যন্ত সে ভাবতে পারে, তার বেশি আর কিছু নয়। সুরেশ্বরের মতন সে কি চাতকের মতন পাটনার ডাক্তারদের জন্যে দিন গুণবে নাকি?

"শিবনন্দনজী বলছিলেন—" সুরেশ্বর বলল, "এখন আর কোথাও মেলা বসতে দিচ্ছে না, পুলিস গিয়ে দোকানপশার তুলে দিচ্ছে। কোথায় যেন মেঠাইমণ্ডা সব ফেলে দিয়েছে টান মেরে, চাটাই—ছাউনির ঢাকা-টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে।"

মনে মনে হৈমন্তী বলল ঃ ভালই করেছে। হতভাগার দল যত! মরছে, তবু মেলায় যাবে, গিয়ে ওই মেঠাইমণ্ডা খাবে। কিন্তু সুরেশ্বর কি এইসব কথা বলার জন্যে তার কাছে এসেছে? হৈমন্তীর মনে হল না, পাটনা থেকে ডাক্তার আসছে, পুলিস মেলা বন্ধ করে দিচ্ছে—এ-সব তুচ্ছ কথা শোনাবার জন্যে বা তা নিয়ে গল্প করার জন্যে সুরেশ্বর এসেছে।

অন্ধ আশ্রমের ফটক পেরিয়ে তারা জাম-তলার সামনে এসে দাঁড়াল। গোধূলি নামছে। হৈমন্তী লাটুডার দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। শীত মরে আসছে, তবু বেশ ঠাণ্ডা আছে এখনও। ধুলোয় মাঠঘাট ধূসর, আলোর অভাবে এবং ছায়ার জন্যে ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলো কালচে দেখাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বর এবার বলল, "কলকাতা থেকে কোনো চিঠি পেয়েছ, হেম?"

হৈমন্তী মুখ তুলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এতক্ষণে যেন সুরেশ্বরের আসার কারণটা সে বুঝতে পারল।

"কদিন আগে পেয়েছি," হৈমন্তী বলল।

সামান্য অপেক্ষা করে সুরেশ্বর বলল, "আমি আজ গগনের একটা চিঠি পেলাম।"

হৈমন্তী মুখ তুলে সুরেশ্বরকে দেখল না; না দেখেও অনুমান করতে পারল গগন কি লিখেছে। অন্যমনস্ক ভাবে আকাশে গোধূলির মেঘ দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল।

সুরেশ্বর অল্প সময় নীরব থাকল, পরে বলল, "গগনকে তুমি কিছু লিখেছিলে?"

হৈমন্তী ঘাড় ফিরিয়ে সুরেশ্বরকে "কিসের কি লিখব!"

"এখানের অসুখবিসুখের কথা?"

"গগন নিজেই দেখে গেছে।"

"তখন এতটা বাড়াবাড়ি এদিকে হয় নি।" সুরেশ্বর যে প্রতিবাদ করল তা নয়, তবু মনে হল সে বলতে চাইছে, গগন যখন গেছে তখন এমন কিছু হয় নি যাতে খুব একটা ভয় পাবার মতন অবস্থা হয়েছিল। হৈমন্তী বুঝতে পারল গগন বেশ ভয় পেয়ে কিছু লিখেছে।

সুরেশ্বর মাঠঘাট দেখতে দেখতে বলল, "গগন তোমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার কথা লিখেছে।"

হৈমন্তী প্রথমটায় মুখ ফেরাল না, যেমন হাঁটছিল সেই রকম আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, পরে মুখ তুলে সুরেশ্বরকে দেখল। গগন যে কিছু অন্যায় করে নি সে-সম্পর্কে হৈমন্তীর সন্দেহ ছিল না। সে বেচারীর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা হতেই পারে; তার ওপর যদি মা আর মামা সব শোনে তবে কলকাতার বাড়িতে খুব একটা উৎকণ্ঠা যাচ্ছে যে তাতে সন্দেহ নেই।

"গগনের চিঠি পড়ে আমার মনে হল—" সুরেশ্বর বলল, "তুমি কিছু লিখেছ।... এখানের অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—দেখলাম সে প্রায় সবই জানে।"

হৈমন্তী কেন যেন বিরক্তি বোধ করল। সুরেশ্বরের কথার ধরন থেকে তার মনে হচ্ছিল, হৈমন্তী যেন লুকিয়ে লুকিয়ে গগনকে ভয় পাইয়ে দেবার মতন কিছু লিখেছে। বিতৃষ্ণা অনুভব করল হৈমন্তী, সুরেশ্বরের দিকে কয়েক পলকের জন্যে তাকাল, মনে মনে বিরক্তির সঙ্গে বলল ঃ তোমার বুঝি মনে হচ্ছে আমি এখান থেকে পালাবার মতলব করে গগনকে সব লিখেছি? গগন আমার কথা মতন তোমায় লিখেছে?

গায়ের গরম চাদরটা ঘন করে জড়িয়ে নিতে নিতে হৈমন্তী বিরক্ত গলায় বলল, "তোমার মনে হলে আমার আর কি করার আছে! আমি তেমন কিছু লিখি নি।" বলে একটু থামল হৈমন্তী, আবার বলল, "সাধারণ একটা বুদ্ধি আমার আছে ঃ কলকাতার ওদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলে কি লাভ!"

হৈমন্তীর গলার স্বরে বিরক্তি ও অপ্রসন্নতা অনুভব করে সুরেশ্বর হৈমন্তীর দিকে তাকাল। ঈষৎ যেন অপ্রস্তুত হয়েছে, বলল, "তা ঠিক; আমিও তাই ভাবছিলাম—দূরে যারা রয়েছে তারা কিছু জানছে না দেখছে না, অযথা তাদের ব্যস্ত করে ভয় পাইয়ে কি লাভ!...গগন বেশ ভয় পেয়েছে, মাসিমাকেও কিছু কি আর জানায় নি!... গগনটা এত কথা জানল কি করে!"

হৈমন্তীর এতক্ষণে সন্দেহ হল, অবনী নিশ্চয় গগনকে লিখেছে।

সুরেশ্বর বলল, "গগন তোমায় কিছু লেখে নি?"

কথাটা তেমন খেয়াল করে শুনল না হৈমন্তী। সে অবনীর কথা ভাবছিল ঃ ভাব-ছিল, গগনকে সবিস্তারে কেউ কিছু লিখে থাকলে অবনীই লিখেছে। তার পক্ষে লেখা সম্ভব। হৈমন্তী ভাবল, কথাটা সুরেশ্বরকে বলবে নাকি? পরে মনে হল, থাক বলবে না। অথচ হৈমন্তীর খারাপ লাগছিল; সুরেশ্বর হয়ত মনে মনে ভেবে রাখল, হৈমন্তী কিছু গোপন রাখছে।

সামান্য অপেক্ষা করে সুরেশ্বর আবার বলল, "গগন তোমায় কিছু লেখে নি, হেম?"

"কলকাতায় যাওয়ার কথা?"

"হ্যাঁ।" সুরেশ্বর মাথা নাড়ল।

"লিখেছে।"

সুরেশ্বর চুপ করে থাকল, যেন অপেক্ষা করছে হৈমন্তী আরও কিছু বলবে বলে। হৈমন্তী কিছু বলছিল না। আকাশে গোধূলি ফুরিয়ে এল; পশ্চিমের আকাশে অন্ধকারের জোয়ার আসছে, অবশিষ্ট একটু লালের আভার ওপর কালোর ছায়া। মাথার ওপর দিয়ে নিঃসঙ্গ কোনো পাখি ভীত হয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

হৈমন্তী এই নিঃশব্দতায় কেমন আড়ষ্ট বোধ করল। আসন্ন সন্ধ্যার মতন কোনো কিছুর বিষন্ন ভার তাকে আচ্ছন্ন করে আনছিল। হৈমন্তী বলল, "সন্ধ্যে হয়ে গেল; ফিরি। শীত করছে।"

অন্যমনস্কভাবে সুরেশ্বর বলল, "চলো—ফেরা যাক।"

ফেরার পথে হৈমন্তী বলল, "গগন যখন যায়, তখনই তার বেশ ভাবনা হয়েছিল।"

"জানি। আমায় বলেছিল।"

"এখনকার অবস্থা আরও খারাপ।... আমি তাকে ব্যস্ত করার মতন কিছু লিখি নি; তবে চারপাশে খুব অসুখবিসুখ চলছে এখন—এ-রকম কিছু লিখেছিলাম। হয়ত তাতেই আরও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিংবা করে মা..."

সুরেশ্বর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুন-ছিল কি না বোঝা গেল না। কিছু বলছিল না। নীরবে দুজনে আরও একটু হেঁটে এল। দেখতে দেখতে কেমন অন্ধকার হয়ে এল। দূরে নদীর দিকে শূন্যতায় ধুলোর গায়ে বুঝি কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

সুরেশ্বর বলল, "তুমি যাবার ব্যাপারে কিছু ঠিক করেছ?"

হৈমন্তীর পা যেন থমকে স্থির হয়ে গেল, বাঁ পা বাড়িয়ে সে দাঁড়াল, ডান পা আর তুলতে পারল না। সুরেশ্বরের দিকে তাকাল, সুরেশ্বর দু পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ যেন কেমন একটা আক্রোশ ও ঘৃণা হৈমন্তীকে কিছুক্ষণের জন্যে কিছু দেখতে দিল না, ভাবতে দিল না। জীবনে বোধ হয় আর কখনও এমন তিক্ততা সে অনুভব করে নি। সুরেশ্বরকে অত্যন্ত ইতর, কমট ও স্বার্থপর মনে হচ্ছিল। কি ভাবছে সুরেশ্বর? সে কি ভেবে নিয়েছে, হৈমন্তী পালিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রেখেছে?

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হৈমন্তী আসছে না দেখে অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত হৈমন্তী পা বাড়াল।

সুরেশ্বর বলল, "হেম, আমি কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে ক'টা কথা বলব।... গগন থাকতে থাকতেই ভেবেছি কথাটা বলি। বলা হয় নি। তারপর এই রকম একটা অবস্থা দাঁড়াল।"

হৈমন্তী সামান্য দ্রুত পায়ে হাঁটার চেষ্টা করছিল, যেন সুরেশ্বরের সঙ্গ তার আর পছন্দ হচ্ছিল না, সহ্য হচ্ছিল না। দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করতে গিয়ে উত্তেজনার মাথায় হৈমন্তীর শরীর কাঁপছিল, পা এলোমেলো হয়ে পড়ছিল।

হৈমন্তী ঝোঁকের মাথায় তিক্ত গলায় বলল, "যাবার দিন আমি এখনও ঠিক করি নি কিছু, কাল পরশুর মধ্যে করব।"

সুরেশ্বর হৈমন্তীর ক্রোধ এবং তিক্ততা অনুভব করতে পারছিল। অল্প সময় কথা বলল না। পরে বলল, "তুমি আরও কয়েকটা দিন থাকলে ভাল হয়।"

হৈমন্তীর ইচ্ছে হল দাঁড়ায়, সুরেশ্বরের নির্লজ্জ মুখের চেহারাটা একবার দেখে, বলেঃ কেন? তোমার এই আশ্রমের আবার কে অসুখে পড়বে তার চিকিৎসা করতে নাকি?

সুরেশ্বর যেন আগেই কিছু ভেবে রেখেছিল, এখন তা বোঝাবার চেষ্টা করছে—এমন ভাবে বলছিল, "আমি একজন ডাক্তারের খোঁজ করছি, হেম। পাটনায় উমেশবাবুকে লিখেছি, রাঁচীতে শিবনন্দনজীর এক ভাই থাকেন ডাক্তার তাঁকেও বলা হয়েছে। ভেবেছিলাম, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব—পাটনার কাগজে। কলকাতা থেকে ডাক্তার এনে লাভ হবে না, তারা এ জায়গায় থাকতে পারবে না। গগন থাকতে থাকতেই এসব ভেবেছিলাম। হয়ত এ ব্যাপারটায় এতদিনে মন দিতে পারতাম, একটা কিছু ব্যবস্থাও হত, কিন্তু হঠাৎ এই অসুখটা এসে সব গোলমাল হয়ে গেল।... আমার আর ক' দিন সময় দরকার।"

সুরেশ্বরের কথার মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই, আবেগ নেই, রহস্য নেই, একেবারে সাদামাটা সরল কাজের কথা। নিজের অসুবিধে, সমস্যা এমন কি প্রয়োজন সম্পর্কেও সে সচেতন; নিজের স্বার্থটুকু প্রকাশ করতে তার কোনো রকম সঙ্কোচ হল না।

হৈমন্তীর পক্ষে এই নির্লজ্জতা অসহ্য হল যেন। বলল, "তুমি আমায় কি মনে করো?"

সুরেশ্বর কোনো জবাব দিল না। —হাঁটতে লাগল।

হৈমন্তীও হাঁটছিল। বলল, "তোমার সুবিধে অসুবিধে বুঝে আমায় চলতে হবে?"

সুরেশ্বর কি যেন বলার চেষ্টা করল; হৈমন্তী বলতে দিল না। বিতৃষ্ণায় এবং ক্রোধে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে হৈমন্তী বলল, "এখানে এই এপিডেমিকের মধ্যে আমি কেন থাকব? কি লাভ আমার থেকে? যদি আজ আমার অসুখ হয়, কে দেখবে? তুমি?"

সুরেশ্বর হৈমন্তীর গলার স্বরে অস্বস্তি বোধ করছিল, বলল, "হেম তুমি মাথা গরম করছ। একটু শান্ত হয়ে ভাব।" বলে সুরেশ্বর যেন হৈমন্তীকে মাথা ঠাণ্ডা হবার সময় দিল সামান্য, বলল, "এই অসুখ তোমার আমার মালিনীর—এখানের যে-কোনো লোকের হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। আমরা কিছু জানি না। যদি আমাদের হয় তুমি দেখবে; যদি তোমার হয় আমরা কি তোমায় দেখব না?"

"তোমরা!" হৈমন্তী যেন উপহাস করে হাসবার চেষ্টা করল।

সুরেশ্বর অপ্রতিভ হল না; বলল, "আমরা ডাক্তার নই; কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা তোমার বেলায় হবে না বলেই কি তোমার মনে হয়?"

অন্ধ আশ্রমের ফটকের সামনে এসে পড়েছিল ওরা।

সুরেশ্বর বলল, "মনোহর, তিলুয়া, গিরিজার বেলায় তুমি যথাসাধ্য করেছ। একজনকে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছ......"

"তার জন্যে কি আমি তোমাদের কাছে বাধা পড়ে গেছি?"

"না—না; তা কেন! ...এখন এ অবস্থায় তুমি এতগুলো মানুষের ভরসা।"

"তোমার অন্ধ আশ্রমের মানুষদের, তোমার।"

"হ্যাঁ; আমাদের।"

"তাতে আমার কোনো গরজ নেই। তোমার অন্ধ আশ্রমের কার কি হল, তাতে আমার কি যায় আসে?"

"হেম..." সুরেশ্বর যেন কোনো ছেলেমানুষের মুখে বোকার মতন কোনো কথা শুনে শুধরে দেবার মতন করে হাসল, বলল, "হেম, এ তোমার রাগের কথা। মানুষের জন্যে মানুষেই করে, একের রোগে শোকে অন্যে ভাবে।"

"আমি ভাবি নি। আমি তোমার এখানের কারও কথা ভাবি না।"

"তুমি তাদের জন্যে অসুখের সময় ভেবেছ।"

"ওকে ভাবা বলে না। আমার কর্তব্য করেছি। উপায় ছিল না বলে করেছি।"

"এভাবে কি সংসারে বাঁচা যায়?"

"বাঁচার কথা উঠছে কেন! তোমার এই আশ্রম আমার সংসার নয়।" হৈমন্তী রূঢ় গলায় বলল, "নেহাতই আমি ডাক্তার, এখানে আর কোনো ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাই বাধ্য হয়ে আমায় আমার কর্তব্য করতে হয়েছে।"

"এদের জন্য তোমার মমতা হয় নি?"

"না।"

"না?"

"জানি না; দুঃখ হলেও হতে পারে, কিংবা কষ্ট......।"

"তুমি শুধু ডাক্তারী নীতি মেনেছ?"

"তা ছাড়া কি!... এইসব আশ্রম-টাশ্রমে অন্ধ-টন্ধদের মধ্যে তোমার কোনো আদর্শ থাকতে পারে, বিশ্বাস থাকতে পারে। আমার নেই।"

"জানি," সুরেশ্বর ছোট্ট করে বলল।

হৈমন্তী মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকলেও ঝোঁকের মাথায় বলল, "তা হলে কি! এবার আমায় যেতে দাও।"

সুরেশ্বর কোনো জবাব দিল না। কথা বলতে বলতে তারা অন্ধকারে হৈমন্তীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে। মালিনী বাতি

জেনলে রেখেছে বলে মনে হল, তার ঘরে বাতি জবলছিল, হৈমন্তীর ঘরের দরজা ভেজানো।

ঘরের সামনে এসে হৈমন্তী দাঁড়াল না, তবু মুহূর্তের জন্য তার পা থেমেছিল, যেন তার মনে হয়েছিল, সুরেশ্বর এখান থেকেই বিদায় নেবে। সুরেশ্বর গেল না, হৈমন্তীর পাশে পাশে হাটতে লাগল। বারান্দায় উঠে মালিনীকে দেখতে পেল না হৈমন্তী; ঘরে এসে ভেজানো দরজা খুলল। ভেতরে বাতি জবলছে।

সুরেশ্বর ঘরে এসে চৌকাটের কাছে সামান্য দাঁড়াল। হৈমন্তী এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বোধ হয় খেয়াল পড়ায় বাতিটার শিস বাড়িয়ে দিল।

এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে সুরেশ্বর জানলার দিকে চেয়ারের কাছে এসে বলল, "হেম, তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। শান্ত হয়ে বসো একটু। এভাবে তো কোনো কথা বলা যাবে না।"

হৈমন্তী যেন ইচ্ছে করেই সুরেশ্বরের দিকে পিঠ আড়াল করে ছিল। তার যে উত্তেজনা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুরেশ্বরকে তার ভাল লাগছিল না। মানুষটার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে আজ এমন এক হিসেবী, চালাক, প্রভুত্ব-পরায়ণ, সুবিধেবাদীর চেহারা ফুটে উঠেছে যে, হৈমন্তীর অসহ্য ঘৃণা হচ্ছিল। আশ্চর্য, এই মানুষ ভেতরে ভেতরে এত ভেবেছে: ভেবেছে হৈমন্তীকে সরিয়ে নতুন ডাক্তার আনবে, ডাক্তারের জন্য চিঠি লিখেছে, বিজ্ঞাপন দেবার কথা ভেবেছে, সবই ঠিকঠাক প্রায়—অথচ ঘুণাক্ষরেও হৈমন্তীকে কিছু জানায় নি। নেহাত একটা রোগ বেধে গিয়ে সব গোলমাল করে দিল, নয়ত এতদিনে হয়ত সুরেশ্বরের নতুন ডাক্তার জুটে যেত। তখন বিনয় করে বলত: হেম, আমি ভেবে দেখলাম, তোমার এখানে অসুবিধে হচ্ছে, তুমি বরং কলকাতায় ফিরেই যাও।

চেয়ারে বসতে বসতে সুরেশ্বর বলল, "বসো, দুটো কথা বলি।"

হৈমন্তী বসল না, বলল, "আমি ঠিক আছি।"

"তুমি না বসলে আমার খারাপ লাগছে। বসো।"

হৈমন্তী বাধ্য হয়ে বসল।

সুরেশ্বর অল্প সময় কিছু বলল না, পরে বলল, "তুমি যখন এসেছিলে, তখন আমি তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, থাকতে পারবে? তুমি বলেছিলে, পারবে। পরে আমার মনে হয়েছিল, তুমি হয়ত শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে না। আমি তোমায় আগেও বলেছি, এখানে তোমার মন যদি না টানে, আমি জোর করে ধরে রাখব না। ...তুমি যাবে, আমি তো তোমায় আটকাচ্ছি না। ক'দিন আরও থেকে যেতে বলেছিলাম। যদি না পার, থেকো না। এতে তুমি রাগ করছ কেন? অসহিষ্ণু হবার তো কোনো কারণ নেই।"

হৈমন্তী চোখ তুলে না তাকিয়ে পারল না। সুরেশ্বর এমনভাবে কথা বলছে যেন হৈমন্তীর এখানে আসা, থাকা, যাওয়া—এর কোনোটাই তেমন করে গায়ে মাথায় মতন নয়; সহজ একটা অঙ্ক—যদি যোগে না-হয় বিয়োগ করলেই হল। কি করে, কেমন নির্বিকারভাবে একটা মানুষ এ-সব কথা বলতে পারে, হৈমন্তী ভেবে পাচ্ছিল না। কপালের শিরা এবং মাথায় কেমন একটা দপদপে কষ্ট হচ্ছিল।

"তোমার কাছে—" হৈমন্তী কি বলতে গিয়ে কথা হারিয়ে ফেলল; তার চোখের দৃষ্টি তীব্র ও সমস্ত মুখ কালশিরে পড়ার মতন কালচে হয়ে এসেছিল। নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর হৈমন্তী বলল, "তোমার কাছে জীবনটা যত হাওয়া-বাতাসের, আমার কাছে তা নয়।"

"হাওয়া-বাতাসের?" সুরেশ্বর আপন-মনে বলার মতন করে বলল, যেন জিজ্ঞাসুর মতন তাকিয় থাকল। "কথাটা আমি ভাল বুঝলাম না, হেম।"

হৈমন্তীর গলার স্বর সামান্য খসখসে এবং তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছিল, গলার নীচে একটি শিরা ফুলে আছে। হৈমন্তী বলল, "না বুঝলে বুঝো না; আমিও তো অনেক কিছু বুঝতে পারলাম না।" হৈমন্তী চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

সুরেশ্বর স্থির হয়ে বসে থাকল, ভাবছিল। হৈমন্তীর শেষ কথার অর্থ সে বুঝতে পারছে। অথচ বলার মতন কিছুই যেন খুঁজে পাচ্ছে না। মাথা ধরে যাচ্ছিল। আজ সারাটা দিন কেমন ভাল লাগছে না, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

হৈমন্তী বলল, "তোমার অন্ধ-সেবা তোমার সুখ, আমার কিছু নয়। তুমি আমায় কেন তোমার ছকের ঘুঁটি করেছিলে আমি জানি না।"

সুরেশ্বর আহত হল। তার চোখে ক্ষণিকের জন্য আঘাত এবং বেদনায়, মুখে বিবর্ণতার ময়লা দাগ ফুটল। এই অভিযোগ সত্য হোক না হোক, তার বলার কিছু নেই। কিন্তু হেম যেভাবে কথাটা বলছে, সেভাবে ভাবতে সুরেশ্বরের কষ্ট হচ্ছিল। সুরেশ্বর অনচ্চ, দুঃখিত স্বরে বলল, "আমার ভুল আমি মেনে নিয়েছি, হেম। তবে তুমি যে কেন ও-কথাটা বললে, আমি বুঝতে পারলাম না। আমি কি তোমায় সত্যিই ছকের ঘুঁটি করেছিলাম?"

"আর কি!" হৈমন্তী বাঁ পাশের গলা টান করে বলল, ভঙ্গিটা দুঃখের অথচ উপহাসের।

দু' জনেই নীরব হয়ে গেল তারপর। ঘরের মধ্যে কেমন জনহীনতার নিস্তব্ধতা সৃষ্টি হচ্ছিল, বাতির আলো ফ্যাকাশে সাদা, শীত ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে, কখনো হৈমন্তীর, কখনো সুরেশ্বরের দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। নিঃসম্পর্কের মতন, অপরিচিতের মতন দু'জনে বসে থাকল।

অবশেষে সুরেশ্বর বলল, "হেম, আমি তোমায় ছকের ঘুঁটি করব, এ-কথা আমি ভাবি নি কখনও। আমার মনে হত, তুমি অল্প বয়সে মানুষের দুঃখের দিক দেখেছ, নিজেও সেই অসহায়তার স্পর্শ পেয়েছ, হয়ত তুমি সাধারণ সংসারের বেড়ার বাইরে আসতে আপত্তি করবে না।"

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না। মনে হল বলে, তুমি কি ভেবেছিলে সেটা তোমার ব্যাপার, আমার নয়। আমি কখনও তোমায় বলি নি, আমি সাধারণ সংসারের বাইরে যেতে চাই। আমি বলি নি, আমি তোমায় তেমন কিছু অনুমান করতেও দিই নি। অথচ তুমি আমায় এমন স্পষ্ট করে কোনোদিন বুঝতে দাও নি যে, আমায় তোমার শুধুমাত্র অন্ধ হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে থাকার জন্য দরকার। কবে আমি অসুখে ভুগেছি, দুঃখে পড়েছি—তার জন্য আমার সমস্ত জীবন তোমার এই আশ্রমের অন্ধ-আতুরের সেবায়, ব্যয় করতে হবে! কেন? কি করে তোমার মনে হল, আমার জীবন তোমার শখ মেটাবার সামগ্রী? বেশ, শখ না বললুম, তোমার অভিমানে লাগবে, বরং তোমার আদর্শই বলি, তোমার আদর্শের জন্য আমার জীবনটাকে তুমি লাগাম পরিয়ে ঠুলি এঁটে ছুটিয়ে দিতে পার না। আমি আলাদা, আমার মন আলাদা, আমি তোমার মতন অন্ধ কোলে করে জীবন কাটাতে চাই না। ...তুমি তো আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছ, তুমি কোনোদিন আমায় স্পষ্ট করে বলো নি, আমার অন্য
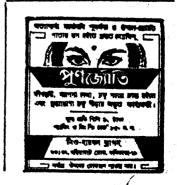
ভালবাস না, এ-ভালবাসায় তোমার সুখ নেই। আমাদের মতন সাধারণ মানুষের ভালবাসাবাসিতে তোমার সুখ না থাকতে পারে, কিন্তু কেন তুমি স্পষ্ট করে আগে বললে না? কি হিসেবে তুমি ধরে নিলে, তোমার সুখ আমার সুখ হবে? তোমার ইচ্ছে আমার ইচ্ছে হবে? তোমার সাধ মেটাবার জন্যে আমার জীবনটা নষ্ট করতে হবে কেন? আসল কথা কি জানো, সেই যে কথায় বলে—যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না, তেমনি যে অন্ধ হাসপাতাল করে, গরীব দুঃখীদের আশ্রয় দেয় সে কি আর নিজের জন্যে ছোট একটু ঘর বাঁধতে পারে না? পারে। দয়া ধর্ম সংসারে অনেক লোক করেছে. হাসপাতাল করতে বাড়ি ঘর টাকা অনেকেই দিয়েছে, যদি বলো জীবন উৎসর্গ তাও অনেকে করেছে, কিন্তু তার জন্যে তাদের নিজের একটু ঘর রাখতে আটকায় নি। ......আমার বয়েস হয়েছে. বেশ বুঝতে পারি, আমায় তুমি তোমার আশ্রমের জন্য প্রত্যাখ্যান করো নি, অন্য কোনো কারণ আছে, গগন যা বলছিল। কিন্তু সেটা কি, আমি জানি না, তুমি গোপন রেখেছ।

হৈমন্তী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে স্থির অথচ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে এত কথা ভাবছিল। সুরেশ্বরও অনেকক্ষণ অন্য চিন্তা করছিল। শেষে হৈমন্তীর দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল কিছু সময়, শেষে কোমল করে ডাকল, "হেম—।"

হৈমন্তী শুনেও শুনতে পেল না।

সুরেশ্বর অপেক্ষা করল; পরে বলল, "আমি তোমায় আমার স্বার্থের জন্যে চেয়েছিলাম কি না—জানি না; তবে একটা কথা ঠিক, আমি ভাবতাম তুমি আমার বড় সহায় হবে।"

হৈমন্তী সামান্য মুখ ফেরাল, "তুমি অনেক কিছুই ভেবেছ; যখন যা ভেবেছ নিজের দিকে তাকিয়ে ভেবেছ।...যাক, এসব কথা আমার আর ভাল লাগছে না। ছেড়ে দাও।"

সুরেশ্বরের মনে হল উত্তেজনার শেষে হৈমন্তী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার মুখে চোখে কেমন অবসন্ন ভাব ফুটে উঠেছিল। হয়ত আরও কিছু বলার ছিল সুরেশ্বরের অন্তত বলতে পারলে ভাল হত, অথচ বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। চুপচাপ বসে থাকল সুরেশ্বর, অশান্তির মতন লাগছে, কোথাও যেন কোনো গভীর কষ্ট থেকে গেল. বলা গেল না, বলা হল না; সম্ভব হল না।

হৈমন্তী হঠাৎ বলল, "তুমি যা চাও এখানে সব পেয়েছ, আমি কিছুই পাই নি। ...কিন্তু এ বয়সে তা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ কি!"

"আমি কি চেয়েছি, হেম?"

সুরেশ্বরের গলার স্বরে যে কাতরতা ছিল, অর্থ ছিল হৈমন্তী তা শুনল, কিন্তু অনুভব করল না। বরং বিরক্ত হল। অনেক দিন থেকে তার মনে হয়েছে কথাটা সুরেশ্বরকে বলবে; বলবে—কারণ নিজের সম্পর্কে সুরেশ্বরের বড় বেশি মোহ। হৈমন্তীর ইচ্ছে হলে বলে, তুমি প্রতিষ্ঠা, সম্মান চেয়েছ; তুমি কর্তৃত্ব চেয়েছ; তোমার মধ্যে ক্ষমতা পাবার কাঙালপনা আছে; এই আশ্রমে তোমার আধিপত্য আমি দেখেছি। ...সাধারণ মানুষের জগতে তোমার এ সব আশা মিটত না, তুমি ব্যর্থ হতে। সেই ভয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ. পালিয়ে এসে এই বুনো জংলী দেশে নিজের জগৎ গড়েছ, সাধ আশা মেটাচ্ছ। তোমার সাধ্য ছিল না, খোলা সংসারের মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে এত কিছু পাও? তুমি ভীরু, নিজের সঙ্গে নিজেকে ঠকিয়ে আজ সান্ত্বনা পেয়ে বেঁচে আছ।

এত কথায় কিছুই হৈমন্তী বলল না। বরং শক্ত দুঃখের মধ্যেও কেমন ম্লান হেসে, ঈষৎ বিদ্রূপের গলায় বলল, "কেন, তোমার সেই—বড় সুখ।"

সুরেশ্বর স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকল। বিদ্রূপে সে আহত হয়েছে কি না বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হল না।

সুরেশ্বর অবশেষে উঠে দাঁড়াল। "গগনকে একটা জবাব দিতে হবে চিঠির!"

"আমি দিয়ে দেব।"

"আমারও একটা চিঠি দেওয়া উচিত।"

"দিও।"

"কি লিখব?"

"তোমার যা খুশি হয় লিখো।"

সুরেশ্বর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এল। বাইরে এসে অনুভব করল তার. খুব শীত করছে। শীতে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছে, গা কাঁপছে, ঠোঁট থরথর করছিল। দাঁতে দাঁত চাপল সুরেশ্বর। মাথাটা ধরে গেছে বেশ।

সুরেশ্বর দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে যাবার চেষ্টা করছিল। (ক্রমশ)

ত্রিলোচন কলমচি

মৃগয়া

মনে হল হঠাৎ কোনো বিরাটকায় প্রাণীর সাউন্ডপ্রুফ জঠরের মধ্যে এসে পড়েছি। চতুর্দিকে নানা অন্ত্র-তন্ত্র ওয়াইয়ার-কেবল্‌ ছড়ানো। সার্কাস সেন্টারের মত নানা ধাঁচের খাঁচামাচা। নানা অংকার আর ওজনের আলো নানা-খানে হুমড়ি খেয়ে সেন ওৎ পেতে রয়েছে। হান্টারের ইশারা পাওয়া মাত্র 'কিল'-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আর সংগে সংগে Dolly-বাহন বৃহৎ আর্টিলারীর মত মূর্তী ক্যামেরা তার নিকট-দূর পাল্লার লেন্স-আই দিয়ে নেগেটিভ শ্যুট করবে। ফ্লোরের ওপর খড়ি দিয়ে দাগ-অংক কষা আছে, ক্যামেরার কেরামতি-দৌড় আগে থেকে মেপে রাখা হয়েছে বুঝি। দাবার চাল, ঘোড়ার চাল আর ক্যামেরার চাল। প্রতিটি চলনের চাল পৃথক, নাম পৃথক। ক্যামেরা কখনো ক্লোজ-আপ নিতে আগু-পিছু করছে, কখনো মিড্‌শট-লংশট নিচ্ছে, কখনো চলেছে ট্রাকিং-ট্র্যাকিং, উত্থানপতন, মূর্চ্ছা-ঘূর্ণি-ঝাঁপ অর্থাৎ প্যান-টিলট্‌-ফ্রীজ-জুম-হুইপ। চলচ্ছন্দের কত নাম, কত রীতি।

Bait-এ বাঁধা ভ'ইস-কী-বাচ্চার কথা মনে করুন, সেটের খুঁটিতে ভারলগে-মানেলগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধা রয়েছেন শিল্পী। গলার পেন্ডুলামের মত ঝুলন্ত ভিজিওগ্রাফ, হাতে লম্বা খাত, কন্যা-সম্প্রদানী পুরুতের মত ফাইন্যাল টেক্‌-এর আগে শেষবারের মত স্ক্রীপ্ট আওড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্ত পরিচালক, বর-বর মূর্তি নায়ক তারই প্রতিধ্বনি করছেন। স্ত্রী আচার-পটীয়সী এয়োর মত কনটিনিউটিম্যান খুঁতখুঁতে চোখে খুঁটিনাটি অদলবদল করছেন। বসেছে রোশনচৌকির মত মিউজিক্যাল হ্যান্ডস, কনট্রোল প্যানেলে ইয়ারফোন কানে সেটে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট। পেন্টার, কার্পেন্টার, প্লাস্টারার, ইলেকট্রিসিয়ান আর সীন-শিফটারের দল যেখা-সেথা যথা নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোট কথা একটা ইলাহী অপারেশন চলেছে।

ক্যামেরাম্যান ইলেকট্রিসিয়ানকে হয়ত আলোক প্রার্থনা জানাচ্ছেন সাংকেতিক ভাষায় : Spot that 2K. Kill no. 5. সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে বিশেষ আলোটি জ্বলে উঠছে। সেই And god said let there be light and there was light. আর কি! দেখতে দেখতে ক্ল্যাপস্টিক পেয়ে সাউন্ড ট্র্যাককে ফলো করে চলল ব্যাচিলার অ্যাকশন-ফিল্ম (পিকচার ফিল্ম) পরে হেঁশেলে গিয়ে ম্যারেড ফিল্ম হয়ে বেরিয়ে আসবে তারা গাটছড়া বেঁধে। সেখানে Editolas যন্ত্রে বসা এডিটার হচ্ছেন ফাইনাল ডিরেকটর।

শেষবারের মত স্ক্রীপ্ট আওড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্ত পরিচালক...

"উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি"র মত দাঁড়িয়ে থাকলেও স্টুডিও এখন আর বসতি বাড়ি নয়, ঘুঘু-চরা ভিটেয় দাঁড়িয়েছে তার অবস্থাটা। রাজা গিয়েছে, পরিষদও একে একে খসেছে। সভারত্নের দল পথ বেছে নিয়েছেন নিজের নিজের। সারা ভারতে ৬৩টি স্টুডিও ছিল, বাংলা দেশে ১৩টি। আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬টি। ভারতের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পের শতকরা ৭৫ ভাগ টেকনিশিয়ান আজ বেকারতুল্য। অন্তত বাংলা দেশে। পরিচালকদের অনেকেরই কাজ নেই, অনেকে কর্মান্তরে ঢুকেছেন। ফিল্ম স্টারের ফেভারে, ফিনান্সিয়ারের কৃপায় অনেক নতুন নতুন পরিচালক আসছেন। প্রতিযোগিতার ধাক্কায় অনেকেই শেষ পর্যন্ত সরকারী তথ্যচিত্র আর ফিচার ছবির ফুটেজ আঁকড়ে বসেছেন।

অথচ একদিন পরিচালকরা নিশ্চিন্ত মনে শিল্পের সাধনা করে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক একটি বিস্ময়কর কৃতী। পুরুষ এমনি করে বেরিয়ে এসেছে। কারণ, সেদিন ম্যাডান স্টুডিও (ইন্দ্রপুরী), নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও, অরোরা স্টুডিও, কালী ফিল্মস (টেকনিশিয়ানস স্টুডিও) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এক একটি অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আলোক-চিত্র শিল্পের এক একটি ঘরোয়ানা যেন, বীরেন্দ্র-নাথ সরকার, অনাদি বসু, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী থেকে আরম্ভ করে একটু আগের মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের মত জ্ঞানী গুণী দরদী শিল্পপতি দেখা দিয়েছেন। তাঁরা প্রকৃত অর্থেই প্রযোজক ছিলেন, শিল্পে এবং বাণিজ্যে, ভিতরে এবং বাইরে, দর্শক-অভিনেতা এবং নেপথ্য কর্মীর মধ্যে সেতু-স্বরূপ ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব কঠিন ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল কোমল। ব্যর্থতায় বিচলিত হননি। দল গড়েছেন, দলের প্রতিটি মানুষকে বুক দিয়ে আগলেছেন। ফিল্মস্টার তাঁদের নজরে বাণিজ্যলক্ষ্মী ছিল না, নেপথ্য শিল্পীকে তাঁরা মর্যাদা এবং

মনের মত অর্থ দিতেন। সত্যিকারের দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল।

তাই তখন পরিচালককে পঁচিশজনকে সেধে-ভজে স্ক্রীপ্ট শোনাতে হত না। ফিনানসিয়ারের যোগাড় করতে ধানকল-

আমের আচার সাঁটাচ্ছেলেন

কোলিয়ারী কিংবা মাছের ভেড়ী পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করতে হয়নি। অর্থে সামর্থ্যে তখন স্টুডিও ছিল এক একটি স্বয়ংভর সংস্থা। কত তার বিভাগ উপবিভাগ। কার্পেন্টারী ইলেকট্রিক সাউন্ড ক্যামেরা স্ক্রীপ্ট মিউজিক, আর্ট, প্রোডাকশন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট। তদুপরি এডিটর্স ডিপার্টমেন্ট এবং ডাইরেকটর্স ডিপার্টমেন্ট এবং ল্যাবরেটরী।

শুধু কি তাই, পরিচালক থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী এবং কাহিনী চিত্রনাট্য-গীতিকার থেকে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী পর্যন্ত তখন বেতনভোগী ছিলেন। ঘরের পরিবেশে স্বজন পরিজনের মত কাজ করতেন তাঁরা, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখার জন্যে যে-কোনো কাজ। তাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাও ছবির জন্য গল্প লিখেছেন, লিখেছেন চিত্রনাট্য, পরিচালনা করেছেন স্বাধীন চিন্তধারা নিয়ে। পরিচালকের ওপর খোদকারি করতে আসতেন না প্রযোজক, যদিও সে বিদ্যে তাঁদের জানা ছিল। জোরে হুটহাট ঢুকে পড়তেন না।

তাই বলছিলাম, স্টুডিও ছিল ঘর-ঘরনী এবং ঘরোয়ানা একত্রে। আর আজ স্টুডিওতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা কেউ একান্নবর্তী নন, ফ্ল্যাট বাড়ির ভাড়াটে বাসিন্দার মত: যাঁরা ছবি তুলতে এবং তোলাতে আসেন তাঁরা যেন আসেন ভাড়া করা বিয়েবাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতে।

গত বছরের শীতের দুপুরে। বারান্দায় ঝোলানো দোলনায় এক ঠ্যাং মুড়ে বসে তিনি তখন আমের আচার সাঁটছিলেন। রোদ্দুরে চুল মেলা। মুখের অবস্থা কিন্তু খুব সুবিধের মনে হল না। যদিও নর্মাল রেস্পিরেশনের মত দোলনাটি দুলছে।

রসিকতা করে বললাম, 'অ্যারে বাপ। একি বিরহের দোলা নাকি! দাদা কোথায়?'

'ঠাকুরপো, আমি তোমার ইয়ার?' বিদ্যুৎ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে আবার নির্লিপ্ত মনে আচারের সদ্ব্যবহারে লাগলেন। বৌদির আমার বয়স খুব বেশী নয়, দাদা একটু বেশী বয়সেই ওঁর পাণিপীড়ন করেছেন। বয়সের তুলনায় আরো বেশী ছেলেমানুষি করেন বউদি যখন চটে যান। বুঝলাম, নির্ঘাত কিছু ঘটেছে। ভাটার অপেক্ষায় দাদা নিকটেই হয়ত কোথাও ঢাকা দিয়ে আছেন।

হঠাৎ বউদি আবার মুখ খুললেন, কিন্তু এবারে স্বগতোক্তি মনে হল, 'মিনসের ভীমরতি হয়েছে! পুরনো মুখে আর চলছে না।'

...এক চোখে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের ঠুলি...

'ছিঃ বউদি!' সবিনয়ে জানালাম, 'ওই-সব ট্র্যাডিশনাল ল্যাংগুয়েজে গুরুজনদের ডাকতে নেই। দাদা কোথায়?'

হাসি চাপছেন মনে হল। আমাকেও মাথা তর্জনী অধরোষ্ঠে শাসন করে নাকের ডগা কুঁচকে ওপরে উঠলো। চোখের কাজলকালো তারা দুটোও সেই সাথে কপালে তুলে ফিক্ করে লুকিয়ে নিলেন। আমিও হদিস পেয়ে দোতলায় ছুটলাম।

গিয়ে দেখি, দুই সাকরেদ নিয়ে দাদা খেলায় মশগুল। তিনজনের হাতেই তেরখানেক তাসের চালাচালির, মনোযোগ দিয়ে নিজের নিজের হাত দেখছেন।

'টু হার্টস্!' বলেই একজন দুখানা তাস ঝাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে দাদা একখানা পিঠোপিঠি মারলেন, 'এই রঙের বিবি!'

দাদার এক চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের

ঠুলি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, কাছে গিয়ে দেখলাম ঠিক তাই, তাস নয় ফটোগ্রাফ।

'কি দাদা, প্রজাপতি অফিস খুললেন নাকি রাতারাতি?'

হ্যা হ্যা করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন দাদা, 'তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, এসো। আমার নতুন ছবি হৃদয়-পঞ্জিকার (নাম গোপন করলাম) জন্য মেয়ে বাছছি। হার্টশেপ্ মুখ, পটের মত চোখ, শ্যামলা রঙ, কোঁকড়া চুল হলে ভালো হয়। মোট কথা, সেই ক্যারেকটার মনে আছে তো?'

প্রায় তিন শ ফটোগ্রাফ এসেছে। ট্যারা-বাঁকা কদাকার মুখও আছে। সব মেয়েই মনে মনে নিজেকে হিরোইন ভাবে। ছবির জন্য নতুন মুখ খোঁজা আজকাল যে ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে, গল্পকে রিয়্যালিস্টিক এবং নায়িকানায়ককে পূর্ববর্তী ছবির ইমিটেশন-মুক্ত করার জন্যে শুধু এইমাত্র কারণ, ভাববার কোনো কারণ নেই।

নায়িকারা অনেকেই শুধু রূপের নয়, গুণের আধার। সেই অভিনেত্রীদের মধ্যে [illegible] এক, এমনও আছে। টাকার অংক লক্ষচ্যুত হতে রাজী নন, উপরন্তু ডেট্ পেতে পরিচালকের [illegible] হবার দাখিল। তার ওপরেও কথা আছে। আপনারা হিরো কাকে করছেন, অমুককে? অসম্ভব। তা হলে আমাকে এ যাত্রা মাপ করতে হবে। অবিশ্যি নির্ভীক [illegible] যদি নেন...। এই ডায়ালগ, ওঃ হর্‍্যাবল্। এ আমার মুখে রুচবে না। গল্পের এণ্ডটা একটু বদলান না মশাই। এতো আর রূপকথা নয়! আউটডোর কোথায় করছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

আদিকালের যেমন সিনেমায় হবু নায়িকাকে প্রায় ফুসলে আনতে হতো, আজ অবশ্য ঠিক তার বিপরীত। একটি বিজ্ঞাপন দিন পাত্র-পাত্রী কলমে, হুড়মুড় করে চিঠি আসবে, ছবি আসবে, সুযোগ পেলে টেলিফোন আসবে।

কিন্তু তবু মনের মত মেয়ে পাওয়া সত্যিই কঠিন, আজো কঠিন। সত্যিকারের ক্যারেকটার-বলা (অন্য অর্থে) সুন্দরী খুব কমই আছে বাংলা দেশে। যাঁরা আছেন তাঁদেরও সবাইকার ফেস-ফিগার ক্যামেরায় ভালো ক্যাচ্ ওঠে না। ক্যাচাং আছে তার ওপর। আনকোরা মেয়ে আনুন, শুটিং-এর সময় সেটে অন্তত সাতজন ঘুরঘুর করবে। বিবাহিতদের অবিশ্যি অনেক সময় সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু ইয়ের ব্যাপার আছে সেখানেও। খালি পেটে ছবিতে স্বাক্ষর করালেন, কোয়ার্টার ইয়ার পরে ফ্লোরে গিয়ে দেখলেন কনটিনিউটি মিলছে না, তিনি দিব্যি একটি বন্দ্রস্থ করে বসে আছেন।

প্রথম দিকে নায়ককে যেমন বরাবরের জন্য ডিরেকটারকেও তেমনি, প্রতি রাত্রে নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালতে হয়। অভিনেতা অম্লান বদনে বলতে পারেন, ক্যামেরার বাইরে এক চুল এগোন নি। হয়ত কনডেন্সড সিনগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন, নায়িকার সঙ্গে যেখানে হাইফেন পর্যন্ত ঘুচিয়ে রীতিমত সমাসবদ্ধ হয়েছেন, সেই ঘনত্বও ক্যামেরার কারসাজি মাত্র, এ কথা বলতে বাধা কি। কিন্তু পরিচালকের অ্যালিবাই কোথায়?

তবে কিছু কিছু দাম্পত্য কলহ মধ্যস্থেন সিনেমা পত্রিকার ধরেন্ধরেরা। শুটিং-এর অবসর যাপনের তথ্যচিত্র, রহস্যা-লাপের গুপ্তকথা, এবং এডিটর সেন্সরের ছাঁটাই করা [illegible] স্যাগল করে নিয়ে আসেন, ছাপ করে ছাপেন। তখন নায়ক ধরা পড়েন হাতে হাতে।

হটার গার্ল আর সুপার হিট ছবির দিকে এক চোখে তাকিয়ে আছেন প্রোডিউসার থেকে ডিস্ট্রিবিউটার সবাই। কিন্তু আমার [illegible] নিয়ে সেক্সসমাজ ছবি তুলতে গিয়ে পরিচালককে ভুগতে হয়। এইসব [illegible] হাতে চুকেছেন [illegible] দিন [illegible] হবার জোগাড়, কিন্তু টাকা আর [illegible] হয় না। নতুন বউ শ্বশুরঘরে ঢুকেছে তো আর বেরুতে চায় না।

বিলিম ইণ্টারের মধ্যে ইদানীং একটি বাই বড় সংক্রামক হয়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে বোম্বাই। এ বিষয়ে কোনো টিপ্পনী না কেটে বলতে পারি, পরিচালকদের কাছে এই বোম্বাই এখনও বাংলা দেশের স্টুডিওর সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি-বিশেষ। সেখানে এখনো পরিচালকের ত্রিশঙ্কু অবস্থা আসেনি।

আপনার কথাই ধরি, পরিচালক হিসেবে আপনি একেবারে নবাগত নন। গল্পকে সী-অফ্ করে সিম্বল টুর্নামেন্টে নেমে পড়েছেন যে-সব নব-নীত পরিচালকের দল, আপনি তাদের গোত্রের নন। তবু ফিনান্সিয়ার আপনাকে মাঝপথে ত্যাগ করে গেছে। অগত্যা গাড়ি বেচে দিয়ে, বসতবাড়ি স্ত্রীর গহনা মর্টগেজ রেখে ছবি শেষ করেছেন। কিন্তু ছবিও আপনাকে শেষ করে রেখে গেছে। যেমন তেমন প্রকারে ছবি তুললেও যেখানে নেগেটিভ কস্ট্ দেড় থেকে দু' লাখ, তারপর প্রিন্ট পাবলিসিটি আছে, সেখানে একটি ছবি মানেই আপনার জীবিত সমাধি। কিন্তু Hall-ধরনের হাত করতে হলে যে পরিমান রূপোর কাঠি চাই আপনার তা নেই। সুতরাং ভালো সময়ে ভালো রিলিজ্ চেন পাওয়া তো দূরে কথা, আপনার ভাগ্যে দু' তিন বছরের গর্ভযন্ত্রণা অবধারিত। অথচ আপনি জানেন খুঁটির জোর থাকলে 'প্রিম্যাচিয়র্ড' বেবিও সেন্সার-এডিটিং-এর পরদিনই খালাস হয়, ফরসেপ-ডেলিভারীর প্রয়োজন হয় না।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, অচিরেই ভারত বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে। তাঁর এই ঘোষণায় অনেকেই হাসাহাসি করিয়াছেন এবং বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—আপনি ঠাকুর খেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু

আমরা হাসাহাসি করিনি, কেননা চাল রপ্তানির প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে রেশনে ইতিমধ্যেই চাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং চাঁদসদাগরিতে সপ্তডিঙায় চাল বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা হরিমটর নিয়ে হরি-হরি করব; এবং বল হরি হরিবোল করতে হলেও দুঃখ করব না; প্রাণ গেলেও দাতা হরিশচন্দ্র এবং কর্ণের ঐতিহ্য তো বাঁচবে।"

চাউল প্রসঙ্গে অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ, বিহারের খরা অঞ্চলের জন্য বাংলার কংগ্রেস সরকার চাউল পাঠাইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু এতে খরা অঞ্চলে প্রীতিধারার বর্ষণ এক ফোঁটাও হয়নি; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক সংবাদে শুনলাম, বিহারে প্রায় দেড় হাজার কংগ্রেসকর্মী শুধু কংগ্রেসই ত্যাগ করেন নি, 'কংগ্রেস ছাড়' ধ্বনিও তুলেছেন—একেই বুঝি বলে—যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর!!"

কংগ্রেস, নির্বাচন, রেশনের উদ্দাম তর্কবিতর্কের মধ্যে আমাদের জনৈক সহযাত্রী অকস্মাৎ অন্য কথা পাড়িলেন বলিলেন—"অন্নচিন্তা চমৎকারা বলে একটা কথা শুনেছিলাম, কিন্তু এই ক'দিন কলকাতায় যা শুনছি তাতে মনে হলো টেস্টের টিকিট-চিন্তা ছাড়া চমৎকারা চিন্তা আর নেই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মানুষ হা টিকিট হা টিকিট বলে হন্যে হয়ে ঘুরছে: তা ঘুরছেন বটে, টিকিট পাবেন কোথায়? যাঁরা সত্যিই দিতে পারেন তাঁরা এখন অজ্ঞাতবাসে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ধরলে বলে—'মাইরি বলছি আমি নিজেই এখনো টিকিট পাইনি'। টিকিট তো দেবেই না, আবার মা মেরীর অপমান!!"

এই প্রসঙ্গে অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা কী বলছেন মশাই, আমার নিজের স্ত্রীর কথাটাই বলছি। উনি কোন এক অফিসে কাজ করেন, সেখান থেকে খবর পেয়েছি, তিনি দুটি টিকিট সংগ্রহ করেছেন—একটি নিজের আর একটি সহ-কর্মিণীর (থ্যাংক গড, সহকর্মী নয়!) জন্য। তাঁর কাছে একটি টিকিট চাইতেই তিনি বললেন—'টিকিট? ক্ষেপে গেলে নাকি? টিকিট কোথা পাব?'—বলেই হাসলেন। সেই হাসিটি দেখে থিয়েটারের গান মনে পড়ল—হাসি হেরে কেঁদে মরি!"

প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। —"অথচ আমরা

শুনেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়েছিলেন—কংগ্রেসং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

টিকিটের প্রসঙ্গ আর শেষ হয় না। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"শুনছি পাড়ায় পাড়ায় নবীনরা ক্লাব, গ্রন্থাগার, ইস্কুল, যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বদলে নির্বাচনী কার্যের পারিশ্রমিক বাবদ টিকিট চাইছেন এবং বলে দিয়েছেন—যাঁরা দেবেন আমরা তাঁদের, আমরা বাঁ-দক্ষিণের ধার ধারি নে!!"

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের দেখার জন্য দমদম এয়ার পোর্টে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল কিন্তু দর্শনার্থীরা নিরাশ হইয়াছেন, এয়ার কর্পোরেশনের একটি বাসে তুলিয়া তাঁহাদের অন্য পথে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এটাকে বোধ হয় বলা যায় উইণ্ডিজদের প্রথম গুগলি, চীনাম্যানও বলতে পার।"

এক সংবাদে প্রকাশ, বেতারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা চিন্তা করা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"ব্যবস্থা পাকা হলে ভালোই হয়। তবে বিজ্ঞাপনের সেরা বিজ্ঞাপন 'পাত্র-পাত্রী'র বিজ্ঞাপন চলবে

কিনা, কিংবা দ্বিতীয় সেরা বিজ্ঞাপন 'উচ্চ-শিক্ষার্থে বিদেশে গমন"-এর ব্যবস্থা থাকবে কিনা সে সম্বন্ধে সরকারী প্রতিশ্রুতি পেলে ঐ ঐ ধরনের বিজ্ঞাপনদাতারা উপকৃত হবেন।"

অন্য এক সংবাদে জানা গেল, ভারত সরকার আইন করিয়া মেয়েদের বিবাহের বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর করিবার একটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"বলতেই হবে উত্তম প্রস্তাব, যদিও জানি, যৎকিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড সাপেক্ষে গৌরীদান সারদা আইন প্রবর্তনের পরেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা ভাবছি অন্য কথা; সর্বনিম্ন বয়স না হয় ২১ হলো, কিন্তু সর্বোচ্চেও বিয়ের একটা বয়স থাকা উচিত এবং উচিত তা বর এবং কনে উভয়ের ক্ষেত্রেই!!"

কলিকাতায় শুনিলাম মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। —"হতে পারে। কিন্তু পুরুষ বেশী হলেও পুরুষোত্তম-এর সংখ্যা নেই, ফলে দিনে দিনে আইবুড়োর সংখ্যাই বাড়ছে; ব্যাপারটা প্রায় রেশন কার্ডের মতোই জটিল হয়ে উঠছে।"

ছুটির দিনেও জোর করিয়া স্বামীকে দিয়া ঘরসংসারের খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ করাইবার অভিযোগে ম্যানিলা-র জনৈক স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করিয়াছেন এবং মামলা জিতিয়াছেন। —"বুঝলাম, ভদ্রলোকের শ্বশুর মশাই 'জামাতৃবাহন নন এবং হলেও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তাঁর নেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কূলের সন্ধানে এর্নাকুলম
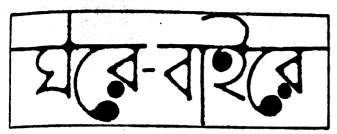
এবারে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইন্‌স্টিটিউশনের দশম বৈঠক বসেছিল এর্নাকুলমে। ২৬শে ডিসেম্বর কেরালার রাজ্যপাল উদ্বোধন করলেন। মিটিং কনফারেন্স সবের জন্যই কোচিন বন্দর সংলগ্ন এর্নাকুলমের কদর বেড়েছে। বিশেষ, শীতকালে যখন কাশ্মীর যাওয়া কষ্টকর! I S Iএর মিটিং-এর একটি বৈশিষ্ট্য এবার একেবারে নূতন। ও'রা গৃহস্থর ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে আলোচনা করবার একটি বিশেষ দিন রেখেছিলেন। সেদিন Standards for the home হয় আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করেন প্রধানত ঘরণীরা কারণ কেনাকাটার দায়িত্ব বেশীর ভাগই আজকাল তাঁদের দায়িত্ব। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন। আলোচনার বিবরণ পরে জানাবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া বলেছিলেন, কষ্টি যেমন শিক্ষার সার, স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান তেমন শিল্প পণ্যোৎপাদনের সার। বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রী, কল কারখানার উৎপাদনে স্ট্যাণ্ডার্ড না হলে অবশ্য আধুনিক দুনিয়া অচল, কিন্তু মানের প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনেও নেহাত অবর্জনীয় হয়ে উঠছে। কলকারখানা ভিত্তিক সভ্যতায় ঘরের বহু জিনিস বাজারে পণ্য। সেই পণ্য সম্বন্ধে সতর্কতা বা সচেতনতাও তাই সুখী স্বচ্ছ সংসারের লক্ষ্য এবং ব্যাপকভাবে জাতীয় লক্ষ্য।

কল কারখানাময় সভ্যতার আগেও মানের জন্য ব্যস্ততার সীমা ছিল না। শেক্সপীয়র বলেছিলেন, "There is a measure in every thing." মানুষের বুদ্ধিগত উপলব্ধির প্রথম সাধনাই ছিল পরিমাপণ। যেদিন মানুষ লিখতে শেখেনি, সেদিন সে মাপতে শিখেছিল। মাপতে শিখেছিল প্রথম, তারপর সে গুণতে শিখেছিল। মাপতে শিখে সে শিল্পচেতনায় সূত্রপাত করেছে। ছুতোর হয়েছে, কুমোরের চাকা ঘুরিয়েছে, রচনা করেছে সভ্যতার প্রথম ভিত। সেই বনিয়াদের উপর উত্তরকালে জীবনের প্রতিটি কীর্তি, প্রতিটি সাধনার সিদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে। পরিমাপ শিল্প বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সেই বিজ্ঞান আমাদের দৈনিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে গভীরভাবে, ব্যাপকভাবে।

যে দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড অথবা মাপ-কাঠি আর ফিতে কেনাকাটার নিত্যসঙ্গী, তার ইতিহাসও বড় বিচিত্র। কত অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়ে আজকের মাপ এসেছে তার সীমা নেই। স্যাকশন যুগের ইংলণ্ডে এক ইঞ্চির মাপ ছিল চারটি যবের দানার পাশাপাশি রাখা দৈর্ঘ্য। রাজা এথেলস্টান তো বার্লিদানাকে ওজনের বাটখারাও বানিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও অল্প দিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ওজন স্বীকৃত হতো। ছালি, পালি সব নানারকম নামও ছিল। ক্রেতা তাতে কখন কতটা ঠকে যেতেন জানি না, আজকের দশমিক ওজনের সহজ হিসেবে অসাধু ব্যবসায়ীর হাত এড়াতে তাঁরা কতটা পেরেছেন বলা কঠিন। তবে এড়াবার একটা পথ হয়েছে বলা যায়। নিরাশ হবার কিছুই নেই। তথাকথিত উন্নত দেশেও আধুনিক কালে দাঁড়িপাল্লার প্রবঞ্চনায় পাগলপ্রায় গৃহিণীরা একত্র হয়ে সাজার ব্যবস্থা করেছেন এমন নজীর যথেষ্ট আছে। শিকাগো

কেরালার নারিকেলকুঞ্জ

শ্যামলে শ্যামল (কেরালার আর একটি দৃশ্য) শিল্পী : বি রামমূর্তি

শহরে ১৯০৭ সালে একটি মহিলা ক্লাব ছিল "Women's Full Weight Club' তাঁদের দাবি খুচরো বাজারে ওজনে, মাপে ঠকানো চলবে না। মাছ মাংস, মাখন সব জায়গায় ওজনের তারতম্য দেখে তো ক্লাবের সভ্যারা গেলেন ক্ষেপে। একদিন লেক মিশিগানের তীরে এনে ফেললেন রাশি রাশি তরাজু, কাঠের তৈরী কুনকে, ফিতে ইত্যাদি। জ্বালিয়ে দিলেন লেলিহান অগ্নি-শিখা। সেই চিতায় ওজন করবার সব কিছু ছাই হয়ে গেল। শিকাগো শহরের পৌর নায়ক এসে সাহায্য করলেন। পৌর নায়কটি ছিলেন বুদ্ধিমান। ইলিনয়স প্রদেশে নারীর ভোটাধিকার পাবার ছয় বছর আগেকার ঘটনা এটি। তবু পৌরকর্তাটি জানতেন সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটালে নারী আহত ভুজঙ্গিনীর মত সর্বনাশা রূপ ধারণ করতে পারে। রাজনীতিতে পরোক্ষ-ভাবে তার যা প্রভাব তাতেই তাঁর আসন টলে উঠবে! এর পরে আর তুলাদণ্ডের প্রবঞ্চনা শিকাগো গৃহিণীদের ভোগ করতে হয় নি।

আমাদের দেশে কেনাকাটার ব্যাপারে আমরা বিশেষ নৈরাশ্যজনক মনোভাব গ্রহণ করি। একত্র হতে পারলে শিকাগোর গৃহিণীর মত ব্যবসায়ীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। শুধু কি ওজন, বেশ নামকরা প্রতিষ্ঠানের জিনিসে পর্যন্ত স্ট্যাণ্ডার্ড বা মানের অভাব সর্বদা পাই। জমাট দুধের কৌটো কাটুন, মনে হবে আগের কৌটোর দুধ যেন আর একটু ঘন ছিল, জেলি জমানোর যে প্যাকেট পাওয়া যায় তাতে আগের প্যাকেটে যতটা জেলি হতো মানে যতটা জলীয় পদার্থ জমতো, আজকের বাজারে ঐ একই প্রতিষ্ঠানের জেলি ক্রিস্ট্যাল দিয়ে ততটা জলীয় পদার্থ জমে না। সাবানের ব্যাপারে দেখুন, মনে হবে যেন আগের চেয়ে সাবানটা একটু ছোট অথচ দিন কতক আগেই প্রসাধনীর একদফা দাম বাড়লো। হয়তো এসব জিনিসের কিছু কিছু I S I মার্কা যুক্ত এবং মান সম্বন্ধে মাত্রার বাইরে যায়নি। কিন্তু I S I তো একটা ন্যূনকল্প মান-এর ব্যবস্থাপত্র বা নির্দেশ দেয়। পণ্যচিহ্ন বা ব্র্যান্ড সম্বন্ধে মালিকানা দায়িত্ব কি তাতে সব সময় বজায় থাকে? ক্রেতা ব্র্যান্ড সম্বন্ধে যা আশা করে ঠিক তাই তার প্রাপ্য নয় কি? বিদেশে এই মালিকানা দায়িত্বও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। যৌথভাবে মালিকানা দায়িত্ব পালন করে দেশে বিদেশে আশ্চর্য রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করা মানক চিহ্নেরও অভাব নেই। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে যখন যুক্তরাজ্যের তৈরী সোনারুপোর জিনিস আমদানি হতো তখন তাতে "হল" মার্কা থাকতো অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন। এই হল মার্কা সরকারী বা আংশিক সরকারী মান নয়। স্বর্ণকার রৌপ্যকারদের সমবায় সঙ্গ বা guild-এর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা চিহ্ন মাত্র। অথচ এই Hall মার্ক কথাটি ইংরাজী ভাষায় উৎকর্ষের সংজ্ঞা-বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে অবলীলা-ক্রমে ক্রেতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার প্রয়াস তাও ক্রেতার উদাসীনতাপ্রসূত।

বর্তমান সংকটে মূল্যস্ফীতি অসাধু ব্যবসায়ীকে আরও অন্যায় করার সুযোগ দিয়েছে। সামান্য কম দাম দিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের জিনিস তারা চালিয়ে দিতে পারছে। বিপর্যস্ত ক্রেতা অল্প ব্যয়-সংকোচের লোভ সামলাতে পারে না। নকল, নিম্নমান, ভেজাল সবই কেটে যায় তার আর্থিক সামর্থের অভাবের সুযোগ নিয়ে। যেসব উন্নত দেশে ক্রেতার আর্থিক অবস্থা আমাদের চেয়ে শতগুণে ভাল সেখানেও মূল্যমাত্রা বজায় রাখতে নিম্নমানের পণ্য খদ্দেরকে দিতে ব্যবসায়ী কখনও সাহস করে না। ক্রেতা সেখানে সদা সচেতন। কোন জিনিসের কি দাম হওয়া উচিত তাও সে জানে, কারণ ক্রেতা সমিতির তরফ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের দেশে ক্রেতা সমিতি গঠনের যে চেষ্টা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টি-টিউশনের সহযোগিতায় কয়েক বছর আগে করা হয়ে গেল, তা বলতে গেলে সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। সাধারণের মধ্যে সাড়া জাগেনি বলে আন্দোলন হিসাবে খদ্দের দল সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সমিতি Consumer's Association of India-র শেষ তো আপনা থেকেই বছর কয়েকের মধ্যে হয়ে গেল। কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে দুটি সমিতি গঠিত হয়েছিল, তার কাজকর্ম এমন কিছু হয়নি, যা সাধারণের সামনে তুলে ধরা যায়। এর্নাকুলমের অধিবেশনে ঘরণীরা যদি আবার উৎসাহ পান, তবে হয়তো বা আন্দোলন হিসাবে ক্রেতা সমিতিতে আবার প্রাণসঞ্চার হ'তে পারে। ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টি-টিউশনের অনুকরণে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশনও একটি মহিলা উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছিলেন। দেশের কয়েকজন সমাজসেবী মহিলা কর্মী উপদেষ্টা সমিতিতে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, উপদেষ্টা সমিতির অবস্থাও প্রায় ঐ C A I-এর মতই। সাধারণ ক্রেতাও তাঁদের পরামর্শ দান থেকে কি উপকার পেয়েছে, বলা কঠিন। মহিলা উপদেষ্টা সমিতি ঘরোয়া জিনিসের মান নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সাহায্য করবেন, কেউ আশা করে না। প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁরা মতামত দিতে পারেন। সে মতের মূল্যও বড় কম নয়। অধিবেশনে উপদেষ্টা সমিতির দায়িত্বে আবার নূতন উৎসাহ আনা যায় কি না, আলোচনা করলে হয়তো বা এ দুর্দিনে কিছু ভরসা বা আশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। আমাদের মনে হয়, খদ্দের সমিতি যদি একটি আলাদা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহসা নাও পারেন, অঞ্চলে অঞ্চলে যে-সব সমিতি বর্তমানে নানা সমাজ কল্যাণ করছেন বা যে-সব মহিলা সমিতি বহু গঠনমূলক আয়োজন সার্থকভাবে সম্পন্ন করে চলেছেন, তাঁদের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন, তবে হয়তো কাজ সহজ হতে পারে। দশ-বিশজন ক্রেতা একত্র হয়ে "দমদম দাওয়াই" দিলেন, দিনকতক ক্রেতা-বিক্রেতা টানাটানি চললো, আবার সেই পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হ'লো, এতে সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু স্থায়ী উপকার হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ীই হয়। মূল্যস্ফীতির যে পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি, ভেজাল আর প্রবঞ্চনার যে যন্ত্রণায় প্রত্যেক খদ্দের নাজেহাল, তাতে দীর্ঘস্থায়ী, দৃঢ়সংকল্প আন্দোলন বজায় রাখা দরকার। সরকারের আইনে যা ফল হয়নি, প্রতি নাগরিক, প্রতি ক্রেতা সচেতন হ'লে তাতে ফল হবে। বড় শহরের মহিলারা কর্মী হিসাবে কম, তা বলতে চাই না, তবে পল্লী অঞ্চলে মহিলা কর্মীদের অন্তরে যে নিষ্ঠা দেখেছি, তার তুলনা নেই। তাঁদের অনেকের আত্মপ্রচারের সুযোগ-সুবিধা নেই, অথচ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কোথাও বা কারও দাওয়ায়, কোথাও বা ঠাকুরদালানে আর পাঁচজনকে একত্র করে নানা কল্যাণের পথ চিনে নেবার চেষ্টা করেন। সেই একই নিষ্ঠায় একত্র হ'য়ে ব্যবসায়ীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালাতে পারেন। শোভাযাত্রার প্রয়োজন নেই, ঝাণ্ডার দরকার নেই, কিছু কষ্টস্বীকার করে বর্জন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক একঘরে করে ব্যবসায়ীদের সাজা দেওয়া সম্ভব। সংগঠনের প্রয়োজন মাত্র, আর কোন আয়োজনের দরকার হয় না। শুনেছি, কেরালার জলহাওয়া, শ্যামল গাছপালা, আয়তনয়না দীর্ঘকেশী রূপসী বাংলা দেশকে মনে করিয়ে দেয়। সেই পল্লব ঘন প্রকৃতির পরিবেশে, রুক্ষ, কঠিন জীবন-যাত্রায় যদি এতটুকুও শীতল ছায়া আনবার ব্যবস্থা অধিবেশনের প্রতিনিধিরা করতে পারেন, তবেই তাঁদের আসা-যাওয়া, আয়োজন সবই সার্থক বলতে পারি। শাসন-ব্যবস্থার যেমন বিকেন্দ্রীকরণই লক্ষ্য, সমাজ কল্যাণও বিকেন্দ্রীকরণ করে দেখুন, যে-সব উৎসাহের খবর শহরে পৌঁছোয় না, তাদের শুভ ইচ্ছার মূল্য কতখানি।

শ্রীমতী

রিভিয়েরা উপকূলের প্রাচীন মানচিত্র

ইউরোপের স্বপ্ন-রাজ্য রিভিয়েরা

জুলফিকার

ভূমধ্য সাগরের রিভিয়েরা উপকূল ইউরোপীয় ধনী ও বিলাসীদের লীলাভূমি। এই রৌদ্রোজ্জ্বল, ফুলেফলে ভরা মনোরম সমুদ্রতটভূমি শুধু ইউরোপের [illegible] ও প্রমোদান্বেষী সারা বিশ্বের [illegible] ও ধনী সম্প্রদায়ের পরম লোভনীয় [illegible]।

রিভিয়েরার কিছু অংশ পড়েছে ফ্রান্সে, কিছুটা ইতালীতে। মার্শেই (Marseilles) থেকে মঁতো (Mentone) পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা এবং মানতোনের পর থেকে স্পেজিয়া (Spezia) পর্যন্ত ইটালীয়ান রিভিয়েরা।

[illegible] আমলে ফোনিসিয়ান বা অ-ইউরোপীয় শৌখিন ধনী ব্যক্তিদের আড্ডা গড়ে উঠেছিল এখানে। টায়ার ও সিডন থেকে ফিনিসীয় বণিকেরা জাহাজ নিয়ে রিভিয়েরা উপকূলে যাতায়াত করত; ফলে, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩৫০ সালের মধ্যে এখানে কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠে—নেমোসা, মাসিলিয়া, অ্যান্টিপোলিস, নিকিয়া প্রভৃতি। নেমোসা হচ্ছে হালের নীম (Nimes), মাসেলিয়া হচ্ছে মার্শেই, ফ্রান্সের বৃহত্তম বন্দর ও দ্বিতীয় শহর। অ্যান্টিপোলিস ও নিকিয়ার বর্তমান নাম আন্টিব (Autibes) ও নীস (nice)। রিভিয়েরা উপকূলে অবস্থিত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাজ্য মোনাকোর গ্রীক নাম ছিল মোনেয়কস (Monoikos)। নীস গ্রীকদের আমলে একটা নামকরা জায়গা ছিল। নীসের প্রসিদ্ধ কার্নিভাল সেই গ্রীক আমল থেকেই চলে আসছে। ওটা ছিল গ্রীকদের ফুল উৎসব—যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশার দিন; অসংযত ও উদ্দাম কোন আচরণের জন্য কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল না এদিনে।

রোমান যুগে রিভিয়েরা সমুদ্র তীরে বহু প্রাসাদ ও উদ্যানবাটিকা নির্মিত হয়েছিল, রোমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শীতকালটা প্রায় এখানেই যাপন করতেন।

রিভিয়েরা উপকূলে বর্তমানে পৃথিবীর ধনকুবেরদের অনেকেরই ভিলা বা প্রাসাদ আছে। বছরের বেশ কয়েক মাস এখানেই কাটান তাঁরা। গত একশো বছর ধরে অভিজাত ইংরেজ ও ইউরোপ এবং আমেরিকার বড়লোকদের এখানে অবসর যাপন করাটা একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ আবার এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছেন।

নিউপোর্ট, পামবীচ, কান (CANNES—কানের ফিল্ম ফেস্টিভালের কথা গত কয়েক বছর ধরেই আমরা শুনে আসছি) দোভিল (Deauville), মন্তে-কার্লো, সন সেবাস্টিয়ান প্রভৃতি স্থানগুলিতে আন্তর্জাতিক ধনী ও শৌখিন চেঞ্জারদের ভিড় লেগেই আছে।

যেমনি চমৎকার জলবায়ু, তেমনি মনোরম পরিবেশ—মেঘমুক্ত আকাশ, পর্যাপ্ত সূর্যালোক, শান্ত সাগরের সুনীল বিস্তার...সদা জাগ্রত বসন্ত। মানুষের ম্রিয়মান মন নিমিষে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

গত মহাযুদ্ধের আগের কথা বলছি।

প্যারী থেকে সন্ধ্যে ৭-২৫ মিনিটে দক্ষিণগামী ট্রেন ছাড়ে—নাম 'ব্লু ট্রেন'। ভূমধ্য সাগরের ধারে তুলোঁয় (Toulon) এসে পৌঁছায় পরদিন বেলা সাড়ে বারোটায়। ব্লু ট্রেন অনেক হোমরা-চোমরা ব্যক্তিকে বহন করে আনেন। যাত্রীদের কেউ প্রিন্স, কেউ ডিউক, কেউ বা মার্কুইস, কেউ বা উচ্চ সামরিক পদে অধিষ্ঠিত, কেউ বিরাট ব্যাঙ্কার, কারো আছে আমদানি রপ্তানির ফলাও কারবার, কারো লোহার কারখানা, কেউ কফি বা রাবার বাগানের মালিক, কারো আছে টেক্সাসে তেলের খনির শতকরা চল্লিশখানা শেয়ার, কেউ সারসাপারিলার একমাত্র রপ্তানিকারক, পৃথিবীর বাজারে। প্রাচ্য রাজ মহারাজদের কেউ কেউ চলেছেন—সাথে পর্বতপ্রমাণ মালপত্র লোক-লস্কর, বেয়ারা, বাবুর্চি, সেক্রেটারী সঙ্গে চলেছেন বহুমূল্য শাড়ি পরিহিতা উজ্জ্বল হীরার কণ্ঠি ও দুষ্প্রাপ্য মুক্তার মালা গলে রাণী বা বেগম সাহেবা। চলেছেন ব্যারনেস, ডাচেস, ইয়াংকি টাইকুনদের পুতুল-কায়া গৃহিণীরা। চলেছেন দু হাতে টাকা-ওড়ানো নিষ্কর্মা ধনী যুবকেরা—নিত্যনতুন ফুর্তির খোঁজে যাঁরা উন্মুখ। যাত্রীদের মধ্যে আছেন ভোজনরসিক—ফরাসীতে যাদের বলে গুরমে (Gourmet), আছেন অজীর্ণ-জর্জর বা বাতগ্রস্ত প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া। গলফ ব্যাগে

রিভিয়েরার আধুনিক মানচিত্র
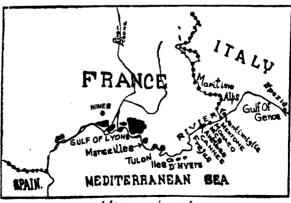
হরেক রকম ক্লাব ও নিবলিক (niblick) ভর্তি করে চলেছেন কোন শিল্পপতি গলফ খেলোয়াড়। র‍্যাকেট সাথে নিয়ে আসছেন উদীয়মান টেনিস স্টার—যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের প্রয়াসী। নতুন উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন কোন খ্যাতনামা লেখক। চিত্রকর চলেছেন রঙ, তুলির গোছা আর ইজেল নিয়ে। মধুচন্দ্র যাপনে চলেছেন নব দম্পতি।

যাত্রীদের মধ্যে আছেন হলিউডের তারকারা—চিত্রজগতের গ্ল্যামার গার্ল যাঁরা। ধনবতী বিধবাদের জুটী হিসাবে চলেছেন, সুবেশ, স্মার্ট তরুণ জিগোলোরা (Gigolo), যাঁদের সমুদয় ব্যয় বহন করছেন তাঁদের বর্ষীয়সী প্রণয়িনীরা। যাচ্ছেন জুয়াড়ীরা, ভাগ্যের দ্বারা বারংবার উপেক্ষিত হয়ে যাঁরা রাতারাতি বড়লোক হবার সুযোগ নিতে চলেছেন—মন্তে কার্লোর রুলেট টেবিলে। যাত্রীদের মধ্যে চোর জোচ্চোরও আছে কেউ কেউ। সুযোগমত লোক ঠকিয়ে কিছু টাকা হাতড়ানোর আশায় ওদের দলে ভিড়েছে। হয়ত কোন পলাতক ব্যাংক লুণ্ঠনকারী এখানে এসে অন্য নামে আমিরী চালে দিন কাটাচ্ছে, তারই সন্ধানে আসছেন কোন ছদ্মবেশী অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে।...

ব্লু ট্রেন যখন লিগুরিয়ান আল্পসের সানুদেশে এসে পৌঁছয়, তখন সহসা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের দ্বার খুলে যায়। একধারে অভ্রংলিহ হিমচূড় আল্পস, অন্য দিকে আদিগন্ত সুনীল জলরাশি নীল আকাশের সাথে মিশে আছে। সমুদ্রের বুকে সাদা পাল তুলে ভেসে চলছে নৌকা, ত্বরিত ডানা মেলে উঠে চলে সী-গাল, পাহাড়ের গায়ে, থাকে থাকে সাজানো বাড়ী, উদ্যানের তরুলতার পুষ্পিত সুষমা...। ঘুমজড়ানো চোখে গাড়ীর জানলা দিয়ে একবার আল্পসের ঋজু উন্নতির দিকে তাকান মৃণালভোজীর দল। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা চলে গেছে অনেক উঁচুতে, এঁকেবেঁকে। গ্রীক, ফিনিসীয়, রোম্যান ও স্যারাসেনেরা—যারা এই পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করেছিল, পর্বতগাত্রে ঝুলন্ত চত্বর ও অলিন্দ নির্মাণে যারা অসামান্য স্থাপত্য-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে—তাদের কথা ভুলেও এই অলস ধনী যাত্রীদের মনে আসে না। এঁরা ভেসে চলেছেন জীবনজোয়ারে। পুরানো দিনের খোঁজ করে কি লাভ? ইতিহাসের সাল-তারিখ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? সোনালী সকালে সাগরবেলায় ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে রৌদ্র উপভোগ করা, প্লাসফোর এঁটে ক্যাডিকে সাথে করে গলফ লিংকে ছুটোছুটি করা, কানে (Cannes) পাল-তোলা নৌকোর ঝাঁক, ক্যাসিনোর সবুজ বনাত মোড়া জুয়ার টেবিলে নিজস্ব পদ্ধতির পরীক্ষা, রেস্তোরাঁর ব্যালকনীতে বসে নানা-দেশী সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ, জাজের উদ্দাম বাজনা শুনতে শুনতে প্রাক যুদ্ধ আমলের ফরাসী বার্গাণ্ডি বা স্কচ হুইস্কি ও সোডার গ্লাসে চুমুক দেওয়া—এগুলোতেই তাদের অধিকতর আগ্রহ।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করবার জন্যে সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা পোস্টার রেলস্টেশনের দেওয়ালে আঁটা, সাময়িক কাগজে ও পত্রিকায় হোটেলগুলোর জেকদারী বিজ্ঞাপন—

LOVELY BEACH—PANORAMIC VIEW!
Modern Comforts! Excellent Cusine! Superb Music!
— French and Italian Wines —
Bathing — Yatching — Rowing — Fishing — Motoring — Tennis — Dancing — Fencing — Golfing — Picnics.
CASINO & BAR ALWAYS OPEN
Black Jack. Chuck-a-luck, Slot Machines etc., etc.

নবাগতদের জন্যে আছে ম্যাৎর দোতেল (Maitre d' hotel) বা হোটেলের ম্যানেজার, সেফ (Chef), ব্যাণ্ড মাস্টার, সংবাহক (Masseur), মুদ্রা বিনিময়কারী, কেশবিন্যাস করবার জন্যে আছে কোয়াফ্যোর (Coiffeur), আছে ম্যানিকিউরিস্ট, পেডিকিউরিস্ট, আমেরিকা-ফেরত দন্তচিকিৎসক, নৃত্য-শিক্ষক, রুলেট টেবিলের পরিচালক ক্রুপিয়ে (Croupier), স্নানের সময় ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া দেয় যারা (Bath chairmen), গলফের থলে বইবার ছোকরারা (Caddies)—সবাই চারধার থেকে হাত বাড়িয়েই আছে—হুজুরদের খিদমত করবার জন্যে।... তীর্থের পাণ্ডাদের মত এরা বা এদের এজেন্টরা ধনী টুরিস্ট দল তাদের লটবহর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ট্রেন থেকে নামলেই ছেঁকে ধরে তাদের।

ব্রিটেনের চ্যান্সলার লর্ড ব্রুহাম ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এখানে বেড়াতে এসে কারান্তিন (Quarantine) আইনে আটকা পড়ে যান, কয়েক সপ্তাহের জন্য। কানের মনোরম দৃশ্য ও চমৎকার জলবায়ু তাঁর খুবই পছন্দ হল। তিনি জমি কিনে এখানে একটা বাড়ি তৈরি করলেন। জায়গাটার প্রশস্তি-বাচক প্রবন্ধও লিখলেন কাগজে। ডাক্তার ও রোগী মহলে বেশ কিছুটা সাড়াও জাগল, ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন লোকেরা বায়ু পরিবর্তনের জন্য একে একে এ অঞ্চলে আসতে শুরু করলেন। লর্ড ব্রুহামের শেষ জীবনটা এখানেই কেটেছে। ভদ্রলোক নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কান শহরের পিছনে পাহাড়ের মাথায় তাঁর সমাধি আছে, ল্যাটিনে লিখিত একটা স্মৃতি-ফলক রয়েছে তাতে। পাশেই অন্টরোজের চতুর্থ ডিউকের কবর।

রিভিয়েরার জনপ্রিয়তার মূলে আছে ইংরেজদের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও প্রচার। লর্ড ব্রুহামের কান আবিষ্কারের অনেক পরে ১৮৫৯ সালে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক—ডাঃ হেনরী বেনেট (Benett) মনতনে (Mentone) এসে বাস করতে লাগলেন। এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, বেনেট কাগজে এখানকার যে একটা অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশ করেন তাতে বারক্লেদের (Barclays) এখানে এসে তাদের ব্যাঙ্কের একটা শাখা খুলতে প্ররোচিত করেছিল।

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া শীতকালটা এখানেই কাটাতে লাগলেন। ক্রমে রিভিয়েরার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বিখ্যাত লেখক ল্যুই স্টিভেনস (R L S) হিয়্যারে (Hyeres) লা সলিবাদ নামক ছোট্ট ফরাসী ভিলায় বেশ কিছুদিন বাস করে গেছেন। এখানেই তিনি তাঁর A children's Garden of Verse—বইখানা লেখেন।

আর একজন ইংরেজ—সাংহাইয়ের ধনী বণিক—স্যার টমাস হ্যানবেরী লা মর্তোলায় এসে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা সুরম্য প্রাচীন প্রাসাদ ক্রয় করলেন। পাশেই একটি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খাদ (gorge)। মালয়, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে বহু রকমের ট্রপিক্যাল গাছপালা আমদানি করে বাগান সাজিয়েছিলেন স্যার টমাস। সত্যিই দেখবার মতন বাগান। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও উদ্ভিদবিদদের অনেকেই তাঁর এই সুন্দর বাগানটি দেখতে এসে তাঁর আতিথ্যে আপ্যায়িত হয়েছেন। এখনও বাগানটি আছে, কিন্তু পূর্বের সেই গৌরব আর নেই। এককালে স্যার টমাসের বাগানের মত এত অদ্ভুত ও দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতার সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোন বাগানে ছিল কিনা সন্দেহ!

Antibes-এর ভটেয় ক্যাপ হ্যান্তিবে অবস্থানকালে ইংরেজ লেখক গ্র্যান্ট অ্যালেন এখানকার বিষয়ে নিয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ কাগজে বার করেছিলেন। তারই ফলে স্নানের স্থান হিসেবে জুয়াঁ লে প্যাঁ'র (Juan-Les-Pins) খ্যাতি রটে গেল। বাস্তবিকই সমুদ্র স্নানের পক্ষে এত চমৎকার জায়গা আর দুটি পাওয়া যাবে না। কানের পরেই সম্ভ্রান্ত ধনীদের (cote de azur) এটা একটা বিশেষ প্রিয় আড্ডানা (rendezvous)।

রিভিয়েরায় সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন স্থান হচ্ছে নীস্ (Nice)। গ্রীকেরা একে বলত 'নিকিয়া'। তারা তাদের বিজয়লক্ষ্মীর (Goddess of Victory) নামে এই শহরের নামকরণ করেছিল। ল্যুভের ম্যুজিয়ামের সিঁড়ির উপর এই বিজয়াদেবী-মূর্তি সংস্থাপিত আছে।

নীসের সমুদ্রতটে পদচারণার জন্য প্রোমেনাদ দা জাংলে (Promenade des Anglais) নামক বাঁধানো রাস্তা দু' মাইলের ওপর লম্বা, ১৮১২ সালে আরম্ভ হয়ে ১৮২৪ সালে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। গত তিরিশ বছরে নীসে আমেরিকানদের প্রতিপত্তি ইংরেজদের চেয়ে ক্রমেই বেড়েই চলেছে। ইংরেজদের অনেকেরই 'কানই'* বেশী পছন্দ। নীসের কার্নিভালে গেলে ইংরেজ ও ইয়াঙ্কি চরিত্রের বৈষম্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইংরেজরা বাইরের লোকদের সামনে হই-হুল্লোড়ে যোগ দেওয়াটা কৃষ্টি ও আভিজাত্যের বিরোধী বলে মনে করে। আমেরিকানদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ পৃথক। তারা এসে জোটে যেখানে হই-চই, উদ্দাম ফূর্তি! আনন্দস্রোতে তারা অবাধে গা ভাসিয়ে দিতে চায়।

হিয়ার থেকে জেনোয়া পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় তটভূমি দু' হাজার থেকে তিন হাজার ফিট উচ্চ, অবিচ্ছিন্ন শৈলপ্রাকারে বেষ্টিত। তারই পিছনে মাথা উঁচিয়ে আছে সাত হাজার থেকে আট হাজার ফিট উঁচু আল্পস গিরিশ্রেণী। হিয়্যার থেকে ফ্রেজু (Frejus) ও সাঁ রাফায়েল পর্যন্ত খর্বতর পর্বতমালার নাম লা মন্তাই দ্য মর (Les Montaignes des Moures) অর্থাৎ মুরদের পাহাড়। সাঁ রাফায়েল থেকে থ্যেউল (Theoule) পর্যন্ত 'কানে'র কাছাকাছি এই পাহাড়ের নাম এস্তরেল পর্বত। যেমন "অদ্ভুত এর গঠন, তেমনি আশ্চর্য মনোরম বর্ণরাজির সমাবেশ এর গায়ে, তারপর আরম্ভ হয়েছে "আল্প্ মারিতিম" (Alps Maritime)—নীস থেকে ভেন্তিনিগ্লিয়া অবধি। খানিক দূরে গিয়ে আবার লিগুরিয়াল আল্পস, জেনোয়ার কাছে গিয়ে আপেনাইন গিরিশ্রেণীর সংগে মিশেছে। এই বিভিন্ন পর্বতমালা—একটি পেছনে একটি —উত্তরে ঠান্ডা হাওয়া 'মিস্ত্রাল' থেকে রিভিয়েরার উপকূলকে রক্ষা করছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালু শাখা (Spur) নেমে এসেছে সমুদ্রের দিকে। এদের আশেপাশের খাঁজগুলো ট্রপিক্যাল বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছন্ন।

হিয়্যারে এসে চোখে পড়ে খেজুর গাছ, উন্নত ইউক্যালিপটাসের সারি, অ্যাগেভের (Agave) বা ঘৃতকুমারীর ঝোপ, নানা জাতের ক্যাকটাস্—ইংরেজ টুরিস্টদের অনেকে আবার তাদের গায়ে ছুরি দিয়ে আপন আপন নাম-ঠিকানা খোদাই করে রেখে গেছে।...

ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে কাতর উত্তরাঞ্চলের ভ্রমণকারীরা সহসা আফ্রিকার তট থেকে বয়ে আসা উষ্ণ বাতাস আর অমিত সূর্যালোকের স্পর্শে যেন নিমেষেই নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। লণ্ডনের বিশ্রী কুয়াশা দিনের পর দিন দেখে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছে রিভিয়েরার এই অজস্র সূর্যকিরণ আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় মনে হয়। তবে ইয়াংকিদের কিন্তু ওটা ঠিক অভিভূত করতে পারে না। ওদের দেশে প্রায় সবখানেই প্রচুর রৌদ্র পাওয়া যায়।

প্যারীতে রাতের ট্রেনে ঘুমিয়ে-পড়া যাত্রীদের চোখে যখন সকালের রোদ এসে লাগে, আর যখন তারা ভূমধ্যসাগরের জলে নীল আর সোনালী রঙের খেলা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, তখন তাদের মনে হয়—যেন তাদের সম্মুখে এক মায়ারাজ্যের দরজা খুলে গেছে।

এই আশ্চর্য সূর্যালোকের উজ্জ্বল প্রাচুর্য দর্শনে রিশার ল্যো গাইয়েন (Richard Les Galliene লিখছেন—

'I had never seen such sunshine uptill then, and I realised why the sun is a god and not a goddess; for the southern sun of Riviera is male indeed. "male of the female earth" ... There seems, indeed, something almost brutal in the masterful force of this sternly generative light, though his kiss is soft, if fierce and his breath is laden with musk Masterful, yet very friendly, very healing.... One can almost imagine even physical wounds being healed by the mere operation of this potent light, the golden touch of this radiant, inexhaustible god.'

* কানের ফিল্ম ফেস্টিভালের কথা আমরা গত কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি। এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় ভারত প্রশংসনীয় খ্যাতি অর্জন করেছে।

...মহাদ্যুতিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

পাহাড়ের ঢালুতে সারি সারি অলিভ বা জলপাই গাছ, তারই ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র বর্ণের বাসন্তী পুষ্পের সমারোহ—পাভি দ্য শাভান্নের (Pavis de Chavannes) কথা মনে করিয়ে দেয়। সারবন্দি জলপাই তরু, তারই নীচে ফুটে আছে অজস্র ভায়োলেট, এর পর আবার এক থাক জলপাইয়ের গাছ, তলায় বিকশিত হায়াসিন্থ, ফের শ্রেণীবদ্ধ জলপাই গাছ, তাদের নীচে যেন গোলাপের ঝাড়গুলো হলদে ফুলে ভরে উঠেছে, না-হয় এক ঝাঁক অ্যানিমোনে তাদের প্রগলভ হাস্যে দর্শকদের চমক লাগাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এই-ভাবে পাহাড়ের গায়ে নেমে চলেছে গাছের সারি আর ফুলের স্তর—নীচে সমুদ্রের ধার অবধি।

কোথাও মাঝে মাঝে অলিভ গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে উন্নত চিরতুষিত কর্ক গাছ। এ ছাড়া আছে নানারকম ফলের গাছ, তাদের শাখা ফলভারে অবনত —তুঁত, ডুমুর, পীচ, ন্যাসপাতি, কমলা, স্তবকে স্তবকে আঙুর ঝুলছে দ্রাক্ষালতায়। প্লাম ও বাদাম গাছগুলো হালকা রঙের মঞ্জরীতে ছেয়ে আছে। ...

জ্যাসমিন তার মৃদু সৌরভ বিলাচ্ছে। অনন্তযৌবনা নারীর মত এক রহস্যময় মাদকতা তাকে ঘিরে আছে। সাদা রঙের ভিলাগুলো পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো। তাদের প্রায় প্রত্যেকের সামনে ফুলবাগিচা—সেখানে ফুটেছে রক্তিম জবা (Hebiscus), সোনালী মিমোসা, কোথাও বা ম্যাজেণ্টা রঙে মেসেমব্রিয়ানথিমম (Mesembryanthemum)। পুরোনো ভাঙা পাঁচিলের গা বেয়ে উঠেছে বহু রঙের ফুলে-ভরা লতা, তার কদর্যতা ঢেকে দিয়েছে কুসুমের আস্তরণে—মনে হয়, ওদের গায়ে কে যেন একখানা বিচিত্র বর্ণের গালিচা ঝুলিয়ে রেখেছে।...

কোথায় শ্রেণীবদ্ধ সাইপ্রেস গাছ। উত্তরে হিমেল হাওয়া বিস্তারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোন একসময় ওদের লাগানো হয়েছিল।

খাড়া পাহাড়ের গায়ের ঝুলন্ত অলিন্দে দাঁড়িয়ে বহু নিম্নে সমুদ্রের শোভা দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। বিস্তৃত নিস্তরঙ্গ সাগর—কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও গাছে-ঢাকা পাহাড়ের ছায়া পড়ে জল ঘোর মসীবর্ণ। প্রভাতের রক্তিম আলোর স্পর্শে সৈকতভূমি মভ (Mauve) রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। ঈষৎ পীতাভ শুভ্র ফেনপুঞ্জে আঁকা দীর্ঘ সমুদ্রতট। নৌকো চলেছে সাদা পাল তুলে, জলের গা ছুঁয়ে উড়ে যায় সিন্ধু-শকুন।.....

এক অপার্থিব শান্তিতে মন ভরে ওঠে। মনে হয়, কল্পলোকের একখানা ছবি বাস্তব রূপ নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

এই বর্ণবৈচিত্র্য, এই উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য, পুষ্পের উজ্জ্বলতা, গিরিগাত্রের গম্ভীর বলিরেখা ও রুক্ষ ধূসর, কঠিন মাটির সাথে যেন কিছুতেই খাপ খেতে চায় না।

হিয়ার থেকে যতই পূব দিকে যাওয়া যায়, প্রকৃতির রমণীয়তা ততই বেড়ে চলে, কানের মাইল কয়েক পিছনে গ্রাস (Grasse), পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছোট্ট শহর—Rock City। পাথর কেটে তৈরী হয়েছে রাস্তা, চত্বর, অলিন্দ। এখান থেকে পৃথিবীর নানা দেশে সুরভি-নির্যাস বহু দিন ধরে রপ্তানি হয়ে আসছে। এর পর মোনাকো—যেখানে পাহাড়ের ঢল সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর চলে গেছে; তারই উপর নির্মিত হয়েছে অগুনতি বাড়ি, ছোট্ট ভিলা থেকে সুরম্য প্রাসাদ—সমুদ্রের কোল থেকে ঊর্ধ্বে আকাশের সীমা পর্যন্ত—জল থেকে অনেক, অনেক উপরে, যেখানে দাঁড়িয়ে নীচে তাকালে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।

পাহাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের পাশে পাশে চলেছে রাস্তা—প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, অনেক উঁচুতে—রোমানদের এ এক অপূর্ব কীর্তি! কী প্রভূত অর্থ ও শক্তি ব্যয়েই না এই পাষাণ সড়ক নির্মিত হয়েছিল। কোথাও অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে রাস্তা বেঁকে গেছে, নীচে নীলাভ অরণ্যসংকুল গভীর খাত, তারই উপর খিলান গেঁথে সেতু তৈরি করা হয়েছে। কোথাও বা মর্মরের আলিসা বাঁধা হয়েছে রাস্তার দুধারে। এই আলিসা (Corniche) হয়েছে সমুদ্রের মাঝ থেকে থাম গেঁথে তারই উপর—প্রাচীন স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন! এই স্থাপত্যকার্যে খানিকটা রোমানদের পূর্ববর্তী গ্রীকদের ও পরবর্তী তুর্কী বা সারাসেনদেরও অবদান রয়েছে। সবচেয়ে উঁচুতে গ্রাঁ কর্নিস, আর সব থেকে নীচুতে হচ্ছে 'কর্নিস দ্য অর'—সমুদ্রতল থেকে ফিট কয়েক মাত্র উঁচুতে। মোটরে বেড়ানোর পক্ষে এমন চমৎকার ও রোমান্টিক পথ আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ।

শিলঙ বা দার্জিলিং-এর রাস্তার চেয়ে এ অনেক সুন্দর। যেমনি পাহাড়ের দৃশ্য, তেমনি রয়েছে সমুদ্রের অপরূপ শোভা দার্জিলিং বা শিলঙের ধারে কাছেও সমুদ্র নেই। প্রমোদান্বেষী ভ্রমণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক চিত্তহীন ব্যক্তি এ পথের মহিমাময় সৌন্দর্যে অভিভূত না হয়ে পারবে না। ...আর মোটর ভ্রমণে অসুবিধা কিছুই নেই। মাত্র শ' তিনেক ফ্রাঁ খরচ করলেই সানরেমো থেকে মার্শেই পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়। ভাড়াটে ট্যাক্সির অভাব নেই এদিকে।

জো গাইয়েন এই উপকূল সম্বন্ধে বলেছেন—

'There is no coast line on the earth that seems so literally like 'the shores of old romance' .. those little rock-towns bound together with arches, like a hornet's nest against the Saracens and earth-quakes .... those little white ports dizzily down with a silent lace of foam curving about their moles and ragged beaches, for those whom the words "Provence" and "Savoy" send off into a dream of troubadours, feudal lords and ladies, all the chivalry of Arabia and Spain and all the perfume of those mysterious eastern lands so near yet so far; for all who cherish such lovely knowledge there is no stretch of earth's surface so drenched with dreams, so fragrant of the poetry of human story.'

এই অমিত রৌদ্রলোক, এই অনুপম নিসর্গশোভা, এ কি শুধুমাত্র বিলাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষী ধনীদের জন্য? সমুদ্রোপকূলবর্তী এই স্থানগুলিতে বিলাস-ব্যসনের স্রোত অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে। আমোদের নেশায় এক-এক রাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে ভোজের টেবিলে বা জুয়ার আসরে। শুধু একটা সাধারণ তৈরি করতে অম্লানবদনে কয়েক শ' পাউণ্ড খরচ করছেন কোন কোন আমেরিকান ধনকুবের।......

ধনের এই অপচয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ বা ঈর্ষান্বিত কিংবা যাঁরা কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন, তাঁরা স্বীকার করুন, চাই না করুন, ঐশ্বর্যের সত্যিই একটা মহিমা আছে, যা মানুষের মনের উপর একটা হিতকর প্রভাব বিস্তার করে। রাতে আলোকোজ্জ্বল ভোজনাগারগুলির অরকেস্ট্রায় ভাগনার, বাক, শোপাঁ (Chopin) বিঠোফেনের সুমধুর সুর-লহরী জেগে ওঠে। সমুদ্রের জলে আলোর ছায়া কাঁপে, বাতাসে ভেসে বেড়ায় সুরের করুণ ক্রন্দন বা উদ্বেল আনন্দ। সুরের অপার বিস্ময় মানুষকে ভুলিয়ে দেয় তার বর্তমান, তার বন্ধ্যা ভবিষ্যৎ, তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে এক কল্পরাজ্যে—পৃথিবীর দুঃখশোক নিষ্ফলতার ক্ষোভ, আশঙ্কার চঞ্চলতা—এ-সবেরই নাগালের বাইরে।

কানের শান্ত সাগরজলে নাচো নৌকোগুলোর 'অমল ধবল পালে' যখন সন্ধ্যার 'মন্দ মধুর হাওয়া লাগে' অথবা সাঁ রাফায়েল থেকে সাঁ রেমো পর্যন্ত শষ্পাবৃত গলফলিংকে, প্লাসফোর-পরা

প্রাচীন খেলোয়াড়েরা যখন সোনালী সকালে বলের পেছনে উৎসাহে ছোটাছুটি করেন, কিংবা সুবেশ প্রাণবান তরুণ-তরুণীদের হাস্যোজ্জ্বল কলগুঞ্জনে যখন বেলাভূমি মুখরিত হয়, তখন জড়তা ও অবসাদ কাটিয়ে উঠে মনটা হঠাৎ যেন কেমন সতেজ হয়ে ওঠে।

রিভিয়েরায় নিত্যনতুন আগন্তুকদের মধ্যে ইংরেজ ও আমেরিকানদের সংখ্যাই বেশী। ইংরেজদের আভিজাত্যের খ্যাতি সর্বত্র। বাইরের বড় বড় হোটেলগুলিতে ইংরেজ লর্ড-লেডীদের মক্কেল পেলে আর কাউকেও চায় না (ইংরেজ পিয়ারদের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিশ্যি শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তবুও ওদের নীল রক্তের ধারেকাছে কি মার্কিনী হঠাৎ-নবাবেরা (Noveaux Riches) ঘেঁষতে পারে। ইংরেজদের খনদানী ভাব প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞান পেতে ওদের ঢের দেরি।)

ইংরেজ ভ্রমণকারীদের অনেকেই আসেন হয় গল্‌ফ খেলার উদ্দেশ্যে (এমন চমৎকার গলফলিংক পৃথিবীর আর কোথাও মেলা ভার), না-হয় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায়, কেউ অবিশ্যি আসেন স্রেফ খাবার জন্য। জুয়ো খেলার নেশা ইংরেজদের বিশেষ নেই। আমেরিকানরা আসে ফুর্তির খোঁজে, নাচ-গান হই-হুল্লোড় করতে, না-হয় জুয়োর টেবিলে দু হাতে টাকা ওড়াতে।

খাওয়ার মতলব নিয়ে এসেছেন যাঁরা, তাঁদের কেউ কেউ আবার নিজেদের সুসজ্জিত বাষ্পীয় বজরায় (Yatch) চেপে ঘুরে ফেরেন দেশে দেশান্তরে নতুন নতুন ভোজ্যের সন্ধানে। হয়ত সুদূরে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের দিকে পাড়ি দিচ্ছেন কিং ফিশের (King fish) লোভে, মিয়ামীতে এসেছেন কচ্ছপের সুপ (Turtle Soup) খাবেন বলে, (এখানে বিরাট বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপ পাওয়া যায়, আর তাদের ঝোলের কি স্বাদ!) সুমধুর রসাল তাজা ডুমুর ও চেরী ফলের সন্ধানে গেছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। হনলুলুর টাটকা আনারস ও তাহিতির সদ্য আহৃত নারকেল শাঁসের আকর্ষণে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌকা ভাসিয়েছেন। রিভিয়েরায় এসে জুটেছেন বুইয়াবেসের লোভে।

মার্শেইয়ের Bouillabaise-এর খুব নাম —অতি উপাদেয় খাদ্য। ইংরেজদের যাঁরা এর আস্বাদ একবার পেয়েছেন, তাঁদের রসনা এর জন্য লালায়িত। বুইয়াবেস হচ্ছে নানারকম সামুদ্রিক মৎস্য, তরকারি ও মসলার সংযোগে এক রকম ঝোল, যার বর্ণনা Thackeray তাঁর Ballad of Bouillabaise-এ দিয়েছেন—

> The bouillabaise a noble dish is
> A sort of soup or broth or brew
> Or hotch-potch of all sorts of
> fishes
> That Greenwich can never
> outdo.
> Green herbs, red peppers,
> mussels, saffron
> Soles, onions, garlic, roach and
> dace
> All these you eat at terres
> tavern
> In that one dish of bouillabaise.'

রিভিয়েরায় হরেক রকম মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও ঝিনুক (Oysters) পাওয়া যায়। তা ছাড়া, সুরসাল ফল ত আছেই। ঔদরিকের রসনা তৃপ্তির কোনই অসুবিধা নেই। সুরাও মেলে নানা জাতের। সর্বপ্রকার ফরাসী মদ্য পাওয়া যায়—গোরসী (Georcy), মাঁক (Macon), কঁইয়াক (Cognac), পোমার (Pommard), ক্লোদে ভুজে (Clos de Vouget); ইটালীয়ান কিয়ান্তি (Cianti), সারত্রোজ (Chartreuse) তারও অভাব নেই। বিলেতী সাহেবরা হুইস্কির পক্ষপাতী, হাল্কা মদের দরকার হলে অর্ডার দেন ক্যারেটের।

ফুর্তির সবচেয়ে জোর আড্ডা মন্তে-কার্লোয়, ইংরেজী ও ফরাসী গল্প-উপন্যাসে মন্তেকার্লোর উল্লেখ অনেক পাওয়া যায়।

নবদম্পতির মধুচন্দ্রিকা যাপনের এটা আদর্শস্থল।

চিত্রকর ও লেখকদের শিল্প ও সাহিত্য প্রেরণা জাগানোর পক্ষে এর মত জায়গা পাওয়া ভার।

মন্তেকার্লো মোনাকো রাজ্যের রাজধানী, জুয়াড়ীদের মক্কা-কাশী।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাজ্য মোনাকো।

বিস্তৃতি অর্ধবর্গমাইল, জনসংখ্যা বিশ হাজার (বহিরাগতদের বাদ দিয়ে ধরলে)।

মোনাকো রাজ্যের একমাত্র আয় রুলেৎ (Roulette) টেবিল থেকে। জুয়ার টেবিল থেকে মোনাকোর প্রিন্সের যে আয় হয়, অনেক রাজা, মহারাজা, শিল্পপতির তা ঈর্ষা উদ্রেক করবে।

ফ্রাঁসোয়া ব্লাঁর (Francois Blanc) হামবুর্গে মস্ত বড় জুয়ার আস্তানা ছিল। ১৮৬১ সালে তার লীজ শেষ হলে ব্লাঁ মোনাকো এসে ওখানকার রাজা প্রিন্স চার্লস (Charles III) কাছ থেকে পঞ্চাশ বছরের কনসেসন পান রুলেৎ টেবিল সানোর। প্রথম লীজ ফুরিয়ে যাবার পর ফের লীজ মিলেছে। মোটা নজরানার বিনিময়ে। লীজের ব্যাপার নিয়ে মোনাকোর প্রজারা আদৌ মাথা ঘামায় না। জুয়ার ইজারা ও টেবিলের লভ্যাংশ থেকে রাজ্যের যে প্রচুর অর্থাগম হয়ে থাকে, তাতে প্রজাদের ওপর কোন ট্যাক্স চাপানোর দরকার হয় না।

এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা তাই সম্পূর্ণ করভারমুক্ত।

অনেক বিদেশী ধনী ও রাজা-মহারাজা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বরোদার ভূতপূর্ব মহারানী সীতা দেবী এই রাজ্যের নাগরিকা।

মৃণালভুক (lotus-eaters) ধনীতনয়েরা খরচ করবার জন্য যাঁরা হাতে অঢেল টাকা পেয়ে থাকেন, ধনকুবেরদের উত্তরাধিকারিণী বিধবা পত্নীরা, প্রাচ্যদেশীয় রাজা নবাবেরা, বিত্তশালী নিষ্কর্মার দল—সবাই ভিড় জমান রুলেৎ ও তাসের টেবিলের চারপাশে। অনেক ভাগ্যান্বেষী ও কিছু ঠগজোচ্চোরও জুটে যায়, বড়মানুষদের প্রলুব্ধ করে যারা মোটা কিছু হাতানোর তালে থাকে।

রিভিয়েরায় জিনিসপত্র সুলভ। অল্প খরচায় ভালভাবেই থাকা যায় এখানে। অবিশ্যি টুরিস্টদের ভিড় যখন খুব বেশী হয়, জিনিসের দর তখন স্বভাবতই কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। রিভিয়েরা উপকূল শুধু প্রমোদকামী ধনীদেরই স্বর্গরাজ্য নয়, শান্তিপ্রিয় স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক —কবি, লেখক, চিত্রকর, দার্শনিক বা উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ বা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চর্চা করে থাকেন—সবার কাছেই এ পরম আকর্ষণীয় স্থান।

হিয়্যারে এক জাতের প্রজাপতি পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও যা মেলে না। স্যার টমাস হ্যানবেরীর লা মর্তোলার প্রাচীন প্রাসাদ সংলগ্ন প্রসিদ্ধ উদ্যানে এখনও অনেক বোটানিস্ট দুষ্প্রাপ্য ট্রপিক্যাল তরুলতার সন্ধানে এসে থাকেন।

অরর দ্য প্রোভাঁস (Auror de Provance), ভেন্স ও জেনেভে দু হাজার বছর আগের গিরিগুহা আছে—পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে সেগুলো একান্ত দর্শনীয়।

চিত্রশিল্পী যাঁরা আসেন এখানে, তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘাটি হচ্ছে আন্তিব ও নীসের মাঝে কাঁই সুর মারে (Cagnes Sur Mer)। কাঁই ও তার সন্নিকটে সাঁ পল ও জেনেভে জনা কত মার্কিনী চিত্রকর ও সাম্প্রতিক ফরাসী আর্টের চাঁই (শাগাল মাৎস) মিলে একটা আধুনিক স্কুল বা Barbizon গড়ে তুলেছেন।

চিত্রপ্রদর্শনী

রমা ঘোষ ও ঝরণা চৌধুরীর চিত্র প্রদর্শনী। আর্টস অ্যাণ্ড প্রিনটস গ্যালারী

প্রাই সমতলভূমি আর কিছু দীর্ঘটান রেখা এই নিয়ে রমা ঘোষের চিত্রের কারসাজ (অ্যারেঞ্জমেন্ট)। অবশ্য এই দুয়ের বিশেষত্বের মধ্যে যা পরিচ্ছন্ন, তা হচ্ছে, তাঁর অনুভূতি—যেন কেমন চোখে তিনি সম্মুখের সমস্ত কিছুকে দেখেছেন। তাঁর ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হবে যে তিনি স্কেচই করেছেন; বারবারই তিনি সেই স্কেচ করে বর্তমানতাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন।

এখন ঐ স্কেচে ঘরে বসে রঙ আরোপ করা একটা ঘটনা; সেই ঘটনা খুব আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর 'লিফ-লেস' ছবিতে। এখানে রঙ খুবই আমাদের জানা, কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের যথার্থ কৌশলে তা সাধারণ হয়ে দেখা দেয়নি। তাঁর ৮নং চিত্রের কাজ ও রঙ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই প্রদর্শনীতে তাঁর ৯ খানি চিত্র ছিল।

ঝরণা চৌধুরী, বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়, একাধারে রঙ ও অপ্রাকৃতিক (নন-ফিজিক্যাল) বিষয় অন্বেষণ করতে চাইছেন। এ'র অনেক ছবি কিছুটা কালচে গোছের, এবং এই কালচে দিয়ে একটা বাস্তবতাকে ঘটিয়ে তুলতে আগ্রহী। সব থেকে উল্লেখযোগ্য এবং যা যে-কোন দর্শকের চোখে পড়বে তা হচ্ছে তাঁর রেখা।

এই রেখা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন, এবং জায়গা বিশেষে চমৎকার ব্যবহারও হয়েছে। যেমন গাছে, কতকগুলি পলাতক রেখায় আশা অনুযায়ী গভীরতা এসেছে। কিন্তু রঙ ব্যবহার যথাযথ নয়, কিম্বা এখানে

পি চন্দ্রর একটি ছবি

ব্রাশ ম্যানর কোন সাহায্য করেনি। লালচে ধরনের রঙ, ইণ্ডিয়ান রেড জাতীয়—তিনি ভেবে দেখবেন।

অথচ 'সেইলস' ছবিতে রেখার কাঠামো সাপরিকল্পিত; জলের ভাগও খুবই ন্যায়-সংগত। এখানের অবিকল্প ভাব উপরে নৌকার গঠনকে যেখানে কোন অবিকলভাব (নেচারলইসম) নেই, জেগে উঠতে দিয়েছে। এখানে এর ১২টি ছবি ছিল।

এরা দুজনেই ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস এণ্ড ড্রাফটসম্যানশিপের ছাত্রী।

পি চন্দ্র-র চিত্রপ্রদর্শনী/আর্টইসান্ট্রি হাউস

১৯১৪তে, রেইমো দুসাঁ-ভিইয়' তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "যন্ত্রের ক্ষমতা নিজেকে ক্রমে আরোপ করছে, তাকে ছাড়া আমরা যে মানুষ, (জীবিত—লেভিভা) একথা আমরা ভাবতে পারি না......" এবং এর পর তত্ত্ব ও কাজের দিক থেকে দেখা যাবে ফিউচারইসমকে।

সেখানে যন্ত্রের গতিবেগকেই আরোপ করা একটি লক্ষ্য, অর্থাৎ ছবির সমস্ত স্থানে থাকবে সেই চঞ্চল আবেগ এবং এরপর ধরা যেতে পারে ফেরনান্দ লেজের কথা যাঁর আঙ্গিক যন্ত্রশিল্পের বাস্তবতা থেকে এসেছে তা আমরা জানি। যাকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন—যেমন সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে গাছের পাতা ও আলুলায়িত কেশের মধ্যে।

পি চন্দ্রর বিষয়বস্তু সবই যন্ত্র ও তার সরঞ্জাম। যন্ত্র এখানে কোন রহস্য নয়, সোজাসুজি তা আমরা দেখতে পাই; রঙ ও রেখার জোরে প্রত্যেকটি ছবিতে তারা তাদের নিকটতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি নয়ন সুখকর রঙেও তাদের কাঠিন্য হারায় নি।

যেমন "পাইপস" এখানে যে বেগুনী রঙের ব্যবহার হয়েছে তা আমরা এযাবৎ কুয়াশা ভেদ করা সকালের আলো অসার ছবিতে অথবা সন্ধ্যার আকাশ আঁকতে দেখেছি। এক কথায় যন্ত্রের সাধারণ কালো বা ছাই রঙ এখানে প্রায়ই নেই। অথচ কোথাও ক্যালেণ্ডারের মত একথা যদি কারো মনে হয়, তাহলে আমাদের মনে হয়, সেটা হয়ত তাদের দেখার অভ্যাস বশতই হয়ে থাকবে।
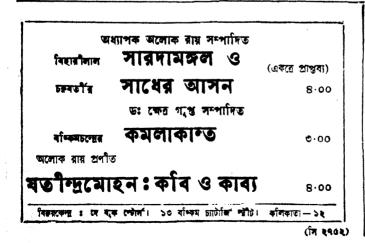
গান্ধীজীর মাদ্রাজ যাত্রা

১২ নভেম্বর তারিখের 'আলোচনা' অংশের নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় আমার বক্তব্য আপনাকে জানাই।

(১) অমরেন্দ্রকুমার সেনের 'গান্ধীজীর সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যাত্রা' সম্বন্ধে বক্তব্যঃ—

লেখক বলিতেছেন, 'গান্ধীজীর সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যাত্রার পশ্চাতপট (পশ্চাৎ-পট?) কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। সোদপুর থেকে সরাসরি মাদ্রাজ যাত্রাকে উপলক্ষ করে...গবেষণা করে শালিমার ইয়ার্ড হয়ে মাদ্রাজ যাবার লাইন বার করতে হয়েছিল। কিন্তু আমরা এই মনে করে কৌতুক অনুভব করছি যে, সোদপুর থেকে নৈহাটি এবং ব্যান্ডেল তথা আসানসোল এবং পরে খড়্গপুর হয়ে মাদ্রাজ যাবার ত রাস্তা ছিল, তথাপি এত পরিশ্রম করে রাস্তা খুঁজতে হল কেন? হয়ত দূরত্ব কিছু বেশী পড়ত। ১৯৪২ (১৯৪৩?) সালে... দামোদরের বন্যায়...ই আই আর-এর অনেক ট্রেন খড়্গপুর ঘুরে আসানসোল হয়ে দিল্লী বা অন্যত্র যাওয়া-আসা করত।'

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ১৯৪৩ সালে দামোদরের বন্যায় মেমারী হইতে বর্ধমান পর্যন্ত রেল লাইন ভাঙিয়া যাওয়ায়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লীগামী ট্রেনের পক্ষে খড়্গপুর-আসানসোল হইয়া ঘুরিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত সোদপুর হইতে দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত মাদ্রাজ যাওয়ার ব্যাপারে আসানসোল-খড়্গপুর হইয়া কোনো ট্রেনের ঐ বিপরীত ও সুদীর্ঘ পথ দিয়া যাইবার প্রশ্নই উঠে না। লেখকের নির্দেশিত নৈহাটি-ব্যান্ডেল হইয়া এবং পরে আমার মতে, হাওড়া হইয়া (কারণ হাওড়া স্টেশনও কার্যত জংশন) মাদ্রাজ যাওয়ার পথ অধিকতর সরল ও সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় পথ হইতেছে, সোদপুর হইতে দমদম জংশন ও ডানকুনি জংশন হইয়া এবং পরে হাওড়া হইয়া মাদ্রাজ যাওয়া। ইহা আরও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু যে শালিমার ইয়ার্ডের পথ তিনটি প্রধান রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার-দের গবেষণাপ্রসূত, সেইটিই সরলতম ও সংক্ষিপ্ততম। কারণ ঐ পত্র-লেখকের জানা নাই যে, দমদম জংশন হইতে মালগাড়ির লাইন, শিয়ালদহ স্টেশনকে উপেক্ষা করিয়া, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া এবং শিয়ালদহ-বালিগঞ্জের মাঝামাঝি স্থানে পুলের উপর দিয়া যাত্রীবাহী গাড়ী লাইন পার হইয়া গঙ্গার ধারে শালিমার ইয়ার্ডের ঠিক পূর্ব-পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঐ খানে গঙ্গার উপরে মালগাড়ি পারাপারের জন্য লাইন-পাতা গাধাবোট, সাজাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর দিয়া মালগাড়ি সরাসরি, গঙ্গার ঠিক পশ্চিম পারে অবস্থিত শালি-মার ইয়ার্ডে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বি এন্ আর-এর (এখনকার সাউথ্ ইস্টার্ন রেলওয়ের) যে কোনো স্থানে যে কোনো ট্রেনের পক্ষে সরাসরি যাওয়া যায়। তাই সুধীর ঘোষ লিখিত সোদপুর হইতে শালিমার ইয়ার্ড দিয়া গান্ধীজীর মাদ্রাজ যাত্রায় কিছুমাত্র কৌতুক বা কৌতূহল অনুভব করিবার নাই।

(২) 'দিল্লী' বনাম 'দিল্লি' (শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত) সম্বন্ধে বক্তব্যঃ—

লেখক রাজধানী শহর দিল্লীর 'দিল্লি' বানানে ব্যথিত হইয়া লিখিতেছেন, 'দিল্লি'-বানান বিকল্পে শুদ্ধ হইলেও বাংলা ভাষায় শহরটার নামে দুরকম বানান ব্যবহার হওয়া শুধু নিরর্থক নয়, দৃষ্টি-কটুও বটে।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমিও এ বিষয়ে লেখকের সহিত একমত।

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য
ভাটপাড়া।

ছাত্র আন্দোলন

গত ১৭ই ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় "আলোচনা" বিভাগে শ্রীসুনীল বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং শ্রীপরিমল পাচাল লিখিত "ছাত্র আন্দোলন এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়" শীর্ষক আলোচনাটি পড়লাম। লেখকদ্বয় নিজেরাও ছাত্র। তাই একজন শিক্ষিত সাধারণ নাগরিক হিসেবে এবং ছাত্র হিসেবে তাঁদের কাছ থেকে আমরা নিরপেক্ষ এবং উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গীর সমা-লোচনাই আশা করি। তাঁদের পত্রের প্রথমাংশ এবং শেষাংশ সম্বন্ধে আমি একমত। কিন্তু মাঝে তাঁরা এক জায়গায় লিখেছেন—"ছাত্র আন্দোলন কলকাতার কলেজে নতুন নয়। তবে এবার নির্বাচনী বৎসর। ছাত্র আন্দোলনের প্রহসনকে জিইয়ে রাখতে পারলে বিরোধী দলগুলির সুবিধা কিঞ্চিৎ বেশীই হবে। কারণ তারা দেশের স্বার্থ দেখে না—ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দেখে না।"

এই উক্তিটি কি নিরপেক্ষ এবং উদার মনোভাবের পরিচায়ক? ছাত্র আন্দোলনের পরিণতি যে ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর তা সত্যিই স্বীকার্য। ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচীও দিন দিন অবনতির পথে যাচ্ছে। কিন্তু এবার নির্বাচনী বৎসর বলেই কি ছাত্র আন্দোলনের এই রূপ? গত কয়েক বৎসর ধরেই ছাত্রদের মধ্যে নানা বিভক্ত মতবাদ প্রচলিত। আন্দোলনও তারা এই প্রথম করছে না। ইতিপূর্বে যে-সব আন্দোলন তারা করেছে, তখনও নিশ্চয়ই নির্বাচনী বৎসর ছিল না। অতীতে যেসব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, পরিণামে তা ভয়াবহ রূপ ধরার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই ছাত্র আন্দোলনের প্রহসনকে জিইয়ে রাখতে পারলেই বিরোধী দলের সুবিধা হবে—এই উক্তিটি নিশ্চয়ই যথার্থ নয়।

সমিতা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৬

(২)

আপনাদের ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সংখ্যা 'দেশ'-এর সম্পাদকীয়টি নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত। প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে আজ যে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে, সে বিষয়ে ওই কলেজেরই একজন ছাত্র হিসেবে কিছু বলতে চাই।

অনেকেই আজ মনে করছেন, এই আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করছে, তাদের পুরোভাগে আছে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। আজকের এই হিংস্র আন্দোলনকে আর যে কেউ সমর্থন করুক না কেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই করে না। শুধু আন্দোলনের কুৎসিৎ চেহারাকেই নয়, অনেক কিছুই যে এই কলেজের বৃহত্তর ছাত্রসম্প্রদায় সুনজরে দেখে না, তা জন-সাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অভিযুক্ত ছাত্ররা কলেজের বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের সহায়তায় পিকেটিং শুরু করে। কিন্তু ক্রমশ এখন সমগ্র আন্দোলনটি চলে এসেছে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নের হাতে। অধ্যক্ষকে যারা ঘেরাও করে ছিল, তারা যে এই কলেজের ছাত্র নয়, সে কথা অধ্যক্ষ নিজেই বলেছেন। পরের দিন এই ঘটনারই জের টেনে যারা কলেজের

ল্যাবরেটরি ভেঙেছে, তারাও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়। অথচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরই পথেঘাটে জনসাধারণের সমালোচনার শিকার হতে হচ্ছে।

বহিষ্কৃত ছাত্রদের সহপাঠীরাই যেখানে তাদের দাবি সমর্থন করছে না, সেখানে অন্যান্য কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির এত দরদের কারণ কি? স্পষ্টত এই আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এবং শুধু এই আন্দোলনই নয়, ইডেন হোস্টেলের অনশন ধর্মঘটেও—যেখানে সমস্ত গোলমালের সূচনা—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কম ছিল না। হোস্টেলে কিছু অব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডঃ মিত্রের প্রতি ছাত্রনেতাদের (আজ তারাই বহিষ্কৃত) আচরণ আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু সেখানেও সংখ্যালঘুদেরই জয় হয়েছিল। জোর করে আমাদের ক্লাস করতে না দিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের (বাম) নেতারা প্রচার করে যে, আমরাই নাকি নিজেদের ইচ্ছায় হোস্টেল আবাসিকদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ক্লাস করি নি। এই ধরনের কয়েকজন ছাত্র-নেতাদর প্রেসিডেন্সি কলেজের

বৃহত্তর ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি মনে করলে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ফেডারেশন (বাম)-এর সমর্থকরা যে নগণ্যতম পি সি এস ও-র Signature Campaign তা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও আন্দোলন প্রতিরোধ করতে পারছি না কেন? এর কারণ, ছাত্র ফেডারেশনের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্য বাইরের সাহায্য পেয়ে আমাদের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করে কলেজ খুলতে গিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা আমাদের অভিপ্রেত নয়।

আজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রী-দের অসহায় ও বিপন্ন অবস্থাটা ভেবে দেখবার জন্যে সুধী জনসাধারণকে অনুরোধ জানাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক ছাত্র

সুজিতকে চিনি না

আমি দেশ পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত ১০ই অগ্রহায়ণে প্রকাশিত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "সুজিতকে চিনি না" ও ২৪শে অগ্রহায়ণে আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত সুধীন দত্ত মহাশয়ের ঐ সম্বন্ধে সমালোচনাও পড়লাম। গল্পটি আমার ভালই লেগেছে—শৈলজানন্দ-বাবুর উপযুক্ত রচনা এবং মৌলিকও বটে। সুধীনবাবু নির্দেশিত আলবার্তো মোরা-ভিয়ার The film testও আমি পড়েছি. 'সুজিতকে চিনি না'তে নীমা বা নীলিমা ঘরের মেয়ে হয়েও সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে, পরে প্রয়োজন বোধে তার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করেছে। The film test-এও তিনজন মেয়ে [illegible] ঐ ভাবেই ব্যবহার করেছে—[illegible] চান্স পাবার জন্য। বাকি সব-দিকেই দুই গল্পের মধ্যে অমিল। এই [illegible] যোগাযোগের জন্য এক লেখক [illegible]র অনুবাদ বা ভাবানুসরণ করেছেন [illegible] করা যে নিতান্তই ভ্রান্তি—শ্রীসুধীন-[illegible] চিঠি লেখার আগে একটু ভাবলেই [illegible] পারতেন।

পিকলু ব্যানার্জী
নিউদিল্লী-৫

সোসাইটি অফ কনটেমপোরারি আর্টিস্টস

নিখিল বিশ্বাস ও দুই দশকের [illegible]লী শিল্পী সমাজ' প্রবন্ধ মাধ্যমে [illegible] শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রতি প্রণব রায় যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তা সময়োচিত এবং আন্তরিকই প্রশংসনীয়। তবে কয়েকটি উক্তি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ঐ প্রবন্ধে আছে 'জন্ম হলো সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর নিখিল, শ্যামল, শৈলেন, অরুণ, সনৎ অহীভূষণ হলেন উদ্যোক্তা'। কিন্তু কোনও দিনই সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সংগে আমার নাম সংযুক্ত ছিল না। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন বোম্বাই শহরে প্রদর্শনীর আয়োজন করার আগে 'ইউনিয়ান অব পেন্টার্স অ্যান্ড স্কাল্পটারস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামে একটি সংস্থা গঠন করার কথা হয়েছিল। শিল্পীরা নিখিল এবং আমাকে ঐ সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক করবেন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু কিছু মতবিরোধ ঘটায় শেষে ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব হয়নি। বোম্বাই-এ প্রদর্শনী হবার পর সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর জন্ম হয় সে কথা ঠিক। নামটি শ্রীমতী কমলা রায়-চৌধুরীর দেওয়া। প্রকাশ, বিজন, নিখিল, সনৎ, অরুণ এবং আমি এই কজনই প্রথম ইউনিয়নের কথা চিন্তা করি। পরে আসেন অন্যেরা। শর্বরী কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টের সভ্য কোনওদিনই ছিলেন না। 'কালকাটা পেন্টার্স' গ্রুপকে কোনও দিনই নীরদ মজুমদার অনুপ্রেরণা যোগাননি। ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর অনেকেই নীরদবাবু সমর্থন করেননি। প্রকাশ কর্মকার সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর সংগে সরাসরি ভাবে কোনওদিনই সংযুক্ত ছিলেন না বলেই আমার জানা। অবশ্য ঐ গ্রুপের প্রদর্শনীতে কয়েকবার তাঁর ছবি প্রদর্শন করা হয়েছিল। আর প্রকাশ এবং একথাও ঠিক নয়। ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে প্রকাশ কর্মকারকেই ধরা যেতে পারে।

অহিভূষণ মল্লিক
কালকাতা-৩৫

ধর্মরাজ পূজায় পিঠবাণ-চড়ক

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৬-র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত "ধর্মরাজ পূজায় আজও পিঠবাণ-চড়ক" প্রবন্ধের লেখক মহোদয়ের অনুসন্ধিৎসার জবাবে এবং দেশ পত্রিকার পাঠকদের অবগতির জন্য লিখিতেছি. আসামের কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনও পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বর্তমানে শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানভুক্ত। কিন্তু ১৯৪৭-এও শ্রীহট্ট শহরের অদূরে গিরিশ রাজার বাড়ীর মাঠে পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। এর পরের খবর আমার জানা নাই। কিন্তু কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনও এই পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। আসামের অন্যান্য জিলায় বাঙ্গালী হিন্দু অধ্যুষিত কোন কোন স্থানেও এখনও চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর শুনিয়াছি।

গত তিন বৎসর একাদিক্রমে কাছাড়ের হাইলাকান্দি শহরে মহকুমাধিপতির আদা-লতের সংলগ্ন মাঠে এই পূজার অনুষ্ঠান আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; হাইলাকান্দির এই চড়ক পূজায় পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক ঘুরানো ত হয়-ই, তদুপরি জিভ এবং শরীরের অন্যান্য স্থানেও বাণ ফুঁড়িয়া সাধক-ভক্ত নানাপ্রকার নৃত্যবাদ্যে যোগদান করেন; তাহা ছাড়া চড়ক যেদিন ঘুরানো হয় তার পূর্ব-রাত্রির "কালী-নৃত্য"ও কম চমক-প্রদ নয়—গভীর রাত্রে সাধকভক্ত মা কালীর রূপে সাজসজ্জা করেন এবং খড়্গ হাতে নানা-প্রকার নৃত্য করিতে করিতে প্রজ্বলিত লকলকে লাল অঙ্গারকুণ্ডের উপর দিয়া নগ্নপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া যান। এখানে চড়ক পূজা চৈত্রসংক্রান্তি দিনে অনুষ্ঠিত হয়; তবে কোন বিশেষ মানত উপলক্ষে বৈশাখ মাসেও আনুপূর্বিক অনুষ্ঠানাদি সহ এই হাইলাকান্দির মাঠেই চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। এতদঞ্চলে যে-সকল চড়ক পূজা দেখিয়াছি তাহাতে চড়ক ঘুরানোর অনুষ্ঠান আলোচ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত বীরভূম জেলার মত গভীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হইতে দেখি নাই। এতদঞ্চলে দিনভর পূজার আনুষঙ্গিক নানা অনুষ্ঠান হয়। বিকালের দিকে পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক ঘুরানো আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার পূর্বেই তাহা শেষ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধের সংগে প্রকাশিত "মেটেলায় জিভবাণ", "মেটেলায় পিঠবাণ" এবং "মেটেলায় চড়ক" এই তিনটি চিত্রই শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে আমার দেখা চড়ক-পূজার অনুরূপ অনুষ্ঠানের সংগে হুবহু একই প্রকার।

শ্রীদিবেন্দু চক্রবর্তী
পাথারকান্দি, কাছাড়।

অরণ্যদেব

টমটম, তুই গিয়ে ওই বাঘের পিঠে ওঠ। তারপর আর, বেশ মানানো যাবে।

অরণ্যদেবকে বাচ্চারা ডাকে ওয়াকার-কাকা!
ওয়াকার-কাকা, আর কদিন আমরা এখানে থাকব?
একটু বাদেই এখান থেকে ফিরে যেতে হবে।

স্বর্গ-দ্বীপে বাঘ-সিংহও অহিংস -----
চলো ছেলেরা, ফেরা যাক।
না না, আর একটু থাকি।
কাটিনা কোথায় গেল?

হিংসা বলে সেখানে কিছু নেই।
ওই তো কাটিনা, হরিণ-শিশুর পিছু নিয়েছে!
না রে কাটিনা, ওকে মারিস না!

হরিণের গায়ে কাটিনা থাবা বসবার আগেই -----
?
দুষ্টু কাটিনাকে বাঘাই শায়েস্তা করে দিয়েছে-----
?

কাটিনাকে ও মারবে না তো?
আরে না না, বাঘা শুধু ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে ও-সব দুষ্টুমি চলবে না ---

বাঘা বলছে, 'মাংস খাওয়া চলবে না, শুধু মাছ খাও!
কাটিনাকে ও মাছ ধরতে শেখাচ্ছে!

আর না, এবারে রওনা হওয়া যাক।
আবার আসব রে!
?

কাটিনাকে ওরা সভ্যভব্য করে তুলুক, তারপর ওকে নিয়ে যাব।
ইয়াও-ইয়াও
চললুম, কাটিনা!
: সুমনা

বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে পিকনিক- রত একটি পরিবার

চা-ঘর ইত্যাদি। ফরম্যাল গার্ডেন হল দু ধরনের : মোগল আর ইংরিজী। মোগল গার্ডেন রাষ্ট্রপতি ভবনে আছে। শ্রীনগরে শালিমার আর নিশাদবাগ মোগলাই বাগিচার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর ইংলিশ গার্ডেন চালু ছিল রাজামহারাজাদের প্রাসাদে, বাংলা দেশের অনেক জমিদারদের বাড়িতে, যাদের বাগানবাড়ির ভগ্নাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডে।

বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কের প্রস্তাবটি করেন জওহরলাল নেহরু ১৯৫৬তে, বুদ্ধের ২৫০০ জন্মদিন উপলক্ষে, যা খুব ঘটা করে পালিত হয়েছিল গোটা দেশে। প্রাকৃতিক কাঠামো বজায় রেখে বিস্তীর্ণ বাগান করার প্রস্তাবটাও জওহরলালের নিজের। জায়গা পছন্দ করেন উনি আর রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন, ২৫শে মে ১৯৫৬। বাগানে ঢুকে বাঁদিকে একটা স্মারক আছে ঐ ২৫শে মে উপলক্ষে।

একটি নতুন প্রস্তাব অনুসারে ঐ স্থানটিতে একটি ৪০ ফিট উঁচু পাথরের গোলাপ-কুঁড়ি স্থাপিত হবে নেহরু স্মরণে, প্রতীক গোলাপ-কুঁড়ি।

এই বাগান এবং নিজামুদ্দিনের সুন্দর নার্সারি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের অধীন। বুদ্ধ জয়ন্তী বাগানের একটি পার্ক কমিটি আছে প্রেমকিষণ সিং-এর সভাপতিত্বে। সভ্যদের মধ্যে আছেন শ্রী এ কে ঘোষ, আই সি এস, ডক্টর বেনজামিনপ্রসাদ পাল (পুসা), শ্রীজগদীশ মাথুর, ডাইরেক্টর হর্টিকালচার, এবং মিসেস মীরা সাহানি।

কিন্তু দেখাশোনা, বাগান-করা, দৈনন্দিন কাজ ইত্যাদির ভার অ্যাসিসট্যাণ্ট ডাইরেক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষের উপর। গত তিন বৎসর ইনি বাগানের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কাজের ভিতর দিয়ে বাগানকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এর আগে ছিলেন মহীশূরে। ঘোষের অধীনে আছে ৭৫ জন মালী ও অন্যান্যরা। একুনে ৭০ একর জায়গার ভিতর ৫০ একরে বাগান ইতিমধ্যে হয়েছে, এবং বাকীটুকু শেষ হতে হয়তো আরো বছর দুয়েক লাগবে।

বছরে এই বাগানের জন্যে খরচ প্রায় দু লক্ষ টাকা, তার ভিতর ৫০ হাজার টাকা শুধু জলের জন্য। এখন প্রায় ৬০ হাজার গ্যালন রোজ পাওয়া যায়, যদিও প্রয়োজন হল ১,৮০,০০০ গ্যালনের। জল আসে যমুনা থেকে। বাগানের নিজস্ব পাম্পে তোলা হয় উঁচু একটা জলাধারে। জলাধারটি চমৎকার, দেখবার মত। একটু চেষ্টা করলে উপরে ওঠা যায় আর সেখান থেকে নয়া-দিল্লির চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সিমেন্ট-করা নালা এঁকেবেঁকে গেছে বাগানের এদিকে-ওদিকে। নতুন ধরনের সাঁকো কয়েকটা আছে। পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেলে, উঁচু জলাধার থেকে নামবে একটা প্রপাত, আর জল নালা দিয়ে বয়ে যাবে। অন্য একটা জলাধারে, সেখান থেকে পাম্প করে আবার তোলা হবে উপরের জলাধারে (যার ছবি দেওয়া হল)। সরকারের পয়সা কম,

প্রতিবেশী সাহিত্য : ওড়িয়া

প্রখ্যাত বাঙালী লেখকদের রচনা নিয়মিতভাবে বিবিধ ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য-কেন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি। অপর-পক্ষে, অন্য প্রদেশীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা বাংলাতে অনুবাদ করা হয় খুবই কম, এবং বাঙালী পাঠকরা অন্য প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে অনেকখানি উদাসীন। কিন্তু বাংলা ভাষা যে অন্য সব ভারতীয় ভাষার চেয়ে অগ্রবর্তী এবং রত্নপ্রসূ—এ কথা ভেবে খুব বেশী আত্মপ্রসাদ বোধ করার কোনো কারণ নেই। পাশ্চাত্য আধুনিকতার সঞ্জীবনী বাংলা দেশে আগে আসে এবং পুনর্জাগরিত ভাষার সবল বয়স্ক সাহিত্য বাংলাতেই প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু এ কথাও ঠিক, কোনো প্রাদেশিক ভাষাই এখন পিছিয়ে নেই। হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি ভাষায় গত দু-এক দশকে এমন একদল লেখকের আগমন ঘটেছে, আমরা জানি যাঁদের দর্শন ও আধুনিক মানস পৃথিবীর সব সাহিত্যেরই সমসাময়িক। তামিল, তেলেগু ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিও যে আধুনিকতায় সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ—এতে কোনো সন্দেহই নেই।

অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী নয়। এই তিনের মধ্যে যে-কোনো এক ভাষাভাষীর পক্ষে অপর দুটি সামান্য মনোযোগ দিলেই বোঝা সম্ভব। বাংলা ও অসমীয়ার হরফ এক, ওড়িয়া হরফেরও মাথার ওপর অর্ধবৃত্তগুলো বাদ দিলে খুব বেশী তফাত নেই। (ওড়িয়া লিপি উদ্ভবের গোড়ার দিকে তালপাতায় লেখা হতো ধাতুশলাকা দিয়ে, তালপাতার ওপর সোজা দাগ কাটলে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই অক্ষরের ওপর সোজা মাত্রা না দিয়ে বক্র রেখা ও অর্ধবৃত্ত দেওয়া শুরু হয়।) সুতরাং এই দুই প্রতিবেশী সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়, এবং তাতে আমাদেরই উপকৃত হবার সম্ভাবনা। সেই হিসেবে ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

ওড়িয়া সাহিত্য বাংলার চেয়ে পুরোনো এবং প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃত অনুবাদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিদেশী প্রভাব ওড়িশায় পৌঁছেছে দেরিতে, তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সেখানে নানা বাধবার সুযোগ পেয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে ওড়িয়া রামায়ণ, লিখেছেন সরলা দাশ, মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন বলরাম দাস। মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু গীতিকবিতা রচিত হয়েছে। উপেন্দ্র ভঞ্জের কবিতাবলী বুদ্ধিপ্রধান ও দুরূহ জ্ঞানসমৃদ্ধ।

গদ্যকবিতা ব্যাপারটা ওড়িয়া সাহিত্যে কিছুই নতুন জিনিস নয়, এর প্রচলন আছে অনেক আগে থেকেই। ভাবপ্রবণতার বদলে, ওড়িয়া সাহিত্যের ধারাই হলো মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত। বর্ণনার বদলে বিশ্লেষণের প্রতিই ওড়িয়া লেখকদের ঝোঁক বেশী। গত তিরিশ বছরে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাওয়া পৃথিবীর যাবতীয় আধুনিক সাহিত্য, পরীক্ষা, দৃষ্টিবদল ও আঙ্গিকের উদ্ভব—সব কিছুরই প্রয়োগ ওড়িয়া সাহিত্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ওড়িয়া আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান হচ্ছেন শচী রাউত রায়। তিনি এখন বয়েসে প্রৌঢ়, তাঁর যৌবনে তিনি ওড়িয়া সাহিত্যে এসেছিলেন বিপ্লবীর ভূমিকায়। কবিতার শরীর বদলাবার জন্য তাঁর অনলস প্রয়াস চিরস্মরণীয় হবে, তাঁর প্রতিটি কবিতাই প্রায় আঙ্গিকের নতুন নতুন পরীক্ষা সার্থকতায় অসাধারণ। ওড়িয়া কবিতায় তাঁর প্রভাব বহু বিস্তৃত এবং তিনি এখনও নবীন কবিদের কাছে মাননীয়। ওড়িয়া ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা দ্বিমাসিক "দিগন্তে"র তিনি সম্পাদক। শচী রাউত রায় বাংলা কবিতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত এবং তাঁর অনেকগুলি কবিতাও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। গুরুপ্রসাদ মোহান্তি ওড়িয়া কবিতায় এলিয়টের কাব্যশৈলীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থের নাম 'কালপুরুষ'। তরুণদের কাছে এখন সবচেয়ে প্রিয় কবি যিনি, তাঁর নাম রামকান্ত রথ। ইনি সুশিক্ষিত এবং দিল্লীতে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, এঁর রচনার শানিত বুদ্ধির দীপ্তি, সূক্ষ্ম বিদ্রূপবোধ ও ভাষার বলিষ্ঠ ব্যবহার এঁকে আলাদা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একসময় এঁর রচনায় সমাজচেতনার প্রকাশ দেখা যেতো বেশী, এখন এঁর রচনা অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মজীবনীমূলক। রামকান্ত রথের বিপরীত কেন্দ্রে আছেন আর একজন, তাঁর নাম রবি সিং। রবি সিং ওড়িয়া সাহিত্যজগতে ঘন ঘন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে থাকেন। ইনি অ্যাকাডেমিক শিক্ষা বিশেষ গ্রহণ করেন নি, কোনো নির্দিষ্ট জীবিকা নেই, সরল ও জোরালো মৌখিক শব্দের প্রয়োগে অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কথা ইনি বিপ্লবীর ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চান। ইনি কখনো কখনো উড়িষ্যার নজরুল নামে আখ্যাত হন। সীতাকান্ত মহাপাত্র, জীবনানন্দ পানি, দীপক মিশ্র প্রভৃতি এঁরাও উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান তরুণ কবি।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র যেমন কলকাতা, ওড়িয়া সাহিত্যের সেইরকম একটি কোনো বিশেষ কেন্দ্র নেই। কটক, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, পুরী ইত্যাদি শহরে জীবিকার জন্য সাহিত্যিকরা ছড়িয়ে আছেন। পেশায় এঁরা অনেকেই সরকারী অফিসার, অধ্যাপক বা শিক্ষক, আইনজীবী বা ডাক্তার। এইসব নানা শহরে ছড়ানো একদল তরুণ কবি একটি সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছেন, যার উদ্দেশ্য, সমস্ত ছন্দ ও প্রথাকে ভেঙে দিয়ে একটি নতুন প্রকাশের রীতি স্থাপন করা। এঁরা অনেকেই আলাদাভাবে সাহিত্যের একটি ফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কৈলাস লেংকা, সত্যনারায়ণ মহাপাত্র, হরিহর মিশ্র, দেবদাস ছোটরায়, হরপ্রসাদ দাস, শুভেন্দুমোহন দাস, জ্যোতি-চরণ কর, ব্রজনাথ রথ প্রভৃতি।

আধুনিক ওড়িয়া গদ্যসাহিত্যের প্রধান লেখক গোপীনাথ মোহান্তি। ইনি অসাধারণ বৈদগ্ধ্য ও মনীষাসম্পন্ন কিন্তু আদিবাসীদের ভাষা ও জীবনযাত্রা নিয়ে উপন্যাস রচনাতেই এঁর সমধিক কৃতিত্ব। ইনি উপন্যাসের জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন এবং তরুণ লেখকদের চোখেও বিশেষ শ্রদ্ধেয়। ওড়িশার অন্ধকার অরণ্যের অবজ্ঞাত আদিবাসীদের সুখদুঃখের কথা ইনিই প্রথম সার্থকভাবে সাহিত্যের আলোকে প্রতিভাত করেছেন। বাংলায় সম্ভবত এঁর তুলনীয় লেখক "ঢোঁড়াই চরিত মানসে"র স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ি। সুরেন্দ্র মোহান্তি সংবেদনশীল ছোটগল্প লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি-সম্পন্ন। ইনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস নিয়ে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখন সেখান থেকে সরে এসে রোমান্টিক ব্যক্তিত্বই এঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। আর একজন লেখক মনোজ দাস, এক্সিস্টেনসিয়ালিস্ট ধরনের গল্প লিখতেন, এখন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। কিশোরীমোহন দাস ও নরেন্দ্রকুমার রায়ও গদ্যলেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান। গদ্যলেখকদের

মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এখন বিভূতি পট্টনায়ক, কিন্তু জনপ্রিয় হলেও তাঁহার জোরালো ব্যবহার, অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের কৃতিত্বের জন্যও ইনি প্রসিদ্ধ। এই তরুণ লেখকের গ্রন্থসংখ্যা কুড়ি। শান্তনুকুমার আচার্য ব্যক্তিগত জীবনে একজন কেমিস্ট, তাঁর রূপকধর্মী গল্পগুলিতে একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, মহাপাত্র নীলমণি, রমাপতি মিশ্র, রবি পট্টনায়ক, কৈলাস লেংকা—এঁরাও নানা ধরনের আধুনিক গল্প রচনায় খ্যাতিলাভ করেছেন।

বাংলা দেশেরই মতন উড়িষ্যারও নাট্য-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। নাট্যসাহিত্যে উড়িষ্যার একটি উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে, তার সংগে সমসাময়িকতা মিশিয়ে একসময় উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছিলেন রমাশঙ্কর রায়, ভিখারীচরণ পট্টনায়ক, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, কালীচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতি। তরুণ-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার এখনো দেখা দেন নি, তার কারণ সম্ভবত আধুনিক নাটক ছাপা কিংবা মঞ্চস্থ করার অসুবিধা। যদিও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র কটক শহরেই দুটি পেশাদারী নাট্যমঞ্চ আছে, যেখানে প্রত্যেক দিন নাটকের অভিনয় হয়। প্রবন্ধ এবং গবেষণামূলক রচনাতেও ওড়িয়া সাহিত্য দ্রুত অগ্রসরমান।

ওড়িয়া সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা এখনো খুব বেশী নয়। শুধুমাত্র লেখার ওপর জীবিকানির্বাহ করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। খুব জনপ্রিয় উপন্যাসও এক বছরে বিক্রি হয় এক হাজার কপি। এর কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের সুফল দেখা গেছে ওড়িয়া সাহিত্যে। লেখকরা যেহেতু একেবারেই পাঠকদের মুখাপেক্ষী নন, ওড়িয়া সিনেমাও এখনো লেখকদের পক্ষে লাভজনক নয়, লেখকদের পক্ষে প্রলুব্ধ হবার সুযোগ খুব কম, সেইজন্য ওড়িষ্যার অধিকাংশ সাহিত্যিকই শুদ্ধ সাহিত্যের চর্চায় আগ্রহী। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার উড়িষ্যায় সদ্য শুরু হয়েছে, সুতরাং সাহিত্যের পাঠক উড়িষ্যায় কম হলেও সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষিত, নেহাত শস্তা রাস্তার লেখা তাদের কাছে সমাদৃত হবে না। সুতরাং অল্পসংখ্যক পাঠকদের জন্য হলেও উড়িষ্যায় উচ্চাঙ্গের মননশীল সাহিত্য রচিত হচ্ছে বেশী।

ওড়িয়া সাহিত্যের আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কোনারক ও ভুবনেশ্বর মন্দিরের দেশ হলেও, ওড়িয়া সাহিত্য এখনও যথেষ্ট তথাকথিত নীতিবাগীশ। ঘনিষ্ঠ সম্ভোগচিত্র, নারীর সর্বাঙ্গীণ বর্ণনা কিংবা স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার ওড়িয়া সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত।

সনাতন পাঠক

ইতিহাস : স্বদেশ

Militant Nationalism In India and its Socio-Religious Background (1897-1917). Bimanbehari Majumdar. General Printers and Publishers Private Limited. Calcutta-13. Price Rs. 10 only.

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ঐতিহাসিকবৃন্দ দ্বারা সরকারী উদ্যোগে স্বদেশচর্চার ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, ইতিহাস রচনার জন্য কালের যে ব্যবধান প্রয়োজন আমাদের স্বদেশচর্চার কাল ততটা দূরের নয়। সেজন্য এই জাতীয় ইতিহাসকর্ম অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। তথাপি উপাদান উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন এখন সর্বাধিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পরিধি ব্যাপক। প্রাদেশিক ভূমিকা এবং সর্বভারতীয় ভূমিকা উভয়বিধ প্রচেষ্টার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য না থাকলে সংগ্রামের বিবর্তনটি জানা সম্ভব নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে বিমানবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ পর্যায়কে নির্বাচন করেছেন। তদানীন্তন রাজনীতির পরিভাষায় হিংসাত্মক সংগ্রাম বলে যে পর্বটি চিহ্নিত, বিমানবাবুর গ্রন্থের আলোচ্য বস্তু তাই। কালসীমা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। এর এক কোটিতে বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কাল, অন্য কোটিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আমেরিকাতে কারাবরণ কাল। অনেককাল আগে লেখক রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। রামমোহন থেকে দয়ানন্দ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর মনন, ধ্যান ও চিন্তার বস্তু সে গ্রন্থে সমাহৃত।

গ্রন্থের প্রথম অংশে মূলত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, ধ্যান সন্নিবিষ্ট। এই সঙ্গে নিবেদিতার অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বিমানবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রধানত বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় খুঁজেছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি এই সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার উৎসাহে (পৃ. ৫২, ৫৩, ৫৪) কিছু সংখ্যক ভারতীয় সংগ্রামে উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। ভিন্ন প্রদেশের নেতাদের মধ্যেও বিবেকানন্দের চিন্তা কতটা প্রবেশ পেয়েছিল সে প্রসঙ্গও গ্রন্থে বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি আবেদন-নিবেদন পর্বেও এই সংগ্রামী মনোবৃত্তি কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল। তিলক, অরবিন্দ, লালা লাজপত রায় এই আন্দোলনে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে যুক্ত করেছিলেন। বিমানবাবু বাংলা, মহারাষ্ট্র পাঞ্জাবের সেই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। একদল দেশপ্রাণ যুবক কিভাবে দেশে-বিদেশে স্বদেশমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, এই বইটিতে তার পরিচয় আছে। অবশ্যই এই সংগ্রাম হিংসাত্মক। কিন্তু এই সংগ্রামেও জনচিত্তকে স্পর্শ করেছিল সে কথা বিমানবাবু বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের বিপরীতও হিংসাত্মক কার্যধারার মধ্যে ছিল। যাঁরা এই আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের সকলেরই চরিত্রবল এবং দেশপ্রাণতার উজ্জ্বল আদর্শ একালের ভারতবাসী মাত্রকেই উদ্বুদ্ধ করে। হতে পারে এঁদের পথ ভ্রান্ত (অনেকেই হিংসাত্মক প্রেরণাকে তিরস্কার করেছিলেন) কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে এঁরা যে সরণী অবলম্বন করেছিলেন তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিমানবাবু সে গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণীয় করে তুলেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। উপাদান উপকরণ সংগ্রহের দিক থেকে বইটিতে কোনো চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। লেখক সংগ্রামের উচ্চাবচ তরঙ্গগুলি লক্ষ করেছেন, সংগ্রামের পতন-বন্ধুর অভ্যুদয় পন্থাকে সহৃদয় দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন, এইখানেই গ্রন্থটির সাফল্য। বইটি কয়েকটি বক্তৃতামালার সংকলন। বোধ করি বিমানবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য-সম্বন্ধে আরও একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই গ্রন্থটি তারই পূর্বাভাস। বিমানবাবু ভক্ত বৈষ্ণব। কিন্তু ঐতিহাসিকের রচনায় যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রত্যাশিত এই গ্রন্থে তার অসদ্ভাব নেই। এই দুর্লভ গুণের জন্য গ্রন্থটি সকলের সমাদর পাবে এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। আট টাকা।

"তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।" —এই বলে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ-বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য পরিষদের সংবর্ধনা-সভায়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বে সাহিত্যপরিষদে অনুরূপ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন পরিষৎ-সম্পাদক। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি; পল্লী-সংবর্ধনার আয়োজনও তৎপূর্বে হয় নি। দূরদর্শী ও দুঃসাহসী রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম অভিনন্দনপত্র রচনা করলেন।

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধার পরিচয় বুঝি আমরা তেমন দিতে পারি নি। না হলে, তাঁর সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘকাল কেন রচিত হয় নি কোনো একক গ্রন্থ? জীবনী নিয়ে দু-একটি গ্রন্থ অবশ্য লেখা হয়েছে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর সেই জাতের লেখক, যাঁদের কীর্তি ও জীবন সমান মহৎ। বর্তমান গ্রন্থের লেখক প্রথমেই নিবেদন করেছেন "এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যেই 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর' রচনায় হাত দিয়েছি। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন ও সাহিত্যের একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় উপস্থাপিত করাই এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য।" শুধু বহুকাঙ্ক্ষিত প্রয়াসের জন্যই ডঃ ভট্টাচার্য সাধুবাদ পাবেন।

গ্রন্থটি পাঠ করার পর অবশ্য আমাদের দুঃখ সম্পূর্ণই ভুলে যেতে হয়। মনে হয়, যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা যদি কোনো কারণ হয় তাহলে অপেক্ষার ফল এক্ষেত্রে পরিণামরমণীয়ই হয়েছে। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে নিষ্ঠা শ্রম অনুসন্ধিৎসা ও দক্ষতার সঙ্গে এই বইটি রচনা করেছেন তা বিস্ময়কর। 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর' রচনায় তিনিও সার্থক পথিকৃৎ।

আলোচনার সুবিধের জন্য বুদ্ধদেববাবু জীবন ও সাহিত্য দুটি পৃথক পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন। সাহিত্য-পর্বটি একাধিক অধ্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আচার্যের সাহিত্য-পাঠের ভূমিকাটি প্রথমেই প্রস্তুত করে নিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য আলোচনায় প্রবেশ করেছেন।

পি এ ফিল্মস-এর "দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা" (পরিচালক : মানু সেন) চিত্রে শর্মিতা বিশ্বাস
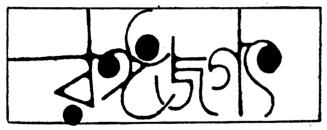
বাংলা ছবি : ১৯৬৬

একটি বছর পার হল। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যেন তা একটি দুঃস্বপ্নের বছর। ধর্মঘট, লক আউট এবং আরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে। তবু উৎসাহে ভাটা পড়ে নি। প্রেক্ষাগৃহের অমানিশা উত্তীর্ণ হয়ে একটির পর একটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে, নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে।

নৈরাশ্য যদি দেখা দিয়ে থাকে সে অন্য কারণে। সমগ্রভাবে বাংলা ছবির শিল্পমান এবার আশানুরূপ হয় নি। অনেক বছরই হয় না। তবে তারই মধ্যে একটি বা দুটি শিল্পগুণান্বিত বাংলা চিত্র ভারসাম্য রক্ষা করে। গত বছরে তাও অদৃশ্য।

১৯৬৬ সনে মোট ২৮টি নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে একটি (পান্ডবের বনবাস) তেলেগু থেকে বাংলায় "ডাব" করা। মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে দুখানি পৌরাণিক, দুখানি জীবনীমূলক, চারখানি কমেডি—বাকী সব ছবিকে সামাজিক বলা চলে। বাংলা ছবিগুলির নাম : পান্ডবের বনবাস, সুশান্ত সা, মণিহার, গৃহসন্ধানে, দোলগোবিন্দের কড়চা, কাঁচকাটা হীরে, অঙ্গীকার, রাজদ্রোহী, শুধু একটি বছর, রামধাক্কা, নায়ক, মায়াবিনী লেন, পাগল ঠাকুর, কলংকী রাত, সুভাষচন্দ্র, স্বপ্ন নিয়ে, হারানো প্রেম, পাড়ি, নতুন জীবন, শেষ তিন দিন, অশ্রু দিয়ে লেখা, গল্প হলেও সত্যি, শঙ্খবেলা, উত্তর পুরুষ, লব-কুশ, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার (চলছে), ফিরে চল, কাল তুমি আলেয়া (সদ্যোমুক্ত)।

বারোখানি চিত্রের কাহিনী প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কাহিনীকারদের মধ্যে উল্লেখ্য : প্রবোধকুমার সান্যাল (কাঁচকাটা হীরে), প্রেমেন্দ্র মিত্র (স্বপ্ন নিয়ে—তেলেনাপোতা আবিষ্কার), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (সুভাষচন্দ্র),. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (দোলগোবিন্দের কড়চা), প্রমথনাথ বিশী (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজদ্রোহী), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (শঙ্খবেলা, কাল তুমি আলেয়া), জরাসন্ধ (পাড়ি), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (নতুন জীবন) প্রভৃতি।

ব্যবসায়িক সাফল্য অল্প ছবির ভাগ্যেই ঘটেছে। অবশ্য চিত্রসাংবাদিক "প্রসাদ সিংহ ও গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত "মণিহার" বক্স-অফিসে যে সফলতা পেয়েছে তার তুলনা বিরল। একাদিক্রমে ৭৫ সপ্তাহ ছবিটি চলেছে। এর পরেই নিচের ছবিগুলির নাম করা যেতে পারে : "রাজদ্রোহী" (৪৯ সপ্তাহ), নতুন জীবন (৪১ সপ্তাহ), নায়ক (৩৮ সপ্তাহ), পাড়ি (৩৬ সপ্তাহ), সুভাষচন্দ্র (৩৩ সপ্তাহ), শঙ্খবেলা (৩০ সপ্তাহ), এখনও চলছে। কয়েকজন বিশিষ্ট পরিচালকের ছবি গত বছরে ছিল না। চিত্র পরিচালক ও সুরকার হিসাবে উত্তমকুমারের নতুন প্রয়াস বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ-ছাড়া চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন নাম : পূর্ণেন্দু পত্রী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অমল দত্ত, শচীন মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অতনুকুমার, চিত্রকর, সারথি ও চিত্রতনু। সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রেও যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য সুগায়ক মান্না দে (রামধাক্কা)। অন্যান্যরা হলেন অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ বাগচী, অতীন চট্টোপাধ্যায়।

পাঁচটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়—এঁরা প্রত্যেকেই তিনটি ছবির নায়িকা। দিলীপকুমার ও ধর্মেন্দ্রর বাংলা ছবিতে আত্মপ্রকাশ এক বিশেষ ঘটনা। বোম্বাইয়ের পরবীন চৌধুরী একটি বাংলা ছবির নায়িকা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত ও ভি বালসারা—এঁরা প্রত্যেকে দুটি ছবির সুরকার। আলোকচিত্র-শিল্পী কৃষ্ণ চক্রবর্তী নবাগত।

গত বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়-কৃত "নায়ক" সমালোচকদের পুরস্কার পেয়েছে। তা ছাড়া জুরীমন্ডলী শ্রী রায়ের সমগ্র চলচ্চিত্রকর্মের জন্য তাঁকে একটি বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

"জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" : রুমা গুহঠাকুরতা, তরুণকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রলোকের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি। তাঁরা হলেন বিমল রায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), বীরেশ্বর সেন, সুধীশ ঘটক, পান্নালাল ভট্টাচার্য ও গীতিকার শৈলেন্দ্র।

মধু বসুর ছবির উৎসব

চলচ্চিত্রকার শ্রীমধু বসুর কয়েকটি ছবি নিয়ে এক উৎসবের আয়োজন করেছেন সিনে সেন্ট্রাল এবং সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। উৎসবে থাকবে "আলিবাবা", "অভিনয়", "রাজনর্তকী", "মাইকেল", "মধুসূদন", "শেষের কবিতা" ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র। ৫ জানুয়ারী টাইগার সিনেমায় সপ্তাহব্যাপী উৎসব শুরু হবে।

নাট্য সম্মেলন

গোয়াবাগান সি আই টি পার্কে নাট্য সম্মেলনের উদ্বোধন হয় গত ২৩ ডিসেম্বর। শিশির মঞ্চে পক্ষকালব্যাপী নাট্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ। প্রধান অতিথি এবং সভাপতির আসনে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী এবং শ্রীমধু বসু।

শ্রী ভঞ্জ তাঁর ভাষণে বলেন, প্রাতঃস্মরণীয় নট ও নাট্যকারদের নামে মঞ্চ তৈরি করে অভিনয়ের এই ব্যবস্থা অভূতপূর্ব। শ্রী গাঙ্গুলী শৌখিন নাট্যসংস্থার ভূমিকার কথা বলেন। শ্রীমধু বসু তাঁর ভাষণে পুরনো দিনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এককালে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে তিনি যখন 'আলিবাবা' নাটক মঞ্চস্থ করতে যান তখন এক শ্রেণীর ব্যক্তি কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। আজ নাট্যমঞ্চ রক্ষণশীলতার প্রভাব থেকে মুক্ত বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রারম্ভে নাট্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু সময়োচিত ভাষণ দেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রীঅপরেশ ভট্টাচার্য।

নাট্য সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন মণ্ডপে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। একটি স্টলে নাট্যগ্রন্থ ও নাট্যপত্রিকা, অপর স্টলে স্থির-চিত্রের (বাংলা রঙ্গমঞ্চের অতীত ও বর্তমান) প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। শেষোক্ত প্রদর্শনীর কৃতিত্ব আলোকচিত্রশিল্পী মীরেন অধিকারীর। এ ছাড়া নিবেদিতা শতবার্ষিকী কমিটি মাটির পুতুলের সাহায্যে নিবেদিতার কর্ম জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে

চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকুশলীদের সাহায্যের জন্য সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যানড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আগামী ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় প্রিয়া সিনেমায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র প্রভৃতি শিল্পী অনুষ্ঠানে গান গাইবেন। রবি ঘোষ ও তাঁর সম্প্রদায় এবং জহর রায় কৌতুক-নকশা পরিবেশন করবেন। এ-ছাড়া অভিনীত হবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম'। অভিনয় করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সান্যাল প্রভৃতি। এ ছাড়া ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার উপহার দেবেন [illegible] প্রতিভা। (রুমা গুহঠাকুরতা [illegible] প্রধান দুই শিল্পী)। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকসংগীত

গত বুধবার হ্যারিংটন স্ট্রীটে বাংলা ও আমেরিকার পল্লীগীতির এক অনুষ্ঠান হয়। আমাদের প্রখ্যাত গায়ক শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী এবং আমেরিকার মিঃ বিল ক্রোফুট এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। মার্কিন প্রচার দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

মিঃ ক্রোফুটের ব্যানজো বাদনের সঙ্গে শ্রী চৌধুরীর গোষ্ঠীর তবলিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত তবলা সঙ্গত অনুষ্ঠানে একটি বিশিষ্ট আমেজ এনে দিয়েছিল।

মিঃ ক্রোফুট শ্রী চৌধুরীর গান শুনে খুব খুশি হয়েছেন। ভয়েস অব আমেরিকা ওঁদের দুজনের গানের রেকরড করে রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে।

"কাল তুমি আলেয়া" : উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী

অন্যায় করতে না চাইলেও সে অন্যায়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, একটির পর একটি মিথ্যার আশ্রয়ে সে মুক্তি পেতে চায়। এত সব ভুলের জন্য তার প্রেম ও সদ্য বিবাহিত জীবনও ধ্বংসের মুখে এসে পৌঁছয়। শেষ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়েই রমানাথের সব কিছু রক্ষা পায়।

পরিচালক কৃষণ চোপরা ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (শ্রী চোপরার মৃত্যুর পর শ্রী মুখোপাধ্যায় ছবিটি সম্পূর্ণ করেন) গল্পের রস অনেক পরিমাণেই দর্শককে উপহার দিতে পেরেছেন। ১৯২৮ সনের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে কাহিনী রচিত। সেই কালের পরিচয়টি ছবিতে অক্ষুণ্ণ। শিল্প নির্দেশক সুধেন্দু রায় কলকাতার সেট সুন্দরভাবে গড়েছেন। পরিচালনার ত্রুটির ভিতর প্রথমেই একটি বিষয় নজরে পড়ে। মধ্যবিত্ত ঘরে নতুন বউ আসার পর শাশুড়ীর সঙ্গে তাকে খুব অল্পই দেখা গেছে—বোধহয় একবার। শ্বশুর-সমীপে পুত্রবধূকে একবারও দেখা যায় নি। ছবির শেষের দিকে পুলিস অফিসারের সঙ্গে নায়কের ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতির মাত্রা একটু বেশী—অনেকটা হিন্দী ক্রাইম চিত্রের দৃশ্যের মত। এ-ধরনের কিছু বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও সমগ্রভাবে একটি বিশিষ্ট চিত্র তৈরির কৃতিত্ব পরিচালকরা দেখিয়েছেন।

নায়কবেশী সুনীল দত্ত এবং নায়িকার ভূমিকায় সাধনা এ-ছবিতে অভিনয়ের একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারতেন। এমনিতে অবশ্য তাঁরা ভাল অভিনয়ই করেছেন।

নিরাশ করেছেন সংগীত পরিচালকদ্বয় শংকর জয়কিষণ। গানের প্রয়োজন তো ছিলই না, তাছাড়া গানও সুরের দিক থেকে খুব সুশ্রাব্য হয় নি।

পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার আলেখ্য

ট্যুরিস্টদের কাছে পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার রূপ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকারের ট্যুরিজম শাখা দুটি ছবি প্রযোজনা করেছেন। একটির নাম "গ্লিমপসেজ অব ওয়েসট বেংগল" (৩৩৯৪ ফুট), অপরটি "ক্যালকাটা" (২০০০ ফুট)। দুটি ছবিই ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত।

"গ্লিমপসেজ অব ওয়েসট বেংগল" (গ্রাফিক ডকুমেণ্টারিজ-কৃত) ছবিতে অল্প অবকাশে পশ্চিম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুন্দরভাবে দেখাতে পেরেছেন বংশীচন্দ্র গুপ্ত। চোখ মেলে দেখতে জানলে একটি ঘাসের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দুও অপরূপ দেখায়। শ্রী গুপ্ত নিজে শিল্পী। তাই তাঁর দৃষ্টিতে অনেক আপাত-তুচ্ছ জিনিসও সুন্দর। তাকে সুন্দরতর করে তিনি ছবিতে দেখিয়েছেন।

'বাঘিনী'-র (পরিচালনা : বিজয় বসু) দুই শিল্পী : অজয় গাঙ্গুলী ও রাখী বিশ্বাস

ফটো—দেশ

রূপবিন্যাসে শ্রী গুপ্তকে সাহায্য করেছেন সৌমেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসুর অসাধারণ ফটোগ্রাফি এবং ইস্টম্যান রঙ। এই দুর্লভ গুণ যেমন ছবির আছে, প্রামাণিক চিত্রের প্রসিদ্ধ লক্ষণও তেমনি এতে বিদ্যমান। অতিপরিচিত স্থানকে বিশদভাবে দেখানোর দুর্বলতা পরিচালক ত্যাগ করতে পারেন নি। যেমন দার্জিলিঙের দৃশ্য—যা বিদেশী পর্যটকের কাছেও সম্ভবত নতুন নয়। ফলে প্রথম পরিচয়ের রোমাঞ্চ ছবিতে কোন কোন মুহূর্তে খর্ব হয়েছে। সমগ্রভাবে ছবিটি কিছুটা ক্লান্তিকর। অবশ্য সব বিরসতা ঢেকে দিয়েছে এর সংগীতাংশ (সত্যজিৎ রায়-কৃত)। বিভিন্ন দৃশ্যের সংগীতে বাংলার প্রাণের পরিচয় প্রকাশ মিলেছে।

"ক্যালকাটা"-তে (নিউজ সিনেমা) কলকাতার চিত্রটি চমৎকার ফুটিয়েছেন পরিচালক জ্যোতির্ময় রায়। দুটি ছবিরই (গ্লিমপসেজ অব ওয়েসট বেংগল এবং ক্যালকাটা) বৈশিষ্ট্য এই : বিদেশী পর্যটকদের মনোহরণের জন্য তৈরি হলেও চিত্র দুটিতে পশ্চিম বাংলা কিংবা কলকাতাকে 'পণ্য' হিসাবে সাজানো হয় নি। পরিচালকরা শিল্পগুণের মধ্য দিয়েই বিদেশীদের কাছে বাংলা দেশের আবেদন রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। এই দেশের সংগীত, ধর্ম ও সংস্কৃতিও ছবি থেকে বাদ যায় নি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও বেলুড়মঠের প্রতি অনেক বিদেশীর অনুরাগের কথা কারো অজানা নয়। কিন্তু "গ্লিমপসেজ অব ওয়েসট বেংগল"-এ এই দুই তীর্থ প্রাধান্য পেল না কেন? "ক্যালকাটা"-র দৃশ্য নির্বাচন নিয়ে বিশেষ কোন অভিযোগের কারণ নেই। প্রথমটির মত এটিও উঁচুদরের প্রামাণিক চিত্র। "ক্যালকাটা"-র সংগীত পরিচালনা করেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। শ্রী চৌধুরীর সুররচনা চিত্তগ্রাহী, এর ব্যবহারও পরিমিত। প্রসংগত উল্লেখ্য, চিত্র প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ-পত্রে চিত্র পরিচয়ে একটি ছবির (পরিচালক সহ) সুরকার ও আলোকচিত্রশিল্পীর নাম আছে। অপর ছবির শুধু পরিচালকের নাম উল্লেখ রয়েছে। অন্যদের নাম নেই কেন?

*

যা ছিল জনশ্রুতি এখন তা সত্যে পরিণত। মারলোন ব্র্যাণ্ডো ও এলিজাবেথ টেলর সত্যিই একসঙ্গে অভিনয় করবেন ঠিক হয়েছে। ছবির নাম "রিফ্লেকশনস অন এ গোল্ডেন আই"। জন হাস্টন চিত্রপরিচালক।

DISTRICT LIBRARY
COOCH BEHAR

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীগোপাল দে

সুস্থ,
চকচকে
চুলের
জন্য...
টাটার সুগন্ধিত
কোকোনাট হেয়ার অয়েল
যাতে আছে বিশুদ্ধ নারকেল তেল।
বিচক্ষণ মায়েরা জানেন যে টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েলে শুধু বিশুদ্ধ নারকেল তেল আছে। ওতে চুলের গোড়া পুষ্ট করে, চুল ঘন ও সুস্থ ক'রে তোলে। টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল চার রকমের মনোরম সুগন্ধে পাওয়া যায়—গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, চামেলী ও পুষ্পা।
চুল সবসময় সুন্দর রাখবার জন্য টাটার সুগন্ধিত কোকোনাট হেয়ার অয়েল
Tatas
Perfumed
HAIR OIL
COCONUT
LAVENDER

ম্যাকলীন্‌স্

টুথপেস্টের তাজা কড়া স্বাদে আপনার মুখ পরিষ্কার স্নিগ্ধতায় ভরে তুলুন

ম্যাকলীন্‌স্

৩ ভাবে কাজ করে

১ **পরিষ্কার করে**—যে সব খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে আটকে দাঁতের ক্ষয় করে, তাদের দূর করে

২ **সাদা করে**—আপনার দাঁতের হলদে অনুজ্জ্বল আবরণ তুলে দেয় ও দাঁতের আরো ঔজ্জ্বল্য আনে

৩ **রক্ষা করে**—আপনার দাঁত ও মাড়িকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করে

দাঁতের অপূর্ব শুভ্রতার জন্য—

ম্যাকলীন্‌স্

বছরের শুরু

দিনের শুরুতে মেঘলা দেখলে মনের কোথায় যেন ময়লা ধরে। নতুন বছরের শুরুতে যেসব অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে অস্বস্তি বই স্বস্তি পাবার কারণ দেখছি না।

গত রবিবার, বছরের প্রথম দিনটিতে ইডেন গার্ডেনস-এ ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট-টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে যা ঘটেছে ক্রিকেটের ইতিহাসে তেমন ঘটনা যদিও-বা সংক্ষিপ্তাকারে কোথাও ঘটে থাকে, কলকাতায় ঘটেনি। ইডেন গার্ডেনস-এর ইতিহাসে এমন দগ্ধ-দিনের উদাহরণ আর নেই। কলকাতার আপামর জনসাধারণ একটি খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন উত্তেজিত আর কখনও হয়েছে বলে জানি না। খেলার মাঠে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—সেই সত্তর-পঁচাত্তর হাজার দর্শক শুধু নন, যাঁরা খেলার মাঠ থেকে বহু দূরে ঘরের নিভৃত কোণে বসে রেডিয়োয় কান দিয়ে রেখেছিলেন অথবা ঘাটে-মাঠে-বাগানে 'নববর্ষ' করে বেড়াচ্ছিলেন—সকলেই জনরোষে ভস্মীভূত খেলার মাঠের সংবাদ এবং পুলিস ও হোমগার্ডপুঙ্গবদের বীরত্বের কাহিনী শুনে চমকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আজও কলকাতার পথেঘাটে, বাসে, চায়ের দোকানে সেই পুলিসী বীর্যের আলোচনা শোনা যায়।

ঘটনা এই : সেদিন কিছু দর্শক স্থানাভাবে দাঁড়াবার অথবা বসবার মতন কোনো জায়গা না পেয়ে খেলার মাঠের মধ্যে সীমানা ছুঁয়ে বসে পড়েন, পুলিস তাঁদের হটিয়ে দেবার পর কিছু উত্তেজনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে লাঠিচার্জ; অতঃপর আরও উত্তেজনা—এবং জনসমুদ্রের একাংশের মধ্যে পুলিসের টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া। এই হঠকারিতা দর্শকদের পছন্দ হয়নি এবং তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ও সন্ত্রাস জেগেছিল। জনৈক প্রবীণ ভদ্রলোক ঘটনাটিতে এত বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, তিনি মাঠে ঢুকে পুলিসের কাছে অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলেন যেন এভাবে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া না হয়। ভদ্রলোক মন্ত্রী নন, পুলিসের কর্তাব্যক্তি নন, এমনকি ক্রিকেট ক্লাবেরও কোনো হোমরা-চোমরা নন। সাধারণ নাগরিক তিনি, সাধারণ মানবিক বোধে বিহ্বল হয়েছিলেন, এই মাত্র। বোধ করি এই কারণে তাঁর দুঃসাহস কতিপয় পুলিসের সহ্য হয়নি; এবং এক দঙ্গল পুলিস ও হোমগার্ড ভদ্রলোককে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে শুরু করে। সমবেত দর্শকদের চোখে দৃশ্যটি সুখকর হয়নি, তাঁরা দলে দলে মাঠে নেমে পড়তে থাকেন এবং পুলিস ও হোম-গার্ডদের তাড়া করেন। অতঃপর খেলা পণ্ড, গ্যালারির সামিয়ানায় আগুন লাগানো, পুলিস বনাম জনতার সংঘর্ষ, পুলিসের পলায়ন, ভীত শঙ্কিত নারী ও শিশুদের ছোটাছুটি, খেলোয়াড়দের 'চাচা প্রাণ বাঁচা' গোছের ছুট—ইত্যাদি দৃশ্য খেলার মাঠে মরণ খেলার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। মাঠের বাইরেও হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে এবং যথারীতি কয়েকটি স্টেট বাস পোড়ে, পুলিসের জীপ ও মোটর সাইকেলে আগুন ধরানো হয়। বলা বাহুল্য, এরই মধ্যে খেলার মাঠে সৈনাবাহিনী তলব করতে হয়েছিল অবস্থা আয়ত্তে আনতে। সেদিন শুধু ক্রিকেট দগ্ধ হয়নি, দগ্ধ হয়েছিল কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের সুনাম।

এই হাঙ্গামার জন্য দর্শকদের দোষ দেওয়া অনুচিত। সারা রাতের শীত, হিম, ঠান্ডা গায়ে সয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে তাঁরা ঢুকেছিলেন মাঠে খেলা দেখতে; অথচ না আছে বসবার, না আছে দাঁড়াবার জায়গা; উপরন্তু কপালে পুলিসের লাঠি ও টিয়ার গ্যাস। সহ্যের সীমা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সি-এ-বি'র ব্যবস্থায় শোচনীয় ত্রুটি ছিল; এ কথাও ঠিক যে, যত না স্থানের সংকুলান ছিল তার বেশি টিকিট-বেচা হয়েছে। তা ছাড়া, একই নম্বরের টিকিট কখনও দুই কখনও তিনটি দেখা গেছে, ভেন্ডার আর সুপার-ভাইজারের কয়েক হাজার কার্ড বিলি হয়েছে। হাঙ্গামা ঘটার প্রধান ও অন্যতম কারণ হিসেবে সি-এ-বি'র গাফিলতি ও অর্থগৃধ্নুতাকে অস্বীকার করা যায় না। তবু, মনে হয়, পুলিসের পক্ষ থেকেও যা করা হয়েছে তার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং নির্মমতার চূড়ান্ত ছিল। স্বৈরাচারও। ঠাসা ভিড়ের মধ্যে (যেখানে নারী ও শিশুর সংখ্যাও কম না, সেখানে বেপরোয়া টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার মত নির্বুদ্ধিতা কেমন করে হল আমরা জানি না। তা ছাড়া, নিরীহ নিরস্ত্র এক প্রবীণ ভদ্রলোককে ঘেরাও করে প্রহারই কি পুলিসী তৎপরতা?

হোমগার্ড নামে একটি পদার্থবিশেষ আজকাল দেখা দিয়েছে। চালের চোরা-কারবারীদের ধরা থেকে ক্রিকেট খেলার মাঠ পর্যন্ত এদের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায়—সরকার জানেন, নিত্য কত বিপত্তি ঘটে চলেছে। এরা খাকি কোর্তা পরে ঘলেই বোধ হয় নিজেদের সরকারের পোষ্য মনে করে।

ভিয়েৎনাম ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জনসনের সমস্যা

কদিন ধরে খবরের কাগজগুলিতে ভিয়েৎনামের যুদ্ধের অবসানের একটা অস্ফুট সম্ভাবনার জল্পনা কল্পনার স্রোত চলেছে। বহুদিন থেকে বহু দিক থেকে আমেরিকাকে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ করার জন্যে অনুরোধ উপরোধ জানানো হয়েছে এই বলে যে, এই বোমাবাজি বন্ধ না হলে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের সঙ্গে শান্তির আলোচনার সূত্রপাতও সম্ভব নয়। সম্প্রতি ইউ-এন-এর সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থান্তও শান্তিপ্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হিসাবে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মার্কিন সরকার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। ওয়াশিংটনের সেই এক কথা—"আমরা তো শান্তির আলোচনার জন্যে প্রস্তুত, কম্যুনিস্ট পক্ষও প্রমাণ দিন যে তাঁরাও শান্তি চান, তাঁরা আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হোন, সেই বৈঠকেই উভয় দিক থেকে যুদ্ধ-বিরতির দিকে অগ্রসর হওয়ার যাবতীয় ধাপের আলোচনা করা যাবে।"

উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার বলে আসছিলেন, "এসব ধাপ্পাবাজিতে আমরা নেই. আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য সরে যাবে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছাড়া আমাদের পক্ষে আলোচনা বৈঠকে যোগদানের কথা ওঠেই না।" এই অবস্থার মধ্যে কয়েকদিন আগে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের একজন প্রতিনিধি প্যারিসে বলেন যে, আমেরিকা যদি বিনাশর্তে এবং স্থায়ীভাবে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ করে তবে শান্তির আলোচনার দিকে কীভাবে এগুনো যায় সে সম্বন্ধে যদি কোনো প্রস্তাব থাকে তবে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার সেটা পরীক্ষা এবং বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত আছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক টাইমস্-এর এক প্রতিনিধিকে বলেন যে, আমেরিকা যুদ্ধের অবসান করলে উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবার বাধা হবে না।

শান্তির আলোচনায় যোগ দেবার শর্ত হিসাবে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার আগে যা চেয়েছিলেন সেগুলোর দাবি প্যারিসে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি অথবা হ্যানয়-এর প্রধানমন্ত্রী কেউই যে প্রত্যাহার করেছেন তা নয়। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ হলেই হ্যানয় সরকার আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত তাও বলা হয় নি, উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বিনাশর্তে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে হ্যানয় যুদ্ধবিরতির আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্পর্কে যদি কোনো প্রস্তাব আসে তবে সেটা উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করবে। উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে সম্প্রতি যা বলা হয়েছে তার মধ্যে এইটুকুই স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও অনেকের আশা হয়েছে যে উত্তর ভিয়েৎনামের আগের মনোভাব এবং স্ট্যান্ডটার কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন আমেরিকার দিক-এর যদি অনুকূল মনোভাব দেখা যায় তবে যুদ্ধ মিটবার পথ হতে পারে।

অনেকেই আশা করেছিলেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ করার জন্যে চারদিক থেকে যে অনুরোধ আমেরিকাকে করা হচ্ছিল হ্যানয়-এর এই কথার পরে মার্কিন সরকার কালবিলম্ব না করে সেই অনুরোধ রক্ষা করতে অগ্রসর হবেন। কিন্তু আমেরিকা তা করেনি। বিনা শর্তে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমা-বাজি বন্ধ করতে মার্কিন সরকার এখনো রাজী হননি। মার্কিন সরকার উত্তর ভিয়েৎনামের বক্তব্যের অর্থ আরো স্পষ্ট করে জানতে চান। কেবল তাই নয়, মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মার্কিন বোমাবাজি বন্ধ করার আগে কম্যুনিস্ট পক্ষেরও রণোদ্যমের হ্রাসের প্রতিশ্রুতি চাই অর্থাৎ বিনা শর্তে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবাজি বন্ধ করতে মার্কিন সরকার রাজী নন। তার মানে—মার্কিন সরকার ইউ থান্তকে যে জবাব দিয়েছিলেন, উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং প্যারিসস্থ প্রতিনিধির বিবৃতির পরেও দৃশ্যতঃ তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে মার্কিন সরকারের উপর নানাদিক থেকে সরকারী ও বেসরকারী জনমতের যে-রকম চাপ চলছে তাতে জনসন গবর্নমেন্টের মনোভাবের পরিবর্তন অসম্ভব না হতে পারে এবং জনসন গবর্নমেন্টের ভাব পরিবর্তন যদি দেখা যায় তাহলে হ্যানয়-এর দিক থেকেও কড়াকড়িটা কিছু কমতে পারে।

কিন্তু কারো যদি আশা থাকে যে উভয়পক্ষের সমান খেলা হবে এবং সমান খেলা জিতিতে সমস্যার সমাধান হবে তাহলে সে আশা নিরর্থক। চূড়ান্ত মীমাংসা শেষ পর্যন্ত কী হবে কেউ জানে না, তবে মার্কিন সরকারের সামরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ মিটবে না অর্থাৎ জনসন সরকারের "মরেল" না ভাঙা পর্যন্ত শান্তির আশা নেই। এই অবস্থায় যদি মীমাংসার দিকে এগুতে হয়, তবে জনসন সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমেরিকা যুদ্ধে জিততে পারেনি। জনসন সরকারের পক্ষে এই স্বীকৃতির সাহস অর্জন করা সম্ভব কিনা সেটা পৃথিবীর সামনে পৃথিবীর এই সর্বাধিক সামরিক শক্তিশালী সরকারের মুখরক্ষার প্রশ্নের চেয়েও বেশি নির্ভর করছে আমেরিকার আভ্যন্তর রাজনৈতিক শক্তি-দ্বন্দ্বের উপর।

আমেরিকায় এমন লোক অনেক আছে যারা ভিয়েৎনামকে জনহীন ভস্মস্তূপে পরিণত করেও মার্কিন "শক্তির" "মানরক্ষা" করার দিকে। এরূপ অমানুষিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও অনেক মানুষ নিশ্চয়ই আমেরিকায় আছেন। উত্তর ভিয়েৎনামের "সামরিক লক্ষ্যের" উপর বোমাবাজির নামে বহু অসামরিক জনপদগুলিরও কী দশা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ বিবরণ নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কাগজেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ফলে মার্কিন সরকার যে কেবল মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন তা নয়, দেশেবিদেশে মার্কিন সরকারের এই কার্যের প্রতি তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের নিজের এবং দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে এর চেয়েও গুরুতর দুশ্চিন্তার বিষয় আছে। এই আর একটু ঠেলা মারতে পারলেই জিতব, এই ভাবে বলে বলে এবং যুদ্ধের জন্যে অপরিমিত জিনিস, টাকা এবং মনুষ্যপ্রাণ ক্ষয় করে এখন যদি মার্কিন সরকারকে স্বীকার করতে হয় যে, যুদ্ধে আমেরিকা জিততে পারল না, তাহলে কেবল জনসনের নয়, তাঁর দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সাংঘাতিক রকম বিপন্ন হবে। শোনা যাচ্ছে টাকা খরচের মিথ্যা হিসাব দেওয়ার অপরাধেও নাকি জনসন সরকার অপরাধী। পাছে খরচের বহর দেখে লোকে শঙ্কিত হয়ে ওঠে সেই জন্যে নাকি যা খরচ হয়েছে যা হচ্ছে সেটা কম কম করে লোককে জানানো হয়েছে। এই অবস্থায় পৃথিবীর চেয়ে স্বদেশের সামনে মুখ রক্ষা করাই হবে জনসন সরকারের প্রধান সমস্যা। শান্তির পথে এইটাই সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন। সুতরাং অচিরে শান্তির আশায় অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়া সমীচীন হবে না।

৭-১-৬৭

'একটি অবদান'

কখনো কখনো এমন এক একটি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা যায়—যা আমাদের চিত্তো-লোককে আকুল করে তোলে। সেই 'গ্রন্থের' সংস্পর্শে 'জননান্তর' না হোক, আমাদের অতীত দিনের অনেক সুখস্মৃতি মনে পড়তে থাকে। সংপ্রতি এই রকম একটি

মূল
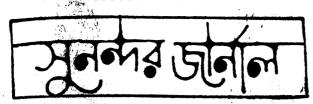
সুখস্বাদ লাভ করে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

শুধু বিষয়ে নয়, চেহারাতেও বইখানি সমান রম্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা যদিচ ত্রিশের বেশি নয়, তবুও এতে (রঙিন প্রচ্ছদপট বাদ দিয়ে) ছবির সংখ্যা তেইশ, তার সতেরো-খানি বহুবর্ণ। দামী দুর্লভ কাগজে ছাপা। ভেতরে অনবদ্য পাঠ্যবস্তু। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এমন নয়নমনবল্লভ বই-খানি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। এই অবদান কার দ্বারা সম্ভব? না—না, কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রোপাগান্ডা লিটারেচর নয়, একেবারে ঘোরতর স্বদেশী ব্যাপার—বইটি আমাদের উপহার দিয়েছেন

"পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন অ্যান্ড - ব্রডকাস্টিং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া", সাকিন : দিল্লী। এর প্রথম প্রকাশ নাকি ঘটেছিল জানুয়ারি ১৯৫০ সালে, এটি মার্চ ১৯৬৬ সালের 'পরি-মার্জিত সংস্করণ' (অপরিমার্জিত সংস্করণ কাকে বলে?)। অবশ্য আরো মাসদশেক আগেই এটি আমার পড়া উচিত ছিল, কিন্তু সব ভালো জিনিসই তো আর চট করে হাতে আসে না!

বইখানি একটি ইংরেজী পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। 'অনুবাদক হচ্ছে পয়লা নম্বরের বিশ্বাসঘাতক'—এই বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় উক্তিটির এমন নমুনা সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু বইটির কথা বলবার আগে আমার স্মৃতি-রোমাঞ্চ জাগল।

সে হয় খাইতেছে কয়েকটি কাঁচকলা—যাহা ছিল অতি পাকা'—আমাদের স্কুলের কোনো সহপাঠী ইংরেজী থেকে এই

ভাবানুবাদ

আক্ষরিক অনুবাদ করায় মাস্টার মশাইয়ের কয়েকটি প্রচণ্ড চড় খেয়েছিল। বলা আবশ্যক, তার সেই নিগ্রহে আমাদের মন বেদনায় ভরে ওঠেনি, বরং উলটো রকমের প্রতিক্রিয়াই ঘটেছিল। তারপর বড়ো হয়ে আরো অনেক ভালো অনুবাদের নমুনা আমরা দেখেছি। 'কেননা পাপের বেতন মৃত্যু'—যার আদিরূপ 'গোনার মাহিনা মৃত্যু'—পথ চলতে চলতে আমাদের চমকে দিয়েছে। দিল্লী থেকেই আমরা 'ঝটিকা'র ইংগানুবাদ পেয়েছি 'ব্রুমস্টিক' এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে পেয়েছি "তিমির আড়ালে কে তুমি দাঁড়ালে"র ইংরেজী রূপান্তর "হু আর্ট দাউ স্ট্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং বিহাইন্ড দি হোয়েল।" কিন্তু বিদেশীদের আমরা সহ্য করতে পারি "ক্লাকিং গোপালস স্টার্টিং" (গোপাল উড়ের যাত্রা) সত্ত্বেও—কারণ বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা নয়।

কিন্তু "আওয়ার ফ্ল্যাগ" বইটিকে

আক্ষরিক অনুবাদ

"আমাদের পতাকা" বলে যাঁরা বা যিনি অনুবাদ করেছেন, তাঁদের বা তাঁর 'পাপের বেতন' নিশ্চয় 'মৃত্যু' নয়—অবশ্যই অনেক-গুলো টাকা। এই বেতনের বিনিময়ে আমরা কী পেয়েছি, তার এক আধটু নিদর্শন নেওয়া যাক। অনুবাদের কৃতিত্ব বোঝবার জন্যে ইংরেজী বইটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত দিতে হবে—সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আগেই বলেছি, এটি 'পরিমার্জিত সংস্করণ।' অপরিমার্জিত বঙ্গ সংস্করণটি ছিল কিনা জানি না, থাকলে সেটি কী রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। "দিল্লী হনুজ দূর অস্ত"—আজকের দিনে সে-কথা নিশ্চয় সত্যি নয়; আর 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র পীঠস্থান দিল্লীতে শুধু—অন্তত অর্থবহ—বাংলা ভাষার চর্চা হয় না, অতি বড়ো নিন্দুকও এমন কথা বলতে পারেন না।

'আমাদের পতাকা' বইখানাকে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিতে পারলে এর পুরো রসটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত (আমার মতো যাঁরা এর আগে এটি

মূল

ভাবানুবাদ

আক্ষরিক অনুবাদ

পড়েননি, তাঁদের সম্পর্কেই বলছি)। তবু বিন্দুতেই সিন্ধুর স্বাদ মিলবে।

• পাতা খুলতেই গান্ধীজির বাণীর অনুবাদে একবার "আবশ্যকীয়' আর একবার 'অত্যাবশ্যকীয়' পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। অনুবাদের স্বর্গরাজ্যের দিকেই তাকানো যাক। আড়ষ্ট, অসহ্য, পূর্ববঙ্গীয় ধাঁচের বাংলোকেও ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু ধাঁধার উত্তর কে দেবে?

'উৎপত্তি' অধ্যায়ের চতুর্থ প্যারাগ্রাফে পাওয়া গেল : "শ্রীমতী কামা এবং তাঁহার বৈপ্লবিক সহকর্মীগণ ১৯০৭ সালে... প্যারিসে দ্বিতীয় পতাকাটি উত্তোলন করেন।" শ্রীমতী কামার পরিচয় না জানলে বাংলা পড়ে সন্দেহ হচ্ছে, বুঝি ফরাসী বিপ্লবীরাই ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। অসম্ভব নয়—ফরাসীরা 'সাম্য মৈত্রীর' মন্ত্রে ভারত-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু ইংরেজিতে আছে "Band of exiled revolutioneries"—আর "exiled" কথাটি বাদ পড়তে (ওর বোধ হয় বাংলা হয় না!) জিনিসটা এমনি ব্যাসকুটে পরিণত হয়েছে।

"Socialist Confernce in Berlin" —এর আদর্শ বাংলা কী হতে পারে মনে করেন? কেন—"বার্লিনে সমাজতন্ত্রবাদীদের সমাজতান্ত্রিক এক সম্মেলন!" বাপস্! কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই—ধনতান্ত্রিকেরাও তো সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন করতে পারেন—তাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেওয়া হল। "Major Community"-র বাংলা "বৃহৎ সম্প্রদায়"—"Reddish Brown" "রক্তাক্ত বাদামী।" একেবারে রক্তারক্তি কান্ড!

কিন্তু কম্বলের রোঁয়া বাছবার দরকার নেই আর সুনন্দর পাতাতেও স্থানাভাব। একটি বাক্য উদ্ধৃত করছি, আপনারা অর্থোদ্ধার করে বলুন, মিশনারীরা এর চেয়েও খারাপ বাংলা লিখেছিলেন কিনা।

"আজিকার দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ এবং পরমত অসহিষ্ণুতার মুহূর্তে আমাদের মন যে প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যের দিকে—যাহা আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, যুগ যুগ ধরিয়া ভারত বহন করিয়াছে—যাহাতে ধাবিত হইয়াছে, ইহা উত্তম কথা।"

"যাহা এবং "যাহাতে"র কল্যাণে যে ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে "ইহা উত্তম কথা" বলতে পারলে খুশি হওয়া যেত, কিন্তু হতভাগ্য জওহরলাল ইংরেজীতে যা বলতে চেয়েছিলেন তা এই :

"It is well that at this moment of strife, conflict and intolarence, our minds should go back towards what India stood for in the ancient days and what, I hope and believe, it has essentially stood for throughout the ages!"

এই অনুবাদ করে কোনো স্কুলের ছাত্র পাশ নম্বর পেতো কিনা সন্দেহ, কিন্তু দিল্লীর ব্যাপারই আলাদা। অতএব রাধাকৃষ্ণনের বাণীর অনুবাদ পড়তে হল : "ভারতবর্ষের পরিবর্তনকে বাধা দেওয়া আর উচিত হবে না, তাহাকে অবশ্যই সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে।" ("India should no more resist change, it must move and go forward.") পরে জানতে হল "Trichonomatic method"-এর বাংলা "ট্রাই-কোনমিক নিয়ম অনুসারে।"

এ সমস্ত মণিরত্ন যথেচ্ছ আহৃত, পাঠক-পাঠিকারা কৌতূহলী হয়ে বইটি সংগ্রহ করলে অসীম আনন্দ পাবেন। জাতীয় পতাকা আমাদের সগর্বে উড়তে থাকুন, কিন্তু এত রাশি রাশি পয়সা খরচ করে এ সব আবর্জনা ছাপা হয় কী উদ্দেশ্যে এবং কা'র স্বার্থে?

হে বিদেশী ফুল

রঞ্জন

খাদ্য নিয়ে আকাশছোঁয়া আর্তনাদ বুঝি, যদিও এই সার্বিক ক্রন্দনচর্চায় বহু মেষের হৃদয় বিগলিত হয়েছে এমন গ্রাহ্য সাক্ষ্য বিরল। ওয়াশিংটন থেকে প্রার্থিত টনের সংখ্যা নগণ্য; অমাত্য সুব্রহ্মণ্যম ভিক্ষা-মুদ্রায় তাঁর দেহের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রদর্শন করতে কসুর করেননি; কিন্তু প্রাপ্তি সামান্য। এইসকল অপমানই হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে ভিক্ষালব্ধ গমে আংশিক প্রাচুর্যের ভান করেছি; থাম করিনি। আন্তর্জাতিক কর্ণ-মর্দন আমরা অর্জন করেছি। পেরেছিও। বর্তমান পরনির্ভরতা একান্তই অবিস্ময়কর। দেশব্যাপী বিলাপ একেবারেই প্রত্যাশিত।

কিন্তু আমাদের বোধ হয় সীমাহীন প্রতিভা আছে অসমস্যাকে সমস্যার আচ্ছাদনে আবৃত করে একাধারে ভয় পাবার এবং ভয় দেখাবার। কোনো অলস মুহূর্তে সেদিন শুনেছিলাম আকাশবাণীর আলোচনা। আমাদের অনেক বিজ্ঞানী ও বিশ্বকর্মারা নাকি বিদেশে স্বেচ্ছানির্বাসনে আছেন এবং আমাদের নানাবিধ দুর্ভাগ্যের মূলে কারণ নাকি এই—কথাটা কোনো ক্লান্ত ফ্লীট স্ট্রিটের সহ-সম্পাদক রাত্রিশেষে প্রসব করেছিল—এই ব্রেন ড্রেন, যার কথাগত তর্জমা বোধ হয় হবে মস্তিষ্ক নিষ্কাশন। কতিপয় ডক্টর, ডাক্তার এবং অনুরূপ ভারতীয় প্রবাসী হয়েছেন বলে আমরা রসাতলে আছি এমন বক্তব্য অগ্রাহ্য জ্ঞান করি। বিদেশে দেখেছি নানা বিত্তবান নিম্নবুদ্ধি; একাধিক সমৃদ্ধ মধ্যবুদ্ধি। তাঁদের বিহনে আজ উপবাস বিহারে, এমন প্রস্তাবনা একেবারেই ঘৃণ্য।

✻

বাইরে থেকে কয়েক হাজার ডাক্তার বা বিজ্ঞান-কর্মীকে ঘরে ফিরিয়ে আনলে আমাদের নানা জাতীয় সংকটের সামান্যতম নিরসন হবে এমন আশা একান্তই অলীক। আর, ঘরে ফেরাই বা তাদের কিসের আকর্ষণে? প্রশ্ন শুধু সাচ্ছল্যের নয়, যদিও এর গুরুত্ব ব্যক্তির কাছে গৌণ হতে পারে না। প্রশ্ন স্বাধীনতারও। বর্তমান ভারতবর্ষে এমন একটা জীবনাদর্শের আধিপত্য ক্রমোন্নতির পথে যা আজকের পশ্চিমী প্রাণপ্রাচুর্যের পরিপন্থী। এখানে মণ্ডূক চাইছে কূপে ফিরে যেতে। পশ্চিমের মূলমন্ত্র বিস্তার। সামাজিক অবাধ মিশ্রণ বা পানস্বাধীনতা আনুষঙ্গিক মাত্র। প্রবাসী ভারতীয় মস্তিষ্কের বুদ্ধি চায় না রাজনীতিকের হাতে তাচ্ছিল্য, তার হৃদয় চায় না বর্তমান সাচ্ছল্যের পরিবর্তনে অকারণ অনটন।

জাতীয় দৈন্যের অর্জিত অপঘাতে আমাদের জাতীয় শ্লাঘার কোথায় যেন বিকৃতি ঘটেছে। বাইরে-থাকা বিজ্ঞানী এবং অন্যান্যদের উপযুক্ত সংস্থান আমাদের বর্তমান সাধ্যের অতীত। ও'রা আসলে এখনই ফিরে এলে নয়াদিল্লি যারপরনাই বিব্রত হবেন। তবু বিলাপ ও বিদ্রূপের অন্ত নেই এজন্য যে, ও'দের বৈদেশিক অবস্থিতি দেশের পক্ষে অবমাননাকর বলে মনে হয়। দেশে সহস্র হাসপাতালে যোগ্য ডাক্তার নেই, অথচ বিলেতে ভারতীয় ডাক্তারের অপরিহার্যতা স্বীকৃত, এ কেমন কথা? বিদেশে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সম্মান-যোগ্য কীর্তি ঘোষণা করছে দিনের পরে দিন, অথচ দেশে সংখ্যা নেই বন্ধ্যা ল্যাবরেটরির, এ কেমন কথা? দিল্লি তুষ্ট যে, অর্থগৃধ্নুতাই এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। অবিচার তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু অভিযোগটা শ্রাব্য হতো যদি দিল্লিতে অর্থগৃধ্নুতা অন্তত আরু পরতো।

✻

দিল্লির সাম্প্রতিক বিক্ষোভের মূলে আরো গভীরে। বিদেশবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ফিরিয়ে আনা চাই—জ্যান্ত বা মৃত—কেননা ওরা বিদেশী ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করেছেন। তুল্য দেশীয় মস্তিষ্কের সমাদরের গুরুত্ব হয়নি। আন্তর্জাতিকতা শিক্ষাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে। বিদেশী ডিগ্রি মাত্রই অশ্রদ্ধের নয়। তবু স্বদেশলব্ধ শিক্ষা বহুকাল ব্রাত্য বিবেচিত হয়েছে শুধু বিদেশাগত নয় বলেই। বিগত শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ফল ছিল আত্মাবিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্র যত না হিন্দু হয়েছিলেন সংস্কৃত পড়ে তার চেয়ে বেশী ইংরেজী পড়ে। মাইকেল তো বাঙলা লিখলেন ইংরেজী সাহিত্যের "মানা" অভিযানে অসার্থক হয়ে। রবীন্দ্রনাথের হে বিদেশী ফুলের অভ্যর্থনা ছিল একেবারেই নিজের ভাষায়। ভারত সরকারের বর্তমান ব্যর্থতা ভাষাগত এই অর্থে যে, একাধারে বিদেশী মোহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদেশী ভাষা নির্বাসিত হয়েছে বা অল্পসংখ্যক লেখকের অপর ভাষার করুণ দ্বিতীয় জীবনযাপন করছে। যেমন, সম্ভবত, আমার অক্ষম রচনায়।

তবু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিচারপদ্ধতি স্বতন্ত্র হওয়াই সম্মত। সাহিত্যের দেশ আছে, জাতি আছে। বিজ্ঞান তো জাতিস্বাধীন। আমার থার্মমিটার যদি বলে আমার জ্বর ১০৫°, তবে তা বিশ্বের সর্বভাষায়ই তাই—শুধু সেণ্টিগ্রেড আর ফারেনহাইটের বিভেদ ছাড়া। চাঁদ আমার কাছে এক বস্তু; তোমার কাছে আর। কিন্তু এ ব্যাপারে রুশ ও মার্কিন শূন্যোচারীদের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান আছে বলে মনে হয় না। দুয়ের ক্যামেরায় চাঁদের চেহারা এক। মোটামুটি। সাহিত্য স্বতন্ত্র সামগ্রী। সেখানে আমি দেখতে পারি কেশবতী কন্যা; তুমি কজ্জাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র।

✻

ভারতীয় বিজ্ঞানে উগ্র স্বাদেশিকতার পুনরুজ্জীবনে শঙ্কিত হবার কারণ এই যে, মৌল বৈজ্ঞানিক অসাফল্যের অজুহাতরূপে মস্তিষ্ক নিষ্কাশনের উদ্ভাবন হয়েছে। অন্তর্বর্তী অবিকাশের ব্যাখ্যা সামান্য নিষ্কাশন। এই অবিকাশের কারণানুসন্ধান স্থগিত রাখা যেতে পারে যদি বহিরাক্রমণের কোনো পরিস্থিতি উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রাজনীতিতে অনুরূপ সত্যাপলাপ প্রায় ইতিহাসসম্মত। বিজ্ঞানে অসমীচীন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন সমার্থক নয় যদিও এ-পার্থক্য অধুনা সর্বত্র স্বীকৃত হয়নি দিল্লিতে। বিজ্ঞাপন প্রাধান্য লাভ করেছে বিজ্ঞানের উপর। বিজ্ঞানীর অপমান ঘটেছে বিজ্ঞাপনকৌশলীর বিপুল সম্মানে।

আমার নাম রামমনোহর লোহিয়া নয়। আমি আদৌ বিশ্বাস করিনে যে, ইংরেজী হঠালেই আমাদের মোক্ষলাভ ঘটবে। ওই ভাষার প্রতি আমার অনুরাগ ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। তবু ব্রেন ড্রেনের কান্নায় আমি যোগ দিতে অপারগ। তজ্জনিত ক্ষতি যা ক্ষত আমার মতে অকিঞ্চিৎকর। আমার আবাদে যদি সোনা না ফলে থাকে তার কারণ আমার নিজের মন কৃষি-কাজ জানে না। কারণ, আমরা স্বদেশী ঠাকুরকে ভুলে বিদেশী কুকুরে মন দিয়েছি। আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, প্রবাসীদের প্রতি অভিসন্ধি-আরোপে আমি অনাগ্রহী; তাঁরা সবাই অর্থগৃধ্নু নন; অন্তে যোগ করতে হয় যে, দেশীয় এবং প্রায়শ গলাবাজ বিজ্ঞানীদের হৃদয়ে প্রধান চিন্তা সর্বদা হয়তো দেশ-প্রেমের নয়। প্রত্যাবর্তনের সমস্যা আদেশের নয়, আকর্ষণের। আকর্ষণ স্বদেশে সদাক্ষীয়মাণ।

করেছেন
'আগে গেলে
সোনা

সাসানি দেশের
ভবিষ্যৎ
অন্ধকার
দেখছেন
রাজাজীর চোখে

উচিত

Kutti

কিচেন গারডেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফুটেছ গোলাপ তুমি কলকাতার কিচেন গারডেনে।
বিলক্ষণ অন্যায় করেছ। তুমি জানো,
এখন খাদ্যের খুব অনটন।
এখন চিচিঙ্গে, লাউ, চ্যাঁড়শের উদ্দেশে ধাবিত
জনতাকে ফেরানো যাবে না
অন্য দিকে।
বাড়ির হাতায়, শীর্ষে, বারান্দায়, ঝুলন্ত কারনিসে
যেখানে যেটুকু ফালতু জায়গা ছিল—
ইনচি-সেনটিমিটারের চৌখুপী বিন্যাসে সব বুঝে নিয়ে
এখন সবাই
বাতিল কড়াই, গামলা, কাঠের বারকোষে
পালং, বরবটি, শিম, ধানী লংকা
ইত্যাদি বসিয়ে যাচ্ছে।

তারই মধ্যে নিঃশব্দে দিয়েছ তুড়ি, ফুটেছ গোলাপ।
অন্যায় করেছ।
"আরেব্বাস, কত বড় গোলাপ ফুটেছে!"—
কে যেন উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলেছিল; কিন্তু তার ভোটার জোটেনি।
জনতা হুড়মুড় করে প্রাইভেট বাসের
বামপারে দাঁড়িয়ে গিয়ে হুলুধ্বনি দিয়ে উঠল : গোলদিঘি
চলো হে।

শুধুই গোলদিঘি বলে কথা নেই। উত্তরে দক্ষিণে
সমস্ত কলকাতা
জুড়ে আজ চমৎকার সবজির বাগান
জমে উঠছে।
শুধুই গোলাপ বলে কথা নেই। সমস্ত ফুলের
বোঁটাসুদ্ধ খেয়ে ফেলছে চ্যাপলিনী তামাসা।
সবাই টোমাটো, উচ্ছে, ধুঁধুলের মধ্যে ডুবে গিয়ে
মনে মনে
অংক কষছে, কোথায় কতটা জমি এক লপ্তে চষে ফেলা যায়—
গঙ্গার জেটিতে, ডকে, নির্বাচনী মিটিঙে, সন্ধ্যার
ময়দানে অথবা শতবার্ষিকী ভবনে।

তুমি রোদ্দুরের দিকে

কবিরুল ইসলাম

তুমি বড্ড দূরে চলে যাচ্ছো ইদানীং
সারা দিনমান তুমি ব্যস্ততার বর্ম পরে থাকো
ঘাড়-ভাঙা ব্যস্ততার দুস্তর আড়ালে
তুমি কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং
সমূহ প্রস্তুত? সর্বনাশ! আমি কিছুই জানিনে।

আমি এরকম যুদ্ধ পছন্দ করিনে
দু পক্ষ প্রস্তুত হয়ে সমকক্ষ হলে
তারপরে খেলা...
তুমি এতো ব্যস্ত থাকো আমি কিচ্ছু খবরই রাখিনে।
নাকি আমি হেরে গেলে তুমি খুশী হও?
আচ্ছা, তাই হবে। আমি যুদ্ধে হেরে যাবো।
আমি খালি হাতে কিছুক্ষণ রুখে যাবো
দেখে নেবো তোমার শক্তির ব্যবহার—
তুমি কতো দূরে যেতে পারো, দেখা যাবে।

দুঃখ কিংবা সুখ কিংবা ঘৃণা
কিংবা প্রেম ভালোবাসা কিংবা
বিরহ কিছুই আর ইদানীং দ্বন্দ্বাতীত নয়—
কখনো ছিলো কি?
তবু এরকম দ্বন্দ্ব আমি কিন্তু পছন্দ করিনে।
ব্যস্ততার বর্ম ছিঁড়ে ভান ছেড়ে তোমার সহজ হওয়া চাই
দীক্ষের খোলস ছিঁড়ে রোদ্দুরের দিকে যাওয়া চাই।

এজন্য দু দণ্ড নয়, দু একদিনের ধৈর্য নয়—
মন্দাক্রান্তা অবসরে ফিরে যেতে হবে :
তুমি রোদ্দুরের দিকে ঈশ্বরীর মতো
আমি সমস্ত দুপুরময় হেঁটে যাবো।

প্রেম

শান্তিকুমার ঘোষ

অতি স্থির লতাকুঞ্জ : কুয়াশা গিয়েছে ম'রে।
জ্যোৎস্নায় দ্রব কন্যা মুখ তার নীচু ক'রে,
অন্যের ফেরানো চোখ আকাশের দিকে।
'কে ধরাবে আযৌবন একটি আধারে এত তপ্ত ভালোবাসা।
উপচে সহস্র পাত্র সর্বপ্লাবী প্রেম ছোটে নতুন হৃদয়ে।
যতক্ষণ আছে, ছিল আমাদের এ প্রণয়, জেনো অনশ্বর'
—গাঢ় স্বর উঠে নেমে অরণ্য-পাহাড় বেয়ে মিশেছে সাগরে।

ধর্মরাজ পূজায় চড়ক

শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার 'ধর্মরাজ পূজায় আজও পিঠবাণ-চড়ক' প্রবন্ধে ('দেশ' ৩৪ বর্ষ, সংখ্যা ৮) বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দিক উদ্‌ঘাটন করায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্য অবগতির জন্য নিবেদন করি—

(১) বীরভূম জেলার সুপ্রাচীন মল্লারপুর গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে আজও যে চড়ক হয় তাতে জিভ-বাণের ব্যবহার আছে। অবশ্য, তা মাত্র একজনের ক্ষেত্রেই—যার উপর 'ভর' হয়। তাঁকে 'রাজা' বলা হয়। (২) আগুন নিয়ে 'ফুল খেলা' এবং কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটা এখানেও প্রচলিত। (৩) এ চড়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিব এবং ধর্ম-দেবতা এ উৎসবে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। (৪) মল্লেশ্বর শিব (মূল মন্দির ১১২৪ শকাব্দ বা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি) এ গ্রামের জাগ্রত দেবতা, যাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। আবার গ্রামে চারটি ধর্মরাজের 'থান'ও আছে। তার মধ্যে দুটিতে পাকা মন্দির, যা দক্ষিণমুখী। সবগুলিই শিলা-মূর্তি এবং একই ধরনের। (৫) একদা সবগুলিই ছিল গ্রাম প্রান্তে এখন একটি মাত্র গ্রামের বিস্তৃতির জন্য ভিতরে এসেছে। প্রসংগত বলে রাখি, মাণিকরামের ধর্মমংগলে মল্লারপুরের ধর্মদেবতাদের কথা সবিস্তারে লেখা আছে। (৬) লোকবিশ্বাস, মূর্তিগুলি প্রায় ১০০০ বছরের পুরনো (মনে হয় এ ধারণা সত্য)। বনের ধারে এ গ্রাম। রাঢ়ভূমির মাল বা মল্লদের দ্বারাই এ গ্রামে গড়ে ওঠে। তাদেরই নামে গ্রামের নাম—মল্ল বা মালদেব পুরী (পুর) এই অর্থে মল্লারপুর। এবং মল্লদের ঈশ্বর এই অর্থে শিবের নাম মল্লেশ্বর। গ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর লোক সংখ্যা এখনও প্রচুর। যদিও তার একটি বিরাট অংশ তুর্কী আক্রমণোত্তরকালে মুসলমান সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। (৭) উৎসবে যাঁর জিভ ফোঁড়া হয় ('রাজা') তিনি শিবের স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নাদেশের দ্বারাই বিভিন্ন সময়ে স্বগ্রাম এমন কি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের ব্যক্তি এই মনোনয়ন লাভ করেছেন। (৮) সংক্রান্তির দিন উষালগ্নে 'রাজা' এবং তাঁর অনুচর ভক্তবৃন্দ মল্লেশ্বর মন্দির হতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে (পশ্চিমে সূর্যোদয়!) শিব-পাহাড়ীর শিবের 'থানে' পৌঁছান গহন বনের মধ্য দিয়ে (কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে নয়। যাবার সময় 'রাজা'র বার বার 'ভর' হয়। আশ্চর্য কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর এবং অন্যান্য ভক্তের। সম্ভবত আর কোথাও এটা নেই)। সেখানে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ঐভাবে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর মল্লেশ্বর মন্দিরের অদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে 'রাজা'র জিভ 'বাণ' দিয়ে বিদ্ধ করা হয়। সহস্র জনতার সম্মুখে, দিবালোকে। এ ছাড়াও সংক্রান্তির পূর্বে ও পরে বিশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রয়েছে, যার বিবরণ পৃথক প্রবন্ধ রচনার দাবি রাখে। (৯) অনুষ্ঠানে শিব দেবতার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনি ধর্মরাজের 'থানসমূহেও ভক্তদের সম্মিলিতভাবে উপস্থিত হতে দেখা যায়। অথচ সাধারণ্যে এটি 'বাণগোসাইয়ের পূজা' নামেই খ্যাত। (১০) ভক্তদের হাতে থাকে দীর্ঘ 'বেতের যষ্টি'। সম্মিলিতভাবে তারা যখন 'বাণ গোসাইয়ের জয়' ঘোষণা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা রোমাঞ্চকর। যেন সুদূর অতীতের মাল যোদ্ধারা যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে দেবতার কাছে প্রণাম জানাতে ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এসেছেন। শুষ্ক দেহ, ঊর্ধ্বাংগ নিরাভরণ, শুধু নিম্নাংগে মালকোচা করে পরা হলুদ রঙে রাঙা পাঁচ হাত ধুতি রয়েছে। তাঁদের আচরণে ভক্তির সংগে মিশেছে বীর্য ও পৌরুষ। (১১) ব্রাহ্মণেরাই এখন এ সকল দেবতার পূজা করে থাকেন। (১২) চৈত্র সংক্রান্তিতে মল্লারপুরের মেলার যথেষ্ট সুনাম আছে। (১৩) এ অঞ্চলে লোক-প্রচলিত ধারণা, এই চড়ক অত্যন্ত প্রাচীন। এবং তাতে আর্যেতর সমাজের সংস্কারও জড়িত রয়েছে। বছরের শেষ দিনটিতে এই উৎসবে রাজার ও প্রজার সম্মিলিত উপ-স্থিতি, যেখানে দেবতার আশীর্বাদে 'রাজা' প্রজা-শাসনের দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু অবিচারের অধিকার তাঁর নেই। গণতন্ত্র পূর্ণ মর্যাদায় এখানে প্রতিষ্ঠিত। জিভবাণের দ্বারা 'রাজা' 'বাক্-বদ্ধ'। অর্থাৎ প্রজাদের কথা মতোই তাঁকে চলতে হবে। আগত নতুন বছরকে সম্মুখে রেখে 'রাজা'র তারই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ। বলা বাহুল্য, এই প্রতীক-ধারণা যুক্তির অপেক্ষা রাখে; যাথার্থ্য বিচারসাপেক্ষ।

তবুও আগুন ও কাঁটার খেলা, বাণ-প্রয়োগ, গহন বন অতিক্রম প্রভৃতি প্রথার প্রাচীনত্বই প্রমাণ করে। এগুলির সংগে শ্রী মজুমদার অনুমিত রঞ্জাবতী, লাউসেন প্রমুখের কৃচ্ছ্রসাধনের আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্থানীয় লোকের ধারণা, মল্লারপুরে একদা মল্লরাজারা রাজত্ব করতেন, যার অজস্র চিহ্ন এ গ্রাম এবং তার চারপাশে বিদ্যমান। মল্লেশ্বরের মন্দির যতদূর সম্ভব একমাত্র বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরেই আছে এবং বিষ্ণুপুরের রাজারাও ছিলেন জাতিতে মাল। প্রশ্ন, মল্লারপুরের অতীত ইতিহাসের সংগে তাঁদের কোন যোগ রয়েছে কি না।

কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি অতি প্রাচীন মূল্যবান মূর্তি মল্লেশ্বর মন্দির এবং গ্রামের অন্যান্য স্থান হতে চুরি হয়ে গেছে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুর দিকে পশ্চিমবংগ সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানস মজুমদার
মল্লারপুর, বীরভূম।

মনের সীমানা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মাঝরাতে সোমেনের ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথমে আবছা অন্ধকার, তারপর একটু একটু করে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এল। জানালার কাঠামো, টেবিলের অস্পষ্ট অবয়ব, খাটের ইশারা। একটু পরে, অন্ধকার তরল হতে খাটের ওপর, সোমেনের পাশে শুয়ে থাকা মানুষ দুটোকেও দেখা গেল। সোমেন দেখতে পেল।

রেবা শুয়ে আছে। একটা পা গুটিয়ে। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলে পড়েছে। অন্য দিন হলে সোমেন হাতটা বিছানার ওপর তুলে দিত। রেবার মাথাটা কাত হয়ে পড়েছে, হয়তো একটু যত্ন নিয়ে মাথাটা আবার বালিশের ওপর সরিয়ে দিত। বলা যায় না, মেজাজ খুশী থাকলে, রজনীর এই মধ্যযামে আলতো একটু আদরও করত রেবাকে। রেবা টের না পেলেও, বুঝতে না পারলেও।

কিন্তু আজ আর কিছু ইচ্ছা করছে না। রেবা সম্পূর্ণরূপে তার আওতার মধ্যে, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতেও ইচ্ছা করছে না। রেবাকে ঘিরে একটা অশুচির বলয়, কলঙ্কের কালিমা।

অথচ সোমেন অফিস থেকে ফিরে এলে প্রতিদিনের মতন তার টাই খুলে দেবার জন্য, জুতোর ফিতে আলগা করার জন্য একই রকম ব্যস্থতা দেখিয়েছিল রেবা। তার আচরণে কোন খুঁত ছিল না। ব্যাপারটা না জানা থাকলে সোমেনের সন্দেহ করার কোন অবকাশই হত না।

আজ সে রেবার সেবা নিতে পারে নি। তাকে এড়িয়ে গেছে। বলেছে, থাক, থাক, আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

রেবা রসিকতা করেছে। দু চোখে বিলোল কটাক্ষ এনে, তার উদ্ধত যৌবনের স্পর্শ সোমেনের শরীরে দেবার প্রয়াস করে বলেছে, শুধু চায়ের তেষ্টা? আর কিছুর নয়?

সোমেন কোন উত্তর দেয় নি। উত্তর দিতে তার ইচ্ছা হয় নি। উত্তর দিতে গিয়ে রেবার স্বৈরিণীরূপটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মনে হয়েছে, এই প্রগলভতা, এই বাকচাপল্য, এ সবের উৎসই ভ্রষ্টাচারিতা। এক থেকে আর একটির জন্ম।

সেবা নেয় নি, কিন্তু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়েছে। নেবার সময় হাতে হাতে যে ছোঁয়াছুঁয়ি সেটা যে রেবার ইচ্ছাকৃত সেটা বুঝতেও সোমেনের অসুবিধা হয় নি। এমনও করতে পারত সোমেন, হাত প্রসারিত করে কাপটা না নিয়ে, আঙুল দিয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিতে পারত। রেবা কাপটা ওখানে রেখে দিক। সোমেন সময়মত ঠিক টেনে নেবে।

কিন্তু পারে নি। এতটা ভাববার সময় সোমেন পায় নি। রোজকার অভ্যাস, যেটা প্রায় সোমেনের রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সেই অভ্যাসমত হাতটা বাড়িয়েছে। চায়ের কাপ নিয়েছে। সামান্য ছোঁয়াছুঁয়িটুকু শরীর গ্রহণ করেছে, মন হয়তো নেয় নি। তবু সোমেন আপত্তি করে নি। মুখে চোখে বিরক্তির আঁচড় ফোটায় নি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেবেছে কিভাবে কথাটা শুরু করবে। কি বলবে রেবাকে? চেঁচামেচি হইচই করতে সোমেন পারবে না, সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার মারাত্মক পরিণতির আশঙ্কা যার প্রতি শব্দে, সে কথাগুলো কি করে সোমেন অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলবে। প্রেমের বাণী উচ্চারণের মতন করে।

ভেবেছিল বিকালের জলখাবারের পর খুলে বারান্দায় পাশাপাশি বসে সোমেন কথাটা বলবে। এই সময়টুকু দুজনে কাছে বসে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নয়, একটু ব্যবধান রেখে। সবুজ রংয়ের দুটি বেতের চেয়ারে। রেবাই কিনেছিল। শুধু দুটো চেয়ারই নয়, দুটো পামগাছ কিনেছিল টবসুদ্ধ। বারান্দার দুটি কোণে রেখেছিল। গাছ দুটো বাঁচে নি। কেন কে জানে। হয়তো রেবার অত্যধিক যত্নে। সকাল, বিকাল, দুপুর জল ঢালা, অফুরন্ত পরিচর্যা, এসব গাছ দুটি সহ্য করতে পারে নি। ঘন সবুজ পাতাগুলো প্রথমে বিবর্ণ, তারপর একটু একটু করে পীত হয়ে গিয়েছিল। কাণ্ডটা শুকিয়ে কালো।

তখন মনে পড়ে নি, আজ, এই মুহূর্তে, অন্ধকার রাত্রে উপমাটা সোমেনের মনে এল। অবিকল বুঝি তার এই সংসারের মতনই। যে সংসারে সে রয়েছে, সেটা নয়, সংসারের যা পরিণতি হবে, ঠিক তার মতন। প্রথমে বিবর্ণ, তারপর পীত। মূল কাণ্ড নীরস, নিথর।

কিন্তু এই ভয়াবহতা থেকে সংসারকে বাঁচাবার, এই সর্বনাশের পাশ কাটাবার কোন পথ নেই। অন্তত সোমেনের জানা কোন পথ।

এরপরও রেবার সঙ্গে এক সংসারে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সব কিছু ভুলে, মিটমাট করে, যেন কোনদিন কিছু হয় নি, এমন মনের ভাব করে। ইংরেজীতে যাকে কমপ্রোমাইজ, খবরের কাগজের ভাষায়, আপোস।

এত ঔদার্য, এত সহনশীলতা সোমেনের নেই। মনের টুঁটি চেপে ধরে শুধু শারীরিক প্রয়োজনে, সমাজের মন রেখে, তাসের ঘর সাজাতে সোমেন পারবে না। এ ত বদান্যতা নয়, নিছক কাপুরুষতা। কালোকে কালো বলবার সাহসের অভাব।

খুলে বারান্দায় বসে নয়, তখন লোটন থাকবে। লোটনকে সামনে রেখে এসব কথা বলা চলে না। এ জটিলতা বোঝার বয়স লোটনের হয় নি। উত্তপ্ত কথাবার্তার সুরে শুনে সে হয়তো চমকে উঠবে। নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে। একবার বাপের দিকে, আর একবার মায়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করবে, কিসের এত উত্তাপ। এত দিনের ঘনিষ্ঠ দুটো মানুষের মধ্যে এত বাদানুবাদ, এমন মেজাজের ফুলঝুরির হেতুটা কি?

বছর পাঁচেকের শিশুর পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়।

লোটনের বয়স পাঁচ বছর। আঙুল গুণে গুণে সোমেন হিসাব করল। রেবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক। সাত বছর বড় কম সময় নয়। সাতটা শীত, সাতটা বসন্ত পার হয়েছে। অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে সোমেন ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি রেবার হৃদপিণ্ডে একটা বিষাক্ত সাপিনী কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। শুধু সুযোগ পাচ্ছে না বলে, ছোবল দেয় নি। এই সাপিনী-হৃদয়কে সোমেন প্রতিদিন ভালবাসার কথা শুনিয়েছে, সোহাগে ভিজিয়েছে, প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ উপহারও দিয়েছে।

প্রতিদানে রেবা সোমেনকে সব দিয়েছে। শরীর, সংসার, সুখ। অন্তত দেবার ভান করেছে। এই ভানটুকু সোমেন ধরতে পারে নি। কারণ, সন্দেহের সামান্য আভাসও তার মনে স্থান পাই নি কখনও। সে নির্ভেজাল সংসার করেছে, গোয়েন্দাগিরি করে নি। করার প্রশ্ন ওঠে নি।

সোমেন রেবাকে কিছু বলতে পারে নি। এক সময় সন্ধ্যায় আবছা অন্ধকার গাঢ় হল। খুলে বারান্দা থেকে রেবা রান্নাঘরে ফিরে গেল। তার মানে ঘণ্টা দুয়েকের মত তার দেখা পাওয়া যাবে না। সোমেন জানে, এই সময়টা লোটন বই নিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের এপারে বসে। আধ ঘণ্টার বেশী নয়। পাঁচ বছরের ছেলের অধ্যবসায়, পাঠস্পৃহা তার বেশী এগোয় না। এক সময় রেবা উনানের সামনে থেকে উঠে এসে ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যায়।

সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু রেবা যখন শোবার ঘরে ঢুকল, লোটনকে শুইয়ে আবার বেরিয়ে গেল সোমেনের খেয়াল নেই। ভাবনা তখন অষ্টোপাশবাহু দিয়ে তাকে মোক্ষমভাবে জড়িয়ে ধরেছে। নিশ্বাস ফেলার পর্যন্ত অবসর দিচ্ছে না।

সোমেন ভাবছিল, এমন যদি হত, জীবন থেকে এ দিনটা, আজকের দিনটা মুছে ফেলা যেত। যেমন ছাত্ররা রাবার দিয়ে ভুল অঙ্ক মুছে ফেলে, চতুর ব্যবসায়ীরা অপ্রয়োজনীয়, কিছুটা ক্ষতিকর হিসাব নিশ্চিহ্ন করে, তেমনি করে আজকের দিনটার বিলুপ্তি-সাধন করতে পারত।

সন্ধ্যাবেলা সম্ভব হয় নি, সোমেন ভেবেছিল রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর যখন সে সকালের খবরের কাগজটা হাতে করে অনেকবার পড়া পুরোনো খবরগুলোর ওপর চোখ বোলাবে, ঘুমাতে যাবার গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে, আর রেবা বাতির নীচে উলের তাল নিয়ে বসবে, কাঁটা নেড়ে নেড়ে ঘর বুনবে, মাঝে মাঝে ভুল হিসাব করে তৈরি করা ঘর খুলে ফেলবে, লোটন বিছানায় অকাতরে ঘুমাবে, তখন সোমেন কথাটা শুরু করবে। প্রথমে শান্ত, নিরুত্তেজ কণ্ঠে, তারপর প্রয়োজনে গলা চড়াবে।

কিন্তু রাত্রেও বলা হয় নি।

বোধ হয় স্বপ্ন দেখে লোটন কেঁদে উঠেছিল, রেবা তার কাছে গিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে করতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে যখন সোমেন চেয়ার ছেড়ে, হাতের খবরের কাগজটা তালগোল পাকিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে, পা টিপে টিপে, একটু শব্দ না করে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল রেবা ছেলেকে জড়িয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

সোমেন ভেবেছিল, বিছানার কাছে আসবার আগে পর্যন্ত এই রকম একটা ভাবনাই তার মনে ছিল, রেবাকে ডাকবে। খুব জোরে নয়, আস্তে, দরকার হলে গায়ে আলতো হাত ছুঁইয়ে, তারপর উঠিয়ে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে কথাগুলো বলবে।

কথাগুলো বলার কোন অসুবিধা নেই। দুপুর থেকে মনে মনে সাজিয়ে, ইঁটের পর ইঁট গেঁথে পাঁচিল তোলার মতন, যুক্তির প্রলেপ দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সোমেন নিরেট করে তুলেছে। প্রায় দুর্ভেদ্য।

সোমেন জানে রেবা একটি কথাও বলবে না। বলতে পারবে না। বলার মতন কথা তার একটিও নেই।

ঘাড় হেঁট করে কথাগুলো শুনবে। সোমেনের কথা। কোথাও অস্পষ্টতার কোন কুহেলী নেই। দিনের আলোর মতন সব কিছু উজ্জ্বল, সত্য।

হয়তো রেবা একবার শেষ চেষ্টা করবে। এমন অবস্থায়, এ পরিবেশে, সব মেয়েই যা করে থাকে। জল ছলছল চোখে চেয়ে দেখবে সোমেনের দিকে। কোন কথা নয়, কথার চেষ্টা পর্যন্ত না, কিন্তু এ নীরবতা হাজার বাক্যের চেয়েও বাঙ্ময়।

মিনতি, অপরাধস্বীকার, নতুন করে

জীবনপালনের প্রতিশ্রুতি। দু চোখের তারায় সব ফুটে উঠবে।

কিন্তু সব অপরাধের ক্ষমা নেই। অঙ্গীকার করে ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানো যায় না। জোড়াতালির প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। মানুষটা থাকে সংসারে, কিন্তু শান্তি চলে যায়।

কথাটা মনে করতেই সোমেন ওপর দিকে চেয়ে দেখল। না, ঈশ্বরের দিকে নয়, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস তার অত্যন্ত কম, বিশেষ করে এমন একটা ব্যাপারের পরে।

জানত, পৃথিবীর লোকেরা যাকে পাপ বলে, সে পাপ সোমেন কোনদিন করে নি। সংসারের প্রতি কর্তব্য, সংসারের মানুষগুলোর প্রতি কর্তব্য, সে অবিচলচিত্তে পালন করেছে। স্নেহময় পিতা, প্রেমনিষ্ঠ স্বামী, এ দুটো ভূমিকাতেই সোমেনের কোন খুঁত নেই। সংলাপে কোন ত্রুটি হয় নি। অথচ আদর্শচরিত্র সোমেনের সংসারে এমন একটা বিপদের ছায়াপাতের জন্য যে ঈশ্বর দায়ী, তার ওপর সোমেনের আস্থা কি করে অটুট থাকবে।

সোমেন কড়িবরগার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। একেবারে কোণের দিকে একটা কড়িতে ঘুণ ধরেছিল। কবে ধরেছিল, সেটা সঠিক সোমেনের জানা নেই। জানা সম্ভবও ছিল না।

হঠাৎ চায়ের কাপে সাদা সাদা গুঁড়ো পড়তে সোমেন চমকে মুখ তুলল, আর তখনই দেখতে পেল। এক নজরে।

কোণের দিকের কড়িটার অনেকখানি খয়ে গেছে। সেখান থেকেই সাদা গুঁড়োগুলো ঝরে পড়ছে। ভাড়াটে বাড়ি নয়, পৈত্রিক বাড়ি। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তাই কড়ির ব্যবস্থা সোমেনকে নিজেকেই করতে হয়েছিল।

কোন এক বন্ধুর কাছে শোনা দাওয়াই। বাঁশের আগায় কাপড় বেঁধে আলকাতরা মাখিয়ে দিল কড়িতে। বন্ধু বলেছিল কীট নির্মূল হবে। ধ্বংসের হাত থেকে কড়ি-বরগা বেঁচে যাবে।

সত্যিই তাই হল। সাদা গুঁড়ো পড়া বেমালুম বন্ধ হয়ে গেল। সোমেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু দিন দশেক, কিংবা তাও বুঝি নয়। অফিস থেকে ফিরতেই রেবা বলল, দেখ কাণ্ড।

সোমেন দেখল।

ময়দার মতন সাদা সাদা গুঁড়োয় সারা মেঝে পরিপূর্ণ।

সেই কড়িরই আর একদিক থেকে ক্ষয় শুরু হয়েছে। আলকাতরার সীমানা পার হয়ে। বোঝা গেল, সোমেন বুঝতে পারল, এ ক্ষয় থেকে কড়িটা বাঁচানো সম্ভব নয়। আলকাতরার আস্তরণ শুধু সাময়িক আরোগ্যের ছলনা।

রেবাকে এই মুহূর্তে কীটদষ্ট ওই কড়িটার মতন মনে হল। প্রলেপে, আস্তরণে তার ক্ষয় বাঁচানো যাবে না। নৈতিক ক্ষয়, কুরে কুরে শুধু মানুষটা নয়, গোটা একটা পরিবারকে যা নিশ্চিহ্ন করে দেয়, অপমানের কালিমায় বিকৃতচিত্রের সামিল।

লোটন পাশ ফিরল। সশব্দে। এতক্ষণ সে মায়ের দেহের আওতায় জড়সড় হয়ে শুয়েছিল। অন্ধকারে দুজনকে আলাদা করে চেনাই দুষ্কর। পৃথক সত্তা নয়, একজন মানুষ, একটি প্রাণ।

এবার লোটন অন্য দিকে ফিরল। মায়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে।

এতক্ষণে সোমেনের লোটনের কথা মনে পড়ল। তার আত্মজের কথা। অবশ্য শুধু তারই নয়, একজনের পৌরুষ আর একজনের

লালিত্য দিয়ে গড়া। দুটি মানুষের রূপ, রস, গন্ধ এক পাত্রে।

কিন্তু এ সংসারে লোটনের একটা ভূমিকা আছে, একটা বক্তব্য। সোমেন আর রেবার এই মনকষাকষির পালায় তার কি অংশ? যদি শেষ পর্যন্ত সব কিছু চরম একটা তিক্ততায় পর্যবসিত হয়, তবে লোটন কি করবে, সে কোথায় যাবে?

নিজের ভবিষ্যত বোঝবার মতন বুদ্ধি তার নেই, সত্যি কথা, কিন্তু সেই জন্যই তাকে অসহায়-তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় না। তার সম্বন্ধে আর কাউকে বিচার করতে হবে, আর কাউকে ভাবতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যা তার ভাবী জীবনের পক্ষে শুভময়।

রেবাও ভাববে, সোমেনও ভাববে।

তবে সোমেনের ভাবনাটাই বেশী কার্যকরী, কারণ এ সংসারের অর্থনৈতিক হাল তার করায়ত্ত। একটা মানুষের ভবিষ্যত গড়ে তোলার নির্দেশ সে দিতে পারে।

রেবার পক্ষে এমন একটা আবদার করা মোটেই অসঙ্গত নয়। শিশু পুত্রের ভার তার ওপরই থাকবে। এ সংসার থেকে বের হয়ে যাবার সময়ে লোটনকে সে নিয়ে যাবে। তাকে মানুষ করবে, সাহায্য করবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

এটা যে রেবা করবে, এমন একটা কথা সে বলবে, এটা সোমেনের জানা। এর জন্য যে সাহস, যে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন, সেটা কে যোগাচ্ছে, যোগাতে পারে, তাও সোমেনের অজানা নয়।

এর চেয়ে রেবা যদি অন্তহীন মিনতিতে ভেঙে পড়ে, দু চোখের কোলে অপর্যাপ্ত জল নিয়ে আসে, ফোঁপানো কান্নার সুরে তার অন্যায়ের স্বীকৃতিটুকু চাপা পড়ে যায়, তাহলে সোমেন খুশিই হবে। যদিও কীট-দষ্ট কড়ির উপমাটা এখনও জ্বলন্ত হয়ে রয়েছে সোমেনের মনে, তবুও সে রেবাকে ক্ষমা করবে। জীবনের অনেক কিছুর বিনিময়ে এই ক্ষমা তাকে করতে হবে, তবু সোমেন এ উদারতাটুকু দেখাতে পরাঙ্মুখ হবে না।

ভাঙাচোরা একটা সংসার, সন্দিগ্ধ একটা মন, জীবনের এই মূলধন নিয়েই তাকে কাটাতে হবে। নিজে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত জীবনযাপন করবে সোমেন, তবু সে মনকে বোঝাল, বোঝাবার চেষ্টা করল, একেবারে গুঁড়িয়ে রেণু রেণু হয়ে যাওয়ার চেয়ে এতো অনেক ভাল, অনেক কাম্য। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের সামনে মাথা নীচু হবে না। হাজার কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে নিস্কৃতি। শুধু মাঝে মাঝে নিজের বুকের ক্ষতটা অশেষ যন্ত্রণায় নিজের অস্তিত্ব প্রচার করার চেষ্টা করবে, চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকারের একটা আস্তরণ নেমে আসবে, কিন্তু সে যন্ত্রণা, সে মসীলিপ্ত যবনিকা শুধু সোমেনের নিজস্ব, তার একান্তের।

এ দুঃখ, এ গ্লানিটুকু তাকে সামাজিক মর্যাদার বিনিময়ে বহন করতেই হবে। এ ছাড়া সোমেনের সামনে, পিছনে, কোথাও আর অন্য পথ নেই।

আইনত, লোটনের ওপর অধিকার রেবার। লোটনের পুষ্টির জন্য, তার বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য সোমেনকেই করতে হবে। যে কোন বিচারালয়ই এমন একটা নির্দেশ দেবে। নাবালক সন্তানের ব্যাপারে এ ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। শুধু সোমেন সন্তানের সান্নিধ্য পাবে না।

অবশ্য লোটন যথেষ্ট বড় হলে, পরিস্থিতি বুঝতে পারার মত সচেতন হলে কার কাছে থাকবে সে দায়িত্ব তার ওপর। মা কিংবা বাবা একজনকে বেছে নিতে পারবে। যতদিন তা না পারে ততদিন লোটন রেবার। তার দিকে হাত বাড়াবার জনকের কোন অধিকার নেই।

ততদিন পর্যন্ত, অবশ্য সে অনেক দিন, আঙুল গুনে গুনে সোমেন হিসাব করল, সতেরো-আঠারো বছরের কম নয়, ততদিন পর্যন্ত সোমেনকে এ সংসারে একলা কাটাতে হবে। তৃষ্ণাতুর হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার মতন মৌসুমী মেঘের টুকরোও কোথাও থাকবে না। টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি, দুটো ঘরে ছড়ানো আসবাব, এই তার সংসার। এদের ছুঁয়ে, এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পায়চারি করে করে, সোমেনকে সংসারের সাধ মেটাতে হবে।

আস্তে আস্তে খাট থেকে সোমেন মাটিতে পা রাখল। পা ঝুলিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল যেন তার ভয় হয়েছে। পা বাড়ালেও হয়তো তল পাবে না। মাটির খোঁজ নয়। এই রকম ত্রিশংকু অবস্থায় বসে থাকবে অন্তহীন কাল।

এক সময়ে মাটি পেল। মেঝের ওপর পা রাখল। দুটো পা। খাট থেকে সরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। সেই ঝুল বারান্দায়।

নির্জন রাস্তা। দু-একটা ট্যাক্সি বোধ হয় বোহিসেবী মানুষকে বাড়ি পোঁছে দিচ্ছে। তার শব্দ। কোথায় একটা রাতজাগা পাখি বিষণ্ণ সুরে ডাকছে। তার সংসারেও বুঝি অশান্তির আগুনের আভাস জেগেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোমেন ভাবল। সংসার যদি মরুভূর প্রতীক হয়, আনন্দলেশহীন, তবুও এভাবে অন্যায়কে, পাপকে প্রশ্রয় দিতে সে পারবে না। পরস্পর্শপঙ্কিল একটা দেহকে আলিঙ্গন করে সোহাগের কথা বলা, যে মন তার নয়, সে মনকে প্রসন্ন করার জন্য অহোরাত্র আরতি, সোমেন পারবে না। এ ধরনের জালিয়াতি তার দ্বারা সম্ভব নয়।

জালিয়াতি ছাড়া আর কি। অন্য লোকের সই নকল করার চেয়েও জঘন্য কাজ।

সোমেন পা দিয়ে চেয়ারটা টানল। একটু শব্দ হল, কিন্তু কেউ জাগল না। রেবা নয়, লোটনও না। লোটনের ঘুম খুব গাঢ়, আর রেবা সম্ভবত দুঃস্বপ্নে বিভোর। অনুচিত একটা চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। ছোটখাট শব্দ, সামান্য কোলাহল, তার মস্তিষ্ককোষে কোন আলোড়ন তুলবে না। পাপ পুণ্যের চেয়ে অনেক শক্তিমান, অন্যায় ন্যায়ের চেয়েও প্রবল। শাস্ত্র, সদ্গ্রন্থ যাই বলুক না কেন। জল যেমন নীচু দিকে গড়ায়, তেমনি মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা নীচ চিন্তার দিকে।

সোমেন চেয়ারের ওপর বসল। আগাগোড়া সব ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করল। রেবার সঙ্গে কথা বলতে হলে সব কিছু মনের মধ্যে সাজিয়ে নিতে হবে। ঘটনার পর ঘটনা।

একেবারে আকস্মিক, কিছুটা যেন দৈবঘটিত।

টিফিনের সময় সোমেন অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল শার্টের কাপড়ের খোঁজে। পাতলা হলদে রংয়ের প্রলেপের মতন ম্লান রোদ। তেজ নেই, দাহ নেই। এমন রোদে কাজের অছিলা করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগে। সোমেন তাই করছিল। এক দোকান থেকে আর এক দোকানে। অপছন্দের ভান করে রোদ পোয়ানো।

হাঁটতে হাঁটতে কখন পার্ক স্ট্রীটে এসে দাঁড়িয়েছে সোমেন, নিজেরই খেয়াল নেই। খেয়াল হবার আগেই দৃশ্যটা চোখে পড়ে গেল।

দীপদণ্ডের পাশে রেবা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। সোমেন আশ্চর্য হয়ও নি। মাঝে মাঝে রেবা দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়ে। লোটনকে প্রতিবেশিনীদের কাছে রেখে। নিউ মার্কেটে যায় টুকিটাকি জিনিসের সন্ধানে, এদিক-ওদিক থেকে কেক, ক্রীমরোল, পেস্ট্রী কিনে এনে সোমেনকে অবাক করে দেয়।

সেই রকম একটা ব্যাপারে পার্ক স্ট্রীটে রেবা এসে পোঁছেছে, এটা সোমেন স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করে নিল।

কথা বলবার জন্য কয়েক পা এগিয়েও ছিল, কিন্তু থেমে গেল। তাকে থামতে হল।

ঠিক রেবার পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রেবার আমন্ত্রণে খালি ট্যাক্সি নয়। ট্যাক্সির ভিতর লোক ছিল। লোক নয়, সোমেনের শনি।

দীর্ঘদেহী, চোস্ত পোশাক পরা একটি ভদ্রলোক নামল। ভাড়া মিটিয়ে দিল। রেবার দিকে চেয়ে বলল, কতক্ষণ? উত্তরে রেবা কি বলল সোমেন শুনতে পেল না। হয়তো কিছুই বলে নি রেবা। ঠোঁট দুটো একটু হেসেছিল। দুটি চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে।

তারপর দুজনে খুব ঘন হয়ে, নিকট আত্মীয়তা ছাড়া যেমন ঘন হওয়া উচিত নয় তেমনই ঘন হয়ে রেবা আর সেই লোকটি ফুটপাথ ধরে চলতে শুরু করেছিল।

ব্যবধান রেখে, মানুষের ভিড়ে নিজেকে

কিছুটা লুকিয়ে সোমেন অনুসরণ করেছিল। অনেক দূর তাকে যেতে হয় নি। ঠিক বিশ গজ দূরের একটা সাজানো শৌখিন রেস্তরাঁর কাটা দরজার পিছনে দুজনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সোমেন উল্টো দিকের ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। চোখের সামনে অন্ধকারের তরল একটা স্রোত। মনে হয়েছিল সেই স্রোতে তার সংসার, ভবিষ্যৎ, জীবন সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে সোমেন পায়চারি করল। আধ ঘণ্টারও ওপর। কিংবা সময়ের সঠিক নিরিখ করা সোমেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পল, বিপল, অনুপল এসব সঙ্কেত পার হয়ে তার মন বিশ্রী একটা আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

দুজনে বেরিয়ে এল। এবারে হাতে হাত। চলতি একটা ট্যাক্সিকে লোকটা ইঙ্গিতে থামিয়ে দুজনে মোটর কোটরে গিয়ে উঠল।

ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে যেতে সোমেনের খেয়াল হল। অফিসের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আধ ঘণ্টা টিফিনটুকু নির্ভর করে সোমেন প্রায় দু' ঘণ্টা বাইরে কাটাচ্ছে।

কিন্তু অফিস যেতে আর ইচ্ছা করল না। সোমেনের মনে হল, তার জীবনের উদ্দেশ্য, বাঁচার সমস্ত তৃষ্ণা দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এই মুহূর্তে অফিসে ফিরে গিয়ে মোটা মোটা লেজার টেনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের হিসাব কষা, নিজের লোকসানের অঙ্ক ভোলার জন্য, কিছুতেই তার দ্বারা সম্ভব নয়।

তবু এভাবে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যে রোদটা নিস্তেজ, একদা সুখপ্রদ মনে হয়েছিল, সেটাই এখন সোমেনের কাছে দাবদাহের প্রতীক বলে মনে হল।

সোমেন অফিসে ফিরে এল। প্রায় মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে। সারাক্ষণ দু কানে বিশেষ এক ট্যাক্সির স্তিমিত গর্জন। দু চোখে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দুটি পুরুষ রমণীর ছবি।

অফিসে কেউ কিছু বলল না। দেরি হবার কৈফিয়ত কেউ চাইবে এটা অবশ্য সোমেন আশা করে নি। ভেবেছিল, বন্ধুরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারে। নিছক কৌতূহল, আর কিছু নয়।

কিন্তু কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। যে যার কাজে ব্যস্ত। এ সময়টা অফিস একটু ব্যস্তই থাকে। সারা মাসের হিসাব-নিকাশ দাখিল করতে হয় বোর্ডের সামনে। আয় ব্যয়ের ফিরিস্তি।

নিজের চেয়ারে সোমেন চুপচাপ বসল। টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ সাজাল। ওগুলো যেন কাজের ব্যাপার নয়, বাইরের জগত থেকে অবরোধ রচনার মালমসলা। ঐ ফাইল আড়াল দিয়ে নিজের চিন্তার জট ছাড়াবার চেষ্টা করল সোমেন।

কতদিন এ ব্যাপার চলছে সোমেনের কিছুই জানা নেই। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে কিংবা পাশের বাড়ি সরিয়ে রেখে এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযান। পাপের গোপন বন্যা, ফল্গুধারার মতন অন্তঃশীলা। বাইরের সাজানো-গোছানো মানুষটাকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই, অন্তরের নিভৃত-তম প্রদেশে এমন একটা অন্যায় বাসা বেঁধেছে। অবৈধ লালসার স্রোত।

তারপর থেকে সোমেনের জীবন্মৃত অবস্থা। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়েছে কে যেন শানিত একটা কুঠার দিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করছে। প্রতি গ্রন্থিতে অসহ্য একটা যাতনা। হৃদপিণ্ডে দুর্দম জ্বালা। এত-

দিনের মত্নে তিল তিল করে গড়ে তোলা গৃহস্থালী যে বালুকাভিত্তিক সেটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

নির্মম হওয়া ছাড়া সোমেনের পক্ষে আর অন্য উপায় ছিল না। ক্যানসারদুষ্ট উপাঙ্গকে ছেদন না করলে সারা দেহ বিষাক্ত হয়ে যাবে। এক বীজাণু থেকে জন্ম নেবে সহস্র বীজাণু। অনেকগুলো প্রাণ খেসারত দিয়েও এক সময়ে সংসার আর অন্য মানুষগুলোকে বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু সোমেন কিছুতেই পারছে না। নিজেকে ইস্পাতকঠিন করে ঘাতকের ভূমিকার জন্য তৈরি করে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করার মুখে বাধা থাকছে। রেবাকে ঠিকমত, উপযুক্ত পরিবেশে পাচ্ছে না সোমেন।

ফলে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চরম লগ্ন এসেও যেন আসছে না। আঘাত মুলতুবী রাখতে রাখতে প্রহরের পর প্রহর পিছলে যাচ্ছে কালের মাপকাঠিতে।

তন্দ্রা যখন ভাঙল, তখন সোমেন দেখল যে সে চেয়ারে বসে। সারাটা রাত তার চেয়ারে কেটেছে।

অন্ধকার অনেকটা তরল। অন্ধকার পুরো কাটে নি, অথচ ভোরের আলোও ফোটে নি, এমনই মাঝামাঝি অবস্থা। পথে লোক চলাচল এখনও শুরু হয় নি।

সোমেন উঠল। খাটে তার শোবার মতন অনেক জায়গা হয়েছে। রেবা লোটনকে বুকে নিয়ে এক কোণে সরে শুয়েছে।

সোমেন নিজের শরীরটা গুটিয়ে একপাশে শুয়ে পড়ল। এভাবে রাতের আধ অন্ধকারে একটা নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি না করে, ভোর হলে, আরো আলো ফুটলে কথাটা রেবাকে বললেই হবে। তা ছাড়া সব কিছু পরিষ্কার দিনের আলোর মধ্যেই ঘটুক, তাই সোমেন চায়। এ কথাগুলো শোনার পর রেবার মুখ-চোখের কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেটাই সে দেখতে চায়। কতগুলো বাড়তি আঁচড় অপরাধীর চোখের কোণে, গালের পাশে ফুটে ওঠে সেটাই সোমেনের লক্ষ্য। তারপর কি ভাবে, কোন কৌশলে রেবা নিজের দোষ-ত্রুটি চাপা দেয়, সাফাই কীর্তন করে, কপট ক্রোধের ধমকে ঝলমলিয়ে ওঠে সেটা দেখতেও সোমেনের মন্দ লাগবে না।

রেবার ডাকাডাকিতে সোমেনের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেক। জানলা দিয়ে রোদের রেখা খাটের পায়া পর্যন্ত এসেছে, তার মানে আটটা বেজে গেছে।

পরের ঘণ্টাখানেক সোমেন যেন সময়ের পারাবারে দ্রুত সাঁতার কাটল। নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে রেবার প্রসারিত হাত থেকে পানের খিলি নিয়ে রাস্তার মোড়ে পোঁছে খেয়াল হল, সকালেও কথাটা রেবাকে বলা হল না।

ভিড় ঠেলে ট্রামে পা দিতে দিতে সোমেন প্রতিজ্ঞা করল, আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জলস্পর্শ করার আগে রেবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কথাটা মনে হতেই রেবার দেওয়া পানটা সোমেন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাস্তায়।

সারাটা দিন অফিসে কাজের চাপে কাটল। সোমেন প্রায় মাথা তোলবারই সময় পেল না। চিন্তার সাপটাও ফণা তোলবার সুযোগ পেল না। মনের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল।

ছুটির পর সোমেন মনটাকে রীতিমত দৃঢ় করে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দুদিন ধরে যে ব্যাপারটা প্রায় শিকেয় তুলে রেখেছে, আজ সেটার ফয়সালা করে ফেলতেই

হবে। সমস্যার পাশ কাটিয়ে তার সমাধান করা যায় না।

ঠিক চৌরাস্তায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আহ্বান পিছন থেকে।

সোমেন প্রথমে শুনতে পায় নি। শুনতে পাবার কথাও নয়। জনতার চীৎকারে, যান-বাহনের শব্দে এলাকাটা সরগরম। সেই শব্দ তরঙ্গের মধ্যে ক্ষীণ একটা স্বর কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই আবার আহ্বান। এবার আরো জোর সুর, আরো কাছে।

পিছন ফিরেই সোমেন অবাক হয়ে গেল।

কমলা-রং শাড়ি, চুলে ভোনাট, আরক্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ। রক্তাভ অধর। তন্বী, শ্যামা। শিখরদশনা কিনা সোমেন বুঝতে পারল না, কারণ তরুণীর দু চোখে হাসির ছাপ থাকলেও, ঠোঁট দুটি দৃঢ় সংবদ্ধ।

সোমেনদা।

আমাকে বলছেন? সোমেন একটু এগিয়ে গেল।

আপনি সোমেনদা তো, নাকি ভুল করলাম? ভুল মানুষকে ডেকে ফেললাম।

তরুণী হাসল।

আর হাসার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মেয়েটিকে চিনতে পারল।

হেনা। হেনা সেন। এক সময়ে এক পাড়ার বাসিন্দা ছিল। পড়তও একই কলেজে।

একদা এমন অবস্থা হয়েছিল যে দু' বাড়ির অভিভাবকরাই রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। দু'জনের মিলনে সামাজিক বাধা ছিল। তাই সোমেনের বাড়ির লোকেরা ভেবেছিল সোমেন দুঃসাহসিক কিছু একটা করে বসবে।

সেই বিপর্যয়টা ঘটে নি। বিপর্যয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে আজ সোমেনের চিন্তা করতেও ভাল লাগল যে কেতাব-কেন্দ্রিক-জীবনে সোমেন যে দুঃসাহসিক কিছু করতে পারে এমন একটা ধারণা তার আত্মজনের ছিল।

দুটি পরিবার যখন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করার একটা পথ খুঁজছে তখন হেনারা দিল্লী চলে গেল। খুব উন্নতি হল তার বাপের। শুধু মাইনে বাড়া নয়, পদ-মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। সোমেন যে মধ্যবিত্ত-চক্রের মানুষ, সে চক্রের পরিধি পার হয়ে হেনারা অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেল।

মামুলি চিঠিপত্রের বিনিময়, কোনদিন বিস্মৃত না হবার প্রতিশ্রুতির পর দুটি হৃদয় অনেক মাইলের ব্যবধানে সরে গেল।

এই মুহূর্তে সোমেন মনে করতে পারল না হেনা কোন চিঠি লিখেছিল কিনা। সম্ভবত লেখে নি। সোমেনেরও লেখা সম্ভব হয় নি, কারণ হেনার ঠিকানা তার জানা ছিল না।

সোমেনের মনের মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ আলোড়ন তুলেই থেমে গেল। হেনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরোনো দিনের কথা এর বেশী ভাববার অবসর পেল না।

হেনা। মন্ত্র উচ্চারণ করার ভঙ্গীতে অল্প ঠোঁট কাঁপিয়ে সোমেন বলল।

যাক, চিনেছ তাহলে। তারপর কি করছ আজকাল বল? বিয়ে করেছ নিশ্চয়? তোমাদের তো সিঁদুরের চিহ্নের রেওয়াজ নেই যে দেখে বুঝতে পারব? সেই পাড়াতেই আছ, না পাড়া বদলেছ?

হেনার এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোমেনের পক্ষে সম্ভব হল না। কোন প্রশ্নের সে উত্তর দিল না। শুধু হেনার চুলের ফাঁকে কুমারী সিঁথিটা লক্ষ করল। লক্ষ করে তৃপ্ত হল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে সোমেনের একটু রাত হয়ে গেল।

হেনার সঙ্গে রেস্তরাঁর পাশাপাশি বসে অনেক কথা হল। ফেলে আসা দিনের উজ্জ্বল হরিৎ দিনগুলোর কথা নয়। প্রথম যৌবনের সে সব উচ্ছ্বাস দু'জনেই সযত্নে এড়িয়ে গেল। অন্য কথা হল। অনেক কথার মাঝখানে একবারও কিন্তু হেনা বলল না, তার ঊষর জীবনের একমাত্র কারণ সোমেনের স্মৃতি, তার অপরিতৃপ্ত প্রেম।

তবু হেনাকে সোমেনের ভাল লাগল। তার বিষন্ন সংসারের বাইরে প্রাণোচ্ছল এক সত্তা হিসাবে হেনার সান্নিধ্যে সুখ পেল সোমেন, হয়তো কিছুটা শান্তিও।

দিন চারেক পর আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোমেন যখন বাড়ি ফেরার পথ ধরল, তখন সে যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ, ভিন্ন চিন্তার বিভোর।

দরজার ওপারে রেবা। দু চোখে শঙ্কা আর উদ্বেগের মিশেল।

এত দেরি?

রেবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন রুক্ষ আর কঠোর হয়ে উঠল। যে কথাগুলো মনের অতলে লীন হয়েছিল এতক্ষণ, সেগুলোই আবর্তিত হয়ে উঠল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য।

কেন, সঠিক বুঝতে পারল না সোমেন, তার হৃদয় অদ্ভুত এক প্রশান্তি আর ঔদার্যে ভরে গেছে। যে চিন্তা দুদিন ধরে তার মস্তিষ্ক-কোণ কুরে কুরে খাচ্ছিল, তার নিদ্রা হরণ করেছিল, বাঁচার আশ্বাস, সে চিন্তা এখন, সারা বিকাল আর রাতের কিছুটা পরিচিত একটা মানুষ আর প্রত্যাশা-থরথর মুহূর্তের সঙ্গে কাটাবার পর থেকে আর তেমন মারাত্মক বলে বোধ হল না।

এমন একটা ভাবনা নিয়ে সে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল সেটা ভেবেই সোমেন কৌতুক অনুভব করল।

সোমেন হাসল। দু' দিন পর হাসি ফুটল তার মুখে। কোন আড়ষ্টতা নয়, জড়তা নয়, রেবার কাছে কৈফিয়ত চাইলে সে যে-সুরে উত্তর দিত, ঠিক যেন সেই ভাবেই সোমেন বলল, আর বল না। দিন দিন এত কাজের চাপ বাড়ছে অফিসে। মাঝে মাঝে এরকম দেরি হবে।

কথা শেষ করে সোমেন আর দাঁড়াল না। চোখ তুলে রেবার দিকে চেয়েও দেখল না। কি জানি সেখানে যদি নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া দেখতে হয়।

কলকাতার ডায়েরি

ইডেন কাননে লংকাকাণ্ডের পর অনেকে বলছেন, সেদিনের সেই অঘটনের জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী বাংলা খবরের কাগজ আর অল ইনডিয়া রেডিও। তাঁদের মতে কাগজে ক্রিকেট নিয়ে নানা ধরনের লেখা এবং রেডিওতে বাংলার রিলে চালু হওয়ার পরই খেলা দেখার মাতামাতি বেড়েছে। আর তারই পরিণামে টেস্ট খেলা না দেখলে সবাই এখন মনে করেন, মানবজনম বুঝি বৃথাই গেল। একদা যা ছিল অভিজাতদের অবসর-বিনোদনের খেলা, ইদানীং তাই হয়েছে সাধারণজনের কাছে অপরিহার্য ব্যাপার। তাঁদের ধারণা, বেতারে ও কাগজে মাতামাতি কমলেই ক্রিকেট খেলা দেখার 'পাগলামি' কমবে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে দেখেই বাংলা খবরের কাগজ নানা দিক থেকে নানাভাবে তার বিবরণ ছাপাচ্ছে এবং নারী ও বালক মহলে ওই জনপ্রিয়তার বিস্তার দেখে সঙ্গত কারণেই বাংলায় রিলে শুরু হয়েছে। না করলেই বরং কর্তব্যচ্যুতি ঘটত।

স্বীকার করি যে, খেলার আসরে যারা যায়, তারা সবাই একসাথী কভার সিলি মিড অফ, ইন সুইঙ, আউট সুইঙ, কিংবা চায়নাম্যান-এর মারপ্যাঁচ বোঝেন না, হুজুগে পড়েই মাঠের দিকে ছোটেন; কিন্তু এমনও তো জানি, বেহাগ-ভৈরবীর

ধারকাছ দিয়ে না যাওয়া অনেক লোকই ক্লাসিকেল গানের আসরে রাত জাগতে জাগতে পরে যথার্থ সংগীত রসিক হয়ে উঠেছেন। ঠিক তেমনই দু'চারটে ভাল খেলা দেখতে দেখতে অনেকেই ক্রিকেটের রসে ডুবেছে, ভাল মারের, ভাল বলের তারিফ করতে শিখেছে। ক্রিকেট খেলা সত্যিকারের একটি আর্ট। তার সমঝদার বাড়লে লাভ বই ক্ষতি নয়। ট্রাম বাস পোড়ানোর তালিম না নিয়ে খেলার মাতা ঢের ঢের ভাল।

এই সমঝদারদের সংখ্যা যে দিন দিন বাড়ছে তার প্রমাণ কলকাতার অলিগলি। আগে যেখানে ছিল একমাত্র ফুটবলের আধিপত্য, এখন সেখানে পয়লা নমবর আসন নিয়েছে ক্রিকেট। ইটের উইকেটে, পরিত্যক্ত ব্যাটে টেনিস বল পিটিয়ে গোটা শীতকাল পাড়ার ছেলেরা শহর মাতিয়ে রাখে। বাড়িতে বাড়িতে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অ্যালবাম, মুখে মুখে হাজার রকম পরিসংখ্যান।

এইসব জিনিস আগেও ছিল, বেড়েছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। বাংলা খবরের কাগজ ও অল ইনডিয়া রেডিও সেই আগ্রহকে আরও উজ্জীবিত করার ভার নিয়েছে মাত্র সাত আট বছর আগে। মনে আছে ১৯৫৮ সালে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন দ্বিতীয়বার ভারত সফরে এল, তখনই আনন্দবাজার পত্রিকা সর্বপ্রথম নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সেবারের খেলার বিবরণ ছাপাতে শুরু করল। পাঠক সাধারণের

মধ্যে কী উল্লাস, কী তৃপ্তি। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বাংলায় রিলে চালু করল পরের বছর অস্ট্রেলিয়া দলের সফর থেকে। ক্রিকেট পাকাপাকিভাবে ঢুকল মধ্যবিত্তের অন্দর মহলে।

মাঠে যাঁরা যান, তাঁরা সবাই যে ক্রিকেট-রসিক নন, একথা নতুন করে বলার দরকার নেই। কিন্তু এ'ও তো প্রতিবার দেখছি, হাজার হাজার লোক টিকিট না পেয়ে ইডেন উদ্যানের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রানজিসটার শুনছে। ভিতরের উল্লাস কিংবা বিষাদের ঢেউ বেতার-তরঙ্গ ছাড়াও সোজাসুজি কানে এসে পৌঁছচ্ছে এবং তাতেই তাঁদের কত তৃপ্তি। এটাকে নিছক হুজুগ কিংবা পাগলামি বলে আমি অন্তত উড়িয়ে দিতে চাই না।

তা ছাড়া পাঁচদিনের টেস্ট খেলার অন্য একটা আকর্ষণ রয়েছে। এ অনেকটা এক্সকারসনের মত। খাবারদাবার বগলদাবা করে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করার সুযোগ এই একঘেঁয়ে জীবনে কদাচিৎ মেলে। পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ-ষাট টাকার বিনিময়ে উত্তেজনা মেশানো একটু অন্য রকমের আনন্দ পাওয়ার দাম অনেক। খেলা দেখাটা অধিকন্তু। এবং বলা বাহুল্য, তা 'ন দোষায়।'

আসল কথা, জনসাধারণের এই আগ্রহকে খবরের কাগজ যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সি এ বি'র কর্তা-ব্যক্তিরা ততটা দেননি। দিলে এতদিনে একটা স্টেডিয়াম হয়ে যেত। টিকিট না পাওয়ার দুঃখে কিংবা বসে দেখার বেবন্দোবস্তে ফুটবল খেলার মাঠে অঘটন প্রায়ই ঘটে, সেটা গা-সহা হয়ে গিয়েছে। সেখানেও যেমন সব গণ্ডগোলের মূলে স্টেডিয়াম না থাকা, ক্রিকেট খেলার ব্যাপারেও তাই। লক্ষ লোকের বসার ব্যবস্থা নিয়ে যদি একটা স্টেডিয়াম থাকত, তাহলে এদিক সেদিক পঞ্চাশ হাজার টিকিট বিক্রিয়েও বাকি পঞ্চাশ হাজারে সাধারণ লোক স্বচ্ছন্দে খেলা দেখতে পারত।

এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারতেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবং ফুটবল আর ক্রিকেটের জন্যে স্টেডিয়াম উপহার দিতে পারলে সবাই দু হাত তুলে তাদের সাধু সাধু বলত। কিন্তু কলকাতা শহরের এমনই পোড়া কপাল, তার ভাগ্যে বড় একটা স্টেডিয়াম এতদিনেও জুটল না। আমি বিশ্বাস করি না যে, টাকার অভাব তার কারণ। সি-এ-বি বা আই-এফ-এ থেকে যদি বাধা আসে, তাহলে কলকাতার ক্রীড়ারসিকদের মুখ চেয়ে সেই বাধা দূর করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। একটা জিনিস লক্ষ করার মত। সেদিন বর্বরোচিত লগুড়ক্রিয়ার পরও দর্শক সাধারণ পুলিসের উপর যতটা না খেপেছে, তার চেয়ে বেশী খেপেছে সি-এ-বি'র উপর। কিন্তু জনতা, কয়েকজন কর্তাব্যক্তিকে খুঁজেছে। হাতের কাছে পেলে হয়ত আরও সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটত। এই রোষ অকারণ নয়।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ, তাঁরা তৎক্ষণাৎ একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করতে। কমিশন বসেছে বসুক, আমার মনে হয়, সব মুশকিলের একমাত্র আসান লক্ষ লোকের বসার স্টেডিয়াম। আমরা সেটাই চাই।

✻

লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, প্রায় সব 'বাঙালী-ট্যাক্সিতে' স্টিয়ারিঙের কাছাকাছি মা কালীর একটি ফটো টাঙানো থাকে। কালীমাতা ইতিমধ্যেই ট্যাক্সির দেবতা হয়ে উঠেছেন।

অন্য অনেক দেবদেবী থাকতে মা কালীর ফটো কেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে ট্যাক্সির পিছনের আসনে বসা এ পাশের বন্ধুটি বললেন, পাঞ্জাবী-ট্যাক্সিতে গুরু নানকের ছবি থাকে বলেই বোধ হয় তার অনুকরণে বাঙালীরা মা কালীর আশ্রয় নিয়েছেন।

ও পাশের অন্য বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, "উঁহু তা নয়, তা নয়, কারণ অন্য। মা কালীর সঙ্গে বলির সম্পর্ক বড় নিকট। লরি এবং ট্যাক্সিরও তাই।"

বন্ধুটির রসিকতায় হাসবার সুযোগ পেলাম না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার যেভাবে ভুরু কুঁচকে পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাল, পথ বলিতে না হোক, তার দু চোখের রোষানলেই পুড়ে মরার যোগাড়।

চাণক্য

নিজের স্টুডিওতে অঙ্কনরত রথীন মৈত্র

দিল্লির ডায়েরি

ভাল লাগা না-লাগা নিয়ে তর্ক চলে না। যুক্তি দিয়ে, কিংবা লাঠি চালিয়ে ভাল লাগানো যায় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা বলছি না, বলছি শিল্প জগতের কথা, আর্ট। বিশেষত ছবি আর মূর্তি নিয়ে, চিত্রকর ও ভাস্করের সৃষ্টি অথবা অনাসৃষ্টি নিয়ে।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাকে নিয়ে যে গল্প আছে, এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। মা লক্ষ্মী তার হাতে একটি মুক্তোর হার দিয়ে বলেছিলেন, 'যাও বাছা, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর গলায় এটা পরিয়ে দিয়ে এস।' পেঁচা বেশ সময় কাটিয়ে ফিরে এল। "কার গলায় দিয়ে এলে?" "মা, পৃথিবীতে অনেক ঘুরলাম, কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। দেখলাম, আমার পেঁচীই সব চাইতে সুন্দরী, তার গলাতেই পরিয়ে দিয়ে এসেছি।" "বাঃ! বেশ করেছ।"

শিল্পজগতে পেচকের স্থান দর্শকরাও যেমন নেন, শিল্পীরাও তেমনি নেন। শিল্পীরা রেগে যান, গালাগালি অবধি করেন যদি তাঁদের সৃষ্টিকে ভাল না-লাগে। আবার বহু দর্শকও আছেন যাঁরা তাঁদের রুচি বদলাতে নারাজ। কিন্তু এ নিয়ে ঝগড়া চলে না। কারণ, সৌন্দর্যবোধ একটি জিনিস যা কিনা একান্ত ব্যক্তিগত, যদিও তাতে সমাজের প্রভাব থাকবে বইকি।

তিনজন বাঙালী চিত্রকরের কথা বলব বলেই ভণিতাটা করে নিলাম। তিনজনেই এখানে তাঁদের প্রদর্শনী করে গেলেনঃ প্রকাশ কর্মকার, রথীন মিত্র এবং বিমল ব্যানার্জি। তিনজনই স্থানীয় সংবাদপত্রের কলা-সমালোচকদের সুদৃষ্টি অর্জন করেছেন, যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে রাজধানীর চারটি প্রধান সংবাদপত্রের সমালোচকদের দৃষ্টি ও অনুভূতি বিকৃতভাবে ইউরোপ-আমেরিকার শিল্প-বিকৃতির অনুরাগী, এবং তাঁদের সামগ্রিক কৃষ্টি-অনুভূতির পশ্চাতে কোনো ঐতিহ্য নেই।

প্রকাশ কর্মকার কলকাতার ছেলে। তাঁর খ্যাতি আর শুধু কলকাতার ভিতর আবদ্ধ নয়। গত বছর ললিতকলা আকাদমি তাঁকে পুরস্কৃত করে তাঁর শিল্প-খ্যাতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অনেকদিন আগে ১৯৫৯-এ, প্রকাশ তার চিত্র প্রদর্শনী করল কলকাতার মিউজিয়মের রেলিং-এ, সদর রোডের ফুটপাতে, খুব হইচই পড়েছিল তখন, যার কথা সাহিত্যিক বিমল কর উল্লেখ করেছেন প্রকাশের ছবির কথা বলতে গিয়ে। অনেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছে এই শিল্পী সেদিনের সামাজিক বাস্তবতা থেকে, যদিও আদর্শগতভাবে এখনও সে তা ত্যাগ করেনি। কিন্তু আংগিক গেছে অনেক বদলে। উজ্জ্বল রঙের স্থানে এসেছে ম্লান নীল, হলদে, সাদা। সে তার ১৯৬৪-৬৫ সনের জগতকেও পেছনে ফেলে এসেছে। গত বৎসরের কাজগুলোতে এসেছে আরো গভীরতা, অর্ধ-বাস্তবতাকে অর্ধ-নির্বাস্তবের দিকে

প্রকাশ কর্মকারের একটি সাম্প্রতিক তেলরঙের কাজ

দিয়ে যাওয়ার প্রয়াস।

তার সাম্প্রতিক ছবিতে আছে রঙের বিচ্ছুরণ, হীরে থেকে যেমন আলো ঠিকরে আসে, আছে অতি নম্র অনুভূতি (যেমন নরম তার ব্যক্তিগত চরিত্র), অসংখ্য রেখা ও তারকা দিয়ে নতুন ধরনের পারস্পেকটিভ সৃষ্টি। এবং ছবিগুলো শুধু ছবি নয়, শুধু রঙের সমষ্টি নয় : তার ভিতর দিয়ে শিল্পী বিশেষ একটা কিছু বলতে চায়। একটা আবেদন, একটা আকুতি আছে। প্রকাশ আধুনিক সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয়, যে অর্থে শিল্পী স্বয়ং ভারতীয়।

প্রকাশের শিল্প-শিক্ষা প্রায় নিজে নিজে বললেও চলে। এর পিতা, শ্রীপ্রহ্লাদ কর্মকারও নামকরা শিল্পী ছিলেন। তাঁর বাস্তবপন্থী অনেক কাজ ছেলের কাছে আছে। সমাজ ও জীবনের দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শিল্পজগতের অন্তর্দৃষ্টি। শুনে দুঃখ হল এমনি একটি বাঙালী শিল্পীকে কলকাতার একজন নামকরা চিত্রকর অযৌক্তিকভাবে অপকার করার চেষ্টা করে গেলেন দিল্লিতে, যখন প্রকাশের প্রদর্শনী চলছিল। তিনি একঘর লোকের সামনে, নিজেকে নিজে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে জাহির করে, উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে গেলেন, "ছ্যা ছ্যা! এ সব কোনো কাজ হয় নি, যাচ্ছেতাই।" বহু শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এক সময় কলকাতায় বছর ১২ কলা সমালোচনা করেছি। আজ অবধি এই প্রকারের জঘন্য উদাহরণ পাই নি। এবং কী কারণে জানি না, যে ললিতকলা আকাদমি গত বৎসর প্রকাশকে তার শিল্পের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করল, তারাই এ বৎসর তার কাজগুলোকে অপাংক্তেয় বলে তাদের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে (শিগ্গির আরম্ভ হচ্ছে) স্থান দেয় নি।

*

আমাদের দ্বিতীয় শিল্পী রথীন মিত্র, কলকাতার ছেলে, এবং একদা ক্যালকাটা গ্রুপ নামক আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর কনিষ্ঠ সভ্য ছিলেন। নিজের ভিতরে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য, যেন টগ্‌বগে। আশ্চর্য নয়, স্কুটারে চেপে সে ভারতের নানা জায়গা ঘুরেছে, স্কেচ বই আর রঙ তুলি নিয়ে। ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে প্রচুর ছবি এঁকেছে। বর্তমানে দেরাদুনের দুন স্কুলের আর্ট শিক্ষক।

রথীনের প্রাণবন্ততা তার ছবিতেও পরিস্ফুট। সে আধুনিক, কিন্তু অত্যাধুনিক নয়। অনেকটা জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট স্কুলের। এবারের কাজগুলোতেও তার সেই ধারাই বজায় আছে দেখা গেল। তার তুলিতে লাল রঙের ব্যবহার একটা নিজস্ব দিক।

ছবি আঁকার শখ ছোটবেলা থেকে এবং তার পিতৃদেব খুব উৎসাহিত করতেন। কলকাতা থেকে পাশ করে রথীন যখন শিল্পজগতে এল, তখন তাকে যিনি সব চাইতে প্রভাবান্বিত করেছেন তিনি হলেন ভাস্কর শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত, অধুনা এখানকার ন্যাশন্যাল গ্যালারি অব্ মডার্ন আর্টের কিউরেটর। এবং ১৯৪১-এ তদানীন্তন ক্যালকাটা গ্রুপের অন্যান্য শিল্পীরাও (যথা গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, সুনীলমাধব সেন, পরিতোষ সেন) রথীনকে নিজেদের ভিতর টেনে নিয়ে-ছিলেন তার শিল্পসম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে।

বিমল ব্যানার্জির একটি এচিং

বললেন আমাকে : "আমি ভালবাসি ট্র্যাডিশনাল রীতির থেকে ছবির সাবজেক্ট বেছে নিতে। এবং আধুনিক আঙ্গিক গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি চাই যে, আমার শিল্প সাধনার ভিত্তি যেন ভারতের ঐতিহ্যের ভিতরই থাকে। কেন জানি না, আমি ছবিকে ভাবি সংগীতের মতন।"

শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া যায়। কারণ, এই রাজধানীতে শিল্পজগতে অতি-বিকৃতির মূলে হল বৈদেশিক দূতাবাস-গুলি, যাদের হাতে আছে অনেক পয়সা এবং যাদের অনেকে উৎসাহিত করেন দুর্বোধ্য নির্বাস্তবতা, এমন কি ছবির ভিতরে কার্ড-বক্স দেশলাইয়ের কাঠি-পাটের ছালা ইত্যাদির আবির্ভাব। যে স্থানে আর্ট হয়ে যায় ফাক্ট।

*

আমাদের তৃতীয় শিল্পী বিমল ব্যানার্জি হলেন এই নির্বাস্তব-ধর্মীদের একজন। কলকাতার ছেলে। বয়সে তরুণ, এক গাল দাড়ি, প্রচুর উৎসাহ কাজে। এর লাইন হল গ্র্যাফিক্স—লিথো, এচিং। সুতরাং এর শিল্পে আঙ্গিক ও শৈলীর স্থান অনেক বেশি। ১৯৬৫ থেকে সরকারী জলপানি পেয়ে এখানকার আর্ট কলেজে শিল্পী সোমনাথ হোড়ের অধীনে কাজ শিখছে, বিশেষত, আধুনিক ডিপ-কাট প্রথায়।

কাজের জন্যে ১৯৫৯ থেকে পারি-তোষিক পেয়েছে বিমল অনেক স্থানে, যথা অমৃতসর, কলকাতা, দিল্লি, হায়দরাবাদ। ললিতকলা আকাদামির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে এই বৎসরে গ্রাফিকসে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

এর ঘরে বসে তার কাজের ধারা দেখলাম। কোনো বিষয়টি নিয়ে পাতার পর পাতা সে এঁকে যায়, বাস্তব কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে নির্বাস্তব কাঠামো, অর্থাৎ বাহ্যিক রূপের পর্যায়ে আসে। দস্তার পাতে নাইট্রিক এসিড দিয়ে কেটে কেটে বাহ্যিক কাঠামো তৈরি করা। তারপর রঙ লাগানো আর হাতের তেলো দিয়ে মোছা, অনেকবার, আর একই রঙেতে নানা শেড আনা, বেশ কঠিন কাজ। দেখতে সুন্দর, এমন কি বুঝো না-গেলেও।

ভারত সরকার এই সব স্কলারদের মাসিক ২৫০ টাকা দিয়ে থাকেন। এই টাকায় থাকা-খাওয়া, ছবির জন্যে সমস্ত জিনিস কেনা, জামা-কাপড়, অর্থাৎ সবকিছু। কী করে হতে পারে? কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা ওদিকে মোটেই ভাবে না। যাঁরা শিল্পজগতের নেতা, তাঁরা এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

খগেন দে সরকার

এদভার্দ ম্যুংখ্‌ ঃ মানুষের নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব

ম্যুংখ-এর ছবি যেন এক কালো পর্দা—নিঃসঙ্গতা আর বিষাদে ভরপুর, স্থাবির নির্বেদ যেন আঁকড়ে ধরে। ভ্যান-গ'র ছবিতে দেখেছি যন্ত্রণা, চিৎকার ক'রে ছটফট করছে যেন টানহাউসের, নরকের আগুনে কাউন্টের আর্তস্বর, কিন্তু ম্যুংখের মধ্যে সেই আর্তস্বর নেই, আছে স্বরহীন এক আত্মা, গলা যেন শুকিয়ে গেছে, চিৎকার করারও আর ক্ষমতা নেই, সমস্ত পৃথিবীতে এক অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে, বিষণ্ণতা লোহার মতো বুকের ওপর চেপে, নির্বেদের পোকারা ক্ষয়রোগের মতো মানুষের হৃদয় খাচ্ছে, এককালে গতি ছিল তাও আজ লুপ্ত, প্রেমিকারা মৃত সব, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক বিরাট শ্মশানে সব আগুন নিবে যাবার পর শরীরে অন্ধকার নিয়ে—কোনো কিছুর অপেক্ষাও আর নেই সেই উপলব্ধিতে স্থাণুর মতো গতিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে।

এদভার্দের জীবন এমন কিছু চিত্তা-কর্ষক নয় তাই সে বিষয়ে খুব বেশী পাত্তা না খোয়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ১৮৬৩ সালে নরওয়ের লোটেন শহরে জন্ম, মৃত্যুও সেই দেশে, অসলো থেকে কয়েকশো মাইল দূরে, একেলেতে। কৈশোর পর্যন্ত তাঁর কাটে অসলোতেই, সেখানে ইস্কুলের পাঠ নিয়েছিলেন—তারপর ভ্রমণে বেরোন। দীর্ঘ কুড়ি বছর প্যারিস, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, হল্যান্ড এ-সব দেশে কাটিয়ে তারপর ফিরে আসেন মাতৃভূমি "রাত্রি ভরে সূর্য"-র দেশ নরওয়েতে। শোনা যায় একটা প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন, একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়, তখন বন্ধুরা তাঁকে জোর করে প্যারিস থেকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন এই আশায় যে শৈশবের স্মৃতির দেশে গেলে প্রেমিকার স্মৃতির ওপর পলিমাটি জমতে পারে।

পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল একাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত, কিন্তু তারপর জীবনের শেষ তিরিশ বছর একদম কাজে গুটিয়ে ফেলেন নিজেকে, অর্ধ-শতাব্দীকাল পৃথিবীকে, জীবনকে, দেখা শেষ হলে, নিজের ধারণা, অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস, একের পর এক ক্যানভাসে মেলে ধরেন তাঁর

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে-জীবনকে কাগেয়ো এবং একেলির বাড়িতে বসে।

আমরা আনন্দের, ভালোবাসার বলে ভাবি তা আসলে একটি ক্লাউনকে সুখী বলার মতনই, মুখোশের নিচে দেখতে পাবে যন্ত্রণা, নিঃশব্দ মৃত্যু, বিষণ্ণতা অসুখের মতো ছেঁকে ধরেছে। ম্যুংখ্‌ উপলব্ধি করেন ছিলেন স্ট্রিণ্ডবার্গের মতো যে-নারী এত সুন্দর, শুভ্র, পবিত্র—আহ্লাদী, সুখী, দয়াময়ী—যার ঠোঁট পাকা ফলের মতো, শরীর ঝর্নার জল, কণ্ঠস্বরে বুক ভেঙে যায়, তারই লুকোনো রয়েছে বিষ দাঁত, রক্ত-শোষণকারী বাদুড়ের লোভ; মাংসাশী ফুলের মতো পুরুষকে গ্রাস করতে গোপনে উৎসুক। [এই প্রসঙ্গে বলি, হয়তো এই প্রচণ্ড নারী-বিদ্বেষের জন্যই স্ট্রিণ্ডবার্গ বা ম্যুংখ্‌ উৎকৃষ্ট শিল্পীর স্থান থেকে মহৎ শিল্পীর আসন পর্যন্ত উঠতে পারলেন না, কারণ শিল্পীর এই অনতিক্রম্য বিষয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যতবারই এসে পড়েছে, একজনের লেখায় এবং আরেকজনের ছবিতে,

আত্মপ্রতিকৃতি

তত্ত্বাবধারই তাঁরা এক আধিমৌত্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, হয়ে পড়েছেন একপেশে, ঈশ্বরের এই অভূতপূর্ব সৃষ্টি "নারী", যার অন্তর অনুসন্ধান শুধু শিল্পীই পারেন, বাকি থেকে গেছে তাদের কাছ থেকে।—তাছাড়া অন্ধ ঘৃণা মহৎ সৃষ্টির পরিপন্থী, যে-কারণে জুভেনাল বা আরিস্টোফিনিস, পোপ কিংবা নুইকট, মহৎ শিল্পী হলেন না।]

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এক্সপ্রেশনিজম চিত্রাদর্শের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, যেমন মোনে বা পিসারো ইম্প্রেশনিজমের। পুনর্বার স্মরণ করা যেতে পারে এক্সপ্রেশনিজমের সংজ্ঞা। শিল্পী পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছেন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, যা তাঁর বিশ্বাস, পরিপার্শ্ব, অভিজ্ঞতা এবং তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ বস্তুভিত্তিক হওয়া সম্ভব নয়, নিজেকে মিথ্যে করে যেকালেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সে তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থা বাইরের দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্রের ওপর প্রতিফলিত করবে। ইম্প্রেশনিস্টরা বলছেন, তাঁরা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাটুকুই এঁকেছেন, কিন্তু এম্‌-

প্রেশনিস্টরা চোখ চেয়ে দৃশ্য যা অভিজ্ঞতা মনে প্রবেশ করতে দিতেন এবং ক্যানভাসে অবশেষে যখন সেই দৃশ্য উঠে আসত তখন তা তুলে নিয়ে আসত মনের অবস্থা। একটা গেলাস ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে যেমন পৃথিবী অন্য রকম হয়ে যায় তেমনি এক্সপ্রেশনিস্টদের ছবিতে বাস্তবতার অভাব লক্ষণীয়, কেননা দৃশ্য ও ক্যানভাসের মাঝে শিল্পীর মানসিক পরিস্থিতি উপস্থিত। ম্যুংখ্ প্রভৃতি শিল্পীকে বলা যেতে পারে আত্মপ্রকাশভিত্তিক চিত্রকর, যাঁরা পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে শুধুমাত্র প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

যেহেতু উদ্দেশ্য নিজেকে কোনো একটি কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা, সেহেতু এক্সপ্রেশনিস্টরা পূর্বসূরী ইম্প্রেশনিস্টদের মতো অনাবিল আনন্দে বিগলিত হয়ে "যা-দেখব তাই আঁকব" এমন উদ্দেশ্য নিয়ে জগতের দিকে তাকাতেন না, অবিরাম খুঁজতেন ঠিক সেই দৃশ্যটি, বা সেই চরিত্র, যার দ্বারা শিল্পীর বলবার কথা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ সম্ভব। দৃশ্য যেহেতু আধার মাত্র, সেহেতু এই আধার নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা অত্যধিক খুঁতখুঁতে ছিলেন। ভবিষ্যতে অবশ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট-এক্সপ্রেশনিস্টরা চেষ্টা করেছেন একটি পেয়ালা-পিরিচ কিংবা কলমদানিকে দিয়েও গল্প বলাতে, কিন্তু ম্যুংখ-সম্প্রদায় অতদূর অবধি যান নি।

তাহলে এখন আমরা বলতে পারি ম্যুংখ্-এর সব ছবিই আমাদের কাছে শিল্পীর চিন্তাধারা, বিশ্বাস, মানসিক অবস্থা এবং স্মৃতির চাবিকাঠি। প্রত্যেকটি ছবিই এই শিল্পীর একটি বিরাট কাহিনীর প্রতীক, প্রত্যেকটি ছবিই গল্প বলে। অনেক চিত্রসমালোচক, এবং আমারও মনে হয়, **চিত্রকলা যেহেতু একটি অসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাধ্যম, তার বেঁচে থাকার অধিকার ততক্ষণই আছে যতক্ষণ তা প্রকাশে সক্ষম হবে এমন কিছু যা অন্য কোনো মাধ্যমের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।** কিন্তু এক্সপ্রেশনিস্টরা যেন তুলি দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন তার প্রভাব আমাদের চোখের ওপর বড়ই কম, মনের ওপর বেশী—মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে এই-রকম, যে-কাহিনীটা ভাবছি সেটা দেখেছিলাম না পড়েছিলাম। ম্যুংখ্ বড় বেশী সাহিত্যিক প্রতীক ব্যবহার করেছেন তাঁর ছবিতে—যেমন কবিতার সংগীত, সংগীতের সংগীত নয়, তেমনই চিত্রের প্রতীক, সাহিত্যের প্রতীকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু এ-সব তো গেল সমালোচকের আপত্তি, কিন্তু কী ভয়ানক জ্যান্ত অভিজ্ঞতা, কী প্রচণ্ড সম্মোহকশক্তি ম্যুংখ্-এর ছবিতে। "চিৎকার" ছবিটি মুদ্রিত করলুম, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। চিত্রটি অস্লোর ন্যাশনাল মুজিয়ামে রয়েছে,

চিৎকার
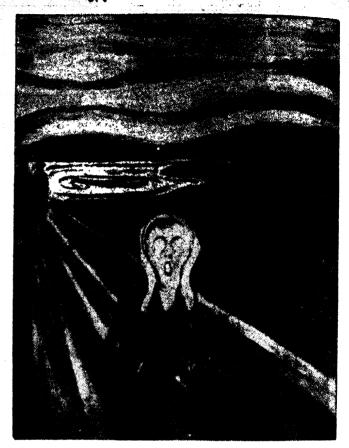
১৮৯৩-তে আঁকা, দৈর্ঘ্যে ছত্রিশ ইঞ্চি, চওড়াতে উনত্রিশ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ব্রিজ, তার সম্মুখভাগে একটি নারী-মূর্তি কানের কাছে হাত নিয়ে চিৎকার করছে, পশ্চাতে দু'টি লোক, দূরে প্যাঁচানো নদী-পাহাড়। প্রথমত দেখা যাক ছবির দু'টি উপাদান, প্রকৃতি ও মানুষ, তাদের ভেতর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। প্রকৃতি এ ছবিতে ক্রন্দনরত নারীটির মনের প্রতিফলন। মেঘ যেন মূর্তিমান বিষণ্ণতা, প্যাঁচানো পাহাড় আর ধূসর নদী যেন যন্ত্রণার প্রতীক। সেতুটি এ-ছবিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যেন কোনো ভয়ংকর সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা, কেমন যেন গা ছমছম করে। প্রকৃতি যেমন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আঁকা হয়েছে, শিল্পী তার সঙ্গে সচেতনভাবে মিলিয়ে এঁকেছেন তাঁর "বিষয়"কে—নারীটি যেন সমগ্র জগতের বিষণ্ণতার নিউক্লিয়স, এবং এই যন্ত্রণা-বিক্ষুব্ধ আত্মা পরিপার্শ্বকেও বিসাদগ্রস্ত করে তুলেছে।

কিন্তু মেয়েটির চিৎকারের কারণ কী? একা একাই তো মেয়েটি এই ভয়ংকর আর্তস্বর করছে, কিছু যে দেখে এমন করছে তা তো নয়। আসলে ছবিটির বিষয় নিঃসঙ্গতা, ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা—মেয়েটি যেন ব্রিজের ওপরে উঠে জগতের অর্থহীনতা এবং মানুষের জীবনের শূন্যতার উপলব্ধিতে এই ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছে এবং তার এই চিৎকার যেন সমস্ত পৃথিবীতে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে ফিরছে।

ছবিটির ঘটনাটি আসলে শিল্পীর একটি অভিজ্ঞতার প্রতীক মাত্র। একটি ধারণা, ম্যুংখ্-এর ছবিতে যা বারবারই ঘুরে আসছে, তা হল মানুষের নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব, অর্থহীন শূন্য অস্তিত্ব। ছবিটি সেই বিশ্বাসেরই প্রকাশ। ম্যুংখ্এর সব ছবির মতো এই ছবিও একটি বার্তা বহন করছে—যেমন কাফ্কা সাহিত্যে একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেমন ফেলিনি সেলুলয়েডে প্রকাশ করছেন এক অমোঘ উপলব্ধি, তেমনই ম্যুংখ্ তাঁর সব ছবিতেই একটি বিশ্বাস প্রকাশে উৎসুক।

শুদ্ধশীল বসু

সম্মিলনের বর্ণনা দিয়ে নেহরু লিখেছেন: সদস্যরা প্রায় সকলেই উচ্চ মধ্য শ্রেণীর লোক, তাঁদের পরণে 'morning coat and well-pressed trousers'। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরই কংগ্রেসের মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সম্মিলনে দুটি ঘটনা ঘটেছিল। (১) কংগ্রেসের নরম এবং উগ্র-পন্থীর মিলন, (২) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত পরিকল্পনা। কংগ্রেস-লীগের এই সম্পর্ক ১৯৪০ সালে রূপান্তরিত হয়েছিল বিরোধিতায়, পরে তার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ। এ সম্পর্কে বাটলারের মন্তব্য—

"My own view is that this course of history was inevitable, although some have blamed the Congress for not carrying the Muslims with them."

১৯১৯ পর্যন্ত গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনীতির নেপথ্যে ছিলেন। রোয়লাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে গান্ধীর রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতরণ। গান্ধীর ঘোষণা এবং তার কিছু পরেই অমৃতসরের 'massacre' নেহরুর চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। গান্ধীর সত্যাগ্রহের মধ্যেই নেহরু প্রথম তাঁর কর্মপদ্ধতি খুঁজে পেলেন।

'ব্যক্তি ও চিন্তার প্রভাব' প্রসঙ্গে বাটলার গান্ধী এবং গান্ধীর চিন্তার প্রভাবের কথাই সবিস্তারে বলেছেন। এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আর একটি প্রভাবের কথাও সজোরে এবং সবিস্তারে বলেছেন। সেটি হল—ভারতবর্ষের সাধারণ নরনারীর সঙ্গে নেহরুর একাত্মতা। কোন্ ঘটনা উপলক্ষে সাধারণ নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল এবং কিভাবে এই সাধারণ মানুষের কথা তাঁর হৃদয়কে উদ্বেজিত করত এবং এই সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ থেকে তাঁর মনে কি প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল—নেহরু-জীবনের অতি গুরুত্বের এই প্রসঙ্গটি বাটলার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

'ব্যক্তি ও চিন্তার প্রভাব' বলতে বাটলার কোন 'থিওরি' বা মতবাদের প্রভাবের কথা বলেন নি। বলেছেন, একটি মানুষের চরিত্র-ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার প্রভাব, আর বলেছেন ভারতের জনগণমনের প্রভাব। নেহরু-জীবনের অগণিত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে যে এই সত্যটি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন তাতেই বাটলারের দৃষ্টির সূক্ষ্মতা প্রমাণ হয়।

এর পরে ঘটনা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে এবং বাটলার বিশ্লেষণী পদ্ধতি ত্যাগ করে কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেছেন। তবে '১৯৩৫ অ্যাক্ট' সম্পর্কে বাটলার কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সম্ভবত তিনি যখন ইণ্ডিয়া অফিসের আণ্ডার সেক্রেটারি ছিলেন তখন এই আইনটি প্রণয়নে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। প্রথমে আইনটি সম্বন্ধে বাটলারের মত উদ্ধার করি—

"....it remains incontrovertible that the 1935 Act—piloted between the Scylla of British hesitation in the face of 'die-hard' opposition in Parliament, and the Charybdis of Indian ambitions and impatience as personified in Congress—was the final major constructive achievement of the British in India".

এর পরে ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ হাউস অব কমন্স-এ বাটলার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হয়েছে। বাটলারের ধারণা, সেদিন তিনি কমন্স-এ যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষের গুরুত্ব সেদিন সাধারণে উপলব্ধি করতে পারে নি। পরবর্তীকালের ঘটনার আলোকে বাটলারের বক্তব্যের কি ব্যাখ্যা হতে পারে ঐতিহাসিকেরা তা বিচার করতে পারবেন:

"....I would like to take up the words of the hon. member for Morpeth who expressed the hope that we had stumbled on a future line of development in regard both to a constitution for India and, possibly, a model constitution for the world. I believe that in this constitution are the features of the strong executive known to the East, and of the democratic form known to the West; and I sincerely hope that we have found a future form of government that will not only provide a possible modification of democracy which may work satisfactorily, but may also tie together the best in the East and the West'.

উপসংহারে আছে নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এই প্রসঙ্গে বাটলার বলেছেন, দ্রুত উন্নতির আকর্ষণে পার্লামেন্টকে এবং জনমতকে অস্বীকার করবার যে দুর্বার ও বিপজ্জনক প্রলোভন আজ আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই, নেহরু সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন নি। দেশের জনগণের উপর তাঁর এমন অপ্রতিহত প্রভাব ছিল যে, পার্লামেন্টের আনুগত্য স্বীকার তাঁর পক্ষে প্রায় অবান্তরই ছিল। তথাপি মানবতাবোধ, মানুষের মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁকে এই বিপজ্জনক প্রলোভনের দিকে আকৃষ্ট করে নি। এখানেও লক্ষণীয়, পার্লামেন্টীয় শাসনপদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য বলেই নেহরুর কাছে সম্মানীয় ছিল না (কেউ কেউ সে ব্যাখ্যা করেছেন বলেই প্রসঙ্গটি তুলতে হল), মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই পার্লামেন্টীয় শাসনপদ্ধতির আদর্শ তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নি। পরিশেষে বাটলারের শেষ উক্তিটি উদ্ধার করি:

"Today a number of voices are raised in criticism of his undoubted tendency at times towards hesitation, delay and compromise, towards unfinished plans and an inconsistent 'Weltanschauung'. At the bar of history, however, Nehru will emerge as a great Indian and a great world figure: not unseathed, perhaps, but as a man whose contribution to the cause of effective democracy ranks as high as those Himalayan mountain peaks which lowered above his erstwhile prison walls."

তারাপদ মুখোপাধ্যায়
১২ ডিসেম্বর ১৯৬৬

কাঠের কাজ করবার জন্য যে সমবায়-সংস্থা গড়া হল, তার ইতিহাসও একই রকমের। প্রতিটি বাড়িতে যদি আট জোড়া দরজা-জানালার দরকার হয়, তাহলে শুধু ছ' হাজার বসত-বাড়ির জন্যই আটচল্লিশ হাজার জোড়া দরজা-জানালা লাগবে। তা ছাড়া অন্যান্য যে-সব অট্টালিকা তৈরী হবে, তার জন্যও প্রয়োজন হবে বহু দরজা-জানালা। সেগুলি তৈরী করবার জন্য আমরা বড়-বড় দুটি সমবায়-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলুম; তার প্রতিটির সদস্য করা হল আড়াই শো পরিবারকে। শুধু কাঠের কাজেই অতএব পাঁচশো পরিবারের জীবিকা-র্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই বিশেষ কাজের জন্য অবশ্য বাইরে থেকে আরও বেশী অনুপাতে কারিগর আনাতে হল। তার কারণ, এ কাজে রীতিমত দক্ষতা চাই। সৌভাগ্যবশত, এই বাস্তুহারাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিখ। কাঠের কাজে তাদের আগ্রহ প্রায় সহজাত। চটপট তারা কাঠ মিস্ত্রীর কাজ শিখে নিল।

একে তো লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার; তার উপরে তাদের জীবিকার জন্য গড়ে তুলতে হল বহু কল-কারখানা। সুতরাং প্রচুর জল চাই। ফরিদাবাদের ধারে কাছে নদী কিংবা খাল নেই। যমুনা সেখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। পাইপলাইন বসিয়ে যমুনা থেকে জল আনতে গেলে তাতে বিস্তর খরচ পড়বে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব। জলই অতএব একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। একমাত্র ভরসা ভূগর্ভের জল। টিউবওয়েল বসিয়ে সেই জল তুলতে হবে। কিন্তু সরকারী ইনজিনিয়াররা সে ব্যাপারেও আমাদের নিরাশ করলেন। তাঁরা বললেন, ফরিদাবাদ-এলাকার ভূগর্ভে জল নেই, সুতরাং সেখানে টিউবওয়েল বসিয়ে কোনও লাভ হবে না, বৃথাই আমরা একটা নির্জলা জায়গায় শহর গড়বার চেষ্টা করছি; এ একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। হতাশ হয়ে আমি শ্রীনেহরুকে সব জানালুম। শুনে তিনি বললেন, গুজরাটে নবনগরের জামসাহেব তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে একজন সাধু আছেন, তিনি জলের হদিস বাতলে দিতে পারেন, এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা নাকি অসামান্য। শ্রীনেহরু বললেন, "তুমি বরং আমার নাম করে তাঁকে একখানা চিঠি লেখো।" মরিয়া হয়ে আমি তাই করলুম; কাথিয়াবাড়ের রাজার কাছে চিঠি লিখে দিলুম। তার দিনকয়েক বাদেই ঢ্যাঙা মতন একজন মানুষ এসে হাজির। মাথায় বিরাট পাগড়ি। তিনি বললেন, জামসাহেব তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন 'পানিওয়ালা মহারাজ।'

সৈন্যবাহিনীর সেই কর্নেলটি তখনও ফরিদাবাদে ছিলেন; বাস্তুহারা-শিবিরের তিনি দেখাশোনা করতেন। সাধু এসে জলের সন্ধান বাতলে দেবে, এই খবর শুনে তো তিনি হেসেই অস্থির। বললেন, এ একেবারে ঘোর অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার।

যাই হোক, পানিওয়ালা মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তো আমরা সেই সাড়ে তিন হাজার একর জমির উপরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। পাগড়িধারী মানুষটি মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় থেমে দাঁড়ান, মাটির উপরে লাথি মারেন, আর বলেন, "এখানে জল আছে।" মোট দশটি জায়গা এইভাবে তিনি দেখিয়ে দিলেন। লোকজন আর ড্রিলিংয়ের যন্ত্র আনিয়ে সেখানে আমি নল বসাবার ব্যবস্থা করলুম। আশ্চর্য, মাটি খুঁড়তেই প্রতিটি জায়গায় জল বেরিয়ে এল। অফুরন্ত জল। প্রথম টিউবওয়েলটি দিয়ে যখন গলগল করে জল বার হতে লাগল, বাস্তুহারাদের তখন আর আনন্দ ধরে না।

হিসেব করে দেখলুম, এক-একটা টিউব-ওয়েল থেকে ঘণ্টায় তিরিশ হাজার গ্যালন জল পাওয়া যাচ্ছে। দিনে দশ ঘণ্টা করে চালালে টিউবওয়েল পিছু জল পাওয়া যাবে তিন লক্ষ গ্যালন। দশটি টিউবওয়েলের প্রতিটিই যদি দিনে মোট দশ ঘণ্টা করে চলে, তাহলে আমরা মোট তিরিশ লক্ষ গ্যালন জল পাব। ধরা যাক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মাথা পিছু রোজ তিরিশ গ্যালন জল দরকার হবে। সেই হিসেবে চল্লিশ হাজার বাস্তুহারার রোজ জল দরকার হবে মোট বারো লক্ষ গ্যালন। বাকী জল দিয়ে কল-কারখানার কাজ অনায়াসে চলবে, কিছু অসুবিধে হবে না। বারো থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ দিয়ে মোট বারোটি টিউবওয়েল আমরা বসালুম। প্রতিটির গভীরতা সাড়ে তিন শো ফুট।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, প্রত্যেকটি টিউবওয়েলের সঙ্গে থাকবে টারবাইন কিংবা সেনট্রিফ্যুগাল পাম্প; ইলেকট্রিক মোটর কিংবা ডিজেল ইনজিন দিয়ে সেগুলি চালানো হবে। ফরিদাবাদে যে সুবৃহৎ শিল্প-নগর গড়ে উঠেছে, আজ পর্যন্ত এই টিউবওয়েলগুলি সেখানে জলের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জল আর কল-কারখানার জল, সবই আসছে ওই টিউবওয়েল থেকে। (পরে অবশ্য বড় বড় কয়েকটি বেসরকারী শিল্প-সংস্থা সেখানে আরও গুটিকয়েক টিউবওয়েল বসিয়েছেন।) অথচ বিজ্ঞানে যাঁদের অচলা ভক্তি, সেই ইনজিনিয়াররা আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, ফরিদাবাদের ভূগর্ভে জল নেই, সুতরাং সেখানে শহর গড়া যাবে না।

রাস্তা ছাড়া শহর হয় না। নগর-প্রকল্পেরই অঙ্গ হিসাবে আমরা ঠিক করে-ছিলুম যে, পঞ্চাশ মাইল পিচের রাস্তা বানাতে হবে। এই রাস্তার প্রতিটি পাথর-কুচি সেই বাস্তুহারারাই আপন হাতে ভেঙেছে। কাছের পাহাড়গুলিতে পাথরের যে-সব কোয়ারি ছিল, পাঁচ শো পরিবারকে সেখানে কাজে লাগানো হল। এই পরিবারগুলিও ছিল কয়েকটি সমবায়-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। শহর গড়বার ব্যাপারে পরিবহণের ভূমিকাও কম নয়। পরিবহণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গড়া হল সত্তরটি সমবায়-সংস্থা; তাদের প্রত্যেকটিতে রইল পনরটি করে পরিবার; এবং বোর্ড থেকে সেই সত্তরটি সংস্থাকে সত্তরটি মোটর ট্রাক কিনবার জন্য মূলধন হিসেবে অগ্রিম টাকা দেওয়া হল। মোট এক হাজার পঞ্চাশটি পরিবারের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হল এইভাবে। ঠিক হয়েছিল, রাস্তার ধারে ধারে এবং ফাঁকা জায়গায় মোট পঞ্চাশ হাজার গাছ লাগাতে হবে। চারা তৈরি করবার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিলুম। এই দারুণ গরম জায়গায় বাস্তু-হারারা যাতে গাছ লাগাতে উৎসাহিত হয়, তার জন্য বিনামূল্যে হাজার-হাজার চারা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হল।

ইঁট, পাথর, সিমেন্ট, বালি। উপকরণ যোগাড় হল। এবারে সেই উপকরণের সাহায্যে পরিপাটি এক-একটি ছোট্ট বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। বাড়ির প্ল্যান সহজ-সরল তবু অল্প-কিছু মজুর-মিস্ত্রী আমরা বাইরে থেকে আনিয়ে নিলুম। আমাদেরই সেন্ট্রাল স্টোর থেকে বাস্তুহারা-দের সমবায় গোষ্ঠীগুলিকে সিমেন্ট, ইঁট, বালি এবং কিছু পরিমাণে ইস্পাত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল। ঠিক হল, বাড়ির নির্মাণব্যয় থেকে তার দাম বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেটাকে এই সমবায়-গোষ্ঠীগুলির আয় বলে গণ্য করা হবে। বাড়িগুলি কত দ্রুত তৈরি হবে, কিংবা কত ধীরে, সেটা সমবায়-গোষ্ঠীগুলিই বুঝবে। কোনও সমবায়-গোষ্ঠী যদি কুড়িটি বাড়ি বানায়, তাহলে মালমসলার দাম বাদ দিয়ে বাড়ি-পিছু ১,৯৩৩ টাকা হিসেবে কুড়িটি বাড়ির জন্য তারা মোট ৩৮,৬৬০ টাকা পাবে। বাড়ি তৈরির কাজ তারা তিন মাসে শেষ করবে, না চার মাসে, সেটা তারাই স্থির করুক। তবে যত তাড়াতাড়ি তারা কাজ চুকিয়ে দিতে পারবে, তাদের আয়ের অংকও ততই বাড়বে।

সমষ্টি-প্রকল্পের আট হাজার কর্মীর কর্মজীবনের বিন্যাসটা কেমন ছিল, সেটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সামবায়িক কর্ম-নীতির ভিত্তিতে তারা কয়েক শ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এক-একটি গোষ্ঠীর ন্যূনতম সদস্য-সংখ্যা হল দশ। ঊর্ধ্বতম সংখ্যাটা বেঁধে দেওয়া ছিল না, তবে দশ-পঁচিশের উপরে সেটা কখনও ওঠেনি। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন হত গোষ্ঠীনেতা। সে-ই বোর্ডের ইনজিনিয়রের কাছে গিয়ে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মালমসলা আর মজুরি নিত। প্রতিটি গোষ্ঠীর রোজগার তার সদস্যদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হত। অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার জন্য যারা কাজে যোগ দিতে পারত না, অনুপস্থিতির সময়ে

ছিলেন পরাজিতজন। যাঁরা নির্বাচিত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন শিক্ষিকাও ছিলেন। ভোটদান শেষ হবার পর ব্যালট-বাক্সগুলিকে সিল করে একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল, ঘরের দরজায় পড়ল তালাচাবি। ঠিক হল, পরদিন সকালে ভোট গণনা করা হবে। প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই সে-রাত্রে ঘুম হল না, রাত জেগে তাঁরা ব্যালট-বাক্স পাহারা দিতে লাগলেন।

বুঝতে বাকী রইল না, আমাদের উদ্যোগ সফল হয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগেও যে বিপন্ন জনসমষ্টির মধ্যে সামাজিক চেতনার বিশেষ পরিচয় মেলেনি, তারাই আজ কর্মনিষ্ঠ প্রগতিশীল একটি সমাজ গড়ে তুলতে চলেছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল আর ইস্কুল দিয়ে ফরিদাবাদের প্রকৃত সাফল্যের বিচার চলে না। সবাই মিলেমিশে নিজেদের হাতে নিজেদের কাজ করতে করতে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিপুল সামাজিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, ফরিদাবাদের প্রকৃত সাফল্য সেইখানেই।

প্রকল্পের বিদ্যুৎ-সমস্যা কীভাবে মিটল, সেই কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক।

বসতি-বাড়িতে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা তো করতেই হবে, সেই সঙ্গে শহরবাসীদের স্থায়ী জীবিকার জন্যে যে কল-কারখানা গড়ে তোলা হবে, তার কাজ চালাবার জন্যেও চাই বিদ্যুৎ-শক্তি। প্রকল্পের মূলধনী ঋণের পরিমাণ তো মাত্র আড়াই কোটি টাকা। তার উপরে নির্ভর করে তো আর আনকোরা নতুন বৃহৎ একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্ল্যান্ট কেনার কথা ভাবা চলে না। ঠিক করলুম, পুরনো একটি জারমান প্ল্যান্ট আমরা যোগাড় করব। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে সেটি জারমানী থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। যুদ্ধের চার বছর আগে হামবুর্গের এক জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় ছ-হজার কিলোওয়াটের এই প্ল্যানটি বসানো হয়েছিল। এর টারবো সেট দুটি। যুদ্ধের সময় হামবুর্গের সেই জাহাজ-কারখানায় বোমা পড়ে, এবং বিদ্যুৎ- প্ল্যানটটি তাতে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পরে মারকিন সৈন্যবাহিনী এটির যন্ত্র-সরঞ্জাম খুলে ফেলে। অতঃপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এটি পড়ে ভারতবর্ষের ভাগে। হামবুর্গ থেকে এর যন্ত্রসরঞ্জাম দেড়শো ক্রেটে বোঝাই করে কলকাতায় পাঠানো হয়। কলকাতার ডকে এটি পুরো দেড় বছর পড়ে ছিল। তখন এটির উপর দিয়ে বিস্তর ঝড়বাদল গিয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি দপ্তরকেই অনুরোধ করা হয়েছিল, এটিকে তাঁরা যেন কাজে লাগান। কিন্তু সরকারী ইনজিনিয়ারদের মনে এটির ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তাই তাঁদের কেউই এতদিন এটিকে কাজে লাগাতে উৎসাহ বোধ করেননি। যন্ত্র-সরঞ্জামের মধ্যে কী কী আছে, এবং কী কী নেই, তার কোনও বিবরণ এর সঙ্গে ছিল না। সরঞ্জামগুলিকে জোড়া দিয়ে কীভাবে আবার প্ল্যানটটি গড়ে তুলতে হবে, তার কোনও নকশা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবু আমার মনে হল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। শ্রীনেহরুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের বাস্তুহারা-সমাজের কাজে লাগাবার জন্যে কি এটিকে আমরা পেতে পারি? সরকারী দপ্তরগুলির কোনওটিই তো এটিকে নিতে রাজী হচ্ছিল না। তাই শ্রীনেহরু নির্দেশ দিলেন, প্ল্যানটটি যেন আমাকে দেওয়া হয়। ঠিক হল, ডিসপোজালের দরে বোর্ড থেকে এটির দাম দিয়ে দেওয়া হবে।

অতঃপর শুরু হল আমার অনুসন্ধানের পালা। বার্লিনে যে ভারতীয় মিলিটারী মিশন তখন মোতায়েন ছিল, তার মারফতে আমি এমন একজন মেকানিক্যাল ইনজি-নিয়ারকে খুঁজে বার করলুম, হামবুর্গের ব্লম অ্যানড ভস জাহাজ-কারখানায় এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্ল্যানটে যিনি কাজ করতেন। মিলিটারী মিশনের কর্তা তাঁর যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাকে জানালেন। সেই সঙ্গে এমন আরও কয়েকজন জারমান ইনজিনিয়ারের যোগ্যতার বিবরণ তিনি আমাকে জানালেন, যাঁরা ভারতে এসে কাজ করতে ইচ্ছুক। ১৯৪৯-৫০ সনে জারমানদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। দক্ষ এইসব ইনজিনিয়ার এত কম বেতনে কাজ করতে রাজী হলেন যে, আমি রীতিমত বিস্ময় বোধ করলুম। যাই হোক, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ে মনে হল, জোহানেস ডলকেই আমাদের পাওয়া দরকার। ভারতীয় মিলিটারী মিশন কিন্তু তাঁকে সুপারিশ করলেন না। তাঁরা বললেন, ইংরেজী এর একেবারেই জানা নেই; সেক্ষেত্রে অন্যেরা সবাই ইংরেজী জানেন। ফরিদাবাদের টিনের চালাঘরে বসে আমার কিন্তু মনে হল, এই জোহানেস ডলকেই আমাদের চাই। তার কারণ একমাত্র তিনিই এই প্ল্যানটটির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর ইংরেজী-জ্ঞান থাক আর নাই থাক, তাতে বয়ে গেল। ঠিক করলাম, তাঁকেই আমি নিযুক্ত করব। ভারতীয় মিলিটারী মিশন অগত্যা কী আর করেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডলকেই তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। এই বিদেশী বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সস্ত্রীক আমি পালাম বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম। আমাদের কথার এক বিন্দুও তিনি বুঝলেন না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, তিনি আসায় আমরা খুব খুশী হয়েছি। ভাষার ব্যবধানকে ভালবাসা দিয়ে খুব সহজেই জয় করে নেওয়া যায়। অতঃপর চটপট আমরা জারমান-জানা একটি তরুণকে যোগাড় করে ফেললুম। সেই হল দোভাষী। তার মারফতে ডল-এর সঙ্গে আমাদের দিব্যি কথাবার্তা চলতে লাগল।

ভেবেছিলুম, দিল্লির একটি হোটেলে আমরা এই জারমান ইনজিনিয়ারের থাকার ব্যবস্থা করে দেব। সেখান থেকে রোজ তাঁকে ফরিদাবাদে নিয়ে আসবার জন্যে এবং ফরিদাবাদ থেকে আবার দিল্লিতে পৌঁছে দেবার জন্যে একটি গাড়ির ব্যবস্থাও থাকবে। দিল্লিতে থাকলে তিনি আরামে থাকবেন, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। ডল কিন্তু তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, যেখানে কাজ হচ্ছে, সেইখানেই তিনি থাকবেন। আমি যে-রকম টিনের চালাঘরে রয়েছি, তাঁরও সেই রকমের একটা চালাঘর পেলেই চলবে; তিনি কাজ করতে এসেছেন, আরাম ভোগ করতে আসেননি। তা ডল সত্যি কাজ করতেই এসেছিলেন বটে। দৈত্যের মতন খাটতেন তিনি। জনা ছয়েক তরুণ ভারতীয় ইনজিনিয়রকে আমি ডলের হাতে সমর্পণ করলুম। তাদের একজনের নাম নাগিয়া। ডলের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় দিয়ে বললুম, "মিঃ ডল, এর নাম নাগিয়া। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ে এ-ছেলেটি ফার্সট ক্লাস পেয়েছে। আপনার সঙ্গে কাজ করবে।" ডল কিন্তু ফার্সট ক্লাস ডিগরীর কথা শুনে বিচলিত হবার পাত্র নন। গম্ভীরভাবে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "দেখা যাক।" তরুণ ইনজিনিয়ারের দল দু-দিনেই টের পেয়ে গেল যে, ছোটখাট্ট এই জারমান ইনজিনিয়ারটি নিজে যেমন দৈত্যের মতন খাটেন, তেমনি অন্যদেরও খাটিয়ে নেন: তাঁকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ফাঁকি অবশ্য কেউ দিতও না। বয়লার টারবাইন, জেনারেটর ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে ডল তাদের প্রত্যেককেই

[illegible] প্রতিটি কাজ হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এমন লোককে সঙ্গে হিসেবে পেলে কে না খুশী হয়। খুশী হয়ে কাজ করতে লাগল তারা। ডলকে তারা খুবই ভালবাসত। কাঠের বাক্সগুলি খুলে বার করা হল সেই প্ল্যানটের হাজার রকম অংশ। তার প্রত্যেকটির মাপজোক করে সবাই মিলে প্ল্যানটের একটি নকশা তৈরি করে ফেলল।

গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা ধাঁধার মত। একটার পর একটা অংশ জোড়া দিয়ে সেই ধাঁধার উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। ছোটখাটো কয়েক শ অংশ তো পাওয়াই গেল না। সৌভাগ্যের বিষয়, প্ল্যানটের যেটা প্রধান অংশ, সেই টারবাইন আর জেনারেটর দুটিকে নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া গেল। ওয়াটার-টিউব বয়লারের টিউবগুলির উপরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন দেখলাম আমরা। [illegible] নির্দেশে জারমান কারিগররা যখন বিদ্যুৎ-প্ল্যানটটিকে খুলে ফেলতে বাধ্য হয়, তখন স্বভাবতই কাজটা তাদের ভাল লাগেনি। নিজের দেশের একটা দামী জিনিস, অন্যেরা সেটাকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে, কার এটা ভাল লাগে। জারমান কারিগরদেরও লাগেনি। প্ল্যানটটার বিভিন্ন অংশকে তাই তারা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, যাতে অন্যরাও সেটাকে সহজে কাজে লাগাতে না পারে। টিউবগুলির দশা দেখে বোঝা গেল, খুব ভাল করে ওয়েলডিংয়ের ব্যবস্থা না করলে সেগুলিকে কাজে লাগানো যাবে না। অত দক্ষ ওয়েলডার ভারতবর্ষে তখন নেই। ডলকে দিয়ে তাই হামবুর্গের এক ওয়েলডারের কাছে চিঠি লেখালুম। ডল তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করলেন। আর প্ল্যানটের [illegible] পাওয়া যাচ্ছিল না, [illegible] এখন কী ব্রিটেনেরও [illegible] লাগিয়ে তল্লাসি চালিয়ে সেগুলিকে যোগাড় করবার ব্যবস্থা হল।

অতঃপর সমস্যা বাধল বয়লার ড্রাম নিয়ে। ড্রামগুলির ওজন পঞ্চাশ টন; নব্বই ফুট উঁচুতে তুলে তাদের বসাতে হবে। ক্রেনের সন্ধান করা বৃথা; ও তল্লাটে যে পঞ্চাশ টন ওজন তুলবার মতন ক্রেন নেই, তা আমরা জানতুম। জারমান ইনজিনিয়ারকে প্রশ্ন করলুম, "এবারে তাহলে কী করবেন আপনি?" তাতে মাথা চুলকে তিনি বললেন, "কিছু-একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।" তা ব্যবস্থা তিনি করলেন বটে। তাঁর কথামত আমি ছটা স্ক্রু জ্যাক আর প্রচুর কাঠের স্লিপার আনিয়ে দিলুম। স্লিপারগুলিকে পর পর সাজিয়ে জেদী সেই জারমান ইনজিনিয়ার পঞ্চাশ টন ওজনের সেই ড্রামগুলিকে একটু-একটু করে নব্বই ফুট উঁচুতে তুলবার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তার তলায় বসালেন ইস্পাতের 'পায়া'। তরুণ ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের সহযোগিতায় 'পায়া'-গুলিকে তিনি ফরিদাবাদের কারখানাতেই বানিয়ে নিয়েছিলেন। পায়া বসিয়ে দেওয়ার পর স্লিপারগুলি সরিয়ে নেওয়া হল। চেয়ে দেখলুম, মাটি থেকে নব্বই ফুট উঁচুতে বয়লার ড্রামগুলি দিব্যি বিরাজ করছে; ওই ড্রাম থেকেই জল আসবে ওয়াটার টিউব বয়লারে। পঞ্চাশ-টনী ক্রেন ছাড়া যিনি কাজ করতে পারেন না, এবং কাজে হাত লাগিয়ে যিনি প্রতিপদে বলতে থাকেন যে, দরকারী প্রতিটি যন্ত্র তাঁর চাই, তেমন ইনজিনিয়ার দিয়ে তো আর অনগ্রসর দেশের কাজ চলে না। এ-দেশের পক্ষে ডলের মতন ইনজিনিয়ারই হচ্ছেন আদর্শ।

নগর-প্রকল্পের কাজ যতই এগোতে লাগল, ততই আমরা অনুভব করতে লাগলাম যে, আমাদের একটা ভালমতন ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় মেশিন-যন্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের আমি খোঁজ করতে লাগলুম। খোঁজ করতে করতে জানা গেল, বোমবইয়ের ডকইয়ার্ডে প্রচুর মেশিন-টুল স্তূপাকার হয়ে আছে। এগুলিও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদে জরমানী থেকে এসেছিল। এইসব যন্ত্র-সরঞ্জামের ৩৬১টি ইউনিট আমরা কিনে নিলুম; বুঝতে পারলুম যে, এগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা ডিজেল ইনজিন তৈরি করতে পারি। এইসব যন্ত্র দিয়ে আগে [illegible] এক বিরাট কারখানার কাজ চলত। সেই কারখানায় তৈরি হত ডিজেল ইনজিন। ভারতে তখন ডিজেল ইনজিনের প্রচুর চাহিদা। ১৯৪৯-৫০ সনে [illegible] বিভিন্ন

সাইজের প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডিজেল ইনজিন আমদানি করতে হত। সেচকার্যের প্রয়োজনে টিউবওয়েল থেকে জল তুলতে, কিংবা যেখানে বিদ্যুৎ পাবার উপায় নেই সেখানে যন্ত্র চালাতে চাই ডিজেল ইনজিন। শুধু ভারতবর্ষ কেন গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়েই তখন ডিজেল ইনজিনের চাহিদা ছিল ব্যাপক। এ যখনকার কথা বলছি, ভারতবর্ষে তখন বছরে ৫,০০০ ডিজেল ইনজিন উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল; সেক্ষেত্রে শুধু আভ্যন্তর প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বার্ষিক চাহিদা ছিল আরও পঁয়তাল্লিশ হাজারের। ফরিদাবাদে যে যন্ত্র-সরঞ্জাম আমরা যোগাড় করলাম, দেখা গেল যে, তার সাহায্যে নতুন কিছু যন্ত্র বসিয়ে নিতে পারলে বছরে আমরা ১২-অশ্বশক্তিবিশিষ্ট চার হাজার ডিজেল ইনজিন তৈরি করতে পারব। গোষ্ঠী-প্রকল্পের মূলধনী ঋণ থেকে লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে তাই কুড়ি লক্ষ টাকা পৃথক করে রাখা হল। একটি জারমান ডিজেল ইনজিনের সরঞ্জাম খুলে খুলে তার প্রতিটি অংশের আমরা নকশা করে নিতে লাগলাম, তারপর সেই অংশগুলিকে আবার জোড়া দিয়ে দেখলাম, দিব্য কাজ চলছে। প্রকল্পের কর্মীরা ছ মাসের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে, জারমান ডিজেল ইনজিনটির প্রতিটি অংশই আমাদের কারখানায় তৈরি করে নেওয়া সম্ভব।

১৯৫১ সনের জানুয়ারি মাসে ফরিদাবাদের কারখানায় প্রথম ডিজেল ইনজিনটি তৈরি হল, সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। একটি ট্রাকের উপরে ইনজিনটিকে বসিয়ে আমরা পারলামেন্ট হাউসে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম; ফরিদাবাদের প্রথম ইনজিনটিকে আমরা তাঁরই হাতে তুলে দেব। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আমার যাতায়াত তখন ছিল অবাধ; আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-করেও যখন ইচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারতাম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং ফরিদাবাদে তৈরি ইনজিনটিকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে শিশুর মতন উৎসাহে সেই ট্রাকের উপরে গিয়ে উঠলেন। বাস্তুহারাদের যে-সব প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসেছিল, ইনজিন স্টার্ট দিয়ে তারাই দেখিয়ে দিল, কীভাবে এটির কাজ চলে। শ্রীনেহরু তো দারুণ খুশী। ফরিদাবাদ প্রকল্পের কাজ চলছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের অধীনে। আমার অনুরোধে শ্রীনেহরু সেই সময়ে পুনর্বাসন-মন্ত্রীর কাছে যে-সব চিঠি দিয়েছিলেন, তার একটি এখানে তুলে দিচ্ছি। এমন চিঠি তখন ইচ্ছে হলেই যে-কোনও সময়ে শ্রীনেহরুকে দিয়ে আমি লিখিয়ে নিতে পারতুম।

নয়াদিল্লি,
২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫১

প্রিয় অজিত প্রসাদ,

ফরিদাবাদের ডিজেল ইনজিন প্রকল্পে যে আমার আগ্রহ খুবই গভীর, তা তুমি জানো। এর প্রয়োজনটা এতই প্রশ্নাতীত যে, বিলম্ব মাত্রেই এক্ষেত্রে দুঃখদায়ক। যে-কোনও কারণেই হোক, বিলম্ব ঘটেছে। এই ব্যাপারটা আমাদের হাতে আসবার পর প্রায় ন-দশ মাস অতিক্রান্ত হতে চলল।

ব্যবসায়ী এবং বিশেষজ্ঞ মহলের পরামর্শ আমরা নিয়েছি। আমাদের নিজেদের কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ছাড়াও রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এফ সি বাধওয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা হয়েছে, এবং টাটা কোম্পানির কে এ ডি নওরোজির সঙ্গে তিনি একমত হয়েছেন।

এখন জানতে পারলাম যে, ফরিদাবাদে কাজের অগ্রগতি ঘটায় ডিজেল ইনজিন নির্মাণের প্রচুর যন্ত্রপাতি পাওয়া যাবে। এইসব যন্ত্রপাতি এখন বোম্বাইয়ে পড়ে আছে। জারমানির কাছ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে এই নতুন যন্ত্রগুলি পাকিস্তানের প্রাপ্য, তবে এগুলি তারা এখনও নেয়নি। ডিসপোজালের দরে এই প্ল্যান্টের দাম অবশ্যই আমাদের মিটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তার ব্যবস্থা তো সহজেই করা যেতে পারে। স্পষ্ট করে অবশ্য আমাদের জানানো হল যে, প্ল্যানটির কাজ তাড়াতাড়ি চালু হবে এবং এ-ব্যাপারে জারমান ফার্মটির সঙ্গে আমাদের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা হয়েছে এ-কথা জানতে পারলে তবেই এই যন্ত্রপাতি তাঁরা আমাদের দিতে পারেন। যন্ত্রগুলি এসেছে ডয়শ কারখানা থেকে।

এ-ব্যাপারে এখনই একটা সিদ্ধান্ত করা দরকার। অব্যবসায়ীসুলভভাবে অনন্তকাল ধরে এ নিয়ে আমরা আলোচনা চালাতে পারি না। শুনলাম, জারমানীর ডয়শ কারখানার ডিরেক্টর জেনারেল খুব শিগগিরই দিল্লির পথে অসট্রেলিয়া যাচ্ছেন। দিল্লিতে তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত। কী শর্তে চুক্তি হবে, তা কে এ ডি নওরোজি, এফ সি বাধওয়ার এবং অন্যেরা মিলে ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন। ফরিদাবাদ বোর্ড এই প্রকল্পটিকে পুরোপুরি অনুমোদন করেছেন। এখন প্রকল্পের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দিল্লিতে আমরা ডয়শ কারখানার ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

আন্তরিকভাবে আপনার

(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু"

মাননীয় শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন,
রাষ্ট্রমন্ত্রী, পুনর্বাসন দপ্তর,
নয়াদিল্লি।

এ যখনকার কথা বলছি, ফরিদাবাদ প্রকল্পকে সাহায্য করবার জন্য শ্রীনেহরু তখন শুধু কলোনের ক্লকনার-হামবোল্ট্-ডয়শ প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটর কেন, আমার অনুরোধে যে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকল্পটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এতই আগ্রহ ছিল তাঁর।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সনের মধ্যে বিদেশ থেকে যত গণ্যমান্য অতিথি নয়াদিল্লিতে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই একবার ফরিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হত। অর্ধদিবস সেখানেই কাটাতেন তাঁরা; আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতেন, অল্প কিছু মূলধন এবং নেতৃত্বের ব্যবস্থা করে দিলে নিতান্ত সাধারণ একদল নরনারীও স্বয়ংনির্ভর সমষ্টি প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে নবজীবন গড়ে নিতে পারে। মিঃ ইউজেন ব্ল্যাক প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তখন পরিচয় হয়েছিল আমার। সমালোচক হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা; কাজ দেখে সমর্থক হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। একদিন সকালে অর্থ-দপ্তর থেকে ফোন করে আমাকে জানানো হল যে, ফরিদাবাদ-পরিদর্শনের জন্য বিশ্ব-ব্যাংকের সভাপতির কাছে প্রস্তাব করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মিঃ ব্ল্যাক তখন নয়াদিল্লি সফরে এসেছেন। সমষ্টি-প্রকল্পের ডিজেল ইন্‌জিন কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে মিঃ ব্ল্যাকের বিশেষ আস্থা ছিল না; এই সব উদ্যোগের পিছনে সরকারী টাকা ঢালা উচিত কিনা, তা নিয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ-সব কাজের দায়িত্ব নেয় না কেন? উত্তরে আমি বললাম এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে আমরা চেষ্টা করছি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সেখানে আসতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মূলধন হিসেবে সরকারের কাছ থেকে যে-টাকা আমরা ঋণ নিয়েছি, তা দিয়ে শুধু ঘরবাড়ি আর সমাজকল্যাণকর কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ব কেন? তার সাহায্যে গুটিকয়েক লাভজনক শিল্পও যদি আমরা সামবায়িক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি, তো তার আয় দিয়েই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণকর কাজের ব্যয় নির্বাহ করা যাবে, সরকারী দাক্ষিণ্যের উপরে আর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না। মিঃ ব্ল্যাক ব্যাংকার মানুষ, লাভ-লোকসানের হিসেব বোঝেন, আমার উত্তর শুনে তিনি খুশী হলেন। টাকাটা কীভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, এবং তার থেকে কীভাবে আয় হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেখবার পর তাঁর আপত্তি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। অতঃপর যখনই আমি ওয়াশিংটন গিয়েছি, নিজের অসুবিধে ঘটিয়েও তখনই তিনি সৌজন্যভরে আমার দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একবারও এর অন্যথা হয় নি। (ক্রমশ)
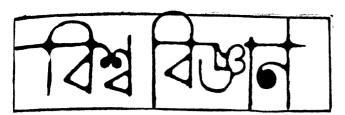
হৃদ্‌রোগের প্রতিকার (১)

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি হালে ঘটে গিয়েছে মেক্সিক্যান শহর হাউস্টনে। বহুকালের পুরানো হৃদ্‌রোগিণী মিসেস এস্পারেন্জা দেল ভালে ভাস্কোয়ে—যাঁর পুরো জীবন বাঁচবার কোন আশা ছিল না—এক অভূতপূর্ব শল্য চিকিৎসার কল্যাণে আরোগ্য হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে মন্তব্য করেছেনঃ—"আমি বলতে চাই কত কিছু, কিন্তু বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।" বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন হৃৎ-শল্য চিকিৎসক ডঃ মাইকেল ডেবেকি রোগিণীর বুক চিরে তাঁর হৃদযন্ত্রের মধ্যে আঙুরের আয়তনের ছোট্ট একটি প্লাস্টিকের পাম্প বসিয়ে দিয়েছেন যেটি ভদ্রমহিলার দুর্বল হৃদযন্ত্রের মেহনতের শতকরা ৪০ ভাগ নিজে নিয়ে যন্ত্রটিকে আরোগ্য হবার সময় ও সুযোগ দিচ্ছে। রোগিণীর শরীরের বাইরে লাগানো একটি কম্প্রেসার আপাতত পাম্পটিকে পরিচালিকা শক্তি যোগাবে। অদূরভবিষ্যতে হয়ত এমন কৌশল আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না যার ফলে ঐ কম্প্রেসারেরও আর দরকার হবে না এবং পাম্পটি শরীরের তাড়িত বা রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে নিজেকে চালু রাখবে। ছোটবেলায় বাতজ্বরে ভুগে ভদ্রমহিলার হৃদ্‌যন্ত্র দারুণ জখম হয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর বেশী দিন বাঁচবার আশা ছিল না। এখন তিনি সেই বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন। এবং বাতজ্বরই হচ্ছে হৃদ্‌রোগের একটি প্রধান কারণ যা আজ পৃথিবীর বৃহত্তম নরহন্তা।

হৃদ্‌রোগের বিষয় আলোচনা করতে হলে আগে সংক্ষেপে হৃদ্‌যন্ত্রের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকলাপের বিষয়ে একটা ধারণা থাকলে তবেই আমরা জানতে পারব কিভাবে সেটিকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখতে হয়, কি কি জিনিস এড়িয়ে চলা দরকার, হৃদ্‌রোগের লক্ষণ কি কি ইত্যাদি।

হৃদপিণ্ড এমন এক যন্ত্র যা মাতৃগর্ভে জন্মলাভের দিন থেকে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত একনাগাড়ে ধুক্ ধুক্ করে চলে। এক পলের জন্যও সে থামে না, তার দমও ফুরোয় না। হৃৎপিণ্ড হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালক যা বাইরের থেকে ফুসফুসের সাহায্যে নেওয়া অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত করে বিপাক ক্রিয়া চালু রাখে, পুষ্টিকর পদার্থ সারা শরীরে বণ্টন করে, কার্বনডায়ক্সাইড এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত ও অনিষ্টকর পদার্থ ফুসফুস, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতির মাধ্যমে দেহ থেকে বার করে দেয়, এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির রস শরীরের মধ্যে পরিচালিত করে। হৃৎপিণ্ডের দায়িত্বের কোন তুলনা নেই কারণ সেই হচ্ছে এই ব্যবস্থার পরিচালক। সুতরাং হৃৎপিণ্ড যদি বলিষ্ঠ ও সুস্থ না হয় তাহলে রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার ক্ষতি হতে বাধ্য এবং জখম হতে বাধ্য রক্তবহা-নাড়ীগুলি। হৃৎপিণ্ড যদি বাতে আক্রান্ত হয় তাহলে সে পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে রক্তপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের এত বড় বহুমুখী দায়িত্ব হলেও সেই হৃৎপিণ্ডের মাথাতেও আবার হর্তাকর্তা রয়েছে যার নাম স্নায়ুতন্ত্র। সেই স্নায়ুতন্ত্রের হেড অফিস রয়েছে মস্তিষ্কে। হেড অফিস থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে অন্যান্য যন্ত্রের মত হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে হেড অফিসের ও ফলত স্নায়ুর কাজে যদি গণ্ডগোল ও বেনিয়ম হয় তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব গিয়ে পড়ে হৃৎপিণ্ডের উপর যা তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করে। আমরা যদি বলি যে, হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার রোগের মূল কারণ নির্ণয় করতে হলে মস্তিষ্কের রাজ্যে যেতে হবে, সেটা হয়ত অন্যায় হবে না। কারণ, রোগমাত্রেরই দুই রকম কারণ থাকে—প্রত্যক্ষ (হৃদ্‌রোগের ক্ষেত্রে যেমন একটি কারণ হচ্ছে কোলেস্টেরলের আধিক্য) এবং পরোক্ষ। এই পরোক্ষ কারণটি পাওয়া যাবে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে এবং সেই পরোক্ষ কারণটিই প্রত্যক্ষ কারণ বা লক্ষণগুলির জন্মদাতা।

মানুষের হৃদযন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

বহুকাল আগে এঙ্গেলস্ তাঁর 'ডায়ালেক্টিক্স অব নেচার' শীর্ষক গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন যে, প্রথমত শ্রম এবং তার পরে বাক্‌শক্তি—এই দুয়ের প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হয়। তারপর সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন

হৃদপিণ্ড আলাদা করে নিয়ে পুষ্টিদান
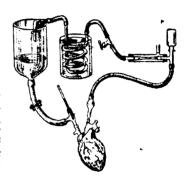
উদ্দীপকের (স্টিমুলাস) প্রভাবে মানব মস্তিষ্ককে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাড়া দিতে শেখায় অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তী (কণ্ডিশন রিফ্লেক্স) গাঁথা হয়ে যেতে থাকে। এই সাপেক্ষ প্রতিবর্তী মানুষের একচেটে। জীবজন্তুর মস্তিষ্কে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিজাত প্রতিবর্তী আছে যেগুলি সাপেক্ষ নয় যেমন খাবার দেখলে খাওয়া, আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে কোন একটা উদ্দীপক যোগ করে মানুষ জীবজন্তুর মাথায় সেগুলিকে সাপেক্ষ করে তুলতে পারে যেমন একটা শব্দ বা আলোকের ঝলক দেবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের থালায় যদি মাংস দেওয়া হয় তাহলে কিছু পরে সেই শব্দ শুনলে বা সেই আলোর ঝলক দেখলে মাংস সেখানে না থাকলেও তার মুখ দিয়ে নাল ঝরবে। এই সাপেক্ষ প্রতিবর্তীটি মানুষ কৃত্রিম কৌশলে তৈরি করে দিল। বিজ্ঞানাচার্য ইভান পাভলফ এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে গুরু মস্তিষ্ক বল্কলের শরীর নিয়ন্ত্রক কার্যকলাপ অনুশীলন করে দিয়েছেন যা শরীরে

ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই দুটি পরিবেশ থেকে যে সব উদ্দীপক মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করে সেগুলি যদি সুস্থ স্বাভাবিক না হয় তাহলেই মস্তিষ্ক পড়ে বিপদে বেকায়দায়। তখন তার স্বাভাবিক শরীর নিয়ন্ত্রণক্রিয়া ব্যাহত হয় যা থেকে অন্যান্য রোগের মত হৃদ্‌রোগেরও জমি তৈরি হয়।

গুরু মস্তিষ্ক-বল্কলের দুটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে উত্তেজিত হওয়া ও দমে যাওয়া। (ইন্‌হিবিটেড) এক এক রকম উদ্দীপক সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের অংশবিশেষে সঞ্চারিত করে। কতকগুলি আবার উত্তেজনার বদলে বা বিপরীতে বাধ সৃষ্টি করে। এইভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রমাগত চলেছে উত্তেজনা ও বাধের দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যেকটি কাজ ও আচরণ সেই স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। কিন্তু নানারকম উদ্বেগ ও অশান্তি ঘটলে সেই দ্বন্দ্ব আর স্বাভাবিক থাকে না তখন উত্তেজনা বা বাধ যে কোনটির অন্যটির উপর অত্যধিক প্রাধান্য ঘটতে পারে, যার ফলে মস্তিষ্ক অত্যুত্তেজিত বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যে অবস্থা ডেকে নিয়ে আসে শারীরিক বৈকল্য। যেমন ধরুন, একনাগাড়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যদি একঘেয়ে জীবন কাটাতে হয়, সব সময় সাংসারিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে মন যদি ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, জীবনে যদি স্বচ্ছন্দতা ও সাবলীলতা না থাকে তাহলেই মস্তিষ্কে বাধের অস্বাভাবিক প্রাধান্য স্বাভাবিক উত্তেজনাকে দাবিয়ে দেয়। ফলে প্রতিবর্তীগুলিও আর ঠিক মত কাজ করে না। গোটা অবস্থাটা মানুষটির স্বাভাবিক চরিত্রের ও আচরণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তার মস্তিষ্ক ঠিক মত তত্ত্বাবধান করে না বলে স্নায়ুতন্ত্রের কাজেও গণ্ডগোল দেখা দেয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের (যেমন পরিপাক যন্ত্র, বিভিন্ন গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবহা নাড়ী ইত্যাদি) স্বাভাবিক কাজেও বাধা পড়ে। এইভাবে বিপাক ক্রিয়ায় যখন গণ্ডগোল দেখা দেয় তখনই আসে নানা রোগ যেমন বদহজম, বাত, রক্তসঞ্চালনে গণ্ডগোল এবং শেষ পর্যন্ত হৃদ্‌রোগের জমি উর্বর হয়ে ওঠে।

হৃদ্‌রোগের সঙ্গে কোন্ স্নায়ুগুলির সম্পর্ক? সেগুলি ভেজিটেটিভ ও সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু। সেগুলির কাজ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির রস রক্তের মধ্যে প্রবাহিত করে বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করা। সে স্নায়ুর প্রভাবে যে রস কাজ করে সেটি সেই স্নায়ুর মতই কাজ করে। যেমন বলা যায় যে, অ্যাড্রিন্যালিন ও সিম্পাথিনের কাজ সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর অনুরূপ, অ্যাসিটিলকোলিনের কাজ ভেগাসের মত। তেমনি কতকগুলি খনিজ লবণও স্নায়ুর মত কাজ করে যেমন ক্যালসিয়াম কাজ করে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর মত, পটাসিয়াম ভেগাসের মত। এখন এই স্নায়ুগুলির কাজ কি? সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু উত্তেজিত হলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, ভেগাসের উদ্দীপনা তার স্পন্দন করে মন্দায়িত। পাভলফের আবিষ্কৃত ইন্টেন্‌সিফাইং স্নায়ু তড়িতের সাহায্যে উত্তেজিত হলে অবসন্ন ও পঙ্গু হৃৎপিণ্ডে বিপাকক্রিয়ার উন্নতি করে যন্ত্রটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। বাইরের ও ভিতরের পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন অস্বাভাবিক ব্যাপার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রতিবর্তীগুলি যখন ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন এই হৃৎপিণ্ড নিয়ন্ত্রক স্নায়ুগুলির কাজে গণ্ডগোল দেখা দেয়। শরীর যদি স্বাভাবিক পরিশ্রম না করে, মন যদি ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় বিকার (নিউরোসিস, নিউরাস্থেনিয়া প্রভৃতি)। সেই বিকার হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে দেখা দিতে পারে অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস প্রভৃতি ব্যাধি। গুরু মস্তিষ্ক বল্কলে যদি দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তাই থেকে উদ্ভব হতে পারে হাইপারটেনশন (অত্যাধিক চাপ) যা শেষ পর্যন্ত ধমনীগুলির নমনীয়তা নষ্ট করে সেগুলি কঠিন করে ফেলে (আথেরো স্ক্লেরোসিস) সেগুলির উপর ক্যালসিয়াম, কোলেস্টেরল এবং হায়ালিন জমিয়ে দিয়ে। বিপাকক্রিয়া ঠিক মত না চলায় এই জিনিসগুলি শরীরে শোষিত না হয়ে জমা হতে থাকে। ধমনী কাঠিন্য স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করে বলে হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রমশ বেশি ধকল পড়তে থাকে, যন্ত্রটি জখম হয়। করোনারি ধমনীগুলিই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের রক্তদাতা। অন্যান্য যন্ত্রের মত হৃৎপিণ্ডের এক দণ্ডও বিশ্রাম নেবার ফুরসত নেই। তাকে সদাসর্বদা খাটতে হয় বলে সব সময় তার প্রয়োজন মত রক্ত চাই। সিস্টেমিক তন্ত্রের শতকরা ১০ ভাগ রক্ত। (অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ) হৃৎপিণ্ডে

[illegible] স্বাভাবিক [illegible]
বাড়লে যায় আরো [illegible]। [illegible]
সংকোচন নিয়ন্ত্রণ [illegible] অসাড়।
ফলে [illegible] হৃৎপিণ্ডে
গণ্ডগোল অনিবার্য। [illegible] রক্ত-
চাপে বিশৃংখলা [illegible] সৃষ্টি করে
ধমনী কাঠিন্য। [illegible] জিনিসের
পলি পড়তে পড়তে ধমনী ও কৌশিক
নাড়ীগুলির ভিতরের [illegible] সরু হয়ে
যেতে থাকে। [illegible] চলাচলে যে
বাধা পড়ে তার দরুন [illegible] চেষ্টা করে ধমনী
ছিঁড়ে যায় হঠাৎ। এইভাবে মাথায় ধমনী
ছিঁড়ে (সেরিব্র্যাল) বা হৃৎপিণ্ডের রক্ত
সরবরাহকারী (করোনারী) ধমনী ছিঁড়ে
লোক মারা যায় বা পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে
থাকে।

কারো যদি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে,
সেই বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করতে করতে তার
এমন নিউরোসিস দেখা দিতে পারে যা
হৃদ্‌রোগের অগ্রদূত। কোন একটি বিশেষ
ঘটনা বা কথাবার্তা কাউকে হয়ত একবার
দারুণ আতঙ্কিত করেছিল। সেইগুলির
পুনরাবৃত্তি-জনিত নিউরোসিস থেকেও
হৃদ্‌রোগের জন্ম হতে পারে কারণ, সেই
আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত ধাতিকে দাঁড়িয়ে
মস্তিষ্কের কার্যকলাপে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উপরে যে সব অস্বাভাবিক ব্যাপারের কথা
বলা হল সেগুলি শেষ পর্যন্ত শরীরের মধ্যে
হৃদ্‌রোগের একটি উৎপত্তি কেন্দ্র বা 'সেপ্টিক
ফোকাস'-এর জন্ম দেয়।

এই গেল খুব সংক্ষেপে রোগের পরোক্ষ
কারণগুলির কথা। যেগুলি থেকে প্রত্যক্ষ
কারণগুলির উদ্ভব। যেমন ধরুন স্নেহ-
জাতীয় পদার্থ কোলেস্টেরলের কথা।
কোলেস্টেরলের মধ্যে আছে চর্বি এবং
আড্রিন্যাল ও যৌন হোর্মোন। আগেকার
দিনে আমাদের ধারণা ছিল যে, কোলেস্টেরল-
বিহীন খাদ্য বাদ দিলেই ধমনী কাঠিন্য রোগ
নিবারণ করা যাবে। কিন্তু নোবেল
পুরস্কারবিজয়ী বৈজ্ঞানিকদ্বয় কনর‍্যাড
এমিল ব্লক ও ফিওডোর লিনেন দেখিয়েছেন
যে, কোলেস্টেরলের প্রধান উৎস খাদ্য নয়,
যকৃৎ এবং শরীরের কিছু কিছু কোষ যে-
গুলি অ্যাসিটেট আয়ন থেকে অন্যাও ভাবে
জিনিসটি পয়দা করে। স্বাভাবিক দৌর্বল্য ও
ব্যাধি থেকে যকৃত ও কোষগুলি যদি ঠিক-
মত খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়
তাহলেই অত্যধিক মাত্রায় সেই অজীর্ণ
কোলেস্টেরল রক্তের মধ্যে বেড়ে থাকে যা
ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে শরীরের ভিতরে। সেই
সংগে যদি কোলেস্টেরল-সমৃদ্ধ চর্বিজাতীয়
খাদ্য খাওয়া যায় তাহলে অবস্থাটা আরো
ঘোরালো হয়ে [illegible]। এখানে
আসল করণীয় কাজ হচ্ছে [illegible]
আসল কারণ [illegible] স্বাভাবিক
কার্যকলাপ [illegible]
সহায়ক [illegible]

করণীয় ব্যায়াম

পরিশ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাভাবিক
পরিশ্রম ও ব্যায়াম শরীর সুস্থ রাখবার
পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। খাবারের মধ্যে যেসব
জিনিস কোলেস্টেরল নষ্ট করতে সাহায্য করে
সেইগুলি দিতে হবে, যেমন ভিটামিন সি এবং
এ ও বি যুক্ত খাদ্য (ভিটামিন ডি নয়),
সোয়াবীন, দই, ডিমের শ্বেতাংশ, কম চর্বি
মাছ, দুধ ভাত, মটর, বাঁধাকপি, লেবু,
টোমাটো, ওটমীল ইত্যাদি। শ্বেতসার-
জাতীয় খাদ্য বেশি চলবে না কারণ বাড়তি
শ্বেতসার চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। রান্না
করার তেল হিসাবে নারকেল তেলের চেয়ে
সরষের তেল অনেক বেশি উপযোগী কারণ
প্রথমটির শতকরা ৯০ ভাগ যে ক্ষেত্রে চর্বি
সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিতে চর্বি শতকরা মাত্র ৫
ভাগ। অথচ যে চর্বিজাত অম্ল কোলেস্টেরল
নষ্ট করে তা নারকেল তেলে আছে শতকরা
মাত্র ৩ ভাগ কিন্তু সরষের তেলে আছে
শতকরা ১৫।২০ ভাগ। তাই আন্তর্জাতিক
হৃদ্‌শাস্ত্র সমিতির গবেষণা পরিষদের
সভাপতি আচার্য অ্যান্সেল কীজ্ নারকেল
তেল রান্নায় বেশি ব্যবহার না করতে
পরামর্শ দিচ্ছেন। সেই সংগে তিনি এ কথাও
বলছেন যে ভারতীয় খাদ্যে চর্বি ও ক্যালরির
মাত্রা অত্যন্ত কম। সেই জন্য কিছুটা নারকেল
তেল ব্যবহারে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।
কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে রক্তে কোলেস্টেরলের
আধিক্য নিশ্চয়ই হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায় মেদবহুল শরীর হচ্ছে
হৃদ্‌রোগের অনুকূল ক্ষেত্র। মেদের আধিক্য
থেকে কোলেস্টেরলের আধিক্য হতে পারে।
দ্বিতীয়ত মেদবহুল শরীরের আয়তন বেড়ে
যায় বলে সব জায়গায় ঠিক মত রক্ত
পৌঁছায় না। সেইজন্য ব্যায়াম ও উপযুক্ত
খাদ্যের সাহায্যে শরীরের [illegible]
দরকার।

হালে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক হৃদ্‌[illegible]
সম্মেলন হয়ে গেল সেখানে দুনিয়ার [illegible]
চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই অত্যধিক আহার
পরিবর্জন ও শারীরিক পরিশ্রম এই দুটি
জিনিসকে হৃদ্‌রোগ থেকে বাঁচবার প্রধান
উপায় বলে বর্ণনা করেছেন। অত্যধিক
আহার, গুরুপাক স্নেহজাতীয় খাদ্য, এসব
এড়িয়ে চলে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে, ও
বেড়ালে হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা হয়ত কিছু
কমবে। কিন্তু তবু এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন
ওঠে। যেমন ধরুন আগেকার দিনে, বিশেষ
করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের
খাদ্যাভ্যাস এখনকার মতই ছিল, বরং লোকে
ভাল ঘি শস্তায় পেত এবং বেশি খেত।
খাইয়ে লোকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু
হৃদ্‌রোগের আধিক্য তো তখন ছিল না।
তারপর ধরুন বাড়ির মেয়েরা কতটুকু
বেড়াবার বা ব্যায়াম করবার সুযোগ পান?
কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে হৃদ্‌রোগের দৃষ্টান্ত
এত বিরল কেন? এই সব প্রশ্নের কোন
জবাব আমরা পাই নি। মোটকথা আগেকার
দিনের সংগে এখনকার দিনের সেই পার্থক্যটা
কোথায় যার দরুন আজকাল এত লোক
হৃদ্‌রোগে সকালে মারা যায়? সেই পার্থক্য
কি আমরা খাদ্যে ভেজালের মধ্যে এবং তার
ফলে মানুষের বিপাক শক্তি যে নষ্ট হয়ে
যাচ্ছে তার মধ্যে খুঁজব এবং তখনকার
তুলনায় মানুষের মনে নানা রকম অশান্তি,
উদ্বেগের আধিক্যের মধ্যে খুঁজব যার ধকল
শেষ পর্যন্ত ঐ বিপাক শক্তির উপর গিয়ে
পড়ে?

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

গোয়া দেখে এলাম

অনিমা গুহ

ইতিহাসের এক চরম ক্ষণে উপস্থিত হয়েছে গোয়া। তার সামনে রয়েছে এক বিরাট প্রশ্ন—ভারতবর্ষের কনিষ্ঠতম এবং ক্ষুদ্রতম রাজ্য হয়েই থাকবে, কি মহারাষ্ট্রের অংশ হবে? অন্যের কাছে সাধারণ হলেও গোয়ানদের কাছে এটা এক জীবনমরণ প্রশ্ন।

"মহারাষ্ট্রের শামিল হলে উন্নতি হয়তো হবে, কিন্তু আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাবে।"

গত দীপাম্বিতার ছুটিতে গোয়ায় বেড়াতে গিয়ে পথে-ঘাটে, বাসে, লঞ্চে অচেনা অনেক গোয়ানকে প্রশ্ন করে প্রায় প্রত্যেকের কাছেই এ ধরনের উত্তর পেয়েছিলাম।

৪৮ কোটি জনসংখ্যার এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে অসংখ্য সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংহতির জন্য দেশটাকে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা উচিত হবে কি? এ প্রশ্নও রয়েছে অন্য দিকে।

গোয়ানদের ভাগ্যপরীক্ষার চূড়ান্ত দিন আগতপ্রায়। তারা নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে নেবে। আমরা নিছক দর্শক মাত্র।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক রমণীয় ঢাল অঞ্চলে সমুদ্রের কোলে এই গোয়া রাজ্য। বোম্বাই শহরের উত্তরে অবস্থিত দমন ও দীউ এ রাজ্যের অন্তর্গত। আয়তন মোট ১.৩৯৪ বর্গমাইল। গোয়াতে এসেই মনে হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও এসেছি। পর্তুগীজদের প্রভাব এখনও মুছে যায়নি। এত শীঘ্র যাবেই বা কি করে? ১৫১০ সনে বিজাপুরের সম্রাট আদিল শাহের হাত থেকে গোয়া অধিকার করে নিয়েছিল পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী আলবুকার্ক। তারপর থেকে ১৯৬১ সনের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো সাড়ে চার শ' বৎসর রাজত্ব করেছে পর্তুগীজরা। গোয়ানরা প্রতি বৎসর এ দিনটি গোয়ামুক্তি দিবস হিসেবে পালন করে। ওদিকে লিসবনে এ দিনটি পালিত হয় জাতীয় দুঃখের দিন হিসেবে।

পুনা থেকে বাসে গিয়েছিলাম গোয়ার রাজধানী পানজিমে। আঠার ঘণ্টার একঘেয়ে বাস ভ্রমণের পর এপারে বেতিম থেকে কানায় কানায় ভরা মোণ্ডোভীর নদী মাণ্ডবীর ওপারে পানজিম শহরটিকে মনে হচ্ছিল ছবির মত। কিছু দূরেই রয়েছে আর একটি নদী, জোয়ারী। দুটোই এখানে আরব সাগরে পড়েছে। দুই নদী ও সমুদ্রের কোলে ছড়িয়ে রয়েছে পানজিম ও আশেপাশের কয়েকটি শহরতলি ও পল্লী। গোয়ায় চলাফেরা করলে এই নদী দুটি অনেকবার লঞ্চে পার হতে হয়। আর যেদিকে তাকানো যায়, দেখা যায় শুধু সবুজ পাহাড়, উপত্যকা ও নারকেল গাছের বাগান।

পানজিম ছাড়াও আর কয়েকটি শহর ও গ্রামে গিয়েছিলাম। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই যেমন দেখেছি রাস্তার ধারে 'বার' ও ফ্রক-পরা মহিলাদের, তেমনই দেখেছি প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গির্জা ও যেখানে সেখানে ছড়ানো কাঠের অসংখ্য ক্রুশ। এই ক্রুশের নীচে যীশু ও মা মেরীর মূর্তিকে খৃষ্টান গোয়ানরা প্রতিদিন ফুল ও মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো করে যায়। দোকানের শো-কেসগুলোতে জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশের সঙ্গে রয়েছে রাম, হুইস্কী বিয়ার, জীন ও ব্র্যাণ্ডির বোতল। গোয়ার পথে দেখা মোটরগাড়ি ও সুন্দর সুন্দর বাসগুলো ভারতবর্ষের অন্যত্র সহজে চোখে পড়ে না। এ ছাড়াও অনেক দোকান, হোটেলের উপর এখন পর্যন্ত পর্তুগীজ ভাষায় সাইন বোর্ড টাঙানো। গোয়া কাস্টমস অফিসে এক আত্মীয়ের খোঁজে গিয়েছিলাম। সেদিন নভেম্বর মাসের একটি সোমবার ছিল। অফিসের ক্যালেণ্ডারের পাতায় দেখতে পেলাম নভেম্বরের জায়গায় লেখা 'Novembro' ও সোমবারের জায়গায় 'Sabado'। আলমারীগুলোতেও রয়েছে গাদা গাদা পর্তুগীজ ভাষার বই। শুনেছি, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বড় বড় প্রতিষ্ঠান মিলিটারী অঞ্চল আদি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে যায়নি বলে গোয়ার শেষ পর্তুগীজ গবর্নরকে লিসবনের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে। গোয়ামুক্তির সত্যাগ্রহী ভারতবর্ষের মোহন রানাডে এখনও রয়েছেন লিসবনের কারাগারে।

গোয়ার সাড়ে ছয় লক্ষ জনসংখ্যার শতকরা ৬২ জন হিন্দু, ৩৬ জন খৃষ্টান ও বাকী ২ জন মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের। কোঙ্কনী এখানকার শতকরা ৯৮ জনের মাতৃভাষা। এ ভাষায় নিজস্ব অক্ষর নেই বলে রোমান অক্ষরে লেখার চেষ্টা চলছে। সারা ভারতে সর্বমোট তের লক্ষ লোকের মাতৃভাষা কোঙ্কনী। গোয়ার বাইরে মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের সংলগ্ন অঞ্চলেও এই ভাষা চলতি রয়েছে। সম্প্রতি কোঙ্কনীরা তাঁদের ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁরা আর এ ভাষাকে মারাঠীর উপভাষা বলে স্বীকার করতে চান না। পানজিমে পর্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা চোখে পড়েছিল। ইংরিজী ও কোঙ্কনীতে দৈনিক ও সাপ্তাহিক মিলে, আরও কয়েকটি পত্রিকা দোকানে সাজানো দেখেছিলাম।

গোয়ার সদাহাস্যময় প্রকৃতির মত গোয়ানদের মনও হাসি-খুশী ও আনন্দে ভরা। কিন্তু এঁরা বড় আরামপ্রিয়। সুরাপান করে গান-বাজনা ও আড্ডায় মেতে থাকতে খুব ভালবাসেন। যশ ও ভাগ্যের অন্বেষণে

পুরোনো গোয়ার একটি গীর্জার অভ্যন্তর

তেরশ শতাব্দীর হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন—মহাদেবের মন্দির

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও এপ্রিল মাসে গরমের দিনগুলো বাড়িতে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য গোয়ানদের মন ছটফট করে। মাছের ঝোল-ভাত ও তাল বা কাজুর রসের তৈরী মদ গোয়ানদের প্রিয় খাদ্য। এদের আলাপের প্রথম প্রশ্নই হবে, "নিস্তেম কিতেম খেলেম অ'ইজ"—অর্থাৎ আজ খাবারের সঙ্গে কি মাছ ছিল? সমুদ্রের ধারে বলে এখানে মাছ বেশ সস্তা। এদের রান্নার সুখ্যাতি ভারত জুড়ে। গোয়ানদের অতিথিপরায়ণতা লক্ষণীয়। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে জায়গা সম্বন্ধে ভালভাবে জানা যায় বলে আমরা পথে ঘাটে লোকজনের সঙ্গে যেচে আলাপ করতাম। একদিন অ'গামাইম গাঁয়ে এক অচেনা পরিবারের দোরে দাঁড়িয়েছিলাম। আলাপের পর গৃহিণী মারিয়া সুজা আমাদের সামনে এনেছিলেন সুরার গেলাস—যেমন আমরা চা দিয়ে থাকি। প্রত্যাখ্যান করার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। গোয়ানের বাড়িতে অতিথিকে মদ না খাওয়ান আর বাঙালী বাড়িতে নেমন্তন্ন করে মাছ-মাংস না খাওয়ান একই কথা। কিন্তু আশ্চর্য—অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোয়ার পথে-ঘাটে ঘুরে কখনও মাতাল দেখিনি।

গোয়ার পাবলিক বাসে চড়া আর এক নতুন অভিজ্ঞতা। অবশ্য কলকাতার অফিস টাইমের ভিড়ে যাঁরা বাসে চড়েন, তাঁদের কাছে এটা বিশেষ নতুন নয়। অনভ্যস্তদের পক্ষে দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার আশঙ্কার কিছু নেই। কলকাতার অবশ্য বাসে হাঁস-মুরগী [illegible] হয় না। কিন্তু গোয়ার মানুষ-মুরগী-[illegible] [illegible] বাসের মধ্যে আত্মীয়রা [illegible] আড্ডা। এর সঙ্গে আবার [illegible] চলে যান। একদিন বাসে

এক গোয়ান ভদ্রলোক বললেন, প্রত্যেকেই প্রয়োজনে বাসে চড়ে বলে কেউ এই ভিড়কে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না।

"আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল"—তিনি বললেন।

মারগাঁও থেকে রাত্রের শেষ বাসে কি করে যে সেদিন অক্ষত দেহে পান্‌জিমে ফিরে এসেছিলাম ভাবলে এখন আশ্চর্য মনে হয়।

গোয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকলেও এ'দের অনেকের মন কুসংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। পেশাদার ওঝাদের কদর এখনো রয়েছে। মন্ত্র করে ভূত তাড়িয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করে এরা। ভূত-প্রেত সম্পর্কে গল্পও আছে অনেক। বাদলা দিনে জটলা বেঁধে এসব গল্প শুনতে এ'রা খুব ভালবাসেন। আগেই বলেছি, গোয়ানরা একটু কুঁড়ে। পর্তুগীজ আমলে ছুতোর মিস্ত্রী সবই আসত পর্তুগাল থেকে। গোয়ার ভারতভুক্তির পর ইংরিজীতে অফিসের কাজ-কর্ম চালানোর জন্য ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে অনেক কর্মচারী আমদানি করা হয়েছে। এ ছাড়াও এসেছেন দলে দলে ভাগ্যান্বেষী ব্যবসায়ী। এতে গোয়ানদের অসন্তুষ্টির কথা পথে-ঘাটে থাকা কয়েকটি পোস্টার দেখে বুঝতে পেরেছিলাম।

১৯৬১ সনে কিছু গোয়ান পর্তুগীজদের সঙ্গে ও-দেশে চলে গিয়েছিল অনেক আশা মনে নিয়ে। বর্তমানে তাদের অবস্থা নাকি সুখের নয়। এদিকে দু-চারজন পর্তুগীজ সাহেব স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে পান্‌জিমে সুখেই ঘরকন্না করছে। লোকমুখে শুনলাম—এখানে চোরের শাস্তি হত ভয়ানক। তাই চুরিও হত কম। পান্‌জিমে আল্টিনো পাহাড়ের উপর সেকালের এক গোয়ানের পরিবার প্রাসাদের একটি ঘরে আমরা ছিলাম। অতি প্রাচীন গোয়া সরকারের সম্পত্তি। ওদের চিরে না বলে এত সুন্দর বাড়ির জানালায় নেই গরাদ, দরজায়ও নেই তালা চাবিকাঠি। পুরোনো গোয়ার এক বাইবেলের দোকানদার বললেন, তাঁর দোকানে নাকি রাত্রেও তালা দেওয়া হয় না। এখন কিছু কিছু চুরি হচ্ছে বলে নতুন বাড়ি-গুলোর দরজা জানালা আগেকার মত নয়।

জোয়ারীর মোহানায় আরব সাগরের পারে মার্মাগোয়া ভারতবর্ষের একটি অন্যতম সুরক্ষিত প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। এখান থেকে গোয়ার খনিতে পাওয়া লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে, রপ্তানি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জাহাজে মাল বোঝাই করার ব্যবস্থা ভারত-বর্ষের অন্য বন্দরে নাকি নেই। সব দিক থেকেই বন্দর হিসেবে মার্মাগোয়ার গুরুত্ব আছে।

স্বাধীনতার পর গোয়া সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে। এখানকার খনিতে প্রচুর লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ থাকায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে বহু। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে চাল-আটার কল, তেলের ঘানি, পাওয়ারলুম, হ্যান্ড-লুম, বাঁশ-বেত, টাইল-ইট, কাজুবাদাম ও সাবানের কারখানা। বিদ্যুৎ, যানবাহন ও যোগাযোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর টাকা ব্যয় করছেন। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হোটেল-রেস্তোরাঁর আধুনিকীকরণ হচ্ছে। বেতিম-পান্‌জিমের মাঝখানে মান্দবীর উপর সেতুনির্মাণকার্য দেখে এলাম।

গোয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাতীত। মার্মাগোয়া থেকে জোয়ারী ও আরব সাগরের সঙ্গম দিয়ে ওপারে ডোনা পাওলায় লঞ্চে যাওয়া এক রোমান্টিক অভিজ্ঞতা। না-সমুদ্র, না-নদীর ঢেউয়ের তালে তালে লঞ্চটি এগুচ্ছিল ধীরে ধীরে। ডোনা পাওলার সমুদ্র-ধারে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে শত দুঃখীও বোধ করি মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে যাবে। সম্মুখে আরব সাগর লীন হয়ে গেছে নীলিমায়, এক দিকে জোয়ারী ও অন্য দিকে মান্দবীর মোহানা, পেছনে পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার সবুজ সারি। তার উপর অজস্র নারকেল গাছ তো আছেই। সব মিলিয়ে মনে হয় প্রকৃতি বুঝি তার সব সৌন্দর্য গোয়ায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। ডোনা পাওলার সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর একটি জনমানবহীন পাহাড়ের উপর কাবো রাজনিবাস—গোয়ার লেফটানান্ট গবর্নরের প্রাসাদ ও পাশে তাঁর বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীচন্দ্র বাবলো। এখানে দাঁড়িয়ে আরব সাগরের নীল জল দেখতে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। [illegible] বন্দরে প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও এখন নাকি ভয়ানক বিরক্তি বোধ হয়।

[illegible] একাধিক

সৈকতভূমি আছে। টুরিস্টের সুবিধার জন্য মাপুসা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সবচাইতে সুন্দর কোলাঙ্গুটে বীচে আধুনিক হোটেল রেস্তোরাঁ আদি তৈরী হচ্ছে। গোয়ার কারবারী শহর মারগাঁও থেকেও মাত্র মাইল চারেক দূরের কোলবা আর একটি রমণীয় বীচ। পানাজিম শহরের মধ্যে বলে সকাল সন্ধ্যায় ভিড় হয় মীরামারা বীচে। এ অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যই বুঝি ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়াকে বলা হত 'প্রাচ্যের রানী'।

গোয়ানরা—কি হিন্দু, কি খৃষ্টান—সবাই বড় ধার্মিক। পানাজিম আর মাপুসা শহরের আশেপাশে খৃষ্টানরা সংখ্যাধিক। একটু দূরে হিন্দুরা। তাই গোয়াময় ছড়িয়ে আছে গির্জা ও মন্দির।

কয়েকগুলি গির্জা ও মন্দিরের ভাস্কর্য অপূর্ব। গোড়ার দিকে পর্তুগীজদের রাজধানী ছিল পানাজিম থেকে অল্প দূরে, পুরোনো গোয়ায়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্লেগ হয়ে প্রায় দু লক্ষ লোকের মৃত্যু হওয়ায় সেখান থেকে নোভা গোয়ায় (এখনকার পানাজিম) রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়। পুরোনো গোয়ার চওড়া রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জা ও কেথিড্রালগুলো অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ মানুষের মনকে করে মুগ্ধ, চিত্তকে করে পবিত্র। অনেক ক্যাথলিক গর্ব করে গোয়াকে বলে 'প্রাচ্যের রোম'। সবচাইতে চিত্তাকর্ষক গির্জা হল বোম জীসাস ব্যাসিলিকা। এই গির্জায় কারুকার্যখচিত এক উঁচু বেদীর উপর একটি রূপোর কাসকেটে সংরক্ষিত আছে 'গোয়েনচো সায়েব' (গোয়ার প্রভু)—অর্থাৎ সেন্ট জেভিয়ার্সের নশ্বর দেহ। প্রতি বার বৎসর অন্তর অন্তর দর্শনের জন্য এই কাসকেটের ডালাটি ভক্তদের সামনে খোলা হয়। ব্যাসিলিকার শতাব্দী-পুরোনো দেয়ালগুলির প্রতিটি পাথর তার অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত। ভিতরে বেদী ও দেয়ালে সোনারূপোর করা নানারূপ কারুকার্য। সিলিং থেকে ঝুলছে অনেক ঝাড়লণ্ঠন।

রাস্তার আর এক দিকে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড কেথিড্রেল। ভিতরে আছে চৌদ্দটি চোখ-ঝলসানো বেদী। ১৫১০ সনে আলবুকার্ক এটি তৈরি করেছিলেন। এ ছাড়াও পুরোনো গোয়া জুড়ে রয়েছে আরও গির্জা ও কনভেণ্ট। এখানে ১৫৯৯ সনে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার স্মরণার্থে তৈরী হয় একটি তোরণ (arch)। কার্যভার গ্রহণ করবার পূর্বে প্রতিজন পর্তুগীজ ভাইসরয়কে এর তলা দিয়ে যেতে হত বলে একে Arch of Viceroys বলা হয়। তোরণের কাছেই পাদ্রী-প্রশিক্ষণ স্কুলের সামনে এক গোয়ানের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি আমায় মহোৎসাহে বোঝাতে লাগলেন—"এখানকার লোকেরা আগে গাছ-পাতা, সাপ-ব্যাঙ ভূত-প্রেত ইত্যাদির পুজো করত। জেসুইট পাদ্রীরা এসে এদের চোখ খুলে দিয়েছে।"

হিন্দু মন্দিরের মধ্যে পানাজিম থেকে ১২ মাইল দূরে চার শ' বছরের পুরোনো মঙ্গেশ মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরের উপর পুরোনো গোয়ার গির্জার প্রভাব সুস্পষ্ট। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢুকেই দেখা যায় গির্জার বেল-টাওয়ারের মত উঁচু এক স্তম্ভ। তার উপরে ঝোলানো আছে মন্দিরের ঘণ্টাটি—গীর্জার মতই নীচে থেকে দড়ি টেনে বাজাতে হয়। এ ছাড়া মন্দিরের ভিতরের কারুকার্যও গির্জার অনুকরণে করা হয়েছে। এখানেও সিলিং থেকে ঝুলছে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন। মন্দির ঘিরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ধারে ধারে তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ব্যারাকের মত ঘর। বিখ্যাত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকারের আদিপুরুষেরা এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে শুনতে পেলাম। মঙ্গেশ মন্দির থেকেই হয়তো মঙ্গেশকার পদবী হয়েছে। এ ছাড়া গোয়ার শান্তাদুর্গা, সপ্তকোটেশ্বর ও মহাদেব মন্দির উল্লেখযোগ্য। তের শ' শতাব্দীর হিন্দু স্থাপত্যের একটি সুন্দর উদাহরণ এই মহাদেব মন্দিরটি।

পোন্ডার সফা মসজিদটি ১৫৬০ সনে সম্রাট [illegible] পরে আকবর তৈরি করেন। পুরোনো পাঁচটি মসজিদের মধ্যে এটিই উল্লেখযোগ্য।

পানাজিমের সেক্রেটারিয়েট ভবনটির ইতিহাস বহু পুরোনো। আদিলশাহের সময়কার তৈরি এই ভবনটিতে পরে অনেক অদলবদল করা হয়েছে।

পাঁচ দিন গোয়াবাসের পর আবার বাসে চড়ে ব্যাঙ্গালোরের পথে রওনা হলাম।

দশ বছর পর যদি আবার গোয়াদর্শনের সুযোগ ঘটে তা হলে হয়তো দেখব এখান থেকে পর্তুগীজদের প্রভাব একেবারে মুছে গেছে। তখন গোয়াকে ভারতবর্ষের আর দশটা জায়গার মতই মনে হবে। রাস্তার পাশে বার (Bar)গুলো হয়তো নিরামিষ চায়ের দোকানে রূপান্তরিত হবে, হোটেল-দোকানের উপর পর্তুগীজ ভাষায় লেখা সাইন-বোর্ডগুলি আর থাকবে না। তবে সেগুলো দেবনাগরীতেই লেখা হবে কিনা, এখনও বলা যায় না। রোমান হরফে লেখা স্থানীয় ভাষা কোঙ্কনীকে সিন্ধী ভাষার মতই নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া হোক—এই দাবি গোয়া ও বাইরের কোঙ্কনীরা ইতিমধ্যে তুলেছে।

ত্রিলোচন কলমচি

A. I. R. Raid

একটি সংস্কৃত শ্লোকে ডিফেন্সের প্র্যাকটিক্যাল থিওরি পড়েছিলাম বাল্যকালে। তাতে শকটবাজী ও শৃঙ্গধারীর কাছ থেকে কত হাত তফাতে থাকতে হবে তার নিখুঁত উপদেশ ছিল, ছিল না শুধু বেতারের সম্বন্ধে কোনো কথা। এর একটিই কারণ মনে হয়, তখনো বেতাররূপী মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। ইন্দ্র-শটগান টেলিফোন এবং শব্দাতিরবকস্ রেডিও যন্ত্রের যন্ত্রণায় আমি যখন ঘর এবং ঘরণী ফেলে ফেরার হবো কিনা ভাবছি তখন আমার জনৈক বেতার-কাতর বন্ধু একটি খসড়া পরামর্শ দিল। তার বক্তব্য, বাড়িতে বাড়িতে ঘরোয়া আন্দোলন চালিয়ে যদি এক একটি "এয়ার রেড" শেল্টার গড়ে তোলা যায় তা হলে আঠার ঘণ্টা A. I. R. আক্রমণ থেকে আমরা কানে-প্রাণে বাঁচতে পারি। যখন খুশি ঘুমোনো এবং যখন খুশি তন্ময় হয়ে বই পড়ায় কিংবা লেখায় তখন আর বাধা থাকবে না। জিরো আওয়ার অবধি জেগে জেগে ইনসমনিয়া আর ডিসপেপ্-সিয়ার শিকার হতে হবে না।

বন্ধুর পরামর্শে উৎসাহ বোধ করলাম না। কারণ, প্ল্যান সব সময়ই চমৎকার কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ঘণ্টা বাঁধার লোকের চিরকালই অভাব ঘটে থাকে। ঘরে ঘরে পুত্রকলত্র আছে এবং ঘরে ঘরে রেডিও আছে যখন তখন রেডিও Nob-পীশের দল হাতের আন্দাজে মুহুর্মুহু স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াবে তাতেও সন্দেহ কি! এবং ফলত নানাবিধ শিস্-শীৎকার আর ব্রোকেন ভয়েস-ডাস্ট টিউন পাঞ্চ হয়ে একটি বিচিত্র লোমহর্ষক শব্দতরঙ্গ উপরি পাওনা হবেই। যে গৃহিণী চুল বাঁধেন এবং যে গৃহিণী উল্ বোনেন, আস্বামী রঞ্জন বাঁধাকপির রাশিয়ান স্যালাড আর অ্যামেরিকান কাঁকড়ার করিত-কোর্মায় যিনি অনুরাগীণি, তাঁদের ঠেকাবে কে? আমাদের ঘরে-বাইরে রেডিওর অবদানও তো নেহাত কম নয়, আমি দুর্মুখ ত্রিলোচন কলমচি যতই নিন্দামন্দ করি না কেন তাতে তার কিছু এসে যাবে না। রান্না থেকে কান্নায়, মেড ইজি থেকে ম্যাজিকে সে জনতাকে নিয়ে যাবে। ঘরে ঘরে টোল খুলবে, টিউটোরিয়াল হোম বসাবে, পরিকল্পিত পরিবারে লুপছোলের সন্ধান দেবে, ভর্তাহর ভৃত্যের মার্কেট নষ্ট করে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাজারদর ধরিয়ে দেবে। প্রখর গ্রীষ্ম দুপুরে বাদলধারার গান, বাদল-দিনে বসন্ত-সংগীত, রম্য-অরম্য, সুগম-দুর্গম, সুবোধ্য-দুর্বোধ্য সকল রকম শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় সঙ্গীত সে পরিবেশন করে যাবেই। এ ছাড়াও কত ফিচার, কত মহল, কত আসর। একই গান অবলীলায় একই দিনের সকালে বিকালে আপনি শুনতে পাবেন। পাছে একঘেয়ে হয়ে যায়, সেজন্যে আবার একই গান দু সুরে গাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ফ্লাইং আওয়ার্স-এর মাঝখানে কোনো ফাঁক-ফোকর নেই। আগে গুটি দুই এয়ার পকেট ছিল, এমার্জেন্সির সময় থেকেই তাও পিকপকেট হয়ে গেছে। এখন বাকি শুধু ছ-টি ঘণ্টা, এই সিকস ভার্জিন আওয়ার্স-ও আশা করি শীঘ্রই বেতার-কোতল হবে। এবং তা হলে রেডিও ইনসমনিয়ায় ভুগন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিও কথায় গানে কসরতে ভরে উঠবে। সুতরাং রেডিও কেন বাধ্যতে।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের পাদপীঠ রেডিও, খবরের কাগজের ভাষায়, আজ সর্বাধিক প্রচারিত। যেখানে বিজলিবাতি এবং খবরের কাগজ পৌঁছায় না সেখানেও ব্যাটারি-সেট রেডিও পৌঁছায়। বিড়ির দোকান আর মোটর গাড়ি দুরস্থান, এখন জেলের নৌকো মোষের গাড়ি কিংবা ফসল প্রহরী চাষার মাচায়ও রেডিও বাজছে। একটি হাসপাতালের মর্গে ট্রানজিসটর বাজতে শুনে আমি শিউরে উঠেছিলাম। সেই কোল্ড স্টোরের ভেল্টের মধ্যে পায়ে টিকেট বেঁধে যেসব পি এম আর ডব্লিউ পি এম বডিরা বিবস্ত্র হয়ে ঘুমোচ্ছে তাদেরও যে মনোরঞ্জনের প্রয়োজন আছে ভাবতে পারিনি।

এয়ার রেড

রেডিও শুধু আমাদের কান নয়, সে আমাদের চোখও বটে। সে আমাদের কেবল লম্বকর্ণই করেনি, চক্ষুদানও করেছে। এই শীতের মরসুমে সেটা বোঝা যায় ভালো করে। টেস্ট ম্যাচের টিকেটের জন্য সমস্ত বাংলা দেশ যখন প্রায় সন্ত্রাস-বাদীর মত হয়ে উঠেছে, কলকাতার ক্লাবের ব্যক্তিরা প্রতিটি সিক্রেট সোর্স ট্যাপ করে বেড়াচ্ছেন, প্যাভিলিয়নে নিকটবর্তী হবার জন্যে যখন রেডিও-ডাক্তার-প্রেস-বক্সে ছোকরা ডাক্তার, জুনিয়ার ক্যামেরাম্যান আর বার্তা-নবিস, সিনিয়রদের পশ্চাদ্দেশে স্টিকিং প্লাস্টারের মত সেঁটে রয়েছেন, তেহেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে রেডিওর দোকানে জানাশোনা লোকের ধর্না। ফর টেস্ট একটা রেডিও সেট দাও না ভাই, ট্রানজিস্টর হলেই ভাল হয়।

অন্যথায় বাড়ির নবীনাদের তপস্বিনীর দশা। আহারে অরুচি, পশমের গুটি নিষ্প্রাণ। ল্যাট্রিন বৈঠকে কর্তার লাইভ সিটিং চার্মলেস। এহেন দিনে মাঠের দুঃখ খাটে বসেই মেটাতে হবে। রেডিও থাকলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, মূকও বাচাল হয়ে ওঠে। মনশ্চক্ষে বাংলা কথকতা শুনতে শুনতে উলের কাঁটা চলবে দ্রুত লয়ে, প্রাইভেট কেরিয়ারের মত ঠাসা টিফিন কৌটো আর দুধ কফি চায়ের ফ্লাস্ক দেখতে দেখতে স্টাম্প আউট। কর্তা এল বি ডব্লিউ হয়েছেন বাথরুমের অন্দর মহলে, মুচাক ফাঁক কপাটের এপাশে অভিনব নৃত্যের ভঙ্গিমায় ভৃত্যবর কাঁধে ট্রানজিস্টর নিয়ে

মাঠের কাঁদুনে গ্যাসে গৃহে প্রতিক্রিয়া

তর্জনীর মত অনড়। অপারেটিং টেবলে তরুণী পেশেন্ট অ্যানাস্থেটিস্টকে করুণ মিনতি জানাচ্ছে। আর এক মিনিট ডাক্তার-বাবু, রান সংখ্যাটি শুনে নিই, তাপর— ঘরে ঘরে উল বুনতে বুনতে চোখ মুছতে লেগেছেন ঘরনীরা, মাঠের কাঁদুনে গ্যাসে গৃহস্থ প্রতিক্রিয়া।

আমার ভাগ্নী মিঠু তার শৈশবদশায় একদা রেডিওর গান শুনে কেঁদে আকুল হয়েছিলঃ 'মামা আমি রেডিওর মধ্যে ঢুকবো', তোরণপ্রমাণ রেডিও ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢুকে সে গান গাইতে চায় কিন্তু ঢোকার পথ জানে না।

আমিও যে খুব জানি তা নয়, কিন্তু অনেক কবি গায়কই আমাকে শুধিয়েছেন সুলুক-সন্ধান। তাঁদের মতে, ক্যামেরার মতই রেডিওতেও নাকি ক্লিক আছে। উঁচু হাতের টীকা, টিপ্পনী ছাড়া নিদর্শীর তরুণ-তরুণীর নাকি অডিশন দেওয়াই সার হয়। অতশত আমি জানি না, শুধু প্রোগ্রামে চোখ বুলোলে, অনেক নাম ঘন ঘন দেখি, কোনো কোনো নাম অনেক দিন দেখি না। এর তাৎপর্য বুঝি না, তবে গুণ-গত বিচারে এগুলো সব সময় ঘটে না, তা বুঝি। নইলে খ্যারখেরে মাঞ্জা দেওয়া গলায় ভুল সুরে রবীন্দ্রসংগীত এবং সাথ, অমুর ধরো ধরো ঢঙে অত্যাধুনিক গান, আড়ষ্ট-জড়িত গলায় পল্লীগীতি এ সব শুনতে পেতাম না। আরো অনেক আজব কণ্ঠ শুনতে পাই, তাঁরা কোকিল কি চড়ুই কোন্ চিঁড়িয়া জানি না, কোন ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী না জেনেও বলতে পারি তাঁরা আকাশবাণীর বাক্‌দত্তা কেউ হবেন [illegible] যেমন রূপদান, মঞ্চ দেহদান, মাইকে [illegible] বাক্‌দান]। এ ছাড়াও শিশুপাঠ্য ইতিহাস দুলে দুলে পড়ার মত বাংলা খবর পাঠিকা, অমৃতভাষী ঘোষক এবং [illegible] পরিচালক দিনের পর দিন কিসের জোরে চালিয়ে যাচ্ছেন জানি না।

ইডেন গার্ডেনের উত্তর-পূবে [illegible] মনোহর বাগানবাড়ির সশস্ত্র ফটকে এসে দাঁড়ালাম। মনে পড়লো সেই লাইনটা, কেউ বা মেতেছে গানে, কেউ বাগানে। [illegible] অবশ্য নেই, থাকলেও সেটা পাঁচিলের ওপিঠে অদৃশ্য এবং অন্য চৌহদ্দি। সেখানে আজ চূড়ামণি যোগ, হাজার হাজার লোক কিউ বাঁধিয়েছে। গোটা মাঠটাই এখন জেনসন নিকলসন আর জি সি লাহা, অম্বেল আর ওয়াটার কালারে মাখামাখি। স্কেচবুকের সেফটি ক্যাচ, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মালটিপারপাস স্টাডি। এই শীতের দুপুরে এত বড় আউটডোর উল-হাউস বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

যাক সে কথা, রিসেপশনিস্টের কাউন্টার আর ডিউটিরুম বাঁয়ে রেখে ডান দিকে একটি ঘরে উঁকি দিলাম। সাক্ষাতার্থী এবং প্রার্থীদের সেখানে একঘরে করে রাখা হয়েছে। তারা সোফায় চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে ইনিসিয়াল সিগনেচারের মত বসে আছে। কিন্তু এ কি! ওপরের অফিসঘর-গুলির মত এখানেও এই দুপুরে বিকেল পাঁচ বেজেছে। প্রকাশ্যে বারোটা বাজলেই যেখানে সাজেসটিভ হত সেখানে এ কি ব্যাপার! সরকারী অনেক অফিসে হলেও শেষ পর্যন্ত রেডিও অফিসে এটা আশা করিনি। কারণ, রেডিও মানেই ঘড়ি এবং ঘড়ি মানেই

আকাশবাণীর বাকদত্তা

রেডিও, মানে ঘড়ি মেলাবার জন্যেই তো রেডিও।

করিডোর দিয়ে ক্যাণ্টিনের দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কোত্থেকে হাতা গুটোন শার্ট পরা জীবন্ত দৈববাণীর মত যেন দেব-দুলাল নেমে এলেন, সঙ্গে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কুত্তা। পাটকেলী রং, নাম শুনলাম লালু, জ্বলজ্বলে চোখে জল্লাদের মত খাড়াই মূর্তি অ্যানাউন্সারের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ক্যাণ্টিনে পৌঁছেই ভদ্রলোক হাঁক দিলেন, কই ম্যানেজার, একে কিছু দিতে বলুন—

কাঠের টেবিলে ম্যানেজার পয়সা ঠুকে বললেন, ওরে কে আছিস, ব্যানার্জিবাবুর ডগ বিস্কুট দে—

লালু অবশ্য নো ম্যানস্ ডগ। সে কারো নিজস্ব নয়। কমিক্রোকের অলিতে গলিতে থাকে, কাউকে ক্যাণ্টিনমুখী হতে দেখলেই সঙ্গী হয়।

বসে বসে মানুষ দেখছিলাম। গুটি গুটি এলেন অনেকেই। এলেন আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান, এলেন [illegible] দিতা, মেয়ে নাকি অভিনয় দিতে এসেছে। বেহালার সঙ্গে [illegible] এলেন [illegible], সুর-কারের [illegible] মত জন-দুই [illegible] আমার

সাইজের বেঁটে সাহিত্যিকও ঘুরে গেলেন বার দুই।

অনেক কথাই জানতে পারলাম এখানে বসে। গার্স্টিন প্লেস থেকে ইডেন গার্ডেনস্-এ উঠে আসার পরের অনেক রূপান্তর। ১৯৫৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটেছে, ঘটছে। স্টুডিও হয়েছে চোদ্দটি, তার তেরটিতেই কাজ চলছে, একটি বাদে। সেটি ডিফেকটিভ। এয়ার কণ্ডিশনের খাস যন্তর তার গায়ে বসানো, ফলে শব্দ আসে। ঘোষক-ঘোষিকার সংখ্যা সামান্য বেড়েছে, এখন নয় দশজন, জন পনের হলে নাকি ভালো হত।

একদিন, যখন বলা হত ও'র আজ রেডিও সিটিং আছে। তখন লাইভ ব্রডকাস্ট হত, জ্যান্ত মাইকের সামনে বসতে হত সত্যি সত্যিই। আজ তার বদলে বলা ভালো, ও'র আজ হিয়ারিং আছে অমুক অমুক অমুক সময়। অর্থাৎ সেই সময় আমরাও যেমন শ্রোতা তিনিও তেমনি। টেপ রেকর্ডের ট্র্যাপে সবাই আজ আকণ্ঠ বাঁধা। বাঁধা আর্টিস্ট বোধ হয় একেই বলে। তা মন্দ নয়, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ডাঁই করা বাসন মাজার মত গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার প্রয়োজন নেই। অনেক রিস্ক এতে কভার হবার কথা, প্রোগ্রাম সুন্দর এবং ত্রুটিহীন হবার কথা। বারে বারে ভাজা মাছ উল্টে দেবার মত গানের এপিঠে ওপিঠে অ্যানাউন্স করার প্রয়োজন নেই। ঠিক সময়টিতে নাচার শিল্পীকে থামাবারও প্রয়োজন নেই। আপাদমস্তক টেপ করা আছে। এডিট করে, ইরেজ করে, টাইমিং করে। শুধু তুমি ঘানিতে জুতে দাও; সুইচ অন করে

জীবন্ত দৈববাণীর মত যেন দেব-দুলাল নেমে এলেন

পনের মিনিট আর ঘণ্টা ঘুরে এলো। তবে হ্যাঁ, একটি ভয় আছে, টেপের কণ্ডিশন খারাপ থাকলে, যে-কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। অবিশ্যি, তখন টেকনিশিয়ান থাকলে তিনি ধরতাই দিয়ে দিতে পারেন। অন্যথায় যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কথাও বলা যেতে পারে।

একবার হয়েছিল কি শুনুন, সত্যি ঘটনা। সত্তে বারোটার রেকর্ডের কাণ্ডিকা বাজাতে বাজাতে প্রথম রেকর্ডটি তৃতীয় দফায় ডিস্কে তুলে দিয়ে বাদিকা পাশের ঘরে নিরিবিলিতে গল্পগাছা করতে গেছেন। এমন সময় ডিউটি রুম থেকে ইনচার্জ ছুটে এসেছেন হাঁ হাঁ করে, কিন্তু ততক্ষণ হয়ে গেছে যা হবার।

অবশ্য ইদানীং অ্যানাউন্সারদের খেলার কমেছে। কিন্তু বিকেলের পর থেকেই স্টুডিও রুম খাঁ খাঁ করে। ডিরেক্টরদের বিকল্পে নীরস টেপের ঘূর্ণি চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়। এই নির্জন অজ্ঞাতবাস কার ভালো লাগে বলুন।

এখানেই জানতে পারলাম, গল্পের মধ্যেও অ্যানাসিনের বড়ি আপনি গিলতে পারবেন না, আর লণ্ঠন স্বচ্ছন্দে জ্বালাতে পারেন কিন্তু হ্যারিকেন নৈব নৈব চ। কোনো জীবিত মানুষের নাম কিংবা কোনো কোম্পানীর (মৃত হলেও, হ্যারিকেন কোম্পানীর মত) উল্লেখ করা চলবে না। কারণ তাতে নাকি পাবলিসিটি এবং প্রোপাগাণ্ডা হয়। তাই কোনো যন্ত্র-কর্তার নির্দেশে একদা একটি কবিতা থেকে চাইনীজ ইঙ্ক মুছতে এবং রাইট হাউস নেবাতে হয়েছিল। অ্যামবাসাডার আটক হয়েছিল নাটকে। আজকাল বুঝি আকাশ-বাণীর কাস্টমস অফিসারদের সে কার্পণ্য নেই, যার পণ্যই হোক বোধ হয় সবই চলে যায়। না গেলেও এবার যাবে। বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা নাকি সত্বরই হবে। অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায় বললে, বেসরকারী বিজ্ঞাপন এবার থেকে হাওয়ায় ভেসে আসবে। কারণ, অন্তত ৬ কোটি টাকা বছরে আপাতত বিজ্ঞাপনের পণ মিলবে।

সুধীনের কবিতা। সমীর মুখোপাধ্যায়

সেই স্বল্প আলোকিত, সদা মুখর, কল্লোলিত কফিহাউসে বসে দু' হাতের গর্তে মুখ রেখে বিভাস বলল 'সাতটা বাজে। এবার উঠতে হয়।'

মেজাজ এতক্ষণ ঠিক ছিলো সুধীনের। বিভাসের এই কথায় হঠাৎ সে গরম হয়ে উঠলো।

'উঠতে হবে?'

'হ্যাঁ। সাতটা বাজতে পাঁচ।'

'সাতটা বাজতে পাঁচ?'

'হ্যাঁ। উঠি।'

'উঠি?'

'বারে, উঠতে হবে না? আমার যে আবার সাড়ে সাতটায় পার্ট-টাইম একটা কাজ। ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমে।'

'ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমে?'

'হ্যাঁ। পার্ট টাইম।'

'পার্টটাইম?'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুধীনের হাতের প্রচণ্ড ঘুষিটা টাইম-বোমার মত টেবিলে ফেটে পড়লো। ঝনঝন শব্দে সঙ্গে সঙ্গে দুটি শূন্য পেয়ালা আর দুটি ডিস ভেঙে পড়লো মেঝেতে।

সমস্ত কফি হাউস সচকিত হয়ে উঠলো।

'শালা, মাল খেয়ে এসেছে আবার।'

'এসব হইচইয়ের অর্থ পরিষ্কার। নাম কেনার ইচ্ছে।'

'না না। ওসব কিছুই নয়। কিন্তু কবিতায় লেখে শুয়োরের বাচ্ছা।'

'ও অ্যাংরি?'

'না না। ওসব কিছু নয়। কিন্তু কবিতায় লেখে শুয়োরের বাচ্ছা।'

'কিছুদিন আগে কম্যুনিস্ট ছিলো না?'

'ইউ এস আই এস এ গিয়ে বসতো না?'

'না না। ওসব কিছুই না। কিন্তু কবিতায় লেখে শুয়োরের বাচ্ছা।'

প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও তারপর দ্রুত ধাতস্থ হয়ে বিভাস চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনে দু' হাত প্রসারিত করে বলল 'বি অ্যাট ইজ। বি অ্যাট ইজ। এমন কিছু হয় নি। এসব একটু-আধটু হয়। কবিদেরই হয়। প্রকৃত, সৎ কবির। বি অ্যাট ইজ।'

খাকি উর্দি চড়ানো তক্‌মাধারী বেয়ারা ট্রে হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে বিভাস তাড়াতাড়ি একটা পাঁচ টাকার নোট ধরে দিয়ে সুধীনকে বলল 'চলো।'

চারিদিকের এত গোলমাল, কাপডিস ভেঙে যাবার ঝনঝন শব্দ, টিটকিরি, মন্তব্য, তক্‌মাধারীর আগমন—এসব তুমুল উত্তেজনার ফেনার ভেতর একমুখ দাড়ির জঙ্গলে মুখের রহস্য লুকিয়ে চুপচাপ সংহত হয়ে বসে সুধীন ভাবতে চেষ্টা করছিলো হঠাৎ সে বিভাসের ওপর চটে উঠলো কেন?

কিছুক্ষণ আগে বাইরে দিব্যি চায়ের দোকান—ভিতরে ঘুপচি মতন অন্ধকার জায়গায় পানশালা—এমন একটি দোকান

...কে যেন খানিক তিপি হেঁটে এসেছিলো ঠিক। কিন্তু সেটা আবার করে না কোন্‌দিন? আর, এমন কি ঘটেলো যার জন্যে এই আকস্মিক বিস্ফোরণ? তাছাড়া, কতদিন পর পুরোনো বন্ধুর সংগে দেখা হল। বন্ধু অনেকেই হয় এমন বন্ধু হয় না কখনো। তার সংগেই দেখা অথচ এমন একটা কান্ড করলো সুধীন কেন যে, কেন যে!

যতই খ‌ুজে পাচ্ছিল না কারণ ততই রাগে টগবগ করে ফুটছিলো।
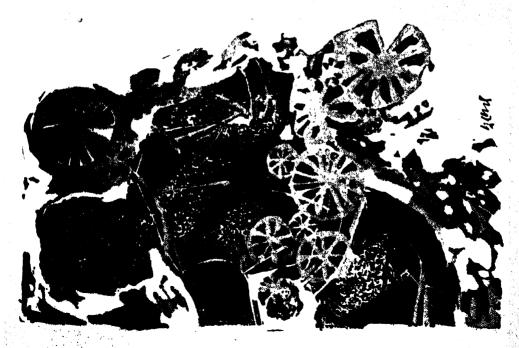
'চলো' বলতেই উঠে পড়লো সুধীন। ঠিক আছে, বাইরেই এর মোকাবিলা হবে। বিভাসকে দেখামাত্র রক্তে তার এত কোলাহল হল কেন? এত শুধু অ্যালকোহলের মহিমা নয়। কি হতে পারে? বিভাস তার বন্ধু, খুব উপকারী বন্ধু, তবু মনে হচ্ছে ও যদি এই মুহূর্তে একটা পাথরের স্ট্যাচু হত তাহলে একটি আঘাতে ওকে ও ভেঙে চুরমার করতো। ওকে সহ্য হচ্ছে না। রক্ত কোলাহল করছে।

'আকার ঠিক শুয়োরের মত চেহারা।'

'শুয়োর অ্যান্ড কবি।'

'উড়ন্ত সোনালী দাড়ির দেবদূত।'

'কবিদের আর জন্মের ওপর ওর বোধ হয় আক্রোশ আছে।'

'না না। ওসব কিছুই নয়। কিন্তু কবিদের দেখে শুয়োরের বাচ্চা।'

পেছনে এইরকম একটা দুর্বোধ্য 'ইমেজ' সৃষ্টি করে সুধীন সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে নামলো।

একটা কিছু ভালো লেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে সুধীন। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। মগজের ভেতর কামড়ে ধরেছে সেই জোঁকটা। ছাড়তে চাইছে না। মাঝে ত বহুদিন লেখার ইচ্ছে পর্যন্ত হয় নি। তখন ভীষণ ভয় হত। মনে হত আমি বড় একা। বড় অসহায়। কবিতাই এতদিন ধরে তার ক্লান্তি আর অবসাদকে দূর করে এসেছে। তার দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রেখেছে। কবিতার সংবিধান ভংগ করে সে কখনো কিছু করে নি। বিনা প্রতিবাদে তার নির্দেশ আনন্দের সংগে মেনে সুস্থ ফুসফুসে অক্ষরের মিছিল সাজিয়ে গেছে। তারপর কখন দিন এসেছে কালো। হঠাৎ মস্তিষ্কে সার্কুলার জারী হয়ে গেছে, তুমি অতঃপর বিতাড়িত। জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। বিক্ষোভ আর বিভীষিকার মাঝখানে পড়ে সেই প্রথম সে মদ ধরলো। স্নায়বিক উত্তেজনায় সুধীনের যেন মনে হল সে মাইক হাতে হল-ভর্তি অপেক্ষমান বিশ্ববাসীকে বলতে পারে, শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন বন্ধুগণ। পৃথিবীতে আবার কবিতা আসছে।

কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনগুলি আজো চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কবিতা লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তার বদলে খবরের কাগজের পাতা সে ফিচার আর্টিকেল দিয়ে ভরিয়ে তুলছে। সে প্রায় একটা স্বপ্ন দেখত। তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। পশ্চিমের আকাশে এক ফোঁটা রক্ত নেই। কোথাকার অজ পাড়াগাঁয়ের একটা ছোট্ট স্টেশন। কারা সব যেন তাকে বিদায় দিতে এসেছে। সুধীন দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে গাড়ির পাদানিতে। সকলে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরলো কেউ কেউ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো একটি যুবতী যার সুন্দর, আয়ত, কটাক্ষ-পাতা চোখ।

কালো ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তখন ট্রেনটা চলে গেছে।

আজকে, হয়তো... সুধীনের মনে ... কিন্তু ... বন্ধু, বিশেষ,

সন্দেহের মধ্যে পা ডুবিয়েও সুধীন অবাক হয়ে এক এক দিন আবিষ্কার করে, এত করেও কবিতা লেখার মন তার আজো একেবারে বিষাক্ত হয় নি।

কিন্তু আলো কোথায়? কোথায় আলো?

ঠিক বারো বছর আগে তার কাকা একদিন বলেছিলো 'ওসব লেখালেখি ছেড়ে দাও। তোমাদের লেখা মাতালের হাসি ছাড়া আর কিছু নয়। ও বৃথা রসে সময় নষ্ট না করে কাল রাত সাতটার সময় ফ্যাকটরীতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কনফিডেন্সিয়াল কাজের জন্যে আমাকে কাল রাত দশটা পর্যন্ত ফ্যাকটরীতে থাকতে হবে। বড়সাহেব আসবেন সাতটায়। ওখানে আলাপ করিয়ে দেব। কোয়ালিফিকেশন আছে আর যখন তোমার পাশে আমি আছি চাকরি তখন তোমার আটকাবে না।'

বারো বছর আগে সুধীন আর এমন কি লিখতো?

কৌতুকের সঙ্গে আত্মীয়তা-সাহিত্য নিজের ম্যাগাজিনের সাহসী দু'চারটি পংক্তি ছাড়া?

এইটুকুমাত্র সম্বল নিয়ে বারো বছর আগে সেই বিদ্রোহী তরুণ সেদিন অতিসাধারণ কাকার মেদস্ফীত মুখের সামনে পুঁজি ভরা পিচ্ছিল তুলে ধরেছিলো।

'আমি বুদ্ধি কখনো বিক্রি করবো না।'

'তোমাকে পশ্চিম জর্মানী পাঠাবো। ওখান থেকে ঘুরে আসতে পারলে রাতারাতি উঁচু পোস্ট।' প্লিমাউথের দরজায় হেলান দিয়ে পাইপ ঠুকে ঠুকে কাকা তার খুব নিশ্চিত, আপনজন হতে চাইলো।

বাতাসে হেলান দিয়ে সেদিন বিদ্রোহী তরুণ বলেছিলো 'আমি যে পোস্টে উঠতে চাই তার থেকে উঁচু নয়।'

'তোমার আবার কি পোস্ট? কবিতা? ও তো গোলপোস্ট। গোল খাবার জায়গা। ওসব ছেড়ে প্র্যাকটিক্যাল হও। কাল সাতটায় পাংচুয়ালি, মনে থাকবে?'

'আমি বুদ্ধি কখনো বিক্রি করবো না।'

'দেন গো টু হেল।' কাকা প্লিমাউথের দরজা সজোরে ভেজিয়ে দিয়েছিলেন। তা নয় হল, সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সুধীন কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বারো বছরের পুরোনো চিন্তা ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে আজ, এখন, কেন উঠে এসেছে? আজকে অনেক দিনের পর লেখবার মারাত্মক ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি যদি একখানা যেমন তেমন কাগজ পাই। হুড়মুড় করে যা খুশী তাই খানিকটা লিখে একটু শান্তি পাই। কিন্তু এই মুহূর্তে, আলো জ্বলে ওঠার এই আশ্চর্য ক্ষণে, মৃত বারো বছর তার একখানা এই শুকনো হাড় পাঠালো কেন? বিভাসের ওপর তার রাগ এত প্রচণ্ড হচ্ছে কেন? কেন ওর গায়ে, সারা শরীরে থুতু থুতু ফেলতে ইচ্ছে করছে?

'এই যে পয়গম্বর। আজ ত ছাড়া হবে না।' বলেই ভবতোষ জামার আস্তিন গোটালো। বিভাস ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে বলল 'এটা ত ঠিক ইয়ারকির মত লাগছে না, ভবো। ইয়ারকির বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই।'

বিভাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ভবতোষ সুধীনের দিকে ঘুঁষি বাগিয়ে বলল 'কি হে লাল টেরেলিন গলিয়ে ত পালালে। বলে গেলে কাল দিয়ে যাবে। তখনই জানলাম ওটা হাত ছাড়া হল। তোমার কীর্তি কাহিনীর সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিলো। তোমার কীর্তিগুলি প্রায় পুরাকীর্তির মতন বিখ্যাত কিনা। কিন্তু বেশি বকবক করবার সময় নেই। আসল কথাটা বলি। কাল চলে যাবার সময় শালা আমার মনিব্যাগটা পর্যন্ত হাতিয়ে গেলে?

বিভাস তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন, বিপন্ন মুখে বলল 'তাই কখনো হয়? ওসব ও করতে যাবে কেন? ভবো, এতটা বাড়াবাড়ি করো না। টেরেলিন, ফেরেলিন ও নিতে পারে তা বলে মনিব্যাগ—'

তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে ঘুরে তাকালো সুধীন বিভাসের দিকে। সেই তীব্র উলঙ্গ ঘৃণার আগুন বিভাস সহ্য করতে পারলো না। মুখ ফেরালো দারুণ অস্বস্তিতে। ভবতোষকে তবু সহ্য করা যায় কিন্তু এই নপুংসক ভদ্রলোক যিনি কবিতার সমজদারও হতে চান অথচ সাতটা বাজতেই পার্ট-টাইম কাজের খোঁজে ছোটে, নিজে মাতাল হয় না, মদ খায় না, কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যদি কেউ কাপ, ডিস ভেঙে ফেলে তবে সমস্ত নিয়ে দেবার মত বদান্য যে হতে পারে তাকে ত এক মুহূর্ত আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

প্রচণ্ড জোরে সুধীন ধমক দিলো বিভাসকে 'বিভাস, তুই থাম। ফোপর দালালি করিস না।' তারপর ভবতোষের দিকে ফিরে গম্ভীর ভাবে সুধীন বলল 'উপায় ছিলো না না নিয়ে। তুই চাইলে দিতিস না। কেননা তুই আমাকে চিনিস। আমি টাকা ফেরত দিতাম না। অথচ টাকাটা তখন আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যাপারটা নিশ্চয় তুই বুঝতে পেরেছিস। তোর মনিব্যাগ হারালে তোর কষ্ট হবে। কিন্তু সেদিন তোর মনিব্যাগ না পেলে আমি না খেয়ে মরতুম।'

'শালা, শখের বোহেমিয়ান, পিওর অ্যান্ড সিম্পল!' দড়াম করে অব্যর্থ লক্ষ্যে ভবতোষ একটি মোক্ষম রদ্দা চালিয়ে সুধীনকে ধরাশায়ী করে তীব্র আলোয় অন্তর্ধান করলো।

অতিকষ্টে সুধীনকে রাস্তা থেকে তুলল বিভাস। না। আজ আর তার কাজে যাওয়া হল না। কফি হাউসে না এসেও পারে না। ভালো না লেগেও পারে না সুধীনকে। অথচ এই ভালো লাগার জন্য উটকো ঝামেলা জোটে। কিছুতেই জীবনটা ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন হয় না। এ একটা অভিশাপ।

সুধীন যখন টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো

তখন ওর মুখটা রক্তে, কাদায় মাখামাখি। সুধীন সেটা বুঝতে পেরে জামার উল্টো পিঠ দিয়ে মুছতে যাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি বিভাস পকেট থেকে রুমাল বার করে এগিয়ে দিলো।

'দূর' ধাক্কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়ে সুধীন গায়ের শার্টটা মুখের কাছে এনে মুখটা মুছে বলল 'চল। এইভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে যতখানি যাওয়া যায়।'

বিভাস বুঝলো আজ সুধীনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ওর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। এই জন্যে মনে মনে বিষণ্ণ হল বিভাস। 'কিন্তু ট্রাম কি দোষ করলো?' ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বিভাস তাকালো সুধীনের দিকে।

সুধীন ওর দিকে কটকট করে তাকিয়ে বলল 'এত তাড়া কিসের?'

এই কথাতে বিভাসের ফর্সা, গোলগাল, পুরন্ত মুখটা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠলো। একটু সামলে নিয়ে বিভাস একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলতে চলতে বলল 'না। এমনি বলছিলাম। বাড়ি গেলে হত।'

'বাড়ি যাবি? বাড়িতে তোর কিসের আজ রাজ্যপাট?'

বিভাস আবার একটু বিব্রত হয়ে উঠলো। ফর্সা, গোলগাল, পুরন্ত মুখটা রক্তে ভরে গেল। কোনক্রমে সামলে নিয়ে বিভাস বলল 'বাড়িতে রাজ্যপাট না থাকলে বুঝি তোদের শাস্ত্রে বাড়ি যাওয়া নিষেধ? কবিতা এমন আইন জারী করে দিয়েছে নাকি? তুই বাড়ি যাস না?'

বিভাসের অন্য কথাগুলি সুধীন শোনে নি। ও একমনে পথ হাঁটছিলো তখন। শুধু শেষের কথাটি কানে গেছে 'তুই বাড়ি যাস না?'

সুধীনের মনে হল বাড়ি সে কতোকাল যায় নি। লাল কার্পেট বিছোনো হৃদয়ের পথ ধরে সে যায় নি কতোদিন সেই যুবতী মেয়েটির কাছে, স্বপ্নের মধ্যে যে একদিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, আয়ত গভীর, কটাক্ষ-গর্ভ অপরূপ চোখ দুটি যার, কবিতা যার নাম।

'বাড়ি, বাড়ি যাইনি কতোকাল।'

'কোথায় রাত কাটাস?'

অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলো সুধীন 'ড্রেনে, নর্দমায়, খুশী ত?'

প্রকৃত ভদ্রলোকের মত আহত হয়ে নিরীহ বিভাস ম্লান স্বরে বলল 'আজ যেন তোর কি হয়েছে।'

আর সুধীনের তখন এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিলো বিভাসের মুখে থু থু ছুঁড়ে দিতে।

'হ্যাঁ। হয়েছে।' মাথার যন্ত্রণাটা সুধীনের আবার হঠাৎ বেড়ে গেল।

উঃ, কতোদিন পর লেখার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু লিখতে পারবে না বোধ হয়। অনেক দিন অপচয় হয়ে গেছে। কেমন করে কবিতা লিখতে হয় সে কি ভুলে গেল? যে কবিতা কখনো লেখা হয় নি, সে কবিতা কি সে লিখতে পারবে না আর?

সুধীন দাঁত কড়মড় করতে করতে বলল 'আমাকে খবরের কাগজে গদ্য লিখতে হচ্ছে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। কোন মানে হয় না এমন জিনিস। আমি অক্ষরগুলো সাজিয়ে যাই বটে কিন্তু অক্ষরগুলো আমাকে চেনে না। অথচ পদ্য লেখার জন্যেই আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। একদিন তুই দেখবি, মানে তোকে দেখাবোই শুধু পদ্যের ঘাড় ভেঙেই খাবো এবং এই বাংলাদেশে।'

বিভাস ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে অনুভব করলো এক অসম্ভব সাহসকে। বুদ্ধি দীপ্ত, মর্মান্তিক, চূড়ান্ত। সহসা বড্ড নার্ভাস লাগলো। বলল 'বাড়ি গেলে হত।'

দারুণ একটা নোংরা শব্দ যেন উচ্চারণ করে ফেলেছে 'বাড়ি ঘর', 'ঘর আর বাড়ি' এমন ভাবে কথা দুটি বলল সুধীন অস্থির-ভাবে। সহসা ব্যস্ত হয়ে পড়লো বিভাস। নিজের বাড়ি ও ঘরের প্রতি সুধীনের প্রবল অনাস্থার কথাও জানে। পরের বাড়ি ও ঘর কিন্তু সুধীন ভীষণ ভালোবাসে। আজ এ বন্ধুর বাড়ি। কাল ও বন্ধুর বাড়ি। বিভাসের বাড়িতেও কতোদিন সুধীন কাটিয়ে গেছে। কিন্তু আজ যদি ফস করে সুধীন বলে বসে তাহলে বিভাস কিছুতেই রাজী হতে পারবে না। অথচ স্পষ্ট করে যে সুধীনকে তা জানিয়ে দেবে তাও ত সম্ভব নয়। ভদ্রতার গায়ে কাদা লাগবে।

বিভাসের ফর্সা, পুরন্ত, গোলগাল মুখটা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠলো।

সুধীন ব্রডওয়েটা পার হয়ে স্বগোতোক্তির মত বলল 'এলার কাছে?'

এলা? কে এলা? মনে পড়লো যেন কষ্ট করে। মেয়েটাকে দেখে একদিন মনে রঙ লেগেছিলো। তারপর যেমন হয়, ধুয়ে গেল। সহজ করে বললেই হত 'চললাম'। কিন্তু বলতে পারে নি বিভাস। অনেকদিন যায় নি আর ওপথে। ওদের গলিতে যেদিন বর্ষা নাবে, জল থই থই করে, আর গলির আকাশে বিদ্যুত চমকে যায়, সেদিন তার কথা ভেবেই এলা হয়তো আজও রবীন্দ্রসংগীত গায়, আজো হয়তো এলা বিভাসকে বিয়ে করার কথা ভাবে।

ভবিষ্যৎ বক্তার মত এবং খানিকটা অজ্ঞেয় ক্রোধে সুধীন বলল 'এলার কাছেই যেতে চাস তাহলে?'

মনের ভাবকে সম্পূর্ণ নিরলংকার করবার জন্যই বিভাসের বলতে ভালো লাগলো 'হ্যাঁ'।

বাঁ হাতি ওয়েলিংটন স্কোয়ারটা পাশে রেখে ধর্মতলা স্ট্রীটে ঢুকলো সুধীন।

'তোর সে প্যানপেনে কাব্যের ঠিকানা ত রসারোডে?'

'তুই কি করে জানলি?'

'ভবোই একদিন বলেছিলো। কিন্তু এলাকে নিয়ে তোর এই বাড়াবাড়ি অসহ্য।'

বাড়াবাড়ি সুধীন? এলার কথা ত সে ভুলেই গিয়েছিলো। এলার পর কতো মেয়ে এল গেল। তাছাড়া এখন ত তার অন্য অবস্থা। সেই অন্য অবস্থার কথা ভেবে 'এখুনি ছুটে বাড়ি গেলে হয়' কথাটা গান হয়ে গেল মনে। সকরুণ, সজল গান। বিভাসের ফর্সা, পুরন্ত, গোলগাল মুখটা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠলো।

কিন্তু পিছুটানের মত টানতে লাগলো এলার স্মৃতি অন্তত এখন। কোন কোন বর্ষার দিনে সে আজো তার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। জানলা দিয়ে দেখছে এখনো দূর থেকে গলির জল ভেঙে বিভাস আসছে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। বিভাস আসছে।

'এলা যে আমাকে—'

'এলা আমাকেও একদিন'

'দূর, এলা যে আমাকে বিয়ে—'

চতুর হেসে সুধীন বলল 'তা তো হবেই। খুব চাপ দিচ্ছে না রে?'

'হ্যাঁ। তুই কি করে জানলি?'

'ও আমাকেও একদিন বিয়ের জন্যে চাপ দিয়েছিলো। কিন্তু মুশকিল হয়েছিলো এই, ততদিনে এলার মনের দেহের সব সংবাদ আমার নেওয়া হয়ে গেছে। তাই স্পষ্টই আমি সেদিন আমার ফিলজফি ওকে ঝেড়ে-ছিলাম, বিয়ে আমি কোনদিনই করবো না। মেয়েরা বিয়ের জিনিস না। মেয়েদের বিয়ে করা অসম্ভব। একান্ত করে তারা কাউকে কোনদিন দেয় না। তাদের তাই একান্ত করে কোন কিছু দেবার উপায় নেই। আশ্চর্য, মেয়েটা আমার এই সরল স্বীকারোক্তিতে রেগে গেল। অথচ ইউনির্ভাসিটিতে নাকি পড়তো তখন। তরুণ কবিদের ও নাকি দাড়ি রাখার স্বপক্ষে ছিল।' বলে হো হো করে হাসতে লাগলো সুধীন।

আর বিভাস রাগে জ্বলতে লাগলো। যদিও এলাকে ও মনে মনে বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু তাই বলে সুধীন ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে? দেহ মনের সংবাদ নেবে? 'শালা, বুড়ো ভাম' মনে মনে উচ্চারণ করলো বিভাস। কিন্তু মুখে মোলায়েম হেসে বলল 'বাঁচা গেল। বিয়ে করবো না তাহলে।'

ভয়ানক চমকে গিয়ে সুধীন বলল 'এই কারণে করবি না!'

'হ্যাঁ।'

'উল্লুক। একটা দুটো প্রেম করেছে বলে, এক আধজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছে বলে যদি বিয়ে না করতে হয় তাহলে ত বাংলা-দেশে মেয়ে খুঁজে পাওয়াই ভার। তোর আটকাচ্ছে কোথায়, মর্যালে?'

মনে মনে একটা অস্বস্তি ছিলো বিভাসের। মেয়েটাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া গেছে। কিন্তু যুক্তি থেকে বাদ দেওয়া যায় কিভাবে? এই চিন্তা বিভাসের এলার জন্যে ছিলো। হঠাৎ সুধীনের বৃত্তান্ত জেনে সুধীনের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলেও ও আবার

সুধীনের প্রতি কৃতজ্ঞও হয়ে উঠলো। সুধীন তাকে বৃত্তির অনিচ্ছুক বন্ধন থেকে মুক্তি আদায় করে দিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র এলার কাঁচা রোমান্স থেকে বিভাস মুক্তি পেল সম্পূর্ণ, সংগে সংগে তার মন ছুটে যেতে চাইলো বাড়িতে। সংগে সংগে ফর্সা, গোলাগাল, পুরন্ত মুখটায় এক ঝলক রক্ত লাগলো। ও সভয়ে তাকালো সুধীনের দিকে। যাক বাঁচা গেল।

সুধীন তাকে লক্ষ্য করে নি। দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা তার রহস্যময় মুখ এই মুহূর্তে কংক্রীটের মত শক্ত।

বাঁ দিকে মোড় ঘুরতেই চৌরঙ্গী।

চোখের সামনে চল-চিত্র। রাশি রাশি মোটর। নিয়নের নীল, লাল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন। মেট্রো।

মেট্রোর আলোকজ্জ্বল অংশে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন মেট্রো দেখতে লাগলো। সাজপোশাকে, চলনে বলনে মেট্রো। ইংগবঙ্গী মেয়েদের দেখে ছলকানো রক্তে মেট্রো। মাতালের কান্নায় মেট্রো। চরিত্র, ভবিষ্যৎ, জীবিকা ভুলিয়ে দেওয়া মেট্রো। অর্থহীনভাবে অমোঘ চতুর্দিকে মেট্রোর গোলার্ধ। একটা ট্যাঁস ব্যাঞ্জোতে ককিয়ে ককিয়ে 'মেট্রো' বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

'কি রে, অতো চুপচাপ কেন?' বিভাস বলল।

মুখটা আবার সুধীনের ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রবল বিস্ফোরণ বোধ হয় আসন্ন। বুকের খানিকটা আগুন আর উত্তাপ যদি কোনক্রমে বার হয়ে যেতে পারতো। কতোদিন, কতোদিন আর সে লেখার জন্যে অপেক্ষা করবে?

'তোর মুখটা অত কঠিন দেখাচ্ছে কেন?'

'তুই-ই এর জন্যে দায়ী।'

'আমি?'

প্রকৃত অপরাধীকে এতক্ষণে সনাক্ত করতে পেরেছে সুধীন। তার সমস্ত দাহের কারণ। কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না, সেই কফি হাউস থেকে। এইবার সে পেরেছে, ধরেছে। হ্যাঁ। অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে সুধীন বিভাসের দিকে তাকালো।

'না ত কি? তুই ত ধরে নিয়ে গেলি কাগজের অফিসে এমনি এক রাতে। মনে করে দ্যাখ সেদিন ছিলো আজকের মতই ১৪ই এপ্রিল। ঘড়ির দিকে তাকালে হয়তো সময়টাও ঠিক ঠিক মিলে যাবে।'

'তা তে কি হয়েছে?'

'নন্দবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলি। তারপর থেকেই ত দফারফা। ফিচার আর্টিকেল লিখে লিখেই জীবন শেষ। আমার মত লোকের কবিতা লিখতে না পারা মানে বুঝিস?'

বছর পাঁচ আগে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সুধীন ছেঁড়া চপ্পলে। হাতে ছিলো একদিস্তে অর্থহীন কবিতা আর মুখে ছিলো বেপরোয়া হাসি। সেই প্রতিভাবান কিন্তু নামগোত্রহীন বন্ধুকে কাগজের অফিসে একদিন রাত্রে ঢুকিয়ে দিয়ে, তার ভাত-রুটির একটা নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত করে দিয়ে খুবই অন্যায় কাজ করেছে বিভাস সত্যিই।

সুধীন তার সম্মোহন দৃষ্টি ফেললো বিভাসের চোখে।

'শালা, আমার অহংকার কোথায় রাখলি? আমি না একদিন বলেছিলাম বুদ্ধি বিক্রি করবো না? কবিতা লেখাই আমার যথার্থ কাজ ছিল। তুই আমাকে আস্তাকুড় ঘাটালি।'

বিভাসের ভয় করলো সুধীনের চোখের দিকে তাকাতে।

'আয় বিভাস, একটু ডেথ-ডেথ খেলি।'

বিভাস তাড়াতাড়ি সেই উঁচু বাড়িটার দিকে তাকালো। রাত সাড়ে আটটা। বিভাস বলল 'আমার কাল অফিস। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আমায় ছেড়ে দে।'

সুধীন গম্ভীর আর ভরাট গলায় বলল 'তা হয় না রে বিভাস। তোর বউদির বোনের জন্যেই ত তখন থেকে বাড়ি যাবি যাবি করছিস?'

চমকে গিয়ে মুখ নীচু করে বিভাস বলল 'এটা তুই কি করে জানলি?'

'এ ও জানি সে খুব সুন্দরী।'

বিভাস ককিয়ে উঠলো 'এটা তুই কি করে—?'

'এ ও জানি তোদের মধ্যে বড় ভাব। একদিন দুপুরে মেট্রোতে এসেছিলি।'

'এটাও জানিস?'

'এও জানি আমাকে তুই অত বড় খবরটা কেন দিতে চাসনি। তুই জানিস আমার চোখ সম্মোহন জানে। আর মেয়েরা বেপরোয়া যুবকই ভালোবাসে।'

আর্তনাদ করে উঠলো বিভাস। বাঘের চোখের মত দপ দপ করে জ্বলতে লাগলো সুধীনের চোখ।

'আয় বিভাস, একটু ডেথ-ডেথ খেলি। খেলাটা খুব সহজ। চলন্ত গাড়ির পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া, ফিরে আসা। আর দেরি করিস না। বিভাস, দেরি করলে তোকে খুন করে ফেলবো।'

'কিন্তু আমার যে কাল অফিস। এভাবে রাতদুপুরে—'

'এই ত' সবে সাড়ে আটটা। সারা রাত খেললেও রাতের দুপুরে যাওয়া যায় না কখনো। আয়। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।' সুধীন বিভাসের জামার আস্তিনে প্রবল টান দিল। দুজনে নেবে গেল রাস্তায়। সিগন্যাল যখ লাল আলো দেবে, যখন গাড়ি সারবন্দী দাঁড়িয়ে যাবে, ভীড় যখন এ-ফুট থেকে অন্য ফুটে যাবে, তখন না। কিন্তু যেই সিগন্যাল সবুজ সংকেত জানাবে, গাড়ি ছুটতে আরম্ভ করবে সেই রোমাঞ্চকর সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তেজনা পাবার প্রচণ্ড মোহে সুধীন হঠাৎ দুর্বার হয়ে উঠলো।

এঁকে বেঁকে সাপের মত, অল্পের জন্যে বেঁচে, ঘুরে ঘুরে, থেমে, প্রতিজ্ঞার মত সোজা কিন্তু আদর্শহীনতার মত বেঁকে সুধীন সোজা চলে গেল অন্য ফুটে। পেছন পেছন কোনক্রমে বিভাস। ফের আবার পাশ কাটিয়ে, নাচতে নাচতে, সর্পিল গতিতে, দ্রুত, আস্তে ও-ফুট থেকে এ ফুটে। এ খেলার যেন শেষ নেই। যেন চিরকাল এই চলছে। ফেনা আর উত্তেজনার মাঝে সুধীন বলল, 'কেমন লাগছে রে বিভাস?' শালা স্টেটবাসগুলো মানুষ খাবার যম। সব সময় ওৎ পেতে আছে। ওদের সতর্ক চোখ এড়িয়ে'—সোঁ করে একটা ডবলডেকার চলে গেল।

'ওঃ। আরেকটু হলে সুধীন' বিভাস পাশ কাটাতে কাটাতে দারুণ আতংকে সুধীনের কাছে এলো।

'কতো সাবধানে থাকবি রে শালা। খালি স্টেটবাস। চতুর্দিকে। সহজ মনে রাস্তা পার হবো তাও স্টেটবাস। সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে। মনিব্যাগ নিয়েছি কেননা, আমার দরকার ছিল। এ খুব সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভবো, আমার প্রাণের বন্ধু, ঘুষি মারলো আমাকে।'

নেশার ঘোরে সুধীন অভিমানী কণ্ঠে বিশ্বের কাছে আর্জি জানিয়ে আর একটা স্টেটবাস কাটালো। পাশ কাটিয়ে বলল, 'আমিও ছাড়ছি না। দেখি পৃথিবীতে কত স্টেটবাস আছে।'

বিভাস এসব তখন শুনছিল না। ও খেলে যাচ্ছে বটে, এর চোখের সামনে তবু তখন বউদির অপরূপ সুন্দরী বোনের ম্লান চুল। একটা ট্যাক্সি কাটাতে গেল। পারল না। ট্যাক্সিটা গাঁক গাঁক করে ছুটে এসে বিভাসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, নিহত করে, হুস করে মিলিয়ে গেল। ভিড় জমে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ বিভাসের রক্তাক্ত দেহটাকে সুধীন ভালো করে তাকিয়ে থেকেও দেখতে পেল না। সুধীন দেখল, অবিকল তারই মত হাত, পা, মুখ, চোখ, আরেকজন সুধীন রক্তমেখে নিহত হয়ে মাটি নিয়েছে।

একটু মমতা হল। নিজের জন্যে কার না মমতা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সুধীন মনের অভ্যন্তরে অস্ফুটে গর্জন করে উঠল। এত
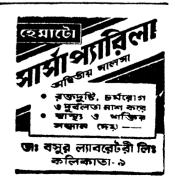
আয়োজন করার পরও ত সে খবরে কাগজের চাকরিটা ছাড়তে পারে নি যেমন বিভাস পারত না কোনকিছু ছাড়তে। বিভাসকে হাজার গালাগাল দেবার পরও চাকরিটা না ছাড়ার জন্যে নিজেকে ত কখনো সুধীন গালাগাল দেয় নি। যেন সব দোষ সংসারী, হিসেবী, ভীতু বিভাসের।

সব দিয়েই সব পেতে হয়। সে লিখতে চায় কিন্তু লেখবার জন্যে সে কি ছেড়েছে? কি? এই প্রশ্ন প্রচণ্ডভাবে তার কানে এসে লাগল। কাল ভোরেই সে যাবে কাগজের অফিসে চাকরিতে ইস্তফা দিতে। বুদ্ধি সে বিক্রি করবে না। কাগজের অফিসের ফিচার আরটিকল্ লেখক সুধীনের টাটকা দুর্ঘটনায় নিহত হবার খবর কাল বার হবার আগেই তাকে এ সব থেকে চলে যেতে হবে।

তারপর অনেক রাত্রে নিজের গর্তে ফিরে, এই নিঃসঙ্গ, কংকরময়, করুণাহীন পৃথিবীতে বসে, সম্পূর্ণ চাতুর্যহীন, প্রসাধনহীন সুধীন, পৃথিবী যখন সুষুপ্ত, আকাশের তারার আলো যখন ধারালো, তখন মোমবাতির আলোয় ছিন্নপত্রে এতদিন পর একটি শুদ্ধ, নির্জন কবিতা লিখল।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আট

ইতিমধ্যে টিকেটবাবু গিয়ে দাঁড়ান ব্রহ্মনারায়ণের কাছে। এক মুখে তাঁর অনেক কথা। টাকা বের করে দিতে দিতে বলেন, 'তিনখানা গোসাবা।'

বলবার আগেই টিকেটবাবুর লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। যেন খবর তাঁর আগেই জানা। ব্রহ্মনারায়ণ তৎক্ষণে আগের সুরেই তাল ধরেন, 'আমি ভাবছি এদিককার লোক কোথাও, ঘরে ফেরা হচ্ছে। তা নয়, একেবারে ফকিরের সঙ্গে! তাও আবার ফকিরের জন্যে নিজের ট্যাঁকের কড়ি দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি। আপনাকে আবার আমি ফিলজফির কথা বলতে গেছি।'

এবার চোখাচোখি মেয়ের সঙ্গে। হাসিতে হাসিতে মজা লোটে বাপ-বেটিতে।

তবু তো গাজীর গলার গুনগুনানি শুনতে পান নি, 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা।'

ভাবের অভিধানে দেখ, ও কথা কার উদ্দেশে। তা, একবার বলে দেখুক না, মাস্টারমশাই প্রেমের ভাব জানেন না। সে সাহস নেই। দেখি, গাজী আমার দিকে চোরা চোখে চেয়ে চেয়ে হাসে। অপরাধ তো আমার। ব্রহ্মনারায়ণের বিদ্রূপে সেই-রকম মনে হয়। বলি, 'তা নয়, ও বলছে বাবে—।'

'তাই আপনি নিয়ে নিলেন, এই আর কী।'

ব্রহ্মনারায়ণ ঘাড় নেড়ে আমার কথা স্মরণ করেন। কন্যা আর শিল্পীর দিকে চেয়ে চোখ পিটপিটিয়ে হাসেন। দেখ, যেন [illegible] দিয়ে চেয়ে কী রহস্য করে। তবে, সব খেলারই উলটো চাল আছে। সেই চালটা মেয়ের দিক থেকেই আসে, 'তাতে কী হয়েছে বাবা। ও'র ভাল লেগেছে, তাই এর সঙ্গে যাচ্ছেন। তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।'

বলুক তো, কন্যা বলুক, আর বাপ তার আপন রক্তের কাছে একটু ঋণগ্রস্ত হোন। ফিলজফি কেবল সেণ্টিমেণ্ট, গাজী নিয়ে বেড়ালে সেটা কেবল বিফল ভাবের ঘোর, আর যত কিছু সঠিক পথের খবর শুধু মাস্টারমশাইয়ের ঝোলায়, এ ঘোর কাটুক। ঝিনি এখন অনেক সহজ। কথা বলে, হেসে তাকায় ভিনযাত্রীর দিকে। যাত্রী সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়বে, সে সাহস নেই।

কিন্তু এতই সহজ। তবে আর 'ও ভোলার মন' বলেছে কেন, 'ক্ষ্যাপা' বলেছে কেন। ব্রহ্মনারায়ণ আপন ভাবেই ভোলা, আপন পথের ক্ষ্যাপা। বলেন, 'ও, বাড়া-বাড়িটা আমার হল। তবে আর কি, কেবল ওই গান শোন আর টাকা দাও, আর এ গিয়ে পকেট উজাড় করে ঘুরুক। তোরাই সংসার করবি বটে।'

অমনি উজানী গাঙের ছলছলানি হাসির জোয়ার ঝিনির গলায়। যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে, তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপে। মাকে বলে, 'শুনেছ মা, বাবার কথা। যেন আমি তাই বলেছি।'

মা ও'র দল ছাড়েন নি। শোনা যায়, 'ও'র কথা বাদ দে না।'

'বাদ দে না? বাঃ! টাকা কি ফুটকড়াই নাকি গো? আমার বেলায় তো তা দেখি নি?'

আবার হাসি, মা-মেয়ে দুই সখীতে। কিন্তু ব্রহ্মনারায়ণের সেদিকে তেমন নজর নেই। অধীনের দিকেই ফিরে একটু চোখ টেনে পুছ করেন, 'তা, মহাশয়ের কী করা হয়, জানতে পারি?'

মহাশয়! স্বরে যে শুধু বিদ্রূপ, তা নয়, সুরে যেন অন্য একটু খোঁচা। পড়তে জানলে হয়, সে লিখনও লেখা আছে ব্রহ্মনারায়ণের চোখে। পড়ে দেখ লেখা আছে, 'তা সাধু ফকিরের পেছনে খরচ করতে তো ভাল লাগছে, এ রেস্তো আসছে কোত্থেকে?' চাহনির রকমটিও একটু তেরছা। একে আপাদমস্তক দেখা বলে না। একে বোধ হয় নজর খুঁচিয়ে দেখা বলে। ছেলেবেলায় পাঠশালার মাস্টারমশাইয়ের মুখখানি চোখের সামনে ভাসে। হাতে যাঁর কাল-নাগিনী ফণা তুলে লিকলিক করতো। কালনাগিনীর মতই সেই বেতগাছা, মাস্টার-মশাইয়ের চোখে একেবারে সেই ছোট্ট বুকে গুঁজে দেওয়া নজর। নজর, হয়তো ছাত্রটির দশ আনা ছ' আনা চুলের ছাঁটের দিকে। মিহি গলাও যে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর শোনাতে পারে, সে জ্ঞানলাভ তখন থেকেই। তার সঙ্গে কেবল একটু দাঁতে দাঁত চিবুনো, শোনা যেত, 'বাবু কি যাত্রার দলে নাম লেখাইছেন নাকি?'

আঃ, যেন শিকার নিয়ে দুলে দুলে সাপের খেলা, এমনি মর্মান্তিক। আসন্ন ছোবলের যন্ত্রণা তৎক্ষণে ভয় হয়ে বুকে কাঁপতে আরম্ভ করতো। শিকারের নজর সেই যে মাস্টারমশাইয়ের চোখে আটকে যেত, তাকে আর নড়ানো যেত না।...তবে এ কথা ঠিক, পাঠশালার গুরুমশাইয়ের সেই বাঘা চোখের নজরে নির্ঘাস ভুল ছিল না। সেইদিনের ছোট্ট বুকের ত্রাস আজ ভরা বুকে হাসি হয়ে বাজে। এক্রামপুরের বামুনপাড়ার কেদার চক্রবর্তীর যাত্রার দল, সে তো ছিল তোমার চোখের আলেয়া হে। তোমার তখন নাক টিপলে দুধ গলে তাতে আবার ভদ্রলোকের ছেলে। আর ঝাঁকড়া-চুলো কেদার চক্রবর্তী, তাকে তুই কোন নজরে দেখেছিলি। মনে করেছিলি, সে প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু, বেহুলার চাঁদসদাগর। সে রামায়ণের রাম, মহাভারতের অর্জুন। কম করে ষাট বছরের সেই লোকটার হাঁকডাক ফেলা-দোলা তোকে

আমার কথার মাঝে চক্ষে বলেন, 'ও, তা হলে গপ্পো। নিশ্চয় গপ্পো লেখা হয়? ওই একই কথা হল। গপ্পোও যা, কবিতাও তাই। আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি।'

একেবারে 'গপ্পো!' 'গল্পের' সম্মানটুকুও নয়। এর পরে যদি ভুলেও 'সাহিত্য-সাধনা' ইত্যাদি বলতে যাও, আরো কী শুনতে হবে, জানো না। কিন্তু অধীনের চেহারায় তার কী উর্দি পরা আছে, বুঝতে পারি না। বোঝবার দরকার নেই, তার আগেই ব্রজনারায়ণের গলায় রহস্য উদ্‌ঘাটনের হাসি। বলেন, 'তাই তো বলি, এ আবার কেন ফিলজফির ওপরে যায়। কবি লেখক না হলে কি আর ওসব হয়।'

অর্থাৎ ব্রজনারায়ণের কাছে সেটা আরো হাস্যকর। যেটুকু বা কল্কে পাওয়া গিয়েছিল, তাও বে-হাত। কথার সুরেই বোঝা গিয়েছে, এও যেন বনের মোষ চরানোর শামিল। নইলে, মাস্টারমশাইয়ের কাছে গপ্পো কবিতা সব একাকার হয়ে যেত না।

জবাব দেবার কিছু ছিল না, অতএব মুখ ফেরাতে হয়। তার আগেই শোনা যায়, 'এতটা যখন হল, তখন নামটা বাকী রাখবেন না।'

ফিরে দেখি, ঝিনির কাজল পরা চোখে কৌতূহল। এবার আরো সহজ, এবার সোজাসুজি। বাপের মিটেছে, এবার মেয়ের শুরু। এ কি বেয়াজ বল, মনের যেন সুর কেটে যায়। পাড়ি ছিল দিগন্তে, এই রোদে নীলের অধরা আকাশে। সবুজে আর সোনা মাঠের শেষে। যত দূরে যাও, তত দূরের বাঁধে বাঁধে। পাখীর ঝাঁকের ঘর-ছাড়া বনভোজের জটলায়, আর দরিয়ায় দরিয়ায়। এখানে কারুর নামধাম নেই, পরিচয় নেই। পরিচয়েই জগৎ ছোট। তখন সীমানা চৌহদ্দি আসে, তখন বেড়া এসে খাড়া। অপরিচয়ের কোন সীমা নেই, কোন দায় নেই। সে চলে যেমন খুশি, বলে যেমন খুশি। বাঁধা-ধরার ছক সীমানা সরহদ্দ সে আজ পিছনে ফেলে এসেছে।

কিন্তু পথ কোথায়। এখন, এই মুহূর্তে তুমি ছকের ঘরে দাঁড়িয়ে। জবাব না দিলে কি চলে। সহযাত্রারও একটা দাবি আছে। তায় আবার এ যুগের এক বিদুষী। কবুল যখন করেছ, নাম না বলে যাবে কোথায়। তুমি তো আপন তুচ্ছতায়, সংকোচে মর। আর একদিকে শালীনতা যায়। ওজরে অহংকারের কালি। অন্তত সম্রাট দূরের কথা, দরবারের পারিষদের গদিটা ইস্তক পাওনি, সেইটি জানান দাও। নামটা বলতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ঝিনির গলায় বাজে, 'কী আশ্চর্য! নাম তো জানা।'

সংগে সংগে ব্রজনারায়ণ উলটো কোপ মারেন, 'তুই জানিস নাকি, আমি তো কই জানি না।'

একেবারে সোজাসুজি কোপ, একটু এদিক ওদিক নয়। হাত ঘুরিয়ে বলেন, 'তা হবে, আমি আবার ওসব পড়িটড়ি না তো।'

শোন হে বাঙালী লেখক। আহা, মরমের ব্যথা না হয় পরে সামলিও, মাস্টারমশাইয়ের পাওনাটা নিয়ে নাও।

ঝিনি তখন পিতৃদেবকে সামাল দেয়, 'তুমি তো কিছুই পড় না, জানবে কী করে। আমি ওঁর অনেক বই পড়েছি।'

ব্রজনারায়ণ জিভ দিয়ে দাঁতে ঠেলা দেন। বলেন, 'অনেক! অনেক লেখার মত বেশ ভার ভারিক্কি লাগছে না তো।'

ঝিনি প্রতিবাদ করে, 'অনেক লিখতে হলে বুঝি তার ভারিক্কি হতে হয়। বাবার যেমন কথা।'

'না, একটা মানানসই আছে তো।'

ইতিমধ্যে গিন্নীর গলাও ভেসে উঠেছে। তিনি একটি বইয়ের নাম করে বলেন, 'সেই বইটা তো? আমিও তো পড়েছি, বেশ লেগেছে।'

মাস্টারমশাইয়ের চোখ কপালে। গৃহিণীর দিকে তাকান যেন, সেই বাগবাজারের বারো বছরের সিলক-এর ভোট জড়ানো মেয়েটির দিকে। বলেন, 'তুমিও পড়ে ফেলেছ, তবে তো আর কথাই নেই।'

বলে বুড়ো চ্যাংড়া গলায় হাসেন। কিন্তু অন্য পক্ষে, সেদিকে কান নেই। এখন মা মেয়েতে কথা। এ যুগের বিদুষীর কাছে যেটুকু পাওয়ানা, সেটুকু দেখতে পাই তার

চোখের আলোতে। সংকোচের পর্দাটা সরে না। তবু কিছু কথা, কিছু জিজ্ঞাসা তার চোখে ঝিকিমিকি করে। তাতে আমার আরো অরুচি। দেখি, দিগন্তে আমার ছায়া ঘনিয়ে আসে। যেমন খুশির অথই পারে বেড়া দাঁড়িয়ে ওঠে।

তার মধ্যেই মাস্টারমশাইয়ের গলা শোনা যায়, 'আপনি কীরকম লেখেন-টেখেন জানি না অবিশ্যি, তবে কিস্‌সা হস্‌সো না। যা তা সব লেখা হচ্ছে আজকাল।'

আহা মান পরে হবে, আগে শুনে যাও। আপন পাওনামা মিটিয়ে নাও হে লেখক। কিন্তু জবাব আসে নিজের ঘর থেকেই, 'তুমি তো কিছু পড়ই না। ভাল মন্দ তুমি জানবে কী করে।'

'আরে না পড়লেও, একটু আধটু পাতা ওলটাই তো। পড়াই যায় না, যাচ্ছে তাই, অপাঠ্য।'

ঝিনির প্রতিবাদ আওয়াজ দেয়, যুক্তির জাল ছড়ায়। তুমি বাঘের ভয় করলে কী হবে, ঠিক জায়গাতেই সন্ধে হয়। তবে শ্রবণ আমার বন্ধন করি, কান দেব না। ভাল মন্দের ধন্দ, সারা জীবনের হাসন শাসন। আজ সেসব রেখে এসেছি। আজ কাজ নেই, আজ বিচার নেই। মন চল যাই খোপের বাইরে। উকীলেরা তর্ক করুন। কোন এজলাসে বিচারক বসে আছেন, তাঁর রায় যবে আসবে তবে। আসামী, আপন গরজে কাম কর গা।

মুখ ফেরাতেই সামনে দেখি গাজীর মুখ। খোপের কথায় কী প্রত্যয় তার কে জানে। এ ফকিরটা সত্যি পাজী। দেখ, সেই মিটিমিটি হাসি, যেন চোরাই মালের খোঁজ পেয়েছে। শোন যাকে নিয়ে এত কথার আমদানি, সে তখনো সেই ধরতাই ভোলে নি। গুনগুনিয়ে খেই টেনে চলেছে, 'পদ্ম-পাতায় পানির ফোঁটা টলমল, পদ্ম ভিজে না। তার সাক্ষী দইয়ের হাঁড়ি, উপরে ভাসে ননী ছানা। প্রেমের সন্ধান যে জেনেছে, তার আবার লেনাদেনার ভাবনা। যেজন প্রেমের ভাব জানে না তার সঙ্গে কিসের লেনা-দেনা।'...

গাজী গাইতে গাইতে হঠাৎ যেন চমক খায়। কপালে হাত দিয়ে রোদ ঢেকে দূরে তাকায়। বলে, 'বাবু, উই যে দেখা যায় কালীনগর, এসে পড়া গেল।'

তার নজরে নজর তুলে দেখি, দূরে পুবের বাঁকে মাস্তুলের ভিড়। বাঁধের কোলে এলোমেলো ঘর। এখান থেকে দেখি যেন, ঘরের ঘাড়ে ঘর, ঘরের মাথায় ঘর। যেন মস্ত বড় একটা চাকের মত। দিগন্তের বুকটা একেবারে হাট করে খোলা নেই। কিছু গাছপালা সেখানে মাথা তুলে আছে। বোধ হয় হেটুরেদের ছায়া দেবার জন্যে তারা মাথা তুলেছে।

সারেঙের খুপরি থেকে ভেঁপু বেজে ওঠে। এবার যেন একটু দূর থেকেই বাজে। এতক্ষণের পথে ঠিক ওরকম জায়গা চোখে পড়ে নি। হয় তো, এবার যাত্রী বেশী, তাই আগে থেকেই তাড়াহুড়ো। যাত্রা আসন্ন, যাত্রী তৈরি হও। লঞ্চের নিচের তলায় হাঁক-ডাক লেগেছে। যন্ত্রের শব্দ ছাপিয়েও তা শোনা যায়। এবার নামা ওঠা, সকলের ভিড়ই বোধ হয় সমান।

ভেঁপুর শব্দে খোপের তর্ক দমন হয়। ব্রজনারায়ণের গলা শোনা যায়, 'কোথায় এল?'

গাজী বলে, 'আজ্ঞা, কালীনগর গঞ্জ।'

বিস্ময়টা যেন বিদুষীর গলাতেই চকিত হয় বেশী, 'এসে গেল আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'ইস্! এই বাবার জন্যে! ও'র সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলাম না। আপনি খুব বিরক্ত হয়েছেন তো?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'বিরক্ত হব কেন?'

'হলেও কি তুমি আর তা বলবে?'

এবার শোন গিন্নীর কথা। এসব আপনি তুমি-এর সহবতে নেই সে অনুমতি সাপেক্ষের অপেক্ষায় সহজের মুখে দরজা টেনে দেবেন। যা মুখে এসেছে, তা-ই। সহজেই সহজ আনে। আপন মন বুঝে দেখ, বিরক্ত কি সত্যি হয়েছি। একটু হয় তো বিব্রত। সেটা কথার গুণে নয়, প্রসঙ্গের জটিলতায়। তর্কে অরুচি, আজ তাকে দিয়েছি দূরের গারদে। স্বয়ং ব্রজনারায়ণ, তার চেয়ে অনেক বেশী ঢেউ দিয়েছেন প্রাণের তরঙ্গে। বরং আঁত দেখিয়েছেন, দাঁত দেখান নি। এ কালের কলম যদি ও'র প্রাণের দরজার কুলুপ না হয়ে ওঠে, সে কথাটা না-বলা থাকবে কেন। বলি, 'না না, বিশ্বাস করুন, বিরক্ত হই নি।'

বোধ হয় গৃহিণীর সহজে সহজ মানেন ব্রজনারায়ণ। 'আপনি'টাকে গোল্লায় দিয়ে, তিনিও বলেন, 'দেখো বাবা, কিছু মনে-টনে করো না। যা মনে এসেছে, তাই বলেছি।'

হেসে বলি, 'ঠিক করেছেন।'

'কিন্তু ঝিনি তা মানবে না, ও ঠিক রেগে থাকবে।'

আমি ঝিনির দিকে তাকাই। ঝিনি যেন সে সব কথা শোনেই না। তার গলাতে একটু যেন অবুঝ বিষণ্ণ হাসি বেজে ওঠে।

বলে, 'আমার এখন খুব খারাপ লাগছে।'

আমি বলি, 'না, না, আমি মোটেই—।'

'সে কথা বলছি না। বাবার কথা ছেড়ে দিন, বাবা ওইরকমই। কিন্তু আপনি এখন নেমে যাবেন ভেবে খারাপ লাগছে।'

ব্রজনারায়ণ বলে ওঠেন, 'তা বলে তুমি এখন ওকে গোসাবায় টেনে নিয়ে যেতে পারো না।'

কথা শুনে সকলেরই হাসি সামলানো দায় হল। ইতিমধ্যে গাজীর ডাক পড়েছে, 'বাবু, লঞ্চ কিন্তু ঘাটে লাগে।'

ততক্ষণে ঝিনির ব্যাগ খুলেছে, হাতে উঠেছে কাগজ কলম। বলে, 'নাম ঠিকানা লিখে দিন, চিঠি দিলে জবাব দেবেন।'

এখন আর দোমনার সময় নেই। লিখে দিই, যদিও জানি, কোন প্রতিজ্ঞা নেই। তবু বিদুষীর কাজল-কালো চোখের ঔৎসুক্যে একবার মনে হয়, গোসাবা কত দূরে। অকূলে নাকি। তবে, তাই বা ভাসি কেমন করে, অকূলের মাঝি আমি নই। হাত তুলে নমস্কার করি, বলি, 'চলি।'

ব্রজনারায়ণ বলে ওঠেন, 'নামছ নামো, তবে আজ যদি ফিরতে না পারো, তবে কাল আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরতে হবে।'

হেসে খোপের বাইরে যাই। ব্রজনারায়ণ-পত্নীর দিকে তাকিয়ে আর একবার শিশু হতে ইচ্ছে করে। ঝিনি চোখ নামায় না। গাজী বারবার উড়িয়ে, দাড়ি নাড়িয়ে, ডুপকি শুদ্ধ কপালে ছুঁইয়ে, জানালার কাছে ভেঙে পড়ে। বলে, 'বাবু, চললাম, কবে যেন আবার দেখা হয়। চলি গো মা-ঠাকুরণ। দিদিকে বজে রাখি, আবার যেন আপনাকে গান শোনাতি পাই।'

'ও হে, ফকির না গাজী, শোন।'

ব্রজনারায়ণ ডাকেন। পকেট থেকে একটি সিকি বের করে বলেন, 'আমারটাই বা আর বাকী থাকে কেন, গান যখন ভালই লেগেছে।'

মুরশেদের মাজে, গাজী একেবারে জানালায় কপাল ঠোকে। মুখে তার কথা সরে না আর। মায়ে মেয়েতে হাসে। আর আমি যেন হঠাৎ, এক সিকিতেই ব্রজ-নারায়ণের ষোল আনা দেখতে পেলাম। নামতে নামতে ভাবি, মানুষ চেনার বড়াই যেন কখনো না করি।

পাড়ে উঠে তাকিয়ে দেখি, ঝিনি হাত তুলে আছে। ও যেন অবাক হয়েছে। তবু মনের পালে তেমন বাতাস নেই। কী যেন বলে, ঠোঁট নড়ে।

গাজী ডুপকিটা তুলে হাঁক দেয়, 'দিদি, আবার যেন দেখা পাই।'

ক্রমশ

রেলওয়ে ইয়ার্ড (জলরঙ)　　　　শিল্পী : অশোক বিশ্বাস

সুন্দরভাবে একটা স্থান টুকরো হল—এই পর্যন্ত তাদের দ্বারা বেশ হয়ে থাকে, কিন্তু যে স্তর রেখার উত্তর-প্রতিউত্তরের ইতিমধ্যে বিদ্যমান হয় সেইখানটা নিয়ে তারাও ভাবনায় পড়ে এটা আলোর ভাগ, এখানেই নিপটতা, কাজেই নির্মাণ বিচার দেখা দেয়; রঙ সম্প্রসারিত হয়ে ঘটনা সৃষ্টি করবে।

এবারও গত বছরের মত প্রায় ছবিতে কালো রঙের প্রাধান্য আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, আমরা যদি আমাদের দেশের ছবি দেখি তা হলে বুঝব কালো রঙ চাপান কোথাও হয় নি, অবশ্য কৃষ্ণ রাজকুমারী
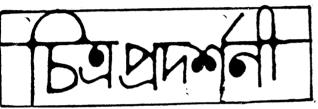
গভর্নমেণ্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর বাৎসরিক প্রদর্শনী

তখনই যে কোন দর্শকের মন খারাপ হয়, যেখানে চোখে পড়ে যে অজস্র উৎসাহীর কেউই, অবশ্য যতটুকু তাদের কাছে আশা করা যায়, সঠিক দিক নির্ধারণ

প্রেস অ্যাডস্ শিল্পী : সলিল চ্যাটার্জী

করতে পারছে না: প্রত্যেক ফ্রেমেই অহেতুক ইঙ্গিত-ভাবের চেহারা—রেখা এখানে দায়—রঙ আভা ছাড়া!

এখন দিক বলতেই আমরা ফরাসী সিদ্ধদের বুঝে নিই, কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণ করে উপলব্ধির প্রয়োজন আছে বলে ধরি না; কতক ব্রাশ ম্যানার যে সব নয় এই বিবেচনা আমাদের ধারণার বাইরে থেকে যায়, এবং তাই সেই ধরনের তুলি চালনা আমরা এলোমেলোভাবে কাজে লাগাই।

এখানে আমাদের সাবধান করার বা যথাযথ উপদেশ দেওয়ার কেউ যে নেই, এটা পরিষ্কার, এবং এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের—যে কোন শিক্ষার্থীরই, বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত, যাতে করে আমরা নিজেদের সাহায্য করতে পারি,—কেন না, কাজের মধ্যেই আমরা আদিষ্ট হয়ে থাকি যে, কোন্‌টি সরলতা।

আমরা প্রায়ই ভুলতে বসেছি যে, ফ্রেম কাগজ রঙ তুলি যেমন আছে, তেমন চিত্রগত রহস্যও আছে। যে কোন উপায়ে ঐ প্রাথমিক ধারণায় আমাদের ফিরে যেতেই হবে; অবিকল-করে কিছু আঁকা খুব সাধারণ কিন্তু খুবই কম হাত আছে যারা আদল মানে ইফেক্টে একটি বস্তুকে ঘটিয়ে তুলতে পারে।

অর্থাৎ কয়েকটি রেখায় একটা কিছু

বালসেবিকাদের পরিচালিত প্রদর্শনীর একাংশ

কালো নয় মোটেই—এই কালো রঙ সম্পর্কে কে কি বলেন তা আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করতে পারি।

যথা, একদা আঁরিই মাতিস, হুনোয়া জন্দর্শনে গিয়েছিলেন। মাতিসের কয়েকটি ছবি দেখার পর তিনি বলেছিলেন যে, "আমি সত্য কথাই বলব—বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি যা করছ তা আমি মোটেই পছন্দ করি না...অবশ্য তার কারণও অনেক... যখনই তুমি কিছু কালো ক্যানভাসে আরোপ করবে...সেটা সেখানেই থেকে যাবে...আমি সারা জীবন বলে আসছি যে কালো রঙ দেওয়ামাত্রই ক্যানভাসে একটা গর্ত সৃষ্টি হয়, ওটা রঙই নয়...আবার তোমার রঙের ভাষা সম্বন্ধে ফলাও কর; এদিকে তোমরা কালো লাগাও...রাখ..."

আপাতত হেনোয়ার কথায় আমরা মূল্য দেব।

এটা স্বাকার করতেহ হবে, তবু এ বছর নানাবিধভাবে ঘটিয়ে তোলার দিকে নজর আমরা দেখেছি, যথা ১৬০, এটির মধ্যে ঘাড়ের কাছে কলরাইজেসন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ১৭১ চমৎকার স্পর্শন-প্রত্যক্ষ থেকেও শুধু রঙের ব্যাপারে অবহেলা আমরা লক্ষ করেছি, ১৬৪ বড় বেশী কালো; ১৫৭, ৭০ এখানে সমস্ত কিছু স্কেচই থেকে গেছে, ১৭৪ মিকসটেকনিকে ও ১৩৮ প্যাটার্ন রয়ে গেছে। এ ছাড়া নূড স্টাডির মধ্যে কোমরের কাপড়-পরার রেখাটা রাখায় কি প্রয়োজন ছিল, অন্যান্য আলেখ্য চিত্রগুলি খুব খেলে উঠে নি।

ভাস্কর্য : ৩২১ ও বিশেষত ৩২৪ ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল না, এখানে প্রায়ই গত বছরের মত মেকানিক্যাল প্যাটার্নে ভর্তি—শুধু যে কাঠেই এমন নয়, অন্যান্য মাধ্যমেও তাই গড়ে উঠেছে।

অনুলাপ আমাদের ভাল লেগেছে, কিন্তু রঙের বিবেচনা কোথাও তেমন ভালভাবে দেখা যায় না, তবু ৯২, ৮৫, ৯৮, ৯১ বলা যেতে পারে।

কমার্শিয়াল কাজে হরফ চেতনার কোন হের-ফের হয় নি, প্রেস অ্যাডস্ ২৯৫, ২৯৮, পোস্টারে দীঘা ও প্রোটেক্ট ওয়াইলড লাইফ—ক্যালেণ্ডার ২৮৮ দর্শকের ভাল লাগবে।

শুধু কালো সাদার কাজ যা আমরা দেখতে চাই তা অত্যন্তই অল্প ছিল। অর্থাৎ শুধু টোনে কিছু আরোপিত। তবে জলরঙ বিভাগে ৩৭, ৪৬, ৩৬, ৩, ৫৭, ৫ চলনসই কাজ হয়েছে। গ্রাফিকে খুব কমই এচিঙ দেখলাম, এই ঘরে ২১৭, ১৯৩, ১৭৪, ২১২ ও ২১১—এটি বাঁদরের স্কেচ—খুব সরলতায় করা হয়েছে।

ক্রাফ্‌ট : সেরামিকের কাজ নেই, তবে বাটিকে অনেক সুন্দর কাজ ছিল, যদিও রঙ অনেক স্থলে বড় হার্ড হয়ে উঠেছে। তবু ৪৫৯, ৪১২, ৪৩৩, ৪৫১ এবং যখন কাজে যাকে টাই অ্যান্ড ডাই বলা হয় তার নমুনা ৩৩৯ আমাদের ভাল লেগেছে। কাঠের খেলনার খরগোশটি খুব মধুর কিন্তু গোঁফে তার দেওয়ার ফলে খেলার সামগ্রী কতখানি হয়ে উঠবে জানি না।

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্প

বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্পের (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদ) ছাত্রীবৃন্দ গত ৩১ ডিসেম্বর '৬৬ থেকে ৩রা জানুয়ারী '৬৭ পর্যন্ত শিশুদের চিত্তাকর্ষক ও অভিভাবক-দের শিক্ষাপ্রদ এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ছাত্রীদের হাতে তৈরি অপ্রয়োজনীয়, অব্যবহার্য জিনিস থেকে নানান শিক্ষাপ্রদ খেলনা ছিল এই প্রদর্শনীর আকর্ষণ। প্রশংসো করার মতো কাজ ছিল বেশ কিছু।

সাতাশ

পরের দিন সকালে মালিনী ছুটতে ছুটতে এল, মুখে থমথম করছে উদ্বেগ, দু চোখে ব্যাকুলতা; এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতন এসেছে যে তার কাঁধের ওপর কাপড় নেই, বুকের পাশ থেকেও শাড়ি পড়ে গিয়েছিল, আঁচলটা কোনো রকমে দু হাতে জড় করে ধরে আছে।

"হেমদি, দাদার খুব জ্বর", ছুটতে ছুটতে এসে মালিনী বলল।

"জ্বর!" হৈমন্তীর বুকের কোথায় যেন ভয়ংকর একটা ভয়ের ঘা লেগে হৃদপিণ্ড ধক করে উঠল, উঠে দোলকের মতন ভয় দুলতে লাগল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হৈমন্তী ভীত গলায় বলল, "জ্বর! কখন জ্বর এল?"

"রাত্তির থেকে", মালিনী বলল।

হৈমন্তীর হাত-পা যেন কাঁপছিল সামান্য। মালিনীর বিহ্বলতা তাকে ভীত করেছিল। কিছু খেয়াল না করেই বলল, "কত জ্বর?"

কত জ্বর মালিনী জানে না। বলল, "গা বেশ গরম।"

"তুমি দেখেছ?"

মাথা নাড়ল মালিনী, দেখেছে। তার ধারণা, গা পুড়ে যাচ্ছে।

হৈমন্তী হাসপাতাল যাবার জন্যে ধীরে-সুস্থে তৈরি হচ্ছিল। আজকাল তাড়াতাড়ি হাসপাতাল যাবার দরকার হয় না, রোগীই আসে না প্রায়। কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন বিমূঢ়তার মধ্যে কাটল; তারপর স্টেথস-কোপটা খুঁজে নিয়ে হৈমন্তী বলল, "চলো দেখি।"

বারান্দায় এসে হৈমন্তী শুধলো, "কি করছে? শুয়ে আছে?"

"বিছানায় বালিশ হেলান দিয়ে বসেছিলেন," মালিনী বলল। এতক্ষণে যেন খেয়াল হওয়ায় কাপড়ের অগোছালো ভাবটা সামলে নেবার চেষ্টা করল মালিনী।

হৈমন্তীর মনে হল, জ্বরটা হয়ত তা হলে তেমন বেশি নয়; বেশি হলে কি বসে থাকতে পারত! কি হল হঠাৎ? মনোহর, বুড়ো তিসুয়ার মতন কিছু যদি হয়—অশুভ চিন্তাটা শিখার মতন যেন দপ করে জ্বলে উঠে তখন থেকে কাঁপছে। কথাটা ভাবতে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছিল।

মাঠে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হৈমন্তী বলল, "গায়ে মুখে কিছু দেখলে?"

"না।"

"কিছু বলল? কোনো কষ্টটষ্ট?"

"মাথায় যন্ত্রণা, গায়ে হাতে ব্যথা।"

হৈমন্তী আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কপালে কি শেষ পর্যন্ত এখানে আটকে যাওয়া আছে? কাল রাত্রে সে স্থির করে ফেলেছিল, সপ্তাহ দুয়েকের বেশি আর সে থাকবে না। আর নয়। এই পনেরো বিশ দিনের মধ্যে সুরেশ্বর যদি পারে অন্য ব্যবস্থা করে নিক। আজ গগনকে চিঠি লিখবে বলেও ঠিক করেছিল, অথচ এ কি বাধা এসে জুটল!

মালিনী পাশে পাশে যাচ্ছিল; যেতে যেতে কিছু ভাবছিল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে। এত লোক থাকতে দাদারই শেষ পর্যন্ত অসুখটা হল, হেমদি? কি হবে এখন কে জানে!"

মালিনীর ছেলেমানুষি আকুলতায় কান দেওয়া উচিত নয়, তবু হৈমন্তী ভাবল: ভাবল সুরেশ্বরের যদি কিছু হয় তবে এই আশ্রমের কি হবে? কি আর থাকবে? সুরেশ্বরকে বাদ দিয়ে মালিনীদের কল্পনা করা যায় না। একটা মাত্র মানুষ, অথচ তার অস্তিত্বই যেন সব। হৈমন্তীর কেমন যেন বেদনা বোধ হচ্ছিল। মন থেকে এই চিন্তাটা সরিয়ে দেবার জন্যে ভয় দমনের চেষ্টায় হৈমন্তী বলল, "অত ব্যস্ত হবার কি আছে, চলো আগে দেখি। জ্বর হলেই কি খারাপ ভাবতে হবে।"

মালিনী বিড়বিড় করে কিছু বলল, তার কথা ভাল করে শোনা গেল না, মনে হল সে ভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছে। ডান হাতের আলগা মুঠো বার বার কপালে ঠেকাতে লাগল, ঠোঁট নড়ছিল।

সুরেশ্বরের ঘরের বারান্দায় পা দেবার সময় হৈমন্তীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, হঠাৎ কেমন হাতে পায়ে অসাড় ভাব এল, বুকের মধ্যে ধক ধক করছিল। তবু বোকার মতন দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

সুরেশ্বর বিছানায় শুয়ে; গায়ের কম্বলটা গলা পর্যন্ত ঢাকা। পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকাল।

হৈমন্তী সুরেশ্বরকে লক্ষ করল। লক্ষ করার সময় তার দু রকম মনোভাব হল। প্রথমে তার মনে হল, সে যে-সুরেশ্বরকে দেখছে, সেই সুরেশ্বর তার অতি অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিল, যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে যাবার পরও কোথাও যেন একটা বন্ধন আছে, দায়িত্ব। এই সুরেশ্বর তাকে ব্যাকুল, বিচলিত ও ভাবপ্রবণ করে তুলছিল। পরে, সামান্য পরে, বিছানার মাথার কাছে এসে পিঠ নুইয়ে সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার চোখের ওপর থেকে কয়েক মুহূর্তের আগেকার সুরেশ্বর যেন কোথাও অদৃশ্য হল, পরিবর্তে সে অসুস্থ এক রোগীকে দেখতে পাচ্ছিল। মিলিয়ে আসা ধোঁয়ার মতন পূর্বের আবেগ হয়ত ছিল সামান্য, কিন্তু এখন তা হৈমন্তীকে অত কাতর অথবা বিহ্বল করছিল না। সুরেশ্বরের মুখ লক্ষ করতে করতে হৈমন্তী হাত বাড়াল, "কখন জ্বর এল?"

"মাঝরাতে—" সুরেশ্বর বলল, বলে কম্বলের তলা থেকে হাত বের করে দিল।

হৈমন্তী সযত্নে, একটু বেশি সময় নিয়ে নাড়ি দেখল। "হঠাৎ এল?"

"কাল সারাটা দিনই শরীরটা ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যের দিকে খুব শীত করছিল।"

সুরেশ্বরের কপালে একবার হাত দিল হৈমন্তী, দেখল। "থার্মোমিটার আছে এখানে?"

"না," সুরেশ্বর হাসবার মতন মুখ করল "ছিল একটা, ভেঙে গেছে।"

হৈমন্তী মালিনীকে থার্মোমিটার আনতে পাঠাল। তার ঘরে থার্মোমিটার আছে, হাসপাতালে যেতে হবে না।

"দেখি, বুকটা..." জড়ানো স্টেথসকোপ খুলতে খুলতে হৈমন্তী বলল।

মুখ পিঠ দেখল হৈমন্তী, জিব দেখল সুরেশ্বরের। "এখনও শীত করছে?"

"কখনো সখনো।"

"মাথায় খুব যন্ত্রণা?"

"মাথাটা বড় ধরে আছে।"

"আর কি কষ্ট—?"

"গায়ে হাতে ব্যথা, কোমর পিঠে।"

হৈমন্তী কিছু ভাবছিল, বলল, "দেখি, তোমার গা পিঠ দেখি আর-একবার।"

সুরেশ্বর সকালে গায়ে জামা দিয়েছিল, জামাটা তুলল; হৈমন্তী নিজের হাতে সুরেশ্বরের গেঞ্জি তুলে গা পিঠ খুঁটিয়ে দেখল। দেখার সময় অকস্মাৎ তার মনে হল, সুরেশ্বরের গায়ের চামড়ায় যেন বয়সের নিষ্প্রভতা এসেছে, অনেক ময়লা হয়ে গেছে রঙ।

সুরেশ্বর আবার গুছিয়ে গায়ে ঢাকা নিয়ে বসল।

হৈমন্তী বলল, "দেখ, আবার চিকেন পক্স না হয়!"

"চিকেন পক্স!"

"দু তিনটে দিন না গেলে বোঝা মুশকিল। নয়ত, আর কিছু না; সর্দি-জ্বরের মতন মনে হচ্ছে।"

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্ত হৈমন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, "এখানে আমার জ্বর-জ্বালা আগে কখনও হয় নি। গত বছরে একবার হাঁপানির মতন হয়েছিল। কাল থেকেই কি রকম হাঁপ ধরছে, হাঁপানিটা আবার হবে না তো?"

হৈমন্তী হ্যাঁ-না কিছু বলল না। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। মালিনী যে-রকমভাবে গিয়ে খবর দিয়েছিল তাতে ভয় পাবারই কথা।

সুরেশ্বর জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশ্বাস ফেলে মুখ ফেরাল সামান্য; বলল, "হেম, আমার সত্যি লজ্জাই করছে; জ্বরটা আসার পর কেমন মনে হয়েছিল তোমায় আবার বুঝি বিব্রত করতে হল...। কিছুই তো বলা যায় না; জ্বর এসেছে দেখে দুশ্চিন্তাই হয়েছিল। এখন ভালই লাগছে; সর্দিজ্বর এমন-কিছু নয়।"

হৈমন্তী কথাগুলো শুনল। তার মনে হল, সুরেশ্বর এখন বিব্রত হবার কথাও ভাবছে। কেন? সে কি ভেবেছিল, তেমন কিছু হলে হৈমন্তী আটকা পড়বে? হৈমন্তীকে তবে আর আটকে না রাখার ইচ্ছেই হয়েছে সুরেশ্বরের।

হৈমন্তী কি স্থির করেছিল সে কথা এখানে তোলার প্রয়োজন মনে করল না। সুরেশ্বরের এই জ্বর, এখন পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে, সাধারণ; এই জ্বরের জন্য তার আটকে পড়ার কোনো কারণ নেই। গগনকে অনায়াসেই হৈমন্তী কাল-পরশু নাগাদ চিঠি লিখতে পারবে।

সুরেশ্বর বলল, "আমি আজই গগনকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম।...তুমি শীগ্গির যাচ্ছ—ওকে জানিয়ে দিতাম।"

হৈমন্তী মুখ ফিরিয়ে সুরেশ্বরকে দেখল। তা হলে তুমিও ভেবে নিয়েছ শেষ পর্যন্ত। যাক্, ভাল; ভালই হল। এখানে কৌতুক বা পরিহাস করা শোভা পায় না, নয়ত হৈমন্তী হয়ত শুধতো, তোমার ডাক্তারের ব্যবস্থা তাহলে হয়ে গেছে।

"কাল—" সুরেশ্বর বলল, "আমি তোমায় আরও কয়েকটা দিন থাকার কথা বলছিলাম। পরে ঘরে ফিরে এসে আমার মনে হল, সত্যিই তোমাকে আর থাকতে বলা উচিত না।"

হৈমন্তী অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, সরাসরি মুখ ফিরিয়ে সুরেশ্বরকে দেখল না—আড়চোখে চকিতের জন্য একবার দেখে নিল। সুরেশ্বর কি অভিনয় করতেও শিখেছে! বরং কাল, সুরেশ্বরের স্বার্থ-চিন্তাও এমন কটু লাগছিল না হৈমন্তীর; এখন লাগছে। এখন মনে হচ্ছে, সুরেশ্বর বিনীত হবার এবং উদার হবার চেষ্টা করছে, এই উদারতার মধ্যে কৃত্রিমতা, বিনয়ের মধ্যে অক্ষমতা আছে। কি প্রয়োজন ছিল তোমার এসব কথা বলার! তোমার কি মনে হল, না হল, তাতে আমার যাওয়া আটকাচ্ছে না। আমি ফিরে যাচ্ছি। নিতান্ত তোমার মুখ-রক্ষা করার জন্য আরও দশ-পনেরোটা দিন আছি। তারপর আর নয়।

সুরেশ্বর বালিশে ভর দিয়ে আধ-শোয়া হল। বলল, "কাল তুমি ঠিকই বলেছ, হেম। এখানে থাকলে তোমার অসুখ-বিসুখ হতে পারে; হলে সে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। যদি কিছু হয়। এ-অসুখের কিছুই যখন ঠিক নেই তখন তোমার জীবনের দায়িত্ব আমার নেওয়া উচিত নয়। আমি যা দিতে পারব না, তা আর নেব না।"

জানলার কাঠ ছুঁয়ে রোদের পা সামান্য এগিয়েছে, দু-তিনটে চড়ুই একে অন্যের গা ঠুকরোতে ঠুকরোতে এবং কিচমিচ শব্দ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পাক খেয়ে আবার ফরফর করে উড়ে গেল। যাবার সময় কার একটা পালক খসে গেল, পালকটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে সুরেশ্বরের বিছানার ওপর এসে পড়ল।

সুরেশ্বরের শেষ কথাগুলো হৈমন্তীর কানে লাগল, যেন অনেক কিছু লেখার পর রবার দিয়ে আর সব মুছে শেষের কয়েকটা কথা রেখে দেওয়া আছে, আর ক্রমাগত কেউ তার ওপর পেনসিল বুলিয়ে সেটা মোটা করছে। সুরেশ্বর কি বলতে চাইল? জীবনের দায়িত্বের কথাটা তুলে সে কি খুব সাবধানে এবং লুকিয়ে একটা খোঁচা দিল হৈমন্তীকে? সে কি বোঝাতে চাইল : সুরেশ্বর শুধু জীবন নয়, আরও কিছু—যেমন ভালবাসা—দিতে পারবে না বলে ভালবাসা নেবে না।

নিজের ওপর হঠাৎ কেমন বিরক্ত হল হৈমন্তী। মনে হল, সে ছেলেমানুষের মতন যা-তা ভাবছে। ভালবাসার কথা আর ওঠে না। কিসের ভালবাসা! সুরেশ্বরকেই কি আর ভালবাসে হৈমন্তী? না—। দেওয়া-নেওয়ার কথা অবান্তর।

হৈমন্তী বিরক্তির মধ্যেই বলল, "আমি যাবার মোটামুটি সময় ঠিক করে ফেলেছি।"

সুরেশ্বর যেন কথাটা শুনেও গা করল না। বলল, "হেম, আমি কাল তোমায় বলেছিলাম—তোমায় আমি ছকের ঘুঁটি করি নি। রাত্রে আমি ভেবে দেখেছি, তুমি অন্যায় কথা বলো নি, ঠিকই বলেছ। সত্যিই তো, আমার স্বার্থ ছাড়া তোমায় আমি আনব কেন!" সামান্য চুপ করল সুরেশ্বর, পরে বলল, "কাল তোমার অনেক কথাই আমার বড় লেগেছিল, হেম। কি জানি—তুমি বলেছিলে বলেই লেগেছিল। মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল।...যাক্‌গে—ভালই হয়েছে। নিজেকে মাঝে মাঝে অন্যের চোখ দিয়েও দেখতে হয়।" সুরেশ্বর এবার হাসবার চেষ্টা করল। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, কথার শেষে বার-কয়েক হাঁপাল, সর্দিতে গলা ভারী হয়ে আছে।

হৈমন্তী অস্বস্তি বোধ করে উঠে দাঁড়াল। মালিনী থার্মোমিটার আনতে গিয়ে হারিয়ে গেল নাকি! থার্মোমিটার খুঁজে পাচ্ছে না? কি মুশকিল, হৈমন্তী তো বলেই দিয়েছে টেবিলের ওপর সেলাই করার বাক্সের মধ্যে থার্মোমিটারটা আছে। তবু পাচ্ছে না! কথাটা তখন কানে শুনেছে কি না মালিনী কে জানে! ওই রকমই ওর স্বভাব। বা, কে জানে থার্মোমিটার আনার ফাঁকে আরও সাত জায়গায় সুরেশ্বরের অসুখের খবরটা পৌঁছে দিয়ে আসছে কি না! হৈমন্তী অস্থির হয়ে জানলার দিকে গেল।

হৈমন্তীর চাঞ্চল্য লক্ষ করছিল সুরেশ্বর। বলল, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, না?"

"হাসপাতালে যাচ্ছিলাম।" জানলার কাছ থেকে হৈমন্তী বলল, গলার স্বর অনুচ্চ এবং বিরক্তি সত্ত্বেও কেমন উদাসীন।

"তাহলে তুমি যাও। মালিনী এলে আমি জ্বর দেখে তোমায় খবর পাঠাব।"

"দেখি আর-একটু।...রুগীটুগীও তো আসে না বড়-একটা আজকাল..." হৈমন্তী মাঠে মালিনীকে দেখতে পেল। ছুটে ছুটে আসছে। "ওই তো আসছে—" হৈমন্তী বলল।

অল্প পরেই মালিনী এল। তার মুখ দেখে মনে হল, কি একটা অপরাধ করে ফেলেছে। হৈমন্তী হাত বাড়িয়ে থার্মোমিটার নিল, "এত দেরি?" বলার সময় হাতের থার্মোমিটারের খাপ দেখেই বুঝতে পারল, এই থার্মোমিটার তার নয়।

মালিনী মুখ নীচু করে অপরাধীর মতন

বলল, "আপনারটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।"

হৈমন্তীর রাগ করা উচিত ছিল না; তবু তার কেমন রাগ হল। হুড়োহুড়ি করে আনতে গিয়েই যে মালিনী হাত থেকে থার্মোমিটার ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। এত ছটফট করার কি আছে! সুরেশ্বরের জ্বর হয়েছে তার জন্য তুমি যে একেবারে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছ, যেন তোমার আর হাতে-পায়ে জোর নেই।

হাসপাতালের থার্মোমিটারটা ব্যবহার করার আগে হৈমন্তীর মন খুঁত খুঁত করল কি না কে জানে, ধুয়ে-মুছে নিয়ে সুরেশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিল।

জ্বর উঠল একশো এক। ছিটেফোঁটা বেশি; সেটা কিছু নয়।

হৈমন্তী সুরেশ্বরের দিকে আধা-আধি তাকিয়ে বলল, "মালিনীর হাতে দু একটা ওষুধ দিয়ে দি; অল্পতেই সাবধান হওয়া ভাল।" বলে মালিনীকে আসতে বলে চলে গেল। যাবার সময় সাবধান করে দিয়ে গেল, ঠাণ্ডা যেন না-লাগানো হয়।

বাইরে এসে মাঠ দিয়ে রোদে হেঁটে যেতে যেতে হৈমন্তীর এখন আর তেমন দুর্ভাবনা হচ্ছিল না। বরং কিছুক্ষণ আগে যে ভীষণ আতঙ্কের ভাবটা এসেছিল তা কেটে যাওয়ায় যেন মনস্থির করে ভাবতে পারছিল, চোখে দেখতে পাচ্ছিল। মাঠে অফুরন্ত রোদ, ঘাসের শিশির প্রায় শুকিয়ে এল, আকাশ নীল, আশ্রমের দু একজন সুরেশ্বরের ঘরের দিকে যাচ্ছে, ওদের কানে খবরটা যে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তাঁত-ঘরের দিকে কাটা জল রোদ পোয়াচ্ছে, সবজি ক্ষেতে বুঝি জল দিচ্ছে কারা, কোণাকুণি বাতাসে গন্ধ ভেসে আসছে, কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ে আসছে, দূরে শিমুল গাছটার পাতা হয়ত।

একটা কথা ভেবে হৈমন্তীর খুবই অবাক লাগছিল। সুরেশ্বর আজ আগাগোড়া কিভাবে অম্লান বদনে সব স্বীকার করে গেল। কাল তার অন্য রকম কথাবার্তা ছিল, অন্য ধরনের যুক্তি, প্রতিবাদ; এমন কি কাল সে ক্ষুব্ধও হয়েছিল; আজ সকালে একেবারে আলাদা কথাবার্তা: মনে হল, রাতারাতি পালটে গেছে। সুরেশ্বর যে রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে যায়নি তা ঠিকই, বা তার কথাবার্তায় এতটা পালটে যাওয়া যে স্বাভাবিক তাও নয়, তবু—হৈমন্তীর মনে হল—সুরেশ্বর যতই চাপা দেবার চেষ্টা করুক খানিকটা ঘা সে খেয়েছে। আজ সকালে যা করল, তা হল অনেকটা ভদ্রভাবে বিদায়-পর্ব সারা: বচসা, তর্কাতর্কি না করে, মনোমালিন্য আরও না বাড়িয়ে কাউকে বিদায় দেবার সময় আমরা যেমন বিনয় করে 'আচ্ছা আচ্ছা' করি সে রকম। সুরেশ্বরের এটা স্বভাব: সে বিরোধের শেষ পর্যন্ত যেতে চায় না, তার আগেই প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে, হৈমন্তীর ধারণা, সুরেশ্বর তার স্বভাব মতন কাজ করেছে। তাছাড়া সে বুঝতে পেরেছে জোর করে বলার মতন তার কিছু নেই, এমন একটাও যথার্থ কারণ সে দেখাতে পারবে না যা তার আচরণকে সমর্থন করবে।

হৈমন্তীর কেমন অদ্ভুত এক সুখ এবং দুঃখ হচ্ছিল। সুখ হচ্ছিল এই ভেবে যে, সুরেশ-মহারাজকে সে আহত ও ক্ষুণ্ণ করতে পেরেছে; শিক্ষা না হোক অন্তত বিব্রত ও কুণ্ঠিত করতে পেরেছে। তবু তো সব কথা—হৈমন্তীর মনে যা ছিল, যা ভাবে হৈমন্তী—বলতে পারল না; লোকটার মনে যে আত্মমোহ, ভীরুতা, অহংকার, আধিপত্যের ভাব ছিল তা তাকে চিনিয়ে দেওয়া গেল না। দিলে ভাল হত। সে যে সঙ্গে সঙ্গে চিনে নিত তা নয়, তবু কাঁটার মতন বিঁধত। সেই জ্বালা সে ভোগ করত।

আবার হৈমন্তীর দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে, মানুষটা তার নিরাসক্ত, দৃঢ়, আত্মম্ভর চরিত্র—বা চরিত্রের সেই ভান নষ্ট করে হঠাৎ যেন নিজেকে নুইয়ে দিল। বলতে গেলে, হৈমন্তী বেশ বুঝতে পারছিল, তার ঘরে সুরেশ্বর নুয়ে পড়ে নি, ইচ্ছে করে নিজেকে অনেকটা নুইয়ে দিয়ে হৈমন্তীর সন্তোষ বিধান করল যেন। এ-রকম না করলেই সুখী হত হৈমন্তী। এক এক সময় এত সহজে নুয়ে পড়া দেখে মনে হয়, সুরেশ্বর যেন প্রতিপক্ষকে অযোগ্য মনে করে লড়ল না, মাথা অবনত করে উপহাস করল।

হৈমন্তী হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। রোগী দেখতে পেল না বারান্দায়। ফাঁকা পড়ে আছে সব। এই দৃশ্যও তার কেন যেন মনঃপূত হল না।

যুগলবাবুও বাইরে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। হৈমন্তী বুঝল, সুরেশ্বরের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বিকেলের পর অবনী এল।

হৈমন্তী বলল, "আসুন। এ ক'দিন কি হল! কাজ?"

"না—" অবনী মাথা নাড়ল হেসে, "কাজের জন্যে অতটা নয়, গাড়িটা বিগড়ে গিয়েছিল।"

"ও গাড়ি আবার খারাপ হয় নাকি?" হৈমন্তী হেসে বলল।

ঘরে এসে বসতে বসতে অবনী বলল, "সব গাড়িই বিগড়োয়।"

নিজের হাতেই বাতি জ্বালিয়ে নিল হৈমন্তী। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

"তারপর, কি খবর বলুন?" অবনী শুধলো।

"আপনাদের সুরেশ-মহারাজের জ্বর;" হৈমন্তী বলল।

"জ্বর!" অবনী চমকে উঠতে গিয়েও তেমন চমকাল না। হয়ত হৈমন্তীর গলার স্বরে কোনো গুরুত্ব না থাকায় এবং হালকা করে কথাটা বলায় অবনী অতটা আতঙ্কিত হল না। তবু সে উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

হৈমন্তী বলল, "ভয়ের কিছু নয়; সর্দিজ্বর বলেই মনে হচ্ছে।"

অবনীর চমকিত ভাবটা কাটল; চোখের পলক ফেলে দৃষ্টি হৈমন্তীর চোখের তলা থেকে নামাল।

"সর্দিজ্বর!"

"তবে বলা যায় না, চিকেন পক্সও হতে পারে..., এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

"কেমন আছেন এখন?"

"ভাল। দুপুরে জ্বর সামান্য বেড়েছিল, এখন—বিকেলে দেখলাম, কমেছে।"

"কত?"

"একশো।"

অবনী চুপ করে থাকল।

"আপনি আমায় যা অপদস্থ করেছেন—" হৈমন্তী সামান্য হেসে বলল, তিরস্কারও যেন রয়েছে।

"অপদস্থ! কেন?"

"গগনকে আপনি চিঠি লিখেছেন?"

"লিখেছি।" অবনী অবাক হচ্ছিল।

"গগন আবার ওকে লিখেছে।... ও ভাবল, আমি গগনকে লিখেছি।"

"না, আমি লিখেছিলাম।...এখানে খুব প্যানিক। রোজই দু-চারটে করে মারা যাচ্ছে শুনি।" অবনী চিন্তিত মুখে বলল।

"আপনি কি যে লিখলেন, ও ভাবল—আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গগনকে লিখেছি।" হৈমন্তী যেন এখনও এই বিষয়ে তার ক্ষুব্ধ ভাবটা সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি।

অবনী হৈমন্তীকে দেখতে দেখতে এবার পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, "গগন আপনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে লিখেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তাই লিখেছিলাম।"

হৈমন্তী এবার কৌতুক করেই বলল, "গগন আবার আপনাকে আমার গার্জেন করে দিয়ে গেছে, কিছু তো আর বলা যাবে না।"

অবনী কৌতুকটা উপভোগ করল হয়ত, বলল, "গার্জেনের রেসপন্সিবিলিটি বড় বেশি।...কিন্তু তা নয়। আপনি কি অবস্থাটা সব জানেন?"

"কি?"

অবনী এবার আর হাসল না, বলল,

"এখান থেকে মাইল চার দূরে একটা গ্রাম আছে, মোটামুটি বড়ই, সেই গ্রামে দিন তিনেকের মধ্যে পাঁচজন মারাই গেছে, ভুগছে যে কত কে জানে!...ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার নয়। বিজলীবাবুর কাছে আমি খবরাখবর পাই, তাঁর বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টাররা তো সারাটা তল্লাট রোজ ঘুরছে, তাদের খবরে রিলাই করা যায়।... আপনি জানেন না কোনো কোনো গ্রাম থেকে লোক পালাচ্ছে।"

হৈমন্তী শুনল। অবনীর উদ্বেগ অকারণ নয় হয়ত, কিন্তু গগনকে কি এইসব কথাও লিখেছে নাকি! সর্বনাশ, তা হলে—বলা যায় না—কোনো রকমে মার কানে কথাটা উঠলে, হয় পত্রপাঠ ফিরে যাবার টেলিগ্রাম না হয় গগনকেই মা পাঠিয়ে দেবে তাকে নিয়ে যেতে। হৈমন্তী চোখ তুলে বলল, "সর্বনাশ, আপনি কি গগনকে একথা লিখেছেন?"

"খানিকটা লিখেছি", অবনী হেসে ফেলে জবাব দিল।

দু পলক অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হৈমন্তী বলল, "তা-ই।...এখন বুঝতে পারছি, গগন কেন অত তাড়া দিয়েছে।"

অবনী কথা বলল না, ধোঁয়া গিলে আস্তে আস্তে নাক মুখ দিয়ে বের করতে লাগল।

খানিকটা চুপচাপ থাকার পর হৈমন্তী বলল, "আমি তো যাচ্ছি।"

অবনী তাকিয়ে থাকল, খুব একটা বিস্মিত হবার মতন কিছু যেন নয়, অথচ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধা রয়েছে দৃষ্টিতে। "যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ—" মাথা নাড়ল হৈমন্তী।

"কখন?"

"দিন পনেরোর মধ্যেই।" বলে হৈমন্তী আরও কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ভেঙে তাকিয়ে থাকল; পরে কি মনে করে কিছু বলল না।

"সুরেশ্বরবাবু জানেন?"

"হ্যাঁ—জানেন।"

"কিছু বললেন না?"

"প্রথমে আরও কিছুদিন থাকার কথা বলেছিল, পরে আর বলেনি।" হৈমন্তী সামান্য বেঁকা হয়ে টেবিলের দিকে ঝুঁকে বাতির শিস ঠিক করতে লাগল। আলো তার মুখে, চোখ নাক চিবুক আলোময় হয়েছিল, চুলের খোঁপা, ঘাড় পিঠ ছায়ায়। সোজা হয়ে বসতে বসতে এবার বলল, "আগে যাবার কথা আমি কিছু ঠিক করিনি, বলিও নি; কিন্তু পরে ওর ভাবসাব দেখে আমার খারাপ লাগল। আরও আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল, নেহাত—" হৈমন্তী থেমে গেল, খানিকটা ঝোঁকের মাথায়, খানিকটা উদ্মাবশে সে কথাটা বলে ফেলেছে। কাল থেকেই কথাটা সে ভুলতে পারছে না: সুরেশ্বর কি করে ধরে নিল হৈমন্তী প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পালাতে চাইছে, কেনই বা সুরেশ্বর ঘুণাক্ষরেও হৈমন্তীকে নতুন ডাক্তার খোঁজার কথা জানায় নি! নিজেকে অন্তত এ ব্যাপারে এত অপমানিত ও আহত বোধ করেছে হৈমন্তী যে রাগ, অভিমান, অসম্মানের জ্বালা যেন কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিল না। অন্য কাউকে কথাটা শোনানোর জন্যে তার ভেতর থেকে একটা উত্তেজনা ছিল। অবনীর কাছে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় হৈমন্তী আগে কখনও আলোচনা করত না, পরে কখনও কখনও নিজের বিরূপতা জানিয়েছে যদিও তবু সেই বিরূপতায় সুরেশ-মহারাজ ছিল, আশ্রম ছিল—সুরেশ্বর ছিল না। তারপর ভাসাভাসাভাবে সুরেশ্বরও হয়ত এসেছে—তবু স্পষ্ট করে ধরাছোঁয়ার কিছু থাকত না। ইদানীং, বিশেষ করে সেদিন, মাদাউআলের সেই ইনসপেকসান বাংলোয় অবনী যেন আর কোনো অস্পষ্টতা না রেখেই সুরেশ্বরের কথা তুলেছিল, হৈমন্তী বাধা দেয়নি, দিতে পারেনি। সেদিনের পর ব্যক্তিগত কথাটা আর চাপা রাখার চেষ্টা অকারণ; বিসদৃশ বলেই যা উচ্চকণ্ঠে ওরা—অবনী বা হৈমন্তী—কথাটা তোলে না, নয়ত মনে মনে আজ আর কোনো বাধা অনুভব করে না।

আজ, এখন হৈমন্তী সুরেশ্বরের ব্যবহারের প্রসঙ্গটা উদ্মাবশে হঠাৎ তুলে ফেলার পর অনুভব করল, অবনীর কাছে কথাটা পুরোপুরি বলতেও তার দ্বিধা বা সংকোচ হচ্ছে না। বরং বলার বাসনা জাগছে, ভাল লাগছে। হৈমন্তী বলল, "আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই এটা ওর ইচ্ছে ছিল না। আরও কিছুদিন থাকতে বলেছিল।...আশ্রমে আবার যদি কারও অসুখ-বিসুখ করে তাই রাখতে চেয়েছিল।...যে যার নিজের দিকটাই দেখে।"

অবনী হৈমন্তীর আচরণের মধ্যে উত্তেজনা এবং বিরূপতা অনুভব করতে পারছিল। কিছু বলল না।

হৈমন্তী হঠাৎ বলল, "আপনাদের সুরেশ-মহারাজ নতুন ডাক্তার আনছেন।"

"বললেন—?" অবনী যেন কথার কথা কথা বলল।

"কাল বললেন।...অনেক দিন থেকেই নাকি খোঁজাখুঁজি করছেন..." হৈমন্তীর ঠোঁটের প্রান্ত কুঁচকে এল, চোখে কেমন উপহাস উপচে উঠছিল। "আমাকে কেউ অবশ্য জানান নি অবশ্য, কিন্তু তলায় তলায় চিঠি লেখালেখি, বিজ্ঞাপন দেবার কথাও ভেবে রাখা হয়েছিল। নেহাত নাকি এই অসুখটা এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল। নয়ত, এতোদিনে আমায় তাড়াতেন।" কথার শেষে হৈমন্তী বিদ্রূপ করে হাসবার চেষ্টা করল, হাসল, অথচ সে হাসি করুণ দেখাল।

অবনী কি বলবে ভেবে পেল না। হৈমন্তীর কোথায় লেগেছে তা অনুমান করার চেষ্টা করে বুঝতে পারছিল: সম্মানে লেগেছে। লাগা অসম্ভব নয়। সে অক্ষম এই অপরাধে সুরেশ্বর নিশ্চয় নতুন ডাক্তারের খোঁজ করছে না, হৈমন্তীকে রাখা যাবে না—বা হৈমন্তী থাকবে না বুঝেই হয়ত নতুন ডাক্তারের খোঁজ করছিল; কিন্তু হৈমন্তীকে কথাটা না জানিয়ে সুরেশ্বর ভাল করে নি। অবশ্য অবনী ভাবল, জানালেই কি হৈমন্তী প্রসন্ন হত?

হৈমন্তীকে শান্ত ও সুস্থির করার আশায় অবনী সামান্য হেসে হালকা গলায় বলল, "না, আপনাকে তাড়াতেন না। ভদ্রলোক এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নন। আপনি থাকবেন না বুঝেই একটা ব্যবস্থা করছিলেন আর কি!"

হৈমন্তী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসার মুখ করল।

সামান্য সময় চুপচাপ আবার। অবনী শেষে বলল, "সুরেশ্বরবাবুকে একবার

দেখে আসা দরকার।... চলুন, যাবেন নাকি?"

"চা খেয়ে যাবেন না? বসুন একটু—চা করে আনছি। মালিনী বোধ হয় এদিকে নেই।" হৈমন্তী বলল : সামান্য অন্যমনস্ক, বোধ হয় এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল, নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিল এবার।

হৈমন্তী উঠছিল, অবনী বাধা দিল, বলল, "এখন থাক—, দেখাটা করে আসি, এসে চা খাব। আপনি যাবেন?"

মাথা নাড়ল হৈমন্তী, "না। আমি বিকেলেও গিয়েছি। আপনি ঘুরে আসুন।"

অবনী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, যেন শেষ পর্যন্ত হৈমন্তী মত বদলাতে পারে। পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তাহলে ঘুরে আসি।"

সুরেশ্বরের ঘরের বারান্দায় ছোটখাট ভিড় ভেঙে গিয়েছে, তারা কেউ সিঁড়িতে, কেউ বাগানে, কেউ বারান্দায়—অবনী এসে পৌঁছল। শিবনন্দনজী তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অবনীর সঙ্গে চোখের পরিচয়, সরে দাঁড়িয়ে পথ দিলেন এবং নমস্কার জানালেন। অবনী মাথা সামান্য নীচু করে প্রতিনমস্কার জানাল, হাত তুলল না। "কেমন আছেন সুরেশ্বরবাবু?"

"ভাল," শিবনন্দনজী জবাব দিলেন।

ঘরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে অবনী শুনল শিবনন্দনজী বারান্দা দিয়ে নামতে নামতে কি যেন বলছেন অন্যদের; মনে হল তিনি কোনো বিষয়ে কিছু ব্যস্ত এবং ভেঙে যাওয়া ভিড়ের কাউকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কাউকে কোথাও থেকে আনা না-আনার কথা বলেই মনে হল।

মাঝের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল। অবনী কয়েক পা এগিয়ে এসে ডাকল, "সুরেশ্বর-বাবু—।"

পাশের ঘর থেকে সুরেশ্বর সাড়া দিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মালিনী ভেতরের বারান্দা থেকে ঘরে এল। মালিনী এ-বাড়িতেই আছে তাহলে।

মালিনী কিছু বলল না, কিন্তু এমন ভাব করল যেন অবনীকে পথ দেখিয়ে সুরেশ্বরের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে।

সুরেশ্বর বিছানার ওপর উঠে বসতে বসতে বলল, "আসুন।"

অবনী ঘরের মাঝামাঝি এসে বলল, "কি হল মশাই, আপনি আবার জর বাঁধিয়ে বসলেন কেন?...কেমন আছেন?"

"ভাল।" জর বাঁধিয়ে সুরেশ্বর যেন অপ্রস্তুতে পড়েছে, সেই রকম হাসল একটু, বলল, "বসুন। মালিনী, ওই চেয়ারটা..." সুরেশ্বর মালিনীকে চেয়ার এগিয়ে দিতে বলছিল, তার আগেই অবনী নিজে চেয়ার টেনে নিল।

"ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগিয়েছেন খুব..." অবনী বসতে বসতে বলল, "কোল্ড ফিভার।"

মালিনী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুরেশ্বর বিছানার পাশ থেকে মোটা গরম চাদর টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল, পায়ের দিকে কম্বল। বোধ হয় শুয়ে ছিল, অবনীর গলা পেয়ে উঠে বসেছে। বলল, "হেম তো তাই বলছে, সর্দিজ্বর। আমার মনে হচ্ছে বেতোজ্বর—" বলে সুরেশ্বর তার অসুখের প্রসঙ্গটা আরও লঘু করার চেষ্টা করল, "বয়েস হচ্ছে, বাত ধরছে। হাড়ে হাড়ে ব্যথা..." হাসল। "আপনাদের খবর কি? বিজলীবাবু কেমন আছেন?"

"ভাল," অবনী বলল, তার মনে হল সুরেশ্বরের চোখমুখ বেশ ফুলে আছে।

"আপনাদের দিকে এখনও অসুখ বিসুখটা ছড়ায়নি।"

"এক আধটা দেখা দিয়েছে, শুরু বলতে পারেন।"

সুরেশ্বর এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, মনে হচ্ছিল যেন সে ভেবেছিল কোনো সুসংবাদ শুনবে, অথচ দুঃসংবাদ শুনল।

অবনী বলল,—"এই এরিয়ায় এরই মধ্যে কম করে আশি নব্বইটা এই রোগে মারা গেছে। কিন্তু দেখছেন না, কারও কোনো গা নেই।...এইভাবেই অসুখটা চলবে—আরও একশো দেড়শো মারা যাবে—তারপর নিজের থেকে থামবে। ততদিনে একটা ন্যাচারাল ইমিউনিটি গ্রো হয়ে যাবে মানুষের।"

"শুনছি পাটনা থেকে কিছু ডাক্তার-টাক্তার আসছেন—"

"আসছেন...! আসুন আগে..." অবনী যেন কথাটার কোনো গুরুত্ব দিল না।

সুরেশ্বর সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, "শিবনন্দনজী খবরটবর রাখেন, তিনি বলছিলেন আসবে, শীঘ্রিই আসবে।...হয়ত এই হপ্তার মধ্যেই।"

"আপনি বিশ্বাস করেন আসবে?"

"বিশ্বাস তো করতেই হয়।"

"আপনি একটু বেশি রকম বিশ্বাসী।"

"বিশ্বাস ছাড়া চলে কই।...হয় কাউকে না হয় কিছুকে তো বিশ্বাস করতেই হয়।"

"ঠকতেও হয়। হয় না—?" অবনী সুরেশ্বরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

সুরেশ্বর অবনীর দৃষ্টি থেকে কথাটার অর্থ হয়ত বুঝতে পারল। বলল, "অনেকে তাই মনে করে।"

"আপনি করেন না?"

সুরেশ্বর আস্তে মাথা নাড়ল, না—সে মনে করে না। বলল, "আপনি যে ধরনের ঠকার কথা বলছেন, আমি তেমন কিছু ভাবছি না।"

অবনীর ইচ্ছে হল বলে, আপনার হয়ত এমনও মনে হতে পারে আপনি কাউকে ঠকাচ্ছেন না।

অবনী সুরেশ্বরের অসুস্থ অথচ সংযত ধীরস্থির মুখোভাব লক্ষ করতে করতে বলল, "আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনি আমাদের জীবনের খুব কমই দেখেছেন।...কখনও কিছু হারান নি, কিছু পান নি।"

"কিছু হারাই নি?"

"না; তেমন কিছু হারান নি—; যে জিনিস হারালে মানুষ তার ক্ষতির মূল্য বোঝে অন্তত তেমন কিছু হারান নি।"

সুরেশ্বর অপলকে অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার চোখের তারা মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, যেন স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেয়েছিল, পরে সেই উজ্জ্বলতা মরে গেল, দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা এবং বেদনার ভাব এল। চোখের পলক ফেলে সুরেশ্বর অন্যদিকে তাকাল। তারপর শান্ত গলায় মৃদুস্বরে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, বড় কিছু না হারালে মানুষ নিজেকে বুঝতে পারে না। তার দুঃখ যন্ত্রণার বোধ থাকে না।..." সামান্য সময় নীরব থাকল; তারপর হঠাৎ বলল, "আপনি কি কিছু হারিয়েছেন "

"আমার কথা আলাদা—" অবনী বলল, "জন্ম থেকেই আমি হারের খেলা খেলছি।...ধাতে সয়ে গেছে।" বলার পর সে কৌতুক অনুভবের ভান করে হাসার চেষ্টা করল।

সুরেশ্বর মুখ ফিরিয়ে তাকাল। "আপনি তা হলে খারাপ খেলোয়াড়।" সুরেশ্বরও হাসবার চেষ্টা করল।

"একেবারে রদ্দি।...এ ব্যাড প্লেয়ার উইথ এ ব্যাড লাক, স্যার।" অবনী এবার সামান্য জোরেই হেসে উঠল।

সুরেশ্বরও যেন না হেসে পারল না। হাসি থামলে বলল, "মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে।...আজ শরীরটায় তেমন জুত নেই। আর একদিন যদি..." বলতে বলতে সুরেশ্বর থামল, ভাবল, তারপর বলল, "অবনীবাবু, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারলে ভাল হত। অন্য আর একদিন..."

সুরেশ্বরের কথা শেষ হবার আগেই শিবনন্দনজী এলেন। সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চিন্তিত। কিছু বলার আছে। প্রয়োজনীয় কথা। অবনীর জন্যে যেন বলতে পারছেন না।

অবনী উঠে পড়ল। (ক্রমশ)
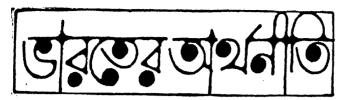
আর্থিক মন্দার আশংকা

খাদ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ লোকের অন্য জিনিসের উপর খরচ যে হ্রাস পাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আয়ের অবশিষ্ট অংশ কমে গেছে বলে নানা রকম ভোগ সামগ্রী, বিশেষ করে স্থায়ী ভোগ দ্রব্যের চাহিদা ইতিমধ্যেই পড়ে আসছে। আগের মতো বিক্রি না হলে কলকারখানায় উৎপন্ন শিল্প দ্রব্য জমে থাকবে এবং উৎপাদনের বহর কমিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কার্পাস বস্ত্র-শিল্পে উৎপাদন সম্প্রতি শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ততখানি না হলেও, শহর অংশে খাদ্য কেনার পর লোকের বাকী আয় কমে আসছে। সুতরাং যে শিল্পগুলি আভ্যন্তরিক বাজারের সম্প্রসারণের মুখাপেক্ষী সেগুলির এখন শিল্পোন্নয়নে উৎসাহী না হওয়াই স্বাভাবিক।

চাহিদার অবনতি

চাহিদা হ্রাসের ফলে দু-একটি শিল্প কাঁচা মাল মজুত করে রাখতে চাইছে না; আবার, কাঁচা তুলো এবং আখের মতো কৃষি-জাত উপকরণের যোগান কমে যাওয়ায় অন্য কয়েকটি শিল্প অসুবিধায় পড়ছে। যে সব শিল্প ইস্পাতের মতো উপকরণ অথবা কল-কব্জার মতো মূলধন দ্রব্য তৈরি করে সেগুলি বোধ হয় আরো অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। এই ধরনের সামগ্রীর চাহিদা দেশে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থার অধীন মূলধন নিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। দেশের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেবার পর ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রথম সরকারী অংশে মূলধন নিয়োগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত দূর মনে হচ্ছে, নতুন বছরে প্রাগুক্ত ক্ষেত্রে বেশি টাকা খাটানো হবে না। আর, বেসরকারী ব্যবস্থায় মূলধন নিয়োগের বহর আগেই কমে গেছে এবং ১৯৬৭ সালে ঐ নিম্নমুখী ধারা সম্ভবত বজায় থাকবে।

উৎপাদন হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালে দেশে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় সরকারের আয়, বিশেষ করে পরোক্ষ কর থেকে আয় কমে এসেছে। রাজস্ব হ্রাসের ফলে উন্নয়ন-খাতে ব্যয় সংকোচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে উৎপাদন আরো কমে যাবে।

পর পর দু বছর খরার জন্য কৃষি উৎপাদনের অবনতি ঘটেছে। খরার পুনরাবৃত্তি যে হবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তার চেয়ে বেশি, নতুন বছরে যদি আশানুরূপ বৃষ্টিপাত হয়ও, একটা মাত্র ভালো ফসল দেশের খাদ্যের মোট ঘাটতি কতখানি পূরণ করতে পারবে তা বলা শক্ত। বছরে আমরা যেখানে ৮ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করি, সেখানে আমাদের ঘাটতি শতকরা ১০ ভাগের মতো।

খরা অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যদান, সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে সরকারের ব্যয় বেড়ে গেছে এবং চলতি বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতি গোড়ায় যে ৩২ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল সেই অঙ্ককে ছাড়িয়ে যাবে মনে হয়। অন্য দিকে, টাকার বিনিময় মূল্যে হ্রাসের প্রতিক্রিয়া বাজেটের উপরও দেখা দেবে। প্রকৃতপক্ষে, মুদ্রা মূল্যে পরিবর্তনের পর থেকে আমাদের রপ্তানি কমে গেছে বলে বাজেটের উপর চাপ পড়বে।

'উন্নয়ন ব্যয়ের রদবদল'

এক কথায়, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা এখন কেবল নিস্তেজ অবস্থা নয়, রীতিমতো মন্দার মুখোমুখি হতে পারে—এ রকম আশংকা দেখা দিয়েছে। সম্ভাবনাহীন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বৈষয়িক অগ্রগতির উপর খরচ আরো ছেঁটে ফেলা উচিত হবে কিনা তা ভাববার বিষয়। উন্নয়ন খাতে ব্যয় সংকোচন এখনই এবং পরবর্তী কালে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করবে। বস্তুত দেশে অনেক রকম শিল্প দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় না, একমাত্র ক্রেতা হচ্ছে সরকার। এ বছর উন্নয়ন-সংক্রান্ত সরকারী ব্যয় যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ফলে কয়েকটি শিল্পে ইতিমধ্যেই সমস্যা জেগে উঠেছে। প্রশাসন ব্যয় সংকোচের সম্ভাবনা ক্ষেত্র আছে, তাতে সন্দেহ নেই। আবার, উপাদান ও উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার—উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে তার নিয়োগ অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করলে যাতে সত্যিকার কাজ হয় তা দেখা দরকার।

এই দিক থেকে দেখলে, চতুর্থ যোজনা-কালে সরকারী ব্যবস্থায় ১৬,০০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে কিনা তা নিয়ে এখন যে তর্ক উঠেছে সেটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী আয়-ব্যয় বছরে বার্ষিক পরিকল্পনার আকার যদি চলতি বছরের প্রায় ২,১০০ কোটি টাকার পরিকল্পনার চাইতেও সামান্য ছোট হয়, তাহলে কার্যত চতুর্থ যোজনাকে হ্রস্ব করা হবে। কেননা, সংকল্প অনুসারে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সমষ্টি এবং বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় যেখানে আগের বছরের ব্যয়ের তুলনায় বেশি সেখানেও তা একটা ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে যে উৎপাদন-ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে, উন্নয়ন-খাতে ব্যয় কমিয়ে দিলে তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাবে না এবং আমাদের আসল অভীষ্টে (মাথাপিছু আয়ের সম্যক বৃদ্ধি সাধন) পৌছতে অনেক সময় লাগবে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর কলকব্জা ও কাঁচা মালের আমদানি উদার করা হয়েছে প্রধানত শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। শিল্প-ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারের বৈষয়িক নীতিরও রদ-বদল করা হচ্ছে। এ সময় যেমন অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থব্যয় ছেঁটে ফেলা এবং অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা, বিশেষ করে অনির্ণেয় উৎসের টাকা কর বসিয়ে এবং অন্য উপায়ে কমিয়ে দেওয়া দরকার, সেই রকম, দেশের উৎপাদনশীল অংশগুলিতে মূলধন নিয়োগ এবং নির্মিত উৎপাদন-শক্তির পূর্ণতম ব্যবহার সবচেয়ে জরুরী।

শান্তিকুমার ঘোষ

সোবার্সের টেস্ট

বিশ্বজিৎ রায়
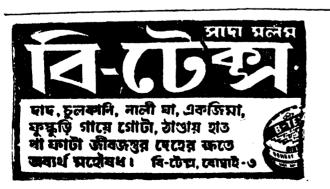
ছ বছর ইডেন গার্ডেনে টেস্টম্যাচ দেখি নি। গত ক' বছরে যে-সব নতুন খেলোয়াড় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমার অচেনা যদিও তাঁদের সস্কৃতিতে লব্ধ ভারতের নানান সফলতার সংবাদ রেখেছি। তাই, এবারে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট দেখার বাসনা আর পাঁচজনের চেয়েও বেশী হয়ে উঠেছিল। ক্রিকেট-খেলা দেখায় যে-সব যোদ্ধাদের কামনা অনন্ত অথচ টিকিট সংগ্রহের কায়দা অনায়ত্ত তাঁদের দলে পড়ি নি। ছিলাম ভাগ্যলক্ষ্মীর সেই বরপুত্র-কন্যাদের সঙ্গে যাঁদের কাছে টেস্ট-ক্রিকেট একটা যৌথ কৌতূহল আর কৌতুকের বিষয় এবং সামাজিক বিভিন্ন সুবিধের সাথে সাথে ইডেন গার্ডেনের টিকিটও যাঁদের লাভ করতে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয় না।

তা জনগণের আগ্রহ-ওথলানো, খবর-কাগজের স্তম্ভ চমকানো এই খেলা কেমন জনপ্রিয় ক্রিকেট হিসেবে এক রকম, ভারতীয় ক্রিকেটের পুনঃপরিচয়ের দিক থেকে হতাশ-জনক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দলগত নৈপুণ্যের বিচারে মন্দ নয়, কিন্তু একজন খেলোয়াড়ের একক প্রতিভায় দেদীপ্যমান প্রদর্শনী হিসেবে অসাধারণ। সেই খেলোয়াড়টি হচ্ছেন গারফিল্ড সোবার্স। নায়করূপে, ব্যাটহাতে, বল-সহ ফিল্ডিং-রত—সোবার্সের যে-বিচিত্র ক্ষমতার অলৌকিক মানের দৃষ্টিনন্দন প্রমাণ পাওয়া গেল ইডেন গার্ডেনে, তার জন্যে সার্থকভাবেই বলা যায় কলকাতার ১৯৬৬-৬৭ সালের ক্রিকেট টেস্ট হচ্ছে—সোবার্সের টেস্ট।

সোবার্সকে এর আগেও ব্যাট করতে দেখেছি এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের সিরিজে ইডেনের মাঠে তাঁর শতাধিক রানের স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে মুস্তাক আলী, অমরনাথ, ওয়াজির আলী, বিজয় মার্চেন্ট, হার্ডস্টাফ, কম্পটন, সি কে নায়ডু, উইকস, কানহাই ইত্যাদির অবিস্মরণীয় সেঞ্চুরীর পাশে। সেবারই তাঁর মাঠের সর্বত্র অবলীলাক্রমে বল পাঠাবার দক্ষতা বুঝিয়ে দিয়েছিল প্রথম শ্রেণীর কোন অত্যুচ্চ ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর জায়গা। এবারে তাঁর সেই যৌবনের তেজে মিশেছে অভিজ্ঞতার দীপ্তি। ফলে গতবারের তুলনায় রান কম করলেও তিনি শক্তি এবং সৌকুমার্যের মেকদারে আরো পরিণত মূর্তিতে প্রকাশ পেলেন। আশ্চর্য দ্রুত তাঁর বল দেখার চোখ, স্থান-গ্রহণ-পটু পা, পরাবর্তকসম্পন্ন হাত। অনুশীলনের দ্বারা নিখুঁত সব ধরনের মারের কুশলী প্রয়োগেই তিনি সিদ্ধহস্ত নন, একই বলকে একাধিক দিকে তিনি চালনা করতেও পারেন সমান স্বাচ্ছন্দ্যে। লক্ষ করেছি অফ স্টাম্পের একটি বলকে তিনি একটু যেতে দিয়ে বলের ওপরে এসে করলেন সৌকর্যময় কাট; আবার ক্ষণ-পরেই ঐ একই জায়গায়-পড়া পূর্বসদৃশ বলকে সজোরে করলেন পুল, এবং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ঠিক যা করতে চেয়েছিলেন তাই হলো, বল পৌঁছলো বাউণ্ডারীতে বরাবর মাটি ঘেঁষে। কান-অবধি-তোলা কলারের পেছনে খাড়া ঘাড়, নমনীয় বৃষস্কন্ধ, চিতোন বুক দু পায়ে ভারসাম্য ছড়িয়ে দিয়ে সপ্রত্যয়ে সংহতভাবে ঝুঁকে পড়ে যখন গভীর মনঃসংযোগ সম্বলিত সুষম স্টান্স তিনি নেন তখনই বোধ হয় যে এ জাত-খেলোয়াড়।

বোলিং-এ সোবার্সের পারদর্শিতা বহুমুখী। ব্যাটসম্যানের প্রতি বাম হস্তে যে-বল তিনি করেন তা কখনো বেগবান সুইংগার, কখনো মন্থর অফ স্পিন, বা লেগ স্পিন এবং চায়নাম্যান। এর প্রতিটিতেই তিনি সুনিপুণ। এর সঙ্গে যখন দেখলাম কত তাড়াতাড়ি ব্যাটসম্যানের আর পিচের দুর্বলতা আর প্রবণতা ধরে ফেলে সেটা তিনি কাজে লাগাতে পারেন তখন সন্দেহ থাকে না যে কেবল বোলিং করার জনাই তিনি টেস্ট-দলে স্থানের দাবি করতে পারেন।

কুন্দরনের হাতে হাণ্ট রান আউট
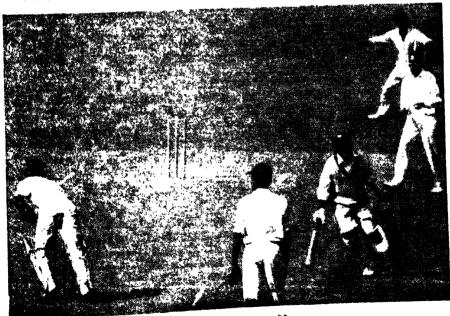
সোবার্সের বলে বেদি বাইনোর হাতে ক্যাচ আউট

আমরা ভারতের ফিল্ডিং-এর অধুনা উন্নতি সত্ত্বেও সাধারণভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় নির্বাচিত ক্রিকেটারদের কাছে ফিল্ডিং-ক্ষমতা ততটাই আশা করতে অভ্যস্ত যতটা করি পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষ থেকে দেশ-চালান সম্পর্কে স্ব-মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা-শক্তি। তাই সোবার্সের ফিল্ডিং —সে স্লিপে সুতীক্ষ্ম ক্যাচ-ধরা বা মার আটকান হোক, কি দূরে ছুটে বাউন্ডারী বাঁচানই হোক, যখন চলতে থাকে তখন কেবল ধুঝলাম বিপক্ষের পতন ঘটাতে কিম্বা রান কমাতে কী ভয়াল অস্ত্র তিনি।

ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণীর অল-রাউন্ডার দেখেছি কিছু। তাঁদের মধ্যে কীথমিলারকে এতদিন সবচেয়ে বড় স্থান দিয়ে এসেছি। কিন্তু সে স্থানে আজ বসাচ্ছি গ্যারি সোবার্সকে। অবশ্য যাঁকে কোনদিন দেখি নি কিন্তু যাঁর কীর্তি-কাহিনীতে শিশুকাল থেকে রোমাঞ্চিত হয়ে এসেছি সেই ওয়াল্টার হ্যামন্ডকেই আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার বলে গণ্য করে চলব। তাতে নিশ্চয়ই সোবার্সকে অসম্মান করা হয় না। কারণ হ্যামন্ডের পরবর্তী গৌরবাসনে অভিষিক্ত হওয়া শ্লাঘার বিষয় বলেই আমি মনে করি।

এবার সোবার্সের টেস্টের দিনপঞ্জী খুলি।

৩১শে ডিসেম্বর ইডেন গার্ডেনের জন-সমুদ্র-ঘেরা সবুজ ঘাসের দ্বীপে আবির্ভূত হলেন দুই নায়ক সোবার্স আর পাতাউদি। টস করলেন পাতাউদি, কিন্তু জিতলেন সোবার্স—ভাগ্যের শুভ ইঙ্গিত। ব্যাট করতে এল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। এদের ব্যাটিং রমণীয়তা উপভোগ করেছি আগে আর উপভোগ না করলেও এই ব্যাটিং ভঙ্গী নিয়ে কত উচ্ছ্বাস ছাপার অক্ষরে দেখেছি। সুতরাং একটা মনে-সাড়া জাগানো কিছুর জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু কী হলো? বলছি।

একদা এক নবীন নাট্যকার জনৈক সমালোচককে তাঁর নাটক দেখাতে নিয়ে আসেন। প্রেক্ষাগৃহে সমালোচক ঘুমিয়ে পড়েন এবং সে-ঘুম ভাঙ্গে তাঁর ঔদাসীন্যে বিক্ষুব্ধ নাট্যকারের ডাকে। নাট্যকার সক্রোধে জানতে চান অভিমত দিতে এসে সমালোচকের এ-হেন ব্যবহারের অর্থ কী। সমালোচক শান্তভাবে উত্তর দেন যে ঘুমিয়ে পড়াটাও এক ধরনের অভিমত প্রদান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম দিনের চার উইকেট খুইয়ে ২১২ রান করার খেলা সম্বন্ধে আমি উপরোক্ত ধরনের মতই কেবল দিতে পারি। মানবো যে পিচ ছিল মন্থর, ফলে বল মারবার যোগ্য উচ্চতায় সর্বদা ওঠে নি; ভারতীয় বোলিং-এ শৈথিল্য ছিল না। তবুও চন্দ্রশেখর এবং তাঁর সঙ্গীদের বলে এতটা তেজ ছিল না যে হান্ট, বুচার, কানহাই নার্সকে এতটা স্তিমিত হতে হবে। মাঝে মাঝে তাঁর স্কোয়ার কাট, সজোর ড্রাইভ, প্রবল সুইপ আর পুল, সূক্ষ্ম গ্লান্স ঝলকে উঠলেও সাধারণভাবে ক্যারেবিয় ব্যাটিং ছিল ম্লান। ভারতীয় বোলাররা কোন রকমে নতুন বলে দ্রুত বল করার নিয়মটা নমো নমো করে অনুসরণ করে নিয়েই স্পিন বোলিং শুরু করলেন। চন্দ্রশেখর, সুর্তি আর বেদী বল ভালই ফেললেন তবে তার সঙ্গে ক্যাচও ফেললেন। সে-ক্যাচের সাথে খেলায় গতি ঘুরিয়ে দেবার সুযোগও হাতছাড়া হলো তবে সুর্তি ক্যাচ ধরায় অপটুতার কিছু ক্ষতিপূরণ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে বাইনোকে রান আউট করে। ভারতীয় ফিল্ডি এই দুটি ছাড়া ভালই হলো। জয়সীমা তৎপরতায় হান্টকেও বাইনোর মত মাঠ ত্যা করতে হলো। পাতাউদি কভারে আশ্চর্যভা পিছু হটে বুচারের তোলা ড্রাইভ ক্যাচ ধ বেদীকে তাঁর প্রথম টেস্টের উইকেট দিলেন আর বেদীর দ্বিতীয় স্বীকার লয়েডের অন্ত ঘটল কুন্দরনের চটপটে হাতে। মোটে ওপর প্রথম দিনের শেষে দ্বিতীয় টে উভয় দলেরই অবস্থা ছিল তুল্যমূল্য।

তারপর দ্বিতীয় দিন, ১লা জানুয়ারী সেদিন কী ঘটেছিল তার বর্ণনা গদ্যে চ না। অবধান করুনঃ—

বহে পউষের শীতের বাতাস
প্রখর সূর্য না-উদি,
মিঠে রোদদুরে ইডেনের মাঠ
ছেয়েছে, ফ্যানেলে হয়ে আটসাট,
নাবে দল নিয়ে কী ঠমক ঠাট
নায়ক বীর পাতাউদি॥
এ মাঠ-গ্যালারী আজি এ-প্রভাতে
অবাধে টিকেট বেচাতে,
দর্শকভীড়ে করে থই থই,
সবে মাখামাখি যেন চিঁড়েদই,
বসার জন্যে করে হইচই,
থাকে ধাক্কাতে চেঁচাতে॥
আজি সি এ বি-র কর্তাদিগের
মুখভাব আহা মনোলোভা
মুগোর আলোক পড়িয়াছে দিল-এ,
টিকেটধারীরা নাইবা বসিলে

টাকার রাশি তো থলকে ভ'রিলে
নাচে প্রাণ যেন প্যাণ্ডলোভা॥
জনতা যখন ভিতরেতে ঢোকে
ক্লিষ্ট ভীষণ ধকলে,
ভাবে স্থানহীন দর্শক সারি,
জায়গা না পেলে বেড়া দিয়ে পাড়ি
মাটিতে বসবে—ও বাউণ্ডারী
ছোট করে নেবে সকলে॥
আসনহারার এ-হেন চেষ্টা
থামাতে আসিল পুলিসে।
মার্জনা চেয়ে, যুক্তি দেখিয়ে,
লোকের কষ্ট কিছুটা কমিয়ে,
খেলা চালাবার দায় না-বুঝিয়ে,
নির্ভর করে কুলিসে॥
মানবমনেতে সাড়া জাগাবার
আবহাওয়া না-করি সৃষ্টি,
"না-হয় ব্যাটারা কিনেছে টিকেট,
তাই বলে মাঠে দেখিবে ক্রিকেট,"
—এত ভাবি বুঝি পুলিসপিকেট
চালাল লাঠির বৃষ্টি॥
মাঠে সমবেত খেলোয়াড়দের
খেলার স্বপ্ন টুটিল।
দলে দলে লোক করে কোলাহল,
বেটন, কাঁদানি গ্যাসের প্রবল
আক্রমণেতে হয়ে বিহ্বল,
এধারে-সেধারে ছুটিল॥
কহেন সীতেশ, সজ্জন এক,
"একী পরিহাস মাঠেতে;
মারধোর করে কেন দিবে নাশ
যে-খেলা দেখতে দলে দলে আসি?
ওরা তো একটু স্থানের প্রয়াসী
—এই আনন্দহাটেতে॥"
খাকীপরা সব পুলিস তাহাতে
সীতেশ রায়েরে ঘিরিয়া,
অতি দুর্দম দানবের মতো,
শক্তির মদে নিষ্ঠুর যতো
প্রহরীরা করি তাঁহারে আহত,
দেখিল না আর ফিরিয়া॥
দর্শকগণ ততক্ষণেতে
শান্ত হয়েছে প্রায়
সংকেত দেয়—শুরু হোক খেলা,
হঠাৎ পুলিসী দাপটের ঠেলা
ক্ষেপাল তাদের—হ্যালা ল্যালা ল্যালা
শোধ নিতে তেড়ে ধায়॥
পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী শত নাগিনী।
ফণা নাচাইয়া পুলিসের পানে
ছুটে এসে সবে ইঁটকাঠ হানে,
পুলিস তখন থাকে কি সেখানে
ধরে পলায়ন-রাগিণী।
বিধি শৃংখলা রক্ষাকারীরা
পালাল লাঙুল তুলিয়া
এবার জনতা পাগলের প্রায়
বেঞ্চি-চেয়ারে আগুন লাগায়,
মাতে জঘন্য ধ্বংসলীলায়—
মান-সম্মান ভুলিয়া॥
ইডেন মাঠেরে লোহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা,
ভিড়-করা পথে পউষ-প্রভাতে
তিক্ততামাখা লজ্জার সাথে
ভাবি ভারতের হবে এ-ধরাতে
কত সম্মান-ঘোষণা॥

বর্ষারম্ভে লগুড়ক্রিয়ার পর খেলা যখন শুরু হলো ৩রা মঙ্গলবার তখন কিন্তু মাঠের দৃশ্য মনোরম। বোরখার তলা থেকে সমস্ত গ্যালারী বেরিয়ে এসে চারদিক উজ্জ্বল করে তুলেছে। আজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রধানহোতা সোবার্স ও তার সঙ্গে সংগতি রেখে পূর্বদিনের ঘোমটাপরা কুণ্ঠার থেকে তাঁর দলের ব্যাটিংকে মুক্ত করলেন ঝলমলে স্ফূর্তির মাঝে। অবলীলাক্রমে খেললেন ৭০ রানের ইনিংসটি যা গুণগত দিক থেকে কানহাই-এর ৯০-এরটির চেয়ে অনেক প্রশস্ততর, গভীরতর, শক্তি সৌকুমার্যে বিশিষ্টতর।

৩৯০ রান এমন কিছু বেশী রান নয়। তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে খেললে ভয়ের কিছু নেই। মনের আশাকে বাড়িয়ে তুলল কুন্দরন-জয়সীমার প্রারম্ভিক জুটি। কতদিন পরে দেখা গেল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সেই রকম খেলা যা স্বরলিপি দেখে দেখে গলা চেপে চেপে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার মতো বিরক্তিকর নয়, খোলা-গলার প্রাণ-ঢালা গানের মতো উপভোগ্য। কুন্দরন সোবার্স-হল-গ্রিফিথের জোর বলকে যেমন করলেন অবজ্ঞা তেমনি ক্রিকেটের ব্যাকরণ না-মেনে সোবার্স-গিবসের স্পিন বলকে করলেন তাচ্ছিল্য। স্কোয়ার কাট, পুল করে করে চার, মিড-উইকেটে তুলে ছয়—নানান মার মেরে সোবার্সের আক্রমণকে করলেন বিপর্যস্ত। তাঁর একটি লেগে পুলের মার সঠিক না হওয়ায় বল উঠে গেল ঐ দূরে, ডিপ থার্ড-ম্যানের যেখানে থাকবার কথা সেখানে। স্লিপ থেকে কালো বাঘের ক্ষিপ্রতায় ৩০ গজ ছুটে এসে পড়ন্ত বলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোবার্স। বল হাতে লাগল কিন্তু আটকাল না। ব্যর্থ হলেও বিস্ময়কর এই প্রচেষ্টায় মাঠে উঠল জয়ধ্বনি। কুন্দরন শেষ পর্যন্ত অবশ্য গেলেন হলের বলে। কিন্তু ৮৯ রান এক উইকেটে—এতো দিব্যি খেলা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছেন জয়সিমা, সংযত কিন্তু ত্রস্ত নন। তিনি ওভার বাউণ্ডারী মেরেছেন অতএব সহর্ষেই মাঠ থেকে বেরোন গেল।

কিন্তু বুধবার ৪ঠা আর বৃহস্পতিবার ৫ই জানুয়ারী রোজই সঙ্গীনমুহূর্তে একেকটি রান আউটের সাহায্যে ভারতীয় দুই ইনিংসের পতন যেভাবে ঘটল তার কারণ একদিকে সোবার্স-গীবস-লয়েডের ধারাল স্পীনাক্রমণ, অন্যদিকে ক্রিজের মধ্যে পায়ে-বেড়ি পরা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভোঁতা ব্যাটচালনা। ১৬৭ আর ১৭৮ রান দু ইনিংসে ধুঁকতে ধুঁকতে করে ভারতীয় দল আছড়ে পড়ল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সামনে। ইনিংসে-পরাজয় যে ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী! একেকজন করে উইকেটে আসেন, আর বোলারদের আজ্ঞানুসরণ করে ফাঁসির দড়িটি গলায় পরে নেন। এতদিন জানা ছিল দ্রুত-বোলিং খেলতেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যা কিছু দুর্বলতা। এবার দেখা গেল, তাঁদের তেমন কোন বিশেষ বাছবিচার নেই, স্পিন-বোলিং-এর সামনেও তাঁদের অক্ষমতা একই রকম। গিবসের অফস্পিন প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্তত দ্বিতীয় ইনিংসে গিবসের চেয়ে সোবার্সের বোলিংই ছিল প্রখরতর। খেলার শেষে বিজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তাঁবুতে ফেরার সময় সামনে গিবসকেই এগিয়ে দিয়েছিলেন সোবার্স। কিন্তু আসলে তাঁর স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। শুধু এই দলেরই নয়, এই খেলার পর আজকের দিনের সব দেশের সব ক্রিকেটারের আগে স্থান হচ্ছে গারফিল্ড সোবার্সের। তাঁর খেলা দেখতে পাওয়া একটা অভিজ্ঞতা, একটা সম্মানের বিষয়।
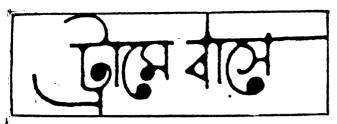
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—কংগ্রেস ভারতের নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এবং নূতন ভূগোলও"।।

সম্প্রতি হাওড়া ব্রিজের উপর দুইটি গরু অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া পথচারীদের গুঁতাইতে আরম্ভ করে। পুলিস শেষ পর্যন্ত গরু দুইটিকে গ্রেফতার করিয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা অবশ্য গ্রেফতারের এবং পুলিস-জুলুমের প্রতিবাদে গণ-অনশনের কোন সংবাদ এখনো পাইনি।"

সংবাদে প্রকাশ, চীনের লালরক্ষীরা এবার নাকি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কমিশনের চেয়ারম্যান ও উপ-প্রধান মন্ত্রী শ্রী পো-ই-পো-এর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"অর্থাৎ যাকে বলে পোঁ ধরা।"

মাস্টার তারা সিং নাকি বলিয়াছেন যে তিনি ফতে সিং-এর পথে চলিবেন না।—"এ আমরা জানতাম, নূতন কথা নয়। ফতে সিং চলবেন কেল্লার পথে আর ওদিকে চন্দ্রবিন্দু তারায় চাঁদে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

বিহারের দলত্যাগী কংগ্রেসীরা যে নূতন দলটি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার নামকরণ করিয়াছেন নাকি—'জনক্রান্তি দল'। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নামটা আরো ভারি করা উচিত বলেই মনে করি। কেননা, 'ক্রান্তি' কথাটার আভিধানিক অর্থ হলো—এক কড়ার তৃতীয়াংশ।।"

ক্রিকেটের কথাটাই আসিয়া পড়িল। টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইডেন গার্ডেনে যে অবাঞ্ছিত ঘটনার ফলে ক্রিকেট-উৎসব শেষ পর্যন্ত বহ্ন্যুৎসবে পরিণত হইল তাহা লইয়া জনগণের ধিক্কারের অন্ত নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কে জানে, শেষ পর্যন্ত আমরা বোধ হয় 'অ্যাশেজ' লাভের যুদ্ধে শুধুই দর্শক হয়ে থাকব না।।"

উক্ত প্রসঙ্গে শ্যামলাল বলিল "ফুটপাথে শুনে এলাম, কোন ক্রীড়া-রসিক বলছেন—এ পর্যন্ত শুধু টেস্ট, টেস্টই শুনে আসছি, এবারে কলকাতায় হলো প্রথম ফাইন্যাল।"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার সদস্য এবং রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট লিখিত এক পত্রে না কি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান খাদ্য সংকটের সময় মন্ত্রীদের এমন কোন

অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত নয় যেখানে খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন আছে।—"কিন্তু আমরা তো বরং উল্টো কথাটাই বরাবর মেনে এসেছি; ঘরে যখন চাল এবং অন্যান্য খাদ্য বাড়ন্ত তখন তো ভালোমন্দ খাওয়ার জন্য অন্যের ঘরে গিয়ে ভোজনানন্দ করতে হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

রবিবারের ঘটনার প্রসঙ্গে সংবাদদাতা বলিতেছেন—প্রত্যেকের মুখে এই প্রজ্বলন্ত প্রশ্ন—এই চরম বিশৃঙ্খলতার মূলে কী-কে-কারা? কোন্ আদি পাপে। সঙ্গী গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি মাথা কর নত, এ তোমার, এ আমার পাপ।"

ক্রিকেট সমালোচক কাহারও কাহারও চোখে নাকি পড়িয়াছে—বেদীর কায়ার মানকড়ের ছায়া। সহযাত্রী বলিলেন——"কথাটা সুন্দর। কিন্তু বেদীর 'ব'-এর পরে মানকড়ের 'ম' পর্যন্ত পৌঁছুতে মাঝখানে যে রয়েছে ভীষণ দর্শন 'ভ', আমাদের পোড়া চোখে তাই শুধু পড়েছে; হয়ত ক্রিকেটের 'ক'-ও জানিনে বলেই।।"

একটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ, ফুটবল লইয়া অনবরত তর্কবিতর্কের চূড়ান্ত ফলে কোন স্ত্রী নাকি তাঁর স্বামী এবং টেলিভিশনটি সস্তায় এবং সত্বর বিক্রয় করিবেন বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে—এ পর্যন্ত দর

উঠিয়াছে দুই শত টাকা।—"আমরা 'আমারে কে নিবি আয় বিকাতে চাই আপনারে' গানের চরণটি যুক্ত করে অনুরূপ অন্য একটি বিজ্ঞাপনও দিতে পারতাম। কিন্তু ঘরে ঘরে ক্রিকেটের তর্কবিতর্ক এখনো শেষ হয় নি, ব্যাঙ্কশাল কোর্টেও জলজ্যান্ত বিদ্যমান, সুতরাং 'ঘা কর কেন খুঁচিয়ে' নীতিই ভালো"—বলেন সহযাত্রী।

গার্ডেনের লণ্ডভণ্ড কাণ্ডের পর মঙ্গলবারের খেলার প্রস্তুতির জন্য পিচ পরীক্ষার সময় সেখানে ফটোগ্রাফারদের উপস্থিতিতে নাকি জনৈক আম্পায়ার বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি গেট আউট, গেট আউট বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন। কারণ, রবিবারের ঘটনার হুবহু ছবি।—"আম্পায়ারের নির্দেশ ভুল। অঙ্গুলি নির্দেশেই আউট-এর নির্দেশ দিতে পারতেন এবং ফটোগ্রাফাররা জানেন তাঁদের ক্যামেরা যন্ত্রটি মিথ্যে বলে না—কিন্তু অপ্রিয় সত্য কি সব সময় বলতে আছে"—বলেন সহযাত্রী।

অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"ভারত ইনিংস পরাজয় বরণ করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাবার লাভ করেছে। কিন্তু সোবার্সের অভিনন্দনটা আপাতত তোলা রইল। শুনলাম তাঁর বিয়ে। বিবাহান্তেই আমরা অভিনন্দনের ডবল সেঞ্চুরি করব।।"

অস্ট্রেলিয়াতে ডেভিস কাপের খেলার কমেনটারি করা হইয়াছে হিন্দীতে (অবশ্য কৃষ্ণনের খেলার দিন)। ইহার বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।—"আমরা করিনি। টেনিসে ব্যবহৃত ইংরেজী 'লাভ' শব্দটির অনুবাদ—'প্রেম' কি সত্যই অসঙ্গত এবং অসুন্দর, অন্তত কণ্ঠ-লেখাটির পর প্রেমোত্তীর্ণ হওয়া অনেক ভালো"।—কে যেন মন্তব্য করিলেন।

কাশ্মীরের শাল
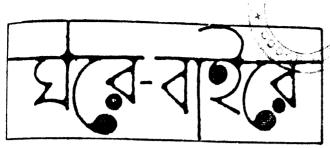
পৌষ প্রায় পেরিয়ে এসে শীতের কাপড়ের আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ এলিয়টের মিসেস হ্যাকিটের কথা মনে হচ্ছে। "Mrs. Hackit regulated her costume by the calendar, and brought out her furs on the first of November, whatever might be the temperature. She was not a woman weakly to accommodate herself to shilly-shally proceedings. If the season did not know what to do, Mrs. Hackit did". ঋতুর হাওয়া বাতাসে আভাস আনুক আর নাই আনুক শ্রীমতী হ্যাকিটের পোশাক-পরিচ্ছদের নিয়মকানুন ছিল ভারী কড়া। মৌসুমের সময়-জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক তারিখ মিলিয়ে দিনপঞ্জী দেখে পয়লা নভেম্বর হ্যাকিট-গৃহিণীর ফারের রাশি বাইরে আসতো। দুর্বল মন মেয়েদের মত তার দোলায়িত চিত্ত বা গয়ংগচ্ছতা ছিল না। আমরা কিন্তু ঠিক উলটোটি করে বসলাম। শীতের শুরুতে না হয়ে পৌষ মাসের শেষে শাল-দোশালার কথা আরম্ভ করছি।

পাশ্চাত্ত্য দেশে কিন্তু পুরো ফ্যাশন-শাসিত সমাজটাই হ্যাকিট-গৃহিণীর অনুগামী। হিমেল হাওয়া লাগুক বা নাই লাগুক হিম-ঋতুর আগমন সম্ভাবনায় দোকানপাট, দর্জির ব্যবসায় পত্রিকার পাতা সব তারিখ মিলিয়ে ঘোষণা করে আগামী সাজসজ্জার ধারা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যে সব দেশে কোটি কোটি মুদ্রা পোশাকের পরিবর্তনশীল বাহারে ব্যয় করা হয়, যেখানে ফ্যাশনশিল্প একটি বৃহৎ শিল্প, সে দেশের ফ্যাশন-কারিগর সদা সচেতন হবেই। তাদের সৃজনী-প্রতিভাও নিত্য-নূতনের সন্ধানে ছুটছে। আমাদের ভাগ্য ভাল। আমরা unchanging East-এর ঐতিহ্য দিয়ে ফ্যাশনকেও প্রায় চিরন্তন করে রাখতে পারি। কোট, প্যাণ্টালুন, শেমিজ, কামিজ, পুলোভার, অলেস্টার ইত্যাদি আমাদের আটপৌরে হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এরা দুনিয়া-জোড়া অফিস-জগতের জিনিস হয়েছে। এরকম পরদেশী আরও পোশাক আছে। ফ্যাশনও তার হয়তো কিছুটা পালটায়, তবে তা সবই অনুকরণের পর্যায়ে পড়ে। আপন কেউই নয়। নীবিবন্ধে বাঁধা সহজ সরল বস্ত্রখণ্ড যেমন প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক, শীতের সাজের বেলায় তেমনই সহজ সরল

চীর শাল

পাড় আর আঁচল

শাল গায়ের উপর ভাঁজে ভাঁজে লুটিয়ে থাকা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের ফ্যাশনের ইতিহাসে ভারতবর্ষের দানও এই ভাঁজ বা fold করা সেলাই-বিহীন অঙ্গ-বস্ত্র। আজকাল শাড়ির অনুকরণের পাশ্চাত্য পোশাকে বিদেশিনী-সুন্দরী আসরে আসতে ভালবাসেন কিন্তু প্রথম যে প্রাচ্য-সজ্জা ইউরোপকে দোলা দিয়েছিল তা হচ্ছে শাল—কাশ্মীরের শাল। অবশ্য ইউরোপ যেমন বরতনুর কমনীয় সৌষ্ঠবের তরঙ্গে মিলিয়ে কাঁধের উপর মেলে দেওয়া শাল নিয়েছিল ভারত থেকে, ভারতের শিল্পী আবার নানা নকশা নিয়েছিল পাশ্চাত্য নমুনা থেকে। ভিক্টোরিয়ার যুগে হয়তো কোনও গরবিনী ধনী কাশ্মীর শালের বাহার নিয়ে সমাজে টেক্কা দিতে চাইলেন অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যেত, সে নক্শা-নমুনা ইউরোপের কোন অংকন-পরিকল্পনা মাত্র! হয়তো বা কাশ্মীরের শিল্পী একটি ফরাসী ডিজাইন-বই সামনে রেখে বুনেছে শালখানা।

ফারসী শব্দ 'শাল' এক ধরনের বোনা কাপড়কে বোঝাতো। ব্যবহারিক প্রয়োগে "শাল" গলায় বাঁধা রুমাল থেকে নিয়ে কোমরবন্ধ পর্যন্ত হতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় পর্যটক পিয়েত্রো দালাভেল বলেছেন, "শাল" পারস্যে কোমর-বন্ধ কিন্তু ভারতবর্ষে স্কন্ধলগ্ন। যাই হোক, ইউরোপ যে শাল নিয়ে মেতেছিল তা এই স্কন্ধলগ্ন ভারতীয় শাল। ভারতবর্ষই এই অর্থে শালের জন্মস্থান। প্রাচ্যের বহুস্থানে বস্ত্রখণ্ডের এ ধরনের ব্যবহার হয়তো বহু শতাব্দী আগেও হয়েছে। মিশরের বর্ণনায় হেরোডোটাস বলেছিলেন, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গায়ের উপর জড়িয়ে নেওয়া পশমীবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। তবে আধুনিক অর্থে শাল যা, তা প্রথম কাশ্মীরের কারিগরের রচনা।

জামাওয়ারের তৈরী কোট

কাশ্মীরের শাল কবে, কোথায় বোনা হয়েছিল জানা যায় না। সেখানকার লোক-কাহিনীর মতে জয়নুল আবেদীনের রাজত্ব-কালে শালের সৃষ্টি। জয়নুল আবেদীন ১৪২০ থেকে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীর শাসন করেন। তাঁকে কাশ্মীরের আকবর বলা হতো। তিনি তুর্কীস্থানের বয়নশিল্পী নিয়ে আসেন। অনেকে মনে করেন, তুর্কীস্থান না হলেও মধ্য-এশিয়া থেকে শিল্পীরা এসে বসতি করেন এ কথা ঠিক, কারণ ভারতবর্ষের আর কোথাও বয়নের এই ধারা নেই। শালের নক্শাদার অংশ আলাদা আলাদাভাবে তাঁতে বুনে জোড়া দেওয়া হতো। যাঁরা জোড়া দিতেন তাঁদের নাম ছিল রফুগর। এতই সূক্ষ্মশিল্প ছিল যে, জোড় কারও চোখে পড়তো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সূচিশিল্পের নক্শা-করা শালের প্রচলন হলো। এ শালের নাম "আমলি"। এম্ব্রয়ডারি করা শালে সময় অল্প লাগতো, পটুতা বা দক্ষতা খুব উচ্চমানের না হলেও চলতো। খাজা ইউসুফ নামে এক আর্মানী ব্যবসায়ীর বুদ্ধিতে "আমলি" শালের পত্তন হয়। পত্তনের কাজে সাহায্য করেছিলেন দরজী "আলিবাবা"। আমলি শালের আদর চটপট বেড়ে উঠলো। তাতে-বোনা শালে দারুণ শুল্ক দিতে হ'তো। আমলি শুল্কমুক্ত হওয়াতে দামে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যে "আমলি"র এম্ব্রয়ডারি নেহাত মোটা চেনস্টিচ মাত্র হ'য়ে উঠলো। কখনও বা এই চেনস্টিচে সুতির কাপড়েও ফুল তুলতে দেখা গেছে।

১৮৬৬ সালে বার্নিয়ের লিখেছিলেন শাল ৫ ফুট লম্বা ও ২½ ফুট চওড়া হ'তো। জমি তার নকশাবিহীন ছিল আর দুই কিনারায় কাজ করা হতো নানারকম। বহুদিন পর্যন্ত এই শালই প্রচলিত ছিল। এই সময় থেকেই নকশায় ফুল গাছের নমুনা আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ সেই নমুনা গুলদস্তা বা ফুলদানির আকার ধারণ করে। তার থেকে এল মোচার মত কল্কা যাকে কাশ্মিরীরা বলে বুটা।

লম্বা শালের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চৌকোনা শাল প্রচলিত হ'লো। তাতে অনেক সময় সারা জমিতে কাজ থাকতো। কেবলমাত্র মধ্যে থাকতো গোলাকার একটু ফুলবিহীন স্থান। কখনও বা কোণায় কোণায় বৃত্তের এক চতুর্থাংশ খালি রাখা হ'তো। এই শালের নাম হ'লো চাঁদদর বা চাঁদশাল।

কাশ্মীরের পশম বা পশমিনা আসতো কিন্তু মধ্য এশিয়া অথবা তিব্বত থেকে। যত উচ্চতায় পাহাড়ী ছাগলের গায়ের লোম সংগ্রহ হ'তো ততই তার কদর, কোমলতা ও শীত নিবারণ ক্ষমতা। বহু উচ্চে শীতের সময় পাহাড়ী ছাগল যে লোমে শীত নিবারণ করতো, শীতের শেষে তা' সে ঝেড়ে ফেলে দিত। তাই সর্ব-শ্রেষ্ঠ পশমিনা বা পাশ্চাত্য জগতের তথা কথিত Cashmere সব সময় যে এই মূল্যবান পশমিনাই ব্যবহার হ'তো তা নয়, আরও নানা ধরনের পশম, ভেড়ার লোম ইত্যাদি যথেষ্ট ব্যবহার হতো। ইউরোপের বাজারে যখন কাশ্মীরের শাল পরম আদরণীয় হয়ে উঠলো তখন সেখানে কারিগরেরা ক্ষেপে উঠলেন

কল্কা বা বুটা

কেমন করে একই রকম শাল অনুকরণ করবেন। করালেনও। অনুকরণগুলি অনেক সময় নেহাত রসিকজন ভিন্ন ধরতে পারতেন না যে আসল কাশ্মীর শাল কি না। গোলমাল লাগল পশমের বেলায়। কাশ্মীর শালের সুনাম তো রং বা নকশার বাহার মাত্র নয়। নরম তুলতুলে অথচ গরম পশম এর উপাদান। তখন ইংলণ্ডের শালশিল্পীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চেপে ধরলেন ঐ পশম সংগ্রহ যেমন করেই হক করতে হবে। কোম্পানী তো কর্মচারী লাগিয়ে পশম সংগ্রহ করে একদফা পাঠালেন, কিন্তু পথে যেতে রেশম সদৃশ পশম তার গুণের অনেকটাই হারিয়ে ফেললো। তবু পশম [illegible] চাই। এবারে আর পশম না পাঠিয়ে [illegible] হেস্টিংস সাহেব পশমের পশুটি-[illegible] পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তিব্বতের [illegible]দের একজন কোম্পানীকে আসল [illegible] তিব্বতী ছাগল না দিয়ে [illegible] ভেড়া। হেস্টিংস সাহেবও ছাড়বার [illegible] বার বার চেষ্টা করে কয়েকটি ছাগল সংগ্রহ করলেন। ছাগল বেচারারা কল-কাতার গরমে বেশীর ভাগই অসুস্থ হয়ে মরে গেল। যা দু চারটে জাহাজে চাপিয়ে চালান করা হলো তারাও বিলেতে গিয়ে [illegible]। ইংলণ্ডের কারিগর তবু দমেনি। পেইস্লি শাল নানাভাবে অভিজাতদের অন্দরে [illegible] চেষ্টা করেছে এবং বহু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

ইংলণ্ডের মত ফ্রান্সেও ভারতীয় শাল এক সময় [illegible] উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের নাকি শত শত শাল ছিল। [illegible] অহংকারে তিনি শাল দিয়ে [illegible] এমন কি কুকুরের জন্য [illegible] তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু [illegible] নেপোলিয়ন তাঁর অনাবৃত স্কন্ধদেশ দেখতে ভালবাসতেন। কাজেই শাল গায়ে [illegible] খুলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে [illegible] দিতেন। জোসেফিন দমবার পাত্রী [illegible] পোশাকের আলমারি খুলে তৎক্ষণাৎ [illegible] একটি আনাতেন। ফ্রান্সেও অনুকরণের [illegible] পড়ে গেল। সেখানে একদিকে রেশম [illegible] পশম দিয়ে প্রথম শাল তৈরি হয়। [illegible] ফরাসী সমাজের সুন্দরীরা কাশ্মীরের শালই বেশী পছন্দ করতেন ও [illegible] তা কিনতেন। নেপোলিয়ন যখন [illegible] মারি লুইকে বিবাহ করেন তখন শাল কেনার জন্যই ৮০,০০০ ফ্র্যাংক বরাদ্দ [illegible]ছিলেন।

ক্রমশ ইউরোপের অভিজাত অন্দরের [illegible] আবার বদলে গেল। শালের কদর [illegible] এল। কিন্তু অভিজাত কামিনীদের শালের দুনিয়া পালটে এসে সাধারণের [illegible] ছড়িয়ে পড়লো। শালের রুমাল বা [illegible] শালের কোণাকুনি দুভাজ করে ব্যবহার সমস্ত পাশ্চাত্য নারী সমাজে চলন হলো। তবে সেটা কাশ্মীরের বহুমূল্য শাল নয়, ইউরোপের তৈরি সস্তা অঙ্গাবরণ, স্টাইল কাশ্মীরের।

পাশ্চাত্য জগতে শালের আদর কমে গেলেও শাল তার নিজের দেশে লুপ্ত গৌরব ফিরে পেয়েছে। রাজা জমিদারের ঘরে শাল দোশালার ব্যবহার চিরকালই ছিল এবং প্রধানত শাল পুরুষের পরিধেয় হিসাবে গণ্য হতো। জামাওয়ার দিয়ে নানা পরিচ্ছেদের উল্লেখ আকবর বাদশাহের আমল থেকে একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এসেছে। আইন-ই-আকবরীতে শালের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিদেশী রুচি পছন্দ সামলাতে গিয়ে শালের শিল্পজগতে অবনতি ঘটেছিল। একজন বিদেশীই বলেছিলেন,

"There was a distinguishing character about the oriental style which is being rubbed out by this foreign influence."

তারপর হঠাৎ ইউরোপে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়ে কাশ্মীরের শাল তার পশ্চিমের বাজার হারিয়ে ফেললো। পশ্চিমের পছন্দ দিয়ে তৈরি শালশিল্প একেবারে দমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৭-৭৯ সালে দারুণ দুর্ভিক্ষে শিল্পী-দল প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। যাঁরা আসলি শাল বানাতেন তাঁদের কেউ কেউ সস্তা টেবিল ঢাকা, বিছানা ঢাকা বানাতে আরম্ভ করলেন। শালের এই অদ্ভুত অপমৃত্যু থেকে আজ আবার তার উদ্ধার পর্বের পালা। ভারতীয় সমাজ বিশেষ করে মহিলারা নূতন করে শালের কদর করতে শুরু করেছেন। আশা করা যায় পুনরধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শালের বেশী সময় লাগবে না। তবে মস্ত বড় বাধা মূল্যস্ফীতি এবং আসল পশমিনার অভাব। কারিগর বা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনায় সেকালে যে সময় দেওয়া সম্ভব ছিল আজ তার পক্ষে সেটা সম্ভবও হয় না। তবে ডিকেন্সের ভাষায় বলা যায়—

"If an article of dress could be immutable, it would be the Kashmir shawl."

কাশ্মীরের শাল-এর ঐতিহ্য পরিবর্তনাতীত। ভারতীয় নারীসমাজ এই ঐতিহ্যের মর্যাদা দিচ্ছেন বলে শালশিল্প হয়তো আর মরে যাবে না।
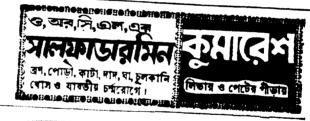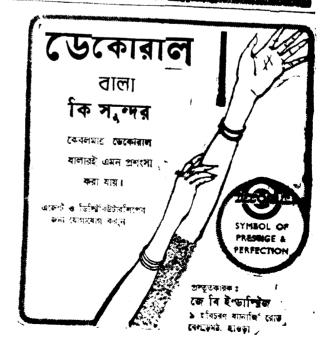
শ্রীমতী

অরণ্যদেব

লী ফক

স্বর্ণ-দ্বীপ থেকে চলে আসবার সময় -----
ইয়াও-ইয়াও
রানটিনা আমাদের সঙ্গে আসতে চাইছে ----
মাস কয়েক বাদে এসে একে নিয়ে যাব।

কাঁদিসনে রাজা। রানটিনা ওখানে ভালই থাকবে।
কই, আমি তো কাঁদছি না।

রানটিনাকে ছেড়ে এসে রাজা ভীষণ কষ্টে আছে।
জানি। তাই একে খুশী করবার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

এখন থেকে তোমরা জুম্বার পিঠে চড়বে, কেমন? এই হবে তোমাদের খেলার সাথী।
জুম্বা!

রাজা আর টমটমকে নিয়ে গুহায় ফিরে এলেন অরণ্যদেব।
7/অ

গুহায় আজ খুব আনন্দ -----
ওয়াকার বাবা, জুম্বাকে তুমি কীভাবে পেয়েছিলে, সেই গল্পটা আবার বলো।
গল্পটা শুনতে তোদের দেখছি ক্লান্তি নেই।

'রাজা, জুম্বা তখন নেহাত বাচ্চা। সেই সময়ে একদিন জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলাম ----

!
আছে -----'

'ঠিক সেই মুহূর্তেই যে দুটো বন্দুকের নল আমাকে তাক করেছিল, তা আমি জানতুম না ---
১১

টেস্‌ট নয় ঃ ফাইন্যাল

শচীন কর

খেলা দেখিনি। কারণ টিকিট পাইনি। এবং তারও কারণ সি-এ-বি-এর সঙ্গে মা দূশ ব্যক্তির কোন ক্ষীণতম বৈবাহিক সূত্র, এমন কি পিসতুতো ভায়ের শালার সম্বন্ধীর ছেলের সম্পর্কও অনুপস্থিত। তাছাড়া, আমি সরকারী চাকুরে নই, বাণিজ্য-সংস্থার হোমরা চোমরা নই, এমন কি ভেন্ডার পর্যন্ত আমি নই। সুতরাং মাঙ্কের বরাদ্দ কমিয়ে ৬০ টাকার টিকিট কাটার আইনানুগ পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বেগ পেতে হয়নি, হয়নি, তার কারণ রেশনে চালের বরাদ্দ কম হয়ে যাওয়ায় মাছটাকে আপাতত "নিয়ম-ভঙ্গের" নিয়ম রক্ষার জন্যই শিকেয় তুলে রেখেছি। কিন্তু যদাশ্রোষং ৬০ টাকার টিকিট ৫০০ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হচ্ছে (হায় দরিদ্র ভারত!) তখন নেমে আসতে বাধ্য হলাম ৪৫ টাকায়। কিন্তু আমি নেমে এলে কী হবে, সি-এ-বি সিংহাসনের আসন থেকে টিকিট নিয়ে নেমে এলেন না, নেপথ্য থেকে ঘোষণা করলেন—গুদাম সাবড়ে। অতঃপর ২৫ টাকার টিকিট কাটতেই রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু ঐ দরের ব্লকের কথা যা শুনেলাম তাতে মনে হল, সরকারী নির্দেশ অমান্য করে পরিবার পরিকল্পনাকে যাঁরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান, সেখানে অগ্রাধিকার তাঁদেরই। রইল বাকী ৬ টাকার ডে-টিকিট। কিন্তু শুনলাম ৬ টাকার ডে-টিকিট কাটতে হলে আগে নাইট-টিকিট কেটে শয়নং গার্ডেন্স দিবসং ছাড়া নান্যঃ পন্থা। সুতরাং কাশকাটা স্টেডিয়ামের কর্মকর্তাদের এবং সি-এ-বি সম্পর্কে শুধু একটা কথাই বার-বার মনে হতে লাগল—হাসি মুখটি দেখতে বেশ, 'ভ'-এর দফা হলো শেষ। তাই খেলা দেখিনি, খেল দেখেছি।

সি-এ-বি উঁচু পর্দায় সুর চড়িয়ে ঘোষণা করলেন ঃ ৬০,০০০ দর্শকের স্থান করা হয়েছে। আসনের ঢালাও ব্যবস্থা। পরে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে শোনা গেল, যাঁরা টিকিট কেটেছেন, বিকল্পে ব্যাজ পেয়েছেন এবং ভেন্ডারের ভেক ধরে মাঠে ঢুকেছেন তাঁদের সংখ্যা কম পক্ষেও লাখ। এই লাখের মধ্যে, রেলওয়ের ভাষায় ডব্লিউ. টি-র সংখ্যা দশহাজার হলেও, বাকি ত্রিশ হাজার ডজনের সুখতলা ক্ষত করে, অনাবৃত আকাশের তলায় রাত্রি যাপন করে, গাঁটের পয়সা খরচা করে টিকিট কেটেছেন একটু-খানি আসনের আশ্বাসে—তৃণাসন বা কাষ্ঠাসন যা-ই হোক। কিন্তু দেখা গেল, সেটা আশ্বাস নয়, অশ্বডিম্ব। স্ত্রী জাতি (কথাটা অবশ্য পণ্ডিত চাণক্যের) এবং রাজকুলকে বিশ্বাস না-করার নীতিটাই সবাই শিখেছিলেন, কিন্তু দুই শ্রেণীর সঙ্গে সি-এ-বি-এর সংযুক্তির প্রশ্নটা ছিল না বলেই টিকিট ক্রেতাদের দুর্গতি চরমে ওঠে। বাদী এবং বিবাদী পক্ষ থেকে পরিসংখ্যানের কচকচি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজন বলেন—পরিসংখ্যানটা 'স্ল্যান্ড স্লাইড' ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এই মিথ্যে দ্বারা শাক দিয়ে কাটকলা ঢাকার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এবং হয়েছেও তাই; পাটিজন বসিয়েক-এর বেঞ্চে দশজন দাঁড়িয়েক-এর ব্যবস্থা, একজনের সীটের নম্বর থেকে অন্যের সীটের নম্বরের মাঝখানে স্থান মাত্র ৮ ইঞ্চি। সি-এ-বি হয়ত যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় সাত-জন'-এর নীতিই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এবং আরো অভিযোগ—কোন কোন নম্বর সংযুক্ত আসনের শরিক নাকি একাধিক। তাই ধিকধিক শুদ্ধ করেছি। খেলা দেখিনি, খেল দেখেছি।'

দ্বিতীয় দিন। রবিবার। আসনের এই অব্যবস্থায় অবস্থা ওঠে চরমে। যাঁরা টিকিট কেটেও আসন না পেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অসুবিধে ভোগ করছিলেন এবং তার চেয়েও বেশি অন্যদের অসুবিধে সৃষ্টি করছিলেন, তাঁরা চিরাচরিত নিয়ম মতোই রেলিং ডিঙিয়ে এসে মাঠের ঘাসের ওপর আসন নিলেন। এমন সময় পুলিসের আগমন। তিলকে তাল করার তালিম বেশ ভালোই আছে। এই রেলিং ডিঙোনোটাকে তাঁরা বুঝি যুদ্ধমান শত্রুপক্ষের সীমানা লঙ্ঘনের মতো মনে করলেন, সুতরাং চলল লাঠি যা বর্তমান পরিবেশে হ্রস্বায়তন হলেও মারাত্মকতায় স্বদেশী যুগের রেগুলেশন

[illegible]ঠির চেয়ে কম যায় না, চলল কাঁদানে গ্যাস। কিন্তু ক্রিকেট-রসিকরা তা-ও সহ্য করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, অবস্থা প্রায় আয়ত্তে এসে গিয়েছিল, দর্শকদের তরফ থেকে সাদা রুমাল ওড়ানো হলো, পুলিসও নাকি দেখিয়েছিলেন সাদা রুমাল অর্থাৎ রীতিমতো যুদ্ধ-বিরতির পারস্পারিক ইঙ্গিত। এমন সময় কোন একজন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি মাঠে এসে পুলিসকে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে মানা করায় পুলিস নাকি অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে লাঠিপেটা করতে শুরু করেন। সেখান থেকেই ক্রিকেটের 'খেল' শুরু। জনতা ছুঁড়লেন ইটপাটকেলের 'বীমার', পুলিস চালালেন কাঁদানে গ্যাস আর লাঠি; পরের ওভারে পেস বোলিং-এর বাম্পার, ফায়ার ওয়ার্কস, ক্লীন বোলড হয়ে পুলিস পালালেন পেভিলিয়নে। ভীত সন্ত্রস্ত দর্শককুল আকুল হয়ে পালাবার পথ খুঁজছেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে চটের চাঁদোয়া ছাই হয়ে গেল। 'অ্যাশেজ' খেলার অধিকারী বুঝি আমরা হলাম। শুনলাম, হাজার হাজার লোক যখন প্রাণ ভয়ে এসে মাঠ চড়াও হলো তখন কতিপয় ক্রীড়ারসিক যুবক নাকি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পিচ্-টিকে সযত্নে রক্ষা করেছে; এই পিচ রক্ষার কাজে আরক্ষীরা অনুপস্থিত, সি-এ-বি বেপাত্তা। এই যুবকদের প্রশংসার ভাষা নেই। কিন্তু বড় দুঃখে তাদের বলি—ভাই, পিচ-কে কাজে লাগানো বুঝি আর হলো না, এতদিনের টেস্ট কলকাতায় এসে ফাইন্যালে পরিণত হলো। সেই ফাইন্যালের খেল দেখেছি, খেলা দেখিনি।

এই প্রসঙ্গে শুনলাম, মাঠের এই তাণ্ডবের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স, লয়েড, গ্রিফিথ প্রমুখ কতিপয় খেলোয়াড় প্রাণভয়ে মাঠ থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পথ খুঁজতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। সি-এ ('বি' কথাটা যুক্ত করতে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।) তখন কোথায় ছিলেন, সেই রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে? ভারতীয় আতিথেয়তার এই মসীলিপ্ত ইতিহাস পৃথিবীর গ্রন্থাগারে চিরদিনের মতো ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্যের বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবে। পতৌদি শুনলাম তাঁর দলবল নিয়ে তাঁদের জন্য নির্ধারিত বাসে করে স্বস্থানে পালিয়ে গেলেন। শুনেছি হালকা গ্রন্থ তিনি বড় একটা পড়েন না, তাই বুঝি তাঁকে বলতে পারি—স্যার ফিলিপ সিডনীর সেই উক্তিটির পুনরাবৃত্তি তিনি এই পরিবেশে করতে পারতেন, সেটাই হতো সত্যিকারের ক্রিকেট। সেই ক্রিকেট খেলা দেখিনি, খেল দেখেছি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মশাইর প্রচেষ্টায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়ী-সুলভ মনোভাবে মঙ্গলবার আবার খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা মাঠে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খেয়েছেন, এই খেলোয়াড়ী-সুলভ মনোবৃত্তির শরিক তাঁরাও এবং তাই বলেই মঙ্গলবার নির্বিঘ্নে খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এইদিনে বঞ্চিতদের কথা আমরা ভুলতে পারছিনে, স্থান সংকুলানের জন্য ডে-টিকিটের বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে টিকিট পাননি কিংবা ৬ টাকার ওপরে টিকিট কাটার সম্বল যাঁদের নেই, তাঁরাই এতদিন ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—ভাবগত অর্থে নিজেদের মৃত্যুবরণ করে। সত্যিকারের ক্রীড়া-রসিকদের এই মৃত্যু দেখেছি। খেলা দেখিনি, খেল দেখেছি।

খেলা দেখিনি তাই খেলার কথা বলতে পারছিনে। তা ছাড়া সেটা বাহুল্যও বটে। কেন না নিজের চোখে দেখে কেউ কেউ এবং কাগজে-কাগজে দেখে অনেকেই খেলার কথা জেনে গেছেন। বুধবার ভারতীয় দল মাত্র ৭৮ রান যোগ করে মোট ১৬৭ রানে ইনিংস শেষ করে ফলো-অন করতে বাধ্য হন। সে খেলায় ৫ উইকেটে মাত্র ১৩৩ রাণ করেন এবং পরের অর্থাৎ শেষের দিন আর মাত্র ৪৫ রাণ যোগ করে মোট রাণ সংখ্যা হয় ১৭৮ অর্থাৎ এই খেলায় ভারত এক ইনিংস এবং ৪৫ রানে পরাজয় বরণ করে। এক ইনিংসে হারা ক্রিকেটের ইতিহাসে নূতন নয় এবং তেমন-তেমন ঝানু খেলোয়াড়দের শূন্যে করার নজীরও নূতন নয়। কিন্তু ভারত যে-হালে খেলেছে তা দেখে মনে না করে উপায় নেই যে, আমরা নূতন খেলোয়াড়দের মধ্যে অতি সহজেই নাইডু-মার্চেন্ট-মুস্তাক-মানকড়-হাজারের উত্তরাধিকারী খুঁজে পাই এবং তারই ঢক্কা নিনাদের তালে তালে ধেই নৃত্য করি। সেই নাচই শুধু দেখেছি। আর দেখেছি আমাদের বহু-বিজ্ঞাপিত নির্ভর-যোগ্য ব্যাটসম্যানদের খাম-খেয়ালির খেল, খেলা দেখিনি। এবং মর্মাহত হয়ে বারবার ভেবেছি ইডেন উদ্যানে টেস্টের বুঝি ১৯৬৭ সালেই ফাইন্যাল হয়ে গেল।

নোবেল প্রাইজের মূল্য কতটুকু ?

মাসিক আটলান্টিক পত্রিকায় ডোনাল্ড ফ্লেমিং নোবেল প্রাইজের বিচারের ধারাবাহিক ভুল সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। সমস্ত পুরস্কার নির্বাচনেই একটু-আধটু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, নোবেল পুরস্কারের পাঁচটি শাখাতেই নানারকম ভুল হয়েছে বারবার, কিন্তু সাহিত্যের পুরস্কারে ভুলের সংখ্যা সর্বাধিক। সব মিলিয়ে বলা যায়, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে যোগ্যদের চেয়ে অযোগ্যদেরই ভিড় বেশী।

যদিও, এ কথা ঠিক, পৃথিবীতে যে কটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আছে, তার মধ্যে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ও সম্মানই এখনো সবচেয়ে বেশী। অর্থমূল্যের চেয়েও সম্মানই এখানে প্রধান, কারণ, সাহিত্যে যিনি নোবেল পুরস্কার পান—তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর সব দেশে একসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ ও বৈশিষ্ট্য দেখানো শুরু হয়। সেইদিন থেকেই তিনি বিশ্ব নাগরিক। কিন্তু, এ সম্মানবোধ পাঠকদের চোখে যতখানি, লেখকদের চোখে, বার বার ভুল বিচারের জন্য, ততখানি নয়। পুরস্কার পাবার পরেও অনেক লেখক এ পুরস্কার সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। রিলকের প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন, রিলকে যে নোবেল প্রাইজ পান নি, সেটা ভালোই হয়েছে, কারণ যে প্রাইজ রুডলফ্ ইউকেন পেয়েছেন, পুরস্কার পেয়ে রিলকে-কে যদি তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসতে হতো, তবে সেটা হতো রিলকের পক্ষেই অপমানজনক।

নোবেল পুরস্কারের মতো যে আর দ্বিতীয় কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কারের প্রবর্তন হলো না, তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে, পৃথিবীতে আলফ্রেড নোবেলের মতন ধনাঢ্য লোক আর নেই। আলফ্রেড নোবেলের চেয়ে সম্পদশালী লোক পৃথিবীতে আরও ঢের আছে, কিন্তু তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির বদলে, ক্ষতি করতেই ব্যস্ত। শুধু ধনী নয়, মানুষ হিসেবেও আলফ্রেড নোবেল ছিলেন খুব উঁচু জাতের। ডিনামাইট ও ধোঁয়াহীন বারুদ আবিষ্কার করে তিনি ভেবেছিলেন এগুলো সভ্যতার উন্নতির জন্যই কাজে লাগবে। তাঁর চরিত্রও ছিল অনেকটা দেশকাল-নিরপেক্ষ, জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি পৃথিবীর নানা দেশে কাটিয়েছেন, রাশিয়া ও আমেরিকাতেও। সেইজন্য তাঁর প্রকৃতি ছিল সত্যিই আন্তর্জাতিক। নোবেল কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, মানুষের সেবাকেই একমাত্র ধর্ম মনে করতেন। তিনি কখনো বিয়ে করেন নি, সুতরাং তাঁর সম্পত্তির বিপুল অংশ কল্যাণমূলক কার্যে গচ্ছিত রাখা সহজে সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। (যদিও তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পুরস্কার বাতিল করে দেবার জন্য পরে মামলা করেছিল)।

পুরস্কার দেবার শর্তগুলি তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিটি বার বার পাকে-প্রকারে এই শর্তগুলি লঙ্ঘন করেছেন। নোবেলের ইচ্ছে ছিল সেইসব লেখককে পুরস্কার দেওয়া, যাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ, যে সময়ে তাঁদের প্রতিভার জ্যোতি সবচেয়ে উজ্জ্বল—এবং যে সময়ে তাঁদের অর্থের প্রয়োজন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন যে, একজন লেখকের সারা জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার মূল্য নিরূপণ করে সম্মান দেখানোর জন্য এ পুরস্কার নয়, পুরস্কার দিতে হবে গত এক বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বইয়ের গ্রন্থকারকে। কিন্তু সেভাবে কখনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি, পুরস্কার প্রাপকদের বয়সের গড় ৬৫। রবীন্দ্রনাথ ৫২ বছর বয়সে পুরস্কার পেয়েছিলেন, সেটাকে অল্প বয়সই বলতে হবে, কারণ, মাত্র দুজন লেখক পুরস্কার পেয়েছেন নিম্ন-পঞ্চাশে, রুডিয়ার্ড কিপলিং এবং আলবিয়ার কামু। পুরস্কারের টাকা নিতে অস্বীকার করে বার্নার্ড শ এইজন্যই বলেছিলেন যে, যখন আমার টাকার দরকার ছিল তখন পাইনি, এখন ও টাকা আমার দরকার নেই। আমাকে এখন পুরস্কার দেবার অর্থ, কোনো জলে ডোবা লোক কোনক্রমে তীরে পৌঁছুবার পর তখন তাকে লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দিয়ে পরিহাস করা। সুইনবার্ন এবং পল ভালেরি-কে যখন পুরস্কার দেবার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতে প্রস্তুত হলেন নির্বাচন কমিটি, তখনই ওঁদের মৃত্যু হলো, উভয়েরই যথেষ্ট প্রাপ্তবয়সে।

পুরস্কারের অন্য শর্ত, প্রকৃত আন্তর্জাতিক বিচার। এই শর্ত রক্ষা করা সুইডেনের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল, কারণ, সুইডেন পৃথিবীতে কারুর মুখাপেক্ষী নয়।

বরং সম্পদ ও সভ্যতায় উন্নত সুইডেন অন্যদের ঈর্ষণীয়। কিন্তু, তবু দেখা গেছে, পৃথিবীর নানান্ সংকটের সময় মুখরক্ষা করার জন্য পুরস্কার দিয়ে নানা দেশকে খুশী করার চেষ্টা। আমেরিকাকে খুশী করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অপ্রধান লেখককে, রাশিয়াকে চটাবার জন্য দেওয়া হয়েছে পলাতক আইভান বুনিনকে। এ ছাড়া নিজের দেশ বা কাছাকাছি পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট। পল ভন হেইস, ভারনার ভন হেইডেনস্টাম, ভ্যাডিস্লাভ রেমন্ট, এরিক কার্লফেলড্ট, ফ্রান্স শিলানাপ্পা—এঁরা কারা? যদি এ প্রশ্ন করা হয়, অনেক মনোযোগী বিদগ্ধ সাহিত্যপাঠকও থতমত খেয়ে যাবেন, কিন্তু এঁরা সবাই সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। এরকম পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও কিন্তু ইবসেন বা স্ট্রিণ্ডবার্গ, যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন, পুরস্কার পাননি। আন্তর্জাতিকতার নাম রাখার জন্য, চিলি, আইসল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস থেকে মাঝে মাঝে এঁরা এমন সব লেখক খুঁজে বার করেছেন, যাঁদের রচনা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। এবং প্রাচ্যদেশীয় মহৎ লেখকদের সম্পর্কে এঁরা কার্যত অন্ধ।

অন্ধত্ব শুধু প্রাচ্যদেশ সম্পর্কেই নয়। ডোনাল্ড ফ্লেমিং-এর প্রবন্ধটির আরম্ভই হয়েছে একটি ধাঁধা দিয়ে। তিনি বলেছেন, টলস্টয়, চেখফ, প্রুস্ত, রিলকে, কাফকা, ব্রেহ্‌থট্, জয়েস, লরেন্স, লোরকা, মিগুয়েল দে উনামুনো, এজরা পাউণ্ড—এঁরা বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রথম সারির লেখক হওয়া ছাড়াও, আর একটা কি মিল আছে এঁদের মধ্যে বলুন তো? এঁরা কেউ নোবেল প্রাইজ পাননি। এঁদের খ্যাতি জীবিতকালেই, এবং এঁদের রচনার শাশ্বতগুণ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে—যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন—তাঁদের অনেকের চেয়েই বেশী ভাবে। এখানেই নোবেল পুরস্কারের অসার্থকতা।

পুরস্কারের একটি শর্ত কিছুটা বিতর্কমূলক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির সঙ্গেও একটা বিশেষণ জুড়ে দিয়েছিলেন আলফ্রেড নোবেল, তিনি বলেছিলেন, 'দি মোস্ট আউটস্ট্যাণ্ডিং ওয়ার্ক অব অ্যান আইডিয়ালিস্টিক টেণ্ডেন্সি।' এখন, মহৎ সাহিত্য ঠিক কীভাবে যে আদর্শমূলক হয় —সেই কথাটাই খুব দুর্বোধ্য এবং গোলমেলে। এই আদর্শের ধুয়ো তুলেই নির্বাচন কমিটি নানারকম অকিঞ্চিৎকর কাজ করেছেন। এ বছর যে নূতন পুরস্কার পেয়েছেন, নেলী শাখস ও অ্যাগনন, তাঁদের রচনার চেয়েও "আদর্শ" প্রধান। গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। পার্ল বাকের রচনা আদর্শমূলক, কিন্তু তাঁকে আমেরিকানরা বড় লেখিকা মনে করে না। টলস্টয় সম্পর্কে যখন প্রবল দাবি উঠেছিল, তখন নির্বাচকমণ্ডলী টলস্টয় যে মহৎ ঔপন্যাসিক—এ কথা মেনে নিয়েও, টলস্টয়ের শেষ জীবনের মতামত নাকি সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর—এই বলে তাঁকে নাকচ করেছেন। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, রুডিয়ার্ড কিপলিং কি আদর্শ প্রচার করেছেন? নর-নারীর জটিল শারীরিক সম্পর্কে একসময় পুরস্কার কমিটির কাছে টাবু, তাই জিদ, প্রুস্ত কিংবা ডি এইচ লরেন্স সেইজন্যই পাননি, অথচ ইউজিন ও'নীল কিংবা আঁদ্রে জীদ তা হলে কী করে পেলেন? রবার্ট ফ্রস্ট ছিলেন নিরাপদ আদর্শের প্রবক্তা, তাঁকে উপেক্ষা করা হলো কেন? এবং ইবসেন, রিলকে, ব্রেহ্‌থট্, কাফকা, ই এম ফরস্টার, আঁদ্রে মালরো—এঁদের রচনাও কি কোনো-না-কোনোভাবে আদর্শমূলক নয়? আসলে যে সাহিত্য মানুষের অন্তর প্রবলভাবে স্পর্শ করে, নিজেকে চিনতে শেখায়, পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করে, ধ্বংস বা সৃষ্টি যার কথাই বলুক না, সেই সাহিত্যই প্রকৃত আদর্শসমৃদ্ধ।

কবিদের অনশন

নিউ ইয়র্ক শহরের একটি কবি পরিষদ সারা পৃথিবীর সমস্ত কবিদের এক দিনের প্রতীক অনশন পালনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই অনশন। তাঁদের অনুষ্ঠানের নাম: 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পোয়েট্স ফাস্ট ফর পীস।' তাঁদের মূল দাবি ভিয়েৎনামের যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া, সেই সঙ্গে তাঁরা আশা করেন, পৃথিবীর সব দেশের কবিরা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো যুদ্ধের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাবেন এই সঙ্গে। এই কবি পরিষদের উদ্যোগে, নিউ ইয়র্ক শহরের কবিদের সমবেতভাবে অনশন শুরু হবে ১৩ই জানুয়ারি, শুক্রবার, রাত্রি আটটায়—এবং শেষ হবে পরদিন শনিবার, রাত্রি আটটায়। পৃথিবীর সব দেশের কবিদের (বাংলা দেশেও) চিঠি লিখে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন—ঐ একই দিনে অনশন পালন করতে।

সনাতন পাঠক

শতভিষা

গত ৩ ডিসেম্বরের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্য সংবাদ'-এ আপনারা 'শতভিষা'র নাম উল্লেখ করেছেন, 'শতভিষা'র একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'শতভিষা' সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে, এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি। 'শতভিষা'র একজন সম্পাদক হিসেবে আমার নাম উল্লিখিত হয়েছে, দেখলাম। যদিও আমি প্রথম থেকেই 'শতভিষা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলাম, কিন্তু পরে—১৯৫৮'র শেষের দিকে—সরকারী কর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই 'শতভিষা'র সম্পাদনার ভার আমি ত্যাগ করেছি। 'শতভিষা'র বর্তমান সম্পাদক হলেন শ্রীতরুণ মিত্র, আর শ্রীআলোক সরকার।

এই বিষয়টি আপনারা যদি প্রকাশ করেন তো ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ উপকৃত হবো।

দীপংকর দাশগুপ্ত
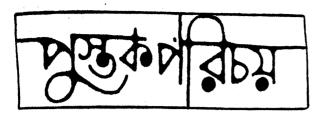
মহাভারত : চরিত্র-আলোচনা

মহাভারতের চরিতাবলী। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। অঠারো টাকা।

মহাকাব্য পাঠের ব্যাপক রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই। হয়তো ছিল কোনকালে, এখন আর তেমন নেই। মূল সংস্কৃতে মহাভারত বা রামায়ণ সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন এমন সৌভাগ্যবান কমই আছেন. বস্তুত সে-অধিকার প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজনেরই অধিগত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমের প্রয়োজনে অবশ্য মহাকাব্যের অংশবিশেষ কোন কোন ছাত্রের গোচরে আসে—সেটা আবশ্যিক কারণে হয়তো, চর্চা, আহরণ ও আনন্দ অর্জনের কারণে হয়তো নয়। কিন্তু এ-কথা সত্যি, মহাভারত ও রামায়ণের বিপুল সম্পদের সংস্পর্শে না এলে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

স্বর্গত রাজশেখর বসুর কল্যাণে অবশ্য উভয় গ্রন্থই বাঙালী পাঠকের সহজ অনুসন্ধানের কারণ হতে পেরেছে। আর অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্যের বিপুল পাণ্ডিত্যপ্রসূত এই বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ 'মহাভারতের চরিতাবলী' প্রকাশিত হবার পর সাধারণ বাঙালীর পক্ষে মহাভারতের অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় নানা চরিত্র সম্পর্কে ধারণা অর্জন যে সহজতর হয়ে উঠবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহাভারতে প্রাচীন ইতিহাসের সংগে অনেক রূপকথারও সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই মহাকাব্যে যে-সকল নরনারীর সংগে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাদের দোষ-গুণ, সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সংগে বস্তুত আমাদের চরিত্রের দোষ-গুণ প্রভৃতির পার্থক্য কিছু নেই। পার্থক্য ও বৈষম্য যেটুকু চোখে পড়ে তা তৎকালীন সমাজ ও সমাজব্যবস্থার বৈপরীত্য হেতু, আর কোন কারণে নয়। কিন্তু, ভাবে, বৈচিত্র্যে ও ব্যাপ্তি ও বিরাটত্বে এবং অবশ্যই সার্বিক জটিলতায়, এইসব চরিত্রের অনন্যতা আজও অক্ষুণ্ণ।

অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে মহাভারতের সামাজিক বা দার্শনিক আলোচনা করেননি, পাত্রপাত্রীদের চরিত্র, বিচিত্রমুখী তাঁদের ক্রিয়াকলাপের আলোচনাতে তাঁদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু, অবশ্যস্বীকার্য যে, পাঠান্তে এই গ্রন্থ মহাভারত পাঠেরই আনন্দ এনে দেয়। আশ্চর্য সাবলীল ও সুষমামণ্ডিত তাঁর ভাষা। আমাদের বিশ্বাস, এ-গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙালীর কাছেই আদরণীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। ৩৪৫।৬৬

উপন্যাস

হলুদপাতার সবুজ শির। শচীন্দ্রনাথ মিত্র। বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

আলোচ্য উপন্যাসটি একটি ফ্ল্যাটবাড়ির অন্তর্বর্তী গুটি কয়েক নরনারীর হৃদয় রহস্যঘটিত উপাখ্যান। উপন্যাসের নায়ক দিব্যেন্দু ব্যায়ামবীর ও ব্রহ্মচারী ধরনের যুবক। সংসারে তার কোনো পিছুটান নেই। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তার নেই: কিন্তু বিলাত থেকে ফিরে এসে ফলিত বিজ্ঞানের চর্চায় সে জীবনকে উৎসর্গ করেছে। অপত্য স্নেহে গড়ে তোলা রসায়ন পরীক্ষাগার এবং একটি নেপালী চাকরকে নিয়ে তার সংসার। তার পৃষ্ঠপোষক একজন অবাঙালী ধনী ব্যক্তি, পিতৃপরিচয়ের সূত্রে তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতি করেন। দিব্যেন্দুর তৈরি ফর্মুলাকে পেটেন্ট করে তিনি বাজারে ছেড়েছেন, এবার চাইছেন একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের দাওয়াই। দিব্যেন্দু যুক্তিবাদী, উদার এবং আদর্শবান যুবক, সব কিছু সে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারছে না।

এদিকে একজন প্রতিবেশী বিভূতির আধুনিকা সুন্দরী স্ত্রী তার প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়ছে। ভাগ্যচক্রে সেই মেয়েটি আবার তার প্রথম জীবনের বাগদত্তা। সাময়িক ভ্রান্তিবশত সে নীচুবর্ণের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে এবং এখন অনুশোচনায় দিন কাটাচ্ছে। একদা বিত্তশালী স্বামীটি তার আজ কপর্দক-শূন্য পথের ভিখারী। রাজনীতি করতে গিয়ে প্রহৃত হয়ে হাসপাতালে। শুধু তাই নয়, যৌন অক্ষমতাবশত তাদের দাম্পত্য জীবন বেশ কিছুকাল আগেই প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং অঞ্জলির অর্থাৎ বিভূতির স্ত্রীর স্বৈরিণী হবার সুযোগ রয়েছে। এদিকে আবার প্রতি-নায়িকার উদ্ভব হয়েছে, নীলিমা নাম্নী একজন উদাসযৌবনা শিক্ষিকাও দিব্যেন্দুর অনুরাগিণী হয়ে পড়েছে। সুতরাং দিব্যেন্দুর চারপাশে হৃদয়ের আবর্ত এবং দ্বিধা।

এমনিভাবে ঘটনার পর ঘটনা এবং চরিত্র এসে কাহিনীকে স্ফীত করেছে। তৎসহ দু চারটি সামাজিক সমস্যা। রাজনীতি, অর্থনীতি, পতিতাবৃত্তি। হালকা ইমোশনাল রীতিতে নায়কনায়িকা প্রতি-নায়িকারা বারংবার মুখোমুখি হয়েছে। আদর্শের অনেক রুচিকর কথাও আছে। গল্প-ক্ষুধিত পাঠক-পাঠিকার যথেষ্ট খোরাক আছে কিন্তু উপন্যাস-পাঠান্তে মনে হয় নায়কের আর একটু সাবালক হওয়া প্রয়োজন ছিল, পৌরুষের ওইটেই প্রথম শর্ত, বয়স নয়, প্যারালাল বারও নয়। লেখকের হাতে কিছু শক্তির পরিচয় পেলাম। এই ধরনের জোলো রোমান্টিক কাহিনী ভাঁজতে গিয়ে তিনি সে শক্তির অপব্যয়ই করেছেন। ২৪৩।৬৬

কবিতা

স্বরচিত দৃশ্যান্তর। রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মানস প্রকাশনী। ৯৩।১।এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২ ২·০০।

'স্বরচিত দৃশ্যান্তর' একজন নতুন কবির নব প্রকাশিত সুদৃশ্য কাব্যগ্রন্থ। শুরু থেকে শেষ অবধি প্রতিটি কবিতা খুঁটে খুঁটে পড়লাম কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হল

না। কবিতাই বটে, ভাব, এবং উক্তি, ছন্দ এবং কাঠামো সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু সব থেকেও কি যেন নেই। ফলত, কোন একটি মাত্র আশ্চর্য লাইনও মনের উপর জোরে দাগ টানে না। এ কথা খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে হল। বর্তমান গ্রন্থের প্রণেতা কবিতা লিখতে জানেন নিশ্চিত, কিন্তু কেমন করে শব্দ সাজিয়ে তাকে ভেঙে গড়ে মনের ভিতরে বাজিয়ে তুলতে হয়, কেমন করে পঠককে দূরান্তে ডাক দিয়ে নিতে হয়, তার মধ্যে অন্য একটি অলীক স্বপ্নজগৎ মূর্ত করে তুলতে হয় তা জানেন না। আমাদের মতো নতুন স্বাদের সন্ধানী কাব্যপাঠকদের জন্য নতুন ছবি নতুন ভঙ্গি, নতুন কোনো স্বাদের নিমন্ত্রণ তিনি রাখেন নি। ৪২২।৬৬

কুলগন্ধে। সরযূবালা রায়। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী। ৪২ বিধান সরনী। কলকাতা-৬। ১·৫০ পঃ।

নাম দেখে মনে হয় রচয়িত্রী কোন বৃদ্ধা মহিলা। আর তা যদি না-ও হয় তবে মনের দিক দিয়ে তিনি বাংলা কবিতার পঞ্চাশ বছর আগেকার পুরো মেজাজটিকে বহাল তবিয়তে বজায় রেখেছেন। তা বেশ ভালো কথা, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, নিকট আত্মীয় স্বজন ছাড়া এ বই দেড় টাকা খরচ করে কেউ কি কিনবে? দিবে, আজিকে, লব, হৃদি, চুমিব, কুতূহল ইত্যাদি অজস্র শব্দ অচল-সিন্দুকে তালা-চাবি আঁটা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এখন যাঁরা ষাটের উপরে এবং এখনকার আধুনিক কাব্য যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের কাছে সরযূবালা রায় স্বভাব কবি হিসাবে খ্যাতি পাবেন। ৪২১।৬৬

চেরী। সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিহার সাহিত্য ভবন প্রাঃ লিঃ। ৩৭এ কলেজ রো। কলকাতা-৯। ২·০০।

নিরাশ করে নি 'চেরী'। মলাটের দরজা খুললে যে ভূমিকাটি স্বাগতম জানায় পাঠককে, সে প্রথমেই পরবর্তী কবিতা-গুলি সম্পর্কে আগ্রহী এবং উৎসাহী করে তোলে। স্বীকার করতে বাধা নেই, কবিতা-গুলির স্বাদ ভিন্ন, সাজ অন্য, ভিতরের অনুভব বা উপলব্ধি কখনও বিধুর কখনও মধুর। কিন্তু আপত্তি একটা আছে, দার্শনিক তত্ত্ব বা জানালা খোলবার চেষ্টা যেখানে দেখা দিয়েছে সেখানেই কবিতার অবনতি ঘটেছে। চরিত্র-কেন্দ্রিক কবিতা-গুলিও অপূর্ব, বাস্তব-পারিপার্শ্বিকের পটভূমিতে, স্থান-কাল-পাত্রের ছোঁয়াচে তারা পাঠকচিত্তে অবিলম্বে আনন্দ জাগায়। বইয়ের শেষাংশে 'চেরীগুচ্ছ' সমান সার্থক—ক'টি কবিতাই যেন রঙিন জাপানী লণ্ঠনের মত অন্ধকারে জ্বলে ওঠে। সমস্ত কবিতাই এই বইএ গদ্য কবিতা, তাতে কিছু খারাপ হয়নি—কবিতার চিরাচরিত একঘেয়ে আঙ্গিকের বাইরে রচয়িতা তাঁর নিজস্ব স্টাইলে সে মনের স্বপ্নজগৎকে মুক্তি দিতে পেরেছেন এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কবির ছবি ফোটাবার ক্ষমতাও রীতিমত প্রশংসার দাবী রাখে।

সাপ্তাহিক কবিতা (প্রথম সংকলন)। সম্পাদক কল্যাণ ভট্টাচার্য। দশ পয়সা।

চার পৃষ্ঠায় দুজনের মারাত্মক বা আক্রমণাত্মক কবিতা! হ্যাঁ কবিতাই। কবিতা আজকাল নানান রকমের হয় তো! হাতে বিলি করবার জন্যে নয়। মাত্র দশ পয়সার ট্যাক্সো ধার্য হয়েছে। মাত্র দশ পয়সার বাংলা কবিতা! বাংলা কবিতা কত শস্তা হয়েছে পাঠকরা দেখুন! চার পৃষ্ঠার 'সংকলন' এটি। নিশ্চয়, দশ পৃষ্ঠার উপন্যাস হলে, চার পৃষ্ঠার কাব্য সংকলন কেন হবে না শুনি?

প্রাপ্তি স্বীকার

শনিবারের সন্ধ্যা। অমরেন্দ্র দাস। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা—৬। মূল্য ৮·০০।

কামমোহিতম। চিত্ত ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন : ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

প্রেম এক মন্ত্র। হেনরি জেমস। অনুবাদ : অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা : ১৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০।

সামবেদীর সন্ধ্যা পদ্ধতি। সম্পাদনা : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৩২।১ রাধা-কান্ত জীউ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ০·৭৫।

মেলবোর্ন থেকে ইডেন। চিরঞ্জীব। জ্ঞান-তীর্থ : ১ বিধান সরণী, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০।

Cricket Records by Moti Nandy. Subarnarekha: 73, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9. Price Rs. 5.50.

Changes in Great Views on Physics by Apurba Choudhury. N. Choudhury: P.O. Bholardhubri, Via. Alipurduar Jn., Dt. Jalpaiguri. Price Rs. 8.50.

দেহলি প্রান্তে। শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং (প্রা) লিমিটেড : ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·৫০।

সমুদ্র-শয়তান। অদ্রীশ বর্ধন। অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৪·০০।

অমানুষ। আলোক ঘোষ। অরুণোদয় প্রকাশনী : ৩এ মদন ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·৫০।

প্রবন্ধাবলী। স্বামী ভূমানন্দ। কালীপুর আশ্রম : কামাখ্যা, গৌহাটি-১০, আসাম। মূল্য ৫·০০।

পরশরতন। শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। সন্দীপন পুস্তকালয় : ৪১-বি রাসবিহারী অ্যাভিনু, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·৫০।

ছবি ও গল্পে বাইবেলের বীর কাহিনী। সুবোধবিকাশ দত্ত। সুসমাচার সাহিত্য ভাণ্ডার : ১১।১ মিশন রো, কলিকাতা-১। মূল্য ১·৫০।

A COMPARATIVE STUDY OF A BENGAL FOLK TALE by Dipl. Theol. Ralph Troger. Indian Publications : 3, British India Street, Calcutta-1. Price 14.50.
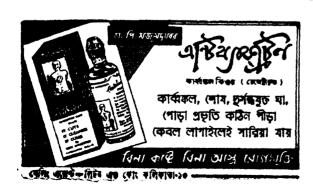
বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে সোবার্স-প্রণয়িনী অঞ্জু মহেন্দ্রু—শ্রীমতী মহেন্দ্রু অভিনীত এইচ এস শেঠিয়ার "উসকি কহানী" (পরিচালনা : বাসু ভট্টাচার্য) অনতিবিলম্বে মুক্তি পাবে

—ফটো-দেশ

উদ্দেশ্য। পতৌদির নবাব ও শর্মিলা ঠাকুরও পার্টিতে ছিলেন। আর ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স। দুই দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের অনেকেই ছিলেন।

অঞ্জুকে কিন্তু কারো সঙ্গে পরিচয় করাতে হয় নি। বরং অঞ্জুই আমাদের সকলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলেরই সঙ্গেই অঞ্জুর হৃদ্যতা। মনে হল, অঞ্জু এঁদের সকলেরই কাছের মানুষ।

অঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সোবার্সের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ মেলবোর্নে। আলাপের পরই বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের পরেই কি প্রণয়? অঞ্জুকে অনেক প্রশ্ন করেও সেদিন সদুত্তর পাই নি। সোবার্স তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন—এ-কথা অবশ্য অভিনেত্রী স্বীকার করলেন। "কিন্তু আমি এখনও মনঃস্থির করতে পারি নি" বললেন অঞ্জু। লক্ষ করলাম, তাঁর সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। অঞ্জুর মা শান্তি দেবী বললেন, "সোবার্স বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আমি ওদের দু' বছর অপেক্ষা করতে বলেছি।"

"কেন?"

"অঞ্জু এখনও ছোট। এ ব্যাপারে তাকে আরও জানতে বুঝতে হবে।" সোবার্স এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। শুধু বললেন, "এখানে কোন প্রেস ইন্টারভিউ নয়। এটা প্রাইভেট পার্টি, তাই না?"

অঞ্জুর মার সঙ্গে সোবার্সকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলতে দেখলাম। অঞ্জু কিন্তু সোবার্সের কাছ থেকে দূরে দূরেই ছিলেন। একবার অঞ্জুর বন্ধুরা (কয়েক-জন তরুণী ছিলেন সেখানে) তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন সোবার্সের কাছে। "ওকে চেনেন?"—একজন জিজ্ঞাসা করলেন সোবার্সকে। সোবার্সের রসিকতাও দেখলাম। মুচকি হেসে বললেন, "না, চিনি না।"

গোপন কথাটি শেষ পর্যন্ত আর গোপন রইল না। কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে সাংবাদিকদের সোবার্স বলে গিয়েছেন, হ্যাঁ, আমরা 'এনগেজড্'। বাগ্দান অঙ্গুরীয়টিও দেখালেন। সেদিন পার্টিতে যা দেখেছিলাম, অনুমান করেছিলাম তা মিথ্যা প্রমাণ হয় নি। আর সব ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে অঞ্জুর কেমন করে এত বন্ধুত্ব হল সে-প্রশ্নও মনে জেগেছিল। তারও উত্তর পেলাম। একের পর এক প্রায় সব ক্রিকেটাররাই এসে উপস্থিত হলেন তাও প্রথমটা বিশ্বাস করি নি। পরে দেখলাম অঘটন আজও ঘটে। যা ঘটে তা সবটাই যে মিথ্যা নয় সেটা সে-রাত্রিতেই বুঝেছিলাম। অঞ্জুর ব্যাপারে শুধু সোবার্সের মনের কথাটাই সেদিন জানতে পারি নি। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই কথা হয়েছে। একটি প্রসঙ্গেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক মৌন অবলম্বন করেছিলেন।

পতৌদির নবাব ও শর্মিলা ঠাকুরের আসতে দেরি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আসবেন তো ওঁরা। জিজ্ঞাসা করলাম অঞ্জুকে। "নিশ্চয়ই আসবেন ওঁরা। আমাকে কথা দিয়েছেন"—বললেন অঞ্জু মহেন্দ্রু। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন "ওই তো 'প্যাট' (অর্থাৎ পতৌদি)।" তাকিয়ে দেখলাম শর্মিলা ও নবাব ঢুকছেন। শর্মিলার পরনে শাড়ি। বাঙালী মেয়ের মতই ছিল তাঁর সাজ। মুখে শুধু ইংরেজী ভাষা। অবশ্য প্রথম সাক্ষাতে আমার সঙ্গে দুটি-একটি কথা বাংলাতেই বললেন। শর্মিলা ঠাকুর "শুভস্য শীঘ্রম"-এ বিশ্বাসী। একজন জিজ্ঞাসা করলেন "শুভ সংবাদ পাব কবে?" "আগামী বছরের কোন এক সময়ে", বলেই বোধহয় তাঁর খেয়াল হল নতুন ইংরেজী বছর শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "এ বছরেই।" ক্যামেরার সামনে শর্মিলা ও নবাবকে একসঙ্গে দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি।

এবার অঞ্জুর কথায় আসা যাক। "তিসরী কসম"-খ্যাত বাসু ভট্টাচার্যের "উসকি কহানী"-তে অভিনয় করেছেন অঞ্জু। আরও কয়েকটি হিন্দী ছবির জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ। একটি "সংঘর্ষ"। বাসুর কাছে তাঁর এক বন্ধু একদিন নিয়ে এলেন অঞ্জুকে। অঞ্জুকে দেখেই বাসুর পছন্দ হয়ে গেল। দু' ঘণ্টা বাদেই শুরু হল শুটিং।

অঞ্জুর জননী শান্তি মহেন্দ্রুর ফিল্মে অভিনয় করার শখ ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। তিনি এখন বোম্বাইয়ে একটি অ্যাডভারটাইজিং সংস্থায় কাজ করেন। অঞ্জু পাঞ্জাবী। ইংরেজী ও হিন্দী বেশ ভাল বলেন। ভুবন কলকাতারই এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। দেখতে ভাল,

স্মার্ট। সকলের সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে কথা বলছিলেন। এক ফাঁকে হঠাৎ অঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাংলা ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা আছে?" অঞ্জু বললেন, "খুব।"

অঞ্জু ফিল্ম স্টার হয়েছেন বলে তাঁর মা বেশ খুশী। তিনি বললেন, "আমারও এক-সময় ফিল্মে অভিনয় করার শখ ছিল। নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি।" মুখ থেকে প্রায় বেরিয়েই এসেছিল, এখনও সময় আছে। তা আর শেষ পর্যন্ত বললাম না।

সমালোচকদের উপর চ্যাপলিন নারাজ

চার্লি চ্যাপলিন বলেছেন, "সমালোচকরা গণ্ডমূর্খ (ব্লাডি ইডিয়টস)"—যেহেতু তাঁরা "এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং" ছবিটি পছন্দ করেন নি। ৫ জানুয়ারী লণ্ডনে চ্যাপলিনের ছবি মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি সম্পর্কে খবরের কাগজে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। সমালোচকদের মতে ছবিটি 'পুরাতন পন্থী' এবং একটি মর্মান্তিক ব্যর্থতা। চ্যাপলিন বলেছেন, "কোটিপতি ব্যবসায়ীর প্রেমে পড়েছে—এর চেয়ে ভাল গল্প ওঁরা কী আশা করতে পারেন?"

চ্যাপলিন আরও বলেন, "আমার ছবির নিন্দা অনেক বেরিয়েছে। আমি তা কখনও পড়িনি। চিন্তিতও হইনি। তবে কিছুটা হতাশ হয়েছি। বেশ কয়েক বছর আগে "সিটি লাইটস" ও "দি গোল্ড রাশ" ভাল সমালোচনা পায় নি। কিন্তু জনসাধারণ ছবি দুটি দেখবার জন্য ভিড় করেছেন। তাঁদের জন্যই আমি ছবি করি"।

সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা

থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় ৮৮টি দল যোগদান করেছেন। পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক জেলায় তিনটির কম দল প্রতিযোগী হলে যুক্ত করা হবে নিকটবর্তী অন্য জেলার প্রতিযোগীদের সঙ্গে। অভিনীত নাটকগুলি নিয়ে একটি নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা হতে পারে কলকাতায়।

নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত "হঠাৎ দেখা" ছবিতে সন্ধ্যা রায়—ছবির মুক্তি আসন্ন

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। গোপেন মল্লিক সুরকার।

কৃষ্ণ পিকচার্স-এর প্রথম ছবি "মুক্ত বলাকা"-র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন পরিমল ঘোষ। কিছুদিন আগে কালীপদ সেনের

মুক্ত বলাকা

সংগীত পরিচালনায় ছবির দুটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন অমর পাল। ললিতা চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, তপতী ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নবাগত মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন।

অমিত মৈত্রর পরিচালনায় চিত্রসংগঠনের "পান্না"-র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটি কিশোরের অসীম সাহস ও পান্না দুর্জয় প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী রচিত। ভি বালসারা ছবির সংগীত পরিচালক।

শ্রীরাজেশ প্রোডাকশন্স-এর "হঠাৎ দেখা"-র মুক্তি আসন্ন। তীর্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন নিত্যানন্দ দত্ত।

হঠাৎ দেখা সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের রূপ দিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, রেণুকা রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতালি রায়, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি।

শ্রীকলা নিকেতনের হিন্দী ছবি "দুসরী মুলাকাত"-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের ইনডোর শুটিং সম্প্রতি কল-

দুসরী মুলাকাত কাতায় সমাপ্ত হয়েছে। সুজিতকুমার ও কাঁকা চ্যাটার্জি ছবির নায়ক-নায়িকা। শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকার পরিচালক। সলিল চৌধুরী সংগীত পরিচালক।

মহিলা শিল্পী মহল অভিনীত "কবি"

মহিলা শিল্পী মহল দুর্গত মহিলা শিল্পীদের জন্য বাসভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন নাটক অভিনয় করছেন। তাঁদের নতুন উপহার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি'। সম্প্রতি এই নাটক দুবার তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন। মহাজাতি সদনে ও নাট্যসম্মেলনের মঞ্চে।

নাট্যসম্মেলনে মহিলা শিল্পী মহলের 'কবি' দেখলাম। দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অবাক করেছে অভিনেত্রীদের টিম-ওয়ার্ক। পুরুষের বেশে এঁরা আরও স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। কিন্তু 'কবি'-তে কী পুরুষ-চরিত্রে, কী নারী-ভূমিকায় তাঁরা যে-ভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন তা দর্শককে বিস্মিত করেছে।

'কবি'-র বিভিন্ন পুরুষ-চরিত্রে কারা অভিনয় করেছেন তা মহিলা শিল্পী মহল প্রকাশ করতে চাননি। দর্শকদের ধাঁধায় ফেলতে চেয়েছেন ওঁরা। এই ক্ষমতা তাঁদের আছে। কারণ 'মেক-আপ' এত চমৎকার হয়েছে যে, পুরুষ-বেশে কোন শিল্পীকেই চেনা সহজ নয়। কানন দেবী, সরযূ দেবী, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, শিপ্রা মিত্র, সাধনা রায়চৌধুরী, কেতকী দত্ত, সীতা মুখোপাধ্যায়, গীতশ্রী, তারা ভাদুড়ি, লীলাবতী, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পুরুষ-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের চরিত্র-চিত্রণই প্রশংসনীয়। কবিয়াল ও রাজনের ভূমিকায় দুই শিল্পীর অভিনয় অসাধারণ। অনুভা গুপ্ত ও নীলিমা দাস হয়েছেন যথাক্রমে ঠাকুরঝি ও বসন। ওঁরা সিনেমায় এই দুটি চরিত্র প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। নাট্যেও এঁদের অভিনয় অতুলনীয়। কবিয়ালের গানগুলিও সুন্দর গেয়েছেন পুরুষবেশী অভিনেত্রী।

সংগীতবহুল নাটকটি শুরু থেকেই দর্শককে আবিষ্ট করে। নাটকীয় আবেগ সঞ্চারেও শিল্পীরা সমর্থ হয়েছেন। এক কথায় এই সুপ্রযোজিত ও সুপরিচালিত নাটক পরম উপভোগ্য। অবশ্য সংগীত পরিমিত। তার চেয়েও প্রশংসনীয় আলোকসম্পাতের কাজ। মঞ্চ প্রায় নিরলংকার। আলোকপাতের মধ্য দিয়ে অনেক দৃশ্যের পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। নাটকটি আর একটু ছোট কিংবা আরও ঘনবদ্ধ করা যেত কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য দর্শকদের মনে জাগতে পারে। তবে কোন মুহূর্তেই 'কবি' ক্লান্তিকর মনে হয়নি। এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, 'কবি' মহিলা শিল্পী মহলের শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনা।

অগ্রদূতের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ চিত্রভারতীর "কখনো মেঘ" ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায় —ফটো-দেশ

মিউনিখ-এ ভারতীয় নৃত্য

পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখ শহরে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ বছর ভারতবর্ষের নৃত্য-গীত-নাট্য ছিল এক বিরাট আকর্ষণ। জার্মান ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', সিতারা দেবীর কথক নৃত্য ও বার্লিনের একটি দলের প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য প্রভৃতি কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল। পয়লা ডিসেম্বর এখানকার প্রাচীন ও অভিজাত মঞ্চ কুনস্টলার হাউসে কলকাতার মঞ্জুশ্রী চাকীর (সরকার) দেড় ঘণ্টাব্যাপী একক নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানটি তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথাক্রমে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর নৃত্যানুষ্ঠান, ভারতনাট্যম ও বাংলা দেশের লোকনৃত্য।

অনুষ্ঠান শেষ হয় ভর্জা গানের সাথে লোকনৃত্য দিয়ে। নমিতা ঘোষাল ও অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে লোকগীতি ও মিউনিখ-প্রবাসী দক্ষ তবলা-শিল্পী শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গত এই অংশটিকে প্রাণবন্ত করে। মঞ্জুশ্রী চাকী (সরকার) পশ্চিম আফ্রিকা থেকে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পথে এখানে এসেছিলেন।

মিউনিখ-এ নৃত্য পরিবেশনরত মঞ্জুশ্রী চাকী
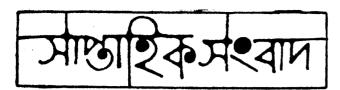
পাটনায় পুলিসের গুলিবর্ষণ বর্তমান সপ্তাহের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। গত ১০ ডিসেম্বর মজঃফরপুরে পুলিসের গুলিতে একজন অধ্যাপক ও একজন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিহার প্রদেশের রাঁচী, জামসেদপুর, সমস্তিপুর, সাসারাম, বেগুসরাই প্রভৃতি বহুস্থানে ছাত্র আন্দোলন ও বিক্ষোভ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গত ৫ জানুয়ারি পাটনায় এই ছাত্র-বিক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এইদিন পাটনার রাজ্য-পরিবহণ ডিপো এলাকায় কয়েক হাজার বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী লোকের (এদের অধিকাংশই ছাত্র) উপর পুলিস কয়েক **রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ফলে** ৯ জন ছাত্র নিহত এবং ৫৪জন আহত হয়। আহতদের **একজন পরে হাসপাতালে মারা যায়। ছাত্র-জনতা বাস ডিপো ও থানা আক্রমণ করে বহু সম্পত্তি নষ্ট করে দেয়। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ এমপোরিয়ামটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উপর ইট-পাটকেল ছোড়ে। এই হাঙ্গামায় প্রায় শতাধিক পুলিসও আহত হয়। সমগ্র পাটনায় কারফ্যু জারি করা হয় এবং বিহার রাজ্যের সর্বত্র শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য পাটনায় মিলিটারী তলব করা হয়।** সম্প্রতি পাটনায় প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

দেশী সংবাদ—

২ জানুয়ারি—রাজ্য খাদ্য দফতরের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, ওড়িশা ও অন্ধ্র পশ্চিমবঙ্গকে যথাক্রমে ১৯ হাজার ও ৫ হাজার টন চাল দিতে সম্মত হয়েছে। শীঘ্রই ওই চাল আসতে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহের মত আগামী সপ্তাহেও মাথাপিছু ৩০০ গ্রাম চাল দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

আজ সন্ধ্যায় দমদম-জংশন স্টেশনে মারমুখী একদল চালের চোরাকারবারীকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্য পুলিস দুই রাউনড গুলি চালায়। গুলিতে কেউ আহত হয়নি বটে, তবে চোরাকারবারীদের ইটের আঘাতে সাতজন পুলিস আহত হয়। এর মধ্যে দুইজন সাব-ইনস্পেকটর। আটজন চোরাকারবারী গ্রেফতার হয়েছে।

৩ জানুয়ারি—এই সর্বপ্রথম ভারত সরকার পূর্ব-শর্ত ছাড়াই আত্মগোপনকারী নাগা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হয়েছেন। কোন পক্ষই কোন পূর্ব-শর্ত দিতে পারবে না, এই ভিত্তিতে আজ বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের শ্রীদীনেশ সিং এর সঙ্গে নাগা প্রতিনিধিদের ঘরোয়া আলোচনা হয়।

হরিদ্বারের নিকটে শিবালিক পাহাড়ের মধ্যে রানীপুর গ্রামে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী বিশ্বের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানার উদ্বোধন করেন। এর নির্মাণ ব্যয় পড়বে ৮৬ কোটি টাকা। সোভিয়েট সাহায্যে এই কারখানা নির্মিত হচ্ছে।

৪ জানুয়ারি—মিজো পাহাড়ে দূর দূর গ্রামের অধিবাসীদের নতুন শহরগুলিতে অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। বৈরীদের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের একত্র রাখার জন্যই সেনা ও সামরিক কর্তৃপক্ষ এই লোকাপসরণের ব্যবস্থা করেছেন। গত বৎসরের বিদ্রোহের ফলেই এই সিদ্ধান্ত।

বিহারের কংগ্রেস-প্রার্থীদের দুদিনের সম্মেলন গতকাল শেষ হয়েছে। সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র মিশ্র সরকারীভাবে ঘোষণা **করেছেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক** কংগ্রেস-প্রার্থী কমিটির কাছ থেকে একটি করে জীপগাড়ি ও নগদ আড়াই হাজার টাকা পাবেন।

৫ জানুয়ারি—গো-রক্ষার সমস্ত দিক বিবেচনা করার জন্য আজ সরকার প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটি গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নটি নিয়েও বিবেচনা করবেন। আজ প্রথমে মন্ত্রিসভার জরুরী কমিটিতে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।

আজ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং আত্মগোপনকারী নাগা প্রতিনিধিদের মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনা শেষ হলেও প্রায় অচলাবস্থা রয়েই গিয়েছে। উভয় পক্ষই সাংবাদিকদের কাছে যা বলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, আজকে যে-সব অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, ভারত সরকার এবং আত্মগোপনকারী নাগা নেতারা তা ভেবে দেখবেন।

৬ জানুয়ারি—আজ কলকাতায় পৌর অধিবেশনে খাদ্য সমস্যা নিয়ে বিরোধী পক্ষের একটি প্রস্তাবকে "বিধিবহির্ভূত" বলায় মেয়রের আসন ঘিরে কয়েকজন ইউ সি সি সদস্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেন, তাতে বাইশ মিনিটের মধ্যেই মেয়রকে সভা শেষ করে চলে যেতে হয়। ঠিক তার পরেই একজন ইউ সি সি সদস্য নিজেকে "সভার পরিচালক" বলে ঘোষণা করে নিজেদের ভোটে প্রস্তাবটি পাশ করান ও স্লোগান দিতে দিতে সভা ভঙ্গ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার পানজাব থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৮ শত টন বাসমতী চাল বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু ওয়াগনের অভাবে এ চাল এ মাসের শেষ সপ্তাহের আগে কলকাতায় পৌঁছাতে পারবে না বলে জানা গিয়েছে। এ চাল কলকাতার রেশন এলাকায় দেওয়া হবে।

৭ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের কাজ পরীক্ষা করে দেখার জন্য ঘোষ কমিটি নিয়োগের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মনিয়োগ ও পুনর্বাসন মন্ত্রক এক প্রেসনোট প্রচার করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবন আজ **দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী** আসন্ন সাধারণ নির্বাচন যাতে হতে পারে, তার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

৮ জানুয়ারি—সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া আজ বলেন, নির্বাচনী সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভারতীয় বিমান বাহিনীর ব্যবহার এবং রাজ্য মন্ত্রীদের সরকারী গাড়ি চড়া গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী।

আজ সরকারীভাবে জানান হয়েছে যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে উত্তর প্রদেশের ৫৪টি জেলার মধ্যে ৪৫টি জেলায় ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। আজ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ৩২তম দিন।

বিদেশী সংবাদ

২ জানুয়ারি—সায়গনে আজ একজন মার্কিন মুখপাত্র বলেন, উত্তর ভিয়েতনামের [illegible] নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের আকাশে এক [illegible] বিমান যুদ্ধে মার্কিন বিমানবহর [illegible] বিমান ধ্বংস করে। এই সংঘর্ষে কোন মার্কিন বিমান ধ্বংস হয়নি।

৩ জানুয়ারি—চীনা বন্দর ডালনিতে [illegible] সোভিয়েট জাহাজ [illegible] অহেতুক আটক রাখায় সোভিয়েট সরকার চীন সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 'তাস' জানিয়েছেন, বন্দরনির্দেশ [illegible] 'অমূলক' অভিযোগ এনে [illegible] ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আটক রাখা হয়েছিল।

৪ জানুয়ারি—আফরো-এশীয় সংহতি সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীইউসুফ সিবাই [illegible] এশীয় ও দক্ষিণ আমেরিকার [illegible] মধ্যে সংহতি সপ্তাহের সূচনায় [illegible] একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। চীন ও সোভিয়েত সমর্থকদের মধ্যে [illegible] চীৎকারের দরুন হইচই-এর মধ্যে [illegible] ভেঙে যায়।

৫ জানুয়ারী—হ্যানয় সরকারের সঙ্গে [illegible] জন্য মার্কিন প্রস্তাব উত্তর ভিয়েতনাম [illegible] করতে রাজি। কিন্তু তার আগে ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ চূড়ান্তভাবে বন্ধ করতে হবে। একথা জানিয়েছেন প্যারিসে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি শ্রীমাই ভান বো।

৬ জানুয়ারি—পূর্ব পাকিস্তানে [illegible] অধিকারের সংগ্রাম দিন দিন [illegible] সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া [illegible] গিয়েছে, পাকিস্তানের দুই শাখার মধ্যে [illegible] মূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ [illegible] দিয়েছে।

৭ জানুয়ারি—টোকিওর এক সংবাদে [illegible] কুনসান ও অন্যান্য স্থানে [illegible] শ্রমিক দলের মধ্যে ব্যাপক "রক্তাক্ত [illegible]" হওয়ায় সাংহাই ও নানকিং-এর মধ্যে সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা [illegible] ১ জানুয়ারি তারিখে পিকিং-এ এই মর্মে পোসটার দেখা যায়। পোসটারের নীচে লাল রক্ষী দলের তৃতীয় অধিনায়কের নাম ছিল।

৮ জানুয়ারি—মানচুরিয়া ও সাইবেরিয়া সীমান্তবর্তী আমুর খণ্ড বরাবর রুশ ও চীনা ফৌজের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। ওই সীমান্তে প্রায় ৩০ ডিভিশন চীনা সৈন্য মোতায়েন আছে। এই সীমানার ঠিক বিপরীত দিকে যে-সব রুশ সৈন্য আছে, চীনারা **প্রায় রোজই তাদের দিকে তাক করে গুলি ছুড়ছে।**

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

"এতদিনে
আমি আবিষ্কার
করেছি!
কুসুম
বনস্পতিতে
রাঁধলে
খাবারের স্বাদ
হয় সেরা"

"তার কারণ, সুখাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ কুসুমে বজায় থাকে। সব রকম রান্নাই আমি কুসুমে রেঁধে দেখেছি···প্রত্যেকটাই খেতে হয়েছে বেশ সুস্বাদু।"

"শুনে মনে হচ্ছে সত্যিকার ভাল বনস্পতি—কুসুম।
সহজে পাওয়া যায় তো? আর টাটকা কিনা?"

"একেবারে টাটকা এবং খাঁটি। সীল-করা ২ কেজি, ৪ কেজির টিন—আনতে নিতে সুবিধে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই—সব জায়গায় পাবেন।"

"বাঃ, তাহলে তো কুসুম বনস্পতি কিনে দেখতে হবে।"

কুসুম বনস্পতি 'এ' আর 'ডি' ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন—জিনিস ভাল হবে। কারণ, কুসুম বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে টিনে ভ'রে কারখানায় সীল ক'রে দেওয়া হয়। সব জায়গায় টাটকা স্টক পাবেন।

খাঁটি স্বাদ পেতে হ'লে

বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১

JWTKPK 2963A

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামে বাসে—		... ১২৩০
আলোচনা—		... ১২৩১
আধুনিক চিত্রকলা—	শ্রীশুদ্ধশীল বসু	... ১২৩৩
সাহিত্য সংবাদ—	সনাতন পাঠক	... ১২৩৫
পুস্তক পরিচয়—		... ১২৩৭
খেলার মাঠে—	একলব্য	... ১২৪৪
ক্রীড়াকীর্তি—	মুকুল	... ১২৪৪
রঙ্গজগৎ—		... ১২৪৫
অরণ্যদেব—		... ১২৫১
সাপ্তাহিক সংবাদ—		... ১২৫২

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল রায়

পাকা চুল মাথায় ছেয়ে গেলে আপনাকে কিন্তু বয়সের চাইতে বেশী দেখাবে

ট্রু-টোন চুলের কলপ লাগিয়ে দেখুন আপনার বয়েস কমই মনে হবে

হেলেন কার্টিস্-এর তৈরী বিশ্ববিখ্যাত এই কেশ-পরিচর্য্যার জিনিসটি এখন ভারতে পাওয়া যাচ্ছে

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

খাদ্য কর্পোরেশানের সমস্যা

বাংলায় একটা গ্রাম্য প্রবাদ আছে, যার অর্থ হল, কারো গায়ে শাল দেবার আগে তার বহরটা দেখে নিও। কেউ কেউ শালের বদলে 'শূল' শব্দটা ব্যবহার করেন। সে যাই হোক, শাল অথবা শূল, খাদ্য কর্পোরেশান পশ্চিমবঙ্গে ধান চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের গোড়ায় মস্ত বড় গলদ থেকে গেছে, চাল ব্যবসায়ীদের মুনাফা-বৃদ্ধির বহরটা ঠিকমত মাপা হয়নি, ফলে বাজারে নতুন ধান চাল এলেও কর্পোরেশানের ভাঁড়ারে এযাবৎ জুটেছে মাত্র পাঁচ হাজার টন। অর্থাৎ তাঁদের কপালে প্রায় কিছুই জোটেনি, ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। গত বছরে এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার সংগ্রহ করেছিলেন এক লক্ষ টনের মতন ধান চাল। অবস্থাটা যে শোচনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

খাদ্য কর্পোরেশান চাল সংগ্রহ করতে যে কুণ্ঠিত তা নয়, তবু কেন তাঁদের ভাণ্ডারে চাল আসছে না! না আসার একাধিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ধূর্ত চাল-ব্যবসায়ীদের কারসাজি। একথা সত্য যে, এবারে এ-রাজ্যে ফলন ভাল নয়। কিন্তু ঠিক এতটা খারাপ নয় যাতে খাদ্য কর্পোরেশানের ভাঁড়ারে কিছুই জুটবে না। যদি ধান চালের তীব্র হাহাকার থাকত তবে খোলাবাজারে ধান চালের কারবার চলত না। নতুন ধান ওঠার পর পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় এই কারবার যথারীতি চলছে। জেলায় জেলায় গ্রাম গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার মণ ধান চালের কেনাবেচা হচ্ছে নির্বিঘ্নে।

সমস্যাটা অন্যত্র। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ধান চালের কারবার করেন, এবং যাঁরা চালকলের মালিক—তাঁরা খাদ্য কর্পোরেশানকে প্রথমাবধি সুনজরে দেখেন নি। চালের বাজারে নীট মুনাফা; এবং চেপে রাখতে পারলে বাজারটিকে বেশ তেজী করা যায়। এমন তেজী বাজারে কর্পোরেশানের হস্তক্ষেপ ঘটলে ব্যবসায়ীদের মুনাফায় ঘাটতি পড়ে। অতএব যাঁরা এই ব্যবসাটিতে পারঙ্গম এবং যাঁরা চালকলের মালিক তাঁদের বেশির ভাগই পরমোৎসাহে নতুন মরশুমে চালের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন, চালকলের মালিকরা কল বন্ধ করে বেনামীতে নেমে পড়েছেন ব্যবসাটিতে। ফলে খাদ্য কর্পোরেশান মিল থেকে চাল পাচ্ছেন না। গ্রাম গ্রামাঞ্চল থেকেও সংগ্রহ হচ্ছে না কিছুমাত্র। অথচ মিল থেকেই কর্পোরেশানের বেশির ভাগ চাল আসার কথা।

অবস্থা এমনই শোচনীয় যে আপাতত কর্পোরেশান রাজ্য সরকারকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবগুলি হল : খোলা বাজারে ধান-চালের পাইকারি ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে, বাজারে ধানচালের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দিতে হবে, লাইসেন্স পাওয়া বা না-পাওয়া সব হাসকিং মেশিন সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর না করলে সরকারী গোলায় ধানচাল উঠবে না।

রাজ্য সরকার অবস্থা বুঝে মাসে মাসে ধানের পাইকারি ব্যবসা হালে নিষিদ্ধ করেছেন। আশা করা যায় এতে কিছুটা উপকার দেখা যাবে। কিন্তু আইন যতই জোর হোক কোথায় কখন গিঁট আলগা হচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। যেমন কি না চালকলে ধান ভানা হলে সে চাল অর্ধেক রাজ্য সরকারের পাওনা হয় বলে রাতারাতি হাসকিং মেশিনে বা ধানভানা যন্ত্রে ধান ভেনে কলের মালিকরা আইনকে কলা দেখাচ্ছিলেন। এই রকম আরও কত ধূর্ত বুদ্ধি আছে যার পরিচয় আপাতত পাওয়া যাবে না, ভবিষ্যতে জানা যাবে। চালের পাইকারি ব্যবসা নিষিদ্ধ না হওয়ায় এ-রকম আশংকা আছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার সরকারের লেভি সংগ্রহে গড়িমসির কথা। গত একমাসে রাজ্য সরকার কোনো বড় জোতদারের কাছ থেকে এক কে জি চালও সংগ্রহ করতে পারেন নি। কেন এবং কি কারণে এঁরা লেভি দেন নি তা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, আপাতত সরকার লেভি আদায়ের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র। এখন জোতদারদের মর্জি, তাঁরা কত গড়িমসি ফন্দি ফিকির করেন কে জানে!

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা ভাল নয়। রেশন এলাকার মানুষ ক্রমশই একটা সংকটের মুখে এসে পড়েছে। কলকাতা এবং বৃহত্তর শিল্প এলাকায় মাঝে মাঝেই চালের সরবরাহ বন্ধ হচ্ছে, রেশনের পরিমাণও কমেছে। এক্ষেত্রে স্বভাবতই আশংকা হয় যদি খাদ্য কর্পোরেশানের ভাণ্ডারে অনতিবিলম্বে চাল সংগ্রহ না বাড়ে তবে রেশনের মুখ চেয়ে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের পেটে ভাত জুটবে না।
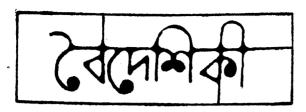
"আশার ওপর ঠান্ডা জল"

রিপাবলিকান পার্টির মনোনীত প্রার্থী মিঃ গোলডওয়াটারকে পরাজিত করে ডেমোক্রাটিক পার্টির মিঃ জনসন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন অনেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, গোলডওয়াটার প্রেসিডেন্ট হলে ঘরে-বাইরে মার্কিন সরকারের পলিসি অত্যন্ত বিশ্রী রকমের "প্রতিক্রিয়াশীল" ধারা নেবে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আশু নিবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না, যুদ্ধের খরচ আরো বাড়বে। স্বদেশে মিঃ জনসন-এর অনুসৃত সামাজিক পলিসির পক্ষে কিছু বলবার আছে। মিঃ গোলডওয়াটার প্রেসিডেন্ট হলে মার্কিন সরকারের সামাজিক পলিসি আরো অনুদার হতো, যদিও নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দান, দরিদ্রের দুঃখ লাঘব ইত্যাদি ব্যাপারে জনসন সরকারের যতটা গর্জন শোনা গেছে, কার্যত বর্ষণ তার তুলনায় অনেক কম হয়েছে, মোটের উপর বলা যায়, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। তবুও যেটুকু হয়েছে, গোলডওয়াটার প্রেসিডেন্ট হলে সেটুকুও হতো না, এরূপ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপারে জনসন সরকার যা করেছেন, তার বেশি নিষ্ঠুর গোয়ার্তুমি করবার সাধ্য মিঃ গোলড-ওয়াটারের হতো না।

মিঃ জনসন-এর নির্বাচনে যাঁরা উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে, মিঃ গোলডওয়াটার প্রেসিডেন্ট হলে এতদিনে আমেরিকা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিউ ক্লিয়ার বোমা ছুঁড়ত। না, মিঃ জনসন যখন এখনো নিউক্লিয়ার বোমা ছোড়েন নি, মিঃ গোলডওয়াটারও ছুঁড়তেন না, কারণ, নিউক্লিয়ার বোমা ছুঁড়লে যুদ্ধ ভিয়েৎনামে সীমাবদ্ধ থাকত না। ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের আপত্তি যতই আন্তরিক হোক না কেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভিয়েৎনাম সত্ত্বেও আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মারমুখী মনোভাব অনেকটা কমে এসেছে। অবশ্য তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে ক্রম-বর্ধমান বৈরীভাব। সে যাই হোক, জনসন প্রেসিডেন্ট না হয়ে গোলডওয়াটার প্রেসিডেন্ট হলে মার্কিন সরকারের বৈদেশিক নীতিতে বিশেষ কোনো তারতম্য হতো না। যে-দলের লোকই প্রেসিডেন্ট হন, বৈদেশিক নীতি মোটামুটি এক ধরনেরই হতো। কোনো বিশেষ প্রতিভা-শালী ব্যক্তি হলে তাঁর প্রভাবে পলিটিকস-এর ধারা বদলে যেতে পারে, কিন্তু এঁরা কেউ সে-শ্রেণীর মানুষ নন। অতি সাধারণ পলিটিশিয়ানদের নিয়ে এখানে কারবার। এমন কি, পলিটিশিয়ান হিসাবেও এঁদের ব্যক্তিগত ইতিহাস এমন নয়, যা নিয়ে গর্ব করা যায়, বরঞ্চ লজ্জা পাবার কারণ আছে। মিঃ জনসন-এর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবন কলংকশূন্য নয়। কিছু কেলেঙ্কারীর কথা পরে প্রকাশ পেয়েছে, যা তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে সাধারণের জানা ছিল না। কেনেডি হত্যার অব্যবহিত পরে মিঃ জনসন-এর ব্যবহার "দ্য ডেথ অব এ প্রেসিডেন্ট" পুস্তকে, যার উল্লেখ নিয়ে এতো হইচই চলেছে, তা-ও তখন ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল। তথাপি মিঃ জনসন যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন "বৈদেশিকী"তে বিশেষ কোনো উল্লাস প্রকাশ করা হয়নি এবং মিঃ গোলডওয়াটার না হয়ে মিঃ জনসন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন বলে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি —বিশেষ করে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে উদারতর হবে, এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সম্প্রতি যাঁরা ভিয়েৎনাম যুদ্ধের আশু নিবৃত্তির সম্ভাবনার কল্পনায় উৎফুল্ল হয়েছিলেন, মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জনসন-এর "দ্য স্টেট অব দি ইউনিয়ন" বক্তৃতা তাঁদের আশার ওপরও ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, শত্রু হার মেনে আমেরিকার দয়া ভিক্ষা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

কারো কারো মনে হতে পারে যে উল্লিখিত বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট জনসন ভারত সম্পর্কে যে দু-একটি উক্তি করেছেন, তজ্জনিত ক্ষোভ থেকে এইসব কড়া কড়া কথা বেরুচ্ছে। তা মোটেই নয়। বরঞ্চ প্রেসিডেন্ট জনসন যে এমন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আমেরিকার কথামতো না চললে ভারত মার্কিন "সাহায্য" পাবে না—এর চেয়ে মহৎ উপকার আর কিছু হতে পারে না। এর পরও যদি আমরা অন্ন-দাসত্বের শৃংখল ভাঙতে না পারি, তবে আমাদের বাঁচা না বাঁচা সমান।

*

ডক্টর রাধাবিনোদ পালের মৃত্যুর সংবাদ জাপানের সংবাদপত্রগুলিতে যে-রকম বড়ো করে প্রকাশিত হয়েছে এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি তাঁর উদ্দেশে যেরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন সেরূপ ভারতেও হয় নি। ডক্টর পালকে জাপানীরা দেবতার মতো ভক্তি করতো। দেখেছি ডক্টর পাল যখন কোলকাতায় থাকতেন তখন কোনো বিশিষ্ট জাপানী কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে যেতেন না, আর কী সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই না তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন! দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরে বিজয়ীরা পরাজিত দেশগুলির নায়কদের "যুদ্ধ অপরাধী" বলে বিচার করেন। জাপানে "যুদ্ধ-অপরাধী"দের যে-বিচার হয় ডক্টর পাল তার বিচারকমণ্ডলীর

অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্য বিচারকগণ অভিযুক্তদের অপরাধী সাব্যস্ত করেন কিন্তু ডক্টর পাল তাঁর সহযোগী বিচারকদের সঙ্গে একমত না হয়ে একটি ভিন্ন রায় দেন। তাতে তিনি এই মত দেন যে, পরাজিত দেশের নায়কদের "বিচার" করে শাস্তি দেবার অধিকার বিজেতাদের নেই, এরূপ "বিচার" ন্যায় বহির্ভূত। ডক্টর পালের এই "ঐতিহাসিক" পদবাচ্য রায় স্বভাবতই সেকালের আবহাওয়ায় বিজয়ী শক্তিগুলির বিরাগ সৃষ্টি করেছিল, অবশ্য তাতে জাপানী "যুদ্ধ-অপরাধী"দের শাস্তি দেওয়া আটকায় নি। কারণ ডক্টর পাল ছাড়া অন্য বিচারকগণের রায় বিজেতাদের ইচ্ছার পক্ষে ছিল। জাপানীরা "বিচারে" দোষী সাব্যস্ত হলেন, শাস্তিও তাদের মাথা পেতে নিতে হোল কিন্তু জাপান ডক্টর পালের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইল। দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে যে ডক্টর পালের ডিসেনটিং জাজমেন্ট এ নতুন নিরীখেও কিছুটা [illegible] হয়েছিল যদিও তখন ভারত স্বাধীন হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা ইন্টারিম গবর্নমেন্টের সময়। কর্তাদের ভয় হয়েছিল সাহেবরা কী ভাববে! আধুনিক যুগের চারজন ভারতবাসীর নাম জাপানীরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এঁরা চারজনই বাঙালী—রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র এবং রাধাবিনোদ পাল। রবীন্দ্রনাথ জাপানী প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং এশিয়ার নবজাগরণের ইতিহাসে জাপানী কৃতিত্বেরও তিনি প্রশংসা করতেন কিন্তু জাপানী ন্যাশনালিজম্ যখন সাম্রাজ্যবাদমুখী হতে লাগল তখন রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই উদ্বেগ ও বেদনা তিনি জাপানে গিয়ে জাপানীদের সামনে ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি। তার জন্যে কোনো কোনো জাপানী চিন্তানায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কও হয়েছিল কিন্তু এত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি জাপান শ্রদ্ধা হারায় নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। জাপানের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অনেক কিছু শেখার আছে একথাও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি অনেককে একাধিক বিষয়ে জাপানে শিক্ষার জন্যে পাঠিয়েও ছিলেন এবং একাধিক জাপানী শিক্ষককে ভারতে আনিয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্নেহ কত গভীর ছিল সে কথা তেমন সুবিদিত নয় যেমন সুভাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের কথা সুবিদিত। জাপানী "যুদ্ধ-অপরাধী"দের "বিচারের" কালে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে তিনি নিশ্চয়ই রাধাবিনোদের ডিসেনটিং জাজমেন্টকে অভিনন্দন জানাতেন, যদিও জাপানের যুদ্ধনীতির তিনি নিঃসন্দেহ নিন্দা করতেন যেমন নিন্দা করতেন জাপানকে যারা যুদ্ধে হারিয়েছে এবং যুদ্ধে যারা অ্যাটমবোমা প্রয়োগ করেছিল।

১৪।১।৬৭

কমিউনিস্ট দেশের তুলনায় মার্ক্সবাদের
কাছাকাছি আছি।" —অতুল্য ঘোষ।
মস্তিষ্কে গ্রুচো মার্ক্স / মার্ক্স ব্রাদার্স
করেছিল।

লাল রক্ষী
লাল শ্রমিক
মাও
চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আজো শান্ত হয়নি।

সুনন্দর জার্নাল

'মাথা ধরার প্রতিষেধক'

কলকাতার টেস্ট্ ম্যাচের পঞ্চাঙ্ক নাটক শেষ হয়ে গেল; করুণ রস, রুদ্র রস, হাস্য রস (ভারতীয় দলের অনবদ্য ব্যাটিং।) ইত্যাদি পার হয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিবাহের মধুর রসের মধ্য দিয়ে বেশ ঘনীভূত

ভাবে যবনিকাপাত ঘটল। তারপরে এল অকাল-বর্ষণ, জলে কাদায় নরকজমানো শীতে কিছু লোকে দু-চোখে শর্ষের ফুল দেখল (যতদূর মনে হচ্ছে, এই সময়েই শর্ষের ফুল-টুল ফোটে), আর একদল ভাগ্যবান 'হোম ওয়েদার' লাভের আনন্দে গায়ে হাজার টাকা দামের জার্কিন চড়ালেন। অচল ট্রামের লাইন ধীরে ধীরে ধুলো আর কাদার তলায় বিলীন হতে থাকল, "তিন দিনের মধ্যে চালু না হইলে ট্রাম তুলিয়া দেওয়া হইবে"—এই সাধু সংকল্প আইনের প্যাঁচে নিরুদ্দেশ হল।

এখন সর্বভারতীয় মহানাটকের 'নান্দী-পাঠ' চলছে। অদূরে সাধারণ নির্বাচন। পোস্টারে, ফেস্টুনে, প্যাম্ফ্লেটে, বক্তৃতায় শীতের বাতাস একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে। আর একটি তুচ্ছ ব্যাপার ক্রমশ খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সরে গিয়ে মাত্র তিন-চার লাইনের মধ্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে: 'অচল অবস্থা অব্যাহত।'

কিসের? কলকাতার দুটি সরকারী কলেজের। এদের অগ্রজটিকে নিয়েই সমস্যা, অনুজটি নিরুপায় অ্যাপেন্‌ডিক্সের মতো দুর্ভাগ্যের শিকার। ফলে প্রায় হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং অন্ধকার।

দোষের পাল্লা কাদের কতখানি ভারী—ছাত্রদের না কর্তৃপক্ষের, এসব হিসেব-নিকেশ কাগজপত্রে কিছু পাওয়া গেল, যদিও তার অনেকটাই ঝাপ্‌সা, পরস্পরবিরোধী এবং পারম্পর্যহীন। কিন্তু মূল প্রশ্নটা থেকেই গেল। এইসব ছেলেমেয়ের কী হবে. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় না হয় উদার চিত্তে এদের সম্পর্কে "বিবেচনা" করবেন, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে?

কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্র্যান্‌সফার নিচ্ছেন এবং নেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু তাঁদেরও পুরো একটি বৎসর নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থবানদের কথা জানি না, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে একটি ছেলে কিংবা মেয়েকে এক বছর কলেজে পড়াতেই নাভিশ্বাস ওঠে—আরো একটি বাড়তি বছর এই এলাহি খরচ চালানোর কল্পনা তাঁদের নিশ্চয়ই আনন্দে উচ্ছ্বসিত করে তুলবে না।

শুনতে পাচ্ছি, এইবারে চরম সিদ্ধান্ত আসছে। "প্রেসিডেন্সী কলেজ তুলিয়া দেওয়া হইবে।" চমৎকার সমাধান। মাথা ধরার প্রতিষেধক মুণ্ডচ্ছেদ।

হতে পারে ছাত্রদের অপরাধ সীমাহীন; প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি ধ্বংসে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল এ কথা প্রায় অকল্পনীয়, কিন্তু এই প্রেত নৃত্যে একটি ছাত্রেরও সমর্থন স্থায়ী কলঙ্ক হয়ে থাকবে। হতে পারে, শিক্ষকদের প্রতি তাদের ব্যবহার কখনো কখনো সব শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে; হতে পারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সমস্ত অবস্থাটা আরো জটিল

করে তুলেছে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও কি একটা সুনিশ্চিত মীমাংসায় কোনোমতে আসা যায় না? কর্তৃপক্ষ কি সীজার পত্নীর মতো নিষ্কলঙ্ক? অপরাধী ছাত্রদের সম্পর্কে কি দ্ব্যর্থহীন, প্রমাণ নির্ভর, নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা যায় না তাদের উপযুক্ত পরিবেশে বিচার করা যায় না, কিছু মমতা, কিছু সহানুভূতি নি

বয়োধর্মের খানিকটা আতিশয্য মার্জনা করা যায় না? শতকরা অন্তত আশী ভাগ (একটু সাবধানেই হিসেব করছি) নির্বিরোধ ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎকে এই অন্ধকার থেকে কোনোমতেই উদ্ধার করা যায় না? আর রোগ সারাইতে রোগীর অন্ত' ছাড়া কি অন্য কোনো উপায়ই কোথাও পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত?

সুধীজনেরা ভালো-মন্দ নানা ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন, কিছু কিছু বিশিষ্ট নাগরিকও অল্পবিস্তর চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন, কিন্তু যোগফল শূন্য। অথচ ছাত্রঘটিত সংকট আজ মাত্র বাংলা দেশের সমস্যাই নয়, সারা ভারতবর্ষেরই সমস্যা। এই সেদিনও বিহারে একটির পর একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলেছে, এখনো তার জের মেটেনি; আজকের কাগজ খবর এনেছে, সদ্যোজাত কাশী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে এক-প্রস্থ তাণ্ডব ঘটে গেছে। কলকাতার ব্যাপারও একটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—একটা নিদারুণ সামগ্রিকতার অংশ মাত্র।

এই দিক থেকে দেখলে সর্বাত্মক জাতীয় সংকটের অংশগত কোনো বিপর্যয়কে কেবল মান-অভিমান, জেদ আর জোরের ওপরে শান্ত করা যাবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে সর্বস্তরের চিন্তাশীল মানুষ এই প্রশ্নে আজ বিব্রত। সময় এসেছে, যখন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক অবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বের আরো গভীরে প্রবেশ করতে হবে—এক বাক্যে সকলে এই সত্যই তুলে ধরতে চাইছেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে কলকাতার দুটি কলেজের অচল অবস্থার দুই প্রান্তে দুটি জেদ অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার একটি মাত্র পরিণামঃ আত্মঘাত। প্রেসিডেন্সী কলেজ তুলে দিলে শুধু আগুনের ওপর এক টিন পেট্রল ঢেলে দেবার প্রাজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

কলেজে কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু কোথাও তার জের অনন্তকাল ধরে চলেনি, একটা না একটা শোভন এবং সুনিশ্চিত নিষ্পত্তি সবক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। সর্বভারতীয় সমস্যার প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েও এই হাজার তিনেক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে কি আমাদের কিছুই আর করণীয় নেই? একটি নিরপরাধ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হলে তারও দায়িত্ব কি সমস্ত দেশের ওপরে বর্তায় না?

আমি ভাবছি, বাংলা দেশ কি বন্ধ্যা হয়ে গেল? একটি সর্বজনমান্য নেতৃত্ব এ সময়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না, হাল ধরতে পারল না, সাহস করে এগিয়ে আসতে পারল না? কিছু বাণী আর সামান্য কিছু সদিচ্ছার পরেই সব ফুরিয়ে গেল, তিন হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রায় নির্বিকারচিত্তে সময় আর স্রোতের দিকে ভাসিয়ে দেওয়া হল?

ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচনের পোস্টার, ফেস্টুন, প্যামফ্লেট, বক্তৃতা আর শোভাযাত্রার বান ডেকেছে। নেতারা এখন অনেক জরুরী কাজে ব্যস্ত। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, এবার কাউকেই ভোট দেব না। দুটি কলেজের কয়েকটি ছাত্রের প্রশ্নে যাঁরা এগিয়ে আসবার সাহস পান না, তাঁরা ভারতবর্ষের সহস্রমুখ সমস্যার সমাধান করবেন—এ কথা বিশ্বাস করতে আমার বাধে।

জানি, আমার একটিমাত্র ভোট ব্যালট-বাক্সে না পড়লে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এখনো যে আমার যৎকিঞ্চিৎ বিবেক অবশিষ্ট আছে—নিজের দিক থেকে অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু আমি পাব।

মায়ার খেলা
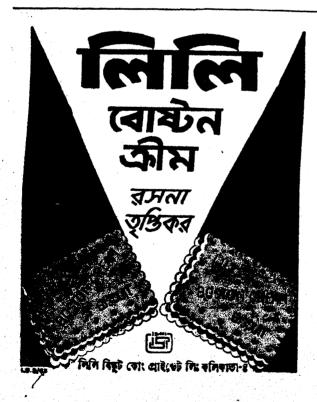
আনন্দ বাগচী

পুরোনো চাবির মত মসৃণ কলকাতা বুকে ঘোরে
হারানো দিনের দরজা খুলে যায়, চৌমাথা-পাঁচমাথা,
অলিগলি ট্রামডিপো, পার্কে হুমড়ি খাওয়া বাড়িগুলো
সব পরিচিত দৃশ্য সিনেমার উজ্জ্বল পোস্টার,
বাসের দোতলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলাম তোমাদের
সবাই ঘাড় নিচু ক'রে কি যেন খুঁজছো চুপি চুপি
সাবধানী প্রোফাইল চোখে পড়লো দিগ্বিদিকে ঃ
অতি ব্যক্তিগত অন্বেষণ।

কাব্যে শিল্পে অন্ধকারে শুধু নারী, নারী, নারী, নারী
এক আর্তস্বর ধ্বনি, ধূর্ত-স্বর, করুণ মিনতি
শেষ যৌবনের জন্য সকলের গোপন সঞ্চয়,
সমস্ত দেওয়াল জুড়ে অবিস্মরণীয় ক্যালেন্ডার,
সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে বাঁধো একমাত্র খেলাঘর—
বাঁধের সন্ধ্যায় নম্র [illegible] আহিরীটোলায়।
দোলনায় শিশুর মুখ
ক্যালেন্ডারে বারোমাস
দর্পণে রমণী
প্রতি মুহূর্তেই সবে যায় এই মায়ার খেলায়।

প্রীতিভাজনেষু

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কী যন্ত্রণা—স্পষ্ট কথায়, যন্ত্রণার হুলে তোমায় ফোটাচ্ছে
চতুর্দিকে তোমার শরীর, আহা কি শরীরের ব্যঞ্জনা
লুকোচ্ছো তুমিও, তুমি এই পাচ্ছো আর ঐ পাচ্ছো না
কী যন্ত্রণা—স্পষ্ট কথায়, যন্ত্রণার হুলে তোমায় ফোটাচ্ছে

আঘাত করছো—আঘাতে [illegible] হতেও পারতো
কিন্তু সে হৃদয়ে বইছে, হৃদয় এমন হতে পারতো না
বিভিন্ন ভাষার সিন্দুক ও কিন্তু ছাপাই পড়তে পারতো না
বিদূষক সে অগ্নি নাচে, বৈরাগী নয় [illegible]—

উল্টোসোজা—রাত দুপহর, চারদিকে [illegible] বাড়ি
কেউ কারুকে ছাড়াচ্ছে না—রুদ্ধ, পুলিশ, [illegible]
সব আমার গোপন গান্ডীবের সংযোজনায় [illegible],
কিন্তু সে হৃদয়ে বইছে, নর্দমায় গড়াতে পারতো!

শীতলপাটি ছোঁয়া হল না

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কথা বলাতে ভালো লাগে না ভালো লাগে না বোবা থাকতে
ভালো লাগে না সারা সন্ধে মদের পাত্রে মুখ রাখতে
রাতের পায়ের খিল খুলে যায় ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই
শহরে আছি গ্রামে আছি, আউল বাউল সাঁই কি গোসাঁই
সবাই চলে মাটির টানে, কিসের টানে আমার চলা——
সোনা মুখে রক্ত ফোটে, শীতলপাটি ছোঁয়া হল না।

[illegible] হৃদয় ছিল, হৃদয় থাকা কাল হল কি;
[illegible] কেউ না টানে, যে টানে সে [illegible] থেকে কি,
[illegible] দেখা হল না কোনো কারে চাওয়া হল না
রাতের পায়ের খিল খুলে যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই—
সোনা মুখে রক্ত ফোটে, শীতলপাটি ছোঁয়া হল না।

বাইরে তাকালেই

অমলকান্তি ঘোষ

যদিও বন্দী আমি, তবু বাইরে দৃষ্টি ফেলবার
অধিকার অব্যাহত। বাইরে তাকালেই
একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখি বারবার:
সকালে দুপুরে রাত্রে এর কোন ব্যতিক্রম নেই।
সেই দৃশ্যের তাপে, মনে হয়, গলে যেতে থাকে
আমাকে বন্দী-করা চতুর্দিকের বেড়াজাল।
বাইরে তাকালেই আমি দেখতে পাই—রাজকীয় ভাবে
পথ দিয়ে চলে যায় তীব্র সমকাল।

শিক্ষার বিতাড়ন

রঞ্জন

বহু বর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, আমাদের গৃহ এবং শিক্ষায়তনের মধ্যে ট্রাম চলে তো মন চলে না। অধুনা ট্রামও অচল। কবির আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষণের মাধ্যম। রবীন্দ্রোত্তর স্বল্পাধিক বিদগ্ধকে আমরা শিক্ষার ভাষা নিয়ে শুধু সংগ্রাম করিনি, বিশেষত দক্ষিণে; সমাধি রচনা করেছি সম্পূর্ণ শিক্ষার। শ্মশানচারী আজও প্রত্যক্ষ প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গনসম্মুখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ নয় বাত্যাবিমুক্ত। ছাত্রদের নানা অভিযোগ নাকি ভিত্তিহীন নয়। আমি সন্দেহী গোটা সমাজের ভিত্তি সম্বন্ধে। প্রেসিডেন্সি কলেজ একদা ছিল বাঙালীর অনন্ত দ্বিমুখিনতার মুখর প্রতীক। মূর্ত প্রতিবাদের অবিশ্বাস্য সঙ্গী ছিল কোমল, কমনীয় কেরানীয়তা। "কেরানী" শব্দটা আমার বিশেষ পছন্দ, কেননা, অন্তত অর্ধশতাব্দী পূর্বে জুলিয়ঁ বেঁদা La Trahison des Clercs বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন এবং গ্রন্থের বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। করণিক বিপ্লব করে না; বিশ্বাসঘাতকতা তার ধমনীতে।

বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রান্স জার্মানির নারীর শাসনে ছিল শুধু দু' তিন বছর। অন্তে তাই শাস্তি হল সহস্র বা লক্ষাধিক বিশ্বাসহন্তার; ওরা দেশের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেনি। গ্রহণ করেছিল বর্তমানকে। ভিশি আর সর্বনাশ সমার্থক হলে পলাশীর প্রয়োজন নবনির্ণয়ন। প্রেসিডেন্সি কলেজ কথা অতি মূল্যবান; ভণয়ে রঞ্জন হেথা শুনে ভক্তিমান।

*

শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ থাকলে গোটা বাঙলার শিক্ষাব্যবস্থা বিকল হয়ে যাবে এমন ধারণা অশ্রদ্ধেয় হওয়া উচিত। তবু স্বীকার্য, এই শিক্ষায়তনের সন্তানেরা বাঙালী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। পরশাসনকেও। এ সব ব্যাখ্যা কখনোই পূর্ণ সত্য ছিল না যে, ইংরেজী শিক্ষণ ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ছিল অনন্ত করণিক প্রয়োজন। তা হলে সম্ভব হত না উমেশ বা চিত্তরঞ্জন বা সুরেন্দ্রের আবির্ভাব।

উক্ত ত্রয়ী অজানিত, অবাঞ্ছিত প্রায়। প্রত্যেকের দেশপ্রেম ছিল তবু সন্দেহের ঊর্ধ্বে। দেশপ্রেমের তদানীন্তন সংজ্ঞা ছিল সামান্য বিভিন্ন। সংহার নেপথ্যে ছিল; সম্মুখে সংহতি। ল্যাবরেটরি ধ্বংসের কথা কেউ সেদিন ভাবতেই পারত না। অধ্যক্ষের অবমাননা সেদিন ছাত্ররা নিজেদের অপমান বলে প্রত্যাখ্যান করত। সম্প্রতি, শোনা গেল, ক্ষুব্ধ ছাত্রদের নানা কার্যে সহযোগিতা ছিল নানা শিক্ষকের। এ অভিযোগ সত্য হলে ছাত্রদের লজ্জাবোধ সীমায়িত হতে বাধ্য। মাস্টারমশাইরা যদি বিগ্রহে বসে, তা হলে আমরা ছাত্ররাই বা কী দোষ করেছি?

*

রুটিবণ্টনের প্রক্রিয়ায় আসল আসামীই না নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। যেমন সম্প্রতি হয়েছে খাস বিলেত মুলুকে। শিক্ষার চিকিৎসাবিভ্রাটের মূলে আছে ভাষাবিভ্রাট। কোন ভাষা শিখব তা নিশ্চিত জানিনে বলে কোনো ভাষাই শিখছি না। এই অনিশ্চয়তা অনিচ্ছাকৃত হলেও অক্ষমণীয় হত। কিন্তু সন্দেহ করবার হেতু আছে যে, ব্যাপকতর সাক্ষরতার প্রসারণের অন্তরালে ষড়যন্ত্র আছে উচ্চতর শিক্ষার বিরুদ্ধে। প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা কত বেড়েছে তা নিয়ে সরকারী সংখ্যাতাত্ত্বিকদের গর্বের অন্ত নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অনির্দিষ্ট কর্মবিরতি সহ্যকরণে ঔদাসীন্যের সামগ্রী।

পরিমিত সাক্ষরতা মন্দ বস্তু নয়। [illegible] কাকে মেলে তাতে। [illegible] প্রচার প্রচেষ্টার বাজার বাড়ে। স্বল্প পাঠ তোলায় সহজ বিশ্বাস। তাদের আস্থা বর্তমান ব্যবস্থায়, ভালো মন্দ নির্বিচারে সকলি। স্বল্পশিক্ষিত স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করতে পারে প্রচার প্রচেষ্টায়; অতুলনীয় ঘোষণা তার কাছে বজ্রনির্ঘোষ। অন্য দিকে উচ্চশিক্ষা; প্রতিবাদ উপক্রমণিকা তার।

শাসকের শত্রু সে, সে শাসক সাদা কালো। অন্যায়ের অরি সে, বর্ণনির্বিশেষে শিক্ষাকে তাই প্রস্তুত থাকতে হয় সার্বি প্রতিরোধের বিরুদ্ধে।

*

এই প্রস্তুতি সুবা বাঙলার কত সামান ছিল তারই সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান ব্যাপক অরাজকতায়। শিক্ষক বাধ্য হয়েছেন রাস্তায় নামতে, কণ্ঠে ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বেত্রহস্ত সহসা বুঝতে পেরেছেন অনিরুদ্ধ মূল্যবৃদ্ধির নির্মম কশাঘাত। মূল্যবোধের শোখীনতা সাজে না শূন্য উদরে। ছাত্র সে তো পা বাড়িয়ে আছে মিছিলে যোগ দেবার জন্য। মাস্টারি মিছিল? চেনা মুখ যে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। একেই কি বলে মণি কাঞ্চন যোগ? বাঙালী শিক্ষার মণি বিদায় নিয়েছে আজ বহুকাল। হায়, শুধু কাঞ্চন মেলেনি।

অর্ধশিক্ষার বিকিরণে কায়েমী স্বার্থ আছে বলে সন্দেহ করি, কেননা স্বাধীন ভারতে সাক্ষরতার প্রসার অনস্বীকার্য। অথচ নেই বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিরও। [illegible] বিদ্যালয়? সে তো শিক্ষার সুপারমার্কেট ভাষান্তরে সুপারবাজার। অন্য দিকে যত ত্রুটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার ধর্মঘটের প্রতি সরকারের বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য লক্ষণীয় প্রধানত এই কারণে যে, অচল ট্রামের প্রতিও সরকার সমান উদাসীন। ট্রাম লাইন ধরে চলে, তার ডিসিপ্লিন আছে। বর্তমান কর্তৃপক্ষের ডিসি-প্রীতি আদৌ আকস্মিক নয়; বিশৃঙ্খলার সহায়ক সে। বিস্মিত হতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মত দূরদৃষ্টা ট্রাম চলা ও মন চলার মধ্যে কিছুর ব্যবধান লক্ষ করেছিলেন। আজ ট্রামও চলছে না, মনের সচলতাও নির্জীব অথবা অপ্রত্যক্ষ। ওয়াকিবহালের অভিযোগ স্বীকার করেও বলতে হয় যে, দুই ও ব্যাপক সাক্ষরতা শিক্ষার শত্রু হতে পারে এবং আমাদের বর্তমান ভাগ্যবিধাতারা আমার ভোটে আগ্রহী, আমার চিন্তায় নয়। এদের মর্মকথা: শিক্ষা মুর্দাবাদ। আমাদের নীতি মানতে হবে। চিন্তা করা চলবে না, চলবে না। অচল হিন্দু কলেজ, অচল বিশ্ববিদ্যালয়, অচল ট্রাম। অচলায়তন সমাপ্তপ্রায়। মুক্তি, অর্থাৎ বন্ধন, আসন্ন।

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন : ড. মেঘনাদ ও রবীন্দ্রনাথ

নেপাল মজুমদার

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পাদিত "A Bunch of Old Letters" প্রকাশিত হলে (১৯৫৮) সাধারণ লোকে আভাস পায়, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে সুপারিশ করে গান্ধীজী ও জওহরলালকে

রবীন্দ্রনাথ

পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু এই পত্র লেখার ব্যাপারে ডঃ মেঘনাদ সাহা-ই যে কবিকে প্রভাবিত করেছিলেন, এ খবর অনেকেরই জানা নেই। তা ছাড়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারেও তিনিই বুঝিয়ে-শুনিয়ে কবিকে এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন' গঠনের ব্যাপারে সেই সময় যাঁরা প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ডঃ সাহা তাঁদের অন্যতম। শুধু তা-ই নয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের দেশে যুক্তি-বাদী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের জন্য যাঁরা দৃঢ় সংগ্রাম করেছিলেন, ডঃ সাহা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ছাত্রজীবন শেষ করে ডঃ সাহা যখন তাঁর গবেষণা ও অধ্যাপনাবৃত্তি শুরু করেন, ভারতবর্ষে তখন 'গান্ধী-যুগের' প্লাবন শুরু হয়েছে। চরকা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে দেশ ভেসে যাচ্ছে। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজীর বিখ্যাত Hind Swaraj পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ হয় (১৯২১ জানুয়ারি)। গান্ধীজী তার ভূমিকায় লিখলেন,

..."I withdraw nothing except one word of it, and that in deference to a lady friend.

"The booklet is a severe condemnation of 'modern civilization'. It was written in 1908. My conviction is deeper today than ever. I feel that if India will discard 'modern civilization', she can only gain by doing so." [Hind Swaraj —P.—16-17]

সেই জাতীয় উন্মাদনার যুগে হিন্দ স্বরাজ-এর জীবনদর্শন দেশের অধিকাংশ মানুষকেই আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই তখন গান্ধীজীর অনুকরণে চিন্তা করছেন ও কথা বলছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিকও চরকা-দর্শনের মহিমা [illegible] প্রচার করছেন। স্মরণ রাখা দরকার, সেদিন রবীন্দ্রনাথই এই অসহযোগ তত্ত্ব ও হিন্দ স্বরাজের জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে—এমন কি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। অবশ্য এর অল্পকাল পরেই আচার্য রায় আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে প্রবল আন্দোলন তুলবার চেষ্টা করেন। উল্লেখযোগ্য, তরুণ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও সেদিন চরকা-দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। ১৯২২ সালের শেষ ভাগে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের অধিবেশনে মেঘনাদ আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনে সেদিন 'জাতীয় উন্নতির উপায়' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'হিন্দ স্বরাজ'-এর জীবনদর্শনের সমালোচনা করে তাঁর ভাষণে বলেন, (নব্য ভারত—৩৪ খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩২৯), "বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি পূর্বেই বলেছি যে, বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। এ বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু স্থলে বলেছেন। আজকাল Back to nature রব উঠেছে; কলকারখানা সব তুলে দেও, দৌলত (Capital) ও মেহনৎ (Labour)কে একই পর্যায়ে আন। অনেকেরই বিশ্বাস যে, বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়—রাশিয়াতে বরং বেশী উৎসাহে দেশময় কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।...

"রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এবং লেনিনের জীবনে মস্ত একটা আকাঙ্ক্ষা যে,

সুভাষচন্দ্র বসু

দেশের সমস্ত কাজ—কলকারখানা, খা খনির কাজ, এমন কি চাষবাস পর্যন্ত তড়িতশক্তিতে চালান। বলশেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে—ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য—উঠাইয়া দিয়াছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল।..."

উপসংহারে তিনি বলেন, "দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হলে শুধু 'ত্যাগ' চলবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ 'অযোগ্যতার'ই নামান্তর মাত্র। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হবে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার স্বাধীন বৃত্তি যা এখন বিদেশীর হস্তগত তাহাতে ক্রমে-ক্রমে ঢুকতে হবে। এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নির্ভুতির উপর

নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে।"...

(দ্রঃ—মেঘনাদ রচনা সংকলন পৃঃ ২৪-২৬)

লক্ষ করবার বিষয়, তখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, সোভিয়েত রাশিয়ায় তখনও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয়নি কিন্তু সোভিয়েতের গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় লেনিনের মূলনীতির তাৎপর্যটি উপলব্ধিতে তাঁর সেদিন কোন অসুবিধা হয় নি। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তখন এ দেশে বুদ্ধিজীবীদের স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না।

বস্তুত ১৯২৭-২৮ সাল থেকেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় জওহরলাল রাশিয়া পরিদর্শন করে আসার পর সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বই লিখলেন। ১৯৩০ সালের শেষ ভাগে 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রবল ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ জন্মাতে থাকে। কিন্তু এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকায় পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে চিন্তা করবার কারুর অবকাশ ছিল না। দীর্ঘ চারটি বছর দেশ ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছে। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে দেশকর্মীদের গ্রামে ফিরে গিয়ে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার আহ্বান জানান। এই বৎসরই বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯৩৪ অক্টোবর) গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মুখে 'অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘ' (All India Village Industries Association) গঠনের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এর অল্পকাল পরে গান্ধীজীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই সংঘের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজী ও কুমারাপ্পার এই গঠনমূলক কর্মসূচীতে গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকলেও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কোন স্থান ছিল না।

ডঃ মেঘনাদ সাহা।

কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৬টি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। এর অল্পকাল পরেই কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসকে দেশের বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৩৭ সালেই আগস্ট মাসে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে (১৪—১৭ আগস্ট) অর্থনৈতিক পুন-গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস মন্ত্রীদের একটি আন্তঃপ্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। নানা গোলমালে তখন এটি কার্যকরী হতে পারে নি। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন (হরিপুরা কংগ্রেস)। ঐ বৎসরই মে মাসে তিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করবার আবেদন জানান। ১৯৩৮ সালের ২৫শে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে দেশের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেস সভা-পতির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতারা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবার পূর্বেই এম বিশ্বেশ্বরাইয়া, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা যন্ত্রশিল্প ও সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে লিখতে থাকেন। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এর সপক্ষে প্রবল যুক্তি দিয়ে লিখতে থাকেন। তিনি Modern Review-এ বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যা প্রকাশ করলেন (আগস্ট ১৯৩৮)। এতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ এস এস ভাটনগর, জি এল মেটা, ডি পি খৈতান, এ আর দালাল, অধ্যাপক সুব্রাহ্মনিয়াম প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তথ্যপূর্ণ ও মননশীল নিবন্ধ লিখলেন। উল্লেখযোগ্য, এই সংখ্যায় ডঃ মেঘনাদ সাহা "The philosophy of industrialisa-tion" এই শিরোনামায় যে নিবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে তিনি কংগ্রেস নেতাদের যে জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই, এই রকম সংশয় প্রকাশ করে তিনি এই সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্যের অভিযোগ করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনার'ও বিরূপ সমালোচনা করলেন। মেঘনাদের এইসব লেখায় বেশ উত্তাপ ছিল, সুতরাং তার সমালোচনা চলতে লাগল। এই বৎসরই আগস্ট মাসে (২১শে) Indian Science News Association-এর পক্ষ থেকে মেঘনাদ সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান। এই সভায় তিনি সুভাষচন্দ্রকে প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে কংগ্রেসের পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও আলোচনাদি করে তাঁর সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট হন (দ্রঃ Crossroads —pp-51-55) এই আলোচনার কিছুকাল পরে—২রা অক্টোবর—দিল্লীতে কংগ্রেস

গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিক স্বভাব সর্বদা সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণে কার্য করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃত কার্যের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে, আমরা ভারতবর্ষে জনপিছু পাশ্চাত্তোর কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র কার্য করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্ত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে—যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি—তাহার অধিকাংশই কার্যে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটা ঘোড়া মানুষের দশগুণ কার্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহা বৎসরে মাথাপিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কার্যে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব মোটের উপর এ দেশে লোকে মাথাপিছু ২০ গুণ কার্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশী গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"গ্রামজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে, গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শ স্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকা-নির্বাহের জন্য গ্রামবাসীদিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসিগণ কি চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ি, পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য। যদি দেশে প্রচুর কার্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য-সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি —তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রামজীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে যাবতীয় 'চাবি-শিল্প'-যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি—সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খাতিরে এইসমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয় না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন ১৯২৩ খৃঃ অব্দে চীনের উদ্ধারকর্তা Dr San yat Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।"

[ভারতবর্ষ—২৬ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে এর কিছু নূতন কথা নয়। বস্তুত মেঘনাদ কবির অন্তরের কথাটাই বলেন—এর মূল কথাটাই কবি বহুকাল ধরে বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় বলে আসছিলেন। এর পর কবি বাংলায় মেঘনাদের এই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার করে যা বলেন, তার মর্মার্থ ছিল এই, "ডঃ সাহার বক্তৃতার দুটি জিনিস আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীন কালের অনাবশ্যক অর্থহীন প্রথা ও ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে মেনে চলার প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন তিনি এবং তার জায়গায় জাতির সম্মুখে এক নূতন জীবনদর্শন তুলে ধরবার

medium

পক্ষে তিনি শক্তিশালী যুক্তি দিয়েছেন—যা আমাদের রাজনীতিক, সামাজিক এবং শিল্প-উন্নয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। শিল্প-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি তথ্যাদি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এর মূলে চাবিকাঠি রয়েছে রাষ্ট্রের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ ও তাকে সহজলভ্য করে তুলতে পারার উপর। আমাদের তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুদের কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিয়ে তাদেরকে তাদের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে আর আমাদের শক্তিসম্পদকে শোষণ করতে দিতে পারি না। যুগের অগ্রগতির তালে তাল রেখে আমাদের চলতে হবে—বিশেষ করে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। অধ্যাত্মবাদের নামে দারিদ্র্য ও পেশাকে বরণ করে নেবার দিনকাল চিরতরে শেষ হয়েছে এবং এ কথা আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের সমস্যা যত বড় ও মহানই হোক না কেন তা ততক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না যতক্ষণ না তাকে মোকাবিলা করবার মত উপযুক্ত শক্তি ও ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পারি।"

[Visva-Bharati News—Nov. 1938 —pp. 44-46.]

সম্ভবতঃ মেঘনাদ প্রথমেই সরাসরি কবিকে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথাটা বলতে সাহস পেলেন না। এই ব্যাপারে তিনি প্রথমে কবির সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দের সাথে সব কথা খুলে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর স্থির হয় যে, অনিল-বাবু সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের প্রশ্নে-পূর্ণ তাৎপর্যটি কবিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ব্যাপারে গান্ধীজী ও জওহরলালকে চিঠি লেখাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে মেঘনাদ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। পরদিনই তিনি অনিল চন্দ মশায়কে ইংরেজীতে এক পত্র যা লিখলেন (১৫ নভেম্বর ১৯৩৮) তার মর্মার্থ ছিল এই :

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স্

১৫ই নভেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আমার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে আমার প্রতি যে আতিথেয়তা দেখান হয়েছিল, তার জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার নির্দেশমত সমস্ত জিনিসটা আমি অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসকে পাঠিয়ে দিয়েছি। অনুগ্রহ করে কবিকে আমার পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন।

আমাদের দুজনের মধ্যে আলোচনাক্রমে যে দুটি বিষয়ে আমরা ঐকামত হয়েছিলাম, আশা করি আপনি কবিকে সেই মত বুঝিয়ে মহাত্মাজীকে ও জওহরলালকে দুটি চিঠি লেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আর তা পাঠিয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে তার কপি পাঠিয়ে Philosophy of Industrialisation নামে আমার প্রবন্ধটির সম্পর্কে কবি অগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেইজন্য এই প্রবন্ধটির দুই কপি এবং Indian National Institute-এর বিগত অধিবেশনে আমার দুটি বক্তৃতার কপিও এই সাথে আপনাকে পাঠালাম। আপনি এই প্যাম্ফ্লেটগুলির 'পরে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পর খুবই বাধিত হব। তিনি যদি তাঁর শক্তিশালী লেখনী আমার মতের সপক্ষে ধারণ করেন—যেটা নাকি আমার মতে দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই মনে প্রসারিত করে দেওয়া উচিত—তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এম এন সাহা

অনিলকুমার চন্দ
সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

উল্লেখযোগ্য, অনিল চন্দ মশায় এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন। ১৯শে নভেম্বর (১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে যে পত্রটি লেখেন সেটি 'A Bunch of

old Letters'-এ সংকলিত হয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার জওহরলাল তখন সবে ইউরোপ থেকে ফিরেছেন। কবির পত্রটি ছিল এই :

"প্রিয় জওহরলাল—এই মাত্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা পড়লাম। সারা দেশের স্বাগত ধ্বনির সংগে স্বরান্বিত হয়ে আমার স্বর মিলিয়ে দিচ্ছি।

তোমার সংগে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি বড়ই উৎসুক, তোমার সূচীতে যদি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আমি সুখী হব।

এই সেদিন ভারতীয় গ্রামশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহার সংগে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয়। তুমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য সুভাষ-গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছ বলে এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।"...

অনিল চন্দ মশায় এই পত্রের কপি মেঘনাদকে ঐদিনই পাঠিয়ে এক পত্রে (ইংরেজীতে) তাঁকে লিখলেন (১১।১১।৩৮).

১১ নভেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় ডঃ সাহা,

অনিবার্য কারণে আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরি হল—আশা করি তার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার প্রবন্ধগুলিও পেয়েছি। কবি সেগুলি মহা-আগ্রহের সংগে পড়ছেন।

দেখবেন এই সাথে জওহরলালকে লেখা কবির পত্রটি পাঠালাম। আশা করি আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে এটি যথেষ্ট হবে। আর অপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহাত্মাজীকে চিঠি লেখাটা ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে কবি নিশ্চিত হতে পারছেন না। তিনি ভাবছেন, মহাত্মাজীকে তাতে সংকটে ফেলবেন যদি গুরুতর রাজনীতিক সংকটের জন্য কোন সভাপতির অন্বেষণ আবশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় না, কবি এ' বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছেন।

এর পূর্বেই একদিন Moscow News-এর—আমরা যা নিয়মিত পেয়ে থাকি—এক কপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি এতে আগ্রহ অনুভব করলে অনুগ্রহ করে আমাকে তা জানাবেন। সোভিয়েত পুস্তকের তালিকাগুলি আমি দেখেছি, কিন্তু আমি দুঃখিত যে, এর মধ্যে আপনার আগ্রহ থাকার মত একটাও বই নেই; সেগুলি সাধারণ শিল্প-সাহিত্যের বই।

বিনীত শ্রদ্ধান্তে
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এ কে সি

এই পত্রের জবাবে মেঘনাদ অনিল চন্দকে পুনরায় তাঁর বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করে লিখলেন। ২২ নভেম্বর ১৯৩৮.*

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স

২২ নভেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার ১১ই নভেম্বরের চিঠিখানির জন্য বহু ধন্যবাদ! ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য কবি যে জওহরলালকে লিখেছেন এজন্য আন্তরিকই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

অপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও কবি যদি আমার সংগে সম্পূর্ণ একমত হন তা হলে আনন্দিতই হব। আর এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুল্লেখ করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে নিশ্চিত জানাই, কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আমার কিছু ওকালতি নাই। এই ন্যাশনাল-প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটা আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে এবং আমি চাই যে, আমাদের পরিশ্রমটা যেন শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য বা 'অ্যাকাডেমিক' ব্যাপার হিসাবে দেখা না হয়, পরন্তু এটি যেন জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা কার্যকরী করা হয়। নেতাদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কলকাতায় আমি শ্রীযুক্ত বসুর সংগে কয়েকদিনই এ বিষয়ে আলোচনা করে তাঁকে আমার স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছি। তাই, যদি তিনি সভাপতি-পদে বহাল থেকেই যান,

* ডঃ সাহা ও অনিল চন্দের মধ্যে ইংরেজিতে যে-সব পত্রবিনিময় হয় এখানে তার বাংলা মর্মার্থ দেবার চেষ্টা করা হল।
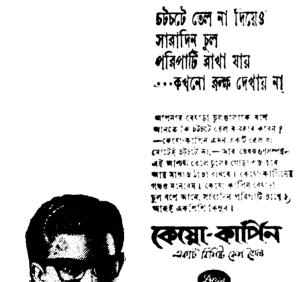
তা হলে তিনি আপনা-আপনিই Industrial Planning Commission-এর চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন—যাঁর কাজ হবে কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়া। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসু যদি ওতে এখন থেকেই যান, তা হলে আমাকে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য তাগাদা দিতে হবে না। তিনি আপন প্রেরণাতেই কাজ করবেন। কিন্তু অন্য কেউ যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হন তা হলে আমাকে এই প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করতে হবে। তাঁকে আমার মতে আনতে হবে এবং এমন কি তাতে করেও কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে এমন লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে—অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষ বসু ছাড়া—যাঁরা এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি হয়ত বলতে পারেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বা প্ল্যানিং-কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন কেন—এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই, কেননা, এ আই সি সি-র মিটিংয়ে এইটেই স্থির হয়েছে। আপনি যদি আমার এই মত কবির সামনে রাখতে পারেন এবং এই ব্যাপারে যদি তাঁর মতামত কংগ্রেসে ধ্বনিত হয় তা হলে আমি আনন্দিত হব।

আপনার প্রেরিত Moscow News-গুলির জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা রয়েছে। আপনারা যদি ওগুলি সংরক্ষণ না করেন, অনুগ্রহ করে ওগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মনে হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত মূল্যবান সোভিয়েট পুস্তকগুলি ভারতে আমদানি করতে দেওয়া হয় না। আপনি বলেছিলেন, ইউসুফ মেহের আলির এইসব বইয়ের পূর্ণ সংকলন আছে। অনুগ্রহ করে আপনি কি তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন?

অনুগ্রহ করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এম এন সাহা

পুঃ

আমার শান্তিনিকেতন ভ্রমণে যে কী আনন্দ পেয়েছি তার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আমার ইচ্ছা, কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাই এবং আরও অধিককাল সেখানে থাকি। বোলপুরে আমার বক্তৃতাটি নিয়ে কাগজে আমার উপর ভয়ানক আক্রমণ শুরু হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছি।"

কিন্তু কবি ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাঁর বিশেষ দূত হিসাবে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মারফত গান্ধীজীকে এক পত্র দেন। এই পত্রে কবি অত্যন্ত বিনীতভাবে বাংলার বিশেষ সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের কথাটা বিবেচনা করে দেখবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান। অবশ্য কবির এই পত্রটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে এই পত্র পাবার পর গান্ধীজী কবির পত্রটি সহ জওহরলালকে যে পত্রটি লেখেন (২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৮) তাতে এর মর্মকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর এই পত্রটি 'A Bunch of old Letters'এ স্থান পেলেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান পত্রটি যে কেন স্থান পেল না, বোঝা যায় না। এই পত্রের এক জায়গায় গান্ধীজী জওহরলালকে লেখেন, "এই পত্রখানি দূত মারফত গুরুদেবের কাছ

থেকে এসেছে। আমি ব্যক্তিগত মত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি যে, বাংলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নেই যে, গুরুদেব তোমাকে সোজাসুজি চিঠি লিখবেন, নয়ত তোমার সংগে আলাপ করবেন। তুমি তোমার নিজের মত জানাবে।"

[পত্রগুচ্ছ—পত্র নং—২৩৭॥
পৃঃ ২৭০-৭১]

অবশ্য এই খবর অনিল চন্দ মেঘনাদকে জানিয়ে দিতে কসুর করলেন না (২৮ নভেঃ ১৯৩৮)। মেঘনাদ তার জবাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন (১লা ডিসেম্বর),

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিকস্

১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ।

কবি যে আমার ইচ্ছা বা মতে সম্মতি দিয়েছেন এর জন্য অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

আশা করি আপনি কুশলেই।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এম এন সাহা

পুনঃ

আপনার *Moscow News* পেয়েছি এবং অপরিসীম আনন্দের সংগে পড়ছি। এই রকম পত্রিকা আরও পেলে আনন্দিতই হব।"

ইতিমধ্যেই অনিল চন্দ জওহরলালের জবাবী-পত্র পান। তিনি এই পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে দিয়ে মেঘনাদকে লিখলেন,

৩০ নভেম্বর

প্রিয় মিঃ সাহা,

গত পরশু আমি সুভাষবাবুর সম্পর্কে আপনাকে লিখেছিলাম, আশা করি আপনি তা যথাসময়েই পেয়েছিলেন।

দু' দিন পূর্বে আমি জওহরলালের কাছ থেকে পত্র পেয়েছি। এতে তিনি লিখেছেন—'এমন কি বিশেষ ব্যাপারে গুরুদেব আমার সংগে আলোচনা করতে চান, জানতে পারলে সুখী হব। তিনি প্ল্যানিং-এর বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত আগ্রহ আছে এবং অন্তত কিছু সময়ও আমি এতে দিতে চাই। এতে কি পরিমাণ সময় দিতে পারব তা চূড়ান্তভাবে স্থির করবার পূর্বেই এর সংগে আমার সম্পর্কটা নির্ণয় করে নিতে হবে। এর যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে তা খুবই মিশ্র ধরনের সংস্থা। তাঁদের মধ্যে সাহার মত কয়েকজন ভালই লোক আছেন, অন্যরা ততখানি সম্ভাবনাপূর্ণ (promising) নন। প্ল্যানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমাকে আরও প্রধান একটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে —আমাদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান বিভেদ-অনৈক্য...'

গতকাল আমি এই ব্যাপারে গুরুদেবের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা সবই তাঁকে এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছি। ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী যদি আসতে পারেন তা হলে গুরুদেবও নিশ্চয় এই স্থাননির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর প্রভাববল আরোপ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

ইউসুফ মেহের আলি এখনও ইউরোপ থেকে ফেরেননি। তিনি ফিরে আসলে পরই আপনার সাথে তাঁর যোগাযোগ করে দেব।

Moscow News-এর আরও এক কপি আপনার ঠিকানায় পাঠান হয়েছে। আমি কর্মীকে দিয়ে তাঁদের লেখাব যাতে তাঁরা আপনাকে নিয়মিতভাবে তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যপত্র পাঠান।

শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে
ইতি আপনার
(স্বাঃ) এ কে সি

এই পত্র পাওয়ার পর মেঘনাদ অনিল চন্দকে লিখলেন (৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮),

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিকস্

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ! কবি যে পণ্ডিত জওহরলালকে লিখেছেন এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি তাঁর চিঠির যে অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এটা উৎসাহব্যঞ্জক। যদি তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন তা হলে আপনি তাঁকে বলতে পারেন যে, কমিটির ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর যে সংশয় সেটা সম্ভবত অতিরঞ্জিত বা বাড়িয়ে দেখার জন্যে (exaggerated)। আমি ব্যক্তিগতভাবে ডঃ জে সি ঘোষ ও মিঃ এ কে সাহার সম্পর্কে বলতে পারি, তাঁরা খুবই সহায়ক হবেন এবং এই নীতির অন্তর্নিহিত আদর্শের দিক থেকেও তাঁরা উপযুক্ত লোক হবেন। ডঃ জে সি ঘোষ একজন খুবই চিন্তাশীল ও উপযুক্ত ব্যক্তি এবং প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা করেছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া খুবই সহায়ক হবেন এবং তাঁর এই ৮০ বছর বয়সেও যে তিনি দিল্লিতে Industrial Conference-এ অংশ গ্রহণের জন্য ছুটে এসেছিলেন, এর থেকেই বাস্তবিকই প্রমাণ হয় এ বিষয়ে তাঁর কী বিপুল উদ্যম উৎসাহ। বোম্বাইয়ের সদস্যদের ব্যাপারে আমি অল্পই জানি। তবে আমার ধারণা, তাঁরাও কাজের হবেন। পণ্ডিতজীর আরও সদস্য 'কো-অপ্ট' করবার জন্য চাপ দেবার সর্বদাই সেই অবাধ অধিকার থাকছে যাঁদের উপর তাঁর আরও অধিক আস্থা আছে। ভারত সরকার কিছু কাজের লোককে এই কমিটিতে যোগদান করতে বাধা দিচ্ছেন। সম্ভবত আপনি কাগজে দেখে থাকবেন, ভারত সরকারের আপত্তি জানানো সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে বিভিন্ন প্রদেশের 'ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ'দের এক সভা আহ্বান করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকারও পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। এইসমস্ত কারণে প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে কংগ্রেসকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। পণ্ডিত জওহরলাল যদি বোম্বাইয়ে আসেন, আশা করি আপনি তা আমাকে জানাবেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমি সেখানে গিয়ে পড়ব।

আশা করি আপনি ভালোই

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এম এন সাহা

অনিলকুমার চন্দ
সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

পুনঃ—দয়া করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

এম এন এস

ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ শুরু হয়। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান। এর পরবর্তী ঘটনা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।*

---

* বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র সদন'-এর তথ্য-ভাণ্ডার থেকে চিঠিপত্রগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। —লেখক

পুরস্কারে বিশ্বখ্যাতি পেলেও তাঁর চেয়ে শক্তিমান অনেক সাহিত্যিক যুগোস্লাভিয়ায় আছেন।

ওলুজিক পড়ে শোনালেন একটি যুগোস্লাভ ও একটি রুশী কবিতা। নিজেই তার অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে এবং কথা-প্রসঙ্গে জানালেন, ইয়েভতুশেংকোর চেয়ে তাঁর বেশী পছন্দ ভজনেসেনস্কিকে। কারণ? কারণ ইয়েভতুশেংকো-র প্রধান সম্বল 'শোম্যানশিপ', আর ভজনেসেনস্কি-র কবিতা গভীর, চিন্তাদ্রাবী।

ওলুজিক জানতে চাইলেন বাংলা দেশের কবিদের কথা। বললেন, দিল্লি-বোম্বাইয়ে শুনে এসেছি, বাংলা কবিতাই নাকি সেরা। বলুন আপনাদের কবিতার কথা, এংরি ইয়ংম্যান সত্যি সত্যি আছেন কি না, থাকলে ও'রা কারা, কী ও'দের বলার কথা?

আসরে বাংলা দেশের কয়েকজন কবি ও গদ্যলেখক হাজির ছিলেন। তাঁরা জানালেন, শুধু কবিতা কেন, সাহিত্যের অন্য দিকেও বাংলা দেশ সেরা। তবে, 'রাগী ছোকরা' কেউ নেই। বাংলা কবিতার নতুন ধারা বোঝাতে ওলুজিক আর এরডেনে—দুজনকেই উপহার দেওয়া হল অশিস সান্যাল সম্পাদিত ইংরেজী 'দি বেংগলি লিটারেচার' পত্রিকার দুটি কপি। পত্রিকা পেয়ে ওলুজিক খুব খুশী। বললেন, চমৎকার কাগজ।

বাংলা দেশ, বিশেষ করে এই কলকাতা শহর কত কবিতা-পাগল বোঝাতে গিয়ে আমাদের একজন বললেন—"জানেন, এখানে কবিতার মেলা বসে।"

"তাই নাকি, দারুণ জিনিস তো!"—ওলুজিক বিস্ময় প্রকাশ করেন।

"জানেন",—আর একজন জানান—"এখানে শুধু কবিতা দিয়ে ত্রৈমাসিক ও মাসিক কাগজ তো বের হয়ই, সাপ্তাহিকও নিয়মিত বের হচ্ছে।"

"তাই নাকি, অদ্ভুত কাণ্ড তো!"—ওলুজিকের আর এক দফা বিস্ময়।

"জানেন, শুধু কবিতা দিয়ে দৈনিক কাগজও এই কলকাতায় বেরিয়েছে।"

"মাই গড্, ভাবতেই পারি না"—ওলুজিক আকাশ থেকে পড়েন।

"শুধু তাই নয়, গত বছর ঘণ্টায় ঘণ্টায়ও কবিতা পত্রিকা বেরিয়েছে।"

ওলুজিক এবার প্রায় চেয়ার ছেড়েই উঠে পড়েন, বলেন, "আশ্চর্য করে দিলেন আমাকে, কখন হয় এসব?"

আমরা বললাম, "তার জন্যে আপনাকে আসতে হবে যে মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কবি-পক্ষে। অবশ্য কলকাতায় গরম পড়ে দারুণ, তবু নেমন্তন্ন রইল।"

ওলুজিক জানালেন, "আসতেই হবে আমাকে সে সময়। কবিতা নিয়ে যে এত কাণ্ড চলে এখানে, আমরা তো জানিই না।"

*

যিনি ছাত্র, তিনিই আচার্য

অসাধারণ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চলনে বলনে আলালের-ঘরের-দুলাল-ভাব নেই। দেখে রাজপুত্র যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশী মনে হয় বুদ্ধিজীবী বলে।

যুবরাজ করণ সিং-এর কথা বলছি। সম্প্রতি বিড়লা জাদুঘর উদ্বোধন করতে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

গত বছর পৌষ-উৎসবের সময় তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়েছিল অনেকক্ষণ। তাঁর ডক্টরেট থিসিস ছিল শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে; তাই বলা বাহুল্য অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সর্বাধিক, কিন্তু দেখলাম রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সম্পর্কেও পড়াশোনা যথেষ্ট। বললেন, "শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনও দেখলাম, এখন ইচ্ছে আছে কামারপুকুর জয়রামবাটি আর বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর দেখে যাওয়ার। তা ছাড়া আমার বড় ইচ্ছে কলকাতার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করা। বাংলা দেশ আর বাঙালী সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য সেই ছোটবেলা থেকে।"

করণ সিংকে বলেছিলাম, "আধুনিক ঘোড়দৌড়, পোলো এবং ক্রিকেটের বদলে দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি এই আগ্রহ একটু অস্বাভাবিক নয় কি?"

করণ সিং

করণ সিং হাসতে হাসতে বলেন—"এই জন্যে নয়, অন্য কারণে আমি একটু অস্বাভাবিক। আমিই বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় যে শিক্ষাজীবনে যুগপৎ আচার্য এবং ছাত্র ছিল। আমি যখন জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার, তখনই বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষা দিই ওই বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে।"

আমি বললাম—"তা জানি, খবরের কাগজেই তো বেরিয়েছিল।"

চাণক্য

ত্রিলোচন কলমচি

বইঠগ্‌খানা

বকস্‌ আইল্যান্ডস্‌ থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলা দেশের অবশ্যই তুলনা হয় না: তার আন্তর্জাতিক বড়বাজারের সাথে আমাদের খণ্ডিত প্রাদেশিক ছোট বাজারের আকাশপাতাল তফাত। সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার-খানা বই ছাপা হয় বছরে, শুধু পেপার-ব্যাকই বিক্রি হয়েছে পঁয়ষট্টি সালে অনুমান সাড়ে পাঁচ কোটি। চুটিয়ে ব্যবসা করছেন এগার শ প্রকাশক; এক শ তিরিশটি দৈনিক, হাজার খানেক সাপ্তাহিক এবং সাড়ে চার হাজার অন্যবিধ পত্র-পত্রিকায় ছেয়ে গেছে তার ঘরবাড়ি পথপ্রান্তের সমুদ্রতীর। সুতরাং তার পাশাপাশি বাংলা বই আটান্ন সালে ৩৩৭৯ খানা বেরিয়েছিল ত পঁয়ষট্টি সালে নেমে এসেছে ২৪৫০ খানায়। তবু তামাম ভারতবর্ষে বাংলা দেশই একমাত্র [illegible] গ্রন্থপীঠ। আর বাংলা দেশ মানেই পশ্চিম-বঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ মানেই কলকাতা। এবং সেই কলকাতাতেও বইপাড়া বলতে একমাত্র কলেজ স্ট্রীটকে বোঝায়। যেখানে গায়ে-গায়ে পিঠে-পিঠে বিরামহীন বইয়ের দোকান, হয়ত বইপাড়ার মিউচুয়াল চৌহদ্দি বিবেকানন্দ রোড-বৌবাজার এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েক শ প্রকাশক এখানে স্বর্ণপঙ্কজের মত জেগে আছেন এবং সারা কলকাতায় বইবাহিকতা ছড়িয়েছে অন্তত হাজারের ওপরে। সকলের নিজস্ব কাউন্টার নেই, কাগজে-কলমে তাঁদের অস্তিত্ব। সাইন-বোর্ডে নয়।

কলেজ স্ট্রীট আধুনিক বই-বাংলার রাজধানী হলেও পুরাতন গৌড়জনের মধুচক্র বটতলার নাম এত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হবার উপায় নেই। পুস্তকলক্ষ্মীর পুণ্যভূমি ছিল তখন হাটখোলা গরানহাটা ইত্যাদি বিস্তৃত এলাকা। এই সেদিনও বাংলা দেশ তোলপাড় করে চলেছিল বটতলার নিষিদ্ধ [illegible] গ্রন্থবাণিজ্য। চিৎপুরের রাস্তা ছিল তখন বটতলার সাহিত্যের শিরদাঁড়া। সাহিত্যও অনেক বড় ছিল তখন বাংলা দেশের। পূর্ব বাংলা এবং আসাম তখন বাংলা বইওয়ালাদের বুকপকেটে ছিল। সুদূর গ্রামে-জনপদে রেলে-স্টীমারে হাটেবাজারে তখন চলে যেত বটতলার ক্যানভাসারেরা, দেশের মানুষ হয়ত আজকের দিনের মত উচ্চশিক্ষিত ছিল না কিন্তু সেই সংগে বইকুণ্ঠও ছিল না। তাই ধনী দরিদ্র, বালবৃদ্ধ, লম্পট ব্রহ্মচারী সকলের মুখ চেয়ে বই লেখা হত, ছাপা হত, হাতে হাতে ফিরি হত। সেদিনকার প্রকাশকেরা এনসাইক্লোপিডিয়া ছাপেন নি ঠিক কথা কিন্তু তাঁদের গ্রন্থের তালিকা দেখলে বোঝা যায়, বাস্তব অবাস্তব কোনো বিষয়ই তাঁরা বাদ দেন নি। এত বিচিত্র প্রতিভা এবং বিশেষজ্ঞ সমাবেশ ঘটিয়ে-ছিলেন যাঁরা, ব্যবসা জিনিসটা তাঁরা খুব ভালোভাবে বুঝতেন তাতে সন্দেহ নেই। তাই রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র থেকে বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল কিছুই বাদ দেননি। সচিত্র প্রেমপত্র, কি কোকশাস্ত্র থেকে তবলাতরঙ্গিণী, সুরের সিঁড়ি পর্যন্ত বই যেমন ছেপেছেন, তেমনি মোটর শিক্ষক, ইনজেকশন শিক্ষা, লেদ সেপিং ও মিলিং ও কোষ্ঠি লিখন প্রণালীও ছাপতে ভোলেননি। রাতকানা জামাই, আক্কেল গুড়ুম জাতীয় প্রহসন কিংবা শাঁখচুন্নীর বিয়ে, বৃহৎ গোপাল ভাঁড় ও মক্ষিরানী হেঁয়ালী নামক মুখরোচক বই এবং অজস্র যাত্রা-থিয়েটার-গানের বই আজও পশ্চিমবাংলার পথের সম্বল।

জনৈক বটুলে-গ্রীন...

এই ধরনের এক একজন প্রকাশক যে কি পরিমাণ লভ্যাংশ ঘরে তুলতেন, সংবৎসর ধরে কি পরিমাণ বই যে আজো বিক্রি হয়, কলেজপাড়ার প্রকাশকেরা হয়ত তা ঠিক ঠাহর করতে পারবেন না। পনের-কুড়ি-পঞ্চাশ কি একশ টাকায় স্বত্ব কেনার কথা তাঁরা ভাবতে পারেন কি? কুড়ি পঁচিশ টাকায় আজও ফর্মা ছাপার কথা? কলেজ-পাড়ায় যখন কপিরাইটের পাট উঠে গেছে, বটতলার বংশধরেরা তখনও পুস্তকের সংস্কার-সংস্করণ কি অন্তিম মুদ্রণ পর্যন্ত সযত্নে টাঁকে গুঁজে বসে আছেন। সবই সেখানে যাবজ্জীবনের কারবার। ছাপা বাঁধাই মলাটের রূপরুচি নিয়ে মাথা ঘামান না তাঁরা, প্রুফ দেখা বিষয়েও খুঁতখুঁতির বালাই নেই। থোড়াই কেয়ার করেন পত্র-পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার। আপাদ-মস্তক মলপাইকার ঠেসে বিজ্ঞাপন দেন বছরে একবার পঞ্জিকার পাতায়। নর্দার্নীর হংসাইকের ফলেকপির কিংবা 'অতি প্রকাণ্ড লম্বা লাল মুক্তার ছবির পাশে অথবা জলন্ধর সিটির যাবতীয় জালিয়াতির সচিত্র বিজ্ঞাপনের প্রতিবেশী হয়ে, নয়ত সিদ্ধভৈরব কবচ ও সতী সূতিকারিষ্টের মুখোমুখী সুন্দর পোজিশনে সেই সরস্বতী ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন ঠাঁই পাবে।

এবং তার ফলেই গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অগণিত উদ্বাহু অর্ডার আসবে। রাজ-সংস্করণ কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণের বিপুল কলেবর ধর্মগ্রন্থ শতকরা ৫০% কমিশনে এজেন্টরা নাচতে নাচতে নিয়ে যাবে। গৃহস্থ-অগৃহস্থ ও অর্ধগৃহস্থ সকলের মনোরঞ্জনী পুস্তক নির্মাণ মোট কথা বটতলা মনোপলি ছিল। ইদানীং উক্ত অঞ্চল থেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ কেউ এক শ্রেণীর উত্তেজক 'অনুপান সাহিত্য'ও ছাপচেন। যার লেখক প্রকাশক মুদ্রক নেই, এমন কি দামও নেই। দেশী-বিদেশী জার্নালের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সেই পাঁচালী পাচার হচ্ছে, ষোল পাতা বত্রিশ পাতার বই পাঁচ টাকায় পর্যন্ত হট কেকের মত বিক্রি হচ্ছে। জনৈক পুলিস অফিসারের খাসমহলে এই ধরনের গুটিকয় কেতাবের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল প্রথমে। পরে আর একটি দৃশ্য দেখেছিলাম। জনৈক বটল-গ্রীন ওপাড়ায় মেয়েমানুষ ঠেঙাতে যাচ্ছেন, বগলে নির্মলাট একটি চটিকায় চাট-সাহিত্য।

আপনি যদি লেখক হন তাহলে আপনার স্থায়ী অস্বস্তির কারণ একমাত্র প্রকাশকই হতে পারেন, আর কেউ নয়। আর আপনি যদি প্রকাশক হন তা হলেও আপনার যাবজ্জীবনের উৎকণ্ঠার কারণ যে ঐ স্বয়ং লেখক সে বিষয়ে বিন্দুতম সন্দেহ নেই। জামাই ভাগনে এবং লেখক ইহলোকে নাকি এই ত্রিলোক কখনো আপন হয় না এবং এই তিন পুরুষের মন পাওয়া কিংবা মনের নাগাল পাওয়া ঈশ্বরেরও অসাধ্য। অথচ প্রতিদিন এই লেখক আর প্রকাশক পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, প্রায় দোসর খোঁজার মতই হলো হয়ে। আমি এই কলেজ স্ট্রীটে বসে অনেক বিচিত্র দৃশ্যই

কয়েক ঝাঁকা নীহার গুপ্ত চলে গেছেন, গেলেন শংকর

দেখেছি অনেক দিন। সাহিত্যের বাজার এবং সাহিত্যিকের আড্ডা তো এখানেই। লেখক-জগতের শীর্ষ সম্মেলন বইপাড়ার অনেক ঘরেই বিকেলে-সন্ধ্যায় ঘটে থাকে।

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোককে দেখেছি তাঁর দোতলার অফিস ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে মাঝে মধ্যে দূরবীন চালাতেন। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় সেই বঁধুয়াকেই নিশ্চয় তিনি খুঁজতেন। দূরের দু তিনটি জমকালো দোকানের অভ্যন্তর তিনি কড়া নজরে রাখতেন। একদিন সত্যিই তাঁর পেয়ারের লেখককে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে ব'সে থাকতে দেখেছিলেন। আমাকে সখেদে বলেছিলেন, এই নিয়ে নটি হল। চক্ষু ফুটলে সব কোকিলেরই এক রা। এত টাকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যাকে তুললুম সেই আমাকে ডোবালে হ্যা!

অবিশ্যি লেখকই সদাসর্বদা দুঃখিত থাকেন, এবং একমাত্র ভুবনেওলা কোনো প্রকাশক এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ১১০০ কপির জায়গায় গোপনে ৩৩০০ ছেপে কারবার করেছেন এমন প্রকাশকের সংখ্যাও তো খুব দুর্লভ নয়। লেখক তাগাদায় এলে শৃগালোপদ্রুত সেই কুমীরের ছানার মত শেষ এগার শ কপি সব সময়েই মজুত থাকে। লেখকের অকাট্য যুক্তির জবাবে তিনি যে কিভাবে ব্যস্ত হয়ে আছেন, সেকথা জানাতে ভোলেন না।

বই যাচ্ছেতাইভাবে ছেপে কিংবা সংস্করণ ফুরোলেও অনেক দিন পর্যন্ত না ছেপে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করে, নাম বদলিয়ে, মলাট বিকৃত করে এবং অর্থনৈতিক উপায়ে প্রকাশক যথেষ্ট ডোবাতে পারেন লেখককে। মাঝে মাঝে জালিয়াত প্রকাশকও দেখা দেন, টেলিফোন নিয়ে কাউন্টার সাজিয়ে বসেন, দৈনিক সাপ্তাহিকে বড় বড় দামী বিজ্ঞাপন দেন, নতুন লেখক লেখিকার পাণ্ডুলিপি এবং নগদ টাকা হস্তগত করে একদিন মহাপ্রয়াণ করেন। কেউ কেউ লেখকলেখিকার টাকা নিয়ে সরে পড়েন না, বই ছাপেন ঠিক ঠিকই কিন্তু আনাড়ী লেখকের সামনে যে হিসেব ধরেন সেটা ঠিক ঠিক না।

তবে প্রকাশক মহলেও নানা সংঘর্ষ আছে। সেখানেও স্পাইং প্রথা আছে। ইনফর্মার আছে। নিরীহমূর্তি প্রুফ-রীডার এবং ভড়ভড়ে বুকবাইন্ডার এক ঘরের কথা অন্য ঘরে পৌঁছে দিয়ে যান। কে কোন্ বই ছাপছেন, কত ছাপছেন সমস্ত নখদর্পণে চলে আসে।

একবার কোনো একটি বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ খানকয়েক কপি সর্বপ্রথম বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমার কোনো বন্ধুর হাতে তেমন একটি কপি এসে গিয়েছিল। সে আমাকে সগর্বে দেখালো। আমি বললাম, মুদ্রণপ্রমাদ হয়েছে, দেখছ না প্রথম কথাটি পঞ্চম ছাপা হয়ে গিয়েছে। বন্ধু হেসে বলল, দপ্তরী-প্রমাদও বলতে পারো, পঞ্চমই হয়ত প্রথম হয়ে গিয়েছে।

আসল রহস্য খোলসা হল আমার সেই

ভেতরে ভেতরে কিন্তু সুইট-হার্ট

বাইনোকুলার দাদার কাছে। তাঁর কাছেই জানলাম অনেক ডাকসাইটে প্রকাশক ম্যাজিসিয়ানের মত এগার শ কপি ছেপেই চার পাঁচটা সংস্করণ বানিয়ে ফেলেন। মলাটের রঙ আর টাইটেল হেরফের করে অ্যান্টিক আর হোয়াইট প্রিন্টের পারমুটেশন কম্বিনেশন করে সংস্করণের পর সংস্করণের আবির্ভাব ঘটে।

তবে সব সময় নয়। কোনো কোনো বই রেসের ঘোড়ার মত পিলে চমকে দেয়। ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাতে না ওল্টাতেই দুসরা এডিশন [illegible] এর পরের পর এডিশন। [illegible] বই [illegible] সংস্করণ, [illegible] মাথার [illegible] দিয়ে [illegible]।

অবিশ্যি সাম্প্রতিক এডিশন [illegible] সত্যিই লোমহর্ষক ব্যাপার। [illegible] অন্য প্রকাশকের ঈর্ষান্বিত [illegible]। আমি এবং আমার এক প্রায় পথে বসা প্রকাশক অবশ্য মুগ্ধ চোখেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। কয়েক খাঁকা [illegible] ইতিহাসে পড়া শিবাজীর মতই চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেলেন, গেলেন শংকর, এই পথ দিয়েই একসময় ঝুড়ি ঝুড়ি অবধূতকেও যেতে দেখেছি। দেখি আর সেঞ্চুরীর হিসেব কষি দুজনায়।

আমি একজন প্রকাশককে জানি, গভীর জলের মৎস্যরাও তাঁর টোপ গিলে বসে আছেন। তাঁর দাদনের টাকা চাকুলিয়া থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত ছড়ানো। কিভাবে যে চতুর্দিকে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়েছেন জেনে আমার সত্যিই বিস্ময় জাগলো। অথচ তাঁকে কৃপণচূড়ামণি বলেই [illegible] এতদিন। শীত গ্রীষ্ম একটি [illegible], তাও সব সময় গায়ে রাখেন না, চেয়ারের কাছে মুসলমান সওদাগরের মত ঝুলিয়ে রাখেন। এমনিতে রগচটা মানুষ, কাজ ফেলে রাখেন না। খদ্দের কিংবা লেখক অনেকের সঙ্গেই মৌখিক ব্যবহার [illegible]। ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে কিন্তু সুইটহার্ট (সুমিষ্ট হৃদয়), অনেক লেখককে [illegible] টাকা যুগিয়েছেন। কাউকে হয়ত [illegible] কিনে দিয়েছেন (অন দি [illegible] আমার হয়ত), কাউকে বাড়ি গাড়ি [illegible] দিয়েছেন, [illegible] যুগিয়েছেন [illegible]। [illegible] হয়ত [illegible] হারাতেন, কিন্তু [illegible] পারি কই?

অনেককাল আগে বাংলা উপন্যাসের [illegible] ছিল। সেদিন [illegible] শিল্পীদের কাজ করতে শুনেছি। বর্তমান সময়ে রেক্সিন কেউ উপন্যাসের মলাট বের করলে সরকারী অফিসে, বিশেষ করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ খুব জনপ্রিয় হবে সন্দেহ নেই। মাটি, কার্পেট, ভেলভেট, বালি, এবং রাংতা বসানো মলাট আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। কাপড়, রেক্সিন, বাটিক এবং চিকনের কাজ করা মলাটও সম্ভব। কবে দেখবো হয়ত মলাট-জোড়া আয়না বসানো হয়েছে, হলে অবশ্য খুব সাকসেসফুলই হবে, গ্রন্থের মধ্যে লেখক যে নিজের ছবি দেখতে পারেন, মলাট তারই ইঙ্গিত। 'আলুলায়িত কুন্তলা' কিংবা 'কখনো মেঘ কখনো রোদ' ধরনের নামকরণের ক্ষেত্রে খুব কষ্টকর হলেও, মুশকিল আসানের এক পোঁচড় চামর বোলানোর মত মলাটের একটি কোনায় একগাছি জেনুইন রমণীর কেশ গেঁথে দিতে পারলে রোমান্সের চূড়ান্ত হতে পারত। মলাট-হুজুগের দিনে, রাশিয়ার জ্যাকেট কবে পেয়েছি আমরা, এখন এতদিনে বোধ করি প্রাপ্য হয়েছে টাইনট বাঁধা জ্যাকেট কিংবা নানা হরফের ব্যাণ্ডেজ কভার।

গান্ধীজীর দূত

সুধীর ঘোষ

কি[illegible] আমি [illegible] [illegible] যা বলার [illegible] [illegible] হাত দিয়েছিলাম, তা সমাপ্ত [illegible]র সুযোগ আমি পেলাম না। শুধু হল [illegible]। সে-কথায় একটু পরে আসছি। ১৯৫২ সনের গোড়ার দিকেই ঘরবাড়ি এবং [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলি সমেত শহরের [illegible] প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু ইঞ্জিন বাটা শু ফ্যাক্টরি এবং আরও কয়েকটি কারখানায় উৎপাদনের কাজ। তাতে [illegible] কর্মসংস্থানেরও সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু চারপাশের গ্রামগুলির জন্য যে-কাজ আমাদের করবার কথা, তা তখন সবে শুরু হয়েছে।

মাত্র আড়াই বছর। তারই মধ্যে, নিতান্ত [illegible]ভূমির মধ্যে গড়ে উঠেছিল ছোট্ট একটি শিল্প-শহর। ফরিদাবাদ। কল্পনা করুন, তারই চারপাশে রয়েছে তিন শো গ্রাম। তার লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই [illegible] একর। সেই [illegible] [illegible] [illegible] চাষ করতে পারত না। [illegible] সে-ক্ষেত্রে, [illegible] ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে বছরে দুবার ফসল ফলানো যে শক্ত হবে না, তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। প্রশ্ন হচ্ছে, [illegible] ব্যবস্থা [illegible] যায়। গ্রাম-গুলিতে হাজার পাঁচেক কুয়ো ছিল। ঠিক করলাম, এখানে চার শো নলকূপ বসাতে হবে। অন্তত তিন শো ফুট গভীর করে টিউবওয়েল না বসালে সেখানে জল পাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উপায় কী, তা-ই ভাবতে হবে। হিসেব করে দেখলাম, প্রতি টিউবওয়েল ঘণ্টাপিছু মোটামুটি পঁয়ত্রিশ হাজার গ্যালন জল তুলতে পারবে; এবং দিনের মধ্যে সেটাকে চালু রাখা যাবে বড় জোর কুড়ি ঘণ্টা। সে-ক্ষেত্রে চার শো টিউবওয়েলকে প্রতিদিন যদি আমরা পনর ঘণ্টা করেও চালু রাখি তা হলে প্রতিদিন আমরা ৩৫,০০০ × ১৫ × ৪০০ = একুশ কোটি গ্যালন জল পাব।

গ্রামগুলিতে যে পাঁচ হাজার কুয়ো ছিল, মান্ধাতার আমলের পন্থায় উট কিংবা বলদের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে তা থেকে জল তোলা হত। উট আর বলদকে রেহাই দিয়ে মোটর বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে এবারে জল তোলা দরকার। কাজটা যেখানে বিদ্যুতের সাহায্যে করা সম্ভব, শিল্প-নগরের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে সেখানে বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে হবে; আর বিদ্যুতের আশীর্বাদ যেখানে পৌঁছয়নি, সেখানে ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে কাজ চালাতে হবে। তার জন্য যত ডিজেল ইঞ্জিন দরকার, তা ফরিদাবাদেই তৈরি করে নেওয়া যাবে।

আমরা হিসেব করে দেখেছিলাম যে, চার শো টিউবওয়েল আর পাঁচ হাজার কুয়োর জল দিয়ে যদি সেচের ব্যবস্থা করা যায়, বছরে দুটো ফসল ফলানো তা হলে শক্ত হবে না। তা ছাড়া, সেচের সুবিধে পেলে গ্রামবাসীরা শুধু গম ইত্যাদির চাষ করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তামাক, তুলো, আখ, চীনাবাদাম ইত্যাদি বাণিজ্যিক কৃষি-পণ্যও উৎপাদন করতে পারবে। গ্রামবাসীদের অভাব অবশ্য শুধু জলেরই ছিল না; অভাব ছিল ভাল বীজ আর সারেরও। উপরন্তু, তারা যাতে ভাল জাতের গরু-মোষ কিনতে পারে, তার জন্যও যে তাদের কিছু সাহায্য করা দরকার, তাও আমরা ভেবেছিলাম। এর জন্য একর পিছু যদি এক শো টাকা বিনিয়োগ করা হয়, আড়াই লক্ষ একরে তা হলে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই কোটি টাকা। এ-টাকায় জলের ব্যবস্থা তো করা যাবেই, বীজ সার আর গো-মহিষ ক্রয় ও বণ্টনের জন্য একটা ঋণ-তহবিলও গড়ে তোলা যাবে। একর পিছু বছরে যদি দশ টাকা ও সেইসঙ্গে নামমাত্র সুদ ফেরত পাওয়া যায়, পুরো টাকাটা তা হলে মোটামুটি দশ বছরে উঠে আসবে। একর পিছু ফসল যদি দ্বিগুণ করে দেবার ব্যবস্থা হয়, চাষীরাও তা হলে বছরে দশ টাকা ও তৎসহ কিছু সুদ দিতে দ্বিধা করবে না। কেননা ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের লাভটাই থাকবে অনেক বেশী।

জমি থেকে আয় বাড়ছে। কিন্তু কৃষকরা শুধু সেইটুকুতেই খুশী থাকবে কেন। তারা চাইল, শিল্প-নগর ফরিদাবাদে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার যে-ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামেও তার সম্প্রসারণ হোক। তার জন্য তিন শো গ্রামকে দশটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা দরকার; প্রতি গোষ্ঠীতে থাকবে দশটি করে গ্রাম। তার মধ্যে একটি হবে কেন্দ্র-গ্রাম; সেইখান

থেকেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রামে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য-বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে। ফরিদাবাদের কেন্দ্রীয় শিল্প-এলাকার পাঁচটি ইউনিটে জনসাধারণের সেবার জন্য বিভিন্নমুখী যে-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছিলাম, গ্রামাঞ্চলের এ দুটি প্রয়োজন মেটাবার জন্যও সেই একই ব্যবস্থা সংগঠিত করা হবে বলে আমরা ঠিক করলাম। অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্র-গ্রামে ছোট-খাটো আস্পাতালের ও চিকিৎসার জন্য একটি করে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দুটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। হাসপাতালে রেখে যাদের চিকিৎসা করা দরকার, শিল্প-নগরের হাসপাতালে তারা ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারেও সেই একই ব্যবস্থা হল। শহরে একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কারিগরী বিদ্যালয় ছিল। ঠিক হল, গ্রামের ছেলেরা সেখানে গিয়ে ভর্তি হতে পারবে। গ্রামের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

চার শো টিউবওয়েল ও পাঁচ হাজার কুয়োর তত্ত্বাবধান এবং সার বীজ ও গো-মহিষ ক্রয় ও বণ্টনের দায়িত্ব নেবার জন্যে আমরা ঠিক করলাম যে, মোট দশটি সর্বার্থসাধক সমবায়-সংস্থা গড়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি সমবায়-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে তিরিশটি করে গ্রাম। ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত মূলধন বিনিয়োগের কাজ এবং প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শেষ হবার পর সমবায়-সংস্থাগুলিই যাবতীয় সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করবে। গ্রামগুলি তো আর নিজেদের চেষ্টায় সমবায়-সংস্থা গড়ে তুলতে এবং ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত মূলধনকে সদ্ব্যবহারে লাভ-জনকভাবে খাটাতে পারবে না; দারিদ্র্য ছেড়ে দিলেও নিজেদের চেষ্টায় তা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সূচনায় তাই বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই নেতৃত্বের কাজ ফুরনো চাই; তারপর যেন আর বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে না হয়।

এর থেকে যে চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তা হচ্ছে এই। গ্রামাঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর জন্যে আমাদের কাজ করতে হবে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামীণ মানুষ (তিন শো গ্রাম, জনসংখ্যা আড়াই লক্ষ); আর যে-অঞ্চলে তারা থাকে, তার কেন্দ্রে রয়েছে কিছু শিল্পনির্ভর নাগরিক (সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ হাজার)। এই দুই অংশের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে একটি সমন্বিত ইউনিট। এখন বলাই বাহুল্য, গ্রামীণ এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য শহরের ভাগ তার মধ্যে কতটা রাখা দরকার, তা নিয়ে বিতর্ক তোলা যেতে পারে। ফরিদাবাদের ক্ষেত্রে নাগরিক শিল্পাঞ্চলটিকে একটু বেশী পরিমাণেই বড় করে রাখবার দরকার হয়েছিল আমাদের। তার কারণ বাস্তুহারাদের আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের আশু সমস্যা; তার সমাধানের জন্যই এ-কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে তিন শো গ্রাম নিয়ে যে দশটি গোষ্ঠী গড়বার পরিকল্পনা করলাম আমরা, সেখানে নতুন করে কাউকে আশ্রয় দেবার কোনও সমস্যা ছিল না। এ-ক্ষেত্রে, তিন শো গ্রামের উন্নয়নের ব্যবস্থা আগে করে নিয়ে তারপর তার কেন্দ্র হিসেবে ছোটখাটো একটি শিল্পাঞ্চল হিসেবে ফরিদাবাদ শহরকে গড়ে তুললে সেটাই হত এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের যুক্তিসংগত পদ্ধতি। বলাই বাহুল্য, সেই শিল্পাঞ্চলে এমন কিছু পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং জনসেবার এমন কিছু ব্যবস্থা রাখতে হবে, গ্রামগুলি যার দ্বারা উপকৃত হয়। গ্রামীণ মানুষেরা সে-ক্ষেত্রে অনুভব করতে

তারা বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি একটা অসাধারণ কাজ করেছেন। সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি, আপনি সুস্থ থাকুন, যাতে আপনার দেশের আপনি আরও সেবা করতে পারেন। আপনার দেশকে আমিও ভালবাসি। ভগবান আপনাকে ও আপনার সহায়কদের আশীর্বাদ করুন। ইতি

আন্তরিকভাবে আপনার

(মিসেস) আর শারার"

আমাদের কাজের তাৎপর্য শুধু যে এই অখ্যাত মহিলার মতন সরলচিত্ত কিছু নরনারীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল, তা নয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রীতিমত পোড় খাওয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি বহু মানুষের চিত্তও এতে আলোড়িত হয়েছিল। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলস্-এর লেখা একটি চিঠি থেকেই সে-কথা বুঝতে পারা যাবে। প্রথম যে-বার তিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে এ-দেশে আসেন, সেবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি আমার জন্য এই চিঠিখানি রেখে যান।

মার্কিন দূতাবাস,

নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ, ১০ই মার্চ, ১৯৫৩

"প্রিয় সুধীর,

তুমি দেশে ফিরে আসবার আগেই আমাকে ভারত ছাড়তে হচ্ছে, এই চিন্তাটা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তবে এ সম্পর্কে আমাদের কিছু করবার নেই। ২০শে মার্চ নাগাদ আমরা রওনা হব। যাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে। নানান জায়গায় থামব। মে-র আগে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে পারব, এমন মনে হয় না।

তোমার ও শান্তির সম্পর্কে আমার ও স্টেবের শ্রদ্ধা যে কত গভীর, আশা করি তা তুমি জান। সেই যে প্রথম ফরিদাবাদে গিয়েছিলাম, চিরকাল সে-কথা আমাদের স্পষ্ট মনে থাকবে। বস্তুত, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে কী বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, সেই দিন থেকেই তা আমি বুঝতে শুরু করি। তখন থেকেই আমি অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সাহায্য পেয়েছি এবং প্রচুর নানা বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছি।

যে ধরনের কাজে তোমার প্রতিভাকে ঠিকমত লাগানো সম্ভব, দেশে ফিরে সেই ধরনের কাজের দায়িত্ব তুমি পাবে বলেই আশা করি। আমার তো মনে হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের [illegible] কিছু একটা দায়িত্ব পেলেই সবচাইতে ভাল হয়। তাই নয়? নিউ ইয়র্কে থাকতে এই ধরনের সম্ভাবনার কথা তুমি হয়তো চিন্তা করে দেখেছ।

অবসর পেলে চিঠি লিখো। আমাদের ঠিকানা হলে এসেক্স্, কনেকটিকাট।

নিবিড় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

আন্তরিকতাপূর্ণ [illegible]

চেট

(চেস্টার বোলস্)"

কিন্তু এই মার্কিন আদর্শটি ফরিদাবাদের পক্ষে একটা সমস্যা সৃষ্টি করল। [illegible] বোলস্ যখন ১৯৫১ সনের [illegible] ভারতে আসেন, [illegible] সেখানে তখন একটা নতুন হাওয়া বইতে [illegible]। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ কেসি তখন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। [illegible] তিনি অন্যত্র যাবার পথে নয়াদিল্লীতে থেমেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তিনি চেনেন; তাঁকে তিনি বলেছেন যে, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার। ইতিপূর্বে কখনও রাষ্ট্রদূত বোলসের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। মিঃ কেসির সঙ্গে সেই কথা হওয়ার দিন কয়েক বাদেই রাষ্ট্রদূত বোলস আমাকে ফোন করে জানালেন যে, সস্ত্রীক তিনি ফরিদাবাদে এসে একটা দিন কাটাতে চান। রাষ্ট্রদূতের কথায় তাঁর এতটুকু আনুষ্ঠানিকতার আড়ষ্টতা ছিল না। তাঁর প্রস্তাবের খোলামেলা ভাবটা ভারী ভাল লাগল। তাঁর যে চিঠিখানি উদ্ধৃত করেছি, তার থেকেই বোঝা যাবে, ফরিদাবাদ তাঁর কেমন লেগেছিল। মিঃ বোলস্ও আমারই মতন উৎসাহী মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দ্রুত দানা বাঁধতে লাগল। এ-দেশে তিনি তখন নবাগত। কাজের সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে তাঁকে আমার সাধ্যমত নানা পরামর্শ দিয়েছি আমি। মিঃ কেসিও তাই চেয়েছিলেন।

ফরিদাবাদে যে কাজটাকে আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখাচ্ছিলাম, কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন কিছু মানুষের সেটা ভাল লাগেনি। আমার কাজেকর্মে ইতিমধ্যে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ফরিদাবাদের যখন সূচনাপর্ব, সরকারের শক্তিশালী আমলা-মহল এবং অন্যান্য জনকল্যাণ বিভাগ তখন আমার কাজ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান

নি। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, এই যে আমি বাস্তুহারাদের দিয়ে তাদের আপন হাতে একটা শহর গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি, এ চেষ্টা কখনও সফল হবে না। এইসব বাস্তুহারার খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে তিন বছরে সরকারের যা ব্যয় হবার কথা, সেই টাকাটাই আমি সরকারের কাছে চেয়েছিলাম। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, আমি সব ভণ্ডুল করে ছাড়ব এবং অপদস্থ হব। তাঁদের আশা পূর্ণ হল না। মাত্র দু' বছরের চেষ্টাতেই আমি ও আমার সহকর্মীরা ফরিদাবাদ-প্রকল্পে এতটাই সাফল্য অর্জন করলাম যে, দেশে-বিদেশে এ নিয়ে কথা হতে লাগল; সবাই ভাবতে লাগল, এশিয়া ও আফরিকার সুবিস্তীর্ণ অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলগুলিকে বিনিয়োগের ব্যাপারে কীভাবে স্বয়ংনির্ভর করে তোলা যায়। হাতে-কলমে আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, মাত্র ১৯৩৩ টাকা ব্যয় করেই কলঘর-পায়খানা সমেত দু-কামরার একটি ছোট্ট পাকাবাড়ি নির্মাণ করা যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আমলারা এতে আমার উপরে দারুণ চটে গেলেন।

ফরিদাবাদে কী করা হয়েছিল, সেটা বড় কথা নয়; কীভাবে করা হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। আমি যে শুধু নামেমাত্র স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলাম তা নয়, শ্রীনেহরুকে ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে যুক্ত রেখে এই সংস্থার স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তুলেছিলাম। আমাদের ছোট্ট সেই বোর্ডে যে-সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তার সঙ্গে যুক্ত থাকায় কোনও আমলা, এমন কী কোনও মন্ত্রীও, তা নিয়ে আপত্তি তুলতে সাহসী হত না। সরকারী আমলাতন্ত্র (ভারতবর্ষের মতন দেশে আমলারাই হচ্ছেন প্রকৃত শাস্তিধর) সচরাচর যে-পন্থায় কোনও স্বয়ংশাসিত সংস্থার কাজের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেন, তা হচ্ছে এই। সংস্থাটির মধ্যে তাঁরা অর্থ-দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে ঢুকিয়ে দেন। অতঃপর সেই প্রতিনিধিটি দাবি করতে থাকেন যে, সংস্থার আর পাঁচজন সদস্যের মত তিনি একজন সাধারণ সদস্য নন,—টাকা-পয়সার প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, সেটা তিনিই ঠিক করবেন। অর্থাৎ কিনা, তাঁর দাবিটা এই যে, সংস্থার অর্থনৈতিক যে-কোনও সিদ্ধান্তকে ভেটো প্রয়োগ করে তিনি নাকচ করে দিতে পারবেন। সেই ক্ষমতাটা তাঁর নাকি থাকাই চাই, তার কারণ, তিনি তো আর একজন সাধারণ মনুষ্য নন, তিনি হচ্ছেন সরকারী অর্থের রক্ষী। ধরেই নেওয়া হয় যে, সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা যা-ই বলুন না কেন, তাঁদের সকলের সম্মিলিত জ্ঞানের চাইতেও এই একটি লোকের জ্ঞানবুদ্ধি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। ফরিদাবাদ-প্রকল্পের ব্যাপারেই এই প্রথম দেখা গেল যে, আমলাতন্ত্র বিশেষ এঁটে উঠতে পারলেন না। আমাকে তার জন্য তাঁরা ক্ষমা করেন নি।

ব্রিটিশ আমলে এই মূলে অনুমানের উপরে ভিত্তি করে সরকারী টাকার বিলিব্যবস্থা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনা করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষই চোর; নিয়মাবলীকে অতএব চৌর্য-নিরোধক করে তোলা চাই, অর্থাৎ কিনা নিয়মাবলীর ফাঁসে ব্যাপারটাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা চাই। কিন্তু সরকারের কাজ তখন ছিল যৎসামান্য। তাঁরা নেহাতই রাজস্ব আদায় করতেন, আইন-শৃংখলা বজায় রাখবার ব্যবস্থা করতেন, এবং ছিটেফোঁটা কিছু-কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। সুতরাং খরচও সে-আমলে বেশী ছিল না। সে-ক্ষেত্রে জনকল্যাণই যে-রাষ্ট্রের লক্ষ্য, এবং জনসাধারণের জন্য যেখানে এক নবজীবন গড়ে তুলবার আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে, ব্রিটিশ আমলের তুলনায় সেখানে ব্যয়ও অনেক বেশী হতে বাধ্য। ভারতবর্ষে প্রশাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও আদর্শ আমূলে পালটে গিয়েছে; অথচ তার কাজ চলছে সেই উনিশ শতকের নিয়ম অনুযায়ী। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে-সব কাজের প্রকৃতি আর-পাঁচটা সাধারণ সরকারী কাজের মত নয়, এবং যা আরও দুরূহ, তার দায়িত্বভার যদি স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের স্বাধীন করে তুলবার চেষ্টা অদ্যাবধি একটি ক্ষেত্রেও সফল হয় নি। ফরিদাবাদ-প্রকল্পকে আমি স্বাধীন রাখতে চেয়েছিলাম, এবং প্রায় বছর তিনেক তাকে স্বাধীন রাখতে পেরেছিলামও। সরকারী আমলারা তো একটা কাজকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব নেন না, তাঁরা চান শুধু ক্ষমতা। এক দিকে ছিলেন তাঁরা। অন্য দিকে ছিলেন সেই কর্মী-দল, ফরিদাবাদ-প্রকল্পকে সার্থক করে তুলবার জন্য যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করছিলেন। আর এই দুই দলের
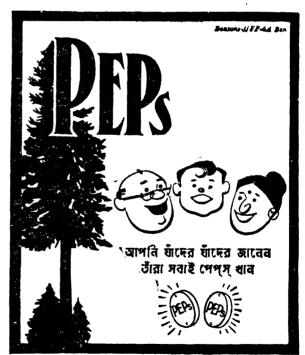
মধ্যে ছিলাম আমি; সারাক্ষণ লক্ষ্য রেখে-ছিলাম, আমলারা যেন কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন। ফরিদাবাদে আমি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে-ছিলাম, কর্মীদের পক্ষে যাতে উদাম-সহকারে কাজ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের জড়তা এতই প্রবল যে, তার বিরুদ্ধে যে একবার রুখে দাঁড়াবে, তার আর রক্ষা নেই। রক্ষা আমিও পেলুম না। অসুবিধেটা ছিল এইখানে যে, শ্রীনেহরুর উপরে সর্বাংশে আমাকে নির্ভর করতে হত। যতদিন তিনি নির্ভর করতে দিয়েছেন, ততদিন আমি কাজ করতে পেরেছি। তাঁর স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হবার পর আর আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ফরিদাবাদ প্রকল্পের ব্যাপারে আমার মার্কিন বন্ধুরা যে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, তারই সূত্রে এই স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হল। ১৯৫২ সনের জানুয়ারি মাসে মার্কিন সেনেটর ওয়েন ব্রুস্টার ভারত-সফরে এসেছিলেন। মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর তিনি সদস্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রদূত বোল্‌সের প্রতিপক্ষ। রাষ্ট্রদূত হিসেবে বোল্‌সের এই নিয়োগের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। রাষ্ট্রদূত বোল্‌স ভারতের একজন উৎসাহী বন্ধু; ভারতের জন্য ব্যাপকভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রস্তাব করে তিনিই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর কাছে যখন সেই প্রস্তাবটি পেশ করা হল, কমিটী তখন সরেজমিনে ব্যাপারটা বুঝবার জন্য একজন সদস্যকে ভারতে পাঠালেন। সেই সদস্যটিই হচ্ছেন ব্রুস্টার। ভারতকে ব্যাপকভাবে সাহায্য দেবার জন্য যে প্রস্তাব করেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, মার্কিন কংগ্রেসের সমর্থন তা পাবে কিনা, সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সুপারিশের উপরেই সেটা নির্ভর করছিল। আবার কমিটীর সুপারিশ কী হবে, সেটা নির্ভর করছিল ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে সেনেটর ব্রুস্টার কী রিপোর্ট দেন তার উপরে।

রাষ্ট্রদূত বোল্‌সের প্রধান আগ্রহ ছিল সমষ্টি-উন্নয়নে। সমষ্টি-উন্নয়ন বলতে তিনি এই বুঝেছিলেন যে, কৃষি-ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে, এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সুবিধার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। মার্কিন সাহায্য ছাড়াই এ-ব্যাপারে ভারতীয়রা তাদের আপন চেষ্টায় জনসাধারণের এক নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য যে কাজ করছে, স্বচক্ষে দেখে তার তাৎপর্য বুঝবার জন্য সেনেটর ব্রুস্টারকে তিনি ফরিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। শীতের এক উজ্জ্বল সকালে ঝকঝকে এক বিরাট গাড়িতে চড়ে সেনেটর ব্রুস্টার ফরিদাবাদে এসে হাজির। আমার সেই টিনের চালাঘরে তাঁকে বসালুম আমি; উৎসাহভরে শোনাতে লাগলুম, ফরিদাবাদের গোষ্ঠী-জীবনকে আমরা কীভাবে গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু সেনেটর যে আমার কথায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছেন, তা মনে হল না। রাষ্ট্রদূত বোল্‌স অবশ্য আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইনি একজন ঝানু রাজনীতিক, তেলের টাকায় লাল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু দৈব-যোগাযোগই বলতে হবে, শীতের সেই সকালবেলায় আমার সেই টিনের ঘরে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সেনেটরকে যখন আমি ফরিদাবাদ-প্রকল্পের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এবং চেষ্টা করতে-করতেই বুঝতে পারছি যে, আমার কথাগুলি তাঁর কানেই যাচ্ছে না, তখন হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটি ফোটো-গ্রাফের দিকে আঙুল তুলে ধরলেন তিনি। বললেন, "উনিই তো গান্ধী, তাই না? আর ওই যে গান্ধীর পাশে যে যুবকটিকে দেখতে পাচ্ছি, উনিই তো আপনি?" গান্ধীর সঙ্গে তা হলে আপনার পরিচয় ছিল, কেমন?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, সেনেটর, ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি ছিলেন আমার পিতার মত।"

দেখলুম, সেনেটরের মুখের ভাব একেবারে পালটে গিয়েছে। গান্ধীজীর সম্পর্কে অসীম তাঁর আগ্রহ। ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন "কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?" একটার পর একটা প্রশ্ন তিনি করে যেতে লাগলেন। ফরিদাবাদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অতঃপর গান্ধীজীর কথাই আমি তাঁকে শোনাতে লাগলুম। নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গান্ধীজী তাঁর আপন হাতে [illegible] আমাকে লিখেছিলেন, তার [illegible] দেখালুম তাঁকে। আলোচনা শেষ হবার [illegible] সেনেটর বললেন, "[illegible] [illegible] আমরা [illegible], সেখানেও তাঁর [illegible] প্রভাব আমরা অনুভব [illegible]।" [illegible] একজন মার্কিন [illegible] [illegible] বললেন, তা আমি [illegible] শুনে আমার খুব [illegible] লাগল।

ফরিদাবাদ-প্রকল্পে [illegible] প্রথমে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] পরিবারের সবার [illegible] আমেরিকার টাকা [illegible] নই আমি। কিন্তু [illegible] [illegible] দক্ষিণা হিসেবে [illegible] এই সমস্যাগুলির [illegible] সরকারের কাছ থেকে [illegible] ঋণ হিসেবে নিয়ে [illegible] বিনিয়োগ করেছেন, [illegible] এমন একটি [illegible] জমি [illegible] [illegible] চড়া হারে [illegible] [illegible] জিনিস, সেখানে আপনি [illegible] তা আপনি সমস্ত [illegible] পারেন, তা হলে [illegible] হবে, তার একটা অংশ [illegible] ঋণ শোধ করে দিতে পারেন, [illegible] দিয়ে এখানকার [illegible] চালু রাখা যাবে। সরকারের কাছ থেকে [illegible] ঋণ আপনি নিয়েছেন, আমাদের [illegible] তার পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ [illegible]। [illegible] এই ভিত্তিতে পঞ্চাশ কোটি ডলার [illegible] কেউ এ-দেশে কিংবা উন্নয়নশীল যে-কোনও দেশে এমন এক শো-টা ইউনিট গড়ে তুলতে পারে, তবে আমি, ব্রুস্টার, নিশ্চয়ই দ্বিধা না করে সেই পঞ্চাশ কোটি ডলার ঋণদানের প্রস্তাব সমর্থন করব। আমি দয়া-দাক্ষিণ্যে বিশ্বাস করি না। ও-সব ব্যাপারকে আমি অর্থহীন বলে গণ্য করি।"

(ক্রমশ)

হৃদ্‌রোগের প্রতিকার (২)

এপর্যন্ত ধমনীকাঠিন্যের কথা বলা হয়েছে। এই রোগের আর একটি দশা আছে যার নাম থ্রম্বসিস। তাতে ধমনীর মধ্যে রক্তের ফাইব্রিন বা প্লেটলেটের কণাগুলি রক্ত থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ধমনীর মধ্যে জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়। পথ যেভাবেই বন্ধ হোক, এই সব রোগীর শতকরা ৪০ জন প্রথমবারের আক্রমণেই মারা যায় এবং তাদের মধ্যে ২০ জনের মত আক্রান্ত হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পশ্চিম ওয়েলসের [illegible] শহরের [illegible] হাসপাতালের দুজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী—ডঃ ভি এফ [illegible] এবং ডঃ এ ক্লার্ক ধমনীর সরবরাহ পথ বন্ধ হওয়া সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন বহু হৃদরোগী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর। তাঁরা দেখেছেন যে সুস্থ লোকের রক্ত প্রবাহে যে প্লাজমা প্রোটিন থাকে, হৃদ্‌রোগ হলে সেটি আর রক্তে দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণ অবস্থায় রক্তের মধ্যে যেসব জিনিস গলে মিশে থাকে, রক্ত সেগুলিকে ধমনীর উপর জমা হতে দেয় না। বিজ্ঞানী দুজনে বলছেন যে, প্লাজমা প্রোটিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুনই নাকি রক্তের ঐ ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়।

রক্ত চলাচলের রাস্তা বন্ধ হবার আরো একটি কারণ থাকতে পারে। রক্তের মধ্যে নিউক্লিয়াসবিহীন এক রকমের চ্যাপটা কোষ থাকে যার নাম প্লেটলেট। চর্বি-জাতীয় পদার্থ বেশি খেলে সেই কোষ-গুলি নাকি বেশি চটচটে হয়ে যায় যার ফলে সেগুলি ধমনীর গায়ে আটকে থেকে থাকে।

আগেই বলেছি বিভিন্ন ধরনের নিউ-রোসিস হচ্ছে আসন্ন হৃদ্‌রোগের পূর্ব-লক্ষণ যেগুলির উদ্ভব হয় ব্যক্তিগত বা কর্মজীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, বিশ্রামের অভাব ইত্যাদি থেকে। তারপর এমন সব ক্ষয়রোগ বা মারাত্মক রোগ আছে যেগুলি শেষ পর্যন্ত হৃদ্‌রোগ ডেকে আনতে পারে। যক্ষ্মা, রক্তাল্পতা, যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থির পীড়া, ডিফথিরিয়া, বাত ইত্যাদি রোগ কঠিন হয়ে উঠলে তাই থেকে নিউরোসিস এবং নিউরোসিস থেকে হৃদ-রোগের উৎপত্তি হতে পারে। এমন কি ঐ সব ব্যাধি গোটা শরীরের যন্ত্রপাতি দুর্বল করে দিতে পারে। এ ছাড়া [illegible] প্রভৃতি জীবাণুও হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করতে পারে।

প্রথমে যখন নিউরোসিস হয় তখন রোগী শরীরে সবসময় অস্বস্তি বোধ করে, মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে, নাড়ী ও হৃৎস্পন্দনে গোলমাল ঘটে অথচ হৃদ্‌যন্ত্র বা রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা পরীক্ষা করে কোন দোষ পাওয়া যায় না। সেই অবস্থায় নিউ-রোসিসের কারণ দূর করে দিয়ে ওষুধের এবং নিয়মিত কাজ, বিশ্রাম ও ব্যায়ামের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলে রোগী আরোগ্য হয়ে যান। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে দীর্ঘকাল ঘুম পাড়িয়ে রেখেও সুফল পাওয়া যায়।

একটি হৃদ্‌রোগের নাম হাইপারটেন্শন, ধমনীতে অত্যধিক রক্তচাপ যার একটি প্রধান লক্ষণ। অবশ্য রক্তচাপের আধিক্য অন্য নানা কারণেও হয়, যেগুলি ধমনী সংকুচিত করে (যেমন অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারী প্রভৃতি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে অত্যধিক হোর্মোন নিঃসরণ, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ইত্যাদি)। রোগ যখন বাড়তে থাকে তখন শুরু হয় মাথা ধরা, অনিদ্রা, নাক

মস্কোর এক গবেষণাগারে এই কুকুরটির শরীরে দ্বিতীয় এক হৃৎপিণ্ড লাগিয়ে দেবার পর জীবটি বেশ সুস্থই আছে

ধড়ফড় হৃৎপিণ্ডের কাছে অস্বস্তিবোধ। তখনো পরীক্ষা করে কিছুই না পাওয়া যেতে পারে। তারপরে আরম্ভ হয় ধমনী-কাঠিন্য। চিকিৎসকেরা এ বিষয়ে একমত যে, যাঁরা সর্বদা বসে বসে মাথার কাজ করেন, যাঁদের মোটা হবার ধাত তাঁদেরই এই অসুখ বেশি হয়। সুতরাং প্রতিদিন খোলা হাওয়ায় ঘণ্টা দুয়েক বেড়ানো চাই বা খেলাধুলো করা চাই, খাওয়ার বাছবিচার চাই। এছাড়া ধূমপানও রক্তবহা নাড়ীতে আক্ষেপ সৃষ্টি করে। সেটা এবং মদ্যপান বন্ধ করতে হবে। তারপর খাওয়া কাজ ও বিশ্রামের নিয়ম মেনে চলতে হবে। মনে শান্তি এক্ষেত্রে খুবই জরুরী। রোগ যদি পাকে তখন অবশ্য পুরো বিশ্রাম চাই, চাই নিদ্রা-চিকিৎসা অর্থাৎ রোগীকে ১০।১২ ঘণ্টা করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মস্তিষ্ককে অত্যুত্তেজনা থেকে রেহাই দিতে হবে। সেই সঙ্গে চলবে রক্তচাপ কমানোর ওষুধপত্র। ওষুধ নানারকমের বার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু ধমনীকাঠিন্যের অমোঘ ওষুধ বার হয়েছে একথা এখনো বলা যাচ্ছে না। ওষুধগুলি প্রধানত চর্বি ও প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। যেমন ভিটামিন

বিশুদ্ধ ওষুধ, হোর্মোন, যকৃৎ নির্যাস ইত্যাদি। কয়েকরকমের বিশেষ ওষুধ অবশ্য বার হচ্ছে, যেমন ফাইব্রিনোলাইসিন ও হেপারিন। এগুলি রক্তে সঞ্চারিত করলে জমাটবাঁধা থ্রম্বিন গলতে শুরু করে। বিভিন্ন জাতের ফাংগাস যে থ্রম্বিন নষ্ট করে সেটা অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঐরকম কোন ফাংগাস ইঞ্জেকশন দিলে সেটি কি শুধু থ্রম্বিনের প্রোটিন নষ্ট করবে, নাকি অন্য

ব্রিটেনে নির্মিত হৃৎপিণ্ডের জন্য একটি কৃত্রিম মাইট্রাল ভাল্‌ভ্‌

প্রোটিনগুলিও শেষ করে দেবে? মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যাপার নিয়ে ৫০ রকমের ফাংগাস পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষার ফল অনুযায়ী হওয়ার ওষুধের এক নতুন ওষুধ তৈরি হয়েছে অ্যাসপারজিলাস জাতীয় ফাংগাস থেকে যার নাম অ্যাসপারজিলিন। এর আগে অন্য লোকের গা থেকে ফাইব্রিনোলাইসিন ও হেপারিন মিশ্রিত রক্ত নিয়ে রোগীর শরীরে দিতে হত। এই ওষুধটি যদি নিয়মিত মানুষের গায়ে দেওয়া যায় (জীবজন্তুর দেহে পরীক্ষা সফল হয়েছে) তাহলে ঐ রক্তদানের আর প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া ফাইব্রিনোলাইসিনের তুলনায় এর ক্ষমতা ২০০ গুণ বেশি। আর্টিনোমাইসিটিস নামে আর একটি সুপরিচিত ফাংগাস নিয়েও এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

আর একরকম হৃদ্‌রোগের নাম স্টেনোকার্ডিয়া। এই রোগে নিঃশ্বাসের কষ্টের সঙ্গে বুকে থেকে থেকে বেদনা হয়। কখনো অল্পক্ষণ, কখনো বেশিক্ষণ ধরে। রোগী বিছানায় হেলে বা শুয়ে থাকলে যন্ত্রণা কম। কখনো কখনো যন্ত্রণাটা কাঁধ হয়ে হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রোগটি অল্প বয়সে বেশি হয় আর হয় ধমনী-কাঠিন্যের রোগীদের। স্নায়ুতন্ত্রের উপর অত্যধিক চাপ থেকে এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তী প্রসূত নিউরোসিস থেকে, এবং তামাকের বিষ থেকে এই রোগ হয়। ধরুন একজনের প্রচণ্ড ভিড়ওয়ালা বাসে যেতে যেতে হঠাৎ স্টেনোকার্ডিয়ার আক্রমণ হলো। তাই থেকে তিনি এমন আতঙ্কিত হতে পারেন যার ফলে তাঁর মধ্যে এক সাপেক্ষ প্রতিবর্তী তৈরি হতে পারে। শেষে যখনই তিনি ভিড়ভর্তি গাড়ি চড়বেন তখনই তাঁর ঐ রোগের আক্রমণ শুরু হতে পারে। ধমনী-কাঠিন্য এই রোগ ঘনিয়ে তোলে। স্টেনোকার্ডিয়ার রোগীকেও খাওয়াদাওয়ার খুব ধরাকাট করতে হবে। নিকোটিনিক অ্যাসিডও এই রোগে ফলপ্রদ হয়। এছাড়া এই রোগের জন্য কতকগুলি ব্যায়াম আছে যা করোনারি ধমনীগুলির কাজের উন্নতি করে। কখনো কখনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।

স্ক্লেরোসিস ও স্টেনোকার্ডিয়া থেকে আর একরকমের হৃদ্‌রোগ হতে পারে যার নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যাতে রক্ত সরবরাহের অভাবে হৃৎপিণ্ডের পেশীর

কিছুটা অংশে রক্ত না পৌঁছানোর দরুণ সেই অংশ কাজ করে না এবং পরে সেই অংশে একটা ক্ষত দেখা দেয়। ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার ফলেই এই ব্যাপার ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্টেনোকার্ডিয়া থেকে রোগটি হয়। আক্রমণ হলে রোগীর দেহের তাপমাত্রা হঠাৎ চড়ে যায়, রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য হয় এবং ইরাইথ্রোসাইট কোষের পলি পড়তে থাকে। এই রোগও স্নায়ুতন্ত্রের উপর অত্যধিক ধকল, গুরুপাক খাদ্য, খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম থেকেই হয় বলে চিকিৎসকরা মনে করেন। তাঁরা দেখেছেন যে জাপান, চীন, স্পেন, আফগানিস্থান প্রভৃতি যে সব দেশে লোকে গুরুপাক জিনিস এবং মাংস-ডিম ও চর্বিযুক্ত কোলেস্টেরল-সমৃদ্ধ খাদ্য কম খায় সেখানে এই রোগের মাত্রা অন্য দেশের চেয়ে কম। এই রোগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও টানা ঘুমের দরকার কিন্তু খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে শুতে হয় যাতে খাদ্য গ্যাস হয়ে বুকে চাপ না দেয়। কারণ রোগটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোয়া অবস্থায় আক্রমণ করে। ওষুধের চেয়ে এইগুলিই হচ্ছে বড় কথা। আর একটি জরুরী বিষয় হচ্ছে মন প্রফুল্ল ও নিরুদ্বিগ্ন রাখা।

জখম-হওয়া হৃৎপিণ্ড আরোগ্য করা নিয়ে দেশে দেশে ব্যাপক গবেষণা চলেছে—অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের পুনরুজ্জীবনের সমস্যা নিয়ে। হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে ক্ষত দেখা দিলে, সুস্থ অংশ পরিবর্ধিত হয়ে কাজের ক্ষতি পোষাবার চেষ্টা করে। রক্তের চাপে ক্ষতস্থান ফেটে গিয়ে হার্ট্‌ফেল হওয়ার দৃষ্টান্তও বহু আছে। হালে মস্কোর ইন্সটিটিউট অফ অ্যানিম্যাল মর্ফোলজির কয়েকজন বিজ্ঞানী খরগোশের উপর আহত হৃৎপেশীর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করে সাফল্যলাভ করেছেন। প্রথমে ডিফথিরিয়ার বিষ দিয়ে জীবগুলির হৃদ্‌যন্ত্র আহত করা হয়। তারপর তাঁরা জীবগুলিকে একটি ওষুধ ইঞ্জেকশন দেন। ফলে ১৮ থেকে ২০ দিনের মধ্যে তাদের হৃৎপেশী প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এইরকম সাফল্য লাভ করা যাবে কিনা বলা শক্ত। কারণ, বিবর্তনের পথে কোন জীব যখন উচ্চাঙ্গের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিশিষ্ট জীবের স্তরে পৌঁছায় (যেমন মানুষ) তখন তার আর হৃত অঙ্গ পুনর্লাভের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু বলা কি যায়? হয়ত প্রোটিন ও নিউক্লিয়োপ্রোটিডের স্বয়ং-উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তি পরিবর্তন করে, পুনরুজ্জীবনের সময় এনজাইমের কার্য-কলাপ ইচ্ছামত অন্যদিকে পরিচালিত করে এই কাজও একদিন সম্ভব হবে।

হৃদ্‌রোগ থেকে হার্ট্‌ফেল বেশি দূরে পথ নয়। নানা কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থেমে যেতে পারে। ঐ যন্ত্রের ভালভ্‌ ও প্রকোষ্ঠগুলিতে অসুখ হলেই যন্ত্রটি আর কাজ করতে পারে না। ভালভের খোলা আর বন্ধ হওয়ায় গণ্ডগোল হলেই হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তের যাওয়া আসায় বিঘ্ন ঘটে। বাতজ্বর যে ভালভের গণ্ডগোলের এক প্রধান কারণ সেটা আবিষ্কার করেছিলেন আজ থেকে শতাধিক বছর আগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বয়্যালো এবং রুশ বৈজ্ঞানিক সোকলস্কি। বাতজ্বর সারা শরীরের যে কোন জায়গা আক্রমণ করতে পারে। বাতজ্বর হবার আগে অনেক সময় শরীরের একটি জায়গায় একটা সেপ্টিক ফোকাস দেখা দেয় (দাঁতে, আলজিভে) যা স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে ডেকে আনে 'অ্যালার্জি'। অনেকে বলেন যে, স্ট্রেপ্টো-কক্কাস জীবাণুর আক্রমণে ফোকাসটি তৈরি হয়। সেই অ্যালার্জির (অতি সংবেদনশীল অবস্থা) সময়ে হঠাৎ কোন স্নায়বিক 'শক্' পেলে বা অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগলে বাতজ্বরের আক্রমণ হতে পারে। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর বাতজ্বরজনিত হার্টফেলের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। এই রোগের শিকার শিশুরাই বেশি। শরীরে দুরারোগ্য সংক্রমণকেন্দ্র বা সেপ্টিক ফোকাস (বিশেষ করে আলজিভের) সারিয়ে তোলাই হচ্ছে এই রোগ নিবারণের প্রশস্ত উপায়।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার আধিব্যাধি সারিয়ে তোলার বহু অভিনব উপায় উপকরণ উদ্ভাবিত আবিষ্কৃত হচ্ছে। খোলা হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার সেই-রকম নবতম একটি উপায়। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্রের সংগে রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা জুড়ে দিয়ে, হৃৎপিণ্ড কেটে রুগ্ন ভালভ বার করে নিয়ে কৃত্রিম ভালভ জুড়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা হচ্ছে। এইরকম আরো কত ব্যাপার ঘটছে যা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভবিষ্যতে হয়তো রুগ্ন হৃৎপিণ্ড কেটে বাদ দিয়ে গোটা একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দেওয়া যাবে যার ফলে হৃদ্‌রোগের পুনরাক্রমণের আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

কিন্তু এসবই রোগ হলে চিকিৎসার ব্যাপার, রোগ নিবারণের ব্যাপার নয়। অথচ নিবারণটাই অনেক বেশি কাম্য। সেক্ষেত্রে করণীয় কী?

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা এ পর্যন্ত যা বলেছেন তা যদি ঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অস্বাভাবিক কৃত্রিম জীবন-যাত্রা, প্রতিনিয়ত দুঃখদুর্দশা, উদ্বেগ আশংকা দুশ্চিন্তা এইগুলিই স্নায়ুতন্ত্রে বৈকল্য ডেকে এনে হৃদ্‌রোগের কারণ হয়। ভারতের মত দেশের সাধারণ মানুষ যারা কায়ক্লেশে দিনপাত করে জীবিকানির্বাহের জ্বালা যন্ত্রণায়, বেকারদশায়, পুষ্টির অভাবে, ভেজালযুক্ত খাদ্য, ওষুধের অগ্নি-মূল্য ইত্যাদি হাজারো সমস্যার ঘায়ে জর্জরিত—তাদের স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থাটা কিরকম হতে পারে? স্নায়ুতন্ত্রের সহ্য-ক্ষমতারও একটা সীমা আছে এবং সেই ক্ষমতা সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। অবস্থা যখন স্নায়ুতন্ত্রের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক শরীর পরিচালক শক্তি ক্ষুণ্ণ হবেই যার ফলে নিউরোসিস ও বিপাক ক্রিয়ায় গণ্ডগোল অনিবার্য। এইভাবেই জমি তৈরি হয় বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে হৃদ্‌রোগ। সুতরাং রোগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি উচ্ছেদ করতে না পারা পর্যন্ত রোগ নিবারণের চেষ্টা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়া কঠিন।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

অবসরযাপন

ইন্দ্রজিৎ

[illegible] —মানুষের জীবনে [illegible] বৃহৎ [illegible]

[illegible]

[illegible] সময় নিকটবর্তী হলে মানুষ যেমন [illegible] বোধ করে এমন আর কোন সময়ে [illegible]। মৃত্যু [illegible] পারলে মানুষের [illegible] যে অবস্থা হয় অবসর [illegible] সময় [illegible] অনেকের দেখেছি প্রায় সেই অবস্থাই [illegible]।

[illegible] পূর্বে আমি যখন চাকুরি [illegible] অবসর গ্রহণ করি তখন আত্মীয় বন্ধু [illegible] উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। [illegible] শেষ হলে সকলেই অবসর নিতে [illegible] উদ্বেগ প্রকাশ [illegible]। অবশ্য [illegible] কার্যকাল শেষ হতে তখনও দু-এক [illegible] বাকি ছিল। বর্তমান অর্থ সংকটের [illegible] যখন কার্যকাল উত্তীর্ণ হলেও লোকে প্রাণপণে চাকরি আঁকড়ে থাকতে চায় তখন স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করা তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন নি। এ ছাড়া আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে অকস্মাৎ কর্মত্যাগের দরুন বহুকালের অভ্যাসগত জীবনে হঠাৎ যে পরিবর্তন আসবে তার ফলে শরীর মনে ভাঙন ধরা বিচিত্র নয়। এর জন্যে আগে থেকে মনকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অত [illegible] বিবেচনা করে কাজ করা আমার স্বভাব নয়। আমি বরাবর ঝোঁকের মাথায় [illegible] করেছি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সুপরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য বিচিত্র [illegible] কোন প্রকার অঘটন ঘটা কিছুই [illegible] ছিল না। সুখের বিষয় এ যাবৎ কিছু ঘটে নি। [illegible] জীবনের বৎসরকাল [illegible] কাটিয়ে দেবার পর পরিবর্তন [illegible] দেখছি তাতে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ দেখছি না। খুব একটা বড় রকমের পরিবর্তন কিছুই হয় নি। আমার শরীর আগে যেমন অপটু ছিল, এখনও তেমনি অপটু আছে। আমার স্ত্রী পুত্রকন্যারা [illegible] আশা করেছিলেন অবসর গ্রহণ এবং বিশ্রাম লাভের ফলে আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হলেও বা পারে, সেদিক থেকে তাঁরা অবশ্যই নিরাশ হয়েছেন। পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে সেটা মনের দিক থেকে এবং সুখের বিষয় সেটা ভালর দিকেই হয়েছে। আমি সারাজীবন একটি জিনিসকে ভয় করে এসেছি—সেটি গতানুগতিক জীবন, গতানুগতিক কাজ। ত্রিশ বছরের অধিক কাল একই জাতীয় কাজ করতে হয়েছে। এ ধরনের কাজে মন নির্জীব হয়ে পড়বার আশংকা থাকে। সারাক্ষণ সে বিষয়ে অবহিত ছিলাম বলেই মানসিক অপমৃত্যু থেকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি। কাজের মধ্যেও মনটাকে ছুটি দিতে শিখেছিলাম। যাদের নিয়ে কাজ করেছি তাদের মনেও একটা ছুটির আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা আমি করেছি। সেটাই আমার কাজের নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। আমি যাঁকে আজীবন গুরু বলে জেনেছি এবং যাঁর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম তাঁর কাছ থেকেই এই ছুটির মন্ত্র গ্রহণ করেছিলাম। শুধু মন্ত্র নয়, নিমন্ত্রণ। 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে'—যেদিন তাঁর কাজে যোগ দিয়েছি কেবল সেদিন থেকে নয়, তার বহু আগে যেদিন থেকে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেদিন থেকেই ছুটির আমন্ত্রণটি পেয়েছি। কাব্য সাহিত্য শিল্প ছুটির আমন্ত্রণ নিয়েই আসে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন খেলা আর কাজে তফাত কোরো না, দুটোকে এক যায়গায় মেলাবার চেষ্টা কোরো। আমি আড্ডা আর কাজকে একত্র মিলিয়েছিলাম। কাজের মধ্যে আড্ডার আমেজ এনেছিলাম, আড্ডার মধ্যে কাজের। একদিন হঠাৎ দেখলুম খেলার পাট ঘুচে গেল অর্থাৎ যাকে খেলা বলে জানতুম সেটা ছেলে খেলায় পরিণত হল। যা ছিল নিত্য নতুনের সন্ধানে রোমাঞ্চকর সেটা হয়ে গেল প্রাণহীন নিয়ম পালন। সে কাহিনী আজ নয়, আরেকদিন বলা যাবে। আমি বাঁধা সড়কে চলে অভ্যস্ত নই, বরাবর নিজের পথ নিজে করে নিয়েছি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করিনি, নিজের ইচ্ছায় করেছি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম স্বয়ং কর্তারও মনঃপূত ছিল না।

আমি যে আজীবন ছুটির চর্চা করে এসেছি, কাজ থেকে ছুটি নিয়ে অবধি সেটি

খুব কাজে লাগছে। অবসর চর্চা একটা আর্ট। যিনি পূর্বাবধি সে আর্টের চর্চা করেননি, হঠাৎ কাজ থেকে অবসর নিলে ডাঙায় তোলা মাছের মত তাঁর দুর্দশা হয়। আমি কাজের মানুষ নই, ছুটির মানুষ। কাজের মানুষ কাজ না থাকলে একেবারে অসহায়। ছুটির মানুষ দুটি পেলেই খুশী—আমি আমার নিজের element-এ এসে গিয়েছি। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার অন্যতম গুরু ল্যাম বলেছিলেন, Man is out of his element as long as he is operative. আমার মতই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, এতদিনে নিজেকে ফিরে পেলাম।

এটা মস্ত বড় কথা। যতদিন কর্মজীবনে আছি ততদিন দৈনন্দিন কর্মে যাঁরা সহকর্মী, সহযোগী, বন্ধুবান্ধব তাঁদের সংসর্গেই সময়ের মোটা অংশ কেটে যায়। অপরের সঙ্গ যতখানি উপভোগ করি নিজের সঙ্গ ততখানি নয়। মানুষ নিজের কাছেই সব চাইতে বেশি অপরিচিত। কারণ পরচর্চা যতখানি করি, আত্মচর্চা ততখানি করি না যদিচ সকল জ্ঞান সাধনার মূলে—আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জান। বেশির ভাগ মানুষ নিজের চাইতে অপরের সঙ্গ বেশি উপভোগ করে, নিজের companyকে dull মনে করে। তার কারণ বেশির ভাগ মানুষেই খুব uninteresting, সেটা নিজেই টের পায় যখন একলা থাকে। নিজের সঙ্গ উপভোগ করে না কারণ তার মনটা বোবা, কথা কইতে জানে না। যদি জানত তো নিজের সঙ্গেই দিব্যি আলাপ জমাতে পারত। শুনে আপনারা আমাকে অহংকারী মনে করতে পারেন কিন্তু সত্যি বলছি আমি আমার নিজের চাইতে interesting company আজ পর্যন্ত পাইনি। নিজের সঙ্গে কথা বলে যতখানি আরাম পাই, অপরের সঙ্গে কথা বলে ততখানি নয়। এ পর্যন্ত যৎসামান্য যা কিছু আমি লিখেছি তা সমস্তই আমার imaginary conversations এবং সে কথোপকথন আমার নিজের সঙ্গে। বাস্তবিক পক্ষে কবি সাহিত্যিকরা যা কিছু লেখেন সমস্তই imaginary conversations. অপরের সঙ্গে আলোচনা করে কবিতা বা গল্প উপন্যাস লেখা যায় না। একমাত্র নিজের সঙ্গেই সে আলোচনা চলতে পারে। অপরের তুলনায় কবি সাহিত্যিক মাত্রই নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। তাঁরা নিজেই নিজের সখা এবং সচিব।

নিজের সঙ্গে আমি দিব্যি জমিয়ে গল্প করতে পারি, জাঁকিয়ে তর্ক করতে পারি। তর্কের মত উপভোগ্য জিনিস আর নেই কিন্তু সেজন্যে সমকক্ষ প্রতিপক্ষের প্রয়োজন। বলতে বাধা নেই, সমকক্ষের অভাবে বেশির ভাগ তর্ক আমি নিজের সঙ্গেই করে থাকি। অপরের সঙ্গে তর্ক করে আমরা সময় নষ্ট করি, নিজের সঙ্গে তর্ক করলে সময় বাঁচে। কারণ আমার সমস্যা আমি যেমন বুঝি অপরে ঠিক তেমন করে বুঝবে না। আমি সমস্যাটাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি অপরে সেভাবে নাও দেখতে পারেন। সেজন্যে তাতে কালক্ষয় যতখানি হয় ফললাভ ততখানি হয় না।

এই এক বছরে নিজের সঙ্গে আমার সখ্য অনেকখানি বেড়েছে, নিজেকে অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে জেনেছি। মনের মধ্যে অনেক অপরিচিত অর্ধপরিচিত প্রকোষ্ঠ থাকে—কোন কোন বাড়িতে যেমন থাকে গুদোম ঘর, বহুকালের সঞ্চিত জিনিসে ঠাসা। কোনদিন অবসর মুহূর্তে সে সবে নাড়া দিলে অনেক বিস্মৃত জিনিস নতুন করে আবিষ্কৃত হয়। পুরোনো সুখ দুঃখের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে। অবসর জীবনের এক প্রধান আনন্দ এই স্মৃতিচারণে। অতীত দিনের সুখস্মৃতি উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেয়। পুরাতন দুঃখের তীব্রতা দূর হয়ে সেও একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য বিকীর্ণ করে। কালের ঐখানেই কৃতিত্ব, সব কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

খুব কৌতুকের কথা যে কাজের অযোগ্য হলে তবে মানুষ অবসর গ্রহণ করে। এর চাইতে শোচনীয় ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আমার মতে বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করে তবে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কাজের জন্যে যতখানি যোগ্যতা প্রয়োজন তার চাইতে ঢের বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন অবসর যাপনের জন্যে। কাজের চাইতে সহজ কাজ আর কিছু নেই, নইলে লোকে কেন কথায় কথায় বলবে—চোখ বুজে কাজ করে যাও। চোখ বুজে যা

যায় তার চাইতে সহজ ব্যাপার আর কি ? লোকে আরো বলে—দশে মিলে কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। কি ও কথা! এই যদি হয় কাজের তবে কাজ করেই বা লাভ কি? অবসর? অবসর যাপনের হার জিত নিজের, আমার একলার। কাজের অপরের ঘাড়ে চাপানো যায়, র অবসর আপনি কার ঘাড়ে দেন? এই জন্যেই বলছিলাম কর্ম-এর চাইতে অবসর জীবনের দায়িত্ব বেশি। বোধ করি ঐ দায়িত্বটাকে র জন্যেই বেশির ভাগ মানুষ কে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকেন, তেই অবসর নিতে চান না। এঁরা চাকুরির মাপে তৈরি, মনের একটুও বাড়তি সম্বল নেই যা নিয়ে যাপন করতে পারেন। এঁদের চাকরি অবসর নেওয়া মানে জীবন থেকে নেওয়া। কারণ চাকরি-হীন কথা এঁরা ভাবতেই পারেন না। পরে এঁরা অবসর জীবন যাপন না, বেকার জীবন যাপন করেন। এই দুই-এ আকাশ পাতাল য।

জীবনের মর্ম যাঁরা বোঝেন না অবসর জীবন স্বার্থপরের , সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেন না যে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সংসারকে অতিব্যস্ত হয়। মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় কত রকম ধাঁধা ...—আপনারে লয়ে বিব্রত ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এসব হাসি পায়। আমি যদি যদি করতেই হয় তো নিজেকে ... ঐ যারা সারাক্ষণ কাজ করে তাঁরাই সকলকে বিব্রত করছেন। একটা কথা আছে—going it doing good, কিন্তু সুবুদ্ধি জানেন এর মধ্যে—there's e going about than doing l. সংসারে প্রত্যেকে যদি নিজেকে ব্যস্ত থাকতে জানত তবে অপরকে ব্যস্ত করবার সময় বা সুযোগ পেত সংসারে শান্তি বজায় থাকত। অবসর-মানুষ কাউকে বিব্রত করে না, এমন নিজেকেও না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত কে বিব্রত থাকা বলে না। অবসর এক প্রকার ব্রত পালন।

ই কারণে অবসর জীবনের বিশেষ ট ডিগনিটি আছে। আপনি যেমন কে বিব্রত করতে চান না, আপনাকেও বিব্রত করবে না। মাসের প্রথম ই তহবিল শূন্য হলে এখন গৃহিণী কে তা স্মরণ করিয়ে দেন না, পাওনা-দাররাও এখন আমার কাছে আসেন না। এখন আমি এসবের ঊর্ধ্বে। যতদিন কাজে ছিলাম ততদিন এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নষ্ট করবার মত সময় যথেষ্ট ছিল। এখন অবসরের মহামূল্য সময় এ সব নিয়ে নষ্ট করি সেটা আমিও চাই না, অন্যরাও চান না। এমন কি বন্ধুবান্ধবরা যখন আসেন তাঁরাও পারতপক্ষে কোন কাজের কথা তোলেন না। নিছক নির্জলা গল্প গুজব আড্ডার জন্যই আসেন। এঁরা পূর্বাবধিই জানেন যে কাজের কথায় আমি কখনো কান দিই না; কারণ কাজের কথা মাত্রই মামুলী কথা। বাজে কথায় আমার যতখানি উৎসাহ, কাজের কথায় ততখানি নয়। আগের চাইতে এখন আমার বাজে কথা বলার এবং শোনার অবকাশ ঢের বেড়েছে। বাজে কথার মূল্য যে কতখানি সে তো আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, রবীন্দ্রনাথের 'বাজে কথা' নামক প্রবন্ধটি একবার পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন। জীবনভর বাজে কথা বলতে পেরেছি বলেই মনটা আজও তাজা রাখতে পেরেছি। আর দু কলম যদি লিখতে শিখে থাকি তাও ঐ মামুলী কথা ছেড়ে বাজে কথার মর্ম বুঝেছি বলেই।

অবসর জিনিসটা টনিকের কাজ করে, মনকে তাজা রাখে, প্রসন্ন রাখে। মনের ভ্রূকুটিবাই কেটে যায়। আগে যা দ্রষ্টব্য মনে হত না, এখন তাও দর্শনযোগ্য মনে হয়। শুধু তাই নয়, আগে যেদিকে দৃষ্টি যেত না এখন সেদিকে অনায়াসে দৃষ্টি যায়। ... দেখে অবাক হই। জানালার ফাঁকে ... চড়াই পাখির আনাগোনা, খড়-কুটো নিয়ে বাসা বাঁধা বেশ লাগে দেখতে। ওদের কিচির মিচির শুনতেও কিছু খারাপ লাগে না। সুমুখের রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত আগে এমনভাবে কখনো লক্ষ করে দেখিনি। সকালবেলায় ফিরিওয়ালাদের হাঁক শুনে শুধু তাদের জীবনযাত্রাই নয়, পাড়া প্রতিবেশীর সংসার যাত্রা সম্পর্কেও কৌতূহল জাগে। জীবনের একটি খণ্ড চিত্র বারান্দায় বসে বসেই দেখতে পাই, বেশ লাগে। মনে হয় আমার মত অবসর-পাওয়া মানুষদের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধে দিয়েছেন—আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আজীবন অবসর জীবন যাপন করেছেন, সেজন্যেই অতখানি দেখেছেন। সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকলে দেখতেন কখন? তার চাইতেও বড় কথা, ভাবতেন কখন? লোকে বলে, যে রাঁধে সেও চুল বাঁধে কিন্তু যে কাজ করে সে কি কখনো ভাবে? পনেরো আনা মানুষ তো দেখি না ভেবেই কাজ করে।

তা হোক, যা বলছিলাম। আগে এসব দেখবার চোখ ছিল না কারণ চোখ বেশির ভাগ সময় থাকত পুঁথির পাতায়। বোধ করি সেজন্যেই মন এমন কৃশ হয়ে ছিল। করেছি ছেলে পড়ানোর কাজ। পরীক্ষার জন্যে পড়া তৈরি করানো রোগীর পথ্য তৈরি করার মতো। কাব্য সাহিত্যের অধ্যাপনা যদি পরীক্ষা-রোগীর পথ্য তৈরিতে পরিণত হয় তবে সে যে কী উৎকট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় গত আট দশ বছরে সেটি আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। অথচ এমনটা হবার কোন কারণ ছিল না। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম পরীক্ষা পাশ বটিকা ছাড়া ছাত্রদের অন্য কিছু সেবন করা বারণ। যে জিনিস লেমনেডের ন্যায় সুস্বাদু হ'তে পারত তাকে আমরা বার্লির জলে পরিণত করেছি। রবীন্দ্রনাথ কেন যে আমাদের ইস্কুল কলেজের শিক্ষাকে hospital treatment-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সেটি অধ্যাপনা জীবনের শেষ পর্বে এসে বুঝলুম।

তিরিশ বছরের কর্মজীবনে বহু কৌতুক সঞ্চিত হয়ে আছে। যতদিন কাজে লিপ্ত ছিলাম ততদিন তার রসটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি। এখন অবসর মুহূর্তে আরাম কেদারাটিতে গা এলিয়ে দিয়ে সেই কৌতুক খুব রসিয়ে উপভোগ করছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যকে বলেছেন —emotion recollected in tranquillity, আমার কাব্য—emotion recollected in retirement.

আপনার লাবণ্যের যত্ন নিন...

সূক্ষ্ম রূপচর্চার জন্য
ল্যাক্‌মে ভ্যানিশিং ক্রীম

আপনার লাবণ্য বাড়িয়ে তুলুন…আরও কমনীয় ক'রে তুলুন! ল্যাক্মে ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের পূর্ণ পরিচর্যা করে—রোদ, ধুলোবালি থেকে রক্ষা করে, কোন চকচকে প্রলেপ এনে দেয় না, ফুসকুড়ি ও ব্রণ রোধ করে—আপনাকে এনে দেয় এক মসৃণ, উজ্জ্বল লাবণ্য! এই ক্রীম বেশ হাল্কা এবং তেলতেলে নয়, তাই পাউডার চমৎকারভাবে বসে যায় বা এমনিতেও চমৎকার—ত্বককে আরও কমনীয়, আরও লাবণ্যময় ক'রে তোলে।

অপূর্ব ফর্মুলার প্রসাধনের জন্য
ল্যাক্‌মে কোল্ড ক্রীম

আপনি আপনার ত্বকের যত্ন নেবার সময় সেরা বস্তুই ত' নেবেন! একমাত্র ল্যাক্মে কোল্ড ক্রীমে আছে অপূর্ব প্রসাধনী তেল যা আপনার ত্বককে পরিষ্কার করে, আর্দ্র রাখে, কোমল ক'রে তোলে এবং এক অপরূপ মোলায়েম সৌন্দর্য এনে দেয়! আপনার ত্বকের নিষ্প্রভতা ঘুচিয়ে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ক'রে তুলুন।

ল্যাক্মে

এখন এই দুই ল্যাক্মে ক্রীমই সঙ্গে রাখবার মত ছোট সাইজে পাবেন।

Bensons 280A/4.

মরমক্তায়মের দেশে

...র্থা স্টেশনে গাড়ি থামতেই কলার কাঁদি নিয়ে ফেরিয়ালা হাঁক দিল। ...লা, খুব ভাল আর স্বাস্থ্যকর। এতে ...ছে ভিটামিন 'এ' আর 'বি'। ফেরিও-...লার সেল্সম্যানশিপের বুকনি আর ...র ফোড়ন বেশ লাগলো। ডেকে বললাম ...টামিন খেলে কি হয়? উৎসাহিত হ'য়ে ...সিতে উদ্ভাসিত মুখে জানাতে শুরু ...লো 'এ' ভিটামিনে চোখের জ্যোতি বাড়ে, ...রের রং উজ্জ্বল হয়। আমরা জিজ্ঞাসা ...লাম "আর 'বি'?" বি-তে কি হয় ভাবতে ...চার বার ঢোঁক গিলে ফেরিওয়ালা মশাই ...লে ফেললেন 'বি' ভিটামিন খেলে মোটা ...য়। সর্বনাশ! মহিলা কামরার সামনে ...চারের চাল প্রায় বেচাল হবার উপক্রম! ...নে খানিকটা বুঝেই সামলে নিয়ে বললো ...র 'ডি'ও আছে কলায়। বেচারা! আবার ...কে বললাম "তুমি এত সব ভিটামিন তত্ত্ব ...শখলে কোথায়?" "কেন, এই তো এখানে ...য়েছে সেবাগ্রাম, আর সেখানে থাকতেন ...ঃ সুশীলা নায়ার।" নজিরের উল্লেখটি ...দ নয়। যাক। কলা কয়েকটি কিনতেই আবার শুনলাম মন্তব্য "ভাল, ভাল খুব ভাল ফল।" বাংলা বলতে বাধলো না। সরল, স্পষ্ট উচ্চারণ। আবার অবাক হবার আগেই বুঝিয়ে দিল সেবাগ্রামে বাঙালী এসেছেন গেছেন অনেক। তাঁদের সেবা করে সে শিখেছে বাংলা।

মাদ্রাজ পৌঁছে গাড়ি বদল করে এর্নাকুলম যাবার কথা। কেরালার বন্দর কোচিন, উইলিংডন দ্বীপ আর এর্নাকুলম একাধিক অংশ দ্বারা গঠিত এক যৌগিক শহর। কোচিন আর এর্নাকুলমের সংযোগের উইলিংডন দ্বীপটি এক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারের কৃতিত্ব। মানুষে গড়া এই দ্বীপ কেরালার লোককাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম যিনি পরশু দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করেছিলেন। পরশুরাম পশ্চিমঘাট পার হ'য়ে ব্রাহ্মণের জন্য ভূমি জয় করেছিলেন অশান্ত সাগরের বুক থেকে। দুস্তর, দুর্নিবার আরব সাগরের তরংগ লক্ষ্য করে তাঁর কুঠার নিক্ষেপ করেন। সন্ত্রস্ত সমুদ্র সরে চলে গেল কুঠার যতদূরে গেছে তার সীমানা পার হ'য়ে। পরশুরাম স্থাপনা করলেন কেরালা। কেরবৃক্ষ বা নারিকেল কুঞ্জরাজি শ্যামল কেরল। সংগে তার এসেছিলেন যে সব ব্রাহ্মণ তাঁরাই ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মালাবারের নিম্বোতম্ নাম্বুদ্রিপদ

কেরলের মহিলা ডাকহরকরা—শ্রীমতী এন গোমতী

ব্রাহ্মণ। সারস্বত ব্রাহ্মণশ্রেণী এখানে এসেছিলেন জলপথে সারস্বত দেশ থেকে অর্থাৎ পাঞ্জাব বা কাশ্মীর থেকে।

পরশুরামের সংগে এসেছিল আর্য-সভ্যতার ধারা। কিন্তু মালাবারের কৃষ্টিতে হ'য়ে আছে তার এক অপূর্ব সমন্বয় আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির সংগে। এর্নাকুলমে যেদিন পৌঁছোলাম সেদিনই দেখলাম দলে দলে লোক চলেছে তীর্থের পথে। সংগে যোগ দিয়েছে জনকতক বিদেশী পর্যটক আর তাদের ক্যামেরা। [illegible], ব্রতাদির সংযমনে রুক্ষ শুষ্ক পুরুষমাত্র যাত্রী। রজোদর্শনের পূর্বে বালিকা অথবা বৃদ্ধার এ পুণ্য সঞ্চয়ের অধিকার আছে। অন্য নারীর নাই। মরমক্তায়ম্ শাসিত সমাজে একটু আশ্চর্যজনক বিধি মনে হ'লো। কেরলবাসী ভাস্করম্ মহাশয় কাহিনীটি শোনালেন। বিষ্ণুমায়ার চমৎকার চর্চা। ভগবান বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে বহু সংকটের সমাধান করেছেন। মোহকারিণী, মনোহারিণী মোহিনী কেমন দেখবার সখ হয় শঙ্করের। নারায়ণ-এর মোহিনী-মূর্তিতে মোহিত শঙ্করের ঔরসে মোহিনীর উরুদেশ ভেদ করে জন্ম হয় এক পুত্রের। সেই পুত্র মালাবারের আইয়াপ্পন বা হরিহরপুত্র। আইয়াপ্পন ঠাকুরটি কিন্তু দারুণ নারী বিদ্বেষী। নারীর রূপ যৌবন থেকে বাঁচিয়ে চলেন নিজেকে। তাই তাঁর পূজার নিয়মও কঠোর। তীর্থ যাত্রীরা যে কেবলমাত্র শ্মশ্রু-মোচন না করে দেড়মাস কাটান তা নয়, নারী সহবাসও ততদিন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যৌবন মধ্যস্থা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুখ-স্পর্শাঙ্গী মোহিনী দেবাদিদেব শঙ্করের বিচলিত হবার কারণ হ'য়েছিল। অতএব মোহের সম্ভাবনা মাত্রই তফাত যাও। মোহিনীতে মুগ্ধ শঙ্কর, এমন সময় পার্বতীর প্রবেশ এরকম একটি চমৎকার দেওয়ালে অংকিত চিত্র আছে কোচিনরাজের একটি প্রাসাদে।

মরমক্তায়ম্ বা মাতৃশাসিত সমাজ, যেখানে স্ত্রীলোকের দিক থেকে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয়, তার শেষ রেশ এখনও মালাবারে আছে। এ জন্য মেয়েরা এখানে চির-কাল স্বাধীন জীবন যাপন করেছে। এমন কি এখানকার মপলা মুসলমান মেয়েদেরও অবাধ চলা ফেরায় বাধাবিঘ্ন নেই। ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণ পত্নী গ্রহণে বাধাও কোনদিন ছিল না। মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির রীতি থাকায় ব্রাহ্মণ পিতা ও ব্রাহ্মণেতর মাতার সন্তান নিয়েও সমাজে সংশয় আসেনি কখনও। পদবী সন্তান মায়েরই পেত। বাবা যদি পিল্লাই হন আর মা মেননের মেয়ে তবে ছেলেমেয়েরা হ'তেন মেনন। মহিলা সমাজের এই স্বীকৃতি সম্পত্তির বেলায় বিশেষ করে তার স্বাধীন সত্তার প্রতিষ্ঠা ছিল। লেখাপড়া তেমন না জানলে পুরুষ নারীর ধনসম্পদের দেখা-শুনো করতেন, কিন্তু মালিকানা নারীর ছিল। পরিবর্তন হ'তে হ'তেও কিছু তার বাকী সমাজ ব্যবস্থায় আজও আছে। ছেলে-মেয়েরা থাকে মায়ের সংগে মামাবাড়ি আবার তাদের পিতা থাকেন তাঁর বোনের ভার নিয়ে। স্বামী স্ত্রীর দেখাশুনো যত-টুকু তা রাতের ঘোরের আবেশ। দায়িত্ব

নারিকেল কুঞ্জ

ভাই-এর। এরকম অবস্থা মালাবার অঞ্চলে পেতে দেরি হয় না যদিও বহু ক্ষেত্রে ব্যবস্থার অদলবদলও হচ্ছে। একজন মালয়ালী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁদের নিজেদের এই অখন্ড স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি মত। মহিলা বললেন আমরা চিরকাল যা পেয়ে এসেছি আজকের নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনে তার উপর নূতন করে কিছু দেয় নি। অথচ অন্যত্র মেয়েরা পেয়েছে আগলখোলা পূর্ণ সংস্কারমুক্ত সাবলীল গতি। সেখানে মালাবারে ছোট ছোট সামাজিক সংকীর্ণতা এখনও পুরোপুরি বাদ পড়েনি। আর তা ছাড়া সমাজ-বন্ধনের বাইরের যে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ক নারী ও পুরুষকে ঘিরে রেখেছে আছে, তার কোথাও এখানকার মেয়েও চিরন্তনী নারী মাত্র। নারী এবং ভারত-বর্ষের নারী। যে তিথিতে মদনভস্ম হয়েছিল সে তিথি নিয়ে মেয়েরা কতই না উৎসব করে। কত তার আয়োজন। কেন? সম্ভবত মদনভস্মই শংকরের তপস্বী পার্বতীর কাছে হারমানার প্রথম পর্ব। অতনু অনঙ্গ-দেব পড়ে ছাই হলেন কিন্তু নারীর তপস্যা ব্যর্থ হয় নি। পার্বতীর কাছে শিবের পরাভব নারীর জিত হিসেবে অনন্ত কালের স্বাক্ষরে রয়ে গেল।

কেরলে লিখতে পড়তে জানে না এমন মেয়ে নেই বললেই চলে। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন আর মালাবার এই তিনে মিলে আজকের কেরালা। ত্রিবাঙ্কুরের রাজমাতা সেতু-পার্বতী বাঈ-এর কথা সকলেই জানেন। মেয়েরা স্বাধীন হবে, লেখাপড়া শিখবে, নাচগানে পারদর্শী হবে—পার্বতীবাঈ তাই চেয়েছিলেন। মহিলা সমাজের উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য সেতুপার্বতীবাঈ অনেক করেছেন। মালাবার কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরের মেয়ে তাই অবাধে লেখাপড়া শিখছে। বহুদূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল শিক্ষা। এখনও কেরলের পথে ভোরের আলোয় দেখবেন প্রত্যেক মেয়ে পুরুষ একটি করে খবরের কাগজ খুলে বসে পড়ছে। মালয়ালম পত্রিকার প্রচারও তাই এত বেশী।

চাকরির বা জীবিকার ক্ষেত্রেও কেরল-কামিনী কোনও দিন পিছিয়ে থাকেনি। পল্লী অঞ্চলে তাদের পোশাক 'মুন্ডু' বা লুঙ্গির মত কাছাকোঁচাহীন খাটো ধুতি বিশেষে নিম্ন অংগ আবরিত করে তারা ঘরের কাজ, বাইরের কাজ আজও করে। 'মুন্ডু' কেরলের মেয়ে-পুরুষ সকলেরই পোশাক। বর্মী লোঙ্গি থেকে হয়তো শব্দ হয়েছে। শহরের কেরলকন্যা জীবিকার উদ্দেশে যখন যায় তাকে দেখলে বাঙালী ঘরের মেয়েকে মনে পড়ে। আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশদাম, নরম কোমল শ্যামল রূপে কোথাও এতটুকু উগ্রতা নেই। পোস্টম্যান থেকে নিয়ে, পণ্যপসারিণী, সরকারী অফিস থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সবত্র মেয়েরা কাজ করে। চিঠি বিলি করার কাজে দার্জিলিং-এর পাহাড়ী মেয়ে দু-একজন রয়েছে শুনেছি, কিন্তু তন্বী শ্যামা কেরলের মেয়েকে চোখে দেখে বড় ভাল লাগল। ১৮৯২-৯৩ সালের ভারতীয় ডাক বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে পাওয়া যায়, আমাদের শাহাপুর জেলায় শাহ[illegible] নামে জায়গায় একটি মহিলা বিশ বছর ধরে ডাকহরকরার কাজ করেছিলেন। [illegible] গ্রামবাসীদের তরফ থেকে তাঁর [illegible] বিরুদ্ধে কখনও কোন নালিশ [illegible] হয় নি। তাঁকে মাসের শেষে মাইনে দেওয়া হতো না। প্রতি চিঠিতে এক পাই হিসাবে ছিল তাঁর পাওনা। শাহাপুরের [illegible] কমিশনার তখন ডাক বিভাগের [illegible] করতেন। পরে মহিলাকে ডাক বিভাগ [illegible] নিয়ে নেওয়া হয়। তিনি একেবারে লেখা-পড়া জানতেন না বটে কিন্তু [illegible] সম্বন্ধে এমনই জ্ঞান ছিল যে, যে কোন চিঠি একবার সেই ঠিকানা পড়ে শুনিয়ে দিলে গন্তব্য স্থানে কখনও [illegible] না। ডাকহরকরা মহিলাটি [illegible] সবার প্রিয় ছিল।

কেরালার ডাকহরকরা মেয়েরা [illegible] জানেন। [illegible] দিনের পর দিন [illegible] ঘরে ঘরে আপনজনের সংবাদ পরিবেশন করে আসেন। এমনি একটি মেয়ে গোমতী। ত্রিচূরম-এর কাছে [illegible] তার বাড়ী। আমাদের সেই মহিলার মত ঠিকানা তাকে কারও পড়ে শোনাতে হয় না। অথচ এরা ঘরে ফিরে গেলে আবার সাধারণ মেয়ের মত গৃহকর্মের শত কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। নারকেলের নিম্কি, চালের গুঁড়োর পিঠে বাঙালী মেয়ের মত স্বহস্তে প্রস্তুত করে আত্মীয় বা অতিথি আপ্যায়ন করে। আমাদের মত ডাব বা নারকেল মাঙ্গলিক বলে মানে, তাই উৎসব আয়োজনে তোরণে রাখে কলাগাছ আর ডাব। ওদের ঐশ্বর্য নারকেল তাই মালয়ালী মেয়েরা বলে নারকেল গাছে যদি জল দাও, তবে সে গাছ তোমায় চিরকাল জল দেবে। গোমতীর বাড়িতেও তাই নারকেল গাছের সেবা সে নিজে হাতে করে।

শ্রীমতী

খেলার ছল

মিঠুর গোল গোল মোটামোটা দুটো পায়ের একটা জীবনের বুকের ওপর, আর একটা তার শোয়ানো হাতে। তার বুকের ওপর কাত হয়ে শুয়েছে মিঠু, ঘাড়ের কাছে মাথা আর ল্যাভেন্ডারের গন্ধময় চুল। জীবন কানের ওপর মিঠুর দুরন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আর কবিতা-আবৃত্তি শুনতে পাচ্ছিল :
'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা, তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে সূর্য-তারা। তারি একধারে আমার ছায়ারে আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো আহ্লাদে, তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি...'. একটা ছোট্ট নরম হাতে মিঠু তার বাবার [illegible] বেঁধেছে [illegible] দিকে। জীবন অন্যমনস্ক ভাব দেখাতেই মুখ টেনে নিয়ে বলছে 'শোনো না বাবা!'
মিঠুর ভারী শরীর, নরম তুলতুলে। বুকের ওপর যেখানে মিঠুর পা সে জায়গাটা অল্প ধরে আসছিল জীবনের। পা-টা একবার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে মিঠু দাপিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই উঠে এল জীবনের বুকের ওপর, দুই [illegible] চোখ রেখে জীবনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হঠাৎ অকারণে ডাকল 'বাবা!'

'উঁ।'

'তুমি শুনছো না।'

'শুনছি মা-মণি।' জীবন চোখ খুলে তার ছয় বছরের শ্যামবর্ণ মেয়েটির দিকে তাকাতে হঠাৎ তার বুক কান্নায় কান্নায় ভরে ওঠে। চুলে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, চোখে কাজল, মুখে অল্প পাউডারের ছোপ—এত সকালেই মেয়ে সাজিয়েছে অপর্ণা। না সাজালেও মিঠুকে দেখতে খারাপ লাগে না। কী বড় বড় চোখ, আর কী পাতলা ঠোঁট মিঠুর! জীবন মিঠুকে আবার দু হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তোমার কবিতাটা আবার বলো।' মিঠু সঙ্গে সঙ্গে দুলে ওঠে, 'ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' শুনতে শুনতে সকালের গাড়িমসির ঘুম-ঘুম ভাবটা আবার ধীরে ধীরে জীবনকে পেয়ে বসতে থাকে। বলতে কি সারাদিনের মধ্যে মিঠু আর তার বাবাকে নাগালে পায় না, সকালের এটুকু সময় ছাড়া। তাই এটুকুর মধ্যেই সে পুষিয়ে নেয়। ধামসে, কামড়ে, কবিতা বলে, গান গেয়ে বাবার আদর কেড়ে খায়। জীবনের মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না যে এই সুন্দর, সুগন্ধী মেয়েটা তার!

মাঝখানের ঘর থেকে অপর্ণার গলা পাওয়া যাচ্ছিল। চাপা গলা, কিন্তু রাগের ভাব। মিঠু মাথা উঁচু করে মায়ের গলা শুনবার চেষ্টা করে বাবাকে চোখের ইংগিত করে বলল 'মা!' নিঃশব্দে হাসল 'মা আতরদিকে বকছে। রোজ বকে।' জীবন নিস্পৃহভাবে বলে

'কেন!' মিঠু মাথা নামিয়ে আনল জীবনের গলার ওপর, তার থোকা থোকা চুলে জীবনের মুখ আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল, 'আতরদি রোজ কাপডিশ ভাঙে। সকালে দেরি করে আসে। মা বলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে। 'বলতে বলতে টপ্ করে জীবনের বুক থেকে পিছলে নেমে যায় মিঠু, মশারি তুলে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে। জীবন ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে বলে 'কোথায় যাচ্ছো, মা-মণি!' দরজার কাছে এক ছুটে পেণছে গিয়ে মিঠু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে 'দাঁড়াও, দেখে আসি।'

গোয়েন্দা! এই মেয়েটা তার পুরোপুরি গোয়েন্দা। বাড়ির সমস্ত খবর রাখে, আর সকালে বাবাকে একা পেয়ে সব খবর চুপি চুপি বলে দেয়। বিশেষত অপর্ণার খবর। মিঠু তার সহজ বুদ্ধিতে বুঝে গেছে যে, বাবা মায়ের খবরটাই বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনে। গতকাল তাদের মোটরগাড়িটার জ্বর হয়েছিল কিনা, কিংবা তিনশ' ছিয়ানব্বই নম্বর বাড়িতে কুকুরটার কটা বাচ্চা হল এসব খবরে বেশী কান দেয় না। মিঠুর উল্টো হচ্ছে মধু—জীবনের তিন বছর বয়সের ছোট মেয়ে। সে মায়ের আঁচল ধরা, জীবনকে চেনে বটে, কখনো সখনো কোলেও আসে কিন্তু থাকতে চায় না। দুই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জীবন উঠে সিগারেট ধরাল। মাথা ধরে আছে—কাল রাতের হুইস্কির গন্ধ এখনো যেন ঢেঁকুরের সঙ্গে অল্প পাওয়া যাচ্ছে। কেমন ঘুমে জড়িয়ে আছে চোখের পাতা। কিছুতেই মনে পড়ে না কাল রাতে 'বার' থেকে কি করে সে ঘরের বিছানা পর্যন্ত পেণছুতে পেরেছিল। কোনোদিনই মনে পড়ে না। কাল বিকেলে কারখানা থেকে তার ড্রাইভার তাকে 'বার' পর্যন্ত পেণছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল। বার-এ দেখা হয়েছিল দুজন চেনা মানুষের সঙ্গে। আচার্য আর মাধবন্। তারপর!

মিঠু ছোট পায়ে দৌড়ে এসে মশারি তুলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের কোলে। হাঁফাচ্ছে। এত বড় বড় চোখ গোল করে বলল, 'আমাদের বেড়ালটা না বাবা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে ছিল! মরে কাঠ হয়ে আছে!' একটু অবাক হয়ে জীবন বলল, 'সে কি!' তার হাত ধরে টানতে টানতে মিঠু বলল, 'চলো দেখবে। নইলে এক্ষুণি আতরদি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে'। কৌতূহল ছিল না, তবু মিঠুকে এড়াতে পারে না জীবন, তাই হাই তুলে বিছানা ছাড়ল।

ঘরের চারদিকেই লক্ষ্মীর শ্রী। মেঝেতে পাতা চকচকে লিনোলিয়ম। ওপাশে অপর্ণা আর মিঠু মধুর আলাদা বিছানা। নীচু সুন্দর খাটের ওপর শ্যাওলা রঙের সাদা ফুলতোলা চমৎকার বেডকভার টান টান করে পাতা। মশারি খুলে নেওয়া হয়েছে। ডানদিকে প্রকাণ্ড বুককেস যার সামনেটা কাচের, বুককেসের ওপর বড় একটা হাই-ফাই রেডিও, তার ঢাকনার অর্গান্ডিতে অপর্ণার নিজের হাতের এমব্রয়ডারী, পাশে মানিপ্লান্ট রাখা, গোলা রঙের চীনেমাটির ফুলদানি, সাদা ক্যাবিনেটের ভিতরে রেকর্ডচেঞ্জার মেশিন—কোথাও একটুকু ধুলোময়লা নেই। পুবের জানলা খোলা, নীল পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে শরৎ-কালের হাল্কা রোদ আর অল্প স্নিগ্ধ হাওয়া আসছে। অপর্ণা খুব বড় ভালবাসে, তা ছাড়া ওর রুচি আছে। এর জন্য জীবন কখনো মনে মনে কখনো প্রকাশ্যে অপর্ণাকে বাহবা দেয়। কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে সুন্দর দেখায় জীবন তা ভেবেও পায় না। যদিও এ সবই জীবনের রোজগারে অর্জিত জিনিস, তবু তার মাঝে মাঝে মনে হয় এই ধরনের, এই ফ্ল্যাট বাড়ীটার আসল মালিক অপর্ণাই। সারাদিন ঘর দুয়ার অপর্ণা বড় ভালবাসায়, যত্নে, বড় মায়ায় এই সবকিছু সাজিয়ে রাখে। জীবনের সন্দেহ হয়, সে যখন থাকে না, তখন—পোষা গৃহ-পালিতের গায়ে লোকে যেমন হাত রেখে আদর করে তেমনি অপর্ণা রেডিও, বুক-কেস, সোফায় বা টেবিলে তার স্নেহশীল সতর্ক হাত রেখে আদর জানায়। তাই জীবন যখনই ঘরে ঢোকে তখনই মনে হয় এ সব জিনিস অপর্ণারই পোষমানা, এ সব তার নয়। তাই যখন সে ঘরে চলাফেরা করে, বসে, বা শুতে যায়, যখন ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খোলে তখন সে তার নিজের ভিতরে এক ধরনের কুণ্ঠা ও সতর্কতা লক্ষ করে মনে মনে হাসে। বাস্তবিক অপর্ণা হয়ত তার এ স্বভাব লক্ষ করে না, কিন্তু জীবন জানে লোকে যেমন তাদের ঘরে ফিরে সহজ, খোলামেলা, আরামদায়ক অবস্থা ভোগ করে সে ঠিক তেমন করে না।

'পাগলীর বাবা' বলতে বলতে মিঠু তাকে টেনে আনল মাঝখানের ঘরে। আসলে ঘর নয়, প্যাসেজ। তিনদিকে তিনটে দরজা—একটা রান্নাঘর, অন্যটা বসবার, তৃতীয়টা তাদের শোওয়ার ঘরের। তিন কোণা প্যাসেজের একধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ক্রীম রঙের সুন্দর ফ্রিজ-টা। রাতে যখন প্রায়ই ভীষণ ঘোর অবস্থায় খানিকটা এলো-মেলো পায়ে অন্ধকার প্যাসেজ-টা পার হয় জীবন তখন সে মাঝে মাঝে ফ্রিজটার কাছে একবার দাঁড়ায়, কোনো দিন ঠাণ্ডা সাদা ফ্রিজটার গায়ে হাত রাখে। মনে হয় ঘুমন্ত সেই ফ্রিজটা তার হাত টের পেয়ে আস্তে জেগে ওঠে, সাড়া দেয়। জীবনের মনে হয় ফ্রিজটা এতক্ষণ যেন এই আদরটুকুর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এখন দিনের বেলা সব কিছু অন্যরকম। ফ্রিজটার দুটো দরজা দু হাট করে খোলা, সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে গম্ভীর-মুখ অপর্ণা, তার পিঠে ঝুঁকে মধু, আতর নীচু হয়ে তলার থাকে অন্ধকারে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। জীবন লক্ষ করে সে এসে দাঁড়াতেই অপর্ণার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জীবন অল্প হেসে জিজ্ঞেস করে 'কি হল!' অপর্ণা ফ্রিজটার দিকে চেয়ে থেকেই জবাব দিল 'দেখো না, বেড়ালটা ভেতরে ঢুকে মরে আছে!' জীবন অপর্ণার মুখের খুব সুন্দর কিন্তু একটু নিষ্ঠুর পাথুরে প্রোফাইলের দিকে চেয়ে সহজ গলায় বলে 'কি করে গেল ভেতরে?' অপর্ণা সামান্য হাসে, 'কি জানি! হয়ত আমিই কখনো যখন ফ্রিজ খুলেছিলুম তখন ঢুকে গেছে। খেয়াল করিনি।' জীবন সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে 'ওরকম ভুল হয়। ওটাকে বের করে ফ্রিজটা ভাল করে ধুয়ে দিও। মরা বেড়াল ভাল নয়।' 'আচ্ছা।' জীবন চলে যাচ্ছিল বাথরুমের দিকে, হঠাৎ মনে-পড়ার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে 'আর আজ বাজারে যাবে বলেছিলে! ছুটির দিন। যাবে না?' এক ঝলক মুখ ফিরিয়ে জীবনের চোখে চোখ রাখল অপর্ণা, হাসল 'যাবো না কেন! একটা বেড়াল মরেছে বলে! তুমি তৈরি হওনা।' কথাটা ঠিক বুঝলনা জীবন, শুধু অপর্ণার ঐ এক ঝলক তাকানোর দিকে চেয়ে ওর সুন্দর ছোটো কপালে সিঁদুরের টিপের চারপাশে কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ ফুলে থাকা অভিমানী সুন্দর ঠোঁট, নিখুঁত আর্ট-এর মতো ভ্রূ আর থুতনির চিক্কণতা দেখে হঠাৎ নিজেকে তার বড় ভাগ্যবান মনে হল। বড় সুন্দর বউ তার। বড় সুন্দর অপর্ণা। ছেলেবেলা থেকে অনেকে এরকম বউ পাওয়ার আশায় বড় হয়ে ওঠে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনের ছেলেবেলা ছিল বড় দুরন্ত, বড় ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির বড় দামাল দিন ছিল তখন। আজ একটা বেড়াল তার ফ্রিজ-এর ভিতরে মরে পড়ে আছে, আর তখন সেই ছেলেবেলায় যখন সে ছিল চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, তখন উনুনের পাশে ছোট্ট নোংরা যে চৌখুপী জায়গায় সে চট আর শতরঞ্জির বিছানায় শুতো তখন আর-একটা বেড়াল তার মাথার কাছে শুয়ে থাকতো সারা রাত। মিনি নামে সেই বেড়াল উনিশশো পঞ্চাশে চক্রবর্তীদের তিনতলা থেকে দিয়েছিল লাফ। জীবন আজও জানেনা বেড়ালটা আত্মহত্যা করেছিল কিনা। সেই সব ছেলেবেলার দিনে জীবন কখনো অপর্ণা বা অপর্ণার মতো সুন্দর অভিজাত বউ-এর কথা ভাবেই নি।

বাথরুমের বড় আয়নায় কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল জীবন। দুর্ধর্ষ কাঁধের ওপর শক্ত ঘাড়, বুকে দু ধারে চৌকো পেশী, দাঁতে ব্রাশ ঘষতে হাতের শক্ত রগ, শিরা আর মাংসপেশীতে ঢেউ ওঠে। ছোটো করে ছাঁটা চুল, চওড়া, মেধাবী এবং দুঃখী এক ধরনের অদ্ভুত চোখ তার। তার গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, মেমেটা মিঠুর। মধু তার মায়ের মতোই ফর্সা। জীবনের নাক চাপা, ঠোঁট একটু পুরু কিন্তু সুন্দর। তার সঙ্গে মিঠুরই মিল বেশী, মধুর সঙ্গে অপর্ণার। জীবনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ আছে বোঝা যায় আভাস্য না আরামে সে মধুর অল্প সময়েই বায় করেছে। [illegible] দিকে চেয়ে হাসে জীবন। [illegible] ফুটপাথের রাস্তায় [illegible] আলাদা পাড়ার পরিশ্রম [illegible] ভাবলে তার মাঝে মাঝে [illegible]

[illegible]

যাবে!

জীবন ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অপর্ণা মধুকে সাজাচ্ছে। জীবন বলল 'ও যাবে নাকি?'

অপর্ণা মধুর মাথায় রিবন জড়াতে জড়াতে বলল 'যাবে না! থাকবে কার কাছে! মা বড্ড কাঁদে।'

জীবন নিজে তাকে মুখ ফিরিয়ে দেখল মিঠু মেঝের [illegible] ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে হাঁ করে মা আর মধুর দিকে চেয়ে আছে। জীবন বলল 'দোকানে দোকানে ঘুরতে হবে, ওকে নিয়ে অসুবিধে। কখন জলতেষ্টা পায়, কখন হিসি পায় তার ঠিক কি।'

শুনে মিঠু মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে। অপর্ণা তার ধীর হাতে মধুর মাথার রিবন সরিয়ে নেয়। তেমনি গম্ভীর মুখে একবার মিঠুর দিকে চেয়ে বলে 'ঠিক আছে।'

জীবন সঙ্গে সঙ্গে সহজ হওয়ার ভাব করে বলে 'অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়—'

'না, থাক। আয়ার ত রইলই, ও দেখতে পারবে।'

'কাঁদবে বোধ হয়।'

'তা কাঁদবে।'

'কাঁদুক।' জীবন হাসে 'কান্না খারাপ নয়। তাতে অভ্যেস ভাল হয়। জেদ-টেদ কমে স্বাভাবিকতা আসে।'

অপর্ণা উত্তর দিল না।

জীবনের [illegible] রঙের [illegible] সুন্দর গাড়িটা দরজার সামনে দাঁড় করানো। ড্রাইভার গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের এক পা পিছনে অপর্ণা—ছাইরঙা সিল্কের শাড়ি, ছাইরঙা ব্লাউজ, হাতে ছাইরঙা বটুয়া, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে শান্তিনিকেতনী চটি—বড় সুন্দর দেখায় অপর্ণাকে। পাশাপাশি যেতে কেমন অস্বস্তি হয় জীবনের। [illegible] [illegible] শার্ট আর [illegible] প্যান্ট—[illegible] দেখাচ্ছে [illegible] [illegible] মধু অপর্ণার পাশে কি কারণে যেন কিছুতেই তাকে মানায় না। ড্রাইভারকে [illegible] সঙ্গে যেতে বলে জীবন একবার পিছু ফিরে চাইল। ব্যালকনিতে আয়ার [illegible] মধু—সে ভীষণ কাঁদছে, চোখের জলে মুখ ভাসছে তার। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে মিঠু—বিষণ্ণ মুখ—জীবনের চোখে চোখ পড়তেই হাসল, হাত তুলে বলল 'টা-টা বাবা! দুর্গা দুর্গা বাবা!' অপর্ণা খুব তাড়াতাড়ি ব্যালকনির দিকে চেয়েই চোখ সরিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল। জীবন হাসিমুখে হাত তুলে ব্যালকনিতে মিঠু আর মধুর উদ্দেশ্যে বলল 'শীগগিরই আসছি ছোটো মা! টা-টা, দুর্গা দুর্গা বড়ো মা।'

'টা-টা, দুর্গা দুর্গা বাবা। টাটা দুর্গা দুর্গা।'

'টা-টা। দুর্গা দুর্গা।'

জীবন গাড়ি এনে দাঁড় করাল মোড়ের পেট্রল পাম্পে। অপর্ণা নামল না। জীবন নেমে ধরাল একটা সিগারেট। আকাশে শরৎকালের হেঁড়া মেঘ, রোদ উড়ছে। পেট্রলপাম্পের একদিকে বিরাট একটা সাইন বোর্ড 'হ্যাপি মোটোরিং!' সেই দিকে চেয়ে রইল জীবন, হঠাৎ অলগা একটা খুশিতে তার মন গুন গুন করে উঠল 'হ্যাপি মোটোরিং! হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপি মোটোরিং!' যে বাচ্চা ছেলেটা মোটরে পেট্রল ভরল, হাত বাড়িয়ে তাকে একটা টফি দিল অপর্ণা। খুশী হল জীবন। অপর্ণার মুখ এখন পরিষ্কার ও সহজ। হায়! কতকাল অপর্ণার সঙ্গে জীবনের ঝগড়া বা খুনসুটি হয় না। জীবন যা বলে অপর্ণা একটু গম্ভীর মুখে তাই মেনে নেয়। সত্যিই মেনে নেয় কিনা জীবন তা জানেনা। অন্তত বিয়ের আগে অপর্ণা যে বাড়ির মেয়ে ছিল সে বাড়ির লোকেরা সহজে অন্য কারো কথা

মেয়ে নিতনা, বলও মানতো না। অপর্ণাই মানছে কি! ঠিক জানেনা জীবন। আসলে সারাদিনে তাকে অপর্ণার বা অপর্ণাকে তার কতটুকু দরকার পড়ে! ভাল করে দেখাও হয় না। শুধু রাতে যখন সে ঘোরলাগা অবস্থায় ঘরের দরজায় পৌঁছোয়, আর দরজা খুলে দিয়ে অপর্ণা সরে যায় তখন প্যাসেজের আলো-আঁধারিতে সে একঝলক অপর্ণার সুন্দর কিন্তু নিষ্ঠুর মুখে একটু বিরাগ লক্ষ করে মাত্র। সেটুকুও ভুল হওয়া সম্ভব। তবু অপর্ণাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা মনেও হয় না জীবনের।

সামনেই ট্র্যাফিকের হলুদ বাতি লাল হয়ে যাচ্ছিল। আগে একটা সাদা বড় প্লিমাউথ শ্লথ হয়ে থেমে যাচ্ছিল, জীবন স্টিয়ারিং ডাইনে ঘুরিয়ে তাকে পাশ কাটাল, গতি কমাল না, জ্বলজ্বলে লাল আলোর নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল তার ছোটো গাড়ি, আড়াআড়ি ক্রসিং-এর গাড়িগুলো সদ্য চলতে শুরু করেছে, জীবন অনায়াসে ধাক্কা বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেল। অপর্ণা চমকে উঠে বলল 'এই! কি হচ্ছে!' জীবন বাঁ হাতটা তুলে অপর্ণাকে

ত থাকতে ইঙ্গিত করল শুধু। অপর্ণা ঘুরিয়ে পিছনের রাস্তা দেখে নিয়ে বলে ঙ্গস তোমার নাম্বার কল করছে, হাত থামতে বলছে।' জীবন গম্ভীর মুখে 'যেতে দাও।' অপর্ণা চুপ করে যায়। া সুন্দর গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে গাড়ি ছ পার্ক সার্কাসের দিকে। সকাল। ফক খুব বেশী নয়। তবু সামনেই বাস প একটা দশ নম্বর বাস আড় হয়ে ছে, ফলে পাশ কাটানোর রাস্তা প্রায় । জীবন নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা গালা- দেয়, গাড়ির গতি একটুও কমায় না, ছোট্টো গাড়ি বাসটাকে প্রায় বুরুশ করে য়ে গেল। অপর্ণা কিছু বলে না, শুধু বড় বড় চোখ কৌতূহলে জীবনের র ওপর বার বার ঘুরে যায়। জীবনের বড় গম্ভীর, কপালে অল্প ঘাম। যেতে ও জীবন ভীষণ বেগে হঠাৎ স্টিয়ারিং রে আবার সোজা করে নিল, গাড়ি এত র টাল খেল যে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকে অপর্ণার। 'উঃ!' গাড়ির সামনের রাস্তায় র সাজগোজ করা একটি যুবতী মেয়ে ং করে লাফ দিয়ে ট্রামলাইনের দিকে পড়ল। ঐ বয়সের মেয়েকে এরকম দিতে আর দেখেনি জীবন, সে ঘাড় রে আর একবার মেয়েটিকে দেখবার করে, অপর্ণা হঠাৎ তীব্র গলায় বলে আজ কি হয়েছে বলো তো! এটা কি র নাকি!' জীবন তার গম্ভীর অকপট র, 'অপর্ণা, আমরা একটু মুশকিলে ছি।' অপর্ণা বড়ো চোখে তাকায় কিসে!' জীবন রাস্তার দিকে তার পা রেখে বলে 'গাড়ির ব্রেকটা বোধ হয় গেছে। ধরছে না।' অপর্ণা নিঃশব্দে রে ওঠে, চুপ করে জীবনের দিকে একটু থেকে বলে 'স্টার্ট বন্ধ করে দাও।' একটা টেম্পোকে পাশ কাটিয়ে নিল, রে একটা ক্রসিং, আড়াআড়িভাবে একটা পাশের রাস্তা থেকে প্রকাণ্ড বুইকের মুখ বার করেছে—এক্ষুণি রাস্তা যাবে। জীবন এই বিপদের মধ্যেও আয়নার একপলকের জন্য নিজের র উদ্বিগ্ন ও রেখাময় মুখ দেখতে । অপর্ণা চোখ বুজে হাতে হাত মুঠো ধরে আছে। জীবন হাত বার করে র ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে নাড়ল, তারপর নাড়াতে নাড়াতেই এক হাতে স্টিয়ারিং ন গাড়িটাকে এক ঝটকায় মোড় পার দিল। অল্প ফাঁকায় জীবন। 'স্টার্ট বন্ধ হ না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আগেও সব ঠিক ঠাক ছিল। অথচ...'। র্ণা বক্তব্যহীন ফ্যালফ্যালে চোখে তাকায় হবে তাহলে!' ড্যাশবোর্ডে ঝুলছে লের চকচকে চাবির রিং, দোল খাচ্ছে। বন আর একবার স্টার্ট বন্ধ করার চেষ্টা ল। অপর্ণা শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলে 'ঠেলা ড়, ওঃ, একটা ঠেলাগাড়ি...' জীবন তার হাতের ওপর অপর্ণার নরম হাত টের পায়, বলে 'ভয় পেওনা, চেঁচিও না, মাথা ঠিক রাখো, সামনে যতদূর দেখা যায় দেখে দেখে আমাকে বলো। ফাঁকা রাস্তা পাচ্ছি এখনো। বোধ হয় বেরিয়ে যাবো।' অপর্ণা হাতের দলাপাকানো রুমালে চোখ মোছে, 'গাড়ির এত গণ্ডগোল, আগে টের পাওনি কেন?' খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, তবু জীবনের কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখে মুখে, জিভে সে ঘামের নোনতা স্বাদ পায়, বলে 'দিন পনেরো আগেই তো গ্যারাজ থেকে আনলুম, গীয়ারটা একটু...' অপর্ণা হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে 'বাঁ দিকে, বাঁ দিকে মোড় নাও, সামনে জ্যাম!' তিনটে রিকশা একে অন্যকে কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল, পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ির বনেটে লাগল একটা রিকশার হাতলে, ছোট্ট একটা ধাক্কায় রিকশাটাকে সরিয়ে বাঁয়ে মোড় ফিরল জীবন, রিকশাওয়ালা হাতল শূন্যে তুলে প্রাণপণে রিকশাটাকে দাঁড় করবার চেষ্টা করছে—এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাজরা রোড ঢুকে উল্টোদিক থেকে আসা একটা ষোলো নম্বর বাস-এর দেখা পায় জীবন। বাসটা একটা ধীরগতি কালো অস্টিন অফ ইংল্যাণ্ডকে ছাড়িয়ে যাবে বলে রাস্তা জুড়ে আসছে। দাঁতে ঠোঁট চাপে জীবন, টের পায় ঠোঁটের চামড়া কেটে দাঁত বসে যাচ্ছে, মুহুর্মুহু ঘোষে স্টিয়ারিং ঘোরায় সে, তবু বুঝতে পারে অত অল্প জায়গা দিয়ে গাড়ি যাবে না। চোখ বুজে ফেলার ভয়ংকর একটা ইচ্ছে দমন করে সে দেখে ষোলো নম্বর বাসটা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, বাস-এর ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে তার কান মলে দিয়ে বলতে পারে 'শিখতে অনেক বাকী হে!' কিন্তু জীবন খুব অবাক হয়ে দেখল তার ছোট্টো গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে জড়োসড়ো এবং আরো ছোট্টো হয়ে রাস্তার সেই খুব অল্প ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। জেতাখেলার মতো হাতে জীবন, 'অপর্ণা...'। তাকিয়ে দেখে অপর্ণা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, জীবনের ডাক শুনে শুধু বলল আমার মেয়ে দুটো! মেয়ে দুটোর কি হবে? মুহূর্তের জন্য স্টিয়ারিঙের ওপর হাত ঢিলে হয়ে যায় জীবনের। গাড়ি টাল খায়। দুর্বল সময়টুকু আবার সামলে নেয় জীবন, বলে 'কেঁদোনা, কাঁদলে আমার মাথা ঠিক থাকবে না। একটু ভুল হয়েছে তোমার, এই রাস্তায় মোড় নিতে বললে, কিন্তু রাস্তায় বড় ভিড়।' গাড়ি খুব জোরে চলছে না, জীবন চারদিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। অপর্ণা চোখের জল মুছে শক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে 'যেমন করে হোক বাসার দিকে গাড়ি ঘোরাও।' জীবন স্থির গলায় বলে 'তাতে লাভ কি! বাসার সামনে গেলেই কি গাড়ি থামবে!' অপর্ণা জোরে মাথা নাড়ে, 'না থামুক। মধু আর মিঠু হয়ত এখনো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।' জীবনের ঘাড় টন টন করছিল ব্যথায়, সহজ ভঙ্গীতে না বসে সে অনেকক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে আছে। বাঁ দিকে পর পর কয়েকটা সরু নোংরা গলি, মোড় ফেরা গেল না। সামনেই চৌরাস্তা, দূরে থেকেই দেখল জীবন ট্রাফিক পুলিস অবহেলার ভঙ্গীতে হাত তুলে তার সোজা রাস্তা আটকে দিল। অপর্ণা হঠাৎ জোরালো গলায় বলল 'ডান দিকে মোড় নাও, ওদিকে ফাঁকা রাস্তা, তারপর রেইনী পার্ক...' কিন্তু জীবন মোড় নিতে পারল না, গাড়িটা অল্পের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, তারপর সহজ নিশ্চিতভাবে ট্রাফিক পুলিসটাকে লক্ষ্য করেই ছুটছিল। লোহার হাতে স্টিয়ারিং সোজা রাখে জীবন, পুলিসটার হাতের তলা দিয়ে তার গাড়ি ছোটে। বাঁকের মুখে নীল রঙের একটা ফিয়াট তার গাড়ির বাফারের ধাক্কায় নড়ে উঠে থেমে কাঁপতে থাকে। ফিরেও তাকায় না জীবন, দুটো লরীকে পর পর কাটিয়ে নেয়। পিছনের পুলিসটা চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে। সামনেই হাজরার মোড়, লাল বাতি জ্বলছে, অনেক গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে। কিছুই ভাবতে হয় না জীবনকে, সে থেমে থাকা গাড়িগুলোকে বাঁয়ে রেখে অবহেলায় এগিয়ে যায়, আবার একটা ডবল-

ডেকার; পিছনে লম্বা ট্রাম আড়াআড়ি রাস্তা জুড়ে যাচ্ছে, জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে 'আজ কেবলই লাল বাতি, রোজ এমন হয় না তো!' অপর্ণা বাঁ হাত বাইরে বের করে মোড় নেবার ইঙ্গিত দেখায়, ডবল-ডেকারটার মুখ কোনোক্রমে এড়িয়ে জীবন গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল। রাস্তা ফাঁকা নয়, কিন্তু অনেকটা সহজ। বাঁয়ে মনোহরপুকুরের মুখ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গাড়ি ঘোরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে জীবন সোজাই চলতে থাকে। কালীঘাটের স্টপে গোটা চার-পাঁচ স্টেট বাস একসঙ্গে থেমে আছে। দূর থেকেই জীবন দেখে প্রথম বাসটা ধীর স্থির ভাবে স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে, সে পৌঁছুবার আগে আর বাসগুলো যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। ওখানে বাস স্টপের পাশেই একটা পাবলিক ইউরিনাল। [illegible] জীবন তাই ট্রামের ট্র্যাকে ঢুকে [illegible] গাড়ি। অপর্ণা কি বলতে [illegible] কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে [illegible] গাড়িটাকে এবার অনেকের [illegible] জীবন কালীঘাট পেরিয়ে [illegible] মাটির জমির ওপর [illegible]

[illegible]

'অপর্ণা!' [illegible] চোখ মেলে [illegible] কেমন বোধ ও [illegible]হীন [illegible]

খানিকক্ষণ জীবনের মুখের দিকে তাকায়, হঠাৎ তীব্র আক্রোশে বলে 'তুমি ছোটোলোক। তুমি বরাবর ছোটোলোক, ভিখিরি ছিলে। তুমি কখনো আমার উপযুক্ত ছিলে না।' ঠিক। সে কথা ঠিক। জীবন জানে। ফাঁকা সুন্দর রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলে 'আমার ঘুম পাচ্ছে অপর্ণা। আমি রাস্তা ভাল দেখছি না।' অপর্ণা তেমনি আক্রোশের গলায় বলে 'ভেবোনা, তুমি মরলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি দরজা খুলে এক্ষুণি লাফিয়ে পড়ব।' বলতে বলতেই দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয়, অপর্ণা, আধখোলা দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ে, দ্রুত হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কনুইয়ের ওপর বাহুর নরম অংশ চেপে ধরে তাকে টেনে আনে জীবন। বলে 'কপালটা কি করে কাটল! দরজায় ঠুকে গিয়েছিল, না! রুমালে ওটা মুছে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।' বলতে বলতে লেকের দিকে গাড়ির মুখ ফেরায় জীবন, বলে 'গাড়ির স্পীড পঁচিশের মতো। এখন লাফিয়ে পড়লেও তুমি বাঁচবে না। যা নরম শরীর তোমার! কোনোকালে ত শক্ত কোনো কাজ করো নি!' বলতে বলতে হাসে জীবন। অপর্ণা রুমালে মুখ চেপে ফোঁপায়, 'কেমন অসম্ভব... অদ্ভুত লাগছে...এমন সুন্দর সকালটা ছিল...মিঠু মধু আর এখন! দুজনেই হয়ত মরে যাবো।' জীবন প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে গাড়ির সীট-এর ওপরে রাখে, বলে 'একটা সিগারেট আমার মুখে লাগিয়ে দাও তো। আর ধরিয়ে দাও।' অপর্ণা কাঁপা হাতে জীবনের ঠোঁটে সিগারেট লাগায়। লেকের হাওয়া দিচ্ছে, অপর্ণা অনভ্যাসের হাতে দেশলাই ধরাতে গিয়ে পর পর কাঠি নষ্ট করে। জীবন মাথা নাড়ে 'হবে না, ওভাবে হবে না।' বলতে বলতে ঠোঁটের সিগারেট নিয়ে অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় 'তুমি নিজে ধরিয়ে দাও। গাড়ির মধ্যে নীচু হয়ে বসে ধরাও।' অপর্ণা প্রায় আর্তনাদ করে বলে 'তার মানে? আমাকে মুখে দিতে হবে?' জীবন একবার তার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয় 'তাড়াতাড়ি করো। আমার ঘুম পাচ্ছে।' অপর্ণা একটু দ্বিধা করে, তারপর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে মুখে লাগিয়ে সিগারেটটা ধরানোর চেষ্টা করে। ধরায়, তারপর সিগারেট জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলে 'ছোটোলোক, তুমি ছোটোলোক ছিলে। কোনো দিন তুমি সুন্দর কোনো কিছু ভালবাসো নি। ভেবোনা আমি টের পাই নি। কাল রাতে যখন তুমি প্যাসেজ দিয়ে আসছিলে তখন আমি ফ্রিজ-এর দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ পেয়েছিলুম।' স্টিয়ারিং হুইলের ওপর জীবনের হাতের পেশী ফুলে ওঠে 'তার মানে?' অপর্ণা হিসহিসে গলায় বলে 'ওই বেড়ালটা, ওই সুন্দর কাবলী বেড়ালটা...তুমি কোনোদিন ওটাকে সহ্য করতে পারোনি।' লেক-এর চারধারে ফাঁকা রাস্তায় জীবন গাড়ি ঘুর-পাক খাওয়াতে থাকে। হাওয়া দিচ্ছে, প্রবল হাওয়ায় তার কপালের ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে, আর তার আবছা মনে পড়ে...হ্যাঁ মনে পড়ে...সে ফ্রিজ-এর দরজা খুলেছিল কাল রাতে। অপর্ণা ঠিক বলছে। অপর্ণাই ঠিক বলছে। তার গাড়ি টাল খায়, ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে একটা ছেলে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আকাশের দিকে চোখ। জীবন তার দিকে সোজা এগিয়ে যেতে থাকে, অপর্ণা চীৎকার করে ওঠে 'এই-ই-ই...' ছেলেটা চমকে উঠে তাকায়, তারপর দৌড়ে রাস্তা পার হয়। ঘুড়ির সুতো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লেগে দু' ভাগ হয়ে যায়। ভো-কাট্টা! জীবন হাসে। অপর্ণা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে 'আমাদের পিছনে একটা পুলিসের গাড়ি...', জীবন আয়নায় তাকিয়ে একটা কালো গাড়ি দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সে, অল্পক্ষণ পরেই তার গাড়ি লেক পার হয়ে ঢাকুরিয়া ওভারব্রীজ-এর ওপর উঠে আসে। ব্রীজ-এর নীচে একটা পুলিস দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে তার গাড়িতে থামবার ইঙ্গিত করে। গ্রাহ্য না করে জীবন বেরিয়ে যেতে থাকে। অপর্ণা পিছু ফিরে দেখে বলে 'তোমার নম্বর টুকে নিল।' বলতে বলতেই আবার কেঁদে ফেলে অপর্ণা, 'তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তোমার অনেক বছর জেল হওয়া উচিত।' জীবন কথা বলেনা। সামনেই যাদবপুরের ঘিঞ্জি বাস্-টার্মিনাস, বাজার দোকানপাট। একটা লরী দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের চাকার কাছে একটা লোক বসে ঠুকঠাক করে কি যেন ঠিক করছে, একটা সাইকেল রিকশা মুখ ফেরাল। জীবন সোজা রাখে তার গাড়ি, রিকশার সামনের চাকা আর লরীর পিছনের চাকায় সেই লোকটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে স্পষ্ট টের পায় কিছু একটায় তার গাড়ির ধাক্কা লাগল, একটা চীৎকার শোনা যায়। সে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখ তো লোকটা মরে গেছে কিনা!' কিন্তু অপর্ণা কি বলল শুনতে পেল না জীবন। তার কান মাথা চোখ জুড়ে দপ্ দপ্ করে চমকে উঠল একটা রগ। সে জিজ্ঞেস করল 'কি বলছো?' অপর্ণা অস্ফুট উত্তর দিল। শোনা গেল না। সামনে লোক, অজস্র লোক, সরু রাস্তা, রিকশা লাইন, নীচু দোকান ঘর—এইসব হিজিবিজি ছবির মতো তার চোখে দুলে দুলে উঠছিল।... একটা বেড়াল...কাল রাতে একটা বেড়াল ফ্রিজ-এর মধ্যে সমস্ত রাত...না মনে পড়ে না, মনে পড়ে না,...জীবন দেখল ব্যালকনিতে মধু আর মিঠু দাঁড়িয়ে, মিঠু তার বাবার মতো, মধু তার মায়ের মতো—তারা হাত নাড়ছে, টা-টা, দুগ্গা দুগ্গা বাবা। অপর্ণা কিছু বলছে? 'কি বলছো তুমি?' সে জিজ্ঞেস করে, অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিয়ারিং সোজা রাখবার চেষ্টা করে। জীবন ঝাঁকুনি খেয়ে আবার ধোঁয়াটে ভাবটুকু কাটিয়ে নেয়। অপর্ণা কাঁদে 'কি হচ্ছে...এবার তুমি মাথা খারাপ করছ। চারজনকে ধাক্কা দিলে পর পর। ওরা ঢিল ছুঁড়ছে, গালাগাল দিচ্ছে।' বাস্তবিক ঢিল এসে পড়ছিল, পিছনে লোক দৌড়ে আসছে, সামনের দিকে একটা লোক বাঁশ তুলে চীৎকার করছে 'মাইরা ফালামু...।' জীবন ক্লান্ত গলায় বলল 'এত লোক কেন বলতো! কেন এত অসংখ্য লোক! ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।' জীবন বাঁশ হাতে লোকটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না, গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটা বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে সরে গেল। বাঁশের নোংরা ধারালো মুখটা তার গাল আর থুতনি কেটে, গলায় ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। জীবন সীটের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে বসে। মাথা ঠিক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার চোখের সামনে হিজিবিজি, হিজিবিজি দোকানপাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, সিনেমার বিজ্ঞাপন, আর অজস্র মানুষের মুখ একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতার ভিতরে সরে যেতে থাকে। তার মাথা টলতে থাকে, ঘুড়ির মতো লাট খায়, সে সব ভুলে একবার সিগারেটের জন্য স্টিয়ারিং ছেড়ে হাত বাড়ায়, আবার স্টিয়ারিং চেপে ধরে। অপর্ণা কেবলই কি যেন বলছে, সে বুঝতে পারছে না। এখনো তার ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল। সে কল কল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে বাঘা যতীন, বৈষ্ণবঘাটা পেরিয়ে যায় জীবন। গড়িয়ার পর হু-হু করা রাস্তা। কিন্তু জীবনের কাছে ক্রমে

সবকিছুই আবছা হয়ে আসছিল। হঠাৎ জীবন যেন শেষ চেষ্টায় ব্রেকে পা দেয়, তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে দু হাত শূন্যে তুলে বলে 'অপর্ণা, আমি আর পারছি না, পারছি না...', গাড়ি বেঁকে গেল, রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে এল মাঠের ওপর। উঁচুনীচু খোয়াইয়ের মতো জমির ওপর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে কাত হয়ে থেমে পড়ল।

আস্তে আস্তে চোখ খোলে জীবন। অপর্ণা গাড়ির ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেছে। ছোট্ট ছাইরঙা একটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে তাকে। জীবন আপন মনে হাসে, দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখনো সকালের মতো নরম রোদ, ধান কেটে নিয়ে যাওয়া ক্ষেত। জীবন হাত পা ছড়িয়ে একটু দাঁড়ায়, তারপর এসে দরজা খুলে অপর্ণাকে বের করে, মাঠের ওপর শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় তাকে 'অপর্ণা, এই অপর্ণা...', গালে থুঁতনিতে তীব্র জ্বালা টের পায় সে। গলায় ডেলা পাকানো ব্যথা। মাথা এখনো অল্প ধোঁয়াটে। অপর্ণা চোখ খোলে, অনেকক্ষণ জীবনের দিকে অর্থহীন চেয়ে থাকে। জীবন হাসে 'ওঠো। উঠে বোসো। আমরা বেঁচে আছি।'

অপর্ণার চোখ জীবনের মুখ থেকে সরে আকাশের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য উড়ে যায়। তারপর আঁচল সামলে সে উঠে বসে। তার মুখের কঠিন, একটু নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর পাথরের মতো প্রোফাইল ঘাসের সবুজ পশ্চাৎভূমিতে জেগে ওঠে। জীবনের মন গুনে গুনে করে ওঠে 'ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা...' অপর্ণা দাঁড়িয়ে বলে 'এবার, তাহলে?' জীবনের দিকে চায় 'তোমার মুখের ডানদিক কী ভীষণ ফুলে লাল হয়ে আছে, কেটে গেছে অনেকটা!' জীবন হাতে অবহেলার ভাব ফুটিয়ে বলে 'ও কিছু না।' রাস্তা থেকে জমি পর্যন্ত এমন কিছু ঢালু নয়। জীবন ভেবে দেখে যে একাই গাড়িটা ঠেলে তুলতে পারবে। কয়েকজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে গেছে, মাঠের ওপর দিয়ে দূর থেকে দৌড়ে আসছে কয়েকটা কালো কালো ছেলে-মেয়ে। জীবন অপর্ণাকে বলে 'তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি এটাকে ঠেলে তুলছি।' অপর্ণা ভুরু কোঁচকায় 'তুমি একা পারবে কেন?' 'পারব।' অপর্ণা মাথা নাড়ে 'তা হয় না।' পরমুহূর্তেই একটু অদ্ভুত নিষ্ঠুর হাসি হাসে সে 'এক সঙ্গেই মরতে যাচ্ছিলুম দুজনে। তা ছাড়া আমি তো তোমার সহধর্মিণীও, অনেক কিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা আমাদের।' বলতে বলতে সে কোমরে আঁচল জড়ায়, গাড়িতে 'হেঁইয়ো' বলে ঠেলা দেয়, রাস্তার লোকেরাও কয়েকজন নেমে আসে। 'কোথায় যাবে এটাকে নিয়ে?' জীবন চিন্তিত মুখে বলে 'কিছু দূরেই বোধ হয় একটা পেট্রল পাম্প আছে।' যারা ঠেলছিল তাদের একজন সায় দেয় 'হাঁ, আছে।'

বুড়ো মেকানিক খোলা বনেটের ভিতর থেকে মুখ তুলে জীবনের দিকে তাকায় 'কই! কিছু পাচ্ছি না তো! কোনো গোলমাল নেই ইঞ্জিনে।' জীবন চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে 'আমি জানি যে কোনো গোলমাল নেই।' মেকানিক ঝাড়নে হাত মোছে 'চালিয়ে দেখব?' জীবন মাথা নাড়ল না। বলল 'বোধ হয় [illegible] একটু...', মেকানিক বলল, 'কানেকশনে গোলমাল? আচ্ছা দেখছি।' কয়েক মিনিটেই কাজ সারা হয়ে গেল। অপর্ণা পেট্রল পাম্পের অফিস ঘরে বসে ছিল। জীবন ডাকতেই উঠে এসে গাড়ির কাছে একটু থমকে দাঁড়াল। জীবন [illegible] ছিল। একটুও দ্বিধা না করে অপর্ণা গাড়িতে উঠে বসল। জীবন গাড়ি [illegible] দেয়।

সারা রাস্তায় আর কথা হল না দুজনে।

সন্ধেবেলায় জীবন বসবার ঘরে [illegible] জানালার দিকে মুখ রেখে এলিয়ে [illegible] ছিল। মধু আর মিঠু আতরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে পার্কে। জীবন মনে মনে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অপর্ণা এসে সামনেই দাঁড়াল। জীবন একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অপর্ণা জানালার থাকের ওপর বসে বলে 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

জীবন দু' আঙুলে কপাল টিপে রেখে বলে 'বলো।'

অপর্ণার মুখ খুবই গম্ভীর 'যখন পেট্রল পাম্পে বসে ছিলুম, তখন ওখানকার লোকটার সঙ্গে কথা হল আমার। আমি গাড়ির কিছুই বুঝি না, কিন্তু লোকটাকে যখন আমাদের গাড়ির গোলমালের কথা বললুম, তখন সে খুব অবাক হয়ে বলল অত গোলমাল এক সঙ্গে একটা গাড়ির হতে পারে না। গাড়ি থামাবার অনেক উপায় নাকি ছিল।'

জীবন হাসে 'ঠিক। সে কথা ঠিক।'

'তবে গাড়ি থামাওনি কেন?'

জীবন মাথা নাড়ে 'গাড়ি থামে নি গাড়ি থামানো হয় নি বলে।'

'তবে? তুমি কি ঠিক করেছিলে আমাকে নিয়ে সহমরণে যাবে! না কি এ [illegible]?'

জীবন অস্থির চোখে অপর্ণাকে দেখে, [illegible] মাথা নীচু করে [illegible] কি জানি কেন আমি গাড়ি থামাতে পারিনি। থামানো সম্ভব ছিল না—বোধহয়।'

'কেন?'

'[illegible]' জীবন [illegible] চোখ চারপাশে [illegible] চেষ্টা করে, তারপর [illegible] বলে তখন, যা তুমি বুঝবে না।'

'[illegible] অপর্ণা, 'বোঝাও না কেন? [illegible]! আমি বুঝবার জন্য তৈরি।'

জীবন অপর্ণার চোখ এড়িয়ে যায়, কি একটা কথা যেন বলবার ছিল কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছে না সে, তবু সে ম্লান হেসে হালকা গলায় বলে 'তুমি কোনোদিন আমাকে সুন্দর দেখোনি, তাই না। কিন্তু আজ যখন ঐ ভিড়ের রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টের ঐ ভয়ের মধ্যেও আমি ঠিক পাঁচিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার মনে হয়—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। তুমি দেখোনি।'

জীবন মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে অপর্ণার মুখ রাগে ঝলমল করে উঠল 'সুন্দর! কিসের সুন্দর। তুমি জানতে না তোমার সংসার আছে? দুটো বাচ্চা শিশু মেয়ে তোমার? তোমার নিজের হাতে তৈরি কারখানা যা অনেক কষ্টে তৈরি করতে হয়েছে? কতগুলো মানুষ তোমার ওপর নির্ভর করে আছে, সে কথা তুমি কি করে ভুলে যাও?'

জীবন বুঝতে পারে সে অপর্ণার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছে, বস্তুত তার কোনো যুক্তিই নেই, তবু হাসি ঠাট্টার সুর বজায় রাখবার চেষ্টায় সে বলে 'বোধ হয় তোমার কাছে একটু বাহবাও পেতে চেয়েছিলুম। তুমি তা দাওনি। কিন্তু মনে রেখো রাস্তার ঐ ভিড়, পর পর অত বিপদের মধ্যেও আমি ঠিক পঁচিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে গেছি, একবারও থামিনি। মনে রেখো, একবারও থামিনি।'

রাস্তার একটা ন্যাংটো পাগলের দিকে লোকে যেভাবে তাকায়, সেভাবেই অপর্ণা জীবনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর এই প্রথম সে জীবনকে নাম ধরে ডাকে 'জীবন, তুমি ছিলে রাস্তার ছেলে, প্রায় ভিখিরি। তোমার সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই আমার মিল নেই। ভাগ্য তোমাকে এত দূর এনেছে। তবু আজ ঐ কাণ্ড করে তুমি সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে চেয়েছিলে। ডোবাতে চেয়েছিলে নিজেকে, আমাদেরও। এর জন্যেই কি তুমি বাহবা চাও?'

জীবনের মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। অপর্ণার কথার ভিতরে কোথায় যেন একটু সত্য ছিল, কিন্তু জীবন তা ধরতে পারে না। তার প্রাণপণ ইচ্ছে হয় অপর্ণার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে —তুমি ঠিক বলেছো অপর্ণা। ঠিক বলেছো। এই ঘর বাড়ি সংসার আমার নিজের বলে মনে হয় না। এখানকার বাতাসে আমি এক বিন্দু শ্বাস পাই না। আমার কেবলই ইচ্ছে এই সব বিরাট বাড়ির ওপর দিয়ে একবার জোরে চালিয়ে দিই, আমার গাড়ি। কিন্তু সে সব কিছুই বলে না জীবন, মুখে মৃদু হাসি টেনে আনে, যেমনি [illegible] সুরে বলে 'জীবনে সে কটি মুহূর্তই দামী যে সব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে সুন্দর দেখে। [illegible] থেকে তুমি কি কেবলই শিখেছো কি করে নিরাপদে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা যায়?'

মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করে জীবন। অপর্ণা নিষ্ঠুর [illegible] চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামান্য বিদ্রূপের মতো করে বলে 'হায়, আমাদের কাবলী বেড়ালটারও সেই দামী মুহূর্ত বোধ হয় কাল রাতে এসেছিল যখন তাকে তুমি সুন্দর দেখেছিলে। আমি, আর তোমার দুই মেয়েও তো সুন্দর জীবন, তাদের জন্য এবার একটা বড় দেখে ফ্রিজ কেনো। দোহাই, জোরে গাড়ি চালিয়ে নাটক কোরো না।'

হঠাৎ তীব্র এক অসহায়তা সঙ্গীহীন জীবনকে পেয়ে বসে। তার মাথার ভিতরে কল চলবার শব্দ, বুকের ভিতরে কেবলই একটা বলাবের বল লাফিয়ে ওঠে। তবু তার এই কথা বলবার ইচ্ছে হয়—ঠিক, তুমি ঠিকই বলছো অপর্ণা। আমার ঐ রকমই মনে হয়। এই সব ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়ে আমার আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার সেই চায়ের দোকানের উনুনের পাশে, চট আর ছেঁড়া শতরঞ্চির বিছানায়, যেখানে দুঃখী রোগা এক মায়াবী বেড়াল আমার শিয়রের কাছে শুয়ে থাকবে সারা রাত। কিংবা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই মোটর সারাই কারখানায়, যেখানে লোহার জোড় মেলাতে মেলাতে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল দেখে গান গাইবো আবার। হ্যাঁ, অপর্ণা, আমি এখনো ছোটোলোক, ভিখিরি। মুখে মৃদু হাসল জীবন, তার মুখ করুণ দেখাচ্ছিল, কোনোক্রমে সে গলার স্বরে এখনো সেই ঠাট্টার সুর বজায় রাখছিল 'কে জানে তোমার কাবলী বেড়ালটাও আত্মহত্যা করেছিল কি না!'

অপর্ণা কি বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে জীবন বলে 'চুপ, অপর্ণা!' তারপর স্খলিত গলায় বলে 'তুমি সহমরণের কথা বলছিলে না! ধরে নাও আজ আমি তোমাকে সহমরণেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। তুমি বুঝবে কি এসব অপর্ণা?'

অপর্ণা মাথা নাড়ে—না। তার চোখে জল, মুখের প্রতিটি রেখায় রাগ আর

আক্রোশ। সে জীবনের দিক থেকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে চলে যায়। জীবন বাধা দেয় না। শুধু এতক্ষণ অপর্ণা যে জায়গায় বসেছিল সেইখানে গভীর চোখে চেয়ে থাকে, যেন এখনো অপর্ণা বসে আছে।

ঘরে কেউ ছিল না, তবু হঠাৎ জীবন চমকে উঠে বলে 'কে?' তারপর শূন্য চোখে চারদিকে চায়। সিগারেট আর দেশলাইয়ের জন্য চারদিকে হাতড়ে দেখে। বড় ক্লান্তি লাগে জীবনের, এলোমেলো অনেক কথা তার ভিতর থেকে ঠেলে আসতে চায়। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করতে থাকে। সে ভীষণ অন্যমনস্কের মতো বলে 'আঃ, অপর্ণা...!' পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে 'কেউ কি আছো?' কেউ ছিল না, তবু জীবন একবার পরম বিশ্বাসে দুটো হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে শূন্যে তুলে ধরে, যেন ভিক্ষুকের মতো বলতে চায় —আমাকে নাও।

দরজার কাছ থেকে মিঠু ডাকে 'বাবা!'

অলীক আত্মসমর্পণের এক শূন্যতা থেকে জীবন আবার শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের বাস্তবতার ভিতরে দ্রুত ফিরে আসে।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

ভুল হত না। আবার শোন, এবার গলা খুলেই গেয়ে ওঠে, 'ও তার বসত কোথায়, না জেনে তায়, মরি হায় হায় রে।'......

'তা মরগা না, এখন যেতি দেবে তো। সর দিনি।'

পিছন থেকে কে যেন হাঁক দেয়। তাকিয়ে দেখি, চিনি চিনি মনে হয়। হ্যাঁ, এ আর কখনো ভুল হতে পারে। মহাশয়ের পাশে, মিলের লাল শাড়ি জড়ানো ঘোমটা টানা মহাশয়াকে দেখলেই, গাজীর মাহাতো চাচা আর চাচীকে চিনতে পারা যায়। মাহাতো খুড়োর নিকষ কালো মুখে মাংসের কিছু খুড়বুড়ি। তবে খসখসে নয়, শক্তপোক্ত। কে মিলের চাহনির রকম জানা নেই। কিন্তু কে কিনের চোখ তুলে এনে যেন খুড়োর চোখে বসানো হয়েছে, এত লাল। সেই পান্তুয়ার মোটা ঠোঁট দুটির কথাও বলতে হবে। হতে পারে, দোকানীর সেজে দেওয়া পান খেয়েছে। পাশে পাশে খুড়ীর চোখের নজর ছিল যে! সেই চোখের অনুরাগেই খুড়োর মোটা ঠোঁট দুখানি বেশ রাঙানো। সুতী কোটের ওপরে একখানি পশমী আলোয়ান কোমরে বেড় দিয়ে জড়ানো। তবে কি না, হাতে কোন স্যুটকেস্ নেই, প্লাস্টিকের শহুরে ঝোলা। মাথার চুলের কথা আর বলো না। কদিন চিরুনি দেখে নি, কেউ জানে না। গলায় আছে হাঁক, কিন্তু লাল ছোপানো দাঁতে একেবারে বগ্‌বেগে হাসি।

হাঁক দেবারই কথা। বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। একা মানুষ চলতে পারে। দুজনের পাশাপাশি যাওয়া চলে না। পথ দিতে হবে।

গাজী ফিরে বলে, 'কে, মাহাতো চাচা নাকি।'

বলতে বলতে সে বাঁধের ঢালুতে নেমে দাঁড়ায়। আমিও তার পাশে যাই। মাহাতো বলে, 'আর কে।' বলে পিছন ফিরে ডাক দেয়, 'এইস।'

খুড়ীর মুখে এখন বিড়ি নেই। ঘোমটাখানিও তেমন মুখ জুড়ে ঝাঁপ ফেলে রাখে নি। অপযশ আগে করি নি, এখনো করব না। বিড়ি খাওয়া হোক, আর যা-ই হোক, মুখখানিতে এখনো ঢল ঢল ভাবের বেশ আত্মিসুরতা রয়েছে। আটপৌরে ধরনে পরা শাড়িখানিতে আরো বোঝা যায়। মধ্যবয়

আশ্বিনের শরীরে, জলের টান যত, গহীনও তত। বরং বলি, মুখের চেয়ে যেন শরীর-খান আরো কাঁচা।

হাসলে বুঝি মাহাতো-বউয়ের মান যায় এই হাটবাজারের কাছে। তবু মামুদ গাজীর দিকে তাকিয়ে চাচীর কপালের টিপ কেঁপে যায়। চোখে হেনে যায় চোরা হাসির ঝিলিক গাজীর পাশে ভিন্ দেশীতে তেমন লজ্জা জড়ানো ভাব নয়। তবে, দেখতে হলে, আড়চোখেই দেখতে হয়। মুখের কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই।

গাজী ডেকে বলে, 'চাচা কি এখন সেই ভোলাখালি চললে নাকি গো।'

মাহাতো বলে, 'না, লারানের ঘরে একটু বইসে যাব।'

কথার ভাবে মনে হয়, খুড়োর চলা থামবে না। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলে, 'বাবুটা কে?'

গাজী আমার দিকে চেয়ে হাসে। বলে, 'পথে পেয়িছি, বাবু বেড়াতি এসেছেন।'

মাহাতোর লাল টকটকে চোখের মণি দুটোও লাল মনে হয়। বাবুর দিকে ক্ষণেক চেয়ে হাসতে গিয়ে কাশে। বলে, 'এই বাদার বাজারে বেড়াতি? কী বলে দ্যাখ।'

হাসতে হাসতেই এগিয়ে যায় আবার। খুড়ী আর একবার পিছন ফিরে দেখে নেয়। হাতে পায়ে ভদ্দরলোক, আবার এমন জায়গাতেও বেড়াতে আসে।

বাঁধের নিচেই ঘর। ঘরের পর ঘর। তবে বাঁধের এদিক হল হাটের পিছন দিক। বেচাকেনার দোকানদারি সব সামনের দিকে। তবে, জলপথে আসাযাওয়ার রাস্তা এদিকেই। কালীনগর, নগর বটে। গাড়ি-ঘোড়ার খোঁজ ক'রো না। নদী খাল-বিল নয়ানজুলি, তার ওপর দিয়ে চলা ফেরা।

ঘাটে মেলাই নৌকা। এক থেকে দশ মাল্লাই, যেমন নৌকাই খোঁজ। বস্তু বিকল কিনা কে জানে. উত্তরের সীমায় গোটা দুই লঞ্চ নোঙর করে রয়েছে। তার থেকে একটু দূরে, নৌকা এপার ওপার যাওয়া-আসা করে। বোধ হয় খেয়াঘাট। ঘাট বরাবর ওপারেরও বাঁধের ধারে গায়ে গায়ে ঘর। একটা রাস্তার ইশারা পাওয়া যায় ঘরের সারির পিছনে। কিন্তু দেখা যায় না। ইশারা পাওয়া যায় লোক যাতায়াত দেখে।

ওদিকে আবার এক সোজা রাস্তা চোখে পড়ে। ঘাট থেকে উঠে পুবের মাঠ-মাথাতে সিঁথি সোজা হয়ে চলে গিয়েছে। মনে হয়, এই তো বুঝি কাছে। কিন্তু দূর বোঝা যায় একটা গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে যখন দূরান্তরের রাস্তাটা চোখে পড়ে। সেদিকে চাও, নজর কোথাও ঠেক খায় না। এখানে ভূমি সমুদ্র। মাঠের বুক যে গ্রামখানি রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে, তার মাথার ওপরে ধোঁয়ার রেশ। সেই বুঝি সেই বনচড়ুই, বনভোজনের মাঝে মাঝে মাঠ থেকে সোঁ করে উঠছে আকাশে। যেন মাঠ ছুঁড়ছে থাকা বাঁকা তীরের মত। তারপরে হঠাৎ উড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ ভরে পাখা সন্তাসে। ঝাঁপ দেয় গিয়ে আর এক সীমায়। মাঠে মাঠে মানুষের দেখা পাওয়া নয়। ধান কাটা শুরু হয়েছে। তবে পুরো মাত্রায় নয়। প্রস্তুতা এখনো শ্রমের ফসল তুলতে দল বেঁধে মাঠে নামেনি।

ফসলের গন্ধে ভোমরা পাগল, ধানের গন্ধে মানুষ। ঘ্রাণে ঘ্রাণে গন্ধ রক্তে রক্তে ছোঁয়ায়। প্রাণে যেন নেশা ধরে যায়। ভেঙে-চুরে ব্যাখ্যা করি তেমন কথা খুঁজে পাই না। কিন্তু দিক দিকেতে দেখে মনে হয়, কী এক উৎসব যেন আসন্ন। হাটের ঘাটে, মাঝিমাল্লাদের হাটের দিনের হাঁকডাক ছুটোছুটি ব্যস্ততা নেই বটে। আস্তে আস্তে ভিড় করছে সবাই। অল্পস্বল্প ব্যস্ততা, অল্পস্বল্প মাল বোঝাই-খালাস চলেছে। ভাঁটার পলি পাঁকে, হাঁটুর ওপর অবধি ডুবিয়ে ওঠানামা চলেছে। একে দধিকর্দম বলা যাবে না, ক্ষীরকর্দম মালুম দেয়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে পায়ের নিচে জলের ধারে গেমো জঙ্গলের ভিড়। এখনো অনেক গেমো কোমর ডুবিয়ে আছে জলে, অনেকের গা থেকে জল নেমে গিয়েছে। পলি পাঁকে পাখীর দলটাও ছোট নয়। হাটের ঘাটে রোজের ভোজ, মানুষকে তাদের ভয় নেই। দেখ, কেমন নির্ভয়ে ভোজ নিয়ে ব্যস্ত। একটু ওদিকেই যে নৌকা যাতায়াত করে, মাঝিরা ওঠানামা করে, বাঁধের ওপর দিয়ে মানুষ চলাচল করে, সেদিকে যেন একটু রেয়াত নেই।

সব মিলিয়ে যত দেখি, মনে হয়, যেমন গুরু গুরু মেঘ ডাকে দূরের আকাশে, চিকুর হানে চিক চিক অলক্ষ্যের মেঘে, যেন আশমান জমিন দেবে ভাসিয়ে, তেমনি এখানকার মাঠে জলে মানুষে সব কিছুতে এক মহোৎসব যেন আসন্ন। একটা পাগলা হাসি, খুশির ডাক যেন কোথায় এখনো ঠেক খেয়ে আছে। ফাটবে ধারায় ধারায়। কেন এমন মনে হয়, আমার মন বোঝে না। যখন সে আপনাতে আপনি দেখে, তার হাল হদিস পাই না। কেবল হাসতে গিয়ে কোথায় যেন একটা জলের ধারা ছলছলায়। ভাবি, সে উৎসবে আমার অংশ থাকবে না। আর যে উৎসবে আমি নেই, কেন সেই উৎসবেই আমার সকল খোঁজার পরম যাবে ফিরে। আমি যার নাম জানি না, রূপ চিনি না। যার কেন ও কিসের কেন কারণ জানি না। অথচ তার ডাক শুনেছি সেই কোন ভোরে। যখন সংসারে পরম বন্ধন বলে জানা ছিল মাকে, যখন তার কোলের কাছে শুয়ে প্রথম চোখ খুলে-ছিলাম। সেই থেকেই ডাক শুনেছি দৌড় দিয়েছি। কে ডাকে, কে ডেকে যায়। চোখ-জোড়া রূপের ঘরে, এই কালীনগরের বাঁধের বুকে দাঁড়িয়ে থাকার মতই দাঁড়িয়েছি গিয়ে। মনে হয়েছে, কে যেন লুকোচুরির ঢুক দিয়ে যায় দূরে দূরান্তরে অন্য কোনখানে। আর প্রাণটাকে যদি বল খেলার বুড়ী, তবে তাকে আগলে রেখে কেবল ছুটেছি সেই ঢুক-এর পিছনে। যদিও তার হদিস দূর, ডাকের কথাটিও বুঝিনি।

মন গুণে কি ধন দেখ, সংসারেতে যত উৎসব, সবখানে যেন আমার 'খুঁজে ফেরা' ফেরে। একা পরি না শতেক হতে। অথচ যেন শতখানে 'সে' আমার থেকে অধরায়। এই যে সেই বলে না, 'ও ভোলার মন, ত্রিবেণীতে বান ডেকেছে, ডুব দি গে যা ফুরাতে' সেই গোছ। ডাকের খবর আসে। গিয়ে দেখ, বানের কোটাল কেটে তখন ভাটার জল নামে।

গাজীর গলায় চুপি চুপি শোনা যায় 'বাবু।'

ফিরে তাকাই। চোখ ফেরে, মন গিয়েছে কোথায়। দেখি, গাজীর দাড়ির ভাঁজে হাসি। আরশি-চোখে ধন্দের ঝিকিমিকি। বলে, 'কেমন বোঝেন বাবু।'

মতলব দিয়ে যে নিয়ে এল গাজী, এখন তো ভাল কি মন্দ বোঝ। গাজী তার চাল দিয়েছে। এবার তোমার দান দাও। আবার মনের উদয় কালীনগরে। আবার দেখি দিগন্তে। নতুন ভাবনা আসে। এই যে এক আসন্ন উৎসবের স্বপ্ন দেখ-ছিলাম, এই প্রকৃতি আর মানুষ দেখে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা নতুন ধরন লাগে। এই যে প্রকৃতি, এ শুধুই যেন সুন্দরী নয়, আরো কিছু। এ যেন তেমন করে নিজেকে সাজায় নি। আপনাকে একেবারে উদাস করে ছড়িয়ে মেলে ধরে আছে। প্রকৃতি যে অরণ্যে সাজে, যেন লাজে ঢাকে, তা নয়। এ মেয়ে নিলাজ বড়। আকাশকে ডাক দিয়ে সব হাট করে খুলে বসে আছে। জিজ্ঞেস করি, 'এখানে গাছপালা নেই? চারদিক যেন কেমন খাঁ খাঁ করে।'

গাজী বলে হেসে, 'ইনি যে এখন সোনা ফলান বাবু। গাছের জায়গাই তো ছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এখানে যে এই সিদিনেও সুঁদুরির জঙ্গল ছিল, গড়ানের বন ছিল। দখিনরায়ের বাহন মশাইরা ঘোরাফেরা করতেন। বন কেটে আবাদ হয়েছে, এর নাম বাদা।'

সুন্দরবনের কথা বলে গাজী। যে বনেতে সুন্দরীগাছ ছিল, তার নাম সুন্দরবন। অনেক গাছের অনেক নাম শুনেছি শাল পিয়াল সেগুন, কিন্তু মুখে চিত্ত বলে ওঠা এমন নাম শোনিনি। নাম খুঁজতে হয়নি। চোখ ভরে যাওয়া মন ভুলে যাওয়া মন বলেছিল, এ গাছ সুন্দরী। কিন্তু 'এই সিদিনেও' বলে কেন গাজী। ক'দিনের কথা। জিজ্ঞেস করি, 'এই সিদিনে মানে, কতদিন আগে?'

গাজী দাড়ি মুঠো করে ধরে বলে, 'তা ধরেন গিয়া শ দেড় শ বছর হবে।'

যেন এক দেড় বছর আগের কথা বলে। গাজীর বাবরিতে কালোর ঝলক, দাড়িতেও তাই। দু চার গাছি যা একটু সাদা দেখা যায়, কালোর ভিড়ে নজর পড়ে না। না, চুল দেখে বয়স বলব না। এমন কি এই বাদাতে চৈত্র-মাঠের মত মুখখানি যে এত ফাটফাট, তা দিয়েও হিসাব হয় না। এ সবই তো ঘাট বাটের রোদ জল বাতাসের দান। একে দেড়শ শ কেন, আধ শ বছরের মানুষ বলেও মানতে পারি না। তবে সে ব্যাখ্যা চাইতে যেও না। মন বুঝে দেখ, গাজী হিসাবে ভুল করেনি। আজ না হয় তার পথে পথে মুরশেদের নামের মজদুরি। তার বাপ পিতামহ ছিল। তাদের কাছে শোনা কথা শোনায় আমাকে।

এ ধরিত্রী নবীনা। এ ধরিত্রী আদি-বাসিনী, এখনো আঁচল ঢাকতে শেখেনি। বিশাল মহীরুহের সভ্যতা এখনো তাকে সাজ পরাতে আসেনি। এমন কি, এই নিচের দেশে, এই যে দেখতে দেখতে এলে নারকেল সুপারির মাথা দোলানো, এখানে তার চিহ্নও কম।

এ আর এক রূপ। রূপেতে যার নেশা, সে এই রূপেতেও মজে। নিরখিয়া তো এলে জনমভোর, চোখের কপাট বন্ধ তো হয়নি। সে বারে বারে নতুন নতুন দেখে, তবু তৃষ্ণা মেটেনি। দূরের মাঠে চোখ রেখে বলি, 'এমন কোথাও দেখিনি।'

গাজী ঘাড় দুলিয়ে বলে 'এমন যে আর কোথাও নাই বাবু। যেমন দেশের যেমনটা। তয় বাবু, দাঁড়িয়ে আছেন তো

জঙ্গলের হাতায়। সুন্দরবন আর কত দূরে। গাছ দেখতি চান, চলেন যাই কত দেখবেন? সে আবার দেখবেন, গাছ আর আশমান আছে, মাটি দেখা যায় না। দিনমানে ঘোর আন্ধার, গাছের ভিড়ে নজর চলে না।'

মনে মনে ছবি দেখি সেই নিবিড় বনস্পতির। যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ডাক আমার পিছনে, যে ডাক ঠিকানা নিয়ে পিছন ধাওয়া করে। আর গাজীর দিনমানের অন্ধকারে, নজর না যাওয়া বনে যে ডাক দিলেই যাব, আমার বুকের পাটা তেমন বড় নয়। দখিনরায়ের বাহনদের সঙ্গে আমার কোন দোস্তালি নেই। তার থেকে আজ এই দেখাটুকুই হোক, এই বন কেটে আবাদ। যে ছেউটি কন্য মেয়েটা, তার কৌমার্য দিয়েছে মানুষকে। যে নিজেকে দলেছে চিরেছে মানুষের লাঙলের ফালে, আর মা হয়ে দিয়েছে সোনার ফসল। যাকে ঘিরে জনপদ, হাট গঞ্জ বাজার জমেছে। গাজীকে বলি, বন দেখতে পরে যাব। আজ এখানেই দেখি।'

গাজী হাসে। বলে, 'বললাম বলেই কি যাওয়া যায় বাবু। গাছ দেখতি পাচ্ছেন না, তাই বললাম। চলেন, একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন।'

বলে গাজী বাঁধের ওপর দিয়ে দক্ষিণ মুখে হাঁটে। বাঁ দিকে ঘরের সারি, মুখ তার অন্য দিকে। ডান দিকে নদী। গাজীর পিছন পিছন যাই। উলটো দিক থেকে লোক এলে সবাইকেই কাত হয়ে চলতে হয়। কানে আসে নানান গলা, নানান কথা, হাঁক ডাক হাসি। সবই আসে ঘরের সারির উলটো থেকে। হাটের সদর সেটা। একটু দূরেই দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে বাঁধ। সেই বাঁকে দেখি, মসজিদের মিনার, পাকা দালান। যদি দেড়শ বছরের আবাদ হয়, তা হলে তার থেকে পুরনো নয় পাকা মসজিদ। তার গায়ের লিখনের দাগও তেমন নয়। তবে মন্দিরের চিহ্ন না দেখে, প্রত্যয় হয়, যারা প্রথম এসেছিল এই কালীনগরে, তারা এসেছিল খোদার নাম করে।

গাজী বাঁধের ওপর থেকে দুই ঘরের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে নামতে নামতে ডাক দেয়, 'এদিক দিয়ে আসেন বাবু, একটু বাজার দেখে যান।

নেমে গিয়ে দেখি দোকান অনেক রকম। বাজারের এদিক ওদিক দেখা হয়। চার পাশে বাঁধানো ঘরে সারি সারি দোকানপাট, মাঝখানের উঠোন জুড়ে এলোমেলো চালা-ঘর। তবে বাজারে বাজার নেই। চালা-ঘরের সবই ফাঁকা। বেড়াবেড়া, কাঠের খুঁটি ফ্রেম আর টিনের চাল দেওয়া ঘরে দস্তুরমত মনোহারী মালের কারবার। শীতলপাটি পাতা তক্তাপোশের গদিতে বসে আছেন মহাজন। আলমারিতে থরে থরে কাপড় সাজানো। [illegible] তাঁত, শান্তিপুরী ফরাসডাঙা মিলের কলকানি। কলকাতা বল, বোম্বাই বল, নকশাদার ছাপা শাড়ি। [illegible] মেয়েদের নামে নামে শাড়ি পাবে। তার ওপরে, বল না কেন, শাল আলোয়ান [illegible] পশমী এই নগরে [illegible] আছে। আর কী চাও। [illegible] স্নো পাউডার, সেন্ট [illegible] আলমারিতে থরে বিথরে সাজানো। রেশমী চুড়ি, পাথরের মালা, [illegible] সোনা-রুপোর হার কানপাশা, বালা [illegible]। এমন কি, সেই যে বিদেশী চলে গেল, তার বিলাসের ঠোঁটরাঙা লিপস্টিকও পাবে, টিপ [illegible] কাজলের ভাণ্ডারও ভরা। আরো যদি বল, নাইলন [illegible], ছাপানো প্যাকেটে নেবে, নাও না। সব ধরে রেখেছে মনের মত করে।

গাজী ইতিমধ্যেই সমাচার দেওয়া নেওয়া শুরু করেছে। 'এই যে দাশকর্তা, ভাল আছেন তো!...এই এলাম একটু...। তারপর মুরশেদ, সাধনদাদা কবে এলে গো। একটু পান খাওয়াতি হবে কিন্তু। আসি একটা পাক দিয়ে।'...

তার মধ্যেই সঙ্গীকে বলে, 'হাটের দিন হলি দেখতেন বাবু, লোক কাকে বলে। পা ফেলবার জায়গা থাকে না।'

সে কথা ঠিক। এত বড় বাজার সপ্তাহের কোন কোনদিন সে হাট হয়ে ওঠে। এখানে রোজের বেচাকেনায় সরগরম নয়। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় ঘোরা যাচ্ছে। তাই সব ঘরেই খদ্দের আজ কম, ঢিমেটিমে ঝিমঝিমে। যখন সে গঞ্জ হয়ে ওঠে, তখন চেহারা আলাদা।

তবু পাবে সব। 'গড় করি কবরেজ মশাই, বাড়ি যান নাই এখনো। বেলা তো ঢসকে যায়।' গাজী সবার সঙ্গেই কথা বলে। কবিরাজ মশাই কী বলেন, শুনি না। দেখি, তাঁরও ঢসকে যাওয়া বয়স, চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে হাসেন। ঔষধালয়ের ছাপটি ঠিক আছে। তার সঙ্গে মোদক মকরধ্বজ আর সারিবাদি সালসার বিজ্ঞাপন দরজায় টাঙানো।

ডাক্তারখানাও না পাবে তা নয়, তবে টিঙ্গি-মিঙ্গির কথা তুলো না। বুক দেখার নল আছে, আলমারিতে শিশি বোতল আছে। দেখ, রুগীরা এখনো ধর্না দিয়ে বসে। সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে [illegible]। [illegible] 'ডাক্তারখানা' লেখা [illegible] দাঁড়ায়। একটু ছোট বড় [illegible] মা। তা বলে এক নয়, অনেক। [illegible] কথায়, সেই যে 'টিনের [illegible]' সে ডাক্তারখানাও আছে। দু একটা [illegible] আছে। গাজীর সঙ্গে সকলের আলাপ।

আর যদি অন্যরকম [illegible] চাও তো দেখ [illegible]। মনে হবে, কলকাতার দোকানে [illegible] ছবি, সব [illegible] [illegible] [illegible] পিসটাডের ওপরে [illegible] [illegible], ফুল ছাপিয়েছে [illegible] আছে।

এতেও যদি না হয়, তা হলে পান বিড়ির দোকানে যাও। বিড়ির [illegible] অদ্বিতীয়, এমন লেখা আছে, যার নাম 'মহম্মদলাল বিড়ি' কিম্বা 'গুণিক সাহেবের বিড়ি।' যার প্যাকেটে দেখবে, মোটা দাগে ছাপা সুন্দরী, চুল এলিয়ে তোমার দিকে আড় চোখে চেয়ে হাসছে। এবার বল, এমন করে চাইলে কেমন বিড়ি না খেয়ে, পোড়াকপালে কী সুখ! তবে আর এক কথা কি, মহাদেব আর মহম্মদ বল, কাশী আর মক্কা বল, মায় দেশের নেতা মন্ত্রী, সকলের ছবিই পাবে এই বিড়িতে। আর পানবিড়ির দোকানেই দু চারজনের গল্প গুজব গুলতানি। গল্প গান তাশ পাশা, এই সে-দিনে, সেখানেই জমেছে। গাজীর বাতপচ্ছ সকলের সঙ্গেই।

খুঁত কাড়া যার কাজ, তার কাজ। সব মিলিয়ে যেন এক ভিন্ন জগতে ফিরি। নতুন ছবি, নতুন সমাচার। কৌতুকের টানা বহে যায়, মনটা টলটলিয়ে ওঠে। শহরের ঝলক নিয়ে কোন অহংকার নেই যে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসি। মনে হয়, অপরিচয়ের বেড়াটা ডিঙিয়ে এলাম। এ সাজসজ্জা অনেকদিনের চেনা বলে মনে হয়। ওপারের পুবে, বাঙলায় দেখে এসেছি বলে নয়, এই

'ওই নামেই। জমমো তো এখেনেই।'

তাও না হয় মানি। কিন্তু গলায় অমন ঠিনঠিনে হাসিটি বজায় আছে কেমন করে। কেবল যে ঘরের ভাতে হাঁড়িয়া হয়েছে, তা নয়। পরেষ ঘরে মাতাল হয়ে পড়ে। কাঁথের ছেলে হাটের ভুঁয়ে; কচু পাতায় কুচো চিংড়ির পসরা, তবু হাসি যে অমর।

তারপরেই দেখি, সামনে ধানের পাহাড়। শহরের একতলা বাড়ির সমান উঁচু হবে, এত বড় ডাঁই। এক আধটা নয়, অনেক ক'টা।

গাজী বলে 'এদিকটা হল ধান-চালের আড়ত। তয় বাবু, এ কিছু নয়। দেখাতি হয় হাটের দিনে।'

খবর দিয়েই সে অন্য দিকে বাতচিৎ করে। সোরেনের বউ তার সংগে হাসে। আবার দেখি, আড়তদারও পান চিবিয়ে হেসে বলে, 'গাজী যে! অনেক দিন বাদে।'

কিন্তু তখন আমি শুনি হারমোনিয়ামের বাজনা। যত জোরে বাজনা, তত জোরে কাঁসি বাজানো মেয়ে-গলায় গান, 'প্রেম করে ভাই, সংগে নিলে না—আ—আ—আ...।' এ যে নয়, ধন্দ লাগায়।

(ক্রমশঃ)

বার্লিনের চিঠি

লরকার মৃত্যু ও স্পেনে সাহিত্যের স্বাধীনতা ?

গ্রানাদার শেষবীর? লরকার মৃত্যু? প্রশ্নটা দেখা দিল, কবির ৩০তম মৃত্যু দিবসে বিথনার (Viznar) থেকে—তিরিশ বছর আগে, পৃথিবীর এই অখ্যাত কোণে কিভাবে কবি ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল! বর্তমানে স্পেনের সাহিত্যিকদের অবস্থাই বা কি? কিছুকাল পূর্বে "দেশ" পত্রিকার ১০ই অগাস্ট সংখ্যায় "অন্য দেশের কবিতা" বিভাগে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন—"লোরকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখন অনেকে বলেন যে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কোন সৈনিক ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই লোরকাকে খুন করে।" যেহেতু লরকা এমন একটি নাম, যে নামের সাথে জড়িয়ে আছে আধুনিক স্প্যানীশ সাহিত্য আর স্পেনের মাটি, যে নামের অক্ষরগুলি রক্ত দিয়ে লিখতে গেলে সমগ্র স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধের ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে, যাঁর নাম আর মৃত্যু পৃথিবীর দেশে দেশে কবি সাহিত্যিকদের মনে আলোড়ন জাগায়—চিরবরেণ্য এমন একজন সাহিত্য রথীর মৃত্যু আর হত্যাকাণ্ড কেন এভাবে দেখা দেয়, যে লরকা নামে কেবল স্পেনের লাতিন আমেরিকার তরুণ কবি সাহিত্যিক আর ছাত্র বুদ্ধিজীবীরাই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে না, এমন কি, যে হিটলারের জার্মানী সেদিন স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোকে নগ্নহাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, আর পৃথিবীর সমগ্র গণতান্ত্রিক মানুষের মুখের ওপর তুড়ি মেরে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার আর আন্দোলনকে মিলিটারী বুটের তলায় কবরে মিশিয়ে দেয়, সেই জার্মানীতেও আজ যুদ্ধোত্তরকালে লরকার নামে এখানকার বুদ্ধিজীবী মানুষ স্প্যানিশ নাটক আর কবিতার কথাই স্মরণ করেন। এখন এ দেশে লরকার ওপর প্রায়ই বিভিন্ন লেখা দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁর এই ৩০তম মৃত্যু-বার্ষিকীতে এ দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ও সাহিত্য-পত্রিকায় লরকার ওপর এত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন নির্ধারণ করার চেষ্টা চলেছে তার পরিমাণ পৃথিবীর যে-কোন জীবিত বা মৃত কবিকে ঈর্ষান্বিত করতে পারে। যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানীতে আর কোন বিদেশী কবি লরকার মত রাজনীতি ও সাহিত্যগতভাবে এত দৃষ্টি আকর্ষণ

লরকা

করতে পেরেছেন কিনা, আমার জানা নেই। ইদানীং তাঁর মৃত্যু-রহস্যের ওপর বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে, ১৯ আগস্ট তারিখ, ১৯৩৬ সালের যে নিশিতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়, তার ওপর।

আজো বিদেশীরা যখন স্পেনে বেড়াতে আসেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতীতের ইতিহাসসম্পন্ন গ্রানাদা, আর গ্রানাদায় এসে উপস্থিত হলেই মানুষের মনে পড়ে এই Viznar (বিথনার) গ্রামের কথা। গ্রানাদার খুব কাছেই এই বিথনার গ্রাম। সামান্য পথ। যে গ্রামের কথা ৩০ বছর আগেও কেউ কোনদিন জানত না। শুধু সীমাবদ্ধ ছিল গ্রানাদা অঞ্চলে। আজকে সেই Viznar কেবল একটা গ্রামের নাম নয়, এর চাইতে বড় একটা নাম—যে নাম এখন স্প্যানিশ কবির হত্যা, বিভীষিকা আর মৃত্যুর প্রতিধ্বনি। পদধ্বনি যেখানে এখন বিদেশী টুরিস্টদের ঘন ঘন যাওয়া আসায়। তারা খোঁজেন সেই "Barranco"—যেখানে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে কেবল উঁচু-নীচু পাহাড়—টিলার দল, বৃক্ষহীন, রুক্ষ মাটিময়, নিস্তব্ধ প্রান্তরের জনহীন সাক্ষীর দল। হ্যাঁ এখানেই লুটিয়ে পড়েছিল কবির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। কোথায়? মানুষের দৃষ্টি খোঁজে সেই একখণ্ড জমিকে, শুধু স্বিপদভূমি। কোথায় দেখি দেখি? টুরিস্টদের কৌতূহল লরকার বধ্যভূমিতে। ল্যাতিন আমেরিকার ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করি—"এমিগো, তোমাদের স্প্যানিশ ভাষায় কোন কবিতা নেই, যা কবি তাঁর মৃত্যুকালে হয়ত এখানে বলে গেছেন।" সে আবৃত্তি করে আরেক বিখ্যাত স্প্যানিশ কবি Antonio Machado থেকে, যিনি স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে রিপাবলিকানদের দলে যোগদান করে পরে ফ্রান্সে পালিয়ে যাবার পথে ছোট্ট একটা গ্রামে অসুখে পড়ে ১৯৩৮ সালে মারা যান। কবিতাটির নাম "কবি ও মৃত্যু" ("গ্রানাদায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটে" থেকে), বন্ধু লরকাকে নিয়ে লেখা। লরকা যেন এই বিথনার মাঠে গ্রানাদার শেষ বীর।

আর স্পেনের এই প্রান্তরের কথা মনে পড়লেই চোখে ভেসে ওঠে, কানে বেজে ওঠে—স্প্যানিওলা — এমিগো, বন্ধু? রোট-হুয়াইন, লাল মদ? যাযাবরীদের নাচ? ফ্লামিংগো? আর গীটারের ঝংকার? স্পেনের আকাশে বাতাসে রয়েছে গীটারের সুর। লরকার "La Guitarra" (লা গীথারা) কবিতাটির মর্মার্থ বুঝি এই মাটির ওপর এসে দাঁড়ালেই ঠিকমত অনুভব করা যায়—"গীটারে বিলাপ শুরু/ভোরের পেয়ালা ভেঙে ভেঙে যায়/দূর দিগন্ত ভোরে./গীটারে বিলাপ শুরু./গীটারের তারে এই যে সুরের জ্বালা/হায় কী ভীষণ/কিছুতেই আর থামানো যাবে না তারে/কেবল কান্না শুনি/একঘেয়ে এক সুরের বিলাপ/জল ঝরে ঝরে কাঁদে/তুষারের দেশে কান্না হাওয়ার করুণ স্বরের মত/গীটারের তারে এই যে সুরের ব্যথা/হায় কী ভীষণ/কিছুতেই আর থামানো যাবে না তাকে।/সে খোঁজে দূরের দৃষ্টি-অতীতজীবনের বাসনা/প্রার্থনা করে অগ্নিকোণের দক্ষিণ মরু/কোথায় স্নিগ্ধ ক্যামেলিয়া ফুল ফোটে/যেখানে ফোঁপানো কান্নার সুরে/লক্ষ্য হারানো শর/যেন সে বিরহী সন্ধ্যাগগন/কখনো যে-চোখে তোলেনি প্রভাত চোখ/এবং প্রথম মরা পাখি দেখে/গাছের শাখায়, মৃত।/হে গীটার!/তুমি আমার হৃদয়/পাঁচটি তারের প্রাণ-ঝংকারে/ছিন্নভিন্ন কী ভীষণ এক আমার হৃদয়!"/

El llanto (এল ইয়ান্তো) অর্থাৎ কান্না কেবল স্পেনের গীটারে নয়, লরকার

কবিতায় নয়, স্পেনের মাটিতেও। টুরিস্ট মানুষদের মধ্যে কোলাহল। গুলির শব্দ এই ৩০ বছর বাদেও দিগন্ত থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে কিনা। টুরিস্টরা খুঁজে চলে তাঁর কবরভূমি। কোথায়, কবরভূমি! কর্কশ বালি, পাথর আর আগাছায় ঢেকে গেছে স্পেনের এক-খণ্ড জমি, কবির দেহের দৈর্ঘ্যের। সেখানে ১৯৩৬ সালের ১৯ আগস্ট উষার আলোয় জগদ্বিখ্যাত স্প্যানিশ কবি ও নাট্যকার ফেদেরিকো গারথিয়া লরকাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

কবির এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ ক্রোধে সেদিন ফেটে পড়ে। মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে এমন একজন কবিকে বধ করা হ'ল, যাতে কেবল স্প্যানিশ সাহিত্য নয়, এই শতাব্দীর সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের অপরিমিত ক্ষতি সাধিত হ'ল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কেবল লরকার এত অল্প বয়সে বিরাট প্রতিভার মধ্যে নয়, বরং তাঁর চিন্তা কল্পনা আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায়। ইদানীং এখানে লরকার অপ্রকাশিত বহু রচনাবলী-সম্বলিত সংকলন "ফেদেরিকো গারথিয়া লরকার চিঠিপত্র, ইণ্টারভ্যু, কবিতা ও নাটকের ভূমিকা"—নামে যে বিরাট বইটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তাঁর বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্রে দেখা যায়- আগামীকালের জন্য লরকার কি অপরিসীম পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রায় তৈরি ছিল। সে পরিকল্পনা কবিতা আর নাটকের ওপর। এবং তাঁর আঁকা ছবি আর সংগীত রচনার ওপর।

লরকার মৃত্যুতে স্পেন সরকারের ঘাড়ে চিরকালের মত এক বোঝা চেপে রইল, যা বইবারও উপায় নেই, কৈফিয়ত দিয়ে এই অন্যায় কার্যের বোঝা নামাবারও উপায় নেই। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক PEN-ক্লাবের তরফ থেকে H G Wells বহু চেষ্টা করলেন গ্রানাদার মিলিটারী গভর্নরের কাছ থেকে লরকার দুর্ভাগ্যের ঘটনার সত্যিকারের সংবাদ সংগ্রহ করবার। গভর্নর টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন "বর্তমানে ফেদেরিকো গারথিয়া লরকার অস্তিত্ব আমার অজ্ঞাত।" দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে লরকার মৃত্যুর ওপর অসংখ্য কল্পিত কাহিনী প্রকাশিত হ'ল। স্পেনের স্কুল-কলেজের সাহিত্য সংকলনে লরকার স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল এভাবেঃ এই সময় আর যে-সব কবির নাম করা যেতে পারে,, তাঁরা হলেন......। ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও কূটনৈতিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে অপমানিত হতে লাগলেন, যখন তাঁরা "আর লরকা?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। ১৯৪৮

পাবলো নেরুদা

সালে ফ্রাংকো সরকারের তরফ থেকে সাহিত্যিক Jose Maria Peman সর্বপ্রথম এই বরফকঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। "A B C" হচ্ছে স্পেনের কনসারভেটিভদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা। এমন কি আজো। সেখানে "A B C" সাহিত্য পত্রিকায় কবির মৃত্যুর ওপর লেখা হ'ল—"যুদ্ধের সময়কার নানান ঘটনার ভিড়ে সবচাইতে কুৎসিততম কাহিনী এবং সবচাইতে পরিতাপময় দুর্ভাগ্যের ঘটনা হ'ল কবি লরকার মৃত্যু।" স্বভাবতই চেষ্টা করা হ'ল 'A B C' পত্রিকার মারফত, মিথ্যা প্রমাণ সহ, লরকার মৃত্যুকে একটা অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা আর ব্যক্তিগত বিবাদের হত্যাকাণ্ড বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করবার। কিন্তু যে সকল বিদেশী স্পেনতত্ত্ববিদরা (যেমন Brenan, Couffon, Schonberg) পরবর্তীকালে লরকার মৃত্যুর ওপর গবেষণাকার্য চালিয়ে গেছেন, তাঁদের গবেষণা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য লাভ করা গেছে, যা লরকার মৃত্যুর শেষের কয়দিনের ওপর বেশ নতুন-ভাবে আলোকপাত করে, যা এতকাল অন্ধকারে ছিল। লরকার শেষ মুহূর্তের বন্ধু Luis Rosales-এর কাছ থেকেও পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায়। আর যে-সব বৃদ্ধ মানুষরা এখনো গ্রানাদায় বাস করছেন, যাঁরা অনেক কিছু জানতেন সেদিনের, কিন্তু যেই তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল লরকার মৃত্যুর ওপর, তখন তাঁরা নিস্তব্ধতা অবলম্বন করলেন।

আর সব বছরের মত ১৯৩৬ সালেও ১৭ জুলাই লরকা তাঁর গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপভোগ করবার জন্য গ্রানাদায় এসে তাঁর পরিবারের সাথে মিলিত হলেন। তার একদিন পরেই মাদ্রিদে গণফ্রন্ট পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে মিলিটারীর এক অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রানাদাও অফিসারদের হাতে চলে যায়। অর্থাৎ মিলিটারী আর সে সময়কার ফ্যাসিস্ট পার্টি Falange সে শহরকে গ্রাস করে রাখে। জর্মানী আর ইতালীর ফ্যাসিস্টদের অনুকরণে তৈরি করা হ'ল কালো-পোশাক-পরা "Escuadra Negra" বাহিনী, যাদের মধ্যে প্রচুর গুণ্ডা, বদমায়েশ আর খুনীর সমাবেশ ঘটেছিল। এইসব ফ্যানাটিকদের কর্ণধার নেতা ছিলেন Ramon Ruiz Alonso, যিনি কেবল প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি CEDA-র শ্রমিক নেতাই ছিলেন না, সেই সাথে লোকসভার সদস্যও ছিলেন।

পুলিসের লোকে যখন চারিদিকে ছেয়ে গেছে, সেই সময় লরকা তাঁর দেশের বাড়িতে এসকুয়াদ্রা নেগ্রার দলের এক সদস্য কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। কবি লরকা নিজেকে আর নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। তাঁর এক কবি বন্ধু তাঁকে সাহায্য করল অন্য এক তরুণ কবি Luis Rosales, যিনি যদিও Falange দলেরই এক সদস্য ছিলেন, তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে। Falange দলের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মনে হচ্ছে, সেই দলেরই অন্য শাখা এসকুয়াদ্রা নেগ্রা দলের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। Rosales-রা ছিল চার ভাই। এই চার ভাই ছিল Falange পার্টির সদস্য। এবং সেই শহরে সর্বপরিচিত। Jose Rosales সেই অঞ্চলের Falange পার্টির নেতা। অন্য দিকে লরকার পরিবার ছিল বাম-পন্থী। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গ্রানাদা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সমাজতন্ত্রবাদী। ১৮ আগস্ট বিকেলের দিকে CEDA-র নেতা ভয়ংকর Ruiz Alonso এসে হাজির হ'ল Rosalesদের বাড়িতে। কবি লরকাকে তাঁর চাই। সংগে তাঁর গ্রেফতারী পরোয়ানা, গভর্নর Valdes-এর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। লরকার বন্ধু Luis Rosales এবং তাঁর প্রতিপত্তিশালী ভাই Jose' বাড়িতে ছিল না। তাঁদের অন্য ভাই Miguels Rosales লরকার সাথে সিভিল গভর্নমেণ্ট-এর কারাগার পর্যন্ত এল, যদি কবিকে উদ্ধার করা যায়। সে তাঁর ভাই Jose'কে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল, যাঁর সাথে গভর্নরের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু Jose'র সাথে কোন যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। অন্য ভাই Luis যখন ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা। সংগে সংগে সে সিভিল গভর্নমেণ্ট-এর সাথে বোঝাপড়া করে লরকাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু হতাশ হতে হল। লরকাকে

বিথনারের মাঠ, যেখানে লরকাকে গুলি করে হত্যা করা হয়

Nestares নামে একজিকুশান কমাণ্ডের হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর বিচারে লরকার ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হল। পরদিন ১৯শে আগস্ট ভোরে বিথনারের পাহাড়ী মাঠে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হল লরকাকে।

এই নাটকের অন্যান্য পর্বে যাঁদের ভূমিকা ছিল সেদিন, তাঁদের মধ্যে গভর্নর Valde'র ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তিনি গৃহযুদ্ধে মারা যান। বাকী প্রধান দুই নেতা Ramón Ruiz Alonso আর Nestares এখনো স্পেনে জীবিত আছেন। তাঁদের সেই ক্ষমাহীন অপরাধের বিচার আজো পর্যন্ত করা হয় নি। স্পেন সরকারের লরকার এই হত্যাকাণ্ডে যদি কোন প্রকার সমর্থনই না থাকতো, তবে অন্ততঃ এতকাল পর এই দুই কুখ্যাত ব্যক্তির বিচার হত। অথচ ফালাংখে পার্টির মুখপত্রে কয়েক বৎসর ধরেই প্রচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, লরকা, Falange পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন, তাতে স্পেনের ফ্রাঙ্কো সরকার প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে পারতেন যে, এই হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু না, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কেননা, ইদানীং লরকার যেসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, তাঁর সমর্থন সম্পূর্ণই বামপন্থীদের জন্যে ছিল। তাছাড়া সে সময়কার স্পেনের সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে বামপন্থী ছাত্রদের থিয়েটার গ্রুপের "La Barraca"-র প্রতিষ্ঠা হয়, তার প্রবর্তক ছিলেন লরকা, এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন সমাজতন্ত্রবাদী শিক্ষামন্ত্রী Fernando de los Rios। সুতরাং লরকাকে খুন করে স্পেনের গৃহযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করাই ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। এখন দেখা যাক, বর্তমানে ফ্রাঙ্কোর স্পেনে লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা কতটুকু স্বাধীনতা উদ্ধার করতে পেরেছেন?

১৯৬২ সালে বার্সিলোনায় ষোড়শ আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রকাশক সংঘের যে অধিবেশন হয়, তাতে জার্মানী, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য প্রকাশকগণ মিলিতভাবে স্প্যানিস সরকারের সাহিত্যের ওপর তার বর্বরোচিত সেন্সারশিপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সমস্যা: স্পেনে প্রকাশিত যাবতীয় বই সেন্সারশিপের অনুমোদনের জন্যে সরকারের নিকট যে উপস্থাপিত করতে হয়, তার হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের উপায়। একটা রাষ্ট্রের আইননির্দেশ এই ধরনের কোন সেন্সারশিপ বোর্ডের অস্তিত্ব এবং তার একনায়কতন্ত্রী বাধা-নিষেধের নির্মম কাটাছাঁটের প্রাচীর আন্তর্জাতিক প্রকাশক সংস্থার আদর্শবিরোধী। যদিও বহু পশ্চিমী রাষ্ট্র, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে এক ধরনের নিয়ম-কানুন প্রচলিত, কিন্তু স্পেনের রাষ্ট্র আর সরকার যেভাবে স্প্যানিশ সাহিত্যের মাথার ওপর সর্বদা গিলোটিনের খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

স্পেনের সাহিত্যে এই বিভীষিকাময় আইন-কানুনের নগ্ন হাত বেরিয়ে আসে প্রথম ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৮, এবং তাকে স্পেনের বুকে প্রচলিত করা হয় ১৯৩৯ সালের ১৫ই জুলাই থেকে—গৃহযুদ্ধ শেষের কয়েক মাস বাদে। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো ভাল করেই জানতে পেরেছিলেন সেদিন, কেবল লরকা নয়, আগামী কালের লরকাদেরও ভ্রূণাবস্থায় হত্যা না করতে পারলে, তাঁর জীবিতকালেই তাঁর হাত থেকে স্পেনের শাসন ক্ষমতা একদল বুদ্ধিজীবী আবার কেড়ে নেবে। গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্ম গুরুদের কোন স্বর্গীয় ক্ষমতাই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রেস ও প্রচার দপ্তরের কর্ণধার Fraga Iribarne হচ্ছে বুদ্ধিজীবী সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা।

এখন প্রশ্ন—কোন লেখকের বই কিভাবে যাচাই করা হয় এই Fraga Iribarne কর্তৃক?

কোন বইয়ের প্রকাশনার জন্য প্রকাশককে, সেই সঙ্গে কখনো কখনো লেখককেও সেন্সারশিপ বোর্ডের মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি লাভের জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ দরখাস্ত ফর্মে প্রার্থনা জানাতে হবে। সেই সাথে দুই কপি মূল লেখাও দাখিল করতে হয়। যদি অনুবাদ সাহিত্য হয়, তবে মূল বই ও এক কপি অনুবাদ। এখন এই বই ও মূল পাণ্ডুলিপির কপিগুলি বিভিন্ন নাম গোত্রহীন Lektor (=Publisher's Reader)-দের কাছে প্রেরণ করা হয় গোপনে। বই আর লেখকের ভাগ্য নির্ধারণ করার ভার এঁদের হাতে। এঁরা কারা, কেউ তা জানে না, জানতেও দেওয়া হয় না। কেবল ফ্রাঙ্কোর নিজস্ব মন্ত্রীই সে কথা জানে। বইটি ছাপার যোগ্য, কি অযোগ্য—সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৈফিয়ত বা সমালোচনা দাখিল করবার দায় এঁদের নেই।

সাহিত্যের এই সব পাহারাদাররা লেখকদের

এই সব লেখার প্রতিটি লাইন পরীক্ষা করার জন্যে অর্থ পুরস্কার পেয়ে থাকেন সরকারের কাছ থেকে। আবার এই সব পরীক্ষকদের এক প্রকারের ফর্ম দেওয়া হয়, সেসব ফর্মের ওপর নানান ঘর রয়েছে, যেমন নিজস্ব চিন্তাধারা, রাষ্ট্রের মতবাদকে অপমান করা হয়েছে কি না, ক্যাথলিক ধর্মের আদর্শকে কোন প্রকার আঘাত বা বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে কি না, যাঁরা গীর্জা বা রাষ্ট্র কার্যে নিযুক্ত, সেসব গ্রন্থের ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোন কটাক্ষ আছে কিনা, ইত্যাদি। সেখানে এই সব সাহিত্য বিচারকদের লাল কালিতে মতামত লিখে দিতে হয়। সেই মতামত দুই চার কথাতেই যথেষ্ট।

ছাপবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত দাখিল করার পর কয়েক সপ্তাহ বা মাস বসে থাকতে হবে, ফলাফলের অপেক্ষায়।

সেন্সারের বলির মধ্যে বহু জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিকদের বই রয়েছে। জর্মানীর—গ্যুন্টার গ্রাস, পেটার হ্বাইস, উহে জনসন, হান্স এরিক নোজাক অন্যতম। অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন—Colin McInnes, Doris Lessing, James Baldwin, Claude Simon, Michel Butor, Raymond Queneau, Moravia, Testori, Arpino, Natalia Ginburg, Brandy—
—এমন কি Mary McCarthyর জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস—"The Group" পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই গেল প্রাথমিক সেন্সরশিপের কথা। এরপর প্রত্যক্ষভাবে সরকারী হাতের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ত রয়েছেই।

লক্ষ্য করবার বিষয়, ল্যাতিন আমেরিকার

আন্গেল মারিয়া দ' লেরা

স্প্যানিশ ভাষার বই সাধারণত খুব একটা স্পেনে ঢুকতে পারে না—তবু অল্প সংখ্যায় বহু সাহিত্যিকের বই স্পেনে পাঠকদের নিজেদের চক্রের মধ্যে গোপনে এ হাত থেকে সে হাতে ঘুরতে থাকে, যেমন আমাদের দেশে নিষিদ্ধ যৌন সংক্রান্ত হঠযোগের বই ছেলেমেয়েদের নিজেদের বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে হাতে হাতে গোপনে ঘুরে থাকে। স্পেনে আজ এমন লেখক খুব কমই আছেন, যাঁর বই বা লেখা রাষ্ট্র থেকে নিষিদ্ধ বা কাটাছাঁটা করা হয় নি। হয় অনুচ্ছেদ পরিচ্ছেদ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়ত এমনভাবে ওলটানো পালটানো হয়েছে, যার ফলে লেখার মূল উদ্দেশ্যই বদলে গেছে। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে Camilio Jose Cela, Jose Antonio Zunzunegui, Ana Moria Matute ও বাদ যায় নি। তরুণতরদের মধ্যে এমন অনেক সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁদের বই স্পেন থেকে কোনকালে প্রকাশিত হয় নি, যেমন Fernando Arrabal কিংবা Xavier Domingo; আবার এমন কেউ কেউ রয়েছেন—যাঁদের কোন কোন বই প্রকাশিত হতে পেরেছে, যেমন—Juan Goytisolo, Antonio Ferres, Amando Lopez Salinas, Juan Garcia Hortelano, Alfonso Grossol আবার এমন সাহিত্যিকরাও রয়েছেন—যাঁদের বই প্রকাশক গ্রহণ করেছেন, অথচ রাষ্ট্রের অনুমতি নেই।

কবি ও কবিতার ওপরেও ফ্রাঙ্কোর নজর কঠোর। কত কবি যে স্পেনের মাটি স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি জগদ্বিখ্যাত স্প্যানিশ ভাষার কবি চিলির পাবলো নেরুদা, যাঁর সেই কবিতার লাইন "from death comes our rebirth"—এর মধ্যে রয়েছে যেন তারকারাই নবজন্ম, যাঁর নাম গত কয়েক বৎসর ধরেই সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ-এর জন্যে নোবেল কমিটির বিচারকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন কবির বইও স্পেনের বইয়ের দোকানে পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি ভাগ্য Rafael Alberti কবিরও! আর Antonio Machado ও Miguel Hernandez? তাঁরাও সম্পূর্ণ নন। কারণ খুঁজতে গেলে অন্ধকারে হাঁটতে হবে।

স্পেনের এই হতভাগ্য সাহিত্যিক আর তাঁদের সাহিত্যের অবাধ নিধন-যজ্ঞের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৬০ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ২১৬জন লেখক, সাহিত্যিক ও প্রকাশক—প্রায় সকল স্তরের, সকল মতবাদের মানুষের সইযুক্ত একটি ডকুমেণ্টারী আলোচনা ও প্রশ্ন স্পেনের ফ্রাংকো সরকারের কাছে দাখিল করা হয়—যার উত্তর আজো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

স্পেনের মানুষ বলে—আমাদের এই মাটিতে দর্শক সমাজ খুব জোর আজকে আন্তোনিয়ানির হয়ত কোন ফিল্ম দেখে সংস্কৃতি স্বাধীনতার স্বাদ পিটুলিগোলা জলে পেতে পারেন, কিন্তু পাঠক সমাজের কাছে দুধের স্বাদ স্বাধীনতা আজো স্পর্শাতীত, অন্ধকারে নিমজ্জিত। কবি সাহিত্যিকদের কবিতা আর গল্পের বিষয়-বস্তুর ওপর কেবল কাটাকাটি আর কড়াকড়ি চলছে না, তাঁদের ভাষার ওপরেও চলেছে একালে নামহীন গোত্রহীন ঘাতকদের হাতের অস্ত্রপ্রয়োগ। তার জবানী লিখছে স্পেনের বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাস লেখক Angel Maria de Lera তাঁর আত্মজীবনীতে, যাঁর বেশ কয়েকটা গল্প উপন্যাস ইউরোপের সাহিত্যের বাজারে সাড়া জাগিয়েছে, এবং সাহিত্য পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছে—যেমন, "Hemos perdido el sol" (আমরা সূর্যকে হারিয়েছি), "Tierra Para morir" (মৃত্যুর দেশ) আর "Con la maleta al hombro" (কাঁধের ওপর বাক্স চাপিয়ে)—এর মত গল্প ও উপন্যাস।

Lera নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন—এবং কখন তুমি তোমার প্রথম গল্প লিখলে?

অনেককাল পরে, ১৯৫৭ সালে প্রথম।

কেন আগে লেখোনি?

পাঠকরা আমাকে পড়তে পেত না।

কে বা কারা তোমাকে বাধা দিয়েছে?

আমাদের গৃহযুদ্ধ।

গৃহযুদ্ধ? সে ত ১৯৩৯ সালেই শেষ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, কিছু কিছু লোকের কাছে। আমার জীবনে এই গৃহযুদ্ধ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলেছে।

তোমার এ হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে বলো।

"খুবই সোজা। আমি গৃহযুদ্ধের সময় রিপাবলিকানদের পক্ষে যে দলের হয়ে যুদ্ধ করেছি, সেই পার্টি যুদ্ধে হেরে যায়। ফলস্বরূপ, বিজয়ীর দল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। কিন্তু কেন জানি না, তাঁরা আমাকে বধ্যভূমি থেকে আমাকে বধ না করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি আজো পর্যন্ত জানলাম না, কেন ওরা আমাকে সেদিন হত্যা করল না। কিন্তু আমাকে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় জেলে দিন কাটাতে হল। তাই যেদিন আমি প্রথম আবার পথে বেরিয়ে এলাম মুক্ত আকাশের নীচে, সেদিন আমার গৃহযুদ্ধ শেষ হল।"

এক স্থানে Lera নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন—"কেন তুমি সাহিত্য করতে নেমে এলে?"

আমার অন্তরের প্রেরণা থেকে, যেখান থেকে আমার এক নতুন "আমি" জেগে উঠেছে, যা ভয় ও একাকিত্বের বিরুদ্ধে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। সেহেতু মানুষকে বলপ্রয়োগ ও নিষ্পেষণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, যেহেতু লেখা আমার কাছে স্বাধীনতার সত্যিকারের রূপান্তর, যা আমার অস্তিত্বের মাপকাঠি রচনা করে, সেহেতু আমি লিখতে লেগেছি। আমার লেখার মধ্যে দিয়ে আমি আমার স্বাধীনতাকে আমার গভীরে সৃষ্টি করবো, এবং তাকে আমি আমার পরবর্তী মানুষের হাতে তুলে দিয়ে যাবো। আমার জীবনের মতই আমি আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি। স্বাধীনতা ব্যতীত আমি আমার জীবনকে চিনতে পারতাম না।

বর্তমানে কোন রচনা নিয়ে তুমি ব্যস্ত?

আমার উপন্যাস "Las ultimas banderas" (শেষ পতাকার দল)। উপজীব্য—মাদ্রিদে আমাদের গৃহযুদ্ধের শেষের মাস এবং মৃত্যুর বুকে পার্টির ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা, যে পার্টি রিপাবলিকানদের রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। এমন একটা উপন্যাস, যেখানে যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে।

তুমি কি এতই সহজ সরলভাবে বোকার মত বিশ্বাস করতে পারলে, তোমার এই বই স্পেনে প্রকাশিত হতে পারবে?

যদি আমি সহজ সরল বোকাই না হবো, তবে আমি কখনো লেখক হতে পারতাম না। সে যাই হোক, তবু আসল কথা বলতে হয়—এতগুলো দীর্ঘ বৎসর পার হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত এত বৎসর ধরে পৃথিবীর মানুষকে কেবল তাঁদের কণ্ঠস্বরই শুনতে হল, যাঁরা সেই গৃহযুদ্ধের জন্যে দায়ী, কিন্তু আজ দিন এসেছে, একথা স্বীকার করতে হবে অন্য মানুষদেরও অনেক কথা বলার আছে। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, সেদিনের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজো স্পেনের মানুষ যে আলোচনা নিজেদের মধ্যে জ্বালিয়ে রেখেছে তাকে দীর্ঘকাল ধরে আর সরিয়ে রাখা চলবে না। অবশেষে এই বিশাল ট্র্যাজিক ইতিহাসের শাপমুক্তি ঘটবে। স্পেনে কোন দিনই সত্যিকারের শান্তি সম্ভব নয়, যতদিন স্পেনের মানুষকে সেদিনের গৃহ-যুদ্ধের ওপর মুক্তকণ্ঠে কথা বলতে দেওয়া না হয়। চুপ করে থাকার মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান নেই। শুধুমাত্র শব্দ ও কথার মধ্যেই সেই শক্তি নিহিত আছে, যা সব কিছুকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে পারে। তবু আমার দ্বিধা জাগে, সত্যি আমার এই উপন্যাস "শেষ পতাকার দল" আমার জন্ম-ভূমিতে কোন দিন প্রকাশিত হতে পারবে কি না।

পরিশেষে তাই বলতে হয়, যদিও কোন ঝড়ো হাওয়াকেই স্পেনের আকাশ আর মাটির মধ্যে দিয়ে বইতে দেওয়া হচ্ছে না, যাতে স্পেনের আত্মা আবার জেগে উঠতে পারে, তবু সেদিন লরকাকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের সাথে স্পেনের স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শক্তির যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার রক্তস্রোত আজো গোপনে বয়ে চলেছে স্পেনের মাটিতে, শেষ পতাকার দলে—তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল আজ গ্রানাদায় এই রুক্ষ বন্ধুর Viznar (বিথনার) প্রান্তরে। যেখানে তাঁর প্রেয়সী যাযাবরী মৃত্যু গ্রানাদার শেষ বীর লরকাকে চুম্বন করছে তাঁর ভালবাসার জন্যে, সাহিত্যের স্বাধীনতার স্বপক্ষে।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

চিত্রপ্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের একত্রিংশ বাৎসরিক প্রদর্শনী/ ফাইন আর্টস ভবন

বাঙলার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস সারা ভারতের শিল্পীদের কাছেই ধীরে ধীরে সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে কাজ মনোনীত হলে এমন তরুণ শিল্পী নেই যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে না। এবার বহু দেশ থেকে ছবি এসেছে, এমন কি রাজকোট, রায়পুর, চন্ডীগড়, ত্রিপুরা, বারানসী ও ওড়িষ্যা থেকেও অনেকে ছবি পাঠিয়েছে।

বলতে গেলে এইটিই প্রদর্শনী যেখানে ভারত, কিয়ারসকুরারো নিয়ে, রঙ ও তুলির সীসা নিয়ে—কার্যকারিতা সম্পর্কে, বাস্তবতা বিষয়ে নির্মাণ চাতুর্য সম্বন্ধে কিভাবে চিন্তা করছে, সমস্ত কিছুকে কি পরিমাণে আরোপ করতে পেরেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়; অবশ্য এ ছাড়া অ্যাকাডেমীর উদ্যোগে আর একটি প্রদর্শনী গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ মিড-সন্যের প্রদর্শনীতে সমগ্র ভারতকে জানবার কোন সুযোগই নেই; সেটিতে স্থানীয় ছাত্ররাই বেশী যোগ দেয়, সামান্য ছবি আসে কলকাতার বাইরে থেকে।

ঐ দুটি প্রদর্শনীতে একসংগে নানাবিধ পদ্ধতিই প্রদর্শিত হয়ে থাকে; একাধারে এচিঙ, লিথ, ভারতীয় পদ্ধতি এবং তেল রঙ। এটা না করে অ্যাকাডেমীর উচিত এগুলিকে আলাদা আলাদা করে অন্য সময়ে প্রদর্শনী করা। তাতে করে অনেকের জানার এবং শেখার সুযোগ বেশী হয়।

এবং আর একটি কথা বললে নিশ্চয়ই সংগত হবে যে, অ্যাকাডেমী যদি মাদ্রাজ, দিল্লি, বোম্বাই, নাগপুর ইত্যাদি শহরে নিয়ম করে তাদের মনোনীত ছবির প্রদর্শনী করে, এতে আমাদের মনে হয় বিভিন্ন দেশীয় শিল্পীদের ভাববার দিক থেকে অনেক সাহায্য হবে।

নিদর্শনগুলিকে এবার দেশ অনুযায়ী সাজান হয়েছিল। তার একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে, কোন দেশ কেমন কাজ করছে জানা যায়, কিন্তু তার থেকে ন্যায়সম্মত হত যদি তাঁরা কাজ অনুযায়ী, শুধু যে অবয়বী বা অপ্রাকৃতিক (অ্যাবসট্রাকট) তা বলছি না, আরোপ চিন্তা অনুযায়ী অর্থাৎ যারা কিছু নির্মাণ করতে চাইছে, যারা শুধু পরিদৃশ্যমান বাস্তবতাকে স্পর্শন-প্রত্যক্ষে আনতে চাইছে তাদের কাজ আলাদা করে দেখাবার ব্যবস্থা করতেন।

এখানেও সেই একই কথা মনে হয় যে, প্রায় ক্যানভাসেই লাগে—অকৃ ভাব নিয়ে গঠিত, এমন কি যারা নাম করা শিল্পী, যারা ক্যালেণ্ডার-মোহন, এ'রা বছরে একবার আর্টইস্ট হবার কথা মনে করে, যারা ছেলেমানুষ, তাদেরও মনোভাব একই, এই জন্যে মনে হয় অবনীবাবু ঠিকই বলেছিলেন—

"শুধু তুলি রং-এর শিক্ষা শিক্ষাই নয়... আমাদের অনেক বিষয়ে সুশিক্ষিত হইতে হইবে...যদি দেশের এবং বিদেশের শিল্পাদির কতক ইতিহাস চর্চা করি, যদি কিছু না পড়িয়া যাদুঘরটায় ঘুরিয়া দেখি অর্থাৎ দেখার মত করিয়া দেখি তবেও উপকার! মানুষ কল নয় সর্বদা কার্য করিবে! তাহাকে ভাবিতে হইবে দেখিতে হইবে..."

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা দেশের শিল্পীরা, পড়েশুনে উপলব্ধির প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করি না, অবশ্য এই বিষয়ে শিক্ষাদীক্ষা সংস্থাগুলিই দায়ী। সেখানে থিওরী শেখাবার কোন ব্যবস্থাই নেই, অন্যদিকে আধুনিক আর্টের আসল কিছু দেখবার মত ভাগ্যবান আমরা নই। এই সূত্রে বলা যায়, কলকাতায় বসে ম্যারী লরেসাঁ থেকে ব্রাক-এর সামনে দাঁড়াবার তিলেক সুযোগ আমরা পেয়েছি, বুফের 'ইরিস' দেখেছি এবং পাশে পিকাসোও একটা ছিল।

সম্যক জ্ঞান আমরা কোথা থেকে পাব?

মহাজাগতিক শিল্পী: সুবল সাহা

আমরা ছোট ছোট রি-প্রোডাকশান দেখে, বেশ বুঝতে পারা যাবে, ফরাসী সিদ্ধদের ছবির ছকটা আমাদের নজরে পড়ে, ইম্প্রেশনইজম পোষ্ট ইম্প্রেশন বলতে খানিক বোকা ব্রাশম্যানার, ফোভ বলতে খানিক সরবী রঙ, অ্যানালিটি ব্যাপারটা নকশার নামান্তর, ডিসটরশন বলতে আজগুবি ধরণ ঠাওর করি। কিভাবে যে সিদ্ধরা ঘটনা সৃষ্টি করে থাকেন তা সত্যই হৃদয়ংগম হয় না।

গোপাল ঘোষের গতানুগতিক কাজ ছিল,

গণেশ শিল্পী: ভি মধুসুদন রাও

রথীন মৈত্র কনকেভের খেলা দেখাতে চেষ্টা করেছেন সত্য কিন্তু তাঁর কাজে বস্তু গঠন হয়ে উঠে নি—কারণ টেনসন রেখা এখানে ছকে পরিণত হয়েছে, রঙ যে সম্প্রসারিত হয় সেটা তিনি ভেবে দেখেন নি; শুধু উনি নন, আরও দুয়েকজনের মধ্যে ঠিক একই ধরনের অসাবধানতা দেখা যায়। হেবৃবারের 'ইলিউজন' ছবিটি আধা-একসপ্রেশনইস্টিক এবং মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

অ্যাকাডেমী নিজের পারমনেণ্ট গ্যালারী অফ কনটেমপোরারী আর্ট অব ইন্ডিয়ার জন্য সি জে এনটনী ডসের 'ম্যাডোনা' ছবিটি কিনেছেন। কাজটি বেশ সরল, কিন্তু পুরস্কার দিয়েছেন সুনীল দাসের মিকস্‌ড টেকনিকের কাজটিকে—কাজটি সিলেকসন-গোষ্ঠির কেন যে ভাল লেগেছে জানি না। অতুল বোসের পোর্টরেট আমাদের ভাল লাগেনি, বরং ব্রজগোপালের 'সিসটার অনিতা'র কাজটি উল্লেখযোগ্য।

ল্যান্ডস্কেপে তেমন বলার মত ছবি ছিল না, 'ভ্রইঙের সুষ্ঠতায় ২৬৯ আমাদের ভাল লেগেছে। ভাস্কর্য : দি কসমিক ওয়ার্লডের কাঠামো মনোজ্ঞ, ডনের মধ্যে মুরগীর সর্বশক্তির আরোপটি খুব স্পষ্ট। ভারতীয় পদ্ধতিতে লক্ষ্মী-এর চেষ্টার প্রশংসা করতে হয় এ এস পানওয়ারের—তাঁর ব্ল্যাকহর্সটি রেখার জোরে খুব খেলে উঠেছে।

আটাশ

দিন দুয়েক পরের কথা।

অবনী গুরুডিয়ায় আসছিল, সঙ্গে বিজলীবাবু। সুরেশ্বরের অসুখ শুনে বিজলীবাবু আসতে চেয়েছিলেন। আজ আসার পথে বাস-অফিস থেকে অবনী তাঁকে তুলে নিয়েছে।

বিকেল পড়ে গিয়েছিল, শীতের বাতাস যদিও আজ সারাটা দিনই থেকে থেকে নিরুভুল করে দক্ষিণ দিয়ে আসছিল, বয়েক ঝলক আসে আবার থেমে যায়, বাতাসে শিহরণ আছে, শীতের ধার নেই, ঈষৎ যেন উষ্ণ। ফাল্গুনের মুখোমুখি এসে বাতাস যেন দোলা-মোলা করে কখনও মাঘ কখনও ফাল্গুনের মন রেখে বইছিল। রাস্তাটা শুকনো পাতায় ভরা, দু' পাশে অজস্র ঝরা পাতা, গরগলগাছগুলোর মাথা প্রায় নিষ্পত্র হয়ে এল, মাঠেঘাটে ধুলো উড়ছে, ঝোপঝাড়গুলো ধূসর, বিজলীবাবু কখন যেন ঝোপ থেকে বুনো ফুলের গন্ধ পেয়ে নাক টেনে গন্ধ নিলেন।

যাই যাই করেও বিকেলটা কিছুক্ষণ ছিল, তারপর অপরাহ্ন ফুরোলো।

বিজলীবাবু বললেন, "শীতটা এবার গেল মিত্তিরসাহেব; আর ক'টা দিন।"

অবনী মুখে কিছু বলল না, বার দুই ঘাড় নাড়ল আস্তে, অর্থাৎ, হ্যাঁ; শীত যাচ্ছে।

বিজলীবাবু দেশলাই-কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে কাঠিটা ফেলে দিলেন। ইদানীং পানের সঙ্গে তিনি যে নতুন জরদাটা খাচ্ছেন সেটা নেশার পক্ষে জুতের নয়, কিন্তু গন্ধটা ভাল। নিজের মুখের গন্ধ যেন নিজেকেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দেয়। বিজলীবাবু বোধ হয় মুহূর্ত কয় মুখ হাঁ করে সেই গন্ধ নিচ্ছিলেন, তারপর নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই মুখ বন্ধ করে হেসে ফেললেন। বললেন, "মিত্তিরসাহেব, একটু পানটান অভ্যেস করুন।...জীবনটা একেবারে বিধবার ঠোঁট করে রাখলেন—!"

অবনী হেসে জবাব দিল, "পানের অভ্যেস তো আমার আছে, বিজলীবাবু।"

বিজলীবাবু নিজের ভুলটুকু যেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন। বললেন, "আরে না-না, সে হল কি না জলপান, আর এ হল স্থল পান।" বলে বিজলীবাবু হাসতেই থাকলেন; পরে আবার বললেন, "পানের কত রকম-ফের আছে জানেন?"

অবনী মাথা নাড়ল; জানে না।

বিজলীবাবু একটা ছড়া কাটলেন, তার খানিকটা হিন্দী হিন্দী শোনাল, বাকিটা উর্দু উর্দু হবে। বললেন, "আয়ুর্বেদের অনুপানের মতন নানা অনুপান আছে পানের: অনুপান ভেদে কোনো পানে মনোসুখ কোনো পানে রতিসুখ।" বলে হাসতে লাগলেন।

বিজলীবাবুর যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান মাঝে মাঝে অবনীকে চমৎকৃত করে। আপাতত সে তেমন চমৎকৃত হল না, বলল, "পান-শাস্ত্রে আপনি বরাবরই পণ্ডিত।"

"শাস্ত্রটাস্ত্র না, এ হল নিজের মুখে ঝাল খাওয়া। সমঝদার হলে বুঝতেন।"

পরিহাসটা অবনী উপভোগ করল কি না বোঝা গেল না।

বিজলীবাবু অল্পসময় যেন অবনীর জবাবের অপেক্ষায় থাকলেন, তারপর সহাস্যমুখে বললেন, "কথাটা আপনার মনে ধরল না মিত্তিরসাহেব; কিন্তু যা বললাম—এ হল খাঁটি কথা।"

অবনী হাসল না; সামনাসামনি একটা গাড়ি এসে পড়েছে, স্টেশন ওয়াগন; রাস্তার দিকে চোখ রাখল।

বিজলীবাবু পকেট থেকে তাঁর সিগারেট কেস বের করছিলেন।

মুখোমুখি গাড়িটা পাশ কাটাল: অবনীর মনে হল গাড়িটা সে টাউনে অনেকবার দেখেছে, সরকারী গাড়ি, গাড়ির মধ্যে বেশ কয়েকজন যেন ছিল।

নিজের হাতে পাকানো সিগারেটের একটা নেড়েচেড়ে বেছে নিয়ে বিজলীবাবু দেশলাই জ্বালালেন। সিগারেটের অল্প একটু ধোঁয়া গলায় টেনে নিয়ে সামান্য পরে বললেন, "আপনি যতই কেননা বলুন মিত্তিরসাহেব, এক হাতে সংসারের খেলাটা ঠিক জমে না। ...যদি জমত তবে ভগবানের এই বাড়তি খরচটা হত না।"

অবনী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, হাসল সামান্য, "বাড়তি খরচ?"

অবনীর নির্বুদ্ধিতায় যেন কত হতাশ হয়েছেন বিজলীবাবু সেইভাবে মাথা নেড়ে জিবের শব্দ করলেন; বললেন, "বাড়তি খরচটা বুঝলেন না—! হায় হায়, মিত্তিরসাহেব, বিধাতা পুরুষের এমন সৃষ্টি যার সব দিকেই বাড়তি—সেই ফেমিনাইন জেণ্ডার চিনলেন না।"

অবনী হেসে উঠল।

"হাসির কিছু নয়," বিজলীবাবু বললেন, "জগতে এই বাড়তি খরচটা না থাকলে বাঁচার কোনো সুখ ছিল না।"

অবনী বলল, "তা ঠিক, আপনাকে দেখেই বেশ বুঝতে পারি।"

"ওই তো, শুধু দেখেনই; শিক্ষাটিক্ষা নেন না।" বিজলীবাবু বেশ জোরে জোরে হাসলেন। হাসি থামলে বললেন, "একটা কথা বলব, মিত্তিরসাহেব?"

"বলুন।"

"আপনি তো আর সুরেশ-মহারাজ নন যে বেহ্মচারী হয়ে হরতুকি খেয়ে পড়ে থাকবেন আজীবন। বয়েস-টয়েসও বেশ হল, অর্ধেক বেলা তো কবে শেষ, এখন একটু... মানে ধরুন গৃহসুখ বলেও তো একটা কথা আছে।"

"গৃহসুখ...!" অবনী কৌতুকের স্বরে বলল।

"হাসবেন না, মিত্তিরসাহেব, সংসারে এসেছেন—সুখ-অসুখ, শোক-দুঃখ, আরাম-বিরাম এ সবই প্রয়োজন; আপনি না চাইলেও এরা ছাড়বে না। তাছাড়া স্নেহ-মমতা...।"

অবনী চুপচাপ থাকল। বিজলীবাবু যে আর রঙ্গরসিকতা করছেন না—বেশ বোঝা যাচ্ছিল। দিনে দিনে বিজলীবাবুর সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে যে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের মতন এখন অনেক কিছুই অক্লেশে বলতে পারেন, বলতে সংকুচিত হন না।

বিজলীবাবু বললেন, "আমি মাঝে মাঝে ভাবি মিত্তিরসাহেব, আপনি বড় বিচিত্র লোক।"

অবনী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, "বিচিত্র লোক! কেন?"

"বিচিত্র বই কি! দেখছি তো!.. ইচ্ছে করলে আপনি, সাধারণ লোক যা চায়, যাতে সুখ শান্তি পায় সবই প্রায় পেতে পারতেন, অথচ এমন বাউণ্ডুলে হয়ে থাকলেন যেন আপনার কিছুই জোটে নি। এটা কি আপনার শখ! তাও তো নয়!"

অবনী সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না, পরে বলল, "আপনি খানিকটা বেশি বেশি ভাবছেন, বিজলীবাবু!"

বিজলীবাবু নিবে যাওয়া সিগারেটটা আবার ধরাতে লাগলেন, গাড়ি প্রায় লাটঠার মোড়ে এসে পৌঁছল।

সিগারেট ধরিয়ে বিজলীবাবু বললেন, "মিত্তিরসাহেব, আমি কোনোদিন আপনার ফ্যামিলির ব্যাপারে কথা তুলি নি।...দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব, অপরাধ নেবেন না।"

অবনী চুপচাপ থাকল। বিজলীবাবু যে প্রসঙ্গটা কোনোদিন তোলেন নি তা নয়, কিন্তু স্পষ্ট করে কোনোদিন বলেন নি, প্রকারান্তরে এক আধবার তিনি বিষয়টার উল্লেখ করেছেন।

বিজলীবাবু বললেন, "স্ত্রীকে কি আপনি আদপেই পছন্দ করেন না?"

"না। আমার স্ত্রী নেই—এক সময়ে ছিল; এখন সে অন্য কারও স্ত্রী..."

"মিত্তিরসাহেব!"

"রাগের কথা নয়, বিজলীবাবু—; সত্যিই তাই।...কলকাতায় আমার দু-একজন বন্ধু আছে; তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ রয়েছে। আমি না জেনে কথাটা বলি নি।"

বিজলীবাবু কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকলেন, পরে বললেন, "আপনি বর্তমানে তিনি কি করে অন্য লোকের স্ত্রী হতে পারেন?"

"পারেন—." অবনী এবার যেন ইচ্ছে করেই সামান্য পরিহাসের চেষ্টা করল, "বেআইনী স্ত্রী হতে বাধা থাকে না।...কথাটা তা নয়, আমাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নেই, হবে না—; কাজেই তার পক্ষে অন্য কারও স্ত্রী হতে বাধা নেই।"

হাতের সিগারেটটা ঠোঁটে তুলেও বিজলীবাবু ধোঁয়া টানতে পারলেন না; আবার নিবে গেছে। মুখের কাছ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, "আপনি যে কি বলেছিলেন সেবার, ডাইভোর্স...তাই নাকি?"

অবনী মাথা নাড়ল। "না। হয় নি। হবে। আমি কলকাতায় আমার বন্ধুকে ডির্ভোসের ব্যবস্থা করতে লিখেছি।"

বিজলীবাবুর কাছে যেন প্রসঙ্গটি বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল। অল্প সময় কি যেন ভাবলেন, বললেন, "মিত্তিরসাহেব, আপনাকে আমি অনেকটা চিনি, এই ব্যাপারটায় চিনতে পারলাম না। স্ত্রীকে আপনি ভালবাসেন নি?"

"না।"

"সম্বন্ধ" করে বিয়ে?"

"না, না। সম্বন্ধ কে করবে, আমার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ ছিল না।...নিজেই করেছিলাম।"

"পছন্দ করে, ভালবেসে?"

"পছন্দ করে বই কি!"

"ভালবেসে নয়?"

"না।"

অবনী গাড়িটা ধীরে করে আনল, রাস্তার মাঝামাঝিখান থেকে একটা মোষ সরে যাচ্ছে; মাত্র শ' দেড়েক গজ দূরে লাটঠার মোড়।

বিজলীবাবু যেন কোনো ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। মিত্তিরসাহেব যে কি বলছেন! এই বললেন পছন্দ করে বিয়ে করেছি, এই বলেন ভালবেসে নয়। পছন্দ করার সময় কি ভালবাসাটা ছিল না! না ভালবেসে পছন্দ! সেটা তবে কি?

"মিত্তিরসাহেব—", বিজলীবাবু গলার স্বর নামিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনি বোধ হয় কোথাও ভুল করেছিলেন। ভালবাসা ছাড়া কি পছন্দ হয়!"

অবনী কথার কোনো জবাব দিল না। ললিতাকে তার কেন পছন্দ হয়েছিল, কোথায় ললিতার আকর্ষণ ছিল বিস্তৃত করে তা বলার আগ্রহও অবনীর হল না। অথচ একটা জবাবেরও বুঝি প্রয়োজন ছিল। অবনী বলল, "হ্যাঁ, ভুল করেছিলাম—, যৌবনের ভুল...।"

বিজলীবাবু কান পেতে কথাটা শুনলেন, হয়ত ভাবছিলেন। ছায়া গাঢ় হয়ে অন্ধকার হল, লাটঠার মোড় ছাড়িয়ে গুরুডিয়ার পথে চলেছে গাড়িটা, কিছুটা দূরে—বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট গজ তফাতে কোনো শবযাত্রা চলেছে। 'রামনাম সত্ হ্যায়'...'রামনাম সত্ হ্যায়'... ধ্বনিটা শোনা যাচ্ছিল, প্রায় ঝিল্লি-স্বরের মতন ভেসে আসছে। ক্রমশ সেটা নিকট হতে লাগল, ধ্বনিটা জোর হচ্ছে; অবনী গাড়ির গতি ধীর করল, শবযাত্রা আরও কাছে, রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামছে, 'রামনাম সত্ হ্যায়'...গাড়ি পাশ কাটিয়ে হেডলাইটের আলোয় ভিজিয়ে চলে গেল। বিজলীবাবু মাথা নত করে মৃতের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে শ্রদ্ধা দেখালেন, এটা তাঁর অভ্যাস। নিশ্বাস ফেলে আপনমনে কথা বলার মতন করে বললেন, "আর একটা গেল!"

গাড়িটা আরও সামান্য পথ এগিয়ে আসতে 'রামনাম' আর শোনা গেল না। লণ্ঠনের আলো দুলছে পেছনে; মাঠ ভেঙে ওরা নদীর দিকে চলেছে।

বিজলীবাবু এবার বললেন, "মিত্তিরসাহেব, স্ত্রী না হয় আপনার পছন্দ-অপছন্দর ব্যাপার ছিল, কিন্তু মেয়েটা? সে তো আর আপনার পছন্দের মুখ চেয়ে জগতে আসে নি, কপালে পেয়েছিলেন। তাকে ফেলে এলেন কেন?"

অবনী এই প্রশ্নটার প্রত্যাশা করছিল। বিজলীবাবু যেদিন প্রথম কুমকুমের কথা জানতে পারেন সেই দিন থেকেই তাঁর মনের কোথাও যেন একটা প্রবল আপত্তি ছিল, এবং দু-চারবার তিনি যে প্রকারান্তরে অবনীকে অভিযোগ না করেছেন এমন নয়। নিজে সন্তানহীন, সন্তানের প্রতি এই অবহেলা যেন তাঁকে খুব বেশি আঘাত দিয়েছে, মর্মাহত করেছে।

অবনী বলল, "কুমকুমকে তার মা তখন ছাড়ে নি।"

"জোর করে নিয়ে এলেন না কেন?"

বিজলীবাবুর আন্তরিকতা ও উষ্ণতা অবনী অনুভব করতে পারল; উনি যে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু অবনী কি বলবে! কি করে বিজলীবাবুকে বোঝাবে—কুমকুমকে কেন আনতে পারে নি! বিজলীবাবুকে বোঝাতে হলে প্রসঙ্গটা দু কথায় বোঝানো যাবে না। অবনীর তেমন কোনো ইচ্ছেও হল না। অল্প সময় চুপচাপ থেকে শেষে অবনী বলল, "তা হয় না, বিজলীবাবু। অসুবিধে ছিল।" বলে থামল, পরে আবার বলল, "কুমকুমকে আমার আনার ইচ্ছে আছে।..."

বিজলীবাবু তাকিয়ে থাকলেন। যেন অপেক্ষা করছিলেন।

অবনী কিছু ভাবছিল, ভাবতে ভাবতে বলল, "ডিভোর্সের মামলায় কি দাঁড়াবে আমি জানি না। মানে, কোর্ট থেকে কাকে মেয়ে দেবে কে জানে। জেনারেলি মায়ের কাছেই দেয়।...এখানে অবশ্য আমার একটা অবজেকসান আছে—থাকবে...। দেখি...কি হয়!"

বিজলীবাবু আর কিছু বললেন না। অবনীর মুখ দেখে তাঁর মনে হল, মেয়ের সম্পর্কে কিছু ভাবছেন হয়ত।

দেখতে দেখতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল। পাতলা কুয়াশা ধোঁয়ার মতন দুলছে, গাড়ির আলোয় কখনও কখনও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মতন দেখাচ্ছিল; সন্ধ্যার মাঠে গন্ধ উঠেছে, তারা ফুটেছে আকাশে, বাতাস বড় শুকনো। এই স্তব্ধতার মধ্যে যেন অতিদূরের বাতাস 'রামনাম সত্ হ্যায়'-এর গুঞ্জন আনল।

অবনী গাড়ি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বিজলীবাবুও নরম সিগারেট নিলেন অবনীর।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে বিজলীবাবু ইতস্তত করে বললেন, "মিত্তিরসাহেব, আমার মন একটা কথা বলে। বলব?"

অবনী ধোঁয়া টেনে নিয়ে সিগারেটটা বাঁ হাতের আঙুলে রাখল। বিজলীবাবু এবার কি বলতে পারেন অবনী যেন তা অনুমান করতে পারছিল। হৈমন্তীর কথা বলবেন কি! বিজলীবাবুকে প্রসঙ্গটা তুলতে দিল না অবনী, তার ভয় হল, সরাসরি তিনি কি বলবেন, কি জিজ্ঞেস করবেন কে জানে!

অবনী বলল, "সুরেশ-মহারাজের আশ্রমে নতুন ডাক্তার আসছে জানেন নাকি?"

"নতুন ডাক্তার!" বিজলীবাবু অবাক হলেন।

"হৈমন্তী চলে যাচ্ছেন—" অবনী বলল। বিজলীবাবুকে এ-যাবৎ সে কথাটা বলে নি।

বিজলীবাবু অবাক হলেন না। বললেন, "উনি যে থাকবেন না তা বুঝেছিলাম, মিত্তিরসাহেব। কিন্তু নতুন ডাক্তার আসছেন জানতাম না। কে আসছেন?"

"জানি না। শুনেছিলাম নতুন ডাক্তারের খোঁজ হচ্ছে।"

"ভাল।" বিজলীবাবু বললেন, বলে নিশ্বাস ফেললেন দীর্ঘ করে।

নিবিড় নীরবতা; গাড়ি চলছে।

"গগনের সঙ্গে আমার নানা গল্প হত—" বিজলীবাবু কিছু পরে বললেন, "আমি খানিকটা জেনেছি শুনেছি, মিত্তিরসাহেব।... মানুষের মতি এই রকমই। না না, আমি ও'র দোষ দিচ্ছি না। তবে, এও তো কেমন একরকম ভালবাসা। আমরা বলতাম প্রণয়, আপনারা বলেন ভালবাসা। কে জানে আপনাদের আজকালকার ভালবাসা কি রকম! সেই গানটার মতন : 'সুধার কলসী অলসে ভাসালি...'"

অবনীর কি মনে হল, হেসে বলল, "আপনার বাড়িতে এবার একদিন ফেয়ারওএলের ব্যবস্থা করুন।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন বিজলীবাবু, কেন যেতে চাইলেন—তা তো ঠিকই, যাবার আগে ওঁকে একদিন বাড়িতে আনতেই হয়। ঠোঁটে সিগারেট রেখে পর পর কয়েকটা টান দিলেন; শেষে সিগারেট সরিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "সে না হয় হবে একদিন মিত্তিরসাহেব, কিন্তু আপনি? আপনিও কি ফেয়ারওএল দিচ্ছেন নাকি?"

অবনী নীরব; বিজলীবাবুর দিকে তাকাল না, একটু বেশি রকম মনোযোগ দিয়ে সামনের রাস্তা দেখতে লাগল যেন। তারপর অকারণে হর্ন দিল বার দুই।

বিজলীবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বললেন, "আপনার স্বভাবে তেমন জোর নেই, মিত্তিরসাহেব। পুরুষমানুষের কব্জি হবে জোরালো, মুঠো করে ধরবেন যখন তখন আর ছাড়বেন না। আলগা মুঠোতে কিছু হয় না।"

অবনী কিছু বলল না। বিজলীবাবু পুরুষমানুষের কব্জির কথাটাই জানেন, তার বেশি জানেন না। ললিতাকে ধরার সময় তার কব্জি জোরালো ছিল, কিন্তু কি হল, ললিতাকে রাখা গেল, নাকি রাখতে ইচ্ছে হল!...তবু, অবনী ভাবল, তার চরিত্রে বরাবর এই জিনিসটা আছে—দুর্বলতা; সে পারে না—ধরে রাখতে পারে না; তার মুঠো—এক ললিতার বেলায় কিছুটা শক্ত হয়েছিল—নয়ত সব সময় আলগা, দুর্বল। কেন?

অন্ধ আশ্রমের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ল।

হৈমন্তীর ঘরের কাছাকাছি গাড়ি থামাল অবনী। বলল, "আমি একটু পরে যাচ্ছি, বিজলীবাবু। আপনি কি আসবেন না সুরেশ-মহারাজের কাছে যাবেন?"

"আপনি আসুন, আমি যাই," বিজলীবাবু বললেন; বলে গাড়ি থেকে নামতে লাগলেন।

অবনীও নেমে পড়ল। বিজলীবাবু গায়ের চাদরটা ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে আবার গায়ে দিলেন, দিয়ে এগিয়ে গেলেন। অবনী দু' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে হৈমন্তীর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সামনের মাঠটুকু পেরিয়ে বারান্দার কাছে আসতেই ঘরের মধ্যে আলো দেখা গেল। দরজা খোলা, পরদা ঝুলছে। হৈমন্তী ঘরেই আছে।

বারান্দায় উঠে আসতেই হৈমন্তীকে দেখা গেল, গাড়ির শব্দে দরজার পরদা সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

অবনী কাছাকাছি এসে বলল, "বিজলীবাবু এসেছেন; সুরেশ্বরকে দেখতে গেলেন।"

হৈমন্তী পরদা সরিয়ে নিল, অবনী ঘরে পা বাড়াল।

হৈমন্তী ঘরে বসে বসে কি করছিল বোঝা যায় না। রেডিয়ো বন্ধ; বইপত্রও কোথাও খোলা নেই; মাঝে মাঝে উল নিয়ে বুনতে বসে—উলের গোলা, বোনার কাঁটাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। বিছানা পরিষ্কার, কোথাও কোনো ভাঁজ নেই, শুয়ে ছিল বলেও মনে হল না।

অবনী বলল, "কি করছিলেন?" বলে হৈমন্তীর মুখের দিকে তাকাল। "কেমন আছেন সুরেশ্বরবাবু?"

"ভাল।"

"জ্বর ছেড়েছে?"

"হ্যাঁ; কাল থেকেই আর জ্বর নেই।"

"যাক, আপনার একটা বড় রকম দুশ্চিন্তা কাটল।"

হৈমন্তী তাকাল। অবনী কি তাকে পরিহাস করল? মুখ দেখে মনে হল না, অবনী পরিহাস করে কিছু বলেছে। হৈমন্তী বলল, "আমার খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিল না।"

হৈমন্তীর গলার স্বরে ঠিক রূঢ়তা নয় কিন্তু কেমন একটা কাঠিন্য ছিল, যেন কথাটা তার পছন্দ হয়নি। অবনী বসল। বসে হৈমন্তীকে লক্ষ করল : কেমন শুকনো ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অসন্তুষ্ট ভাব।

"আর কি খবর—?" অবনী বলল। হৈমন্তী কি সাধারণ একটা কথায় অসন্তুষ্ট হল? তেমন কিছু ভেবে কথাটা অবনী বলে নি।

"খবর ভাল না," হৈমন্তী জবাব দিল।

অবনী বুঝতে পারল না। "কেন? খারাপের কি হল?"

হৈমন্তী সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না; বিছানার কাছে গিয়ে বসল, আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত,
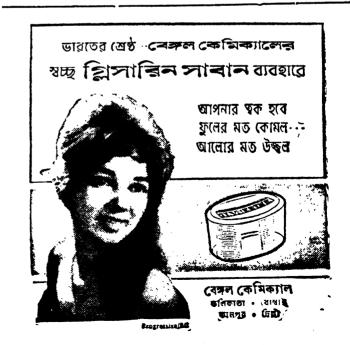
তারপর অবনীর দিকে। বলল, "এখানে আবার একটা রুগী এসেছে—অবস্থা ভাল না।"

অবনী বিস্মিত; কেমন যেন বিমূঢ় হল। এই আশ্রমে আবার সেই রোগ ঢুকল নাকি!

হৈমন্তী বলল, "মানুষের সাধারণ একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকে, এখানকার লোকের তা নেই।"

"সেই এপিডেমিক—?"

"হ্যাঁ।"

"কার হল?"

"এখানকার কেউ না! তাঁতঘরে হারকিষণ বলে আছে একজন তার ভাই। নদীর ওপারে গাঁয়ে থাকত। তাকে নিয়ে এসেছে।"

"এখানে?"

"আর কোথায় যাবে! এটাই তো যত জঞ্জাল ফেলার জায়গা।"

"কবে?" বলেই অবনীর মনে পড়ল, সেদিন সে যখন সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা

করতে গেল তখন বাইরের ভেঙে-যাওয়া জটলার মধ্যে বোধ হয় এই রোগী আনা-নেওয়ার কথাটা হচ্ছিল। শিবনন্দনজী সম্ভবত তাই অত ব্যস্ত ছিলেন। হয়ত সেদিন অবনী যখন চলে আসে শিবনন্দনজী ওই বিষয়েই কিছু বলতে এসেছিলেন। অবনী বলল, "সেদিন আমি যখন সুরেশ্বর-বাবুকে দেখতে গেলাম বোধ হয় এ-রকম একটা কথাবার্তা চলছিল।"

মাথা নাড়ল হৈমন্তী। "পরের দিন বেলায় গরুর গাড়িতে নদী পার করে নিয়ে এসেছে।"

অবনী বুঝতে পারল না কি বলবে।

হৈমন্তী বিরক্ত গলায় বলল, "এদের মাথায় যে কি আছে আমি ভেবে পাই না। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ এভাবে ওই রুগী এখানে আনে।"

"এ-রকম একটা রিস্ক উনি নিলেন কেন?"

"দয়া।"

"কিন্তু এখানে...! এটা তো জেনারেল হাসপাতাল নয়..."

"এটা কিছুই নয়।"

"আপনি কিছু বললেন না?"

"আমার বলার অপেক্ষায় ওরা ছিল না।" হৈমন্তী রাগে বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। মানুষের সাধ্য অসাধ্যের জ্ঞান থাকা দরকার, সুরেশ্বরের সে জ্ঞান নেই। সে জানে না তার ক্ষমতা কতটুকু অক্ষমতা কত বেশি।

অবনী বলল, "রোগটাকে আমার আপনারা আশ্রমে ছড়াবেন।"

"আমি না, উনি—ও'রা।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এতে কি লাভ হল?"

"কিছু না।...দয়ায় গলে মহত্ত্ব দেখানো হল।"

"বরং টাউনে নিয়ে গিয়ে সরকারী হাসপাতালে দিতে পারতেন।"

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না। মানুষ যদি নির্বোধ হয়, না বোঝে তাকে কে বোঝাবে! এখানে যার চিকিৎসা হবে না, হওয়া সম্ভব না—তাকে রেখে কি লাভ? এমনিতেও যে মরত তাকে এখানে এনেও সেই মারছ। চোখের সামনে মনোহর মরল, বুড়ো তিলুয়া মরল—তোমরা দেখনি? তবে? 'গিরজা তো বেঁচেছে, হেম...'। হ্যাঁ বেঁচেছে; কিন্তু সে কপাল জোরে, হৈমন্তীর হাতযশে নয়। সুরেশ্বর এ-সব বুঝেও বুঝবে না। 'কি করব হেম, ওরা বড় ধরেছে।'

সুরেশ্বরের এই হঠকারিতা অবনীরও পছন্দ হচ্ছিল না। কি করে একজন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন নির্বোধের মতন কাজ করে কে জানে! নিতান্ত দায়িত্বহীন না হলে এভাবে মরণাপন্ন, সংক্রামক রোগীকে আনত না। হৈমন্তীর তিক্তবিরক্ত হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে: সে চোখের ডাক্তার, এই হাসপাতালটাও চোখ দেখাবার, এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু নেই, তবু কেন তুমি রোগী আনলে?

অসন্তুষ্ট হয়ে অবনী বলল, "ভদ্রলোক নিজের মর্জিতে কাজ করেন।......উচিত অনুচিত বোধটাও বোধ হয় তাঁর সবসময় থাকে না।"

হৈমন্তী বলল, "দয়া দেখানো খুব সহজ; ও শুধু দয়া দেখাতে শিখেছে—, দায় নিতে নয়।...আমি হাজার বার করে বলেছি, এসব আমি পারি না, বুঝি না, আমি যা জানি না তার দায় আমি ঘাড়ে করতে পারব না। তবু...। মানুষের জীবন নিয়ে এই ছেলেখেলা আমার ভাল লাগে না।"

অবনী তাকিয়ে থাকল। হৈমন্তীর চোখে এমন একটা অসহায়, অক্ষম ভাব ফুটে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো অপরাধে অপরাধী হবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আছে। সম্ভবত এই দায়িত্ব তার পক্ষে দুঃসহ ভারের মতন মনে হচ্ছে। নিজের অক্ষমতায় সে পীড়িত, বিব্রত।

অবনী কিছু ভাবল; "লোকটার অবস্থা এখন কেমন?"

"ভাল না।"

"বয়স কত?"

"বছর পঁচিশ।"

"কোনো রকমে টাউনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেত না?"

"নিতে পারলে ভাল ছিল। চল্লিশ মাইল টানা হেঁচড়া। কেই বা নিয়ে যায়!"

"কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।"

"কি ব্যবস্থা? আপনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন?"

অবনী অন্যমনস্কভাবে বলল, "ভাবছি।"

হৈমন্তী কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল, পরে বলল, "না।...যে এনেছে এ দায়িত্ব তার। রাস্তার মধ্যে রুগী মরলে সে দোষ হবে আমার, আপনার।"

অবনী ভাবল; বলল, "এখানে এভাবে রুগী পড়ে থাকলেই কি সে বাঁচবে! তাছাড়া আমার ভয় হচ্ছে যদি আপনার কিছু হয়...! রোগটা এখানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

অবনীর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা হৈমন্তীকে অকস্মাৎ কেমন দুর্বল ও অভিভূত করল। সুরেশ্বর কোনোদিন এ চিন্তা করে নি: ভাবে নি যে হৈমন্তীরও আপদ-বিপদ হতে পারে। মুখে সে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছে, কাজে হৈমন্তীর জীবনের মূল্য বড় দেয় নি।

অবনী সিগারেট ধরাচ্ছিল। হৈমন্তী লাইটারের আলোর শিখা দেখল, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ পেল। কেমন যেন বেহুঁশে ছিল কিছুক্ষণ, হুঁশ হলে বলল, "আমার কিছু হবে না। ডাক্তারদের রোগ হয় না।" বলে হাসবার চেষ্টা করল।. তারপর আলোর দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল, যেন কিছু দেখছে; শেষে বলল, "যে কয়েকটা দিন আর আছি—অশান্তি করে লাভ নেই।..."

"এভাবে থেকেও তো আপনার শান্তি হচ্ছে না।"

"না। তবে...দু চারদিনের মধ্যেই আমার দায়িত্ব ফুরোবে।"

অবনী বুঝতে পারল না, তাকিয়ে থাকল।

হৈমন্তী বলল, "কি বলে যে—মেডিকেল রিলিফ—তাই আসছে। দু একজন ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র। আপনাদের সুরেশ-মহারাজ এখানে তাদের হাসপাতাল খুলতে ঘর দিয়েছে। তারা আসবে, থাকবে, চিকিৎসা করবে। আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না।"

অবনী বিশ্বাস করতে পারছিল না, "গুজব, নাকি সত্যি?"

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, "না, গুজব নয়।... আজ বিকেলেই টাউন থেকে সরকারী লোকজন এসেছিল গাড়ি করে। কথাবার্তার সময় আমি কিছুক্ষণ ছিলাম।"

অবনীর হঠাৎ সেই স্টেশন ওয়াগনের কথা মনে পড়ল, আসবার সময় পথে যেটা দেখেছে। অবনী বলল, "আসবার সময় একটা সরকারী স্টেশন ওয়াগন দেখে-ছিলাম। সেটা নাকি?"

হৈমন্তী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, সেটাই।

দুজনেই তারপর নীরব হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে অবনী বলল, "আপনা-দের চোখের হাসপাতালটা তাহলে এপি-ডেমিকের হাসপাতাল হচ্ছে?"

'এখন কিছুদিনের জন্যে।...আগে প্রাণ, পরে না চোখ..." হৈমন্তী ম্লান হাসল।

অবনী সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দেবার আগে এক মুখ ধোঁয়া গলায় নিল; বলল, "এবার বোধ হয় আপনি ফিরতে পারেন।"

"পারি।"

"কবে?"

"ইস...আপনি আমায় তাড়াবার জন্যে বড্ড যে ব্যস্ত।"

অবনী কি যেন বলতে গিয়েও পারল না। এবং কেমন বিব্রত ও আড়ষ্ট বোধ করল। শেষে সামলে নিয়ে হেসে বলল, "না, কবে যাচ্ছেন জানা দরকার, আমরা আপনাকে একটা ফেয়ারওয়েল দেব।"

হৈমন্তী হাসল না; অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল। (ক্রমশ)

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ

গত কয়েক বছরের আর্থিক উদ্যোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি তা এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্রথমত, দেশের দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয় নি অথবা সেটা অপরিবর্তনীয় নয়। উপযুক্ত কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব।

সম্পদ নির্মাণ বৈষয়িক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অবশ্য আর্থিক উন্নয়ন বলতে কেবল বস্তুগত মূলধন বাড়িয়ে তোলা বোঝায় না—উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধন। কিন্তু আর্থিক উদ্যোগ আরম্ভ করার পক্ষে সম্পদ নির্মাণের উপর গুরুত্বদান একটি ভালো নীতি। সঞ্চয় এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে মূলধন নিয়োগ করে অনেক কিছু করা যায়।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের গুরুত্ব

সম্পদ নির্মাণের মতো শিল্পব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষমতার একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। মূলধন খাটাবার সুযোগ সন্ধান এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যোগ্যতা, দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। বেসরকারী ব্যবস্থার শিল্প পরিচালকদের বেলা যেমন, রাজপুরুষ এবং সরকারী সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক-দের ক্ষেত্রে সে রকম যোগ্যতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। উৎকৃষ্ট প্রশাসন—বৈষয়িক উন্নয়নের যা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—আর্থিক ব্যবস্থার গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন-গুলি সুশৃংখলভাবে আনার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

কৃষি উৎপাদনের বিশেষ ভূমিকা

গত পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈষয়িক অগ্রগতির মানে শুধু শিল্পোন্নয়ন নয়, তার জন্য কৃষি উৎপাদনের সম্প্রসারণও দরকার। বলতে গেলে, কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন হচ্ছে শিল্পবিকাশের একটি পূর্ব-শর্ত। দেশের জনসংখ্যা যখন দ্রুত বেড়ে চলেছে সে সময় কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধি জরুরী। ভারতের আর্থিক উদ্যোগের ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, কৃষির অগ্রগতি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নির্ধারণ করে এবং কৃষির নিস্তেজ অবস্থা দেশের উন্নয়ন ব্যাহত করে। সেই সঙ্গে চলাচল, পরিবহণ ও গুদাম-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতিসাধনও বৈষয়িক অগ্রগতির পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমিয়ে আনার প্রয়োজন শুধু দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকটের আশংকার কারণে অনুমোদনযোগ্য নয়, লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়লে উপাদানরাশির একটা বড়ো অংশ ভোগ বা ব্যবহারের জন্য নিয়োগ করতে হবে। বেশী সংখ্যায় শিশু থাকলে দেশে আরো বিদ্যালয়, বড়ো বাসগৃহ, তাদের কাপড়চোপড় উৎপাদন করার আরো কল-কারখানা প্রভৃতি গড়ে তোলা দরকার। তার ফলে প্রতি শ্রমিকের জন্য আরো যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং সাধারণভাবে উৎপাদন করার মাথা পিছু সুবিধাসৃষ্টির জন্য আবশ্যক মূলধনের পরিমাণ কমে যাবে।

আর্থিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে একটি পরিচ্ছন্ন সর্বাংগীণ পরিকল্পনা যে রচনা করা হয় নি তা নয়; কিন্তু বাস্তবে অনুদিত করা যায় এরকম সুপরিকল্পিত প্রকল্পবিন্যাসের অভাবে নানা অসুবিধা ও বিচ্যুতি ঘটেছে। খুব কম প্রকল্পের কাজই হাতে নেবার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং হিসাবপত্র নির্ভরযোগ্যভাবে করা হয়েছে। ফলে, অনেক প্রকল্প ও কার্যক্রম ন্যায্য খরচে এবং সময়মতো শেষ করা সম্ভব হয় নি।

পরিকল্পনার প্রয়োগ

এত দিনে বোধহয় এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার চাইতে পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগ আরো কঠিন সমস্যা। পরিকল্পিত উৎপাদন নির্ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎপাদনে পৌঁছাবার জন্য বিশেষ বিশেষ নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। না হলে তা কেবল ভবিষ্যৎবাণী অথবা সদিচ্ছামূলক মনোভাবের প্রকাশ থেকে যাবে। এবংপ্রকার কারণে, পরিকল্পনামূলক উদ্যোগের বিন্যাস এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে দেশের উন্নয়ন একেবারে নীচের থেকে উপরের দিকে গড়ে তোলা যায়।

আর্থিক উদ্যোগে সাফল্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্ববোধ এবং ভালো প্রশাসন ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর-শীল। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রায়ই এটা উপলব্ধি করা হয় না যে, মূলধন নিয়োগ করলেই অগ্রগতি অর্জন করা যায় না এবং উন্নয়নের ব্যাপারে বেশী মূলধন খাটানোর চাইতে প্রশাসন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার শক্তিবৃদ্ধি আরো গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রচনা করার সময় দেশের আর্থিক সম্ভাবনা অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, দেশের প্রশাসন-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দিকে তেমন দৃষ্টি রাখা হয় নি।

শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। কেবল বস্তুগত মূলধন নয়, মানবসম্পদের সম্যক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা এখন সকলেই স্বীকার করে। শিক্ষাদান ব্যয়সাধ্য হওয়ায় দেশের পরিমিত অর্থসংগতির কতখানি তার উপর খরচ করা যাবে তা অবশ্য একটি স্বতন্ত্র এবং জটিল প্রশ্ন।

বহির্বাণিজ্যের স্থান

বাস্তব জগতে আভ্যন্তরিক সঞ্চয়কে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত করা দেশের পক্ষে সব সময় সহজ নয়। ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অবস্থা গত কয়েক বছর ধরে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। কৃষি উৎপাদনের মতো বহির্বাণিজ্য দেশের আর্থিক অগ্রগতি অনেকখানি নিয়মিত করে। রপ্তানি থেকে উপার্জন যত বেশী হবে এবং ভোগের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর দেশ যত কম নির্ভর করবে, ততোই তার উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রসারিত হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

চীনে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব শুরু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।—"ত পুষ্প এতদিন শুধু কুঁড়িই ছিল. এবার রক্তবর্ণের পরিপূর্ণ সমারোহে

প্রস্ফুটিত হয়েছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

হংকং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে, এক বছর ধরিয়া পিকিং-এর শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে-ভাবে চলিতেছে তাহাতে চীনের এক কোটি মুসলমানের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে।—"তা হলেও চীন তো; সুতরাং বলা যায়—তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নেইকো অবহেলা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পিকিং-এর পথে পথে পোস্টার পড়িয়াছে,—চু এন লাই-কে জীবন্ত পোড়াইয়া মার। সহযাত্রীও শ্যামলালের মতই কবিতায় মন্তব্য করিলেন—"এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে রথুরাজ।"

অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"সে তো যেন হলো, কিন্তু এখান থেকে তীর ছুঁড়বার পর যা গিয়ে কলাগাছে পড়ল, তাতে যে হাটু বেয়ে রক্ত পড়লে এবং চোখ দুটো যাবে, তার কী হবে"—কথাটা তার প্রায় ধাঁধার মতো শোনাল।

আসন্ন নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচনী প্রতীক সম্বন্ধে বিশুখুড়ো বলিলেন—"কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য একটু পরিবর্তন ছাড়া নির্বাচনী প্রতীক প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা ভাবছিলাম, ট্রাম-বাস-এর প্রতীক বর্তমান পরিবেশে ব্যবহার করলে সেটা বলদ বা কাস্তে-হাতুড়ির চেয়েও জোরদার হতো;

রেশনের বরাদ্দ হ্রাসের চেয়ে এ-দুটির বরাদ্দ হ্রাস কোন অংশে কম মারাত্মক নয়।"

এই প্রসঙ্গে ট্রাম উঠিয়া গেলে "ট্রামে-বাসে" থাকিবে কি না এই প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। আমরা অবশ্য উত্তরে ঠেলা-টেম্পোর কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু বিশুখুড়ো বলিলেন—"ট্রামে-বাসে থাকতে আপত্তির কোন সংগত কারণ নেই, কেননা জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর নেই কিন্তু ঠাকুর বাড়ি আছে, রাজা নির্বাসনে গেলেও রাজভবন আছে, অন্ন নেই কিন্তু অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়া আছে। সুতরাং বুঝি বলা যায়—ট্রামে-বাসে ইজ ডেড, লং লিভ ট্রামে-বাসে"—আমরা বাসের ঝাকুনি খাইতে খাইতেও ধ্বনি তুলিলাম—লং লিভ ট্রামে-বাসে।

তুলার অভাব মিটাইবার জন্য বস্ত্র শিল্পের তরফ হইতে সরকারের নিকট দাবি জানান হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"তাঁদের দাবি মেটানো সরকারের

পক্ষে খুবই শক্ত, কেননা কানে গোঁজার প্রয়োজনে যে-পরিমাণ তুলা সরকারের চাই, শুনেছি বর্তমানে তা-ও নাকি যথেষ্ট নয়!!"

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড়) রজত জয়ন্তীর উদ্বোধনী সভায় মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন—ভালবাসা হইল শিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম। শ্যামলাল স্বামীজী মহারাজের কথাটা বুঝিতে না পারিয়া অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে মন্তব্য করিল—"সবিনয়ে নিবেদন করব, কত ভালবাসায় শিক্ষার বারোটা বেজে গিয়েছে, তবু মানুষের শিক্ষা কি আর হয়"—এবং তার এই ভ্রমাত্মক মন্তব্যের সমর্থনে শ্যামলাল আবার মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয়ে গীত গানের একটি চরণ আবৃত্তি করিয়া শুনাইল—"ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে রে।"

শুনিতেছি ভোজ্যজাত দ্রব্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইবার আশ্বাসে অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন।—"কিন্তু নিয়ন্ত্রণের শিকেয় সন্দেশ রেখে জিভে শান দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে

না। তবে সাময়িকভাবে হলেও নিয়ন্ত্রণ উঠে না গেলে নির্বাচনের পর ইতরজন কোথা মিষ্টান্ন পাওয়া যাবে কোথায়"—সহযাত্রী বুঝি জিভ চাটিতে চাটিতেই মন্তব্য করিলেন।

এক সংবাদে প্রকাশ, বিদেশের বাজারে ময়ূরপুচ্ছের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"এতং সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ না হলে দেশের বায়সকুল শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হবেন!!"

সংবাদটা অনেকবারই শুনিয়াছি, আবার নূতন করিয়া শুনিলাম—বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করার তোড়জোড় চলিতেছে। অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"ভালো কথা। তবে বিনা আসনে টিকিট বিক্রয় বন্ধ করার কথা এখনো শুনিনি"—মনে হইল সহযাত্রী ইডেনে টেস্টের টিকিট বিক্রয়েরই ইঙ্গিত করিলেন।

সংবাদে প্রকাশ, এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অন্যান্যদের সঙ্গে খেলোয়াড়রাও উপস্থিত থাকিবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কথা। তবে মনে হয়, এতে ক্রিকেট খেলুড়েরা থাকবেন না, কেননা ক্রীজ থেকে প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত তাঁদের মিছিল আমরা সম্প্রতি ইডেন উদ্যানেই প্রত্যক্ষ করেছি!!"

শ্রীমোরারজী দেশাই জয়পুরে নির্বাচনী ভাষণ দেওয়ার সময় কয়েকজন লোক সারা দেশে গো-হত্যা বন্ধের দাবি জানাইয়া নানা রকম ধ্বনি দিতে থাকেন এবং বক্তৃতা-মঞ্চে ইট-পাটকেল এবং জুতা ছুঁড়িয়া দেন। শ্যামলাল বলিল—"প্রতিবাদের নিমিত্ত শেষোক্ত অস্ত্রটি ব্যবহার না করলেই ভালো হতো, আফটার অল, সেটা গো-মাতার চর্মে প্রস্তুত তো।

বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে

"বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে।" প্রবন্ধের (দেশ, ৭-১-৬৭) অন্তিম সিদ্ধান্ত (—"আজকের প্রয়োজন হল, বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধানের") নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু লেখকের অন্য দু একটি অভিমত সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়; তার মধ্যে উচ্চারণ বিষয়ক ব্যাপারটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই।

ভাষার ইতিহাসের বিশদ আলোচনা যেহেতু পত্রের পরিসরে করণীয় না, অতএব সংক্ষেপে বলব—বাংলায় ঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করা অভিধান-সংকলয়িতার পক্ষে এখনও প্রায় অসম্ভব কাজ। বাংলা শব্দের বহু বিচিত্র উচ্চারণের ভাষাতাত্ত্বিক কারণ ও নিয়ম যে মোটেই বের করা যায় না তা না, কিন্তু তা এত ব্যাপক ও পরিবর্তনশীল যে, একবার তার উল্লেখ করে রাখলেই সব সময় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। 'ব্যাণ্ডাল লেম্প' বা 'কেমন আছেন' (এ-য়ুক্ত ক)—এই জাতীয় উচ্চারণ অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশের অভাব হেতু করা হয় না, করা হয় প্রয়োগকর্তা ঐ শব্দের বিশিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাব এড়াতে অক্ষম বলে।

সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে ধরা পড়বে, তৎসম শব্দেরও অঞ্চলবিশেষে উচ্চারণ-পার্থক্য বর্তমান (অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সংস্কৃত কখনও মুখে বলবার ভাষা ছিল কিনা সে বিতর্কের প্রসঙ্গ এসে পড়ে)। আমি বলতে চাই—উচ্চারণ-পার্থক্যের কারণে তৎসম ও অ-তৎসম বাংলা শব্দের ভিন্ন বর্ণমালা হওয়া উচিত, যেহেতু বাংলা ভাষা থেকে তৎসম শব্দের সম্পূর্ণ বিলোপের আশু সম্ভাবনা নেই। শুধু অকারের না, তৎসম শব্দের প্রায় সব স্বরবর্ণের উচ্চারণই বাংলায় অল্পবিস্তর পালটে গেছে। কিন্তু লেখকের দেওয়া দৃষ্টান্ত সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। ঐ, ঔ-এর বাংলা উচ্চারণ, লেখক দেখিয়েছেন, 'ওই' 'ওউ'। এ বিষয়ে কথা এই—ই বা উকারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ ওকারের মত হয়ে যায়, এটা ভাষাতত্ত্বের নিয়ম। দৃষ্টান্ত হিসেবে অতি এবং অনুশব্দের উচ্চারণ লক্ষ করুন। কাজেই ওই, ওউ না লিখে অই অউ লিখলেও একই উচ্চারণ হবে এবং তা লিখলেই দেখা যাবে এদের সংস্কৃত উচ্চারণ আই, আউ এর সঙ্গে এদের তফাত সামান্যই যেহেতু 'অ' এখানে হ্রস্ব উচ্চারণযুক্ত লেখক নিজেই বলেছেন।

উচ্চারণভিত্তিক বানানের পরিকল্পনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর রূপায়ণ আদৌ সম্ভব কিনা—বলা মুশকিল। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বানের মত অন্য অনেক ভাষাতেই আছে। কিন্তু একটি শব্দের উচ্চারণভেদে যখন অর্থ পালটায়, তখন বানানের প্রকারভেদ প্রবর্তন করা ও মানা উচিত বলেই মনে হয়। বাংলা বানানের সম্ভবপর সরলীকরণের প্রয়োজন যেহেতু আমি নিঃশর্তে মানি, সুতরাং লেখকের প্রদত্ত উদাহরণ আমি এভাবে লিখব—

কোনদিন (কোনদিন বোঝাতে)

এবং কোনওদিন (কোনোদিন বোঝাতে)। কোনদিকে—প্রথম দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

নতুন শিক্ষার্থী শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগরীতি (usage) দেখে ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর যাদের মাতৃভাষা বাংলা না, তাদের আপন গরজে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করতে হবে। বিদেশীর ভাষা শিক্ষার সুবিধের জন্যে কোন ভাষার পরিবর্তন বিবেচ্য না। তবে বাংলা ভাষা নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়, তাদের আপন সুবিধের জন্যেই বাংলা ভাষার সুচিন্তিত ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন এবং সে ব্যাপারে অভিধানের ভূমিকা যে উল্লেখযোগ্য এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।

বিজয়া দাশগুপ্ত
কলিকাতা-১৯

'সাম্প্রতিক সাহিত্য'

॥ ১ ॥

গত ৭ই জানুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত নরেন্দ্র দেবের 'সাম্প্রতিক সাহিত্য' রচনাটি আমাকে বিস্মিত করেছে। দেব মহাশয় একজন প্রবীণ সাহিত্যিক—তাই তাঁর আলোচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-গতি সম্বন্ধে সারগর্ভ কিছু আশা করেছিলাম—কিন্তু নিরাশ হয়েছি। কেবল আত্মস্তুতি (ইংরেজীতে যাকে বলা যায় Patting own back) ছাড়া এতে অন্য কিছু নেই। লেখক প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি বস্তু বা চরিত্রের মধ্যে ভালো ও মন্দের দুটি দিক আছে—কিন্তু কেমন করে তিনি নিজে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের মন্দ দিকটি একেবারে ভুলে গেলেন জানি না।

সাহিত্য যে জীবনের দর্পণ তা আমরা জানি এবং যেহেতু জীবনে আছে 'পঙ্কিলতা, নোংরামি ও ব্যভিচার' তার প্রতিফলন ঘটবে সাহিত্যে এতে আশ্চর্য কি? কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রতিফলনের পদ্ধতি ও মাত্রাবোধ সম্বন্ধে আধুনিক লেখক সচেতন নয়। যেমন দক্ষ চিত্রশিল্পী Model-কে সামনে রেখেই ছবি আঁকেন—তবু তাঁর সৃষ্টি যে নিছক ফটোগ্রাফিতে পরিণত হয় না সে তাঁর রং ও তুলির ওপর অবাধ আধিপত্যের প্রভাবে। সেই রকম জীবন-দর্পণে যে নোংরামি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তার ওপর লেখকের লেখনীর কারুকার্যই হবে শিল্পীর সৃষ্টি—যার অভাব আমরা এখন অনুভব করছি।

লেখকের বক্তব্য 'প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার, তেমনি জীবন-দীপের তলদেশেও ছায়ার মত অন্ধকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। ছায়াকে বাদ দিয়ে কায়ার সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র আঁকা সম্ভব নয়।' এখানে সকলেই একমত। অন্ধকারকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলোর স্তুতি কেউ চায় না। কিন্তু ভুললে চলবে না আলোচ্য উপমায় মুখ্য চিত্র প্রদীপের আলো—সেই আলোটিকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যেই প্রয়োজন অন্ধকারের। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যিক প্রদীপের আলোর চেয়ে, তার কোলের অন্ধকারটিকেই মহিমান্বিত করে তোলেন বেশী—এবং সেইটিই নিন্দনীয়।

লেখক বলেছেন 'সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা ও মানবগোষ্ঠীর চরিত্র পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব সাহিত্যিকের নয়। ভালো কথা। কিন্তু সেই চরিত্রকে বিকৃত কদর্য রূপে দিয়ে সমাজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করার অধিকারও কি তাঁর আছে?

শ্রীতপনজ্যোতি সান্যাল
হাওড়া-৪

॥ ২ ॥

'দেশ' (সংখ্যা ১০) পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্র দেবের 'সাম্প্রতিক সাহিত্য' নিঃসন্দেহে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। তবু শ্রী দেবের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন যোগ্য নয়।

তিনি লিখেছেন....'সাম্প্রতিক সাহিত্য-শিল্পীরা এ সত্যটা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন নিয়ে জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। ...তাঁদের এই সাহস ও সত্যনিষ্ঠা যথার্থই প্রশংসনীয়। আজকের

সাহিত্য তাই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।'...এ কথা ঠিক যে সাম্প্রতিক সাহিত্যে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে। সনাতনপন্থী সাহিত্যের সাথে আজকের সাহিত্যের এক আদর্শগত বৈষম্য ঘটে গেছে। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকেরা কোন কিছুই গোপন রাখছেন না, সত্যকে অকপটে মেলে ধরছেন; কিন্তু সত্যের আনন্দ-কে নয়। ফলত আজকের সাহিত্যে সজীবতা ও প্রাণের যোগ Love of life-এর আন্তরিকতা থেকে Frustration of life-এর যন্ত্রণায় নিরন্তর আহত হয়ে চলেছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রই জীবন প্রীতিতে বিশ্বাসী।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য পাঠ করে লেখকদের সুস্পষ্ট কোন জীবনবোধের সাথে পাঠকেরা পরিচিত হতে পারছেন না। যুগ-যন্ত্রণার ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় আজকের সাহিত্যিকেরা চোখের সামনে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে যাচ্ছেন। ফলে কখনো কখনো চোখ তৃপ্তি পেলেও পাঠকদের মন সজীব হচ্ছে না।...'সমাজ ও জীবনের পঙ্কিলতা, নোংরামি ও ব্যভিচার দেখে কি অন্ধের মতো দু চোখ বন্ধ করে থাকবে?'... কোনকালের সাহিত্যিকেরই সমাজ ও জীবনের কোন দিক থেকেই দৃষ্টি সরানো উচিত নয়। কিন্তু সাহিত্যিকের অপর নাম শিল্পী। অতএব, শিল্পীমাত্রেরই একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গি থাকবে আশা করা যায়। অথচ সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি যখন আর পাঁচজন সাধারণ দর্শকের মত হয়ে পড়েছে তখন তাঁদের শিল্পীসত্তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আসে।

বর্তমান সমাজের নোংরামির সমাবেশে আধুনিক লেখকরা যে Hermony-এর সৃষ্টি করে চলেছেন তা প্রায়শই বেসুরো। কেননা এ'রা পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবে কলমকে অগ্রসর করেছেন যতখানি, ঠিক সেই অনুপাতে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে নিজস্ব জীবনবোধ গড়ে তুলতে পারেন নি। এই যুগের ছিটে-ফোঁটা, টুকরো-টাকরা যে সমস্ত চিত্র এ'রা তুলে ধরছেন, তার গুণে সাম্প্রতিক সাহিত্য রূপের পশরার মূল্যটুকু পেতে পারে—রসের স্বীকৃতি পাবে না। Coleridge, Bradley তাঁরাও বলেন, যে সামাজিক সত্তার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে ধরা যায় না।

সুদীপ্ত চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

দুই দশকের শিল্পী

গত ১৭ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় "নিখিল বিশ্বাস ও দুই দশকের শিল্পী"র জন্য লেখক প্রণবরঞ্জন রায় ও 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ধন্যবাদার্হ। প্রণবরঞ্জনের সুলিখিত স্মৃতিচিত্র তথ্যহৃদয়ের স্পর্শে পূর্ণ। সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভরশীল প্রবন্ধে কিছু তথ্যের ভুল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ৭ই জানুয়ারীর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅহিভূষণ মল্লিক লিখিত আলোচনায় কয়েকটি সামান্য বিষয় উল্লেখ করে যে পত্র দিয়েছেন, তথ্যের ভুল সেখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন কোনও দিনই "সোসাইটি অব কন্টেমপরারী আর্টিস্টের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না।" কিন্তু প্রণবরঞ্জন উক্ত সংস্থার জন্মের প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসাবে তার নাম উল্লেখ করেছেন। অহিবাবু লিখেছেন "ইউনিয়ন অব পেন্টার্স অ্যান্ড স্কালপটারস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" নামে একটি সংস্থা গঠন করার কথা হয়েছিল। এখানেও অহিবাবুর স্মৃতি নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ঐ সংস্থার নাম ছিল "পেন্টার্স অ্যান্ড স্কালপটারস ইউনিয়ন, ক্যালকাটা।" এবং ঐ নাম বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে বোম্বাই শহরে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তার 'ক্যাটালগ ও প্যাড'-এ ব্যবহৃত হয়েছিল। ২।৬।৬০ তারিখে উক্ত সংস্থার অফিস ৭এ নং মহীশূর রোডে ১৪জন সদস্যের উপস্থিতিতে অহিবাবু ও নিখিল যুগ্ম সম্পাদক ও অনিলবরণ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ২৭।৮।৬০ পর্যন্ত ঐ নামই বহাল ছিল। সর্বসম্মতক্রমে ৮ই অক্টোবর '৬০ ঐ একই সংস্থার নাম বদল করে হয় "সোসাইটি অব কন্টেমপরারী আর্টিস্টস।" এবং এ সভায় একমাত্র অহিবাবুই অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কর্মী পরিষদের কোন বদল হয় না। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় উক্ত সংস্থার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে অনুপস্থিত থাকার দরুন ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীর পর নতুন কর্মী পরিষদ নির্বাচিত হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুপস্থিত সদস্যদের সদস্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেই সময় অহিবাবুর সাথে ঐ সংস্থার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

অহিবাবু আরও লিখেছেন সর্বরী ও প্রকাশ কর্মকার কোনদিনই কন্টেমপরারী আর্টিস্টের সভ্য ছিলেন না। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই প্রকাশ ও সর্বরী ঐ সংস্থার সদস্য ছিলেন। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ, নিয়মিত চাঁদাদান, সভায় উপস্থিতি; ২২।১২।৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি কি সদস্যভুক্তির যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

নানা কারণে কয়েকজন সহযোগী শিল্পীর সাথে এই সংস্থার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু শিল্পীদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট আছে। তারাও এই সংস্থার শুভাকাঙ্ক্ষী। তা ছাড়া নিখিল বিশ্বাসের স্মৃতিচারণে প্রণবরঞ্জন যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় প্রশ্নের অবতারণা অপ্রয়োজনীয়।

প্রসঙ্গত প্রণবরঞ্জনের একটি ভুলের উল্লেখ করছি—নিখিলের মৃত্যুদিন ১১ই নভেম্বর নয় ১০ই নভেম্বর।

পরিশেষে পত্র প্রকাশের কারণে সমকালীন শিল্পী ও শিল্পদরদীদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ক্ষুন্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই কামনা করি।

শ্যামল দত্তরায়
যুগ্ম সম্পাদক, সোসাইটি অব কনটেমপোরারী আর্টিসট।
কলকাতা-২৬।

পিঠবাণ-চড়ক

শনিবার ৮ই পৌষ ১৩৭৩ তারিখের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৮০১ পৃষ্ঠায় শ্রীনেপাল মজুমদার কর্তৃক লিখিত "ধর্মরাজ পূজায় আজও পিঠবাণ-চড়ক" প্রবন্ধের ৮০৫ পৃষ্ঠার (২) পরিচ্ছেদে "সদ্গোপ" জাতিকে অনুন্নত শ্রেণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ভ্রান্তিমূলক।

সরকারী নথিপত্রে ও ঐতিহাসিক বিবরণী ও প্রমাণ পত্রে সদ্গোপ জাতি অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত নয় একথা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সদ্গোপ জাতির মধ্যে মন্ত্রী, লোকসভার সদস্য, পশ্চিম বাংলার বিধান-সভার সদস্য, বহু গুণীজ্ঞানী অধ্যাপক উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত আছেন। চিকিৎসক, ব্যবহারজীবি, সঙ্গীতশিল্পী, পৌরপিতা, ইঞ্জিনীয়ার, লেখক, সমাজসেবী, চিত্রশিল্পী এবং ক্রীড়াবিদ, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীতেই সুনামের সহিত দেশবাসী ও জনসাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিতেছেন।

পরিতোষ ঘোষ
সহ-সম্পাদক—বঙ্গীয় সদ্গোপ সভা।

লেখকের উত্তর

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, উক্ত প্রবন্ধে আমি সদ্গোপ শ্রেণীকে অনুন্নত শ্রেণী বলতে চাই নি। পত্র লেখক লিখেছেন—"প্রবন্ধের ৮০৫ পৃষ্ঠার (২) পরিচ্ছেদে 'সদ্গোপ' জাতিকে অনুন্নত শ্রেণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ভ্রান্তিমূলক।"

বক্তব্য এই, আপনি যদি সতর্কতার সঙ্গে আমার প্রবন্ধের ঐ অংশটি পড়েন তাহলে লক্ষ করবেন এবং শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করে আমি ডোম-বাউরী-বাগদী ইত্যাদিদেরকেই অনুন্নত শ্রেণী বলে বোঝাতে চেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের মানুষকে ছোট ভাবি না। এবং কাউকে আঘাত দেওয়াও আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এমনকি ডোম বাউরী বাগদী ইত্যাদি তথাকথিত "অনুন্নত শ্রেণী"দের প্রতিও শ্রদ্ধা ভালোবাসা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছি আমার এই প্রবন্ধে। তবুও বলছি, উক্ত প্রবন্ধে আমি কোন জাতি সম্প্রদায়ের মনে আঘাত দিয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে ধরে নিয়ে আমাকে ক্ষমা করবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নেপাল মজুমদার

জর্জ রুয়ো

"Abandon hope, all ye that look at me. Flagellate yourselves for the sins and sorrows of the world."

১৮৭১ সালের বাতাসে যে কোন এক মাটির তলার ঘরে রুয়োর যখন জন্ম হয় তখন মাথার উপরের প্যারিস শহর বোমায়

আত্মপ্রতিকৃতি

বিধ্বস্ত গর্ভের শীতল অন্ধকার থেকে জগতের সেই কক্ষের মিটমিটে আলোর জগতে যে মুহূর্তে সেই শিশুটি নিক্ষিপ্ত হয়, সেই মুহূর্তে একটি জ্বলন্ত পিণ্ড এসে ফাটে মাথার ওপরের বাড়িতে—জন্মক্ষণের সেই অচেতন অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর সম্ভাষণ, তাঁর সব ছবিতেই যেন ছায়ার মতো উপস্থিত।

গত কয়েকদিন ধরে আমি রুয়োর ছবি দেখেছি অনবরত। ভেতরে-ভেতরে একটা চাপা যন্ত্রণা হয়, কত কিছু বলার থাকে কিন্তু ঠোঁটের ওপরে যেন ভারি পাথর, হাসতে গেলে মনে হয় মুখের চামড়াটা আসলে মুখোশ, দাঁত নকল, আসলে আরো ভেতরে গুমরোচ্ছে বোবা কোনো জন্তু; একটা যেন বিরাট সারকাসের ক্লাউন আমরা, হাসির কথা সব ফুরিয়ে গেছে, চিৎকার করে-করে এখন গলা এত শুকনো যে কণ্ঠনালী যেন এ-দেয়ালে ও দেয়ালে ঘষে ছড়ে যাবে, শরীর থেকে ধুলো উঠছে, শহর শুকিয়ে ফেটে গেল কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি হবে না আর। আমার বয়েস ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা আসা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই শিল্পীর ছবি দেখলে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি হয় ঈশ্বরের অভাব, কিংবা অনুপস্থিতি, কারণ রুয়ো অবিরাম বিশ্বাস রেখেছেন ঈশ্বরে, এবং তাই পাপে আর দুঃখে ভরা জগতের দিকে তাকিয়ে তাঁর বারবার মনে পড়েছে যীশুকে, ঈশ্বরের অনুপস্থিতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

বালক বয়সে স্টেইন্ড-গ্লাসের কাজ শিখেছিলেন জর্জ। স্টেইন্ড-গ্লাস ব্যবহার করা হয় গীর্জার দরজা জানালার জন্য। মধ্যযুগীয় গীর্জাগুলি বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে সে সব মেরামতের কাজ নিয়েছিলেন তিনি। গির্জা-জানালায় রঙিন সেইসব কাচের দ্বারা ঈশ্বরের কাহিনী চিত্রিত করার চেষ্টা হয় বেশ কিছু—সেইসব রঙ, পবিত্র গন্ধ ভেতরে চলে যায়, যার প্রভাব তাঁর জীবনের শেষ দিনের ছবিতেও লক্ষণীয়। মোটা এবং ঘন কালো রেখার দ্বারা বিষয়কে পরিবেষ্টিত করা রুয়োর বৈশিষ্ট্য, এবং গভীর রঙের মধ্যে এক টুকরো আলোকিত উজ্জ্বলতা, যেন সেই জায়গাটা দিয়ে আলো ঢুকছে, এমন বর্ণবিন্যাসও আসছে তাঁর শৈশবের স্টেইন্ড-গ্লাস অংকনের অভিজ্ঞতা থেকে।

কুড়ি বছর বয়স থেকে তিনি গুস্তাভ মোরোর স্টুডিওর নিয়মিত ছাত্র হয়ে দাঁড়ান। এ সময়কার ছবিতে তাঁর ধর্মীয় চেতনা স্পষ্ট; ১৮৯২ সালে একোল দা বোজার্টে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনী হয় সেগুলো সবই খুব গভীরভাবে খ্রীষ্টান ছবি। এ সব ছবির অনেকগুলির জন্য তিনি পুরস্কৃত হন, কিন্তু যে পুরস্কারের জন্য সতিাই তিনি অভিলাষী ছিলেন প্রি-দ্য-রোম, সেটা বহু চেষ্টা করেও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। রুয়ো একোল ছাড়েন ১৮৯৫ সালে গুস্তাভ মোরোর কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে।

১৮৯৮ সালে গুস্তাভ মোরোর মৃত্যুতে রুয়ো খুবই ভেঙে পড়েন। তাঁকে মোরো-গ্যালারির কিউরেটার করা হয় বছরে ২৪০০ ফ্রাঁ মাইনেতে—এই সময়টা তাঁর জীবনের এক শক্ত সময় যখন আর্থিক দিক থেকেও তিনি ছিলেন বিপর্যস্ত, মানসিক অবস্থাও ভালো না, পৃথিবীভরা পাপ, দুঃখ ও অনাচার দেখে জগৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুয়োর এক নতুন উপলব্ধি হল; এতদিন তিনি যে সব ছবি এঁকেছেন তা নিজের কাছে রেমব্রাণ্টের অনুলিপি ছাড়া আর কিছু মনে হল না, অনুভব করলেন যে, শৈলী পরিবর্তনের সময় এসেছে, তা

আমরা নিজেদের রাজা ভাবি

বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন মাতিসের সঙ্গে, সাঁল দ-তম্ তৈরী হল—চিত্রকলায় ফোবিজম্-এর সূচনা।

১৯০৩ সালে সাঁল দা-তম-এ তাঁরই ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়, যা দেখে তখন অনেকেই অবাক হয়েছিলেন এমন রাতারাতি তাঁর শৈলীর পরিবর্তনে। রঙের উত্তাল ব্যবহার, বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার এবং নতুন বিষয় নির্বাচন, অনেক সমালোচকের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল, বিরূপ সমালোচনার অন্ত ছিল না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ফোভদের একজন মনে হয়, তবু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, গোড়াতেই তাদের সঙ্গে রুয়োর একটা

বিরাট তফাত থেকে গেছে। রুয়ো ছবিকে কখনোই শুধুমাত্র ফর্ম হিসেবে দেখেননি, তাঁর ছবিতে অভিজ্ঞতা, কাহিনী এবং [illegible]র অংশ ছিল প্রধান—ফোভদের ফর্ম তিনি [illegible]ছিলেন, কিন্তু তাদের ফর্ম-চেতনা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুয়োর সঙ্গে দুই গোঁড়া ক্যাথলিক সাহিত্যিকের ঘনিষ্ঠতা হয়, একজন ঈমান এবং অপরজন লেয় ব্লয়। ঈমান চেষ্টা করছিলেন ক্যাথলিসিজমের এক পুনর্জন্মের, ফিরিয়ে আনতে সেই আদর্শ যে "ধর্মের জন্যই শিল্প, শিল্পের জন্যই ধর্ম"। ব্লয় চাইছিলেন শিল্পকে ধর্ম-প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে; পৃথিবীর মুক্তির একমাত্র পথ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ। এই রকম মত ছিল তাঁর। এঁরা রুয়োর গভীর বন্ধু হন এবং গভীরভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেন। জগৎ যে পাপে সত্যাই নিমজ্জমান, আশা আর নেই, পুনর্বার এবং গভীরতমভাবে তা উপলব্ধি করেন রুয়ো—তারই প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর সমসময়ে আঁকা কয়েকটি বেশ্যার ছবি থেকে—যারা ক্ষয় এবং রোগের প্রতীক হয়ে ক্যানভাসে বর্তমান। এই সময়েই রুয়ো তাঁর বিখ্যাত ক্লাউন পর্যায়ের ছবিগুলি আঁকেন।

দুঃখ ক্লাউন

১৯০৭ থেকে রুয়োর শৈলীতে পুনর্বার পরিবর্তন দেখা যায়, ফোভদের বর্ণোচ্ছ্বাস মুরে এসেছে লক্ষ করি, লক্ষ করি ফিরে যাচ্ছেন স্টেইন্ডগ্লাস চিত্রাদর্শে, কিন্তু "বিষয়" সম্পূর্ণ সমসাময়িক, ধর্মের চিত্রকল্প নয়, বর্তমান মানুষের জীবন। বিশ শতকের রুয়োর সত্যিকারের এখান থেকেই আরম্ভ, যে পর্যায় নিয়ে কিছুটা তাৎপর্যে আলোচনার ইচ্ছে রইল পরবর্তী সংখ্যায়।

এ সপ্তাহে রুয়োর যে দুটি ছবি ছাপা হ'ল, তার একটি বিশ শতকের গোড়ায় আঁকা এবং "আমরা আমাদের রাজা ভাবি" চিত্রটি ১৯৪০-এ 'মিসেরের' ("আর্তি") পর্যায়ে। চিত্র দুটি আজকের জীবনী পর্ব আলোচনাকালে তাঁর কাজের উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ করছি। রুয়ো এমন একজন শিল্পী, যার বিষয়ে অনেক কথা থেকেই যায়, বিশেষত তাঁর সমগ্র শিল্পী-জীবন নিয়ে যদি আলোচনার উচ্চাশা থাকে। এ সপ্তাহে তাই মোটামুটি জীবনী-নির্ভর আলোচনার ভূমিকা সেরে নিয়ে, ইচ্ছে রইল শুধুমাত্র শেষ পর্যায়ের ছবি নিয়ে কিছুটা আলোচনার সামনের সপ্তাহে।
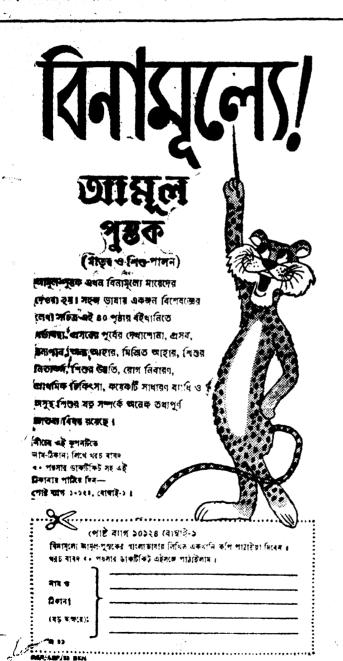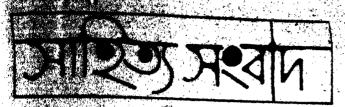
শুদ্ধশীল বসু

[illegible] সাহিত্য

গত [illegible] কোনো উল্লেখযোগ্য [illegible] বই কি প্রকাশিত হয়েছে, যা ছোট-বড় সকলকে তৃপ্তি দিতে পারে? শিশু সাহিত্য [illegible] শিশুদের জন্যই লেখা হয় বটে, কিন্তু তা যখনি সাহিত্য হয়ে ওঠে, তখন পাঠকের বয়স-ভেদ থাকে না।

আমরা যারা এখন বড়ো হয়ে উঠেছি, প্রতিদিন যাদের দাড়ি কামাতে হয়, বাড়িতে কেউ ডাকতে এলে জামা গায় না দিয়ে বেরুতে পারি না, কারুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হলেও তার সামনে মুখে স্মিতহাস্য এঁকে রাখি, ট্রামে-বাসে কারুর পা মাড়িয়ে দিয়ে বলি সরি, আড়ালে মানুষের নিন্দে করা যাদের দ্বিতীয় ব্যসন, ক্রিকেট থেকে রাজনীতি কিংবা টেরা-কোটা শিল্পে যাদের সমান উৎসাহ, আমরা সেই 'বড়ো'রা নানারকম ইংরেজি-বাংলা কঠিন কঠিন বই পড়ি, পড়ার পর নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলি, ট্রাশ কিংবা মন্দ না, কিংবা, বাঃ—! নিরুত্তাপ আমাদের সেই কণ্ঠ, চোখের দৃষ্টি আলগা, অলস-ভাবে শুয়ে-বসে অনেক সময় পড়ার বদলে 'বাস্ট রাউজিং', এবং থ্রিলার না হলে তো একটানা শেষ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না! কিন্তু বই পড়ার আসল উত্তেজনা কৈশোরেই। তখন পড়ার সময় যেন চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে, বুক ধড়াস ধড়াস করে, শরীরে ঘাম এবং রোমাঞ্চ ফোটে, আমার মনে আছে ছেলেবেলায় 'কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ' পড়তে পড়তে কলকাতার দোতলায় ঘরের মধ্যে আমি হঠাৎ বাঘের গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেছিলাম এবং ভূতের গল্প শেষ না করে কত দিন অনেক রাত্তিরে নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে চুপি চুপি মায়ের পাশে গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়েছি।

সেই উত্তেজনা কমে গেলেও, শিশু সাহিত্যের প্রতি মানুষের মন থেকেই যায়। অনেককে দেখেছি, পর পর কয়েকখানা মহাসাহিত্য পড়ার পর মাথায় জ্যাম ধরে গেলে, কয়েকখানা ছোটদের বই পড়ে আবার সেটা পরিষ্কার করে নেন। হাতের কাছে একটা ছোটদের বই আর একখানা বড়োদের বই থাকলে, প্রথমেই ছোটদের বইখানা তুলে নেবার লোভ অনেকেই সংবরণ করতে পারেন না। ছেলের জন্য বই কিনে এনে অনেক বাবা নিজেই সেটা প্রথমে পড়তে শুরু করে দেন। বয়স্কদের এইসব দুর্বলতার কথা জেনেই কি না, আজকাল অনেক লেখক বড়োদের লেখার নাম করে আসলে ছোটদের লেখাই ভেজাল দিচ্ছেন।

সে যাই হোক, বাংলা শিশু সাহিত্যের এখন কী অবস্থা! পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁদের রচনা বাংলা চিরায়ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির চাহিদা সমান অব্যাহত, এ ছাড়া, রবীন্দ্র পরবর্তী প্রখ্যাত বয়স্কপাঠ্য লেখকদের কিছু ছোটদের জন্য লেখার সংকলন ও শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা ছোটদের আদরণীয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো নতুন ছোটদের বই কিংবা ছোটদের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য নতুন লেখকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কেন এরকম হলো? বস্তুত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজ ছাড়া গত দশ বছরে এমন কোনো নতুন ছোটদের বই প্রকাশিত হয়নি, যা বড়োদের আলোচনায় কখনো উল্লেখ করা হয়। আর, সত্যজিত রায় 'প্রফেসার শঙ্কু' নামে একখানা উপভোগ্য বই লিখে রায়চৌধুরী পরিবারে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকারিত্ব প্রমাণ করেছেন।

ছোটদের লেখা সকলের হাতে খোলে না। সাধারণভাবে দেখা গেছে, ছোটদের লেখক ও বড়োদের লেখক—এ'রা আলাদা জাতের। এবং এ কথাও নিঃসন্দেহেই বলা যায়, বড়োদের জনপ্রিয় লেখকের তুলনায় ছোটদের জনপ্রিয় লেখক নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসেবে শক্তিমান। সম্ভবত যোগেন্দ্রলাল মিত্রের আমল থেকেই ছোটদের জন্য আলাদা বই লেখার কথা বাঙালী সাহিত্যিকদের মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ একাই শিশু সাহিত্য শাখায় অনেক কুসুম সজ্জিত করেছেন, পরবর্তীকালে ভারতী ও কল্লোল যুগের প্রখ্যাত লেখকরা ছোটদের জন্য অনেক চমৎকার গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যে একখানি গর্ব করার মতন বই। কিন্তু ছোটদের সাহিত্য আসলে সজীব করে রেখেছিলেন তাঁরা, যাঁরা শুধু ছোটদের জন্যই লিখেছেন। রায়চৌধুরী পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, মধ্যমণি সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার এ'রা ছোটদের রচনাতেই হৃদ-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। [illegible] গল্প-উপন্যাসের [illegible] দুখানে বা [illegible] এ সবের জন্য তিনি [illegible] থাকবেন।) 'ভারতী' যুগের [illegible] ঔপন্যাসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়, [illegible] খাতায় বেশী উপন্যাস লিখেছেন, [illegible] জীবদ্দশাতেই পাঠকেরা সে-সব উপন্যাসের নাম ভুলে গেছে, কিন্তু যখের ধন আজকালকার শিশু-বুড়োরাও পড়ছে—এক শিশু সাহিত্যিক হিসেবেই আজ হেমেন্দ্রকুমারের শ্রেষ্ঠ পরিচয়; জীবনের দুই দশক তিনি ছোটদের জন্যই লিখেছেন। এর বিপরীত উদাহরণ, ধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা ছোটদের খুব প্রিয়, তাঁর 'অসি বাজে ঝন ঝন', 'নীল সায়রের মাঝি' কিংবা 'কামানের মুখে মানিকং' যে-কোনো বালকের হৃদয় উন্মথিত করে, কিন্তু বড়োদের জন্য ধীরেন্দ্রলাল ধরের একখানি বই 'রাত্রিবিলাপ'—অত্যন্ত কুৎসিত। শিবরাম চক্রবর্তীর বড়োদের লেখাও কখনো তেমন সার্থক হয়নি।

সেইজন্যই মনে হয়, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ছোটদের লেখক এবং বড়দের লেখক—এ'রা দুটি আলাদা জাত। এক লেখকের পক্ষে, একই সঙ্গে দু'জাতের লেখা

[illegible] নয়। বুদ্ধদেব বসুর [illegible] জটিল, [illegible], তার থেকে সামাজিক [illegible] এলে সহজভাবে সরলমুখী সাহিত্য লিখতে গেলে সার্থক না-হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী। একই লেখকের পক্ষে দুরকম ভাষার ব্যবহার করা খানিকটা অস্বাভাবিক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের লেখা বইগুলো বড়দের পরম প্রিয়, কিন্তু ঐ ভাষায় বড়দের সাহিত্য রচনা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। সুকুমার দে সরকার ছোটদের জন্য কয়েকখানা চমৎকার বই লিখেছেন, কিন্তু ধন্যবাদ তাঁকে, তিনি এরকম কবিত্বময় ভাষায় বড়দের জন্য লিখে ব্যর্থ হবার ঝুঁকি নেন নি। সেই রকম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট [illegible] ছোটদের [illegible] ছোটদের কথা ভেবে লেখেন নি। [illegible] সম্ভব ছিল না, [illegible] কোনো ছোটদের কবিতা লেখা। অনেক খ্যাতিমান বয়স্ক-পাঠ্য লেখক ছোটদের জন্য যেসব [illegible] লিখেছেন, তা পড়তে বেশী ভালো লাগে ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের, এগুলোকে ঠিক শিশুসাহিত্য বলা যাবে কিনা জানি না, এইরকমই একখানা বই [illegible] কোনখানে। তা ছাড়া শিশু সাহিত্যের পাঠক বলতে কি ১৪ থেকে ১৮ বছরের পাঠক-পাঠিকাদের বোঝাবে? কেননা, ঐ বয়েসে তো টুর্গেনিভের বা মণীন্দ্রলাল বসু ধরনের অতি রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী পড়তেই বেশী ভালো লাগে।

'বড়' হয়ে ওঠার পর অনেক মানুষই কবিতার জগৎ থেকে দূরে চলে যায় বটে, কিন্তু ছেলেবেলায় সকলেই কবিতা মুখস্ত করতে এখনো ভালোবাসে। ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা তো আছেই, কিন্তু সুকুমার রায় যে অন্য ধারার প্রবল-ভাবে সূচনা করে গিয়েছিলেন, এখন আর সে-রকম ছোটদের জন্য সার্থক পদ্য লেখক একজনও নেই। সুনির্মল বসুর পর শুধু ছোটদের কবিতার জন্যই বিখ্যাত আর কেউ নেই। ছোটদের কবিতার প্রধান গুণ ছন্দের প্রাণপ্রাচুর্য, কিন্তু অনেক ছোটদের পত্র-পত্রিকা নেড়ে বেছে দেখেছি, ছন্দের বৈচিত্র্য তো দূরের কথা, বেশীর ভাগ লেখাতেই ছন্দের ভুল। বাংলা দেশে এখন এত আধুনিক কবি, অথচ ছোটদের কবিতার ক্ষেত্রে শক্তিমান কবিরা নেই কেন? ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এক সময় যেমন ছোটদের জন্য কিছু বিজ্ঞানমূলক লেখা লিখেছিলেন, এখন বিজ্ঞানমূলক লেখার অনেক সুযোগ, কিন্তু সেরকম উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই বা কেন হচ্ছে না? সব মিলিয়ে শিশু সাহিত্যে এখন অতি সাধারণের যুগ। শিশু সাহিত্যের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে শক্তিমান লেখকদের কেন এত নিরুৎসাহ এখন সে সম্পর্কে অনু-সন্ধানের নিশ্চিত প্রয়োজন।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ঘৃণা ক্রোধ সব মিলিয়েই বড়দের সাহিত্য লেখা যায়, কিন্তু ছোটদের প্রতি একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া ছোটদের সাহিত্য রচনা করা বোধ হয় সম্ভব নয়। ছোটদের প্রতি ভালোবাসা বা নিজের ছেলেবেলাকে ভালোবাসা। শিশু সাহিত্য রচনা খানিকটা প্রতিদান নিরপেক্ষ। শুনেছি, শুধু [illegible] জন্যই [illegible] একটি প্রেস কিনেছিলেন।

[illegible]

পুস্তকপরিচয়

গ্রামের চিত্র : পশ্চিমবঙ্গ

রায়বাঘিনী। শ্রীনন্দকুমার সিংহ সম্পাদিত। প্রকাশক—ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস, সিভিল লাইনস, দিল্লি। দাম নয় টাকা।

রায়বাঘিনী বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার একটি গ্রাম। বইটি ঐ গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার ফল। সেন্সাস কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ সনে লোক-গণনার সময় পশ্চিমবঙ্গের একুশটি গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার ব্যবস্থা করেন। রায়বাঘিনী সেই একুশটি গ্রামের একটি। সারা দেশ যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, গ্রামসমাজকে তা কী পরিমাণে প্রভাবিত করেছে ও করছে, গ্রামের লোকদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, রুজি-রোজগার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভও এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

রায়বাঘিনী অবশ্য অতি সাধারণ গ্রাম নয়। কিংবদন্তী অনুসারে ষোড়শ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের রানী ভবশঙ্করীর সঙ্গে পাঠানদের এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল। শ্রীসুবোধ ঘোষের 'কিংবদন্তীর দেশে'ও এই গ্রামের কাহিনী পাওয়া যাবে। গ্রামটি যে অতি পুরাতন, সতেরোটি জাত ও এক ঘর মুসলমান নিয়ে মোট ১৪৩ পরিবার এবং গ্রামের বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তার প্রমাণ মিলবে।

গ্রামটি কুড়ি বছর আগেও শাঁখা, কাঁসা ও তাঁতশিল্পের কেন্দ্র ছিল। আশে-পাশের গ্রামের হকাররা এই গ্রামে শাঁখা নিতে আসত, কাঁসার জিনিসপত্রও বিক্রি হত। কিন্তু বর্তমানে শাঁখা ও কাঁসা শিল্প বিনাশের পথে। যাঁরা এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও ১৯৬৩ সনে গ্রামের শতকরা ৩২·২৪ জন গ্রামের শিল্প-ব্যবসায় কাজে নিযুক্ত ছিল, কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা জাতীয় হারের তুলনায় অনেক কম, শতকরা ৪৫·৯০ জন। শতকরা ২১·৮৬ জন ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

সমীক্ষায় রায়বাঘিনীর শিল্প ও কৃষির [illegible] [illegible] করেছে। [illegible] [illegible]

আগে সিংহল শঙ্খ রপ্তানি বন্ধ করলে মাদ্রাজের কাঁচামাল দিয়ে কাজ চালানো হত। কিন্তু মাদ্রাজের শঙ্খ আনে ব্যবসায়ীরা। নগদ দামে একসঙ্গে ১০০টি শঙ্খের এক বস্তা কিনতে হয়। [illegible] ২৭০৲ থেকে ৩০০৲। কিন্তু এই শঙ্খ কেনার সময় বস্তায় কী আছে, তা দেখবার উপায় নেই। ফলে কাজে লাগানো যায় না, এমন শঙ্খ জমতে থাকে। এই কাঁচামালের সরবরাহও নিয়মিত আসে না। এক বস্তা শঙ্খ কিনলে পনেরো দিন চলে। কিন্তু এই পনেরো দিন কাজ করার পরে বসে থাকতে হয়। ফলে শাঁখা তৈরি করে এখন আর পেট চালানো যায় না। অপর দিকে অনিয়মিত সরবরাহের জন্য বিক্রেতার আনাগোনা বন্ধ হয়েছে।

বিক্রেতা এক তন্তুবায় পরিবার ২৫ বিঘা, অপর এক ব্যবসায়ী তন্তুবায় পরিবার ১৫ বিঘা, শাঁখা-ব্যবসায়ী জনৈক শংখ-বণিক ২০ বিঘা জমি কিনেছে। দুইটি ব্রাহ্মণ ও বৈরাগী পরিবার শংখ শিল্পের খারাপ অবস্থা দেখে ১০ বিঘা করে জমি সংগ্রহ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ গ্রামেই ব্যবসায়ী বা কৃষক-ব্যবসায়ীদের হাতে জমির পরিমাণ বাড়ছে। গ্রামের বেশীর ভাগ অধিবাসী চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন। ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তবে যাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে, তারাই ঋণ পায়। সরকারী ঋণ অন্য খাতে ব্যয় হয়, কৃষি-ঋণ সংসার-খরচে লাগে। সুদের হার শতকরা ৩৬ টাকা। কিন্তু গ্রামের ৩৮ ঘর বাউড়ি ও ২৪ ঘর বাগদীর এই ধরনের ঋণ পাওয়ার উপায় নেই। চাষের কয়েক মাস ছাড়া কাজও মেলে না। এই সময়ে যারা বড় চাষীর নিকট থেকে ধার পায়, কাজের সময় তাদের ৭৫ পয়সা রোজ দিতে হয়, অথচ নগদ কিষাণের জন্য তখন আরও ৫০ পয়সা বেশী লাগে।

বড়দের তো কাজ নেই, কিন্তু ছোট শিশুরা কী কাজ পাবে? কাজ করতে পারবে? রায়বাঘিনীতে তার কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। শিশুরা যে পরে কর্মক্ষম হবে, সে আশাও কম। ১৪০টি পরিবারের মধ্যে ২২টি পরিবারের পাঁচিশটি গাভী আছে, তার মধ্যে আবার ১৯টি পরিবারের একটি করে। গ্রামে কেউ দুধ বিক্রি করে না। কাজেই ১২১টি পরিবারের শিশু ও রোগীরা একেবারেই দুধের মুখ দেখতে পায় না, ১৯টি পরিবার বছরে বা দুই বছরের মধ্যে কয়েক মাস দুধের স্বাদ পেয়ে থাকে। বাউড়ি ছেলেরা একটু বড় হওয়ার সংগে সংগে পনেরো বৎসর পর্যন্ত কেবল খাওয়ার বদলে গৃহস্থ বাড়িতে গরু চরিয়ে বা চায়ের দোকানে কয়েক মাস খেটে থাকে। এইসব পরিবারের ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না।

গ্রামে জাতিভেদ প্রথা অতি বেশী প্রবল। জল-চল কথাটা এখনও এই গ্রামের লোকদের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোন ব্রাহ্মণ বাগদীর বাড়িতে পুজো করলে তাকে 'পতিত' বলে একঘরে করা হয়। শ্রাদ্ধের সময় নিজের জাতের কোন বৃদ্ধকে দিয়ে পুরোহিতের কাজ চালাতে হয়। ধোপারাও তাদের কাপড় কাচে না। কিন্তু বাউড়িদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। ব্রাহ্মণ, ধোপা, এমন কি নাপিত ও বাউড়িদের অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে। এদেশে যে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইন পাস হয়েছে, বাউড়ি ও বাগদীদের তা জানা নেই। গ্রামের মাত্র ২৯টি পরিবার এই আইনের কথা জানে।

গ্রামের তেরোটি পরিবারের মাত্র সতেরো জন লোক খবরের কাগজ পড়ে। মাত্র সাতাশটি পরিবার গ্রাম-সেবকের গ্রাম-পরিদর্শনের কথা জানে। এ দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হলেও রায়-বাঘিনী গ্রামের কোনও উন্নতির ক্ষীণ আশাও দেখা যাচ্ছে না। এ রাজ্যে এই ধরনের গ্রামের সংখ্যা যে নগণ্য নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৮৭টি ছক ও ৭৩টি সুন্দর ছবির মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জানাবার চেষ্টা হয়েছে। সমীক্ষার জন্য শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ও সম্পাদনার ব্যাপারে শ্রীসুকুমার সিংহ রায়বাঘিনীর ছবি তুলে ধরে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। (৩১০।৬৬)

প্রাপ্তি স্বীকার

500 QUESTIONS ON THE SUBJECTS REQUIRING INVESTIGATION IN THE SOCIAL CONDITIONS OF THE PEOPLE OF INDIA by Rev. James Long. Indian Publications: 3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. 10.50.

উজবেকিস্তানের 'বাহার' নৃত্যদলের দুই শিল্পী—গত সপ্তাহে রবীন্দ্রসদনে তাঁরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ফটো—[illegible]

ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া

ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া ভারতের বিভিন্ন শহরে সিনেমা হল তৈরির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ওই-সব প্রেক্ষাগৃহে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা সহ ক্লাসিক চিত্র দেখানো হবে। প্রথমে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লিতে একটি করে চিত্রগৃহ নির্মিত হবে। অনতিবিলম্বে যদি সিনেমাগৃহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তবে আরকাইভস চিত্রগৃহ ভাড়া নিয়ে তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকর করবেন। ১৯৬৪ সনে ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভস স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে আরকাইভস মোট ১৭৬টি চিত্র সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে ১৫৭টি ভারতীয়, ১৯টি বিদেশী। "রাজা হরিশচন্দ্র" (১৯১৩) ছবির একটি রীল আরকাইভস সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত চিত্রের তালিকায় "পথের পাঁচালী"ও আছে।

কাঁচা ফিল্মের অভাব?

আমাদের দেশে সত্যিই কি কাঁচা ফিল্মের অভাব আছে? এই প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। ফিল্মের অভাবই যদি থাকবে তবে ভারতীয় ছবির দৈর্ঘ্য এত বেশী কেন? দীর্ঘ ছবি বসে দেখা প্রায় অসম্ভব। ছবি অল্পদৈর্ঘ্যের হলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

উটকামণ্ডে হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মস-এর কারখানা উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী এই মন্তব্য করেন। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য ওই কারখানায় [illegible] ফিল্ম তৈরী হচ্ছে। নাম: "[illegible]"।

পতি-পত্নী

তিন দম্পতির কাহিনী নিয়ে তৈরী "পতি-পত্নী" (মমতাজ ফিল্মস)। বাড়তি চরিত্রও কিছু আছে। আমোদ এবং বক্তব্য এই উভয় কারণেই এদের জড়ো করা হয়েছে। দর্শক মনোরঞ্জনের যে প্রয়াস পরিচালক এস এ আকবরের ছিল তা সফল বলা যেতে পারে। কমেডির আঙ্গিকে তৈরী এ ছবির দম্পতিদের চরিত্রে রয়েছেন ওম প্রকাশ ও লীলা মিশ্র, মেহমুদ ও মমতাজ এবং সঞ্জীবকুমার ও নন্দা।

লীলা মিশ্র ও মমতাজ (যথাক্রমে মাতা ও কন্যা) উগ্র আধুনিকতার ফল যথাসময়েই ভোগ করেছেন, এবং পতি যে পরম [illegible] তা অশেষ লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে [illegible]

এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে রূপবাণী ফিল্মস-এর হাসির ছবি "৮০তে আসিও না" (পরিচালনা: শ্রীজয়দ্রথ)—ছবির একটি দৃশ্যে 'রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। স্ত্রীরা শাস্তি পেয়েছেন তাঁদের স্বামীর হাতে। শাস্তি ভোগের পর্ব তথা প্রহসনটি খুবই উপভোগ্য, প্রেক্ষাগৃহ হাসির রোলে ফেটে পড়ে।

অপর দম্পতি সঞ্জীবকুমার ও নন্দা আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। তবে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ও পুনর্মিলনের মেলোড্রামার চিরাচরিত নিয়ম তাঁদের পালন করতে হয়েছে। ছবির অপর চরিত্র শশীকলা ভ্রষ্টা, বহুবল্লভা। অবধারিত রীতিতে তিনিও তাঁর এক দুশ্চরিত্র পুরুষ-সংগীর কাছে নির্যাতিত হয়েছেন। পরক্ষণেই দেখা যায়, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তখনও তাঁকে সাহায্য করার একজন ছিল। তিনি সুজিতকুমার—ছবিতে আগাগোড়া ভাল মানুষ। শশীকলাকে ভালবাসতে গিয়ে একবার ঠকেছেন।

এঁদের সকলকে নিয়ে বহু শাখা-প্রশাখা সংবলিত যে চিত্রনাট্য তাতে অবাস্তবের মাত্রাই বেশী। তবে ছবিটি দেখতে বেশ ভালই লাগে। ভারতীয় নারীর আদর্শ দেখাবার এই চেষ্টা নতুন নয়। তবে কমেডির ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে বলে এই পুরনো বক্তব্যটি আবার মেনে নিতে কষ্ট হয় না।

শিল্পীরা সবাই চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। হাসির খোরাক যুগিয়েছেন মেহমুদ, জনি ওয়াকার ও ওম প্রকাশ।

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত ছবির গানের সুরে নতুনত্ব ও মাধুর্য দুই-ই আছে। [illegible] দে একাধিক গান গেয়েছেন। কাঁ… বাহুল্য, তাঁর গাওয়া গানগুলি জনপ্রিয় হবে।

সগাই

সিনেমা দেখা তো নয়, যেন যন্ত্রণার একশেষ। টাইটেল-এর সঙ্গে যত মধুর সুরেই শানাই বাজুক না কেন, "সগাই"-এর ব্যাপার (কাহিনী বলার মানে হয় না) যে এত তিক্ত, আগে থেকে তা বোঝবার সাধ্য কার!

প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরকে হেনস্তা করার যথাবিহিত কর্মসূচীর অবসানে নায়ক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা রাজশ্রীর সগাই অর্থাৎ বিয়ের বাগ্‌দান (বলা বাহুল্য, ওদের প্রণয়ের পরেই) যখন কাহিনীকার-প্রযোজক-পরিচালক এস ডি নারাং চটপট সেরে নিয়েছেন, তখনই বোঝা গেছে, ভণ্ডুল শুরু হতে বিলম্ব নেই। খলনায়কের ব্যবস্থাপনায় তা যথাসময়েই দেখা গেছে। নায়কও পঙ্গু হয়েছে। প্রণয়ী-যুগলের পুনর্মিলন কীভাবে ঘটল তার ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই।

ঝরমুলো তবু সহ্য করা যায়। অসহ্য লেগেছে পরিচালকের নানা উদ্ভট 'প্ল্যান'—যার মধ্য দিয়ে তিনি 'বক্স-অফিস'কে তুষ্ট করতে চেয়েছেন। খন্দের মনোরঞ্জনের যেসব ব্যবস্থা তিনি করেছেন তা দেখে আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন যে-কোন দর্শক ক্ষুব্ধ হবেন। পাগলামি-হ্যাবলামিই কি দর্শকের কাম্য? উন্মাদবৎ একটি কমিক চরিত্রের (রাজেন্দ্রনাথ অভিনীত) লম্ফ-ঝম্ফ ও চিৎকার কারো ভাল লাগতে পারে কিনা জানি না। সে আবার 'বিউটি এক্সপার্ট'।

বিরক্তিকর নানা ঘটনার মধ্যে রাজশ্রীর নাচ অবশ্য মন্দ লাগে না। তাঁর অভিনয়ও অনেক মুহূর্তে সংবেদনশীল। বিশ্বজিতের অভিনয়ও বেশ ভাল। এবং সংগীতপরিচালক রবি সুরারোপিত কিছু গান খুবই সুশ্রাব্য। এ ছাড়া ছবির আর কোন গুণ নেই। ইস্ট-ম্যান রঙ মোটামুটি একরকম।

নেপথ্যে

গত সপ্তাহে নেপথ্যলোকের বড় খবর কলকাতায় মেহমুদ ও ওমপ্রকাশের আগমন। ও'রা এসেছিলেন, "পতি-পত্নী"র মুক্তি উপলক্ষে। ছবির পরিচালক, প্রযোজক এবং

'মুক্ত বলাকা' (পরিচালনা: পরিমল ঘোষ) ছবিতে নবাগত মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালিতা চ্যাটার্জি

"পতি পত্নী" হিন্দীছবির মুক্তি উপলক্ষে গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন সঞ্জীব-কুমার, মেহমুদ ও ওমপ্রকাশ ফটো—দেশ

সঙ্গীতপরিচালক রাহুল দেববর্মণও শিল্পী-দের সঙ্গে ছিলেন।

দুই কমেডিয়ানের সঙ্গে দেখা হল এক পার্টিতে। মেহমুদের মাথায় ছিল টুপি। মনে হল, মাথা কামানো। পরে টুপিটা খুলে মেহমুদ দেখালেন তাঁর চুলের ছাট। সারা মাথাই প্রায় কামানো, তালু থেকে একটা লম্বা টিকি ঝুলছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটা মেক-আপ-এর অংশ। এর জন্য চুল কামিয়ে ফেলতে হবে? মেহমুদ বললেন, আমার নিজের ছবির শুটিং। "পাশের বাড়ি"র হিন্দী রূপ প্রযোজনা করছি আমি। ছবিটি তৈরি হচ্ছে মাদ্রাজে। আমি সেজেছি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতজ্ঞ, নায়িকার গানের শিক্ষক।

কথায় কথায় মেহমুদ তাঁর নিজের শিল্পী-জীবনের কথা বললেন। প্রথম অভিনয় করি "কিসমত" হিন্দী চিত্রে। উন্নতি হয়েছে আরও পরে। এর জন্য আমি পরিচালক ফণী মজুমদারের কাছে কৃতজ্ঞ।

ওমপ্রকাশ বেশ রসিক ব্যক্তি। সাধারণ কথাবার্তাতেই হিহি হাসাতে পারেন। "পতি-পত্নী"র পরিচালক এস এ আকবরের বয়স বেশী নয়। কিন্তু বেশ গম্ভীর। এটা তাঁর দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি "ছোটে নবাব"। মিস্টার আকবর হলেন প্রযোজক ... আকবর। অর্থাৎ মেহমুদের ভগ্নীপতি।

*

এইচ এস পোদ্দার জানালেন, তিনি সোবার্স ও অঞ্জু মহেন্দ্রুর উপর একটি দুই মিনিটের প্রামাণিক চিত্র তৈরি করছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও নানা সামাজিক পরিবেশে তাদের দুজনকে দেখানো হবে। ছবিটি তৈরি করবেন বাসু ভট্টাচার্য। মাদ্রাজ সফর

পর সোবার্স বোম্বাইয়ে আসছেন। কিছুদিন থাকবেন। তখনই ছবিটি তোলা হবে।

"উসকি কহানী" ছবিটির সঙ্গে এই তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে। "উসকি কহানী"র পর বাসু ভট্টাচার্য যে হিন্দী ছবিটি

পরিচালনা করবেন তার নাম "দেবী"। "দেবী"র নায়িকা হবেন অঞ্জু মহেন্দ্রু। শিলং-এর পটভূমিতে সম্পূর্ণ আউটডোরে মাত্র ৪৫ দিনে ছবিটি শেষ হবে। শিলং-এ একটানা শুটিং শুরু হবে মার্চ মাসে। ভুবন ছবির নায়ক। সিনেমায় ভুবন নবাগত দেখতে সুদর্শন। এতকাল কলকাতায় ব্যবসায় ছিলেন ভুবন। ছাত্রজীবনে সৌখিন মঞ্চে অভিনয় করেছেন। সিনেমার শিল্পী হওয়ার সাধ ছিল অনেক দিনের। অঞ্জু খ্যাত অভিনেত্রী হবেন—ভুবনের তাই বিশ্বাস। ভুবন সম্পর্কেও অঞ্জুর উঁচু ধারণা। ভুবনের সঙ্গে অঞ্জু-প্রণয়ী সোবার্সেরও পরিচয় হয়ে গেছে। বন্ধুত্ব বলা চলে। তিনজনের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশাও অনেক হয়ে গেছে। সোবার্সকে চটাবার জন্য ভুবন বলেছেন, "জানো, সিনেমায় অঞ্জুর প্রণয়ী হব আমি।"

"তোমাকে এমনিতে বেশ সরল মনে হয়। আসলে তুমি সাংঘাতিক", সোবার্সও মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেন।

বালাসরস্বতীর ভরতনাট্যম

ভরতনাট্যম বলতে কী বোঝায়, কী তার অভিনয় ও ভঙ্গিমা এবং প্রকাশের পরিমিতি তাই যেন দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করলেন। গত বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদনে বালাসরস্বতী নৃত্যানুষ্ঠানে। পরিণত বয়সেও (পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে?) শিল্পী ভরতনাট্যম প্রাণবন্ত ক

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের "প্রান্তর স্বাক্ষর" (পরিচালনা ...) ছবিতে ... ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

...সংগীত-অভিনীত হয়। বিশেষ করে রাম—সুশীল চট্টোপাধ্যায়, বিভীষণ—অসিত বসু, তরণী (সেন)—সমীর মিত্র, রাম—পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দোদরী—মেনকা দেবী, সীতা—দীপ্তি হালদার ও সরমা—রানু, মুরের অভিনয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ষষ্ঠীর বিয়ে' নাটকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, শ্যাম ঘটক, মিত্র বাবু, কান্ত ও ষষ্ঠীর ভূমিকায় যথাক্রমে অনিল দাস, পাঁচু বসু, অভেদানন্দ রায়, মোহন বাগ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, রায় সরকার ও মেনকা দেবী অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। আলোকসম্পাতে রামপদ মাঝি ও সম্প্রদায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

"এই তীর্থ" ছবির গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে গীতিকার পুলকবরণ, পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সংগীতপরিচালক ও নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন ১ ফেব্রুয়ারী শুরু হচ্ছে। স্থানঃ পার্ক সার্কাস ময়দান। চার রাত্রির এই সংগীত-অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ঃ আমীর খাঁ, ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, এ কানন, রবিশঙ্কর, ভি জি যোগ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর খাঁ, আমজাদ আলি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু, শঙ্কর ঘোষ, সাগিরুদ্দীন খাঁ। নৃত্য পরিবেশন করবেন ঃ শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়, বুলবুল লাহিড়ী, সরোজা দেবী ও সম্প্রদায়। প্রথম দিন কিংশুকগোষ্ঠীর "শ্যামা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হবে।

ইয়ংস কর্নারের অনুষ্ঠান

ইয়ংস কর্নারের বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠান হবে ২১ জানুয়ারী। কালীঘাট পার্কে সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ের মহম্মদ রফি, মুকেশ, মিনু পুরুষোত্তম, জনি হুইস্কি এবং মধুমতী ও মনোহর দীপক (নৃত্য) যোগ দেবেন। তা ছাড়া, কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরাও থাকবেন। এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীটুলু মুখোপাধ্যায় বলেন, দক্ষিণ কলকাতায় এত বড় বিচিত্রানুষ্ঠান এই প্রথম।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে "দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা" চিত্রের সমালোচনায় "অপর রাজকুমারের" ভূমিকায় শিল্পী হিসাবে মধুকুমারের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এই চরিত্রের শিল্পী অজিত মুখোপাধ্যায়।

অরণ্যদেব ★ লী ফক

'ব্যাপার দেখে আমি ভীষণ রেগে গেলাম। আমার এলাকায় ঢুকে হাতি মেরেছে, এত বড় দুঃসাহস কার? আমি বুঝতে পারিনি যে....'
এ-কাজ কে করল? কে সে?
'আড়াল থেকে আমাকেও তারা তাক করেছে।'
এই জঙ্গলে হাতি মারা নিষিদ্ধ, বুঝলি
'তাই আমি রেগে গিয়েছিলাম, আর তাই শিকারীদের আমি দেখতে পাইনি।'
8/7
'ডেভিল হঠাৎ ডেকে উঠল!'
ক্লিক!
!
ক্লিক!
শুয়ে পড়! নড়িসনে!
'ডেভিলের ডাক শুনেই আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে নীচে পড়লাম। গুলি আমার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল!'
দুম্! দুম্!
'হীরো আর ডেভিল মড়ার মত শুয়ে রইল।'
তোর গুলি কি ঘোড়ার গায়ে লাগল?
'পা টিপে টিপে আমি শিকারীদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।'
আমার গুলিও না।
বন্দুক নামাও!
? ?
'তখনও আমি জুমবাকে দেখিনি। অন্য শিকারীদেরও না।'
?
!

সাপ্তাহিক সংবাদ

চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। চীনের কমিউনিসট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং তাঁর তিন-চারজন পার্শ্বচরের সাহায্যে চীনের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার মানসে গত বছর রেড গারড নামে একটি বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন করে চীন দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেন। এই বৈপ্লবিক কার্যে মাও সে তুং-এর তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর। চীনের প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চি মাও-বিরোধী দলের অধিনায়ক। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পাল্টা বিপ্লবে মধ্যপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। চীনের বহু মুসলমান অধিবাসী এবং নিরীহ জনসাধারণ এই রেড গারডের অহেতুক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবপন্থীদের উৎপীড়ন চরম সীমায় এসে পৌঁছয় এবং তার ফলে পিকিং, সাংহাই, হংকং এবং ক্যানটন প্রভৃতি বহু-স্থানে কলকারখানা এবং রেল ধর্মঘট শুরু হয়। সাংস্কৃতিক-বিপ্লবী এবং পাল্টা-বিপ্লবী দলের এই আন্দোলনকে পৃথিবীর বহু দেশের সাংবাদিকগণ চীনে গৃহযুদ্ধের সূচনা বলে মনে করেন। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে রক্তপাত ও হতাহতের সংবাদও পাওয়া গিয়েছে এবং চীনের সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

দেশী সংবাদ—

৯ জানুয়ারি—১৯৬২ সালের অকটোবরে যে অবস্থার পরিণামে নেফায় চীনা আক্রমণের মুখে ভারতীয় বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে, তার জন্য জওহরলাল নেহরু, কৃষ্ণ মেনন ও মোরারজী দেশাইকে জবাবদিহি করতে হবে। নেফায় সে দিনের অভিযানের কোর কমানডার লেফটেনানট জেনারেল বি এম কল "দি আনটোলড স্টোরি" নামে ৪৯১ পৃষ্ঠার একখানি বই লিখেছেন। সেই না-বলা কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি ওই মন্তব্য করেছেন।

সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে পাশ কাটাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ধানকল মালিক নিজেদের মিলের কাজকর্ম বন্ধ রেখে বেনামিতে ধান-চালের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা বাজার থেকে হাজার হাজার মন নতুন ধান কিনছেন এবং তা হাসকিং মেশিনে ভাঙিয়ে খোলা বাজারে চড়া দরে চাল বিক্রি করছেন।

১০ জানুয়ারি—উত্তরপ্রদেশের সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ৩৫তম দিনে অর্থাৎ আজ ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠি চারজ করে, বেত চালায়। ধর্মঘটীরা পুলিসের উপর ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এর ফলে পুলিস সহ প্রায় ২৪ জন আহত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ ডঃ রাধাবিনোদ পাল আজ শম্ভুনাথ কারনানি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৮১ বৎসর বয়স হয়েছিল। ডাঃ পাল চার পুত্র, ছয় কন্যা এবং নাতিনাতনী রেখে গিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত টোকিওতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সামরিক

ট্রাইব্যুনালে তিনি অন্যতম বিচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে আইনজ্ঞ হিসাবেই ডঃ পাল বিশেষ সুপরিচিত হন।

১১ জানুয়ারি—প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন অভিযোগ করেছিলেন যে, বর্তমান সরকার দক্ষিণ পন্থায় ঝুঁকে পড়ছেন। দলনেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ তা অস্বীকার করে বলেন যে ভারত ও কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী নয় বরং বাম ঘেঁষা।

১২ জানুয়ারি—মার্চ মাসের আগে কেন্দ্র পশ্চিম বাংলাকে আর চাল দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। এর উপর কেন্দ্র থেকে পশ্চিম বাংলার জন্য উড়িশার ১৫ হাজার এবং অন্ধ্রের ৫ হাজার টন চালের যে বরাদ্দ করেছিলেন, তা এখনও বলতে গেলে ফাইলেই আবদ্ধ আছে।

লেভির ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জোতদারের উপর পৃথকভাবে নোটিস দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চের মধ্যে যাতে সেচ এলাকায় দশ একর এবং সেচহীন এলাকায় সাত একর জমির মালিক সরকারকে নির্দিষ্ট লেভি দেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও জেলাশাসকদের বলা হয়েছে।

১৩ জানুয়ারি — ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসাম থাকবে আর একটা যুক্তরাষ্ট্র হয়ে। সংক্ষেপে এই হল আসাম রাজ্য পুনর্বিন্যাসের নবতম সরকারী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম ফেডারেশনের অধীনে যতগুলো ইউনিট থাকবে তাদের সবারই সমান মর্যাদা, সমান অধিকার। কেউ কারও অধীনে থাকবে না। শুধু কতকগুলো অভিন্ন স্বার্থের বিষয় সমগ্রভাবে ফেডারেশনের আওতায় থাকবে, বাকী বিষয়গুলোর বিলিব্যবস্থা করবে ইউনিটগুলো।

১৪ জানুয়ারি — আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মারকসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তাঁরা ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই শ্রীমতী গান্ধী এই অভিযোগ করেছেন।

বহু-কথিত খাদ্য বাজেটের চূড়ান্ত রূপদান আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সম্ভব নাও হতে পারে। কেন্দ্রীয় খাদ্য-দপ্তর এপর্যন্ত প্রাথমিক কাজ কিছু করেছেন মাত্র। আবশ্যকীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ, উৎপাদন এবং আমদানির বিভিন্ন হিসাবের ভিত্তিতে কয়েকটি বিকল্প খসড়া রচনা করা ভিন্ন কাজ আর এগোতে পারেনি।

১৫ জানুয়ারি — চতুর্থ যোজনার খসড়ার অন্তর্ভুক্ত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রকল্পগুলির জন্য মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তী বৈদেশিক মুদ্রার হার অনুযায়ী ভারতের ৩৮৮৩ কোটি টাকার দরকার হবে। এই অর্থের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের জন্য ২৯৪৬ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের জন্য ৯৩৭ কোটি টাকার প্রয়োজন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় ১৩ জানুয়ারি ধানবাদে তাঁর নির্বাচনী সভা পণ্ড হওয়ায় মনে মনে পুলিসের উপর খাপ্পা হয়েছিলেন। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে আজ যখন তিনি ধানবাদ বিমানবন্দরে বিমানে আরোহণ করতে যাচ্ছেন। সেই সময় শ্রী সহায় সকলের সামনেই জনৈক পুলিস সুপারকে তিরস্কার করেন।

বিদেশী সংবাদ

৯ জানুয়ারি—চীনের সংগে গুরুতর যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে এবং সেজন্য সোভিয়েট সরকার জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে প্রস্তুত রাখছেন, এর প্রমাণ ক্রমেই বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে। এই সংবাদ জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১০ জানুয়ারি — প্রেসিডেনট সোয়েকার্নো ১৯৬৫ সালের কম্যুনিসট অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বের কথা অস্বীকার করেছেন। ইনদোনেশিয়ার অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতনের ব্যাপারেও তিনি তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন।

১১ জানুয়ারি—প্রেসিডেনট জনসন গতকাল রাত্রে কংগ্রেসে "নরম গরম" নীতি প্রচার করেন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয়-ভার নির্বাহের জন্য ব্যক্তিগত আয়ের উপর সারচার্জ ও যৌথ কোমপানির উপর কর ধার্যের প্রস্তাব করেন।

১২ জানুয়ারি—প্রেসিডেনট জনসন সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাছে একটি গোপন পত্র পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। পর্যবেক্ষক মহলের খবরে প্রকাশ, ক্ষেপণাস্ত্রচালিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য দুটি দেশের যে বিপুল ব্যয় চলছে, তা এড়াবার জন্য এই গোপন চিঠিতে নতুন চেষ্টার আভাস আছে।

১৩ জানুয়ারি—পশ্চিম জার্মানীর পারলামেনটের উন্নতমুখী দেশগুলিকে অর্থসাহায্য মঞ্জুর সংক্রান্ত কমিটির সদস্যগণের একটি দল বর্তমানে পাকিস্তান সফর করছেন। এই দলটি তিন দিনের সফরে ভারতে আসবেন।

১৪ জানুয়ারি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর ভিয়েতনাম গত কয়েক দিন যাবৎ গোপন আলোচনা চালাচ্ছে বলে আজ সুইজারল্যানডের একটি খবরের কাগজে বলা হয়েছে, জানাচ্ছেন এ এফ পি।

১৫ জানুয়ারি—ভারতের কোটি কোটি মানুষকে খাওয়াবার দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা নিতে রাজি নয়। ভারতের খাদ্যসংকট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেনট জনসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ের সহকারী সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুরেন দে

ক্লীয়ারটোন সুরুচি ও
মিতব্যয়িতার স্বাক্ষর !

ইস্ত্রি :
"এলিগ্যান্ট" ইস্ত্রি
"সুপার" অটো কন্ট্রোল
"ইম্পিরিয়াল" স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রি

কেটলি :
তাপ-প্রতিরোধক হাতল, ঢাকনির উপর
গোল হাতল ও পায়া সমেত "ইম্পিরিয়াল"
কেটলি, সসপ্যান কেটলিও
পাওয়া যায়

টোস্টার :
মচমচে সোনার বরণ টোস্টের জন্য

র‍্যাডিয়েন্ট হট প্লেট :
ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই—
আপনার রান্নাকে সহজ করে তোলে

ফোল্ডিং স্টীল ফার্নিচার :
দেখতে সুন্দর, দামেও কম

এই সব ক্লীয়ারটোন সামগ্রী ব্যবহার করলে আপনি নিরাপত্তা ও দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আর সারিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোন ভাবনা নেই, কেননা ভারতের যে কোন জায়গাতেই এগুলি সারিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া সমস্ত উৎপাদনই ১-বছরের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত।

GRA

সব বড় ইলেক্‌ট্রিকের দোকানে এবং নীচের ঠিকানায়ও পাওয়া যায়

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস্ লিমিটেড

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, সেকেন্দ্রাবাদ ও পাটনা

চান যদি উন্নত জীবনযাপন, নিন তবে ক্লীয়ারটোন উৎপাদন

INTERPUB GRA-18 B

রুক্ষত্বক্
ব্রন
মেচেতা
ছুলী
রূপ প্রসাধনে
অপরিহার্য
Basant
Malati
বসন্ত
মালতী

প্রকাশিত হল

"বিবর"-এর পরিপূরক উপন্যাস

স্বীকারোক্তি ॥ সমরেশ বসু

নিরন্তর নিরীক্ষায় বিশ্বাসী সমরেশ বসু "স্বীকারোক্তি" উপন্যাসে নায়কের জবানীতে উত্তমপুরুষে এক আশ্চর্য পাপের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, এর রচনা-শৈলী ও বক্তব্য উভয়ই বাংলা সাহিত্যে নতুন। এখন এর ভালো বা মন্দ, মেনে নেওয়া বা না মেনে নেওয়া বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সন্দেহ নেই, যে-কোনও পাঠককেই এ উপন্যাস ভাবিয়ে তুলবে।

'স্বীকারোক্তি', 'অস্বীকার' ও 'পাপ' তিনটি অধ্যায়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে। তবু মূলে, এটি একটি ভয়ংকর স্বীকারোক্তি। পাপবোধ থেকেই এ স্বীকারোক্তির উদ্ভব। অথচ সমাজে সবাই যা করছে, সেও তাই করছে। কিন্তু পাপ-চেতনাই তাকে সকলের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ ও কিম্ভূত করে তুলেছে। এবং একই সঙ্গে তাকে মহৎ ও করুণও করে তুলেছে।

'বিবর' সমরেশ বসুর যে মানস-পর্বের ফসল, 'স্বীকারোক্তি'ও সেই পর্বের। উপলব্ধি, মনন, রচনাভঙ্গি, বক্তব্য—সব দিক থেকেই 'বিবর'-এর সঙ্গে এর আশ্চর্য আত্মীয়তা। এই মানস-পর্বের যে উপলব্ধিটুকু 'বিবর'-এ বলা হয়ে ওঠেনি, কিংবা বলা যায়নি, তা-ই যেন পরিশীলিত রূপ পেয়েছে 'স্বীকারোক্তি'তে। সে হিসেবে এই গ্রন্থটি 'বিবর'-এর পরিপূরক উপন্যাস তো বটেই, বাংলা উপন্যাসে এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্নও।

দাম ৫·০০

॥ সমরেশ বসুর আরও উপন্যাস ॥

বিবর ॥ ৫·০০

সমরেশ বসুর "বিবর"-এর নতুন করে পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নেই। মাত্র এক বছর হল এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, অথচ এরই মধ্যে এ উপন্যাসটি সাহিত্যরসিক-মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। [illegible] সাহিত্যপাঠকদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি যদিও কোনও অনিবার্য কারণে এ বইটি অদ্যাবধি [illegible] ওঠার সুযোগ করে উঠতে না পেরে থাকেন, অন্তত এর নাম শুনেছেন, কিংবা কোথাও-না-কোথাও এর সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছেন।

দুই অরণ্য ॥ ৬·০০

স্বার্থের স্রোতে ভেসে সভ্য মানুষ গেছে অরণ্যের ঐশ্বর্য লুটতে। আর পেটের দায়ে, কৌতূহলের বশে অরণ্যের সন্তানরা মিশেছে তাদের সঙ্গে। কখনও বা ছিটকে বেরিয়ে গেছে শহরের অনভ্যস্ত পরিবেশে। সেও আর এক [illegible] দুই গোষ্ঠীর সহাবস্থান এখানে নয়। সবলের ক্ষুধায় জীর্ণ হয়েছে সরল আরণ্যক সমাজ। আরণ্যক জীবনের [illegible] "দুই অরণ্য" একটি বিশিষ্ট উপন্যাস—বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ফেরাই ॥ ৩·০০

একটি মেয়ে—চারটি পুরুষ। পুরুষ চারজনই বিশিষ্ট। একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী—প্রায় প্রৌঢ়; একজন কোটিপতি ধনী—রুচিবান শিক্ষিত যুবক; একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক নেতা—শেষ-যৌবনেই অতি-প্রবীণ; আর একজন বুদ্ধিজীবী কবি-অধ্যাপক—অতিক্রান্ত-যৌবন মনীষী। এই চারজনের কাছ থেকেই প্রেমের আমন্ত্রণ আসে মেয়েটির কাছে।......"ফেরাই" অভিনব আঙ্গিকে লেখা একটি নতুন ধরনের প্রেমের উপন্যাস।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

প্রজাতন্ত্র দিবস
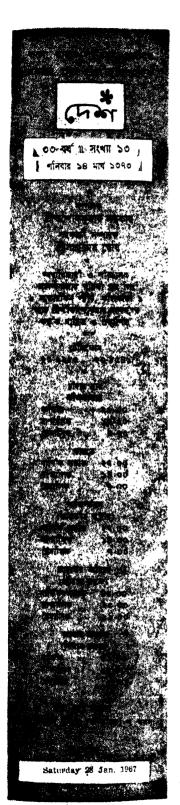
ভারতের জাতীয় জীবনে ছাব্বিশে জানুআরি একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজাতন্ত্র। আজ তার সপ্তদশ বর্ষ পূর্ণ হল। দীর্ঘকাল রাজতন্ত্রে যে জাতি লালিত হয়েছে তার পক্ষে প্রজাতন্ত্র যে কত বড় মুক্তি, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ঘটনাটি যে ভারতীয় ইতিহাসে অভিনব তাই শুধু নয়, এই ঘটনার দ্বারা সাধারণে তার ক্ষমতা ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দেশের শাসন পরিচালনায়। গত সতেরো বছরের ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসকে আমরা তাই মর্যাদার ইতিহাস বলতে পারি। যদিও স্বীকার করে নিতে হবে প্রজাতন্ত্রের দায় সম্বন্ধে আমাদের এখনও সম্যক উপলব্ধি হয়নি।

প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রিক জীবনের একটি সংগঠন মাত্র, যার মধ্যে প্রজার হাতে তার সমস্ত অধিকার সফল হবার মন্ত্র সঁপে দেওয়া আছে। এখানে প্রজাই নিজের চালক। তার ইচ্ছা, সংকল্প ও শক্তি তাকে চালাবে, তাকে সমৃদ্ধির পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। একথা ভুলে গেলে চলবে না, প্রজাতন্ত্র সাধারণ মানুষের বহু দুঃখ ও সংঘাতের সাধনায় উপার্জিত একটি আদর্শ। এই আদর্শকে কলঙ্কিত করলে তার দায়ভাগ আমাদেরই বইতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রজাতান্ত্রিক হলেই রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ হয় না, তেমন ব্যক্তি বা উৎকট দলগত প্রতাপ ও সংহতি প্রজার সংগত অধিকারকে মিথ্যা করতে পারে। আমরা সে-রকম কোনো সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেব না কদাচ।

প্রজাতন্ত্রের আদি কথা ঃ মানবাধিকার, সাধারণের সম্মান, ন্যায় বিচার। শাসনে ও প্রশাসনে যদি সাধারণের সম্মান ও সমাদর না থাকে, যদি সংগত অধিকার বোধ খর্বিত হয়, যদি একশ্রেণীর আধিপত্য সমষ্টিগত কল্যাণকে খর্ব করে তবে সে-প্রজাতন্ত্র পরিহাসেরই সামিল হতে বাধ্য। অনেকে মনে করেন, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েও ভারতে যথার্থ প্রজা-প্রতিনিধিত্বের বিকাশ হতে পারছে না। এই সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়, তবে যে দেশে মাত্র সতেরো বছর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার আত্মবিকাশবোধের উন্মেষ হতে কিছু সময় প্রয়োজন। আমরা আশা করতে পারি, শিক্ষার প্রসার, বোধ ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটলে যথার্থ প্রজা-প্রতিনিধিত্বের উন্মেষও ঘটবে।

জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ প্রজাপুঞ্জের হাতে। যদি আমরা মনে করি, রথ টানার দায় আমাদের নেই, দায়িত্বও নয়—তবে সেই রথের গতি অবশ্যই প্রশাসনের হাতে গিয়ে পড়ে। আর যদি মনে করি, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে সফল করার দায় আমাদের—সাধারণ মানুষের তবে সে রথের দড়ি আমাদেরই ধরতে হবে। কোটি কোটি ভারতীয় প্রজা অবশ্য এভাবে খুঁটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত নন, প্রশাসনও তাই অনেক সময় মর্জিমাফিক চলে।

সুবিচার, সাধারণের কল্যাণ, আত্মবিকাশ, সর্বজনের মঙ্গল আমাদের প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে আমরা একটি দরিদ্রতম দেশের মানুষ, এই দারিদ্র্যকে আমাদের দূর করতে হবে। দারিদ্র্য দূর করার জন্যে কেবলমাত্র বিদেশী সাহায্য ভিক্ষা করব, এমন হতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনে নিদারুণ আলস্য রয়েছে, রয়েছে কর্মে ভীতি, নানা রকম দুর্বলতা। যদি আলস্য পরিহার করতে না পারি, যদি কর্মে আসক্তি না আসে তবে এ-দারিদ্র্য দূর হবার নয়। মুখের কথায় যেমন চিড়ে ভেজে না—তেমনি যেখানে প্রজা নিজেই উৎসুক ও আগ্রহী নয়, কর্মে যেখানে মতি নেই, যেখানে সহিষ্ণুতা ও সঙ্কল্প নেই সেখানে প্রজাতন্ত্র একটিমাত্র শব্দ বই আর কিছু না। দেশ ও জাতিকে শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে, ন্যায় ও নীতির পথে নিয়ে যাবার জন্যেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; প্রজাহিতের দায়িত্ব আজ আমাদেরই, সে-ক্ষমতা ও অধিকারও আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া আছে। প্রজাতন্ত্রের এই মর্যাদা আমরা নিজস্বার্থে রক্ষা করব—এই যেন হয় আমাদের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন—রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা দ্বারা আমরা আজ সর্বদিক দিয়ে পীড়িত। কখনও কখনও এই পীড়ন নৈরাশ্য সৃষ্টি করতে পারে। যদি সেই নৈরাশ্যে আমরা বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হই, তবে তার ফলাফল ভাল না-ও হতে পারে। প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সচেতন সহযোগিতা ও সক্রিয়তা প্রয়োজন। আমাদের মনোমত ভারত আমরাই গঠন করে তুলব—এই যেন হয় আমাদের সঙ্কল্প।
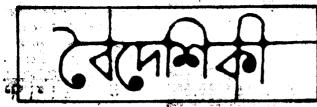
বিষময় জাল থেকে মুক্তি চাই

কমিউনিস্ট চীনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তার তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য পরিণাম সম্বন্ধে দৈনিক ব্যাপারে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরাও জোর গলায় কিছু বলতে পারছেন না। "পণ্ডিতদের" চুপ করে থাকাও মুশকিল। চুপ করে থাকলে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, আবার ভবিষ্যৎবাণী করতেও ভয়, পাছে একেবারে উল্টো কিছু না ঘটে যায়। সুতরাং অ্যা-ও হয় ও-ও হয়—এই ধরনের লেখালেখির ছড়াছড়ি চলছে। তাৎপর্য সম্বন্ধে গবেষণাতেও রামধনুর মতো বেগুনি থেকে লাল পর্যন্ত সব রংই মিলবে। মাও সি তুং-এর মতবাদ এবং পলিসি থেকে চীন যাতে না সরে তার জন্যে মাও সি তুং নীতির যাবতীয় সমালোচককে সকল ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই "প্রোলিটারিয়ান রেভল্যুশনের" সৃষ্টি—এই ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে মাও সি তুং মারা গেছেন অথবা মর-মর, চীনে যা ঘটছে সেটা শক্তির উত্তরাধিকারের লড়াই—এই থিসিস পর্যন্ত রকমারি কথা শোনা যাচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তানকে আমেরিকা সমান ভালোবাসে কিনা অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের হালের বৈদেশিক নীতির চোখে পাকিস্তান ও ভারত সমান হয়ে উঠেছে কিনা এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই যে বর্তমানে মাও সি তুংকে এক নম্বরের শত্রু বলে মনে করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অবশ্য ভবিষ্যতে চীনের প্রতি আমেরিকার চেয়েও রাশিয়ার বৈরভাব বেশী হতে পারে। আপাতত উভয়েই মাও সি তুং-এর ধ্বংস কামনা করে। মাও সি তুং হেরে গেলে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সমঝোতার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, কিন্তু মাও সি তুং হারলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের সহজে উন্নতি হবে না: কারণ "মাও-ইজম্"-এর হ্রাস হলেও রাশিয়া ও চীনের মধ্যে যে-জাতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে তা সহজে মিটবার নয়।

চীনের শক্তি বিপথগামী হয়েছে, এটা এশিয়ার দুর্ভাগ্যের বিষয়। ইউরো-মার্কিন জাতিদের হাতে চীনের লাঞ্ছনার যুগের অবসান যখন হল তখন সারা এশিয়া আনন্দিত হয়েছিল, যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জাপানের নব-অভ্যুদয়ে এশিয়ায় নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, জাপানী শক্তি যেমন মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী অনুকরণে নিজের এবং অপর এশীয় জাতির ক্ষতি করেছিল, তেমনি চীনের শক্তিও বিপথগামী হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার জন্যে ইউরো-আমেরিকা এবং রাশিয়ার দায়িত্বও কম নয়।

কম্যুনিস্ট চীন ভারতের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে ভারত ক্ষুব্ধ। যার শক্তি ভয় উৎপাদন করে সে একটু দুর্বল হোক—যারা ভীত তাদের মনে সহজেই এই ভাবটা আসতে পারে। চীনের আভ্যন্তর দুর্যোগের সংবাদে ভারতে কিছুটা উল্লাসের প্রকাশ স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের দৃষ্টি এবং রাশিয়া বা আমেরিকার দৃষ্টি একরকম হতে পারে না, হওয়া মারাত্মক। চীন অন্যায় করে ভারতের হিমালয় অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করেছে, চীন অন্যায় করে তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ করেছে বলে আমরা মনে করি। ভারতবর্ষকে মার্কিন সামরিক বেস বলে ধারণা করে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে চীনের এইসব করতে হয়েছে—চীনের পক্ষে এই ওকালতি গ্রাহ্য নয়, যদিও ভারতবর্ষের আত্মনির্ভরতার অভাব তার নিরপেক্ষতাকে অপরের চক্ষে ষোল আনা নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে নি। সামরিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—অন্ততপক্ষে চীন-ভারত সংঘর্ষের পূর্ব পর্যন্ত—মোটের উপর যে স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণের পরিচয় দিতে পেরেছিল, সর্ব রকম মিলিটারি অ্যালায়েন্স্ থেকে দূরে ছিল—এবং বরাবর চীনের প্রাপ্য আন্তর্জাতিক মর্যাদার পক্ষে যথাসম্ভব চেষ্টা করে এসেছে, তাতে চীনের প্রতি ভারতের বন্ধুভাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ করার সঙ্গত কারণ ছিল না।

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে, ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পরে ভারতের বৈদেশিক নীতিতে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। বাহ্যত নন-অ্যালাইনমেন্টের বয়ান বজায় থাকলেও ভিতরের বস্তুটা অনেকখানি বদলে গেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, সামরিক ক্ষেত্রেও পরমুখাপেক্ষিতা আজ অধিকতর প্রকট হয়েছে। চীন যদি বন্ধুভাব রক্ষা করত তা হলে আমাদের এ দশা হত না। চীন যদি গোড়ায় অন্যায় না করত তবে যে ভিসাস সার্কেল সৃষ্টি হয়েছে সেটা হত না। চীন যা করেছে তার ফলে ভারতবর্ষকে এমন পথে চলতে হয়েছে যাতে চীনের সন্দেহ বেড়েছে এবং চীন ভারতবর্ষের আরো ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে যার ফলে চীনের প্রতি ভারতের বিরাগ আরো বেড়েছে। এশিয়ার পক্ষে এটা যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা বলে শেষ করা যায় না।

এখনো ভারতবর্ষ আমেরিকার পক্ষ নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে লাগে নি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ নিয়ে চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে ভারত সরকারকে নামতে হয়েছে। যেখানেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে ঝগড়া সেখানেই কলের পুতুলের মত ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ নিয়েছে, যেমন আফ্রো-এশিয়ান গোষ্ঠীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের এশীয় শক্তি বলে স্বীকৃত হবার দাবি যখন উঠল, ভারত চীনের আপত্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েটের হয়ে কোমর বেঁধে লাগল। জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে পার্থক্য আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তাই বলে মস্কোর শক্তিকে এশীয় শক্তি বলে স্বীকার করতে হবে তার কোনো মানে নেই। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ
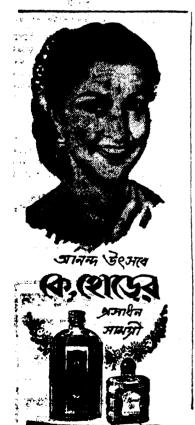
চীনের সাম্প্রতিক ছবি। মাও সে তুং-এর বিরাট প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে রেডগারডের দল হ্যাংকাউ স্ট্রীট দিয়ে মিছিল করে চলেছে

থাকতে পারত, তা না করে সে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে জোয়ান হয়ে লড়তে আরম্ভ করল। চীনের সংগে যেখানেই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিবাদ বেধেছে সেখানেই ভারত সরকার সোভিয়েটের পক্ষ নিয়েছেন। এই-সব অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানার অবসানের কোনো সম্ভাবনা দেখি না যতদিন পর্যন্ত না চীনের শক্তি সুপথে আসে এবং ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে। চীন-ভারত সম্পর্কের জটিলতাকে পাক-চীন ষড়যন্ত্র আরো মারাত্মক করে তুলেছে। এই বিষময় জাল থেকে এ-দেশগুলিকে যাতে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ বাস করে—মুক্তি পেতেই হবে, তা না হলে এশিয়ার রক্ষা নেই।

আমেরিকা অথবা রাশিয়ার চোখ দিয়ে ভারতবর্ষ চীনকে দেখতে পারে না। ভারতের কাম্য : চীনের শক্তি বিপথ থেকে সুপথে আসুক, কিন্তু চীন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক এরূপ কামনা ভারতের হতে পারে না। কিন্তু ভারতের পক্ষে এই স্বতন্ত্র দৃষ্টির সৃষ্টি এবং রক্ষা নির্ভর করে ভারতের দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের উপর যেটা আজ কিছুতেই নিশ্ছিদ্র বলা যায় না। এ-দেশে যারা মার্কিন সোহাগের জন্যে লালায়িত অথবা যারা সোভিয়েটের চোখ দিয়ে চীনকে দেখতে চায় অথবা যারা মাও সে তুং-এর জয়ধ্বনি করছে—এরা সকলেই কেবল ভারতের স্বাতন্ত্র্যের নয়, ভারতের ঐক্যেরও পরিপন্থী। ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্য কোনোটাই সুরক্ষিত হবার নয় যতদিন আত্মনির্ভরতা না আসবে। যার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হয় নি তার পক্ষে অপরের কাছা ধরে ঝুলে শত্রুরও লাঞ্ছনা দেখে উল্লসিত হওয়া শোভন নয়। ভারত বিভিন্ন জীবনধারার কো-এগ্‌জিস্‌টেনস্‌-এ বিশ্বাসী। আমেরিকার অথবা রাশিয়ার অথবা চীনের পথ ভারতবর্ষের পথ নয়। এক অদিগুরুর দোহাই দিয়ে যারা ভেবেছিল এক পথে চলছে, সেই রাশিয়া এবং চীনও একে অপরের কাছ থেকে কেবল দূরে সরে যায় নি, একে অপরের সর্বনাশ ঘটাতে উৎসুক। হায়, চীন ও আমেরিকার মধ্যে তবু প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান আছে, কিন্তু চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের আরো বিপদ এই যে, এই ভিন্নহৃদয় কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য-দুটি গায়ে গায়ে লাগা।

২১।১।৬৭

প্রজাতন্ত্র দিবস

'দূরভাষ-নির্দেশিকা'

প্রথমটায় মনে হল : 'বারোখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস 'পরিশোভিত' কোনো দূর্ধর্ষ শারদীয় সংখ্যা নাকি? কিন্তু জানুয়ারি মাসে তো এ-রকম পৃথুল 'সাহিত্য-সম্ভার' আমাদের বরাতে জোটে না। এখন স্কুল বই আর টেস্ট-পেপারের সীজ্‌নে, সরস্বতী গা-ঢাকা দিয়েছেন ক্যানভাসারের থলিতে, ষোলো পৃষ্ঠার 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' কিংবা বারো পৃষ্ঠার কাব্য সংগ্রহ ছাপতে গেলেও প্রেস লাঠি হাতে তাড়া করে আসে।

তারপর অবধান করা গেল—না, ওটি শারদীয় সাহিত্য-সমারোহ নয়, ক্যালকাটা টেলিফোনস ডাইরেক্‌টরি। সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত বিহ্বল অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল : 'ও হোয়াট এ ফল!' কোথায় সেই পাঁচ কে-জি ওজনের অতুলন-সমৃদ্ধি, কোথায় সেই নিঃসঙ্গ গৃহিণীর চোর-বিতাড়নের অমোঘ অস্ত্র, কোথায় বালিশের সেই অদ্বিতীয় বিকল্প? এক-একটা ক্লাব-সুজ্‌নিরও যে এর চাইতে বপুষ্মান। এ যেন পাঁজিকার উল্টো বিজ্ঞাপন—মহাশক্তি সালসা সেবনের পরবর্তী অবস্থা থেকে একেবারে পূর্বাবস্থায় অবতরণ!

বিমূঢ় ভাবটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, এই অনুষঙ্গের ধারায়, মন কিছুক্ষণ পঞ্জিকার জগতেই বিচরণ করতে লাগল। সেই ছেলে-বেলায়, হাতের কাছে জুতসই কোনো গল্পের বই না জুটলে, পঞ্জিকা—পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনই প্রধানত ছিল আমাদের পরম সুখপাঠ্য উপ-পাঠ্য। ওই সব বিজ্ঞাপনের অনেকগুলোই যে ছিল 'এ' মার্কা। সেটা বোঝবার বয়েস তখনো হয় নি এবং পঞ্জিকার অবধারিকা ঠাকুর মা-ও তা নিয়ে বিশেষ বিচলিত বোধ করতেন না।

বড়ো হয়ে পঞ্জিকার জায়গা দখল করেছিল ক্যালকাটা টেলিফোনস ডাইরেকটরি—যেহেতু প্রকৃতির রাজ্যে ভ্যাকুয়াম নেই। আর এই

তো স্বাভাবিক। কারণ পঞ্জিকা যদি শিশু-সাহিত্য হয়, টেলিফোন-নির্দেশিকা তা হলে বয়স্কের চিন্তা-উদ্বোধক সদ্‌গ্রন্থ। একটি নন্দন-সাহিত্য, আর একটি মনন-বিকাশ।

এই দূরভাষ নির্দেশিকা—বঙ্গানুবাদটাই চালানো যাক, বেশ ভালো শোনাচ্ছে—যে-কোনো বিবেকবান বাঙালীকেই বিবিধ জিজ্ঞাসায় উদ্দীপিত করতে বাধ্য। প্রথমেই কৌতূহল জাগবে, তাঁর স্বপদবীধারী কত-জন টেলিফোন-সংরক্ষণ করে থাকেন। তাঁরা যদি কয়েক পাতা জুড়ে বিদ্যমান হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই একটা আত্মপ্রসাদ জাগবে, মনে হবে কলকাতার সমাজ-জীবনে আমরা চক্রবর্তীরা, ঘোষেরা কিংবা সেনেরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত আছি। তারপরেই অনুধাবন করতে থাকব, আমাদের কতজন এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, কতজন আই-এ-এস, কতজন গ্লাসগো ইত্যাদি মার্কা এনজিনীয়র, ক'জনই বা বিলেত-ফেরত প্রোফেসার। এ থেকে নিজেদের পদবী সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধান্বিত হবো এবং চক্রবর্তীরা কিংবা সেনেরা কিংবা ঘোষেরা পরস্পরকে আরো বেশি ভালোবাসতে থাকব।

গুহ, অর্থাৎ পদবীগত চ্যারিটিতে দীক্ষিত হওয়ার পর বর্ণগত জিজ্ঞাসা দেখা দেবে।

টেলিফোন ডিরেক্টরী পড়তে পারেন না? তাই চোখ আপনার ঠিক আছে

চক্রবর্তীরা চাটুজ্জে ইত্যাদির খোঁজ-খবর করব, ঘোষেরা বোস-টোসদের সন্ধান করে দেখব, সেনেরা দাশগুপ্ত প্রমুখের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠব। বর্ণের বর্ণচ্ছটায় আরো খানিকটা নিবিড় আত্মতুষ্টি লাভ হলে, তখন বৃহৎ বাঙালীত্বের জন্যে মন-প্রাণ কাঁদতে থাকবে। তখন মেট্রোপলিট্যান সমিতির রিপোর্টগুলো বিদ্যুৎশিখার মতো আমাদের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হবে : 'কলকাতা কি বাঙালীর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে?' প্রথমেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার-দের তালিকায় মনোনিবেশ করব, কতজন বাঙালী তাতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন, কজনই বা নিছক 'পি-এ টু দ্য জেনারেল ম্যানেজার!' বুঝতে চেষ্টা করব, সর্বভারতীয় চাকুরির প্রতিযোগিতায় আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল কিংবা কী পরিমাণেই বা অন্ধকার।

এই সমীক্ষা শেষ হলে, বাঙালীর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠব। বলা অনাবশ্যক, কোনো রবিবারের ছুটিতে, সারাটা সকাল এই মহান অন্বেষায় কাটিয়ে, আমাদের হৃদয় নিশ্চয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাবে না। তখন প্লুত স্বরে আমরা স্বগতোক্তি করতে থাকব : 'ঠিক কথা—কলকাতা বাঙালীর হাতের বাইরেই চলে যাচ্ছে—বাংলা দেশের ইকনমিক ফিল্ডে—'

তারপরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অমর বাণী আমাদের বারংবার মনে পড়তে থাকবে। পরীক্ষা পাশ এবং চাকুরি-লাভের "হাস্যো-দ্দীপক উন্মত্ততা"র পরিণাম ভেবে ভেবে, দুপুরের খিদেটা চাগিয়ে না ওঠা পর্যন্ত কিংবা ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, আমরা কাতর আর ভাবুক হয়ে থাকব। আমাদের মনে পড়বে, এই বাংলা দেশেই জন্মেছিলেন মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল, স্যার রাজেন মুখুজ্জে—এবং—

'এবং' এর পরে যদি আর কিছু খুঁজে না-ও পাই, আমাদের ভাবুতায় বাধা পড়বে না। কলকাতার দূরভাষ-নির্দেশিকা এইভাবে আমাদের মনকে ক্রমশ উন্নত আর চিন্তাশীল করে তুলবে।

কিন্তু শারদীয়া সংখ্যার মতো ছলনা-জাগানো এবং ক্লাব-সুভ্যিনিরের মতো আকৃতিময় দর্শিকার এই নববিধান আমাকে নৈরাশ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার তিন কলাম-ব্যাপী নামাবলী এবং বাইবেল হরফ-

বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু পড়া যাবে না স্যার, কথা দিচ্ছি আপনাকে

বিনিন্দিত অক্ষরমালায় পাঁচ মিনিটের বেশি চোখকে আকৃষ্ট করে রাখা সুন্দর চশমার পক্ষে অসাধ্য। অর্থাৎ এই সদ্গ্রন্থ থেকে আত্মোন্নয়নের পালা আমার শেষ হল। নম্বরগুলো কখনো কালিতে একাকার, কখনো পরিপূর্ণ নিষ্কালি। একটি-দুটি পাতা কখনো বা প্রায় অম্লান শুভ্রতায় উজ্জ্বল—যাঁরা পত্রস্থ ছিলেন, খুব সম্ভব স্বহস্তে নিজের নাম বসিয়ে দেবার সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়েছে।

একবার সন্দেহ হয়েছিল বোধ হয় 'স্যাবোটাজ'—এর পেছনে কলকাতার চক্ষু-চিকিৎসকের একটা সম্মিলিত চক্রান্ত থাকতেও পারে। কিন্তু পরক্ষণেই একজন পরিচিত চক্ষুবিশারদকে একটি শ্বেতপ্রায় পত্রে প্রায় অদর্শনরূপে আবিষ্কার করে এই পাপ-ধারণাকে মন থেকে দূর করতে হল।

শোকাহত চিত্তে বসে আছি, অকস্মাৎ আর একটি চিন্তা আমাকে চকিত করল, যাকে বলে সিলভর-লাইন! গৃহিণীরা? যাঁরা ত্রিশ বছর আগেকার স্কুলের সহপাঠিনীদের নম্বর খুঁজে খুঁজে সখী-সম্বাদ চালাতে থাকেন? এবং সদ্য কলেজগামিনী বালিকারা? যাদের টেলিফোনধারিণী বান্ধবীর সংখ্যা কলেজের ছাত্রী সংখ্যার চাইতেও বেশি?

সন্দেহ নেই, সন্ধ্যার পরে দূরভাষ-নির্দেশিকার পাতা ওলটাতেও তাঁদের সাহসে কুলোবে না। ঠিক কথা, টেলিফোনের বিল কমে যাবে, আর এই দুঃসময়ে সেইটেই কি কম বাঁচোয়া?

মৃতেরা

বুদ্ধদেব বসু

শুনতে পাই জীবিতের ভারে এই পৃথিবী অবসন্ন। কিন্তু মনে হয় মৃতের সংখ্যা আরো বেশি।

সে কোন জগৎ, যেখানে তারা ধ'রে যায়? সে কি পাতাল, সে কি অন্তরিক্ষ, কোনো কল্পনাতীত সুদূর?

কোনো বায়ুহীন ব্যোমে কি ভেসে বেড়ায় তারা? কোনো অতল, অনার্দ্র জলে সাঁৎরে চলে? তাদের ওষ্ঠাধর আছে? কণ্ঠস্বর? তারা কি জানে তারা মৃত?

মনে হয় সন্তান সেখানে মা-কে ফিরে পায়, প্রেমিক-প্রেমিকা হাতে হাতে ধ'রে হাঁটে—নিঃশব্দে, নিঃশব্দে—যেন মাটিতে তাদের পা পড়ে না অথচ মাটি তাদেরই জন্য সবুজ।

কিংবা হয়তো স্পর্শেরও আর প্রয়োজন নেই; বৈদ্যুতের দুটি স্ফুলিঙ্গ তারা এখন, স্রোতের মতো পরস্পরে ব'য়ে যায়।

খিদে পায় কি তাদের? ঘড়ি আছে? আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী? নতুন কেউ এলে কি এগিয়ে আসে, দল বেঁধে অভ্যর্থনার জন্য? কোনো সাঁকোর রেলিঙে ঝুঁকে নিশেন ওড়ায়?

না কি তারা প্রত্যেকেই একলা, সীমাহীনরূপে নিঃসঙ্গ, না কি এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের মতোই দূরত্ব তাদের অফুরান?

দেখেছিলাম এক মুমূর্ষুকে, পায়ের নখগুলো প্রকাণ্ড, গায়ের চামড়া ব্যাঙের মতো কর্কশ। কিন্তু সেদিন আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি। মৃতের দেশে সান্ত্বনা কি পেয়েছিলো সে? কেউ তার পায়ের নখ কেটে দিয়েছিলো?

অনেক, অনেক মুমূর্ষুকে আমি দেখিনি। সেই দুঃখী ফুর্তিবাজ, দু-মন ওজনের মহিলা, যাঁর স্নেহের দৃষ্টিতে ঘাসের মতো আমি বেড়ে উঠেছিলাম। পাঁচ মিনিট দূরে হাসপাতালে ছিলেন তিনি, আমি দেখতে যাইনি।

এক যুবতী ছিলো কোনো-এক কালে বাংলার পাড়াগাঁয়ে, তার চোখে ছিলো স্বাভাবিক আবেশ, কিন্তু স্বামী ছিলো পাগল। আমার জন্য আরো অনেক কষ্ট সে পেয়েছিলো, কিন্তু কেমন ক'রে তার মৃত্যু হ'লো তাও আমি জানি না।

বলো, দেখা হবে কি সেখানে? ক্ষমা চাইতে পারবো? না কি তোমরাও কার্থেজের রানীর মতো মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে, মিলিয়ে যাবে পাৎলা চাঁদের মতো অন্তরালে? একটু দেখা—একটু চোখের দেখা শুধু—তাও কি হ'তে পারে না? চোখ,

আমার দৃষ্টি, আমার আলো, তোমরা কি পুষ্পিত
হ'তে পারো না অন্য এক উদ্যানে?
কিন্তু যত চেষ্টা করি, কিছুতেই ভাবতে পারি না
কোন দেশ মৃতের। ভাবতে পারি না কেমন তারা।
আমার এই ধ্বংসে-পড়া ইন্দ্রিয়গুলোতেই এখনো
আমি বন্দী।
তাই আমি দেরাজ খুলে লুকিয়ে-লুকিয়ে
ফোটোগ্রাফ দেখি, পাইচারি করি ঘরের মেঝেতে,
সিগারেট ধরাই; মনে আনি ঝাপসা মুখ, মুছে-যাওয়া
হাতের লেখা, আর আমাকে যে-নাম ধ'রে ডাকতো,
সেই শব্দ। বিশ্বাস হয় না এর পরে আর-কিছু নেই।
বলো, তোমরা কি মনে রেখেছো আমাকে? স্মৃতি
আছে কি তোমাদের? তোমরা কি জানো যে আমি
এখনো ভুলিনি?
বাইরে বৃষ্টি পড়ে সন্ধেবেলা, আঁধার হ'য়ে
আসে পৃথিবী, আর আমি জানলার ধারে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকি কোনো
অস্পষ্ট উত্তরের জন্য—কিন্ত বৃষ্টির শব্দ ছাড়া
আর-কিছুই শোনা যায় না, বাতাসের নিশ্বাস
ছাড়া আর-কিছুই শোনা যায় না।

বিষণ্ণ গোধূলি

মনুজেশ মিত্র

বিষণ্ণ গোধূলি, তবু সমাহিত বিষণ্ণতা ছেয়ে
কোথাও রয়েছে দুটি শান্ত স্নিগ্ধ হাত,
না হলে পাখিরা কেন এমন নির্ভয়,
না হলে গাছেরা কেন এমন প্রগাঢ়,
না হলে হাওয়ারা কেন এমন নির্ভার।
শ্যামলী মেয়ের মতো মেঘ যেন শান্ত করে আনে
উদগ্র রৌদ্রের কাম। যেন চলে যায়
দেবতার শুভ্র সান্নিধানে, নিয়ে যায়
রৌদ্রকে সমাধি সৌম্যতার রূপান্তরে........
ঘনিষ্ঠহৃদয় এক শিল্পীর মতন স্তব্ধ ঘাসের ভিতরে
কার স্পর্শ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল বিমূঢ় ফড়িং:
এরা সব একদেশী, বিষণ্ণ পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
স্নিগ্ধ কোনো হাতের কোরক তুলে নেবে।
অনাত্মীয় হে আমার বিদেশী হৃদয়,
সময়ের কাছে করো নির্মল প্রার্থনা—
হে সময়, বিষণ্ণতা, চেয়ে নাও সেই দুটি
শান্ত স্নিগ্ধ হাত।

সন্নিধান

মানস রায়চৌধুরী

ওই দেখ ওই রৌদ্রে প্লাবিত উপকূল
আরেকটু গেলে ফেনার শুভ্র জল
আমরা এখানে প্রস্তরপাথরে যুগ যুগ ধরে অবিকল
নত কার্পাস শাখাটির মত মেলে রাখি সাদা চুল
কত শতাব্দী [illegible] ধরেছি [illegible] এলোমেলো
গ্রীষ্ম তোমার রৌদ্রচাদর কত দূরে উড়ে এলো
আরেকটু গেলে বালিতে লুটানো জল
আরেকটু গেলে হাসিতে তুমুল সাদা ঢেউ অবিরল।

এতকাল কারা পাহারা দিয়েছে বানিয়েছে কালো শৃঙ্খল
লেবুগাছটির সৌরভচ্যুত শতাব্দীজয়ী ছল
আমাদের বাঁধে শুষ্ক পাথরে ভাস্কর্য কি চিরদিন?

নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে দেবে জীবনের রীতি স্মৃতিহীন
আরেকটু চলো আরেকটু গেলে মৃত্যুর মত বাহুতল
দিগন্ত ছেঁড়া অন্ধ আবেগ জাহাজডুবির নীল জল।

পাবো তারে

কালকূট

দশ

এ যেন, 'কে না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি, কালিনী নই কূলে।' বড়ায়ি, কে যেন বাঁশী বাজায় কালিন্দী নদীর ধারে। সুন্দরবনের হাওয়ায়, এই হাটের মধ্যে, এ যেন সেই রকম। দোকানপসার বুঝতে পারি, ধানচালের আড়ত তো থাকবেই। তার মধ্যে এমন সরু সুরের চড়া শব্দে হারমোনিয়ম কে বাজায়। শুধু বাজায় না, আবার গান করে। তাই বা যদি হল, তাও আবার ইস্তিরিলোকের গলায়। গলাখানিও সেই রকম। চন্দ্রবিন্দু প্রতি অক্ষরেই আছে, সেই সঙ্গেই ধারণা হয়, গলাখানি কাঁসা দিয়ে বাঁধানো। তারপরে যদি বাণীর বিচারে যাও, তবে তো মূর্চ্ছো যেতে হয়। তখন থেকে এক কলিই দু তিনবার শোনা যাচ্ছে, 'প্রেম করে ভাই, সংগে নিলে না...।' এখন এ কোন্ ভাই, সেটাই বিচার্য। এ ভাইয়ের অনেক অর্থ। ক্ষেত্রে আর পরিবেশে, কে কাকে না ভাই বলে। প্রেমিক প্রেমিকাও পরস্পরের ডাকাডাকিতে ভাই হয়ে ওঠে। এ গায়িকার ভাইটি কে, কার প্রতি এমন নালিশ, কে জানে।

গাজী পাশে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলে। আড়তদার মশাইদের কারুরই সেরকম কাজের তাড়া নেই। আড়তের সামনেই ধানের পাহাড়। মজুরেরা কাজ করছে। পাল্লায় ওজন হচ্ছে। বাইরের ধান ঘরে উঠছে। খাতা কলম নিয়ে হিসাব করছে কেউ কেউ। এই বে-দিনে সম্ভবত, কেবল সংগ্রহ। এখন কেনারাম, পরে বেচারাম। লাভরাম তারও পরে। বলা যায় না, লোকসানরাম হতেই বা কতক্ষণ। কেনাবেচার মাঝখানে, লাভ-লোকসানের জোয়ার ভাটা বাইরে দেখতে পাবে না। তবে যদি আড়তদারদের মুখের দিকে নজর করে দেখ, জোয়ারের ঝলক দেখতে পাবে। দিগন্তের মাঠ তার সাক্ষী। বসুমতী পরিপূর্ণ। সেখানে ভরা ভরতি থাকলেই হল। জোয়ারের কোটালের তিথি-নক্ষত্র সেখানেই।

'ও গাজী, তোমার সংগে কে?'

আড়তের মহাজন মশাইরা সবাই, মায় চোখে দেখে নির্বিকার থাকতে পারে না। হাটের দিন হলেও একটা কথা ছিল। ভিড়ের মধ্যে কত লোকের আনা যানা। তার আবার চেনা অচেনা। কিন্তু এই ফাঁকায় ফাঁকায়, বে-দিনে অচেনা লোক দেখলে একেবারে নির্যস চুপ করে থাকা যায় না। তাই জিজ্ঞাসাবাদ। গাজীর জবাব সেই এক, 'বাবু বেড়াতি এসেছেন।'

আড়তদার মশাইদের কারুর কারুর ভুরু কুঁচকে যায়। চোখ দিয়ে গাজীর বাবুকে একটু মাপজোক করা হয়। অবাক না হয়ে করে কী। এ তোমার ভারি শহর বন্দর নয়। এই নোনা গাঙের কূলে, বাদার গাঙে কেউ আবার বেড়াতে আসে নাকি। বুড়া আড়তদার মশাই ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানেন, হেসে বলেন, 'এখানে আর কী দেখবেন। খালি ধান আর চাল।'

পথে বেরুনোর কারণ যদি শুধু তাই হয়, তবে বলি, এ পাপচক্ষে তাই বা দেখতে পাই কোথায়। ধান চাল তো নিজের সীমায় আর তেমন নজরে পড়ে না। তবু, সোজাসুজি কথার একটা জবাব দিতে হয়, 'এই একটু নতুন জায়গা দেখা আর কী।'

'অই সেই।' আড়তদার বৃদ্ধ হুঁকোর চুমো থামিয়ে বলেন, 'যেখানে যাবেন, সেখানেই এক। এদিকে গেলে মাঠ, ওদিকে গেলে জল। মধ্যখানে এই বাজার। বসেন না, বসেন এসে।'

বসব না, বসতে চাই না। তবু বুড়ো মানুষের ডাকটি বেশ। সেই 'এস জন

বস জন' বলে বাঙলায় একটা কথা শোনা ছিল, সেইরকম মনে হল। কাজ কর্ম আছে, তার মধ্যে লোকজনের আসা যাওয়া। চেনা অচেনা কথা নেই। থাকতে আসনি, রাখতেও চাই না। একটু বসে যাও। এসেছ আমাদের দেশে। একে বলে সাবেকী শালীনতা। যার মধ্যে একটু প্রাণের সুরের রেশ পাওয়া যায়। তাও বোধ হয়, এই বয়স বলেই এখনো এটুকু শোনা যায়। আগামীকালের কালীনগর গঞ্জের কোন বুদ্ধ আড়তদার এ কথাও আর বলবে না। তার চালচলন হবে আলাদা। শহরের আধুনিকতা দিয়েছে পাশাপাশি মানুষের বিচ্ছিন্নতা। মানুষে তা নিক বা না নিক, সময়ের ফের বুঝে, স্রোত ধরে, বিচ্ছিন্নতা টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাচ্ছে। সে কেবল আপনা বোঝে। তাইতেই সে হাসল। দুসরাকে সে দেখবে কখন।

সেই ধারা কি এখানেও চোঁয়াচ্ছে না। চোঁয়াচ্ছে, আসছে। সময় তার সব কিছুই সবখানে দিয়ে যাবে। আগে পরে, দেরিতে আর ধীরে। যোগের সুতো এখনো কিছু এইসব মানুষদের হাতে। যাদের মুখ হয়তো সামনের দিকে এখনো ফেরানো। কিন্তু ছাঁটা শুরু হয়েছে পিছনে, যেদিকে সূর্য পাটে নামে, পড়ন্ত রোদ যাদের মুখে শেষবার আলো দেয়।

ধন্যবাদ দিতে পারি না কেতাবী রকমে, বলি, 'বসব না, একটু ঘুরে ঘুরে দেখি।'

আড়তদার ফোকলা দাঁতে হাসেন। বলেন, 'দেখেন, তবে অই দেখবার কিছু নেই। হাটের দিনে এলেও হত, দেখতেন কত তরিতরকারি ধান চাল বোঝাই হয়ে যায়। তার সঙ্গে গরু ভেড়া ছাগল, ইস্তক মানুষও।'

'মানুষও?' অবাক না হয়ে পারি না।

আড়তদার ফোগলা দাঁতে হাসেন। বলেন, 'তা বাবা, অত চমকান কেন। খালি কি ধান চাল তরিতরকারি পশু পাখি বিকোয়। মানুষ বিকোয় না? কত মানুষ আপনার কতখানে চালান হয়ে চলে যাচ্ছে। বসে থাকবার যো কই। হাটের দিনে দেখবেন, মানুষ নৌকা ভরে চলে যাচ্ছে। এখন, বাবা, বেচা বলেন, যা-ই বলেন, পেটের ধান্দায় কমনেকার মানুষ কমনে চলে যাচ্ছে। একটু তামাক খাবেন?'

অন্য কোথাও হলে সব কথাগুলোকে ঠাট্টা মনে করতাম। 'অন্তত তামাক খাবার ডাকে তো বটেই। কিন্তু ভুলে যাই, বয়স দিয়ে ভব্যতার বিচার হয় না। পথ-চলতি লোক, একেবারে কচিকাঁচাটি নয়। নিজে খাচ্ছেন, আর একজনকে না বললে কি ভাল দেখায়। তায় আবার ভিনদেশী। বলি, 'না, না, তামাক খাব না।'

গাজী হেসে বলে, 'বলি অ বিশ্বাস মশাই, এনারা তামাক খান না, ছিরগেট খান, ছিরগেট।'

বিশ্বাসমশাই ঘাড় নেড়ে বলেন, 'তবু বলা দরকার তো।'

এগিয়ে যাই আস্তে আস্তে। কিন্তু বুড়োর মানুষ বিকোবার কথাটা হঠাৎ ভুলতে পারি না। আমি যে চমকে ভেবেছিলাম, ধান চাল গরু ভেড়ার মত মানুষও বুঝি বিকিয়ে যায়, তা নয়। মানুষ শ্রমে বিকোয়। সেও এক রকমের বিকনো। দূরের এই ভেড়ি বাঁধের নোনা কূলের হাটে, রোজের শোনা কথার মধ্যে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে। হয়তো সে নিষ্ঠুরতা একেবারে মিথ্যে নয়।

গাজীর সঙ্গে এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিতেই দেখি, সামনে এক মস্ত পুকুর। তবে, তার বুক-জোড়া কচুরিপানা। পুকুরের প্রায় চার পাশেই ঘর। গাছের গুঁড়ি আর পাটাতন ফেলে ঘাটলা করা আছে। যার যেমন দরকার, সে ততখানি কচুরিপানা সরিয়ে দিয়েছে। সেখানে জল দেখা যায়। বাকী সবই দেখ, শত সহস্র নাগের ফণা তোলার মত কালো সবুজের ডগা মাথা তুলে আছে। একদা হয়তো এই পুকুরই ছিল এই নোনা কূলে মিঠে জলের ভাণ্ডার। এখন হয়েছে টিউবওয়েল। চাপা কল যাকে বলে। ভাণ্ডা ধরে চাপ দাও, ভলকে ভলকে জল পড়বে। তাই এ মিঠা জলের ভাণ্ডারের আর কদর নেই। কেবল, একজনকে দেখি, কোমর-জলে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে গা ডলছে। তার পরের ঘাটে, খোলা পিঠে চুল এলো করা, পাশ ফেরানো এক মেয়ে বাসন মাজে। বউ বলতে পারি না, কারণ তার ঘোমটা দেখি না। ঘাটের পিছনে, এমন খোলা জায়গায় বউমানুষের মত তার ভাবও দেখি না।

কিন্তু সেই গান গেল কোথায়। হারমোনিয়ামের সেই সরু সুতো কাটার শব্দ আর তার সঙ্গে, 'প্রেম করে ভাই সঙ্গে নিলে না।'...গাজীকে জিজ্ঞেস করতে যাব। তার আগেই দেখ, প্রলয় কাণ্ড। কোন দিক থেকে এল, ধরতে পারি না। এক মাঝবয়সী মোটাসোটা শক্ত গড়নের খালি গা মানুষ ক্ষ্যাপার মত ছুটে আসছে আমাদের পিছনেই। তাকে কয়েকজন ধরে রাখবার চেষ্টায় টানাটানি করছে। কিন্তু তার যো কী। সে আকাশ কাঁপিয়ে হাঁকে, 'না, ছেড়ে দাও, ছাড়, আজ ওর রক্তদর্শন না করি ছাড়ব না।'

কার রক্ত দর্শন করতে চায়। গাজীর দিকে তাকাই। গাজী তাকায় ক্ষ্যাপার দিকে। এই অচেনা তল্লাটে গাজী ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু আমার দিকে তার খেয়াল নেই। সে আপন মনে বলে, 'এই দেখ, পালমশাই যে ক্ষেপে উঠেছে একেবারে। হলটা কী।'

ততক্ষণে পাল মশাই আরো এগিয়ে এসেছেন। যারা ধরে রাখবার চেষ্টায় আছে, তাদের মধ্যে একজন বলে, 'আরে অ অনাদি, একটু ঠাণ্ডা হও দিনি। তুমি যাও, আমরা দেখি কী করা যায়।'

যাকে বলা, সেই অনাদির কাছে থেকে থাকা অনন্তকালের মত। সে এমনভাবে এগিয়ে আসে, আমাকে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতে হয়। সেও এগোয়, তাকে যারা সামলায়, তারাও এগোয়। পুকুরধারে সরু রাস্তা, রাস্তার ধারে ঘর। ঘরে ঢুকতে পারি না, অতএব আমি গাজী দুজনেই অনাদি আর সামলানো দলের ধাক্কা খাই। গাজীকে জিজ্ঞেস করি 'ব্যাপার কী, কার রক্ত দর্শন করতে চায়?'

আমার থেকে সে সমস্যা গাজীর অনেক বেশী। সে অনাদির দিকে চোখ রেখে বলে, 'সেইটাই তো বুঝতে পাচ্ছি না বাবু। তয়, কেমন যেন একটা সন্দ লাগে। চলেন দেখি, আগায়ে যাই। লোকটাকে তো ভাল বলিই জানি।'

গাজীর তো আজ মুরশেদের নামে ভরাডুবি, বাবুর সঙ্গেই দিন কেটে গেল। কিন্তু আমি না জানি মুরশেদ, না গুরু। কোথায় যাই, কেন যাই, কিসের সন্ধানে, তার হদিস জানি না। এটুকু জানি, এই দূরের বাদার গঞ্জে রক্তারক্তি দেখার ইচ্ছা এক ফোঁটাও নেই। তাই বিরক্ত হয়ে বলি, 'তুমি যাও, মারামারি দেখতে চাই না।'

গাজী ভরসা দিয়ে বলে, 'আ হা হা বাবু, ভয় পাবেন না। আসেন না দেখি, বিষয়টা কী।'

ভয় নেই, ভাবনা আছে। যেসব ভাবনা রেখে এলাম পিছনে, এইসব হাঁক ডাক উত্তেজনায় সেই ভাবনাগুলোই বিরাজ করে। কে জানে, কার সঙ্গে তার কিসের সংঘাত। যাতে আমার হাত নেই, তাতে আমার কাম নেই। ওই যে অনাদি পাল, এখন সে যদি কারুর রক্ত দর্শন করে, এমন প্রত্যয় নেই যে, ঠেকাতে পারি। তবে যাই কেন। কৌতূহল? সে কৌতূহল আমার আজ নেই। তাও আজ রেখে এসেছি আমার জনপদের সীমায়, সমাজে। সেখানে আমার করবার আছে, বলবার আছে। সেখানে আমার কৌতূহলের কার্যকারণ থাকে। আজ আমার শরিকানা অন্য রূপের সীমায়। কে এক অনাদি পালের ক্ষ্যাপামি আজ আমি দেখব না।

দেখবে না। সব কি তোমার মর্জিতে চলে। দেখ, নায়ের মজুরের কালো ফাটা হাতখানি তখন বাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। তুমি যাকেই ছাড়ো, ছাড়ো; তোমাকে কে ছাড়ে। 'যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না হে।' কিন্তু লোকটা এত সাহস পায় কোথায়। আলখাল্লা তো বলব না, তালিতে তালিতে তালিখাল্লার ধুলো আমার গায়ে লাগিয়ে অবলীলায় হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। কোন মানামানি নেই নাকি। বাবু কি তার হাতের লোক নাকি,

যেমন খুশি টেনে নিয়ে যাবে। বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে ধমক দিতে যাই। 'তার আগেই নতুন দৃশ্যে চোখ পড়ে যায়। ভুলে যাই হাত ছাড়াবার কথা। ধমক আটকে থাকে গলায়। দেখি, এক ঘরের সামনে নিচু দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে এক মেয়ে। অনাদি পাল আর তার সামলানো দল সেখানে এসে ঠেক খেয়েছে।

কবুল আমার আগেই করা, মেয়েদের বয়স-বিচারে যাব না। তবে নজর বলে, এ মেয়ে যুবতী। কিন্তু সরে দাঁড়াও ভিন্‌দেশী, নজর হুঁশিয়ার। এ তো মেয়ে নয়, যেন নাগিনী ফণা তুলে ঘাড় কাত করে আছে। ছায়াটিও যদি নড়ে, জানবে তা হলেই ছোবল। সেইরকমই দেখি যেন। নয়া কাজলের কালি নয়, বাসী কাজলের কালি তার চোখে। তার সঙ্গেই দেখ, রাত জাগা ছায়া চোখের কোলে। তাইতে যেন বড় ফাঁদি চোখের চাহনিকে খরতা দিয়েছে বেশী। চোখ নয়, শান দেওয়া ছুরি। তাতে আবার আগুন দপদপায়। বাসী পানের ছোপ ঠোঁটে। সেও যেন আর এক বাঁকা ছুরি। ঠোঁট টেপা, বুকের আগুনে বাঁকানো। এর থেকে নতুন খাওয়া পানের রঙে রাঙানো ঠোঁটের ঝলক আলাদা। তাতে রক্ত থাকে, আগুন থাকে না। কালো কালো মুখখানির ছাঁদ এদিকে মন্দ নয়। নাক একটু বোঁচা বোঁচা, তবে তোলো কম নয়। নাকের পাটা থরো থরো, তাইতে নাকছাবির পাথর ঝিলিক হানে। মাথায় ঘোমটা নেই। বাসী খোঁপা এলো। সিঁথের বাসী সিঁদুর কিঞ্চিৎ মলিন। কপালের ফোঁটা, কপাল জুড়ে মাথামাথি করা। জামা নয়, জামার চিলতে গায়ে, অন্তর্বাস বলি। তার ওপরে শাড়িটি ফিনফিনে পাতলা, ফুল ফুল ছাপ। সব ছাপিয়ে সায়ার ফুলছাপ ইস্তক দেখা যায়। পায়েতেও বাসী আলতার দাগ। সাজে-গোজে বসনে একটু যেন বিলাপের ছাপ। গলার হারে হাতের চুড়িতেও তাই বলে। তবে ভাবভঙ্গি বিপরীত। যুবতীর নজর যে কার ওপর, বুঝতে পারি না। ঠিক কারুর দিকেই নয়। সাপিনীর চোখ যেন ছায়ার দিকে নিবিষ্ট।

যে দাওয়াতে বসে আছে সে, তার ওপরে ঘরের দরজা বন্ধ। অনাদি পালের লক্ষ্য সেদিকে। তিনজনে তাকে ধরে রাখতে পারে না, সে জোর করে দাওয়ায় উঠতে চায়। আর মুখে বুলি, 'ও দরজা আমি লাথি মেরে ভাঙব। আজ আমি ওর রক্ত দর্শন করব। বেরে হয়ে আয় বলছি, যদি মানুষ হস ত, আমার সামনে বেরু হয়ে আয়, তোর পীরিতের দৌড় দেখি আমি।'

সামলানো দলের একজন বলে, 'আহা ছি ছি, কী কর অনাদি। হাটে বাজারে লোক হাসিয়ে লাভ কী বল দিনি। তুমি চল, আমরা যা করবার তা করছি।'

অনাদি পালের ভৈরব কণ্ঠ তার ওপরে যায়, 'আর লোক হাসাতে বাকী কী আছে। এ বাজারে কি কারুর কিছু অজানা। ও আমার মাথা হেঁট করেছে, বংশের মাথা হেঁট করেছে। ওকে আমি ছাড়ব না, না না না। অনেক দিন বলেছি, আর না। যে কুত্তায় একবার গু খেয়েছে, সে কুত্তায় আর তা ছাড়তে পারে না। ওকে আজ আমি শেষ করব।'

বলেই সে সকলের হাত ছাড়িয়ে, ঠেলে দাওয়ায় উঠতে যায়। যদিও পারে না, এবং হাঁক দেয়, 'বের হয়ে আয়, ওরে হারামজাদা, দেখি তোর পীরিত কুড়কুড়ায়, না জান কুড়কুড়ায়।'

ব্যাপার বুঝি না। বন্ধ ঘরে কে, কার উদ্দেশে এমন গুরুতর অভিযোগ যে, কুকুরের মত তার নোংরার নেশা। তবে, এই যে মেয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, ওদিকে ঘরের দরজা বন্ধ, এদিকে পীরিতি বিষয়ক ধিক্‌কার, তাতে যেন কেমন একটা চেনা চেনা গন্ধ লাগে। কিন্তু ঘরেই বা কে। মেয়েটি বা কে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এসে জুটেছে। জোটবার জন্যে আসছে এদিক ওদিক থেকে। কেবল এক ব্যাপারে ধন্দ লাগে। যুবতীর ভাবভঙ্গিটা একটু যেন কেমন। তার খর চোখে আগুন বটে, ফণা তোলা ভাবখানিও ঠিক আছে। ঠোঁটের বাঁকানিতে এমন একটা তুমুল ব্যাপার যেন ভারী তুচ্ছতায় খান খান। আর নজর যদি ঠিক থেকে থাকে, তবে একটা জিনিস ঠিক দেখেছি। অনাদি পাল যতই ঠেলাঠেলি করুক, দাওয়ায় উঠে দরজায় লাথি মারা যেন তার ক্ষমতার অকুল। কোথায় তাকে কিসে বন্ধন করেছে, এমনি ধরা যায় না। মনে হয়, পা ঝুলিয়ে

বসা মেয়ে সেই বন্ধন। অথচ দেখ, এ মেয়ে একবারও চোখ তোলে না অনাদি পালের দিকে। অনাদি পালও তার ক্যাপা ঘোরে বেন বড় সজাগ। মেয়েটির দিকে তার নজর পড়ে না।
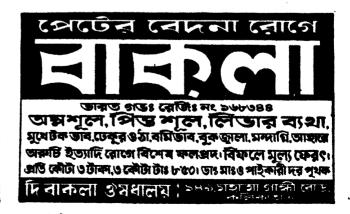
আমি গাজীর দিকে চাই। গাজীর নজর সকলের মুখে মুখে ঘোরে। সে এখন অন্য ঘোরে আছে।

সামলানো দলের একজন আবার বলে, 'শোন অনাদি, পাগলামি করে না। তুমি যাও, আমরা ওকে বের করে আনছি। তারপরে মার কাট, পরে হবে। যাও, তুমি যাও দি'নি।'

এত সহজ নয়। আজ রক্ত সব মাথায়, সেই রক্তে আজ আগুন লেগেছে। তাবে কথায় বোঝা যায় অনাদির ধৈর্য আজ অথরা। সে চীৎকার করে, 'না, ওকে না নিয়ে আজ যাব না। আজ ওর একদিন, নয় আমার একদিন। লম্পট, ইন্নতে! এই সেদিনে হারামজাদাকে কিমা কাড়িয়েছি, নাকে খত দিয়েছে। গত হপ্তায় গে নিজে মেয়ে দেখে এসেছি, বে' হেব বলে, আর সেই আবার এখেনে, অ্যাঁ?

অনাদি পাল দু হাত তুলে ঘোষণা করে,

খালি দেব, পাঁটাকে আজ আমি বলি দেব। বের হয়ে আয়।'

কী বিড়ম্বনা! সত্যি সত্যি একটা রক্তারক্তি দেখতে হবে নাকি। গালাগালির তোড় বেরকম, তাতে কানে জনালা ধরে যায়। যারা এসে জুটেছে, তাদের মধ্য থেকেই একজন হঠাৎ বলে, 'অরে, ও দুলি, একটা কাণ্ডমাণ্ড হবে, তার চে' বের করে দে না ছোঁড়াকে।'

যুবতী ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বক্তার দিকে। ছিলায় যেন টান পড়ে। ঠোঁটের ধনুক আরো বেঁকে ওঠে। এইবার শোন, গলায়ও কেমন ছুরি ঝলকায়, 'কেন, দুলি কি ঘরে ঢুকে কোলে করে বসে আছে নাকি। তোমরা যেখেনে, দুলিও তো সেখেনেই।'

তা বটে, কথায় খুঁত পাবে না। জলজ্যান্ত তোমাদের সামনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার নাম জানা গেল দুলি, কিন্তু এ মেয়ে কে। এ ঘরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, ভিতরের প্রাণীটিই বা কে। এক ব্যাপার বোঝা গিয়েছে, ভিতরের প্রাণীটি একটি ছোঁড়া। সে নাকে খত দিয়ে কিরা কেটেছে, আর এখানে আসবে না। তার বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখাও হয়েছে। তবু সে এখানে এসেছে। তাতে একটু 'সন্দ' লাগে, এ ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দুলি নামে এই যুবতী। এবং এই যুবতীর সঙ্গে ঘরে বন্ধ প্রাণীটির কী যেন কী আছে। বোধ হয় সেই পীরিত না কী, অনাদি পালের ভাষায় যা কুড়কুড়ায়।

বক্তা আবার পথ দেখায়; 'না, সে কথা হচ্ছে না। ছোঁড়াকে বের হয়ে আসতে বল্। না হলে একটা কী বিপদ্ আপদ ঘটবে।'

দুলি শরীরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। যেন বিপদ আপদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে। তেমনি ঠোঁট বাঁকিয়েই বলে, 'ডেকে তো আনি নি। নিজের মনে এসে ঢুকেছে, ইচ্ছে হলে নিজের মনেই বেরুবে।' এই তার বক্তব্য। এ বক্তব্যেও কোন ত্রুটি নেই। দুলি যদি না ডেকে থাকে, আর সে যদি নিজের মনে এসে থাকে, তবে তাকে নিজের ইচ্ছেতেই বেরুতে দাও। হ্যাঁ, কথার ত্রুটি নেই বটে, কিন্তু এ যেন তলায় তলায় স্রোত বহে যায়। যে ডুব দিতে জানো, সে দেখে নাও। তলে তলে একটা যেন লড়াই চলেছে।

বক্তার এবার রুষ্ট স্বর; 'ঘর তো তোর, তুই না বললে বলবে কে?'

হঠাৎ যেন সাপিনী ঘাড় হেলিয়ে তাকায়। চোখের ছুরিতে খান খান করে কাটে। ঘৃণা যেন উপ্চে পড়ে। রোষে রোষে ফোঁসে। বলে, 'ঘর আমার হতে পারে, বাতাস্তুও সকলের। চলে যাবার কথা নিজের মুখে বলি কোন্ মুখে বল। গেরস্তের ঘর তো নয়, এখেনে সবাই আসে।'

বলে যেন বিতৃষ্ণায় আর ধিক্কারে ঘাড় ফেরায় সজোরে। বাসী খোঁপায় ঝাপটা লেগে, আর এক প্রস্থ ভাঙে। একটা ঝকঝকে রুপোর কাঁটা শিথিল হয়ে ঝোলে ঘাড়ের কাছে।

পথিক, আপন বুঝে চল। বাজারের কোন সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবার তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। এও এক বেচাকেনার হাট। মনের কোণে একটু যে এই ধারণায় উঁকিঝুঁকি না ছিল, তা বলতে পারি না। একটু ধন্দ ছিল। এ বেচাকেনার ইতিহাস

জানা নেই, কবে থেকে শুরু। কিন্তু যবে চোখ মেলে তাকিয়েছি এই পৃথিবীর দিকে, তখন থেকে এই হাটের দেখা পেয়েছি সমাজের পাশে, জনপদের ধারে। এ সভ্যতার দান কি না, কে জানে। তার হদিসে যাব না। নাগরী। যেখানে যত ঝলক, সেখানেই নগর-নাগরী। যেখানে যত ঝলক, সেখানেই নগর বিলাসিনী বাররামা নায়িকা। দুলির স্পষ্ট কথায়, এলাকা আপন চিহ্নে ফোটে। এখন যেন খেই ধরিয়ে দেয়, সেই সরু, তীক্ষ্ম সুরের হারমোনিয়মের বেসুরো বাজনা, আর কাঁসা বাজানো গলায়, 'প্রেম করে ভাই সঙ্গে নিলে না...।' এবার বোঝ সে কোন্ নিকুঞ্জ থেকে শোনা গিয়েছিল।

কিন্তু এমন বেচাকেনার হাটের দেখা যে এই সুন্দরবনের হাতায়, নোনা গাঙের কূলে, দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝে, হাটের ধারে পাবো, ভাবতে পারি নি। এই বেচাকেনার হাট যবে প্রথম দেখেছি, তখন তার মর্ম বুঝি নি। সংসার কবে কাকে চিরকাল কল্পলোকের আলোর মিনারে বসিয়ে রেখেছে? আলোতে অন্ধকারে, ধুলোতে কুলাতে সে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবন ভরে কেবল আমি সু দেখেছি, কু দেখি নি; এমন 'অংখার' নেই। বলার কথা কইতে গেলে, তুমি কেবল সু-ভাব করেছ, কু-কথা বল নি, এমন নিপাট পবিত্র প্রকাশের চোখ বোজানো ঠ্যাকার নেই। তাই, যবে মর্ম বুঝেছি, তখন সংসার আমার রক্তে দিয়েছে কাঁটা। ঘৃণা দিয়েছে শিহরন। ভয় দিয়েছে দূরে পালাবার তাড়া।

তারপরে এই সংসারের পথে, আপন জীবনে জীবিকায়, চলার চড়াইয়ে উংরাইয়ে, নিজের গায়ে পায়ের ধুলোয়, কান্না হাসিতে, চেতন পেয়েছি, এ হাটের প্রমোদকুঞ্জে বিলাপ বাজে, অস্র অস্র করে। এর বাতির ঝলকের তেল আসলে গ্লানি, যে গ্লানি চোখের আলোর নিচের কালোয়। সলুতের বুনোট নিষ্ঠুর পাকে বোনা। পানের পিকে গলাক্ষতের রক্ত ঢেকে রাখার মত হাসিটা মর্মান্তিক করুণ। অতএব, ওহে মানুষ, নিজের হাতে গড়া বিষপাত্রের গড়নখানি দেখ। আপন চড়াই দেখ, দুরন্ত চড়াই। সেই কলিটি ভাবো, 'আপনারে চিনলে পরে, চেনা যায় পরওয়ারদিগরে।'

এখানে দাঁড়িয়ে আমার চমক লাগে না, শিরদাঁড়াতে কাঁপন ধরে না। লাজে লাজানো সংকোচে অপমানিত হই না। এইসব সারি সারি ঘরে কাদের বাস, এখন আর তা অস্পষ্ট নয়। তবে, দুলি নামক যুবতীর কথায় অনাদি পালের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। গলার শির ছেঁড়ে কি মাথার রগ ফাটে, সে ঝাঁকুনি দেয় প্রচণ্ড, হাঁক দেয় প্রবল, 'ওরে লোচ্চা, শুয়োর, এখনো যদি না আসিস, তবে কিন্তু আমি দরজা ভাঙব। এই তোমরা সবাই সাক্ষী—।'

দুলি তৎক্ষণাৎ দুলে ওঠে, যেন নাগিনী। আগুনের মত চোখে রক্তের ছিটা লেগে যায়। অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঘরের দরজা মাগনা নয়। এই ঘরে যখন বাস করি, তখন তা'লে ভাঙাচুর আমাকে আগলাতে হবে। তারো সবাই সাক্ষী।'

এইবার বুঝি সত্যি সত্যি রক্তারক্তি হয়। এতক্ষণ স্রোত ছিল তলে তলে। এখন ঢেউ জাগে ওপরে। সোজাসুজি ঢেউ তোলে দুলি বিলাসিনী। কেন, ঘর যখন গৃহস্থের নয়, এ মেয়ে বিবাদে কেন যায়। এ যে যাদার হাটে এসে দেখা পেলাম হালের বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির। এই রূপের হাটে অরূপের আলো কোথাও ধিকি ধিকি জ্বলে নাকি। তবে কি এ পীরিতি সেই পীরিতি নাকি। ধরায় ফেরে অধরা চিন্তামণি, ফাঁদ পেতেছে বিল্বমঙ্গল। দুলির কথায়, ঘর ঠিকানায়, সেই কথাটাই বাজে যেন। আসতে বলি নি, যেতে বলব না। এতে কী বোঝ হে। ভিতর ভরে যে আছে সে থাক্।

এবার গাজীকে না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'কে আছে ভেতরে?'

গাজীটা নেহাত পাজী, এখনো চোখ ঝিকিমিকি করে। চুপি চুপি বলে, 'পুরনো কিস্যা বাবু। ঘরের মধ্যি পাল মশাইয়ের ছোট ভাই, অনন্ত পাল। সব বলব আপনাকে পরে।'

ওহ্, ব্যাপার অনাদি-অনন্ত। কবে শুরু, শেষ কবে, কেউ বলতে পারে না। তার চেয়ে, এ পালা চলতে থাকুক, অন্য দিকে যাই। যতটুকু কৌতূহল, সেটুকু মিটে যায়। বাকী যেটুকু, সেটুকুর মধ্যে কোন টান পাই না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই অনন্তর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছে। অনাদি পাল হেঁকে চলেছে, 'আমার বাপের ব্যাটা যদি হোস্, তবে বের হয়ে আয়।'...

ভেবেছিলাম, কোন কিছুতেই এই কাঠাল-কাঠের দরজাটি খুলবে না। দুলির ঠোঁটের মতই তো শক্ত করে টেপা। কিন্তু সকল বাঁধন ঝরো ঝরো, খুট্ করে হুড়কো খুলে গেল। অনন্ত পাল দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। দাদা ভাইয়ের চেহারা অব্যর্থ মিল, বয়সের একটু ফারাক যা আছে। অনন্তর মাথা নিচু, দৃষ্টি আপন পায়ে। যেন চুরি করে খাওয়া অপরাধী সারমেয়টি। সত্যি অনাদির বাপেরই ব্যাটা, এইটি প্রমাণ হাতে-নাতে দিয়েছে।

সকলেরই মুখে যখন স্বস্তি, একটা বিপদ আপদের ভয় যখন ভাগ, তখন দেখ, দুলির দপদপে চোখে কেমন চমক। সে অবাক হয়ে ঘাড় ফেরায়। তার ঠোঁট খুলে যায়। তবু নাকছাবির পাথরটা কেমন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। যেন স্বপ্ন দেখা বিভ্রম, ঘর চোখে ছায়া ঘনায়।

ইতিমধ্যে অনাদি পালকে তার লোকজন ঠেলাঠেলি করে নিয়ে চলেছে। 'চল চল, বিচার যা তা পরে হবে। বের হয়ে এসেছে যখন, তখন আর এখেনে ল্যাটা বাড়িয়ে কাজ নাই।'

অনাদি পাল জয়ী। ফিরে যাবার পথেও সে নিজের বাপের ব্যাটার দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে বীরবিক্রমে যায়। অনন্ত নেমে আসতে থাকে পায়ে পায়ে।

দুলি আবার ফণা তোলে। এবার সে ঘা খাওয়া সাপিনী, আরো ভয়ংকরী। এবার দেখের সবটুকুই আগুনে আগুন। পণ্যাঙ্গনার গোটা শরীরটিই আগুনের শিখা। যেন শিস্ দিয়ে বলে, 'দাঁড়াও।'

অনন্ত দাঁড়ায়। দুলি বিদ্যুতের মত ঘরে ঢোকে। আর ঘরের ভিতর থেকে এসে দাওয়ায় পড়তে থাকে নতুন একটি ছাপা শাড়ি, মনোহারি জিনিস কিছু, হিমানী, পাউডার, আলতা, একটা রুমাল, যেন তাতে কিছু টাকা বাঁধা। এক ঠোঙা খাবার। তারপরে দরজার পাশে একবার তার মুখ ঝলকে ওঠে। গলা শোনা যায়, 'ওগুলান নিয়ে যাও, লজ্জা থাকে তো আর এ মুখো হয়ো না।'

পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমার যেন মনে হল, দুলির চোখ দুটো চলকানো গাঙের মত দেখাল।

(ক্রমশ)

আফ্রিকার চিঠি

ইংরেজরা যদি গড়ে ক্লাব, ফরাসীরা কাফে আর বাঙালীরা রাজনৈতিক দল, তবে টেমনেরাই বা 'কম্পিন' গড়বে না কেন? আপনারা বলবেন, এতো আচ্ছা মুশকিল। টেমনেরা কোথাকার লোক, আর 'কম্পিন'টাই বা কী বস্তু?

সেই কথাই তবে বলি।

ফ্রী টাউনের নাম শুনেছেন? দাসপ্রথা বিলোপের পর সদ্যমুক্ত গোলামদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় কয়েকটি কলোনী স্থাপন করা হয়, এদেরই একটি পরে রূপান্তরিত হয় ফ্রী টাউনে। আজ যেখানে ফ্রী টাউন সেখানে টেমনেদের আদি বাসস্থান ছিল। এখনও আছে, তবে আজ আর শুধু টেমনেরাই সেখানে থাকে না, আছে মেণ্ডে বা মাণ্ডিংকা, ফুলানি, আকু আর ক্রিওল। এবং এদের দাপটে টেমনেরা হয়েছে কোণঠাসা, নিজবাসভূমে পরবাসী।

আকু, ফুলানি ও মেণ্ডেদের টাকা-পয়সা বেশি, লেখাপড়াতেও ওরা এগিয়ে আছে। টেমনে বলতে ওরা নাক সিঁটকোয়। ব্যাপার এতদূর গড়াল যে শেষে অনেক টেমনে যুবকের নিজেদের টেমনে বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ হয়। যারা ইংরেজী কি পিজিন-ইংলিশ জানে তারা নিজেদের টেমনে নামের পেছনে হাইফেন দিয়ে ক্রিওল নাম যোগ করে ক্রিওল বনবার চেষ্টা করে (ফলস্বরূপ ফ্রী-টাউনে সিসে-পোর্টার, কোরোমা-নিকলস জাতীয় দুনলা নামের প্রাদুর্ভাব হয়েছে)। অন্যরা কেউ আকুদের মত পোশাক পরতে শুরু করে। কেউ নেয় ফুলানি নাম আর কেউ বা যোগ দেয় মেণ্ডেদের ক্লাবে। মেণ্ডেদের ক্লাবে জাঁকজমক কত! নাচ তো লেগেই আছে, সঙ্গে থাকে মেণ্ডে ভাষার চটুল গান, কোনাক্রি থেকে আনা 'ইয়ানকাণ্ডে' সুর আর স্থানীয় 'ডায়ানসিস' বাজনা। মেণ্ডে মেয়েরা সাজতে জানে, আর জানে ইশ্‌ক। টেমনে তরুণরা মেণ্ডেদের আড্ডায় ভিড় করবে না?

ব্যাপার যখন এত গুরুতর তখন এক টেমনে মাতব্বর তার ইয়ার-পড়োশীকে একাট্টা করে বলে, আল্লা আমাদের টেমনে করে পয়দা করেছেন কিনা? আর তা যদি করে থাকেন তবে আমাদের ছেলেছোকরারা মেণ্ডে ছুঁড়ীদের পেছনে ছুটবে আর দুপাতা ইংরেজী পড়ে ক্রিওল-কেরেস্তান বনে যাবে, এই আমরা বসে বসে দেখব?

অতএব সমবেত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল, "আম্বাস গেদা", ফ্রী টাউনের পয়লা নম্বরের কম্পিন। 'গেদা' কথাটি যেমন ইংরেজী 'টোগেদার'-এর অপভ্রংশ, 'কম্পিন' তেমনি হল "কোম্পানীর" বিকৃতরূপ। তারপর ত্রিশ বছরেরও কম সময়ে ত্রিশটিরও বেশি টেমনে 'কম্পিন' চালু হয়েছে।

এক একটা 'কম্পিন'-এ থাকে ৫০।৬০ জন সভ্য। এদের অনেক সদস্যই হল গাঁ থেকে আসা ছেলে ছোকরা, ফ্রী টাউনে চাকরী করে যাদের হাতে জমেছে কাঁচা পয়সা, কম্পিন-এর নাচে লাল নেকটাই আর জমকালো টুপী পরে যারা সবার প্রথমে যোগ দেয়।

নাচগান অবশ্য কম্পিন-এর একমাত্র কাজ নয়। মৃতের সৎকার করতেও এরা এগিয়ে আসে। পশ্চিম আফ্রিকার অনেক উপজাতির মধ্যে শ্রাদ্ধের জাঁকজমক বিয়ের চেয়ে বেশি। শেষকৃত্যের খরচের বোঝার কতকাংশ বহন করে এরা। অবশ্য এক এক 'কম্পিন'-এর এক এক রকম নিয়ম। অনেক 'কম্পিন'-এ কোন সদস্য মারা গেলে প্রত্যেকে ২ শিলিং করে দেয়, কোথাও আবার সদস্য-

তার [illegible] ([illegible]) [illegible]ও সবাই মিলে চাঁদা তুলে টাকা দেয়। এছাড়া আর্থিক অনটনেও 'কম্পিন' থেকে মদত মেলে। আর যখন কেউ রাস্তাঘাটে মারামারির পর পুলিসের পাল্লায় পড়ে, তখন তার পেছনে দাঁড়ানোও কম্পিন-এর অন্যতম কাজ। তবে এমন সাহায্য বারবার মেলে না। পরপর তিনবার কেউ অভিযুক্ত হলে, সে প্রায় দাগীর পর্যায়ে পড়ে যায়। নামকরা কম্পিন-এর এমন লোকের পেছনে দাঁড়ানো সাজে না। বরং দায়িত্বশীল কম্পিনগুলি রীতিমত স্ক্রীনিং করে সভ্যপদের অধিকার দেয়। সভ্যপদপ্রার্থী যদি অতীতে অন্য 'কম্পিন'-এর সদস্য থেকে থাকে, তবে সে কম্পিন-এর কর্তাব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ করা হয়। সভ্য হওয়ার পরও কম্পিন-এর নিয়ন্ত্রণ বড় কমে না। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যখন সান্ধ্য নাচের পর সোজা বাড়ি না যাওয়ার জন্য তরুণ-তরুণীদের সভ্যপদ খারিজ করা হয়েছে।

আব্বাস-গেদা কম্পিন-এ অনেক সদস্যের কোন না কোন অফিস মিলেছে। কম্পিন-এর কর্তার অফিসিয়াল নাম 'সুলতান', তাঁর সহকারীর নাম 'সেকেন্ড সুলতান'। সভ্যাদের পৃথক নেত্রী, তাঁর খেতাব হল 'মামী কুইন'। মামী কুইনের প্রতিপত্তি যথেষ্ট। এক সময় রানী ভিক্টোরিয়াকে টেমনেরা মামী কুইন বলত। আজ টেমনে কম্পিন-এর সভ্যাদের নেত্রী এই আখ্যা পেয়েছেন। সেকেন্ড সুলতানের মত একজন সেকেন্ড মামী কুইনও রয়েছে। এছাড়া আছে জাজ, ডক্টর, ম্যানেজার, ইন্সপেক্টার, প্রোভো, ক্লার্ক বা সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার, লীডার, কন্ডাক্টার, সিস্টার, নার্স, কালেক্টার, রিপোর্টার, বেলিফ এবং তাদের ডেপুটি। এদের কাজের ফিরিস্তিও বৈচিত্র্যময়। জাজের কাজ হল সভ্যদের ঝগড়াঝাঁটি মেটানো। কম্পিন-এ প্রবেশলাভের আগে সদস্য পদপ্রার্থীকে পরীক্ষা করে দেখা ডক্টরের কাজ। তবে এমন পরীক্ষা মেডিক্যাল চেক-আপ নয়। বেশির ভাগ ডক্টর আসলে চিকিৎসক নয়।

ডক্টর যাচাই করে দেখে, লোকটির সামাজিক প্রতিষ্ঠা কেমন, চোর-ছ্যাঁচড়, মাতাল, দুশ্চরিত্র বা দাগী অপরাধী কিনা। তারপর কোন সভ্যের অসুখ করলে ডক্টরের আবার কাজ পড়ে। বলা বাহুল্য রোগ নির্ণয় নয়, হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দেওয়া। এখানে বলে রাখি, বাড়ির কারো অসুখ করলে কম্পিন-এ খবর না দেওয়া গুরুতর অপরাধ, যার জন্যে কম্পিন দোষী সভ্যকে জরিমানা পর্যন্ত করতে পারে।

এতবড় গালভরা উপাধি সত্ত্বেও ম্যানেজারের কাজটি নিতান্ত সাধারণঃ 'কম্পিন'-এর জলসার আগে সকলের বসার বন্দোবস্ত করা ও আলো সাজানো। লীডার আসলে নাচের লীডার, নাচের শুরু ও শেষে হুইসল দেয়। কন্ডাক্টার ব্যান্ডের কর্তা। রেডক্রস মার্কা নার্সের পোশাক পরলেও নার্সদের কাজ হল নাচের ফাঁকে ফাঁকে লেমনেডের যোগান দেওয়া। রিপোর্টার খবরের কাগজের সংগে মোটেই যুক্ত নয়। কেউ মারা গেলে খবরটা ডক্টরের কাছে পৌঁছে দিলেই তার কাজ শেষ হয়।

এছাড়া অনেক কম্পিন-এ আছে লইয়ার, সিক-ভিজিটর ও ওভারসীয়র। নাম্না পরিচীরতে প্রথমজন আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দেন, দ্বিতীয়জনের কাজ অসুস্থ সদস্যদের দেখে বেড়ানো, আর তৃতীয় পদের সৃষ্টি কেন তা অনেক চেষ্টা করেও আমি আবিষ্কার করতে পারিনি।

এমনিভাবে আব্বাস গেদা কম্পিন-এর একটি শাখায় ৯০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৫ জনকেই কোন না কোন গালভরা খেতাব দেওয়া হয়েছে। কাজ না থাকলেও এতগুলি পদ সৃষ্টি সদস্যদের অনেকের 'আমুর প্রপর' তুষ্ট করে। ইওরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত নাগরিক জীবনে যার আস্বাদন মেলেনি, কম্পিন সংগঠন তাকে সহজ আরামের মধ্যে এনে দিয়েছে, কাজে না হোক, অন্তত নামে।

আব্বাস গেদার পরেই যে 'কম্পিন' চালু হয়, তার নাম আলিমানিয়া। প্রথমটির নেতা ছিলেন জনৈক টেমনে স্কুলমাস্টার। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাবপন্থী। আলিমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতাও একজন টেমনে শিক্ষক। কিন্তু তিনি পড়ান আরবী ভাষা ও কোরাণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল। আলিমানিয়ায় প্রমোদ বিভাগের পাশাপাশি স্থাপিত হল সাহিত্য বিভাগ, কিন্তু তার লক্ষ্য সাহিত্য সাধনা নয়, কোরাণ পাঠ শিক্ষাদান।

এরপর সর্বত্র যা হয় তাই ঘটল। আব্বাস গেদা আর আলিমানিয়ার লেগে গেল লড়াই, মুষ্টিযুদ্ধ নয়, বাকযুদ্ধ। গীতযুদ্ধই বোধহয় বলা ভাল। কারণ দু-পক্ষই চটপট অন্যের নামে গান বেঁধে ফেলল। এবং তারস্বরে সেইসব গান গাইতে লাগল হাট-বাজার, রাস্তাঘাটে।

আব্বাস গেদার তরুণ নেতাকে উদ্দেশ্য করে আলিমানিয়া গাইলঃ

"ওরে এঁচড়ে-পাকা। কম নয় তোর স্পর্ধা।
আমি হনু তোর দাদার বড় দাদা,
ইয়াইয়ে। মুখের ওপর করবিনে চোপা।"

'ইয়াইয়ে' বলে হাঁক দিয়ে আলিমানিয়ার জবরদস্ত জোয়ানরা মাটি থেকে চার হাত উঁচু লাফিয়ে ওঠে। আর তাই দেখে রাস্তার পাশে ভিড়করা ছেলেমেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। আব্বাস গেদার লড়ায়রা জবাব দেয় গান গেয়েঃ

"গোলাম, [illegible] কী [illegible],
দেখ [illegible] কী [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
গেদার [illegible] [illegible] কাটছে।"

"আরে [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] কথা।
মোরিম্যান মাথায় কেজো
বাজারেতে এল চলে
শাপ দিল সে মোদের গেদায়।"

"ও যদি মরে কাল
দেখিস কী হবে হাল
নরক থেকেও তাকে খেদায়।"

এ গানে উল্লেখিত মোরিম্যান হল জনৈক মোল্লা। আব্বাস গেদার ধ্বংস কামনায় কয়েকজন টেমনে মাতব্বর এই ব্যক্তির প্ররোচনায় মন্ত্রপূত রুটি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা গেদাকে ফ্রী-টাউন থেকে খেঁদিয়ে তাড়াবে।

অবশ্য কম্পিন-এর সব গানই কিন্তু বিপক্ষকে গালাগাল দেবার জন্য নয়। দলীয় নেতাদের সংসাহস ও উদারতার প্রশংসায়ও অনেক গান রচিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত মামী কুইন হলেন আলিমানিয়ার একটি গানের বিষয়বস্তুঃ

"মামী কুইন হলেন বনেদী ঘরের,
তিনি যা করেন, তাই তাঁকে মানিয়ে যায়,
মামী কুইনের বাড়ি হল কিসি রোডে,
শোন! সকলে কোরাস গায় তাঁরই প্রশংসায়।"

অন্য এক গানে দানবীর আলহাজি সিসের স্তুতি করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত সিসে মক্কায় হজ করে আলহাজি উপাধি পেয়েছেন। এবং পরে নিজ অর্থে এক কম্পিন-এর ড্রাম কিনে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ কম্পিন-এর সভ্যরা তাঁর বদান্যতার প্রশংসায় গান বেঁধেছে।

এইভাবে সুস্থ আনন্দ পরিবেশন আর সমাজসেবার মধ্য দিয়ে টেমনে কম্পিনগুলি নিজেদের সমাজ চেতনা প্রখর করেছে। এতে টেমনে যুবসম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। আজ টেমনে বলে পরিচয় দিতে তারা গর্ববোধ করে। শুধু তাই নয়, এইসব কম্পিন-এর মারফৎ তারা টেমনে উপজাতি ফ্রীটাউন তথা সিয়েরা লিওনের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। আব্বাস গেদা স্থাপনের কিছুদিন বাদে যখন ফ্রী-টাউনে টেমনে উপজাতি প্রধানের পদ খালি হল, তখন আব্বাস গেদার উৎসাহী সদস্যরা মিলে তাদের স্কুলমাস্টার সংগঠককে এই পদে নির্বাচিত করায়। পরে ইনি দেশের মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠন, সিয়েরা লিওন পিপলস পার্টির কোষাধ্যক্ষ পর্যন্ত নির্বাচিত হন। এইভাবে 'কম্পিন' সংগঠন হয়েছে পার্টি সংগঠনের মুখবন্ধ, আর কম্পিন নেতৃত্ব সারা দেশের নেতৃত্বের হাতেখড়ি।

অংশুদত্ত

ভারতের অর্থনীতি

গবাদি পশু—সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা
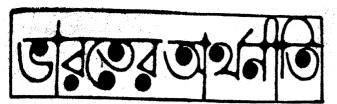
১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতের গো-মেষাদি পশুর সংখ্যা ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল এই পাঁচ বছরে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেড়েছে। হিসাব করা হয়েছে যে, আমাদের দেশের গবাদির সংখ্যা এখন ২৫ কোটির মতো। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের গো-মেষাদি পালের সবটাকেই সম্পদ বলা চলে না। তার বেশ কিছু অংশ দেশের উপাদানরাশির দিক থেকে প্রকৃত একটা বোঝার শামিল। তৃণাদি দ্রব্য বা ভক্ষ্যের তুলনায় সংখ্যায় বেশী হওয়ায় গবাদি নীরেস জাতের হয়ে পড়েছে। এক কথায়, গো-মহিষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান অবস্থা

গাভীকে ঘিরে আমাদের মনে আবেগ থাকায় গবাদির ক্ষেত্রে সংখ্যার সমস্যা শান্তভাবে আলোচনা করা শক্ত হয়ে ওঠে। যে দেশে গাভীকে শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে দেখা হয়, পরিহাসের কথা, সেখানেই তার প্রতি সবচেয়ে দুর্ব্যবহার করা হয়। গবাদি ও মহিষ উৎপাদন এবং পালন করা হয় ভার টানা বা দোহন করার উদ্দেশ্যে—মাংসের জন্য নয়। সাধারণত, অকর্মণ্য পশুগুলি কসাইখানায় এসে পড়ে। ভেড়া বা ছাগলের মতো ছোট জন্তুর বেলা বা নয় গো-মহিষ বধের ব্যাপারে আমাদের একটি মৌল বিতৃষ্ণা আছে, সন্দেহ নেই। দেশের গবাদি পালনে একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

অধুনা মহামারী ও ব্যাধির ভালোরকম নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হওয়ায় এবং স্বাস্থ্যবিধান অথবা গবাদির চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। ফলে মৃত্যুর উপর জন্মের যে বড়ো রকমের উদ্বৃত্ত থাকছে সেটা প্রতি বছর মোট সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলছে।

একটি গাভী রাখার কারণ হচ্ছে যে, তা বাছুর বিয়োয় এবং দুধ দেয়। বাছুরের দরকার না থাকলেও আশা করা হয়, গাভী প্রতি বছর একটি বাছুরের জন্ম দেবে যাতে তার দুধ দেবার ক্ষমতা অটুট থাকে। সুতরাং বাছুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করলে গাভীর দুগ্ধদান অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকবে। গবাদির ক্ষেত্রে তাই জন্মের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সংখ্যা রোধ কার্যত সম্ভব নয়। অন্য দিকে, বর্তমানে তারা কৃশ বা অশক্ত বলে (ডি এম দাণ্ডেকরের নির্ণয় অনুসারে) বয়োপ্রাপ্ত গাভীগুলির মাত্র একের তিন ভাগ দুধ দিতে পারে।

স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের আদর্শ

আমাদের দেশে গাভীকে জননীর প্রতীক রূপে দেখা হয়। কারোর অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে সমস্যার একটা স্বাভাবিক সমাধান করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাদের রাখায় মানে হয় না সেইসব জন্তুকে অবহেলা করে এবং না খেতে দিয়ে মরতে দিলে তাদের সংখ্যা আপনা থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে এটাই বর্তমান ধারণা।

কেবল বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য পশুগুলোকে যে উপবাস করতে দেওয়া হয় তা নয়।

তরুণ গবাদির সংখ্যা বেশী হওয়ার এবং প্রাপ্তবয়স্ক এত পশুর দরকার নেই অথবা তাদের রাখার মতো সংগতি নেই বলে তরুণ পশুদের মরতে দেওয়া হয়। তরুণ গবাদির পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে মৃত্যুর হার প্রায় একই। এর থেকে স্বভাবত মনে হয়, বর্তমানে যতগুলি আছে তার চেয়ে বেশী বলদেরও দরকার নেই। কাজে কাজেই, তরুণ গবাদির পুরুষদের বেলাও বিশেষ কোনো যত্ন নেওয়া হয় না।

তা হলে আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে, নির্দিষ্ট আকারের বয়োপ্রাপ্ত গবাদি তার স্থান পূরণ করার মত আবশ্যক সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী তরুণ পশুর জন্ম দেয়। তরুণ গবাদির নির্বাচন দ্বারা সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বদলে অন্য উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অথচ কোনো অবস্থাতেই আমরা তরুণ গবাদির সবটাকে বয়োপ্রাপ্ত হতে দিতে পারি না। কেননা, তা হলে মোট গবাদি মাত্রাহীনভাবে বেড়ে যাবে এবং উপাদানরাশির উপর অত্যন্ত চাপ পড়বে। নির্বাচন ও উৎপাটনের প্রয়োজন তাই স্বীকার করতে হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব

না খেতে দিয়ে সরিয়ে ফেলার প্রতিক্রিয়া যেখানে এলোপাথাড়িভাবে দেখা দেয়, গো-মহিষ বধ সেখানে নির্বাচনমূলক হতে পারে। প্রথম ব্যবস্থাটি অপচয় ঘটায়—অর্থনৈতিক দিক থেকে সেটা সমর্থন করা যায় না। একই জন্তু দীর্ঘ উপবাসের ফলে প্রায় সব অর্থনৈতিক মূল্য হারিয়ে ফেলে এবং শেষে কেবল হাড় ও নিকৃষ্ট ধরনের চামড়ার একটা শব রেখে যায়। তার উপর, বধে কয়েকটি পশুকে মারা হয় কিন্তু বাকী জন্তুগুলিকে আগের চাইতে ভালো-ভাবে খাওয়ানো যায়। অপর পক্ষে, উপবাস প্রক্রিয়ায় যতগুলিকে সরিয়ে ফেলতে হবে তার চেয়ে বেশী সংখ্যাকে কম খাইয়ে এবং না খাইয়ে রাখা দরকার।

মানতে হয়, গো-বধ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু স্বল্প সংগতির এবং অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত চাষীর পক্ষে অকেজো পশুগুলিকে রাখা এবং খাওয়ানো সহজ ব্যাপার নয়। বধ অথবা না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা—এ দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি দয়াশীল এবং ঐতিহ্যের বেশি কাছাকাছি, সমাধান হিসাবে সেটাই বেছে নেওয়া হোক না কেন, গবাদি-পালনের প্রাথমিক সূত্র রূপে স্ত্রী বা পুরুষ লিঙ্গের মধ্যে এবং এক জন্তু ও অন্য জন্তুর ভেতর থেকে উপযুক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি না করলে পশুপালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হতে পারে না। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তারতম্য উদ্বৃত্ত গবাদি কমিয়ে ফেলতে হবে যাতে গোমহিষ এখনকার চাইতে আরো কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান হতে পারে। প্রাগুক্ত সূত্র এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন অগ্রাহ্য করলে দেশে গবাদির উন্নয়ন বিলম্বিত ও দুরূহ হয়ে উঠবে। তখন শেষ পর্যন্ত এই সত্যই স্পষ্ট হবে যে, সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত না করলে, গাভীরা বেড়ে উঠবে না—শুধু তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

দেশে খাদ্যের অনটন সংকটের আকার নিয়েছে। গোচারণের ভূমি ক্রমে মানুষের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়ায় তৃণাদি ভক্ষ্যের যোগান বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। এমনতর অবস্থায় মানুষ ও গবাদি দুইয়ের যুগপৎ বিস্ফোরণ ভারতের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়।

শান্তিকুমার ঘোষ

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী : আর্টিস্ট্রি হাউস

পশ্চিমের আলো লাল মেজেতে, এখানে সেখানে অনেক আধা-ইজিপতীয় নীচু চেয়ারগোছের সোফা। তবু কেউ বসে ছিল না—এমন কি বেগুনি বুগান্তকারী যশোরের 'কাঁথার কচমোড়া' স্ক্রীনের আড়ালে—সেখানেও কেউ না, তা ছাড়া দেওয়াল ঘেঁষে বই-এর হাত দেড়েক চওড়া বেঁটে তাক আলমারি তাতে কেউ হাত রেখে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত নেই।

কেন না অবনীবাবু, কেন না গগনবাবুর ছবির সামনে হলময় দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র ছবি—এখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েণ্টাল আর্টের বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী। যে রীতির তাঁরা প্রবর্তক তাঁরাই বিভিন্ন যুগের [illegible] দণ্ডায়মান, তাঁরা দুজনেই; [illegible] ছবি বিচার করছেন।

ক্ষিতিনবাবুর একটা ছবিতে খড়ের চালে সোনার ব্যবহার দেখে গগনবাবু বলছেন, "ক্ষিতিন সোনালী কথাটা যদি না থাকত তাহলেও কি তুমি সোনা দিতে?..."

অবনীবাবু মন্তব্য করলেন, "...বড্ড মেটাফরিকাল হল হে...বেশী দূর যেতে পারনি..."

এখন ভাবা যেতে পারে ইদানীংকার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনী যদি দেখতেন তাহলে তাঁরা কি ভাবতেন? তাঁরা কোন ছবির সামনে মন্তব্য করা দূরে থাক, দাঁড়াতেই পারতেন না। প্রথমত খুশী হতেন যে ক্যাটালগের কোথাও তাঁদের নাম উল্লেখ নেই, তাঁদের নাম নিয়ে

পাপেট সোসাইটি শিল্পী: ঈপ্সিতা চক্রবর্তী

এ'রা ছেলেমানুষি করছেন না এটা সত্যাই সুখের কথা; এখনকার কর্মকর্তাদের কেউ আদৌ শিল্প সম্পর্কে যদি জানতেন তাহলে প্রদর্শনীর এই হাল হত না।

যে সব ছবি এখানে সাজান হয়েছে প্রায় প্রত্যেকটিতেই অত্যন্ত রেয়াজের চিহ্ন ছবি আঁকব বলে আঁকা হয়নি। তবু এদের মধ্যে অরুন্ধতী রায় চৌধুরীর ছবিগুলিই উল্লেখযোগ্য।

সাত্যকী সেন-এর চিত্রপ্রদর্শনী : আর্টইসট্রি হাউস

সাত্যকী এখনও সত্যিই ছেলেমানুষ (বয়েস জাত), এখনও খুব তাড়াতাড়ি একটা ছবিকে সে শেষ করতে চায়, তাই তুলি ধোয়ার সময় তার নেই; তাই মনে মনে ঠিক-করা রঙ অন্য রকম হয়ে যায়, যেমন "ক্যাট"। তার মোটা করে আঁকা শুধু সাদা কালোর কাজগুলি বেশ হয়েছে।

সুকুমার চ্যাটার্জি ও বীরেশ্বর ভট্টাচার্য-এর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইসট্রি হাউস

এ'রা দুজনেই প্রবাসী তাই এই প্রথম এ'দের ছবি দেখলাম। সুকুমার চ্যাটার্জির এখানে ২০টি কাজ ছিল। রেখার দিক থেকে শুধু অবয়ব করতে সত্যাই তাঁর হাত আছে, কিন্তু কারসাজ সম্পর্কে এখনও কোথাও পৌঁছতে পারেন নি। তাঁর আনুভূমিক পাড়-করায় উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৬নং ছবিটি যেহেতু [illegible] একটি [illegible] (মেড) তাই আমাদের ভাল লাগে, এখানে ফোনের পরিণতি সার্থক। বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের সর্বসমেত ২০টি ছবি ছিল। তিনি অনেকগুলি ছবি দিয়ে দিয়ে এ'কেছেন—কিন্তু ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি—তাঁর '[illegible]' [illegible] কাজটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ব্রজগোপাল, পার্থ ভট্টাচার্য ও নিতাই ঘোষ-এর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইসট্রি হাউস

নিতাই ঘোষের, ছবি সবই জল রঙে করা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোন কিছু নূতনত্ব নেই ফলে টোনাল ভ্যারিয়েশন আমাদের অজানিত নয়—কালো সাদাগুলি খুবই সাধারণ। পার্থ ভট্টাচার্যের 'ইলিউ-সান' সিরিজ ছিল ৬টি। তাঁর কালো রঙের ব্যবহার এক আধ জায়গায় মন্দ না। ব্রজগোপালের ছবি ছিল ৬টি। আদতে ব্রজগোপাল পোর্টরেট পেনটার—নূতনত্ব না করে বিষয়বস্তুকে যদি পোর্টরেট ভেবে নেন তাহলে ভাল হয়।

এস সি দাস-এর চিত্র প্রদর্শনী : পূর্ণদাস রোড

এস সি দাস সবে ছবি আঁকা আরম্ভ করেছেন—২০টি ছবি এখানে ছিল। এই প্রদর্শনীতে সমরেশ চৌধুরীর ভাস্কর্য ছিল ৪টি—এ'র হাত পাকা।

ঈপ্সিতা চক্রবর্তীর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইসট্রি হাউস

ঈপ্সিতা চক্রবর্তীর আগের প্রদর্শনীর যতটুকু মনে আছে তাতে ছিল টোনের তার-তম্য। এবার তা কোথাও নেই। তিনি রঙ দিয়েছেন, রেখা টেনেছেন। অনেকের হয়ত মনে হবে তিনি ড্রইঙের দিকে একটু মন দিলে পারতেন। কিন্তু সমস্ত অ্যারেঞ্জমেণ্ট দেখলে হয়ত সে কথা আসে। সব সময় তিনি শিশু দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছেন—এমন কি রঙের পছন্দেও। তাঁর পাপেট সোসাইটির বিষয়বস্তু লোকের মনকে নাড়া দেবে।

ভ্রম সংশোধন : ১৪ জানুয়ারির সংখ্যায় 'দিল্লীর ডায়েরী'-র সব উপরের ছবির পরিচয়ে শিল্পীর নাম ভুল ছাপা হয়েছে। প্রকৃত নাম রথীন মিত্র।

চড়ক

গত ৮ই পৌষ 'দেশ' সংখ্যায় শ্রীনেপাল মজুমদারের লেখা 'ধর্মরাজ পুজায় আজও পিঠবান-চড়ক' সম্বন্ধে আমি নতুন কিছু আলোকপাত করতে ইচ্ছুক। আশা করি এই বিষয়ে উৎসুক পাঠকদের কিছু সুবিধা হবে। আমার গবেষণার কাজে আমি মেদিনীপুর জেলার নানা জায়গায় গিয়েছি এবং দু জায়গায় এই চড়ক উৎসব দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। জায়গা দুটির মধ্যে একটি মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার ভহরপুর গ্রাম এবং অন্যটিও এই জেলার সাঁকড়াইল থানার কাশীডাঙ্গা গ্রাম, তবে কাশীডাঙ্গায় এই চড়ক উৎসব ভহরপুরের থেকে অনেক বড় এবং অনুমানিক প্রায় ৭০০০ লোক এই চড়ক উৎসবে ও এই উপলক্ষে আয়োজিত মেলাটি দেখতে আসে।

এই জেলায় এই চড়ক বা গাজন উৎসব হয় চৈত্রের শেষে, একটি শিবপুজো বা শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে, বীরভূমের মতো ধর্মরাজপুজোকে উপলক্ষ করে নয়। এই জেলায় শিব-দেবতার বহুল প্রাধান্য, এই জেলায় অজস্র শিবমন্দির নানা নামে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সাধারণত বারোদিন ধরে চলে এই উৎসব এবং চৈত্রের শেষ দিন চৈত্র-সংক্রান্তিতে হয় এর সমাপ্তি।

এই উৎসবের আগে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে কয়েকজন ভক্ত নেওয়া হয়। ব্রাহ্মণদের মতো এদের উপবীত বা উত্তরীয় থাকে এবং উৎসব চলাকালীন এদের অনেক আচার অনুষ্ঠান ও কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে হয়। বীরভূমের ধর্মরাজপুজোর মত এরা মদ ইত্যাদি কখনও স্পর্শ পর্যন্ত করে না। এই ভক্তদের নেতার নাম 'পাট' বা 'রাজভক্ত' এবং অন্যরা 'দেওল' নামে পরিচিত। কোন নতুন ভক্ত নেওয়া হলে তাকে কিছু আচার-অনুষ্ঠান মানতে হয় এবং দীক্ষা নিতে হয়।

উৎসবের প্রথমদিন গ্রাম্যপুরোহিত ভক্তদের নিয়ে 'গাজনে-পুকুর' নামে একটা পুকুরে স্নান করতে যায়, সঙ্গে থাকে বাঁশের মাথায় লাল কাপড়ে বাঁধা একটা দন্ড-নিশান বা 'আলম'। গ্রাম্য ঢালীরা, ঢোল বাজাতে বাজাতে এদের অনুসরণ করে। উৎসবের এই কয়দিন এরা একত্রে যেখানেই যায় সেখানেই সঙ্গে থাকে এই নিশান এবং এই বাজনাদাররা। গ্রাম্য পুরোহিত 'কাসিন্য' নামে একটা মাটির পাত্রে জল ভরে শিবমন্দিরের মধ্যে স্থাপন করে এবং সকল ভক্ত সকালে ও বিকালে এখানে পুজো করে। বীরভূমের 'দোলসেবা' অনুষ্ঠানের ন্যায় এখানেও 'হিনডোলা' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়, এতে সকল ভক্তরা অংশ নেয়।

চৈত্রসংক্রান্তির আগের তিনদিনে আরো কিছু অনুষ্ঠান আছে। এইদিন ভক্তরা এবং গ্রাম্য পুরোহিত গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে যায়—পুরোহিত মন্ত্র পড়ে এবং আশীর্বাদ করে। এই তিনদিনের মধ্যে এরা গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে, গ্রামে [illegible] এবং যেই যেই গ্রামের সঙ্গে [illegible] অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে [illegible] পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও অনেক সময় এদের ঘুরতে দেখা যায়। এই সময় কখনও ভক্তদের মধ্যে কেউ শিব এবং পার্বতীর মতো পোশাক পরে এবং দুজনকে শিবের দুই বিশ্বস্ত অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গীর অনুকরণে নাচতে দেখা যায়। এই চলার সময় গ্রামের লোকেরা অনেক সময় এদের পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারত থেকে নানা-রকম প্রশ্ন করে, ভক্তরা তার উত্তর দেয়। সংক্রান্তির আগেরদিন গ্রামের পুরোহিত সুন্দর করে মন্দিরকে সাজায়। এদের বিশ্বাস এইদিন শিব এবং পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। এইদিন বিকেলে গ্রামের লোকেরা চড়ক-ডাঙ্গায় চড়ক-গাছ স্থাপন করে। এই কাজে গ্রামের আদিবাসীরা এদের খুব সাহায্য করে।

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন নানা অনুষ্ঠান হয়—এতে নিয়মিত ভক্তরা এবং কিছু মানত-ভক্তরা অংশ নেয়। মেটেলায় জিভ-বাণের মতো এখানেও হয় জিভ-ফোঁড়। তারপর

ছিনড়োলা অনুষ্ঠানের পর এঁরা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটে। 'ছিনড়োলা' অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরের সামনে যে গর্ত করা হয় সেটা কাঠ ও শুকনো ডাল দিয়ে ভালভাবে জ্বালানো হয় এবং প্রথমে প্রধানভক্ত ও পরে অন্যান্য ভক্তরা খালি পায়ে ঐ গর্ত পার হয়ে এর ঠিক পাশেই একটা ছোট গর্তে কলা-পাতায় রাখা দুধের মধ্যে পা ডোবায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কারো পায়েই কোন ফোস্কা পড়ে না।

মেটেলার পিঠবাণের মতো এখানেও 'পিঠ-ফোঁড়' এবং চড়কে ওড়ার অনুষ্ঠান হয়। অনেক সময় অনেকে অবশ্য 'পিঠ-ফোঁড়' না করেও চড়কে ওড়ে। তবে এখানে আর একটা অনুষ্ঠান হয়—'রজনীফোঁড়'। এই অনুষ্ঠানের সময় ৮।১০ জন লোক লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। এদের প্রত্যেকের দুই বাহুমূলের মাংসের মধ্যে দিয়ে চট্‌ সেলাই করার মতো বড় ছুঁচের সাহায্যে বেশ মোটা দুটো দড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সামনে একজন ও পেছনে একজন দড়ি দুটো একসঙ্গে ধরে। এরপর আরম্ভ হয় উদ্দাম নাচ। নাচতে নাচতে অনেক সময় দড়ি দুটো মাংস কেটে বেড়িয়ে আসে। আরো মজার কথা এই যে এই দড়িটা কোথাও কোথাও শক্ত নারকেলের দড়ি, যার মাঝে মাঝে লোহার ছোট পেরেক বা বাবলা কাঁটা লাগানো থাকে। এগুলো নাচের সময় মাংসের মধ্যে দিয়ে ঢোকে এবং বের হয়। ৮।৯ বছর থেকেই ছেলেরা এই 'রজনীফোঁড়ে' অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং আমি কাশীডাঙ্গার চড়কে ৮।৯ বছরের একটা ছেলেকে দুটো সিল্কের সুতো তার বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শিখতে দেখেছি।

এই চড়কের নানা অনুষ্ঠান থেকে বিস্মিত হতে হয় যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে শরীরের নানারকম কৃচ্ছ্রসাধন। এদের স্থির বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান চলাকালীন মহাদেব এদের সবরকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। 'রজনীফোঁড়', পিঠ-ফোঁড়, বা জিভ-ফোঁড়ের পর কারুর ক্ষতস্থান দূষিত হয়েছে বলে আমিও শুনিনি। আরো মজার কথা এই যে, এই তিনটি অনুষ্ঠানের

পর এদের অতস্থানে সিঁদুর মাখাতে দেখেছি কিন্তু এতেও কোন ক্ষতি হতে শুনিনি।

চড়কের নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সূর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নানা অনুষ্ঠানে সূর্যদেবের উপাসনা করা হয়। অনেকের মতে চক্রাকারে চড়কে ওড়া সৌর-জগতের প্রদক্ষিণের অনুকরণেই হয়েছে। পূর্বভারত এবং ছোটনাগপুরের হিন্দু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধর্মরাজ পূজার অনেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই চড়ক উৎসবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন আজকার এই ধর্মপূজা আগেকার দিনের সূর্যপূজা থেকে উৎপত্তি বলেই এটা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের এই চড়ক-উৎসবের একটা বিশেষ দিকের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই জেলার এক অসাধারণ মূল্য আছে। এই সীমান্ত বাংলায় ছোটনাগপুরের মালভূমির সঙ্গে সমতল বঙ্গভূমির মিলন হয়েছে। এখানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহালী, লোধা, কড়া, ভূমিজ প্রভৃতি অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যসংস্কৃতির মিলনে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। এই চড়ক উৎসবে যেমন রয়েছে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব তেমনি রয়েছে অনার্য-সংস্কৃতির অবদান। আদিবাসীরাও এই উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এই উৎসব চলাকালীন অংশগ্রহণকারী নিম্ন ও উচ্চ-জাতের ভক্তদের মধ্যেও কোনরকম ভেদাভেদ থাকে না। এই প্রসঙ্গে আরো আগ্রহী পাঠকদের ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক লিখিত Folklore-এ (১৯৬৪) প্রকাশিত "Gajan, a regional festival" নামক প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

বুদ্ধদেব চৌধুরী
নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

খেলার মাঠে

কলকাতা টেস্ট খেলার মাঠের সাম্প্রতিক গণ্ডগোল সম্বন্ধে শ্রীএকলব্যের সময়োচিত মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ (দেশ, ২২ পৌষ)।

খেলার মাঠে গণ্ডগোল বা বাস পোড়ানো কেউ চায় না, কিন্তু ঘটনার পেছনে অনেক কারণ থাকে। শ্রীএকলব্য তার মূলে অনেক কথাই বলেছেন।

আমি বোম্বেবাসী। কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য অনেকে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন বঙ্গভাষী বলে। কলকাতার ভালো নামে কালিমা পড়লো কিনা সেটা নিয়ে বিতর্ক চলে। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, দোষ কাদের বেশী।—যারা বহু মেহনতে পাওয়া টিকিটের ন্যায্য বিনিময়ে খেলা দেখতে চেয়েছিল (টাকার প্রশ্ন উপলক্ষ্য), তাদের? না যারা সমস্ত জেনেশুনে শুধু কালো টাকার লোভে বাজারে টিকিট ছেড়েছে তাদের। আমার পরিচিত এক অবাঙালী মেয়ে বলেন, কলকাতার লোকেরা যে এ সব সহ্য করবে না এ তো জানা কথা।

অশোককুমার দত্ত
বান্দ্রা, বম্বে—৫০

সেনেটর ব্রুস্টার অতঃপর দিল্লিতে ফিরে গেলেন; এবং রাষ্ট্রদূত দেখে বিস্মিত হলেন যে, এক দিন ফরিদাবাদে কাটিয়েই তাঁর মনের ভাব একেবারে পালটে গেছে। যিনি বিদ্রূপ করতে এসেছিলেন, তিনি অনুরাগী হয়ে উঠলেন। সেনেটর ব্রুস্টার স্বদেশে ফিরে গেলেন, এবং ওয়াশিংটনে গিয়ে সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সদস্যদের বললেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ধরনের আত্মনির্ভর উন্নয়ন-কর্মের কীভাবে ব্যাপক বিস্তার ঘটানো যায় তা নিয়ে ঘরোয়াভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং মারকিন রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় ১৯৫২ সনের এপরিল মাসে তাঁরা আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হল, সেখানে গিয়ে আমি কৃষি-উন্নয়নের আধুনিক ব্যবস্থা এবং টেনেসি ভ্যালি সংস্থা ইত্যাদির কাজ দেখব, এবং ওয়াশিংটনে সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

কিন্তু শ্রীনেহরু এতে অসন্তুষ্ট হলেন। এমন নয় যে, মারকিন সাহায্য গ্রহণে তাঁর আপত্তি ছিল। তা নয়। ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য যে প্রভূত মারকিন সাহায্য দরকার, তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ভারতীয় ভারতকে সাহায্যদানে আমেরিকানদের উৎসাহিত করবার জন্য কোনও প্রকারে চেষ্টা করুক, এটা তিনি চাইতেন না। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে থেকে এগিয়ে এসে যদি সাহায্যের প্রস্তাব করে, তবে ভারত সরকার তা গ্রহণ করবেন, এই পর্যন্ত। তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানাতেও রাজী ছিলেন। ভারতে মারকিন সাহায্য দানের ব্যাপারে আমেরিকান ও ভারতীয়রা যে কেন পরস্পরের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কের মতন কথা বলতে পারেন না, তা কখনও আমার বোধগম্য হয়নি। সরকারীভাবে ভারতের বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার কখনও মারকিন সাহায্য প্রার্থনা করেন না; এবং সরকারীভাবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার যতক্ষণ না সরকারীভাবে সাহায্য চাইছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে এক ডলার দেওয়াও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বে-আইনী ব্যাপার। অথচ এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ ছ শো কোটি ডলারের উপরে। এ এক মজার খেলা। আমেরিকান ও ভারতীয়রা পরস্পরের সঙ্গে এই খেলা খেলে থাকেন।

যাই হোক, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আমাকে আমন্ত্রণ করায় এবং সেই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করায় ফল হল এই যে, ফরিদাবাদ প্রকল্প বিনষ্ট হল। ইতিপূর্বেই আমি বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশালী আমলা এবং বাস্তুহারা দপ্তরের মন্ত্রী-মহোদয়ের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। মন্ত্রিত্বের চাইতেও যেন ফরিদাবাদ পরিকল্পনার মহিমা আরও বেশী বলে তখন প্রতিভাত হচ্ছিল। তিনি আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। এবারে আমি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সিদ্ধান্ত করায় মন্ত্রী-মহোদয় এবং আমলারা তাঁদের সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সংশয়টা আমার ভাল লাগেনি। সে-কথা আমি জানিয়েছিলামও। তার ফলে শ্রীনেহরুর সঙ্গে আমার কিছু কথা-কাটাকাটি হল, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে জানালেন যে, একমাত্র বেসরকারী ব্যক্তি হিসেবেই এই ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারি; সে-ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকা চলবে না। (পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শত শত সরকারী কর্মচারী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন।) ঝোঁকের মাথায় আমি আমার কাজে ইস্তফা দিলাম, এবং বেসরকারী ব্যক্তি হিসেবে ১৯৫২ সনের ১৮ই এপরিল তারিখে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম। সে-যাত্রায় শুধু ওয়াশিংটনে নয়, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু জায়গায় বহু ব্যক্তির বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—নানান সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। এবং মারকিন জনমতের উপরে এই সফর যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে

পেরেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। ১৯৫২ সনের ১৩ই মে তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার থেকেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। সেই নিবন্ধটিকে এখানে তরজমা করে দেওয়া হল :

ভারতবর্ষের জন্য সাহায্য

"অন্যান্য দেশের জন্য ব্যয়বরাদ্দ, সাহায্য এবং ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন চতুর্দিক থেকে কংগ্রেসকে এতই নিন্দা করা হতে থাকে যে, যেখানে সত্যিই প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে প্রশংসা না-করাটা অন্যায় হবে। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে বলতে পারা যায় যে, দুটি পরিষদই এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু কংগ্রেস-সদস্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-ব্যাপারে যে ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে সমীচীন সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সহানুভূতি ও উপলব্ধির বাস্তব প্রয়োগ এখনও অবশ্য ঘটেনি, তবে কী করা দরকার এবং কেন তা করা দরকার, প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ এবং এত বেশী সংখ্যক কংগ্রেস-সদস্য যখন তা বুঝতে পেরেছেন, তখন আশাবাদী হবার নিশ্চয়ই কারণ আছে।

বৃহত্তর বিচারে পশ্চিম আজ কমিউনিজ্‌ম্‌-এর সেই চ্যালেন্‌জ্‌-এরই সম্মুখীন, চীনে যার মোকাবিলা করতে আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছিলাম। গত বুধবার ওভারসীজ প্রেস ক্লাবে পল জি হফম্যান যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে শুধু অস্ত্রশস্ত্র-বাবদেই তো বহু মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল, তার বদলে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের সাহায্য বাবদে যদি এক মিলিয়ন ডলার খরচ করা হত, চীনকে তাহলে হয়ত রক্ষা করা যেত।

ভারতবর্ষকে সাহায্য করবার সময় এখনই। এবং সেই সাহায্যের স্থান হচ্ছে গ্রামাঞ্চল। ফরিদাবাদ-প্রকল্পের চাঞ্চল্যকর সাফল্য সম্পর্কে এই পত্রিকায় গত কাল একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে; এই ধরনের গ্রামোন্নয়ন-প্রকল্পের জনাই সাহায্য দেওয়া দরকার। তরুণ গান্ধীবাদী সুধীর ঘোষ এখন যুক্তরাষ্ট্রে; তিনি তাঁর প্রকল্পের কথা সবাইকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অল্প-কিছু সাহায্য এবং ভারতীয়দের কঠিন পরিশ্রম ও আত্ম-বিশ্বাস?এই দুইয়ের সমন্বয়ে পাঁচ-ছ বছরের মধ্যেই গ্রামীণ ভারতবর্ষের চেহারা পালটে দেওয়া যেতে পারে।

পারস্পরিক নিরাপত্তা আইনের বিলটি এখন বিবেচনাধীন; কংগ্রেস এতে ভারত-বর্ষের জন্য সাড়ে এগারো কোটি ডলার সাহায্য বরাদ্দ করছে। এই অঙ্কটা বরাদ্দ করবার প্রয়োজন এতই বেশী যে, শতকরা বারো ভাগ ছাঁটাইয়ের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে খাদ্যশস্য বাবদ এ-বছরে বাড়তি আরও সাড়ে বারো কোটি ডলার বরাদ্দ করবার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। একটানা খরার দরুন দক্ষিণ ভারতে—কমিউনিজম যেখানে সবচাইতে বেশী প্রসার লাভ করেছে—আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখান থেকে যদি কয়েক মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য সেখানে পাঠানো হয়, তা হলে এই বছরের মতন জনসাধারণ সেখানে সংকট উত্তীর্ণ হতে পারবে। আবার তার বিক্রয়লব্ধ টাকা দেওয়া যাবে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে।

এই হচ্ছে পরবর্তী লক্ষ্য। কংগ্রেসের অধিবেশন জুন মাসে মুলতুবি হবে; তার আগেই এই খাদ্যশস্যের জন্য একটি বিশেষ বিল পাস করা দরকার। সরকার নিশ্চয়ই অনুরূপ ব্যবস্থাকে সমর্থনই করবেন। এই ধরনের সমীচীন স্বার্থবোধ ও আদর্শবাদই যুদ্ধের পরবর্তী কালে সঠিক ইতিহাস রচনা করেছে, এবং এতে লাভও হয়েছে।"

আমার চেষ্টা অবশ্যই এই রকমের একটা জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল, যা ভারতকে সাহায্যদানের অনুকূল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য বাবদে প্রথম পাঁচ কোটি ডলার ভারতবর্ষ লাভ করল। কিন্তু ১৯৫২ সনের জুন মাসে ভারতবর্ষে ফিরে দেখলাম যে, ফরিদাবাদের

উপরে এবং আমার নিজের জীবনে এর ফল হয়েছে মারাত্মক। আমার উপর থেকে শ্রীনেহরুর স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ফরিদাবাদ ধসে পড়ল। ফরিদাবাদের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দেবার জন্যে বোম্বাই থেকে আমদানি করা হল একজন পাকা আমলাকে। কীরকম কার্যকরভাবে যে ফরিদাবাদকে 'লিকুইডেট' করা হল, নীচের সংক্ষিপ্ত হিসেব থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে:

ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব ও ফরিদাবাদ বোর্ডকে প্রদত্ত ঋণের লিকুইডেশন

ব্যয়ের খাত	প্রাথমিক হিসাব	চূড়ান্ত হিসাব
(১) জরিপ, সীমানা নির্ধারণ ও জমি দখল	১৫,৬৫,০০০	৩২,০২,০০০
(২) গৃহনির্মাণ	১,০৮,০০,০০০	১,২৩,৭৪,০০০
(৩) বিদ্যুৎ (উৎপাদন ও বণ্টন)	২৩,৬৮,০০০	৫২,৫৫,০০০
(৪) রাস্তাঘাট ও বৃক্ষ রোপণ	৯,২৫,০০০	১৬,০৪,০০০
(৫) জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী	৩৫,০২,০০০	৩৭,২৫,০০০
(৬) অস্থায়ী দপ্তর ও অন্যান্য কাজের জন্য নিসেন চালা	৩,৩০,০০০	৬,৬০,০০০
(৭) দপ্তরের পরিচালন-ব্যয় ও অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যয়	৯,৯৫,০০০	১৪,৬৩,০০০
(৮) শ্রমিকদের ইনসেনটিভ বোনাস (সাহায্যস্বরূপ)	১৪,০০,০০০	১৬,০০,০০০
(৯) রেলওয়ে সাইডিং ও লেভেল ক্রসিং	৩,৬৫,০০০	১১,৪৫,০০০
(১০) কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র	১৫,৪৭,০০০	৪১,৬১,০০০
(১১) যন্ত্রপাতি	১,১৫,০০০	২,৪৭,০০০
(১২) গৃহের জন্য জমির উন্নয়ন (উদ্বাস্তুদের বাড়ি ছাড়া অন্যান্য)	...	১,৬৯,০০০
(১৩) সমবায়-সংস্থাকে ঋণ	১৪,৫০,০০০	২৪,০০,০০০
(১৪) স্টক সাসপেন্স্	...	১৬*০০,০০০
(১৫) অব্যবহৃত জমির উন্নয়ন	...	৫,৮৩,০০০
(১৬) অপ্রত্যাশিত ব্যয়	...	৫০,০০০
(১৭) অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র	...	৩,০০,০০০
মোট	২,৫৪,৫১,০০০	৪,০৬,২৮,০০০

ঋণ হিসাবে প্রদত্ত ৪,০৬,২৮,০০০্ টাকার লিকুইডেশন

(ক) সরকারকে পরিশোধ (পাকিস্তানে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে উত্থাপিত দাবির সঙ্গে যে-অঙ্ক অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে তৎসহ)	২,৫৬,৮৪,০০০
(খ) সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাপ্য (পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে যে পাওয়ার হাউসটি বিক্রি [অংশত বিনামূল্যে প্রদত্ত] করা হয়েছে ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে যে ডিজেল ইনজিন প্ল্যানট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্রি করা হয়েছে, তার বাবদে)	৩৯,২২,০০০
(গ) সরকারী সাহায্য হিসাবে যে-অঙ্ক প্রদর্শন করা হয়েছে (রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাওয়ার হাউস [অংশত বিনামূল্যে প্রদত্ত], অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্র, কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। পাঞ্জাব সরকারের কাছে হস্তান্তরিত	১,১০,২২,০০০
মোট:	৪,০৬,২৮,০০০

বাস্তুহারারা পাকিস্তানে যে ঘরবাড়ি ও জমিজমা ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন, তার জন্য তাঁদের অনেকেই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী ছিলেন। সরকার এই বাড়িগুলি তাঁদের দিয়ে বাড়ির দামটাকে তাঁদের প্রাপ্যের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট্ করে নেন। প্রতিটি বাড়ির দাম ধরা হয় পাঁচ হাজার টাকা। (প্রাপকদের তাতে ক্ষতি হয়নি; ও-বাড়ির দাম নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার টাকা ধরা যেতে পারে।) বাড়িপিছু নির্মাণ ব্যয় অবশ্য ১,৯৩৩্ টাকা পড়েছিল। সরকারী বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্ল্যান্টটি অংশত বিনামূল্যে ও অংশত মূল্যের বিনিময়ে পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়। সমষ্টি-প্রকল্পের ডিজেল ইনজিন কারখানাটি বিক্রি করা হয় এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়-ভবন, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা—এ সবই পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফরিদাবাদ জায়গাটি পাঞ্জাবের মধ্যে পড়ে। ৪,০৬,২৮,০০০্ টাকার ঋণকে সামগ্রিকভাবে এইভাবে 'লিকুইডেট' করবার পরে (এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, বাস্তুহারাদের শুধু খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিন বছরে সরকারের ব্যয় হত মোট ৪,০২,০০,০০০্ টাকা) ভারত সরকারের হাতে আরও আড়াই হাজার বাড়ি (যে-সব বাস্তুহারা ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী ছিলেন না, এগুলি তাঁদের দেওয়া হয়) ও আড়াই শো একর অব্যবহৃত জমি রয়ে গেল। শুধু তারই দাম আড়াই লক্ষ টাকার উপরে।

পিছনে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে আমি ভাবি যে, আমেরিকানদের সম্পর্কে যে উৎসাহ আমি দেখিয়েছিলাম, তার সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা। ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে মার্কিন আগ্রহ অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবং অনাগ্রহের অবসান ঘটাতে আমার চেষ্টাতেও যে কিছুটা কাজ হয়েছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চোদ্দ বছর বাদে আজ পিছনে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আমেরিকানদের সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সন্দেহ যতই অযৌক্তিক হোক, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। তার কারণ, মার্কিন সাহায্যের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, আমার কাছে ফরিদাবাদ-প্রকল্পই ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; তাকে সফল করে তোলাই আমার উচিত ছিল। আর তা ছাড়া শ্রীনেহরুর এই কথাটাও সম্ভবত ঠিকই যে, আমেরিকা থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য পাবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ি করবার কোনও দরকার নেই; পীড়াপীড়ি ছাড়াই তা পাওয়া যাবে। আমার সিদ্ধান্তে শ্রীনেহরু খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। সমষ্টি-উন্নয়ন প্রকল্পের একজন পথিকৃৎ হিসেবে আমি খুবই প্রশংসা পাচ্ছিলাম। সেই প্রশংসার মায়া ত্যাগ করে যে আমি পদত্যাগ করে বসব, তা তিনি ভাবতে পারেননি। আর আমি ভাবতে পারিনি যে, তাঁর ক্রোধ এতদিন স্থায়ী হবে। আমি ভেবেছিলাম, মাস দুয়েক বাদে আমি যখন দেশে ফিরব, তখন আবার তিনি আমাকে ফরিদাবাদের কাজে ব্রতী হতে দিয়ে কাজটা শেষ করবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু তা না দিয়ে তিনি যে বরং ফরিদাবাদ প্রকল্পকে (যার জন্য তিনি প্রচুর সময় দিতেন, এবং যার প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল) ভাসিয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন, এতটা আমার কল্পনায়

ছিল না। ট্রিগভে লি ছিলেন একজন অসাধারণ মহৎপ্রাণ মানুষ; কিন্তু কোনও কিছুই তিনি ভুলে যেতেন না। মানুষ মাত্রেই তো নানা ধাতুর সমাবেশে গড়া। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন।

তিন-তিনটে বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে কোনও কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কী করে হবে। সবাই জেনে গিয়েছিলেন যে, 'কর্তা' আমার উপরে অপ্রসন্ন। অবস্থায় কী আর করা, [illegible] রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজ নিয়ে, সমষ্টি-উন্নয়ন-'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে, আমি দক্ষিণ আমেরিকা চলে গেলাম। তা ছাড়া আরও পাঁচ-রকমের কাজ তখন আমি করেছি। ১৯৫৪ সনে জাপানী শান্তিবাদীদের আমন্ত্রণে টোকিওর অনুষ্ঠিত বিশ্ব [illegible] যোগ দেবার জন্য আমি জাপানে যাই। দক্ষিণে কিয়ুশু দ্বীপ থেকে উত্তরে হোক্কাইডো পর্যন্ত সমস্ত জাপান জুড়ে কীভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চলছে, তা দেখবার সুযোগ তখন হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সেনেটর হিউবার্ট হামফ্রি (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটির অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের আমন্ত্রণে আমি ওয়াশিংটনে যাই। ১৯৫২ সনে তাঁদের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার, তাতে আমার সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে একটা আস্থার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মার্কিন অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে আমেরিকার কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে একটা অনিচ্ছার ভাবই মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে। এমন নয় যে, তাঁরা অত্যধিক কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী। আসলে, এই ব্যাপারটা দেখে তাঁরা নিরুৎসাহিত বোধ করছিলেন যে, ভারতবর্ষ সমেত উন্নয়নশীল সকল দেশই মার্কিন অর্থসাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র বটে, কিন্তু তাদের কেউই এই সাহায্যকে কাজে লাগাবার এমন কোনও পন্থা উদ্‌ভাবন করতে পারেনি, তাদের সমস্যা যাতে মিটতে পারে। এ-বিষয়ে আমার কি কিছু বলবার আছে? আমি কি তাঁদের কোন পরামর্শ দিতে পারব?

বললাম, তাঁদের এই বৃহৎ প্রশ্নের সার্বিক উত্তর আমার জানা নেই; শুধু চারটি প্রকল্পকে রূপায়িত করলেই আমি খুশী হব। একটি ল্যাটিন আমেরিকায়, একটি আফরিকায়, আর দুটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বিশেষ করে ভিয়েতনাম-লাওস-কামবোডিয়ায়। এই প্রকল্প হবে বহুসংখ্যক গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য। এর মূলধন এর কাজের মধ্য থেকেই উঠে আসবে, এবং একবার চালু করে দিলে আপনা থেকেই এই প্রকল্পের কাজ চলে থাকতে পারবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই রকমের চারটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কি তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদকে আরও দু কোটি ডলার সাহায্য দিতে রাজী আছেন? কারিগরী সাহায্য পরিষদ এই অর্থকে একটা অক্ষয় তহবিল হিসাবে কাজে লাগাবেন। প্রকল্পগুলিকে এই তহবিল থেকেই মূলধনী ঋণ যোগাবেন তাঁরা; সেই মূলধনকে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে সমষ্টি-প্রকল্পগুলি তাদের জমি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ তো বৃদ্ধি করতে পারবেই, উপরন্তু ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ সামান্য সুদ সহ কিংবা বিনা সুদে আবার কেন্দ্রীয় তহবিলে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে দিতে পারবে; তহবিল তার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং একই তহবিলের অর্থকে বারবার কাজে লাগানো যাবে। আমার বক্তব্য তাঁরা শুনলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদ যে প্রদত্ত অর্থকে এইভাবে কাজে লাগাতে পারবেন, এতটা আস্থান্বিত তাঁরা হলেন না। তাঁরা বললেন যে, জাতীয় আমলাতন্ত্রের চাইতে আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্র আরও অকর্মণ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য তহবিলে তখন বছরে মাত্র দু কোটি ডলার সংগৃহীত হত। তার শতকরা ষাট ভাগ দিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেই দু কোটি ডলার টুকরো টুকরো করে বণ্টন করা হত। রাষ্ট্রপুঞ্জের ছাপ থাকায় এই তহবিলের একটা মহিমা ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা ছিল এতই দুর্টিযুক্ত যে, বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার রোগ-নিবারক গুটিকয় প্রকল্প ছাড়া, অন্যান্য কোনও প্রকল্পই কোথাও স্থায়ী কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। সে যাই হোক, আমি বললাম যে, দান করা ভাল, কিন্তু দাতা হিসেবে নিজেকে জাহির করা ভাল নয়। মার্কিন বন্ধুদের এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করা দরকার।

দেখে বিস্মিত হলাম, মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটী প্রকল্পের প্রস্তাবে একমত তো হলেনই, উপরন্তু ১৯৫৩ সনের পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে তাঁরা যে 'রিপোর্ট দিলেন', তার একটি অনুচ্ছেদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানানো হল যে, চারটি প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য তহবিলে (স্বাভাবিকভাবে যে অর্থ দেওয়া হয়, তা ছাড়াও) যেন বাড়তি আরও দু কোটি ডলার দেওয়া হয়। এই প্রকল্প-চতুষ্টয়ের কথা আমিই তাঁদের কাছে বলেছিলাম। সেনেটের আলেকজানডার স্মিথ এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা। এ-বিষয়ে তিনি আমাকে এই চিঠি লিখলেন:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনেটের
পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় কমিটী
১৮ই জুন, ১৯৫৩

"প্রিয় মিঃ ঘোষ,

আপনার প্রস্তাবিত স্বনির্ভর গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, ইতিমধ্যে তা আপনি জেনেছেন।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আশা করেছিলেন যে, আইনের মধ্যেই এই প্রকল্পগুলির একটা বিশেষ উল্লেখ রাখার ব্যবস্থা হবে, তবে আমার ধারণা, ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক নিরাপত্তা অ্যাডমিনিসট্রেটরের হাতে ছেড়ে দেবার এবং কমিটীর রিপোর্টে সাধারণভাবে এই সামগ্রিক প্রকল্পের উল্লেখ করবার সিদ্ধান্তটাই সমীচীন হয়েছে। এর ফলে, আপনি যে ধরনের পরীক্ষায় উৎসাহী, অ্যাডমিনিসট্রেটর সেই ধরনের কিছু পরীক্ষায় হাত দিতে পারবেন, এর একটা কার্যসূচী স্থির করে নেওয়া যাবে বলে আমি আশা করি।

প্রীতিপাশে আবদ্ধ
এইচ আলেকজানডার স্মিথ"

কিন্তু এর ফল হল এই যে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলারা আমার উপরে চটে গেলেন। ক্ষমতাশালী এইসব মার্কিন সেনেটরের মাথায় কি আমি কতকগুলি বদ খেয়াল ঢুকিয়ে দিচ্ছি না? এই প্রকল্পগুলি যদি সফল হয়, এবং তাঁদের রাজনৈতিক কর্তারা যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে মার্কিন আমলা-মহলের রচিত অর্থদান-পরিকল্পনাগুলির অদৃষ্টে কী হবে? মার্কিন আমলারা অর্থদাতার ভূমিকায় নিজেদের জাহির করতে বড়ই ভালবাসেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, আমার 'অমিত্রসুলভ' কার্যকলাপে বিচলিত এই মার্কিন আমলারা তাঁদের ভারতীয় দোসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। (এক বছর আগেই কিন্তু আমার কার্যকলাপকে তাঁরা মিত্রসুলভ বলে মনে করেছিলেন, তার কারণ ভারতবর্ষকে আরও অর্থসাহায্য দেবার জন্য তাঁদের রাজনৈতিক কর্তাদের তখন আমি অনুরোধ করেছি; আমলারা তাতে এই জন্য খুশী হয়েছিলেন যে, এর ফলে তাঁরা দাতা সাজতে পারবেন।) রাষ্ট্রপুঞ্জে

ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি একজন অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সারভ্যান্ট; তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটেন। নিউ ইয়র্কে তিনি আমাকে বললেন, "এ তুমি কী করছ সুধীর? মারকিন সেনেটররা যদি রাষ্ট্রপুঞ্জকে এইভাবে সাহায্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে আর একটি কানাকড়িও তাঁদের কাছে আমরা পাব না। কথাটা বুঝতে পারছ?"

ভারত-মারকিন সম্পর্কের এই একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, ভারত সরকারের আমলারা যে শুধুই মারকিন অর্থসাহায্য চান, তা নয়, সেই সাহায্যকে তাঁরা সরাসরি মারকিন আমলাদের কাছ থেকেই পেতে চান। আমেরিকার অর্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফতে আসবে এটা তাঁরা পছন্দ করেন না। তার কারণ, মারকিন আমলাদের বলা চলে, "দূরে থাকো।" সাহায্যের টাকাটা কীভাবে খরচা করা হচ্ছে, মারকিন আমলারাও সে ব্যাপারে নাক গলাতে সাহসী হন না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফতে সাহায্য এলে তো সেই স্বাধীনতা থাকবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করতে পারবে যে, ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁদেরও একটা ভূমিকা থাকা চাই। প্রাপ্ত সাহায্য কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে বিশ্ব ব্যাংক থেকে কি প্রতি শীতকালে একদল অফিসারকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় না? তাঁরা এসে কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন না যে, সাহায্যের টাকাটা কীভাবে বিনিয়োগ করা হল, কতটা সাহায্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল, এবং তার কারণ কী? সে এক মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তার চাইতে সরাসরি সাহায্য পাওয়া ভাল। মারকিন আমলাদের সেক্ষেত্রে স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে, এ সব ব্যাপারে তাঁরা যেন নাক গলাতে না আসেন। নাক গলাতে তাঁরা সাহসও পান না। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে সরাসরি অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থায় অতএব দাতা আর গ্রহীতা দুই পক্ষেরই স্বার্থ রয়েছে।

মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলারা যে আমার উপরে খেপে গেলেন, তাতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই।

মারকিন জনমত কিন্তু আমার প্রস্তাবের অনুকূলতাই করেছে। ১৯৬৩ সনের ২৯শে অগস্ট বহুল প্রচারিত মিনিয়াপলিস স্টার' পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা উৎসাহব্যঞ্জক। নিবন্ধটিকে এখানে তরজমা করে দেওয়া হলঃ

মারকিন সমর্থন লাভের যোগ্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রগতি সাধনের জন্য (এবং ঠান্ডা লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলি যাতে জয়লাভ করে তার জন্য) জনৈক তরুণ ভারতীয় একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন। পূর্বে ইনি গান্ধীজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনাটি পরিপূর্ণভাবে পরখ করে দেখা দরকার। জনসাধারণের আয় যেখানে অত্যন্ত কম, সেই সব অঞ্চলে—যথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে, আফরিকায় আর ল্যাটিন আমেরিকায়—তিনি সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করার পক্ষপাতী।

পরিকল্পনার উদ্ভাবক সুধীর ঘোষ প্রমাণ পেয়েছেন যে, এই ধরনের প্রকল্প ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তিন বছর আগে ভারতবর্ষের ফরিদাবাদ শহরের জন্য তিনি একটি উন্নয়ন-প্রকল্প গড়ে তোলেন। তার অগ্রগতি খুবই উল্লেখযোগ্য। নয়াদিল্লির দক্ষিণে ফরিদাবাদ হচ্ছে তিরিশ হাজার উদ্বাস্তুর এক শিবির-শহর। প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ঘোষ বলেন যে, বাস্তুহারাদের শুধুই দাক্ষিণ্য বাবদে টাকা না দিয়ে টাকাটা এমনভাবে ব্যয় করা দরকার যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে।

ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পরিমাণ টাকা ঋণ নেন। সেই টাকায় ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল আর কারখানা গড়া হয়েছে। সমষ্টি-প্রকল্প সেই ঋণ ইতিমধ্যে শোধ করতেও শুরু করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, জল সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নয়নকর্মে হাত দেওয়া হবে।

ঘোষ চান যে, মারকিন সেনেট এই ধরনের প্রকল্পের জন্য পারস্পরিক নিরাপত্তা সংস্থার তহবিল থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করুন। তাঁর এই পরিকল্পনায় কয়েকজন সেনেটর আগ্রহ দেখিয়েছেন। আইওয়ার সেনেটর হিকেনলুপার ও জিলেট এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। হিকেনলুপার ও জিলেট দুজনেই গত বছর ভারত-সফরে গিয়েছিলেন; ফরিদাবাদের অগ্রগতি তাঁরা দেখে এসেছেন।

ঘোষের পরিকল্পনা এই যে, বিনিয়োগের অর্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য

পরিবারের মাথাপিছু বণ্টন করতে হবে। বিভিন্ন জনসমষ্টির জন্য প্রায়-স্বাধীন বোর্ড গঠন করা হবে, এবং প্রকল্পের পরিচালন-ভার থাকবে সেই বোর্ডের হাতে। প্রতিটি বোর্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং প্রকল্পের কাজ যেখানে চলবে সেই দেশের সরকারের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে হবে।

আমেরিকার কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনার (পয়েন্ট্ ফোর) কাজ শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে। তার প্রধান কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে শিল্পকৌশল সফল হবার সম্ভাবনা, তার সন্ধান সহজে মিলছে না। পয়েন্ট্ ফোর-এর কর্তারা মোটামুটি মার্কিন পদ্ধতি বিশেষত ফেডারেল-স্টেট সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় অবলম্বিত পদ্ধতি অনুযায়ী অন্যান্য জায়গায় কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বহু স্থানেই এই পদ্ধতিতে কাজ করে সুফল পাওয়া যায়নি।

সাধারণ সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে বণ্টিত এই বৈদেশিক কারিগরী সাহায্যের পরিমাণ কোথাও কোথাও এতই কম যে, স্থানীয় মানুষরা তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। ঘোষ-পরিকল্পনার গুণ এই যে, প্রয়োগ করলে এতে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে, এবং অন্যান্য জন-সমষ্টি তাতে উৎসাহিত হবে।

অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগের ব্যবস্থা না রেখে শুধুই কারিগরী সাহায্য দিলে তাতে কাজ খুবই শ্লথ গতিতে এগোয়। ঘোষ-পরিকল্পনায় এমন একটা পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার সঙ্গে নূতন মূলধন প্রয়োগের ব্যবস্থা সমন্বিত; পরন্তু একে 'সাম্রাজ্যবাদী শোষণ'ও বলা চলবে না।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে এই কার্যসূচীকে রূপায়িত করা হলে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে। 'ঔপনিবেশিকতাবাদ'-এর বিরুদ্ধে মনোভাব খুবই প্রবল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ চালাবার পথে সেটা একটা বৃহৎ বাধা। কমিউনিস্ট প্রচারকার্যের এতে খুবই সুবিধে হয়। এই কারণেই ঘোষের পরিকল্পনার আবেদন এত শক্তিশালী। এ পরিকল্পনা একজন ভারতীয়ের পরিকল্পনা; রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে এটি রূপায়িত হবে; সুতরাং 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ'-এর দুর্নাম একে ভোগ করতে হবে না।

আমরা আশা করি, কংগ্রেস ও শাসন-কর্তৃপক্ষ, পরীক্ষামূলকভাবে, পারস্পরিক নিরাপত্তা সংস্থা তহবিলের কিছু অংশ ঘোষ-পরিকল্পনায় জন্য বরাদ্দ করবেন। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কত রকমভাবেই তো আমরা অর্থ বিনিয়োগ করছি; সেই তালিকায় এইটিই হয়ত শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ বলে প্রমাণিত হবে।"

যে পরিকল্পনা আমার ছিল, বিহারের চম্পারন জেলায় সেই অনুযায়ী যাতে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয়, রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তার জন্য শ্রীনেহরুকে অনুরোধ জানান। ১৯৫৩ সনের ২৭শে অগস্ট তারিখে শ্রীনেহরুকে তিনি একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হলঃ

রাষ্ট্রপতি ভবন,
নয়াদিল্লি,
২৭শে অগস্ট, ১৯৫৩

"প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

কিছুদিন আগে সুধীর ঘোষ আমার কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। আমাদেরই একটি রাজ্যের এক গ্রামীণ জেলায় তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে চান। সেখানে শিল্প ও কৃষির সমন্বিত উন্নয়নই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা উৎসাহ বোধ করেছি। গ্রামীণ জনসমষ্টির উৎপাদন-ক্ষমতা ও জীবনমানের উন্নয়নসাধনের এই ব্যবস্থাকে যে স্বয়ংনির্ভর ও স্বয়ংজীবী করে তোলা যায়, হাতে-কলমে সেটা দেখিয়ে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ধরা যাক, আমরা একটা জেলার পাঁচ শো গ্রাম নিয়ে এই কাজ শুরু করব। তার লোক-সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লক্ষ, চাষের জমির আয়তনও মোটামুটি পাঁচ লক্ষ একর। বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে, এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও নিবিড় কৃষি-ব্যবস্থার জন্য মূলধন সরবরাহ করে তিন-চার বছরের মধ্যেই সেখানে এমনভাবে সম্পদসৃষ্টির ব্যবস্থা করা যায়, যাতে সেই জনসমষ্টির বর্ধিত আয় থেকেই (রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর না করে) সেখানকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে এবং এই উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলের মূলধনী ঋণও ধীরে ধীরে পরিশোধ করা যাবে।

পাঁচ শো গ্রামের একটি ইউনিটের জন্য সংগঠনের এই পরিকল্পনা করা হয়েছেঃ

১) পাঁচ লক্ষ একর জমির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সমবায় সংস্থা গঠন। এই সংস্থা-গুলি খাল খনন ও টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করবেন; কুয়ো থেকে জল তুলবার

তাঁত, মৃৎশিল্পের কারখানা ইত্যাদি ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্পকে সংগঠিত করবার জন্য এবং উদ্বৃত্ত কর্মীদের হাতে কাজ দেওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে, যেখানে যেখানে সম্ভব, চিনিকল, রাসায়নিক কারখানা ও অন্যান্য কিছু বৃহৎ শিল্প সংগঠিত করবার জন্য সমবায় সংস্থা গঠন।

৮) উপযুক্ত এলাকার বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে কাজে লাগাবার জন্য সমবায় সংস্থা গঠন।

৯) স্থানীয় মালমসলা কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলে আরও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঘরবাড়ি বানানোর জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(১০) একটি সাধারণ হাসপাতাল ও কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যসূচী অনুযায়ী ব্যাপকভাবে কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সমবায়-সংস্থা গঠন।

(১১) কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপন করে তার মাধ্যমে গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রামের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সমবায় সংস্থা গঠন।

(১২) গ্রামজীবনে যা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, সেই লোকসংস্কৃতি—অর্থাৎ লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকশিল্প ইত্যাদির সংরক্ষণ ও পুষ্টির জন্য সমবায় সংস্থা গঠন।

কোন্ জেলায় কাজ শুরু হবে, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর বিচক্ষণ শিল্পপতিদের সাহায্যে সহজেই স্থির করা যাবে যে, কী কী শিল্প সেখানে সংগঠিত হতে পারে। সুধীর ঘোষের ইচ্ছা, উত্তর বিহারে চম্পারন জেলায় একটি বৃহৎ অংশের উন্নয়ন-কর্মে তিনি হাত দেবেন। সেখানে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসাধনের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সেখানকার স্থানীয় মানুষেরা জীবন বেকার-সমস্যা ও অন্যান্য বহু সমস্যায় আজ পীড়িত। সেখানে যদি এইরকমের একটি প্রকল্প অনুযায়ী কাজে হাত দেওয়া হয়, তা হলে তারা খুবই উপকৃত হবে।

প্রকল্পের মূলধন কিংবা বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়ভারের একাংশও কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে দিতে হবে না। সুধীর ঘোষ আমাকে জানাচ্ছেন, প্রকল্পের জন্য যত মূলধনই দরকার হোক, রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদই তা দেবার ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা সে অর্থ পাবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য তহবিল থেকে। তবে এই প্রকল্পের প্রয়োগ ব্যবস্থায় তাই বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদৌ কোনও অংশ নেবে না। যে এলাকায় প্রকল্পের কাজ হবে, সেখানে এই অর্থ দিয়ে একটি তহবিল সৃষ্টি করা হবে এবং একটি ট্রাস্টের হাতে তার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। ট্রাস্ট গঠিত হবে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে:

(১) রাজ্য সরকারের মনোনীত একজন সদস্য। তিনিই হবেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। (চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ সৈয়দ মামুদের নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে।)

(২) উপযুক্ত একজন শিল্পপতি। রাজ্য সরকারই তাঁকে মনোনীত করবেন।

(৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদের মনোনীত একজন সদস্য (ভারতীয়)।

এই ট্রাস্ট একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করবেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, ব্যবসায়সুলভ পদ্ধতিতে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা উদ্ভাবনের স্বাধীনতা তাঁদের থাকবে। সংস্থাটির উপরে এই অর্থে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে যে, ট্রাস্টের সদস্যত্রয়ের মধ্যে দুজনই হবেন তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি; স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাটির কাজকর্ম যদি রাজ্য সরকারের মনঃপূত না হয়, তা হলে তাঁদের মনোনীত সেই সদস্য দুজনকে রাজ্য সরকার অপসারিত করতে পারবেন। আর এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রপুঞ্জে কারিগরী সাহায্য পরিষদেরও অংশ থাকবে এই অর্থে যে, ট্রাস্টের সদস্যত্রয়ের একজন হবেন তাঁদেরই মনোনীত প্রতিনিধি, এবং তাঁরা তাঁকে অপসারিতও করতে পারবেন। তবে, এই সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম যাতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে, তার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। স্বয়ংশাসিত এই সংস্থা তাঁদের কাজের জন্য যে-সমস্ত লোক নিয়োগ করবেন, স্বভাবতই তাঁদের প্রায় সকলেই হবেন ভারতীয়; তবে অন্যান্য দেশ থেকেও কিছু কিছু কর্মী, যথা স্ক্যানডিনেভিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমবায় বিশেষজ্ঞদের, আনিয়ে নেওয়া হতে পারে।

সরকারের উপরে নির্ভর না করে, সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংনির্ভর ব্যবস্থায় যে একটি গ্রামীণ জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব, হাতে-কলমে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হবে। এমন প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে কোনও আপত্তি হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে আপনার কী মত?

আন্তরিকভাবে আপনার
রাজেন্দ্র প্রসাদ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
প্রধানমন্ত্রী।

এই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হলে তাতে

ভারত সরকার কিংবা বিহার সরকারের এক কপর্দকও সাহায্য হত না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী নেহরুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম ডঃ সৈয়দ মামুদের সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও শ্রীনেহরুর চিত্ত দ্রবীভূত হল না।

প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারীকে এদেশে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন আমার বক্তব্যের ঘোর বিরোধী। তাঁর অভিমত ছিল এই যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামীণ জনসমষ্টির এই ধরনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন প্রকল্প কখনও স্বয়ংনির্ভর হতে পারে না। পারে কি পারে না, বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে তারই ফলাফলের ভিত্তিতে যে তার বিচার হওয়া উচিত—এ কথা তাঁকে বলে কোনও ফল হল না। যদি কাউকে বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হত, তবে তাতে ক্ষতিটা হত কী? তাঁর মনে কি এমন আশঙ্কা ছিল যে, পরীক্ষাটা হয়ত সফলও হতে পারে? কর্তা আমার পক্ষে না বিপক্ষে, এই প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৫২-৫৩ সনে স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী তাঁর সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই সেই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের চেহারা একেবারে পালটে দেওয়া ছিল যার লক্ষ্য। এই সেই পরিকল্পনা, যার পিছনে আমরা আজ পর্যন্ত সাত শো কুড়ি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। শ্রী বি জি খের একজন সাচ্চা প্রকৃতির রাজনীতিক। তিনি তখন বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতবর্ষের জন্য স্যার ভি টি যে ধরনের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষপাতী, তার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য শ্রীখের আমার সঙ্গে স্যার ভি টি-র কাছে গেলেন। শ্রীখের তাঁকে বললেন যে, রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক প্রশাসন-যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কার্যসূচীর প্রতি সুবিচার করা যাবে না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বোম্বাইয়ের সিভিল সার্ভিস সম্ভবত দক্ষতর; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীখেরের মনে হয়েছিল যে, সেখানেও এই ধরনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বললেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে এই কাজের জন্য একটা দপ্তর সৃষ্টি করা অনুচিত; তার কারণ দপ্তর মাত্রেই রাজনৈতিক ও আমলাদের কায়েমী স্বার্থের একটা চক্র হয়ে দাঁড়ায়। একবার একটা দপ্তর গড়লে সেটাকে ভেঙে দেওয়াও শক্ত। সর্বোপরি, আসল কাজ তো হবে বিভিন্ন রাজ্যে; কেন্দ্রের কাজ তো আর কিছুই নয়—তাঁরা শুধু সাহায্য বণ্টন করবেন ও কার্যসূচীর উপরে লক্ষ্য রাখবেন।

শ্রীনেহরু ও আমি প্রস্তাব করলাম যে, আমাদের উচিত একটি তহবিল সৃষ্টি করা। তহবিলের পরিচালন-ভার একটি ট্রাস্ট অথবা ফাউন্ডেশনের উপরে ন্যস্ত থাকবে; এবং কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে মূলধন পরিশোধ করতে হবে এই কড়ারে সারা ভারতে বিভিন্ন প্রকল্পকে সেই তহবিল থেকে মূলধন সরবরাহ করা হবে। সামান্য সুদে কিংবা বিনা সুদে এই মূলধনী ঋণ দেওয়া যেতে পারে। জেলা স্তরে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থাকবে। সংসদের একজন সদস্য, জেলার কালেক্টর ও প্রকল্প অফিসার তার সদস্য হবেন; এবং প্রকল্পের কাজ তাঁরাই পরিচালনা করবেন। এই সংস্থাগুলি রাজ্য উন্নয়নমন্ত্রীর মাধ্যমে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কাছে কিংবা পরিকল্পনামন্ত্রীর মাধ্যমে সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। সংসদের কাছে দায়ী থাকবার ব্যবস্থা হলেই ভাল হয়। পরিকল্পনামন্ত্রীর পক্ষে এই সংস্থাগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তো উচিত হবেই না, পরন্তু তাঁকেই সেই স্বাধীনতার প্রহরী হতে হবে। স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাগুলির কাজের অগ্রগতির উপরে লক্ষ্য রাখবার জন্য সংসদ থেকে একটি কমিটী গঠনের ব্যবস্থা হোক। গণতন্ত্রকে গড়ে তোলাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নয়াদিল্লিতে মাত্র জনাকয়েকের হাতে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রবণতাকে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাষ্ট্রই ক্রমে ক্রমে সর্বময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে; অথচ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন—এই দ্বৈত দর্শনের ভিত্তিভূমির উপরেই গ্রামীণ ভারতবর্ষের গান্ধীজী এক সামবায়িক কমনওয়েলথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণ সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে যে পরিমাণে নিজেদের

কাজ নিজেরাই করে নিতে পারবে, বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষ সেই পরিমাণে স্বাধীন।

স্যর ভি টি কৃষ্ণমাচারী ছিলেন ভারতবর্ষের দক্ষতম ও বিশিষ্টতম ব্যুরোক্র্যাট। আমাদের এইসমস্ত যুক্তি তাঁর চিত্তে কোনও রেখাপাত করল না। তাঁর সেই এক কথাঃ রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক প্রশাসন-যন্ত্রের সাহায্য যদি এইসব প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করা না যায় তো বুঝতে হবে যে, সেগুলি রূপায়ণের যোগ্যই নয়। আভ্যন্তর সম্পদের সাহায্যেই যার বিকাশ হবে, গ্রামোন্নয়নের এমন কার্যসূচী রচনার পরিবর্তে সরকার যা গড়ে তুললেন, মূলত তা কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার মার্কিনী ধাঁচেরই একটা অনুকরণ মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কাউন্টি এজেন্ট'কে কেন্দ্র করে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়; তার প্রতিনিধিরা মার্কিন কৃষকদের কাছে নতুন নতুন এবং সুফলপ্রসূ নানা কৃষি ব্যবস্থার জোর প্রচার চালান। কোনও কৃষক যদি সেই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে চায়, তো তার জন্যে কোনও সমস্যায় তাকে পড়তে হয় না। ইচ্ছে হলেই সে অতি সহজে প্রচুর ঋণ ও সরবরাহ পেতে পারে। ভারতীয় কৃষকের তা পাবার উপায় নেই। সে চায়, তার জন্যে এমনভাবে মূলধন সংগঠন করা হোক (দাক্ষিণ্য হিসেবে এটা দেবার কোনও দরকারই নেই), যাতে সে সুবিধাজনক শর্তে সেচের জল, সার, ভাল বীজ ও ভাল গরু-মোষ পেতে পারে। নতুন ধরনে জীবন গড়ে তুলবার ফাঁকা উপদেশ সে শুনতে চায় না। টুকরো টুকরো যেসব কল্যাণকর্মের আয়ু দু দিনেই ফুরিয়ে যায়, তাতেও তার আস্থা নেই।

গ্রামবাসীরা যাতে সুবিধাজনক শর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুসংগঠিত মূলধনের সুবিধা পায় কিংবা তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাকে যাতে সরবরাহ করা হয়, সরকার তার ব্যবস্থা করলেন না। তার বদলে ভারতবর্ষের চেহারা পালটে দেবার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে তিন শো গ্রাম নিয়ে এক প্রকল্প রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। ঠিক হল, সেখানে তাঁরা ছ শো মাইল কাঁচা রাস্তা বানিয়ে দেবেন (বর্ষা এলেই যার বেশীর ভাগ জলে ধুয়ে যাবে), আশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, এবং তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দশ-শয্যার একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সরকারী সাহায্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন দেবে কে, এবং জনকল্যাণকর এইসব প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখবার টাকাই বা আসবে কোথা থেকে—এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। এ ছাড়া একটি প্রেরণামূলক কর্মসূচীর কথাও বলা হল। এই কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষকদের গিয়ে বলতে হবে, কী করে তাদের শস্যের উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়, কী করে তাদের কুটিরশিল্প আর গ্রামীণ চারু ও কারুকলার উন্নতি করা যায় ইত্যাদি। দেখা গেল যে, তিন শো গ্রামের (লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ) এক সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে নবজীবন সম্পর্কে গ্রামবাসীদের জ্ঞান বিতরণ করতেই সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাবে। আর শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছোটখাটো সেচ ব্যবস্থার জন্যে ব্যয় করা হবে বাকী সাড়ে উনত্রিশ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার বারো বছরের মধ্যে ৩½% সুদসহ এই টাকাটা কেন্দ্রকে পরিশোধ করবেন। রাজ্য সরকার আবার এজন্য জনসাধারণের কাছ থেকে নেবেন ৫% সুদ। ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে সাড়ে ষোল হাজার গ্রামের জন্য যে পঞ্চান্নটি প্রকল্প করা হল, এই হচ্ছে তার ব্যবস্থা।

আঠারো মাস কাজ চলবার পর দেখা গেল, প্রকল্প রূপায়ণের ভার যাঁদের হাতে, সেই সংস্থা উক্ত সময়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের শতকরা সাইত্রিশ ভাগের বেশী খরচ করে উঠতে পারেননি। ব্যবস্থাটা অতঃপর আরও তরলীকৃত হল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও যে আঠারোটি প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়, তাতে তিন শো গ্রামের এক-একটি প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হল মাত্র পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা। তার মধ্যে পঁচিশ লাখ টাকা দাক্ষিণ্য। বাকী কুড়ি লাখ পরিশোধ করতে হবে। ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে তেইশ হাজার ন' শো গ্রামের সম্পর্কে এই হল ব্যবস্থা।

বাকী পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শো গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হল। এক কোটি গ্রাম (লোকসংখ্যা মোটামুটি এক লক্ষ) নিয়ে গড়া হল এক-একটি ব্লক। ঠিক হল, ব্লক পিছু মোটামুটি বারো লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। তার মধ্যে পরিচালন-ব্যয়ই চার লক্ষ টাকা। বাকী আট লক্ষ টাকা এক শো গ্রামে বিনিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে অর্ধেকটা হল দাতব্য; বাকী অর্ধাংশ পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ হিসেবে মাথাপিছু চার টাকা আর জনকল্যাণকর্মের জন্য দাতব্য হিসাবে মাথাপিছু চার টাকা। আমার বাড়ি পুরুলিয়া জেলায়। সম্প্রতি সেখানকার এক তরুণ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের অনুরোধে আমি তাঁর ব্লকের কাজ দেখতে যাই। তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হল। পুরুলিয়া জেলার প্রাণচঞ্চল এইসব তরুণ বি ডি ও-দের সঙ্গে (পুরুলিয়ায় আছেন কুড়িজন বি ডি ও) প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। জেলা উন্নয়ন পরিষদের আমি চেয়ারম্যান; গত পাঁচ বছরে এই তরুণ অফিসারদের সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন কিংবা অংশত বেকার মানুষদের কাজে লাগিয়ে আমি পাঁচ শোরও বেশী পুকুর কাটিয়েছি। শীতকালে যাতে একটি বাড়তি ফসল ফলানো যায়, তার জন্য জল চাই। সেই সেচের জলের জন্যই এইসব পুকুর।

যে কথা বলছিলাম। এক শো গ্রামের জন্য যে আট লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা দিয়ে কল্যাণকর কী কী কাজ এ যাবৎ করা গিয়েছে, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার ও

পঞ্চায়েতের সদস্যারা আমাকে তার সবিস্তার বিবরণ দিলেন। এই কার্যসূচীতে কি তাঁরা সন্তুষ্ট? শুনে তাঁরা হাসলেন। বললেন, "উদ্ধে থই গোবিন্দায় নমঃ।" প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য টাকা, বিরাট একটি এলাকা জুড়ে তাকে যদি ছিটেফোঁটা করে বরাদ্দ করা হয়, তবে তাতে কোনও স্থায়ী সুফল মেলে না, দেখতে-না-দেখতে তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। তবে এ কাজ করা হয় কেন? করা হয় রাজনৈতিক কারণে। স্রেফ এইটে দেখাবার জন্যে যে, ভারত জুড়ে প্রত্যেকের জন্যই 'যা হোক কিছু' করা হচ্ছে। এতে হয়ত ভোট পাবার সুবিধে হয়, কিন্তু এতে সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট সাত শো কুড়ি কোটি টাকা। অতঃপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাতে কাজের কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি। ইতস্তত এক-আধজন উৎসাহী কর্মী হয়ত এরই মধ্যে যতটা সম্ভব করেছেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে ব্যর্থই হয়েছে এই কার্যসূচী। টাকা নষ্ট হয়েছে, সেটাও বড় কথা নয়। তার চাইতেও বড় ক্ষতি এই যে, সরকার যে গ্রামীণ ভারতবর্ষের চেহারা পাল্টে দেবার ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা রাখেন, জনসাধারণের এই বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়েছে। সংসদে মাঝে মাঝে দাবি তোলা হয়েছে যে, সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রকই তুলে দেওয়া হোক। ১৯৬৬ সনের জানুয়ারিতে তা-ই হল। পৃথক অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে কৃষি-মন্ত্রকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এটিকে। এইভাবেই সমাপ্তি সূচিত হল বৈপ্লবিক এক আন্দোলনের। ঢক্কানিনাদে যার সূচনা, এখন তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে অবসর নেবার পর সার ভি টি কৃষ্ণমাচারী রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৬৪ সনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সংসদের লবিতে তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সমষ্টি উন্নয়নের একটি বৈঠক থেকেই তিনি তখন ফিরছিলেন। আমাকে থামিয়ে তিনি বলেন, "সুধীর, সমষ্টি প্রকল্প নিয়ে ১৯৫৩ সনে তোমার সঙ্গে আমার একদিন তুমুল তর্ক হয়েছিল, মনে আছে?"

নিরীহভাবে বললুম, "তা মনে আছে সার ভি টি।"

সিভিল সারভ্যান্টদের কুলচূড়ামণি সেই প্রবীণ মানুষটি তখন বললেন, "কী জানো, গোটা ব্যাপারটাই বড় আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শুনে বললুম, বিখ্যাততম ব্যুরোক্র্যাটের মুখ থেকে এই মন্তব্য শুনতে আমার ভাল লাগছে বটে।

প্ল্যানিং কমিশনের অভিমত সর্বদাই এই ছিল যে, গ্রামোন্নয়নের এইসব প্রকল্প স্বয়ংনির্ভর হতে পারে না, হবার দরকারও নেই। সামগ্রিকভাবে দেশ যদি স্বয়ংনির্ভর হয়, তা হলেই হল। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আয় হবে, তারই সাহায্যে চালানো যাবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের কল্যাণকর্ম। শুনে মনে হয়, কথাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। আসলে কিন্তু এই কথার মধ্যে ফাঁকি রয়েছে। প্রথমত, 'সামগ্রিকভাবে দেশ'-এর অর্থভাণ্ডার খুব শিগগির এতটা স্ফীত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই, যাতে দেশ জুড়ে অনির্দিষ্ট কাল ধরে এই ধরনের জনকল্যাণকর কাজের টাকা যুগিয়ে যাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তা যদি সম্ভব হত, তার পরিণামে ক্ষমতা প্রভূতভাবে কেন্দ্রীভূত হত। সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণ নয়াদিল্লির দাক্ষিণ্যের উপরে বেঁচে থাকবে, এ-চিন্তা একমাত্র আমলাতন্ত্রের পক্ষেই সুখকর হতে পারে, আর কারও পক্ষে হবে না।

আমাদের মারকিন বন্ধুরা এ-দেশে সমষ্টি-প্রকল্প নিয়ে আসবার অনেক আগেই প্রগতিশীল জনাকয়েক ব্রিটিশ সিভিল সারভ্যান্ট এ-ব্যাপারে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে চমৎকার কাজ করেছিলেন। এ-যুগে তাঁরাই এ-ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। গুরগাঁও জেলায় ব্রেন এতই সুন্দরভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ চালিয়েছিলেন যে, স্বয়ং গান্ধীজী 'ইয়ং ইনডিয়া'য় তাঁর প্রশংসা করেন। আজ বইয়ের দোকানে ব্রেনের বই কিনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে-কাজ তিনি করেছিলেন, গুরগাঁওয়ের গ্রামাঞ্চলে তার কোনও চিহ্নও আর আজ চোখে পড়ে না। আসলে এমনভাবে কাজ করাই চাই, কাজটা যাতে ধোপে টেঁকে, তার সুফল যাতে স্থায়ী হয়। ১৯৫২ সন থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত এই কথাই শ্রীনেহরুকে আমি বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। না পারার কারণ এই যে, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই বিগড়ে গিয়েছিল।

(ক্রমশ)
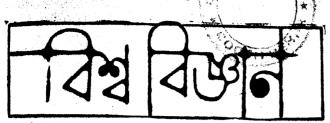
বিজ্ঞান কংগ্রেস

প্রতি বছর আমরা আমাদের দেশে নানা পুজো-পাল-পার্বন উদ্‌যাপন করি, পালন করি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নতুন বছরের প্রথম দিন। আমরা সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি, এগুলি পালন আমরা বরাবর করে এসেছি, আজও করি। তেমনি জাতীয় জীবনে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে আমরা একটি করে বিজ্ঞান কংগ্রেস ডাকি এবং তাতে যোগ দেবার জন্য দেশ-দেশান্তরের নামকরা বিজ্ঞানীদের আমরা আমন্ত্রণ করে আনি তাঁদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞান বিনিময় করব বলে। এই দেওয়া-নেওয়াই হচ্ছে জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য বিজ্ঞানীদের জমায়েতের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যোগাযোগ এখনো নেই বললেই চলে, কারণ, এখনো আমরা মানুষকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তুলতে পারিনি,, দেশব্যাপী সহজবোধ্য বিজ্ঞান প্রচারের বন্দোবস্ত করতে পারিনি। তবু এটা অনস্বীকার্য যে, আজকের যন্ত্রযুগে, এই শিল্প প্রসারের যুগে বিজ্ঞান ছাড়া কোন দেশের অর্থনীতি এগিয়ে চলতে পারে না।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসে ন্যূনাধিক দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে অন্য দেশের প্রতিনিধির সংখ্যা কম নয়। এই থেকে বোঝা যায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত জাতে উঠেছে।

বরাবরের মত এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনও শুরু হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা দিয়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁর বক্তৃতায় কতকগুলি ভাববার মত প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দেশব্যাপী দারিদ্র্য, এই কথা ঢেকে না রেখে তিনি দেশের বিজ্ঞানীদের আহ্বান করেছেন দারিদ্র্য মোচনের সংগ্রামে সরকার ও জনগণের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য। কথাটা ঠিকই, কারণ, দারিদ্র্য মোচনের সংগ্রামের একটি বড় অংশ হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা এবং এ-যুগে উৎপাদন বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় সহায় হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু ইন্দিরাজীর উপদেশ বিজ্ঞানীদের কার্যে রূপান্তরিত করার একটি পূর্ব-শর্ত আছে। সেটি হচ্ছে দেশের অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের দেশে ব্রিটেনের অনুকরণে অর্থনীতিকে আমরা বিজ্ঞানের পর্যায়ে না ফেলে কলার পর্যায়ে ফেলে রেখেছি। অর্থনীতি কিন্তু বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত অর্থনীতিও কতকগুলি নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে, যেগুলি পালটে দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই। কোন দেশের অর্থনীতির ধারা যদি এমন হয় যে, তার ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হচ্ছে, তা হলে সেখানে বিজ্ঞানীদের সাধ্য নেই দরিদ্রের দারিদ্র্য ঘোচাবার।

প্রধানমন্ত্রী আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে বিলাতে শিক্ষা-প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের জীবিকার সন্ধানে দেশত্যাগ। ভারতের মতো দেশ, যেখানে এমনিতেই বিজ্ঞান-শিক্ষিতের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, সেখান থেকে বিজ্ঞানীদের এই চলে যাওয়া অত্যন্ত আফশোসের কথা। কিন্তু এই আফশোসের ব্যাপারটা ঘটছে কেন, সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। এই তরুণ বিজ্ঞানীরা এত পয়সা খরচ করে বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে আসেন কি দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য? নাকি, দেশকে তাঁরা ভালবাসেন না? বোধ হয় তা নয়। আমাদের দেশে সম্ভবত বিজ্ঞানচর্চার ও মনের মত চাকুরি লাভের সুযোগ পান না। বলেই তাঁরা যেখানে সুযোগ পান, সেখানে চলে যেতে

আচার্য শেষাদ্রী

বাধ্য হন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁদের এমন বেতনের কাজ পাওয়া দরকার, যাতে তাঁরা 'স্ট্যান্ডার্ড' বজায় রাখতে পারেন। সেরকম বেতন কি তাঁরা পান? দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার অবাধ সুযোগ ও সম্পতি পান না বলে তাঁরা অভিযোগ করে থাকেন। এইসব সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হলে, ভারতের মত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশে বিজ্ঞানীর এত চাহিদা সত্ত্বেও তাঁরা দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যেখানে বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেও চাকুরি মেলে না। যেখানকার অর্থনীতি সম্প্রসারণশীল, সেখানে কি বৈজ্ঞানিকের চাহিদা এত কম যে, যোগ্য লোককে দেবার মত কাজ খুঁজে পাওয়া

যায় না? মনে হয়, এই ব্যাপারে পরি-কল্পনার অভাব আছে। দেশের অর্থনীতির কোন্ শাখায় কোন্ সময়ে কতজন বিশেষজ্ঞ দরকার হবে, তার একটা মোটামুটি হিসাব করে সেই মত যদি বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, তা হলে এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে।

উপরে যা বলা হল, তার মানে এই নয় যে, অর্থ ও উপকরণই বিজ্ঞানের প্রগতির একমাত্র উপায়। তা নিশ্চয়ই নয় এবং এ সম্পর্কে আচার্য শেষাদ্রি উচিত কথাই বলেছেন। রণকুশলী সেনাপতি ছোট্ট সৈন্যদল ও সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও বৃহত্তর শত্রুকে ঘায়েল করতে পারেন। রণনীতি হচ্ছে আসল কথা। আচার্য শেষাদ্রি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই রকম রণনীতি রচনায় গুরুত্বের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন, যার মধ্যে থাকবে মানবীয়তার প্রাধান্য, শৃঙ্খলার প্রাধান্য, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য। তিনি বলছেন যে, ভারতে এই দিকগুলির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ এখনো দেওয়া হয় না।

আচার্য শেষাদ্রির এই অভিমতেও সকলে সায় দেবেন যে, ভারতের মত দরিদ্র দেশে অন্যান্য অগ্রগামী দেশের মত বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা খাতে অত টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে জরুরী ক্ষেত্রগুলির দিকে আগে নজর দেওয়া এবং সমস্ত রকমের অপচয় বন্ধ করাই হচ্ছে উন্নতির একমাত্র পথ।

গত ২০ বছরে দেশে অতি দ্রুতবেগে সুসজ্জিত অনেকগুলি জাতীয় লেবরেটরী নির্মিত হয়েছে। সেগুলির প্রসঙ্গে আচার্য শেষাদ্রি বলেন যে, অনেকের মতে, সেগুলি অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য আশানুরূপ ফল প্রসব করতে পারেনি। সেগুলির কর্মীদের কার্যক্ষেত্রের জ্ঞানের চেয়ে পুঁথিগত জ্ঞানই বেশি বলে তাঁরা অর্থনীতিতে এখনো সেরকম যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছেন না। ফলে কারখানা শিল্পের প্রয়োজনে নির্মিত এই লেবরেটরীগুলি কিছুটা মামুলী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আমরা তুলতে পারি। সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রসাশনিক ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে আই-এ-এস অফিসারদের পরিচালক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে, তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত রয়েছেন, সেটি সম্পর্কে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কোন ধারণা নেই। ফলে পরিচালন ব্যবস্থায় ত্রুটি ঘটে, আমলাতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিকতার প্রাধান্য দেখা দেয়। সেইজন্য ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের মত এইসব অফিসারদের জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি যে দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিরাট একটা ব্যাপার তা নয়, এবং সেটা আশা করাও উচিত নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিকের স্বল্পকাল এক জায়গায় জমা হয়ে খুব ভারিক্কী কিছু আলোচনা করা সম্ভবও নয়। এই কংগ্রেসগুলি দেশের বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রধান সমস্যাগুলি তুলে ধরে, সেগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতবিনিময় হয়, এইগুলিই হচ্ছে আসল কথা। কংগ্রেসগুলির উদ্যোগ-আয়োজনে ও কার্যক্রমে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে, অনেক সময় নেহাতই মামুলী বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতার পিছনে অনেক-খানি সময় চলে যায়। আবার এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যার হয়ত ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সেরকম কোন সম্পর্ক নেই। এইসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে কার্যক্রম রচনা করলে কংগ্রেসগুলি আরো সুষ্ঠু ও সার্থক হতে পারে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

নূতন দিল্লির পথে শান্তি-নিকেতনের কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেতনের সকাল। দেখতে দেখতে চড় চড় করে রোদ্দুর কড়া হ'য়ে উঠল। তবু বল্লভপুর যাবার জন্য রিকশওয়ালার খোসামোদ করে, চড়াই এলে পায়ে হেঁটে পৌঁছলাম। শান্তি-নিকেতন সংলগ্ন বলে বল্লভপুরকে পুরোপুরি গ্রাম না বললেও চলে। বিশ্ব-ভারতীর আওতায় আর আসা-যাওয়ার আদান-প্রদানে বল্লভপুরবাসী গ্রামেরও নন, শহরের চেয়ে ঝামেলাও কম। মেয়েদের বেলায় তো বিশেষ করে লক্ষ করলাম, চটপটে, কর্মিষ্ঠ এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ তারা। বল্লভপুর পৌঁছেই ঘুরে ফিরে যাঁর দাওয়ায় আতিথ্যের আপন-করা আদর-যত্নে, গল্পে মেতেছিলাম, তাঁর নামটি ঠিক মনে নেই, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা। মস্ত হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ করছিলেন। তারপর বস্তায় ভরে ধান পাঠাবেন কাছাকাছি কোনও কলে। মণপ্রতি কিছু দক্ষিণা দিলে চাল হবে। অবশ্য এটা শান্তিনিকেতনের র‍্যাশন বা লেভির যুগের আগের কথা। কাঠের উনুনে একটু একটু যোগান দিচ্ছেন আর হাতে কি যেন সেলাই করছেন। সমানে আমাদের গ্রামের খবরও শোনাচ্ছেন। সেলাই দেখে অবাক হলাম। কাঁথার কাজের ছোট্ট টুকরো। গ্রামের সংসারে এ দিয়ে কি হবে বুঝতে পারিনি। বিপ্রকন্যা বুঝিয়ে দিলেন। শান্তিনিকেতনের কারুসঙ্ঘের সঙ্গে কাজ করেন ওঁরা। গ্রামের ক'জন মেয়ে কারু-সঙ্ঘের দপ্তর থেকে কাজ নিয়ে আসেন আবার তৈরী হ'লে দিয়ে আসেন। তাতে যা উপার্জন হয়, দু-চারটে খরচার কাজ চলে যায়। সবচেয়ে সুবিধে ঘরে বসে নানা কাজের ফাঁকে অথবা অবসরের মুহূর্ত-গুলিতে হাত চালানো চলে। এদিকে ধান সিদ্ধ করা আর ওদিকে হাতে সেলাই, মাঝে মধ্যে ঘরের আর পাঁচটা হিসেব-নিকেশও হাজির হচ্ছে। পুকুর থেকে পদ্মপাতা তুলে এনে তাতে গরম মুড়ি পরিবেশন করতে করতে মহিলা আরও দু-চারজনকে ডেকে আনলেন। মোটামুটি সূচীশিল্পের নকশা কাটা, কাঁথার কাজ সবই তাঁরা করেন, তবে পণ্য হিসাবে পরিবেশনের শেষ উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়ে যান কারুসঙ্ঘের কারিগরদের কাছে। কারুকার্যের "ফিনিশ"টুকু বা শেষ করার সেলাইটুকু তাঁরা করে দেন। বাজারেও যায় তাঁদেরই মারফত।

কারুসঙ্ঘের কথা একবার আমরা আলোচনা করেছি অনেকদিন আগে। এবার নূতন করে ও'দের কথার অবতারণা করছি, কারণ, যখন ও'দের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের সৌভাগ্য হয়েছিল, তার পরে কারুসঙ্ঘ আরও অনেকটা এগিয়ে গেছেন। বছর দুই আগে হায়দরাবাদে প্রদর্শনী নিয়ে গিয়ে যা প্রশংসা কুড়িয়ে এনেছেন, তা বাংলার লোকশিল্প এবং বাঙালী মেয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুপরিচালিত সংগঠনের জন্য অর্জিত শিরোমাল্য। অন্ধ্র প্রদেশ সরকার ও
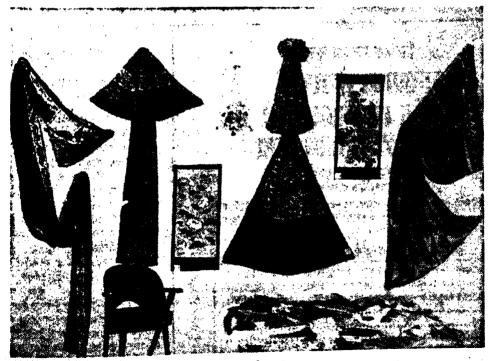
হায়দরাবাদ প্রদর্শনীর এক অংশ

কারুসঙ্ঘের বাতিক শিল্পী

জনসাধারণ সমান সহযোগী হ'য়ে বাংলার ঘরণীদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা সফল করেছিলেন। এবার কারুসঙ্ঘ প্রদর্শনী নিয়ে আসছেন রাজধানী নয়াদিল্লিতে। অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির একটি প্রদর্শনী কক্ষে আগামী ২৮ জানুয়ারী থেকে সাত দিন প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার দর্শক ও ক্রেতার জন্য মজুদ থাকবে। নুতন দিল্লি একরকম ভারতবর্ষের "ড্রইংরুম" বললেই চলে। বিশেষ করে শীতকালে। সভা, কনফারেন্স থেকে নিয়ে নাচ-গান আর শিল্প-প্রদর্শনীর যা ধুম চলে, তাতে পৃথিবীর যে-কোন রাজধানীকে টেক্কা দিতে পারে। দিল্লির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি আছে, কতটা আছে, তা নিয়ে নানা মতবাদ শোনা যায়, তবে ড্রইংরুম সজ্জার মত এদিক ওদিক থেকে আনা নানা শিল্প ও কৃষ্টির ধারায় দিল্লি আকণ্ঠ নিমজ্জমান। আমরা আশা করছি, এই আকণ্ঠ অবস্থায়ও কারুসঙ্ঘের প্রদর্শনী তার আলপনা, কল্পনা, বাতিক ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য নিয়ে দিল্লির দর্শককেও মুগ্ধ করবে, যেমন করেছিল অন্য দেশের রাজধানীকে। নুতন দিল্লির অধিবাসীদের উৎসাহের কাছে এটুকু ভরসা করা চলে বইকি।

কারুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে। আচার্য নন্দলাল বসুর ইচ্ছায় এই নামে যে শিল্পীদল গঠিত হয়, তার সেক্রেটারী ছিলেন প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রামকিঙ্কর বৈজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজি প্রভৃতি। কারুসঙ্ঘের কাজ খুব ভালভাবেই চলছিল, কিন্তু সভ্যদের কেউ কেউ অন্যত্র চলে যাওয়ায় কারুসঙ্ঘের কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৯৬০ সালে নন্দলাল বসুর দুই কন্যা গৌরী ভঞ্জ ও যমুনা সেনের উৎসাহে আবার কারুসঙ্ঘ নুতন জীবন লাভ করে। নুতন করে কাজ কর্ম আরম্ভ হয়। চল্লিশ পঞ্চাশটি সভ্যার অনেকেই কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রী। কলাভবনের শিক্ষা সমাপ্ত করে কোন কাজ করবার সুযোগ না পেয়ে এতদিন বসেছিলেন। কারুসঙ্ঘ নুতন করে কাজ আরম্ভ করায় গৃহকর্মের সামান্য অবসরটুকু তাঁদের শিল্পচর্চার কাজে লেগে যায়। মাঝে মাঝে বড় বড় প্রদর্শনী নিয়ে ও'রা নানা জায়গায় যান। পৌষ মেলায় প্রতি বছর শান্তিনিকেতনে কারুসঙ্ঘের দোকানে ভাল বিক্রি হয়। বল্লভপুরের মত আশপাশের গ্রামের মেয়েরাও কারুসঙ্ঘের মাধ্যমে তাঁদের পল্লী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সুযোগ পান এবং সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনও কিছু করতে পারেন। বাংলার পল্লী শিল্প, বাংলার একান্ত নিজস্ব ঐতিহ্য সবই বাংলার গ্রামের শিল্পী—মেয়ের হাতে গড়ে ওঠে তার নুতনতর রূপ নিয়ে যা আজকের বাজারের উপযোগী।

শিল্প সৃষ্টির মধ্যেও বাতিক এ'দের বৈশিষ্ট্য। এক সময় মোম দিয়ে ঢেকে বাতিকের মত হাতে ছাপার কাজ নাকি বাংলা দেশে হতো। তার নাম ছিল মোমিন। বাংলা দেশের বাঁধনি ছাপাও যেমন লুপ্ত হয়েছে, মোমিনও তেমন হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আবার নুতন কৌশল নিয়ে এলেন নন্দলাল বসু। নন্দলাল বসু এবং রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুরের প্রচেষ্টায় যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ থেকে আনা প্রায়োগিক বিদ্যা বাংলার মাটিতে অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতীয় ছাঁচের নকশার সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে গেছে দূর থেকে আসা বাতিক শিল্প। কারুসঙ্ঘের মহিলারা সেই বাতিকের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন করে চলেছেন। শান্তিনিকেতনের পরে বাতিকের ধারা নকল করে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছাপার কাজ হচ্ছে।

তাৎক্ষণিক, বিমূর্ত, নির্বস্তুক এক কথায় abstract—সব নমুনারই দুর্বোধ্য প্রকাশ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য কারুসংঘ বজায় রেখে আসছেন। নূতন রং-এর, নূতন সব নকশার নমুনা নিত্য নূতন সৃষ্টিকে আভিনবত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা তাঁদের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে দেননি এও কম সাহস ও শক্তির পরিচয় নয়। শিল্পসৃষ্টিকে যান্ত্রিক যুগের প্রভাবে নমুনা ও নকশায় একঘেয়েমি বা mass production-এর মধ্যেও ফেলেননি। প্রত্যেকটি নমুনা, প্রত্যেকটি কাজ নূতন কল্পনার স্বরূপ। বাটিকের শাড়ি ব্যাগ, অঙ্গবস্ত্র, ব্লাউজ পিস, টেবিল ঢাকা, দেওয়াল অলঙ্করণের ছবি বা wall plaque—বাঁসকরনের জন্য প্রথম প্রথম রচনা ও পরিবেশন শান্তিনিকেতনেই হয় এবং কারুসংঘের কাছে এই শিল্প ধারার জন্য সারা দেশ ঋণী।

কারুসংঘের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাঁথার কাজ। কাঁথা সম্পূর্ণভাবে বাংলার পল্লীশিল্প মাত্র নয়, কাঁথা বাংলার পল্লী মেয়ের শিল্প। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক একঘেয়েমির অবসরে কল্পনার প্রতিফলিত রূপ। আলপনা যেমন আশা ভরসা, সৌন্দর্য পিপাসা দিয়ে ঘেরা মানসিক সৃষ্টি, কাঁথাও ঠিক তেমন মনের রংগে রাঙ্গানো সৃষ্টি। কাঁথা হয়ে উঠেছিল একটি মরণোন্মুখ শিল্প। মধ্যদিনের অবসরে শিল্পী মেয়ের প্রাণ ঢালা সৃজন তার কদর হারিয়ে ফেলেছিল তথাকথিত সভ্যতার স্থূল আড়ম্বরে। ঘটা, জাঁকজমক আর বাহুল্যের শূন্যগর্ভ প্রকোপ যখন আমাদের সংস্কৃতিকে মামুলি ও অমার্জিত করে তুলেছিল তখনই পল্লীশিল্প সসঙ্কোচে সরে দাঁড়িয়েছে। সেই শিল্প সমুদয়কে উদ্ধার করার উৎসাহ ও প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসেছিল। তারই ধারা বহন করে কারুসংঘ কাঁথা শিল্পের নূতন রূপ দিয়েছেন। বটুয়া, টেবিলে পাতবার টুকরো, গায়ের চাপা সমস্তই কাঁথার কাজের নমুনায় করছেন ও করাচ্ছেন এর সভ্যারা। পরিশ্রমের আর্থিক মূল্যবৃদ্ধি, অবসরের অভাব আধুনিক মানব গোষ্ঠীর বিশেষত্ব। তাই আগের দিনের প্রমাণ মাপের কাঁথা আর হয়নি। হয়েছে তা দিয়ে শৌখিন সমাজের ব্যবহার্য দু চারটে জিনিস।

কারুসংঘের বাঁধনি ছাপার কাজও চমৎকার। ভারতবর্ষে বাঁধনির কাজ বহু জায়গায় হয়। দক্ষিণে মাদুরা থেকে নিয়ে উত্তরে জয়পুর, জামনগর সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ধারা শত শত বছর ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের বাঁধনি রেশমী শাড়ি চলেনি। বিশেষজ্ঞরা বলেন তার মূলে কারণ সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ বাঁধনির কাজের যা মূল্য হ'তো তা দেবার জন্য সুন্দরী সমাজ বিমুখ হয়েছিলেন। একই দামে চকচকে বেনারসীর জরি ঝলমল রূপ তাঁদের হাতছানি দিত। এই সস্তা বেনারসীর চাপে আমাদের বালুচরও লোপ পেয়েছিল। জয়পুর, জামনগরেও বাঁধনির কাজ সস্তা কাপড়ে, কাঁচা রং দিয়ে করে প্রতিযোগীতার বাজারে এতদিন টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সরকার ও সাধারণের নূতন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য অধিক মূল্য দিয়ে শিল্পকে উৎসাহিত করার চেষ্টায় জয়পুর বা জামনগর নূতন জীবন পেয়েছে। কারুসংঘের বাঁধনিও যদি শিল্পকে নূতন জীবন দান করতে পারে তবে শিল্প ধারার সৌভাগ্য

"আমি কালের আওয়াজ; ইতিহাসের দস্তাবেজদার। অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শুনেছি রাজা-বাদশাদের জন্ম, আর কতো না রাজবংশের পতন। আনন্দের গান, আর জনতা-হত্যার চিৎকার। নগর আর প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা, আর তাদের লুঠতরাজ, আমার চোখে যা একদা দেখেছি, আপনাদের সামনে এখন তাই আসছে।"

সন্ধ্যের পর লালকেল্লা। এমনি কথায় হিন্দী আর ইংরিজীতে আরম্ভ হয় এশিয়া ভূখণ্ডের প্রথম "প্রকাশ ধ্বনি" বাহার, যেখানে এক ঘণ্টায় দেওয়ান-ই-খাসের সামনে বয়ে যায় যেন গত তিনশো বছরের ইতিহাস : সাজাহান থেকে আরম্ভ করে জওহরলাল নেহরু ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। অনেক নাটকীয় মুহূর্ত, অনেক হাসিকান্না, নরনারীর কোলাহল, যুদ্ধ, হত্যা, ইতিহাসের উত্থান পতন। আলো আর ধ্বনিতে আর সংগীতে পুরোপুরি এক বিরাট নাটক, মুক্তাংগনে মঞ্চস্থ। প্রভেদ এই যে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় তাদের অ্যাক্টিং।

এটাই হল যার ফরাসী নাম আজ জগৎ বিখ্যাত "স-এ-লুমিয়্যার" (উচ্চারণ "স'নে লীমিয়্যার"। হিন্দী, "প্রকাশ ধ্বনি", আমি ঐ নামটাই বজায় রাখলাম। ভারতের বাইরে নিটকবর্তী যে-স্থানে "প্রকাশ ধ্বনি" আছে, তা হল কায়রোতে। সুয়েজের এদিকে দিল্লী ছাড়া আর কোথাও নেই। সুতরাং যাঁরা দিল্লী বেড়াতে আসেন, কিম্বা কাজে আসেন তাঁরা যেন লাল কেল্লার "প্রকাশ ধ্বনি" বাহার মিস্ না করেন।

প্রথম উদ্বোধন হল ২২শে মার্চ, ১৯৬৫; লালবাহাদুর শাস্ত্রীর হাতে, এক বছরে প্রায় দু লক্ষ লোক "প্রকাশ ধ্বনির" মাধ্যমে লাল কেল্লাকে দেখেছে, শুনেছে। জনক হল কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট, এবং স্থাপন করার গোটা কৃতিত্ব হল পৃথিবী-খ্যাত ফিলিপস্ কোম্পানি, যাদের ইন্জিনিয়াররা সম্ভব করেছে বৈদ্যুতিক আলো (অনেক রঙের ও চারু বিন্যাসকৃত), টেপ্ রেকর্ডার ও স্টিরিয়োফোনিক লাউড-স্পিকারের মাধ্যমে নতুন ধরনের নাটককে। বিশেষত তিনজন লোকের টেকনিক্যাল পারদর্শিতা : মিস্টার এস-কে সেন, মিঃ পি এন শ্রীনিবাসন এবং মিঃ ভ্যান আমেরস্ফুট্। ভারত সরকার প্রথম পদক্ষেপ নেন ১৯৬৩-তে যখন ফিলিপস্ বৈদেশিক এক্সপার্টদের এনে সরেজমিনে তদন্ত করালো। পরের বছর সরকার এদের উপর ভার দিল আর ১৯৬৫-তে খোলা হল "প্রকাশ ধ্বনি" লাল কেল্লায়।

এই বাহারের ইংরিজী ভাষ্য করেছেন কুলওয়ান্ত সিং; হিন্দী করেছেন শ্রীবাৎসায়ন। আর্ট ডাইরেক্টর ছিলেন ইয়ান্ হান্টার, লণ্ডনের নামকরা লোক। ইংরিজী প্রডাকশনে অ্যানটনি চারলে, হিন্দীতে চেতান্ আনন্দ, যার নাম বহু লোক জানেন।

আবহসংগীত হল আলি আকবরের, আর তাই দিয়ে শুরু "প্রকাশ ধ্বনি"। খুব চমৎকার বাজনা, তাঁর নিজের স্বরোদ, আর সময় সময় জনত্রিশেকের বাদ্যবৃন্দ। খুব ভাল সানাই আছে। কিন্তু শুরুতে কেন যে বিদেশী সংগীতের "ফেন্ফেয়ার" (সম্ভবত

দেওয়ান-ই-খাস

টাম্‌পেটে), বুঝলাম না।
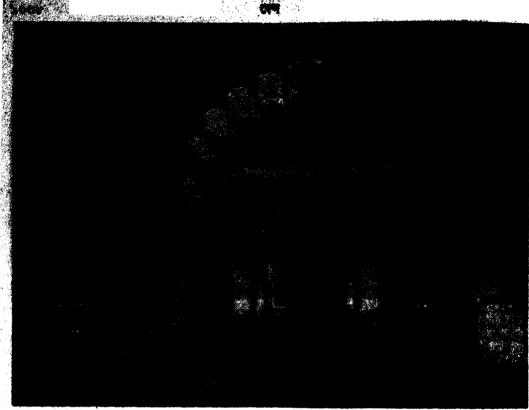
তারপর থেকে ভেসে আসে ঘটনাবলীর দস্তাবেজদার, কালের আওয়াজ; যেন সেই "যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও, তারই রথ নিত্যই উধাও"—তেমনি একটা ইতিহাসের কলরব। দৃশ্যের পর দৃশ্য—কিন্তু কাউকে দেখা যায় না; মাত্র শোনা যায়, আর আলোতে ভেসে ওঠে লাল কেল্লার রঙমহল, দেওয়ান-ই-খাস, হামাম মতি মসজিদ। ঐ হামামে একদিন বয়ে যেত গোলাপ-গন্ধী স্নানের জল, যে-জলে খোলা চুলে গা' ভেজাতো সূর্য না-ছোঁয়া বেগমরা। আওয়াজ আসে সাজাহানের : "আমি তৈরি করব এই দিল্লীতে এমন দুর্গ আর প্রাসাদ যে পৃথিবীর লোকেরা অবাক হয়ে দেখবে।" তৈরার হল তাই একুনে ৯ বছরে, ১৬ই এপ্রিল, ১৬৪৮। সেদিনকার এক কোটি টাকা খরচে। রাজপুতানা থেকে আনা লাল পাথরের দেয়ালে ঘেরা ২·৪১ কিলোমিটার পরিধি। ঢোকার পথে নহবতখানা। একদা সেখানে দিনে পাঁচবার বাজত বাজনা, সানাই; আজ সেখানে টিকিট বিক্রি হয় প্রকাশ ধ্বনির জন্যে। এক টাকা, তিন টাকা আর পাঁচ টাকা। তবে এক টাকার টিকিটই যথেষ্ট।

শুনবেন ঘোষণা করছে নকিব : আলা হজরত সাহাবুদ্দিন, মির্জা সুলতান, সাহানশাহ্ হিন্দুস্থান সাজাহান ইত্যাদি

রঙমহল
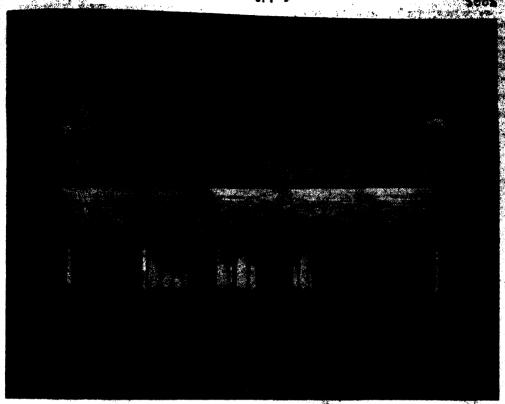
বিশেষণ-ভূষিত সম্রাট-নামা। আর একত্রে স্লোগান্ "মরহাবা, খোডান্ আল্লা।" সাজাহান বলেছিল, এ হবে "শৌকত্ কে নিশান্।" হয়তো হয়েও ছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেল, আর এল ঔরংগ্জেব। শুনবেন, সংগীতের মৃত্যু আর মতি মসজিদ্ স্থাপনা; তার ধর্ম-গোঁড়ামি, অথচ মৃত্যুকালে বিলাপ, "মেরা মনজিল কাঁহা হ্যায়?

তার আগে ফরাসী পর্যটক বের্নিয়ে সাহেবের মুখে সাজাহানের রাজসভার বিবৃতি। সেদিনকার লাল কেল্লার। অশ্বারোহী ফৌজ আসে এক পাল থেকে অন্য পালে ঘোড়সওয়ার হয়ে। আসে মীনাবাজারের কথোপকথন, আর তদানিন্তন চাঁদনি চৌকের কলরব। কতো হাসি আর গান, আর অবসর বিনোদনের আবাহন!

কালের রথ থামেনি; এসেছিল চক্রাপিষ্ট আঁধার মানব জীবনে, এই লাল কেল্লা ঘিরে। এসেছিল অপদার্থ বাদশাহের দল। জাহানদার শাহ্ আর মহম্মদ শাহ্ রংগেলা। চাঁদনি চৌকের বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়ে (লালকুঁয়া) হল বেগম ইমতিয়াজ মহল। তার সহেলি, জোহরা, বেচত তরমুজ; তিনি হলেন প্রাসাদের সখী, আর তার ভাই (যে বাজাত সারেংগি) হল মুলতানের গভর্নর। "মহব্বত কে গুলাম" —রংগেলা নিজেকে ঘোষণা করল। খুনি লুটেরা নাদির শা আসছেঃ কোনো পরোয়া নেই। আমোদ আহ্লাদ, মেয়েমানুষের হাসি আর সরাবের গেলাস। রংগেলা তখনো বলেঃ "দিল্লী দূর অস্ত্" আর তারপর এলো বিভীষিকাঃ তিন দিন তিন রাত্রি নাদির শা'র হুকুমে তার সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে হত্যা করল দিল্লীর নরনারী শিশু-দের। তাদের কান্না আর বিলাপে লাল কেল্লার আকাশ ভরে যায়, যখন শুনছেন "প্রকাশ ধ্বনি।"

এতো বাস্তবমুখী যে অনেক সময় শ্রোতারা দাঁড়িয়ে দেখতে চায় কারা করছে আর্তনাদ। কোত্থেকে আসছে অশ্বারোহী সৈন্যরা, কোন দিক থেকে আসছে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যোদ্ধারা।

শিবাজীর মারাঠা আর রণজিৎ সিংহের শিখ সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ওঠে গান, "বাদ্ ভরা তেরি নয়না"। ইতিহাসের কী বিপর্যয়, যার পথ চেয়ে দেখা দিল ইংরাজ, "বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে", অবশেষে। ইতিহাস সেদিনও থামেনি, আজও না। এলেন গান্ধীজী আর সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রাম, আর ভারতের কৌমি ফৌজ যা সৃষ্টি করলেন সুভাষ ভারতের বাইরে। তাদের বিচার লাল কেল্লায়, আর সবশেষে স্বাধীনতা ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট। নেহরুর ভাষণ।

দু একটা কথা বলা দরকার। প্রথম যখন আরম্ভ হয়েছিল লাল কেল্লার "প্রকাশ ধ্বনি" তখন গান্ধীজীর গলা শোনা যায়নি। সরকার বলেছিলেন যে, যাঁরা লাল কেল্লার সংগে সরাসরি জড়িত, তাঁদের কণ্ঠস্বরই শুনানো হয়েছে। অতঃপর লোকসভায় কংগ্রেসী সদস্যরা দাবি তোলেন, গান্ধীজীর কণ্ঠস্বরের জন্য, কেননা তিনিই নাকি ছিলেন স্বাধীনতার হোতা। তাই এক বছর পর বদলানো হল নাটকের দৃশ্যাদি। এলেন গান্ধীজী। কিন্তু কী কারণে জানি

মা-জননী

বিমল দত্ত

এ বাড়িতে যেদিন প্রথম পা রেখেছি সেদিন একগলা ঘোমটার আড়াল থেকে কেবল সারি সারি আলপনা দেখতে দেখতে সদর দরজা পেরিয়ে অন্দরের সামনের বারান্দায় এলাম। ভারী সুন্দর লাগছিল আলপনাগুলো। সানাইয়ের সুর, উলুর শব্দ, হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা টুকরো টুকরো কথা শুনছিলাম আর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

নতুন কনের মনে শুনি কত কি ভয় থাকে। সত্যি বলতে কি, আমার মনে যেসব কিছুই ছিল না। এক মাস আগে কল্পনাও করি নি যে এমন হঠাৎ বিয়ে হয়ে কনে সেজে এই মেদিনীপুরে এসে হাজির হবো। ঠিক ওই সময়টায় আমার বান্ধবীরা হয়তো ইউনিভার্সিটির ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে বসে গল্প করছিল, হয়তো আমারই গল্প।

বরণ হচ্ছিল বহুক্ষণ ধ'রে। তখনই ভারী মজার একটা ব্যাপার দেখে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি নতুন কনে। আমাদের পাশে আরো এক জোড়া বর কনে বরণ হচ্ছিল। কনের কোলে বছরখানেকের এক ফুটফুটে দুরন্ত ছেলে।

কে একজন বললে "ও মা, ছেলে কোলে পিঁড়িতে দাঁড় করাস নি। ছেলেটাকে অন্তত নিয়ে নে।' হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমি ফিরে দেখলাম। ও কনে খাস মেমসাহেব, অতি কষ্টে শাড়ী সামলাচ্ছিল, আর খুব হাসছিল। ওকে নিয়ে এত হইচই হচ্ছিল যে, আমাকে সবাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সেই সুবাদে আমি কিছুটা রেহাই পাচ্ছিলাম।

আমার ভাশুর এ'র ওপরের জন, বছর দুয়েক আগে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে এসেছিলেন। সস্ত্রীক এ বাড়িতে উনি এই প্রথম এলেন। তাই এতো তোড়জোড়। কলকাতায় থাকতেই ও'র নাম শুনেছি, ও'কে দেখেছি। মস্ত ডাক্তার। বাবার সংগে বিয়ের কথাবার্তা বলতে উনিই একদিন এসেছিলেন। দেখেছিলাম, খুব রাশভারী লোক। এখন কিন্তু খুব হা-হা ক'রে হাসছিলেন আর মেমসাহেবকে এইসব দিশী রীতি ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন। সে-ও খুব উৎসাহের সংগে পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্ত্রী আচারের নানা খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল। আমার ভাশুর বেশ জানেন দেখলাম, অনেক নতুন মানে আমিও শিখলাম।

এইসবে মেতে গিয়ে আমার আড়ষ্ট ভাবটা কখন আপনিই কেটে গেছে বুঝতেই পারি নি। কলরব কোলাহলের মধ্যে থেকে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিলাম না, কারা এ বাড়ির লোক আর কারা পাড়াপ্রতিবেশী। সবাই দেখি কর্ত্রী। এতো লোক তো এক বাড়ির হতে পারে না।

বরণের পর আশীর্বাদের জন্যে সবাই দোতলায় ছুটল। আদেশ নির্দেশ থেকে বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ভেতরের উঠোনের দিকে। যেন মেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। চারি ধারে হাসিমুখ। ও'কে উদ্দেশ্য করে নানা রসিকতা। আমাকে লক্ষ্য করে নানা স্তুতি। শুনতে ভাল লাগছিল। আর, একটা নাম বারবার শুনছিলাম—'মা জননী' 'মা জননী'। সম্ভাষণটা অদ্ভুত, তাই উৎসুক হচ্ছিলাম, কে ইনি? ও'রা সবাই বলাবলি করছিলেন 'দেখিস্ যেন মা জননী এদের আটক ক'রে না রেখে দেন। এমনিতেই আশীর্বাদ হয়ে উঠতে বিকেল হবে। বেচারারা কোন সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়েছে।'

শরীর তখন ক্লান্ত লাগছিল। হাওড়া থেকে খঙ্গপুরে পৌঁছেছি দুপুরে। সেখান থেকে এঁদের গাড়িতে এসেছি মেদিনীপুরে। পথ বেশী নয়, কিন্তু এপ্রিল মাসের রোদ্দুর এখানে মাঝরাত্তিরের মত তাতানো।

মেমসাহেবকে নিয়ে ভাশুর একটু পিছিয়ে পড়লেন। অনেকে জেদ করছিলেন একসঙ্গে আসতে। আমার ভাশুর বললেন, 'দেখ, ছোট বউয়ের পাওনা সমাদর তোমরা খেলো করতে করতে বরণের সময়ে অর্ধেক করে দিলে। মা-জননীর প্রথম আদর ভাগাভাগি করে দিয়ে আমি পাপের ভাগী হতে চাই না। আমি নেলীকে নিয়ে পরে আসছি।'

এঁদের ঠাকুমার মা—মা-জননী।

আমি মাজননীর ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলাম। সেটা কোন্ তিথি, কোন্ লগ্ন ছিল জানি না, কিন্তু কারো জীবনে এর চেয়ে শুভক্ষণ আর আসে না।

ঘরখানা আন্ধারি। বিরাট চওড়া দেওয়ালের গায়ে বসানো ছোট একটা জানলা দিয়ে আলো আসছিল। এক দিকে জুড়ে মস্ত একটা তক্তপোশ পাতা। আর এধারে ওধারে একরাশ টুকিটাকি জিনিস। মেঝের অনেকটা জোড়া শীতলপাটির এক পাশে ছোট্ট একটি বিছানা। সেখানে বসে ফরসা রোগা হাসিমুখ এক বুড়ী আমাকে ডাকছিলেন, 'এসো বউ, এসো, কখন থেকে পথ চেয়ে বসে আছি......'

এইবার, এতক্ষণে যেন সত্যিই বধূবরণ হল। ডাকটা আমার বুকে গিয়ে পৌঁছল।

'কি গো ছোটবাবু, বউ পছন্দ হয়েছে?' বলে মাজননী ও'র দিকে তাকালেন। উনি গিয়ে ধপ করে মাজননীর কোল ঘেঁষে বসে পড়লেন। বললেন, 'নাও! বড় যে বলতে আমার বিয়ে করার সাহস নেই? দেখলে তো?'

আমি প্রণাম করতেই মাজননী আমায় বুকে টেনে নিলেন, 'সত্যিকারের বউ? নাকি পুতুল সাজিয়ে এনেছিস? ওমা, কি সুন্দর রে! তোর কপাল ভাল তো!

তারপরের আদরটুকু আমি বুঝিয়ে লিখতে পারব না। লোলচর্ম দুখানি হাত যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার স্বাদ করল। মাজননী আমায় সোনাবাঁধানো একটা নোয়া পরিয়ে দিলেন। আর দিলেন একটা সিঁদুর-কৌটো।

আমাদের তাড়াতাড়ি ছুটি করাবার জন্যে আমার ডাক্তার ভাশুর মেমসাহেবকে এনে হাজির করলেন। বুঝতে পারলাম, মাজননী আগে থেকে তৈরী হয়েই ছিলেন। খবর পেয়েছিলেন দুস্তজনের মুখে। ও'কে কেউ অবাক করতে পারল না। আমার মত উপহার নেলীও পেল। তারও আদর কিছু কম হল না। নেলী ও'র কথা বুঝছে কি বুঝছে না তা একবারও ভেবে দেখছিলেন না মাজননী। উনি নিজের যা বলার বলেই যাচ্ছিলেন। যদিও ভাশুর দোভাষী হয়ে কিছু কিছু অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন, তবু আমি বুঝতে পারছিলাম, মাজননীর ওই সব কথা অনুবাদ করা যায় না, অনুবাদ করার দরকার হয় না।

ও'দের ছেলেটাকে মাজননী দেখতে চাই-ছিলেন। ডাক্তার বললেন, 'ওটা ঘুমিয়েছে। ঘুম থেকে উঠলে তোমার কাছে হাজির করব।' পরে জেনেছি, এত উত্তেজনায় পাছে মাজননীর শরীর খারাপ হয় তাই বাচ্চাটাকে তখন আনা হয় নি।

নেলীর হাতে সিঁদুর কৌটো দিয়ে মাজননী হাসলেন, 'তুই বাছা সিঁদুর নিয়ে কি করবি? গালেই মেখে নিস্ একটু একটু করে!'

ভাশুর মানে বুঝিয়ে দিতেই নেলী খুব জোরে হেসে উঠল, বলল, 'না—আমিও পরব!'

'কেন? শখ করে?' কৌতুকে স্নিগ্ধ মাজননীর পালটা প্রশ্ন শুনে আমার চমক লাগল, 'সাজের জন্যে বুঝি সিঁদুর পরে কেউ? পাগ্‌লী তুই! তোকে তো এমনিই বেশ লাগছে। খেষ্টানদের তো সিঁদুর পরা নেই, তবে কেন পরবি?'

নেলীও অনুবাদ শুনে বিস্মিত হল। হয়তো আমার মত সে-ও প্রাচীন এক হিন্দুবাড়ির আশী পেরোনো বুড়ীর মুখে সংস্কারের আরো গভীর বলিরেখার বদলে এমন প্রসন্ন স্নিগ্ধতা দেখে অবাক হয়ে থাকবে।

ভাশুর বললেন, 'তোমার মত আরো কয়েকটি হিঁদু থাকলেই হয়েছিল আর কি! মাজননী, এখন ছুটি দাও...পাড়াসুদ্ধ সবাই দাঁড়িয়ে আছে।' মাজননীর মনে পড়ে গেল। তাড়া দিয়ে আমাদের আশীর্বাদের ঘরে পাঠালেন। কিন্তু ও ঘর থেকে আসতে আমার মন উঠছিল না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে মাকে আমি প্রথম যে চিঠি লিখেছিলাম, তার আগাগোড়া কেবল মাজননীর কথা। আমার মা হয়তো ভেবেছিল, কলকাতার বন্ধুবান্ধব আর হই-হল্লা ছেড়ে অচেনা বনেদী বাড়ির ভিড়ে আমি হাঁপিয়ে

উচিৎ। চিঠিতে কান্না থাকবে। কোথাও কান্নার তা নেই। আমি কী বোকামি যে করেছিলাম! অভিমান হয়েছিল মায়ের। আর, অবাক তো নিশ্চয়ই হয়েছিল, নইলে সে চিঠিখানা আমার দেখাবার জন্যে অমন রেখে দিয়েছিল কেন? পরে সে চিঠিটা আমি পড়ে দেখেছি। কিন্তু আজও তা আমার অত্যুক্তি মনে হয় না।

এ বাড়ির যাঁর কথা সবচেয়ে বেশী মনে হওয়া স্বাভাবিক তাঁকে নিয়ে, আশ্চর্য, আমার তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই। তবে সেজন্যে আমার খুব দুঃখও নেই। সব আমার পুষিয়ে গেছে মাজননীকে পেয়ে। কথাটা খারাপ শোনালেও, সত্যি!

আমার স্বামী মোটের ওপর লোক ভালই। এ'দের নানাদিকে ছড়ানো নানা ব্যবসা। বাড়ির অনেকে, আর অনেক পুষ্যিরা মিলে দেখাশোনা করেন। উনি যান সদর-বাজারের একটা দোকানে। সবাই জানে, কাজ দেখা ও'র স্বভাবে নেই। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। উনি দাবা খেলার খুব ভক্ত। দোকানে ওই দাবা নিয়েই কাটান। মাঝে মাঝে নেশা করেও ফেরেন।

বিয়ের ক'দিন পরে আমার শুকনো মুখ দেখে মাজননী ধরেছিলেন, 'কি লা? ঝগড়া করতে পেরেছিস? হপ্তায় দুটো দিন অন্তত ঝগড়া করে একটু ঘুমিয়ে নিস্...অবিশ্যি আবার ভাবের ধাক্কা সামলাতে যদি পারিস!'

মাজননীর কথা, রসিকতা, সব সময়ে খুব সুরুচিসম্মত হয় না। উনি আমায় কখনো বউ, কখনো মা, কখনো মেয়ে.. আবার মুখপুড়ী হতভাগী বা আরো অমার্জিত গেঁয়ো কোনো সম্বোধন করেন আর মহাভারতকেও লজ্জা দেবার মত টীকায় স্বামীর বা আমার মনের ভাব নিয়ে রসিকতা করেন, তবু মাজননীর কাছে ঐসব শুনে আমার মনে হত শালীনতা, শ্লীলতা ইত্যাদির মাপকাঠি নিশ্চয়ই অন্য।

সেদিন আমি অভ্যেস মত ও'র কথাতেও হাসি নি। দেখে মাজননী কাছে বসিয়ে পানের চুপড়ি থেকে মোয়া এনে খাওয়ালেন।

'তুই কি খুব চটে গেছিস, বউ?'

আমি চুপ করে রইলাম।

মাজননী চুপিচুপি বললেন, 'আমি একদিন সুযোগ পেলে ওটাকে এমন শিক্ষা দেব!...ভদ্দরলোকের ছেলে, মদ খাওয়া কী?'

আমি বললাম, 'মাজননী সেজন্যে নয়... আমার বাবাও, চিরকাল দেখছি, মদ খায়...'

মাজননীর ভীষণ যেন স্বস্তি হল। আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে আদর শুরু করলেন, 'এ মা, ছি, তুই তা হলে ছোট-লোকের মেয়ে?'

আমি ও'কে আমার দুঃখ পাওয়ার আসল কারণটা বললাম।

এখানে এত সুন্দর অন্তরঙ্গ সংসার। কর্তারা, এ'রা পাঁচ ভাই, আত্মীয়কুটুম্ব, আশ্রিত সবাই মিলে ঘনিষ্ঠ, মেয়েদের ব্যস্ততায়, বাচ্চাদের কলরোলে চমৎকার জমজমাট এই বাড়ি। অথচ আমার স্বামী সদরবাজারে ও'দের একটা কেনা ছোট বাড়িতে আমায় নিয়ে গিয়ে থাকতে চান।

মা জননী হাসলেন, 'তবে তো জিতে গেছিস তুই। বাবুর শখ হয়েছে। দুটিতে নিরিবিলি থাকবেন...কপোত কপোতী!'

'আপনি হাসছেন, আমি কিন্তু ভাবতেই পারি না...'

মা জননী আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, 'তুই আমার দয়াময়ী মা। তোর মনে তো লাগবেই। কিন্তু তোকে একটা বুদ্ধি দেবো?'

আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম।

মা জননী বললেন, 'তুই জোর ক'রে আপত্তি করিস নি। তুই না বললেই ও হ্যাঁ করতে চাইবে। তোকে একটু পৌরুষ দেখানো আর কি! তুই যাবো-যাবো কর্... দেখবি এখানে রাখার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে।'

মাজননীর ষড়যন্ত্রে শরিক হলাম আমি। আপনারা হাসবেন জানি, কিন্তু এর পর আমার স্বামীর মনে উদয় হ'তে লাগল, সাতপুরুষের এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া কত কারণে প্রায় অসম্ভব।

আরও একটা বুদ্ধি আমায় দিয়ে-ছিলেন মা-জননী। কথায় কথায় একদিন ও'কে বলেছিলাম যে, আমার ছোটকাকা খুব ভাল দাবা খেলে। তার কাছে খেলা শিখে একবার আমি কলেজের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। তখন কিছু বলেননি মা জননী। পরের দিন দেখি আমার ঝি রাখালের মায়ের হাতে মা-জননী একটা দাবার সেট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি সেদিন ছক সাজিয়ে একা-একাই খেলতে বসেছিলাম। উনি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে সাজানো ছক দেখে খেলতে ব'সে গেলেন। আমি তো অনেক-দিন খেলিনি। বারবার হারলাম।

পরের দিন থেকে উনি তাড়াতাড়ি ফিরতেন। খেলবার জন্য ডেকে পাঠাতেন। মাজননী মুখ টিপে হাসতেন। আর, দাবা খেলার দর্শক তো এমনিই জোটে। ক্রমে ক্রমে আমার ননদ দেওর সম্পর্কের দু-চারজন তো জড় হ'তে শুরু হলই, মাঝে মাঝে পাড়ার দু-একজনও যোগ দিত।

একদিন আমি জিতলাম।

'কী সর্বনাশ', মা-জননী শুনতে পেয়ে পরের দিন আমায় ধমক দিলেন, 'তুই হতভাগী জিততে গেলি কোন্ বুদ্ধিতে? আমার মা হ'য়ে তুইও ওই বুড়ো খোকাদের মত জেতার লোভে পড়লি তো?'

আমি একটু তর্ক করতে গেলাম, 'এ তো খেলা, মা-জননী!'

'খেলা কোন্‌টে নয়?' মা-জননী বললেন, 'সবটাই তো খেলা রে! মন্ত্রী গেল...রাজা গেল! মান গেল...পয়সা গেল...ওসব বদবুদ্ধি ছাড়। খুব মজা ক'রে খেলবি, কিন্তু জিতিস না বউ। ওতে অহংকার হয়।'

কথাটা সত্যি না মিথ্যে, মাজননীর সঙ্গে তা নিয়ে তর্ক করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি এর পর থেকে প্রায় রোজই, সময় পেলেই, ও'র সঙ্গে দাবা খেলি। খুব ভাল ক'রে খেলি। কিন্তু শেষটা কিস্তি দেবার নাম ক'রে এমন গম্ভীর-

কোথায় মাথাব্যথা হয়েছে তার তত্ত্বতল্লাশ হাতে লোক পাঠান, কিন্তু নিজের কথা কখনো না।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'মাজননী, তুমি এমন হাসো কি ক'রে সব সময়ে...'

মাজননী আরো মিষ্টি করে হাসলেন, বললেন, 'হাসিই তো ওষুধ বউ—সব সময়ে হাসবি...বানিয়ে নয়, লোক-দেখানো মিথ্যে হাসি নয়...নিজের মনকেই শেখাবি...হাসি দেখতেই চায় সবাই...'

আমি বললাম, 'সত্যি হাসি হাসবার কপাল তো সবারের হয় না।'

উনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আর মাজননী যখন এমনভাবে চেয়ে দেখেন তখন বুকের তলা অবধি ও'র নজরের আভা পৌঁছে যায়। ও'র কাছে তো লুকানো নেই যে, আমার মনের অনেকখানি জুড়ে অনেকটা কান্না মেঘলা হয়ে রয়েছে। মাজননী আমাকে একটু আদর করে নিয়ে বললেন, 'নিজের কান্না চুপি চুপি কাঁদবি মুখপুড়ী। খুব কাঁদবি, কিন্তু লুকিয়ে। কেউ কান্না আসলে ভালবাসে না। অনেকে ভাববে কাঁদুনে। তোর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে. হাসি মুখে ভুবন জয় হয়...'

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেবল মাজননী জানলেন। মাজননীর বুক আমার চোখের জলে ভিজে গেল!

মাজননীকেও আমি একদিন কাঁদতে দেখেছি।

না। ও'র চোখে জল আসেনি। কিন্তু ও'র কান্না আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

একদিন দুপুরে যথারীতি মাজননীর ঘরে গিয়েছি, দেখি উনি সেদিন আর তেমন করে হাসলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে ছোটবউ, শুনেছিস, ভোটের জন্যে নাকি সুশীলও দাঁড়াচ্ছে, সুধীরও দাঁড়াচ্ছে...? খুড়োভাইপোতে এ আবার কি কুরুক্ষেত্র?' 'তাই বুঝি?' আমি সত্যিই অবাক হলাম। এ সম্পর্কে তখনো কিছু শুনিনি। মাজননীর কথায় যথাস্থানে খোঁজখবর করতে গেলাম। এ বাড়ীটা ভারী অদ্ভুত। মহলে মহলে কত বয়সের কত রকমের লোক। কোথাও তাসের আড্ডা হচ্ছে, কোথাও নাচ-গান থিয়েটারের রিহার্সাল। কোথাও তুমুল সাহিত্যচর্চা। কোনো ঘরে তেমনি ঘোরতর রাজনীতি। আমার নেমন্তন্ন সব আসরেই। সব আসরেই অল্পস্বল্প যোগ দিই। তবে সবচেয়ে আমার ভাল লাগে মাজননীর কুঠরিটা। সেখানে বাচ্চাদের জুটিয়ে মাজননী যখন রাজপুত্রের গল্প, ভূতপ্রেতের গল্প, ডাকাতের গল্প বা রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলেন—আমার সেগুলোই এ সব কিছুর চেয়ে সত্যি মনে হয়।

তিনতলা এই বিরাট বাড়িটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি যেতে একটা পুরো দেশ দেখা হয়ে যায়। ছোট খুড়শ্বশুরের ছেলে নতুন উকিল হয়েছেন, তাঁর ঘর আর লাইব্রেরী একেবারে অতি আধুনিক। এয়ারকণ্ডিশন করা। একটু এগিয়ে পুব দিকের কোণে মেজ খুড়শ্বশুর থাকেন, তাঁর ছেলে এখানে কলেজে পড়ান। তাঁদের ঘর আবার মাদুরে ফরাসে, পুতুলে পর্দায় একেবারে শান্তিনিকেতনী। শুধু বাইরে দেখতেই নয়, ভেতরে ভেতরেও এমনি বিচিত্র এক বাড়ির নানা বাসিন্দা।

বড় ভাশুরের দুই ছেলে আমার খুব ভক্ত। একজন বি-কম পড়ে আর একজন আই এস-সি। ওরা চিলেকোঠার ঘরে থাকে। আমি ওদের ঘরে গিয়ে দেখি, আরো জনা চারেক সমবয়সী জুটিয়ে সারা ঘর জুড়ে কাগজ বিছিয়ে লাল নীল কালি দিয়ে পোস্টার লিখছে। ওরা বললে, 'আমরা ছোড়দাদুকে মানা করেছিলাম দাঁড়াতে। মন্ত্রলোকা ও'কে তাতিয়ে তুলেছে। উনি শুনবেন না, ওদের হয়েই দাঁড়াবেন।'

আমি বললাম, 'তা হলে সেজকাকাকে বল্ না, নাম উইথড্র করে নিতে?'

'পাগল হয়েছ?' ওরা একেবারে উড়িয়েই দিল আমার কথা, 'সেজকাকার চেয়ে যোগ্য লোক কেউ আছে? একজন বোকামি করেছে বলে সবাইকে বোকামি করতে হবে নাকি?'

দেখলাম, আবহাওয়া বেশ গরম। আমি চলে এসে মাজননীকে বললাম।

পরের রবিবার মস্ত সভা। আমার স্বামীকেও ও'র ছোটকাকার দলের লোকেরা ডাকতে এসেছিল। উনি এসব কিছুতে থাকেন না। 'হ্যাঁ আসছি' বলে তাদের বিদায় করলেন। আবার সেজভাশুরের ভলেণ্টিয়ারেরা তো ধরেই নিয়ে যায় আর কী! তাদের একটু মোটারকমের চাঁদা দিয়ে কোনো মতে এড়িয়ে গড়ের দীঘিতে মাছ ধরতে গেলেন।

সভায় প্রধান অতিথি হয়ে কলকাতা থেকে একজন নামজাদা লোক এলেন। তিনি আবার মাজননীর সম্পর্কে ভাগনী-জামাই।

পাকেচক্রে এক পক্ষের সব আক্রোশ ও'র ওপরেই গিয়ে পড়ল। দাঙ্গার উপক্রমে হট্টগোলে সভা ভেঙে গিয়েছিল।

বাড়ি তখন থমথমে। সেইমাত্তর খবর এসেছে যে, বড়ভাশুরের দুই ছেলেকে আরো একদল ছেলের সঙ্গে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। মাজননীর ভাগনীজামাই সেই সময়ে এলেন ও'র সঙ্গে দেখা করতে।

আমি আর নেলী মাজননীর কাছে ছিলাম। মাজননী চুপ করে ছিলেন।

ও'র ভাগনীজামাইকে চা-জলখাবার দিলাম। তিনি যথাবিহিত সব কুশল প্রশ্ন করছিলেন। নেলীকে বা আমাকেও এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিলেন। মাজননী হঠাৎ কোন একটা কথার মাঝেই ও'কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমাদের কি এসব ঝগড়াঝাটি চলছে বলো তো?'

সে ভদ্রলোক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। দু' কথায় তো ঝগড়াটার ব্যাখ্যা করা যায় না। মাজননীর কথায় শুনলেন যে, বড়ভাশুরের ছেলে দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে। উনি শশব্যস্ত হয়ে ওদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করার জন্যে উঠছিলেন। মাজননী ও'কে বাধা দিলেন, 'না না। ওদের জন্যে নয়। আমি সেই থেকে ভাবছি. তোমরা সব লেখাপড়া জানা লোক, বিদ্বে-

মিশে একটা উপায় হয় না।'
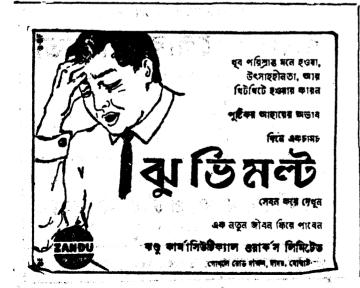
ভদ্রলোককে একটু অপ্রস্তুত মনে হল, বললেন, 'সে আপনি বুঝবেন না মাসীমা। এর মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার আছে।'

'বুঝে কাজ নেই বাবা। তবে, আমার মনে হচ্ছে, কোথাও একটা গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে...'

ও ভদ্রলোক চলে যাবার পর মাজননী চুপ করে রইলেন। আমার মনে হল, উনি ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন।

আমি খুব ভয়ে ভয়ে খানিক বাদে বললাম, 'মাজননী, ছোড়দাদুকে আপনি বলুন না?'

মাজননী একটা কাঁথা না কি সেলাই করছিলেন। আমার দিকে দেখলেনও না। বেশ কিছুক্ষণ পরে সেলাই করতে করতেই ধীরে ধীরে বললেন, 'এসবে কখনো বলতে নেই, বউ। হয় নিজেরাই বুঝবে, নয় বুঝবে না...।'

বিয়ের পর একবারই দিন সাতেকের জন্যে আমি বাবা মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তারপর আর যাওয়াই হচ্ছিল না। এক একটা উপলক্ষ্যে মা চিঠি লেখেন, এঁরা তোড়জোড় করেন। কিন্তু আমি একটা না একটা অজুহাত আবিষ্কার করি। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

মা জননী অসুখ। আমি যাই কি করে?

এইভাবে তিন মাস কেটে গেল।

তখন ভরা শ্রাবণ। থেকে থেকে বড মায়ের কথা মনে পড়ছিল। এখানে বর্ষা অন্যরকম। তেতলায় আমার ঘর থেকে মেঘে ভরা প্রায় সমস্ত আকাশটা দেখা যায়। ওখান থেকে কারো চিঠি পেলে চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে যায়, আমি যেন একেবারে বদলে গেছি! বিশেষ করে এখানের কালবৈশাখীর সন্ধ্যাগুলো আমার অদ্ভুত লাগতো। তখন তো আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। হয়তো মাজননীর কাছে বসে বিকেলে গল্প করছি, ননদেরা কয়েকজন এসে টেনে নিয়ে গেল ছাদে। দৈত্যের মত মেঘগুলো লাল হয়ে ফুঁসে উঠছে। তারপর থমথমে আকাশ তছনছ হয়ে যখন ঝড় আসতো, বাজ ডাকতো বুক কাঁপিয়ে, আমাকে ঘরে টেনে আনা ওদের পক্ষে দুষ্কর হতো। আমার এক ননদ মাজননীকে একদিন বলছিল, 'ঝড় উঠলেই ছোটবউদিকে অন্যরকমই লাগে, কোথায় ঘোমটা, কোথায় কি?...অন্যরকম!'

মাজননী বলেন, 'ছোটবউটা একটা বহুরূপী। যখন যা ভাবি, তাই হয়ে যায়...'

আমার সে ননদ জিজ্ঞেস করল: 'আর কি ভাবো?'

মাজননী আমার চিবুক তুলে ধরে বলেন, 'দেখ না, ওকে নেলীর পাশেও মানায়, আবার ক্যান্ডদের সঙ্গেও মিশে যায় কেমন। আবার আমার কাছে বসে যখন বড় বড় ধর্মকথা বলে, আমি ভাবি, আমার মা এসেছে বুঝি!'

সত্যিই কি আমি তাই, না, আমি ভেতরে ভেতরে বদলে যাচ্ছি?

দু দিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছিল। কোনো খবর না দিয়েই দুপুরে মা হঠাৎ কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হল।

দু চারটে কথা বলেই আমাকে নিয়ে মাজননীর ঘরে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'ঝগড়া করতে এলাম মাজননী। আমার মেয়েটাকে একেবারে কেড়ে নিয়েছেন। তাই দেখতে এলাম, কেমন আপনি?'

আমার শ্বাশুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে এসে-ছিলেন। বললেন, 'বেয়ান, মাজননীর পাল্লায় পড়ে মেয়ে গেছে; তুমিও যাবে ,বলে রাখলাম।' লক্ষণ তাই দেখছিলাম। মা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সারাক্ষণ মাজননীর কাছেই বসে রইল।

সন্ধ্যের দিকে সেদিন ঝড়ে আর বর্ষায় ইলেকট্রিকের লাইন খারাপ হয়ে গেল। ইলেকট্রিক হয়ে অবধি ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার অন্য আয়োজন ছিল না। মহা শোরগোল পড়ল। কোথাও গ্যাসের বাতি, কোথাও মোমবাতি, কোথাও সলতে পাকিয়ে পিদ্দিম জ্বালানোর ব্যবস্থার হইহুল্লোড় করে খানিক বাদে মাজননীর ঘরে এলাম। বুঝতে পারছিলাম, মা এসেছে বলে আমার মনটা ছোট্ট মেয়ের মত হাল্কা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, আদ্দিকালের এক পুরোনো পিলসুজ মাজননীর সামনে জ্বলছে। কারুকাজ করা, থাকে থাকে প্রদীপ দেওয়া একটা পিলসুজ। ওর ওপরের একটা প্রদীপকেই কেবল কেউ জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছে করল, ওর সব কটা পিদ্দিমকে তেল ভরতি করে জ্বালিয়ে দিই। কতদিন ওগুলো জ্বলেনি, কে জানে!

এদের দিকে দেখতেই লক্ষ করলাম, মায়ের চোখে জল। মাজননী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি চলে আসছিলাম, মাজননী কাছে গিয়ে বসতে বললেন।

কিছুক্ষণেই বুঝতে পারলাম যে, মা ইতিমধ্যেই মাজননীর কাছে নিজের সব জ্বালাযন্ত্রণার কথা বলে ফেলেছে। আমি সব জানি, তবু মুখ ফুটে মা কখনো আমার সঙ্গেও এসব আলোচনা করেনি। বাবাকে নিয়ে আজন্ম অশান্তি দেখছি। এড়াবার জন্যে দাদা হোস্টেলে থেকে কলকাতাতেই পড়াশোনা করে। আমি ছিলাম, তবু মায়ের একজন সঙ্গী ছিল। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। পেছনের দেয়ালে এদের দুজনের ছায়া দুলছিল। আমার মনটা আবার ভারী হয়ে গেল।

মা এমনিতে আধুনিকা। নভেল সিনেমা সামাজিকতা নিয়ে সময়টা কাটায়। ওকে এমন দেখে আমার ভারী মায়া লাগল। আমি কেঁদেই ফেললাম। এক

সময়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মাজননীকে মা বললে, 'তুমি যে ক'দিন আছ মাজননী, যদি অনুমতি করো, এখানে থেকে তোমার সেবা করেই নিজের জ্বালা জুড়োই। ওখানে আমি আর পেরে উঠছি না...'

'দূর্ পাগলী!' মা যেন কচি মেয়ে এমনিভাবে মাজননী ওকে বললেন, 'কান্না পেলে মন খুলে কাঁদবি, কিন্তু ওখানে না পারলে চলবে কেন? আর এখানে... যখন ইচ্ছে আসবি, যখন ইচ্ছে থাকবি ...আমি তো মরছি না, দিদি। আমি এ বাড়ী ছেড়ে মরতেও পারবো না—যদি নিয়মরক্ষায় যেতেই হয়...' বলে অদ্ভুত রহস্য চোখে ঘনিয়ে মাজননী মৃদু হেসে আমার দিকে একটু চেয়ে রইলেন, যেন কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে এমনিভাবে মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ...'যদি নিয়মরক্ষায় যেতেই হয়, আমি ফেরার পথ ক'রে রেখেছি। আমি এর পেটে আবার আসবো। আমার মা আমি বেছে নিয়েছি।'

ভয়ে আনন্দে আমার বুকটা ধক্ ক'রে উঠল।

ফিচেল ফিচার রাইটার

ত্রিলোচন কলমচি

যাঁরা লেখেন

আমার জীবনে প্রথম আঘাত এসেছিল সেই কিশোর বয়সে, যখন একের পর এক সেই আশ্চর্য অলৌকিকপ্রায় নর-নারীর দেখা পেতে আরম্ভ করেছিলাম। রহস্য-রোমাঞ্চ-রোমান্সের শিহরভরা অন্তর নিয়ে একের পর এক লেখক-লেখিকার সন্ধানে ছুটে গিয়েছি, তাঁদের বন্ধ দরজায় ঢিবঢিব দম বন্ধ বুকে কড়া নেড়েছি, কোথাও কোথাও চিরকুটে কিংবা স্লেটে দর্শনার্থী হিসাবে নাম লিখেছি এবং কখনো বা অতি অপ্রত্যাশিতভাবে অস্বাভাবিক অসম্ভব জায়গায় তাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ঘুঘুডাঙ্গা থেকে ঢাকুরিয়া সকাল সন্ধ্যে অভিযান চালিয়েছি। রাসবিহারী অ্যাভেনিউ-এর সেই দোতলার বিখ্যাত ষটকোণা ঘর, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের পড়ো মেসবাড়ি, টালা পার্কের প্রান্ত সীমায় সদ্য ভূমিষ্ঠ একতলা কিংবা বাগবাজারের সেই রহস্যময় তিনতলা বাড়ি কিছুই সেদিন বাদ দিইনি। কলুটোলার আগের স্টপে নেমে দাঙ্গা পরবর্তী দুরু-দুরু দিনে রতু সরকার লেনের হাড় কাঠেও গলা বাড়িয়েছি। সোনাগাছির একটি বারোয়ারী বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে সেই অপাপবিদ্ধ বয়সে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেছি। জীবনযাপনের রূপ এবং রহস্য তখনো সব বুঝি না, অস্পষ্টভাবে অস্বস্তি বোধ করেছি মাত্র। ঢালা ফরাসের মত বিছানায় একজন আদর্শবাদী লেখককে রোগের যন্ত্রণায় অচৈতন্য অবস্থায় ছট ফট করতে দেখেছি। বিছানার তিনদিকে দেওয়াল ঘেঁষে কয়েক হাজার টাকার বই অযত্ন সঞ্চিতভাবে পড়ে পড়ে ধুলো আর পায়রার বিষ্ঠা খাচ্ছে। গোটা দুই রহস্যময় বোতল ওই বইয়ের স্তূপের মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে আছে। এমনিভাবে একের পর এক সেল্সম্যানের কেরানীর মত দরজায় দরজায় ঢুঁড়েছি। পাড়ার পর পাড়া তন্ন তন্ন করেছি, লেখক আর লেখিকার অস্পষ্ট ঠিকানার লোকশ্রুতি সম্বল করে। কিন্তু সেদিন প্রায় কোথাও হিসেব মেলেনি আমার। মনের স্বপ্ন এবং সংস্কার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সাহিত্য জগতের দেবতারা আমার কাছে অতিসাধারণ মাটির মানুষ হয়ে গিয়েছেন! এই কি তাঁদের চেহারা, হায়রে! আমার মনের গোপন ইজেলে আমি যে এতদিন তাঁদের ছবি এঁকেছি, অন্য রেখায় অন্য রঙে। ভাষার যাদুকর সামনে এসে তোত্‌লাতে থাকেন, প্রায় অন্তর্যামীর মত গল্প লেখক অবুঝের মত অবান্তর প্রশ্ন করেন অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস দুঃসাহসী সাহিত্যিক এত ক্ষীণ কলেবর, ডিসপেপটিক চেহারা সে কথা কে স্বপ্নে ভেবেছিল। পদবী ছাড়া নামেই সারা বাংলাদেশে যাঁকে চিনতে পারে এমন রোমান্টিক কবিও কেমন কাঠখোট্টা ব্যবহার করেন, অকবিসুলভ কথা বলেন, হাসির লেখক দাঁতের ব্যথায় জীবন্ত বিজ্ঞাপনের মত উদিত হন!

হয়ত লেখকরা এমনিই হয়ে থাকেন। তিনি যা নন, যা হতে পারেন নি, তাই তাঁর লেখার মধ্যে সফল হতে চায়। কিংবা ভেতরে-বাইরে একসঙ্গে কেউ লেখক নয়, সবাই সবসময় লেখক নয়, কখনো কখনো লেখক। খেজুর গাছের মত উষ্ট্রাকৃতি নীরস চেহারা, কাটায় এবং কাঁটায় ভরা, কিন্তু মজ্জায় মজ্জায় রসের ধমনী বইছে, আমাদের লোকচক্ষুতে ধরা পড়ার কথা নয়। স্ত্রী-লোকের চরিত্র যদিবা বোঝা যায় লেখকের চরিত্তির না। লেখক মানেই বাদশা লোক, তাঁদের মন মেজাজ মর্জির তল পাওয়া ভার। তাঁদের চোলাই কর্মের মাল-মশলা কোথা থেকে যোগাড় হয় ভগবান জানেন। কাঁদলে নিজের পিঠ ভিজে যায় এ রকম রাম ট্যারার মত লেখক কখন যে কাকে দেখছেন কাকে টুকছেন এবং কাকে ফুঁকছেন বোঝা অসম্ভব। হয়ত তাঁরা খুব ভালো অভিনেতা, ভালো ভালো কথা বলায় এবং ভালোবাসাবাসিতে তাঁদের জুড়ি নেই। স্খলিত পদে জড়িত কণ্ঠে কখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো ফুলের মালা গলায় দিয়ে ডায়াসের ওপর ক্রীতদাস মূর্তিতে বসে আছেন। ট্রামে-বাসে ট্রেনে সভায় মিছিলে তাঁরা দশজনের মতই ধরা দিচ্ছেন, ছোঁয়া দিচ্ছেন, পরিণামে ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না কিন্তু! অথচ তাঁরাও মানুষ, অতি সাধারণ

এ্যাণ্টিসেপটিক ড্রইংরুম

...দেব, লোক্তে-পাপে-অপমৃত্যুতে সে কথা ...বার প্রমাণ হচ্ছে।

...লেখকরা কিভাবে লেখেন, কি নিয়ে ...লেখেন, কখন লেখেন, ছোট বেলা থেকে এই ...আসা দু চোখে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ...লেখকদের দ্বীপপুঞ্জে। প্রত্যেকের জীবন-...া, লেখার রীতি আলাদা, হরেক রকম ...দোষে তাঁরা স্বতন্ত্র। কেউ ফুলস্ক্যাপ ...ড়া লিখতে পারেন না, কেউ লাইনটানা ...রসাইজ কাগজে লেখেন। নীলচে ব্যাঙ্ক-...পার কারো পছন্দ কারো বা এয়ার ...টারের মত ফিনফিনে কপি পেপার। ...উ প্রথমে পেন্সিলে লেখেন, কেউ আদৌ ...ড়া করেন না একেবারে ফাইনাল। কেউ ...উ কার্বন কপি রাখেন। কেউ দামী ...লমে লেখেন, কেউ সস্তার কলম ছাড়া ...খতেই পারেন না। কলম চুঁইয়ে আঙুলে ...দ কালিই না লাগলো তাহলে লিখছেন ...ল মনেই হয় না। একজন লেখক, তাঁর ...টেবিলে ফুলদানির মত কাচের গেলাসে ...ক গুচ্ছ কলম সাজিয়ে রেখেছেন, নানা ...তের কলম, নানা কালির। প্রহরে প্রহরে ...াঁর মনের রঙ বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে কলমের ...ালির। সকালে লেখা বাদামী কালি ...বকেলে হয়ত টলারেট করতে পারছেন না, ...খন চাই ঘন সবুজ। কেউ টেবিলে বসে ...লেখেন, কেউ সেরেস্তাদারের মত মাটিতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ লেখেন কিনা জানি না, তবে অনেককেই শুয়ে শুয়ে লিখতে দেখেছি। কেউ খোলা জনালার সামনে বসে লিখতে ভালোবাসেন, কেউ বন্ধ দেওয়ালের সামনে। কেউ লেখার ঘরে এয়ার কুলার রেখেছেন, কেউ পাখা পর্যন্ত না। কোনো রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য সাহিত্য সাধনাকে পাছে নষ্ট করে সেদিকে তাঁর সজাগ নজর। অথচ কোনো কোনো লেখক গভীর রাতে সস্ত্রীক বিছানা ত্যাগ করে টেবিলে গিয়ে বসেন। কেউ বা নেশা ছাড়া লেখায় মন বসাতে পারেন না। কেউ ভোর বেলা লেখেন, কেউ দুপুরে, কেউ রাত হলে। কেউ নিয়মিত ভালো ছেলের মত রুটিন ক'রে লেখেন, কেউ খাপছাড়া দুর্ধর্ষ হুজুগে পড়ুয়ার মত রাতের পর রাত জেগেছেন, নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে কয়েকদিনের জন্য লক্-আপে চলে যান। অবিশ্যি পুজোর সময় অনেকেই হোল-টাইমার হয়ে যান, বাহান্নখানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে বেপরোয়া কলম চালিয়ে যান। একজন পরিচিত লেখক এই সময় তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করেন দেখেছি। তখন তিনি টেলিফোন ধরেন না, কারো সঙ্গে কথা বলেন না, লোক-লৌকিকতার ধার ধারেন না। ও'র থেকে তখন ঘড়ি এবং ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি শুধু লিখে যান, লেখা হয়ে গেলে, জানলা দিয়ে এক একটি ক'রে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। বিভিন্ন পত্র-প... পাঠানোর দায়িত্ব তাঁর স্ত্রীর। আবার পুজোর সময়ই, দিনের পর দিন লিখছেন না, কিংবা লিখতে পারছেন না, এমন সুখী লেখকও আছেন।

লেখকদের হাতের লেখাও কত রকমের। ছাপার অক্ষরের মত, মুক্তোর মত আবার কারো কারো হাতের লেখা দুর্বোধ্য সংকেত বলে মনে হয়। জয়েসের মত দুর্বোধ্য লেখকও আমাদের দেশে খুব কম নেই। তাঁদের লেখা সনাক্ত করতে দু চারজন মাত্র কম্পোজিটার বাংলাদেশে আছেন। কেউ কেউ বেশ ফাঁক ফাঁক বড় বড় হরফে লেখেন কেউ কেউ ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে বেশ জমিয়ে লেখেন। সুনন্দ-র কথাই ধরা যাক তিনি উভয় অর্থেই সুলেখক কিন্তু ঘন জমাট তাঁর

লেখা। জিরের মত ছোট ছোট অক্ষর, কম্পোজ করা গ্যালির মত দেখতে। এভাবে তিনি লেখেন কেন, শুধিয়েছিলাম একদিন। তিনি হেসে বলেছিলেন, চিন্তাটা বেশ দানা বাঁধে এভাবে লিখলে ভাবটা বেশ ঘন জমাট হয়।

হ্যংরি জেনারেশন

আসলে লেখকদের এই খামখেয়ালগুলির পিছনে সত্যিই কারণ আছে। মুদ্রাদোষগুলির তলায় গভীর কোনো মনস্তত্ত্ব। একজন লেখক তাঁর লেখার ঘর এবং টেবিল শুধু ওষুধে ওষুধে ঠেসেছেন, দেখলেই মনে হবে কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক ক্লিনিং রুমে ঢুকলাম বুঝিবা। মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটছেন অবসর সময়ে। সব সময়েই মনে মনে তিনি কোনো কাল্পনিক মারাত্মক অসুখে ভুগছেন। যদিও তাঁর আশ্চর্য অসাধারণ লেখার মধ্যে কোথাও এই অসুস্থতা নাক গলাতে পারে নি।

কিন্তু লেখার উপকরণ সংগ্রহ আর অভিজ্ঞতা অর্জনই সবচেয়ে কঠিন কাজ। এটাই লেখকদের ফিল্ড ওয়ার্ক। খবরের কাগজের অফিসের ফিচেল ফিচার রাইটারদের কথা বলছি না, তাঁরা সত্যিই ধুরন্ধর, মানুষের জীবনের কিস্‌সা কথা তাঁরা টেলিফোনের সামনে বসেই সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু যারা অন্যতর লেখক তাঁদের অনেক খেটে খেতে হয়। ঘরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় শুধু গল্পের সন্ধানে। হাসপাতালে মর্গে, ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে জনপার হয়ে, থানায় জেলখানায় হানা দিয়ে, খনির মধ্যে প্রায় কয়লা বনে গিয়ে। মোট কথা যেখানে গিয়েছি, এক আধজন লেখকের সন্ধান পেয়েছি আমি, কেউ হয়ত আমি যাওয়ার একটু আগে পর্যন্ত ছিলেন। মেন্টাল হসপিটালে, স্যানাটোরিয়ামে, গ্রীনরুমে স্টুডিও নিভৃতে অস্থায়ী-বাসিন্দা-লেখক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাংলা সাহিত্য বহুমুখী হয়েছে, তার গল্প উপন্যাস নাটকের ভূগোল বিস্তৃত হচ্ছে, নিছক গল্পের রাজ্যে আর রূপকথার জগতে কেউ পড়ে থাকতে চাইছেন না।

কিন্তু আমাদের জীবনের গুপ্ত কথা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন লেখক। আমাদের আব্রু আবরণ ফর্দাফাই ক'রে দিচ্ছেন। আমাদের সুখ দুঃখের গোপন কথা তাঁরা পত্রিকাওয়ালা এবং প্রকাশকের কাছে বেচে দিচ্ছেন। তাঁরা এক কথায় ইনফর্মার। আমার এক দূর সম্পর্কের বোন একদিন কেঁদে এসে পড়লো। কি ব্যাপার? না, তাকে নিয়ে একজন বিখ্যাত লেখক মারাত্মক প্রেমের গল্প লিখে ফেলেছেন। ফলে তার শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হচ্ছে।

এমন লেখক অন্তত তিনজনকে জানি, যাঁরা পকেটে ডায়েরী নিয়ে ঘোরেন। যে কোনো বাড়িতে ঢোকবার সুযোগ পেলে অন্যথা করেন না। যত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন, তাদের পেটের কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করেন। প্রেমের উপাখ্যান খুঁজে বেড়ান, সংলাপ কুড়িয়ে বেড়ান। লেডিজ সীট ঘেঁষে তাঁরা বসে থাকেন উৎকর্ণ হয়ে। অজস্র চিঠি লিখে, টেলিফোন করে রমণীর দুর্গমতাকে তাঁরা প্রায় জয় ক'রে ফেলেছেন। তাঁদের মেথোডিক্যাল স্টাডি থেকে কারো রেহাই নেই। তাই প্রতিটি গল্পেই কেউ না কেউ ধরা পড়েন। কারো পোর্ট্রেট কারো ফুল ফিগার আঁকা হয়। এমনভাবে তার মুখের কথা এবং পারিপার্শ্বিক সেই গল্পে যোজনা করেন যে পরিচিত যে কেউ তাকে চোখ বুজে চিনতে পারে।

লেখক চরিত্র সামান্য দু কথায় ফুরিয়ে ফেলার নয়। লাইব্রেরী আর কফিখানার অগণিত টেবিল-ফ্যানের দল ঝড় তুলছেন যাঁদের কথকতা নিয়ে তাঁদের এক কলমে আঁকার সাধ্য আমার নেই। হ্যাংরি জেনারেশন থেকে শুরু ক'রে ফ্ল্যাগ হাউসের দিকে তাকিয়ে থাকা পিয়োর রোমান্টিক কবি সকলকেই দূরে থেকে নমস্কার জানানোই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা। কারণ শ্রোতা হওয়ার চেয়ে পাঠক হওয়া বোধ করি অনেক অনেক সহজ ব্যাপার। নীরব কবির নীরব পাঠক অন্তত।

উনত্রিশ

দিন কয়েকের মধ্যে ওরা এসে পড়ল : অল্প বয়সী দুই ডাক্তার, দুজন 'মেল' নার্স, গুটি দুয়েক সিস্টার, আধ-বুড়ো গোছের এক কম্পাউন্ডার, একজন জমাদার। আর এসেছিল প্যাকিং বাক্সের পেটি করে ওষুধপত্র; সেই সঙ্গে কয়েক টিন ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, কয়েকটা নতুন লণ্ঠন, একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি, মাঠে খাটাবার জন্যে তাঁবু—এইসব। সদর থেকে হাকিম এসেছিলেন, সঙ্গে বুঝি সিভিল সার্জন; তদারক করে গেলেন। সরকারী একটা ভ্যানও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ওষুধবিষুধ নিয়ে ঘুরে গেল।

সবজি-বাগানের দিকে, কিছুটা ফাঁকায় খাপরা-ছাওয়া বড় বড় ঘর ছিল দুটো; এক সময় বেতটেত্ত থাকত, বেতের আর দড়ির কাজকর্ম করত অন্ধরা, এখন বেতের কাজ হয় অন্য ঘরে, ঘর দুটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে, কোনো কোনো জায়গায় খাপরা বদল করে সেখানে হল হাসপাতাল; দড়ির খাটিয়া পড়ল গোটা দশেক। কাছাকাছি আর কোনো ঘর ছিল না; পুরোনো তাঁত ঘরের একপাশে বসল ডিসপেনসারী। আগে যে-দালানে চোখের রোগীরা দু চার দিন থাকত—সেই রোগী-ঘর ফাঁকা পড়েছিল এখন; ডাক্তার, মেল নার্স আর কম্পাউ-ন্ডারের থাকার জায়গা হল সেখানে। সিস্টার দুজনের একজন এসেছে মিশনারী থেকে, আদিবাসীটাসী হবে, কালো বেঁটে-খাটো চেহারা, অন্যজন বেহারী মেয়ে—নাম পারবতী, বছর পঁচিশ বয়েস বড় জোর, লম্বা ছিপছিপে তামাটে চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ। সিস্টার দুজনকে হৈমন্তী-দের পাশাপাশি, গগন যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

অন্ধ আশ্রমে চোখের রোগী আর আসছিল না। চোখের হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপাতত। যুগলবাবু হাসপাতাল-ঘরে তালাচাবি দিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন। তাঁত ঘরে অন্ধদের কাজকর্ম খুব সামান্যই হয়; বেত বোনাটোনা, দড়ির কাজ এখন আর হচ্ছে না।

গুরুডিয়ার অন্ধ আশ্রমের জীবন যে আর স্বাভাবিকভাবে বইছে না—এটা বোঝা কষ্টকর ছিল না। সকাল দুপুরে বাসগুলোও নিয়মিত আর আসে না, যাত্রী নেই; রোগীও আসছে না; জামতলায় ভিড় হয় না দুপুরে, অন্ধ আশ্রম যেন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে।

নতুন হাসপাতাল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই গরুর গাড়িতে চাপিয়ে শিবনন্দনজী দুই মরণাপন্ন রোগী এনে হাজির করলেন কোন গাঁ গ্রাম থেকে। পরের দিন আর-একটা এল। তাঁত ঘরের হরিকিষণের ভাই ইতিমধ্যে মারা গেল। বহু চেষ্টাতেও বেচারীকে বাঁচানো গেল না। একেবারে মাঝ দুপুরে—যখন বাতাস আর ধুলো মিশে একটা আঁধি আঁধি ভাব হয়েছে, দেহাতের লোকজন হরিকিষণের ভাইয়ের মৃতদেহটা কাঁধে নিয়ে জামতলা দিয়ে 'রাম নাম সত্ হ্যায়' করতে করতে চলে গেল।

আশ্রমের মধ্যে কেমন একটা থমথমে ভাব জমে আসছিল। মনোহর আর বুড়ো তিলুয়া মারা যাবার পর এই রকম একটা ভাব হয়েছিল, তারপর সেটা কাটছিল আস্তে আস্তে, এখন আবার সেই থমথমে ভাবটা এল। কারও কারও চোখে আতঙ্ক, কেউ বা কেমন সন্ত্রস্ত। এক সময় এই জায়গাটা আশ্রম বলেই মনে হত, নিরিবিলি নিরুদ্বেগ শান্ত সহজ একটা জীবন ছিল; এখন মনে হয় সত্যিই কোনো হাসপাতাল: ভীতি, সন্ত্রাস, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। মাঠঘাট সবজি-বাগানের গন্ধের বদলে ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডারের উগ্র গন্ধ: বাতাসে থেকে থেকে সাদা গুঁড়ো উড়ছিল পাউডারের।

সে-দিন অবেলার ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমন্তী, ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে দেখল বিকেল পড়ে যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে আলো কমে ছায়া জমতে শুরু করেছে। বাইরে মালিনীর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। অবেলায় ঘুমিয়ে আলস্য জমেছিল, শুয়ে শুয়ে হাই তুলল হৈমন্তী বার কয়েক, চোখ জড়ানো, একটু যেন জল এসেছে, ছলছলে ভাব। বিছানায় উঠে বসার আগে বালিশে ছড়ানো চুলের গুচ্ছ আলগা মুঠোয় গলার কাছে এনে দু দণ্ড শুয়ে থাকল হৈমন্তী। ঘুমের মধ্যে সে গগনের স্বপ্ন দেখেছে; গগন তাকে ডাকছে—এই, এই...এই যে; আর ট্রেনের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে হৈমন্তী; প্লাটফর্মে মালপত্র নামছে, কুলি উঠছে। হৈমন্তী উঠি উঠি করছিল, অথচ ভিড়ের মধ্যে উঠতে পারছিল না।

স্বপ্নটার কথা মনে করতে করতে হৈমন্তী উঠে বসল। পায়ের কাপড় গুছিয়ে নামল, জল খেল। জল খেয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ল, রোদ প্রায় গাছের মাথায় গিয়ে উঠেছে; শুকনো, সামান্য উষ্ণ হাওয়া; গতকাল কিংবা আজই বুঝি ফাল্গুন মাস পড়েছে, বাতাসের সর সর শব্দ উঠছিল মাঝে মাঝে, সামনের করবী ঝোপটার পাতা ধুলোয় লাল হয়ে গেছে, জানলার পরদায় একটা শুকনো বটপাতা এসে আটকে রয়েছে।

জানলার সামনে সামান্য দাঁড়িয়ে, আলস্য-ভরে আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়ালো যেন হৈমন্তী, আর একবার হাই তুলল। স্বপ্নের কথাটা আবার মনে এল। আর কয়েকটা দিন, তারপর সত্যি সত্যি হাওড়া স্টেশনে গগনকে দেখতে পাবে হৈমন্তী।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল, বারান্দার নীচে মাঠে দাঁড়িয়ে মালিনী আর পারবতী গল্প করছে। পারবতী হাসছিল, মালিনী গালে হাত দিয়ে কি যেন বলছে। হৈমন্তী কলঘরে চলে গেল।

কলঘর থেকে ফেরার সময়ও হৈমন্তী দেখল, ওরা গল্প করছে। তার দিকে মালিনীর চোখ পড়েছিল। ঠিক বোঝা যায় না, তবু আজ কিছুদিন ধরেই যেন হৈমন্তীর মনে হচ্ছে, মালিনী আর আগের মতন 'হেমদি হেমদি' করে না। আগে মালিনী যেন খুব অনুগত ছিল হৈমন্তীর; এখন ততটা নয়। হয়ত মালিনী ভেবে দেখেছে, যে-লোক চলে যাবে তার দিকে অতটা টলে লাভ নেই। বা, মালিনী বেশ বুঝতে পেরেছে—তার দাদার সঙ্গে হেমদির

বনিবনা না হওয়ায় হেমদি চলে যাচ্ছে; মনে মনে হয়ত সে-জন্যে খানিকটা রাগ, খানিকটা বা অসন্তোষ রয়েছে।

ঘরে আসার সময় কি ভেবে হৈমন্তী দাঁড়াল। মালিনীকে ডাকল।

মালিনী পারবতীর সঙ্গে কথাটুকু শেষ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

হৈমন্তী বলল, "আজ আর চা-টা খাওয়াবে না নাকি?"

"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন বলে ডাকি নি", মালিনী বলল, "করে আনছি।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—" হৈমন্তী বলল, "ডাকলে পারতে।"

মালিনী কোনো জবাব দিল না। চা করে আনতে গেল। পারবতী তখনও মাঠে দাঁড়িয়ে।

ঘরে এল হৈমন্তী। চোখ মুখে ঠান্ডা জলের স্পর্শ ভাল লাগছিল. ক'দিনের মধ্যেই বেশ আবহাওয়া কেমন বদলে গেছে, বেশ শুকনো ভাব এসেছে একটা। এভাবে চললে দেখতে দেখতে গরম পড়ে যাবে। হয়ত গরম পড়ে এলে এই অসুখটাও থাকবে না। বা ততদিনে অসুখটা চলে যাবে।

মুখ মুছে হৈমন্তী চুল বাঁধার জন্যে চিরুনিটা হাতে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাতাসে টুপটাপ টুপটাপ অনবরত পাতা ঝরে যাচ্ছে গাছের; এখন তো গাছপালা বেশ নেড়া নেড়া দেখায়. বেলা বেড়ে গেছে, মাঠের ঘাস কোথাও কোথাও হলুদ হয়ে আসছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে চুল আঁচড়াতে লাগল। রোদ দ্রুত পালাচ্ছে, একেবারে গাছের মাথায় রোদের একটা পাতলা ঢেউ এখনও আছে, মাটিতে আর রোদ দেখা যাচ্ছে না। আজ কয়েকটা দিন হৈমন্তী একেবারে চুপচাপ. কোনো কাজকর্ম নেই, সারাটা দিন আর রাত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা। কেমন আলস্য লাগছে. কুঁড়েমি ধরে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। কাজের মধ্যে নিজের জিনিসপত্র একটু আধটু করে গোছগাছ করে নেওয়া। এমন কিছু জিনিসপত্র নেই যে গোছগাছ করতে করতে সময় কেটে যাবে, তবু ধীরেসুস্থে গা এলিয়ে যেটুকু সময় কাটানো যায় সেইভাবে গোছগাছ করছে। এখন যা অবস্থা তাতে হৈমন্তী ইচ্ছে করলে কাল পরশুও চলে যেতে পারে, তার করার কিছু নেই. থাকাও অর্থহীন, অকারণ। তবু যে আরও পাঁচ সাতটা দিন থাকতে হচ্ছে এটা যেন নিতান্ত সঙ্কোচবশে। গগনকে চিঠি লিখে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল আগেই, সেই মতনই সে যাচ্ছে। তাছাড়া, এখানে এমন অবস্থায়, ওরা সব এল আর সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী চলে সে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো।' ...ওরা যেন ভেবে নিয়েছে এই বিপদের দিনে হৈমন্তীও তাদের বড় রকম সাহায্য। কিছু সাহায্য, কোনো না কোনো রকম সাহায্য হৈমন্তীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। কিছুই বলা যায় না, যদি হাসপাতালের দুটো ঘরই রোগীতে ভরে যায়, বা আরও একটা ঘর রোগীর জন্যে দরকার হয়ে পড়ে—তবে অতগুলো রোগী সামলাতে হৈমন্তীও কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। এ-সব কথা ওরাই বলেছে।...ভদ্রতা এবং সঙ্কোচ-বশে হৈমন্তী ওদের স্পষ্ট করে বলে নি যে সে এ-সবের মধ্যে নেই. সে কলকাতা চলে যাচ্ছে: অস্পষ্টভাবে অবশ্য জানিয়ে ছিল। এ বিষয়ে তার নিজের জানানোর কিছু নেই, সুরেশ্বরই জানাবে, এ এ দায়িত্ব তার।

মালিনী চা নিয়ে এল। ততক্ষণে হৈমন্তী এলো করে খোঁপা বেঁধে নিয়েছে।

মালিনী বলল, "আজ উনি আসবেন নাকি. হেমদি?"

উনি অর্থে অবনী, হৈমন্তী বুঝতে পারল; বলল, "কেন?"

"না—তা হলে..." মালিনী বোধ হয় দ্বিধায় অথবা লজ্জায় সামান্য ইতস্তত করল। শেষে বলল. "বাড়িতে মা বড় ভাবে, হেমদি: এখানে তো অসুখ বিসুখ। যদি উনি আসেন—একটু বলে দেবেন, আমি ভাল আছি। আমার ভাইকে উনি অফিসে একটিবার বলে দিলেই হবে।"

হৈমন্তী ঘাড় নাড়ল, বলল, "যদি আসেন, বলে দেব।"

মালিনী চলে গেল।

চা খেতে খেতে হৈমন্তী অবনীর কথা ভাবল। অবনী কি আজ আসবে? সেদিনের পর আর আসে নি। বলেছিল, কোন ওপরঅলা নাকি আসবে. সঙ্গে আরও সব লোকজন—খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হবে। আজ প্রায় ছ সাত দিন হয়ে গেল, অবনীর কাজ যে ফুরোয় নি এমন তো মনে হয় না। তবু কেন আসছে না কে জানে! কোথাও গিয়েছে, নাকি কোনো কাজে আটকে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। চা খেতে খেতে অন্যমনস্কভাবে হৈমন্তী অবনীর কথা ভাবছিল, তারপর কি মনে পড়ায় হেসে ফেলল। ভদ্রলোক এলে কথাটা বলতে হবে: 'কি. আপনি আমার ফেরারওয়েলের ব্যবস্থা করছিলেন নাকি? কি দিচ্ছেন টিচ্ছেন বলুন, আগে ভাগে শুনে নি।' এই হালকা চিন্তাটা কয়েক মুহূর্ত মন বেশ সকৌতুক করে রাখল, পরে কেমন যেন বিষন্ন হয়ে আসতে লাগল।

ভাল লাগছিল না। ঘরের মধ্যে ছায়ার রঙ পেনসিলের সিসের মতন কালো ও গভীর হয়ে আসার আগেই হৈমন্তী বাইরে [illegible] পাতলা একটা চাদর, সুশ্রীর সাদা শাড়িটাই পরনে। মাঠে নামতে আকাশে চোখ পড়ল, আলো প্রায় নেই, মেঘের গা কালচে হয়ে এসেছে, দক্ষিণের এলোমেলো, বাতাস, কুয়ায় জল উঠলে— লাটা বাম্বার ওঠানামার শব্দ, একপাশে কয়েকটা গাঁদাফুল, কিচমিচ কিচমিচ শব্দ, নিম গাছের দিকে এক ঝাঁক চড়ুই উড়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় জামতলা, আগে এ-সময় অন্ধকার হয়ে যেত, হিম পড়ত; এখন হিম পড়ছে না, ঠান্ডা নেই, পথ-ঘাটও দেখা যাচ্ছে। বিশমারী থেকে আসা সেই সিস্টার আর পারবতীকে দেখা গেল, নদীর দিকটার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছে।

হৈমন্তী উলটো পথে—লাটঠার দিকের পথ ধরে হাঁটতে লাগল। আকাশে কোথাও আর নীলের ভাব নেই, পশ্চিমে সামান্য লালচে ভাব আছে এখনও, সূর্য ডুবে যাবার পর যেন মেঘের গা গড়ানো অবশিষ্ট আলো, এখুনি মুছে যাবে। দৃশ্যটা কেমন বেদনা দিল। সেই বিষন্নতা যেন কাটছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাবার সময় হৈমন্তী কি যেন ফেলে যাচ্ছে। কিছু খেয়াল না করে হৈমন্তী হাঁটতে লাগল, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গুনগুন করে কি যেন গাইবার চেষ্টা করল, অথচ পারল না।

এ-রকম কেন মনে হয়! সে তো বাস্তবিকই কিছু ফেলে যাচ্ছে না। ব্যর্থ, হতাশ, তিক্ত বিরক্ত হয়েই সে চলে যাচ্ছে—, তবু এমন কেন মনে হচ্ছে।

আলো ফুরিয়ে অন্ধকার হয়ে আসার সময় হৈমন্তী ফিরছিল, তখন সে গাড়ির শব্দ শুনতে পেল, দূরে। আলো পড়ছিল রাস্তায়।

অবনী আসছে। অবনী আসছে এই চিন্তাটা হঠাৎ যেন এতক্ষণের নৈরাশ্য দূর করল। মাঝ রাস্তা থেকে সরে গেল হৈমন্তী, আর সহসা তার খেয়াল হল সে যদি আরও খানিকটা মাঠের দিকে সরে যায় অবনী তাকে দেখতে পাবে না। গাড়ির আলোর বাইরে লুকোবার জন্যে যেন ছেলে-মানুষের মতন হৈমন্তী মাঠে নামল, মাঠে নেমে তাড়াতাড়ি সরে যেতে লাগল।

গাড়িটা কাছে এল, একেবারে কাছাকাছি। চলেই যাচ্ছিল যেন, যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেয়ে গেছে অবনী।

হৈমন্তী হঠাৎ কেমন লজ্জিত হল। নিজের ছেলেমানুষির জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে আস্তে আস্তে কাছে এল।

"ওদিকে কোথায়?" অবনী শুধলো।

জবাব দেবার তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না হৈমন্তী; গাড়ির পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

"আসুন—" অবনী গাড়িতে উঠতে বলল।

সামান্য পথ, হেঁটেও যেতে পারত

হৈমন্তী; শুধু গাড়িতে উঠল।

"মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছিলেন কেন?" অবনী আবার শুধলো।

"এমনি; মাঠে একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

"ডাকলেন না তো আমায়?" অবনী বলল,

হৈমন্তী ভেবেচিন্তে বলল, "ডাকার আর কি ছিল, আমিও তো ফিরছিলাম।......"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

"আপনি কি আমার ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করছিলেন নাকি এ কদিন?' হৈমন্তী বলল, গলায় খানিকটা পরিহাস, খানিকটা বা গাম্ভীর্য।

অবনী প্রথমটায় বুঝতে পারে নি, পরে বুঝতে পেরে হাসল। বলল, "না, এখনও করি নি।...ভাবছি ওটা বিজলীবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দেব।"

"নিজের কাঁধ পরিষ্কার রেখে পরের কাঁধে বোঝা চাপানো! খুব চালাক লোক আপনি।" হৈমন্তী বলল, বলে হাসল। অবনীও হাসতে লাগল।

দেখতে দেখতে অন্ধ আশ্রমের ফটকের কাছে গাড়ি এসে পড়ল। হৈমন্তী বলল, "আপনার সেই ওপরঅলারা এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"খুব ব্যস্ত ছিলেন কাজেকর্মে?"

"না; ওপরঅলারা একদিন থেকেই পালাল। ...এপিডেমিকের ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম।" অবনী হাসল।

"তবে?"

"আমার এক বন্ধু এসেছিল", অবনী বলল, "কলকাতা থেকে।"

হৈমন্তী তাকাল, কিছু বলল না।

গাড়িটা হৈমন্তীর ঘরের কাছে থামাল অবনী, থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল। বাতি নেবাল।

হৈমন্তী নামল, অবনীও নেমে পড়ল।

"এখানে নতুন হাসপাতাল হয়েছে, জানেন?" হৈমন্তী বলল।

"নতুন হাসপাতাল।...ও সেই...যা বলছিলেন।...কোথায়?"

হৈমন্তী আঙুল দিয়ে সবজি বাগানের দিকটা দেখাল। এখান থেকে কিছু দেখা যায় না। পেট্রোম্যাক্স বাতিটা আজ ওদিকে জ্বলছে।

"ডাক্তার টাক্তার এসেছে?"

"হ্যাঁ; ডাক্তার, নার্স, সিস্টার, ওষুধ-পত্র...। ব্যবস্থা ভালই হয়েছে।"

"রুগী?"

"আসছে। এখন চারজন রয়েছে। দশটা বেড।"

"তার কি হল? সেই যে—যে-ছোকরা এসেছিল?"

"হরিকিষণের ভাই!...বেচারী মারা গেছে।"

অবনী মুখ ফিরিয়ে তাকাল; আহত ও ব্যথিত হয়েছে। চুপচাপ। হৈমন্তীর পাশা-পাশি বারান্দায় এল। মালিনীর গলা শোনা যাচ্ছে, তার ঘরে কেউ আছে, কথা বলছে জোরে জোরে।

হৈমন্তী নিজের ঘরের সামনে এসে দরজার শেকল খুলল। মালিনী ঘরে বাতি জেবলে রেখে গেছে। বাতির শিস নামানো, আলোর একটু ভাব হয়ে আছে ঘরে; হৈমন্তী এগিয়ে এসে বাতির শিস বাড়িয়ে দিল, জানলা খোলা, বাতাস আসছিল।

অবনী বলল, "আমাদেরও একটা কুলি মারা গেছে শুনলাম। কুলি ক্যাম্পে ছিল, শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়ি গিয়েছিল, সেখানেই মারা গেছে।"

হৈমন্তী কিছু বলল না; বলার কিছু নেই। অবনী দাঁড়িয়ে আছে।

সামান্য পরে হৈমন্তী বলল, "আমার কেমন মনে হচ্ছে, রোগটা এইবার আস্তে আস্তে যাবে।"

"যাবে!"

"আবার কি! মাস দুয়েক হতে চলল। ...এতদিন কেউ গা করে নি, নয়ত এতটা বাড়াবাড়ি হত না। এখন গা লেগেছে।... ওমা, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, বসুন..।" বলে মাঝপথে যে-কথাটা ছেড়ে এসেছিল আবার সেটা ধরল, "এতদিনে বেশ চাড় হয়েছে। তাছাড়া, এই রোগটা একেবারে আচমকা, অদ্ভুত; ভাইরাস থেকেই হচ্ছে বোধ হয়। গোড়ায় গোড়ায় ধরা পড়লে মরার তেমন ভয়ও নেই। কমপ্লিকেসান হয়ে গেলেই মুশকিল।"

অবনী বসল। বলল, "আপনি কি মত পালটাচ্ছেন নাকি?"

"না। কেন?"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে", অবনী হাসল, "হঠাৎ এতটা অভয় দিচ্ছেন—"

"না, না। হৈমন্তী মাথা নাড়ল। "আমি তো এমনিতেই যাচ্ছি।"

অবনী এবার কিছু বলল না। অল্প সময় চুপচাপ। হৈমন্তী বিছানার একপাশে বসেছে।

শেষে অবনী বলল, "সুরেশ্বরবাবু এখন কি করছেন? তাঁর ক্রিয়াকর্ম আপাতত কি?"

"এখন তো খুবই ব্যস্ত। এই এখানে নতুন হাসপাতালের ব্যবস্থা করা......থাকা-টাকার ব্যাপার ঠিক করে দেওয়া। তাছাড়া শুনেছি, শিবনন্দনজীকে এদিক ওদিক পাঠাচ্ছেন, যেন গাঁ গ্রামে কারও অসুখ করলে সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসে।"

অবনী শুনল। শুনতে শুনতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। "সেদিন—আপনার এখান থেকে ওঁর কাছে গেলাম, বিজলীবাবু ছিলেন, মেজাজটা কেন যেন ভাল ছিল না, খানিকটা তর্কা-তর্কি হয়ে গেল।..."

হৈমন্তী অবনীর চোখ মুখ লক্ষ করল। মনে হল অবনী সেদিনের কোনো বিরূপতা অথবা তিক্ততা আজ আর মনে রাখে নি।

"কি নিয়ে তর্ক?" হৈমন্তী জানতে চাইল।

অবনী সে-কথা জবাব দিল না। বলল, "ভদ্রলোক সংসারের কিছু দেখেন নি। একেবারে অন্ধ।"

হৈমন্তী কিছু বলল না, বরং সকৌতুক চোখে তাকিয়ে থাকল, যেন সংসার সম্পর্কে অবনীর কতটা অভিজ্ঞতা আছে জানার কৌতূহল সে অনুভব করছিল।

অবনী সিগারেট ধরাল; সামান্য হেসে বলল, "ভদ্রলোক বোধ হয় মনে মনে ক্ষুণ্ণই হয়েছেন। আমি পরে একটু লজ্জাই পাচ্ছিলাম।"

"ওই একটা তুচ্ছ কথাতেই ক্ষুণ্ণ হবে..."

"না, একটা নয়; আরও কি যেন সব বলেছিলাম।" বলে অবনী যেন নিজের সেদিনের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে হাসল। পরে বলল, "আমায় একবার সুরেশ-মহারাজের কাছে যেতে হবে..."

"মাপ চাইতে—?" হৈমন্তী পরিহাস করে বলল।

"না—" অবনী সরল গলায় হাসল, "মাপ চাইতে নয়। ওঁকে কিছু টাকা দেবার আছে।"

"টাকা?" হৈমন্তী বিস্মিত হল।

"আমার মনে হয় উনি কিছু টাকার টানাটানিতে পড়েছেন; বিজলীবাবুকে বলে-ছিলেন। টাকাটা এনেছি।"

"আপনি কি আশ্রমে দান করছেন নাকি?"

"আমি! না, আমি দান করব কেন? আমার টাকা কোথায়! বিজলীবাবু দিয়েছেন।...উনি নিজে এসে দিলেই ভাল হত। আসতে পারলেন না।"

"ও!" হৈমন্তী অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

অবনী সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে ট্রাউজার্সয়ে ফেলল, হাত দিয়ে ঝেড়ে নিল। বলল, "একবার, এই আশ্রম করার সময় সুরেশ্বরবাবু কিছু চাঁদার জন্যে আমায় বলেছিলেন, আমি দিই নি।...তখন এসব আমার পছন্দ হত না।......চাঁদাটাঁদার জন্যে আর কখনও আমায় কিছু বলেন নি উনি।... এই টাকাটা বোধ হয় ধারকর্জ করলেন। আমাদের স্টেশনের দিকে ওঁর কিছু মাড়োয়ারী ভক্ত আছে।"

হৈমন্তী নীরব থাকল।

অবনী কিছু সময় অপেক্ষা করে বলল, "টাকাটা বিজলীবাবু নিজেও দিতে পারেন—, জানি না। আমায় তো তা বললেন না। লজ্জায় বোধ হয়।"

"কি জানি!" হৈমন্তী পরিহাস করে বলল, "আপনিও দিতে পারেন; লজ্জায়

বলছেন না।"

"না—না", অবনী মাথা নাড়ল জোরে, "আমি নয়।"

"অত না না-র কিছু নেই। দিলেই না—।" হৈমন্তী হেসে উঠল, "সৎ কাজে দিচ্ছেন তো।"

অবনীও হাসল। "তখন দিই নি ঠিক, কিন্তু এখন যদি সুরেশ-মহারাজ আমায় বলতেন, হয়ত যথাসাধ্য সাহায্য করতাম।"

"করতেন।...তবে তো আপনিও দেখছি ও'র ভক্ত।"

"ভক্ত নয়। তবু ভদ্রলোককে কোনো কোনো ব্যাপারে আমার ভাল লাগে।"

"আগে লাগত না—"

"আগে এতটা পরিচয় ছিল না। জানতাম না তেমন। এখন মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি।" অবনী ধীরস্থির গলায় বলল, সামান্য অন্যমনস্ক। "দোষ যে নেই তা বলব না, দোষ আছে ভদ্রলোকের, অন্তত আমার চোখে। তবু, মানুষটি ভাল।"

হৈমন্তী শেষবারের মতন যেন পরিহাস করার চেষ্টা করল, "এত প্রশংসা—?"

"সুরেশ-মহারাজের নিন্দেও কম করি নি, একটু আধটু প্রশংসা করলে ক্ষতি কি।" অবনী হেসে জবাব দিল।

আর কোনো কথা হল না। দু জনেই চুপ করে থাকল। হৈমন্তী বসে থাকতে থাকতে উঠল, বলল, "বসুন, মালিনী আছে কি না দেখি, চা খেয়ে যান।"

হৈমন্তী চলে গেল। অবনী বসে থাকল। জানলা দিয়ে সন্ধ্যের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, বাইরে কোথাও চিপ্ চিপ্ করে একটা পোকা ডাকছে, গাছপাতায় মৃদু খসখসে শব্দ, অবনী অন্যমনস্ক, শূন্যদৃষ্টি, হৈমন্তীর বিছানার দিকে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবছিল।

হৈমন্তী ফিরে এল।

"মালিনী বলছিল—" হৈমন্তী বলল, "অফিসে ওর ভাইকে একটা খবর দিয়ে দিতে ঃ ও ভাল আছে। ওর মা খুব চিন্তা করেন, এখানে অসুখ বিসুখ..."

অবনী তাকাল, হৈমন্তীকে দেখল। "ও বাড়ি যায় না?"

"যায়; তবে এখন আর যেতে পারছে না।"

"কেন? ও কি করে?"

"কি আর, এই কাজকর্ম। ওর দাদাকে দেখাশোনা করে..." হৈমন্তী যেন একটু ব্যঙ্গ করল।

অবনী বুঝতে পারল। কিছু বলল না।

হৈমন্তী বসল। দু এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর বলল, "আমি আগামী রবিবার যাচ্ছি। গগনকে চিঠি লিখে দিয়েছি।"

"আগামী রবিবার...কত তারিখ পড়ছে?"

"উনিশ কুড়ি হবে—" হৈমন্তী হিসেব করল, করে শুধরে নিয়ে বলল, "উনিশ তারিখ।"

অবনী যেন মনে মনে দিন-ক্ষণ ভেবে নিল। বলল, "যাবার আগে আমাদের ওদিকে আসুন একদিন।"

"ফেয়ারওয়েল নিতে?" হৈমন্তী হাসল।

অবনীও হাসির মুখ করল। "এক রকম তাই।"

"যাব। বিজলীবাবুর বাড়িতে দেখা করে না গেলে খারাপ দেখাবে।"

"কবে যাবেন?"

"পরশু দিনও যেতে পারি।"

"পারি কেন, আসুন। পরশুই আসুন।"

"আজকাল খেয়াল মতন বাস আসে। প্যাসেঞ্জার না থাকলে দুপুরে আসেই না।"

"যে কোনো বাসে চলে আসুন। সকালে হলেই ভাল।...আমরা ফেয়ারওয়েলের জন্যে ফুলের তোড়া মালটালা ঠিক করে রাখব।" অবনী ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলল।

হৈমন্তী ভ্রু-ভঙ্গি করে তাকাল। হেসে বলল, "কলকাতায় যেতে যেতে ফুল সব শুকিয়ে ঝরে যাবে। গগনকে আমি বিশ্বাস করাতে পারব না, আমার ফেয়ারওয়েল হয়েছিল।"

অবনী জোরে জোরে হাসতে লাগল। পরে বলল, "আমিও কলকাতা যাচ্ছি।" এমন ভাবে বলল যেন প্রয়োজন হলে সে গগনের কাছে সাক্ষী দিতে পারে।

"আপনিও যাচ্ছেন! কবে?"

"একটু দেরি আছে। আসছে মাসে।"

"অফিসের কাজে?"

"অফিস...। না; কলকাতায় আমাদের অফিসের কিছু নেই, আমাদের সব পাটনায়।" বলতে বলতে অবনী থামল, প্রথমে মাটির দিকে তাকাল, পরে ছাদের দিকে। মনে হল সে প্রসঙ্গান্তরে এসে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ছে।

মালিনীর পায়ের শব্দ উঠছিল বারান্দায়; চা নিয়ে ঘরে এল।

হৈমন্তী উঠে মালিনীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিল, নিয়ে অবনীর দিকে বাড়িয়ে দিল।

মালিনী চলে গেলে হৈমন্তী নিজের জায়গায় এসে বসল। অবনী চায়ে চুমুক দিয়েছে মাত্র। তার মুখ এখন কেমন গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

হৈমন্তী বলল, "তবে কলকাতায় কেন? বেড়াতে?"

অবনী কিছু বলল না, মাথা নাড়ল আস্তে ঃ না বেড়াতে নয়।

হৈমন্তী সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল।

অবনী মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। কলকাতা থেকে কমলেশ এসেছিল। চিঠিতে সব হয় না, কথাবার্তা ছিল অনেক। ললিতা এখন পুরোপুরিভাবে অন্যের কাছে থাকছে। কুমকুমকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়েছে, মাসি মামার কাছে। আসে কখনও কখনও। তার নামের টাকাটা নেয়। ললিতা বুঝে ফেলেছে, কুমকুম হঠাৎ বাপের সোহাগী হয়ে গেছে ঃ 'শয়তানের মেয়ে তো, ওই এক রত্তি হলে কি হবে পেটে পেটে শয়তানী।' কমলেশকে ললিতা আরও অনেক কিছু বলেছে ঃ 'রাখো, রাখো, ন্যাকামি করো না। আমি জানি ওই হারামজাদী তার পেয়ারের বাপকে চিঠি লেখে।...তুমি তো তোমার বন্ধুর স্পাইগিরি করছ। আমি বারে গিয়ে মদ গিলি এ-সব তুমি বলেছ। মেয়ে জেনেছে তো আমার বয়েই গেছে। পেটে ধরেছি তো কি হয়েছে, আমার অত মা-মা আদুরেপনা নেই। আমি না হলে অন্য কেউ তোমার ওই গুণধর বন্ধুর মেয়ে পেটে ধরত না। আমি কেয়ার করি না, যাও যাও তোমার বন্ধুকে লিখে দিও...... ডিভোর্সের ব্যবস্থা করুক...আমি অ্যাডাল-ট্রেস... হ্যাঁ—বেশ করি আমি অন্য লোকের সঙ্গে থাকি। থাকব, থাকব। নিয়ে যাক তার বাপ মেয়েকে। মেয়ে একবার চিনুক কেমন বাপ। কুত্তা, বংশের ঠিক নেই, যার মা থিয়েটারের মাগী ছিল, বাপ...'

ঠন্-ন্-ন্ করে শব্দ হল। চমকে উঠল অবনী। তার হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে পড়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেছে।

হৈমন্তীও চমকে উঠেছিল। ভাঙা পেয়ালা, ছড়ানো চা, অবনীর সচকিত বিহ্বল ভাব—দেখতে দেখতে হৈমন্তী অবাক হয়ে বলল, "কি হল?"

অবনীর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। গলার কাছটাও জল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ট্রাউজার্সের ওপর থেকে চা ঝেড়ে ফেলতে লাগল; পকেট থেকে রুমাল বের করল। বিব্রত, আড়ষ্ট। "না—হঠাৎ কেমন হাতটা...। বড্ড গরম...।" অবনী কপাল মুখ মুছে ফেলল। অতিরিক্ত বিহ্বল যেন।

"শরীর খারাপ লাগছে?"

"না, না।" মুখ মুছে অবনী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল, "বুঝতে পারলাম না—হঠাৎ কেমন...।"

"মাথা ঘুরে গেল?"

"না।"

"অন্য দিকে তাকিয়ে কি অত ভাবছিলেন?"

"কিছু না। তেমন কিছু নয়।"

"বাঃ, ভাবছিলেন—"

"সে রকম সিরিয়াস কিছু নয়।...হঠাৎ পুরোনো একটা কথা মনে পড়ল..." অবনী যথাসাধ্য সংযত ও সুস্থ হবার চেষ্টা করল। "ছি ছি, কাপটাপ ভেঙে একটা কেলেংকারী কান্ড করে ফেললাম।" অবনী লজ্জিত।

"জামাটামায় যে একরাশ চা ফেললেন—" হৈমন্তী উঠে জল গড়িয়ে দিতে গেল।

"উঠে যাবে।" অবনী বলল।

"গেলে ভাল। তবে এমন দাগ যায় না।"

অবনী তাকাল, হৈমন্তীর দৃষ্টি লক্ষ করল। মনে হল, হৈমন্তীর বিস্ময় ও কৌতূহল যেন আরও গভীর হয়েছে।

জল দিয়ে চায়ের দাগ মুছতে মুছতে অবনী বলল, "আমি সুরেশ্বরবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি। টাকাটা না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।"

হৈমন্তী ঘাড় হেলিয়ে বলল, "আসুন।"

অবনী চলে গেল।

(ক্রমশ

বিধানসভা প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য কংগ্রেস কতিপয় সঙ্গীত-শিল্পী নিয়োগ করিয়াছেন; উদ্দেশ্যঃ শিল্পীরা ভোটারদের প্রেরণা যোগাইবেন।—"প্রতি-পক্ষও নীরবে বসে নেই। শুনেছি কোন

কোন পার্টি তাদের দলীয় পতাকাটিকে তারকা-লাঞ্ছিত করে গ্ল্যামার-এর আয়োজন করেছেন। কথায় বলে,—ন বিদ্যা গানাৎ পরা। তবু দেখা যাক গান, না গ্ল্যামার-এর আবেদন বড়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

নির্বাচন প্রসঙ্গে অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, ভোট-প্রার্থীরা নাকি আঠা ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছেন। আঠার অভাবে দেয়ালে-দেয়ালে (এবং কোথায় নয়) পোস্টার সাঁটার কাজ ব্যাহত হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"ব্যাপকভাবে আঠা ব্যবহার না করে প্রার্থীরা যদি আঠা-কাঠির ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তা পোস্টারের চেয়েও কার্যকর হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে চোপাও খুব কার্যকর কিন্তু সেটা সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত!!"

সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্র নাকি সমস্ত রাজ্য সরকারকে ইঁদুর-নিধন যজ্ঞে আরও তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়েছেন।—"কেন্দ্রের নির্দেশ শিরোধার্য করে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোন; গণেশ তো বহুদিন আগেই উল্টে গেছেন সুতরাং কোন দিক থেকেই কোন সম্ভাব্য প্রতিরোধের আশঙ্কা নেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে বছরে ৫৮ হাজার লোক নাকি কলিকাতা আসিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"আসতেই হবে। তাঁরা যে শুনেছেন—নিবে আর নিবে, যাবে না ফিরে!!"

গুরু গোবিন্দ সিং-এর ত্রিশত জন্ম বার্ষিকীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন, গুরু গোবিন্দ আমাদের প্রেরণার উৎস। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু তাঁর হরি-মন্দিরের অব্যবস্থার বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, উদ্ভট খৈ গোবিন্দায় নমঃ করা ছাড়া অন্য কোন প্রেরণাই আমরা লাভ করিনি!!"

অভিমত-ভোটে প্রকাশ, গোয়া কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেই থাকিতে চায়। সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বোঝা গেল, লাভের আবেদন এখনো অম্লান!!"

চীন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, সেখানে শ্রমিকরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেঃ অতিরিক্ত মজুরীর চেয়ে ছাড়া কিছু নয়; আর্থিক উন্নতি ঘৃণ্য জিনিস; মোংরা টাকা কে চায়।—"মাটি টাকা, টাকা মাটি আমরা শুনেছি কিন্তু আমরা 'মানতে হবে' 'দিতে হবে', 'চলবেনা-চলবেনা'ও শুনেছি। চীনের নূতন পাঠ কী করে সংশোধিত এবং গৃহীত হবে তাই ভাবছি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

একটি ইংরেজি পত্রিকার সংবাদ-শিরো-নামায় পড়িলাম, পশ্চিমবঙ্গের সচিব মহোদয়গণ নাকি 'নির্বাচন-জ্বরে' ভুগিতে-ছেন।—"কোন চিন্তার কারণ নেই। শুধু

আয়ুর্বেদের নির্দেশটি মনে রাখতে হবে অর্থাৎ জ্বরের আদিতে লঙ্ঘনই পথ্য"—বলেন সহযাত্রী।

একটি সংবাদঃ সমস্যা জর্জরিত বর্তমান কলকাতার চেহারা এবং প্রকল্পগুলি কার্যকর হলে কলকাতার রূপ কীভাবে বদলে যাবে সে সম্পর্কে তথ্য কেন্দ্রে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শ্যামলাল বলিল—"[illegible] [illegible] [illegible] হলে তাঁর চেহারায় কী পরিবর্তন হবে তা-ই প্রদর্শনী [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে!!"

সাহিত্য অকাদেমি কি এবং কেন' বই হইতে একটি 'তথ্য' সংগ্রহ করিয়া জনৈক সহযোগী-পত্রিকার উপহার দিয়াছেন; উহার এক স্থানে নাকি লেখা আছেঃ "রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন"। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের কোন এক স্থানে বেড়াতে গেলে সেখানকার জনৈক নবাবজাদা নাকি তাঁকে বলেছিলেন—কবি দুইজনই দেখলাম, এক আপনি, আর একজন হরি আচার্য (মানে জনৈক কবিয়াল)। কিন্তু এটিও "সাধারণ জ্ঞানের" একটি তত্ত্ব এবং তথ্য!"

সম্প্রতি শুনিলাম, এবার কেঁদুলির মেলাতে বাউলরা মাইকের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিয়াছেন।—"এটা শেপ অব

থিংগস টু কাম—এরই ইঙ্গিত। অদূর ভবিষ্যতে তানপুরো-হারমোনিয়াম এবং সঙ্গে তবলা সঙ্গতের ব্যবস্থা করলেই মজুব আরো জোরদার হবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে দমদম বিমান-বন্দরে সাংবাদিকগণ শ্রীমোরারজী দেশাইকে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—(১) প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য তিনি প্রার্থী হইবেন কিনা এবং (২) প্রধানমন্ত্রীর পদে শ্রীমতী ইন্দিরাকে সমর্থন করিবেন কিনা। সংবাদে প্রকাশ, মোরারজী একটি প্রশ্নেরও জবাব দেন নাই। শ্যামলাল বলিল—"দেশাইজী কঠিন রাজনীতিবিদ, তিনি জানেন বোবার শত্রু নেই!"

রুশ পণ্ডিতেরা নথিপত্র ঘাঁটিয়া দেখাইয়া-ছেন যে, মাও সে-তুং-এর কবিতাবলী নাকি জোচ্চুরি মাল। "কিন্তু তাঁর নিছক গদ্যপদ্যী" [illegible] কিন্তু তাঁর নিজস্ব, কোথাও কবিতার কোন বাষ্প মাত্রও নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলকাতার ডায়েরী

আনন্দবাজারের অফিসে শকুন্তলা দেবী

হিসেব কষার যন্ত্র বসিয়ে যন্ত্রণায় পড়েছেন বীমা কোম্পানি। কর্মচারী-দের আক্রোশ অটোমেশনে, মানুষের উপরে যন্ত্রকে ঠাঁই দিতে তাঁরা নারাজ। তাই নিয়ে রোজ মিছিল, পথ ঘেরাও, নানা রকম ঝামেলা।

আমার বক্তব্য, ক্রোধটা যদি যন্ত্রের উপর হয়, তা হলে কম্পিউটার মেশিন বসানোর কী দরকার, মোটা মাইনের শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীকে এল-আই-সি'তে একটি চাকরি দিয়ে দিলেই হয়। তাড়াতাড়ি নির্ভুল হিসেব কষা যদি একান্তই দরকার, তা হলে তিনি একাই তিন-চারটে কম্পিউটারকে হার মানাবেন এবং 'যন্ত্রের উপরে মানুষ সত্য' স্লোগানটি যথাপূর্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

অসাধারণ এই কর্নাটকী মহিলা—বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। সেকালের শুভংকর এবং একালের আই-বি-এম মেশিনকে তিনি তাঁর ভগবদ্দত্ত ক্ষমতায় নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারেন।

গণিতে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় মেলে সেই ছ' বছর বয়স থেকে। তারপর ইউরোপ, আমেরিকা, আফরিকা, পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সব গণিতবিদ্‌কে অবাক করে দিয়ে ইতিমধ্যেই দিগ্বিজয় করে ফেলেছেন।

১৯৫০ সালে প্রথম পাড়ি দেন লনডন। সেখানে বি-বি-সি'র প্রোগ্রামে নেমে মুখে মুখে পলকে পলকে এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন যে, সকলের ভিরমি খাবার জোগাড়। সেবারই রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আট-নয় সংখ্যার একটি জবর অঙ্ক কয়েক সেকেনডে করে দেখার পর গণন-যন্ত্রে দেখা যায় অন্য রকম উত্তর, শকুন্তলা দেবীর উত্তরের সঙ্গে মিল নেই। তিনি বললেন, উঁহু, হতেই পারে

আডা গার্ডনার ও শকুন্তলা

না, যন্ত্রই ভুল। ঠিক তাই, পরীক্ষা করে দেখা যায়, শকুন্তলা দেবী নয়, যন্ত্রই মিছে কথা বলেছে।

রাতারাতি তাঁর নাম ছড়িয়ে যায়। তাঁকে নিয়ে কত রকম গবেষণা, কত রকম আলোচনা। ইউরোপ আমেরিকায় সর্বত্র তাঁকে দেখার জন্য ভিড়। রাজা-মহারাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সবাই কুর্নিশ জানান ভারত-কন্যা এই শকুন্তলাকে। হলিউডেও গিয়েছিলেন একবার, সেখানে তাঁকে দেখার জন্য ছুটে আসেন নামী নামী অভিনেতারা। আভা গারডনার শুটিং ফেলে রেখে এসে ছবি তোলেন শকুন্তলার সঙ্গে। খবরের কাগজ লিখল—'দি ভারজিন ফ্রম ইনডিয়া ইজ ইনডিড এ মারভেল।'

সেই শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ গত সপ্তাহে। জাদুকররা যেমন আসর পেলেই তাস কিংবা টাকার খেলা মুফত দেখান, তেমনি একটি আসরে বসে গণিতের ভানুমতী তাঁর অঙ্কের খেলা দেখাচ্ছিলেন। দোহারা চেহারা, মুখে সব সময় দক্ষিণ ভারতীয় মৃদু হাসি, কানড় ছাঁদে কবরী বাঁধা এবং কথাবার্তায় সদা-সপ্রতিভ।

বললেন, বলুন তো আপনার বিয়ের তারিখ? কত বললেন, চৌদ্দই ডিসেমবর? সাল? ১৯৫৮? বেশ, বার হচ্ছে রবিবার।

ঠিক তাই। তারপর একের পর এক নানা রকম খেলা। আমরাও বার বার অবাক।

শকুন্তলা দেবী জানালেন, জন্মের এক মাস আগে বাবা এবং এক ঘণ্টা পরে মা মারা যাবার পর একমাত্র সহায় হন ভগবান, তাঁরই কৃপায় তিনি এই ক্ষমতার অধিকারী। শকুন্তলা দেবী এখনও বিয়ে করেননি, কেননা, এখনও 'মনের মানুষ' মেলেনি।'

তাঁর অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল কলকাতায় আসার। এতদিন পরে সুযোগ মিলল। আছেন রাসবিহারী এভিনিউ-এর কমলা-বিলাসে। অঙ্কের খেলা দেখাবেন কয়েকটি জায়গায়।

তবে এবারে কলকাতায় আসা তাঁর সার্থক হল না। কেন? আবার কেন: ভেবেছিলেন, এই শহরে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবার রসগোল্লা খাবেন পেট পুরে, এসে দেখেন কলকাতা এখন নী-রসগোল্লা।

—'আচ্ছা, রসগোল্লা ছাড়া আপনারা আছেন কী করে? —শকুন্তলা দেবীর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা।

✻

শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলশ্রুতিরূপে কলকাতার ডায়েরি-র পাঠকদের একটি অঙ্কের খেলা শিখিয়ে দিই, অনেককে তাক লাগাতে পারবেন।

তারিখ জেনে বার বলার কায়দা শিখতে হলে গোড়ায় কয়েকটি সংখ্যা সড়গড় করে রাখুন। ১৪৪, ০২৫, ০০৬, ১৪৬। জানুআরি থেকে ডিসেমবর বারটি মাসের এইগুলো বারটি সাংকেতিক সংখ্যা। জানুআরি যদি ১ হয়, তা হলে এপরিল ০, নবেমবর ৪, এবং জুন ৫।

ধরুন একটা তারিখ—১৯৬৭ সালের ২৬ জানুআরি। প্রথমে নিন সালের শেষ দুই সংখ্যা—৬৭। তার সঙ্গে যোগ দিন ৬৭-র চার ভাগের এক ভাগ ১৬। এই সঙ্গে যোগ দেন তারিখ—২৬ এবং সাংকেতিক সংখ্যা ১। যোগফল দাঁড়াল ১১০। তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্ট রইল ৫। এই অবশিষ্টই বার। রবি থেকে গুণতে হবে। ১ যদি রবি হয়, তা হলে ৫ কী? —বৃহস্পতিবার।

আর একটি নম্বর দিন ১৯৫৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর। ৫৮ (সাল)+১৪ (চার ভাগের এক ভাগ)+১৪ (তারিখ)+৬ (সাংকেতিক সংখ্যা)=৯২। তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ১৩ পাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে ১। অর্থাৎ রবিবার।

দেখুন পুরোনো পাঁজি কিংবা ক্যালেনডার মিলিয়ে, ঠিক আছে কিনা। প্রথমে অবশ্য মেলাতে একটু সময় লাগবে, খানিক প্র্যাকটিস করলেই পরে তিরিশ সেকেণ্ডের বেশী লাগবে না।

শকুন্তলা দেবীর অবশ্য দু' সেকেণ্ডের বেশী লাগে না। তা হোক, আমরা কেউই

তো ওঁর মত ভগবৎ-কৃপা পাইনি, অতএব তিরিশ কেন ষাট সেকেণ্ড লাগলেও বাহবা মিলবে।

✻

আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিরাট দুটো পুতুল, একটি চল্লিশ ফুট, অন্যটি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। রণেন আয়ান দত্তের তৈরী। কলকাতা শহরে এত বড় পুতুল আমি এর আগে দেখি নি। চারধারে আলোর রোশনাই। ছোটরা কেন, বড়দেরও ভিতরে যাবার লোভ হয়।

গিয়ে অবশ্য ঠকিনি। দেখি, দেশপ্রিয় পারকের এক কোণে ছোটখাট একটি ডিজনি-ল্যাণ্ড। নানা রকম খেলা, নানা রকম খাবার,—নাচ-গান-হল্লা। ওখানে বসেছিল শিশুমেলা, আয়োজন করেছিলেন 'পাঠভবন।' তাদের স্কুলের জন্যে টাকা তুলতে রবীন্দ্র-সদন আর নিউ এমপায়ারে আয়োজন করা হয়েছিল বালা সরস্বতীর নাচ, ওই শিশুমেলার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

শহরে শিশুদের বিনোদনের জায়গা কোথাও নেই। সবেধন নীলমণি চিড়িয়াখানায় শিশু-উদ্যান। এই শিশুমেলা

শিশু মেলায় দুই দানব—পুতুলের মাথা

দেখতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে, এই রকম একটা কিছু সারা বছরের জন্যে পাকা-পাকি বন্দোবস্ত রেখে দিলে মন্দ হয় না। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা খাবে, খেলবে, মজার পর মজায় মজে বাড়ি ফিরবে।

করপোরেশনের কাছে আমার প্রস্তাবটা রইল, তাঁরা যেন বিবেচনা করে দেখেন।

✻

কানেকটিকাট থেকে কর্ণাটক অনেক দূর, কিন্তু এই দূরকে নিকট করে ফেলেছেন এক

হিগিনস

মারাকিন যুবক, তাঁর নাম জন হিগিন্‌স্‌। সেদিন কলকাতার এক গানের আসরে কর্ণাটকী সংগীত নির্ভুল পরিবেশন করে সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন হিগিনস। শুধু গলায় কৌশলে নয়, তার হাবভাব, হাতনাড়া পোশাক পরিচ্ছদ (ধুতি পাঞ্জাবিতো পরনে ছিলই, কপালে কুমকুমের টিপ পর্যন্ত বাদ পড়ে নি) দেখে কে বলবে তাঁর বাড়ি দূর মারকিন মুলুকের কনেকটি-কাট রাজ্যে।

১৯৬২ সালে আমেরিকায় বালা সরস্বতীর নাচ দেখে হিগিনস আকৃষ্ট হন দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে। ওয়েজলেয়ান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ ডিগ্রিধারী ছাব্বিশ বছর বয়সের হিগিনস সেদিনই ঠিক করলেন এই গান শিখতেই হবে। ফুলব্রাইট স্কলার হয়ে ১৯৬৪ সালে চলে আসেন ভারতে। তার-পরই তালিম নিতে লাগলেন মাদরাজের নামকরা সংগীতগুরু টি বিশ্বনাথনের কাছে।

দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চারণে হিগিনসের কণ্ঠে গমকের খেলা দেখে একজন নামকরা সংগীত সমালোচক বলেছেন—'ইন দি পারসন অব জন হিগিনস, উই হ্যাভ দি ট্রিবিউট হুইচ এ গ্রেট মডার্ন সিভিলাইজে-শন পেইজ টু এন ওল্ড অ্যান্ড এনশিয়েন্ট কালচার।"

✻

বাংলায় 'উজবুক' শব্দের অর্থ পালটানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাঠান আমলে উজবেকিস্থান থেকে আসা গোঁয়ারগোবিন্দ উজবেকী সিপাইদের দেখে বাংলা গালা-গালির ভাষায় 'উজবুক' শব্দটি দীর্ঘকাল চালু আছে। সেই পাঠান আমল আর নেই, উজবেকী সিপাইরাও আসেন না, তার বদলে উজবেকিস্থান থেকে ইদানীং প্রায়ই আসছেন নাচ-গানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল সেই দলে যে-সব মেয়েরা থাকেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অসামান্য সুন্দরী। কিছুদিন আগে কলকাতায় 'বাহার' দলে যে-সব নর্তকীরা এসেছিলেন, তাঁদের এক-একজন ডানাকাটা পরী। দেখে মনে হয়েছে ওদেশে কোন তরুণীই যেন কুরূপা নন। সুতরাং এখন থেকে যদি 'সুন্দরী' অর্থে আমরা 'উজবুক' শব্দ ব্যবহার করি তাহলে কথাটার সুবিচার হয় এবং ভারত-উজবেকি-স্থান মৈত্রীও আরও জোরদার থাকে।

কী, আমাদের দেশের সুন্দরীরা রাজী তো?

চাণক্য

জগতে সবত্র চোখের জল : রুয়োর "মিসেরের" পর্যায়

আমার এই অভিজ্ঞতাটা কয়েক বছর আগে হয়েছিল—কলকাতার এক গানের জলসা থেকে রাত শেষে হেঁটে ফিরছিলুম, পথের পাশে দেখলুম তালগোল পাকিয়ে ভিখিরিরা শুয়ে ঘুমোচ্ছে, দুটো বুড়ো পাশের ডাস্টবিন খুঁটছে, একটি বাচ্চা হানা দিয়ে মাঝরাতে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে বেরিয়ে একেবারে রাস্তার মাঝে। সবার যেমন হয়, আমারও তেমনি বীভৎস মনে হয়েছিল, নাক্কারজনক ঘৃণ্য লেগেছিল সমস্ত ব্যাপারটা, প্রায় দৌড়ে পার হয়েছিলাম সেই পাড়া। —পরের দিন সকালের চা খেতে খেতে ভাবছিলুম আগের দিনের কথা, খুবই প্রসঙ্গত, হেঁটে ফিরতে কষ্ট হয়েছিল বলে, মনে পড়ল ভিখিরিদের ওই অসহ্য দৃশ্য—আর সবের পরে। যে অভিজ্ঞতা আমাকে আগের রাত্রে পাগলের মত করে দিয়েছিল, দৌড়ে সরে এসেছিলুম, তা পরের দিনই কেন এমন যোগাযোগহীন, বুদ্ধি দিয়ে খারাপ লাগানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল?—অবাক হলুম ভেবে, কী করে আমি সকালে ডিম রুটি খেয়ে বাজারে মাছ কিনলুম: বন্ধুর সংগে দেখা, গল্প করা, হাসিঠাট্টা কী করে বারো ঘণ্টা আগে মানুষের ওই দুর্দশার অভিজ্ঞতার পরও আমার জীবনে সম্ভব হল?

এই প্রশ্নের উত্তর পেলুম সেই সন্ধ্যাতেই—আলোর উজ্জ্বল গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা চীনে কসরত দেখাচ্ছিল, খুব মজা পাচ্ছিল সবাই, লোকটা নাক কুঁচকে যতটা পারে হাসছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে। যখন খেলা শেষ হল, কয়েক আনা রোজগার হল লোকটার, অ্যাসিস্টেন্ট বাচ্চা ছোকরার হাতে লাঠি, বর্শা এগুলো গুঁজে দিয়ে, একটা বিড়ি ধরিয়ে, দাঁড়িয়ে রইল একা একা, আমি ওর থ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখের মজাদার মুখে দেখলুম অদ্ভুত এক অন্ধকার নেবে এল—লোকটা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মনে আছে অনেকক্ষণ। ব্যাপারটায় সত্যি কি কোনো দুঃখ আছে? কিন্তু আমার কাছে সেই দৃশ্য অনেক বেশী বেদনাদায়ক, বিয়োগান্ত এবং মনে রাখবার মতো লেগেছিল আগের দিনের প্রকট যন্ত্রণার চেয়ে। আজও সে মুখ মনে পড়ে, মনে হয়, সেই দৃশ্য আমাকে অনেক বেশী অভিজ্ঞ করেছিল জীবন সম্পর্কে।

আসলে এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রথমটি একটি সমাজচিত্র, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত উপলব্ধি। সমাজের দুর্দশার হেতু সমাজের কাঠামোতেই লুকিয়ে থাকে, আমরা জানি সামান্য মেরামতের ফলে এমন সময় আসা সম্ভব হতে পারে যখন সব ভিখিরি বেঁচে যাবে, ঘর উঠবে, এ কোনো চিরন্তন সমস্যা নয়। তাই অবিলম্ব আঘাত ভেতরে যায় না, বুদ্ধি কিংবা বিবেচনা এইসব দরজাতে গিয়েই থেমে থাকে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা মানুষকে নিয়ে, আত্মার অসুখের, যা চিরদিন থাকবে, যতদিন মানুষ থাকবে—যে অভিজ্ঞতা মৃত্যুর, যে অভিজ্ঞতা জন্মের, ঈশ্বরের, শয়তানের, তা বুদ্ধি পেরিয়ে কেন্দ্রে পেঁছোয় এবং বহু প্রশ্নের, বহু দুঃখের সামনে নিয়ে ফেলে আমাদের। রুয়োর ছবি এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা, সামাজিক নয়, ধর্মীয়। মানুষের নির্বেদ, মানুষের দুঃখ, মানুষের পাপ, যিশুর যন্ত্রণা—রুয়োর ছবির বিষয়; দ্যামিয়েও দুঃখের ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু তা একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ দেশের সমাজের চিত্র বলে সর্বকালের কাছে শাশ্বত নয়।

কিন্তু কোনো শিল্পীকেই মহৎ বলে প্রমাণ করা যায় না তাঁর বিষয়মাহাত্ম্যের জোরে। কীভাবে তা উপস্থিত সেটাই হয়তো আরো প্রয়োজনীয়। তাই আলোচনা এই ধারায় টেনে দেখা যেতে পারে, কীভাবে রুয়ো তাঁর চিন্তা, তাঁর চরিত্রের সংগে আমাদের একাত্মীকরণ ঘটাচ্ছেন।—

সমস্ত কিছুতেই অশ্রু —রুয়ো

আসল্ল একথা। কই মনে হয় না সব মানুষেরই, যখন সে একটি মুখের দিকে গভীরভাবে চোখ ফেলে, যে পৃথিবীতে সেই মানুষটি ছাড়া, সেই মুখটি ছাড়া আর কিছুই নেই? একটিই মানুষ আপনার সামনে, একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সবার চেয়ে আলাদা, জগৎ থেকে ছিটকে আসা, একা, একজন? (গভীর-ভাবে তাকানোর কথাটায় প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যাপার বলছি যেন মনে হয়, আমি কিন্তু যে কোনো দুজনের কথা বলছি)। আসলে তা কেন? মানুষের দ্বারা সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ এক-একটি সমাজ-চিত্র নয়—একটি মানুষ আলাদা করে দেখলে সে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, সার্ত-এর ভাষায় সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য তার মুখ, চোখ, ব্যবহার, কথা বলা সবের উপরেই সমাজের একটা জলরঙ পড়ে, কিন্তু গভীরভাবে তাকালে সে রঙ উঠে একা একটা বুদ্ধিমান বিষণ্ণ জন্তু বেরিয়ে আসে—মানুষের চিরকালের সমস্যা, পুঞ্জীভূত পাপ, অবিরাম নির্বেদ, যন্ত্রণা, প্রস্ফুটিত হয়। রুয়োর ছবিতে লক্ষ করবেন প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রায় কেমন সোজা হয়ে মুখের মুখোশ খুলে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, অচেতন মুহূর্তে সেই চীনে সার্কাসওলার মুখ হঠাৎ যেমন দেখে ফেলেছিলুম, ঠিক সেই রকম মুখ নিয়ে যেন রুয়োর সব ছবিই আমাদের সামনে উপস্থিত। সমাজের জলরঙ তুলে দিয়েছেন, মুখোশ খোলা, একা, নিঃসঙ্গ সব মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

রুয়ো ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এও তাঁর দৃঢ় উপলব্ধি হয়েছিল যে, যতদিন মানুষ আছে পাপ আছে, এবং পাপ মানুষ কখনো এড়াতে পারবে না বলে ঈশ্বরও আসবেন না; অবিরাম, অবিরাম সে দয়া-ভিক্ষা করবে, করুণার জন্য আর্তনাদ শোনা যাবে; আর যিশু ক্রুশে ছটফট করবেন যন্ত্রণায়। এ উপলব্ধি যেন তাঁর আরো প্রবল হল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। "মিসেরের" ("করুণা করো!") পর্যায়ের ছবি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রুয়োর জীবনের এক ভয়ঙ্কর সময় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের কয়েকটি বছর। এক ভয়ঙ্কর উপলব্ধি হয় তাঁর, মানুষ বিষয়ে হতাশ তাঁকে অস্থির করে তোলে, পৃথিবীতে নৈরাশ্য, পাপ আর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই বুঝতে পারেন। এ পর্যায়ের সমস্ত ছবিগুলি না দেখলে ভালো করে উপলব্ধিই করতে পারব না কত বড় ধাক্কা পেয়েছিলেন তিনি। এই সব ছবির তিনি নাম দিয়েছিলেন, বলতে গেলে এক একটি কবিতার লাইনের দ্বারা। পর পর ছবিগুলির কয়েকটি তাঁর রচিত কবিতার আকারে রাখলে দেখবেন, উনি প্রত্যেকটি ছবিকে আসলে কবিতার অনুবাদ করেছিলেন—হয়তো এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, সত্যি উনি এ পর্যায়ে কোন চিন্তায় ডুবেছিলেন [১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি বসাচ্ছি এক একটি ছবির নামের পাশে]:

1. It is hard to live.
2. Are we not all convicts?
3. Who does not paint himself a face?
4. Lonely sojourner in this life of pitfalls & malice.
5. We think ourselves kings.
6. To-morrow would be beautiful, said the shipwrecked man.
7. Mouth that was to be fresh, bitter as gall.
8. Man is a wolf to man.
9. We are insane.
10. In all things tears.
11. We all must die, we and all we possess.

রুয়োর "মিসেরের" থেকে "সমস্ত কিছুতেই অশ্রু" চিত্রটি মুদ্রিত হল—চিত্রটির বিষয় বা বিন্যাস বিষয়ে নতুন কিছু বলবার প্রয়োজন নেই, "মিসেরের" একটি দীর্ঘ কবিতার মতো, যার এক-একটি ছবি এক-একটি লাইনের মতো—চিত্রে পুরো কবিতাটি ছাপা যেহেতু সম্ভব নয়, তার একটি হৃদয়-বিদারক লাইন, মুদ্রিত চিত্রটিকে, ভাবতে পারেন। পৃথিবীতে সত্যিই কি দুঃখ ছাড়া আর কিছু আছে? নেই। কিন্তু থাকলে বোধ হয় ভালোই হত।

শুদ্ধশীল বসু
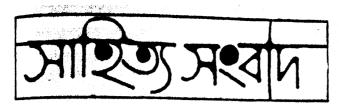
শিখরে প্রতিষ্ঠিত লেখক

সাহিত্যিকরাই তো প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। তাঁদের কল্পিত ও বর্ণিত সমাজই পরবর্তীকালে বাস্তব রূপগ্রহণ করে আস্তে আস্তে। প্লেটোর বর্ণিত রিপাবলিক কোনো দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বটে, কিন্তু প্লেটো যে কবিদের তাঁর রিপাবলিক থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন, সেই কবিরাই নানান রিপাবলিকের মানুষের আচার-আচরণ নির্দিষ্ট করেছেন। আজকের শিক্ষিত রুচি-সম্পন্ন বাঙালীরা যে-ভাষায় কথা বলেন, চিঠি লেখেন, নানান সমস্যাবলীর বিচার করতে চান, তার অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির কাছা-কাছি। ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের মূলে আব্রাহাম লিঙ্কনের চেয়ে 'আংকল টমস কেবিন' বইটির মূল্য কম নয়। তেমনি ডি কুইন্সির 'ইংরেজ আফিংখোরের স্বীকারোক্তি'ও ইউরোপে সর্বনাশা আফিঙের নেশার বিস্তার রোধ করায় প্রধান সহায়ক হয়েছিল। এ-রকম উদাহরণ অসংখ্য আছে, কিন্তু একথা ঠিক, সাহিত্যিকরা সমাজের পরিবর্তন ঘটান খুব ধীরে ধীরে, মানুষকে পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলেন, তার-পর রাষ্ট্র আইন পাশ করে। হিন্দু কোড বিল পাশ করার পর যে তার বিরুদ্ধে ধর্মের ছুতো তুলে এ-দেশে বড় রকমের আন্দোলন হয়নি, তার কারণ বহু বিবাহ কিংবা বিচ্ছিন্ন দম্পতির দুর্দশা এদেশের সাহিত্যে আগেই মর্মান্তিকভাবে ফোটানো হয়ে গিয়ে-ছিল। গো-রক্ষা নিয়ে যে আন্দোলন এত জোরদার হতে পারছে, তার কারণ, সাহিত্য এ প্রসঙ্গ নিয়ে আগে মানুষকে চিন্তার সুযোগ দেয়নি।

সাহিত্যিক বদল ঘটান আস্তে আস্তে। তার ইচ্ছে মতন তখনই সমাজের বদল ঘটাতে হলে এ যুগে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু কর্ণধাররা সাহিত্যিকের কথায় কর্ণ-পাত করবেন কেন? কোনো দেশের শাসক-বর্গ দেশের কোনো সমস্যার সময় লেখক-দের কাছে মতামত চাইছেন, তার কোনো নজীর নেই। লেখকদের সম্পর্কে প্রায় সব দেশের শাসকরাই উদাসীন, কয়েকটি পুরস্কার বা দু-একটি বৃত্তি বা খেতাব দিয়েই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ। তাহলে আর একটা উপায়, লেখকদেরই শাসন ক্ষমতা দখল করে নেওয়া। কিন্তু শুধু লেখকরা সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো দেশের রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করবেন—এ রকম ঘটনা কারুর হঠকারী কল্পনাতেও আসে না। লেখকরা এক আশ্চর্য ধরনের জাত, তাঁরা অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বাস্তব সজাগ (নইলে রচনায় ওরকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কিংবা গভীর বাস্তববোধ আসে কি করে?) হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে একটু ন্যালাখেপা ধরনের, নিজস্ব সুখ-অসুখ সম্পর্কে স্পৃহাহীন, ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অসার্থক কিংবা সার্থকতায় বীতরাগী। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারদের মধ্যে ক-জন লেখক আছেন?

কোনো নতুন ধরনের বিপ্লব বা পরি-বর্তনের জন্য কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন লোকের নেতৃত্বই প্রয়োজন, যে-রকম অনু-ভূতি সাধারণত লেখক বা শিল্পীদেরই থাকে। প্রতিটি লেখকই জানেন, তাঁকে পুরোনোদের মতন লিখলে চলবে না, তাঁকে সাহিত্যরীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে, দেশের শাসকেরও যদি সেরকম মনোভাব না থাকে, তবে তিনি দেশের অবস্থার কোনো বড় পরিবর্তন আনতে পারবেন না, পুরোনো ব্যবস্থাই টিঁকিয়ে গিয়ে মৃত্যুর পর জনতার মন থেকে মুছে যাবেন। পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লবী বা রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে দেখা গেছে, অনেকেই এক সময় কিছু না কিছু সাহিত্য-চর্চা করেছেন বা সাহিত্য-প্রেমিক ছিলেন।

সমগ্র পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাতে চেয়ে-ছিলেন যে দুজন, সেই নেপোলিয়ন এবং হিটলার দুজনই জীবন শুরু করেছিলেন সাহিত্যিক ও শিল্পী হিসেবে। তরুণ বয়েসে নেপোলিয়ন প্রায় চার-পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। ফরাসীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা নেপোলিয়নকে এখনো পছন্দ করো? তাদের অনেকেই উত্তর দেবে, না, না, নেপোলিয়নকে নয়, বোনাপার্টকে। অর্থাৎ কর্সিকা থেকে আসা সেই লাজুক তরুণ, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না, আড়ালে গল্প-উপন্যাস লেখে, সেই অশ্বা-রোহী সৈনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তারপর যখন তাকে পেয়ে বসলো ক্ষমতার লোভ, সাহিত্য-টাহিত্য সব মাথা থেকে উবে গেল, মানুষ মারার নেশায় ক্ষেপে উঠলেন, সেই নেপোলিয়ন দি গ্রেট অশ্রদ্ধেয়, একজন হঠকারী ডাকাত মাত্র। আর আর্ট স্কুলে যদিও সুবিধে করতে পারেননি, তবু হিটলারেরও কৈশোর-যৌবন কেটেছে ভিয়েনায় একজন অনশনক্লিষ্ট শিল্পী হিসেবে। তাঁর 'মাইন কাম্ফ' বইখানিও বিক্রি হয়েছে কয়েক লক্ষ। তারপর ক্ষমতা-সম্পন্ন ও রণদানব হয়ে ওঠার পর অবশ্য, সাহিত্যের আলোচনাই সহ্য করতে পারতেন না, ভালো ছবি দেখলেই নষ্ট করতে চাইতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপর দুই নায়কের মধ্যে চার্চিল তো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারই পেয়েছেন এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য প্রত্যেক দিন কবিতা মুখস্ত করতেন। জেনারেল আইসেনহাওয়ারেরও ছবি আঁকার খুব শখ, তাঁর আঁকা ছবির একাধিক প্রদর্শনীও হয়েছে। স্ট্যালিনও যৌবনে একসময় বলেছিলেন, পেন্সিলই আমার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

বর্তমান পৃথিবীর নায়কদের মধ্যে কার কার সাহিত্য শিল্পে প্রীতি আছে? জওহর-লাল নেহরু নিজে সাহিত্যিক ও শিল্প প্রেমিক ছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর মনে পড়েছিল রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা। কেনেডি'রও সাহিত্যের প্রতি প্রবল টান ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের সাহিত্য-পাঠের স্বভাব নেই, ব্যবসা ও রাজনীতি চর্চাতেই তাঁর জীবন পূর্ণ। ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী উইলসন একজন ধুরন্ধর রাজনীতি-বিদ, সাহিত্যে তাঁর উৎসাহ কতখানি তা জানা যায় না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী একজন কবি। শ্রীমতী উইলসনের ইচ্ছে আছে নিজস্ব একটি কবিতার বই প্রকাশ করা, কিছুদিন আগে তাঁর অ্যাটমবোমার ওপর লেখা একটা কবিতা রাশিয়াতেও ছাপা হয়েছে।

সাহিত্যিক হিসেবে অত্যন্ত বিখ্যাত এবং রাষ্ট্রের অতি উচ্চপদে আসীন, সারা পৃথিবীতে এরকম একজনই আছেন, আঁদ্রে মালরো, ফরাসীদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী। ফরাসীদেশের অবশ্য কথাই আলাদা, কবি ও লেখকরা সে দেশে সব সময়ই উচ্চ সম্মান পায়, বহু কবি-লেখক ওদেশে আগেও রাষ্ট্র-দূত বা মন্ত্রী হয়েছেন, পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র দেশ—যেখানে টাকার নোটেও লেখকদের ছবি ছাপা হয়। স্বয়ং দ্যগলও এক সময় শিশু-সাহিত্যের চর্চা করেছেন। আফ্রিকার একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিও-পোল্ড সেংঘরও ফরাসী ভাষায় কবি হিসেবে বিখ্যাত।

সাম্যবাদী দেশগুলিতে মাও সে-তুং এবং হো-চি-মিন-এর কবি খ্যাতি আছে। অবশ্য ওঁদের কবিতার মধ্যে শিল্প কতখানি, তা ঠিক বোঝা যায় না। নতুন সাম্যবাদীদের কাছে সাহিত্যের প্রধান মূল্য প্রচারের বাহন হিসেবে, সুতরাং যে-যতবড় প্রচারবিদ, সাহিত্যে তার তত অধিকার।

পশ্চিম জার্মানীর সম্প্রতি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডঃ কিসিংগারও একজন কবি। দক্ষ দলনেতা হয়েও, মাঝে মাঝে তিনি নির্জনে চুপ চাপ বসে থাকতে ভালোবাসেন। তার প্রকাশিত কবিতার বইয়ের নাম, "ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।" ডঃ কিসিংগার আবার এক সময় নাৎসী দলেরও সভ্য ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের দু'রকম মত। এক দলের সমলায়, একজন পুরোনো নাৎসীর হাতে ক্ষমতা এলো, জার্মানীতে আবার জঙ্গী মনোভাব জেগে উঠবে নাকি? অন্যদলের আশঙ্কা, একজন কবি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, জার্মান দেশটা একেবারে নির্জীব হয়ে যাবে না তো?

সনাতন পাঠক

যাদুকরী মহাদেশ
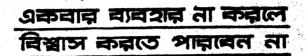
সরোজ আচার্য

The Continent Circe: By Nirad C. Chaudhuri (Chatto & Windus, London) 35 sh.

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দৃশ্যপট বদলেছে বহুবার, কিন্তু সে পরিবর্তন প্রায়ই অগ্রগমন নয়, বৃত্তাকার আবর্তন। শক, হূণ, পাঠান, মোগল থেকে ইংরেজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য-পরিবর্তনের পরিচালক-শক্তিটা বাইরের, ভারতের অন্তঃস্থিত শক্তির স্ফুরণ, কিম্বা বিস্ফোরণ নয়। দেশের লোক হয়েছে এই বাইরের থেকে আসা শক্তিদ্বারা তাড়িত, পরিচালিত এবং পদানত। ঐতিহাসিক যুগপরম্পরায় বাইরে থেকে ভারতবর্ষে যারা এসেছে, রাজত্ব গড়েছে, সেইসব বিজেতাদেরই বা শেষ পর্যন্ত গতি কি? শক, হূণ, পাঠান, মোগল এসেছে বিজয়ীর ভূমিকায়, তারপর কুহকিনী ভারতের যাদুকরী ক্ষমতাগুণে পৌরুষ হারিয়েছে তারা, এক পর্বের বিজয়ী হয়েছে পরবর্তীকালে বিজিত। ভারতেতিহাসের এই মর্মান্তিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, এর গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছেন নীরদ চৌধুরী। "দি কন্‌টিনেণ্ট অব সার্সি" গ্রন্থখানি তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসার ফল।

কামরূপ, কামাখ্যা নয়, গোটা ভারতবর্ষই কুহকিনী, যার মোহিনী মায়ায় মানুষ হয় ভেড়া। অবশ্য রূপকার্থে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন, "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ!" সেও রূপকার্থে, একটি বিশেষ স্বাদেশিক সংকল্পের ঘোষণা। হাজার পঞ্চাশ ইংরেজের তাঁবেদার তখন কোটি কোটি ভারতবাসী। সেই মেষজন্ম থেকে মুক্তির জন্যই তখনকার আহ্বান, "আবার তোরা মানুষ হ!" নীরদ চৌধুরী মশায় বলছেন, অসম্ভব, ভারতবর্ষের জল হাওয়ায় যুগ যুগ ধরে যারা পালিত তাদের পক্ষে শক্ত সমর্থ মানুষ হতে পারা অসম্ভব-প্রায়। অতএব জড়ত্বই তাঁর মতে ভারতবাসীর ভবিতব্য, অলঙ্ঘ্য ঐতিহাসিক নিয়তি।

নীরদ চৌধুরী সুবিজ্ঞ, ইতিহাসদর্শী, স্পষ্টবাদী। তিনি যে মত বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যতই অপ্রিয় হোক না কেন, সেটি ব্যক্ত করায় তাঁর দ্বিধা নেই। ইংরেজীতে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেই। সে-বইখানির একটি বক্তব্যে তখন জাতীয়তাবাদী অনেকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হন। নীরদ চৌধুরী বলেছিলেন, বৈদেশিক আধিপত্য ছাড়া ভারতের গতি নেই, ভারতের ইতিহাসের অমোঘ বিধান এই। এই ১৯৬৭ সনে ভারতবর্ষ যখন দেশে দেশে ভিক্ষার্থী, মার্কিন মহাজনদের ইঙ্গিত বুঝে ভারতের বৈষয়িক নীতি ঠিক করতে হয়, তখন নীরদ চৌধুরীর উক্তির যথার্থতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

কুহকিনী ভারতবর্ষ যেন গ্রীক পুরাণের সেই যাদুকরী সার্সি যার ইন্দ্রজাল-প্রভাবে ওডিসিয়ুসের বীর যোদ্ধারা হয়েছিল ভেড়া। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছে; স্মরণাতীতকালে অমিতবীর্য আর্য যোদ্ধারা

....

'দি কন্টিনেন্ট অব সার্সি' শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাম্প্রতিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির জন্যে তিনি এই বছর 'ডা ফ-কু পা' পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যে অবদানের জন্য শ্রীচৌধুরীকে আলোচ্য পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। প্রাচ্যদেশে তিনিই প্রথম এই সম্মানে ভূষিত হলেন।

....

দুর্বারগতিতে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেছে, তাদের জনপদ গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে গাঙ্গেয় ভূমি পর্যন্ত। তারপর কুহকিনীর মায়ায় আর্য-শৌর্য অবসন্ন, উৎসাহ স্তিমিত, যেন সার্সির দ্বীপে ভেড়ার পাল সব। নীরদ চৌধুরীর এই অনুপম গ্রন্থের সমস্ত তত্ত্ব এবং অভিমত তর্কাতীত ও প্রমাণসিদ্ধ নয়। কিন্তু সমকালীন ভারতের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা এবং হতাশার কারণ সন্ধানে এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে সহায়ক।

"দি কন্‌টিনেন্ট অব সার্সি" একখানি প্রতিবাদমুখর গ্রন্থ। ভারতীয় সভ্যতার আকৃতি প্রকৃতির অনুপুঙ্খ আলোচনা, কিন্তু গতানুগতিক ধ্যানী ভারতবর্ষের জয়গান নয়। এ বইটি তথ্যে একবারে ঠাসা, তথ্যগুলি অধিকাংশই বারুদের মত বিস্ফোরক। সনাতন ভারতীয় মনের আত্মশ্লাঘা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার জন্যই যেন লেখক সেগুলি ব্যবহার করেছেন।

'ভারতের আধ্যাত্মিকতা' নামক লালিত আজগুবি ধারণা, লেখকের মতে, ইতিহাস-সম্মত নয়। ভারতীয় সহনশীলতাও তাঁর মতে কথায় কথা, বাস্তবে যার ভিত্তি মায়ামাত্র। হিন্দু ধ্যানধারণায় ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় সবটাই স্থূলে সুবিধাবাদী পার্থিব চিন্তাভাবনা অথবা অসার লালিত লবণ্যলতা। ভারতের তথাকথিত 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'ও একটি রূপকথা, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যার সৃষ্টি। ভারত-পূজার এই বর্ণাঢ্য আড়ম্বরে একমাত্র লাভবান গোঁড়া জাত-ধর্মান্ধ কতিপয় ক্ষমতাগোষ্ঠী। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণাও অধিকাংশই ভাসা-ভাসা—হয় চটকদার রোমান্স, অথবা সুবিধাবাদী যুক্তিবিস্তার। প্রকৃত ভারতবর্ষ কতকগুলি ভুল ও আজগুবি ধারণার নীচে কম্বল চাপা রয়ে গেছে। নীরদ চৌধুরী এই সংকীর্ণ ভারত-পূজা ও অবাস্তব ভারতবিদ্যা বিদ্রূপভরে প্রত্যাখান করেছেন। তিনি অভীষ্ট লাভের জন্য সৃষ্ট মিথ্যার আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে, ইতিহাস থেকে সত্য ভারতচিত্র সংগ্রহ করতে উদ্যোগী। আধুনিক ভারতের নানা দুঃখ-দুর্দশা, ব্যর্থতা, বিষাদ, ছলনা প্রতারণার সূত্রটি সন্ধানেও তিনি যত্নপরায়ণ।

গতানুগতিক ইতিহাসের গণ্ডিতে শ্রী চৌধুরীর আলোচনা আবদ্ধ নয়। ইতিহাস থেকে তিনি উপাদান নিয়েছেন বেছে বেছে; তাঁর পঠিত স্মৃতির বিপুল সঞ্চয় থেকে উদ্ধৃত করেছেন এমন সব জিনিস যার সহায়তায় আধুনিক ভারতবর্ষের গ্লানির যুগ-যুগান্তের প্রতিচ্ছবি ও ইতিহাস রূপকের আকারে পরিবেষণ করা যায়। শতাব্দী-সহস্রাব্দীর কালানুক্রম তিনি মানেন নি; গোটা ইতিহাসকাল তাঁর ভাবনা ও কল্পনায় মধ্যে এক অখণ্ড মানচিত্রের মত কাজ করেছে। ভারতের সুদূর অতীত থেকে প্রত্যক্ষ বর্তমান পর্যন্ত তিনি অবাধে পরিক্রমা করেছেন এবং অতীত দিয়ে বর্তমান এবং বর্তমান দিয়ে অতীতকে পরিস্ফুট করেছেন। বলা বাহুল্য, অতীত বা বর্তমানকে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন, মান্যগণ্য মতামতের প্রতি অহেতুক নম্রতা দেখান নি। 'কন্টিনেন্ট অব সার্সি'কে তাই কার্লাইলের 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' গ্রন্থের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা চলে। উভয় গ্রন্থেই সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরাশা-ব্যঞ্জক মনোভাবনা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রক্ষেপ-সুলভ চেতনাবলী ও বিতৃষ্ণা (নীরদ চৌধুরীর লেখা পড়তে পড়তে কার্লাইলের কটাক্ষ 'তিন কোটি লোক—প্রায় সবই গর্দভ, মনে পড়ে যায়), এবং বর্তমানকে নস্যাৎ করবার জন্য দূরতম অতীতকে আদর্শায়িত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। "কার্লাইল সম্বন্ধে এ কথা খাটে যে, তাঁর ইতিহাস-চেতনা এক সাবেগ স্বপ্ন; চমৎকার, উন্মাদক, কিন্তু তা ব্যক্তিগত স্বপ্ন, অতএব তাতে ভুলভ্রান্তি

থাকাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত যে, কার্লাইলের "প্রেজেন্ট" অর্থাৎ বর্তমান সম্পর্কে ধারণাও অনেক স্পষ্ট।" কোনো কোনো বিষয়ে কার্লাইলের মতো নীরদ চৌধুরীও অত্যন্ত বিশদ, কোনো কোনা বিষয়ে আবার তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা।

নীরদ চৌধুরীর ইতিহাস ব্যাখ্যানের মূল সূত্র হচ্ছে, আবহাওয়াই ভাগ্যবিধাতা। ভারতীয় সভ্যতার ক্রমিক অধঃপতনের মূলে এখানকার গ্রীষ্মপ্রধান আর্দ্র জলবায়ুর প্রবল আধিপত্য। লেখক এই সূত্র থেকে ভারতের ঐতিহাসিক ভাগ্যবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে হিন্দুমনের উপর ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক প্রভাব ক্রমে উন্নত আর্যচরিত্রকে অধঃপতিত করেছে। ত্যান, জাসেরান্ড প্রমুখ সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ ব্রিটেনের শীত ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার দ্বৈরথ প্রভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন বিষাদ ও ইংরেজ গম্ভীরতার ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তাঁরা এই প্রভাবকে ঐ দেশের ইতিহাসের অমোঘ ভাগ্যনিয়ন্তার পর্যায়ে উন্নীত করেন নি। শ্রী চৌধুরীর বিবেচনায় ভারতবর্ষের আবহাওয়াই ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগ্যনিয়ামক। তিনি দেখিয়েছেন, বহিরাগত আর্যগণ—যাঁরা পরে হিন্দু হয়েছেন—দানিয়ুব নদীর অববাহিকা অঞ্চল থেকে পূবে দিকে যাত্রা করে ভারতের পঞ্চনদীবিধৌত অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানকার মারাত্মক আবহাওয়ার শিকার হন। "হিন্দু হচ্ছে বিকৃত, নষ্ট এবং অধঃপতিত ইউরোপীয়; তার অধঃপতন ঘটেছে নিষ্ঠুর গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে প্রকৃত ও কল্পিত সংঘর্ষে।" যুগের পর যুগ গিয়েছে, এই অধঃপতন বাড়তে বাড়তে আমরা হিন্দুরা এখন যা তাই হয়েছি—"পচন-ধরা মাংস এবং প্রাগৈতিহাসিক হাড়ের সমষ্টি।" ভারতবর্ষ নামক মায়াবিনী সার্সির কবলে পড়বার পর এই আর্যদের ভেড়া বনে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় গতি ছিল না, কোনো উপায়েই কোনো নিষ্কৃতি সম্ভব হয় নি। নিষ্ঠুর আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য প্রাচীন হিন্দুরা নানাপ্রকার পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়। প্রথম, কৃচ্ছ্রসাধন যার পরিণতি জঞ্জাল ও আবর্জনার সঙ্গে সহ-অবস্থান। দ্বিতীয়, যৌনাচার যারও শেষ হয় ব্যর্থতায়। এমন প্রাচীন হিন্দুগণ তাদের মুক্ত উদার স্বভাব হারিয়ে ফেলে এক ঘেরাটোপ সমাজ সৃষ্টি করে, কুসংস্কারের বেড়াজাল দিয়ে সেই গণ্ডীকে সুদৃঢ় করে তোলে। হিন্দুচরিত্র এর পর থেকে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী প্রবণতায় প্রকট হয়ে ওঠে—গোষ্ঠীবদ্ধতা ও অনৈক্য, যৌথ আত্মম্ভরিতা ও ব্যক্তিগত হীনম্মন্যতা, অন্ধ বিধর্মী-বিদ্বেষ ও প্রায়ান্ধ বিদেশী-পূজো, ধর্মপিপাসা ও শান্তিবাদ, বীরত্ব ও কাপুরুষতা, চাতুর্য ও মূঢ়তা ইত্যাদি (অন্যান্য সভ্যতার মধ্যেও অনুরূপ পরস্পরবিরোধী প্রবণতা নিশ্চয়ই দেখানো যায়)। হিন্দুমানসে স্ববিরোধ আছে। কিন্তু এ বিরোধ ইয়োরোপীয় মানবেও কম নেই। দোষ বা দুর্বলতা যে শুধু হিন্দু বা ভারতীয়দেরই একচেটিয়া, তাও বলা যায় না। নর্মান লালসা (Norman avarice) হিন্দু অর্থলালসার মতই সুপরিচিত প্রবাদবাক্য। বর্তমান ভারতে ভেজাল যেমন ভয়াবহ, উনিশ শতকে ইংলণ্ডেও তেমনই ছিল। শ্রী চৌধুরী জেন অস্টেন থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন হিন্দু চরিত্র কেমন অস্থির। আবার ই-এম-ফর্স্টার সেই জেন অস্টেন থেকেই অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন ইংরেজ চরিত্রের ভণ্ডামি। যে-কোনও জাতি-সত্তকেই এইভাবে সাদা কালো দেখানো সম্ভব।

শ্রী চৌধুরী ধাপে ধাপে তাঁর নিরাশাচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন—হিন্দু বা ভারতীয়দের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। গোষ্ঠিবদ্ধভাবে তারা যে বেঁচে আছে, সে শুধু হিন্দু সমাজের নর-দশাংশ জড় পদার্থ বলে। ইংরেজ-ভাবাপন্ন হিন্দুরাও লেখকের মতে কোন কর্মের নয়; তাদের ফ্যাশান-দুরস্ত আধুনিকতা একটা বহিরঙ্গ বা মুখোশ মাত্র। তাদের মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, যুক্তিহীন সনাতনী রহস্যবাদকে প্রতিহত করে। আধুনিক শিক্ষায়নের ফলে হিন্দু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব বদলাবে, লেখক তা আশা করেন না। সিমেন্ট, ইস্পাত ও পারমাণবিক 'অপসরা'র উপর সর্বদাই টেক্কা দেবে চড়কের মেলা এবং গাজনের সং।

নীরদ চৌধুরী শেষ পর্যন্ত অবশ্য জাতীয় স্বাস্থ্য লাভের একটা উপায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তা হচ্ছে আমাদের আদি ইয়োরোপীয় চেতনা ও চরিত্র পুনরুদ্ধার এবং ভারতীয় পরিবেশকে যথাসম্ভব পরিবর্তন করা। তিনি নিজে সার্সির মায়ার বিরুদ্ধে লড়ে তাঁর নিজের ইয়োরোপীয় আত্মাকে উদ্ধার করেছেন। অন্যেরাই বা তা কেন করতে পারবে না? কিন্তু তাঁর উদ্ধার আত্মোদ্ধার, তাঁর ব্যক্তিগত জয়, অন্য অসংস্কৃতেরা তা অনুসরণ করতে যাবে কেন, পারবেই বা কী করে?

বইটির মনোরম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে লেখকের নিজ হাতে গড়া, নিজের ইচ্ছায় প্রস্তুত, নিজের গরজে পরিচালিত অনর্গল আত্মচরিত্রচিত্রণ। লেখকের বিশ্বকোষী আগ্রহ, বিতর্কস্পৃহা এবং বিবিধ নরনারী ও বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং সর্ব বিষয়ে সাহসী, অকপট, অকুণ্ঠ মন্তব্য পাঠকের মনকে টানবেই। খুশবন্ত সিংহের টাইপ-রাইটার প্রসঙ্গে ভারতে মার্কিন উপস্থিতি ও প্রভাবের বিরুদ্ধে এক হাত লড়াই চালানোর বাহাদুরি তাঁর চমৎকার। এ রকম সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। তাঁর বইতে আকস্মিক মন্তব্য, ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ, অজস্র উদ্ধৃতি, সরস ও বিরস মন্তব্য, বহির্দৃশ্য বর্ণনা এবং বিশুদ্ধ কবিতাশ্রয়ী আবেগ সবই আছে। এ সব বাদ দিলেও মূল বইটি পাঠকের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যভাষণের সাহস আছে এমন যে-কোনো গ্রন্থই পাঠককে নাড়া দিতে বাধ্য। নাইপলের মত শ্রীচৌধুরী একই 'অন্ধকারের রাজ্যে' (Area of Darkness) আলোকপাত করতে চেষ্টিত। কিন্তু নাইপল ব্যক্তিগত কারণে খুঁতখুঁতে, ব্যক্তিগত অসুবিধা ও ব্যক্তিগত অসন্তোষ দিয়ে তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের দীনতা ও হতাশা ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় নাইপলের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অপর পক্ষে, শ্রীচৌধুরীর মন্তব্য যতই তীক্ষ্ণ ও আঘাতপ্রবণ হোক না কেন, তাঁর মনের গভীরে যে উদার মানবপ্রীতির উৎস আছে তাঁর লেখার মধ্যে তা আমরা অনুভব করতে পারি। তাঁর সত্যভাষণের উৎসাহ নিছক অপভাষক হবার প্রলোভন থেকে আসে নি, সত্য উদ্ধারের অকপট ইচ্ছা থেকেই জন্মেছে। চারদিকের দৈন্য, কুশ্রীতার প্রতি তিনি যেমন চোখ বুজে থাকেন নি, তেমনি উপরের আকাশের নিঃসীম নীলিমার প্রতিও তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি। "ভারতবর্ষে সহজে মেজাজ বিগড়ালে চলবে না। একে সহ্য করতে হবে"—বলেছেন শ্রীচৌধুরী।

অতএব 'কন্টিনেন্ট অব সার্সি' ভারত-বিরোধী গ্রন্থ নয়, এমন কী হিন্দু-বিরোধীও নয়। লেখকের কিছু কিছু মন্তব্য উগ্র, কোনো কোনো ঘোষণা অতিরিক্ত চড়া সুরে বাঁধা; তাঁর মতবাদ ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণী বিচারে হয়তো সবটা টিঁকবে না, কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে এমন সত্যসন্ধান আছে যার স্থায়ী মূল্য তর্কাতীত।

অনুবাদ সাহিত্য

মস্তক বিনিময়। টমাস মান্। অনুবাদঃ ক্ষিতীশ রায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার পক্ষে মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ৪।৩ বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কবিতা অসূর্যম্পশ্যা পুরনারী, তাকে এক অন্তঃপুর থেকে অন্য অন্তঃপুরে নিতে গেলে শুধু তার শ্লীলতার হানি হয়, আর কোন লাভ হয় না। অবশ্য কবিতা যতখানি নিষ্ঠাবতী এবং শুদ্ধচারিণী গদ্য ততখানি নয়। তার শুচিবাই নেই, সে বহুগামী। চেষ্টা চরিত্র করলে তার মন পাওয়া কঠিন নয়। অনুবাদকার্য যে আদৌ সহজ কর্ম নয় তা বোঝবার জন্যেই এসব কথার উল্লেখ করলুম, অনুবাদ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে নয়।

বাস্তবিকপক্ষে সম্প্রতি একটি অতি উৎকৃষ্ট বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করে অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে এত সব কথা আমার মনে হল। বাংলা সাহিত্যে আজ ভাল বই-এর অভাব নেই, অভাব ভাল অনুবাদ গ্রন্থের। কালেভদ্রে এক আধটি হাতে এলে উৎফুল্ল বোধ করি। উল্লিখিত গ্রন্থটি—মস্তক বিনিময়—বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস মান্ রচিত Die Vertauschten Kopfe নামক উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদটি মূল জার্মান থেকে নয়; Lowe-Porter কৃত ইংরেজী অনুবাদ—The Transposed Heads—ভাষান্তরিত করেছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়।

শিল্প সাহিত্য এমন জিনিস যে একের সম্পত্তি বহুর মধ্যে বিতরিত হলে তবেই তার মানরক্ষা হয়। বিস্তারের দ্বারা শুধু যে এর খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়ে এমন নয়। নতুন নতুন ভাষা এবং বিশ্লেষণের দ্বারা এর সমৃদ্ধিও বাড়তে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থটি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের কাহিনীটি মূলত ভারতীয়। বেতাল পঞ্চবিংশতির একটি গল্পের সংক্ষিপ্তসার টমাস মান্ তাঁর এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলেন। সেই সংক্ষিপ্ত কাহিনীটিকে অবলম্বন করে মান্ এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। অসাধারণের হাতে পড়লে সাধারণ জিনিসেরও কতখানি রূপান্তর ঘটতে পারে এটি তার এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। আপাত নিরলঙ্কার কাহিনীটির অন্তরালে যে যৌন তত্ত্বটি লুকাইত ছিল টমাস মান তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেটিকে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। যৌন প্রবৃত্তির কুটিলা গতি, নারীচিত্তের অতল রহস্য তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মূল গল্প রচয়িতার মনে যে তত্ত্বই থাক আমরা তা নিয়ে ইতিপূর্বে মাথা ঘামাইনি। আমরা এ জাতীয় গল্পকে সাধারণ grotesque বা উদ্ভট রসের দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখেছি। এর মধ্যে যে মানব মনের চিরন্তন রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে সে কথা ভেবে দেখিনি। টমাস মান্ এ ভাবে বিশ্লেষণ করে না দেখালে এ যুগের পাঠক এর অন্তর্নিহিত রসটি থেকে বঞ্চিত হতেন।

বেতালের গল্প আমাদের দেশে এখন বিস্মৃত প্রায়। নবশিক্ষিত সমাজে এসব জিনিস অজ্ঞাতই বলা চলে। এই অনুবাদের ফলে একটি লুপ্ত জিনিসের পুনরুদ্ধার হল। এ দেশে লুপ্ত কিন্তু বিদেশে সমাদৃত এমন একটি কাহিনী আমরা আবার ফিরে পেলাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল এবং ফিরে এসেছে নব কলেবরে। মনস্বী লেখকের যাদুস্পর্শে এ কাহিনীর রহস্য শতগুণে বর্ধিত হয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। আলোচ্য গ্রন্থটি মান্ এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ না হলেও ভারতীয় পটভূমিকার দরুণ ভারতীয় পাঠকদের কাছে এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই কারণে অনুবাদক ক্ষিতীশ রায় বাঙালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। অনুবাদ বলতে যদি কেবলমাত্র ভাষান্তর ক্রিয়া বোঝাত তাহলে ব্যক্তিগতভাবে অনুবাদকের কাছে আমি অতখানি কৃতজ্ঞ বোধ করতাম না। ক্ষিতীশ বাবুর প্রধান কৃতিত্ব তিনি ভাষান্তর করতে গিয়ে রসান্তর ঘটান নি, রসটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রাণ রাখতে যেমন প্রাণান্ত, রসের কারবারে তেমনি রসান্ত ঘটতে দেখেছি—বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে। ক্ষিতীশবাবু তাঁর অনুবাদটিকে সে দুর্দৈব থেকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। মান্-এর গ্রন্থে নারীচিত্তের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে অনুবাদে তা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে, পুরুষ চরিত্র দুটির মানসিক দ্বন্দ্বও যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে। ভাষার দিক থেকেও অনুবাদক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বইটি সাধু ভাষায় লেখা। আজকের দিনে চলতি ভাষা ছেড়ে সাধু ভাষায় লেখা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু এরও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। জার্মান ভাষায় অজ্ঞতা হেতু মূল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু আমার ধারণা পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত বলে মূল জার্মান গ্রন্থটি পুরাণ কাহিনীর ন্যায় একটু archaic ভাষায় লেখা। আমার এই অনুমানের কারণ এর ইংরেজী অনুবাদ—Transposed Heads গ্রন্থটিও হাল আমলের ইংরেজীতে লেখা নয়, একটু পুরোনো ধাঁচের ভারিক্কি ভাষায় লেখা। মান্-এর অপর একটি উপন্যাস—The Holy Sinner-এর ইংরেজী অনুবাদও ঐ জাতীয় ইংরেজীতে লেখা, কারণ ওটিও একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। মূল গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেই ইংরেজী অনুবাদ ঐ ভাবে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। ক্ষিতীশবাবুও তাঁর অনুবাদে ঐ কথাটি স্মরণ রেখেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মূলের প্রতি কেবলমাত্র আক্ষরিক আনুগত্য রক্ষা করলেই অনুবাদের কর্তব্য সমাধা হয় না, চারিত্রিক আনুগত্য অর্থাৎ মূল গ্রন্থের স্পিরিট রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। ক্ষিতীশবাবু সেটি করেছেন। সেই কারণেই অনুবাদ হিসাবে এই গ্রন্থ এতখানি সার্থকতা লাভ করেছে। এখানে বলা আবশ্যক যে রস সাহিত্য যিনি অনুবাদ করেন তাঁকে শুধু অনুবাদক হলে চলে না তাঁকে সাহিত্যিক হতে হয় কারণ অনুবাদ কার্যও সৃষ্টি কার্যের অন্তর্ভুক্ত। তেমন হাতে পড়লে অনুবাদও মৌলিক রসসৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে পারে। 'মস্তক বিনিময়' গ্রন্থটি পাঠ করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, ক্ষিতীশবাবু নিজে সাহিত্যিক নতুবা তিনি অনুবাদ কার্যে এতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন না। এ কথা নিশ্চিত যে এই গ্রন্থ আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য অনুবাদ সাহিত্য বললে এমন কথা মনে করা উচিত নয় যে এটি সাহিত্যের একটি আলাদা প্রকোষ্ঠ। উঁচু দরের অনুবাদ নির্জলা খাঁটি সাহিত্যের অঙ্গীভূত। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে চ্যাপম্যান, ড্রাইডেন, পোপ গ্রীক লাটিন কাব্য থেকে যে সব জিনিস অনুবাদ করেছিলেন তাকে অনুবাদ বলে জাতে ঠেলা হয়নি। তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। সেই দিক থেকে বলব ক্ষিতীশবাবুর অনুবাদ শুধু আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের নয় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছে।

এবং সেই কারণে অনুবাদক সর্বতোভাবে আমাদের অভিনন্দনের পাত্র।

মুদ্রারাক্ষস। রামজীবন ভট্টাচার্য। এশিয়া পাবলিশিং কোং। এ ১৩২, ১৩৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। ২·০০।

বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠকের কাছে সুপরিচিত। নাটকের প্রধান চরিত্র চাণক্য, [illegible] চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী। দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র মহাপদ্মনন্দের মন্ত্রী রাক্ষস। সে মহা কূট-নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে দমন কিংবা বশীভূত করায় চাণক্যের জুড়ি ছিল না। বিশাখ দত্তের এই নাটকে দেখা যায় কিভাবে চাণক্য নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসকে স্ব-দলে টেনে আনলেন। এই কাহিনী নিয়েই এই বিখ্যাত নাটকটি রচিত হয়েছে।

এই নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য। প্রথমাংশে নাট্যকারের আত্মপরিচয় দানের অংশটুকু বাহুল্য বলে মনে হয়। তা ছাড়া অনুবাদ ভাল। কূট-নীতির চাল এবং পাল্টা চালে জমজমাট এই নাটকটি রঙ্গমঞ্চেও বেশ সফল হওয়ার সম্ভাবনা। ৫৫।৬৬

কবিতা

পরিচিত মুখগুলি। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। তিন টাকা।

শ্যাম কাজ পাত্র। রণজিৎ সিংহ। কথা-শিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

'রাজকন্যা'র পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পরিচিত মুখগুলিতে' গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় খুব বেশি পাল্টান নি। যদিও লিখতে শুরু করেছেন দেরিতে—এখন যাঁরা পঞ্চাশের কবি হিসেবে অল্পবিস্তর চিহ্নিত তাঁদের সমসাময়িক—তা হলেও গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় বয়সে প্রবীণ। পঞ্চাশের কবিতার শুরুতে যে রোমান্টিক

আতিশয্য তরুণতম কবিদের আক্রমণ করেছিল, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তবু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ বলেই হয়তো তাঁর ছন্দের ব্যবহার ছিল নির্ভুল, শব্দের যোজনা সতর্ক, চিত্রকল্প রচনা নিখুঁত। বিষয় সম্বন্ধে কোনো বিপ্লব তিনি কখনো ঘটান নি কাব্য-শরীরে। ফলে তাঁর কবিতায় বিগত দশকের লক্ষণগুলি খুবই স্পষ্ট, সাম্প্রতিক কবিতার চিহ্ন ততটা নয়। এর ফলে লাভ না ক্ষতি হয়েছে বলা কঠিন, কারণ সাম্প্রতিকতার সমস্ত চিহ্নই সুস্থ নয়; তবু 'পরিচিত মুখগুলিতে' একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিশেষ করে, 'উন নাভ' 'পটভূমি' ও 'দংশন তমসা' প্রভৃতি কবিতায় ছন্দের রিনরিন এমন এক ধরনের নস্টালজিয়ার সৃষ্টি করে যা এখন-কার রচনায় ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছে।

রণজিৎ সিংহের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি কবিত্বের নির্ভুল চিহ্ন রেখেছেন। মূলত আবেগ-নির্ভর বলে তাঁর অধিকাংশ রচনারই ফর্ম গদ্য কবিতার। সার্থক গদ্য কবিতা লেখা যে, ছন্দে লেখার থেকেও দুষ্কর কাজ, সন্দেহ নেই। রণজিৎ সিংহ বহুদিন ধরে এই ফর্মে লিখছেন। তাই, গদ্য কবিতা যে তাঁর হাতে সহজে উতরোয় তার বহু প্রমাণ তিনি রেখেছেন। যেমন, শোক, সমুদ্রে, মেঘের দুপুর, ফিরে আসা, জন্মদিন, ঘর প্রভৃতি কবিতা। স্বল্প আঁচড়ে সুন্দর ছবি ফোটে তাঁর হাতে—

যোজন-শূন্যে
অন্ধকার
ব্যথার ভারে টলে ওঠে।
মাঝরাতে অসাড় বনমালা
জ্যোৎস্নায় আকুল হয়।
শূন্য কোটরের মতো ধূ-ধূ রাত্রির শিথান বেয়ে
গলে-গলে নামে, ছড়িয়ে যায় ভোর।
(অবিস্মরণীয়)

কিন্তু এ-সত্ত্বেও বলব, কোনো কোনো রচনায় (অজ্ঞাতবাসের পর, কার্ফিন, হুজুর বাহাদুর জাতীয় কবিতা) তিনি যেন হঠাৎ-হঠাৎ কোন 'জঙ্গী' সুরে কথা বলে উঠেছেন, স্যাটায়ারের বর্মেও তা চাপা পড়ে নি।

৩৪৫।৬৬, ২৪০।৬৬

উপন্যাস

নৌকাডুবির পর। হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯। মূল্য চার টাকা।

এই গ্রন্থে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা যে পরিচায়িকা আছে তা থেকে লেখক শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, এবং আরো জানা যায় যে কেন তিনি এই গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থটির সাহিত্য-মূল্য বিচার করার আগে এর ঐতিহাসিক মূল্যটিকেই কিন্তু স্বীকৃতি দিতে হয়। বস্তুত এটি স্মরণোপযুক্ত [illegible], রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের উপসংহার। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করে-ছিলেন। দুটি পৃষ্ঠার রূপে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এই গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। কাজেই পাঠক এই গ্রন্থে হরেন্দ্রনারায়ণ এবং রবীন্দ্রনাথের যৌথ প্রচেষ্টাটি কৌতূহলের সঙ্গে পড়ে দেখবেন।

নৌকাডুবিতে কাহিনী মিলনাত্মক নয়। কিন্তু এই গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত সুশীলাকে রমেশ তার হারানো স্ত্রী হিসেবে পুনরায় গ্রহণ করেছে। সেই মিলনোৎসবে হেমনলিনী এবং কমলাও সাগ্রহে যোগ দিয়েছে। নাতি-বিস্তৃত এই কাহিনী তাই নৌকাডুবির পাঠকের ট্র্যাজেডি-ভারাক্রান্ত মনে কিছুটা আনন্দসঞ্চার করতে পারে। রমেশের জীবনও যে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল না, গ্রন্থশেষে তারই ইঙ্গিত লেখকের জীবনের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসকেই প্রতিপন্ন করে। আবেগপূর্ণ গতিময় সাধু-ভাষায় লেখা গ্রন্থটি পড়তে ভাল লাগে, তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু এত আবেগপূর্ণ গদ্য কদাচিৎ লিখেছেন।

এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশক সাধুবাদ পেতে পারেন। ৩৭৪।৬৫

প্রাপ্তি স্বীকার

রূপলোকের রাধা। রথীন্দ্র পালিত। সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

ক্যালেণ্ডারের কাহিনী। প্রদ্যোত সেন। গ্রন্থবিতান : ৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·৫০।

শ্রীহরিদাস-পরিক্রমা (১ম খণ্ড)। পথিক। শ্রীপ্রাণগোপাল সাহা : ৬৮।৪ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৮। মূল্য ২·০০।

২৯শে জুন। মুকুল নিয়োগী। কনারক প্রকাশন : ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন। শ্রীশম্ভুনাথ উদ্ভ। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স : ১১।১এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

শতাব্দী শেষের কবিতা (১ম খণ্ড)। সম্পাদনা : মুক্তি দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু চৌধুরী, করুণা সেন। প্রাপ্তিস্থান লেখক সমবায় সংস্থা : এস. বি. গড়াই রোড, আসানসোল, বর্ধমান। মূল্য ২·৫০।

অরণ্যদেব

লী ফক

না, তারা ঘুমিয়েছে তাই পেল না।
গল্পটা তো তোমায় আমি অনেকবার বলেছি।

আবার বলো ওয়াবার-কাকা। আবার বলো।

জুমবার কাকে যারা মেরেছিল, চুপিসাড়ে আমি তো তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জুমবার গল্প -----
বন্দুক নামাও!

'আরে দুজন শিকারী আমার চোখে পড়েনি। ও ডেভিল আবার ডেকে উঠল।'
8/14

ডেভিলের সেই ডাক সবাইও কাঁপিয়ে দিল আমাকে।
তারপর?

'মাথা নামাতেই তাদের বন্দুকের গুলি আমার কাঁধের খানিকটা চামড়া তুলে নিয়ে চলে গেল। আর সেই সুযোগে প্রথম দুজন শিকারী ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে।'

'সামনে উঠে তাদের ধরলাম আমি; মাথা দুটো ঠুকে দিলাম। বাস, বাছাধনরা অজ্ঞান!'

'বাকী দুজন শিকারী যখন আমাদের খোঁজ করতে এল, অজ্ঞান সেই লোক দুটিকে নিচে আমি তখন মড়ার মতো শুয়ে আছি।
?
?

ব্যাপার কী এখানে?
কে এদের এই দশা করল?

'তড়াক করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম আমি! আর তারপরেই...'
আ!

নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত শ্রীরাজেশ প্রোডাকশন্স-এর "হঠাৎ দেখা" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির [illegible] [illegible] পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যা রায়, সুস্মিতা সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও জহর রায়

রঙ্গজগৎ

চ্যাপলিন ও তাঁর "কাউন্টেস..."

চার্লস চ্যাপলিন জোর গলায় বলেছেন, তিনি ব্যর্থ নন। এবং ইংরেজ সমালোচকদের আবার 'নির্বোধ' আখ্যা দিয়েছেন। প্যারিসে "এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং" মুক্তি পাবার আগে তিনি সাংবাদিক সভায় বলেন, "ওরা (ইংরেজ সমালোচকরা) বলতে চেয়েছে আমি ব্যর্থ। একে সমালোচনা বলে না।"

চ্যাপলিন যখন এই কটুক্তি বর্ষণ করছিলেন তখন সাংবাদিকদের অনেকেই [illegible] হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলেন।

নিজের ছবি সম্পর্কে ৭৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ চ্যাপলিন বলেছেন, "এটি একটি মহৎ কমেডি, এতে মাধুর্য আছে, আছে আঙ্গিকের নতুনত্ব।"

চ্যাপলিন সম্ভবত বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়া সামলাতে পারেন নি। তাই প্রকাশ্যেই সাংবাদিকদের সমালোচনা করেছেন।

চ্যাপলিন যখন অনেককাল পর এই ছবির কাজ শুরু করেন তখন সাংবাদিকদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল : "আর কেন ?" ইতিপূর্বেই তাঁর আত্মজীবনী লেখা হয়ে গিয়েছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর স্থানটিও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে একটি 'লিজেণ্ড' হয়ে উঠেছিলেন। আবার কেন তিনি এ যুগের দর্শক ও সমালোচকদের কাছে পরীক্ষা দিতে এলেন। হয়ত এটাই শিল্পীর অহংকার। তিনি এ যুগের দর্শককে বুঝি জানাতে চেয়েছিলেন, তিনি নিঃশেষ হননি। চ্যাপলিনের বক্তব্যও অনেকটা তাই। তিনি বলেন, "আমি প্রমাণ করতে চাই, এখনও আমি কিছু করতে পারি। আমার সুইজারল্যাণ্ডের বাড়িটি খুবই আরামদায়ক। হেসেখেলে আমি সময় কাটাতে পারি। কিন্তু কাজের উৎসাহ আমার বেশী।"

চ্যাপলিনের প্রতি তাঁর নতুন ছবির শিল্পীদের সহানুভূতি অপরিসীম। সোফিয়া লোরেন বলেন, "সত্যি কথা, এ ছবি করবার কোন প্রয়োজন ছিল না চ্যাপলিনের। তাঁর খ্যাতি আবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হোক সেটাও দরকারী নয়। কিন্তু তিনি [illegible] তিনি কর্মক্ষম। এ যুগের মানুষের [illegible] তাঁরও কিছু বলবার আছে।"

বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত "উসকি কহানী"-র নায়িকা অঞ্জু মহেন্দ্রু

কান্না নয়

নিম্ন মধ্যবিত্তের নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি আধুনিক বাংলা নাটকে প্রায়ই দেখতে পাই। বাস্তবের এই করুণ রূপটি একালের নাট্যকারেরা দেখাতে সমর্থ। তবে দুঃখ-কষ্ট অনেক সময় নাটকে চরমে ওঠে। ঘটনাসূচীতে অবিশ্বস্ততার ছায়া পড়ে।

সলিল সেনের "কান্না নয়" সেদিক থেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। তবে নাট্যকার একাধিক চরিত্র-বিশ্লেষণে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। "কান্না নয়" এক দরিদ্র পরিবারের কাহিনী। গৃহস্বামী অমরেশ পঙ্গু। তার স্ত্রী জ্যোতির প্রতিজ্ঞা, হাসি-মুখে সে দুঃখকে বরণ করবে। স্বামী যতদিন জীবিত ততদিন কান্না নয়। অমরেশ একদা সুপ্রতিষ্ঠিত, কর্মঠ আত্মবিশ্বাসী ছিল। তার অতীতের সেই প্রত্যয় অসমর্থ অহংকারে রূপান্তরিত। যার অন্তর্জ্বালাই সম্বল। চরিত্রের এই ট্র্যাজেডি এবং অসহায়তা নাট্যকার সুন্দরভাবে এঁকেছেন। চরিত্র-চিন্তার দিক থেকে আরও বেশী উল্লেখ্য অমরেশের ছোট মেয়ে সুজাতা। সংসারের উপর, সমস্ত পৃথিবীর উপর সুজাতার রাগ। তার চারিদিকে সে দেখে শুধু ব্যর্থতা। কোন কিছুতেই সে ভরসা পায় না। নৈরাশ্য তার মনে যে প্রতিক্রিয়া এনে দিয়েছে তার বিষফল স্বার্থপরতা ও মূল্যবোধহীনতা। সুজাতাকে খুব 'রিয়্যাল' মনে হয়েছে। বিপরীত চরিত্রের মেয়ে সুজাতার দিদি অনিতা। সে নিঃস্বার্থ ও কষ্টসহিষ্ণু। মূল্যবোধের মূল্য তার কাছে অপরিসীম।

বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক এই কয়টি চরিত্র নিয়েই নাটকটি স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়েছে বেশ কিছু দূর। তারপরই দেখা দিয়েছে অঘটন—বাস্তবের বিচারে। অনিতা বাবার চিকিৎসার জন্যই অফিসের সহকর্মীর টাকা চুরি করেছে। অনিতার এই হঠাৎ-অপরাধ লজিক মেনে চলেনি। এই চুরি মুহূর্তের ভুল নয়। সুজাতার পক্ষে সম্ভব হলেও এই পদস্খলন অনিতার চরিত্রোচিত নয়। নাট্যকার শেষের দিকে মেলোড্রামার উপর নির্ভর করেছেন। একটির পর একটি আকস্মিক ঘটনার তালিকা রচনা করেছেন। যে স্বার্থলেশহীন তাকে দিয়ে এমন অসম্ভব আত্মত্যাগ করিয়েছেন যা মাটির জগতে সম্ভব নয়। সুজাতার দেহ কলুষিত করেছে এক সুযোগসন্ধানী উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য অনিতা (তখন সে বাগদত্তা) রাজী করিয়েছে তার প্রেমাস্পদ প্রভাতকে। অন্য উপায় কি কিছু ছিল না? প্রভাত ও অনিতার এই আত্ম-নিগ্রহের যুক্তি নেই। মায়াহীন মাটিতে
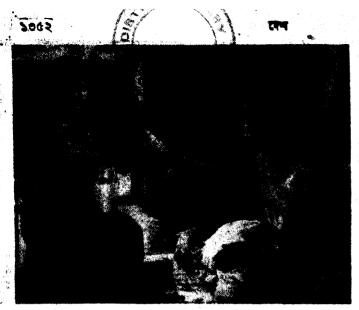
আসন্ন মুক্তিপ্রতীক্ষিত বি কে প্রোডাকশনস-এর "নায়িকা সংবাদ"-এ অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তম কুমার

আরও কিছু করুণ ঘটনা। অমরেশের মৃত্যুর জন্য ভুল করে তাকে ইঁদুর মারার ওষুধ খাওয়ানো, পুলিশের আগমন অথবা মাকে বাঁচাবার জন্য কারাবরণে উন্মুখ অনিতার মিথ্যা ভাষণ ইত্যাদি ঘটনার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বীকার করি, আবেগের উপকরণ এই পর্বে যথেষ্ট। নাট্যচমক পরিচালক-নাট্যকার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যা দর্শককে উৎকণ্ঠ করে রাখে। "কান্না নয়" দেখতে দেখতে আবেগ-কাতর দর্শকের কান্নাও পেতে পারে। কিন্তু এত সব কিছু যা দর্শককে দেওয়া হল তা বাস্তবের বিনিময়ে নয় কি?

তবু নাটকটি দেখতে ভাল লাগে, মন টানে। এর মূলে সুপরিচালনা ও চমৎকার টিম-ওয়ার্ক। আলো দাশগুপ্ত সেজেছেন জ্যোতি। খুবই স্বাভাবিক তাঁর কথা বলার ধরন ও চলাফেরা। মনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। মঞ্চাভিনয়ে এমন আতিশয্যহীন চরিত্রচিত্রণ বিশেষ দেখা যায় না। তবে এই চরিত্রের ধর্ম যেহেতু 'কান্না নয়' তাই সব সময়েই এমনকি আশংকার মুহূর্তেও মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হবে এর মানে কি? অমরেশের চরিত্রটিতে ভাল অভিনয় করেছেন সুশীল চক্রবর্তী। কনক রায়ের সুজাতা দর্শককে অবাক করবে। অনিতার ভূমিকায় উমা মেনাকের অভিনয় পরিশীলিত। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন প্রণব পাল, অমিতাভ মাইতি, শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মঞ্চসজ্জা সরল, সুন্দর। আলোকসম্পাত সন্তোষজনক। শ্রীসেনের সুষ্ঠু নাট্য-পরিচালনার কথা আগেই বলা হয়েছে। একটি মুহূর্ত অসাধারণ—যেখানে অন্ধকার মঞ্চে অমরেশ 'জ্যোতি জ্যোতি' বলে চিৎকার করছে।

একাকী

মঞ্চটি ছোট, নাটকটিও। কিন্তু বড় কিছু যেন পেয়ে গেলাম। অন্তত সেই অনুভূতি নিয়েই ফিরেছি। মনের মধ্যে যার অবশিষ্ট রইল বহুক্ষণ।

জ্যোতির্ময় বসুরায় একটি বিদেশী নাটক থেকে "একাকী" রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। চরিত্র সামান্য, ঘটনা আরও কম। সময় অল্প, মাত্র এক ঘণ্টা। তারই মধ্যে নাট্যকার নিপুণ শিল্পীর মত তিনটি মনের জটিলতা ও যন্ত্রণার চিত্র এঁকেছেন। চিত্রটি অস্পষ্ট, সেটা শিল্পের অস্পষ্টতা। মোটা আঁচড় নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনার ভঙ্গিতা নেই। আধুনিক জীবনের একটা জট লুকনো ছিল। দরজাটা ভেজানো। ঘটনার বেগে নয়, দুটি চারটি কথা দিয়ে দ্বার খুলে দিয়েছেন নাট্যকার। নিঃসঙ্গতার একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস আমাদের ছুঁয়ে গেল। একাকীত্বের মধ্যে নিজেকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন স্কুলের শিক্ষক প্রশান্ত। তার স্ত্রী পরপুরুষ-প্রণয়িনী। সেই ব্যক্তি বিজ্ঞানের মাস্টার তরুণ। স্ত্রী-পুরুষ ধাপে ধাপে নীচে নামে। পুরুষ নামতে নামতেও বুঝি হঠাৎ থামে, বিবেকের টানে, দংশনে। অনুতাপ ও আত্মজিজ্ঞাসার অবসরটুকু খুঁজে পায়। যাকে বঞ্চনা করেছে তার ক্ষমা না পেলে স্বস্তি পায় না। রবীন্দ্র-নাথের "নষ্টনীড়"-এর অমলের মনে এই অপরাধবোধ জেগেছিল। "একাকী"-র তরুণও এই আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পায়নি। সে প্রশান্তর কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। প্রশান্ত সবই শুনেছে, জেনেছে; নিজের মনের শূন্যতাকে একমাত্র সম্বলের মত আঁকড়ে ধরেছে। তার স্ত্রী মিলি আছড়ে ভেঙে পড়েছে, ডুকরে কেঁদেছে। তরুণ চলে যাবার পর নষ্টনীড়েই তারা রয়ে গেল। প্রশান্তর শেষ কথা, চল খাবার ঠাণ্ডা করে লাভ কি!

একাকী কে? ওরা প্রত্যেকেই। তবু প্রশান্তর ব্যথা বেশী করে বুকে বাজে। সব সুন্দরভাবে সে গড়ে তুলতে চায়। প্রতিদানে সে পায় উপহাস। প্রশান্ত অসামান্য নয়। তাকে 'ক্লাশ এইট-এর হিটলার' বলা হয়েছে বলে সে আঘাত পেয়েছে। প্রিয় ছাত্র তপনের শ্রদ্ধা ও উপহারের বস্তু পেয়ে মুহূর্তের জন্য সে নিজেকে সার্থক মনে করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্য-আবেগ দেখা দিয়েছে। এরও প্রয়োজনও

অরুন্ধতী দেবীর "ছুটি"-র মুক্তির আর বিলম্ব নেই—একটি দৃশ্যে মৃণাল মুখো-মুখোপাধ্যায় ও নন্দিনী

ফটো—দেশ

ছিল। এই ঘটনার পরেই মিলিকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করবার সুযোগ পেয়েছে তরুণ—যখন মিলি প্রশান্তকে জানিয়েছে তপন অসরল। সে কি প্রশান্তকে শুধু ব্যর্থই দেখতে চায়।

একাঙ্ক কিংবা একটি দৃশ্যের নাটক রচনার কাজটি বোধ হয় একাধিক অঙ্ক সৃষ্টির চেয়েও কঠিন। কারণ একাঙ্কের গতি জলের ধারার মত অবিচ্ছিন্ন, এর কোথাও যতি নেই। সেদিক থেকে "একাকী" একটি সার্থক একাঙ্ক। এক মুহূর্তের জন্যও মন্থর নয়। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা, নাট্যকার শ্রীবসুরায় নাট্য-চরিত্রের বাইরের কর্মজীবনের পরিচয় ও দায়-দায়িত্ব সব কিছুই অর্থাৎ নাটকের পরিমণ্ডল সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন এবং এহ বাহ্যের সঙ্গে আগে কহতবাটিও না-বলার মত করেই আমাদের অনুভবের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাই এই একাঙ্কের আকর্ষণ এমন অনিবার্য।

সামগ্রিক অভিনয় উঁচুদরের হলে এই নাটকের প্রভাব আরও গভীর হত। তবে প্রশান্তর ভূমিকায় কুমার শোভনের অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিত। সংবেদনশীলতার পরিচয় দীপালি চক্রবর্তীর (মিলি) চরিত্র-চিত্রণেও আছে। কিশোর অভিনেতা তরুণ দত্তকেও (তপন) ভাল লাগবে। ভিতেন দত্তর তরুণ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় দেবব্রত সরকার, প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী ও সীমা বিশ্বাস চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

সুদর্শনম প্রযোজিত এবং উত্তর কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চ অনন্য-অঙ্গনে অভিনীত এই নাটক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন কুমার সুশোভন।

সুরেশ সংগীত সংসদ

নবগঠিত সুরেশ সংগীত সংসদের উদ্বোধন রবিবার ২৯ জানুয়ারি উত্তরা সিনেমা-হলে। সকাল পৌনে নয়টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। উদ্বোধন করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। শ্রীঅশোককুমার সরকার সভাপতির আসনে থাকবেন। প্রধান অতিথি শ্রীপ্রীতি-কুমার রায় চৌধুরী।

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক, সংগীত-শিল্পী, সাংবাদিক এবং সংগীত রসিকদের নিয়ে সংসদ গঠিত। সংসদের সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ; সহ-সভাপতি—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীবনবিহারী মল্লিক, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রী[illegible] সেন; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক—[illegible] বসু, মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী; সহকারী সাধারণ সম্পাদক—শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করবেন হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, চিন্ময় লাহিড়ী, কমলা ত্যাগরাজন ও সুধীর চট্টোপাধ্যায়।

এই দিন প্রবীণ ধ্রুপদী শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যকে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা স্বর্ণপদক (মিউজিশিয়ান অব বেংগল—১৯৬৭) প্রদান করা হবে। স্বামী প্রজ্ঞানা-নন্দের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের ব্যালটে শ্রী ভট্টাচার্যই প্রচুর ভোটাধিক্যে এই বৎসর এই পদক লাভের অধিকারী হয়েছেন। এই বৎসর একজন কণ্ঠশিল্পীকেই এই পদক দেওয়া হবে বলে পূর্বে স্থির হয়।

"অভিশপ্ত চম্বল"-এ প্রযোজিকা-পরিচালিকা মঞ্জু দে ও প্রদীপকুমার

এস্ এফ সিনে ক্লাব

ভারতের প্রথম ও একমাত্র সায়ান্স ফিকশন সিনে ক্লাবের এক বছর পূর্ণ হলো! গত জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ক্লাবের আটটি ফিল্ম অধিবেশনে মেটরো-গোল্ডউইন-মেয়ার, ওয়াল্ট ডিসনী প্রোডাকশন্স, ইউনিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনাল, টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, সোভেক্সপোর্ট ফিল্ম এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছবি 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' ১৫ জানুয়ারী দেখানো হয়েছে প্যারাডাইসে। দ্বিতীয় ছবি 'ফ্যাবুলসা ওয়ার্ল্ড অব জুল ভার্ন' দেখানো হবে ১২ ফেব্রুয়ারী এবং পরবর্তী ফিল্ম হিচককের বিখ্যাত 'দি বার্ডস' ১৪ মে। তবে সম্ভাব্য ফিল্মগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—'মিস্টেরিয়াস আয়-ল্যাণ্ড' ওয়াল্ট ডিসনীর 'টোয়েনটি থাউজ্যাণ্ড লীগস আনডার দি সী' ও 'মাথম্যাজিকল্যাণ্ড', স্ট্যানলী কুবরিকের 'ডকটর স্ট্রেনজল্যাভ', চেকোস্লোভাক ফিল্ম 'ক্রাকটিট' ও 'ইকারাস এক্স-বি-ওয়ান', ফকসের 'জারনী টু দি সেনটার অব দি আর্থ' এবং এম-জি-এমের কয়েকটি আলোড়নকারী ছবি।

গীত-বীথিকার সমাবর্তন উৎসব

গীত বীথিকার সমাবর্তন উৎসব গত ২৫ ডিসেম্বর বসুশ্রী হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। তারপর গীত বীথিকার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য পরি-চালনা করেন বালকৃষ্ণ মেনন। রীণা দাশ-গুপ্তা, সন্ধ্যা নন্দী ও শিবশংকরণের নৃত্য প্রশংসনীয় হয়। কণ্ঠসংগীতে মায়া সেন, আশীষ সেনগুপ্ত ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রশংসার দাবি রাখেন।

এ ছাড়া শিক্ষায়তনের শিশুশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক একটি নৃত্যও পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বকুল সেনগুপ্ত।

ভ্রম সংশোধন

"বাংলা ছবি: ১৯৬৬" শীর্ষক প্রবন্ধে দেবেশ বাগচীকে ১৯৬৬ সালের নবাগত সংগীত পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রথম "শহীদ ক্ষুদিরাম" চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

গোয়া, দমন দিউ-র প্রশাসনিক সমস্যা এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। ১৯৬১ সালের ডিসেমবরে ভারত সরকার এক সামরিক অভিযানের সাহায্যে গোয়া, দমন, দিউ-কে সাড়ে চারশ' বছরেরও অধিককাল সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগালের কবল থেকে মুক্ত করে সেখানে সামরিক শাসন বলবৎ করেন। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি এক অরডিন্যানস জারি করে গোয়া, দমন, দিউ-কে একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত করেন। এই তিনটি অংগরাজ্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থাকবে, না পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি এখানকার জনমতের রায় জানবার উদ্দেশ্যে গণভোট গৃহীত হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, জনমতের অধিকাংশের রায় স্থিতাবস্থার পক্ষে। জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ যখন স্পষ্টই অন্য কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে নারাজ এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী, তখন মহারাষ্ট্র, মহীশূর, গুজরাট প্রভৃতি অংগরাজ্যের মত গোয়া, দমন এবং দিউ-ও অখণ্ড ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের রায়ই মেনে নিয়েছেন। এই ধরনের ভোট গ্রহণ ভারতে এই প্রথম। ভোট গণনার সংগে সংগেই গোয়ায় ৭ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এ পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

দেশী সংবাদ—

১৬ জানুয়ারি—অজ নাগার্জুন সাগর বাঁধের কাছে একটি বাঁশের ভারা ভেঙে দশজন নিহত এবং ৭৮ জন আহত হয়েছেন। নাগার্জুন সাগর হায়দরাবাদ থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে। ৫০ জন আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার সময়ে ভারার উপরে প্রায় একশ' জন কাজ করছিলেন।

কর্মচারী রাজ্যবীমা প্রকল্পের ভুয়া প্রেস-ক্রিপশন দেখিয়ে হাজার হাজার টাকার দামী ওষুধ নিয়ে এক শ্রেণীর লোক ফলাও চোরা-কারবার ফেঁদেছেন বলে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস সন্দেহ করছেন। এ সম্পর্কে পুলিস এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন।

১৭ জানুয়ারি—বছরে গড়ে কম করেও ৫৮ হাজার লোক ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে বৃহত্তর কলকাতায় আসছেন। ১৯৫১-৬১ এই দশ বছরে শুধু শহর কলকাতায়ই এসেছেন ৫ লক্ষ ৪২ হাজার। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশী চাকরি আজ অবাঙালীদের হাতে। বছরে তারা অন্তত ২৮ কোটি টাকা মানি অরডারে মুলুকে পাঠাচ্ছেন।

রায়বেরিলির অনতিদূরে গৌরের একটি নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সাধুদের দল এবং যাঁরা তাঁদের অর্থ সাহায্য করছেন, তাঁরা গোরক্ষা নিয়ে বড়ই মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী খরা-পীড়িত এলাকায় গরুর যত্নের জন্য কিছুই তাঁরা করেননি। তাঁরা একটিও গোশালা স্থাপন করেননি কিংবা একটি গরুকেও বাঁচাবার জন্য হাত বাড়াননি।

১৮ জানুয়ারি—সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রস্তাব করেছেন যে, সংসদ এমন একটি আইন প্রণয়ন করুক, যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগণ প্রাণহানি ঘটলেই পুলিশি গুলি-বর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে বাধ্য হবেন। ডাকাতি কিংবা অন্যান্য অপরাধের বেলায় পুলিশবৃন্দের ব্যাপারটিকে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া আইনজ্ঞদের পক্ষে কঠিন হবে না।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তর রাজ্য সরকার সমূহকে 'ইঁদুর-নিধন' ব্যাপারে আরও তৎপর" হওয়ার জন্য বলেছেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ইঁদুর মারার বিষ ক্রয় এবং ইঁদুর-নিধন ব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ সাহায্য দেওয়া হবে।

১৯ জানুয়ারি—আসামকে আঞ্চলিক ফেডারেশনরূপে পুনর্গঠনের কেন্দ্রীয় প্রস্তাব সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের অনুমোদন লাভ করলেও মিজো পার্বত্য-জেলাকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করার দাবি ত্যাগ করেননি।

গত দুমাসে বৃহত্তর কলকাতার রেশনিং এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার নতুন রেশন কারডের দরখাস্ত জমা পড়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন বিহার প্রদেশ থেকে এসেছেন। আর শতকরা ২৫ জন এসেছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে।

২০ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ২৮০টি বিধানসভা ও ৪০টি লোক-সভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ১৬ শতাধিক মনোনয়ন দাখিল করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র পেশের আজই শেষ তারিখ ছিল। বর্তমানে বিধানসভার ২৫১ জন লোকসভার ৩৬ জন—মোট ২৮৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ২৭১ জন এবার পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন।

২১ জানুয়ারি—ফিরোজপুরের সংবাদে প্রকাশ—রিটারনিং অফিসার আজ পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জ্ঞানী জইল সিং-এর মনোনয়নপত্রটি বাতিল করে দিয়েছেন। যে ভোটার তালিকায় জ্ঞানী জইল সিং-এর নাম নথিভুক্ত রয়েছে, তার একটা অনুলিপি নাকি জ্ঞানী জইল সিং তার মনোনয়নপত্রের সংগে জুড়ে দেননি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এখন আমূল পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ১৯৭৮ সালে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী নবম শ্রেণীতে উঠবেন, তাঁরা নতুন পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ১৯৭০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন বলে পর্ষদ-কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

২২ জানুয়ারি—ভারতকে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব শর্ত আরোপ করেছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সেগুলোর মর্ম প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমেরিকার খাদ্য সরবরাহের শর্ত অসম্মানজনক নয়। আমেরিকা জানিয়েছে, তার কাছ থেকে খাদ্য পেতে হলে কিউবা ও উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায় বন্ধ করতে হবে।

গোহাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে বাজালি গ্রামে ছজন দরিদ্র গ্রামবাসী ধান ক্ষেতে ইঁদুরের গর্ত থেকে চল্লিশ মণ ধান উদ্ধার করেছেন। এই ধান উদ্ধার করতে তাদের ১৬ দিন সময় লাগে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ জানুয়ারি—চীনের রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীলিউ শাও চি বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে পিকিং থেকে শিচিয়াচুয়ানে চলে গিয়েছেন। পিকিংয়ের কাছে ওই জায়গায় সদর দপ্তর স্থাপন করে মাওয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন।

১৭ জানুয়ারি—টোকিও-র এক সংবাদে প্রকাশ : নিজেদের মধ্যেই ষড়যন্ত্র, ব্যক্তি স্বার্থের প্রাবল্য এবং ভাঙনের কথা স্বীকার করে চীনা কমিউনিসট পার্টির মাওগোষ্ঠী গণমুক্তি ফৌজের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য মাও-পন্থী সব সংস্থাগুলিকে আজ ডাক দিয়েছে।

১৮ জানুয়ারি—সামরিক শিক্ষাদানের জন্য অফিসার বিনিময়ে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সম্মত হয়েছে। আজ ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুহার্তো ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী চাগলার মধ্যে জাকারতায় কয়েক মিনিটের আলাপেই উভয়ে এ-বিষয়ে সম্মত হন।

১৯ জানুয়ারি—চীনের লানচাও-তে মাও সে-তুং ও লিউ শাও চি-এর সমর্থকদের দুদিন ধরে একটানা রক্তাক্ত সংঘর্ষে হাজার দেড়েক সাংবাদিকী খতম হয়েছে। জয়ী হয়েছে লিউ শাও চি-র সমর্থকরা। লানচাও এখন পুরো-পুরি লিউ সমর্থকদের হাতের মুঠোর বলেই মনে হচ্ছে। খবরে আরও জানা গিয়েছে, ক্ষমতা দখলের জন্য চীনে দু' দলে যে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছে।

২০ জানুয়ারি—দুজন শীর্ষস্থানীয় মাও বিরোধী নেতা—পদচ্যুত সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল লো জুই-চিং এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী পো ই পো আত্মহত্যা করেছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল তেং সিয়াও-পিং সুপ্রীম কোরটের প্রেসিডেন্ট ইয়াং সিউ-ফেং আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

২১ জানুয়ারি—চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও নিজেই এবার কবুল করেছেন : সমগ্র দেশ জুড়ে গৃহযুদ্ধ চলছে। চীনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন পিয়াও।

২২ জানুয়ারি—চীনের লাল ফৌজ মাও সমর্থকদের ফৌজী নেতাদের নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মাও সমর্থকরা একের পর এক ফৌজী নেতাদের সংবাদ নিন্দাবাদ করায় লাল ফৌজের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। লাল ফৌজের এক কুদ্ধ প্রতিনিধি দল গতকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাইয়ের সংগে দেখা করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে বিপ্লবী নেতাদের উপর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য দাবি জানান।